দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিক পত্র

একবিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৪০

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—

চিত্রসূচি

আষাঢ়—১৩৪০

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রাবণ—১৩৪০

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৪০

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৪০

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৪০

বহুবর্ণ চিত্র

পুরুষ ও প্রকৃতি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আষাঢ়—১৩৪০

প্রথম খণ্ড	একবিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

মহাভারতে ভারত-যুদ্ধকাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

মহাভারত হইতে ভারতযুদ্ধ-কালের পূর্ব্বাপরসীমা অনুমানের উপায় আছে। কিন্তু তাহা যুদ্ধকালের গ্রহস্থিতি নয়, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ নয়, নানাবিধ দুর্নিমিত্ত-বিচার নয়। তখন কোন্ নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের আদি, ইহা দ্বারা কালের পূর্বাপর সীমা পাওয়া যায়। "ভারত সাবিত্রী" ধরিয়া তাহা আলোচনা করিতেছি। *

'ভারত-সাবিত্রী'

পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধকালে মহাভারতের বিরাট-পর্ব পাঠ বিহিত। বিরাট-পর্ব বিরাটই বটে। বিরাট-পাঠ করিতে না পারিলে কিম্বা পারিলেও ভারত-সাবিত্রী পাঠ বিহিত। গায়ত্রীর মধ্যে যেমন বেদ, ভারত-সাবিত্রীর মধ্যে তেমন মহাভারত সন্নিবিষ্ট। লোকে সমগ্র মহাভারত না জানুক, মহাভারতের ভূমিকা জানিতে পারে। গ্রন্থ-সংখ্যা অল্প, ৬০।৭০টি শ্লোক।

প্রথমে ব্যাস প্রণাম। পরে নারায়ণ নর ও সরস্বতী প্রণাম। পরে গ্রন্থারম্ভ। এখানে অষ্টাদশ পর্বের নাম আসিবার কথা। নামগুলি আছে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা। যুদ্ধে কে কে প্রধান যোধা, কে কে মহাবল, কে কে মহারথ, কেমনে তাঁহারা হত হইলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য মন্দাত্মা দুর্যোধন কেমনে হত হইলেন? সঞ্জয় বলিলেন, যুধিষ্ঠির পাঁচখানি গ্রাম যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন, দুর্যোধন সূচ্যগ্র ভূমিও দিলেন না। কেশব সন্ধি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন তাঁহার বাক্য শুনিলেন না। ইহার পরে কোন্ পক্ষে কে কে মহারথ ও মহাবল ছিলেন, তাঁহাদের নাম। কবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, কে কবে হত হইয়াছিলেন, কতদিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে এই যুদ্ধ যজ্ঞ-স্বরূপ হইয়াছিল। ইহার পর সাবিত্রী পাঠফল ও গ্রন্থ সমাপ্ত।

ভারত-সাবিত্রী ভারত-যুদ্ধের সারাংশ, যুদ্ধের স্মারক শ্লোক। ইহার রচনাকাল অজ্ঞাত। মহাভারতের

---

* 'ভারত-সাবিত্রী' পৃথক মুদ্রিত হইয়াছে কিনা জানিনা। পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি তাঁহার "আহ্নিককৃত্য" ২য় ভাগে ভারত-সাবিত্রী দিয়াছেন। আমি তাহা দেখিয়া লিখিতেছি।

টীকাকার নীলকণ্ঠ চারিশত বৎসর পূর্বে সাবিত্রী হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ প্রাচীন মনে হয়। পরে প্রমাণ পাওয়া যাইবে। শ্লোকে আর্ষ-প্রয়োগও আছে। ইহাও প্রাচীনতার প্রমাণ।

কবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল?

হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে॥

হেমন্তের প্রথম মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে ভারতযুদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেদিন যমনক্ষত্র (ভরণী নক্ষত্র) ছিল।

মাস না জানিলে তিথি নক্ষত্র দ্বারা দিন অবধারিত হইতে পারে না। মাস, চান্দ্র। ত্রিশ তিথিতে মাস। অমাবস্যার পর হইতে অমাবস্যা, না পূর্ণিমার পর হইতে পূর্ণিমা? কোন্ কোন্ মাসে হেমন্ত? পূর্বকালের পাঁজি স্মরণ না করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে না।

আমরা অমাবস্যার পরদিন হইতে মাস ধরিয়া অমাবস্যায় পূর্ণ করিতেছি। অর্থাৎ প্রথমে শুক্ল পক্ষ পরে কৃষ্ণপক্ষ। ইহা অমান্ত মাস, পাঁজিতে নাম মুখ্য চান্দ্র। কিন্তু ভারতের সর্বত্র সে বিধি নয়, পূর্বকালেও সে বিধি ছিল না। বেদের কালে পূর্ণিমার পরদিন হইতে মাস গণা হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণ হইত। পূর্ণিমা, পৌর্ণমাসী শব্দের অর্থ এই। অর্থাৎ প্রথমে কৃষ্ণপক্ষ পরে শুক্লপক্ষ। ইহা পূর্ণিমান্ত মাস, পাঁজিতে নাম গৌণচান্দ্র। উভয় মতেই মাস নাম এক, এবং শুক্লপক্ষে তিথির মাসও এক। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে একমাসের নামের অন্তর ঘটে। যথা, চিত্রে শু শুক্ল, কৃ কৃষ্ণপক্ষ। পূর্ণিমান্ত কার্তিক, অমান্ত কার্তিকের পনর তিথির পূর্বে আরম্ভ হয়। অথবা, অমান্ত মাস পূর্ণিমান্ত মাসের পনর

	কার্তিক		অগ্রহায়ণ	
অমান্ত	শু	কৃ	শু	কৃ	শু
পূর্ণিমান্ত	আশ্বিন		কার্তিক	অগ্রহায়ণ

তিথি পরে চলিয়া আসিয়াছে। এই পরিবর্তনের কারণ অবশ্য ছিল, এবং যতদূর জানি খ্রিষ্ট-পূর্ব ১৩৫৪ অব্দে অমান্ত-মাস-গণনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বেদের কাল হইতে পূর্ণিমান্ত মাস গণনা চলিয়া আসিতেছিল, পঞ্জিকা সংশোধনের নিমিত্ত তাহাকে এক পক্ষ আগাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু বৈদিক কর্মে পূর্ণিমান্ত ম[াস] চলিতে লাগিল। ঋষিরা দর্শ (অমাবস্যা) ও [পৌর্ণ]মাসীতে (পূর্ণিমায়) যাগ করিতেন। অর্থাৎ তা[াঁরা] প্রথমে অমাবস্যা পরে পূর্ণিমা দেখিতেন। তাঁহা[দের] রীতি অনুসারে পরবর্তী কালেও দর্শ পৌর্ণমাসী হইতে লাগিল। যেটা বহুকাল চলিয়াছিল, সে[টার] লোপ সহজে হয় না। এই কারণে উত্তর ভারতে [বি]সংবতের মাস পূর্ণিমান্ত, এবং এই কারণে আমা[দের] পাঁজিতেও দ্বিবিধ মাস লিখিত হইতেছে। (এই প্র[বন্ধে] মাস শব্দে সর্বত্র চান্দ্রমাস বুঝিতে হইবে।)

মহাভারতে দ্বিবিধ মাসের উল্লেখ আছে। য[থা] যুধিষ্ঠিরকে তীর্থযাত্রার উপদেশ কালে,

কৃষ্ণশুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ।৯৬।
("বঙ্গবাসীর") অ: ৮৪

এখানে প্রথমে কৃষ্ণ, পরে শুক্লপক্ষ।

অশ্বমেধ পর্বে শ্রবণাদি-নক্ষত্র গণনায়

অহঃ পূর্বং ততো রাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।২।
অ: ৪৪।

এখানে প্রথমে দিবা পরে রাত্রি, প্রথমে শুক্ল পরে [কৃষ্ণ]পক্ষ। শ্রবণাদি নক্ষত্র বহু পরবর্তীকালে (খ্রি-পূ ৩ [...] অব্দে) আরম্ভ হইয়াছিল। তখন প্রথমে শুক্ল প[রে] কৃষ্ণপক্ষ গণনা চলিতেছিল।

সাবিত্রী পূর্ণিমান্ত মাস গণিয়াছেন। ইহার প্রম[াণ] এখনই পাওয়া যাইবে।

তিনি কোন্ কোন্ মাসে হেমন্ত ধরিয়াছে[ন]? শারদ বিষুবের অগ্রপশ্চাৎ দুই মাস শরৎ। শরতের [পর] হেমন্ত। আমরা আশ্বিন-কার্তিক শরৎ, এবং অগ্রহায়[ণ] পৌষ হেমন্ত ধরিতেছি। কিন্তু পূর্বকালে ঋতু আ[গে] পরে হইত, বিষুব পিছাইয়া আসিয়াছে, শরৎ ও হেমন্ত আসিয়াছে। উপরে বলিয়াছি, সাবিত্রী পূর্ণিমান্ত ম[াস] গণিয়াছেন, এবং উভয়মতে পূর্ণিমার নাম একই। অশ্বি[নী] নক্ষত্রে বিষুব বর্তমানের নিকট কাল, হইতে পারে না। কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুব উদ্দিষ্ট হইতে পারে। বিষুবে কার্তি[ক] পূর্ণিমা হইলে কার্তিক অগ্রহায়ণ দুইমাস শরৎ, এবং পৌ[ষ] মাঘ দুইমাস হেমন্ত। তখন পৌষ, হেমন্তের প্রথম মাস বিষুবে কার্তিক পূর্ণিমার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে।

সাবিত্রী লিখিয়াছেন, হেমন্তের প্রথমমাসের শুক্ল-ত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। পৌষ মাঘ হেমন্ত, অতএব পৌষের শুক্ল ত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। পৌষের কৃষ্ণপক্ষ অতীতে শুক্লপক্ষে যুদ্ধ। ইহার পরে মাঘের কৃষ্ণপক্ষ। ত্রয়োদশীর পরে কে কোন্ তিথিতে হত হইয়াছিলেন, তাহা দেখিলেই কৃষ্ণপক্ষ মাঘ পাওয়া যায়।

অর্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘমাসেঽসিতাষ্টমী।
নবম্যান্তু ত্রিগর্তানাং হতো রাজা মহাবলঃ॥
দশম্যাং ভগদত্তশ্চ একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ।
দ্বাদশ্যামর্ধরাত্রে চ হতো বীরো ঘটোৎকচঃ॥
ত্রয়োদশ্যান্তু মধ্যাহ্নে ভারদ্বাজো নিপাতিতঃ।
চতুর্দশ্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্তনো হতঃ।
ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাটদ্রুপদৌ হতৌ।
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ চ হতো যথা॥
অমাবস্যান্তু মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্যএব চ।
অমাবস্যান্তু সন্ধ্যায়াং রাজা দুর্যোধনো হতঃ॥

সাবিত্রী পর পর তিথি ধরিয়া যোদ্ধার নাম করিয়াছেন। মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্ম, ত্রয়োদশীর মধ্যাহ্নে দ্রোণ, চতুর্দশীর সন্ধ্যাকালে কর্ণ, অমাবস্যার মধ্যাহ্নে শল্য, অমাবস্যার সন্ধ্যায় দুর্যোধন হত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে জানিতেছি পৌষ মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া দশম দিবসে মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্ম, এবং অষ্টাদশ দিবসে অমাবস্যায় দুর্যোধন হত হইয়াছিলেন। শুক্ল ত্রয়োদশী হইতে পরের অমাবস্যা ১৮ তিথি বটে, কিন্তু দ্রোণ ৪॥০ দিন, কর্ণ ১॥০ দিন, যুদ্ধ করিয়াছিলেন, মোট ১৭ দিন। মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী ১১ দিন হইতেছে! এই অনৈক্যের হেতু পরে প্রদর্শিত হইবে।

কে কতদিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

দিনানি দশ ভীষ্মেণ ভারদ্বাজেন পঞ্চ চ।
দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যেনার্ধদিনং তথা।
দিনার্ধন্তু গদাযুদ্ধমেতদ্ ভারতমুচ্যতে॥

মহাভারত বলেন, ভীষ্ম দশদিন, দ্রোণ পাঁচদিন, কর্ণ দুইদিন, শল্য অর্ধদিন ও দুর্যোধন অর্ধদিন যুদ্ধ করিয়া-করিয়াছিলেন। মোট ১৮ দিন। (কিন্তু বাস্তবিক ১৭ দিন।)

সাবিত্রী হইতে পাইতেছি, কার্তিক পূর্ণিমায় বিষুব হইত। নইলে পৌষ মাঘ হেমন্ত হইতনা। ইহা বায়ু মৎস্য বিষ্ণুপুরাণও লিখিয়া গিয়াছেন। এমন স্পষ্টার্থে লিখিয়াছেন যে তাহা হইতে বৎসর গণিতে পারা যায়। অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ, এই ২।০ নক্ষত্রে কার্তিক মাস। খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৩৬ অব্দে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বিষুব এবং পূর্ণিমা হইয়াছিল।* সেটি কার্তিক পূর্ণিমা। কিন্তু বিষুব নিরন্তর কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে ছিল না, ক্রমশঃ পিছাইয়া কৃত্তিকার আদিতে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রেবতীর চতুর্থ পাদ, অশ্বিনী ও ভরণী, এই ২।০ নক্ষত্রে কার্তিক মাস হইত। খ্রি-পূ ১৬৯৭ অব্দে কৃত্তিকার আদিতে বিষুব ও কার্তিক পূর্ণিমা হইয়াছিল। ইহার পরে খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে ভরণীর তৃতীয় পাদান্তে বিষুব আসিয়াছিল। তখন কৃত্তিকা আর প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইত না। তখন ভরণী প্রথম নক্ষত্র।

খ্রি-পূ ১৮৩৬ অব্দের পূর্বে নক্ষত্র-চক্রের বিভাগ ছিল, কিন্তু কৃত্রিম বিভাগ ছিল না। তখন কৃত্তিকা তারা-পুঞ্জের পর এক নক্ষত্রপাদ দূরে বিষুব আসিলে এবং পূর্ণিমা হইলে কার্তিক পূর্ণিমা হইত। ইহা খ্রি-পূ ২৪৭৯ অব্দের কথা। অতএব কৃত্তিকা কাল দুইটি পাইতেছি।

এখন জিজ্ঞাস্য, সাবিত্রী কোন্ কালের, অথবা দ্বিবিধ নক্ষত্রচক্র-বিভাগের কোন্ কালের কার্তিকী পূর্ণিমা গ্রহণ করিয়াছেন? ইহার উত্তর দুরূহ, তথাপি ক্রমশঃ প্রকাশ্য অন্যান্য প্রমাণ হইতে মনে হয় কৃত্রিম বিভাগের কৃত্তিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দুইটি তথ্য পাইতেছি, (১) সাবিত্রী মতে ভারত যুদ্ধ খ্রি-পূ ১৮৩৬ অব্দের পরে হইয়াছিল, (২) তখন কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইত। মহাভারতে ইহার প্রমাণ আছে। যথা, অনুশাসন পর্বে (অঃ ৬৪) কৃত্তিকা

* এখন সৌর ৭ই আশ্বিনে বিষুব হইতেছে। এই দিন আশ্বিন শুক্ল সপ্তমী হইতে পারে। তখন কার্তিক পূর্ণিমায় বিষুব হইত। অর্থাৎ তদবধি ৫৩ তিথি পিছাইয়া আসিয়াছে। ১ তিথি পিছাইতে ৭১ বৎসর, ৫৩ তিথিতে ৩৭৬৩ বৎসর গিয়াছে। খ্রি-পূ ১৮৩: বৎসর পাওয়া যাইতেছে।

হইতে এক এক নক্ষত্রে দানফল কীর্তিত হইয়াছে। পুনশ্চ, উক্ত পর্বে (অঃ ৮৯) এক এক নক্ষত্রে শ্রাদ্ধবিধি-বর্ণনায় কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মহাভারতে ভরণী হইতে, অশ্বিনী হইতে নক্ষত্র গণনার উল্লেখ নাই। না থাকিলেও খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে ভরণীর তৃতীয় পাদান্তে থাকিবার উল্লেখ কথাপ্রসঙ্গে আছে। অতএব বলিতে পারি, ইহার পূর্বে কৃত্তিকা কাল চলিয়াছিল, পরে ছিল না। সাবিত্রীমতে খ্রি-পূ ১৮৩৬ হইতে ১৩৫৪ অব্দের মধ্যে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। আরও বলিতে পারি, খ্রি-পূ ১৬৯৭ হইতে ১৩৫৪ অব্দের মধ্যে হইয়াছিল। কারণ খ্রি-পূ ১৬৯৭ অব্দে কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র হইয়াছিল।

বৎসরের প্রথম মাস দ্বারাও উক্ত অনুমান সমর্থিত হইতেছে। মহাভারতে মার্গশীর্ষ প্রথম মাস। অনুশাসন পর্বে (অঃ ১০৬) এই মাস হইতে পর পর দ্বাদশ মাসের নাম আছে। এইরূপ উক্ত পর্বে (অঃ ১০৯) দ্বাদশ মাসের বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম আছে। এখানে মার্গশীর্ষ প্রথম মাস। ভগবদ্গীতায় "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং," মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ প্রথম।

বিষুবের পরের মাস বৎসরের প্রথম মাস। উপরে আমরা শারদ বিষুব ধরিয়াছি। যদি কার্তিক পূর্ণিমায় শারদ বিষুব হয়, মার্গশীর্ষ নিশ্চয় প্রথম মাস হইবে। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। বিষুব কৃত্তিকা হইতে ভরণীতে আসিয়া ৯৬০ বৎসর ভোগ করিয়া খ্রি-পূ ৬৩৪ অব্দে অশ্বিনীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ভরণী নাম হইতে মাসের নাম নাই। রেবতীর চতুর্থ পাদ, অশ্বিনী, ভরণী, এই ২৷৹ নক্ষত্র লইয়া কার্তিক মাস চলিতেছিল। অতএব বিষুব রেবতীর তৃতীয় পাদান্তে পর্যন্ত যত কাল ছিল, কার্তিক মাসও ততকাল বর্ষান্ত মাস গণ্য হইত। অর্থাৎ খ্রি-পূ ১৩৫৪—৯৬০=৩৯৪ অব্দ পর্যন্ত কার্তিক মাসে বর্ষ শেষ হইত, এবং মার্গশীর্ষ প্রথম মাস গণ্য হইত। এইরূপে জানিতেছি, খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দ হইতে প্রায় ২০০০ বৎসর মার্গশীর্ষ প্রথম মাস চলিয়াছিল। অতএব গীতার উক্তি হইতে এইটুকু জানিতেছি, ইহা খ্রি-পূ ৪০০ অব্দের এদিকে নয়।

অবশ্য এতাবৎকাল কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র ছিল না। কৃত্তিকার পর ভরণী প্রথম নক্ষত্র হইয়াছিল। ইহার উল্লেখ অন্যগ্রন্থে আছে। ভরণীর পর অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র হইয়াছিল। ইহা খ্রি-পূ ৬০০ অব্দের কথা। তদবধি অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র হইয়াছে, এবং পুরাণে অশ্বিন্যাদিনক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী হইয়াছে। তদবধি আশ্বিন মাসে বর্ষান্ত হইতেছে, ও কার্তিক বৎসরের প্রথম মাস। মহাভারতে কোন্ নক্ষত্র প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইয়াছে, ইহাই চিন্তনীয়। ভারত-সাবিত্রী না দেখিলেও কৃত্তিকা পাওয়া যাইত। কোন্ তিথিতে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, সেটা অকিঞ্চিৎকর বিষয়।

(১) সাবিত্রী-বাক্য

এখন যুদ্ধের আরম্ভ দিন দেখি। হেমন্তের প্রথম মাসে যুদ্ধ। ইহা কেবল ভারত যুদ্ধে নয়, পূর্বকালে যুদ্ধারম্ভের ও সৈন্যযানের কাল এই ছিল। ইহার হেতুও স্পষ্ট। মহাভারতের কালে পৌষমাস হেমন্তের প্রথম মাস ছিল। কিন্তু এই মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ, এ কথা সাবিত্রী কোথায় পাইলেন? মহাভারতে পাইতেছি, গদাযুদ্ধকালে—

রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্বণি বিশাম্পতে।১০।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, হে মহারাজ, তখন ঘোরতর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইল, গণিলে পর্ব (পনর তিথি, পঞ্চদশী) না হইলেও রাহু সূর্যকে গ্রাস করিল।

গদাযুদ্ধ দিনে সত্য সত্য সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল কি-না, তাহা বৎসর না জানিলে পরীক্ষার উপায় নাই। কিন্তু অমাবস্যা ঠিক। চতুর্দশীতে অমাবস্যা, অসাধারণ নয়, এবং সাবিত্রী যে যে তিথির যে যে সময়ে ভীষ্মদ্রোণাদির পতন বলিয়াছেন, তাহাতে মোট যুদ্ধ ১৭ তিথি আসে। কিন্তু যদি অমাবস্যায় যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপূর্বে শুক্লত্রয়োদশীতে আরম্ভ না করিলে ১৮ তিথি পাওয়া যায় না।

সাবিত্রীর কর্তা যিনিই হউন, তিনি মহাভারত যেমন পাইয়াছিলেন, তেমন পড়িয়া সাবিত্রী করিয়াছিলেন। তাঁহার কালে ঐতিহ্যও চলিয়া আসিতেছিল, ইহাতেও তাঁহার সাহায্য হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধারম্ভ দিনে নক্ষত্র ভরণী ছিল, সাবিত্রী এ কথা কোথায় পাইলেন? বিপুল মহাভারতের কোথায় কি

আছে, কোন্‌টি কাল্পনিক দুর্নিমিত্ত, কোন্‌টি সত্য, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। সেদিন ভরণী হইলে কি দাঁড়ায়, প্রথমে দেখি। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে পৌষ পূর্ণিমা ৬০ তিথি, শুক্লত্রয়োদশী ৫৮ তিথি। ৫৮ তিথিতে প্রায় ৫৬.৪ নক্ষত্র, দুই নক্ষত্র-চক্র গতে তৃতীয় নক্ষত্র। যদি কার্তিক পূর্ণিমা রেবতীর দ্বিতীয় পাদে হইতে পারিত, তাহা হইলে পৌষ শুক্লত্রয়োদশীতে নক্ষত্র ভরণী হইত। কিন্তু কার্তিক পূর্ণিমা রেবতীর দ্বিতীয় পাদে হইতে পারে না। পৌষ শুক্লত্রয়োদশী ভরণীতে হইতে পারে না।

আমরা পূর্বকালের পাঁজি গণিবার পদ্ধতি জানি না। যদি কোনও কারণে এক বৎসর আশ্বিন মাসকে কার্তিক বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ একমাস কাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাবিত্রী-বাক্য সত্য হইবে। অথবা সাবিত্রী স্বসময়ের মাস দেখিয়া ভরণী লিখিয়াছেন। তখন আশ্বিন পূর্ণিমায় বিষুব হইত, কার্তিক পূর্ণিমায় নয়। তখন আশ্বিন কার্তিক শরৎ হইয়াছিল। ইহা খ্রি-পূ ৪০০ অব্দের পরের কথা। পরে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যেও এইরূপ পাওয়া যাইবে। অতএব বোধহয়, এই বাক্যে সাবিত্রী ভ্রমে পড়িয়াছেন, স্ব-সময়ের পাঁজি লিখিয়াছেন।

সাবিত্রীর তিথি ও দিন নানা বৎসরে পাওয়া যায়। একারণ ইহাদ্বারা যুদ্ধ-বৎসর নির্ণীত হইতে পারে না। বর্তমান পাঁজি হইতে উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি পূর্বকালের দুই বৎসর উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কেতকর-নির্মিত ও সূর্যসিদ্ধান্তাশ্রিত তিথিনক্ষত্র-সারণি দৃষ্টে গণিত হইল। মহাভারতের কালে চন্দ্রসূর্যের মধ্যগতি লইয়া তিথিনক্ষত্র গণিত হইত। এখানে তাহাই করা গেল। স্পষ্টগতি ধরিলে মাত্র দুই এক দণ্ডের অন্তর হইত।

খ্রি-পূ ১৪৪০। (মাস পূর্ণিমান্ত)

১৩ সেপ্তম্বর কার্তিক পূর্ণিমা ॥০ দং, অশ্বিনী ৪২ দং।
৯ নভেম্বর পৌষ শুক্লত্রয়োদশী ৬ দং, রোহিণী ৫৪ দং।
১১ „ পৌষ পূর্ণিমা ॥০ দং।
১৭ „ মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী ৫৮ দং।
২২ „ „ „ ত্রয়োদশী ৫৩ দং।
২৪ „ „ অমাবস্যা ৫১ দং, পূর্বাষাঢ়া ২৪ দং।

এখানে একটু ভাবিতে হইবে। সাবিত্রী তিথি গণিয়াছেন। তিথি গণিবার কি রীতি ছিল? সূর্যাস্ত-তিথি না সূর্যোদয়-তিথি? উপরে সূর্যোদয়-তিথি দেওয়া গিয়াছে। বেদের কালে তিথি-জ্ঞানের উৎপত্তি রাত্রিতে হইয়াছিল, তিথি শব্দের মূলেও রাত্রি। মহাভারতে রাত্রি অর্থে তিথি, দুই তিন স্থানে আছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে সূর্যাস্ত কালে যে তিথি, পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে তিথি। ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, নবরাত্র, প্রভৃতি শব্দের এইরূপ অর্থ। অর্থাৎ প্রথমে রাত্রি পরে দিবা। পূর্ণিমান্ত মাসেও প্রথমে কৃষ্ণ পরে শুক্ল পক্ষ। এই তিথি গণনা ধরিলে উল্লিখিত তারিখ দাঁড়াইবে—

৯ নভেম্বর পৌষ শুক্ল ত্রয়োদশী। যুদ্ধারম্ভ।
১৮ „ মাঘ কৃষ্ণ অষ্টমী। ভীষ্মের পতন।
২৩ „ „ „ ত্রয়োদশী। দ্রোণের পতন।
২৫ „ „ অমাবস্যা। দুর্যোধনের পতন।

এখানে যুদ্ধারম্ভ দিনের ভরণী নক্ষত্র পাওয়া গেল না। যুদ্ধ ১৮ দিনও ঘটিল না, ১৭ দিন হইল।

খ্রি-পূ ৪০০। (মাস পূর্ণিমান্ত)

৩ সেপ্তম্বর আশ্বিন পূর্ণিমা রেবতী।
৩১ অক্টোবর মার্গশীর্ষ শুক্লত্রয়োদশী ভরণী।
৯ নভেম্বর পৌষ কৃষ্ণাষ্টমী।
১৬ „ পৌষ অমাবস্যা মূলা।

এখানে তিথি-নক্ষত্র মিলিতেছে বটে, কিন্তু আশ্বিন কার্তিক শরৎ হইয়াছে। যুদ্ধ ১৭ দিন।

(২) শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মবাক্য

মহাভারতে আর এক যুদ্ধারম্ভ দিন আছে। সাবিত্রী শোনেন নাই, কিম্বা মানেন নাই। উদ্‌যোগ পর্বে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব রাজধানী যাত্রা করিলেন। সেদিন,—

কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে।
স্ফীতশস্যসুখে কালে

অঃ ৮৩।৭।

রেবতীনক্ষত্র-যুক্ত কার্তিক মাস। শরৎ অন্ত, হিম আরম্ভ, এবং ধান্য স্ফীত হইয়াছে।

'কৌমুদ' শব্দে কার্তিকমাস ধরিতে হইতেছে। কারণ ইহার পর হেমন্ত আসিয়াছিল। অতএব আশ্বিন কার্তিক

শরৎ, অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত। অতএব খ্রি-পূ ৪০০ অব্দের পরের উক্তি।

প্রথমে দেখি মাস পূর্ণিমান্ত না অমান্ত। শ্রীকৃষ্ণ পথে একদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তদনন্তর দিন-কয়েক কৌরব গৃহে থাকিয়া দৌত্যকর্মে ব্যর্থ হইয়া প্রত্যাগমন কালে কর্ণকে বলিয়াছিলেন, এখন মাস 'সৌম্য,' শিশির সুখকর।

সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদমাবাস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামে যুজ্যতাং তস্যাং তাং হ্যাহুঃ শক্রদেবতাম্ ॥১৮॥

অঃ ৪৪২।

আজি হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে। সেদিন ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা) নক্ষত্র। সেদিন সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। যুদ্ধারম্ভে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র প্রশস্ত।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ কৌরব গৃহে সাতদিন ছিলেন, এবং কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ণকে যুদ্ধারম্ভের দিন বলিয়া আসিয়াছিলেন, অতএব মাস পূর্ণিমান্ত, এবং অগ্রহায়ণ অমাবস্যা যুদ্ধদিন স্থির হইয়াছিল।

মাস অমান্ত ধরিলে এটি কার্তিক (দীপালী) অমাবস্যা। অমাবস্যায় চন্দ্র-সূর্য এক নক্ষত্রে থাকে। চন্দ্র জ্যেষ্ঠায়, সুতরাং সূর্যও জ্যেষ্ঠায় ছিল। অশ্বিনী হইতে গণিলে জ্যেষ্ঠা অষ্টাদশ নক্ষত্র, ২৪০° অংশে ইহার অন্ত। সৌর বৈশাখ হইতে গণিয়া গেলে অষ্টম মাস সৌর অগ্রহায়ণে না আসিলে ২৪০° অংশ পাওয়া যায়না। কিন্তু মাসটি কার্তিক, তাহাতেও ভুল নাই। অতএব সে বৎসর এক চান্দ্রমাস বাড়িয়াছিল। গত ১৩৮ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাস দুইটি হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠাযুক্ত অমাবস্যা সৌর অগ্রহায়ণের ২৩শে পড়িয়াছিল।

ভীষ্মদেব যুদ্ধের দশম দিবসে শরশয্যাগ্রহণ করিয়া ৫৮ রাত্রি তদবস্থায় থাকিয়া মাঘ শুক্লাষ্টমীতে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনুশাসন পর্বে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

পরিবৃত্তোহি ভগবান্ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ ॥২৬॥
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শযানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা ॥২৭॥
মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥২৮॥

অঃ ১৬৭।

দিবাকর বিনিবৃত্ত হইয়া উত্তরায়ণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজি আমার ৫৮ রাত্রি শরশয্যায় গত হইল, মনে হইতেছে যেন শতবর্ষ। হে যুধিষ্ঠির, সৌম্য মাঘ মাস সম্যক গত হইয়া একভাগ অবশিষ্ট আছে, পক্ষ শুক্ল বটেই। (কারণ মাস পূর্ণিমান্ত।)

'ত্রিভাগশেষঃ মাসঃ', ইহার অর্থ হঠাৎ মনে হয় মাসের তিনভাগ অবশিষ্ট আছে। নীলকণ্ঠ এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু গত চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাভারতের দ্রোণ পর্ব (অ ১৮৭।১) হইতে 'ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্তত' শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন, 'ত্রিভাগশেষঃ' পদে ত্রিভাগ-গত বুঝিতে হইবে। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব মাঘমাসের ত্রয়োবিংশতিথিতে শুক্লপক্ষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

'অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ' ৫৮ রাত্রি। রাত্রি অর্থে তিথি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন,—

পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।

অঃ ৫১।১৪।

হে কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের ৫৬ 'দিন' অবশিষ্ট আছে। এখানে 'দিন' অহোরাত্র। ৫৮ তিথিতে ৫৬ দিন হইতে পারে।

একটা উদাহরণ লইয়া মিলাইয়া দেখি। বৎসরটি খ্রি-পূ ৪০০ অব্দের পরের হইলে কার্তিক পূর্ণিমায় শরদন্ত হইবে। সে বৎসর একমাস বৃদ্ধিও চাই।

খ্রি-পূ ৩৬৮। (মাসপূর্ণিমান্ত)

২০ অক্টোবর	কার্তিক পূর্ণিমা কৃত্তিকা।	
৩ নভেম্বর	অগ্রহায়ণ অমাবস্যা জ্যেষ্ঠা। যুদ্ধারম্ভ।	
১২ „	„ শুক্লনবমী। ভীষ্মের পতন।	
২০ „	পৌষ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া পুষ্যা।	
		যুদ্ধ সমাপ্ত।
৮ জানুআরি	মাঘ শুক্ল সপ্তমী। পরদিন	ভীষ্মের স্বর্গারোহণ।

শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের পতনের তিথি বলেন নাই। শুক্লনবমী

না হইলে দশদিন ঘটেনা। অগ্রহায়ণ শুক্লনবমী হইতে মাঘ শুক্লসপ্তমী ৫৮ তিথি (বা ৫৭ দিন) গত হইয়াছিল।

পূর্বে দেখা গিয়াছে,ভারত সাবিত্রী মাঘ শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মের স্বর্গারোহণ জানিতেন না। জানিলে তিনি কৃষ্ণাষ্টমী লিখিতেন না। ভীষ্মদেব উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, ৫৮ রাত্রি শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন, ইহা সামান্য কথা নয়। সাবিত্রীর মহাভারতে কথাটা ছিলনা, অথবা তাঁহার কালে কথাটির উৎপত্তি হয় নাই। তিনি রেবতীযুক্ত কার্তিকমাসে শরদন্ত দেখিয়াছিলেন। অতএব খ্রি-পূ ৪০০ অব্দে মহাভারতে ভীষ্মাষ্টমী ছিল না। কোন কবি ইহার পরে এই অদ্ভুত ঘটনা জুড়িয়া দিয়াছেন। কোন কারণে মাঘ শুক্লসপ্তমীতে রবির উত্তরায়ণ বিখ্যাত হইয়াছিল, কবি তাহা স্মরণীয় করিয়াছেন। গত বৎসর অগ্রহায়ণ ও পৌষের "প্রবাসী"তে খ্যাতির মূল অন্বেষণ করা গিয়াছে। তাহাতে খ্রি-পূ ২০৫ অব্দে আসিতে হইয়াছে। এই কাল অক্লেশে গণিতে পারা যায়। এখন ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ হইতেছে। এই দিন পৌষ শুক্লসপ্তমী হইতে পারে। শুক্লসপ্তমী হইতে পারে। মাঘ শুক্লসপ্তমী ৩০ তিথি। তিথি প্রতি ৭১ বৎসর। অতএব ২১৩০ বৎসর গত হইয়াছে, খ্রি-পূ ১৯৪ অব্দ পাইতেছি।

(৩) বলরাম বাক্য

শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বলিয়াছিলেন, আগামী অমাবস্যায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে 'সংগ্রামে যুজ্যতাং'। 'যুজ্যতাং' অর্থে নীলকণ্ঠ বুঝিয়াছেন, সংগ্রাম-সাধন-কলাপ একত্র করিবে। এই অর্থ হইতে পারে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে সংগ্রামের অনুকূল কৃত্য করিবে এবং পরে সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। ইতিপূর্বে বলদেব পুষ্যানক্ষত্রে দ্বারকা হইতে তীর্থযাত্রা করিয়া কুরুক্ষেত্র শিবিরে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রবণা নক্ষত্রে অপরাহ্নে দুর্যোধন ভীমের গদাযুদ্ধ নিরীক্ষণ করেন। শল্যপর্বে তিনি বলেন,—

> চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বেচমে নিঃসৃতস্যবৈ।
> পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ ॥৬॥
>
> অঃ ৩৪।

আমি পুষ্যানক্ষত্রে যাত্রা করিয়া আজি ৪২ দিনের দিন শ্রবণায় পুনরাগত হইয়াছি।

বলদেব মাস ও তিথি বলেন নাই। ইহার সহিত সাবিত্রী বা কৃষ্ণবাক্যের ঐক্য নাই। বোধ হইতেছে বলদেব আশ্বিন-কার্ত্তিক শরৎ মাস অমান্ত ধরিয়াছেন। শ্রবণা অমাবস্যা এক বিখ্যাত তিথি। মহাভারতে (আদি অঃ ৭১, অশ্বমেধ অঃ ৪৪) বিশ্বামিত্র যে নূতন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রবণা অমাবস্যা সেই। এই তিথি ও নক্ষত্রে রবির উত্তরায়ণ হইত। খ্রি-পূ ৩১৪ অব্দের ঘটনা। এখানে একটা উদাহরণ দিই, ইহা একটু পূর্বের হইলেও ক্ষতি নাই।

খ্রি-পূ ৩৭১। (মাস অমান্ত)

১৪ নভেম্বর	অগ্রহায়ণ শুক্ল তৃতীয়া পুষ্যা।		বলদেবের যাত্রা।
৯ ডিসেম্বর	পৌষ	শুক্ল ত্রয়োদশী মৃগশিরা।	যুদ্ধারম্ভ।
১৮ „	„	কৃষ্ণাষ্টমী।	ভীষ্মের পতন।
২৫ „	„	অমাবস্যা শ্রবণা।	যুদ্ধ সমাপ্তি।

ভারত-সাবিত্রী গদাযুদ্ধ দিনের শ্রবণা নক্ষত্র শোনেন নাই। শুনিলে যুদ্ধারম্ভ দিন মৃগশিরা নক্ষত্র লিখিতেন। অতএব সাবিত্রী খ্রি-পূ ৪০০ হইতে ৩০০ অব্দ মধ্যে রচিত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে, যে কবি যে তিথি ও নক্ষত্র স্মরণীয় ও বিখ্যাত মনে করিয়াছিলেন, তিনি মহাভারতে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু পরস্পর ঐক্য নাই।

সমবলোকন

সাবিত্রী-বাক্য কি শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম-বাক্য কি বলদেব-বাক্যদ্বারা যুদ্ধকাল অবধারিত হইতে পারেনা। এই সকল বাক্য মিলাইতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। কৌতূহল তৃপ্ত হয়, মূলপ্রশ্ন পড়িয়া থাকে। কিন্তু কৃত্তিকা নক্ষত্র অটল অচল হিমালয় বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন চারি পাঁচটি বাক্যে পরীক্ষিতের কাল লিখিত আছে। প্রত্যেকের মূল স্বতন্ত্র। একটি অপরটির অনুবন্ধ নয়। সে সকল বাক্য হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া দিতেছে, উত্তর পার্শ্ব নয়।

উত্তর পার্শ্বে ষণ্মাতৃকা তারাপুঞ্জময় কৃত্তিকা। এই কারণে খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে না গিয়া ইহার সহস্রবর্ষ পরে আসিতে হইতেছে। তখন কৃত্রিম কৃত্তিকা নক্ষত্র-চক্রের আদি ছিল। শারদ বিষুবের তিনমাস অন্তে রবির উত্তরায়ণ হইয়া থাকে। মার্গশীর্ষ পৌষ মাঘ এই তিন মাস গতে মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। প্রসিদ্ধি আছে, যুদ্ধের পর কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পাঁজিতেও আছে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগোৎপত্তি। এই কলি বৃহৎ কলি নয়। বৃহৎ কলি খ্রি-পূ ৩১০২ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারাও তারাপুঞ্জময় কৃত্তিকা তিরোহিত হইতেছে। কারণ ইহার কাল খ্রি-পূ ২৪৪৯ হইতে ২২০০ অব্দ।

কৃত্তিকানক্ষত্র দ্বারা যুদ্ধকালের পূর্বাপর সীমা পাওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ বৎসর? মহাভারতে আদিপর্বে ২য় অধ্যায়ে বৎসরটি লিখিত আছে,

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
স্যমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥

কলি ও দ্বাপরের অন্তর কালে স্যমন্তপঞ্চকতীর্থ কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব-সেনার যুদ্ধ হইয়াছিল।

ইহার ব্যাখ্যা দুই এক কথায় হইতে পারেনা। ইহার সহিত অন্যান্য যাবতীয় প্রমাণ মিলাইয়া মনে করি খ্রি-পূ ১৪৫৫ অব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল।

তুমি সব

৺সুরবালা ঘোষ

তুমি সব, তুমি সব।
কঠোর সংসার-পথে বাঞ্ছিত বান্ধব।
তুমি স্বর্গের শিশির, পুণ্য মন্দাকিনী নীর,
সুধাংশুর সুধা তুমি মন্দার আসব।

তুমি সার, তুমি সার।
তুমি বিনা এ হৃদয়ে কিছু নাহি আর।
শুষ্ক এ সংসার-মরু, তাহে তুমি কল্পতরু,
চরণ-ছায়ায় প্রাণ জুড়ায় আমার।

তুমি আলো, তুমি আলো।
বিমল প্রভাতে নিত্য নব বিভা ঢালো।
নয়নের জ্যোৎস্না তুমি, তোমা-হারা অন্ধ আমি,
সোণার এ বিশ্বরাজ্য তোমা বিনে কালো।

তুমি প্রাণ, তুমি প্রাণ।
মম কায়া ছায়া সদা করে তব ধ্যান।
তুমি স্বর্গ, তুমি শোভা, এ হৃদয়-মনোলোভা,
সুখ সাগরেতে ডুবি মুদিয়া নয়ান।

তুমি দুখ, তুমি সুখ।
নিরখিলে ও মূরতি উথলে এ বুক;
হৃদয়-সাগর মোর, তোমার পরশে ভোর,
এ হৃদি-সিন্ধুর ইন্দু তব ইন্দুমুখ।

তুমি সব, তুমি সব।
জীবন-সর্ব্বস্ব মর্ত্তে অমরা বিভব।
তুমিই সোণার কাঠি, তুমিই রূপার কাঠি,
তুমি এলে বাঁচি প্রাণে, চলে গেলে শব।

শেষ পথ

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(১)

অনেক দিনের কথা।

নদীর ধারের লম্বা পথ দিয়া তারা হাঁটিয়া চলিয়াছিল —একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার একটি গ্রাম—শরতের শোভায় ভরপূর।

গ্রামের বসতি যেখানে শেষ হইয়াছে তার পর শুধু বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের পাশ দিয়া গ্রামের সড়ক চলিয়াছে উত্তর দিকে—একটু হেলিয়া দুলিয়া কিন্তু সোজা উত্তর মুখে—দিগন্তের গায় গিয়া তার শীর্ণ রেখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে আর একটি গাঁয়ের ঘন গাছপালার ছায়ার তলে। দূরের সে গাঁখানি যেন দিগন্তের নীলিমার বুকে গাঢ় সবুজের ছোপ হইয়া ফুটিয়াছে, তার মাথায় নিবিড় বৃক্ষরাজির চূড়ায় একটা এলোমেলো রেখার বিচিত্র শোভা।

পথের এক পাশে মাঠ—সবুজ ধানের একটা বিপুল আয়তন। পবনের ঈষৎ হিল্লোলে লীলায়িত। মাঝে মাঝে তার থোপা থোপা কাশের ঝাড়। উপরে স্বচ্ছ নীল আকাশের গায় থোপা থোপা সাদা মেঘের স্তূপ,— ভূমি ও আকাশ যেন রঙের খেলায় পাল্লা দিতেছে।

আর এক পাশে ছোট্ট একটি নদী—স্বল্পতোয়া কিন্তু খরস্রোতা। তার ওপারে একটু দূরে দিগন্ত-বিস্রান্ত প্রকাণ্ড বিল। তার বুকে রাশি রাশি পদ্ম জলের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝি আকাশের রবিকে ছুঁইবার ব্যর্থ দুরাশায়। চারিদিক দিয়া নির্ম্মল নীলিমা দিগন্তের শেষে ঘন বৃক্ষের নিবিড় হরিৎ রেখা চুম্বন করিয়া একটা স্ফটিকের ঢাকনার মত পৃথিবী ঢাকিয়া রহিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র—পথে জনমানব নাই। মাঠ ঘাট আকাশ আপন মনে সুধু আপনার বিচিত্র শোভা ছড়াইয়া সাজিয়া বসিয়া আছে।

সেই পথের উপর দিয়া তারা দুটি মন্থর গমনে চলিয়াছে—গলায় গলায়।

মেয়েটির বয়স দশ-এগার—ছেলেটি বড় জোর তের। কিন্তু দুজনেই খর্ব্ব, দেখিতে শিশুর মত।

শিশুর অহেতুক চঞ্চলতার প্রেরণায় সুধু তারা চলিয়াছে ভর দুপুরে ঘরের শান্ত আশ্রয় ছাড়িয়া মাঠের পথে। কোনও প্রয়োজন তাদের নাই—পথে যাইতে যাইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুধু নূতন নূতন প্রয়োজন জন্ম লইতেছে।

মেয়েটির হাতে ছিল একটি লম্বা ডাঁটাযুক্ত সাদা সাপলার ফুল। মেয়েটি কথা কহিতে কহিতে অন্যমনস্ক ভাবে ডাঁটা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া একটা মালা রচনা করিতেছে। ছেলেটি পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ কখনও একটা ঢিল কুড়াইয়া লইয়া একটা পাখীকে মারিতেছে—কখনও বা পথের ধারের ঝোপ ঝাড় হইতে বৃথাই পাতা ছিঁড়িতেছে। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে তারা চলিয়াছে যেন দিগন্তের পথের দুটি ক্ষুদ্র যাত্রী।

ছেলেটি কালো, মেয়েটি ফরসা। ছেলেটি খানসামা শ্রেণীর কায়স্থের ছেলে, মেয়েটি তাঁতির মেয়ে। ছেলেটির বাপ জমীদার বাড়ীর খানসামা, মেয়েটির বিধবা মা ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে বাসন মাজে, রান্নার যোগান দেয়।

ছেলেটির নাম গোপাল, মেয়েটির নাম শারদা।

যারা ইহাদের অভিভাবক তারা করে চাকরী—দিন রাত তাদের মুনিব-বাড়ীতে কাজ করিতে হয়। ছেলে-মেয়ে দুটি তাই আগাছার মত অযত্নে বাড়িয়া উঠিতেছে। সারা দিন ও সন্ধ্যার অনেকটা সময় তারা "দস্যিপণা" করিয়াই বেড়ায়। কোথায় তারা কখন থাকে তার খবর রাখে সুধু গাছপালা, ফলফুল, পশুপাখী।

একটা বক জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বসিয়া ছিল, শিকারের সন্ধান পাইয়া তার ধব্‌ধবে সাদা গলাটা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিল। চোখে পড়িতেই গোপাল তাকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। বকটা তার তুষারশুভ্র ডানা মেলিয়া নীল আকাশের পটে এক অপূর্ব্ব চলচ্চিত্র আঁকিয়া উড়িয়া গেল।

অনেকক্ষণ পথে চলিতে চলিতে গোপাল বলিল, "ঈ-ই-স! কত পদ্ম!"

মেয়েটির হাতের সাপলার মালা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে চাহিয়া দেখিল। হঠাৎ উৎসাহে তার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "চল্‌ আনি গা।"

বাক্য ব্যয় না করিয়া ছেলেটি তার সংক্ষিপ্ত বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মেয়েটি তার হাতের ফুল ফেলিয়া দিয়া তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইয়া তাদের দুটি নগ্ন সিক্ত মূর্ত্তি পরমুহূর্ত্তেই ওপারে লাফাইয়া উঠিল। ছুটিতে ছুটিতে তারা গিয়া পরপারে বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হুড়ামুড়ি ছুটাছুটি করিয়া তারা পদ্মবনে একটা ভীষণ উৎপাত লাগাইয়া দিল। ফুল সংগ্রহ করিল গোটা দশেক কিন্তু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা ফুল।

তার পর তারা ফিরিল। সাঁতার কাটিয়া এপারে আসিয়া পরিত্যক্ত বসন দিয়া তারা গা মুছিল। তার পর সেই কাপড় পরিয়া যেই তারা তাদের ফুলের বোঝা তুলিতে যাইবে অমনি একজনের লম্বা চুল ও অপরের কর্ণ একজন বলিষ্ঠ পুরুষের হস্তে হঠাৎ নিপীড়িত হইয়া উঠিল।

চোখ তুলিয়া তারা দেখিল, কালান্তক যমের মত তাহাদের কেশ ও কর্ণ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কানাই সিকদার—গোপালের পিতা—এবং স্বয়ং জমীদার-বাড়ীর খানসামা।

কানাই যে সব বাক্য সে সময়ে প্রয়োগ করিল তাহা খুব শক্তিশালী হইলেও ভদ্রসমাজে তার অনেক কথাই উচ্চারণের যোগ্য নয়। এবং দুটি বালক বালিকা পৃষ্ঠে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সব আঘাত লাভ করিল, বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষেও তাহা অশোভন হইত না। কিন্তু গোপাল ও শারদা এরূপ সম্ভাষণে অভ্যস্ত। এবং যদিও তারা যথারীতি তারস্বরে চীৎকার করিল, তথাপি প্রত্যাবর্ত্তন পথে তারা মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত ভূলুণ্ঠিত পদ্মের রাশির দিকে অপাঙ্গে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ছাড়িল না।

কানাই সিকদার সেদিন হঠাৎ অসময়ে বাড়ী ফিরিয়াছিল। এ সময়টা জমীদার-বাড়ীতে বাবুদের স্নানাহারের সময়। এ সময় কানাই কখনও বাড়ী আসে না। কিন্তু আজ আসিয়াছিল। একজন প্রজার কাছে সে দুই টাকা ঘুস পাইয়াছিল—তার মনে হইল টাকাটা সঙ্গে থাকিলে হারাইয়া যাইতে পারে, তাই ছুটিয়া একবার বাড়ী গিয়াছিল। বাড়ীতে গোপালকে না দেখিয়া সে সুধু একবার বিনা কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল গোপাল কোথায়? যখন সে শুনিল গোপালকে শারদার সঙ্গে উত্তর দিকে যাইতে দেখা গিয়াছে তখন সে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। এই দুইটির সংযোগের ফলে ইতিপূর্ব্বে অনেক বিপ্লব ঘটিয়াছে—তাই সে ক্ষেপিয়া উঠিল। অনুসন্ধানের ফলে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিয়া, নিজের বাড়ীতে না গিয়া সে গেল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুকুর পাড়ে।

শারদার মা দুর্গা সেখানে এক কাঁড়ি বাসন লইয়া তখনও মাজিতেছে।

কানাই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখ তাঁতি বউ,"—

তাঁতি বউ মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

কানাই বলিল, "দেখ তাঁতি বউ, তুমি যদি তোমার মেয়্যারে না সামলাও তবে একদিন ও আমার হাতেই মইরবো।"

তাঁতি বউ তড়াক করিয়া উঠিয়া আসিল। চক্ষের নিমেষে কানাইয়ের হাত হইতে শারদাকে ছিনাইয়া

লইয়া সে তার পিঠে মারিল প্রকাণ্ড এক চড়। মারিবার হেতুর অনুসন্ধানে সে বৃথা সময়ক্ষেপ করিল না।

শারদা হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সিকদার মহাশয়কে কিন্তু তাঁতি বউ কোনও নম্র বিনয়-বাক্যে সম্ভাষণ করিল না। বরং পরের ছেলে-পুলে এবং বিশেষতঃ 'মেয়ে সন্তানের' গায় হাত তোলার ধৃষ্টতার জন্ম উচ্চ কণ্ঠে তীব্র তিরস্কার করিল এবং কানাইয়ের মুখের সামনে বহুবিধ হস্ত চালনার সহিত তাকে সমঝাইয়া দিল যদি কাহারও সন্তানকে সামলাইবার দরকার হইয়া থাকে তবে সে গোপালকে। ও দস্যি ছেলেটাই মেয়েটাকে "টালাইয়া" লইয়া যায়—এক দণ্ড যদি মেয়েটা ঘরে থাকে।

কানাই তখন নিজের বংশধরের সপক্ষে এবং শারদার বিপক্ষে বহুবিধ দৃষ্টান্ত প্রয়োগে অশেষ পরুষতা সহকারে অনেকগুলি কথা বলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা কণ্ঠ-বিক্রমে কানাইয়ের বাক্য-প্রচেষ্টা নিষ্ফল করিয়া দিয়া প্রচণ্ডবেগে তার তিরস্কার চালাইল।

দীর্ঘকাল এ কোলাহল চলিল। লোকজন জমিয়া গেল।

ক্রমে কানাই প্রকাশ করিল যে এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত শারদাকে বিবাহ না দেওয়াতেই যত দোষ জন্মিয়াছে, এবং এই বয়স পর্য্যন্ত শারদার বিবাহ না দেওয়ায় দুর্গার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিল।

প্রত্যুত্তরে দুর্গা অনেক কথাই বলিল এবং প্রসঙ্গক্রমে কানাইর দুশ্চরিত্রের বিশদ ব্যাখ্যান করিল।

কানাই পুকুরের পাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল, যে "মাগীর" এত "ত্যাল" ভাল নয়, এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে সে যদি সত্য সত্যই কানাই সিকদার হয় তবে দুর্গার এ ত্যাল সে "পাড়িবে"।

দুর্গা তার উত্তরে জমীদার-বাড়ীর খানসামার "ত্যালের" কথা উল্লেখ করিয়া যাহা বলিল তাহা অশ্রাব্য।

দীর্ঘ কাল কলহের পর কানাই যাইবার সময় শাসাইয়া গেল যে দুর্গা যদি সাত দিনের মধ্যে তার অতীতযৌবনা কন্যাকে পাত্রস্থ না করে তবে কানাই তাকে একঘ'রে করিয়া ছাড়িবে।

দুর্গা তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বিবিধ বক্তৃতা করিতে করিতে ঘাটে নামিয়া গেল, এবং খুব জোরে জোরে ঘোকনো মাজিতে মাজিতে অনর্গল তার অসম্পূর্ণ বক্তৃতা চালাইয়া গেল। এ সব বিষয়ে দুর্গার বক্তব্য কখনই সম্পূর্ণ হইত না।

যাহাদের লইয়া এ উৎপাত, তাদের কথা ইহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ঝগড়ার প্রারম্ভে শারদা যে চড় খাইয়াছিল তাহাতে সে কিছুক্ষণ তারস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রমে থামিয়া গিয়াছিল। কানাই ঠিক তখনই গোপালের কাণ ছাড়িয়া দিয়াছিল, কেন না দুর্গার সঙ্গে কলহে হাত নাড়ার বিস্তর প্রয়োজন ছিল। মুক্তি পাইয়া গোপাল এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর যখন লোক জমিয়া গেল, তখন পা টিপিয়া পিছাইয়া সে ক্রমে দর্শকদের দলে ভিড়িয়া গেল। তার পর সে আর দুই পা পিছাইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। তার পর তার খোঁজ-খবর লওয়া কেহ আবশ্যক বোধ করিল না।

শারদা যেখানে পড়িয়া কাঁদিতেছিল সেইখানেই কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর যখন দেখিল যে গোলটা বেশ বাধিয়া উঠিয়াছে, তখন সেও উঠিয়া এক পায় দুই পায় সরিবার জোগাড় করিতেছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় কানাই বেগে প্রস্থান করায় দুর্গার চক্ষু ছুটি ছুটি পাইয়া হঠাৎ শারদার উপর পড়িয়া গেল। শারদা পলায়নের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া দুর্গা তার পিঠের উপর আর দুইটা প্রচণ্ড চড় বসাইয়া তাকে টানিয়া ঘাটে লইয়া গেল এবং সেখানে বসাইয়া তাকে বাসন মাজিতে বলিল।

শারদা কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসন মাজিতে লাগিল।

বাসন মাজা শেষ হইলে দুর্গা শারদাকে লইয়া মনিব-বাড়ী গেল। তখন বেলা গড়াইয়া আসিয়াছে। বাসনগুলি তুলিয়া রাখিয়া সে তার জন্য বাড়াভাতের ঢাকা খুলিয়া মেয়ের সঙ্গে খাইতে বসিল।

আহারান্তে যখন মা ও মেয়ে বাড়ী ফিরিতেছে তখন শারদা দেখিতে পাইল পথে একটা বেত ঝোপের আড়াল হইতে গোপাল তাহাকে ইসারা করিতেছে। তার মনটা ভয়ানক ছট-ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু মায়ের পাশ হইতে সরিয়া যাইতে সাহস হইল না। সে ইসারা করিয়া গোপালকে সে কথা জানাইল।

শারদা কিন্তু মায়ের পাশ ছাড়িয়া পশ্চাতে হাঁটিতে লাগিল এবং চলিতে চলিতে একটু পিছাইয়া পড়িল।

একটা ঝোপের পাশ দিয়া পথটা বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই বাঁক ফিরিয়া যখন দুর্গা ঝোপের আড়ালে চলিয়া গেল তখন কানাই ছুটিয়া আসিয়া শারদার হাতে এক ঝোপা পদ্মফুল দিয়া বলিল, "আনচি সে ফুল!" বলিয়া নিজের বাহাদুরীতে সে হাসিয়াই খুন।

গোপালকে যখন কানাই টানিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন তার মনটা পড়িয়া ছিল সেই পরিত্যক্ত পদ্মফুলগুলির কাছে। তাই যেই সে ছাড়া পাইল অমনি সে ছুটিয়া সেই উত্তরের পথে ছুটিল। সেই স্থানে গিয়া দেখিল পদ্মফুলগুলি সেখানে তেমনি পড়িয়া আছে। উৎফুল্ল হইয়া সে সেগুলি কুড়াইয়া লইল এবং কাপড় চাপা দিয়া সে সেই ফুল বুকের কাছে লুকাইয়া গোপন পথে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়া শারদার সন্ধানে গেল।

অনেকক্ষণ তার অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। শেষে যখন শারদার দেখা পাওয়া গেল তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

শারদা ফুলগুলিকে আঁচল দিয়া ঢাকিয়া ঘরে লইয়া গেল। গোপাল পরম আনন্দে রিক্ত হস্তে বাড়ী চলিয়া গেল। সে জানিত যে ওই পদ্মের একটা পাপড়ীও তার হাতে যদি কানাই দেখিতে পায় তবে তার পিঠে একখানা গোটা চেলাকাঠ গুঁড়া হইয়া যাইবে।

(২)

কানাই সুধু বৃথা শাসাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। সে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া তাঁতি বউকে 'সমাজে বন্ধ দিবার' উদ্যোগ করিয়াছিল।

আর বন্ধ হইবার কথাও তো বটে। শারদার একটা দুটো নয়, এগার বার বছর কাটিয়া গিয়াছে। এত বড় ধুবড়ো মেয়ে ঘরে রাখিয়া দুর্গা যে কি সাহসে গাঁয় বাস করে তাহা গ্রামের লোকে ভাবিয়া পাইল না। ষাট বছর আগের কথা, তখন এগার বছরের অবিবাহিতা কন্যা ভদ্রঘরে অনাহারের কারণ হইত, তাঁতির ঘরে তো তার অস্তিত্বই লোকে কল্পনা করিতে পারিত না। তবু দুর্গা শারদাকে বিবাহ দেয় নাই। এমন কথা নয় যে তার মেয়ে বিবাহ দিবার সঙ্গতি নাই। কেন না মেয়ে বিবাহে তার খরচ তো কিছু নাই-ই, বরং নগদ কিছু প্রাপ্তির আশা আছে। তাঁতির ঘরের মেয়ে টাকা দিয়া কিনিতে হয়। অতএব শারদার বিবাহ না দেওয়াটা দুর্গার পক্ষে একটা দারুণ ব্যভিচার সে বিষয়ে কার সন্দেহ থাকিতে পারে?

অগ্রহায়ণ মাসে ঘোঁটটা বেশ পাকাইয়া উঠিল। তখন জমীদার-বাড়ীতে একদিন দুর্গার তলব হইল।

দুর্গা দেখিল বিষম বিপদ। শারদার বিবাহের বহু প্রস্তাব তার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু কোনও প্রস্তাবই দুর্গার লোভ মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া সে বিবেচনা করিতে পারে নাই। কুড়ি পঁচিশ টাকা পণে এমন সুন্দরী কন্যার বিবাহ দেওয়া তার পক্ষে গুরুতর লোকসান বলিয়া মনে হইয়াছিল। তার মনে মনে আশা ছিল যে এমন একটি বর সে পাইবে যার ঘরে খাইবার যথেষ্ট সংস্থান আছে এবং যার কাছে কন্যার সঙ্গে সে নিজে গিয়া অবশিষ্ট জীবন সম্পন্নভাবে কাটাইয়া দিতে পারে। সেই বরের সন্ধান সে এখনও পায় নাই।

জমীদার-বাড়ী গিয়া সে দেখিল যে তার জাতির যারা সমাজপতি তারা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে দুর্গা অযথা ধুবড়ো মেয়ে ঘরে রাখিতেছে এবং তাকে 'একঘরে' করা সঙ্গত। এ বিষয়ে সমাজপতিরা জমীদারের আদেশ ভিক্ষা করিতেছে। পাছে বরের অভাবঘটিত আপত্তি ওঠে তাই তারা তিনটি যোগ্য পাত্র সহ উপস্থিত হইয়াছে,—তাদের প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা পণ দিতে প্রস্তুত আছে।

দুর্গা দেখিল এ কুম্ভীপাক হইতে তার উদ্ধারের উপায় নাই। তাই সে কাঁদিয়া জমীদারের দরবার ভাসাইয়া দিল। সদর নায়েব এবং জমীদার স্বয়ং তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না; সে অতি সহজ কথাও বুঝিতে চায় না, কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর কোনও কথার দেয় না, সুধু হাঁউমাউ করিয়া কাঁদে আর আপনার মত কথা বলিয়া যায়।

দুর্গা বলে, তার দুধের মেয়ে—তাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে?

জমীদার বুঝান, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মেয়েকে সবারই

পরের ঘরে পাঠাইতে হয়—স্বয়ং জমীদার বা জমীদার-গৃহিণী সে নিয়ম হইতে ছাড়া পান নাই। অতএব—

দুর্গা বলে, তার কোলের মেয়েটুকু—ক'দিনেরই বা? একে পরের ঘরে পাঠাইয়া কেমন করিয়া থাকিবে?

জমীদার আবার যুক্তি দিয়া বৃথা বুঝাইতে যান।

দুর্গা আবার বলে তার দুধের মেয়ে।

কেউ ধমক দিয়া ওঠে। দুর্গা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে। তার বুড়া থাকিলে আজ তাকে লোকে এমনি কথা বলিতে সাহস পাইত না—সে গরীব বিধবা—তার কেউ নাই—ইত্যাদি।

ক্রমে জমীদার বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সেদিনকার বৈঠকে হুকুম হইয়া গেল যে এক মাসের মধ্যে যদি শারদার বিবাহ না হয় তবে দুর্গা 'জাতে বন্ধ' হইবে।

দুর্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু লাল করিয়া ফেলিল।

বাড়ী ফিরিয়া দুর্গা দেখিল যে শারদা ঘরে নাই। তার থাকিবার কথাও নয়। কেন না, দু দণ্ড ঘরে চুপ করিয়া থাকা শারদার কোষ্ঠিতে কোনও দিনই লেখে নাই।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুর্গা শারদার সন্ধানে বাহির হইল। এক জায়গায় খবর পাইল যে শারদাকে গোপালের সঙ্গে যাইতে দেখা গিয়াছে।

শুনিয়া দুর্গা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আবাগের বেটা দস্যি ছেলে তার হাড় জ্বালাইয়া খাইবে এই সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া সে ছুটিল এই দস্যিযুগলের সন্ধান করিতে।

তখন অঘ্রাণ মাস। দেশ হইতে জল নামিয়া গিয়াছে—খালবিল শুকনো খটখটে হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে যা জল আছে তাতে কাপড় বাঁচাইয়া পায় হাঁটিয়া পারাপার করা চলে। মাঠের উপর ধানের ক্ষেত সোণার রঙে রাঙিয়া শস্যভারে আনত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষেতের আইলের উপর এক জায়গায় বসিয়া গোপাল ও শারদা মহাব্যস্তভাবে ব্রতের আয়োজন করিতেছে। কতকগুলি কচুপাতা সংগ্রহ করিয়াছে। একটা ছোট্ট গর্ত্ত করিয়া তাতে জল ভরিয়া পুকুর করিয়াছে, দূর্ব্বা ও ফুলও কিছু সংগ্রহ করিয়াছে, আর বাড়ী হইতে একটা প্রদীপ আনিয়া তাহা জ্বালিয়াছে।

অঘ্রাণ মাসে প্রতি রবিবার পূর্ব্ববাঙলার এই অংশে হিন্দুরা নাটাই বর্ত্ত করিয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ ছেলে মেয়েদের ব্রত। ব্রতকথা অনুসারে এই ব্রত অশেষ ফলপ্রসূ; ইহাতে দূরের ধন উড়িয়া আসে, অবিবাহিতের বিবাহ হয়, অপুত্রকের পুত্র হয় ইত্যাদি। ব্রত কথায় আছে এক সওদাগরের দুটি ছেলেমেয়ে বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত ও গৃহবহিস্কৃত হইয়া পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে মাঠের ভিতর গিয়া হঠাৎ স্মরণ করিল যে সেদিন অঘ্রাণ মাস, রবিবার—তাদের নাটাই ব্রতের দিন। তারা তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিয়া, ধানের শীষ ভাঙ্গিয়া পিঠা করিয়া কোনও মতে ব্রতরক্ষা করিয়াছিল।

আজ হঠাৎ গোপালের খেয়াল হইয়াছিল যে তারা ক্ষেতের মাঝখানে গিয়া ঠিক সেই রকম করিয়া নাটাই বর্ত্ত করিবে। প্রস্তাবটা শুনিয়া শারদা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তারা দুজনে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিছু মালমসলা সংগ্রহ করিয়া মাঠের দিকে চলিয়া আসিয়াছিল।

অন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে তারা বিচার করিতে লাগিল যে ধানের শীষ হইতে পিঠা কিরূপে প্রস্তুত করা যায়। শারদা বলিল যে ঢেঁকি কিম্বা জাঁতা বা অন্ততঃ শীল নোড়া না হইলে এ কার্য্য কিছুতেই সম্ভব হয় না।

গোপাল বলিল যে, ধনপতি সদাগরের পুত্রেরা হঠাৎ মাঠের মাঝখানে এই সব যন্ত্র নিশ্চয় পায় নাই।

শারদা বলিল, তাহাদিগকে নাটাই চণ্ডী ঠাকুরাণী স্বয়ং কোনও অতিপ্রাকৃত উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, নতুবা ধান হইতে চাল বাহির করিয়া তাহা গুঁড়াইয়া পিঠা তৈয়ার করা তাদের অসম্ভব হইত।

গোপাল বলিল, বর্ত্ত হইলে তবেই না নাটাই চণ্ডী আসিবেন—বর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবতারা কখনই আসিয়া বর্ত্ত করিতে সহায়তা করেন না।

শারদা বলিল, যারা দেবীর বিশেষ প্রসাদের পাত্র তাদেরকে তিনি সর্ব্বদাই সাহায্য করেন; ব্রত সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা করেন না।

খুব জোরের সহিত গোপাল বলিল, "তুই ছাই জানস্।"

শারদা বলিল, "তুই ছাই জানস্, পুরুষে পিঠার কথা কি জানে ?"

পরস্পরের জ্ঞান ও অজ্ঞান বিষয়ে তর্ক এতদূর অগ্রসর হইয়া উঠিল যে শেষে গোপাল শারদার গণ্ডে এক চপেটাঘাত করিয়া বসিল। শারদা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং গোপালকে নখের দ্বারা আক্রমণ করিল। গোপালের প্রতিদান আরও তীব্র হইয়া উঠিল—এবং শারদা তারস্বরে চীৎকার করিয়া বাড়ীর পথে ফিরিতে লাগিল।

গোপাল তার পথ আগলাইয়া দাড়াইয়া বলিল, "বর্ত্ত না সাইর‍্যা যাস্ কোথায় ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে দৃঢ়কণ্ঠে শারদা বলিল, "আমি করুম না বর্ত্ত।"

"তোর বাপে ক'রবো—আয় শীগ্‌গির।"

আরও জোরে শারদা বলিল, "করুম না আমি।"

সুর আরও চড়াইয়া গোপাল বলিল, "করন লাইগবো তর,—চল্।" বলিয়া সে শারদার চুল চাপিয়া ধরিল।

শারদা ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই সময় মাঠের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দুর্গা তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিল, "শারদী—ও শারদী—শারদী লো !"

যখন সে চীৎকার শারদীর কাণে গেল তখন সে নিজের কান্না থামাইয়া কাণ খাড়া করিয়া শুনিল। তার পর সে চীৎকার করিয়া কান্নার সুরে বলিল, "এই যে আমি !"

মা ডাকিল, "ক'নে ?"

আবার উত্তর হইল "এই যে।"

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া ডাকিতে ডাকিতে দুর্গা অগ্রসর হইল।

ভয় পাইয়া গোপাল বলিল, "দেখ্, খবরদার। আমার নাম কইস্ না কইল।"

শারদা তীব্রকণ্ঠে কহিল, "কমু না ? খুব কমু। ক্যান কমু না ?"

খুব শাসাইয়া গোপাল বলিল, সে কিছুতেই বলিতে পারিবে না।

শারদাও সমান তীব্রতার সহিত উত্তর করিল, সে বলিবেই।

দুর্গার কণ্ঠস্বর সন্নিকট হইয়া উঠিল। পলায়নে বিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া শেষে গোপাল বলিল, "কস্ যদি তবে তোর শরীলে একখান হাড্ডি আস্তা রাখুম না।" বলিয়া সে দ্রুতবেগে ক্ষেতের আইল দিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

দুর্গা যখন শারদার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন শারদা একলা দাঁড়াইয়া আছে, তার পশ্চাতে আছে তার নাটাইবর্ত্তের আয়োজন।

শারদাকে দেখিয়া দুর্গার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। সে দমাদম তার পিঠে দুই চারটা কীল চড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিস্তর গালিগালাজ করিয়া শেষে বলিল, "সে নির্ব্বংশ্যার বেটা গেল ক'নে ? সেই গোপাইলা।"

কাঁদিতে কাঁদিতে শারদা বলিল, "সে আইসে নাই।"

"ও পোড়ামুখী, তুই একলা এই ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে ক্ষেতে আইচস্, তরে ভূতে চাবাইয়া খায় নাই ! কি ক'রব্যার লইচস্ এহানে।"

শারদা জানাইল সে নাটাইবর্ত্ত করিতেছিল।

এই বিশিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে শারদা বরাবরই মাতার কাছে উৎসাহ পাইয়াছে, এবং ইহা শিখিয়াছে সে তার মায়ের কাছেই। প্রতি বৎসরই অগ্রাণ মাসে রবিবারে দুর্গাই আয়োজন করিয়া শারদাকে দিয়া এই ব্রত করাইয়াছে।

কিন্তু আজ মেয়ের মুখে নাটাইবর্ত্তের কথা শুনিয়া এবং সম্মুখে ব্রতের আংশিক আয়োজন দেখিয়া দুর্গা ক্ষিপ্ত হইয়া গেল। নাটাই চণ্ডীর বিবিধ শক্তি থাকিলেও তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি অবিবাহিতের বিবাহ সংঘটনে।

আজ বৈকালে যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে তার পর শারদার আশু বিবাহ সংঘটন সম্বন্ধে দুর্গার সবিশেষ উৎসাহ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য।

কাজেই সে মুখ ভেঙ্চাইয়া বলিল, "নাটাইবর্ত্ত করুইন—মেয়্যা নাটাইবর্ত্ত ক'ইরবার লইছেন। আর নাটাইবর্ত্ত করণ লাইগবো না—চল্।" সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গালিগালাজ—সুধু মেয়েকে নয়, স্বয়ং নাটাইচণ্ডী ঠাকুরাণীকে পর্য্যন্ত।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি-সৌধ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৩৩২ সালের ৩রা আষাঢ়ের কথা আমাদের স্মৃতিপথে অত্যুজ্জ্বল আছে। শুধু আমাদের কেন, বঙ্গদেশবাসী কি কোন দিনই ১৩৩২ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখটিকে ভুলিতে পারিবেন? শত বিস্মৃতির মধ্যেও মনে জাগিবে, ঐ তারিখে বাঙলার চিত্তরঞ্জন বাঙলার মায়া, বাঙালীর মায়া কাটাইয়া, নশ্বর জগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন! বাঙালীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলচ্ছেদ করিয়া, বাঙালীর রাজনৈতিক কণ্টকাকীর্ণ দুস্তরপথের পথিপ্রদর্শক দুর্জ্জয়লিঙ্গশিরে ভবানীপতি দেবাদিদেব মহাদেবের বাসভবনের সন্নিকটে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

আমি ১লা আষাঢ় দার্জ্জিলিং ত্যাগ করি। আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত দেশবন্ধুর বাসা (Step Aside) হইতে আসিয়া খবর দিলেন, এইমাত্র আহারাদি শেষ করিয়া দেশবন্ধু তোমার কাগজ পড়িতেছেন দেখিয়া আসিলাম। পূর্ব্বদিন আমি দেখা করিয়াছিলাম, নানা কথা আলোচিত হইয়াছিল, তাঁহার শরীর যে ক্রমে সুস্থতার পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আমরাও বুঝিয়াছিলাম, তিনি নিজেও বুঝিতে- ছিলেন। ফিরিবার দিন, কিছুতেই সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না, Step asideএ গিয়া একবার যে বিদায় (শেষ বিদায় তাহা ত কল্পনাও করিতে পারি নাই!) লইয়া আসিব সে অবসর করিতে না পারিয়া, বন্ধুবর হেমেন্দ্র দাশগুপ্তকে বিদায়ের ব্রীফ চাপাইয়া দিয়া (তিনি উকীল বটেন!) দার্জ্জিলিং ত্যাগ করিলাম।

একটি দিন পরে, সেই নিদারুণ মর্ম্মভেদী সংবাদ আসিয়া পৌছিল। আষাঢ় মাস বটে, কবিদের চক্ষুতে (মনে?) আষাঢ়স্য প্রথম দিন হইতেই আকাশ নবজলধর ভারে পীড়িত হয় বটে, কিন্তু সেদিন আকাশ ছিল নিছক নীল, মেঘ-লেশশূন্য, তাই বা[illegible]তের আবাল-বৃদ্ধবণিতার মস্তকে এই দুঃসম্বাদ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতই পতিত হইয়াছিল।

৫ই আষাঢ় কলিকাতা শহরে যে শোকযাত্রা বাহির হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে বা পরে এমন সমারোহ কেহ কোনদিন দেখিয়াছে বা দেখিবার আশা করিতে পারে ইহাও যেন কল্পনা করিতে পারিত না। কোন রাজ-চক্রবর্ত্তী রাজার বিয়োগে, কোন ক্ষিতিপতি সম্রাটের শব-মিছিলেও এত শোকোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে কি না সন্দেহ!

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

চিত্তরঞ্জনের নশ্বর দেহ অগ্নিসংযুক্ত হইয়া যে স্থানে

পঞ্চভূতে বিলীন হয়, আমার দেশবাসী কেওড়াতলার সেই শ্মশানে স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত করিয়া এই রাজর্ষির—রাজসন্ন্যাসীর অসাধারণ ত্যাগ, অনন্যসাধারণ মনীষার, অমিত তেজ ও অকুতো সাহস ও আত্মবলিদানের মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘোর অমানিশার উজ্জ্বল বর্ত্তিকার মত, দুস্তর সাগরে আলোকদীপের মত, অনাগত কালের নরনারীর সম্মুখে ধরিবেন এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সংকল্প হয়ত ঠিকই আছে, কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দিন দিন করি মাস, মাস মাস করি বৎসর, বৎসর দেখিতে দেখিতে আটটি কাটিয়া গেল, কাগজের সঙ্কল্প, কাগজের প্ল্যানেই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

স্মৃতি-সৌধের সঙ্কল্প কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় নাই বটে, তবে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। যেমন ভাবে রক্ষিত হইবার কথা সেই ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ফরিদপুরে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গিয়া শুনিলাম, দেশবন্ধু তাঁহার ভবানীপুরের বাসভবনখানি দেশের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ মাদারীপুরের সুখ্যাত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে দেশবন্ধু ছিলেন, মহাত্মা গান্ধীও সুরেন্দ্র দাদার গৃহে অতিথি। সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের মুখেই প্রথম শুনিলাম, বাড়ীটি ঋণমুক্ত করিয়া নারী-কল্যাণকর কোন কার্য্যে দিবার ইচ্ছা চিত্তরঞ্জনের আছে। চিত্তরঞ্জনের কিছু ঋণ ছিল, ঋণের দায়ে বাড়ীখানি আটক। ঋণমুক্ত করিয়া দেশবন্ধুর ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হয়, নলিনীবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। আমার মনে আছে, কলিকাতায় ফিরিয়াই মৎসম্পাদিত "বাঙলা"য় সংবাদটি প্রকাশ করি; ভূমিকা করিলাম—"বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম" ইত্যাদি। ইতঃপূর্ব্বে এই সংবাদ কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পায় নাই।

চিত্তরঞ্জনের বাসভবনখানিকে দায়খালাস করিয়া, তাঁহার সাধ পূর্ণ করিবার ভার যাঁহারা লইয়াছিলেন, সুদূর কল্পনাতেও তাঁহারা ইহা জানিতে পারেন নাই যে ইচ্ছাপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কাজে হাত দিতে হইবে। বোধ হয় মাস দু'য়েকের মধ্যেই চিত্তরঞ্জনের তিরোধান ঘটিল এবং যাহা ধীরে সুস্থে করা যাইবে সঙ্কল্প ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে নিযুক্ত হইতে হইল। কেওড়াতলার স্মৃতি-সৌধের ভাগ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি বলিয়াই বলিতে পারিতেছি, 'ধীরে সুস্থের কাজ' আমাদের দেশে হয় না। আজ যে প্রতিষ্ঠানের কথা আমি বলিতে বসিয়াছি, তখন-তখনই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু না হইলে এবং তখন-তখনই কার্য্য আরব্ধ না হইলে ইহাও হয়ত tower in the air হইয়া থাকিত।

ভারতের সর্ব্বজনবরেণ্য নেতা তখন বাঙলায়—রাজর্ষির চিতাপার্শ্বে উপবিষ্ট মহামানব গান্ধী! চন্দন কাষ্ঠস্তূপ পর্ব্বতের রূপ ধারণ করিয়াছে, গাড়ী গাড়ী ঘৃতের টিন আসিতেছে, পুষ্প, মাল্য, অগুরু গন্ধ যেন মন্ত্রবলে আসিতেছে! ঘৃতভুক্ত অগ্নির লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করিতেছে, সুগন্ধে দশ দিক আমোদিত! থাকিয়া থাকিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর আর্ত্তনাদ গগন পবনকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিতেছে। চিতাপার্শ্বে গান্ধী নীরব, নিশ্চল, বুঝি নিস্পন্দ! প্রিয়তম শিষ্য, প্রাণাধিক ভক্ত, দক্ষ সেনাপতির শেষ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পাষাণ মূর্ত্তিসম গান্ধীজী কি ভাবিতেছিলেন? 'এক রাজা গেল', অন্য রাজার চিন্তায় কি বিভোর ছিলেন? না, তাহা মনে হয় না। দূরদর্শী গান্ধীজী ভাবিতেছিলেন, এই চিতাগ্নির ধূম নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে না হইলে, চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষা করা সম্ভব নাও হইতে পারে; এই শোকবহ্নি কালের অমৃত প্রলেপে প্রশমিত হইয়া গেলে, প্রিয়তমের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা না'ও থাকিতে পারে।

তাই দেখিলাম, সেই দিনই দীনা ভারতের মুনিঋষি-ত্যাগী তপস্বীর পুণ্যস্মৃতিপূত ভারতের আদর্শ মানব নগ্ন কায়ে, নগ্ন পদে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তাই দেখিলাম, স্বল্পসলিলা আদিজননীজাহ্নবী চিত্তরঞ্জনের চিতাভস্ম বহন করিয়া সিন্ধুকে সাদরোপহার দিবার পূর্ব্বেই ভিক্ষুকের ভিক্ষার ঝুলি সোনায়, রূপায় ভরিয়া উঠিল।

তাই দেখিলাম, রাজা মহারাজা হইতে দীনতম শ্রমিক্‌ও সাধ্যমত অর্থ দান করিয়া ধন্য হইয়া আসিতে লাগিল।

প্রবেশ-তোরণ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন

তাই দেখিলাম, এক পক্ষ কালের মধ্যে তহবিল পূর্ণ! আলস্যে অপরাজেয়, বক্তৃতায় দুর্দ্দম, কর্ত্তব্যে চিরউদাসীন, প্রতিজ্ঞাপালনে স্বভাব-শিথিল বাঙালী আমরা, তবু এই অঘটন ঘটিয়া গেল। চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের মহিমা ছিল, গান্ধীজীর পূতঃচরিত্রের প্রভাব ছিল, অসাধ্য সাধন না হইবে কেন! ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ঐ দুই সম্পৎ অক্ষয় হৌক্!

বাঙলার অসহায়া নারীদের জন্য চিত্তরঞ্জনের প্রাণ কতখানি কাঁদিত?—এ প্রশ্ন কি অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক নহে? কিন্তু যদিই কেহ এই প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর দিবে কে? আমি?না—উত্তর দিতেছে, উত্তর দিবে—ঐ চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন! যেখানে একটি অপর্ণা বা একটি কল্যাণী নয়, বাঙলার শত গৃহকোণ হইতে শত কষ্টে শত দুঃখেও যাহারা মুখটি বুজিয়া রোগের যন্ত্রণা সহিয়া অনাহারে অনাদরে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছিল, সেই শত শত অপর্ণা ও কল্যাণী আশ্রয় লাভ করিয়াছে, সেই চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন চিরদিন সেই নারী-কল্যাণকামী করুণার্দ্র হৃদয়ের কথা ও ব্যথা গাহিবে!

নারী—তাহার জাতি নাই, বর্ণ নাই, ধর্ম্ম নাই—নারী, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই—নারী, মাতৃজাতি যাহাতে বিনাব্যয়ে শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইতে পারেন; নারী সহায়-সম্বলহীনা, দুঃস্থা, অনাথা নারী যাহাতে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা করিয়া নারীজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন—চিত্তরঞ্জন দাশ তাহারই জন্য একটি নারী কল্যাণাগার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বলিতেন, মাতৃজাতি স্বাস্থ্যবতী না হইলে জাতির সন্তান সন্ততি জাতির বা দেশের কল্যাণকর কার্য্য করিতে পারিবে না; আমাদের স্বরাজসাধনা কখনও সিদ্ধ হইবে না; আমাদের দেশের কার্য্য স্বপ্ন থাকিয়াই যাইবে।

চিত্তরঞ্জনের বাসভবন সেবাসদনের সম্মুখভাগ

বাঙলার বধূর বুকে যত মধুই থাক্, বাঙলার নারীদেহ যে রোগে ভরপুর, তাহা বোধ হয় অবিসম্বাদিতরূপে

নূতন ব্লক—পশ্চাদ্ভাগ

প্রসবাগার

প্রসূতি ও প্রসূতের বিশ্রামকক্ষ
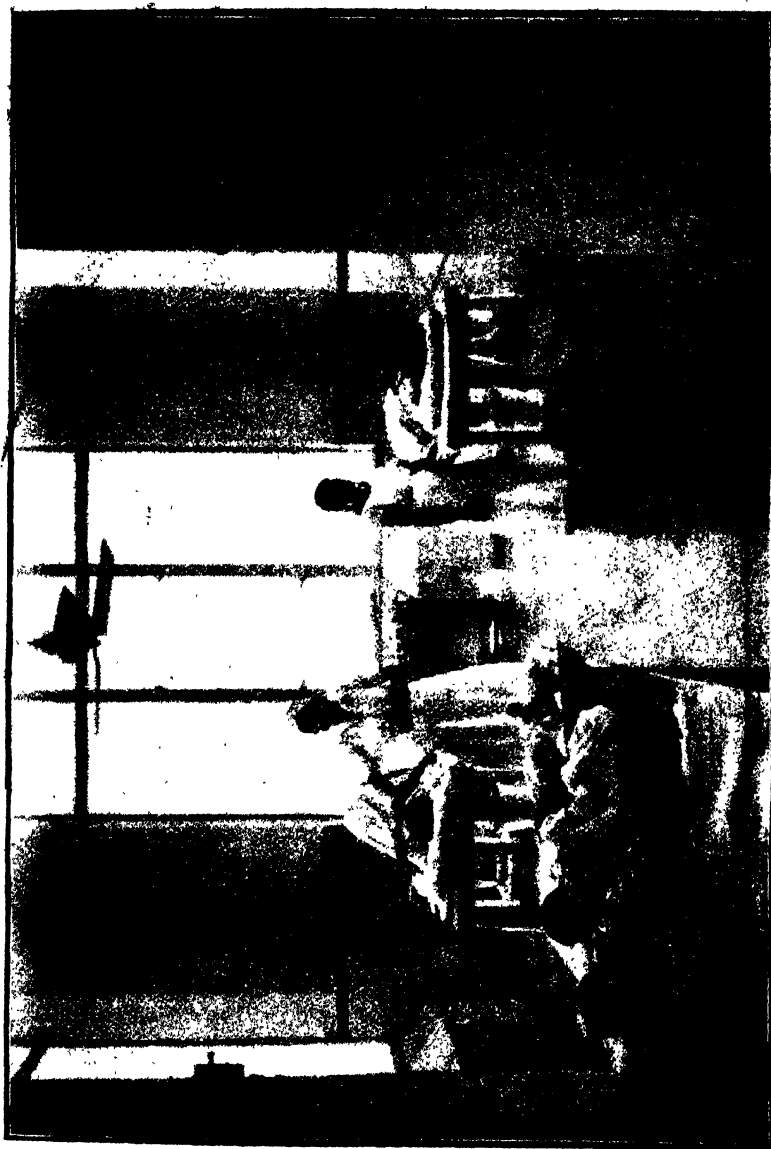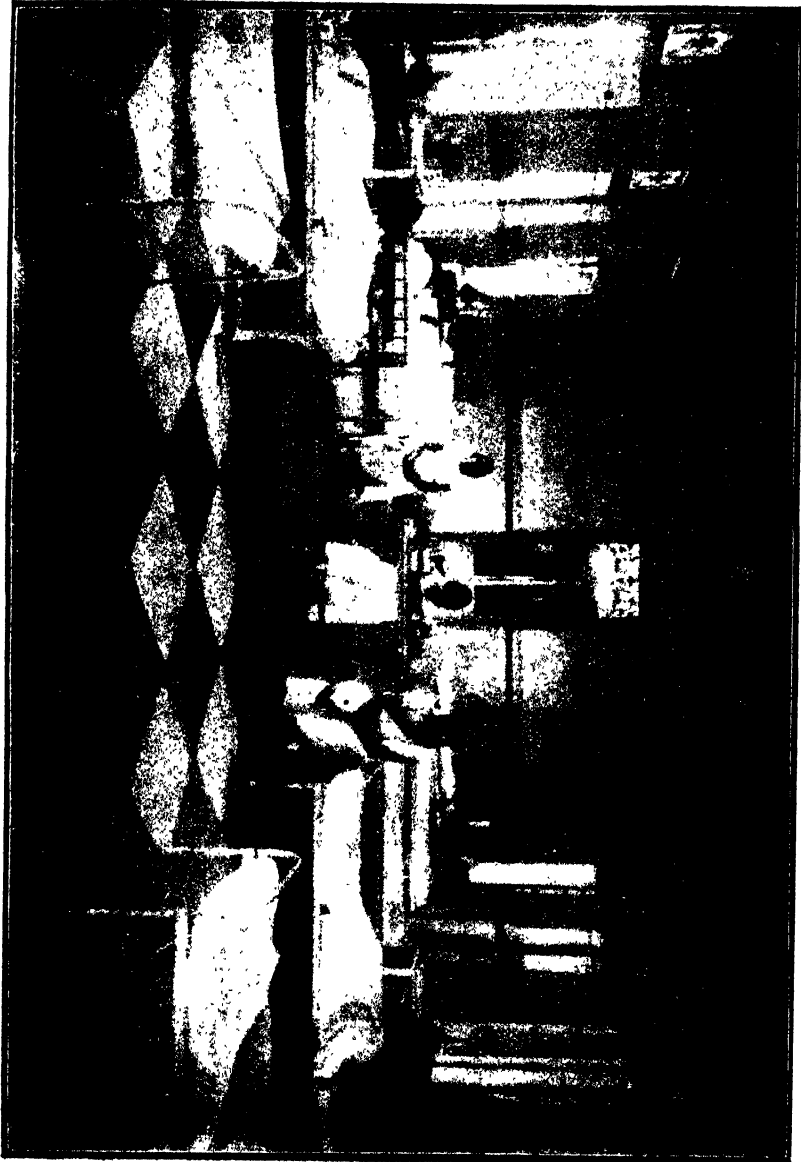
সাধারণ বিভাগ
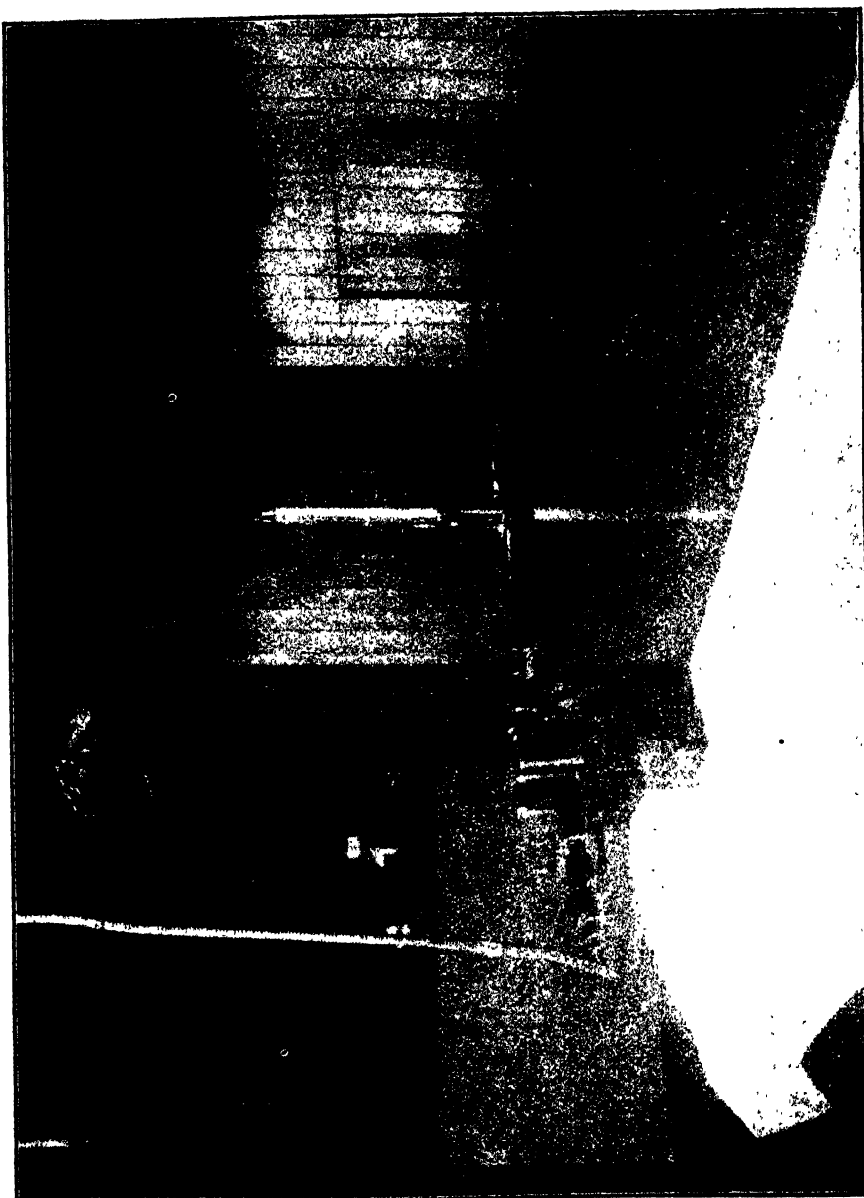
রঞ্জন-রশ্মি বিভাগ

সত্য। নিজ দেহকে অবলীলাক্রমে অবহেলা করিতে বাঙলার নারী যত পারেন, এমন আর কেহ নয়! চিকিৎসায় যেমন ঔদাসীন্য, রোগ প্রকাশেও তেমনই তাচ্ছিল্য! ঔষধ গ্রহণে ততোধিক অরুচি! তার পর অনাহার আছে, অল্পাহার আছে, রীতিমত সন্তানবিলাস আছে, সংসারধর্ম্ম স্বামীপুত্র, এ সকলও আছে। আছে সব, এবং সকল দিকেই নারীর অন্তরের যত্ন, হাতের সেবা, বুকের ভালবাসা অজস্র ধারায় বর্ধিত হয়; নাই কেবল নারীর নিজের দেহের চিন্তা! অন্য দেশের মেয়েদের কথা ভাল জানি না, যতটুকু জানি, তাহাতেও বলিতে পারি, এমন আত্মচিন্তাবিরহিত জীবন যাপন করিতে কেবলমাত্র বঙ্গনারীই পারেন। একে ত চিকিৎসারই সুযোগ নাই, চিকিৎসা করাইবার সঙ্গতিও নাই, তদুপরি রোগ গোপনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা, গৃহের শোভা না হইয়া অধিকাংশ স্থলে বঙ্গনারী গৃহের ভার হইয়া উঠিতেন। জননী এই স্বাস্থ্য লইয়া যে সন্তান সন্ততিকে ধরায় আনয়ন করিবেন, তাহাদের স্বাস্থ্যসম্পদ কিরূপ হইবে তাহা কল্পনা করিতে কষ্ট হয় না। চিত্তরঞ্জন বাঙলার এই স্বাস্থ্যহীনা নারীর ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; বাঙলার গৃহকোণে তৈলহীন দীপশিখার মত নীরবে, প্রায়ান্ধকারে যাহাদের জীবনাবসান ঘটে, তাহাদের জন্য তাঁহার অন্তর কাঁদিয়াছিল। তাঁহার জীবদ্দশাতেই, ট্রাষ্ট যে আবেদন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই ব্যথাই মূর্ত্ত হইয়াছিল। বাঙলার, তাই বা কেন, ভারতের প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে সে আবেদন সাড়া দিয়াছিল। তাই চিত্তরঞ্জনের ভক্ত ও শিষ্যগণের চেষ্টায় তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই সেবা-সদন স্থাপিত হইয়াছিল। ১৩৩৩ সালের ১লা বৈশাখ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

আমরা আগেই বলিয়াছি, চিত্তরঞ্জনের বাসভবনটি দায়মুক্ত ছিল না। প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দেনা ছিল। চিত্তরঞ্জন যে ট্রাষ্ট গঠন করিয়াছিলেন, যে ট্রাষ্টে স্যার নীলতরন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, কুমার সত্যমোহন ঘোষাল প্রভৃতি সদস্য ছিলেন, সেই ট্রাষ্ট পাওনাদারদের নিকট ঋণের কতকাংশ মকুব করিবার জন্য আবেদন করেন। একজন মহাজন ষাট হাজার টাকা একেবারেই ছাড়িয়া দেন; অন্যান্য মহাজনরাও কিছু কিছু মকুব করেন—দুই লক্ষ বিশহাজার টাকায় সমস্ত দেনা মিটমাট হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যে আট লক্ষ টাকা উঠে, তাহা হইতে ঐ দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা ঋণ শোধ করিয়া হাসপাতালের কার্য্যে হাত দেওয়া হয়।

আমরা বরাবর দেখিয়াছি, বিরাট কাজ কখনও অর্থের বা কর্ম্মীর অভাবে আটকাইয়া থাকে না। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসভা নির্ম্মাণের জন্য কোথা হইতে একটি দানব জুটিয়া গিয়াছিল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন গঠনের জন্যও একটি দানব আসিয়া জুটিলেন। ময়দানবটি মানব ছিল অথবা মানবেতর কোন জীব ছিল, তাহা আমি জানি না, তবে এই দানবটিকে জানি। নুন তেল ভাত ডালে পুষ্ট মানব এবং এই কলিরই মানব। শক্তি সামর্থ্যে দানব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দানব কয় মাসের মধ্যে হাসপাতাল স্থাপন করিলেন, আর মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে সেটিকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারী-চিকিৎসাগারে পরিণত করিয়া তুলিলেন। চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের আদর্শ ছিল, দানবের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল, অর্থ সাহায্য করিতে দেশের জনসাধারণ কোন দিনই কার্পণ্য করেন নাই---১৯২৬ সালে যে হাসপাতাল মাত্র ২৩টি শয্যা লইয়া গঠিত হইয়াছিল, ১৯৩২ সালে তাহাতে ১২৫টি শয্যা হইয়াছে। রঞ্জন-রশ্মি চিকিৎসার যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন হাসপাতালেই নাই, এখানে তাহাও আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের রথী মহারথী সম্মিলন দেখিয়াও বিস্মিত হইতে হয়। একই হাসপাতালে নীলরতন, বিধানচন্দ্র, কেদার দাশ, ললিত বন্দ্যো, মৃগেন্দ্র মিত্র, হরিহর গাঙ্গুলী, সুবোধ মিত্র কি সেই 'উর্ব্বশী যুগের' অষ্টবজ্র সম্মিলনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় না?

কেবিন দেখিলাম, ১৩টি। কেবিনের চার্জ্জ অন্যান্য হাসপাতালের অপেক্ষা বেশী না হইলেও, কেবিনগুলির অবস্থা ও ব্যবস্থা ভাল। সামান্য খরচের (bed) শয্যাও আছে; অধিকাংশই ফ্রি! কেবিন বেশীর ভাগই খালি, ফ্রি বেডের চাহিদাই অধিক! ইহাই স্বাভাবিক। পোড়া দেশে কয়জন নারী বা নারীর অভিভাবক অর্থ ব্যয়

গভীর রশ্মি। এমন শক্তিশালী যন্ত্র ভারতে অল্পই আছে।

বজ্ঞানিক স্ন র

পাকশালা
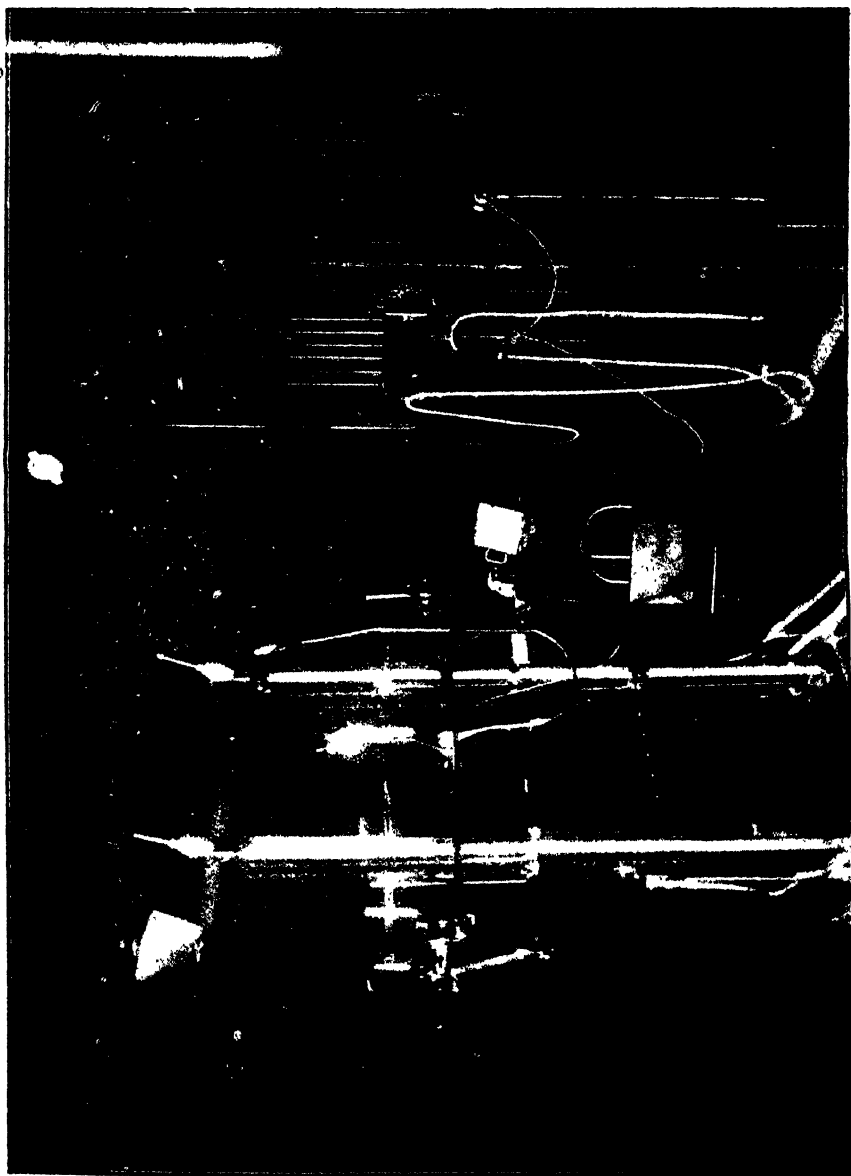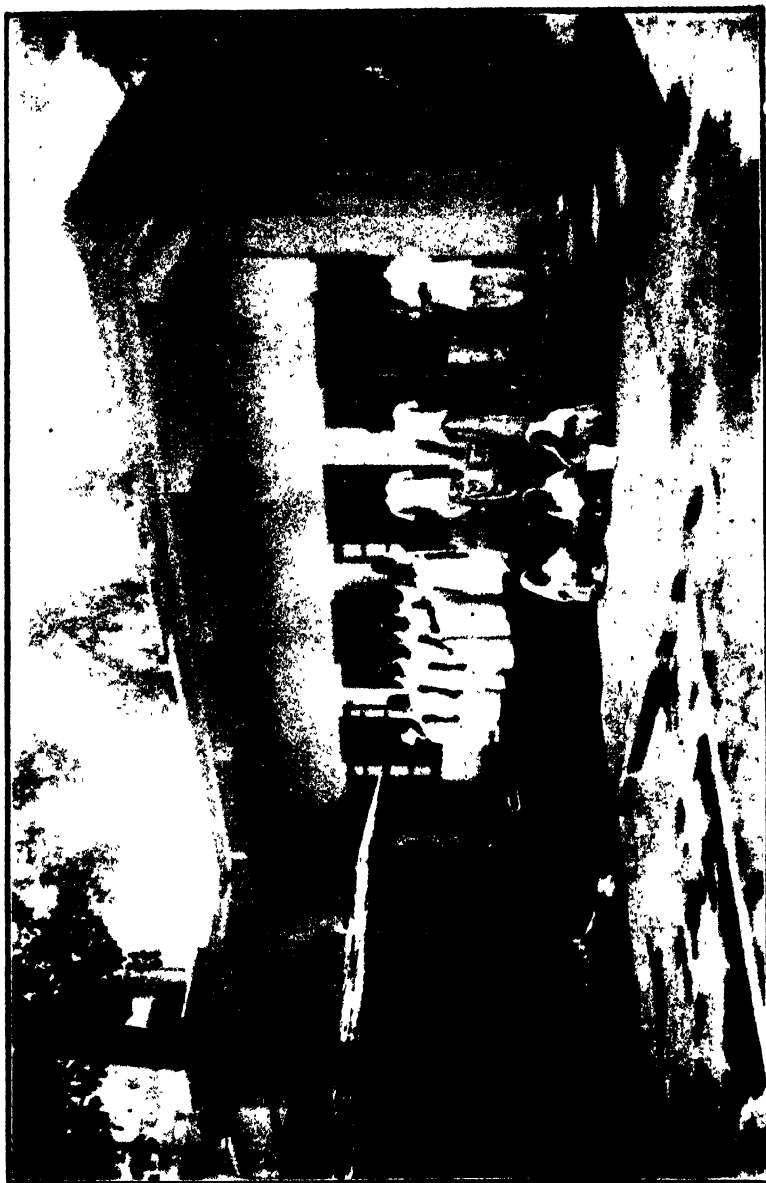
করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন? চিকিৎসা ত অন্য কথা, পেট পুরিয়া দুইবেলা খাইতে দিতে পারেন কয়জন লোক? ইয়োরোপ আমেরিকার দৃষ্টান্ত ধরি না, বোম্বাইয়ের কথা—যেখানে অলিতে গলিতে ক্রোড়পতি বসতি করেন, সেখানকার কথাও ধরি না, আমাদের এই গরীব বাঙলাদেশেও যে জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে এতবড় একটি নারী-চিকিৎসালয় চলিতেছে, ইহাই যথেষ্ট বিস্ময়ের বিষয়।

কিরূপে চলিতেছে, তাহা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বুঝা যাইবে:—

"I take this opportunity of expressing my deep appreciation of the spirit of sacrifice represented in this Institution which, I am sure, carries its own seed of fulfilment."

চিত্তরঞ্জন দেশের কাজে লক্ষাধিক টাকা আয়ের ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছিলেন, দেশের হিত চিন্তায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য যে প্রতিষ্ঠান গঠিত, তাহাও সেই ত্যাগ মন্ত্রের বলেই পরিচালিত। যাঁহারা অর্থ দান করিয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করিয়াছেন এবং চিকিৎসা করিয়া, অন্য নানা ভাবে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সকলের মূলেই আছে ত্যাগ এবং পরদুঃখকাতরতা।

হায়! তবুও কত অভাব! এটিকে পরিপূর্ণাঙ্গ করিতে কত অর্থেরই প্রয়োজন! মাসে সাত হাজার টাকা ব্যয়, অথচ আয় চার হাজারও নয়—তাহাকে পরিপূর্ণাঙ্গ করা কি কোনও দিন সম্ভব হইবে?

কিন্তু কেন সম্ভব হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারি না! বাঙলা দেশে আর কোন দিন কি রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক জন্মিবেন না? "রাজা" সুবোধ মল্লিকও কি আর আসিবেন না? স্যার তারকনাথ পালিত, ডাক্তার স্যার রাসবিহারী ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি দানবীর কি আর কোন দিন বঙ্গ-জননীর কোল আলোকিত করিবেন না? বঙ্গদেশে নারীদুঃখকাতর হৃদয়বান ধনবানের সত্যই অভাব ঘটিয়াছে? এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান অর্থের অভাবে পঙ্গু ও অপূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকিবে, ইহা কি দেশের লোকের পক্ষেই লজ্জাকর নহে?

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের অর্থ-সংগ্রহ তালিকায় একটি বিশেষত্ব আমার চোখে পড়িয়াছে, সেটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। গবর্ণমেণ্টের দান, ইহাতে একটি কপর্দ্দকও নাই। কেন নাই, তাহা জানি না, তবে নাই ইহাই আসল কথা! রাজনৈতিক ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, ইহাই কি এই 'নাই'-এর কারণ? গবর্ণমেণ্ট দেন নাই, অথবা চাওয়া হয় নাই? আমার বিশ্বাস, চাওয়া হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধীজী

চাহিলে গবর্ণমেণ্ট যে কিঞ্চিৎ না দিয়া একদম বঞ্চিত করিতেন, ইহা আমার মনে হয় না। সে যাহাই হৌক, এই বিশেষত্ব আছে বলিয়াই চিত্তরঞ্জন সেবাসদন চিত্তরঞ্জনের দেশবাসীর অর্থে, শ্রমে, যত্নে, মস্তিষ্কে চিত্তরঞ্জনের দেশের মাতৃজাতির কল্যাণকল্পে গঠিত এ গর্ব্ব করিতে পারে।

বৈজ্ঞানিক স্নানাগার হইতে রন্ধনশালা বার বার করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। অঙ্গনে

প্রাঙ্গণে সোপানে উদ্যানে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রোগিনীদের কক্ষে, রন্ধনশালায়, শৌচাগারেও সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিরাজিত। আমি যাইব খবর দিয়া যাই নাই, হঠাৎ গিয়াছিলাম—সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার কারণ বা অবসর ঘটে নাই ; দেখিলাম, তাহার প্রয়োজন হয় না। নারীর করস্পর্শে সকলই সুন্দর, শ্রীবিমণ্ডিত হয়, সেই নারীদের আবাস-নিকেতন বলিয়াই কি ইহা সর্ব্বদা শোভা ও শ্রীসমন্বিতা?

দুঃখ হয়, যখন শুনি, স্থানা-ভাবে নিত্য পীড়িতা নারী-দিগকে ফিরাইয়া দিতে হয় : কষ্ট হয়, যখন শুনি, দেশ-দেশান্তরাগত নারীরা অশ্রুসজল নয়নে ফিরিয়া গিয়া হয় ত রোগে ভুগিয়া, বিনা ঔষধে, বিনা পথ্যে বাঙলার ঘর সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া যান জানিয়াও 'কোন উপায় নাই' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে হয়! হায় চিত্তরঞ্জন, নারীর জন্য প্রাণ কি সারা বাঙলায় একা তোমারই কাঁদিয়াছিল? হায়! এতো প্রাণ, কোথাও কি নারীর জন্য এতটুকু বেদনাও সঞ্চিত হয় না?

কিন্তু না, আমরা হয়ত ভুল বলিতেছি! সাত বৎসর দীর্ঘ সময় নহে, এই সাত বৎসরে যে অঘটন ঘটিতে চোখের সম্মুখে দেখিলাম, তাহাতে এমন কথা কেমন করিয়া বলিব যে নারীর জন্য প্রাণ বাঙলায় কাঁদে না। তা যদি না কাঁদিত, তাহা হইলে এই সেবাসদনই কি গঠিত হইতে পারিত! এই সেবাসদন নারীর জন্য বহু বেদনার্দ্র হৃদয়ের প্রস্তরীভূত ইতিহাসই নহে কি?

হ্যাঁ, এইবার দানবটির পরিচয় দিয়া রাখি। প্রতিষ্ঠা হইতে লালন পালন যিনি দৃঢ় অথচ কোমল হস্তে করিয়াছেন আজও করিয়াছেন, সেবাসদনের শুচিতায়, সৌন্দর্য্যে, অর্থ সংগ্রহে, রোগের চিকিৎসায় যাঁহার মস্তিষ্ক সর্ব্বদা মগ্ন, সেবাসদনের প্রত্যেকটি ইষ্টকে যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি ও দারুণ অধ্যবসায়ের কথা গাঁথা আছে, সেই দানবটির নাম, শ্রীবিধানচন্দ্র রায়! কলিকাতার মেয়র বলিয়া নয়, সেবা-সদনের যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া শুধু একালে নয়, বহু পরবর্ত্তী-কালেই লোকটি 'জীবিত' থাকিবেন এবং বাঙলার নারীর কল্যাণকামীদিগের পুরোভাগে আসন লাভ করিবেন!

ডাক্তার বিধানচন্দ্র
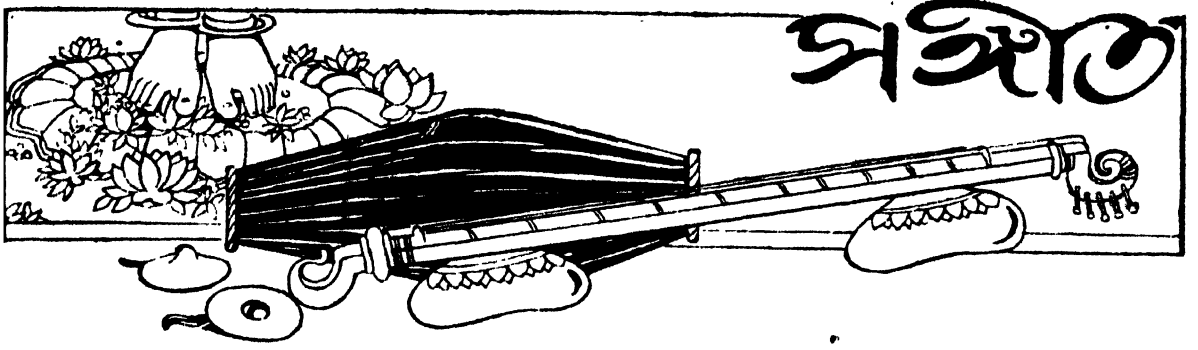
কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। **স্বরলিপি ঃ—শ্রীজগৎ ঘটক।**

পাহাড়ী মিশ্র—দাদ্‌রা

দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিণী।
গাহিয়া সজল চোখে বেলা শেষের রাগিণী॥
মিনতি ভরা আঁখি, কে তুমি ঝড়ের পাখী
কি দিয়ে জুড়াই ব্যথা, কেমনে কোথায় রাখি',
কোন প্রিয় নামে ডাকি, মান ভাঙাবো মানিনী॥
বুকে তোমায় রাখতে প্রিয় চোখে আমার বারি ঝরে,
চোখে যদি রাখিতে চাই, বুকে ওঠে ব্যথা ভ'রে,
যত দেখি তত হায়, পিপাসা বাড়িয়া যায়,
কে তুমি যাদুকরী, স্বপন-মরু-চারিণী॥

II II গা -া মগা | রা -ঋরা গা | রসা -া -সা | সা -া -া I
দাঁ ০ ড়া০ লে ০০ দু য়া০ ০ রে মো ০ র

[সরা -মপধা ধা -পা -মা]
I (সরা মা মা | -মা -া } মপা | পগা -া মা | গমগরা -সরাঃ -সঃ I
কে০ ০ তু মি ০ ভি০ খা ০ রি ণী০০০ ০০ ০

I গা -া মগা | রা -ঋরা গা | -রসা -া সা | সা -া -া I
গা ০ হি০ য়া ০০ স জ০ ল্ চো খে ০ ০

I সরা মা মা | মা -া মপা | পগা -া মা | গমগা -রা -া I
বে০ ০ লা শে ০ ষের্ রা ০ গি ণী০০ ০ ০

I -ঋরা -ঋরা -গা | -গসা -া -া II II
০০ ০০

শেয়র্ II সা সা সরগা -সরা -গা -পা | পা -পা পা -পা -া -া I
মি ন তি॰॰ ॰॰ ॰ ॰ ভ রা আঁ খি ॰ ॰

I র্স্মা র্স্মা -র্স্মা -া র্স্মা -র্স্মা | -পা -র্স্মপা গপা মা -গা -া I
কে তু মি ॰ ঝ ড়ে র ॰॰ পা॰ খী ॰ ॰

I মা মা -মা মা মা -া | মা গপা -মগা -রগা -া -া I
কি দি য়ে জু ড়া ই ব্য থা॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰

I গমা গরা ঋরা গা রসা -া | সা -সা -া -া ণধ্া -া I
কে॰ ম॰ নে॰ কো থা॰ য়্ রা খি ॰ ॰ ॰ ॰

I পধ্া -া -সা -া -া -া II
॰ ॰ ॰

তালে II গা -া মগ | রা -ঋরা গা | রসা -া সা | সা -া -া I
কোন্ ॰ প্রি॰ য় ॰॰ না নে॰ ॰ ডা কি ॰ ॰

I সরা মা মা — মা -া মপা | পগা -া মা | গমগরা -সাঃ -ধ্ঃ II II
মা॰ ন্ ভা ঙা ॰ বো॰ মা ॰ নি নী॰॰॰ ॰ ॰

শেয়র্ II সা গা গা -গা গা -গা | গা -গা -া -া -া -া II
বু কে তো মায়্ রাখ তে প্রি য় ॰ ॰ ॰ ॰

I গমা -মা মা -মা মা -মা | মা -গপা -মগা -রগা -া -া I
চো॰ খে আ মার্ বা রি ঝ রে॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰

I গা -পা র্স্মা -পা র্স্মা পা | পা পর্স্মা -ধপা -র্স্মপা -মা -া I
চো খে য দি রা খি তে চা॰ ॰॰ ॰॰ ই ॰

I মা মা মা গমা -গমগাঃ -রঃ | রা রগা -সরা -মা -গমগা -রা I
বু কে ও ঠে॰ ॰॰॰ ॰ ব্য থা॰ ॰॰ ॰ ॰॰॰ ॰

I -মা -গমগা -রা রগা গসা -া I
॰ ॰॰॰ ॰ ভ॰ রে ॰

I সা -সা গা মা পা পা | র্ম্মা -ধপা -র্ম্মপা -া -া -া I
য ত দে খি ত • ত হা • • য়্ • • • •

I পা ধা পধা -া -পমা -গা | গা মা মধা পা -া -া I
পি পা সা• • • • • বা ড়ি য়া• যা • য়্

I -মা -া -া -গমগা -সা -া | -ণ্া -া -া -পধ্া -সা -া II

তালে I গা -া মগা | রা -ঋরা গা I রসা -া সা | সা -া -া I
কে • তু• নি • • যা দু• • ক রী • •

I সরা মা -মা | মা -া মপা I পগা -া মা | গমগরা -সাঃ ধ্ঃ। II II
স্ব• প ন ম • রু• চা • রি নী• • • • •

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

"আ মর, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! ওই সোয়ামীর আবার ঘর করিস্, ওরই আবার সেবা করিস্? যাই বলিস্ বাছা, আমি হলে কখ্খনও অমন সোয়ামীর মুখই দেখতুম না, সেবা করা তো দূরের কথা। ওই যে লোকে কথায় বলে না—'যাকে লোকে বল্লে ছি, তার মনুষ্যত্ব রইল কি—' হেন লোক নেই যে না বিশুকে ছি ছি করছে। সত্যিই তো, লোকে বলবে নাই বা কেন, লোকের অপরাধটা কি? বলবার মত কাজ করলেই লোকে বলে থাকে। সেবার গাঁয়ের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না করলে, লোকে সকালবেলা যার জন্যে ওর নাম করে না। তার পর দুটি দিন যেতে না যেতে কি না এই কাণ্ড! মা গো—কি প্রবৃত্তি, গলায় একগাছা দড়িও কি জোটে না?"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাত্যায়নী এই কথাগুলা বলিয়া গেলেন, সে একটা উত্তরও দিল না, একটীবার মুখও তুলিল না। নীরবে নতমুখে সে বসিয়া রহিল। আর তাহার চোখের জল টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া মাটিটাকেই ভিজাইয়া দিতে লাগিল মাত্র।

কি কথা বলিবে সে, কি লইয়া সে বিবাদ করিবে? একা কাত্যায়নীই নহেন, গ্রামের ছোট বড় সকলের মুখেই সে এই একই কথা শুনিতেছে।

স্বামী তাহার অসচ্চরিত্র, মাতাল; কিন্তু সে দোষ কি তাহার? লোকে তাহাকেই দোষ দেয়—সে যখন স্ত্রী হইয়াছে তখন স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিবার ভার তাহার,—কেন সে তাহা করে নাই? বিশ্বপতি না কি প্রথমে বেশ ভালো ছেলেই ছিল, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে সেই পর্য্যন্ত সে অধঃপাতে গিয়াছে।

সে অনেকেরই মুখে শুনিতে পায়—আজ বিশ্বপতি ব মদকে পরমার্থ জ্ঞান করে, একদিন সে তাহাই ন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। চরিত্রহীনকে সে কোন নেই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে নাই।

সে না কি কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহে নাই, কবলমাত্র মায়ের জিদে পড়িয়াই তাহাকে বিবাহ রিতে হইয়াছে। বিবাহের মাস তিনেক পরেই মা এই য়েটীর মাথায় সংসার ও ছেলের ভার চাপাইয়া নিজে নন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন।

কল্যাণী বিবাহের সময় যে বিশ্বপতিকে দেখিতে াইয়াছিল আজ তাহার ছায়াই আছে মাত্র; আর াছে মুখে তাহার সেই মৃদু হাসিটুকু মাত্র, যাহা দখিয়া তাহাকে চেনা যায়। দৈর্ঘ্যে সে তেমনই আছে, দিকে এমন শীর্ণ হইয়া গেছে যে তাহার হাড় কয়খানি ণিয়া লইতে পারা যায়। বড় বড় দুইটী চোখের ীচে কালি পড়িয়াছে, নাক ও গালের হাড় উঁচু ইয়াছে, মুখখানা লম্বা হইয়া গেছে। রাত্রি জাগরণ াহার নিত্যকার ব্যাপার, নেশা না করিয়া সে একদিনও াকিতে পারে না।

কল্যাণীর যখন বিবাহ হইয়াছিল তখন সে নেহাৎ ছলেমানুষ ছিল না। শৈশবে সে পিতামাতাকে ারাইয়াছিল,—মাসীর নিকটে সে লালিতা পালিতা ইয়াছিল। সেখানে সে নির্ব্বাকে শুধু সংসারের কাজই রিয়া যাইত, সকলেরই অত্যাচার পীড়ন সহ্য করিত। নজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত তাহার ধারণায় জাগে নাই।

বিশ্বপতির মা হঠাৎ একদিন এই মেয়েটীকেই পছন্দ রিয়া ফেলিলেন। কি দেখিয়া যে তাঁহার পছন্দ হইল াহা তিনিই জানেন। তিনি বিবাহের সমস্ত খরচপত্র দিয়া মেয়েটীকে নিজের ঘরে আনিলেন।

বিশ্বপতি প্রথম দুই একবার আপত্তি করিয়াছিল, কন্তু তাহার সে আপত্তি টিঁকে নাই। মা তাহার কোন থা শুনেন নাই,—জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন াহাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

তখন কল্যাণীর বয়স ছিল সতের। অনাদরে, অযত্নে াসীর বাড়ীতে সে বয়সের উপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিতে ারে নাই। তখন লোকে তাহাকে দেখিয়া তের চৌদ্দ বৎসরের একটী মেয়ে বলিয়াই ভাবিয়া লইত। বিবাহ হইবার পর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সে এমনভাবে সকল দিকেই পুষ্টিলাভ করিল যাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে মেয়েটী নববধূ হইয়া সসঙ্কোচে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল সেই আজ গৃহিণী হইয়াছে।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি এমন অধঃপতনের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা কল্যাণীর পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য।

কিন্তু তথাপি সে চেষ্টা করে নাই কি? সে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, সবই ব্যর্থ হইয়া গেছে। সজল নয়নে সে যখন অনুরোধ করিত "আর ও-সব ছাই-পাঁশ খেয়ো না, আমার মাথা খাও; এদিকে জমীজমা যা একটু আছে সবই গেল। এদিকে আর সব যে যায়- এসব একটু দেখ।" তখন বিশ্বপতি কেবল হাসিত, উত্তর দিত, "সব দিকেই আমার নজর আছে রাঙা বউ, ভেব না কোন দিকে নজর দেই নে, কাজেই দশ ভূতে সব লুটে খাচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তি জমীজমার দিকে একটা চোখ সদাই পড়ে আছে রাঙাবউ, বিশ্বপতি এমন নেশা করে না যাতে সব ঘুচাতে হবে।"

কিন্তু সে সর্ব্বদা একটা চোখ জমীজমার দিকে ফেলিয়া রাখিলেও সংসারের আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। সব গিয়া আজ একটী কুড়ি বিঘা জমী ও একটী ফলের বাগানই মাত্র অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। কল্যাণীর অলঙ্কারগুলির কিছুই আজ নাই। হাতে কেবল মাত্র দুইটী শাঁখা তাহার আয়ত রক্ষা করিতেছে।

পাড়ার বর্ষীয়সী মেয়েরা সদুঃখে বলিতেন, "গয়না-গুলো পর্য্যন্ত ওই হতভাগাটাকে ধরে দিলে বউমা, আখেরের কথাটা ভেবে দেখেছ কোন দিন? ও যে রকম লক্ষ্মীছাড়া তাতে কিছু রাখবে না। এর পরে হয় তো গাছতলায় মালা হাতে বসতে হবে। একমুঠো ভাতের জন্যে এর পরে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে যে—"

কল্যাণী প্রায়ই জবাব দিত না। যদি কখনও জবাব দিত—বলিত "গয়নায় আমার দরকারই বা কি? যার

গয়না তিনিই নিয়েছেন, ওতে আমার কথা বলবার—বাধা দেবারই বা অধিকার কোথায় ?"

ভবিষ্যতে সত্যই ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া গাছতলায় বসিতে হইবে কি না, লোকের দ্বারে দ্বারে একমুষ্টি ভাতের জন্ম ঘুরিতে হইবে কি না, তাহা সে কোন দিনই ভাবে নাই। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভেই নিহিত থাক, বর্ত্তমান লইয়াই জগৎ, বর্ত্তমান লইয়াই মানুষ বিব্রত, ভবিষ্যতের ভাবনা এখন ভাবিতে গেলে চলে না।

যখন কল্যাণী শুনিতে পায় বিশ্বপতি বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভালো ছিল, বিবাহের পর হইতেই সে অধঃপাতে গিয়াছে; সে বিবাহ করিতে চায় নাই মা জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছেন, তখন সে কিছুতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিতে পারে না। আকাশের পানে তাকাইয়া সজল-নয়নে ডাকিত—"তবে কেনই বা বিয়ে দিয়েছিলে মা, এ বিয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল যা দেবতাকে পশু করে তুলেছে।"

কোন দিন সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই—কি দুঃখে সে এমন করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিল? এ কথা কতবার সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেছে। মনে হইয়াছে, কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে? সে একদিন যখন মানুষ ছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হয় তো পাইলেও পাওয়া যাইত। আজ সে বুদ্ধি সে জ্ঞান ইহার যে নাই।

স্বামীর মাতাল অবস্থা সে জানে, চরিত্র ভ্রংশের কথা সে জানে নাই। আজ কাত্যায়নী স্পষ্ট জানাইয়া দিয়া গেলেন বিশ্বপতি কায়স্থের সন্তান,—কিন্তু সে জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। অস্পৃশ্য বাগ্দী-বাড়ীতে সে দিন কাটাইয়া দেয়। তিনি নিজের চোখে তাহাকে জল খাইতে দেখিয়াছেন। বাগ্দীদের মেয়ে চন্দ্রাই ইহার মূল কারণ,—সেই মেয়েটাই কল্যাণীর স্বামীকে বিপথগামী করিয়াছে। চরিত্রহীনতার কথাটা ধ্বক করিয়া আসিয়া কল্যাণীর বুকে বাজিল।

আজ কয়েক দিন হইতে বিশ্বপতি সকাল সকাল সেই যে দুইটা ভাত মুখে দিয়া বাহির হয়, আর তাহার খোঁজ পাওয়া ভার হয়। আজ কয়দিন ধরিয়া রাত্রে সে বাড়ী থাকে না।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে নাই সে কোথায় যায়,—বলিতে পারে নাই রাত্রে একা থাকিতে ভয় করে। বাড়ীর চারি দিকে বাগান। লোকালয় দূরে থাকায় সে চীৎকার করিলেও কেহ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে না।

আজ কল্যাণীর চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কাত্যায়নী চলিয়া গেলেও সে উঠিল না, ঘরের কোন কাজে হাত দিল না, যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল।

(২)

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দুপুরের সেই ধরিত্রীর এখন আর এক মূর্ত্তি। কেহ দেখিয়া বলিতে পারিবে না দুপুরে এই পৃথিবীই ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল।

গৃহস্থের বাড়ীতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জলিয়াছে। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীগণ গলায় আঁচল জড়াইয়া তখনই সবে তুলসীতলা প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে পরিবারের মঙ্গল কামনায় প্রণাম করিতেছেন। প্রায় প্রতি গৃহ হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে।

কল্যাণী তখনও বারাণ্ডায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গৃহে এখনও সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বালে নাই, প্রাত্যহিক শঙ্খনিনাদ করে নাই,—স্বামী ফিরিবে বলিয়া অন্য দিনের মত সে জল কাপড়, খড়মজোড়াটী ঠিক করিয়া রাখে নাই, আহার্য্য প্রস্তুত করিতেও যায় নাই।

বারাণ্ডার নীচে তাহারই স্বহস্ত-রোপিত কয়টী বেল ফুলের গাছে সাদা ফুলগুলি সান্ধ্য বাতাসের সুশীতল স্পর্শে কেবলমাত্র জাগিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—মুদিত দলগুলি আস্তে আস্তে মেলিয়া দিতেছিল।

উঠানের দরজা ঠেলার শব্দ হইল। স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে যে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল। তাহার পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই কল্যাণী চিনিল এ কে।

বিশ্বপতি বড় ব্যস্তভাবেই বারাণ্ডায় উঠিয়া দাঁড়াইল, "তোমার চাবিটা একবার দাও তো রাঙাবউ, বিশেষ দরকার পড়েছে, এখনি না দিলে চলছে না।"

কল্যাণী নীরবে চাবির গোছা অঞ্চল হইতে খুলিয়া

সামনে ফেলিয়া দিল। চাবির গোছাটা তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া অন্ধকার দেখিয়া বিশ্বপতি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, ঘরে এখনও সন্ধ্যে পড়ে নি ?"

কল্যাণী উত্তর দিল না। বিশ্বপতি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেই সে জলিয়া উঠিয়া একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, "না, জ্বালা হয় নি,—আমার সময় হয় নি, গরজ পড়ে নি বলে ; তোমার দরকার থাকে তুমি জেলে নাও গিয়ে।"

কল্যাণীর মুখে এমন ধরণের কথা বিবাহ হইয়া অবধি আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি শুনিতে পায় নাই। সে কতদিন মদ খাইয়া মাতলামি করিয়াছে, কতদিন নেশার ঝোঁকে আহার করিতে বসিয়া ভাত তরকারি পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়া উঠিয়া গেছে, —কল্যাণী চির-কালের আদর্শ পতিব্রতা নারীর মতই প্রতি পদে তাহার দোষ ত্রুটী সারিয়া লইয়াছে,—কোন দিন তাহার সহিষ্ণুতা নষ্ট হয় নাই। সে যেন পৃথিবীর মতই পরম সহনশীলা। যত কিছু অত্যাচারই তাহার উপর দিয়া হইয়া যাক্, সে নির্ব্বাক জড়ের মতই পড়িয়া থাকিবে, এই যেন তাহার চরিত্রের চিরন্তন রীতি।

আজ সেই সহনশীলা রমণীর মধ্যে এরূপ অসহিষ্ণুতা সত্যই বড় বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইল, তাই বিশ্বপতি স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাকে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পরই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আলো জ্বালাটা এমন কিছু শক্ত নয় রাঙাবউ, ও কাজ আমি বেশ পারি। সব কাজই পারি—তবে হাতের কাছে সব জিনিস গুছানো পাই নে এইটেই হয় মুস্কিল। তোমরাই না এমনি করে আমার মাথা খেয়েছ রাঙাবউ! নিজের ওপরে যদি কতকটা নির্ভর করতে আমায় ছেড়ে দিতে,—দেখতে, আমি সব পারতুম, এমন কি রেঁধে ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু ওই যে গোড়াতেই মুস্কিল বাধিয়েছিলেন আমার মা। এতটুকু বেলা হতে—এটা করিস নে, ওটা করতে নেই, এমনি করেই না তিনি আমায় অধঃপাতে দিয়ে গেছেন। তার পর এলে পরের মেয়ে তুমি,—তুমিও মার কাছ হতে সেবা করা ব্যাপারটা হাতে কাজে শিখে নিলে। আমার আর অপরাধ কি বল ? না চাইতে হাতের কাছে সব জিনিস পেয়ে এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিজের কিছু করতে হবে ভাবতেও মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। যাকগে, ঘরে আলো জ্বালা না হয় নাই রইল, সন্ধ্যেটা দিয়ে-ছিলে তো ?"

কঠিন সুরেই কল্যাণী বলিল, "না, দিই নি।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দাও নি ? আমার ওপরে রাগ করে সন্ধ্যে বেলায় ভিটেয় সন্ধ্যেটা দিলে না রাঙাবউ ?"

পরক্ষণেই সে আবার হাসিল, "আর পিতৃপুরুষের ভিটের কল্যাণ ? যে গুণধর ছেলে জন্মেছি, তাঁদের নিত্যি একধাপ করে নামিয়ে নরকের পথেই নিয়ে যাচ্ছি। ওপরে তুলবার যোগ্যতা তো আমার হলনা, আর হবেও না। শুনছো রাঙাবউ, তোমার ঘরে কোথায় কি আছে তা তো কিছুই জানি নে, জানবার দরকার হয় নি, সে সুযোগও দাও নি। দেশালাই কোথায় দেখে শুনে আলোটা একবার জালিয়ে দিলে হতো। ওদিকে বড্ড দরকার, দাঁড়াবার যো নেই।"

কল্যাণী রাগ করিয়াই উঠিল, এবং স্বভাবের বিপরীত পদশব্দ করিয়াই ঘরের মধ্যে গিয়া কোথা হইতে দেশালাই বাহির করিয়া প্রদীপটা জ্বালিয়া দিল।

আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিল, "এই তো, ফুরিয়ে গেল লেঠা, এই আলোটা সন্ধ্যেবেলা জ্বাললেই বেশ হতো। দেখ দেখি অনর্থক বকতে গিয়ে কতটা দেরি হয়ে গেল! অথচ ওদের বলে এসেছি—এই আসছি—"

কল্যাণী বড় বড় দুইটী চোখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের বলে এসেছিলে—চন্দ্রাকে ?"

আচমকা চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়া বিশ্বপতি কল্যাণীর মুখের পানে তাকাইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে সে চোখের দৃষ্টি সে দেখিতে না পাইলেও কণ্ঠস্বরে তাহা সে বেশই বুঝিতে পারিল।

বাক্স হইতে একখানা কাপড় তুলিয়া লইয়া সেখানা বগলে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "সত্যি ঠিক তাই। এই জন্যেই আমি তোমার ভারি সুখ্যাতি করি রাঙাবউ, কি করে তুমি এত খপর যোগাড়

কর। ওই গুণটী তোমার সত্যি বড় চমৎকার! মার কিন্তু এসব বালাই ছিল না। যাক, এও বোধ হয় শুনেছ—চন্দ্রার মায়ের ভারি অসুখ হয়েছিল, কিন্তু বেচারাকে দেখতে কেউ ছিল না। অগত্যা আমিই তার সেবা শুশ্রূষা করেছি, ওষুধপত্তর এনে নিয়ে খাইয়েছি। কিন্তু সব যত্ন মিথ্যে করে বেটি শেষটায় মরে বাঁচল। তা যাক, ওতে দুঃখ নেই, বুড়ো মানুষগুলো জগৎ হতে যত সরে যায় ততই ভালো—বুঝলে? তোমার কপাল ভালো রাঙাবউ, মা বুড়ি বেশী দিন টেঁকল না। না হলে—বুঝলে, তোমার এমন গিন্নি হ'য়ে পাড়ায় পাড়ায় আমার খবর নেওয়া পোষাত না; তোমায় চিবিয়ে খেতো—" বলিতে বলিতে সে আবার অপর্য্যাপ্ত হাসিতে লাগিল।

কল্যাণী কি বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। আস্তে আস্তে সে বাহিরে যাইতেছিল, বিশ্বপতি ডাকিল, "আহা, থামো রাঙাবউ, সত্যিই যে রাগ করে চললে দেখছি। আসল কথা তো তবু এখনও বলি নি, এতেই তোমার এত রাগ হল? চন্দ্রার মা সেই ভোরে মারা গেছে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, বেটা বাগ্দীরা কেউ আসে নি। এই দিনটা ওদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, খোসামোদের একশেষ করেছি। এখন ওদের কর্ত্তা বললে—'টাকা দাও, তবে মড়া তুলব।' সত্যি বল রাঙাবউ, আমার কি বাপ মা মরেছে যে তার জন্যে টাকা যোগাড় করতে হবে আমারই?"

কল্যাণী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু ওই কাপড়খানা আর বাক্সের কোণে যে দুটো টাকা ছিল ও দুটো নিলে কি জন্যে বল দেখি?"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তাও দেখেছ? বাবাঃ, তোমাদের মেয়ে জাতের চোখের সামনে কিছু এড়িয়ে যাওয়ার যো নেই। কত হাত-চালাকী করে টাকা দুটো নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলুম, তাও কখন দেখে ফেলেছ। ভয় নেই গো, আজ মদ খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। তবু তুমি নিশ্চয়ই মনে করছো টাকা কাপড় কি হবে। ওই যে বললুম, ছোটলোক বেটারা কিছুতেই আসে না, কাজেই তাদের তাড়ি খাওয়ানোর খরচ, আর তাদের মোড়লকে এই কাপড়খানা দিতে হবে, নইলে মড়া উঠবে না যে।"

প্রদীপের নির্ব্বাপিতপ্রায় সলিতা বাড়াইয়া দিতেই তাহার আলো দৃপ্ত ভাবে কল্যাণীর কঠিন মুখখানার উপর ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বপতি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সকল সঙ্কোচ দূর করিয়াই বলিয়া উঠিল, "ছোটজাত আর কাকে বলে? সেই কাল রাতে চন্দ্রার মা মরেছে, আজ আবার রাত এলো, এখনও কি না মড়া উঠল না।"

কল্যাণী শক্ত সুরে বলিল, "তোমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন, দেশে কি আর কেউ নেই, কোনও লোক নেই?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া বিশ্বপতি বলিল, "আরে, সে না থাকারই মধ্যে। এই যে কাল রাতে গাঁয়ে একটা লোক মরেছে, আজ সারাদিন সেই মড়া পড়ে আছে, কেউ একবার উঁকি দিয়ে দেখেছে? গাঁয়ে তো এ দিকে লোকের অভাব নেই,—গায়ে গায়ে বাড়ী, শত শত লোক,—কিন্তু কেউ কি একবার দেখলে?"

কল্যাণী হাসিতে গেল, হাসি ফুটিলও, কিন্তু বড় বিকৃতভাবে। সে বলিল, "তা তো বটেই; কিন্তু কথাটা কি জানো? সবাই তো তোমার মত পরার্থপর হতে পারে নি যে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে, নিজের ঘরের পানে না তাকিয়ে পরের কাজ করতে ছুটবে? তাও বুঝতুম যদি স্বজাত কি বামন হ'তো; জাতে তো বাগ্দী, অস্পৃশ্য, যার ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়—ছোঁওয়া তো দূরের কথা—"

বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তুমি বলছ কি রাঙাবউ! দশজনের মত তুমিও এই কথা বললে? বাগ্দী অস্পৃশ্য, ওকে ছুঁয়ে স্নান করতে হয়; কাজেই ওর সেবা আর কেউ করবে না, কেউ ওকে দেখবে না। আচ্ছা, আমায় তুমি বলে বুঝিয়ে দাও দেখি,—যাদের আমরা ছোটজাত বলে দূরে রেখে চলি, যাদের ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়, সত্যিকার চোখে দেখে বল দেখি তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কিসে? তাদেরও যেমন দেহ আমাদেরও তেমনি, তাদেরও যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম

বিচারের জ্ঞান আছে, আমাদেরও তাই আছে;—আমাদের যা আছে তাদেরও তাই আছে। তবু আমরা ভদ্রবংশে জন্মেছি তাই আমরা ভদ্র, আর তারা নীচবংশে জন্মেছে বলেই নীচ—অস্পৃশ্য। আরও একটা মোটা কথা আছে—তারাও যেখান হতে এসেছে আমরাও সেখান হতে এসেছি, আবার যেতেও হবে আমাদের সেই একই জায়গায়,—বিচার হবে সেই একজনেরই কাছে। আর সবদিক ছেড়ে কেবল যদি এই দিকটাই ধর, তাই কি প্রচুর হবে না রাঙাবউ?"

কল্যাণী তাচ্ছিল্যের ভাবে মুখ বাঁকাইল, বলিল, "চিরকালের অস্পৃশ্য যারা, আজ তোমার বিচারে তারা হবে ভশ্চায্যি বামুন। এর পর আমার যেদিন অসুখ বিশুখ হবে, সেইদিন দুটো ভাত রাঁধার জন্যে চন্দ্রাকেই ডেকে নিয়ে আসবে তো?"

বিশ্বপতি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা যদি হয় তা হলেও মন্দ হয় না রাঙাবউ। জাতে বাগ্দী এই মাত্র ওর অপরাধ—নইলে আমি এ কথা জোর করে বলতে পারি সে যেমন ভাবে থাকে, সে রকম ভাবে একজন বামন কায়স্থের ঘরের বিধবাও থাকতে পারে না।"

রাগে কল্যাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর একটী কথাও না বলিয়া বারাণ্ডায় চলিয়া গেল।

পিছনে পিছনে ঘরের বাহিরে আসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তা হলে আমি চললুম রাঙাবউ। রাত্রে হয় তো ফিরতে পারবো না। কত রাত হবে কে জানে। এখন এ সব নিয়ে গিয়ে তাদের দিতে হবে। তার পর সব এসে মড়া তুলবে। হয় তো এগারটাই বেজে যাবে। তার পর সঙ্গে যদি না যাই, মড়াটাকে নদীর জলে ফেলে পালাবে। কাজেই বুঝতে পারছ আজ সারা রাতই শ্মশানে কাটবে।"

কি একটা কথা কল্যাণীর মুখে আসিয়াছিল, সে তাহা ফুটিতে দিল না। বারাণ্ডার ধারে দাঁড়াইয়া সে নক্ষত্র-শোভিত আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, স্বামীর দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না।

দরজা পর্য্যন্ত গিয়া বিশ্বপতি আবার ফিরিয়া আসিল, "দেখ, নেহাতই যদি ভয় করে, না হয় বল, আমি সনাতনকে বলে যাই, সে রাত্রে এসে বারাণ্ডায় শোবে এখন।"

যে কথাটা কল্যাণী চাপিয়া গিয়াছিল তাহা আর চাপা রহিল না; সে বলিল, "ভয় এতদিন হল না, আজকেই হবে, এমন ভয় আমার নেই। একা বাড়ীতে কেবল আজই থাকব না, এর আগেও কতগুলো রাত কাটিয়েছি সে কথাটা বোধ হয় তোমার মাথায় আসে নি। সে সব রাতে সনাতন বা আর কেউ আমায় পাহারা দিতে তো আসে নি; আজও কারও দরকার নেই।"

খুব খুসি হইয়াই বিশ্বপতি বলিল, "বেশ—বেশ, তা হলে তো আর কথাই নেই। তবে আমি চললুম রাঙা-বউ। কোন ভয় নেই—বুঝলে না? ভয় করলেই ভয় হয়। তুমি জোর করে থাকো—দেখো, যদি ভয় লাগে তবে আমার নামই বিশ্বপতি নয়। দরজাগুলো বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসো গিয়ে।"

পরম নিশ্চিন্ত ভাবেই সে চলিয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ দাঁতে নীচের ঠোঁটটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উঠানের দরজাটার পানে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার বড় বড় দুইটী চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ্-ডি

জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাপুরুষ মহাবীরের বিস্তারিত জীবনী লিখিতে হইলে সুবৃহৎ গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। ভারতবর্ষে যে কয়জন ধর্ম্মগুরু এ যাবৎ জন্ম গ্রহণ করিয়া এ দেশের ধর্ম্ম ও চিন্তাজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে মহাবীর অন্যতম। তাঁহার বাণী ও কর্ম্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

কাশ্যপগোত্রীয় ক্ষত্রিয়কুলে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশলা। সিদ্ধার্থের আরও দুইটী নাম ছিল শ্রেয়াংস এবং যশংস। ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলারও অন্য দুইটী নাম ছিল বিদেহদত্তা এবং প্রিয়কারিণী। ত্রিশলার ভ্রাতা চেটক লিচ্ছবি দেশের অন্যতম রাজা ছিলেন [১]। মহাবীরের পিতামাতা উভয়েই জ্ঞাত্রিক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন এবং ভগবান পার্শ্বনাথের পূজা করিতেন। জৈন শ্রমণদিগের গৃহী শিষ্য বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। বৈশালী-নগরের সন্নিকটস্থ কুণ্ডনগর মহাবীরের জন্মস্থান এবং বৈশালীর অন্যতম খ্যাতনামা ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া মহাবীর বেশালিয়ে (অর্থাৎ বৈশালিক) নামে পরিচিত ছিলেন [২]। তাঁহার জন্মদিনে কুণ্ডনগরের বন্দীরা সকলে কারামুক্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত নগরী দশ দিন আনন্দ-উৎসবে সমারোহে মুখরিত ছিল এবং উৎসব-শেষে দেবতাদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। বিদেহ-দত্তার পুত্র, বিদেহ জনপদের অধিবাসী এবং বিদেহ রাজকুমার বলিয়া মহাবীরের অন্য নাম ছিল বিদেহ [৩]। মহাবীরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ধনে জনে মানে পুণ্যে তাঁহার পিতামাতার খুব সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল বলিয়া মহাবীরের অন্য আর একটি নামকরণ হইয়াছিল বর্দ্ধমান। নিন্দা অথবা প্রশংসা কোন দিকেই তাঁহার কিছু আকর্ষণ ছিল না বলিয়া লোকেরা তাঁহাকে আখ্যা দিয়াছিল শ্রমণ বা সন্ন্যাসী। সুখে, দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া তপস্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা তিনি স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারিতেন বলিয়া দেবতারা তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন "মহাবীর"। এই নামগুলি ছাড়া তাঁহার আরও কয়েকটী নাম ছিল, যথা,—জ্ঞাত্রিপুত্র, নামপুত্র, শাসন-নায়ক এবং বুদ্ধ। যে জ্ঞাত্রিককুলে মহাবীরের জন্ম হয় সেই জ্ঞাত্রিকেরা কখনও পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতেন না, কোনও লোকের অনিষ্ট করিতেন না এবং মাংস খাইতেন না [৪]। মহাবীর যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে নায় অথবা নাথ কুলও বলা হইত। নাথের পুত্র বলিয়া বৌদ্ধেরা মহাবীরকে "নিগণ্ঠনাথ পুত্ত" বলিতেন। যাঁহারা সর্ব্ববন্ধনমুক্ত ছিলেন অর্থাৎ এই পৃথিবীর যত প্রকার মোহবন্ধন আছে তাহার অতীত যাঁহারা তাঁহাদিগকেই বলা হইত নিগণ্ঠ (অর্থাৎ গ্রন্থিবিহীন)। মহাবীর বলিতেন তাঁহার এ প্রকারের বন্ধন কিছুই নাই; সকল পাপ হইতে তিনি মুক্ত। যাহার যাহা দ্বিধা বা সন্দেহ আছে তাহা লইয়া তাঁহার নিকটে আসিলেই সকল দ্বিধা বা সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতে পারেন।

পালি সাহিত্যে মহাবীরকে ধর্ম্মসংঘ বিশেষের নেতা, বিশেষ ধর্ম্মগোষ্ঠির শিক্ষক বা প্রচারক এবং দলবিশেষের কর্ত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পণ্ডিত ও নৈয়ায়িক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। লোকেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং সুদীর্ঘ সন্ন্যাস জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জরার আক্রমণে তিনি একটু ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিলেন [৫]। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে মহাবীর ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত কৌণ্ডিল্যগোত্রীয় যশোদা নাম্নী এক ক্ষত্রিয়া নারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে অনোঘ্যা বা প্রিয়দর্শনা নামে এক কন্যা

১। Jaina Sutras, (S. B. E.), Pt. I. p. xii.

২। Ibid. p xi.

৩। Jaina Kalpasutra, §. 110.

৪। Jaina Svtras (S. B. E.) pt. II, p. 416.

৫। Digha Nikaya Vol. I, p. 48.

জন্ম গ্রহণ করে এবং যমালি নামক এক ক্ষত্রিয় যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সর্ব্বপ্রথমে যমালি মহাবীরের প্রধান শিষ্য ও সহকর্ম্মী ছিলেন; কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে মহাবীর পিতৃমাতৃহীন হন। ইহার পরেই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য ব্যক্তিদের অনুমতি লইয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং জগতের অন্যান্য প্রাণীর কল্যাণের নিমিত্ত সত্যধর্ম্মপ্রচারের জন্য বাহির হইয়া যান [৬]। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কঠিন সাধনা ও তপশ্চর্য্যার পর তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ইহার পর তিনি বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের কয়েক বৎসর আগে মহাবীর মল্লদের পাবানগরীতে মোক্ষ লাভ করেন [৭]।

কল্পসূত্র নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যেদিন মহাবীর জন্ম, জরা ও মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সকল দুঃখ মায়ার অবসান করিয়া, সকল জ্বালা যন্ত্রণার অতীত হইয়া সিদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, সেদিন পূর্ণিমার রাত্রে কাশী এবং কোশলের আঠারজন রাজা, নয়জন মল্লপ্রধান এবং নয়জন লিচ্ছবিপ্রধান সকলে একত্র হইয়া সমস্ত গ্রাম ও নগর আলোকমালায় সজ্জিত করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জ্ঞানের আলো যখন নিভিয়া গেল তখন চল আমরা সকলে মিলিয়া এই জড়মরণশীল পার্থিব পদার্থের আলোয় আলোকিত করি [৮]। সমসাময়িক রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণ মৃত্যুর পর এই মহাবীর মহাপুরুষকে কি প্রকার সম্মান দেখাইয়াছিল কল্পসূত্রের এই উল্লেখ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুতে জ্ঞাত্রিক্ষত্রিয়েরা সত্যই তাহাদের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষ হারাইল।

মহাবীর নিষ্কলঙ্ক আদর্শ চরিত্রপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায়, অন্যায় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, জ্ঞান ও বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং ভিক্ষালব্ধ অন্নে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন এবং যাহা কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন তাহা আপনা হইতেই তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইত [৯]। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের কোন সীমা ছিল না—নিদ্রায় ও জাগরণে, গমনে ও উপবেশনে—সকল অবস্থাতেই তিনি সব কিছু দেখিতে ও জানিতে পারিতেন [১০]। কে কখন কি পাপ অথবা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে বা কে করে নাই কিছুই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না [১১]। সূত্রকৃতাঙ্গ নামক গ্রন্থের [১২] মতে মহাবীরের জ্ঞান ও অনুভূতির বিশেষ ক্ষমতা ছিল। অধর্ম্ম ও অপবিত্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। এই পৃথিবীতে তিনি ছিলেন মহত্তম, জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্ব্বোত্তম। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মহান এবং যশস্বী ছিলেন। অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌স্ তাঁহার Religions of India নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৯২) লিখিয়াছেন যে মহাবীর কখনও কোনও অভিনয় বা আনন্দোৎসবে যোগদান করেন নাই; পিতামাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি পিতৃগৃহেই বাস করিয়াছিলেন। মহাবীর ত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যান [১৩]।

সমসাময়িক যুগে ছয়জন প্রসিদ্ধ চিন্তাগুরু ও ধর্ম্মাচার্য্যের মধ্যে মহাবীর ছিলেন অন্যতম, ধর্ম্মাচরণ কি করিয়া করিতে হয় তিনি তাহা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার বাণী ছিল মহৎ। তাঁহার মতে সৎ ও অসৎ, ন্যায় ও অন্যায় কর্ম্মের ফল নির্ভর করে কর্ম্মীর পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফলের উপর। কার্য্য কারণ সম্বন্ধে এবং প্রেম ও কামনার বশে সকল প্রাণীই জন্ম গ্রহণ করে এবং প্রাণী

৬। Kalpasutra §, 11.

৭। Sangiti Suttanta Digha Nikaya, III 209-210. এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁহার আজিবিক সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য—"Four years after his (Mahavira's) separation from Gosala, when he founded a new Nigantha order with which the order of Parsvanatha was amalgamated afterwards through the intercession of Kesi and Gautama into a common Jaina school of religio—philosophy (Vide Uttaradhyayana Sutra Lec. XXIII; B. M. Barua, the Ajivikas, p. 19).

৮। Kalpasutra, §. 128 (S. B. E. XXII, 266). ৯। Saruyutta Nikaya, I 66.

১০। Angottara Nikaya, I, 220.

১১। Majjhima Nikaya, II, 214-228.

১২। I. 2. 3. 22.

১৩। Acaranga Sutra, chap, XXIV, § 1007.

মাত্রেই যে অনুভূতি লাভ করে তাহা পূর্ব্বকৃত কোন কার্য্যকারণেরই ফল মাত্র। এই পৃথিবীতে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপ অথবা পুণ্যের ফল স্বরূপ। কর্ম্মফলের উপর মহাবীরের অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। তিনি ক্রিয়াবাদী ছিলেন[১৪]। মহাবীরের ধর্ম্ম অর্থাৎ জৈনধর্ম্ম অনেক প্রকার কর্ম্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করে। বৌদ্ধধর্ম্মেও কর্ম্মফলের নানা প্রকার বিভাগ আছে। মহাবীর আত্মবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহা প্রচারও করিতেন। তাঁহার মতে জ্ঞান ও দৃষ্টি সীমাবদ্ধ,—সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও দৃষ্টি লইয়া যে পৃথিবী আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহাও সীমাবদ্ধ অথবা সসীম[১৫]। গৌতম বুদ্ধ এই মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীর সর্ব্বশেষ সীমা দৌড়াইয়া কেহ নাগাল পাইতে পারে না। যিনি সর্ব্বপ্রকার আসব অর্থাৎ পাপকে জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছেন কেবল তিনিই সেই সীমায় পৌছিতে পারেন। সেই হেতু কেহই পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কোনও মতবাদ অথবা সত্যকে সেই হেতু একেবারে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না; কারণ, বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন সূত্র ধরিয়া একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সেই একটি ভিন্ন দিক ও সূত্র হয়ত একটি পরিপূর্ণ চিন্তা-জগৎকে আশ্রয় করিয়া আছে। দুইটি বিভিন্ন মতবাদ আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে একটি আর একটির বিপরীত বলিয়া দেখা যাইবে, কিন্তু উল্লিখিত মতবাদ বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে একটি মতবাদ অপরটির পরিপূরক মাত্র।" বুদ্ধদেবের মতে সেই জন্য এই পৃথিবীর বেদনার আদিও নাই, অন্তও নাই।

কায়কর্ম্ম এবং মনকর্ম্ম এই দুই প্রকার কর্ম্মের বিশেষ স্থান মহাবীরের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল[১৬]। মহাবীর বলেন যে অজ্ঞানীরা কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম খণ্ডন করিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া কর্ম্ম খণ্ডন করিতে পারে। জৈন ধর্ম্মে চারিটী নির্দ্দেশ পালন এবং আত্ম-সংযম করিলেই আত্মার শান্তি ও কল্যাণময় অবস্থা লাভ করা যায়। বৌদ্ধদিগের মতে জৈনদের তপশ্চর্য্যা খুব কঠোর ছিল না[১৭]। দেহ, মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা আসক্তি, প্রেম, ঘৃণা ও বাসনা এই চারি প্রকার কাম-ভাবের উদ্রেক হয়। জৈন ধর্ম্মানুসারে এই চারি প্রকার কামভাবের ফলে আত্মা বিকৃতি লাভ করে। এরূপ যে আত্মা তাহার সংজ্ঞা আছে, তাহা বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারে[১৮]। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক হত্যা মাত্রই পাপ ও অধর্ম্মের কারণ। সুমঙ্গলবিলাসিনী[১৯] নামক বৌদ্ধ টীকাগ্রন্থে মহাবীর সম্পর্কে চাতুযাম সংবর বলিতে কি বুঝায় তাহার ব্যাখ্যা আছে। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে নিগণ্ঠ যিনি তিনি জলের ব্যবহার সম্বন্ধে অত্যন্ত সংযমী ও সাবধানী, তিনি অন্যায় ও অধর্ম্ম হইতে নিজেকে সংযমে রাখেন, সকল অধর্ম্ম, অন্যায় তিনি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন এবং সকল পাপ ও অধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়াছেন। ইহাকেই বলে চাতুযাম সংবর; এবং যেহেতু তিনি চারি প্রকার সংযমের বন্ধনে আবদ্ধ, সেই জন্যই তাঁহাকে বলা হয় নিগণ্ঠ। এই চারি প্রকার সংযমের বন্ধনই হইতেছে জৈন ধর্ম্মের চারিটী নির্দ্দেশ। এ কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই চাতুযাম সংবর মতবাদ পার্শ্বনাথই সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর পার্শ্বনাথেরই প্রাচীন মতবাদটীকে নূতন রূপ দান করিতে গিয়া পঞ্চ মহাব্রত অর্থাৎ পাঁচটী ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা প্রবর্ত্তন করেন; ইহার মধ্যে কখনও কিছু পণ না করার প্রতিজ্ঞাকে (অপরিগ্গহ) মহাবীর সবচেয়ে বড় বলিয়া মনে করিতেন। এই চাতুয়াম সংবর ব্যতীত ইন্দ্রিয়মরণ আচরণ (অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মানুগামী নিজেকে উপবাসী হইয়া আত্মহত্যা) বিষয়েও তিনি কিছু সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারের ফলে ইন্দ্রিয়-মরণ আচরণ উঠিয়া যায় এবং কতকগুলি কঠিন নিয়মের মধ্যে এই আচরণকে বিধিবদ্ধ করা হয়। তাহার ফলে যে কেহ যখন তখন এই অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। নিগণ্ঠ অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বলেন যে শীতল জলের মধ্যে প্রাণী, কীট বাস করে; সেই হেতু মহাবীর নিগণ্ঠদিগকে শীতল

১৪। Anguttara Nikaya IV, 180.
১৫। Anguttara Nikaya, IV, 429.
১৬। Majjhima Nikaya, I 338.
১৭। Digha Nikaya, I, 161 foll.
১৮। Sumangalavilasini p. 119.
১৯। I, 168.

বুদ্ধের দেহত্যাগ
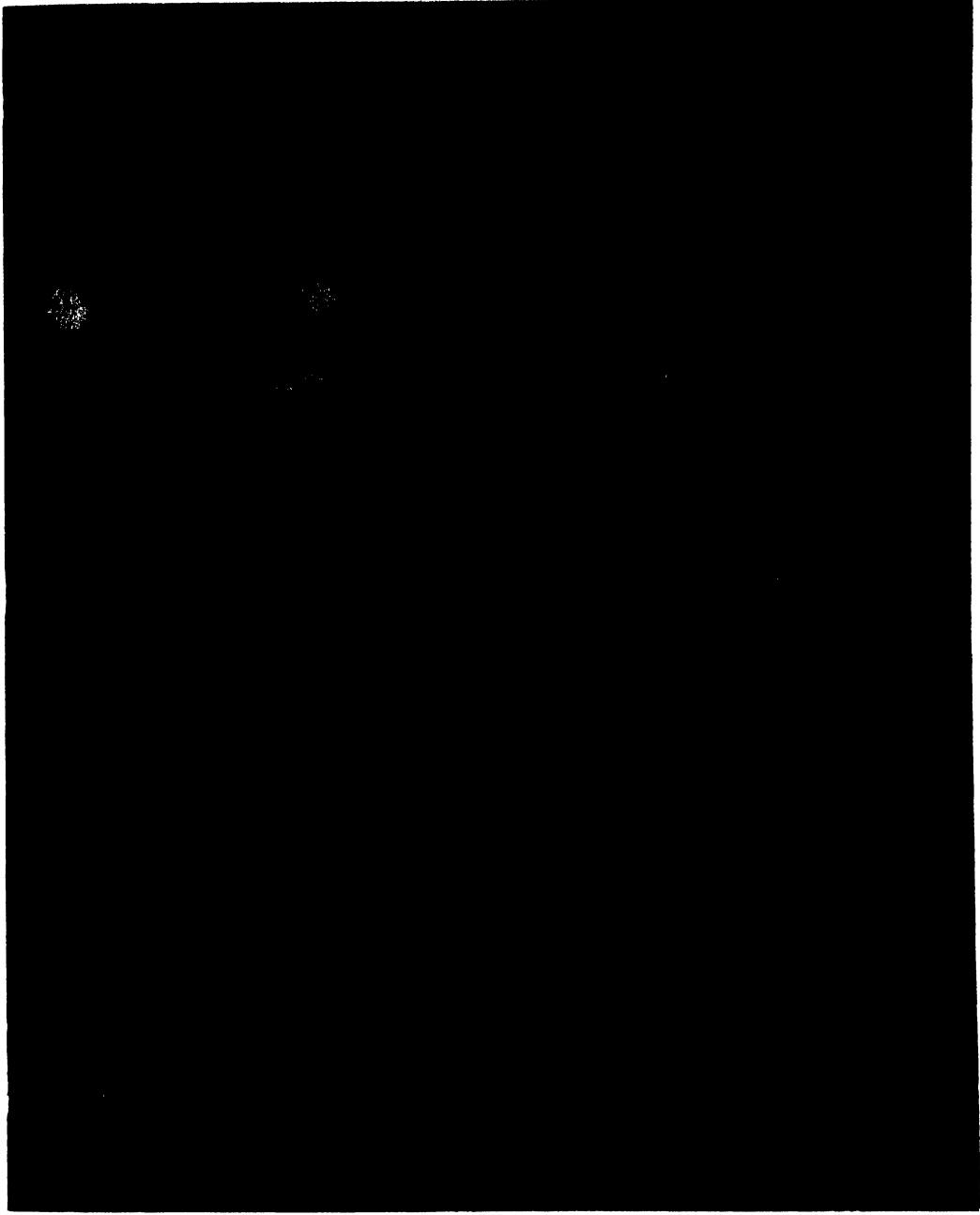
জল পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মোক্ষপ্রাপ্ত জ্ঞাত্রি-কুলসম্ভূত জৈন সন্ন্যাসীরা বলেন, যাঁহারা অস্ত্র ব্যবহার করেন, বিষ ভক্ষণ করেন, কিংবা নিজেদের জলে বা আগুনে নিক্ষেপ করেন তাঁহারা বারবার এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন [২০]। উত্তরাধ্যয়নসূত্রের মতে ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহারা সুপণ্ডিত কেবল তাহারাই মুক্তির বাণী শুনিবার এবং গ্রহণ করিবার যোগ্য [২১]। আর যাহারা বাক্যে, চিন্তায় এবং কর্ম্মে এই দেহের প্রতি, রূপের প্রতি, বর্ণ-বিন্যাসের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে তাহারা দুঃখ ও যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারে না [২২]। মহাবীর-প্রচারিত ধর্ম্মে বাক্য, চিন্তা ও ধর্ম্ম এই তিনটী সমভাবে বিবেচিত হইত; কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে কর্ম্মের পশ্চাতে যে ইচ্ছা, যে প্রবৃত্তি, যে কামনা থাকে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচ্য বলিয়া মনে করিতেন [২৩]। জৈনদের মতে চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটী প্রত্যেকটী হইতে পৃথক। "কর্ম্মের কথা বলিও না, কর্ম্ম বিবেচ্য নহে, দণ্ডই অর্থাৎ কর্ম্মফল যথার্থই বিবেচনার বিষয়"—ইহা মহাবীরের মত। তাঁহার মতে চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম এই তিনটীর সম্বন্ধে যে পাপ ও অধর্ম্ম দেখা যায় তাহার তিনটী কারণ আছে। সমসাময়িক যুগে অজিতকেশকম্বলী নামক যে অন্যতম ধর্ম্মগুরু ছিলেন মহাবীর তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মবাদের যথার্থ বিবরণ আমাদের দিয়াছেন। অজিত কেশকম্বলী ধর্ম্মজ্ঞানী ছিলেন; নৈষ্কর্ম্মের, কর্ম্মহীনতার বাণী—মহাবীর তাহা যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য বলিতে গেলে অজিতকেশকম্বলীর প্রচারের ফলে মহাবীর ও বুদ্ধ গৌতমের ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য এত সহজ ও সুগম হইয়াছিল। ইহা ছাড়া মহাবীর যথার্থই মনে করিতেন যে মক্ষলিগোশালের ধর্ম্মমতের মধ্যে ইচ্ছার স্বাধীনতার কোনও স্থান নাই।

খৃঃ পূঃ ১ম ও ২য় শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীকদের প্রাধান্য ছিল। ইণ্ডো-গ্রীক্ রাজন্যবর্গ মহাবীরকে খুব সম্মান করিতেন [২৪]। মিলিন্দপ্রশ্ন নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে এক সময়ে ৫০০ ইণ্ডো-গ্রীক্ রাজা মিলিন্দকে তাঁহার প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের জন্য নিগণ্ঠনাথপুত্তের নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছিল। ধর্ম্মগুরু মহাবীরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তদানীন্তন জনসমাজে তাঁহার প্রভাব খুব ছিল। ১৪,০০০ শ্রমণ সম্মিলিত একটি বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘ মহাবীরকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইন্দ্রভূতি তাঁহাদের নেতা ছিলেন। ইহা ছাড়া নাথপুত্তের ধর্ম্মসঙ্ঘে ৩৬,০০০ শ্রমণী ছিলেন। চন্দনা তাঁহাদের নেত্রী। এই শ্রমণ ও শ্রমণী ছাড়া গৃহস্থ ভক্ত পুরুষ ছিলেন ১৫৯,০০০। তাঁহাদের নেতা ছিলেন সঙ্খশতক। গৃহস্থ ভক্ত রমণী ছিল ৩,১৮,০০০। তাঁহাদের নেত্রী ছিলেন সুলসা ও রেবতী। প্রচারক হিসাবে মহাবীরের ধর্ম্মজীবন সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন গৌতম ইন্দ্রভূতি। সুধর্ম্ম, গোপাল, আনন্দ, ইন্দ্রভূতি প্রভৃতি প্রধান শিষ্যেরা মহাবীরের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন।

বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্গত অঙ্গ, মগধ, কোশল, বৈশালী, পাবা প্রভৃতি মহাবীরের প্রধান কর্ম্মস্থল ছিল; কিন্তু মিথিলা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় স্থান ছিল। মহাবীর তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম বর্ষাঋতু যাপন করেন অস্থিকগ্রামে। তিনটী বর্ষাঋতু যাপন করেন চম্পা ও পৃষ্টিচম্পাতে, ১২টী বৈশালী ও বানিজগ্রামে, ১৪টী রাজগৃহ এবং নালন্দার উপকণ্ঠে, ৬টী মিথিলায়, ২টী ভদ্রিকাগ্রামে, ১টী আলভিকাতে, ১টী পাণিতভূমিতে, ১টী শ্রাবস্তীতে এবং ১টী রাজা হস্তীপালের রাজ্যস্থিত কোনও নগরে। এইখানেই তাঁহার জীবনের শেষ ঋতু যাপন করেন। অবন্তীরাজ্যেও মহাবীর কিছুদিন তপশ্চরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার ধর্ম্মদীক্ষার পূর্ব্বে তিনি ত্রিশ বৎসর বিদেহ রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন [২৫]। বিদেহ নগরের প্রতি তাঁহার এমন একটি আকর্ষণ ছিল যে পরবর্ত্তী কালে তিনি তাঁহার পুরাতন জন্মস্থানটীকে ভুলিতে পারেন নাই। সন্ন্যাস-জীবনের ৪২টী বর্ষাঋতুর মধ্যে

২০। Jaina Sutras, II. 231 232.
২১। Ibid., p. 231.
২২। Jaina Sutras, II, 24-27.
২৩। Majjhima Nikaya, III, 2-7.
২৪। Questions of Milinda (S. B. E.), pt. I. p. 8.
২৫। Jaina Sutras I 256.

১২টী বৈশালীতে যাপন করিয়াছিলেন [২৬]। একবার মহাবীর উজ্জয়িনীতে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন;, সস্ত্রীক রুদ্র তখন তাঁহাকে বাধা দিতে বৃথাই চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিগম্বর জৈনদের মতে রুদ্রকে জয় করিয়া আবার ধ্যান ও আরণ্যক জীবন অবলম্বন করিবার পর মহাবীর মনঃপর্য্যায় জ্ঞান লাভ করেন [২৭]।

মহাবীর গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। বৌদ্ধ সংযুক্ত নিকায় এই মতের সমর্থন করেন [২৮]। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে বলিতেছেন "আপনি নূতন ধর্ম্মদীক্ষা লাভ করিয়াছেন। আপনি নিগণ্ঠনাথপুত্তের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ"। জৈনধর্ম্মের পুরাণ কথানুযায়ী বিক্রমাব্দ প্রতিষ্ঠার ৪৭০ বৎসর আগে মহাবীর লোকান্তরিত হন। বিক্রমাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয় খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে। এই মতে মহাবীরের লোকান্তরের তারিখ তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ৫২৮ অব্দ। পণ্ডিতবর ডাঃ চার্‌পেন্টিয়ার এই মত সমর্থন করেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৪৬৮ অব্দকে মহাবীরের লোকান্তরের তারিখ বলিয়া মনে করেন [২৯]।

মহাবীর বুদ্ধদেবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই মারা যান। ডাক্তার হোর্ন্‌লি মনে করেন পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। মহাবীর ৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া জৈন পুরাণ কথায় প্রমাণ আছে [৩০]। কর্ণাট দেশীয় জৈনদের মতে মহাবীরের লোকান্তর গমনের তারিখ খৃঃ পূঃ ৬৬৩ অব্দ, কোল্‌ব্রুকের মতে খৃঃ পূঃ ৬৩৭ অব্দ, গুজরাটী জৈনদের মতে খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দ এবং প্রিন্সেপের মতে খৃঃ পূঃ ৫৬৯ অব্দ। সত্য করিয়া বলিতে গেলে মহাবীরের যথার্থ তারিখ নির্দ্ধারণ করিবার মতন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই তারিখ মোটামুটি ভাবে খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে মহাবীরের স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। তাঁহার দানের মূল্য অপরিসীম। কোন প্রসিদ্ধ জ্ঞানাচার্য্য জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংঘ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই জৈনধর্ম্ম ও সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসে তাহাদেয় অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় নাই [৩১]। বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠালাভের আগেই জৈনদের ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও বাণী তাহাদের দার্শনিক মতবাদ এবং ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি ভারতীয় জনসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়েও ভারতবর্ষে জৈনধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। ডাক্তার য়াকোবি (Jacobi) বলেন যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ইতিহাসে জৈনধর্ম্মের একটি বিশেষ মূল্য আছে। জৈনধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন এবং যে সকল প্রাচীনতম ধর্ম্ম ও দার্শনিক প্রশ্ন, সমস্যা ও মতবাদ ইত্যাদি পরবর্ত্তী কালের সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ দর্শনের সূচনা করিয়াছে, সেই সকল প্রাচীনতম ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদের বিচিত্র ধারার সঙ্গে জৈনধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে [৩২]। মানবের ইতিহাসে মহাবীরের স্থান অতি উচ্চে। তিনি এক নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মত চিন্তাশীল লোক সকল দেশে সকল যুগে জন্ম গ্রহণ করে না। সেই জন্যই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

২৬। Kalpasutra, § 122.

২৭। Stevenson Heart of Jainism, p. 3.

২৮। Vol. I. p. 68, cf. Sabhiya Sutta of the Sutta Nipata.

২৯। Samagama Sutta, Majjhima Nikaya, II, 243.

৩০। কল্পসূত্রের মতে মহাবীরের জীবনের ৭২ বৎসরের মধ্যে ৩০ বৎসর কাটে গার্হস্থ্য জীবনে এবং ৪২ বৎসর সন্ন্যাস জীবনে। সন্ন্যাস জীবনের ১২ বৎসর কাটিয়াছিল স্নাতক অর্থাৎ শিক্ষাপ্রার্থীরূপে এবং বাকী ৩০ বৎসর "জিন" অথবা "কেবলিন্" রূপে। শিক্ষা জীবনের প্রথম এক বৎসর তিনি বসন-পরিহিত ভিক্ষুকের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতেই নগ্ন ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতে হয় (Kalpasutra, § 117)। ডাক্তার বড়ুয়া তাঁহার আজিবিক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৮) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শিক্ষা জীবনের প্রথম বৎসরে মহাবীর পার্শ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সংঘের শিষ্য ছিলেন, সেই সংঘের নিগ্রন্থ শিষ্যেরা বসন পরিধান করিতেন; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর মহাবীর সেই সংঘ পরিত্যাগ করিয়া আজিবিক সংঘে যোগদান করেন।

৩১। Buddhist ttura, p. 143.

৩২। Hasting's Encyclopaedia of Religion Jathics p. 464.

আই হ্যাজ্ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্ত আভাস]

[নবীনবাবু পরকালের পুঁজি সঞ্চয় করবার জন্তে তাড়াতাড়ি আপিসের পাততাড়ি গুটিয়ে কাশীবাস করতে আসেন। দেখলেন—তোফা স্থান, রাবড়ীর গঙ্গাসাগর, রসগোল্লার Shell Factory, ছোট বড় চ্যাপ্টা বার যা সয়। ফলের গুলজারিবাগ,—দন্তহীন শ্রীমন্তদের এমন স্থান আর নেই। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বৃন্দাবনের ব্যাপারী—দই আর লাড্ডু মেরে মানুষ—ফলের মধ্যে তাল তিন্তিড়ি কুল আর বকুল, তাও বাঁদরের অধিকারে; তাই ফলত্যাগের এন্তার উপদেশ দিয়ে গেছেন,—পাছে লোকে কাশীর দিকে ঝোঁকে,—পাছে বৃন্দাবন দ'পড়ে যায়।

এখন ইংরিজি পড়ে, মানুষ তাঁর চালাকি বুঝতে পেরেছে;—কাশীতে ইয়া ইয়া ইমারত বানিয়ে ধর্ম্মপ্রাণেরা চেপে বসেছেন। ডাক্তারদের ব্যবস্থাপত্রে আজকাল ফলই প্রধান—যেহেতু তা ভিটামিনের ভাণ্ডার; অধিকন্তু সন্দেশ—যা সেনাটোজেনের কাঁচা পাক্। এখানে উভয়কে সহজ করে নিয়ে, একাধারে স্পৃশ্য করা হ'য়েছে, যথা—'আঁব সন্দেশ', 'নেবু সন্দেশ', রোগীর যেবা ইচ্ছা হয়—সবই মজুদ। এই পথ্য পারিপাট্যে—বিশিষ্ট শিষ্ট অশিষ্ট সকল প্রকার রোগীই তুষ্ট, সুতরাং ভোগী ও রোগীর অন্ত নেই।

যাঁরা বহুদিন মারা গেছেন বলে' নবীন বাবুর ধারণা ছিল,—একে একে দশাশ্বমেধে তাঁদের কয়েকটির সঙ্গে দেখা। এখন তাঁরা সব দ্বিজ—পরম দ্বৈতবাদী। মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, চায়ের দোকান আশ্রয় করেছেন। পথে ঘাটে প্রব্রজ্যা—পরম স্বদেশী; গেরুয়া নিয়ে পরকালের পথ পরিষ্কার করছেন। গায়ে-পড়া সদালাপী, যাত্রীদের সেবায় জীবন সমর্পণ করেছেন, কারুর পাশ কাটাবার যো নেই। সঙ্গ দান, আশ্রয় দান, মন্ত্র দান, উপদেশ দান, মায় আয়ের উপায় বিধান, অর্থাৎ পরার্থ দিয়েই থাকেন।

নবীন এসে পর্য্যন্ত রুটিন্ ঠিক করতে পারছিল না। বাজার করে, খায়, বেড়ায়, ঘুমোয়,—ধর্ম্মের পথ না পাকড়ালে মনে শান্তি নেই। সারা জীবন কারে পড়লেই—দুর্গা দুর্গা—হরি হরি করেছেন, হঠাৎ বুড়ো বয়সে, দুর্ব্বল শ্বাসক্লিষ্ট অবস্থায়, অত লম্বা সন্ধিসমাসযুক্ত 'জয় বাবা বিশ্বেশ্বর' জপ করাও খপ্ করে আসেনা, বেচারা বড় মুস্কিলে মনমরা হয়ে পড়ছিলেন। দিনও কাটেনা।

দেখলেন বিশিষ্ট কাশীবাসীরা বাট্ পেরিয়ে, সার্ট গায়ে পামসু পায় চা-খেয়ে সকাল বিকাল round মারছেন sound health লাভেচ্ছায়। মাছ মাংস নিত্য চাই—চাকর নিয়ে আসে—at any cost. সন্ধ্যায় অহল্যা ঘাটে হল্লা, তাতে নাকি chestএর বল বাড়ে।—আলোচনা—বিগত চাকরির, বর্ত্তমান সুদের, আর মানুষ যে আর নেই তার প্রমাণের, অর্থাৎ তাঁরা ক'জন গেলেই দুনিয়া অন্ধকার।

দূর করো, একটা কাজ নিয়ে থাকা ভালো, কর্ম্মও তো ধর্ম্ম—এই ভেবে, পূর্ব্বাভ্যাস মত গরীবের ছেলেদের পড়াবার সঙ্কল্প নবীন বাবুর মাথায় এলো। বেঞ্চি বই কিনে ফেললেন। প্রতিবেশী মুকুন্দ বাবু নিষেধ করেন।

নবীন বাবুর সাহিত্য রসে রুচি চিরকালই একটু ছিল। কখন, সেটা কোন্ ফাঁকে কস্ বেয়ে চুইয়ে থাকবে। একদিন একটি অপরিচিত যুবা এসে সবিনয়ে জানতে চাইলে—"বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠ কোন্ রস-প্রধান এবং সেই আসল রসটি কোথায় ফুটেছে, অনুগ্রহ করে যদি বুঝিয়ে দেন" ইত্যাদি। নবীন বাবু ছেলেদের বড় ভালো বাসেন, তাদের কোনো দিন ক্ষুন্ন করতে পারেননা। এমন একটি জিজ্ঞাসু পেয়ে ভারী খুসি হয়ে—আলোচনা সুরু করবার মুখেই মুকুন্দ বাবুর আবির্ভাবে,—রসভঙ্গ, সব মাটি। ছেলেটি অন্য সময় আসবে বলে দ্রুত চলে গেল।

মুকুন্দ বাবু সব শুনে বিরক্ত ভাবে বললেন—আপনি কি কাশীবাস করেছেন ছেলেদের 'আনন্দ মঠ' বোঝাতে! ওকে চেনেন? কে, কি উদ্দেশ্যে আসে তা জানেন? কোন্ দিন বিপদে পড়বেন দেখছি। ওর ওপর কলেজের ছেলেরা পর্য্যন্ত সন্দেহ রাখে…

নবীন বাবু অবাক্। মানুষের বুদ্ধি একটু কম হওয়াই ভালো, যারা বেশী বুদ্ধি ধরে তাদের সুখও নেই, শান্তিও নেই, তারা কোনো কিছু উপভোগ করতে পারেনা,—মুকুন্দ বাবুটি তাই। আশ্চর্য্য,—তরুণদের সইতে পারেননা। তারা কি ভাগবত নিয়ে বেড়াবে না মোহমুদ্গর ভাঁজবে!

পরিচিত বন্ধুরা তাঁকে মহাপুরুষ মিলিয়ে দিলে! তাঁর তাড়স্ তাঁর সইলনা। তিনি কাশীখণ্ড পড়তে বলেন—যা চিত্রাঙ্গদাও নয়—সোনার তরীও নয়। কাশীর গরমও অতিষ্ঠ করলে। দার্জ্জিলিং বা শিলং যাবার অবস্থা নয়। পূর্ণিয়া জায়গাটা নরম-গরম, সেথা আপনার লোকও আছে; সেইটাকেই গ্রীষ্মাবাস স্থির করলেন। স্থানটাও বেশ 'আধময়া'—হালু-চালু করবার মত হাল কারুর নয়—পীলেয় সব মেরে রেখেছে। গরমের সময় আঁবটাও প্রচুর পাওয়া যায়; সাত্ত্বিক ভূমি, ফলযোগে সাত্ত্বিকতা বাড়ানো যাবে।

গরম পড়তেই নবীন বাবু পূর্ণিয়া পালাতে আরম্ভ করলেন, বর্ষান্তে কাশী ফেরেন। দু'নৌকোয় পা পড়ল।

মহাপুরুষ কিন্তু নবীন বাবুর মধ্যে মনের মত গুণ আবিষ্কার করে'

তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। নেকনজরে পড়ে যাওয়ায়—চোখের আড়াল করতে নারাজ। খোঁজ খবরের কড়া ব্যবস্থা করলেন—নবীনের অজ্ঞাতে।

নির্ব্বোধ নবীন বুঝতে পারেনা—ব্যাজার হয়। ক্রমে কোথাও শান্তি রইলনা, সর্ব্বত্রেই অতিষ্ঠ। অতিরিক্ত আদরে,—কোলে কোলে ছেলে যেমন গলে যায়,—পরিবার পালাই পালাই করে,—নবীনের সেই দশা।]

[লেখা—বহু দিন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলুম। আশা করি ৭০ বছর বয়সের সেবকের কাছে এই অপরাধের জন্ম আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকারা কৈফিয়েৎ চাইবেন না। কারণ, ডাক্তার বৈদ্যের লম্বা লম্বা ব্যবস্থাপত্র ছাড়া আমার নিজের বলবার কিছু নেই।]—লেখক

১৮

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ধোঁয়াটে অন্ধকারে বাইরে একখানা বেঞ্চিতে বসে নানা কথা ভাবছি আর মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ছি। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে—কাজের মধ্যে personal (নিজস্ব) বলতে এইটিই আছে।

মাথা খুলে গেল,—এইটিই ত' সত্যি, ভারত বহু সাধনান্তে জান্‌তে পেরেছিলেন—মানুষের চরম পরিণতি ধূমে, তাই পূর্ব্বপুরুষেরা পরম শ্রদ্ধার সহিত এই জিনিষটির প্রগাঢ় চর্চ্চা করতেন—জ্ঞান হতেই। অবশ্য অসাধারণ যাঁরা বা যাঁদের পূর্ব্বসংস্কার প্রবল, তাঁরা জ্ঞানের অপেক্ষা রাখতেননা। ভালো কাজ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করা হউক—ফল একই পাওয়া যায়। আমাদের বরেণ্য কবিও সেই ইঙ্গিতই ক'রেছেন—

"চিতা ভস্মে হতে হবে সবার সমান" অর্থাৎ ধূমে—

দেখি কে একজন আমার দিকেই আসছেন। এটাও জীবনের একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতা! গুড়ের গন্ধ পেলে কেউ না কেউ আসবেনই। তাই মৌলিক চিন্তাগুলো এবার আর দানা বাঁধতে পারলেনা। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য।

চিন্তাটা বাধা পেলে, এই ভাবে অনেক চিন্তাই নষ্ট হ'য়েছে। যাক্—শুভাংসি বহু বিঘ্নানি তো আছেই।

—দেখুন কি রকম খবর রাখি, বলে উপস্থিত হলেন। পূর্ব্বের দেখা মুখ।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু নাকি,—আসুন—আসুন। আপনারা খবর রাখবেন বই কি, সুপক্ক ফল যে,—কবে আছি কবে নেই,—সন্দেহের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছি কিনা··· কখন হাতছাড়া হয়—

মৃত্যুঞ্জয় কাকে বলছেন?

সত্যিই নামটি ভুলে গেছি। এ অভ্যাসটি আমার আজকের নয়—পঠদ্দশা থেকেই। আট-আট মাস পরে ঠিক ঠিক নাম মনে থাকা কি ভীষণ কস্‌রতের কাজ! দুরভিসন্ধি না থাকলে সেটা বোধ হয় সম্ভবই নয়। দুনিয়ায় তো দুচোখো আলাপ পরিচয় নিত্যই চলে, তা বলে···

তিনিই রক্ষা করলেন। হেসে বললেন—ও বুঝেছি। এর মধ্যে কখন শুনলেন যে আমি দাঁত বাঁধিয়েছি! তাই বুঝি—মৃত্যুঞ্জয়···

বললুম,—তা হ'লে স্বীকার করুন—খবরটা রাখা আপনারি একচেটে নয়!

মাপ করুন—ঠকেছি। তবে গূঢ় কারণেই নিতান্ত প্রয়োজনে ও-কাজটি করতে হয়েছে। কি করি আরো দু'বচর ঝুঁকতির (extension) মিনতি পেশ করতেই হ'ল কিনা,—এটা তারির সেলামী। এখন দু'বচর বাঁচাও চাই—যেহেতু ঠিক্ দু'বচরের সীমা-রেখায়—সাবিত্রীর-ব্রতের উদ্‌যাপন উঁকি মারচে—

বললুম—দাঁত বাঁধাবার খরচও তো আদায় ক'রতে হবে···

হেসে বললেন—রসসিন্দুর সে শর্ম্মাই নন। ওটা এক-রকম ভগবানের দেওয়া—এই তিনবার দিলেন।

যাক্, নামটা তো এসে গেল। কিন্তু এ কি মানুষের মনে থাকবার কথা! এ সব কি করে' যে চরকের চৌহদ্দি ছেড়ে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো—ভেবেই পাই না। ছেলেদের নাম জিজ্ঞাসা করলে, নিশ্চয়ই শুনতে হবে—চ্যবনপ্রাস কি সুচিকাভরণ। থাক্, শুনে দরকারই বা কি,—কৌতূহল না রাখাই ভালো।

বললুম—এটাও ভগবানের দেওয়া। বললেন—কি রকম,—তা শুনে রাখি।

সন্দেহ রাখবেননা,—বিচারক্ষেত্রে কাজ করি। মিথ্যা পাবেননা,—সত্যের চৌষট্টি রকম সংজ্ঞা কণ্ঠস্থ।

লোকের উপকারের উপায় পেলে তো ছাড়িনা;—সঞ্জীব নন্দীর বিপদে নথির নকল বার করেছি। লোকটা ২৫ টাকা না দিয়ে ছাড়লেনা। পকেটে ফেলে বললুম,—এ টাকা চাই না নন্দি, ও তোমারি রইলো, ওতে তো দাঁত বাঁধানো হবেনা, আর তা না হ'লে চাকরিও থাকবেনা। তাতেও দুঃখ ছিলনা, কিন্তু হিন্দুর ছেলে, শেষ দিন-কটা ধর্ম্ম কর্ম্মে দেবারই ইচ্ছা; চাকরি না থাকলে তোমাদের উপকার করবই বা কি করে। ৩০ বছর সেইটাই অভ্যাস করে এসেছি,—শেষ সময়ে —অন্তকালে চ কাজে লাগবে বলে। এখন দেখছি···

নন্দি বাধা দিয়ে বললে—সেকি ঠাকুর,—আপনি না থাকলে,—আপনার চললেও আমাদের চলবে কেনো! ভাববেননা, আমার সম্বন্ধি ভগবান কুণ্ডু একজন ওস্তাদ্ Dentist,—পত্র দিচ্ছি অর্দ্ধেক দিলেই হবে। কলকেতায় আছেন অনেকেই—কিন্তু হাড়-মাস জব্দ করবার দাঁত ওই একজনই যোগায়। এখানকার অনেকেই পেয়েছেন। এনে বাক্সে তুলে রাখতে হয়—কাজ যেমন চলতো ঠিকই চলে। ছেলেদের দিয়ে যাওয়াও চলে।

সুপারিস্ নিয়ে চলে গেলুম। ৯৫এর স্থলে ৪০শে রফা হল। আমার নিজের তিনটে ছিল—না নড়ে না পড়ে। কুণ্ডু বললেন—ও তিনটে তুলে দেওয়াই ভালো,—সঞ্জীব যখন পত্র দিয়েছে, আপনাকে extractionএর (উৎপাটনের) আর মূল্য দিতে হবে না, সবই subtractionএ করে দেব।—

—করলেও তাই, কিন্তু রক্ত আর থামেনা। কুণ্ডুর বাপ গোপিচন্দনের রকমারি ছাপ মেরে বসে, মালা জপছিলেন। তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন—সর্ব্বনাশ করলি —ব্রহ্মরক্তপাত! ও যে গোরক্তের বাবারে! শ্রীগৌরাঙ্গের সংসারে অ্যাঃ! একটি নিশ্বাস ফেলে ছেলেকে বললেন —একটু পায়ের ধুলো ছাড়া একটি পয়সা নিতে পাবিনি।

আমারি মত আর একজন জলপাইগুড়ি থেকে এসে একদিকের চোয়াল চেপে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছিলেন। দেখে বলে উঠলেন—ওটা রক্ত নাকি? দেখি দেখি—অনেকদিন দেখিনি। আজ ক'বছর অজন্মা,—তাইতো, আজো শরীরে এত রক্ত রয়েছে? কোন্ দেশে থাকেন মশাই? রাম-রাজ্যের লোক দেখছি,—Caseএ Cessএ, নানা বাবুদে টেনে নিয়ে—শরীরটা খোড় বানিয়ে দিয়েছে মশাই। যা একটু আছে, পুণ্য কর্ম্মে দেওয়াই ভালো,—এখন তাই জীবে দয়ায় লাগাচ্ছি,—ছারপোকায় শুষছে। যাক্—দেখে বড় আনন্দ হল। বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয়?

বললুম—(দাওয়ানী আদালতের) Civil Courtএর সেরেস্তায়···

ওঃ—তাই, আমি ভেবেছিলুম আপনার রক্ত! যাক্ তবে ও পাপ বেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

স্বাতি এসে তাড়া দিলে—তুমি না খেয়ে নিলে আমরা যাত্রা শুনতে যাব কি করে? এর পর যায়গা থাকবে কিনা!

কত লোক হবে রে?

রসসিন্দূর বললেন—ওঃ তা বলবেননা—ওরাই মাথা খেলে! কিছুতে বুঝবেনা মশাই

বললুম—যে জায়গায় থাকেন, কিছু দেখা তো ঘটেনা। বারো মাসই তো সংসারের খাটুনি—পুঁজি-খানেক সোনার-চাঁদ সামলানো;—আরামের মধ্যে যা একটু ফুরসৎ দেয় ম্যালেরিয়া—দু'দণ্ড পা ছড়িয়ে বাঁচেন। ওঁদের আর আমোদ প্রমোদের কি আছে বলুন। কালে-ভদ্রে যদি একটা যাত্রা কি সার্কাস্ আসে—দেখবেননা? যাত্রা তো লোক-শিক্ষার একটা বড় উপায় মশাই,—দেখতে দিন—দেখতে দিন।

রসসিন্দূর বললেন,—কি বলচেন মশাই—এ সেই যাত্রা কিনা! ওঁরা যাত্রা দেখবেন—আর আমরা মহা-যাত্রার পরোয়ানা দেখবো। শিক্ষার কথা বলচেন? হুঁঃ—ওঁদের শিক্ষা আর আমাদের ভিক্ষা,—এ সেই যাত্রা মশাই। দেখে এসে সব ঢাল-খাঁড়া নিয়ে ফেরেন,—আবার ছেলেগুলোর দাপট্ কি! কোথায় সাবিত্রী ব্রতের জন্যে দাঁত বাঁধাতে রক্তারক্তি, কোথায় ওঁদের এই সব বুদ্ধি। তারা 'মা মা' বলে' কি দুটো বলেছে, ওঁরা একেবারে গলে গেলেন। আমরাও বলতে জানি,—কি বলবো ও কথাটা যে বলতে পারিনা।···মা মানে নাকি [এদিক ওদিক চেয়ে] দেশ! ছেলেবেলা Rat ছিল নেংটে ইঁদুর এখন হ'য়েছে ধেড়ে ইঁদুর। মা হয়েছেন দেশ।

স্বাতি এবার ভেতর থেকে অতিষ্ঠ ভাবে চেঁচিয়ে বললে, অনেকক্ষণ বাড়া হ'য়েছে যে দাদামশাই ! জুড়িয়ে গেল যে—

এই যাচ্ছি—বলে, উঠে পড়লুম।

রসসিন্দুর, চঞ্চল ভাবে—ইস তাইতো, আমারো যে দেরি হ'ল। সর্ব্বনাশ,—করলুম কি ? এতক্ষণ কি আর,······বলতে বলতে দ্রুত চলে গেলেন।

১৯

আমি আর সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত না করে আহারান্তে শয্যা নিলুম। মুকুন্দ বাবুতো ঘরের লোক- দেখা হবেই। মেয়েরা যাত্রা শুনতে গেলেন।

কখন কে ফিরেছে জানতেই পারিনি। সকালে নিদ্রাটা ভাঙবে ভাঙবে করচে—ভাঙচেনা। কানে সুর পৌছে—সুষণি শাকের কাজ করছে। শুনচি—

মরণ সাগর পার
হতে হবে সবাকার
দিন গেলো—বেলা অবসান।

অ্যাঁ বলে কি ? এযে আমাকেই বলে !—এ নিশ্চয়ই মুকুন্দ-বাবুর কাজ ! বেশ জানেন কিনা আমি এখানেই আছি।

হাসি-ঢাকা চিন্তা নিয়ে উঠে পড়লুম। ও-সব চিন্তা চিরদিনই পল্‌কা,—ছুঁয়ে যায় মাত্র, দাগ কাটেনা। ছুটো কুলকুচোর সঙ্গে সাফ বেরিয়ে গেল।

বাড়ীর কেউ ওঠেনি। যাই—রসসিন্দুরবাবুর বাসায় চা'টা খেয়ে আসি,—কাল এসেছিলেন—দেখাটাও ফেরৎ দেওয়া হবে :—আজকাল ওটা ভদ্র আদান-প্রদান,—খরচ নেই। এতো আর বই নয় বা ছাতা নয় যে ফেরৎ দিতে নেই।

বারবাড়ীতে ঢোকবার পথ খুঁজে পাইনা ! বে-ফাক্ ফণীমনসার বেড়া—বেয়নেট্ উঁচিয়ে রয়েছে। পদস্পষ্ট একটা সরু পথ নজরে পড়লো, কিন্তু না লাফালে পরপারে পা দেওয়া যায়না। সুবিধা যখন পেলুম—অভ্যাস করে রাখি। দুর্গা বলে করতেও হল তাই। রসসিন্দুরবাবুর এ আপদ বাড়িয়ে নিরাপদ হবার কারণ কি ? দেখি—একটু বাগিচা ফেঁদেচেন,—শ'খানেক লঙ্কাচারা আর কুড়ি দুই ট্যাঁড়োস্ গাছ—বর্দ্ধনোম্মুখ।

কোথায় একটা চাপা গোলমাল গুমরে মরছিল। কিন্তু রসসিন্দুর বাবুর চিত্তাকর্ষী বেড়া ও বাগান আমাকে একাগ্র করে রাখায় সেদিকে কান ছিলনা।

হঠাৎ একটু বাড়ন্ত সুরে কানে এলো—জ্বলে পুড়ে মলুম······।

একি,—কোথাও আগুন লাগলো নাকি ?

পরেই স্ত্রীকণ্ঠে—তুমি না আমি ?—সারাক্ষণ রাঁধো, খাওয়াও দাসীবৃত্তি করো আর—যাত্রা শুনতে গেছি তো মহাভারত অসুদ্ধ হয়ে গেছে ! দুটো ভালো কথা,—দেশের কথা, দেশের দুঃখুর কথা,······

ভিটে নেই—তার দেশ ! কাদের দেশরে—সেটা জানা আছে ? history তো পড়নি······

ভাগ্যিস পড়েছিলে ! বলতে লজ্জা করেনি।

রসসিন্দুরবাবুর আওয়াজ থেমে গেল। 'এরূপ কথা বোধহয় এই প্রথম শুনলেন। এ যে বুকে-পিটে ফণী-মোনসা !

এর ওপর আর চায়ের পিত্যেশ অতিবড় পেশা-দারেও রাখতে পারেনা। আজ চুলো জ্বলে কিনা সন্দেহ।—

—"এ যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
এর কাছেতে যম ঘেঁসেনা।"

ভাঙতে ভাঙতে ফিরতি লাফে পথস্থ হলুম।

টাল না সামলাতেই—একি, কবে এলেন ? নমস্কার। কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করাটা দেখছি অনাবশ্যক, লাফেতেই স্বাস্থ্যের পরিচয় পেয়েছি—লঙ্কা-বাগে প্রভাত বায়ু সেবনে এসেছিলেন বুঝি। ভারী স্বাস্থ্যকর······

চেয়ে দেখি—চটি পায়, গেঞ্জি গায় রঞ্জনবাবু। উকীল, ডাঁসা হলেও পাকার টাকা নেন,—যেহেতু কঠিন মামলা সামলাবার সুনাম রাখেন। হালকা caseএ হাত দেননা। যাতে মাথার দরকার নেই তাতে সময় নষ্ট করেননা। বলেন—গেঁটে 'কেসে' খেটে সুখ আছে। —দুরারোগ্য রোগীরাই শরণ নেয়।

নমস্কার,—সব কুশল তো ? কাল এসেছি।

এ পাড়ায় এ বেড়া পেরিয়ে অকুশল ঢোকবার উপায় নেই। ম্যালেরিয়া মুষড়ে গেছে,—বেড়েছে

কেবল মা-মনসার অবাধ বিচরণ। একটা Lexin পকেটে করে এদিকে পা বাড়াবেন।

বলেন কি!—মা-মনসা! বেড়ার দিকে একবার চেয়ে—দশপা সরে দাঁড়ালুম। বুঝতে পেরে বললেন—এখন নয়—সন্ধ্যা থেকে তাঁদের বক্ষ-চারণ সুরু হয়। এই সেদিন হাজার দুই টাকা খুইয়েছি।

চোর ডাকাতও·····

না মশাই,—সাঁশালো মক্কেল। পুষ্যিপুত্তুর,—ভারী ক্ষতি করে গেছে। টাকা পুতে রাখবে; তবু একটা টর্চ কিনবেনা,—বিলিতি জিনিস! Brain বলতে ঐ টিকি কিনা!—একটা মাস পরে গেলেও······

ইস্—মারা গেল নাকি?

মারা গেল, না মেরে গেল! তবে আর বলচি কি মশাই। সামনে পূজো,······যাক্, কিছু সময় নেবে,—পরিবারটা নাবালিকা! যক্ষের কড়ি এসেই যাবে। হ্যাঁ—এখন আছেন তো?

আমি তখন ভাবচি—লোকটাকে সর্পাঘাতে বাঁচিয়েছে দেখচি। মা-মনসা কৃপাই করেছেন। সব যক্ষের কড়িটা—যক্ষের ঘরেই ঢুকতো······

বললুম—মা মনসা যদি রাখেন তবেই থাকা····

আপনাকে কোনো···

বললুম—তা বটে—পুষ্যিপুত্তুর নই—মামলাও নেই—

রঞ্জনবাবু হেসে বললেন—না না সে কথা কেনো ভাবছেন। এই দেখুননা—জন্মটা পরের চিন্তা নিয়েই গেল—মাথাটা তাদেরই দিয়ে রাখতে হয়েছে। ভগবানকে ডাকাও তাদেরি জন্যে। ভাবটা বুঝেচেন?

কথাটা থামাতে পারলে বাঁচি। সকাল বেলা একি পাপ। বললুম—ও কথা কে আর অস্বীকার করে। কেস্ না এলেও তাঁকে ডাকা, এলেও ডাকা, এই জন্যেই বলে ধর্ম্মাধিকরণ, ওতো আছেই,—এখন যাত্রা শুনচেন কেমন বলুন?

তাই ভেবেছেন বুঝি? সে ভয় পাবেননা; এখানকার আমাদের অত মুক্ষু ঠাওরাবেননা। অতো বাজে কথা শোনবার কারো সময় নেই। তা ছাড়া——শুনতে গিয়ে নজরে পড়া আর নাম লেখানো, তাতে কেবল শিক্ষার আর বুদ্ধির অপমান করা বইতো নয়।—ভিটে বেচে—আমাদের মুখের কথা বার করাতে হয়,—বড় বড় জজে যাদের কথা কান পেতে শোনেন, সেই তারা যাবে যার তার কথা শুনতে, ওই বেলতলায়?

বললুম—তাইত এই সোজা কথাটা আমার মাথায় আসেনি। দশজনে বিগড়েও দেয় কিনা।—শুনলুম মুকুন্দ দাসকেও নাকি সাত-শো টাকা দিয়ে তাঁর কথা শোনা হচ্ছে! নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা, তা হলে আপনাদের চেয়েও fee যে অনেক বেশী হয়,—না? এটা কেউ একবার ভেবে দেখলেনা? backward যায়গা!

অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—সে আর বলতে।—পরে—আচ্ছা দেখা হবে'খন, একজন মক্কেলকে বসিয়ে এসেছি। আমার কাছে তো সহজ কিছু নিয়ে কেউ আসেনা—তাঁর সদ্য-মরা বাপের টাট্‌কা উইলখানা ওড়াবার উপায় করা চাই! তাকে বসিয়ে তাই মাথাটায় হাওয়া লাগাতে বেরিয়েছিলুম।

হাসতে হাসতে বললুম এ আর শক্তটা কি?—নিজের বাড়ীতে আগুন দিলেই কার্য্যসিদ্ধি—উইলতো কাগজ,—শালগ্রাম শুদ্ধু সাফ হ'য়ে যায়!

My God, আমি অনেক ভেবে যে···অ্যাঃ আপনার মাথায় এলো কি করে! Law class attend ক'রেছিলেন বুঝি!

না—আমাকে ততদূর পৌছুতে হয়নি। আপনাদের সঙ্গই যথেষ্ট। তা ছাড়া চিরদিনই ব্রাহ্মণদের মুখে আগুন তো লেগেই আছে জানেন।··

আচ্ছা এখন তবে নমস্কার, ভারি উপকার করলেন, দ্বিধা রইল না—বলে,' রঞ্জন বাবু হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

২০

আমিও ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলুম—লোকটা বলে কি। পাপ জিনিষটে দোসর খুঁজে শাস্তি চায়! দেখচি সময়ে টিক্‌টিকিতে সাড়া দিলে অবিশ্বাসির মনও ঠাণ্ডা হয়। অসময়ে সেদিকে কানও থাকেনা। কে যে কখন কোন্ কাজে লাগে বলা যায়না। তামাসা করে কথা কওয়াও মুস্কিল্—সত্যিই না আগুন দেওয়ায়। স্বাস্তির আওয়াজে ভূত ছাড়লো।

-- সকালে কোথায় গিয়েছিলে দাদামশাই—চা হয়ে গেছে, চারবার এসে দেখে গিয়েছি।

আমি ভাবলুম—তোমরা ঘুমুচ্চো, জাগাবনা। আমার সকালে বেড়ানো অভ্যেস কিনা, সেইটে সেরে এলুম।

আহা আমি যেন জানিনা,—সাতটার আগে তোমার ঘুম ভাঙে কিনা।

কথাটা এতো সত্যি যে হেসে সামলানো ছাড়া উপায় ছিলনা।

চা এসে গেল, রসসিন্দূরও এসে গেলেন। নিজেই বললেন—আর এক কাপ্ আনো মা। আজ বাড়ীতে এখনো আগুন জ্বলেনি।

কেনো? আমি তো দেখে এলুম খুব জ্বলছে।

একটু হাসি টেনে বললেন—ওদিকে গিয়েছিলেন বুঝি? সে আগুনে মানুষ পোড়ে চা পাকেনা।

বললুম—পাকা সংসারী বটে—এই তো চাই। খাসা বাগিচা বানিয়েছেন দেখলুম। ঝালের অভাব বোধ করেন নাকি? লঙ্কাটা বাজে খরচ নয় কি!

বললেন, বিপদ থেকেই বুদ্ধির উৎপত্তি,—মানেন তো? ছেলে মেয়েগুলো গ্লোবিউলের মত আসতে আরম্ভ করায় হোমিওপ্যাথিতে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, বই আর বাক্স কিনে—স্ত্রীপুরুষেই চালিয়ে আসছি। অবশ্য যটা থাকে যটা যায় এ (courage), সাহস, থাকা চাই। তা না থাকলে ও-কাজে হাত দিতে নেই। তবে এক ছেলের ঘরে ও-বিদ্যে ঢোকাতে নেই বটে।

বাঃ ও শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান এসে গেছে দেখছি, ওর —সার মেরে নিয়েছেন। তা ঝালের দিকে অত ঝোঁক গেল কেনো?

বুঝচেন না, Similia Similibus যে, ঝালে ঝাল মারে—বিষে বিষক্ষয়।

শুনে খুসি হলুম, বেশ লাগলো। বললুম—ও শাস্ত্রে আমারও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কেবল মুখের দোষে—

কি রকম?

সে আজ ৫০ বচর আগেকার কথা। মহেন্দ্রবাবু (সরকার নন—ঘোষ)—বউবাজারে নাইট স্কুল খোলেন। কোনো ইস্কুলই বাদ দেওয়া হয়নি,—ফূর্ত্তি করে ভরতি হলুম। বেশ চলছিল, এক (aconiteএই) একোনাইটেই সাত নাইট কেটে গেল। তার গুণাবলীতে নোট-বই ভরে গেল। সকল ব্যাধিরই ব্যাধ,—কখনো বলেন ব্রহ্মাস্ত্র, কখনো ল্যান্‌সেট্, কখনো বজ্র।

জিজ্ঞাসা করলুম—তা হলে মানুষের ওপর চালাবো কি করে—বারো মাস জেলেই থাকতে হবে যে Sir?

চক্ষুতে তাঁর চটা ভাব ফুটে উঠলো। নতুন ইস্কুল, তায় ছাত্র সংখ্যা কম,--মুখে হাসি টেনে বললেন—না হে না—ওর মানে—রোগের যম—মানুষের নয়।

যাক, দিন যায় রাত্তি আসে। ক্রমে ক্যামোমিলায় এসে পড়া গেল। খেলে নাকি দাঁত ওঠে। বললুম—পিসিমার একটিও দাঁত নেই—খাবার বড় কষ্ট Sir.

Sir গম্ভীর ভাবে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—আগে chapterটা শেষ কর, তার পর বুঝবে শিশুদের দাঁত ওঠবার সময়টা বড় সঙ্কট সময়, সেই সময় ক্যামোমিলা আশ্চর্য্যজনক কাজ দেয়। পিসিমাদের জন্যে ব্যবস্থা এই পার্শ্বেই আছে—অ্যাস্‌বি কোম্পানী রয়েছেন।

খোষাল ভায়া ছিলেন আমার সিনিয়ার গুরুভাই। অমন একনিষ্ঠ সহপাঠী আর কেউ ছিল না; তেমনি মেধাবী। জগতের প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। ভায়া আমার ওপর এতটুকু মমতা না করে—সারা পথটা ক্যামোমিলার আশ্চর্য্য ক্ষমতা শুনিয়ে চললেন।—ওর জোড়া নেই, ওর এক ফোঁটার কি ভীষণ শক্তি, বিভিন্ন ডাইল্যুশনের কি কি চমৎকারিত্ব, তাদের সরু শক্তি, মোটা শক্তি, সূক্ষ্মশক্তি, বিশেষ ভক্তিসহ বলে চললেন।

মনে মনে ভাবলুম—কাল থেকে আর একসঙ্গে এক পথে চলা নয়। ভগবান শুনলেন,—আর চলতেও হয়নি।

কেনো?

—সে অনেক কথা—সংক্ষেপেই বলি। পরদিন কি কারণে মনে নেই, Sir খুব উৎসাহের সহিত বোঝাচ্ছিলেন—হানিম্যান সায়েবের মাথায় বিষস্য বিষমৌষধম্—ধারণাটা কোথা হতে এলো!—

—আমার মুখ থেকে Point blank বেরিয়ে গেল,

—ঘরে বোধ হয় দুই পত্নী ছিলেন…কথাটা ভেবে চিন্তে বলিনি। সেই সময় মনে পড়েছিল কেবল আমার দাদামশার কথা,—তাঁরও ছিল দুই। তাঁকে একদিন বলতে শুনেছিলুম—"এ বিষ থেকে—বিষই কেবল অব্যাহতি দিতে পারে।"—সেই মেমারিই আমাকে মারলে।

যাক্—তাই ক্যামোমিলাতেই আমার হোমিও-লীলা খতম হয়। সেটা ভগবানের কৃপা বলেই এখন মনে হয়।—অনেক extra মহাপাপ বেঁচে গিয়েছে, আর ঘোষাল ভায়াও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে সেটা একাই চালাতে পেয়েছেন। তাতে বন্ধুঋণ হতে মুক্ত হ'য়েছি।

—মহতে মন্দ করতে জানেন না, মন্দ করতে গিয়ে ভালই ক'রে বসেন—তা না তো আজ চিকিৎসক হতেই হত—

রসসিন্দুর সহাস্যে বললেন—অর্থাৎ সহস্রমার।

বললুম—শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা রাখতে হয় বইকি। দেখছিও তা সর্ব্বত্রই। প্রমাণ সব পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। তবে শ্রদ্ধা আমার বরাবরই সমান রয়ে গেছে। বেকারের অমন বন্ধু আর নেই। এক বেলেডোনায় মাইলার বদন মাষ্টার সোণা ফলিয়ে গেছেন।

কারো অসুখের কথা কানে এলে একটা কিছু বেরিয়েই যায়। পড়া বিদ্যে কিনা। পূর্ব্বেই বলেছি মেমারিই আমাকে মেরেছে। জেনে না বলাও পাপ যে। সেখানেও ভগবান বাঁচিয়ে আসচেন—অ্যামেচারের কথা কেউ বড় শোনেননা। বরং বাড়ীর এঁদের encourage করে থাকেন, যেহেতু charity begins at কিনা—।

ভাবলুম রসসিন্দুর এইবার উঠবেন; চা খাওয়ার পর অনেকেই বসেননা,—একটা জরুরি কাজ মনেই পড়ে।

রসসিন্দুর কিন্তু ভালো ক'রে চেপেই বসলেন। নিশ্চয় বাড়ীর অবস্থা সুবিধের নয়। চোখে হাসি ফুটিয়ে বললুম, এবেলা এখানেই—কি বলেন ?

বুঝতে পেরে তিনিও হেসে বললেন—না না—তা হলে আর… দেখচি আপনার আমার বোধ হয় একই রাশি—আপনার কি বলুন তো ?

বৃষ না হয় মেষ, এ ছাড়া আর কি হবে ?

—তাই তো বলি—আমারো যে তাই,—ওই মেষ।

বাড়ীতে বোধহয় সিংহ ?

—ওঃ আপনার দেখচি এ বিদ্যেও জানা আছে, ঠিক বলেচেন তো !

—ও আর জানাজানি কি,—এদিকে মেষ হলে ওদিকে সিংহ যে হবেই,—দরকার যে। বেদরকারি কাজ ভগবান করেননা। রাজযোটক্ একেই বলে। বে-পরোয়া থাকুন, কোনো চিন্তা নেই।

এতক্ষণে, উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সুরু হল। খুসী হয়েই ফিরলেন।

আমিও তেল চাইলুম। (ক্রমশঃ)

অগ্নিগর্ভ মাঞ্চুরিয়া

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে বিশ্বের রাজনীতি-ক্ষেত্রে কিছুকাল থেকে যে নাটকের অভিনয় সুরু হয়েচে তা' এক কথায় রোমাঞ্চকর। ১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর

চাংচনে নূতন রাজ্য-প্রতিষ্ঠার উৎসব

বেলা দশটা বিশ মিনিটের সময় ডায়নামাইট দিয়ে মুক্‌দেনের উত্তরে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ উড়িয়ে দেবার
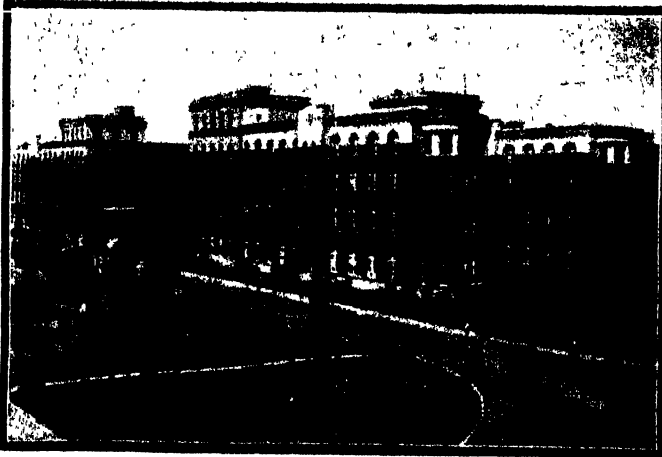
ডেরেণ হাস্পাতাল—দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেল-কোম্পানী পরিচালিত

চেষ্টা হয়;—সেই প্রচেষ্টাকেই এই রোমাঞ্চকর নাট্যের প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে। তার পর বহুবার দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হয়েচে, বহু কণ্ঠের কলরব শোনা গেচে এবং তারই ফলে নূতন মাঞ্চুরাজ্যের জন্ম।

কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে এই নাটকের শেষ দৃশ্য মনে করলে ভুল হবে। বলা যেতে পারে যে সত্যকার নাটক এইমাত্র আরম্ভ হ'ল এবং এ কথা বললেও ভুল হবে না যে, এই নাটকের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকরাও নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন না।

মাঞ্চুরিয়া প্রাচ্যের বালকান্, এসিয়ার অগ্নি-কেন্দ্র। বালকানের মত এখানেও সারাজেভো হত্যাকাণ্ডের মত কোন ঘটনা ঘটতে পারে এবং তা' থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হওয়াও বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বহু সাম্রাজ্যবাদী জাতির লোলুপ দৃষ্টি যে এর প্রতি কতদিন নিবদ্ধ থাকবে তাই বা কে বলতে পারে। তবু এ কথা স্বীকার করতে হ'বে যে নূতন মাঞ্চুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাসে যুগ-পরিবর্ত্তনের সূচনা। নব মাঞ্চু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে পুরাতন নাটকের উপর শেষবারের মত যবনিকা পড়েচে এবং সুরু হয়েচে নূতন নাটকের অভিনয়। ১৮৯৪ ১৮৯৫ সালের চীন জাপানের যুদ্ধের পর থেকে পুরাতন নাটকের অভিনয় চলছিল এবং তার মধ্যে বিরোধী-শক্তিদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনাই বেশী কাণে বাজতো। যুদ্ধকামী চীনাদের আধিপত্যের অবসানের সঙ্গে সে নাটকের অভিনয় বন্ধ হ'ল।

নূতন রাজ্যের শাসন-কর্ত্তারা রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পরই একটী বিবৃতি প্রচার করে বলেছিলেন যে, মাঞ্চুরিয়া যাতে

আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের কারণ হয়ে না থাকে তারই জন্যে তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করবেন। এই ঘোষণার মধ্যে কতটুকু আন্তরিকতা ছিল তা বলা কঠিন, কিন্তু

দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার ডেরেণের অন্তর্গত হোসি গাউরা সহর—দলে দলে লোক এখানে স্বাস্থ্য লাভের আশায় গিয়ে থাকে

তা যত বেশীই হ'ক —তাঁদের উদ্দেশ্য সহজ সিদ্ধ হ'বে মনে হয় না, কারণ মাঞ্চুরিয়া কেবলমাত্র একটী বা দুটী জাতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নহে,—পৃথিবীর নয়টী জাতি মিলে একদিন যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল তা'তে মাঞ্চুরিয়ার কথাই বলা হয়েছিল অত্যন্ত বেশী করে। সুতরাং মাঞ্চুরিয়ায় সাময়িক শান্তি হয় ত মধ্যে

স্বরাষ্ট্র-সচিব মাং-লী
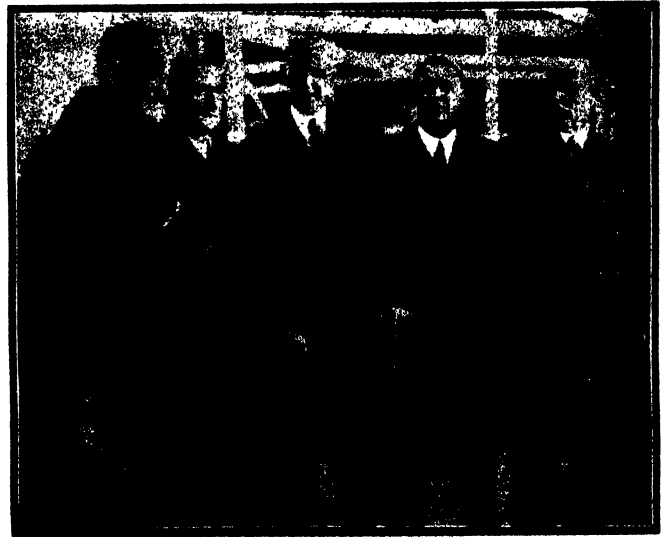
মধ্যে দেখা দেবে, কিন্তু এতগুলি স্বার্থের স্থায়ীসমন্বয় সাধন কবে সম্ভব হবে তা কে বলতে পারে ?

কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মনোভাব বিশ্লেষণ করবার পূর্ব্বে, মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাস জেনে রাখা দরকার। তা'তে মাঞ্চুরিয়ার জটীল অবস্থা উপলব্ধি করা সহজ হ'বে।

মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাস সুদীর্ঘ—চিন্ন

নূতন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী চেব্-মিয়াও-সু

রাজত্বের প্রতিষ্ঠার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তার সূচনা। কিন্তু গোড়ার সেই ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমান

মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে তদন্তের জন্য নিযুক্ত জাতি-সঙ্ঘ কমিশনের সদস্যগণ—মাঝখানে সভাপতি আর্ল অফ-লিটন

সমস্যার কোন সম্বন্ধ নেই বলে এখানে তা উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চুরিয়ায় চিঙ্-রাজত্বের সূচনা হয়। এর আগে মাঞ্চুরিয়ায় মিঙ্-দের আধিপত্য ছিল। তাদের শাসন-সম্পর্কীয় অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে মাঞ্চুরিয়ায় চিঙ্-রাজ, প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর তারা বিরাট প্রাচীর অতিক্রম করে চীনে হাজির হয় এবং চীন দখল করে। চীনেও তখন মিঙ্দের আধিপত্য ছিল;—সেখানেও তাদের পতন ঘটে। চিঙ্গরা সমগ্র চীনকে এক করে, পিকিং-এ রাজধানী স্থাপন করে।

মাঞ্চুরিয়ায় চীনের প্রভাব দেখা দেয় Civil war আরম্ভ হ'বার পর। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল তারও আগে—তাঙ্, সুঙ্গ ও মিঙ্ রাজাদের সময়।

প্রাচীর-বেষ্টিত মুকদেন সহরের রাজপথ

কিন্তু তখন মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল না যে তার জন্যে দুশ্চিন্তার উদয় হতে পারতো।

চিঙ্-রাজত্বের প্রথম দিকে মাঞ্চুরিয়ার একদল লোক চীনে বাস করতে যায় এবং চীনের একদল লোক বিরাট প্রাচীর অতিক্রম করে মাঞ্চুরিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করে। তারা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়ী-ঘরের পত্তন করল এবং চাষ-আবাদ সুরু করে দিল। ক্রমে মাঞ্চুরিয়া-প্রবাসী চীনাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে চিঙ্-শাসনতন্ত্রের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে' মাঞ্চুরিয়ায় বিদেশীদের আগমন বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে চেষ্টার ফল তেমন ভাল হয় নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে চীনারা মাঞ্চুরিয়ায় পাকাপাকি ভাবে বাস আরম্ভ করে। এই শতাব্দীর শেষভাগে চাইনিজ ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য বহু চীনা শ্রমিক শান্তঙ্ ও চিহ্লি প্রদেশ থেকে মাঞ্চুরিয়ায় আসে। রেল-পথের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হ'বার পর এই শ্রমিক-দল দেশে না ফিরে, মাঞ্চুরিয়ার নানা স্থানে ঘর-বাড়ী বেঁধে বাস করতে সুরু করলো। এমনি করে উত্তর এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। ১৯০১ সালে রাশিয়া স্থির করলো যে তাদের দেশ থেকে ছয় লক্ষ লোক মাঞ্চুরিয়ায় পাঠান হ'বে। বিপদ দেখে চিঙ্-শাসন-

মাঞ্চুরিয়ার আইন-সভার সভাপতি
ডক্টর চাও সিন্-পো

তন্ত্রের কর্ণধার উত্তর মাঞ্চুরিয়া সংলগ্ন মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশের দ্বার দিলেন খুলে। প্রবেশপথ খোলা পেয়ে কেবল রাশিয়ানরা এল না, চীনারা এলো। ১৯০৭ সালে চীন হিলংকিয়ং প্রদেশে দুই লক্ষ চীনা নর-নারী পাঠাবার আয়োজন করলো।

এর পর এলো জাপানীরা,—দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেল-পথের ভার নিয়ে। এরা মাঞ্চুরিয়ায় এসে চাষ-আবাদের ব্যাপক ব্যবস্থা করলে এবং রীতিমত ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিল।

১৯১১ সালে মাঞ্চুরিয়ায় বিপ্লব বাধল, চিঙ্-রাজত্বের

অবসান ঘটলো, চীনারা বসলো মাঞ্চুরিয়ার মালিক হয়ে। চীনের দীর্ঘ গৃহ-বিবাদের ফলে সম্প্রতি চীন থেকে গড়ে প্রতি বৎসর একলক্ষ লোক চীন ছেড়ে মাঞ্চুরিয়ায় চলে আসতে আরম্ভ করেচে। ফলে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের সংখ্যা পাচ গুণ বেড়ে গেছে। মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীদের সংখ্যা মোট তিন কোটী। এদের মধ্যে তুঙ্গু, মঙ্গোলীয় এবং চীনাদের সংখ্যাই বেশী। মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন চীনা। আচার, ব্যবহার, চিন্তা এবং অন্যান্য বিষয়ে এই চীনারা প্রকৃত চীনের অধিবাসীদের হুবহু অনুকরণ করে।

রুশ-জাপানের যুদ্ধের পর মাঞ্চুরিয়ায় বাণিজ্যের যে উন্নতি সাধিত হয়েচে তা বিস্ময়কর বললে অত্যুক্তি হয় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ দশগুণ বেড়ে গেচে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে অল্প সময়ের মধ্যে কাজে লাগিয়ে কি করে দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করা যায় তার একটা প্রমাণ পাই আমরা উত্তর আমেরিকার ইতিহাস থেকে। কিন্তু উত্তর আমেরিকাতেও

ফিল্ড মার্শাল ওয়ামার নেতৃত্বে জাপানী অশ্বারোহীদল মুকদেনে প্রবেশ করচে। এটী রুশ-জাপানের যুদ্ধের সময়কার আঁকা ছবি

উত্তর অঞ্চলের অধিকারীদের আক্রমণে বাধা দেবার জন্য দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বিরাট প্রাচীর

এর জন্য দেড় শত বৎসর সময় প্রয়োজন হয়েছিল। সুতরাং মাঞ্চুরিয়ায় কি রকম অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্ভব হয়েচে তা ভাবতে গেলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জাপান বলে, মাঞ্চুরিয়ার এই বাণিজ্য বিস্তারের একমাত্র

সংহাই কাউয়ান্—চীন এবং মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত প্রাচীন চীনা-নগর

কারণ জাপান মাঞ্চুরিয়ায় অসংখ্য অর্থ ঢেলেচে। জাপানের অর্থ-নিয়োগ এই উন্নতির একমাত্র কারণ না হলেও,

হাঙ্গামার সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রিত জাপানী নারী ও শিশু দল

একটা কারণ বটে। অন্যান্য জাতিও এই দিক দিয়ে মাঞ্চুরিয়ার উন্নতি সাধনের জন্য অল্প-বিস্তর চেষ্টা করেচে।

রাশিয়া ও জাপানের যুদ্ধের পর থেকেই আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিতে মাঞ্চুরিয়ার মূল্য যেন বেড়ে গেল। যুদ্ধের পরেই চিঙ্ রাজ্যের পক্ষ থেকে পূর্ব্ব অঞ্চলের তিনটী প্রদেশের জন্য একজন রাজপ্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় এবং তাঁর ওপর সামরিক ও অসামরিক কার্য্যপরিচালনার ভার প্রদান করা হয়। প্রথমে যিনি রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন তাঁর নাম যু-শি-চাং। উত্তর কালে ইনি চৈনিক গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

রাজপ্রতিনিধি যু শাসন-ব্যবস্থা, পথ-ঘাট প্রভৃতির সবিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং তাঁর এই কার্য্যে সাহায্য করেছিলেন টাং-শায়ো-ই। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সাহায্যকারী যুয়ান্ শিং কাইয়ের পতন ঘটায় তিনি রাজপ্রতিনিধির পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সি-লিয়াং তাঁর স্থান অধিকার করেন।

১৯১১ সালে বিদ্রোহ বাধলে পূর্ব্বাঞ্চলের তিনটী প্রদেশের তখনকার রাজপ্রতিনিধি চাও এর সান, সীমান্ত

হারবিণের গীর্জ্জা

বাহিনীর কমাণ্ডার চাং-সো লিন্‌কে মাঞ্চুরিয়ার বিপ্লবী বাহিনী দমন করবার ভার দেন। চাং-সোলিন্ অদ্ভুত রণদক্ষতার পরিচয় দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ

হন এবং তার ফলে কুশলী যোদ্ধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চীনে বিদ্রোহ সফল হওয়ায় এবং চীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদেশ তিনটী তার অধিকারে গিয়ে পড়লো। চাং সো লিন্ এই বিদ্রোহে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু য়ুয়ান্-শিহ্-কাই তাঁকে চীনা-গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেন এবং তিনি সপ্তবিংশতি সংখ্যক সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়ে মুকদেনে বিপুল শক্তির অধিকারী হন,—তাঁর ক্ষমতা রা জ প্র তি নি ধি র ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

এর পর য়ুয়ান্-শিহ্-কাই সম্রাট হ'বার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নি। ফলে, তুয়ান্-চু-জুই মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং চাং সোলিন্ ফেংতিনের সামরিক গভর্ণর ও এই প্রদেশের সিভিল্ গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের তিনটী প্রদেশের ইনস্পেক্টার জেনারেল নিযুক্ত হন এবং সত্যকার ক্ষমতা তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে। এই তিনটী প্রদেশের পরবর্ত্তী ইতিহাস তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

১৯২১ সালে চাং-সো-লিন্ চিলি সামরিক বাহিনীকে চীনে প্রেরণ করেন—চীনের অন্তর্বিপ্লবে যোগদান করবার জন্য। চিলি বাহিনী সেখানে জয়লাভ করে, তিনি মঙ্গোলিয়ার হাই কমিশনার নিযুক্ত হন এবং জেহল ও চহর তাঁর অধিকারের মধ্যে এসে পড়ে।

কিন্তু এই অধিকার তিনি বেশী দিন রাখতে পারেন নি, এক বৎসর পরে চিলি বাহিনীই তাঁকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করে। যুদ্ধে পরাস্ত হ'বার পর মাঞ্চুরিয়ায় ফিরে এসে তিনি তিনটী প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রচার করেন এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য, জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন করতে থাকেন। ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় চিলি-মুকদেন যুদ্ধে তিনি চিলি-বাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং মুকদেনে প্রবেশ করে তুয়ান্-চু-জুইকে সমর্থন করেন ও নিজের শাসনতন্ত্র গঠন করেন। এই ভাবে ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হ'ল, এবং এক সময় এ কথাও লোকের মনে হয়েছিল যে, তিনি একাই বুঝি আর সকলকে আচ্ছন্ন করে রাখবেন।

পোর্ট আর্থার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

কিন্তু এক বৎসর যেতে না যেতে বোঝা গেল যে এই ধারণা ভুল। চীনের নির্ব্বাচিত ফেংটিন-বাহিনীর কমাণ্ডার কুয়ো মঙ্-লিং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বিদ্রোহের ফলে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উৎপত্তি হয়। বহু দিনে এবং বহু পরিশ্রমের ফলে তিনি কুয়ো মঙ্-লিংকে পরাস্ত করতে সমর্থ হ'ন বটে, কিন্তু ভীষণ যুদ্ধের ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ে,—মনে হয় এইবার বুঝি তারাও বিদ্রোহ করবে।

দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেল-কোম্পানী পরিচালিত কৃষিক্ষেত্র

পরের বছর চাংসো-লিন্ ফেং-উ-সিয়াং-এর বিরুদ্ধে

অভিযান আরম্ভ করেন এবং ডিসেম্বর মাসে তিনি পিকিং দখল করেন। ১৯২৭ সালে তিনি গ্র্যাণ্ড মার্শালের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং ইয়াং সি কিয়াং নদীর উত্তরে সমগ্র চীন তাঁর আধিপত্যের মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু তাঁর এই অপ্রতিহত প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১৯২৮ সালের জুন মাসে চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয় সৈন্যবাহিনী তাঁকে পরাস্ত করে। পিকিং পরিত্যাগ করে তিনি মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে পালাতে বাধ্য হন। ফিরে যাবার পথে অস্বাভাবিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফুশনে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেল-কোম্পানীর কয়লার খনি

চাং সোলিনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র চাং-সুয়েলিয়াং তিনটী প্রদেশ শাসন করতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁর পিতা যে অন্তর্বিপ্লব বহু পরি-

মাঞ্চুরিয়ার সমবেত শটংএর শ্রমিক-দল

শ্রমে দমন করে রেখেছিলেন তখন তা আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। উপরন্তু জাতীয় গভর্মেণ্টের চাপ এবং বৈদেশিক স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে চারি দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হ'ল। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করচে দেখে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চ্যাং-সুয়ে-লিয়াং জাতীয় সরকারের সঙ্গে এক চুক্তি করেন এবং চুক্তির ফলে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত বাহিনীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সান্ প্রভৃতির বিরুদ্ধে চিয়াং কাই শেকের অভিযান চলতে লাগল এবং সেই সময় চিয়াং-কাই-শেক চ্যাং-সুয়ে লিয়াংকে সৈন্যবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌ-বাহিনীর সহকারী প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং চিয়াং-কাই শেকেরই অনুগ্রহে তাঁকে উত্তর চীনে শাসন ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অতঃপর ইনি চিয়াং-কাই শেকের সাহায্যের জন্য তিন্‌সিন্ ও পিকিংএ সৈন্যবাহিনী নিয়ে
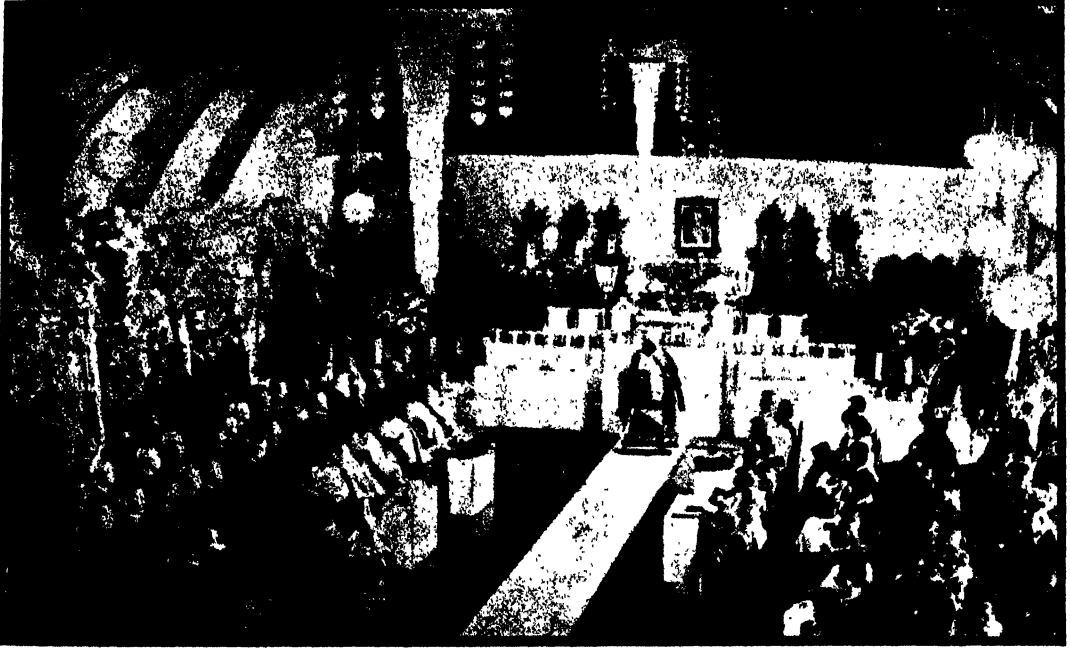
বৌদ্ধ মতে নিহত প্রধানমন্ত্রী ইনুকাইর অন্ত্যেষ্টি

নিযুক্ত হন। এমনি করে নীল-আকাশে সূর্য্য-চিহ্নিত পতাকা পূর্ব্বাঞ্চলের সেই তিনটী প্রদেশের উপর উড়তে লাগল এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়া নামে জাতীয় সরকারের অধিকার-সীমার মধ্যে গিয়ে পড়ল। ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে ফেংটিন প্রদেশের নূতন নামকরণ হ'ল—লিয়াওনিং প্রদেশ। তবে ফেঙ্গ-উ-মিয়াং; ইয়ান্-সি-যান এবং চিয়াং-কাই শেকের বিরোধী দলকে পরাস্ত করেন। চ্যাং প্রকৃতপক্ষে উত্তর-চীনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসলেন। কিন্তু তা হ'লেও পূর্ব্বাঞ্চলের প্রদেশগুলি কোন দিন জাতীয় সরকারের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নি; ভিতর ও বাহিরের স্বাতন্ত্র্য তারা বরাবর বজায় রেখে গেছে।

তীর্থকামীর পত্র

শ্রীনিরুপমা দেবী

দ্বাদশীর সকালে বেলা ৭টা হ'তেই তীর্থকৃত্য আরম্ভ হ'ল। প্রথমে লক্ষ্মণকুণ্ডে স্নান, তর্পণ, সঙ্কল্প। পরে তীর্থগুরু প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র পড়াতে আরম্ভ কর্‌লেন। মন্ত্রগুলি তো কানে শুন্‌তে বেশ; কিন্তু ক্রমে চক্ষুগুলি স্থির হবারই উপক্রম। অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তে অঙ্গের ওজনে সোনা বা চাঁদি চাই! "যার যেমন ইচ্ছা!" পথিমধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালী আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন,—তাঁরা তো শুনেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। পঞ্চানন তৎপূর্ব্বেই "প্রায়শ্চিত্ত আবার কিসের? যাত্রার আরম্ভ থেকেই প্রায়শ্চিত্ত করা চল্‌ছে, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিত" বলে সে নিজের সন্ধ্যাহ্নিকে মন দিয়েছে। ফাঁদে পড়্‌লাম আমরাই মাত্র কয়জন। বাড়াবাড়ি দেখে যখন মাত্র সেই কয়জন ভক্ত শিষ্যাও ফাঁদ হ'তে বাহির হবার উপক্রম করছে, এ কথা তীর্থগুরু বুঝ্‌তে পারলেন, তখন তিনিও ক্রমে সোজা হ'তে লাগলেন। দেহের ওজনে সোনা রূপার স্থানে শেষে সামান্য কিছু স্বর্ণ রৌপ্যাংশ। আর এক একটী রৌপ্য মুদ্রাতেই তাঁকে সন্তুষ্ট হ'তে হ'ল।

রাম লক্ষ্মণের নামে কয়েকটি প্রস্তরমূর্ত্তি সেইখানেরই একটা ঘরে দেখা গেল। তার পরে সমস্ত রামেশ্বর তীর্থে আর রামের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। রাম ও সীতার নামে যে দুইটী কুণ্ড দেখা হোলো তাদের অস্তিত্ব না থাক্‌লেই ভাল ছিল; এবং সেটুকুও যে আর বেশী দিন থাক্‌বে না এটুকু বুঝে মনে সান্ত্বনা নেওয়া গেল।

তার পরে পাণ্ডাপ্রবর যাত্রীদলকে নিজের বাটীতে নিয়ে গিয়ে অতি সমাদরে বস্‌বার স্থান দিলেন। তীর্থশ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্য-দানাদি তো সেইখানে করতেই হবে। ৺রামেশ্বর পূজাও যদি মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে স্বহস্তে করতে চাই তো সেইখানে বসে কর্‌লেই ভাল হয়। এই রামেশ্বর তীর্থের সমস্ত ভূমিই শিবাধিকৃত,—"যত্রতত্র" বসেই তাঁর পূজা করা চলে। যেখানে তাঁর লিঙ্গমূর্ত্তি দৃশ্যমান সে মন্দিরের তো তিন প্রকোষ্ঠ দূরে যাত্রীদের স্থান। প্রভুর মস্তকে যে গঙ্গাজল চড়ানো হবে তার জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুই টাকা ক'রে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়। পূজার উপকরণ. বস্ত্র ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। গোমুখীর জলে রামেশ্বরের পূজা হয়। এক ছটাক জলের দাম সওয়া পাঁচ টাকা। এখানে বাবার নামে নারিকেল গাছ দান করার (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করার) ব্যবস্থা আছে। গো দান তো অবশ্য কর্ত্তব্য! এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁদের ফর্দ্দের পর ফর্দ্দ বেড়েই চললো। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ ভোজন, তীর্থগুরুকে ভোজন দান, সর্ব্বশেষ তাঁর চরণপূজা ও 'সুফল' এ-সব তো আছেই।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা কোনরূপে তাঁদের হাত হ'তে নিজেদের প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই বাসার দিকে চল্‌লাম। যে ফর্দ্দ তাঁরা দাখিল করেছিলেন, কার্য্যকালে আবার এর মধ্যে পূজা-অঙ্গেরও নানা উপাঙ্গ এবং শাখা-প্রশাখা যে বার হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য! তাঁরা বার বার আমাদের পুণ্যের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে উল্লেখ করছিলেন যে "আজ দ্বাদশী, এ তিথিতে এ কাজে আপনাদের যে কতগুণ বেশী ফল হ'ল সে আর বল্‌বার নয়।" তাঁদের সঙ্গে বাক্‌-বিতণ্ডা আর হায়রাণিতে ফলটা অবশ্য দ্বাদশীর দায়ে একটু বেশীই হ'য়েছিল বটে কিন্তু তবে পুণ্যের নয় এ নিশ্চিত। কেবল যখন রামেশ্বরের মস্তকে সেই গালা-মোহর-বন্ধ পাত্র উন্মোচন করে গোমুখীর জলধারা নিষেকের সঙ্গে কর্পূরের আরতি হ'ল সেই সময়টিকে মাত্র জীবনের একটা পুণ্যক্ষণ বলে সকলেরই মনে হয়েছিল। রামেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে তাঁর ভোগমূর্ত্তি (পার্ব্বতী সমন্বিত মূর্ত্তির) মন্দির। মূলতঃ পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরে যেতে অন্য একটী চত্বর ও প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর্‌তে হ'ল।

আহার ও বিশ্রামে বাকি দিনটুকু শেষ করে সন্ধ্যায় আরতি দেখ্‌বার জন্য আবার মন্দিরে উপস্থিত হওয়া

গেল। রামেশ্বরে ধাতুময়-আচ্ছাদনহীন বালুময়ী মূর্ত্তি যাহা দেখা গেল তাহা যেন ঠিক্ স্বাভাবিক বলে বোধ হ'লো না। মণিময় মূর্ত্তি নামে মুল্যবান প্রস্তরের যে ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গটি দেখায় তাহা বেশ সুন্দর বটে। ভোরের ট্রেণে ধনুষ্কোটির দিকে যাবার ইচ্ছা। সেজন্য সকাল সকাল বাসায় ফেরার মতলব থাক্‌লেও সন্ধ্যারতির চেয়েও শয়ন-আরতির বেশী ধুম, তখন শ্রীমন্ রামেশ্বরই বাদ্যভাণ্ড আলোকমালাসহ পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরে (কৈলাসে) অভিসার করেন এ কথা শুনে সে লোভও ত্যাগ করা অসম্ভব হ'ল। মাঝের সময়টা কি করে কাটান যায়? সে জন্য অবশ্য বেশী ভাব্‌তে হ'ল না, দেখ্‌বার এতই আছে। কাশীতে যেমন তেত্রিশ কোটী দেবতা ও তীর্থ সকলেই উপস্থিত, এখানেও তেমনি দক্ষিণের সকল তীর্থই হাজির আছেন। চিদম্বরমের নটরাজের মূর্ত্তি রামেশ্বরের নটরাজের কাছে যে অনেক খানিই ছোট তা পরে বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। আসল নটরাজের চেয়ে গৌরব ও বৈভবে অনেক হীন হ'লেও এখানের প্রকাণ্ড নটরাজ-মূর্ত্তিটি মনে বেশ সম্ভ্রমের ভাব আনে। গৈরিক বস্ত্রে তাঁর প্রকাণ্ড দেহটি আচ্ছাদিত দেখ্‌লাম। দিগম্বর বা বাঘাম্বরের এই গৈরিক বসনটিও ভাল লাগ্‌লো। মনে হচ্ছিল সেই অক্ষয় কয় লাইন্—"তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল, দাও পাতি নভস্তলে—বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষ কোটী নরনারী হিয়া চিন্তায় বিকল! দাও পাতি গৈরিক অঞ্চল!" ভাই পঞ্চানন ততক্ষণ স্তব আরম্ভ করে দিয়েছে "জটা কটাহ সম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্প নির্ঝরী—বিলোল বীচি বল্লরী বিরাজমান মূর্দ্ধনি। ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাট পট্ট পাবকে কিশোর চন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম। * * * ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমি ধ্বনন্ম দঙ্গ তুঙ্গ মঙ্গল ধ্বনি ক্রম প্রবর্ত্তিত প্রচণ্ড তাণ্ডবঃ শিবঃ।" চিদম্বরের অতুল্য মণিমাণিক্যমণ্ডিত নটরাজ এমন উদাস ভাবটি মনে জাগাতে পারেন নি। সে ঐশ্বর্য্যে স্তম্ভিত হ'য়েই চেয়ে থাক্‌তে হয়।

তার পরে কৃষ্ণপ্রস্তরের রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি মূর্ত্তিও এক কোণে এক অন্ধকার ঘরের মধ্যে দেখা গেল। বাহিরের প্রবল আলোয় ক্ষুদ্র গৃহটির অন্ধকার বেড়েই গেছে। সে জন্য সেখানে বেশী দৃষ্টির চেষ্টাই আর চল্‌লো না। সেই বিশাল স্তম্ভমধ্য খিলানের পথেই বেড়াতে বেশী ভাল লাগছিলো। সর্ব্বত্র বিদ্যুতালোকে দিনের মতই শোভা। কেবলই মনে হচ্ছিল—এই সেই পথ, সেই মন্দির, যার ছবি দেখেও প্রথম জীবনে এই ভেবে চোখে জল আস্‌ত যে, এ জীবনে কি সৌভাগ্য হবে—ঐ পথে ঐ দৃশ্যের মধ্যে বেড়াতে পাব? আজ অর্দ্ধ কিম্বা তিন ভাগ জীবনই হয় ত অতিবাহিত করে এই যে প্রাপ্তি, এ কি আজ সেদিনের সে কল্পনার অনুভবের এক কণাও এনে দিতে পারছে? অসম্ভব। পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড একটী দীপের ঝাড়! আরতির সময় সেটিকে জেলে দেওয়া হয়েছে। চত্বর পার হবার পর যে বহিঃপ্রাঙ্গণটি, সেটির সজ্জা খুব বেশী, যেন বিবাহ-মণ্ডপে প্রবেশ করা গেছে এমনি ভ্রম হয়। চারি দিকে অগণ্য দেবদেবী মুনিঋষি গ্রহ দেবতাদের অনতিক্ষুদ্র মূর্ত্তি! ঘুরতে ঘুরতে আবার হনুমানজীর দরওয়াজায় গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল। তাঁরও তখন আরতি হচ্ছে। কিছু তাঁর মহিমা-কীর্ত্তনও শোনা গেল সেবকের মুখে, ঠিক আপনার মুখে শোনা সেই প্রণামটির ভাবেই—"উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধু সলিলং সলীলং যশ্চোক বহ্নি জনকাত্মজায়া, আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কা নমামি তং প্রাঞ্জলি রাঞ্জনেয়ং।" এমনি করে দশটা বাজিয়ে তার পরে শিবের অভিসার দেখবার জন্য কৈলাসের দরজায় অর্থাৎ পার্ব্বতী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে সকলে বসে পড়্‌লাম। সেখানের পথে লাল কাপড় বিস্তৃত হয়েছিল (বর কনেকে যেমন ভাবে প্রথম গৃহে বরণ করে নেওয়া হয় তেমনি ভাবে) ধূপ প্রদীপ প্রভৃতি নানা উপচার হস্তে সেবকগণ ক্রমে এসে জম্‌তে লাগলেন। একজন সেবক প্রকাণ্ড এক তোড়া চাবী এনে সে গৃহের তালা খুলতেই দর্পণ-মণ্ডিত সেই ক্ষুদ্র গৃহের স্বর্ণ-রৌপ্যময় বহু-মূল্য বিবিধ সজ্জা ও পালঙ্কের উপরে উজ্জ্বল আলোকপাতে দর্পণের বিভ্রমে তাহাকে বহু-দূর-প্রসারী অমরাবতী তুল্য বলেই মনে হয়। কৈলাস বল্‌তেই আমাদের মনে যে ভাব জাগে এই ইন্দ্রভোগ্য সজ্জা ও দৃশ্যে যেন সে ভাবটা খণ্ডিতই হয়ে যায়। মনে হল ভক্তের হাতে এই বৈরাগ্যের মূর্ত্ত

দেবতাটির নাকালের সীমা নেই। যেখানেই তিনি মন্দিরের মধ্যে ধরা দিয়েছেন সেই সেইখানেই এই ব্যবস্থা। তার পরে বাদ্য ভাণ্ড আলোকমালা ছত্র চামর সঙ্গে পূজারীদের স্কন্ধে বাহিত হয়ে শ্রীশ্রীরামেশ্বর ও পার্ব্বতী দেবীর ভোগ-মূর্ত্তিকে আগত দেখে সকলে যোড়হস্তে উঠে দাঁড়ালেন। পালঙ্কে তাঁদের বসিয়ে আরতি ও ভোগ হল,—পুরোহিতেরা যোড়হস্তে বেদমন্ত্র ও স্তোত্র পড়তে লাগলেন। দুঃখের মধ্যে তার একবর্ণও বোঝা গেল না। সবশেষে তাঁদের প্রসাদ বিতরণ হল—পঞ্চামৃত বা দুগ্ধ আর ছোলা সিদ্ধ এই মাত্র।

রাত্রি এগারটার পরে আমরা ছত্রে ফিরে এলাম। সঙ্গে ছড়িদারজী ছিলেন বলেই দ্বারবানকে বিরক্ত না করে প্রকাণ্ড দ্বারের মধ্যস্থ একটা ক্ষুদ্র রন্ধ্রপ্রায় পথে আমরা প্রবিষ্ট হ'তে পারলাম। ছড়িদার পূর্ব্বেই এই দ্বারের তালা চাবীটি দ্বারবানের নিকট হতে আদায় করে নিয়ে বাহির হ'তেই লাগিয়ে রেখেছিলেন। এই ধরমশালা বা ছত্রের প্রহরীকে দ্বারবান বল্লে অপমান করা হয়। তিনি সর্ব্বের সর্ব্বা! সপরিবারেই তিনি এখানে দোদ্দণ্ড প্রতাপে বাস করেন। যিনি অধিকারী, যিনি তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য এতখানি করিয়াছেন, তিনি নিজে উপস্থিত থাকলে হয় ত নিজের অধিকার এর চেয়ে খর্ব্ব করেই রাখতেন। লোকটিকে অবশ্য অনেক জ্বালাতনও সহ্য করতে হয়। সে জন্য তাঁর মেজাজ একটু রুক্ষ হবারই কথা। তাঁর চেয়ে তাঁর চাকর কয়টিরই এ বিষয়ে প্রতাপ বেশী,—বিশেষ বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁদের একটু কড়া দৃষ্টিই চলে! স্বজাতি-প্রীতিটার তাঁদের একটু মাত্রাধিক্যই দেখা যায়। আমাদের ছড়িদারজীও দুঃখ করলেন "দেখুন, এসব দেশে প্রত্যেক হিন্দু জাতিরই প্রায় এক একটা তীর্থে এক এক ছত্র দেওয়া আছে; প্রত্যেক দেশীয়দেরই সে জন্য এক একটা দল বা সঙ্ঘ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীদের কোন কীর্ত্তিই এদিকে নাই। রাজা মহারাজা কোটীপতি বাঙ্গালীরও তো অভাব নাই; কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে বড়ই উদাসীন। সে জন্য বাঙ্গালীকে এদিকে একটু হীনচক্ষেই দেখে।" কথাটা সত্য, সে জন্য নত-মস্তকেই থাকতে হল।

রাত্রি চারিটায় বার হয়ে ৪-৫৫ মিনিটে ট্রেণ ধরে পাম্বান ষ্টেশনে এসে আবার সেই ইন্দোসিলোন্ মেলে 'ধনুস্কোটী'র উদ্দেশে যাত্রা করলাম। গন্তব্য স্থানে পৌছুবার কিছু পূর্ব্বে দুই ধারে জলার আকারে সমুদ্রের বদ্ধ জলরাশি তাদের গন্ধে বড়ই বিব্রত ক'রে তোলে। মৎস্য লোভে চারি দিকে অসংখ্য পাখী উড়ছে। স্থানে স্থানে মানুষ, গো, মহিষ, টাট্টু প্রভৃতি পথের সংক্ষেপার্থ সে জল পার হয়ে যাচ্চে দেখে বোঝা গেল যে জল বেশী নয়; কিন্তু তার বিস্তৃতিতে বিভ্রম লাগল। ক্রমে ট্রেণ ধনুস্কোটি ষ্টেসনে এসে থামলো। সমুদ্র সেখান হতে প্রায় চারি মাইল রাস্তা। গোযানই মাত্র যান! বহু লোক হেঁটেই চল্লো। আমরাও উৎসাহে সেই পথ ধরলাম; কিন্তু শুভা ও ম শেষে যানে চড়তে বাধ্য হয়েছিল।

সমুদ্রতীরে পৌছুলাম। ধনুস্কোটী সার্থকনামা বটে। যেখানটায় স্নান সেখানটার তিন দিকেই জল। কি সে নীল জল, আর তার বুকে দীর্ঘ প্রলম্বিত বেলফুলের গড়ের মত ফেণের মালা কি উপমা যে মনে আনছিলো আপনি তা বুঝবেন। ঢেউগুলি মারাত্মক নয় অথচ রূপের যেন সীমা নাই। বিস্তীর্ণ বালুরাশির কোলে সেই অনন্ত নীলাম্বু—ওপরে তেমনি নীল আকাশ, আমাদের এমনই মুগ্ধ করে তুলেছিলো যার ফলে দুই একটা দুর্ঘটনও ঘটে গেল। হাতের টাকা পয়সার ছোট্ট থলিটা কখন যে হাত থেকে পড়ে গেছে টেরও পাই নি,—ম যদি কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে জব্দ করবার জন্য নিজের ট্যাঁকে রাখ্‌তো তো সেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ্রহে সেটা সুদ্ধই নেমে পড়ায় জলনিধির মধ্যেই সে কখন আশ্রয় করে নিয়েছে জান্‌তে পারা গেলো। নিতান্তই তার জোর বরাত বোঝা গেল। পুরী মাদ্রাজের সমুদ্রও তো দেখেছি। সে কেবল সম্মুখের দিকেই প্রসারিত। আর এ যে সেই সমুদ্রে তিন দিক বেষ্টিত হ'য়ে তার বুকে খেলা করা। জলের রংও আশ্চর্য্য সুন্দর। খানিকটা ফিকে নীল, খানিকটা ঘন; আবার খানিক পরেই সেটা বেগুনে হ'য়ে যাচ্ছে। সেই জল-রাশির উপরে সূর্য্যদেব যেন আদরে মুহুর্মুহু তাঁর বিচিত্র কিরণ তুলি ফেরাচ্ছেন; আর অনবরত জলের রং ফিরে যাচ্চে। উতলা আনন্দে অনেকক্ষণ স্নানের পর

ধর্ম্মে যখন মনকে ফেরাতে হ'ল, তখন আবারও সকলের মনের মধ্যে ভাবের ধাক্কা সেই সমুদ্রবেলার মতই যেন তাকে আকুল করে তুললো। এখানে সোনার তীর-ধনুক ও নানা উপচার দিয়ে ক্ষুদ্র মানবে সেই স্মরণীয় বীর দুটির ও তাঁদের ধনুকের পূজা করে। আমাদের কৃত্তিবাসের লেখা অনুসারে অনেকেই আমরা বলি যে লক্ষ্মণ ধনু দিয়ে যেখানে সমুদ্রের সেতু শৃঙ্খল মুক্ত করে দেন সেইখানটার নাম ধনুষ্কোটি; কিন্তু বাল্মীকি এ কথা বলেন নি। তিনি সেতু-মোচনের ভার কালের হস্তেই সমর্পণ করেছিলেন। এ স্থানটির মূর্ত্তিই ঠিক ধনুকের।

এগারোটার মধ্যেই আবার সিলোন্ মেল ধ'রে রামেশ্বরে যেতে হবে। যাত্রীদল শীঘ্রই ফিরে চল্‌লো। রৌদ্রে বালি তখন তেতে উঠেছে। মধ্যপথে একটী আশ্রম। যাত্রীরা পিপাসার্ত্ত হ'য়ে সেখানে মিঠাজল খায়। এই স্থানটি ভিন্ন আর পানীয় জলের উপায় সেখানে নেই। আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র সীতা লক্ষ্মণ নারায়ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি বিরাজিত। সেবক দর্শকদের প্রসাদী সিদ্ধ ছোলা বিতরণ করলেন। এক ব্যক্তি তো মুক্তহস্তে সকলকে জল এবং বসবার স্নিগ্ধ স্থানও দান করছে। এই মরুভূমির মত বিস্তৃত কয়েক ক্রোশব্যাপী স্থানের মধ্যে এগুলির বিশেষ প্রয়োজনও হয়। আশ্রমকে প্রণাম ক'রে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে, আমাদের ছড়িদারজীর নিযুক্ত যে ব্রাহ্মণ আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি গল্প চালাতে লাগলেন —এখানে ধরমশালা করবার জন্য কয়েকটি মহাজনই চেষ্টা করেছেন, ছত্রও নির্ম্মিত হয়েছিল; কিন্তু বালির জন্য অচিরেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ঐ আশ্রমটিরও একটী ইতিহাস বল্লেন,—একজন সাধু একটী শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র আশ্রয় ক'রে ঐ ধনুষ্কোটার তীর-ভূমিতে বহুকাল ছিলেন। তীব্র সাধনা ছিল তাঁর। দক্ষিণের তীক্ষ্ণ রৌদ্রে বর্ষায় এই বালুভূমিতে তাঁর আসন অটল ছিল। পরে তাঁকেই আশ্রয় করে ধীরে ধীরে এই আশ্রম গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতি তিনি সমাধিপ্রাপ্ত। এই সব ইতিহাস সে ব্রাহ্মণ সমানে গল্প করতে করতে চল্‌লো।

ক্রমে আমরা সমুদ্রতীরে যেখানে সিলোন্ মেল এসে দাঁড়ায় সেই পীয়েরে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। এবার আর ধনুষ্কোটি ষ্টেশনে নয়। দেখ্‌লাম—মেল্ জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে জেটির কোলে। আর ট্রেণ দাঁড়াবার জন্য একটা সেতুর মত কাষ্ঠ ও লৌহময় পথ জেটিরও কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রেণ তার ওপর দাঁড়িয়ে মুহুমুহু বংশী নিনাদ করুচে। আস্তেব্যস্তে আমরা গিয়ে চড়ে বস্‌লাম। এই স্থানটিকেই সেদিন রামঝরোয়া হ'তে পেন্সিলের দাগের মত দেখা গিয়েছিল। যাত্রীরা সব ব্যস্ত। কেবল আমরাই যেন নিশ্চিন্তভাবে ডাবের সদ্ব্যবহার আর সমুদ্রজাত চিত্র-বিচিত্র শঙ্খের দর করছিলাম, মাঝে মাঝে লোলুপ-দৃষ্টি সিংহলগামী যাত্রীদের প্রতিও পড়্‌ছিল। মনটা কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল না। উপায় নাই,—এর বেশী আর উপায় নাই। ক্ষমতার সীমা এতই সংকীর্ণ। এই জলনিধির তীরে জলের কিন্তু বড়ই অভাব। গোল গড়নের মালগাড়ী বোঝাই বোঝাই জল এনে রেল কোম্পানি একটা সুদীর্ঘ বাঁধানো নালার মধ্যে নিকাশ করছিল, আর বহু লোক বাল্‌তি হস্তে সেই দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়লো। "জয় সীতারাম" বলে সিংহলযাত্রীদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে চাইলাম। আবার জলের রং ফিরেছে। ঠিক যেন রামধনু রংয়ের শোভা। অগণ্য সমুদ্রমৎস্য তরঙ্গ-তাড়নে তীরের কাছে এসে পড়ে ছিট্‌কে গভীর জলে চলে যাচ্চে। তাদের সেই মুহুর্মুহু উৎক্ষেপে সূর্য্যের আলোয় তাদেরও গায়ের নানা রং চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠছে। তীরের কাছে কপিশ্ মাঝখানটি রামধনু, বাদবাকিটা বেগুনি—সিন্ধু এমনি বর্ণ-বৈচিত্র্য নিয়ে ক্রমেই চক্ষের অন্তরালে চলে গেলেন। "জয় রামেশ্বর প্রভু" বলে আবারও মনকে সান্ত্বনা দিতে হ'ল।

বাসায় পৌছে রন্ধন ও আহারাদি সান্ধ্য-কৃত্যের কাছাকাছিই এসে পৌছুলো। কথা আছে, রাত্রি প্রভাতেই আমাদের ত্রিরাত্রি তীর্থবাস শেষ হবে,—ভোরের ট্রেণে আমরা মাদুরাভিমুখে রওনা হব। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই দক্ষিণের বর্ষা সাড়ম্বরে নেমে এলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর বিক্রম দেখে ভোরের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিলাম।

পরদিন কার্ত্তিকী অমাবস্যা—৺কালী পূজা! সকাল পর্য্যন্ত বর্ষণের পর আকাশ পরিষ্কার হ'ল; কিন্তু তখন

আর পঞ্চাননকে সেখান হতে নড়ায় কে! সে তার "খুঙ্গিপুঁথি" নিয়ে "পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের" মন্দিরে জপ চণ্ডীপাঠ ইত্যাদিতে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে। সুবিধাজনক ট্রেণও তখন আর নেই। অগত্যা আমরাও কোনরূপে দিনটা কাটিয়ে রাত্রি ৯টা হ'তে রামেশ্বর মন্দিরে পার্ব্বতী দেবীর অভিসার দেখ্‌বার জন্য ধর্ণা দিলাম। ছড়িদার এর জন্য দু-তিন দিন হ'তেই প্রলুব্ধ করছিলো। ভাগ্যে আপনা হতেই ঘটে গেল যখন, তখন না দেখে কে থাক্‌বে? রাত্রি দশটার পর বিরাট স্বর্ণ চতুর্দ্দোল শালুমোড়া অবস্থায় ৺রামেশ্বরের অভ্যন্তর প্রাঙ্গণে মন্দির সম্মুখে দাঁড়ালো। বাহক এতগুলি যে তাতেই ব্যাপারটা কতক বোঝা যায়। ক্রমে তার আবরণ খুলে মধ্যস্থিত স্বর্ণ সিংহাসনের মখমল শয্যার উপর স্বর্ণময়ী পার্ব্বতী দেবীকে এনে বসিয়ে তাঁর শিঙ্গার আরম্ভ হ'ল! যেমন চতুর্দ্দোল দেবীর মূর্ত্তি ও শিঙ্গারও তদুপযুক্ত। চতুর্দ্দোলা যেমন বিশাল তাতে সজ্জাও তেমনি বহু মূল্য,—চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। দেবীর মূর্ত্তিটিও দিব্য চারি পাঁচ বৎসরের বালিকার মত বড়। সুবর্ণময় হ'স্তে বহু রত্ন-আভরণ, তার মধ্যে আর একটি বিচিত্র বস্তু! বাম করতলের উপর একটি সুবর্ণ শুক, মণিময় তার চক্ষু। দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণ লীলা কমল! সম্মুখে বৃহৎ সুবর্ণ-মণ্ডিত দর্পণ! দেবী এই বেশে শিঙ্গার আরতির পর রামেশ্বর দেবকে প্রদক্ষিণ করতে সেই বিশাল মকরমুখ চতুর্দ্দোলে বাদ্যভাণ্ড আলোক ছত্র চামর এবং অগণ্য অনুচর সঙ্গে রওনা হলেন। আমরাও উভয়কে বিদায় প্রণাম জানিয়ে যাত্রা কর্‌লাম।

সন্ধ্যাকালেই পাণ্ডা এবং তাঁহার ভ্রাতা এসে সুফলাদি দিয়ে এবং প্রণামী নিয়ে গেছেন। বাকি ছিল কেবল ছড়িদারের বিদায়। এঁকে আমরা পাণ্ডার গোমস্তা বলেই বুঝেছিলাম; কিন্তু পরে জান্‌লাম ব্যাপার তার চেয়েও বেশী! এই ছড়িদার বা গোমস্তারা যে সব যাত্রী ধ'রে নিয়ে যায়, তাঁদের যত কিছু দান ধর্ম্ম করানো হয়, সমস্ত বিষয়েই এই গোমস্তার অংশ যাকে বলে চৌদ্দ আনা। পাণ্ডার মাত্র দুই আনা অংশ লভ্য হয়ে থাকে। কেবল সুফলের টাকাটিই পূর্ণ মাত্রায় পাণ্ডার প্রাপ্য। আমরা ধনুষ্কোটী হতে ফেরার পর দিন ছড়িদারের এই ব্যাপারটি ঘটনা ক্রমে খানিকটা প্রকাশিত হয়েছিল। ছড়িদার ধনুষ্কোটী যেতে আমাদের সঙ্গে একটী লোক দিয়েছিল। ফিরবার সময় দেখলাম তিনি বেশ একটী গাঁটরী বহিয়াই আসিলেন! ব্যাপারটা কতক বুঝলেও মন সে অনাবশ্যক বিষয়ে বেশী অনুসন্ধিৎসু হয় নি। রামেশ্বরে পৌছানোর খানিক পরে দেখা গেল ছড়িদার-জীর মুখ কিছু ভার। ক্রমে তিনি আর ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে ধনুষ্কোটীর করণীয় পুণ্যকার্য্য সকলের যথাযথ হয়েছে কি না খোঁজ নিতে লাগলেন। ব্যাপার না বুঝে অনেকেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। তার পরে যে বীভৎস কাণ্ড তিনি করলেন তা অবক্তব্য। সেই ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া প্রায় বিবস্ত্র করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বস্ত্র স্বর্ণ রৌপ্যাদি অনেক কিছুই আদায় করিয়া লইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে তখন সিংহ-গর্জ্জনের সঙ্গে যে ভাষা বাহির হইতেছিল, তাহাতে বালিয়া জিলার অপূর্ব্ব মহিমা তিনি প্রদর্শন করিলেন। না জানিয়া আমরা সঙ্গী ব্রাহ্মণটির যে লাঞ্ছনার সাহায্য করিয়াছি, তাহাতে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইল। কেহ কেহ অবশ্য এমন কথাও বলিয়া ফেলিল যে, লোভীর উচিত ফলই হইয়াছে। কিন্তু পরে ছড়িদার বাবাজীর লভ্যাংশের কথা জানিয়া তাঁহার উপরেও সকলের আর ততখানি উদার ভাব থাকিল না। তিনি যে প্রভু-ভক্তির জন্যই মাত্র ঐ কাণ্ডটি করেন নাই, এ কথা কাহাকেও আর বুঝাইতে হইল না। যাই হোক্—তথাপি, পথে ঘাটে সর্ব্বদা সাহায্যের জন্য তাঁহার একটা দাবী সকলেরই প্রতি জন্মিয়াছিল। তিনি সে দাবী যথারীতিই উপস্থিত করলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আমরা যতদূর পর্য্যন্ত আসিতে বলি আসিতে রাজী ছিলেন (অবশ্য তাঁর সর্ব্ব ব্যয় ভার আমাদেরই বহন করিতে হইবে), কিন্তু আমাদের মন আর তাঁহার প্রতি ততখানি শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল না। সর্ব্বশেষে প্রণাম ও আশীষ বিনিময়ান্তে উভয় পক্ষই বিদায় নেওয়া গেল।

সেই ভোর চারিটায় ট্রেণ। এ ট্রেণ একেবারেই মাদুরা যাবে। এবারে তো ধনুষ্কোটী যাত্রার মত ব্যাপার নয়,—কুলী ও গাড়ী চাই! শেষ রাত্রে কি জানি কি হয়, এই ভয়ে অগত্যা রাত্রি বারোটাতেই ষ্টেশনে গিয়ে অনেক

হাঙ্গামার পর আমরা একটা কামরা দখল করে নিশ্চিন্ত ভাবে বিছানা পাতলাম। ট্রেণটি সমস্ত রাত এইখানেই থাকেন এ খবর জানা গিয়েছিল বলেই এ সুবিধাটি পাওয়া গেল। শুভা বল্‌লে "এতক্ষণে আমরা নিজেদের বাড়ী-ঘরে এসে আরাম ক'রে বস্‌লাম।" ট্রেণ ভিন্ন আমাদের সুস্থির হয়ে শোওয়া বসার সময় বা উপায় যে ছিল না এটা সত্য। ট্রেণই আমাদের এই ক'দিনে মাত্র নিজেদের ঘর-বাড়ীর মতই হয়ে উঠেছিল। তাকে ছাড়্‌বার সময়ে রীতিমত চিন্তাতেই পড়া যেত, আর উঠে অনেকখানি নিশ্চিন্ততা আস্‌ত।

ভোরে ট্রেণ ছেড়ে বেলা দশটায় মাদুরা পৌছুলাম। দৈনিক ভাড়ার হিসাবে একটা 'ছত্রে' উঠে কোনরূপে স্নানান্তে মীনাক্ষী দেবী এবং মন্দবেশ্বর মহাদেব দর্শনে যাত্রা করা গেল। এতক্ষণ মাদুরাকে একটা সহর বলেই মনে হচ্ছিল, এতক্ষণে একটু তীর্থ তীর্থ ভাব মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়লো "দক্ষিণ মথুরা" এসে মহাপ্রভু যাঁর অতিথি হয়েছিলেন। এই নগরে বাস করেও তিনি মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—

—"প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি।
বন্য মূল ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ
তবে সীতা করিবেন পাক আয়োজন"।

কত বড় তত্ত্বই এখানে কবিরাজ গোস্বামী নিহিত রেখেছেন। যে মূর্ত্তি যার ইষ্ট সে সর্ব্বদা মনে ধ্যানে তাঁর সমীপে বাস করবে। সীতারাম-ভক্ত ব্রাহ্মণ অত বড় নগরে বাস করেও অন্তরে বনবাস করতেন, তাই মহাপ্রভুকে এই উত্তর দিয়েছিলেন। তাই—

"তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।"

তার পরের কথাগুলিতেও কবি সেই সরল ভক্তের প্রীতির গাঢ় মোহের কথাও তেমনি ব্যক্ত করেছেন—

"প্রভু কহে বিপ্র কাঁহে কর উপবাস,
কেন এত দুঃখ তুমি করহ হুতাশ!
বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি।
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়।
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর,
পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার?
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি,
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে কার শক্তি?
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।

মনে মনে এই কথাগুলো তোলাপাড়া করতে করতে দেব মন্দিরের সম্মুখে এসে পৌছুলাম। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হিসাবে এমন মন্দির আর দক্ষিণে নেই। গোপুরম্ থেকে ভেতরের যত কাজ, তক্ষিত যত মূর্ত্তি দেখে বিস্ময়ে চেয়েই থাকতে হয়। দেবী মন্দিরে যেতে রক্ত-চন্দনের দীর্ঘ মণ্ডপ! কোন্ দিকের কথাই বা বল্‌ব। পাথর খুদে কি অপূর্ব্ব কবিত্বই না মানুষে লিখে গেছে এই মন্দিরে। দক্ষিণী মেয়েরা দলে দলে আসছেন। ফুলের গন্ধে সর্ব্বত্র আমোদিত। মন্দির চত্তরের মধ্যেও একটী টেপ্পা বা কুণ্ড! তিরুমল নায়ক সস্ত্রীক এক স্থানে মূর্ত্তি পেয়ে যোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন আমাদের রাঁধবার অবসর হ'ল না। জলযোগান্তে সমস্ত দিন ধরে তিরুমল রাজার আরও সব কীর্ত্তি,—তাঁর প্রকাণ্ড রাজভবন (অধুনা তাতে গবর্ণমেণ্টের বিচারালয় বসেছে), 'টেপ্পা কুল্মা' নামে বিশাল পুষ্করিণী—এ সব দেখে বেড়ানো গেল। সেদিন কালী পূজার পর দিন—এই প্রতিপদে আমাদের দেশেও যেমন গোয়ালা এবং গো যান স্বামীদের উৎসব এবং প্রতিযোগিতা চলে, সুদূর দক্ষিণেও তা দেখা গেল। দেশবাসী নরনারীরাও দলে দলে বিচিত্র বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে 'টেপ্পা' তীরে উপস্থিত হচ্চেন—সেখানে সেদিন রীতিমত মেলা।

রাত্রি ১০টায় চিদম্বরাভিমুখে যাত্রা করে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শুভার কথিত নিজেদের ঘর-বাড়ীতে বিছানাটি পেতে আঃ বলে শুয়ে পড়া গেল। ট্রেণ ছাড়ার আগেই বোধ হয় সকলে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম।

পরদিন বেলা এগারোটায় চিদম্বরম্! ধুলাপায়েই নটরাজ এবং পার্ব্বতী দর্শন করা হল। সেই নটরাজ যাঁর নাম দক্ষিণ-ভারত হতে এখন সমস্ত ভারতেই বুঝি ব্যাপ্ত! বিশ্বকবির 'নটরাজ'কে বার বার মনে আসছিল। ইনি ব্যোমমূর্ত্তি মহাদেবের চাক্ষুষ ভোগমূর্ত্তি! এমন মণিমুক্তার সজ্জা আর কোথাও দেখিনি, সমস্ত কপালটা একখানা প্রকাণ্ড হীরায় মণ্ডিত! করতলে লোহিত হীরা। পার্ব্বতী দেবীরও এমনি সজ্জা। পশ্চাতে কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে তাঁর আকাশলিঙ্গ। অর্থাৎ সেখানে কিছুই নাই—মাত্র দেয়ালের গায়ে কতকগুলি রুদ্রাক্ষ মালা! সম্মুখের মূর্ত্তি ঘিরে মহা আড়ম্বর আর অভ্যন্তরে—সেই ব্যোম বিগ্রহের আভাস মনকে এক অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট করলে। ডান হাতে ডমরু আর বাঁ হাতে অগ্নি শিখা; বাম পদ দক্ষিণ পদের জানুর উপর তুলে নটরাজ নৃত্য করছেন। চতুর্দ্দিকেও বহ্নির পরিকল্পনা। বৈকালে আমরা এঁর আর এক মূর্ত্তি স্ফটিকলিঙ্গ মহাদেবের পূজা ও আরতি দেখ্‌লাম। স্বর্ণকবচ বা গৌরীপট্টে মণ্ডিত হয়ে এক বৃহৎ স্বর্ণ-কৌটায় তিনি থাকেন। সে আরতি, পূজা ও অভিষেক অপূর্ব্ব! এঁর উপরেই নটরাজের পূজা আদি হয়! দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চন্দন ছাড়া অন্নের দ্বারাও এঁর পূজা হয়। সমস্ত দ্রব্যের মত অন্নের স্তূপেও তাঁকে ঢেকে ফেলা হ'ল। তাঁর মণিময় লিঙ্গ আর আমাদের ভাগ্যে দেখা হ'ল না, কেন না তাহলে আবার পূরা একদিন থাকতে হয়! এখানে ধরমশালা মেলেনি, মন্দিরের সামনে পাণ্ডার বাড়ীতেই উঠ্‌তে হয়েছে; কিন্তু সেখানে রাত্রিবাস করেও মনঃপূত হচ্ছিল না। মন্দিরের অন্যান্য দেবতা শ্রীগোবিন্দরাজ প্রভৃতি দর্শন হ'ল এঁরও শেষশায়ী মূর্ত্তি। নটরাজের 'কনক সভা' বা অষ্ট-কলসযুক্ত সুবর্ণ মণ্ডপটি একটী দ্রষ্টব্য বস্তু এবং এ বিষয়ে শ্রোতব্যও কিছু পাণ্ডার মুখে শোনা গেল। ২১৬০০ স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা এটি মণ্ডিত। অহোরাত্রে মানুষের নাকি ঐ সংখ্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, তারই স্মরণে রাজা পরন্তপ এই মণ্ডপের শিরোভাগ সেই সংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রায় মণ্ডিত করেছেন। সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ঐ স্বর্ণের মূল্য। মন্দিরের ভিতর চত্বর এইরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ কিন্তু গোপুর হইতে বহিঃপ্রাকার এবং ভিতর প্রাকারের গাত্রের সারি সারি কক্ষ সব যেন জীর্ণ, বহুদিনের অসংস্কৃত! প্রথম প্রবেশের মুখে ব্যোম দেবের মন্দিরের এই উদাস ভাবটাও মনকে বেশ একটা বস্তু দিয়েছিল। ভিতরের ঐশ্বর্য্যে বাহিরের সে উদাস শোভা গোপুরমের উপরে একপার্শ্বে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের পল্লব নেড়ে যেন নটরাজের নৃত্যে তাল দিয়েই একটা গোপন হাসি হাস্‌ছিল। মন্দিরপ্রবেশের দক্ষিণ দিকে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ—তারও অবস্থা জীর্ণ। সম্মুখে সারিসারি স্তম্ভমালা; উপরে আবরণহীন। যখন উৎসব হয় তখন এগুলির উপরে আবরণ দেওয়া হয়। এই স্তম্ভগুলির অবস্থাও অসংস্কৃত। আরও দক্ষিণে একটী সুন্দর সুবৃহৎ কুণ্ড! ব্যোমগঙ্গা নামে ইনি অভিহিতা। সরোবরটি এতই ভাল লাগ্‌লো যে আমরা সেই আকাশগঙ্গার তীরেই বৈকালটা কাটিয়ে দিলাম। পঞ্চানন সেইখানে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে নিল। পরদিন থাকার জন্য পাণ্ডা অনেক অনুরোধ করলেন। পরদিনের প্রণামী ও ভোগ দেব উদ্দেশে তাঁর হস্তে নিবেদন করে আমরা সন্ধ্যার পর ষ্টেশন মুখে চল্‌লাম। এবার চিঙ্গলপটে নেমে পক্ষীতীর্থ, আর কাঞ্চি। আমার বরদরাজের চরণ দর্শন এতদিনে বুঝি ভাগ্যে মিল্‌লেও মিল্‌তে পারে! (আগামীবারে সমাপ্য)

"আবার এসেছে আষাঢ় –"

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

রাত থেকে কাল নেমেছে বাদল, হাতে নেই কোনো কাজ।
পড়শীর বাড়ী মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন আজ ॥
বাড়ীর কর্ত্তা বিদেশে আছেন ; ছেলে-পুলেগুলো সব
বেলাবেলি সেজে গিয়েছে সে বাড়ী, ঘরে নেই কলরব ॥
নির্জ্জন বাসা স্তব্ধ নিরালা, একেবারে চুপ্‌চাপ।
একঘেয়ে সুরে কাণে আসে শুধু বৃষ্টির ঝুপ্‌ঝাপ ॥
হেঁসেল ঘরের শিকল বন্ধ, নেই আজ হাড়িঠেলা।
বহুদিন বাদে বাতায়নে তাই বসেছি বিকেলবেলা ॥
আকাশ হয়েছে মলিদা রংয়ের,-- তারি পানে চেয়ে আছি।
যদিও কোলেতে নেই মেঘদূত, বীণা নেই কাছাকাছি ॥
বকুল-মালিকা কোনও মালবিকা দেয়নি আমায় এনে।
এলায়িনি কেশ, এলো-খোঁপা শুধু নিজেই বেঁধেছি টেনে ॥
ভালে নেই মোর অলকাতিলক, তনুতে পত্রলেখা।
ভবন-বলভি-শিখরে আমার নাচেনা মত্ত কেকা ॥
যূথীপরিমলে গৃহগুহা মোর মোটে নয় সুরভিত।
প্রবাসী প্রিয়ের বিরহ-দহনে গুমরি দহেনা চিত ॥
তবুও আজিকে বহুদিন বাদে দেখি এ অস্ত-বেলা
গিরিতে গিরিতে নবআষাঢ়ের মেঘের বপ্রখেলা ॥
সিক্ত মাটীর সোঁদালি গন্ধে নব অনুভূতি লাগে।
অতীত দিনের ছোট খাটো স্মৃতি মধু হয়ে মনে জাগে ॥
মনে পড়ে কবে এমন দিনেতে পড়াশুনো সব ভুলে
মেঘের কবিতা লিখেছি গোপনে অঙ্কের খাতা খুলে ॥
এ হেন উতল ধারা-মুখরিত সজল আঁধার সাঁঝে--
রবি ঠাকুরের বরষার গান বেজেছে কণ্ঠ মাঝে ॥
গগনে এমন ধূমল কৃষ্ণ মন্থর মেঘ-ভার।
তুলিত আমার তরুণ-হৃদয়ে ছন্দের ঝঙ্কার ॥

অকারণ ব্যথা অজানা বিরহে কাঁদিত হৃদয়বধূ।
মেঘের মায়ায় বনের ছায়াটি নয়নে লাগিত মধু ॥
আজো বাতায়নে বসেছি আবার, সেই আমি সেই 'রনু'।
কানে বাজে সেই বর্ষা নটীর নূপুরের ঝুণ্ ঝুণ্ ॥
চিকণ সবুজ পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টি ধারার চিক
স্ফটিক-পর্দ্দা দিয়েছে টাঙিয়ে দেখি চেয়ে অনিমিখ ॥
শিখরে শিখরে শুভ্র মেঘের চপল ঝুলন-মেলা।
শ্যামল-ভ্যালির স্নিগ্ধ বুকেতে শ্রাবণের লীলা খেলা ॥
সুনীলকান্ত মণিনিভ-মেঘ সুদূর শৈল-শিরে
দিয়েছে পরায়ে রঙীন-কীরিট উন্নত চূড়া ঘিরে ॥
সবুজের বুক চিরে চলে গেছে সিঁদুরবর্ণ পথ —
নব-বিবাহিতা শ্যামা রূপসীর রক্তিম-সীঁথিবৎ ॥
সোজা সুদীঘল পাইনের দল দোলে গান গেয়ে গেয়ে।
ঝির ঝির ঝির ঝরে জলকণা ঝাউয়ের ঝরোকা বেয়ে ॥
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি বাজিছে মাদল দামামা নাকাড়া নানা।
পুঞ্জে পুঞ্জে চেরাপুঞ্জির মেঘ-সেনা দেয় হানা ॥
পার্ব্বতী বালা 'থাপ্পা' বাহিয়া ভিজে চলে গেয়ে গীতি।
বাদল-ঝাপ্‌সা পাহাড়িয়াপথ গিরিদরী বন-বীথি ॥
ঝর্ণার কোলে ফুলে ছেয়ে গেছে লতাগোলাপের ঝোপ্।
বৃষ্টি ও মেঘে রৌদ্র ছায়ায় রচিছে বায়োস্কোপ্ ॥
আপনার পানে আপনি তাকায়ে বিস্ময়ে আজ ভাবি,
সেদিনের সেই মনের দুয়ারে কেবা আজ দিলো চাবি ॥
কোথা হৃদয়ের সেই অনুভূতি ভাবাকুল সেই প্রাণ!
রূপ-রস-হীন সংসার কূপে দিন করি গুজরাণ ॥
সদা আনন্দে উতল-হৃদয়া লীলাচঞ্চলা সেই
প্রাণউচ্ছলা অতীতের 'রনু'—আজ আর বেঁচে নেই ॥

আজো তো আকাশে এসেছে বরষা—হেসেছে ধরার রূপ।
হৃদয় আমার মুখরিছে কই ?—মৃতের মতই চুপ ॥

মিছিমিছি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আয়নাতে নিজের মুখ দেখা ছাড়া পৃথিবীতে পীতাম্বরের আর কাহারো মুখ চাহিবার প্রয়োজন ছিল না। সংসারের সঙ্গে তাহার সকল বন্ধন খসিয়া গিয়াছে। নিজের দেহটা বহন করার জন্য দুইটা সক্ষম পা ছাড়া তাহার আর কিছু-এমন আছে বলিয়া তো মনে হয় না।

গাঁয়ের কোন্ সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া চিম্‌টা বাজাইতে বাজাইতে সে কবে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। উজোন বয়েস, মা-সরস্বতীকে ইহারি মধ্যে এক ঢোঁকে সে জলপান করিয়া বসিয়াছে, তাহাকে দিয়া কিছু হইবে না—এমনি প্রসন্ন, নিশ্চিন্ত মুখভাব করিয়া সে বৈরাগ্যে গা ভাসাইয়া দিল। কতলোকে কত বুঝাইল, কত মুখনাড়া দিল, ক্ষুদে-পিঁপড়ের কামড়ের মতো কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিল, কিন্তু কোন-কিছুই পীতাম্বর কানে তুলিল না। স্থিতপ্রতিজ্ঞের মতো অটল নিঃশব্দতায় যেন বলিতে লাগিল,—'আমাকে কাটিলেও রক্ত নাই, কুটিলেও মাংস নাই। আমি আর ফিরিব না।'

তাহার পর তাহার মা-বাবা একে-একে গত হইয়াছেন, ভালো ঘর দেখিয়া ছোট বোন যমুনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই তিনটা মোটা খবর কি করিয়া যেন তাহার কানে আসিয়াছিল। তাহার পর প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গেল, পীতাম্বর ধারে-কাছে আর কোনোরূপ উচ্চবাচ্য শোনে নাই, পরম নিশ্চিন্ততায় তাহার এই তীব্র, অজস্র একাকীত্বে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

বেশিদিন সন্ন্যাসগিরি তাহার পোষায় নাই, কিন্তু সাধুসঙ্গের গুণেই হোক্ বা স্বভাবের প্ররোচনায়ই হোক্ তাহার মনে বৈরাগ্যের রঙ ধরিয়াছিল। সে রঙ গেরুয়া, নিঃস্পৃহ ঔদাসীন্যের রঙ। কোথাও শরীর তাহার শিকড় গাড়িয়া বসিতে চাহিত না, আর মন—তাহার মন লঘুপক্ষ চঞ্চল পাখির মত সর্ব্বদাই উড়ু-উড়ু করিতেছে।

অথচ তাহার পোষাকের পারিপাট্য দেখিয়া তাক লাগিয়া যায়। সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া দেহ তাহার অতিরিক্ত আয়েসী হইয়া উঠিয়াছে। দিব্যি চুল ফাঁপাইয়া টেরি কাটে, ঘুন্টি-দেওয়া আদ্দির পাঞ্জাবী হাঁটু-পর্য্যন্ত নামাইয়া দেয়, কোঁচা মাড়াইয়া গয়ংগচ্ছ ভাবে পথ চলে। গা ভরিয়া যে বেশ রগ্‌রগে করিয়া তেল মাখে ও পেট ভরিয়া যে পঞ্চ ব্যঞ্জন আহার করে তাহার চিহ্ন তাহার সমস্ত শরীরে উদ্ভাসিত হইতেছে। অথচ কি করিয়া যে সে ধোপদোরস্ত ভাবে গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ায় ভাবিয়া-চিন্তিয়া কেহ কিছু কিনারা করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিলে পীতাম্বর বলে :

—একা মানুষ, খাই-দাই, হাই তুলি—আমার আবার ভাবনা কী!

তাহার একা থাকার এই অসম্ভব সুবিধা দেখিয়া সকলেই কম-বেশি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠে; নিজেদের হৃত-দরিদ্র সংসারের দিকে চাহিয়া কেহ-কেহ বলে : এবার একটা বিয়ে করলেই তো পারিস্।

নিতান্ত অপ্রস্তুত হইবার ভাণ করিয়া পীতাম্বর জিভ কাটিয়া বলে : রামোঃ! আমি সন্নেসি না?

যদি কেহ মুখের উপর তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলে : "এই নাকি তা'র চালচুলো?", পীতাম্বর তখুনি ভারিক্কি চালে হাসিয়া বলে : 'সব সন্নেসিই এই। উপরে চাকণ-চিকণ, ভেতরে খ্যাঁড়।'

চেৎলার হাটের কাছে একটা চা'লের আড়তের পাশে পীতাম্বর তখন ছোট একটা খোপরি নিয়া প্রায় কায়েমি হইয়া বসিয়াছে। একটা পানের দোকান দিয়া কয়েক দিন সে মনের সুখে বিড়ি পাকাইয়াছিল; সে-দোকান চলিল না। চেৎলায় যে হাট বসে তার এক দিকটা চিঁড়ের, অন্য দিকটা চুড়ির—মর্জ্জি হইয়াছিল সে এই বেলোয়ারি চুড়ি বেচিয়া একদিন বড়োলোক হইবে; কিন্তু প্রথম দিনেই আনাড়ি হাতে চুড়ি পরাইতে গিয়া মট্‌মট্ করিয়া প্রায় ডজনখানেক ভাঙিয়া ফেলিয়া ব্যবসায় সে ইস্তফা দিয়া পলাইয়া আসিল। আবার খেয়াল হইল ভোরবেলা ভদ্রলোকদের ঘরে-ঘরে সে খবরের

কাগজ বিলি করিয়া বেড়াইবে। কিন্তু শয়নে সে পদ্মনাভ, সূর্য্যদেব স্বয়ং আসিয়া গায়ে না ঠেলা দিলে তাহার ঘুম ভাঙে না—অত বেলায় সকল খবর তখন বাসি হইয়া গিয়াছে। তাহার পর সে একটা ভবঘুরে যাত্রার দলে ঢুকিতে গিয়াছিল, কিন্তু মৃত সৈনিক বা পত্রবাহী দূত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার মুখর বা সবাক পার্ট তাহাকে তাহারা দিতে চাহে নাই—মুখে সামান্য একটু রঙ মাখিবার পর্য্যন্ত তাহার সৌভাগ্য হইল না। পীতাম্বর 'বিরক্ত' হইয়া চলিয়া আসিল।

শেষকালে, শেষ-সন্ন্যাসীর ঝুলি হইতে যাহা সে কৌশলে হাতড়াইয়া আনিয়াছিল তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া সে একদিন সিঙ্গল্-রিডের এক হার্মোনিয়াম কিনিয়া বসিল। নাগাড়ে তাহাই সে এখন টিপে ও মুখব্যাদান করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই কণ্ঠস্বরটা অবলীলাক্রমে সা হইতে নি-তে এক দৌড়ে উঠিয়া আসে। তাহার পরে গ্রামে-গ্রামে হোঁচট খাইয়া, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, ছত্রখান হইয়া সে-স্বর আগুন উদ্গার করিতে থাকে।

পীতাম্বর এই আছে বেশ।

কিন্তু পাড়ার মধ্যে জোয়ান একটা লোক বেকার বসিয়া আছে—কাজে-কর্ম্মে আপদে-বিপদে তাহার ডাক পড়াই স্বাভাবিক। বলিতে কি, কারো কোনো হাঁক-ডাকেই সে সাড়া-শব্দ করে না, বেশি পিড়াপিড়ি করিলে সরাসরি না বলিয়া বসে। ব্যারামে-পীড়ায় কাহাকেও যত্ন-আত্তি করা দূরে থাক্, অসহায় কাহারো মৃত্যু হইলেও সে কাঁধ আগাইয়া দেয় না, পৃথিবীতে সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যের চেয়ে নিজের সুখ-সুবিধার দিকেই তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। একলা নিজেকে লইয়াই সে অস্থির। কেহ কিছু নালিশ করিতে আসিলে বলে:

—বাবা, নিজের উন্নতি করবার জন্যেই এই সন্নেসি হওয়া! পাঁচ জনের জন্যেই যদি ভাববো, তবে বে-থা করে' সংসার ফাঁদতে কী দোষ হয়েছিলো? একা আপনাকে নিয়েই থাকবো বলে' তো এতো তোড়জোড়। বেশি ঘাঁটিয়ো না, বাবা, আবার কোন্ দিন শিকলি কেটে ভেগে পড়বো।

পীতাম্বর বেশ ভালোই আছে বলিতে হইবে।

কিন্তু একদিন হঠাৎ তাহার নামে এক চিঠি আসিয়া হাজির। হ্যাঁ, দস্তুরমতো তাহারই নাম লেখা, নিচে স্পষ্টাক্ষরে তাহার ঠিকানা পর্য্যন্ত দেওয়া আছে। কে যে তাহাকে গায়ে পড়িয়া চিঠি লিখিতে পারে পীতাম্বর এক নিমেষে সমস্ত স্বর্গ-মর্ত্ত্য মন্থন করিয়াও তাহার কোনো হদিস পাইল না। তবুও, অজানা জায়গা হইতে অপ্রত্যাশিত চিঠি পাইবার মধ্যে যে তীব্র মাদকতা আছে তাহারই প্রেরণায় খামের মোড়কটা সে খুলিয়া ফেলিল।

প্রত্যেকটি শব্দ ধরিয়া-ধরিয়া পড়িয়াও পীতাম্বর সে-চিঠির কোনো বোধগম্য অর্থ করিতে পারিল না। কাঁচা মেয়েলি অক্ষরের বাঁকাচোরা কয়টি লাইনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তালগোল পাকাইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

চিঠি লিখিয়াছে যমুনা—তাহার কবেকার সেই ছোট বোন। বক্তব্য তাহার বিশেষ বিস্তারিত নয়, তাহার গ্রাম-সুবাদে এক দাদার সঙ্গে কাল ভোরে সে কলিকাতা পৌঁছিতেছে। এতো দিন অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও পীতাম্বরের সে কোনো ঠিকানা পায় নাই, ঠিকানা জানা থাকিলে আরো অনেক আগেই সে চিঠি লিখিত। সে যাহা হোক্ আর পত্র-ব্যবহার করার দরকার হইবে না, নিজেই সে এইবার সশরীরে আসিতেছে—পীতাম্বর যেন দয়া করিয়া ষ্টেশনে হাজির থাকে। সব কথা খোলাখুলি চিঠিতে বলা অসম্ভব—তাহার মনের অবস্থাও তেমন নয়, সাক্ষাৎ হইলেই পীতাম্বর সব কথা জানিতে পারিবে।

চিঠি পড়িয়া পীতাম্বর কেমন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার যে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো জায়গায় সামান্য বাধ্য-বাধকতারও সম্পর্ক ছিল এ-কথাটা তাহার একেবারেই মনে ছিল না। আজ হঠাৎ চিঠির সেই কয়টি আঁকাবাঁকা ভাঙা লাইনে একটি কৃশ-করুণ মমতা-কোমল মুখের অস্পষ্ট আভাস বারে-বারে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল। কিন্তু কলিকাতায় যমুনা বেড়াইতে আসিতেছে, তাহার কত আয়োজন-সমারোহ, কত বিলাস-ঐশ্বর্য্য,—সেখানে সর্ব্ববন্ধনমুক্ত নিঃসম্বল পীতাম্বরকে ডাকিয়া আনা কেন? সে তো কবেই ঐ সব স্নেহসম্পর্ক নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়াছে। তাহাকে আবার কাহার কী

প্রয়োজন! এমন করিয়া তাহাকে আবার সঙ্কীর্ণ পরিচয়ের গণ্ডিতে বাঁধিতে যাইবার কী অর্থ থাকিতে পারে, যে একদিন ইচ্ছা করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে আত্মীয়তায় স্বীকার করিবার কেন এই অমানুষিক চেষ্টা। মনে-মনে পীতাম্বর হাসিল, ভাবিল এই চিঠি সে সজ্ঞানে গ্রহণ করিবে না, চেৎলার এই অঞ্চলে ঠায় এতোদিন বসিয়া থাকিবার তাহার কথা নয়, মনে করিলেই হইল এখান হইতে সে আর কোথাও চলিয়া গিয়াছে, এ-চিঠি তাহার হস্তগত হয় নাই।

চিঠিটাকে আঙুলে পাকাইয়া-পাকাইয়া তাহার অস্তিত্ব সে প্রায় ভুলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু অক্ষরের অন্তরালে যমুনার সেই স্নেহসুন্দর স্নিগ্ধ মুখখানি সে কিছুতেই মুছিতে পারিল না। কত ছোটটি সে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। হাড়-কাঁপানে দুর্দ্দান্ত শীতে গায়ে ছোট র‍্যাপার মুড়ি দিয়া সে মাঘমণ্ডলের ব্রত করিতে মায়ের সঙ্গে পুকুর-ঘাটে যাইত—অত ভোরে ঘনঘোর কুয়াসার মধ্যে তাহার সেই প্রথম ঘুম-ভাঙাটি আজো তাহার মনে পড়ে। হাতে তাহার সেই দু'গাছি মাটা বালা, সেই আধ-ময়লা কুঞ্জবাহার সাড়িখানি আজো যেন তাহার চোখে লাগিয়া আছে। তাহার পর কত যুগ যেন সে তাহাকে দেখে নাই। তাহার পর সে বড়ো হইল, কাঠি-কাঠি হাত-পা বয়সে ভরিয়া আসিল, ত্বরান্বিত চঞ্চলতার উপর নামিয়া আসিল মধ্য দিনের মদির মন্থরতা, কারবারী টাকাতে বড় ঘরে তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গেল—সবই পীতাম্বরের অগোচরে, তাহার দিগন্তের পরপারে, অন্য কোন অচেনা পৃথিবীতে। তাহার পর আরো কত দিন চলিয়া গিয়াছে পীতাম্বর তাহার হিসাব রাখে না। এখন দেখিতে তাহাকে কেমন হইয়াছে, তাহার এই ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে জীবনের সঙ্গে যমুনার কত বৃহৎ ও কত গভীর পার্থক্য—পীতাম্বরের হঠাৎ তাহা নিজ চক্ষে দেখিতে ভারি লোভ হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহাকে যে কেহ আজ এতদিন পরে অতলস্পর্শ আন্তরিকতায় হঠাৎ ডাক দিয়া উঠিল তাহার সত্য সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না—তাহার সমস্ত রক্তে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সকালবেলা যমুনার শ্বশুরবাড়ি হইতে কখন ট্রেন আসিয়া পৌঁছায়—কয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে, ষ্টেশনে আসিয়া কিছুই পীতাম্বরের জানিতে দেরি হইল না। চার পয়সা দিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া সে কখন হইতে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছে।

তাহার পর ট্রেন যদি বা আসিল, যমুনাকে আর সহজে বাহির করা যায় না। এঞ্জিন হইতে গার্ডের গাড়িটা পর্য্যন্ত পীতাম্বর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু কোথায় যমুনা! মেয়েদের কামরায় যাহারা বিছানা-বাক্সের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায় ভিড় করিয়া বসিয়াছিল এক-এক করিয়া তাহাদের কাহারো সঙ্গে যমুনাকে সে মিলাইয়া দেখিতে পারিল না, দূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বোঝাই ট্রেনটা আস্তে-আস্তে আল্‌গা হইতেছে, প্ল্যাটফর্মও প্রায় ফাঁকা হইয়া আসিল, কিন্তু আনাচে-কানাচে কোথাও যমুনার দেখা নাই। তাহার সঙ্গে এতদিন বাদে এমন একটা করুণ ও কঠিন রসিকতা কে করিতে পারে পীতাম্বর কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

—দাদা, ঐ যে দাদা! সহসা মৃদু নারীকণ্ঠে কে ডাক দিয়া উঠিল।

সেই ডাক অনুসরণ করিয়া পীতাম্বরের চোখ গিয়া পড়িল যমুনার মুখের উপর। মেয়ে-কামরার দরজার নিচে প্ল্যাটফর্মের উপর এক দঙ্গল ছেলেপিলে লইয়া সে অসহায়ের মতো দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণ এখান দিয়া বার-বার হাঁটাহাঁটি করিয়াও পীতাম্বর তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এখনো যে তাহাকে চিনিতে পারিতেছে ঘুণাক্ষরে তাহাও তাহার মনে হইল না। তবু তাহার দিকে আঙুল তুলিয়া দাদা বলিয়া ডাকিতেই সে কৌতূহলী হইয়া মেয়েটির দিকে দুয়েক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। না, সন্দেহ করিয়া লাভ নাই, যমুনাই বটে। সেই টিকলো নাক, চিবুকের উপর ছোট সেই তিল, কপালের উপর তেমনি গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল হাওয়ায় উড়িয়া পড়িতেছে। যমুনা বটে, কিন্তু সেই যমুনা নয়—মনে-মনে রেখাঙ্কিত যে-ছবি সে এতক্ষণ রঙাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া যমুনার প্রথম ও উচ্ছ্বসিত কান্নার প্রাবল্যে তাহা ধুইয়া-মুছিয়া বিবর্ণ, ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কোথাও এতটুকু রঙের আঁচড় রহিল না।

এত লোকের মাঝে বেশিক্ষণ কাঁদাকাটা করা ভদ্রতায় হয়তো বাধে, তাই চোখের জল মুছিয়া যমুনা কি-জানি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পীতাম্বরের মনে হইল ব্যাখ্যা করিবার কিছুই আর নাই, স্পষ্ট-প্রখর দিনের আলোতে সবই সে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে। কথার চেয়ে এই শোকঘন নিস্তব্ধতা অনেক বেশি মুখর, অনেক বেশি উচ্চারণময়।

যমুনার পরনে শাদা থান শাড়ি, মাথার দিকটা ছেঁড়া, গায়ের উপর দিয়া কোনো রকমে একখানা খাটো চাদর জড়াইয়া নিয়াছে, সমস্ত শরীরে মলিন, বিষণ্ণ কৃশতা। সেই কিশোর-কালের অনতিস্ফুট যমুনার কথাই মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু, মাঝখানে তার জীবনে ও শরীরে যে অভূতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অবতারণা হইয়াছিল আজ কোথাও তাহার এতটুক্ চিহ্ন নাই। সমস্ত শরীরে দারিদ্র্য যেন নিরাবরণ নির্লজ্জতায় আত্ম-প্রকাশ করিয়া আছে।

পীতাম্বর খানিকক্ষণ বিহ্বলের মতো তাকাইয়া রহিল; হাতটা ডাইনে প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —এরা কা'রা?

শোকের প্রথম অভিঘাতটা যমুনা ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। নিচু হইয়া পীতাম্বরের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল,—কে আবার হ'বে? আমারই সব। না খেতে পেয়ে মরবার জন্যে আমারই কোলে এসে জন্মেছে।

মায়ের পাশে একত্র গোল হইয়া দাঁড়াইয়া তিনটি শিশু ভীত ও ডাগর চক্ষু মেলিয়া সমস্ত ষ্টেশনটাকে যেন গ্রাস করিতেছে। বড়োটির বয়স বড়ো-জোর পাঁচ— আর ছোটটি এই দুই কি আড়াই বছরের হইবে। পোষাকের সামান্য তারতম্য হইতে কোন্‌টি ছেলে বা কোন্‌টি মেয়ে তাহার একটা অস্পষ্ট ধারণা হইতেছিল, কিন্তু এক জায়গায় সব ক'টি পোষাকেরই আশ্চর্য্য মিল আছে—সব ক'টিই যেমন পুরানো ও ময়লা, তেমনি সব ক'টিই শরীরের সঙ্গে বেজুত ও বেমানান্। জামাগুলি যে তাহাদেরই জন্য কেনা হইয়াছিল এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন, কাহারো নিকট হইতে যেন চাহিয়া-চিন্তিয়া জোগাড় করা হইয়াছে। ঠাণ্ডায় গায়ের চামড়াগুলি চুপ্‌সাইয়া কালো হইয়া গিয়াছে—এই দুর্দ্দান্ত শীতে এতখানি রাস্তা যে তাহারা কী করিয়া সামলাইল তাহাই পীতাম্বর ঠিক ধারণা করিতে পারিল না।

কহিল,—এখন কোথায় যাবি?

গভীর, ম্লান চক্ষু মেলিয়া যমুনা বলিল,—কোথায় আবার যাবো? যাবার জায়গাই যদি থাকবে তবে তোমার কাছে এসে কেঁদে পড়বো কেন? বলিয়া সে প্ল্যাটফর্মের চারদিকে চঞ্চল হইয়া চোখ ফিরাইতে লাগিল: নবু-দা, নবু-দা গেল কোথায়? খুকিটা ভীষণ কাঁদছিলো বলে' কোলে করে' খানিকটা ঘুরে আসতে গেলো—যদি এই ফাঁকে তোমার দেখা পায়। কোথায় গেলো বলো তো,—দেখতে পাচ্ছি না যে?

চিন্তিত মুখে পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিল,—কে নবু-দা? তোর শ্বশুর-বাড়ির কেউ নাকি?

আর শ্বশুর-বাড়ি! একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া যমুনা বলিল,—পাশের গাঁয়েই নবু-দা থাকে, তামাকের ক্ষেত করে' তা'র বিস্তর পয়সা। কী ব্যবসা সূত্রে কল্‌কাতা আসছিলো, আমিও অমনি তার পিছু নিলাম। সারা রাস্তা কী আদর-যত্ন করে'ই এনেছে, দাদা—রেল-ভাড়ার একটি পয়সাও আমার লাগে নি। আর দিতামই বা কোত্থেকে বলো?

পীতাম্বর খানিকটা হাল্‌কা হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—ও! তোর নবু-দা'র সঙ্গে কল্‌কাতায় বেড়াতে এসেছিস বুঝি?

বিশীর্ণ মুখে ম্রিয়মাণ একটি হাসি আনিয়া যমুনা বলিল,—আমার এই চেহারা দেখে তোমার কি তাই মনে হচ্ছে নাকি? সঙ্গে মাত্র এই ভাঙা টিনের বাক্সটা— তার মধ্যে কী আছে বাড়ি গিয়েই তা তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে -আর এই ক'টা রোগা উপোসী ছেলে-পিলে,— এ আমার সহর বেড়াতে আসবারই বেশবাস বটে! বলিতে-বলিতে সমস্ত মুখ তাহার ভারি হইয়া চক্ষু দুইটা ছলছল করিয়া উঠিল।

পীতাম্বর অসহিষ্ণু হইয়া সরাসরি তাহার মুখের উপর প্রশ্ন করিয়া বসিল: তবে তোর নবু-দা'রই বা ঘটা করে' তোকে এখানে নিয়ে আসবার কী হয়েছিলো?

ষ্টেশনের বাহিরে যাইবার পথের দিকে আবার

উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া যমুনা বলিল,—সে কেন আমাকে আনতে যাবে, আমিই তার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

কথা কাড়িয়া লইয়া পীতাম্বর কঠিন হইয়া বলিল,—না রাম না গঙ্গা বলে' এই অবস্থায় তুইই বা ছেলেপিলে নিয়ে এখানে আসতে গেলি কেন? মেয়েছেলে বলে' কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই?

যমুনার দুই চোখে জল এইবার উথলিয়া উঠিল। নিজেকে তবু প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করিয়া গাঢ় গলায় সে কহিল,—সংসারে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই—আজ তুমি ছাড়া আপনার জন বলতে আমি কাউকে ভাবতে পারছি না। নবু-দা কত কষ্টে তোমার ঠিকানা জোগাড় করে' দিয়েছেন—এতদিন তোমার কোনো খোঁজই পাইনি বলে' কোনো দুঃখই তোমাকে জানানো হয় নি। শ্বশুর-বাড়ি! সেখানে আমার সমস্ত দাবি মুছে গেছে, মুখের ওপর দেওর দরজা বন্ধ করে' দিয়েছেন—এখানে দাঁড়িয়ে সব তা এখন বলা যাবে না। আমায় বাড়ি নিয়ে চলো, সব—সব তুমি শুনতে পাবে।

প্রথমে পীতাম্বরের তবুও খানিকটা সন্দেহ ছিল,—যমুনা ও তাহার শিশুসন্তানগুলির এই নিদারুণ রিক্ততা দেখিয়াও সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় নাই। স্বামীর মৃত্যুতে অবস্থা খারাপ হইয়াছে ঠিক, কিন্তু হয়তো কোনো ফিকির-ফন্দি করিয়া কলিকাতায় ছেলেপিলেদের লইয়া কয়েকটা দিন তামাসা দেখিতে আসিয়াছে, কি বড়-জোর কালিঘাটে একটা পূজা দিয়া আবার শ্বশুর-বাড়িতেই ফিরিয়া যাইবে। তাই, মাঝে পড়িয়া সেই কয়টা দিন অনাবশ্যক তাহাকে ঝক্কি সামলাইতে হইবে বলিয়াই সে মনে-মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তার ঝাঁজ তাহার কথার উচ্চারণেও আসিয়া পড়িয়াছে। চিরকাল সে সৌখিন সন্ন্যাসী মানুষ, গায়ে ফুঁ দিয়া চলাই তাহার অভ্যাস, কাহারও ব্যক্তিগত জীবনে উঁকি দিবারও তাহার অবকাশ নাই। গোড়ায় চিঠি পাইয়া সে ভাবিয়াছিল, যমুনার সঙ্গে সামান্য একটু দেখা-শোনা বা তাহার অতিরিক্ত একটু স্নেহসম্পর্কসুলভ অনুরোধ-অনুনয়ের পালার পরই সে অনায়াসে পিছলাইয়া পড়িতে পারিবে। কিন্তু চিঠিটার সঙ্কেত যে শব্দভেদী বাণের চেয়েও মর্ম্মান্তিক, তাহার কলিকাতায় আসিবার অর্থটা যে এত ভয়াবহ তাহা বুঝিতে পারিয়া পীতাম্বর এইবার একেবারে বসিয়া পড়িল। আর রাগ করিবার কথা তাহার মনেই রহিল না। সম্পর্ককে অস্বীকার করিয়া পলাইবার দরজা তাহার খোলা আছে কি নাই তাহা বিচার করিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। মুক্ত প্রান্তরের উপর বিশালকায় একটা পর্ব্বত যেন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া দিয়াছে।

ঝাপ্সা চক্ষু তুলিয়া পীতাম্বর যমুনার দিকে তাকাইল। অসহায় পরিপাণ্ডু মুখের উপর মিনতির নির্ব্বাক মালিন্য মাখা, বৈধব্যের চেয়েও তাহার দারিদ্র্য যেন বেশি প্রগল্ভ। এই তাহার সেই ছোট বোন, সেই কবে শিশুকালে তাহার সঙ্গে পীতাম্বরের শেষ দেখা হইয়াছিল—তখন সে গায়ের উপর পরিপাটি করিয়া শাড়ি গুছাইতেও শেখে নাই, সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সমানে লাটু ঘুরাইয়াছে, 'কড়ি-মির' খেলিয়াছে, গাছে উঠিয়া পাখির বাসা পাড়িয়া আনিয়াছে। সেই ছোট, চঞ্চল, দুষ্টু যমুনা। হাওয়ায় আঁচল ফুলাইয়া সেই তাহার রাস্তা দিয়া ছোটাছুটির দীর্ঘ, দ্রুত ছবিটি এখনো তাহার মনে পড়ে। আজ সে কত শান্ত, শরীরের একটি রেখাও তাহার আজ উৎসাহে দীপ্ত নয়—প্রতিটি রেখায় একটা অস্ফুট কাতরোক্তি যেন খোদিত হইয়া আছে। অথচ তাহার বয়স এখন কুড়ির বেশি হইবে না। ঝড়ের প্রচণ্ড বাড়ি খাইয়া যে-নৌকা নাজেহাল হইয়া জলের তল খোঁজে তাহার আলঙ্কারিক চেহারাটাও বোধহয় যমুনার চেয়ে করুণ নয়। তাহার বৈধব্যও হয়তো চোখ তুলিয়া দেখা যায়, কিন্তু এই অপরিমেয় দারিদ্র্যের কদর্য্যতায় পীতাম্বরের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। টিনের ভাঙা বাক্সটার উপর বড়ো মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ছোট ছেলে দুইটি মা'র গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কি-যেন অস্বাভাবিক আবদার করিতেছে—পীতাম্বরের তাহা কানে আসিল না। সন্তান ক'টি যেন যমুনার সংসারের প্রতি তিনটি বিষতিক্ত নিষ্ঠুর কটূক্তি। তাহাদের দিকে চাহিয়া পীতাম্বরের কেমন মায়া হইল। অপরিচ্ছন্ন মুমূর্ষু দীপশিখার মতো তাহারা বাতাসের ঝাপ্টায় মিট্‌মিট্ করিতেছে—কে কাহাকে ফেলিয়া

আগে বিদায় হইবে ইহাদের মধ্যে তাহারই যেন গোপন প্রতিযোগিতা! সে তাহাদের বাড়িই লইয়া যাইবে বটে। তাহার বাড়ি! কথাটা ভাবিতে পীতাম্বরের আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল।

হঠাৎ কাছে আসিয়া কে বলিয়া উঠিল: লোক পেয়ে গেছ দেখছি যে যমুনা-দি। এই ধরো তোমার মেয়ে, তোমাকে ছেড়ে এক পা এগিঁয়েছি কি অম্‌নি ভ্যাবাতে সুরু করেছে। তারপর এই একটা ঝুমঝুমি কিনে দিলে তবে ঠাণ্ডা!

বলিয়া কোলের মেয়েটাকে যমুনার হাতে সমর্পণ করিয়া লোকটি এইবার পীতাম্বরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনাকে এতোক্ষণ দেখতে না পেয়ে যমুনা-দিদি তো ভেবেই অস্থির। আমি বল্‌লুম,—শত হ'লেও রক্ত-সম্পর্কের ভাই, খবর পেলে কক্‌খনো আর না-এসে থাকতে প্যারবে না। কী, আমার কথা ফল্‌লো না, যমুনা-দিদি?

পীতাম্বর লোকটির দিকে অবাক হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বয়সে তাহার কিছু বড়োই হইবে হয় তো, কিন্তু কথায় ও আচরণে সে যেন তাহাদের কত অন্তরঙ্গ, তাহার সঙ্গে যেন কতকালের স্বজন-সম্বন্ধ! পীতাম্বর বুঝিল এই সেই নবু-দা, যে গায়ে পড়িয়া যমুনাকে তাহার ঠিকানা জোগাড় করিয়া দিয়াছিল। ভাগ্যিস দিয়াছিল, নহিলে যমুনা আজ জলে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া যাইত না-জানি। সে ছাড়া তাহার আর কে আছে!

নবু-দা স্মিতমুখে কহিল,—আর কি! গ্রাম-সুবাদের ভাই ছেড়ে এবার সত্যিকারের মায়ের পেটের ভাই পেলে—ধড়ে এতোক্ষণে প্রাণ এসেছে তো? আমি এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে সামনে এগোতে পারি—কী বলো? কুলির মাথায় বাক্সটা চাপিয়ে তোমরাও এবার বেরোও। এই নাও তোমাদের টিকিট—তোমাদের তো গাড়ি করতে হবে, যেতে হ'বে সেই টালিগঞ্জ। আর,—আর —নবুদা বুক-পকেটে হাত রাখিয়া সামান্য দ্বিধা করিতে লাগিল: আর কিছু তোমার লাগবে নাকি, যমুনা-দিদি? হাত লাগিয়া মনি-ব্যাগটা তাহার শব্দ করিয়া উঠিয়াছে।

যমুনা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,—না।

—তা আর আমার কাছ থেকে নেবে কেন? কৃত্রিম অভিমানে মুখ ভারি করিয়া নবু-দা বলিল,—এবার যে তোমার আসল দাদা পেয়ে গেছ। তার পাশে আমি আর কোন্ অধিকারে দাঁড়াবো বলো? আমি তো নেহাৎ ভেজাল-দাদা।

চোখ নামাইয়া যমুনা বলিল,—এতোদিন তো তোমার দয়ার ওপরই দিন যাচ্ছিলো। তোমার ঋণের তো কোনো হিসেব রাখিনি।

—এবার তবে সেই ঋণ শোধ করবার চেষ্টা কোরো, যমুনা-দিদি। নবু দা'র গলা হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল: তবে স্নেহকে আমার যদি নিতান্ত ব্যবসাদারি ঋণ মনে না করো তো মাঝে-মাঝে তোমার খবর দিয়ো। আমি চিরকাল তোমার এক ডাকে খাড়া থাকবো।

যমুনার এই সাহায্য-গ্রহণের সংক্ষিপ্ত অস্বীকৃতিটা পীতাম্বর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না। কিসের ভরসায় সে তাহার দাদার দ্বারস্থ হইয়াছে শুনি? 'বাড়ি'তে পৌছিয়াই হয়তো ছেলেপিলেগুলি খাবারের জন্য চীৎকার পাড়িতে থাকিবে, আর সেই চীৎকারে ছাত বিদীর্ণ করিয়া অমনি পয়সার পুষ্পবৃষ্টি সুরু হইবে হয়তো! কিসের জোরে তাহার এত অহঙ্কার, কিসের আশায় তাহার চরিত্রের আজ এই সবল ভঙ্গিমা! অন্তত আজকের জন্য কিছু চাহিয়া রাখিলে তাহার কি-এমন ক্ষতি হইত, আচরণে কোথাও বরং অসঙ্গতি থাকিত না। মনে-মনে পীতাম্বর চটিতেছিল, কিন্তু যমুনা সহসা তাহাকে আমূল নাড়া দিয়া কহিল, চলো বেরোই। কুলি ডাকো। গাড়ি করো একটা।

কাটা-কাটা কথা কয়টা যেন তীব্র আঘাতের মতো পীতাম্বরকে সচেতন করিয়া তুলিল। সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যের চাইতে তাহার দাদার আত্মসম্মান যে অনেক বড়ো জিনিস—যমুনার এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি পীতাম্বরের চোখে তাহার দারিদ্র্যের চেয়েও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। নিজে সে অনেক লাঞ্ছিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার দাদাকে ছোট করিতে পারিবে না।

অতএব পীতাম্বর কুলি ডাকিয়া গাড়ি ঠিক করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ-সমেত যমুনাকে লইয়া তাহার টালিগঞ্জের

ডেরার দিকে রওনা হইল। নবু-দাকে তখন আর কোথাও দেখা গেল না। না যাক্, সে যে দয়া করিয়া যমুনাকে তাহার ঠিকানার সন্ধান দিয়াছিল তাহারই জন্য পীতাম্বর তাহার কাছে আমরণ কৃতজ্ঞ থাকিবে।

পুলটা পার হইয়া গাড়িটা ডাইনে বেঁকিতেই যমুনা কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া তাহার দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত সুরু করিল: উনিও মারা গেলেন আর যেন গো-মড়কে মুচির পার্ব্বন সুরু হ'লো। আমার যিনি দেওর—তার হাড়ে ভেল্কি হয়, দাদা। সব সে হাত-সাফাই করে' নিলে। নাবালক ছেলে ক'টা নিয়ে পথে ভাস্‌লাম। তাও বেরিয়ে আসতে চাইনি দাদা, টাকা সে গাপ্‌ করেছে করুক, অন্তত ছেলে ক'টাকে যদি খেতে-পরতে দিয়ে মানুষ করতো, আমার আর কিছু দুঃখ থাকতো না। কিন্তু বাঁশবনে আমার কাঁদাই সার হ'লো, দু' হাত আমার তেমনি খালি-ই থেকে গেলো, দাদা।

এমনি করিয়া সবিস্তারে আরো সে অনেক দুঃখের কাহিনীই বলিয়া যাইতেছিল কিন্তু পীতাম্বরের যেন তাহাতে বিশেষ কান নাই। সে ভাবিতেছিল বাসায় পৌঁছিয়া গাড়ি-ভাড়াটা সে কোথা হইতে চুকাইয়া দিবে, খাবারের জন্য যখন এই ক্ষুধার্ত্ত শিশুগুলা চিল-চেঁচাইতে সুরু করিবে তখন ইহাদের মুখের কাছে সে কী আনিয়া ধরিবে, তাহার ঐ একটুখানি ঘরে এতোগুলি প্রাণীর পা ছড়াইবারো জায়গা হইবে না। সংসারের প্রতিকূলতার থেকে নিস্তার পাইবার জন্য যমুনা আজ কোথায় আসিয়া আশ্রয় নিল! পীতাম্বর দুই চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এই অন্ধকারে সসন্তান যমুনাকে ঠেলিয়া তাহার পলাইবার আজ আর কোনো পথ নাই।

বড়ো মেয়েটি টুনি ও তাহার পরের ছেলেটি রাজু দুই পাশের দুই বন্ধ দরজা ধরিয়া বিস্ময়-বিগাঢ় চোখে কলিকাতা দেখিতেছে। ছোট কোলের মেয়েটি মা'র বুকে ঘুমাইয়া, ও তাহার আগের ছেলেটি সিতু মামার কোলে চড়িয়া তাহার চুল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। এই ক'টি অবোলা অপোগণ্ড শিশুর জন্য পীতাম্বরের বুকে কবে থেকে যে এতো অগাধ স্নেহ সঞ্চিত হইয়া ছিল সেই খবর তাহার নিজেরই এতোকাল জানা ছিল না। নির্ম্মল, সুকুমার সেই ক'টি সুন্দর মুখ বিধাতার নিরুচ্চার আশীর্ব্বাণীর মতো তাহার জীবনে যেন সহসা আবির্ভূত হইল। ইহাদের যে সে কী করিয়া সম্মান করিবে, রক্ষা করিবে—তাহাই তাহার কাছে এখন কঠিন সমস্যা। তবু ভাগ্যিস সে তাহাদের ছিল, ভাগ্যিস ঈশ্বর তাহাদের ঠিক পথ চিনাইয়া দিয়াছেন, নহিলে কোথায় তাহারা গুঁড়া হইয়া পথের ধুলার সঙ্গে মিশিয়া যাইত তাহার ঠিকানা কী!

রাজু ছেলেটি ভারি চঞ্চল, প্রশ্নের পর প্রশ্নের ঝাপটা মারিয়া মামাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, টুনি কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইলেও মামাকে কেবল দোকান-দানির জিনিস-পত্তের দর জিজ্ঞাসা করে, দুই বছরের সিতু 'পয়সা পয়সা' বলিয়া পীতাম্বরের পকেট হাট্‌কায়। আর কোলের মেয়েটিকে বুকে করিয়া যমুনা একমেটে প্রতিমার মতো বিষাদে নিষ্প্রভ হইয়া চাহিয়া থাকে।

উপায় কী,—পীতাম্বরকে টালিগঞ্জের সেই ডেরা ছাড়িয়া কালিঘাট-অঞ্চলে সস্তায় দুইটা কোঠা নিতে হইল। মহামায়া লেন্‌এর দিকে প্রকাণ্ড একটা তিন-তলা বাড়ি, টুকরা-টুকরা করিয়া উপরে-নিচে আলাদা আলাদা পরিবারকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে—তাহারই নিচেকার দুইখানা ছোট অন্ধকার ঘর পীতাম্বর পছন্দ করিয়া আসিল। ভাড়া এগারো টাকা। কোথা হইতে সে-টাকা সংগ্রহ হইবে পীতাম্বরের খেয়াল নাই। নোংরা পাড়ায় মাটকোটা সে ইহার চেয়ে সস্তায় পাইতে পারিত বটে,—যমুনারো আগ্রহ ছিল তাহাই, বাড়ির পিছনে অযথা কতোগুলি টাকা বাহির করিয়া দেওয়ায় লাভ কী, যাই হোক্, নিশ্বাসে বাতাস গ্রহণ করার মতো বাড়িতে থাকিবার সুখেরো কোনো একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি নাই,—কিন্তু এঁদো মাটির ঘরে থাকিতে গেলেই ছেলেগুলির স্বাস্থ্য নিশ্চয় আরো খারাপ হইতে থাকিবে, এমনিতেই তো তাহাদের পাটখড়ির মতো চেহারা, তাহার পর যমুনার যতই কেননা দুরবস্থা হোক তাহাকে সে হাতে ধরিয়া একটা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে লইয়া যাইতে পারে না। শত হইলেও সে তাহার

দাদা, তাহাকে সে নিশ্চিন্ত সুখাশ্রয়ে আবৃত করিয়া রাখিবে।

সেই সঙ্কল্প করিয়াই সে বাহির হইল, কিন্তু হাতের কাছে একটাও কোনো কাজ সে দেখিতে পাইল না। অথচ দিনের পর দিন এই ক'টি বুভুক্ষু গ্রাস তাহাকে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। লুকাইয়া সে একদিন যমুনার ভাঙা বাক্সটাও ঘাঁটিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু রূপার ক'গাছি মল ছাড়া কিছুই সে সেখানে খুঁজিয়া পাইল না। অভাবের প্রথম তাড়নায় সে মল ক'গাছি নিরাপদে বিক্রি হইয়া গেল! তারপর একদিন সূর্য্য উঠিলে দেখা গেল বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথাও এককণা ক্ষুদ-কুঁড়া পড়িয়া নাই।

আজ পীতাম্বর কাজ করিতে গিয়া দেখে কোনো কাজেই তাহার আর হাত উঠে না। বহুদিনের আয়াস-কৃত আরামের অভ্যাসে সমস্ত স্নায়ু-শিরা তাহার শিথিল হইয়া আসিয়াছে, মেরুদণ্ডটা সে দুই দণ্ড সোজা করিয়া বসিতে পারে না, আলস্যের আবেশে শরীর-মন স্তিমিত হইয়া আসে। তবু তাহার জীবনে এই আকস্মিক উৎপাতের সূচনায়, শরীর চাহিলেও, মন কিছুতেই বিমুখ হইতে চায় না। ছোট-ছোট কয়টি নিষ্কলঙ্ক শিশুর নিষ্ঠুর ক্ষুধার সামনে তাহার কঠিন হইয়া থাকা অসম্ভব। প্রাণপণ করিয়া যা-হোক তাহার একটা কাজ জুটাইতেই হইবে—এবং সে-কাজে অনভ্যস্ত শরীর ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেলেও তাহার ক্লান্তিকে সে প্রশ্রয় দিবে না। তবু প্রথমটায় যমুনার মুখে-চোখে সতেজ একটা গ্রাম্য স্নিগ্ধতা ছিল, কিন্তু এখন অনাহারে ও অনটনে তাহার সমস্ত দেহ শুকনো ও শিটে হইয়া আসিয়াছে—ফসল কাটা হইয়া গেলে মাঠেরো সেই রুক্ষ দারিদ্র্য দেখা যায় না। এত কম খাইয়া ও এত বেশি চেঁচাইয়া ছেলেপেলেগুলি যে এখনো কেমন করিয়া টিকিয়া আছে তাহাই পীতাম্বরের কাছে ভীষণ আশ্চর্য্য লাগে।

অবশেষে এখানে-সেখানে অনেক দৌড়ঝাঁপ করিয়া পীতাম্বর একটি চাকরি জুটাইল। ভবানীপুরে এক ময়রার দোকানে তাহাকে খাবার বেচিতে হয়—মাসে সতেরো টাকা করিয়া মিলিবে। আপাততঃ তাহাতেই সে রাজি হইয়া গেল। কোনো রকম একটা ছোট-খাটো ব্যবসা ফাঁদিতে পারিলে কাজটা অনেক স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত হইত বটে, কিন্তু আন্দাজি আয়ের চাইতে বাঁধা-বরাদ্দ মাইনেই এখন বেশি নিরাপদ—টাকা সে যতই কম হোক্ না কেন। বাড়ী-ভাড়াটা সম্বন্ধে তো অন্তত নিশ্চিন্ত—তাহার পর লুকাইয়া কয়েকটা মিষ্টি-মণ্ডা না কোন্ সে ভাগ্নেদের জন্য লইয়া যাইতে পারিবে।

সেদিন দুপুরবেলা ভুবন তাহার দোকানে সওদা করিতে আসিয়াছিল। পীতাম্বরকে খড়কে গুঁজিয়া ঠোঙা করিতে দেখিয়া তো সে অবাক্। বলিল,—এ কী কাণ্ড পীতাম্বর! সন্নেসিঠাকুরের শেষকালে এই দশা!

পীতাম্বর হাসিয়া বলিল,—কী আর করি বলো? বিধবা বোন একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘাড়ে পড়লো—একটা কিছু ক'রতে না পারলে চলে কী করে'? তা, তেমনি সন্নেসি এখনো আছি ভাই। ঠোঙাই বাঁধছি কেবল, জিভে আর কিছু ঠেকান যায় না।

ভুবন কাঁচুমাচু মুখে কহিল,—কী গেরো! শেষকালে কি না তোর এই সব ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে।

—উপায় কী তা ছাড়া? পীতাম্বর ম্লান, নিষ্প্রাণ গলায় কহিল,—তিনকুলে বোনের আমার দু'টি মাত্র লোক ছিলো—এক তা'র দেওর, আর আমি। দেওর তার নাবালক ছেলেদের ভাগের টাকা সব চেটেপুটে সাবাড় করে' তাকে বাড়ির বা'র করে' দিলে, এখন আমি ছাড়া তা'র আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। কিন্তু আমি গেঁতো মানুষ, চিরকাল গদাইলস্করি চালে চলে' এসেছি—আমার করবার আর কী সাধ্যি বল্?

—তা তো সত্যিই। ভুবন খাবারের ঠোঙাটা হাতে লইয়া সোৎসাহে সায় দিল: তোর কেন এ-সব মানাবে? কোথায় কোন্ বোন এতোকাল যা'র বিন্দুবিসর্গ খোঁজখবর ছিলো না, সে হঠাৎ কিনা হুড়মুড় করে' ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কী ভজকট বল্ দিকিন? তা আমিও ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছি পীতাম্বর তুই এর মধ্যে হঠাৎ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলি কী করে'? চিরকাল হাত-পা ছড়িয়ে আমিরি করে' এসেছিস্, কারো তোয়াক্কা রাখিস্ নি, এই বাঁধাবাঁধি তোর সইবে কেন? তোর কি, একদিন সব ফেলে-ছুঁড়ে হাল্কা হ'য়ে টুপ্

করে' বেরিয়ে পড়লেই হ'লো। সন্নেসি-মানুষের আবার ভাবনা!

ফিবৃতি পয়সাটা ভুবনকে গুনিয়া দিতে-দিতে পীতাম্বর কহিল,—তা আমারো এককালে মনে হ'তো না তা নয়, কিন্তু সংসারের জঞ্জালে হঠাৎ জড়িয়ে পড়ে' টের পাচ্ছি সন্নেসি হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। এখানে যতোই কেননা দুঃখ থাক, সন্নেসি হওয়ার চাইতে এখানে বেশি মজা।

ভুবন ঠাট্টার সুরে বলিল,—সেই সংসারই যদি করবি তো বিয়ে করতে তোর কী হয়েছিলো?

—ভাগ্যিস করিনি। প্রবল নিশ্বাসে বুক হইতে ভারি একটা পাথর নামাইয়া দিয়া পীতাম্বর বলিল,—তা হ'লে আকাশের নিচে যমুনাদের আর-কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না।

—তোকে কে খুঁজে পায় ঠিক নেই, তুই মিছিমিছি পরের খোঁজ নিয়ে বেড়াচ্ছিস্। একটা কুৎসিত বিদ্রুপাত্মক মুখভঙ্গি করিয়া ভুবন বলিল,—খাচ্ছিলি তাঁত বুনে, তোর কেন এই এঁড়ে গরু কিনতে সাধ যাবে? সন্নেসির আবার এ কোন্ বাবুগিরি!

মুখে সে ভুবনকে অতগুলি কথা বলিল বটে, কিন্তু খাবার লইয়া সে চলিয়া গেলে পীতাম্বরের মনে হঠাৎ বৈরাগীর তম্বুরা বাজিতে সুরু করিল। সত্যিই তো, সে কেন ঘাড় পাতিয়া এই জোয়াল টানিতে যাইবে! তাহার কী দায় পড়িয়াছে! জীবনের সঙ্গে সকল গ্রন্থিই তো সে একদিন শিথিল করিয়া আসিয়াছিল, আজো তাহার জন্য চারিদিকে অবারিত দরজা ও প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়া আছে। প্রথম যখন সে ঘর ছাড়িয়াছিল, তখন তাহার ফিরিয়া আসিবার পথের দিকে চাহিয়া তাহার মা-ও অনেক চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, আজিকার ধূলিতে তাহার একটিও সজল চিহ্ন চোখে পড়িবে না। পৃথিবীতে কাহার কতখানি দুঃখ তাহা বসিয়া-বসিয়া কে পরিমাপ করিবে? পিছনের হাতছানির দিকে চাহিয়া সময় বসিয়া থাকে না। যে-স্রোতে পীতাম্বর ভাসিবে, সেই স্রোতেই যমুনা তাহার শিশুসন্তানদের লইয়া নিরুদ্দেশ, নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। গেল-ই বা। তাহাতে আকাশের একটি তারাও খসিয়া পড়িবে না।

কথাটা মনে-মনে তোলপাড় করিতেই পীতাম্বরের সারা গায়ে কালঘাম ছুটিল। আর সব সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে—সমস্ত অতীত, সমস্ত ভবিষ্যৎ—কিন্তু ঐ ক'টি দুর্ব্বল, মাতৃমুখাপেক্ষী অসহায় শিশুর ক্ষুধাকাতর মলিন মুখ সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। কেন যে সে প্রথমবয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছিল তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না, আর সন্ন্যাসীই যদি হইয়াছিল তো সামান্য একটা চিঠিতে সে এমন সাড়াই বা দিতে গেল কেন? চিঠিটা পাইয়া সরাসরি যদি সে ষ্টেশনে না যাইত,—বাকিটা পীতাম্বর ভাবিতে পারে না—তাহা হইলে ঐ শিশুগুলিকে কে সাম্‌লাইত, দুঃখিনী যমুনার কোথায় সান্ত্বনা মিলিত না-জানি। ভাগ্যের এই চক্রান্তে পীতাম্বর কেমন ফাঁদে পড়িয়া গেছে। পলাইবার কথা মনে করিলেই সে আর পলাইতে পারে, না, ভাগ্যের চাকার মধ্যে সে আষ্টেপৃষ্টে আটকাইয়া পড়িয়াছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই অবিরত ঘূর্ণ্যমানতায় জীবনের অনেক বেশি মাধুর্য্য—তাহার এতদিনের আলস্যচর্য্যা তাহাই তাহাকে শিখাইয়া দিল। এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সে কাহারো কোনো কাজে লাগে নাই, কিন্তু আজ যমুনাকে ঘিরিয়া তাহার এই শিশু ক'টির রক্ষণ ও অবেক্ষণে সে প্রথম টের পাইল—সংসারে তাহার জীবনের কী অগাধ মূল্য ছিল, নিজেই সে নিজেকে এতদিন অকারণে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছে।

সতেরো টাকায় কুলাইয়া ওঠা অসম্ভব বলিয়া একখানা ঘর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দুই বেলা হাঁড়ি সমানে চড়েও না, তাই রান্নার ব্যাপারটা সামনের ফালতু বারান্দাতেই সমাধা হয়। সেই বারান্দাতেই পীতাম্বর রাতের বেলায় শোয়, যমুনা কিছু বলিতে আসিলে সস্নেহে হাসিয়া বলে: কতো গাছতলায় শুয়ে দুর্দ্দান্ত শীতের রাত কাটিয়ে দিলাম, এ তো দিব্যি সিমেণ্ট-করা মেঝে। সন্নেসি হ'তে গিয়ে আর যাই হোক-না-হোক যমুনা, যাকে তোরা চল্‌তি-ভাষায় দুঃখ-কষ্ট বলিস্, সব আমার গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।

এবং এই যুক্তি তুলিয়াই কোনো-কোনো বেলা সে মুখে গরস তোলে না পর্য্যন্ত। বলে: আমার জন্যে খামোকা তুই ভাবিস্ নে, যমুনা। আমি সন্নেসি-মানুষ,

প্রতি ঘরে আমার জন্যে বিধাতা পাত পেতে রেখেছেন। আমার আবার খিদে! দিনান্তে এক ঘটি জল পেলেই আমার পোড়া দেহ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। তোদের যদি আমি পেট পুরে খেতে দেখতে পারি, দিদি, তবেই আমার খিদে মেটে।

অথচ প্রথম দিন কলিকাতায় পা দিয়াই যমুনা পীতাম্বরের যে চেহারা দেখিয়াছিল• তাহাতে তাহার ভোগবিরতির এতোটুকুও রুক্ষতা ছিল না। তৈলাক্ত কমনীয়. কান্তি, কাপড়-চোপড়ে ফিট্‌ফাট বাবুয়ানা, পায়ে সে দস্তরমতো ফিতা বাঁধিয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ আপাতশোভন পোষাক-পরিচ্ছদের নিচে যে এত ভয়াবহ দারিদ্র্য অনাবৃত হইয়া আছে তাহা সে তখন বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারিলেও তাহার ফিরিয়া যাইবার কোনো পথ ছিল না। কিন্তু আজ পীতাম্বরের এই নিদারুণ বেশপরিবর্ত্তনের লজ্জায় যমুনার দুই চক্ষু বেদনায় অন্ধ হইয়া আসে—তাহার তুলনায় সামান্য একটা সন্ন্যাসীও আজ বেশি সৌখিন। পায়ের জুতা-জোড়া কবে ছিঁড়িয়া লোপাট হইয়া গেছে, জামার ভিতর দিয়া কাঠি-কাঠি পাঁজরাগুলা কটমটাইয়া চাহিয়া থাকে, সিকি-পলা তেলও সে আজকাল গায়ে মাখিতে পায় না--অথচ এই অবস্থায়ই সে যমুনার জন্য আকাশ-পাতাল করিতেছে। মুখে অভিযোগ তো নাই-ই, বরং অযোগ্যতার লজ্জায় তাহা যেন একটু মলিন—সে যে যমুনাদের এখানে আনিয়া সুখের হাওদায় বসাইতে পারিল না—এই যেন তাহার কত অপরাধ! তাহার দাদার চিরকালের সুখী স্বভাব, যাহা সে রোজগার করুক বা না করুক একজনের পক্ষে তাহা ফেলিয়া-ছড়াইয়া অনেকখানি, কিন্তু তাহার রঙ্গমঞ্চে যমুনাদের এই অনধিকার প্রবেশই তাহাকে এমন সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। দুই চক্ষু মেলিয়া তাহার দাদার এই অধঃপতন সে দেখিতে পারে না, কিন্তু করিবারই বা তাহার আছে কী!

তবু যদি পীতাম্বর এমন পীড়িত মুখে না থাকিয়া মাঝে-মাঝে রাগারাগি করিয়া ভাগ্যকে অভিশাপ দিত, যমুনাকে তিরস্কার ও শিশুগুলিকে মারধোর করিত, তাহা হইলে হয়তো দারিদ্র্যদুঃখটা এমন অসহনীয় লাগিত না। তাহার দাদার এই আপ্রাণ পরিশ্রম ও অনর্গল স্নেহই যেন দুঃখকে আরো ধারালো করিয়া তুলিতেছে। অথচ একদিন তাহার গা ভরিয়া গয়না ছিল, হাতবাক্সটা নাড়াচাড়া করিতে গেলেই টাকা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিত, ছেলেপিলেগুলিকে ধূলা-কাদায় এমন গড়াগড়ি দিতে দেখিলে দাসী-চাকরকে বকিয়া-ঝকিয়া আর আস্ত রাখিত না। সব সে সহিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সব সময়ে দাদার এই অক্ষমতার চেতনা, এই করুণ সলজ্জতা সে গা পাতিয়া আর সহ্য করিতে পারে না।

তাই একদিন পীতাম্বরের কাছে সে সরাসরি কথা পাড়িয়া বসিল: দাদা, এক কাজ করলে কেমন হয়? তেতলার মুখুজ্জেদের ঝি ক'দিন হ'লো পালিয়ে গেছে, আমি সেই কাজটা নেব ভাবছি। বাসন-কোসন চাকরেই মাজে, কিন্তু বিছানা পাতা, ঘর-ঝাঁট, মেয়েদের চুল বেঁধে দে'য়া, আলতা পরানো—এই রকম দু' চারটে হাল্কা কাজ—মাসে সাত টাকা মাইনে। আমি ওটা নিই, কী বলো?

পীতাম্বর মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,--ছিঃ!

--এতে লজ্জা কিসের, দাদা? নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছি বই তো নয়। তা বলে' বাড়ির থেকে তো বেরোতে হ'বে না, নইলে খুকিদের যদি ঐ সামনের ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসবার কাজ নেই তো মাইনে আমার আরো তিন-চারটাকা বেড়ে যায়। তুমি কেন এতে আপত্তি করছ?

পীতাম্বর ভারমুখে কহিল,-- তুই পাগল হয়েছিস, যমুনা? আমি বেঁচে থাকতে তোর এই কলঙ্ক আমার দেখতে হ'বে?

—কিছুই কলঙ্ক নয়, দাদা, সৎপথে থেকে পরিশ্রম করে' উপার্জ্জন করা মাত্র। যমুনা পীতাম্বরের পায়ের তলায় বসিয়া পড়িয়া কহিল,—বলতে গেলে, এতোগুলি শিশুর ভরণপোষণ করবার দায়িত্ব তোমার এতোটুকুও নয়, সব আমার—একলা আমারই। আমার জন্যে খেটে-খেটে তোমার এমনি হাড় কালি হ'বে, আর আমি নিষ্কর্ম্মার মতো চিবিয়ে-চিবিয়ে ভাত গিলবো, এ আমি কিছুতেই সইতে পারছি না, দাদা। আমারো তো দুটো করে' হাত পা ছিলো, ওদের ব্যবহার করতে না পারলে আমি মরে' যাবো।

—তাই বলে' তোর ঝি-গিরি করতে হ'বে? পীতাম্বর ঝাঁজিয়া উঠিল: গরিব ভাই পেট পুরে খাওয়াতে পারে না বলে' তার ওপর কি এমনি করে'ই প্রতিশোধ নিবি নাকি? এ প্রকাণ্ড বাড়িটায় সব চেয়ে তুই গরিব হ'তে পারিস্, কিন্তু আত্মসম্মানে কারো চেয়ে তুই খাটো নস্, যমুনা। প্রাণ থাকতে এই নোংরা কাজে আমি তোকে হাত দিতে দেবো না।

যমুনা ভিজা গলায় কহিল,—কিন্তু আয় বাড়াতে না পারি, খরচ তো কিছু কমানো যায়।

—কিসে?

—এখন এই যে একখানা ঘরের জন্যে মাস ছ' টাকা লাগছে, চেষ্টা করলে তার চেয়েও কমে ঘর পেতে পারি। এতে করে' দুটো টাকাও যদি তোমার বাঁচে, তো সে অনেকখানি।

পীতাম্বর হাসিয়া বলিল,—আমার টাকা বাঁচাবার জন্যে তোর ভাবনা না করলেও চল্‌বে। যা পাচ্ছিস দু' হাতে ছুঁড়ে-ছেনে উড়িয়ে দিয়ে যা। এমন টাকার আণ্ডিল আর কোথাও পাবি না, সংসারে কোনো বোনেরই এমন শাঁসালো দাদা নেই। তারপর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর গলায় সে কহিল,—মিছিমিছি পাগলামি করিস নে, যমুনা। আর যাই হোক্, এই বাড়িটা ভালো, ভাড়াটেরাও বেশ ভদ্রলোক,—ছোটখাটো কতো রকম সাহায্য পাচ্ছিস্ বল্ তো।

যমুনা বলিল,—তা তো মান্‌লাম, কিন্তু ছেলেদের তুমি সখ করে' অমন ভালো-ভালো জামা কিনে দিতে গেলে কেন?

—ওকে তুই ভালো জামা বলছিস্? বাড়ির আর-আর সব ছোট ছেলেদের সঙ্গে ওদের সেদিন উঠোনে খেলতে দেখ্‌লাম, কিন্তু যমুনা, তুলনা না করলে বুঝি দারিদ্র্যকে কখনো চেনা যায় না।

অনুযোগের সুরে যমুনা বলিল,—কিন্তু ওদের কিছুটা খেলো এনে দিলে তোমার একটা আস্ত জামা হ'তো দাদা। আমাকেই বা একজোড়া কাপড় এনে দেবার তোমার কী হয়েছিলো? আমার মাথা খাও, তার একখানা তোমাকে পরতেই হ'বে।

সেইখান হইতে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া পীতাম্বর কহিল,—আমার জন্যে মিছে তুই ভাবছিস, যমুনা। আমি সন্নেসি মানুষ যা-হোক একটা নেংটি হ'লেই আমার চলে, কষ্ট সয়ে'-সয়ে' হাড় আমার ঝাঁঝু হ'য়ে গেছে—আমার আবার চাল-চুলো। তোকে বরং একখানা ফর্সা কাপড় পরতে দেখলে আমাদের সেই যমুনা বলে' চিনতে পারবো।

তবু যা-হোক দিন কাহারো জন্য বসিয়া থাকে না, কিন্তু ইহার মধ্যে আবার যদি ছেলেপিলেগুলা একটার পর একটা করিয়া অসুখে পড়িতে থাকে, তবে যমুনা আর নাকে-মুখে পথ খুঁজিয়া পায় না। টোট্‌কা-টাট্‌কি ওষুধ খাইয়া সবাই একরকম সামলাইয়া উঠিল, কিন্তু রাজু সেই যে গেল অঘ্রানের শেষ দিকে বিছানা নিয়াছে আজো তাহার সামান্য পাশ ফিরিবার ক্ষমতা নাই। কি-এক হাড়-ভাজা জ্বরে সে চুপ্‌সাইয়া একেবারে চিম্‌সে হইয়া পড়িল—তাহাকে দেখিতে এখন প্রায় একটা সরু টিক্‌টিকির মতো হইয়াছে। ওষুধ বলিতে কয়েকটা লতা-পাতার রস, আর পথ্যের মধ্যে খানিকটা জলো পালো। ডাক্তার একজন না দেখাইলেই নয়। কিন্তু তাহাদের পক্ষে সেটা দুর্ব্বহ বিলাসিতা।

যমুনা বলিল,—তুমি কিছু চিন্তিত হয়ো না, দাদা। ভগবান যে ভার দেন তা আবার কখন অত্যন্ত সোজা করে' দেন।

পীতাম্বর কথাটার গভীর তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পাইয়া ভাসা ভাসা চোখ তুলিয়া যমুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গলার স্বরটা হালকা করিয়া যমুনা কহিল,—ছেলেটার অসুখ ভীষণ বেড়ে গেলো দেখে মহা ভাবনায় পড়ে' গিয়েছিলাম—কে বা বাকিগুলিকে দেখে-শোনে, কেই বা তোমাকে দুটো ফুটিয়ে দেয়। এ দিকে মিত্তিররা আর তেতলায় মুখুজ্জেরা সবাই খুব ভালো লোক, দাদা। মুখুজ্জেদের ছোট গিন্নি আজ নিজ হাতে রেঁধে দিয়ে গেছে—কী যে ছিলো বা ছিলো না কিছুই আমাকে জিগ্‌গেস করতে হয় নি। আর মিত্তিরদের মেয়েরা তো সারাক্ষণ আমার সঙ্গে-সঙ্গে—কতো কাজ যে আমার হাল্কা হ'য়ে গেছে, দাদা। আজ সকাল থেকে সারাক্ষণ আমি এর কাছে বসে' থাকতে পারছি। ওদের

মেয়েরা এসে সিতুকে তাদের বাড়ি সরিয়ে নিয়ে গেছে। এ নাকি ভারি ছোঁয়াচে জর, দাদা—যদ্দিন না রাজু ভালো হ'য়ে ভাত খায় ততদিন নাকি ওরা এ-ঘরে আসতে পাবে না। তুমি কেন যে তখন এই বাড়ি ছাড়তে চাওনি, বুঝতে পারছি। পৃথিবীতে ভালো লোকের সংসর্গও একটা বড়ো পাওয়া।

যমুনার কথার মাঝখানেই পীতাম্বর অস্থির হইয়া ঘরময় পাইচারি সুরু করিয়াছে; কথা শেষ হইলে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তা তো হ'লো, কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচাই কী করে' ?

প্রশ্নটা এমন উলঙ্গ যে যমুনা কিছুক্ষণ কোনো কথা কহিতে পারিল না। সাদা, শুক্‌নো চোখে মুমূর্ষু ছেলের দিকে চাহিয়া রহিল।

পীতাম্বর তক্তপোষের কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল,—এক কাজ করি, যমুনা। তোর নবু-দাকে কিছু টাকার জন্যে লিখে দি। অচিকিৎসায় ছেলেটাকে এমনি মরতে দিতে পারি না।

যমুনা গম্ভীর হইয়া কহিল,—না, না, টাকার জন্যে নবু-দা'র কাছে আর হাত পাততে যাবো কেন ?

—হাত পাতলে দোষ কী ?

—না, না, সে আমার ভারি লজ্জা করবে। এখন আমাকে সাহায্য করবার তার কথা নয়। যমুনা চোখ নামাইয়া কহিল,—তার কাছে আমি তোমাকে ছোট হ'তে দেবো না।

পীতাম্বর কহিল,—ছোট,—আমি তো সবাইর চেয়েই ছোট, যমুনা। সে-কথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জা কোথায় ? আমি তো সত্যিই পারছি না, তুই তো নিজের চোখেই তা দেখতে পাচ্ছিস্, এই সময় যদি তার থেকে কিছু উপকার হয়, তো মন্দ কী! ধীরে-সুস্থে পরে টাকাটা শোধ করে' দিলেই হ'বে।

যমুনা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল,—না, না, তুমি একাই খুব পারছো, দাদা,—খুব। এর মধ্যে আমি কাউকে আর ডাকতে পারবো না। তুমি আমাকে যদি আজ মেরেও ফেলো, তা-ও আমি ভাগ্য বলে' মনে করবো, তবু পরের কাছে ভিক্ষা চেয়ে তোমাকে—তোমার অধিকারকে অসম্মান করতে পারবো না।

ঈষৎ তপ্ত হইয়া পীতাম্বর কহিল,—তাই বলে' ছেলেটাকে একটা ডাক্তার দেখানো হ'বে না ? আমি তো নিজেই আমার অধিকারের চমৎকার সম্মান রাখছি, তুই কি না তা'রই বড়াই করে' বেড়াস্।

—তা'রি বড়াই করি, দাদা। যমুনা অশ্রু-আপ্লুত চোখ তুলিয়া বলিল,—ডাক্তারের জন্যে তুমি ভেবো না; মুখুজ্জেদের সেজ ছেলে এইবার শেষ ডাক্তারি পরীক্ষা দিয়ে বেরুবে, গিন্নি-মা'র কথায় রাজুকে সে দেখে গেছে। বিকেলে নিজেই সে একটা-কি ওষুধ এনে দেবে। একেবারে শেষ হ'য়ে যাবার অবস্থা নাকি এখনো আসে নি। তার'ই তো এ-সব ব্যবস্থা, তা'রই কথায় তো টুনি সিতুকে নিয়ে দোতলায় পালিয়েছে, খুকিটা রয়েছে মিত্তিরদের বড়ো মেয়ের হেপাজতে।

পীতাম্বর বিরক্ত হইয়া কহিল,—ও-সব কাঁচাখেগো হাতুড়ে ডাক্তারে হ'বে না, যমুনা।

—না হ'বে তো না হ'বে। যমুনাও ঝাম্‌টা দিয়া উঠিল: তার জন্যে তোমার এতো মাথা ঘামাতে হ'বে কেন ? ধামায় ঐ তোমার ভাত চাপা আছে, চান্ করে' দুটো তুমি মুখে তোল। নতুন হাতের রান্না তোমার আজ ভালোই লাগবে। তোমার এই বিচ্ছিরি বাউণ্ডুলে চেহারা আমি দু'চক্ষে আর দেখতে পারি না, দাদা। নাই-চিন্তায় কেন তুমি এতো নাকাল হচ্ছ ? ও যদি যায়, যাবে, ঈশ্বর যদি নেন্ তো নেবেন—তার জন্যে কী করা যাবে, কী করতে পারে মানুষে! তুমি সন্নেসি হয়েছ, না, কাঁচকলা!

রাজুর অবস্থা শেষে, এককালে অবশ্য ভালো হইল, কিন্তু ভবানীপুরের সেই মিঠাইর দোকানটা কখন ও কি করিয়া যে উঠিয়া গেল তাহার ঠিক কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

আত্মসম্মানজ্ঞানটুকু সযত্নে লালন করিবার সময় এইবার ফুরাইয়াছে। নবু-দাকে যমুনা শেষকালে এক-খানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। দেরি করিয়া উত্তর আসিল বটে, কিন্তু বড় সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর। মাগ্‌গি-

গণ্ডার বাজার, ব্যবসা-পত্তর ভারি মন্দা যাইতেছে, এই সময় তুলিয়া কিছু দেওয়া তাহার অসম্ভব।

যমুনা অমনি ছুটিল তেতলায় মুখুজ্জেদের ওখানে। গিন্নি-মা'র পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—একটা-কিছু কাজ আমাকে জোগাড় করে' দিন্, মা।

মুখুজ্জে-গিন্নি বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, যমুনার এই হন্ত-দন্ত চেহারা দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন,—কিসের কাজ বল্‌ছ ?

—যাই হোক্ মা, যে কোনো কাজ। যমুনা একেবারে কান্নায় উথলিয়া উঠিল: আমি আর হাত গুটিয়ে বসে' থাকতে পারছি না, মা। আমার সন্নেসি-দাদা শেষকালে শুন্‌লাম জন খাটতে সুরু করেছে, তবু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না—আমি তাকে কোথা থেকে কোথায় এনে ফেল্‌লাম! পৃথিবীতে আমি আর এমন অপদার্থ হ'য়ে বসে' থাকতে পারবো না, আমাকে যা-হোক একটা কাজ দিন্।

—কাজ ? কী কাজ করবে তুমি ?

—ধরুন, আপনাদের বাড়িতে ঝি হ'বো, বাসন মাজবো, ঘর নিকোবো—যা আমাকে দিয়ে করাবেন আমি গা দিয়ে সব তাই করবো, গিন্নি-মা। মুখুজ্জে-গিন্নির দুই পা চাপিয়া ধরিয়া যমুনা ঝরঝর করিয়া আরেক পশ্‌লা কাঁদিয়া লইল: ছেলেপিলেরা যে খিদেয় কাৎরাচ্ছে সে আমার কাছে বড়ো দুঃখ নয়, কিন্তু দাদার এই কালো মুখ আমি আর দেখতে পারি না, মা।

যমুনার দুই হাত তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিয়া মুখুজ্জে-গিন্নি মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—তাই বলে' বামুনের মেয়ে হ'য়ে এঁটো মাজবে ?

—গরীবের আবার জাত কী, মা! কুণ্ঠিত হইয়া যমুনা বলিল,—দাদার আশ্রয় যদি না পেতাম তবে আমার এই খালি হাত দু'টো কি এতোদিন এমনি নিষ্কর্মা হ'য়ে বসে' থাকতো নাকি ? একটা কাজ দাও না, মা।

মুখুজ্জে-গিন্নি অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তাইতো দাদার আশ্রয় পেয়েছ। তুমি বল্‌লেই তো আর আমি অপমান করতে পারি না তোমাকে। বিধবা হ'লেই মেয়েমানুষ কম-বেশি দুঃখে পড়ে, তাই বলে' তো সম্মান খোয়ানো যায় না। চাও যদি তো দু' চারটে টাকা দিতে পারি, না পারো শোধ না-হয় না-ই দিলে।

মিত্তিরদের বাড়িতে গিয়াও যমুনা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া এই কথাই শুনিয়া আসিল। সবাই তাহাকে অর্থ ভিক্ষা দিয়া সম্মান করিতে চায়, কিন্তু ইহার চেয়ে হাত পাতিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরা উপহার লওয়া বোধ হয় অনেক সহজ।

পীতাম্বরের উপর সে মুখাইয়া উঠিল: তুমি আর-কোথাও আমাদের বাসা বদলাও, দাদা। এই ভদ্দর-লোকদের ভিড়ে বসে' শরীর বাঁচিয়ে চলতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

পীতাম্বর হাল্‌কা গলায় কহিল,—আর ভাবনা করিসনে, যমুনা। এতোদিনে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে। খুচরো রোজগারে আর পোষাচ্ছে না, একটা প্রায় স্থায়ী বন্দোবস্ত করে' ফেলেছি

যমুনা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পীতাম্বর বলিল,—আমাদের দু'জনের কী ;—ঝড়-ঝাপ্‌টায় আমরা মচ্‌কাতে পারি কিন্তু ভাঙবো না কোনোদিন। ভাবনা হচ্ছে ঐ ছেলেপিলেগুলিকে নিয়ে। তাদের বন্দোবস্ত তারা নিজেরাই করবে দেখিস। আমরা না পারি, তারা তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবে—আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবার তাদের দরকার নেই।

সাত-পাঁচ কিছু বুঝিতে না পারিয়া যমুনা নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া নিস্পন্দ হইয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

—দেখিস্, বিকেল হোক্—রাতারাতি ভোজবাজি হ'য়ে যাবে।

বিকেলবেলা পীতাম্বর কোথা হইতে একটা কাঠের ঠেলাগাড়ি জোগাড় করিয়া আনিল। টুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—চল্ তোদের শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। রাস্তায় কতো-কি দেখবি চল্—কতো ঘোড়া, কতো গাড়ি, কতো কি সব মজার মজার ব্যাপার।

রাস্তায় নামিয়া কী যে তাহারা সত্যিকারের দেখিবে কে জানে, কিন্তু গাড়ি চড়িয়া বেড়াইবার কথা হইতেই শিশুগুলি আহ্লাদে টুকরা-টুক্‌রা হইয়া গেল। জামা

বদ্লাইবার কিছু নাই, যাহা পরনে আছে তাহাই তাহাদের পোষাকি। পীতাম্বর হাত বাড়াইয়া কহিল,—তোর কোলের মেয়েটাকেও দে, যমুনা, একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসি।

রাজু প্রবলকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল: ও কিছু বুঝবে না, মামা। ও কেবল কাঁদবে।

টুনি সকলের বড় বোন, মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিল,—একটু কাঁদলো-ই বা। আমি ওকে ঠিক ঠাণ্ডা করে' রাখবো।

—কাঁদবে কী! সঙ্গে আমার এই বাজনা আছে না?

এত কষ্টে পড়িয়াও পীতাম্বর তাহার সেই সিঙ্গ্‌ল্‌-রীডের হার্মোনিয়ামটি বিক্রি করে নাই। তক্তপোষের তলা হইতে তাহাই সে বাহির করিয়া কহিল,—বাজনা বাজিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো। আর যদি নেহাৎ কাঁদে-ই তো মন্দ কী! ওর কান্না আর আমার হার্মোনিয়াম—দু'য়ে মিলে চমৎকার বিজ্ঞাপন হ'বে।

হার্মোনিয়ামের দুই কড়ার সঙ্গে শক্ত করিয়া একটা কাপড় সে বাঁধিয়া নিয়াছে। দরকার হইলে গলায় সে সেটা মালার মত ঝুলাইতে পারিবে।

দরজায় দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক নির্ব্বাষ্প চোখে যমুনা এই করুণ দৃশ্যটি দেখিতেছিল। গাড়ির চারদিকে আধ-হাত উঁচু করিয়া বাঁশের রেলিঙ দেওয়া, তাহা ধরিয়া ছেলে-গুলি গাড়ির উপর আহ্লাদে দোল খাইতেছে। উহাদের মাঝখানে খুকি শুইয়া আছে ও তাহার মাথার উপরে এত বড় একটা আকাশ দেখিয়াই হয়তো তাহার মুখে আর রা নাই। তাই বলিয়া টুনির মাতব্বরি থামিতেছে না; ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে শান্ত রাখিবার জন্য এখন হইতেই সে নানারকম মহড়া দিয়া রাখিতেছে।

ঠেলা গাড়ি চলিতে সুরু করিল। পীতাম্বর পিছন ফিরিয়া যমুনার দিকে একটিবার চাহিল হয়তো, কিন্তু সে-মুখে হাঁ-না কোনো ইসারাই সে খুঁজিয়া পাইল না। ব্যাপারটার কতক হয়তো সে বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু কিছু-একটা মত জাহির করিবার তাহার মুখ নাই।

রাস্তায় পড়িতেই রাজু সোল্লাসে চেঁচাইয়া উঠিল: ও ফটিক, গাড়ি চড়বি?

ফটিক মুখে একটা 'ফুঃ' করিয়া কহিল,—এ আবার একটা গাড়ি নাকি? এ তো একটা খোঁয়াড়! আমাদের গাড়ি দেখেছিস? তোদের মতো তা ঠেল্‌তে হয় না, আপনা থেকেই হুস্ হুস্ করে' বেরিয়ে পড়ে।

খানিকটা রাস্তা চুপচাপ কাটাইয়া দিতে হইল। অপরিচিত পাড়ার মধ্যে না আসিতে পারিলে হার্মোনিয়ামটা গলায় ঝুলানো যাইবে না।

বড় রাস্তায় একটা সম্ভ্রান্ত পাড়ার মধ্যে আসিয়া পীতাম্বর গাড়ি থামাইল। গান সে আগেই বাঁধিয়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে। এখানে সুরের কস্‌রতে কিছু আসিয়া-যাইবে না, কাজ করিবে একমাত্র কথা—এবং সে-কথা কবিতায় যত অস্পষ্ট না হয় ততই ভালো।

পীতাম্বর হঠাৎ চাবি টিপিয়া-টিপিয়া কাতর আর্ত্তনাদের মতো একটা সুর বাহির করিল। গলা ভাঁজিয়া স্বর তাহার বেশ দরাজই ছিল বলিতে হইবে—এবং গানের প্রথম পংক্তিতেই পাশের বাড়ি ও দোকানগুলির জান্‌লায়-দরজায় নারী-পুরুষের ভিড় লাগিয়া গেল।

তাহারা দেখিল একটা নড়বড়ে ঠেলা গাড়ি করিয়া একটি লোক চারটি অনাথ-শিশুকে লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের জন্মের পশ্চাতে ও সম্মুখে কঠোর, কদর্য্য অভিশাপ। মুখে যেমন করুণ কালিমা, চেহারায়ও তেমনি হতশ্রী দারিদ্র্য। নিষ্পাপ অবোধ শিশুগুলির দিকে মুখ তুলিয়া বেশিক্ষণ চাওয়া যায় না,—অহেতুক মায়ায় সমস্ত চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে—তাহার চেয়ে মৃত্যুও বোধ হয় বেশি সহনীয়, বেশি কমনীয় মনে হয়। সব চেয়ে ছোট খুকিটি দুই হাত-পা ছুঁড়িয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে,—হয়তো তাহার মা'র জন্যই, এক ফোঁটা দুধ পাইবার জন্যই তাহার এই কান্না—কিন্তু কোথায় তাহার সে রাক্ষুসি মা! খুকিটি কাঁদিতেছে, আর দলের বড় মেয়েটি মায়ের মত কোল বিছাইয়া তাহাকে নিয়া কত দেয়ালা করিতেছে, কত প্রবোধ দিতেছে! তাহাদের হতভাগী মা নিজে এই কান্না শুনিতে পাইতেছে না, কিন্তু পাড়ার এতগুলি মেয়ের বুক স্নেহে ও সুধায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আহা, আর ছেলে দু'টিই বা কী চঞ্চল! চোখে-মুখে বুদ্ধি যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে! এই নর্দ্দমার মধ্যে পড়িয়া না থাকিলে হয়তো ইহারা দেশের

একেকটা দিক্‌পাল হইতে পারিত! জন্মের দুর্ঘটনায় তাহারা কোথায় আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

যমুনা কী বুঝিয়াছিল কে জানে, কিন্তু ছেলেমেয়ে কয়টি শুধু গরিবের সন্তান, বাপের বিষয়ে যাহা-যাহা উহাদের ন্যায্য স্বত্ব ছিল তাহা সব তাহাদের খুড়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহারা সদলবলে মামার কাঁধে আসিয়া ভর করিয়াছে, আর মামা তাহাদের নিতান্তই বেকার, বাউণ্ডুলে—এই কথা শত জাঁকজমক করিয়া বলিলেও কোনো ফল হইত না।

আহা, লোকটি কী সুন্দর গান গায়! আস্তাকুঁড় হইতে হতভাগ্য শিশুগুলিকে কুড়াইয়া জীবনে তাহাদের জায়গা করিয়া দিবার জন্য কী সুমহান চেষ্টা! ইহাকেই বলে কাজের মত কাজ। বিরাট অপচয়ের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার সাধনা। নামগোত্রহীন নিঃসম্বল কয়টি শিশুর জন্য এই বৃহৎ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আর কোথায় চোখে পড়ে!

ফুটপাত ধরিয়া পীতাম্বর গাড়িটা কতদূর ঠেলিয়া আনে, সন্ধান বুঝিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া ফের হার্মোনিয়মের 'বেলো' করিতে থাকে।

গাড়ি চড়িয়া বেড়াইবার সুখেই তাহারা বিভোর, কিন্তু তাহাদের উপর রাশি-রাশি পয়সা-টাকা, জামা-কাপড়ের পুষ্পবৃষ্টি হইতে দেখিয়া ছেলেমেয়েগুলি অবাক, হতভম্ব হইয়া রহিল। পয়সা দিয়া কী হইবে তাহা তাহারা জানে না, কিন্তু এই সব নরম রঙচঙে জামা-কাপড়, কাঁথা-কম্বল যে তাহাদেরই জন্য, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কী মজা,—মাকে গিয়া যে কত গল্পই বলা যাইবে! গাড়িটা যত এগোয় ততই কাপড়-জামা স্তূপাকার হইতে থাকে, পীতাম্বরের পকেটও বেশ ভারি হইয়া আসিল। গাড়িটা যত এগোয়, পিছনে সহবেদনাক্লিষ্ট মানুষের শোভাযাত্রা চলিতে থাকে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাড়ির আধমাইলটাক এদিকে আসিয়া পীতাম্বর বাজনা বন্ধ করিল। একবেলার পক্ষে যথেষ্ট—যথাতিরিক্ত রোজগার হইয়াছে। জোরে-জোরে ঠেলিয়া গাড়ির বেগ সে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল—তাড়াতাড়ি বাড়ি না ফিরিলে যমুনা আবার ভাবিয়া-ভাবিয়া দগ্ধ হইতে থাকিবে। বাজনা বন্ধ করিয়া গাড়ির গতি বাড়াইয়া দিতেই লোকজন আলগা হইয়া খসিয়া পড়িয়াছে। গাড়ি চড়াইয়া ছোট কয়টি ছেলেকে হাওয়া খাওয়াইয়া নিয়া আসিল—এখন দেখিলে পীতাম্বরকে ইহার চেয়ে বেশি কিছু আর মনে হ বে না।

বাড়ি ফিরিয়া ছেলেদের স্ফুর্তি আর দেখে কে! সিতু পর্য্যন্ত আধ-আধ ভাষায় বলিতে লাগিল; এতো—এতো পয়সা মা, এতো—এতো জামা—সব আমার।

চোখ বড় করিয়া রাজু বলিল,—মামা, মা, গান গাইলো, আর ঝুপ্ ঝুপ্ করে' পয়সা পড়তে লাগলো। দেখ না মামার পকেটটা।

টুনি পীতাম্বরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—কালকেও আবার গাড়ি চড়ে' যাবো, মামা।

খুকি এতক্ষণে মাকে পাইয়া শান্ত হইয়াছে। মার বুকে মুখ গুঁজিয়া সেও বোধকরি মার কাছে তাহাদের সৌভাগ্যের বর্ণনা দিতেছিল।

ভয়ে-ভয়ে যমুনা একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু সে-মুখে আজ আর চিন্তা বা দুঃখের এতোটুকু কুয়াসা নেই—নির্মেঘ প্রসন্ন নির্ম্মলতা। ছেলেদের নিয়া তরল খেলায় ছেলেমানুসি করিতেছে, কখনো বা হাল্‌কা গলায় সুরের একটা টান দিয়া বসিল। এতদিন পরে দাদার মুখে আজ হাসি দেখিয়া তৃপ্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় যমুনার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

যমুনা ব্যাপারটা হয়তো বুঝিয়াছে, কিন্তু কতোটুকু বুঝিয়াছে তাহা কে বলিবে! বড়াই করিবার আর তাহার কিছুই নাই, দাদা যে তাহাকে নিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন তাই ঢের।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন—কথাটা আর চাপা রহিল না।

গাড়ি করিয়া ছেলেগুলিকে পৌঁছাইয়া দিয়া পীতাম্বর কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। বারান্দায় অন্ধকারে কাহার ছায়া পড়িতে যমুনার গা-টা চম্ করিয়া উঠিল। বাহির হইয়া দেখিল—মুখুজ্জে-গিন্নি, পিছনে মিত্তিরদের বাড়ির মেয়েরাও আসিতেছে। আতিথ্য-সৎকারের সুযোগে প্রচুর উৎফুল্ল হইয়া যমুনা গাঢ় গলায় বলিল,—আসুন গিন্নি-মা, এসো এসো উষা, লটু এস—আমার কী সৌভাগ্যি আজ!

বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রা
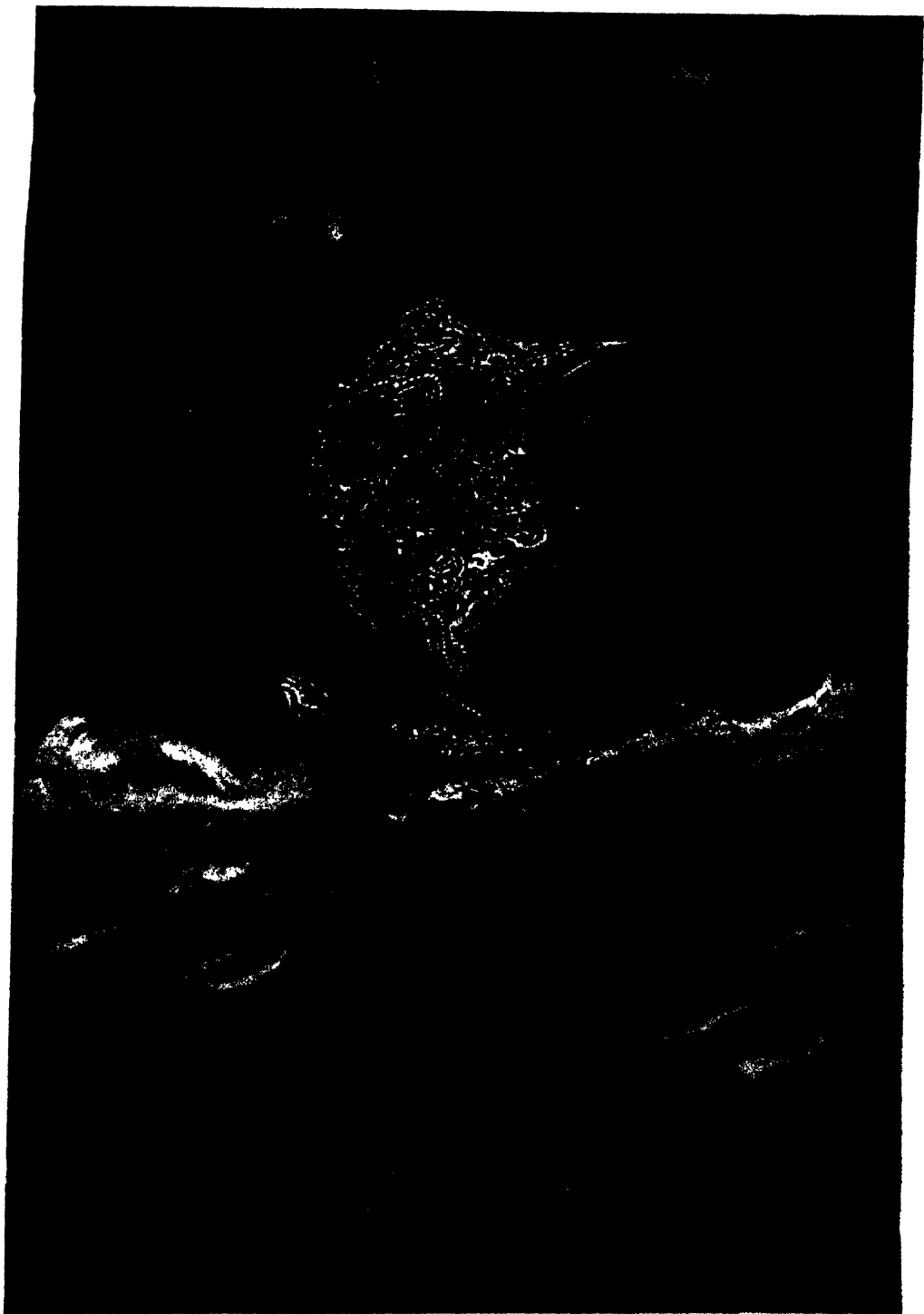
শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম এ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মুখুজ্জে-গিন্নি নাক সিঁটকাইয়া কহিলেন,—কে তোমার আর ঐ নোংরা ঘর মাড়াতে যাচ্ছে। কথাটা আমি এখান থেকেই সারছি। না, না, দরকার নেই আলো আনবার—আলোয় তোমার মুখ দেখবার আমাদের সাধ নেই।

লণ্ঠনটা আনিবার জন্ত যমুনা পিছন ফিরিয়াছিল, কিন্তু কথা শুনিয়া পা দুইটা তাহার কাঠ হইয়া রহিল। আলো আর আনা হইল না।

মুখুজ্জে-গিন্নি শানানো গলায় কহিলেন,—তোমাকে আমরা ভালো-মানুষের মেয়ে ব'লেই জানতাম। কিন্তু এ কী কেলেঙ্কারির কথা! বামুনের বৌ বলে' খুব যে বড়ফট্টাই ছিলো, কিন্তু ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে। ছাই চাপা দিয়ে আগুন আর কতকাল লুকানো যায়—সত্য কথা একদিন বেরোবেই বেরোবে। ছি-ছি!

শুক্‌নো, নিষ্প্রাণ গলায় যমুনা বলিল,—কেন, কী হয়েছে, গিন্নি-মা?

—কী হয়েছে! মুখুজ্জে-গিন্নি খেঁকাইয়া উঠিলেন: এটা ভদ্দরলোকের বাসা, এখানে তোমার মতো মেয়েলোকের জায়গা হ'বে না—কাল সকালে যেখানে পারো পথ দেখবে। আর কিসের লজ্জা-সরম, পোড়ামুখ লুকোবার কিসের এতো ঠাট। ঝি-গিরি করতে এলে আমি আবার ওনাকে সম্মান খোয়া যায় বলে' ফিরিয়ে দিলাম। তুমি তো একটা ঝিরো বেহদ্দ, আস্তাকুঁড় ছেড়ে এখানে উঠে আসতে তোমার লজ্জা করলো না?

তিরস্কারের আঘাতে যমুনার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল; মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না।

মুখুজ্জে-গিন্নি আবার শতমুখে গালি পাড়িতে লাগিলেন: ছেলেমেয়েগুলির জন্মের ঠিক নেই সে-কথা আবার ঢোল পিটিয়ে শহরময় রাষ্ট্র করে' ভিক্ষে চাওয়া হচ্ছে! ছি-ছি ছি-ছি—এই কলঙ্ক লুকিয়ে এতোদিন তুমি আমাদের সঙ্গে সমান হ'য়ে চল্‌ছিলে—আমার বাসায়! পুলিশ ডাকিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিতে চাইনে বাপু, কাল বাপু ভালোয়-ভালোয় বিদেয় হও। তোমার জন্তে অন্ত জায়গা আছে, সেখানে এমন মেকি ভদ্দর সেজে থাকবার পরিশ্রম করতে হ'বে না। কথাটা কর্ত্তাদের কানে উঠেছে---তাঁরা আর সবুর মানতে চাইছেন না—কালই যা-হোক পথ দেখ। ছি-ছি!

জিহ্বাগ্র সূক্ষ্ম করিয়া খানিকটা থুতু দেয়ালে ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া উষা কহিল,—তার চেয়ে থিয়েটারে গেলেই তো পারো, এমন চমৎকার অভিনয় করতে পারো।

ঘাড় ফলাইয়া লট্টু বলিল,—আর এর জন্যে আমরা এ এক বছর কী না করেছি! বিপদে টাকা দিয়ে, অসুখে সেবা করে' ছি-ছি, লজ্জায় যে আমারই মরতে ইচ্ছে করছে।

যমুনার কণ্ঠ চিরিয়া কথা বাহির হইল: ছেলেদের কথা কী বল্‌লেন, মা?

—তুমি তা নিজে জানো না, ন্যাকা মেয়ে! বীভৎস ঘৃণায় মুখুজ্জে-গিন্নি ঠোঁট-মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—তোমার নিজের কীর্ত্তির কথা আমাদের মনে করিয়ে দিতে হ'বে? বাজনা বাজিয়ে শহরশুদ্ধ লোকের কানে সে-কথা রটিয়ে দিয়ে এখন আমাদের কাছে জিগ্‌গেস করতে এসেছ? চরিত্র নেই বলে কি মেয়েমানুষের সামান্য লজ্জাও কি তোমাকে ছেড়ে গেছে? বলিয়া মুখুজ্জে-গিন্নি দল লইয়া পাশের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। কহিলেন,—তোমার বাজনাওয়ালা দাদাকেই না-হয় জিগ্‌গেস করে' দেখো।

আবার এক-পা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন: তোমার সঙ্গে কথা বলবার আমাদের রুচি নেই, কাল সকালে আমার ঘর খালি ক'রে দিয়ে যেয়ো, নইলে কিন্তু ভালো হ'বে না বলে' দিচ্ছি।

সিঁড়িতে উঠিবার সময় আবার তাঁহার কথা শোনা গেল: সত্য কথা একদিন প্রকাশ না হ'য়ে পারে না, বুঝলি উষা, চন্দ্র-সূর্য্য এখনো মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ছি-ছি, মেয়েটাকে আমাদের কত ভালোই না আগে মনে হ'তো—ঐ যা বলেছে লট্টু—থিয়েটার, থিয়েটার!

তাহাদের পায়ের শব্দ আস্তে-আস্তে মিলাইয়া গেল, কিন্তু যমুনার কানে যেন সেই অপস্রিয়মান শব্দ আর শেষ হইতেছে না।

হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া উঠিয়াছে, হৃৎপিণ্ডের দ্রুত আঘাতে বুকটা যেন তাহার এখুনি দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—যমুনা মেঝের উপর শূন্য, সীমাশূন্য চোখে অভিভূতের মত, প্রেতগ্রস্তের মত বসিয়া রহিল। হয়তো বা সে বসিয়া নাই, ধীরে ধীরে মাটির কোন্ অতলে সে তলাইয়া যাইতেছে।

কতক্ষণ এমনি বসিয়া ছিল খেয়াল নাই, পীতাম্বরের গানের আওয়াজে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙিল। রোজ বিকালে গান অভ্যাস করিয়া পীতাম্বরের গলা এখন খুলিয়া গেছে, নড়িতে-চড়িতে পকেটে আজকাল তাহার পয়সা বাজিয়া উঠে বলিয়া তাহার বড় স্ফূর্ত্তি। দাদাকে এখন এত প্রসন্ন ও নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখিয়া যমুনার ভারি ভালো লাগে।

যমুনা উঠিয়া পরিপাটি করিয়া পীতাম্বরকে ভাত বাড়িয়া দিল; গায়ে পড়িয়া একটিও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বুঝিতে তাহার কিছুই আর বাকি নাই, এইজন্য দাদাকে কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ করিয়া লাভ কী! পীতাম্বর আজকাল বড়-বড় গ্রাস তুলিয়া খায়, পেট ভরিলে পরিপূর্ণ তৃপ্তিসূচক একটি ঢেঁকুর তোলে—তাহাই সে চোখ ভরিয়া দেখে। আজো সে নিঃশব্দে, খুঁটিয়া-খুঁটিয়া পীতাম্বরের খাওয়া দেখিতে লাগিল।

যা দুই-একটা কথা হইল, তা নিতান্তই অবান্তর। হাসিমুখে, কোনো-কিছু হয় নাই এমনি উদাসীন ভঙ্গিতে যমুনা কথা বলিয়া চলিল। কাল সকালে যে তাহাদের এই বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে সেই প্রয়োজনীয় কথাটা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিল না।

রাত তখন অনেক—নিজের আজ আর তাহার খাইতে ইচ্ছা নাই—পীতাম্বর বারান্দায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে তক্তপোষের উপর নতুন-পাওয়া কম্বল পাতিয়া ছেলে-মেয়েরা ঘুমাইয়া আছে। যমুনা তাহাদের শিয়রে চুপি-চুপি আসিয়া বসিল। লণ্ঠনের মৃদু শিখায় তাহাদের করুণ, কৃশ মুখগুলি আজ তাহার কাছে বড় সুন্দর মনে হইল। পাপ দূরের কথা, তাহাতে এককণা দুঃখের আঁচড়ও সে দেখিতে পাইল না।

তাহাকে দিয়া দাদা যা-কিছু ঘৃণ্য কাজ করাইতেন যমুনা আপত্তি করিত না, সে নিজেই একদিন যাচিয়া চাকরানি হইতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই সব নিঃস্ব, নিরপরাধ সন্তানদের উপর এই কলঙ্ক আরোপ করিবার কী হইয়াছিল! কিন্তু তাহার জন্য, দাদার বিরুদ্ধে সে কাহার কাছে অভিযোগ করিবে?

যমুনা নিচু হইয়া প্রত্যেকের কপালে একটি করিয়া চুমু খাইল। খুকির কাঁথা বদলাইয়া, সকলের গায়ে ভালো করিয়া কম্বল টানিয়া দিল। সিতু আজ ফিরিবার সময় একটা ঢোল কিনিয়া আনিয়াছে, ঘুমাইতে গিয়াও তাহা সে গলা হইতে নামাইয়া রাখে নাই। যমুনা আস্তে-আস্তে তাহা খুলিয়া লইল, দেয়ালে এমন জায়গায় টাঙাইয়া রাখিল যাহাতে ঘুম ভাঙিয়াই তাহার চোখে পড়ে, কান্নাকাটি করিয়া দাদাকে না বিব্রত করিয়া তোলে! খুকিটারই কষ্ট হইবে—তা টুনু বেশ পাকা মেয়ে কোনোরকম বুঝ দিয়া রাখিবে আর-কি!

সিলিঙে লেপের ছালা টাঙাইবার জন্য লোহার একটা শক্ত হুক্ লাগানো আছে—যমুনা তাহারই নিচে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনের শাড়িটার আঁচল গোছা করিয়া টানিয়া দেখিল,—না, বেশ শক্তই আছে, ছিঁড়িবার সম্ভাবনা নাই।

খুকিটা ঘুমের মধ্যে কাঁইকুঁই করিয়া উঠিয়াছে, তাহার গালে মৃদু-মৃদু কয়েকটা চাপড় মারিয়া তাহাকে আবার শান্ত করিতে হইল। ছোট-ছোট দুইটি হাতের তালু ও পায়ের নরম পাতা সে চুমায় ভরিয়া তুলিল। সিতু, রাজু ও টুনুর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া লইল। ঘুমে-অগোছাল টুনুর চুলগুলি সরাইয়া মুখখানি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নতুন প্রথমভাগখানি সেদিন সে কিনিয়া আনিয়াছে, বালিশের তলায় হাত দিয়া দেখিল তাহা কাছে-কাছে রাখিতে সে ভোলে নাই। কাল সকালে উঠিয়া তাহারা কি খাইবে বাটি-বাটি করিয়া তাহা সে আগেই ভাগ করিয়া রাখিয়াছে—কোন্ বাটি কাহার তাহা লইয়া হয়তো আর উহাদের ঝগড়া হইবে না।

যমুনা জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তা-ঘাট নিশুতি, সমস্ত রাত থমথম্ করিতেছে। দূরে গ্যাসের অস্পষ্ট একটু আলো তাহার চোখে পড়ে—সে-আলোয়

কে যেন তাহাকে হাতছানি দিতেছে। আর কতক্ষণ পরেই তাঁহার সঙ্গে তাহার দেখা হইবে—তাহার স্বামী যেন কোথায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।

জানালাটা দিয়া ঠাণ্ডা আসিতে পারে,—কথাটা মনে হইতেই যমুনা জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। আবার সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শিশুগুলির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বুকে সে আঁচলটা পরাইয়া দিল, কিন্তু গলায় ফাঁসটা বাঁধিয়া ঝুলিয়া পড়িবার আগে—আর একবার, আর কতোবার যে তাহার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া চোথ বন্ধ করিয়া ফেলিতেছে তাহার আর শেষ নাই।

কিন্তু তাহাদের জন্য বৃথাই সে এতক্ষণ ভাবিতেছিল। দাদা তাহাদের জীয়াইয়া রাখিবার জন্য চমৎকার পথ পাইয়াছেন। তাহাদের জন্য তাহাকে আর ভাবিতে হইবে না।

ওহে সুন্দর

শ্রীরামেন্দু দত্ত

কত মন্দির-দ্বার খুলেছে তোমার
  সুন্দর কর-পরশে!
কত মঞ্জুল ফুল হয়েছে বাউল
  মুঞ্জরি' নব হরষে!
  ওহে সুন্দর!

কত দীর্ঘ যামিনী প্রভাত হয়েছে
  তোমারি কিরণে নাহিয়া—
কত চকোর মিটালো জ্যো'স্নার তৃষা
  তব মুখ পানে চাহিয়া!
  ওহে সুন্দর!

কত অশ্রুর ধারা মিলালো কপোলে
  হাস্য-মুকুতা রাখিয়া—
কত শূন্য হৃদয় ধন্য হইল
  তব প্রেম-রেণু মাখিয়া!
  ওহে সুন্দর!

কত জীবন ধরিয়া তোমারে স্মরিয়া
  এসেছি ধূলার ধরাতে
প্রিয়, তুমি মোর সাথে গোধূলি বেলাতে
  আসিয়ো গোধন চরা'তে!
  এসো সুন্দর!

এই ধূলামাখা দেহ ধন্য হইবে
  শ্রমজল যাবে শুকায়ে—
আমি যমুনার-কূলে ত্রিভুবন ভুলে
  বাঁশরী শুনিব লুকায়ে!
  ওহে সুন্দর!

মোর শ্যামলী ধবলী কোথা যাবে চলি'
  কুল-মান যাবে ভাসিয়া!
মোর প্রিয়-পরিজন ক'বে কুবচন,
  তুমি সুধু চেয়ো হাসিয়া!
  মম সুন্দর!

মোর গেহ সংসার হ'বে ছারখার
  দেহ হবে রোগ-দীর্ণ,
মোর শান্তির আশা নিভিবে সেদিন
  আয়ু হবে সংকীর্ণ
  ওহে সুন্দর!

মোর নয়নের তারা হবে জ্যোতিহারা,
  অন্তরে আঁখি ফুটিবে!
আর, সে গোপন-লোকে গোলোক-বিহারী
  তুমি ত আসিয়া জুটিবে?
  এসো—সুন্দর!

কামাখ্যা

শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ দেশের উত্তর-পূর্ব্বে কামরূপ [১]; কামরূপে কামাখ্যা। পুরাণে আছে, দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে সেই মৃতদেহ বিষ্ণুচক্রে একান্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় এবং উহার মধ্যে এক অংশ মহামুদ্রা কামাখ্যায় পড়িয়াছিল [২]। এই কারণেই হিন্দুদের বিশেষতঃ শক্তি উপাসক বাঙ্গালী ও আসামীয়গণের কামাখ্যা প্রধানতম তীর্থ এবং তন্ত্র অনুসারে সাধনার সর্ব্বোত্তমোত্তম ক্ষেত্র। প্রাচীন বাঙ্গলার রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত ও পরবর্ত্তী কালের সেনরাজগণের মন্ত্রসাধনায় 'কামাখ্যা' নাম বিজড়িত; যোগীরাট্ পূর্ণানন্দ কামাখ্যা মণ্ডলে বসিয়া জগৎকে ষট্চক্র নিরূপণের পন্থা দেখাইয়া গিয়াছেন; অবধূতাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কামাখ্যায় অবস্থান কালেই শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; কামাখ্যা দেবীর বর লাভ করিয়াই দেবীবর ঘটক তৎকালীন বাঙ্গলার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারগ হইয়াছিলেন। কামাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষতঃ চারিখানি তন্ত্রের নাম পাওয়া যায়,—কামাখ্যা দর্পণ, কামাখ্যা প্রয়োগ, কামাখ্যা তন্ত্র ও কামরূপ দীপিকা। এতদ্ভিন্ন, যোগিনী তন্ত্রেও বিশদভাবে পূজাদির উপদেশ আছে। পুরাণাদির মধ্যে কামাখ্যা সম্বন্ধে কালিকা-পুরাণই শ্রেষ্ঠ।

কামাখ্যা বহু প্রাচীন পীঠস্থান। গভীর প্রাগৈতিহাসিকযুগের কোনও সময়ে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্য (কামাখ্যা মণ্ডল) গঠিত হইয়াছিল [৩]। একদা মহীরঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পর হাটকাসুর,—সম্বরাসুর ও রত্নাসুর রাজত্ব করিয়াছেন [৪]। অনন্তর বিদেহ-রাজ জনকের সমকালে কামরূপে কিরাতপতি ঘটোৎকচের সংগ্রামে রত্নাসুর নিহত হইলে [৫] শ্রীবিষ্ণুর সাহায্যে ক্ষত্রিয় নরকাসুর [৬] ঘটোৎকচকে বধ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ অধিকার করেন [৭]। নরকাসুর শ্রীবিষ্ণুর মতানুসারে কামাখ্যা দেবীর অর্চনা করিতেন এবং উত্তর ভারত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া কামাখ্যা-মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; পরন্তু, এই মঠ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ক্ষত্রিয় নরক গত হইবার আনুমানিক তিন শত বৎসর পরে [৮] বিপ্রবংশীয় নরকাসুর কামরূপের রাজা হন। ইঁহার জন্মকথা আসাম রাজবংশাবলীতে আছে [৯]। বিপ্র নরক রাজ্য লাভ করিবার পর কামাখ্যা ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং প্রতিদিন পূজাদির সময় মন্দির-দ্বারে স্বয়ং দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেন। কিন্তু, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত মদমত্ত হইয়া অদিতির কুণ্ডল ও হিমালয় হইতে ষোড়শ সহস্র কুমারী হরণ করায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন [১০]। ইঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ মন্দিরগামী চারিটি পথ [১১] এবং গৌহাটীর নিকটে "নরকাসুর পর্ব্বত"

---

১ কামরূপের বিভিন্ন নাম:—টামেরা (টেলেমী); কিয়া মা লিউ ফো (হিয়নসং); কামরু (আইনই আকবরী) এবং কামরূড্ (তপকৎ ই নসিরী)।

২ বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্র।

গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয়ের আসাম বুরঞ্জীতে আছে—"পুরাণতো কামরূপর ত্রিকোণাকৃতি বুলি লেখিছে। ইয়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেক আছে। আরু যোগী সকলর যোগ অভ্যাসর যে ই ঠাই ইয়ার কোনো সংশয় নাই। এনে স্বাভাবিক নিভৃতঠাই মহাপীঠ অর্থাৎ তপস্যার অতিশয় উপযুক্ত স্থান বুলি প্রসিদ্ধ হইছে। * * *। সেই কারণে তন্ত্রত অত্যুক্তিরূপে লেখিছে বোলে আন ঠাইত দেবী বিরল, কিন্তু কামরূপত হলে ঘরে ঘরে। কামরূপর আকৃতির নিমিত্তই ইয়াক মহামুদ্রা বা গুপ্তপীঠ বুলি কইছে।"

(তন্ত্র-পুরাণাদি ও তবাকৎ ইনসিরী অনুসারে কামরূপ ত্রিকোণাকৃতি)।

৩ Assam By Wm. Robinson.

৪ আসাম বুরঞ্জী; History of Assam—Gait.

৫ Cal. Review, Oct. 1911: কালিকা-পুরাণ।

৬ রাজা জনকের পালিত পুত্র; কালিকাপুরাণে বিভিন্ন দুই নরকের চরিত্র একত্র সংমিশ্রণে একই নরক ধৃত হইয়াছে।

৭ যোগিনী তন্ত্র ১২ পটল।

৮ "বরুণালয়ে কামাখ্যা" প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, দুই নরকের মধ্যে অন্যূন ১৩ পুরুষের কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

৯ Assam Govt. Colln. No, 4: রাজা উপেন্দ্র সিংহের সঙ্কলিত "রাজবংশাবলী" "ইকথা থাকোক স্থমরে প্রস্তাবর গতি। বরাহর অংশে ব্রাহ্মণর উৎপতি॥ পৃথিবীর অংশে সতী ব্রাহ্মণর ঘরে। কন্যাজায়া জন্মিলাহা পায়া দেব বরে॥ বিষ্ণুব্রত ব্রাহ্মণেয়ো বরক সাদরি। জগন্নাথ দ্বিজপুত্র মানিলাহা বরি॥ নামত সে বিষ্ণুদেব কন্যা বিষ্ণুমায়া। রাসিগণ ঠারা বিহা দিল দেবজায়া॥ দশমাস গর্ভ ধরি করিয়া সাদর। পুত্র এক জন্মাইলা মহাভয়ঙ্কর॥ নামত নরকাসুর জন্মিলান্ত ভালে॥ কামরূপ রাজা ভৈলা নরক ঈশ্বর। ষোড়শ হাজার কন্যা গৃহর ভিতর॥ পুত্র আছিল এক তান নাম ভগদত্ত॥

(History of Kamrupa By N. Vasu)

১০ শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু, কালিকা প্রভৃতি পুরাণ।

১১ এই পথগুলি সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে:—কামাখ্যার সৌন্দর্য্যে নরক মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার

অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে নরকাসুরের বাসভবন ছিল [১২]। এতৎ কালেই বশিষ্ঠ মুনি কামাখ্যা মণ্ডলে উগ্রতারা দেবীর উপাসনা করিতেন [১৩]। একদিন তিনি কামাখ্যা দর্শনে যাইবার সময় নরক কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় কামাখ্যা দেবী ও নরকাসুরের প্রতি শাপ বাক্য প্রয়োগ করেন এবং তৎফলে কামাখ্যা মন্দির শিলাপাতে ভাঙ্গিয়া যায় [১৪]। বিপ্র নরকের সমসাময়িক বশিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সমকালীন সুতরাং ইনি রামায়ণের মহর্ষি বশিষ্ঠ নহেন।

বিপ্র নরকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইন্দ্রসখা ভগদত্ত রাজা হন। ভগদত্ত শ্রীসম্পন্ন প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য লাভ করিয়া তথায় আগমন করিয়া প্রভূত বিনয় সহকারে তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ তিনি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপরিপত্তনের আধিপত্যও দিয়াছিলেন এবং যাহাতে উত্তর কালেও তাঁহার বংশীয়গণ প্রাগ্‌জ্যোতিষের আধিপত্য করেন তাহারও বিধান করিয়াছিলেন [১৫] ॥ ৬ ॥ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন, 'উপরিপত্তন' দ্বারা প্রাগ্‌জ্যোতিষের পার্শ্বস্থ উচ্চ (পর্ব্বতময়) ভূমিভাগও সূচিত হইতে পারে [১৬]। কিন্তু, প্রাগ্‌জ্যোতিষের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতময় ভূমিভাগ পূর্ব্বকাল হইতেই কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল, সুতরাং মনে হয়, 'এই পদটি দ্বারা পর্ব্বতোপরি অধিষ্ঠিত কামাখ্যা দেবীই উপলক্ষিত হইয়াছেন। মহাদেব কেবলমাত্র ভগদত্তকেই 'উপরিপত্তনের' কিনা কামাখ্যার আধিপত্য ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ কামাখ্যা মহামন্ত্ররূপ ঐশ্বর্য্য দিয়াছিলেন (মন্ত্র সাধনার অধিকার দিয়াছিলেন)। মন্দির বিনষ্ট হইলে কোনও এক ব্রাহ্মণ রাজা তাহার সংস্কার করেন [১৭], সম্ভবতঃ কথিত অধিকার লাভ করিয়া বিপ্রবংশজাত ভগদত্তই তাহা করিয়া থাকিবেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সাগরোপকূলবাসী কিরাত, চীন প্রভৃতি বহু সৈন্য সমাবৃত হইয়া পাণ্ডবের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিলে অর্জ্জুনের শরে ভগদত্তের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। জনশ্রুতি আছে, তাঁহার শ্রাদ্ধ-বাসরে বাহাত্তর জন সোয়ালকুচী নিবাসী ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছিলেন [১৮]।

ভগদত্ত হইতে পুষ্যবর্ম্মার রাজত্বকাল (২৭৫ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত কিরাত, কোক, মেছ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সহিত নরক বংশের পুনঃপুনঃ সংঘর্ষে ও গুহ্যাতিগুহ্য তন্ত্রধর্ম্মের প্রাধান্য বশতঃ সকল বৃত্তান্তই লুপ্ত রহিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে দেব্যাশর নামে এক রাজা ছিলেন। কোনও কোনও পুরাতত্ত্ববিদের মতে দেব্যাশর মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া যোগিনীতন্ত্র রচনা [১৯] এবং তদনুযায়ী কামাখ্যা পীঠের নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদির ব্যবস্থা করান [২০]। আন্তর্দ্দেশিক মাৎস্য ন্যায়ে প্রাচীন প্রথা উপেক্ষিত হওয়ায় দেব্যাশর এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। মতান্তরে, যোগিনী তন্ত্র নিতান্ত আধুনিক রচনা। পরন্তু মূল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য সুতরাং তাহার একাংশ মাত্র দেখিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এখনকার গ্রন্থখানির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদিরও অভাব নাই। কামাখ্যার চিরন্তন ধর্ম্মের মূল, শক্তিবাদ এবং কামাখ্যার মহামুদ্রা জগতের মাতৃত্বজ্ঞাপক। অতি প্রাচীন কালে মানব একই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনধারণের চেষ্টায় ঐশী শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল এবং তৎকালেই জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাজাত অভিজ্ঞতা অনুসারে চিন্তাধারা প্রবর্ত্তিত হইয়া রহস্য-শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছিল। যোগিনী-তন্ত্রে তারাকল্প, উত্তর, ফেৎকারিণী, সরস্বতী, নীল প্রভৃতি আগম-নিগমাদির উল্লেখ থাকায় এই গুলিকে যোগিনীতন্ত্রের পূর্ব্বেকার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ ললিত-বিস্তরে তন্ত্রের নিন্দাবাদ তন্ত্রের প্রাচীনত্বই নির্দ্দেশ করে। রাজা অশোকের সময়ে (২৪০ খৃঃ পূঃ) তন্ত্র প্রচলিত ছিল [২১]। তাহারও বহু পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সমকালীন কাশ্মীররাজ গোণন্দের সভাপণ্ডিত 'শিবাগমে'র ভাষ্য লিখিয়াছিলেন [২২]। সুপ্রাচীন এসিরিয়ন, পণি ও বেবিলনিয়নগণের মধ্যে প্রকারান্তরে হোমানুষ্ঠান ও বলিপ্রথা এবং ধর্ম্মের সহিত ইন্দ্রজাল বিদ্যা জড়িত ছিল [২৩]। অতি প্রাচীন কালের মানবগণও ধর্ম্মের সহিত ইন্দ্রজাল বিদ্যার সাধনা করিত [২৪]। ক্রম-বিকাশের সহিত আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

২

বর্ম্মা-বংশের শেষ রাজা ভাস্কর শিবভক্ত ছিলেন। চৈনিক ভ্রমণ হিয়নসং ভাস্করের নিমন্ত্রণে কামরূপে আসিয়া সকলকেই হিন্দু, দেবভক্ত,

প্রস্তাব করায় কামাখ্যা বলিয়াছিলেন যে, যদি রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে চারিটি পথ ইত্যাদি করাইয়া দিতে পার তাহা হইলেই আমি বিবাহে সম্মত আছি। বলশালী নরক তাহাই করিতেছিল এমন সময় একটি মায়া-কুক্কুট প্রাতঃকালীন ধ্বনির দ্বারা রাত্রি শেষ জ্ঞাপন করায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই।

১২ (Hist. of Asam—Gait)।

১৩ রুদ্রযামল, ব্রহ্মযামল ইত্যাদি।

১৪ যোগিনী-তন্ত্র। এই তন্ত্রমতে—মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার তিন শত বৎসর পরে বিনষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা বিপ্র নরকের কালেই ঘটিয়াছিল। ইহা দ্বারা বশিষ্ঠ শাপেরও সার্থকতা রক্ষা হয়।

১৫ কামরূপ শাসনাবলী ধৃত বনমালের তাম্রশাসন।

১৬ কামরূপ শাসনাবলী, পৃষ্ঠা ৬৬ পাদটীকা।

১৭ যোগিনী-তন্ত্র, পূর্ব্বার্দ্ধে ১২ পটল।

১৮ Dist. Gazetteer.

১৯ J. A. S. B. Vol. No IV 1851.

২০ আসাম বুরঞ্জী, History of Assam Gait.

২১ History of Religion in Ancient India—M. Anezaki.

২২ Principles of Tantra Part 1—A. Avalon.

২৩ Myths & Legends of Babeylon & Assoyria—Mackenzie. History of Kamrupa—N. Vasu.

২৪ Myths of Pre-Hellenic Europe.--Mackenzie.

বলি-পূজাদিতে অনুরক্ত এবং বৌদ্ধধর্ম্মে অনাসক্ত দেখিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কাল হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে কামরূপে একটিমাত্রও সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয় নাই [২৫]। তৎকালে কামাখ্যার প্রাচীন ধর্ম্মই বলবৎ ছিল; কিন্তু কামরূপ রাজ্য উপর্য্যুপরি বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকিলে রাজধানী ক্রমান্বয়ে এক স্থান হইতে অপর স্থানে অপসৃত হওয়ায় ক্রমশঃ কামাখ্যার দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছিল। তথাপি, কামরূপরাজাবলী [২৬] হইতে জানিতে পারা যায়, "পুরুষানুক্রমে কামরূপ রাজগণ কামাখ্যা দেবী ও তদীয় ভৈরবের পূজা করিতেন। যেখানেই রাজধানী হইত সেইখানে ইঁহাদেরও স্থাপনা হইত। তাই ইঁহারা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে হারূপেশ্বরে, তথা হইতে দুর্জ্জয়ায় এবং অবশেষে কামরূপ বা কাম্‌তা নগরে নীত হইয়া অধিষ্ঠাতৃ দেবীরূপে পূজিত হইয়াছেন।" আদি পীঠস্থান, কামাখ্যা, ও রাজধানীর দূরত্ব বশতঃ নিজ কামাখ্যার পূজা অপরের দ্বারা সাধিত হইত। ফলতঃ তন্ত্রের অনুশাসনবাধ্য ক্রিয়া-কলাপ কিছুই প্রকাশ পাইত না।

বনমালাদেবের শাসন হইতে জানা যায়, তিনি হাটকেশ্বর শিব মন্দিরের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন; শ্রীমদ্ভাগবত [২৭] ও দেবীভাগবতের [২৮] মতে দ্বিতীয় পাতালে হাটকেশ্বর শিব এবং তৃতীয় পাতালে বলিরাজের রাজ্য। বলিপুত্র বাণের রাজধানী ছিল শোণিতপুর [২৯], আধুনিক দিনাজপুরের অন্তর্গত দেওকোট [৩০]। বাণের অন্তরঙ্গ বন্ধু নরকাসুর এবং বাণরাজ্যের সন্নিধানে, দ্বিতীয় পাতালে, ভব ও ভবানী সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন। দ্বিতীয় পাতালের রমণীগণ পুরুষকে হাটক (ধুতুরা?) রস পান করাইয়া বশীভূত ও তাহাদের সহিত যেচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিত; আশ্চর্য্যের বিষয়, কামাখ্যা সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ আছে—'লোকে কামাখ্যা গেলে ভেড়া হয়ে যায়'। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রাচীন কালে হাটকাসুর নামে এক রাজাও ছিলেন; হাটকেশ্বর শিব তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কি না বলিবার উপায় নাই; এবং দ্বিতীয় পাতালের রমণীগণের সহিত কামাখ্যার প্রবাদটির কোনও সম্পর্ক আছে কি না তাহাই বা কে বলিবে?

কামরূপের ম্লেচ্ছরাজগণ সকলেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও শিবের উপাসনা করিতেন [৩১]। রাজা হর্জ্জর বর্ম্মা (৮০০—৮৩০ খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতির শাসনাদি ইহা সমর্থন করে। হর্জ্জরের পুত্র বনমালাদেবের পর হইতে কয়েকখানি শাসনে 'আঞ্জী' চিহ্ন আছে। ইহা দ্বারা তাঁহাদের তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞাপিত হয়। সৃষ্ট্যাদৌ আবির্ভূত শক্তি-বিশেষের নাম 'ব্যাপিকা', বক্র রেখারূপে অঙ্কিত আঞ্জী এই শক্তিরই চিহ্ন বিশেষ:—যথা, ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে, "ততো হি ব্যাপিকা-শক্তিরাঞ্জীতি যাং বিদুর্জ্জনাঃ।" তন্ত্র-বাধ্য শক্তি-উপাসকের সকল লক্ষণই কামরূপের রাজগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যতঃ তাঁহারা শৈব; অথচ তাম্রশাসনাদিতে শিবের সহিত শ্রীবিষ্ণুরও গুণকীর্ত্তন রহিয়াছে। তন্ত্র নির্দ্দেশ করেন, "অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবা সভায়াং বৈষ্ণবা মতা নানা-রূপাধরা কৌলা বিচরন্তি মহীতলে"॥

কামাখ্যার মন্দিরে বলিদানাদি বরাবরই প্রচলিত আছে। ঘন-রামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, গৌড়েশ্বর নিজ ভাগিনা বলশালী লাউসেনকে প্রকারান্তরে বধ করিবার ইচ্ছায় কামরূপ জয়ের অছিলা করিয়া লাউসেনকে তথায় পাঠান এবং কামরূপরাজকে 'সঙ্কেত সমাচার' দেন,—"আমার ভাগিনা বলি না করো অপেক্ষা। বলিদান দিয়া তারে পূজিবে কামাখ্যা॥" লাউসেনের সঙ্গে 'যমের দোসর' সম কালুডোমও গিয়াছিল; কাল্‌ ভেক বেশে মন্দিরে পৌঁছাইয়া প্রার্থনা করিল—'দিবসেক পুরী যদি ছাড় ভগবতি। কলিকালে থাকে ধর্ম্ম পূজার পদ্ধতি॥" তাহার পরই, "ভাঙ্গিয়া পড়িতে চূড়া চমৎকার পড়ে।" ইহা হইতে দুইটি বিষয় অবগত হওয়া যায়, প্রথম—বলিদানাদি সহ কামাখ্যার পূজা এবং দ্বিতীয়তঃ মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথায় মন্দিরের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের পালরাজগণের কোনও ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল।

৩

প্রতাপশালী কোচবংশীয় রাজগণ কিছুকাল কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন] কোচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ গৌড়, নদীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া কামাখ্যা মন্দিরের পুনরুদ্ধার করেন। ইহা গঠনের সময় প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের সহিত (মতান্তরে ইষ্টক; প্রস্তর-নির্ম্মিত ইষ্টক হইতে পারে) এক রতি ওজনের স্বর্ণ দেওয়া হইয়াছিল [৩২]। ইহার পরই ধর্ম্মত্যাগী ও ধর্ম্মদ্বেষী হিন্দু রাজীব লোচন রায় (কালাপাহাড়) [৩৩] বিদেশীয় তুষ্টি বিধানে কামাখ্যা মন্দির ভূমিসাৎ করে। এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ভগ্নস্তম্ভ, প্রস্তর খচিত বিবিধ ভগ্ন মূর্ত্তি, বিকৃত প্রস্তর রাশি প্রভৃতি অদ্যাপি কামাখ্যার চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। এইগুলি হইতে উক্ত মন্দিরের আকার ও আয়তনের এবং ইহা গঠনে কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহার আভাস পাওয়া যায়। কালাপাহাড়ের

২৫ Beal's Buddhist Records of Western World Vol II.

২৬ কামরূপ শাসনাবলী—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ।

২৭ ৫ অংশ ২৪ অধ্যায়।

২৮ ৮ অংশ ১৯ অধ্যায়।

২৯ বিষ্ণু পুরাণ ৫—৩৩।

৩০ History of Kamrupa—N. Vasu.

৩১ History of Assam—Gait.

৩২ আসাম বুরঞ্জী—গুণাভিরাম বড়ুয়া।

৩৪ আসামীর ভাষায়—পোড়া লুঠার, পোড়া কুঠার, কালা যুঠান ও কাল যবন।

৩৩ History of Assam—Gait.

প্রত্যাগমনের পর বিশ্বসিংহের উপযুক্ত পুত্র রাজা নরনারায়ণ পিতৃ প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর গঠিত ভিত্তির উপর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করান। এতদুপলক্ষে কামাখ্যার মহাপূজার আয়োজন হয় এবং একই দিনে নব নব তাম্রাধারে রক্ষিত এক শত চল্লিশটি সদ্য উৎসর্গিত রক্তাপ্লুত নর-শির দেবীর প্রীতি কামনায় নিবেদন করা হইয়াছিল ৩৪। এই কালে কামরূপে 'ভোগী' নামে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহারা বলিরূপে স্বেচ্ছায় জীবন দান করিত ৩৫। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হ্যায়ে সাহেব সাদিয়ার নিকট এক গৃহস্থের কথা জানিতেন যাহারা বংশপরম্পরায় বলি উদ্দেশ্যে আত্মদান করিয়াছে। রাজা নরনারায়ণের স্থাপিত মন্দির ও তদনুসারে প্রতিষ্ঠিত কামাখ্যা-মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান। মন্দির স্থাপনার সময় একখানি প্রস্তর-ফলকও মন্দির গাত্রে সংরক্ষিত হইয়াছিল (বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল না) নরনারায়ণের কালে কেন্দুকলাই নামে একজন ব্রাহ্মণ সাধক নিত্য সায়ংকালে কামাখ্যাদেবীর ভজনা করিত এবং এই গীত শুনিবার জন্য ভগবতী তাঁহার সম্মুখে নিত্যই প্রকাশ পাইতেন ৩৬। নরনারায়ণ এই কথা শুনিয়া দেবীর সাক্ষাৎদর্শন লাভার্থে ঐ ব্রাহ্মণের সন্তোষ বিধান করতঃ একদিন যথাসময়ে মন্দির গবাক্ষের ধারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিয়মিত ভাবে পাঠ আরম্ভ করিবামাত্রই দেবী আবির্ভূত হইয়া কেন্দুকলাইকে বিনাশ করেন এবং কোচবিহার রাজবংশের প্রতি পুনরায় কামাখ্যা পীঠ দর্শনের নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেন্দু কলাইর মূর ছিঙ্গার দরে মুর ছিঙ্গিব ৩৭।" তদবধি কোচবিহার রাজবংশের কেহই কামাখ্যা দর্শনে যান না।

আবুল ফজল কামরূপকে কোচরাজগণের অধীন এবং কামরূপবাসী-মাত্রকেই ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়াছেন। তাঁহার লিখিত আইনই আকবরী গ্রন্থে ৩৮ কামরূপ সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের গল্প আছে। কয়েকটির সারাংশ অত্র উদ্ধৃত হইল ; (১) বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণে ইহারা মন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে বশীকৃত লোক ও চরমদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী-গণকে গৃহের স্তম্ভ প্রাচীরাদি রূপে ব্যবহার করে (পরন্তু শিয়ার উল মুতাক্ষরীণের লেখক নিজে অনুসন্ধান করিয়া, এই বিষয়ের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করতঃ বলিয়াছেন যে কামরূপে ষট্‌কর্ম্মাদির যথেষ্ট প্রচলন আছে। (২) তাহারা অস্ত্র সাহায্যে পূর্ণগর্ভস্থ শিশু বাহির করিয়া তাহার অঙ্গচালনা হইতে দেশের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করে। (৩) এক জাতীয় বৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার কোনও একটি শাখা কাটিলেই সুমিষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায়। (৪) এই দেশে একপ্রকার কাণ্ডহীন আম্রলতা হয়। (৫) এক জাতীয় পুষ্পের উল্লেখ আছে যাহা বৃন্তচ্যুত হইবার পর দুই মাস কাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক রূপ ও গন্ধযুক্ত থাকে।

অতঃপর কামাখ্যামণ্ডল হস্তান্তরিত হইলে রাজা রুদ্রসিংহ প্রাচীন ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটস্থ মালিপোতা গ্রামনিবাসী শাক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যকে কামাখ্যায় লইয়া যান, তথাপি তিনি নিজে দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা করেন নাই। এই কারণে ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বগৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন ; কিন্তু সেই সময়ে আকস্মিক ভূকম্পে কয়েকটি মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়া পড়ায় রুদ্রসিংহ ভীত হইয়া কৃষ্ণরামকে যথোচিত সম্মান ও সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক নিজ বংশধর ও স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করান ৩৯। রুদ্রের পুত্র শিবসিংহ কামাখ্যা মন্দিরের সম্পূর্ণ ভার গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করেন ; তদবধি কৃষ্ণরাম স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ—"পার্ব্বতীয় গোঁসাই" নামে অভিহিত। শিবসিংহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবিধ সৎকার্য্যের দ্বারা ধর্ম্ম সজাগ রাখিয়াছিলেন ; তাঁহার স্থাপিত কয়েকটি মন্দিরের নাম,—উগ্রতারা, উমানন্দ, অশ্বক্রান্তা, রুদ্রেশ্বর, অগ্নিবাণেশ্বর, জনার্দ্দন ইত্যাদি। এতৎকালেই সর্ব্বপ্রথম গড্‌উইন, লিষ্টার ও মিল নামে তিনজন ইংরাজ আসাম ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কামরূপে গিয়াছিলেন।

শিবসিংহের পর কামাখ্যা মন্দির-সংলগ্ন বৃহৎ দালানটি গঠিত হয়। কলিকাতা রামবাগান নিবাসী স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ দালানের মধ্যে একখানি প্রস্তর-ফলক ও একখানি তাম্রশাসন দেখিয়াছিলেন ৪০। প্রথমখানি হইতে জানা যায় যে রাজা রাজেশ্বরসিংহের আদেশে তাঁহার প্রতিনিধি 'বড় ফুকন' দশবম—১৬৮১ শকে এই দালান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাম্রশাসনখানির কিয়দংশ পাঠ এখানে প্রদত্ত হইল :—

"ভূপাল শ্রেণি-মৌলি প্রকর মধুকরাকীর্ণ পাদারবিন্দঃ কামাখ্যা পাদপদ্মার্চ্চনজনিত মহোদীপ্ত শুদ্ধান্তরাত্মা। * * * * ॥ লক্ষ্মী সিংহাখ্যো ভূপতিঃ সহজগুণনিকর গ্রাম বিশ্রামধামাধীরস্তাদুত্বরস্রো নিখিলগুণনিধির্ন্নাস্তিনাসীন্ন ভাবী ॥ * * * * ॥ অঙ্গীকৃত্যতদাস লক্ষক বলিং দাতুঃ সুধীরাগ্রণী কামাখ্যা প্রমোদাৎকটায় হৃদয়ং প্রাধাদিবাং নাশনে প্রাপ্যং লক্ষবলিং শুভায় মহতে শ্রীস্বর্গনারায়ণঃ শক্তঃ সাধয়িতুং প্রতিশ্রুতমিদং * * * ॥ শ্রীমান্ বড় ফুকণোঽস্য পুরোং নাথাভিধানং ক.র্ত্তি প্রাক্‌জ্যোতিপুর মেত্য ছাগমহিষৈঃ পারাবতা স্কৈর্ব্বলিং দৈবৈর্লক্ষ-মিতং বিবিচ্যহিত * * ॥ সদাকামাখ্যাং সততং নিধায় হৃদয়ে নিত্যাং সুরেঃ সেবিতাং বর্ণাকাশ মণিক্যপাকরমিতেশাকে শুভে হৃদ্রং সদা প্রবধা নদীনং যলক্ষক বলিং প্রাদাপয়েৎ ফুকণঃ। (১৭০৪)।" ইহা দ্বারা সাধারণকে জানান হইয়াছে, ১৭০৪ শকে রাজা গৌরীনাথের পুত্র লক্ষ্মীসিংহ শত্রুনাশের উদ্দেশ্যে কামাখ্যাদেবীর প্রীতি কামনায় এক শত সহস্র জীব বলি দিবার অঙ্গীকার করেন এবং তদনুসারে বড় ফুকণের ব্যবস্থায় তাহা সম্পাদিত হইল।

কামাখ্যা মন্দিরের নিকটেই ইষ্টক নির্ম্মিত কালীমন্দির। ইহার যাবতীয় ইষ্টক মুর্শিদাবাদ হইতে আনীত ৪১। কামাখ্যার পূর্ব্বোত্তরে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ভুবনেশ্বরী মন্দির। প্রবাদ আছে, এক সময় এস্থলেও নরবলি প্রচলিত ছিল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কামরূপ ইংরাজগণের শাসন-বাধ্য হয়।

---

৩৪ ——Aquoted form Haft Iqlim.
৩৫ History of Upper Assam Shakespeare.
৩৬ আসাম বুরঞ্জী—গুণাভিরাম বড়ুয়া।
৩৭ বিশ্বকোষ।
৩৮ Jarretts T[illegible]nslation Vol II
৩৯ History of Assam—Gait.
৪০ Old Relics in Kamrup.
৪১ Old Relics in Kamrup By Late J. C. Dutt.

স্মরণী

শ্রীবিভু কীর্ত্তি

তখন আমার অশোক শাখায়
রং শুধু ধরিয়াছে,
একা পড়েছিনু গহন আঁধারে
তুমি ত ছিলে না কাছে,—
নীরবে নিভৃত বনের ছায়ায়
ছিনু আপনার স্বপন মায়ায়,
আনন্দহীন শূন্য আকাশ
মুখপানে চাহিয়াছে।
স্বপন!—সে ছিল বিভীষিকা মোর
ভোরের আলো ছায়ায়,
মেঘ-সুনিবিড় আকাশে অশনি
চমকি মিলায়ে যায়—
হিংস্র দীপ্তিচ্ছটায় তাহার
হারানো জীবন করে হাহাকার
ম্লান গোধূলির আঁধার মিলায়
গোধূলির ম্লানিমায়!
একাকী অচেনা পৃথিবীর পানে
স্তব্ধ চাহিয়া থাকি—
শুনিতে চেয়েছি কেহ বা কোথাও
আমারে ডেকেছে নাকি।
মর্ম্মরধ্বনি পাতায় পাতায়
কতদূরে গিয়ে বনেই মিলায়,
সে যেন আমার বুকের আঁধারে
শুধু অপূর্ব্ব ফাঁকি!
রং ধরেছিল কুসুম শাখায়
শাখা রহিল না বাঁচি,
কতদিন গেল তারপরে—একা
আমি তবু রহিয়াছি!
ফুল ধরে নাক—রং গেছে মিশে
এক অখণ্ড বেদনার বিষে
—সেই সনাতন আশা বিশ্বাসে
তথাপি চাহিয়া আছি।

হে মোর সূর্য্য! তুমি ত রয়েছ—
তথাপি এল না দিবা,
মোর ফসলের ক্ষণ চলে' গেছে
আশা আছে আর কিবা—?
বনের আড়ালে তরুবীথিকায়
দিনের আলোক ক্রমে মিশে যায়
আঁধার ক্রমেই মিছে হ'য়ে ওঠে
শেষ আশ্বাস বিভা।
তবু মনে করি—জীবনে আমার
হইতে পারিত না কি—
শুধু একটুকু আলোর অভাবে
যা কিছু রহিল বাকী?
আমারি নগ্ন শাখার আড়ালে
ফুটিতে পারিত নাকি কোন কালে
ফিরাতে যদি এ জীবনের পানে
তোমার আলোর আঁখি!
আমার অশোক তরুর ছায়ায়
ঝরিল যে ফুলগুলি
আঁধারের মাঝে স্বপনের মত
চেয়ে থাকে মুখ তুলি,—
মনে মনে তারা কত কথা কয়,
"—ঝরেছি আমরা এই শেষ নয়,
ঝরিব আবার—এই ত জীবন—
মোদের যেয়ো না ভুলি!
"ফুটি নাই বটে গন্ধে বরণে
তোমার শাখার বুকে—
তোমারি শুষ্ক পাতার মাঝারে
তথাপি ত আছি সুখে—
তুমি স্নেহভরে চাহিবে যখনি
আমিও জাগিয়া উঠিব তখনি,
মোরা বিবর্ণ—ব্যর্থ মুকুল
ভুলি নাই বন্ধুকে।"

উদয়-পথের সহযাত্রী

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

(৩)

আমাদের এবারের শফরটা মাত্র দুই মাসের জন্য, কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকটি নূতন দেশ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। তা, ছাড়া আগের প্রায় সমস্ত ভ্রমণ মোটরবাসে হয়েছিল, এবারে ট্রেণে, মোটর বোটে এবং ষ্টীমারে।
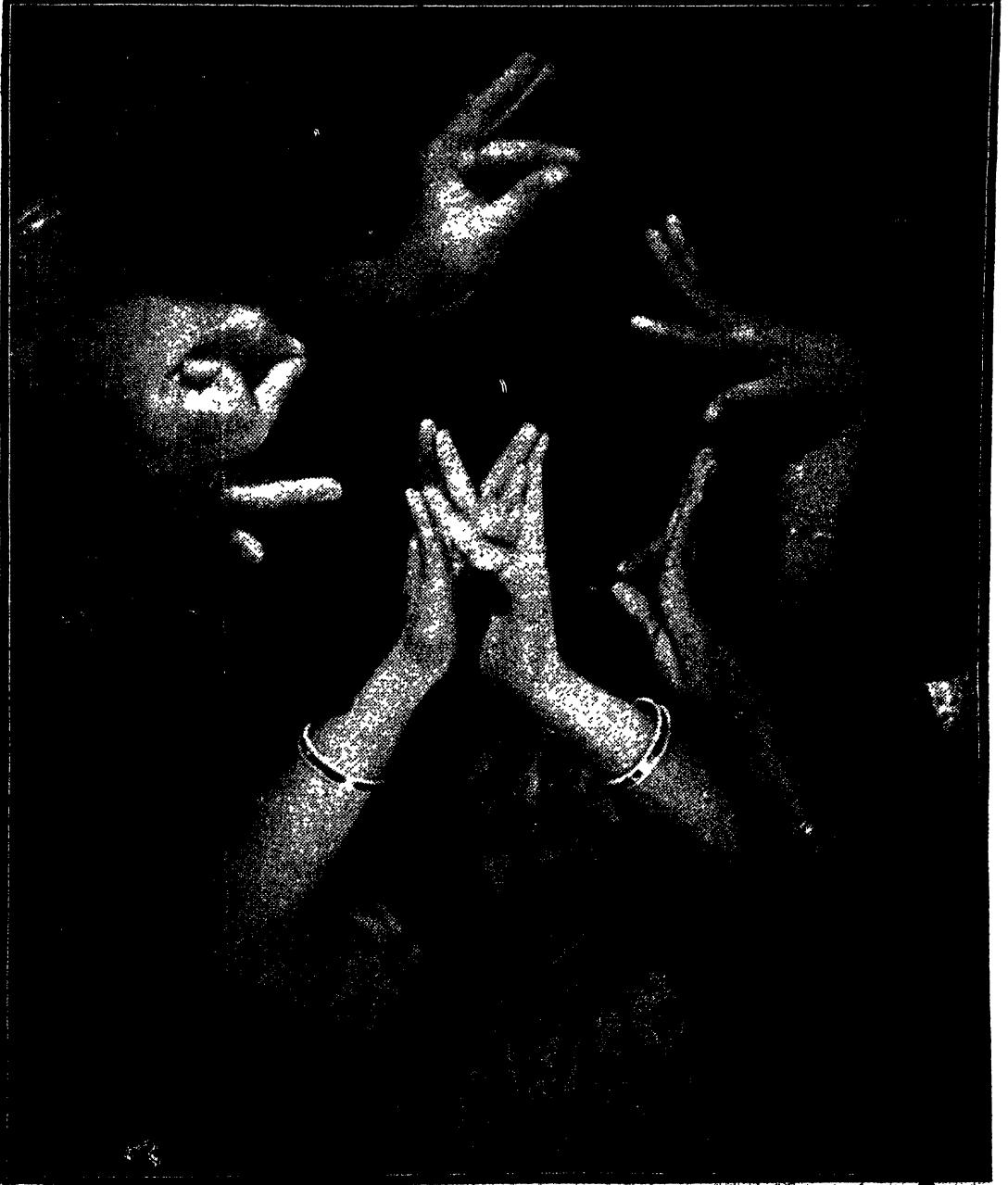
কয়েকটি মুদ্রা (উদয়শঙ্কর, মীনা, অমলা নন্দী)

২৪শে মে ভোরবেলা আমরা রওনা হলেম ট্রেণে প্যারী থেকে হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ড) এর রাজধানী আমষ্টার্ডামের উদ্দেশে। নানা দেশের ট্রেণযাত্রায় অনেক রকম সুবিধা ও অসুবিধা আছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনায় এখানকার সর্ব্বত্র ট্রেণ-সিষ্টেম্ যে খুবই উন্নত তা নয়—অবশ্য স্বাধীন দেশের সব বিষয়ে অনেক রকম সুবিধা আছে—তাছাড়া জন-সাধারণের সুবিধা অসুবিধা বা অভাব অভিযোগের দিকে এদেশের কর্ত্তৃপক্ষের আমাদের দেশের কর্ত্তাদের মত উদাসীন থাকবার উপায় নেই। ফ্রান্সে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর অনেক তফাৎ। তার মধ্যে প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য কোন রকম রেস্তোরঁা-কারের বন্দোবস্ত নাই। এখানকার রেল ষ্টেশনে খাবার জিনিষ বা চাএর ফেরীওয়ালাও বড়-একটা পাওয়া যায় না—কাযেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ট্রেণে উপবাস ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী বা অন্য দেশে এ অসুবিধা নেই—সে সমস্ত দেশে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর জন্য পৃথক্ রিফ্রেস্‌মেণ্ট-কারের বন্দোবস্ত আছে। ট্রেণ যেই ফ্রান্সএর সীমানা অতিক্রম করে তখনই অন্য দেশের রেস্তোঁরা-কার জুড়ে দেওয়া হয়; অর্থাৎ গাড়ী যে দেশের ভিতর দিয়ে যাবে সেই দেশেরই রেস্তোঁরা-কার ঐ গাড়ীর সঙ্গে থাকা নিয়ম। একবার মিলানো (ইটালী) থেকে বার্লিনে যাচ্ছিলাম—পুরো ২৪ ঘণ্টার রাস্তা। আমরা রেস্তোরঁা-কারে নিষিদ্ধ মাংস বাদ দিয়ে অন্য যা কিছু আছে দিতে বললাম। প্রথমতঃ তারা এমন অবাক্ হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল যেন তারা এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু কখনো শোনেনি! যাই হোক্ তাদের কাছে—অন্য কোন রকম মাংস না থাকাতে শুধু ডিম আর রুটী দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রতে হ'ল। কিছু পরেই আমরা ইটালীর সীমানা পার হয়ে জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করলেম। তখন জার্ম্মাণীর রিফ্রেস্‌মেণ্ট-কার ঐ গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হ'ল। এদেরও জিজ্ঞাসা করলাম নিষিদ্ধ মাংস ছাড়া অন্য কোন রকম মাংসের যোগাড় হবে কি না;—তারাও বললে, 'হ্যাম্' আর 'বিফ্' ছাড়া অন্য কিছুই নেই—তবে যোগাড় করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব'। কোন একটি জংসনে আমাদের ট্রেণকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হয়েছিল, সেই সুযোগে আমরা যা যা খাই সমস্ত এরা সংগ্রহ ক'রে এনে আমাদের খবর দিল যে খাদ্য

কিরাত-নৃত্য (দেবেন্দ্রশঙ্কর)

যোগাড় হ'য়েছে। আমরা নির্ভাবনায় থাকতে পারি। এই সমস্ত ছোট ছোট ঘটনা থেকে জার্ম্মাণ জাতির উপর আপনা থেকেই একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠে। জনকয়েক ভারতবাসী যাত্রী কি খাবে বা না খাবে তার জন্য এত আয়াস স্বীকার করা অন্য কোন জাতির দ্বারা হ'ত কি না সন্দেহ। এ ছাড়া ইউরোপে ট্রেণযাত্রা সম্বন্ধে আরও অনেক রকম মজার অভিনয় হয়েছে; তার মধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখ না করে থাকতে পাচ্ছি না। কিছুদিন আগে স্পেনের সান্ সিবাষ্টিন্ থেকে বিয়ারিজ্এ আসছিলাম। উভয় দেশের দূরত্ব মাত্র ৪৫ মাইল। কিন্তু ট্রেণে চড়েছিলাম সকাল ৭টায় এবং বিয়ারিজ্এ পৌছেছিলাম সন্ধ্যা ৫টায়। দশ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ট্রেণের গতি হিসাব করিলে ঘণ্টায় ৪ মাইল দাঁড়ায়। আমরা ট্রেণে ওঠার পর প্রথমতঃ সেটা নির্দ্ধারিত সময়ের ঘণ্টা দুই পরে চলতে আরম্ভ করল, তাও অতি ধীরে ধীরে—একেবারে যাকে বলে শম্বুক গতি! মধ্যপথে গিয়ে আবার হঠাৎ থেমে গেল! অনেকের দেখাদেখি আমরাও নেমে একটু এগিয়ে দেখি, লাইনের উপর একটি বিশাল কায়

"গঙ্গা-পূজা"র একটি দৃশ্যে মীনার নৃত্যভঙ্গী

নাচ (মীনা ও সিংকীর নৃত্য)

বলীবর্দ্দ লম্বমান অবস্থায় রোমন্থন করছে। এঞ্জিনের বিকট আওয়াজ এবং তীব্র বংশীধ্বনিতেও তার ভ্রূক্ষেপহীন নির্ব্বিকার ভাব দেখে মনে হল সম্ভবতঃ এই প্রাণীটি বধির, না হয় ওর উদ্দেশ্য আমাদের নিয়ে একটু রসিকতা করা। যাই হোক্ তাকে সকলে মিলে তাড়া দিয়ে এবং ল্যাজ মলে অতিকষ্টে তার বিশাল অলস বপুখানি তার নিতান্ত অনিচ্ছায় রেললাইন থেকে অপসারিত করা গেল।

গন্ধর্ব্ব নৃত্যে—উদয়শঙ্কর

গাড়ী আবার কিছুদূর গিয়ে পুনরায় থেমে গেল! এবার আমরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম এঞ্জিন-চালক একটি বাড়ীর দিকে চেয়ে হাত নেড়ে ভীষণ চীৎকার করছে। খানিক পরেই একটি বৃদ্ধা—(সম্ভবতঃ ঐ ড্রাইভারের ঠাকুরমা বা দিদিমা) বাড়ীর ভিতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল—ড্রাইভার তার হাতে একটা কুমড়া ও কতকগুলো ফল দিলে। বুড়ি নিয়ে গেল—তখন গাড়ী আবার চলতে আরম্ভ করল। কিছুদূর যাবার পর একজন রেল-কর্ম্মচারী এসে আমাদের কাছে ভাড়া বাবদ আরও কিছু আদায় করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললেন যে, এই ট্রেণখানি এতক্ষণ 'প্যাসেঞ্জার' ছিল এইবার 'এক্সপ্রেস্' হয়ে গিয়েছে! কাযেই বাকী পথটুকুর জন্য বেশী ভাড়া লাগবে! আমরা কিন্তু পথের শেষ অবধি গিয়েও গাড়ীখানি যে কি হিসাবে কোন্ সময়ে 'এক্সপ্রেস্' হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারিনি, কারণ তার সেই আদর্শ মন্থর গতির কোথাও তিলমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি! যাই হোক্ হয়তো বা এই নামে-এক্সপ্রেস না হলে এ গাড়ী আরো দেরীতে পৌছত—অথবা একেবারেই গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারতো না! ইউ-রোপের মত নামজাদা সভ্য দেশে এ ধরণের ব্যাপার ঘটতে পারে—বিশ্বাস করা শক্ত হবে—কিন্তু সেখানেও সত্যিই এই কাণ্ড হচ্ছে। শুনেছি, আমাদের দেশেও একবার কোন এক ট্রেণের গার্ড এবং ড্রাইভার গাড়ী দাঁড় করিয়ে নিকটস্থ এক গ্রামে ঘণ্টা দুইএর জন্য যাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন; এবং আর একবার কোন নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য রেলপথের গোঁড়া ব্রাহ্মণ গার্ড সাহেব পথের মধ্যে ট্রেণ থামিয়ে কর্ণে উপবীত জড়িয়ে জলপাত্র হস্তে কিছুক্ষণের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল মধ্যে প্রয়াণ ক'রেছিলেন। আমরা বাইরে থেকে ইউরোপকে কল্পনায় যা মনে করতাম বাস্তবে ইউরোপ তা নয়; সকলেই যে সেখানে বিদ্বান বা অসম্ভব মার্জ্জিত রুচি অথবা দিনরাত কায কর্ম্মেই ব্যস্ত, এদেশের মত অলস বা দীর্ঘসূত্রী এবং বেকুব লোক যে সেদেশে একেবারেই নেই এ ধারণা করবার কোনও

নাচ (মীনা ও সিমকী) উপবিষ্ট (বামদিক হইতে)—কেদারশঙ্কর, বিষ্ণুদাস, তিমিরবরণ, রাজেন ও ব্রজবিহারী

কারণ নেই। তবে এদের দেশে একটা প্রাণের সাড়া আছে, সম্ভবতঃ স্বাধীন দেশ বলেই; তাছাড়া এদের দেশাত্মবোধ, স্বজাতিপ্রীতি এবং ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে সব কাজে যোগ দেওয়া, আমোদ-উৎসব খেলা-ধূলায় ও হাস্য-পরিহাসে সকলের অবাধ মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদান আমাদের সত্যই বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে তোলে! মধ্যে মধ্যে মনে হয় যেন কোন আশ্চর্য্য দেশে এসে পড়েছি।

যাক্—আমরা যাচ্ছি—আম্‌ষ্টার্ডামে বেশীক্ষণ আমাদের ট্রেণে থাকতে হবে না, বিকাল বেলাই সেখানে পৌছে যাব। যখন হল্যাণ্ডের সীমানায় এলাম—ভয় হচ্ছিল কথাতেই রাজী হলেন এবং কয়েকটি বাক্স খুলিয়ে এদিক-ওদিক নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা শেষ করলেন। মনে হল হয় এঁরা চাকরীকে ফাঁকি দিচ্ছেন—নয় ত আমাদের কষ্ট দেওয়া এবং অসুবিধায় ফেলাই এঁদের চাকরী! এঁরা কি ভাবে খোঁজ করেন তা আমাদের জানা আছে এবং ইচ্ছা করলে সকলেই নিষিদ্ধ জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। এঁদের মধ্যে একজন উদয়শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার হল্যাণ্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?" উদয়শঙ্কর জবাব দিলেন "উদ্দেশ্য কিছু টাকা রোজগার।" তাতে সে ভদ্রলোক একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে খুবই বিনীত ভাবে বল্লেন "দেখুন মশিঁয়ে, হল্যাণ্ড-এর অবস্থা

প্রেগনগরের পুরাতন গির্জ্জার নিকটবর্ত্তী গোল্ডেন লেন নামক অপ্রশস্ত রাস্তা। প্রাচীনকালে এই রাস্তায় তখনকার সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্‌গণ বাস করিতেন। বিদেশীদের এই সকল বাড়ীতে যাইবার অধিকার আছে। এই সমস্ত বাড়ীতে স্ত্রীলোকরা বাস করে। বাড়ীগুলি প্রাথমিক অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

গতবারের মত কাষ্টমস্ অফিসে আবার স্বরদ খুলে বাজিয়ে শোনাতে না হয়। কাষ্টমস্ অফিসাররা আবার সমস্ত বাক্স খুলতে হুকুম দিলেন। আমরা বললাম যে পনেরোটি বাক্স আমাদের সঙ্গে আছে। সবগুলি খোলা কষ্টকর এবং আপনাদের পক্ষেও অসুবিধা—আপনারা যে কোন বাক্স খুলতে বলুন আমরা খুলে দিচ্ছি। এবারে তাঁরা এই

এখন বড়ই খারাপ। এ সময়ে সেখানকার টাকা বিদেশে নিয়ে যাওয়া আপনার সমীচীন হবে না।" উদয়শঙ্কর জবাব দিলেন "বেশ এবারে না হয় কিছু দিয়েই আসবো।" ভদ্রলোক খুব খুশী হয়ে অনেক ধন্যবাদ দিতে দিতে চলে গেলেন।

আমষ্টার্ডামে—আমরা পাঁচদিন ছিলাম; এর মধ্যে

তিনদিন আম্‌ষ্টার্ডাম্ ও ছু'দিন 'রতার্দ্দাম্ (Rotterdam) ও (Chevmingen) 'চেভ্‌মিন্‌জেনে' আমাদের নৃত্যাভিনয় ছিল। শেষোক্ত ছুটি দেশে আমরা বাস্ ভাড়া করেই গিয়েছিলাম। এখনকার একটা বৈচিত্র্য এই যে এ-দেশের চারিধারেই হ্রদ। এখানে ট্রাম, মোটর, বাস্ ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়া মোটরবোট বা নৌকা করে যে কোন স্থানে যাওয়া যেতে পারে।•

তখন সেখানে যাভা এবং বালী প্রদর্শনী চল্‌ছিল। আমরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেই প্রদর্শনী দেখতে গেছলেম। যাভা ও বালীর শিল্পকলা দেখে আমরা সত্যই অবাক্ হয়ে গিয়েছি। তা ছাড়া ওদের বাদ্যযন্ত্র, ঐক্যতান এবং নৃত্য সত্যই অভিনব। গত বৎসর প্যারীর বিরাট প্রদর্শনীতেও এদের নৃত্য ও সঙ্গীতে আমরা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারের যন্ত্রের এরা বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু বড় বড় কাঁসর ও ঘণ্টাদ্বারা ভাবে ও ছন্দ-বৈচিত্র্যে এদের নৈপুণ্য ও বিশেষত্ব এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলে যে আমাদেরই নাচ্‌তে ইচ্ছা করে। এদের সুরের ভিতর দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় আছে। সাধারণতঃ এরা বেহাগ এবং তিলঙ্গ সুরই বাজায়। (ওরা নিজেরা এ ছুই সুরকে কি বলে জানা নেই, তবে আমাদের কানে 'বেহাগ' ও 'তিলঙ্গ'ই শোনায়।) এদের ভিতর, অর্জ্জুন, ভীম, রাবণ ইত্যাদি মহাভারত ও রামায়ণসুলভ নাম দেখে মনে হয় আমাদের দেশ থেকেই এই নৃত্য ওদের দেশে প্রসারিত হয়েছে। এদের দেশে সকলেই নৃত্যকে সামাজিকতার অঙ্গ মনে করেন—স্ত্রী ও পুরুষ ধনী ও নির্ধন সকলের মধ্যেই নৃত্যপ্রথা প্রচলিত। এদের রাজপরিবারের মেয়েদের মধ্যে অন্যান্য নৃত্যের সঙ্গে গোপিনী নৃত্যের প্রচলন আছে। তাতে শুধু রাজাকে (অন্য কাকেও নয়) শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা ক'রে তাঁর চতুর্দ্দিকে ঘিরে নৃত্য করা হয়। সভ্য-সঙ্গীত বা 'অর্কেষ্ট্রা'র দিক্ দিয়ে এরা খুবই উন্নতি করেছে। আমেরিকার বিখ্যাত ফিলাডেল্‌ফিয়া অর্কেষ্ট্রার পরিচালক শ্রীযুক্ত লিপোণ্ড ষ্টকোস্কি (Lepold Stocowski) বালী এবং যাভা পরিভ্রমণের পর এদের 'অর্কেষ্ট্রা' প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"এত সুন্দর 'সিম্‌ফনিক্ অর্কেষ্ট্রা' পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা তাঁর জানা নেই।" প্যারীতে আমাদের সঙ্গে এদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—এরা অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। এরা ইতিপূর্ব্বে কখনো ইউরোপে আসেনি অথবা এখানকার নৃত্য বা সঙ্গীতের সঙ্গে এদের পরিচয়ও নেই—তথাপি এদের নৃত্য ও সঙ্গীতে ইউরোপ

কোপেনহেগেন—সুবিখ্যাত উদ্যানের একাংশ। (বামদিক হইতে—বেচু, রাজেন, সিভালি, কেদার চৌধুরী, অমলা, উদয়শঙ্কর, সিমকী, কনকলতা, দেবেন্দ্র, তিমিরবরণ, ব্রজবিহারী)

মুগ্ধ। এরা প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছে—তাই প্রতীচ্যে এদের এত আদর।'

এই সময়ে হেগ্ সহরেও বালী প্রদর্শনী চল্‌ছিল—সেখানকার বিশেষত্ব এই যে, প্রদর্শনীর ঘরবাড়ী আস্‌বাব-পত্র যা কিছু সমস্তই বালীর অনুকরণে তৈয়ারী; যেন বালী দেশটাই তুলে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। তাঁর

বিচিত্র গির্জ্জা

নাম শ্রীযুক্ত জেস্‌ল মিষ্টকস্কি (Czeslaw Mystkowski) জন্মস্থান পোলাণ্ড দেশে। ইনি যাভার একটি মেয়েকে বিবাহ করেছেন; কাযেই যাভা এবং বালীকে কেন্দ্র ক'রে ইনি প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, গীতবাদ্য প্রভৃতির বিশেষ অনুরাগী। আম্‌ষ্টার্ডামে এঁর সঙ্গে ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম—এখানকার সংরক্ষিত দ্রব্যাদির মধ্যে যাভা ও বালীর প্রাধান্যই বেশী তবে অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সংগ্রহও বিস্তর আছে। এখানে ভারতবর্ষেরও নানা প্রদেশের ছবি ও শিল্প-নিদর্শন আছে। উক্ত পোলিস্ চিত্রকরের অঙ্কিতও অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখলাম। এ সমস্ত প্রধানতঃ যাভা, বালী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। তা ছাড়া ডাচ্-ইণ্ডিস্‌এর চারুশিল্পের যা নমুনা দেখলাম তাও অনির্ব্বচনীয়।

২৯শে মে আমরা আম্‌ষ্টার্ডাম্ ছেড়ে ডেন্‌মার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেম। এই কয়েকদিনেই এদেশে অনেক বন্ধু ও বান্ধবী জুটেছিলেন, তাঁদের বিদায় অভিনন্দন এবং রুমাল আন্দোলনের মধ্যে ট্রেন আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশে রওনা হল। সুইডেন এবং নরওয়ে দেখবার সাধ যে কতদিনের তা বলা যায় না; এতদিনে সেই সাধ পূর্ণ হতে চ'লল! হাম্‌বার্গে আমাদের গাড়ী বদল করবার কথা, সেখানে চার ঘণ্টা অপেক্ষা কর্ত্তে হয়েছিল, তার মধ্যেই আমাদের আটটি ক্যামেরার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফিল্ম ক্রয় করলেম। আমরা রাত্রি ১১টার সময় 'ইষ্ট্ সি'র Warnemunde ষ্টেশনে এসে পৌছালেম। আমরা সকলেই জেগে-ছিলেম কারণ এবারের ট্রেন-যাত্রার একটা অভিনব আকর্ষণ ছিল, এখান থেকে সমস্ত ট্রেনখানাই গিয়ে সোজা জাহাজের উপর উঠবে। আমরা তো সবাই জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করলেম—তবে দুঃখ এই যে রাত্রির অন্ধকারে ফটো নেবার সুবিধা হল না। যাই হোক স-যাত্রী সমস্ত ট্রেনটাই নির্ব্বিবাদে সোজা জাহাজে উঠে এল। আমরা ট্রেন থেকে নেমে জাহাজের ডেকে এসে হাজির হলাম। কিন্তু রাত্রিকাল এবং ভীষণ কুয়াসা আমাদের সমস্ত আনন্দটুকু হরণ করে নিল। জাহাজের গতির সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান উপকূলের ধূম্র-স্তিমিত-নিষ্প্রভ আলোকমালা ক্রমবিবর্দ্ধমান ব্যবধানের মধ্যে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে একেবারেই অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। জাহাজের ইঞ্জিনের বিকট গর্জ্জন কুজ্ঝটিকার বিপদ নিবারক অবিশ্রান্ত তীব্র বংশীধ্বনিতে শ্রবণপটহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম হল। এই

বিচিত্র শব্দের মধ্যেও আমরা নিজ নিজ কামরায় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিলেম। সকালে উদয়শঙ্করের ডাকে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হল। তখন সবেমাত্র ভোর হ'য়েছে। আলোছায়ার সন্ধিক্ষণে প্রকৃতি দেবী যেন রক্তরাগ-অলক্ত-রঞ্জিত চরণ বাড়িয়ে আমাদের নূতন দেশে অভ্যর্থনা করে নিতে এসেছেন। মনে হ'ল গতরাত্রে কুয়াশার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে আমাদের আনন্দটুকু হরণ করার জন্য আজ ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা হয়ে দেখা দিয়েছেন। দিকচক্রবালের সীমারেখা পর্য্যন্ত সমগ্র আকাশ তাঁর রক্তাম্বর বেষ্টিত চঞ্চল তনুলাবণ্যে হিল্লোলিত ও সমুদ্ভাসিত। সুদূর-প্রসারিত বেলাভূমিসংলগ্ন বনভূমির স্নিগ্ধশ্যাম নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব দৃশ্যে অমর কবি কালিদাসের সেই শ্লোকটি বার বার মনে প'ড়তে লাগল—

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—
তমাল তালীবনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা :

আকাশের এই রঙের খেলা প্রতিমুহূর্ত্তেই নব নব রূপে প্রতিভাত হ'তে লাগল। আমরা বিমূঢ় মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির এই অপরূপ হোরী খেলা দেখতে লাগলাম। প্রকৃতির সেই প্রতিবিম্বিত রক্তরাগ স্তব্ধ গম্ভীর নীলাম্বুধিকেও সহসা যেন চঞ্চলতায় অধীর ক'রে তুললে; মনে হল রত্নাকর তার সহস্র সহস্র উর্ম্মিবাহু বিস্তার ক'রে রক্তালোকস্নাতা উষার নভঃপ্রসারিত জলধিচুম্বিত চঞ্চল রক্তাঞ্চলপ্রান্ত আকর্ষণ ক'রতে উদ্যত হয়েছেন। চলচ্চিত্রের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় এই আলো ও রঙের রূপ ক্ষণে ক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হতে লাগল। এইভাবে আমরা কতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে আকাশের দিকে চেয়েছিলেম জানি না—হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখলাম তখন রাত্রি ১-৩০। আড়াইটে!—একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, ঘড়ীর সঠিক সময় নিরূপণ সম্বন্ধে সংশয় হ'ল, পরে জানলুম এখানে এই সময়েই অর্থাৎ রাত্রি (?) ২টার সময়ই নিত্য ভোর হয়! কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্!—কিছুক্ষণ পরেই আমাদের ট্রেণ জাহাজ থেকে নেমে ভূমিতে চক্রার্পণ করলে। কিছুদূর যাবার পরে ট্রেণখানি আর একবার ঐ ভাবে আমাদের সকলকে নিয়ে জাহাজে উঠেছিল—এবার আর বেশীক্ষণ নয়, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য।

আমরা ৩০শে মে সকাল ৬টার সময় ডেন্‌মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এসে উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য অন্যান্য দেশের মত বহু সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এবং ফটোগ্রাফার ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন—প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায সুরু করে দিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা নানাপ্রকার আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় প্রশ্নে আমাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করতে লাগলেন। অবশ্য সকলকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের ব্যবসা, কাযেই সেদিক দিয়ে যাতে ত্রুটী না হয়—তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল। এঁদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যখন হোটেলে উপস্থিত হলাম তখন বেলা ৮টা বেজে গেছে। সেখানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই
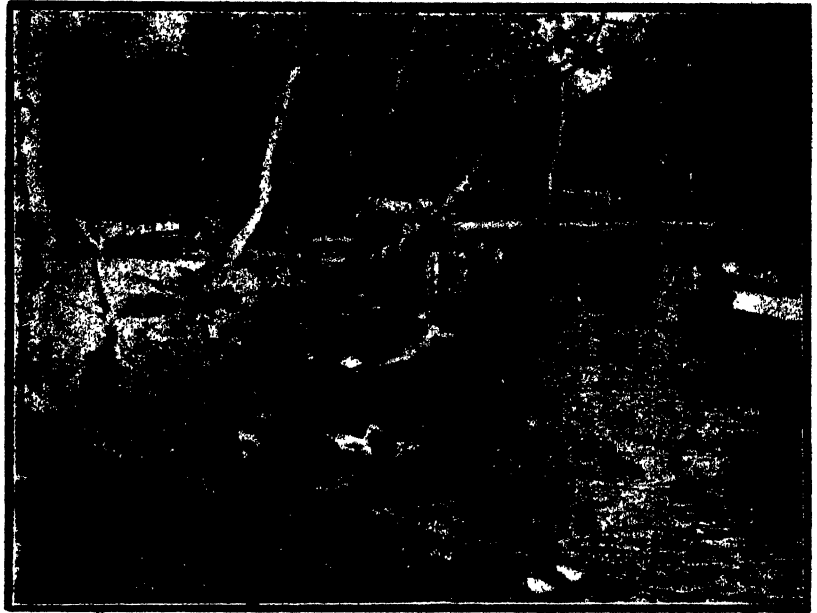
ষ্টকহোম—ন্যাশনাল গার্ডেনের ভিতরের দৃশ্য (তিমিরবরণ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো)

ম্যানেজার এসে সুখবর দিয়ে গেলেন বেলা ২টার সময় ওদেশের প্রধান প্রধান জার্ণালিষ্টরা দেখা করতে আসবেন। যথাসময়ে তাঁরা এসে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্নে ও সদালাপে আমাদের আপ্যায়িত করে সম্ভবতঃ পরিতুষ্ট হয়েই প্রস্থান করলেন। এই সমস্ত প্রশ্নোত্তর সাধারণতঃ ইংরাজী জার্ম্মাণ ও ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই হয়ে থাকে, আলাপের নমুনা গতবারেই পাঠিয়েছি। এই সহরটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এখানকার অধিবাসীবৃন্দও খুব সরল এবং অতিথি-পরায়ণ। তবে সর্ব্বত্র যা ঘটে এখানেও তাই ; রাস্তায় বেরুলেই অসংখ্য লোক আমাদের

আমষ্টার্ডামের একটি দৃশ্য (তিমিরবরণ গৃহীত ফটো)

অনুসরণ করে এবং অধিকাংশ স্থলেই অভিবাদনান্তে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় প্রশ্ন করতে সুরু করে। কনকলতা চৌধুরী এবং অমলা নন্দীর (শ্রীমতী অপরাজিতা) পরিধানের অদৃষ্টপূর্ব্ব সাড়ীই সম্ভবতঃ তাদের এই অত্যধিক কৌতুহলের কারণ।

এখানে আমাদের দুদিন 'নৃত্যাভিনয়' ছিল রয়্যাল থিয়েটারে। প্যারীর 'সাঁজ্ এলিজ্' থিয়েটার বুদাপেষ্টের অপেরা হাউস্এর মত এখানেও শুদ্ধ প্রথম শ্রেণীর কলাকুষ্টি ব্যতীত অপর কোনো সম্প্রদায়কে উক্ত রঙ্গপীঠে অভিনয় করতে দেওয়া হয় না। এদিক্ দিয়ে আমাদের সৌভাগ্য একেবারে চরমে এসে পৌঁছেছিল। কারণ, উক্ত রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোনও নর্ত্তক বা নর্ত্তকী তার পাদপ্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশের অধিকারী বিবেচিত হয়নি—এমন কি পরলোকগতা বিশ্ববন্দিতা নর্ত্তকীকুলরাজ্ঞী আণা পাভ্লোভাও এই রঙ্গালয় ব্যবহার করবার অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন—। তিনি বাধ্য হয়ে এখানে অন্য একটি রঙ্গমঞ্চে তাঁর নৃত্য নৈপুণ্য প্রদর্শন ক'রে গেছলেন।

যথাসময়ে আমাদের অভিনয় সুরু হল, প্রেক্ষাগারে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এখানকার রাজা, রাজপুত্র, রাজপিতৃব্য প্রমুখ রাজপরিবারস্থ সকলেই—গ্রীসের রাজা এবং সহরের বিশিষ্ট অধিবাসীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়-শেষে রাজার পার্শ্বচর এসে রাজার পক্ষ থেকে উদয়শঙ্করকে অনেক ধন্যবাদ এবং সুখ্যাতি করলেন এবং পরের বৎসরে পুনরায় আসবার জন্য অনুরোধও জানিয়ে গেলেন। এই রঙ্গালয়ের আর একটি অদ্ভুত নিয়ম, দর্শকবৃন্দ যতই আনন্দধ্বনি করতালি বা পুনরাহ্বান (Encore) করুন—যবনিকা দ্বিতীয়বার উত্তোলন করা হবে না। দেবেন্দ্রশঙ্করের ব্যাধ-নৃত্য এবং উদয়শঙ্করের শিব-তাণ্ডবের পর দর্শকবৃন্দের ১৫।২০ মিনিট ব্যাপী করতালি, ভূমিতে পদাঘাত ধ্বনি এবং চীৎকারে মনে হল থিয়েটারটী বুঝি এখনি ভেঙ্গে পড়বে। একজন ডিরেক্টর ছুটে এসে আমাদের বিনীত অনুরোধ জানাতে লাগলেন —যেন আমরা পুনরায় যবনিকা তোলবার আদেশ না দিই—রঙ্গালয় রসাতলে গেলেও ক্ষতি নেই কিন্তু কিছুতেই যেন গতানুগতিক নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ না হয়। এখানে আর একটি উপভোগ্য বিষয়—প্রেস্

রিপোর্টারদের নেওয়া নাচের পেন্সিল স্কেচ্। কারণ তাদের প্রত্যেক খবরাখবরের সঙ্গে ছবিও থাকা চাই। আমাদের নাচের সময় দু'পাশের উইংস্ থেকে অনেকেই ঐ রকম নাচের ছবি আঁকছিলেন—সেগুলি পরে কাগজেও বেরিয়েছিল—কতকগুলি সত্যই ভারী চমৎকার এবং উপভোগ্য হয়েছিল।

সাধারণতঃ এই সমস্ত 'স্কেচ্'এর ভিতর হাস্যকর উপাদানও যোগ ক'রে দেওয়া হয়ে থাকে—তার ফলে পাব্লিসিটির দিক্ দিয়ে খুবই সুবিধা হয়। এখানে আমরা যেখানেই বেড়াতে গিয়েছি বা যে কোন দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছি সকলেই আমাদের নাম ধরে ডেকে অভ্যর্থনা করেছেন—এমন কি এ দেশ ত্যাগ

কোপেনহেগেন—সমুদ্রতীরে (ফটো—তিমিরবরণ)

করবার সময় ষ্টীমার ষ্টেসনের কর্ম্মচারীরাও উদয়শঙ্করের নাম ধরে ডেকে অভিবাদন জানিয়ে গিয়েছে। ইউরোপের কাগজে 'কার্টুনের' আদর আছে—আমাদের দেশে এংলো-ইণ্ডিয়ান কয়েকটি কাগজের কথা বাদ দিলে এক "শনিবারের চিঠি" ছাড়া এই জিনিষের আদর ও মর্য্যাদা অন্য কোনো সাময়িকপত্রে একেবারেই নেই—যা থাকে তা কদর্য্য নোংরামী! এখানে যে সকল উচ্চপদস্থ বা মাননীয় ব্যক্তির ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়—তার জন্য ঐ সমস্ত মনীষীরা ক্রুদ্ধ হয়ে সম্পাদকের বা উক্ত কাগজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন না কারণ, তা করবার কারণও ঘটে না বা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বিদূষণ" বা কাঁটাগাছ ব'লে) ওগুলোকে একান্ত অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ করেন না। মানহানির মামলাও রুজু করে দেন না কেউ!—বরঞ্চ ভাল 'কার্টুন' হলে

তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য ও বিষ্ণুদাস সিভালি
(রাজেন্দ্র গৃহীত ফটো)

খুসী হ'য়ে সুখ্যাতিই করে থাকেন। পোল্যাণ্ডএর কন্সল্ Mr. & Mrs. Cohomiel এবং আমেরিকান্ কন্সল্ Mr. & Mrs. Spoford তাঁদের মোটরে এই কয়দিনে আমাদের সমস্ত সহর এবং তদুপকণ্ঠস্থিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। ওয়া জুন থিয়েটার রয়েলএ আমাদের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। ঐদিন সমগ্র ইউরোপে আমাদের সর্ব্বশুদ্ধ দুইশততম অভিনয় সম্পূর্ণ হল। (প্রথম অভিনয় ৩রা মার্চ ১৯৩১ প্যারীর সাঁজ্ এলিজ্ থিয়েটারে)

আমেরিকান এজেণ্ট মিঃ এস, হরক। দক্ষিণে অপরাজিতা (অমলা), বামে কনকলতা (ফটো—উদয়শঙ্কর)

৪ঠা জুন আমরা ডেন্মার্ক ছেড়ে ষ্টীমারে সুইডেন অভিমুখে যাত্রা করলুম। ৩ ঘণ্টা পরে সুইডেনের মাল্মো সহরে উপনীত হলুম। এখানেও যথাপূর্ব্বম্ কাষ্টম্স্ অফিসার প্রেস্ রিপোর্টার ফটোগ্রাফার প্রভৃতির ব্যূহ ভেদ ক'রে তবে হোটেলে পৌছতে হ'ল। 'মাল্মো' একটি ক্ষুদ্র সহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই বিখ্যাত। Lund বিশ্ববিদ্যালয়এর খুব নিকটেই। এখানে আমাদের একটিমাত্র 'নৃত্যাভিনয়' ছিল—অভিনয়ের পরেই একজন কতকগুলি ফুল এবং একটি পত্র পাঠিয়ে দিলেন—পত্রখানি হিন্দীতে লেখা। উদয়-শঙ্করের অনেক স্তব-স্তুতির পরে সে পত্রে লেখা আছে পত্র-লেখক যদিও সুইডেনবাসী কিন্তু তাঁর জন্মস্থান ভারতবর্ষে ইত্যাদি।

পরদিনই আমরা ট্রেণে নরওয়ের রাজধানী 'অস্লো'র উদ্দেশে যাত্রা করলুম। আমাদের অনেকক্ষণ ট্রেণে কাটাতে হ'য়েছিল—তবে নানা কারণে যাত্রা একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।

আমাদের গাড়ী অনেকক্ষণ সমুদ্রের এবং বড়বড় হ্রদের ধার দিয়া চলছিল। নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের পরম সার্থকতা উপলব্ধি করতে লাগলাম। সুইডেন থেকে কোনও স্কুলের অনেকগুলি মেয়ে অস্লোতে বেড়াতে যাচ্ছিল। তাদের চঞ্চল হাস্য পরিহাস লাস্য এবং সঙ্গীতে সমস্ত গাড়ীখানিকে মুখরিত ক'রে রেখেছিল। তারা আমাদের সঙ্গে ভাঙ্গাভাঙ্গা জার্ম্মান ভাষায় আলাপ সুরু করে দিলে। ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই এত বেশী হয়ে পড়ল যে আমাদের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিয়ে অভিনেত্রীসুলভ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে ধূমপান সুরু করে দিল। সম্ভবতঃ বেশী সিনেমা দেখার ফলে এই নাটকীয় অনুকরণ-স্পৃহা তরলমতি বালিকাদের মনে আপনা থেকেই এসে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছুটে পার্শ্ববর্ত্তী কম্পার্টমেণ্টে তাদের শিক্ষয়িত্রীরা কি কচ্ছেন একবার করে দেখে আসছিল, উদ্দেশ্য তাঁরা পাছে মেয়েদের এই সমস্ত ফ্লার্টিং দেখে ফেলেন।

অস্লোতে যখন পৌছালাম তখন রাত্রি (?) প্রায় ৯টা তখনো বেশ রৌদ্র আছে। আবার সেই কাষ্টম্স্ অফিসার—রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারএর দল অতিক্রম করে—হোটেলে এসে হাজির হলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ কর্ত্তে রাত্রি ১২টা বেজে গেল। সূর্য্য অস্ত

গিয়েছেন কিন্তু তখনো যা আলো রয়েছে—তাতে বই পড়্তে পারা যায়। নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর থেকে ২৪ ঘণ্টাই সূর্য্য দেখা যায়। রাত্রি ১টার পরই আবার সূর্য্যোদয় হয় অর্থাৎ মাত্র ২॥ ঘণ্টার জন্য সূর্য্য অস্তমিত হন। আমরা সমুদ্রের (উপ-সাগর) ধারে বেড়াতে বেরুলেম। এদেশের একটা সুবিধা গ্রীষ্মকালে রাস্তায় আলো দেবার খরচ বেঁচে যায়।—(শীত কালে সম্ভবতঃ সুদশুদ্ধ আদায় হয়ে যায়।) গ্রীষ্ম-সায়াহ্ন উপভোগ করবার জন্য অনেকেই সমুদ্রতীরে এসেছেন দেখলাম। বর্ণ-বৈচিত্র্যে আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এবং অনেকেই আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্ব্বার জন্য নানাপ্রকার সাদর সম্ভাষণ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছিলেন। আমরা যখন হোটেলে ফিরলুম তখন বেলা ২টা বেজে গেছে—অত আলোয় আলোর ঘুম হয় না, কাযেই মাফ্লার চোখে জড়িয়ে নিদ্রা দেওয়া গেল।
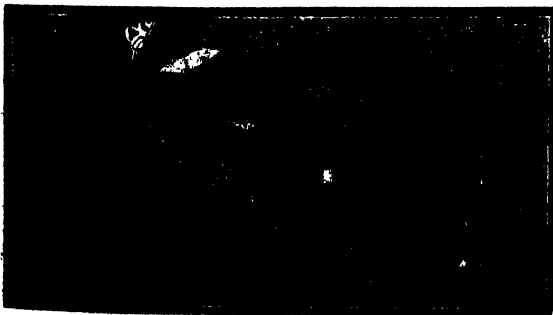
আমষ্টর্ডামে। পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকর মিঃ Czeslaw Mystkowski ও তাঁহার যাভানিজ পত্নী ভারতীয় নর্ত্তক দলকে তাঁহাদের চিত্রপ্রদর্শনী দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন। এইখানে যাভা ও বলী দ্বীপ হইতে সংগৃহীত চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই মিউজিয়মে ভারতীয় নর্ত্তকদল ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ইণ্ডিজ দ্বীপাবলী হইতে আনীত বাদ্যযন্ত্রাদি ও কলাশিল্প-নিদর্শন প্রভৃতি দর্শন করেন। ইহা হইতে যাভানীজ ও ভারতীয় সভ্যতার আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। (ফটো—রাজেন্দ্র)

আমষ্টার্ডাম (ফটো—তিমিরবরণ)

পরদিন প্রাতর্ভোজনের পর আমরা ইলেক্ট্রিক ট্রেণে নিকটবর্ত্তী পাহাড় "Froger Soete Sen"এ বেড়াতে গেলাম। এই পাহাড়ের উপর থেকে সমস্ত 'আস্লো' সহরটি ভারী সুন্দর দেখায়। জঙ্গল পরিবেষ্টিত এই পাহাড়ের উপরে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, সেখানে কোন বিদ্যালয়ের অনেকগুলি ছোট ছোট মেয়ে তাদের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে খেলা ক'রছে দেখলুম। এই সমস্ত শিক্ষয়িত্রীদের স্বভাবও এই সমস্ত বালিকাদেরই মত—তাঁদের হাতে বেত না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীরা তাঁদের যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করে। এদের শিক্ষার ভিত্তিই অন্যরকম। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আমরা

এইখানেই বসে পড়লাম। ঐ সমস্ত মেয়েরা তাদের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্বরে গান আরম্ভ করল। পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত এই কলতান এবং বিশাল জলাশয়ের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গের উচ্ছলিত সঙ্গতে সমগ্র বনভূমিতে আনন্দ শিহরণের সাড়া পড়ে গেল যেন! স্নিগ্ধ শীকরসিক্ত মলয়তাড়িত বিরাট মহীরুহ শ্রেণীও যেন পত্রপল্লবের মর্ম্মর রবে তাদের উন্নত-শির আন্দোলিত করে এই সঙ্গীতে যোগদান করলে। পার্ব্বতশৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত স্বরলহরী সুদূর প্রবাহিত নির্ঝরের কলতান এবং চঞ্চল সমীরণ-শিহরিত শ্যামল তরুরাজির

একটি দুর্ঘটনা। ভারতীয় নর্ত্তকদলের গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া একটি সুবৃহৎ বাস উল্টাইয়া পড়িয়াছে। বাসখানি খালি ছিল। কেহ আঘাত পায় নাই। ভারতীয়-দিগের গাড়ীর সামনের চাকার সম্মুখে মীনা ও বেচু। ইহারা ভগ্ন বাসখানির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বাসওয়ালাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দেওয়া হয়।

মর্ম্মরধ্বনির সঙ্গে তরুণীদলের কলকণ্ঠের সারিগান বিধাতার নন্দন-গীতিরূপে আমাদের মুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে ফেললে! জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি কালিদাসের অমৃতময়ী অমর লেখনীপ্রসূত সেই বাণী—বারবার মনে প'ড়তে লাগল—

যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্র ভাগান্
দরী মুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং
তান প্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্॥

সম্মুখে প্রসারিত গগনচুম্বী গিরিশৃঙ্গ সমাধিমগ্ন বিরাট পুরুষের মত। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে প্রকৃতি ও মনুষ্য-কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত উপভোগ করতে লাগলো। মারুত হিল্লোলিত শৈলগাত্রের শষ্পশ্রেণীর মুহুর্মুহু আন্দোলন যেন পর্ব্বতমালার পুলক-রোমাঞ্চ রূপে প্রতীয়মান হ'তে লাগল'।

উদয়শঙ্কর

—এখানে আমাদের দু'দিন 'নৃত্যাভিনয়' ছিল। বলা বাহুল্য সমাদরের মাত্রা খুব বেশীই হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে এখানকার রাজা উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষে যথারীতি পার্শ্বচর পাঠিয়ে উদয়শঙ্করের যথেষ্ট স্তুতি ও জয়গান করেছিলেন।

—আসলো সহরটী খুবই আধুনিক। এখান কার মেয়েরা নিজেদের প্যারী বা অন্যান্য সভ্যদেশের মহিলা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা, স্বাধীনা এবং অগ্রগামিনী মনে করেন। তার নমুনা বিশেষভাবে নজরে পড়ে রাত্রে রাস্তায় বেরুলেই—পথপার্শ্বের বেঞ্চে বা পার্কে প্রেম নিবেদনের ছড়াছড়িতে। মোটরের ধুলা ও বহু পথচারী-গণের উৎসুক সহাস্য দৃষ্টিতেও তাদের ভ্রূক্ষেপহীন তাচ্ছিল্য (অথবা প্রেম-তন্ময়তা) সত্যই বিস্ময়কর।

রাত্রে ডিনারের সময় একটি মহিলা উপস্থিত ছিলেন—তিনিই নরওয়ের একমাত্র বিমান-পরিচালিকা এমিলি ষ্টুয়াট। কথাপ্রসঙ্গে নরওয়ের নারী-প্রগতির কথা উঠ্‌ল। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে "নারীপ্রগতি" শব্দের আভিধানিক বা যৌগিক অর্থের কথা বাদ দিলে সাধারণতঃ বোঝায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি, কলেজে ছেলেদের সঙ্গে বসে ক্লাস করা, সকলের সঙ্গে কথা বলার অধিকার, পথে বাসে বা ট্রামে অবাধ চলাফেরা—অথবা ঐ ধরণের আরো কিছু; কিন্তু এখানে ঐ শব্দের অর্থ ঢের বেশী ব্যাপক—অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষের সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা, রাজনীতি, ব্যবসায়, ক্রীড়া, উচ্ছৃঙ্খলতা, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতিতে সমান অধিকার ও স্বাধীনতা বোঝায়। সমাজ বা কোন লোকের অভিভাবকত্ব তাঁরা একেবারেই স্বীকার করতে চান না। এই প্রসঙ্গে অনেক কথার পর তিনি বললেন "প্যারী প্রভৃতি নামজাদা সহরের মেয়েরাও আধুনিকতার দিক্ দিয়ে আমাদের এই দেশের মেয়েদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে পারে না।" আমাদের মুখে অবিশ্বাসের হাসি দেখে তিনি রাজেন্দ্রকে আহ্বান কল্লেন "বেশ তুমি আমার সঙ্গে বাইরে এস এবং যে কোন সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও আমি করিয়ে দিচ্ছি; তারপর তোমার যে কোনরকম ব্যবহার তাঁরা কি রকম 'স্পোর্টিং-স্পিরিট'এ নিতে পারেন তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করবে।" এই কথার অর্থ কতকটা এই রকম দাঁড়াল যে, যেকোন লোকের সঙ্গে ফ্লার্ট কর্ত্তে এই সমস্ত মহিলাদের কোনরকম আপত্তি থাকে না। দুঃখের বিষয় রাজেন্দ্র এই কথার সত্যতা পরীক্ষার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে কিছুতেই রাজী হল না, উক্ত মহিলাটীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এবং আমাদের উৎসাহদান সত্ত্বেও। এই বৈমানিকা মহিলাটি যে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ ক'রেছিলেন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের সম্বন্ধে একটা ভাল প্রবন্ধ লেখা। ভবিষ্যতে ইনি লিখ্‌বেনও, এবং যদি কখনো সেটা আমাদের নজরে পড়ে তাহলে হয়তো দেখবো তাতে রাজেন্দ্রের এই বিতৃষ্ণা (বা সঙ্কোচ) ইউরোপের ভাষায় 'ভীরুতা' ও shyness বলেই উল্লেখ থাকবে—আমরা কিন্তু সেটা রাজেন্দ্রের প্রশংসা বলেই ধরে নেব।

আমরা এখান থেকে সুইডেন, ফিন্‌ল্যান্ড ল্যাটে্‌ভিয়া, এস্‌থোনিয়া লিথুয়ানিয়া, জার্ম্মানীর কয়েকটি সহর এবং পুনরায় চেকোশ্লোভেকিয়া হয়ে প্যারী ফিরে যাব। এই সমস্ত বিবরণ পরের বারে পাঠকদের শোনাতে চেষ্টা করব। (ক্রমশঃ)

কুঁড়ি ও কাঁটা

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

—'এই, কড়ার শব্দ না হয়—আস্তে।'

'শব্দ হয় নি'—যাহাকে আদেশ করা হইয়াছিল, সে চাপা-স্বরে উত্তর দিল।

একটা প্রাচীর-ঘেরা সাদা দোতলা কোঠা-বাড়ীর সদর-দুয়ার খুলিয়া দুইটি বালক বাহির হইল। পিছনের বালকটি আস্তে আস্তে দুয়ারের কপাট দুটি বাহির হইতে টানিয়া দিল।

—'বাপ্‌রে! যে কুয়াসা—!'

—'চুপ্,—আয় আমার সঙ্গে।'

এই বলিয়া পরিচালক বালকটি কুয়াসাগ্রস্ত অপর বালকের হাত ধরিয়া, যে রাস্তাটি বাঁকিয়া সেই বাড়ীটার পশ্চাৎ দিক দিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেই সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া অগ্রসর হইল।

মফঃস্বলের এক ক্ষুদ্র সহর। সহরের বুকের উপর নদী—নদী বহতা নয়; নদীর উপরে সেতু। নদীর এপারে, সহরের প্রথম অংশে গঞ্জ, গোলা, দোকান, বাজার, স্কুল প্রভৃতি; ওপারে সরকারী ডাক্তারখানা, রেজেষ্ট্রী অফিস, মুন্সেফ কোর্ট, ফৌজদারী আদালত,

জেলখানা ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় অংশে, মুন্সেফ কোর্টের নিকট হইতে রেজেষ্ট্রী অফিসের পাশ ঘেঁসিয়া একটি রাস্তা জেলখানা পার হইয়া, সহরতলী অতিক্রম করিয়া, 'মড়াকাটা'র ঘর পর্য্যন্ত পৌছিয়া একটি মাঠের প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। গলি-পথ ছাড়িয়া বালক ছুটি সেই রাস্তায় আসিয়া উঠিল।

পৌষের শেষ-রাত—রাত তখনও ঠিক শেষ হয় নাই। ছুই-একটি পাখী রাস্তার ধারের গাছের পত্রান্তরাল-নীড়ে জাগিয়া পাখা-ঝাড়া দিতে সুরু করিয়াছে, এখনও ডাকিয়া উঠে নাই।—কন্‌কনে শীত!

বালক ছুটির গায়ে উপযুক্ত শীতবস্ত্র ছিল না; পরিধেয়ও মলিন। ছুজনারই পা খালি। রাঙা মাটির পথ শিশিরে ভিজিয়া পিছল হইয়া আছে,—ভেজা মাটিতে পা ফেলিতে পা পিছ্‌লাইয়া পড়ে, টাটাইয়া উঠে। ধূসর ধোঁয়ার মত গাঢ় কুয়াসা—সেই কুয়াসা ভাঙিয়া চলিতে হইতেছিল। তাহারা হাত-ধরাধরি করিয়া, যতদূর সম্ভব দ্রুতই চলিতেছিল।

হঠাৎ প্রথম বালকটি থামিয়া গেল—দ্বিতীয় বালকের হাতে টান লাগায় সেও থমকাইয়া দাঁড়াইল।

—'ধাঃ! সব মাটি! বোকা ছেলে কোথাকার,—তুইও দিস্‌নি মনে করে' ?'

—'কি ?'

—'আর কি! জিনিষটাই আসলে আনা হয় নি। ফিরে' চ—'

'বাঃ! আনিনি বুঝি ?'—দ্বিতীয় বালক তাহার গাত্রাবরণের মধ্য হইতে দক্ষিণ হাতখানি বাহির করিয়া একটা মোড়কের মত কি দেখাইল।

তাহারা পুনরায় চলিতে লাগিল।—গতিবেগ অপেক্ষাকৃত বাড়িল।

এখন ছুই-একটি পাখীর ডাক শোনা যাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বাকাশে চাহিলে উষার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না—যে কুয়াসা! মনে হয় যেন এখনও রাত্রি আছে। তাহারা প্রায় 'মড়াকাটা'র ঘরের সাম্‌নে আসিয়া পড়িয়াছিল। এবার তাহারা আরও দ্রুত চলিতে লাগিল—যেন এখনই দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে,—যেন তাহারা ছুটিয়া কোথাও পলায়ন করিতেছে!

কে ইহারা ?—কোথায় যাইতেছে ? ঐ যে আবার পিছু ফিরিয়া তাকাইতেছেও!—কিসের ভয় ? কাহার ভয় ? স্থান, কাল ও পাত্র তিনটিই সমান বিস্ময়কর—অনেক-কিছুই মনে করা যায়,—কৌতূহল হয়।

'মড়াকাটা'র ঘর!—দ্বিতীয় বালকটি প্রথম বালকের হাত চাপিয়া ধরিল

—'এই, কাপড় দে নাকে।'

ছুজনেই নাকে কাপড়-চাপা দিল—যেন এখনই কোন বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যাইবে সেখানে! কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু কল্পিত অস্বস্তিতে তাহারা মুখ বিকৃত করিল—দৌড়াইতে লাগিল।

পথের স্থাজা ও মাঠের মুড়া আসিয়া যেখানে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে, সেখানে কয়েকটা বাব্‌লা গাছ, কাঁটাঝোপ ও আগাছায় ভরা খানিকটা পোড়ো জমি,—একটা সর্পিল সরু পায়ে-চলা পথ-রেখাও যেন সেই দিকে নামিয়া গিয়াছে। সেই পোড়ো জমিটার পাঁজরের উপর দিয়া বালক ছুটি চলিতে লাগিল।

সড়াৎ!—হঠাৎ কি যেন একটা প্রাণী সম্মুখের কাঁটা-ঝোপ হইতে বাহির হইয়া পার্শ্বের আগাছার ভিতর দিয়া এক-ঝট্‌কায় সোঁ করিয়া মিলাইয়া গেল। দ্বিতীয় বালকটি আঁত্‌কাইয়া উঠিল,—'সাপ! সাপ!'

—'দূর্‌,—সাপ কোথায় রে! এই শীতে সাপ আস্‌ছে কোত্থেকে ?'

—'সাঁ করে' গেল, সাপ না ত' কি ?'

প্রথম বালক হাসিয়া বলিল,—'ধ্যৎ!—ও খরগোস।'

কিছুদূর আসিয়া তাহারা থামিল। সম্মুখে একটা মরা বট গাছের গুঁড়ি—গুঁড়ির নীচের দিকটায় একটা বড় ফোকর—একটা ফাঁপা গোল অন্ধকার,—দেখিলে ভয় করে!

পূব আকাশে ঈষৎ গোলাপী ফিকে ছোপ লাগিল বলিয়া মনে হইতেছে,—কুয়াসা পাত্‌লা হইয়া আসিয়া বালক দুটির মুখ এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দেব-শিশুর মতই অকলঙ্ক নির্ম্মল দুটি মুখ—শুভ্র সুন্দর দুটি শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি!

বটগাছের গুঁড়ির ফোকরের ভিতর কি আছে কে জানে। দ্বিতীয় বালকটি মুখ নীচু করিয়া চাহিল—একটি সিঁদূর-মাখা কিম্ভুত-কিমাকার প্রস্তরখণ্ডের চারি দিকে অনেকগুলি শুষ্ক-বিবর্ণ ফুল ও বিল্বপত্র ছড়াইয়া পড়িয়া আছে।

—'দাদা, এই কি—'

'হ্যাঁ, এই বটজী ঠাকুর'—অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালক উত্তর করিল।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই ভাই পাশাপাশি ভূমিষ্ঠ হইয়া বটজী ঠাকুরকে প্রণাম করিল। তার পর ছোট বালকটি তাহার দাদার হাতে সেই গাত্রাবরণের আড়ালে লুকাইয়া আনা মোড়কটি দিয়া কহিল, —'দাদা, নাও—খোলো।'

দাদা মোড়ক খুলিল। বাহির হইল—কিছু ফুল, কয়েকটি বেলপাতা, এক টুক্‌রা কাগজে জড়ানো একটু-খানি সিঁদূর। ফুলগুলি রায়েদের বাগান হইতে এবং বেলপাতা কয়টি বোসপাড়ার রাস্তার মোড়ের বেল গাছ হইতে কাল শেষ-বেলায় তাহারা স্বহস্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; সিঁদূরটুকু সন্ধ্যার পর দিদিমা'র সিঁদূর-কৌটা খুলিয়া গোপনে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বটজী ঠাকুর—বটজী মহাদেবকে স্পর্শ করিয়া দুই ভাই সিঁদূর মাখাইল। তার পর ফুল ও বেলপাতা লইয়া যুক্তকরে অঞ্জলি প্রদান করিল। তাহাদের অঞ্জলি-দানের মন্ত্র—'ঠাকুর, আমাদের বাবাকে তুমি ভালো করে' দাও। বাবা ভালো হ'য়ে এসে তাঁর কাছে আমাদের যেন নিয়ে যান। সেখানে বাবার কষ্ট—এখানে আমাদের কষ্ট। বাবাকে ভালো করে' দাও, ঠাকুর!'

এবার তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে। শীতে যেন হাড়ের ভিতরে পর্য্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়া যায়! বেগে উত্তর বায়ু বহিতে সুরু করিয়াছে। উষোদয় একবার মাত্র কিরণ বিকীরণ করিয়াই আবার নিভিয়া গেল—কুয়াসা যেন আরও বাড়িয়াছে। ছোট ভাই শিবেশ বলিল,—'শীতে যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে, দাদা!—উঃ!'

'সত্যি রে, বড্ড শীত'—বলিয়া শঙ্কর ভাইটিকে আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া, তাহার নিজের গাত্র-বস্ত্রের এক প্রান্ত তাহার গায়ে চাপাইয়া দিয়া, ঘাড়ের উপর একখানি হাত আস্তে উঠাইয়া দিল। বলিল,—'শিবে, অনেকটা পথ, আরও একটু জোরে চল, ভাই! নইলে দাদা মশাই—'

শিবেশ সজোরে পা বাড়াইয়া বলিল,—'আর দিদিমা'ই বা কম কি!—পিঠের ছাল তুলে' ছাড়্‌বে।'

শঙ্কর বলিল,—'এঃ! ছাল তোলা সোজা কি না! কিন্তু দিদিমা ভালোই রে,—ঐ ছোট মামাই যত নষ্টের গুরু।'

শিবেশ বলিল,—'বড মামীমা কিন্তু আমাদের খুব ভালোবাসেন,—না দাদা?'

—'তা আর বল্‌তে।'

গতি আবার শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল। শঙ্কর বলিল, —'শিবে, জোরে চলা হ'চ্ছে না ত'—?'

—'এমন করে' কি জোরে চলা যায়? এক কাজ করি দাদা,—'

শঙ্কর শিবেশের দিকে চোখ তুলিল। শিবেশ বলিল,—'এক কাজ করি দাদা,—এস আমরা দৌড়ই। শীতও ছুটে' যাবে—হবে বেশ।'

শঙ্কর হাসিয়া বলিল,—'হ্যাঁ, এক্সারসাইজ্‌ও।'

তার পর তাহারা সত্যই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

তাহারা দৌড়াইতেছিল। পথে দুই-একটি করিয়া লোক দেখা যাইতেছে। কেহ গাড়ু মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া নিমগাছ হইতে দাঁতন-কাঠি ভাঙিয়া লইতেছে, কেহ কেহ বা ভাঁড়-হাতে খেজুর গাছের দিকে চলিয়াছে। তাহারা দৌড়াইতেছিল—সম্মুখে লোক দেখিলে এক একবার থামিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল, আবার ছুটিতেছিল।

রাস্তার ধারের এক গেরস্ত-বাড়ীতে কয়েকটি গরুকে

আব দেওয়া হইয়াছে। একটা টোপ্পর-ওয়ালা গরুর গাড়ীর জোয়াল একজোড়া বলদের কাঁধে চাপানো হইতেছে। অদূরে বিচালির গাদার উপর একটি ময়ূরকণ্ঠী রঙের মোরগ উঠিয়া মাথা উঁচাইয়া ডাকিতেছে—আর ডাকের তালে তালে তার মাথার লাল ঝুঁটি দুলিতেছে, কাঁপিতেছে।

আরও দূরে একটি কুলগাছে অজস্র কুল ধরিয়া আছে—গাছের তলায় প্রচুর কুল ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বালসুলভ প্রবৃত্তির বশে তাহারা দাঁড়াইল,—উবু হইয়া হাত বাড়াইল,—কুলতলা হইতে কয়েকটি বড় বড় কুল কুড়াইয়া মুঠি ভরিল,—প্রত্যেকে এক একটি মুখে পুরিল।

'কি টক কুল—ধ্যেৎ!'—শিবেশ তাহার মুখের কুলটি দাঁতে কাটিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ফেলিয়া দিল।

শঙ্কর তাহাকে তাহার নিজের হাতের একটি কুল দিয়া বলিল,—'নে, এই কুলটা দেখ্ খেয়ে। আমার ত' বেড়ে লাগ্ছে! খুব মিষ্টি কুল কি আর ভালো?'

ঐ ত' জেলখানার প্রাচীর—না? এখনই রেজেষ্ট্রী অফিস দেখিতে পাওয়া যাইবে। না,—আর এমন বেশী দূর কি,—তাহারা প্রায় আসিয়াই পড়িয়াছে বলিলে হয়! আর তাহারা দৌড়াইল না,—খুব লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল।

সেই সাদা বাড়ীটা তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। কুয়াসা কাটিয়া প্রভাত-রৌদ্র আসিয়া সেই বাড়ীটার উপর পড়িয়াছিল। ভিতরে উঠানের এক দিকে খানিকটা এবং বারান্দার রকের উপর খানিকটা রোদের ফালি পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে।

কর্ত্রী রোদে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। সামনে একটা শূন্য ঘটি, ঘটির পাশে রকের উপর কিছু গুলের গুঁড়া ছড়ানো। তিনি কিছুক্ষণ আগে গুল দিয়া দাঁত মাজিয়া গরম জলে মুখ-ধোওয়া শেষ করিয়াছেন।

কর্ত্তা একখানা পায়া-ভাঙা দেয়ালে-ঠেস-দেওয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া ফরসী টানিতে টানিতে হঠাৎ উঠিয়া ঘরের মধ্যে গিয়াছিলেন, খড়ম খটমট করিয়া চৌকাঠ পার হইয়া আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'সর্ব্বনাশ! বালিসের তলা থেকে আমার পয়সাগুলো নিলে কে?—কালাচাঁদ! কালাচাঁদ!'

কালাচাঁদ তাঁহার জীবিত কনিষ্ঠ পুত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বছরখানেক পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। কালাচাঁদের বয়স বছর-বারো হইবে, ফোর্থ্ ক্লাসে পড়ে। এইমাত্র ধড়াচূড়া পরিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল। কর্ত্তা আবার ডাকিলেন,—'কালাচাঁদ! অ কালাচাঁদ!'

কর্ত্রী বলিলেন,—'আঃ, বের হ'য়ে গেল,—ওকে আবার পিছু ডাক্‌তে লাগ্‌লে?'

কর্ত্তা বলিলেন,—'এ্যাঁ, বালিসের তলা থেকে তিন-তিন আনা পয়সা—নিলে কে চুরি করে'?'

কর্ত্রী চটিয়া উঠিলেন,—'তা আমার কালাচাঁদ জান্‌বে কেমন করে'?—কে নিলে কে জানে!'

কর্ত্তা অস্থির হইয়া পড়িলেন—এরূপ ব্যাপারে অস্থির হইয়া পড়াই তাঁহার স্বভাব। বলিলেন,—'গুয়ো দুটো গেল কোথায়?'

কর্ত্রী হাত নাড়িয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন,—'কি জানি, ভোরে উঠে' কোথায় ওরা মর্‌তে গিয়েছে। আমি উঠে' অবধি ত' দেখি নি।'

কর্ত্তা বলিলেন,—'তা হ'লে এ শিবে-শঙ্করেরই কাজ। হারামজাদারা আসুক্ দেখি আজ ফিরে'—'

বিধবা পুত্রবধূ কুয়োতলা হইতে এককাঁড়ি বাসন মাজিয়া লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল। কর্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন,—'বৌমা, তুমি ত' বাছা নাও নি পয়সাগুলো—তোমার শ্বশুরের বালিসের তলা থেকে?'

বধূ শাশুড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে মাথা নাড়িয়া জানাইল,—'না, মা!'

বধূ রান্নাঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর বাসনের কাঁড়ি নামাইল। চোখ দুটি তাহার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল—শাশুড়ী তাহাকে কারণে-অকারণে এমনিই যখন-তখন অযথা অপদস্থ করিয়া থাকেন,—তাহাকে মিথ্যা গঞ্জনা দিয়া কি সুখ পান তিনি! পরক্ষণেই হতভাগ্য বালক দুইটির কথা মনে করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল।—কি জানি তাহাদের ভাগ্যে আজ কিই বা আছে! অথচ বধূ জানিত, আদুরে-গোপাল কালাচাঁদই ঐ পয়সাগুলি

লইয়াছে—মাঝে মাঝেই সে অমনি লইয়া থাকে। আজও কুয়োতলার দিকের খোলা জানালা দিয়া কালাচাঁদকে সে শ্বশুরের খাটের শিয়রে দাঁড়াইয়া বালিস উল্টাইতে দেখিয়াছে। কিন্তু বলিবার উপায় নাই!

বধূ ঠিক বুঝিতে পারিল না, শিবেশ ও শঙ্কর এত ভোরে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে—সকাল হইতে সেও ত' কই তাহাদিগকে একবারও দেখিতে পায় নাই? বটজী ঠাকুরের মাহাত্ম্যের কথা সে-ই তাহাদিগকে কাল বলিয়াছিল,—তবে কি তাহারা—? তাহার বুক দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। তাহাদের কোন আপদ-বিপদ ঘটিল না ত'?—দুর্গা! দুর্গা!—বটজী ঠাকুর, তাদের শুভ কর,—তাদের বাপকে ভালো কর!

•

রেজেষ্ট্রী অফিসের হাতায় পড়িয়া শিবেশ ও শঙ্কর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—সেই সাদা বাড়ীটা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এবার তাহারা গলি-পথ না ধরিয়া সোজা রেজেষ্ট্রী অফিসের ধার ঘেঁসিয়া চলিল। সেই পথে একটা চায়ের দোকান; চাহিয়া দেখিল—ছোট মামা কালাচাঁদ সেখানে বসিয়া চামচ-হস্তে ডিমের মাম্লেট সেবন করিতেছেন,—সাম্নে টেবিলের উপর এক-পেয়ালা ধূমায়িত গরম চা।—এমন শীতের দিনে লোভনীয় বটে!

—'দাদা, ছোটমামা যে দিন-দিন ভারী সৌখীন হ'য়ে পড়্‌ল?'

—'হবে না? চুরি-চামারি ক'রে' কি কম পয়সাটা নষ্ট করে,—কিন্তু আদুরে-গোপালের কথা কয় কার সাধ্যি!'

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই তাহারা বাড়ীর সীমানায় পৌঁছিল। তার পর সদর-দুয়ার পার হইয়া ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা আড়চোখে একবার বারান্দার দিকে চাহিল—দাদা মশাইয়ের নজর তাহাদের উপর পড়িয়াছে কি? বুঝিতে পারিল না। দেখিল, দিদিমা'র দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি ফিস্‌ফাস্ করিয়া কি যেন কহিতেছেন। তাহারা হাত-পা ধুইবার জন্য চুপিচুপি কুয়োতলার দিকে যাইতেছিল,—আঙিনার মধ্যপথে পৌঁছিতেই হঠাৎ বারুদে আগুন লাগিয়া গেল কর্ত্তা সশব্দে জ্বলিয়া উঠিলেন,—'ছুঁচোরা, গেছিলি কোথা—বল্?'

শিবেশ ও শঙ্কর যুগপৎ চমকিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল শঙ্কর বলিল,—'কেন, এই ত' ঐদিকে একটু মর্ণিং-ওয়াক্ করে' এলাম।'

—'মর্ণিং-ওয়াক্?—বদমাস! বাটপাড়! চোর!'

সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তার একপাটি খড়ম বোঁ করিয়া উঠানের দিকে ছুটিয়া গেল। ভগবান্ রক্ষা করিলেন—খড়ম শিবেশ বা শঙ্করের গায় লাগিল না, শঙ্করের গায়ের কাপড় ছুঁইয়া তাহা গিয়া পড়িল দিদিমা'র সোহাগের বিড়াল সোহাগীর ঘাড়ের উপর। তার পর—

তার পর তুমুল কাণ্ড!—দে জল! আন্ পাখা!—এবং কর্ত্তা ও কর্ত্রীর মধ্যে বাধিয়া গেল যাহাকে বলে কুরুক্ষেত্র-কোঁদল।

ওদিকে কোঁদল চলিতেছিল, এদিকে শঙ্কর ও শিবেশ সোহাগীর মাথায় এবং চোখে জলের ঝাপটা দিয়া, মুখে জল ঢালিয়া, বাতাস করিয়া, বিবিধ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে বসিয়াছিল। কিন্তু সোহাগী শীঘ্র সারিয়া উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

দিদিমা তখন কোঁদল ছাড়িয়া অকুস্থলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিলেন,—'কি হবে রে শঙ্কর, ওরে শিবে, আমার সোহাগীর কি হবে!'

শিবেশ দিদিমা'র ব্যাকুলতার ভঙ্গী দেখিয়া মুখ টিপিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। শঙ্কর বলিল, —'ভয় কি দিদিমা! নিশ্বাস ত' চল্‌ছে,—এই এখনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে' বস্‌ল ব'লে'।'

দিদিমা এবার কাঁদিয়াই ফেলিলেন,—'আমার সোহাগীর এ কি হ'ল রে!—সর্ব্বনেশে বুড়ো আমার কি সর্ব্বনাশই কর্‌লে রে!'

শঙ্কর বলিল,—'সোহাগী মাথা নাড়্‌ছে, দিদিমা!'

কর্ত্তা মহাশয় কট্‌মট্ করিয়া শঙ্কর ও শিবেশের দিকে বারবার তাকাইতেছিলেন।—তখনও তিনি সেই বালিসের তলার তিন-আনা পয়সার কথা ভুলিয়া যান নাই!

দিদিমা বলিলেন,—'ওরে, এমন সময় আমার কালাচাঁদ গেল কোথায় রে।'

শিবেশ বলিল,—'কেন দিদিমা, ছোট্‌মামা এখন চা'র আড্ডায় দিব্যি আরামে বসে' হাঁসের ডিম আর চা খাচ্ছেন—দেখে এলাম।'

শঙ্কর অনুচ্চস্বরে বলিল,—'আঃ! থাম্ না, গাধা!'

বড় মামীমা একান্তে, রান্নাঘরের দুয়ারে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া শঙ্কর ও শিবেশকে একাগ্র দৃষ্টি ভরিয়া অশেষ মাতৃস্নেহ বর্ষণ করিতেছিল।

সোহাগী মরিল না—গা-ঝাড়া দিয়া সত্যই উঠিয়া বসিল। কিন্তু গণ্ডগোল তখনও গোল পাকাইয়া গড়াইতেছিল। সেই বালিসের তলার তিন-আনা পয়সা এবং চা'র আড্ডার ডিমের মাম্‌লেট ও চা একসঙ্গে মিলিয়া হতভাগ্য বালক দুটিকে দণ্ডবিধান না করাইয়া ছাড়িল না। সোহাগীর সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য দিদিমা তাঁহার দৌহিত্রদ্বয়কে প্রায় ক্ষমা করিয়াই ফেলিয়াছিলেন বলিলে হয়, কিন্তু ঐ নিষ্কলঙ্ক কালাচাঁদের প্রতি অযথা-কলঙ্কের কূট ইঙ্গিত পুনরায় তাঁহাকে কর্ত্তা মহাশয়ের বিচার-আসনের একাংশে সহ-বিচারিকা রূপে উপবেশন করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু অপরাধি-গণকে এবার হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার বিচিত্র ব্যবস্থা হইল। রায়-শ্রবণে জানা গেল—এ বেলার মত শিবেশ ও শঙ্করের অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ,—অর্থাৎ খোরাকীর চা'ল বাঁচাইয়া সেই অপহৃত তিন-আনা পয়সার পুনরুদ্ধার করা হইতেছে।—কি সুষ্ঠু ও সূক্ষ্মতম সুবিচার!

বাড়ীর বিধবা বধূটি—বালকদের বড় মামীমা শুধু অলক্ষিতে চক্ষু মুছিল।—হায় রে হতভাগারা!

সত্যই তাহারা হতভাগ্য।—পিতা পদ্মনাভ তাহার শ্বশুরের মত সুসম্পন্ন তালুকদার-বংশধর রূপে জন্মপরিগ্রহ না করিয়া থাকিলেও, যখন সে শিবেশ ও শঙ্করের জননীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহাকে এখনকার মত একান্তভাবে চাকুরির উপরই নির্ভর করিতে হইত না এবং চাকুরিও তখন সে করিত না—একজন গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত ভদ্র-গৃহস্থের উপযোগী জোত-জমি-ব্রহ্মোত্তরের অভাব আদৌ তাহার ছিল না। পাকা কোঠা-বাড়ীর মালিক না হইলেও, পৈতৃক ভদ্রাসনের টিনের গৃহগুলি অবস্থান ও পরিচ্ছন্নতা-বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট পরিবারের বাসস্থলী বলিয়াই লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিত।

এক দিকে ছিল সদাস্নেহময়ী মাতা, মাতার অধিক স্নেহশীলা দেবীস্বরূপিণী পিতৃস্বসা,—অন্য দিক দিয়া প্রেমের অমৃতপাত্র বহন করিয়া আগমন করিল সুন্দরী সুরলক্ষ্মী বধূ—শঙ্কর ও শিবেশের জননী। অমৃতের পাত্র বহন করিয়া আসিয়াছিল বধূ,—আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আসিল শিশু—শঙ্কর। পদ্মনাভের সংসার স্বর্গীয় পদ্মসৌরভে পুরিয়া উঠিল! পদ্মনাভ ভাবিল, এমনই অমৃত ও আনন্দের মধ্য দিয়াই বুঝি তাহার জীবনকাল কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু চক্রের মতই সুখ এবং দুঃখ আবর্ত্তিত হইয়া চলে। যেন, এই প্রবাদটাই প্রমাণ করিবার জন্য সামান্য সরিকান বিবাদের তুচ্ছ একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া সংসারে শনি প্রবেশ করিল। বছর-দুই ঘুরিতে না ঘুরিতে, পৈতৃক ভদ্রাসনটুকু এবং বিঘা-তিনেক খামার মাত্র অবশেষ রাখিয়া পদ্মনাভের সংসারের স্বচ্ছলতা দেখিতে দেখিতে কর্পূরের মতই উবিয়া গেল এবং চাকুরি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পদ্মনাভকে দাস-জীবনের লৌহশৃঙ্খল ধারণ করিতে হইল। কিন্তু তখনও, সেই শনিগ্রস্ত সংসারে স্বচ্ছলতা না থাকুক্ সৌষ্ঠব ছিল—পিতৃস্বসা ও মাতার স্নেহ, বধূর প্রেম, শিশুর কলহাস্য! সুখের বিষয়, পদ্মনাভ তাহার দাসত্বলব্ধ উপার্জ্জনে সংসারকে দারিদ্র্য-পর্য্যায়ের দূরোর্দ্ধ সীমায় রাখিতে সমর্থ না হইলেও, যাহাতে সম্মান বজায় রাখিয়া কোনপ্রকারে চলিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু চক্রনেমি ক্রমশঃ নিম্নেই অবতরণ করিতেছিল। দুরদৃষ্ট এবার ধন ছাড়িয়া পরিজনের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিল। শিবেশকে জন্মদান করিয়াই সুরলক্ষ্মী সুরলোকে অন্তর্দ্ধান করিলেন। কিন্তু তখনও শেষ হয় নাই,—বর্ষচক্রের পূর্ণাবর্ত্তন শেষ না হইতেই কালচক্রতলে পরিবারের বাকী মানুষ দুটিও নিষ্পেষিত হইয়া গেল। পদ্মনাভ পদ্মের কচি কুঁড়ি দুটিকে লইয়া অকূল মরুসমুদ্রে পড়িয়া পথ হারাইল।

তারপর হৃদয়হীন কৃপণ শ্বশুরের সংসারের কন্টক-স্তূপের উপর একদা সেই কুঁড়ি দুটিকে ফেলিয়া রাখিয়া সর্ব্বহারা পদ্মনাভ কর্ম্মসূত্রে দূর প্রবাস-যাত্রা করিল।

স্কুলের বেলা হইয়াছিল,—কালাচাঁদ খাইতে বসিল। শিবেশ ও শঙ্করের আজ খাওয়া হইবে না;—স্কুলের পাট্ ত' গত মাস দুই হইল তাহাদের উঠিয়াই গিয়াছে, যেদিন হইতে পীড়িত পিতার প্রবাস-বাসস্থল হইতে তাহাদের দাদামহাশয়ের নামে আর মনি-অর্ডারের টাকা আসিয়া পৌছায় নাই। শিবেশের চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; শঙ্করের মুখের ভাব কঠিন।

তাহারা বাহির-বাড়ীর বারান্দায় গিয়া বসিল। শঙ্কর বলিল,—'তুই ভারী ছিঁচ্ কাঁদুনে শিবে, একটুকুতেই চোখে জল আসে।'

শিবেশ শঙ্করের দিকে চাহিল। শঙ্কর বলিল,—'মা'র গয়না আছে দাদামশাই'র কাছে, জানিস?'

—'আছে, না আট্‌কে রেখেছেন?'

—'সে যা'ই হোক্, আমাদেরই মা'র গয়না ত'? জানিস্,—আমরা জোর করে' সেই গয়না আদায় করতে পারি? না হ'লে আমাদের মাইনে দিয়ে স্কুলে পড়ান না কেন উনি?'

শিবেশ শঙ্করের হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'চুপ করো দাদা, ওরা শুন্‌তে পেলে আর আস্ত রাখ্‌বে না।'

কথার মোড় অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। শঙ্কর বলিল,—'শিবে, কর্ত্তামাকে মনে পড়ে না রে—আমাদের বাবার মা?'

শিবেশ কোন উত্তর দিল না। শঙ্কর বলিল,—'তা তোর মনেই বা পড়্‌বে কেমন করে'? তুই তখন এই এত্তটুকু ছিলি কি না!'

শঙ্কর এই বলিয়া তাহার এক হাত উঁচুতে আর এক হাত নীচুতে রাখিয়া শিবেশকে দেখাইয়া দিল যে সে কত্তটুকু ছিল। শিবেশ হাসিয়া বলিল,—'অত্তোটুকু?'

শঙ্কর বলিল,—'তা নয় ত' কি!—কিন্তু কর্ত্তা-মা তোকে বড্ড ভালোবাস্‌তেন রে,—আমার চেয়েও। তুই হবার পরই মা মরে' গিয়েছিলেন কি না, সেই জন্যে।'

শিবেশ শঙ্করের দিকে আরও সরিয়া বসিয়া, শঙ্করকে স্পর্শ করিয়া বলিল,—'দাদা, মা আমাদের কেমন ছিল, বল না?'

'মা—!'—শঙ্কর আর কিছু বলিতে পারিল না, একটা আকস্মিক কান্নার বেগ তাহার বুক হইতে ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিল।—মা!

শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, মাছের ঘরের এঁটোকাঁটা পুঁছিয়া, বাসন মাজিয়া, বিধবা বধূ দ্বিতীয়বার স্নান করিল—তার পর নির্দ্দিষ্ট পৃথক কক্ষে তাহার হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

শাশুড়ীর নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কা সত্বেও সে সেদিন বেশী করিয়া চা'ল লইল—আহা! শঙ্কর ও শিবেশ যে না খাইয়া আছে!

শ্বশুর ও শাশুড়ীর দিবানিদ্রা কোন দিন বাদ যাইত না—সেদিনও তাঁহারা ঘুমাইতেছিলেন। হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হইলে মামীমা ভাগিনেয়দ্বয়কে তাঁহার ভোজনকক্ষে ডাকিয়া লইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে খাইতে দিলেন, পরে নিজে বসিলেন।

ফৌজদারী আদালতের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া গেল—এক, দুই, তিন। বধূ শঙ্কিতা হইল—শ্বশুর-শাশুড়ীর উঠিবার সময় প্রায় হইয়াছে যে! সে বলিল,—'তোমরা একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নাও এখন, ওঁরা উঠ্‌বার আগেই।'

তাহারা খাইতেছে, বধূ একবার কি দুইবার অন্নগ্রাস মুখে তুলিয়াছে মাত্র, এমন সময়—ও কি, ও-ঘরের কপাট খুলিবার শব্দ হইল না? শঙ্কর ও শিবেশ একমুহূর্ত্তে থালা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল—নিজেরা মার খাইবে বলিয়া ভয়ে নয়, বড় মামীমা'র লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া।

বধূও আর অতিরিক্ত গ্রাস মুখে তুলিতে পারিল না—গম্ভীর ম্লান-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু কর্ত্তা ও কর্ত্রীর ঘুম তখনও ভাঙে নাই—সোহাগী বিড়ালটা কপাট নাড়িয়া ঐরূপ শব্দ করিয়াছে।

পরিত্যক্ত অন্নস্থালী তিনটির প্রতি চাহিয়া বিড়ম্বিতা বধূ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।—ভগবান্!

* * *

আজ রাতে আরও বেশী শীত পড়িয়াছে—বাহিরে আরও গাঢ় কুয়াসা। রাত্রি তৃতীয় প্রহর পার হইয়া কেবল চতুর্থ যামে পড়িয়াছে। সুতীব্র শীতল বাতাস বহিতেছে—শন্ শন্। আকাশে বুঝি মেঘও করিয়াছে—ফুঁই-ফুঁই বৃষ্টি পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়; হিমকণাও হইতে পারে। সেই সাদা বাড়ীটার দুয়ারে আজও যেন অশরীরী ছায়ার মত দুটি মানবশিশুকে দেখা যাইতেছে। ঐ,—কে যেন অনুচ্চ অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল,—'চুপ্,—কড়ার শব্দ না হয়, আস্তে।'

卐

জৈন দৃষ্টিতে অস্পৃশ্যতা

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা

মহাত্মা গান্ধীর জীবনপণ-তপস্যার প্রভাবে ভারতের হরিজনগণের সামাজিক ও ধার্ম্মিক উন্নতির যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে, এ সময়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা সময়োপযোগী মনে করিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের নিম্নতম বর্ণের ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান কালের ন্যায় অস্পৃশ্য এবং ধার্ম্মিক ও সামাজিক উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিল। যজ্ঞাদি ধার্ম্মিক কর্ম্মে বা শাস্ত্র-শ্রবণে কিংবা সামাজিক প্রগতির কোন প্রকার চেষ্টায় যোগদান করিবার তাহাদের অধিকার ছিল না। জৈন তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর কিন্তু অন্ত্যজগণের এই সমস্ত অন্তরায় দূর করিয়া তাহাদিগকে জৈন চতুর্ব্বিধ সঙ্ঘের মুকুটমণি স্বরূপ সাধু সঙ্ঘের মধ্যে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য উচ্চ জাতির সাধুগণের সহিত সমান আসন প্রদান করিয়া অন্ত্যজগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব ক্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা জৈনশাস্ত্রে এখনও পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোন জাতির প্রকৃত বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মবিকাশের চরম সোপানে উপনীত হইবার চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করিতে তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন।

ভগবান মহাবীরের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ে একাদশজন গণধর অর্থাৎ সঙ্ঘের নেতা ও ১৪০০০ সাধুগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতজ্জন সাধুর মধ্যে উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে চণ্ডাল-বংশোদ্ভব "হরিকেশবল" নামক একজন সাধুর বিশেষভাবে উল্লেখ ও প্রশংসা দৃষ্টে মনে হয় যে ইনি আধ্যাত্মিক উন্নতির সু-উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

"সোবাগকুল সম্ভূত গুণুত্তর ধরো মুণী।
হরিএসবলো নাম আসী ভিক্খু জিইন্দিও॥"

"শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডাল-কুলোৎপন্ন শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, হরিকেশবল নামক ভিক্ষু ছিলেন।" ইঁহার পিতার নাম 'বল-কোট্ট' ও মাতার নাম 'গৌরী' ছিল। বলকোট্ট গঙ্গাতীরে শ্মশানের রক্ষক ছিল। বলকোট্টের পুত্র হরিকেশবল অত্যন্ত কুরূপ ছিলেন ও তজ্জন্য অনেক তিরস্কার পাইয়া বৈরাগ্যবশে জৈন দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হন। ইনি মন-বচন-কায়াকে বশীভূত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছিলেন ও কঠোর তপস্যার প্রভাবে ঋদ্ধিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জৈন সাধু সম্প্রদায়ে অন্ত্যজগণের প্রবেশাধিকার থাকা সত্বেও ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজগণকে পূর্ব্ববৎ ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। হরিকেশবল কোশলদেশের রাজার প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ভিক্ষার্থ গমন করিলে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হন। ব্রাহ্মণগণ কেবল তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তাঁহাকে প্রহার করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পুরোহিত কর্ত্তৃক পরিণীতা রাজ-কন্যা হরিকেশবলের তপোবলের বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে এরূপ কার্য্য হইতে বিরত করেন। হরিকেশবল ব্রাহ্মণগণের নিকট অহিংসা, তপস্যা ও সংযমের উপকারিতা বিবৃত করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন ও আহার্য্য গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করেন।

শাস্ত্রকার এ স্থলে বলিয়াছেন যে জাতির কোন মাহাত্ম্য নাই।

"সক্খং খু দীসই তবো বিসেসো ন দীসই জাই বিসেস কোঈ।
সোবাগ পুত্তং হরিএস সাহুং জস্সেরিসা ইড্ঢি—মহাণুভাগা॥"

"ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে তপস্যারই মাহাত্ম্য আছে—জাতির কোন মাহাত্ম্য নাই। হরিকেশবল সাধু শ্বপাকপুত্র হইলেও তাঁহার এতাদৃশ

ঋদ্ধি ও মাহাত্ম্য।" এই উক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে জৈন সংস্কৃতিতে জন্মগত জাতি-মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় নাই।

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চিত্ত ও সম্ভূত নামক আর দুই জন চণ্ডাল-কুলোৎপন্ন সাধুর বর্ণনা পাওয়া যায়। ইঁহারা বারাণসী নগরীর "ভূতদিন্ন" নামক চণ্ডালের পুত্র। ইঁহারা সঙ্গীত-বিদ্যাতে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন ও যখন নগরে গান করিতে আরম্ভ করিতেন তখন শত শত নরনারী ইঁহাদের মধুর কণ্ঠ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিত। উচ্চবর্ণের নরনারী ইঁহাদের সংস্রবে যাইতেছে—নগরের প্রধানগণের ইহা সহ্য হইল না। তাঁহারা রাজার নিকট আবেদন করিয়া ইঁহাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন। উভয় ভ্রাতা এই অপমানে মর্ম্মপীড়িত হইয়া এক পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন; কিন্তু দৈববলে এক জৈন সাধুর সাক্ষাৎ লাভ করায় তাঁহার উপদেশে জৈনদীক্ষা অবলম্বন করেন। চিত্ত ও সম্ভূত সাধু হইবার পর একদা হস্তিনাপুরে গমন করেন; কিন্তু সেখানেও নীচজাতিত্বের জন্যই নগর হইতে বহিষ্কৃত হন। ইহার পরে হস্তিনাপুরের বাহিরে উভয় ভ্রাতা অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হরিকেশবল ও চিত্ত সম্ভূত কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না; তবে বোধ হয় যে ইঁহারা মহাবীরের সময়েই বা তাহার অল্প পরেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন।

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে জয় ঘোষ ও বিজয় ঘোষের আখ্যানেও জাতি জন্মগত নয় কিন্তু কর্ম্মগত এরূপ জৈন মান্যতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জয় ঘোষ ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন হইয়াও জৈন দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন। একদা বারাণসী নগরীতে তিনি বিজয় ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্মণের যজ্ঞে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে, বিজয় ঘোষ বেদাধ্যয়ন রত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। জয় ঘোষ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, ব্রাহ্মণের গুণ কি ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক করিয়া মত প্রকাশ করেন যে, "কেবলমাত্র মস্তক মুণ্ডন করিলে শ্রমণ হওয়া যায় না, ওঁকার উচ্চারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, বনে বাস করিলেই মুনি হওয়া যায় না, কিংবা বল্কল পরিধান করিলেই তপস্বী হওয়া যায় না। কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, কর্ম্মের দ্বারাই ক্ষত্রিয় হওয়া যায়, কর্ম্মের দ্বারাই বৈশ্য হওয়া যায় ও কর্ম্মের দ্বারাই শূদ্র হওয়া যায়।" (উত্তরাধ্যয়ন ২৫—৩১।৩৩)

আর একজন চণ্ডালকুলোৎপন্ন সাধুর বৃত্তান্ত জৈন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইঁহার নাম "মেঅজ্জ বা মেতার্য্য।" ইনি চণ্ডালপুত্র ছিলেন, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠীর গৃহে পালিত হইয়াছিলেন ও পরে ভগবান মহাবীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি একটী ক্রৌঞ্চপক্ষীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজে ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ও মৃত্যুর সময় কেবল জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন। [বিশেষাবশ্যক ভাষ্য—২৭৭৭ (৮৬৯)] একজন চণ্ডালকুলোৎপন্ন সাধুর পক্ষে আত্মোন্নতির চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হওয়ার কথার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অন্ত্যজগণের পক্ষে জৈন সম্প্রদায়ে কোনরূপ বাধা ছিল না, বরং সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সুবিধা তাঁহারা প্রাপ্ত হইতেন। এখনও জৈনগণ নিত্য পঠনীয় স্তোত্রে স্থূলভদ্র, বজ্রস্বামি প্রভৃতি বিখ্যাত আচার্য্যগণের নামের সহিত "মেঅজ্জ" বা মেতার্য্য মুনির নামও প্রত্যহ স্মরণ করিয়া থাকেন। (ভরহেসর সিজ্ঝায়)

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের উক্তি। জৈন-দিগম্বর সম্প্রদায়ের শাস্ত্রেও জাতির জন্মগত অধিকারের পরিবর্ত্তে গুণ-কর্ম্মগত অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। "মনুষ্য জাতি একই জাতি, বৃত্তিভেদ দ্বারা তাহার চারি ভেদ হইয়াছে (আদি পুরাণ ৩৮-৪৬)। ঋষিশৃঙ্গ আদি মনুষ্য গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ,—জন্ম দ্বারা নহেন। (পদ্মপুরাণ ১১-২০০) ইত্যাদি (১) উক্তির দ্বারা জাতির গুণকর্ম্মগত অধিকারই স্বীকৃত হইয়াছে।

ভগবান মহাবীরের সময়ে অন্ত্যজগণকে জৈন সাধু সমাজে গ্রহণ করা হইলেও পরবর্ত্তীকালে কিন্তু জৈনাচার্যগণ এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য রীতি দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়; কারণ, যদিও জৈন সংস্কৃতি জন্মগত অধিকারের পরিবর্ত্তে গুণকর্ম্মগত অধিকার স্বীকার করে তত্রাপি পরবর্ত্তীকালে কোন জৈনাচার্য্য অন্ত্যজগণকে সাধু সমাজে গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। (২)

---

(১) জৈনজগৎ—ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩।

(২) পণ্ডিত শ্রীসুখলালজী লিখিত "অস্পৃশ্যো অনে জৈন সংস্কৃতি" শীর্ষক গুজরাটী প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতজীর নিকট লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

ডেলি প্যাসেঞ্জার

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

বক্কেশ্বর ঢোল ডেলি প্যাসেঞ্জার। সে মেমারী ষ্টেসন থেকে দু' মাইল দূরবর্ত্তী ওলাইচণ্ডীপুর গ্রাম থেকে রোজ কলকাতা যাতায়াত করে। ডালহাউসী স্কোয়ারের গ্রীন্ মার্শাল কোম্পানিতে সে কাজ করে, মাইনে পায় ত্রিশ টাকা।

বক্কেশ্বরের চেহারায় লালিত্য বা মাধুর্য্যের একান্ত অভাব। রোগা লম্বা ছিপছিপে চেহারা। ছিপে বড় মাছ টেনে তুললে ছিপটা বেঁকে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বক্কেশ্বরের চেহারাও সেই রকম দেখতে। সাধারণ মানুষ যতখানি লম্বা হয় বক্কেশ্বর তার চেয়ে বেশ কিছু লম্বা ব'লে তার শরীর সরু কাঠির মত রোগা, আর সামনে অসম্ভব রকম ঝোঁকা। মুখে দু' পাটিতে একটিও দাঁত নেই, তার জন্যে গাল দুটো ভিতর দিকে ঢুকে উপরের দিকে দু'দিকে দু'টো গর্ত্ত তৈরী করেছে। নাকটা বাঁকা, চোখ দুটো অসম্ভব রকম কোটরে প্রবিষ্ট, আর কুতকুতে। মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা এবং ছোট ক'রে কাটা। এই মুখে গোঁপ জোড়া সম্মার্জ্জনীর মত উঁচু হ'য়ে আছে। কানে বড় বড় চুল, ভ্রূ মোটা লোমশ। তার এই চেহারার জন্যে সে যেখান দিয়েই যাক্ না কেন সকলের নজর তার উপর পড়বেই পড়বে। গলার স্বর ছিল মিহি ও মোটা মিশানো এক অদ্ভুত রকমের। চেহারাটা দেখ্‌লেই মনে হয় ভগবান বোধ করি কুৎসিত সৃষ্টির নমুনা দেখাবার জন্যেই বক্কেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন। বয়স তার চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চাশও হ'তে পারে।

বক্কেশ্বরের বাড়ীতে আছে স্ত্রী যোগমায়া ও কন্যা ক্ষেপী। বক্কেশ্বরকে আপিসে হাজিরা দিতে হয় আটটার সময়, সেই জন্যে তাকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী থেকে বের হ'তে হয়। যোগমায়া রাত্রি থাকতে উঠে রান্না ক'রে দেয়। বক্কেশ্বর কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে ষ্টেসনের দিকে ছোটে, এক মিনিট দেরী হ'লেই ট্রেণ ফেল হবে। পরের ট্রেণে গেলে অনেক দেরী হবে। বক্কেশ্বর ভাত খেয়ে ফোকলা দাঁতে পান পাখলাতে পাখলাতে হাতে একখানা ঝাড়ন নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেয়। ঝাড়নখানা সঙ্গে থাকে রেলে বসবার জন্যে এবং জিনিষপত্র বাঁধবার জন্যেও। তার এক পকেটে থাকে একখানা বটতলার উপন্যাস ও আর এক পকেটে থাকে হাতের-ময়লায়-কালো পুরোনো একজোড়া তাস।

বক্কেশ্বর চাকরী করছে সে আজ অনেক দিনের কথা। কবে ঢুকেছে চাকরীতে তা তার মনেই পড়ে না বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত সে রেলের ভাড়া বাবদ এক পয়সাও কোম্পানিকে দেয় নি। একখানি পকেট টাইমটেবল তার বুকপকেটে ক্লিপ দিয়ে আঁটা থাকে। তারই কিয়দংশ বাইরে উঁকি মারে। হাওড়া ষ্টেসনে তখন টিকিট নেওয়া বা দেখার তত কড়াকড়ি ছিল না। বক্কেশ্বর ট্রেণ থেকে নেমেই ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে হন্ হন্ করে গেটের দিকে এগিয়ে চলতো। সকালের ট্রেণে যারা আসে তাদের সকলেরই আপিস যাবার তাড়া থাকে ব'লে সকলেই আগে বেরিয়ে যাবার জন্যে এসে দোরগোড়ায় ভিড় লাগায়। টিকিট কালেক্টররা ভীড়ে সকলের টিকিট ভাল ক'রে দেখতে বা নিতেও পারে না। এই সুযোগে বক্কেশ্বর ভীড়ে মিশে হন্ হন্ ক'রে ব্যস্তভাবে রেলিং পেরিয়ে বেরিয়ে যেতো। কোন দিন যদিবা কোন কালেক্টর জিজ্ঞাসা করতো,—মশায় আপনার টিকিট ?

বক্কেশ্বর অতি ব্যস্তভাবে নিজের বুকপকেটে হাত দিয়ে টাইমটেবেলের কোণটা একটু উঁচু ক'রে তুলে ব্যস্তস্বরে বলতো,—মান্থলি, মশায় মান্থলি। ব'লেই হন্ হন্ ক'রে দৌড়।

টিকিট কালেক্টররা ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সকালবেলার তাড়া জানে ব'লে আর বেশী পেড়াপিড়ি করতো না টিকিটের জন্যে।

বিকেলবেলাও প্ল্যাটফরমে ঢোকবার সময়ও অমনি ব্যস্তভাবেই সড়াৎ ক'রে ঢুকে পড়তো। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো তো গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতো—ডব্লইউ, টি।

চেকার অতটা খেয়াল না করেই ছেড়ে দিতো। আবার কেউ ভাবতো, হয় তো সপ্তাহান্তিক টিকিটই আছে, যদি সেটা সপ্তাহের শেষদিন হতো। কিন্তু বক্কেশ্বর এ-সব কোন অর্থেই ডব্লইউ, টি, শব্দ ব্যবহার করতো না। সে সত্য কথাই ব'লে যেতো যে, without ticket (বিনা টিকিটে) সে চলেছে।

ভোরবেলা খেয়ে-দেয়ে দু'মাইল পথ হেঁটে এসে ষ্টেসনে একটা ভাঙা বেঞ্চিতে বসে বক্কেশ্বর খানিক জিরিয়ে নিতো। তার পর ট্রেণে উঠেই গাড়ীতে ভীড় থাকলে একবার চোখ বুলিয়ে সমস্ত বেঞ্চির লোক-সংখ্যা গুণে দেখতো। তার পর যে বেঞ্চিতে লোক কম বসেছে সেই বেঞ্চির যাত্রীদের সম্বোধন করে বলতো—মশায়, একটু সরতে হচ্ছে, এ বেঞ্চিতে আর একজন বসবে। কোম্পানির গাড়ী, এতে আইন-কানুন পাকা, একজন লোক কম বসবার উপায় কি। সরুন দেখি একটু একটু ক'রে। ব'লেই, যাত্রীদের সরবার অপেক্ষা না ক'রেই, সকলকে ঠেলে, বেঞ্চিতে ঝাড়নখানি পেতে বসে প'ড়ে, আরামের নিশ্বাস ফেলে, হাই তুলতে তুলতে বিচিত্র আওয়াজে বলতো,—তারা, তোমারই ইচ্ছা মা। তার পর গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি তারা দেবীর উদ্দেশেই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতো।

ট্রেণে বসেই সকলের সঙ্গে আলাপ জমাতো। কাউকে দাদা, কাউকে ভাই, কাউকে খুড়ো, এমনি সব সম্বন্ধ পাতিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসতো। তার অদ্ভুত চেহারা ও অদ্ভুত ব্যবহারে লোক মজা পেতো, কেউ কিছু বলতো না তাকে।

কারো কাছে কোন বই দেখলেই বক্কেশ্বর পরম আগ্রহান্বিত হ'য়ে বলতো—দাদা, বই পড়তে আমি বড় ভালবাসি। দেখি আপনার কি বই।

ভদ্রলোক বই হাতে দিতো। বক্কেশ্বর জিজ্ঞাসা করতো,—আপনি তো আর এখন পড়বেন না নিশ্চয়, আমি ততক্ষণ পড়ি, কি বলেন?

ভদ্রলোকের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে বই পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। তার পর সমস্ত পথ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তে পড়তে চললো। হাওড়ায় গাড়ী থামলে গম্ভীর ভাবে বইখানি মুড়ে পকেটে ঠেসে-ঠুসে গুঁজে তেমনি গম্ভীর ব্যস্ত ভাবে গাড়ী থেকে নেমে পড়তো।

ভদ্রলোক চীৎকার ক'রে বললে,—ও মশায়, আমার বই নিয়ে যাচ্ছেন যে।

বক্কেশ্বর যেন হঠাৎ চমকে উঠে বললে,—ওঃ, আপনার বই। তার পর দন্তশূন্য মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাঁ ক'রে হেসে বললে,—তা ভুলে যখন পকেটে পুরেছি তখন আর আজ দিচ্ছিনে দাদা। বড় ভাল বইখানি। আপিসে পড়ে আপনাকে বিকেলে ফেরত দেবো। আপনিও তো ডেলি; কোন্ ট্রেণে ফিরবেন?

ভদ্রলোকের উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ভদ্রলোককে হতভম্ব ক'রে দিয়ে সে নিজেকে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে দিত।

ট্রেণে উঠে কোন দিন সে কোন যাত্রীকে ডেকে বলতো,—আসুন না খুড়ো, এক হাত তাস খেলা যাক।

ভদ্রলোক রাজী হ'লে আরো দু'জনকে রাজী করিয়ে চারজনে কোলের উপর একখানা গায়ের চাদর বিছিয়ে তাস খেলতে ব'সে যেতো। বক্কেশ্বর তার পকেট থেকে সেই পুরোনো ময়লা তাস জোড়া বের ক'রে খেলতে সুরু করতো।

সেদিন বাড়ী ফেরবার মুখে খেলা চলেছে। খেলা খুব জমে উঠেছে। বক্কেশ্বর দাঁতশূন্য মাড়ীতে একটা অর্দ্ধ-দগ্ধ বিড়ি চেপে ধ'রে তার অপর পক্ষকে বললে,—হুঁ হুঁ, মশায়, এ তাস খেলে খেলে একেবারে বনমানুষের হাড় হ'য়ে গেছে। আমার কথা শোনেন। আপনার সাধ্যি কি যে আমায় হারান।

তার পর প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে বললে,—মশায় ব্যাণ্ডেল ছেড়ে গেছে? এক কাপ চা না খেলে তো আর চলছে না। মৌতাতের সময় এসে গেছে। আমি ভাত না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু চা আর বিড়ি না খেয়ে থাকতে পারি নে। দিন তো মশায় আর একটা বিড়ি। আরে বিড়ি তো দিলেন, ধরাই কিসে, দেশলাইটা দিন্।

ভদ্রলোক তাস কি খেলবেন ভাবতে ভাবতেই বক্কেশ্বরের দিকে না তাকিয়েই দেশলাই হাত বাড়িয়ে দিলেন। বক্কেশ্বর বিড়ি ধরিয়ে একবার সেই ভদ্রলোকের দিকে তাসের আড়াল দিয়ে আড়চোখে দেখে নিলে ভদ্রলোক অন্যমনস্ক আছেন। সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে গম্ভীরভাবে দেশলাইটি পকেটস্থ করলে।

ট্রেণ ব্যাণ্ডেলে এসে থামলো। বক্কেশ্বর একবার আড়চোখে দেখে নিলে কোন্ ষ্টেসন। দেখে নিয়েই সে গম্ভীর ভাবে তন্ময় চিত্তে তাস খেলতেই লাগলো। ট্রেণ ছাড়বার বোধ করি মিনিট খানেক দেরী আছে। হঠাৎ যেন বক্কেশ্বরের চমক ভাঙ্গলো। প্ল্যাটফরমের দিকে জানলার কাছের এক ভদ্রলোককে সম্বোধন ক'রে বললে,—মশায় এটা কি ব্যাণ্ডেল ?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

বক্কেশ্বর ব্যস্ত ভাবে বললে,—মশায় একটা চা-ওয়ালাকে ডাকুন না দয়া ক'রে। তাস খেলায় এত অনমনস্ক হ'য়ে গেছি যে, ব্যাণ্ডেলের কথা মনেই নেই। কথায় বলে, তাস, দাবা, পাশা, তিন কর্ম্মনাশা।

বলেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তার ফোকলা মুখে দাঁতের আগল না থাকায় পানের কুচি ফোয়ারার মত ছিটকে সামনে-বসা ভদ্রলোকের সাদা জামা লাল ছিটের ক'রে দিলে।

ভদ্রলোক রেগে বললে,—মশায়, আমার জামাটা কি করলেন দেখুন দেখি, একটু আস্তে হাসতে হয়।

বক্কেশ্বর অপ্রতিভ ভাব দেখিয়ে বললে,—মাপ করুন স্যা'র, একটু জোরে হেসে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না।

তার পর পূর্ব্বের ভদ্রলোকের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে—কই মশায় চা পেলেন না, মরে গেলাম যে মশায়।

এই বলতে বলতেই একটা চাওয়ালা গাড়ীর সামনে এলো। বক্কেশ্বর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে,—আঃ, বাঁচালি বাবা, দে দেখি এক কাপ চা। বেশ গরম আছে তো ?

চাওয়ালা বললে,—এখন চা দিবো না বাবু, গাড়ী ছোড়তে আর এক মিনট আছে।

বক্কেশ্বর কাকুতি ক'রে বললে,—দে বাবা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, নইলে এ ব্রাহ্মণ মারা যাবে। আমি এক চুমুকে খেয়ে তোর কাপ ফেরত দিচ্ছি।

চাওয়ালা বোধ করি বক্কেশ্বরের কাকুতি দেখেই চা ঢালতে ঢালতে বললে,—আচ্ছা, চা দিচ্ছি, আপনি পয়সা নিকালান।

বক্কেশ্বর চায়ের কাপ হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বললে,—দিচ্ছি বাবা পয়সা, পয়সা দেবো না তো কি অমনি খাবো। টাকার ভাঙানি আছে ? খুচরো পয়সা নেই। তুমি ততক্ষণ চট্ ক'রে ভাঙ্গানিটা দাও—আমি টনাৎ ক'রে টাকা দিয়ে দেবো।

চাওয়ালা বিরক্ত হ'য়ে বললে,—এই তো বাবু বড় ঝঞ্ঝাট বাধালেন গাড়ী ছাড়বার সময়। নিন পয়সা।

গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। বক্কেশ্বর তার চোরা চাহনিতে দেখে নিলে প্ল্যাটফরম ছাড়াতে গাড়ীর আর কতদূর। চাওয়ালা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে, আর কাপ আর টাকার তাগাদা করছে। বক্কেশ্বর আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে বললে,—দাঁড়া না, আর একটু আছে খেয়েই তোর টাকা আর কাপ দিচ্ছি। জানিস আমরা চোর নই, আমরা রোজ এই ট্রেণে যাই, আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জার।

ব'লে একবার টাকা বের করবার জন্যেই যেন পকেটে হাত দিলে। ইতিমধ্যে ট্রেণও জোর গতিতে প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। চাওয়ালার চেঁচামেচি, বোধ করি গালাগালিও, ট্রেণের শব্দে মিলিয়ে গেল।

বক্কেশ্বর ব্যস্ত এবং যেন লজ্জিত হয়েই আপন মনে ব'লে উঠলো,—যাঃ, ট্রেণ যে প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে এলো। ও ব্যাটার টাকা আর কাপ ফেরৎ দেওয়া হলো না তো। নাঃ, আমার কাজ বাড়লো আর কি, কাল আবার সকালে ব্যাটাকে খুঁজে ফেরৎ দিতে হবে। অধর্ম্ম তো আর করতে পারবো না।

চায়ে আর এক আরাম-চুমুক দিয়ে হেসে বললে,—ব্যাটা যেমন চা দিতে ভোগাচ্ছিল তেমনি জব্দ হয়েছে। ব্যাটা নিশ্চয় মনে করছে যে, বাবু পনের আনা পয়সা আর কাপটা ফাঁকি দিয়ে নিলে। কিন্তু কাল যখন ব্যাটা টাকা আর কাপ ফেরৎ পাবে তখন ব্যাটা বুঝবে যে

বক্কেশ্বর বাবু অন্য ধাতুর তৈরী। আসুন, মশায় এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেলা যাক্।

শীত সবেমাত্র পড়েছে। বাজারে ফুলকপি উঠেছে। ক্ষেপী আসবার সময় বার বার বলেছে,—বাবা, আজ একটা ফুলকপি এনো, আর ভাল গলদা চিংড়ী। বক্কেশ্বর একটি ফুলকপি কিনে বাড়ী চলেছে, পয়সা অভাবে গলদা চিংড়ী আর কেনা হয় নি। ঠিক্ করেছে ক্ষেপীকে যা হোক ক'রে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে। মনে মনে একটু দুঃখও হলো, মেয়েটা খেতে চেয়েছে, আর সে কিনে খাওয়াতে পারলে না।

ভগবান তার সহায়। ট্রেণে যে কামরাতে সে উঠলো, সেই কামরার দরজার কাছের বেঞ্চির নীচেই বেশ বড় বড় এক জোড়া গল্দা চিংড়ী। বক্কেশ্বর মনে মনে হেসে, সেই চিংড়ী মাছের কাছেই নিজের ঝাড়নে বাঁধা কপিটি ঝাড়ন শুদ্ধ রাখলে; এবং সেইখানেই কোন রকমে ঠেলে ঠুলে বসলো। কয়েকটি ভদ্রলোক সেইখানে বসেই তখনই তাস খেলা সুরু করেছিলেন। বক্কেশ্বর তাদের খেলা দেখতে লাগলো এবং খেলা বলেও দিতে লাগলো। এমনি করেই তাদের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাব জমিয়ে নিলে।

তার পর হঠাৎ একজনকে জিজ্ঞাসা করলে,—মশায়, এ চিংড়ীগুলো কি আপনার?

তিনি বললেন—না।

অপর একজন হাতের তাস ফেলতে ফেলতে বললেন,—ও আমার মাছ।

বক্কেশ্বর বললে,—বেশ মাছ তো কিনেছেন, কোথায় যাবেন আপনি?

ভদ্রলোক উত্তর করলেন,—বর্দ্ধমান।

বক্কেশ্বর এমনি ক'রে কার মাছ এবং কোথায় যাবে তা জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসলো।

খেলা খুব জমে উঠেছে। গাড়ীর প্রায় সকলেই যে যার অন্যমনস্ক। গাড়ীও ব্যাণ্ডেল ছেড়ে গেছে। বক্কেশ্বর সকলের অলক্ষ্যে চিংড়ী মাছ দুটি নিজের ঝাড়নে বেঁধে নিলে। তার পর মেমারী ষ্টেসনে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

ছোট ষ্টেসনে গাড়ী অল্পক্ষণই থামে। যার মাছ হঠাৎ তার কি খেয়াল হলো—সে নীচের দিকে তাকিয়ে মাছ দেখতে গিয়েই দেখলে মাছ নেই। হাতের তা ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললে,—আমার মাছ?

একজন ভদ্রলোক বললেন,—ওখানে যে মাছ ছিল সে তো ওই ভদ্রলোক নিয়ে নেমে গেল। ওর পোটলার কাছে ছিল। ও যখন বাঁধলে মনে করলাম ওরই মাছ বুঝি।

যার মাছ সে ছুটে জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার ক'রে বললে—ও মশায়, আমার মাছ নিয়ে যাচ্ছেন যে।

গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

বক্কেশ্বর কোটরে-ঢোকা চোখ দুটো যথাসম্ভব বিস্ফারিত ক'রে চীৎকার ক'রে বললে,—কোথাকার ছোট লোক হে তুমি। তার পর পোটলাটা উঁচু ক'রে ধ'রে বললে,—আমি এই দামী কপি কিনতে পেরেছি, আর দুটো চিংড়ী কিনতে পারি নি?

এই বলেই সে মাঠের পথে পা জোরে চালিয়ে দিলে।

বাড়ী এসেই দোর গোড়া থেকেই ডাকলে,—ক্ষেপী, মা, তোর জন্যে কত বড় চিংড়ী এনেছি দেখ।

বর্ষাকাল এসেছে। বক্কেশ্বর রোজই প্রায় ভিজে ভিজে আপিস যাওয়া-আসা করে।

একদিন যোগমায়া বললে,—হ্যাঁ গা, রোজ এমন ভিজে ভিজে আপিস যাও—অসুখ করবে যে। একটা ছাতি কিন্‌তে পারো না।

বক্কেশ্বর এই কথার উত্তর করলে শুধু—হুম্।

সেদিন ছাতা সংগ্রহ করবার একটা যোগাযোগ ঘটেও গেল। বক্কেশ্বর যত-কিছু জিনিষ সংগ্রহ করতো তা ফেরবার সময়। কারণ, মেমারী ষ্টেসন ছোট বলে ট্রেণ মিনিটখানেক দাঁড়ায় মাত্র। আর সেই জন্যে বক্কেশ্বরের সুবিধাও বেশী।

আপিস যাবার সময় বৃষ্টি ছিল না। ফেরবার সময় টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগলো, এবং ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো।

বক্কেশ্বর গাড়ীতে উঠেই একবার সমস্ত গাড়ীর ভিতর, উপর, নীচ, চারি দিক নজর বুলিয়ে নিলে—কোথায় কোন্ জিনিষ, কোথায় কে বসেছে। দেখলে, সে যেখানে বসেছে ঠিক তার মাথার উপর হুকে ঝুলছে একটি সুদৃশ্য ছাতা। বক্কেশ্বর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসলো—

আর তাকে ভিজতে হবে না। সারা পথ সে ছাতাটার উপর লক্ষ্য করতে করতে এসেছে পাছে ছাতার অধিকারী মাঝ-পথেই নেমে যায়। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন—মেমারীর আগের ষ্টেসন পর্য্যন্ত ছাতার অধিকারী নামলো না। বক্কেশ্বরের মুখখানা খুশীর আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

মেমারীতে যখন গাড়ী থামলো তখন বৃষ্টি আরো জোরে পড়ছে। বক্কেশ্বর তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যস্ততার সঙ্গে ছাতাটি নিয়ে সটান নেমে গেল।

সে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাধিকারীর ছাতার প্রতি নজর পড়লো। যে বৃষ্টি তার মধ্যে ভদ্রলোক নেমেও ছাতা কেড়ে আনতে পারে না, অথচ চোখের সামনে ছাতা নিয়ে বক্কেশ্বর নেমে গেল এও তো সহ্য হয় না। ভদ্রলোক যথাসাধ্য বৃষ্টির মধ্যে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে বললেন,—ও মশায়, আমার ছাতা যে ওটা।

বক্কেশ্বর মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে বললে,—কোথাকার বেল্লিক হে, আচ্ছা জোচ্চর তো। এই বৃষ্টিতে আমি বিনা ছাতায় এসেছি, না? বক্কেশ্বরের যুক্তি মুখে মুখে।

তার পর কাকে উদ্দেশ ক'রে সে বললে সেই জানে,—দেখুন তো মশায়, জোচ্চোরের কাণ্ড। বলে কিনা ওর ছাতা।

বৃষ্টি আর ট্রেণের ছাড়ার শব্দে ভদ্রলোকের কথা মিলিয়ে গেল। বক্কেশ্বরও পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ী ফিরে যোগমায়াকে বললে,—দেখছো গিন্নী, কেমন ছাতা?

যোগমায়া বক্কেশ্বরের হাত থেকে ছাতাটা নিতে নিতে আনন্দোৎফুল্ল হ'য়ে বললে,—এত দামী ছাতা কিনলে?

বক্কেশ্বর বেশী কথা না ব'লে, বললে,—হুম্।

এইবার বক্কেশ্বর একটু মুস্কিলে পড়েছে। গাড়ীতে সে সবচিন্ হ'য়ে পড়েছে। সে যে গাড়ীতে ওঠে সে গাড়ীর সবাই সাবধান হ'য়ে থাকে। তার পর পিছনে লেগেছে কোম্পানি। টিকিট দেখবার নতুন লোক সব নিয়োগ করেছে। তারা গাড়ীতে গাড়ীতেই থাকে। বিনা টিকিটে বক্কেশ্বরের যাওয়া দায় হ'য়ে উঠলো। কয়েক দিন সে গাড়ীতে উঠেই পায়খানায় গিয়ে ব'সে থাকতো, আর নামতো একেবারে হাওড়ায়। তারপর সেখানে কোনগতিকে এড়িয়ে যেতো। ফেরবার সময়ও এই উপায় অবলম্বন করতো।

কিন্তু হায়, কি দুর্দ্দৈব! সেদিন ফেরবার সময় গাড়ীতে উঠেই দেখে একজন চেকার ব'সে রয়েছে পূর্ব্ব হতেই। গাড়ীতে যারা উঠছে সে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের টিকিট দেখছে। বক্কেশ্বর বিপদ গুরুতর বুঝে ভাল মানুষের মত একপাশে চুপ ক'রে গিয়ে বসলো। অন্য লোকের টিকিট দেখতে ব্যস্ত থাকায় চেকার তাকে নজর করলে না এবং পরে ভাবলে যে তার টিকিটও দেখা হয়ে গেছে, নইলে বক্কেশ্বর অত কোণে কি ক'রে গিয়ে বসবে। বক্কেশ্বরের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগলো। আজ না জানে তার অদৃষ্টে কী বিপদই আছে।

ব্যাণ্ডেলে গাড়ী থামতেই চেকার আবার টিকিট দেখতে লাগলো। বক্কেশ্বর প্রমাদ গুণলে। এবার তার নিস্তার নেই। তার কাছে যখন টিকিট দেখতে চাইলে তখন সে গম্ভীর ভাবে বললে,—মান্থলি মশায়।

চেকার দেখতে চাইলে। বক্কেশ্বর অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে বললে,—কি আপদ, মশায় আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জার, আমরা রোজ যাই।

চেকার বললে,—তা হোক, দেখি।

বক্কেশ্বর ব্যস্তভাবে টিকিট বের করতে গিয়ে খুঁজে না পাওয়ার ভান ক'রে বললে,—যাঃ মশায়, আনতে ভুলে গেছি।

চেকার জরিমানা ও টিকিটের দাম চাইলে। কিন্তু বক্কেশ্বরের পকেটে কিছু থাকলে তো সে দেবে। বৃথাই তার পয়সা খোঁজাখুঁজি। হঠাৎ মুখ তুলে বললে,—আরে মশায়, পয়সাই দিয়ে যদি গাড়ী চড়বো, তো রেল গাড়ী চড়বো কেন। রেল কোম্পানি তো আমাদের জায়গা দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে, বিনা ভাড়ায় নিয়ে যেতে তারা বাধ্য।

চেকার কোন কথা না শুনে তাকে পুলিশের হাতে দিলে। বক্কেশ্বর অনেক কাকুতি মিনতি করলে; কিন্তু কিছুই ফল হলো না।

গাড়ী থেকে নামতে নামতে সে গাড়ীর যাত্রীদের উদ্দেশ ক'রে বললে,—মশায়, মেমারী ষ্টেসনে কাউকে একটু দয়া করে ব'লে যাবেন যে, ওলাইচণ্ডীপুরের বক্কেশ্বর ঢোলকে পুলিশে ধরেছে—নইলে বাড়ীতে ভাবেব।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কলিকাতার সান্নিধ্যে ২৪-পরগণার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী খড়দহ গ্রামখানি এককালে বহু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বংশের মধ্যে একটি বংশ 'গুরুবংশ' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যবিনোদ মহাশয় সন ১২৭০ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির পুণ্যাহে এই সুবিখ্যাত প্রাচীন গুরুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রজ—শাস্ত্রচর্চ্চা ও নিষ্ঠার জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের পিতামহ কালিদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শৈশবে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার জননী লক্ষ্মীমণি দেবী পতির চিতারোহণ পূর্ব্বক সহমৃতা হন।

সুবিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জোন্স ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কালিদাসের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন ও কনিষ্ঠ গুরুচরণ শিরোমণি। অম্বিকাচরণ অল্পবয়সে লোকান্তরিত হন। ক্ষীরোদপ্রসাদ গুরুচরণ শিরোমণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র।

কালিদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আয় ছিল যেমন প্রচুর, দানধ্যান, অতিথি-সৎকার ও পূজাপার্ব্বণে, ব্যয়ও তদনুরূপই ছিল। সেই জন্য মৃত্যুকালে তাঁহার সঞ্চয়ের পরিমাণ আট আনার অধিক ছিল না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী প্রচুর উপায়ন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া মহাসমারোহে নির্ব্বাহ হয়। শ্রাদ্ধশেষে জিনিসপত্র এত উদ্‌বৃত্ত হইয়াছিল যে পুত্র গুরুচরণকে সংসারধর্ম্ম উপলক্ষে তিন বৎসর ধরিয়া এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় নাই।

গুরুচরণ শিরোমণি মহাশয় স্বনামধন্য মহাত্মা স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। খড়দহের এই গুরুবংশের প্রতি গুরুদাসবাবুর পিতা স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জননী সোণামণি দেবীর এরূপ অচলা ভক্তি ছিল যে তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গুরুদাস। ১৩১৫ সালে কলিকাতায় গুরুচরণ শিরোমণি মহাশয়ের ৺গঙ্গালাভ হয়।

কিছু দিন খড়দহগ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করিবার পর ক্ষীরোদপ্রসাদ খড়দহ বঙ্গবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। দশ বৎসর বয়সে এই বিদ্যালয় হইতে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই তিনি কঠিন প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হন। তিন বৎসর ধরিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইতে থাকায় তাঁহার অবস্থা এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে চিকিৎসক মহাশয় তাঁহার জীবনে হতাশ হইযা পড়েন। অবশেষে এক অলৌকিক উপায়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ আরোগ্য লাভ করেন। সেই হইতে তিনি অলৌকিক ব্যাপারে অতি আস্থাবান হন। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে সকল অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে সেইগুলি, এবং তাঁহার "অলৌকিক রহস্য" নামক মাসিকপত্র প্রকাশ বোধ হয় এই বিশ্বাসের ফল।

আরোগ্য লাভের পর ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আশুতোষের নিকট ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বিগত তিন বৎসর প্রায় কিছুই পড়াশুনা হয় নাই। তীক্ষ্ণধী বালক এক বৎসরের মধ্যেই তিন বৎসরের পাঠ অধ্যয়ন করিয়া শেষ করিলেন।

ইহার পর তিনি ব্যারাকপুরের ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত প্রত্যহ খড়দহ হইতে ব্যারাকপুরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এই বিদ্যালয় হইতে যথাসময়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময় হইতে তিনি কলিকাতার অধিবাসী হইয়া পড়িলেন।

কলেজে ভর্ত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চাও আরম্ভ হয়—তিনি খণ্ড কবিতা লিখিতে থাকেন। কতকগুলি কবিতা তৎকালীন সাময়িক পত্রে প্রকাশিতও

হইয়াছিল। বি-এ পাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার "ফুলশয্যা" নাটক রচিত হয়; এবং মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন কালেই তিনি "ধ্রুব" এবং "নল-বিয়োগ" নামক আরও দুইখানি নাটক প্রণয়ন করেন।

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন হইতে ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রসায়ন-বিজ্ঞানে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করেন। পর বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যখন পরিণত বয়সে কৃষ্ণ-চরিত্র রচনায় ব্যাপৃত তখন ক্ষীরোদপ্রসাদ তরুণ যুবক। বঙ্কিমচন্দ্রের যশোভাতিতে তখন বঙ্গের আকাশ সমুজ্জ্বল। সাহিত্য-জগতে প্রবেশার্থী তরুণ সম্প্রদায় তখন প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে উপদেশ লইবার জন্য গমন করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ একদিন তাঁহার এক আত্মীয় শেয়াখালা নিবাসী গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার "ফুলশয্যা" নাটকের পাণ্ডুলিপি-খানি লইয়া বঙ্কিম-সন্দর্শনে গমন করেন। বঙ্কিমবাবু তখন তাঁহার সেই লোকপ্রসিদ্ধ বৈঠকখানায় বসিয়া কৃষ্ণচরিত্র লিখিতেছেন। এক-একখানি পৃষ্ঠা লেখা হইতেছে, আর তিনি লিখিত কাগজখানি তাঁহার পার্শ্বে রক্ষা করিতেছেন। তিনি এমন তন্ময়-চিত্তে লিখিতেছেন যে, দুইজন আগন্তুক আসিয়া যে তাঁহার অদূরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সেদিকে খেয়ালই নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও বঙ্কিমচন্দ্র যখন আগন্তুকদিগের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না, তখন চঞ্চল যুবক ক্ষীরোদপ্রসাদ একটি অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন—তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বদেশে রক্ষিত সদ্য-লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর হস্তার্পণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "কে হে তুমি ছোকরা? লেখার সময় পাণ্ডুলিপি দেখা কতদূর অন্যায় তা তুমি জান না?" সপ্রতিভ ক্ষীরোদ-প্রসাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, মহাশয়, লেখার সময় পাণ্ডুলিপি দেখা অন্যায়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। আপনার "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাস পড়িয়া আমি নিষ্কামধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছি; নিষ্কামধর্ম্মের স্বরূপ কি তাহাও কতকটা বুঝিয়াছি। আমি আপনার পাণ্ডুলিপি আকর্ষণ করিয়া দেখিতেছিলাম আপনার নিষ্কামতা কিরূপ।"

গোপালচন্দ্র গীতা প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাসংযুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেইসূত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। গোপালচন্দ্র বলেন, বাকপটু ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে গোপালচন্দ্রের নিকট হইতে ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া উপদেশচ্ছলে স্নেহপূর্ণ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ বাবা, বই লিখে পাণ্ডুলিপিটা এক বৎসর ফেলে রেখে দেবে। এক বৎসর অন্তে সেটা একবার আদ্যোপান্ত পড়ে দেখবে। যেখানে যেটা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করবে, তা নির্ম্মম ভাবেই করবে। পরে নিজের মনের মত হলে তবে বইটি সাধারণ্যে প্রকাশ করবে। তুমি যে পাণ্ডুলিপিটা এনেছ, সেটা আজ নিয়ে যাও। এক বৎসর পরে ওটা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

বঙ্কিমচন্দ্রকে "ফুলশয্যার" পাণ্ডুলিপি দেখানো ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাগ্যে আর ঘটে নাই বটে, তবে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ পালন করিয়াছিলেন—বহু দিন উহার পাণ্ডুলিপি ফেলিয়া রাখিবার পর, অনেক সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তবে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এম-এ উপাধি লাভ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তখন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে আইন অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। আইন পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে উচ্চ শ্রেণীগুলিতে গণিতের অধ্যাপনা করিতেন। আইনের শেষ পরীক্ষায় কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতার ফলে বাঙ্গলার রঙ্গভূমি এবং অভিনয়-দর্শকবৃন্দ সমূহ উপকৃত হইয়াছিলেন। নাট্য-কলার ভিতর দিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন—ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে বোধ করি তাহা সম্ভবপর হইত না।

ভোরের পূরবী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
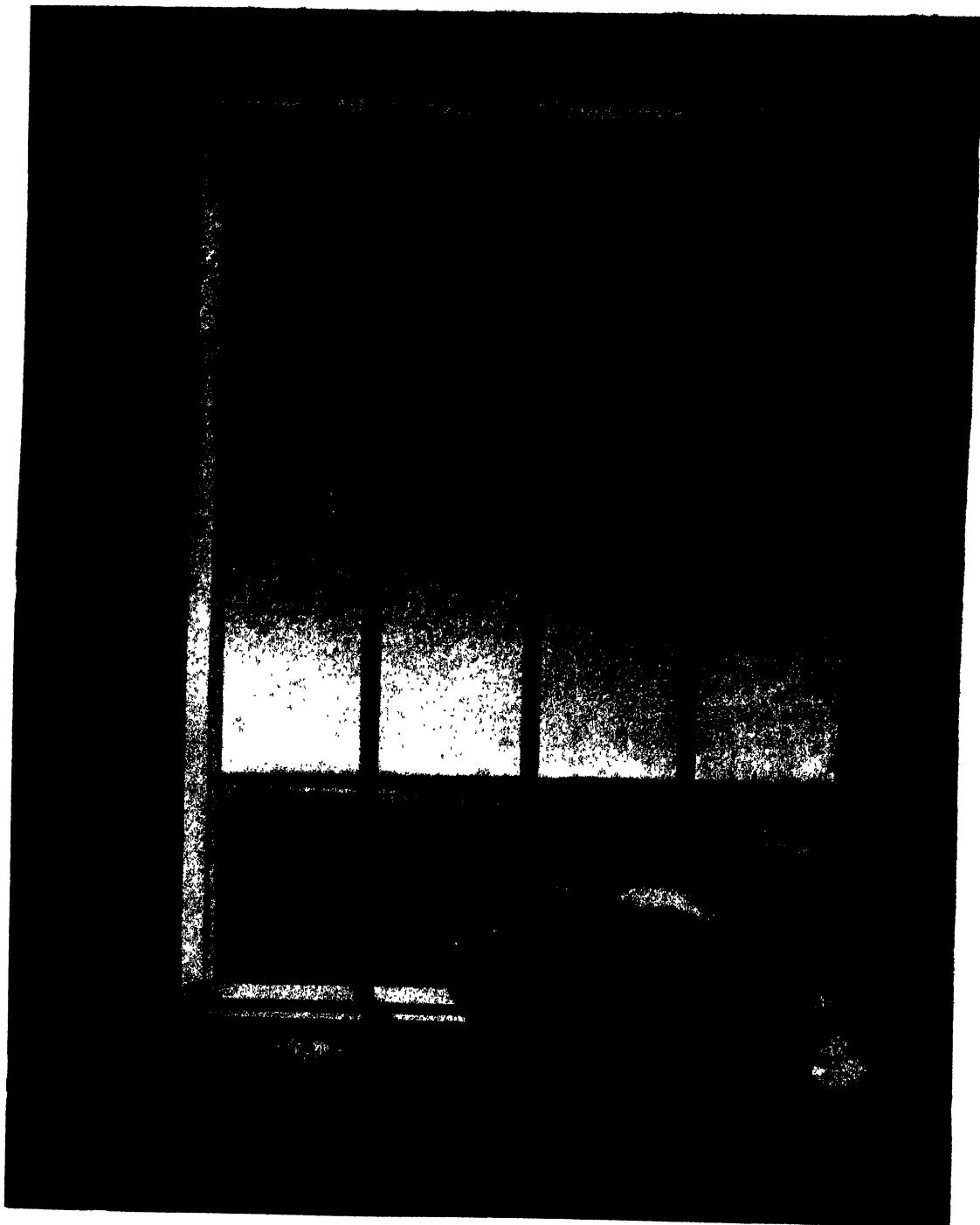
এইবার তাঁহার কর্ম্মজীবনে প্রবৃত্ত হইবার সময় উপস্থিত হইল। তিনি পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে একটি বিজ্ঞান-বিভাগ খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি ঐ বিভাগের অধ্যাপকতার কর্ম্ম পাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তৎকালে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্ব্ব শ্রেণীর সকল বয়সের লোক নানারূপ প্রার্থনা লইয়া সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। অর্থী-প্রত্যর্থীদের মধ্যে কেহ-বা কর্ম্মপ্রার্থী, কেহ-বা উপদেশপ্রার্থী, এবং অধিকাংশই পুস্তক, অর্থ বা ঐরূপ কোন সাহায্যপ্রার্থী। ক্ষীরোদপ্রসাদ যেদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সেদিনও তাঁহার বসিবার ঘরে বহু লোকের জনতা। বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ শরীরে ক্লান্ত চিত্তে এক-একজনের প্রার্থনা শুনিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া বিদায় দিতেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের দিকে দৃষ্টি পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কি জন্যে এসেছ? বইটই কিছু চাই না কি?"

ক্ষীরোদপ্রসাদ বলিলেন, "না মহাশয়, আমি আপনার লিখিত সমস্ত বই পড়িয়া শেষ করিয়াছি। শুনিলাম আপনি মেট্রোপলিটানে বিজ্ঞান-বিভাগ খুলিবেন। আমি রসায়নে এম-এ পাশ করিয়াছি। আমি ঐ বিভাগে অধ্যাপক-পদপ্রার্থী।"

বিদ্যাসাগর বলিলেন, "সে আমি তোমার গোঁফ দেখেই টের পেয়েছি।"

উপস্থিত-বক্তা ক্ষীরোদপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "মহাশয়, মানুষ চিনিবার এই অপূর্ব্ব ক্ষমতা আপনার না থাকিলে লোকে আপনাকে বিদ্যাসাগর না বলিয়া বিদ্যাসরোবর বলিত।"

বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, যদি বিজ্ঞান-বিভাগ খোলা হয়, তবে তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে লইব।"

ইহার অল্প কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন।

১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষীরোদপ্রসাদ জেনারেল এসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউসনে (অধুনা স্কটিস চার্চ্চেস কলেজ) রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। কলেজে অধ্যাপনা কালের মধ্যেই এমারেল্ড থিয়েটারে তাঁহার "ফুলশয্যা" এবং ক্লাসিক থিয়েটারে "আলিবাবা" অভিনীত হয়। আলিবাবার অভিনয় এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, কলেজের ছাত্ররা সকাল সকাল কলেজে আসিয়া, দ্বার বন্ধ থাকিতে দেখিলে উচ্চকণ্ঠে "চিচিং ফাঁক" বলিয়া চীৎকার করিত।

তৎকালে শিক্ষিত জনসাধারণ থিয়েটার বা তৎসংশ্লিষ্ট সব-কিছুই তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাটক-প্রহসন থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার কলেজে অধ্যাপনায় একটু গোলযোগ ঘটিল। জেনারেল এসেম্বলীজ ইনষ্টি-টিউসনের তৎকালীন অধ্যক্ষ মরিশন সাহেব কলেজের কোন অধ্যাপকের সাধারণ নাট্যশালার সহিত কোনরূপ সংস্রব থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। অধ্যক্ষ সাহেব ক্ষীরোদপ্রসাদকে, হয় অধ্যাপনা, না হয় নাট্যসাধনা, এই দুইটার একটা বাছিয়া লইতে বলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষেরটাই বাছিয়া লইয়া-ছিলেন। অতঃপর তিনি অবশিষ্ট জীবনকাল থিয়েটার, নাটক, প্রহসন লইয়াই অতিবাহন করেন। নাটক, প্রহসন, উপন্যাস ইত্যাদিতে তিনি পঞ্চাশখানির অধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

'অলৌকিক রহস্য' নামে একখানি মাসিক পত্র তিনি বাহির করেন। ইহাতে থিয়জফি বা তত্ত্ব-বিদ্যা, প্রেততত্ত্ব ও অন্যান্য অলৌকিক ব্যাপার সমূহের আলোচনা হইত। কাগজখানি দুই তিন বৎসরের অধিক চলে নাই। থিয়জফির দিকে যে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল, তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ অতি অমায়িক ও মিশুক লোক ছিলেন। তাঁহার সমসময়ের প্রবীণ অপেক্ষা নবীন সম্প্রদায়ের তিনি অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন, তরুণরা এক একখানি সোনার ইট। ইহাদিগকে সাজাইয়া গাঁথিতে পারিলে রাবণের স্বর্ণ লঙ্কার মত সুবর্ণ-অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায়।

সন ১৩৩৪ সালের ১৮ই আষাঢ় এই প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক-নাট্যকার লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(বাবিরুষ ও আসিরিয়ার শিল্পকলা)

য়ুরোপীয় সভ্যতার শৈশবযুগে যেখানে যখন শিল্পকলার প্রথম অভ্যুদয় হ'য়েছিল তখন লোকের ধারণা ছিল যে একমাত্র মিশরের কাছেই সে তার এই শিল্পানুপ্রেরণার জন্য ঋণী। কিন্তু যদিও এ তথ্য সম্পূর্ণ সত্য যে আধুনিক কারুকলার প্রত্যেক বিভাগেই নীলনদীতীরের শিল্প-

সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তর-মূর্ত্তি (এটি চুনে-পাথরে তৈরি মূর্ত্তি। ইনি কোনো সুমেরীয় নৃপতি বা গুরু পুরোহিত কেউ হ'তে পারেন। খৃঃ পূঃ ২৫০০ শতাব্দীতে এঁরা মেসোপোটেমিয়ার 'লাগাশ' অঞ্চলে রাজত্ব ক'রতেন। এঁরা সেমিটিক জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ নন। এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই দুর্লভ মূর্ত্তিটি আছে।)

প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তথাপি এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে য়ুরোপীয় শিল্পী ও কারিগরদের প্রথম ও প্রধান পথপ্রদর্শক হচ্ছেন চাল্‌দীর সুচারু কলাবিদ্‌গণ।

বাবিরুষ ও আসিরিয়ার শিল্পকলার উপর মিশরের প্রভাব এসে পড়েছিল অনেক পরে এবং তাও ঠিক সরাসরি আসেনি। নীলনদীতীরের শিল্প-প্রভাব মেসোপোটেমিয়ায় প্রথম এসে পৌঁছেছিল প্যালেষ্টাইনের আরামেইনদের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মেসোপোটেমিয়ার শিল্পকলার তখন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও দেখা দিয়েছে সেটা তাদের নির্দ্দিষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দীর্ঘকালের জাতীয় প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছিল।

চাল্‌দীর শিল্পকলার ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় তার বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কলাপদ্ধতির মধ্যে একটা সৌকুমার্য্যের সাম্য ও সঙ্গতি বরাবরই রক্ষিত হ'য়েছে। এবং এই বিশেষ গুণটি থাকার জন্যই এদের শিল্পকলা অন্য দেশ ও অন্য জাতির কলা-পদ্ধতিকেও প্রভাবান্বিত ক'রতে পেরেছিল। গ্রীসের প্রথম শিল্প-সাধনার যুগে তাদের আদর্শ ছিল এই চাল্‌দীর কলা-পদ্ধতি। পার্থেননের স্থাপত্য-কলার মধ্যে যে কারু-কার্য্যময় কটি-বেষ্টনীর (Frieze) সন্নিবেশ দেখতে পাওয়া যায় সেটা আসিরিয়ার ইমারত সংক্রান্ত কটি-বেষ্টনী শিল্পেরই একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ বলা চলে। তারমধ্যে যে তেজদৃপ্ত বেগবান অশ্বযূথ উৎকীর্ণ করা আছে যারা চমৎকার গ্রীবাভঙ্গী করে অস্থির পদনখে মৃত্তিকা খনন করছে, তাদের দেখলে মনে হয় ওরা যেন নৃপতি আসুর বাণীপালের অশ্বশালা থেকেই এসেছে! য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের শিল্প ও কারুকলার শৈশব অবস্থাতেও প্রাচ্যের এই অনুকরণের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মরোক্কো ও বায়জান্টাইন শিল্পকলার অজস্র দানে যখন য়ুরোপে প্লাবিত হয়ে উঠেছিল তখন এ কথা তারা জান-

শিকার অভিযান (এটিও উদ্গত শিলা-চিত্র। নৃপতি অসুরবাণীপাল অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। কথিত আছে তাঁর শিকারের অত্যাচারে চাল্দীর অরণ্য সিংহ-বিরল হ'য়ে পড়েছিল, কিন্তু রাজার শিকার চাই! কাজেই দেশান্তর থেকে সিংহ ধরে এনে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে রাখা হ'ত। শিকারের দিন তাকে অরণ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত এবং অশ্বারোহী শিকারীর দল তার অনুসরণ করতো। এই শিলা-চিত্রে সেই ˙ বিই উৎকীর্ণ করা হয়েছে)

তোনা যে রায়জাস্তাইন বা মরোক্কো তাদের যা দিয়েছিল সে তাদের নিজস্ব সম্পদ নয়, প্রাচীন বাবিরোযের অফুরন্ত শিল্পভাণ্ডার থেকেই তা সংগৃহীত। সুতরাং, এ কথা আজ বেশ জোর করেই বলা চলে যে বর্ত্তমান জগতের এমন একটিও কোনো কলা-পদ্ধতি এখনো দেখা যায়নি, যা কোনো-না-কোন দিক দিয়ে বাবিরুষের প্রাচীন শিল্প-কলারই পুনরাবৃত্তি নয়।

বাবিরুষের অধিবাসীরা স্বভাবতই শিল্প-প্রবণ জাতি। ললিত কারু-কলার প্রতি তাদের একটা প্রকৃতিগত অনুরাগ ছিল, কিন্তু, দোষের মধ্যে তারা বড় গতানুগতিক প্রিয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে কোনো কিছু মৌলিক সৃষ্টির প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে একরকম ছিলনা ব'ললেই চলে। পূর্ব্ববর্ত্তীরা যেমন ক'রে গেছেন ঠিক তেমনটি ক'রতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট হ'ত, অর্থাৎ দেশের প্রাচীন শিল্প-কলার অন্ধ অনুকরণই ছিল তাদের সাধনা; নূতন কিছু করবার প্রয়াস তাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল, কারণ সেরূপ করাটা তাদের রীতি-বহির্ভূত কার্য্যের মধ্যেই ছিল। এই ঐতিহ্যের মোহ তাদের অসাধারণ শিল্প-প্রতিভাকে বহুযুগ ধ'রে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছিল। তাছাড়া গ্রীক্ শিল্পীদের মত বাবিরুষের শিল্পীরা কলা-বিদ্যাকেই তাদের ধ্যানজ্ঞান ব'লে মনে ক'রতোনা। Art for Arts' Sake নীতি তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তারা তাদের দেবতা ও রাজার প্রীতি ও সন্তোষের জন্য, তাদেরই মর্য্যাদা ও গৌরব বাড়াবার উদ্দেশ্যেই প্রাণপণে শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রতো। কাজেই বাবিরুষীয় শিল্প যুগেযুগে নবীন ও বিচিত্র হ'য়ে
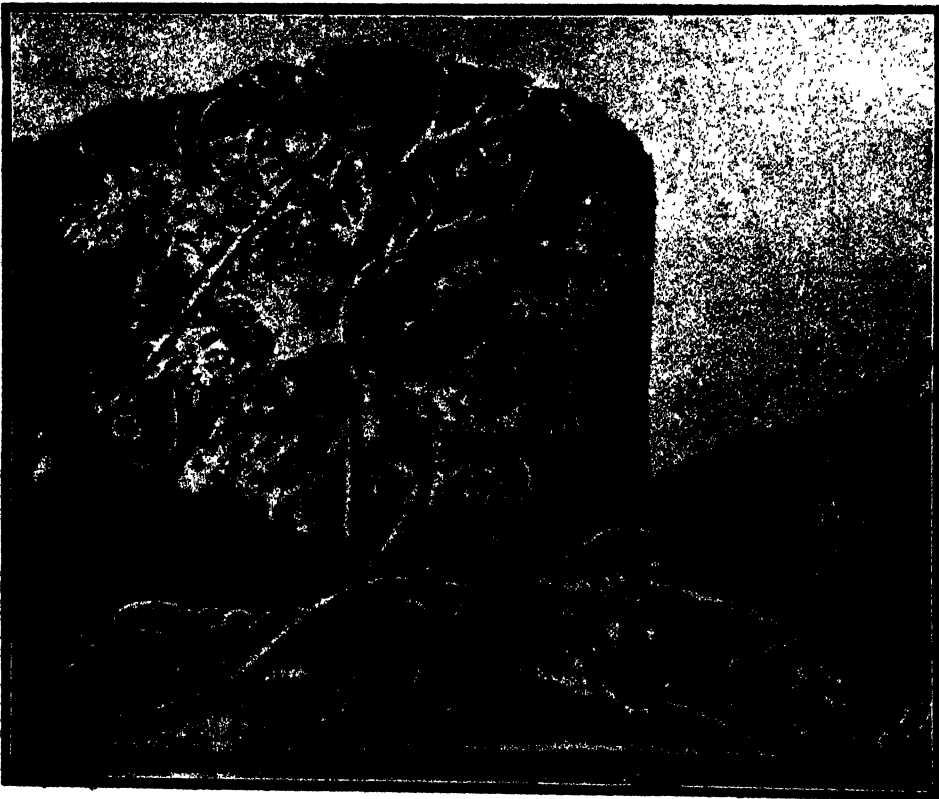
উদ্গত শিলা-চিত্র (পাথরের উপর উৎকীর্ণ ছবি। অরণ্যে সিংহ-দম্পতির আরামে অবস্থান। পট-ভূমিকায় নানা ফল ফুল ও তরু লতা উৎকীর্ণ ক'রে অরণ্যের ইঙ্গিত দেওয়া হ'য়েছে। সিংহিনীকে দেখা যাচ্ছে। সিংহ ওর সম্মুখে ডানদিকে ঠিক ওই একই ভঙ্গীতে ছিল। নৃপতি অসুরবাণীর প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে এই চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে)

উঠবার অবকাশ পায়নি। মিশরীয় শিল্পকলা নানা দিক দিয়ে উন্নতির পথে অগ্রগামী হ'লেও বাবিরুষীয় শিল্পকলাকে অতিক্রম ক'রে যেতে পেরেছিল মাত্র কয়েকটা বিভাগে। উদ্গাত শিলা-শিল্পে (Bas Relief) এবং বস্ত্রশিল্পে চারুকলার সমাবেশ ইত্যাদিতে নীলনদী-

রাজ-পোষাকের কারুকার্য্য (এটি রাজ পরিচ্ছদের উপরাংশ—অর্থাৎ বক্ষাবরণ। রাজার পোষাক যে কত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ছিল, এই চিত্রে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়)

তীরের শিল্পীরা কোনোদিনই বাবিরুষের সমকক্ষ হ'তে পারেনি। মেসোপোটেমিয়ার ভাস্কর্য্য-শিল্প মিশরীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ও আভিজাত্যের তুলনায় অনেকটা নিরেশ বলে মনে হ'লেও মূর্ত্তি ব্যঞ্জনায় গতির অভিব্যক্তি ও অক্ষুণ্ণ ভাস্কর্য্য-রীতির দিক দিয়ে তা' কোনো অংশেই হীন নয়।

কিন্তু চাল্‌দীর ভাস্করেরা একটা বিষয়ে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কাজ ক'রতে বাধ্য হ'ত—সেটা হ'চ্ছে তাদের দেশের ও জাতির একটা অদ্ভুত রুচিবোধ।

গ্রীস বা মিশরের মত সেখানে ভাস্কর্য্য-কলায় নগ্নতার স্থান নেই। পাষাণ মূর্ত্তিকেও বিবস্ত্র ক'রে গড়া তাদের কাছে ছিল লজ্জাকর ব্যাপার। বিশেষ সে দেশের আবহাওয়াই ছিল নগ্নতার বিরোধী। চাল্‌দীরা খুব মোটা ভারি ও মূল্যবান আঙরাখা ব্যবহার করতো এবং মাথার উপর উষ্ণীষ পরিধান ক'রতো, তা নইলে প্রখর সূর্য্যতেজ ও তপ্ত বায়ুর দহন-জ্বালা থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌তো। কাজেই তাদের চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে মানব দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্যের যে সুকুমার দিব্য রূপ—তা' ব্যক্ত করবার কোনো সুযোগই চাল্‌দীয় শিল্পীরা পেতনা।

পক্ষে মানবদেহের অস্থি-সংস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হওয়াটাই হ'চ্ছে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ ঐটাই তার প্রথম সোপান। কাজেই, পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন শ্লেট পেন্সিলে মূর্ত্তি আঁকে একটা ডিম্বাকার বৃত্তের চার কোনে চারটে হাত পা জুড়ে আর মাথার উপর একটা মুণ্ড বসিয়ে দিয়ে, তেমনি করেই বাবিরুষের ভাস্করেরা মূর্ত্তি গড়তো একটা আঙ্‌রাখার চারকোণে হাত পা লাগিয়ে এবং গলার কাছে একটা মানুষের মুণ্ড বসিয়ে। এর ফলে তাদের মূর্ত্তিগুলি হ'ত আনুপাতিক পরিমাপের দিক থেকে প্রায়ই অসমান। কোনোটির হাত পা মুখের তুলনায় শরীর হ'য়ে যেতো ভারি। আবার কোনোটির

পৌরাণিক চিত্র (নিমরুদের এনার্ত্তা দেবী-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার-পার্শ্বে এই চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে। আসিরীয়ার দেবরাজ হচ্ছেন 'অসুর', যেমন বাবিরুষের দেবরাজ হচ্ছেন 'মোরডুক'। রাক্ষসী তিয়েমাৎ দেবতাদের গ্রাস করবার সঙ্কল্প ক'রেছিল, তাই দেবগণ তাকে বধ করবার জন্য সুরপতি অসুরকেই অনুরোধ করেছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অবশেষে 'বজ্র' আঘাতে তাকে বধ করেন। সেই রাক্ষসীর বিরাট কলেবর দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃষ্টি হ'য়েছিল। (অনেকটা আমাদের পৌরাণিক কাহিনী মধুকৈটভ বধ ও মেদিনী সৃষ্টির সঙ্গে মেলে ! দক্ষিণে বজ্রপানি দেবরাজ অসুর, মধ্যে রাক্ষসী তিয়েমাৎ, বামে অসুর সঙ্গী অপর এক দেবতা।)

অস্থিবিদ্যার অনুশীলনে তাই বাবিরুষের শিল্পীরা ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত, অথচ ভাস্কর্য্য-কলায় সুদক্ষ হওয়ার

শরীরের অনুপাতে হাত পা ও মুখ হ'য়ে পড়তো অসম্ভব লম্বা চওড়া ও বড়।

রাজা রাজড়াদের এবং গুরু পুরোহিতদের মূর্ত্তি গড়তো তারা একেবারে বীরবাহু বা ভীমসেনের আদর্শে মহা শক্তিশালী করে। তাদের দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কুঞ্চিত কেশদামের যে রকম প্রসাধন-পারিপাট্য দেখা যায় তাতে মনে হয় নাইনেভের কেশ-বেশকার নরসুন্দরেরা সেখানে বেশ মোটারকম উপার্জ্জন ক'রতো। কিন্তু এই চাল্‌দীয় বা আসুরীয় ভাস্কর্য্যের একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে সেগুলি শুধুই শিল্পীর পরিকল্পিত মূর্ত্তি নয়, বহু রাজকাহিনী ও কীর্ত্তির ইতিবৃত্তও তার মধ্যে উৎকীর্ণ আছে। বিশেষ ক'রে সেখানকার রাজপ্রাসাদের কক্ষপ্রাচীরে ও দেবমন্দিরের ভিত্তি গাত্রে যে সব পাষাণ ছিল, সবই যেন সেই একছাঁচে ঢালা একঘেয়ে কাজ; একই জিনিষের বারম্বার পুনরাবৃত্তি ব'লে মনে হয়!

বাবিরুষের ভাস্কর-শিল্পীদের কাজ ক'রতে হ'ত অতি কঠিন প্রস্তরের উপর। কারণ, সেখানে আলাবাস্তার এবং বেলে পাথর প্রভৃতি পাওয়া যেতোনা। আসিরীয়ায় কিন্তু এরকম পাথর প্রচুর পাওয়া যেতো, কাজেই আসিরীয়ার শিলা-শিল্পীদের কাজ ছিল বাবিরুষীয়দের চেয়ে অনেক সহজ। তাই পাথরের উপর সূক্ষ্মকাজ আসিরীয়াতে যত বেশী বাবিরুষে তা' নেই। যে ইনাবতের কটি-বেষ্টনীর কথা পূর্ব্বে বলেছি নাইনেভের আশেপাশে তার অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। আলাবাস্তার

মৃগ যূথ (অসুরপতি অসুরবাণীপালের সময়ে শিকার-চিত্রের আদর ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই প্রদর্শিত শিলা-চিত্রে যে গতিশীল মৃগযূথের অপূর্ব্ব চিত্র উৎকীর্ণ হ'য়েছে এটি একটি শিকার চিত্রেরই অঙ্গ। মৃগয়া আরম্ভ হবার পূর্ব্বে মৃগগণের অবস্থা এতে প্রতিফলিত করা হয়েছে।)

চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে সেগুলি সেই সেই রাজার শাসনকালের স্মরণীয় রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর প্রতিচ্ছবি এবং দেব-দেবীর পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এমনি করে সে দেশের শিল্পীরা সেখানে একাধারে শিল্প, ইতিহাস ও পুরাণের সমন্বয় ঘটিয়েছিল। তবে, তাদের সে শিলা-শিল্পের একটা ছন্দমাধুর্য্য ও আভিজাত্যমর্য্যাদা থাকা সত্বেও সেগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব খুব নরম পাথর, সহজেই তার উপর ছেনী চলে, কাজেই আসিরীয়ার ভাস্কর-শিল্পীদের মধ্যে সংযমের বেশ একটু অভাব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা অনেকক্ষেত্রে একেবারে বে-পরোওয়া হয়ে ছেনী চালিয়ে গেছেন। তাঁদের হাতের কাজ যেমনি জোরালো তেমনি ক্ষিপ্র। সহজেই ছেনী চলে বলে অনেক স্থলে তাঁরা বাড়াবাড়ি করবার প্রলোভন সম্বরণ ক'রতে পারেননি।

আদিকালের সকল শিল্পীদের মতই এঁরাও প্রথমটা জীব-জন্তুর পাশের দিকের (Profiles) ছবি আঁকতে সুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্তও ওই পাশের দিকের ছবি আঁকারই পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁদের ভাস্করেরা যখন সম্পূর্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের চেষ্টা ক'রেছিলেন তখন বিশেষ উন্নতি বা প্রগতির পরিচয় দিতে পারেননি। শীঘ্রই তাঁরা এ চেষ্টা থেকে বিরত হন এবং পাষাণ-ক্ষেত্রের উপর ঈষৎ উদ্গত শিলা-চিত্র (Bas-relief) উৎকীর্ণ করার দিকেই বেশীরকম মনোযোগ দেন। ফলে ভাস্কর্য্যের এই বিভাগে তাঁরা এতদূর উন্নতিলাভ পদ্ধতি বলা যেতে পারে। প্রথমটা দেখলেই মনে হয় যে এগুলি বুঝি প্রস্তর মূর্ত্তি, কিন্তু দ্বিতীয়বার একটু মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলে বোঝা যায় যে এগুলি ঠিক প্রস্তর মূর্ত্তি নয়, পাষাণ ক্ষেত্রের উপরই উদ্গত শিলা-চিত্র মাত্র, তবে ঈষৎ উদ্গত না হ'য়ে সেগুলি একটু বেশী মাত্রায় তোলা। আসিরীয়ার ভাস্করেরা মানব-মূর্ত্তির সংগঠন অপেক্ষা জীব জন্তুর মূর্ত্তি সংগঠনে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন ক'রতে পেরেছেন। তাঁরা রূপকথার কোনো কাল্পনিক জীবজন্তুর অদ্ভুত আকৃতি অপেক্ষা জীব-জন্তুর স্বাভাবিক ও স্বরূপ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করারই পক্ষপাতি

বন্য অশ্ব (এটিও শিকার সম্বন্ধে একখানি উদ্গত শিলাচিত্র। বাণাহত বন্য অশ্বগণ প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে—এমন অপরূপ সুন্দর ছবি শিল্পীর তুলিতেও খুব কম দেখা যায়।)

করেছিলেন যে তাঁদের হাতের কাজ আজও বিশ্বে অতুলনীয় হ'য়ে রয়েছে।

নগর-তোরণের উভয় পার্শ্বে যে সব বৃহদাকার সিংহ ও পক্ষসংযুক্ত বৃষভ দ্বারপালের ন্যায় সজ্জিত রয়েছে দেখা যায় সেগুলিকে ঠিক উদ্গত শিলা-শিল্প বলা চলে না, আবার সেগুলি ঠিক প্রস্তর মূর্ত্তিও নয়, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি বা দু'য়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক প্রকার ভাস্কর্য্য ছিলেন। যেমনটি তাঁরা চোখে দেখেছেন অবিকল ঠিক তেমনিটিই তাঁরা পাষাণে উৎকীর্ণ ক'রে রেখেছেন।

আসিরীয়ার ভাস্কর্য্যের তুলনায় বাবিরুষের ভাস্কর্য্য পদ্ধতিকে অনেকটা রোমের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে গ্রীসের ভাস্কর্য্যের যে ভেদ তারই অনুরূপ বলা চলে। পূর্ব্বেই বলেছি আলাবাস্তার ও বেলে পাথর প্রভৃতি নরম উপকরণের সুযোগ পাওয়াতে আসিরীয়ান্ শিল্পীরা

তাঁদের ভাস্কর্য্যে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন বাবিরুষের ভাস্করেরা তা কোনো দিনই পাননি। দৃঢ় মুষ্টিতে তীক্ষ্ণধার ছেনী ধরে অতি কঠিনতম প্রস্তর ভেদ ক'রে তাঁদের প্রত্যেক কল্পনাকে রূপ দিতে হ'য়েছে। তথাপি, মানব মূর্ত্তি সংগঠনে বাবিরুষের শিল্পীরা আসিরীয়ানদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত ও নিপুণ ছিলেন।

প্রাচ্যের চিত্রকলা যখন নানাদিক দিয়ে চরমোৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল তখনও পাশ্চাত্য দেশে চিত্র-বিদ্যার হাতে-খড়ি শেষ হয়নি। বর্ণ-বিন্যাস এ-দিকের চিত্রে যেমন অপরূপ হ'য়ে উঠেছিল তেমন আর কোথাও চখে পড়ে না। বাবিরুষ ও আসিরীয়াতেও এই রঙের খেলা নয়নাভিরাম হ'য়ে উঠেছিল। প্রাসাদ অভ্যন্তরের প্রাচীর গাত্রে সে দেশের যাদুকর শিল্পীদের মোহন তুলিকা যে অফুরন্ত বর্ণ-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছিল তার তুলনা মেলে না। তাঁরা যে সব রং ব্যবহার ক'রেছেন তার অধিকাংশই গাছ গাছড়া ও মাটীর রং। তাঁদের প্রিয় রং ছিল নীল ও হরিদ্রা। প্রাচীর-চিত্রের পীঠভূমিকায় তাঁরা প্রায়ই নীল রং ব্যবহার করতেন। হলদে রংটাও তাঁদের প্রায় প্রত্যেক চিত্রের সাজসজ্জা ও অলঙ্কারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। লাল ও সবুজ রংও তাঁরা ব্যবহার ক'রেছেন বটে কিন্তু খুবই কম। সাদা-কালোর রেখা-চিত্র যা বর্ত্তমান যুগের শিল্পীদের হাতে নানা রূপে রসে ফুটে উঠেছে চাল্‌দীর প্রাচীন শিল্প-সম্পদের মধ্যে তার পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বাবিরুষের চিত্র-শিল্পীরা ধাতব রংয়ের ব্যবহারও জানতেন। তাঁরা তাম্রের সঙ্গে ঈষৎ শিসক মিশ্রিত ক'রে নীল রং প্রস্তুত করতেন, এবং সৌবিরাঞ্জন সংযুক্ত শিসকের (Antimoniate of lead) সঙ্গে ঈষৎ টিন মিশ্রিত ক'রে হরিদ্রা বর্ণ প্রস্তুত করতেন। সাদা রং তাঁরা টিন থেকেই নিতেন। লাল রং লোহা থেকে বা শিসা থেকে সংগ্রহ করতেন। মোটের উপর পাঁচ ছয় রকম রং ছিল তাঁদের

সিংহাসনের সিংহ (মিনের কাজ-করা এই রঙীন সিংহ মূর্ত্তিটি তিন হাজার বৎসরের পুরাতন।)

শরবিদ্ধ সিংহ (শিকারের এমন জীবন্ত চিত্র অতি অল্পই দেখা যায়। শরবিদ্ধ সিংহের কাতর ভাব অতি চমৎকার ফুটে উঠেছে।)

শিল্পীর ভাণ্ডারের মূলধন। এইগুলিকেই উল্টে-পাল্টে পরস্পর সংমিশ্রণ ও বর্জ্জনের দ্বারা তাঁরা নানা রংয়ের বৈচিত্র্য সম্পাদন করতেন।

মেসোপোটেমিয়ার চিত্রশিল্পকে খাঁটি আলঙ্কারিক শিল্প (Decorative Art) বলা যেতে পারে, তবে তার পরিধি একটিমাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের শিল্পীদের মতই তাঁরাও প্রত্যেক বস্তুর স্বাভাবিক বর্ণের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকতে পারেন নি। তাঁদের চিত্রের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য-সাধনের দিক থেকে প্রয়োজনানুসারে যেখানে যে বস্তুর যে রং হ'লে মানায়, বেশী বা ভাল দেখায় বেশী, তাঁরা সেখানে সেই রং ব্যবহার করতেন। এই জন্যই খোসর্সাবাদ ও নিমরুদের প্রাচীর-গাত্রে নীলবর্ণ বৃষভ, পীতবর্ণ মানুষ, শ্বেতবর্ণ বৃক্ষ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এই যে রংয়ের বিদ্রোহ, এই যে স্বাভাবিক বর্ণের বিরুদ্ধাচরণ রীতি যা আজকাল অতি আধুনিক প্রাচীর-পত্রাকা ও বিজ্ঞাপন-পটেও প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় তিন হাজার বছর পূর্ব্বের শিল্পীরাই তার প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

বাণাহতা সিংহিনী (বাণাহতা সিংহিনীর আর্ত্তনাদ যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে !)
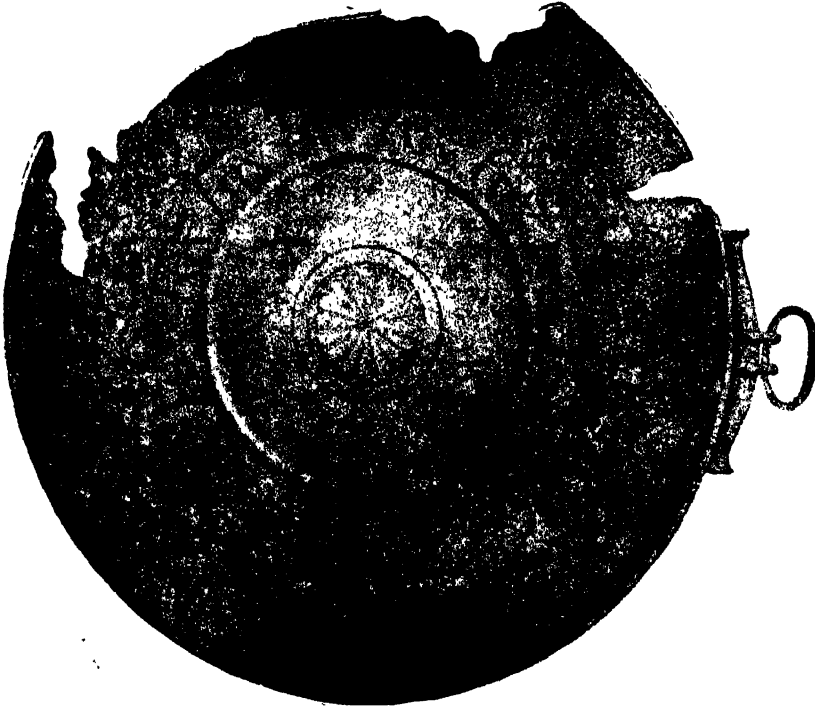
ব্রোঞ্জের পাত্র (নৃপতি অসুরবাণী পালের প্রাসাদে ব্যবহৃত তৈজস। ইহার উপরের কারুকার্য্য জীবজন্তুর মূর্ত্তি সাজিয়ে রচিত।)

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মেসোপোটেমিয়ার চতুর্দ্দিক খনন ক'রেও প্রাচীন সোনা রূপার অলঙ্কার বা জহরতাদি কিছু উদ্ধার ক'রতে পারেন নি। মিশরে এই রকম প্রচুর পুরাতন অলঙ্কারাদি পাওয়া গেছে ব'লে প্রত্নতাত্ত্বিক-

দের অনেক সুবিধা হ'য়েছে। এখানে তাঁরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছেন। কেন যে এখানে অলঙ্কার পত্র কিছু পাওয়া গেল না—তার কারণ অদ্যাপিও কিছু নির্দ্দেশ করতে পারা যায় নি। তবে বাবিরুষে কি রকম অলঙ্কারাদি ব্যবহার হ'ত তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাদের শিলাচিত্রে উদ্গাত মূর্ত্তির রূপ-সজ্জা
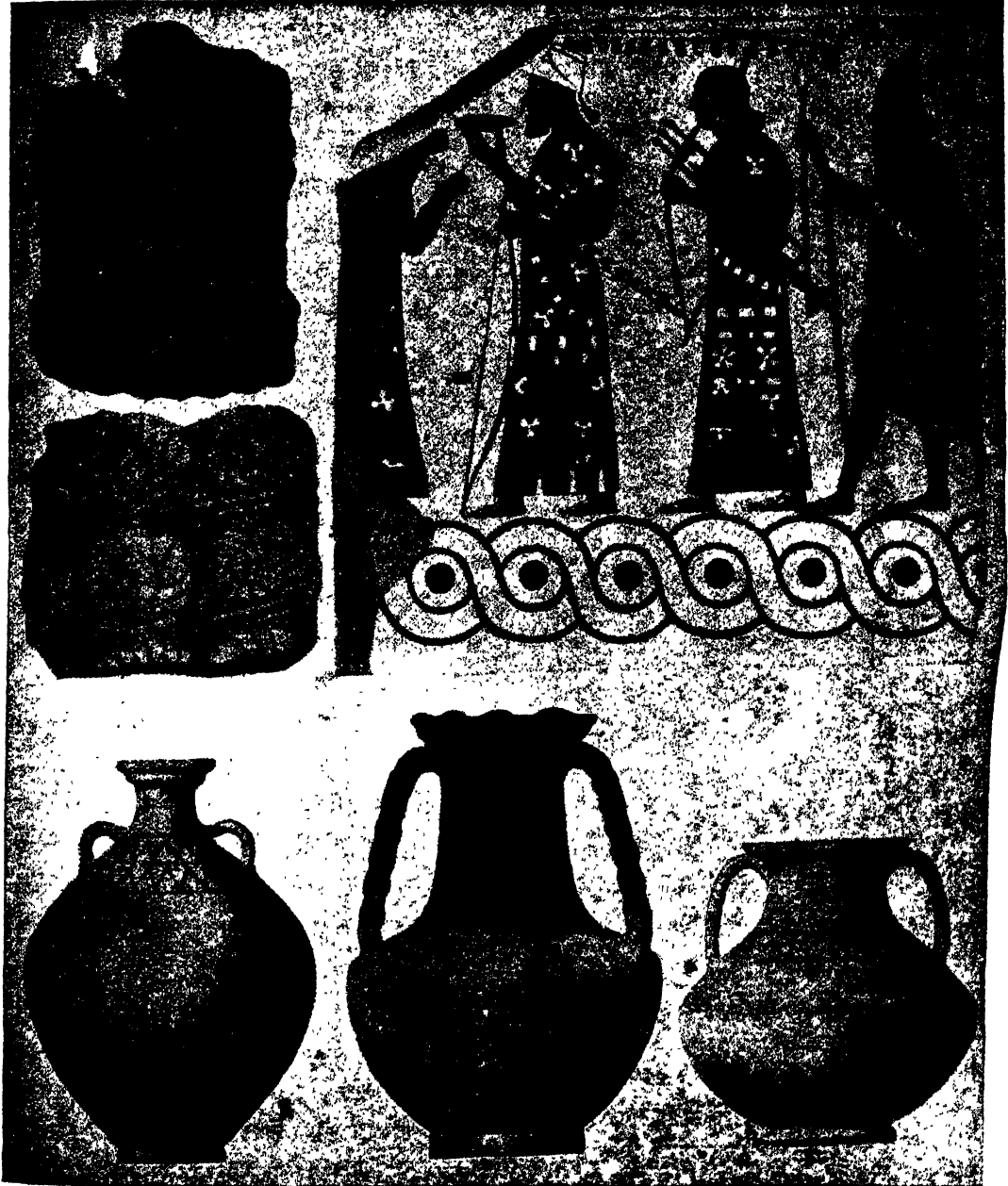
মাটির শিল্প-সামগ্রী (নীচের তিনটি উজ্জ্বল পালিশ করা রঙীন মাটির জলাধার। উপরে বাঁদিকের দুটি টুকরো হ'চ্ছে সে যুগের কেশ-প্রসাধনের নমুনা। মাটির টালির উপর যে মূর্ত্তি উদ্গাত ছিল তারই কেশাংশের ও শ্মশ্রুর ভগ্ন খণ্ড এগুলি। দক্ষিণে একটি চিত্রিত ইটের নমুনা। ছবির বিষয়—রাজা শিকার থেকে ফিরছেন।)

থেকে। নাইনেভের 'শার্গন্' প্রাসাদের ভিত্তিভূমি খনন করে মাত্র দু' একটি কণ্ঠহারের ছিন্নাংশ পাওয়া গেছে। সেগুলি নানা আকারে কাটা রঙীন পাথর ও স্ফটিকে নির্ম্মিত। রাজারা সেখানে সকলেই মূল্যবান কণ্ঠহার ব্যবহার করতেন, যেমন আমাদের দেশের তাশের গোলাম রাজার। আজও দরবার প্রভৃতি বা লাট প্রাসাদে নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে যাবার সময় পরেন। তবে, তাঁদের

সমাধিস্তম্ভ। (নৃপতি হামুরাবির সময়ে সমাধির উপর এই ধরণের খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ দেওয়া হ'ত। উপরের যুগ্ম তারকা মৃতের কুলচিহ্ন এবং নিম্নে তার ইষ্টদেবতা)

মালাগুলি ছিল সবই মূল্যবান পাথরের—এঁদের মত গজমতি হার বা মুক্তার সাতনর পুরুষেরা পরতেন না। সে দেশের রাজারা প্রকোষ্ঠে বলয় বা কঙ্কনও পরিধান ক'রতেন,—বাবিরুষের দেবতাদেরও মূর্ত্তির মণিবন্ধ বলয় কঙ্কন পরিশোভিত দেখা যায়। আমাদের দেশেও প্রাচীন যুগে এ রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও কোনো কোনো প্রদেশে পুরুষেরা অলঙ্কার পরেন দেখা যায়। বিহার উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে এ রীতি খুব বেশী-রকম প্রচলিত। আসিরীয়ার অলঙ্কার-শিল্পীরা এই সব কঙ্কন ও বলয়ে অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের পরিচয় রেখে গেছেন। রাজমহিলাদের কণ্ঠের জন্য তাঁরা খুব লঘু-ভার স্বর্ণ হার, অর্থাৎ মটর-মালার বা মুড়কী-দানার মত কণ্ঠি নির্ম্মাণ করে দিতেন। আবার দড়িহার, হেলে হার, সাপ হার প্রভৃতি নানা ডিজাইনের অন্যান্য কণ্ঠাভরণও সে দেশের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্য্যের ফলে সোনা রূপার অলঙ্কার কিছু খুঁজে না পাওয়া গেলেও সেকালের স্বর্ণকারের দোকান সেখানে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তারা যে সব সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য সংযুক্ত ছাঁচে ঢালাই ক'রে কঙ্কন কুণ্ডল বলয় অঙ্গদ ও কণ্ঠহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করতেন সেই ছাঁচগুলিও খুঁজে পাওয়া গেছে। এই সব ছাঁচে সোনা রূপা গলিয়ে ঢেলে দিলে আজও চাল্‌দীর অতীত যুগের সেই আশ্চর্য্য অলঙ্কারগুলি তৈরি হ'তে পারে। ছাঁচে ঢালাই ক'রে নেবার পর সে দেশের কারিগরেরা নরুণের মত খোদাইয়ের যন্ত্রে তার উপরের নক্সাগুলিকে আরও স্পষ্ট ও নিখুঁত ক'রে কুঁদে দিতেন। কি ভাবে গড়লে সোনার ফাঁপা জিনিসকেও একেবারে অবিকল নিরেট সোনার জিনিসের মত দেখাবে সে কৌশলও তাঁদের চমৎকার আয়ত্ত ছিল।

হাতীর দাঁত, মুক্তা ও ঝিনুকও তাদের অলঙ্কারে খুব বেশী রকম ব্যবহার হ'ত। মেসোপোটেমিয়ার কারুশিল্পীদের প্রধান বিশেষত্ব ছিল তাঁরা মূল্যবান মণি জহরতাদি প্রস্তর খণ্ডের উপরও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য বা নক্সার কাজ উৎকীর্ণ করতে পারতেন। এই রকম নক্সার কাজ খোদাই-করা অসংখ্য মূল্যবান পাথর বাবিরুষের ধ্বংস-স্তূপের ভিতর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে নাগরিকদের প্রত্যেকের স্ব স্ব শীলমোহর আর কুল-চিহ্ন। হেরোডোটাস সেখানে শহরের ছোট বড়

প্রত্যেককেই এই শীলমোহর আর কুলচিহ্ন ব্যবহার ক'রতে দেখে বিস্মিত হ'য়ে লিখে গেছেন—"প্রত্যেক বাবিলোনীয়া বাসীর একটি ক'রে শীলমোহর আছে। এই শীলমোহর তারা যে কোনো কাঁচা মাটির চিঠি
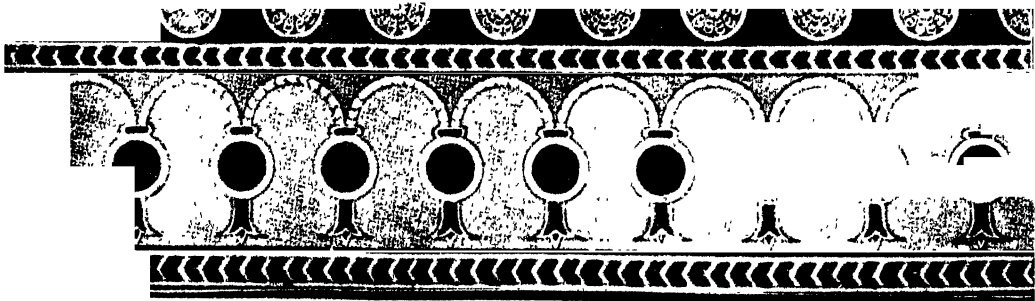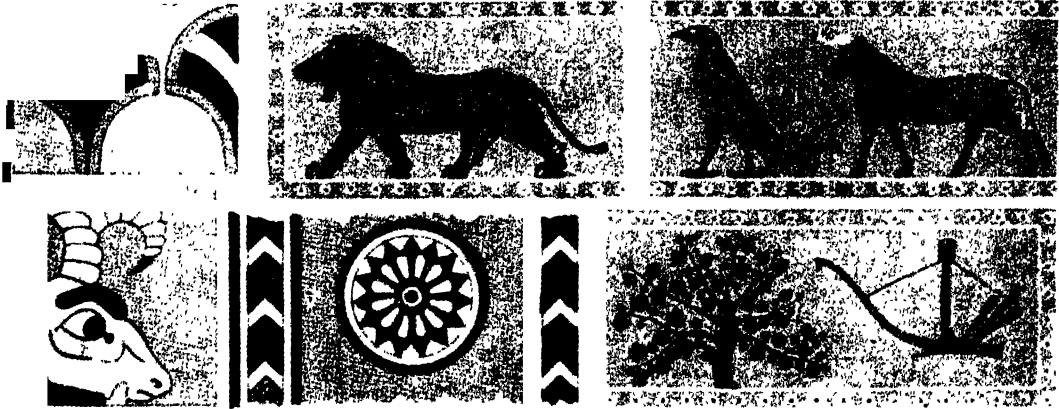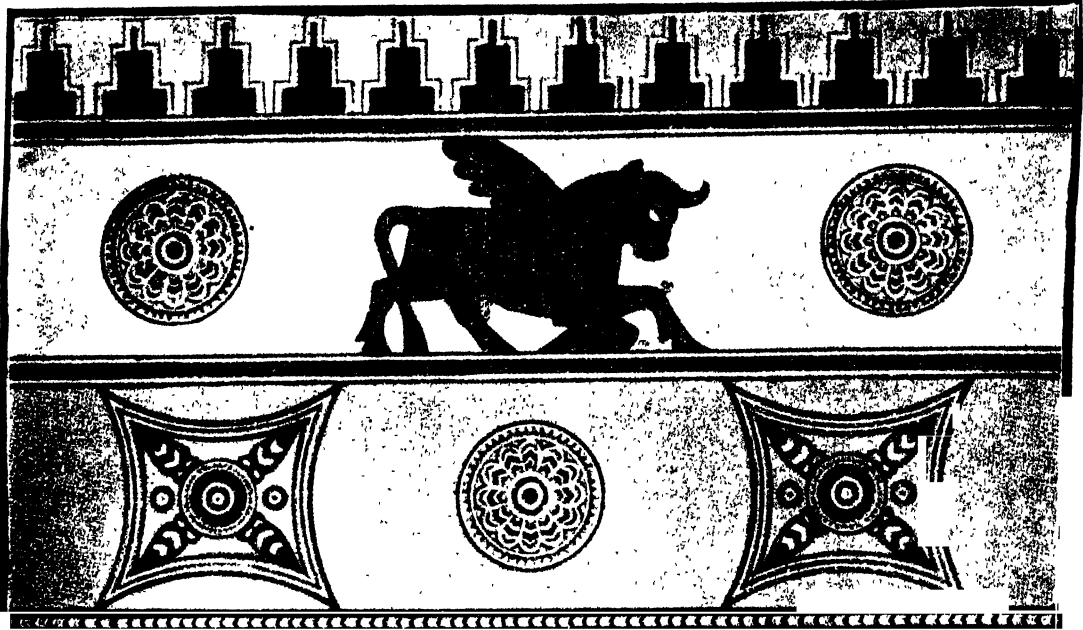
চিত্রিত রঙীন টালি (আসিরীয়ার মৃৎশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন)

চিত্রিত রঙীন ইট (এই রকম জমকালো ইটে আসিরীয়ার রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হত ।
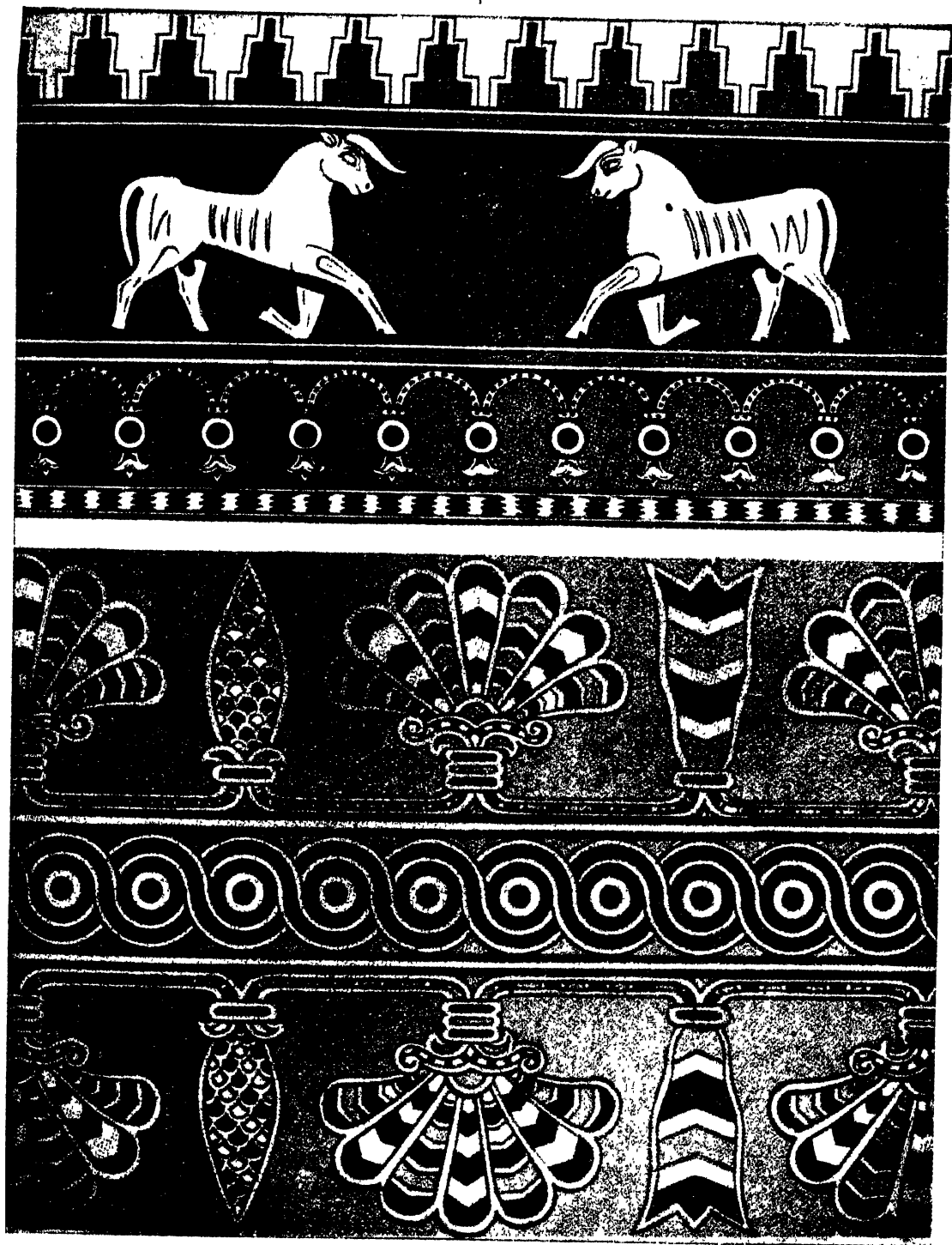
দলিল বা ব্যবসায়ের চুক্তিপত্রে সই করার পরিবর্ত্তে ছেপে দিত। প্রত্যেকের শীল ছিল ভিন্ন ভিন্ন রকমের— যাতে কেউ কারুর নাম না জাল ক'রতে পারে। এই শীল-মোহরের আর একটা বিশেষত্ব এই যে সেগুলি

শিকার-চিত্র (উলুবনে হরিণ ও শূকর চরে বেড়াচ্ছে)

বন্য অশ্ব শিকার (এই উদ্গাত শিলা-চিত্রে বন্য অশ্ব কি ভাবে জীবন্ত ধ'রে আনা হ'ত তারই ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে)

তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়-জ্ঞাপক বা পারিবারিক দেব-প্রতীক কিম্বা কুল-চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার হ'ত। এগুলি প্রায়ই নানা মূল্যবান মণি বা জহরতী পাথরের উপর উৎকীর্ণ করা থাকতো; এবং তারা প্রত্যেকে এই শীল-মণি আপন আপন অঙ্গে ধারণ ক'রে থাকতেন। এগুলি তাঁদের কেবল শীলমোহরই ছিল না—তাঁদের কবচ স্বরূপ ছিল। কারণ তাঁদের প্রত্যেকের শীলমোহরেই যা-তে নরম মাটির চিঠি-পত্র ও দলিলের উপর সেগুলিকে সহজেই বেলনের মত ডলে দিয়ে মহরৎ করা যায়। এই শীলমোহরের আকার খুব ছোট, সিকি ইঞ্চি, বা বড় জোর আধ ইঞ্চির বেশী মোটা নয়, লম্বায় পৌনে এক বা এক ইঞ্চি, খুব বড় হ'লেও দেড় ইঞ্চির বেশী নয়। গলায় কিম্বা হাতে ঘুন্সী দিয়ে মাতুলীর মত করে আড়ে দিকে ঝুলিয়ে বেঁধে প'রতো তারা সেই শীল।

সমরশায়ী সৈনিকগণের সমাধি স্তম্ভ (এই সমাধিপ্রস্তরের উপর মৃত সৈনিকগণের কবর দেওয়া হ'চ্ছে, এই চিত্র উৎকীর্ণ রয়েছে)

এই শীলমোহরের চাহিদা ছিল খুব বেশী ব'লে সেখানে এর কারিগরও ছিল অনেক এবং প্রতিযোগিতার ফলে এই ছোট একটু মণির উপর সূক্ষ্ম নক্সা কাটা কাজে বাবিরুষের শিল্পীরা মেসোপোটেমিয়ার অন্য সকল প্রদেশকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিল। আসিরীয়ার শীলমোহর সহজেই চিনতে পারা যায় তার 'কুলচিহ্ন' দেখে৷ সেই কি যেন রহস্যজড়িত এক বনস্পতি, পক্ষ সংযুক্ত ভূগোল, গরুড়-মুখ দেবতা—এ সব আসিরীয়ারই পরিচিত চিত্র। তা' ছাড়া, মূর্ত্তির অঙ্গে যে সাজসজ্জা থাকে সে দেখেও ধরা যায় যে এ শীলমোহর উর্, এরেক্, বা আক্কাদ ইত্যাদি মেসোপোটেমিয়ার অন্য কোনো জায়গার নয়— একেবারে খাশ্ বাবিরুষ বা নাইনেভের তৈরি জিনিস।

চাল্দীর নানা শিল্প-কলার মধ্যে তাদের ইটের কাজটা হ'য়ে উঠেছিল একেবারে অদ্বিতীয়! রঙীণ টালি, ফুলকাটা ইট এ সবের প্রথম জন্ম হ'য়েছিল এই বাবিরুষের মাটিতে। পূর্ব্বেই বলেছি বাবিলোনিয়া পাথরের দেশ নয়, নরম মাটির দেশ। সেই মাটিতে তৈরি ফুলকাটা পালিশ করা রঙীন ইটের তুলনা জগতে কোথাও মেলে

তাঁদের ইষ্টদেবতা বা কুলপতির মূর্ত্তিও উৎকীর্ণ করা থাকতো, যিনি শুভগ্রহরূপে সর্ব্বদা সঙ্গে থেকে সকল আপদ-বিপদ হ'তে তাঁদের রক্ষা ক'রতেন। এই শীলমোহরগুলি প্রায় বাতির আকারেই নির্ম্মিত হ'ত।

না। আধুনিককালের বিজ্ঞান ও কলকব্জার আশাতীত সুযোগ পেয়েও বর্ত্তমান জগৎ বাবিরূষের তৈরি টালির

ব্যাঘ্রের মুখ (চুণে-পাথরে তৈরী)

মতন একখানি টালিও তৈরি করতে পারেনি। বাবিরূষের কারিগরেরা ইট তৈরি করবার আগে মাটি তৈরি ক'রে ফেঁসো। তারপর গাম্‌লার মধ্যে ফেলে তাতে একটু একটু ক'রে জল খাইয়ে তারা দু'পায়ে ঠেসে ঠেসে অনেকদিন ধ'রে মাখতো। তারপর চৌকনা ছাঁচে ঢেলে তারা এক একখানি কাঁচা ইট তৈরি করতো ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া, এবং ৪ ইঞ্চি থেকে ১০ ইঞ্চি মোটা। তারপর সেই ইট তারা ভাল ক'রে আগুনে পুড়িয়ে নিত। প্রত্যেক ইটের উপর কারিগরের মার্কা ও নাম দাগা থাকতো। যে সব ইট রঙীণ ও কারুকার্য্য-খচিত হ'ত সেগুলি বেশী পোড়ানো হ'ত না। কারণ বেশী পুড়লে তাতে রং ধরবে না। যে সব ইটে চক্‌চকে পালিশ ধরানো হ'ত সেগুলি সব ধাতব বর্ণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সম্পন্ন হ'ত। এই ইটের কারিগরেরাই ছিল আবার সে যুগের মুহুরিবাবু, কারণ তাদেরই তৈরি কাঁচা মাটির ফলকের উপর তাদেরই লিখতে হ'ত যা কিছু চিঠি-পত্র, দলিল, চুক্তিনামা, খত, রাজ-অনুজ্ঞা এবং ধর্ম্ম-পুস্তকাদি। বলা বাহুল্য যে বাবিরূষের লেখার হরফ্ ছিল মিশরের মতই চিত্র-লিপি। (Hieroglyph)

বাবিরূষের হাঁড়ি-কলসী ঘটী বাটী প্রভৃতি তৈজসপত্র

পুতুল (খড়িমাটির বা টেরা-কোটার তৈরি মূর্ত্তি)

নিতো বহু যত্নে। মাটিকে দৃঢ় ও ভারসহ করবার জন্য তারা মাটির সঙ্গে মেশাতো গাছের আঁশ বা শরের দেখতে খুব সৌখিন ছিল, কিন্তু তাতে প্রথমটা কোনো কারুকার্য্য খচিত থাকতো না। খৃঃ পূর্ব্ব নবম থেকে

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সেখানে কারুকার্য্য-খচিত তৈজসপত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু, এ ফ্যাশান বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ ব্রোঞ্জের তৈরি সৌখিন জিনিসপত্র চলতে সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির জিনিসের আদর ও কদর দুইই নষ্ট হয়ে গেছলো।

কামারের কাজটা বাবিরুষের লোকেরা জানতো না। অন্য জাতের দেখাদেখি শিখেছিল। খৃঃ পূঃ ২৮০০ শতাব্দীর আগে বাবিরুষে ব্রোঞ্জের কাজ ছিল না। তখনকার যে সব যন্ত্রপাতি খুঁজে পাওয়া গেছে সে সমস্তই তামার তৈরি। তামা সে দেশে পাওয়া যেত না, ভারতবর্ষ এবং মালয় উপদ্বীপ থেকে তাদের তামা আমদানি করতে হ'ত। তারপর তামা ও টিন মিশিয়ে তারা যখন ব্রোঞ্জ তৈরি ক'রতে শিখলে তখন ব্রিটেন থেকে তারা টিন আমদানী ক'রতো। এই টিন ব্রিটেন থেকে ফিনিসিয়া হ'য়ে বাবিরুষে চালান যেতো। লোহা সেখানে প্রথমটা ভারি মূল্যবান ধাতু ব'লে গণ্য হ'ত, কিন্তু খৃঃ পূর্ব্ব নবম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাবিরুষে লোহার আর মর্য্যাদা ছিল না। এই সময় সেখানে সব কিছু যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্র লোহার তৈরি হ'ত। খোরসাবাদে প্রায় একঘর প্রাচীন লোহার জিনিস খুঁজে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কাঁটা, পেরেক, হুক্, সাঁড়াশী, শিকল থেকে সুরু ক'রে ছেনী শাবল হাতুড়ি মায় লাঙলের ফলা পর্য্যন্ত রয়েছে। এই সময় থেকে ব্রোঞ্জে কেবল সৌখীন জিনিসই সেখানে তৈরি হ'ত।

দারু-শিল্প বা কাঠের কাজও চাল্দীতে উন্নতির চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল বলা চলে। খৃঃ পূঃ ২৮০০ শতাব্দীর আগেও সেখানে সুন্দর সুন্দর কাঠের দরজা দেখতে পাওয়া গেছে। কাঠ সেখানে খুব দুর্ম্মূল্য ছিল, তাই যারা জমী ইজারা নিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরী করতো তারা মেয়াদ ফুরুলে অন্যত্র উঠে যাবার সময় গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে বাড়ীর দরজা জানালাগুলিও খুলে নিয়ে যেতো। কাজেই সেগুলি এমনভাবে তৈরী হ'ত যাতে সহজেই খুলে নিয়ে যাওয়া যায়। নাইনেভেতে রাজা অসুরবাণী পালের প্রকাণ্ড প্রাসাদ থেকে অনেক কাঠের তৈরী আসবাবের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু কাঠের কাজগুলি সব ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে, বহুশত শতাব্দীব্যাপী মহাকালের আক্রমণ সহ্য ক'রতে না পেরে। কাঠের উপর হাতীর দাঁতের ও সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতুর এবং মূল্যবান প্রস্তরাদির নক্সার কাজও সে সময় প্রচলিত ছিল। আজ সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের কবলে তা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে।

ভারতের চিনি

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

জার্ম্মান যুদ্ধের আগেকার কথা। একটী প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে যে, ইংরেজ জাতির পকেটে হাত না পড়িলে, মাথায় টনক পড়েনা। জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের বীটচিনি যখন ইংরেজের বাজারে উপস্থিত হইয়া বিষম বিভ্রাট ঘটাইয়াছে এবং ইংরেজ উপনিবেশ-গুলির চিনির ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি করিতেছে, তখন ইং ১৮৮৭ সালের ২রা জুলাই ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট, ইয়োরোপের বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টসমূহকে এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। আগষ্ট মাসে লণ্ডন নগরীতে সেই সম্মেলনের অধিবেশন হইল এবং ৩০শে আগষ্ট তারিখে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণের দ্বারা এক স্বীকারপত্রী এই মর্ম্মে স্বাক্ষরিত হইল যে, কোন দেশেই গভর্ণমেণ্ট হইতে চিনির কলওয়ালাদিগকে কোন অর্থ-সাহায্য (bounty) দেওয়া হইবেনা; এমন কি,

এই রকম সাহায্য-পুষ্ট (bounty-fed) চিনি কোন দেশে আমদানী করিতেও দেওয়া হইবেনা। কথা ছিল যে এই চুক্তিপত্র ইং ১৮৯০ সালের ১লা আগষ্ট তারিখের মধ্যে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর (ratify) করা হইবে এবং ১৮৯১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ইহার সর্ত্ত-সমূহ আমলে আসিবে। কিন্তু ঐ চুক্তিপত্র কোন গভর্ণমেণ্টই শেষ পর্য্যন্ত মঞ্জুর করিলনা; অবস্থা যেমন তেমনই রহিয়া গেল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য এই সম্মেলনে যোগদান করেনি এই অজুহাতে ফ্রান্স আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় আট বৎসর পরে ১৮৯৬ সালে জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রিয়াহাঙ্গারী তাহাদের চিনির বাউণ্টি (bounty) ডবল করিয়া দিল। ফ্রান্সে তখন টন প্রতি ৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং সাহায্য (bounty) দেওয়া হইত; তাহারা সেই বাউণ্টি আরও বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য এক আইন পাশ করিল।

ইংরেজরা দেখিল যে, চিনির বাজারে, দিনের পর দিন, অবস্থা ক্রমেই কাহিল হইয়া উঠিতেছে। তখন কমিশন-পটু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৬ সালে এক রয়াল কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশন ১৮৯৭ সালে এক রিপোর্টও দাখিল করিল, কিন্তু সব কমিশনের রিপোর্টের যা অবস্থা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইলনা। 'ধনক্ষয়'ই হইল, লাভ কিছুই হইলনা। ১৮৯৮ সালের জুন মাসে ব্রুসেল্‌সে আবার এক কন্‌ফারেন্স বসিল। ফ্রান্স তখন বিরোধী হইয়া উঠিল, রুশিয়া আলোচনায় যোগদান করিলনা। অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় পুনরায় সম্মিলিত হওয়ার শুভ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত করিয়া দিলেন।

এই সময়ে ভারতের চিনির অবস্থা শোচনীয়। চিনি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন ইংরেজ (Mr. Chapman) এই সময়ে ভারতের চিনির অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন "Exportation had long ceased, partly owing to the bountied competition of beet sugar and partly because the people had become able to afford the consumption of a greater quantity than they produced and German and Austrian sugar were pouring into the country to supply the deficiency. But the importation of foreign sugar, cheapened by foreign state-aid to a price which materially reduced the fair and reasonable profit of native cultivators, was a state of things India Government could not accept...etc."* ইহার ভাবার্থ হইতেছে এই যে, ভারত হইতে বিদেশে যে চিনি রপ্তানী হইত তাহা অনেক দিন আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার কতকটা কারণ, ভারতের বাজারে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-পুষ্ট ((bounti-fed) বীট-চিনির আমদানী, আর কতকটা কারণ, ভারতবাসীরা যে পরিমাণে চিনি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে চিনি তাহারা খাইতে শিখিয়াছে। খাইতে বেশী শিখিয়াছে, অথচ প্রস্তুত করিতে পারে না জিহ্বার মাপমত, সুতরাং নাজাই যাহা সেই পরিমাণে, বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপুষ্ট বিদেশী চিনি, ভারতের বাজারে হু হু শব্দে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নেটীভ কৃষকদের প্রকৃত লাভ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয়। এ অবস্থা ভারত গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিতে পারেননা।

ভারতের এই দুর্দ্দশায় ব্যথিত এবং বিচলিত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ইং ১৮৯৯ সালে সাহায্যপুষ্ট (bounty-fed) চিনির উপর সমীকরণ শুল্ক (counterveiling duty) ধার্য্য করার এক আইন পাশ করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে আমদানী চিনির উপর কিছু কিছু শুল্ক ধার্য্য করিয়া মন্থর গতিতে সেই শুল্ক একটু করিয়া বেশী করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এ চেষ্টা যখন আরম্ভ হইল, বলা বাহুল্য, তাহার বহুপূর্ব্বেই ভারতের চিনির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দীপ নিভিয়া গেলে, তাহাতে এক ফোঁটা করিয়া তেল ঢালিলেই অমনি তাহা পুনরায় জ্বলিয়া উঠিবে, এমন দুঃস্বপ্ন দেখিলেও তাহা সত্য হয়না, এ কথা জোর করিয়া বলা যায়। 'নেটিভ' কৃষকদের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের তখনকার এই দরদের গভীরতা কতদূর তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ভারতের বিশ্ব-বিখ্যাত চিনির ব্যবসা, যাহা অবলম্বন

* Ency. Brit. 11th. Ed. Vol. XXVI, p. 48.

করিয়া সহস্র সহস্র ভারতবাসী স্মরণাতীত কাল হইতে প্রাণ ধারণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা যে অতি সহজে অল্প কাল মধ্যে এই রকমে ধ্বংস হইয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী কে? সহস্র সহস্র ভারতবাসী এই রকমে নিরন্ন এবং নিরাশ্রয় হইয়া যে মরণের পথে দাঁড়াইল, তাহাদের এই মৃত্যুর জন্য প্রকৃত অপরাধী কে? বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-পুষ্ট চিনির অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক আক্রমণ হইতে ভারতের এই ব্যবসাকে রক্ষা করার জন্য তখন ন্যায়তঃ দায়ী ছিল কে? যথাসময়ে রক্ষার কোন চেষ্টা করা হইল না কেন?—কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞাসা করিব কাহাকে? সেদিন কাগজে দেখিলাম একজন চিন্তাশীল ইংরেজ বলিয়াছেন যে, ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতবাসীর এই অকর্ম্মণ্যতার জন্য দায়ী স্বয়ং বুদ্ধদেব। আর একটা কথা বলিতে সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ইহার জন্য অধিকতর দায়ী ভারতের স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা! ইংলণ্ডের সে পণ্ডিতকে হাতের কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই; পাওয়া গেলে না হয় এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া শিক্ষা পাওয়া বা দেওয়া যাইত।

যাহোক, ওদিকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে আবার ছোট-খাট এক কন্‌ফারেন্স বসিল; ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌সে পুনরায় এক কন্‌ফারেন্স। এইটাই বোধ হয় ইয়োরোপীয়ান সুগার বাউন্টি কনফারেন্সের অষ্টম অধিবেশন। ইহাতে রাশিয়া যোগ দিলনা। এই অধিবেশনেও, চিনি প্রস্তুতকারী বা চিনির ব্যবসায়ীদিগকে কোনও গভর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য (bounty) করিতে পারিবেনা, এই সম্বন্ধে নানারকম বৃথা বাক্যাড়ম্বরযুক্ত অনেক বিধি-নিষেধ রচিত হইল। সেই চুক্তিপত্র মোতাবেক সর্ত্তসমূহ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ৫ বৎসরের জন্য প্রচলিত হইবে, ইহাও ঠিক হইল। কিন্তু ফল দাঁড়াইল একই রকম। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সেই সর্ত্তের পুনরায় কিছু পরিবর্ত্তন হইল; পুনরায় ৫ বৎসর। তার পরেই তো ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর মহাযুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবী সেই পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার হুঙ্কারে কাঁপিয়া উঠিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোস খসিয়া পড়িল; ইয়োরোপের বুকের উপর দিয়া রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল। সেই রক্তের উদ্দাম স্রোতে অনেক কিছু ভাসিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে বীটের চাষও গেল, বীটের চিনিও গেল।

যুদ্ধ থামিল; শান্তি ফিরিয়া আসিল। যুদ্ধের মধ্যে সব দেশই চিনির অভাব অনুভব করিয়াছে; ইয়োরোপে সে অভাব অতি তীব্র হইয়াছিল। সেকথা ইয়োরোপ ভুলিলনা। যুদ্ধের পরে প্রত্যেক দেশই এই সম্বন্ধে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার ইয়োরোপ বীটের চাষে এবং চিনিতে অধিকতর সাফল্য লাভ করিল।

স্বাধীনতার লীলাভূমি ইয়োরোপ। আজ সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিও, জাতীয় মঙ্গল-সাধনার অভীষ্ট পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার কত রকম সুবিধাই করিয়া লইতেছে। জীবনের গতির ছন্দ যেখানে অবাধ এবং স্বাধীন, সেখানে ক্ষুদ্রের মধ্যেও পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য্য সার্থক হইয়া ওঠে। শৃঙ্খলিত জীবনের আড়ষ্ট গতি শুধু যে দেহকেই পীড়িত করে তা নয়, মনকেও তেমনি অসাড় ও অশোভন করিয়া তোলে।

যুদ্ধের পর গ্রেটবৃটেনও বীটের চাষে খুব মনোযোগ দিয়াছে। গত ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেনে ৪,৮৫,০০০ টন বীট চিনি (raw sugar) হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; কিছু কম হইয়াছিল। নিজের দেশে ব্যবহারের জন্য গ্রেটবৃটেনের প্রয়োজন প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ ৪ হাজার টন। সুতরাং চিনি সম্বন্ধে গ্রেটবৃটেনের আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার আশা সুদূর-পরাহত।

শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, জেকোশ্লোভেকিয়ার মত ক্ষুদ্র একটা দেশ, সেও তাহার নিজের অভাব (প্রায় ৪ লক্ষ টন) পূরণ করিয়া, প্রায় ৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টন বীটচিনি গত ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে।

জার্ম্মাণী আজ নিজের অভাব দূর করিয়া আট লক্ষ টন বীট চিনি বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে; ফ্রান্স এক লক্ষ টন, পোল্যাণ্ড সাড়ে তিন লক্ষ টন রপ্তানী করিতে পারে। হায় রে, ভারতবর্ষের চিনির সেই বিরাট ব্যবসা! আজ এক ছটাক চিনিও ভারতবর্ষ বিদেশে রপ্তানী করিতে পারেনা; পরন্তু প্রতি বৎসর কমবেশী

দশ লক্ষ টন বিদেশ হইতে গ্রহণ করিয়া, নিজের অভাব পূরণ করে।

জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পরে, চিনির সম্বন্ধে, বীটের চাষ করিয়া, ইয়োরোপে প্রায় সব দেশই এখন আত্ম-প্রতিষ্ঠ, গ্রেট-বৃটেন ছাড়া।

আমেরিকাতেও বীটের চাষ হয়, খুব বেশী নয়। আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে কিছু হয়; কানাডাতে সামান্য, আর্জ্জেণ্টাইনে অতি সামান্য।

অষ্ট্রেলিয়াতেও সামান্যই বীট হয়।

রাশিয়া, পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতি বৎসর অনেক চিনি খরিদ করিত। সোভিয়েট রাশিয়া বীটের চাষের না কি এ রকম বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, গত ইং ১৯৩১-৩২ সালে তাহারা ২৬ লক্ষ টন চিনি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে এই রকম অনুমান করিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার সবই অদ্ভুত। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চিনি প্রস্তুতের শিল্পকে রক্ষিত-শিল্প (nationalised industry) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এই শিল্পের কি রকম দ্রুত-গতিতে উন্নতি সাধন করিতেছে নীচের তালিকা হইতে তাহা অনুমান করা যাইবে :—

খৃষ্টাব্দ	কারখানার সংখ্যা	জমি চাষের পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপন্ন চিনির পরিমাণ (টন)
১৯২১-২২	১১০	২১৭০০০	৫৬০০০
১৯২২-২৩	১১২	১৭৬০০০	২৩৩০০০
১৯২৩-২৪	১২০	২৪৭০০০	৪১৯০০০
১৯২৪-২৫	১২৪	৩৭৯০০০	৫০৬০০০
১৯২৫-২৬	১৪৪	৫২৩০০০	১,১৮৮০০০
১৯২৬-২।	১৬৮	৫৪২০০০	৯৭০০০০
১৯২৭-২৮	১৬৮	৬৭০০০০	১,৪৯৪০০০

(Indian Tariff Board's Report on Sugar Industry, p. 8)

এসিয়াতে, জাপানে বীটের চাষ সামান্য কিছু হয়; কোরিয়া এবং তুর্কীস্থানের আনাটোলিয়াতে সামান্যই হয়, উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতবর্ষে বীটের চাষ হয় না। ইয়োরোপে আকের চাষ হয় না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ইয়োরোপে যে যে দেশে বীটচিনি হয় সেই সব দেশে, সংরক্ষণ শুল্ক দ্বারাই হোক, অর্থসাহায্য দিয়াই হোক, বা যেমন করিয়াই হোক, প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টই, নিজের দেশের বীটচিনিকে রক্ষা এবং পুষ্ট করিবার জন্য আইন করিয়া বীটচিনি প্রস্তুতকারীদিগকে সহায়তা করিয়াছে।

সাধারণতঃ রাজস্ববৃদ্ধির জন্য (for revenue purposes), বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর প্রায় সব গভর্ণমেণ্টই কিছু কিছু শুল্ক বা কর (duty) ধার্য্য করিয়া থাকেন। এই শুল্ক বা ডিউটী যখন দেশের কোন বিশেষ শিল্প বা ব্যবসাকে বিদেশীর প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে ধার্য্য করা হয় তখন তাহাকে সংরক্ষণ-শুল্ক (protective duty) বলা হয়।

বিদেশের বাজার দখল করার জন্য কোন কোন গভর্ণমেণ্ট নিজের দেশের কোন বিশেষ শিল্প বা পণ্য-ব্যবসায়ীদিগকে রপ্তানি জিনিষের মূল্য বা পরিমাণের উপর এ রকম ভাবে অর্থ-সাহায্য করেন যে, তাহারা সেই সাহায্যপুষ্ট হইয়া, এমন কি জিনিষ প্রস্তুতের খরচা বা পড়তা অপেক্ষাও কম দামে, বিদেশের বাজারে মাল চালান দিয়া প্রতিযোগিতা করিয়া বাজার দখল করে। এই রকম সাহায্যকে bounty বা subsidy বলে। এই রকমে কোন বিদেশী পণ্য সেই দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য-পুষ্ট (bounty-fed or subsidised) হইয়া আসিয়া যদি কম দামে প্রতিযোগিতা করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই পণ্যের উপর তাহার দেশের বাউণ্টীর সম-পরিমাণ শুল্ক ধার্য্য করা হয়। তাই শুল্ককে সমীকরণ শুল্ক (countervailing duty) বলা যায়। এই রকম শুল্কের দ্বারা সেই বিদেশী পণ্যের বাউণ্টীর সুবিধা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিদেশী সস্তা পণ্যের আক্রমণ হইতে দেশী শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেশী-পণ্যের ব্যবসায়ী বা উৎপন্নকারীদিগকে সময়ে সময়ে গভর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্যও (bounty) দিয়া থাকেন।

ইয়োরোপের সব গভর্ণমেণ্টই এই রকমে কোনও না কোনও প্রকার শুল্ক বা সাহায্যের দ্বারা নিজ নিজ দেশের বীটচিনির শিল্পকে রক্ষা করিয়া তাহার যথেষ্ট পুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিয়াছে। এ কথা বলিলে সত্যের সীমা

অতিক্রম করা হইবেনা যে, যখনই তাহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজন হয়, তখনই ইয়োরোপ অবাধ-বাণিজ্যের ধাপ্পা দিয়া অন্য দেশকে নির্ব্বিচারে শোষণ করে; আবার পর মুহূর্ত্তেই নিতান্ত নির্লজ্জের মত নানা রকম কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনমত নিজেদের শিল্প-বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। আমরা এ সত্য আজ হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। অন্ততঃ এসিয়ার শোষণ-ইতিহাসে, এ কথা বলা চলে যে, ইয়োরোপ যদি নীতি-শাস্ত্রের কোন নীতি মানিয়া থাকে, তাহা হইলে ততটুকুই তাহারা মানিয়াছে যতটুকু তাহাদের নিজেদের ভাগ-বাটোয়ারার সমতা রক্ষা অথবা গৃহবিবাদের আশঙ্কা প্রশমনের জন্য প্রয়োজন। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ইং ১৯৩১ সালে বিদেশী চিনির উপর যে শুল্ক ছিল তাহার পরিমাণ নীচে দেওয়া হইল :—

দেশ ভারতের মণ হিসাবে শুল্ক

গ্রেটবৃটেন প্রতিমণ ৪৲ টাকা

(মন্তব্য :—ব্রিটিশ উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যভুক্ত মরিসস্ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের চিনি সম্বন্ধে ইহার অর্দ্ধেক শুল্ক। গ্রেট-বৃটেনে উৎপন্ন (home-grown) বীটচিনির প্রতিমণে ছয় টাকা ছয় আনা হিসাবে সাহায্য (subsidy) দেওয়া হয়)

আমেরিকা প্রতিমণ ৩॥৵০ টাকা

(মন্তব্য :—কিউবা প্রভৃতি উপনিবেশের চিনি সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা আছে)

জার্ম্মাণী প্রতিমণ ৭৸০ টাকা

ফ্রান্স " ৫।৵০ "

স্পেন " " "

অষ্ট্রিয়া " ৬৲ "

অষ্ট্রেলিয়া বিদেশী চিনির প্রবেশই নিষেধ

(See Indian Tariff Board's Repor tp 7 & 8)

ভারত-গভর্ণমেণ্ট, প্রথমে ইং ১৮৯৪ সালে, বিদেশ হইতে আমদানী চিনির উপর (মুল্যের পরিমাণের উপর ad valorem) শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহাই বিদেশী চিনির উপর ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রথম ট্যাক্স। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ শুল্ক ভারতের চিনির শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য লইয়া ধার্য্য করা হয়নি; তখন তো ভারতের চিনির ব্যবসা ধ্বংসই হইয়া গিয়াছে। এ শুল্ক শুধু প্রধানতঃ রাজস্ব-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ধার্য্য করা হইয়াছিল। এই শুল্ক ইং ১৯১৬ সালে শতকরা ১০৲ টাকা, ১৯২১ সালে শতকরা ১৫৲ টাকা এবং ১৯২৪ সালে শতকরা ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

(See Indian Taxation Committee's Report Vol. I p 121)

ইং ১৯২০-২১ সাল হইতে ১৯৩০-৩১ সালে পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানী চিনির উপর ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে শুল্ক আদায় হইয়াছিল, তাহার হার নীচে দেওয়া হইল :—

বৎসর	মুল্য প্রতিমণ		শুল্ক প্রতিমণ
১৯২০-২১	২৯৸৵	১০% হিঃ	২॥৶৮ পাই
১৯২১-২২	১৬॥৪	১৫%	২৵৫ "
১৯২২-২৩	১৫॥৴৯	২৫%	৩৵ "
১৯২৩-২৪	১৮৲৮	"	৩॥৴১০ "
১৯২৪-২৫	১৪৴৭	"	২৸০ "
১৯২৫-২৬	১০৸৴৯	বিশেষ শুল্ক	৩।৯ পাই
১৯২৬-২৭	১১৸৴১১	" "	৩।৯ "
১৯২৭-২৮	১০।৵০	" "	৩।৯ "
১৯২৮-২৯	৯৸৬	" "	৩।৯ "
১৯২৯-৩০	৯৲২	" "	৩।৯ "
১৯৩০-৩১	৮৸৶৫	.. ..	৪।৵৫ ..

(Tarriff Board's Report p 73)

উপরের হিসাবে দেখা যায় ইং ১৯৩০-৩১ সালে, বিদেশী চিনির ব্যবসায়ীরা, গভর্ণমেণ্টের শুল্ক ৪।৵৫ টাকা বাদ দিলে, চিনি প্রতিমণ ৪॥৴০ টাকা মুল্যে ভারতে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। ঐ সময়ে একবার কলিকাতার দর প্রতিমণ ৭৸৶০ টাকাও হইয়াছিল; তখন তাহা হইলে ৩৴৭ টাকা মণ দরেও চিনি বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। এত সস্তায় যাহারা চিনি বিক্রয় করিতে পারে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা ভারতের চিনি প্রস্তুতকারী-দিগের পক্ষে কত কঠিন তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। অবাধ-বাণিজ্যের সুবিধা লইয়া তাহারা ভারত হইতে কোটী কোটী টাকা দীর্ঘ দিন লাভ করিয়া

আসিয়াছে। তাহারা বহু অর্থ ব্যয়ে বীট ও ইক্ষুর চাষের উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিনি প্রস্তুতের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন বাজার রক্ষার জন্য লোকসান দিয়াও বহুদিন তাহারা প্রতি-যোগিতা করিতে পারে এবং সে শক্তি তাহাদের আছে, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

ওদিকে, চিনির বাজারে ভাগবাটোয়ারার সমতা রক্ষার জন্য ইং ১৯৩০ সালে ইয়োরোপে ব্রুসেল্‌স্ নগরে এক আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হয়। তাহাতে ঠিক হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত হিসাব মত ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশ চিনি রপ্তানী করিবে :—

কিউবা	...	৩৫, ৭০, ০০০ টন
জাভা	...	২২, ০০, ০০০ "
জেকো	...	৫, ৯০, ০০০ "
পোল্যাণ্ড	..	৩, ২০, ০০০ "
জার্ম্মাণী	...	২, ০০, ০০০ "
বেলজিয়ম	...	২৯, ০০০ "
হাঙ্গারী	...	৯০, ০০০ "

(Indian Tariff Report 18)

জার্ম্মাণী প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়নি, তাহার ভাগে কম পড়িয়াছিল। শেষে আবার পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব করা হয় যে, জার্ম্মাণী প্রথম বৎসরে ৫ লক্ষ টন, ২য় বৎসরে ৩॥ লক্ষ টন এবং তৃতীয় বৎসরে ৩ লক্ষ টন রপ্তানী করিতে পারিবে। এই সংশোধিত প্রস্তাবে জার্ম্মাণী না কি রাজী হইয়াছে, এই রকম প্রকাশ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর এখন দুরবস্থা, হয় তো অল্পেই অভিমান দূর হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া এ সব বন্দোবস্তের বাহিরে আছে। অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট না কি ২০ লক্ষ টনেরও অধিক চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ার এই চিনি যদি বাজারে আসিয়া উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়, তাহা হইলে চিনির বাজারে যে কি বিভ্রাট (disturbing effect) উপস্থিত হইবে তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

এই ব্রুসেল্‌সের পরে চেলসিয়াতেও আর এক সম্মেলন হইয়াছিল। দেখা যাক, এই সব সম্মেলন, আলোচনা এবং আড়ম্বর-পূর্ণ চুক্তির ফলে কত বড় অশ্ব ডিম্ব লাভ হয়। মনে হয়, পর্ব্বত যেমন চিরকাল মূষিক প্রসব করে, তেমনি করিতেই থাকিবে। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হইলেও, আলিঙ্গন তেমন নিবিড় হয় না; ফাক রহিয়াই যায়। আর তাহাদের চুক্তি যদি সফলই হয়, তাহাতে ভারতের কি? এ তো তাহাদের নিজেদের ভাগ-বখ্‌রার কথা। ভারত, 'তুমি সে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে'।

প্রলয়

শ্রীহেমপ্রভা দেবী

(১)

পৃথিবী হইবে নাশ।
ক্ষিপ্ত মূরতি নাচে নটরাজ বদনে মধুর হাস।
সংহাররূপ ধরেছে ভীষণ, পৃথিবী করিতে নাশ॥
উঠে কোটি ধূমকেতু গগন মণ্ডলে।
নাচে বারিনিধি নিয়ে প্রলয়ের রোলে॥
ছুটিয়াছে হুতাশন—।
কাল বৈশাখীর ভীষণ ঝঞ্ঝা, বহে স্বন্ স্বন্ স্বন্॥
উড়ায় পাদপ মহামহীরুহ, অগ্নিহল্কা ছুটে।
উঠে দিকে দিকে রোদনের ধ্বনি সকল আঁধার টুটে॥
সুধার আধার—চাঁদ পূর্ণিমার, রাহু গ্রাসিয়াছে আসি'।
একই সাথে আজ উদয় গগনে অযুত তপন শশী॥
নাচিতেছে নটরাজ!
পরিয়া প্রলয় সাজ!!

(২)

লক্ষ লক্ষ কোটি গ্রহতারা, অগ্নিগোলক প্রায়।
উঠিছে পড়িছে ভুবন জুড়িয়া নমিছে অনলকায়॥
ছুটে ভীমবেগে রুদ্রবিলাসী নিয়ে ধরণী পানে।
হয়ে অধোগামী করিতে বিনাশ পৃথিবীর জীবগণে॥
গিয়াছে টুটিয়া জগতের সাজ সেই শ্যাম শোভাময়।
বজ্র-বিনাশী এসেছে নামিয়া করিতে জগৎলয়॥
সকলই অনলময়॥
সভ্য জগৎ হইল বিলোপ নাহিক চিহ্ন তার।
যত নদ নদী সাগর সরিৎ, সবই হ'ল একাকার॥
ভীষণ আরাবে কাঁপিছে জগৎ, মন্দ্রে বজ্র-বীণা।
ধরণী আলোক-হীনা॥
লক্ষ্যস্থির—ধ্রুব তারকার ও নড়েছে আসন আজি।
পাটলবরণ ছেয়েছে ভুবন বিভীষণ মেঘরাজি॥
নভোনীলিমার নাহিক চিহ্ন, তথায় প্রলয় খেলা।
বাজায় ঈশান, ভীষণ বিষাণ—ঝরায়ে তারার মালা॥
নাচে নট কলেবর!
ভীম প্রলয়ঙ্কর!!

(৩)

সহসা জ্বলিল, আলো জ্যোতির্ম্ময়, উজলি উঠিল ধরা।
হেরিল ধরণী নবীন মূরতি দিব্যদ্যুতিতে ঘেরা॥
হস্তে তাহার সৃষ্টির আলো, কণ্ঠে প্রলয় বাণী।
ঘনমেচকিত মেঘের বরণ, কেশে জটাবেড়া ফণী॥
উপর আকাশ হইতে ঝরিল দীপ্ত অনলকণা।
তারায় তারায় ছুটে বিদ্যুৎ, সাগরে ছুটিল ফেনা॥
নয়নে তাঁহার ঝলকিল আলো, কম্পিত হ'ল ধরা।
উঠে সঙ্গীত প্রলয়ানন্দে সংজ্ঞা চেতন-হরা॥
সাধিতে আপন কাজ!
ধ্বংস করিতে বিপুল বিশ্ব নাচিছে রে নটরাজ॥
হিন্দোলে দোলে নিখিল বিশ্ব নর্ত্তক পদভরে।
প্রলয় মায়ায় ছাইল জগৎ, ছন্দে, গানে ও সুরে॥
(এ মহাপ্রলয়ে বাজিল গোপনে নব সৃষ্টির সুর।)
আসে রে আসে রে ঘনায়ে প্রলয় নহে ত অধিকদূর।
ছিন্ন ভিন্ন হইল বিশ্ব—গর্জ্জিয়া পড়ে বাজ।
নাচিছে প্রলয়রাজ॥
সৃজিতে আবার নূতন জগৎ নাচিছে রে নটবর।
ভীম প্রলয়ঙ্কর!
জয় শিব শঙ্কর!!

সাময়িকী

নববর্ষ—

এই সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। যখন কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সর্ব্বতোভাবে বঙ্গবাণীর সেবায় নিবেদন করিবার সঙ্কল্প করিয়া 'ভারতবর্ষে'র পরিকল্পনা করিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্পাদকতায় 'ভারতবর্ষ' বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগের ভাবপ্রকাশকেন্দ্র হইবে, তখন কে মনে করিয়াছিল, সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সব আয়োজন করিয়াই তিনি মহাযাত্রা করিবেন। তিনি 'ভারতবর্ষের' যে আদর্শ স্থির করিয়াছিলেন—দীর্ঘকাল আমি সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার জরাজীর্ণ দেহে আর পূর্ব্বের উৎসাহ নাই, কিন্তু যতদিন পারিব, ততদিন দেবীপূজার ভার লইয়া আরত্রিকের পঞ্চপ্রদীপ দুর্ব্বল হস্তেও ব্যবহার করিব ইহাই আমার একমাত্র আশা। আমার 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনে আমি যে বন্ধুবান্ধব, পাঠক প্রভৃতির সহানুভূতি লাভ করিয়াছি তাহা আমার সাহিত্য সাধনার সিদ্ধি বলিয়া মনে করি; জীবনের সায়াহ্নে তাহার অনুভূতিই আমাকে 'ভারতবর্ষের' সেবায় রত থাকিতে সাহস ও উৎসাহ দিতেছে। আজ বঙ্গভারতীর চরণে প্রণাম করিয়া আবার নববর্ষে কার্য্যারম্ভ করিলাম। আজ তাঁহার উদ্দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর মন্ত্র উচ্চারণ করি—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণা শরীরে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন—

গত ২৫শে বৈশাখ হইতে মহাত্মা গান্ধী ত্রিসপ্তাহ-ব্যাপী প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখনও তিনি কারাগারে—আইনভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে বন্দী। তাঁহার বয়স ও দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই তাঁহাকে তাঁহার প্রায়োপবেশন-সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি নিবৃত্ত হয়েন নাই। যে ইংরাজ সরকার আয়র্লণ্ডে কর্ক সহরের মেয়র মিষ্টার ম্যাকস্থইনী কারাগারে প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাকে মুক্তি দান করেন নাই এবং তাহার ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, সেই ইংরাজ সরকার প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত মহাত্মাজীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ইতঃপূর্ব্বে বহুবার প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। সে-সকলের মধ্যে কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—

(১) ১৯২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বোম্বাই সহরে যে হাঙ্গামা হয় তাহাতে ব্যথিত হইয়া তিনি শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়োপবেশন করেন। পঞ্চম দিবসে নগরে শান্তি স্থাপিত হইলে তিনি প্রায়োপবেশন ত্যাগ করেন।

(২) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় চৌরীচৌরায় উত্তেজিত জনতা পুলিসের প্রতি অত্যাচার করায় তিনি পুনরায় প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হয়েন। ফলে কংগ্রেস আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তনে বিরত হয়েন।

(৩) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় মহাত্মাজী ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান নেতা ঐক্য স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে তিনি প্রায়োপবেশন ত্যাগ করেন।

(৪) গত বৎসর বিলাতের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে ভারতে "অবজ্ঞাত" সম্প্রদায়সমূহকে ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনমণ্ডলী দিবেন বলায় মহাত্মাজী প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হয়েন। ফলে পুণায়

যে চুক্তি হয় তাহাতে প্রধান মন্ত্রী তাঁহার নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

কিন্তু এই সকল প্রায়োপবেশন—যে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, সে সকল সহজবোধ্য এবং সকল ক্ষেত্রেই মহাত্মাজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। এবার তাঁহার প্রায়োপবেশনের কারণ অন্যরূপ। তিনি বলিয়াছেন, তিনি আত্মশুদ্ধির জন্য অন্তরাত্মার আদেশে এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইহা অনিবার্য্য। তবে তিনি যে বলিয়াছেন, এই প্রায়োপবেশনের সহিত কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের সম্বন্ধ নাই এবং ইহা, তিনি যাহাদিগকে "হরিজন" নামে অভিহিত করিয়াছেন সেই "অস্পৃশ্যদিগের" সম্বন্ধীয় আন্দোলন সম্পর্কে, তখন মনে করা যাইতে পারে, তিনি "হরিজন" আন্দোলনে তাঁহার দেশবাসীকে অধিক অবহিত দেখিতে চাহেন। তিনি সরকারের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিয়াও "অস্পৃশ্যতা" দূর করিবার জন্য সহযোগের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—ব্যবস্থাপক সভায় সে-জন্য আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—হিন্দুসমাজ হইতে "অস্পৃশ্যতা" দূর করিবার জন্য এবার প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে। মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন যে এই আন্দোলনে তাঁহার দেশবাসীকে অবহিত করাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতিভেদ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ নেতা বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় বলিয়াছিলেন :—"উচ্চ ও নিম্নজাতির কল্পনা হিন্দুধর্ম্মে নাই। ইহা বেদানুমোদিত নহে। সামাজিক অসমতার আদর্শ আমাদিগের সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহা লইয়া জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধাইবার চেষ্টা হয়। যদি ইহার প্রতীকার না হয়, তবে সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে।" সামাজিক প্রয়োজনে যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে কালোচিত পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত না হইলে তাহাতে ইষ্ট সাধিত না হইয়া অনিষ্ট ঘটে। বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দুসমাজে আজ কিরূপ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন প্রয়োজন এবং পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে কিরূপে—সংস্কারকে সংহারমূর্ত্তি প্রদান না করিয়া—তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, হিন্দুর পক্ষে তাহা বিবেচনা করিবার সময় সমুপস্থিত। ভারতবর্ষের উপর দিয়া যেমন যবনাদির বিজয়-বন্যা বহিয়া গিয়াছে, তেমনই নানা ধর্ম্মমতের বন্যাও প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধমত রাজ্যত্যাগী সন্ন্যাসী রাজকুমার কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া একদিন ভারতবর্ষে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দুসমাজের গঠন পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। চৈতন্যদেব যে প্রেমধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন তাহা—তিনি যে নীলাম্বুমধ্যে নীলমণিময় দেবতাকে দর্শন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই সমুদ্রেরই মত উদার ছিল। কিন্তু সেই প্রেমধর্ম্মও হিন্দুসমাজ হইতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজে "অস্পৃশ্যতা" ধর্ম্মের অঙ্গ নহে—তাহা সামাজিক ব্যবস্থা। হিন্দুসমাজ অবশ্যই এই "অস্পৃশ্যতার" বিষয় নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। মহাত্মাজী কেন সেজন্য উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি যদি "অস্পৃশ্যতা" দূর করাই আশু প্রয়োজন মনে করিয়া থাকেন, তবে সেজন্য আন্দোলন না করিয়া কেন আপনার জীবন বিপন্ন করিলেন? ইহার একমাত্র উত্তর—তিনি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, সে অবস্থায় সাধারণ মানুষের আদর্শ ও ব্যবহার অপ্রযোজ্য। সাধারণ মানুষের সাধারণ আদর্শ তথায় উপনীত হইতে পারে না। বাইবেলের উক্তি তিনি পৃথিবীর লোককে নিজ কার্য্য দ্বারা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :—

"Greater love hath no man in this that a man lay down his life for his friends"

তাঁহার বিরাট ত্যাগ সর্ব্ববিধ সমালোচনা মূক করিয়া দিয়াছে—সর্ব্ববিধ বলের মধ্যে আত্মিক বলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। যে বলে তিনি প্রায়োপবেশনব্রত উদযাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার উৎস কোথায়? সে উৎসের সন্ধান লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ এবং যিনি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার সাধনা যে জাতির মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব সে জাতিকে ধন্য করে।

—

মহাত্মাজী ও আইনভঙ্গ আন্দোলন—

কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আইনভঙ্গ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তদনুসারে কংগ্রেসের সভাপতি মিষ্টার এনী ছয় সপ্তাহের জন্য সে আন্দোলন স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই আন্দোলনের বিস্তার বুঝিতে হইলে স্মরণ করিতে হয়:—

(১) গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে বলা হয়, গত জানুয়ারী হইতে জুন এই ছয় মাসে বাঙ্গালায় এই আন্দোলন সম্পর্কে মোট ১১ হাজার ৮১ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল——ইহাদিগের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৯ হাজার ৩ শত ৬৭ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬ শত।

(২) গত নভেম্বর মাসে বিলাতে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন, গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে এই আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিতদিগের সংখ্যা—৬১ হাজার ৫ শত ৫১। মহাত্মাজী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—যতদিন আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কে দণ্ডিত এক জন লোকও কারাগারে থাকিবেন, ততদিন সে আন্দোলন প্রত্যাহার করা যায় না। কিন্তু সরকার যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা আন্দোলন স্থগিত রাখার সময় বিনা সর্ত্তে সেই সব কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করুন।

তিনি আরও বলিয়াছেন, তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াই যখন কারারুদ্ধ হয়েন, তখন যে স্থানে কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতেই কার্য্যারম্ভ করিতে ইচ্ছুক। তখন লর্ড আরউইনের সহিত তাঁহার সন্ধির ফলে তিনি সহযোগের পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যদি সেই স্থান হইতেই কার্য্যারম্ভ করিতেন, তবে আবার সহযোগের আরম্ভ হইত।

কিন্তু ভারত সরকার তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। সরকার বলেন, কংগ্রেস আর আইনভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ করিবেন না—এমন বিশ্বাসের কারণ না ঘটা পর্য্যন্ত সরকার আইনভঙ্গকারীদিগকে মুক্তি দিতে পারেন না। ইতঃপূর্ব্বে ভারত-সচিব বিলাতে পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন, বন্দীদিগের মুক্তির পর যে আইনভঙ্গ আন্দোলন পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইবে না—ইহা বুঝিবার কারণ ঘটিলে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তিনি কংগ্রেসকে সেজন্য কোনরূপ প্রতিশ্রুতি বা প্রতিভূ দিবার কথা বলেন নাই। তাঁহার কথায় মনে করা যাইতে পারে—বন্দীদিগকে মুক্তি দিলে ঐ আন্দোলন পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হইবে না, সরকার ইহা মনে করিলেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দিবেন। কিন্তু তাহার পর এ দেশে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সার হ্যারী হেগ বলেন, সে জন্য কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সে আন্দোলন পুনঃপ্রবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই। কংগ্রেসের মত প্রতিষ্ঠানের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবি করা যে অসঙ্গত ও অন্যায় তাহা সার তেজ বাহাদুর সপ্রুর মত সরকারের বিশ্বাসভাজন ভারতীয় নেতাও বলিয়াছেন। কিন্তু এখন বিলাতে ভারত-সচিব ভারত সরকারের কথারই পুনরুক্তি বা প্রতিধ্বনি করিতেছেন। দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা এবং মহাত্মাজী প্রমুখ নেতৃগণের কার্য্য লক্ষ্য করিলে মনে হয়, নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে মহাত্মাজীর ইচ্ছানুসারে আইনভঙ্গ আন্দোলন স্থগিত রাখা কংগ্রেসের পক্ষে নীতি পরিবর্ত্তনের সূচনা মনে করিয়া রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তি দিলে দেশে শান্তি স্থাপনের পথ সুগম হয়। যাহারা সন্ত্রাসবাদী অর্থাৎ যাহারা হিংসাশ্রয়ী তাহারা রাজনীতিক কারণে বন্দী নহে। কারণ, কংগ্রেস অহিংসার পথ ত্যাগ করিয়া হিংসার পথ অবলম্বন করিবার বিরোধী বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মহাত্মাজী স্বয়ং যে হিংসার বিরোধী তাহা তিনি বার বার আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই সময় সরকার ও কংগ্রেস উভয় পক্ষকেই রাজনীতিকোচিত দূরদৃষ্টির ও সাহসের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।

ইতোমধ্যেই অবস্থা জটিল হইয়া উঠিতেছে। সরকার যেমন আইনভঙ্গ আন্দোলন স্থগিত রাখাই যথেষ্ট বলিয়া

বিবেচনা করেন না, তেমনই আবার শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল প্রভৃতি মহাত্মাজীর কার্য্য—অসাফল্যের স্বীকৃতি বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত রাজনীতিকদ্বয় ভিয়েনা সহর হইতে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সে কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—আমাদিগের ধারণা এই যে, রাজনীতিক নেতৃরূপে মহাত্মা গান্ধীর অসাফল্যে আর সন্দেহ নাই।

তাঁহারা বলিয়াছেন, এখন নূতন নীতিতে ও পদ্ধতিতে কংগ্রেস পুনর্গঠিত করিবার সময় আসিয়াছে। সে জন্য নূতন নেতারও প্রয়োজন। কারণ, মহাত্মাজী যে তাঁহার অনুসৃত নীতি বর্জ্জন করিয়া নূতন নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, ইহা মনে করিতে পারা যায় না। সমগ্র কংগ্রেসকে যদি পরিবর্ত্তিত করা না যায়, তবে কংগ্রেসের মধ্যেই নূতন দল গঠিত করিতে হইবে। অসহযোগনীতি ত্যাগ করা যায় না—কিন্তু তাহার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা উগ্রতর করিতে হইবে।

আইনভঙ্গ আন্দোলনের ফলে দেশে কত লোক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা অবশ্যই ভিয়ানা-প্রবাসী সুভাষচন্দ্রের ও পেটেল মহাশয়ের অজ্ঞাত নাই। তাহা জানিয়াও তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করিয়া গঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসে কোন্ নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে ও কোন্ নূতন পদ্ধতিতে কংগ্রেস পরিচালিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে প্রকাশিত হয় নাই।

তবে এই বিবৃতি দেখিয়া মনে হয়, মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নামেই কেহ কেহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারেন। যদি তাহা হয়, তবে যে দেশে শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দেশ এখন শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

যখন ঘোষণা করা হয়, কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য তাহার সভাপতি হইবেন, তখন সরকার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বে-আইনী বলিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যখন অধিবেশন আরম্ভ হয়, তখন পুলিস আসিয়া সভানেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। কলিকাতার পথে পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। কয় দিন পরেই সকলকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল।

কলিকাতায় যে সকল প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তারের পর পুলিস বিষম প্রহার করিয়াছিল, পণ্ডিতজী এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া এক বিবৃতি ব্যবস্থাপরিষদের সদস্যদিগের নিকট প্রেরণ করেন এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব তাহা পাইয়া বলেন, বাঙ্গলা সরকারকে অভিযোগের তদন্ত করিতে বলা হইয়াছে।

ইহার পরই বাঙ্গালা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা—গভর্ণর ও তাঁহার সচিবগণ ঘটনাস্থল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দার্জ্জিলিংএ গমন করেন। তদন্তের বিষয় কলিকাতার লোক জানিতে পারে নাই।

কিন্তু গত ২২শে মে তারিখে বিলাতে পার্লামেণ্টে ঐ ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব বলেন, বাঙ্গালা সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অভিযোগ মিথ্যা। পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভারত-সচিব বলেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত একজন প্রধান জননায়ক যে ঐরূপ দুষ্ট ও মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দুঃখিত এবং আরও বলেন, পণ্ডিতজী ২ বার মিথ্যা ও প্রমাণহীন অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বারাণসীতে কংগ্রেসকর্ম্মী মহিলাদিগের প্রতি কুব্যবহারের অভিযোগই ভারত-সচিবের উক্তির উদ্দিষ্ট।

ভারত-সচিবের মত পদস্থ ব্যক্তি যে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অশিষ্ট ভাবের উক্তি করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই দুঃখের বিষয়। কিন্তু পণ্ডিতজী বলিতেছেন :—

(১) যদি সরকার তাঁহার উপস্থাপিত অভিযোগের প্রকাশ্যভাবে তদন্ত ব্যবস্থা করেন, তবে তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ দিবেন।

(২) আর সরকার যদি সেরূপ তদন্ত না করেন,

তবে (মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার জন্য) তাঁহাকে মামলা সোপর্দ্দ করুন। (তাহা হইলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে আবশ্যক প্রমাণ দিতে পারিবেন।)

তিনি এ কথাও বলিয়াছেন, তিনি বারাণসীর ব্যাপার সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের যে সমালোচনা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপস্থাপিত অভিযোগের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

আমরা বারাণসীর ব্যাপার সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর সমালোচনা পাই নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি না। কিন্তু এ কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—পণ্ডিতজী যখন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করিতে প্রস্তুত তখন তাঁহাকে তাহা করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার কেন আহ্বান করেন নাই ?

যে তদন্ত প্রকাশ্যভাবে হয় না, তাহার সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ দূর করা যে দুষ্কর তাহা সরকার অবশ্যই জানেন। তাহা জানিয়াও সরকার সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেন কেন? চট্টগ্রামের ব্যাপারে পুলিস যে নিরপরাধ ছিল না, তাহা সরকারী তদন্তেও প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু সরকার সে তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করেন নাই।

পণ্ডিতজীর অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত-সচিব যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে পণ্ডিতজীর পক্ষে কি প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করা—অন্ততঃ তাঁহার সমস্ত প্রমাণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া আপনার উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না ?

বিপ্লবীর সন্ধান—

সপ্তাহ কাল মধ্যে বাঙ্গালার দুই স্থানে—চট্টগ্রামে ও কলিকাতায় পুলিস বিপ্লবীদিগের সন্ধান পাইয়াছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবীরা পুলিসের উপর গুলী বর্ষণ করিয়া শেষে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। চট্টগ্রামে তাহাদিগের মধ্যে দু জন নিহত ও এক জন আহত হইয়াছে; কলিকাতায় এক জন পুলিস কর্ম্মচারীর আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। সে ঘটনা যেন উপন্যাস-বর্ণিত ব্যাপার। তদবধি পুলিস ও সৈনিকরা চট্টগ্রামে বিপ্লবীদিগের সন্ধান করিতেছে। প্রকাশ, অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত অস্ত্র চন্দননগরেও পাওয়া গিয়াছিল। এই সন্ধানের ফলে চট্টগ্রামের বহু নিরীহ ও নিরপরাধ লোক বিশেষ অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে। বাঙ্গালার গভর্ণর চট্টগ্রামে পাইকারী জরিমানার সমর্থনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়—

"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।"

কিন্তু এত চেষ্টাতেও সকল বিপ্লবী ধৃত হয় নাই। ইহার মধ্যে আবার কুমারী কল্পনা দত্ত নাম্নী এক কিশোরী যুবকের বেশে ধরা পড়িয়া মামলা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। সে যখন জামিনে খালাস ছিল, সেই সময় নিরুদ্দেশ হয়।

গত ১৮ই মে তারিখে চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে পুলিস কোন বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। গৃহস্থগণ পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া গুলী চালায়। পুলিসের গুলিতে

মনোরঞ্জন দাস ও পূর্ণচন্দ্র তালুকদার

নিহত, ও

প্রসন্নকুমার তালুকদার

আহত হয় এবং

কল্পনা দত্ত
তারকেশ্বর দস্তিদার
সুহীন্দ্র দাস

গ্রেপ্তার হন।

আর গত ২২শে মে তারিখে কলিকাতা শ্যামবাজার পল্লীতে পুলিস মেদিনীপুর জেলখানা হইতে পলায়িত দীনেশ মজুমদার, হিজলী বন্দিশালা হইতে পলায়িত নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়—এই কয়জনকে একটি গৃহে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বাঙ্গালায় যে আজও বিপ্লবতন্ত্রীরা হিংসার পথে বিচরণ করিতেছে, ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। হিংসা হিন্দুস্থানের হিন্দুদিগের ধাতুসহ নহে ও তাহাদিগের চিরাগত সংস্কার-বিরুদ্ধ এবং হিংসার রক্তসিক্ত

বসন যে কোন জাতিকে মুক্তির মোক্ষদ্বারে লইয়া যায় না—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি যে এ দেশে মুষ্টিমেয় যুবক যুবতী হিংসার পথ গ্রহণ করিতেছে, সন্ত্রাসবাদী হইতেছে, ইহা জাতির পক্ষে দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। যে কার্য্য জাতির সংস্কারবিরোধী তাহাতে যাহারা আকৃষ্ট হয়, তাহারা কোন্ প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া যে কাজ করে এবং কেন করে, তাহা বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, রোগের নিদান নির্ণীত না হইলে আবশ্যক ভেষজ প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে না। সরকার দমননীতি অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন, যে কনোলী আয়ার্লণ্ডের মুক্তিসাধনোদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—সে নীতি কেবল গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের বিস্তার সাধন করে—তাহাতে অসন্তোষের অবসান হয় না—

"Driving organisations under the surface does not remove the causes of discontent, and, consequently, we find that as rapidly as reaction triumphed above ground its antagonists spread their secret conspiracies underneath."

আজ যখন দেশের লোক ও দেশের সরকার উভয় পক্ষই দেশ ও সমাজ হইতে এই অনাচার দূর করিবার জন্য ব্যাকুল তখনও কি উভয় পক্ষ একযোগে লোকমত গঠন প্রভৃতির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিতে পারেন না?

জয়েণ্ট কমিটী—

বিলাতের সরকার সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের কার্য্য-বিবরণ বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে নূতন শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাই "শ্বেতপত্রে" প্রকাশিত হইয়াছে। এখন পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী সেই সব প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবেন। সেই কার্য্যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল ভারতবাসীকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে তাঁহারা কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিবেন বা কমিটীর আলোচনায় যোগ দিবেন। কমিটীর আলোচনাকালে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের কার্য্যবিবরণ সাংবাদিকদিগকে প্রদান করা হইবে।

প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বিলাতের রাজনীতিকদিগের মধ্যে প্রবল মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। রক্ষণশীল দলের নেতা মিষ্টার বলডুইন প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, এখন যদি ইংরাজ অগ্রসর না হয়েন অর্থাৎ ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার বর্দ্ধিত না করেন, তবে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবে না। তিনি, বোধ হয়, ইতিহাসের শিক্ষায়—আমেরিকার ও আয়ার্লণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া—রাজনীতিকোচিত দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আর একদল রাজনীতিক বলিতেছেন, এই প্রস্তাব ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষে সব অধিকার ত্যাগ করিয়া আসা ব্যতীত আর কিছুই নহে, আর ইংরাজ অধিকার ত্যাগ করিয়া আসিলে ভারতবর্ষ প্রাচীর অনাচারে পীড়িত হইবে। মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চহিল শেষোক্ত দলের নেতা; মনে হইতেছে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার লয়েড জর্জ্জও সেই দলে ভিড়িবেন।

এ দেশ হইতে জয়েণ্ট কমিটীর কাজের জন্য যাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহাদিগের অন্যতম। সরকার মহাশয় গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দিয়া, বাঙ্গালার প্রতি যে আর্থিক অবিচার করা হইয়াছে, তাহার কথা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি "রক্ষাকবচ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় বুঝাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে ভারতবাসী স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে না বটে, কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর হইবে এবং ইংরাজ বহু বিষয়েই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখিবেন।

সেদিন বিলাতে রক্ষণশীল দলের এক সভায় তিনি বলিয়াছেন, ইংরাজ যে ভারতবর্ষে সব অধিকার ত্যাগ করিতেছেন না, তাহার প্রমাণ :—

(১) সামরিক ও অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কিত ব্যবস্থায় ভারতবাসী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(২) রাজস্বের শতকরা ৮০৲ টাকা সামরিক ব্যয়ে, ঋণ বাবদে, বিলাতে চুক্তিবদ্ধ চাকরীয়াদিগের বেতন

প্রভৃতিতে যাইলে ভারতবাসীরা মাত্র শতকরা ২০৲ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৩) বড় বড় চাকরীয়াদিগের নিয়োগ হইতে কর্ম্মস্থান পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত মন্ত্রীরা করিতে পারিবেন না।

তিনি বলিয়াছেন—

যদি ইংরাজ মনে করেন, তাঁহারা এতদিন ভুল করিয়া আসিয়াছেন—প্রাচীর অধিবাসীদিগের জন্য স্বৈর-শাসনই প্রয়োজন, তবে অদূর-ভবিষ্যতে তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন, তাঁহারা নদীর মধ্যস্থলে যানের অশ্ব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় দারুণ ভুল করিতেছেন। কারণ, ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া বাঁধ কাটিয়া দিবার পর কখনই জলের প্রবাহ বন্ধ করিতে পারিবেন না।

লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, মর্লি-মিণ্টো সংস্কারে তাহা বিস্তার লাভ করে এবং তাহার পর মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান ও কার্য্যারম্ভ হয়। আজ কি ইংরাজ বলিতে পারেন, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জাতির মনে রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্রেকের ব্যবস্থা করিবার পর তাঁহারা অনায়াসে সে আকাঙ্ক্ষা অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া দেশবাসীর অসন্তোষ-কঙ্কর-কণ্টকিত পথে অনায়াসে শাসনের রথ পরিচালিত করিতে পারেন? ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যের সন্তুষ্ট ও সমৃদ্ধ অংশ করিয়া রাখাই কি ইংরাজের ঈপ্সিত নহে?

ফল রপ্তানী—

ভারতবর্ষ ফলের দেশ এবং এই দেশের কতকগুলি ফল অন্য কোন দেশে ভাল হয় না। অথচ গত ১০ বৎসর হইতে এ দেশে বিদেশী ফলের আমদানী বাড়িয়া চলিয়াছে। সিঙ্গাপুর হইতে আনারস ও কলা আমদানীর কথা ছাড়িয়া দিলেও আমেরিকা ও জাপান হইতে যে ফলের আমদানী এই কয় বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা বোম্বাইয়ের ও কলিকাতার ক্রফোর্ড মার্কেট ও হগ মার্কেট দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এ দেশের আনারস, আপেল, কমলা লেবু, পেয়ারা প্রভৃতি কি কারণে বিদেশী আনারস, আপেল, কমলালেবু, পেয়ারা প্রভৃতির সহিত প্রতিযোগিতায় পারে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

কয় বৎসর হইল বিলাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের নানা পণ্যের ক্রয় বিক্রয় সুবিধা সৃষ্টির জন্য এক বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং সুখের বিষয় সেই বোর্ডের চেষ্টায় ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ও অন্যান্য দেশে ভারতীয় ফল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত বৎসর হইতে এই বোর্ডের কাজ বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে।

গত ৩০ বৎসর হইতে ব্রহ্মের ম্যাঙ্গোষ্টীন বা গাব বিলাতে পাঠান হইতেছে। তবে গত বৎসর ইহার বহুল রপ্তানী হইয়াছিল। জুন মাসে যে এক হাজার গাবের চালান লণ্ডনে পৌছে তাহা তথায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল এবং লোক উহা আর চাহিয়া পায় নাই।

এ বৎসর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে কলার চালান গিয়াছে। বিলাতে কলার যথেষ্ট কাটতি আছে এবং জ্যামেকা বিলাতে কলা বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়া থাকে। যে সব দেশের সহিত বিলাতের কলার ব্যবসা আছে, সে সকল দেশ হইতে জাহাজে কলা লইয়া যাইবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে—যে ঘরে কলা থাকে, তাহার তাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। পাঠাইবার সুব্যবস্থার অভাবে ভারতবর্ষ হইতে যে প্রথম চালান কলা গিয়াছিল, তাহার তেমন আদর হয় নাই বটে, কিন্তু এখন পাঠাইবার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইতেছে।

গত বৎসর জুন মাসে বোম্বাই হইতে যে আম্র চালান যায়, তাহা যে দামে বিক্রীত হইয়াছে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে দেশে ৪।৫ টাকায় ১ শত উৎকৃষ্ট আম্র পাওয়া যায়, সেই দেশের আম্র বিলাতের লোক ১টি ১ টাকা ২ আনা দিয়া সাগ্রহে ও সাদরে লইয়া গিয়াছে। তাহার পর আবার যখন রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, আম্র বিশেষ পুষ্টিকর এবং ইহাতে এ ও সি ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে এবং ডি ভাইটামিন সামান্য পরিমাণে আছে, তখন বিদেশে ইহার আদর যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, এমন আশা অবশ্যই করা যায়। এ বৎসর গত ২১শে এপ্রিল

তারিখে "প্রেসিডেণ্ট পিয়ার্স" জাহাজে বোম্বাই হইতে প্রথম চালান আম গিয়াছে। বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্বয়ং জাহাজে যাইয়া সব ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই চালানে মোট ৬০ হাজার ফল ছিল। উহার মধ্যে ৬০টি সম্রাটের জন্য। গত বৎসর বোম্বাই ফলোৎপাদনকারীদিগের সভার পক্ষ হইতে বিলাতে ভারতের হাই কমিশনার কতকগুলি আম্র সম্রাটকে উপহার দিয়াছিলেন। গত বৎসর একশত জন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ হইতে আম্র চালানী ব্যবসা সম্বন্ধে সন্ধান লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গত বৎসর বিক্রয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হওয়ায় বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ব্যবসা আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। এ বৎসর ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এ বৎসর জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক দুইবার বোম্বাই হইতে আম্রের চালান যাইবে।

বাঙ্গালার বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরে ফল দীর্ঘকাল রক্ষা করিবার উপায় পরীক্ষিত হইতেছে এবং বিহার ও উড়িষ্যার সরকার যুক্ত প্রদেশের সহিত একযোগে এ বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য গত বৎসর ৯০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছিলেন। আম্র, পেঁপে ও লিচু কিরূপে বিদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহাই পরীক্ষার বিষয়। বাঙ্গালায় মুর্শিদাবাদ, মালদহ, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জিলায় নানারূপ উৎকৃষ্ট আম্র আছে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় কলা ও আনারসও ভাল উৎপন্ন করা যায়। বাঙ্গালা সরকারের কৃষিবিভাগ কি বাঙ্গালা হইতে বিদেশে ফল রপ্তানী ব্যবসা পত্তন করিবার উপায় চিন্তা করিবেন?

রামমোহন-শত-বার্ষিকী উৎসব—

বর্ত্তমান ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নবযুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। রাজার শত-বার্ষিক উৎসবের যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার উদ্যোগ পর্ব্ব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে যে প্রাথমিক জনসাধারণ সভা হইয়াছিল, সেই সভায় গঠিত কর্ম্মনির্ব্বাহক কমিটি ও বিভিন্ন শাখা সমিতির অনেকগুলি বৈঠক ইতোমধ্যে হইয়া গিয়াছে। এই সকল বৈঠকের ফলে একটি বিস্তৃত কার্য্যতালিকা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী উৎসবাঙ্গ মোটামুটি এইভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

প্রথমতঃ—(১) রাজার গ্রন্থাবলী প্রকাশ, (২) গ্রন্থ সকলের একটা সাধারণের পাঠোপযোগী নির্ব্বাচিত সংস্করণ প্রকাশ, (৩) তাঁহার জীবনী ও কর্ম্মাবলীর বিশ্লেষণমূলক বিবরণ ও (৪) বর্ত্তমান উৎসবের একটি স্মারক সংস্করণ, প্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ কলিকাতায় আগামী বড়দিনের ছুটিতে (১) একটি ধর্ম্ম সমন্বয় (২) রাজার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা (৩) একটি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (৪) মহিলা সম্মেলন ও (৫) রাজার জীবন ও কর্ম্মসংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী।

তৃতীয়তঃ—রাজার জন্মস্থান রাধানগর-তীর্থ-যাত্রা।

চতুর্থতঃ—রাজার স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন, যথা, কলিকাতার কোন কেন্দ্রস্থলে (১) রাজার একটি পিত্তলময়ী মূর্ত্তি স্থাপন, (২) টাউন হলে রাজার তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা (৩) আপার সার্কুলার রোডের উত্তরার্দ্ধের "রামমোহন রায় এ্যাভিনিউ" নামকরণ। এবং রাধানগরে (৪) একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন ও (৫) রাজার স্মৃতি-মন্দিরের গঠন সম্পূর্ণ করা।

পঞ্চমতঃ ভারতের বাহিরে লণ্ডনে, বৃষ্টলে এবং ইয়োরোপের অন্যান্য শিক্ষা ও ধর্ম্মকেন্দ্রে রামমোহন-উৎসবের অনুষ্ঠান।

এবং ষষ্ঠতঃ—(১) যদি যথেষ্ট টাকা উঠে তবে রামমোহনের নামে তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে অধ্যাপকের পদ-সৃষ্টি। (২) লণ্ডনে সভাসমিতির অধিবেশন ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য একটি রামমোহন অট্টালিকা ও হল নির্ম্মাণ। (৩) অদূর ভবিষ্যতে রাধানগর রামমোহন তীর্থযাত্রার জন্য মোটর যাতায়াতের উপযোগী রাস্তানির্ম্মাণ (৪) রামমোহনের মাণিকতলার বাটী ক্রয়।

এই সকল অনুষ্ঠান প্রচুর অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। কেবল গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্য্যের ব্যয় পড়িবে ১৫০০০

টাকা; উৎসবের ব্যয় ৫০০০৲; পিত্তলমূর্ত্তি ২০০০০৲; চিত্র ও স্তম্ভ ১০০০৲; রাধানগর স্মৃতি-মন্দির ২৮০০০; সর্ব্ব সমেত ন্যূনাধিক ৭৫০০০৲। তদ্ব্যতীত অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য তিন লক্ষ ও লণ্ডনে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১ লক্ষ; এক কথায়, রামমোহন শতবার্ষিকী উৎসব যথাযোগ্য ভাবে সম্পাদন করিতে পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার।

রাজা রামমোহন রায় কেবল হিন্দুর নহেন, ব্রাহ্মের নহেন; মুসলমানের নহেন—তিনি সর্ব্ব-জাতির। কেবল বাঙ্গলার নহেন, ভারতের নহেন—সমগ্র পৃথিবীর। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর নহেন—সর্ব্বকালের, সর্ব্ব-যুগের—চিরন্তন। এই রাজর্ষির প্রথম শত-বার্ষিক উৎসব তাঁহার যোগ্য হওয়া চাই। অন্যান্য দেশের লোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের মনস্বীবর্গের শতবার্ষিক উৎসব যে ভাবে সম্পাদন করেন, আমাদের দেশে রাজা রামমোহনের শতবার্ষিক উৎসব তদপেক্ষা একটুও কম হইলে চলিবে না। আমরা ভাল করিয়া উৎসব করিতে পারি না পারি—রাজার তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না; তিনি নিজে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়, অবিনশ্বর—আমরা তাহার গৌরব এতটুকু কমাইতে বা বাড়াইতে পারিব না। তবে আমরা যে ভাবে উৎসব করিতে পারিব তদনুপাতে আমাদের নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিব। মনে রাখিতে হইবে, রাজা ছিলেন cosmopolitan। আমরা যে ভাবে তাঁহার স্মৃতি-উৎসব সম্পাদন করিব—বিশ্বের দরবারে আমাদের স্থানও তদনুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে।

স্বর্গীয় কমলাচরণ দত্ত—

গত ২রা মে তারিখে যে পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনা হয়, তাহাতে যে কয়েকটী অমূল্য জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এলাহাবাদবাসী সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ যুবক ৺কমলাচরণ দত্ত একজন। ইংরাজী ১৯০৯ সালের ২১শে অগাষ্ট শ্রীমান কমলাচরণ এলাহাবাদের সুপরিচিত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার এলাহাবাদ সহরে প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া পরিচিত। কমলের পিতা ৺ললিতচরণ দত্ত মহাশয় Uuited Provinces'র Civil Secretariatর P. W. D.র Superintendent ছিলেন। স্বীয় পিতার ন্যায় কমলাচরণও পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। কমলাচরণের শিক্ষা আরম্ভ হয় এলাহাবাদের Anglo Bengali স্কুলে (অধুনা Intermediate কলেজ); এবং পরে স্থানীয় Ewing Christian College। উনিশ বৎসর বয়সে কমলাচরণ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস্‌সি পাশ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে কমলাচরণ Civil Engineering শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং London University Collegeএ প্রবেশ করেন। কমলাচরণই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে প্রথম যুবক যিনি London University'র তিন বৎসরে অর্জ্জনীয় Engineering degree মাত্র দুই বৎসরেই লাভ করিয়া বহু লোকের বিস্ময়ভাজন হ'ন। পরে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার মহাশয় যে আটটি ভারতীয় ছাত্রকে ভারতীয় Railwaysএ ট্রেনিঙের জন্য নির্ব্বাচিত করেন তাঁহাদের মধ্যে কমলাচরণ একজন। তিনি E. I. Ry'র এলাহাবাদ divisionএ Student Engineer রূপে নিযুক্ত হন; এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় সমস্ত উপরিতন কর্ম্মচারীরা মুগ্ধ হ'ন। বিশেষ করিয়া উক্ত divisionএর ৩৩নং ব্রিজের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি যে উচ্চাঙ্গের রিপোর্ট দেন তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার Engineering দক্ষতা সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ইহারই অনতিকাল পরে কমলাচরণ Calcutta Improvement Trust Valuation departmentএ চাকুরী লইয়া যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে ঐ হতভাগ্য পাঞ্জাব মেলে কলিকাতা যাইতেছিলেন, এবং পথে এই একান্ত শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটে। এইরূপে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে জীবনের সমস্ত সঙ্কল্প, দৃঢ় পণ, কৃতী এঞ্জিনীয়ার হইবার পথে নিযুক্ত করিবার প্রারম্ভেই এই মহান্-হৃদয় উদ্যমী বাঙ্গালী যুবক অনন্তের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। স্বর্গীয় কমলাচরণের মুক্ত আত্মা শান্তিতে থাকুক।

গ্রন্থাগারের কথা—

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক, নিখিল-ভারত গ্রন্থালয়-সমিতির সহযোগী সম্পাদক,

বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সদস্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় মহাশয় আমাদের জানাইতেছেন যে তিনি বরোদার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে সেখানে ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থালয় সংরক্ষণের জন্য বাৎসরিক ৫২ হাজার টাকা খরচ হয়, এবং সুশৃঙ্খলভাবে এই ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ের ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে বরোদাতে গ্রন্থাগার আন্দোলন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—এবং সেখানে বালক যুবক বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিই শিক্ষালাভ মানসে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারগুলি ব্যবহার করিতেছে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিষয়ে তিনি জানাইতেছেন যে কর্পোরেশন কলিকাতার গ্রন্থাগার গুলির জন্য বাৎসরিক ৪৮ হাজার টাকা খরচ করে, কিন্তু তথাপি গ্রন্থাগার আন্দোলনের কোন চিহ্নই এখানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না, কারণ, কলিকাতার গ্রন্থালয়গুলির কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাপন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের দ্বারা নিজ নিজ গ্রন্থালয়গুলির জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া ইচ্ছামত সেই অর্থ ব্যয় করেন। ফলে মাত্র কয়েকটী গ্রন্থালয়ের জন্যই ৪৮ হাজার টাকা খরচ হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি এবং শিক্ষাবিস্তারের কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না—গ্রন্থালয়গুলি চাঁদা দিয়া উপন্যাস পাঠের একপ্রকার দোকান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এই ৪৮ হাজার টাকার সদ্ব্যয় করিতে হইলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস রায় মহাশয়ের মতে গ্রন্থালয়গুলির সংরক্ষণ ও এই আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধির জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন যেন কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কাউন্সিলার এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই একজন বাহিরের লোক লইয়া অবিলম্বে একটী শাখা সমিতি গঠন করেন, এবং ঐ ৪৮ হাজার টাকা হইতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া নাগরিকদের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারকল্পে নানাপ্রকার প্রচার কার্য্যের জন্য অন্ততঃ প্রতি বৎসর ১৯ হাজার টাকা খরচ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ প্রয়োজন-অনুযায়ী বিচার করিয়া যদি সাহায্যদান করেন তাহা হইলে কলিকাতা সহরেও অচিরেই বরোদার অপেক্ষা গ্রন্থাগার আন্দোলনের কম পরিপুষ্টি সাধন হইবে না। আমরা আশা করি করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব—

বিলাতের সরকার ভারতে যে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। এই প্রস্তাবে মূলতঃ কি আছে, আমরা নিম্নে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।—

(১) বর্ত্তমানে প্রদেশসমূহের কোন মৌলিক বা স্বাধীন ক্ষমতা নাই। সকল ক্ষমতা ভারত-সচিবে কেন্দ্রীভূত। তদ্ভিন্ন শাসনব্যাপারে প্রাদেশিক শাসকরা সপার্ষদ বড় লাটের অধীন।

প্রস্তাবিত রাজ্যসঙ্ঘ কার্য্যে পরিণত হইলে প্রদেশগুলি স্বায়ত্ত-শাসনাধীন হইবে এবং প্রাদেশিক শাসকরা সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসন কার্য্য পরিচালিত করিবেন।

তদ্ভিন্ন শাসনের সকল বিভাগই ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদিগের কর্তৃত্বাধীন হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যাংশের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয় ব্যতীত আর সব বিষয়ই প্রাদেশিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বর্ত্তমানে শাসন-বিভাগগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত। কেবল হস্তান্তরিত বিভাগগুলি মন্ত্রীদিগের অধীন; অবশিষ্ট বিভাগগুলি সরকারের কর্ম্মচারী—শাসন-পরিষদের সদস্যদিগের হস্তগত। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সকল বিভাগই মন্ত্রীদিগের অধীন করা হইবে। অর্থাৎ রাজনীতিক, পুলিস, বিচার, আর্থিক, বাণিজ্য, ভূমি-রাজস্ব, কারাগার, সেচ, বন—কোন বিভাগই আর "সংরক্ষিত" বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(২) ব্যবস্থাপক সভার গঠন পরিবর্ত্তিত হইবে। বাঙ্গালায় (বিহারের ও যুক্তপ্রদেশের মত) দুইটি ব্যবস্থাপক সভা হইবে—"এসেমব্লী" ও "কাউন্সিল"। প্রথমটিতে ১ শত ৪০ জনের স্থানে ২ শত ৫০ জন সদস্য থাকিবেন। ইহাদিগের মধ্যে এক জনও সরকারী কর্ম্মচারী থাকিতে পারিবে না। সভার আয়ুষ্কাল ৫ বৎসর হইবে এবং অর্থ-

সম্বন্ধীয় আইন কেবল এই সভাতেই পেশ করা যাইবে। দ্বিতীয়টির সভ্য সংখ্যা ৬৫ হইবে।

বর্ত্তমানে সদস্য-বিভাগ এইরূপ—

শাসন-পরিষদের সদস্য ও মনোনীত সদস্য	২২ জন
অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি ...	১ "
ভারতীয় খৃষ্টান (মনোনীত) ...	১ "
শ্রমিক (মনোনীত) ...	২ "
মুসলমানাতিরিক্ত	৪৬ "
মুসলমান	৩৯ "
ফিরিঙ্গী	২ "
য়ুরোপীয়	৫ "
জমীদার	৫ "
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ...	২ "
ব্যবসায়ী	১৫ "
	মোট ১৪০ জন

নূতন ব্যবস্থায় হইবে—

মুসলমানাতিরিক্ত	৮০ জন
(২ জন স্ত্রীলোক)	
মুসলমান ...	১১৯ "
(২ জন স্ত্রীলোক)	
ফিরিঙ্গী	৪ "
(১ জন স্ত্রীলোক)	
ভারতীয় খৃষ্টান	২ "
য়ুরোপীয়	১১ "
জমীদার	৫ "
বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ...	২ "
ব্যবসায়ী	১৯ "
শ্রমিক	৮ "
	মোট ২৫০ জন

(৩) ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা যেমন বর্দ্ধিত হইবে, তেমনই ভোটদাতাদিগের সংখ্যাও বাড়িবে—অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে সকল কারণে ভোট দিবার অধিকার লাভ করা যায়, তদতিরিক্ত কারণেও সে অধিকার পাওয়া যাইবে। অন্যূন ২ টাকা চৌকীদারী টেক্স বা ইউনিয়ন বোর্ড রেট অথবা ১ টাকা ৮ আনা মিউনিসিপ্যাল টেক্স দিলে, ম্যাট্রিকুলেশন বা ঐরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, ইনকাম টেক্স দিলে ভোট দিবার অধিকার লাভ করা যাইবে। বর্ত্তমানে যাঁহাদিগের ভোট দিবার অধিকার আছে, তাঁহাদিগের মত সম্পত্তিশালী ব্যক্তির পত্নীও ভোট দিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার লোকের শতকরা ২.৫ জন ভোট দিতে পারেন। নূতন ব্যবস্থায় শতকরা ১৫জনই অধিকার লাভ করিবেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে ২৭জন পুরুষ ভোট দিতে পারেন সে স্থানে স্ত্রীলোক ভোটারের সংখ্যা একজন মাত্র। নূতন ব্যবস্থায় যে স্থানে সাতজন পুরুষ ভোট দিতে পারিবেন সে স্থানে একজন স্ত্রীলোক ভোট দানের অধিকার লাভ করিবেন।

(৪) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সরকারের সকল বিভাগই মন্ত্রীরা পরিচালিত করিবেন। নির্ব্বাচন শেষ হইলে গভর্ণর যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্যের বিশ্বাসভাজন বিবেচনা করিবেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। বিশেষ কারণ ব্যতীত গভর্ণর হস্তান্তরিত বিভাগের কার্য্যে মন্ত্রীর মতবিরুদ্ধ কাজ করিবেন না। বিলাতের ব্যবস্থা এই যে, পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন শেষ হইলে যে দল সংখ্যাধিক রাজা সেই দলের নেতাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলেন। এ দেশে বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল যেবার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, সেইবার গভর্ণর লর্ড লিটন সেই দলের নায়ক চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। এখন এ দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কোন এক সম্প্রদায়ের একজন নেতাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য আহ্বান করা অসম্ভব বলিয়া গভর্ণরই মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিবেন।

(৫) এত দিন পর্য্যন্ত অর্থাভাবে বাঙ্গালায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সেচ এই সকলের আবশ্যক উন্নতি সাধন সম্ভব হয় নাই। বাঙ্গালার আয়ে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। সেইজন্য বাঙ্গালার লোক ও বাঙ্গালা সরকার

পাটের রপ্তানী শুল্কের ও বাঙ্গালায় আদায়ী আয়করের টাকা বাঙ্গালাকে দিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছেন। এবার বাঙ্গালার প্রতি অবিচারের কতকটা প্রতীকার ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, পাটের রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধাংশ পাটের উৎপত্তি প্রদেশকে দেওয়া হইবে। কিন্তু এই শুল্ক কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাতে আমাদিগের বিশেষ আপত্তি আছে। পাট বঙ্গদেশে এবং বিহারের ও আসামের কতকাংশে উৎপন্ন হয়—অন্যত্র নহে। পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক প্রাদেশিক রাজস্ব বিবেচনা করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অংশ উৎপত্তি প্রদেশকে প্রদান করাই সঙ্গত। আয়করেরও অংশমত ভাগ বাঙ্গালাকে দিলে সুবিচার হয়। বাঙ্গালায় যে পরিমাণ আয়কর আদায় হয়, সে পরিমাণ আয় কোন প্রদেশে হয় না। আয়করের যথাসম্ভব অল্প ভাগ কেন্দ্রী সরকার রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগ যদি আদায়ের অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তবেই সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে, নহিলে নহে। কারণ, ইহা প্রধানতঃ শিল্প প্রধান প্রদেশে আদায় হয়, কৃষিপ্রধান প্রদেশে নহে। সুতরাং লোক সংখ্যার অনুপাতে বণ্টন ব্যবস্থায় শিল্প প্রধান প্রদেশগুলিকে সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত করা হইবে।

(৬) কতকগুলি বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ অধিকার থাকিবে—যথা শান্তিভঙ্গের কারণ নিবারণ, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের ও চাকরীয়াদিগের ন্যায্যসঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ, ব্যবসাগত বৈষম্য নিবারণ, বান্ধব রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষণ, বড়লাটের আদেশ পালন ব্যবস্থা করণ। বলা বাহুল্য অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব না হইলে গভর্ণরের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না। গভর্ণরও মন্ত্রীদিগের মত উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিয়া কাজ করিতে চাহিবেন না। ক্রমে কতকগুলি নিয়ম গড়িয়া উঠিলে সেই সকলের দ্বারাই গভর্ণরের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

যদি শাসিত ও শাসক উভয় পক্ষের মধ্যে সদ্ভাবের ও সহযোগের অভাব না ঘটে, তবে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যে দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর করিতে পারিবে, তাহা বলা যাইতে পারে। সদ্ভাবের ও সহযোগের অভাব ঘটিলে কোন শাসন-পদ্ধতিই সুফল প্রসব করিতে পারে না।

রাজা বিজয় সিং ধুধুরিয়া—

বাঙ্গালায় জৈন সমাজের অন্যতম নেতা রাজা বিজয় সিং ধুধুরিয়া হৃদ্‌রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। আজিমগঞ্জের (মুর্শিদাবাদ) যে ধুধুরিয়া পরিবারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিজয় সিংহের জন্ম হয় সেই পরিবারের বংশপতি হরজিমল অনুমান ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা ব্যপদেশে বিকানীর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া আজিমগঞ্জে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ে উন্নতিলাভের ফলে তাঁহার পৌত্র হরেকচাঁদ কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে আজিমগঞ্জে, কলিকাতায়, ময়মনসিংহে ও জঙ্গীপুরে "গদী" রাখিয়া মহাজনী ও তেজারতী কাজ আরম্ভ করেন। বিজয় সিং তাঁহার পৌত্র। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিজয় সিং পিতৃহীন হইয়াছিলেন। যখন লর্ড মিণ্টো এদেশে বড়লাট তখন মিণ্টো ফেট অনুষ্ঠানে লক্ষ টাকা দান করিয়া বিজয় সিং "রাজা" উপাধি লাভ করেন। ইনি জিলাবোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়াছিলেন এবং শেষে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। পলিতাগর রাজার সহিত জৈনদিগের তীর্থস্থান লইয়া যে বিবাদ হয় তাহার নিষ্পত্তিতে উদ্যোগী হইয়া বিজয় সিং সমগ্র ভারতে জৈন সম্প্রদায়ে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় ছয় মাস কাল অসুস্থ থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বিজয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ৬ বৎসর মাত্র। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত স্বজনগণকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোয়ার—

কিছু দিন হইতে সামন্ত রাজ্য আলোয়ারে প্রজা-বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বৃটিশ সরকার তথায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কর্ম্মচারী প্রেরণও করিয়াছিলেন। সংপ্রতি জানা গিয়াছে, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় এবং মহারাজার রাজ্যে অবস্থিতি শৃঙ্খলার পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা। মহারাজাকে বলা হইয়াছিল, হয় তিনি অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য রাজ্যত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিয়া সেই সময়ের জন্য শাসন-

ভার ইংরাজসরকারের উপর প্রদান করুন, নহে ত রাজ্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্তে সম্মতি দান করুন। মহারাজা তদন্তে সম্মতি প্রদান না করিয়া রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে তদন্তে সম্মতি দেন নাই, তাহাতেই মনে করা যাইতে পারে, তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার শাসনে ত্রুটি আছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, সামন্ত নৃপতিরা তদন্তে অসম্মত হইয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, আলোয়ার রাজ্যের প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ পায় নাই, কখন প্রকাশ পাইবে কি না জানি না। দেশীয় রাজা আপন রাজ্যমধ্যে সুশাসনে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারিয়া শাসনভার ইংরাজ সরকারের উপর অর্পণ করেন, ইহা যে দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি সামন্ত নৃপতিরাজ্যে ইহা ঘটিয়াছে। সে সকল রাজ্যে শাসকরা কি গণতন্ত্রের গতি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন না? না—তাঁহারা সুশাসনের শিক্ষা উপেক্ষা করেন? অতঃপর যদি আলোয়ার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং প্রজাপুঞ্জের আর শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকে, তবে আমরা প্রীতিলাভ করিব।

পরলোকে—

বিজয়চন্দ্র সিংহ—

গত ২৪এ বৈশাখ (১৩৪০) রবিবার বেলা একটার সময় যোড়াসাঁকো সিংহ পরিবারের—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসরের অধিক হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় ধুরন্ধর বর্ত্তমানকালে বাঙলোদেশে নাই বলিলেই হয়। কত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা মরণের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। শুনা যায় তাঁহার গবেষণার ফলে বহু নূতন হোমিওপ্যাথিক ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর সাধন করিয়াছে। তিনি নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজ্ঞানের সাধনা

৺বিজয়চন্দ্র সিংহ

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় তাঁহারই গৃহে অল্পকাল পূর্ব্বে নিখিল ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-সম্মেলন হইয়াছিল। বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদান ও ব্যবসায় পরিচালন ব্যাপারটিকে সঙ্ঘবদ্ধ

ভাবে সুশৃঙ্খলিত করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছে। জ্ঞানার্জ্জন ও আবিষ্কারের স্পৃহা তাঁহার এমন প্রবল ছিল যে, তিনি নিজ গৃহে প্রকাণ্ড একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করিয়া তাহা অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-তন্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া একাকী তথায় রসায়ন-বিজ্ঞানের সাধনা করিতেন এবং কাচের সুবৃহৎ চৌবাচ্ছায় লালমাছ, বহুপুচ্ছ মাছ, রুই কাতলা, কুম্ভীর-শাবক প্রভৃতি ছোট বড় মৎস্য ও জলজীব পালন করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি, অক্সিজেন ও উপযুক্ত খাদ্য-সমবায়ে তাহাদের জীবনগতি—বৃদ্ধি, পুষ্টি, বংশরক্ষা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীব-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন। নীরব কর্ম্মী ছিলেন বলিয়া মহাভারতের অনুবাদক তাঁহার পিতার ন্যায় তিনি সমগ্র দেশে তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার একমাত্র পুত্র "বড় বাবু" ও অন্যান্য স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মিলন-তিথি

শ্রীনবগোপাল দাস, আই-সি-এস্

বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদাসভাবে রেবা বৈশাখী ঝড়ের রুদ্র-লীলা দেখ্ছিল।

কালবৈশাখীর হুঙ্কারে তার মনের পটে শুধু একটি দিনের কথা ভেসে উঠ্ছিল, যেদিন তার প্রথম দেখা হয় স্বামী নিখিলের সাথে।

তখন কল্‌কাতায় সে, দাদা কমলেশ, আর মা-বাবা ছোট্ট একটি বাসায় থাকৃত। কলেজের পড়া শেষ না ক'রেই সে ঘরের কোণে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, কারণ, কি-জানি-কেন সেখানকার আড়ষ্ট আব্‌হাওয়ার সাথে সে তার স্বচ্ছ-সরল ভাবুক প্রকৃতির খাপ খাইয়ে ওঠাতে পারেনি। বাড়ীতে এসে নিজের মনে যা-খুসী-তাই পড়্‌বার এবং ভাব্‌বার অবসর পেয়ে সে হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লে।

বাবা সেকেলে লোক হ'লেও তাঁর চিন্তাধারা ছিল একেলে তরুণদেরই মতো। অভিজ্ঞতা এবং বয়সের দোহাই না দিয়ে সব জিনিষই তিনি বিচার করতে বল্‌তেন নিজের বুদ্ধি আর অনুভূতি দিয়ে। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কেউ কেউ বল্‌তেন, কিন্তু এ-ভাবে ছেড়ে দিলে ছেলেমেয়েরা শিখ্‌বে কি ক'রে' ?···তিনি একটু হেসে জবাব দিতেন, নিজে ঠেকে শেখার মতো বড়ো শিক্ষা আর হয় না হে, বিপিন !

বিপিনবাবু প্রতিবাদ ক'রে বল্‌তেন, আমাদের মুনি-ঋষিরা যা' বলে গিয়েছেন সে পথে চলাটা কি মূর্খতার কাজ হবে ?

রেবার বাবা নলিনবাবু তেম্‌নি হেসে জবাব দিতেন, কিন্তু আমাদের মুনি-ঋষিরা কি ব'লে যান্‌নি "প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে পুত্রম্‌ মিত্রবদাচরেৎ" ?

এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে এসে রেবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিল। কলেজের বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে তার মন শান্তি আর তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল। দাদা কমলেশের বন্ধুবান্ধব অনেকেই তার পড়ার ঘরে আড্ডা জমাত এবং চা' ও তাসের সদ্ব্যবহার সেখানে বেশ ভালোরকমই হ'ত। রেবাকে মাঝে মাঝে দাদার ফরমায়েস্ খাট্‌তে হ'ত—এবং অনেক সময় সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাদার ও বন্ধুদের তর্কের ফোয়ারার স্বাদ গ্রহণ করৃত। কথায় যোগ দেওয়াটা সে বিশেষ পছন্দ কর্‌তনা, তাই কমলেশ মাঝে মাঝে তাকে লক্ষ্য করে বল্‌ত, ও আমাদের নীরব সমালোচক···

এক বৈশাখী সন্ধ্যায় এম্‌নিভাবে নিখিলের সাথে রেবার প্রথম দেখা হয়। সেদিন ছিল ঝড়ের মাতামাতি, আর মেঘলা দিনের আকুলতা। বাড়ীতে কেউ ছিলনা, বাবা-মা দু'জনেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন, আর

কমলেশ গিয়েছিল য়ুনিভার্সিটিতে তার ক্লাশ করতে। রেবা একটা কবিতার বই কোলে নিয়ে চুপটি করে নটরাজের প্রলয়নৃত্য দেখ্‌ছিল।

হঠাৎ নীচের ঘর থেকে তার দাদার ডাক শোনা গেল, রেবা···ও রেবা···

রেবা শশব্যস্তে কবিতার বইখানা আঙুলের মধ্যে ধরেই নীচে নেমে এল। দেখ্‌লে, কমলেশ এবং তার একটি বন্ধু জলে ভিজে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে।

বন্ধুটি নিখিল ; এর আগে এ কখনও রেবাদের বাসায় আসেনি'।

কমলেশ বল্‌লে, আমাদের দুটো শুক্‌নো কাপড় এনে দেনা, দিদি! ··বোশেখি ঝড়ের জ্বালায় মারা গেলাম আর কি ·

নিখিল একটুখানি প্রতিবাদের সুরে বল্‌লে, জলে ভেজার সুখটুকু ত তুমি বুঝ্‌তে পারো না ; তাই অমন বল্‌ছ ··এই রুদ্র হাওয়ার চঞ্চলতা যে কতোখানি মিষ্টি তা' তোমার মত বেরসিক কেমন ক'রে বুঝ্‌বে বলো ?

এই বলেই নিখিল হাসিমুখে রেবার দিকে একবার তাকালে।

কি-জানি-কেন হঠাৎ রেবার মুখচোখ সিঁদুর-রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি কাপড় আন্‌বার জন্য উপরে ছুটে গেল।

রাত আটটা অবধি ঝড় থাম্‌লনা ; নিখিল কমলেশের ঘরে বসে আজগুবি সব গল্প আর কাহিনী ব'লে সময়টা কাটিয়ে দিলে। রেবা চুপটি ক'রে সব কথা শুন্‌লে।

রাত্রিতে যখন সে শুতে গেল তখন সে দেখ্‌লে একটি বৈশাখী-ঝড়ের সন্ধ্যা তার মনটিকে অনেকখানি ওলট-পালট ক'রে দিয়ে গেছে। কবিতার বইএর ছন্দ তার কাছে নৃত্যভঙ্গীতে বেজে উঠ্‌ল, গানের অর্থ তার কাছে সহজ ও সরল হ'য়ে এল।

মাসচারেক পরে এক রাত্রিতে সানাইয়ের সুরে তাদের বিয়ের শুভদৃষ্টি হ'লো।

আজও রেবা বাইরের দিকে তাকিয়ে সেই সন্ধ্যাটির কথাই ভাব্‌ছিল। ঘড়িতে তখনও বেলা দুপুর, কিন্তু কালো মেঘের মাতামাতিতে মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।···ক্লান্তিভরা কোন্ বেদনার মায়ায় বিভোর হয়ে সে কত কী ভাব্‌ছিল।

স্বামী নিখিল বেলা দশটায় চারটি ভাত খেয়েই বেরিয়ে গেছে চাকুরীর উমেদারী করতে। নিখিলের ছাত্রজীবনের সেই অখণ্ড অবসর এবং তার চেয়েও বেশী অখণ্ড প্রফুল্লতার মাঝে একটুখানি বিষাদের ছায়া এসে পড়েছিল। সকালে ও সন্ধ্যায় প্রাইভেট্ টুইশানি ক'রে সে যে কটা টাকা পেত নিপুণা গৃহকর্ত্রী রেবা তা' দিয়েই সংসার গুছিয়ে নিত, কিন্তু ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা যখন তাদের মনের কোণে উঁকি মার্‌ত, তখন যেন সব শৃঙ্খলা এবং আনন্দ এলোমেলো হয়ে আস্‌ত।

রেবা চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে এ-সব কথাই ভাব্‌ছিল এমন সময় পেছন দিক্ থেকে কে এসে হঠাৎ তাকে বাহুপাশের নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেল্‌লে! একটুখানি ত্রস্ত হয়ে রেবা পেছন ফিরে দেখ্‌লে, স্বামী নিখিল ; হাসিভরা মুখ, চুলগুলো উস্কখুস্ক, চোখের কোণে প্রীতির উৎস।

রেবা প্রশ্ন কর্‌লে, সফল হলো ?

নিখিল তেম্‌নি হাসিমুখে জবাব দিলে, না··· কোন্ দিন হয়েছে ব'লো!

রেবা বল্‌লে, তা হ'লে মন আজ এত খুসীতে ভরা যে!

নিখিল জবাব দিলে, এই বোশেখি ঝড়ে একটি দিনের কথা মনে পড়ে গেল ; সব দুঃখ, হতাশা সেই ঝঞ্ঝায় কোথায় যেন উড়ে চলে গেছে!

ওঃ হরি! নিখিলও সেই দিনটির কথাই ভাব্‌ছিল! প্রেমপূর্ণ চক্ষে রেবা নিখিলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, এ-রকম কবিতা গড়্‌লেই হয়েছে আর কি! কবিতাতে ত আর পেটের ভাত জুট্‌বেনা!

নিখিল তার গালদুটি টিপে দিয়ে বল্‌লে, নাই বা জুট্‌ল!···যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের ক্ষিদে মিট্‌ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পেটের ক্ষিদের কথা ভাব্‌তে কে চায় ?

—কিন্তু আমার যদি মনের ক্ষিদের তৃপ্তিতেই সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হয় ?

নিখিল এর কোন জবাব না দিয়ে রেবার ঠোঁট দুটি

নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে তার উপর চুম্বনরেখা এঁকে দিয়ে বল্‌লে, এতেও যদি তোমার তৃপ্তি না হয়, রেবা, তা হ'লে স্বয়ং ভগবান্ এসেও তোমার ক্ষিদের খোরাক জোগাতে পার্‌বেননা!

রেবা কোন কথা না ব'লে নিখিলের কাঁধের উপর নিজের মাথাটি রেখে চুপ ক'রে রইলে।

খানিকক্ষণ পরে বল্‌লে, ওগো···

—কী?

—আমাদের সেই মিলন-সন্ধ্যাটির আজ একটা উৎসব ক'রো না!

রেবার প্রস্তাবের নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে নিখিল বল্‌লে, তুমি সত্যিই কবিতার রাণী, রেবা!···আমার মাথায় এমন একটা আইডিয়া একেবারেই ঢোকেনি!

একটুখানি তর্জ্জন ক'রে রেবা বল্‌লে, ওইখানেই মেয়েদের বাহাদুরী গো! তোমরা একটা জিনিষ ভাব্‌তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দাও, আর আমাদের কাছে তার সুর বিদ্যুতের ঝিলিকে ভেসে আসে!

নিখিল মাথা নেড়ে পরাজয় স্বীকার করলে।

ঘরে এসে দু'জনে আলোচনা আরম্ভ কর্‌লে কি ক'রে মিলন-তিথির উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মধুর ক'রে তোলা যায়। নিখিল যত সব আজগুবি কথা বলে রেবা হেসে লুটিয়েই পড়ে। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিখিল বল্‌লে, আমার বুদ্ধিতে কিছুতেই কুলোচ্ছেনা, তুমি যা হয় ক'রো···

এবার রেবা গম্ভীরভাবে তার প্রস্তাব আরম্ভ করলে! বল্‌লে, সেই সন্ধ্যাটিকে ফিরিয়ে আন্‌তে হ'লে আমাদেরও যে সেই সন্ধ্যাটিতে ফিরে যেতে হবে!

নিখিল হেঁয়ালি বুঝ্‌তে না পেরে বল্‌লে, সে কী ক'রে সম্ভব হ'বে?

—হবে গো, হবে। তোমার সে সময়কার ফটো আছে ত?

—আছে, কিন্তু ঠিক সেদিনকার ত নয়, তার মাস তিন চার আগেকার। আর, সে ফটো বড্ড বিশ্রী দেখ্‌তে!

রেবা তখন বল্‌লে, আমার ফটোও একখানা চাই যে!

—আছে ত?

—আছে বোধ হয়, খুঁজে দেখ্‌তে হ'বে!

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দু'জনের পুরাণো দু'খানা ফটো পাওয়া গেল। অযত্নে রাখার ফলে দাগ ধরে গেছে, কিন্তু রেবা তা'ই ঝেড়েমুছে নিলে।

নিখিল প্রশ্ন কর্‌লে, আর কী চাই গো?

রেবা বল্‌লে, র'সো···এখন ভাব্‌তে হবে।

খানিকক্ষণ পরে বল্‌লে, ধূপকাঠি, ফুল আর কিছু চন্দন···আর যদি পাও, রঙীন মোমের বাতি গোটা-কয়েক।

নিখিল বল্‌লে, কিন্তু উৎসব কি হ'বে একেবারে শুক্‌নো মুখে, রেবা?

রেবা তার উৎসবের জন্য সৌন্দর্য্যের উপকরণগুলো ভাব্‌তে এতখানি ব্যস্ত ছিল যে এ দিক্‌টা তার মনেই ছিলনা! নিখিলের প্রস্তাবে সে একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম গো!···দু' একজন বন্ধুবান্ধবকে আস্‌তে বল্‌বে?

—তাই ভাব্‌ছি।

—ভাব্‌বে আবার কি?···সৌরীন্‌বাবু, কালীপদবাবু এদের নেমন্তন্ন ক'রে এসোনা!

—কিন্তু আমাদের মিলন-তিথির এই উৎসবটিতে এত সব বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন কর্‌লে যে আমাদের আনন্দটুকু মাঝখান থেকে উবে যায়!

নিখিলের এই ছেলেমানুষী স্বার্থপরতায় তর্জ্জন ক'রে রেবা বল্‌লে, ছিঃ—আমাদের আনন্দ যদি সবাইকে নিয়ে উপভোগ কর্‌তে না পার্‌লাম তাহ'লে এর সম্পূর্ণতা আস্‌বে কোত্থেকে?

অবশেষে নিখিল রেবার তৈরী করা লিষ্ট নিয়ে জিনিষ-পত্র কিন্‌তে ও বন্ধুদের নেমন্তন্ন কর্‌তে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টা আড়াই পর যখন সে ফির্‌ল তখন রেবা তাদের শোবার ঘরটিকে একেবারে নূতন ক'রে সাজিয়ে তুলেছে। নতুন চাদর, নতুন আসন প্রভৃতি বার ক'রে, সে ঘরটির অপরূপ এক শ্রী ক'রে তুলেছে।

নিখিল মুগ্ধভাবে রেবার তৎপরতা ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধির বিকাশ লক্ষ্য কর্‌ছিল।

হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল বিছানার পাশে। একটি চৌকীকে বেদীর মত সাজানো হয়েছে, তার উপর দু'খানা ছবি, তার এবং রেবার।

নিখিল হেসে বল্‌লে, বেশ ছেলেমানুষী হচ্ছে কিন্তু যা' হোক্!

রেবা নিখিলের কথায় রাগ করলে; বল্‌লে, পুরুষমানুষদের কাছে ছেলেমানুষী হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের মেয়েদের কাছে আজকের দিনটি বড়ো মধুর ও পবিত্র গো!

নিখিল ক্ষমা-ভিক্ষার সুরে, অথচ যেন একটু আহত হয়েছে এম্‌নিভাবে, বল্‌লে, ঐ ত তোমাদের দোষ, একটুখানি কথা বল্‌লেই তোমাদের চোখ জলে ভরে আসে!

রেবা বিদ্যুতের মত একঝিলিক হাসি হেসে বল্‌লে, আর তোমাদের স্বভাবই এই যে তোমরা জোর ক'রে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমা আদায় করবে! মাগো! একেই বলে বুঝি পৌরুষ?

নিখিল দু'বাহু দিয়ে রেবাকে জড়িয়ে ধরলে। রেবা আদরের সুরে বল্‌লে, এই ছেলেমানুষীকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারা যায় জীবন ততই মধুময় হ'য়ে উঠ্‌বে, নয় কি গো?

নিখিল সায় না দিয়ে পারলেনা। তার মনের মধ্যেও তখন ছেলেমানুষীর বন্যা এসেছে। রেবার আনন্দোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সে তার সব দুশ্চিন্তা ভুলে গিয়েছিল।

খানিকক্ষণ চুপটি ক'রে থেকে হঠাৎ যেন কী মনে পড়্‌ল এম্‌নিভাবে আত্মস্থ হ'য়ে রেবা নিখিলের বাহুপাশ থেকে নিজকে মুক্ত ক'রে বল্‌লে, এম্‌নিধারা দাঁড়িয়ে থাক্‌লে ত কাজ এগোবেনা; অতিথিদের জন্য খাবার তৈরী করতে হ'বে যে!

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন নেমে আস্‌ছে তখন রেবা স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, জানো, চান্ করতে করতে আমি কী ভাব্‌ছিলাম?

—কী?

—ভাব্‌ছিলাম, আজকের এই উৎসব, একে কী ক'রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ করা যায়! কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হচ্ছেনা, মনে হচ্ছে বুঝি বা কিছু ফাঁক রয়ে গেল!

নিখিল হেসে বল্‌লে, একটি নবীন অতিথির অভাব মনে উঠ্‌ছে বুঝি?

সরমে রাঙা হয়ে রেবা বল্‌লে, যাঃ-ও···

নিখিল তেম্‌নি হেসে বল্‌লে, এতে আর লজ্জার কী আছে? হয়ত বা আস্‌ছে বছর তোমার ফাঁক পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে!

রেবা তাড়াতাড়ি নিখিলের মুখ নিজের ডান হাত দিয়ে বন্ধ ক'রে বল্‌লে, বারবার এ-সব কথা বল্‌লে আমি ভয়ানক রাগ করব কিন্তু···

তার পর আস্তে আস্তে বল্‌লে, না, সত্যি বল্‌ছি গো, আমার তৃপ্তি কেন যেন কিছুতেই হচ্ছেনা!

নিখিল মুখ থেকে রেবার হাত সরিয়ে নিয়ে সেই-রকম দুষ্টুমিভরা চোখে বল্‌লে, আসল কথা কি জানো? তোমার রাঙা ঠোঁটদুটো এখন আমার কালো ঠোঁট-দুটোর স্পর্শ পাবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে···তাই এ স্বস্তিহীন আকুলতা!

রেবা এবার সত্যি সত্যি রাগ ক'রে নিখিলের কাছ থেকে সরে গেল। বেদীটাকে ভালো ক'রে সাজানোর দিকে সে মন দিলে। নিখিল তাকে সাহায্য করবার অজুহাতে তার পাশে গিয়ে বস্‌লে।

ফুল আর চন্দন দিয়ে বেদীটা সাজানোর পর রেবা যখন উঠ্‌ল তখন ঘরটা সৌরভে ভরে গিয়েছে। ধূপকাঠি কয়েকটা জ্বেলে দিয়ে রেবা বল্‌লে, এবার আমাদের বেশভূষা একটু ভদ্রগোছের ক'রে নিই, কি বল?··· তোমার বন্ধুরা ত এখ্‌খুনি আস্‌বেন!

নিখিল হেসে জবাব দিলে, আমার ত আর কিছু করতে হ'বেনা, তুমিই ঠিক হ'য়ে নাও! দেখো, তোমাদের মামুলীভাব মত দেরী ক'রো না যেন!

রেবা একটু কোপপূর্ণ কটাক্ষ ক'রে হেসে পাশের ঘরে চলে গেল।

বেশভূষা শেষ ক'রে রেবা যখন তৈরী হ'য়ে ফিরে এল তখন তার চেহারা অনির্ব্বচনীয় হয়ে উঠেছে। অলকে তার শুভ্র ফুলের মালা, পরনে গোলাপী রংএর শাড়ী···তাকে দেখাচ্ছিল যেন বনযূথিকার মত। নিখিল মুগ্ধ নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ফিক্ ক'রে একটু হেসে রেবা বল্‌লে, অমন তাকিয়ে কাকে দেখ্‌ছ, আমাকে না আমার সজ্জাকে ?

তেম্‌নি বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থেকে নিখিল বল্‌লে, তোমার সজ্জা যে তোমার কবিতা-মাধুরীকে ফুটিয়ে তুলেছে, রেবা !

এমন সময় নিখিলের বন্ধু সৌরীন্ এসে হাজির হ'লো। একটুখানি হেসে বল্‌লে, আপনাদের মিলন-তিথির কল্লোলের সুর নীচে থেকেই পাচ্ছিলাম।

লজ্জায় রাঙা হয়ে রেবা চুপ ক'রে রইলে। নিখিল হেসে বল্‌লে, তাই ত রেবার খেয়াল চাপ্‌ল কল্লোলটাকে স্মরণীয় ক'রে তুল্‌তে !

সৌরীন্ রেবার পক্ষ নিয়ে বল্‌লে, এ নিখিলের ভয়ানক অন্যায় কিন্তু, বৌদি ! ওর মন যে কতখানি রঙীন্ নেশায় ভরা সে আপনি খুব ভালো ক'রেই জানেন, অথচ সব দোষ ও চাপাচ্ছে আপনারই ঘাড়ে !

রেবা হেসে বল্‌লে, চাপিয়ে যদি উনি সুখ পান তাহ'লে আমি ওঁর সুখের পথে বাধা দিতে যাব কেন ?

হো হো ক'রে হেসে সৌরীন্ বল্‌লে, ঐখানেই ত আপনাদের দোষ, বৌদি ! আপনারা এত সহজেই নিজেকে মুছে ফেলেন বলেই ত নিখিলের মত ছেলেরা আপনাদের মাথায় চড়ে !

নিখিল সৌরীনের পিঠে মৃদু একটু চাপড় দিয়ে বল্‌লে, আর বৌদির পক্ষে ওকালতী কর্‌তে হ'বেনা···

একটু পরে কালীপদও এসে হাজির হ'ল। তিন বন্ধুতে বসে তখন যা-খুসী-তাই গল্পের ফোয়ারা ছুট্‌ল। রেবাও তার মাঝে যোগ দিলে।

কালীপদ আর সৌরীন্ যাকে বলে পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে বসেছিল। কলেজ তারা অনেকদিন ছেড়েছিল এবং বাঙালীর যা' গতি সেই কেরাণীগিরি অবলম্বন ক'রে তাদের সংসারযাত্রা সুরু করেছিল। তাদের কাছে নিখিল-রেবার এই ছেলেমানুষী-উৎসব এক নতুন বৈচিত্র্য-ভরা ; ঠিক যেন এর মধ্যে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পার্‌ছিলনা।

রেবা মাঝে মাঝে দু'একটি কথা বল্‌ছিল, আর প্রতিবাদের প্রতীক্ষায় নিখিলের দিকে তাকাচ্ছিল। নিখিলের মাথায় তখন দুষ্টুবুদ্ধি চেপেছে, সে প্রতিবাদের স্থলে সায় দিয়ে এবং সায় দেবার স্থলে প্রতিবাদ ক'রে রেবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌ছিল। রেবা অবশ্য নিখিলের এই দুরন্তপনা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছিল, তাই মুখে মাঝে মাঝে অসন্তোষের ভঙ্গী কর্‌লেও মনে মনে সে ভয়ানক আমোদ অনুভব কর্‌ছিল।

কালীপদ বল্‌ছিল, কিন্তু, বৌদি, এরকম কবিত্ব নিয়ে ত সংসার করা চলেনা।

রেবা জবাব দিলে, আমরা ত কবিত্ব কর্‌ছিনে, কালীপদবাবু। আমাদের জীবনের একটা পুণ্য মুহূর্ত্তকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি মাত্র। এটা হচ্ছে আমাদের বড়ো আনন্দ ও মাধুর্য্যের মুহূর্ত্ত, তাই আমাদের আনন্দ আমরা সবার সাথে মিশে উপভোগ কর্‌বার জন্য আপনাদের ডেকেছি।

সৌরীনের মনে তখনও ছাত্রজীবনের তারুণ্যটুকু লোপ পায়নি'। সে রেবার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লে, তাই ত নিখিলের ডাকে আজ ছুটে চলে এসেছি, বৌদি ! বাড়ীতে ছেলেটার গা গরম হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হ'ল এরকম নতুনত্বের স্বাদ আর বোধ হয় পাবনা, তাই খানিকটা নিষ্ঠুর হ'লেও একলা ছুটে চলে এসেছি।

নিখিল বল্‌লে, সত্যি যদি আমায় স্বীকার কর্‌তে হয়, কালীপদ, তা হ'লে আমায় বল্‌তেই হ'বে যে জীবনের মাধুর্য্য যা কিছু তা' শুধু মেয়েরাই বাঁচিয়ে রাখে। আমরা ছেলেরা শীগ্‌গীরই বুড়িয়ে যাই, কিন্তু তরুণীদের মনের তারুণ্য বহুদিন অটুট থাকে বোধ হয়।

নিখিলের এই কথায় হঠাৎ রেবার মনে পড়ে গেল, অতিথিদের ঠিকমত অভ্যর্থনা করা হয়নি'। সে উঠে বল্‌লে, এবার আমার হাতে একটুখানি অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হ'বে কিন্তু আপনাদের।

রেবার মাথায় আবার কী প্ল্যান্ আছে বুঝ্‌তে না

পেরে নিখিল বল্লে, তুমি আবার কী কর্তে যাচ্ছ, রেবা ?

—সবুর করো, দেখ্তে পাবে।

হাতে একটি সাজিতে গুটিকয়েক ছোট্ট ফুলের তোড়া এবং চন্দনের বাটি নিয়ে এসে রেবা বল্লে, রাগ কর্তে পার্বেননা কিন্তু···

কালীপদ ব্যাপারটা ঠিক বুঝ্তে পারেনি', কিন্তু সৌরীন্ খানিকটা আঁচ ক'রে নিয়েছিল। আর নিখিল রেবার কবিত্বজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

ডান হাতের ছোট্ট আঙুলটি চন্দনের বাটিতে ডুবিয়ে নিয়ে রেবা বল্লে, এবার আপনাদের কপালগুলো এগিয়ে নিয়ে আসুন···

মন্ত্রমুগ্ধের মত কালীপদ আর সৌরীন্ রেবার চাঁপার কলির মত আঙুলে চন্দনের ফোঁটা পর্লে। রেবা তাদের হাতে একটি ক'রে ফুলের তোড়া দিয়ে নমস্কার কর্লে। তারাও তাকে প্রতি-নমস্কার জানালে।

এবার নিখিলের পালা। রেবা কাছে এসে অস্ফুট-স্বরে বল্লে, এবার তুমি আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দাও।

নিখিল হেসে তার হাতটি ধরে তার শুভ্র ললাটে চন্দনের রেখা এঁকে দিলে। তার পর নিজের কপালটি এগিয়ে দিলে রেবার জন্য।

উৎসবের শেষ হ'ল কিছু জলযোগের পর। রাত প্রায় দশটার সময় সৌরীন্ ও কালীপদ যখন এই আনন্দ-আবেশবিহ্বল দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিলে তখন তাদের মনও এক নতুন রসে ভরে গিয়েছে। সৌরীন্ ত বিহ্বল হয়ে রেবার হাত ধরে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেই ফেল্লে, আজ্কে যে অমৃতের সন্ধান আপনি দিলেন, বৌদি, তার জন্য আমি আপনার চিরদিনের কেনা হ'য়ে রইলাম্।

কালীপদ নমস্কার কর্তে কর্তে বল্লে, আমার নেহাৎ গদ্যময় প্রকৃতির মধ্যেও আপনি আজ একটু চাঞ্চল্যের ধারা এনে দিলেন, বৌদি !

বন্ধুদের বিদায় ক'রে দিয়ে উপরে এসে নিখিল দেখে, রেবা চুপটি ক'রে বেদীর সাম্নে বসে আছে, আর তাদের ফটোদুটির দিকে তাকিয়ে আছে।

নিখিল এসে রেবার ডান পাশে বস্ল। বল্লে কী ভাব্ছ ?

রেবা রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যার মত তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে রয়েছিল, নিখিলের কথার আলোর সোণার কাঠিতে জেগে জবাব দিলে, ভাবছি আমাদের সেই মিলন-সন্ধ্যাটির কথা !···যেদিন তোমার সাথে আমার অম্নি অজানতে দেখা হ'লে সেদিন কি আর ভেবেছিলাম চিরমিলনের বাঁশী সত্যিসত্যিই বেজে উঠ্বে, আর এম্নি ক'রে আজ আমরা সেই তিথিটির উৎসব কর্ব !

নিখিল রেবার মাথাটি নিজের বুকের উপর নিয়ে বল্লে, বাঁশী যখন বাজ্বার হয় তখন এম্নি অজানতেই বেজে ওঠে, রেবা···আর এই চুপিচুপি অজানতে বেজে ওঠে বলেই ত তার মাধুর্য্য এত বেশী !

রেবা নিখিলের কথাগুলি নিবিড়ভাবে বুঝ্বার চেষ্টা কর্ছিল···নিখিলের কথার প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে তার চিত্তবীণায় সাড়া দিচ্ছিল।

খানিকক্ষণ পরে নিখিল আবার বল্লে, তোমাকে আজ আমার এত ভালোবাস্তে ইচ্ছে হচ্ছে রেবা ! সবচেয়ে মধুর লেগেছে তোমার এই আইডিয়াটি যে তুমি বিয়ের শুভদৃষ্টির চেয়েও আমাদের সেই প্রথম দেখার শুভদৃষ্টির দাম দিয়েছ বেশী···

—কেন দেবনা বল ? সেই সন্ধ্যাটিতেই ত আমার দেহমনের রন্ধ্রেরন্ধ্রে প্রথম বীণা বেজে উঠেছিল। বিয়ের শুভদৃষ্টি ত' সেই সুরেরই একটা অধ্যায় মাত্র।

—যদি সেই অধ্যায়টি এম্নিভাবে না আস্ত ?

গভীর বিশ্বাসের সুরে রেবা জবাব দিলে, আস্তেই হ'ত।···আমার তপস্যা, আমার কামনা সবই কি বিফল হ'য়ে যেত মনে করো ?

নিখিল তার উচ্ছ্বসিত বিশ্বাস ও নীরব অনুভূতির কাছে মনের প্রণতি জানালে। পরে ধীরে ধীরে বল্লে, কিন্তু তুমি ত নিজেই জান, কত জায়গায় বিফল হয়ে যায় !

এবার একটু বিপদের সুরে রেবা বল্লে, জানি…। কিন্তু বীণার প্রথম ঝঙ্কারটি যদি সত্য হ'য়ে থাকে তা হ'লে তা লোপ পায়না। সংসারের সব জিনিষের মধ্যেই সেই ঝঙ্কারটির সুর এসে লাগে। মাঝে মাঝে হয়ত তা' বেসুর ঠেকে, কিন্তু সে দোষ ঝঙ্কারের নয়, ঝঙ্কারের সাথে তাল রাখ্তে পারেনা এই সংসারের।

নিখিল নিবিড়ভাবে রেবাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, আমাদের ঝঙ্কারটিকে আমরা বছর বছর এম্নি ক'রে বাঁচিয়ে রাখ্ব, রেবা, কি বলো ?

রেবা একটু চিন্তিতস্বরে বল্লে, চেষ্টা করব। কিন্তু কি জানি কেন ভয় হয় সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে এর মূর্চ্ছনাও ধীরে ধীরে দুর্ব্বল হ'য়ে আস্বে !

এর পরের বছরও তারা তেম্নি আনন্দ-ভরা মনে তাদের মিলন-তিথির উৎসব করলে। নিখিল ততদিনে তার উমেদারী ছেড়ে চাকুরীতে বহাল হয়েছিল, তাদের অভাব-অনাটনও অনেকখানি কমে এসেছিল।

উৎসব-সন্ধ্যায় এবারও বন্ধুদের আহ্বান করা হ'লো। নিখিলের বন্ধুর সংখ্যাও বেড়েছিল, কাজেই কোলাহল প্রথমবারের চেয়ে বেশীই হ'লো।

ফটো দু'খানির দু'খানা ভালো এন্লার্জমেণ্ট্ করানো হয়েছিল। বড় হলঘরে সুন্দর একটি বেদীর উপর বাঁধানো এন্লার্জমেণ্ট্ দু'খানা তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল প্রথমবারের সেই হঠাৎ-খুঁজে-পাওয়া যেমন-তেমন ছবি দু'খানা নিয়ে হাসির রোল আর কৌতুকের প্রস্রবণের কথা। ফুলের সৌরভ, চন্দন-কুঙ্কুমের গন্ধে সমস্ত হলঘরটি এবার পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

অতিথিদের বিদায়ের পর রেখা আর নিখিল যখন একত্র হলো তখন দু'জনে অবাক্ হয়ে দেখ্লে, তাদের মধ্যে কী যেন নেই…প্রথম উৎসব-তিথির সেই বিমল আনন্দ যেন আর তেমন পূর্ণমাত্রায় ফিরে আস্ছেনা !

তৃতীয় বৎসরে তাদের ঘরে নূতন অতিথির আগমন হল। এই অতিথির কথা উল্লেখ ক'রেই প্রথম উৎসবের দিনে নিখিল রেবার সাথে কৌতুক করেছিল। তৃতীয় বৎসরের উৎসব আরও জম্কালো, আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'লো…আর নবীন অতিথির হাসিকান্নার রোল এক নতুনত্বের সৃষ্টি করলে। কিন্তু এবারও তারা দেখ্লে, প্রথম বছরের আনন্দটুকু যেন তেমনিভাবে ফিরে পেলেনা !

তবু তারা বছরের পর বছর সেই সন্ধ্যাটির উৎসব ক'রে যায়…দুটি মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রতীক যে এই উৎসব ! স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখ্তে হ'লে, তার মাধুর্য্যকে সজীব রাখ্তে হ'লে বাহিরের একটা পোষাক দরকার… তাই না ওই উৎসব !

কিন্তু প্রথম মিলন-তিথির সেই পূর্ণতাটুকু আর আসেনা ! হারানো সুরের প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে মরে, কিন্তু তার রাগিনীতে দীপ্ত শিখা আর তেম্নি ক'রে জ্বলেনা !

প্রথম মিলন-তিথিতেও অপূর্ণতার একটা ভাব ছিল, কিন্তু তার উৎস ছিল পূর্ণতায়। তার পর যে অপূর্ণতা এল তা' শূন্যতারই নামান্তর…সে হ'ল কোন এক মধুর অভাব।

কী সে মধু ?—নিখিল রেবাকে প্রশ্ন করে, রেবা জবাব দিতে পারেনা, অশ্রুসজল চোখে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

কী সে মধু ?—প্রথম উৎসব-তিথিতে কি সত্যি সত্যিই তাদের মিলন-সন্ধ্যাটি ফিরে এসেছিল ? তাই কি তার মাধুর্য্য এবং পূর্ণতা সুর ছাপিয়ে উঠেছিল ?—না, অনুভূতির ধর্ম্মই এই ? দূরত্ব যতই আসে অনুভূতি ততই শিথিল হ'য়ে আসে ?

বাঙ্গালা কবিতায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

মিল্‌টন্‌ তাঁহার অমর কাব্য Paradise Lostএর ভূমিকায় মিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন,...rime being no necessary adjunct or true ornament of poem or good verse, in longer works specially, but the invention of a barbarous age, to set off wretched matter and lame metre...। ক্রমে পরবর্ত্তী শক্তিমান লেখকদিগের হস্ত স্পর্শে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পমার্জ্জিত হইলেও কবিতা যে আদিম-বর্ব্বর জাতির সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি সেই বিষয়ে অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। সেই জন্যই কোন কোন শক্তিমান লেখক তাহাদের কাব্য-সৃষ্টিতে এই মিত্রাক্ষর ছন্দকে অস্বীকার করিয়াই সার্থক সাহিত্য-রচনা করিতে পারিয়াছেন। এলিজাবেথীয় সাহিত্যের যুগ হইতেই ইংলণ্ডে নাট্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে ইতালীয় ও স্পেন দেশীয় বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্য রচনায় ইহা নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ইংলণ্ডই সর্ব্বশেষ এই প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল; এবং মাত্র খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিল্‌টনের পরবর্ত্তী কাল হইতেই ইহা দৃঢ়রূপে সেই দেশের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন কি ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ যখন সম্পূর্ণ পরিচিত হইয়াই ছিল, তখনও ইংলণ্ডে এই ছন্দ-প্রথা অনুকরণ কালে মিল্‌টন্‌কে তাহার প্রথম এতচ্ছন্দ-রচিত কাব্যের মুখপত্রে এই ছন্দ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর গৌরচন্দ্রিকা করিয়া লইতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রসরুচির মূলে যাহাতে এই নব প্রবর্ত্তিত কাব্যরূপ রূঢ় ও আকস্মিক আঘাত না করিয়া বসে সেই জন্য মিল্‌টন্‌কে Paradise Lostএর ভূমিকায় দেশ বিদেশের সাহিত্য হইতে এবম্বিধ রীতিপ্রিয়তার দোহাই দিতে হইয়াছে, এবং মিত্রাক্ষরপ্রিয়তাকে গ্রাম্য-রুচি'র পরিচায়ক বলিয়া নিন্দা করিয়া লওয়া হইয়াছে। *

কিন্তু মিল্‌টন্‌কে ইংরেজিতে সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তক বলিলে ভুল করা হইবে। প্রাগ্‌-সেক্সপীয়র-যুগেই খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সারি অমিত্রাক্ষর ছন্দে একখানি কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেন। তার পর এলিজাবেথীয় যুগে মার্‌লো ও সেক্সপীয়র নাট্য-সাহিত্যে এই ছন্দ-প্রথাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও মিল্‌টন্‌ই ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে এই ছন্দরীতির সর্ব্বপ্রথম সার্থক স্রষ্টা।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্য এক নব জন্ম পরিগ্রহ করে। কেবল সাহিত্যই নহে—বাহ্যিক দূরাকাশের অভিনব বর্ণচ্ছটায় বাঙ্গালী অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপর সম্পর্কহীন এক অপূর্ব্ব আত্ম-চেতনা লাভ করে। তাহার ফলে যাহা কিছুই ছিল বিজাতীয় বিদেশীয় তাহাই একান্ত আপনার হইয়া আমাদের ভাব-মন্দিরের পূজামণ্ডপে আসিয়া স্থান লাভ করে। বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালীর এই মনোভাবগত বহির্মুখী জ্ঞান-সাধনায় যুগোচিত এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিলাভ; বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব-পরিণামের এক অভিনব সার্থক ফলসৃষ্টি।

মিল্‌টনের মত শক্তিমান লেখককেও কাব্যারম্ভে তাঁহার ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গৌরচন্দ্রিকা করিতে হইয়াছিল, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক মিলটনের কাব্যশিষ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকেও তাঁহার প্রথম এতচ্ছন্দ ব্যবহার সম্পর্কে তেমনি গৌরচন্দ্রিকা দ্বারা পাঠকের বদ্ধ-সংস্কার অপনোদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় তদানীন্তন সংস্কার-বদ্ধ সমাজ-পম্বলে যে একটি সূর্য্যমুখী পদ্ম ফুটিতেছিল তাহা মাইকেলের জীবন-চরিত * হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

---

* 'This neglect then of rime so little is to be taken for a defect, though it may seem so perhaps to vulgar readers, that it rather is to be esteemed an example set, the first in English, of ancient liberty recovered to heroic poem from the troublesome and modern bondage of riming."—মিল্‌টন্‌ কৃত Paradise Lostএর ভূমিকা

* শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

"মধুসূদন যে সময় তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় একদিন নাটক ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে কথা পড়িলে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্র-মোহনকে বলিলেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে ততদিন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশা নাই।......মহারাজা বলিলেন, বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিবেচনায় ইহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ফরাসী ভাষা আমাদের ভাষা হইতে উন্নত; কিন্তু আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে ইহাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কোন কাব্য নাই। মধুসূদন বলিলেন, সত্য, কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা; এরূপ জননীর সন্তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।" এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই মাইকেল তাঁহার "পদ্মাবতী" নাটকে সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিলেন। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এই আকস্মিক বৈচিত্র্য-সৃষ্টি প্রচলিত রস-সংস্কারের মূলে বিজাতীয়-ভাব প্রণোদিত নহে। ইহা যে আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের দূরদৃষ্টিতে শক্তিমান ছিল তাহা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম আত্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত তিলোত্তমা মহাকাব্যের উৎসর্গ-পত্র পাঠেই অনুমিত হইবে। মাইকেল লিখিতেছেন,

"......যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না, এরূপ পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশে—সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয় তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"

কিন্তু কবির এই স্থির আত্মবিশ্বাসের মূলে প্রচলিত সংস্কার আত্মাভিমানের সুর খুঁজিয়া বাহির করিল। তাই কবির প্রায় সমসাময়িক সমালোচক * লিখিলেন,

"আমাদের বোধ হয় ইনি এক নূতনরূপ কাণ্ড করিয়া উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ভবভূতির এই গর্ব্ববাক্য স্বয়ং প্রয়োগ করিবার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইংরেজির অনুকরণপ্রিয় আমাদের কৃতবিদ্য দলও মিল্‌টনের ছন্দের অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন।"

কিন্তু সেই কথা পরে বলিতেছি। বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্ব্বপ্রথম কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকই বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্ব্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশের ক্ষেত্র। ইহা'র পূর্ব্বে নাটুকে রামনারায়ণের লোকপ্রিয় নাটকগুলিতে মিত্রাক্ষরযুক্ত পয়ার এবং দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদীর ছন্দের কবিতাই ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী কালে যাহা গিরীশ ঘোষের নাটকীয় ছন্দ অথবা গৈরীশ ছন্দ বলিয়া পরিচিত হইল সেই ছন্দেই পদ্মাবতী নাটকে মাইকেল সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। গৈরীশ ছন্দ অমিত্রাক্ষর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তথাপি মাইকেলের এই ছন্দকে যে কেন অমিত্রাক্ষরই বলিলাম তাহাই বলিতেছি। যতিস্থলে চরণচ্ছেদই এই ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ। এই ছন্দেই মাইকেলের ভবিষ্যৎ অমিত্রাক্ষরের সূচনা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পদ্মাবতী নাটকের কলির স্বগতোক্তি হইতে আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যথা,—

"আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি' আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।"

এইভাবে প্রত্যেক যতিস্থলে চরণচ্ছেদ করিয়া করিয়া একখানি সমগ্র মহাকাব্য রচনা করিলেও অমিত্রাক্ষরের ছন্দসুরের কোন ব্যতিক্রম হয় না। তথাপি কাব্যদেহের

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

সংযম রক্ষার জন্য মাইকেলকে চৌদ্দ অক্ষরের পয়াররূপের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। উপরের উদ্ধৃত অংশ নিম্নলিখিত ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে—

আমি কলি | এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে |
শুনিয়া আমার নাম | সতত কুপথে
গতি মোর | নলিনীরে স্বজেন বিধাতা |
জলতলে বসি' আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।

মিল যতি ও ঝোঁকের নিয়মিত সংযম অস্বীকার করিলেও মিল্‌টন্ কাব্য-দেহের বাহ্য-রূপকে আঘাত করেন নাই। যথা,—

"Of man's first disobedience, and the fruit
Of that forbidden tree whose mortal taste
Brought death into the world, and all our woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful seat,
Sing, Heavenly Muse,.........

চরণচ্ছেদে যতি-স্থান অধিকতর সুস্পষ্ট হইলেও অমিত্রাক্ষরের অনিয়ম-বিন্যস্ত যতিও নির্ভুল আবৃত্তি-কালে চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ হইতেও আপনি কানে বাজিয়া উঠে। সেইজন্যই মাইকেল সর্ব্বপ্রথম গৈরীশ-ছন্দে অমিত্রাক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিয়াও তৎপর মুহূর্ত্তেই বাহ্যতঃ পয়ার-দেহকে অবলম্বন করিয়া একটা বিশিষ্ট ছন্দ-রূপের সংযম রক্ষা করিলেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ পূর্ব্বোক্ত যতি-সর্ব্বস্ব গৈরীশ-ছন্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। কিন্তু ইহাকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া ভুল করিয়া পরবর্ত্তী কালের একজন সমালোচক * বলিয়াছেন, "মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহই তাহা প্রথমে হুতোম পেঁচায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। হুতোমের উৎসর্গটি এইরূপ :"

বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
রহস্য রসে রঙ্গে চিত্রিনু চরিত্র,
দেবী সরস্বতী বরে। কৃপাচক্ষে হের
একবার; শেষে বিবেচনা মত যার—
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির গতি ('পাতি' ?)।"

কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহিত উদ্ধৃত অংশের বিলক্ষণ বৈষম্য লক্ষিত হইবে। প্রথমতঃ প্রত্যেক চরণে ইহাতে চৌদ্দ অক্ষরের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। তার পর ইহাতে গৈরীশছন্দানুরূপ প্রত্যেক যতি-স্থলেই যে চরণচ্ছেদ হইয়াছে এমনও নহে। অতএব কেবল মাত্র পদান্তে মিত্রাক্ষরের অভাব দেখিয়া উক্ত সমালোচক ইহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া ভুল করিয়াছেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বোদ্ধৃত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মাইকেলের কথোপকথন হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে মাইকেল তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন না। অতএব মাইকেলের পূর্ব্ববর্ত্তী কাহাকেও বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিলে ভুল করা হইবে।

পয়ার-প্লাবিত বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠকগণ সর্ব্বপ্রথম কি ভাবে গ্রহণ করিল তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। মাইকেল আত্মশক্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার আত্ম-বিশ্বাস নিরবধি কালস্রোত ও বিপুলা পৃথ্বীর একাংশে হইলেও কোন দিন না কোন দিন জয়ী হইবে, এই দূরদর্শিতার বশবর্ত্তী হইয়াই এই দুঃসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং অদূর-ভবিষ্যতে এই শুভদিন যে একদিন আসিবেই সেই বিষয়ে একান্ত বিশ্বাসী হইয়াই যেন তিনি লিখিলেন,—

"সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে মাইকেল কেবল তাঁহার সমসাময়িক পাঠকের জন্য এই ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন নাই। দূর ভবিষ্যতে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি মাইকেলের সমসাময়িক ও তাঁহার একান্ত

* রামগতি ন্যায়রত্ন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।"

গুণগ্রাহী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্য "তিলোত্তমা সম্ভবে"র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন,

...a Monument that marks a grand epoch in our literature, when Bengali poetry first broke thro' the fetters of rhyme....

কিন্তু এত প্রশংসার পরও রাজা যতীন্দ্রমোহন এই কাব্যের লোকপ্রিয়তা ও সাফল্যের জন্য ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া ছিলেন। তিনি উদ্ধৃতাংশের পরই আবার লিখিতেছেন,

"Time will come when the poem will meet with due appreciation and will find that high place in the estimation of posterity it so richly deserves."

তবে সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধারণ পাঠক ইহা কি ভাবে গ্রহণ করিল? একজন তৎকালীন সমালোচক* মাইকেলের পরবর্ত্তী কাব্য মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে বলিলেন,

"অমিত্রাক্ষর ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দল ভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদ বধের ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে···।

মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করিয়া ঢাকা প্রাণকুণ্ডা নিবাসী জগবন্ধু ভদ্র নামক জনৈক ব্যক্তি একখানি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ কাব্য প্রণয়ন

* রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পৃঃ ২৭৭

করেন। ইহাই সর্ব্বসাধারণের সুপরিচিত "ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য।" ব্যঙ্গকাব্য হিসাবে সারা বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করিতে গিয়া লেখক নিজের উত্তম কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এক মাইকেল ব্যতীত এমন শক্তিমান অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে এ পর্য্যন্তও আর কেহ লিখিতে পারেন নাই। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"দ্রুহিণ-রাহণ সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল বলে শকুন্ত দুর্জ্জয়
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি'
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর প্রহারে
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে। ইত্যাদি।

মাইকেলের প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে পরবর্ত্তী সময়ের মধ্যেও মাত্র এই একখানিই সার্থক কাব্য লিখিত হইয়াছিল। ইহার অপূর্ব্ব যতি-বিন্যাস-বৈচিত্র্য ও অনুপ্রাসবহুল সংযুক্ত বর্ণের ঝঙ্কারে ইহাকে ছন্দের দিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। লেখক তাঁহার শক্তির এই ভাবে অপচয় না করিয়া যদি মৌলিক কাব্য রচনায় এই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেন তবে মাইকেলের পরই বাঙ্গালা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের এত দ্রুত অধঃপতন ঘটিত না। একমাত্র শক্তিমান স্রষ্টার অভাবেই একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-রীতি বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে অচিরে লোপ পাইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত তিন বর্ণে মুদ্রিত বহু বর্ণের চিত্র শোভিত "আরব্য উপন্যাস"—৫৲
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রে "সেকালের কথা" প্রথম খণ্ড—২৷৹
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড—৩৷৹
সাংখ্য-যোগাচার্য্য শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত "ভাস্বতী"; বৈয়াসিক পাতঞ্জল ভাষ্য টীকা শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা বঙ্গভাষায় অনূদিত—১৲
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ প্রণীত "পরলোকের কথা"—২৲
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত গল্পের বই "বিধবার কথা"—২৲
শ্রীবিমল সেন প্রণীত ছোটদের গল্পের বই "গল্পের ছলে"—১৷৹
শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনকথা "হাজি মহম্মদ মহসীন"—৵৹
শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জ্ঞানচক্ষু"—৸৹
শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত উপন্যাস "স্মৃতি রেখা"—৷৹
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ প্রণীত "মার্কিণ সমাজ ও সমস্যা"—২৲
শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "যুগ-গুরু"—১৷৹
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রণীত "নারীহরণের প্রতিকার"—৷৹
শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন প্রণীত কাব্য "নব জ্যোতি"—১৷৹
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্যলহরী সিরিজের "রবার্ট ব্লেকের ফাঁসি" ও "মরা মানুষ জাল" প্রত্যেকখানি—৸৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
The Bharatvarsha Printing Works
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শ্রাবণ—১৩৪০

প্রথম খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ভারতের কারু-শিল্প

অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার

এখন দেশে শিল্প-কলার উপর যে একটা টান হয়েচে তার প্রধান কারণ দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ব্যবহারিক পণ্য-শিল্পের উপর টান হওয়া। বিশেষ ভাবে শিল্পকলার মধ্যে কারু-শিল্পের প্রতি টান দেশের লোকের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে না হলেও তারও যে বিশেষ একটা জায়গায় স্থান পাওয়া উচিত এ কথা এখন আর কেহই অস্বীকার করবেননা। দেশের কতকগুলি ব্যবহারিক পণ্যের উন্নতির পক্ষে শিল্পকলা যে বিশেষ সহায়ক তাও এখন অনেকে বুঝতে পেরেচেন। এখন আমরা কাপড়ের ছিট দেশী ধরণের ডিজাইনে ছাপা পেতে চাই, (অবশ্য যদিও কোন্ ডিজাইনটি দেশী কোন্‌টি বিলাতী এ জানবার শিক্ষার পরিণতি এখনো হয়নি), জ্যাকেটের 'কাট্' প্রাচীন কঞ্চুলীর ধরণের হ'লেই ভাল হয়, শাড়ীর পাড়টায় পদ্ম বা হংস-মিথুন চাই—গয়নায় নক্সা দেশী ধরণের হওয়া চাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই দেশী আর্টের দিকে দেশের লোকের লক্ষ্যকে নিয়োজিত করার জন্যে দায়ী দেশী শিল্পের প্রবর্ত্তক শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর শিষ্যবর্গ। পত্রিকার পাতায় পাতায় পরিবেষিত তাঁদের ছবিতে ছয়লাপ হয়ে গেল দেশ এবং ক্রমশঃ সবাকার অজ্ঞাতসারে পেয়ে বসল সকলকে। অজন্তার ধরণের ভরসুৎ, সাঁচী, প্রভৃতি প্রাচীন কালের অসন-ভূষণ, বাস্তশিল্প, ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে সব কারু-শিল্পের পরিকল্পনাকে নবশক্তি দিলেন এঁরা তাঁদের চিত্রকলায়, তাতে দেশের লোকের স্বাদ ফিরল দেশের শিল্পকলার দিকে। এই ভাবে তাঁদের ছবির মধ্যে আঁকা আসবাবপত্র পোষাক-পরিচ্ছদ আধুনিক ঘরে ঘরে প্রচলন হবার যোগাড় হ'ল। আমাদের মনে হয় এই একই কারণে বিলাতের আর্ট গ্যালারীগুলির নগ্ন নারী চিত্রকলার ছোঁয়াচ লেগেচে আধুনিক ইয়োরোপীয় মহিলাদের মধ্যে এবং প্রায় দিগম্বরা বেশ ধারণ করবারই তাঁরা চেষ্টায় আছেন। গ্রীক সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক আর্টের পতন এবং সেই সঙ্গে উরোপের দর্শনীয় ও রমণীয় গ্রীক পরিচ্ছদেরও রেওয়াজ চলে

গেছে। তাই শিল্পীরা এখন আঁকার অযোগ্য আধুনিক কোট-প্যাণ্টের ছবি না-এঁকে, বিধাতার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য নগ্নতার মধ্যে যা' পান তাই এঁকে চলেছেন। তা' যাই হোক, শিল্পীরাই দেশের স্বাদ ফেরান যুগে যুগে, এ কথা অস্বীকার করলে আর চলবেনা। চারুশিল্প যে কারু-শিল্পকে পথ দেখায় এও আমরা যুগে যুগে দেখেছি। এমন কি ব্যবহারিক পণ্য-শিল্পেও তার ছাপ প'ড়ে। Lord Eustace Percy, President, Board of Education of Great Britain বলেছেন: "Broadly speaking, the nation would have a higher standard of industrial art if it had a great school in the Fine Arts. If we had a national school of painting, sculpture and architecture its influence would be felt throughout all the Art schools and in every branch of industry." আমাদের দেশে এই যোগাযোগ এতদিন ঘটেচে। বাঙলার শিল্পী সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্পীদের নিকট ভারতের জাতীয় শিল্পের ঐশ্বর্য্যের দ্বার আজ খুলে দিয়েছেন। এখন কেবল প্রাদেশিকতা রক্ষা ক'রে আপন আপন প্রদেশের শিল্প বিদ্যালয়ে ভারত-শিল্পের চর্চা অল্প-বিস্তর হ'চ্চে; এমন কি বাঙলার শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা অধ্যক্ষরূপে অন্যান্য প্রদেশের শিল্প-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় স্পষ্ট, যে, বাঙলার চারুকলার প্রভাব সমগ্র ভারতবর্ষের শিল্প-বিদ্যালয়ে চারু ও কারুকলার উপর যে পড়বে সেটা খুবই স্বাভাবিক; এবং জাতীয় শিল্প-গঠনের সহায়ক হবে। এখন অবশ্য বাঙলা দেশের সময় হয়েচে চারু-কলা ছাড়াও কারুকলায় মন দেওয়ার। যদিও কারুকলা-প্রধান অন্যান্য প্রাদেশিক শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রভাবে দেশের কারু-শিল্প গড়ে উঠ্‌চে

লক্ষ্ণৌ স্বদেশী প্রদর্শনীতে সজ্জিত মডেল-গৃহে গভর্মেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌সের তৈরী কারু-শিল্প সম্ভার

বটে, কিন্তু ঠিক্ বাঙলা দেশেও তার প্রতীক পাওয়ার কি কোনো ব্যবস্থা হ'তে পারেনা? এ বিষয় সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হ'লে মন্দ হয়না। বিশেষ ভাবে কলকাতার কর্পোরেশনের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আমাদের দেশের কেহ কেহ আর্টের উপর বক্তৃতা দেবার কালে দেশের কারু-শিল্পের অধঃপতনের জন্যে অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছেন; এবং আগেকার মত সূক্ষ্মভাবে তৈরী করার ধৈর্য্য না থাকার কথা নিয়ে

আলোচনা করেচেন। কিন্তু আসল কারণগুলি যে কি, তা' কেউ অনুসন্ধান ক'রে দেখেননি। এ দেশের লোকেরা এ বিষয়ে উদাসীন হলেও, এ দেশের কারু-শিল্পের অধঃ-পতনের সম্যক কারণ নির্দ্ধারণ করেচেন ইংলণ্ডের Sir Walter Crane, Sir Alfred East, Sir Edward Buck. Mr. T. W. Rolleston প্রভৃতি মনীষীরা। বিলাতে The Festival of Empire and Imperial Exhibitionএ ১৯১১ সালে যখন এ দেশের শিল্পকলা, "আগেকার আমাদের সব ভাল ছিল; আর এখন সব খারাপ হয়ে যাচ্চে।"

উল্লিখিত ইয়োরোপীয় মনীষীদের মতামতের কথা উল্লেখ করার পূর্ব্বে আমাদের একটা বিষয় ভাবা উচিত এই যে, মানুষের চিত্তবৃত্তি গতিশীল (dynamic); সেটাকে একটা কোন পছন্দের মাপকাটিতে বেঁধে রাখা চলেনা। তাই সাহ-আলমের বা তারও আগেকার সব নক্সায় তৈরী কারু-শিল্প, যা' পণ্য-শিল্প হিসাবে আজ পর্য্যন্ত
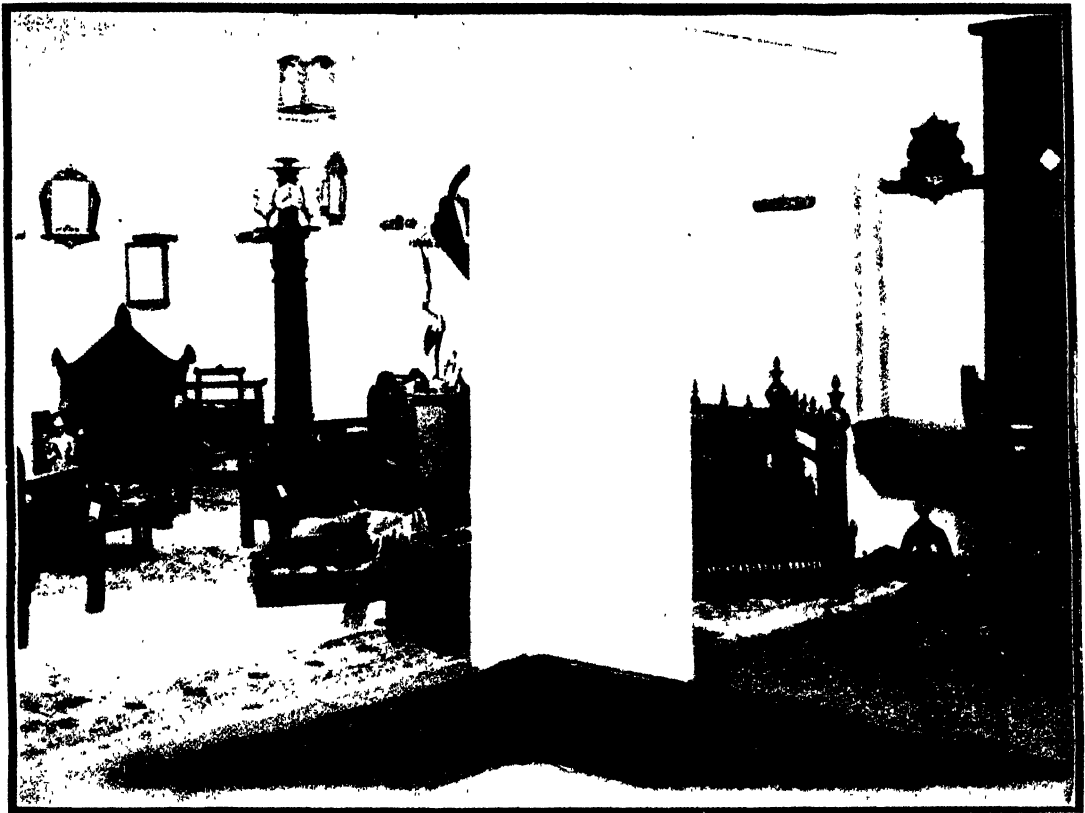
লক্ষ্ণৌ স্বদেশী প্রদর্শনীতে সজ্জিত মডেল গৃহে গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস এণ্ড ক্রাফ্টেসের তৈরী কারুশিল্প সম্ভার

ব্যবহারিক পণ্য ও কারু-শিল্প প্রদর্শিত হয়েছিল, তখন উল্লিখিত মনীষীরা এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে দেখেছিলেন (The Journal of Indian Art and Industry পত্রিকার Vol. XV দেখুন)। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিল্পকলা-পরিচালকগণ তার খোঁজও রাখেন না—কেবল ভাসা ভাসা কাল্পনিক কারণগুলি কল্পনা ক'রে ক্রন্দন করতে থাকেন। আর বলেন বাজারে চলে এসেচে, সেগুলির curio হিসাবে ইয়োরোপে আদর হ'লেও এ দেশের চিত্তকে যে অধিকার করতে আর পারেনা, তা স্বতঃসিদ্ধ কথা। নতুনের উপর টান—এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় আমাদের দেশের মন যখন উন্মুখ, তখন কেবল "যা' বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আস্চে তাই নিয়ে ভাল থাক" মুরুব্বিয়ানা কথা বল্‌লে আর কে শুন্‌বে? তাই দেখা যায় দেশের

ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে অথচ তাতে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি আছে এরূপ কারুকলার সন্ধান না পাওয়ায় দেশের লোকে বিলাতি সস্তা কারু-পণ্যের নামে কলের জাঁতায় তৈরী বিলাতি বস্তুতে ঘর বোঝাই করে থাকেন।

ব্যবসায়ীদের হাতে কারু-শিল্প অন্যান্য পণ্য-শিল্পের শ্রেণীতে পরিগণিত হওয়ায় যে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েচে তা' বিলাতের ১৯১১ সালের Festival of Empire Exhibitionএর Judging Committeeর report থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করে দিলেই বোঝা যাবে। "The art is influenced by some cause which was not present in the past, at least not to the same extent. This influence may arise from various causes, the tendency to commercialise art, the quickness and cheapness of production, the increasing value of time, the loss of patronage and the other causes, but I think the chief cause is the desire of the craftsmen to conform to a demand, and the demand today is such that it prefers to select articles which show an infinity of labour and an extraordinary amount of industry. In this particular way I fear the Indian craftsman has been influenced by the European purcshasers. পণ্য হিসাবেই শিল্পকলার কেবল দরকার যদি হয়, ত সে শিল্পকলা পণ্যই হ'য়ে থাকে, তার প্রয়োজন যতটা ততটাই হয় তার আয়োজন। অর্থাৎ যেগুলি বাজারে চলে গেল, সেগুলিই গেল—তার বাইরে কিছুই করবার আর থাকেনা। তখন পরিমাণ হয় তার অনুমান কিন্তু উন্নতি বা পরিণতির দিকে কোনো লক্ষ্যই থাকেনা আর। জন্ কোম্পানীর আমলে ভারতের পণ্য হিসাবে বিলাতে নানান প্রদেশ থেকে কারু-শিল্প পৃথিবীর নানান স্থানে চালান্ যেতো। তার দরুণ যেমন এ দেশের কারু-শিল্পের জগতে প্রচার হয়েছিল, তেমনি তাতে বিলাতি পছন্দের অনুরূপ গড়া ফুলদান, টেবিল প্রভৃতি অনেক আসবাবপত্রের বিশেষ একটি বিলাতী গঠনের চলন এ দেশে হয়েচে। এখন আমরা সেগুলি নিত্য দেখে দেখে এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি যে সেগুলি যে বিদেশ থেকে কখনো আমদানী হ'য়েছিল তা' কিছুমাত্র টের পাইনা।

বিলাতের মনীষীরা এম্পায়ার প্রদর্শনীতে বিচার-সভায় গবেষণা করে দেখেচেন নিম্ন-লিখিত কারণে ভারত-শিল্পের পতন হ'য়েচে—

১। খারাপ পরিকল্পনা (bad design)

২। খুব বেশী কারুকার্য্যের বহর এবং ফলে জবড়্জঙ্ ক'রে ফেলা।

৩। নিজের নিজের প্রদেশের ঐতিহ্য-অনুরূপ নক্সায় গড়ে এক দেশ বা প্রদেশের নক্সা অন্য দেশ বা প্রদেশে চালানোর চেষ্টা। অর্থাৎ প্রাদেশিকতা রক্ষা করে না চলা।

৪। তৈরী করায় অমনোযোগিতা সুতরাং

৫। তাড়াতাড়ি কাজ করার স্পৃহা—

৬। অনুপযোগী করে গড়া—

৭। তৈরী করবার যন্ত্রপাতি ভাল নয় এবং যা'-তা' সামগ্রী দিয়ে জিনিষ তৈরী করার চেষ্টা।

পরিকল্পনা-শক্তির অভাবটাই কারুশিল্পের প্রথম ও মুখ্য অভিযোগ। এবং তারই নিরাকরণের চেষ্টা করার কথা প্রাদেশিক শিল্প-বিদ্যালয়গুলির দ্বারা। পরিকল্পনার উৎকর্ষের উপর কারু-শিল্পের উৎকর্ষ। এই পরিকল্পনার শক্তির অভাবই যে একমাত্র দেশের শিল্পের অধঃপতনের কারণ তা বোধ হয় বোঝাবার কোনোই প্রয়োজন নেই। পরিকল্পনার উৎকর্ষ না হওয়ায় বংশানুক্রমে একঘেয়ে ধরণের শিল্প-বস্তু-সম্ভার ভারে ভারে বিলাতে ভারতীয় কারু-শিল্প নামে চালান যাচ্ছে এবং আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। Sir Walter Crane বলেচেন "The nature of the exhibits confirms the opinion that native design and handi-craft have greatly suffered from European influence, which always appears to have a confusing effect upon the native artist and craftsman, destructive of his natural taste and feeling." এই যে গুরুতর বিষয়টি—আমাদের দেশে শিল্প-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা যদি এটি মনোযোগ দিয়ে বোঝেন ত দেশের শিল্পের বিদেশে আদর বা কদর হওয়ার জন্যে ব্যস্ত না হয়ে যাতে দেশের মধ্যে দেশী কারুশিল্পের কদর হয় তার নানা পন্থার চিন্তা করবেন। নিম্নলিখিত উপায়ে দেশের লোকের স্বাদ দেশের কারু-শিল্পের দিকে ফেরাতে পারা যায়—

১। দেশের প্রাচীন ভাল ভাল কারু-শিল্প-সম্ভারের সংগ্রহের দ্বারা প্রদর্শনী বা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা।

২। বাৎসরিক প্রদর্শনীতে আধুনিক শিল্পীদের নতুন নতুন পরিকল্পনার দরুণ কারু-শিল্পের প্রতিযোগিতা পুরস্কার।

প্রতিষ্ঠা দ্বারা কারীগরদের সমবায় প্রণালীতে দাদন দিয়ে ভাল ভাল নক্সা ডিজাইনের দেশী কারু-শিল্পের কাজ করানো ও তার প্রচার।

৫। আধুনিক নতুন নতুন পরিকল্পিত কারু-শিল্পের ক্যাটালগ প্রস্তুত।
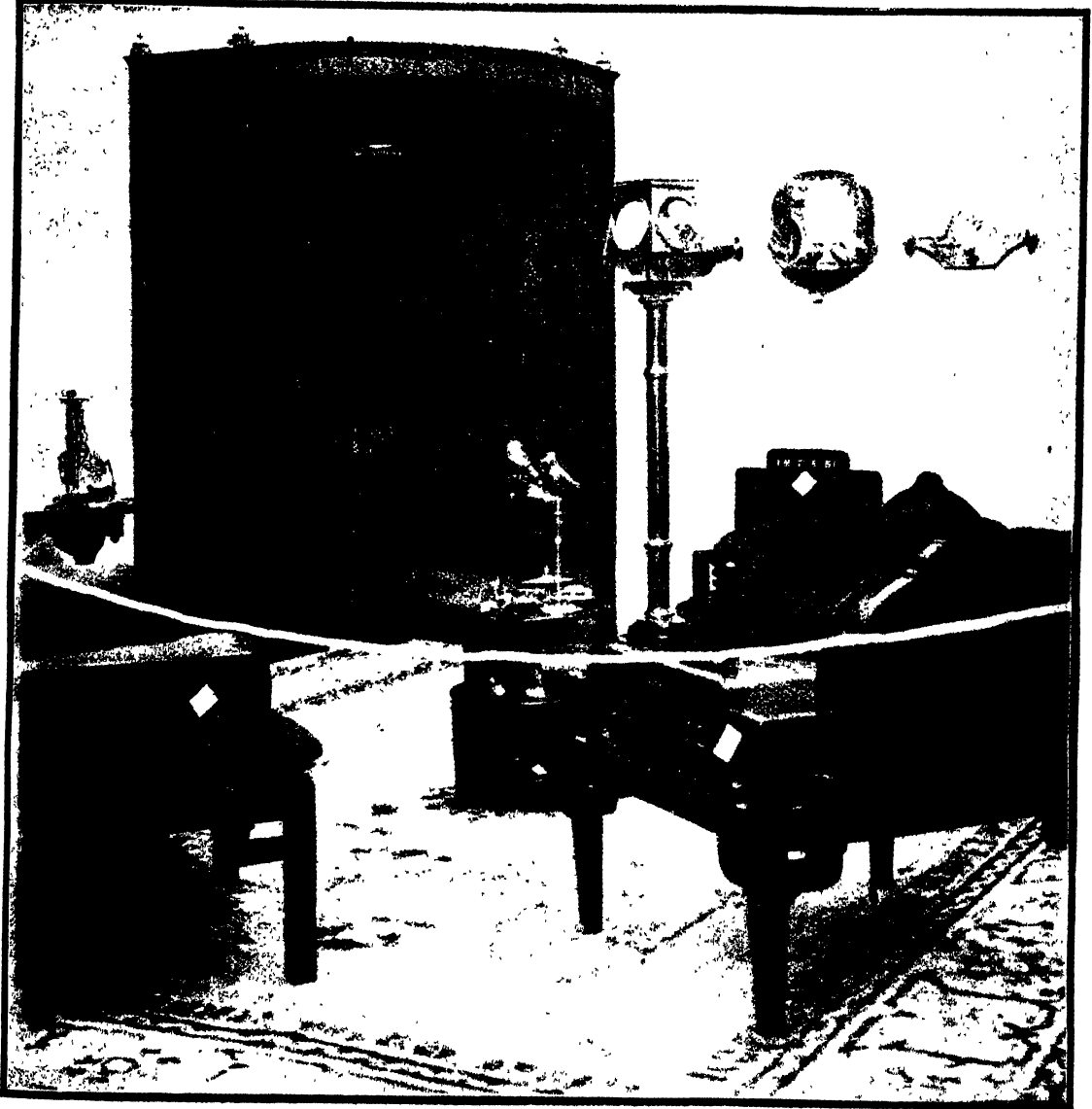
লক্ষ্ণৌ স্বদেশী প্রদর্শনীতে সজ্জিত মডেল গৃহে গভর্মেণ্ট স্কুল অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্টসের তৈরী কারুশিল্প-সম্ভার

৩। সিনেমা প্রভৃতির দ্বারা ছবি দেখিয়ে বিলাতি ও দেশী কারু-শিল্প-সম্ভারের তুলনা-মূলক বক্তৃতা।

৪। বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় কারু-শিল্প-সঙ্ঘের

৬। কারু-শিল্পের বিষয়ে নানান ভাষায় মাসিক পত্রিকার প্রচলন যাতে দেশ-বিদেশের এবং বিশেষ ভাবে ভারতের নানান প্রদেশের শিল্পালয়ের উদ্ভা-

বিত পরিকল্পনাগুলির ছবি ও সে বিষয়ে প্রবন্ধ থাকবে।

এই ভাবে দেশের সঙ্ঘ ও প্রদর্শনী প্রভৃতির দ্বারা পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করলে দেশের লোকের মনে দেশের শিল্প আবার স্থান পাবে এবং সকলেই তার প্রচারের নানান উপায় সকল চিন্তা করবেন। আমরা সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ স্বদেশী একজিবিসানে একটি মডেল গৃহ তৈরী করে লক্ষ্ণৌ শিল্প-বিদ্যালয়ের কারু-কলা যথাযথ ভাবে সাজিয়ে

লক্ষ্ণৌ স্বদেশী প্রদর্শনীতে সজ্জিত মডেল গৃহে গভর্মেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টেসের তৈরী কারুশিল্প সম্ভার

রেখেছিলুম। অর্থাৎ গোলকামরায় যা' যা' আসবাব থাকে, আফিস-ঘরে, কাপড় ছাড়বার ঘরে যা যা' থাকে সব জিনিষ নতুন নতুন পরিকল্পনায় তৈরী করে সাজানো হয়েছিল। তার ফলে নানান দেশ বিদেশের দর্শকেরা সেগুলি দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অনেকে সেইরূপ সজ্জিত আসবাব নিজেদের ঘরের জন্ম পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা যে চিত্র দিচ্চি এতে কতকটা তার আভাষ পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু লাক্ষার রঙের কাজের নমুনাগুলি এক রঙায় হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা যাবেনা। তবে এই ভাবে প্রদর্শনী প্রভৃতির দ্বারা দেশের জিনিষের উপর টান ক্রমশঃ যে জন্মানো যেতে পারা যায়, তার অভিজ্ঞতা এই লক্ষ্ণৌ প্রদর্শনীতে হ'য়েচে। দেশী ধরণের চারু-শিল্পেরও (Fine art) প্রচার এই ভাবে প্রদর্শনী ও সঙ্ঘের স্থাপন দ্বারা যে হ'য়েছিল সে ইতিহাস বেশী দিনের নয়। The Indian Society of Oriental Art ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীনাথ ঠাকুর এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ভিত্তি স্থাপনা করেন দেশী ও বিলাতি বন্ধুদের নিয়ে। প্রথম প্রথম সোসাইটার প্রদর্শনীতে দেশী ধরণের আঁকা চিত্রগুলি দেখে শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গ যে কিরূপ লাঞ্ছিত হ'য়েছিলেন তা' সে সময়কার প্রচলিত 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রভৃতির পাতা ওল্টালে এখনো দেখতে পাওয়া যাবে। তেমনি নতুন ধরণের দেশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে একটা কিছু কারুকলা (crafts) করতে গেলেই দেশে হৈ হৈ পড়বারই কথা। কিন্তু ক্রমাগত কারুকলার বিষয়ে পত্রিকা প্রচার প্রদর্শনীর প্রত্যক্ষ বিচারের দ্বারা দেশের মধ্যে কারু-শিল্পের প্রতি অনুরাগ জাগানোর দরকার। তাতে করে দেশের অর্থনীতির দিক থেকেও দেখতে গেলে দেশের কারীগরদের মঙ্গল হবারই সম্ভাবনা।

ইয়োরোপে আর সেজর্জিয়ান, ভিক্টোরিয়ান ফ্যাসানের আসবাবপত্র কারুশিল্প নেই। এখনকার হাওয়া প্রাচ্যের (Oriental) ফ্যাসানে অর্থাৎ চীনা জাপানী ধরণের কারু-শিল্প—বিশেষ গৃহসজ্জার যাবতীয় সামগ্রীর (যথা furniture প্রভৃতির) মধ্যে এখন সচল হয়েচে। এখন আর অর্থশূন্য জবড়জঙ্ জন্তুর পায়া সম্বলিত খাটিয়া,

টেবিল চেয়ার প্রভৃতি তৈরী হয়না। এখন ঘরের ভিতর জাপানী ফ্যাসানে খুব সংযত ভাব আনবার চেষ্টা চলচে। জাপানে যেমন প্রতি গৃহ-সামগ্রীর ভিতর তার আকারগুলির এরূপভাবে পরিকল্পনা করা হয় যাতে চোখে না লাগে; জিনিষগুলি যেন চীৎকার করতে না থাকে—"ওগো আমায় দেখ, আমায় দেখ।" ইয়োরোপে লুভ, ভার্সাই প্রভৃতি শিল্পাগারে দূর করার চেষ্টা হচ্চে এবং এটি হ'চ্চে ইয়োরোপের উপর এসিয়ার প্রভাব। এখানে ইয়োরোপ হয়েচে এসিয়ার শিষ্য। ইয়োরোপের আধুনিক শিল্পী ও রসিকেরা, সূক্ষ্ম রস-বোধ যাঁদের আছে, তাঁরা নিজেদের দেশের আর্টের পাশবিক স্পষ্টতার হাত থেকে এড়াতে চান। তাই তাঁরা অভিজ্ঞতা আহরণ করচেন চীন, জাপান, ইজিপ্ত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের শিল্পকলা থেকে। আর আমরা

লক্ষ্ণৌ স্বদেশী প্রদর্শনীতে সজ্জিত মডেল গৃহে গভর্মেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টসের তৈরী কারুশিল্প সম্ভার

বা প্রাসাদে প্রবেশ করলে ঠিক্ তার উল্টো ভাব মনে আনে; যেন restfulness ব'লে নাম নেই! সব যেন চেঁচাচ্চে "আমায় দেখ" "আমায় দেখ" বলে। এখনকার modern artএ বিশেষ করে কারু-শিল্পে সে রোগ ক্রমশঃ এখনো ইয়োরোপের আর্টের মোহে মুগ্ধ হয়ে চুপচাপ বসে আছি। "আত্ম-ভোলা জাত আমরা"—তা ঠিকই। আবার যখন ইয়োরোপে ভারতশিল্পের ফ্যাসান প্রচলিত হ'বে তখন আমরা তাদের উচ্ছিষ্টের জন্যে লালায়িত

হ'ব। কি লোভী আমরা! আত্ম-অবিশ্বাস নাশ ক'রে দেশের কারুশিল্পের দিকে দেশের লোকের বিশ্বাস ও ভালবাসা। এই বিশ্বাস ও ভালবাসা জন্মাবার চেষ্টা যতক্ষণ না হচ্চে ততক্ষণ শিল্পকলার কোনোই উন্নতি এ দেশে হ'তে পারেনা। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য এই তিনটি চারুকলার মধ্যে কেবল চিত্রকলাই দেশের

লক্ষ্ণৌ স্বদেশী প্রদর্শনীতে সজ্জিত মডেল গৃহে গভর্মেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টেসের তৈরী কারুশিল্প সম্ভার

মুখ রেখেচে বলা যেতে পারে। ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের দিকেও কারুশিল্পে অনেক কিছু করবার আছে। সে কথাও এখন অনেকে যে বুঝতে পেরেচেন তা' দেখেও আনন্দ হয়। এখন সেই সঙ্গে কারুশিল্পেরও আজ জাগরণের দিন এসেচে। দেশের জিনিষের গৌরব দেশের কারুশিল্পের উপরই ন্যস্ত আছে এ কথা দেশভক্তেরা যেন না ভোলেন। ইয়োরোপীয় পণ্য হিসাবে আদর করলে যদি দেশের কারু-শিল্প বেঁচে থাকে তাহ'লে সে দেশের শিল্পের মরণই শ্রেয়ঃ। কেন না প্রত্যেক দেশের বিশেষ ঐতিহ্যের উপরই দেশের কারুশিল্প দাঁড়িয়ে থাকে, নচেৎ তার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ইয়োরোপের মনীষীরা বলেন: Commercialism, faculty of communication, and, in consequence, the great increase in patronage of tourists, have led to an enormous demand for all kinds of curios and for specimens of Indian art work at the different centres on lines of communication, and especially of such as are portable and can be taken home or sent to friends as reminiscences of travel. The dealer demands and the workman provides for the rush of purchasers which every winter brings to the East, and both are eager to suit all pockets and to meet all wants. Prices are so cut down that the craftsman cannot afford to waste labour or material, for which reasons they are not able to reject imperfect specimens; and thus the standard is lowered and the world is flooded with bad work, which in time, moreover, leads to the decay and abandonment, perhaps, of what once were beautiful and profitable

art industries. ভারতের কারুশিল্পের বিষয় এরূপ সূক্ষ্ম ভাবে দেখবার শক্তি যেদিন আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যে জন্মাবে, তখন অধঃপতনের কারণের নিরাকরণ হ'বে। একদল চেঁচাচ্ছেন "খুব প্রচুর পরিমাণে শিল্প-পণ্য তৈরী কর"; একদল বলচেন "সূক্ষ্ম কাজ আগেকার মত তৈরী হচ্চে না।" অথচ যে কি মুখ্য কারণে হচ্চে না তা' বোঝবার শক্তি আমাদের দেশের কারু নেই—আমরা সত্যিই কি শিল্পকলা বিষয়ে এতই মূর্খ ?

বাজারে curio হিসাবে চল্‌তি পুরানো কারুশিল্পকে যদি আমরা নাড়া দিতে যাই ত দেখব যে দোকানদার-গুলি 'হাঁ হাঁ' করে উঠে বলবেন "তা কি হয় ? ইয়োরোপ এ দেশের কারুকলাকে ঠিক যে রূপটিতে জানে তার অদল-বদল করলে যে তারা তাদের বাজারে নেবে না !" অতএব আমাদের বাপ-দাদার আমোলের যে সামগ্রী কারুকলা হিসাবে বাজারে চলে যাচ্ছে এবং বিদেশে আদৃত হচ্চে তার উর্দ্ধে আমাদের আর যাবার প্রয়োজন নেই। এই জন্তেই বিদেশী marketএর demandএর উপর ভর্সা করে দেশের আর্টের চর্চ্চা করতে গেলে যে সব দিক ফর্সা হবার কথা, এ কথা না বল্লেও সহজে বোঝা যায়। Prof: Josf Hoffmann, art Director, (ভিয়ানার) মহোদয় সম্প্রতি Studio পত্রিকায় লিখেচেন: "Industry had become the pray of the manufacturer who now began to produce almost exclusively bad designs. Beautiful tradition had gone astray. The most important factor in the big enterprises of the manufactures was to calculate how best to conquer big markets. To do this they pandered to the thoroughly degenerate taste of the masses." আমাদের দেশের আর্টের tradition নেই এ কথা আমরা বলতে পারিনা। তা যদি না থাকত, আমরা যদি আফ্রিকার কাফ্রী হতেম, ত না হয় যে কোনো সভ্যদেশের নকলে একটা কিছু 'কলা' আমরা গড়ে তুলতুম। আমাদের প্রাচীন যুগের শিক্ষার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা যদি নূতনের দিকে অগ্রসর হই, তাহলে আমাদের দেশের কাজে দেশের ছাপ পড়বে; নচেৎ অতি-আধুনিক ইয়োরোপের শিল্পী—Paul Klee. Pablo Picâsso, Jaun Gris, Andre Masson প্রভৃতির মত অভিনবত্বের নিছক নকল ক'রে জাতীয় শিল্পের জাত মারার অতি সহজ পন্থার আমরা কেহই পক্ষপাতী হ'তে পারিনা। ইয়োরোপের এই অতি-আধুনিক চিত্রকলার ছাপ তাদের নূতন নূতন কারুকলায়ও যে পড়েনি তা নয়; বরং তাতে কারুকলার ছিরি বাড়চে। যদিও তাঁদের সেই অতি-আধুনিক চিত্রকলা-গুলির অনুকরণে ছবি আঁকতে গেলে প্রয়োজন হয় নিজের চোখ বেঁধে 'কানামাছি' অবস্থায় চিত্রপট সামনে রেখে প্রচুর রঙ ও রেখা আন্দাজে আন্দাজে টেনে যাওয়ার। তা' না হয় বিলাতেই চল্‌ল—তাই বলে তাদের ভূত আমাদের ঘাড়ে কেন চাপ্‌তে দেওয়া ? ইয়োরোপের অতি-আধুনিক শিল্পীর দল আসলে প্রকৃতির হুবহু প্রতিকৃতি গড়া—"মাছিমারা" শিল্পের উপর আস্থা হারিয়ে বসে আছেন। তাঁরা তাই বল্গা আল্গা করে ঘোড়া ছুটিয়েচেন—পথের কথা ভুলে গিয়ে। আমাদের দেশে তার প্রয়োজন নেই; কেন না, চিত্রপটকে 'পটই' বলা হয়েচে। প্রকৃতির নকলই আদর্শ ছিলনা। অজন্তা, বাগ, সিগিরী প্রভৃতি প্রাচীন চিত্রগুলিতে তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন আমাদের শিল্পীদের রঙ ও রেখার মধ্যে যে সংযম ছিল সেইটির রহস্য আমাদের আবার খুঁজে বার করতে হ'বে প্রাচীন শিল্পের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরিচয়ের দ্বারা—তাকে বিসর্জ্জন দিলে হ'বেনা। এ সাধনা বড় কঠিন সাধনা। Artএ revolt আন্‌লে revoltই হ'বে—কিন্তু art হ'বেনা। আর্ট হচ্চে (intuition) প্রেরণার সন্তান, সেটিকে যতই খুঁটিয়ে দেখতে যাওয়া যায় ততই সে সরে চলে যায়। সেই জন্তে অভিনবত্বটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত যদি না হয়, কেবল revolt আনবার জন্তে যদি প্রয়োজন হয়, ত কখনো তার দ্বারা কারু বা চারুশিল্পের ভিত্তি কায়েম হ'তে পারেনা, এ কথা বলাই বাহুল্য।

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(৩)

দুর্গার স্বীকার করিতেই হইল। শারদার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল অদূরবর্ত্তী এক গ্রামে। বরের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। এক বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সে স্ত্রী কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে আজ সাত বৎসর। মাধব তাঁতির বাড়ীতে একখানা তাঁত আছে, তার পিতামহের ছিল চারখানা তাঁত। বিলাতী কাপড়ের আমদানীর ফলে তাঁতির ব্যবসায় তখন মন্দা পড়িয়াছে। তাই মাধবের এই একখানা তাঁত, তাও অনেক সময় চলেই না। একখানা ক্ষেত আছে, ভিটাবাড়ীর সঙ্গে পালান আছে, তাহার আবাদ করিয়া কোনও মতে দিনাতিপাত হয়। যখন দু' পয়সা হাতে হয় সুতা কিনিয়া কয়েকখানা কাপড় বা চাদর বোনে, হাটে গিয়া তাহা বিক্রয় করে।

স্ত্রী কুলত্যাগ করিবার পর এক বিধবা আসিয়া মাধবের গৃহে অধিষ্ঠিত হইল—তার নাম বিন্দু। বিন্দুর কিছু টাকাকড়ি ছিল—বিষয়-বুদ্ধিও ছিল; আর তার পরিশ্রম করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। তাহার অর্থ-সাহায্য এবং বুদ্ধির সহায়তায় মাধবের ক্রমে কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইল। আগে তাহার ক্ষেত হইতে সে যে উপস্বত্ব পাইত, বিন্দুর সুব্যবস্থার ফলে সে তার চেয়ে বেশী পাইতে লাগিল। তা ছাড়া বিন্দু গরু কিনিয়াছিল; তাহার দুগ্ধ বেচিয়াও দু' পয়সা আসিতে লাগিল। মাধবের ভাঙ্গা ঘর মেরামত হইল, ঘরে ঢেঁকি চলিতে লাগিল—তাঁতও পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী জোরে চলিতে লাগিল। বিন্দুর হাতে শতাধিক টাকা জমিয়া গেল।

মাধবকে যখন তার সমাজের লোক বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, তখন সে অস্বীকার করিল। বিবাহ করিবার তার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া সে অনুভব করিল না, কেন না বিন্দু তার ধর্ম্মপত্নী না হইয়াও পত্নীর সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিত, সর্ব্ববিধ সেবার দ্বারা সে তাহাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিয়া রাখিত। তা ছাড়া সে বিন্দুকে ভালও বাসে, ভয়ও করে। বিন্দুকে অসন্তুষ্ট করিয়া বিবাহ করিতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

গোবিন্দ তাঁতির বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছিল। সকলে নানামতে মাধবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। শেষ পর্য্যন্ত তাকে একঘরে' করিবার ভয় দেখান হইল। মাধব কিছুতেই কাবু হইল না। সে তীব্র ভাষায় তার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

বিন্দু তার জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া তার প্রতীক্ষা করিতে করিতে খানিকটা সুতায় মাড় দিয়া লাটাইয়ে জড়াইতে-ছিল। এক মুহূর্ত্ত বিনা কার্য্যে বসিয়া থাকা বিন্দুর স্বভাব নয়। মাধব তার আঙ্গিনায় পা দিতেই বিন্দু ঝঙ্কার দিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এই তৃতীয় প্রহর বেলায় সে কোথায় কোন্ কর্ম্ম করিতেছিল। সেই কোন্ বেলায় বিন্দু রাঁধিয়া বাড়িয়া বসিয়া আছে—হতভাগ্যের ঘরে ফিরিবার নামই নাই। এই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে সে তীব্র প্রশ্ন করিল।

মাধব আমতা আমতা করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "হ, বড়ই বেলা হইয়া গিছে"; বলিয়া তাড়াতাড়ি তেল লইয়া মাথায় ঠাসিতে লাগিল।

এত সহজে বিন্দু তাকে মুক্তি দিল না। সে তাকে

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। শেষে মাধব বলিয়া ফেলিল যে গোবিন্দের বাড়ীতে বৈঠক করিয়া সকলে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু মাধব অস্বীকার করিয়াছে।

আগুনে যেন জল পড়িল। বিন্দু ফস করিয়া একেবারে নিভিয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া রহিল।

মাধবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল।

বিন্দু বসিয়া বসিয়া ভাবিল। কথাটা নূতন নয়। বহুবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছে; বিন্দুও বহুবার এ কথা ভাবিয়াছে। আজও সে ভাবিল।

মাধব যখন স্নান করিয়া আসিল তখন বিন্দু তার সামনে ভাত বাড়িয়া দিয়া সম্মুখে বসিল। অনেকক্ষণ পর সে বলিল, "তুমি একটা বিয়্যা কইর‍্যা ফালাও গা।"

একগ্রাস ভাত মুখে তুলিতে গিয়া মাধব থামিয়া গেল। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বিন্দুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

বিন্দু চক্ষু নত করিল।

তার পর বিন্দু বুঝাইয়া বলিল যে মাধবের কোনও পুত্র-সন্তান না হইলে তার পিতৃ-পিতামহের নাম লুপ্ত হইবে। বিন্দুর দ্বারা তার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। সে জন্য মাধবের বিবাহ করা প্রয়োজন।

ক্রমশঃ আরও যুক্তি বাহির হইল। বিন্দুর এখন বয়স হইয়াছে, সে মাধবের চেয়েও চার পাঁচ বছরের বড়। তার পক্ষে এখন আর পূর্ব্বের মত সংসারের সব কাজ চালান সম্ভব নয়। এক হাতে তাঁতের জোগান দেওয়া, রান্নাবাড়া, ধান ভানা, পালান আবাদ, মুড়ী ভাজা প্রভৃতি কাজ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মাধবের একটি বালিকা-পত্নী আসিলে তাহার দ্বারা বিন্দুর কাজের অনেক সুবিধা হইবে।

বিন্দু আরও বুঝাইল যে সমাজে তাহাকে বন্ধ দিলে তাদের নান রকম অসুবিধা হইবে; হয় তো তাদের গ্রামে বাস করাই কঠিন হইবে।

এতগুলি যুক্তি সত্ত্বেও মাধব তখন ঘাড় পাতিল না।

বিন্দু যে সব যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল সেগুলি কেবল তার মুখের কথা নয়। সত্য সত্যই সে অনুভব করিতেছিল যে বিবাহ করা মাধবের কর্ত্তব্য। বিন্দুর মনে ছোট ছেলে-পিলে সম্বন্ধে একটা বুভুক্ষা ছিল। আপনার গর্ভে সন্তান আসিবার যার সম্ভাবনা নাই, সে পরের সন্তানের উপর প্রায়ই অধিক মমতাবতী হয়। বিন্দুও পাড়ার লোকের ছেলেপিলেদের লইয়া অনেক আদর আহ্লাদ করিয়া থাকে। কিন্তু পরের ছেলে নাড়িয়া চাড়িয়া তার মন ভরে না। মাধবের ছেলে-পিলে হইলে তারা হইবে তার নিজস্ব। তাই তার মনে হইল মাধবের বিবাহ করিয়া সন্তান লাভ করা কর্ত্তব্য।

আর, যতই শক্তিমান ও কর্ম্মিষ্ঠ সে হোক, তবু চল্লিশ বৎসর বয়সে তার একটু আরাম লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। খাটিতে খাটিতে এখন অনেক সময় তার মনে হইত যে তার ফরমাস খাটিবার জন্য একটা "হাতের লাইড়া" থাকিলে ভাল হইত। এখন মনে হইল যে মাধব বিবাহ করিলে তেমনি একটা হাতের লোক সে পাইবে।

বউকে সে শিখাইয়া-পড়াইয়া তার মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। বউ বড় হইয়া উঠিলে মাধবের সুখ হইবে, এ কল্পনাও সে করিয়াছিল। বধূ আসিয়া যে তাকেই তার অধিকার হইতে চ্যুত করিতে পারে, সুধু এই কল্পনাটাই তার মনে তখন আসে নাই।

মাধব যদিও প্রথমে বিন্দুর প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, তবু বিন্দু হতাশ হইল না। সে সময়ে অসময়ে কথাটা তুলিতে লাগিল; আর ক্রমে মাধবের প্রতিবাদের তীব্রতা কমিয়া আসিল। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে এ কথা উঠিলে মাধব নীরব থাকে, এবং সে নীরবতা অসন্তোষের পরিচয় বলিয়া বিন্দুর মনে হইল না।

শেষে একদিন মাধব বলিল, বিবাহ করা অমনি মুখের কথা নয়, তাহাতে শতাধিক টাকার প্রয়োজন। বিন্দু তখন বলিল, সে ভাবনা মাধবের ভাবিতে হইবে না।

তার পর বিন্দু গিয়া গোবিন্দ তাঁতিকে বলিল, মাধব বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে, গোবিন্দ উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়ে দিলেই হয়। গোবিন্দ সম্মত হইল, এবং কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়া শারদাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

শারদার মা কিছুতেই সম্মত হইল না। গোবিন্দ ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তার কয়েক দিন বাদে কানাই সিকদার তাহাকে সংবাদ দিয়া একেবারে জমীদার-কাছারীতে উপস্থিত করিল।

তার পর দুর্গার সম্মতি পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

যথাসময়ে শারদা আসিয়া মাধবের ঘর আলো করিল। আলো সে সত্য সত্যই করিল, কেন না, শারদা সুন্দরী। বারো বছরের কচি মেয়ে সে, ফুট-ফুটে ফরসা, গোলগাল দেহখানি, আর মুখখানি যেন চাঁদের মত—অত শান্ত স্নিগ্ধ নয়, কিন্তু উজ্জ্বল, চঞ্চল। তার চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করিতেছে, ঠিকরিয়া পড়িতেছে তাহা হইতে বিদ্যুতের মত আলো।

বিন্দু তাকে বরণ করিতে আসিয়া ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শারদার চিবুকে হাত দিয়া তাকে চুমা খাইয়া বলিল, "আহা, কি সুন্দর! মাধইব্যার কপাল ভাল।"

মাধবও উৎফুল্ল গর্ব্বিত দৃষ্টিতে একবার শারদার দিকে চাহিয়া তার পর বিন্দুর দিকে চাহিল।

বিন্দু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "কি দেখস্ কি? আমার থিক্যা সুন্দর; না, কি কস্?"

বিন্দু অসুন্দর নয়। রং তার কালো, কিন্তু চল্লিশটি বছরে তার অঙ্গের নিটোল সৌষ্ঠব একটুকুও মলিন করিতে পারে নাই।

মাধব সানুরাগ দৃষ্টিতে বিন্দুর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "না।"

ঘোমটা খুলিতেই শারদা চক্ষু বুজিয়াছিল। এ কথায় সে কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া দেখিল। রূপবতী বলিয়া সে চিরদিনই খ্যাতি, আদর, নিন্দা, হিংসা ও তিরস্কার পাইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে কে এমন একটা আসিল যে বলে যে সে তার চেয়ে সুন্দর? একটু কুটিল দৃষ্টিতে শারদা চাহিয়া দেখিল।

বিন্দুর কালো মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া উঠিল—বুঝিল, এটা তামাসা। সে তাড়াতাড়ি আবার চক্ষু বুজিল।

শারদার হাসিটা বিন্দুর প্রাণে খোঁচা দিল। তার রাগ হইল এই ভাবিয়া যে এক ফোঁটা এই মেয়ে, সে রূপের জোরে তার উপর এতখানি টেক্কা দিয়া গেল যে তাকে উপহাস করিতেও ছাড়িল না। বিন্দুর হাসি মিলাইয়া গেল।

সে একটু তীব্রস্বরে বলিল, "ও মা লো মা, ই কি মেয়্যা লো! লাজলজ্জার ছিটাও নাই গায়। বিয়া না ফুরাইতেই আইস্যা হাসে! ছিক্কো!"

শারদা চটিয়া গেল। সে কোনও কথা কহিল না—কিন্তু মনে মনে বিন্দুর উপর ভারী রাগিয়া গেল! হাত বাড়াইয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে চক্ষু মেলিল, আর ঘোমটার আড়াল হইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বিন্দুর দিকে চাহিয়া রহিল।

মনে মনে সে জিজ্ঞাসা করিল, এ মেয়েটা কে? কিন্তু মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবার লোক সে খুঁজিয়া পাইল না। মাধবের সঙ্গে তখন পর্য্যন্ত বাক্যালাপ হয় নাই। কথাবার্ত্তা হইলেও দিনের বেলায় স্বামীর সহিত কথা বলিবার মত দুঃসাহস তার ছিল না। তা ছাড়া আশে পাশে তার পরিচিত আর কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। তাই কথাটা সে মনে মনেই শুধু বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কে এই মেয়েটি?

(৪)

প্রথম দৃষ্টিতে বিন্দু ও শারদার এই যে পরস্পর বিরুদ্ধতা ফুটিয়া উঠিল, তাহার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই মাধবের সংসার একটা ছোট-খাট কুরুক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

শারদা ছোট্ট মেয়ে, কিন্তু তার বার তের বছরের ছোট্ট দেহখানি আগাগোড়া একটা উগ্র তেজস্বিতায় ভরা। জগতে কাহারও কথা শোনা বা গ্রাহ্য করা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। আর তার উদ্দাম প্রাণের প্রচণ্ড উল্লাস তার চলাফেরা কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার ভিতর চিরদিনই একটু উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়াছে,—ঠিক নারী-সুলভ লজ্জা বা সৌকুমার্য্যের নিয়ম-শৃঙ্খল কোনও দিনই তাকে বাঁধিতে পারে নাই। বিবাহের ফলে কয়েকটি দিন তার সে উচ্ছৃঙ্খলতার বেগ একটু স্তব্ধ হইয়াছিল। তার বিবাহ হইয়াছে—এবং একটি অপরিচিত ভয়াবহ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ তার উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার

পাইয়াছে—এই পরিজ্ঞাত সত্যের অনুভূতি তাকে একটু দমাইয়া দিয়াছিল। তার পর তার পরিচিত আবেষ্টন ছাড়িয়া সে একটা সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনে, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকজনের মধ্যে পড়িয়াছে—এ কারণেও সে কতকটা সঙ্কুচিত বোধ করিতেছিল। তার উপর এই বিন্দু মেয়েটির সম্বন্ধেও তার একটা নিরাকার ভীতি জন্মিয়াছিল। বিন্দুরও তেজের অভাব নাই তাহা সে এক দিন না যাইতেই দেখিতে পাইল, এবং মাধবের উপর যে বিন্দুর প্রভুত্বের সীমা নাই তারও বহু পরিচয় সে পাইল। সুতরাং সে মহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

বার তের বছরের পাড়াগেঁয়ে মেয়ে শারদা, সে একেবারে কিছু জানে না এমন নয়। বরং সে সংসারের এত কথা জানে যা তার বয়সের মেয়েদের না জানাই ভাল। তাই বিন্দুর সঙ্গে মাধবের সত্য সম্পর্কটা জানিতে তার বেশী বিলম্ব হইল না।

শুভরাত্রির দিন রাত্রে মাধব যখন তার পাশে আসিয়া শুইল, তখন শারদা ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ খুব আঁটো সাটো করিয়া আবৃত করিয়া কাঠের মত মাধবের দিকে পিঠ দিয়া শুইয়া রহিল। মাধব তাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিল, সে কোনও মতেই কথা কহিল না। মাধব তার হাত ধরিয়া টানিল, শারদা জোর করিয়া হাত টানিয়া লইয়া শক্ত হইয়া শুইয়া রহিল।

বিন্দু সেদিন ঘরের দাওয়ায় শুইয়া ছিল।

তার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত মাধব অনেকক্ষণ ধরিয়া সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাকে কথা বলাইতে পারিল না। বিবাহের এক মাস পর একদিন এমনি দীর্ঘ সাধ্য-সাধনার পর শেষে সে শ্রান্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। এক ছিলিম তামাক সাজিয়া সে চিন্তান্বিত ভাবে ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া টানিতে লাগিল।

তামাক খাওয়া শেষ হইলে সে প্রদীপ লইয়া শারদার মুখের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া সে ভাবিল শারদা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তার সে ঘুমন্ত কচি মুখের রূপ দেখিয়া অনেকক্ষণ মুগ্ধ নয়নে তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বাতিটা নিভাইয়া পিলসুজের উপর রাখিয়া সে দুয়ার খুলিয়া বাহিরে গেল। সেখানে দাওয়ার উপর বিন্দু শুইয়া ছিল—কিন্তু ঘুমায় নাই।

শারদা সত্য সত্যই ঘুমায় নাই, সে সুধু ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া ছিল। যখন মাধব দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতক্ষণ কাঠ হইয়া শুইয়া ছিল, এখন একটু আরাম করিয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইল।

বিন্দুর সঙ্গে মাধবের কথাবার্ত্তা ক্রমে তার কাণে আসিতে লাগিল। দুই চারটা কথা শুনিয়াই সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। তার পর আরও শুনিল।

ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ সে সুধু রাগে গা কামড়াইতে লাগিল। শেষে তার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি আসিয়া জুটিল। সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল—যেন সে মহা ভয় পাইয়াছে?

তার চীৎকার শুনিয়া মাধব ও বিন্দু ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল। মাধব ত্রস্ত, বিন্দু ঈষৎ ক্রুদ্ধ।

মাধব তাড়াতাড়ি শারদার কাছে আসিয়া বলিল, "কি? কি? কি? কি হইচে?"

শারদা তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে বলিল, "ভূত!"

মাধব বলিল, "রাম, রাম"—একটু শঙ্কিতভাবে চারি দিকে চাহিয়া বলিল, "না, না, স্বপন দেইখ্যা ডরাইছ; শোও! কিচ্ছু না।"

বিন্দু ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, "ভূত না আর কিছু—নে শো! আর ঠেকার করন লাইগবো না।"

একটা অগ্নিময় ক্রূর দৃষ্টি শারদার ঘোমটা ভেদ করিয়া বিন্দুকে আঘাত করিল। কিন্তু শারদা কোনও কথা কহিল না, সুধু মাধবকে চাপিয়া ধরিল।

মাধব বিন্দুকে বলিল, "না, পোলাপান! ডরাইছে! ওয়ারে একটু মিঠা আর জল দেও গে বিন্দু!"

বিন্দু অনিচ্ছার সহিত একখানা বাতাসা ও একঘটি জল গড়াইয়া আনিয়া দিল. শারদা তাহা খাইল।

তার পর বিন্দু গরগর করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মাধব উঠিতেই শারদা তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তুমি যাইও না, আমি ডরামু।"

মাধব হাসিয়া বলিল, "আরে না না, যামু না,

দুয়ারডায় আগল দিয়া আসি।” শারদা তার সঙ্গে কথা কহিয়াছে, তাকে এমনি করিয়া ধরিয়াছে ইহাতে মাধবের আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

সে দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইল, শারদা তার গায় হাত রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

আদর করিয়া মাধব তাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমারে পছন্দ হইচে নি?”

শারদা ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল “হইচে।”

মাধবের আনন্দ রাখিবার আর ঠাঁই রহিল না।

পরের দিন সকাল হইতেই বিন্দুর মেজাজ চড়িয়া রহিল। সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে শারদার ভূত দেখা বা ভয় হওয়া সবই মিথ্যা—এ-সব তার শয়তানী। এতটুকু মেয়ের পেটে পেটে এত শয়তানী দেখিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। মনে মনে সে স্থির করিল যে সে শারদাকে ‘আক্কল' দিবে।

গুড়মুড়ি দিয়া জলপান করিয়া মাধব তার তাঁতে বসিল। তানার ভিতর দিয়া মাকু তার বিচিত্র সঙ্গীত গাহিয়া চলিল। সে শব্দ শুনিয়া শারদা মুগ্ধ হইয়া তাঁতের দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁতির মেয়ে হইলেও সে তাঁত কখনও দেখে নাই। তার মা মনিববাড়ী কাজ করিয়া খায়—তার গ্রামে আর তাঁতী নাই,—শারদা মাঠে ঘাটে ছুটিয়াই চিরদিন বেড়াইয়াছে—এ বিচিত্র যন্ত্র দেখিবার সুযোগ তার কখনও হয় নাই। তাই সে কৌতূহলী হইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে মাধবের বস্ত্র বয়ন দেখিতে লাগিল। ওই ছোট লোহার মাকুটা মাধব যে কেন একবার এদিক আর একবার ওদিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। তার গর্ভে যে পড়েনের সূতা আছে, আর সেই সূতা যে ইহার গতিমুখে বাহির হইয়া তানার সঙ্গে গাঁথিয়া যাইতেছে ইহা সে দেখিতে পাইল না। আর তানার গোড়ার দিকে যে কাপড়খানা কেমন করিয়া বোনা হইয়া যাইতেছে তাহাও সে বুঝিল না। অপার কৌতূহলের সহিত সে তাই মাধবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তার এই বিচিত্র কার্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিন্দু ততক্ষণে রান্নাঘর লেপিয়া এই ঘর লেপিবার জন্য গোবরজলের হাঁড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। সে শারদার এই কাণ্ড দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। ডান হাতে গোবরজলের হাঁড়ি লইয়া বাঁ হাত গালে দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া সে বলিল,—

“মা গো মা, কি পাকুন্নি লো! লাজলজ্জার মাথা খাইচস্ এক্কিবারে! ভাতাররে গিল্যা খাইবার চাস্—ক্যান?”

শারদার মাথায় ঘোমটা ছিল—ঘোমটাটা আরও লম্বা করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

বিন্দু দাওয়ার উপর উঠিয়া নেতাশুদ্ধ হাঁড়ি শারদার হাতে দিয়া বলিল, “আন্নার বিবি সাইজ্যা থাইক্‌লে চইল্‌বো না, কাম করগা—ঘরখান সার, আমি একটু মাছ দেইখ্যা আসি।”

শারদা নেতার চুপড়ী হাতে লইয়া ঘর লেপিতে বসিল। এই ব্যাপারে মাধবের সূতা ছিঁড়িয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি সূতা জুড়িতে জুড়িতে আড়চোখে শারদার কর্ম্মরত মূর্ত্তির দিকে চাহিতে লাগিল।

বিন্দু ইতিমধ্যে নদীর ধারে গেল। মাধবের বাড়ীর ঠিক গায়-গায় না হইলেও খুব নিকটেই নদী। নদীর পারে দুইটা ছিপ মাটিতে পোতা ছিল। রাত্রে বঁড়শীতে একটা ছোট মাছ গাঁথিয়া গৃহস্থেরা ছিপ ফেলিয়া রাখে, মাধবও রাখিয়াছিল। বিন্দু দেখিল একটা ছিপে একটা বোয়াল মাছ ধরা পড়িয়াছে। সে মাছটা তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ী ছুটিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে মাধবকে ডাকিয়া বলিল, “দেখ্ দেখ্ কত বড় বোয়াল প'ড়ছে!”

মাধব তাঁত হইতে উঠিয়া আসিয়া মাছ দেখিয়া হাসিল। শারদা তখনও ঘর নিকাইতেছিল, সেও মুখ ফিরাইয়া দেখিল।

এই মাছের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া মাধব ও বিন্দুর যে সামান্য বিশ্রম্ভালাপ হইল তাহাতে শারদার অন্তর যেন বিষাইয়া উঠিল। সে গম্ভীরভাবে ঘর নিকাইতে লাগিল।

ঘরের দাওয়ার খুব কাছে এক কোণায় বিন্দু মাছ কুটিতে বসিল। শারদা দাওয়া নিকাইতে নিকাইতে ঠিক সেইখানে যখন আসিল, তখন সে নেতাটা খুব করিয়া গোবরজলে চুবাইয়া, হাতটা একটু ঘুরাইয়া

দিল ; বিন্দুর মাথার উপর গোবরজলের বৃষ্টি হইয়া গেল—শারদা যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে দাওয়া নিকাইতেই লাগিল।

বিন্দু তিড়িং বিড়িং করিয়া উঠিল ; তারস্বরে চীৎকার করিয়া সে বলিল, "চক্ষের মাথা খাইচস্ লো আবাগী, চক্ষে দেখস্ না মাইনসেরে—ক্যান ?"

হাতের পিঠ দিয়া মুখের উপরকার গোবরজল মুছিয়া ফেলিয়া বিন্দু মাছ কুটিতে লাগিল, আর গজর গজর করিয়া শারদাকে বকিতে লাগিল।

বিন্দু রাঁধিল। মাধব স্নান করিয়া আসিলে তাকে খাওয়াইয়া বিন্দু শারদাকে লইয়া স্নান করিতে গেল। শারদা এক হাত ঘোমটা টানিয়া কলসী কাঁখে বিন্দুর পিছু পিছু চলিল।

ঘাটে তখন অনেক মেয়ে জুটিয়াছে। সকলেই বহুবার শারদাকে দেখিয়া গিয়াছে, তবু সকলে শারদাকে ঘিরিয়া ধরিল—যেন সে একটা আজব জানোয়ার। বিন্দু কলসীটি নামাইয়া তাদের সঙ্গে দিব্য গল্প জমাইয়া লইল।

শারদার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। বর্ষার জলে ছোট নদী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, আর ওপারে কূল ছাপাইয়া সমস্ত মাঠ ডুবাইয়া একটা বিস্তীর্ণ সাগরের মত হইয়া পড়িয়াছে। ছল-ছল কল-কল শব্দে প্রবল বেগে ছুটিয়াছে নদী—তার সেই স্রোতের ভিতর অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া সাঁতার কাটিতেছে, লাফাইতেছে, ডুব মারিতেছে—খেলা করিতেছে। শারদার প্রাণ ছটফট করিতেছিল তাদের সঙ্গে মিলিয়া তেমনি করিয়া খেলিতে। কিন্তু বিন্দুর গল্প আর শেষ হয় না, শারদাও জলে নামিতে পারে না। তাই সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

অবশেষে শারদার প্রায় সমবয়স্কা একটি তাঁতির মেয়ে ঘাটে আসিল, তার নাম ভবতারিণী—প্রকাশ্য ভবী। সে সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে ; তার চলনের ভঙ্গীতে চোখের ঠমকে সেই সৌভাগ্যের পরিচয় ঠিকরিয়া পড়িতেছে। বড় জোর বার বছরের মেয়েটি, কিন্তু তার চলন-চালন ঠিক যেন পূর্ণ যুবতীর মত। ধীর মন্থর গতিতে সে চলে, গর্ব্বভরে এদিক ওদিক চায়, আর কোনও পুরুষের সঙ্গে চাওয়াচাওয়ি হইলে সলজ্জভাবে চক্ষু নত করে,—কিন্তু বাপের বাড়ী আসিয়াছে সে, মাথায় ঘোমটা দেয় না। শারদার সঙ্গে তার কাল একবার দেখা হইয়াছে, আজ দু-এক কথায়ই হৃদ্যতা জন্মিয়া গেল—সে মেয়েটি টানিয়া শারদাকে জলে নামাইল। শারদা বাঁচিয়া গেল।

জলে নামিয়া শারদা কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সাঁতার দিতে লাগিল। ভবীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল। প্রথমে বেশ সভ্যভব্য ভাবে, মাথায় কাপড় দিয়া, ধীর মন্থর গতিতে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ভব্যতার খোলস তার খসিয়া পড়িল—সে জলের ভিতর ভীষণ লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করিল। ভবীকে সে সহজেই সকল বিষয়ে পরাস্ত করিল, এবং সাঁতার কাটিতে কাটিতে ভবী যেখানে মাঝ নদী হইতে ফিরিল, সেখানে সে আরও দূরে চলিয়া গিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। মাঝ নদীতে খুব খানিকটা মাতামাতি করিয়া সে চিৎ হইয়া ভাসিতে লাগিল।

বিন্দু তখন জলে নামিয়াছে। সেও খানিকক্ষণ সাঁতার কাটিয়া উঠিল। তার পর সে শারদার খোঁজ করিল। শারদা তখন বহু দূরে ভাসিয়া গিয়াছে। বিন্দু চীৎকার করিয়া তাকে গালিগালাজ করিতে লাগিল—শারদা ভ্রূক্ষেপও করিল না।

অনেকক্ষণ পর শারদা হঠাৎ ডুব মারিল। অনেকটা দূর হইতে আসিয়া সে ভবীর পা জড়াইয়া ধরিয়া তার পর ভাসিয়া উঠিল। ভবী প্রথমটা ভড়কাইয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, তার পর শারদাকে দেখিয়া সে তাহাকে তাড়া করিল—শারদা ছুটিয়া চলিল এবং শেষে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল—ভবী তার অনুসরণ করিল। বিন্দু তীরে দাঁড়াইয়া তাকে যা নয় তাই বলিয়া গালি-গালাজ করিতে লাগিল।

শেষে একবার শারদা নিকটে আসিতেই বিন্দু হঠাৎ তার চুলের মুটি চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

শারদা কাঁদিতে কাঁদিতে তীরে উঠিল। কলসে জল ভরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে বিন্দুর অনুসরণ করিল।

মাধব তখন দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। বিন্দু উঠানে পা দিয়াই মাধবকে জানাইল যে তার এই

দুর্দ্দান্ত বধূকে সামলান বিন্দুর কর্ম্ম নয়। এখন হইতে মাধব ইহাকে শাসন না করিলে বধূ মাধবকে 'সাত ঘাটের জল' খাওয়াইয়া ছাড়িবে।

মাধব সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "পোলাপান! ও কি বুঝে?"

বিন্দু এ কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল; "পোলাপান না পোলাপান—পাকুম্মির শেষ! ওয়ার প্যাটে যা দুষ্টবুদ্ধি তা সাত বুড়ার প্যাটে নাই।"

শারদার কান্না থামিয়া গিয়াছিল, সে রাগে গরগর করিতে লাগিল।

কাপড় ছাড়া হইলে বিন্দু শারদাকে খাইতে বসাইল। বিন্দু রাঁধিয়াছিল ভাল—অনেকগুলি মাছ দিয়া সে শারদার সামনে ভাতের থালা আগাইয়া দিল, আর তার পর সে নিজের জন্ম বাড়া থালা হেঁসেল হইতে বাহির করিয়া আনিল। শারদা খাইতে বসিল, বিন্দু পাক সারিয়া কুয়ার পাড়ে হাত ধুইতে গেল—শারদার সামনে সে খাইতে বসিল না।

শারদা লক্ষ্য করিল যে যদিও যথেষ্ট মাছ তাকে দেওয়া হইয়াছে, তবু মাছের লেজাটা তার মধ্যে নাই। সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে লেজাটা মাধবকেও দেওয়া হয় নাই। বোয়াল মাছের লেজাটাই সব চেয়ে সুখাদ্য, সেটা হঠাৎ এইরূপ ভাবে নিরুদ্দেশ হওয়ার হেতু বুঝিতে শারদার বিলম্ব হইল না।

তাঁতিদের বিধবারা কেউ মাছ খায়, কেউ খায় না। বিন্দু মাছ খায়, কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করে না। তার জন্য যে ভাতের থালা সে বাড়িয়াছিল তাতে কাজেই কোনও মাছ দেখা গেল না। কিন্তু বিন্দু বাহির হইয়া গেলে শারদা সেই থালার ভাত সরাইয়া তাহার তলা হইতে বোয়াল মাছের লেজাখানা উদ্ধার করিয়া ভাত ঠিক পূর্ব্বের মত করিয়া বাড়িয়া রাখিল। তার পর শারদা ধীরে সুস্থে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া আঁচাইতে গেল। তখন বিন্দু আহার করিতে বসিল।

শারদা যে এমন দুপুরে ডাকাতি করিয়া গিয়াছে তাহা আবিস্কার করিয়া বিন্দু থ' মারিয়া গেল। এ এমন একটা নির্য্যাতন, যাহা কহিবারও নয়, সহিবারও নয়। ঠিক এই কথা তুলিয়া শারদার সঙ্গে ঝগড়া করা অসম্ভব—এ চোরের কীল, সহিতেই হইবে। কিন্তু বিন্দু মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং শারদার উপর প্রতিহিংসার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইল।

অবসর ঘটিতে বিলম্ব হইল না।

কেউ কোথাও নাই দেখিয়া শারদা এদিক-ওদিক চাহিয়া গাছে উঠিয়া একটা নীচু ডালে বসিয়া মনের সুখে কামরাঙ্গা খাইতেছিল। বিন্দু আঙ্গিনায় আসিয়া বেহায়া বধূর এই কাণ্ড দেখিয়া স্থির করিল ইহাই উপযুক্ত অবসর। সে একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিল, শারদা তাহাকে দেখিতে পাইল না।

শারদা যখন নামিতে লাগিল তখন অর্দ্ধপথে বিন্দু ছুটিয়া আসিয়া তার চুলের মুঠি ধরিয়া দমাদম দমাদম সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতে লাগিল। বিন্দু চুল ধরিতেই শারদা প্রাণপণ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, আর তিন চার ঘা' পড়িতে না পড়িতেই কোথা হইতে মাধব আসিয়া পড়িয়া শারদাকে বিন্দুর হাত হইতে মুক্ত করিল। দুই চারটি পাড়াপড়শীও আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া ফেলিল।

শারদার যাহা চোট লাগিয়াছিল তাহাতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু বিন্দুর হাত হইতে ছাড়া পাইয়া সে মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে এমন চীৎকার করিতে লাগিল যেন তার মৃত্যু আসন্ন।

মাধব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শারদার মুখে চোখে জল দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল, পাড়া-পড়শীরা ভীড় করিয়া তার চার-দিকে দাঁড়াইল এবং স্বচ্ছন্দে তাদের মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল। শারদার গৌর অঙ্গে লাল লাল দাগ দেখিয়া সবাই আহা উহু করিল—কেহ বা বেশ ঝাঁঝের সহিত বলিল, "মাইরা ফালাইছে—রাক্ষুসী ওয়ারে খাইবেক্!"

বিন্দু দেখিতে পাইল সে হারিয়া বসিয়াছে। একে তো মাধব হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে হাতের সুখ করিয়া মারিতে পারিল না, তাহাতে আবার শারদার কান্নার জোরে পাড়াপড়শীরা সকলেই হইল বিন্দু বিরুদ্ধ। বিন্দুর যে শারদার উপর রাগের যথেষ্ট হেতু আছে এবং শারদাকে বধ না করিলে তার রাজ্যপাট বজায় থাকে না, এই

প্রকার অভিমত যাহারা প্রকাশ করিল তাহারা খুব চাপা গলায় কথাটা বলার কোনও প্রয়োজন অনুভব করিল না।

শারদা যে কত বড় বেহায়া, নূতন বধূ হইয়া সে গাছে চড়িয়া কামরাঙ্গা খায়, এই কথা বলিয়া বিন্দু শারদার অপরাধ খুব বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেও বিন্দু সহজেই দেখিতে পাইল যে সাধারণের অভিমত এই যে শারদার অপরাধটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক; এবং সে তাহা করিয়া থাকিলেও, তার জন্য তার এত গুরু দণ্ড পাইবার কোনও কথা নয়। তাই বিন্দু খানিকক্ষণ হাত পা নাড়িয়া শারদার গুণপণা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে কাঁদিয়া ফেলিল।

শারদা দেখিল সে জয়ী। মনে মনে সে খুব হাসিল, কিন্তু মুখখানা চুণ করিয়া সে বসিয়া রহিল। মাধব ছুটিয়া খানিক তেল লইয়া তার অঙ্গের ক্ষতস্থানে লাগাইতে লাগিল, বিন্দু দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়া ফুলিতে লাগিল। বিন্দুর সুস্পষ্ট বিরক্তি ও আক্রোশ দেখিয়া শারদার তৃপ্তির আর সীমা রহিল না।

শারদাকে সুস্থ করিয়া ঘরে পাঠাইয়া, প্রতিবেশীরা চলিয়া গেলে মাধব আস্তে আস্তে বিন্দুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবটা নিতান্ত অপরাধীর মত।

বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

মাধব তার পাশে বসিয়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, "দেখ, ও পোলাপান, ওয়ার লিগ্যা তুমি—"

বিন্দু গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পোলাপান না পোলা-পান—সাতটা বুড়ীর হাড্ডি ও চাবাইয়া খাইবার পারে। উ কি এমুন হারামজাদী! মিছামিছি আমারে এমুন ফৈজতটা করাইল! আমি কিচ্ছুই করি নাই—তবু গেরামসুদ্দা লোক আইস্যা আমারে এমনি ফৈজত কইরা গ্যাল।" বলিয়া বিন্দু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মাধব তার হাত ধরিয়া বলিল, "আরে ছিঃ! তুমিও দেখি পোলাপানের নাহাল কর—কি হইচে কি? ইয়ার লিগ্যা কাঁদন কিসের? তোমারে কে কি কইচে? আরে ছি! হইছে—আর কান্দন লাইগ্বো না। থাম গা—যাও উঠ—কাম করগা—বুঝছ নি। দেহ তো—আবারো কান্দে! আরে, পোলাপানের লগে কাইজ্যা কইরা কান্দে কেডা?" ইত্যাদি ছন্দোবন্ধে মাধব তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর বিন্দুর ক্রোধ প্রশমিত হইল। ইহার পর শারদা নিতান্ত ভালমানুষের মত বিন্দুর পিছু পিছু ঘুরিয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। বিন্দু বসিয়া তাকে সুতায় মাড় দেওয়া ও লাটাইয়ে সুতা জড়ান শিখাইতে লাগিল; শারদা নিতান্ত অনুগত ভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে লাগিল।

মাধব দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, শারদা ভারী লক্ষ্মী মেয়ে—দোষ সব বিন্দুর! ভাবিয়া তার ভারী অস্বস্তি বোধ হইল। বিন্দু যদি এমনি করিয়া বিনা দোষে বধূর উপর অত্যাচার করিতে থাকে তবে—সংসারে টেঁকাই দায় হইবে!

শারদার হিংসা পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হইয়াছিল। বিন্দুকে সে যতটা নাকাল করিয়াছে ইহা তাহার আশার অতীত। ইহাতে সে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাই এখন বিন্দুর সঙ্গে বেশ সদ্ভাবের অভিনয় করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নাই।

কিন্তু কয়েক দিন পর আবার তার ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিল। শারদা রোজ রাত্রে সকাল সকাল ঘুমাইয়া পড়ে, এবং ওঠে একটু বেলায়। সেদিনও আহারের পর শারদা বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাধব তখনও তাঁত চালাইতেছিল, বিন্দু সংসারের কাজ সারিতেছিল।

শারদা ভয় পায় বলিয়া রাত্রে ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

রাত্রে যখন শারদার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল বিছানার অপর পার্শ্বে মাধবের পাশে শুইয়া আছে বিন্দু।

শারদা তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল। প্রদীপটা একটু উস্কাইয়া দিয়া সে দেখিল যে তার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য! তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল।

মাধবের প্রতি তার প্রেম, ভালবাসা বা লোভ তখনও মোটেই জন্মে নাই। কিন্তু বিন্দু যে এমনি করিয়া শারদার অধিকারের ক্ষেত্রের ভিতর অনধিকার-প্রবেশ করিবে ইহা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না।

সে কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া ভাবিল। তার পর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বুদ্ধি স্থির করিল।

বিন্দু একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। সে কাঁথাখানা ঘরের এক কোণায় পড়িয়া ছিল। শারদা পা টিপিয়া কাঁথাটি সংগ্রহ করিয়া দেখিল তার এক পাশে দুইটা ছুঁচ ফুটান আছে। ছুঁচ দুটি সংগ্রহ করিয়া সে অতি সন্তর্পণে বিন্দুর কাছে গিয়া বসিল। বিন্দু পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল। যে কাঁথায় বিন্দু শুইয়া ছিল শারদা তার ভিতর ছুঁচ দু'টি এমনভাবে গাঁথিয়া রাখিল যে, বিন্দু একটু নড়িলেই ছুঁচ দুটি তার পিঠের ভিতর ফুটিয়া বসিবে।

তার পর নিজের জায়গায় আসিয়া নিতান্ত ভাল-মানুষের মত সে শুইয়া পড়িল, এবং অনেকক্ষণ বিন্দুর চীৎকারের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থাকিয়া সে শেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পর বিন্দু প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাধব ও শারদা দুজনেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিন্দু পাশ ফিরিতেই তার পিঠে ছুঁচ দুটি ফুটিয়া গিয়াছিল—অমনি সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। ছুঁচ কাঁথায় গাঁথা ছিল, পিঠে হাতড়াইয়া তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিন্দু অনুমান করিল তাকে সাপে কামড়াইয়াছে। তাই সে একেবারে হাঁউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল!

মাধব বিন্দুর কথা শুনিয়া বাতি লইয়া সাপের সন্ধান করিতে লাগিল। শারদাও তার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানে গিয়া দেখিতে লাগিল, এবং সবার অলক্ষিতে সে ছুঁচ দুটি সরাইয়া ক্রমে তাহা যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। সাপ দেখা গেল না বটে, কিন্তু বিন্দুর পৃষ্ঠে কাছাকাছি দুইটা ক্ষত দেখা গেল, দু ফোঁটা রক্তও দেখা গেল।

মাধব উন্মত্তের মত ছুটিয়া লোক ডাকিতে গেল।

দেখিতে দেখিতে সাপের ওঝা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভয়ে বিন্দুর হাত পা ছাড়িয়া আসিল, তার মাথাটা টলিয়া পড়িল।

ওঝারা চিকিৎসা আরম্ভ করিল!

শারদার অন্তর আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। এমনটা যে হইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই! তার উদ্দেশ্য ছিল বিন্দুকে সুধু ছুঁচের খোঁচা খাওয়াইবে। তার চক্রান্তের ফলে যে বিন্দুকে সাপে কামড়ান সাব্যস্ত হইবে এ কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এ আনন্দের বেগ আপনার ভিতর ধারণ করিয়া কি রাখা যায়? গোপাল থাকিলে তাকে কথাটা বলিলে আমোদ হইত।

তার পর যাহা হইল তাহাতে শারদার আনন্দ চাপিয়া রাখা দায় হইল। ওঝারা ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া কিছুক্ষণ তর্ক করিতে লাগিল। একজন বলিল, সর্পাঘাত নয়, এবং ঠিক সেই জন্যই অপর ব্যক্তি বলিল, ইহা নিশ্চয় সর্পাঘাত। তার পর বিন্দুর মাথা যখন টলিয়া পড়িল, তখন উভয়েই সর্পাঘাতের চিকিৎসা আরম্ভ করিল। চিমটি কাটিয়া কাটিয়া তারা বিন্দুর হাত পা ও অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। ক্ষতস্থান কাটিয়া পোড়াইয়া দিল। মাথায় কলসী কলসী জল ঢালিতে লাগিল, আর, একটা গামছায় কতকগুলি ঔষধ বাঁধিয়া বিন্দুর মাথার উপর তাহা দিয়া ঠাঁই ঠাঁই করিয়া মারিতে লাগিল।

প্রায় আধঘণ্টা এইরূপ চিকিৎসার পর উভয় চিকিৎসক সাব্যস্ত করিল যে বিষ নামিয়া গিয়াছে—এ যাত্রা বিন্দু রক্ষা পাইল!

শারদা তখন আসিয়া মহা ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বিন্দুর জন্য একখানা পাটি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিয়া বিন্দু শুইলে তার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

লোকজন সবাই চলিয়া গেলে মাধব স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতে বসিল।

বিন্দু ও মাধব দুজনেই বলিল, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। শারদার হাসি চাপা দায় হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

উৎকলের প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদ

শ্রীজগৎমোহন সেন বি-এস্‌সি, বি-এড

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈদেহীশবিলাস—কবিবর উপেন্দ্র ভঞ্জ

আলোচ্য কাব্যের আখ্যান-বস্তু যে রামায়ণের এক অংশ, সেটা বলা বাহুল্য। যে কবির রচনা আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনি প্রাচীন উৎকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিগণিত। তাঁর নাম বাঙালী পাঠকের অজ্ঞাত নয় বলেই আমার বিশ্বাস। এমন কথাও শোনা যায় যে তিনি "কর্ণাটরাজপ্রিয়া"র মত বলেছিলেন "তেষাং মূর্দ্ধি দধামি বাম চরণং।" নীচের পংক্তি ক'য়টি অনেকেরই জানা থাকতে পারে ,—

"কহে উপইন্দ্রভঞ্জ টেকি বেনি বাহাকু।
রবি তলে কবি বোলি ন মানিবি কাহাকু॥
কালিদাস দীনকৃষ্ণ চরণে শরণ।
আউ সবু কবিঙ্কর মস্তকে চরণ॥"

[টেকি—তুলে ; বেনি—দুই ; বাহাকু—বাহুকে ; ন মানিবি—মান্‌ব না ; কাহাকু—কাহাকেও ; আউ সবু—অন্য সব]

হ'তে পারে এ উক্তির মধ্যে দম্ভটা একটু অতিমাত্রায় পরিস্ফুট, আর সেই জন্যে ভাল লাগে না ; কিন্তু যাঁরা ভঞ্জ-কবির কাব্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় দম্ভটা খুব অসঙ্গত বা অনর্থক নয়। "উড়িষ্যার চিত্রে"র শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার ভঞ্জকবির কবিত্বকে বলেছেন আভিধানিক ; উড়িয়া ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অল্প-অভিজ্ঞ সমালোচকের পক্ষে ঐ মন্তব্যটাই স্বাভাবিক। কারণ কবি অতিমাত্রায় অলঙ্কার-প্রিয়। অলঙ্কারের স্তূপ সরিয়ে অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পতে হ'লে পাঠককে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। এ কথা এ যুগের তরফ থেকে।

কিন্তু ভঞ্জকবি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কাব্য পড়লে মনে হয়, সে যুগে অলঙ্কারেরই প্রাধান্য বেশী ছিল। পাঠক সম্প্রদায় তখন হয় ত কাব্যের অন্তরঙ্গের চেয়ে বহিরঙ্গের ঝলমলানিটাই বেশী লক্ষ্য করতেন, আর তাও হয় ত কতকটা স্থূল ভাবে।

কবি অনেক ক্ষেত্রেই গণেশের উপাসক। এ গণেশ যে কে, এঁর স্বরূপ যে কি, তা এ যুগের গণমনস্তত্ত্বে (Mass Psychology) অভিজ্ঞ পাঠককে স্পষ্ট করে না বললেও চলে। বাগদেবীর আরাধনা অন্তরের অন্তঃপুরে নিভৃতে চলতে পারে ; মনের নিকুঞ্জে যে সৌরভে সুন্দর ছোট ফুল ফোটে, বাণীর চরণে তার অনাদর হয় না। কিন্তু গণেশের জন্য টক্‌টকে লাল জবার ব্যবস্থা আছে। কারণটা সম্ভবতঃ এই যে হেরম্ব গজাননের শ্রেষ্ঠাঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব উচ্চ নয় ; —আমরা বলি গজমূর্খ।

সম্ভবতঃ এই কারণেই বৈদেহীশবিলাসের কবি গোড়াতেই চড়া সুর ধরেছেন ;—চমক লাগাবার জন্যে। প্রথম শ্লোক দু'টি দ্ব্যর্থক,—তাতে একসঙ্গে বিষ্ণু (রাম) এবং রামের বংশের আদিপুরুষ সূর্য্যের বন্দনা করা হয়েছে,—

"বন্দই দীনবান্ধব* হরি,
যে তম-চক্র-খণ্ডনকারী,
সদা কমলানন্দ-বিস্তারি,—
স্বভাবে ঈন যে।
বিভু অনন্ত-অঙ্ক-বিহারী,
কর প্রতাপ যার সঞ্চরি,—
নিশাচরঙ্ক উল্লাস হরি,—
পূজে সুমন যে।
বইনতেয় যাহা অগ্রতে স্থিত যে।
বইকুণ্ঠ পঙ্কক লোক তোষিত যে।

* সূর্য্যের বেলায় "দিনবান্ধব" হবে।

বিকাশ অখণ্ডিত মণ্ডলে
সিংহ ভাবরে—ক্রীড়িত কালে
ভবে তরণী† হোই মণ্ডলে
গিরি-উদিত যে। ১।
বিহিত যেহু রোহিত মূর্ত্তি
শ্রুতি রঞ্জন কারক অতি
হংস হোইণ যাহা প্রশস্তি
অছি প্রবর্ত্তি যে।
বিহার রূপ যাহার পুণি
দ্বিজচক্র যা দর্শন গুণি
আত্মভূ-পর সংসারে ভণি
কি শুভ্রকীর্ত্তি যে।
বুধজনক শিরোভূষণ যেহি যে।
বিনয়রু সে আন বাণী ন কহি যে।
বলি যাহাকু সর্ব্বদা নাহি
দীপপ্রসন্ন করন্তা সেহি
পুণত ধর্ম্মস্বরূপ প্রাহি
কি স্তুতি তহিঁ যে। ২।"

মূলের ভাষা, ভঙ্গী এবং ছন্দ যথাসাধ্য বজায় রেখে এর বাংলা ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ নিচে দিচ্ছি।

বন্দিনু দীনবান্ধব হরি, নিখিল মূঢ়তা খণ্ডন করি,
কমলা হৃদয় মণ্ডন করি প্রভু প্রতিষ্ঠা যাঁর।
বিভু যিনি, 'শেষ' যাঁহার শয়ন, অমিত
প্রতাপে নিশাচরগণ
ত্রস্ত সতত; যাহার চরণ অর্চ্চিত দেবতার।
বিনতা তনয় নিত্য সেবক তাঁর,
বিষ্ণু,—নিখিলশরণ, বিশ্বাধার,
বসতি তাঁহার নিখিল ভুবনে;
নমি নীলাচলবাসী নারায়ণে,—
শিষ্টপালন, দুষ্টদলনে নরহরি অবতার। ১।
বন্দনা করি রোহিত মূরতি, বেদোদ্ধরণ, আশ্রিতগতি,
পরমহংস নামে প্রশস্তি গায় সারা সংসার।
বিরাট স্বরূপে তাঁর আরাধনা; বেদাধ্যায়ীর
পরম সাধনা;
স্বয়ম্ভু তাঁর করেন কামনা অমলিন মহিমার।
বিধু শিরোশোভা যে পরম দেবতার
বিনতি করেন তিনিও চরণে তাঁর।
বলি-সংঘের দর্পদলন, আর্ত্তগজের ভীতিবিমোচন
কি করিব তাঁর কীর্ত্তিকথন, দীনা এ
বাণী আমার। ২।

অনুবাদে কেবল বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। দু'এক জায়গায় বানানের পরিবর্ত্তন করে, কোথাও সন্ধি বা সমাসের পরিবর্ত্তন করে এবং অভিধানের সাহায্য নিয়ে এই বন্দনাকে সূর্য্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায়; যেমন:—

দীনবান্ধব—দিনবান্ধব। কমলা + আনন্দ—কমল + আনন্দ। ঈন—সূর্য্যের একটী নাম। অনন্ত = আকাশ। নিশাচর—পেচক। সুমন = পণ্ডিত। বৈনতেয়—সূর্য্য-সারথি অরুণ। বৈকুণ্ঠ = ইন্দ্র। ইত্যাদি। আবার, বুধ-জনক শিরোভূষণ = বুধজনক (চন্দ্র) যাঁর শিরোভূষণ কিংবা বুধ (পণ্ডিত) জনক (= বিশ্বপিতা মহাদেব) তাঁর শিরোভূষণ যে, অর্থাৎ চন্দ্র।

আগেই বলেছি যে, উড়িয়া শ্লেষে সংস্কৃতের কড়া নিয়ম নেই, সুতরাং সে দিক দিয়ে এর বিচার আমরা করব না। কিন্তু সহৃদয় পাঠক হয় ত এর ভেতর কবির শিল্প-কলার পরিচয় পাবেন। চিত্রশিল্পী যেমন রেখা এবং রঙকে আশ্রয় করে চিন্তা করেন, এখানে শব্দশিল্পী কবির কল্পনা তেমনি শব্দকে আশ্রয় করেই রূপ পেয়েছে। শ্লেষালঙ্কারকে সর্ব্বত্র হয়ত কাব্যের বহিরঙ্গে চাপানো চলে না। এর মধ্যে একটা আবিষ্কারের আনন্দ, একটা বিস্ময় অনুভূতির আভাষ আছে। আনন্দটা এক ঢিলে দুই পাখী মারার আনন্দের মত,—অবশ্য হত্যার বীভৎসতাটুকু বাদ দিয়ে। তাই শ্লেষ নীরস হয় না। রচনার মধ্যে কবি সেই অনুভূতি, সেই আনন্দটুকু হয় ত অনেক ক্ষেত্রে দিয়ে যেতে পারেন না,—পাঠককে সেটা নিজের মন থেকে জোগাতে হয়। তবে সেজন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা চাই।

বিশেষ করে প্রাচীন কাব্যে রসাস্বাদের আনন্দকে সম্পূর্ণ করতে হলে অর্থবোধের ব্যাপারটা একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সিরাপ আর এসিডের অম্লমধুর স্বাদ

† সূর্য্যের প্রতি আরোপ করতে গেলে "তরণি" হবে।

বেশ, কিন্তু তাতে যখন ক্ষার (sodi bicarb) মেশে, তখনই সেটা ভর্‌ভর্‌ করে ফেনিয়ে ওঠে। অর্থবোধ অনেকটা এই ক্ষারের মত।

বৈদেহীশবিলাসের কবি খুবই শব্দাড়ম্বর এবং অলঙ্কারপ্রিয়। এর একটা কারণ আগে বলেছি, অন্যটা সম্ভবতঃ তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কবিদের প্রভাব। কবি একটু দোটানায় পড়েছেন। হয় ত এইজন্যেই উদ্ভট শ্লোকের আভিধানিক হাস্যরস বা অদ্ভুতরস তাঁর রচনায় শ্লেষকে আশ্রয় করেছে। অহল্যা উদ্ধারের পর রাম যখন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলা যেতে গঙ্গার কূলে এসেছেন, তখন ত্রিপথগা গঙ্গার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন,—

"বিতলক্ আলিঙ্গন করি জাহ্নবী শোভন
হরে সুরবরতাপ চারুধারা সে।
বহে মকর-কেতন উচ্ছন্ন রতি সমান
পূরিত হোইছি পুণি অশেস রসে।
বিন্ধ হৈমবতী পদরে।
বিষকণ্ঠ তোষদানী বেনিমতরে। ১।
"বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদ ইকার ভেদ শবদ
তরণীর গতাগত তহিঁ উচিত।
বিশারদ সে সামন্ত মণ্ডরে দাস সেবিত
ডাকু ন শুনন্তে রঘুনাথ কথিত,
'বিষধর প্রায়ে কি তুহি?
বেলে নেত্র ঢালি শুন বধির নোহি'। ২।
"'বধির তুহই বীর' বোইলা তাহিঁ ধীবর
'শুনিলিণি পথরে পথর অবলা।
বালি পড়ি তো চরণুঁ, আশঙ্কা উপুজে এণু
নউকা নায়িকা হেলে বুড়িব ভেলা।
বৃত্তি এ মো পোষে কুটুম্ব
বসাই ন দেবি পাদ ন ধোই নাব।' ৩।"

অনুবাদ :—

স্বরগ পাতাল ধরা সুরবর তাপহরা
চারুধারা সন্তাপ বারিণী বারি—
মকর-কেতন দহে শীতলিতে রতি বহে,
মকরের নিকেতন সরসা ঝারি।
হিমবান-নন্দিনী অভয়া
বিষকণ্ঠেরে চিরসদয়া।
বিষ্ণুপদ, বিষ্ণুপদী 'ঈ'কারে প্রভেদ যদি,
তরণি না, তরণীর উচিত থাকা
নাবিকদের সর্দ্দার অধিক গরব তার
বিফল হইল তারে যতেক ডাকা।
রাম ক'ন, "বিষধর যদি হে,
নয়ন ফিরাও দেখি এদিকে।"
নাবিক কহিছে, "বীর! নহি হে নহি বধির,
তোমার আচার নাই শুনিতে বাকী,
পথের পাথর ধরে অবলা করেছ, মোরে,
তরণী তরুণী করে দেবে কি ফাঁকী?
ডরি তব চরণের ধূলিরে,
পা' ধোয়ালে পরে নায়ে তুলি হে।"

প্রথম অংশটা হৃদয়কে স্পর্শ করে না, পাঠকের বুদ্ধির কাছেই তার দরবার। আর সেজন্যে অভিধানের নজীর নিয়েই কবি হাজির হয়েছেন। বিতলের অনুবাদ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল করা হয়েছে; কবির উদ্দেশ্য অবশ্য প্রথম দু'টি, কিন্তু এখানে অনেকে তিনটিকেই ওর মধ্যে জড়িয়ে দেন। বি অর্থে স্বর্গ বা আকাশ, বিতল সপ্ত পাতালের একটি। এর সমর্থন করা হয় "সুরবর তাপ" কথাটির তিন রকম ব্যাখ্যা করে—(১) সুরবর—তাপ= সুরবরের (ইন্দ্র বা মহাদেবের) তাপ—স্বর্গে। (২) সুর= বরতাপ=সুর (সূর্য্যের) বরতাপ বা প্রখর তাপ —পৃথিবীতে। (৩) 'সু'—রবর তাপ এ কথাটা সংস্কৃত নয়, একেবারে উড়িয়া। মানে হয় "সু" (ফোঁস্) রব (শব্দ) যার, তার তাপ অর্থাৎ সর্পরাজ বাসুকীর তাপ—পাতালে। "বিষকণ্ঠ" কথাটারও দু'রকম অর্থ হয়, (১) বিষকণ্ঠ মহাদেব, (২) বিষ (মৃণালের মত) কণ্ঠ যার তেমন পাখী। চারুধারা=শচী।

এর মধ্যে রতিকামকে যে কবি কেন টেনে এনেছেন তা বোঝা যায় না; আর এনে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তাও নয়। হয়ত এটা তাঁর অতিরিক্ত শৃঙ্গাররসপ্রিয়তার লক্ষণ।

তার পরে রাম এবং ধীবরের পরস্পরের প্রতি পরিহাসটুকু বেশ। "বিষধর" এই জন্যে যে সাপের এক নাম চক্ষুঃশ্রবা। কথাটার মধ্যে নাবিকের কুটিলতার প্রতি একটু কটাক্ষও আছে।

শ্লেষের কথা এত বেশী করে বলছি এই জন্যে যে বৈদেহীশবিলাসে শ্লেষের প্রয়োগ অত্যন্ত বেশী। এই সব শ্লেষের সিঁড়ি ভেঙে না উঠলে তাঁর কাব্যচন্দ্রের সুধার আস্বাদ পাওয়া যায় না। শ্লেষের আশ্রয়ে কবি নিসর্গ-বর্ণনা করেছেন, আবার চরিত্র-চিত্রণও করেছেন।

নিসর্গ-বর্ণনার আলোচনা পরে হবে। প্রথমে চরিত্র চিত্রণের জন্য বনবাসের দু' একটা দৃশ্য দেখা যাক্।

"বোইলে সীতা সিতাংশুমুখী একদিনে অতিদীন হোই।
বিহি বিহিলা বনবাস বাসরে নৃপতি হেবার যাইঁ।
বিলসাই যথা অলকা তেজাই ঈশ্বরঙ্ক শমশানে।
বিষ্ণুঙ্ক রতন পল্যঙ্ক ছড়াই জড়াই সর্পশয়নে। ১।
বিসোরি ন পারে বিধি অবিধিকি কি পাইঁ
বোলাএ বিধি।
বসাই কোঁলে শ্রীরাম কহে ভোলে রসাই লাবণ্য নিধি।
বিরঞ্চি একান্ত কেলিকি বিরচি গউরী কমলা সঙ্গে।
বিজনস্থান বোলিটি তোতে মোতে বনে বিহরাই রঙ্গে ২।
বিবেক কর রসিকা রসিকর এথিরু অছি উৎসব।
বৃষভাষা তেজি মলয় পর্ব্বতে বসন্তে আসে বাসব।
ব্রহ্মলোক ছাড়ি সেহিপুণি লোড়ি গন্ধমাদন শিখরী।
বিভবুঁ আন্তর সুরস প্রবীণা কি উণা অছি কি করি।৩।
বিহরি সউধ সদনে, বিহরি সউধ সদনে ধন।
বেঢ়ি ডাকুথান্তি কঞ্চুকীন, বেঢ়ি ডাকুছন্তি কঞ্চুকীন।
বসিথাই চন্দ্রাতপ তলে, বসিথাইঁ চন্দ্রাতপ তলে।
বেষ্টিত যে সহচরীকুলে, বেষ্টিত যে সহচরীকুলে।৪।
বুলিবা থিলা জগতীরে, বুলিবা জগতীরে হেলা ঘেন।
বিলোকু থাইঁ চিত্রলেখা, বিলোকুথাইঁ চিত্রলেখা পুণ।
বিক্ষিপ্ত শেষে রজনীকর শেষে বিক্ষিপ্ত রজনীকর।
বোধক সুকবি গির হেউথিলা, বোধক শুক-বি-গির।৫।
বারে বারে দেখি ভদ্র উৎসবকু, ভদ্র উৎসবকু দেখি।
বিশেষ খদির চলিত, বিশেষ খদির চলিত সখি।
বিঘ্ন নোহে তথি অক্ষলীলা, এথি বিঘ্ন নোহে অক্ষলীলা।
বসিথান্তি সাক্ষী সুশীলা, অছন্তি এবে ত শাখী সুশীলা।৬।
বশ করুথিলা চিত্ত ক্ষীরপান, বশ করে ক্ষীরপান।
বোলা শুনুথাই আনকস্বনকু, শুনিবা আনকস্বন।
বধিরে গন্ধর্ব্বে গায়ন করন্তি, বোধন্তি সুমনা বাসে।
বধিরে গন্ধর্ব্বে গায়ন করন্তি, বোধন্তি সুমনা বাসে। ৭।
বান্ধবি, এথিরে দেখা যাউনাই নাচিবার—নৃত্যকারী।
বেণী নাসামণি রমণীমণিরে নচা অনুগ্রহ করি।"

* * * *

(বিংশ ছান্দ—রাগ বঙ্গলাশ্রী)

অনুবাদ :—

কহিলেন সীতা, মর্ম্মপীড়িতা, মলিন চন্দ্রমুখ।
"অভিষেক হ'ল উপহাস, বিধি বনবাসে দিল দুখ।
অলকা হইতে দিল ভগবানে শ্মশানে নির্ব্বাসন।
গোলোক ছাড়ায়ে সাগরে করেছে শেষশায়ী নারায়ণ।
হেন নিদারুণে বিধি কেবা বলে, অবিধি ত তার সব।"
"বান্ধবি," অতি মধুর ভাষণে হাসিয়া ক'ন রাঘব,
"জানকি, জানো কি কেন তা করেছে?
নহে ত সে দিতে দুখ;
উমাশিব আর রমা-মাধবের নিভৃত মিলন সুখ
করেছে নিবিড়; আমাদেরও তাই হেথায় বিজন বনে
জীবন যাপন করেছে বিধান, রেখোনা বেদনা মনে।
জানো ত বাসব মধুমাসে কেন মলয় শিখরে আসে,
আপনি বিধাতা গন্ধমাদনে কেন রয় পরবাসে!
মোদের বিভব সমারোহে হেথা ক্রটি ত দেখিনে কিছু,
সব উৎসব থাকে, জেনো সখি, প্রেমিকের পিছু পিছু।
সৌধসদন ছেড়েছি, হেথায় পেয়েছি সাধুর সঙ্গ;
কঞ্চুকী নাই? নাগ ও নাগিনী নিতি করে কত রঙ্গ।
নকল চাঁদোয়া কি হ'বে? এখানে চন্দ্র-আতপ পাই;
সহচরীদের সততই দেখি যখন যেদিকে চাই।
ভবন ছেড়েছি, লভিয়াছি সারা ভুবনের অধিকার,
এত শোভাগারে চিত্র লেখার অভাব কি আছে আর?
রজ বা রজনীকর,—তাও দেখ ছড়ানো সকল খানে;
সুকবির গান? ঐ শোন শুক কি কয়,—পশিছে কাণে।
তোমার বিলোল আঁখির বিলাসে অক্ষবিলাস ম্লান,
কত উৎসব জাগাইছে শোনো নীলকণ্ঠের গান।
বাদলে বাদলে মাদল বাজিছে, দুলিছে খদিরশাখী,
ফুলে ফুলে জাগে মাতাল সুবাস ডালে ডালে গায় পাখী।
সখি, শুধু দেখি একটি অভাব নর্ত্তকী নাই কোথা,
বেণী, নাসামণি নাচাও, নয়ন লভুক সার্থকতা।

রামের এ শান্ত সদানন্দ অভিরাম মূর্ত্তিটি সত্যই অতি

সুন্দর,—কিন্তু অভিধানের পাতার মোড়ক না খুললে সহজে চোখে পড়ে না।

রাম যখন শূর্পণখার নাসাচ্ছেদন করতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিচ্ছেন, তখনো তাঁর এই মূর্ত্তি। সীতার ভয়-ব্যাকুলতা, বিপদের আশঙ্কা কিছুই তাঁকে বিচলিত করেনি। কিন্তু দোষ একটু হয়েছে অন্য কারণে।

শূর্পণখার জোর জুলুমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাম তার হাত দিয়েই লক্ষ্মণকে এই লেখা পাঠালেন,—

"বাবু, নাকশিরীদান যোগ্য যোষাকু।
বিহর কানন, কর আলিঙ্গনকু॥
বইদেহী দাসী এ কি যেনি হোইব।
বিধিরে ইন্দ্রপ্রশংসা তুম্ভে পাইব॥"

(ত্রয়োবিংশ ছান্দ,—রাগ চিন্তাদেশাক্ষ)

[বাপূ লক্ষ্মণ, এ নারীকে (নাকশিরী) স্বর্গশ্রী দান করা উচিত। তুমি একে আলিঙ্গন করে কাননে বিহার কর। এর ত বৈদেহীর দাসী হওয়া সাজে না। তুমি (একে বিবাহ করলে) ইন্দ্রের সম্পদ যথাবিধি লাভ করবে।]

অন্য অর্থে:—(সভঙ্গ এবং অভঙ্গ দুরকম শ্লেষই প্রয়োগ করেতে হবে)

"বাবু, নাকশিরীদান যোগ্য যোষাকু।
বিহর কাণ, ণ কর আলিঙ্গনকু।
বইদেহীদাসী এ কি যেনি হোইব।
বি-ধীরে ইন্দ্র প্রশংসা তুম্ভে পাইব।"

[বাপু, এ নারীর নাসাশ্রী (নাকশিরি) দান (ছেদন) করা উচিত। একে আলিঙ্গন না করে এর কাণ হরণ কর। (তোমার স্ত্রী হয়ে) বৈদেহীর দাসী হওয়ার যোগ্যতা এর কোথায়? (একে যদি বিবাহ করতে হয়, তবে) বি-ধীর (মূর্খ) সমাজে তুমি ইন্দ্রত্ব লাভ করবে।]

কিন্তু শূর্পণখা বাচ্যার্থটাই ধরে নিল,—

"বোধ মতি, কামান্ধে ন বুঝি হসিলা।
বাহুড়াইবে নাহি যে আউ ভাবিলা॥
বোলে দাশরথি "নাহি নাহি" তক্ষণ।"

* * * *

[শূর্পণখা এর আগে একবার লক্ষ্মণের প্রত্যাখান লাভ করেছে, তাই এবার একটু আশান্বিতা হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এবার ত' আর তিনি আমাকে ফেরাবেন না?" রাম বললেন, "না না," এখানেও শ্লেষ আছে; আসলে রাম বললেন, "না নয়।" অর্থাৎ "ফেরাবেন না'র 'না' টা নয়।

এর পরে কবি কামাতুরা শূর্পণখাকে নিয়ে একটু নির্দ্দয় রসিকতা করেছেন। নাসাকর্ণ ছেদনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে লক্ষ্মণের মুখে দু' একটা কঠিন কথা বসালে বোধ হয় ব্যাপারটা একটু সহজ হ'ত আর শোভনও হ'ত। কিন্তু কবি যে রসিকতাটুকু সুরু করেছেন তাকে আর একটু ফেনিয়ে তোলার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়হীন হয়ে গেছে।

লক্ষ্মণ শূর্পণখার কেশাকর্ষণ করে যখন মাটিতে ফেলছেন, তখনও মুগ্ধা রাক্ষস রমণী জানে না, কি তাঁর উদ্দেশ্য। সে স্থির করেছিল এদের দেশে প্রণয়ের এই বুঝি রীতি; তাই সে পরিপূর্ণ ভাবে লক্ষ্মণের হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল।

এখানে কবি যে কেবল লক্ষ্মণ চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছেন, তা নয়, নিজেও অনেকখানি নেমে গেছেন। রামও নিজের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি। কাব্যের এই অংশটি আর ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়নের ব্যাপারটি কাব্যের কলঙ্ক। ঋষ্যশৃঙ্গের কথা পরে বলব, কারণ সেই সঙ্গে বাংলার অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে।

নিসর্গ-বর্ণনায় কবি যে শ্লেষের প্রয়োগ করেছেন, তাতেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল দু' তিনটি উদাহরণ দিলেই চলবে।

১। চিত্রকূটের বন-বর্ণনা,—(অষ্টাদশ ছান্দ; রাগ বিভাস গুর্জ্জরী)

"বন্ধ্যা শিখরীর তহিঁ বিপ্রলব্ধা প্রায় হোই
রুষিবার প্রবর্ত্তাই অছি যে।
বিটপ প্রকম্প কর সঙ্গতি সহচরীর
পুর অভিমুখর হোইছি যে। ১।
বিরস খণ্ডিতা সেই পিকবাণীরে ছলাই
প্রবৃদ্ধি করই মদনকু যে।

বিম্পরশ কর সঙ্গ পয়োধর ফল তুঙ্গ,
পুরুষ প্রকাশি রঞ্জনকু যে। ২।

অনুবাদ :—*

বনানী সে গিরিশিরে, কপট নাগরে ফিরে
ফিরায় মরমাহতা ভামিনী।
কাঁপায়ে বিটপ-কর বিটপে জানায়, 'সর'
সহচরীসনে পুর-গামিনী।
কোকিল-কূজন ছলে স্খলিত বাণী কি বলে,
মানিনী বাড়াতে শুধু তিয়াসা ;—
"তুঙ্গ পয়োধর ফল পরশনে কেন ছল ?
কপট ! মিটাতে চাও কি আশা ?"

অল্প কথায় বনের একটা বিশিষ্ট রূপ বেশ ফুটেছে। কবি যেমন দেখেছেন, তেমনি এঁকেছেন। কিন্তু মনে হয়, কল্পনা একটু ক্লিষ্ট। মনে হয় এই জন্যে যে, কবি বেশী করে লক্ষ্য করেছেন শব্দগুলোর ধ্বনিরূপকে, বনের রূপ তাঁর মনে তেমন বেশী প্রভাব বিস্তার করে নি। বিপ্রলব্ধা নায়িকার কথা মনে আনতে পারে, এমন জিনিস আসল বনের কোনোখানে নেই, আছে ঐ বিটপ, সহচরী, পুর, তুঙ্গ, পয়োধর প্রভৃতি শব্দদের মধ্যে। এটা আমরা সাধারণ ভাবে বলতে পারি।

ব্যক্তিগত ভাবে ধরতে গেলে এমনও হতে পারে যে কবির মনে বনের সঙ্গে নায়িকার, মনস্তত্ত্ব যাকে association বলে, তাই আছে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করতে হ'লে জানা চাই উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি দেবার ইচ্ছা আসে কেন ?

মন একটা Messএর মত। তার বাসিন্দারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে, কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের আপনার জনকে চেনে না। আগন্তুক কেউ যদি আসে, অন্যেরা তাকে আমল দিতে চায় না, কিন্তু যখন মেসের সেই মেম্বর, যার কাছে সে এসেছে, তাকে দেখতে পায় অমনি সাগ্রহ নিমন্ত্রণ তার উদ্দেশে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ক্রমে সে অনেক নূতনের সঙ্গে পরিচিত হয় যে 'অমুকের নিজের লোক।' এইটিই তখন তার প্রধান পরিচয়,—কুলশীলের বালাই তেমন নাও থাকতে পারে। তবে সেটাও সময়-বিশেষে বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে।

সৌন্দর্য্যানুভূতি অনেক সময়ে এই পরিচয়টুকুর অপেক্ষা করে। বনাকীর্ণ পোড়ো বাড়ী, আগাছায়, ঝোপে চারি দিক ভরা। তার মধ্যে একটা করুণ আবেদন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে স্বরতরঙ্গ বার বার মনে আঘাত করে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। চোখ তাকে রোজই দেখে, কিন্তু পরম উপেক্ষার সহিত। সকলের কাছেই তার প্রার্থনা নিষ্ফল। কারণ সকলের মনের দ্বারে সে তখন পর্য্যন্ত অপরিচিত আগন্তুক,—কে তার ব্যথার সন্ধান নেবে ? যে নিত, সে তখন অন্দরের কোনো এক ঘরে দরজা এঁটে রয়েছে।

কিন্তু এমন এক সময় আসে যখন তার সে পরিচিত মরমীর দরজা খুলে যায় অকস্মাৎ। সে দেখেই তাকে চিনে নেয়। তখন সারা মন জুড়ে তার জন্য সম্বর্দ্ধনার ধূম পড়ে যায়,—পরিচয়ের ফল। তখন সে শুধু আগাছার জঙ্গলে পরিত্যক্ত চূণ-বালি-খসা ইট-কাঠ নয়, তার জঙ্গলের পাশে তখন হয় ত শ্মশান জেগেছে, আর তার পাশে দাঁড়িয়েছে হয় ত কঙ্কাল। এই শ্মশান আর কঙ্কাল তার মরমী, কিন্তু তারাই এত দিন মনের অন্তঃপুরে রুদ্ধ ছিল, এখন তাকে হয় ত সার্টিফিকেটের মতই লিখে দেবে "পোড়ো বাড়ীটা কঙ্কাল যেন। পাঁজরের হাড়ের মতই জিরজির করছে তার চূণ-সুরকি-খসা ইঁট কাঠ।" ইত্যাদি। কারণ জানি সে এই পরিচয়ে আমার মনে যখন প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে, তখন অন্যের মনেও তার আবেদন ঐ সার্টিফিকেটের জোরে গ্রাহ্য হবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই যে হ'বে এমন কোনো কথা নেই। যেখানে হ'বে না সেখানে 'কঙ্কাল' তার অপরিচিত বা অল্প-পরিচিত। অনেক স্থলে তার কুলশীলের, তার অতীতের খোঁজও পড়তে পারে। যদি তার গৌরবময় অতীতের সার্টিফিকেট্ কেউ তাকে দিয়ে থাকেন, তবে সেখানেও সে আদর পাবে,—"ও, তুমি অমুকের সন্তান। তাকে যে খুব চিনতাম হে। আরে, এস, এস।"

দেখা যাচ্ছে, associationএর ব্যাপারটা অনেক পরিমাণে ব্যক্তিগত। তবে এমন হ'তে পারে, সমষ্টির

---

* বিটপ—শাখা বা লম্পট। সহচরী—সঙ্গিনী, ঝাটি (ছোট গাছ)।—পুর—গৃহ, ঝোপ। পয়োধর—স্তন, নারিকেল।

† উড়িয়ায় "ঋষি" উচ্চারণ রুষি। কবি ঋষিদের আশ্রমকে নায়িকার দোষ বলে ব্যবহার করছেন।

অধিকাংশের মনে একই ধরণের association আছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের মনে যদি বন আর নায়িকার মধ্যে কোনো association না থাকে, তবে কবির উপমার সার্টিফিকেট আমাদের মনকে স্পর্শ করবে না। আমরা বলব কবির কল্পনা ক্লিষ্ট। কবির ব্যক্তিগত association এর প্রয়োগ এখানে তার জন্য দায়ী।

কিন্তু কবির শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা যখন দেখি, তখন মনে হয় কবি বনের রূপ হৃদয় দিয়ে দেখেন নি, বুদ্ধি দিয়ে বা পাণ্ডিত্য দিয়ে দেখেছেন ঐ শব্দগুলোর ধ্বনিরূপ। এ কথা আরও বেশী সঙ্গত মনে হয়, যখন দেখি তিনি "ঋষি"কে (উড়িয়া উচ্চারণ 'রুষি') নায়িকার রোষের সঙ্গে জড়িয়েছেন। 'বিটপ' শব্দটীর ব্যবহারেও একটু দোষ হয়েছে।

বনবাসী রাম যখন সীতার বিরহে কাতর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সেখানেও কবি বর্ষার বর্ণনা করতে গিয়ে "বিরোধাভাষ" প্রয়োগ করেছেন। এতে ওস্তাদী আছে বটে, কিন্তু কালোপযোগী হয় নি। এর মধ্যে কবির রসদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না,—যেটি পূর্ব্বের উদাহরণে আমরা কতক পেয়েছি :—

"বিরোধাভাষ প্রকটাই কবিরে বরষা সময় সঞ্চরি।
ব্যাপি শোভা দিশে ভয়ঙ্কর দিশে গরাসে ঘনাঘন হরি।
বিসর্জ্জই যে। বড় আনন্দরে জীবন।
বিধিরে কালিকা মহিষ সন্তাপ নাশি প্রমোদ
করে দান।

"বিজ্জলিত কলা স্বান অবিরতে চমক রচিলা শরভে।
বিহিত দ্বিজব্রজর কষণকু করকে পুণ সে আরম্ভে।
বৃদ্ধশ্রবার। বাণাসন যে হোই জাত।
বিহিত রোহিত স্বরূপ ত্বরিত নাকরে রঙ্গে বিহরিত।
বিষ্ণুপদ লীন হেবারে চঞ্চলা জ্যোতি প্রকাশি কলা লীলা,
বিষকণ্ঠ সুখে বিলসে কুলিশে গিরিজা সংঘাতী হোইলা।
বিলোকনে যে। বিরস যোগিএ নোহিলে।
বিকাশ পুষ্পে সুজাতি সুমনা এ মধুপ মন কু মোহিলে।
ব্রহ্মপুত্রকু ভক্ষিবা ইচ্ছা কলে বিচ্ছেদী হোইথিলা জনে।
বিচারি পথিক পদ বিসরিলে অতি উৎসুক জাত মনে।
বিহে অগতি। বহে যহিঁরে সদাগতি।
বিটপ বিনাশে সুমনরে হসে গণিকাপঙ্ক্তি দিনরাতি।
বিমল ককুভ কদম্ব ককুভ কদম্ব মলিন রভসে।
বিদিত উড়ুপ পুষ্করে উড়ুপ পুষ্করে আউ যে ন দিশে।
বনে কলে যে। বরহীশিখা টেকি নৃত্য।
বনে হেলে যে বরহি শিখা তঁহি সমস্ত পরকারে হত॥
বাহার কন্দলী ভক্ষিলে কন্দলী হোই অতিশয় লালস।
ইত্যাদি।

(২৯শ ছান্দ—রাগ কল্যাণ আহারী)

* * * *

অনুবাদ :—

ব্যাপে দিশি ঘনঘটা বিথারি শ্যামল ছটা
বিরোধ আভাষ সনে বরষা ঝরে।
ঘোর গরজন করি করী কি গরাসে হরি,—
জীবন সে দেয় ডারি পুলক ভরে।
কালিকার পরতাপ নাশিল মহিষ তাপ,
প্রমোদ লভিল বুঝি জীবন দানে;
গরজে গগন ঘিরে শরভ শিহরি ফিরে,
করকা তাড়নে দ্বিজবরজে হানে।
বাসবের বাণাসনে রোহিত রূপে গগন
বিহরি করিছে কত রাগের খেলা।
লুপ্ত বিষ্ণু-পদ চপলার সম্পদ—
দীপ্তি উলসে,—উৎসবের মেলা।
গিরিজারে হানে বাজ তাই কি আবেশে আজ
বিষকণ্ঠের ঘন নাচন লাগে?
যোগীগণ তারে হেরি হরসে মাতিল; মরি,
মধুপ সুমনাভোগী কি অনুরাগে।
চাহিল বিয়োগীজন ব্রহ্ম পুত্রাশন
পথিক ভুলিল কত পথের ব্যথা।
বহিছে অধীর বায়ু নাশিয়া বিটপ আয়ু,
হাসিয়া গণিকা সারি কহে কি কথা।
ককুভ, কদম্ব দলে অমলিন প্রভা ঝলে;
ককুভ কদম্ব দুখে মলিন বুঝি।
উড়ুপ পুষ্করে নাচে, উড়ুপে পুষ্কর মাঝে
উপরে চাহিয়া আজ বৃথাই খুঁজি।
কাননে বর্হী-শিখা মেলিল বরণ-লিখা
বনের বর্হিশিখা মুদিল বনে।

অঙ্কুরিত কন্দলীর লালসা করে অধীর
কন্দলীকুল চরে অধীর মনে।

[হরি—সিংহ, সূর্য্য। জীবন—প্রাণ, জল। কালিকা—কালী, মেঘ। মহিষ—মহিষাসুর, মহিষ। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, পক্ষী। বাসবের বাণাশন-রোহিতরূপে—ইন্দ্রের শর-ভক্ষক রোহিত মৎস্যরূপে। কিংবা বাসবের বাণাসন রোহিতরূপে—ইন্দ্রচাপ লাল রঙ্ নিয়ে। বিষ্ণুপদ—বিষ্ণুর পদ, আকাশ। চপলা—লক্ষ্মী, বিদ্যুৎ। গিরিজা—পার্ব্বতী, গিরিশৃঙ্গ। বিষকণ্ঠ—শিব, ময়ূর। যোগী—যোগী, যারা বিরহী নয়। মধুপ—মাতাল, ভ্রমর। সুমনা—পণ্ডিতা রমণী, ফুল। ব্রহ্মপুত্র—কপিল বিষ বিশেষ।* বিটপ—লম্পট, পাতা। গণিকা—বেশ্যা, যূথিকা। ককুভ কদম্ব—অর্জ্জুন এবং কদম্ব; দিক্‌সমূহ। উড়ুপ—ভেলা, চাঁদ। পুষ্কর—জল, আকাশ। বহী—ময়ূর। বর্হি—অগ্নি। কন্দলী—তৃণাঙ্কুর, মৃগ।]

অনুবাদে শ্লেষের প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে এতখানি অভিধান লিখতে হ'ল। এখানেও দেখা যাবে যে, কবি বর্ষাকে বেশী দেখেন নি, দেখেছেন শব্দকে। এর পরে রামকে বিরহী যক্ষের আসনে বসিয়ে কবি খানিকটা মেঘদূত লিখেছেন।

"বিরহের ক্ষীণ ভীরুমণি ধন ন নিঅ প্রখর পবন।
বজ্রপতন স্তনিত ন করিব প্রবেশ হেব সন্নিধান।
বারিবাহ হে। বন্ধু নবাম্বুভবী সত।
বোলিব যেমন্তে শিব শিব নিত্যে প্রবেশ হেব সন্নিধান।

*   *   *   *

বুজু নয়ন শয়নে লীলামান দিশিপ্লাই যেহু তোহর।
বেল তেত্তেক সুখ ভোগ যেতেক কউতুক জাতু মাতর।
বারিবাহ হে। বোল দুঃখী সদা নোহিলে।
বাহারে তোহর আহা করিবাকু সাহা নাহিঁ যহুঁ
অখিলে।"

ইত্যাদি পদে উত্তর মেঘের ছায়া পড়েছে বটে, কিন্তু আন্তরিকতা তেমন বেশী ফুটতে পারে নি।

"তস্মিন্ কালে জলদ দয়িতা লব্ধনিদ্রা যদি স্যা—
দন্বাস্যৈনাং স্তনিত বিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত ভূজলতা গ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥৩৬॥

*   *   *   *

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়া শ্লেষ হেতো
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু। ইত্যাদি।৪৫।
(উত্তর মেঘ)

৩৪ ছান্দে বসন্ত-বর্ণনা করতে গিয়েও কবি বিরোধাভাসের আশ্রয় নিয়েছেন। বর্ণনার ধরণ আগের মতই। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে পঞ্চাশৎ ছান্দের বর্ণনা, যখন রাম নন্দিঘোষ রথে যুদ্ধ করতে আসছেন—

"বিশ্রবানন্দন তপ উদিত পর্ব্বতরূপ
প্রতাপ দাবাগ্নি লোপ স্যন্দন-দৃশ্যে।
বরষাকাল তা কল্পে বলাহক মেঘপুষ্পে
শোভা ঘোষচক্রে ব্যাপে প্লবগ তোষে।
বিন্ধ্য ঘনে
বিরাজ রাম লক্ষ্মণ গর্জে।
বিভাজই বৃষাচাপ শর পূর্ণরে লোলুপ
চপলা গতি সংক্ষেপ নভে কি শোভে।
বিহি শরদ লক্ষণ বিদিত রামলক্ষণ
বিরাজিত ঋক্ষগণ কুমুদ তোষে।
বল হিমন্ত পর্ব্বত প্রবল বাতজনিত
হেবারু সাঞ্জু ওটিত রাক্ষস বংশে।
বিশেষরে—
বিশিষ্টরে ইসি ইসি ভাষি।
বিচাবিলা এহি * শূর—ঠারুত অসুর পর
নোহিলে কি রথবর মিলন্তা আসি ॥"

অনুবাদ :—

রাবণের তপোরবি গ্রাসিতে কাজল ছবি
উদিল কি রথবর জলদ হেন।
পরতাপ-দাবদাহ নাশিতে কি বারিবাহ?
চক্র গরজে ঘোর,—অশনি যেন।

---

* "পুংসি ক্লীবে চ কাকোল কালকূট হলাহলাঃ।
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৌক্লিকেয়ো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ।
দারদো বৎসনাভশ্চ বিষভেদা অমীনব।" (অমর কোষ)

* বৈদেহীশ বিলাসের ছাপানো সংস্করণে "শূর" পাঠ আছে। কিন্তু ওটা বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ, কিংবা সঙ্কলনের দোষ। "সুর" পাঠ হওয়া উচিত। তা' হলে মানে হয়, এ দেবতাদের চেয়েও বড় শত্রু। "শূর" (বীর) কথাটার এখানে কোনো মানে হয় না।

বলাহক হ্রেষারব মাতায়ে তুলিয়া সব
প্লবগে কি উৎসাহ বাণীতে তোষে !
রথী রাম লক্ষ্মণ ; শর নিক্ষেপে মন
প্রলপে বাসবচাপ অধীর রোষে।
অতি বেগবান রথ গতিশীল পর্ব্বত
চপলার লীলা তার চক্রতলে।
রক্ষের উদ্বেগ ; ঋক্ষ কুমুদে মেঘ
শারদ-সুষমা সম হাসায়ে তোলে।
প্রবল বাতজ হিম কাঁপন অপরিসীম
বর্ম্ম আবরে তাই অসুর দেহে।
সেনানীরা ভাবে ডরি এ আরো বিষম অরি
দেবতা দিয়াছে রথ তাইত স্নেহে।

[বলাহক—মেঘ, ঘোড়া। প্লবগ—ভেক, বানর। রাম—চন্দ্র, রাঘব। বাসব চাপ--ইন্দ্রধনু, রামকে ইন্দ্রের উপহৃত ধনু। ঋক্ষ—নক্ষত্র, ভল্লুক সৈন্য (জাম্বুবানের)। কুমুদ—শালুক, বানর সেনাপতি। বাতজ—বায়ুজাত, হনুমান।]

এখানেও অভিধান লাগে। কবি নিজের শব্দাড়ম্বর ছাড়তে পারেন নি। কিন্তু সে সব ছাড়াও এর মধ্যে উচ্চশ্রেণীর শিল্পের পরিচয় আমরা পাই। এ বর্ণনাটুকুর জন্যে কবিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। আভিধানিক অর্থবোধের ব্যাপার বাদ দিলেও এ বর্ণনার কৌশল মনে চমক লাগিয়ে দেয়। একটু সূক্ষ্ম হাস্যরসেরও সৃষ্টি কবি করেছেন,—কিন্তু তাতে সমগ্র বিষয়টী সুন্দরই হয়েছে।

একে আদর্শ নিসর্গ-বর্ণনা বলে প্রচার করতে চাইনা, কিন্তু এমন আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না, যে সহৃদয় পাঠকবর্গ কবির বিশিষ্ট ধরণের সৃষ্টিটুক যথার্থ ই উপভোগ করবেন।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩)

সনাতন আসিয়া ডাকিল—"দা-ঠাকুর, বাড়ী আছ নাকি ?"

কল্যাণী গৃহমধ্য হইতে উত্তর দিল, "তিনি বাড়ীতে নেই সনাতন, এই খানিক আগে কোথায় বেরিয়েছেন।"

সনাতন মাথার ঝুড়িটা বারাণ্ডায় নামাইয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল ; গামছাখানা খুলিয়া লইয়া গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "তুমিই একবার বেরিয়ে এসো মা-লক্ষ্মী ; এই আম কয়টা এনেছি দা-ঠাকুরের জন্যে, একটা পাত্র এনে তাতে নাও দেখি।"

একটা ঝুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া কল্যাণী বলিল, "অনর্থক নিত্যি তোমার আম বয়ে আনা সনাতন ; যাঁর নাম করে তুমি নিয়ে এসো, তিনি যে কত খান, তা আমিই জানি। দিনরাত বাইয়ে বাইরেই থাকেন,—কদাচিৎ বাড়ীতে আসেন। তা সে এমন অবস্থায় থাকেন—কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন সে জ্ঞানই থাকে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আমগুলি নিজের ঝুড়িতে তুলিতে লাগল।

সনাতন মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "বুঝি তো সবই মা-লক্ষ্মী, তবুও তো মন মানে না। দা-ঠাকুরকে গাছের জিনিস না দিলে যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না, নিজের মুখে তোলা যায় না। সেদিনে দা-ঠাকুর আমাদের বাড়ী গিয়ে এই নতুন হিমসাগর আমের ভারি প্রশংসা করেছিলেন, তাই আজ গাছ হতে পেড়েই আগে ওঁর জন্যে এনেছি।"

কল্যাণী আমের ঝুড়ি গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিয়া বারাণ্ডায় বসিল, "বোস সনাতন, দুটো কথাবার্ত্তা বলি। তোমার মেয়ের খবর পেয়েছ সনাতন ? ভালো আছে তো সে ? নাতি নাতনী ভাল আছে ?"

সনাতন উত্তর দিল, "তোমাদের মুখের আশীর্ব্বাদে মেয়ে জামাই, নাতি নাতনী সব ভাল আছে,—প্রায়ই

ওদের খবর পাই। এইবার একবার ওদের নিয়ে আসব মনে করছি। দেখি, যদি এই হপ্তায় যেতে পারি ওদের ওখানে, একদিন ছুটি করে যাব।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী বলিল, "আমাদের বাগানটা কত টাকায় বিক্রী হয়েছে এ বছরে সনাতন?"

উৎফুল্ল মুখে সনাতন বলিল, "তা অনেক টাকায় হয়েছে মা, দা-ঠাকুর সে সব কথা কিছু বলেন নি বুঝি? এ অঞ্চলে এবার কোন গাছেই প্রায় আম হয় নি। কিন্তু তোমাদের কোন গাছেই আম বাদ যায় নি,—সব গাছেই কিছু না কিছু ফল হয়েছে। অন্য বছর ঐ বাগান পাঁচ সাত টাকায় বিক্রী হয় না,—এ বছর ষাট টাকায় বিক্রী হয়ে গেছে। তারা সব টাকা এখনও দেয় নি, অর্দ্ধেক পরে দেবে কথা আছে।"

কল্যাণী গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। স্বামী একটা কথাও তাহাকে বলে নাই,—একটা টাকাও সে দেখিতে পায় নাই। এ সব টাকা কোথায় গেল,—চন্দ্রার বাড়ী কি?

"আচ্ছা সনাতন, তোমার দা-ঠাকুর আজকাল এত বাইরে বাইরে থাকেন কেন বলতে পার? আজকাল রাত্রেও বড়-একটা বাড়ী আসেন না, অথচ—"

সনাতন বাধা দিয়া বলিল, "সে সব জানি মা, আমার কাছে কোন্ কথাই বা গোপন থাকে? দা-ঠাকুরের মত মানুষ গাঁয়ে আর একটা আছে—কেউ বলুক দেখি? কোথায় কার কি হয়েছে,—সারা দিন-রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেই রোগীর পাশে কাটিয়ে দিতেন। এই মাঝের বছর তিন-চার আর সে উৎসাহ ছিল না মা, হঠাৎ আবার ফিরেছে। কোথায় কে কোন্ বিপদে পড়েছে সেই নিয়েই আবার ঘুরছেন। শুনলুম মহেশপুরে নাকি খুব মারধোর হাঙ্গামা চলেছে, দা-ঠাকুর নিশ্চয়ই সেখানে ছুটেছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "মারধর কেন চলল সনাতন, কাদের সঙ্গে হল?"

সনাতন শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "যাদের সঙ্গে যাদের হয়, আর কার সঙ্গে হবে মা? বড়লোক চিরদিনই ধনগর্ব্বে অন্ধ হয়ে গরীবকে পীড়ন করে। গরীব যদি না সইতে পারে তখনই মারধর চলে। এখানেও হয়েছে ঠিক তাই—প্রজারা জমীদারের বাকি খাজনা দিতে পারে নি, তাই জমীদারের হুকুমে ওদের সর্ব্বস্ব ক্রোক হয়ে যায়। প্রজারা অনেক সইলেও আর সইতে পারছে না,—ক্ষেপে উঠে মারধর সুরু করে দিয়েছে।"

শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বিবর্ণমুখে কল্যাণী বলিল, সেখানে—সেই বিপদের মধ্যে তোমার দা-ঠাকুর গেলেন, —কি হবে সনাতন? একে তো ও-মানুষ মোটেই সুবিধার নয়, একটু কিছুতেই ওঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাতে এই রকম ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়ে যদি আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন?"

সনাতন বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে ভয় করো না মা-লক্ষ্মী; পাঁচ ছয় বছর একত্রে বাস করেও তুমি দা-ঠাকুরকে চিনতে পার নি, আমরা এতটুকু বেলা হতে দেখছি ওঁকে, সেই জন্যেই খুব চিনি। আজই না হয় সেয়ানা হয়ে, নেহাৎ ভদ্দর লোককে নাম ধরে ডাকতে নেই বলেই দা-ঠাকুর বলি, নইলে ও তো আমাদের চিরকালের বিশু, ওকে না চেনে কে? অমন একটী মানুষ এ অঞ্চলে নেই। কারও দুঃখ কষ্ট শুনলে পাগল হয়ে যান, কারও অন্যায় কোন দিন সইতে পারেন না। এই যে রামা বাগ্দীর মায়ের অমন ব্যায়রামটা হল, কেউ তাকে একটীবার চোখের দেখা দেখলে না। তখন এই দা-ঠাকুরই না ভিজিট দিয়ে পাঁচ-সাত দিন ডাক্তার এনেছে, ওষুধের দাম পথ্যি সব যুগিয়েছে। ঘরে তুমি মা লক্ষ্মী দা-ঠাকুরকে যা খুসি বলতে পার, বাইরে আমরা তাঁকে দেবতা বলেই জানি।"

কল্যাণী মলিনমুখে বলিল, "কিন্তু অন্যায় সইতে পারেন না বলেই না ভয় পাচ্ছি সনাতন। ওখানে গিয়ে অন্যায় সইতে না পেরে হয় তো জমীদারের বিপক্ষে লাঠি ধরে দাঁড়াবেন।"

সনাতন বলিল, "সে গোল কাল মিটে গেছে মা-লক্ষ্মী। আজ তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলেছে বটে, দুই পক্ষের কেউ সামনাসামনি নেই যে মারামারি বাধবে। দা-ঠাকুর এখনই এলেন বলে, তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

কল্যাণীকে সান্ত্বনা দিয়া সনাতন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

উনানে তরকারী চড়ানো ছিল, কল্যাণী সেখানে আসিয়া বসিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব।

বেলা প্রায় বারোটার সময় বিশ্বপতি বড় শ্রান্তভাবে ফিরিয়া আসিল। সে জুতা যোড়াটা একপাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়াল হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

তাহার হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বপতি মলিন হাসিয়া বলিল, "থাক, আর অতটা আদুরে দুলাল করে তুল না রাঙাবউ। অমনি করেই না সব রকমে আরও আমার মাথাটা খাচ্ছ, নিজের একটু হাত নাড়ার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দিচ্ছ না। তুমি বস এখানে, আমি নিজে বাতাস খাচ্ছি।"

রুষ্ট হইয়া কল্যাণী বলিল, "বকো না বলছি, পাখা দাও, আমি বাতাস করি। এই রোদে তেতে পুড়ে এলে, না হয় একটু বাতাসই করলুম, তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, তুমিও চিরকেলে আলসে কুড়ে হবে না।"

নিশ্চিন্তভাবে নিজেই পাখার বাতাস করিতে করিতে বিশ্বপতি বলিল, "তবে আসল কথা বলি রাঙাবউ—শোন—আমি এখন একটু একটু করে স্বাবলম্বী হ'তে চাই। বলা তো যায় না রাঙাবউ—যদি সেই দিনই আসে—যেমন করে আমায় ফেলে মা অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন, তুমিও তেমনি করে হয় তো চলে যাবে। তখন কিন্তু আমি সেকালের সতীদের মত তোমার অনুগমন করতে চিতায় পুড়ে মরব না বা আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করব না—এ কথা ঠিক। আমায় যখন বেঁচে থাকতেই হবে তখন কাজকর্ম্ম কিছু কিছু নিজের হাতে করার অভ্যেস রাখাটা কি ভালো নয় রাঙাবউ?"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল; কিন্তু কল্যাণীর মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটী কথাও বলিল না।

বিশ্বপতি পাখা রাখিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "ওই দেখ, অমনি তোমার রাগ হয়ে গেল। আরে বাপু,—ভালো কথাটা বললেও যদি রাগ কর, তবে আমি বেচারা যাই কোথায়? সত্যি কথা বল—তুমি যদি আজ না থাকো, আমায় কি একমুঠো ভাতের জন্যে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না?"

রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে চাপা সুরে কল্যাণী বলিল, "ভয় নেই, যম আমার মত হতভাগীকে ছুঁতে পারবে না।"

বিশ্বপতি কথাটা মানিয়া লইল—"না ছুঁতে পারে, কিন্তু মানুষই যদি সে কাজটা করে?"

কল্যাণী গর্জ্জিতে লাগিল, একটী কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

বিশ্বপতি বলিল, "যাক গে, স্নানটা সেরে আসা যাক। পুকুরের জল বোধ হয় এতক্ষণ গরম হয়ে গেছে—না?"

কল্যাণী বাহির হইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঘরে জল আছে—দেব?"

"না থাক, পুকুরেই যাই।"

বলিয়া মাথায় একটু তৈল দিয়া গামছাখানা লইয়া বিশ্বপতি বাহির হইয়া গেল।

(৪)

আহারের স্থান করিয়া দিয়া কাপড় ও খড়ম যোড়াটী যথাস্থানে রাখিয়া কল্যাণী স্বামীর জন্য ভাত বাড়িতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই বিশ্বপতি ফিরিয়া আসিল। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া আহার করিতে বসিয়া গেল। কল্যাণী একখানা পাখা লইয়া নিকটে বসিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে বিশ্বপতি একবার মুখ তুলিয়া কল্যাণীর বিমর্ষ অথচ গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইল, বলিল, "আমার কথা শুনে রাগ করেছ রাঙাবউ?"

কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, রাগ করব কি জন্যে,—রাগ করার মত কি কায হয়েছে?"

মৃদু হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "অত ভদ্রভাবে মিষ্ট কথা নাই বা বললে রাঙাবউ, ওর চেয়ে বরং খুব চেঁচিয়ে ঝগড়া করাও ভালো। যাক গিয়ে, ও-সব

কথা আর না তোলাই ভালো - কি বল রাঙাবউ? এবার এসো—ঘর-কন্নার কথা দুটো বলা যাক—কেমন? আমায় একটা তরকারী রাঁধতে শিখিয়ে দেবে রাঙাবউ, —সেই যে মোচা দিয়ে কি একটা তরকারী করে—"

চকিতে কল্যাণীর মনে পড়িয়া গেল বিশ্বপতি মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাসে, এবং কয়েক দিন পূর্ব্বে সে নিজের হাতে বাগান হইতে দুইটী মোচা কাটিয়া আনিয়াছিল; এবং ইহার তরকারী খাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে মনের অবস্থা খারাপ হইয়া যাওয়ায় কল্যাণীর এ তরকারী আর রন্ধন করা হয় নাই।

স্বামী হয় তো আজ আশা করিয়াছিল তাহার সে তরকারী হইয়াছে। থালার দিকে তাকাইয়া সে—কেন হয় নাই, সে কৈফিয়ৎ চাহিল না।

কল্যাণীর মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিশ্বপতি তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বেশ বুঝিতে পারিল সে লজ্জিতা হইয়াছে, সে প্রসঙ্গ আর না তুলিয়া সে বলিল, "কই, জিজ্ঞাসা তো করলে না—আজ সকালেই কোথায় গিয়েছিলুম, এত বেলা করে বাড়ী ফিরলুম কেন?"

একান্ত উদাস ভাবেই কল্যাণী উত্তর দিল, "জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই বলেই করি নি। এই যে নিত্যি এখানে যাও ওখানে যাও, কত রাতও এখানে ওখানে কাটিয়ে এসো, কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছি কি, তুমি কোথায় গেছ, কেন গেছ? জানি জিজ্ঞাসা করলেও তার সত্যি উত্তর কখনও তুমি দেবে না, উল্টে প্রশ্ন তুলবে—সে কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ কি।"

হাতের ভাত মাখা হঠাৎ স্থগিত রাখিয়া বিশ্বপতি সোজা হইয়া বসিয়া স্ত্রীর পানে তাকাইল।

কল্যাণী বলিল, "খেয়ে নাও, আবার চুপ করে বসে রইলে কেন?"

বিশ্বপতি বলিল, "একটা কথা বলে নেই আগে রাঙাবউ, তার পর খাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি যে অত বড় অপবাদের বোঝা আমার মাথায় চাপালে,—সত্যি করে বল দেখি, তুমি কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছ কি? আমার তো মনে পড়ে না, তুমি কোন দিন কোন কিছু জানতে চেয়েছ, আর আমি তার উত্তর দিই নি। তুমি নিজে কি রকম নির্লিপ্ত ভাবে থাকো, সেটা একবার ভেবে দেখ, তার পর আমায় দোষ দিয়ো।"

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "কথা রাখ, আগে খেয়ে নাও, তার পর কথাবার্ত্তা যা হয় বলো এখন।"

বিশ্বপতি আবার আহারে মন দিল।

কল্যাণী বলিল, "সনাতনের মুখে শুনলুম মহেশপুরে না কোথায় মারামারি হয়েছে—সেখানে গিয়েও বোধ হয় কর্ত্তৃত্ব করে এলে?"

হাসিমুখে বিশ্বপতি বলিল, "এই যে, সে খবরটাও রেখেছ দেখতে পাচ্ছি। কর্ত্তৃত্ব বিশেষ কিছুই করি নি। করবার যোগ্যতা হয় তো আছে, কিন্তু তা মানছে কে? তোমার স্বামীর অক্ষমতা তুমি যা জানো, দেশের আর দশজনেও তাই জানে। কাজেই তারা আমায় আমল দেবে কেন?"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, সে যোগ্যতা তোমার বেশ আছে। তুচ্ছ ঘরের কাজে তোমার যোগ্যতা না থাকলেও থাকতে পারে,—এ সব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করবার যোগ্যতা তোমার বেশ আছে। গেল বছর নবীন ভট্চার্য্যের পক্ষ নিয়ে গাঁয়ের পাঁচটা ছেলের সঙ্গে বাজারে মারামারি করে এসেছিলে, না, যার জন্যে শেষে পুলিশ পর্য্যন্ত এসেছিল?"

মুখখানা গম্ভীর করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "বাঃ সে কথা এখনও ভোল নি দেখছি। কিন্তু সে কাজ করা যে অন্যায় হয় নি—একজন বুড়ো বামনকে যারা অবশেষে বিদ্রূপ করেছিল, তাদের মারা যে অন্যায় নয় বরং উচিতই হয়েছিল, এ কথা আজ স্বীকার না করলেও সে দিন তো অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছিলে রাঙাবউ।"

কল্যাণীর মুখে বিশ্বের গাম্ভীর্য্য জমা হইয়াছিল,—সে নিস্তব্ধে অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি ততক্ষণে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ও-সব ভেবে আর মাথা খারাপ কোর না, খেয়ে-দেয়ে নাও এখন। ভয় করো না, আজ আমি অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াই নি যাতে পুলিস আসবে। ওখানে

দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই, প্রতিপক্ষ খোদ জমীদার নিজে ; দাঁত বসাতে গেলে সে দাঁতই ভেঙ্গে যাবে, রক্তপাত নিজেরই হবে, প্রতিপক্ষের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না।"

একলা ঘরে কল্যাণী, ভাতের থালাটার পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে কেবল অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কি লোক, ইহাকে কোন মতে বিদ্ধ করা যায় না তো। ওই তো শেষের দিকে বলিয়াই গেল—অক্ষম যদি প্রাণপণ বলে দাঁত বসায় তাহাতে তাহার দাঁতই ভাঙ্গিয়া যায়, রক্তপাত হয়, প্রতিপক্ষের তাহাতে এতটুকু ক্ষতি হয় না।

মানুষটা সংসারে থাকিয়াও যেন নাই। এমন অনাসক্ত লোক সংসারে খুব কমই দেখা যায়। সংসারে যে আরও একটা মানুষ আছে, সে মানুষটা যে তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহা যেন কোন মতে উহাকে বিশ্বাস করান যাইবে না, ওই লোকটা সে কথা সম্পূর্ণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে।

এমন লোকের উপর নির্ভর করিলেও সে নির্ভরতা স্থায়ী হয় না। ও যেন অনন্ত সমুদ্র, নিজের মনে গান গাহিয়া চলিয়াছে, উহার পাশে কূল আছে কি না সে সন্ধান সে রাখে নাই।

ইহাকে যাহাই দাও, ও ফিরাইয়া দিয়া যাইবে, কিছুই লইবে না। লোকে জানে সবই, জানিয়াও এই সমুদ্রকে সব দিতে চায়, দেয়ও।

কল্যাণী চায় নির্ভর করিতে, কিন্তু ও তো আমল দেয় না। উহাকে কল্যাণী কত না কঠোর কথা বলিয়া যায়, কিন্তু ও যে সব হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। নিজের কাজে নিজেই সে ভুলিয়া রহিয়াছে,—সামনে যে পথ রহিয়াছে। তাহাই ধরিয়া সম্মুখের পানে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছে, পাশে কে আছে—পিছনে কে আছে তাহা সে কোন দিন ফিরিয়া দেখে নাই।

আচমন সমাপনান্তে বিশ্বপতি বাহির হইতে ডাকিল, "আমি তা হলে বার হচ্ছি রাঙাবউ, ওদিকে আমার কাজ আছে। তুমি খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বসো—"

আর্দ্র-কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "হবে এখন, তুমি তোমার কাজে এখন যাও, দেরী করো না।"

কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা স্পষ্ট অনুভব করিয়াই সন্দিগ্ধ মনে বিশ্বপতি দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতর দিকে উঁকি দিল। তাহার আসিবার সাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী চট করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া নিজের জন্য ভাত বাড়িতে বসিল।

(৫)

সেদিন গ্রাম্য নদী ইচ্ছামতীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সামনে চন্দ্রাকে দেখিয়াই কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রার পরণে সুন্দর একখানি কালা ফিতা-পেড়ে শাড়ি, দুই হাতে সবুজ রংয়ের রেশমী চুড়ি, গৌর বর্ণের উপর মানাইয়াছিল বেশ। একরাশ কালো কোঁকড়া চুল সমস্ত পিঠখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কালো চুলের মাঝখানে তাহার সুন্দর মুখখানা সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সামনে যদি একখানা আয়না থাকিত, কল্যাণী চট করিয়া নিজের মুখখানা একবার দেখিয়া লইত। চন্দ্রার এই সৌন্দর্য্য সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। নীচ বাগ্‌দি-কন্যা, তাহার এত রূপ কেন ?

অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাই মুখখানা অন্ধকার করিয়াই কল্যাণী এক পাশ দিয়া জলে নামিয়া গেল,—অতি সন্তর্পণে—যেন চন্দ্রার স্পর্শ না লাগে।

চন্দ্রা কাপড় কাচিতেছিল, জল ছিটকাইয়া কাছে পড়িতেই কল্যাণী কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আ মর, চোখের মাথা তো এখনও খাস নি চন্দ্রা ! ঘাটে মানুষ রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস নে ? তুই জাতে বাগ্‌দি তা মনে আছে ? তোর জল গায়ে লাগলে এই অবেলায় আবার আমায় নেয়ে মরতে হবে সে খেয়ালটুকু আছে ?"

তরুণী মেয়েটির মধ্যেও অনেকখানি দুষ্টামী ছিল। হয় তো সে সাবধান হইয়াই কাপড় কাচিত যদি কল্যাণী তাহার সমবয়স্কা না হইয়া বয়সে বড় হইত। সে অকুণ্ঠিত ভাবেই কাপড় আছাড় দিতে দিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা কি করব বাপু, চোখের মাথা না খেলেও খেতে হয়েছে। তোমাদের ভদ্দর লোকের জ্বালায় তো ঘাটে কাপড় কাচবার যো নেই। যখনই কাপড় আনব—দেখব ঘাট-ভরা লোক, আর শুনব—ছুঁস নে, ছুঁস নে।"

বিকৃত মুখে কল্যাণী বলিল, "বলবে নাই বা কেন? তোরা জাতে বাগ্‌দি, তোদের ছুঁয়ে চান না করলে ঘরে যাওয়া তো চলে না। তোদের উচিত নিত্যি যখন এত কাপড় কাচা—তখন আর একটা ঘাট করা। এক ঘাটে বামন কায়েতের সঙ্গে তোরাও আসবি,—তোদের তো মুস্কিল নয়, মুস্কিল হয় যে আমাদেরই।"

চন্দ্রা এবার স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল, "বেশ তো ঠাকরুণ, তোমরা সবাই মিলে একটা আলাদা ঘাট যদি করে দাও, আমাদেরও নিত্যি তোমাদের কথা শুনতে হয় না। দাদাবাবুকে বলব এখন—ওই পাশটা পরিষ্কার করে যদি একটা ঘাট করে দেন—"

দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "কেন, দাদাবাবুর কি বাপ-মা মরা দায় পড়েছে যে তোর জন্যে ঘাট তৈরী করে দিতে যাবে? আরও তো অন্য লোক আছে, তাদের দিয়ে করিয়ে নে গিয়ে।"

চন্দ্রা বলিল, "অন্য লোক আর কোথায় পাব গো ঠাকরুণ। দাদাবাবুই আসেন যান, নিত্যি বাজার-হাটও করে দেন, যা কাজ পড়ে তাও করে দেন। যাই বল ঠাকরুণ, দাদাবাবুর মত আর একটী পাওয়া দুষ্কর। কায়েতের ছেলে, তবু জাতের অহঙ্কার নেই। নিত্যি বাগ্‌দি বাড়ী যাওয়া আসা করেন। তোমাদের মত অত আচার-বিচার নেই। লোকের উপকার ওঁর মত অমন ভাবে আর কেউ করতে পারবে না, এ কথা সবাই বলবে। আমি তো ময়লা কাপড়েই থাকতুম, কেবল দাদাবাবুর বকুনিতেই না তিন দিন অন্তর কাপড় সেদ্ধ করতে হয়। উনি যে মোটেই ময়লা সইতে পারেন না। আজ গিয়ে বলব এখন, ঘাটে কাপড় কাচলে ঠাকরুণ বকেন, আলাদা ঘাট না করে দিলে কাপড় কাচা হবে না।"

দুষ্টামীভরা মুখে সে কল্যাণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

কল্যাণী কথা বলিতে পারিল না। ক্রোধে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল দুইটী চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে চোখের আগুনে সে এই অস্পৃশ্যা দুর্ভাগিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

চন্দ্রা বিনীতভাবে বলিল, "এখন আজ তো ওঠো ঠাকরুণ, কাপড়খানা আর একবার আছাড় দিতে দাও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা করে বলে দাদাবাবুকে ঘেন্না কর না তো,—ঘরে-দোরে উঠতে দাও তো?"

ঘৃণায় কল্যাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিরশির করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়াটা ডুবাইয়া লইয়া এক পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল। পিছনে অস্পৃশ্যা বাগ্‌দির মেয়েটী যে প্রচুর হাসিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, তাহা সে পিছন ফিরিয়াও দেখিল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া ঘড়াটা দুম করিয়া বারাণ্ডায় নামাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

চন্দ্রার মুখে বিজয়িনীর হাসি; নীচ বাগ্‌দিনী তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিল!

তাহার স্বামী চন্দ্রার হাট-বাজার করিয়া দেয়, তাহার বাড়ীতে অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। উঃ, এ কথাটা মনে করিতেও ঘৃণায় সমস্ত শরীর ও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। মানুষের কি জঘন্য প্রবৃত্তি! ইহারা জাতিধর্ম্ম কিছুই মানে না!

ছিঃ, যে স্বামী বাগ্‌দির বাড়ী যাতায়াত করে, নিজের জাতিধর্ম্ম যে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহারই উচ্ছিষ্ট সে আহার করে। দেবতা ভাবিয়া সে কাহাকে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিতেছে! না, এখন হইতে সে সতর্ক হইবে; স্বামী-সেবা সে করিবে, তাই বলিয়া নিজের ধর্ম্ম সে ঘুচাইবে না।

কিন্তু এ কল্পনাতেও সে চিত্তে শান্তি পাইল না। স্বামীকে জব্দ করিবার উপায় কি? এমন শাস্তি দেওয়া আবশ্যক যাহা ওই নির্লিপ্ত লোকটীর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া যায়; সে বুঝিতে পারে—অনুতাপ করে। মরিয়া তাহাকে জব্দ করিতে পারা যায়, কিন্তু সে যে অনুতাপ করিবে তাহা তো কল্যাণী দেখিতে পাইবে না, তবে সেরূপ জব্দ করিয়া ফল কি?

দিন কয়েকের জন্য মাসীমার বাড়ী চলিয়া গেলে হয় না? মাসীমা সেবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিজের ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে যায় নাই।

বিশ্বপতি তাহাকে যাইবার অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তাহারই কষ্ট হইবে ভাবিয়াই কল্যাণী যায় নাই।

"বউদি, বাড়ী আছ নাকি ?"

সমবয়স্কা রমা কখন বারাণ্ডায় উঠিয়াছিল তাহা কল্যাণী জানিতেও পারে নাই। ডাক শুনিয়া সচেতন হইয়া সে উত্তর দিল, "হ্যা, আছি।"

ঘরের দরজায় উঁকি দিয়া রমা বলিল, "বাপ রে, এখন ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে কি করছ ভাই ?

কল্যাণী বাহির হইয়া আসিল, একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বসো ভাই।"

রমা পিঁড়িখানা সরাইয়া রাখিয়া মেঝেয় বসিয়া বলিল, "কখন এসেছি, ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছিলুম। তার পর হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা খোলা দেখে মনে হল ঘরেই আছ, কোথাও যাও নি। ওই অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে কি করছিলে বল দেখি ? কাজ যে কিছুই করছিলে না তা দেখেই বুঝেছি।"

কল্যাণী বলিল, "কাজ ছিল না কি রকম ? উনোন ধরানোর চেষ্টা করছিলুম। তার পর ভাত চড়াব, মসলা পিষব, তরকারী কুটব—"

বাধা দিয়া মুখ ঘুরাইয়া রমা বলিল, "ওগো হ্যা হ্যা, আমি সব জানি, বুঝাচ্ছ কাকে ? আর কেউ হলে তাকে যা তা বলে বুঝাতে পারতে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। দাদার ব্যবহারের কথা ভাবছিলে,—না ? কবে পুরী যাচ্ছেন সে সব কথা শুনেছ কিছু—বলেছেন ?"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া কল্যাণী বলিল, "পুরী যাওয়া কি রকম ?"

রমা বলিল, "আহা, যেন উনি কিছুই জানেন না ? দাদা নন্দার সঙ্গে পুরী যাচ্ছে, এ কথা গাঁয়ের সকলেই শুনেছে,—শুনতে পাওনি শুধু তুমি; তাই ঝিঁঝিঝিলি অন্ধকার রান্নাঘরে একলা বসে ভাবছিলে আর চোখ মুচছিলে—না ?"

কল্যাণী সাগ্রহে প্রতিবাদ করিল, "কক্ষণ না। আমার চোখের জল এত সস্তা নয় যে একটু আঘাত লেগেই ঝরে পড়বে রমা।"

রমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ভালো কথা, সে জন্যে তোমার তো নিন্দে করছি নে ভাই বউ-দি; বরং প্রশংসাই করছি। কিন্তু সত্যি বল দেখি ভাই—দাদার এখনও কি ওই নন্দার আঁচল ধরে ওর পেছনে পেছনে বেড়ানো ভালো দেখায় ? তুমি সে সব কথা শুনেছ—না ?"

একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "না, আমি কিছুই শুনি নি। তুমি একদিন কি সব বলবে বলেছিলে—"

রমা মাথাটা কাত করিয়া বলিল, "হ্যা, বলব ভেবেছিলুম; কিন্তু দরকার হয় নি বলেই বলি নি। ভেবেছিলুম, দাদা নিজের ভুল সামলাতে পেরেছেন। এখন দেখছি মাকাল ফলের গুণ পরীক্ষা ক'রে ঠকলেও পাখীরা ওর রং দেখেই ছুটে যায়। নন্দাকে দেখেছ কি বউ-দি ? দাদা এককালে তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দাও কত দিন আমাদের সঙ্গে বলেছিল—সে দাদাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না, তার জীবনপণ। কিন্তু বিয়ে হল না,—নন্দার বাবা তাকে গরীবের হাতে দিতে রাজি হন নি। তাঁর তো ওই একটী মাত্র মেয়ে, তার ওপর মেয়ে সুন্দরী। কাজেই তিনি বড়ঘরে মেয়েকে দেওয়ার আশা করেছিলেন। হলও ঠিক তাই;—মেয়ের পেছনে তিনি অজস্র টাকা ঢাললেন, তার বিয়ে হল, জমীদারের একমাত্র শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে, আর দাদার বিয়ে হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।"

কল্যাণীর মনে হইল তাহার চোখের সামনে আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে কৃষ্ণ-যবনিকা পড়িয়া ছিল, তাহা হঠাৎ উঠিয়া গেল। কল্যাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

একটু থামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "নন্দাকে আমি দেখি নি, তবে সে যে খুব সুন্দরী তা শুনেছি।"

রমা বলিল, "দেখবে কি করে ? নন্দার বাবা এই রকম সব গোলমাল দেখে মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় যান। সেখানেই বিয়ে হয়। তার পর তারা আর দেশেই আসেন নি। নন্দার বাবা মারা গেলে ওর মা এই এক বছর মাত্র দেশে ফিরেছেন। নন্দাও

এই সবে দশ দিনের কড়ারে ছয় বছর পরে দেশে পা দিয়েছে।"

কল্যাণী একটুকরা হাসি শুষ্ক ওষ্ঠে ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "কিন্তু সেই পুরানো পচা ভালোবাসাটা আজও ওদের দুজনের কেউ ভুলতে পারে নি বলে মনে হয়,—না?"

রমা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দূর, তা কি ভোলা যায়? ভালোবাসা জিনিসটা যদি অত অল্পেতেই মিলিয়ে যেত, তা হলে আর ভাবনা থাকত না,—কেউ আজ অতীতের কথা ভেবে চোখের জলও ফেলত না। সে জিনিসটা মনের অতল তলে চাপা থাকে। ওপরে হয় তো অনেক প্রলেপ পড়ে, কিন্তু হাজার প্রলেপ দিলেও ভেতরের সে জিনিস বিলীন হয় না। এই দেখ না—আমরা সবাই ভেবেছিলুম দাদা সে সব ভুলে গেছে। হয় তো দীর্ঘকালের অদর্শনে, মনে হয়েছিল, দাদা নন্দাকে ভুলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ—যেই নন্দাকে দেখা—অমনি সব মুছে গিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠল একমাত্র নন্দাই। সেখানে আর কেউ নেই,—না তুমি, না দাদার আজকালের প্রিয়তমা চন্দ্রা—"

রমা প্রচুর হাসিতে লাগিল।

কল্যাণী হাসিল না, মুখখানা বড় গম্ভীর করিয়া সে, অদূরে একটা গাছের সরু ডালে বসিয়া যে ছোট পাখীটী কত রকম ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছিল, তাহারই পানে তাকাইয়া রহিল।

রমা বলিল, "দেখ না, নন্দা এসেই—আর কাউকে না—একেবারে দাদাকেই দিলে খবর। আর দাদা আমার সব ফেলে ভোঁ করে ছুটল তার কাছে। এ কয়টা দিন তাঁর চুলের আগা দেখতে পেয়েছ কি বউ-দি?"

শুষ্ক হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "হাঁ, নেহাৎ স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করতে, স্ত্রীকে পাহারা দিতে, রাত এগারটায় এসে, কয়েক ঘণ্টা নাক কান বুজে থেকে, ভোর পাঁচটা হতে না হতে চলে যান।"

রমা বলিল, "তা বুঝেছি।"

একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "দাদা অন্ততঃ পক্ষে একবারও তোমায় বলবেন তিনি পুরী যাচ্ছেন। আমার কথা যদি শুনতে চাও—তাঁকে কিছুতেই যেতে দিয়ো না, তাতে তোমারই ভালো হবে। এখনও যদি ধরে রাখতে পারো! একবার এ বাঁধন কাটলে আর বাঁধন দিতে পারবে না—এ কথা ঠিক জেনে রেখো।"

কল্যাণী একটু হাসিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "যে নিজেই পালাতে চায় তাকে কেউ ধরে রাখতে পারে ভাই? যে পিছল পথে পা দিয়ে নেমে চলেছে—সে সেই পিছলে যাওয়ার আরামটুকু ত্যাগ করতে চায় না এই যা দুঃখ।"

সে নিস্তব্ধ হইয়া সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)
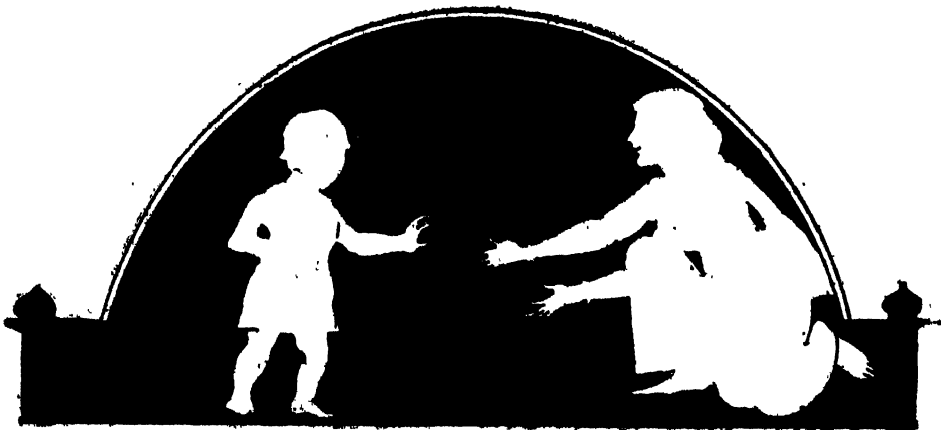
কন্যাদায়

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

অশ্রুধারায় উৎসব-সভা ভাসাইয়া চিরতরে
চরণে প্রণমি মা আমার তুমি চলে গেলে পর-ঘরে।
আমার হৃদয় চিরিয়া চিরিয়া সানাই উঠিল গাহি,
"বৃথা রয়েছিস্ চাহি,
এমনি করিয়া সকল উমাই পর-ঘরে যায় চলে'
পিতার পাষাণ হৃদয় ভেদিয়া সুরধুনী পড়ে গলে'।"
আর বৈশাখে চলে গেলে তুমি ফিরে এল বৈশাখ,
বৈশাখ-জ্বালা বারো মাস ধরি পরাণ করিল খাক।
অবুঝ পিতার হৃদি
বুঝে না ইহাই দুনিয়ার ধারা—তারই তরে নয় বিধি।

একদিনও মোরে ভাবাও নি, তাই বুঝিনি কন্যাদায়,
গচ্ছিত ধন ছিলে বলি মন সান্ত্বনা নাহি পায়।
একটি বছরে বুঝিয়াছি ছিলে কত আদরের ধন,
তোমার বিদায়ই দায় হ'য়ে মোরে দহিতেছে অনুখন।

ভবন দুয়ারে পথ হতে আজো তোমারেই ডাকি তুলি'
একটি বরষ ছুটিয়া আসিয়া দাওনি দুয়ার খুলি'।
একটি বছর পাইনি মা আমি মনের মতন সেবা,
তুমি ছাড়া আর মায়ের মতন আদর করিবে কেবা?

ভিখারীরা ফিরে যায়
গালি দিতে দিতে, তারা ত জানে না তুমি হেথা নাই হায়।
একটি বছর পড়া বলে নিতে আসনি আমার কাছে,
টেবিলের তলে বইগুলি সব অযতনে পড়ে আছে।
তোমার হাতের সূচিকা-চাতুরী কতদিন দেখি নাই—
আর কেউ তারে করিবে আদর? ভেবে যে বেদনা পাই।

অই যে ঘরের কোণে—
লুতা-জালে ঘেরা তোমার সেতারা দুলিতেছে অযতনে।
খুকী কেঁদে তার মায়েরে জ্বালায়, আমি তায় রেগে মরি,
তোমার কথাটি মনে পড়ে যায় আঁখি যায় জলে ভরি'।

সংসারে কোন শৃঙ্খলা নাই, সবি এলোমেলো বড়—
তুমি যবে ছিলে কোনদিন কই দেখিনি এমনতর।

সবেতে অঙ্গহানি,
সব ঘটে চূত শাখাটি রচিত তব মঙ্গল-পাণি।
ভুল ক'রে ডাকি আজো তব নাম, ভাইগুলি ছুটে আসে,
আমি যাহা চাই কোথা তাহা পাই, ভুল দেখে তারা হাসে।

তারা কি কিছুই জানে?
একটা আনিতে বারবারই তারা অন্যটা খুঁজে আনে।
একা চাবিটাই কি-বার হারাই, কোথা কি জিনিষ থাকে,
তুমিই জানিতে, খুঁজে ঘেমে মরি, জিজ্ঞাসা করি কাকে?

আজি ভুল হয় কত,
তুমি ছিলে মাগো মোর শরীরিণী স্মৃতি-শক্তির মত।
যোগ্য হস্তে তোমারে সঁপেছি, সুখে আছ নিশ্চয়,
অবুঝ পিতার পরাণে তবু যে কত ভয় সংশয়।
কঠোর কথায় কেহ যদি হানি ও-হৃদয়ে দেয় ব্যথা,
অভিমানিনী যে বড় তুমি মাগো জানেনা তারা সে কথা।

ছোট ছোট ত্রুটী ধরি
কেউ যদি করে ক্রূর পরিহাস, ভৎর্সনা, মরি মরি।
তাও যদি নাহি হয়, স্মরি তবু পিতা মাতা ভাই বোনে
সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় বেদনা পেতেছ মনে।
যত সুখে থাক, মোর মনে জাগে সেই ম্লান মুখখানি,
কানে বাজে তব বিদায়-বেলার অশ্রু-করুণ বাণী।
চির সুখে থাক এ আশীস্ নিতি করি মা পরাণ খুলে,
তাতে যদি মোরে ভুলিতেও হয় তাও যেও তুমি ভুলে।
তব মধুময়ী স্মৃতি,
তারকার মত এ গৃহ-তিমিরে ভাস্বর র'বে নিতি।
তব সুখ-সংবাদ
মোদের আর্ত্ত মর্ত্ত্য-জীবনে দিবে স্বর্গের স্বাদ।

আই হ্যাজ্ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

নাঃ, আর পড়ে থাকা নয়—সাড়ে তিনটে। একটুও ঘুম হল না, চোখ বুজলেই মুকুন্দবাবু। আশ্চর্য্য লোক্! ক'ঘণ্টা পরেই দেখা হবে,—দেখি কি বলেন। কোথায় কাশী, কোথায় পুর্ণিয়া! ধাওয়া করেছেন—কম নয়,—প্রেম একেই বলে। 'নন্দ-কুমার' খান নিশ্চয়ই সঙ্গে আছে। দেবার আগে কি বলবেন ?—ভারি মজা হবে!

উঠে পড়লুম। তার পরই আয়নার কাছে,—ওটা আর ভাবতে হয় না, পা নিয়ে যায়,—অভ্যাস। যদিও প্রায় সবটাই টাক্—তবু চুল আঁচড়াতে হয়! বারাণ্ডায় ঝাড়ু দেবার মত—মার্বল ফ্লোরে বুরুস্খানা বুলুতেই হয়। তাতেও একটা আত্মপ্রসাদ আছে, মানস চক্ষে নিজেকে বেশ দেখায়। এর কদর রাজধানীতে। ভাগ্যিস্ গিয়েছিলুম,—সেবার গিয়ে অনেক কিছু আদায় হোল।

আশ্চর্য্য! কলকেতায় সমবয়সী মিললো না,—বুড়ো নেই! সারা গ্রে-ষ্ট্রিটে একজনকেও 'গ্রে' দেখলুম না! সব পঁয়ত্রিশ,—বড় জোর—চল্লিশের এ-পারে। বিনি মাইকেলকে দেখেছেন—তিনিও। থাকতে হয় তো এই সব জায়গায়,—ব্রাহ্মণীরও বৈকুণ্ঠবাস হয়। হঠাৎ কানে এলো—"কেষ্টো বন্দ্যোর লেকচার যদি শুনতে,—তখন আমরা কলেজ ছেড়েছি।"—ফিরে দেখি—সেই পঁয়ত্রিশ। দিব্যি চুনোট্করা কোঁচা, পমস্থ, আমেরিকান imitation silkএর মোজা, ১৪ ইঞ্চি বুকখোলা নেভি ব্লু ব্লেজার কোট্,—ঝক্ঝকে বোতাম; বাঁ কাঁধে ইস্তিরি-পাটের জামিয়ার, আঙুলে নীলার আংটী, হাতে ভাইন-ষ্টিক্,—গোঁফ গজিয়েছিল কিনা বলা কঠিন। মাথায় পেটে-পড়া কুচ্কুচে চুল; মুখে মুক্তো সাজানো দাঁত। চৌহদ্দি বেশ pleasant and mild (ভুর্ভুরে) গন্ধামোদিত। ইনি কেষ্ট বন্দ্যোর লেক্চার শুনলেন কবে? দেবতার দেশ—বাঃ!

আমার সঙ্গী আমার বিস্ময় ভাব দেখে বললেন,—"ওঁর বয়সটা কতো ঠাওরান ?—ছিয়াত্তর ছাপিয়েছে যে! দাঁত খুলে নিলেই আম্সি—চামড়ার বেকার bellows।" আমি কিন্তু বারবার তাকিয়েও বিশ্বাস করতে পারিনি, ক্রমে—'ভবতি বিজ্ঞতম'। তাতে আনন্দই পেলুম। তার পর রায় বাহাদুর দাদাকে পেয়ে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। কলকেতায় বোধ হয় ওই একটি মাত্র unalloyed, খাঁটি বৃদ্ধ বর্ত্তমান।

আর পেলুম রাজধানীতে—রাত নেই। সহর সর্ব্বক্ষণই সাড়া দিচ্ছে—সরগরম। কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের "আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি"—বাতিল। যা কিছু তর তম সব রাত্তেই চলে, রাত্তেই প্রশস্ত।

জানলার পাশেই টেবিলের ওপর আয়না। হাসনা-হেনাটা থাকায় বাইরে থেকে দেখা শোনার বাধা,—ঘরে থেকে বাইরে দেখার অসুবিধা নেই। ব্রস্খানা রেখে চেস্তা মারতেই দেখি, দূরে কে একজন অপর একটি ভদ্রলোককে আঙুল বাড়িয়ে এই বাড়ীটে দেখিয়ে দিয়ে চট্ চলে গেল। মনে হল যেন বনগোপাল। এলেই হোত—আসবে বলেছিল, চলে গেল কেনো? বোধ হয় কাজ আছে।

বাবুটি কাছাকাছি এলে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।—প্যারেডের চালে পা ফেলে আসছেন। দেখতে সুপুরুষ, বলিষ্ঠ গঠন। চশমা, রিষ্ট ওয়াচ, সবই আছে; হাতে—বাঁধানো একখানি মোটা বই। শরীরের দিকে বেশ দৃষ্টি রাখেন বলেই যুবা বলা চলে। তিরিশ পার হয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের প্রথামত একটু হাসি ভাঁজতেই—দেখলুম, দাঁত ঈষদ্ উঁচু।—"মশাই এইটা কি * * * ডাক্তারের বাসা ?"

"হ্যাঁ—এই বাড়ীতেই তিনি থাকেন,—খবর দেবো কি ?"

"আমার জিজ্ঞাস্য, নবীন বাবু বলে কেউ এ বাসায় আছেন কি ?"

"সম্প্রতি আছেন বটে।"

"তাঁর সঙ্গে একবার"···

"বলুন,—তিনি হাজির।"

"ওঃ আপনিই! আমার কি সৌভাগ্য"—বলেই একেবারে পায়ে ছোঁ।

"কি করেন, কি করেন,—আমি তো চিনলুম না।"

"আমাদের আবার চিনবেন কি, চেনবার আমাদের কিই বা আছে। তবে আপনাকে চেনেনা—বাঙালীর মধ্যে এমন কে আছে। চট্টলে, শ্রীহট্টে বাড়ীর দাসীদেরও আপনার লেখা সাগ্রহে তন্ময় হয়ে পড়তে দেখেছি।"

"দাস-দাসীতে যে পড়ে এটা স্বীকার করে নিতে আমার আপত্তি নেই। তা বলে আপনি পায়ের ধূলো নেন কেনো ?"

"বলেন কি! আমি নেবনা, পাবো কোথা! ছ' সাত বচরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সহসা আজ অভীপ্সিতকে পেয়েছে। আবার কি করে তা শুনুন"—বলেই—"ঘরে গিয়ে বসতে বাধা আছে কি? লেখার সময় নয় তো? আপনাকে যখন পেয়েছি দয়া করে ভক্তের এ দৌরাত্ম্য সইতেই হবে মশাই।"

"বাধা আবার কি ? আসুন।"

ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনের চেয়ারখানিতে তাঁকে বসতে দিয়ে নিজে খাটেই বসলুম। বললুম,—"এইবার পরিচয়টা আগে শুনি"···

"আমাদের আবার পরিচয়,—যা হয় একটা বললেই হল। জন্মই বৃথা—আজো দেশের—যাক্। নাম—চক্রধর গুপ্ত, নিবাস গুপ্তিপাড়া। পিতা ঢাকা কোর্টে পেস্‌কার ছিলেন। জজ সায়েবের ডান হাত, তাই সুযোগমত কয়েকটা মহাল নিলেমে ডেকে নিয়ে—ছোট-খাটো জমিদারই হন। ঢাকায় I. A. পড়তুম। পড়বো কি, সাহিত্যের ঝোঁক্ তখন থেকেই দৈত্যের মত ঘাড়ে চেপে এগুতে দিলেনা। প্রায় দেড়শো গল্প লেখা রয়েছে, নিতে কেউ সাহস করেনা। দেশের কি মানসিক অধঃপতনই হ'য়েছে। বাজে লিখিনা,—দেশের সত্যিকারের অবস্থা ও তার প্রতিকার, গল্পচ্ছলে জীবন্ত করে এঁকেছি মশাই। পড়লে মুমূর্ষুর হস্তও দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হয়। সব দেখাবো, কাজে লাগাতে হবে মশাই। আপনার কথা ঠেলবে এমন কে আছে ?"

"এখন কি করা হচ্ছে ?"

"—বলছি, আগে শুনুন মশাই। আপনাকে পাওয়া এ কি কম···সব কথা তাল-গোল পাকিয়ে পেটে ঢু মারছে। হাঁ, ওর মধ্যে 'কালনিমের লঙ্কা ভাগ' অর্থাৎ বুঝেছেন কিনা,—সব Covered meaning প্রচ্ছন্ন,—যেমন আপনি লেখেন—"

"সে কি হে—Covered meaning আবার কি ?"

হেসে বললেন—"সে intelligent পাঠক মাত্রেই বোঝে মশাই—Breathes there a man, যে এ যুগে তা না বুঝে থাকতে পারে ? এ যুগই বা কেন বলচি,—মাইকেল পর্য্যন্ত লিখে গেছেন—

'অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে বজ্রাঘাতে ;

কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে।'

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ? ওর মানে কি ?—তোমাদের আধিপত্য গেলে—ভারতের কোনো ক্ষতিই নেই। সে মাথা খুঁড়ে মরবেনা।—একেবারে ঘাটে ঘাটে মিল্, আপনি কি বলেন ?"

বলবো কি, আমি তখন ভাবচি এ আবার কোথাকার পাপ এলো। গেলে যে বাঁচি। মহা বিপদে পড়লুম, বললুম—

"ও রকম অর্থ বার করলে যে তর্কালঙ্কারও বাঁচেন না—"

'দিন যায় রাতি আসে আর বেলা নাই,

রবির কিরণ কিছু দেখিতে না পাই।'

অর্থাৎ ওর হয়ে এসেছে—তেজের দফা গয়া। এই বলবে তো ?"

'Exactly' বলেই চক্রধর লাফিয়ে উঠলো। "আপনি বুঝবেন না তো বুঝবে কে,—a Veteran, একদম ঝুনো,—I mean অভিজ্ঞ। যাক—তার পর, এটা ম্যালেরিয়ার জায়গা, লোক যদি সব মরেই গেলো তো কাদের জন্তে স্বরাজ। আমি একজন diplomaধারী হোমিওপ্যাথ। কিন্তু আসলে সাধুসন্ত ধরে আলমোড়া থেকে যে সব

জড়িবুটি আদায় করেছি, যত রকম 'রিম্না' আছে, তাতে আর মার নেই। এক এক ডিষ্ট্রিক্ট ধরবো আর তাগড়া করে ছাড়বো। এখানে আপনি রয়েছেন শুনে আমি যেন স্বর্গ পেয়েছি মশাই।"

মনে মনে ভাবলুম—"আমাকেই পাওয়াতে এসেছ দেখচি।"

গলা নামিয়ে বল্লেম—"Between us—বলুন্ তো কতটা এগুলেন? মুকুন্দদাসকে এনে ফেলেছেন, খুব কাজ করেছেন—ভারী কাজ করেছেন—এই তো চাই। এ রকম কর্ম্মী না হলে কি হয়! Sincerity and honesty—তার পরই 'আগে চল—আগে চল—ভাই।' আপনাকে পেয়েছি, এই দেখুন না—কি করি…"

আমি ওঠবার জন্যে উস্-খুস্ করচি। চাকরটাকে গাড়ুতে জল দিতে বললুম। কথনো ও অভ্যেস নেই—কিন্তু অন্য উপায়ও যে নেই।

বোধ হয় উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে,—"হ্যাঁ, প্রধানতঃ আজ যে-কাজের জন্যে আসা আপনাকে পেয়ে প্রাণের আবেগে সব ভুলে যাচ্ছি। সে তো আর কোথাও পাবনা,—সেই বারিনদার সুবর্ণ-যুগের—'যুগান্তরের' ফাইল। আর কোথায় পাবো বলুন? আপনারাই তার ট্রাষ্টী,—কস্টোডিয়ান্। কি যুগই গেছে মশাই—সে ভাবার এক-আধ লাইন শুনি,—কানে যেন কামান দাগে আর আশায় বুক ভরে ওঠে! দয়া করে আমাকে দেখাতেই হবে কিন্তু,—আমি হত্যে দেবো। সে না দেখলে এ জন্মই বৃথা। আমাকে ছোট ভাই জানবেন। বলেন—এইখানেই বসে দেখবো। কাশীতে গুরুদেবের কাছে শুনলুম,…তাঁর দূরদৃষ্টি অসীম, অদ্বিতীয় সত্যবাক্!"

তিনিই নাকি? মনে পড়ে শিউরে উঠলুম। দু'হাত তুলে কপালে ঠেকালুম। বললুম—"সেই সময় হাতে পড়লে 'যুগান্তর' দেখতুম বটে; বলতে বলতে গাড়ুতে হাত দিলুম—"

"সে সব কথা ছোট ভাই শুনচেনা"—বলতে বলতে দাঁড়ালো।—গেলে যে বাঁচি! যাম্‌না,—পা ঘসে।

বললুম—"আচ্ছা সে কথা অন্য একদিন হবে।"

—"ভাই বলুন"—বলেই পায়ের ধূলো নেওয়া। আমি আর কথা কইলুমনা।

অভ্যাসও নয়, গাড়ুর দরকারও ছিলনা কিন্তু—পাইয়ে দিয়ে গেল। যাক—এ ফ্যাসাদে জিনিষের চাষ তো এখানে ছিলনা,—গজায় যে! স্পষ্টবাদী রণগোপালকে যা দেখেছি—সে তো একটি ডাঁসা বোমা। এ নিশ্চয় তারি আলাপী। যে বাসা দেখিয়ে দিয়ে গেল সে রণগোপাল ছাড়া আর কেউ নয়। কোথাও যে স্বস্তি নেই। অনেক করে এই 'Good hope'টি মিলেছিল,—সয়না দেখছি।

অবিমিশ্র মন্দও নেই। লোকটা জোলাপের কাজ করে গেল।

২২

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালার সঙ্গেই মুকুন্দবাবুর যাত্রা বসবে। বালক যুবা রমণী সব দলে দলে সেই-মুখো চলেছেন। আর দেরী করা নয়। এটা আমার পক্ষে তো শুধু যাত্রা শুনতে যাওয়া নয়, এ এক রহস্যোদ্ঘাটন। সেই গম্ভীর প্রকৃতি, রগচটা এতটুকু লোকটির মধ্যে এতখানি রস ঢেউ খ্যালে,—এ যে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সাইকলজির অপঘাত!

একে সন্ধ্যার আবছায়া, তায় রাস্তায় জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের জারালিরা যেন ছাড় পেয়ে শূন্যে কিলবিল্ করে বেড়াচ্ছে। কি এগুলো? ওঃ ধোঁয়া। দেখি ১৫ গজ এগিয়ে একদল বালক—ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে চলেছে, বাঃ কি আর্টিষ্টিক্ ডিস্প্লে। নিরর্থক কিছুই নয়—চক্রধরের অর্থবিজ্ঞান মনে পড়লো। এরও মানে আছে,—ধোঁয়া-যাত্রা ভালো। না—বোধ হয় আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে—দেখে রাখো—সময় সন্নিকট,—শেষ এই। ওঃ এই বয়সে এরা পরার্থে কি ত্যাগ-স্বীকারই শিখেছে। বাঃ!

অস্পৃশ্যের মত পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিভৃতে একটি কোণ নিলুম। আসর প্রায় ভরে এসেছে—কচি-কাচার আর চিকের মধ্যে মেয়েতে। বিশ পঁচিশজন যুবক, আমারি মত চুপ্‌চাপ্ মুখ গুঁজে সতর্কভাবে এখানে ওখানে বসে। পার্শ্বেই আম্রকানন—তার মধ্যে অনেকগুলি। এমন দূরে দূরে কেনো?

সিগারেট জ্বালায় নেবার, জোনাকির ঝাঁকের মত,—গোপনচারী!

যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। আমার সেদিকে কান নেই,—চক্ষু মুকুন্দবাবুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ চোখ্ পোড়লো চক্রধরের ওপর, সেও এক পাশে ভিড়ের মধ্যে বসে, মাথা গুঁজে হিড় হিড় করে পেনসিল্ চালাচ্ছে! এ আবার কি? ভাববার সময় পেলুমনা—দেখি রণগোপাল,—এরে ডিঙিয়ে ওরে সরিয়ে, ফাঁকে ফাঁকে বকের মত পা ফেলে, প্রত্যেকের মুখ দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। কাকে খুঁজচে বুঝি? খদ্দরের জামা—গান্ধী টুপি।

আমাকে দেখতে পেয়েই—"এই যে—আপনি? তাইতো বলি,—আপনি আসবেননা এমন হয়? কেমন, সত্যিকারের প্রাণের সাড়া পাচ্ছেন তো? life giving. ……জড়ে চেতনা আনে……"

বললুম—"মুকুন্দবাবুকে দেখচিনা?"

"এই এলেন বলে। খাঁটি মাল এইতেই চেনা যায়, আপনার প্রাণ সেই তাঁর ওপরই পড়ে আছে। মুকুন্দ বই সুখ নেই। আমারও মশাই ওই রকম। তা আপনার এ ঘোঁজে থাকলে চলবেনা, সামনে চলুন।"

"বেশ আছি ভাই—"

"আচ্ছা থাকুন, বিরক্ত করবনা, নিজেই এগুবেন," এই বলে চলে গেল।

"তাইতো, ছেলে মানুষ, খুব মেতে গেছে দেখচি।"

বাঃ মুকুন্দবাবুর idea একদম নতুন।—একেবারে গোড়া থেকে গড়তে চান, শেকড়ে টান দিয়েছেন—কামার কুমার চাষী।

এই সময় একজন দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ প্রৌঢ় গান ধরে এসে আসরে ঢুকলেন। যেমন জোর কণ্ঠ, গানের মধ্যে তেমনি ঐকান্তিক অনুরোধ। সকলকে একাগ্র করে দিলে—

'জাগো জাগ জননী
তুই না জাগিলে শ্যামা'…ইত্যাদি।

আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেলো—"ইনি কে?"

পাশের একটি ভদ্রলোক বললেন—"ইনিই মুকুন্দদাস।"

বললুম—'না আমি তাঁকে চিনি।'

"আমরা ক'দিন দেখচি, আমরাও যে চিনি মশাই!"

কথা আর না কওয়াই ভালো। চুপ করেই শুনতে লাগলুম। পূর্ব্বে না দেখলে বরং কথা ছিল।

শেষ চরণ—

"মুকুন্দের কথা রাখ, করুণা নয়নে ত্যাখো,
তারো দীনে তারিণী।"

গাইতে গাইতে এগিয়ে একদম আমার কাছে এসে, পায়ের ধূলো নিয়ে—"এখানে থাকলে হবেনা কর্ত্তা, দয়া করে সামনে আসুন। মুকুন্দ পয়সার জন্যে যাত্রা গেয়ে বেড়ায়না, আপনাদের মত সমঝদার শ্রোতাই তার কাম্য।—এখন কথার সময় নেই, পরে হবে,—আসুন।"

দেখিনি, পশ্চাতে কখন চক্রধর হাজির হ'য়েছে; সে বললে—"উনি তো ঠিকই বলেছেন, সোনা বাইরে আঁচলে গেরো! এগিয়ে চলুন।"—নিয়ে গিয়ে ছাড়লে।

—"শুনলেন তো—'তুই না নাচালে কারো,' ইত্যাদি একদম আপনাদের I mean আমাদেরি মনের কথা। এই দেখুন না—সাহিত্যিকের নেশা, নোট্ করে চলেছি। অবসর বুঝে লাগাতে পারলে—আগুন ছুটবে। আশীর্ব্বাদ করুন কোনোটা মিস্ না করি।"

একটু ঘোঁজ দেখে বসে পড়লো।

ভাববার অবকাশ নেই, গায়কের মুখ থেকে যেন বহ্নিবীণা বাজছে। সব চুপ্। যে দিকে চাই—কয়েক জনের পেনসিলের পাল্লা চলেছে। কি একাগ্রতা! এখানে এতো সাহিত্যিক! সব উদীয়মান,—তা জানতুমনা! যাদের হয়, এমনি করেই হয়। শুনেছি দীনবন্ধু মিত্রের পকেটেও খাতা পেনসিল থাকতো। সাহিত্যের কি যুগই আসছে। বেহারিরা পর্য্যন্ত নোট্-নিবিষ্ট! বাঃ, হবেনা,—মিথিলার মাথা।

থাকতে না পেরে, আম্রকানন ছেড়ে এক একটি তরুণ এক একবার এসে, চেয়ার বা বেঞ্চি—বিহারীদের পশ্চাৎ হতে, ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে শুনে সট্‌কাচ্ছে। এ আত্ম-গোপনের চেষ্টা কেনো? অভিভাবকরাও উপস্থিত আছেন বুঝি? তাঁদের অনেককেই তো চিনি। অধিকাংশই উকীল মোক্তার। কই তাঁদের আধখানিকেও তো দেখচিনা। স্বাধীন ব্যবসা, নিকটেই সব থাকেন,

—তাঁরা কোথায় ? মক্কেলদের আক্কেল দিচ্ছেন বোধ হয়। আহা—পরের দুঃখেই সব গেলেন। দেখবার সময় কোথা ? কিন্তু একজনও……

শক্তিশেলের মত কানে ঢুকলো—

"পণ কোরে সব লাগরে কাজে,
খাটবো মোরা দিন্ কি রাত্,—
কিসের মান—আর কিসের জাত।"

ওঃ তাই এঁদের দিন রাত খাটুনি, একটা প্রিন্‌সিপ‌্‌ল ধরে আছেন। বিদ্যা এঁদের মধ্যেই সফল হয়েছে,—বাঃ! তবে যে শুনতে পাই দেশের সকল মুভমেণ্টের গোড়াই ওঁরা, ওঁরাই দেশটাকে নাচিয়েছেন। আহা বেচারাদের এ বদনাম কেনো। কত মিথ্যাই যে সত্য বলে চলছে! খাঁটি বুদ্ধিজীবী জাত, এঁদের অজানা আর কি আছে। 'আত্মানাম সততং রক্ষেত্' টুকু কি এড়িয়ে যেতে পারে,—ঘর বার ঠিক্ রেখেছেন। অসামান্য দক্ষতা।—কিন্তু মুকুন্দবাবু কোথায় ? কথাটা আবার অন্যমনস্কে উচ্চারিত হয়ে গেল।

'আরে মশাই—সামনে দেখেও বিশ্বাস করবেননা ?'

সত্যিই কি তাই। কোনোখানটা, এমন কি কণ্ঠস্বরেও যে মিল পাইনা! 'তা হলে লোকটা আর্টিষ্টও, কি মার্ভেলাস্ মেক্ অপ্—এ যে দেখছি Holy woodকে হারিয়ে দেয়! এক মোণ পাঁচ সের ওজনের লোকটি, আড়াই মোণ হয়েছেন;—সাড়ে চার ফুটের স্থানে ছ ফুট্। মুখ অতো ভারী, হাত পা—ভীমের! এঁর কাছে 'লন্‌চেনি' তো হে-পেনি! হাঁ make up একেই বলে! মন কিন্তু মুকুন্দ বাবু বলে সায় দিচ্ছেনা। নাঃ এখানে কোনো কথা কওয়া নয়।

বড় অস্বস্তির মাঝে পড়ে গেলুম। তখন চলছে—

"মরণ সাগর পার, হতে হবে সবাকার,
দিন গেলো বেলা অবসান।
ভয় নাই—মাঝি ভগবান।"

এ কি, চারশো লোকের শ্বাস পড়চেনা—এক সুরে সব-যন্ত্র বেঁধে দিয়েছেন। তরুণদের আম্রকানন থেকে টেনে এনেছেন! বাক্‌শক্তির কি দুর্জ্জয় বল, কি ক্ষিপ্র আঘাত! সবাই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কেউ কারুর অপেক্ষা রাখেনি। 'ভয় নাই মাঝি ভগবান'—ভারতের লোকের সকল বিষয়েই এটি একান্ত আপন কথা। এ কথাটি যে হতাশ অবসন্ন হৃদয়েও—পরম অভয়বাণী; চরম সঞ্জীবনী।

শেষ গানের শেষ চরণ গাইতে গাইতে মুকুন্দ এগিয়ে এলেন,—আশায় আনন্দে তখন আরো ফুলে উঠেছেন। প্রোজ্জ্বল চক্ষে প্রত্যাশাপন্নের সুরে প্রশ্ন করলেন—'হবে তো' ?

এই ছোট্ট কথাটির পশ্চাতে তাঁর যে ঐকান্তিকতা ও প্রবল আশা উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে, তাকে ক্ষুণ্ণ করবার শক্তি অতি বড় নিষ্ঠুরেরও নেই। মুখ থেকে যেন টেনে বার করে নিলে—"হবেই হবে।"

দেখিনি যে পেছনে চক্রধর উপস্থিত। মুকুন্দ বাবুকে বলছে,—"ওঁর কথা একদম অভয়বাণী,—এ যার-তার মুখের কথা নয়!"

লোকটা বলে কি,—কেনই বা ?

মুকুন্দ নত হয়ে নমস্কার করে' আনন্দমাখা মুখে চলে গেলেন।

দু তিন সেকেণ্ড অবাক হয়ে বসে থেকে, নানা চিন্তা নিয়ে উঠলুম।—ইনি তবে কোন্ মুকুন্দ,—দুজনেই দাস। এঁকে পূর্ব্বে কোনো দিনই দেখিনি। ইনি—তিনি তো ননই, বরং দেহে মনে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিপরীতই দেখলুম। খাঁটি দেশভক্ত বটে। কি ভ্রমেই পড়েছিলুম!—

—খুঁজে এসে আমারই পায়ের ধূলো নেবার মানে কি! বয়স ? আরো ২।৪ জন বৃদ্ধও তো ছিলেন। নিশ্চয়ই এ রণগোপালের ইঙ্গিত। সেই বলেছিল—দেখবেন—এগুতেই হবে। ছেলেমানুষ, নবীন উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করছে। এতটা ভালো নয়। অচ্যুত বাবু এই সব ভেবেই, ছেলেপুলে নিয়ে শান্তিপুর ছুটেছিলেন। এখন বুঝছি—ভালই করেছেন।

—সবসে বিপদ দেখছি এই চক্রধরটি। যখনই মুকুন্দ বাবু কাছে এসেছেন—ও-ও হাজির। সব কথায় আমার সুপারিস পেল। কেনো ? আমার সঙ্গে ওর কতটুকু পরিচয় ? আমি কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে চাই না'—ভালোবাসি, এই অপরাধ!

—সহসা মুকুন্দ বাবু এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"হবে

শ্মশানে শৈব্যা
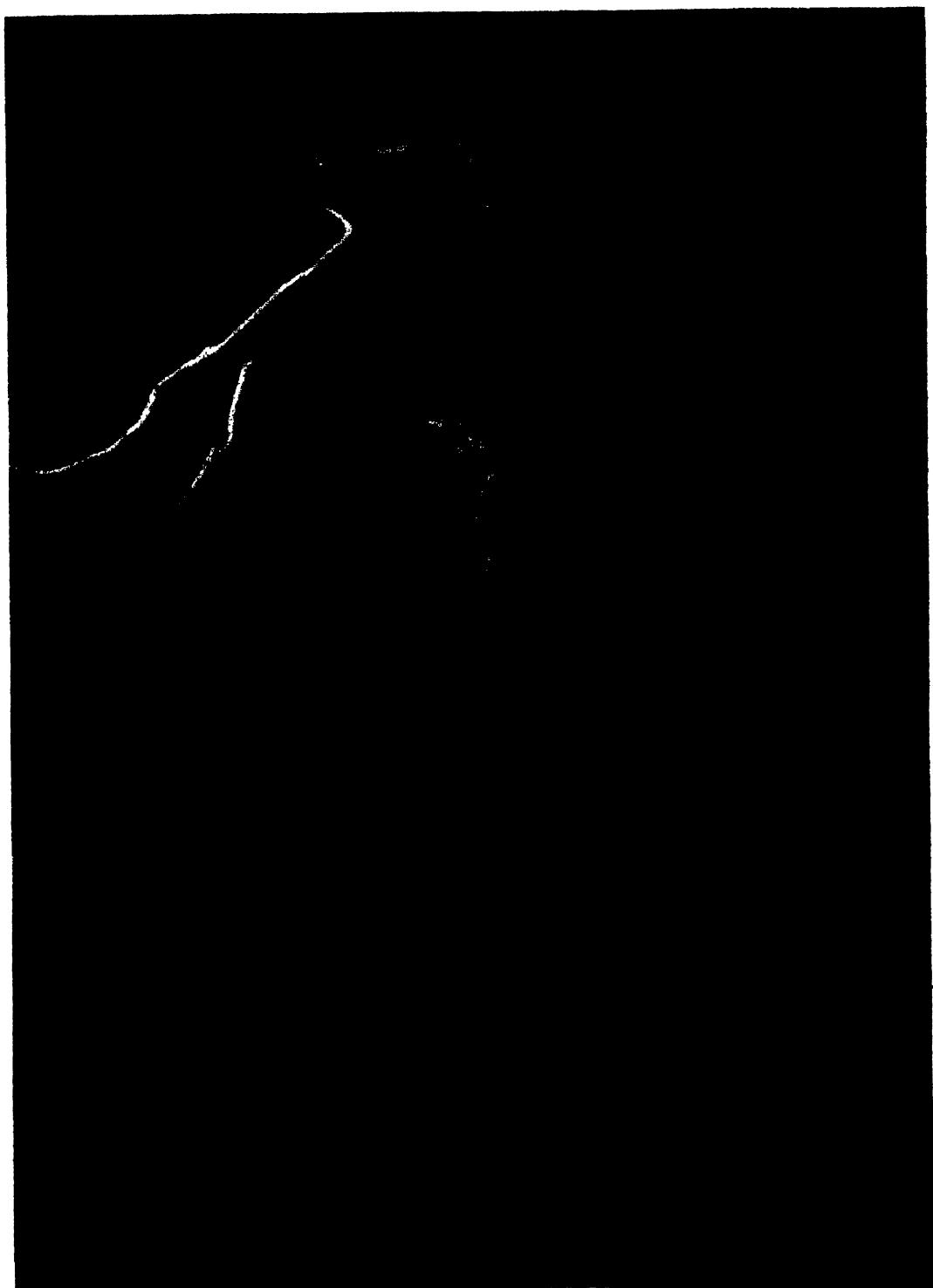
শিল্পী—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়   Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তো ?" কি হবে, কেনো হবে, হয়ে লাভ কি লোকসান,—কিছুই জানিনা। কিন্তু ভদ্রলোককে একটা উত্তর তো দিতেই হয়, রুক্ষতাও বাঁচাতে হয়, কাজেই ও-ক্ষেত্রে লোকে বলে থাকে—'হবে বই কি মশাই',—এই তো বুঝি। লোককে ক্ষুণ্ণ করবার দরকার ? অমনি সে মুকিয়ে ছিল,—অভয়বাণী-টানি অনেক কথা আউড়ে গেলো। তার এ-সব মাথা ব্যথা কেনো ?

—'দেখচি, এ জায়গাও আর সে জায়গা নেই—এখন মোটরে মজা ওঠে,—ভোটের ছোটে, গ্রামোফোন্ গান শোনায়, বেতারে বে-একতার ক'রে দেয়—মকরধ্বজ আর লাইফ্ assuranceএর (বিমার) হিতব্রতী এজেন্টরা লোকের মঙ্গল চিন্তায় সর্ব্বদাই ঘুরচে। ছেলের দুধ বন্ধ করে—বাপ গোল্ড্ ফ্লেক্ ফুঁকচে। যেখানে কুমীর আর বাইসন্ শীকার প্রসিদ্ধ ছিল, সেখানে লক্ষ্মীমানরা—দোয়েল আর কোয়েল মেরে বেড়াচ্চেন। যিনিই আসেন, কারুর পরিচয় ছোট নয়। কেউ বা রায় মশায়ের আপন ভায়রা-ভাই,—হলেই বা তিনি চিরকুমার—তাতে বাধেনা।

আজ দেখলুম, একনিষ্ঠ সাহিত্যিকও কম আসেননি। উন্নতি লাফিয়ে চলেছে। ঘি-টা খাঁটি মিলতো, সায়েন্সের উন্নতিকল্পে—নিরক্ষরেও সেদিকে মন দিয়েছে তাকে—মেষ-গরুর সম্পর্ক শূন্য ক'রেছে। আনন্দের অবধি নেই।

প্রথম যখন আসি, ট্রেণে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়।—পূর্ণিয়ায় আসছি শুনে তিনি চমকে যান। প্রশ্নের পর প্রশ্ন,—কেনো মশাই ? কি করেছিলেন ? পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া ? এ বয়সে সেটা সয়ে থাকাই বুদ্ধির কাজ ছিল। মাপ করবেন,—বিয়োগ ? না সংসার-বৈরাগ্য ? জ্ঞাতির গর্ত্তে ভিটেটা গেছে বুঝি ? তবে কি--কন্যাদায়ের চাঁদা ? কিছু মনে করবেননা—ওয়ারেন্ট ঝুলছেনা তো ?—ওঃ বুঝেছি, ম্যালেরিয়া মিক্শ্চার চালাবার চেষ্টা—না ? এজেন্ট বুঝি ? কিন্তু সেটা চলবার আগে, নিজের চলাটা যে···নিজে এলেন কেনো ? ইত্যাদি—

ভাবলুম রোগ আর কোথায় নেই—সহরে সরঞ্জাম আর সোর-গোল না থাকলেই শান্তি। এসে পেয়ে তাই। কিন্তু বিশ বচরে কিছু আর বাকি রইলনা,—With vengeance পাল্লা দিয়ে দেখা দিয়েছে। এখন যাই কোথা ? এর পর সাইবিরিয়া ছাড়া ঠাণ্ডা স্থান দেখিনা।—এই সব নানা চিন্তা নিয়ে ধীরে ধীরে বাসামুখো চলেছি—মগজ অশান্তিতে ভরা। দু'গজ পেছন থেকে,—"কেমন—যা চান তাই তো ?"

চমকে গেলুম,—চক্রধর পেছু নিয়েছে—ছাড়েনি। বড় বিরক্তিকর বোধ হল,—উত্তর দিলুমনা।

—"যা নোট্ নিয়েছি মশাই; এখন কিছুদিন কাজ দেবে। চলুননা, দেখা করে যাবেন, এই তো। দেখবেন আপনাকে পেলে মুকুন্দ বাবু···"

"না ভাই মাপ করো, শরীর ভালো বোধ হচ্ছেনা—গিয়েই শুয়ে পড়বো।"

—"উনি যদি কাল চলে যান, তা হলে যে,—এই তাজা তাজা আমারও যে অনেক শোনবার রয়েছে !"

"কি করবো পারছিনা,—মাথাও ঘুরচে—"

"ঘুরবেনা,—জিনিষটি কেমন। আমাদেরি,···আর আপনার তো প্রতি রক্তবিন্দু—হুঁ,—ব্লড্ প্রেসার বাড়িয়ে দেয়,—সিম্প্যাথেটিক্ যে। তবু শোনেননি—

"গান গেয়েছি অনেক বটে, তারে কি কয় গান ?
আকাশ পৃথ্বি হল না যায় টলটলায়মান।
ডাকলো না কো বান্।"

বুঝলেন ?"

"এখন কিছুই বুঝতে পারচিনা ভাই, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বো।"

"আপনারা উঁচু লেবেলের লোক্—ও-সব কথায় কেবল ব্যথা জাগায় কিনা। এখন কেবল উপায় চিন্তা—পথনির্দ্দেশ। আমরা বুঝতে পারিনা তাই জ্বালাতন করি, মাপ করবেন। হৃদয়তন্ত্রী ঘা খেয়ে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে, থাকতে পারিনা। বুঝেছি, নিশ্চিন্তে শুয়ে শুয়ে এখন কর্ম্মধারাটা স্কেচ্ করবেন। আচ্ছা—পরে শুনবো। আমরা আর কিসের জন্যে আছি—যা বলবেন"···পথেই পায়ের ধুলো নিয়ে—চলে গেলো।

বাঁচলুম। (ক্রমশঃ)

কথা ঃ—শ্রীক্ষিতীন সাহা। স্থর ঃ—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, স্থরসাগর

মিশ্র যোগিয়া—দাদ্‌রা

ভালবেসে বুঝি ভুলিবার
দিলে অবকাশ।
স্মরণের দোলা পরে তবু
দুলিছে স্থবাস॥
শরত অঙ্গন ঘিরে
আলোক আসে বাহিরে,
বিরহ বরষা তীরে—
মিলন উছাস॥

নিশীথ তারার সাথী, হে শেফালি!
ছিল তব সাথে—
স্বপন লোকের ছবি, দীর্ঘ রাত্রি
জাগি হিয়া পাতে।

শিশির মুকুতাগুলি
রাঙিল ভোরের তুলি
সুপ্তির দুয়ার খুলি
ডাকিল আকাশ॥

* স্বরলিপি ঃ—শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজগৎ ঘটক।

[র্সণা]
II II ণা -া -দা দপা দা দমা । দা -া -ম্া -মা -ঋম্া -পদা I
ভা ০ ল বে ০ সে বু ০ ০ ঝি ০ ০

I দপা -মজ্ঞা -ঋা -সা -া -া | সা -া ঋা মা -া -মা I
ভু • • • লি বা • র্ দি • লে অ • ব

I -গমা -গমা -পদা মপা -া -র্া | র্ণা -া -দা পা দা মা I
কা • • • • • • • • শ্ ভা • ন বে • সে

I দা -া -া মা -া -া | ঋা -া -া -সা -া -া I
বু • • ঝি • • ভু • লি বা • র্

I া া া া া া II

II র্সা -া -া -নর্সা -র্সা -নর্ণা | ণা -া -ধা ধর্সা -ণণা -দা I
স্ম র ণে র • • • • • • দো • • লা • • প

I -পা -া -া -া পা -পা | দা -সা -ঋা -মা -া মা I
রে • • • ভ বু ছু • লি ছে • সু

I -গমা -গমা -পদা -মপা -া -া II II
বা • • • • • • • • স্

II দা -া -দা না -া -না | র্সা -া -া সর্ঋা -ঋর্সা -না I
শ • র ত • অঙ্ গ • ন ঘি • • •
শি • শি র • মু কু • তা গু • • •

I -র্সা -া -া -া -া া | সর্ঋা -া -ঋা -ঋা -া -ঋা I
রে • • • • • আ • • লো ক • আ
লি • • • • • রা • • ভি ল • ভো

I -র্সা -া -া -া -া -ঋা | ণা -া -া -া -সর্ঋা -ণর্সা I
সে • • • • • বা • • হি • • • •
রে • • • র্ • তু • • • • • •

I -পা -দা -া -া -া -া | -দজ্ঞা -র্জ্ঞা -র্জ্ঞা -র্জ্ঞা -া -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ বি ০ ০০ র হ ০ ০ ব
লি ০ ০ ০ ০ ০ সু ০ প্ তি র ০ ০ ছ

I -র্সা -া -ঋা -র্জ্ঞা -র্জ্ঞা ঋা | র্সা -া -া -া -া -া I
র ০ ০ ষা ০ ০ ০ তী রে ০ ০ ০ ০ ০
য়া ০ ০ র ০ ০ ০ খু লি ০ ০ ০ ০ ০

I সা -া -ঋা -মা -া মা | -গমা -গমা -পদা -মপা -া -া II II
মি ০ ল ন ০ উ ছা ০ ০০ ০০ ০০ ০ স্
ডা ০ কি ল ০ আ কা ০ ০০ ০০ ০০ ০

II পা -া পা পা -া পা | পা -া -া পা দা ণা I
নি ০ শী থ ০ তা রা ০ য্ সা ০ ০

I পা -া -া -া -া -া | পা -া পা পা -া পা I
থী ০ ০ ০ ০ ০ নি ০ শী থ ০ তা

I পা -া -া -দা ণা র্সা | পা -া -া -া পা -দা I
রা ০ র্ সা ০ ০ থী ০ ০ ০ হে ০

I মা -পদা -পা -মা -গমা -া | া া সা -ঋা জ্ঞা -মা I
শে ০০ ফা লী ০০ ০ ০ ০ ছি ল ত ব

I পর্সা -ণর্সা ণদা -া -া -া | মঋা -া -ঋা -সা -া সা I
সা ০ ০০ থে ০ ০ ০ ০ স্ব ০ প ০ ন ০ লো

I সা -া -ঋা -মজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা | -সা -া -া -া -া -া I
কে ০ ০ র ০ ০০ ছ বি ০ ০ ০ ০ ০

I সঋা -া -া ঋা -র্সা ণা | র্সা -া -া -া -া -া I
দী র্ ঘ রা ০ ০ ত্রি ০ ০ ০ ০ ০

I ণা র্সা -র্জ্ঞঋা -র্সা ণা -দণদা | -পা -া -া -া -া -া II
জা গি হি ০ য়া পা ০০০ তে ০ ০ ০ ০ ০

জননী, রমণী, নন্দিনী

শ্রীপরেশনাথ সেন বি-এ

(আলোচনা)

গত জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' 'জননী, রমণী, নন্দিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে পাদটীকায় মাতৃভাবের উপাসনাকে বাৎসল্যের অনেক নিম্নে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মাতৃভাবের উপাসক আমরা ইহাতে আপত্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এক সম্প্রদায়ের মত যখন পত্রস্থ করিয়াছেন, আশা করি অন্য সম্প্রদায়ের বক্তব্যও পত্রস্থ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

ভাগবতভূষণ মহাশয় বলিতে চান, মাতৃভাবে ভক্তি ও বাৎসল্যে প্রেম। কিন্তু ভক্তি কি প্রেম নয়? ভক্তিসূত্রকার শাণ্ডিল্য ও নারদ ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন, 'সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা', 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। সুতরাং ভক্তি শুধু প্রেম নয়, পরম প্রেম। ভাগবতভূষণ মহাশয় হয় ত বলিবেন, মাতৃভাবে সেরূপ প্রেম হয় না, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? তিনি বলিয়াছেন, 'ভক্তির দার্ঢ্য স্নেহ-ভালবাসা অপেক্ষা কম'। ভক্তির কোন্ ত্রুটি থাকাতে তাহার দার্ঢ্য কম তাহা তিনি বলেন নাই। পুত্র-কন্যা কি মাতার প্রতি স্নেহশীল হয় না, কেবল সম্মানই করে? তাহা ত নয়; বরং মাতাকে যে সম্মান করিতে হয়, শিশু এ কথা জানেই না। সম্মান করিবার শিক্ষা সে সমাজের কাছে পায়। মায়ের প্রতি যে ভাবটী তাহার স্বভাবজাত, তাহা নিছক প্রেম। শিশু মাতাকে বেশীক্ষণ না দেখিলে অস্থির হয়; যে মাই ছাড়িয়াছে, সেও হয়। মায়ের কোল শিশুর পরম শান্তির, তৃপ্তির স্থান। মায়ের জন্য সন্তান প্রাণপণ করে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

স্তন্যপায়ী শিশুর ত মায়ের প্রতি আকর্ষণ অদম্য, বিরাট। মায়েরও বোধ হয় শিশুর প্রতি তেমন আকর্ষণ হয় না। উপাসক ত জগন্মাতার স্তন্যপায়ী শিশু। পরম-শান্তিময় মায়ের কোলে বসিয়া তাঁহার স্তন্যামৃত পানের দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার তুলনা কোথায়? মাতৃভাবের উপাসকের সেই আকর্ষণ। শুধু 'মা' নামের যে মধু, তাহারই বা তুলনা কোথায়? ইহার তুলনায় আর সকল নামই শুষ্ক কঠোর।

বাৎসল্য ভাবের সাধক ভগবান্‌কে কি ভাবে দেখেন? ভাগবতভূষণ মহাশয় বলেন, "বাৎসল্য সাধনায় সাধকের কাছে ভগবান্‌কে ছোট হইয়া আসিতে হয়, অর্থাৎ সাধক তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ভাবিয়া থাকেন।" এখানে আমার মনে এই খটকা উপস্থিত হইতেছে যে, উপাস্য যদি ছোট হইয়া গেলেন, ভগবানের 'ভগ'ই যদি না থাকিল, তবে সে উপাসনার মূল্য রহিল কি? এক অর্থে পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদিও ত এক একটী ছোট ছোট ভগবান্। ইহাদের প্রতি প্রেম ও ইহাদের উপাসনা অপেক্ষা সে উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? আমার ত ধারণা, এইরূপ বাৎসল্য ভগবানের প্রতি প্রযোজ্য নহে। ভাগবতে প্রহ্লাদোক্ত ভক্তির নবলক্ষণ—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ইহার মধ্যে বাৎসল্য নাই। তবে বালক-বালিকাদিগের মধ্যে ভগবদ্দর্শন করিয়া ইহাদিগকে স্নেহ করা, সেবা করা, সুখী করাকেও বাৎসল্যভাবের সাধন বলা যায়; তাহা উত্তম। তাহাতে ভগবান্‌কে ছোট করা হয় না।

ভাগবতভূষণ মহাশয় প্রহ্লাদের সহিত যশোদার তুলনা করিয়াছেন। প্রহ্লাদ ছোট কিসে? প্রহ্লাদ জ্ঞানী, যশোদার মধ্যে মধ্যে জ্ঞানোদয় হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না। যশোদার কৃষ্ণপ্রীতি বালক কৃষ্ণকে ছাড়াইয়া সর্ব্বভূতস্থ কৃষ্ণে কতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। প্রহ্লাদের ভক্তি কিন্তু কেবল বিশ্বপ্রীতিতে নিরস্ত নহে, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার আত্মভাব। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'অন্য দেবতার উপাসকেরাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে; অবিধির কারণ এই,—

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।

অর্থাৎ তাহারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানে না, তাই আমার উপাসনার ফল যে আমাকে লাভ করা, তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। যশোদা যদি কৃষ্ণকে পুত্র মাত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে তিনি সেই জন্যই কৃষ্ণকে হারাইয়াছেন। আর যদি তিনি তত্ত্বতঃ তাঁহাকে জানিয়া থাকেন, তবে কখনও হারান নাই; কিন্তু তাহা হইলে কৃষ্ণ আর তাঁহার কাছে ছোট ছিলেন না। প্রহ্লাদ কিন্তু ভগবান্‌কে ক্ষণকালের জন্যও হারান নাই। যশোদার নিকট নাচিয়াছেন, খেলিয়াছেন রক্তমাংসের শিশু, প্রহ্লাদের নিকট নাচিয়াছেন খেলিয়াছেন বিশ্বাত্মা ভগবান্। প্রহ্লাদ ছোট কিসে?

ভক্তি প্রেমাত্মক; কিন্তু যাহাকে আমরা সাধারণতঃ স্নেহ বলি, ভাগবতভূষণ মহাশয় যাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'স্নেহ নীচগামী' সেই স্নেহকে বোধ হয় ভক্তি বলা যায় না। গীতায় যে চারি প্রকার ভক্তের কথা আছে, বাৎসল্য সাধক তাহার কোন প্রকারের মধ্যেই পড়েন না। ভাগবতেও নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকে স্নেহকে ভক্তি হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে—

কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্ গতিং গতাঃ॥

নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, ভক্তি দ্বারা যেমন হয় সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহ হেতু ও ঈশ্বরে মন আবিষ্ট করিয়া অনেকে উত্তম গতি ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন।

এই শ্লোকে 'তদঘং হিত্বা' অর্থাৎ 'তাহার দোষ হইতে মুক্ত হইয়া,' এই বাক্যে কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহের মধ্যে যে একটা দোষ আছে তাহা

ব্যক্ত হইল। এই দোষ ভক্তিতে নাই, সুতরাং এগুলি ভক্তি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অজ্ঞানই এই দোষ। সত্য ভগবান্‌কে জানিলে তাঁহার প্রতি কামাদি ভাব হওয়া অসম্ভব হয়। তাঁহাতে মানুষ ভাব আরোপ করিয়া মানুষ জ্ঞানেই গোপীরা কাম, শিশুপালাদি দ্বেষ, কংস ভয়, নন্দ যশোদা প্রভৃতি স্নেহ করিয়াছেন। নারদ বলিতেছেন, কালে ইঁহাদের সেই অজ্ঞান দূর হয় এবং ইঁহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। এমন কথাও ভাগবতে আছে যে, মিত্রভাব অপেক্ষা শত্রুভাবেই ভগবান্‌কে অধিক সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে জন্য শত্রুভাবকে ভক্তির উপরে আসন দেওয়া যায় না। কারণ ভগবানে যেরূপ ভাবে মন আবিষ্ট করিলে অজ্ঞান-মোহ কাটাইয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়, যাহারা সেই অজ্ঞানমোহেই তুষ্ট থাকে, তাহা যে কাটাইতে হইবে সে বোধও যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে সেভাবে মন আবিষ্ট করা দুরূহ। ভক্তির পথ কিন্তু নিশ্চিত পথ। যে যতটুকু ভক্তি লইয়া সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে, তাহাই তাহাকে সাহায্য করিবে। ভক্তি-সহকৃত কর্ম্মযোগের কথা ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

মাতৃভাব ও মধুর ভাব, এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? আমি বলিব উভয়ই সমান। মাতৃভাব মধুর ভাবেরই রূপান্তর। কেহ মাতৃভাব, কেহ বা মধুরভাব অধিক পছন্দ করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মধুর ভাবের মধ্যে যদি কামগন্ধ থাকে, তবে তাহা হীন হইয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখান হইয়াছে, এক মধুর ভাবের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যের গুণ বর্ত্তমান, অধিকন্তু—

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।

মাতৃভাবের সাধনায়ও এই পঞ্চ গুণ বর্ত্তমান। শিশু যখন খেলনা লইয়া খেলা করে, অথবা লেখাপড়া করে, কিংবা বেড়াইতে বাহির হয়, তখনও তাহার মনের অন্তস্তলে মায়ের স্মৃতি লুকায়িত থাকে। বাহিরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু একটু কিছুতেই সে যখন 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠে, তখনি তাহা ধরা পড়ে। এখানে শান্তভাব। মাতা যদি কিছু করিতে বলেন, তাহা করিবার জন্য শিশুর কত আগ্রহ, করিতে পারিলে কত আনন্দ; মাতার জন্য কোন কাজ করিতে চাহিলে যদি তাহাকে তাহা করিতে না দেওয়া হয়, তবে তাহার কত দুঃখ হয়। সুতরাং মাতৃভাবের মধ্যে দাস্য ভাব সুন্দররূপে প্রকটিত দেখা যায়। শিশুর সকল আবদার মায়ের কাছে। একটু বয়স না হইলে সম্ভ্রম বোধ জন্মে না। সে মায়ের কোলে উঠে, ঘাড়ে চড়ে, গলা ধরিয়া আদর করে, চুমা খায়, তুই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতা কোন অভিলাষ পূর্ণ না করিলে অভিমান করে। এ সকল সখ্যভাবের লক্ষণ। মাতাকে ক্লান্ত বা অসুস্থ দেখিলে অথবা মাতা বৃদ্ধ হইলে সন্তানই তাঁহার মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে লালন করে, এখানে বাৎসল্য (এ ভাব কিন্তু ভগবানের প্রযোজ্য নহে)। কিন্তু ভক্ত কখন কখন ভাবাবেশে মাকে এমন সকল আদরের, স্নেহের কথা বলেন, যাহা সন্তানের প্রতিই প্রযোজ্য। এইভাবে কখনও তিনি মাকে তিরস্কারও করেন। ভক্ত জানেন, মা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী। কিন্তু যেমন পার্থিব মাতা রুগ্না, ক্লান্তা অথবা কোন প্রকার ক্লিষ্টা না হইলেও স্নেহশীল সন্তান তাঁহার সম্ভাবিত ক্লেশ কল্পনা করিয়া অভিভাবকের মত ভাবা প্রয়োগ করে, এবং সেই ক্লেশ দূর করিবার জন্যই চেষ্টিত হয়; ভক্তও সেইরূপ ভাবাবেশে জগন্মাতার ক্লেশ কল্পনা করিয়া ঐরূপ ভাষার প্রয়োগ ও কর্ম্ম করিতে পারেন। আর পত্নী যেমন পতির প্রতি পরম নির্ভরশীলা, পতি বই জানেন না, পতির নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার বুকে মিশিয়া থাকাকে চরম সুখ, চরম সৌভাগ্য মনে করেন, শিশুও তেমনি মা বৈ জানে না, মায়ের উপর তাহার সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস, মায়ের বুকে মিশিয়া থাকাই তাহার চরম সুখ। অন্যের কথা কি, মা নিজেও যদি তাহাকে তিরস্কার বা প্রহারও করেন, তথাপি সে মায়ের কোল ছাড়িতে চায় না। মাতৃভাবের সাধক এইরূপ মায়ের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই করেন, কিছুতেই মাকে ছাড়েন না। মধুর ভাবের আত্মসমর্পণ অপেক্ষা এ আত্মসমর্পণ কোন অংশে ন্যূন নহে। ভগবানের সম্বন্ধে 'কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া সেবনের' অর্থ ত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ হইতে পারে না। ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ও দেহ মনকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ, নিজের জন্য কিছুই না রাখা। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মাতৃভাবের সাধক গণ তাহাই করিয়াছেন।

মাতৃভাবের সাধনায় সুবিধা এই যে, এই একই ভাব লইয়া সাধনার নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমে উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারা যায়। নিম্ন স্তরের অনধিকারী মধুর ভাবের সাধনা করিতে গেলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী।

আমি স্তন্যের আকর্ষণের কথা বলিয়াছি। কেহ হয় ত বলিবেন, 'তবে ত মাতৃভাবের সাধন সকাম হইয়া পড়িল'। 'হাঁ, তাহা হইল বটে, কিন্তু এই উচ্চ সাত্ত্বিক কামনাই নিকৃষ্ট সমস্ত কামনা জয় করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। মধুর ভাবের সতীর পতিপ্রেমই কি নিষ্কাম? বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যে বলিয়াছেন, 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি'—অর্থাৎ পত্নী যে পতিকে ভালবাসেন, সে পতির কোন উপকারের জন্য নহে, ভালবাসিয়া নিজে সুখী হন বলিয়াই ভালবাসেন,—এ কথা অতি সত্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে বলেন, 'নিজের সুখেচ্ছার নাম কাম, আর কৃষ্ণের সুখেচ্ছার নাম প্রেম', এ কথা সত্য; কিন্তু কৃষ্ণের সুখেচ্ছা করিব কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলেই দেখা যাইবে, কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলে সুখী হন বলিয়াই ভক্ত কৃষ্ণের সুখেচ্ছা করেন। তবেই ত স্তন্য আসিয়া পড়িল। যে পর্য্যন্ত দ্বৈতভাব থাকে, সে পর্য্যন্ত এই সাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়া যায় না। উচ্চতম স্তরে যখন দ্বৈতভাব চলিয়া যায়, ভক্ত ভগবানের (বা ভগবতীর) সহিত একীভূত হইয়া যান, তখন আকাঙ্ক্ষা থাকেও না, তাহার প্রয়োজনও হয় না; প্রেমামৃত অবিরত ধারায় আপনিই ক্ষরিত হইয়া ভক্তকে অনন্ত তৃপ্তি ও আনন্দ দান করে।

কোনও সম্প্রদায়ের কাহারও ক্লেশকর হইতে পারে, এমন কথা না বলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যদি অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ কাহারও ক্লেশকর কিছু বলিয়া থাকি, তজ্জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

তীর্থকামীর পত্র

শ্রীনিরুপমা দেবী

রাত্রি সাড়ে তিনটায় চিঙ্গলপেটের ধরমশালায় পৌঁছে তাদের ভোরের ঘুম ভাঙিয়ে স্থান পেতেই চারটে বেজে গেল। বেলা ৭টার মধ্যেই পক্ষীতীর্থে রওনা হতে হবে, সকালেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া! বিশ্রাম করার সময় নেই, মাল্‌-পত্র গুছিয়ে রেখেই স্নানাহ্নিকে ব্যাপৃত হতে হল! পঞ্চাননের তো কথাই নেই। তাকে ফোঁটা দিয়ে নিয়ে বেলা প্রায় সাড়ে সাতটায় 'বাস' আরোহণে পর্ব্বতের কাছে একটা ছোট রকম হ্রদের সামনে পৌঁছে সেখানকার কয়েকটী দেবমন্দিরের মহাদেব এবং ত্রিপুরেশ্বরী দেবী দর্শন করলাম। হ্রদটির দুই দিকে গ্রামের বসতি, এক দিকে প্রান্তর, বাকি দিকটায় পাহাড়! এই জলরাশির সাম্‌নে বেদগিরি (পাহাড়ে উঠে পাণ্ডার মুখে এই নাম শুনি) পাহাড়টিকে বেশই দেখাচ্ছিল। বেলা ৮টাতেই আমরা পর্ব্বতারোহণ করতে লাগ্‌লাম। বাস্‌ মাত্র ২০ মিনিটেই এই কয়েক মাইল রাস্তা অতিবাহিত করেছিল। লিখতে ভুলেছি, চিঙ্গলপেট ধরমশালায় কতকগুলি বাঙ্গালী যাত্রীর সঙ্গে আমরা মিলিত হই। তাঁরা মান্দ্রাজ যান্‌ নি—মেন পথ ছেড়ে শাখা পথে ত্রিপতি বালাজী বা বেঙ্কটেশ্বর দর্শন করে এইখানে এসেছেন। পক্ষীতীর্থ কাঞ্চি এ-সব সেরে তবে শ্রীরঙ্গম রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করবেন। সম্পন্ন অবস্থায় লোক, সঙ্গে বহু জন এবং সম্ভার। এঁরাও পক্ষীতীর্থ পথে আমাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। মহোৎসাহে আমরা পর্ব্বতে উঠ্‌তে লাগলাম। শোনা গিয়েছিল, দেড় শত সিঁড়ি; কিন্তু গুণে দেখা গেল, পাঁচ শতেরও উপর কয়েকটি। শিখরে উঠে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নেবার অবসরে পাহাড়ের এক দিকে একটু নেমে দশ ক্রোশ দূরস্থ সমুদ্র দর্শন ক'রে নেওয়া হল। দশটার পর পুরোহিত এসে মন্দির খুলে বেদগিরি দেব শিবের পূজা করলেন—বাদ্য শব্দ গুহাদ্বার মন্দির অভ্যন্তরে গম্ভীর শব্দে বাজতে লাগ্‌ল। যাত্রীদের প্রবেশাধিকার দিয়ে তিনি কর্পূরের আরতি করতে লাগলেন। তার পরে আবার খানিকটা নেমে গিয়ে আমরা পাখীদের খাবার জায়গায় উপস্থিত হ'য়ে একটা চালার নীচে সমবেত হলাম। সেই সম্ভ্রান্ত দলেরাও গেলেন—তাঁদের হাতে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। তিনি পক্ষীতীর্থ সম্বন্ধে কি লিখেছেন সকলকে শোনাতে লাগলেন। "ভারতবর্ষে" এইখানটা এই পক্ষীতীর্থে এসে কে যেন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করেছিল আমাদের মনে হ'ল। যাক্‌—আমরা উঠে বেড়াতে বেড়াতে দেখি পশ্চাতের সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে একটা বড় রকম সাদা পাখী এসে বসে নিজের গা ঝাড়ছে আর ডানা-পাখ্‌না শুখাচ্ছে। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, এঁরাও অনেকগুলি সহযাত্রী ছিলেন। তাঁরা 'ওহি রে ওহি' বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পক্ষীবর কিন্তু একমনে নিজের অঙ্গ সংস্কারেই ব্যাপৃত! খানিক পরে একজন সেবক এসে সেই চালাটার সমুখে যে বৃহৎ রকমের হাতীর পীঠের মত পাহাড়ের অংশগুলা ছিল তারই একটার উপরে একখানা আসন ও দু'খানা পিঁড়ি পাতলো, দু'বটী জল, এবং ছোট ছোট দু'টো বাটি রাঁখল। পরে এলেন পুরোহিত—সঙ্গে একটী ঘড়ার মত গড়নের ধাতুর হাঁড়ি। তারই ভিতরে অগস্ত্য মুনির সন্তান দুইটার জন্ম ভোগ আছে; ঋষি-সন্তান দু'জন প্রত্যহ রামেশ্বরে সমুদ্র স্নান করে এখানে ভোজন করেন। সকলে আমরা তীক্ষ্ণ চক্ষে চারিদিক্‌ দেখছি। পাহাড়ের উপরে সেই একটী পাখী একভাবে ডানা শুখাচ্ছে। এদিকে পুরোহিত ভোগ নিবেদন ক'রে যোড়হাতে কি সব বল্‌তে লাগলেন—পক্ষীর দেখাই নাই। তার পরে পুরোহিত পাহাড়ের গায়ে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়লেন। এইবার তিনি উঠে বসতেই বিদ্যুৎগতিতে কোথা হতে একটা পাখী এসে যে সেখানে আবির্ভূত হলো এতগুলো চোখ কিন্তু কেউই তা ধরতে পারলে না! যেটা আমরা এতক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম তার চেয়ে এটি কিছু ছোট; এটি

আসার পরেই পাহাড়ের সে পাখীটীও তখনি তার কাছে উড়ে এল। তার পরে পুরোহিতের দত্ত সেই বাটী থেকে এবং তাঁর হাত থেকেও তাঁরা তাঁদের ভোগ বা খিঁচুড়ী খেতে লাগ্‌লেন—ঘটী থেকে জল খেলেন, তার পরেই হঠাৎ দে ছুট! অমনি সেই জনতা উর্দ্ধশ্বাসে সেই হাতীর পীঠের মত উঁচু জায়গাটুকুতে উঠে। (সেটার খুবই কাছে যাত্রীরা ছিল ৮।১০ হাত দূরে হয় কি না সন্দেহ।) পাখীদের সন্ধানে দৃষ্টি চালাতে লাগলো। পাহাড়ের সেদিকে নীচে পর্য্যন্ত দেখা যেতে লাগলো—সেখানটা একেবারে খাড়া সোজা বল্‌লে হয়। একটী পাখী উড়তে উড়তে সমুদ্রাভিমুখেই চলেছে বটে (তাঁরা থাকেন নাকি সমুদ্রের মধ্যস্থ দ্বীপে) কিন্তু আর একটীর কোন পাত্তাই মিল্‌লো না। এইটীর সঙ্গে পুরোহিতের কোন সম্বন্ধ হয়ত আছে বলে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেন। পুরোহিত সকলকেই প্রসাদ নিতে ডাকলেন; কেন না, সকলেই সাধ্যানুসারে পক্ষীরাজদের ভোগ দিয়েছিল। প্রসাদ অবশ্য নিজ নিজ রুচিমতই অনেকে নিল, অনেকে নিল না।

তার পরে পর্ব্বতাবরোহণের পালা! নেমে আমরা একটা জায়গায় বসে জলযোগের চেষ্টা কর্‌ছি, ইতিমধ্যে শোনা গেল ডুলি ছিঁড়ে কে পাহাড়ের সিঁড়িতে প'ড়ে গেছেন। সকলে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লাম। পঞ্চানন তার অর্দ্ধভুক্ত আহার ফেলে নিজের কর্ত্তব্যে সেই দিকে দৌড়ালো। কিন্তু তাকে বেশী আর যেতে হ'ল না। দেখা গেল, সেই তাঁরাই সদলে নেমে আস্‌ছেন। একটী গিন্নির মাথায় ভিজা গামছা জড়ানো। তাঁর হাত ধরে এবং আসে পাশে সকলে মহা তর্জ্জন গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে অগ্রসর হচ্চেন। পিছনে অপরাধী ডুলি-বাহকের দল মুখ চুণ করে আস্‌ছে। নিকটে এলে দেখা গেল আঘাত এমন কিছু নয়। বাহকের পদস্খলন বা দড়ী ছিঁড়ে যাতেই তিনি প'ড়ে থাকুন, ডুলির বাঁশে মাথায় একটু চোট্ লাগা ছাড়া অত্যহিত কিছু হয় নি; কিন্তু সেই পতন সম্ভ্রমেই সমস্ত দলটি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। সাত আটখানা ডুলিতে তাঁদের দলের বেশীর ভাগ মেয়েরাই পাহাড়ে উঠেছিলেন। সকলেই তার পর নেমে পড়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মৃদু মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ কর্‌তে কর্‌তে আসছেন; কিন্তু কর্ত্তারা ডাক হাঁকে পার্ব্বত্যপ্রদেশটি ধ্বনিত করে তুলেছেন। কুলীদের শাসাচ্ছেন তাদের অচিরে তাঁরা জেলে দেবেন, নিশ্চয় তারা মদ খেয়েছিল, ইত্যাদি। বাহকদের পক্ষে কেহ কেহ দোভাষী হয়ে হাতযোড় ক'রে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছে যে এ পদস্খলন দৈবাৎই হ'য়ে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা সে কথায় কর্ণপাত না করে তাদের গালাগাল দিতে দিতে বাসে উঠে বস্‌লেন। বাহকদল হতভম্ব হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করায় তখন ব্যাপারটা কঠিন বলেই মনে হল। একের অপরাধে তাঁরা সমস্ত বাহকদেরই দণ্ডিত ক'রে চললেন, অর্থাৎ কাউকেই কিছু দিলেন না। আমরাও সেই বাসে উঠ্‌লাম। তাঁরা সমস্ত পথ একই ভাবে কুলীদের উপর তর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লেন, যে, দেশে হ'লে তাদের ধরে জেলে দিতেন, বিদেশ তাই এইটুকুতেই রেহাই পেল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে, শেষে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে, ক্রমে ক্রমে আমরা মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলাম, একের দোষে সবগুলির দণ্ড হ'তে পারে না। তাঁরা প্রথমে বেশী রকম উত্তেজিত হয়েই উঠলেন; কিন্তু ক্রমে "তীর্থ করতে আসা—ওরা কাঁধে করে পাহাড়ে তুলেছে, নামিয়েছে,—একে তো তীর্থের পথে এইটাই এক পাপ—আমরা অসমর্থ, কাজেই উঠ্‌তে হয়; কিন্তু যেটুকু ক্ষমা কর্‌তে সমর্থ, তাতে ত্রুটী না হয়; অন্যগুলির দণ্ড তো হতেই পারে না,—যে দোষ করেছে তার বিষয়েও ভাববেন,—এই পাহাড়ে কাঁধে ক'রে তো সে তুলেছে।" ইত্যাদি শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে তাঁরা একটু একটু ক'রে শান্ত হ'তে লাগলেন। বাস ততক্ষণ সবেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে চিঙ্গলপেট ষ্টেশন অতিক্রম করে আমাদের ধরমশালার নিকটস্থ হয়েছে। সকলের বিশ্রামের বা আহারাদির চেষ্টার মধ্যেও যেন একটা বিরসতা ফুটে উঠ্‌ছিল। বৈকাল হ'তেই তাঁদের দিকে আবার তর্জ্জন সুরু হওয়ায় খবর নেওয়া গেল—বাহকের দল এসে উপস্থিত হয়েছে। মধ্যস্থতা কর্‌তে অনেকেই সেখানে যাওয়ার পর শেষে শোনা গেল, অন্যান্য বাহকেরা নিজেদের মূল্য পেয়েছে,—কর্ত্তারা কেবল দোষীকেই কিছু দেন্ নি। কিন্তু সব শেষ তাও নয়। মেয়েরা সেই

দোষীকেও ডেকে তার প্রাপ্য তাকে দিয়ে দিয়েছেন। সব ভাল যার শেষ ভাল! স্বস্তিতে অনেকেই 'যাক্' বলে ফেল্লেন।

এইবার আমাদের কাঞ্চি যাত্রা দিদি। সমস্ত যাত্রা-পথটি যাঁর জন্য অপেক্ষা করছি তিনিই এবারে হয়ত দেখা দিতে পারেন। কি একটা উত্তেজনাই যে মনে আস্‌ছিল। সন্ধ্যা সাতটাতে কাঞ্চির গাড়ীতে রওনা হয়ে রাত্রি ৯টার মধ্যেই সেখানে পৌছানো গেল। ষ্টেশনেই একজন তীর্থগুরুর সঙ্গ লাভ হল, নাম দেবলকৃষ্ণ! কাঞ্চির যে বড় ধরমশালা, সেখানে এবারে কিন্তু স্থান মিল্‌লো না! যাত্রী বেশীর জন্য নয়; বরং যাত্রী এখানে বড় একটা দেখাই গেল না। শোনা গেল, ধরমশালার উত্তরাধিকার নিয়ে একটু বেশী রকম গোল বাধায় সরকার থেকে কমিশন এসেছে ইত্যাদি। মোট কথা, এখন সেখানে অন্ততঃ বাঙ্গালী যাত্রীর স্থান হবে না। দেবলকৃষ্ণ আমাদের শিবকাঞ্চির দেবতা—স্বয়ং একাম্বর-নাথের দরজার প্রায় সামনেই একটা একতালা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তালা খুলিয়ে দেওয়ালেন। ঐটিই ঠিক্ ধরমশালা,—ভিতরে মাত্র সামান্য ছচারটে কুঠ্রী, তাও তালাবন্ধ। চারি দিকে পাথরের সরু সরু থাম দেওয়া বারান্দা মাত্রই যাত্রীদের আচ্ছাদক! আমরা এই স্থান পেয়েই মহানন্দে একটা বারান্দা অধিকার করলাম। বাড়ীটায় জনমানব নেই; নিজেদেরই ছুই দিকের দরজায় তালাবন্ধ করতে হ'ল। সেজন্য শুভা একটু ভয়-ভয়ই বোধ করছিলো। কিন্তু বাহিরের সুপ্রশস্ত পথ বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, রাস্তার ছুই দিকেই মনুষ্যাবাস। নিকটেই একাম্বরনাথের মন্দির! বাড়ীটা বহু পুরাতন, পড়ো বাড়ীর মত। আর একটা দিকের দরজা অন্য দিক হতে বন্ধ, ভিতরের থেকে বন্ধ করার উপায় মাত্র নেই। তবুও অভয় সঞ্চয় করে সকলে শুয়ে পড়া গেল।

প্রত্যুষে তীর্থগুরু এসে আমাদের তীর্থ-স্নানার্থে 'সর্ব্বতীর্থ' কুণ্ডে নিয়ে চললেন। শুনলাম এখানে তিনধারা প্রবহমান—নাম কৃষ্ণবেণী, বেগবতী এবং পম্পা! কিন্তু একজনেরও দর্শন মিল্‌লো না,—সবই বহু দূরে, এবং বোধ হ'ল তাঁরা অন্ততঃ এ স্থানে নামমাত্রেই পর্য্যবসিত। যাত্রীদের এই কুণ্ডেই স্নান দানাদি করতে হয়, এঁর নাম সর্ব্বতীর্থোদক কুণ্ড! সংকল্প ও স্নানান্তে কুণ্ডকে প্রণাম করালেন এই মন্ত্রে "কৃষ্ণে কৃষ্ণাঙ্গ-সম্ভূতে জন্তুনাং পাপ-নাশিনীং; যাচিতং তীর্থ মে দেহি—কৃষ্ণ ভক্তিপ্রদায়িনী!" সারা তীর্থ ঘুরে এইখানে এসে যেন কাণ-প্রাণ জুড়িয়ে গেল এমনি মনে হ'ল। নারায়ণের অজস্র নাম উল্লেখ ক'রে এই কুণ্ডের জলে স্বহস্তে যাত্রীকে তীর্থগুরু পূজা করাতে লাগ্‌লেন। কুণ্ডটির "মুকুন্দপ্রিয়া" নামটি সার্থক বটে, পুরোহিত এ নামটিও বার বার উল্লেখ করছিলেন। অদূরে একাম্বরনাথের বিশাল গোপুরম্—মণ্ডপ-মন্দির, পথে আস্‌তে আস্‌তে দুই দিকের চতুষ্পাঠী হ'তে অজস্র বেদগান শোনা যাচ্ছিল; মাঝে মাঝে শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তিগাথাও কাণে এসেছিল "চিদানন্দরূপং শিবোঽহং শিবোঽহং!" অপূর্ব্ব এই হরিহরক্ষেত্র! পাণ্ডা বল্‌লেন —"মা অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা এবং দ্বারাবতী এই মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর মধ্যে তিনটি হরক্ষেত্র কিনা কাশী অবন্তী আর মায়া; অর্থাৎ হরিদ্বার বা হরদ্বার এগুলিতেই হরই তীর্থরাজ! আর তিনটি হরিক্ষেত্র —অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারাবতী, এতে হরিই তীর্থস্বামী, আর এই কাঞ্চিই কেবল হরিহরের একাঙ্গ স্বরূপ হরিহরক্ষেত্র। এর অর্দ্ধেকে শিবাধিকার অর্দ্ধেকে নারায়ণাধিকার।" বাকী যথাকর্ত্তব্য সেরে আমরা একাম্বরনাথ দর্শনে চল্‌লাম। পথে কতকগুলি মুণ্ডিতমস্তক বেদপাঠার্থী একাম্বরনাথ দর্শন করে বেদগান করতে করতে ফিরে আস্‌ছে দেখ্‌লাম। তার পরে যথারীতি মহাদেবের দর্শন! সম্পূর্ণ বারিহীন শুষ্ক বিল্বপত্র দ্বারা এঁর পূজা হচ্চে—কেন না, ইনি একেবারে ক্ষিতিলিঙ্গ! জলস্পর্শ মাত্র নিষেধ। দর্শন পূজা আরতির পর মন্দিরের চারি দিকে ঘুরতে সুকৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভযুক্ত যে বারান্দা দেখা গেল তা বিশাল না হলেও সুন্দর! কৃষ্ণপ্রস্তরের কয়েকটি বিশালকায় হস্তী শিব মন্দিরের পশ্চাদ্ দিকে কারুকার্য্যময় নন্দিরের শোভা বর্দ্ধিত করছিলো। অনেক শিবলিঙ্গ ও দেবদেবী পশ্চাতের চত্বরে বিরাজমান। মাঝখানে চ্যূতলতা নামটির সার্থকতা দেখিয়ে একটা প্রাচীন বহু শাখাপ্রশাখার আম্রবৃক্ষ বিরাজমান। এই "আম্র"টির নামেই নাকি একাম্বরনাথ নামের উৎপত্তি! পার্ব্বতী এই খানেই তপস্যা করেছিলেন। পাণ্ডা দেবলকৃষ্ণ এমন সুন্দর

বাংলা বলছিলেন যে আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। শাস্ত্রেও তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণ এবং বহু শাস্ত্রের বহু শ্লোকের আবৃত্তি, আর তার মাত্র শ্লোকার্থ নয়—তার ভাবার্থও এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যে, আমরা তাঁর পাণ্ডিত্যে খুব মুগ্ধ হলাম। ইতিমধ্যে তাঁর একটি কথায় বিষম অনর্থ-পাতের সৃষ্টি হল! তন্ত্র সম্বন্ধে তিনি বাংলাদেশের অনভিজ্ঞতা এবং ত্রুটীর কি কথা উল্লেখ করায় পঞ্চানন একেবারে হুঙ্কার করে উঠলো! তর্কের ঝড় বইতে লাগলো। এইখানে পৌঁছে তিনিও আর বাংলা চালাতে পারেন না, পঞ্চাননও সংস্কৃত পারে না; তখন ইংরাজির বৃষ্টি নামলো। শোনা গিয়েছিল দক্ষিণের তীর্থপাণ্ডারা খুব ইংরাজী জানে, কিন্তু সেটা খুব স্পষ্ট ভাবে এই দেবলকৃষ্ণেই প্রমাণ পাওয়া গেল। তন্ত্রের কত কথা কত গোপ্যতত্ত্বেরই যে আলোচনা চলতে লাগলো আমরা তা আর শেষে বুঝেই উঠতে পারলাম না। এইটুকু মাত্র শেষে বুঝলাম, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই যে শেষ অবস্থায় এই কাঞ্চিতে কামাক্ষী দেবীর নিকটে শক্তিসাধনা করেছিলেন,—তাঁর কামাক্ষী দেবীর পদতলে সমাধি নেওয়াতেই তার প্রমাণ। ঐখানের নামই কামকোষ্ঠী পুরী। এখনকার যিনি ৺শঙ্করাচার্য্য তাঁর অসাধারণ তপস্থার কথায় এই তর্কের ঝড় তীর্থগুরু অন্য পথে পরিচালিত করছেন দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তখনো পঞ্চানন তার জেদ ছাড়ে নি,—তন্ত্রশাস্ত্রে যে বাংলা পশ্চাতে নেই—দক্ষিণের এ ধারণা যে ভুল,—আগম শাস্ত্রের বহু তন্ত্রের উল্লেখে সে তা প্রমাণ করতে লাগলো,—দেবলকৃষ্ণ কিন্তু তাকে উত্তেজিত বুঝে বেশ সংযম ও কৌশলের সঙ্গেই তীর্থের প্রসঙ্গান্তরে ক্রমে এনে ফেললেন।

তার পরে আমরা বাইরে এসে বিষ্ণুকাঞ্চি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। দেবলকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গী হলেন না, বল্লেন, সেখানের তীর্থগুরু ৺বরদরাজের পুরোহিতরাই। দর্শন ছাড়া অন্য কাজ আর সেদিকে নেই। পথে কামাক্ষী দেবী ও শঙ্কর সমাধি দর্শন করানোর কথা গাড়োয়ানকে বলে দিলেন।

কাঞ্জিভেরাম দুই ভাগে বিভক্ত। শিবকাঞ্চির দিকটাই সহর এবং যাত্রীরাও এসে এই দিকেই বাস করে। মাইল দুই যাওয়ার পর কামাক্ষী দেবী দর্শন হল। এঁর জন্যই এর নাম কামকোষ্ঠী পুরী! সম্মুখের অঙ্গনে ৺শঙ্করাচার্য্যের সমাধি এবং তাঁর প্রস্তরমূর্ত্তি। ভারতের এক মহাযোগী মহাজ্ঞানী এবং মহান আচার্য্য এইখানে সমাধিস্থ। কোথায় সে অলোকসামান্য প্রতিভা—কোথায় সে দিগ্বিজয়ী শক্তি—কোথায় বা সে শক্তিমান্! সবই কালের কুক্ষিগত। এই সেই দক্ষিণ, যেখানে মাধবচার্য্য, যামুনা-চার্য্য, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি জন্মেছিলেন বিশাল প্রতাপশালী রাজন্য বংশ, যাঁদের প্রতাপে বিধর্ম্মীরা এদিকে মাথা ঢোকাতেই পারে নি। পশ্চিম ভারতে আজ রঘুপতির কোশলরাজ্যই বা কই, আর যদুপতির অগণিত স্বর্ণমন্দিরশোভী মথুরাপুরীই বা কোথায়! কিন্তু দক্ষিণের দেবতার এই যে শ্রীসম্পদ এর কতকটা দক্ষিণের শ্রীরঙ্গের দ্বারাও হয়ত রক্ষিত হয়েছে। আর হয়েছে অজেয় নদনদী, দুর্গের দ্বারা, দূরত্বের দ্বারা। মনের মধ্যে কেবলই শঙ্করের মোহ-মুদ্গরের আঘাত যেন বেজে চলেছিল! কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ। আবার তাঁর চর্পট পঞ্জরিকার শেষ সুরটুকুও মনের মধ্যে আনন্দের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে। প্রাপ্তেসন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞকরণে"॥

পথে এক স্থানে এক বিশাল বামনমূর্ত্তি দেখলাম। তার পরে বরদরাজ স্বামীর মন্দির-গোপুরমের কয়েকটি পার হয়ে তাঁর অঙ্গনে প্রবেশ করা গেল। বামে একটী কুণ্ড, একটী ব্রাহ্মণ তাঁর অনেক মহিমা-কীর্ত্তন করলেও জলস্পর্শ করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব বলে মনে হল না। নৃসিংহ দেব কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি কয়েকটি মূর্ত্তি দর্শন আর মণ্ডপ প্রভৃতি দেখার পর দেবাদিদেবের দর্শনের জন্য সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হল। এ ব্যবস্থা দক্ষিণের তীর্থে আর কোথাও দেখা যায় নি। গোপুরম্ কুণ্ড এবং অন্যান্য মন্দির সব প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিলেও স্বয়ং বরদ-রাজের দ্বিতল মন্দিরে আরোহণের সোপান ও সে স্থানের চতুর্দ্দিকের চিত্রকলা কিছু আধুনিকতারই পরিচয় দিচ্ছিল। বরদরাজ তখন ভোগে বসেছেন। উপরের বহির্দালানের এক দিকে খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর অনতিউচ্চ অথচ

সুদৃঢ় প্রস্তর-দ্বার মুক্ত হলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। আরও কয়েকটী প্রকোষ্ঠ অতিক্রমের পর ৺বরদরাজের কতকটা নিকটস্থ হয়েছি বলে মনে হল। এসব প্রকোষ্ঠ কিন্তু অধিকতর পুরাণ যুগের পর্ব্বত-গুহার সঙ্গেই যেন অনেকটা উপমেয়। তার পরে সম্মুখে বরদরাজ! সম্মুখে হীরা-মাণিক্য-খচিত ভোগরূপ, পশ্চাতে প্রস্তর-গাত্রেই খোদিত বিশাল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রস্তরমূর্ত্তি! কপালের উজ্জ্বল হীরকে বক্ষের কৌস্তুভে উজ্জ্বল শ্রী এবং শ্রীবৎস চিহ্নে আর চরণ পর্য্যন্ত প্রসারিত রত্নহারে সে যে কি দেখলাম আপনাকে কি লিখব! ধ্রুবকে (বিষ্ণু পুরাণে) যেখানে "অহং বরদবাড়্" বলছেন ঠিক্ যেন তেমনি মূর্ত্তিতেই এখানেও ব্রহ্মাকে বরদরাজ হ'য়ে দেখা দিয়েছেন (আমাদের দেবলকৃষ্ণের মুখেই ব্রহ্মাকে বর দিতে এখানে প্রত্যক্ষ হবার কথা শুনেছিলাম)। বিশাল মালাটির মাঝে মাঝে মরকত প্রভায় তাকে যেন তুলসীর মালা বলেই বিভ্রম হচ্ছিল। শ্রীভাগবতে যখন ব্রহ্মাকে মোহিত করেছিলেন তখনো ব্রহ্মা এমনই দেখেছিলেন "আঙ্ঘ্রি মস্তকমাপূর্ণা স্তুলসী নবদামভিঃ, কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপণ্য বদর্পিতৈঃ।" দক্ষিণে প্রভুর তুলসীর সঙ্গে অনেকটা বিচ্ছেদ বল্লেই চলে; কিন্তু রত্নে সে অভাব পূর্ণ করেছে। এত দিনে যেন দক্ষিণযাত্রা সফল মনে হল। "অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলাং ক্রিয়া।"

তার পরে পূজা, কর্পূরের আরতি, ভোগ, প্রণামী ইত্যাদির পরে পুরোহিত ষোল আনা দক্ষিণা নিয়ে বরদরাজের একটি স্বর্ণ শিরোভূষণ, (আমাদের দেশের বড় রকমের একটী টোপরের গড়ন) নিয়ে যাত্রীদের মাথায় স্পর্শ করিয়ে দিলেন। চরণ পাদুকা যদি হত তাহলেই বোধ হয় বেশী আনন্দ পাওয়া যেত। পাণ্ডা বল্লেন "মনে মনে অভীষ্ট বর চাও—ইনি বরদ শ্রেষ্ঠ"। এখনো ধ্রুবের সেই কথাটি মনে এল—

"স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"।

বরদরাজের মহালক্ষ্মীকে দর্শন করলাম। মহালক্ষ্মীই বটেন! সমস্ত করতল দুখানি উজ্জ্বল লোহিত হীরা দ্বারাই নির্ম্মিত! এরই নাম কি পদ্মরাগ হীরা? মূর্ত্তির ললাট করতল সব সোনার খাপ, আর সে স্থানটী হীরা দ্বারা পূর্ণিত। নটরাজ, রঙ্গনাথ, তার পরে এই মহালক্ষ্মী সকলেরই ললাট-ফলক ফলকের মত গড়নের হীরার। বেশীর ভাগ মহালক্ষ্মীর করতল পর্য্যন্ত পদ্মরাগের দ্বারা নির্ম্মিত দেখলাম। এইবার ফিরবার পালা। বিষ্ণুকাঞ্চিতে যাত্রীনিবাস আছে বলে মনে হল না। এ দেশের বিষ্ণু-মন্দির একটী বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত! দুই দিকে শ্বেত মধ্যে রক্তরেখা, যাকে আমরা রামানুজী তিলক বলে থাকি সেই তিলক-চিহ্ন এখানকার বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে, শিরোভাগে এবং বহু স্থানেই বিরাজমান। পার্থ-সারথি এবং রঙ্গনাথেও এই চিহ্ন দেখেছি। স্বয়ং বেঙ্কটেশ্বর বা বালাজীর তো দুই দিকে সাদা হীরা এবং মাঝে রক্তবর্ণ হীরার ললাটে এই তিলকই রচনা হয়েছে পরে দেখেছিলাম।

বাহিরে এসে 'বরদরাজে'র কিছু ছবি কিনে বিদায় হ'লাম। শিবকাঞ্চিতে ফিরে ফলাহারেই বেলা শেষ। সন্ধ্যায় দেবলকৃষ্ণ যাত্রীদের তীর্থগুরু পূজা সুফল বাক্য দান প্রভৃতি শেষ কার্য্যের জন্য এসে আবার খুব গল্প জুড়ে দিলেন। অবশ্য সব কথাই ভগবৎ সম্বন্ধীয়। এদিকের কিম্বা কোন' তীর্থেই বুঝি এঁর মত পাণ্ডা এ পর্য্যন্ত দেখি নি। এমন সুপ্রসন্ন "যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট"-মুখ, এমন স্নিগ্ধ শান্ত স্বভাব, সর্ব্বোপরি এমন জ্ঞান পণ্ডিত এবং বোধ হয় সাধক ও তীর্থগুরুদের মধ্যে যদি কেহ এঁর অর্দ্ধেক সদ্‌গুণও পেতেন তাহলে সেই তীর্থকেও তাঁরা এমনি তীর্থোত্তম ক'রে তুলতে পারতেন। ক্ষোভের বিষয় এই—তাঁরা তীর্থকে দিন দিন অতীর্থই ক'রে তুলছেন। আপনি পম্পা সরোবর আর ঋষ্যমূক কিষ্কিন্ধ্যার খোঁজ নিতে বলেছিলেন, সে কথা মনে ছিল। এঁর কাছে সবই পেলাম—কিন্তু যাবার কষ্ট তো স্বীকার করতে পারলাম না আর। সঙ্গীরা রাজীই হল না কেউ! আর একটা কথা স্বীকারই করছি, পম্পার কথা শুনে মনে হল ওটা বাল্মীকির বর্ণনায় আমাদের মনে যে শোভা নিয়ে আছে, তাই থাক্; বর্ত্তমানে তার একটী সমস্তল জল সহ ক্ষুদ্র কুরত্ব প্রাপ্তির কথা শুনে তাকে আর দেখতেই ইচ্ছা হল না। নৈলে শবরীর আশ্রম দেখার গূঢ় একটী সাধ মনে ছিল। এখন তার সন্ধান পেয়েও যাবার ইচ্ছা আর এলো না। মধ্বাচার্য্যের উড়ুপীকৃষ্ণের

কথা জিজ্ঞাসা করাতে পাণ্ডাঠাকুর তো একেবারে ক্ষেপে উঠবার মত হলো। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীর মারফতে যাহা পাই বললাম—

"নর্ত্তক গোপালকৃষ্ণ পরম মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে
* * * মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন,
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ!

দেবলকৃষ্ণ তাঁদের দেশের এক দ্বিতীয় বিল্বমঙ্গলের গল্প করলেন, কেমন করে সে সর্ব্বহারা হয়ে, স্ত্রীর মুখের একটী কথায় পরম ও চরম বৈরাগ্যে উপনীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছিল। সেই ডাকটির কথা বলতে গিয়ে তীর্থগুরু নিজেই উদাত্ত স্বরে গেয়ে উঠলেন "হে রঙ্গা বারো"। কিনা হে কৃষ্ণ দেখা দাও! তাঁর সেই একটী ডাকেই এই উড়ুপী কৃষ্ণ অর্থাৎ নর্ত্তক গোপাল মূর্ত্তি পরম মোহন আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরে তিনি মধ্বাচার্য্যকে কৃপা করতে পারেন, কিন্তু এ মূর্ত্তি সেই পরম ভোগ-বিলাসীর দ্বারাই প্রথম এ দেশে স্থাপিত হন। রামানুজা-চার্য্যের সমাধির কথাও শুন্‌লাম—কিন্তু সেও তো শোনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হল।

ভোরের গাড়ীতে তিরুপতি বালাজীর উদ্দেশে রওনা হলাম। বালাজী, বেঙ্কটস্বামী প্রভৃতি এঁর অনেকগুলিই নাম। আর্কোনামে একবার গাড়ী বদল, দ্বিতীয়বার রেনিগুণ্টার, তার পরে তিরুপতি ইষ্ট্‌ পৌছুবার গাড়ীকে ধরা গেল। গাড়ীতে একটী অন্ধ বালক গান গাইছিল তার এইটুকু মাত্র শব্দ বুঝতে পারলাম "বেঙ্কট রমণ সঙ্কট হরণ"! আর একটা গান যা শুন্‌লাম তারও এইটুকু মাত্র বোঝা গিয়েছিল "এ পাপ যাজিনে—বেঙ্কট রমণ।" দ্রাবিড় ভাষায় বেঙ্কট বা ভেঙ্কট শব্দের অর্থ নাকি বিষ্ণু!

ক্রমে পর্ব্বতমালার পাশ দিয়ে ট্রেণ চলতে লাগল! পাহাড়ের পর পাহাড়। আর সে পাহাড়ের সবুজ গাছের মাথার উপরে যেন সুদৃঢ় প্রস্তর-দুর্গের ভীম প্রাকার ক্রোশের পর ক্রোশ ধরে দেখা যাচ্চে। এমন পাথরের প্রাচীরের মত টানা লম্বা ও এক ভাবের পাহাড় আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। বেঙ্কটাচল যেতে ঐ পর্ব্বতরাজ্যেই না কি প্রবেশ করতে হবে। বেলা এগারোটার মধ্যেই তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশনে নেমে আবার গো-যানে এক মাইল গিয়ে "পুষ্প তোটা" নামে এক ধরমশালায় উঠ্‌লাম। পুষ্প তোটায় পুষ্পের চিহ্ন না থাক্‌লেও এমন সুশ্রী সুন্দর এবং চমৎকার বন্দোবস্তের ধরমশালা আর দুটি দেখেছি বলে মনে হয় না। টানা বারান্দার সম্মুখে ছত্রের প্রবেশ দিকটি দ্বিতল হলেও ভিতরের বিস্তৃত অঙ্গনের চারি পাশে একতালা কুঠরী। আর তার পশ্চাতে ঠিক্‌ প্রত্যেক ঘরের পেছনেই একটু করে রোয়াক ও রাঁধ্‌বার ঘর। অন্য সব ছত্রেই রান্নার মহল বাসের মহলের ক্রোশখানেক দূরেই প্রায় পড়ে, সেজন্য আমাদের মত যাত্রীদের নাকালের সীমা থাকে না। এখানের এই ব্যবস্থায় পরমানন্দে স্নান পূজান্তে দুদিনের পর রন্ধনাদিতে নিযুক্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার আগেই সব সেরে আমরা এইবার বাজারে বেরুলাম। এখানকার চন্দন কাঠের পুতুল ও অন্যান্য জিনিষের কথা দক্ষিণময়ই শোনা গিয়েছিল। তার প্রমাণও পাওয়া গেল। শ্বেত রক্ত চন্দনে নানা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে। দেবীর মধ্যে মহালক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মূর্ত্তি! কৃষ্ণের অনেক রকম মূর্ত্তি।

উড়ুপী কৃষ্ণ, কালিয়দমনকারী, অঘারি, গো গোপাল, কদম্বচারী ইত্যাদি; আর রামলক্ষ্মণ, সুব্রহ্মণ্যদেব (কার্ত্তিক), গণপতি এঁদের মূর্ত্তিও পাওয়া গেল, বালাজী ও মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি রক্ত চন্দনের এবং বৃহত্তর। এই দুই চন্দন ছাড়া 'দুধকাঠ' নামে দুধের মত সাদা কাঠেও অনেক সুন্দর এই সব পুতুল তৈরী হয়েছে। এইবার আমাদের বোঝা যে শঙ্খ কড়ি প্রভৃতির বহুগুণ বেশী হ'য়ে পড়্‌চে তা বুঝতেই পারছেন। সন্ধ্যায় পুষ্প তোটায় ফিরে আসবার সময় দেখি অদূরস্থ বেঙ্কটাচলের সবুজ গায়ের উপরে মালার মত হ'য়ে বিদ্যুতালোক পথের উচ্চ নীচত্ব অনুসারে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। পাহাড় যেন ঝলমল্‌ করুছে। শুন্‌লাম কত লোক এই সময়েই যাত্রা করছে। সমস্ত রাত্রি হেঁটে সকালে তারা মন্দিরে পৌছুবে। সমস্ত রাস্তা বিদ্যুতের আলোয় দিনের মত। চারি দিকে বন থাকলেও ভয়ের নাম মাত্র নেই। সমস্ত রাত্রিই যাত্রী চলছে। মন তখনি ছুটতে চাইছিলো। কিন্তু শেষ রাত্রে উঠেই যেতে হ'ল আমাদের। বসতি থেকে তিন মাইল দূরে পর্ব্বত-মূল! সমস্ত রাত্রি মুষলধারে

বৃষ্টি, যাওয়া হয়ত হবে না বলে রাত্রে উৎকন্ঠিতই হয়েছিলাম। রাত্রি তিনটায় টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে গোযানে চড়েই পাহাড়ের নীচে পৌছুবামাত্র ডুলীওলারা ছেঁকে ধরলো। ভাড়া বেশী নয়, দুজনে একজনকে নিয়ে যাবে আস্‌বে; ৫৲ টাকা মাত্র ভাড়া। কিন্তু সম্মুখের সেই দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ সুউচ্চ সিঁড়ি দেখে ডুলিকে এক বিপজ্জনক যান বলেই ভয় হতে লাগলো। সাত মাইল পথ, তার তিন মাইল এইরকম সিঁড়িতে খাড়া চড়াইয়ে উঠে উৎরাই। সমতলে ও চড়াইয়ে আরও চার মাইল যেতে হবে। এই তিন মাইলের চিন্তাই কিন্তু সব চেয়ে বেশী! সিঁড়ি না হলে হয়ত এতটা বিভীষিকা লাগ্‌তো না,—তাতে টিপি টিপি বৃষ্টি। "পর্ব্বতে রঘুনন্দন"কে স্মরণ ক'রে আমরা কেউ কেউ খানিকটা হাঁটবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা! অগত্যা মুখ চুণ করে ডুলীতেই উঠে বসতে হ'ল। দার্জ্জিলিংয়ে যখন উৎসাহ করে পাহাড়ে উঠ্‌তাম, দীর্ঘপথ অদম্য উৎসাহে বেড়াতাম, ছোট্‌দা হেসে বল্‌তেন "বদরীনারায়ণ যাবার মক্‌স হচ্চে"। কি করে তিনি মনের ভাব বুঝতে পারতেন জানি না। আর, পঞ্চাননও আজ সেই কথাই বললে "আমি কিছুতেই উঠ্‌বো না। তাহলে সে পথে যদি কখনো যাই, হাঁটব কি করে? তোমাদের মত ঝুলিতে ঢুকে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।" পঞ্চানন ডুলিতে না ওঠায় কিন্তু স্বস্তিই পেলাম যেন। বাহকের প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছিল একটু যদি পা টলে তাদের—একেবারে খাড়া পথ! বার বার নেপাল যাত্রা স্মরণ হচ্ছিল। কিন্তু সিঁড়ির জন্য তার চেয়েও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হয়। দুই দিকের সবুজ বন বৃষ্টিসিক্ত হ'য়ে বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। এমন সুন্দর পথ! শোভার যেন সমুদ্র!

গিরি-শিরে প্রভাত! মেঘ কতক কেটে যাচ্চে! সে প্রভাতেরই বা কি শোভা! মেঘের পাশে রেখায় রেখায় আকাশের গায়ে উষার প্রথমচ্ছটা, ক্রমে রূপান্তর। মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌বার মত দৃশ্য! পঞ্চানন পেছনে কয়টি সঙ্গীর সঙ্গে হেঁটে আস্‌ছে--মা ও শুভার ডুলি এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমার একটী বাহকের পা পিছলে পতন। সমতল জায়গায়—তাই! নইলে আপনাকে এ চিঠি লেখা ঘট্‌তো না। বেচারার হাঁটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। অপ্রতিভ হ'য়ে তাই বারে বারে দেখাতে লাগলো। আরোহীরও যে কিছু হতে পারে সেটা যেন বুঝতেই পারে নি। আরও খানিকটা গিয়ে সেই ব্যাপার—পাথরে বাঁধানো রাস্তা এমনি পিছল! উৎরাইতেও সিঁড়ির দোষে আরোহী তাতে মাঝে মাঝে খানিকটা ছেঁচ্‌ড়েও যায়! তখন প্রায় এসে পড়েছি, পথের শেষ! বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই মন্দিরের কাছে পৌছুলাম। এক সাধুর আশ্রমে ক্ষণিকের জন্য আড্ডা স্থাপনা ক'রে আমরা দর্শনে ছুটলাম,—বিষ্ণুর বিশ্বরূপ দর্শন তখনি হচ্চে। সকালে সাতটা থেকে নটা এবং বেলা বারোটা থেকে একটা পর্য্যন্ত যাত্রী সাধারণকে পাণ্ডাদের বিনা কর্ত্তৃত্বে দেখ্‌তে দেওয়া হয়। এই পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে যেন কোন লুকানো বস্তুকে ধরা গেল। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হীরক তিলক ও ভূষণশোভী বিশাল মূর্ত্তি। বহুকাল পূর্ব্বে পুরীতে একটি মালয়লী মহিলার গানে এই বেঙ্কট স্বামীর নাম শুনেছিলাম! বেঙ্কট রমণ জয় সঙ্কট হরণ! দর্শনের পর আমরা চারিদিক বেড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। এখানকার বন্দোবস্ত খুব কড়া। ঠাকুরকে যা ভোগ দেওয়া হবে আরও সেই সংখ্যক মুদ্রা বা পয়সা লইয়া বেঙ্কটেশ্বরের অফিস্‌ ঘরে জমা দিলে তাঁরা টিকিট দেন— সেই টিকিট পাইয়া তবে পূজারীরা ঠাকুরকে ভোগ লাগাইতে পায়। পাণ্ডারা কোন পীড়ন করিলে অভিযোগ করিবারও অফিস্‌ আছে। বেঙ্কটস্বামীর পূজা ভোগ ও সেবাদির বিবরণী ছাপানো বোর্ড বাহির মন্দিরে গাঁথা রহিয়াছে, খুব উচ্চ ও অসাধারণ রকমের সেবা, এবং সে সেবা দেখিতে পাইবার অধিকারও উচ্চ হারের প্রণামীতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের সম্পত্তিও নাকি বিশাল। এই পর্ব্বতের সমস্তটাই তাঁহার অধিকারে, বিধর্ম্মী এই পর্ব্বতে আরোহণ পর্য্যন্ত করিতে পায় না। কুণ্ডস্নান করিতে গিয়া শুনিলাম অপর পার্শ্বে ডায়নামোর নির্ঘোষ! অথচ সমস্তই দেশীয় সধর্ম্মী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত। সমস্ত পার্ব্বত্য পথের দায়িত্ব বেঙ্কটাচল স্বামী বালাজীর সেবকবৃন্দের। কোন বিপদও নাকি এ পর্য্যন্ত হয় নি।

বেলা প্রায় একটার সময় আবার একবার দর্শন!

এবারের নাম বিষ্ণুদর্শন। বিশ্বরূপের সঙ্গে এবার প্রভেদ এই যে ফুলে ফুলময় মূর্ত্তি! ফুলের সঙ্গে মন্দির মণ্ডপ পূর্ণ! যাত্রীও বড় কম নয়। ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি করেই এ দর্শন! নিজেদের কৃতকৃতার্থই বোধ হচ্ছিল। বড় বড় ভাতের লাড়ু প্রসাদ বিতরিত হচ্ছিল, তার গায়ে দুচারটা ডাল দেখে বোঝা গেল তিনি খিচুড়ি। যাত্রীদের মাত্র মিছরীতে ঠাকুরের ভোগ দেবার অধিকার। সেই মিছরীপ্রসাদ নিয়ে জলযোগান্তে বেলা দুটোয় বেরিয়ে পাঁচটার সময় আমরা আবার পুষ্প তোটায় ফিরে এলাম।

পরদিন বেলা তিনটায় তিরুপতি ইষ্ট থেকে গুডুর পর্য্যন্ত এসে রাত্রি দশটায় মাদ্রাজ মেল ধরে ফিরে চল্‌লাম। কত আশা অপূর্ণ থাক্‌লো বটে, তবু যা ভাবিনি এমনও যে অনেক পেয়েছি, সেজন্য মন কিন্তু পূর্ণই ছিলো। পরদিন বেলা দেড়টায় ওয়াল্‌টেয়ারে ট্রেণের প্রবেশ। অদূরে পর্ব্বতমালার অঙ্গে সজল মেঘের আচ্ছাদনের উপর সূর্য্যের কিরণপাতে রামধনু রংয়ের অপূর্ব্ব বিকাশ। সমুদ্রের নূতন শোভা দেখবার জন্য মন আবার যেন নূতন উৎসাহে উঠে দাঁড়ালো। আপনাকেও তীর্থযাত্রা শেষে প্রণাম নিবেদন করে এ পত্রের এইবার ইতি দিলাম। ইতি—আপনার স্নেহের নিরুপমা।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ এম-এ

ভারতীয় বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্ম্মসংস্কারক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের দর্শনের সহিত কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের দর্শনের যে সৌসাদৃশ্য দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। শঙ্কর-দর্শনের মায়াবাদ, বিচার ও জ্ঞান ঠিক যেভাবে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে ইয়োরোপীয় দর্শনেও তাহার প্রতিধ্বনি প্রভূত পরিমাণে হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের নিজস্ব কোন মত বা দর্শন কিছু আছে বলিয়া তিনি স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন না। স্বাব রাধাকিষেণ বলিয়াছেন যে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বভাবসুলভ বিনয়বশতঃ বলিয়াছেন যে তাঁহার নিজস্ব কোন দর্শন নাই। তিনি কেবলমাত্র সনাতন বেদান্ত-দর্শন উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমৎ শঙ্করের এ কথা মানিয়া লইবার পক্ষে আমাদের একটু বিঘ্ন আছে। কেবলমাত্র শঙ্করাচার্য্যই বেদান্তের টীকা প্রণয়ন করেন নাই; পরন্তু রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি অপরাপর অনেক মহাত্মাও বেদান্তের প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর-দর্শনের যে প্রকৃতি তাহা যেন অপরাপর ভাষ্যের প্রকৃতি হইতে অনেক পৃথক্। শঙ্কর এই পৃথিবীটাকে যেমন একেবারেই মায়া, ভুল, ভ্রান্তি বা স্বপ্নবৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আর কেহই তদ্রূপ করেন নাই। এই ভুল বা ভ্রান্তি হইতে আত্মরক্ষার জন্য শঙ্করাচার্য্য ক্ষুরধার অস্ত্রের মত রাখিয়াছেন "বিচার"। "বিচার"-বলেই মানুষ আপনার স্বরূপ চিনিতে পারে। পথ চলিতে চলিতে যখন কাহারও রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তখন তিনি কেবলমাত্র "বিচার" প্রয়োগ করিয়াই আপনার ভ্রান্তি দূর করিতে পারেন। শঙ্কর তাঁহার দর্শনের প্রতি স্তরে "বিচার" (reason) সমুজ্জ্বল রাখিয়াছেন। এই "বিচার" বা reasonই ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান যুগের দর্শনের মূলমন্ত্র হইয়াছিল।

যাঁহারা ইয়োরোপীয় দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এক একটি ভাব (spirit) অনুযায়ী ইয়োরোপের দর্শনে এক একটি "যুগ" (age গঠিত হইয়াছে। ইয়োরোপীয় দর্শনে এখন পর্য্যন্ত চারিটি যুগ দেখা যায়। ইহার প্রত্যেক যুগেরই এক একটি স্বতন্ত্র ভাব বা Spirit আছে। অতি প্রাচীনকালে গ্রীকগণ এই প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির ভিতরই প্রকৃতির মূল বা সৃষ্টির কারণ খুঁজিতেন। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই প্রকৃতির (Nature) কারণস্বরূপ এক অপ্রাকৃত রাজ্য আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। এইখানেই এই প্রাচীন যুগের (Ancient age) অবসান হইল। ইহার পরই ইয়োরোপের দর্শনে আর একটি ভাবধারা লক্ষিত হইতে লাগিল। মানুষ তখন স্বাধীন চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া শাস্ত্রাদিতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই সময় বাইবেলের মতগুলিই তাঁহারা সার সিদ্ধান্তরূপে ধরিতে লাগিলেন। যাঁহারা বাইবেলের বিরুদ্ধে কথা কহিতেন, তাঁহাদিগকে নাস্তিক পর্য্যায়ভুক্ত করা হইতে লাগিল। কেবলমাত্র তাহাই নহে—তাঁহাদিগকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিতও করিতে লাগিলেন। ফল কথা, তদানীন্তন ইয়োরোপের চিন্তারাজ্যে এক অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। স্বাধীন চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক মানুষ বাইবেল ও পোপকেই সার করিল। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ঘোর ধর্ম্মান্ধতা ইয়োরোপকে গ্রাস করিয়া বসিল।

চিরদিনই মানুষ অন্ধকারে থাকিতে পারে না। সূর্য্যাস্তের পর সূর্য্যোদয় ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। যে ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার সমস্ত ইয়োরোপের মনকে গ্রাস করিয়াছিল, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বেকন (Bacon) নামক মহামনা তাহার প্রতিবাদ করিতে সুরু করিলেন। ইহাই ইয়োরোপের মধ্যযুগের অবসানের কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। বেকন বলিতে লাগিলেন যে কেবলমাত্র বাইবেল ও পোপকে মানিলেই

আমরা সত্যের সন্ধানী হইতে পারিব না। চাই বিচার—ব্যক্তিগত বিচার। একমাত্র স্বাধীন বিচারবলেই আমরা সত্য লাভ করিতে পারিব। বেকনের প্রচারে সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী বাস্তবিকই একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মানুষ তাহাদের ধর্মান্ধতার কুফল বুঝিতে লাগিল। ইয়োরোপে নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। ইহার নাম হইল "বর্ত্তমান যুগ" (Modern Age)। এই বর্ত্তমান যুগের ভাবধারার সহিত শাঙ্কর দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। শঙ্করেরও দর্শনের মূলে ছিল "বিচার"। তীব্র "বিচার"-বলে মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে ইহাই তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন। শঙ্কর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ন্যায় প্রচলিত মতকে অবিশ্বাস করিয়া বিচারের নিশান উড্ডীন করেন নাই। শঙ্কর যে ন্যায় (logic) দেখাইয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি সনাতন বেদান্ত-ধর্ম্মের মহিমাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্কর স্বাধীন বিচারবলে বেদান্তোক্ত এক "অবাঙ্মনসোগোচরম্" ব্রহ্মেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে তিনি তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ফলে যে ব্রহ্মতত্ত্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, ইয়োরোপের "বর্ত্তমান যুগের" দার্শনিকগণও ক্রমোন্নতির ধারানুসারে সেই বেদান্ত-কথিত ব্রহ্মতত্ত্বেই আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। হেগেল, ব্র্যাড্‌লী ও বোসাঙ্কে যে Absolute বা ব্রহ্মতত্ত্বের কথা প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহার সহিত শাঙ্কর বেদান্তের সাদৃশ্য খুবই বেশী। আমাদের মনে হয় এই হেগেল-ব্র্যাডলী-বোসাঙ্কের চিন্তাধারা লইয়া যদি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে কেহ স্বাধীনভাবে গবেষণা করেন, তবে অচিরেই তাঁহারা শাঙ্কর বেদান্তে উপস্থিত হইতে পারিবেন। লেখকের বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই যে একমাত্র স্বাধীন বিচারের ফলেই প্রাচ্যের শঙ্কর আর প্রতীচ্যের হেগেলীয় দার্শনিকগণ এক অবাঙ্মনসোগোচরম্ Absolute বা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তবে পার্থক্য হইতেছে এই স্থানে যে স্বাধীন বিচার ফলে শঙ্করাচার্য্য ভারতীয় প্রচলিত ধর্ম্মে আরও গভীর বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ প্রচলিত মতে বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। ইহাতে বেদান্ত-ধর্ম্মের মহিমাই সূচিত হইতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের "নেতি নেতি" বিচার ও ডেকার্টের 'সন্দেহের' প্রস্রবণ একই। উভয়েরই আবার গতি বিভিন্ন হইলেও নিয়তি একই। বাস্তবিকই উভয়ের ভিতরেই যে উদ্দেশ্যের ঐক্য তাহা অতীব চমৎকার। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-নির্দ্দেশমত "নেতি নেতি" (ইহা নহে, ইহা নহে), এইরূপ করিয়া পরমব্রহ্মের সন্ধানে ছুটিয়াছিলেন। ডেকার্টেও একবার এই জগতের মত ও পথ সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সর্ব্বদাই আমাদিগকে মিথ্যা সংবাদ দিতে রত। একই দ্রব্য নানা সময়ে দেখিলে নানা রূপ দেখা যায়। একই শব্দ নানা জায়গা হইতে শুনিলে নানা রকম শুনা যায়। কাজেই কোন্ দৃশ্যটি বা কোন্ শব্দটি যে খাঁটি তাহা বোঝা বাস্তবিকই শক্ত। এই সমস্ত নানা কারণে ডেকার্টে সিদ্ধান্ত করিলেন যে হয় ত এই দুনিয়াটা প্রকাণ্ড একটা স্বপ্নবৎ। অবশেষে ডেকার্টে আর কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পরলোক, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপে যতই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে একটি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, তিনি সন্দেহ করিতেছেন। যিনি সন্দেহ করেন, তিনি আছেন তাহা ঠিক। অতএব অন্যান্য বিষয়ে সন্দেহ করিলেও, আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। কারণ যিনি সন্দেহ করেন, তাঁহার আপনার সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে আর সন্দেহ কার্য্যটাই হয় না। অতএব ডেকার্টে সিদ্ধান্ত করিলেন, "Cogito ergo sum" [আমি চিন্তা (সন্দেহ) করি, অতএব আমি আছি]। এই সিদ্ধান্তটি অতি সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তিনি আরও স্থির করিলেন যে "যাহা কিছু অতি নিখুঁতভাবে অনুভব করা যাইবে, তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে।" আপনার অস্তিত্ব আপনার অন্তরে অতি নিখুঁতভাবে অনুভব করা যায়। অতএব আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হয় না। ঠিক এইরূপ নিখুঁতরূপে যাহা কিছুই অনুভব করা যাইবে, সকলই সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। তৎপর ডেকার্টে তাঁহার অন্তর খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে জ্ঞান তাহার ভিতরে নিখুঁতভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। তিনি অন্তরটি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার ভিতর একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যক্তির (Perfect Being) ধারণা আছে। আমরা ক্ষুদ্র ও সসীম। আমাদের অন্তরও তাহাই। অতএব আমাদের এই ক্ষুদ্র মনে কে সেই অসীম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের আদর্শ দান করিল? কারণ কার্য্য হইতে ক্ষুদ্র হইতে পারে না। অতএব আমরা নিজেরা সসীম ও ক্ষুদ্র হইয়া কখনও এই অসীম আদর্শের কারণ হইতে পারি না। সুতরাং এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অসীম আদর্শের কারণ স্বরূপ নিশ্চয়ই তদ্রূপ কোন পুরুষ আছেন এবং তিনিই ঈশ্বর। এইরূপে ডেকার্টে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন। আবার ঈশ্বর যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সীমাবিহীন হয়েন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বমঙ্গলময়। অতএব ডেকার্টে পরলোকে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও ধর্ম্মে পুনরায় তাঁহার বিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন। এই স্থলে ডেকার্টে ও শঙ্করের ভিতরে দর্শনীয় বিষয় হইতেছে এই যে ডেকার্টে সন্দেহের বলে যে ঈশ্বরের সন্ধান পাইলেন, শঙ্করও "নেতি, নেতি" (ইহা নহে ইহা নহে) বলিয়া জগতের প্রতি বস্তুই ব্রহ্মের অপ্রকাশক স্থির করিয়া পরিশেষে এক অসীম, অনন্ত ও অবাঙ্মনসোগোচরম্ ব্রহ্মের সন্ধান পাইলেন। উভয়ের বিচারের ভিতরে যে সাদৃশ্যের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে তাহা বাস্তবিকই চমৎকার।

বিচারের দিক দিয়া শঙ্করাচার্য্যের যেমন ডেকার্টের সহিত সাদৃশ্য আছে, তেমনি তাঁহার মায়াবাদের সহিতও কান্টের Phenomenalism বা প্রত্যাভাববাদের সাদৃশ্য আছে। মধ্যযুগের দর্শন "বিচারকে অবলম্বন করিয়া চলার শাঙ্কর দর্শনের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হইতেছে। কান্ট তাহার Phenomenalism বা প্রত্যাভাববাদ দ্বারা যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মায়াবাদ সাহায্যে প্রায় তাহাই বুঝাইতেছেন। আবার ব্র্যাড্‌লী তাঁহার Appearance বা প্রতিকৃতি দ্বারা যাহা বুঝাইতেছেন, শঙ্করের মায়াবাদ দ্বারাও প্রায় তাহাই বুঝান হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এই দুনিয়ার সব কিছুকেই "মায়া" বলিয়া

অভিহিত করিয়াছেন। শঙ্কর "মায়া"র সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "সদসদ্বিলক্ষণম্", অর্থাৎ আছে কি নাই তাহা বলিতে পারি না। এই দুনিয়াকে শঙ্করাচার্য্য সত্যও বলেন নাই, আবার অসত্যও বলেন। এই দুনিয়া যে কি তাহা কিছুই বলা যায় না। ইহাকে সত্য বলা যায় না, কারণ, ইহা হইতে অসংখ্য ভ্রম, প্রমাদ উত্থিত হয়। আবার ইহাকে মিথ্যা বলাও সুকঠিন, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ। যাহা একেবারেই মিথ্যা তাহার কোন অবস্থানই নাই। যাহা অসত্য তাহারও অবস্থান সত্যই। অতএব এই দুনিয়াকে সত্যের সহিত একও বলা যায় না, আবার পৃথকও বলা যায় না। "সদসদ্বিলক্ষণম্" কথাটি দ্বারা শঙ্কর ইহাই বুঝাইতেছেন। কান্ত আবার এ জগৎকে বলিয়াছেন একটা প্রত্যাভাষ (Phenomenon)। কোন একটা জিনিষ আপাততঃ দেখাইতে যেরূপ হয়, তাহাই তাহার প্রত্যাভাষ। একটা বৃক্ষ যেরূপই হউক, কিন্তু তাহাকে আপাততঃ যেমন দেখায় তাহাই বৃক্ষের প্রত্যাভাষ। কান্ত মনে করিলেন যে খাঁটি জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি দ্বারা যে জগৎ প্রাপ্ত হই, প্রকৃত জগৎ তাহা হইতে পৃথক্। তবে আমরা প্রকৃত জগতের একটা প্রত্যাভাষ প্রাপ্ত হই। কান্ত মনে করেন যে আমাদের পক্ষে জগতের একটা প্রত্যাভাষ ব্যতিরেকে আর কিছুই জানা সম্ভব নয়। প্রতি দ্রব্যের প্রত্যাভাষই (phenomenon) আমরা দেখি, প্রকৃত দ্রব্য (thing-in-itself) আমরা দেখি না। ব্যাড্‌লী বলেন যে আমরা এই দুনিয়াস্বরূপ ব্রহ্মের (Absolute) প্রতিকৃতি। এই দুনিয়া একেবারে ব্রহ্মের সহিত এক না হইলেও ব্রহ্ম হইতে একেবারেই পৃথক নহে; কারণ, দুনিয়াটা ব্রহ্মেরই প্রতিকৃতি বা appearance। একটা মানুষ এবং তাহার ফটোগ্রাফের মধ্যে যে সম্পর্ক এই দুনিয়া ও ব্রহ্মের মধ্যে ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। যিনি যে ভাবেই এই দুনিয়াকে গ্রহণ করিয়া থাকুন, কেহই ইহাকে ব্রহ্মের সহিত এক বলিয়া ধরেন নাই। ইহা যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কোন না কোনরূপে পৃথক তাহাই সকলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চিন্তাধারার দিক দিয়াও তাহাদের ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

শঙ্করাচার্য্যের সহিত জার্ম্মাণ দার্শনিক স্পিনোজারও সাদৃশ্য কম নহে। অবশ্য যে কয়টি দার্শনিকের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য থাকুক, সর্ব্বক্ষেত্রেই যে তাঁহার মতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন ও সুসঙ্গত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ডেকার্টে, কান্ত, স্পিনোজা, বার্গসোঁ, ব্যাড্‌লী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যের দর্শন অধিকতর সুসঙ্গত এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র খ্যাতনামা গ্রীক দার্শনিক প্লেটোই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য দর্শনে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। ভারতে যাঁহারা রামানুজ বা মধ্বাচার্য্য-পন্থী এবং পাশ্চাত্যে যাহারা হেগেল কিংবা ম্যাক্ টেগার্ট-পন্থী, তাঁহারা শঙ্করের দর্শন সমধিক যুক্তিসঙ্গত মনে না করিলেও, তাঁহার দর্শনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ করিতে পারেন না। শঙ্করের অচ্ছেদ্য যুক্তিজাল সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা ক্রমান্বয়ে স্পিনোজা, বার্গসোঁ ও প্লেটোর কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

স্পিনোজা এই জগৎকে ব্রহ্মের বিকার (mode) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা সকল বিকারের কারণস্বরূপ, স্পিনোজা তাহার নাম দিয়াছেন "বস্তু" (Substance)। এই যে জগৎ এবং সমুদয় জাগতিক ব্যাপার, তাহা সমস্তই এই "বস্তু"রই (Substance) বিকার (mode)। স্পিনোজা এ জগৎকে সেই বস্তুর সহিত এক করেন নাই। এখানে শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্য এ জগৎকে "মায়া" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাকে একেবারে ব্রহ্মের সহিত একীভূত করেন নাই। স্পিনোজা এ জগৎকে "বস্তু"ও বলেন নাই, আবার "বস্তু" হইতে পৃথক্‌ও বলেন নাই; তিনি ইহাকে বস্তুর বিকার বলিয়াছেন। আবার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে মায়া অপসারিত হইলে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তখন জীব ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে পারে। স্পিনোজাও বলিয়াছেন যে, যে প্রতিবিকারের ভিতরই বিকারের মূল কারণ অর্থাৎ 'বস্তু' দর্শন করিতে পারে, তাহারই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান হইয়াছে। ঐ "বস্তু"ই ঈশ্বর এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরেরই বিকার। জ্ঞানচক্ষে যিনি ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বর-প্রেমী। এই কারণে, স্পিনোজা ঈশ্বর-প্রেমের স্বতন্ত্র নাম রাখিয়াছিলেন "বিজ্ঞান-মূলক ঈশ্বর-প্রেম" (intellectual love of God)। ইহা খৃষ্টান ধর্ম্মের ভক্তি বা ভাবমূলক ঈশ্বর-প্রেম হইতে পৃথক। এই বিজ্ঞানমূলক ঈশ্বর-প্রেমের সহিত শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞানের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

বর্ত্তমান যুগের আর কোন দার্শনিকের সঙ্গে শঙ্করাচার্য্যকে তুলনা করিবার বিশেষ কিছু নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে মধ্যযুগের দর্শনের মূল মন্ত্র হইতেছে "বিচার"। এই মধ্যযুগের পরই আধুনিক যুগ (contemporary age)। এই যুগে যদিও তীব্র বিচারের ধারা পরিত্যক্ত হয় নাই, কিন্তু এই বিচার ব্যতিরেকেও আর একটি জিনিষ এই যুগের বৈশিষ্ট্যরূপে উপলক্ষিত হইতেছে। "বিচারের প্রকৃতি" নির্দ্দেশ করাই যেন এ যুগের দর্শনের স্বভাব। এক্ষণে বিচারের প্রকৃতি বাস্তবতা (realism), কি বিজ্ঞান (idealism), কি ব্যবহার (Pragmatism) ইহা লইয়াই সমস্যা চলিতেছে। আধুনিক যুগের দর্শনে ফ্রান্সদেশীয় হেন্‌রী বার্গসোঁর সহিত শঙ্করের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

হেন্‌রী বার্গসোঁ ঠিক শঙ্করাচার্য্যের মতই "অনুভূতি" (intuition) কেই সত্য লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধি (intellect) দ্বারা যে সত্য বা ব্রহ্ম লাভ হয় না এ বিষয়ে উভয়েই একমত। কিন্তু বার্গসোঁ যেমন মনে করিয়া থাকেন যে বুদ্ধি "চলমান সত্য"কে (Reality that continually changes) স্থবির, শান্ত ও বিকৃত করিয়া ফেলে, শঙ্কর তদ্রূপ মনে করেন না। শঙ্করের সহিত বার্গসোঁর ইহাই প্রকাণ্ড প্রভেদ। আবার বার্গসোঁ যেমন সত্যকে (Reality) "চলমান" (continually changing) মনে করেন, শঙ্কর ব্রহ্মকে তদ্রূপ মনে করেন না। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং অবাঙ্মনসো গোচরম্। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত বলিয়াই তাহাকে বুদ্ধি দ্বারা ধরা যায় না। ইহা অক্ষয়, অব্যয় ও সনাতন। ইহার

হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। ইহা পূর্ণ ও সর্ব্বদা একরূপ। ইহা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। একমাত্র "অনুভূতির" সাহায্যেই ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়। এই অনুভূতি আর বার্গসেঁার intuition একই জিনিষ। Intuition বা অনুভূতির মধ্যে বুদ্ধির বিচার নাই। ইহা অতীন্দ্রিয় একটা অনুভূতি। মানুষ যখন সসীম বিচারবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অসীমে ডুবিয়া যায় তখনই সে সত্য (Reality) অথবা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ে তাঁহাদের খুব মিল দেখা যায়।

প্লেটো এবং শঙ্করবেদান্তে যে মিল দেখা যায়, আর কোন দার্শনিকের সঙ্গেই শঙ্করের সে মিল দেখা যায় না। প্লেটোর দর্শন যেন "প্রচ্ছন্ন শাঙ্কর দর্শন"। শঙ্কর এই জগৎকে মায়া নামে অভিহিত করিয়া ব্রহ্মের সহিত বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন। প্লেটোও এই জগৎকে "নকল জগৎ" (world of copies) বলিয়া "আসল জগৎ" (world of ideas) হইতে তফাৎ করিয়াছেন। মায়া কাটিয়া গেলেই, শঙ্করাচার্য্যের মতে, আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। প্লেটোর মতেও তেমনি এই "নকল জগতে"র মোহ কাটিয়া গেলেই "আসল জগতে"র জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হয়। আকাশে যখন চাঁদ থাকে, তখন তাহার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সলিলে পতিত হয়। প্লেটো ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই মনে করেন যে, এই জগৎটা যেন ঐ প্রতিবিম্বিত চন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু খাঁটি চাঁদ দেখিতে হইলে এই মায়াস্বরূপ প্রতিবিম্বিত চাঁদ হইতে দৃষ্টি ঊর্দ্ধে তুলিতে হইবে। আমরা মায়িক জীব। সর্ব্বদা মিথ্যাস্বরূপ এ সংসারে মায়ায় হাবুডুবু খাইতেছি। যদি আমরা তীব্রভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিতে পারি, তবেই আমরা মায়া বা ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইব। মায়া হইতে আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টাকে শঙ্করাচার্য্য বলেন উপাসনা এবং প্লেটো বলিয়া থাকেন "আদর্শ শিক্ষা"। বাস্তবিকই উভয়ের সাদৃশ্য খুবই আনন্দপ্রদ। বাস্তবিকই এই দুইটি দার্শনিকই যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন-সেতু। আমরা উভয়কেই অদ্বৈত বেদান্তের ভাষ্যকার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

এডেন

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাহাজ গুরুগম্ভীর স্বরে বাঁশী দিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরটী কি জানি কেন কেঁপে উঠল —এ যে জন্মভূমি থেকে বিদায়ের নির্দ্দেশ! হোক না সে স্বেচ্ছাকৃত, তবু ত জাহাজের মৃদু কম্পন সারা অন্তরকে নাড়া দিয়ে উঠল! আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, নিজের গ্রাম, জেলা, এমন কি, পরিচিত আবহাওয়াটী পর্য্যন্ত ত্যাগ কোরে কোন্

আকাশ হইতে—এডেন

বিদায়। জাহাজের এঞ্জিন ধক্ ধক্ করে নড়ে উঠল,— যেন বিরাট কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গে চেতনা লাভ কোরল। অনির্দ্দিষ্টের পথে এ যাত্রা! ম্যাপে সে দেশের রঙীন চিত্র দেখেছি, নামটীও মনে রেখেছি; কিন্তু সে ত

সত্যকার পরিচয় নয়, আমি ত তার প্রকৃতি জানি না। সে যে কি ভাবে আমাকে গ্রহণ কোরবে কে জানে? আর—আর কি কখনো এ দেশের বুকে ফিরে আসব? পরপারে পৌছাব, ফিরেও হয় ত আসব; কিন্তু নিশ্চয়তা দেবে কে?

বেলা একটায় জাহাজ ছাড়ল। জাহাজ তীর ত্যাগ
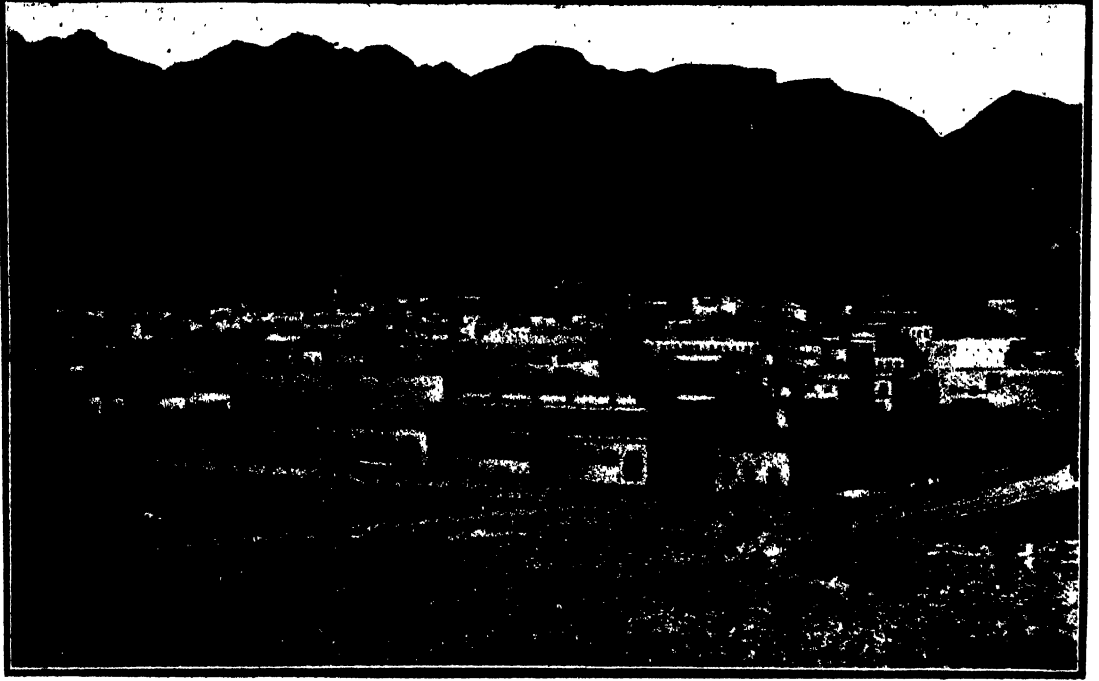
সাধারণ দৃশ্য—এডেন

কে জানে? জলযাত্রার মত এত বড় অনিশ্চয়তা আর কি আছে? হয় ত আজ, হয় ত বা কাল, হয় ত করবার পূর্ব্বেই জাহাজে ভেঁপু বেজে উঠল। খাবার ডাকে সকলের সঙ্গে খানা-ঘরের দিকে এগিয়ে চল্লাম।

প্রথম প্রবেশদ্বার—এডেন

বা তীর ছাড়ার পর মুহূর্ত্তে নিয়তি আমাদের জন্য সলিল-সমাধি রচনা করে রেখেছেন। হয় ত বা নিরাপদেই সিঁড়িতে নামবার সময় একটী ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হোল। তিনি বল্লেন "আপনার খানা-টেবিল কোথায়?"

বল্লাম "জানি না ত এখনো"। তিনি বল্লেন "বেশ হয়েছে : এক সঙ্গেই বসব চলুন।" খাবার হলের প্রধান পরি-

বন্দরের নিকট সাধারণ দৃশ্য—এডেন
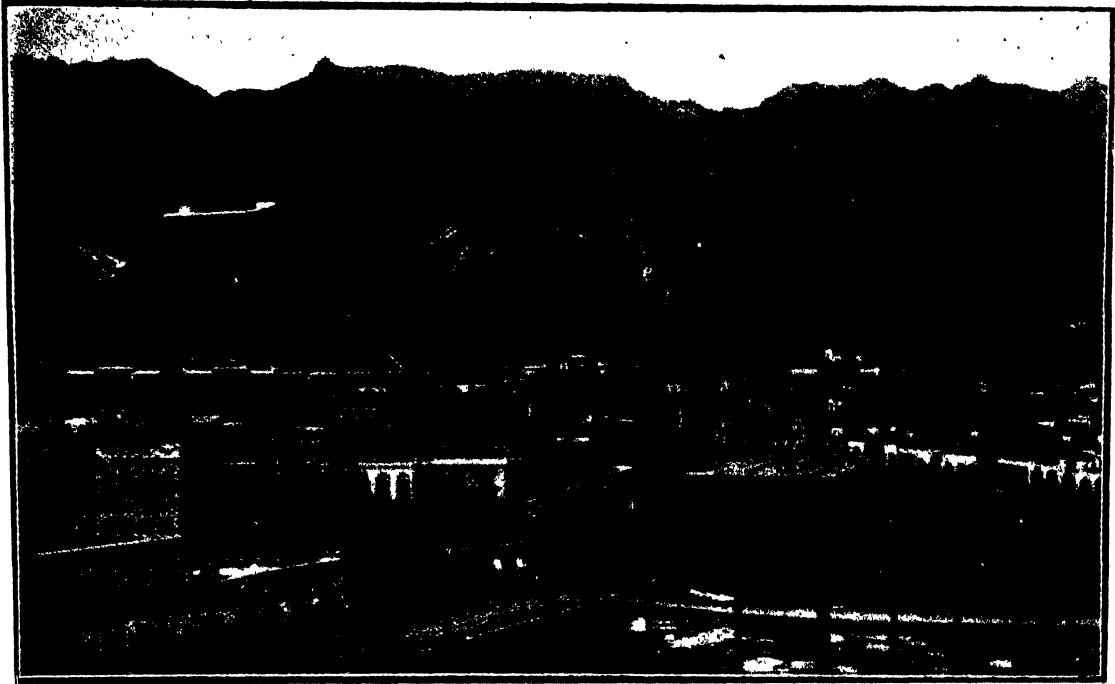
পোষ্টাফিস বে—এডেন

চারকের (Head Steward) কাছে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের পাশেই আমার খাবার জায়গায় ব্যবস্থা করে নিলাম। ইনি আলিগড়বাসী, নাম মিঃ খাঁ। মানুষের আত্মীয়তার গণ্ডী এই ভাবেই প্রসার লাভ করে। মানুষ চায় সর্ব্ব-প্রথমে নিজের পরিবার, তার পর গ্রাম, জেলা, প্রদেশ। প্রদেশের বাইরে গেলে খোঁজে নিজের দেশের

লোক। প্রবাসে দেখেছি এসিয়ার লোক পেলেও যেন একটা আত্মীয়তা বোধ আপনা-আপনি জাগত। ভারতের লোক পেলে মন খুব খুসী হোত। আর বাংলার ভারতবাসীই সেখানে আসন গ্রহণ কোরেছেন। পরিচয়-পর্ব্ব শেষ হতে বেশীক্ষণ লাগল না। আমরা ভারতীয় যাত্রী হলাম (সেকেণ্ড ক্লাসে) দশ জন। তার মধ্যে

বন্দরের নিকট প্রধান রাস্তা—এডেন
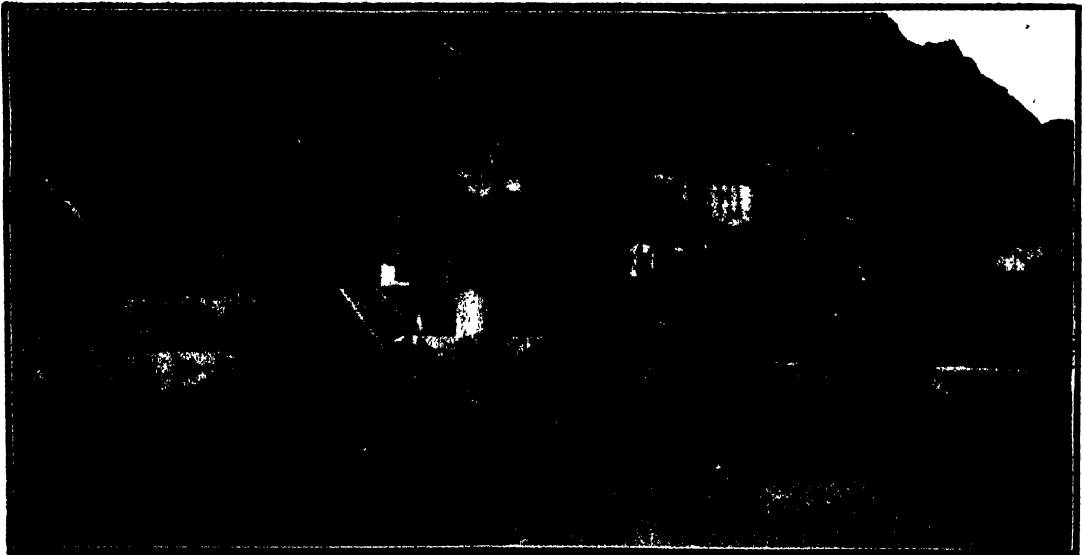
জলপূর্ণ প্রধান জলাধার—এডেন

লোক ছিল ঘরের লোক—আলাপের পর মুহূর্ত্তেই ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। টেবিলে খেতে গিয়ে দেখি সব কটী আমি ও মিঃ এইচ, ব্যানার্জ্জি নামে আর এক ভদ্রলোক বাঙ্গালী ও একটী বোম্বাই-আগতা মহিলা।

গল্প করতে করতে জাহাজের কম্পনটা একঘেয়ে হয়ে এসেছিল। বাইরের জগৎটা সম্বন্ধে খুব বেশী খেয়াল

বাজারের একাংশ—এডেন

ছিল না। নূতন বন্ধু, নূতন সমাজ গড়ে তুলতেই ব্যস্ত ছিলাম। খাওয়ার পর উঠে দাঁড়াতেই পোর্টহোল দিয়ে

আমাদের জাহাজ

দৃষ্টি অপ্রতিহত গতিতে চক্রবালের তীরে গিয়ে পৌছাল। সহসা সমস্ত অন্তর হাহাকার করে উঠল "আমার চির-পরিচিত আশ্রয়দাতা স্থল কই? এ যে খালি জল!" আমাদের ভেতর সকলেই পোর্টহোলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল চীৎকার করে বলি "মায়াবিনি! এ কি তোর ছলনা? খাবারের লোভ দেখিয়ে এমনি কোরে সর্ব্বনাশ করলি! ভাল কোরে স্নেহময়ী মার কাছ থেকে

বিদায় চাইতেও দিলি না! বিদায়-বেলায় মায়ের শান্ত করুণ মুখখানি দেখবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করলি"! কিন্তু এই ওরা করে থাকে। জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ মানুষের এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটীকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যই ঠিক জাহাজ ছাড়বার সময় আহারের ডাক দিয়ে থাকেন।

ধীরে ধীরে ডেকে এসে দাঁড়ালাম। দূরে বোম্বাইএর

গিরিবর্ত্ম্য—উপরে কেল্লা—এডেন
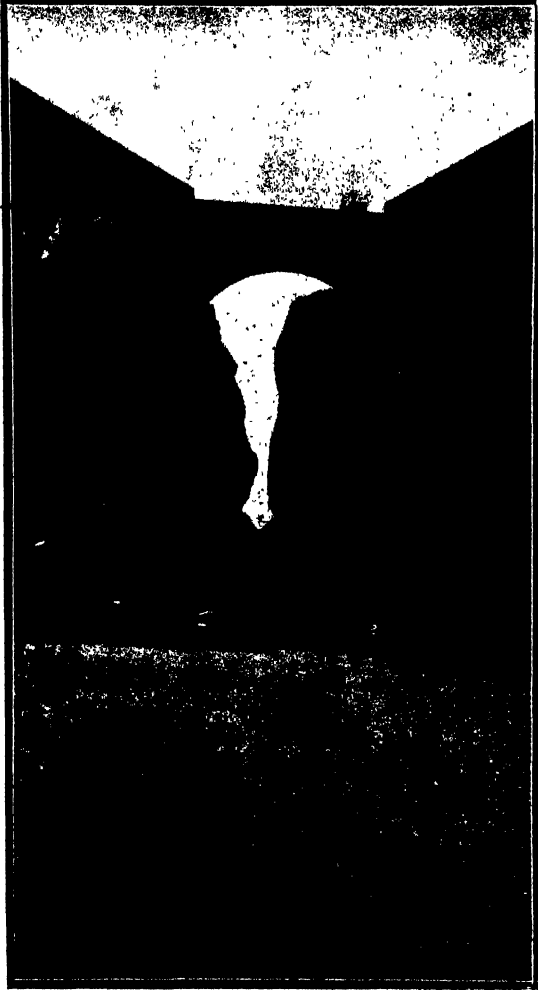
নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলোর অস্পষ্ট মূর্ত্তি তখনও চোখে পড়ছিল। তা ছাড়া আর সব দিকে গাঢ় নীল অসীম সমুদ্রবারি। একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া বড় মিষ্টি লাগছিল; কিন্তু মনটা তখনও পুরাতনের মোহ ছেড়ে নূতনকে গ্রহণ কোরতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। মনে পড়ছিল এক-জেটী লোকের হাত নেড়ে, রুমাল নেড়ে চীৎকার কোরে নিজেদের বক্তব্য বলবার, বিদায় অভিনন্দন জানবার কি প্রচণ্ড চেষ্টা! আর জাহাজের ওপর রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়া যাত্রীদল। জন্মভূমির মায়া তাদিগকে যেন জোর করে আকর্ষণ কোরছিল। কোথায় এখন তারা? কোথায় এখন সেই ইট, পাথরের ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, লোকজনের হৈ, হৈ? কিছু নাই, কিছু নাই, সে সব যেন স্বপ্ন। সে যে ছিল তার প্রমাণ কি? বৈদান্তিকেরা বলেন পৃথিবীটাই মিথ্যা মায়া। সে কথা মানতে আজ বাধা নাই। একদিন যাকে পরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম, যার মাঝে নিজে বাস করেছিলাম, যার অস্তিত্ব নিজের দেহে, মনে সর্ব্বদা অনুভব করেছি, আজ সে কই? এক আমি ছাড়া সেই অতীতের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই ত আজ সঙ্গে নেই! শুধু কি তাই? আজ যে এই সাগরের বুকে ভাসতে ভাসতে চলেছি; এই যে কর্ম্মহীন ক্লান্তিলেশ দিনগুলি অনন্তের বুকে পরম শান্তির কোলে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে চলেছি, এও ত স্থায়ী অবিনশ্বর নয়—একদিন এরও সমাপ্তি ঘনিয়ে আসবে। আবার হয় ত কোন নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। তখন তাই হবে সাক্ষাৎ সত্য, যত দিন না আবার নূতন কোন পরিচয়ে তাও লীন হয়।

মানুষ দল পাকাতে ভালবাসে—সেটা তার চিরন্তন অভ্যাস। তাই ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভাষার এক একটী ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে সমষ্টির সৃষ্টি করে। তার পরিণতি হয় ক্ষুদ্র একটী সমাজে। ইংরাজি ভাষাটা বিশ্বব্যাপী; তাই তার মধ্যস্থতায় ভাবের আদান-প্রদান হয়। সমাজ-জীবন কর্ম্মশীল গতিময় হোয়ে উঠে—ডেক-টেনিস, ডেক-কয়েন, তাস, দাবা ইত্যাদি চলে। রাত্রে বল নাচ। পাশ্চাত্য-সমাজের দোষের দিকটা বাদ দিলে তাদের কাছে এখনও বহু জিনিষ আমাদের শিখবার আছে। জীবনটাকে তারা সত্যকার ভালবাসে। তাই তাকে ভোগ করে পূর্ণমাত্রায়। জীবনের সার্থকতা তারা উপলব্ধি কোরেছে। তাই তার নশ্বরতা দেখে তারা আঁতকে উঠে না। আজ এভারেষ্ট অভিযান, মেরুপ্রদেশ আবিষ্কার বা এরোপ্লেনের লম্বা দৌড় দিয়ে তাই তারা প্রাণকে বিপন্ন করতে ভয় পায় না।

জীবনটা সার্থক করে তুলতে, তাকে বিপন্ন করতে তারা নারাজ নয়। আবার তেমনি একটী অবসর মুহূর্ত্তও তারা জীবনের একটী ক্ষণও অপব্যয় কোরতে নারাজ,—কে জানে কখন তার পরিসমাপ্তি আত্মপ্রকাশ কোরবে।

জল-বিক্রেতা—এডেন
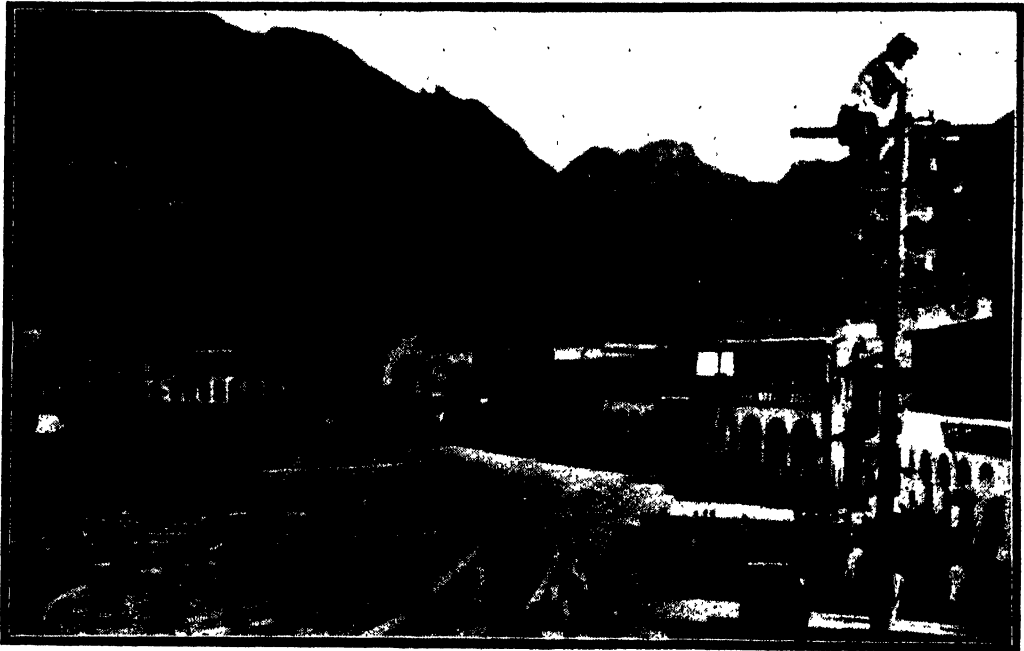
ক্রেসেণ্ট—এডেন

নিরানন্দে কাটাতে চায় না; জীবনের প্রতিটী মুহূর্ত্ত এরা কানায় কানায় আনন্দে বৈচিত্র্যে পূর্ণ করে নিতে চায়। এই ক্ষুদ্র সমাজ-জীবনে হাসি, প্রেম, আনন্দ আছে; আবার অশ্রু, প্রত্যাখ্যান, অভিমান, কুটিলতা,

পরশ্রীকাতরতাও আছে। এই সমুদ্রবুকে কত প্রেমিক মিলিত হয়েছে, কত পর বন্ধু হয়েছে; আবার এর বুকেই বিচ্ছেদ-ব্যথাও জমে আছে প্রচুর; কারণ, এ মানুষেরই সমাজ। এর মাঝে যাত্রীদের শ্রেণীবিভাগ আছে; অর্থ

জাহাজ হইতে বন্দরের দৃশ্য—এডেন

তাদের মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীতে যেতে পায় না, পাছে দাম না দিয়ে তার সুবিধা ভোগ করে। পৃথিবীর বুক থেকে তার সন্তানদিগকে ধরিত্রীর অঙ্কচ্যুত তার সন্তান-দল এখানে দ্বিতীয় ধরার সৃষ্টি করে।

প্রথম দিনের পর থেকেই সমুদ্র বেশ মাথা নাড়া দিতে লাগল—অনেকেই শয্যা নিলেন। সঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এডেনের আগে আর শয্যা-ত্যাগ কোরলেন না; এমন কি, খাবার ঘরেও তাঁর দেখা মিলত না। ইনি সঙ্গে এনেছিলেন চাল, ডাল, নুন, ঝালমসলা, তেজপাতা, হলুদ, তেল, ঘি ও একটী ইকমিক্ কুকার। এ ছাড়া গজা খাজা জাতীয় অন্যান্য জিনিষও ছিল সঙ্গে। নিজে রেঁধে খাবার প্রবৃত্তি থাকলেও সামর্থ্য ছিল না, অথচ জাহাজের বিলাতী খাওয়া, ম্লেচ্ছর হাতে খেতে বন্ধুবরের রুচি হোত না। তাই খাজা গজা আর কিছু ফলমূল খেয়েই বন্ধু বিলাতের পথের এই চার দিন কাটালেন। যাঁরা শয্যা নিলেন না, তাঁরা সকলেই মাথাটা ঝাঁকি দেন
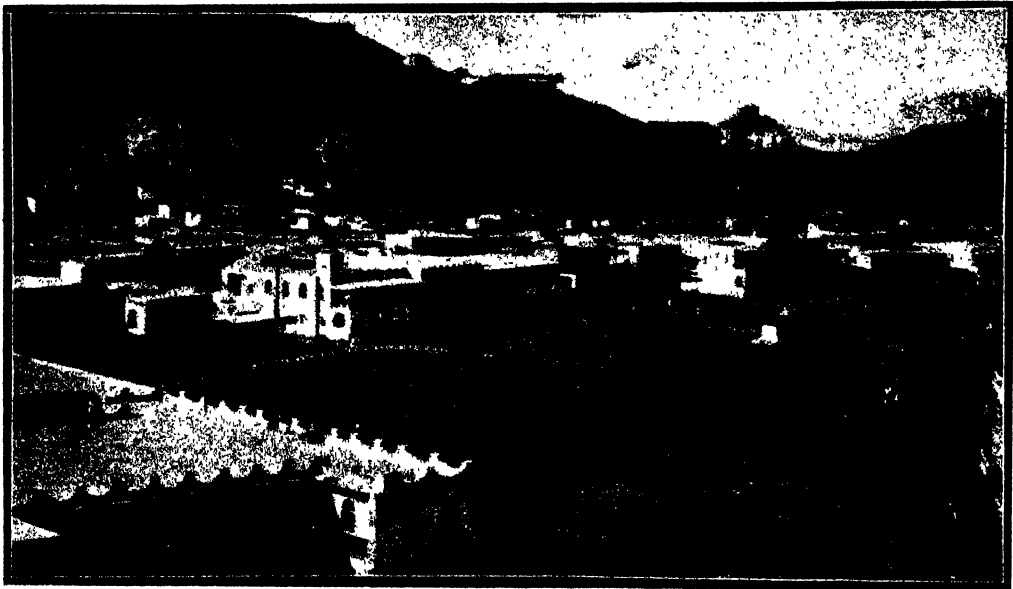
ষ্টীমার পয়েন্ট—এডেন

কেড়ে নিয়ে মাটীর আবহাওয়া থেকে তাদিগকে দূরে সরিয়ে নিয়ে এলেও তাদের অন্তরের হাসি ও বেদনাকে ত বাষ্পদৈত্য নিশ্চিহ্ন কোরতে পারে নি। তাই আর বলেন "Feeling giddy—isn't it?" এ অবস্থাটাও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়—বিশেষ কেবিনের মধ্যে থাকা অসম্ভব। ডেকের খোলা হাওয়ায় তবু টাল সামলান যায়।

একঘেয়ে দিনগুলির সূর্য্যাস্ত হয় আর ভাবি, অনিশ্চয়তার দিনগুলির একটী কোম্‌ল। মাঝে মাঝে ঢং ঢং করে কাপ্তেনের সঙ্কেত-ঘণ্টা পড়ে। ডেকের ধারে বসে গভীর অনন্ত সমুদ্রের বুকের দিকে চেয়ে থাকি। ছোট ছোট ওড়া মাছগুলি রূপার পাতের মত চক্‌ চক্‌ করে নীল বুকের ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে মিলিয়ে যায়। শান্ত স্থির বুকখানা চিরে জাহাজটা দামাল ছেলের মত এগিয়ে চলে। পেছনে বহুদূর পর্য্যন্ত গভীর নীলাকাশে ছায়াপথের মত একটা আব্‌ছা শুভ্র রেখা জাহাজের গতিপথ নির্দ্দেশ করে। সমুদ্রের বুকে ছোট ছোট অগণিত ঢেউগুলি ধীরে ধীরে মাথা তোলে আবার লীন হয়ে যায়, —যেন দুরন্ত চঞ্চল নাগশিশু কৌতুকে এই অদ্ভুত জিনিষটী দেখতে আসে, পরক্ষণেই আত্মপ্রকাশের লজ্জায় আত্মগোপন করে। ভেঙ্গে পড়বার আগে তাদের শুভ্র ফেনাগুলি মণির মতই রৌদ্রকিরণে ঝক্‌ ঝক্‌ করে। এই কৌতুক যখন ক্রোধে পরিণত হয়, তখন এই গতিশীল বিরাট বপুকে বাবু করে তোলে। ঈশ্বর অনুগ্রহে আমাদিগকে সে রূপ দেখতে হয় নি।

এই একঘেয়েমি কাটাবার জন্য কোন দিন রাত্রে খেলায় কুকুরের বা ঘোড়ার রেস হয়, যাত্রীরা বাজী ধরে, হার জিতের আশায় উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব হয়ে থাকে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় জাহাজ কতশো মাইল চলেছে তা নিয়ে বাজী ধরা হয়। কাপ্তেন পর্য্যন্ত যোগ দেয়, হারেও। কোন দিন সৌখীন পোষাকের নাচ হয়, কোন দিন বা মৌলিক বেশের। আমাদের জাহাজে ভারতীয় রাজার পোষাক পরে একজন সৌখীন পোষাকে প্রথম পুরস্কার পান। আর মৌলিক পোষাকে একজন ক্ষেতের জানোয়ার

বিশ্রামরত মরুপোত—এডেন

তাড়াবার জন্য নকল মানুষ সেজে ও একজন কাগজের পার্শ্বেল সেজে দুটি পুরস্কার পেয়েছিল। দুইটী পোষাকই

আরব সন্তান—এডেন

বাস্তবিক বড় সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়েছিল। প্রথমটা এমন সেজেছিলেন যে তিনি যে একজন জীবন্ত মানুষ তা

বোঝাই যাচ্ছিল না। একজন লোক তাকে ধরে নিয়ে এল ঠিক যেন বাঁশ কাঠের তৈরী একটা নকল মানুষ। দ্বিতীয়টী সেজেছিলেন আগাগোড়া কাগজের প্যাকিং দেওয়া একটী মেয়ে, গলায় একটী লেবেলে ঠিকানা পর্য্যন্ত লেখা।

এর মধ্যে একদিন ফায়ার প্যারেড (Fire Parade) হোল। জাহাজে বিপদসূচক বাঁশী বাজতেই নিজের নিজের লাইফ বেলট বুকে ঠিক করে বেঁধে ডেকে এসে দাঁড়াতে হল। ক্যাপ্টেন বা তাঁর প্রেরিত কেউ এসে দেখে গেল সব ঠিক বাঁধা হয়েছে কি না।

ও পরিচালন বিভাগের কর্ত্তা তেমনি জাহাজে তিনিই ধর্ম্মগুরু। ইচ্ছা করলে তিনি জাহাজে পৌরোহিত্য করে বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন এবং সে বিয়ে আইনতঃ সিদ্ধ হয়।

ক্যাপ্টেনের নীচেই পার্সার (Purser)—খাওয়া-দাওয়া, কেবিনের ব্যবস্থা, টাকাকড়ির জিম্মা রাখ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ভার তাঁর হাতে এই সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার একটা কথা দেশবাসীকে জানান উচিত মনে করছি—তা পি এণ্ড ও কোম্পানীর ব্যবহার। পূর্ব্বে যেমন শোনা যেত তেমন কোন খারাপ

মরুযান—এডেন

বিকালের দিকে অনেকে জাহাজের উপর জলের বড় চৌবাচ্চায় সাঁতার দিতেন। কেউ বা সূর্য্য-স্নান করতেন। কেউ বা স্কিপিং বা অন্য ব্যায়াম করতেন। অবসর বিনোদনের জন্য স্মোকিং রুমে একটা লাইব্রেরীও ছিল। এ ছাড়া সরবৎ, সিগারেট, বিয়ার ও অন্যান্য পানীয়ের একটী দোকানও সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলেছিল।

ক্যাপ্টেন জাহাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা। টিকিট ক্রয়ের সর্ত্তই থাকে যে, যদি ক্যাপ্টেন মনে করেন কোন কারণ না দেখিয়ে তিনি যে কোন বন্দরে যে কোন যাত্রীকে নামিয়ে দিতে পারেন। তিনি যেমন শাসন

ব্যবহার আমরা পাই নাই; কিন্তু বারংবার বলেও আমাদের খাওয়ার কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। বহুবার বলায় একটী কোরে নিরামিশ চপের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তা মোটেই পর্য্যাপ্ত ছিল না—অথচ ইতালীয় বা অন্যান্য জাহাজে যাত্রীদের আহারের দিকে ব্যক্তিগত ভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

ক্রমাগত চার দিন চলার পর একদিন সকলে আনন্দে চীৎকার কোরে উঠলেন "ঐ মাটী, ঐ পাহাড়"। দূরে অস্পষ্ট পাহাড় দেখা গেল। যাঁর দূরবীক্ষণ ছিল তিনি ত দেখলেনই; যাঁর না ছিল তিনি ধার করলেন। ক্রমাগত

চারদিন একঘেয়ে জলের পর স্থল দেখে সকলেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। জাহাজের কোলে আরাম বা আয়োজনের অপ্রতুল ছিল না; কিন্তু তবু সে সৎমায়ের আদর—কখন কোন্ মুহূর্ত্তে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার ঠিক কি? আর এই স্থল, হয় ত ওখানে নিয়মিত দুবেলা আহারও না জুটতে পারে, তবু ওর বুকে মানুষ অভয় পায়, ওর বুকেই যে সে মানুষ।

ক্রমে ক্রমে তীরে শ্যামলতা-হীন পাহাড়ের বুকে ঘরবাড়ীর রেখা ফুটে উঠল—তীর আরো নিকটে এল। বাবেলমাণ্ডব প্রণালীব মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করল,—এক দিকে আফ্রিকা, অপর দিকে এসিয়ার সীমারেখা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। একটী মোটরলাঞ্চে বন্দরের পথ-প্রদর্শক এসে জাহাজে উঠল। চারি দিকে লম্বা সাদা পাল-ওয়ালা নৌকার দল মাছ শিকারে চলেছিল। মোটরলাঞ্চটী জাহাজ থেকে দড়ি নিয়ে গিয়ে বন্দরের বয়াতে বেঁধে দিলে। অনেক দিন পর এডেনে এসে তবু মাটীর স্পর্শ পাব ভেবে মন আনন্দে নেচে উঠল।

জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়াল। বোম্বাইএর মত এডেন বন্দরের জল অত গভীর নয়। তাই তীর থেকে একটু দূরেই দাঁড়াতে হল। মোটরলাঞ্চ এসে আমাদের তীরে নিয়ে গেল। দেশ-প্রবেশের প্রণামী স্বরূপ মাথা পিছু আট আনা করে গুণে দিতে হোল। বিস্তর মহাজনের দল ঘিরে দাঁড়াল "Money Change Sir." এখানে কিন্তু ভারতীয় মুদ্রা ও পোষ্টেজই চলে, এডেন বোম্বাই সরকারের অধীন।

খানিকটা হেঁটে বেড়িয়ে সকলে মিলে যুক্তি কোরলাম—একটি ট্যাক্সী নিয়ে সহরটা ঘুরে দেখা যাক্। হেঁটে কতটুকুই বা দেখা হবে, বিশেষ সময়ও বেশী নাই।

মোটর বন্দর থেকে আমাদের নিয়ে ছুটল। কিছু দূর গিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা পাক দেওয়া রাস্তা দিয়ে পাহাড়ের বুকে চড়তে লাগল। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য বেশ।

আরব মসজিদ—এডেন

ক্রমে একটী গিরিসঙ্কটের মুখে গাড়ী এল। প্রবেশপথে পাহাড়ের গায়ে অনেক কিছু লেখা আছে। সব পড়া সম্ভব হয় নি। দুটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মাঝে সামান্য একটু রাস্তা—এডেন ঢুকবার এইটাই প্রধান ফটক। এর

জপ প্রমেনেড—এডেন

উপরও পাহাড়ের মাথায় বরাবর লম্বালম্বি কেল্লা চলেছে। এডেনের এদিকটা বেশ সুরক্ষিত মনে হোল।

গিরিবর্ত্মের দুই মাথাতেই প্রহরী খাড়া রয়েছে। এর পর সমতল ক্ষেত্রে এডেন সহরটী চোখে পড়ল। কোথাও শ্যামলশ্রীর চিহ্ন নাই—ধূসর মরুপ্রান্তর। বাড়ীঘরগুলিও সেই রং-এর। এমন কি একমাত্র যান উটগুলিকে পর্য্যন্ত যেন বিধাতা রং মিলিয়ে তৈরী কোরেছেন। সমস্ত জায়গাটা যেন পাহাড়ের বুক ভেঙ্গে তৈরী,—পাথরের টুকরো ও গুঁড়োতে সবটা আচ্ছন্ন। বাড়ীগুলির মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য কিছু নাই—লোকগুলি সাধারণতঃ দরিদ্র বলে মনে হোল। রং কালো। যেমন হৃষ্টপুষ্ট আরব

জলাধার সমূহ—এডেন

বেদুইন দেখব বলে আশা করেছিলাম, ঠিক তেমনটী দেখতে পেলাম না। ঢিলে-ঢালা পোষাক। মেয়েরা কেউ বোর্খা পরে, কেউ-বা অনবগুণ্ঠিতা হয়েই রাস্তা দিয়ে চলেছে—সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। তবে সাধারণ জনসংখ্যাও খুব বেশী মনে হোল না—রাস্তাঘাটে ভীড়ও তেমন নাই। গাড়ী বাজারের মধ্য দিয়ে চল্‌ল। অনেক জিনিষেরই দোকান। সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জল-বিক্রীর বিপণিগুলি—জলকষ্টের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাজারে দুপারে দোকানে বসে অনেকেই ফর্সী, আলবোলা মুখে দিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে সময় কাটাচ্ছে মনে হোল। মাঝে মাঝে আমাদের মোটর উটের গাড়ির পাশ কাটাতে লাগল। এখানে এক মোটর ছাড়া সব যানেরই বাহন ঐ কুৎসিত জীবটী—ওকে ছাড়া গত্যন্তর নাই। রাস্তায় জল দিচ্ছে উটের গাড়ি, বোঝা বইছে উট, মানুষ বইছে উট। কোথাও বা আহারের পর নিশ্চিন্ত হয়ে তারা বিশ্রাম কোরছে।

ক্রমে আমাদের গাড়ী এসে থামল মিউজিয়ম এবং জলাধারের কাছে। পাহাড়ের গায়ে একটী জলপথকে বাঁধ দিয়ে চৌবাচ্চার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই চৌবাচ্চা একটীর পর একটী কোরে থাকে থাকে নেমে এসেছে। প্রথমটা জলপূর্ণ হোলে দ্বিতীয়টী উদ্বৃত্ত জল দ্বারা পূর্ণ হয়; তার পর তৃতীয়টী। এমনি ধারা চলে। জলহীন মরুর দেশে এটী একটী দ্রষ্টব্য। তাই ট্যাক্সী এই দ্রষ্টব্যহীনের দেশে এইখানেই আমাদিকে হাজির কোরলে। এখানে সন্ধ্যা হয়ে আসায় এবং আমাদের সঙ্গী অন্য একটী গাড়ি ইতিপূর্ব্বেই চলে যাওয়ায় মিউজিয়মটা দেখা হয়ে উঠল না। শুন্‌লাম এডেন অধিকারের ইতিহাস ও অস্ত্রশস্ত্র এটীর শ্রীবৃদ্ধি কোরছে।

সহরটী চক্র দিয়ে আবার সেই গিরিবর্ত্ম দিয়ে বেরিয়ে এসে বন্দরের কাছে নামলাম। বন্দরের কাছেই পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাম অফিস ও অন্যান্য বড় বড় দোকানপাট। এদিকের ষ্টীমার-পয়েণ্ট, ক্রেসেণ্ট (Crescent) প্রভৃতি কয়েকটী জায়গা আয়তনে ছোট হোলেও দেখতে বেশ। বহুব্যয়ে এখানে কিছু গাছ-পালা তৈরী করা হয়েছে। বড় বড় সৌখীন দোকান-পত্রও সব এই পাড়ায়; পোষ্ট অফিস বে (Bay), জপ প্রমেনেড প্রভৃতি কয়েকটী রাস্তাও বেশ মনোরম। এক দিকে সমুদ্র ও অপর দিকে পাহাড় থাকায় এগুলির শ্রী দ্বিগুণ বেড়েছে। এডেন ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের একটি বড় ঘাঁটি; কাজেই সৈন্যসামন্তের পোষ্ট এবং টেলিগ্রামের যে বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে তা বলাই বাহুল্য।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এল। দূরে জাহাজে আলোর মালা জলে উঠল। আজ কিন্তু ঘর ছাড়িয়ে

আনা ঐ জাহাজটাকেই আত্মীয় বলে মনে হল। মাটী হোলেও এ যেন পর, এর সঙ্গে অন্তরের কোন টানই বোধ করলাম না। আজ ঐ জাহাজের বুকে ফিরে গেলেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি—ঐ জাহজের বুকের ওরা যে আমার বন্ধু—আমার সমাজ যে আজ ওখানে। নিতান্ত পর যে ছিল, যার ওপর অভি-মানে আক্রোশে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে সে-ই আজ আত্মীয় হয়ে বসেছে —ওর ঐ আলোর ইসারা আমার অন্তরকে আজ নাড়া দেয়।

উটবাহী রাস্তায় জল দেওয়া গাড়ী—এডেন

পিয়ন

শ্রীবিজলী দেবী

বিশ্বের বারতা বহি, হে পত্রবাহক
নিত্য তুমি ঘরে ঘরে বিলাইয়া যাও
প্রবাসীর বাণী, সুদূরের কত কথা
কত সুখ কত দুঃখ আশা ও নিরাশা।
বিরহীর ব্যথাভরা তপ্ত অশ্রুজল
মিলনের আশে হাসি উচ্ছ্বাস তরল
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখি—হও অগ্রসর
তোমার কর্ত্তব্যপথে, স্থির অচঞ্চল।
দিবা-শেষে সারি কাজ ফিরে যাও ঘরে
নির্লিপ্ত সাধক সম, প্রশান্ত অন্তরে।
আমিও তোমার মন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
কর্ত্তব্যের পথে যেন চলি অবিরত
সারি জীবনের কাজ প্রফুল্ল অন্তরে
শেষ দিন শান্ত মনে ফিরে যাই ঘরে॥

রাজা, রাণী ও প্রজা

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষ্মী চঞ্চলা। পৃথিবী হইতে এই চঞ্চলা মেয়েটী অকস্মাৎ যেন কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন।

তের শত উনচল্লিশ সালে ধানের মণ দাঁড়াইল পাঁচ সিকা। চাষীর দুঃখ-দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। শুধু চাষী কেন? সারা পৃথিবীশুদ্ধ লোক টাকা টাকা করিয়া পাগল হইয়া উঠিল। আমেরিকায় না কি ষাটটা ব্যাঙ্ক ফেল মারিয়াছে। আরও শতখানেক এমন টলমল করিতেছে যে পাশ ফিরিতে আর হইবে না।

মনে মনে ঐ সংবাদগুলাই সান্ত্বনা দেয়। পৈত্রিক ক্ষুদ্র জমিদারী কঠিন পেষণে গলায় চাপিয়া বসিয়াছে। জমিদারী এখন দাঁড়াইয়াছে হায়রাণী। সরকারের সদনে এক একবার রাজস্ব দাখিলের সময় হয় আর নিখিল ভুবন অন্ধকার হইয়া উঠে।

গমস্তারা লিখিল—প্রজারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। আপনি স্বয়ং না আসিলে কিছুতেই তাহাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করানো যাইতেছে না।

কি করিব—অভিযানে বাহির হইতে হইল।

গজ-পঞ্চাশেক লাল শালু কিনিয়া ফেলিলাম। ভোঁদা, ভোম্বল, গণেশ, গদাধর, গজেন্দ্র—বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের মাথায় সেই শালুর পাগড়ী মোটা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আর লাঠী পাঠান হইল গাড়ীখানেক। সতীশ খানসামা গেল গুজব লইয়া যে লাঠী ধরিবার লোকও গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিতেছে ভাগলপুর হইতে।

অবশেষে বাহির হইলাম নিজে। ছোট ভাই বন্দুক টোটা সঙ্গে দিয়া কহিল—"রোজ রাত্রে দুটো ক'রে ফায়ার করবে। তাছাড়া দিনে দুপুরে মাঝে মাঝে বেটাদের সামনে এক আধটা ক'রো।"

আমি একটু হাসিলাম।

স্ত্রী কহিলেন—"হাসছ যে? মন্দ কি বলেছে ও? তারা সব করতে পারে, রাজার খাজনা যারা দেয় না তারা ডাকাতি করতে পারে না?"

প্রজাদের রাণীর কথা হেলা করিতে সাহস হইল না। বন্দুক পাল্কীতে উঠিল।

যাইবার সময় পিসীমার বরাত হইল—সজিনা-খাড়া।

স্ত্রী কহিলেন—"চাল্‌তা এক ঝুড়ি পাঠিয়ে দিয়ো, আর নতুন নালতে শাক।"

ছোট কন্যাটী কহিল—"আমার জন্যে কিলিপ্ এনো বাবা।"

কন্যার জননী হাসিয়া কহিলেন,—"তোর বাবার যে মহাল সে কলকাতার চেয়েও বড়; ক্লিপের দোকান সেখানে সারি সারি।"

হাসিয়া জবাব দিলাম—"রাজ্য যেমনি হোক, রাণী কিন্তু কোন রাণীর চেয়ে প্রতাপে কম নন।"

—"বেশ বেশ, আর সময় নষ্ট ক'র না। আবার বারবেলা পড়বে।"

বাড়ীর লম্বা রাস্তা ঘরটায় আসিয়া গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। বারবেলার জন্য নয়। দেখিলাম দশ বছরের কনিষ্ঠ পুত্র সেখানে ভাঙা বাইসিক্ল, ট্রাইসিক্লের গোটা ছয়েক চাকা সারি সারি টাঙাইয়া খেলা পাতিয়াছে। চাকাগুলি আবার দড়ির মালায় পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ।

প্রজাদের রাণীমা রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বারবেলা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। শুভযাত্রায় বাধা পড়িল। কোনরূপে পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

ছেলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"আমার রাইস মিল ভেঙে যাবে।"

একটু কৌতূহল হইল। দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —"এটা কি তোমার রাইস মিল মাণিক?"

—"হ্যাঁ। দেখবে?" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে প্রান্ত-দেশের ছোট একটী ডাণ্ডা ঘুরাইতেই সমস্ত চাকাগুলা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম মিলের বেল্টিংএর তথ্যটা ছেলের মাথায় ঢুকিয়াছে। মনটা খুসী হইয়া উঠিল। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"মাণিকের মাথা

দেখেছ? ও ভাল একজন ইঞ্জিনীয়ার হতে পারবে। ওকে বিলেত পাঠাব।"

স্ত্রী কহিলেন—"সেই ত, সেই জন্যেই ত বলি এখন থেকে টাকা জোগাও। প্রজাদের কাছে পড়ে থাকলে ত টাকা জমবে না, বাড়বেও না। তুমি সে কথা কানেই তুলবে না। আজ না জল হয় নাই, কাল না বানে ফসল ডুবে গেছে। পরশু শুনছি ধানের দর নেই। আর তুমি রাজা রামচন্দ্র সেজে বসে আছ। কোন দিন প্রজার কথায় আমার না বনবাস হয়!"

হাসিয়া বলিলাম—"মা-ভৈঃ। বিশ হাতে গলা চেপে ধরে দশ মুখে এবার বেটাদের রক্ত শোষণ করে আনব।"

স্ত্রীর অধরে একটী বিচিত্র হাসি দেখা দিল। সে হাসির ছটায় আমার ব্যঙ্গ ম্লান হইয়া গেল। সেই হাসি হাসিয়া স্ত্রী কহিলেন—"ওতে আমার খুব আনন্দ হয় তাই তুমি মনে কর,—না? কি করব বল, আমার গর্ভে যারা এসেছে তাদের ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে আর কোন দিকে চোখ ফেরাতে আমার অবসর থাকে না।"

এ সংবাদ আমার অপরিজ্ঞাত নয়। এই মমতাই তাঁহাকে অতিরিক্ত স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল।

বলিলাম—"রাণীর দৃষ্টিটা হতভাগ্যদের উপর একবার ফিরুকই না। বেচারাদের একটু কল্যাণ হোক।"

সদম্ভে উত্তর হইল—"তা হয় না মনে করছ না কি? আমরা কোন্ জাত জান?"

বুঝিলাম উপন্যাস পাঠ বৃথা যায় নাই। মায়ের জাত কথাটা শিখিয়াছেন। স্ত্রীকে আর কিছু না বলিয়া ছেলেকে বলিলাম—"কই তুমি ত কিছু আনতে বললে না মাণিক?"

ছেলে মনোমত সামগ্রী কিছু আবিষ্কারের পূর্ব্বেই ছেলের মা তাহাকে শিখাইয়া দিলেন—"বল, আমার জন্যে টাকা এনো।"

* * * *

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম যে এই প্রজা একদিন রামচন্দ্রকে সীতা বনবাস দিতে বাধ্য করিয়াছিল! গাড়ীর লাঠী গাড়ীতেই থাকিল। ভোঁদা, ভোম্বলের শুকনো মুখে হাসি ফুটিল। আমি সেখানে পদার্পণ করিতেই সকল সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া গেল। প্রজারা যোড়হাত করিয়া কহিল—

—"সুদটা এবারের মত মাপ দিতে হবে হুজুর। আমরা খেতে পাচ্ছি না। আগের কিস্তিতে খাজনা আমরা দিতে পারি নি; অভাবে দিতে পারি নি হুজুর। ফসল কুটো তখন কিছু ছিল না। এখন আমরা আসল যোগাড় করেছি। গমস্তা কিন্তু সুদ নইলে খাজনা নিচ্ছেন না।"

বুঝিলাম এরাও পশু, আমরাও তাই। গমস্তাই হইতেছেন বাজীকর। যাক্—অজাযুদ্ধ বলিয়াই এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই রক্ষা পাইয়া গেল।

মাতব্বর গোকুল মণ্ডল কহিল—

"হুজুর আমাদের মা-বাপ। আপনার এখানে থাকতে কষ্ট হবে তা' জানি। কিন্তু প্রজার মুখ চেয়ে এখানে দশ দিন থাকতে হবে আপনাকে। খাজনা আদায় হয়ে যাক, তার পর আমাদের চেক রসিদ পাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে থাকতে হবে।"

গমস্তা তাড়াতাড়ি কহিল—"কেন, কেন, হুজুরকে থাকতে হবে কেন শুনি? টাকা তোমরা 'ডেপোজিট' কর হে বাপু। চেক রসিদ আমার কাছে পাবে। হুজুরের এখানে থাকতে খরচ কত হে বাপু? এই সব লোকজন—এ-তো সোজা ব্যাপার নয়। তোমাদের চাষার বুদ্ধি কি চিরকাল এমনি থাকবে?"

গোকুল হাত যোড় করিয়া বলিল—

—"হুজুর এসেছেন আপন রাজ্যে। তাঁর সেবার ভার আমাদের। সে যোগাব আমরা। আমাদের গেরামে এসে যদি রাজাকে খরচ ক'রে খেতে হয় তা হ'লে সে লজ্জা কি আমাদের ন'লে যাবে?"

মুখ হাত ধুইতে ধুইতে ভাবিতেছিলাম এ জাতটা কি? জানোয়ার যে জানোয়ার তা'রাও শুনিয়াছি কসাইএর গায়ের গন্ধে ভয় পায়,—তাহার সান্নিধ্য হইতে সরিয়া যাইতে বল প্রকাশ করে। আর এরা পা চাটিতে চাটিতে গলা বাড়াইয়া দেয়।

কাছারী-প্রাঙ্গণে একটা ভারী আসিয়া ভার নামাইল। দেবভোগ্য চাল হইতে তরী-তরকারী, মসলা,

ঘি, তেল কিছুরই অভাব তাহার মধ্যে নাই। ভারবাহীর পিছনে আর একটা লোকের মাথায় সের-পাঁচেক একটা রুই মাছ। লোকটী মাছটা নামাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—"তুধ আসচেন।"

পাচক জিনিষপত্র দেখিয়া তুলিতে তুলিতে কহিল —"নূন কই হে মোড়ল?"

উত্তর শুনিলাম—"ওইটাই হুজুরকে কিনে খেতে হবে। আমাদের নূন কি রাজাকে খাওয়াতে পারি?

সতীশ চাকর ঘি-এর পাত্রটা তুলিতে তুলিতে কহিল—"ঘৃতটা কি রকম মণ্ডল মশায়? গব্য বটে ত?"

মনটা কেমন হইয়া উঠিয়াছিল। মনে মনে নিজেদের অপরাধের বোঝা ওজন করিতে করিতে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলাম। সেও ভাল লাগিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সকলের অলক্ষিতে পাশ কাটাইয়া কাছারী-বাড়ীর পিছনে আমবাগানের অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কে কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল—

—"মরবি, তুই বেটারাই মরবি। জমিদারকে কখনও গাঁয়ে রাখতে আছে? বিদেয় ক'রে দে। তার পর আমি সব ঠিক ক'রে দেব। বুঝলি? সবাই খাজনা না দিতে পারিস আমি সব বুঝিয়ে দেব।"

কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম বক্তা আমার বিশ্বস্ত গমস্তা। আমারই লজ্জা বোধ হইল। সেখান হইতে পলাইয়া আসিলাম।

* * * *

বসিয়া বসিয়া রাজভোগ মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু কর্ম্মহীন অলস দীর্ঘ দিনগুলি বুকের উপর বোঝা হইয়া চাপিয়া বসিতেছিল। অবশেষে স্থির করিলাম ব্যাধ-বৃত্তিটা মন্দ নয়। আনন্দ থাক বা না থাক,—উত্তেজনা আছে। বন্দুক লইয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিলাম।

গ্রামের চারি দিকে বড় বড় বৃক্ষনিবিড় বাগানগুলা জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। ছায়াশীতল তলদেশ নানা আগাছায়, লতায় বন হইয়া গিয়াছে। সরু একফালি রাস্তার আশে পাশে কত নাম-না-জানা গাছে মধুগন্ধী ফুলের সমারোহ। বড় বড় গাছগুলার মাথা হইতে লতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে মালার মত। কুঁচের লতায় থোলো থোলো লাল বরণ কুঁচ ধরিয়া আছে। মাথার উপর পাখীর কলরব। নানা কণ্ঠে নানা স্বর, নানা গান। বড় ভাল লাগিল আমার।

মানুষের চোখে কৃত্রিমতার মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ বেশী করিয়া ধরা দিয়া থাকে। তাই সে একদিন বন কাটিয়া গড়িয়াছিল পল্লী-বসতি। সে পল্লী ভাঙিয়া ক্রমে সে রচনা করিল নগর। পল্লীর বুক ছাড়িয়া দলে দলে মানুষ ছুটে সেই নগরের বুকে। তাহার কারণ বোধ হয় কৃত্রিমতার মধ্যে সে পায় ছোটর মধ্যে বিরাট প্রকৃতির সম্পূর্ণ একটী প্রতিলিপি। প্রকৃতির বিশালতায় তাহার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে ধরা দেয় শুধু খণ্ড প্রকৃতি। সম্পূর্ণতার বৈচিত্র্যের অভাব থাকে তাহার মধ্যে। কিন্তু যেদিন প্রকৃতি, অবগুণ্ঠনাবৃতা পল্লীবধূর মত অতর্কিত মুহূর্ত্তে আপনার অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্য্য লইয়া মানুষের চোখের সম্মুখে দাঁড়ায়—সে মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনে সৌভাগ্যের একটী পরম মুহূর্ত্ত। সেদিন আমার জীবনেও এমনি একটী লগ্নক্ষণ আসিয়াছিল। পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে যেন শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। মুগ্ধ হইয়া চারি পাশে চাহিয়া দেখিলাম।

মাথার উপরে একটা শিমুলগাছে অজস্র রাঙা ফুলের স্তবকে স্তবকে কে যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। একদল হরিয়াল পাখী জলতরঙ্গের মত কূজন সহকারে ফুলের মধু খাইতেছিল। বন্দুকে টোটা পূরিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম কোথায় কোন্ শাখায় তাহারা দল বাঁধিয়া আছে। একটা জায়গায় দেখিলাম চমৎকার লাইন পাওয়া গিয়াছে—এক গুলীতে পাঁচ-ছয়টা মরিবেই। বন্দুক তুলিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই বন্দুকটা নামাইয়া লইলাম। প্রকৃতির এমন শান্ত মাধুর্য্যময়ী গভীর মধ্যে হত্যা করিতে ইচ্ছা হইল না।

মনে হইল পৃথিবীর আদিকাল হইতে এই শান্তিময় স্থানটায় রক্তাক্ত হত্যা কেহ কখনও করে নাই। আমি সেই স্থানটাকে রক্তাক্ত কলঙ্কে কলঙ্কিত করিব!

একটা গাছের তলায় সবুজ ঘাসে ঢাকা একটু প্রশস্ত স্থান দেখিয়া বসিয়া পড়িলাম। এমন স্থানে এমন মুহূর্ত্তে

হত্যার উত্তেজনা হইতে নিজেকে সংযত করিয়াছি বলিয়া আনন্দে চিত্ত ভরিয়া উঠিল। মনে হইল আমি ভাগ্যবান।

এই গ্রামখানিতে সকলে আমাকে ভালবাসে, কেহ আমার শত্রু নাই, আমি কাহাকেও হিংসা করি না। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে পরিপূর্ণ আনন্দের সুর উঠিতেছিল। জগতের অহিংসাব্রতী মহাপুরুষগণকে স্মরণ হইল। মনে মনে তাঁহাদের চরণে প্রণতি জানাইলাম।

এমন স্থান হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। ভাব-বিচলিত চিত্তের এমনি একটী মুহূর্ত্তে ধরিত্রী জননীর শ্যামাঞ্চল-তলে শিশুর মত দেহ এলাইয়া দিতে ইচ্ছা হইল। বন্দুকটা পাশে রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু মনে পড়িয়া গেল প্রজাদের আজ আবার তলব দেওয়া হইয়াছে। গমস্তা সকাল সকাল ফিরিতে বলিয়া দিয়াছে। আনন্দমগ্ন চিত্ত কর্ত্তব্যের বাধ্য-বাধকতার চলিতে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

কাছারীতে ফিরিয়া মুখ হাত ধুইতে বসিলাম। গমস্তা কড়া ক্রান্তি গুটাইয়া টাকায় পরিণত করিতেছিল। একটী লোক আসিয়া স্বচ্ছন্দ নমস্কার সহকারে হাস্যমুখে প্রশ্ন করিল—"কেমন আছেন? রাজবাড়ীর সব কুশল ত?"

লোকটী অপরিচিত। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, তোমাদের সব ভাল ত?"

সে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গমস্তা কহিল—"কি হে রাইবল্লভ যে! এত দিনে জমিদার ব'লে মনে পড়ল না কি?"

লোকটীর নামে তাহার পরিচয় পাইলাম। রাইবল্লভ আমাদের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর এক মণ্ডল। এবং অবাধ্য প্রজার গোপন তালিকায় বারবার তাহার নামোল্লেখ আছে।

রাইবল্লভ বেশ সপ্রতিভ ভাবেই মৃদু হাসির সহিত মাথা চুলকাইতে লাগিল।

তাহার এ হাসি আমার ভাল লাগিল না। গমস্তার অনুযোগটাকে তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া যেন সে স্বীকার করিয়া লইল। অপরাধ-বোধের বিন্দুমাত্র প্রকাশ তাহার মধ্যে দেখা গেল না। দ্বিপ্রহরের সুপ্রসন্ন অন্তর ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহাকে বলিলাম—তুমিই রাইবল্লভ?

পূর্ব্বের মত ভঙ্গীতেই সে কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পাঁচ মোড়লের তুমি না এক মোড়ল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কই তোমাকে ত এ ক'দিনের মধ্যে একদিনও দেখলাম না?

—আপনি যেদিন এলেন তার পরদিন থেকেই আমি গাঁ-ছাড়া।

—কই, যেদিন এলাম সেদিনও ত তুমি এস নাই? জমিদার মহালে এলে তোমরাই তাঁর তদ্বির করবে। তোমরা হচ্ছ মণ্ডল। তা' তুমি সে সব দূরে থাক দেখা পর্য্যন্ত ক'রে গেলে না?

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই রাইবল্লভ জবাব দিল—আজ্ঞে বিদেশে যেতে উয্যুগ আয়োজন ত আছে। আর আপনার মোড়ল ত আরও সব রয়েছে।

মনটা আমার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কহিলাম—খাজনা-পাতি তোমার সব মিটে আছে?

দেনা-পাওনার সংসারে মানুষের মাথা মাটীতে নোয়াইতে পাওনার তাগিদের চেয়ে বড় আক্রমণ নাই—এ জ্ঞান আমার ছিল। এবং ফলও সঙ্গে সঙ্গে ফলিল। রাইবল্লভের মুখের হাসিটুকু কোথায় মিলাইয়া গেল। সে নত মুখে উত্তর দিল—আজ্ঞে না।

গমস্তা সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিল—আজ্ঞে তিন বছরের বাকী হ'ল রাই মোড়লের। কথা কানেই তোলে না।

জিজ্ঞাসু নেত্রে রাইবল্লভের মুখের দিকে চাহিলাম। রাই মুখ তুলিল। দেখিলাম ললাটে তাহার ভ্রূকুটী দেখা দিয়াছে। বেশ সহজভাবেই সে কহিল—অভাবেই বাকী প'ড়েছে। খাজনা দিতে হবে বৈ কি।

লোকটার দাম্ভিকতায় আমার মনের উষ্ণতা ক্রোধের আকার ধারণ করিতেছিল। বেশ গম্ভীরভাবে কহিলাম—দিতে হবে বৈ কি মানে কি?

—আজ্ঞে দোব খাজনা।

উষ্ণভাবে কহিলাম—কবে দেবে?

—বোশেখ মাস ক'রে দেখে শুনে দোব। এখন ত পারছি না।

লোকটার অদ্ভুত স্পর্দ্ধায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

উত্তর করিল গমস্তা—বোশেখ মাস মানে ত' চল্লিশ সাল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

গমস্তা দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল—ই-দিকে ত ছেলেকে বি-এ, এম-এ পড়াবার জন্যে উদ্যুগ হচ্ছে। নাই কেবল জমিদারের বেলা ?

রাই কহিল—তা সাধ হয় বৈ কি গমস্তা মশায়। গরীবের কি সাধ হয় না ? বুদ্ধিমান ছেলে—মাইনরে বৃত্তি পেলে। তাকে পড়াবার সাধ হয় বৈ কি। লেখা-পড়া শিখলে ভদ্র-সমাজে বসতে পাবে, আমাদের মত মাটীতে ত' বসবে না।

অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তা হ'ল না। দুটা ভাতের অভাবে তা হ'ল না। সেই চেষ্টাতেই ত সেদিন গিয়েছিলাম। তা বাবু মশায়—

প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম—তোমার ছেলে বৃত্তি পেয়েছে ?

কিন্তু রাইএর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গমস্তা কহিল —ওরে বাপু, তা' হবে কেন ? এঁটো পাত স্বগ্‌গে যায় না। যাক্ গে—এখন খাজনার কি হবে বল ? না দিলে এবার নালিশ হবে কিন্তু।

—তা হয়ই যদি কি করব বলুন ? তাই নালিশই করবেন। তা হলে আসি—প্রণাম।

মুখে বলিল প্রণাম, কিন্তু নমস্কার করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

গমস্তা তাড়াতাড়ি আমার কানে কানে একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিল। আমি চাপরাশীকে কহিলাম—ফেরাও ওকে।

রাইবল্লভ ফিরিল ; কহিল—আবার আমাকে তলব কেন হুজুর ?

কহিলাম—দরকার আছে বৈ কি। লাখরাজ বেণে-পুকুর, তুমি যা নিজস্ব বলে ভোগ করছ, সেটা আমার বাবা তোমার বাপকে তার জীবন-ভোর ভোগ-দখল করতে দিয়ে গিয়েছিলেন,—কেমন ?

রাইবল্লভ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; কোন উত্ত দিল না।

অসহিষ্ণু হইয়া কহিলাম—চুপ ক'রে থাকলে চলে না ; উত্তর দাও।

এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়া' সে উত্তর দিল—আছে আমি তার কিছু জানি না। আমি তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ।

লোকটার শঠতা দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম গমস্তা আমার হইয়া প্রশ্ন করিল—বলি শুনেছ ত হে বাপু, না শোনও নাই ?

রাই কহিল—শোনা কথার দাম কি বলুন ? কো লেখাপড়াও নাই, প্রমাণ প্রয়োগও নাই।

বুঝিলাম কথাটা সত্য। অন্তরের ক্রোধ আমা আর শাসন মানিতেছিল না।

বহু কষ্টে আত্মদমন করিয়া বলিলাম—ও পুকুর আ থেকে আমি দখল করলাম। ওর পাড় দিয়ে তুমি আ যাবে না। বুঝেছ ?

অবিচলিত ভাবে সে উত্তর দিল—আজ্ঞে আইে যদি পান, তা' আপনি ছাড়বেন কেন ?

সে আর অপেক্ষা করিল না, দ্রুত চলিয় গেল।

দারুণ ক্রোধে আমি হুকুম করিলাম—পাকড়ে উসকো। চাপরাশীরাও উঠিয়াছিল। কিন্তু গমস্তা ইঙ্গিে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া আমাকে কহিল—ধর-পাকড়ে হাঙ্গামায় কাজ কি হুজুর ? ও লোকটা ভাল নয় যাক না—ও যাবে কোথা। কালই আমরা পুকুর দখ করছি। আর একবার বাকী-খাজনার নালিশ করলে ওর গণেশ ওল্টাবে।

মাথাটা যেন দপ্ দপ্ করিতেছিল। কিছুই ভা লাগিতেছিল না। লোকটার ঔদ্ধত্যের আশু একা প্রতিকার করিতে না পারিয়া অন্তরে ক্ষুব্ধতার সীমা ছি না। অনেক ভাবিয়া উঠিয়া কহিলাম—চল ত পুকুর দেখতে যাব।

তখন অপরাহ্ন বেলা। পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইলাম গমস্তা আমের বাগান দেখাইতেছিল, পুকুরটায় কেম মাছ বাড়ে সমস্ত খুলিয়া বলিতেছিল। সে সমস্ত কি

আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল না। আমি চাহিতেছিলাম রাইবল্লভের দাম্ভিকতার শাস্তি দিতে, তাহার মাথাটা আমার পায়ের তলায় লুটাইতে।

দৃষ্টি পড়িল ওপাড়ের ঘাটের দিকে। দেখিলাম ঘাটে কয়টী স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আমাদের অপেক্ষায় জলে নামিতে পারিতেছে না। গমস্তাকে কহিলাম—এস,—চলে এস।

—ও-পাড়টা দেখবেন না? ওদিকে সব কলমের গাছ। বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তোমার কি আক্কেল বুদ্ধি একেবারে নেই হে? দেখছ না ঘাটে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেছে।

মন তখনও বেশ পরিষ্কার হয় নাই। দ্বিপ্রহরের অপ্রীতিকর ঘটনাটা মনের ভিতর অহরহ পীড়া দিতেছিল। কাছারীর অন্ধকার প্রাঙ্গণে একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া সিগারেট টানিতেছিলাম। গমস্তা চাপরাশীদের লইয়া পুকুর দখলের ব্যবস্থা করিতেছিল। সন্ধ্যায় একজন পাইক প্রজাদের তলব দিতে গিয়াছে।

সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—আজকে আর কেউ তারা আসবেন না আজ্ঞে। কি সব তাদের মজ্‌লিস বসেছেন।

গমস্তা খুব গম্ভীর ভাবে কহিল—হুঁ।

সে যেন একটা কিছু অনুমান করিতেছিল। লোকটার এই অহেতুকী গাম্ভীর্য্যের বহর দেখিয়া পীড়িত চিত্তেও অন্ধকারের মধ্যে ঈষৎ হাসিলাম।

গমস্তা চাপরাশীদের হুকুম দিল—তোমরা চার জন যাও দেখি,—

বাধা দিয়া বলিলাম—থাক না আজ রাত্রে।

গমস্তা কহিল—আজ্ঞে না, আপনি বোঝেন না; একবার মাথা বেগড়ালে মহা মুস্কিল। যাও-হে, তোমরা যাও।...কে?—কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

সম্মুখের অন্ধকার হইতে উত্তর আসিল—আজ্ঞে আমরাই। জন-ছয় প্রজা আসিয়া কাছারীর বারান্দায় বসিল। রাইবল্লভও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মন আমার খুসী হইয়া উঠিল। বুঝিলাম লোকটা নিজের ব্যবহারের অপরাধ বুঝিতে পারিয়াই এতগুলি মাতব্বর সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে। মনের প্রসন্নতাটুকু কিন্তু নির্লিপ্ততার আবরণে গোপন রাখিলাম।

গমস্তা কহিল—কি হে সব ব্যাপার কি বল দেখি? ঘোঁট কিসের পাকাচ্ছ শুনি?

কেহ উত্তর দিল না, উত্তর দিল রাইবল্লভ—চাষা হলেও ত আমাদের একটা মান-ইজ্জত আছে গমস্তা মশায়। না—গরীব ব'লে আমাদের তাও নাই?

ইজি-চেয়ারটার উপর খাড়া হইয়া বসিলাম; গমস্তাও চুপ করিয়া রহিল। অগ্রপশ্চাৎহীন এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহার অভ্যাস নয়।

রাইবল্লভ বলিয়া গেল—আমাদের যা করছেন তাই করছেন,—কানে ধ'রে উঠাচ্ছেন, বসাচ্ছেন—বেশ করছেন। কিন্তু আমাদের মেয়েছেলেদের ত মান-ইজ্জত আছে—সেটা ত রেখে চলতে হবে।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমার লোকজনের মধ্যে এমন কে লোক আছে যে স্ত্রীলোকের অপমান করিতে পারে? গমস্তাও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে একটু খিঁচাইয়া কহিল—সে রেখে চলতে হবে না তা বলছে কে শুনি? কে কি করলে তোমাদের?

—আজ্ঞে করবে আর কে কি? এই হুজুরই আমাদের মাঠে বাগানে দিনে দুপুরে শীকার ক'রে ফেরেন, বেলা অবেলায় ঘাটে পথে বেড়ান,—আমাদের মেয়েদের তাতে—

ক্রোধে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আপনাকে আর আমি স্থির রাখিতে পারিলাম না। একটা চীৎকার করিয়া কহিলাম—

—বাঁধ্ বেটাদিগে।

চাপরাশীরা ইতস্ততঃ করিতেছিল। ঘর হইতে বন্দুকটা বাহির করিয়া চাপরাশীদের বলিলাম—আগে তোদের গুলি ক'রে মারব আমি।

চাপরাশীদের কাহাকেও বাঁধিতে হইল না। প্রজারা বসিয়াই রহিল। রাইবল্লভ শুধু ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু আমার ক্রুদ্ধ চিত্ত বারম্বার তাহাকেই সম্মুখে চাহিতেছিল। আমার অনুমান মিথ্যা নয়, বাকী প্রজারা স্বীকার করিল এটা সকলের দৃষ্টিতে এমন কুৎসিত ভাবে টানিয়া আনিয়াছে

রাইবল্লভই। ইহার জন্য গ্রামে ধর্ম্মঘট পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম লোকটার ক্রূরতায়। সাপেও বোধ হয় এতখানি ক্রূর হয় না। যে অপমানের কলঙ্কের কালি আমার মুখে ও মাথাইয়া দিয়া গেল তার চেয়ে জঘন্য কিছু জীবনে আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

চাপরাশীদের হুকুম দিলাম—রাইবল্লভকে আমার কাছে এনে হাজির কর। যেমন ক'রে হোক।

আর ওই ভেড়ার মত অপদার্থ লোক কয়টাকে বলিলাম—যাও তোমরা, ধর্ম্মঘটই করগে যাও। এর পর যে কাছারীর দিকে আসবে তাকে আমি জুতো-পেটা করব।

রাত্রে কাছারী-ঘরে আগুন লাগিল।

সদ্য ঘুমটী আসিয়াছিল—চাপরাশীর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। আগুন তখন নাচিতেছে। লোকবল আমার কম ছিল না। নিজেও উঠিয়া পড়িলাম চালের উপর। ঘরের আগুনের আলোয় দেখিলাম প্রজারাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি হাঁকিয়া বলিলাম —পুড়ুক আমার কাছারী, যে প্রজা আগুনে হাত দিতে আসবে তাকে খুন করব আমি।

তাহারা সরিয়া গেল।

ক্ষতি বিশেষ কিছু হইল না। বারান্দার চালটা খানিকটা পুড়িয়া গেল। কিন্তু আমি আঘাত পাইলাম। পায়ের খানিকটা পুড়িয়া গেল। উত্তেজনায় তাহা গ্রাহ্য করিলাম না।

বুঝিলাম এ কাহার কাজ। গমস্তাকে বলিলাম, তাকে আমার চাইই। বুঝেছ?

গমস্তার তাহাতে আপত্তি ছিল না। সকাল বেলাতেই আশ পাশ হইতে আরও জন সাতেক চাপরাশী বাহাল করা হইল। তাহারা সব পারে। হুকুম দিবার লোক থাকিলে মানুষের মাথা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া আনিতে পারে তাহারা।

এদিকে ধর্ম্মঘটই বোধ হয় হইয়া গেল। প্রজারা কাছারী দিয়া কেহ হাঁটে না। আমিও তলব দিলাম না। নালিশের ফর্দ্দ তৈয়ার হইতে লাগিল।

গমস্তা বরং একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—এদিকে সরকারের খাজনা চাই ত! একটু ভেবে দেখুন।

তাহাতেও বিচলিত হইলাম না। চিত্তের যে অবসাদটা আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়াছে। অদ্ভুত ধীরতার সহিত একটী পেষণ-যন্ত্র রচনা করিয়া সেটাকে সুকৌশলে পরিচালিত করিতে লাগিলাম। পূর্ব্ব-পুরুষের রসের, সুপ্ত ধারা শিরায় শিরায় শতমুখী হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল।

চাষীর সম্পদ দুটী—গরু ও ফসল। সর্ব্বাগ্রে সেই দুটীতে হাত দেওয়া হইল। জমিদারের পতিত ভূমিতে গোচারণ নিষিদ্ধ হইল। খাস পুষ্করিণী হইতে ক্ষেত্রে জল সেচনের অধিকার কাড়িয়া লইলাম। মৌখিক বা প্রত্যক্ষভাবে কাহাকেও পীড়ন করা হইল না। সাক্ষাতে চাহিতেছিলাম শুধু একটী লোককে—রাইবল্লভকে। দিবারাত্রি চাপরাশীর দল ঘুরিয়া-ফিরিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। শুনিলাম লোকটা গ্রাম হইতে পলাইয়াছে। গুজব নানারূপ রটিতেছিল। কোন দিন শুনি সে পুলিশ কেস করিতে গিয়াছে। কখনও শুনিলাম খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরবারের চেষ্টায় সে ফিরিতেছে। রাইবল্লভের বেনেপুকুর হইতেই মাছ ধরাইয়া একটা সের দশেক রুই মাছ থানার দারোগার কাছে পাঠান হইল। প্রত্যুত্তরে পত্র পাইলাম, বড় খুশী হইয়াছেন তিনি।

দিন দুই পর বোধ হয়। সকালে গমস্তার এক গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল রাইবল্লভ এ গ্রামেই আর বাস করিবে না। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে সে। প্রজা সে কাহারও থাকিবে না।

মনের মধ্যে পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করিলাম। গমস্তাকে বলিলাম—যেমন ক'রে পার এ বিক্রী বন্ধ কর। খোঁজ ক'রে দেখ খরিদ্দার কে? তাকে শাসিয়ে দাও।

ভাবিলাম ছোট ভাইকে লিখিয়া দিই সাব্‌রেজিষ্টারী আপিসে নজর রাখিতে। কিন্তু সাত পাঁচ ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। পায়ের আঘাত বা এ সমস্ত গোলমালের সংবাদ বাড়ীতে দিই নাই। লোক গেলে স্ত্রীর জেরায় মুখে এ সংবাদ গোপন থাকিবে না। আমার জীবন

অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কাণ্ডজ্ঞানহীন তিনি হয় ত এখানে আসিয়াই হাজির হইবেন।

গমস্তা কহিল—এক কাজ করি। ওর ছেলেটাকে ধরে এনে খবর সব আদায় করি।

মাথায় খুন চাপিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম। পাঁচজন চাপরাশী বাঘের মত ছুটিল। শীকার না লইয়া ফেরা তাহাদের স্বভাব নয়। কিন্তু ফিরিল তাহারা রিক্ত হস্তে। সংবাদ পাইলাম বাড়ীতে কেউ নাই। রাইবল্লভের স্ত্রী-পুত্রও দিন দুই আগে গ্রাম ছাড়িয়াছে।

অন্তরের মধ্যে নিষ্ফল ক্রোধের তাড়নায় গ্লানির আর সীমা রহিল না।

সেদিন প্রাতঃকালেই ছোটভাই ঘোড়ায় চড়িয়া অকস্মাৎ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তুই যে হঠাৎ? সব খবর ভাল ত?

—ভালই সব, তবে বৌদিদির অসুখ করেছে, তুমি বাড়ী যাও। আমি এখানে থাকব।

আমার হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল। প্রথমেই মনে হইল এতগুলি প্রজার দীর্ঘশ্বাস, মুক গোমাতার উদরের জ্বালার প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া গেছে। প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া গেল বুঝি। ছোট ভাই আমার অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছিল। সে কহিল—ভয় নাই কিছু, অসুখ সামান্যই। তবে জান ত তাকে, একটু কিছু হলেই তোমাকে তার শিয়রে চাই।

কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। তাহাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া কহিলাম—যেমন করে হোক ভাই এ বিবাদ মিটিয়ে ফেল্।

ভরসা দিয়া ভাই কহিল—কোন চিন্তা ক'র না তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাল্কীতে বন্দুক টোটা তুলিয়া দিয়া কহিল—এটা নিয়ে যাও।

কহিলাম—না থাক। বিবাদের সময় অস্ত্র একটা থাকা ভাল।

—ভাল ত বটে। বৌদিদির হুকুম নাই যে। পাখী মারব বলে আমাকে বন্দুক দিয়ে তার বিশ্বাসই হয় না যে।

—না—না রেখে দে। মেয়ে মানুষের কথা সব মানতে গেলে চলবে কেন?

—না দাদা, ও তুমি নিয়ে যাও। শেষে আমার সঙ্গে কথাই কবে না। আর প্রজাদের সঙ্গে যখন মিটেই যাবে, তখন ভাবনা কি?

ভাবিবার শক্তিও তখন ছিল না। বারবার শুধু এতগুলি প্রপীড়িত লোকের কাছে মনে মনে মার্জ্জনা ভিক্ষাই করিতেছিলাম।

আমার যাত্রার সংবাদে প্রজারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাত্রার সময় গোকুল প্রণাম করিয়া কহিল—আমাদেরই দোষ হুজুর। আমরা বুঝতে পারিনি। সন্তানদের অপরাধ নেবেন না।

নিজের অপরাধের বোঝা যেন বাড়িয়া গেল। ভাবিতেছিলাম—বিচিত্র ইহাদের অপরাধ-বোধের ধারা। আমার অকল্যাণের দিনে তাহাদের অভিসম্পাতের জন্য তাহারা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে!

* * *

বাড়ীতে নামিয়া বরাবর চলিয়া গেলাম শয়ন-কক্ষে। সে ঘরে স্ত্রীকে না দেখিয়া বাহির হইতে যাইতেছি, সরবতের গ্লাস হাতে স্ত্রী আসিয়া হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৈহিক অবস্থা দেখিয়া মনটা বাঁকিয়া উঠিল। অসুখের কোন লক্ষণ তাঁহার নাই, সুস্নাত-চুলের গোছা এখনও পিঠে এলানো রহিয়াছে। বুঝিলাম একটা চাতুরী খেলা হইয়াছে। প্রজাদের সহিত দ্বন্দ্বের সংবাদে আমাকে নিরাপদ করিবার জন্যেই দেবরকে বিপদের মুখে ঠেলিয়াছেন আধুনিক সীতা ভ্রাতৃজায়া।

গম্ভীরভাবে কহিলাম—তোমার নাকি অসুখ করেছে?

নির্লজ্জভাবে হাসিয়া তিনি কহিলেন—হ্যাঁ।

—অসুখের কোন চিহ্নই ত দেখছি না। এর মানে কি?

—সরবৎটা খাও দেখি। পায়ের ঘাটা ধোও—পোড়া-ঘায়ের মলম করে রেখেছি—

গ্লাসটা ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম—আগে শুনি এর মানে কি?

—সে ঝগড়া-বিবাদের মুখে তোমার থেকে কাজ কি বাপু? যে জেদী—

আর শুনিলাম না, কহিলাম—তোমার মত নীচ স্বার্থপর—

স্ত্রী কথাটা কাড়িয়া লইয়া উদ্ধত ভাবে কহিলেন—আর দেখ নি, না?

—না সত্যিই দেখি নি।

তাঁহার ঠোঁট ছটী কাঁপিতেছিল,—বুঝিলাম, স্বার্থপরা কাঁদিয়া জিতিতে চায়।

পথ অশ্রু-পিছল হইবার পূর্ব্বেই আমি দৃঢ় পদক্ষেপে সদর কাছারীতে আসিয়া উঠিলাম। স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম ওই পাল্কীতেই আবার রওনা হইব।

নায়েব কাজ করিতেছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম—জিনিষপত্র নামাতে মানা ক'রে দিন। আমি এখুনি উঠব।

তিনি কহিলেন—ছোট বাবুই সব ঠিক ক'রে আসবেন। আর আপনি গিয়ে কি করবেন?

দূরে মাণিক একটী ছেলের সহিত খেলা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া ছেলেটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দশ বারো বছরের একান্ত সরল পল্লীগ্রামের ছেলে একটী।

নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ছেলেটী কে?

—আজ্ঞে রাইবল্লভের ছেলে।

—এখানে?

—এখান থেকেই ছেলেটী ইস্কুলে পড়বে। রাণীমার দয়া হ'ল, প্রজার ছেলে আমাদের। ছেলেটী ভাল, মাইনরে বিত্তি পেয়েছে এবার।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা চোখের সম্মুখে ঢুলিতেছিল। ক্রোধে বোধ হয় সর্ব্বশরীর আমার কাঁপিতেছিল। রূঢ়স্বরে বলিলাম—দয়াময়ীর দেখি দয়ার অন্ত নাই। সে কি করেছে জানেন?—

মাণিক ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তাহার খেলার বোধ হয় দেরী হইতেছিল। নায়েব কহিলেন—শুনেছি সব। আমি—

বাধা দিয়া বলিলাম—তবে? আমার নাক কেটে ঝামা ঘষবার কি খুব দরকার হয়েছিল?

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নায়েব কহিল—

আজ্ঞে আমরা ত কিছু জানতাম না। রাই-মোড়লও ত আসে নি। সে ত' পালিয়ে পালিয়ে ফিরছিল—জমি বিক্রী করবার জন্যে। ওর স্ত্রী ভয়ে ছেলেটাকে নিয়ে রাণীমার পায়ে কেঁদে এসে পড়ে। সেই ত এসে সব সংবাদ দেয় এখানে। আমরা ত কিছুই জানতাম না।

প্রশ্ন করিলাম—কি বল্লে?

সর্পের সর্পী যে কিরূপ তাহা জানিতে কৌতূহল হইল।

—সে অবিশ্যি সব সত্যি কথা বলেছিল, মায় ঘরে আগুন লাগান পর্য্যন্ত। শেষে কেঁদে বল্লে—মা, তার পাপে কি আমার শিশু মারা যাবে? রাণীমারও দয়া হয়ে গেল। আমি অবিশ্যি বলেছিলাম—বৌমা, এটা কি ঠিক হচ্ছে? তিনি হেসে বল্লেন—নায়েববাবু, শুধু কি রাই-মোড়লই আপনাদের প্রজা? এই মেয়েটী কি ছেলেটী নয়? একের পাপে অপরের দণ্ড হবে কেন?

প্রতিবাদ করিবার কিছু পাইলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম।

নীরবতায় ভরসা পাইয়া নায়েব বলিলেন—

তার পর বল্লেন—এই আপনাদের বাবু সেদিন বলছিলেন মাণিককে বিলেত পাঠাবেন। কিন্তু যদি না পাঠাতে পারেন তবে কি দুঃখের সীমা থাকবে তাঁর? তেমনি দুঃখ ত এদেরও। ছেলেটী থাক—এখানে থেকে পড়বে ও। ওই বালকের আশীর্ব্বাদেই মাণিকের আমার সে আশা পূর্ণ হবে।

মনের মধ্যে ক্ষুব্ধতা তখনও পাক দিয়া ফিরিতেছিল। কহিলাম—সে বেশ করেছেন। কিন্তু এর পর রাই-বল্লভ পুলিশ এনে ছেলে-চুরীর চার্জ্জ যদি না দেয় তখন বলবেন আমাকে।

—আজ্ঞে এসেছিল সে বোম্বেটে। ঠিক তার পরদিনই অগ্নিশর্ম্মা হয়ে এসে হাজির। বলে—আমার ছেলে-পরিবার দাও। রাণীমা ত' বাড়ী ঢুকতে দেন নি। ওর পরিবার গিয়ে বাইরে দেখা করে সব ব'লে বললে—এর পর আমি গলায় দড়ি দেব। তখন হতভাগার সে কি ভেউ ভেউ ক'রে কান্না! রাণীমা যখন পূজোয়

বেরিয়েছেন, তখন পায়ে এসে আছড়ে পড়লো। রাণীমা রেগে আগুন। বল্লেন—তুমি মনে কর না তোমার ভয়ে তোমার ছেলেকে আমি ভাত ঘুঁস দিয়েছি। তোমাকে আমি মাপ করতে পারি না।

তার পর অনেক কাঁদা-কাটা করলে। না খেয়ে একদিন পড়ে ছিল। তখন রাণীমা বল্লেন—এবার বাবুর হয়ে আমি তোমায় মাপ করছি। কিন্তু আর যেন এমন না হয়।

নিজের কান দশ বার মলে, নাকে খত দিয়ে বল্লে—এই শেষ মা, এই শেষ। কিন্তু বাবু যে রেগে আগুন হয়ে আছেন, আমাকে পেলে আর আস্ত রাখবেন না। গাঁয়েও ত ধর্ম্মঘট হয় নি মা, বাবুর ভয়ে প্রজারা কেউ সামনে যেতে পারছে না।

তখন রাণীমা ছোটবাবুকে বল্লেন—ঠাকুরপো, তুমি যাও ভাই—গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দাওগে। তাঁকে বলো আমার অসুখ। নইলে যে জেদী মানুষ তিনি আসবেন না। ছোটবাবুও—

আর শুনিতে ধৈর্য্য আমার থাকিতেছিল না। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল তাঁহার সজল চোখ দুটী। তাড়াতাড়ি আমি উঠিয়া চলিলাম বাড়ীর দিকে।

পালবংশের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

পালরাজগণ খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গৌড়দেশ শাসন করেন। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ের প্রজাবৃন্দ অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যপটের পুত্র গোপালদেবকে তাহাদের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করে। উক্ত লিপি হইতে আরও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গোপালদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ধর্ম্মপালদেব গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপালের বাকপাল নামে এক সহোদর ও ত্রিভুবন পাল ও দেবপাল নামে দুইটী পুত্র ছিল। ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে ত্রিভুবন পালকে যুবরাজ বলা হইয়াছে। ধর্ম্মপালদেবের দেহাবসানের পর দেবপাল গৌড়ের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। দেবপালের পুত্রের নাম রাজ্যপাল। দেবপালের দেহ-ত্যাগের পর বাক্‌পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল (প্রথম শূরপাল) গৌড়ের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন [১]। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, ত্রিভুবন পাল ও রাজ্যপাল উভয়েই স্ব স্ব পিতার জীবদ্দশায় ইহলোক ত্যাগ করেন এবং সেই হেতুই তাঁহারা গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। এই মত অবশ্য নিছক অনুমান ভিন্ন অন্য কোন ভাবেই গ্রহণ করা যায় না। প্রাচীন কালে রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই যে সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গুপ্তবংশের তালিকার আলোচনা করিলে ইহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। পালরাজগণের সমগ্র তাম্র ও শিলালেখ মধ্যে মাত্র একখানিতে তারিখের উল্লেখ আছে। উহা মহীপালের রাজ্যকালে সং ১০৮৩, খ্রীঃ ১০২৬ সালে সারানাথে সম্পাদিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৫—৮১৪ খ্রীঃ) ও প্রতীহার নাগভট্টের (৭৮৩—৮৩৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। এমত অবস্থায় ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল খ্রীঃ নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে ছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে গণ্য হইতে পারে। দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী নরপাল ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট রাজভূষণ শ্রীপরবল নামক নরপালের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই পরবল প্রাচীন দশার্ণ (বর্ত্তমান ভূপাল রাজ্য) রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পরবলের ৯১৭ সংবতে সম্পাদিত (খ্রীঃ ৮৬০) একটি স্তম্ভলিপি ভূপাল এজেন্সির পাথরী নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে [২]। ইহাতে পরবলকে রাষ্ট্রকূট বংশসম্ভূত বলা

১। গৌড়লেখমালা।

হইয়াছে। পরবলের কোন বংশধরের নাম এখনও জানিতে পারা যায় নাই। একখানা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য হইতে হারবর্ষ যুবরাজ নামধারী পালবংশসম্ভূত আর এক নৃপতির নাম জ্ঞাত হওয়া যায়। সোড্ঢল বিরচিত "উদয় সুন্দরী কথা" সাহিত্যে এই নৃপতিকে শুধু যুবরাজ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে[৩]। উক্ত নৃপতির প্রকৃত নাম যুবরাজ বলিয়াই মনে হয়। ত্রিপুরীর কলচুরি বংশে যুবরাজ নামধারী দুই জন নৃপতি ছিলেন। সুতরাং যুবরাজ ব্যক্তিবিশেষের নাম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যুবরাজের বিরুদ বা উপাধি হারবর্ষ ছিল ইহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অভিনন্দ নামে এক প্রসিদ্ধ কবি যুবরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মধ্যযুগে অভিনন্দ নামধারী দুইজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। যুবরাজের সভাপণ্ডিত অভিনন্দের পিতার নাম শাতানন্দ, অপর অভিনন্দের পিতা জয়ন্ত ভট্ট ছিলেন। জয়ন্ত ভট্টের পূর্ব্বপুরুষ গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে কাশ্মীরে যাইয়া বসবাস করেন। কবি বা পণ্ডিতগণ আদি নিবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিলেও তাহারা আদি নিবাস অনুসারে পরিচিত হইত। মালবের পরমাদের সভাপণ্ডিত মদন নিজেকে গৌড়াম্বয় সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে কবি গৌড়াভিনন্দের চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই গৌড়াভিনন্দ জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনন্দ বলিয়াই মনে হয়। উভয় অভিনন্দের মধ্যে পার্থক্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় গৌড় শব্দটি সংযোগ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের বহু সংখ্যক কাব্যে কবি অভিনন্দের নামোল্লেখ ও শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক স্থলেই উভয় কবির কাহাকে যে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

যুবরাজ সম্বন্ধে তাঁহার সভাকবি অভিনন্দ-বিরচিত রামচরিত হইতে অনেক সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়[৪]। উক্ত পুস্তকে যুবরাজকে পালকুলপ্রদীপ, পালকুলচন্দ্রমা এবং পালবংশপ্রদীপ বলা হইয়াছে[৫]। এই বংশ যে গোপালদেব স্থাপিত বাঙ্গলার পালবংশ তাহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। কেন না অন্যত্র যুবরাজকে "ধর্ম্মপাল কুল কৈরব কাননেন্দু" বলা হইয়াছে[৬]। এই ধর্ম্মপাল যে গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যুবরাজের উপরিউক্ত বংশ-বর্ণনা হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে তিনি ধর্ম্মপাল হইতে কয়েক পুরুষ ব্যবধান ছিলেন। রামচরিতে যুবরাজের পিতার নাম বিক্রমশীল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে[৭]। বিক্রমশীল ও ধর্ম্মপাল এবং যুবরাজ ও দেবপাল অভিন্ন এইরূপ অনুমান করার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং যুবরাজকে "ধর্ম্মপাল কুল কৈরব কাননেন্দু" বলায় ও তাহার পিতার নাম বিক্রমশীল বলিয়া উল্লেখ করায় ধর্ম্মপাল ও বিক্রমশীল যে পৃথক ব্যক্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। রামচরিতে যুবরাজকে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "উদয় সুন্দরী কথা" সাহিত্যেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়।

যুবরাজের আবির্ভাবের কাল মোটামুটী নির্ণয় করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সোড্ঢলের উদয় সুন্দরী কথাতে যুবরাজের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সোড্ঢল কোঙ্কনাধীশ চিত্তরাজ (খ্রীঃ ১০২৬), নাগার্জ্জুন ও মুম্মুনি দেবের (খ্রীঃ ১০৬০) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লাটদেশের অধিপতি চৌলুক্য বৎসরাজের সভায় কিছু দিন অবস্থান

২। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ভলিয়ুম ৯।

৩। স্পষ্টং তদত্র যুবরাজ নরেশ্বরেণ
যদ্দ্ভুরং কি মপি যেন গিরঃ শ্রিয়শ্চ।
প্রত্যায়নং স্ফুটমকারি নিজে কবীন্দ্র
মেকাসনে সমুপবেশয়তাহ ভিনন্দম্॥

৪। রামচরিত গাইকার অরিয়েণ্টল সিরিজ নং ৪৬

৫ সেনাস্ত রামচরিত চরিতাদ্ভুতেন যেনাধরীকৃতমতবি মহীতল্যে স্মিন্। তেনৈব পালকুলচন্দ্রমসা তদিত্থমুত্থাপিতং জগতি পণ্ডিত চিত্তমেতৎ॥ দীপঃ সতাং স খলু পালকুল প্রদীপঃ শ্রীহারাবর্ষ ইতি যেন কবি প্রিয়েন। সত্তঃ প্রসাদ ভরদত্তমহাপ্রতিষ্ঠে নিষ্ঠাপিতঃ পিশুন বাক্য প্রসরো ভিনন্দে॥ স্থূলৈদ বিপুলগাত্রঃ শক্র কোটম্বকারী সতত মুপচিতায়ং সন্নিবিষ্টো দশায়াম। জগদমলমুদ স্তাশেষ দোষান্ধকারং জনয়তি যুবরাজঃ পালবংশ প্রদীপঃ॥

৬। ধর্ম্মপাল কুলকৈরব কাননেন্দু রাজা বিলাসাকৃতি
পঙ্কজিনী বিবস্বান।
সর্ব্বাভিরামগুণ পত্ররথ ত্রজৈক নিরুদ্রমো বিজয়তি
যুবরাজ দেবা॥

৭। কিমিন্দুনা চন্দনপরিণা বা কিমন্তকন্দৈরভিনন্দ বৎসলঃ।
বিচিন্ত্যতামান্তর তাপশান্তয়েম কেবলং বিক্রমশীল নন্দনঃ॥

নব শ্রাবণ মাস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

করিয়াছিলেন, ইহাও উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বৎসরাজের পুত্র ত্রিলোচন পালের খ্রীঃ ১০৫০ অব্দে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল বিষয় হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সোড্‌ঢলের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পরে (খ্রীঃ ৮১৪) যুবরাজের রাজত্বকাল নির্ণয় করিতে হইবে।

যুবরাজ কোন্ দেশের অধিপতি ছিলেন ইহা স্থির করা একটা মহা সমস্যার বিষয়। বাঙ্গলার পাল সম্রাটদের বংশ-তালিকায় হারবর্ষ বা যুবরাজ নামে কোন নরপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত পাল বংশের সকল রাজারই নামের শেষে পাল শব্দটি সংযুক্ত আছে। অবশ্য এই প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে যুবরাজ বাঙ্গলার পালদের সিংহাসনে কখনই আরোহণ করেন নাই। মালবের পরমার বংশের কোন শিলা বা তাম্র-লেখেই নৃপতি জগদ্দেবের উল্লেখ নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজাম রাজ্যের জয়নাদ গ্রামে প্রাপ্ত শিলা-লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ভোজের ভ্রাতুষ্পুত্র জগদ্দেব মালবের সিংহাসনে কিছুদিন আরূঢ় ছিলেন। মগধের গুপ্ত রাজাদের মধ্যে মাধব গুপ্তের পুত্র আদিত্য সেনের নামের শেষে গুপ্ত সংযুক্ত নাই। অথচ বাকী সকলেরই নামের শেষে তাহা যুক্ত আছে। সুতরাং উপরিউক্ত কারণদ্বয়ের জন্য যুবরাজকে পালবংশসম্ভূত বাঙ্গলার রাজা বলিয়া অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কিন্তু যেহেতু যুবরাজের পিতার নাম বিক্রমশীল বলিয়া প্রকাশ এই অবস্থায় তাঁহাকে পালবংশের অন্তর্গত বাঙ্গলার নৃপতি বলিয়া অনুমান করা আর চলে না।

বিক্রমশীল ও যুবরাজ পালবংশের অন্য একটি শাখা-ভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যুবরাজ ধর্ম্মপালের কুলসম্ভূত। ধর্ম্মপালের পুত্র ত্রিভুবন পালের ও দেবপালের বংশধরগণই শুধু ধর্ম্মপালের কুলসম্ভূত বলিয়া দাবী করিতে পারেন। দেবপালের পরবর্ত্তী বাঙ্গলার পালবংশের সমগ্র নৃপতিবৃন্দই ধর্ম্ম-পালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের বংশধর। যুবরাজের হারবর্ষ উপাধি হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি কোন রাষ্ট্রকূট সিংহাসনের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। "বর্ষ" সংযুক্ত উপাধি সাধারণতঃ রাষ্ট্রকূট বংশের নৃপতিগণই ধারণ করিতেন। এই অনুমান সত্য হইলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে যুবরাজ পশ্চিম বা মধ্য-ভারতের কোন স্থলে এক রাষ্ট্রকূট রাজবংশের উত্তরাধিকারী রূপে রাজত্ব করিয়াছেন। পালবংশের কাহারও রাষ্ট্রকূট রাজ-বংশের সিংহাসনে আরোহণ করিবার দাবী ছিল কি না ইহা বিবেচনার বিষয়। পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল দশার্ণের রাজা রাষ্ট্রকূট পরবলের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। পরবলের বংশধরদের নাম অজ্ঞাত। পরবল অপুত্রক হইয়া থাকিলে তাঁহার দৌহিত্র ত্রিভুবন-পাল ও দেবপাল দশার্ণের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ত্রিভুবনপাল কখনই বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে তাঁহাকে পরবল হয় ত দত্তক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবলের মৃত্যুর পর বোধ হয় ত্রিভুবন পাল দশার্ণের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল কেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিয়াছিলেন এই প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক। বাঙ্গলার পাল রাজাদের মধ্যে ধর্ম্মপালের পর দেব-পালের ন্যায় প্রতাপশালী নৃপতি আর ছিল না। ধর্ম্ম-পাল দেবপালকে তাঁহার সিংহাসনে বসিবার প্রকৃত উপযুক্ত ভাবিয়া ত্রিভুবনপালকে হয় ত দত্তক দিয়া-ছিলেন। বেঙ্গির রাজা চালুক্য রাজরাজের একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্র চোড় শৈশব হইতেই তাঞ্জোরের মাতামহ রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে দত্তক ভাবে বাস করিয়াছেন। তিনি চোল সিংহাসনে বসিবার পর নিজের কুলনাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলুতুঙ্গ চোল বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। উপরিউক্ত আলোচনা যুক্তিসঙ্গত হইলে বিক্রমশীল ও যুবরাজকে ত্রিভুবনপালের বংশধর বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তানুসারে অভিনন্দ দশার্ণের রাজ-দরবারের সভাপণ্ডিত বলিয়া নিরূপিত হয়। যুবরাজ অভিনন্দের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কবিগুরুর সহিত একাসনে বসিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। এক স্থলে যুবরাজকে মহাকবি বলা হইয়াছে। কবিবৃন্দের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহাকে শকারি ও শ্রীহর্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে যুবরাজ সম্বন্ধে উপরিউক্ত অনেক সিদ্ধান্ত অনুমান মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত আরও নূতন তথ্যের আবিষ্কার না হয়, যুবরাজ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গবেষণার বিষয় হইয়াই থাকিবে।[৮]

৮। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুঁথি বিভাগের রক্ষক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। এই জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভারতীয় কুস্তীতে যে সকল প্যাঁচ আছে ও সাধারণতঃ কুস্তিগীরদিগকে যেগুলি ব্যবহার করিতে দেখা যায়

১নং প্যাঁচের ছবি

তাহার কতকগুলি এই মাসিকে ধারাবাহিকরূপে বাহির করিয়াছি। এ সকল ছাড়াও পরস্পরে কুস্তি করিতে

২নং প্যাঁচের ১ম ছবি

করিতে উভয়ের পাঁয়তারা, ধরার অবস্থা ও "মওকা" (opportunity) অনুযায়ী যে সকল প্যাঁচে অপরকে চিৎ করিতে পারা যায় তাহার কতকগুলি এই সংখ্যাতে বাহির করিলাম। প্যাঁচগুলি এক ধার দিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক প্যাঁচটী ডান ধার ও বাঁ ধার দুই ধার দিয়াই করিতে পারা যায়। তবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিতে হইবে।

১ নং

অপরের পিছনে যাইয়া "উথাড়" প্যাঁচের ন্যায় তাহার কোমরটী দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া, নিজের হাতের জোরে তাহার শরীরটী একটু কাৎ করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া নীচে ফেলিবার সময় হাত দুইটী তাহার কোমর হইতে দুই বগলে তুলিয়া দিয়া পিছাইয়া আসিয়া তাহাকে শুয়াইয়া চিৎ করিতে পারা যায়।

২ নং

২নং প্যাঁচের ২য় ছবি

অপরে পিছনে যাইয়া কোমরটী যদি জড়াইয়া ধরে ও তাহার একটী কিম্বা দুইটী পা-ই যদি নিজের পায়ের

নিকটে বা দুই পায়ের মধ্যস্থলে থাকে তবে কোমরের উর্দ্ধাঙ্গ নীচু করিয়া হাত দুইটী নিজের দুই পায়ের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া তাহার পায়ের মোজা জোরে ধরিয়া লইয়া, নিজের দুই পায়ের মধ্য দিয়া তুলিয়া তাহার পায়ের উপর জোরে চাপ দিলে তাহাকে চিৎ করিতে পারা যায়।

সময় তাহার পিঠের উপর দিয়া হাত দুইটী চালাইয়া দিয়া তাহার পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া নিজে বসিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান কিম্বা বাঁ দিকে একটু কাৎ হইয়া তাহার শরীরটী উল্টাইয়া দিয়া চিৎ করিতে পারা যায়। বসিবার সময় নিজের শরীরের টাল ও পায়তারা ঠিক রাখিয়া প্যাচটী করিতে হইবে।
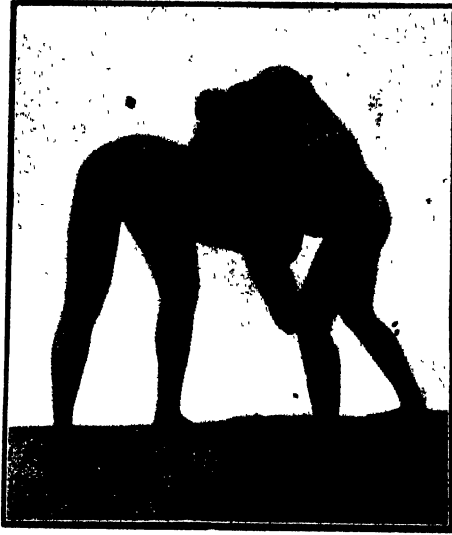
৩নং প্যাচের ছবি

৪নং প্যাচের ১ম ছবি

৩ নং

অপরে যদি সাম্‌নে থাকে, যে কোন প্রকারেই তাহার মাথাটী নিজের বাঁ বগলের নীচে পাইলে বাঁ বাহু দ্বারা তাহার গলাটী জড়াইয়া ধরিয়া ও অপর হাতটী সাম্‌না হইতে তাহার বাঁ বগলের মধ্যে চালাইয়া দিয়া পিঠের উপর তুলিয়া তাহার মোড়াতে চাড় দিতে দিতে তাহাকে বাঁ দিকে ঘুরাইয়া নীচে ফেলিয়া চিৎ করিতে পারা যায়।

৪ নং

দুই জনে সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াইলে অপরে যখন নিজের লেঙ্গটটী সাম্‌না হইতে দুই হাত দিয়া ধরিয়া একটু নীচু হইয়া কোন প্যাচ মারিবার চেষ্টা করে সেই

৫ নং

অপরে যখন "পট" করিবার জন্য দুই হাত দিয়া পা দুইটী ধরে তখন যদি তাহার মাথা নিজের বাঁ দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার মাথাটী চাপিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু নীচু হইয়া ডান হাতটী তাহার সাম্‌না হইতে

৪নং প্যাচের ২য় ছবি

৫নং প্যাঁচের ১ম ছবি

৫নং প্যাঁচের ২য় ছবি

তাহার পাছার নীচে চালাইয়া দিয়া ও নিজের ডান হাঁটুটী তাহার পেটের কাছে রাখিয়া হাতের ও হাঁটুর জোরে তাহার শরীরটী উল্টাইয়া দিয়া চিৎ করিতে পারা যায়।

৬ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া ডান হাঁটু

৬নং প্যাঁচের ১ম ছবি

তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে ডান হাতটী বাহির দিক হইতে তাহার গলার নীচু দিয়া লইয়া গিয়া (অথবা ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া) তাহার বাঁ কনুইটী ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে ধরা লেঙ্গট্‌টী ছাড়িয়া, বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান পায়ের মোজাটী ধরিয়া, তুলিয়া ও বুকের দ্বারা ঠেলিয়া তাহার শরীরটী ঘুরা-ইয়া চিৎ করিতে পারা যায়। চিৎ করিয়া

৬নং প্যাঁচের ২য় ছবি

তাহার বুকের উপর নিজের বুকটী চাপিয়া (শেয়ার হইয়া) থাকিবে।

৭নং প্যাচের ১ম ছবি

৭ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে ডান হাতটী তাহার ঘাড়ের উপর রাখিয়া ও বাঁ হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া তাহার ডান কাঁধের উপর দিয়া লইয়া গিয়া নিজের ডান কব্জীটী ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাঁটুটী তাহার মাথার সামনে রাখিয়া ও বাঁ হাঁটুটী তুলিয়া, তাহার ঘাড়ে ও মোড়াতে চাড় দিতে দিতে একটু সামনে ঝুঁকিয়া যাইলে তাহাকে চিৎ করিতে পারা যাইবে।
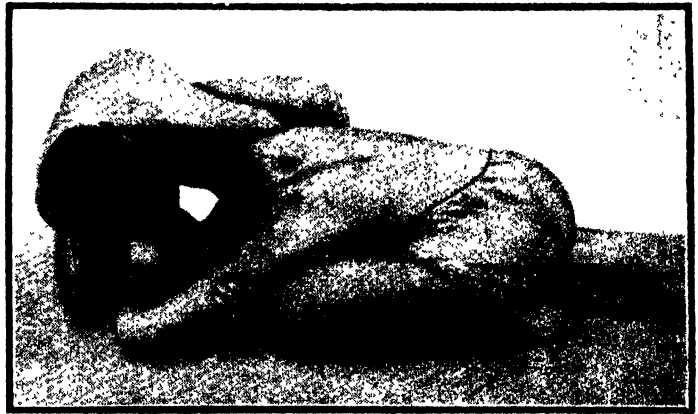
৭নং প্যাচের ২য় ছবি

৮ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ঘাড়ের উপর রাখিয়া তাহার ঘাড়ে

৮নং প্যাচের ১ম ছবি

ও মোড়াতে চাড় দিতে দিতে বাঁ হাতে ধরা লেঙ্গটটী ছাড়িয়া বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান পায়ের মোজাটী ধরিয়া, তুলিয়া ও বুকের দ্বারা ঠেলিয়া তাহার শরীরটী ঘুরাইয়া চিৎ করিতে পারা যায়। চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর নিজের বুকটী চাপিয়া (শোয়ার হইয়া) থাকিবে।
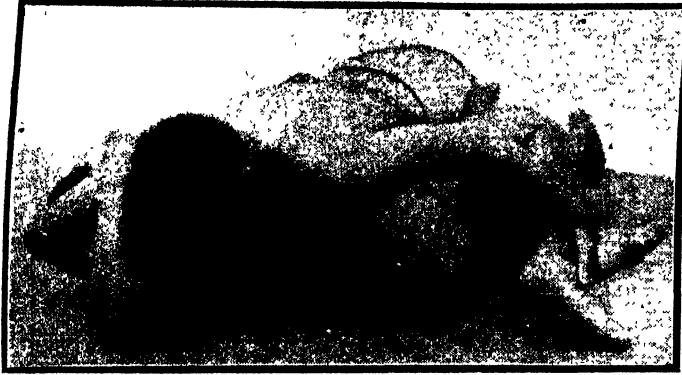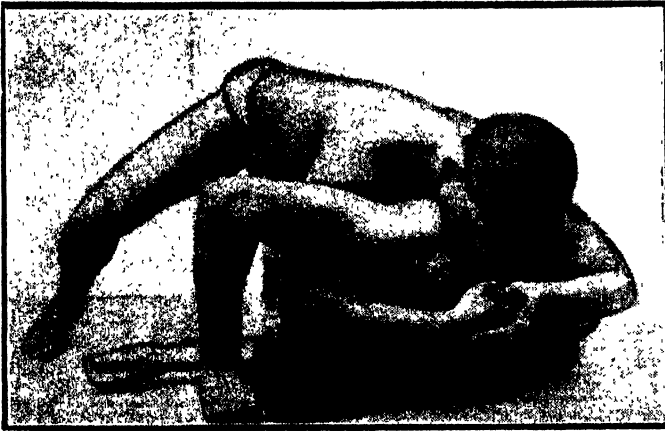
৮নং প্যাঁচের ২য় ছবি

৯ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু মাটীতে রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া তাহার কাঁধের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া ঘাড়ের উপর রাখিয়া তাহার ঘাড়ে ও মোড়াতে চাড় দিতে দিতে বাঁ হাতে ধরা লেঙ্গটটী ছাড়িয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান কব্জীটী ধরিয়া বুকের দ্বারা ঠেলিয়া তাহার শরীরটী ঘুরাইয়া চিৎ করিতে পারা যায়। চিৎ করিয়া তাহার বুকের উপর নিজের বুকটী চাপিয়া (শোয়ার হইয়া) থাকিবে।

৯নং প্যাঁচের ছবি

১০নং প্যাঁচের ১ম ছবি

১০ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গটটী চাপিয়া ধরিয়া ডান হাঁটু তুলিয়া ধরিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিয়া পরে ডান হাতটী তাহার ডান বগলের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া বাঁ মুঠো বা কব্জীটী ধরিয়া নিজের দিকে টানিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া

তাহার বাঁ কনুইয়ে মারিয়া, টানিয়া আনিয়া দুই হাত দিয়া ধরিয়া, ডান হাঁটু তাহার শরীরের উপর দিয়া লইয়া গিয়া বাঁ কাঁধের কাছে রাখিয়া বাঁ হাঁটু তুলিয়া তাহার বাঁ দিকে বসিয়া ধরা মুঠোটী নিজের দিকে টানিয়া তাহাকে চিৎ করিতে পারা যাইবে।

১০নং প্যাঁচের ২য় ছবি

১১ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিবার পর যদি সে উঠিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে একটু উঠিতে দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার গলাতে কিম্বা কপালে ধাক্কা দিয়া কিম্বা নিজের হাতে হাত দিয়া জোরে মুঠো করিয়া তাহার ঘাড়ে চাড় দিতে দিতে তাহার শরীরটী পিছনে উল্টাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-টী তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিলে তাহাকে চিৎ করিতে পারা যাইবে।

১১নং প্যাঁচের ১ম ছবি

১২ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার বাঁ পাছার কাছে লেঙ্গট্‌টী চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতটী উপর হইতে তাহার বাঁ কাঁধের মধ্যে চাপাইয়া দিয়া
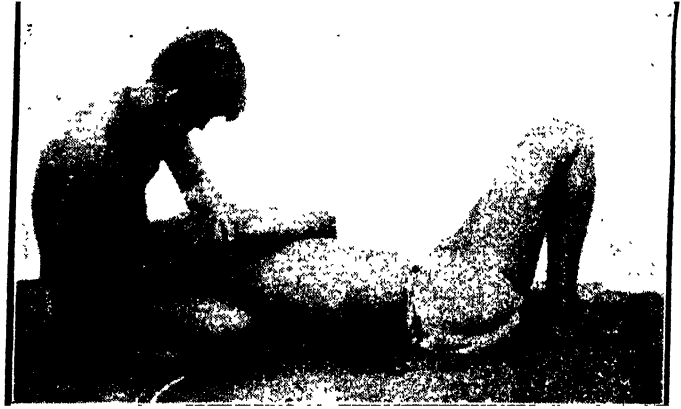
১১নং প্যাঁচের ২য় ছবি
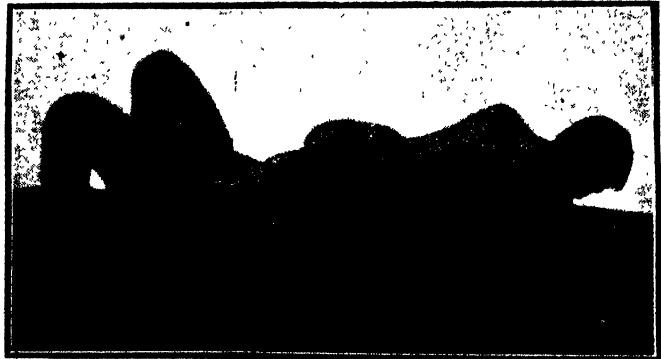
১২নং প্যাঁচের ১ম ছবি

১৩নং প্যাঁচের ১ম ছবি

১২নং প্যাঁচের ২য় ছবি

১৩নং প্যাঁচের ২য় ছবি

তাহার বাঁ বগলে আট্কাইয়া রাখিয়া ডান হাঁটু তুলিয়া ও বাঁ হাঁটু তাহার ডান উরুতের উপর রাখিয়া জোরের সহিত বসিবার পর যদি সে উঠিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে একটু উঠিতে দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার শরীরটা কাৎ করিয়া পিছনে উল্টাইয়া দিয়া ডান পা-টা তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিলে তাহাকে চিৎ করিতে পারা যাইবে।

১৩ নং

অপরকে নীচে লইয়া আসিবার পর যখন সে হাত ও পা ছোট করিয়া মাটীতে বসে ও উপরে যে আছে সে যদি তাহার ডান দিকে থাকে তবে বাঁ হাত দিয়া তাহার লেঙ্গটটা জোরে ধরিয়া ও ডান পা-টা লম্বা করিয়া ডান উরুতের নীচুটা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া রাখিবার পর যদি সে উঠিতে চেষ্টা করে তাহাকে একটু আল্গা দিয়া উঠিতে দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের গোড়ালী দিয়া তাহার বাঁ কনুইয়ে মারিয়া ও বাঁ পা-টা তাহার ডান বগলের মধ্যে চালাইয়া দিয়া আটকাইয়া রাখিয়া ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত বাঁ দিকে ঘুরিয়া বসিয়া পড়িলে তাহাকে চিৎ করিতে পারা যায়।

জনম্-ঋণী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নিবারণের স্ত্রীর নাম খেঁদী।

ভাল নামের প্রয়োজন তাহার কোনোদিনই হয় নাই। বিবাহের সময় প্রয়োজন একবার হইয়াছিল বটে। পুরোহিত বলিয়াছিলেন, 'খেঁদীর আমাদের ভাল নামটি হ'লো গিয়ে…'

কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিয়া কালিদাসবাবু বলিলেন, 'খেঁদুরাণী।'

তাহার পর স্বামীকে চিঠি লিখিতে হইলেও বা ভাল নামের প্রয়োজন তাহার হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু বিবাহের পর হইতে স্বামী তাহাদের বাড়ীতেই রহিয়া গেল, চিঠি লিখিবার প্রয়োজনও হইল না।

কাজেই আমাদের খেঁদী শেষ পর্য্যন্ত খেঁদুরাণীই হইয়া রহিল।

বিবাহের পর নিবারণ ঘর-জামাই হইয়া থাকিবে তাহাই ছিল বন্দোবস্ত। হেতুটা তাহার একটুখানি খুলিয়াই বলা আবশ্যক।

কালিদাসবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে; কিন্তু প্রথম পক্ষের ঐ একমাত্র খেঁদুরাণী। মা মরিয়া যাইবার পর, বিমাতার সংসারে হেলায়-ফেলায় অনাদরে অযত্নে মরিয়া না গিয়া কোনোরকমে বাঁচিয়া আছে।

এবং বাঁচিয়া যখন আছে, বিবাহ তখন তাহার দিতেই হইবে। অথচ বিবাহ দিতে হইলে গুণ না থাক্, মেয়ের যতটুকু রূপ থাকা দরকার খেঁদুরাণীর তাহাও নাই।

থাকিবার মধ্যে আছে শুধু বাপের পয়সা। তাহারই লোভে ঘটকেরা সম্বন্ধ আনিতে লাগিল।

বিমাতা বলিলেন, 'টাকা খরচ করে' বিয়ে ত' দেবে, কিন্তু জামাই ওকে নেবে বলে' ত' আমার মনে হয় না।'

কালিদাসবাবুও যে সে-কথা ভাবেন নাই তাহা নয়। বলিলেন, 'মেয়েকে আমি গয়নায় মুড়ে দেবো, তাহ'লেই নেবে।'

গহনার লোভে অনেকেই আসিলেন, কিন্তু মেয়ে দেখিয়া গহনা-টাকার লোভ তাঁহাদের সম্বরণ করিতে হইল।

কালিদাসবাবু তখন ভাবনায় পড়িলেন। ঘটকদের বলিলেন, 'গরীবের ছেলে ছাখো। গয়না-টাকা ত' দেবোই, তাছাড়া ছেলেকে আমি ঘর-জামাই করে' রাখব।'

তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে বাসুদেবপুরে নিবারণকে পাওয়া গেল। নিবারণ তখন কোনোরকমে ঘরের খাইয়া গ্রামের ইস্কুল

হইতে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করিয়া ঘরে বসিয়া আছে। নিবারণের বাবা চিন্তাহরণের সামর্থ্য নাই। কাজেই পড়াশোনা তাহার ওইখানেই শেষ। সামর্থ্য অবশ্য তাঁহার কোনোদিনই ছিল না। জমিজমা যাহা আছে, তাহা দিয়া অগ্রহায়ণে নূতন চালের নবান্নের সময় হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত অতিকষ্টে কোনোরকমে চলে, তাহার পর বৎসরের প্রথম শুভ বৈশাখ হইতেই অচল। গত দুই-বৎসর ধরিয়া তাই এই বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বৎসরের এই কয়টা মাস চিন্তাহরণ বাড়ীতে থাকেন না; নিবারণের বিবাহের জন্য গ্রামে গ্রামে পাত্রী খুঁজিয়া বেড়ান। কিন্তু অভাব তখন তাঁহার এত বেশি নিদারুণ যে, পাত্রীর সন্ধান পাইবামাত্র নিজে উপযাচক হইয়া ভাবী বৈবাহিকের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কথায় কথায় কৌশল করিয়া বলিয়া বসেন, 'তা বেশ, ছেলের বিয়ে আমি এইখানেই দেবো, কিন্তু একটি কাজ আপনাকে করতে হবে।'

কন্যার পিতা বলেন, 'কি কাজ বলুন।'

চিন্তাহরণ বলেন, 'পঞ্চাশটি টাকা কিন্তু এখন আপনাকে দিতে হবে। তারপর বিয়ের দেনা-পাওনা ত' আছেই, তখন না-হয় কেটে নেবেন। দোকানে জিনিস কিনতে হ'লেও কিছু বায়না দিতে হয়।'

এই বলিয়া আসন্ন লাভের আনন্দে তিনি হাসিয়া ওঠেন।

কিন্তু এই কৌশল করিতে গিয়াই সব-কিছু গোলমাল হইয়া যায়। কন্যার পিতা ভাবেন, এত যাহার অভাব, কন্যা সেখানে না দেওয়াই ভালো।

এমনি করিয়া এ-গ্রাম সে-গ্রাম করিতে করিতে কোনোরকমে আবার অগ্রহায়ণ আসিয়া পড়ে। পাকা ধান তখন ঘরে আসিয়া ওঠে। পৌষে বাড়ী হইতে নাকি বাহির হইতে নাই। মাঘে দুরন্ত শীত। ফাল্গুনটা যাই যাই করিয়াই কাটে। চৈত্রে বিবাহ হয় না।

তাহার পর আবার সেই বৈশাখ!

এবার চিন্তাহরণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন—যেমন করিয়াই হোক্ নিবারণের বিবাহ দিয়া এ বৎসর তাঁহার অভাব বলিতে আর কোথাও কিছুই রাখিবেন না।

এই বলিয়া তিনি যাই যাই করিতেছেন, এমন দিনে কালিদাসবাবুর ঘটক আসিয়া হাজির!

পাওনার কথা শুনিয়া চিন্তাহরণের চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িল। ঘটক-ঠাকুরকে বলিলেন, 'চলুন তাহ'লে পাকাপাকি করেই আসি।'

পাকাপাকি করিতে গিয়া দেখেন, কালিদাসবাবুর প্রকাণ্ড দোতলা দালান, মেয়ের চেহারা ভাল নয় কিন্তু সোনার গহনায় খেঁদুরাণী একেবারে ঝলমল্ করিতেছে।

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'তাহ'লে এইবার দেনা-পাওনার কথাটা—'

কালিদাসবাবু তাঁহাকে তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। চাকরে পান দিয়া গেল, তামাক দিল। রূপার রেকাবিতে পান, গড়গড়ার নল সোনা দিয়া বাঁধানো!

দেনা-পাওনার কথা উঠিল। কালিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার সন্তান কি ওই একটি?'

'আজ্ঞে না, নিবারণ আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ওই একমাত্র···ওর মা নেই।'

আরও কি যেন তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, কালি-দাসবাবু হাসিয়া উঠিলেন;—'তাহ'লে আপনারও তাই। আমারও মেয়েটি প্রথম পক্ষের ওই একমাত্র মেয়ে।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'ছেলে আমার মশাই হীরের টুক্‌রো। ওই ত' আপনার ঘটক-মশাই দেখে এসেছেন। এণ্ট্রান্স পাশ করে' অসুখ হ'লো কিনা, তাই আর কলেজে ভর্ত্তি হ'তে পারলে না।'

ঘটক-মশাই বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেলেটি চমৎকার।'

কিন্তু সে সব কথা কালিদাসবাবু শুনিতে চান না। তিনি বলিলেন, 'ছেলেকে কিন্তু আমি বিয়ের পর থেকে এইখানেই রাখব। তাতে আপনার আপত্তি আছে?'

চিন্তাহরণ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'কিছু না, কিছু না। আপনিই তার অভিভাবক হবেন, কাজকর্ম্ম একটা দেখেশুনে দেবেন···'

কালিদাসবাবু বলিলেন, 'বেশ। এইবার কাজের কথা। মেয়ের গায়ে যে-সব গহনা দেখলেন, ও-সব

ওরই, তা ছাড়া নগদ টাকা আপনাকে আমি শ'-পাঁচেকের বেশি দিতে পারব না।'

গড়গড়ার নলটা তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া চিন্তাহরণ ধোঁয়া বাহির করিতে লাগিলেন।—দুঃখের দিনে স্ত্রীর গহনাগুলা বন্ধক পড়িয়াছে, সেগুলা ছাড়াইতে দু'শ টাকা লাগিবে, পঞ্চাশ টাকার চাল কিনিয়া রাখিতে হইবে, বৌভাতে কোন্-না পঞ্চাশ টাকা খরচ হইবে, তাহার পর বাকি দুশ' টাকা গৃহিণীর হাতে তুলিয়া দিবেন, যাহা করিতে হয় সে-ই করিবে। বড়লোক বৈবাহিক, এমনি কত টাকা তিনি তাঁহার কাছে আদায় করিবেন, এখন আর বেশি চাহিতে গেলে যদি সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার চেয়ে আর কিছু না চাওয়াই ভালো।

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'পঞ্জিকাটা দেখুন তাহলে—ভাল দিন একটি এই বৈশাখেই···জ্যৈষ্ঠে ত' দিতে নেই, কারণ নিবারণ আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে। বৌমাকে আমি তাহ'লে আশীর্ব্বাদ করেই যাই।'

বৈশাখেই দিন স্থির হইল। ধান-দুর্ব্বা দিয়া চিন্তাহরণ খেঁদুরাণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর ভাবিতে বসিলেন—অগ্রিম কিছু টাকা তিনি বৈবাহিকের কাছে চাহিবেন কেমন করিয়া। এমনি চাহিতে গিয়াই অন্য সম্বন্ধগুলা ভাঙ্গিয়া গেছে।

ওদিকে কালিদাসবাবু ভাবিলেন, পাকাপাকি একটা-কিছু করিয়া ফেলা দরকার, তাই তিনি দশ টাকার দশখানি নোট তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, 'এক শ' টাকা এখন নিন, বাকি টাকা বিয়ের রাত্রে দেবো।'

এক শ' টাকার কথা চিন্তাহরণ ভাবিতেই পারেন নাই। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নোটগুলার দিকে কিয়ৎক্ষণ তিনি তাকাইয়া রহিলেন, পড়্ পড়্ করিয়া গড়গড়ার নলটা তিনি বারকতক্ খুব জোরে জোরে টানিলেন, তাহার পর এক সঙ্গে গোটাদুই পান মুখে দিয়া আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়া কি যে বলিলেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিলেন।

কালিদাসবাবু ইসারা করিতেই চাকর আসিয়া হাতে তাঁহার একটা পাখা দিয়া গেল।

এই ত' গেল বিবাহের ইতিহাস।

বিবাহের পর ভাল কাপড়-জামা গায়ে দিয়া গায়ে এক-গা গহনা পরিয়া খেঁদুরাণী শ্বশুরবাড়ী গেল।

গ্রামের লোক বৌ দেখিয়া অবাক্!

মেয়েরা আড়ালে গিয়া ছি ছি করিতে লাগিল।—'ও মা, তাই ত' বলি, হেনা দেবে, তেনা দেবে, বড়লোক শ্বশুরবাড়ী···গয়না-টাকার লোভে মিন্‌সে করেছে কি গা!'

বাবাকে তাহার আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিবারণ বলিল, 'টাকাটাই আপনার বেশি হ'লো?'

কথাটা শুনিতে পাইয়া বিমাতা সুরধুনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কেন বাবা নিবারণ, বৌ আমার মন্দ কি হয়েছে? গেরস্ত ঘরের বৌ, এখন ছেলেমানুষ, বড় হ'লে ও-ই দেখবি আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে।'

নিবারণ বলিল, 'ছাই হবে।'

সুরধুনী খানিকটা জিব বাহির করিয়া বলিল, 'ছি বাবা ছি, বলতে নেই। অত অত গয়না নিয়ে বৌ আমার ঘরে ঢুকেছে, তুই বলিস কি রে নিবারণ, কই কেউ বার করুক্ দেখি পাঁচ-সাতখানা গাঁ খুঁজে কার বৌএর এত গয়না! ওই যে দেখছিস্—একটি চোখ ট্যারা, ও খুব পয়মন্ত, ওকে ধন-ট্যারা বলে। তুই কিচ্ছু ভাবিসনি বাবা, ওই বৌ থেকে আমাদের দেখবি সব দুঃখু ঘুচে যাবে।'

বৌ লইয়া সুরধুনী প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। বৌ দেখিতে যে আসিল তাহাকেই ডাকিয়া বসাইয়া একটি একটি করিয়া বৌএর গয়না-কাপড় দেখাইতে লাগিল। বলিল, 'মস্ত বড়লোকের মেয়ে মা, আমাদের বাড়ী যে আসবে তা কি আর আমি ভেবে-ছিলাম কখনও! তা আমার ছেলে-বৌএর দৌলতে এবার আমাদের দুঃখু ঘুচলো।'

সুরধুনীর এত বলা সত্ত্বেও বৌএর সুখ্যাতি কেহই করিল না। গোপনে সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, 'প্যাঁচার মত বৌ নিয়ে মাগী করছে দ্যাখো!'

কিন্তু যে যাহা করিল—সবই মাত্র তিনটি দিনের জন্য।

তিন দিন পরেই কালিদাসবাবুর বাড়ী হইতে লোকজন আসিল, পাল্‌কি আসিল এবং সেই পাল্‌কি

চড়িয়া গয়না-কাপড় লইয়া বৌ আবার তাহার বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

নিবারণকেও সঙ্গে যাইতে হইল।

নিবারণ সেই অবধি শ্বশুরবাড়ীতেই আছে।

খেঁদুরাণী বলে, 'হ্যাগা, কদম-পিসি বলছিল, তুমি নাকি আমায় নেবে না, আমায় এইখানে ফেলে রেখে কোন্‌দিন চলে' যাবে,—সত্যি?'

নিবারণ জবাব দেয় না।

খেঁদুরাণী তাহাকে নাড়া দিয়া বলে, 'কথা কইছ না যে?'

নিবারণ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করে, 'কে বললে?'

'কদম পিসি।'

ঘাড় নাড়িয়া নিবারণ বলে, 'না।'

খেঁদুরাণীর চোখ দুইটা তখন ছল্ ছল্ করিয়া আসে। বিমাতার সংসারে বাল্যাবধি সে বড় হেলায়-ফেলায় মানুষ। বিবাহের পর এই এক নিবারণকে ছাড়া এমন ভাবে আপনার করিয়া সে আর কাহাকেও পায় নাই। কথাটা সে বলিতে গিয়াও লজ্জায় আর বলিতে পারে না। চুপ করিয়া একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকে। চোখের জল তাহার চোখেই শুকায়।

খেঁদুরাণীর সঙ্গে কথা কহিয়া নিবারণের সুখ হয় না। তাই সে পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু খেঁদুরাণীর সেদিন কি যে হয় কে জানে, নিবারণের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য সে যেন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। নিবারণ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া থাকে খেঁদু ধীরে-ধীরে সেইদিকে উঠিয়া গিয়া তাহার মাথার কাছটিতে গিয়া বসে, তাহার পর নিবারণের চুলের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, 'এরই মধ্যে আজ ঘুমোচ্ছ যে? ঘুম পেয়েছে?'

কণ্ঠস্বর শুনিলে মমতা হয়, কিন্তু চোখ খুলিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইতে পারে না, তেমনি চোখ বুজিয়াই বলে, 'না ঘুমোই নি। কি বলছ বল।'

ভয়ে ভয়ে খেঁদু বলে, 'কিছু বলিনি।'

এই বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ থামিয়া আবার জিজ্ঞাসা করে, 'মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো? ভাল লাগছে?'

নিবারণ বলে, 'দাও।'

মাথার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে খেঁদু বলে, 'আমাদের বেশ মিলেছে কিন্তু। তোমারও সৎ-মা আমারও সৎ-মা।'

নিবারণ বলে, 'হুঁ।'

এইবার সাহস পাইয়া খেঁদুরাণীর মুখ খুলিয়া যায়। বলে, 'কিন্তু দ্যাখো, তোমার সৎ-মা বেশ ভাল মানুষ। আমার সঙ্গে ত' সেই বিয়ের সময় দু'দিনের দেখা, তাইতে আমার এত ভাল লেগেছিল, সত্যি বলছি—তোমাদের বাড়ী থেকে আমার আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমার বাপু সবই উল্‌টো।'

বড়লোকের মেয়ে খেঁদু যে এরকম কথা বলিবে নিবারণ তাহা ভাবে নাই। এইবার সে চোখ মেলিয়া তাকাইল। বলিল, 'সে কি খেঁদু? আমরা গরীব, আমাদের ভাঙ্গা মাটির ঘর, আর তোমরা কত বড়লোক, এমন সুন্দর বাড়ী তোমাদের—"

খেঁদু বলিল, 'হ্যাঁ—পিণ্ডি! জানো না ত' আমার ওই সৎ-মা মাগীর কথা ত' শোনোনি! তুমি জামাই মানুষ, তাই তোমার মুখের সাম্‌নে কিছু বলে না, সেদিন আমার কাছে কি বলছিল শুনবে?'

কথাটা বলিয়াই সে বুঝিল বলা তাহার ভাল হয় নাই। শুনিয়া যদি সে কিছু মনে করে? যদি সে রাগ করিয়া পালায়? কথাটা তৎক্ষণাৎ চাপা দিবার জন্য তাই সে একবার ঢোঁক গিলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া অপ্রস্তুতের একশেষ হইয়া গিয়া বলিল, 'বিয়ের আগে ও আমায় এমন মা'র মারতো! আজকাল বড় হয়েছি, বিয়ে হয়ে গেছে, তার ওপর তুমি রয়েছ, তাই মারে না। দেখবে কেমন মারতো?'

বলিয়া সে তাহার বাঁহাতের জামাটা তুলিয়া কাঁধের কাছে মস্ত একটা দাগ দেখাইয়া বলিল, 'এই দ্যাখো। ওর ওই ছেলেটাকে একদিন কোলে নিইনি বলে' উনোনে লোহার চিম্‌টে গরম করে'—'

বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল, নীচের ঠোঁটটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কথাটা আর শেষ হইল না।

কিন্তু যে-কথাটা সে চাপা দিয়া গেল, নিবারণ তাহাই জানিতে চাহিল। বলিল, 'বল কি বলেছিল!'

খেঁদুরাণী বলিল, 'ও কিছু না। ও ভারি বজ্জাত, আমায় দেখতে পারে না কি-না তাই অমন বলে।'

কিন্তু নিবারণের কৌতূহল তাহাতেও নিবৃত্তি হইল না, কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বলিতেই হইল। বলিল, 'আগে আমার গা ছুঁয়ে বল তুমি রাগ করবে না।'

নিবারণ তাহাই করিল।

খেঁদু বলিল, 'বলছিল, হ্যাঁলা, তোর বরের কি যাবার কোথাও জায়গা-টায়গা নেই নাকি? এখান থেকে আর নড়ছে না দেখছি।'

নিবারণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

খেঁদু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আমার তখন ইচ্ছে করছিল—দিই আচ্ছা করে' শুনিয়ে। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারলাম না। বললাম, তা আমি কি জানি!'

নিবারণ তখনও চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া আছে দেখিয়া খেঁদুর ভয় হইল। বলিল, 'রাগ করলে? তুমি রাগ করলে ওর ত' ভারি বয়েই যাবে! কাল রাত্তিরে খাবার আগে যে ঘুমিয়ে পড়লাম ত' জাগিয়ে আমায় আর খেতেও বললে না। ঘুম ভাঙতেই দেখি—সব অন্ধকার। কিছু না খেয়েই ওপরে উঠে এলাম।'

নিবারণ বলিল, 'উপোস দিয়ে রইলে?'

ম্লান একটুখানি হাসিয়া খেঁদু বলিল, 'ও আমার অভ্যেস্ হয়ে গেছে। দেখলে না—ওপরে এসে ঢক ঢক্ করে' কতটা জল খেলাম? জল খেয়ে আমি দু'দিন থাকতে পারি। মাইরি বলছি। তিন দিনের দিন কষ্ট হয়।'

কালিদাসবাবুর দেওয়া টাকা কবে ফুরাইয়া গেছে!

ইহার মধ্যে বৈবাহিকের কাছে চিন্তাহরণ দু'বার আসিয়াছিলেন। প্রথমবার আসিয়া সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা বলিয়া গোটাকয়েক টাকা লইয়া গেছেন, দ্বিতীয়বার টাকাকড়ি কিছু পান নাই, বাগানের কিছু তরি-তরকারি লইয়াই সেবার তাঁহাকে বিদায় লইতে হইয়াছে।

চার-পাঁচ হইল আবার আসিয়াছেন। শ্রীমান্ নিবারণকে এবং শ্রীমতী বধূমাতাকে সুরধুনী একখানি চিঠি লিখিয়াছে। চিঠিখানি গোপনীয়।

লিখিয়াছে—

তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই। একবার বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। তোমরা দু'জনেই যদি একবার আসিতে পার ত' ভাল হয়। বৈবাহিক-মহাশয়কে বলিও—ঘর-জামাই রাখিবার বন্দোবস্ত হইলেই যে আর মা বাবাকে দেখিবার উপায় নাই তাহা নয়।

আমাদের কষ্টের কথা আর কি বলিব বাবা, বড় কষ্টে দিন কাটিতেছে। তুমি উপযুক্ত পুত্র, তোমার মুখ চাহিয়াই আমরা বসিয়া আছি। তোমার শ্বশুর এখনও তোমার একটি চাকরি কেন করিয়া দিলেন না বুঝিতে পারিতেছি না। শ্বশুরকে বলিয়া যেমন করিয়া পার চাকরি একটি জোগাড় করিবে। চাকরি যদি তিনি না করিয়া দেন তাহা হইলে বুঝিও তাঁহার মতলব খারাপ। তুমি যদি বধূমাতাকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিতে পার তাহা হইলে তিনি জব্দ হইবেন। তাহা না হইলে যেমন বসিয়া আছ তেমনিই হয়ত বসিয়া থাকিতে হইবে।

দু'-তিন বৎসর হইল, রাজার খাজনা দেওয়া হয় নাই। এবার বোধহয় জমিজমাগুলি নিলাম হইয়া যাইবে। তাহা হইলে আমরা পথে দাঁড়াইব। তোমার ভাই-দুইটি ঘরে বসিয়া আছে। ইস্কুলের বেতন দেওয়া হয় নাই বলিয়া অপমান করিয়া ইস্কুল হইতে নাম কাটিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে।

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

তোমাদের দুঃখিনী মা

পুনশ্চ লিখি—বধূমাতাকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিবে। আসিবার সময় বধূমাতার গহনাগুলি যেন সেখানে ফেলিয়া আসিও না। অনেক দামী গহনা, তোমরা ছেলেমানুষ, সেগুলি সঙ্গে না রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

চিঠি পাইয়া নিবারণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।

খেঁদু জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন করে' ভাবছ যে ? কে চিঠি লিখেছে ? মা ?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া চিঠিখানি খেঁদুর হাতে দিয়া নিবারণ বলিল, 'পড়ে ছাখো।'

চিঠি পড়িয়া খেঁদু বলিল, 'চল আমরা চলে যাই। এখানকার চেয়ে ভাল থাকব।'

নিবারণ ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'দাঁড়াও একটা কাজকর্ম্মের জোগাড় আগে করি তারপর যাব। এমনি গেলে তোমার বড় কষ্ট হবে।'

কালিদাসবাবু বৈবাহিককে সেবার একরকম প্রকারান্তরে স্পষ্টই জবাব দিলেন।

বলিলেন, 'রাগ করবেন না বেই-মশাই, আপনাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞেস্ করি। আচ্ছা বলুন ত' কতদিন আপনি এমনি পরের মুখ চেয়ে বসে আছেন ?'

প্রশ্ন শুনিয়া চিন্তাহরণ একটুখানি ক্ষুণ্ণ হইলেন। কোনও জবাব দিতে পারিলেন না।

কালিদাসবাবু আবার বলিলেন, 'নিজে কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করুন। নইলে আর কিছুদিন পরে আপনার দুর্গতির আর সীমা থাকবে না।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'এতসব কথায় কাজ কি বেয়াই, আপনি দেবেন না তাই বলুন।'

বৈবাহিক ছেলের বাবা। চটাইতেও ভয় হয়। কালিদাসবাবু দশটি টাকা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আমি ত' আর চিরকাল দিতে পারব না বেই, তা ছাড়া এতে আপনার দুঃখুও ঘুচবে না, সেই জন্যেই বললাম। কিছু মনে করবেন না।'

ছেলেকে চাকরি করিবার উপদেশ দিয়া দশটি টাকা লইয়া চিন্তাহরণ চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই রাত্রে আহারাদির পর নিবারণ উপরে উঠিতেছিল, সিঁড়ির পাশেই কালিদাসবাবুর শোবার ঘর, শুনিল সেই ঘরের মধ্যে শাশুড়ী ও শ্বশুরে তুমুল ঝগড়া সুরু হইয়াছে। ঘরের দরজা বন্ধ। নিবারণ চুপি চুপি সেই বন্ধ দরজার পাশে গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল।

কালিদাসবাবু বলিতেছেন, 'আঃ, চুপ কর, জামাই হয়ত শুনতে পাবে।'

শাশুড়ী বলিতেছে, 'শুনুক না! কাল থেকে ত' আমি শুনিয়ে শুনিয়েই বলব। তখনই বলেছিলাম-না যে, হাভেতে গরীবের ঘরে মেয়ে তুমি দিয়ো না! মিন্‌ষের আজ খেতে কাল নেই, ঘরে হাঁড়ি চড়িয়ে তোমার কাছে এসে ধন্না দিয়ে পড়ে রইলো। দাও এইবার কত দিতে পার। ওই এক মেয়ের পেছনেই যদি ফতুর হবে ত' আমার মেয়েটার গতি কি করবে শুনি ?'

শ্বশুর বলিলেন, 'তোমার মেয়ে সুন্দরী গো, তোমার জামাইকে ত' আর ঘরে পুষে রাখতে হবে না!'

শাশুড়ী বলিলেন, 'আ মরি মরি! আমার মেয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ভাত রাঁধবে! দেবো যে যেতে! কখ্খনো না। আমারও মেয়ে-জামাইকে আমি ঘরে রাখব। দেখি তোমার কত টাকা হয়েছে, কত তুমি দিতে পার! এখনও বলছি জামাইকে তুমি বিদেয় কর, নইলে জামাইএর বাপ তোমায় আর আস্ত রাখবে না।'

শ্বশুর চুপ করিয়া রহিলেন। নিবারণের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল। হাত-পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ধীরে-ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া সে তাহার ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। খেঁদু আসিলে বলিল, 'তোমার গয়না-কাপড় সবই তোমার কাছেই আছে, না ?'

খেঁদু বলিল, 'হ্যাঁ, কেন বল ত ?'

'চল আমরা এখান থেকে চলে যাব।'

খেঁদু তৎক্ষণাৎ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। বলিল, 'চল—আজ রাত্তিরেই চলে যাই। দিব্যি চাঁদের আলো, কাছেই ত' ইষ্টিশান, গয়নাগুলো একটা পুঁটুলিতে বেঁধে আমি হাতে করেই নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু কাপড় জামা ত' তাহ'লে বেশি নেওয়া হবে না।'

নিবারণ বলিল, 'না আজ রাত্রে নয়, লুকিয়েও নয়, জানিয়েই যাব।'

খেঁদুর মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তাহ'লে বাবা হয়ত যেতে দেবে না।'

নিবারণ বলিল, 'নিশ্চয়ই দেবে।'

এই বলিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শুইয়া শুইয়া এখান হইতে কেমন করিয়া যাইবে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল।

শাশুড়ীই বাড়ীর গৃহিণী। তাহারই হাতে সব-কিছু। পরদিন দেখিল, সেই সকালে চাকর আসিয়া কখন্ তাহাকে এক পেয়ালা চা দিয়া গেছে, তাহার পর বেলা প্রায় বারোটা বাজিতে চলিল তখনও পর্য্যন্ত তাহার জলখাবারের কোনও ব্যবস্থাই কেহ করিল না। ইহার পূর্ব্বেও দু'একদিন যে এমন না হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু সেদিনের এই ইচ্ছাকৃত অবহেলার হেতুটা যে কোথায় সেকথা বুঝিতে তাহার বিশেষ কষ্ট হইল না। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেছে, কালিদাসবাবু স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় নিবারণ শুনিল, নীচে হইতে শাশুড়ী বলিতেছেন, 'জামাই কি আজ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে নাকি রাধু, খাবার দেবে কিনা ওইখান থেকে একবার হেঁকে বল্ ত' বাবা!'

অন্যদিন চাকর আসিয়া স্নান করিবার জল, তেল, গামছা সবই রাখিয়া যায়, আজ সে তাহাও রাখে নাই। নীচে গিয়া তেল গামছা চাহিয়া লইয়া পুকুরে গিয়া তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে হইবে। অবশ্য পুকুরে স্নান করাই তাহার চিরকালের অভ্যাস, কিন্তু এখানে আসিয়া অবধি কোনোদিনই তাহার সে ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া সেদিন তাহার কেমন যেন লজ্জা করিতে লাগিল। শীতকাল। স্নান আজ তাহার না করিলেও চলিবে।

নিবারণ কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া নীচে গিয়া খাইতে বসিল। ভাত যেন সেদিন তাহার গলা দিয়া আর পার হইতে চায় না! কোনোরকমে খাওয়া শেষ করিয়া আবার সে উপরে উঠিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে চাপা নারীকণ্ঠে কে যেন কহিল, 'হ্যাঁ, ডিমে তা দিয়ে আবার বোসোগে যাও।'

কথাটা তাহার শাশুড়ীই বলিল কি না তাই-বা কে জানে!

রাত্রে খাইতে গিয়া দেখে—অন্যদিন থালার পাশে বাটি সাজাইয়া ভদ্রভাবে তাহাকে যেমন করিয়া খাইতে দেওয়া হয় সেদিন সে ব্যবস্থাও উঠিয়া গেছে। রাঁধুনী-বামনী বাটির জন্য খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ইহার-উহার দোষ দিয়া শেষে থালার উপরেই যাহা-কিছু ঢালিয়া দিয়া গেল এবং দুধের বাটিতে চুমুক দিয়া দেখিল, দুধের বদলে চিনি গুলিয়া খানিকটা সাদা জল তাহাকে গরম করিয়া খাইতে দেওয়া হইয়াছে।

একবার ভাবিল, খেঁদুকে সে এইখানে ফেলিয়া রাখিয়া নিজেই চলিয়া যায়। কিন্তু আহা, বেচারা খেঁদু! জীবনে অনেক কষ্টই সে সহিয়াছে। আর না।

খেঁদু বলিল, 'সেদিন যাব বললে, বলে' আবার কি ভুলে গেলে নাকি? নতুন-মা এতদিন পরে আজ আমায় আবার মেরেছে।'

নিবারণ বলিল, 'মেরেছে?'

'হ্যাঁ। দেখবে?' বলিয়া সে তাহার হাতখানা ধরিয়া নিজের মাথায় দিয়া বলিল, 'হাত দিয়ে ছাখো।'

নিবারণ দেখিল, চুলের নীচে অনেকখানা ফুলিয়া উঠিয়াছে।

খেঁদু বলিল, 'খেতে বসে রাধুকে বলেছিলাম এক গ্লাস জল দে। উনি নিজেই তখন জল গড়িয়ে এনে গ্লাসসুদ্ধু আমার মাথায় ঠুকে দিয়ে বললেন, নিজে গড়িয়ে নিতে পার না নবাবের মেয়ে!'

'হুঁ।' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিবারণ চুপ করিয়া রহিল।

কালিদাসবাবু সেদিন বাড়ী ছিলেন না। কি একটা কাজে কোথায় যেন গিয়াছিলেন। দু'দিন পরে ফিরিবার কথা।

ইহাই উপযুক্ত সুযোগ ভাবিয়া নিবারণ বলিল, 'আজই যাব।'

খেঁদু প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

কথাটা শুনিয়া শাশুড়ী বলিল, 'সে কি বাবা? তোমার শ্বশুর আজ বাড়ী নেই।'

নিবারণ বলিল, 'বাবার ভয়ানক অসুখ চিঠি পেলাম, আমাদের যেতেই হবে।'

বলিয়া নিবারণ নিজেই একটা গরুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল।

শাশুড়ী ভাবিল, একবার বলে যে খেঁদুর গহনাগুলা যেন সে না লইয়া যায়, তাহার পর কি ভাবিয়া সে চুপ করিয়াই রহিল।—যাক্ গে, আপদ বিদায় হইলেই সে বাঁচে!

খেঁদু ও নিবারণ গরুর গাড়ী চড়িয়া ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিল।

ছেলে-বৌকে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ী আসিতে দেখিয়া চিন্তাহরণ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'বেশ হয়েছে, আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেছে।'

আনন্দে সুরধুনীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, চোখ দিয়া দর্‌দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

তাহাদের আসিবার হেতুটা জানিবার জন্য চিন্তাহরণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারপর—এলি কেমন করে' শুনি! শ্বশুর কিছু বললে না?'

নিবারণ বলিল, 'এলাম—সেখানে আমাদের আর ভাল লাগল না বলে'। এইখানেই আমরা থাকব—আর যাব না।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'বেশ, বেশ, এইবার ভাল দেখে একটি চাকরির জোগাড় করে' এইখানেই থাকো বাবা, কালিদাসবাবু লোকটা তেমন সুবিধের নয়—সে আমি এইবারেই টের পেয়ে গেছি।'

চোখ মুছিয়া সুরধুনী তাহাদের কাছে আসিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌমার গয়নাগুলি সব দেখেশুনে এনেছ ত' বাবা? তোমরা দু'জনেই ছেলে-মানুষ, এই জন্যেই আমার বেশি ভাবনা।'

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু গরীবের সংসার। চারিদিকে দিবারাত্রি শুধু নাই আর নাই! চিন্তাহরণ উঠানের একপাশে রৌদ্রের দিকে পিঠ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবেন আর কাঠি দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটেন।

দোকানী টাকা পাইবে, টাকার তাগাদা করিতে আসে। চিন্তাহরণ বলেন, 'বোসো, তামাক খাও।'

দোকানী বলে, 'না দাদা, বসে বসে আমার তামাক খাবার অবসর নেই। টাকা ক'টা এইবার না দিলে আমার আর চলছে না।'

চিন্তাহরণ বলেন, 'দাঁড়াও ভাই, আর কয়েকটা দিন সবুর কর। নিবারণ তার শ্বশুরের কাছ থেকে—'

দোকানী বলে, 'সে ত' আজ ছ' সাত মাস ধরে' শুনছি দাদা, কখনও বল অমুকের কাছ থেকে, কখনও বল তমুকের কাছ থেকে, ও-সব পরের আশা-ভরসা ছেড়ে দাও দাদা, নিজে কোথাও থেকে জোগাড়-যন্তর করে' টাকা-ক'টা আমার ফেলে দাও। আমি আরও একমাস তোমায় সময় দিয়ে গেলাম।'

দোকানী গ্রামের লোক। চক্ষুলজ্জার খাতিরে বেশি কড়া কথা সে শোনাইতে পারে না। কিন্তু জমিদারের পেয়াদা হিন্দুস্থানী। ভদ্রলোকের খাতির রাখিতে তাহারা জানে না। ইয়া লম্বা একটা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া যমদূতের মত দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়। প্রায় মাসখানেক ধরিয়া জমিদারের নায়েব চিন্তাহরণকে ডাকিয়া পাঠাইতেছেন। কাছারী-বাড়ী বেশি দূরে নয়। কিন্তু কোনোদিনই তিনি সেখানে যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না।

ভকত সিং তাহার হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া বলিল, 'আভি হাম্ নেহি ছোড়েঙ্গা। আপনাকে যাতি হোবে।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'যেয়ে কি করব বাবা, বলছি একবারে টাকা নিয়েই যাব, তবু বার-বার কেন যে আসছ কে জানে। ওরে ও নিবারণ, বল্ ত' বাবা, ভকত সিংকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে একবার বলে দে ত' বাবা।'

নিবারণ বলিল, 'তা আপনি একবার নায়েবের সঙ্গে দেখা করে' না হয় বলেই আসুন।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'বলে আসার মানে ত' বুঝিসনি বাবা, তোর বিয়ের সময় অনেক টাকা পেয়েছি

ভেবে নায়েব ডেকে পাঠালে। ডেকে পাঠিয়ে এমন অপমান করলে যে সে আর বলবার কথা নয়। ডেকে পাঠাচ্ছে শুধু অপমান করবার জন্তে।'

নিবারণ ভকত সিংএর কাছে গিয়া বলিল, 'তুমি তোমাদের নায়েবকে গিয়ে বল যে, বাবুর ছেলে আজ বিকেলে আসবে বলেছে।'

ভকত সিং ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিবারণ বলিল, 'আমাদের কত টাকা খাজনা বাকি আছে?'

চিন্তাহরণ তেমনি হেঁটমুখে মাটিতে আঁচড় কাটিতে কাটিতে বলিলেন, 'চার বছরের বাকি, তা প্রায় সুদে আসলে একশ' টাকা।'

নিবারণ বলিল, 'বিয়ের সময় পাঁচশ' টাকা ত' পেলেন, তাই থেকে এটা আপনার দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

'উচিত ত' ছিল, কিন্তু দিতে পারলাম কোথায়? তোর মা'র গয়নাগুলো বন্ধক পড়ে ছিল সেগুলো ছাড়াতে হ'লো, সুরেন হালদারের দেনাটা শোধ করলাম, কারও একখানা পরবার কাপড় ছিল না, ছাদন অভাবে ঘরে জল পড়ছিল, দোকানের দেনা···কত আর বলি।'

নিবারণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তাহরণও কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, 'তুই যে নায়েবের কাছে যাব বললি, গিয়ে কি বলবি শুনি?'

নিবারণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'দেখি আরও কিছুদিনের সময় নিয়ে কাল একবার কাজের সন্ধানে বেরোই। শ্বশুরের ভরসায় বসে না থেকে এতদিন বেরোনো আমার উচিত ছিল।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'হুঁ, লোকটাকে আমিও এতদিন চিনতে পারিনি। ওর ভরসা করা মিছে। ও আর কিছু দেবে না। তাই ত্যাখ্ বাবা, তুই আমার উপযুক্ত ছেলে, এইবার দেখি যদি তুই কিছু করতে পারিস।'

রাত্রে খেঁদু জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগা, নায়েব কি বললে?'

নিবারণ বলিল, 'আরও কিছুদিনের সময় নিয়ে এলাম।'

'তুমি কি সত্যি-সত্যিই কাল কোথাও কাজের চেষ্টায় বেরোবে নাকি?'

নিবারণ বলিল, 'তাই ভাবছি। এ-সব তুমি কোথায় শুনলে?'

খেঁদু বলিল, 'মা বলছিলেন।—ত্যাখো, মা আজ খুব কাঁদছিলেন আমার কাছে। বলছিলেন, তোমার শ্বশুরটি কোনও কাজের নয় মা, কোনোদিন একটা পয়সা রোজগারের কোনও চেষ্টা পর্য্যন্ত করলেন না, খালি পরের মুখ চেয়ে বসে রইলেন।'

নিবারণ বলিল, 'হুঁ।'

খেঁদু বলিল, 'মা বললেন, আমার ছেলে-বৌ দুদিন কোথায় সুখে বাস করবে, তা না, ছেলেকে আমার কাজের সন্ধানে ছুটতে হচ্ছে।—ত্যাখো, এমন সৎ-মা সত্যি কারও হয় না তা তুমি যা-ই বল।'

নিবারণ চুপ করিয়া রহিল।

'চুপ করে' রইলে যে? সত্যি নয়? আমার কিন্তু বাপু ভারি ভাল লাগে। আমার মা নেই, সত্যি আমি এতদিন পরে মা পেয়েছি।'

নিবারণ বলিল, 'ভালো।'

খেঁদু বলিল, 'হাঁগা, তোমার পরীক্ষার সময় ফিচ্ দাখিল করতে নাকি অনেক টাকা লেগেছিল? সে টাকা মা-ই ত' দিয়েছিলেন শুনলাম গয়না বন্ধক দিয়ে।'

নিবারণ বলিল, 'হ্যাঁ, দিয়েছিলেন।'

'তারপর আবার কি বলছিলেন জানো? বলছিলেন—'

বলিয়াই খেঁদু ফিক করিয়া একটুখানি হাসিল। হাসিয়া বলিল:

'বলছিলেন, তোমাদের এইসময় আনন্দ করবার বয়েস মা, তোমরা দুটিতে এখন কিছুদিন একসঙ্গে থাকো। ছেলেকে এখন আমি বাড়ী থেকে যেতে কিছুতেই দেবো না।'

নিবারণ বলিল, 'তারপর? এদিকের ব্যবস্থা কি হবে তাহলে?'

'তাই ত' বলছি গো!' বলিয়া খেঁদু তাহার আরও

কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, 'মা বলছিলেন, উনি তাঁর হাতের চুড়ি ক'গাছা বন্ধক দিয়ে রাজার খাজনা শোধ করে' দেবেন। বলছিলেন, ওই চুড়ি নাকি আজ তিন বচ্ছর বন্ধক পড়ে ছিল, তারপর আমাদের বিয়ের সময় ছাড়িয়েছেন।'

নিবারণ চুপ করিয়া রহিল।

খেঁদু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না—হ্যাগা, আমার ত' অনেক গয়না, আমারই একটা গয়না না হয় বিক্রি করে' খাজনা শোধ করে' দাও না!'

নিবারণ খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'বেশ তাই দিও। সেই গয়না নিয়ে কাল আমি একবার বেরোব বাড়ী থেকে।'

খেঁদু বলিল, 'বা' তাহ'লে আর বেরোবে কেন? ওই যে মা বললে, ওকে আমি যেতে কিছুতেই দেবো না!'

নিবারণ ঈষৎ হাসিল।

'হাসলে যে?'

নিবারণ বলিল, 'এখন যদি আমি রোজগারের চেষ্টা না করি খেঁদুরাণী, তাহ'লে ওই মা'র মত তুমিও চিরকাল কষ্ট পাবে। তাই তোমায় আমি সুখে রাখবার জন্যেই —বুঝেছ?'

খেঁদুর মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন সে বুঝিয়াছে। নিবারণের মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ সে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'কিন্তু আবার—'

বলিয়াই একটা ঢোঁক গিলিয়া লজ্জায় একেবারে যেন সঙ্কুচিত ম্রিয়মান হইয়া গিয়া কহিল, 'তোমায় ছেড়ে আমি কিন্তু বেশিদিন—'

পরদিন বৃহস্পতিবার।

সুরধুনী বলিল, 'না, আজ এই বিষ্যুৎবারে তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না নিবারণ, একান্তই যদি যেতে হয় ত' বরং কাল যাস্।'

নিবারণ চাকরি করিতে যাইবে, চিন্তাহরণ ভাবিতে বসিলেন, বেতন যদি তাহার মাসে অন্তত পঞ্চাশ টাকাও হয় ত' আগামী মাস হইতে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা সে বাড়ীতে পাঠাইবে। রাজার খাজনা ত' সে যেমন করিয়াই হোক্ দিবে বলিয়াছে, সুতরাং আর তাহার চিন্তা করিবার কিছু নাই। ঋণের তাগাদায় অন্য পাওনাদারেরা টাকা চাহিতে আসিলে এবার নিবারণের নাম করিয়া দিলেই তাহারা অন্তত কিছু দিনের জন্য চুপ করিয়া থাকিবে।

এই ভাবিয়া তিনি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। খেঁদুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা বল ত' বৌমা, তোমার কি খেতে ইচ্ছে করে?'

খেঁদুরাণী নীরবে নত মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইতে লাগিল। খানিক পরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কিছু না।'

সুরধুনী কাছে আসিয়া বলিল, 'থামো আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। বৌমার যা খেতে ইচ্ছে করে তাই তুমি খাওয়াতে পারবে?'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'দেখি না চেষ্টা করে'।'

সুরধুনী বলিল, 'আমি বলছি শোনো। বৌমা মাংস খেতে চায়। শীতকাল। নিবারণ কাল বাড়ী থেকে চলে যাবে—আনো না মাংস, কোত্থেকে আনবে। দেখি কেমন বাহাদুর।'

চিন্তাহরণের বাড়ী একেবারে গ্রামের বাহিরে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে। গ্রামের বাহিরে অবশ্য চিরদিন ছিল না। বাঁদিকে হরিহর মুখুজ্যের বাড়ী ছিল। বহুদিন হইল তাহারা এ-গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্রে চলিয়া গেছে। এখন সেখানে মাত্র তাহাদের ভিটে ছাড়া আর কিছুই নাই। মাটির খানিকটা উঁচু ঢিপির উপর অযত্নবর্দ্ধিত একটা কুলের গাছ খাড়া দাঁড়াইয়া আছে।

সেই কুলগাছটার নীচে দেখা গেল, তিন-চারটা ছাগল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিয়া-পড়া শুকনো কুল চিবাইতেছে। একে পল্লীগ্রাম, তায় আবার দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। লোকজন কেহ কোথাও নাই। চিন্তাহরণ ধীরে-ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চুপি চুপি সেই কুলগাছটার নীচে গিয়া পিছন্ দিক হইতে টপ্ করিয়া একটা ছাগলের পা দুইটা ধরিয়া ফেলিলেন। অন্য ছাগলগুলা ছুটিয়া পলাইল।

তাহার পর ছাগলটাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই দরজায় খিল বন্ধ করিয়া দিলেন।

সুরধুনী দেখিতে পাইয়াছিল, বলিল, 'ও তুমি কোত্থেকে আনলে গো?'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'চুপ!'

তাহার পর অন্ধকার ঘরের মধ্যে খিল বন্ধ করিয়া বাঁ হাত দিয়া পাঁঠাটার মুখ চাপিয়া ধরিয়া, নিজের পা দিয়া তাহার পা চাপিয়া, ধারালো একটা দা লইয়া সে যে কি নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে তিনি হত্যা করিলেন তাহার আর কেহ সাক্ষ্য রহিল না। চামড়া এবং নাড়িভুঁড়িগুলা দূরের একটা পুকুরের ধারে তিনি পুঁতিয়া দিয়া আসিলেন।

সুরধুনী রান্না চড়াইল।

দুপুরে আহারাদির পর নিবারণ ও খেঁদু দু'জনেই কথা কহিতে কহিতে তাহাদের কোঠাঘরের উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এ-সবের কিছুই তাহারা জানিতে পারে নাই।

রাত্রে মাংস রান্না হইয়াছে দেখিয়া খেঁদু বলিল, 'এ-সব কখন করলে মা? বাবা তাহ'লে আজ আমায় সত্যিই খাওয়ালেন?'

নিবারণ বলিল, 'গোটা একটা পাঁঠাই কেনা হয়েছে বুঝি? দাম নিশ্চয়ই এখনও দেওয়া হয়নি। কত লাগবে?'

সুরধুনী হাসিয়া বলিল, 'দাম আর লাগবে না।'

চিন্তাহরণ উনোনের কাছে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, বলিলেন, 'হারু নায়েকের পাঁঠাটা তখন ওই কুলতলায় চরছিল, ব্যাটাকে কোনোদিনই ঠিক বাগে পেতাম না, আজ ঠিক পেয়েও গেলাম, তাই লুকিয়ে ধরে এনে দিলাম কেটে।'

নিবারণ বলিল, 'না না, এ আমাদের উচিত হলো না।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'উচিত হ'লো না কি রে? আমাদের হাঁস ছিল প্রায় চোদ্দটা, ওই হেরো ব্যাটার পুকুরে চরতে যেতো, একটা একটা করে' না হবে ত' সাত-আটটা হাঁস ও আমার কেটে খেয়ে দিলে।'

চিন্তাহরণের এ-পক্ষের ছোট ছেলে নন্তু ঘুমাইয়া পড়িবে বলিয়া উনানের কাছেই একটা বাটি লইয়া মাংস খাইতে বসিয়াছিল, ঝোলটা সে পরম পরিতৃপ্তির সহিত চাটিতে চাটিতে বলিল, 'আর আমাদের সেই ময়রকণ্ঠী পায়রাটা বাবা—হারু নায়েকের বেড়ালটাই ত' ধরে খেয়েছে।'

খেঁদুরাণী অবাক্ হইয়া তাহাদের সকলেরই মুখের পানে একবার করিয়া তাকাইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে নিবারণ খেঁদুরাণীকে একখানি ও তাহার বাবাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে—সেখানে তাহার সহপাঠী বন্ধু একজন চাকরি করে, নিবারণ তাহারই বাসায় গিয়া উঠিয়াছে। চাকরি একটি করিয়া দিবে বলিয়া বন্ধু তাহাকে আশা দিয়াছে এবং সেইজন্যই এখন তাহাকে কিছুদিন কলিকাতায় থাকিতে হইবে।

সুরধুনী বলিল, 'তা বেশ ত' ! বৌমা আমার কাছে বেশ ভালই আছে।'

তা খেঁদুরাণী যে তাহার কাছে ভালই আছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই। মা-হারা মেয়ে মা পাইয়াছে। দিবারাত্রি নিজের পেটের ছোট মেয়ের মত 'মা' 'মা' বলিয়া তাহার পিছু পিছু সে ঘুরিয়া বেড়ায়, পাড়া-পড়শীর বাড়ী বেড়াইতে যায়, গল্প করে।

মেয়েরা বলে, 'তা সত্যি বলতে কি মা, এমন সৎ-শাশুড়ী আমরা কারও দেখিনি। এমনটি আর হয় না।'

সুরধুনী বলে, 'অনেক তপস্যা করে' বৌ পেয়েছি মা, ওকে আমার ঠিক নিজের পেটের মেয়ে বলে' মনে হয়।'

রাত্রির অন্ধকারে গ্রামের বাহিরে তাহাদের নিরালা মাটির ঘরখানি সন্ধ্যার পরেই নিঝুম হইয়া ওঠে। বাড়ীর সুমুখে বহুদূর বিস্তৃত ধানের মাঠে তখন ধান কাটা শেষ হইয়া গেছে, কোথায় কোন্ দূরের একটা পুকুরের পাড়ে কিম্বা সেই কাটাধানের মাঠের মাঝখানে যখন শেয়াল ডাকিতে থাকে, খেঁদুরাণী তখন ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়া সুরধুনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'মা, একটি গল্প বল না শুনি।'

সুরধুনী হাসিয়া বলে, 'গল্প কি আর আমি জানি মা ছাই! সেবার আমি এই ভাঙ্গা ঘরে একা ছিলাম, তোমার শ্বশুর বাড়ী ছিল না, তার ওপর ওই সুমুখের পাঁচিলটাও পড়ে গিয়েছিল, সেবার আমি কি রকম ভয় পেয়েছিলাম শোনো! গ্রামে সে-বছর পুকুরের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে কলেরা বসন্ত লেগে গেছে, দিনে রাতে মানুষ মরার আর সংখ্যে ছিল না। একদিন রাত্তির বেলা হলো কি—'

খেঁদু তাহার আরও কোলের কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বলে, 'না মা, ও-গল্প বোলো না, আমার ভারি ভয় করছে।'

তখন সে হাসিয়া অন্য গল্প আরম্ভ করে। এবং শেষ পর্য্যন্ত গল্প শুনিতে শুনিতে খেঁদু ঘুমাইয়া পড়ে।

এমনি করিয়া ভয়ে ভাবনায় দিনের পর দিন কাটিতে থাকে।

সুরধুনী বলে, 'ভয় কোরো না মা, ভয়ের কিছু নেই। মাসের এই অন্ধকার পনেরোটা দিনই যা একটু ভয়-ভয় করবে, তারপর আকাশে চাঁদ উঠলে আর ভয় কিসের!'

খেঁদু জিজ্ঞাসা করে, 'চাঁদ কবে উঠবে মা?'

মা বলে, 'তার এখনও দেরি আছে বাছা। আমার ত' আর কোনও কিছুর ভয় কোনোদিন ছিল না মা, তুমি এসেছ, এতগুলি গয়না-গাঁটি রয়েছে, তাই শুধু যা চোর-ডাকাতের ভয়!'

খেঁদু খানিক ভাবিয়া বলে, 'গয়না এবার আমরা আনিনি বললেই হ'তো। তুমি যে আবার জনে-জনে ডেকে ডেকে দেখাতে গেলে মা!'

সুরধুনী বলে, 'কেন দেখালাম জানো বৌমা? আমাদের সব গরীব বলে' ঘেন্না করে, তাই ডেকে ডেকে দেখালাম—বলি, এই ছাখো, লক্ষ্মীঠাকরুণ আমার বৌমা ঘরে এসেছে, আমরা আর গরীব নই।'

কিন্তু চোর-ডাকাতের কথা শুনিয়া খেঁদুরাণীর মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। এত এত সোনার গহনা, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে বাড়ী, চোর-ডাকাতে অনায়াসে সেগুলা তাহাদের কাছ হইতে মারিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারে। সে-কথা এতদিন সে ভাবিয়া দেখে নাই। খেঁদুরাণীর চিন্তিত হইবারই কথা।

খানিক পরে বলিল, 'আচ্ছা মা, গয়নাগুলোর কোনও ব্যবস্থা করা যায় না?'

'ব্যবস্থা?' বলিয়া সুরধুনী রান্না করিতে করিতে বৌমাকে তাহার কাছে ডাকিয়া বলিল, 'এইদিকে সরে এসো মা, বলি।'

বলিয়াই দু'জনে তাহারা পরামর্শ করিতে বসিল।

পরামর্শে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই স্থির হইল যে, সোনার গহনা যখন 'আভরণ' 'পেট-ভরণ' দুই-ই, তখন সেগুলি অমন করিয়া বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া কোনও লাভ নাই। তাহার চেয়ে সেগুলি বিক্রি করিয়া সেই টাকায় যদি খেঁদুরাণীর নামে ধানের জমি কিনিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে বছর বছর সেই জমির উৎপন্ন ফসল বিক্রি করিয়া অনেক টাকা জমিবে, অভাব ত' তাহাদের কাহারও থাকিবেই না, চাই কি দু'চার বছরের মধ্যে তাহারা বড়লোক হইয়া যাইতেও পারে। এবং খেঁদুরাণীর জয়জয়কার তাহা হইলে ত' হইবেই, অথচ টাকাকে টাকাও রহিয়া যাইবে, জমিজমা কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেও পারিবে না।

আনন্দে খেঁদুরাণী লাফাইয়া উঠিল।—'ঠিক বলেছ মা! উনি না এলে ত' কিছু হবে না; উনি আসুন তাহ'লে কলকাতা থেকে, এলে সেই ব্যবস্থাই হবে।'

সুরধুনীর চোখ দিয়া জল আসিয়া পড়িল। বলিল, 'তোমার ওই নিষ্কর্ম্মা শ্বশুরের হাতে পড়ে জীবনে অনেক কষ্টই সহ্য করেছি মা, এবার বোধ হয় তোমার দৌলতে কষ্ট আমাদের ঘুচলো।'

বেলা অনেক হইয়াছিল। স্নান করিবার জন্য খেঁদু-রাণী উঠিয়া গেল।

সকাল হইতে চিন্তাহরণ সেই যে প্রাচীরের কোণের কাছটিতে বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তখনও তেমনি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া সুরধুনী তাহাকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, 'শোনো!'

চিন্তাহরণ উঠিয়া আসিতেই তাহাদের দু'জনের মধ্যে আবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বোধ করি ওই গহনাগুলি চোর-ডাকাতের হাত হইতে নিরাপদে রাখিবার পরামর্শই চলিতে লাগিল।

রাত্রে সেদিন ছোট ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া দুই শাশুড়ী-বৌএ শুইয়া শুইয়া গল্প করিতেছে, চিন্তাহরণ কোথায় গিয়াছিলেন, অন্ধকারে সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, 'ওগো শুনেছ?'

সুরধুনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল :

'কি গো? কি শুনব?'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'রাধামাধবপুরে কাল ডাকাতি হয়ে গেছে।'

'ডাকাতি!' খেঁদুও উঠিয়া বসিল। তাহার বুকের ভিতরটা তখন ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে।

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'একটা মেয়েকে একেবারে খুন করে' দিয়ে গেছে, আর অনেক টাকার জিনিস-পত্তর সব লুট করে' নিয়েছে। তাই না শুনে আমি চট্ করে' চলে এলাম। ভাবলাম—তোমরা একা রয়েছ, আর যে দিন-কাল পড়েছে, লোকে যে খেতে পাচ্ছে না।'

সুরধুনী বলিল, 'সর্ব্বনাশ! বল কি গো, খুন করে' দিয়ে গেছে?'

চিন্তাহরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। একেবারে খুন। ও ব্যাটাদের শরীরে কি আর মায়াদয়া আছে!'

খেঁদু তাহার শাশুড়ীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁমা, তাহ'লে আমাদের কি হবে?'

সুরধুনী বলিল, 'তাই ত' ভাবছি মা, ভয়ে আমার বুক দুর্ দুর্ করছে।'

খেঁদু বলিল, 'না মা, খুন-টুন করে' দেয় ত' কাজ নেই মা আমার গয়নায়, আমি বলে' দেবো—ওই বড় বাক্সের ভেতরে ছোট হাত-বাক্সে আছে,—তোমরা নিয়ে যাও বাবা, নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও।'

চিন্তাহরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভাঙা সেই নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম অন্ধকার ঘরের মধ্যে সে অট্টহাসি বড় অদ্ভুত শোনাইল। বলিলেন, 'ক্ষেপেছ বৌ-মা! আমি বেঁচে থাকতে কে তোমার গয়না নিতে পারে? তার চেয়ে এক কাজ কর। পথে আসতে আসতে আমি এক বুদ্ধি ঠাওরালাম।'

সুরধুনী বলিল, 'কি বুদ্ধি গো, তাই বল, নইলে যে গেলাম।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'গয়নার বাক্সটা বের কর বৌমা। তারপর চল আমাদের ওই রান্না-ঘরের পাশে কলাগাছের তলায় খুব খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে বাক্সটা বেশ ভাল করে' রেখে দিই গে। চোর আসুক ডাকাত আসুক—কেউ কোনও সন্ধান পাবে না। বলে দেবো—কোথায় পাব বাবা, বৌমা সে-সব কিছুই নিয়ে আসেনি, সব তার বাপের বাড়ীতে আছে।'

খেঁদু বলিল, 'আমার এই গায়েরগুলোও তাহ'লে ওই সঙ্গে দিই।' বলিয়া সে তাহার গায়ের গহনাগুলি খুলিতে যাইতেছিল।

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'হ্যাঁ দাও।'

কিন্তু সুরধুনী নিষেধ করিল। বলিল, 'না মা, ওগুলো তোমার গায়েই থাক্। তা নইলে লোকে যে সন্দেহ করবে।'

শেষ পর্য্যন্ত গায়ের গহনা তাহার গায়েই রহিল। শুধু দামী দামী গহনাগুলি যে-বাক্সে ছিল সেই ছোট হাত-বাক্সটি তাহারা তিনজনে মিলিয়া অন্ধকার উঠানের একপাশে লণ্ঠন জ্বালিয়া অতি সন্তর্পণে কলাগাছের তলায় গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিল।

সুরধুনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্ বাবা, এতক্ষণে বাঁচা গেল।'

খেঁদু বলিল, 'না মা সেই তোমার বুদ্ধিই ভালো। আসুক একবার ও বাড়ীতে, তার পর ওগুলো বিক্রি করে' দিয়ে আমি জমি কিনব।'

সুরধুনী বলিল, 'সেই ভালো বৌমা। নিবারণ যতদিন না আসে ততদিন ওইখানেই থাক্।'

কিন্তু দুর্ভাগ্য এম্‌নি যে, নিবারণের আসা পর্য্যন্ত উহা

আর সেখানে রহিল না। একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, কলাতলার সেই গোপনীয় জায়গাটা খুঁড়িয়া মাটিগুলা এদিক-ওদিক ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এবং যে-বস্তুটির জন্য এত চিন্তা এত পরামর্শ সেই গহনার বাক্সটি সেখানে নাই।

ব্যাপারটা সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়িল সুরধুনীর এবং সে-ই প্রথমে হায় হায় করিয়া বুক চাপড়াইয়া মাথা চাপড়াইয়া ডাকিল, 'বৌমা, দেখে যাও ত' বাছা!'

বৌমা দেখিল। এবং তাহার পরে দেখিলেন চিন্তাহরণ।

অবাক্ কাণ্ড!

সুরধুনী সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। খেঁদুরাণী কাঁদিতে লাগিল। চিন্তাহরণ অবাক্ হইয়া চোখ দুইটা বড় করিয়া কোমরে হাত দিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে বলিলেন, 'অন্ধকার রাত, চোর-চণ্ডাল আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, সেদিন আলো হাতে নিয়ে পুঁততে আসাই যে আমাদের বেকুবী হয়েছিল। বেশ হলো, এখন কি করা যায় বল দেখি? থানায় খবর দেবো?'

কাঁদিতে কাঁদিতে সুরধুনী উঠিয়া বসিল।—'ওগো না গো না, থানায় খবর দিয়ো না গো! পৃথিবী সুদ্ধু জানাজানি হয়ে যাবে তাহ'লে।'

চোখের জল মুছিয়া খেঁদু বলিল, 'হ্যাঁ মা, আমার বাবা যেন না শোনে।'

চিন্তাহরণ বলিলেন, 'বা-রে! এত এত টাকার জিনিস গেল আর আমাদের চুপ করে' থাকতে হবে?'

সুরধুনীর কান্না তখনও থামে নাই। বলিল, 'তা ছাড়া আর উপায় কি বল। লোক-জানাজানি হ'লে কি আর কিছু বাকি থাকবে? কই তুমিই বল ত' বৌমা!' বলিয়া বৌমাকে তাহার কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, 'লোকে ত' আর চুরির কথা বিশ্বাস করবে না বাছা, বলবে শ্বশুর শাশুড়ী অভাবী মানুষ, ওরাই নিয়েছে।'

এই বলিয়া সে ঠিক উন্মাদিনীর মত খেঁদুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। বলিল, 'তাহ'লে কি হবে মা? এ দুর্নাম ত' আমি সইতে পারব না মা, তার চেয়ে আমায় ছেড়ে দাও—আমি জলে ডুবে মরিগে যাই।'

সুরধুনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সত্যই সে জলে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছে ভাবিয়া খেঁদু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'না মা, যাগ্‌গে আমার গয়না, কপালে থাকলে আবার হবে। এ আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই। তুমি অত কেঁদো না মা, তুমি চুপ কর।'

সুরধুনী চুপ করিয়াও এক-একবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।—'কাঁদছি কি সাধে বাছা! অত অত গয়না যে আমি কখনও চোখেও দেখিনি! তুমি যে কেমন করে' চুপ করে' আছ মা কে জানে।'

খেঁদু বলিল, 'যাক্ গে মা। আমার মনে হচ্ছে—বাবা ওগুলো আমায় ভালো মনে দেয়নি, তাই গেল।'

চিন্তাহরণ তখন অদূরে বসিয়া হেঁটমুখে তামাক সাজিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ঠিক বলেছ বৌমা। আমারও ঠিক ওই কথাই মনে হয়েছে।'

কলিকাতায় নিবারণের চাকরি হইয়াছে। পঞ্চাশ টাকা বেতন। চিঠি লিখিয়াছে, 'গহনাটি তোমার বিক্রি করিয়াছি। প্রায় দু'শ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিছু টাকা লইয়া আমার এখানকার খরচ চালাইতেছি। আগামী সপ্তাহে আমার চারদিনের ছুটি আছে, ভাবিতেছি সেই ছুটির সময় বাড়ী গিয়া জমিদারের খাজনাটা মিটাইয়া তোমার হাতে কিছু টাকা দিয়া আসিব। সেই টাকা হইতে সংসার-খরচের জন্য মাকে কিছু দিবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আশা করিতেছি, এবার আর আমাদের কোনও কষ্ট হইবে না।'

কিন্তু চিঠিখানি লিখিবার পরেই খেঁদুর গহনা চুরির সংবাদ পাইয়া নিবারণকে তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিতে হইল।

সুরধুনী এত কান্না কাঁদিতে লাগিল যে, তাহাকে চুপ করানো দায় হইয়া উঠিল। নিবারণ বলিল, 'কি আর করবে মা, অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন এমনিই হ'য়ে থাকে। চুপ কর।'

সেইদিনই বৈকালে জমিদারের খাজনা দিবার জন্ত বিমর্ষ ম্লান মুখে গ্রামের ভিতর দিয়া নিবারণ কাছারী-বাড়ীর দিকে যাইতেছিল। কলিকাতায় তাহার চাকরি হইয়াছে সেকথা ইহারই মধ্যে গ্রামের লোকের আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। যাহারই সঙ্গে দেখা হয় সে-ই বলে, 'এই যে নিবারণ, কবে এলে কবে? শুনলাম কলকাতায় তোমার বেশ মোটা মাইনের চাকরি হয়েছে। তা বেশ বেশ, শুনে ভারি আনন্দ হ'লো।'

দীনু ভট্‌চাজের বৈঠকখানায় পশুপতি বোধ করি তাহার দোকানের টাকার তাগাদায় আসিয়া তামাক টানিতেছিল। কথাটা শুনিবামাত্র হুঁকা হাতে লইয়াই পশুপতি কাশিতে কাশিতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল, 'হ্যাঁ, নিবারণ আমাদের ছোক্‌রা খুব ভালো যে! তা ভালই হ'লো, তাহ'লে আমার দোকানের টাকাটা এবার—'

নিবারণ বলিল, 'হ্যাঁ আমিই দেবো।'

পশুপতি বলিল, 'বেশ বেশ, বাপের কষ্টটা এইবার ঘুচিয়ে দাও বাবা! সময়ের ছেলে—মানুষ এইজন্যেই চায়।'

দীনু ভট্‌চাজও বাহির হইয়া আসিলেন। হুঁকাটা লইবার জন্ত পশুপতির দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'তা কম বয়েসে ওই ছেলেটা হয়েছিল তাই রক্ষে! চিন্তাহরণের কষ্টটা তবু ঘুচলো এদ্দিন পরে।'

এই বলিয়া তিনি হুঁকাটা টানিতে টানিতে রাস্তার উপর নিবারণের কাছে আগাইয়া আসিলেন।—'চাকরিটি তোমার শ্বশুরমশাই করে' দিলেন, কি বল?'

নিবারণ বলিল, 'আজ্ঞে না, আমি নিজেই জোগাড় করলাম।'

দীনু ভট্‌চাজ একটুখানি বিস্মিত হইয়া গিয়া বলিলেন, 'নিজেই জোগাড় করলে? বাঃ! তাহ'লে তোমার বাহাদুরী আছে বাবা।' বলিয়াই তিনি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'একটা সন্ধান-টন্ধান রেখো দেখি বাবা, আমাদের মত এই মুখ্যু-শুখ্যু মানুষের পক্ষে—এই ধর ঠাকুরসেবার কাজ-কাজ···তা ছাড়া রসুইএর কাজও আমি বেশ ভালই করতে পারি। বুঝলে? মনে থাকবে ত?'

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, ভট্‌চাজ আবার তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এই তোর হাতে ধরে বলছি বাবা নিবারণ, বড় কষ্টে পড়েছি।' বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাঁহার জল আসিয়া পড়িল।

তাঁহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে নিবারণ পথ চলিতেছিল। পথের পাশেই বিনোদ স্যাক্‌রার বাড়ী। সে তাহার রাস্তার ধারের ছোট্ট ঘরখানিতে বসিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া সোনারূপার গহনার কাজ করে। লোকটির বয়স হইয়াছে; বোধ করি চিন্তাহরণের চেয়েও বড়।

পিছন হইতে তাহারই ডাক শুনিয়া নিবারণ থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিনোদ তাহার নিকেলের চশমা কপালে তুলিয়া বাঁশের একটা নলের মুখে আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বলিল, 'এসো বাবাজি, তোমাকেই ডাকছিলাম।'

নিবারণ তাহার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'কি বলছ?'

বিনোদ বলিল, 'বোসো ওই চাটাইএর ওপর ভাল করে' চেপে। তারপর শোনো। কাল আমি শহরে গিয়েছিলাম বাবাজি, সোনার বাজার আর মেয়েমানুষের যৈবন—ও দুই-ই সমান বাবা, উঠতেও যতক্ষণ আবার পড়তেও ততক্ষণ।'

কথাটার অর্থ নিবারণ ভাল বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বিনোদ বলিল, 'তোমার বাবা আমায় বলেছিলেন বটে যে, নিবারণকে বোলো না বিনোদ, এ-সবে তার বড় লজ্জা। কিন্তু এতে আর লজ্জার কি আছে বাবাজি? মেয়েছেলের গয়না কে বিক্রি করে না শুনি? বিপদে পড়লে কত বড় বড় মিঞাকে ওই কাজ করতে হয়। তবে তোমার বৌ-ঠাকরুণ বড়লোকের মেয়ে, ওর গয়না কি আর বলতে আছে বাবা, তাই খাঁটি বলেই কুড়িটাকা দর দিয়েছে। বল যদি ত' কালই শহরে গিয়ে আমি ওটির ব্যবস্থা করে' দিয়ে আসি।'

নিবারণ বলিল, 'আমি কিছু বুঝতে পারলাম না বিনোদ, ভাল করে' খুলে বল।'

বিনোদ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। বলিল, 'বুঝতে ঠিক পেরেছ বাবাজি, তবে কিনা লজ্জা···তা

লজ্জা একটুখানি হয়। কিন্তু আগেই ত' বলে দিলাম বাবাজি, লজ্জা আমায় কোরো না। তবে শোনো আর-একবার খুলেই বলি। আমাদের দাদাঠাকুর—তোমার বাবা গো,—সেদিন চুপি-চুপি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললাম, পেন্নাম দাদাঠাকুর, আসতে আজ্ঞা হোক্। উনি বললেন, 'আমার একটি বিশ্বেসী কাজ তোমায় করে দিতে হবে বিনোদ। কাউকে বলতে পাবে না কিন্তু। এমন-কি আমার ছেলে নিবারণকে পর্য্যন্ত না। নিবারণের বড় লজ্জা তা ত তুমি জানো, তাই সে আমাকে পাঠালে। এই বলে' একটি সোনার গয়না আমার হাতে দিয়ে বললেন—ওজন করে ছাখো আগে ক'ভরি হয়। বড্ডো টাকার দরকার, এটি তোমায় কিনতে হবে।' গয়না দেখেই বুঝলাম—এ আর কারও নয়, তেমন গয়না তোমার বৌ ছাড়া এ গাঁয়ে আর কার আছে বল! ওজনে সাড়ে পাঁচ ভরি হ'লো। বললাম, এত টাকা ত' আমার কাছে হবে না দা'ঠাকুর, এটি আপনাকে বিশ্বেস করে' আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। শহর থেকে যাচাই করে' দামে যদি পোষায় ত' শহরেই বিক্রি করে' আসব। দাদাঠাকুর হেসে বললেন, শোনো বিনোদের কথা! তোমায় আবার কবে অবিশ্বাস করেছি বিনোদ! তাই সে জিনিসটি আমি কাল শহরে যাচাই করে' এসেছি বাবাজি। নিজের এক পয়সা লাভ না রেখে আমি এই বিশ্বকর্ম্মার হাংড়ি ছুঁয়ে বলছি বাবাজি, অনেক দোকান ঘোরাফেরা করলাম, কিন্তু কুড়ি টাকার বেশি দর আর কোথাও পেলাম না। তাই তোমায় জিজ্ঞেস্ করছি বাবাজি—যদি বল ত' ওই দরেই বিক্রি করে' আসি, আর না যদি বল ত' গয়নাটি নিয়ে যাও।—বাস্, এই ত' কথা।'

নিবারণের মাথার ভিতরটা কেমন যেন করিতেছিল। বলিল, 'কই দেখি গয়নাটা।'

'অত দামী গহনা বাবাজি, একটুখানি সন্তর্পণে রেখেছি।' বলিয়া বিনোদ তাহার কোমর হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কাগজে-মোড়া গহনাটি আনিয়া নিবারণের হাতে দিয়া বলিল, 'ছাখো।'

নিবারণ দেখিল, খেঁদুর মাথার টায়রা। দেখিবামাত্র তাহার নিজের মাথাটাও ঘুরিয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুচ্‌কি একটুখানি হাসিয়া গহনাটার দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কি তাহার করা উচিত তাহাই ভাবিল। তাহার পর বিনোদের হাতে কাগজ-সমেত গহনাটি সে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'রাখো। কিন্তু শোনো, একটি কথা তোমায় বলি। আমার কাছে এ গয়না সম্বন্ধে তুমি যে কোনও কথা বলেছ বা এ গয়না আমায় দেখিয়েছ—বাবাকে কি অন্য কাউকে এ-কথা তুমি বলতে পাবে না বিনোদ।'

বিনোদ বলিল, 'তা বেশ। বারণ যখন করছ বাবাজি, তখন আর বলব না।'

নিবারণ বলিল, 'বাবা যা বলেন তুমি তাই কোরো। বুঝলে?'

বলিয়া নিবারণ আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। জমিদারের কাছারিতে যাওয়া আর তাহার হইয়া উঠিল না। যে-পথে আসিয়াছিল আবার সেই পথ দিয়াই বাড়ী ফিরিয়া চলিল।

বাড়ী!—নিবারণের ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত সেই নভোমণ্ডলের অসীম বিস্তারের পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া ভাবিল—নিজের মা যার নাই তার আবার বাড়ী কোথায়?

খেঁদুকে নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তোমার সে বাক্সের মধ্যে কি কি গয়না ছিল?'

খেঁদু বলিল, 'যা আমার গায়ে আছে আর তুমি যেটি নিয়ে গিয়েছিলে, তা ছাড়া সবই ছিল। মাথার টায়রা, সাতনরী, গিনিবাঁধা ব্রেস্‌লেট্, রতনচূড়, অনন্ত, তাবিজ—'

নিবারণ শিহরিয়া উঠিল। বলিল, 'থাক্, আর শুনতে চাই না। মাথার টায়রাটাও ছিল?'

'হ্যাঁ ছিল। তাই যদি বুদ্ধি করে' পরে' থাকতাম ত' চোরে এমন করে'—' বলিতে গিয়া চোখদুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

নিবারণ বলিল, 'চল আমরা দু'জনে কলকাতায় থাকি গে।'

খেঁদু তাহার কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছিয়া বলিল, 'সত্যি বলছ ?'

নিবারণ বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। কোনরকমে কষ্ট করে' দু'জনে—'

খেঁদু বলিল, 'কষ্ট কি গো! তোমার সঙ্গে আমি গাছতলায় গিয়ে থাকতে পারি, ভিক্ষে করে' খেতে পারি।'

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল।

রাত্রে খাইতে বসিয়া নিবারণ বলিল, 'তোমার বৌমাকে আমি কাল কলকাতায় নিয়ে যাব মা।'

কথাটা সুরধুনীর বুকের ভিতরে গিয়া ধ্বক্ করিয়া বাজিল; বলিল, 'সে কি রে! এরই মধ্যে, চাকরি পেতে না পেতেই ?'

নিবারণ বলিল, 'হাঁ মা, নইলে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

ইহার পরে আর কথা চলে না। সুরধুনীও নিষেধ করিল না। বলিল, 'তা বেশ বাবা, যাতে যা ভাল হয় তাই কোরো। তোমার ওপরেই আমার একমাত্র ভরসা।'

পরদিন সন্ধ্যার ট্রেনে তাহারা কলিকাতায় যাইবে। ষ্টেশনে যাইবার জন্য চিন্তাহরণ নিজেই গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। খেঁদুর বাক্স-প্যাঁট্‌রা গাড়ীতে তোলা হইল। সুরধুনী কাঁদিতে লাগিল। মাকে ছাড়িয়া যাইতে খেঁদুর চোখেও জল আসিল।

সুরধুনী বলিল, 'আমাদের যেন ভুলে থেকো না মা।'

ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিয়া খেঁদু গাড়ীর উপর উঠিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

*

* *

তাহার পর আট বৎসর পার হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে আমরা কাহারও কোনও সংবাদ লইতে পারি নাই।

ওদিকে বাপের সংবাদ ছেলে রাখে নাই, ছেলের সংবাদও বাপ জানিতেন না।

সে বৎসর মাঘ মাসের এক দুরন্ত শীতের সকালে দেখা গেল, বাসার নম্বর খুঁজিয়া খুঁজিয়া চিন্তাহরণ নিবারণের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বহুদিন পরে নিবারণ তাহার বাবাকে দেখিয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আসুন!'

চিন্তাহরণ ছেলেকে দেখিয়াই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

খেঁদু তাহার রান্নার জায়গায় উনানের কাছে বসিয়া বসিয়া চা তৈরি করিতেছিল, মুখ তুলিয়া শ্বশুরকে দেখিবামাত্র মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিল।

চোখ মুছিয়া কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া চিন্তাহরণ বলিলেন, 'এমনি করেই কি ভুলে থাকতে হয় মা? ভাল আছ ত' ?'

নীরবে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া খেঁদু আবার তাহার উনানের কাছে গিয়া বসিল।

চিন্তাহরণ তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিলেন, 'এই আট বছর তোরা দেখলি না বাবা, এর মধ্যে কত কাণ্ড যে ঘটে গেল, কত ঝড়-ঝাপ্‌টা যে পেরোলো মাথার ওপর দিয়ে তার আর ইয়ত্তা নেই। অত কষ্ট করে' সুধার বিয়ে দিলাম। বিয়ের একটি বছর পেরোতে না পেরোতে গলায় দড়ি দিয়ে মেয়েটা মরে' গেল। তাই নিয়ে কত হাঙ্গামা যে হ'লো তা আর বলবার নয়। মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। কিন্তু ওই মেয়েটার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছি বাবা। জমিজমা আর কিচ্ছু নেই, আমরা পথের কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি।'

সুধা-মেয়েটিকে খেঁদু অত্যন্ত ছোট দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার বিবাহ হইয়াছে এবং ইহারই মধ্যে সে মরিয়াও গেছে শুনিয়া সে সত্যই একটুখানি দুঃখিত হইল। মুখ তুলিয়া একটুখানি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গলায় দড়ি দিয়ে ম'লো কেন ?'

'কেন মলো সে কি আর কিছু বলে গেছে মা? শুনলাম নাকি গয়না নিয়ে তার মা'র সঙ্গে ঝগড়া

হয়েছিল, পরের দিন সকালে উঠে দেখি, কলাতলার কাছে রান্নাঘরের চালায় মেয়েটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।'

কথাটা বলিতে গিয়া তিনি যেন একবার শিহরিয়া উঠিয়া চুপ করিলেন। চোখ দিয়া তাঁহার দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

খেঁদু কিন্তু সেদিকে বড়-একটা ভ্রূক্ষেপ করিল না, তাহার কানের কাছে শুধু দুইটা কথা যেন বারে-বারে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল—'গয়না নিয়ে ঝগড়া' আর 'সেই কলা-তলার কাছে।'···খেঁদুর চোখ দুইটা নাজানি কেন অকারণেই ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার দুনিয়ায় কি তবে ঠিক এমনি করিয়াই হয়!

চোখ মুছিয়া চিন্তাহরণ বলিলেন, 'ভগবানের এমনি অবিচার মা, একটা মেয়ে ত' আমায় সর্ব্বস্বান্ত করে দিয়ে চলে গেল, তার জায়গায় আবার আরও দুটো পাঠিয়ে দিলেন। এই ছোট মেয়ে দুটোকে তোমরা দেখে আসোনি।'

তাহার পর সকলেই চুপ। কাহারও মুখে আর কোনও কথা নাই!

বাসার ঝি বোধ করি কাজকর্ম্ম সারিয়া চলিয়া যাইতেছিল। খেঁদু বলিল, 'দাঁড়াও মানদা, গায়ের কাপড়টা তোমার নিয়ে যাও।'

এই বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া এ-ঘরের আলমারি খুলিয়া রঙিন একখানি গায়ের কাপড় ঝি'র হাতে দিয়া বলিল, 'শীত শীত করছিলে, হয়েছে ত' এবার?'

ঝি খুশী হইয়া গায়ের কাপড়খানির ভাঁজ খুলিয়া তৎক্ষণাৎ গায়ে দিয়া হাসিতে হাসিতে গড় হইয়া খেঁদুকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল. 'হ্যাঁ মা, হয়েছে।'

চিন্তাহরণ সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন, ঝি চলিয়া গেলে নিবারণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'অমনি একটা যদি আমাকেও কিনে দিস্ বাবা, শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি।'

নিবারণ ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল কিছুই বুঝা গেল না।

এতক্ষণ পরে সাহস পাইয়া চিন্তাহরণ বলিলেন, 'আর অমনি যদি গোটা-পাঁচেক টাকা তোর মা'র নামে মণি-অর্ডার করে'··ছেলেমেয়েগুলো দুবেলা পেট ভরে আজকাল খেতেও পায় না।'

এবারেও নিবারণ মুখে কিছু না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া বোধ করি তাহার সম্মতি জানাইল।

৬

খেঁদু সেদিন রাত্রে তাহার স্বামীকে একা পাইয়া বলিল, 'ভগবান নেই নেই করছিলাম, কিন্তু শুনলে ত'··· অত অত নিয়েও আবার সেই দশা! কিন্তু হ্যাঁগা, উনি তোমার ঠিকানা কেমন করে' পেলেন? তুমি কি চিঠি পত্র কিছু··'

নিবারণ বলিল, 'না।'

কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল কথাটা সম্ভবত সে গোপন করিল।

'যাই হোক্ তুমি যেন আর-কিছু ওঁকে দিয়ো না।'

নিবারণ এবারেও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

দিন দুই-তিন পরে একদিন রাত্রে দেখা গেল, চমৎকার একখানি গরম আলোয়ান গায়ে দিয়া চিন্তাহরণ খাইতে বসিলেন। খেঁদু বার-বার সেই আলোয়ানটির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে নিবারণকে কোনো কথাই সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

রাত্রে সকলের খাওয়া-দাওয়া তখন চুকিয়া গেছে। পাশাপাশি দু'খানি ঘর। বাহিরের ঘরে চিন্তাহরণ শুইয়াছেন, আর ভিতরের ঘরে ইহারা দুই স্বামী-স্ত্রী। মাঝখানে একটি বন্ধ দরজার ব্যবধান।

খেঁদু বেশ জোরে-জোরেই জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, ওই আলোয়ান তুমি ওঁকে কিনে দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' বলিয়া হাতের ইসারা করিয়া নিবারণ বলিল, 'চুপ। এত জোরে চেঁচিয়ে বলে? ছি! শুনতে পাবে যে!'

'শুনুক্ না! শুনিয়ে শুনিয়েই ত' বলছি!'—খেঁদু চীৎকার করিতে লাগিল।—'কেন, সেদিনের কথা ভুলে

গেলে? যেদিন ওঁরা আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে' নিয়ে পথে বসিয়েছিলেন! আজ আবার সেই ছেলে-বৌএর কাছে হাত পাতা কেন—কেন শুনি!'

হাঁ হাঁ করিয়া নিবারণ তাহার মুখে হাত দিয়া চুপ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলিল, 'অভাবে পড়লে মানুষের তখন আর—'

'কাণ্ডজ্ঞান থাকে না তা জানি। সৎ-মা যা-খুশী তাই করুক্ তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাবা ত' সৎ নয়।'

এই বলিয়া ঠিক উন্মাদিনীর মত খেঁদু তাহার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া সুরু করিল।—'খবরদার বলছি—ওঁকে তুমি একটি পয়সা দিতে পাবে না, যথেষ্ট দিয়েছি, আমার সর্ব্বস্ব দিয়েছি, আমার মান সম্ভ্রম, বাবা আমার মরে গেল তবু তাকে আমি একবার শুধু ওই গয়নার লজ্জায়...'

বলিতে বলিতে গলাটা তাহার আটকাইয়া আসিল, চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল, তবু সে থামিল না। যে-সব কথা সে অনর্গল বলিয়া চলিল খেঁদুর মুখ দিয়া তাহা যে কোনোদিন বাহির হইতে পারে নিবারণ সে কথা বিশ্বাস করে নাই। কোনোপ্রকারেই তাহাকে চুপ করাইতে না পারিয়া সে শুধু স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে লজ্জায় আর নিবারণ তাহার বাবাকে মুখ দেখাইতে পারিতেছিল না। তব সে জোর করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া একবার বাহিরের ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, বাবা যদি কোনো কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন ত' সে বলিবে,—গয়না চুরি যাওয়ার পর হইতে মাথাটা তাহার মাঝে-মাঝে এমনি গোলমাল হইয়া যায়, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কথাই সে বলিতে পারে না, কাঁদে আর অমনি করিয়া যা মুখে আসে অনর্গল তাহাই বকিতে থাকে। এ তাহার একটা কঠিন ব্যারাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু চিন্তাহরণ তাহাকে কোনও কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, পায়ের শব্দ পাইবামাত্র মুখ তুলিয়া তাকাইলেন। চোখ দুইটা লাল!

নিবারণ কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা তাহার আর হইয়া উঠিল না, চিন্তাহরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটা ঢোক্ গিলিয়া একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, 'আজ আমায় যেতে হবে নিবারণ, এক্ষুণি যেতে হবে, বিশেষ একটা জরুরী কাজ—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ...এই সকালের ট্রেণে...আমি উঠি।'

নিবারণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না। তাহার পর যখন দেখিল তিনি তক্তপোষ হইতে নামিয়া তাঁহার ছেঁড়া জুতাদুইটি পায়ে দিয়াছেন, তখন বলিল, 'আজ ত' আমার কাছে টাকা—'

'থাক্ সে হবে এরপর, তুই কিছু মনে করিসনি বাবা!' বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং চলিয়া যাইবার আগে রাস্তা হইতে মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত সকরুণ ম্লান দৃষ্টিতে নিবারণের মুখখানি বোধ করি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন।

নিবারণের কি যে হইল কে জানে, সে না পারিল দু'পা আগাইয়া গিয়া দরজার কাছে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে, না পারিল কোনও কথা বলিতে; কি করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মত দেওয়ালের একটা ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার নজরে পড়িল তাহারই কিনিয়া-দেওয়া আলোয়ানখানি ভাজ করিয়া তিনি তক্তপোষের উপর ফেলিয়া গেছেন, ওদিকে টিনের একটা চেয়ারের উপর ছোট একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলিতে কি যেন বাঁধা রহিয়াছে। পুঁটুলিটি নিবারণ খুলিয়া দেখিল, সযত্নে একটুকরা খবরের কাগজে মোড়া কয়েকটি বিস্কুট, গোটা-দুই-তিন শুকনো সন্দেশ ও একটি নারকেলের নাড়ু! প্রত্যহ তাহার জল খাবার হইতে কাটিয়া সেগুলি বোধ করি তিনি বাড়ী লইয়া যাইবার জন্যই সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আবার তেমনি করিয়া পুঁটুলিটি বাঁধিতে গিয়া নিবারণের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

এদিকে খেঁদু আসিয়া দরজার কাছ হইতে বাহিরের ঘরে একবার উঁকি মারিয়া বলিল, 'উনি কোথায় গেলেন?'

নিবারণ জবাব দিল না।

'তুমি অমন করে' বসে রয়েছ যে?'

নিবারণ নিরুত্তর।

'কথার জবাব দাও না কেন? কি করছ কি?' বলিয়া খেঁদু ধীরে-ধীরে তাহার স্বামীর কাছে আগাইয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দেখিল, কিছুই সে করে নাই, পাগলের মত একদৃষ্টে সে নীচের দিকে তাকাইয়া আছে, আর সেই ভাজ-করা নূতন আলোয়ান-খানির উপর টস্ টস্ করিয়া তাহার চোখের জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

নতুন মা

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

হেসে হেসে গেলো পেটে খিল্ ধরে—ব্বাপ্ !!
একরত্তি ছেলে ওই এ কী তার দাপ্ !
হাত পা তো কচি ফুল, নড়বড়ে ঘাড়,
সারা বিছানাটা তবু করে তোলপাড় !

ওগো—ওগো ! শীগ্‌গির এসে দেখে যাও !
রাখো বাপু লেখাপড়া ! এসো মাথা খাও !
পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি ! এসো একবার,—
এ ছেলে তো নিয়ে আমি পারিনেকো আর !

অদ্ভুত বুদ্ধি যা'—দেখে লাগে তাক্ !
হাত থেকে কেড়ে কিছু যদি বলি—রাখ্ !
মুঠি এঁটে ঠিক সেটা চেপে ধরে রয় ;—
'ন-ন্—না-না—' বলে সে যে কতো কথা কয় !

অতো ভারী ওর সেই নেটের কভার্
ঘুমোলে বিছানা ঢেকে দিই যত বার,—
বল্‌লে—হয়তো তুমি ভাব্‌বে—এ মিছে—
—লাথি মেরে খোকা রোজ ফেলে দেয় নীচে।

এই ছাখো ! উঠ্‌চি যে বুঝেচে তা' ঠিক !
আঁকড়ে আঁচল ধরে হাসে ফিক্-ফিক্ !!
—এই বোকা ! খাস্‌নিকো কাপড়ের কোণ !
বমি হয়ে যাবে পাজি !—না না—যাদুধন !

বিষম চালাক বাপু তোমাদের খোকা !
আমি নিজে ওর কাছে বনে' যাই বোকা !
দিন দিন বেড়ে চলে দুষ্টুমি যতো,—
অথচ মুখটি ছাখো !—যেন ভালো কতো !

লোকচেনা শিখে গেছে,—দেখনি তো মজা !
বুঝতে পারে ও ঠিক, যেই আসে ভজা !
কোকিয়ে কেঁদে যা' ওঠে রেগে একেবারে !
ও ছোঁড়া কি এ ছেলেকে সামলাতে পারে ?

ওরে ভজা ! ভরে আন্ দুধের বোতোল !
এই গো !! পেয়েচে টের !!·· বাধালে যে গোল !—
সরে যা' সরে যা' ব্যাটা কটকের উড়ে !!
তোকে দেখে খোকাবাবু ওঠে জ্বলে পুড়ে !

গেল গেল !···ভাঙলে গো !! ঝুম্‌ঝুমিটাকে !—
যা-ই দাও মুখে পুরে চুষ্‌বে ও তাকে।
কাঁথাগুলো স্যাতা হোলো ছুঁড়ে ফেলে ফেলে !
সামলানো দায় ওকে,— যে দামাল্ ছেলে !

বুকে হাঁটে ঘরময় পিছ্‌লানি খেয়ে !
সে বড়ো মজার ! তুমি দেখনি কি চেয়ে ?
এই ছাখো, সারা ঘরে কি কোরে ও ঘোরে !—
ধরো—ধরো—মাথা ঠুকে যায় বুঝি দোরে !

না—না—ছাড়ো, চুপ্ কোরে ছাখো ও'কি করে ?
ওমা ! ওমা ! হামা টেনে ঘুরছে যে ঘরে !
উঁচু খাটে শোয়ানো তো চল্‌বেনা আর !
কখন্ কী করে বসে,—ঠিক নেই তার !

তুমি বলো—আমি করি কেবলি নালিশ্ !—
দেখচো কি কাণ্ডটা !· ·পাশের বালিশ
অতো বড়ো ভারী মোটা, তাকে ঠেলে ঠেলে—
মেঝেতে ফেলেচে ওই একফোঁটা ছেলে !

নাওয়া খাওয়া নিয়ে ওর রোজ মারামারি !
হিম্‌সিম্ খেয়ে যাই,—একলা কি পারি ?—
ধরো দেখি একবার, দেখে আসি ছুটে,—
ভাঁড়ারে রাঁধুনী বুঝি নিলে সব লুটে !

কি কোরে হোলো গো এটা এমন ডাকাত !
ভয় ডর নেই মোটে !—সবেতেই হাত !
পিছন ফিরেছো যদি পলকে চোখের !
অমনি যা হোক্ ক্ষতি করেছে লোকের !

একবার দু' মিনিট যেই উঠে গেছি!
অমনি চেঁচিয়ে উঠে করে চেঁচামেচি!!
সবটা মোজার বোনা টেনে দেছে খুলে!—
গিয়েছিনু রেখে ওটা পাশে ওর ভুলে।

'ক্ষুদে শত্তুর' সাধে বলেছি কি তাই?—
যা' কিছু পড়বে চোখে, তক্ষুনি চাই!
টেনে ছিঁড়ে মুখে পুরে—চেটে চুষে শেষে—
দফা রফা করে বাবু ফেলে দেন্ হেসে!

তবে রে দুষ্টু! দেবো পিঠে এক কীল!!
ছাখো মজা! যতো বকি, হাসে খিল্-খিল্!
উহু-হু-হু—লাগে—লাগে! ওরে! ছাড়্ চুল!
—ওরি ভয়ে কাণে আর পরিনে তো দুল!

তুমি বলো- আজকাল বদ্‌লেছো বীণ্!
কেশ-বেশ কমছেই—ক্রমে দিন-দিন!
বুড়ী বনে যেতে দেখি বড় বেশী তাড়া!
ষোলো বছরেই যেন দিদিমার বাড়া!

তোমার কী!! খাও দাও যাও কাছারীতে।
হয়না তো এ' বাবুর ঝক্কিটি নিতে!
বুড়ো হয়ে পড়ি সাধে? না পেরোতে ষোলো!
এখন যে 'মা' হয়েচি,—সেটা কেন ভোল?—

জানোনা তো সাজা-গোজা কেন পারিনাকো!
বুঝবে তা' হাড়েহাড়ে, বাড়ী যদি থাকো!
চুল্-টুল্ আঁচ্‌ড়িয়ে যেই রোজ সাজি'—
অম্‌নি হাঁটকে দেয় এই ছেলে পাজি!

টীপ্ তো পরার মোটে জো'টি নেই আর!
দেখলেই জিভে চেটে খাওয়া চাই তার!
ভালো শাড়ী পরলেই ওঠা চাই কোলে,—
ভরে দিতে 'হিসি' আর বমি নালে-ঝোলে।

এই হার কতোবার ছিঁড়লে ও টেনে,—
নেবেনা তো আর কিছু,—যদি দিই এনে।
আঁচলের চাবি নিয়ে পুরে দেয় মুখে,—
তোমরা তো হাসবেই!…আছো কিনা সুখে!

মার চেয়ে বাপ বড়?—ঈষ্, তাই নাকি!!
—দশমাস দশদিন বওয়া বুঝি ফাঁকি?—
এ' নয়কো তোমাদের আল্‌গোছে চুম্!
—দিনে ছুটী নেই যার, রাতে নেই ঘুম।

রোগে রাগে কান্নায় মায়েদেরই দায়।
বাপেরা এ ঝন্‌ঝাট্ পোয়াতে কি চায়?—
ওমা এ কি! খোকা দেখি ঘুমে পড়ে ঢুলে,—
চুপ্! চুপ্! কাজ নেই আর কথা তুলে!—

যবনিকা

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

কড্-লিভার অয়েলটা দুধের ভেতর ফেলে চামচ দিয়ে নাড়্‌তে নাড়্‌তে মাষ্টার মশাই ব'ল্লেন, তাহ'লে সত্যি সত্যিই চ'ল্লে কৃত্তিবাস?

খাওয়ার পরে আরাম্-চেয়ারে ব'সে কৃত্তিবাস বিশ্রাম করছিল, একটু হেসে ব'ল্‌ল, হ্যাঁ, চল্লুম বৈ কি!

—বেশ যাও, সাবধানে থেকো।…কড্‌লিভার অয়েলটা মাষ্টার মশাই গালের ভেতর ঢেলে দিলেন। পরমুহূর্ত্তেই মুখখানাকে বিকৃত ক'রে ব'ল্লেন, রাম রাম, কি গন্ধ রে বাবা, আর যে কদ্দিন অদৃষ্টে এই ভোগ আছে তাই ভাবি! তুমি তো বাপু এম্নিই খাও, আমি যে এতটা দুধ মিশিয়ে নিই, তাইতেই যেন পেটের নাড়ী উল্টে আস্‌তে চায়!

কৃত্তিবাস বল্ল, আমিও ও ঘোড়াডিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েচি, খেলেই আমার পেটের গোলমাল হয়।

মাষ্টার মশাই পাশের কুঁজো থেকে একটু জল ঢেলে নিয়ে খেলেন। তার পরে কৃত্তিবাসের পাশেই আরেকখানা চেয়ারে ব'সে পড়্‌লেন।

অল্প একটু চুপ ক'রে থেকে মাষ্টার মশাই ব'ল্লেন,

ফিরে গিয়ে অত্যেচার-টত্যেচার আর ক'রো ট'রো না, নিরিবিলি যে ক'টা দিন পারো—কাটিয়ে দাও। এম্নি শালা পাজী অসুখ—

কৃত্তিবাস হেসে ব'ল্ল, যা বলেচেন !

—কেমন ঠিক ব'লেচি না ? আরে বাপু, মানুষের অসুখ বিসুখ হয়, দু'দিন চারদিন প'ড়ে থাকে—না হয় দু'মাসই প'ড়ে থাকে, আবার দিব্যি ভালো হয়—কাজ করে, কাম করে, খায়, দায়·· চুকে গেল ল্যাঠা ! আর এই যে শালা পাঁচ-পাঁচটি মাস বিছানার ওপর সটান লম্বা হ'য়ে আছি—ওই যে নাইন্‌টি নাইন্ পয়েন্ট্ টু—ও আর যাবেই না ! আর ওই যে যোগেশ ডাক্তারের কথা তোমায় ব'লেচিলুম না ? রোজ খুশ্‌খুশে কাশী হয়, ডা'ন ধারে নিশ্বেস নিতে গেলে চিড়িক্ ক'রে টাটিয়ে ওঠে, কিছু পারিনে হজম ক'র্‌তে—সন্ধ্যেবেলায় জ্বর জ্বর ভাব ! গেলাম ওর কাছে। ব্যাটা তো এক দিগ্‌গজ, ব'ল্লে, কিছু না—লিভারের একটু দোষ, এই ওষুধ লিখে দিলুম, দু' তিন শিশি খেলেই সেরে যাবে।·· হঠাৎ একদিন তামাক খেয়ে পাইখানায় যাচ্ছি, খক্ ক'রে এলো কাশী। মাটিতে ফেল্‌লুম—এক দলা রক্ত!·· গেলুম আবার যোগেশ ডাক্তারের কাছে। বুক পরীক্ষা ক'রে ব'ল্লে, তাই তো একটু সন্দেহই হ'চ্চে, যাক্, কড্‌লিভার-টার খান্। গোটা-কত ক্যালসিয়াম ইঞ্জেক্‌শান দিয়ে দিচ্চি, ভালোমতন্ খাওয়া দাওয়া ক'র্‌বেন, আর বেশী পরিশ্রমের কাজ কিছু করবেন না। পরিশ্রমের কাজ ক'র্‌বেন্ না মানে যে এই রকম দাঁত মুখ সিঁটকে দিবারাত্রি প'ড়ে প'ড়ে লম্বা ঘুম দেয়া—এ কি আর জান্‌তুম ? ইস্কুলে ব'কে ব'কে আস্‌তো দারুণ ক্লান্তি—কাজেই ইস্কুল থেকে নিলুম ছুটি ! বাড়ীতে তাশ-পাশার আড্ডা বানিয়ে নিলুম, একটা তরকারির ক্ষেত করলুম—ভাব্‌লুম বেশ থাক্‌চি ! এদিকে যে আমার কর্ম্মশোধ ক'রে আন্‌চে—

কৃত্তিবাস ব'ল্‌ল, তাই তো, প্রথমটা তো বুঝ্‌তে পারাই মুস্কিল কি না !

—আবার তাও বলি বাপু। ওই তো গাঁয়ের ইস্কুল—বাড়ী থেকে রোজ আট্ মাইল ঠেঙিয়ে তো আর ইস্কুল করা যায় না—থাক্‌তুম ইস্কুলেরি বোর্ডিং-এ। খাওয়া দাওয়া যা' হ'ত, মরি মরি ! কলা, কচু, মোচা··· সকল ক'টা মিলিয়ে এক ঘ্যাঁট্, তা'তে না আছে নুন, না আছে হলুদ ! এক বাটি কড়ায়ের ডাল—বদ্ধোমানের কড়ায়ের ডালের কথা শুনে থাকবে বোধ হয়—আর মোটা চালের গুটিকখানিক আ-ফোটা ভাত ! এই তো খাওয়া, এ খেয়ে যদি ব্যারাম না হয় তবে আর হবে কিসে তাই বল।

কৃত্তিবাস ব'ল্‌লো—তাই তো !

ডান হাতটা মুঠি ক'রে মুখের কাছে নিয়ে ছোট্ট একটা কাশী দিয়ে মাষ্টার মশাই ব'ল্‌লেন—সে যাক্ গে, যা হবার হোক্ গে, কিন্তু ভায়া, যে দুর্ভাবনার ভেতরে দিন কাটাচ্চি, তা' তোমায় আর কি ব'ল্‌ব ! চার চারটে মেয়ে, বড়টির এই পনর শেষ হ'ল—আর রাখা যায় না ! নিজে থাক্‌লুম এই অবস্থায় প'ড়ে,—মাষ্টার মশাই গলার স্বর একটু নীচু ক'রে ব'ল্‌লেন—তা' ছাড়া যে রোগে ধ'রেচে, যে শালা শুন্‌বে, সে কি আর আমার মেয়ে ঘরে নিতে চাইবে ? গাঁ-ময় জানাজানি হ'য়ে গেচে—শত্তুরেরো তো অভাব নেই—

কৃত্তিবাস ব'ল্‌ল, বেশ, তাই যদি হয়, তবে মেয়ের বিয়ে না হয় না-ই দিলেন। লেখা-পড়া শেখান্,—আর পনর বছরে আবার বিয়ে কি ? কুড়ি বাইশ পর্য্যন্ত অনায়াসে অপেক্ষা করা যেতে পারে। তদ্দিনে আপনি সেরে যাবেন ভালো হ'য়ে।

—ওসব তোমাদের বাজে কথা রেখে দাও বাপু। ভারি কয়টা কাণাকড়ি মাষ্টারি ক'রে পাই, দুবেলা খাওয়া চ'ল্‌তে চায় না—লেখাপড়া ! তাও আবার মেয়ের !! আর আমাদের গাঁয়ের ব্যাপার তো জানো না, বিশ বছরের মেয়ে ঘরে যদি রাখি, তবে কেলেঙ্কারী তো কেলেঙ্কারী, একদিন সবাই জুটে হয় আমাকে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে মাটির তলায় পুঁতে ফেল্‌বে, নয় তো মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে গাঁ থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে ! যা' হবার নয়, যা' হয় নি, হবে না, সে কথা তুলো না। আর তা' ছাড়া তোমাদের মতের সাথে আমারো মত মোটে মেলেই না। এ কালের ছেলে তোমরা তায় সংসারের চাপও ঘাড়ে পড়ে নি। তোমরা ভাবো এক, আমরা ভাবি আর। আমার তো ঘুমই আসেনা রাত্তিরে নানান্ ভাব্‌নায়—

মাষ্টার মশাই পায়ে একটা চাপড় মারলেন, ব'ল্‌লেন, শালা এখানেও মশা কি রকম দেখেছো ?…

কৃত্তিবাস খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটা হাই তুলে ধীরে ধীরে ব'ল্‌ল, শুয়ে প'ড়্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে মাষ্টার মশাই, ঘুমও পাচ্চে।

মাষ্টার মশাই ব'ল্‌লেন, তা' বেশ তো, পড় শুয়ে। আর শুয়ে শুয়েই তো দিন যাচ্ছে—খালি করো rest ! উঠ্‌তে rest, ব'স্‌তে rest, চ'ল্‌তে rest—আরে বাবা, এতো rest নিয়ে মানুষে পারে ? বাত-ব্যাধিতে না ধরে শেষে !…ওই ছাখোনা—সব rest নিচ্চেন—খেয়ে উঠেই একেবারে লম্বা !

(দূরের একটি bed থেকে একটি গলা শোনা গেল ; শো যাও মাষ্টার সাব্, শো যাও। বুখার জাদা হো যায়ে গা।)

কাপড়ের কোঁচাটিকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মাষ্টার মশাই উগ্রস্বরে ব'ল্‌লেন, যানে দাও শালা বুখার। এ বুখার কাঠের তলায় গেলে তব্ যায়েগা।…

কৃত্তিবাসের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন, এখান থেকে ট্রেণে রওনা হবে না মোটরে ?

কৃত্তিবাস চেয়ারখানা ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে ব'ল্‌ল, ট্রেণেই যাবো। মোটর যখন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুট্‌তে সুরু করে, আমার তো পেটের ভেতর একেবারে গুলিয়ে আসে—মাথাও বিশ্রী রকম ঘোরে। মোটরের চেয়ে ট্রেণই ভালো—ট্রেণে আমার ও-রকম হয় না।

সকাল বেলা উঠে হাত মুখ ধুয়ে দুধ আর ডিম খেয়েই কৃত্তিবাস নিজের ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। আজ্‌কেই স্যানাটোরিয়াম থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্চে, সব বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা ক'র্‌তে হবে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ডান দিকের একটা রাস্তা ধ'রে কিছু দূরে উঠেই একটি কটেজ। কৃত্তিবাস আস্তে-আস্তে গিয়ে এই কটেজটায় ঢুক্‌লো।

—আইয়ে জনাব্, বৈঠিয়ে। আপ্ আজ সাম্‌কো চলা যাতে হেঁ ?

কৃত্তিবাস চেয়ারখানা টেনে নিয়ে ব'সে উত্তর দিল, হ্যাঁ সায়েব্ আজ্‌কেই যাবো।

গোলাম হোসেন ব'ল্‌ল, মাগ্গর্ ইয়ে বাত্ হ্যায়, ভোৎ হুঁসিয়ার সে রহ্‌না চাহিয়ে। দেখিয়ে মেরা দো সাল হো গিয়া, তব্‌ভি কেইসা তক্‌লিফ্ হোতা হ্যায় হর্‌রোজ্। বুখার তো হোতাই হ্যায়, থুক্‌মে খুন ভি নিকাল্‌তা হ্যায় কোভি কোভি ! ই সাল ভি ম্যায় সেন্‌টোরিয়ম্‌সে নেই যাউঙ্গা, ভোৎ গর্‌মী হ্যায় প্লেন্‌মে আভি। এইসা খারাব্ বেমারী—

গোলাম হোসেন চুপ ক'র্‌ল, কৃত্তিবাস ব'ল্‌লো, তাই তো সায়েব—মুস্কিল !

একটু পরে গোলাম হোসেন ব'ল্‌ল, আচ্ছা গাঙ্গুলী বাবু, আমার দেশে চল না ? আমাদের বাড়ী র'য়েচে, বেশ থাক্‌বে, পাণি-হাওয়াও আচ্ছা আছে। তোমার কোনোই অসুবিধে হবে না। আর আমাদের ওদিকে ফ্রুট্‌স্ বেজায় সস্তা, যতো খুশী খাবে—আঙুর, কিস্‌মিস্, বাদাম, আনার, আখ্‌রোট্…

—বেশ তো, যাবো তোমাদের দেশে। তুমি সেরে-টেরে দেশে গিয়ে চিঠি দিয়ো আমাকে। আচ্ছা সায়েব, এখন উঠি, সকলের কাছেই একটু একটু ক'রে ঘুরে আস্‌তে হবে…কৃত্তিবাস স্মিতমুখে গোলাম হোসেনকে সেলাম ক'রে বেরিয়ে এলো।

আরেকটু উঠেই পণ্ডিত উমাশঙ্কর সুকুলার ঘর। পণ্ডিতজীর বাড়ী গুজ্‌রাট্, ইষ্ট্ আফ্রিকায় সরকারি কাজ কর্‌তেন্, ইদানীং দেশে ব'সে পেন্সন ভোগ কর্‌চিলেন। এখানে আছেন মাস ছয়েক—কিছুদিন পূর্ব্বে বুকে ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে। আশ্চর্য্য রকম ভীতু, পণ্ডিতজীকে নিয়ে সবাই রঙ্গ করে।

কৃত্তিবাস ঢুকে দেখল পণ্ডিতজী সটান লম্বা শুয়ে আছেন চোক্ দুটি বুজে। শব্দ পেয়ে চোখ্ খুলে তাকালেন, আঙুলের ইসারায় কৃত্তিবাসকে বস্‌তে ব'ল্‌লেন।

—কেমন আছেন পণ্ডিতজী ?…কৃত্তিবাস জিজ্ঞেস ক'র্‌ল।

পণ্ডিতজী সতর্কতার সাথে চোক্ দুটি ওপরের দিকে টেনে সাঁই সাঁই ক'রে ব'ল্‌লেন—সুবিধে নয়, পাল্‌স্ আজ সকালে সিক্স্‌টি টু হ'য়ে গেচে, সেই জন্যে ষ্ট্রোলিং আর নিই নি ! ফিফ্‌টি এইট্‌এর ওপরে ত' আমার

পাল্‌স্ কখনো যায় না ! কি জানি, কি হ'ল আবার আজ্‌কে। রাত্তিরে স্লিপ ও তো ডিস্‌টার্ব্‌ড্ হয়নি !

কৃত্তিবাস হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, ঈশ্বরকে ডাকুন পণ্ডিতজী, পাল্‌স্ যেন আপনার আরো কিছু বেড়ে যায়। নইলে যে একদম টেঁসে যাবেন ! যাহোক্‌, আমি তো আজ্‌কেই চ'লে যাচ্চি।

পণ্ডিতজী এবারে পষ্ট ক'রে চোক্ মেল্‌লেন। তার-পরে আস্তে আস্তে বিছানার ওপরে উঠে ব'সে ব'ল্‌লেন, ও, তুমি আজ্‌কেই যাচ্চো ? আমি শুনেচিলুম বটে তুমি চ'লে যাচ্চো, তবে আজই যাবে তা' জানিনি।

একটা ঢোক্ গিলে পণ্ডিতজী আবার ব'ল্লেন, মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে আছে কৃত্তিবাস বাবু, আজ্‌কে আমার স্ত্রীর চিঠি পেলুম, আমার মেয়েটির বড়ো অসুখ। জ্বরে অচৈতন্য, মাঝে মাঝে খালি 'বাপুজী, বাপুজী' কচ্চে। এই তো সেদিনও আমায় নিজে হাতে চিঠি লিখেচিল, 'বাপুজী, তুমি কেমন আছ, কবে আস্‌বে, তোমার জন্যে মন কেমন করে বাপুজী .....

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে পণ্ডিতজীর দুটি চোক্ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো, কৃত্তিবাস বুঝ্‌লো চোখের জল ঠেকানোর জন্যে পণ্ডিতজী আপ্রাণ চেষ্টা ক'র্‌চেন। জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, আপনার মেয়ের বয়স কত পণ্ডিতজী ?

—বয়েস ? এই তো মোটে এগারো। কৃত্তিবাস বাবু, সাত সাতটি জোয়ান ছেলেকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়েচি—সর্ব্বশেষে এলো আমার এই শান্তি-মা। পাগ্‌লী মা আমার কি মায়ায়ই যে আমায় আবদ্ধ ক'রে রেখেচে কৃত্তিবাস বাবু--

পণ্ডিতজীর গলার স্বর আট্‌কে এলো, একটা কাশী দিয়ে গলার স্বর পরিষ্কার ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, সবই তো হারিয়েচিলুম, কিন্তু ভগবান আবার এই শান্তি-মাকে দিয়ে আমায় সংসার ধরালেন। চাকুরি ক'রে যা' কিছু সঞ্চয় ক'রেচিলুম, সমস্ত নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে গেচে, স্বাস্থ্য ভেঙে প'ড়্‌লো, দিনও সত্যিই ফুরিয়ে এসেচে। তবুও আমি যে এমন ক'রে বাঁচতে চাই সে কার জন্যে বাবুজী ? তোমাদের এমন সব সুন্দর জীবন নষ্ট হ'য়ে যাচ্চে, আমি কি বুঝিনা যে আমার বাঁচ্‌বার চেষ্টা করা কদ্দূর হাস্যকর ?

একটু অন্যমনস্কের মতো পণ্ডিতজী ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, কি ক'রে যে আমার শান্তি-মাকে ছেড়ে আমি এখানে প'ড়ে থাকি, তা' আমিই শুধু জানি। এই যে তার অসুখ, কে তা'কে দেখে, কে তা'র যত্ন নেয়। তা'র মা কি আর সবদিকে সাম্‌লাতে পারে ? একটি টাকার সংস্থান নেই—আমার পেন্সনের টাকায় এখানে আমারই কুলোয় না—মায়ের আমার হয় তো একটু পথ্যেরও জোগাড় হ'চ্চে না···আমি এখানে ব'সে দুধ, মাখন খাচ্চি ! দেখোনি তো তুমি তা'কে বাবুজী, দেখ্‌লে বুঝ্‌তে···শুতে, ব'স্‌তে, চ'ল্‌তে—সব সময় আমার চোখের সাম্‌নে তা'র মুখখানা, তা'র হাসিটুক্‌, তা'র অভিমান, তা'র আব্দার—

হঠাৎ দুই হাঁটুর ভেতরে মুখ গুঁজে বৃদ্ধ পণ্ডিত একেবারে হাউহাউ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লেন ! অবশিষ্ট একটিমাত্র সন্তানের জন্যে পণ্ডিতজীর গভীর বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত পিতৃ-হৃদয়ের সাম্‌নে কৃত্তিবাস স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল।

পণ্ডিতজীকে একটু শান্ত ক'রে রেখে কৃত্তিবাস ষ্টিভেন্সের ঘরমুখো রওনা হ'ল। রাস্তার দু ধার দিয়ে ইউক্যালিপটাস্ গাছ, আশে পাশে ছোট ছোট ফুলের বাগান। ষ্টিভেন্সের কটেজের অবস্থান ভারি মনোরম— এখান থেকে প্রায় সমস্ত স্যানাটোরিয়ামের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

ষ্টিভেন্স তার Cookকে কি নিয়ে ধমকাচ্চিল, কৃত্তিবাস দরজার গোড়ায় যেতেই ষ্টিভেন্স ব'ল্‌ল, Come in Mr. Ganguly, just look at this hopeless fellow, how he has prepared my soup !

নামে মাংসের যূষই বটে, কিন্তু সেটা এক কাপ গরম জল ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলের বেশীটুকু রান্না-ঘরেই ও ব্যাটা সাবাড় ক'রে দিয়ে মিশিয়ে নিয়ে এসেচে খানিকটে গরম জল ! ষ্টিভেন্স একেবারে মারমুখ হ'য়ে কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌ল, উল্লু-কা-বাচ্চা, তোম্ এইসাই কর্‌তা হায়, হাম্ সমঝ্‌তে হেঁ। ফের কোভি এইসা হোনেসে তুম্‌কো হাম্ ডাণ্ডা পিটেগা, ইয়াদ্ কর্‌কে কাম কর্‌না—সমঝে ?

Cookটা কাপ্ নিয়ে মুখ নীচু ক'রে ধীরে ধীরে

বেরিয়ে গেল। ষ্টিভেন্স একটা সিগারেট্‌ ধরাতে ধরাতে কৃত্তিবাসের দিকে ফিরে বল্‌ল, Really, so difficult to manage this rascal!

কৃত্তিবাস বল্‌লে, যাক্‌ গে, ওদের সাথে চ্যাঁচামেচী ক'রে বড় বেশী কিছু লাভ হবে না। ওরা যা চালাকি কর্‌বার তা' ক'র্‌বেই। তবে হ্যাঁ, যতটা পারা যায়, শাসনে রাখাই ভালো।…কিন্তু মিঃ ষ্টিভেন্স, তুমি বড্ড সিগারেট্‌ খাও। আমাদের অসুখের পক্ষে সিগারেট্‌ তো ভালো নয়! ডাক্তারে কিছু বলে না? ধূমপান এখানে নিশ্চয়ই মানা!

ষ্টিভেন্স চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে হেসে বল্‌ল, So was the fruit of knowledge in the garden of Eden!……Well, I've been asked by the doctor not to smoke more than one daily—but I don't care a pin for that. You know Mr. Ganguly, all my patience and energy have been spent up—I'm fed up with this life!

কৃত্তিবাস হেসে বল্‌লে, কিন্তু একটু কষ্ট ক'রে অপেক্ষা ক'রে থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সারিয়ে শেষেও ত' এগুলো কর্‌তে পারো!

—Oh! Ganguly, I 've grown weary of waiting my cure! Really I can tell you—I shall indulge in all sorts of amusements and what d' you call it—excesses—as soon as I am freed from this Sanatorium—and only through that way either I shall get the better of this disease or this disease will get the better of me. You know, yesterday I played Badminton with Mrs. Morgan in the recreation-hall with the result that I got coloured sputum this morning and the temperature also went up! But I tell you--I'm not going to stop till I get a profuse hemorrhage and am compelled to stick to my bed!

কৃত্তিবাস এর উত্তরে কিছু বল্‌তে পারলো না। সে নিজে ভুক্তভোগী; ষ্টিভেন্সের মানসিক অবস্থা সে নিজেও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে!

ওঠ্‌বার সময় ষ্টিভেন্স কৃত্তিবাসের করমর্দ্দন ক'রে ব'ল্‌ল—Good bye to you Mr. Ganguly—wish you all luck and prosperity!…Remember me in your prayer!

দরজা পার হ'য়ে খানিক দূরে আস্‌তে আস্‌তে কৃত্তিবাস শুন্‌তে পেল ষ্টিভেন্স গান ধ'রে দিয়েচে—

'Let me dream in her arms again'……

আরো দু'তিনটে ব্লকের কয়েকজন রোগীর সাথে দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে কৃত্তিবাস স্যানাটোরিয়ামের সর্ব্বশেষ ব্লকটিতে এলো। এসে প্রথম ঘরখানিতে ঢুকলো।

বিছানার ওপর শায়িত একটি চোদ্দ পনর বছরের ছেলে। কৃত্তিবাসকে ঢুক্‌তে দেখেই সে তড়াক্‌ ক'রে বিছানার ওপর লাফ দিয়ে উঠে ব'সল। বল্‌ল, এই যে কৃত্তিবাসদা—ইদিকে যে সেই দিন এসে ঘুরে গেলেন, আর মোটে আপনার দেখাই নেই! তা' পরে আপনার যাওয়া না কি আজ্‌কেই ঠিক?

কৃত্তিবাস বল্‌ল, কার কাছে শুন্‌লে?

—কার কাছে যেন শুন্‌লুম—ওঃ কম্পাউণ্ডারটা বল্‌ছিল। সত্যি না কি?

—হ্যাঁ ভাই, সত্যিই আজ্‌কে যাচ্চি। তাইতেই তো দেখা ক'র্‌তে এলুম।

—তা' বেশ যান্‌, কিন্তু আপনার একখানা ফটো তো আমায় দিলেন না? যদি প্রিণ্ট্‌ না থাকে তবে গিয়ে কিন্তু খামের ভিতর পুরে পাঠিয়ে দেবেন।…আর জানেন্‌ কৃত্তিবাসদা, প্যাটেলের চাইতে রমাপ্রসাদের হাত অনেক বেশী পাকা। প্যাটেল আমাদের এই ব্লকের, তার পরে আট নম্বর কোয়াটারের, পার্শী ফিমেল ওয়ার্ডের--কতো জনের যে কত ফটো তুল্‌লো, তার একটাই ভালো হোক্‌! আর দেখ্‌বেন ত' রমাপ্রসাদের ফটোগুলো! এম, সি, কটেজের ওধারে সাম্‌নের ভিউটা রমাপ্রসাদ তুলেছে—কি এক্সেলেণ্ট! মিস হাম্‌ফ্রের একখানা তুলেচে—ব্যাক-গ্রাউণ্ড ছিলো ডিস্‌পেন্সারির ঠিক নীচের ওই জায়গাটা--বাস্তবিক একখানা ফটোর মতো ফটো! মিস্‌ হাম্‌ফ্রের যেই না চেহারা—কিন্তু ফটোতে কি বিউটিফুল দেখাচ্চে! ও ব্যাটা প্যাটেলকে দিয়ে ফটো তোলানো খালি পয়সাই নষ্ট। নিজের বউয়েরি যা' তুলেচেন--আহা! কম্পাউণ্ডারটা বল্‌ছিল

ডাক্তার. ষ্টাফ, পেসাণ্ট. সবাই মিলে শীগ্‌গীরই নাকি একটা গ্রুপ্‌ ফটো তোলা হবে। সত্যি কৃত্তিবাসদা, আমার একটা যদি ক্যামেরা থাক্‌তো—

কৃত্তিবাস হেসে বল্‌ল, বেশ তো, একটু ভালো হও, তার পরে খুব ফটো তুলো।...আচ্ছা শৈলেন, তোমায় না কি কে দেখ্‌তে এসেচেন?

শৈলেন বল্‌ল, হ্যাঁ, আমার দূর সম্পর্কের এক দাদামশাই এসেচেন। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, আগ্রা—তীর্থে এসেছিলেন, আমাকে ছোটবেলা থেকেই ভালো বাস্‌তেন, অসুখ হ'য়ে প'ড়ে আছি এখানে, আমাকেও একটু দেখে গেলেন। পরশু চলে যাবেন। বসুন না, কৃত্তিবাসদা, দাদাবাবু বাজারের দিকে গেছেন—এই এলেন ব'লে! আলাপ ক'রে যান্‌, দেখ্‌বেন কি মজার মানুষ—বক্তৃতা যা' সুরু করবেন!

বেশীক্ষণ আর বস্‌তে হ'ল না, সামান্য পরেই শৈলেনের দাদামশাই এসে হাজির হলেন।

বুড়ো মানুষ।

কৃত্তিবাস একটা নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াল; দাদামশাই প্রতি-নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, বসুন বসুন।... আপনার কদ্দিন হ'ল এখানে?

কৃত্তিবাস একটু হেসে বল্‌ল, তা' প্রায় বছর দুয়েক!

—এখন ভালোই আছেন ত?

—হ্যাঁ, মোটামুটি আছি এক-রকম, স্যানাটোরিয়াম থেকে পরশু ডিস্‌চার্‌জড্‌ হ'য়েছি, আজ চলে যাচ্ছি।

দাদামশাই বল্‌লেন, যাক্‌, শুনে সুখী হলুম। এম্‌নি খল ব্যাধি—আর একেবারে ঘরে ঘরে আজকাল। আমাদের সময়ে তো এ সবের নাম-গন্ধও শুনিনি, যা-ও বা জানা গেছে দুটো একটা। মানে অনিয়ম, অত্যাচার অনাচার—এইতেই সব শেষ করচে কি না!...আপনার পুরো নামটা কি?

—আজ্ঞে কৃত্তিবাস গাঙ্গুলী।

একটু চুপ ক'রে থেকে দাদামশাই জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন, মুর্‌গী-টুর্‌গী খান্‌ না কি?

—খাই।

শৈলেন হেসে বল্‌ল, খালি খান? উনি যে রকম মুর্‌গীর ভক্ত, সায়ের জন্মে মুরগী হয়েই জন্মাবেন।

—সন্ধ্যে-আহ্নিকও ছেড়ে দিয়েচেন বোধ হয়?

কৃত্তিবাস হেসে বল্‌ল, বহু কাল। কি হবে আর ওসব দিয়ে?

—পৈতেটা গলায় আছে তো, না কি তা-ও নেই?

একটু মাথা চুল্‌কে কৃত্তিবাস বল্‌ল, আজ্ঞে সেটাও দিয়েচি ফেলে।

ক্ষুব্ধ হ'য়ে দাদামশাই বল্‌লেন, কতো বড় অনাচার তাই বলুন দেখি! আপনি সদ্বংশের ছেলে, অথচ কতো অধঃপতন আপনার! এইতেই তো জাত্‌টা উচ্ছন্নে গেল! যাক্‌, আমার কথা শুনুন। ফিরে গিয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক না হোক্‌ অন্ততঃ গায়ত্রীটা জপ করবেন দু'বেলা, শুদ্ধ-শান্তভাবে থাক্‌বেন, আর ভগবানের ওপর একটু বিশ্বাস রাখ্‌বেন, অখাদ্য-কুখাদ্যগুলোও ছেড়ে দিন্‌। আর আপনি ব্রাহ্মণ হ'য়ে পৈতে ফেলে দিয়েচেন, ছি ছি, শুন্‌তেও যে কেমন লাগে! আর বুঝেচেন, গীতাখানা পড়বেন। গীতাই হ'চ্চে সমস্ত আধি-ব্যাধির পরম ওষুধ। আপ্‌নারা যতোই বাঁশের মাথায় তুলুন্‌ এই সব ডাক্তারি চিকিচ্ছেকে, আমার তো মশাই এ-সবের ওপর এক কাণা কড়িও বিশ্বাস নেই! এই ডাক্তারগুলোই আমাদের দফাটা আরো বেশী ক'রে সার্‌চে।

কৃত্তিবাস দাদামশায়ের কোনো কথারই বিশেষ কোনো উত্তর দিল না—শুধু সায় দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। কারণ, দাদামশাই যে সব কথা তুল্‌চেন, তা' নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তর্ক চল্‌তে পারে। কতো বিভিন্ন বিষয়, কতো বিভিন্ন মত, কতো বিভিন্ন পন্থা—সে সব আলোচনার সময় ও স্থান এ নয়।

মোটামুটি সবার সাথেই দেখা করা হ'ল—এখন বাকি খালি একজন। কিন্তু বেশ বেলা হয়ে উঠেচে, ডাক্তারেরও রাউণ্ড নেবার সময় এটা। কাজেই শৈলেনের ঘর থেকে বেরিয়ে কৃত্তিবাস নিজের ঘরের দিকেই ফিরে আস্‌তে লাগ্‌লো। ওর ঘরটা অনেকখানি নীচুতে,—এঁকে, বেঁকে, ঘুরে, ফিরে রাস্তা নেমে গেছে।

খানিক দূর আস্‌তে আস্‌তেই গোলাম হোসেনের সাথে দেখা। গোলাম হোসেন জিজ্ঞেস ক'র্‌ল—সব্‌ কোই কো সাথ্‌ মোলেকাত্‌ হো গিয়া? মিস্‌ চৌধুরি কো পাশ্‌ গিয়া রহা আপ্‌নে—এম, সি, কটেজমে!

কৃত্তিবাস বল্‌ল, না সাহেব, এম, সি, কটেজেই যাই নি। আর সবার সাথেই একরকম দেখা ক'রেচি—এম, সি, কটেজে যাবো ও-বেলায়।

গেলোম হোসেন হেসে বল্‌ল, উন্‌কী সাথ্ তো ভোৎ দোস্‌তি হ্যায় আপ্ লোক কো!

কৃত্তিবাসও হাস্‌ল। তার পরে আবার পা বাড়াল—আচ্ছা সার, সেলাম!

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে সমস্ত রোগীর বিশ্রাম করবার সময়। কিন্তু কৃত্তিবাস শুলো না।

সন্ধ্যের পরেই ট্রেণ, সমস্ত জিনিষপত্র বেঁধে ছেঁদে ঠিকঠাক করতে হবে, ট্রাঙ্কটাও গুছোনো দরকার খানিকটা। কৃত্তিবাস ট্রাঙ্ক খুলে মণিব্যাগটা বা'র করল—খুচ্‌রো ভাঙানি আছে কি না দেখ্‌বার জন্যে। কম্পাউণ্ডার, চৌকিদার, ওয়ার্ডার, মেথর—সবাইকেই কিছু কিছু ক'রে বকশীশ দিতে হবে। এত দিন অম্লান বদনে তা'রা তা'র কাজ ক'রেচে, আজ যাবার সময়ে প্রত্যেককে সে খুশী করে যাবে।

স্যানাটোরিয়ামের একটি চাকরকে ডেকে কৃত্তিবাস বাঁধা-ছাঁদা সব শেষ করল।

এবারে এম. সি. কটেজ। মিনিট্ কয়েক বিশ্রাম ক'রে একগ্লাস জল খেয়ে কৃত্তিবাস রওনা হ'ল—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন তা'র দ্রুততর হয়ে উঠ্‌লো।

এম. সি. কটেজ দেখা যায়—

কৃত্তিবাসের গতি একটু মন্থর হ'য়ে আসে; কিন্তু রক্তের চাঞ্চল্য অনেকগুণ বেড়ে চলে। অবশেষে দরজার গোড়ায় এসে পৌছ্‌ল।

স্নিগ্ধা বিছানার ওপর ব'সে ব'সে একখানা বই প'ড়ছিল। কৃত্তিবাস এগিয়ে এসে পাশের চেয়ারখানায় ব'স্‌তে ব'স্‌তে একটু হেসে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল—কি, শোওনি যে?

কোলের ওপর বইখানি খোলাই থাক্‌ল, একটি কথাও না বলে স্নিগ্ধা চুপ ক'রে কৃত্তিবাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—চুপ ক'রে আছো যে? খেয়ে উঠ্‌বার পরে এখনো বিশ্রাম কর্‌বার দরকার না?

এবারে খুব ধীরে ধীরে স্নিগ্ধা জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, কৃত্তিবাসদা, সত্যিই আজ্‌কে যাচ্ছো?

কৃত্তিবাস ব'ল্‌লো, সত্যি ছাড়া আর কি!

—না গেলে হয় না?

কৃত্তিবাস হেসে ব'ল্‌ল, কি ছেলেমানুষ! এটা তো আর শ্বশুরবাড়ী নয়! চিকিৎসার জন্যে এসেছিলুম, সুস্থ হ'লুম, এখন তো চ'লে যেতেই হবে! এখানে কি আর চির দিন থাক্‌বার জন্যে কেউ আসে?

এবারে স্নিগ্ধাও হাস্‌ল।

—কি বই পড়্‌চো ওটা? কৃত্তিবাস জিজ্ঞেস ক'র্‌ল।

স্নিগ্ধা ব'ল্‌ল, টি, বি'র বই।—যে পাতাটা খোলা ছিল তার মাঝখানে মাইক্রোশ্‌কোপের নীচে টি, বি, ব্যাসিলাই, কেমন দেখা যায় আঁকা র'য়েচে। সেই ছবিটির ওপর আঙুল রেখে স্নিগ্ধা ব'ল্‌ল—আচ্ছা কৃত্তিবাসদা, এতটুক্ খানিক—যে মোটে মালুমই হয় না—অথচ এরাই আমাদের বুকটাকে কি রকম খেয়ে শেষ ক'রে দিচ্চে—ভারি আশ্চর্য্য, না?

ব'লেই ছবিখানির দিকে তাকিয়ে নিজে নিজে আওড়াতে সুরু করল:—

> 'হে অজ্ঞাত, একান্ত অচেনা
> আমার স্মরণে পড়িছে না—
> তোমারে চেয়েছি কভু;
> সমুখ হইতে তবু
> কেন তব ছায়া সরিছে না?…

কৃত্তিবাস হেসে ফেলে বল্‌ল, বাবাঃ টি, বি, ব্যাসিলাস দেখেও তোমার কবিত্ব! বইখানা বন্ধ ক'রে সরিয়ে রেখে দাও, তা' হলেই আপাততঃ সমুখ হইতে ওর ছায়া স'রে যাবে।

স্নিগ্ধা তাই-ই ক'র্‌ল। বইখানাকে রেখে বিছানা থেকে নেমে ব'ল্‌ল, ব'সো কৃত্তিবাসদা, তোমায় চা ক'রে দিচ্চি।

ব্যস্ত হ'য়ে কৃত্তিবাস ব'ল্‌ল, আরে না, না, থাক্ গে চা। কেন আবার হাঙ্গামা ক'র্‌তে যাবে মিছিমিছি, ব'সো।

স্নিগ্ধা ততক্ষণে নীচু হ'য়ে স্টোভটা টেনে নিয়েচে, মৃদুকণ্ঠে বল্‌ল, হাঙ্গামা,—বেশ।…

কৃত্তিবাস বুঝ্‌লো স্নিগ্ধা ব্যথা পেয়েচে, তাড়াতাড়ি

ব'ল্‌ল, আচ্ছা, ক'র্‌বে কর, কিন্তু ষ্টোভ্‌ আমি ধরিয়ে দিচ্চি, তুমি পাম্প ক'র্‌তে যেয়ো না।···

ব'লে ষ্টোভ্‌টা ধ'র্‌তে যেতেই স্নিগ্ধা খপ্‌ ক'রে কৃত্তিবাসের হাতখানা চেপে ধ'রে ব'ল্‌ল, আচ্ছা মশাই, আমিই বেশ পার্‌বো···সদ্দারি কর্‌তে আর হবে না।···

চা তৈরি ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্নিগ্ধা অনেকটা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো—ছেলেমানুষের মতো হাসি, ছেলেমানুষের মতো অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা—আর তারি মাঝে মাঝে বারবার ওই একই কথা—কৃত্তিবাসদা, তুমি চ'লে যাচ্চো, আমার একটুও ভালো লাগ্‌চে না—একটুও না·

কৃত্তিবাস ব'ল্‌লো, কেন, ভালো লাগ্‌বে না কেন? সারাদিন তো খালি নভেল আর ম্যাগাজিন প'ড়েই কাটাতে, আমার কথা তো এম্নিও ভাব্‌বার সময় পেতে না। এখন তো আরো ভালোই হ'ল, আমি মাঝে মাঝে এলে যে বিরক্তটুক্‌ হ'তে—তাও আর হ'তে হবে না!

স্নিগ্ধা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লো, একবার মুখ তুলে বাইরের দিকে একটু তাকাতেই কৃত্তিবাস দেখ্‌ল স্নিগ্ধার দুটি চোখ জলে টলটল কর্‌চে।

কৃত্তিবাস দুঃখিত হ'য়ে ব'ল্‌ল, ছি স্নিগ্ধা, কি একটু বল্লুম, আর অম্নি ও-রকম ক'র্‌তে আছে? এখন যদি তুমি ও-রকম করো—

কাপড়ের আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে চোখের জলটুকু মুছে ফেলে স্নিগ্ধা অত্যন্ত ম্লান একটু হেসে বল্‌ল, এখন নয় কৃত্তিবাসদা, Isadora Duncanএর মতো ব'ল্‌তে গেলে my eyes are seldom dry when I am alone—কিন্তু সে কথা যাক্‌, তুমি তা' বুঝ্‌বেও না, আর বুঝে দরকারও নেই।

স্নিগ্ধার বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো।

খানিক পরে স্নিগ্ধা নিজেই উঠে তোয়ালে দিয়ে মুখ চোক্‌ মুছে একেবারে কৃত্তিবাসের গা ঘেঁষে পেছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল, আচ্ছা, এখান থেকে এখন কোথায় যাবে কৃত্তিবাসদা, দেশে?

কৃত্তিবাস চুপ ক'রে ব'সে ছিল, ব'ল্‌ল, না স্নিগ্ধা, দেশে যাবো না। একজনকে আমি দিদি ব'লে ডাকি, আমায় খুবই স্নেহ করেন। আমি এখন তাঁর কাছেই যাবো। তিনি আমাকে অনেক ক'রে লিখেছেন তাঁর কাছে গিয়ে কিছু দিন থাক্‌বার জন্যে, না গেলে মনে খুব কষ্ট পাবেন। তা' ছাড়া আমারো তাঁর কাছেই যেতে ইচ্ছে, আর যেখানে আছেন জায়গাও ভালো। কাল্‌কের ডাকেই দিদিকে চিঠি লিখে দিয়েচি যে তাঁর ওখানে গিয়েই উঠ্‌চি।

এখানে একটু থেমে কৃত্তিবাস নিজের বুকে হাত দিয়ে দু' তিন বার চেপে ব'ল্‌ল, বুকটার ভেতর আবার ব্যথা করে কেন যাবার বেলায়!

স্নিগ্ধা এবারে একটু মৃদু হেসে ব'ল্‌ল, ক'র্‌বে না ব্যথা? অপরের বুকে ব্যথা দিয়ে গেলে নিজের বুকেও ব্যথা পেতে হয়—বুঝেচো?

কৃত্তিবাস হেসে বল্‌ল, ভারি দুষ্টু হ'য়ে গেছ দেখ্‌তে পাচ্চি!

স্নিগ্ধা নিজের মুখখানা প্রায় কৃত্তিবাসের মুখের ওপর নামিয়ে এনে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌ল—অন্য দিনকার চাইতে আজ্‌কে আরো একটু বেশী—তাই না?

এর ভেতরে বাইরে রাস্তায় কা'র চ'লে যাবার শব্দ পাওয়া গেল। কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি বল্‌ল, দুষ্টুমি রেখে এখন সরো দেখি একটু, যে ভাবে র'য়েচো—কেউ দেখ্‌লে আবার—

স্নিগ্ধাও সে শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিল, সেও তাড়াতাড়ি স'রেই গেল বটে, কিন্তু একটু স'রে গিয়েই ব'ল্‌ল, দেখুক্‌ গে না, ভা-আরি ব'য়ে যাবে আমার। কি আর কর্‌বে, ডাক্তারকে ব'লেও দিতে পারে—এই তো? তা ডাক্তার যদি স্যানাটোরিয়াম থেকে তাড়িয়ে দেয় আমাকে—বেশ ভালোই হয়—

গলার স্বর আরেকটু নামিয়ে মুচ্‌কি হেসে বল্‌ল—বেশ তা'হলে তোমার সাথেই চ'লে যাই···

আরো কতোক্ষণ ধ'রে দুজনের মধ্যে গল্প চ'ল্‌তে থাকে—নিজেদের জীবনের কথা, আশা-নিরাশার কথা, তাদেরি মতো আরো দশটি ভুক্তভোগীর কথা।··

কিন্তু ধীরে ধীরে কৃত্তিবাসের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে আসে. কৃত্তিবাস বলে—স্নিগ্ধা, এবারে উঠি? সব সময় সাবধানে থেকো, চিঠি পত্র লিখো—কেমন? বেঁচে থাক্‌লে আবার দেখা হবে। আমার কথা ভুল্‌বে না তো?

সহসা স্নিগ্ধার মুখের দীপ্তি একেবারে ম্লান হ'য়ে আসে, এবারে সত্যি সত্যিই সে কেঁদে ফেল্‌ল।

কোনো কথা বোঝাতে গেলে বুঝ্‌তে চায় না, সান্ত্বনা মানে না। স্নিগ্ধার হাতখানা নিজের হাতের ভেতর টেনে কৃত্তিবাস অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে ব'ল্‌ল, সত্যি, কি পাগল তুমি স্নিগ্ধা, বল তো!

নিজেই আস্তে আস্তে ওর চোক্‌মুখ মুছিয়ে দেয়।

কৃত্তিবাস মুহূর্ত্তের জন্যে একবার বারান্দায় এসে চারি দিক দেখে আবার ঘরে ঢোকে।

দরজার পেছনেই স্নিগ্ধা দাঁড়ানো, কৃত্তিবাস ধীরে ধীরে ওকে নিজের বুকের ভেতর টেনে নেয়—আরো ধীরে ধীরে তা'র ওষ্ঠাধর স্নিগ্ধার কম্পিত, অশ্রুজলসিক্ত, আরক্ত ঠোঁট্‌ দুটিকে অত্যন্ত নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে⋯ ⋯

*　　*　　*　　*　　*

ট্রেণ ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্‌ ত্যাগ ক'র্‌তে থাকে, কৃত্তিবাস জানালা দিয়ে মুখ বে'র করে একদৃষ্টে স্যানাটোরিয়ামের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীর্ঘ দুইটি বছর!

তা'র মন এই স্যানাটোরিয়ামের প্রত্যেকটি অধিবাসী, প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি পথ, প্রত্যেকটি আনন্দ ও দুঃখের উৎসবকে শিরা-উপশিরার মতো জড়িয়ে আছে! এই পাহাড়ের প্রত্যেকটি পাইন গাছ তার বন্ধু, প্রত্যেক শুভ্র মেঘ-খণ্ডের সাথে তা'র পরিচয়, এখানকার প্রতিটি ধুলিকণা তা'র কাছে পবিত্র, প্রতি টুক্‌রো পাথর তা'র কাছে শালগ্রাম! অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মন নিয়ে, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে একদিন সে এক অসীম অনিশ্চিতের উদ্দেশে একাকী যাত্রা ক'রে এখানে এসে পৌঁছেছিল, তা'র আনন্দ-ভরসাহীন, অবসন্ন অন্তর অত্যন্ত নিরুৎসাহের সাথে এই স্যানাটোরিয়ামের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছিল। সে কি তখন স্বপ্নেও ভাব্‌তে পার্‌তো যে তা'র দেহ-মনে জীবনের উৎস আবার সহস্রধারে জেগে উঠ্‌বে?

এখানকার আলো, এখানকার বাতাস নিয়ত তা'কে আশীর্ব্বাদ ক'রেচে, তা'কে বাঁচিয়ে তুলেচে, তা'কে আবার সুন্দর ক'রেচে!

কৃত্তিবাসের অতীতের কথা মনে পড়ে—আত্মীয়-স্বজন প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে অনাদর, অবহেলা জানিয়েচে; বন্ধুবান্ধব ঘৃণায়, ভয়ে নিঃশব্দে দূরে স'রে গেচে। সহায়হীন, আশ্রয়হীন বর্ত্তমান, আর সম্পূর্ণ অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ।

এই স্থান তা'কে তুচ্ছ করে নি। এখানে এসে সে শক্তি ফিরে পেয়েচে, তা'র গৌর দেহে আবার ফুটে উঠেচে নূতন রক্তের লালিমা, মুখে চোখে ফুটে উঠেচে নূতন আশার দীপ্তি। এই দীর্ঘ দিন এই স্যানাটোরিয়াম তা'র জীর্ণ, দুর্ব্বল দেহটিকে যেন দুটি ডানায় ঢেকে সাবধানে লালিত ক'রেচে, যেদিন বিদায় দিলো—সেদিন তা'র কানে কানে দিয়ে দিয়েচে জীবনের মন্ত্র;—মৃত্যুর মন্ত্র নয়!

এই মুহূর্ত্তে কৃত্তিবাসের নিজের ওপর অসীম মমতা জ'ন্মে গেল—হ্যাঁ, সে বাঁচ্‌বে, নিশ্চয় বাঁচ্‌বে! শক্তি যেন তা'র প্রত্যেকটি স্নায়ুতে, প্রত্যেকটি শিরায়, প্রত্যেকটি রোমকূপে আবার জেগে উঠ্‌তে চায়—এ তো অনন্ত সম্ভাবনা, এই সুন্দর দেহ, এমন সুদূর-প্রসারি মন—এই নিয়ে যদি এই পৃথিবীর বুকে সে না বাঁচ্‌বে, তবে বাঁচ্‌বে কি ওই রাম, শ্যাম, আর মধু?

ডাক্তার তাকে সাবধানে থাক্‌তে ব'লেচেন—অন্ততঃ বছর তিনেক।

শুধু সাবধানে কেন, সে অত্যন্ত সাবধানে থাক্‌বে—আর তিন বছরের জায়গায় আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেবে! সে কিছুতেই এখন মর্‌তে পারে না—তা'র যে এখনো অনেক কিছু পাওয়ার বাকি, অনেক কিছু দেওয়ার বাকি। নিজের ওপর সে এতটুক অত্যাচার ক'র্‌বে না—নিজের প্রতি সে এতটুকু বীতশ্রদ্ধ হবে না কোনো সময়ের জন্যে।

তফাৎ হবে এইটুক—তা'র আগেকার জীবন ছিলো সমুদ্রের মতো চঞ্চল—চারি দিকে ছড়িয়ে পড়্‌বার সুখে বিভোর, এখন থেকে তা'র জীবন হবে পর্ব্বতের মতো গম্ভীর—সমস্ত বাহুল্য থেকে নিজেকে সংযত ক'রে রাখ্‌বার প্রশান্ত আনন্দে পূর্ণ।⋯দুই-ই সুন্দর, দুই-ই মহান্‌, দুই-ই উপভোগ্য!

এই স্থান—এই স্যানাটোরিয়াম তা'র অন্তরের গহন অন্তরালের আর কোন্‌ গোপন বস্তুকে বিকশিত ক'রে

তা'র সম্বন্ধে তা'কে সচেতন ক'রে দিয়েচে?···কৃত্তিবাস মনে মনে—অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'র্‌ল—Love!· টলষ্টয়ের মতে যা-ই না কি 'Fundamental law of life!'···এই স্যানাটোরিয়াম তা'কে এতদিন কর্ষণ ক'রে শুধু উর্ব্বর ক'রেই ছেড়ে দেয় নি—তা'র ভেতরে ফুটিয়ে দিয়েচে একটি ফুল, যা'র সৌরভে তা'র সমস্ত অন্তর, সমস্ত অঙ্গ একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে! যা' না কি সমস্ত মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য, যা'র অভাবে প্রত্যেক মানুষের জীবন সত্যিকারের দীনতায়, ব্যর্থতার বেদনায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে—তাই-ই সে লাভ ক'রেচে,—সে পেয়েচে প্রেম!

স্নিগ্ধা তা'কে ভালোবাসে!

স্যানাটোরিয়ামে আরো বহু যুবক ছিল—কিন্তু স্নিগ্ধা তা'কেই এই দুরূহ সৌভাগ্য বহন ক'র্‌বার জন্যে বেছে নিয়েচে!

স্নিগ্ধার মুখখানা কৃত্তিবাসের বারবার মনে পড়ে। স্নিগ্ধা সুন্দরী, কিন্তু বিকেলবেলা জ্বরটা একটু বাড়্‌বার সাথে সাথে তা'র মুখখানা যখন আরক্ত হ'য়ে ওঠে, তা'র মুখের তখনকার সৌন্দর্য্যের বুঝি তুলনা নেই! তা'র কোমল বুকখানির একদিকে চ'ল্‌চে মৃত্যুর নিঃশঙ্ক লীলা—আরেকদিকে ফুটে উঠ্‌চে প্রেমের সহস্রদল পদ্ম—আর তার সমস্ত সুপ্তি, সমস্ত জাগরণ তারি মধুতে সর্ব্বক্ষণ সিক্ত হ'য়ে র'য়েচে।

স্নিগ্ধা আপনার সমস্ত সুধা কৃত্তিবাসের অধরে নিঃশেষ ক'রে ঢেলে দিয়েচিল। ওই মুহূর্ত্তটিতে যেন জগতে ব্যাধি ছিলো না, দুঃখ ছিলো না, শোক ছিলো না—শুধু সেই রকমই সত্যি মনে হ'য়েচিল যেন—'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ!'

স্নিগ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন কৃত্তিবাস রাস্তা বেয়ে নেমে আস্‌চিল, তখন পাষাণ-প্রতিমার মতো স্নিগ্ধা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে কৃত্তিবাসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কৃত্তিবাস চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে পেছন ফিরে দেখেচিল।

পাহাড়ের গায়ে একটা জায়গায় রাস্তাটা বেঁকে গেচে। শেষবারের জন্যে কৃত্তিবাস আবার পেছন ফির্‌লো—স্নিগ্ধা তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে!

স্নিগ্ধা তা'কেই ভালোবাসে, স্নিগ্ধার হাসিটুকু তা'কেই আনন্দে ভ'রে দেবার জন্যে, তা'র চোখের জল তা'কেই দুঃসহ বেদনায় ব্যথিত ক'র্‌বার জন্যে!···

স্নিগ্ধার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে কৃত্তিবাসের সমস্ত দেহ অলস হ'য়ে আসে, সমস্ত চিন্তা যেন কোন্ এক সুদূর রহস্যের মাঝে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়!···

ট্রেণ তখন একটা টানেলের মুখে প্রবেশ করেচে।

* * * *

ষ্টেশনে অঞ্জনাদিদি নিজেই এসেচেন।

হাসিমুখে কৃত্তিবাস গাড়ী থেকে নাব্‌লো। অঞ্জনাদিদি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, বাঃ, ভারি সুন্দর চেহারা হ'য়েচে তো তোমার!

ষ্টেশন থেকে বাসার পথে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে গাড়ীতে ব'সে অঞ্জনা ব'ল্‌ল, সত্যি ভাই, আবার কদ্দিন পরে দেখা হ'ল—তাই না? সত্যি, তুমি যখন একেবারে তারিখ ঠিক ক'রে চিঠি দিলে যে এইদিন পৌছুবে, তখনো যেন বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌চিলুম না যে তুমি সত্যিই আস্‌চো! পথে কোনোরকম কষ্ট হয়নি তো?··· তোমায় কিন্তু খুব নতুন নতুন লাগ্‌চে!···

কৃত্তিবাস হেসে ব'ল্‌ল, এ তো দূরের পথ, অল্প একটু কষ্ট হ'য়েচে বৈ কি! কিন্তু আমাকে নতুন নতুন লাগ্‌চে—তার মানে কি অঞ্জনাদি?

ষ্টেশন থেকে বাসা খুব বেশী দূরে নয়, অল্পক্ষণের ভেতরেই ওরা পৌছে গেল।

চারু—অঞ্জনার এক বোনের মেয়ে। অঞ্জনার কাছে থেকে ম্যাট্রিক পড়ে। সে দরজার সাম্নেই দাঁড়িয়ে ছিল।

অঞ্জনা ব'ল্‌ল, চারু, এই যে তোর কৃত্তিবাস-মামা এসেচে, তুই তো আর দেখিস্ নি কখনো···

চারু কৃত্তিবাসের দিকে তাকিয়ে একটু মুচ্‌কি হেসে স'রে গেল।

রাত্তিরে শোবার সময়ে কৃত্তিবাস ঘরের সব জানালা খুলে দিয়েচে।

অঞ্জনা দেখে ব'ল্‌ল, ক'রেচো কি কৃত্তিবাস, সব ক'টা জানালা খোলা! মারা যাবে যে তুমি ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে!

হেসে কৃত্তিবাস ব'ল্‌লো, কিচ্ছু ভয় নেই অঞ্জনাদি।

এ তো দূরের কথা, কতো দিন একেবারে খোলা বারাণ্ডায়ই শুয়ে প'ড়ে থেকেচি। আমার বেশ অভ্যেস হ'য়ে গেচে, ঠাণ্ডা মোটেই লাগ্‌বে না, আপনি ভয় পাবেন্ না। বদ্ধ ঘরে শোয়া আমার পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। আর আমার ব'লে নয়—সবার পক্ষেই তাই। আপ্‌নারা সব দোর জানালা বন্ধ ক'রে শোন্ বুঝি?

—বন্ধ ক'রেই তো শুই!···না, না বাপু, অতো বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই, অন্ততঃ মাথার কাছেরটা বন্ধ ক'রে দিতেই হবে—

কৃত্তিবাস আরো দু' একবার বোঝাতে চেষ্টা ক'র্‌ল, কিন্তু অঞ্জনা কোনো কথাই মান্‌লো না। সে নিজে এসে জানালাটাকে বন্ধ ক'রে দিলে।

কৃত্তিবাস বুঝ্‌লো কথা-কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই। সে তখনকার মতো চুপ ক'রে থাক্‌লো, কিন্তু অঞ্জনা, চারু ওরা অন্য ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে প'ড়্‌বার একটুক্ষণ পরেই সে মাথার কাছেকার জানালাটা খুলে দিল।

এতক্ষণ যেন তা'র ভারি অস্বস্তি ঠেক্‌চিল। জান্‌লাটা খুলে দিতেই ঝির-ঝির ক'রে একটু মনোরম হাওয়া তা'র মুখের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেল।

সকালে উঠে কৃত্তিবাসকে নিয়ে অঞ্জনা বেড়াতে চ'লেচে। অঞ্জনা হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে ব'ল্‌ল, এখানকার জল-হাওয়া ভারি চমৎকার, বুঝেচো? আমি তো রোজ সকালে চার পাঁচ মাইল ক'রে হাঁটি, যেমন শরীরটা ঝর্‌ঝরে বোধ হয়, তেম্নি হয় ক্ষিদে। ওই যে দূরে একটা ঢিবি মতন্ দেখ্‌চো মাঠের ভেতরে—ওর ওপরে মাঝে মাঝে সকালে গিয়ে বসি, এমন চমৎকার লাগে!

কিন্তু কিছু দূর চ'ল্‌বার পরেই কৃত্তিবাস ব'ল্‌ল, অঞ্জনাদি, আজ্‌কে চলুন বাসায় ফিরে যাই।

একটু আশ্চর্য্য বোধ ক'রে অঞ্জনা জিজ্ঞেসা ক'র্‌ল, কেন?

—মানে আমার চলা-ফেরা সম্বন্ধে একটু নিয়ম আছে কি না! আমি এখনো খুব বেশী হাঁটাহাঁটি করি নে, এই অল্প-স্বল্প যা' হয়। ডাক্তার আস্তে আস্তে হাঁটাটাকে বাড়াতে ব'লেচেন, তা' ছাড়া নতুন জায়গায় এসে প্রথম দিনই বেশী অত্যাচার করা ঠিক নয়।

অঞ্জনা কৃত্তিবাসের কথা হয় তো বুঝ্‌লো, হয় তো বুঝ্‌লো না। তবে বল্‌ল, তা' বেশ; চল, বাসায়ই ফেরা যাক্; কিন্তু শোনো, তুমি অতো ভয়ে ভয়ে থেকো না, বুঝলে? হাঁট্‌বে, চ'ল্‌বে, বেড়াবে, খাবে—তবেই না শরীর সুস্থ হবে? আর তোমার তো এখন অসুখই নেই,—তুমি আবার অতো জড়সড় হ'য়ে থাক্‌বে কেন?

কিছুটা দিন কেটে যায়, কৃত্তিবাস যেন মাঝে মাঝে সামান্য বিব্রত বোধ করে। অঞ্জনা তা'কে স্নেহ করে যথেষ্ট—কিন্তু সে স্নেহ তা'র অসুস্থ দেহ, মন হজম কর্‌তে পারে না। এতোদিন দেখে, শুনে, প'ড়ে, মিশে, ভুগে, বুঝে তা'র যে শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েচে, তা'কে যখন চট্ ক'রে অঞ্জনা উড়িয়ে দিয়ে বলে যে ওসব তোমার মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়, তার মনটা যেন হঠাৎ অঞ্জনার ওপর বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। অঞ্জনা ভাবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে গেচে, সে চায় কৃত্তিবাস আর দশজনের মতোই হাস্‌বে, খেল্‌বে, বেড়াবে···কেন থাক্‌বে তা'র নিরর্থক এই ভীতু-ভীতু ভাব? অঞ্জনা বলে, বুঝ্‌লে কৃত্তিবাস, তোমার এই ভয়টা অনেকটা ছেলেপেলেদের অন্ধকার দেখে ভয় পাবার মতন্।

আর সত্যিই তো, যার এমন সুন্দর চেহারা, সুস্থ লোকের চাইতেও যা'কে অধিক সুস্থ ব'লে মনে হয়, সে কেন মোটে নড়্‌তে চ'ড়তে চাইবে না?···কিন্তু অঞ্জনা বোঝে না 'পুষ্পে কীট সম' তা'র এই চেহারার পেছনে কি দুরন্ত, কুটিল শত্রু প্রতি মুহূর্ত্তে শুধু সুযোগের অপেক্ষা ক'র্‌চে! কেন যে অঞ্জনাদি বোঝে না, কৃত্তিবাস মনে মনে একটু ব্যথাও পায়।

তত্রাচ কৃত্তিবাস সাবধানে থাকে।

চারু এসে কৃত্তিবাসের হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বলে, উঠুন কৃত্তিবাস মামা, স্নানটান ক'রে খেতে চলুন। কতোক্ষণ শুয়ে থাক্‌বেন আর?

কৃত্তিবাস চারুর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌ল, তোমরা স্নানটান করগে যাও, দিদিকে বল আমার ভাত রেখে দিতে। বেড়িয়ে এসে পাল্‌স্‌টা বড্ড বেড়ে গেচে—একটু বিশ্রাম ক'রে নেব। আর খাওয়ার আগে অন্ততঃ এক ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে তবে আমাদের খাওয়ার নিয়ম।

চারু অঞ্জনার কাছে গিয়ে বল্‌ল, ও মাসিমা, কৃত্তিবাস মামা এখন চান্‌ও করবেন না, খাবেন্‌ও না, তাঁর পাল্‌স্ বে › গেচে। তাঁর ভাত রেখে দিতে ব'ল্লেন।

অঞ্জনা বল্‌ল—ম্যানিয়া!

পাড়ায় মস্তবড় ক্লাব। পাড়ার ছেলেরা কিছুদিনের ভেতর একটা থিয়েটার করবে। ক্লাব-ঘরে দিবারাত্রি তার রিহার্সাল চলে, অঞ্জনার বাসা থেকে শোনা যায়।

একদিন অঞ্জনা বল্‌ল, কি যে তুমি দিবারাত্তির ঘরের ভেতর ব'সে থাকো কৃত্তিবাস, মাঝে মাঝে ক্লাবে গেলেই তো পারো! মস্ত বড় লাইব্রেরি আছে, খেলা-ধূলোর বন্দোবস্ত আছে, আর এই তো ক্লাবের সব ছেলেরা মিলে ক'রচে থিয়েটার—শীগ্‌গীরই। একমাইল আধমাইল ভোর-বেলা আর সন্ধ্যেবেলা একটু পায়চারী ক'রে কি কখনো স্বাস্থ্য ভালো থাক্‌তে পারে? কি ক'রে যে তুমি থাকো—তাই ভাবি! এই বয়েস, পুরুষ ছেলে—প্রাণ খুলে সব রকম ফূর্ত্তিতে দিনরাত্‌ মেতে থাক্‌বে। তোমার এ কি রকম মিইয়ে পড়া ভাব?

কৃত্তিবাস যথাসাধ্য চেষ্টা করে অঞ্জনাকে তার অবস্থা বোঝাতে, কিন্তু অঞ্জনা তা'র কথা মোটে মান্‌তে চায় না। কি ক'রে যে অঞ্জনাদি তা'র সম্বন্ধে এই সব ধারণা পোষণ করেন, ভেবে কৃত্তিবাস অবাক হ'য়ে যায়! তা'র বয়েস সম্বন্ধে, তা'র পুরুষত্ব সম্বন্ধে কি সে সচেতন নয়? প্রাণ-খোলা আমোদ যে তা'র চাই, এ কথা তা'র চেয়ে আর কে বেশী জান্‌তে পারে? এ কথা তা'কে আর কারো এসে শিখিয়ে দিতে হবে? তা'র এই কঠোর সংযমের মাঝখানে যে কতোখানি মর্ম্মবেদনা লুকানো—তার খোঁজ অঞ্জনাদি পান্‌ না। কৃত্তিবাস অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে ওঠে।

অঞ্জনাদি বলেন, আমি অমুককে জানি, তোমার বা কি, তার·আর বিছানা থেকে উঠ্‌বার জো ছিল না। সে স্যানাটোরিয়ামেও যায় নি, তোমার মতো এত পণ্ডিতও হয় নি, মাত্তর বুঝি দিনকতো একটু কবরেজী ওযুধ খেয়েছিল। সে তো দিব্যি সেরে গেচে, কাজও ক'রুচে, সবই ক'রুচে!

অঞ্জনাদি একটা দৃষ্টান্ত দেন্‌, দুটো দেন, বড় জোর তিন্‌টে দেন্‌। কিন্তু কৃত্তিবাস জানে হাজার হাজারকে—যারা অত্যন্ত শোচনীয় অজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অকাল-মৃত্যুর কাছে নিজেদের নিয়ত বলিদান ক'রে চলেচে। কৃত্তিবাসের নিজের শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার সাথে অঞ্জনার শোনা-কথা আর অনুমানের দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চল্‌তে থাকে।......

এম্নি ক'রেই দিন কাটে।

একদিনকার ঘটনায় যেন একটু বেশী তিক্ততা বোধ হোলেন।...

বাজার থেকে একটা কুলী চা'ল নিয়ে এসেচে, প্রকাণ্ড বস্তা। বাসার ভেতর ঢুকে কুলীটা ডাক্‌লো—চা'ল নাবিয়ে লাও বাবুজী...

কুলীটার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে, পীঠটা হ'য়ে গেছে ধনুকের মতো বাঁকা। রুগ্ন, ক্লিষ্ট দেহ—মাথায় বিপুল ভারি বোঝা। মেরুদণ্ডটা বুঝি ভেঙে দুখণ্ড হ'য়ে যায়!

কুলীটা ক্ষীণকণ্ঠে আবার হাঁক্‌লো—ধরো বাবুজী, ঘাড় ভাঙে যাছে!...

কৃত্তিবাস সাম্নেই দাঁড়ানো, অঞ্জনা একটু দূরে। অঞ্জনা তাড়াতাড়ি বল্‌ল, কি করুচো কৃত্তিবাস, ধরো! মলো যে লোকটা!

মুহূর্ত্তের জন্যে কৃত্তিবাসের আপাদমস্তক একবার শিউরে উঠলো। দু'মণ ভারি ওই বোঝাটা যদি সে টেনে নামায়, তা'হলে তার পরমুহূর্ত্তে...

কৃত্তিবাসের বুকের ভেতর ঢিপ্‌ ক'রে উঠ্‌লো।

হঠাৎ লোকটা ধড়াস্‌ ক'রে দিলো চালের বস্তাটা মাথা থেকে ফেলে। দিয়ে ওইখানেই ব'সে হাঁফাতে হাঁফাতে ব'ল্‌ল, বাবুজী, আপ্‌নি জোয়ান্‌ আদ্‌মী, চুপ ক'রে দাড়াইয়ে থাকলেন, হামি যে ম'রে যেতুঁ!

কোনো কথা না ব'লে অঞ্জনা শুধু কৃত্তিবাসের দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে কুলীটাকে দেবার জন্যে পয়সা আন্‌তে ভেতরে চ'লে গেল—সে দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠ্‌লো একটি কঠিন অবজ্ঞা ও তিরস্কারের ছায়া!

কৃত্তিবাস অপরাধীর মতো সেখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

এর পর থেকে কৃত্তিবাস অঞ্জনার বেশ একটু পরিবর্ত্তন বুঝ্‌তে পারে।

বিজনে
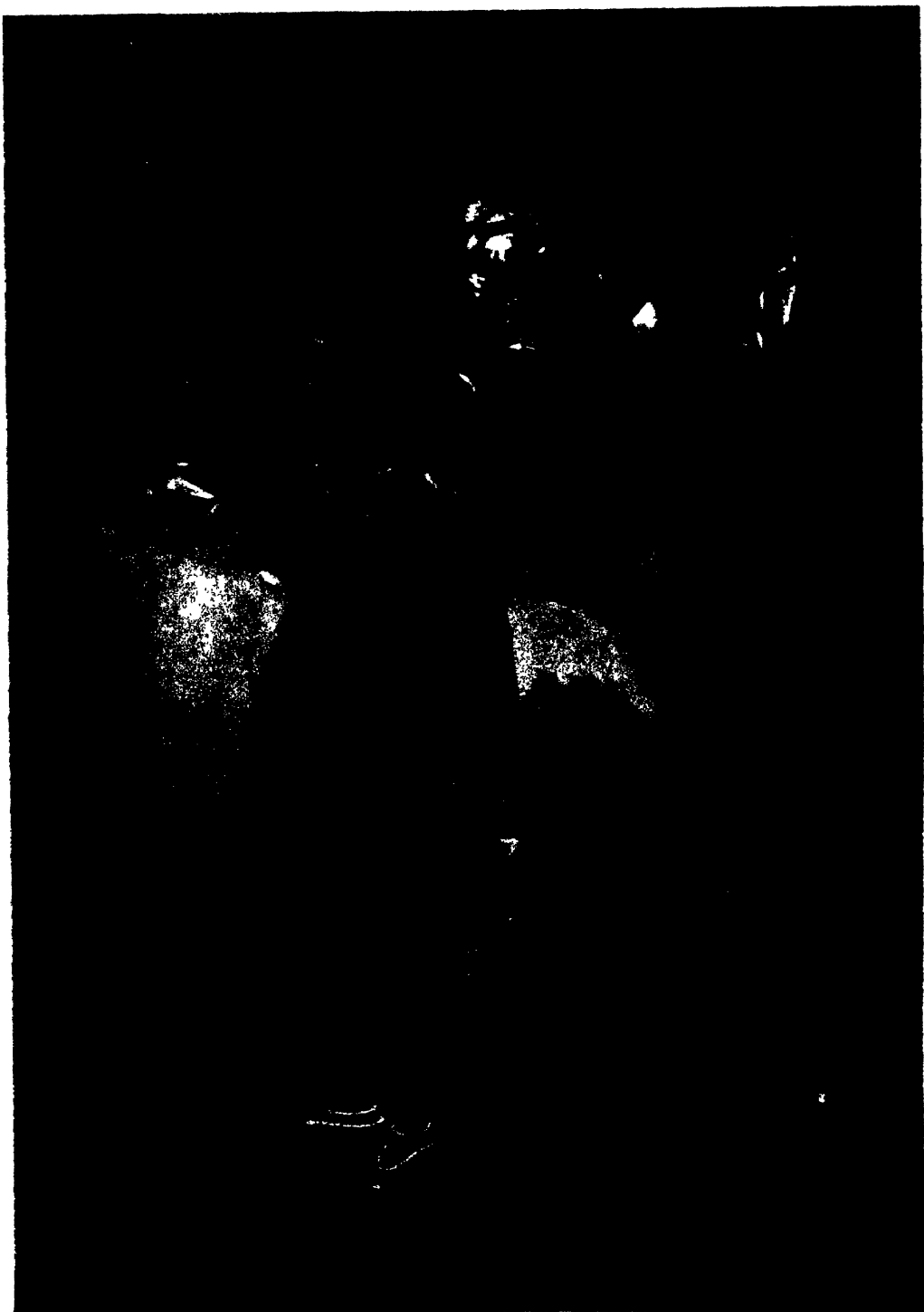
শিল্পী—ডি, পি, রায়চৌধুরী
মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সেদিন অঞ্জনা ব'লছে—চারু, আজ ঘড়িটাতে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছি, দিয়ে দে তো তুই।

ঘড়িটা কৃত্তিবাসের হাতের কাছেই ছিল, ঘড়িটা হাতে নিয়ে সে বল্‌লে, আমিই চাবি দিয়ে দিচ্ছি অঞ্জনাদি।

অঞ্জনা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কৃত্তিবাসের হাত থেকে খপ্‌ ক'রে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে ব'ল্‌ল—না ভাই, থাক্‌, তোমার আর চাবি দিয়ে কাজ নেই, শেষে আবার হয় তো জ্বর হবে, কি বুকে বেদনা হবে—

কৃত্তিবাস একটু অবাক্‌ হ'য়ে গেল!

আরেকদিনও ওই-রকম অঞ্জনা চারুকে টেব্‌লের ওপর থেকে ফাউন্টেন্‌ পেন্‌ না কি রাইটিং প্যাড্‌—কি একটা এগিয়ে দিতে ব'ল্‌চে, কৃত্তিবাস কাছেই ছিল, দিতে গেলেই অঞ্জনা একটু শ্লেষের সুরে ব'ল্‌ল, ওঃ, কৃত্তিবাস! ওটা ধ'র্‌তে যেয়ো না যেন, মুখ দিয়ে আবার রক্ত-টক্ত উঠ্‌বে!

রাত্তিরে শোবার সময়ে কৃত্তিবাস ভাবে—আর কেন, এইবারে অঞ্জনাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়া যাক্‌। একদিন অঞ্জনা তা'কে সত্যই অত্যন্ত স্নেহ ক'র্‌তো—আজ সে সেই স্নেহের সম্পূর্ণ অযোগ্য অধিকারী!

সত্যিই তো, সে কি একটা মানুষ? হাস্‌বার যো নেই, চ'ল্‌বার যো নেই, কথা ব'ল্‌বার যো নেই—দুনিয়ার কোনো প্রকার আনন্দ-উৎসবে তা'র যোগ দেবার যো নেই! প্রতি পদে তা'র বন্ধন—প্রতি কর্ম্ম তা'র নিষিদ্ধ।

এটা তো স্যানাটোরিয়াম নয়, শুয়ে ব'সে থাক্‌বার জায়গাও নয়। এখানে সবাই ক'রে চ'লেচে কাজ—অমানুষিক পরিশ্রম, কঠিন প্রতিযোগিতা! কেউ শ্রান্তি মানে না, ক্লান্তি মানে না, এক মুহূর্ত্ত সময় কারো নেই! যখন এতটুকু অবসর জুটচে, তখন সবাই এক উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে সেই অবসরটুকু উপভোগ ক'রে নিচ্চে। এখানে তা'র আরাম কর্‌বার প্রয়াস, নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে চলা—এ সবাই-ই ঘৃণা এবং বিদ্রূপের চোখে দেখ্‌বে, শুধু একলা অঞ্জনাদি নয়।

কিন্তু সে যে চ'লে যেতে চায়—কোথায়ই বা যাবে? তা'র আজ এমন অর্থ, এমন সামর্থ্য নেই, যা'র জোরে সবার কাছ থেকেই দূরে স'রে গিয়ে সে নিজে স্বতন্ত্র ভাবে কোথাও থাক্‌তে পারে!

এক আছে নিজের দেশ—গ্রাম।

কিন্তু কৃত্তিবাস গ্রামের কথা চিন্তা ক'র্‌তেই মনে মনে ভয় পায়। সেই কলহ, কুৎসা, হীনতা, সঙ্কীর্ণতা—যা' দিয়ে তা'র গ্রাম একেবারে পূর্ণ; সেই ক্লান্তিকর বৈচিত্র্য-হীনতা, তারি ভেতর গিয়ে সে বাস ক'র্‌বে? ভাব্‌তেও কৃত্তিবাস যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। সে গ্রামকে ভালোবাসে;—কিন্তু গ্রামের সংসর্গ যে তা'কে মুষ্‌ড়ে ফেলে! তা'র বহির্ম্মুখী, বহুমুখী মন—গ্রাম তার মনের খোরাক যোগাতে পারে না! কারো সঙ্গে সে মানাতে পারে না ব'লে সেখানকার কেউই তাকে চায় না!…

তা' ছাড়া দেশের স্বাস্থ্যও ত' ভালো নয়!

কিছুক্ষণ পরে কৃত্তিবাসের যেন কেমন মনে হয়—এ বাঁচা কি তা'র না বাঁচ্‌লেই হয় না—এত কোলাহল, এত আয়োজনের মাঝখানে নিজেকে এই রকম নিত্য উপবাসী রেখে? এই তো ক'বছর অতীত হ'য়ে গেল—সে বারবার চেষ্টা ক'রেই চ'লেচে, এখনো তা'র বার্‌বার চেষ্টা ক'রেই চ'ল্‌তে হ'বে! হয় তো এম্‌নি ক'রেই তার দিনগুলি অতীত হ'তে থাক্‌বে—কোনো দিনই সে সুস্থ হবে না, হয় তো যদি বা কোনো দিন হয়, সেদিন তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে হবে যে তা'র সমস্ত জীবনটা একখানা সাদা কাগজের মতোই শূন্য—এতটুকু সঞ্চয় তা'তে নেই! সেদিন হয় তো কিছু সঞ্চয় ক'র্‌বার মতো শক্তিও আস্তে আস্তে নিভে নিভে আস্‌চে! সেদিন হয় তো সে দেখ্‌বে, তা'র এই প্রতীক্ষাকে কেউ-ই ক্ষমার চোখে দেখে নি—সকলেই অনেক দূরে চ'লে গেচে এবং তাদের পাশে তা'র ঠাঁই নেই!…

পরদিন রাত্রে চারু প'ড়্‌তে ব'সেচে, কৃত্তিবাস গিয়ে চারুর কাছে ব'স্‌ল।

চারু ব'ল্‌ল, আচ্ছা কৃত্তিবাস মামা, আমাকে A. P.-টা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেবেন?

কৃত্তিবাস উৎসাহিত হ'য়ে ব'ল্‌ল, A. P.? বেশ তো,

তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। খাতা আর পেন্সিল দাও—দেখবে কি রকম interesting ব্যাপার!

চারু খাতা পেন্সিল এগিয়ে দিল।

কৃত্তিবাস খাতার ওপরে প্রথমে আঁকলো একখানা টেবিলের ছবি, তা'র ওপরে আঁক্‌লো একটা বাক্স। বাক্সের ভেতরে দুটি বোতলের ছবি আঁক্‌লো—বোতল দুটিকে সংযুক্ত ক'রে কতকগুলি টিউব্ আঁক্‌লো। তার পরে বোতল দুটির গায়ে দাগ কেটে কেটে কতকগুলি নম্বর বসালো। শেষে একটা টিউবের মাথায় আঁক্‌লো একটা প্যাচ্‌ওয়ালা মোটা, লম্বা নিড্‌ল্।

চারু এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে কৃত্তিবাসের কাণ্ড দেখ্‌ছিল, এবারে ব'লে উঠ্‌লো, এ আপনি ক'র্‌চেন কি কৃত্তিবাস মামা? এ সব কি আঁক্‌চেন? Arithmetical Progressionএ আবার এ সব লাগে কোত্থেকে? কষেন্ নি A. P., G. P.র অঙ্ক?

কৃত্তিবাস হাতের পেন্সিলটা খাতার ওপর ফেলে দিয়ে বল্‌ল, ওঃ, Arithmetical Progression? আমি ভেবেছিলুম Artificial Pneumothorax! আমাদের এই অসুখে বুকের ভেতর একটা injection দেওয়া হয়—তা'কে বলে Artificial pneumothorax, তা'কেই সংক্ষেপে বলে A. P. -আমি মনে ক'রেছিলুম, তুমি সেই injectionটা সম্বন্ধে জান্‌তে চাইচো বুঝি!...তা' আমি Arithmetical Progression তো তোমায় ভালো ক'রে বোঝাতে পার্‌বো না—আমি ত' প্রায় ভুলেই গেচি!

চারু আর হাসি চাপ্‌তে পার্‌ছিল না, ব'ল্‌ল, আপনার মাথার ভেতরে যে কি সব ঘোরে, দিবারাত্তির খালি অসুখের কথাই ভাব্‌চেন—খালি অসুখের কথাই ভাব্‌চেন! পাগল না হ'য়ে যান্ শেষ কালটায়!... দাঁড়ান্, এক্ষুণি আমি মাসিমাকে সব ব'লে আস্‌চি...

চারু চট্ ক'রে উঠে মুখে কাপড় গুঁজে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অঞ্জনা শুনে ব'ল্‌ল, ভূতে পেয়েচে ওকে!

তার পরের দিন রাত্রে কৃত্তিবাস চারুকে ব'ল্‌ল, দ্যাখো, আমি A. P.র অঙ্ক ভুলে গিয়েচি বটে, কিন্তু অঙ্ক বাদে আমি তোমাকে আর সব বিষয়ই পড়িয়ে দিতে পার্‌বো। তুমি কোন্‌টায় কাঁচা আছো বল তো?

চারু ব'ল্‌ল, কাঁচা আর অকাঁচা কি, তা' হ'লে আমায় সব সাব্‌জেক্টই একটু একটু ক'রে পড়ান্ না কৃত্তিবাস মামা! অঙ্ক না হয় না-ই বোঝাতে পার্‌লেন, যা' আমাকে পড়াবেন্ তাই-ই আমার কাজে লাগ্‌বে। আজ্‌কে ইংলিশ প্রোজ্‌টা পড়ান্।

কৃত্তিবাস চারুকে ইংরিজী পড়াতে লেগে গেল। বই যে খুলে নিয়ে সুরু ক'র্‌ল আর অবিশ্রান্ত ভাবে ঘণ্টা তিনেক সমানে বুঝিয়ে গেল। একটা গল্প একেবারে শেষ ক'রে তবে ছেড়ে দিলে।

—কেমন, হ'য়েচে ত'?...কৃত্তিবাস জিজ্ঞেস কর্‌ল।

চারু অত্যন্ত খুশী হ'য়ে ব'ল্‌ল, হ'য়েচে আবার না! সত্যি কৃত্তিবাস মামা, আপনি এমন চমৎকার বোঝাতে পারেন যে তা' আর কি ব'ল্‌ব। সত্যি আপনি যদি আমায় এই রকম কিছুটা দিন পড়ান, তবে আমি নিশ্চয় স্কলারশিপ্ পাবো।

চারু বই খাতা গোছাতে লাগ্‌লো, কৃত্তিবাস অঞ্জনাকে গিয়ে ব'ল্‌ল, খেতে দিন দিদি, ক্ষিদে পেয়ে গেচে।...

সকাল হ'তেই কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি ক'রে মুখ-টুখ ধুয়ে তৈরি হ'য়ে অঞ্জনাকে বল্‌ল, অঞ্জনাদি, আজ্‌কে ভারি বেড়াতে ইচ্ছে হ'চ্চে, চলুন যাই। চারু কোথায়?

চারু ব'ল্‌ল, নাঃ, মাসিমাকে নিয়ে আপনিই যান, আমি যাবো না। আপনার সাথে বেড়িয়ে মোট্টে আরাম পাওয়া যায় না। কয়েক পা হেঁটেই আপনি একবার টিপ্‌বেন পাল্‌স্, একবার টিপ্‌বেন মাথা, আর কথা তো মোটে কইতেই চান্ না চ'ল্‌বার সময়ে—

কৃত্তিবাস হেসে ব'ল্‌ল, না, না তুমি চলো, আজ একেবারে সেই মাটির উঁচু ঢিবিটা অবধি যাবো।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।...

চারু, অঞ্জনা, কৃত্তিবাস বেরিয়ে পড়্‌ল। সারাপথ হাস্‌তে হাস্‌তে, গল্প ক'র্‌তে ক'রতে কৃত্তিবাস চল্‌ল। মাটির সেই ঢিবিটা প্রায় মাইল আড়াই দূরে। কাছে পৌছে কৃত্তিবাস সকলের আগে গিয়ে ঢিবির ওপরে তর্ তর্ ক'রে উঠে গেল।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে চ'ল্‌ল তিন জনে মিলে গল্পগুজোব আর হাসাহাসি !

কৃত্তিবাস যেন ব'দ্‌লে গেচে হঠাৎ! অঞ্জনা খুশী হ'য়ে ব'ল্‌ল, আচ্ছা ভাই, সত্যি বল তো আজ্‌কে কেমন আমোদ লাগ্‌চে! নিজেকে দিন দিন তুমি একটা অপদার্থ ক'রে তুল্‌ছিলে।

ফিরে আস্‌তে অনেক বেলা হ'য়ে গেল। পাক্কা পাঁচ মাইল হাঁটা প'ড়েচে—তা' ছাড়া হৈ-চৈও হ'য়েচে খুব। কিন্তু কৃত্তিবাস আজ বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না ক'রে স্নান ক'র্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

স্নান ক'র্‌বার সময়ে কৃত্তিবাস চারুকে ডেকে নিলো —বল্‌লো, বেশ ক'রে সাবান দিয়ে আমার পীঠ্‌টা র'গ্‌ড়ে দাও তো দেখি চারু···

পীঠ্‌ রগ্‌ড়ে দিতে দিতে কৃত্তিবাসের গলার উপর হাত রেখেই চারু ব'ল্‌ল, সত্যি কৃত্তিবাস মামা, আজ আপ্‌নাকে ভারি ভালো লাগ্‌চে। আপ্‌নি ও-রকম মন-মরা হ'য়ে যেন আর থাক্‌বেন্‌ না, অসুখ কি চিরদিনই মানুষের ব'সে থাকে না কি ?

কৃত্তিবাস একটু হাস্‌ল।

কিছু দিনের ভেতরে কৃত্তিবাস যেন একটু মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে।

খাওয়ার ঠিক নেই, নাওয়ার ঠিক নেই, যখন তখন বেড়াতে বের হয়। হয় তো বিকেলে বেরুল—আর ফিরে এলো রাত্‌ দশ-এগারোটায়—এমনও হয়।

পাড়ার ক্লাবে যোগদান ক'রে সে আড্ডাটাকে আরো জমিয়ে তুলেচে। সকল যুবকেরা একত্র হয়—গান, বাজ্‌না, তর্ক, বিতর্ক—ঘর একেবারে তোলপাড়।

ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে কৃত্তিবাস গাদাখানেক ক'রে বই নিয়ে আসে,—যেটুকু সময় বাসায় থাকে, ব'সে ব'সে পড়ে।

হঠাৎ এক-এক সময় কি রকম বিশ্রী অস্বস্তি বোধ হয়, চোক্‌ মুখ পুড়ে যায়, উঠে একটু দাঁড়াতে গেলেই বুকের ভেতর দপ্‌ দপ্‌ ক'রে ওঠে।···

একদিন সন্ধ্যেবেলা কৃত্তিবাস লুকিয়ে টেম্পারেচার নিয়ে দেখ্‌ল—সাড়ে নিরেনব্বই।

কৃত্তিবাস ভ্রূক্ষেপও করে না।—

প্রত্যেক দিন সে নিয়মিত, হয় অঞ্জনা না হয় চারুকে নিয়ে বেড়াতে বে'র হয়—রদ্দুরে একেবারে ঘেমে ফিরে আসে। ক্লাবের আড্ডা একটি দিন বাদ্‌ না দিয়ে চালাতে থাকে তুমুল ভাবে; কোথায় যায়—কি করে!

আরো কিছু দিন অতীত হবার সাথে সাথে কৃত্তিবাস বেশ একটু রোগা হ'য়ে আসে। একদিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ষ্টেশনে গিয়ে ওজন নিয়ে দেখ্‌ল আগের চাইতে পাউণ্ড দশেক কম!

কৃত্তিবাস বাসায় ফিরে এসে অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস কর্‌ল, আচ্ছা অঞ্জনাদি, আমার শরীর কি খারাপ হ'য়ে গেচে একটু আগের চাইতে ?

অঞ্জনা কৃত্তিবাসের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, হ্যাঁ, অবিশ্যি একটু রোগা হ'য়ে গেচ বটে, তা' ও কিছুই নয়। বরং আগে যেন কেমন একটা ফোলা ফোলা ভাব ছিলো, সব অসুখের পরেই সাধারণতঃ যেমনটা হয়। এখন থেকেই শরীটা আসল অবস্থায় দাঁড়াবে আর কি!

চারু কাছে প'ড়তে ব'সেচিল, সার্টটা খুলে রেখে দিয়ে রোজ্‌কার মতো সে চারুকে প'ড়াতে ব'স্‌ল।

চারু হেসে বল্‌ল, আগে আগে কৃত্তিবাস মামা কি অদ্ভুতই যে ছিলেন, একটু ঘুরে এসেই একেবারে সটান বিছানায়! আজ্‌কাল তবু যা হোক্‌ একটু সাহস বেড়েচে!

এম্‌নি সময় অঞ্জনা কৃত্তিবাসকে জিজ্ঞেস ক'র্‌ল, আচ্ছা কৃত্তিবাস, তোমার তো সাহিত্য-চর্চ্চার দিকে ভারি ঝোঁক ছিল—আগে আগে তো লিখ্‌তে-টিখ্‌তেও খুব, আজকাল ছেড়ে দিয়েচো বুঝি ?

হেসে কৃত্তিবাস উত্তর দিলো, হ্যাঁ, ছেড়েই দিয়েচিলুম বটে, কিন্তু ভাব্‌চি আবার সুরু ক'র্‌ব।

—হ্যাঁ, শুধু সময় কাটাবার জন্যে নয়, তোমার শক্তি ছিলো—তুমি নষ্ট হ'তে দেবে কেন ?

সেই দিন থেকেই চারুকে পড়িয়ে খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘরের ভেতর আলো জ্বেলে কৃত্তিবাস রাত্রি এগারোটা বারোটা পর্য্যন্ত লিখ্‌তে সুরু ক'রে দিলে—লেখা যেন হঠাৎ তা'কে একেবারে পেয়ে ব'স্‌ল নেশার মতো!

কৃত্তিবাসের চোখের নীচে কালী প'ড়ে আসে, বুকের হাড়গুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ভাবে জেগে উঠ্‌তে থাকে।

আরেকদিন কৃত্তিবাস টেম্পারেচার নিলো সন্ধ্যেবেলাটায় —একশোরো একটু ওপরে !

রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না, কপালটা অল্প অল্প ঘাম্‌তে থাকে। ভোরবেলা যেন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তেই পারে না—এম্‌নি দুর্ব্বলতা !

খাওয়ার সময়ে ভাত নিয়ে বসে, কিন্তু ভালোমতন্ খেতে পারে না, কোনো মতে খাওয়া শেষ ক'রে উঠে যায়।

একদিন অঞ্জনা অনুযোগ ক'রে বল্‌ল, না খেয়ে না খেয়েই তুমি শরীরটাকে মাটি ক'র্‌লে কৃত্তিবাস ! এই কিছু দিনের ভেতরে হঠাৎ যেন তোমার চেহারা সত্যিই বড় বিশ্রী হ'য়ে উঠেচে। এ রকম কেন হ'ল বলতো ?

কৃত্তিবাস বল্‌লো, কি জানি অঞ্জনাদি, আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চি না। তবে কিছু দিন ধ'রে পেট্‌টায় বড্ড গোলমাল হ'চ্চে, সেই জন্যেই বোধ হয়।

—ও, তাই বল। তা' দাঁড়াও, তোমার আর কলের জল খেয়ে কাজ নেই,—এখানে এক ভদ্রলোকের বাসার একটা কুয়ো আছে, জলটা ভারি চমৎকার। পেটের গোলমালে এখানকার অনেকেই সেই কুয়োর জল খেয়ে উপকার পেয়েচে। দাঁড়াও, চাকরটাকে আন্‌তে ব'লে দেব।···আর তোমার ডাল, শাক এ-সব খাওয়াও ত' ঠিক হ'চ্চে না, কয়েক দিন শুধু ঝোল-ভাত খেয়ে ছ্যাখো। দুধটাও কমিয়ে দিলে পারো—দুধে অনেক সময় পেটের গোলমাল বাড়ায়।···

অঞ্জনার উপদেশ শুনে কৃত্তিবাস মনে মনে একটু হাস্‌ল ; মুখে ব'ল্‌ল, ঠিকই ব'লেচেন দিদি, দুধটাই ছেড়ে দেব ভাব্‌চি।···

কৃত্তিবাস সত্যিই দুধ খাওয়া ছেড়ে দেয়—যা' ছিলো না কি তা'র প্রধান খাদ্য, যে অমৃত এত কাল পান ক'রে সে দেহের সমস্ত ক্ষয় পূরণ ক'রে আস্‌চিল !

একদিন দুপুরবেলা ঠিক খাওয়া দাওয়ার পরেই অঞ্জনা ব'ল্‌ল, আচ্ছা কৃত্তিবাস, তুমি দাবা খেল্‌তে পারো ? আমি ভাই, কিছু দিন আগে আমার ভগ্নিপতি এসেচিলেন, তাঁর কাছ থেকে দাবা খেলা শিখিচি। তিনি যে ক'টা দিন ছিলেন—দিবারাত্তির খেলা চল্‌ত। এখন তো আর লোক পাই নে। জানো তুমি ?

কৃত্তিবাস ব'ল্‌লো, হাঁ অঞ্জনাদি, জানি একটু একটু, —আমাকে একটি ভদ্রলোক স্যানাটোরিয়ামে থাক্‌তে শিখিয়েচিলেন।

অঞ্জনার ভারি ফূর্ত্তি। বল্‌ল···বটে ? আজই তা'হলে সব বেঁ'র কর্‌চি, দুপুর বেলাটা বেশ কাট্‌বে—কি বল ?

তার পর থেকে খাওয়ার পরেই দুজনে দাবা নিয়ে বসে—দুপুরবেলা।

কৃত্তিবাস যেন আর কিছুতেই পারে না—খাওয়ার পরে দাবার ওপর ঝুঁকে থাক্‌তে থাক্‌তে পিঠ্‌টা যেন ভেঙে আস্‌তে চায়, চোখের সাম্নে অন্ধকার হ'য়ে আসে। বুকের পূর্ব্বেকার বেদনাটা কয়েক দিনের ভেতরেই তীব্রভাবে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কৃত্তিবাস মুখে একটি কথাও বলে না, কাশীর বেগ চাপ্‌তে চাপ্‌তে ঘোড়াটাকে আড়াই পা সরিয়ে দেয় !

সেদিন খেলা চলে একেবারে দারুণ ভাবে। হাতি মরে, ঘোড়া মরে, সৈন্য মরে—যুদ্ধের অবস্থা ঘোরতর হ'য়ে আসে।

হঠাৎ এক সময় অঞ্জনা বলে বস্‌ল—এ তুমি ক'র্‌চো কি কৃত্তিবাস, আমার নৌকোর মুখে দাবাটাকে চেলে দিলে ? তা'ছাড়া এবারে যদি আমি এখানটায় কিস্তি দেই, তা' হলে যে তুমি এক চোটেই মাৎ হ'য়ে যাও ?

কৃত্তিবাস নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি ব'ল্‌ল, দাবাটাকে ফিরিয়ে নিতে দেবেন অঞ্জনাদি, আমি অন্য চাল দেব।

অঞ্জনা ব'ল্‌ল, নাও, কিন্তু হুঁশিয়ার হ'য়ে খেলো।···

কৃত্তিবাস একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লো—তার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত মন, সমস্ত চোখ কঠোর ভাবে নিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌লো দাবার কোট্‌খানার ওপরে।

কৃত্তিবাস জয়ী হ'লো। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হ'য়ে গেচে।

বাসা থেকে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড খাল ব'য়ে গেচে। খালের এপারেই সহর, ওপারেও কিছু কিছু আছে। বাজারের কাছে খালের ওপরে পোল ক'রে দুই অংশকে যোগ ক'রে দেয়া হ'য়েচে। খালটা নদীর সাথে সংযুক্ত, যেমন গভীর, তেমন স্রোত। এ-পাড়ার

প্রায় সমস্ত লোকে এই খালেই স্নান করে। খালটার ধারে একটু বেড়াবার জায়গাও আছে।

কৃত্তিবাস অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে বাসা থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে খালের ধারে এসে ব'স্‌ল।

কিন্তু বসার সাথে-সাথেই কেবলি কাশীর বেগ হ'তে লাগলো। দু'তিন বার কেশে কৃত্তিবাস পাশে ফেল্‌ল—এক দলা তাজা রক্ত! একটিবার তাকিয়েই যেমন এসে বসেছিল তেম্‌নি উঠে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এসে নিজের বিছানায় সে শুয়ে প'ড়্‌ল।

অঞ্জনা হঠাৎ অসময়ে তা'কে এ রকম শুতে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কৃত্তিবাস, শরীর কি খারাপ লাগ্‌চে?

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে নিয়ে কৃত্তিবাস ব'ল্‌লে, অঞ্জনাদি, আমার বড়ো জর জর লাগ্‌চে, রাত্তিরে আর কিছুই খাবো না।

অঞ্জনা ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, তাড়াতাড়ি কাছে ব'সে মাথায় হাত দিয়ে দেখ্‌ল, সত্যিই কপালটা পুড়ে যাচ্ছে। দুঃখিত হ'য়ে অঞ্জনা বল্‌ল, শরীরের ওপর তুমি একটু অত্যাচারই ক'রেচো। যাক্ ভাই, ডাক্তারে যেমন ব'লে দিয়েচে তুমি সেই রকমই থাকো, বেশী বাড়াবাড়ি ক'রে দরকার নেই।·· অঞ্জনা ব'সে ব'সে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

চারু খানিকক্ষণ পরে শুনে কাছে এসে ব'ল্‌ল, আবার জর বানিয়ে নিলেন কৃত্তিবাস মামা? সোমবার দিন দোল—ভাব্‌লুম খুব আমোদ ক'রে আপনাকে রং দেয়া যাবে, কিন্তু তা' আর হ'তে দিলেন না দেখচি!···যাক্, এ কয় দিনের ভেতরে কিন্তু সেরে ওঠা চাই-ই—

চারু কৃত্তিবাসের কাছে ব'সে তা'র হাতের আঙুল মট্‌কে দিতে লাগ্‌লো।

কৃত্তিবাস ধীরে ধীরে বল্‌ল, চারু রাগ ক'রো না, আমার এখন একটু একলা থাক্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে, তুমি এখন চ'লে যাও।

কৃত্তিবাসের হাতখানা ধরে এক মুহূর্ত্তের জন্যে চারু চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লো, তা'র পরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ব'ল্‌ল—বেশ!

হয় তো ওর স্বরে একটু প্রচ্ছন্ন অভিমানের আভাস ছিলো!

দিন দুই পরে কৃত্তিবাস উঠ্‌লো, ব'ল্‌ল, নাঃ—একটু কেমন কেমন হ'য়েছিল বটে শরীরটা, এখন আর কিছু নেই!···

সোমবার দিন সমস্ত পাড়া একেবারে নেচে উঠেচে। হোলির দিন!...

দলে দলে ছেলে মেয়ে বেরিয়েচে রং খেলা ক'র্‌তে—প্রত্যেকের হাতে আবির, পিচ্‌কারি, রংয়ের বাল্‌তী।

কিছুক্ষণের ভেতরেই পাড়ার চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেল। প্রত্যেকের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রক্ত-রাঙা, রাস্তা-ঘাট লাল হ'য়ে গেচে, যে যা'কে পার্‌চে আবির দিচ্চে, পিচ্‌কারী ছুঁড়ে একেবারে স্নান করিয়ে দিচ্চে!

ফর্সা কাপড় প'রে পথ দিয়ে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যিনি চোক্ গরম ক'র্‌চেন, তিনিই নাকাল হ'চ্চেন সব চেয়ে বেশী করে। ছেলের দল চারিদিক থেকে তাঁকে বীভৎস ভাবে আক্রমণ ক'র্‌চে। এক এক দল এক এক বাসার ভেতরে ঢুক্‌চে, যারা লুকিয়ে ছিলেন, তাঁদের বাহিরে টেনে এনে দুর্দ্দশার চরম ক'রে ছাড়্‌চে। ভেতরে হল্লা, বাহিরে হল্লা—পাড়াময় এক তাণ্ডব-লীলা!

কৃত্তিবাস ঘরে ব'সে ব'সে এই হিংস্র প্রমোদ দেখ্‌চিল। হঠাৎ একদল ছেলে বাসার ভেতরে ঢুকে কৃত্তিবাসকে ঘিরে ফেলে পিচ্‌কিরি ছুঁড়তে সুরু ক'রে দিলে। অঞ্জনাকেও তা'রা রেহাই দিলে না। এক বাল্‌তী রং কৃত্তিবাস আর অঞ্জনার গায়ে শেষ ক'রে আবার তারা রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়্‌ল। কৃত্তিবাস স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল।

খানিকক্ষণ পরেই এলো একদল মেয়ে—সেই দলে চারুও একজন।

হুড়্‌মুড়্ ক'রে দলবল নিয়ে চারু কৃত্তিবাসের ঘরে ঢুকে বল্‌ল, ওঃ—আগেই হ'য়ে গেচে দেখ্‌চি, আচ্ছা এবারে আরেক চোট হবে। এই সুষমা—দে তো—

মুহূর্ত্তের ভেতরে মেয়েরা উন্মত্তার মতো কৃত্তিবাসকে চেপে ধ'রে আবির মাখাতে লাগ্‌লো।

খানিক পরে কৃত্তিবাসকে ছেড়ে ওরা ধ'র্‌ল অঞ্জনাকে। এই ফাঁকে চারু কৃত্তিবাসের কাছে এসে ব'ল্‌ল, ছোঁড়াগুলো যা' সুরু ক'রেচে কৃত্তিবাস মামা,—রং

তো গিয়েচে ফুরিয়ে—এখন যে যা'কে পারচে আলকাতরা পর্য্যন্ত মাখাচ্ছে!—সত্যি, ভাগ্যিস্ আপনার জরটা সেরেছিল, বেশ রং দিয়ে নেয়া গেল আপনাকে!··· আপনি কিন্তু মোটে উঠ্‌লেন্‌ই না···

চারু চ'লে কৃত্তিবাস কয়েকবার কাশ্‌ল—

তাড়াতাড়ি একখানা ন্যাকড়া নিয়ে মুখের কাছে এনে ধর্‌ল। যে রক্ত একদিন একটু দেখা দিয়ে বন্ধ হ'য়েছিল, তাই উঠ্‌লো মুখ একেবারে ভর্ত্তি হ'য়ে। আবার কাশী এলো—আবার রক্ত!

খানিকটা ছিট্‌কে পরণের কাপড়ের ওপর প'ড়ে আবিরের রঙের সাথে একাকার হ'য়ে গেল।

কৃত্তিবাস উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে খালের ধারে এলো—অঞ্জনা অন্য ঘরে কি যেন করছিল, জান্‌তেও পার্‌লো না।

খানিক বাদেই চারু আর কয়েকটি মেয়েকে সাথে ক'রে ফিরে এসে জিজ্ঞেস্ ক'র্‌ল, মাসিমা, কৃত্তিবাস মামা কি ঘাটে গেচেন্?

অঞ্জনা ব'ল্‌ল, কেন, সে ঘরে নেই?

—না, তো!·ঘাটেই গেচেন বোধ হয়। আমরাও যাই এক্ষুণি নেয়ে আসিগে। ঘাটে এখনো ভিড় নেই,— এর পরে ব্যাটা ছেলেরা এসে খালে নাব্‌লে আর আমাদের নাওয়া চ'ল্‌বে না···

কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় অঞ্জনার বুকের ভেতর কেঁপে উঠ্‌লো, সে ব'ল্‌ল, ছাখ্ চারু, কৃত্তিবাস যেন বেশীক্ষণ জলে মোটেই থাকে না,—বাড়ীতে গরম জল ক'রে চান্ ক'র্‌লেই পার্‌তো। ও রোগা মানুষ, ওর ওপর অত অত্যাচার করা মোটেই ঠিক হয় নি।

ঘাটের একটু দূরেই খালের ধারে একটা গাছ জলের ওপরে ঝুঁকে প'ড়েচে। স্নানের সময়ে এই গাছের ওপরে চ'ড়ে সবাই জলের ভেতরে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে আবার স্রোতে গা ছেড়ে দিয়ে ঘাটে চ'লে আসে। কৃত্তিবাস এই গাছটার গোড়ায় ব'সে ছিলো চুপ ক'রে। এতক্ষণ কাশীর সাথে অনবরত রক্ত উঠে এখন কিছু শান্ত হ'য়েচে।

দূর থেকে কৃত্তিবাসকে দেখেই চারু দৌড়ে ছুটে এলো। এসেই ব'ল্‌ল, কৃত্তিবাস মামা, আপনি তো বেশ আগে থেকেই এসে বসে আছেন দেখ্‌চি!···আচ্ছা, আপনার মাঝে মাঝে কি হয় বলুন তো? আজ সারাটা দিনই গম্ভীর হ'য়ে থাক্‌লেন। কই, কাল তো এ রকম ছিলেন না?

বুকের ভেতর ঘড়্ ঘড়্ ক'র্‌চে, হৃৎপিণ্ড যেন এখুনি বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে চায়, খাল—আকাশ—ঘর—বাড়ী— রাস্তা—মানুষ—সব কিছু চোখের সামে মিলে মিশে এক হ'য়ে যায়! তবুও প্রাণপণ শক্তিতে কৃত্তিবাস দুর্ব্বল পা দুটিকে কোনোমতে সোজা ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌ল, বা-রে, গম্ভীর আর কই?

—নাঃ, গম্ভীর আবার নয়! আমাদের তো কাউকেই একটু রং দিলেন না, বাইরে তো বেরুলেনই না! আপনি রোগা মানুষ ব'লেই সবাই ছেড়ে দিয়েচে, নইলে টেনে হিঁচ্‌ড়ে বা'র ক'রে নিতো—আপনার ওপরে আর কই বা অত্যাচার হ'য়েচে! দেখ্‌লেন না তো! মাসিমা ব'ল্‌ছিলেন আবার!·· সে যাক্‌গে, চলুন না কৃত্তিবাস মামা, গাছটার মাথায় চলুন—ওখান থেকে জলের ভেতর প'ড়ে আপনি লুকোবেন, আমরা আপনাকে ছোঁব।··

কৃত্তিবাস হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে উঠে ব'ল্‌ল— বেশ তো, চল না, একটু লুকোচুরি খেলা যাক্!

ব'লেই সে কেমন অস্বাভাবিক দ্রুত পায়ে গাছের মাথায় এসে দাঁড়াল।

চারুও সঙ্গিনীদের ডেকে নিয়ে গাছের ওপর উঠে এসে তৈরী হ'তে ব'ল্‌ল সবাইকে।

একটি মেয়ে বল্‌ল, কৃত্তিবাসদা, এবারে পড়ুন লাফিয়ে, আগেই উঠ্‌বেন না যেন, আপনাকে আমরা খুঁজে বের ক'র্‌ব—।

কৃত্তিবাস আরেকবার হেসে ওদের দিকে ফিরে চেয়ে ব'ল্‌ল—কেমন, রেডি? আচ্ছা,···ওয়ান—টু—থ্রী···

কৃত্তিবাস অত্যন্ত জোরে জলের স্রোতের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল,—তার প্রায় সাথে সাথে চারুরাও ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

ওরা কৃত্তিবাসকে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো—

কিন্তু কৃত্তিবাস সত্যিই আর উঠ্‌লো না!

জন্মাষ্টমী

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ বি-এল,

(১)

বর্ষা তখনও হয় নাই শেষ, ভাঙ্গেনি মেঘের জাল,
শরত-আকাশে উঠে নাই ভাতি, রবির কিরণ লাল,
ঘন অমানিশা রজনী ছেয়েছে, তাহে বিদ্যুৎ চলে,
অগণিত তারা নিষ্প্রভ হ'য়ে, লুকায় বারিদ কোলে।
দৈত্যরাজার মথুরা নগরী, উজলিত পথ আলোকে,
স্ফটিকরচিত রাজ নিকেতন মুখরিত গীত বাদকে।
প্রমোদ-ভবনে কংস নৃপতি, নৃত্য সুরায় মত্ত,
পাপের ভোগের বহু উপাদান ভরিছে তাহার চিত্ত।

(২)

দূরে দেখা যায় কঠিন কারার উচ্চ প্রাচীর-চূড়া,
ভীম দরশন নিঠুর প্রহরী দিতেছে পাহারা কড়া।
শোভিছে ভিতরে পুরুষ-রতন, জগতের সেরা নারী,
শৃঙ্খলে বাঁধা লৌহবলয়, ন'য়নে ঝরিছে বারি।
বুক বিদরিয়া উঠে হাহাকার, কারার প্রাচীর ভেদি,
ম্লান হ'য়ে যায় উৎসব-বাতি, ব্যর্থ প্রমোদ-রাতি।
মথুরা নগরে নরনারী যত, আহার বিহার ছাড়ে,
পশুপাখী সব, কাঁদিয়া নীরব, দেবে হাহাকার করে।

(৩)

বলম্বিত হাতে করি করযোড়, ফেলি নয়নের নীর,
আকুল আবেগে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিছে নমিত শির,
সতীর শ্রেষ্ঠ দেবকী জননী, কাঁদিছেন পতি সহ,
"কোথা শ্রীকৃষ্ণ! দেখা দাও তুমি,"—এই বলি অহরহ।
"অগতির গতি, অনাথের নাথ তোমাকে পাইব বলি,
একে একে মোর ছয়টি তনয়, নিজ হাতে দিছি বলি।
আর ত সহিতে পারিনাক মোরা, নিদারুণ শোকভার,
নিঠুর কঠোর রাজার আদেশ, কংসের অনাচার।"

(৪)

কারাকক্ষের এক কোণে ছিল, মৃদুক্ষীণপ্রভা দীপ,
সহসা হইল উজল আলোকে, আলোকিত সব দিক।
ঝলসিত চোখ কারাপ্রহরীর, স্তব্ধ দাঁড়ায়ে অন্ধ,
আকাশ হইতে ফুলদল ঝরে, সুরভি বহিল মন্দ।
খুলিয়া পড়িল লৌহবলয়, খুলে শৃঙ্খল ভার,
বসুদেব সহ দেবকী মুক্ত, মুক্ত কারার দ্বার।
বসুদেব চান দেবকীর দিকে, দেবকী স্বামীর পানে,
ভীত, শঙ্কিত, বচন না সরে, বিস্ময় মনে হানে।

(৫)

কাতর রোদনে কৃষ্ণ-হৃদয়, কোমল হইয়া গেলে
সুমধুর স্বরে, অমিয় বচনে, পিতা মাতা প্রতি' বলে,—
কাঁদিও না দোঁহে, আসিয়াছি আমি,
আদি দেব নারায়ণ,
বিনাশিতে অরি, তরিতে সাধুকে,
আজি মোর প্রয়োজন।
তোমাদের দুখ দূর হবে এবে, ভাতিবে সুখের রবি,
জগতের পাপ, করিব বিনাশ কংস রাজারে বধি।
শুন মোর কথা, দূর কর ব্যথা, হৃদয়ে সাহস ধর,
জনক জননি! যে রূপেতে বলি, দুজনে তেমতি কর।

(৬)

গোকুলেতে আজ, গৃহে নন্দরাজ, যশোদা জননী ক্রোড়ে
যোগমায়া রূপে, আমার শকতি, মানবী জনম ধরে।
পিতা মোরে তুমি, কোলে ক'রে যাও,
নন্দ রাজার ভবনে,
যশোদা মায়ের কোলে রাখি মোরে,
যোগমায়া আন যতনে।
আমার মায়াতে মুগ্ধ প্রহরী, মৃতবৎ জড় রবে,
অজানিত শিবা পথ দেখাইবে, যমুনা সুগম হবে।
করিও না দেরি, যাও ত্বরা করি, আমার প্রণাম লহ,
পুন দেখা পাবে, মোক্ষ লভিবে,
আজিকে বিদায় দেহ।

(৭)

আলুথালু বেশ, শিথিল কবরী, দেবকী জননী উঠি,
পতির চরণে করিয়া প্রণাম কৃষ্ণেরে দেন তুলি।
শঙ্কিত চিত কম্পিত হাত, বসুদেব মায়া মুগ্ধ,
জপে অবিরাম, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রজনী নীরব স্তব্ধ।
কারার কপাট তড়িতে খুলিল, শৃঙ্খল গেল ঝরি,
মোহে অচেতন, প্রহরী কজন, মেঘ হ'তে পরে বারি।
মণিময় ফণি ছত্র ধরিল, শুষ্ক যমুনা-জল,
দেবশিশু কোলে দেবপিতা চলে, নীরব গগন-তল।

(৮)

নন্দ রাজার পুণ্য ভবন, সেথাও মায়ার খেলা,
গৃহ পুরজন, ঘুমে অচেতন প্রকাশিছে হরি-লীলা।
কন্যা কোলে করি, বাসুদেব ফিরি দেখেন দেবকী মূর্চ্ছিতা,
ক্রোড়েতে পতির জ্ঞান লাভ পুনঃ, উঠিয়া বসেন লজ্জিতা।
নিমেষের মাঝে কারার কপাট সহসা হইল রুদ্ধ;
প্রহরী জাগিল, কোলাহল হ'ল শৃঙ্খল হ'ল বদ্ধ।
খর তরবারি, দৃঢ় হাতে করি, কংস আসিল ছুটিয়া।
ভীম পদাঘাতে ভাঙ্গিল কপাট, কন্যারে মারে ছুড়িয়া।

(৯)

শিলার আঘাতে যোগমায়া হ'তে উদিত স্বরগ জ্যোতিঃ
দশভূজা রূপ, ধরি অপরূপ, উঠেন আকাশ গতি।
হাসিয়া বলেন, "বৃথা রোষ কর দুষ্ট কংসরাজ!
তোমার শমন, গোকুলে জনম, তোমারে বধিতে আজ।
আকাশমার্গে দেবগণ দেখে, ধরণীতে হরি-খেলা,
আনন্দে মগন, পুষ্প বরিষণ, করিলেন দেব-বালা।
খসে তরবারি গদা যায় পড়ি নীরবে দাঁড়ায় কংস।
প্রকাশিল দেবে "সুসাধিত হবে দৈত্যকুলের ধ্বংস।"

রামতনু লাহিড়ী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

লাহিড়ী মহাশয় সংসারী হইয়াও যথার্থ সাধু পুরুষ ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্ব্বদা গুণ গুণ স্বরে গাহিতেন "মন সদা কর তাঁর সাধনা"। কেবল গাহিতেন না, এই গানের মর্ম্ম তিনি নিজ জীবনে সর্ব্বদা পালন করিতেন— সদাই "তাঁর সাধনা" করিতেন। সংসারের পাপ পঙ্কের মধ্যে থাকিয়াও পাঁকাল মাছের মত তিনি নিজেকে নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার মন কত উন্নত ছিল, ভাল থাকিবার শক্তি কত বেশী ছিল। এরূপ সাধু, পবিত্র ব্যক্তি মানবমাত্রেরই নমস্য, এরূপ সাধু জীবন মানুষমাত্রেরই আদর্শ। যে সকল ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন, রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

লাহিড়ী মহাশয়রা বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার কোন একজন পূর্ব্বপুরুষ বিবাহসূত্রে কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করেন। সেই হইতে লাহিড়ী বংশের এক শাখা কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। রামতনু বাবুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয় অতি ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। রামকৃষ্ণের আট পুত্র ও দুই কন্যা। রামতনুবাবু রামকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সন্তান। সন ১২১৯ সালের (১৮১৩ খৃষ্টাব্দ) চৈত্র মাসে বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার জননীর নাম জগদ্ধাত্রী দেবী। ইনি কৃষ্ণনগর-রাজের দেওয়ান-বংশের কন্যা। ইনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির কন্যা হইয়াও পরম সন্তুষ্ট চিত্তে দরিদ্র পতির গৃহে দারিদ্র্য-দুঃখ বরণ করিয়া লইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। দেওয়ান-বংশও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। এই বংশের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীও পরম ধার্ম্মিকা ছিলেন। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতার সন্তান রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও যে ধার্ম্মিক হইবেন, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ; এবং হইয়াছিলও তাহাই।

যথারীতি পঞ্চম বর্ষে হাতে-খড়ি দিয়া রামতনুর

বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে কৃষ্ণনগরের নৈতিক আবহাওয়া বড় বিশুদ্ধ ছিল না। সেইজন্য পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রামতনুর ধার্ম্মিক পিতা-মাতা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—কিরূপে সন্তানকে এই দুর্নীতির প্রভাব হইতে নিরাপদ দূরে রক্ষা করিবেন। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবচন্দ্র তখন আলিপুরে কর্ম্ম করিতেন এবং চেতলায় বাসা করিয়া থাকিতেন। মাতা-পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি রামতনুকে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন।

কৃষ্ণনগরে থাকিতে রামতনু তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুগামী কিছু বাঙ্গলা ও কিছু পার্শী শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র নিজেও আরবী ও পার্শী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইংরেজীও কিছু কিছু জানিতেন। তিনি ভ্রাতাকে আরবী, পার্শী পড়াইতে এবং ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। তখনকার কালে কি পাঠশালে, কি মক্তবে, কি ইংরেজী বিদ্যালয়ে হস্তলিপি শিখাইতে অত্যন্ত যত্ন করা হইত এবং বাঙ্গালা, পার্শী ও ইংরেজী সুন্দর হস্তলিপির অত্যন্ত আদর ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যত্নে রামতনুর হস্তলিপি-শিক্ষা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবে কাটিয়া গেলে রামতনুকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে দেওয়া স্থির হইল। রামতনু বাবুর হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যাপারটা আধুনিক যুগের লোকের নিকট অতি বিচিত্র ঠেকিবে, কিন্তু তখনকার কালে অবস্থা বাস্তবিকই ঐরূপ ছিল।

সে সময় ইংরেজী শিখিবার জন্য লোকের আগ্রহ অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল; অথচ, ইংরেজী শিখিবার সুযোগ বেশী ছিল না। স্কুল কলেজের সংখ্যা তখন অত্যন্ত কম ছিল; তাহার অনুপাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এই জন্য তাহাদিগকে স্কুলে প্রবেশলাভ করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত—রামতনু বাবুকেও পাইতে হইয়াছিল।

ডেভিড হেয়ার সাহেব যে কয়টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের একটিতে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হেয়ার সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র রামতনুকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গৌরমোহন সম্মত হইলেন এবং রামতনুকে সঙ্গে করিয়া হেয়ার সাহেবের নিকট গমন করিলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রথমে অনেক বালক বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। কিন্তু বিদ্যার্থীর, বিশেষতঃ বিনা বেতনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের আবেদন এবং উপরোধ-অনুরোধে সাহেব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরে-বাহিরে আবেদন-নিবেদনের বিরাম ছিল না। তিনি পাল্কী করিয়া বাটীর বাহির হইলেই বালকরা তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া ভর্ত্তি হইবার প্রার্থনা জানাইত। সেই জন্য সাহেব বিনা বেতনে ছাত্র লওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, এবং ফ্রী বালকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালঙ্কার যখন রামতনুকে ফ্রী লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন তখন সাহেব বলিলেন, খালি নাই, লইতে পারিব না। বিদ্যালঙ্কার কিন্তু দমিলেন না। তিনি রামতনুকে উপদেশ দিলেন—কিছু দিন সাহেবের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে হইবে। তদনুসারে রামতনু কোন দিন বিদ্যালঙ্কারের হাতীবাগানস্থ বাসায় সকাল সকাল আহারাদি করিয়া, কোন দিন বা অনাহারেই হেয়ার সাহেবের বাহির হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বাসার নিকট গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং হেয়ার সাহেবের পাল্কী বাহির হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিন ঘুরিয়া অপরাহ্ন কালে হেয়ার সাহেবের বাসায় প্রত্যাগমন করা পর্য্যন্ত রামতনু এইভাবে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেন। হেয়ার সাহেব দেখিতেন, কিন্তু কিছু বলিতেন না। একদিন তিনি দেখিলেন, ছেলেটির মুখ অত্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। পাল্কী হইতে নামিয়া তিনি রামতনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার ক্ষুধা পাইয়াছে কি না—তিনি কিছু খাইবেন কি না। সাহেবের বাড়ী খাইলে জাতি যাইবার ভয়ে রামতনু বলিলেন, ক্ষুধা পায় নাই। সাহেব পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য বল, তোমার খাওয়া হইয়াছে কি না। আমার বাড়ীতে তোমাকে খাইতে হইবে না—ঐ মিঠাইওয়ালার দোকানে খাইবে। সেদিন রামতনুর আহার হয় নাই, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া ক্ষুধা বিলক্ষণ পাইয়াছিল—তিনি কাঁদিয়া

ফেলিলেন। সাহেব তখন মিঠাইওয়ালার দোকানে তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ মধ্যে মধ্যে ঘটিত—সমস্ত দিন অনাহারে ছুটিবার পর সন্ধ্যাকালে হেয়ার সাহেবের মিঠাইওয়ালার নিকট মিঠাই খাইয়া তিনি বাসায় ফিরিতেন। দুই মাসের অধিক কাল এইরূপ ছুটাছুটির পর সাহেব দেখিলেন ছেলেটি নাছোড়-বান্দা—শিক্ষালাভে ইহার যথার্থই অত্যন্ত আন্তরিক আগ্রহ। তখন তিনি তাঁহাকে স্কুল সোসাইটীর স্থাপিত স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। এই স্কুল পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল এবং তাহার পর হেয়ার স্কুলে পরিণত হইয়াছে। তখনকার দরিদ্র বালকদিগকে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইত।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামতনু স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। হিন্দু কলেজে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন, এবং দিগম্বর মিত্র হেয়ার স্কুল হইতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই একই দিনে হিন্দু কলেজে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতে আসেন। সুপ্রসিদ্ধ হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ঐ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার এক বৎসর পরে পরীক্ষা দিয়া রামতনু মাসিক ষোল টাকার একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বৃত্তি পাইয়া রামতনু কলেজের নিকট স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতাকে আনিয়া লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ঐ কলেজেই শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিলেন। বেতন মাসে ৩০৲ টাকা। তিনি শিক্ষকতা কর্ম্ম করিয়া যৎসামান্য অর্থে নিজের ও ভ্রাতৃ-দ্বয়ের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইহাতেই তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। তিনি কৃতি এবং উপার্জ্জন-শীল, এই অপরাধে অনেক নিরাশ্রয় লোক আসিয়া তাঁহার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। উত্তর-কালে সুপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তখন খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে এক ইংরেজের নিকট দশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। কোন কারণে সেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি বন্ধু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ আসিয়া আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনা করিলে লাহিড়ী মহাশয় কখনও 'না' বলিতে জানিতেন না। তিনি শত অসুবিধা, সহস্র কষ্ট সত্ত্বেও অম্লান বদনে প্রার্থীমাত্রকেই আশ্রয় দিতে ও সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কেবল ইহাই নহে—ঐ টাকা হইতেই তিনি দেশে পিতা-মাতাকেও কিছু কিছু সাহায্য প্রেরণ করিতেন।

লাহিড়ী মহাশয় তিনবার দার পরিগ্রহ করিয়া-ছিলেন। তিনি যখন হিন্দু কলেজের তৃতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করেন। এই পত্নীর পিতা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইতে চাহিতেন না, এবং কখনও পাঠান নাই। তিন-চারি বৎসরের মধ্যে ইঁহারও মৃত্যু হয়। তৎপরে রামতনু সাঁতরাগাছির চৌধুরী বাড়ীতে তৃতীয় বার বিবাহ করেন। এই তৃতীয়া পত্নীই ছিলেন লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার সন্তানগণের জননী। ইতোমধ্যে লাহিড়ী পরিবারে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে—লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার জননী স্বর্গারোহণ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কৃষ্ণনগরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে রামতনু মাসিক এক শত টাকা বেতনে ঐ কলেজের স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণনগরে গমন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ-এপ্রেল মাসে তিনি মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে হেড মাষ্টারের পদে উন্নীত হইয়া বর্দ্ধমানে বদলী হন।

বর্দ্ধমানে কার্য্য করিতে করিতে একদা রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নিমন্ত্রণে কতিপয় বন্ধুসহ নৌকাযোগে গাজিপুরে গমন কালে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করেন। তিনি উপবীত-বিহীন অবস্থায় বর্দ্ধমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেখানে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাঁহাকে লোকে একঘরে করিল। তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ হইল, দাসদাসীরা কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল—সপরিবারে তাঁহার কষ্টের একশেষ উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার কয়েক মাসের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। আন্দোলনের তরঙ্গ বর্দ্ধমান হইতে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা রামকৃষ্ণ

লাহিড়ী মহাশয়কে পর্য্যন্ত উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। এক বৎসর মাত্র বর্দ্ধমানে থাকিবার পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় বালি উত্তরপাড়া ইংরেজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে তাঁহার প্রতি সামাজিক উৎপীড়ন একটু কম হইল বটে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হইল না। তবে কলিকাতার সান্নিধ্যে বলিয়া এখানে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমুখ বন্ধুগণের নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য ও সান্ত্বনা পাইতে লাগিলেন—দিন এক প্রকার কাটিতে লাগিল। নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একবার যে উপবীত তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিতে তিনি সম্মত হইলেন না। উত্তরপাড়ায় লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ছাত্রগণের যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার উত্তরপাড়া ত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য ঐ বিদ্যালয়ে একটি প্রস্তর-ফলকের প্রতিষ্ঠা করেন। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বারাসত স্কুলে বদলী হইয়া যান। এখানে তিনি দেড় বৎসর মাত্র ছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি সেখানে ছাত্র ও জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় যখন বারাসতে ছিলেন তখন সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। ইহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়া গমন করেন। ইহার পর তিনি কিছুদিন রসাপাগলায় টিপু সুলতানের বংশধরগণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া গমন করেন। সেখানে তিনি মাত্র তিন মাস ছিলেন। বরিশাল হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তিনি আবার কৃষ্ণনগরে আসেন, এবং কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয় যেন শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছিলেন। তিনি নিজেও চিরদিন শিক্ষার্থী ছিলেন। নিত্য নূতন জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার অদম্য আগ্রহ এবং অপরিসীম উৎসাহ দিল। পাঠ্য পুস্তক তিনি কমই পড়াইতেন; কিন্তু পুস্তক অবলম্বন করিয়া তিনি নানা বিষয়ের অবতারণা করিতেন, এবং এমন ভাবে পড়াইতেন যে, তিনি যাহা বলিতেন, তাহা ছাত্রগণের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যাইত। আর একটি কাজ তিনি করিতেন—ছাত্রগণকে তিনি চিন্তা করিতে, বিচার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা দিতেন, এবং তাহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেন।

অবসর গ্রহণের কিছু কাল পরে তিনি সরকার কর্ত্তৃক গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় বংশীয় নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া কিছু দিন তথায় বাস করেন।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ধর্ম্মে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু কোনও দলের ছিলেন না—তিনি সকল প্রকার দলাদলির অতীত ছিলেন। অকপট ঈশ্বর-ভক্তি, এবং চরিত্রের সাধুতায় সমাজের সকল স্তরের এবং সকল সম্প্রদায়ের নিকট তিনি সমান শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার সাধুতার সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছিলেন—

> "এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
> দশ দিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন।"

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পরলোকগত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং নামক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং অর্থ উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হ্যারিসন রোডে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে আনিয়া তথায় স্থাপন করিয়া শেষ বয়সে অতি যত্নে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদিন রামতনু লাহিড়ী মহাশয় কেমন করিয়া খাট হইতে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙিয়া ফেলিয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ঐ বৎসর ১৩ই আগষ্ট (২৯এ শ্রাবণ, সন ১৩০৫ সাল) লাহিড়ী মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন।

নবীন বঙ্গের জীবন-প্রভাতের দৃশ্য

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, কে-টি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"-র প্রথম খণ্ডে ১৮১৮ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিবরণ ছিল। এই দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার পরবর্ত্তী দশ বৎসরের ইতিহাসের তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই দশ বৎসরকে অনেক দিক হইতে আমাদের দেশের যুগসন্ধি বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর চিন্তা ও জীবনের যে সব বীজ ঐ প্রথম খণ্ডে বর্ণিতকালে বপন করা হইয়াছিল, এই দ্বিতীয় বর্ষ-দশকে তাহা শাখাপল্লবিত হইয়া দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ বিকাশের অভ্রান্ত দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম যুগে দেখি যে আমাদের নেতাগণ শিক্ষায়, সমাজে, সাহিত্যে, ভাষায় যেন শিশুর মত প্রথম স্খলিত পদক্ষেপ আরম্ভ করিয়াছেন, যেন এদিকে ওদিকে হাতড়াইয়া অন্ধভাবে পথ বাহির করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। সেই প্রথম যুগে কত ভ্রম ও ভ্রম-সংশোধন, কত এগোনো পিছোনো, কত ব্যর্থ চেষ্টা ও অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার স্বভাবতই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ১৮৩০—১৮৪০-এর যুগে আমরা দেখিতে পাই যে নেতারা নিজের শক্তি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন, গম্য পথ চিনিয়াছেন, দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন ; আর পরীক্ষা করিবার, নানাদিকে হাতড়ানোর আবশ্যকতা নাই।

এই জন্যই দ্বিতীয় খণ্ড এত অধিকতর মূল্যবান। এই সুবৃহৎ ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে (সূচীপত্র বাদেই), সেকালের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম,—অর্থাৎ যে-কটি বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি সমগ্র ভারতের পক্ষে এক শত বর্ষ ধরিয়া অগ্রগামী, পথপ্রদর্শক আলোকশিখা, দৃষ্টান্ত ও নেতা হইয়াছিল,—ঠিক তাহারই অতি বিস্তৃত সত্য ও মনোরঞ্জক সমসাময়িক বিবরণ একত্র করা হইয়াছে। এইরূপে বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় জীবনের ও ভারতীয় নব্য কৃষ্টির ইতিহাসের অত্যাবশ্যক প্রথমশ্রেণীর উপাদান আমাদের সম্মুখে ব্রজেন্দ্রনাথ উপস্থিত করিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসের কোন লেখক বা ছাত্রই এই উপাদানকে গ্রহণ না করিলে নিজে বঞ্চিত হইবেন। আমাদের পুস্তকাগারগুলি যদি এখনই এই গ্রন্থ সংগ্রহ না করেন, তবে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। কারণ, যে-সব পুরাতন পত্রিকা হইতে এই সব তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য, অনেক স্থলে অংশতঃ বিলুপ্ত, কখন বা যক্ষের ধনের মত আঁধার কোঠায় গোপনে রক্ষিত ; সেখানে প্রবেশ করিতে সম্পাদককে কত কল-কৌশল, কত স্তুতি ও সাধনা, কত ধৈর্য্য ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা আমি জানি।

একজন মাত্র লেখকের শ্রম ও ত্যাগস্বীকারে এই গ্রন্থ রচিত হইল এবং এত দ্রুত হাজার পৃষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে ! অন্যান্য দেশে কোনও পণ্ডিত-সংঘের সমবেত চেষ্টায়, কোন ধনাঢ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্থ ও জন-সাহায্যে এবং উৎসাহে এইরূপ গ্রন্থ রচিত হয়। বাঙ্গলার একজন নির্ধন, অন্ন-উপার্জ্জনে অন্যত্র নিত্য ব্যস্ত, যুবকের অবসর-বিহীন অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নের ফলে এই কাজ যে সম্পন্ন হইল, ইহা ব্রজেন্দ্রনাথের গৌরব, বাঙ্গালী জাতিরও কম শ্লাঘার কথা নহে।

কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি এই বিষয়ের মূল্য বুঝিয়া অগ্রসর না হইতেন এবং ইহার দুই খণ্ড ছাপিয়া না ফেলিতেন, তবে ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনার ফল হস্তলিপিতেই আবদ্ধ থাকিয়া দুই-চার বৎসরে লোপ পাইত, অথবা তাঁহার চেষ্টা অঙ্কুরেই শুকাইয়া যাইত ; ভবিষ্যতের বঙ্গীয় পাঠকগণ চিরদিনের তরে এই ঐতিহাসিক ধন হইতে বঞ্চিত হইতেন। এই দ্রুত মুদ্রণ লেখককে উৎসাহিত করিয়াছে, তাঁহার আরব্ধ চেষ্টাকে অন্তিমে পৌঁছাইবার জন্য তাগিদ দিতেছে। ইহা নিশ্চয়ই পরিষদের কীর্ত্তিমালার মধ্যে নগণ্য বলিয়া লিখিত হইবে না !

এই জাতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া অবিকল অভ্রান্ত আকারে মুদ্রিত করিতে যে কত শ্রম কত মনোযোগ আবশ্যক তাহা আমি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি ; বিশেষতঃ সেকেলে বাঙ্গলা ভাষার ঠিক ঠিক নকল করাও সাধারণ লিপিকরের অসাধ্য, ইহাতে মস্তিষ্কের অনেক ব্যয় আছে। কিন্তু বঙ্গ-ভাষার ইতিহাসের পক্ষে এই অবিকল নকলই অত্যাবশ্যক, নকল করিবার সময় ইচ্ছা করিয়া অথবা মুদ্রাকর-প্রমাদে ভাষাকে নব্য করিলে গ্রন্থের অর্দ্ধেক মূল্য নষ্ট হইবে।

এই খণ্ডের বিষয়গুলিও অতি মনোরম। কৃতজ্ঞ নব্য-বঙ্গের স্মৃতির সুদূর প্রথম কোঠায় যে সব মহাপুরুষের, যে-সব মহাপ্রতিষ্ঠানের নাম অস্পষ্ট নামমাত্র হইয়া ছিল, আজ এই গ্রন্থে তাহাদের দিনের পর দিন চাক্ষুস দেখিতেছি। পাতার পর পাতা পড়িয়া যাই উপন্যাসের মত আকর্ষণে, অথচ কথাগুলি সত্য ! বিশেষতঃ সেই আদি যুগের সমাজ-সংস্কারকদের চেষ্টা ও বিপদ, ভয় ও লাঞ্ছনা পড়িয়া কখনও হাসি, কখন কান্না পায়। কিন্তু যদি আজ ভারত ব্যাপিয়া সমাজ-সংস্কার বিজয়ী হইয়াছে, যদি আজ তাহা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মত লোকের চোখেই পড়ে না,—তবে তাহা ঐ প্রথম যুগের কর্ম্মীদের সাধনার ও নির্য্যাতন সহ্য করার ফল,—এই সত্য এই দ্বিতীয় ভাগ হইতে পদে পদে প্রমাণ করা যায়। কি ভয়ানক কথা, ১৮৩১ সালে একজন সাহেবকে টৌনহলে যে খানা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে কেষ্টা বন্দো (ভবিষ্যৎ রেভারেণ্ড) যাইতে উদ্যত হইয়াও ভয়ে "তৎ সুখাস্বাদনে নিবারিত হন।" (৪৮১ পৃঃ) ৺বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিকথায় পাঠকেরা জানেন যে ইহার ৫০ বৎসর পরেও কলিকাতায় "মনুনিষিদ্ধ" আহার কত বিপদজনক ছিল।

বিবিধ দিকে বাঙ্গালীর আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা আদর্শ ও সাধনা, কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার কি ফল হইল, জাতীয় বিকাশ কোন্ পথ ধরিল এবং কখন ধরিল, তাহা পত্রে পত্রে এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। ইহা নব্য ভারতের অমূল্য ইতিহাস। ইহার কোন অংশই সামান্য বা ছোট বলিয়া ত্যাগ করা অবহেলা করা চলে না। সুবিখ্যাত ইংরাজ-লেখক লেস্লি ষ্টিফেন্ সত্যই বলিয়াছেন :—"Such a labourer may incidentally provide data of real importance to the political or literary historian : *he reduces*, once for all,

one bit of chaos to order, and helps to *raise the general standard of accurate research.* He is pretty certain to confer a benefit, if not a very important benefit, upon mankind." ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে।

বাঙ্গলা পত্রিকা হইতে সে-যুগের ইতিহাসের উপাদান ত এইরূপে নিঃশেষ হইতে চলিল ; এখন শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং সাহিত্য সম্বন্ধেও সে-যুগের কিছু কিছু উপাদান পুরাতন পাদরিদের লিখিত গ্রন্থে ও পত্রিকায় পাওয়া যায় ; তাহা দিয়া ঐতিহ্য ভাণ্ডার পূর্ণ করা আবশ্যক। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে আমি অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, যথা—Heber's Journal, Stathan's Indian Recollections, Handbook of C. M. S. Missions (by James Long), Calcutta Christian Observer (মাসিক), Oriental Christian Biography (2 vols.), Adam's Report. ইহা ভিন্ন Asiatic Journal and Monthly Registerও মূল্যবান ; এই মহা দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার এক সেট এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে।

অবশেষে, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ৬২ কলম্-ব্যাপী দীর্ঘ সূচীপত্র রচনা করিয়া চিরদিনের তরে পাঠকের আন্তরিক ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। যে অনুসন্ধিৎসুই এই গ্রন্থ ব্যবহার করিবেন তিনিই এই সূচীর মূল্য বুঝিবেন।

ভারতযুদ্ধ কোন্ মাসে ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' "মহাভারতে ভারত-যুদ্ধকাল" নামক প্রবন্ধে[১] দেখা গিয়াছে, তৎকালে কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র ছিল। ইহার প্রসঙ্গে যুদ্ধমাস ও যুদ্ধারম্ভ-তিথি অবলোকন করা গিয়াছে। নানা কবির নানা মত। তিথি সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও ঋতু সম্বন্ধে মতান্তর নাই। আমরা মনে করিতাম অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আসচর্যের বিষয়, 'ভারত-সাবিত্রী' পৌষ মাসে যুদ্ধারম্ভ ধরিয়া মাঘী অমাবস্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা জানি আশ্বিন কার্তিক, দুই মাস শরৎ, অগ্রহায়ণ পৌষ দুই মাস হেমন্ত। কিন্তু সাবিত্রী মতে কার্তিক অগ্রহায়ণ দুই মাস শরৎ, পৌষ মাঘ দুই মাস হেমন্ত। ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কোন্ মাসে কোন্ ঋতু আরম্ভ? কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে বর্ষ আরম্ভ? "কলি-দ্বাপরান্তরে ভারত-যুদ্ধ" নামক আগামী প্রবন্ধে বর্ষারম্ভ-বিচার আবশ্যক হইবে। এখানে এই সকল প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

যৎকিঞ্চিৎ হইলেও বিষয়টি দুরূহ, দেশটি ছোট নয়, কালও অল্প নয়। পুরাকালের দেশ বানে ডুবিয়া গিয়াছে, পথঘাট নদী-নালা সব একাকার। কেবল মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে দুই একটা গাছ দেখা যাইতেছে। এই গাছ লক্ষ্য করিয়া পথ-ঘাট অনুমান করিতে হইতেছে, সব গাছ চেনাও যাইতেছে না। কোন্ গাছ কোন সীমানায়, সেখানেও তর্ক আসে।

স্থূলতঃ সূর্য্যস্থিতি-দ্বারা ঋতু নিয়মিত হয়। সূর্যের চারি পদ আছে, দুই বিষুব দুই অয়ন! সূর্য্য দুই বিষুব পদে আসিলে শীতগ্রীষ্ম সুখকর হয়, উত্তর পদে আসিলে গ্রীষ্মাধিক্য, দক্ষিণ পদে আসিলে শীতাধিক্য ঘটে। কিন্তু দেশভেদে ঋতুমাসের অগ্রপশ্চাৎ করিতে হয়। পুরীতে চিরবসন্ত। বঙ্গদেশে যখন হেমন্ত দিল্লীতে তখন শীত। দিল্লীতে চারি মাস শীতঋতু বলিতে পারি।

যে দেশে যেমন, সে দেশে তেমন ঋতুর পর্যায় চলিতেছে। ইহা সামান্য কথা। বিশেষ কথা, কখন্ কোন্ ঋতু আসিবে, আজি হইতে কত দিন পরে বর্ষা পড়িবে, কতবার চন্দ্র পূর্ণ হইলে ইন্দ্র প্রসন্ন হইবেন, সাক্ষাৎরূপে অন্নদান করিবেন। কোন্ নক্ষত্রের উদয়ে ইন্দ্রের আগমন হয়, কোন্ নক্ষত্রের উদয়ে শরৎ আসে, যবের ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। অন্নই প্রাণ। জীবন-মরণের এই কাঠি খুঁজিতে গিয়া নক্ষত্র-দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছিল, যজ্ঞের জন্য নয়, ইন্দ্রস্তুতির কাল নির্ণয়ের জন্যও নয়। ঋতুজ্ঞান না হইলে কৃষিকর্ম অচল, কৃষিকর্ম অচল হইলে প্রাণ সংশয়।

আমরা বিষ্ণুর (সূর্যের) ত্রিবিক্রম নাম শুনিয়াছি।

---

১ প্রবন্ধে দুইটি ভুল আছে।
২য় পৃষ্ঠে চিত্রে পূর্ণিমান্ত অমান্ত নাম উলটা পালটা হইয়াছে।
৩য় পৃষ্ঠ পাদটিপ্পনীতে "তখন কার্তিক পূর্ণিমায় বিষুব হইত" স্থলে "তখন ৩০শে কার্তিক বিষুব ও পূর্ণিমা হইত." হইবে।

তিনি কোথায় কোথায় তিন পদ স্থাপন করিয়াছিলেন? যাঁহার মনে যেমন আসিয়াছে, তিনি তেমন বুঝিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্‌বেদের ঋষিই বলিয়াছেন, বিষ্ণু চারিটি পদ নব্বই দিন যুক্ত চক্র বৃত্তাকারে ভ্রমণ করাইতেছেন।[২] তাঁহার চক্রে দুই বিষুব দুই অয়ন, এই চারি পদ আছে, এবং পদদ্বয়ের মধ্যে নব্বই দিন করিয়া ৩৬০ দিন আছে। ঋষি বলিতেছেন, লোকে তাঁহার দুই পদ দেখিতে পারে, তৃতীয় পদ এত ঊর্ধ্বে সে কেহ দেখিতে পায় না। কেমনেই বা পাইবে? যে পদে তিনি অবস্থিত, সে পদ দুর্নিরীক্ষ্য। এই পদই বর্ধিত হইয়া অসুর বলির (নক্ষত্র Hercules) মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে। একদা চারি পদ দৃশ্য হইতে পারে না। ফল্গুনী এক অয়ন-পদ এবং ভাদ্রপদা অপর অয়ন-পদ দেখাইয়া দিত। তিনি থাকিতেন বামনাকার কালপুরুষ নক্ষত্রে। এই তৃতীয় পদই পাতালে চলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু কোন্ পদ হইতে বর্ষ গণিত হইত? চক্রে চারি পদ আছে বটে, কিন্তু চক্রে পাঁচটি অর আছে (১।১৬৪।১৩)। পাঁচটি অর পাঁচ ঋতু। কোন্ ঋতু হইতে নূতন বৎসর হইত? ঋগ্‌বেদে শরৎ শব্দ দ্বারা বৎসর বুঝাইত। এক শত শরৎ, এক শত বৎসর। চন্দ্র পূর্ণ হইয়া মাস গণিতেন: শরৎ পূর্ণিমা বৎসরের আরম্ভ। শারদ-বিষুবের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত, শারদ বিষুবে পূর্ণিমা হইলে সূর্য বাসন্তবিষুবে থাকিত।

ঋগ্‌বেদে বৎসর আরম্ভ করিবার বিষবক্রম যত স্পষ্ট, অয়নক্রম তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু হেমন্ত শব্দ দ্বারাও বৎসর বুঝাইত। ঋতু পাঁচটি হইলে হেমন্তের মধ্যে শিশিরও ধরা হইত। হেমন্ত অর্থে শিশির না বুঝিলে শরৎ ও হেমন্ত-দুইটিই বৎসর বুঝাইতে পারে না। এ মতে অনুমান হয় শিশির হইতেও বৎসর গণা হইত। তখন সূর্য উত্তরপদে, চন্দ্র দক্ষিণপদে থাকিত।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৭।৪।৮) কথাটা স্পষ্ট আছে। সেখানে বর্ষব্যাপী সত্রের আরম্ভ দিন সম্বন্ধে আলোচনা আছে[৩]। ঋষি বলিতেছেন, একাষ্টকায় (মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী) দীক্ষিত হইবে। কারণ এই তিথি সংবৎসরের পত্নী; এখানে সংবৎসর রাত্রিবাস করে। কিন্তু ইহার দোষ আছে। সে সময় আর্ত (শীত) কাল। আর, বৎসরের শেষের দিকে। ফল্গুনী পূর্ণমাসে দীক্ষিত হইবে। কারণ ইহা সংবৎসরের মুখ (আরম্ভ)। কিন্তু ইহার দোষ আছে। বিষুবান্ (সত্রের মধ্য দিন) বর্ষাকালে (ভাদ্র মাসে) পড়ে। চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষিত হইবে। কারণ ইহা সংবৎসরের মুখ, আর ইহার কোনও দোষ নাই।"

এখানে মূল প্রশ্ন সংক্ষেপ করিয়া লিখিলাম। ঋষি ফল্গুনী ও চিত্রা, পরপর পুস্ত নক্ষত্রের নাম করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতার কালে চান্দ্রমাসের নাম ফাল্গুন, চৈত্র ইত্যাদি হয় নাই। তখন বলা হইত ফাল্গুনী নক্ষত্রে বা চিত্রা নক্ষত্রে যে চন্দ্রমা (চন্দ্রমস্) পূর্ণ হয়, সে চন্দ্রমা। একাষ্টকা সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটি যে মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই দিন উত্তরায়ণ হইত। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ ব্যতীত মহাবিষুব হইতে পারে নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।২।৮) উত্তর ও পূর্ব ফাল্গুনীর পৃথক নাম করিয়া উত্তর ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বৎসরের প্রথমা রাত্রি বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও ফাল্গুনী পূর্ণমাস সংবৎসরের প্রথমা রাত্রি। চৈত্রী পূর্ণিমাতেও কি উত্তরায়ণ বুঝিতে হইবে? অতি পুরাকালে চৈত্রী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত, ঋগ্‌বেদ হইতে প্রমাণ করিতে পারা যায়। টিলক এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সে অর্থ নয়। এখানে অর্থ চৈত্রী পূর্ণিমাতে বৎসর আরম্ভ হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় তারাপুঞ্জময় কৃত্তিকা, নক্ষত্রচক্রের আদি। ইহা হইতে এই সংহিতার কাল খ্রি-পূ ২২০০ অব্দ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

দৈবক্রমে এক অচিন্তিত দিক্ হইতে সংহিতা-প্রণয়ন-কাল আরও নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা গিয়াছে। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় এক গর্গবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে গর্গজ্যোতিষী বলিয়াছেন, শক-

---

২ চতুর্ভিঃ সাকং নবতিংচ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীপৎ। সায়ণ চতুর্নবতি কালায়ব গণিয়াছেন। কিন্তু অর্থ সঙ্গত হয় না! বোধ হয়, বিষ্ণুচক্রের চারি পদ হইতে স্বস্তিক-চিহ্নের চারি পদ। বিষ্ণু-মন্দিরের উপরে স্থাপিত চক্রেও চারি পদ।

৩ বালগঙ্গাধর টিলক তাঁহার Orion গ্রন্থে প্রথমে এই উক্তির আলোচনা করেন। পরে উদ্ধৃত বৈদিক প্রমাণ কয়টি আমি তাঁহার ও শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতের গ্রন্থ হইতে লইয়াছি। ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ আমার।

পূর্ব ২৫২৬ অব্দে (খ্রি-পূ ২৪৪৯) যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ। অব্দটি প্রসিদ্ধ হইল কেন? যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হেতু, না কোন স্মরণীয় জ্যোতিষিক ঘটনা হেতু? এই প্রশ্নের উত্তরে জানিতে পারিয়াছি, খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে কৃত্তিকা-তারা হইতে পাদ-নক্ষত্র পূর্বদিকে বিষুব ছিল এবং বিষুব দিনে পূর্ণিমা দৃষ্ট হইয়াছিল। গর্গ কিম্বা অন্য জ্যোতিষীর পক্ষে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বিষুব ও পূর্ণিমা গণিয়া অব্দটি পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। এটি বৈশাখী পূর্ণিমা। সূর্য ক্রান্তিবৃত্তের আদিতে অর্থাৎ ৩৬০ অংশে ছিল। এক মাস পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় সূর্য ৩৩০ অংশে ছিল। মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। এখন তৈত্তিরীয় সংহিতা লিখিত দীক্ষা দিনের ব্যবস্থা সুস্পষ্ট হইতেছে। একাষ্টকা মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী বটে, সেদিন রবির দক্ষিণায়ন। চৈত্রী পূর্ণিমায়, ক্রান্তিবৃত্তের ৩৩০ অংশে বৎসর আরম্ভ হইত। চান্দ্রমাস ধরিয়া বৎসর গণনায় এই রীতি।

বসন্ত ঋতুর মুখ, এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে। যেখানে ঋতুর নাম আছে, সেখানে বসন্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই যজুর্বেদেই ঋতু ছয়, মাস বার। মাস অবশ্য চান্দ্র। প্রতি বৎসর বিষুব দিনে পূর্ণিমা হয় না। এইরূপ সূর্যের অন্য তিন পদে একই তিথি ঘটে না। কোন কোন বৎসর ত্রয়োদশ মাস গণিবার রীতি ঋগ্‌বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতে-ছিল। তখন সৌরমাস আদিত্য নাম দ্বারা ব্যক্ত হইত। যজুর্বেদের কালে দ্বাদশ ঋতু মাস বা আর্তবমাসের দ্বাদশ নামকরণ হইয়াছিল। মধু মাধব বসন্ত, শুক্র শুচি গ্রীষ্ম ইত্যাদি। চৈত্র বৈশাখাদি চান্দ্রমাস সূর্যের চারি পদ ঠিক রাখিত না, এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত মধু মাধবাদি দ্বাদশ আর্তব মাসের উৎপত্তি। তৎকালে চৈত্র বৈশাখ বসন্ত ধরা হইত। এই কারণে মধু চৈত্র মাসের, মাধব বৈশাখ মাসের নামান্তর হইয়াছিল। অয়ন এক মাস পিছাইতে ২১০০ বৎসর লাগে। এই দীর্ঘ কাল হেতু খ্রি-পূ ২৪৪৯ —২১০০ = প্রায় খ্রি-পূ ৩৫০ অব্দ পর্যন্ত মধুমাস ও চৈত্রমাস সমার্থ হইয়াছিল।

মহাবিষুবকে প্রধান করিয়া চৈত্রাদি মাসগণনা, বর্ষব্যাপী গবাময়ন সত্রে বিষুবান্‌কে সত্রের মধ্য দিনে রাখা হইত। অর্থাৎ শারদ বিষুব হইতে সত্র আরম্ভ করিয়া সে বিষুবে সমাপ্ত করা হইত। কিন্তু বিষুবদ্বয় ব্যতীত সূর্যের অন্য দুই পদেরও মাহাত্ম্য আছে। দক্ষিণ পদ হইতে উত্তর পদ, দেবপথ, এবং উত্তর পদ হইতে দক্ষিণ পদ, পিতৃপথ। এই দুই পথ দেব-যান ও পিতৃ-যান নামে খ্যাত ছিল। সূর্য উত্তর পদে আসিলে দক্ষিণ পদে পূর্ণিমা হয়। দক্ষিণ পদ হইতে দেব-যান। উত্তর পদ প্রধান হইয়া শিশির মাস বৎসরের প্রথম মাস হইয়া-ছিল। এই কারণে তৈত্তিরীয় সংহিতা একষ্টকা স্মরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ষব্যাপী সত্রে অয়নদ্বয়ের প্রাধান্য ছিল না। আমি যতদূর দেখিয়াছি, মহাবিষুব হইতে অব্দ গণিত হইত। বসন্ত ও শিশির হইতে দুইটা অব্দ একই দেশে প্রচলিত হইতে পারে না। হইলে শকাব্দ ও খ্রিষ্টাব্দ গণনার তুল্য নয় মাস ঐক্য, তিন মাস অনৈক্য হইত। কিন্তু বসন্ত ও শিশির দুই মুখও স্বীকার করিতে হইত। বর্তমানে গ্রাম্যজন দুর্গাপূজা হইতে, পৌষ হইতে বৎসর গণে। কিন্তু অব্দ একটি। এখন দেখি, কোন্ (চান্দ্র) মাসে কোন্ ঋতু। সূর্য পদ চারিটি, কিন্তু ঋতু ছয়টি। অতএব দুইটি ঋতু ভাঙ্গা পড়িবে। (পাঠক মনে রাখিবেন, মাসগুলি পূর্ণিমান্ত। সৌরমাস দ্বিতীয় ক্রম অনুযায়ী হইবে।)

বসন্ত হইতে গণিলে	শিশির হইতে গণিলে
বসন্ত—চৈত্র বৈশাখ (৩৬০°)	বৈশাখ (৩৬০°) জ্যৈষ্ঠ
গ্রীষ্ম—জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়	আষাঢ় শ্রাবণ (৯০°)
বর্ষা—শ্রাবণ (৯০°) ভাদ্র	ভাদ্র আশ্বিন
শরৎ—আশ্বিন কার্তিক (১৮০°)	কার্তিক (১৮০°) অগ্রহায়ণ
হেমন্ত—অগ্রহায়ণ পৌষ	পৌষ মাঘ (২৭০°)
শিশির—মাঘ (২৭০°) ফাল্গুন	ফাল্গুন চৈত্র

সূর্যপদ ও ঋতুর আরম্ভ কোন ক্রমে এক হইতে পারে না। বোধ হয়, ইহাও মধুমাধবাদি নামের উৎপত্তির এক কারণ। ইহার উপর সকল দেশ ষড় ঋতুর অনুকূল নয়, সূর্যপদও মানে না। ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শতপথ ব্রাহ্মণে, ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রভৃতিতে ঋতু পাঁচ। হেমন্ত শিশির যোগে একটি ঋতু হেমন্ত। কোথাও কোথাও ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত ধরা হইত।[৪]

---

৪ ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত সুশ্রুত সংহিতায় পাওয়া যায়। ইহাতে দ্বিবিধ ঋতু মাসের উল্লেখ আছে। প্রথমে উত্তরায়ণে শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম; মধু মাধব বসন্ত, ইত্যাদি ক্রমে অন্য ঋতু ও মাস। পরে লিখিত হইয়াছে,

এখন 'ভারত-সাবিত্রী' দেখি। ইনি শিশির হইতে ঋতু গণিয়া পৌষ মাস হেমন্ত পাইয়াছেন। এই ঋতু গণনা অবিধি নয়, তথাপি অগ্রাহ্য করিতে পারি, কিন্তু মাঘ মাসে যুদ্ধ সমাপ্তি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যুদ্ধ সমাপ্তির এক পক্ষ পরে মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইয়াছিল, সাবিত্রী বাক্য মানিলে পৌষ শুক্ল ত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল।

মহাভারতে ভিন্ন ভিন্ন কবি ভিন্ন ভিন্ন তিথি ধরিয়াছেন। ভীষ্ম পর্বে ২য় অধ্যায়ে ব্যাসদেব কার্তিকী পৌর্ণমাসীর পর দিন অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ প্রতিপদে যুদ্ধারম্ভ দেখিয়াছেন। কেহ কেহ এই দিন হইতে ৬৮ তিথি গণিয়া ভীষ্মাষ্টমীর সহিত ঐক্য করিতে গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ভীষ্মাষ্টমী মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী হইবে। মহাভারতে শুক্লাষ্টমী স্পষ্ট আছে। অতএব সে চেষ্টা বৃথা। কৃত্তিকায় কার্তিকী পূর্ণিমা। পরদিন রোহিণী। কিন্তু ভীষ্মপর্বের ১৭শ অধ্যায়ে স্পষ্ট আছে, যুদ্ধারম্ভ দিনে চন্দ্র মঘাতে ছিল। উদ্‌যোগ পর্বে কৃষ্ণকর্ণ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। রোহিণীর ছয় দিন পরে মঘা, মঘার আট দিন পরে জ্যেষ্ঠা। বলরামের বাক্যে রোহিণী নয, মৃগশিরা। ব্যাসবাক্যের কবি দুইজন। প্রথম কবি যুদ্ধের পূর্বরাত্রে কার্তিকী পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ, দ্বিতীয় কবি রোহিণীতে অমাবস্যা দেখিয়াছিলেন।

গ্রহণ দেখি। উদ্‌যোগ পর্বে কৃষ্ণকর্ণ সংবাদে কর্ণ বলিতেছেন, চন্দ্রমার কলঙ্ক ক্ষীণ হইয়াছে, রাহু সূর্যকে গ্রহণ করিতেছে (সোমস্য লক্ষ্ম ব্যাবৃত্তং রাহুরর্ক মুপৈতি চ॥)। সে দিন কিন্তু অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমী। ব্যাস-বাক্যের প্রথম কবি কার্তিকী পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়াছেন। দ্বিতীয় কবি বলিতেছেন, এক মাসে দুইটা গ্রহণ হইয়া গেল, দ্বিতীয় গ্রহণ তের দিনে হইল। কার্তিকী পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হইবার পূর্বের অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। এক মাসে দুইটি পর্ব, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা। এক মাসের দুই পর্বে দুই গ্রহণ অসাধারণ নয়, এক স্থলে দৃশ্য হওয়াও অসাধারণ নয়।[৫] কিন্তু এক গ্রহণের ত্রয়োদশ দিবসে অপর গ্রহণ এক স্থলে দৃশ্য হওয়া অসাধারণ। যাহা হউক, কার্তিক মাসে দুইটি, কর্ণবাক্যে অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় তৃতীয় গ্রহণ, দুর্যোধন-পতনের দিনে পৌষ কিম্বা মাঘ অমাবস্যায় চতুর্থ গ্রহণ হইয়াছিল! এতগুলা গ্রহণ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সাক্ষীর বিশটা উক্তি কল্পিত, একটা সত্য মনে করিতে হইলে অন্য দৃঢ় প্রমাণ চাই। কালক্রমে উৎপাত ও দুর্নিমিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বৃদ্ধি স্মরণ করিলে কর্ণের কবি জ্যেষ্ঠ,ব্যাসের প্রথম কবি মধ্যম, দ্বিতীয় কবি কনিষ্ঠ।

কোন্ মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল? পূর্ণিমান্ত অগ্রহায়ণে, না পৌষে? বোধ হয় ভারত-সাবিত্রী ঠিক, পৌষে আরম্ভ হইয়া মাঘে সমাপ্ত হইয়াছিল। কারণ, (১) যুদ্ধ কলিদ্বাপরান্তরে হইয়াছিল। উত্তরায়ণ প্রবৃত্তির এক মাসের অধিক পূর্বে যাইতে পারা যায় না। মাঘী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইলে পৌষ পূর্ণিমা এক মাস। এ বিষয় আগামী প্রবন্ধে দেখা যাইবে। (২) খ্রি-পূ পঞ্চদশ শতাব্দে যুদ্ধ হইয়া থাকিলে তদবধি ঋতু প্রায় দেড় মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। তৎকালের পৌষ পূর্ণিমা ঋতুতে বর্ত্তমান কালের ৩০শে কার্তিক, অগ্রহায়ণ অমাবস্যা ১৫ই আশ্বিন, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপ্রতিপদ্ ১লা আশ্বিন। কুরু-পাণ্ডবেরা সৌর আশ্বিন মাসের ঋতুকালে যুদ্ধ করেন নাই।

'ইহ তু' এই দেশে ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা, কার্তিক অগ্রহায়ণ শরৎ, পৌষ মাঘ হেমন্ত, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত. বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম, আষাঢ় শ্রাবণ প্রাবৃট্। অতএব দেখা যাইতেছে সুশ্রুতের সংস্কর্তার দেশে শিশির অনুভূত হইত না, বর্ষা চারি মাস গণ্য হইত। দেশটি দিল্লী অঞ্চলে হইবে। দিল্লীতে বর্ষা অল্প বটে, কিন্তু জুন জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বর, এই চারি মাসে হয়। মে জুন, দুই মাস গ্রীষ্ম, মার্চ এপ্রিল বসন্ত।

৫ দ্বিতীয় কবি অর্বাচীন। বোধ হয় খ্রি-পূ দুই তিন বৎসরের মধ্যে ছিলেন। বোধ হয় তিনি এক মাসে দুইটি গ্রহণ দেখিয়াছিলেন। একটা উদাহরণ দিই। খি-পূ ১৭৪ অব্দে ১০ই অক্টোবর রবিবার কুরুক্ষেত্রে সূর্যাস্তের প্রায় দুই দণ্ড পূর্বে সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। গ্রস্ত সূর্য অস্তগত হইয়াছিল। এই দিন পূর্ণিমান্ত কার্তিক অমাবস্যা, ২৪শে অক্টোবর রবিবার কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রি প্রায় তের দণ্ডের সময় চন্দ্র-গ্রহণ হইয়াছিল। দুই গ্রহণের মধ্যে চৌদ্দ দিন পাইতেছি। চন্দ্রগ্রহণ সূর্যাস্তকালে হইলেও চৌদ্দ দিন হইত। কেহ পরিশ্রম করিয়া তিন শত বৎসরের কার্তিক মাসের গ্রহণ খুজিলে কবির অর্থ বুঝিতে পারা যাইত।

সাময়িকী

শ্রীবৃন্দাবনের কুণ্ড—

বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী যাত্রীরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলার ক্ষেত্রসন্নিহিত হইলেই ব্রজবালকগণ যাত্রী ও যানের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে—তখনও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত তাম্রখণ্ড "ঢেপুয়া" লাভের আশায় মধুরস্বরে সুর করিয়া বলিত—

"শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন।
ধূলা নয়, এ বালু নয়, এ গোপীর পদরেণু,
এই রেণু শিরে ধরে নন্দের বেটা কানু।"

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন গিরি কেবল "ব্রজমণ্ডল" মধ্যেই অবস্থিত নহে, পরন্তু বৃন্দাবনের অংশ বলিয়াই বিবেচিত—কৃষ্ণলীলাস্মৃতিপূত। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থোদ্ধার বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। মামুদ মথুরা লুণ্ঠন ও ব্রজমণ্ডল ধ্বংস করিবার পর ইহা প্রায় জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়। দেশ যে সময় অরাজক সেই সময় প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডলে তীর্থ ও দেবমূর্ত্তি সকলের উদ্ধার-সঙ্কল্প করেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপালভট্ট ও রঘুনাথ দাস অগ্রণী হইয়া অন্যান্য ভক্ত সহ তীর্থোদ্ধারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্য দেব যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তাঁহার শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ বিবরণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে—

"এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
রাধাকুণ্ড বার্ত্তা প্রভু পুছে লোক স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থলুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান।
দুই ধান্য ক্ষেতে অল্প জলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥

এইরূপে চৈতন্য দেব শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করেন। ইহার পর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শিষ্য ছয় জনের মধ্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের পক্ষ হইতে কুণ্ডের চৈতন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ক্রয় করেন। তখন কুণ্ড লুপ্ত হইয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে, কোন ধনী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে কুণ্ডদ্বয় পুনরায় খনন করাইয়া দেন। কান্দী ও পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার-পরিবারের "লালাবাবু" (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) যখন বিষয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন, তখন তিনি নিজব্যয়ে কুণ্ডদ্বয়ের পাকা ঘাট ও চাঁদনী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমানে কুণ্ডদ্বয়ের যে ঘাট, চাঁদনী ও উভয় কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পথ দৃষ্ট হয়, তাহা "লালাবাবুর" অর্থে রচিত হয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তখনও কুণ্ডদ্বয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অধিকৃত ছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কাসিমবাজার জমীদার-পরিবারের বংশপতি "কান্তবাবু" বৈষ্ণব ছিলেন এবং ঐ পরিবারের দেবালয় বা "কুঞ্জ" এখনও বৃন্দাবনে আছে। ঐ পরিবারে প্রচলিত প্রথা—কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার অস্থি এই কুণ্ডদ্বয়ের নিকটে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করা হয়। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও পাবনা জিলার তাড়াসের জমীদার রায় বনমালী রায় বাহাদুর বৃন্দাবনবাসী হইয়া কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার ও ঘাট সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, এত কাল পরে এবার জরীপের সময় কুণ্ডদ্বয় স্থানীয় জমীদারের সম্পত্তি বলিয়া লিখিত হয়। ফলে ঐ জমীদার বাঙ্গালী মোহান্তকে কুণ্ডদ্বয় পরিষ্কার ও ঘাট প্রভৃতি সংস্কার করাইতে বাধা দেন। অর্থাৎ তিনি বাঙ্গালীর অধিকার অস্বীকার করিয়া কুণ্ডদ্বয় অধিকার করিবার চেষ্টা করেন।

বাঙ্গালীর পক্ষে সুখের বিষয় বর্ত্তমান মোহান্ত তাহার প্রতিকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান মোহান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজী ও দর্শন উভয় বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী কালেক্টারের কাজ করিতে-

ছিলেন; সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছেন। তিনি কুণ্ডদ্বয়ের বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মথুরার দাওয়ানী আদালতে স্থানীয় জমীদারের নামে মামলা রুজু করেন। চৈতন্যের শিষ্য কর্ত্তৃক কুণ্ডের স্থান এতকালাবধি যে সব দলিলে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের অধিকার প্রমাণিত হয় সে সকল এবং আকবর ও ঔরঙ্গজেবের সময়ের পরওয়ানা পর্য্যন্ত আদালতে দাখিল হইয়াছিল। আদালতের বিচারে কুণ্ডদ্বয় বাঙ্গালী মোহান্তের অধিকৃত বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছে।

আমাদিগের মনে হয়, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাঙ্গালীকে তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, ইহাও তাহারই নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃন্দাবনের মত বারাণসীতেও বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বারাণসীতে এখন আর বাঙ্গালীকে তাহার অবশ্য-প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা হয় না। শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব সন্ন্যাসী শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শঙ্করাচার্য্যের "গদি" হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সর্ব্বত্যাগী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সাধারণ সম্পত্তির মত ঐ মঠের কর্ত্তৃত্বলাভের জন্য আদালতে মামলা না করিয়া পুরী ত্যাগ করিয়া যাইয়া আপনি সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়া এখন অন্য প্রদেশের লোক সে মঠের মোহান্ত হইয়াছেন। হৃষীকেশে কালীকম্বলীওয়ালাক্ষেত্র লইয়াও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এই বিরাট ক্ষেত্র এখন যাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন তিনি প্রতিষ্ঠাতা কালী কম্বলীওয়ালার শিষ্য বা প্রশিষ্য ত নহেনই, পরন্তু সন্ন্যাসীও নহেন। অথচ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ অবাঙ্গালীরা তাঁহারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন; আর হাইকোর্টে মামলায় প্রকাশ পাইয়াছে, কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ মাড়য়ারী ব্যবসায়ী এই প্রতিষ্ঠানের ধন-ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া ব্যবসা চালাইয়া থাকেন!

বাঙ্গালীকে এ সকল বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে—যে সব স্থানে বাঙ্গালীর অধিকার সঙ্গত, সে সকল স্থান যাহাতে বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার মোট ফল এইরূপ—

পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	...	২০,৬৫০
উত্তীর্ণ ছাত্র-সংখ্যা	...	১৩,৫৯০
প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ	...	৪,৮৩৮
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ	...	৬,৮৭৭
তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ	...	১,৮৭৫
শতকরা উত্তীর্ণ	...	৬৫,৭

আই-এ পরীক্ষার ফল—

মোট উত্তীর্ণ	...	২,৪৩৬

আই-এসসি পরীক্ষার ফল—

মোট উত্তীর্ণ	...	১,৯২১

এখন প্রশ্ন—এই সব ছাত্র কি করিবে? অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল পূর্ব্বে সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার দূরদৃষ্টি হেতু বলিয়াছিলেন, ইংরাজ এ দেশে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে কেবল কেরাণী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতেছে। কিন্তু ইহার পর কি হইবে? ইহারা চাকরী লাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে শিখিতেছে, কিন্তু চাকরীতে কয়জনের অন্নের উপায় হইবে বা হইতে পারে? এখন তাহাই দেখা যাইতেছে। ২৫ বৎসরের কিছু অধিক কাল পূর্ব্বে সার ভ্যালেনটাইন চিরোল বলিয়াছিলেন, তখনই বঙ্গদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৪০ হাজারেরও অধিক। আর তখনই শ্রমজীবীরা সাধারণ শিক্ষিত চাকুরিয়াদিগের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে। তাহার পর এই যে ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়াছে, ইহার মধ্যে যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা সরকার এই বেকার-সমস্যার সমাধান-কল্পে কেন্দ্রে কেন্দ্রে লোককে কতকগুলি স্বল্পব্যয়সাধ্য শিল্প শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সমস্যা-সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা সরকারের উদ্দেশ্যের প্রশংসা

করিলেও আমরা তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায় লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। অল্প দিন পূর্ব্বে পাঞ্জাবের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাক্তার গোকুলচাঁদ নারং লাহোরে প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—পল্লীগ্রামে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সব উটজ শিল্পে লোক অর্থার্জ্জন করিতে পারে সে সকলের উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন। তিনি মত প্রকাশ করেন—এ দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি দেশের প্রয়োজনানুরূপ নহে এবং অনেক ক্ষেত্রেই শক্তির অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি বলিয়াছিলেন, ধনীর সন্তানরা ও মেধাবী ছাত্ররাই কেবল উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে ভাল হয়; দরিদ্র ও সাধারণ ছাত্রদিগের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা অনাবশ্যক বিলাস। ইয়োরোপে ও আমেরিকায় প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায় না। উচ্চ শিক্ষার যে আদর্শ এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অবলম্বিত হয়, তাহারই বা মর্য্যাদা কি? প্রতি সপ্তাহেই আমরা দেখিতে পাই, এ দেশে শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্ররা গণিত, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতেছে। দেখিয়া মনে হয়, এই যে প্রায় ৮০ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এতদিনেও কি ইহাতে ছাত্রদিগকে এমন শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হয় নাই যে, তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতে হইবে না? কারীগরী বিদ্যায় ইয়োরোপের প্রাধান্যের কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি বিদেশের কোন ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আসিয়াছে? এ দেশ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্ররা উচ্চতর বিদ্যার জন্য বিদেশে যাইতেছে। অথচ এ দেশকে ব্যাধিকেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং কতকগুলি রোগ কেবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই উদ্ভূত হয়। ম্যালেরিয়া, কলেরা, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, কালাজ্বর প্রভৃতির চিকিৎসা শিখিবার জন্য লণ্ডন, এডিনবরা, ভিয়েনা প্রভৃতি সহর হইতে ডাক্তাররা কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইতে আসিয়াছেন? এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের যে বিভাগে পরীক্ষায় সসম্মানে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে, বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে যাইয়া সেই ছাত্রই সেই বিভাগে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহাতে মনে করা যাইতে পারে, এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শের সমতুল্য নহে। যদি তাহাই হয় তবে "পাস" ছাপ দিবার যন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা থাকিতে পারে? অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যে ব্যবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ত্রুটি যদি সপ্রকাশ হয়, তবে সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-প্রয়োজন বিবেচনা করিবার সময় হইয়াছে। বিশেষ যে কিতাবতী শিক্ষা মানুষকে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে শিখাইতেছে না, তাহার ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া শিক্ষা কি রূপ ধরিলে সার্থক হয়, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ফেলো) নিয়োগে যে মন্ত্রী শিক্ষার আদর দেখাইয়া থাকেন, এমনও বলা যায় না। অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি যাঁহাদিগকে ফেলো মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কোন পত্রের প্রশংসা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "At such times, in the bitter daily struggle simply to keep their heads above the waters……" যে কোন উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্র ইহা লিখিলে শিক্ষকের নিকট দণ্ডভোগ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মন্ত্র "জ্ঞানের উন্নতি সাধন"। যদি সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ না হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয়িত অর্থে দেশের লোকের কি উপকার হয়? কবে বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি প্রদানেই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হয় না বুঝিয়া যে শিক্ষায় ছাত্রদিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহা করিবেন? যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লোকের কাছে কোনরূপ শ্রদ্ধা পাইবে না ও পাইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আজ তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবার সময় সমাগত।

প্রায়োপবেশনের পর।—

মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন শেষ হইয়াছে। অসাধারণ মানসিক শক্তির দ্বারা তিনি দৈহিক দৌর্ব্বল্যকে জয় করিয়া প্রায়োপবেশন শেষ করিয়াছেন বটে, কিন্তু

তাহার পর তিনি আশানুরূপ বল লাভ করিতে পারিতেছেন না। তিনি যখন প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সমগ্র দেশ তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিবে বলিয়া তাঁহার পরামর্শে কংগ্রেসের সভাপতি ছয় সপ্তাহ কালের জন্য আইন ভঙ্গ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। সে ছয় সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। এখন মহাত্মাজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া আন্দোলন স্থগিত কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে মহাত্মাজীর প্রতি শ্রদ্ধা সপ্রকাশ হইলেও ইহা যে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে নেতৃদৈন্যের পরিচায়ক তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মহাত্মাজীর পরামর্শ ব্যতীত কংগ্রেসের অন্য নেতারা যে এই আন্দোলন সম্পর্কে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের কার্য্যে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। কেবল ইয়োরোপে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল এই ব্যাপার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হইয়াছে। সংপ্রতি বিলাতে যে ভারতীয় সম্মিলন হইয়াছে, তাহাতে যোগ দিবার জন্য সুভাষচন্দ্র তথায় যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁহাকে অনুমতি প্রদান না করায় তিনি তাঁহার অভিভাষণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সে অভিভাষণ এ দেশে আনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহার যেটুক তারের সংবাদে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তিনি বলিয়াছেন, এই আন্দোলন স্থগিত রাখা ভাল কাজ হয় নাই এবং ইহার ফলে গত তেরো বৎসরের ত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকার ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি আরও ব্যাপকভাবে সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন; এবং বলিয়াছেন, পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে কাজ করিতে হইবে। তিনি কিরূপ কর্ম্ম-পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি কি পুনরায় আইন-ভঙ্গ আন্দোলন প্রবল করিবার আশা করিতেছেন? তিনি এখন বিদেশে। সংপ্রতি সরকার গত বৎসর এপ্রিল মাসের শেষে ও এ বৎসর ঐ সময়ে আইন ভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

প্রদেশ	গত বৎসর এপ্রিল মাসে বন্দীর সংখ্যা	বর্ত্তমান বৎসর এপ্রিল মাসে বন্দীর সংখ্যা
মাদ্রাজ…	১,৭৮৯	৭৯৭
বোম্বাই…	৬,৬১২	২,৯৩২
বাঙ্গলা…	৫,৩৯৮	১,২৪০
যুক্তপ্রদেশ …	৬,৫৮২	২,০৮৮
পঞ্জাব…	৯৯০	১৯০
বিহার ও উড়িষ্যা	৪,২৮০	১,৬৫৩
মধ্যপ্রদেশ…	১,৭২৩	১১১
আসাম …	৬৮১	১৫০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ…	৩,৬৪৬	১,৬৬১
দিল্লী	৪৩৩	৪৩
কুর্গ	১৮৭	৬৪
আজমীর-মাড়োয়ার…	১৪২	২১
মোট……	৩২,৪৫৮	১০,৯৫০

আমরা বিস্তৃত ভাবে কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব না—কিন্তু কারণ যাহাই কেন হউক না, আন্দোলনের আকর্ষণ যে কমিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় আন্দোলন আর অধিক দিন চলিতে পারে কি না, এবং চলিলে তাহার ফল কি হইবে, তাহা বিবেচ্য। রাজনীতিতে কোন বিভাগেই চূড়ান্ত জয় বা পরাজয় থাকিতে পারে না। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনও লজ্জার বিষয় নহে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিক পীট বলিয়াছিলেন—

"সব মতই সময়ের ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে অবস্থায় কোন মত গঠিত হয়, সে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও যিনি মত পরিবর্ত্তন না করিয়া আপনার মতদৃঢ়তার কথা বলেন, তিনি আত্মম্ভরিতার দাস ব্যতীত আর কিছুই নহেন।"

মহাত্মা গান্ধীও সেদিন, তিনি যে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিবার জন্য পূর্ব্বে তাঁহার দেশবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে "অস্পৃশ্যতা" দূর করিবার

জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কোন মতই সর্ব্বাবস্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে না।

সুতরাং আইন ভঙ্গ আন্দোলনে দেশের লোক ত্যাগের তুলনায় ঈপ্সিত ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছে কি না, তাহা পুনর্জ্জীবিত করা সম্ভব কি না এবং তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী কি না—এ সব বিবেচনা করিয়া কাজ করা প্রয়োজন। কংগ্রেস যদি বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করেন, তবে হয় ত কাজও সম্পন্ন হইবে না, আবার দেশের লোকও যথেষ্ট ত্যাগ ও দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, বিলাতে পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটী তাহা বিবেচনা করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের মতানুসারে নূতন শাসন-পদ্ধতি শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইবে। বর্ত্তমানে সে পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা 'ভারতবর্ষে'র পূর্ব্ব সংখ্যায় তাহার পরিচয় দিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন, ইহাই তাঁহার গুণানুরক্ত স্বদেশবাসীদিগের কামনা। কিন্তু তিনি সুস্থ হইলেও এই বিষয়ের আলোচনায় যোগ না দিতে পারেন, কেন না তিনি "হরিজন" আন্দোলন সম্পর্কে প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হওয়ায় সরকার তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং তিনিও সেই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবেন, বলিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে কি করিবেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি তিনি আর রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব না করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজনীতিক নেতার পক্ষে দেশবাসীকে আর অনিশ্চয়তায় না রাখিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য স্থির করা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। দেশ আজ শান্তি চাহিতেছে—তাহাকে শান্তির পথে তাহার উন্নতি-সাধনের সুযোগ প্রদান করা সকলেরই বাঞ্ছিত।

জাপানের প্রতিশোধ—

জাপান হইতে আমদানী অল্প মূল্যের কার্পাস-বস্ত্র ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছিল এবং জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় এ দেশের কাপড়ের কলগুলি পারিয়া উঠিতেছিল না বলিয়া ভারত সরকার জাপানী বস্ত্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপিত করিয়াছেন। জাপানী ব্যবসায়ীরা ইহার প্রতিশোধ-কল্পে স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা আর ভারতবর্ষ হইতে তুলা কিনিবেন না। ভারতবর্ষ জাপানের যত নিকটে অবস্থিত, অন্য দুই তুলা উৎপাদনকারী দেশ—মিশর ও আমেরিকা তত নিকটে নহে; সুতরাং জাপানী ব্যবসায়ীরা সে সকল দেশ হইতে তুলা আনিলে পড়তা অধিক পড়িবে—এই বিশ্বাসে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মনে করিতেছেন, জাপান ভারতবর্ষ হইতে তুলা ক্রয় করিবেই। কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন সস্তা জাপানী কাপড়ের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, জাপান যদি তেমনই অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যেও মিশরের বা আমেরিকার তুলা ব্যবহার করে, তবে যে ভারতীয় কৃষকদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাটের রপ্তানী হ্রাস হওয়ায় বাঙ্গালার কৃষকের দুরবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, আর ইহাও দেখিতেছি যে, সঙ্গে সঙ্গে জমীদার প্রভৃতিরও আর্থিক কষ্ট বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। ইহার উপর যদি ভারতীয় তুলার রপ্তানী হ্রাস হয়, তবে যে এ দেশের আর্থিক ক্ষতি আরও অধিক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

সকল দেশই স্বাবলম্বী হইতে চাহে এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশে যে পণ্য সহজে উৎপন্ন হইতে পারে, কেবল সেই পণ্যোৎপাদক শিল্পের প্রতিষ্ঠা জন্য অস্থায়ীরূপে বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের লোককে ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করাই সমর্থনযোগ্য। ভারতবর্ষে এখন নানা শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রক্ষাশুল্ক প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। টাটার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার জন্য সরকারী সাহায্য, বিদেশী লৌহ ও ইস্পাতের জিনিষের উপর হন্দর প্রতি ৩৭ টাকা ৮ আনা শুল্ক, সস্তা রেলভাড়া প্রভৃতি সব ধরিলে দেশের লোককে বৎসরে দুই কোটি টাকারও অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালাদিগের তীব্র আন্দোলনে বিদেশী বস্ত্র সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যে জন্য দেশের দরিদ্র অধিবাসীরা সানন্দে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে—অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতেছে, সে উদ্দেশ্য

সিদ্ধ হইতেছে কি? এই সব সুবিধা পাইয়াও টাটার কারখানা ও কাপড়ের কলওয়ালারা কি জন্য আশানুরূপ লাভবান হইতেছেন না? শুল্কের উপর শুল্ক স্তূপীকৃত করিলে এক সময়ে দেশের লোক আর তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। কাজেই কি কারণে এ দেশের শিল্প সুবিধা পাইয়াও বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না, তাহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ হইতে তুলা লইয়া যাইয়া স্বদেশে কাপড় প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয়া তাহা ভারতে পাঠাইয়া জাপানী ব্যবসায়ীরা কেন ভারতীয় কলের কাপড় অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করিতে পারিতেছে, তাহা না বুঝিয়া কেবল শুল্কের অর্গলে বিদেশী পণ্যের আমদানী দ্বার রুদ্ধ করিলে কখন স্থায়ী উপকার হইবে না। পরন্তু তাহাতে নানারূপ অপকার হইতে পারে।

ইংরাজ যখন স্বদেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট আইন করিয়া বিদেশী কাপড়ের আমদানী-পথ সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর—সেই সুযোগে—বিলাতে কাপড়ের শিল্প এমন উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, ইংরাজ অবাধ-বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। এ দেশে জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় হইতে কাপড়ের কলগুলি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সুবিধা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে এত দিনে নিশ্চয়ই বিদেশী কলের প্রতিযোগিতা প্রহত করিবার শক্তি সঞ্চয় করা উচিত ছিল। কেন তাহা হয় নাই, তাহাই বিবেচ্য। ম্যানেজিং এজেণ্টরা লাভের সিংহভাগ গ্রহণ করেন কি না অথবা ব্যবস্থার দোষে এ দেশে পণ্যোৎপাদনের ব্যয় অধিক হয় কি না, তাহা বুঝিয়া আমাদিগকে আমাদিগের ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে। এ দেশের ব্যবসায়ীরা বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহার কতকাংশ যদি তাঁহারা অন্যান্য দেশে ব্যবসায়ীদিগের সাফল্যের কারণানুসন্ধানে ব্যয় করেন, তবে তাহা কথনই অপব্যয় হয় না। প্রতি বৎসর এ দেশ হইতে বহু ছাত্র শিল্প-শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করে। তাহারা কি বিদেশের ব্যবসায়ীদিগের সাফল্যের কারণ জানিতে পারে না?

মনে হয়, জাপানী সরকারের সাহায্য পাইয়াই জাপানী ব্যবসায়ীরা অল্প মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু কেবল কি তাহাই জাপানের সাফল্যের কারণ? জাপানী সরকার কি পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে? ভারত সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ দেশের শিল্পের যে সব সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন সে সব কি জাপানের সরকারের সাহায্য অপেক্ষা অল্প?

এই সকল বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

লোহের উপর, চিনির উপর, কাপড়ের উপর—নানা দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক স্থাপিত করা হইয়াছে ও হইতেছে, ফলে দেশের লোককে অধিক মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে হইতেছে। যদি অল্প কাল মধ্যে দেশে সেই সব শিল্প আত্মরক্ষাক্ষম হয়, তবেই দেশবাসীর ত্যাগ স্বীকার সার্থক হইবে, নহিলে নহে। এ দেশের শিল্প যে কেবল সরকারের সংরক্ষণ-শুল্কের সুযোগই পাইতেছে তাহা নহে, পরন্তু এ দেশের লোকের স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের আগ্রহ তাহাতে আরও সুবিধা যোগ করিয়া দিতেছে। এ দেশের ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে এই সুবিধার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জাপান যদি ভারতীয় তুলা বর্জ্জন করে, তবে যে জমীতে তুলার চাষ বন্ধ করিতে হইবে, সে জমীতে কোন্ কোন্ ফসল উৎপন্ন করিলে তজ্জনিত ক্ষতি পূরণ হইতে পারে, সরকারের কৃষিবিভাগের পক্ষে তাহা বিবেচনা করিয়া দেশের লোককে তাহা জানাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিল্প-সম্মেলন—

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সরকারসমূহের শিল্পবিভাগে যে সকল শিল্প সম্বন্ধে পরীক্ষা হয়, তাহার অনেকগুলি বহু প্রদেশের উপযোগী। প্রধানতঃ সেই সকলের আলোচনার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ভারত সরকারের রাজধানীতে প্রাদেশিক শিল্পবিভাগ সমূহের মন্ত্রী ও ডিরেক্টারদিগের এক সম্মিলন হইত।

ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া যখন ব্যয়সঙ্কোচ করা প্রয়োজন হয়, তখন ইঞ্চকেপ কমিটীর নির্দ্ধারণানুসারে এই বার্ষিক সম্মিলন বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর শিল্প প্রতিষ্ঠার ও শিল্পে উন্নতি সাধনের প্রয়োজন আরও তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে ও হইতেছে। এ বিষয়ে বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম, ফরোকী ও এঞ্জিনিয়ার শ্রীমান সতীশচন্দ্র মিত্রের চেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, তাহার পরিচয় 'ভারতবর্ষের' পাঠকগণ পাইয়াছেন। একাধিক প্রাদেশিক সরকারের পরামর্শে ভারত সরকার এবার ঐ সম্মিলন পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। এই সম্মিলনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে—

(১) শিল্পে সরকারের সাহায্য প্রদান

(২) উটজ শিল্পের উন্নতি সাধন এবং পণ্য—বিশেষ হাতের তাঁতের কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ

(৩) প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান ও শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা

(৫) ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে একখানি পত্র পরিচালন

(৬) বিদেশী শিল্পশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান

(৭) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে বেকার সমস্যা

(৮) শিল্পে গবেষণা সম্বন্ধে একযোগে কাজ করিবার ব্যবস্থা

(৯) পল্লীগ্রামে শিল্পোন্নতি সাধনের জন্য সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ

(১০) কারাগারের ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্যের সহিত সাধারণ লোকের পণ্যের প্রতিযোগিতা

(১১) একই আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিল্প বিবেচ্য।

বিভাগের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ রচনা—

(১২) বিদেশে ট্রেড কমিশনারদিগের কার্য্যের সুযোগ গ্রহণ।

বিবেচ্য তালিকার ব্যাপকতা ও বিস্তার যে আশানুরূপ হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এবার সম্মিলনে কেবল যে পণ্যোৎপাদনের ও পণ্য বিক্রয়ের বিষয় আলোচিত হইবে, তাহাই নহে, পরন্তু গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশের বিষয়ও বিবেচিত হইবে। শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন বহু দিন হইতেই অনুভূত হইতেছে এবং সেইজন্য মাদ্রাজে, বিহার ও উড়িষ্যায় এবং বাঙ্গালায়ও আইন হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় সে বিষয়ে কাজ অগ্রসর হয় নাই। কি ভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তাহা স্থির করিবার সময় সমাগত। আজকাল লোক বুঝিয়াছে, উটজ শিল্পের উন্নতি সাধনের সঙ্গে পল্লীগ্রামের সংস্কারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং উটজশিল্প কেবল যে কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তাহাই নহে; পরন্তু তাহাতে শিল্পীরা সহরে আসিয়া সমাজে বিপর্য্যয় ঘটায় না। শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্যের অভাব এত অধিক যে সে তথ্য সংগ্রহ ও শিল্প সম্বন্ধীয় পত্র পরিচালনের ফলে সকল প্রদেশই সমভাবে উপকৃত হইবে। এই পত্র প্রচারে ও একযোগে গবেষণায় যে শ্রম ও অর্থব্যয় সম্বন্ধে মিতব্যয়িতার অবসর ঘটিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ একযোগে চিনি উৎপন্ন করিবার বিষয়ে গবেষণা করিতে পারে, বাঙ্গালা ও বোম্বাই একযোগে বয়ন শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইতোমধ্যেই বিহার ও যুক্তপ্রদেশ একযোগে ফল সংরক্ষণ ও বিদেশে রপ্তানী সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা যে এখন অর্থনীতির ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ দেশেই শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে বৃত্তি দিয়া ছাত্রদিগকে বিদেশে শিল্পশিক্ষার্থ প্রেরণ করা প্রয়োজন কি না, তাহা জার্ম্মাণী পল্লীগ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিয়া শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে। ভারতবর্ষে সেই কার্য্যের অনুসরণ যে সফল হইতে পারে না, এমন নহে। নদীর স্রোতের সাহায্যে কল চালাইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা স্বপ্নমাত্র নহে। ভারতবর্ষ হইতে এখন বিদেশে একাধিক বাণিজ্যকেন্দ্রে ট্রেড কমিশনার পাঠান হইয়াছে। ইঁহারা সেই সকল দেশে উদ্ভাবিত ভারতের শিল্পোপযোগী কল-কব্জার সন্ধান দিতে পারেন—এ দেশে সে সব পাঠাইতে পারেন। আবার তাঁহারা সে সব দেশে বিজ্ঞাপন দিয়া বা অন্য উপায়ে এ দেশের পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেও পারেন। বিলাতে যে "মার্কেটিং

বোর্ড” গঠিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে যে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ফল রপ্তানীর সূচনা হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। বিহার ও উড়িষ্যার সরকার বিলাতে প্রতিনিধি রাখিয়া বিহারের উটজশিল্পের পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বিহারে যে নানা বর্ণের পর্দ্দা বয়ন করা হয়, বিলাতে তাহার আদর দিন দিন বাড়িতেছে। গত এপ্রিল মাসে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, লণ্ডনে বৃটিশ ইনডাসট্রিজ কেয়ারে বিহারের পর্দ্দা, পিকনিক বাস্কেট, সতরঞ্চি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইলে অনেক ব্যবসায়ী সে সকল কিনিতে চাহিয়াছেন। ভারত সম্রাজ্ঞী পূর্ব্বেও যেমন—এবারও তেমনই বিহারের উটজ শিল্পের পণ্যের আদর করিয়াছেন। যদি ইয়োরোপের ও আমেরিকার নানা কেন্দ্রে এইরূপে এ দেশের পণ্য বিক্রয় হয়, তবে যে দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন-পথ প্রশস্ত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এবার সম্মিলন আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন এবং ভবিষ্যতে কার্য্য-পরিচালনার জন্য কি উপায় অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য লোকের আগ্রহ স্বাভাবিক।

সার আহম্মদ ফকরুদ্দীন -

গত ১৯শে জুন তারিখে পাটনায় সার মহম্মদ ফকরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। পর পর চারিবার বিহার ও উড়িষ্যার শিল্প-বিভাগের মন্ত্রীর কার্য্য করিয়া শারীরিক অসুস্থতা হেতু প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বিহারে উকীল হইয়া ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উকীল-সরকার নিযুক্ত হইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উকীল অবস্থায় তিনি রাজনীতি-চর্চ্চায় মনোযোগ দেন এবং বাঙ্গালা প্রদেশ যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় গঠিত ছিল তখন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের মন্ত্রী হইয়া শিক্ষাবিভাগের ভার গ্রহণ করেন। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে শিক্ষাবিস্তার কল্পে তিনি যে কায করিয়াছেন, তাহা ঐ প্রদেশের অধিবাসীরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করিবে। তিনি পর পর চারিবার ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত অল্প কাল মধ্যে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, সেনেট হাউস, ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদিগের বাসগৃহ—এ সবই তাঁহার উদ্যমের পরিচায়ক। ক্ষমতা ও আন্তরিকতা থাকিলে যে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতেও লোকের কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, বাঙ্গালায় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিহার ও উড়িষ্যায় সার মহম্মদ ফকরুদ্দীন তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সার আলি ইমাম, মিষ্টার হাসান ইমাম ও সার মহম্মদ—অল্প দিনের মধ্যে বিহার এই নেতৃত্রয়কে হারাইয়াছে। সার মহম্মদের জন্য কেবল বিহারবাসীরা নহেন, সমগ্র ভারতের শিক্ষিত লোকরা শোকানুভব করিতেছেন।

নিদান ও বিধান -

পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতির গভীর পঙ্কে উন্নতির রথচক্র বদ্ধ হইয়া গিয়াছে—সভ্যতা আজ বিপন্ন। এই দুর্গতি দেশ-বিশেষের নহে; কারণ, বর্ত্তমানে কোন দেশ অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মাণ যুদ্ধে কেবল যুযুধান দেশগুলিই জড়িত হয় নাই—জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও তুর্কীই ইহার ফলভোগ করিতেছে না, পরন্তু আমেরিকাও ও ইহার ফল বিশেষরূপ অনুভব করিতেছে। জাপানও যে ইহার প্রভাব বর্জ্জন করিতে পারিয়াছে তাহা নহে, ভারতবর্ষও সেই অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। এই যুদ্ধ কেবল যে পরাজিত জার্ম্মাণীকেই আর্থিক হিসাবে বিপন্ন করিয়াছে, তাহা নহে—জেতারাও আজ বিশেষ বিপন্ন। উভয় পক্ষই ঋণভারে প্রপীড়িত। কাহারও পণ্য কিনিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ নাই। স্বতন্ত্রভাবে এই অবস্থার প্রতীকারোপায় চিন্তা করিয়া কেহই সাফল্যের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তাই সকলে সম্মিলিত হইয়া লণ্ডনে বিরাট আর্থিক সম্মিলনে সমবেত হইয়াছেন। উদ্দেশ্য নিদান বুঝিয়া বিধান করা।

এই বৈঠকের বিরাটত্ব বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট

যে, পৃথিবীর নানা দেশের ৬৭টি সরকারের দুই হাজার পাঁচ শত প্রতিনিধি ইহাতে সমবেত হইয়াছেন। গত ১২ই জুন তারিখে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এই বৈঠকের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সকল জাতির সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে কোন নৃপতির হয় নাই। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এই বৈঠকের গুরুত্ব ও তাঁহার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিনিধিদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—

"সকল জাতিই এক বিপদে বিব্রত। বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। বেকারের সংখ্যা যে মানুষের কষ্টের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কাল হইতে আমি ইহার জন্য শঙ্কিত হইয়া আছি, আজ এই বৈঠকে সমবেত ভিন্ন ভিন্ন দেশের সরকারের পরিচালকরাও যে সেজন্য শঙ্কিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।"

এই সর্ব্বব্যাপী বিপদে তিনি সকলকে একযোগে কার্য্য করিতে—বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপায় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রাজা জর্জ্জ তাঁহার বক্তৃতায় বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছিলেন। জানা গিয়াছে, বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য যে সব দেশে বেকারের তালিকা রাখা হয়, এ হিসাব সেই সব দেশের। ভারতবর্ষে বেকারের তালিকা রাখা হয় না। সুতরাং যদি সকল দেশের হিসাব ধরিতে হয়, তবে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে।

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বর্ত্তমান জগতে আর্থিক অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়—সকল দেশ আর্থিক দুর্গতিগ্রস্ত, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, কলকারখানা বন্ধ হইতেছে, অনেক রাজ্যই দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। তিনি বলেন—এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি আর যে সব বিষয়ের আলোচনা করেন, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইয়া ক্রমে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পণ্যোৎপাদন করিয়া আর লাভ করা যায় না।

(২) বট্রোবিভ্রাট প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর বাণিজ্যের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

(৩) বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ হইয়াছে।

বৈঠকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে—

(১) আর্থিক নীতি ও আর্থিক সম্ভ্রম
(২) পণ্যের মূল্য
(৩) মূলধনের পুনঃ-প্রয়োগ
(৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা
(৫) সন্ধিসর্ত্ত ও শুল্ক ব্যবস্থা
(৬) পণ্যোৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ।

যদিও এই তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের রণজনিত ঋণ পরিশোধের উল্লেখ নাই, তথাপি বিলাতের প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

রণঋণ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা অবিলম্বে স্থির করিতেই হইবে।

এই ঋণ লইয়াই ইয়োরোপ বিব্রত। রুশিয়া তাহার শাসন-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ঋণ অস্বীকার করিয়াছে। ইংলণ্ড ঋণ শোধ করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ এবং তাহার পরে রৌপ্য বিলাতে চালান দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে। ফ্রান্স বলিতেছে, তাহার কিস্তির টাকা দিবার উপায় নাই। জার্ম্মাণী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে পারিতেছে না। নানা দেশের মহাজন আমেরিকা স্বর্ণস্তূপে বসিয়াও বেকারের সংখ্যা কমাইতে পারিতেছে না, কারণ, সে যদি অধিক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করে, তবে কে তাহা কিনিবে? কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন, আমেরিকা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নিকট প্রাপ্য টাকা ত্যাগ করুক এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করুন। তাহা হইলেই ব্যবসার চাকা আবার ঘুরিতে থাকিবে এবং পৃথিবীর দুর্গতির অবসান হইবে। কিন্তু আবার অনেকে মনে করেন, সমস্যার সমাধান এত সহজসাধ্য হইবে না—সমগ্র জগতের লোকের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না করিলে এ অবস্থার অবসান সম্ভব নহে। অর্থাৎ যাহাকে যুগপরিবর্ত্তন বলে, তাহা না হইলে কিছুই

হইবে না। যান্ত্রিকযুগের বিপদ অনেকের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এইরূপে নানা জন নানা বিধানের জন্য ব্যস্ত হইতেছেন। কিন্তু নিদান নির্ণীত না হইলে বিধান প্রয়োগে ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এবার সকল জাতির সম্মিলিত বৈঠক এই রোগের কি নিদান নির্ণয় করেন, তাহা জানিবার জন্য আর্থিক দুর্দ্দশায় বিপন্ন সকল জাতির ঔৎসুক্য স্বাভাবিক।

চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিমন্দির—

চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে দেশবাসী শোকাতুর হইয়াছিল এবং মহাত্মা

শ্মশানে চিত্তরঞ্জন

(ফটোগ্রাফার টি-পি-সেনের সৌজন্যে)

গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবার আয়োজন করে। তাঁহার যে গৃহ তিনি জননীর নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে নারী-চিকিৎসালয় হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল এবং সেই জন্য তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীরা সেই গৃহ ঋণমুক্ত করিয়া তাহাতে "সেবাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন যে স্থানে তাঁহার দেহ চিতাভস্মে পরিণত হইয়াছিল তথায় একটি স্মৃতিসৌধ রচনার প্রস্তাব হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন সেজন্য আবশ্যক ভূমিখণ্ড প্রদান করেন। বহু ধনী স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভ্য থাকিলেও এত দিনে অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু স্মৃতিসৌধ রচনার আনুমানিক ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সমিতির সম্পাদক কলিকাতার মেয়র এবার স্মৃতিসমিতির পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট কুড়ি হাজার টাকা চাহেন ও উৎসাহ সহকারে চাঁদা সংগ্রহের আয়োজন করেন। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া হিসাব-পরীক্ষক এই টাকা দিতে আপত্তি করিলেও কর্পোরেশন কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন যে টাকা উঠিয়াছে তাহাতে এইবার স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্মৃতিসৌধের নক্সা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। বাঙ্গালায় স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ নূতন নহে। শ্মশানে এইরূপ স্মৃতিচিহ্নরক্ষা ব্যবস্থার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন—অধুনা নদীগর্ভস্থ রাজাবাড়ীর মঠ। ইহাতে বাঙ্গালার স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন স্মৃতিসৌধে সে বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা মিশ্রস্থাপত্যের নিদর্শন। সর্ব্বোপরি—ইহার শিখরে যে চিত্তরঞ্জন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একখানি চালা-ঘরের প্রতিকৃতি রচনায় সৌধটির সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা এই সৌধের নক্সা রচনা করিয়াছেন ও ইহা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাঁহারা কি জানেন না, বাঙ্গালার মন্দিরস্থাপত্যেই বাঙ্গালার চালাঘরের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইয়াছে? ফার্গুসন তাঁহার স্থাপত্য সম্বন্ধীয় পুস্তকে বাঙ্গালার স্থাপত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"Its leading characteristic is the leent cornice copied from the bamboo huts of the natives."

কিরূপে বাঙ্গালার চালাঘরের চাল প্রস্তুত করা হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"It is the only instance I know of elasticity

..ing employed in building, but is so singular-.. successful in attaininig the desired end, ..d is so common. that we can hardly wonder when the Bengalis turned their attention to more permanent modes of building they should have copied this one."

কেওড়াতলায় স্মৃতি-তর্পণ (ফটোগ্রাফার টি-পি-সেনের সৌজন্যে)

কেওড়াতলায় স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ (ফটোগ্রাফার টি-পি-সেনের সৌজন্যে)
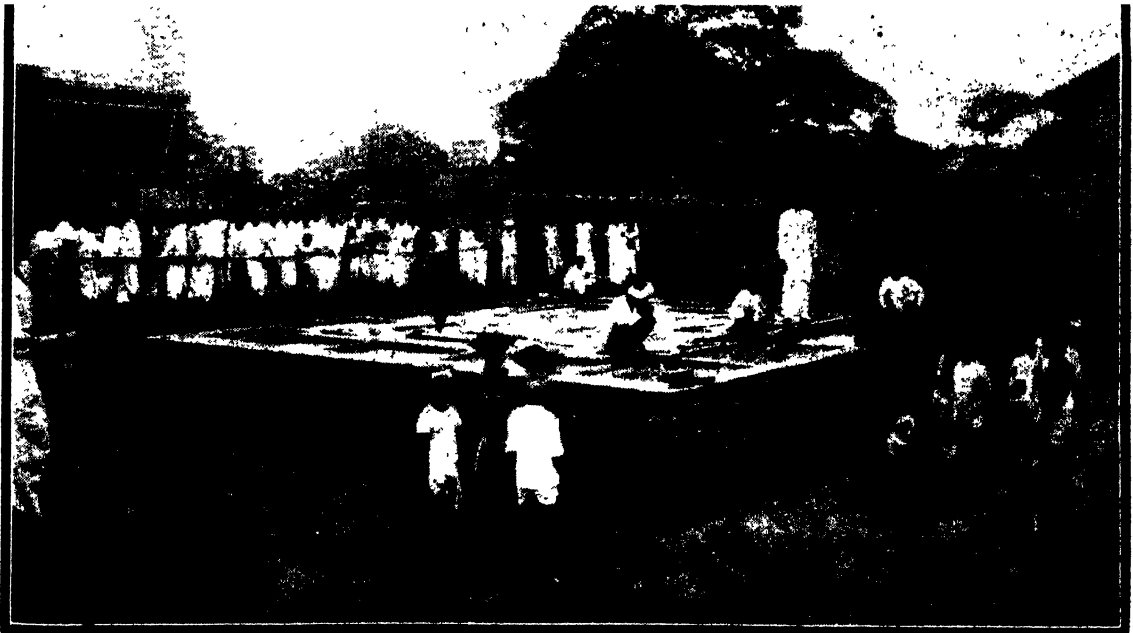
বাঙ্গালার স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাহোরে মুসলমানদিগের রচিত গৃহেও গৃহীত হইয়াছিল এবং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্জাব অঞ্চলে বহু গৃহেই ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং চিত্তরঞ্জন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, স্মৃতিসৌধে সেই ভাব প্রকাশ করাই যদি স্মৃতিসৌধ সমিতির সভ্যগণ অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সৌধশিখরে বাঙ্গলার কুটীরের প্রতিকৃতি রক্ষা না করিয়াও তাহা করিতে পারিতেন। শিখরে উহার অবস্থিতি যে সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া সৌধের শ্রী ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, স্মৃতিসমিতির সভ্যগণ এখনও ইহা বিবেচনা করিয়া নক্সাটির পরিবর্ত্তন করাইবেন এবং সৌধটি যাহাতে বঙ্গীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ও সৌন্দর্য্য-ভূষিত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৮০ বৎসর হইল। এই উপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বাইবেলের কথা—মানবের আয়ুষ্কাল ৭০ বৎসর; কিন্তু আমাদিগের হিন্দুস্থানে লোককে "শতায়ু হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা হয়। আমরা আজ সার রাজেন্দ্রনাথকে তাহাই বলিতেছি—তিনি শতায়ু হউন। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষমতায় আজ সমগ্র ভারতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের নেতৃগণমধ্যে পরিগণিত। তিনি কর্ম্মবীর এবং তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহার নাম আজ—"সমস্ত ভারতে বাষ্ট্র প্রবাদের মত" করিয়াছে। তিনি যে বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তাহার নানা বিভাগ আছে—তাহার এঞ্জিনিয়ারিং, মালগাড়ী নির্ম্মাণের, জীবন-বীমার, ছোট রেলের বিভাগ আছে এবং সকল বিভাগই সুপরিচালিত। এই প্রতিষ্ঠান বঙ্গদেশে বহু ছোট রেল প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছে। ইহা যে জীবনবীমা কোম্পানীর পরিচালক, তাহা কেবল কাজ বাড়াইয়াই আপনাকে প্রশংসাভাজন মনে করেন না—পরন্তু অংশীদারদিগকেও লাভের অংশ দিয়া থাকে। ইহার এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কীর্ত্তি গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিসৌধে ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাগৃহে সপ্রকাশ। রাজেন্দ্রনাথ জীবনে কেবল যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাই নহে; পরন্তু বাঙ্গালীর কল্যাণকর কার্য্যে—বহু অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য প্রদানও করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। তিনি এখনও কর্ম্মঠ আছেন এবং তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের কার্য্য নখ-দর্পণে দেখিয়া থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব।

জগদানন্দ রায়—

গত ১১ই আষাঢ় (১৩৪০) রবিবারে বোলপুর "শান্তি-নিকেতনে" বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত রায় সাহেব জগদানন্দ রায় পরলোকগত হইয়াছেন। নদীয়া জিলায় কৃষ্ণনগরে জগদানন্দের পৈত্রিক বাসভূমি। তিনি কৃষ্ণ-নগরেই শিক্ষারম্ভ করেন এবং যখন তিনি বি-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময় অঞ্জনার তীরে দারুণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। সেই সময় হইতেই তিনি বাঙ্গালা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার সাহিত্য অনুরাগ ও কর্ম্মক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্তরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নবপ্রতিষ্ঠিত "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নামক বিদ্যালয়ে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তদবধি তিনি নানারূপে সেই বিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে কায করিয়া বোলপুরেই দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বই তাঁহাকে বাঙ্গলায় পরিচিত করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই তিনি বিজ্ঞানের নানা বিভাগের তথ্য সরল ও সরস বাঙ্গালায় লিপিবদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার রচনা নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের চিত্তা-কর্ষণ করিত। 'গ্রহ নক্ষত্র', 'পোকামাকড়', প্রভৃতির বিষয়ে তাঁহার রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও আদৃত হইয়াছে। তিনি নানাদেশের বিশেষজ্ঞদিগের রচনা হইতে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাহা আপনার রচনার উপকরণরূপে ব্যবহার করিবার কৌশল জানিতেন এবং তাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন। দেশের লোককে—বিশেষ বালক-বালিকাদিগকে—তাহাদিগের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের নানা তথ্য বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া জগদানন্দ বাবু সেই কাযে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। এবং তাহাতেই তাঁহার রচনার সার্থকতা ছিল। তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার রচনায়ও সপ্রকাশ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছি।

সার কেদারনাথ দাস—

এবার সম্রাটের জন্মদিনে যাঁহারা উপাধি পাইয়াছেন, বাঙ্গলায় তাঁহাদিগের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি "নাইট" হইয়াছেন।—বাঙ্গালীর দ্বারা সৃষ্ট—রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের কল্পনার মূর্ত্ত বিকাশ কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং ধাত্রীবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথের নাম আজ কেবল বঙ্গদেশেই নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতে সুপরিচিত; এমন কি তাঁহার খ্যাতি বিদেশেও ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। সার নীলরতন সরকার ও সার কেদারনাথ দাস প্রমুখ বাঙ্গালী চিকিৎসকরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিতা বিলাতে বা ইয়োরোপের অন্য কোন দেশের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না; তাহা প্রতিভাশালী—একনিষ্ঠ চিকিৎসকের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের পুরস্কার। ইঁহারা উভয়েই উপেক্ষিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং যাঁহারা বিদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন বা further study করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইঁহাদিগের চিকিৎসানৈপুণ্যের সন্নিকটে আসিতে পারেন না। সার কেদারনাথ দাস পরিণত বয়সে এত দিনে যে সম্মান লাভ করিলেন, তাঁহার পক্ষে তাহা বহুদিন পূর্ব্বে লাভ করাই সঙ্গত ছিল। এই উপাধির উপর ডাক্তার কেদারনাথের দাবী কত অধিক, নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন মিশরের শিল্প-কলা)

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা যে অনেকটা বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতারই অনুরূপ ছিল এ প্রমাণ টুটানখামেনের সমাধি-মন্দিরে পাওয়া একাধিক দ্রব্যসামগ্রীর পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, সেকালে মিশর যে কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ও বিলাসানুরাগী ছিল, সে পরিচয়ও ওই সব আস্‌বাব পত্র থেকে পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরের নিপুণ শিল্পী-দের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয়! তিন হাজার বছর আগে তাঁরা যা গড়ে রেখে গেছলেন, আজ তার কলা-সম্মত গঠন-পারিপাট্য ও ঔজ্জ্বল্য দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে ভাবতে হয় সেকালের শিল্পীদের প্রতিভা ছিল কী অসামান্য!. মিশ-রের শিল্পকলার এই সুসম্পূর্ণ পরি-ণতির পশ্চাতে যে একটি সুদীর্ঘ-কালের সাধনার সন্ধান পাওয়া যায় —তা' থেকে মিশরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানীর মনে আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারেনা।
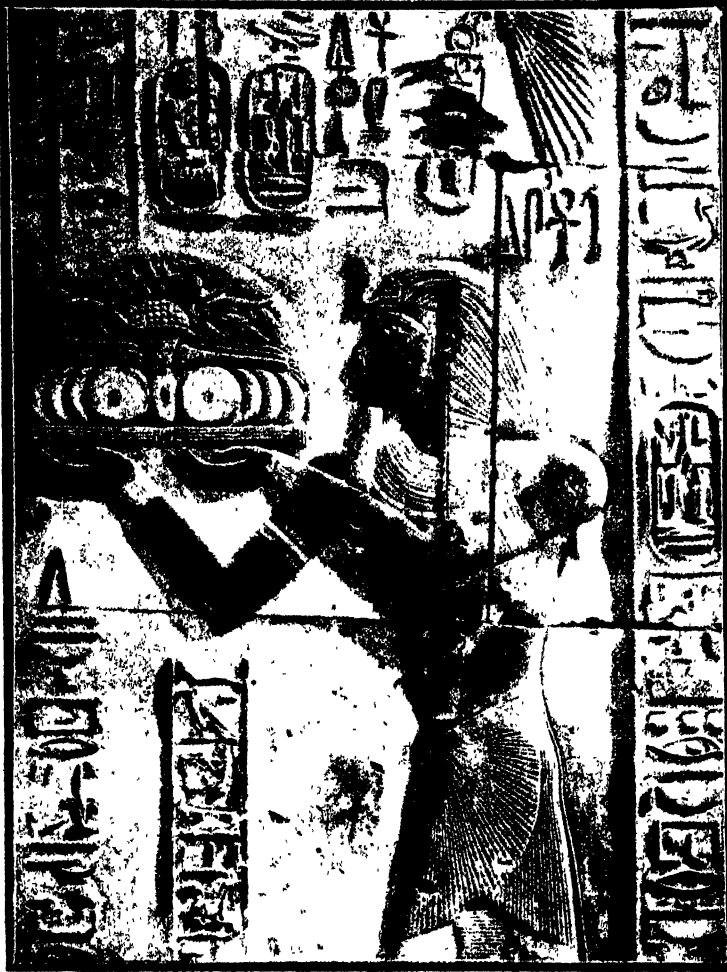
উদ্গাত শিলা-শিল্প (প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ এই ভাস্কর্য্য-কলা মিশরীয় স্থাপত্য-শিল্পের একটি প্রধান বিশেষত্ব। আবাইদোশের সেতী-মন্দিরের প্রাচীরে খৃঃ পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই উদ্গাত শিলা-চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। নৃপতি প্রথম সেতী তাঁর ইষ্ট দেবতা শেথ মেৎকে পূজার নৈবেদ্য উপহার দিচ্ছেন)

প্রাচীন মিশরের সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত বংশীয়েরা বিবিধ কারু-কার্য্য-খচিত মূল্যবান আস্‌বাব্‌ পত্র ব্যবহার করতেন। তাঁরা নানা সুন্দর সুন্দর আকারের চৌকী চেয়ার ও কেদারা ব্যবহার করতেন। তাঁরা যখন ভোজনে বসতেন সুন্দরী পরিচারিকারা তাঁদের বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য পরি-বেষণ করতো। তাঁদের আহার স্থানে ফুল সাজিয়ে রাখতো। তাদের আচমনের জন্য বারিপাত্র

এনে দিতো। সুবাদক ও সঙ্গীতজ্ঞেরা তাঁদের গীতবাদ্য শোনাতেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যের প্রচলিত প্রথার সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট! প্রাচ্যের সেই ভূমির উপর আসন বিছিয়ে আহারে বসা মিশরের সভ্যতায় ছিলনা; এমন কি প্রাচীন রোমকগণ যেমন আহারের সময় গদীর উপর পা ছড়িয়ে এলিয়ে শুয়ে হেলান দিয়ে আরাম ক'রে খেতেন, মিশর তা'ও করতোনা। সে একেবারে বর্ত্তমান য়ুরোপের মতোই সোজা চেয়ারে বসে

লেখক (আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হয়েছিল। লেখক আসনে উপবিষ্ট হয়ে বক্তার মুখের বক্তব্য শুনে পুঁথিতে লিখে নিচ্ছেন)
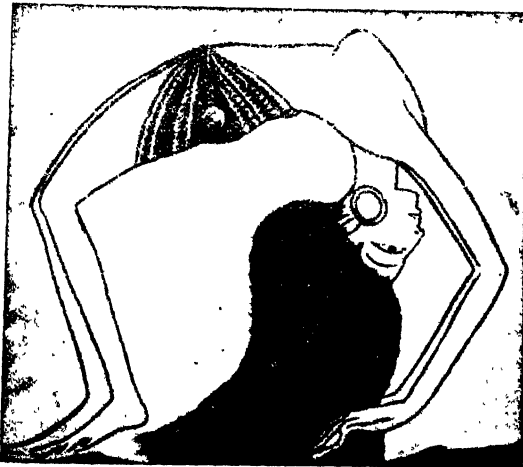
রেখা চিত্র (মিশরীয় ভানুমতির খেলার অতি সুন্দর একখানি ছবি)
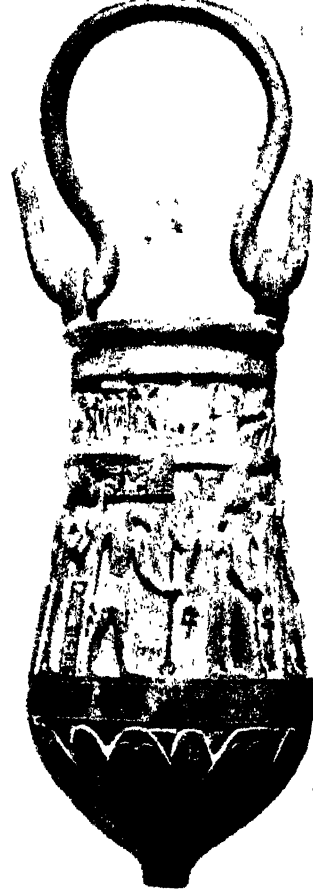
উৎসর্গ পাত্র (এইরূপ কারুকার্য্য-খচিত ব্রোঞ্জের পাত্র পানীয় পূর্ণ করে মৃতের সমাধি-কক্ষে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। এই পাত্রের উপর যে সকল চিত্র উৎকীর্ণ করা থাকে তা প্রায়ই দেব-দেবীর লীলা-সংক্রান্ত পৌরাণিক ধর্ম্মোপাখ্যান)

স্বর্ণ নির্ম্মিত বা আলাবাষ্টারের পাত্র হ'তে খানা খেতো। তবে চেয়ারের উপর অনেক সময় তারা আমাদের মত পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে ব'সতো।

আহার্য্য বস্তু সম্বন্ধেও তাঁদের বিলাসিতার অন্ত ছিলনা।

এত রকমারী রান্না হ'ত সেখানকার একজন ধনি বা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর নিত্য নৈমিত্তিক আহারের জন্য যে তা' আজকাল অনেক উৎসব অনুষ্ঠান বা যজ্ঞ ব্যাপারেও হ'তে দেখা যায়না। কিছুদিন আগে সমাধি-মন্দিরে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে মিশরের প্রাচীন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনোও অনুষ্ঠানে কি খাওয়ানো হ'য়েছিল, তার একটি তালিকা পাওয়া গেছে। সেই তালিকাটির অনুবাদ থেকে জানা যায়—সেদিন তাঁরা দশবিধ বিভিন্ন মাংস, পঞ্চবিধ ডিম্ব, ষোড়শ প্রকার রুটি লুচি পুরী পুলি প্রভৃতি, ষড়বিধ আসব, চতুর্ব্বিধ মাদক সর্ব্বৎ, দ্বাদশ প্রকার ফল এবং প্রচুর মিষ্টান্ন ভোজন ক'রেছিলেন।

প্রাচীন মিশরে সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের মধ্যে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কঠিন জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁরা বিদেশীদের সঙ্গে কখনো একত্রে বসে আহার করতেন না এবং দেশে যাঁরা পদমর্য্যাদায় তাঁদের সমকক্ষ নন তাঁদের সঙ্গেও কখনো একত্রে ভোজনে বসতেন না। সামাজিক ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মিশরীয়েরা অত্যন্ত খাতির করতো। এ প্রথা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল এবং

প্রাচীর-ভাস্কর্য্য (সেতী মন্দিরের আর একটি প্রাচীর-গাত্রে উদ্গত শিলা-চিত্র। নৃপতি সেতী দেবতা শেখমেৎকে ধূপ নিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করছেন)
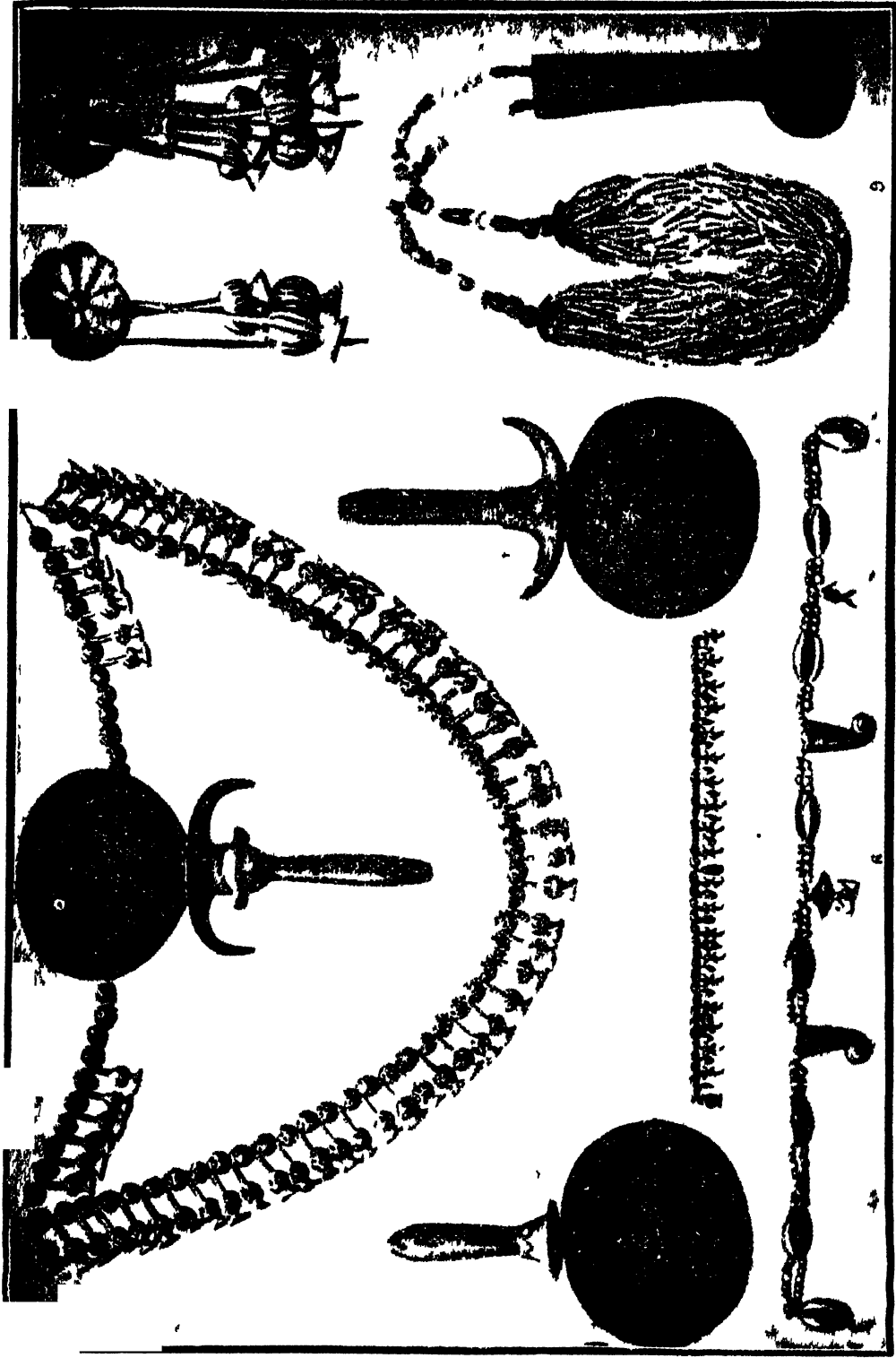
পধাৎন (প্রাচীন মিশরে নানা আকারের সৌখীন কাঠের উপধান ব্যবহার হত)

অলঙ্কার (তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশর মহিলারা এই সব অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। (১) সোণার কণ্ঠহার, (২, ৩, ৪) বিভিন্ন আকারের দর্পণ। এই দর্পণ ব্রোঞ্জ ধাতুর চকচকে পাত থেকে তৈরী হত, কিন্তু হাতলগুলি হত সোণা রূপার কাজ করা। (৫) সোণা ও রঙীন পাথরের ফুল সংলগ্ন কণ্ঠহার। (৬) লাল নীল প্রভৃতি রঙীন স্ফটিক মণি ও কড়ির সঙ্গে গ্রথিত স্বর্ণহার। (৭, ৮) কুণ্ডল (৯) পুঁথির মালা। পুঁথির গুচ্ছ বক্ষে দোলে, স্ফটিকাংশ উপর স্কন্ধের পরে এবং ব্রোঞ্জের উজ্জ্বল পাতটি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকে)

আজও আছে। বৃদ্ধেরা শ্রদ্ধেয় ব'লে গণ্য হ'তেন সেখানে। রাজ-সভায় সভাসদ্‌বর্গ তাঁদের স্ব-স্ব মর্য্যাদা অনুযায়ী আগে পিছনে আসন পেতেন। তদনুসারে সেখানে আসনেরও উৎকর্ষের তারতম্য ছিল। রাজাকে মিশরীয়েরা বলে 'ফ্যারাও'! তাঁর জন্য থাকতো সিংহাসন অর্থাৎ, সভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনখানি। ডাঃ এল্যান্ গার্ডিনার্ সম্প্রতি বহু অনুসন্ধান ক'রে আবিষ্কার ক'রেছেন যে মিশরীয় সভ্যতার প্রাচীনতম যুগে এই সব ভেদাভেদ ও আসনের পার্থক্য সেখানে বিদ্যমান ছিলনা। অতি পুরাতন একটি পাথরের কারুকার্য্য খচিত আসন সেখানে আবিষ্কৃত হ'য়েছে যেটি একটি সাধারণ রাজ-কর্ম্মচারী ব্যবহার ক'রতেন সেকালে কিন্তু, পরে দেখা যায় একমাত্র ফ্যারাও ভিন্ন অন্য কারুর ওইরূপ বিশেষ গঠনের আসনে বসবার অধিকার ছিলনা। ডাঃ গার্ডিনার ব'লেন খুব প্রাচীনকালে মিশরের ঘরে ঘরে যে সব আস্‌বাব-পত্র নিত্য ব্যবহৃত হ'ত, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে সেই সব দ্রব্য-সরঞ্জামই কেবলমাত্র
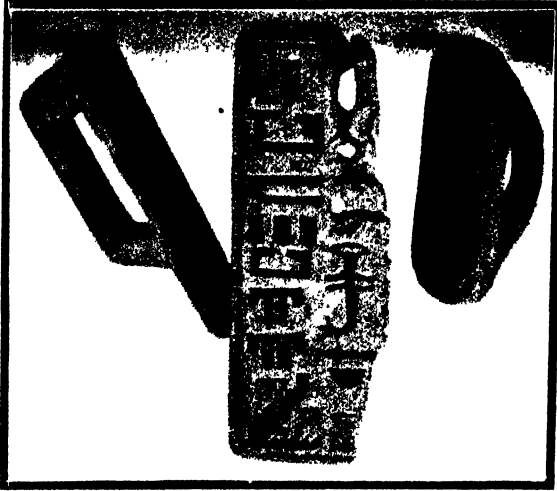
স্থপতির যন্ত্র (দক্ষিণে 'উশো' অর্থাৎ যা দিয়ে বালি চুণ কাদামাটি চোস্ত করে দেওয়ালে লাগানো হয়। মধ্যে চিত্রলিপির ছাঁচ। বামে নৃপতি ২য় আমেন-হোতেপের নামের শীলমোহর। এগুলি সবই মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে প্রাচীন মিশরে ব্যবহার হ'ত)
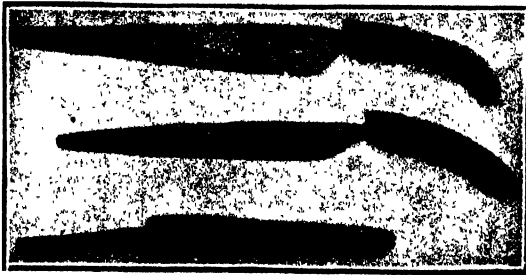
ছুরিকা (প্রাচীন মিশরে এই রকম ছুরির ব্যবহার হ'ত)

প্রস্তর মূর্ত্তি (নৃপতি ক্ষাত্রার প্রসিদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি। মিশরীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন। নৃপতি ক্ষাত্রা মিশরের দ্বিতীয় পিরামিডটি নির্ম্মাণ করেছিলেন। তাঁর সমাধি-মন্দিরে এই প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গেছে)
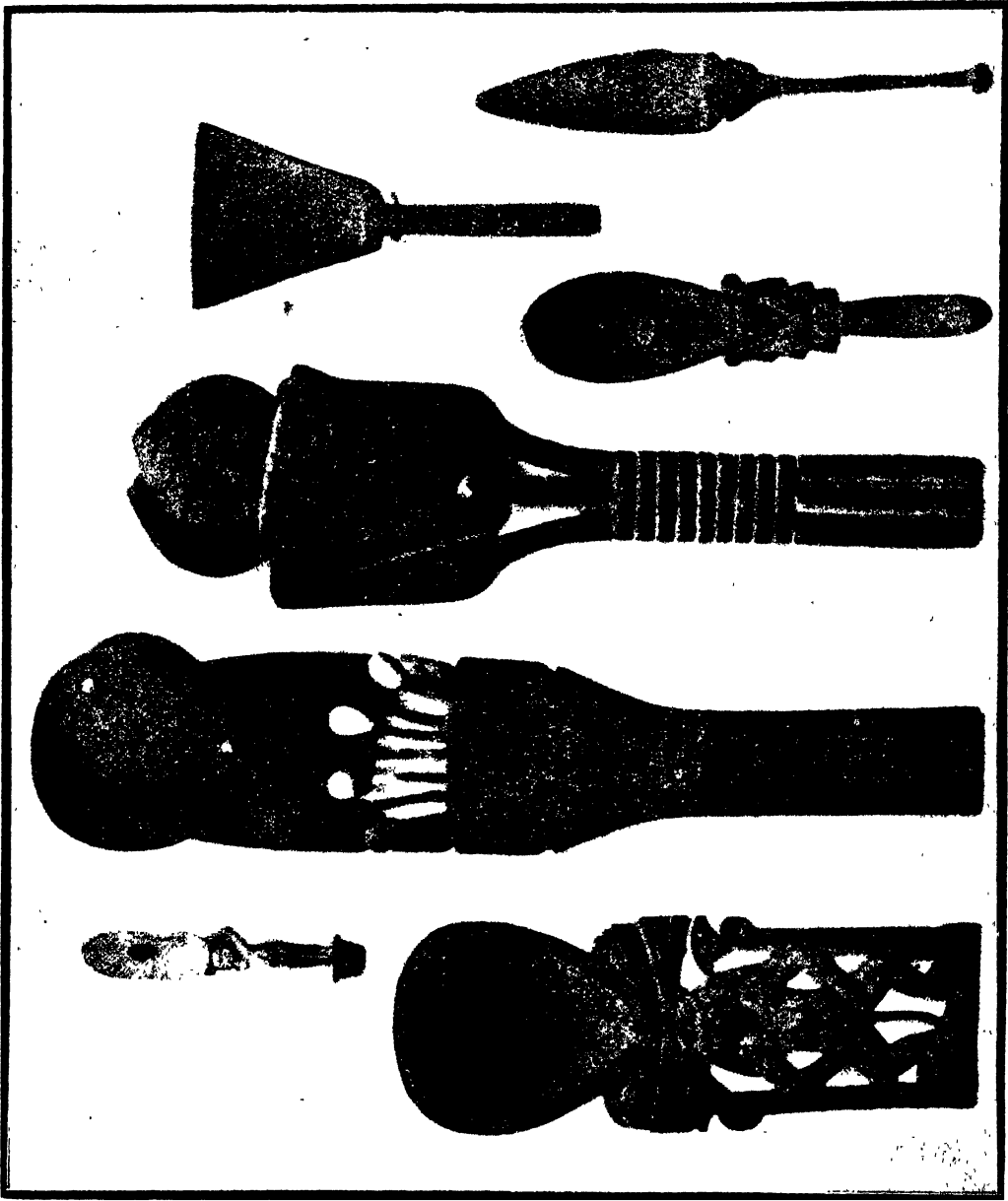
চামচে (প্রাচীন মিশরে চাম্‌চের ব্যবহারটা খুব বেশী ছিল। এত রকমের বিভিন্ন চাম্‌চে সেখানে পাওয়া গেছে যে দেখে বোঝা যায়—সেকালের মিশরবাসীরা কত বেশী সৌখীন ও সুক্ষ্মকলানুরাগী ছিল।

বিশেষ কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে ব্যবহার হ'তে দেখা যেতো।

টুটেন্‌খামেনের সময় মিশরের সামাজিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছলো। তখন পদমর্য্যাদা হিসাবে জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব বেশী রকম প্রশ্রয় পেয়েছিল সেখানে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য যেমনি রাজসভায়, তেমনি অন্যত্রও কেবলমাত্র যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ও আকারের আসন রাখাই প্রচলিত হ'য়েছিল তাই নয়, পোষাক পরিচ্ছদ বা বেশভূষাও পদ-মর্য্যাদার পার্থক্য হিসাবে প্রত্যেককে বিভিন্ন রকমের প'রতে

দারুমূর্ত্তি (সাকারা প্রদেশে এই কাঠের প্রতিমূর্ত্তিটি পাওয়া গেছে। এটি সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ। শেখ-এল্‌-বেলেদের মূর্ত্তি বলে এটি প্রসিদ্ধ। মিশরের প্রাচীন-তম মূর্ত্তি-শিল্পের নিদর্শন হিসাবে কেয়ারো মিউ-জিয়মে এটি সযত্নে রক্ষিত আছে। বিশে-ষজ্ঞেরা অনুমান করেন প্রায় তিনহাজার বছর পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি নিৰ্ম্মিত হয়েছিল)

হ'তো। রাজা বা ফ্যারাও যে ধরণের সব আস্‌বাব ব্যবহার ক'রতেন রাজ্যের অপর কারও অধিকার ছিলনা আর তা ব্যবহার করবার; এমন কি রাজার মৃত্যুর পর অন্য যিনি রাজা হ'তেন, তাঁরও পর্য্যন্ত সে সব আস্‌বাব্‌ ব্যবহার করবার উপায় থাকতো না, কারণ রাজার মৃত্যু হ'লেই তাঁর ব্যবহারের যাবতীয় জিনিসপত্র সমস্ত তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে কবরের মধ্যে দেওয়া হ'তো, যাতে লোকান্তরে গিয়ে তিনি সেগুলি ব্যবহার করতে পারেন; সেখানে তাঁর কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। এ প্রথা কিন্তু আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের অনেক আদিম অসভ্য জাতিদের মধ্যেও প্রচলিত আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

উদ্‌গত দারু-চিত্র (কাঠের পুরু তক্তার উপর উদ্‌গত এই দারু-চিত্র (bas relief) প্রাচীন মিশরের শিল্পীদের অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয়)

টেবিল চেয়ার খাট-পালঙ্ক এবং পেটিকা প্রভৃতি আস্‌বাব্‌ পত্রের ব্যবহার মিশরে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। টুটান্‌খামেনের রাজত্বকালের আরও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মিশরের ভুঁইঞারা বসবার জন্য আরামদায়ক ও শিল্প-খচিত অর্থাৎ সুদৃশ্য শিলাসন

ও কাষ্ঠাসন ব্যবহার ক'রতেন। হাতীর দাঁতের তৈরী সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত চামচ ছিল তাঁদের প্রতিদিন—নিত্য ব্যবহারের সরঞ্জাম। তাঁরা যে সব কাঠের আস্‌বাব্‌ ব্যবহার ক'রতেন তা' প্রস্তুত হ'ত অতি দুর্লভ ও মহার্ঘ কাষ্ঠ সংগ্রহ করে এনে। সুনিপুণ শ্রেষ্ঠ কারিগর দিয়ে এমন সুদৃশ্য সুন্দর ক'রে সেগুলি তৈরি হ'ত যে দেখবামাত্র চোখ জুড়িয়ে যেতো! কোনোটির পায়া হ'ত একেবারে দুগ্ধশুভ্র হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত গো-খুরের মত,

কাঠের প্রতিমূর্ত্তি (কাঠের নির্ম্মিত এই সুগঠিত নারী মূর্ত্তিটিও সাকার প্রদেশে পাওয়া গেছে। পূর্ব্বে এটি শেখ-এল্‌ বেলেদের পত্নীর মূর্ত্তি বলেই প্রচারিত হ'য়েছিল, কিন্তু পরে জানা গেছে তা' নয়)

কোনোটির বা আবার কাল কুচ্‌কুচে। আব্‌লুশের কালো বুক চিরে হাতীর দাঁতের সাদা ফুল্‌কারী বসানোর কারু-কার্য্যেও সেকালের মিশরীয় শিল্পীরা বেশ সুদক্ষ ছিলেন।

হাতীর দাঁতের খোদাই কাজে মিশরের প্রাচীন শিল্পীদের নৈপুণ্যের তুলনা হয় না। গীজের যে তিনটি বিরাট পীরামিড্‌ আজও মিশরের বিপুল গৌরব ঘোষণা করছে তারই একজন নির্ম্মাণকারী শিল্পী বলে প্রসিদ্ধ স্থপতি 'খুফু'র একখানি যে হাতীর দাঁতের উপর উৎকীর্ণ করা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে, মিশরীয় দ্বিরদ শিল্পের

রেন্‌ফার প্রতিমূর্ত্তি (কেয়ারো মিউজিয়মে রক্ষিত এই মূর্ত্তিটির সজীব প্রতিরূপ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে রেন্‌ফার এই পাষাণ-প্রতিরূপ প্রাচীন শিল্প-জগতের অতুলনীয় গৌরব স্বরূপ।)

সে একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন! অধ্যাপক Flinders Petrie এই চিত্রখানি আবিষ্কার ক'রে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছেন।

টেবিলের ব্যবহার পুরাকাল থেকেই সেখানে প্রচলিত

ছিল বটে কিন্তু খুব বেশী নয়। চেয়ার কেবল পুরুষেরা ব্যবহার করতেন। পরে টুটেন্‌খামানের আমলে চেয়ার টেবিলের ব্যবহার খুব বেড়েছিল। মেয়েদের মাদুরে বসে অথবা গাল্‌চেয় বসে আহার ক'রতে হ'ত। সে সব মাদুর ও গাল্‌চে ছিল খুব পুরু দামী ও সৌখীন জিনিস। বসবার জন্য খুব নরম জমকালো ক্যশান্ বা ছোট্ট গদীর আসনও ব্যবহার ক'রতেন তাঁরা। এই সব গদীর আসনগুলি প্রায়ই কোমল মসৃন চামড়ায় তৈরি হ'ত। শুধু যে হরেক রকমের বিচিত্র সুন্দর আকারের এবং বিচিত্র সুন্দর কারুকার্য্য খচিত হ'ত এই ক্যশানগুলি তাই নয়, নানা বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হ'ত সেগুলি। চেয়ার এবং চৌকীর উপরও এই সব চামড়ার নরম ও আরাম-প্রদ গদি ব্যবহার করতেন তাঁরা। বিছানার গদীও এই নরম রঙীণ চামড়ায় তৈরি হ'ত। কোনো সভায় বা উৎসব প্রাঙ্গণে যে চাঁদোয়া ঝোলানো হ'ত তা' পর্য্যন্ত অনেক সময় এই রঙীণ কারুকার্য্য-খচিত চামড়ায় তৈরি হ'ত।

ঝুড়ি চুপড়ি (তিন হাজার বছরেরও আগে মিশরে এই ঝুড়ি চুপড়িগুলি তৈরী হয়েছিল। আজও অনেক সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য দেশে এই রকম ঝুড়ি চুপড়িই তৈরি হয়, সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এতকালের ব্যবধানেও পৃথিবীতে এ শিল্পের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। সেই তাল পাতা, শরকাঠি, বেত ও বাঁশের চিয়াড়ী দিয়ে সেকালেও ধামা-চাঙারি তৈরি হ'ত)

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসীতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "বন্যা"—২।•
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "মন্দির প্রবেশ"—১৲
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত পঞ্চাঙ্ক নাটক "ঠাকুর মন্ত্র"—১৲
শ্রীপ্রবোধ সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "সরল রেখা"—১৲
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত খণ্ডকাব্য "কাজরী"—১৲
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত গল্পের বই "সূচি"—২৲
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "স্বাগতম্"—২৲
কুমারী লতিকা দেবী প্রণীত Guide Book "কাশী"—।•
ইব্রাহীম খাঁ এম-এ, বি-এল প্রণীত "খালেদার সমর-স্মৃতি"—১।•
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত "প্রবুদ্ধ এশিয়া"—৸•
শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক নাট্য-রূপান্তরিত শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস "মহানিশা"—১।•
আজিজুল হাকিম প্রণীত কবিতার বই "মরু-সেনা"—।৶•
মীর্জ্জা লালতান আহ্‌মদ প্রণীত কোর্-আন শরীফ"—১৲
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত "আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ"—২৲
আজিজুল হাকিম প্রণীত কবিতার বই "ভোরের সানাই"—১৲
শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম-এ, বি-এল প্রণীত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"—বাঁধাই ১৲ সাধারণ ৸•
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত "মহাকবি শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ"—২৲
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত "মহাকবি শেখ সাদির বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ"—১৲
শ্রীমন্মথমোহন বসু প্রণীত নাটক "আঁধারে আলো"—১৲
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—১।•

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

ঝড়ের পরে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভাদ্র—১৩৪০

প্রথম খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

প্রবাসী জমিদার ও দুরবস্থ পল্লী

আচার্য্য সার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমাদের দেশে যদি কেহ দু'চার লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ অথবা লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ অভিশপ্ত। তাহারা যে কেবল কুঁড়ের বাদশা হইবে ইহা নহে,—আনুষঙ্গিক যত রকম চরিত্রদোষ প্রায় সকলেরই বশীভূত হইবে। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে, An idle brain is the devil's workshop, অর্থাৎ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আশ্রয়স্থল। আজ বাঙ্গালী জীবন-সংগ্রামে দিন দিন পরাভূত হইয়া হটিয়া যাইতেছে; তাহার একটী প্রধান কারণ অলসতা। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যত হৌসের মুচ্ছুদ্দি প্রায় সবই বাঙ্গালী ছিল। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এই হৌসের মুচ্ছুদ্দিরা যখন কলিকাতার আশে-পাশে বাগানবাড়ী করিয়া নানা প্রকার বদ্‌খেয়াল ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, এবং জমিদারি কিনিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। আমাদের দেশের ধনীলোকের বংশধরগণ জড়বৎ মাংসপিণ্ডের সমষ্টি, এবং মস্তিষ্ক-চালনার অভাবে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। অধিকাংশ জমিদারিই তিন পুরুষের মধ্যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। এখনও যাহা বজায় আছে তাহার ভিতর অনেক বড় বড় জমিদারিই ঋণভারাক্রান্ত হইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন। এখন দেশে বাঙ্গালীর ঘরে নগদ টাকার আদান-প্রদান একেবারেই নাই। আজ যদি কোন জমিদারের ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তিন-চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দালালকে সর্ব্বপ্রথমে মাড়োয়ারী অথবা ভাটিয়া মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হইবে। কাজেই আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বাঙ্গালার ভূমি-লক্ষ্মী আজ এই শ্রেণীর অবাঙ্গালীর গৃহে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে।

এই ত গেল জমিদারির কথা। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলের ভূস্বামী প্রধানতঃ বাঙ্গালীরাই ছিলেন। কিন্তু যে কারণে জমিদারি পর-হস্তগত হইতে চলিয়াছে, সেই কারণেই বড়বাজার অঞ্চলের মালিকানার অধিকাংশই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

একবার চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া যাইতে থাকিলে রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা দু'একটী বাঙ্গালীর হইবে কি না সন্দেহ। এতদ্‌ভিন্ন, চোরবাগানে কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক এবং শীলদের বাড়ী বাদ দিলে প্রায় সবই অবাঙ্গালীর হস্তগত হইয়াছে। বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর বনিয়াদি বাঙ্গালী ঘরও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমার আত্মচরিতে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এই খেদোক্তি করিয়াছি—হায় বাঙ্গালী, তুমি "নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে"।

বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বাঙ্গালী জমিদারগণের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তক পাঠ করিলে ইহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

যেদিন হইতে জমিদারগণ কলিকাতায় আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ ও বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে ইঁহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। তাহা হইলে আমি আমার নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করিতাম, কারণ ইহাতে আমি একপ্রকার নিমজ্জিত আছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমি বর্জ্জন করিতে বলি না, তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসারটুকু বাদ দিতে হইবে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যদি একটা অনুন্নত জাতি কোন একটী উন্নতিশীল জাতির সংস্পর্শে আসে, তাহা হইলে প্রথমে তাহাদের বাহ্যিক আড়ম্বর, বেশভূষা ইত্যাদির নকল অনুকরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী কদাচিৎ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে কলিকাতায় যাঁহারা ধনাঢ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরগণ কলিকাতার আশে-পাশে বাগান বাড়ী করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

আমার বাল্যকালে, অর্থাৎ ষাট বৎসর পূর্ব্বে, যখন জমিদারবর্গ কায়েমী ভাবে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে শেখেন নাই, তখনও তাঁহারা বছরে দু'তিন মাস কাল কলিকাতায় আসিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, এমন কি, যখন দেশে ফিরিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বাক্স বোঝাই করিয়া ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি লইয়া যাইতেন এবং পরে ধারাবাহিক ভাবে ইহার চালানেরও ব্যবস্থা করিতেন। এই প্রকারে উৎসন্ন যাইবার পথ পরিষ্কার হইল এবং তাঁহাদের পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া যতই কলিকাতার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি হইতে লাগিল, ততই পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।

এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বড় বড় জমিদারদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৯৫ জন কলিকাতাবাসী। আমরা ছেলে-বেলায় দেখিয়াছি যে, জমিদারগণ স্ব স্ব গ্রামের পুষ্করিণী ও দীঘি খনন এবং তাহার পঙ্কোদ্ধার এবং রাস্তা-ঘাটের দিকে নজর রাখিতেন। কাজেই এখনকার মত পল্লী বনজঙ্গল-সমাকীর্ণ ম্যালেরিয়ার আকর হইয়া উঠে নাই। এতদ্‌ভিন্ন, ধনী ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। কাজেই, জমিদারগণ কখনও কখনও অত্যাচারী হইলেও, দেশের টাকা দেশেই ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে যথার্থই বলিয়াছেন

> প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
> সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

এই স্থলে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাকে Linlithgow কমিশনে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তখন আমি পল্লীর হতশ্রীর কারণ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম; এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, পল্লীর যাবতীয় দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ ধনী জমিদারগণের পল্লী ত্যাগ। পূর্ব্বকালে পল্লীজননী যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, তাহা জমিদারদের ভগ্ন প্রাচীর ও দেউল দেখিলেই বেশ বুঝা যায়।

বড় বড় জমিদারের কুঠীসংলগ্ন ফুলের ও ফলের বাগ-বাগিচা থাকিত। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের বিষয় পড়িলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। জমীদারগৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা হইত এবং ওস্তাদ ও কালোয়াতের যথেষ্ট আদর ছিল।

এই সকল কারণে জমিদারবাড়ী তখন জমজম্ করিত। কিন্তু হায়, আজ আমি পাড়াগাঁয়ে যেখানেই যাই, সেখানেই দেখিতে পাই যে, বড় বড় অট্টালিকা জন-মানবশূন্য হইয়া ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূজার দালানে আর কাঁসর ঘণ্টার রব শুনিতে পাওয়া যায় না। পায়রা বাদুড় চামচিকা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ভাঙ্গা বাড়ী শিয়ালের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বড় বড় পুষ্করিণী কর্দ্দমে ও শৈবালে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে।

বর্ত্তমানে জমিদারগণ কলিকাতাবাসী হইয়াছেন এবং টাকার জন্য নায়েব আমলাদের উপর কড়া তাগাদা দিতেছেন। এমনও আমি জানি যে 'যেন তেন প্রকারেণ টাকা না পাঠাইলে তোমার চাক্‌রি থাকিবে না' ইত্যাদি বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। আজ এই সমস্ত টাকা, যাহা দুঃস্থ প্রজাগণের শোণিতস্বরূপ, দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে—ইহার এক কপর্দ্দকও আমাদের দেশের লোক পাইতেছে না। চৌরঙ্গীর অট্টালিকায়, রকমারী মোটর কেনায়, ল্যাজারাসের আসবাবশালায় অধিকাংশ টাকাই ব্যয় হয়। এই স্থানে ইহাও বলা উচিত যে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল বর্ত্তমান জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ তখন অনেক দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, এমনকি, কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কারণ, বাঙ্গলার জমিদারগণের মধ্যে আজকাল শতকরা ৯৫ জনই ঋণজালে জড়িত এবং পল্লীমাতার ক্রোড় হইতে চির-নির্ব্বাসিত।

এতক্ষণ বাঙ্গলার জমিদারবর্গের অলসতা ও অপদার্থ-তার বিষয় আলোচনা করিলাম। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে কেবল বসিয়া খান; এবং জড়তা, নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বিলাসিতা হেতু পৈতৃক বিষয়-বৈভব হারাইতে বসিয়া-ছেন। কিন্তু একবার যাঁহারা নিজ বুদ্ধি, প্রতিভা এবং পুরুষকার বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে কৃতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ আলস্য-স্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া কি ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন, তাহার তুলনামূলক আলোচনার জন্য কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কিছু দিন হইল সার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদের আমন্ত্রণে হোলকার-রাজের রাজধানী ইন্দোরে যাই এবং তথায় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করি। সার স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে ভারতের মধ্যে আজ একজন শ্রেষ্ঠ কলকারখানা-সংস্থাপক। হুগলী-নদীর তীরে ইঁহার যে পাটকল আছে, তাহা ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইঁহার অধীনে যে প্রধান ইংরাজ ম্যানেজার, তাঁহার বেতন ও কমিশনে মাসিক প্রায় ৮০০০ টাকা হইবে; এবং অন্যান্য ১৫জন ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং উচ্চ-বেতনভোগী দেশী কর্ম্মচারীও আছেন।

বালিগঞ্জে ইঁহার যে Electric steel works আছে সেখানে ইস্পাত গালাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া রেলওয়ে চাকার সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। ইন্দোরে ইঁহার কর্তৃত্বাধীনে চারিটি কাপড়ের কল। গত মহাযুদ্ধের অবসানে গভর্ণমেণ্ট যখন সমর-ঋণের জন্য আবেদন করেন, ইনিই প্রথমে এক কোটী টাকার War bond কিনিয়াছিলেন। যিনি একদিনে এক কোটী টাকা নগদ তহবিল হইতে বাহির করিতে পারেন, তাঁহার যে কত টাকা আছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে শেঠ্ হুকুমচাঁদ আদৌ ইংরাজী জানেন না। বড়ছেলে ইন্দোরে পৈতৃক ব্যবসায়ে পিতার একজন প্রধান সহকারী হইয়াছেন।

আর একজন কৃতী ইহুদী ব্যবসায়ীর কথা বলিতেছি। বেঙ্গল কেমিক্যালের সহিত তাঁহার লেন-দেন আছে বলিয়া আমি তাঁর কতকগুলি ঘরোয়া খবর রাখি। কলিকাতার সন্নিকটে তাঁহার একটী পাটকল আছে। ইঁহার দুই পুত্র ও এক জামাতা শিক্ষানবীশী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ইহুদী প্রায় দুই কোটী টাকার সম্পত্তির মালিক। তাহা হইলে প্রত্যেক ছেলের ভাগে প্রায় এক কোটী টাকা করিয়া পড়িবে। এই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও তাঁহারা প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সকালে ৬টার সময় একটু দুধ ডিম (কিন্তু চা নয়) খাইয়া পাট-কলে বেলা দশটা পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে কাজ করেন। অবশ্য মাঝে টিফিনের জন্য একটু বিশ্রাম করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ ঘনশ্যাম দাস বিড়লা এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও

মজিয়াছে। শারদা সবে তেরয় পা দিয়াছে—এতটুক্ মেয়ের মুখ দেখিয়া মাধবের মত বয়স্ক লোকের এমন করিয়া মজাটাই বিন্দুর কাছে একটা ঘোরতর অপৌরুষের কার্য্য বলিয়া মনে হইল। ঘৃণায় তার নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—ক্রোধে সে ফুলিয়া উঠিল—কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝিল যে ওই চাঁদমুখ বধূর কোনও দোষ দেখা বা তাকে কোনও শক্ত কথা বলা মাধবের পক্ষে এখন অসম্ভব!

কথাটা সত্য। কিন্তু সুধুই যে চাঁদ মুখে মাধবকে এতটা কাবু করিয়াছিল তাহা নয়। শারদার বয়স যাই হোক সে অসম্ভব পাকা মেয়ে, আর তার বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সে মাধব ও বিন্দু দুজনকেই এক হাটে বেচিয়া আর এক হাটে কিনিতে পারে।

যে দিন সে মাধবের সঙ্গে বিন্দুর সম্পর্কের স্বরূপটা বুঝিতে পারিল, সেই দিনই সে স্থির করিল যে তার অধিকারের উপর বিন্দুর এই অনধিকার-প্রবেশ সে হইতে দিবে না। সেই দিন হইতে সে এক দিকে যেমন বিন্দুকে পরোক্ষে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল, অপর দিকে সে মাধবকে মুগ্ধ করিবার জন্য বয়সের অতিরিক্ত কুশলতার সহিত বিবিধ ছলাকলা আরম্ভ করিল। সেবার সৌকর্য্যে সে মাধবকে চারি দিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। মাধব আর এখন নিজ হাতে তামাকটুক্ পর্য্যন্ত সাজিয়া খায় না। গভীর রাত্রেও শারদা নিজে উঠিয়া তার তামাক সাজিয়া দেয়। এমনি করিয়া মাধবের আহার শয়ন বিশ্রাম কর্ম্ম, সব ব্যাপারের ভিতর সে চারি দিক দিয়া মাধবকে এমন করিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল যে, তার ভিতর দিয়া বিন্দুর প্রবেশের রন্ধ্র-পথটুকুও অবশিষ্ট রহিল না। তার পর, সে সময়ে-অসময়ে যখন তখন মাধবের কাছে আসিয়া বসিয়া থাকে, তার মাথায় হাত বুলায়, তার হাতের আঙ্গুল লইয়া খেলা করে, তার নাক্ লইয়া লুকাচুরী করে; আর এত রকম চিত্তহারী চপলতা করে যে, মাধবের মনেই হয় না যে, সে সুধু ত্রয়োদশী কিশোরী—তার চিত্ত শারদার চরণপ্রান্তে লুটোপুটি খায়।

বিধাতাও যেন শারদার এই অভিযানে তার সহায় হইলেন। বিবাহের পরই হঠাৎ শারদা চট্-পট্ অসম্ভব বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। লোকে বলিল, "বিয়ার জল গায় লাগ্‌ছে"। তিন চার মাসের মধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণরূপে পুষ্ট হইয়া দেখিতে সে একটি পূর্ণ যুবতীর মত হইয়া উঠিল।

ঈর্ষা ও অসূয়ার সহিত বিন্দু শারদার অঙ্গে এই অপরূপ লাবণ্যের বৃদ্ধি চাহিয়া দেখিত—দেখিয়া দেখিয়া তার অঙ্গ জ্বলিয়া যাইত।

শারদার সঙ্গে দ্বন্দ্বে সে যে হটিয়া যাইতেছে সে কথা বিন্দু অনুভব করিল—শারদার উপচীয়মান রূপরাশির দিকে চাহিয়া তার মনে হইল বুঝি-বা তার কাছে তার পরাজয় একেবারেই অনিবার্য্য। কিন্তু যতই সে ইহা অনুভব করিল, ততই তার রোখ চড়িয়া গেল—তার অধিকার সে কিছুতেই ছাড়িবে না, মাধব তাহাকে কেমন করিয়া অবহেলা করে সে একবার দেখিয়া লইবে। সে তখন মনে মনে হিসাব করিয়া যায়; সে মাধবের জন্য এত বৎসর ধরিয়া কত কি করিয়াছে, কত ত্যাগ স্বীকার, কত সেবা, কত অর্থব্যয় সে করিয়াছে মাধবের জন্য। আর এই যে সুন্দরী বধূর দিকে চাহিয়া আজ মাধব জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে—সে বধূও তো আনিয়াছে বিন্দুই! এত উপকার কি মাধব ভুলিয়া যাইবে—ভুলিতে পারিবে? এত বড় নিমকহারাম সে?

বিন্দুর একটিবারও মনে হইল না যে ভালবাসা যখন কৃত উপকারের উপর আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, সেই মুহূর্ত্তই তার চরম পরাজয়ের ক্ষণ!

সে শারদাকে নানা মতে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করে। বাক্যবাণে সে তাকে দগ্ধ করে। শারদা এখন তার জবাব দেয়। ফলে রোজই বাড়ীতে কোন্দল বাধিয়া উঠে। বিন্দু শারদাকে আর যত্ন করিয়া খাইতে দেয় না, তার জন্য কদন্ন বাড়িয়া দেয়—শারদা আসিয়া জোর করিয়া বিন্দুর থালা কাড়িয়া খায়। এমনি করিয়া ঝগড়া বাড়িয়া যায়।

খুব বেশী রাগ হইলে বিন্দু শারদাকে প্রহার করে—কিন্তু বেশী মারিতে সাহস করে না, পাছে মাধব চটিয়া যায়।

শারদা বিন্দুর গায় হাত তোলে না, মার খাইয়া কাঁদেও না,—সে মুখের কথায় বিন্দুর গায় বিছুটির বিষ ছড়াইয়া দেয়।

কয়েক দিন মার খাইয়া শারদার হাতটা নিস্ পিস্ করিতে লাগিল। তার পর একদিন বিন্দু ঘাটে যাইতেছিল, একটা বাতাবী নেবু গাছের তলায় আসিতেই তার মাথার উপর দুমদাম করিয়া দুইটা প্রকাণ্ড বাতাবী নেবু আসিয়া পড়িল। বিন্দু মাথা ঘুরিয়া ভুমড়ী খাইয়া পড়িল। সেই ফাঁকে ঝোপের আড়াল হইতে শারদা সরিয়া গিয়া ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে লাগিল।

বিন্দু যখন উঠিয়া চারি দিকে চাহিল, তখন দেখিল জনমানব নাই। সে মনে মনে ঠিক বুঝিল যে ইহা শারদার কার্য্য। সে রাগিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল ;—ঘরে গিয়া দেখিল, শারদা এক মনে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে।

অগ্নিময় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া বিন্দু শেষে বিকট ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "ক্যাথা শিলাইন—কিছুই জানি জানুইন ন্যা—হারামজাদী, তরে আইজ আমি থুমু না—হাড্ডির থিক্যা তর মাংস উঠাইয়া ল'মু—র'।"

শারদা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "ক্যান দিদি ? কি হইচে ?"

আবার ভ্রূকুটি করিয়া বিন্দু বলিল, "জানুইন ন্যা—আর ঢং করণ লাইগবো না লো, ঢং করণ লাইগবো না।" তার পর সে যাহা বলিয়া গেল তাহা অশ্রাব্য।

মাধব আঙ্গিনার এক কোণায় বসিয়া তার তাঁতের জন্য একটা বাঁশের খুঁটা বানাইতেছিল। সে অল্প কিছুক্ষণের জন্য বাঁশঝোপের দিকে গিয়াছিল, বাঁশ কাটিয়া আনিতে,—তাহারই মধ্যে শারদা গিয়া কর্ম্ম সাধা করিয়া আসিয়াছে।

বিন্দুর চীৎকার শুনিয়া মাধব উঠিয়া আসিল—সে জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে ?

বিন্দু বিস্তর হাত পা নাড়িয়া বুঝাইল সে ঘাটের দিকে যাইতেছিল, শারদা গিয়া তার মাথায় দুইটা প্রকাণ্ড 'জাম্বুরা' ছুঁড়িয়া মারিয়াছে—এবং এই হারামজাদী ইত্যাদি এখন 'মুখ মুছিয়া' সাধু সাজিয়া বসিয়া আছে।

মাধব হাসিয়া বলিল, বিন্দু ভুল করিয়াছে—শারদা সমস্ত সময় তার চক্ষের সম্মুখে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিয়াছে—সে একবারও ওঠে নাই।

শারদা ঘোমটার আড়াল হইতে ফিস ফিস করিয়া বলিল, "কও চে ? আমি উইঠল্যাম কহন ?"

বিন্দু আরও জ্বলিয়া উঠিল। মাধব ও শারদা উভয়কে চতুর্দ্দশ পুরুষ সমভিব্যাহারে নানা অনভিধানিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া এবং নানাবিধ অসম্ভব স্থানে পাঠাইয়া সে এমন একটা বিরাট, অশ্রুবহুল বক্তৃতা করিল যে মাধবেরও ধৈর্য্য প্রায় লোপ হইল।

সে বিন্দুকে গোটা কয়েক কড়া কথা শুনাইল। তাহা শুনিয়া বিন্দু হাঁউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শাপিতে শাপিতে সে গিয়া ঘরের ভিতর কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

বিন্দু চলিয়া গেলে মাধব শারদাকে জিজ্ঞাসা করিল "বিন্দুকে বাস্তবিক মারিল কে ?"

শারদা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। তার পর তারা দুইজনে নানারকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা তুলিয়া আলোচনা করিল। পরিশেষে শারদার মাথায় একটা খুব চমৎকার কথা আসিল।

সে বলিল, "কি জানি—ভূতও হইতে পারে!" সে মুখ চোখের ভাব এমন করিল যেন সে এ কল্পনায় ভয় পাইয়া গিয়াছে।

মাধব অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "আরে দূর! দিনে দুপুরে ভূতে মাইরবো কি ?"

চক্ষু দুটি বড় বড় করিয়া শারদা বলিল যে সে এমন অনেক বিবরণ শুনিয়াছে যে ভূতেরা যখন স্ত্রীলোকের উপর দৃষ্টি দেয় তখন তারা দিনে-দুপুরে তাদের উপর এমন বহু অত্যাচার করে। দুই চারটা শোনা গল্প সে বলিয়া গেল ; এবং বিশেষতঃ এই আড়াই প্রহর বেলায় ভূতের বিচরণের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় বলিয়া সকলেই জানে।

মাধব ঘাড় নাড়িল।

শারদা বলিয়া গেল যে বিন্দুর উপর ভূতের দৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। আর ঐ যে রাত্রে সাপে কাটা—অথচ সাপ দেখা গেল না—সেটাও হয় তো ঐ ভূতেরই কাজ!

মাধবের এখন একটু সংশয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল।

এই কথা বলিয়াই শারদার মনে অনেক রকম নষ্টামীর বুদ্ধি প্রচণ্ড বেগে খেলিয়া গেল। বিন্দুর উপর ভূতের দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা সাব্যস্ত করিতে পারিলে তাকে বেশ একটু নির্য্যাতন করিবার বিবিধ সম্ভাবনা তার মাথায় খেলিয়া গেল।

এই ব্যাপারের পাঁচ সাত দিন মধ্যে শারদা বিন্দুর সঙ্গে আবার বেশ ভাব জমাইয়া লইল। লোকের মন পাইবার বিবিধ ছলনায় তার সহজ সিদ্ধি ছিল। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই সে অনায়াসে বিন্দুকে হাতের মুঠায় পুরিয়া ফেলিল। তার পর একদিন শারদা নিজে রাঁধিয়া বিন্দুকে ভাত বাড়িয়া দিল। অনেক যত্ন করিয়া সে রাঁধিল, অন্নব্যঞ্জন দেখিয়া বিন্দুর নোলায় জল আসিল। এই কয়েক দিনের মধ্যে শারদা বিন্দুকে বলিয়া কহিয়া মাছ খাওয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। মৎস্য ভক্ষণে আপত্তি বিন্দুর কোনও দিনই ছিল না—ছিল সুধু লুকোচুরী। কাজেই শারদার সামনে, অথচ গোপনে, মাছ খাইতে সে সহজেই সম্মত হইল। সুরসাল মাছের পাতুরী ও ভাত এবং কচি দাঁড়া ফেলিয়া ডাল দেখিয়া তার পেটের ক্ষুধা চাড়া দিয়া উঠিল। সে গোগ্রাসে খাইতে আরম্ভ করিল।

শারদাও তার ভাত বাড়িয়া তার পাশে, একটু তফাতে খাইতে বসিল।

আহারের মধ্যপথে হঠাৎ কোথা হইতে বিন্দুর থালার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল ছাইভরা একটা মালসা।

বিন্দু ও শারদা দুজনেই লাফাইয়া উঠিল। শারদা তার ভাতের থালা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—বিন্দু হাঁউ-মাউ করিয়া চীৎকার করিয়া বাহির হইল।

মাধব ছুটিয়া আসিল; তিনজনে মিলিয়া চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করা হইল—কোনও পথে কোনও লোকের দ্বারা এই কার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না।

শারদাকে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই দেখা গেল না—কেন না শারদা বিন্দুর সামনেই বসিয়া ভাত খাইতেছিল—এবং, বিন্দু নিজেই বলিল যে ছাইয়ের মালসাটা সে একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দেখিয়াছিল ঘরের কোণায়।

—সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে শারদা বিন্দুর অনবধানতার সুযোগে সেটা তাহার আঁচলের তলায় আনিয়া রাখিয়াছিল, এবং বিন্দু যখন মাথা তুলিয়া ঘটী হইতে আলগোচে জল খাইতেছিল, সেই সুযোগে যে শারদার বাম হস্তের ক্ষিপ্র চালনায় মালসাটা বিন্দুর থালার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এ কথা না বিন্দু, না মাধব, সন্দেহ করিল।

মাধবের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে মনে মনে রাম নাম জপিতে লাগিল। শারদাকে সে বলিল, সে যাহা বলিয়াছিল তাহাই সত্য - ইহা মানুষের কার্য্য নয়।

ইহার পর এমনি অনেকগুলি ব্যাপার ঘটিতে লাগিল।

বিন্দু এখনও মাধবের ঘরেই শোয়—তবে স্বতন্ত্র বিছানায়। শারদা ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে কোনও আপত্তি করে না, কিন্তু বিন্দু যখন ঘরে থাকে,—তা সে নিদ্রিতই থাকুক বা জাগ্রতই থাকুক, তখন শারদা মাধবকে তার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেয় না। মাধব ইহাতে ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু সুন্দরী বধূর এ আপত্তি সে অযৌক্তিক মনে করিতে পারে না।

মাধব ভাবে বিন্দুর শুইবার জন্য একটা স্বতন্ত্র চালা প্রস্তুত করিলেই ভাল হয়, কিন্তু বিন্দুর কাছে এমন একটা প্রস্তাব করিবার সাহস তার হয় না। তাই সে মাথায় হাত দিয়া সুধু ভাবে।

একদিন রাত্রে বিন্দু আবার হাঁউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাধব ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া রাম নাম করিতে করিতে বাতি জ্বালিয়া বিন্দুর কাছে অগ্রসর হইল।

দেখা গেল বিন্দুর বিছানার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে একটা কাঠপিঁপড়ার বাসা; আর তাহা হইতে রাশি রাশি কাঠপিঁপড়া বাহির হইয়া দংশনের জ্বালায় বিন্দুকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

তার পর তার গায়ের উপর একদিন একটা হেলে সাপ টুপ করিয়া পড়িল। একদিন বিন্দুর দুধের বাটীতে কেঁচো কিলবিল করিতে দেখা গেল।

এমনি সব অত্যাচারে বিন্দু ভয়ানক ভয় পাইয়া গেল। শেষে মাধব ওঝা ডাকিল, বিন্দুর কণ্ঠ ও বাহু কবচে ভরিয়া গেল।

শারদা দেখিল ইহাতে মাধবের অনেকগুলি পয়সা খরচ হইয়া গেল—সে পয়সার ন্যায্য অধিকার তার। কাজেই ইহার পর ভূতের উপদ্রব বন্ধ হইয়া গেল।

যত দিন ভূতের উপদ্রব ছিল তত দিন বিন্দু বড় ভয়ে ভয়ে থাকিত—তখন তার নিজের উপদ্রব কাজেই স্থগিত হইয়াছিল। এবং সেই সুযোগে শারদা তার আধিপত্য প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কবচের ফলে যখন ভূতের উপদ্রব বন্ধ হইয়া গেল, তখন বিন্দু ক্রমে ক্রমে তার স্বরূপ আবার প্রকাশ করিতে লাগিল। উঠিতে বসিতে সে শারদাকে তিরস্কার করে; পাড়ার লোক ডাকিয়া শারদার নিন্দাবাদ করে। শারদা তাকে কথা বলিতে ছাড়ে না, আর সে কথাগুলি সংখ্যায় কম হইলেও তার খোঁচা এমন যে তাতে বিন্দুকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেয়।

একদিন সে এক মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া ভীষণ কুরুক্ষেত্র লাগাইয়া দিল।

বিন্দু শারদাকে কি একটা কাজ করিতে বলিয়াছিল, শারদা সে কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। মাধব তখন বাড়ী ছিল না—বিন্দু একাই কলকণ্ঠে শারদাকে তার অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিল। গোবিন্দ তাঁতির স্ত্রী সেখান দিয়া যাইতেছিল, বিন্দু তাহাকে ধরিয়া শারদার শত সহস্র কীর্ত্তির কথা শুনাইতে লাগিল।

শারদা যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন সে দেখিতে পাইল বিন্দু তার নিন্দা করিতেছে এবং বৃদ্ধা তার কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িতেছে।

বৃদ্ধা গ্রাম-সম্পর্কে শারদার দিদিশাশুড়ী। শারদাকে দেখিয়াই সে বলিল,"ক্যান্ লো ছেমরী, তুই এমুন বজ্জাতি করস্ ক্যান? রূপের ঠমকে বুঝি আর কারুইরে গায় লাগে না! ক্যান? ওয়ার কথা শোনস্ না ক্যান?"

শারদা তার কাঁখের কলসী ঘরে নামাইয়া সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে শান্ত কণ্ঠে গোবিন্দ-পত্নীকে বেশ বুঝাইয়া বলিল যে, তার পক্ষে বিন্দুর কথা শুনিবার বাধ্যবাধকতার কোনও ভিত্তিই তো নাই। বিন্দু তো তার শাশুড়ী নয়। তবে, হাঁ, বিন্দু যদি বলে যে সে শাশুড়ী—অর্থাৎ মাধবের মা—তবে শারদা কথা শুনিতে অবশ্যই বাধ্য। বলিয়া বিন্দুর দিকে চাহিয়া বলিল, বলুক বিন্দু সেই কথা।

বলিয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে সে উঠানে দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

শারদার উত্তরে বৃদ্ধা তাঁতিনীর ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বিন্দু কিন্তু একেবারে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল। সে একেবারে যদৃচ্ছ অশ্লীলতার সহিত শারদার পিতা মাতা ও চতুর্দ্দশ পুরুষ সহ সকলের নিন্দাবাদ করিয়া শারদার নানাবিধ ভীষণ পরিণতির ইঙ্গিত করিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত উঠানের উপর লাফালাফি করিতে লাগিল।

শারদা কোনও কথা না বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঘরে গিয়া সামান্য একটু প্রসাধন করিয়া ফিরিয়া আসিল।

গোবিন্দের স্ত্রী এই মুখরোচক সংবাদটা গ্রামে রাষ্ট্র করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া চলিয়া গেল।

বিন্দু অনেকক্ষণ লম্ফঝম্ফ করিবার পর শারদা বলিল, "ক্ষেপ ক্যান্? ক্ষেপনের কি কথা হইচে?" সে বুঝাইয়া বলিল যে, সে অন্যায় কোনও কথা বলে নাই। সে সুধু বলিয়াছে যে বিন্দু তার শাশুড়ী নয়—কথাটা কি মিথ্যা? বলিয়াছে সেও যা, বিন্দুও তাই—বরং বিন্দু তাও নয়। কেন না, কাল যদি মাধব বিন্দুকে তাড়াইয়া দেয় তবে বিন্দুর বলিবার কিছু নাই। অতএব বৃথা চীৎকার করিবার কোনও হেতু নাই।

এই প্রশান্ত উপদেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ফলে মাধব যখন বাড়ী ফিরিল তখন সে দেখিতে পাইল যে শারদা চুপ করিয়া বসিয়া আছে, বিন্দু একাই পাড়া মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। আর এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়াছে যাহাতে শান্তিস্থাপন মাধবের পক্ষে প্রায় অসম্ভব মনে হইল।

সেদিন রাত্রে বিন্দু রাগ করিয়া রান্নার চালায় গিয়া শুইল—মাধব ও শারদা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(৮)

রান্নার চালায় একলা ঘরে শুইয়া বিন্দু সেদিন আছাড়ি পাছাড়ি করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তার বুক ফাটিয়া গেল দুঃখে।

বিন্দুর কিছু টাকা-কড়ি ছিল, তাহা লইয়া সে আসিয়াছিল মাধবের কাছে। মাধবকে সে উন্মত্ত হইয়া ভালবাসিয়াছিল। তাই মাধবের অবস্থা যখন যার-পরনাই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল বিন্দু তখন তার টাকা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করিয়া মাধবকে দিয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া সে মাধবের বিবাহ দিয়াছিল—শারদাকে বড় আশা করিয়া সে ঘরে আনিয়াছিল, তাকে ভালবাসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে আনিয়াছিল।

এই কয় মাসের মধ্যে এক ফোঁটা একটা মেয়ে আসিয়া এ কি বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিল তার সুখের জীবনে! সম্বলহারা সর্ব্বস্বহারা হইয়া সে আজ আপনাকে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল মাধবের পরিত্যক্ত বলিয়া অনুভব করিল।

এত দিন---যখন সে ধীরে ধীরে এই ক্ষুদ্র পরিবারের প্রাধান্য হইতে অপসৃত হইতেছিল—এত দিন সে সুধু রাগই করিয়াছে। যে অধিকার তার ছিল তাহা যে সে হারাইতে বসিয়াছে, একদিনও সে তাহা অনুভব করে নাই, তাই সে সেই অস্তমান প্রভুত্বের স্পর্দ্ধায় সুধু ক্রোধই করিয়াছে,—আজ আর সে রাগ করিল না—অন্তহীন দুঃখ তার সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

আজ শারদা তার মুখের উপর বলিয়াছে যে কাল যদি মাধব তাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করে তবে তার বলিবার কোনও কথা নাই। কথাটা শুনিয়া তখন সে আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন আর তার রাগ হইল না। সে অনুভব করিল কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কোনও জোর নাই তার! মাধবকে বাঁধিবার মত কোনও সম্বল তার নাই—রূপ নাই যৌবন নাই—আছে সুধু একটা সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা—তার কিই বা দাম? সে সুধু ভালবাসে, কিন্তু তাতে তো পুরুষকে বাঁধা যায় না। সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে তার অভিযোগ করিবারও পথ নাই।

এ কথা সে এত দিনে বেশ হাড়ে হাড়েই বুঝিয়াছে যে শারদার সঙ্গে তার বিরোধে সমস্ত জগৎ তার বিপক্ষে। তার পক্ষে দাঁড়াইবার কেহই নাই; কেন না, লোক-চক্ষে শারদার অধিকার ন্যায্য—তার কোনও অধিকারই নাই। হায় রে, কোনও অধিকার নাই? ধর্ম্মের অধিকার নাই, সমাজ তাকে কোনও অধিকার দেয় না, কিন্তু মাধব—মাধবও কি সেই কথা বলিবে? তার কাছেও তার কোনও অধিকার নাই? তার সর্ব্বত্যাগী ভালবাসার কি এক বিন্দু করুণার অধিকারও নাই?—জগতের কাছেও নাই, মাধবের কাছেও নাই?

নাই, নাই, নাই—কোনও অধিকারই নাই।

অবৈধ প্রেমের পিছল পথে যখন সে পা দিয়াছিল, তাহার সমাজ তখন তাকে হাতে ধরিয়া ফিরায় নাই, শাসন করিয়া নিবৃত্ত করে নাই! তাদের সমাজে এমন ব্যাপার এমন কিছু অস্বাভাবিক বা অসাধারণ নয়। সমাজ সুধু কৌতুকের চক্ষে একটু মৃদু হাসিয়া তার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল। আজ যখন সে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, রিক্ত অসহায় হইয়া পাকের ভিতর আসিয়া ডুবিতে বসিয়াছে—এখনও সমাজ, সুধু সকৌতুকে তার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে! এই নির্ম্মম কঠোরতার অনুভূতি তার প্রাণের ভিতর তপ্ত শলাকার মত বসিয়া গেল। সে হতাশ ভাবে সুধু কাঁদিয়া ভাসাইল, মনের দুঃখে মেঝেয় জোরে জোরে মাথা ঠুকিল, নিদারুণ আত্মনির্য্যাতনে সে তার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

রিক্ত সর্ব্বহারার বুক-ছেঁড়া এ করুণ-ক্রন্দন, তার নিঃসঙ্গ শয্যা সিক্ত করিল, শূন্য গৃহের বাতাসে মিলাইয়া গেল—বিশ্বের শীতল অঙ্গে তার দারুণ জ্বালা কোথাও একটু তাপও সঞ্চার করিল না। বিশ্বের অতীত কোনও দেবতার মনে এ ব্যথার কোনও দাগ পড়িল কি? কে জানে! এমন নিঃসঙ্গ, এমন অসহায়, এমন সর্ব্বহারা সে! জগতে কেউ নাই যার হৃদয় তার জন্য একটু ব্যথিত হয়, যার চোখে সে এক ফোঁটা জল টানিয়া বাহির করিতে পারে। কেউ যদি থাকিত, কেউ যদি একবার তার মুখ পানে একটু সদয় দৃষ্টিতে চাহিত, তবে বুঝি এ-সব জ্বালা সে সহিতে পারিত। কিন্তু কেউ তো নাই! আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেউ তার নাই—মাধবও নাই! তাই অসহ্য বেদনায় সে বার বার ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে সে স্থির করিল, অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই। পূর্ব্বজন্মে

—হয় তো এই জন্মে—সে অশেষ পাপ করিয়াছে ; তাই তার অদৃষ্টে এই ভোগ—এই সর্ব্বনাশ। এখন সুধু সহিয়া যাওয়া ছাড়া তো আর উপায় নাই।

সকলই সহিতে হইবে। যে গৃহে সে প্রভু ছিল সেই গৃহে অন্নদাসী হইয়া থাকিতে হইবে। যেখানে সে ভালবাসা পাইয়াছে, সেখানে ঘৃণা ও অবহেলা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। যার জন্য সে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছে তার জন্য মানও ছাড়িতে হইবে।

মাধবকে সে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। এ গৃহ সে ছাড়িয়া যাইবে না। কোথায় যাইবে ? কে আশ্রয় দিবে তাহাকে ? এখন তো তার কিছুই নাই, কে তাকে আগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিবে ? যেখানেই যাক, লাঞ্ছনা ও অবহেলা সহিয়াই তার জীবন কাটাইতে হইবে। ঝাঁটা লাথিই যদি খাইতে হয়, অবজ্ঞা ও অবহেলাই যদি তার একমাত্র প্রাপ্য হয়, মাধবের কাছেই সে তাহা লইবে—শারদার কাছেই লইবে। যাকে তার সৌভাগ্যের ভাগিনী করিবে বলিয়া আদর করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে যদি তার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া তার রাজ্যপাটে অধীশ্বরী হইয়া বসিয়াই থাকে, তবে তারই সে সিংহাসনের তলায় সে লুটাইয়া মরিবে।

সে দিব্য করিল শারদাকে সে একটি কথাও বলিবে না। তার আজ্ঞাদাসী হইয়া সে থাকিবে—একটি কথাও কহিবে না।

ইহাই যখন তার অদৃষ্ট, তাই সে মাথা পাতিয়া লইবে। বিনিদ্র রজনীর শেষভাগে সে এই সঙ্কল্প করিয়া হাত পা এলাইয়া পড়িয়া রহিল—শ্রান্তির শেষ সীমায় উপনীত হইয়া শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে শারদা তাকে ডাকিয়া উঠাইল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। শারদার বিজয়োজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তার প্রাণের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিল। সে কোনও কথা কহিল না। চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া সে বাহির হইয়া ঝাঁটা খুঁজিতে লাগিল—উঠান ঝাঁট দিয়া লেপা পোঁছা করিবার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।

শারদা তাকে বলিল ঝাঁটপাট সে নিজেই দিয়াছে, ঘর দুয়ার নিকানোও হইয়া গিয়াছে।

তার চিরাভ্যস্ত গৃহকর্ম্ম যে আজ শারদা করিয়া শেষ করিয়াছে এ কথায় বিন্দুর মনে পড়িল যে এই শ্রমসাধ্য কর্ম্মের তলায় তার যে অধিকারের ক্ষেত্র ছিল তাহা শারদা সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইয়াছে। তাই কথাটায় তার মনটা চিড়বিড় করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

রান্নাঘর নিকানো বাকী ছিল, তাই শারদা বিন্দুকে উঠাইয়াছে। বিন্দু উঠিতেই সে রান্নাঘর নিকাইতে আরম্ভ করিল।

বিন্দু তাহা দেখিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কুয়ার পাড়ে মুখ-হাত ধুইতে গেল।

মাধব তখন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সে বিন্দুকে দেখিয়া ভয়ানক ভাবিতে লাগিল।

বিন্দু মাধবের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিতে পাইল উৎফুল্ল আনন্দ—বুঝি বা বিজয়োল্লাস! আবার তার বুকটা বিষাইয়া উঠিল। তাহাকে অবহেলা করিয়া আজ মাধবের এত উল্লাস! হায় রে, একদিন এই মাধব এক মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুর ভার মুখ দেখিতে পারিত না!

কিন্তু বিন্দু মাধবের প্রতি অবিচার করিল। মাধব তাকে উপেক্ষা তো করেই নাই, বরং আজ এবং গত কয়েক দিন ধরিয়া সে ভাবিতেছিল বিন্দুরই কথা। শারদার অপরূপ রূপ-যৌবনের বন্যায় সে ভাসিয়া গিয়াছিল—না গিয়া তার উপায় ছিল না বলিয়া। কিন্তু বিন্দুকে সে ভুলে নাই। বিন্দুর কাছে তার যে কত ঋণ তাহা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। শারদার প্রেমে যখন তাকে ভাসাইয়া লইয়াছে তখনও সে তার অপরিশোধনীয় স্নেহের ঋণের কথা ভাবিয়াছে, বিন্দুর জন্য তার প্রাণ কাঁদিয়াছে।

বড় আনন্দের কথা হইত মাধবের, যদি বিন্দু ও শারদার সম্পর্ক এমন আদা-কাঁচকলার মত না হইয়া পরিপূর্ণ স্নেহের সম্বন্ধ হইত। তবে সে দুজনের প্রতিই উপযুক্ত সুবিচার করিতে পারিত—দুজনকেই ভালবাসিত, দুজনেরই সমান আদর-যত্ন করিতে পারিত। বিবাহের সময় সে আশা করিয়াছিল তাই হইবে। বিন্দু তাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিল যে শারদাকে ঘরে আনিলে—ছোট্ট বউটিকে সে কত আদর করিয়া মানুষ করিবে,

তাকে গড়িয়া পিটিয়া মাধবের মনের মত করিয়া তুলিবে—যাতে তাকে পাইয়া মাধবের জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। শারদাকে পাইয়া জীবন তার ধন্য হইয়াছে—বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল ও চঞ্চল তার রূপরাশি তাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, তার সহস্র লীলা-চপল চাতুরীতে সে আনন্দে হাবুডুবু খাইয়াছে। কিন্তু তার এই যে পরিপূর্ণ আনন্দের জীবন ইহার ভিতর বিন্দুর কোনও স্থান নাই—স্থান থাকিতে পারে না। কেন না, বিন্দুকে শারদা গোড়া হইতেই একদিনের তরেও সহিতে পারিল না। বিন্দুকে একটা স্নিগ্ধ কথা বলিলে শারদার প্রাণ টাটাইয়া উঠে। আর বিন্দুও শারদাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, শারদার প্রতি সত্য ও কল্পিত প্রত্যেক পক্ষপাতে সে আগুন হইয়া উঠে। অব্যঞ্জনীয় স্নেহের বেদনা, শঙ্কিত অকৃতজ্ঞতার বেদনায় তার প্রাণ টন্ টন্ করিয়া উঠিতেছিল।

অনেক দিন ধরিয়াই মাধব ভাবিতেছিল, ইহার কি একটা উপায় হয় না? ভাবিয়া সে কূল পায় নাই—ভাবনা তার থামে নাই।—ইহার কি একটা উপায় হয় না। এই দুটিকে মিলাইবার কোনও উপায় কি হয় না? এখন তার আশা হইতেছিল বুঝি বা উপায় হইতে পারে।

আজ ভোরে সে শারদাকে আদর করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া বলিয়াছিল, তার ঘর দুয়ার, ধনপ্রাণ যত কিছু আছে সবই তো শারদার, শারদা তার সর্ব্বস্ব—তার ভালবাসার বিনিময়ে শারদা কি তাকে একটি ভিক্ষা দিবে না?

শারদা বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া পরম স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কি চাও তুমি?"

মাধব বলিয়াছিল, "আর কিছুই চাই না—ক্যাবল ইয়াই চাই যে তুই বিন্দুডারে মিঠা মুখে দিবি। উ তরে ভালবাসে। ওই তো আহ্লাদ কইরা তরে সর্ব্বস্ব দিবার লিগ্যা ঘরে আনচে। তবে যে ও তরে কৈফিয়ৎ করে—সে উয়ার স্বভাব। তার লিগ্যা গোসা কইরো না সোণা!"

শারদা বলিল, রাগ তো সে করে না, করে বিন্দু। শারদা তো কোনও কথাই কয় না।

"হ, তা ঠিক! কিন্তু তবু, ওয়ারে একটু ক্ষ্যামা করণ লাগে। উ আমারে না ক'রছে কি? উয়ার টাকা পয়সা যা কিছু আছিল সব আমার লিগ্যা খরচ ক'রছে, রাইতে দিনে শরীলডারে বিশ্রাম দেয় না এক রত্তি—সুদা আমার লিগ্যা—এত ক'রছে ও, উয়ারে তুই একটু মিঠা মুখ দিবার পারবি না?"

শারদা হাসিয়া মাধবের দাড়ি নাড়িয়া বলিয়াছিল, "আইচ্ছা দিমু গো দিমু—তোমার বড়রাণীরে মিঠায় মিঠায় একিবারে মুখ মাইরা দিমু, দেইখ্যা লইও।"

এই প্রতিশ্রুতি শারদা সর্ব্বান্তঃকরণে দিয়াছিল। বিন্দুকে তার অধিকার হইতে নিঃশেষে বহিষ্কৃত করিয়া আজ সে বিজয়ের আনন্দে এত উৎফুল্ল হইয়াছিল যে তার মনে বিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের আর ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না। তাই মাধব যখন তাকে এমন সোহাগ করিয়া বিন্দুর অশেষ ত্যাগ ও স্নেহের পরিচয় দিয়া গেল, তখন তারও বিন্দুর প্রতি একটু করুণা হইল। তাই এ প্রতিশ্রুতি দিতে সে তার অন্তরের কোনওখানে কোনও বাধা অনুভব করিল না।

সকালে বিন্দুর প্রতি এই সহৃদয়তা লইয়া সে উঠিল। সেই সহৃদয়তার ফলে সে স্থির করিল, সে বিন্দুকে কাজ করিতে না দিয়া নিজে তার কাজ সারিয়া রাখিবে। তাই বিন্দু উঠিবার আগেই সে ঘর দুয়ার ঝাঁটপাট দিয়া নিকাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বিন্দু তাকে ভুল বুঝিল। সদয় হৃদয়ের যাহা পরিচয়, সে বুঝিল যে তাহা কেবল শারদার অধিকার প্রতিষ্ঠার আয়োজন, তার পরিপূর্ণ বিজয়ের স্পর্দ্ধিত ঘোষণা!

শারদার কথা ও কাজে মাধবের মনে সাহস হইয়াছিল যে, এত দিন যাহা সে একেবারেই অসম্ভব মনে করিয়াছিল, বুঝি-বা তাহা সহজসাধ্য—সুধু সাধ্য নয়, বুঝি-বা করায়ত্ত। সে তাই স্থির করিল যে বিন্দুকে ডাকিয়া তাকেও ঠিক শারদার মত করিয়া একবার বুঝাইতে পারিলে বুঝি-বা সব গোল মিটিয়া যাইবে। বিন্দু লোক মন্দ নয়,—তার গুণের অবধি নাই, তার বুদ্ধি-বিবেচনা মাধবের চিরদিনের চরম আশ্রয়, তার স্নেহ-প্রবণতা মাধব খুব ভাল করিয়াই জানে। ছেলেমানুষ হইয়াও শারদা তার কথা যতটা সুবুদ্ধির সহিত বুঝিয়াছে, পরিণতবুদ্ধি বিচক্ষণ বিন্দুর পক্ষে সে কথা

বাঝা মোটেই কঠিন হইবে না বলিয়া মাধবের মনে হইল।

মাধব যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হয় তো হইতে পারিত, হয় তো বা নাও হইতে পারিত—যদি শারদাকে সে যেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছিল, বিন্দুকেও তার পক্ষে ঠিক তেমনি করিয়া কথাটা বুঝান সম্ভব হইত। শারদাকে স্নেহে সমাদরে প্লাবিত করিয়া দিয়া সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ হইয়া তার মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিল, বিজয়িনী শারদা তার সে সম্ভাষণের পুলকে আনন্দের সহিত তার অনুরোধ মানিয়াছিল। কিন্তু—বিন্দুকে ঠিক তেমনি করিয়া কথাটা বলিতে মাধবের সাহসও হইল না, ইচ্ছাও হইল না। শারদা মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া মাধবকে সত্য সত্যই বিন্দু হইতে এতটা তফাৎ করিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রয়োজনের খাতিরেও বিন্দুকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইবার কল্পনায় মাধবের বাধ বাধ ঠেকে—লজ্জা বোধ হয়। তার মুখ চাহিয়া কথা কহিতেও তার দারুণ সঙ্কোচ বোধ হয়। বিন্দুকে দিবার যে কিছুই তার অবশিষ্ট নাই, তার স্নেহ-প্রেম যে শারদা আসিয়া ডাকাতি করিয়া লুটিয়া লইয়াছে, এই অনুভূতিই মাধবকে বিন্দুর কাছে মহা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে।

মাধব ভাবিতেছিল, বিন্দুকে দুটো স্নেহের কথা বলিয়া কথাটা পাড়িবে। কিন্তু কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহা তার কাছে নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, আজ সেই কথাটা বলিবার উপায়ই সে ভাবিয়া পাইল না। কি বলিবে সে? কেমন করিয়া করিবে তার শূন্যগর্ভ স্নেহের সম্ভাষণ?

বিন্দু যখন মুখ ধুইয়া কুয়ার পাড় হইতে ফিরিল, তখন মাধব হাসিয়া বলিল, "আরে শোনো—ছ্যাহ—শুইন্যা যাও—বুইচ্চ নি?"

মাধবের হাসিটা যেন বিন্দুর প্রাণে বিষের ছুরীর মত হইয়া বিঁধিল—আজ সকালে এত হাসিমুখ যে শারদার প্রতি প্রেমের ফল তাহা সে বুঝিল—তাই তার মন বিষাইয়া উঠিল।

চোখ টান করিয়া মাধবের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিন্দু বলিল, "কি কও?"

মাধব বলিল, "আইসই এহানে—বইস আইসা, কই।"

বিন্দু একটা ভ্রূকুটি করিল, সে অগ্রসর হইল না।

মাধব বলিল, "না আইস—সাচা কই—কথা আছে—শুইন্যা যাও।"

মুখ ফিরাইয়া বিন্দু বলিল, বেলা হইয়া গিয়াছে, তার কাজ আছে।

মাধব হাসিয়া বলিল, আজ তার কাজের জন্য বিন্দুর ভাবিতে হইবে না—আজ শারদা একাই সব কাজ করিবে।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত বিরক্ত ভাবে বিন্দু মাধবের কাছে অগ্রসর হইল। দাওয়ার কাছে আসিতে মাধব তাহাকে হাতে ধরিয়া দাওয়ার উপর বসাইল। বিন্দু বিরক্ত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

তার পর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া মাধব কিছুক্ষণ হাতের হুঁকাটায় কেবল টান দিতে লাগিল।

শেষে অনেক মুসাবিদা করিয়া সে বলিল, সে বধূকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে—এবং শারদাও বুঝিয়াছে। সে আর বিন্দুর সঙ্গে ঝগড়া করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সে বরং বিন্দুর সহায় হইয়া তার সংসারের কাজ করিয়া দিবে। তার পর সে বলিল, "এাহন, ছ্যাহ—তুমি তো বুঝই—তোমারে আর কি কমু—তুমিও একটু বুইঝা শুইন্যা চইলো, তবেই তার কাইজ্যা করচান হইবো না। নাইলে বুঝই তো—একসাথে যেহানে থাকন লাইগবো—সেহানে নিত্যি কাইজ্যা কইরা চলে কেমতে? বুইঝচ না?"

বিন্দু একবার কুটিল কটাক্ষে মাধবের দিকে চাহিল। তার পর সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "হ' বু'চ্চি! তর ডর নাই, আর তর বউরে আমি কিছুই কমু না।"

বলিয়া সে উঠিল। তার ঐ ক্ষণিকের কটাক্ষ মাধবকে চমকাইয়া দিল, আর এ প্রসঙ্গে কথা কহিতে তার সাহস হইল না।

সে তাড়াতাড়ি কথাটা বদলাইয়া বলিল, "হ' এক কথা! তর শোঅনের কি হো'বো?"

বিন্দু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাধবের দিকে চাহিয়া বলিল. কি আর হইবে সে ওই চালায়ই শুইবে।

মাধব মাথা চুলকাইয়া বলিল, "নিতান্তই যদি বিন্দু

তার ঘরে নাই শোয়, তবে বিন্দুর জন্য একখানা ঘর তোলা যাক।

বিন্দুর প্রাণের ভিতরটা মাধবের এই প্রশান্ত প্রস্তাবে হাহাকার করিয়া উঠিল! মাধবের ঘরে যে আর তার স্থান নাই, তার মনে হইল যে মাধব যেন এ কথাটা অনাবশ্যক কঠোরতার সহিত তাকে বুঝাইয়া দিল। নচেৎ কোনও দরকার তো ছিল না এ কথাটা তুলিবার, আর তুলিল যদি, লজ্জার খাতিরেও তো সে একটিবার অনুরোধ করিতে পারিত তাকে এই ঘরেই শুইতে! নিদারুণ অভিমান গর্জ্জন করিয়া উঠিল তাহার চিত্তে।

তার উদ্যত আক্রোশ দমন করিয়া বিন্দু বলিল, আর ঘর তুলিতে হইবে না। ঘরের প্রয়োজন নাই, ঐ রান্নার চালাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

বলিয়া সে বাহ্য নির্লিপ্ততার তলায় অন্তরের অগ্নি চাপিয়া চলিয়া গেল।

শারদা তখন রান্নার চালা সারিয়া হাত-পা ধুইয়া বিন্দুর কাছে আসিয়া নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আইজ হাটের থিক্যা কি আনন লাইগবো?"

আজ হাটবার। মাধব হাটে তার বোনা ধুতি-চাদর লইয়া বিক্রয় করে, ফিরিবার সময় এক সপ্তাহের যোগ্য খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া আনে। কি আনিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ বরাবরই বিন্দু দেয়, কিন্তু গত দুই হাটের দিন মাধব তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই—কেন না সে দুই দিনই বিন্দু অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ছিল।

আজ শারদা আসিয়া বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিল। বিন্দু বিরক্ত হইয়া বলিল, সে কিছু জানে না—শারদাই দেখিয়া শুনিয়া বলুক।

কিন্তু শারদা ছাড়িল না। মাধবের শুইবার ঘরের এক পাশে একটা মাচা বাঁধা আছে—সেই মাচার উপর তাদের ভাণ্ডার। শারদা মাচায় উঠিয়া দেখিয়া আসিল চাল ডাল প্রভৃতি কোন্ জিনিষ কতটা আছে। তার পর আবার আসিয়া বিন্দুর কাছে বসিয়া তাকে বলিতে লাগিল, চাল কতটা আছে, ডাল কিছুই নাই, লবণও সামান্যই আছে—ইত্যাদি।

এড়াইবার জন্য বিন্দুর সকল চেষ্টা নিস্ফল করিয়া দিল সে কেবল পীড়াপীড়ির জোরে। তার পর সে বিন্দুকে দিয়াই মাধবকে বলাইল কি কি জিনিষ আনিতে হইবে।

তার পর মাধব বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে দুইটি 'কামলা', কয়েকটা খুঁটির কাঠ এবং এক বোঝা বাঁশ আনিয়া হাজির করিল। তার শুইবার ঘরের কোণার সহিত মিলাইয়া একখানা ঘর তুলিবার জন্য সে কামলাদের সহিত মিলিয়া ঘরের চৌহুদ্দি করিয়া ফেলিল, এবং নিজে তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ কাটিতে আরম্ভ করিল। স্নানে যাইবার পূর্ব্বেই গর্ত্ত করিয়া খুঁটি পোঁতা হইয়া গেল।

তার জন্য ঘর তুলিতে মাধবের এই আগ্রহ দেখিয়া বিন্দুর প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল।

সে কোনও কথা বলিল না। পাড়ায় যাইবে বলিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। অদূরে একটা নির্জ্জন ঝোপের আড়ালে বসিয়া সে খুব খানিকটা কাঁদিল। তার পর সে বেড়াইতে গেল। (ক্রমশঃ)

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন মিশরের শিল্পকলা)

মিশরের অন্যান্য প্রাচীন শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্ত্রবয়নের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য থেকে সুরু করে নানা বর্ণে কাপড় রং করা, কাপড়ের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য করা এবং তার পাড়ের নক্সার কাজে তাঁরা যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন তা যথার্থই বিস্ময়কর।

রাজপরিচ্ছদ তৈরি হ'ত যে কাপড়ে তা' প্রায় রেশমী বস্ত্রের মতই সূক্ষ্ম ও চিকণ। সে কাপড় রাজোচিত বর্ণে
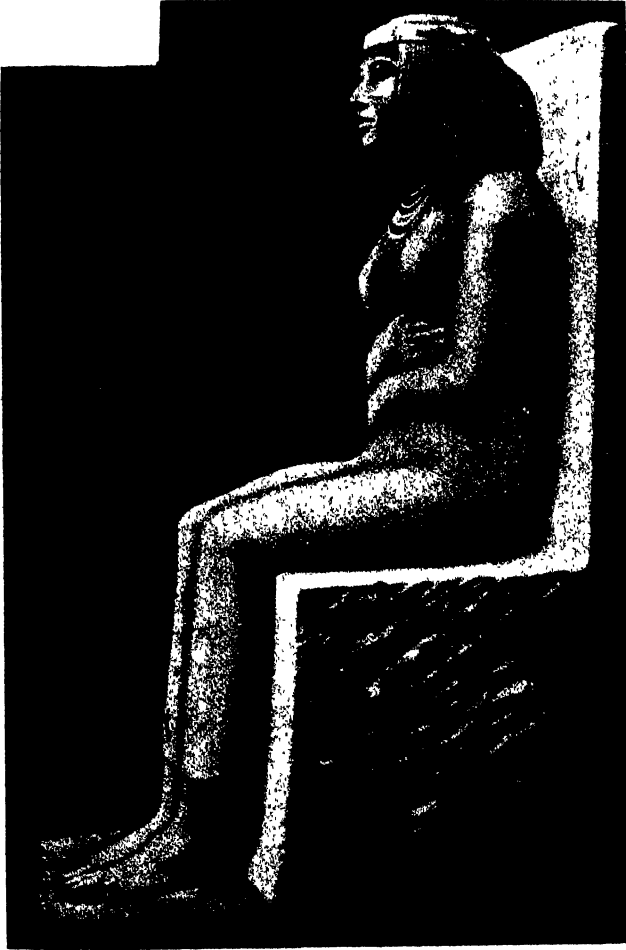
রাজকুমারী (রাজকুমারী নেফার্ত্তের এই প্রতিমূর্ত্তি আজও মিশরের প্রাচীন মূর্ত্তি-শিল্প হিসাবে অতুলনীয় হ'য়ে রয়েছে)

পূজার ঘণ্টা (আইরিশ দেবীর পূজায় এই ঘণ্টা বাজানো হ'ত)

রঞ্জিত হ'ত এবং সুন্দর সুন্দর নক্সার পাড় দেওয়া থাকতো তাতে। কাপড়ের রংয়ের

পার্থক্যের দ্বারা প্রত্যেকের পাদমর্য্যাদার পার্থক্য বোঝা যেতো। পূর্ব্বেই বলেছি টুটেন্‌খামেনের রাজত্বকালে এই সব উচ্চপদের মর্য্যাদাভিমান মিশরবাসীদের মধ্যে যেন সংক্রামক হ'য়ে উঠেছিল।

তাঁরা নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব প্রকাশ করবার আগ্রহে খুব বেশী পরিমাণ আস্‌বাব্‌পত্র ব্যবহার ক'রতে সুরু করেছিলেন। এই সময় চেয়ার ভিন্ন অন্য কিছুতে কেউ আর বসতেন না, কারণ, মাটিতে গাল্‌চের উপর

প্রাচীর-চিত্র (সমাধি-মন্দির-গাত্রে অঙ্কিত এই সকল চিত্র থেকেই প্রাচীন মিশরের শিল্পীদের কর্ম্মপদ্ধতির একটি সুসম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়)

প্রাচীর-চিত্র (বিভিন্ন শিল্পীরা যে যার কর্ম্মে রত)

বসা তখন হীনমর্য্যাদার ব'লে গণ্য হ'ত। সাধারণ লোকেদের জন্য মাটীতে বসবার ব্যবস্থা করা হ'ত এবং উচ্চপদস্থদের জন্য চেয়ার রাখা হ'ত। যারা মাটীতে

মূর্ত্তি-রঞ্জন (প্রাচীর চিত্রে একজন শিল্পী একটি কাঠের মূর্ত্তি রং করছে)

বসতো তারা অধিকাংশই জানু পেতে বসতো, কেউ কেউ বা পদ্মাসন হ'য়েও বসতো। রাজা,

স্থাপত্য-শিল্প (একটি স্তম্ভের শীর্ষদেশ নির্ম্মাণ হ'চ্ছে)

দেবতা ও শ্রদ্ধেয় গুরুজন প্রভৃতির সম্মুখে নতজানু হ'য়ে বসাই মিশরীয় সভ্যতার প্রথা ছিল। মন্দিরের পূজারীরা দেবতার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রতো।

খাট-পালঙ্কের ব্যবহারও এই সময়ই খুব বেড়েছিল। সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ধনীসম্প্রদায় স্ব স্ব পদমর্য্যাদা অনুযায়ী নানা উৎকৃষ্টতর পালঙ্ক ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্ত
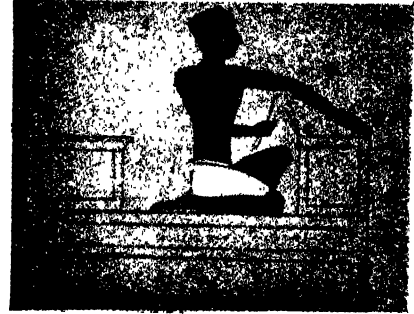
পালঙ্ক নির্ম্মাণ (সূত্রধর পালঙ্ক নির্ম্মাণ করছে)
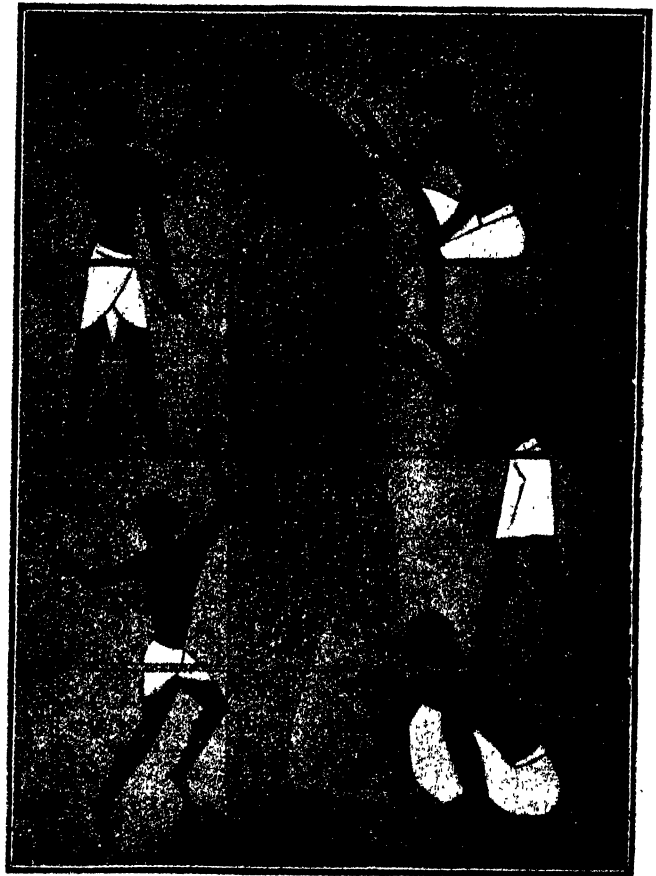
মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ (ভাস্করগণ রাজার এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করছে)

লোকেরা 'চারপাই' বা খাটিয়া ব্যবহার ক'রতো। দরিদ্রেরা মেঝের উপরই মাতুর বিছিয়ে শয়ন করতো। সেকালে মিশরবাসীরা কাঠের উপধানে মাথা রেখে শয়ন ক'রতো। এই কাঠের উপধানগুলি শিল্পীর পরিকল্পনা অনুসারে নানা বিচিত্র ও অদ্ভুত আকারের তৈরি হ'ত। সে সময় যিনি যত বেশী উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁর পালঙ্কও তত বেশী উচ্চ হ'ত। মিশরাধিপতি তৃতীয় র‍্যামাশেসের সমাধি-গর্ভ থেকে তাঁর যে পালঙ্ক পাওয়া গেছে, সেটি এত বেশী উঁচু যে তার উপর আরোহণ করবার জন্য পাশে রীতিমত কাঠের সোপানশ্রেণী সংলগ্ন ছিল। টুটেন্‌খামানের সমাধি-গর্ভেও যে সব আস্‌বাব্ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এই ধরণের গাভী, সিংহিনী, যেন বন্দী অবস্থায় টেবিলটি মাথায় বহন করছে। চার কোণা টেবিলও ব্যবহার হ'ত, তবে তাতে সাধারণতঃ তিনটি বা চারটি পায়া সংযুক্ত থাকতো। টেবিলগুলি যে সব সময় কাঠেরই তৈরী হ'ত তা নয়, ধাতু বা প্রস্তর-নির্ম্মিত টেবিলও তাঁরা ব্যবহার করতেন। টেবিলের উপর ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত চিহ্ন বা প্রতীক উৎকীর্ণ করা থাকতো। বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি রাখবার জন্য তাঁরা যে সব কারুকার্য্যখচিত পেটিকা ব্যবহার করতেন সেগুলি ছিল এক একটি চারু শিল্পকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ।

ধনীর অট্টালিকায় বা দরিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্রই শিশুর দল ছিল সকল কালেই সমান অস্থির চপল। তাদের

স্বর্ণ-ভৃঙ্গার (প্রাচীর-চিত্রে স্বর্ণকারেরা কেমন করে স্ববর্ণ ভৃঙ্গার নির্ম্মাণ করছে দেখানো হয়েছে)

জলহস্তী প্রভৃতির আকারে নির্ম্মিত উচ্চ পালঙ্ক, চেয়ার এবং সিংহাসন প্রভৃতি আছে।

টুটেন্‌খামেনের আমলে যে সব টেবিল খানার জন্য ব্যবহার হ'ত সেগুলির অধিকাংশই দেখতে গোলাকার এবং একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সেটি সংলগ্ন থাকতো। এই স্তম্ভটি শিল্পীদের পরিকল্পনা অনুসারে নানা বিভিন্ন আকার ধারণ করতো। কোনো কোনোটি হয়ত মানুষের মতোও করা হ'ত। কিন্তু সে মানুষটি অধিকাংশ স্থলেই কল্পিত হ'ত পরাজিত বিদেশী এক শত্রু ভুলিয়ে রাখবার জন্য খেল্‌না পুতুলের প্রয়োজন যেমন একালে হয় তেমনি সেকালেও হ'ত। শিশুরা চিরদিনই তাদের পিতামাতার অনুকরণ করে। বালিকা হ'তে চায় মায়ের মত গৃহিণী, বালক হ'তে চায় পিতার মত যোদ্ধা বা শিকারী অথবা ব্যবসায়ী। ছেলে-মেয়েদের সমাধি-পার্শ্বে পাওয়া গেছে কত রকমারি খেলনা পুতুল ছোট ছোট ফুলদান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি, রংচংয়ে কাঠের পুতুল—আরও কত কি। পুতুলগুলি যথাসাধ্য স্বাভাবিক করবার চেষ্টা আছে দেখা গেলো। মাথায় পরচুলে

পরানো, ছোট ছোট পুঁতির মালার গহনা গায়ে এবং মূল্যবান পোষাক আঁটা। কোনো কোনো পুতুল আবার হাত-পা নাড়তে পারে। এত পুরাকালেও রাক্ষস মুখ হাঁ করছে ও বন্ধ ক'রছে ইত্যাদি পুতুল ছেলেদের কবরের মধ্যে পাওয়া গেছে। সুতো ধ'রে টানলে বাঁদর লাফায়, ময়ূর পেখমধরে নাচে, এরকম
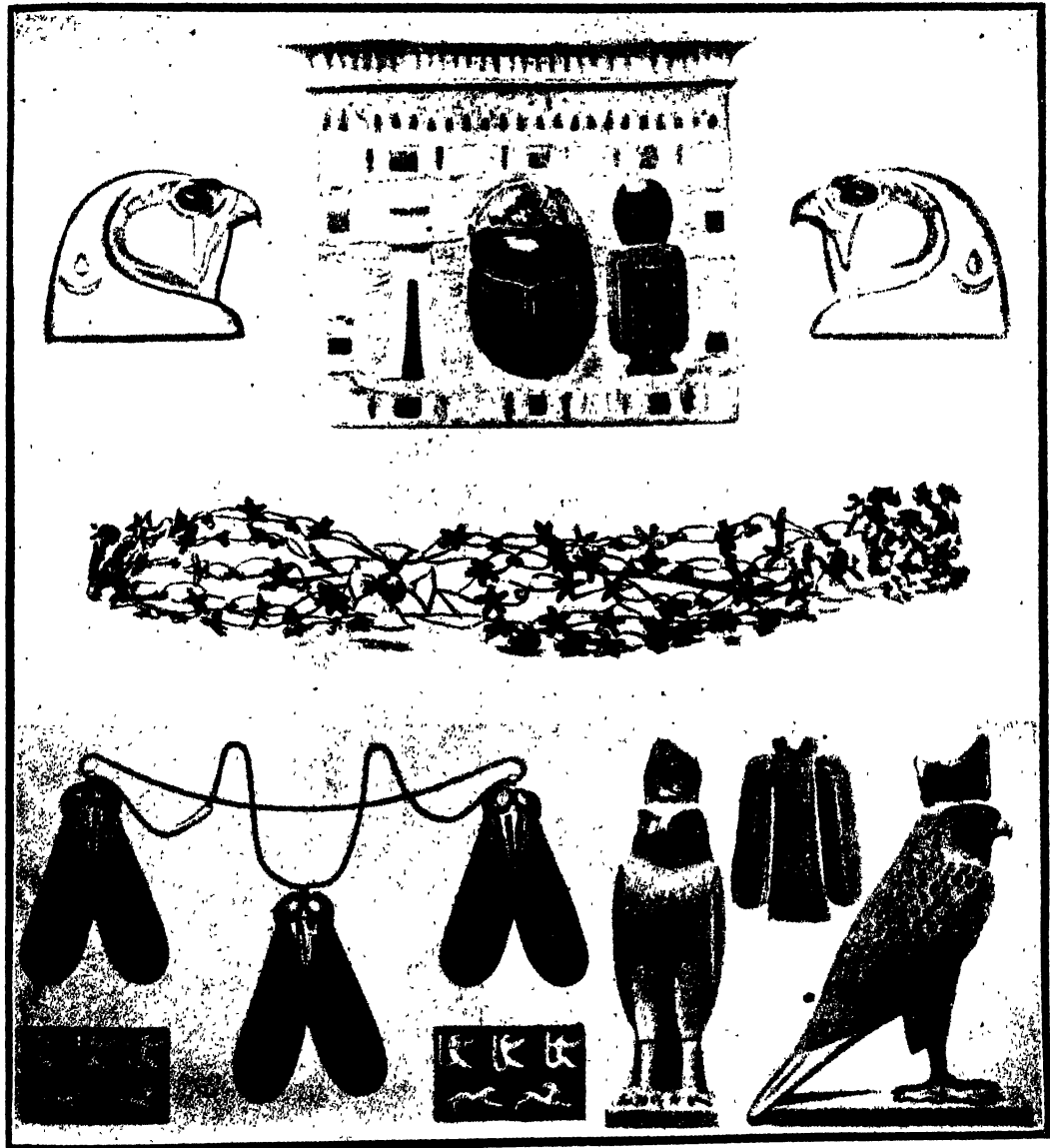
মৃতের সম্পদ (এই সব মূল্যবান প্রস্তর-মণ্ডিত স্বর্ণালঙ্কার মৃতের সঙ্গে তার সমাধিগর্ভে দেওয়া হ'ত। বাজপাখী মিশরীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাই মৃতের সমাধিতেও তারা স্বর্ণ-নির্ম্মিত বাজপাখী দিত।)

মিশরে ছেলেদের জন্য কলের খেলনার প্রচলন ছিল। ধোপা কাপড় কাচ্ছে, রুটিওয়ালা রুটি তৈরী করছে, পুতুলও সেকালে ছিল। ছেলেদের খেলবার ছোট ছোট বলও পাওয়া গেছে। বেলেপাথরের তৈরী খেলনা

পুতুলও সে-সময় প্রচলিত ছিল। এগুলি প্রায়ই হাস্য-রসাত্মক এবং ব্যঙ্গসূচক খেলনা—অনেকটা সঙের পুতুলের মত! যেমন একটি পুতুল পাওয়া গেছে—একটি ধূর্ত-

স্তম্ভ-নির্ম্মাণ (স্থপতিরা একটি প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে সেটি পালিশ করছে)

শৃগাল পুরোহিতের বেশে মন্দিরে যাত্রীদের পূজা দেওয়াচ্ছে। আর একটি পুতুলে একটি ইঁদুর একখানি রথ চালাবার সময় একটি বিড়ালকে পথ থেকে ডেকে রথে তুলে নিচ্ছে। আর একটি পুতুলে একজন বাঁশী বাজিয়ে খুব জোরে বাঁশীতে ফুঁ দিতে গিয়ে শুধু গাল ফুলিয়ে নেই, সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়ে ফেলেছে! আর একটি পুতুলে আছে একজন কৃপণ ধনী ঘোড়ার অভাবে একটি বাঁদরের পিঠে চড়ে চলেছে। আর একটি পুতুলে আছে রাজা রাণী দু'জনে মিলে তুমুল ঝগড়া ক'রছে। অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের মধ্যেও যে পারিবারিক কলহ মাঝে মাঝে হয়—এ পুতুলে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সমাধিমন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে সব ছবি অঙ্কিত আছে, সেগুলি যে অতি সুদক্ষ চিত্রকরগণের নিপুণ তুলিকায় আঁকা, ওই সব ছবির প্রত্যেক টানটি দেখে তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। চিত্রবিদ্যায় মিশর যে একদিন চরমোৎকর্ষ লাভ ক'রেছিল এ-সব ছবি দেখ্‌লে আর সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ থাকেনা। যেমনি পাকা হাতের তুলির টানে সুপটু রেখার বিন্যাস, তেমনি আপেক্ষিক পরিমাণের নিভুল পরিচয় প্রত্যেক ছবি-খানিতে। যে কোনো ছবি যেন অবিকল জীবন্ত চিত্র! চিত্রে রংয়ের সমাবেশে এমন সূক্ষ্ম বর্ণ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা, যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় সেই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের শিল্পীদের চরণোদ্দেশে মাথা নত হ'য়ে পড়ে। এমন বিচিত্র উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রংও আর কোথাও কোনো দেশের চিত্রে দেখা যায় না।

অলঙ্কার-নির্ম্মাণেও মিশরের প্রাচীন কারিগরেরা যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা যথার্থ-ই বিস্ময়কর। স্বর্ণালঙ্কার তাঁরা যেমনি চমৎকার তৈরী করতেন—হীরা মুক্তা ও মণি-মাণিক্যের অলঙ্কারও তাঁরা তেমনি সুন্দর তৈরী ক'রতে জানতেন। মিশরের এক রাণীর হাতের সোনার উপর জড়োয়ায় কাজ করা যে প্রাচীন কঙ্কন পূর্ব্বোক্ত পেট্রী সাহেব খুঁজে বার করেছেন, তার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের তুলনা হয়না। হাতের সোনার আংটি এবং চক্‌মকী পাথরের সোনার
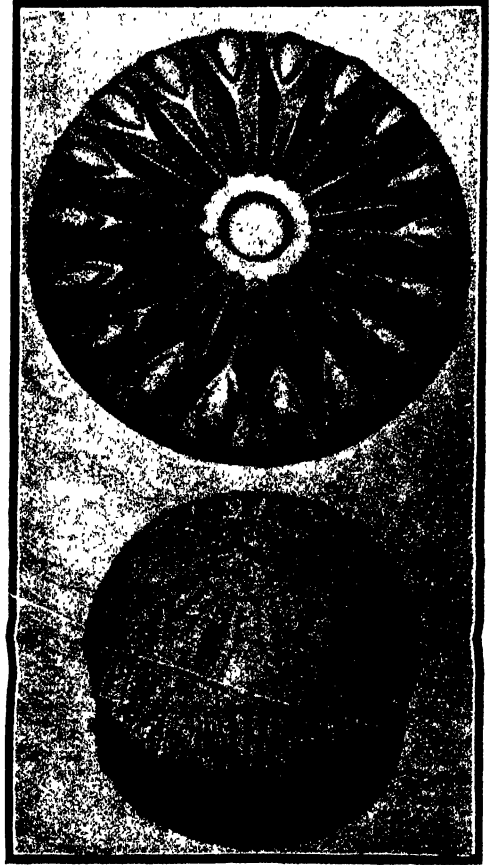
রৌপ্য পাত্র (রৌপ্য পাত্রের উপর উদ্গত ও উৎকীর্ণ বিচিত্র শিল্প-কার্য্য)

বাট দেওয়া ছুরি প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মিশরে তৈরী হ'ত। চমৎকার সোনার হার নির্ম্মাণ করতে মিশরের কারিগরেরা পীরামিড্ তৈরি করতে শেখবার আগে থেকেই জান্তো। টুটেন্খামেনের রাজত্ব-কালের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর আগেও মিশরের রাজপরিবারের মেয়েরা মাথায় যে স্বর্ণমুকুট পরতো তাতে উজ্জ্বল মণিরত্ন সন্নিবেশিত থাকতো। এই স্বর্ণমুকুটের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও সুচারু সৌন্দর্য্য আজও অতুলনীয়। কেয়ারোর যাদুঘরে এমনিতর দুটি মাথার মুকুট সযত্নে রক্ষিত আছে। দাহ্শুরের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদাভ্যন্তরে এই মুকুট দুটি পাওয়া গিয়েছিল। মিশরের নিচোলাভরণ একটি বিশেষ অলঙ্কার। তরুণী মিশর সুন্দরীরা তাঁদের পীনপয়োধরে এই অলঙ্কার পরিধান করতেন। পদ্ম, চক্র, ছত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পুষ্প ও প্রজাপতি প্রভৃতি নানা আকারে এই নিচোলাভরণ নির্ম্মিত হত। সোনার উপর মণিমুক্তা বসিয়ে এইগুলি এমন সুদৃশ্য করে গড়া হ'ত যে রূপসীদের বক্ষশোভা এই আভরণে অধিকতর মনোহর হ'য়ে উঠতো। টুটেনখামেনের আমল থেকে মিশরে রৌপ্যের ব্যবহার খুব বেশী রকম দেখতে পাওয়া যায়। তবে অলঙ্কার অপেক্ষা তৈজসপত্র নির্ম্মাণেই রৌপ্যের প্রচলন ছিল বেশী। রূপার বাসন ব্যবহার করা মিশরীদের মস্ত একটা বিলাস ছিল। এই সব রূপার বাসন এমন চমৎকার গড়নের ও
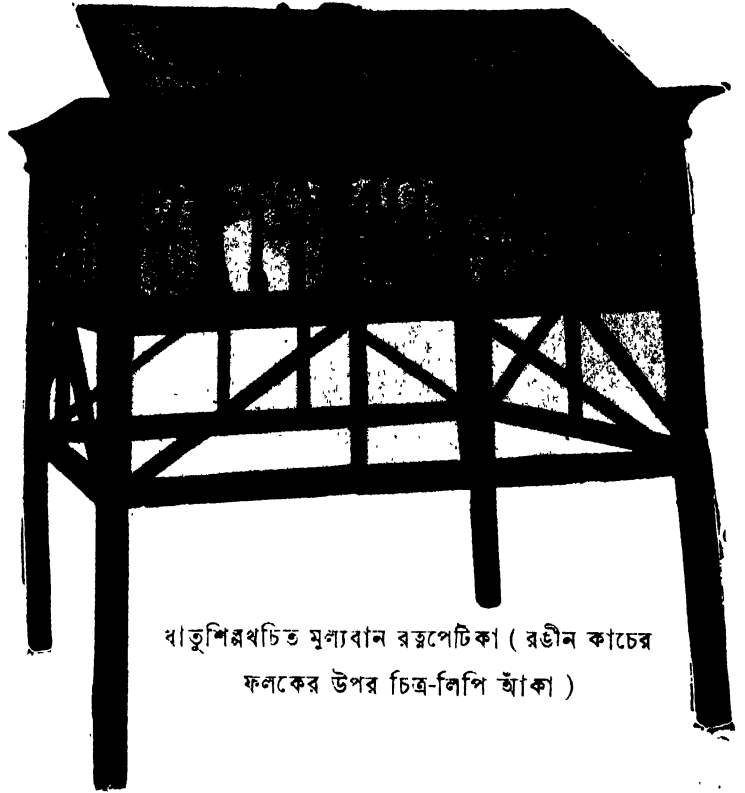
ধাতুশিল্পখচিত মূল্যবান রত্নপেটিকা (রঙীন কাচের ফলকের উপর চিত্র-লিপি আঁকা)
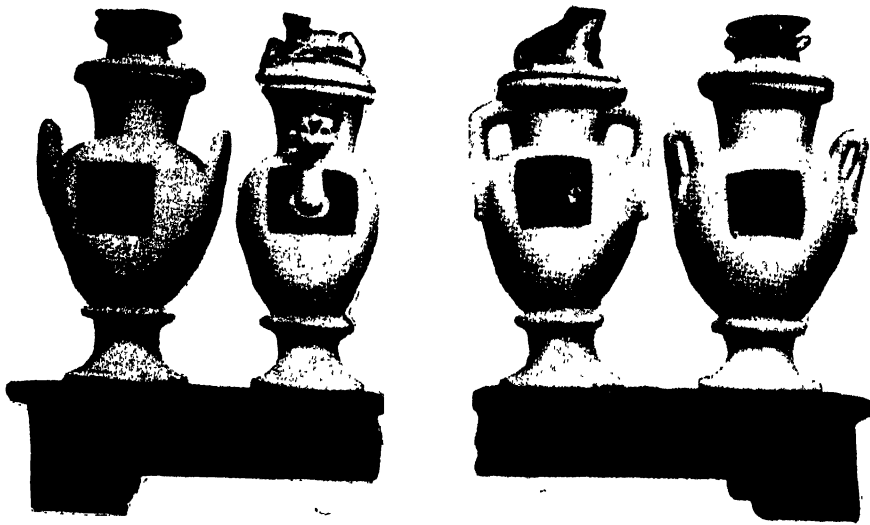
সুরঞ্জিত ভৃঙ্গার (মুখাবরণের উপর জীবজন্তুর হাতল ও তলদেশে কাষ্ঠাধার সংযুক্ত)

এমন সুন্দর কারুকার্য্যখচিত হ'ত যে দেখলে মনে হ'ত এগুলি বুঝি ব্যবহার করবার নয়—সাজিয়ে তুলে রাখবার।

রত্নপেটিকা (নীল স্ফটিক, শ্বেত ও রক্তবর্ণ দ্বিরদ, কালো আবলুশ ও সোনালী নক্সা-খচিত)

বস্ত্রাদি রং করা বিদ্যায় প্রাচীন মিশর যে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছে,—বর্ত্তমান রাসায়নিকদের রঞ্জন-রাগ—অর্থাৎ অত্যন্ত গাঢ় থেকে ক্রমশঃ একেবারে ফিকে পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের পৃথক অবস্থায় সৌখিন ব্যবহার তাঁরা জানতেন। নানা রংয়ে সূতা রং করা হ'ত এবং তাঁতিরা সেই রঙীন সূতা মিলিয়ে সাজিয়ে তাঁতে ফেলে এমন সুন্দর সুন্দর রংদার কাপড় তৈরি ক'রতো যে আজও সে কাপড়ের রং যেন টাট্‌কা তাজা বলে মনে হয়।

শিল্প-সাধনা মিশরে প্রায় ধর্ম্ম-সাধনারই সমতুল্য শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র অনুষ্ঠান ব'লে বিবেচিত হ'ত। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্প তো সেখানে প্রায় ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ হ'য়ে উঠেছিল। মন্দির ও মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করতো তারা রীতিমত ভক্তিভরে দেবতার প্রসন্ন বরলাভের আকাঙ্ক্ষায়। সম্রাট আখ্‌নাটনের রাণী মহিষী নেফারুটাইটির যে একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, তার ভাস্কর্য্য-কলা নাকি গ্রীসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মূর্ত্তি-শিল্পকেও অতিক্রম করেছে। মিশরের এই মহিলার প্রতিমূর্ত্তিতে যে সৌকুমার্য্য ও নারীর অঙ্গ-সুষমা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে গ্রীসের কোনো রূপদক্ষ ভাস্করের নির্ম্মিত নারী-মূর্ত্তিতে সে ললিত চারুতার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়না।

সুরঞ্জিত ভৃঙ্গার

বিজ্ঞান তার কাছে শিশুর প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। নীল সবুজ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান রংয়ের এত রকম ভিন্ন ভিন্ন

তৈজসপত্রের মধ্যে সোনা রূপা প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র ছাড়া মিশরের কারিগরেরা আলাবাষ্টারের যে সব
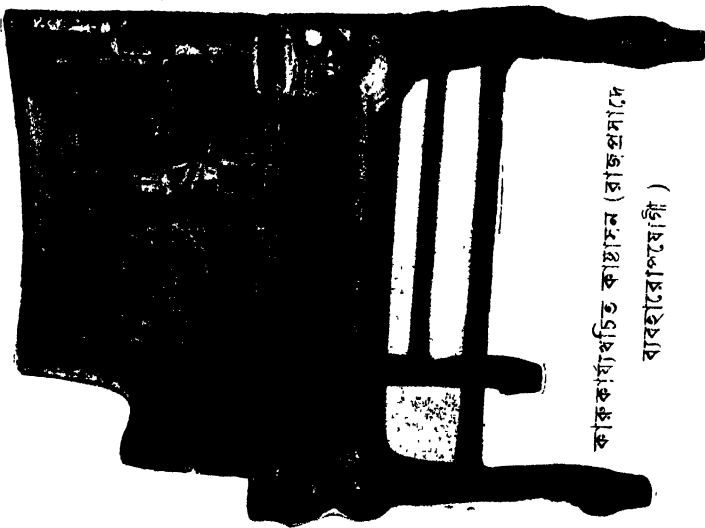
দ্বিচক্র যান (কাষ্ঠ ও চর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত এই রথে জালি কাটা কারুকার্য্য করা)

কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠাসন (রাজপ্রসাদে ব্যবহারোপযোগী)
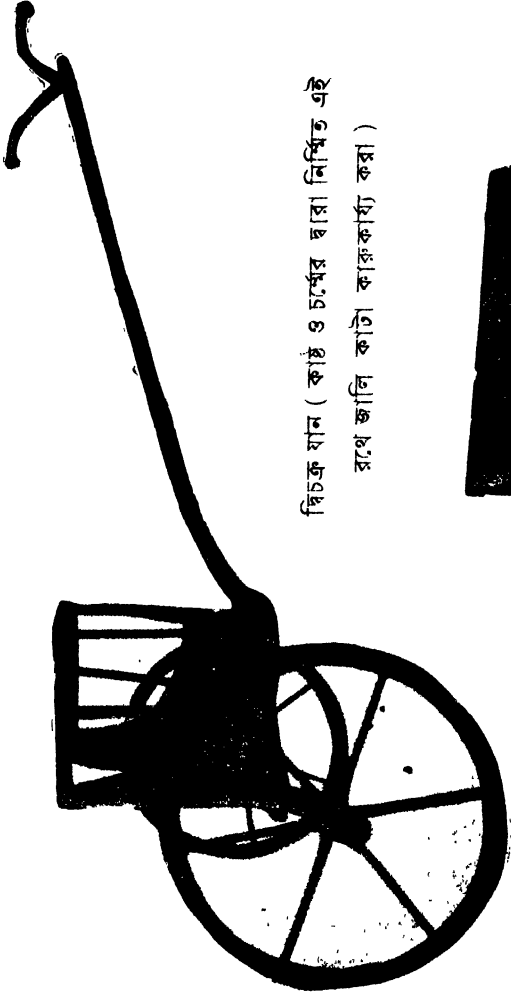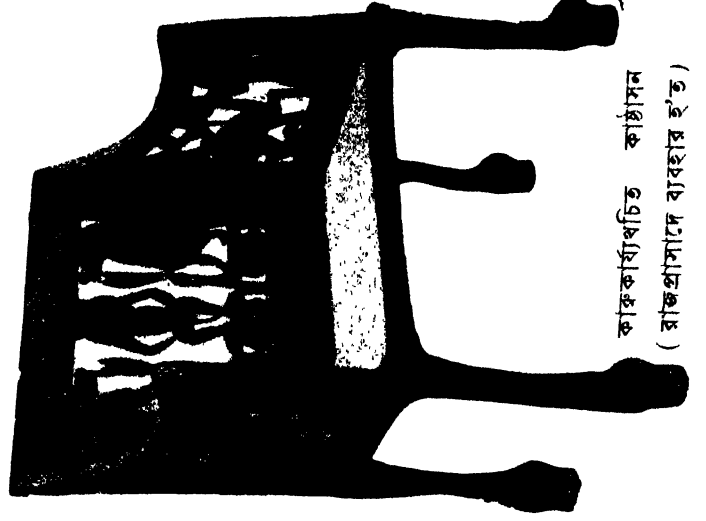
কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠাসন (রাজপ্রাসাদে ব্যবহার হ'ত)
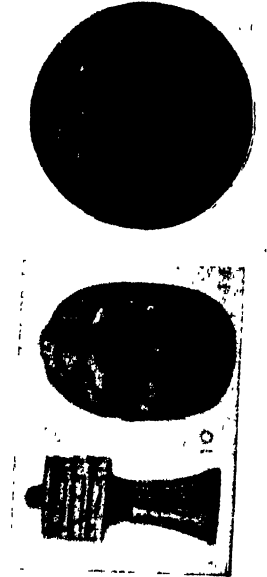
(১) নীল স্ফটিকের কবচ
(২) নীলার উপর উৎকীর্ণ বজ্রকীট (প্রাচীন মিশরীদের কাছে এই কীটের খুব সমাদর ছিল)
(৩) চিত্রিত আবরণ (ঢাক্‌না)
(৪) নীল স্ফটিকের 'কান্তি প্রলেপ' আধার (cosrneric) আধার।

সৌখীন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতো তার গঠন-পারিপাট্য এত চমৎকার ও মনোহর যে রাজ-প্রাসাদেও তার প্রচুর সমাদর ছিল। টুটেন্‌খামেনের সমাধি-গর্ভে এই আলাবাষ্টার্‌-নির্ম্মিত অনেকগুলি ভৃঙ্গার পাওয়া গেছে। এগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। নৃপতি টুটেন্‌খামেন যে আলাবাষ্টার্‌-নির্ম্মিত জিনিস ব্যবহার ক'রতে খুব ভালবাসতেন এ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা একাগ্রচিত্তে ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে যা-কিছু সৃষ্টি করতো তার মধ্যে প্রধানতঃ তাদের একটা ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা থাক্‌তো। মিশরীয় শিল্প-কলা বুঝ্‌তে হ'লে তাদের এই আধ্যাত্মিক উৎস-মূলের সন্ধান নেওয়া চাই। সে সন্ধান পাওয়া যাবে মিশরের প্রাচীন দেব-দেবীর মন্দিরে, কারণ এই মন্দিরগুলিই হ'চ্ছে তাদের সকল শিল্পকলার সুতিকাগার।

আই হ্যাজ্‌ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৩)

গত রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবার আসল উদ্দেশ্য ছিল মুকুন্দ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং অকস্মাতের আনন্দ উপভোগ,—তথা 'নন্দকুমার' প্রাপ্তি। তার কোনটাই হয়নি। তার ওপর চক্রধরের অযথা উচ্ছ্বাস ও অর্থহীন মিথ্যা বাচন মিলে মনটাকে তিক্ত করে তুলেছিল। যাত্রা মন্দ লাগছিলনা, কিন্তু উৎপাতে উপভোগ করতে দেয়নি। মুকুন্দ বাবু সম্বন্ধে নিজের গলদটাও লজ্জার কারণ হয়েছিল। সুখের বিষয়,—এক ঘুমেই রাত কেটে যায়।

উঠে, হাত মুখ ধুয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলুম। স্বাতি-শোভা চা রেখে, হাসিমুখে বললে,—"কেমন যাত্রা শুনলে দাদামশাই,—ভালো নয়?"

বললুম—"সত্যিই ভালো যাত্রা দাদু। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তো?"

"আ-হা-হা, আমি ঘুমুবো কেনো? ছেলেগুলো চোক্‌ কি রকম করে দেখেছো। দেখেই ঘুম পালালো!"

"ওঃ তাই। তা কিসের পালা হল' দাদু?"

"তুমি বুঝতে পারলে না বুঝি!—কর্ম্মক্ষেত্তোর গো!"

"সে কাকে বলে?"

"আহা শুনে এলে, আবার সে কাকে বলে!"

জবাব সুন্দর দিয়েছে। সে না বুঝলেও আমাকে থামিয়ে দিলে।

"এই যে নিবিড়, এসো এসো। ছুটি নাকি? কবে এসেছ?"

নিবিড় বড় সৎ ছেলে, সুমিষ্ট প্রকৃতি। পাটনায় B. Sc. পড়ে। ভালোবাসি, দেখলেই আনন্দ পাই।

—"মার শরীর ভালো নয়, দেখতে চেয়েছিলেন, তাই এক হপ্তার ছুটি নিয়ে এসেছি। এখনো ৩.৪ দিন থাকতে পারবো।"

"বেশ করেছ,—দেখতে পেলুম। আমি এসেছি জানলে কি করে? তুমি তো ও-পাড়ায় থাকো।"

"কাল আপনাকে যাত্রা শুনতে দেখেছি যে! যাত্রা ভাংলে দেখা করবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু সুবিধে পেলুম না, একজন—"

"ওঃ বুঝেছি, চক্রধর বলে' কে এক উৎপাত…"

—"আমি ওঁকে জানি,—পাটনায় থাকেন"…

"পাটনায়! তবে যে বললে, · দাদু, তোমার দাদার জন্যে এক কাপ্‌…"

—"না না শোভা, কাজ নেই, আমি ছেড়ে দিয়েছি যে!"

—"আর খাওনা? কেনো?"

"এমনিই" বলে চোখ নত করে হাসলে।

"বেশ করেছ, খুব ভাল করেছ, ব্যাধি যত কমে ততই ভালো। শরীর কেমন, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?"

"ভালোই আছি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে পাস্ করতে পারবো বলেই মনে হয়।"

"নিশ্চয়ই করবে…"

"একটা কথা বলবার জন্যে সকালেই এলুম, তা'নাতো বিকেলেই আসতুম…"

"এমন কি কথা নিবিড়।"

"আপনি সকলকেই ভালোবাসেন, আমাদের পেলে সব কথাই সরল ভাবে ক'ন্, সতর্ক হবার দরকার বোধ করেন না। সেটা ঠিক্ নয় দাদাবাবু। স্বার্থ থাকলে কত লোক ওই goodness এর advantage নিতে পারে,…"

শুনে আমি অবাক্! হাসতে হাসতে বললুম—"যে গোলমালের গা ঘেঁশেও চলেনা, তার চিন্তা কি নিবিড়, তুমি এ সন্দেহ করচো কেনো?"

"আপনি গোলমালে থাকেননা জানি, কিন্তু আপনার হাস্য-রহস্যকে গোলমালের পোষাক পরাতে,—কদর্থ করতে, কতক্ষণ!"

"তাতে কার কি লাভ আছে ভাই? হ্যাঁ—ঠিক্ ঠাউরেছ বটে। কদর্থের কথা আর বোলোনা,—তাতে বোধ হয় লোক আনন্দ পায়। চক্রধর ও-বিষয়ে পেল্লেয়ে ওস্তাদ্ দেখলুম। আবার সেইটাই লেখকের বলার উদ্দেশ্য বলে গর্ব্ব করে।"

নিবিড় গম্ভীরভাবে বললে—"উনি তো বলবেনেই, —মানে আর উদ্দেশ্য বার করাই যে ওঁর কাজ।"

"হ্যাঁ—দেখলুম ওইতেই আনন্দ।"

—"শুধু আনন্দ নয়—পেটও চলে।"

"না না, তা নয়, হোমিওপ্যাথ্, হাতে 'রডক্' দেখলুম। সাহিত্যের দিকে ঝোঁকও খুব। কাল দেখলে না,—যাত্রা শুনতে এসেছে, সেখানেও নোট্ নিচ্ছে! এবা উন্নতি করবেই—"

নিবিড় হাসিমুখে বললে,—"তা হতে পারে—রণগোপালকেও আপনার কাছে যেতে দেখলুম, সেই তো ফিরে এসে মুকুন্দ দাসকে আপনার উচ্ছ্বসিত স্বদেশ-প্রেমের কথা শোনালে, আর আপনাকেও দেখিয়ে দিলে। আমি তখন সেখানেই, আমাকে দেখতে পায় নি। তার পরই চক্রধর বাবুর কাছে গেলো…"

"ছেলে মানুষ, এসব নিয়ে থাকে কেনো? ওরে বারণ করে দিও। এখন থেকে দেশের ঝোঁক ধরলে যে…। বাপ্ তো দেখলুম খুব ভয় পেয়েছেন, পাবারই কথা…"

পূর্ব্ববৎ হাসিমুখেই নিবিড় বললে,—"আপনারা ভিক্‌টোরিয়ান যুগের মানুষ,—আপনাদের এখন বান-প্রস্থই উচিত।" এই বলে সরে এসে কাণে যা বললে, —আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, বিশ্বাস করতেই পারলুম না। বললুম,—"না—না—ভুলচুক্ সবারই হয়, রণগোপাল সম্বন্ধে,—না—না, যা দেখেছি তাতে ভীত ও ক্ষুণ্ণই হয়েছি। তোমাদের অমিল আছে বুঝি? বাপ-বেটায় তো আদায় কাঁচকলায়! তুমি ভুল করচো নিবিড়। ও ছোকরা সম্বন্ধে…না তরুণদের মন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তারা ভুল করতে পারে কিন্তু জ্ঞানতঃ অনিষ্ট করবে না। পারলে সাহায্য করাই তাদের ধর্ম্ম,—না পারলেও চেষ্টা পায়। তাই না ভালোবাসি…আর—অচ্যুত বাবু—না—না—নিবিড়—তাও কি…"

"আপনার মনে সন্দেহ এনে দিতে আমার কষ্ট হয়,—আমার তা উদ্দেশ্যও নয়। কয়েক মাস পূর্ব্বের একটা মজার ঘটনা বলি। দয়াল পণ্ডিত মশাইকে জানেন তো —নিরীহ, রহস্যপ্রিয়, গরীব। অনেকগুলি কাচ্ছা-বাচ্ছা, মাইনে ৪০ মাত্র। অচ্যুত বাবু নিজের মেয়ের পাত্ররূপে তাঁর ছেলেটিকে চান। পণ্ডিত মশায় অমত ছিলনা, কিন্তু ঠিকুজিতে মিললোনা; ব্রাহ্মণ সাহস পেলেন না। অচ্যুত বাবু ওসব মানেন না, ভাবলেন না-দেবার ওজর। তার পর আমাদের যা ঘটে থাকে,—বিবাদ, শত্রুতা। রণগোপাল দ্বিতীয় বার ম্যাট্রিক দেবে। ফুটবল খ্যালে ভালো,—সুতরাং মাষ্টারদের প্রিয় বস্তু—তৃতীয় চতুর্থেও তাঁরা অরাজি নন্। ইন্‌স্পেক্টর আজিজ ইমাম সায়েব, inspection এ এসেছেন—হঠাৎ। দোরের বাইরে থেকে সব ক্লাসের পড়ানো শুনে বেড়াচ্ছিলেন। রণগোপাল জানতো,—তখন পণ্ডিত মশার পিরিয়ড। ইমাম সায়েবকে দোরের বাইরে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াতে দেখে সে পণ্ডিত মশায়কে অনুরোধ করলে,—ইংরাজ আসবার পূর্ব্বের ভারত ও পরের ভারত সম্বন্ধে কিছু বলুন। সে জানতো—এ বিষয়টী পণ্ডিত মশার বড় প্রিয়।

—পণ্ডিত মশাই শত মুখে অতীতের প্রশংসা ও বর্ত্তমানের দুরবস্থা ও অবনতির কথা শুনিয়ে চললেন।—'তখন ভারতের শিল্পজাত মসলিন, মছলন্দ, শাল, সিল্ক, আমাদের অর্ণবযান সিরিয়ার হাটে যবদ্বীপের ঘাটে সরবরা করে বেড়াতো, আর আজ নুনটা পর্য্যন্ত লিভার-পুল। থেকে আসে,'—এই পর্য্যন্ত বলেই ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন—"এই তো ?"

"—তিনি দোরের দিকে পেছন করে ছিলেন। চশমা ছিল তাঁর সবুজ কাঁচের—দুধারে ডানা চাপা। ডান দিকের ডানায় ফেজের ছায়া দেখেই চমকে,—'এই তো ?' বলেই থেমেছিলেন। সর্ব্বনাশ আসন্ন !"

পরেই বললেন,—"এই তো তোমাদের ধারণা ? আমি জানি—অনেকেই তোমরা এই ধারণা পোষণ করো। কিন্তু বই কি বলে ? যা কমিটি থেকে বিশিষ্ট শিক্ষিত সুধীদের মঞ্জুরী পেয়ে বেরিয়েছে। তোমরা তা হলে তাঁদের চেয়ে নিজেদের পণ্ডিত মনে করো কি ? বয়েতে যা পড়চো, সেইটিই সর্ব্বসম্মত মত। এইটি মনে রেখো। ও-সব ঠাকুমাদের গল্প বিশ্বাস কোরনা। আমাদের প্রকৃত ইতিহাস নেই, পুরাণ প্রভৃতি—আজগুবি উপাখ্যান শোনায়,—শুনতে বেশ মাত্র। ইংরাজ আমলে দেশের সকল বিভাগে উন্নতির রশ্মিপাত হয়েছে।—রেল, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট, বে-তার, উড়োযান, গ্রামো-ফোন, রোটারি-প্রেস্। মায় মেসিন-গন্,—ভারত স্বপ্নেও যা দেখেনি। ইংরাজ রাজ্যের কথা ছেড়ে দাও—এটা আমাদের তপস্যালব্ধ ঐশ্বর্য্য বলাই উচিত। মোগল পিরিয়ড্টা একবার স্মরণ করো, তাঁদের শিল্পকলা ভারত চিরদিনই সগর্ব্বে স্বীকার করবে। তাজমহল চিরদিনই জগতের দর্শনীয় থাকবে, কুতব মিনারের মত কীর্ত্তি জগতে আর ক'টা আছে ? তোমাদের মহাভারতে এক রাজসূয় যজ্ঞের—ঘটা করে বর্ণনা আছে। তখনকার দিনে, বাঁশ বাঁখারির ওপর অভ্রপাত বসিয়ে তাঁরা বাহবা নিয়েছিলেন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আজকের এই খিলেনটাই দেখনা" বলে,—দোরের দিকে চাইতেই ইমাম সায়েবের সঙ্গে শুভ দৃষ্টি !

তিনি হাসতে হাসতে ভিতরে এলেন। বললেন—আপনার—ছেলেদের বোঝাবার ধারা দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, এ কথা আমি ভুলবনা দয়ালবাবু।" পণ্ডিত মশাই সময়োচিত অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানালেন।—ফিরে মাস থেকে ৬০ টাকা পাচ্ছেন।

—রণগোপাল এমন বিষয়ের অবতারণা করেছিল, যাতে ছেলেদের কাছে পণ্ডিত মশার স্বাদেশিকতা প্রচার, সরেজমিনে প্রমাণ হয়—চাকরিটিও গত হয়, অধিকন্তু··· আর যা হয়। কিন্তু চশমার ডানাই সে ক্ষেত্রে নিরীহ ব্রাহ্মণের দানাপানি বজায় রাখলে।"

বললুম,—"এটা স্বতন্ত্র কথা নিবিড়, তবে খুবই গর্হিত। বোধ হয় মজা দেখবার আগ্রহেই পরিণাম চিন্তা ছিলনা। উঃ ব্রাহ্মণের কি দুর্দ্দশাই হোতো···"

—"সে যাক্, আপনি কিন্তু দয়া করে ওদের কোনো আলোচনায় উৎসাহ দেখিয়ে যোগ দেবেননা দাদাবাবু। ওর সহপাঠীরাও ও-এলে, এখন—কোন্ দরজির কেমন ছাঁটকাট্, আর মোহন-বাগানের হাফ্-ব্যাক্ নিয়ে কথা আরম্ভ করে। আর উনিতো আনুষ্ঠানিক সার্কল (Circle) ভুক্ত ;—ঐ যে আস্চেন,—এ দিকেই বোধ হয়।"

"তাই তো দেখচি।" মনটা বিরক্ত হলেও ঠিক্ বিপরীতটা দেখানোই ভদ্রলোকের কাজ। ভদ্রলোক হওয়া আর মিথ্যাচারী হওয়া বোধ হয় একই অর্থবাচক।

"তুমি আর কেনো এর মধ্যে থাকো, তুমি যাও নিবিড়।"

"আপনাদের কথা আরম্ভ হলে যাব।"

নিবিড় বুদ্ধিমান ছেলে। চক্রধর এসে শুনলে নিবিড বলচে—"ফিজিক্সটে আমার মাথায় ঢোকেনা। কোনো রকমে পাস্ মার্ক পেলেই অন্য গুলোর জন্যে ভাবিনা। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন দাদাবাবু।"

চক্রধর খুব ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে—

—"এখন কেমন বোধ করচেন ! মাথার সে ভাব আর নেই তো ? Solve হয়ে গেলে আর থাকেনা জানি। আপনাদের কাছে না হলেও—সমস্যা গুরুতর তো বটেই। হ্যাঁ—কাল আপনার টেবিলে রাজস্থান দেখে গেলুম, লিখতে বসে রাতেই একটা reference দরকার হল, আপনার মাথাটা খারাপ না থাকলে তখুনি আসতুম। একবার দেখবো, এইখানেই বসে—"

নিবিড় আমার দিকে চাইলে। বললুম, "থাকে তে

দেখো—কার বই জানিনা, বোধ হয় ছেলেরাই এনেছিল, কই টেবিলে তো দেখতে পাচ্ছিনা।"

"আপনার নয় ?"

'ও বই দেখবার নেশা ৪০ বছর আগে একবার এসেছিল,—৬০ বচরে আর কে দেখে।"—বলে হাসলুম।

"—ইস্ আপনার নয় ? কত ভ্যালুয়েবল্ নোটস্ পেতুম।"

নিবিড় আমার দিকে আবার চাইলে। সে পা ঘষছিল, বললে,—"আপনি এসেছেন জানলে কিছু তামাক নিয়ে আসতুম। এখন যাই দাদাবাবু"—ধীরে ধীরে পা বাড়ালে।

চক্রধর বললে,—"আপনি কি বলেন! ওতেও ৬০ বচরের সব দেশ-প্রাণ হিরোজ্ (hero) রয়েছেন। ভীমসিংহের কথা আর আপনার স্মরণ নেই!"

নিবিড় শুনতে পেয়ে—ফিরে চেয়ে মুখ্ মুচ্‌কে চলে গেল।

"এটি ? আপনার Selection (বাছাই) তোফা! এরা লাগলে,—লাগলেই বা কেনো—লাগিয়েই তো রেখেছেন! ছেলেরা আপনার যে রকম অনুগত! এরেই বলে organizing power, সকলের থাকেনা। সুরেন্দ্রবাবুর ছিল, তার পরই দেশবন্ধুর,—এখন আপনি। মাপ্ করবেন—থার্ড প্রেস্ দিচ্ছিনা। এটা কি আমাদের কম্ ভাগ্যের কথা। আর তো তেমন পাইনা। আপনার শিষ্যদের মধ্যে, কার ওপরে আশা পোষণ করেন ?"

"আপাতক তো তোমার চেয়ে নজরে পড়েনা।"

"হ্যাঁ, আমাদের আবার · আপনি তয়ের করে নিলে এ জীবন ধন্য হবে। যে অবস্থায় পড়া গেছে, জীবন ত তুচ্ছ মশাই। কাজের জন্যে ছট্‌ফট্ করছি—দয়া করে একটা কাজের মত কাজ দিয়ে দেখুন। আর যুগান্তরের ফাইলটে একবার পড়িয়ে দিন—inspiration draw করে নিই। তার পর যা বলবেন। চক্রধর যমের বাড়ী যেতেও ভয় করেনা।"

"অমন মরিয়া হ'য়ে উঠোনা হে। হিন্দুর ভগবান ভিন্ন গতি নেই, তাঁর দিকে একটু এগোও।"

"আস্তানা পাকড়ে তার পর সব পারি মশাই, তা নাতো এ চাঞ্চল্য যাবে না! আপনি তো সবই বোঝেন—প্রধানদের সঙ্গে একটু পরিচয় করে দিন, আর ওই আস্তানা,—তার মাটি মাথায় ধরে,—যা বলবেন,··· আপনাকে আর কি বলবো—"

সহসা,—"হ্যাঁ ওটা ঘাটশিলায় না থাসিয়া ছিলে,—কি বললেন ?"

"কই—কিছু তো বলিনি,—স্বপ্ন দেখচো নাকি ?"

"এম্‌নিই হ'য়েছে বটে,—দয়া করুন, জীবনটা বিফল করে দেবেন না। প্রাণ-চাঞ্চল্যের বেগ আমাকে যে—"

"নিজেকে অমন করে নষ্ট করতে নেই, Over-boiled জিনিষের সার থাকেনা হে..."

"তা আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আস্তানায় ঢুকিয়ে দিন। আপনার হাতের এক লাইনই যথেষ্ট। আপনার একটু ইঙ্গিত পেলে আমি নিজেই,···সেণ্টারটা আমাকে ··। আপনি বিশ্বাস করুন, আর আমি কি বলবো। মনের ফটো দেখাবার যন্ত্র থাকলে,··· আপনাদের শপথের যা প্রণালী আছে·· "

কি বিপদেই পড়লুম। এ সব কি বকছে, আমার কাছেই বা কেনো ? কি জায়গাই ছিলো,—বিরাটের গো-চারণ ক্ষেত্র। কেউ ওপর দিকে চাইতোনা—সব নিম্নমুখী—শান্ত নিরীহ। তাই না পচন্দ করেছিলুম। এরা যে তিষ্টুতে দেয় না, বলে প্রাণ-চাঞ্চল্য! সাহিত্যিকের প্রিয় কথা বটে, আবার এ সব অপ্রিয় ঝোঁক্ কেনো ?

বললুম—"স্থির হও ভাই। অনেক বিদ্যাই আয়ত্তের মধ্যে তো রয়েছে—মিছে দিন খুইওনা—হোমিওপ্যাথিক, অবধৌতিক, সাহিত্যিক ওর একটায় মন দাও, নিজের ও দেশের উপকার হবে, পরোক্ষে দেশের কাজও হয়ে যাবে। এর বেশী আমার বলবার কিছু নেই। সাহিত্যে যার ঝোঁক ধরেছে সে ভুনিয়ার বার, এটা ভুগে শেখা। নিজের ক্ষতি করে আনন্দ পেতে চাওতো, ও কাজ মন্দ নয়। সংসার চালাতে চাও তো প্রথম ত্রুটি নিয়ে থেকো।"

কাতর চক্ষে বললে—"আপনি আমাকে কেনো এড়াতে চাচ্ছেন। কত করে পেয়েছি, কত আশা করে এসেছি,—আমাকে একটু কিছু কৃপা করুন—দোহাই আপনার। আমি চিরদিন সগর্ব্বে তা স্মরণ করবো।

এ সুযোগ আর কবে পাবো? নিদেন ওটা চালাবার ঘাঁৎঘোঁৎটো বলে দিন।"

"তোমার আছে?"

"আপনারটায় দেখিয়ে দিন আর সংগ্রহ করবার Source (পথ)টাও বলে দিন ; একটা কাজ হোক্।"

কি ফ্যাসাদ। সে কাতর ভাব দেখলেও কষ্ট হয়। না কে হাঁ বলায়।

বললুম, —"আজ কিসনগঞ্জ যাচ্ছি—এই সাড়ে দশটার ট্রেনে, এখন বড় তাড়া রয়েছে। ফিরে দেখা হবে।"

"কিসনগঞ্জ? কেনো?"

"নাতীর কাছে কাজ আছে—সে এখন কিসনগঞ্জে।"

একটু হাসি ছড়িয়ে,—"ও বুঝেছি। কায়দা কর্ত্তে পারলে কিন্তু ভারি কাজ হয়—ফিল্ড্ বটে। আপনি Take up করলে কতক্ষণ। উজিরের সঙ্গে দেখা করবেন—অবাধে খোলাখুলি কথা কইবেন—সব রকম help পাবেন।"

তার ঠিকানা,—সে ঠিক্ উল্টো ভোজে থাকে, ইত্যাদি অনেক কথা বলেও দিলে।

"ফিরচেন কবে?"

"দু'তিন দিনের মধ্যেই।"

তবে আর দেরি করবনা,—আমার দ্বারা যতটুকু হয়,—মুকুন্দ দাসের সঙ্গে নিভৃতে আপনার দেখাটা করিয়ে দি। দেখবেন—কি রকম খুসি হন, একদম পাহাড়-ঢাকা আগ্নেয়-গিরি—অথচ আপনারই মত গম্ভীর। তাঁর কাছে ও জিনিষ থাকবেই,—আপনার কথাও তিনি রাখবেনই।—এই দুদিনেই ওর কায়দা কানুন শিখে নিতে পারবো। কিন্তু সংগ্রহের উপায়টা?"

স্বাতি-শোভা ডাকলে—"নাবে-খাবে না দাদামশাই?"

"এই যাই।" চক্রধরকে বললুম—"এত ভাবচো কেনো, ফিরতে আমার দুদিনও লাগবেনা। মুকুন্দ বাবু থাকতে থাকতেই ফিরছি।" বলেই উঠে পড়লুম।

"ভুলবেন না, আমি আশা করে রইলুম।" বলে পায়ের ধুলো নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

এখন করি কি? কিসনগঞ্জে যাবার কোনো দরকার নেই, নাতীর পত্র পেয়েছি—ভালই আছে। কিন্তু না গেলেও যে বাঁচিনা। ভেতরে ভেতরে কি করে যে এত বড় হলুম তাও তো জানিনা। একেই বলে অদেষ্ট! আমার কাছে রিভলবার পাবার ও শেখবার আবদার! মন্দ নয়। অন্ততঃ পাবার উপায় ও আড্ডা বলে দিতে হবে! কি পাপ! ক্রমশঃ

ভারতযুদ্ধ কোন্ বৎসরে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১) অব্দনির্ণয়ের উপজীব্য

অমুক শতাব্দে যুদ্ধ, আর অমুক অব্দে যুদ্ধ, এই দুই বাক্যের মধ্যে দ্বিতীয়টির নির্ণয় অবশ্য কঠিন। এই কঠিন কর্ম করিতে পারা যায় কিনা, দেখিতেছি।

এ নিমিত্ত মহাভারত ও পুরাণ আমাদের দুই আশ্রয় আছে। মৎস্য, বায়ু, বিষ্ণু, ভাগবত, এই চারি পুরাণে পরীক্ষিতের পর হইতে রাজবংশ ও রাজ্য-ভোগকাল প্রদত্ত হইয়াছে। পুরু-বংশের রাজা ক্ষেমক, ইক্ষাকু-বংশের সুমিত্র, এবং মগধের জরাসন্ধ-বংশের রিপুঞ্জয় শেষ রাজা। রিপুঞ্জয়ের পরে মগধের সিংহাসন প্রদ্যোত ও শিশুনাগবংশে চলিয়া যায়। শিশুনাগবংশের রাজা মহানন্দীর শূদ্রাপত্নীজাত মহাপদ্মনন্দ, বা মহানন্দ অতি লোভী ছিলেন, এবং দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া একরাট্ হইয়াছিলেন। শূদ্র রাজার ক্ষত্রিয়োচিত অভিষেক, যজুর্বেদে অধিকার কস্মিন্‌কালে ছিল না। তদুপরি তাঁহার কুকীর্ত্তি ও নৃশংস আচরণ হেতু তাঁহার অভিষেক-বৎসর স্মরণীয় হইয়াছিল। তাঁহার অন্তে তাঁহার অনেক তনয়ের মধ্যে আটপুত্র রাজ্য করিয়াছিলেন। পুরাণ মতে স্থূলতঃ এক শত বৎসর। মহানন্দ

ও তাঁহার আটপুত্র নবনন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। চাণক্যের মন্ত্রণাবলে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশ উচ্ছেদ করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার অভিষেক-অব্দ ঠিক জানা নাই, খ্রি-পূ ৩২১ হইতে ৩১৩ অব্দের মধ্যে, এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। প্রদ্যোত, শিশুনাগ ও নন্দ-বংশ কত বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, প্রথম দুই বংশের সকলে মগধে কি কেহ কেহ অন্যত্র রাজ্য করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পাঠান্তর আছে। জৈন ও বৌদ্ধপুরাণের সহিত মতান্তর আছে। এই সংশয়গ্রস্ত উপজীব্য হইতে যুদ্ধ-শতাব্দ নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা। পুরাণের দ্বিতীয় উক্তি, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহানন্দের অভিষেক পর্যন্ত এত বৎসর, ইহা নির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু এখানেও চারি পুরাণের তিন মত্। মৎস্য ও বায়ু মতে ১০৫০, বিষ্ণু মতে ১০১৫, ভাগবত মতে ১১১৫ বৎসর। যুদ্ধের পর-বৎসর পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। মহানন্দের অভিষেক খ্রি-পূ ৪০০ অব্দের কিছু পূর্বে হইয়াছিল। এইরূপে জানিতেছি, খ্রি-পূ পঞ্চদশ শতাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল।

এই উপজীব্য ব্যতীত কয়েকটি জ্যোতিষিক উপজীব্য আছে। কেহ এই সকল উপজীব্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেন নাই। আমি ইহাকেই অবলম্বন করিতেছি। এখানে প্রত্যেক উপজীব্যের সম্যক্ আলোচনার স্থান নাই, পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির শঙ্কাও আছে। শাখা প্রশাখা ত্যাগ করিয়া এখানে মাত্র কাণ্ড অবলোকিত হইবে।

গত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত "মহাভারতে ভারত যুদ্ধকাল" প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি নাই। আদি পর্বের ২য় অধ্যায়ে আছে,

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥

এখানে কবি যুদ্ধের দেশ কাল পাত্র, তিনই বলিয়াছেন। সমন্তপঞ্চক নামে পাঁচটি হ্রদ ছিল। সে হ্রদের নামানুসারে এক প্রদেশের নাম সমন্তপঞ্চক হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র পাঁচ মাইল হউক দশ মাইল হউক, সমন্তপঞ্চক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এখানে কুরু-পাণ্ডব সেনার যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন্ বৎসর কোন্ মাসে? যখন দ্বাপর পূর্ণ হইতে কিছু বাকি ছিল। ইহার পরে কলি পড়িয়াছিল। যুদ্ধ এক বৎসরও হয় নাই, মাত্র আঠার দিন হইয়াছিল। অতএব 'অন্তর' শব্দে প্রায় এক মাস বুঝাইতে পারে। অর্থাৎ কলির প্রায় একমাস পূর্বে দ্বাপরে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দ্বাপর ও কলি, দুই বৎসরের নাম হইতে পারে। নচেৎ 'অন্তর' শব্দের অর্থ হয় না।

কেহ কেহ দ্বাপর ও কলি বর্তমান পাঁজির দ্বাপর ও কলিযুগ বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি দাঁড়ায় দেখি। দ্বাপর যুগ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। ইহার পর ৮৬,৪০০ বৎসর দ্বাপরের দ্বিতীয় সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যার অন্তিম বৎসরে যুদ্ধ হইয়াছিল? অসম্ভব নয়। অতীব পুরাকাল হইতে দ্বাপর চলিতেছিল। যুদ্ধ বৎসরে ইহা পূর্ণ হইতে প্রায় এক মাস ছিল। ইহার পরে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যা ৪৩,২০০ বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল। এই অর্থ করিলে যে তিমিরে সে তিমিরে থাকিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, পাঁজিতে লিখিত আছে, এ বৎসর কলির ৫০৩৪ বৎসর গত। অতএব এত বৎসর পূর্বের বৎসরে হেমন্তে যুদ্ধ হইয়াছিল। শক-পূর্ব ৩১৭৯ অব্দে কলির আরম্ভ। অতএব শক-পূর্ব ৩১৮০ অব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজী সালে খ্রি-পূ ৩১০৩ অব্দে। কেহ কেহ আরও সূক্ষ্ম গণনা করেন। যুধিষ্ঠির যুদ্ধজয়ের পর ৩৬ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। কলি আরম্ভের ৩৬ বৎসর পূর্বে যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখন কলির প্রথম সন্ধ্যা চলিতেছিল, দ্বাপর ছিল না। পরীক্ষিৎ হইতে কলিযুগ আরম্ভ, ইহা সত্য। কিন্তু যদি পাঁজির কলি হয়, ৩০০০ বৎসরে অন্ততঃ ১০০ রাজা হইবার কথা। সে সবের নাম কই? কবির কলি আর এই কলি যে এক, তাহার প্রমাণ কই? রাম বলিলে যেমন তিন রাম বুঝায়, কলিও তিন চারিটি থাকিতে পারে। শক-পূর্ব ৩১৭৯ অব্দে পাঁজির কল্যব্দের আরম্ভ। শক দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, অতএব শকের পরে এই কলিমুখ স্বীকৃত হইয়াছে। মহাভারতে ও পুরাণে ইহার উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ মহাভারতের কৃত্তিকানক্ষত্র পাঁজির কলিতে প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়াছে। খ্রি-পূ পঞ্চদশ শতাব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল, জ্যোতিষিক প্রমাণেও সেই শতাব্দ আসে, অধিকন্তু যুদ্ধাব্দও আসে। তাহা দেখাইতে যাইতেছি।

(২) সপ্তর্ষি মঘায়, মঘা-শতাব্দ

বিষ্ণুপুরাণে,

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥
তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥

সপ্তর্ষি সাতটি তারা। তাহাদের দুই তারা প্রথমে উদিত হয়। সে দুই তারার মধ্য (বিন্দু) দক্ষিণোত্তর রেখায় যে নক্ষত্রে দেখা যায়, সপ্তর্ষি সে নক্ষত্রে মানুষের শত বৎসর থাকেন। পরীক্ষিতের কালে তাঁহারা মঘাতে ছিলেন, এবং তখন মানুষের দ্বাদশ শত বর্ষের কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। (শ্রীধর স্বামীও সপ্তর্ষির নক্ষত্রের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন।)

এখানে চারিটি উক্তি আছে। (১) কেমনে সপ্তর্ষির নক্ষত্র নির্ণীত হইয়াছিল। (২) সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ থাকেন। (৩) পরীক্ষিতের কালে মঘাতে ছিলেন। (৪) তখন বারশতবর্ষের কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। চতুর্থ উক্তিটি পরে আলোচনা করা যাইবে।

পুরাণ এত সংক্ষেপে লিখিয়াছেন যে প্রথমে ধাঁধা ঠেকে। কিন্তু নক্ষত্র-চক্রে তারার স্থিতি স্মরণ করিলে অর্থে সন্দেহ থাকে না। আকাশে অগণ্য তারা আছে। কিন্তু কোনও তারা যেখানেই থাকুক, নক্ষত্র-চক্রে তাহার স্থিতি বলা হয়। পুরাণে উক্ত আছে, যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র ধ্রুব-বদ্ধ হইয়া আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। সে তারা ও ধ্রুব এক সূত্র দ্বারা যোগ করিলে সে সূত্র নক্ষত্র-চক্রের যেখানে স্পর্শ করিবে, সেখানে তারাটি আছে বলা হয়। নক্ষত্র-চক্র এক আদি বিন্দু হইতে অংশে অংশে কিম্বা নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছে। এক নক্ষত্র=১৩⅓ অংশ। অতএব তারাটি এত অংশে কিম্বা অমুক নক্ষত্রে আছে। ধ্রুব-সূত্র দ্বারা পরিমিত হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে এই অন্তরকে ধ্রুবক বলে। তারা নিশ্চল, কিন্তু ধ্রুব নিশ্চল নহে। উহা অল্পে অল্পে পশ্চিমে সরিতেছে। ফলে তারা সরিয়া যাইতে, তাহার ধ্রুবক বাড়িতেছে। (১)

কিন্তু সপ্তর্ষি একটি নয়, সাতটি তারা। সাতটি এক ধ্রুব-সূত্রেও নাই। সাতটির মধ্যে ক্রতু ও পুলহ প্রথমে উদিত হয়। উত্তরেরটি ক্রতু, দক্ষিণেরটি পুলহ। এখানে পৌরাণিক এক পরিভাষা করিয়াছেন। এই দুই তারার মধ্য-সূত্র যে নক্ষত্র স্পর্শ করিবে, সপ্তর্ষি সে নক্ষত্রে আছেন বুঝিতে হইবে।* (২)

এখন 'মঘাসু' পদের অর্থ বুঝা যাউক। পদটি বহুবচনান্ত। পঞ্চতারা-সম্বলিত হলাকার মঘা নক্ষত্র। ঋগবেদ হইতে বহুবচনান্ত প্রয়োগ আসিয়াছে। দশম মণ্ডলে (৮৫।১৩), 'অঘাসু হন্যন্তে গাবঃ।' অঘাসু=মঘাসু গো হনন করিবে। ইহার অর্থ, মঘা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইত, দক্ষিণায়ন প্রবৃত্তিকালে। গত মাসের "ভারত যুদ্ধ কোন্ মাসে ?" প্রবন্ধে মঘাতে দক্ষিণায়ন পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি মঘাতে ছিলেন, সপ্তর্ষিসূত্র ৯০ অংশে ছিলেন। (এখানে মঘা-তারা হইতে

(১) অভিজিৎ তারা ইহার চমৎকার উদাহরণ। পুরাকালে আর্য্য নক্ষত্রদর্শকেরা ইহাকে নক্ষত্র-চক্রের এক নক্ষত্র গণিয়া চক্রকে আঠাইশ নক্ষত্রে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অভিজিৎ তারার পূর্বদিকে শ্রবণা তারা। কিন্তু অভিজিৎ ধ্রুবের নিকটে, শ্রবণা দূরে ছিল। উভয়ে সমবেগে সরিল না। অভিজিৎ-সূত্র পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ শ্রবণা-সূত্রের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। পরে অন্তর আর রহিল না। তখন অভিজিৎকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহা খি-পূ ত্রি-সহস্র অব্দের কথা। মহাভারতে বনপর্বে ইহার উল্লেখ আছে। পরে পাওয়া যাইবে।

(২) যথা সিদ্ধান্তদর্পণে (১২) চন্দ্রশেখর

ধ্রুবসূত্রেণ যল্লগ্নৌ তদৃক্ষস্থা মহর্ষয়ঃ॥

ক্রতু ও পুলহের ধ্রুবসূত্র যে নক্ষত্রে লগ্ন হয় মহর্ষিরা সে নক্ষত্রে অবস্থিত। অর্থাৎ দুই সূত্রের মধ্য নক্ষত্র। ভাগবত পুরাণে, "তয়োস্তু মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি", ক্রতু পুলহের মধ্যে যে নক্ষত্র দক্ষিণোত্তর রেখায় দৃশ্য হয়। দুই-ই ফলে এক। বর্তমানকালে সপ্তর্ষি পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থিত। সন্ধ্যার পর ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি উদিত হইয়া থাকেন। প্রথমে ক্রতু, দুই মিনিট পরে পুলহ দক্ষিণোত্তর-রেখায় আসেন। খি-পূ ১৪০০ অব্দে প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে আসিতেন। কাজেই মধ্য লইতে হইত। অতি পুরাকাল হইতে সপ্তর্ষি ঋষিদিগের লক্ষ্য হইয়াছিলেন। ঋগবেদে ইঁহারা শকটাকার। কবি মাঘ ও শ্রীধর স্বামী শকট বলিয়াছেন।

পারে না। সপ্তর্ষিসূত্র খ্রি-পূ ৩১০ অব্দে মঘা-তারা বিদ্ধ করিয়াছিল।)

মহাভারত হইতেও মঘা=৯০ অংশ। "ভারতযুদ্ধ কাল" প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বিষুব হইত। অশ্বিনী হইতে গণিলে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্ত ২।০ নক্ষত্র, মঘা ৯ নক্ষত্র। অতএব তৎকালে মঘা=৯−২।০=৬৷০ নক্ষত্র=৯০ অংশ। পরীক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি অয়ন-রেখায় আসিয়াছিলেন। ইহা হইতে পরবর্তীকালে সপ্তর্ষি অর্থে অয়ন হইয়া গিয়াছিল। (৩)

ক্রতু ও পুলহ তারার মধ্য বিন্দু লইয়া গণিত করিলে দেখা যায়, খ্রি-পূ ১৩৯১ অব্দে সপ্তর্ষি ৯০ অংশে আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব হইতে নক্ষত্র-দর্শকেরা সপ্তর্ষি ও অয়ন দেখিতেছিলেন। খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল। সে কি, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা দেখিলেন, ইহার প্রায় ৫০ বৎসরে সপ্তর্ষি অয়নে আসিয়াছেন। তাঁহারা খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দ হইতে এক অব্দ গণিতেছিলেন, এখন সে অব্দ হইতে শতাব্দ গণিতে লাগিলেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বলা পূর্বকালের রীতি ছিল না। তাঁহারা মঘা হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র নাম দ্বারা শতাব্দের নাম করিতেন। সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে বলিলে খ্রি-পূ ১৪৪০ হইতে ১৩৪০ অব্দ পর্যন্ত বুঝাইত।

ভাগবত পুরাণ (১২।১) লিখিয়াছেন, মহাপদ্মনন্দের কালে সপ্তর্ষি পূর্বাষাঢ়ায় আসিবেন। মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র। অতএব মহানন্দ খ্রি-পূ ১৪৪০−১০০০=৪৪০ হইতে ৩৪০ অব্দের মধ্যে ছিলেন। মৎস্য ও বায়ু পুরাণ লিখিয়াছেন, চতুর্বিংশতি নক্ষত্রে অন্ধ্র রাজ্যের অন্ত হইবে। অর্থাৎ খ্রি-পূ ১৪৪০−১৪০০=খ্রি-পূ ৪০ হইতে খ্রি-প ৬০ অব্দের মধ্যে। নক্ষত্র ২৭টি, খ্রি-প ৩৬০ অব্দে পূর্ণ হইয়াছিল, তখন এক সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল। তখন পুনর্বসুতে ৭ম নক্ষত্রে অয়ন হইত। মনে করা হইল এক নক্ষত্রচক্র ভোগ হইয়া পুনর্বসুতে আসিয়াছে। অতএব সপ্তর্ষির আদি ২৭০০+৭০০−৩৬০=খ্রি-পূ ৩০৪০ অব্দ। দৈবক্রমে খ্রি-পূ ৩০৭৬ অব্দে এক স্মরণীয় জ্যোতিষিক ঘটনা হইয়াছিল, সেকালে জানা ছিল। এই অব্দ, শক-পূর্ব ৩১৫৪ অব্দ হইতে সপ্তর্ষি-অব্দ লৌকিকাব্দ নামে কাশ্মীরে প্রচলিত আছে। বর্তমান বৎসর ৫০০৮ গত। আমার অনুমানে সপ্তর্ষিমুখে ২৫ বৎসর যোগ করিয়া পাঁজির কলিমুখের উৎপত্তি হইয়াছে। খ্রি-পূ ৩৬০ অব্দের পূর্বে কল্যব্দ গণনা ছিল না।

সপ্তর্ষির মঘা-শতাব্দে পরীক্ষিৎ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দ হইতে কিম্বা কিছু পরে। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, এই সময় বারশত বর্ষের কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ৫ম পরিচ্ছেদে এই কলি আলোচনা করা যাইবে।

(৩) চারিবর্ষে যুগ।

ভারতের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলেই একটা প্রশ্ন বারম্বার মনে উঠে, ঋগ্বেদের ঋষিগণকেরা কোন্ বৎসর হইতে কি ক্রমে অব্দ গণিতেন। ৩৬০ দিনে বৎসর, ঋগ্বেদে আছে। কিন্তু সেটা দ্বাদশ চান্দ্রমাসে ১২×৩০ =৩৬০ দিন। পুরাণেও ৩৬০ দিন, আমরাও গণি ৩৬০ দিন। (ইদানী ৩৬৫ দিন বলিতে শিখিয়াছি।) ৩৬০ দিনে বৎসর, না চান্দ্র না সৌর। ৩৫৪ দিনে চান্দ্র, ৩৬৫।০ দিনে সৌর বৎসর। যাঁহারা বিষুব ও অয়নদ্বয়ে যজ্ঞ করিতেন, যাঁহারা বিষ্ণুর কাল-চক্রে চারি পদ পাইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা ঋতুকে ঋত, সত্য রাখিবার নিমিত্ত মলমাস ত্যাগ করিতেন, তাঁহারা বৎসরে ৩৬০ দিন গণিয়া কেমনে এই সকলের সামঞ্জস্য করিতেন? আমরা কিছুই জানিনা। কেমনে অব্দ মনে রাখিতেন? দুইচারি শত বৎসরই পর পর মনে রাখা অসম্ভব। নিশ্চয়, বৎসরের সমষ্টি করিতেন, সমষ্টি মনে রাখিতেন। ঋগ্বেদে 'যুগ' শব্দ আছে, কিন্তু তাহা দীর্ঘ, এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়, সংখ্যা বলিতে পারা যায় না।

প্রথমে যুগ শব্দের অর্থ চিন্তা করি। অমরকোষে "যুগ্মং তু যুগলং যুগম্।" যুগ্ম, যুগল, যুগ এক অর্থ। ক্ষীরস্বামী ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, "যুজ্যতে ধর্মিবৃত্ত্যা যুগম্।"

---

(৩) বোধহয় শতাব্দগণনা সপ্তর্ষির গতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল। তৎকালে সপ্তর্ষির গতি দ্রুত ছিল। প্রায় ১২৭ বৎসরে এক নক্ষত্রপাদ অতিক্রম করিয়াছিল। এত বৎসর না ধরিয়া ১০০ বৎসর লইয়া শতাব্দ। দুই তারার মধ্য নক্ষত্র নির্ণয় করিতে দশ বার বৎসরের ভুল হইয়া থাকিলেও আরম্ভ বৎসরে ভুল ছিল না।

যুগ, সমান-ধর্মীর বৃত্তিদ্বারা যুক্ত। যেমন, পদ-যুগ। সমান-ধর্মী, সমান-বৃত্তি পদ-দ্বয়ের একত্রাবস্থিতি হেতু পদ-যুগ। যাহা দ্বারা যুগ যুক্ত থাকে, তাহাও যুগ। যেমন, রথ-যুগ। রথ-যুগে অশ্ব-যুগ বদ্ধ থাকে। আমরা বলি, যোয়ালের একজোড়া বলদ। বলদ দুইটি সম-ধর্মী ও সম-বৃত্তি। তাহা না হইলে একজোড়া হয় না। কালবাচক যুগেরও লক্ষণ এই। দুইটিতে একটি, একটির পর অপরটি আসিয়া এক পূর্ণ করে। এই অর্থে দিবা ও রাত্রি, এক যুগ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যোদয়কাল পূর্ণ করে। কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ, এক যুগ, একমাস পূর্ণ করে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, এক যুগ, এক বৎসর পূর্ণ করে, সূর্য যেখান হইতে যাত্রা করে, সেখানে পুনরাগত হয়।

ঋগ্‌বেদের কালে অক্ষ-ক্রীড়া এক দারুণ ব্যসন ছিল। 'অক্ষ' অর্থে বয়ড়া ফল। কয়টি ফল লইয়া খেলা হইত, তাহা বলিতে পারা যায় না। বোধ হয় চারিটি। চারিটি ফল বিশেষ করিতে একটিতে এক দাঁড়ি, আর একটিতে দুই দাঁড়ি, আর একটিতে তিন দাঁড়ি, আর একটিতে চারি দাঁড়ি, কিম্বা অন্য কোন চিহ্ন করা হইত। প্রথমটির নাম কলি, দ্বিতীয়টির দ্বাপর, তৃতীয়টির ত্রেতা, চতুর্থটির কৃত। বোধহয়, এই পাশা খেলা হইতে চারি বৎসরের নাম কলি বা একত, দ্বাপর বা দ্বিত, ত্রেতা বা ত্রিত, এবং কৃত হইয়াছিল। এই চারি বৎসরে এক যুগ। ডক্টর শ্রীযুত রুদ্রপট্টন শামশাস্ত্রী তাঁহার 'গবাময়ন' নামক ইংরেজী গ্রন্থে চারি বৎসরের কল্যাদি চারি নাম প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, অব্দের পরিমাণ ৩৬৫।০ দিন ছিল। ফলে, প্রথম বৎসর সূর্যাস্তে আরম্ভ হইয়া ৩৬৫ দিন গতে মধ্যরাত্রে শেষ হইত। দ্বিতীয় বৎসর মধ্যরাত্রে আরম্ভ হইয়া সূর্যোদয়ে, তৃতীয় বৎসর মধ্যাহ্নে, চতুর্থ বৎসর সূর্যাস্তে শেষ হইত। (৪) যুগের দুই লক্ষণ, পূর্ণতা ও পরিবর্তনীয়তা, একটা জ্যোতিষিক ঘটনাকাল পূর্ণ করিবে, এবং পরে পরে আসিতে থাকিবে। চারি বৎসরে এক চক্র পূর্ণ হইত, এবং সে চক্র পূর্ববৎ পরিবর্তিত হইতে থাকিত।

কিন্তু কোনও বৎসর সূর্যাস্তে, কোনও বৎসর মধ্যরাত্রে ইত্যাদি ক্রমে আরম্ভ সুবিধাজনক নয়। এই কারণে অনেকে ৩৬০ দিনে বৎসর গণিয়া চতুর্থ বৎসরে ৪ × ৫।=২১ দিন যোগ করিতেন। কেহ বা ৩৬৫ দিনে তিন বৎসর গণিয়া চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিন গণিতেন। চতুর্থ বৎসর দীর্ঘ বলিয়া হউক, চক্র পূর্ণ করিত বলিয়াই হউক, উহা প্রথম গণ্য হইত, এবং কৃত ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই পর্যায় চলিয়া আসিয়াছিল। পূর্ণ চক্রের নাম 'গো' ছিল, এবং গণকেরা এই চতুষ্পাদ গো বা যুগ গণিতেন। বৃষরূপ ধর্মের চতুষ্পাদ এইরূপে আসিয়াছিল। ঋগ্‌বেদের কাল হইতে অন্ততঃ জৈনগ্রন্থ, ভগবতীসূত্র, কাল (খ্রি-পূ ৪র্থ শতাব্দ) পর্যন্ত কৃতাদি চারিবর্ষে যুগ-গণনা প্রচলিত ছিল।

কৃতাদি বর্ষের নাম মহাভারতেও আছে। যথা, বনপর্বে লোমশ ঋষি এক তীর্থে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়াদ্বাপরস্য চ।

অঃ ১২০।

পুনশ্চ আর এক তীর্থে

সন্ধির্দ্বয়ো নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়াদ্বাপরস্য চ।

অঃ ১২৪।

হে নরশ্রেষ্ঠ, ইহা ত্রেতা-দ্বাপরের সন্ধি।

নীলকণ্ঠ ও তদনুবর্তী পণ্ডিতেরা বাক্যটিকে তীর্থের বিশেষণ করিয়াছেন, তীর্থে ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই অর্থ সংলগ্ন হইতেছে না। লোমশ ঋষির সে অভিপ্রায় হইলে তিনি সত্যযুগের নাম করিবেন, যখন ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল। 'সন্ধি' বলিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? ঋষি যুধিষ্ঠিরকে সে তীর্থে স্নান করিতে বলিতেছেন, আর বলিতেছেন সে দিন তীর্থস্নানের যোগ্যও বটে, তখন এক নূতন বৎসর আসিতেছে। (বোধ হয় বৈশাখ মাস।) দ্বাদশবর্ষ বনবাস কালে ত্রেতা ও দ্বাপর তিন তিনবার আসিয়াছিল।

বনপর্বে হনুমান্ ও ভীমের বিক্রম-প্রকাশ-কালে হনূমান্ বলিতেছেন,

(৪) ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭।১৫) বিখ্যাত শ্লোক

কলিশ্‌শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।

উত্তিষ্ঠন্ ত্রেতা ভবতি চরন্‌সম্পদ্যতে কৃতঃ॥

কলি শুইয়া আছে, দ্বাপর জাগিতেছে, ত্রেতা দাঁড়াইয়াছে, কৃত বেড়াইতেছে। ক্রীড়ায় চারি অক্ষের দৃষ্টান্তে যুগের চারি বর্ষের বর্ণনা।

এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ততে।

অঃ ১৪৮।

হে ভীম, এই কলিযুগ অচিরে প্রবর্তিত হইবে। অবশ্য পাণ্ডবদিগের বননবাসকালে দীর্ঘ কলিযুগ আরম্ভ হয় নাই। এখানে কলিযুগ কলিবর্ষ। যদি কলিযুগ ধরি, তাহা হইলে অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত।

শল্যপর্বে ভীমসেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিলে বলরাম অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতেছেন,

প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।

অঃ ৬১।

আপনি ভাবিয়া দেখুন, এখন কলিযুগ উপস্থিত, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই। পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাও স্মরণ করুন।

এখানে কবি কলিযুগের লক্ষণ স্মরণ করিয়া আপনাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পাদধর্ম কলিযুগ আসে নাই।

এখন মহাভারতের "অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োঃ" শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। দ্বাপরবর্ষ পূর্ণ হইবার একমাস পূর্বে যুদ্ধ হইয়াছিল। হেমন্তের পরে উত্তরায়ণ ও নববর্ষ প্রবৃত্তি। 'ভারত-সাবিত্রী'র মতে যুদ্ধারম্ভের প্রায় একমাস পরে নূতন বৎসর আসিয়াছিল। অতএব 'অন্তর' শব্দ ঠিক প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৪) বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগে যুদ্ধ

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই মন্বন্তর পৌরাণিকের নিকট অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। আমরা পাঁজিতে অদ্যাপি বৈবস্বত মনুর অধিকারে বাস করিতেছি। ইহার তাৎপর্য পরে দেখা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণ (৩।৩) অষ্টাবিংশতি বেদব্যাস গণিয়াছেন। সকলেই বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতিযুগের দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই মনুর এই যুগের দ্বাপর এত স্মরণীয় হইয়াছিল যে পৌরাণিক তাঁহার উক্তির অর্থ চিন্তা করেন নাই। কিন্তু ইহা ঠিক এই মনুর অষ্টাবিংশতি যুগ, কালসংখ্যার একটা বিশেষ যুগ হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণ লিখিয়াছেন (অঃ ৪)

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে যাদবান্বয়সম্ভবঃ।

রামো নাম যদা মর্ত্যো মৎসত্ত্ববলাশ্রিতঃ॥

বৈবস্বত মন্বন্তরে রামকৃষ্ণ ছিলেন।

বৈদ্য ত্র্যম্বকগুরুনাথ কালে তাঁহার "পুরাণ নিরীক্ষণ" নামক মরাঠী গ্রন্থে ভবিষ্যপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রতিসর্গ পর্ব),

ভবিষ্যাখ্যে মহাকল্পে প্রাপ্তে বৈবস্বতেঽন্তরে।

অষ্টাবিংশ দ্বাপরান্তে কুরুক্ষেত্রে রণোঽভবৎ॥

ভবিষ্যকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল।

মহাভারতের কবি মন্বন্তর ও যুগ উহ্য রাখিয়া কলি দ্বাপরের অন্তর বলিয়াছেন। আমরা যেমন ইংরেজী সাল লিখিতে শতাব্দ উহ্য রাখি, কাশ্মীরে যেমন সপ্তর্ষি-অব্দ লিখিতে শতাব্দ লেখা হয় না, কবিও তেমন করিয়াছেন, মনু ও যুগ জানা ছিল, লেখেন নাই।

এখন মনুর কাল-বিভাগ দেখি। কৃত ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই চারি বর্ষে যুগ।

১ যুগ = ৪ বর্ষ

১ মনু = ৭১ যুগ = ৭১ × ৪ = ২৮৪ বর্ষ

১ কল্প = ১৪ মনু = ৯৯৪ যুগ = ১৪ × ২৮৪ = ৩৯৭৬ বর্ষ

যথা, বায়ুপুরাণে (অঃ ৯)

ষড়্নং যুগসাহস্রমেভি র্ব্যাপ্তং নরাধিপ।

হে নরাধিপ, এই চতুর্দশ মনু দ্বারা ষড়ূন সহস্র যুগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ৯৯৪ যুগে ১৪ মনু, ১ মনুতে ৭১ যুগ, ১ যুগে ৪ বর্ষ। *

চতুর্দশ মনুর নাম এই

১ম	স্বায়ম্ভুব	৮ম	সাবর্ণিক
২য়	স্বারোচিষ	৯ম—১৪শ	অন্যান্য সাবর্ণিক
৩য়	ঔত্তমি		

---

* কল্প = ৪০০০ বর্ষ ধরিয়াও মনুগণনা ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও

সহস্রযুগপর্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে।

১ কল্প = ১০০০ যুগ = ৪০০০ বর্ষ। কিন্তু ইহাতে ১ মনু = ৭১.৪২৮৬ যুগ হয়। এই কারণে উক্ত পুরাণে (৫৩ অঃ)

মন্বন্তরাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততি॥

মন্বন্তরের সংখ্যা (পরিমাণ) কিঞ্চিদধিক ৭১ যুগ। কিন্তু ইহাতে ভাগ শেষ হয় না বলিয়া ৭১ যুগে মনুগণনা অধিক প্রচলিত ছিল।

৪র্থ তামস

৫ম রৈবত

৬ষ্ঠ চাক্ষুষ

৭ম বৈবস্বত

এখন দেখি, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরে কত বৎসর হয়। বৈবস্বত সপ্তম মনু। কল্পমুখ হইতে

৬ মনুতে ৬ × ২৮৪ = ১৭০৪ বর্ষ

২৭ যুগে ২৭ × ৪ = ১০৮ "

কৃত ত্রেতা ২ = ২ "

১৮১৪ " গতে দ্বাপর।

কথাটি এ পর্যন্ত সোজা। দুরূহ কথা, কবে হইতে? এই প্রশ্ন সেকালের লোকের মনে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমরা লোমশ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেন কিম্বা বলিতেন কল্পমুখ হইতে।* কিন্তু কল্প যে অনেক। বায়ুপুরাণ ৩৩ কল্প গণিয়াছেন, ৩০টি নাম করিয়াছেন। অনেক ছোট ছোট কল্প এক বৃহতের অন্তর্গত হইয়াছে। আমরাও দেখিতেছি, কোথায় গুপ্তাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ, সব শকাব্দে প্রবেশ করিয়াছে। আপনার কল্পের আরম্ভ কোথায়? ভারতযুদ্ধের ১৮১৪ বৎসর পূর্বে।

কাল নিরবধি, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। বলি উহার পর ইহা, কিম্বা ইহার পূর্বে উহা। এই 'উহা' অনন্তকাল-সমুদ্রের যেখানে ইচ্ছা সেখানে দীপস্তম্ভস্বরূপ স্থাপন করিতে পারি। মন্বন্তর গণনা অদ্যাবধি চলিয়া আসিলে কিম্বা শকে ব্যক্ত থাকিলে আমরা কল্পমুখ অক্লেশে বুঝিতে পারিতাম। এখন নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে। উদ্ধারের একমাত্র উপায় সূর্য ও নক্ষত্র।

শুভাদৃষ্টক্রমে বায়ুপুরাণে (অ: ৫৩) চাক্ষুষ মন্বন্তরে সূর্যস্থিতি লিখিত আছে,—

বিবস্বানদিতেঃ পুত্রঃ সূর্যো বৈ চাক্ষুষেঽন্তরে।
বিশাখাসু সমুৎপন্নো গ্রহাণাং প্রথমো গ্রহঃ॥১০৪।
ত্বিষিমান্ ধর্মপুত্রস্তু সোমো বিশ্বাবসুস্তথা।
শীতরশ্মিঃ সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকাসু নিশাকরঃ॥ ১০৫।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সূর্য বিশাখায় এবং চন্দ্র কৃত্তিকায় সমুৎপন্ন, দৃষ্ট হইয়াছিলেন। বায়ুপুরাণের অন্য অধ্যায়ে, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণেও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে ও আদ্যে বিষুব হইত এবং তৎকালে পূর্ণিমা দৃষ্ট হইয়াছিল। এই দুই বৈশাখী পূর্ণিমা খ্রি-পূ ১৮৩৮ ও ১৫৯৯ অব্দে ঘটিয়াছিল, "মহাভারতে ভারতযুদ্ধকাল" প্রবন্ধে ইহারই উল্লেখ করিয়াছি। (সেখানে শারদ বিষুব ধরিয়াছি।) এই দুই পূর্ণিমা চাক্ষুষ মনুকালে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১ মনু ২৮৪ বৎসর, এই দুই পূর্ণিমার অন্তর ২৩৯ বৎসর। অতএব প্রথম পূর্ণিমার অব্দ ধরিলেই অপরটিও পাওয়া যাইবে।

চাক্ষুষ মনু ষষ্ঠ মনু। অতএব কল্পমুখ হইতে

৫ × ২৮৪ = ১৪২০ বর্ষ

৬ × ২৮৪ = ১৭০৪ "

অতএব কল্পমুখের উত্তর সীমা

১৪২০

১৮৩৮

খ্রি-পূ ৩২৫৮ অব্দ

অর্থাৎ (ক) কল্পমুখ যেখানেই হউক, খ্রি-পূ ৩২৫৮ অব্দের পরে নয়। কল্পমুখ অবশ্য কৃতবর্ষ। সে বর্ষ হইতে গণিয়া আসিলে ১৮১৪ বর্ষ গতে দ্বাপর, ১৮১৫ বর্ষ গতে কলিবর্ষ হইবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দ কলিবর্ষ ছিল। অতএব (খ) খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দ দ্বিতীয় পরীক্ষা।

কতকগুলি যুগে কল্প। যে-সে বৎসর কল্পমুখ হইত না। জ্যোতিষিক বিশেষ যোগ ঘটিলে তাহাকে অব্দ-গণনার আদি করা হইত। খ্রি-পূ ৩২৫৮ অব্দ কিম্বা ইহার পূর্বে কি প্রসিদ্ধ যোগ ঘটিয়াছিল? দেখিতেছি, (১) খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দে রোহিণী তারা-রেখায় মহা-বিষুব হইয়াছিল। (২) প্রজাপতি, রোহিণীর দেবতা।

---

* শ্রীযুত শাম শাস্ত্রী কল্যব্দ ও কল্পাব্দ এক মনে করিয়াছেন। অর্থাৎ কল্পমুখ ও কলিমুখ খ্রি-পূ ৩১০২ অব্দ। কিন্তু এই অনুমানের কোনও আধার নাই। আমি পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উত্তর দিতে পারেন নাই। ৺ত্র্যম্বক কালে এই নিরাধার অনুমানে নির্ভর করিয়া এবং ৭২ বর্ষে যুগ ধরিয়া ভারত-যুদ্ধাব্দ খ্রি-পূ ১২৬৩ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈবস্বত মনুই যুদ্ধের একমাত্র সাক্ষী নহেন। কালে মহাশয় অন্যান্য সাক্ষীর উক্তি ঐক্য করিতে পারেন নাই। তথাপি স্বীকার করিতেছি শামশাস্ত্রী ও কালে মহাশয় পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি বৎসর ও যজ্ঞ। একদা প্রজাপতি স্বীয় কন্যা কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও পুরাণে প্রজাপতির এই গর্হিত কর্ম্ম বর্ণিত আছে। (৩) জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্যৈষ্ঠ নামেই প্রকাশ একদা ইহা বৎসরের প্রথম মাস ছিল। খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা পাইয়াছি। তখন বৈশাখ প্রথম মাস। ইহার পূর্বে নিশ্চয় জ্যৈষ্ঠমাস প্রথম মাস ছিল। রোহিণীতে বিষুব হইলে এবং সূর্য সেখানে আসিলে যে পূর্ণিমা হয়, সেটি জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠ্যের সপ্তম মাস, অগ্রহায়ণ। এই নামেও বৎসরের প্রথম মাস পাইতেছি। (৪) মহাভারতের বনপর্বে (অঃ ২৩০) পঞ্জিকার এই প্রাচীন ইতিহাস লিখিত আছে। কবি লিখিয়াছেন, অভিজিৎ ও রোহিণীর জ্যেষ্ঠত্ব গিয়াছে, রোহিণী স্থানে কৃত্তিকা নক্ষত্র-চক্রের আদি হইয়াছে। আরও লিখিয়াছেন, রোহিণী দ্বারা যে কাল নিরূপিত হইত, তাঁহার কালে তাহা ধনিষ্ঠা দ্বারা হইতেছে।

ধনিষ্ঠাদি স্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্বং

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে ধনিষ্ঠাতারা-রেখায় উত্তরায়ণ হইত। পরদিন হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব এক পূর্বকালে রোহিণীতেও নূতন বর্ষ আরম্ভ হইত। রোহিণীতে অয়ন হইতে পারিত না, কেবল মহাবিষুব হইতে পারিত। আমরা জানি, পূর্ণিমা হইতে মাস ও বর্ষ গণিত হইত। অতএব খ্রি-পূ ৩২৫৬ অব্দের নিকটবর্ত্তী এমন এক অব্দ চাই, যে অব্দে বিষুব দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল। দেখিতেছি, খ্রি-পূ ৩২৫০ ও ৩২৬৯ অব্দ, এইরূপ। প্রথমটি হইতে পারে না, চাক্ষুষ মনু পথ রোধ করিয়া আছেন। অতএব খ্রি-পূ ৩২৬৯ অব্দ কল্পমুখ। এই জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা অবশ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। নচেৎ কল্পমুখ হইতে পারিত না।*

প্রথমে চাক্ষুষ মন্বন্তরের পূর্ণিমাদ্বয় মিলাইয়া দেখি।

খ্রি-পূ ৩২৬৯	৩২৬৯
— ১৪২০	১৭০৪
১৮৪৯	১৫৬৫

পূর্ণিমা খ্রি-পূ ১৮৩৮ ও ১৬৯৯ অব্দে হইয়াছিল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বটে।

এইরূপ, কল্পমুখ হইতে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপর গণিলে

খ্রি-পূ ৩২৬৯ কৃতবর্ষ
- ১৮১৪
১৪৫৫ দ্বাপর

এই দ্বাপরবর্ষের হেমন্তে যুদ্ধ এবং ১৪৫৪ অব্দে কলিবর্ষে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। (খ) অনুসারে খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে কলিবর্ষ। তদনুসারে খ্রি-পূ ১৪৫৪ অব্দও কলিবর্ষ। উভয়ের ঐক্য হইতেছে।

প্রাচীন নক্ষত্রদর্শক ঋষি পূর্ণিমা দেখিতে ভুল করিতে পারেন না। বিষুব-দিন নির্ণয়ে দুই এক দিন ভুল করিতে পারিতেন। যদি ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে খ্রি-পূ ৩২৬৯ — ৮ = ৩২৬১ অব্দ, কিম্বা ৩২৬৯ — ১১ = ৩২৫৮ অব্দ কল্পমুখ ধরিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি হইতে পারে না, ১৩৫৪ অব্দের কলি বাধা দিবে। প্রথমটি হইতে পারে, কারণ খ্রি-পূ ৩২৬১ - ১৮১৪ = ১৪৪৭ অব্দ দ্বাপর, ১৪৪৬ অব্দ কলি। খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দ হইতে গণিয়া গেলে ১৩৫৪ + ৯২ = ১৪৪৬ অব্দ কলি বটে। কিন্তু কলিযুগের ১০০ বৎসর সন্ধ্যা পাওয়া গেল না। অন্য বাধাও আছে। এ বিষয় পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখা যাইতেছে।

(৫) পাঁচবর্ষে যুগ। বারশত বর্ষে কলিযুগ

উক্ত খ্রি-পূ ৩২৬৯ অব্দে কল্পমুখ স্বীকার করিলে খ্রি-পূ ১২৮১ অব্দে বৈবস্বত মনুর অধিকার পূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয়, প্রথমে সপ্তমনুতে কাল বিভক্ত হইত। বৈবস্বত মনু শেষ মনু ছিলেন। মনুসংহিতায় মনু সাত। পুরাণে প্রথম সাত মনু কালের বিবরণ আছে, পরের মনুর নাই। বৈবস্বত মনুর পরে সাবর্ণিক মনু আসিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকার খ্রি-পূ ৯৯৭ অব্দে পূর্ণে

---

* আশ্চর্য্যের বিষয় সিন্ধুদেশে মোহঞ্জদরো (মোহন দ্বীপ) খনন করিয়া পুরাকালের যে পুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রত্নবিৎ অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার নির্ম্মাণকাল খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দ অনুমান করিয়াছেন। এই পুরের নীচেও লোকালয়-চিহ্ন আছে। উদ্ধার করিলে উর্দ্ধসীমা খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দেও যাইতে পারিবেন।

হইয়াছিল। ইহার কালের পুরাবৃত্ত অল্প। কিন্তু ইহার পরে মনু গণনা লোকব্যবহারে ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া জ্যোতিষীর পুথীগত রহিয়াছিল। ইহার দুই কারণ ঘটিয়াছিল। খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে এক কল্প আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা সায়ন সৌর ২৪৭ বর্ষ ১ মাস পরিমিত যুগে যুগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক যুগ শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত, এবং সপ্তমীর নামানুসারে যুগের নাম হইত। এই যুগের সূক্ষ্মতা ও বৈশিষ্ট হেতু এই কল্প সমাদৃত হইয়াছিল।* রথসপ্তমী ইহার পঞ্চম যুগ। এই সপ্তমীতে রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল। পরদিন ভীষ্মাষ্টমী। ৭ম পরিচ্ছেদে এই কল্প সম্বন্ধে আরও বলা যাইবে।

দ্বিতীয় কারণ আরও গুরুতর। শ্রাবণমাসে প্রকাশিত "ভারতযুদ্ধ কোন্ মাসে?" প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, বসন্ত ও শিশির, মহাবিষুব ও উত্তরায়ণ, বৎসরের দুই মুখ ছিল। মনুর বৎসর ও যুগ গণনায় প্রথম মুখ গৃহীত হইত। ইহার যুগ কৃতাদি চারি বর্ষের। শিশির হইতে 'সংবৎসর'াদি পাঁচ বর্ষেও এক যুগ গণিত হইত। মনুর যুগ রবি-যুগ। সংবৎসরাদি পাঁচ বর্ষের যুগ রবি-শশীর যুগ। কৃতাদি চারিবর্ষ গতে রবি বিষুবে পুনরাগত হইত। সংবৎসরাদি পাঁচবর্ষে গতে রবি দক্ষিণ পদে এবং শশী উত্তর পদে উপস্থিত হইত। তখন মাস পূর্ণিমান্ত ছিল। রবিশশী যুগের পাঁচ বর্ষের পাঁচ পৃথক নাম ছিল। ঋগ্‌বেদে (৭।১০৩) সংবৎসর ও পরিবৎসর, মাত্র দুইটি নাম পাওয়া যায়। শঙ্কর দীক্ষিত দেখাইয়াছেন, শুক্ল-যজুর্বেদে (২৬।৪২, ৩০।৫) পাঁচটি নাম আছে। যথা, সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর, ইদ্বৎসর। বোধ হয়, ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ এই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ দ্বারা অধিমাস (মলমাস) গণনা করিতেন। প্রতি বিশ বর্ষে দ্বিবিধ যুগ মিলিত হইত। রবি-শশী যুগের কোন বৃহৎ যুগ ছিল কিনা, বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, ছিল, এবং তাহাই ঋগ্‌বেদে 'পূর্ব যুগ', 'প্রথম যুগ' ইত নামে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইয়া থাকিবে। কারণ রবির উত্তর দক্ষিণ পদ ক্রমশঃ পিছাইয়া আসিয়াছে। খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দের সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। বসন্ত হইতে বর্ষ গণিলে খ্রি-পূ ১৩৫৪, শিশির হইতে এবং খ্রিষ্ট সালে গণিলে খ্রি-পূ ১৩৫৩ অব্দ। ইহা ঋগ্‌যজুঃ জ্যোতিষ বা বেদাঙ্গ জ্যোতিষ নামে খ্যাত। ইহা স্থূল পঞ্জিকা গণনার বই। সোজা করিতে গেলেই তিথি নক্ষত্র গণনা স্থূল হইবে। বিরাট পর্বে পিতামহ ভীষ্ম এই পাঁজি ধরিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বর্ষ গণিয়াছিলেন। এই বেদাঙ্গ জ্যোতিষে মাস অমান্ত, এবং ধনিষ্ঠাতারা রেখায় উত্তরায়ণ হইত। মনুর কৃতাদি বর্ষগণনায় খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দ অর্থাৎ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের সংবৎসর কলিবর্ষ পড়িয়াছিল। প্রথম বর্ষ কলি হইলে পঞ্চম বর্ষও কলি। শামশাস্ত্রী লিখিয়াছেন, এই কারণে লোকে পঞ্চবর্ষাত্মক যুগকে কলিযুগ বলিত। ইহার সমর্থক প্রমাণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

কালে কালে নানাবিধ কালমান কল্পিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি লোক-যাত্রার উপযোগী মানুষ বা লৌকিক মান, অপরটি অহোরাত্রবিদের দৈব বা দিব্য মান। একালে যেমন কোন কোন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর জীব-সঞ্চার ও জীবধ্বংসকাল গণিয়া থাকেন, সেকালেও পণ্ডিতেরা তেমন গণিতেন। তাঁহারা গণিতেন, কতকাল সৃষ্টি চলিয়াছে, কতকাল চলিবে না, প্রলয় হইবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। যখন সৃষ্টি চলে তখন তাঁহার দিবা, যখন প্রলয় হয় তখন তাঁহার রাত্রি। এই দিবা ও রাত্রি ব্রহ্মার অহোরাত্র। যাঁহারা অহোরাত্র গণিতেন, তাঁহারা অহোরাত্রবিৎ। যাঁহারা কালমান জানিতেন, তাঁহারা সংখ্যাবিৎ। ব্রহ্মার অহোরাত্র, ব্রহ্মার কল্প।

এই কল্প কদাপি অল্প হইতে পারে না, মানুষের দিন কিম্বা বৎসর গণিয়া ব্যক্ত করাও চলে না। দেবতার দিবা ও রাত্রিতে সংখ্যাবিদের গণনার আরম্ভ। রবির উত্তরায়ণ ছয় মাস দেবতার দিন, দক্ষিণায়ন ছয় মাস রাত্রি। এমন ৩৬০ দিব্য দিনে ১ দিব্য বৎসর, ৪ দিব্য বৎসরে ১ দিব্য যুগ, ৭১ দিব্য যুগে ১ দিব্য মনু, ১৪ দিব্য

* কল্পটি হারাইয়া গিয়াছিল। কেতকরের অধ্যবসায়ে ইহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। তিনি ইহার নাম জানিতেন না, "আর্যযুগমালিকা" নাম রাখিয়াছিলেন। ১৩৩১ সালের আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' "পঞ্জিকা-সংস্কার" পশ্য।

মতে ১ ব্রাহ্ম অহোরাত্র বা ব্রাহ্ম কল্প। এই কল্পের নাম বরাহকল্প। অতএব ৩৬০ মানুষ বৎসর, দিব্য সংখ্যায় ১ বৎসর। পৌরাণিকেরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চিন্তায় এত মগ্ন ছিলেন যে, লৌকিক মান অগ্রাহ্য করিয়া দিব্যমান বলিতে ব্যগ্র হইতেন। আমরা পার্থিব মানুষ, দিব্যলোকের পাঁজি দ্বারা আমাদের প্রয়োজন মিটে না।

কলিযুগ ছাড়িয়া আসিয়াছি। কলিযুগ মানুষ সহস্র বৎসর। মনুর কৃতাদি চারি বর্ষ স্থানে এখন কৃতাদি চারি সহস্র বৎসর। ইহাকে ব্রাহ্মকল্প বলা চলে না, যুগ বলা হইত। এক যুগ চারি পাদে বিভক্ত। বায়ুপুরাণ (অঃ ৩২) লিখিয়াছেন, যেমন বেদ চতুষ্পাদ, যুগও তেমন চতুষ্পাদ। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ আর্যভটও এক যুগকে চারি সমান যুগ-পাদে বিভক্ত করিয়াছেন, সংখ্যা যাহাই হউক। কিন্তু কলি দ্বাপর ত্রেতা কৃত, যুগ নাম পাইলেই যুগ হইবে না। এক এক যুগে কি জ্যোতিষিক ঘটনাকাল পূর্ণ হয়? কিছুই না। এখন যুগের লক্ষণ পরিবর্তিত হইল। কলিযুগে ধর্ম এক-পাদ, দ্বাপরে দ্বি-পাদ, ত্রেতায় ত্রি-পাদ, কৃতে চতুষ্পাদ। কৃতযুগেই সত্য ছিল, কৃতযুগ সত্যযুগ।

যথা, সোমসিদ্ধান্তে, তথা চ ব্রহ্মসিদ্ধান্তে কৃতা-দীনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্মপাদ-ব্যবস্থয়া। ধর্মপাদ ব্যবস্থা দ্বারা কৃতাদি যুগের ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাও ত ঠিক নয়। ধর্মের যেমন পাদ বৃদ্ধি, যুগের পরিমাণেও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি ছিল। কলি ১০০০ বৎসর, দ্বাপর ২০০০ ত্রেতা ৩০০০, সত্য ৪০০০ বৎসর। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নয়। দ্বাপরের দ্বিপাদ ধর্ম হঠাৎ কলিতে একপাদ হইতে পারে না। সন্ধ্যাকাল চাই। কলি আরম্ভের পূর্বে সন্ধ্যা ১০০ বৎসর, কলি অন্তে সন্ধ্যা ১০০ বৎসর। দ্বিতীয় সন্ধ্যার নাম সন্ধ্যাংশ এখন কলি ১২০০ বৎসর। এইরূপ দ্বাপরের দুই সন্ধ্যা ৪০০, ত্রেতার ৬০০, সত্যের ৮০০ বৎসর।

এখানে কলিযুগই দেখি। মহাভারতে নানা স্থানে যুগ সংখ্যা ও লক্ষণ বর্ণিত আছে। বনপর্বে (অঃ ১৮৮),

সহস্রমেকং বর্ষাণাং ততঃ কলিযুগং স্মৃতম্॥
তস্য বর্ষশতং সন্ধিঃ সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্।

সহস্রবর্ষে কলিযুগ। ইহার সন্ধ্যা একশত, সন্ধ্যাংশও একশত বর্ষ। এই যুগ গণনায় দৈববর্ষের নাম গন্ধও নাই।

তথা চ বায়ুপুরাণে (অঃ ৩২),

কলিং বর্ষসহস্রন্তু প্রাহুঃ সংখ্যাবিদোজনাঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ শতমেব চ॥

এখানেও দৈববর্ষ নয়। মনুসংহিতায় এইরূপ। দিব্যসংখ্যা করিলে অবশ্য ১২০০ × ৩৬০ বর্ষ হইবে।

কলিযুগের বর্ষসহস্র যে দিব্য নয়, তাহা মহাভারতের উক্ত অধ্যায় পড়িলে প্রতীতি হইবে। লিখিত আছে, "কলিযুগ অল্পাবশিষ্ট কালে অন্ধ্র শক যবন *** বহুবিধ ম্লেচ্ছ জাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদ পরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে।" আমরা ইতিহাসে পাই খ্রি-পূ ৩২৫ অব্দে গ্রীক যবন আলেকজাণ্ডার পশ্চিমোত্তর ভারতে যবন রাজ্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। মহাভারত বলিতেছেন, তখন কলির অল্প অবশিষ্ট ছিল।

খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ, এবং ৩৫৪ অব্দে অন্ত। খ্রি-পূ ১৪৫৪ অব্দ হইতে ১৩৫৪ অব্দ কলির সন্ধ্যা, ৩৫৪ হইতে ২৫৪ অব্দ সন্ধ্যাংশ গত হইয়াছে।*

বিষ্ণুপুরাণও লিখিয়াছেন, মঘাসপ্তর্ষি-শতাব্দে দ্বাদশ শতবর্ষের কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে, অর্থাৎ পনর বৎসর পরে কলির আরম্ভ ধরিয়াছেন। ভাগবতপুরাণ লিখিয়াছেন, দশম শতাব্দে মহানন্দের কালে কলির বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ খ্রি-পূ ১৪৫৪ − ১০০০ = ৩৫৪ অব্দে মহানন্দের কালে কলির পূর্ণ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। লোকে তাহাকে কলির অংশ বলিত।

খ্রি-পূ ২৫৪ অব্দে দ্বাদশশতবর্ষের কলিযুগ গত হইল, কিন্তু সত্যযুগ আসিল না। দৈবজ্ঞ বলিলেন, মানুষ দ্বাদশশত বর্ষের কলি নয়, দিব্য দ্বাদশশত বর্ষের কলি, অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বর্ষের কলি। তখনও ইহার আরম্ভ খ্রি-পূ ১৪৫৪ অব্দেই ছিল। পরে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ইহা কি সম্ভব, মাত্র দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কুরুপাণ্ডবেরা পৃথিবী ভোগ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করিয়াছেন?

---

* অবশ্য কল্কি অবতারও হইয়া গিয়াছেন। বায়ুপুরাণে (অঃ ৫৮) ইহাঁর প্রকৃত নাম প্রমিতি। তখন কলির সন্ধ্যাংশ চলিতেছিল। পৌরাণিক কুত্রাপি ভবিষ্যৎবাণী করেন নাই, শ্রুত ও দৃষ্ট ঘটনাই লিখিয়াছেন।

পুরাণে কলিযুগের ধর্মের বর্ণনা পড়িলে বুঝি তৎকালে ব্রাহ্মণেরা ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞকর্ম লুপ্ত, মিথ্যাচার পাষণ্ড বৌদ্ধ প্রবল, রাজা শূদ্র। তৎকালে অনেক পুরাতন কল্পমুখ জানা ছিল। গর্গ জ্যোতিষী দেখিলেন, পরীক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন। ইনি সপ্তর্ষি অর্থে দক্ষিণায়ন বুঝিলেন, এবং দেখিলেন শক-পূর্ব ২৫২৬ অব্দে (খ্রি-পূ ২৪৪৯) এইরূপ হইয়াছিল। অতএব যুধিষ্ঠির এই অব্দে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

কিন্তু ইহাও ত মাত্র আড়াই হাজার বৎসর। ইহাতে সপ্তর্ষি কই? শকপূর্ব ৩১৫৪ অব্দে সপ্তর্ষি-অব্দের এবং ৩১৭৯ অব্দে বৃহৎ কলির আরম্ভ। এবং যেহেতু ভারত-যুদ্ধের পর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেহেতু শকপূর্ব ৩১৭৯ অব্দের পূর্ব বৎসরে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল! এই ভ্রান্ত যুক্তি অনেককে মুগ্ধ করিতেছে।

(৬) পরীক্ষিত-মহানন্দ কালান্তর

বায়ু ও মৎস্যপুরাণ মতে পরীক্ষিতের জন্মের ১০৫০ বৎসর পরে মহানন্দের অভিষেক হইয়াছিল। যদি মনে করি, খ্রি-পূ ১৪৫৪ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল, তাহা হইলে ৪০৪ অব্দে মহানন্দ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহা সম্ভব কি-না দেখি। মৎস্যপুরাণ (অঃ ২৭২) মতে মহানন্দ ৮৮ বর্ষ, এবং তাঁহার আট পুত্র ১২ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। একজনের ৮৮ বর্ষ রাজ্যভোগ অসম্ভব। এটি নবনন্দের রাজ্যভোগ কাল। শতবর্ষ পূর্ণ করিতে ৮ জনে ১২ বর্ষ আসিয়াছে। এই অনুমানে খ্রি-পূ ৪০৪ −৮৮=৩১৬ অব্দে নন্দবংশ লুপ্ত হয়। এই অব্দে কি ইহার দুই এক বৎসর পরে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ মতে পরীক্ষিতের জন্মের ১০১৫ বৎসর পরে মহানন্দ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই পুরাণের গণনা অন্যরূপ। ইনি খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম ধরিয়া থাকিবেন। খ্রি-পূ ১৪৪০−১০১৫=৪২৫ অব্দে মহানন্দের অভিষেক, ৩২৫ অব্দে নবনন্দের অন্ত, এবং আলেকজাণ্ডারের আগমন। এটিকে গোঁজা-মিল বলা চলে। জৈনপরম্পরামতে নবনন্দ ১১৫ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ৪২৫−১১৫=৩১০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। ইহাও আর এক গোঁজামিল ভাগবত পুরাণে 'শতং পঞ্চদশোত্তরম্', অন্য তিন পুরাণে 'শতং' স্থানে 'জ্ঞেয়ং' আছে। বোধ হয় প্রাচীন পাঠে বিষ্ণুপুরাণের মত ছিল। বিষ্ণুপুরাণের পরে ভাগবত পুরাণ প্রণীত হইয়াছিল।

(৭) খ্রি-পূ ১৪৫৪, না ১৪৪০?

পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে সপ্তর্ষি-অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই অব্দে বার শত বর্ষের কলিযুগের আরম্ভ। এই অব্দে এক কল্পেরও আরম্ভ। বায়ু পুরাণে (অঃ ৩২) মহাকাল চতুর্মুখ মহেশ্বরের চারি মুখে চারি যুগ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার চতুর্থ মুখ

তদা কলিযুগং ঘোরং সর্বলোকভয়ঙ্করম্।
কল্পস্য তু মুখং হ্যেতচ্ চতুর্থং নাম ভীষণম্॥

তদনন্তর সর্বলোক ভয়ঙ্কর ঘোর কলিযুগ। এই ভীষণ চতুর্থমুখ এক কল্পের মুখ।

এই বর্ণনা পাঁজির কলিযুগের হইতে পারে না। যুগে যুগে বিভক্ত না হইলে কল্প হয় না। পাঁজির কলিযুগ যুগে যুগে বিভক্ত নয়। বায়ুপুরাণের কলিযুগে কল্প আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দের মাহেশ্বর কল্প।

কেহ কেহ এই অব্দে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ যুগের দ্বাপরান্ত মনে করিতেন। সোম সিদ্ধান্তে এক গার্গ্যশ্লোক আছে,

অথ মাহেশ্বরেঽমুষ্য দিবসে ব্রহ্মণোঽধুনা।
সপ্তমস্য মনোর্যাতা দ্বাপরান্তে গজাশ্বিনঃ॥

অধুনা ব্রহ্মার মাহেশ্বর কল্প চলিতেছে। ইহা বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ দ্বাপরান্তে অর্থাৎ কলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই মাহেশ্বর কল্প সপ্তম যুগের, খ্রি-পর ৫৩৮ অব্দের পর আর চলে নাই। তখন সিদ্ধান্তজ্যোতিষের প্রসার হইয়াছিল। ইহার পূর্বে এই কল্প বহু প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল। লোকে ইহার আদি যুগে কলিযুগ ও বৈবস্বত মনুর কলিবর্ষ আরম্ভ মনে করিত। এই ভ্রম সহজেই ধরিতে পারা যায়। খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে কলিবর্ষ হইতে

ধরিলে ১৪৪০ অব্দ ত্রেতাবর্ষ। অথবা ১৩৫৩ অব্দ হইতে ধরিলে কৃতবর্ষ। কোনও ক্রমে কলিবর্ষ নয়। চাক্ষুষ মনু ও এই অব্দকে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের কলি স্বীকার করিবেন না।

কি কারণে এই অব্দে এক কল্পমুখ হইয়াছিল? যে জ্যোতির্বিৎ ইহার যুগ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি অন্য এক বৎসরেও সূত্র প্রয়োগ করিতে পারিতেন। কেনই বা সপ্তর্ষি মঘাকে পঞ্চাশ বৎসর পিছাইয়া ধরা হইয়াছিল? খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে জ্যোতিষিক বিশেষ যোগও হয় নাই। দেখিতেছি, অক্ষয়া তৃতীয়াতে বর্ষারম্ভ, নাগ পঞ্চমীতে রবির দক্ষিণায়ন, দুর্গামহাষ্টমীতে শারদ বিষুব, এবং ভৈমী একাদশীতে রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল তিথির প্রসিদ্ধি পরে হইয়াছে, পূর্বে ছিল না। আর দেখিতেছি, ২৭শে অক্টোবর অমান্ত অগ্রহায়ণ পূর্ণিমান্ত (পৌষ) অমাবস্যায় বেলা ১১ দণ্ডের সময় কুরুক্ষেত্রে আংশিক সূর্য্যগ্রহণ দৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণে, যেমন প্রয়াগে, পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল। কিন্তু এই পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সে বৎসর যুদ্ধ বৎসর হইতে পারে না। অন্য পক্ষে, খ্রি-পূ ১৪৪২ অব্দে ২রা ডিসেম্বর পৌষ পূর্ণিমায় ৪৩ দণ্ডের সময় চন্দ্রগ্রহণ এবং ১৭ই ডিসেম্বর পরের অমাবস্যায় ১৩ দণ্ডের সময় কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ দৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই হেতু সে বৎসর যুদ্ধ হইয়াছিল বলিতে পারা যায় না।

খ্রি-পূ ১৪৫৫ অব্দে যুদ্ধ পাইয়াছি। এই অব্দে অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ, তিন মাসে গ্রহণ হয় নাই। গ্রহণ দ্বারা অব্দ পরীক্ষা অপেক্ষা আঠার দিন যুদ্ধ দ্বারা পরীক্ষা অধিক বিশ্বাস্য। 'ভারত সাবিত্রী' ধরিয়া এবং কুরুক্ষেত্রের স্পষ্ট তিথি গণিয়া পাইতেছি,

খ্রি-পূ ১৪৫৫। মাস পূর্ণিমান্ত

২৪ নভেম্বর পৌষ শুক্লত্রয়োদশী ৩১ দং মৃগশিরা

৩ ডিসেম্বর মাঘ কৃষ্ণাষ্টমী ৫১ দং

১১ ডিসেম্বর মাঘ অমাবস্যা ৫৭ দং উত্তরাষাঢ়া

আঠার দিন যুদ্ধ এবং যুদ্ধের দশম দিবসে মাঘ কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্মের পতন ঠিক পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য কেবল এই ঐক্য দ্বারা যুদ্ধাব্দ নির্ণীত হইতে পারে না।

খ্রি-পূ ১৪৫৫ অব্দে যুদ্ধ হইলে ১৪৫৪ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম। ১৩৫৪ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ, ইহার শত বৎসর পূর্বে কলির সন্ধ্যা আরম্ভ। ১৪৫৪ হইতে ১৪৪০ অব্দ পনর বৎসর। শোনা যায়, পরীক্ষিৎ পনর বৎসর বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের কোন উপায় নাই। বিষ্ণুপুরাণের ১০১৫ সংখ্যার ১৫টির উৎপত্তি এই কারণে হইতেও পারে। পুরাণ শুনিয়াছিলেন, পরীক্ষিতের সহস্র বৎসর পরে মহানন্দ। যদি খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে পরীক্ষিতের অভিষেক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পনর বৎসর বয়সে হইয়াছিল। ১৪৪০ অব্দ হইতে বৎসর গণিবার আর কোন হেতু পাইতেছি না।

(৮) সংক্ষেপ।

গত বৎসর ভারত-যুদ্ধাব্দ নির্ণয় করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়াছিল। গত শ্রাবণ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে তাহার কয়েকটি প্রধান বিষয় বলিয়াছিলাম। তথাপি দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল, শ্রোতৃমণ্ডল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হইবারই কথা। একে বিষয় নূতন, তাহাতে কেবল অব্দের কথা। এক বার শুনিলে মনেও থাকে না। তদবধি এক বৎসর হইতে চলিল মূল যুক্তির পরিবর্তনের হেতু পাইলাম না। এক্ষণে নূতন প্রবন্ধ লিখিয়া যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া যুক্তির সমালোচনার আশায় পাঠকের সমীপে উপস্থিত করিতেছি। আমি মতিবশে চলি নাই, কিন্তু অভ্রান্ত নই। প্রত্যেক যুক্তির তিন অঙ্গ, তিন দোষস্থান,— উপজীব্য, ব্যাখ্যা, গণিতফল। তিনটির একটিতে দোষ থাকিলে অনুমান দুষ্ট ও অগ্রাহ্য।

১। মহাভারতের কৃত্তিকা নক্ষত্র দ্বারা জানিতেছি খ্রি-পূ ১৪৩৮, বরং ১৫৯৯ অব্দের পরে যুদ্ধ হইয়াছিল, পূর্বে হয় নাই।

২। পরীক্ষিতের কালে মঘায় সপ্তর্ষি ছিলেন এবং এক শত বৎসর ছিলেন। অতএব পরীক্ষিত খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে কিম্বা কিছু পরে রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপরে যুদ্ধ হইয়াছিল। অতএব খ্রি-পূ ১৪৫৫ অব্দে যুদ্ধ। এই অব্দ দ্বাপরবর্ষ। দ্বাপর যুগের শেষও বটে।

৪। যুদ্ধের পর বৎসর হইতে বার শত বর্ষের কলি-যুগের একশত বর্ষ সন্ধ্যা আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রি-পূ ১৩৫৪ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ। অতএব ১৪৫৪ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম।

৫। মৎস্য ও বায়ুপুরাণ মতে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহানন্দের অভিষেক ১০৫০ বৎসর। ১৪৫৪ অব্দে জন্ম ধরিলে ৪০৪ অব্দে মহানন্দের অভিষেক হয়। ইহার বিরোধী প্রমাণ কিছুই নাই। বরং ইহা হইতে জানিতেছি ৩১৬ অব্দে নন্দবংশ বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

৬। খ্রি-পূ ১৪৪০, শকপূর্ব ১৫১৮ অব্দ হইতে এক অব্দ ও শতাব্দ গণিত হইয়া প্রায় আঠার শত বৎসর চলিয়াছিল। উহা পরীক্ষিতের অভিষেক বৎসর মনে হয়। অন্য কোন হেতু পাওয়া যায় না।

এতগুলি প্রমাণের ঐক্য কাকতালীয় হইতে পারে কি?

বর্ষা-দুলালী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌সি

আবার এসেছে বর্ষা নৃত্যপরা দুলালী আমার,
ছন্দে ছন্দে জাগাইয়া সুকুমার নুপুর ঝঙ্কার—
দুলা'য়ে চপল বেণী অঞ্চল জড়া'য়ে মেখলায়
চঞ্চল চরণ চারু আন্দোলিয়া চাপল্য-খেলায়
আমারি কিশোরী মেয়ে!

আমারি চপল মেয়ে! বাহু মেলি' ভৃষিতা ধরণী
ব্যগ্র হ'য়ে গণিতেছে পলে পলে দিবস-রজনী;
কবে তার বেদনার যুগরুদ্ধ তপ্ত বক্ষভার—
চঞ্চল কমল স্পর্শে শ্যামলিয়া উঠিবে আবার!
—গণিছে প্রহর তাই!

মেঘের নবনী অঙ্গে পড়েছে দেহের ছায়া তার,
মনের অলক্ষ্য স্পর্শে স্পন্দন জাগিছে অনিবার,
দূরান্তের স্বপ্ন-লেখা বক্ষ জুড়ি' বাঁধিয়াছে বাসা—
আপনা বিলা'য়ে দিয়ে মিটাইবে ধরার পিপাসা,
লক্ষ বরষের তাপ!

কদম্ব মেলিছে আঁখি, গন্ধরাজ জাগিছে গোপনে
এসেছে বারতা তার; উতলে সমীর ক্ষণে ক্ষণে
আশায় শিহরি' উঠে। মেঘলোকে আসিয়াছে বাণী
কল্পনার ইন্দ্রজালে বুঝি তাই জাগে কানাকানি—
স্মৃতির হিন্দোলা লাগে!

আমারি চপল মেয়ে! সমগ্র জগৎ তারে মাগে,
আমি শুধু রুদ্ধকক্ষে অভিমানে ক্ষুব্ধ অনুরাগে
আরবি' রাখিতে চাহি। অসীমের ভাষা তার প্রাণে,
দিকে দিকে আপনারে বিথারিয়া দেয় কলতানে—
তথাপি আমারি মেয়ে!

স্বর্ণ-সীতা

শিল্পী—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works
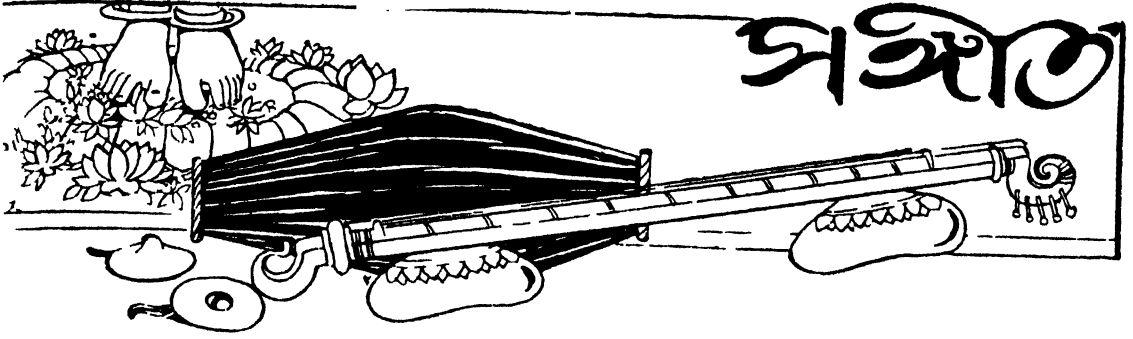
কথা, সুর ও স্বরলিপি

শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায়

ইমন মিশ্র—দাদরা

মৃদুল চরণ ঘায়, আজি এ নিশীথে হায়
চাঁদিনীর সনে মলয় পবনে
এলে কে গো মন বনের ছায়।

আঁখির ঘন দিঠী
আবেশে মিটি মিটি
পুলকে পরাণ উতলা আজি তব
স্বপন জড়িত শিথিল বাহুতে
বাঁধিতে কি আজি চাহ আমায় ?

চিনি গো তোমারে চিনি চিনি
অচেনা ওগো বিদেশিনী
হৃদয়ে গোপনে শুনি রয়ে রয়ে
নূপুর রিণিকি রিণি ঝিনি,

শ্রবণ বীণাখানি
বাজায়ে এলে জানি
জীবন পশরা তোমারে দিনু সব
তোমার সুরের মধুর ছন্দে
আঁখিতে বরষা বারি ঘনায়॥

```
      +              ০              +               ০                  +                ০
II  গা মা গরা | গা পা হ্মা | পা পা পা | পা ধপহ্মা পা | হ্মা পহ্মপা রা | গা গা গা |
    মৃ  দু  ল    চ  র  ণ    ঘা য় ০    আ  জি  এ     নি  শী  থে    হা য় ০

      +              ০                 +              ০
    গা  গা  রগা | মগরা  সা  রা | গরা  গনা  ধা | হ্মা  ধা  পহ্মগা |
    চা  দি  নী     র  স  নে      ম  ল  য়      প  ব  নে
```

+ +
গা গপা মা | গরা গা রগা | ধনা নরা রগা | সা সা সা |
এ লে কে গো ম ন ব নে র ছা য় ০

+ ০ +
গা মা গরা | গা পা হ্মা | পা পা পা II
মৃ দু ল চ র ণ ঘা য় ০

I। { পা পনা নধা | না নর্সা র্সা | র্সা র্সা -া | নর্সা ধনা পহ্মা | পা না ধনর্সা | না না না } |
আঁ খি র ঘ ন দি ঠী ০ ০ আ বে শে মি টি মি টি ০ ০
স্ম র ণ বী ণা খা নি ০ ০ বা জা য়ে এ লে জা নি ০ ০

পা পর্সা র্সা | র্সনা র্সর্সা পা | পা হ্মা পা | গা পা মা | মপমা গরা গা |
পু ল কে প রা ণ উ ত লা আ জি ত ব ০ ০
জী ব ন পশ রা ০ তো মা রে দি নু স ব ০ ০

গা মা পা | ধা না র্সনর্সা | ধা ধর্সা ণধা | পধা পহ্মপা মা | গা গা গা |
পু ল কে প রা ণ উ ত লা আ জি ত ব ০ ০
জী ব ন প শ রা তো মা রে দি নু স ব ০ ০

সা না সা | গমা গা মা | পা হ্মা পা | না না র্সা
স্ব প ন জ ড়ি ত শি থি ল বা হু তে
তো মা র সু রে র ম ধু র ছ ন্ দে

না নর্রা র্সনা | পহ্মা পা ধা | গমা গা পা | গমা গরা সন্‌া |
বাঁ ধি তে কি আ জি চা হ আ মা য় ০
আঁ খি তে ব র ষা বা রি ঘ না য় ০

গা মা গরা | গা পা হ্মা | পা পা -া II
মৃ দু ল চ র ণ ঘা য় ০

II সা গা রা | পা হ্মা পা | গা গপা মা | গা গা গা |
চি নি গো তো মা রে চি নি চি নি ০ ০

রা গা রমা | গা সা না | সা সরা রা | রা রা রা |
অ চে না ০ ও গো বি দে শি নী

সা পা পা | পা পা পা | পা পা হ্মা | গা মা গা |
হৃ দ য়ে গো প নে শু নি র য়ে র য়ে

পা পনা ধনা | পধা পা হ্মা | রা হ্মা হ্মা | পা পা পা |
নূ পু র রি ণি কি রি ণি ঝি ণি ০ ০

পা হ্মপা ধণা | ধা ধণা ধা | পধা পা হ্মা | রা হ্মা হ্মা | পা পা পা II II
ও গো ০ নূ পু র রি ণি কি রি ণি ঝি ণি ০ ০

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৬)

সাত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, যেদিনে বিশ্বপতি সত্যই নন্দাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল।

নন্দা রাখাল মিত্রের একমাত্র কন্যা। নন্দা ও বিশ্বপতি পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসিত,—তথাপি রাখাল মিত্র ইহাদের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

বিশ্বপতি শিক্ষিত নহে, তাহার অবস্থাও ভালো ছিল না। এরূপ পাত্র রাখাল মিত্র একমাত্র কন্যার জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই।

ব্যাপারটা যখন অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছিল, তখন অবস্থা গুরুতর দেখিয়া তিনি গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া, স্ত্রী-কন্যা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। তাহার পর হইতে বিশ্বপতির মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর নিতান্ত বাধ্য হইয়া কেবল মায়ের জিদে পড়িয়াই সে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিল।

মধ্যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল নন্দার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আবার দুজনের দেখা হইয়াছে।

নন্দা প্রস্তাব করিল "আমাদের সঙ্গে পুরী চল না বিশু-দা। যে চেহারা হয়েছে, এখানে থাকলে আর বাঁচতে হবে না তা বেশ বুঝছি। আমরা ওখানে দু-তিন মাস থাকব। তুমিও যদি এই মাস দু-তিন ওখানে থাক, তোমার স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসবে।"

বিশ্বপতি প্রথমটায় কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। ধনীর গৃহের বধূ নন্দা বাল্যসঙ্গী বিশুদাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। নন্দা দশ দিনের জন্য দেশের মাটীতে পা দিয়া আগেই যখন বিশুদাকে ডাকিয়া পাঠাইল, তখন, আনন্দে কি বিস্ময়ে কে জানে, কি একটা ভাবে তাহার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নন্দার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল।

নন্দা বিস্ময়ে খানিক তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া, তাহার পর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল, "বউ যত্ন করে না বুঝি,—খেতেও দেয় না?"

প্রথমেই এই প্রশ্ন শুনিয়া বিশ্বপতি তাহার বড় বড় চোখ দুইটী বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বাকে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া ছিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যত্ন করে না, খেতে দেয় না—কি করে জানলে?"

স্পষ্টবাদিনী নন্দা উত্তর দিয়াছিল, "তোমার চেহারা দেখে। সাত বছর আগে যে বিশুদাকে দেখে গিয়েছিলুম

তার সঙ্গে তোমার চেহারার এতটুকু মিল নেই। তাতেই বুঝতে পারছি—যত্ন কেউ করে না, খেতেও পাও না।"

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে বেচারাকে সে দোষ দিয়ো না নন্দা, সে আমায় যত্নও করে, যা পায় খেতেও দেয়। গরীবের ঘরে রাবড়ী পোলাও তো জোটে না, শাক ভাতই খেতে হয়। চেহারা যদি ভালো থাকবার হতো ওতেই থাকত,—সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। নিজের দোষে নিজের চেহারা নষ্ট করেছি, বউয়ের কোন দোষ নেই। বরং, এ কথা জোর করে বলতে পারি—সে আমায় এত যত্ন করে—হয় তো অনেক স্বামী স্ত্রীর কাছে এমন যত্ন পায় না।"

নন্দার মুখখানা নিমেষে মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, "উঃ, তুমি যে বউয়ের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে বিশুদা। কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, বউয়ে যত্ন করবে না তো কি পরে এসে যত্ন করবে? বউয়ের কর্ত্তব্যই যে স্বামীকে যত্ন করা, সেবা করা।"

সেদিন এইখানেই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল।

দুদিন থাকিতে থাকিতে নন্দা লোকের মুখে শুনিতে পাইল, বিশ্বপতি নিজেই তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য দায়ী,—সত্যই বেচারা বউটীর উপর এ জন্য দোষারোপ করা চলে না। আজ ছয় সাত বৎসর সে অধঃপাতে গিয়াছে। তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য কল্যাণী বড় কম চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেছে।

ছয় সাত বৎসর!—নন্দা যেন চমকাইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ সেই একটী দিনের অতীত স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে গোপনে সে চোখের জল মুছিয়াছিল।

সে গোপনে বিশেষ ভাবে সন্ধান লইয়া জানিল, বিশুদার স্ত্রী নেহাৎ ভালো মানুষ। নহিলে এত দিন হয় তো স্বামীকে ফিরাইতে পারিত। চন্দ্রাকে লইয়া যে কেলেঙ্কারী কাণ্ড চলিয়াছে, সে কথাটাও নন্দার নিকট গোপন রহিল না। বিশুদার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নন্দা সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বপতিকে পুরীতে লইয়া যাইবার কথা সে যখন আবার তুলিল, তখন বিশ্বপতি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সে কি করে হবে নন্দা, তুই একদিন নয়, একেবারে কয়েক মাসের জন্যে যাওয়া—"

নন্দা রাগ করিল, বলিল, "ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় বিশুদা,—তোমারই বা যাওয়া না হবে কেন? তোমার এমন কি বিষয়-সম্পত্তি আছে যা তুমি না থাকলে একেবারে লাটে উঠবে? সম্পত্তির মধ্যে তো ওই কয়েক বিঘা জমী। সেও তো একজনের হাতে দিয়ে রেখেছ। কাজেই, ওর কথা ভাববার তোমার দরকার নেই। ও সব বাজে কথা রেখে দাও বিশুদা। আর সকলকে ওই সব যা তা কথা বলে বুঝাতে পারবে, আমায় পারবে না। তুমি সহজে না যেতে চাও, আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব,—তোমায় না নিয়ে আমি যাচ্ছি নে।"

নিতান্ত নিরুপায় ভাবেই বিশ্বপতি বলিল, "বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই যে যেতে পারছিনে তা নয় নন্দা, যেতে আমারও খুব ইচ্ছে আছে। তবে কি জানো—রাঙাবউ একেবারে একা থাকবে, ওকে দেখতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একা মেয়ে মানুষ কি করে থাকবে, কেই বা ওকে দেখাশুনা করবে, আমি কেবল তাই ভাবছি।"

নন্দা অকস্মাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "থাক, অতটা ভালোবাসা আর নাই দেখালে বিশুদা, তবু যদি আমার কিছু শুনতে বাকি থাকত। এই যে শুনতে পাচ্ছি তুমি অনেক রাতই বাড়ী থাক না, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তুমি বাড়ীতে খাও না,—সে সব দিন রাতগুলো কেমন করে তার কেটে গেছে সেটা ভেবে দেখেছ কোন দিন?"

বিশ্বপতি যেন সচেতন হইয়া উঠিল,—"কি রকম? এ সব কথা তুমি কোথা হতে শুনলে বল দেখি, কে বললে?"

নন্দা বলিল, "শুনেই বা লাভ কি? নাম করব কার, গাঁয়ের লোক সবাই এই এক কথাই বলছে এখানে তুমি থাকলেও বউ যেমন থাকে, তুমি চলে গেলেও ঠিক তেমনি থাকবে। বরং পতিব্রতা মেয়েদের মত মনে করে শান্তি পাবে—সে কষ্ট পাক দুঃখ পাক—

তার স্বামী তো ভালো আছে, তার স্বাস্থ্য তো ভাল আছে।"

বিশ্বপতি একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ফুটিল না, মুখখানাই কেবলমাত্র বিকৃত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "থাক, আর বলতে হবে না নন্দা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। তুমি কবে যাচ্ছো বল দেখি ?"

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আজই রাত্রে রওনা হওয়ার জন্যে তাগাদা এসেছে। উনি হাওড়ায় এসে থাকবেন, আমরা এদিক হতে যাব, এই ব্যবস্থা করে পত্র দিয়েছেন। তুমি তা হলে আর দেরী করো না, বউকে দেখবার শোনবার জন্যে কাউকে ঠিক করে দিয়ে তোমার যা জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

বিশ্বপতি তথাপি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি,—আর কোন কথাবার্ত্তা আছে না কি ?"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল।

নন্দা বলিল, "বুঝেছি, তোমার এ গাঁ ছেড়ে যেতে মন সরছে না। বলি, বউয়ের ওপর তো এতটুকু মায়াদয়া নেই শুনেছি, তবে কিসের মায়ায় যেতে চাচ্ছো না শুনি ?"

বিশ্বপতি হাসিল, বলিল, "কি যে বল নন্দা—" সে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার হাসিতে একটুকুও জোর ছিল না।

নন্দা বলিল, "তা হলে যাও, আর দেরী করো না। সনাতনকে বলে এসো—তুমি যে তিন মাস পুরীতে থাকবে, এই তিন মাস যেন সে তোমার বাড়ী, বউ চৌকী দেয়। তোমার বউকেও বেশ করে বুঝিয়ে বলে এসো— তোমার কোন ভয় নেই, এতে তোমার ভালোই হবে। আর যাওয়ার সময় বাগদী পাড়াটা ঘুরে যেয়ো একবার। ওদেরও তো একবার জানানো দরকার, নইলে সে বেচারারাই বা কি ভাববে।"

তাহার শ্লেষপূর্ণ কথাটা বিশ্বপতির বুকে বড় বেশী রকমই আঘাত দিল, তাহার সুগৌর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে উষ্ণ স্বরে বলিল, "সেই সঙ্গে এ খবরটা তোমার পাওয়া উচিত ছিল নন্দা,—বাগদী পাড়ায় যাকে খবর দেব সে নেই,—আজ কয়দিন হল তোমারই কাকার সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছে।"

নন্দা যেন আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই না কি,—বাঁচলুম। আমার কাকার সঙ্গে সে যেখানে খুসি যাক, আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই ; কারণ, আমার কাকা বিপত্নীক, উনি গেলে ওঁর পেছনে কাঁদতে কেউ নেই। তিনি অধঃপাতে গেলেও কারও কিছু আসবে না যাবে না, ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কারও নেই। তোমার অধঃপাতে যাওয়ার সঙ্গে আমার কাকার অধঃপাতে যাওয়ার ঢের তফাৎ আছে সেটা ভেবে দেখো। যাক, তোমার ঘাড় হতে যে পেত্নী নেমে গেছে, এর জন্যে আমি হরিলুট দেব।"

বিশ্বপতি মলিন হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

পথেই সনাতনের সঙ্গে দেখা। বিশ্বপতি তাহাকে জানাইল, সে মাস দুই তিনের জন্য পুরী যাইতেছে। এই দুই তিন মাস সনাতনকে তাহার বাড়ী দেখাশুনা করিতে হইবে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ যে পুরী চললেন, মানে ?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "মানে আর কি ? ওরা যাচ্ছে, দয়া করে সঙ্গে নিচ্ছে,—ভাবলুম পরের দয়ায় এই সুযোগে যদি জগন্নাথ দর্শনটা হয়ে যায় যাক না। বাড়ীর ভার কিন্তু তোমারই ওপরে থাকল সনাতন! সব যেন ঠিক থাকে দেখো। তোমার মা লক্ষ্মীকে দেখাশোনা—"

সনাতন একটু হাসিল, বলিল, "সে কথা আমায় আর বলতে হবে না দা-ঠাকুর। এই যে প্রায়ই রাতে তুমি বাড়ী থাক না,—মা-লক্ষ্মী একা কি ওই বাড়ীতে থাকতে পারে,—কাজেই এই বুড়োকেই গিয়ে পাহারা দিতে হয়। যাক, কপালে যখন জুটল, ঠাকুর দর্শন করে এসো, আমি ওঁকে দেখাশোনা করব।"

নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্বপতি বাড়ী আসিল।

"কই গো রাঙাবউ, কোথায় গেলে ? বাক্সের চাবিটা একবার দাও দেখি, বিশেষ দরকার।"

কল্যাণী রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করিতেছিল, হাত ধুইয়া অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া স্বামীর সামনে ফেলিয়া দিল।

বিশ্বপতি তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া কাপড় জামা বাছিতে লাগিল।

পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল কল্যাণী, শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "পুরী যাচ্ছো, ফিরবে কবে?"

বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "জানলে কি করে?"

চোখ দুইটী জ্বালা করিতেছিল, তবু কল্যাণী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "খবরটা আমায় কোন রকমে না জানানোই ইচ্ছে, তা আমি জানি। সারা গাঁয়ের লোক জানতে পারলে, আমি জানতে পারব না? যাক, ফিরছ কবে, এখানকার কি ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছো?"

বিশ্বপতি বলিল, "ফিরতে বোধ হয় মাস দুই তিন দেরী হবে। এখানকার ব্যবস্থা ঠিক করেছি। সনাতন রয়েছে, তোমার কিছুমাত্র ভাবনা করতে হবে না। আমি হয় তো এর মধ্যেও ফিরে আসতে পারি। মহাপাপী লোক, শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে কি মন টিঁকে থাকবে? ওই জন্যেই না কোথাও যেতে পারিনে, গেলেও একদিনের বেশী দুদিন থাকতে পারিনে।"

কথাগুলি বলিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল। তাহার সে হাসিতে কল্যাণীর গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল মাত্র।

ছোট স্যুট-কেসটার মধ্যে দুখানা কাপড় জামা গুছাইয়া লইয়া বিশ্বপতি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তা হলে এখনই চললুম রাঙা-বউ, ওদের ওখানেই খাওয়া দাওয়া হবে, নন্দা বলে দিয়েছে। সনাতন সন্ধ্যেবেলাই আসবে এখন, তোমার কোন ভয় ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো, নিজের শরীরের দিকে নজর রেখো—বুঝলে?"

দুঃখের আবেগে কল্যাণীর সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল। নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর। সংসারী সে, তাহার সবই তো আছে, কাহার ডাকে সে একটী মুহূর্ত্তে বাড়ী ঘর, স্ত্রী সব পিছনে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! সে কে? সে তাহাকে কতখানি দিয়াছে?

আর কল্যাণী, সে স্বামীকে সর্ব্বস্ব দিয়া দাসীরও অধম হইয়া, কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া রহিয়াছে! তাহার কথা বিশ্বপতি একটীবার মনে করিল না, তাহার কষ্টের পানে একটীবার চোখ তুলিয়া চাহিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী ভাবিল স্বামীর হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায়? বিবাহ দুইটী মানুষকে একত্র করে, তাহাদের জীবন সুখময় করে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সে ধারণা ভুল। বিশ্বপতির হৃদয় অন্যের অধিকৃত, সেখানে বিবাহিতা পত্নীর স্থান কোথায়?

স্বামীর পিছনে চলিতে চলিতে আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "তোমার শরীর মোটেই ভালো নয়, মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে জানাতে পারবে কি কেমন আছ?"

চলিতে চলিতে বিশ্বপতি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখখানা নত করিয়া পত্নীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, তাহার বড় বড় দুইটী চোখে জল টল টল করিতেছে।

কি মনে করিয়া সে চট করিয়া হাতখানা কল্যাণীর স্কন্ধে রাখিল। মুখখানা নত করিতেই কল্যাণীর ললাটে ঠেকিল। তখনই চমকাইয়া উঠিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া সে বলিল, "দেব বই কি, তুমিও দিয়ো।"

সে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে একবার পিছন পানে তাকাইয়া দেখিল, কল্যাণী আড়ষ্ট ভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে,—তাহার চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

আনন্দপূর্ণ মনটা কি জানি কেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

(৭)

বড় দুঃখেও মানুষের হাসি আসে।

তাই প্রথম যেদিন নিশীথ রাত্রে বাড়ীর উঠানে কোথা হইতে গোটাকত ইঁট আসিয়া পড়িল, সেদিন কল্যাণী না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

সনাতন ঘুম ভাঙ্গিয়াই লাঠি হাতে ছুটিয়াছিল। কিন্তু যাহারা ঢিল ছুঁড়িয়াছিল, তাহারা, তাহার যথাস্থানে পৌঁছাইবার অনেক আগেই, অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সনাতন বলিল, "বুঝেছ মা-লক্ষ্মী, এ সব এই গাঁয়ের বদ ছোঁড়াদের কাজ। কেবল ওরা কেন, গাঁয়ের অনেক লোকই জানে দা'ঠাকুর পুরী গেছে, দুই তিন মাস বাড়ী আসবে না। ভাবছে—এই সময়ে একবার বীরত্ব দেখিয়ে নেওয়া যাক।"

কল্যাণী হাসিতেই সে একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রস্বরে বলিল, "না, তুমি হেসো না মা, ওতে ছোটলোকগুলা প্রশ্রয় পেয়ে যায়। এটা হাসির কাজও নয়, কথাও নয়। আমি এর উপায় করব তবে আমার নামসনাতন দাস। কালই আমি এই সব বদ ছোঁড়াদের দেখে নেব। এই পাকা বাঁশের লাঠির ঘায়ে এক একটাকে কাবার করে দেব, জানাব,—সনাতন দাস বুড়ো হলেও তার বুকে সাহস আছে, হাতে জোর আছে।"

বাঁশের লাঠিটা সে দু-চারবার খুব জোরে মাটিতে আছড়াইল।

কথাটা শুনিয়া হাসি পায়। কিন্তু হাসিলে পাছে সনাতন আবার অতিরিক্ত রকম চটিয়া উঠে, তাই কল্যাণী হাসি সামলাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "বুঝলুম তো সবই, কিন্তু কথা হচ্ছে কি—প্রকৃত দোষীকে পাবে তবে তো তাকে লাঠির ঘায়ে কাবার করবে। সত্যি, গাঁয়ে যত ছেলে আছে সবাই কিছু দোষী নয়,—আমার বাড়ী ঢিল ফেলতে সবাই আসে নি। ওদের মধ্যে দু-চারজন হয় তো এ কাজ করেছে, তুমি তাদের ধরবে কি করে?"

সনাতন ভাবিয়া দেখিল কথাটা সত্য। নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া সে বলিল, "তাই তো! তবে?"

কল্যাণী বলিল, "একেবারে হাতে হাতে না ধরলে কিছুই করতে পারবে না। সন্দেহ করে তুমি ধরবে কাকে, লাঠি মারবে কার মাথায়?"

ইহার পর দুই তিন দিন সনাতন জাগিয়া পাহারা দিল। সে কয়দিন কোন উৎপাত হইল না, কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘাটে নরেনের স্ত্রী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী না কি ঢিল পড়েছে ভাই?"

কল্যাণী গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "কই—না।"

সে বেচারা থতমত খাইয়া গেল।

সেদিন দুপুরে বেড়াইতে আসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "কাজটা ভালো করনি বউ-মা,—ছেলেটাকে ওদের সঙ্গে কখনও পাঠাতে হয়? এই সামনে রথ আসছে,—লাখ লাখ যাত্রী সেখানে যাবে,—আর কি মড়কই না সেখানে ধরবে। এ সময় না কি কেউ কাউকে পুরীতে পাঠায়?"

শান্ত সুরেই কল্যাণী বলিল, "রথের সময়েই তো সকলে পুরী যায় জ্যেঠাইমা।"

জ্যেঠাইমা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি আর বলো না বাছা। রথের সময় পুরীতে যায় কারা, যাদের আপনার বলতে কেউ নেই, কিম্বা যাদের পাঁচটা ছেলে-পুলে আছে, নিজে গেলে বংশধ্বংস হবে না, তারাই যায়। বিশুর মত কয়টা ছেলে পুরী যায় বল দেখি?"

কল্যাণী বলিল, "ওঁরাও তো গেছেন, ওই নন্দা, তার মা, স্বামী—"

বিকৃত মুখে কাত্যায়নী বলিলেন, "জামাই কি সেখানে আছে গো, সে তো চলে এসেছে শুনছি। সে হচ্ছে কাজের লোক, সে কি ওখানে বসে থাকতে পারে? আর নন্দা, মিত্রগিন্নির কথা বলছ,—ওরা মেয়েমানুষ, দুনিয়ার জঞ্জাল, ওরা সহজে মরছে না, সে তুমি ঠিক দেখে রেখো। পুরুষ যত মরে হতভাগী মেয়েগুলো সে রকম মরে কি? মেয়েদের আমাদের দেশে যত বেশী দেখতে পাওয়া যায়, পুরুষ অত কই?"

কল্যাণী ইহার উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইল, দরকার নাই অনর্থক বিবাদে।

কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি বাছা আজকালকার মেয়ে হলেও স্বামীকে যে কি করে ঘরে আটক করে রাখতে হয় তা জানো না। বলি, তুমি যদি সে রকম মেয়ে হতে তা হলে কি বিশু আজ কোথায় হাড়ি-বাড়ী, বাগ্‌দী-বাড়ী, মুচি-বাড়ী ঘুরে বেড়াত, না এই নন্দার একটী কথায় ঘর পরিবার ফেলে এমনি করে দূর বিদেশে যেতে পারত? স্বামীকে ভালোর পথে আনা দূরে থাক, ওকে অধঃপাতের পথে আরও এগিয়ে তুমিই দিলে বাছা। নন্দার কথা দেশে জানে না কে? আগে তবু নরম-সরম ছিল, কথা বললে শুনতো, এখন একটা কথা বলতে গেলে সে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। ওই সেদিনে বললুম 'বাছা, নিজে যাবি যা, পরের ছেলেটাকে আরও অধঃপাতে দিতে আর কেন নিয়ে যাচ্ছিস, ওকে ছেড়ে দে।' তাতে হেসে বললে কি—'মার চেয়ে দরদী যে তাকে বলে ডান' তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে, আমার দিকে তাকিয়ে তোমায় মাথা গরম করতে হবে না।' শুনলে মা কথাগুলো? ও না হয়

বড়লোকের মেয়েই হলো, বড় ঘরে না হয় বিয়েই হয়েছে। তা বলে এত দেমাক, এত অহঙ্কার, এ কি ধর্ম্মে সইবে?"

কল্যাণীর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

সমস্ত দিনটা তবু যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া যায়, —রাত্রি হইলেই বিশ্বের ভাবনা সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। বারাণ্ডায় পড়িয়া সনাতন দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমায়, ঘরের মধ্যে কল্যাণী ছটফট করে।

আজ প্রায় এক মাস হইল বিশ্বপতি চলিয়া গেছে, এ পর্য্যন্ত একখানি পৌঁছা সংবাদ পর্য্যন্ত দেয় নাই। মানুষ এমনই করিয়া কি সব ভুলিয়া যায়,—কেবল সম্মুখ পানেই ছুটে, পিছন পানে ফিরিয়া চায় না?

সময় সময় মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্বামী ফূর্ত্তির জন্য চলিয়া গেছে,—আর সে তাহার স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া তাহার ভিটায় বাস করিবে কেন? কেবল বিবাহের দাবীটাই কি বড় হইল, সেই বন্ধনটাই শ্রেষ্ঠ, তাহারই বলে পুরুষ যত কিছু অত্যাচার অনাচার করিয়া যাইবে? অন্তরের বন্ধন যেখানে নাই, উপরের এই আলগা বন্ধন সেখানে কতক্ষণ অটুট হইয়া থাকিবে?

পাড়ার ছেলেগুলিও যেন বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন বিশ্বপতি থাকিতে ইহারা কখনও চোখ তুলিয়া কল্যাণীর পানে তাকায় নাই, আজ বিশ্বপতি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের চোখ কল্যাণীর উপর পড়িল।

অথচ এমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের বেশ দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়, অথবা সনাতনকে বলিয়া দিতে পারা যায়। তাহারা বাড়ীর পাশ দিয়া অশ্রাব্য গান গাহিয়া চলিয়া যায়, কল্যাণী নীরবে শুনিয়া যায়, কথা বলিতে পারে না।

একদিন সনাতন নিজের কানে শুনিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। ছেলেরাও জবাব দিয়াছিল—"তুমি চুপ করে থাকো সনাতন! আমরা পথ দিয়ে গান গেয়ে যাই, তাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। না শুনতে পারো, কান বন্ধ করে রাখ—ফুরিয়ে গেল।"

নিমাই ছেলেটী বরাবর এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিত,—বিশ্বপতিকে সে দাদা বলিয়া ডাকিত,—এবং সেই জন্যই কল্যাণীকে সে বউদি বলিয়া ডাকিত। কল্যাণী কখনও তাহার সহিত কথা বলে নাই, অনেক সময় লুকাইয়া থাকিত।

বিশ্বপতির মনটা ছিল সাদা, সে স্ত্রীকে বলিত, "নিমাইকে দেখে অতটা লজ্জা করো না রাঙাবউ,—ওর মত পরোপকারী ছেলে পাওয়া দুর্ঘট। যে সব ছেলেরা বদমায়েসী করে ফেরে, নিমাই তাদের দলের নয়, এ আমি শপথ করে বলতে পারি।"

তথাপি কল্যাণী অবগুণ্ঠন খুলে নাই, কথাও বলে নাই। এই নিমাইয়ের মধ্যে সে কোন দিনই সন্দেহের লক্ষণ দেখিতে পায় নাই। এবার যেন তাহার একটু সন্দেহ হইল।

মাঝে কয়দিন সনাতনের জ্বর হইয়াছিল, তখন নিমাই অনবরত যাওয়া-আসা করিত, তদারক করিত, ঔষধ আনিয়া খাওয়াইত। ইহাতে কল্যাণী সত্যই যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল, কৃতজ্ঞও হইয়াছিল বড় কম নয়।

স্বামী থাকিতে সে কাহাকেও কোন দিন সন্দেহ করে নাই। এইবার প্রথম তাহার মনে হইল—না ডাকিতে নিমাই কেন আসিয়া সনাতনের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল?

আজকাল বাধ্য হইয়াই অবগুণ্ঠন খুলিতে হইয়াছে; তবু সে বড়-একটা কথা বলিতে চায় না।

নিমাই আজকাল অনেক জিনিস আনিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। প্রায়ই মাছ তরকারী চাকরের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। সঙ্কুচিতা কল্যাণী একদিন সনাতনকে মাঝে রাখিয়া নিমাইকে শুনাইয়া বলিল, "নিমাই-ঠাকুরপোকে বলে দাও সনাতন, আমি একলা মানুষ, এত মাছ তরকারীতে আমার কিছুমাত্র দরকার নেই। আমার যেমন করে দিন চলছে এমনই চলবে, এ সব দেওয়ার দরকার নেই।"

এই সোজা কথাটাতেও নিমাই রাগ করিল, দুঃখ পাইল; বলিল, "এ অন্যায় কথা বউদি, সত্যি করে বল দেখি, বিশুদা থাকতেও কি আমি জিনিসপত্র দিতুম না? আমি তো পয়সা দিয়ে কিনে কিছু দিচ্ছিনে, পুকুরের মাছ, বাগানের তরকারী পাঠিয়ে দেই।

বরাবরই তো দিয়ে আসছি, কই,— বউদি তো কখনও কোন আপত্তি করেন নি, আজই যত আপত্তি তুলছেন।"

কল্যাণী একেবারেই এতটুকু হইয়া গেল। ইহার পর সে আর এ সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতে পারে নাই।

নিমাই এ দেশের ছেলেদের নিন্দা করিত। এই সব ছেলেরা না পারে এমন কোন কাজ নাই। তা না হইবেই বা কেন? ইহারা কি শিক্ষা পাইয়াছে,—মেয়েদের যে সম্মানের চোখে দেখিতে হয়, তা কি ইহারা জানে? জন্ম হইতে এই দেশেই পড়িয়া আছে,—মেয়েদের ছোটবেলা হইতে নিতান্ত হেলার চোখেই দেখিয়া থাকে, —ভোগের বস্তু বলিয়া মনে করিয়া যায়।

নিমাই নিজে জীবনের বাইশটা বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া আজ মাত্র তিন বৎসর গ্রামে আসিয়া রহিয়াছে। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে এখনও তাহার সম্প্রীতি হয় নাই। সে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কাজেই, শিক্ষার গর্ব্ব তাহার মধ্যে বেশই আছে।

বলা বাহুল্য, নিমাই শীঘ্রই বেশ জাঁকাইয়া বসিল। কল্যাণী ধারণায় আনিতে পারিল না—বাইশটা বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া এবং বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া নিমাইয়ের মন আজও তেমন হইতে পারে নাই যাহাতে মেয়েদের মা-বোন ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। মুখে সে মেয়েদের মায়ের জাতি বলিয়া চরম সম্মান দেখাইলেও, অন্তরে তাহার অনেকখানি গলদ রহিয়া গেছে, এবং সেও মেয়েদের ভোগের বস্তু বলিয়াই মনে করে।

বাঘ কখনই নিজের স্বভাব ছাড়িতে পারে না। সে যতই ছদ্মবেশে থাক, ধার্ম্মিকের ভান করুক, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করুক,—সময় পাইলেই সে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবেই। গায়ের উপর মেষের আচ্ছাদন দিলেও সে মেষ হয় না,—তাহার মধ্যে হিংস্র জন্তুটী সর্ব্বদার জন্য সচেতন হইয়াই থাকে। লাভের মধ্যে এই হয়—বাঘকে নিজ বেশে দেখিলে লোকে সাবধান হইতে পারে; কিন্তু মেষচর্ম্মাবৃত বাঘকে দেখিয়া কেহই সাবধান হইতে পারে না,—সেও নিজের ইচ্ছানুসারে নিজের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যায় মাত্র।

(৮)

ভাদ্রমাসের শেষে হঠাৎ একদিন সনাতনের মুখে কল্যাণী সংবাদ পাইল—বিশ্বপতির বড় অসুখ, তাহার না কি বাঁচিবার আশা নাই।

কল্যাণী কাঁদিবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে অজস্র চোখের জল অবাধ্য গতিতে নামিয়া আসিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিয়া গেল।

মনে হইল—সে যাহাই করুক, যাহাই হোক, তবু সে কল্যাণীর স্বামী। আবার শুধু স্বামী হইলেই হইত না, কল্যাণী তাহাকে ভালোবাসে। স্বামীর ঠিকানা সে পাইয়াছিল, নিতান্ত রাগ করিয়াই সেও তাহাকে পত্র দেয় নাই। সে রাগটাও তো নিরর্থক নয়। তাহারও কি সেখানে পৌছাইয়া অন্ততঃপক্ষে একখানা পত্র দেওয়া উচিত ছিল না? সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে সে গিয়াছে, ভাদ্রও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, বাড়ী আসা দূরে থাক, একখানি পত্রও লেখার সময় তাহার হয় নাই।

কত দিন নিস্তব্ধ ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে নির্জ্জলচক্ষে মনে মনে বলিয়াছে—এই কি ভালো কাজ? কত দিন সে অন্যমনস্ক ভাবে আত্মবিস্মৃত ভাবে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়াছে—.

"সে কোথায় দূর বিদেশে হেসে কাটায় মধুরাতি
হেথা যে বুকে আমার জ্বলে মরে আশা বাতি—
ভুলেছে সে,— তবু কেন তারে বাঁধি?"

পুঞ্জীভূত সকল রাগ দুঃখ অভিমান এই একটী সংবাদে আজ দূর হইয়া গেল। সে কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

সেখানে কে তাহাকে তেমন করিয়া দেখিবে? কল্যাণী যেমন ভাবে তাহার সেবাযত্ন করিতে পারিত, নন্দা তেমন করিতে পারিবে কি? না হয় সে বিশ্বপতিকে ভালোবাসে, বিশ্বপতি তাহাকে ভালোবাসে; কিন্তু তবু তাহারা যখন সমাজে বাস করে, সমাজের আইন কানুন মানিয়া দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাহাদের চলিতেই হইবে। এ সময়ে যদি নন্দার স্বামী সেখানে থাকে, নন্দা তো বিশ্বপতির কাছে সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। যদি বিশ্বপতির কিছু হয়, যদি সে ইহলোক ত্যাগ করে, যাইবে কার? নন্দার কতটুকু ক্ষতি হইবে? সে যেমন আছে তেমনই থাকিবে, তাহার নাম বাংলার অভাগিনীদের তালিকা-ভুক্ত হইবে না, সর্ব্বনাশ হইবে যে কল্যাণীর। সে রাগ করুক,—দূরে থাক, তবু কল্যাণী বিশ্বপতিকে ভালোবাসে, তাহার অকল্যাণ কল্পনায় কল্যাণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

তাহার সর্ব্বস্ব যায় এ সংবাদ পাইয়া সে এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে কি করিয়া? কিন্তু উপায় কই? সে সেখানে—সেই দূরদেশে যাইবেই বা কি করিয়া?

এতক্ষণ হয় তো সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে। তাহার পীড়িত শয্যাপার্শে কেহ নাই, কেহ তাহার মাথার উপর স্নেহপূর্ণ হাতখানি রাখে নাই। কেহ তাহাকে দুইটা সান্ত্বনার কথা বলিতে নাই! সে একা বিছানায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, হয় তো তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। উঃ, এ কল্পনাও যে অসহ,—কল্যাণী যে আর থাকিতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় নিমাই আসিবামাত্র সে তাহার সামনে আসিয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকুর-পো, এ যাত্রা আমায় বাঁচাও, আমার ভাইয়ের কাজ কর। আমায় কালই তোমায় পুরী নিয়ে যেতে হবে। ওঁর নাকি সেখানে বড্ড অসুখ, বাঁচবার কোনও আশা নেই।"

আজ এই প্রথম তাহার সঙ্কোচহীন কথাবার্ত্তা। বিপদে পড়িলে লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই থাকে না।

নিমাই প্রবোধ দিয়া বলিল, "তা না হয় যাব, তার জন্যে তুমি এত কাঁদতে আরম্ভ করেছ কেন বউদি?"

চোখ মুছিতে মুছিতে কল্যাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কান্না আসে না? সেখানে কেউ নেই,—কে তাঁকে দেখছে—সেবা করছে বল দেখি?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নিমাই বলিল, "ক্ষেপেছ বউদি, সেখানে নন্দা আছে তা জানো? সেবা করবার লোক যদি কেউ না থাকত, তোমায় নিশ্চয়ই যাওয়ার জন্যে খবর দিত। তা যখন দেয় নি, তখন জেনে রাখ, তোমার ও-সব মিথ্যে কল্পনা। নন্দা তাঁকে সে সব কষ্টের আভাসই পেতে দেয় নি এ আমি ঠিক বলছি।"

সোজা কথাটা শুনিয়া কল্যাণী কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতেই কখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল।

নিমাই গম্ভীর ভাবে বলিল, "তবু যেতে যখন চাচ্ছ, চল,—এর পর যে বলবে—ঠাকুর-পোকে এত করে বলা সত্ত্বেও সে নিয়ে গেল না—সেটী হবে না, অত বড় অপবাদটা আমি সইতে পারব না। আমি কালই তোমায় নিয়ে রওনা হব, গিয়ে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে বউদি—আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কি না। গিয়ে দেখতে পাবে, বিশুদা দিব্যি আরামে শুয়ে থেকে নন্দার সেবা নিচ্ছেন, ভূপেনবাবুর চেয়েও সুখ-শান্তিতে আছেন, নন্দা দিনরাত তাঁর পাশেই আছে। তুমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে সেখানে একটা বিপ্লবই বাধিয়ে তুলবে মাত্র, ওঁদের নিরুপদ্রব শান্তি নষ্ট হবে, আর তাতে কেউই তোমার ওপর খুসি হবেন না, তোমার সতীধর্ম্মও সেখানে উপহাস্য হবে—এ আমি তোমায় লিখে দিচ্ছি।"

কল্যাণী মুখখানা অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল।

নিমাই বলিল, "তা হলে তুমি তোমার কাপড় গুছিয়ে ঠিক করে রেখো, আমি কাল দুপুরের ট্রেনে তোমায় নিয়ে রওনা হব,—কেমন?"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "না থাক, আমি যাব না।"

একটু হাসিয়া নিমাই বলিল, "ওই তো তোমাদের মেয়েজাতির দোষ,—শোন যদি একটু কিছু হয়েছে অমনি ফেটে চৌচির হয়ে পড়। রাগ দুঃখ এখন শিকেয় তুলে রেখে দাও, যখন যাব বলেছ তখন চল একবার, নিজের চোখে সব একবার দেখে এসো বিশুদা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে।"

কল্যাণীর মুখখানা ক্রমেই নত হইয়া পড়িল। তাহারই স্বামীর সম্বন্ধে একজন অনাত্মীয় লোক যে

এতগুলা কথা বলিল, তাহাতে সে একটা প্রতিবাদও করিতে পারিল না। করিবে কি করিয়া। সত্যই যে তাহার স্বামীর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা লইয়া তাহার পক্ষ হইয়া দুইটা কথা শুনাইয়া দিতে পারা যায়।

পরদিন নিমাই যখন একেবারে গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সামনে একটা ছোট বাক্সে খানকত কাপড় সাজাইয়া কল্যাণী স্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল।

নিমাইকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "থাক ঠাকুরপো, আমি যাব না।"

নিমাই বলিল, "তা কি হয় বউদি? এখন সব ঠিক করে 'যাব না' বললে চলে না। আমি বাড়ীতে মাকে বলে এসেছি, গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে এনেছি, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। চল, একবার না হয় চোখে দেখেই আসবে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনলাভও হবে। তোমাদের শাস্ত্রে মহাপ্রভুর দর্শন মহাপুণ্যের কাজ বলে—না? চল না, একঢিলে না হয় দুই পাখীই মেরে আসবে।"

বলিতে বলিতে সে হাসিতে লাগিল।

মনটা যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, তথাপি কল্যাণী জোর করিয়া হাসিল, বলিল, "আমাদের শাস্ত্রে বলে,—তুমি কি আমাদের শাস্ত্রছাড়া লোক?"

নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই। আমি কোন দিনই তোমাদের ওই ছত্রিশ কোটি দেবতাকে মানতে পারি নি, পারবও না। অনেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি বউদি, কেউ বশে আনতে পারে নি, আশা করি পারবেও না। এ একটা সৃষ্টিছাড়া লোক বউদি, কোন দিন ধর্ম্ম নামে জিনিসটার ওপর এতটুকু আস্থা হল না, য শুনি তাইতেই যেন হাসি পায়। সত্যি কথা, ধর্ম্ম জিনিসটার অর্থ কোনদিনই আমি খুঁজে পাই নি। ধর্ম্ম অর্থ যা আমাদের ধারণ করে। তা হলে বলবে, ধর্ম্ম ছাড়লেই আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ যেন একটা গাঁজাখোরের কথা—যে ধর্ম্মই আমাদের ধরে আছে। অনেক নাস্তিকও তো আছে যারা ধর্ম্ম জিনিসটাকে মোটেই মানে না। ওরা বেঁচে রইল কি করে বুঝাও।"

কল্যাণী শান্ত কণ্ঠে বলিল, "অত জ্ঞান পাই নি ঠাকুরপো, মোটামুটি জানি—যারা ধর্ম্ম ছাড়ে, জগতে দুদিনের জন্যে তারা হেসে খেলে দিন কাটিয়ে গেলেও, মরণের পরে তাদের নরকে যেতে হবে।"

নিমাই গম্ভীর মুখে বলিল, "ওই দেখ, গোড়াতেই একটা মস্ত বড় গলদ বাধিয়ে রেখেছ। স্বর্গ, নরক, ইহলোক, পরলোক, জন্মান্তর, এই রকম সব বড় বড় গালভরা নামগুলো মুখস্থ করে রেখেছ,—এগুলো সত্যিই আছে কি না সে সম্বন্ধে কেউ খোঁজ করে প্রমাণ পেয়েছে? আমি সৎ কাজ করছি, অতএব স্বর্গ আমার; আর তুমি পাপ কাজ করছ, কাজেই নরক তোমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট,—আগে ভেবে দেখ পাপ পুণ্য কাকে বলে, তার পর স্বর্গনরকের বিচার হবে। তুমি তোমার ছত্রিশ কোটী দেবতা মান, মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম কর, কাজেই স্বর্গে তোমার স্থান, আর আমি কিছু মানি নে, মানি শুধু আমার আত্মাকে, তাই আমি নাস্তিক, সেই জন্যেই আমায় যেতে হবে নরকে। বল দেখি, স্বর্গ কোন দিন দেখেছ, নরক নাম শুনেছ—চোখে দেখতে পেয়েছ? মরে কোথায় যাব তার ঠিক কেউ কোন দিন পায় নি, অথচ এতগুলি প্রাণ যে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে শূন্য পথেই থেকে যাবে, সেকালের লোকেরা তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি, তাই তারা মনগড়া দুটো জায়গা রেখেছে। এ যুগের মানুষ যদি দেখেশুনে বুঝেসুঝেও তাই মানতে চায়, তাদের কি বলব বল দেখি?"

বিস্ময়ে দুটি চোখ বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণী নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। নিমাই দেবতা মানে না তাহা সে জানে। কিন্তু সে যে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল সবই নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়াছে, সে খবর সে পায় নাই। জগতে এমন লোকও আছে যে কেবল প্রত্যক্ষ ইহলোকটাকেই মানিয়া যায়, বর্ত্তমানকেই শেষ বলিয়া জানে, ইহার পরে কি আছে তাহা দেখিতে চায় না, মানিতে চায় না?

নিমাই আর কোন কথা না বলিয়া নিজের হাতেই বাক্সটা বন্ধ করিয়া গাড়োয়ানকে বাক্স লইয়া যাইতে ডাকিল। সনাতনকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিয়া কল্যাণীর পানে তাকাইয়া বলিল, "গাড়ীতে ওঠো, কথাবার্ত্তা বলতে বলতে যাওয়া যাবে এখন। এদিকে ট্রেনের সময় হয়ে এল, আর দেরী করলে চলবে না।"

কল্যাণী গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল, নিমাই সামনে বসিল।

সাদা কাশ ফুলে মাঠের অনেকখানি জায়গা ভরিয়া গিয়াছে, বাতাস আসিয়া তাহাদের পরশ করিয়া বুকে আনন্দের শিহরণ তুলিয়া পলাইতেছে। মাঝে মাঝে ধানের জমী সারি সারি চলিয়াছে। এই মাঠের ওপারে রেল ষ্টেসন।

শ্রান্ত নয়নে সবুজ মাঠের পানে তাকাইয়া কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অনেক কালের পর আজ ধানের জমি দেখতে পেলুম।"

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া ছিল বলিয়া নিমাইও কথা বলে নাই, এখন সেও কথা কহিল। বলিল, "তুমি যেখানে ছিলে সেখানে বোধ হয় খুব ধানের জমি দেখতে পেতে বউদি ?"

আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, তা পেতুম। আমার মাসীমার বাড়ী হতে খানিক দূরে সবুজ ধানের মাঠ দেখতে পাওয়া যেত। সেখানেও ভাদ্র আশ্বিন মাসে মাঠ ভরে এমনি কাশ ফুল ফুটত, বাতাস এসে তাদের বুকে ঢেউ দিয়ে যেত।"

নিমাই যেন কৌতুক অনুভব করিল, বলিল, "তুমিও এ সব ভাব? এ সব যে কবিদের কথা, তুমি পেলে কোথায়?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "জানিনে কবিরা কি বলেন না বলেন। তবে আমি যে কবি নই তা তো জানোই।"

নিমাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কাজের কথা নয়। কবিত্ব সবারই প্রাণে আছে,—কম আর বেশী এই যা তফাৎ। যে চালনা করে ফুটিয়ে তুলবার সেই হয় কবি। তা বলে যে বেচারা চালনা করতে পারে নি, সে যে অকবি হবে, এমন কথা আমি বলতে পারব না। সেই হিসাবে তুমিও কবি বউদি। এই দেখ না,—একটু কাজের ফাঁক পেয়েছ, তোমার কবিত্ব আবার জেগে উঠেছে।"

কল্যাণী পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বলিল, "কারও বা জন্মান্তরের স্মৃতি অটুট থেকে ক্রমোন্নতি হতে হতে একটা জন্মে পূর্ণতা লাভ করে, এ কথা মানবে কি ঠাকুর-পো ?"

নিমাই মাথা নাড়িল,—"না, আগেই বলেছি আমি জন্মান্তর মানি নে, কেন না, তার কোনও প্রমাণ আমি পাইনি। এই জন্যেই আমরা যা পাই তা চালনা করে বাড়াতে পারি, বিনা চালনায় তা ধ্বংস হয়ে যায়, এ কথা একটু আগেও বলেছি, এখনও বলছি। জন্মান্তর কথাটা বড় শান্তিপ্রদ, না বউদি ? এ জন্মে মানুষ আশা করে অনেক, কিছুই পায় না। তাই সে এই ভেবে প্রাণে এতটুকু শান্তি আনতে চায়—পরজন্ম আছে ; আর সেই জন্মে সে তার চাওয়ার ফল পাবেই।"

সে চুপ করিয়া গেল, কল্যাণীও নীরবে রহিল। তাহার এ সব প্রসঙ্গ মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। নিমাই তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

সে গাড়ীর পিছন দিককার ছোট জানালাটি দিয়া বাহিরের পানে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া রহিল। নিমাইও তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে মন দিল।

(ক্রমশঃ)

মহানাদে প্রাচীন নগরী আবিষ্কার

শ্রীগুরুদাস রায়

ই, আই, রেলের মগরা জংসন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত একমাত্র বাঙ্গালী কোম্পানীর যে রেলপথ গিয়াছে, তাহারই মধ্যবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী স্থানের নাম মহানাদ ষ্টেসন। ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে গ্রাম। বর্ত্তমানে গ্রামের আয়তন পাঁচ বর্গ মাইল।

জটেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে হর-গৌরী মূর্ত্তি

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয়-যুগে হরপার্ব্বতীর প্রস্তরমূর্ত্তি ; নিম্নে দুইটী বুদ্ধমূর্ত্তি খননকার্য্যের সময় প্রাপ্ত

খানি বাইশটী পাড়ায় বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত, বরাট, নগর, সিংহগড় প্রভৃতি কয়েকটী পাড়া লুপ্ত হইয়া ছে। ষ্টেসনের নিকট লক্ষ্মণহাটী গ্রামখানি সেকালের রাজা লক্ষ্মণ গুহের ক্ষীণ স্মৃতি আজিও বহন করিতেছে। এইখানেই রাজা কেশব গুহ কেশবপুর, রুদ্র গুহ রুদ্রগ্রাম, ও চণ্ড গুহ চণ্ড বা শণ্ডগ্রাম স্থাপন করেন। এইখানেই মহারাজা হরিশ সিংহ ও মহারাজা সর্ব্বাদৌ বিরাট গুহ অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন ; পরবর্ত্তী কালে কায়স্থ রাজা রামসুন্দর দত্ত ও সুবর্ণবণিক রাজা রাধাকান্ত রায় রাজত্ব করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পর ইহা নরসিংহ দত্তের জমিদারীভুক্ত হয়।

রাঢ়ের রাজধানী ছিল এই মহানাদ। প্রথমে ইহা বর্দ্ধমান ও পরে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এখান হইতে গুপ্ত-যুগের কুমার গুপ্তের নামাঙ্কিত ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তিসম্বলিত ও স্কন্দ গুপ্তের রমণী-মূর্ত্তি শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তিসম্বলিত এবং শশাঙ্কের সময়ের সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, কুশান যুগেরও মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা ব্রজনাথ সিংহের স্বর্ণমুদ্রা ও রাজা গৌরীনাথ সিংহের ও কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মুদ্রা পুষ্করিণী খননের সময়ে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রা এখান হইতে পাওয়াতে এই প্রমাণই হয় যে, তখন রাঢ় এক বেশী বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল যে নানা স্থান হইতে লোকে এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া মুদ্রার বিনিময় করিয়া গিয়াছে। এখানকার রাজা হেমন্ত সিংহের নামাঙ্কিত মুদ্রার কথা ইতিহাস-লেখক হাণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ করের বাড়ীতে আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন যে, জনৈক মৌলবী পাঠোদ্ধার করিয়া সেটিকে আলাউদ্দিনের সময়ের মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমি উহাকে আকবরের সময়ের মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করি; কারণ উহাতে সুস্পষ্ট ভাবে "জালালুদ্দিন আকবর" এই কথা লেখা আছে এবং বোধ হয় মৌলবী সাহেব এই জালালুদ্দিন নামটী ভুল করিয়া আলাউদ্দিন পড়িয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকখানি নানা প্রকারের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাদের এখনও পাঠোদ্ধার সমাপ্ত করিতে পারি নাই। শশাঙ্কের মুদ্রা ৬০ খৃষ্টাব্দের এবং ঐ প্রকারের আরও পাঁচখানি মুদ্রা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কুশান যুগে সম্রাট হুবিষ্কের

কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মুদ্রা

গৌরীনাথ সিংহের মুদ্রা

কুশান সম্রাট হুবিষ্কের সুবর্ণমুদ্রা (দ্বিতীয় শতাব্দী)

রাজা শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা ৬২০ খৃষ্টাব্দ

আকবরের সময়ের স্বর্ণমুদ্রা

গুপ্তযুগের দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা (৩০০-৪০০ খৃষ্টাব্দ)

যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বিতীয় শতাব্দীর এবং বাংলাদেশে ঐ প্রকারের মুদ্রা আর একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। এখানে খননকার্য্য কালে কতকগুলি মূর্ত্তি পাইয়াছি—তন্মধ্যে অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্ত্তি, দুই একটী বুদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধদের ধনদেবতা জম্ভলের একটী সুবিশাল মূর্ত্তি। এবং এই মূর্ত্তিটীর পিছন দিকে বৌদ্ধধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কতকগুলি লিপি খোদাই করা আছে।

বৌদ্ধপ্রভাব অবসানের সময়ের একটী গৌরীপট্টের অর্দ্ধাংশ
(আয়তনে ২৪ ফীট দীর্ঘ) খননকার্য্যের সময় প্রাপ্ত

৬৮৫ খৃষ্টাব্দে রাঢ়ে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ওখান হইতে বৌদ্ধপ্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য সিংহবংশীয়গণ শৈব ও শাক্তসম্প্রদায়ভুক্ত জনগুলীকে উত্তেজিত করেন। এই উত্তেজনার ফলস্বরূপ এখানে নাথ ধর্ম্মের উত্থান হয়।

মহানাদের রাজা হরিশ সিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। মহাকুতী বীরবর বীরবাহুও বৌদ্ধ ছিলেন। সিংহ ও গুপ্তবংশীয়েরা রাঢ়ে বহু ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া-

খননকার্য্যের সময় প্রাপ্ত ছয়শত বৎসরের প্রাচীন হাঁড়ি
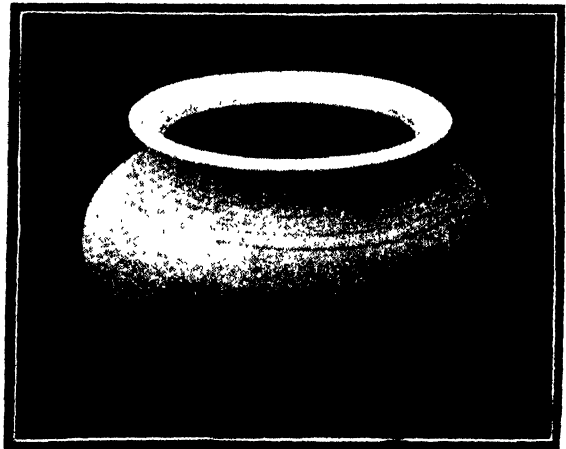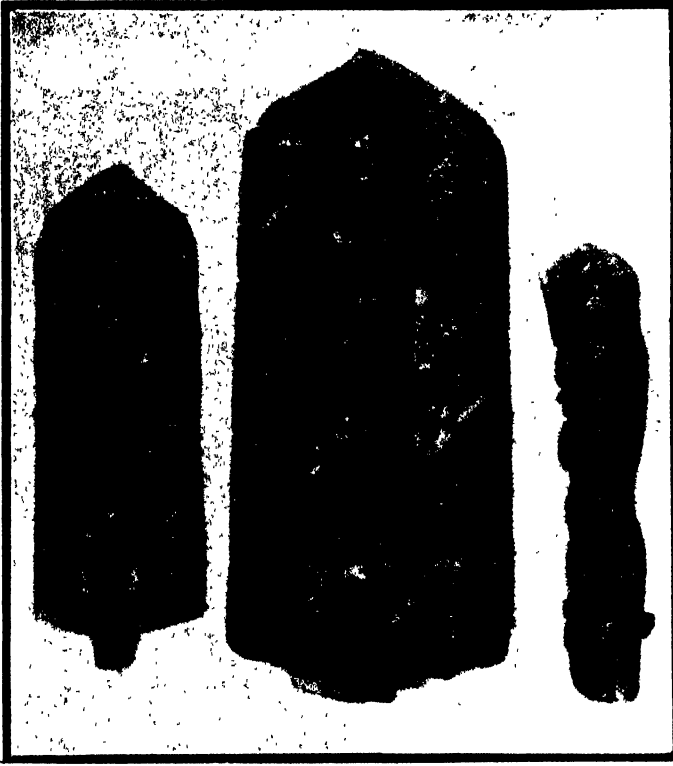
খননকার্য্যকালে প্রাপ্ত কতকগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি

ছিলেন। বহু দিনের অন্তর্বিপ্লব ও খণ্ড-যুদ্ধের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধনের পর মহানাদে পুনরায় প্রাচীন কালের বৈদিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহানাদের সিংহবংশ সৌরবংশীয়। "পবন দূতম্"—গ্রন্থে পাওয়া যায় যে লক্ষ্মণসেন কোনও এক সিংহ উপাধিধারী বীরকে রাঢ়দেশান্তর্গত গঙ্গাতীরে রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সিংহ বংশের কুর্শীনামায় আছে যে, হরিশ্চন্দ্র "সিংহবিক্রমশালী ছিলেন বলিয়া সিংহ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।"

অন্যত্র আছে—

"সমরে হরিশ সিংহ
অত্যন্ত প্রখর।
স্কন্দদেব তুল্য শূর
অবনি ভিতর॥"

মন্দির-শিল্প রাঢ়দেশের রচনা। বাস্তু-জ্ঞান প্রথমে রাঢ়ে পুরন্দর-পুত্র শম্ভু সিংহ

প্রাচীনকালে অশোকের গুহামন্দিরের অনুকরণে
[illegible]

কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। নানা প্রকারের ইষ্টক প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মহানাদ শিল্লাদর্শের চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিল।

রাঢ়ের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ প্রথমে কাশীকোনালেশ্বর প্রসেনজিতের কন্যা অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করায় পিতার ক্রোধ-দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র হইতেছেন পূর্ব্বোল্লিখিত পুরন্দর। এই বিজয় সিংহ তাম্রপর্ণী দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন এবং সিংহবংশের নামানুযায়ী ঐ দ্বীপের নাম সিংহল হয়, এরূপ প্রবাদ আছে।

মহানাদের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অধীন করদ নৃপতি ছিলেন। পীর গোরাচাঁদের সহিত যুদ্ধে মহারাজ চন্দ্রকেতু বন্দী হন। কিন্তু রাজপুত্র বিজয়কেতুর সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার পরাজয় হইয়াছে মনে করিয়া রাজমহিষী ও পুরনারীগণ মুসলমানের অত্যাচার আশঙ্কা করিয়া চন্দ্রদহের জলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তখন রাজাধিরাজ চন্দ্রকেতুও আত্মীয়-স্বজনের শোকে উন্মাদ হইয়া সেইখানে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন।

কেতুগ্রামের চন্দ্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুষ্করিণীর সহিত অপর এক পুষ্করিণীর সংযোগ ছিল—উভয় পুষ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজপ্রাসাদ সুবৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য প্রস্তর-দুর্গ ছিল; অদ্যাপি সেই অতীত যুগের জীর্ণ-স্মৃতি বহনকারী বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর রাজপুতানা হইতে একদল সমরকুশল রাজপুত বীর মহানাদে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। ঐ স্থানটী এখন জনমানবশূন্য হইয়া বিজন অরণ্যানীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

জটেশ্বর শিব মন্দির (অনুমান একহাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত)

রাজা প্রদ্যুম্নসিংহ জলদস্যু দমন করিবার জন্য মহানাদ হইতে এক বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বাহিরের আক্রমণ নিরোধ করিবার জন্য রাজপ্রাসাদের চারিদিকে দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টাব্দে ইহাদের অধিকার সাগর-দ্বীপস্থ কলিঙ্গপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৈদিক ভক্ত শম্ভুসিংহ দীর্ঘ দিন ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াও মহানাদ হইতে তান্ত্রিক প্রভাব বিলুপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই।

৭৫২ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বিশুদ্ধসিংহ মহানাদে বৌদ্ধ পণ্ডিত হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহানাদের সনাতন সিংহ আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

একপাদ ভৈরবের প্রস্তরমূর্ত্তি এবং হাঙ্গরের আকৃতি বিশিষ্ট এক পয়ঃপ্রণালীর ভগ্নাবশেষ ; খনন কার্য্যের সময় প্রাপ্ত

হইয়া জেতারি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। হরিশ সিংহের সময়ে সেখানে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন। মহানাদের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কমল শীল প্রণীত "ন্যায়বিন্দু পর্ব্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ তিব্বতাধিপতি দলাই লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করেন।

হরিশ সিংহ মধ্যদ্বীপে দুইটী মহাকাল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার ভাস্কর্য্য অতুলনীয় ছিল, ইহাই কথিত হইয়া থাকে।

পাল ও সেন রাজবংশ মহানাদে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে কত যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজও পর্য্যন্ত বহু যুদ্ধেরই নিদর্শন আছে। প্রস্তরের গোলা এবং কামানের ব্যবহার এক সময়ে এখানে যে খুব বেশীই হইয়াছিল, তাহার নমুনাদি পাওয়া গিয়াছে।

সিরাজদৌলার দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদ সিংহ মহানাদবাসী ছিলেন। মহানাদের রাজা চন্দ্রকেতুর বংশধরদের মধ্যে রাজা শোভা সিংহ, রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজা হেমন্ত সিংহ, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ, রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ, রাজা শত্রুজিৎ সিংহ, রাজা দুর্জ্জন সিংহ, রাজা সমর সিংহ, রাজা পুরণ সিংহ বিভিন্ন সময়ে মুসলমান শাসন অবসান করিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, ইহা "পাদশাহনামা"তে পাওয়া যায়।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ মহানাদ নগরে সিংহ ও গুহ বংশীয়দের আনুগত্য স্বীকার করাইবার জন্য রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আইন-ই আকবরীতে রাজা ভগীরথের বংশে জগৎ সিংহ, ব্রহ্ম সিংহ, বিনোদ সিংহ, উদয় সিংহ, বিশ্ব সিংহ, সৎ সিংহ প্রভৃতি নৃপতিগণের নামোল্লেখ আছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও রাজভট নামে এক জাতি মহানাদে বাস করিত। ইহারাও মহানাদের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপাল এই রাজ-ভট বংশীয় ছিলেন।

প্রায় ৭০ বঙ্গাব্দে পহ্লবেরা মহানাদ আক্রমণ করিয়াছিল। রাজা পুরুষোত্তম সিংহের গুরুর তত্ত্বাবধানে ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে গয়ায় একটী বৌদ্ধধর্ম্ম কুঠী নির্ম্মিত হয়।

এই সুবৃহৎ শিবলিঙ্গটী একটী মন্দিরের মধ্য হইতে প্রাপ্ত

রত্নময়ী-মন্দির (দুইশত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী স্থাপিত)

মহারাজ চন্দ্রকেতু-প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, জটেশ্বরনাথের মন্দির, অনাদি শিবলিঙ্গ, জামাই-জাঙ্গাল নামে সুপ্রশস্ত রাস্তা, গড়পাড়ার সুবিস্তৃত গড়, সোঁতার বশিষ্ঠ-গঙ্গা নামে সুবৃহৎ জলাশয়, জীয়ৎকুণ্ড নামে একটী দেবখাত কুণ্ড এবং দুই একটী স্তূপ আজিও কোন সুদূর অতীতের প্রাচীন নিদর্শন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজ চন্দ্রকেতু মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যে রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার প্রস্থই ২২৫ ফিট বা দেড় শত হাত। রাজবাড়ীর হাতীশালা প্রভৃতিরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মহানাদের সীমান্তে ধনপোতা নামক যে প্রকাণ্ড প্রান্তর বর্ত্তমানে বিজন অরণ্য সমাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তথায় খনন-কার্য্য করিলে অতীত যুগের বহু চিহ্নই আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এতদ্ব্যতীত, রাজা মহেন্দ্র সিংহ যে সুবিস্তীর্ণ জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ৮৩ বিঘা। মহানাদের মুক্তকুণ্ডের নিম্নে ভূগর্ভস্থ অট্টালিকার প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। মহানাদের গুহরাজবংশের জনৈক রাজা বরাটের মুখ হইতে পাণ্ডুয়া ও হুগলী পর্য্যন্ত একটী সু-উচ্চ রাজপথ বি-নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মেদিনীপুর ও ময়ূর-ভঞ্জের নানা স্থানে মহানাদের গুহরাজবংশের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক প্রমাণই আজও পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। বরাটের ধ্বংসস্তূপগুলি দেখিয়া মনে হয়, রাজা বিরাট গুহের রাজপ্রাসাদ বর্ত্তমান সোণা-পুকুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল।

দ্বারকা চণ্ডিমূর্ত্তির একটী ভগ্নাবশেষ

মহারাজা সিংহবাহুর পরে রাজা মাদব সিংহ ৩৮৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মহানাদে রাজত্ব করেন। তাঁহার পর আরও ছয় জন নরপতি রাজত্ব করার পর মহানাদে গৌড় ও মগধের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণ রাজা মুকট রায় মহানাদের সন্নিকটে সমুদ্র শিখর নামে একটী গড় নির্ম্মাণ করেন। ৬০ জন মুসলমান রাজা ১২৪৪ বৎসর মহানাদে রাজত্ব করিলে, মহারাজ বামদেব বর্ম্মা পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন।

বৌদ্ধরাজ পাণ্ডদাস মহানাদে বাস করিতেন। তাঁহার নামে পাণ্ডু-পুকুর অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে।

বাঙ্গলার বার ভূঁইঞার মধ্যে মহানাদের মহেন্দ্র সিংহ অন্যতম ছিলেন। "সংবাদ রত্নাকর" গ্রন্থে আছে—

"হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার ভূঁঞা।
মহেন্দ্র সিংহ আর কতজন বড় মিঞা ॥"

হরিশ সিংহের বংশে বিষয়-বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

শকজাতি ভারতে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর তাহাদেরই একদল মহানাদে আসিয়া

বসবাস স্থাপন করেন। রাজা বিরাট গুহ হুনদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিয়া দেশের "পরমেশ্বর" আখ্যা পাইয়াছিলেন। ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বালাদিত্য গুহ বঙ্গে হুনদের উচ্ছেদ সাধন করেন। গুপ্তবংশের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাম্রলিপ্তের সত্রপেরা গুহ রাজদিগের পরে প্রাদুর্ভূত হন। ৩০৪ খৃষ্টাব্দে মহানাদের গুহবংশের একটী শাখা তাম্রলিপ্তে রাজত্ব করিতেন। বুদ্ধগয়ায় একটী বৌদ্ধমন্দিরের দ্বারদেশে যে প্রস্তরলিপি আছে তাহাতে মহানাদের সিংহ বংশের অশোকচন্দ্র সিংহের নাম অঙ্কিত আছে। অশোক সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ সহস্রপাদ ভট্টের আদেশে লক্ষ্মণাব্দের ত্রিসপ্তত্তিতম বর্ষের ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার উহা লিখিত হয়। ১১৩১ হইতে ১১৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা মাধব সেন মহানাদের অন্তর্গত টগর নগরে রাজত্ব করিতেন। ৫০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ভাতীয় মহানাদে একটীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজার রাজত্বকালে মহানাদ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের অন্যতর কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

মহেশ্বরী মূর্ত্তি—খননকার্য্যকালে প্রাপ্ত

প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত করিবার একটী পাত্র, খনন কার্য্যের সময় প্রাপ্ত

মহানাদের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন কালে অগ্নিসংযোগে গলিত ধাতুপদার্থের একটী অর্দ্ধসের পরিমিত জমাট পাওয়া গিয়াছে। প্রাসাদের এক স্থানে ইষ্টক সংগ্রহ করিবার সময় একটী ডাবার মধ্যে ধ্বংসাবশেষের ভিতর ডাবাসমেত প্রায় এক মণ চূণ পাওয়া গিয়াছে। সেই চূণ প্রায় ৮০০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়। একটী স্থান খনন কালে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের মাটির হাঁড়ী ও অন্যান্য মৃৎপাত্রখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

মহানাদে সিংহ ও গুহ রাজবংশের মিলিত শক্তি ৭১০ বৎসর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সগৌরবে দণ্ডায়মান ছিল। যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল, তখন নানা অসভ্য জাতীয় লোকেরা ঐখানে বসতি স্থাপন করে—এবং পরে উহারাও এক দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অগণ্য বীরের লীলাক্ষেত্র মহানাদ একদিন তাহাদেরই বক্ষ-শোণিতে বিরঞ্জিত হইয়াছিল। রাজা দিলীপ সিংহকে নিহত করার পর ইংরাজগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে পান। রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে, ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের সুযোগ পাইলেন।*

* ইয়োরোপ-প্রত্যাগত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় তাঁহার নিকট রক্ষিত কুলজী হইতে আমাকে কতকগুলি রাজবংশের রাজাদের নাম লিখিয়া দেওয়ায় আমি তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।—লেখক।

চাষীর বৌ

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

লতিকার মত নহে তার দেহ, বাতাসে পড়ে না ঢলে,
নহে সুকোমল ননীর পুতুল, রোদে নাহি যায় গলে।
শক্ত সবল দেহটী তাহার চিঁড়ে কুটে, ধান ভেনে,
হাতে পায়ে তার পড়িয়াছে কড়া কাঠ কেটে, জল টেনে।
খাটুনীতে তার গঠিত শরীর কষ্টে দমে না মোটে,
ভেঙ্গে নাহি পড়ে দু'চা'র সন্ধ্যা যদি না আহার জোটে।
বিলাস তাহার পানটুক খাওয়া তামাকের পাতা সনে,
খৈল পেড়ী দিয়ে দেহ সাফ্ করা উৎসব পার্ব্বণে।
গহনা রূপার দুই গাছি খাড়ু, গলায় মাদুলী সারি,
সখের কাপড় গুলবাহার ও কোরা সে মিলের শাড়ী।
শিল্প-কর্ম্ম শিকে জোতবটা দুর্লভ অবসরে,
কাঁথার উপরে ফুল পাড় তোলা গুয়া কাটা সরু করে।
চিঁহি চিঁহি করে কয় না সে কথা মিহি মিহি মিঠে সুরে,
শয়তান কাঁপে প্রখর কণ্ঠে সদা থর থর করে।
কায়দায় পেলে কুলোক পশুর পিঠ ভাঙ্গে লাথি মেরে,
দাও বটী পেলে হাতের মাথায় কান কেটে দেয় ছেড়ে।
ফাল্গুন রাতে ছাতের উপরে সেতার লইয়া কোলে,
নাহি গায় সে যে প্রেমের গজল আধ আধ মিঠে বোলে।
কাজের সঙ্গে সঙ্গিনীসহ গায় সে 'বারাষে' গান,
সাদা মেঠো সুর নাহি কারিকুরী, তবুও মাতায় প্রাণ।
স্বামী ত তাহারে আদর করিয়া ডাকে না প্রেয়সী বলে,
নাহি লেখে কভু বিরহের চিঠি ভাসিয়া নয়নজলে।
রাগের সময় করে গালাগালি, হয়ত বা দু'ঘা মারে,
অন্তর-ভরা অনাবিল প্রেমে তবু ভালবাসে তারে।
পল্লীবাসিনী চাষীর গৃহিণী বিধির শ্রেষ্ঠ দান,
সরলতামাখা মুখখানি তার দেখিলে জুড়ায় প্রাণ।

হিরণ্য-গর্ভ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ

সংস্কৃত অভিধানগুলিতে "হিরণ্যগর্ভ" শব্দটীর দুইটী প্রধান অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ, ইহা লোকপিতামহ ব্রহ্মার একটী নাম; দ্বিতীয়তঃ, ইহা পুরাণাদিবর্ণিত "ষোড়শমহাদানের" অন্তর্গত মহাদান বিশেষ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে, বল্লাল সেন রচিত দানসাগরের মহাদানাবর্ত্ত-পরিচ্ছেদে এবং মৎস্য পুরাণের ২৪৭তম ও তৎপরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে এই ষোলটী মহাদানের বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। নিম্ন-লিখিত বস্তুগুলির বিধিমত উৎসর্গই শাস্ত্রে মহাদান বলিয়া কথিত হইয়াছে;—(১) তুলা পুরুষ, (২) হিরণ্যগর্ভ, (৩) ব্রহ্মাণ্ড, (৪) কল্পপাদপ, (৫) গোসহস্র, (৬) হিরণ্যকামধেনু, (৭) হিরণ্যাশ্ব, (৮) পঞ্চ লাঙ্গল, (৯) ধরা, (১০) হিরণ্যাশ্বরথ, (১১) হেমহস্তিরথ, (১২) বিষ্ণুচক্র (১৩) কল্পলতা, (১৪) সপ্তসাগর, (১৫) রত্নধেনু এবং (১৬) মহাভূত-ঘট। এ স্থলে আমরা মাত্র দ্বিতীয় মহাদানটীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব [1]।

দক্ষিণাপথের কয়েকজন রাজার তাম্রলিপিতে হিরণ্যগর্ভ শব্দটীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গোরণ্ট্‌ল তাম্রশাসনে (Ind. Ant, IX. 107f.) রাজা অত্তিবর্ম্মাকে বলা হইয়াছে—"অপ্রমেয় হিরণ্যগর্ভ প্রসব"। ঐ লিপি সম্পাদনকালে ডাক্তার ফ্লীট্‌ উহার অর্থ করিয়াছিলেন, "যিনি অপ্রমেয় দেবতা হিরণ্যগর্ভের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) প্রসব (অর্থাৎ বংশধর)"। চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের মহাকূট স্তম্ভলিপিতেও (ঐ, XIX. ff.) আমরা অনুরূপ একটী কথা পাই—"হিরণ্যগর্ভসম্ভূত"। এখানেও ফ্লীট্‌ "হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা হইতে জাত" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন বংশেরই সমুদয় বা অধিক সংখ্যক রাজাকে হিরণ্যগর্ভের সহিত সম্পর্কিত করা হয় নাই,—কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট কোন নরপতিকেই বার বার ঐ বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। মঙ্গলেশের মহাকূট স্তম্ভলিপিতে কেবল ১ম পুলকেশীকে "হিরণ্যগর্ভসম্ভূত" বলা হইয়াছে। যদি ফ্লীটের অনুমান সত্য হইত, তবে বংশাবলীর আদিতে উল্লিখিত রাজা জয়সিংহকেই উক্ত বিরুদভূষিত দেখা যাইত। বস্তুতঃ, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা জয়সিংহ এবং পরবর্ত্তী রাজা মঙ্গলেশকে পরিত্যাগ করিয়া মধ্যবর্ত্তী রাজা ১ম পুলকেশীকে "ব্রহ্মার পুত্র" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার কোনই সঙ্গত কারণ অনুমান করিতে পারা যায় না। এই কারণে ডাক্তার হুণ্ট্‌শের মতই আমার নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন যে, এ স্থলে হিরণ্যগর্ভ বলিতে পুরাণ-বর্ণিত ষোড়শ মহাদানের দ্বিতীয়টীকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু হুণ্ট্‌শের মতের দ্বিতীয়াংশ অযৌক্তিক; এ স্থলে আমরা তাহাই দেখাইব।

মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলার অন্তর্গত মট্টেপড নামক স্থানে আবিষ্কৃত রাজা দামোদর বর্ম্মার তাম্রশাসন সম্পাদন করিবার সময় (Ep, Ind., XVII, 328 ff,) হুণ্ট্‌শ্‌ পূর্ব্বোল্লিখিত "অপ্রমেয়হিরণ্যগর্ভপ্রসব" কথাটীর অর্থ করিয়াছেন, "অসংখ্য হিরণ্যগর্ভ মহাদানের প্রসব বা উৎপত্তি স্থল (অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা)"। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, হুণ্ট্‌শ্‌ এস্থলে "হিরণ্যগর্ভপ্রসব" কথাটীকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস (হিরণ্যগর্ভের প্রসব) হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই জন্য ১নং ঈপুর তাম্রশাসন সম্পাদনকালে (ঐ 335 ff) হুণ্ট্‌শ্‌ মহাশয়কে একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে বিষ্ণুকুণ্ডিরাজ প্রথম মাধব বর্ম্মাকে [2] বলা হইয়াছে, "হিরণ্যগর্ভ-প্রসূত"। এখন, "প্রসূত" পদটী বিশেষণ; সুতরাং "হিরণ্যগর্ভ-প্রসূত" কথাটীকে পূর্ব্বোক্ত "হিরণ্যগর্ভ প্রসব" কথাটীর মত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস রূপে গ্রহণ করা চলে না। তাই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাম্রশাসনের লেখক "প্রসূতি" লিখিতে গিয়া অসাবধানতাবশতঃ "প্রসূত" লিখিয়া থাকিবে। কথাটীকে "হিরণ্যগর্ভপ্রসূতি" ধরিয়া লইলে অবশ্য ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে "হিরণ্যগর্ভ মহাদানের অনুষ্ঠাতা"—এইরূপ অর্থ হই হয়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, পোলামুরুতে আবিষ্কৃত এই মাধব বর্ম্মার * অপর একখানি তাম্রশাসনেও (Journ. Andhra Hist. Res. Soc, VI. 20) রাজাকে বলা হইয়াছে "হিরণ্যগর্ভ-প্রসূত;" সেখানেও কথাটী "হিরণ্যগর্ভপ্রসূতি" নহে। উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে মহাকূট স্তম্ভ লিপিতে আছে—"হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত"; এ কথাটীকেও ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস-রূপে গ্রহণ করা যায় না। এই সকল কারণে হুণ্ট্‌শের মতের এই অংশ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

"হিরণ্যগর্ভপ্রসূত", "হিরণ্যগর্ভসম্ভূত" প্রভৃতি যে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ইহাদের অর্থ, "হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত"। "হিরণ্যগর্ভ প্রসব (উৎপত্তি স্থল) যাহার"—এই অর্থে "হিরণ্যগর্ভপ্রসব" কথাটীকে বহুব্রীহি সমাস রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং "হিরণ্যগর্ভপ্রসূত" এবং হিরণ্যগর্ভ-প্রসব"—কথা দুইটীর অর্থ একই দাঁড়াইল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি যে, হিরণ্যগর্ভ একটী মহাদানের নাম। একটী মহাদান হইতে কিরূপে একজন রাজার জন্ম হইতে পারে?

এই বিষয়টী পরিষ্কার করিবার জন্য হিরণ্যগর্ভ মহাদানের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে হইবে। এই মহাদান কার্য্যে দান করিবার বস্তু, একটী "হিরণ্যগর্ভ" অর্থাৎ "সুবর্ণ নির্ম্মিত গর্ভ"। হিরণ্যগর্ভ বলিতে এ স্থলে তিন হস্ত উচ্চ একটী স্বর্ণকুণ্ড বুঝিতে হইবে।

"ব্রাহ্মণৈরানয়েৎ কুণ্ডং তপনীয়ময়ং শুভং।
দ্বাসপ্তত্যঙ্গুলোচ্ছ্রায়ং হেমপঙ্কজগর্ভবৎ॥"

(ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ৭২ অঙ্গুলি উচ্চ, স্বর্ণপদ্মের গর্ভের ন্যায় একটী স্বর্ণময় শুভকর কুণ্ড আনয়ন করিবে।)

এই মহাদানানুষ্ঠান ব্যাপারের সমস্ত খুঁটী-নাটী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এ প্রসঙ্গে নিম্নে মৎস্য পুরাণের ২৪৯তম অধ্যায় হইতে

উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতেই আমার প্রতিপাদ্য অর্থ জলের মত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

যথারীতি অর্চনার পর, হিরণ্যগর্ভ মহাদানের অনুষ্ঠাতাকে পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণকুণ্ড লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের উদ্দেশে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়

"ভূর্লোকপ্রমুখা লোকাস্তবগর্ভে ব্যবস্থিতাঃ।
ব্রহ্মাদয়স্তথা দেবা নমস্তে বিশ্বধারিণে॥"

(ভূর্লোক প্রভৃতি লোকসমূহ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার গর্ভের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। হে বিশ্বধারণকারী তোমাকে নমস্কার।) তৎপরে, অনুষ্ঠাতা ঐ হিরণ্যগর্ভের অর্থাৎ স্বর্ণকুণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ শ্বাসরোধপূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং পুরোহিতগণ সাধারণ গর্ভিণীর ন্যায় ঐ কুণ্ডটীর গর্ভাধান পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন কার্য্য সম্পাদন করেন।

"এবমামন্ত্র্য তন্মধ্যমাবিশ্যান্তু উদঙ্মুখঃ।
মুষ্টিভ্যাং পরিসংগৃহ্য ধর্ম্মরাজ চতুর্ম্মুখৌ॥
জানুমধ্যে শিরঃ কৃত্বা তিষ্ঠেত শ্বাসপঞ্চকম্।
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।
কুর্য্যুর্হিরণ্যগর্ভস্য ততস্তে দ্বিজপুঙ্গবাঃ॥"

অতঃপর অনুষ্ঠাতাকে সেই "হিরণ্যগর্ভ" হইতে বাহির করা হয় এবং পুরোহিতগণ সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় তাঁহার জাতকর্ম্মাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। তারপর অনুষ্ঠাতাকে যে মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হয়, আমরা উহা হইতে মাত্র একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"মাত্রাহং জনিতঃ পূর্ব্বং মর্ত্ত্যধর্ম্মা সুরোত্তম।
ত্বদ্গর্ভসম্ভবাদেষ দিব্য দেহো ভবাম্যহম্॥"১

(হে সুরোত্তম, পূর্ব্বে মাতৃগর্ভ হইতে আমার জন্ম হইয়াছিল এবং আমি মর্ত্ত্যধর্ম্মা ছিলাম। এখন তোমার গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়া এই যে আমি দিব্য দেহ ধারণ করিলাম।) হিরণ্যগর্ভ মহাদানের অনুষ্ঠাতাকে যে সত্যই "হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত" বলিয়া ধরা হইত, পরবর্ত্তী মন্ত্রটী হইতেও তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এখানে পুরোহিতগণ অনুষ্ঠাতাকে বলিতেছেন,

"অদ্যজাতস্য তে হঙ্গানি চাভিষেক্ষ্যামহে বয়ম্।"

(যে তুমি অদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই তোমার অঙ্গগুলি আমরা অভিসিঞ্চন করিব।)

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে, অপরাপর দ্রব্যাদির সহিত ঐ স্বর্ণকুণ্ডটীও পুরোহিতগণকে দান করা হয়। ইহাই "হিরণ্যগর্ভ মহাদান"।

পাদটীকা

১। এই বিষয়ে আমার ইংরেজী প্রবন্ধ (Epigraphic Notes.—No. 4) Indian Historical Quarterly নামক ঐতিহাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

২। ১নং ঈপুর ও পোলামুরু তাম্রশাসনদ্বয়ের দাতা বিষ্ণুকুণ্ডী মাধববর্ম্মা যে ১ম মাধববর্ম্মা, তাহা আমি আমার অপ্রকাশিত গ্রন্থ Successors of the Satavahanas in the Eastern Deccanএ এবং Indian Historical Quarterlyতে বিষ্ণুকুণ্ডী রাজগণের বংশতালিকা নামক প্রবন্ধে (Epigraphic Notes—No. 1.) প্রতিপন্ন করিয়াছি। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ ইঁহাকে ৩য় মাধববর্ম্মা বিষ্ণুকুণ্ডী বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবী

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বরাৎ গুণে যেদিন চাকরী জুটিয়া গেল, সেদিন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। চাকরী করিব এ' কথাটা ছেলে বয়স হইতে ভাবিতে ভয় পাইতাম,—বিশেষতঃ যে চাকরীতে বড় বড় টাকার অঙ্কের হিসাব করিতে হয়, ব্যালান্স মিলাইতে হয়, ব্যবসায়ের প্যাঁচ মিশাইয়া কেতা-দুরস্ত ভাবে চিঠি লিখিতে হয়, সেই চাকরী। তাই সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া জনগণের বাণী প্রচার করিবার সুযোগ যে-দিন হাতে আসিল, সেদিন যে আনন্দ বোধ করিলাম তার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না এতটুকু। পর্ব্বতবন্দর বুয়েনস্ আয়ার্সের বিদ্রোহের বিচিত্র খবর অনুবাদ করিয়া দশজনের সম্মুখে ধরিব, মুসোলিনি ভারি ভারি ইঁটের বোঝা মাথায় লইয়া কেমন করিয়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিত, তাহা পড়িয়া আর সবাইকে শুনাইব—এই সব কল্পনা করিয়া মনের মধ্যে রোমাঞ্চ অনুভব করিলাম। আমাদের আফিসের ঘরে বসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিব,—ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড আজ সুদের হার কত টাকা চড়াইয়া দিয়াছে, ওয়াল ষ্ট্রীটের কাগজগুলি আজ আমেরিকার ধনভাণ্ডার লইয়া কি গবেষণা করিতেছে—এ-সব আমার আগে দেশের ক'টা লোকই বা আর

জানিতে পারিবে। আমার বন্ধুদের মধ্যে সবাই যখন বাড়ীর বিছানায় আরাম করিয়া ঘুমাইবে, আমি তখন 'টেলিগ্রামের' পাতায় নর্থপোল হইতে আর্জেন্টাইন পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইব। এ ছাড়া, বাঙ্গালার কোন্ নিভৃত পল্লীতে কোন্ হতভাগিনী নারী স্বামিত্বের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, রাত্রির পথকে শরণ করিল, তাও নিজে আমি দেশের পাঠক-পাঠিকার মনের দুয়ারে পৌছাইয়া দিব। বিংশ শতাব্দীর যে পৃথিবী চাকার মত অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া মরিতেছে, আমি হইব তাহার দূত, বার্ত্তাবহ। পরিশ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিকে ক্ষতি হইবে, না লাভ হইবে, তা' বিচার না করিয়াই কাজ স্বীকার করিয়া লইলাম।

প্রকাণ্ড টেব্‌ল, ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,—তা'র দুই ধারে সারি সারি চেয়ার। মধ্যে গোটা তিনেক টেব্‌ল-ল্যাম্প; মাথার উপর ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান ঘুরিতেছে। টেব্‌লের উপর রাশিকৃত ইংরাজী-বাংলা মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক, এসিয়াটিক রিভিউ হইতে নিউ ষ্টেট্‌সম্যান্ এবং ইণ্ডিয়ান রিভিউ হইতে সাণ্ডে এড্‌ভোকেট্ পর্য্যন্ত। সাইকেল-পিওন আসিয়া টেলিগ্রামগুলি দিয়া যায়—নীল খাম, হল্‌দে খাম, বাদামী খাম আসিয়া টেব্‌লের উপর পড়ে। সেগুলি সই করিয়া লইতে হয় আমাদের।

রাধানাথবাবুর দাবী টেলিগ্রামগুলির উপর সর্ব্বাগে,—সেগুলি বাছিয়া বিতরণ করিবার ভার তাঁর হাতে। বণ্টনের কাজ শেষ করিয়া তিনি সেই যে লিখিতে আরম্ভ করেন, আবার টেলিগ্রামের খাম না আসিলে মুখ তুলিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার হয় না। মোটা খদ্দরের জামা-কাপড়-পরা লোকটী; কথাবার্ত্তায় কোন রকম চাঞ্চল্য নাই, বেশ একটী আত্মসমাহিত ভাব। যখন কাজ করেন তখন মনে হয় না যে তাঁহার মনের মধ্যে পৃথিবীর তুচ্ছ সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলি বাঁচিয়া আছে। আট্-দশ ঘণ্টা কাজ করিতে তাঁর বিরক্তি ত' লাগেই না, বরং মনে হয়, এই কাজ করিতে পাইয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গিয়াছেন। রেলওয়ে বাজেটের ঘাট্‌তি লইয়া তিনি যতখানি চিন্তা করিতে পারেন, পাড়ার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে ততখানি সময় নিয়োগ করিবার অবসর তাঁহার নাই।

কাজ করিতে করিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া মধ্যে মধ্যে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই। রাধানাথবাবু প্রায় কুড়ি বৎসর এইখানেই টি'কিয়া আছেন, অন্য কোথাও নড়িবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নাই। কুড়ি বৎসরের মধ্যে তাঁর কামাই বোধ হয় কুড়ি দিনের বেশী নয় এবং এই কুড়ি বৎসরের বাকী দিনগুলি তাঁর এমনি করিয়াই কাটিয়াছে। বেলা এগারটায় আফিসে ঢুকিয়া, মেসে ফিরিতে তাঁর প্রায় ন'টা বাজিয়া যায়। ন'টার পর রাত্রি আর কতক্ষণ! হাত-পা ধুইয়া খাওয়া, তার পর ঘুমাইয়া পড়িতেই সাড়ে দশটা, এগারটা। সুতরাং এই কুড়ি বৎসরের প্রতিদিনকার পৃথিবীতে যে আকাশ কখনও অস্তরাগে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, কখনও নিবিড় এলোচুলের মত মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, তাহার সংবাদ তিনি রাখেন নাই; মানুষের আয়ুর মত সময় তাঁহার কাছে সংক্ষিপ্ত।

বর্দ্ধমান জেলার ওদিকে তাঁ'দের দেশ ছিল, এখনও আছে, কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি দেশে যাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এ' সম্বন্ধে অনুযোগও অনেকে তাঁহার নিকট করিয়াছে:—বাড়ীঘর যে একেবারে নয়-ছয় হ'ল চক্রবর্ত্তী, একবার গিয়ে সেগুলি দেখে এস না ভাই!

চক্রবর্ত্তী একটু চুপ করিয়া জবাব দিয়াছেন: সময় কই, কাগজের ক্ষতি করে বাড়ী দেখতে যেতে পারি নে।

বিবাহ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এক বৎসর পরেই না কি স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রী মরিয়াছিল, কিন্তু একটী শিশু রাখিয়া। সেই শিশু না কি মরিয়া গিয়াছে—চক্রবর্ত্তী বলেন। সে যত দিন বাঁচিয়া ছিল তত দিন রাধানাথ মধ্যে মধ্যে একবেলার জন্য বাড়ী যাইতেন, ছেলের মৃত্যুর পর সে পাটও উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু আপিসের লোকেদের মুখে শুনা যায়—ছেলে কবে মারা গিয়াছে, আপিসের কেউ তা' নাকি জানিতেও পারে নাই। একদিন হঠাৎ আসিয়া চক্রবর্ত্তী সবাইকে বলিয়াছিলেন—ছেলেটা মারা গেল ভাই।

সবাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিল, বল কি, তুমি যে একদিন বাড়ীও গেলে না! এক-আধ দিন নয়, পনের বছরের ছেলে—

রাধানাথ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, বরাৎ, ভাই বরাৎ। নেমেসিস্। তা' নইলে এত লোক থাকতে ওকেই বা সাপে কামড়াবে কেন!

সাপের কামড়েই তাঁর ছেলে মরিয়াছে, কিন্তু অনেকে কথাটা ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে নাই। নাই পারুক, ছেলের মৃত্যু লইয়া চক্রবর্ত্তী তামাসা করিয়াছেন এ' কথাই বা বলিবে কে।

হাতে কাজ না থাকিলে রাধানাথ একে একে রাজ্যের কাগজগুলি উল্টাইতে থাকেন,—ছোট বড় কোন কাগজই বাদ যায় না। কাগজের মধ্যে তাঁহার সমাহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কি যেন সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কি দেখেন এ'-দেশের কাগজগুলির মধ্যে?—নতুন কথা তো কিছুই থাকে না।

চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন, দেখ্‌বার কোন উদ্দেশ্য নেই —এমনি সময় কাটানো। তবু দেশের খবর একটু রাখা হয়।

সকাল দশটা হইতে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত আফিসের কাজের চাকা ঘুরিয়া চলে। দলের পর দল লোক আসে,—সম্পাদক ও তাঁর সহকারীরা, প্রুফ দেখিবার লোক, কম্পোজ করিবার, ষ্টিরিও করিবার লোক এবং আরও কত! কত লোকের কতখানি পরিশ্রম দিয়া প্রতিদিন একখানি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করে, সে কথা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করি।

রাত্রি সাড়ে তিনটার পর শেষ কপির অর্ডার দিয়া কাঠের সেই টেব্‌লের উপর শুইবার ব্যবস্থা; মোটা মোটা ডিক্সনারিগুলি বালিশের কাজ করে। কিন্তু তখন আর মনে করিতে আনন্দ হয় না যে জনগণের কাছে বৃহত্তর, বিপুলতর পৃথিবীর বাণী বহন করিয়া আনিতেছি! আমরা ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের মতো; দেশের কেউ আমাদের অস্তিত্বের কথা জানে না,—অথচ এর মধ্যে যদি কোথাও এতটুকু আনন্দ থাকে ত', প্রতিদিন দেশের লোকের মনের দুয়ারে হাজির হইতেছি এই কথা ভাবিয়াই।

আমার সুমুখে বসিয়া কাজ করেন প্রাণরঞ্জন হালদার। চোখে ভাল দেখিতে পান না—বার দুই কাটাইতে হইয়াছে। মোটা কাঁচের চড়া-পাওয়ার-ওয়ালা চশমা চোখে দিয়া সারা রাত্রি জাগিয়া প্রুফ দেখেন। সময় সময় চশমাতেও কুলায় না। বাঁ হাতে লেন্স ধরিয়া, ডান হাতে তাঁহাকে প্রুফ্ দেখিতে হয়। আট ঘণ্টার চাকরি, তার মধ্যে অন্ততঃ আটাশটী বিঁড়ি খাইয়া নিজেকে সজাগ করিয়া রাখেন। কিন্তু তামাকের ধোঁয়া দিয়া অবসন্ন শরীরকে নূতন বল দেওয়া যায় না, মধ্যে মধ্যে চোখ দুইটী বুজিয়া আসে, প্রুফ-সীটের উপর কলম আর চলিতে চায় না।

হাতে কাজ না থাকিলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়; আপনার ত শুনেচি তিন চারটী উপযুক্ত ছেলে বর্ত্তমান, আপনি এ' কাজ করেন কেন?

হালদার বলেন,—ইচ্ছায় করি না, স্বভাবে করায়।

ষোল বচর বয়সে প্রুফ্ কাটতে শিখি, তার পর কম পক্ষে দশটী কাগজে এই কাজ করে এলাম। তখন দিনকাল ছিল আর এক রকম, আজ আপনারা যা' খাতির পান আমাদের খাতির তখন তার চেয়ে কম ছিল না। তখন 'জগদ্ধাত্রী' কাগজে কাজ করি, দৈনিকের রেওয়াজ হয়নি তখনও—সাপ্তাহিকের যুগ চলেচে; মুর্গী-হাটার দত্ত ম'শায়রা করলেন—নতুন কাগজ—'সমাচার', হাতে করে কাগজ ছাপা হ'বে—ডেকে নিয়ে গেল এই হালদারকে। পাচ্ছিলাম পঁচিশ, এক কথায় দিলে দশ টাকা বাড়িয়ে। সে সব দিন আজ আর নেই।

—নাই বা থাকল, কিন্তু আপনি এমন করে ক'দিন বাঁচবেন? টাকার লোভ কি এত বেশী?

হালদার চশমার কাঁচটা একটু পরিষ্কার লইয়া বলেন, কত বেশী তা এখনও বোঝনি ভায়া, বয়স হক্, বুঝবে। চল্লিশ বছর টাকা রোজগার করে, বিশ্বাস করতেই মন চায় না যে আর সে শক্তি আমার নেই!

— কিন্তু এই কি রোজগার?

— লোভ ভায়া, লোভ। এ লোভ যাকে পেল, তারই ছুটী। তা' ছাড়া নিজে রোজগার করি, নিজে খরচ করি—ছেলে ব্যাটারা একটী কথাও বল্‌তে পায় না।

— তারা বারণ করে না?

হালদার মুখখানা বিকৃত করিয়া বলে, বারণ করবে এমনি বোকা তারা। বুড়ো বাপের জন্যে খরচ করাটা অন্যায়—বুঝলে কি না, এই হ'ল বেশী লেখাপড়া করার গুণ!

কথা কয়টী বলিয়া প্রাণরঞ্জন সেই যে চুপ করেন, তাঁহাকে দিয়া আর একটী কথাও বলানো যায় না। কাজ করিতে ভাল লাগে না, তাঁর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবি। তাঁর ছেলেরা কত বেশী লেখাপড়া শিখিয়াছে জানি না, কিন্তু তা'রা যে এই প্রায়-দৃষ্টিহীন লোককে বহুতর আঘাত ও বেদনা দিয়াছে, সে বিষয় আর সন্দেহ থাকে না। তা'দের কেউ হয় ত এখন খোলা জানালার পথে, কৃষ্ণপক্ষের তারকা-বিছানো আকাশের দিকে চাহিয়া বউয়ের কাণে কাণে মিষ্টি করিয়া কথা বলিতেছে—কেউ……

আমরা যখন কাজে আসি রাধানাথের তখন ছুটীর সময়। ছাতাখানি বগলে করিয়া বাহির হইতে হইতে একদিন হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলেন, একটু বাইরে আসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে কথা—আর যে ব্যক্তি কদাচিৎ কথা বলেন তাঁরই! বাহিরে সিঁড়ির কাছে আসিয়া রাধানাথ বলিলেন, একটা কথা আপনাকে ক'দিন থেকে বল্‌ব মনে করছিলাম,—

—বলুন, কুণ্ঠিত হ'বার কি আছে!

রাধানাথ একটু থামিয়া বলেন, প্রতিদিন রাত্রি জাগতে আপনার ভাল লাগে? কেন মিছিমিছি শরীর নষ্ট করা? অন্য কোন চাকরির চেষ্টা করুন না কেন!

হঠাৎ এই রকম প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, উত্তরে যা' বলিব তাও বোধ করি তাঁহার মনঃপূত হইবে না। ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। রাধানাথ বলিলেন, নিজেদের সর্ব্বনাশ করেচি বলেই কাউকে নষ্ট হ'তে দেখলে বড় লাগে। এ'কাজের একটা নেশা আছে—সে নেশা পেয়ে বসবার আগে পালান। আর্থিক ক্ষতি হ'বে, কিন্তু বাঁচবার রাস্তা এ নয়।

— কিন্তু—আপনি…

রাধানাথ অদ্ভুত একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, আমি! আমার কথা আলাদা, কারণও ছিল একটু। যাক্ সে কথা। এই বিষয় ভেবে দেখ্‌বেন। আপনাকে আপনার মনে করেই কথাগুলি বললাম।

রাধানাথ আর এক মিনিট অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

সেই রাত্রিতে কাজ করিতে করিতে অনেক কথাই ভাবিলাম। পথ যে সুখের নয়, সে কথা বোধ করি আমার চেয়ে বেশী করিয়া কেউ জানে না। কিন্তু আমার জীবনের ইতিহাস বিধাতা রচনা করেন নাই, সে ইতিহাসে বিধাতার চেয়ে আমার হাত বেশী করিয়া আছে। আমার মনকে আমি হিসাব-নিকাশের বেড়াজাল হইতে চিরকালের মত মুক্তি দিয়াছি। সে যাই হ'ক্, রাধানাথ আমাকে এমন করিয়া সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন কেন?

প্রশ্নের উত্তর মিলিল মাস দুই পরে।

রাধানাথ অসুখের জন্য তিন চার দিন আফিসে আসেন নাই। কাহারো আফিস হইতে দেখিতে যাওয়া প্রয়োজন, আমিই যাচিয়া তাঁহার মেসে গেলাম।

রাধানাথ চোখ বন্ধ করিয়া পড়িয়া ছিলেন, বুক পর্য্যন্ত একটা কম্বল চাপা দেওয়া। পায়ের শব্দ শুনিয়া, চোখ মেলিয়া বলিলেন, এসো, আফিস থেকে কেউ একজন এলে তোমাকেই ডেকে পাঠাব মনে করছিলাম।

তাঁহার পাশটীতে গিয়া বসিলাম। আমার একটী হাত তিনি নিজের হাতের মুঠির মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

বলিলাম, অসুখ কি খুব বেশী?

রাধানাথ বলিলেন, হ্যাঁ, বুকের ব্যথাটা খুব বেশী!

প্রায় বাইশ বছর আগে একদিন রক্ত উঠেছিল—তার পর থেমে যায়; এতদিন পরে আবার—

বলিলাম, এই অবস্থায় বাইরে চলে যাওয়াই আপনার পক্ষে ভাল।

রাধানাথ বলিলেন, যাব। এতদিন শ্বাসরোধ করে খেটেচি, শরীর এবার তার প্রতিশোধ নেবে। কেবল আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হ'বে।

বলুন—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রাধানাথ বলিলেন, কাছাকাছি কেউ নেই ত? না, যে যা'র কাজে গেচে। হাঁা, কি বলছিলাম।—আমার ছেলে পনের বছর বয়সে মারা গেছে, এ'খবর নিশ্চয় শুনেচ?

শুনেচি।

কিন্তু সে মরেনি। একদিন দেশে থেকে চিঠি পেলাম, পালিয়েচে।

কোথায়?

তা' কে বলবে। কিন্তু কেন গেচে, সে কথা জানি। একদিন সিন্‌ফিন্‌দের ছবি এনে বলেছিল, 'বাবা, আমার এদের মত হ'তে ইচ্ছে হয়!'

শুনে প্রাণ কেঁপে উঠেছিল। বলেছিলাম: না, ও রাস্তায় নয়।

তার পর একদিন বাড়ী গিয়ে দেখি, পড়ার বইয়ের নীচে "Ten days that shook the world." দিলাম বইখানা তারি সামনে পুড়িয়ে। ছেলেটা যাবার সময় লিখে গিয়েছিল:

'বাবা, তোমার মত মাথায় করে নিতে পারলাম না। যে বই তুমি পুড়িয়ে দিয়েচ, তাই আমায় পথে ঠেলে দিল।'

রাধানাথ চুপ করিলেন; চোখ দু'টী বন্ধ—কোল দিয়া অশ্রুর রেখা নামিতেছে। একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন:

রাগে অন্ধ হয়ে দিন কতক তাকে ফেরাবার জন্তে কোন চেষ্টাই করি নি। কিন্তু দিন যেতে যেতে বাঁধ এল আল্‌গা হয়ে। কিন্তু যাকে ফেরাব, সে তখন কোথায়! পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন আমি ইংরাজী-বাংলা-হিন্দী দৈনিক, সাপ্তাহিক তন্ন তন্ন করে দেখেচি—কোথাও তার নাম চোখে পড়ে নি। তার নাম সুশান্ত। সুশান্ত চক্রবর্তী। হয় ত নিজের নাম দিয়েচে অশান্ত। যাব আলমোড়ায়। সেখান থেকে যতদিন না ফিরি এবং যদি না ফিরি, তা' হ'লে কাগজগুলো উল্টে দেখো, দেখো যদি তার নাম চোখে পড়ে—

অবসন্ন হইয়া রাধানাথ আবার চুপ করিলেন। সুশান্ত হয়ত সুশান্তই আছে—নাম বদলায় নাই। কিন্তু রাধানাথের কাছে সে অশান্ত, তাঁর অশান্ত-যৌবন-দিনের প্রতিনিধি, সমুদ্রের মত উচ্ছ্বসিত, ভলক্যানোর মত দুর্নিবার!

রাধানাথ আলমোড়ায় চলিয়া গিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর নিয়মিত উপস্থিতির পর একটী লোক আর আসে না; কাগজের কাজের চাকা নিয়মিত ঘুরিয়া চলিয়াছে; নতুন লোক আসিয়াছে। এখানে অতীতের জন্য স্মরণের সমারোহ নাই, প্রতিদিন আমরা চব্বিশ ঘণ্টা সম্মুখে চলিয়াছি। স্পেনের ক্রীড়াভূমিতে মানুষ ও পশুতে লড়াইয়ের সময় দর্শকরা মানুষের শক্তির পরিচয় পাইয়া আনন্দ করিত, তার পর পশুর কাছে মানুষের পরাজয় ঘটিলে নতুন লোক লড়াইয়ে নামিত, নিহত মানুষটীর রক্তের উপর বালি ছড়াইয়া দেওয়া হইত;—পাঁচ মিনিট্ পরে তার কথা কা'রও মনেও থাকিত না, ক্রীড়াভূমিতে নূতন করিয়া হাসি-কলরব শুনা যাইত; এও যেন ঠিক তেমনি!

রাধানাথ কেন আমাকে এই কাজ ছাড়িয়া পলাইতে বলিয়াছিলেন, আমাকে কেন তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল তা' যেন এত দিনে বুঝিতে পারি। কিন্তু ইতিমধ্যে কাজটা সত্যিই নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে,—নতুন নতুন খবরের নেশা, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বিস্ময়ের নেশা!

রাধানাথের অনুরোধ রাখিবার জন্য ইংরাজী বাংলা খবরের কাগজগুলি প্রায়ই খুলিয়া দেখি, কিন্তু যে অশান্ত ছেলেটী উগ্র আবেগ বুকে লইয়া একদিন পথে বাহির হইয়া গিয়াছে, তার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না!

দুই মাস পরে।

শ্রাবণের রাত্রি, ঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। কাচের জানালা দিয়া আকাশের মেঘ দেখিতেছি, হাতে কাজ নাই। টেবললাম্পে এক-টুকরা ফিকে-নীল কাগজ জড়াইয়া দেওয়ায় ঘরখানি স্নেহ-শীতল হইয়া উঠাইয়াছে। রাত প্রায় বারটা বাজে। আমাদের দলে আমি আজ একা, বাকী দুইজন এখনও আসেন নাই। হয়ত আজ আর কেহই আসিবেন না, এমন চমৎকার রাত্রিতে ইচ্ছা করিয়া কেই বা আসে।

নীচে বেল দিয়া সাইকল থামিল।

নিউজ-এজেন্সীর লোক নয়, টেলিগ্রাফ-অফিসের পিওন। হাঁ, আমার নামেই। আলমোড়া…? ঠিক তাই। ছোট খবর, কাগজে ছাপা হইবে না। রাধানাথ বাবু নাই। আজ সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

মৃত্যুর মত সুনিশ্চিত ঘটনা পৃথিবীতে আর কি আছে, জন্মের সঙ্গে মৃত্যুকে আমরা বাঁধিয়া আনি, তবু মানুষের মৃত্যুর বার্ত্তা মনকে বিকল করিয়া দেয় কেন?

খবরটা প্রাণরঞ্জনকে দিলাম; দুঃখের অনুভূতি তাহার মরিয়া অসাড় হইয়া গিয়াছে। মুখে কোন কথাই সে বলিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আমি ভুল বুঝিব না।

সন্ধ্যা হইতে কাজের জোর ছিল না, প্রেস-ম্যান আসিয়া কাপির জন্য তাগাদা দেয়। রাধানাথবাবুর মৃত্যু সংবাদ তাহাকে দেওয়া হয় নাই, হইলেও সে তাগাদা দিতে ভুলিত না। সময়মত 'পেজ' ছাড়িতে না পারিলে তাহার জরিমানা হয়। হাঁা, এইবার একটু লিখিবার চেষ্টা করা সত্যিই দরকার। কিন্তু কি লিখিব, রাধানাথের জীবনী?

আরও আধঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে।

গটাপার্চার ওয়াটারপ্রুফ্ গায়ে দিয়া অপরিচিত একটী লোক ঘরে ঢুকিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, কাছে আসিয়া বলিল, একটু favour করতে হ'বে আপনাকে—

বসুন।

চেয়ারে বসিয়া লোকটী বলিল, একখানি ছবি ছাপতে হ'বে, আমরা ব্লক্ দেব।

ছবি! কিন্তু কি বিষয়ের?

লোকটী একটু চুপ করিয়া বলে, একটী মহিলার, কাল তাঁর মৃত্যু হয়েচে। স্বামী থাকেন বিদেশে—তাঁর ইচ্ছা স্ত্রীর ছবি কাগজে বা'র হয়।

কিন্তু এরকম সাধারণ ছবি ত' আমরা কাগজে ছাপি না—বিশেষতঃ দৈনিক কাগজে। সাধারণের এতে কি যায় আসে বলুন!

—তা' ঠিক্। দেখুন যদি সম্ভব হয়! কিছু টাকা খরচ করতেও আমরা রাজী। তাঁর স্বামী দু'চার দিনের মধ্যেই মেডিকাল কলেজে স্ত্রীর নামে একটী বেডের জন্য টাকা দান করবেন।

—তাঁদের দু'জনার প্রেমকে দশজনের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে?…কিন্তু, টাকা নেওয়ার হুকুম আমার উপর নেই। ব্লক্খানা রেখে যান, আমি রিসিট্ দিচ্চি। কাল কর্ত্তাদের জানিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

ব্লকখানি দিয়া লোকটী চলিয়া গেল। কিন্তু সেটার প্রতি ভাল করিয়া চাহিতে, হঠাৎ নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। রাধানাথের মৃত্যুর সংবাদ আমাকে এতখানি বিস্মিত করে নাই।

এমনি একটী মেয়েকে চিনিতাম। শুধু চিনিতাম বলিলে হয় ত মিথ্যা বলা হয়, ভাল করিয়া জানিতাম। তার পর সাত বৎসর তার সন্ধান ছিল না। একদিন সামান্য কি একটা কথা লইয়া দুইজনে ঝগড়া করিয়াছিলাম—তার পর আর দেখা হয় নাই। জীবনের পাতা হইতে যে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, তাহারই ছবি এমনি করিয়া কাছে আসিবে তা কে জানিত! ব্লকের সহিত ছবির যে পরিচয়-লিপি ছিল, খুলিয়া দেখি নাম—যে নামে তাহাকে জানিতাম, সেই নামই! রেণু, রাণু, রুণু!

রেণুর ছবি আমি থাকিতেও কাগজে ছাপা হইবে না। জন-সাধারণের দরবারে তার কোন দাম নাই। কাল আমাকেই ব্লক্খানি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

চোখ বুজিয়া কি যে ভাবিতেছিলাম ঠিক নাই। একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়িলে বোধ হয় এমনই হয়। বাহিরে বৃষ্টি সমান ভাবে পড়িতেছে। রাধানাথের

চিতাভস্ম বোধ করি এতক্ষণে কোন্ পাহাড়ী নদীর স্রোতে কতদূরে ভাসিয়া গিয়াছে। রেণুর স্বামী হয় ত আজ রাত্রিতে আমারই মত জাগিয়া আছে। এইবার কাজে মন দিতে হইবে। কিছু লেখা দরকার।

ঘরের কোণে ফোন্ বাজিয়া উঠিল!

নিশ্চয়ই কোন জরুরী খবর। উঠিয়া রিসিভার ধরিলাম।...ইয়েস,...বলুন!...ও!...আচ্ছা, নমস্কার!

যাক্; এইবার কাগজের খোরাক মিলিয়াছে। রেণুর ছবি নয়, রাধানাথের মৃত্যু নয়, ফ্রান্সের মন্ত্রীর উপর কোন্ উন্মাদ গুলী করিয়াছে। একটু পরেই খামে বন্দী হইয়া সেই খবর আমার টেব্‌লের উপর আসিয়া পড়িবে। বড়বড় হরফে সাজিয়া কাল সকালে সেই খবর কলিকাতার পথে পথে, লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

ল্যাম্প হইতে নীল কাগজটা খুলিয়া দিয়া, ড্রয়ার খুলিয়া কাগজ-কলম বাহির করিলাম।

নূপুর-ঝঙ্কার

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ঐ যে জীবন-কুঞ্জে নূপুর বাজে!
বনোমাঝে কিবা মোর হৃদয়-মাঝে?
শ্রবণে শুনিতে পাই ক্ষণেক বিরাম নাই
সমভাবে দিবানিশি মানসে রাজে!
"ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু"
আমি যে আপন-হারা তাহারি খোঁজে!

কেহ বলে দ্বিদলেতে হৃদয়-কমল,
অনাহতে কেহ বলে ফুটেছে প্রেমের জলে
বৃন্দাবনে অভিনব চিত্ত-শতদল!
কিবা নটবর-সাজে চঞ্চল চরণ
তালে তালে চলে, বাজে নূপুর-সিঞ্জন!

"কিং কিং কিনি কিনি" কভু বাজে "রুণি ঝুনি"
নটবর চরণ দুখানি,
বক্ষঃ ভাসে আঁখি-নীরে, আঁখি চাহে দেখিবারে
কোথা বাজে নূপুর-বাজনি!

কেহ বলে অনাহতে প্রণব-ঝঙ্কার,
কেহ কেহ মহামন্ত্র-চৈতন্য সাকার!
যে হোক্ সে হোক্ মোর পরাণ কি সুখে ভোর
শুনিয়া ঝঙ্কার রসনার!
ওগো তুমি সদা মোর অন্তর-মাঝে
নাচিয়া বেড়াও নব নাটুয়া-সাজে!

আমি দিব করতালি নিখিল সংসার ভুলি'
ডুবিয়া রহিব নাথ! তোমার কাজে,
নিশিদিন সমভাবে সকালে সাঁঝে!

রাঢ়াপুরী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকে "রাঢ়াপুরী"র নাম পাওয়া যায়। নাটকের অন্যত্র "রাঢ়া" জনপদেরও উল্লেখ আছে। প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশক অহঙ্কার বলিতেছে—"গৌডরাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি 'রাঢ়ী পুরী', ভূরিশ্রেষ্ঠিক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।" চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে শ্রদ্ধার উক্তি—"দেব্যা এষ দেবমুক্তম্। অস্তি 'রাঢ়া'ভিধানো জনপদ। তত্র ভাগিরথী পরিসরালঙ্কার ভূতে চক্রতীর্থে বিবেক উপনিষদ্দেব্যাঃ সঙ্গমার্থং তপস্তপস্যতীতি।"

রাঢ়াপুরী, ভূরিশ্রেষ্ঠী, চক্রতীর্থ প্রভৃতি নাম কাল্পনিক নহে! ভারতচন্দ্রের কল্যাণে ভূরিশ্রেষ্ঠি ভূরশুটের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। "ভূরশুটে মহাকায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়" ভারতচন্দ্রের মহিমায় অমর হইয়া গিয়াছেন। রাঢ়ের গৌরবের দিনে ভাগীরথী-প্রবাহ যে পথ দিয়া প্রবাহিত হইত, এই দুর্দ্দশার দিনেও সে ধারা হয় তো সেই পথেই বহিয়া চলিয়াছে। ভাগীরথী পরিসরালঙ্কার-ভূত চক্রতীর্থের কথা বোধ হয় ধোয়ীর পবনদূতেও পাওয়া যায়।

*　　　*　　　*　　　*

"ভাগীরথ্যাস্তপনতনয়া যত্র নির্য্যাত দেবী

*　　　*　　　*　　　*

সংসর্পন্তীং প্রকৃতি কুটিলাং দর্শিতাবর্ত্ত চক্রাং

তামালোক্য ত্রিদশসরিতো নির্গতামস্য গর্ভাৎ"

আমাদের মনে হয় ত্রিবেণীর পরবর্ত্তী কোন স্থান চক্রতীর্থ নামে খ্যাত ছিল, এবং "দর্শিতাবর্ত্ত চক্রাং" কথায় তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলায় বর্ত্তমান "চাকটা আনখোলা" পাশাপাশি দুইটা গ্রামের "চাকটা" গ্রাম প্রাচীন চক্রতীর্থের স্মৃতি বহন করিতেছে। চাকটা হইতে গঙ্গা অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের পঞ্চমাঙ্কের প্রবেশকের ঘটনাস্থলও চক্রতীর্থ। ষষ্ঠাঙ্কে মন্দর শৈলস্থ মধুসূদন মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় নাট্যকার ঘটনাস্থলগুলির কাল্পনিক নাম ব্যবহার করেন নাই। তিনি এতদঞ্চলের জনপদ ও তীর্থাদির নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং রাঢ়াপুরী বা রাঢ়া জনপদও নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত নহে। "রাঢ়াপুরী" তবে কোথায়? আমরা রাঢ়দেশের কথাই জানি। বর্ত্তমানে রাঢ়াপুরী নামে কোন জনপদ রাঢ়দেশে নাই। অবশ্য এখন নাই, কিন্তু তখন নিশ্চয়ই ছিল। কোথায় ছিল?

এলাহাবাদ হইতে ঝান্সী যাইবার রেলপথে "মহোবা" অন্যতর ষ্টেসন। মহোবার "কীর্ত্তিসাগর" "মদনসাগর" প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপগুলি তাহার অতীত গৌরবের পরিচয়। অদূরে ইতিহাস-বিখ্যাত কালঞ্জরের সুপ্রাচীন গিরিদুর্গ, এবং কিছুদূরে চন্দেল্লরাজগণের কীর্ত্তিভূষিত মধ্যভারতের শিরোভূষণ খাজরাহো। এই সমস্ত স্থান—সমগ্র বুন্দেলখণ্ডই এক সময় একই নরপতির শাসনাধীন ছিল। কৃষ্ণ মিশ্র এই মহোবার অধিপতি চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সভাকবি ছিলেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার ব্রাহ্মণ সেনাপতি গোপাল যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী চেদীরাজ কর্ণকে (জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী নর্ম্মদাতীরস্থিত ত্রিপুরী ইঁহার রাজধানী ছিল) পরাস্ত করিলে গোপালের অভ্যর্থনার জন্যই "প্রবোধ-চন্দ্রোদয়" রচিত হয়। ঐতিহাসিকগণ খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ এই নাটকের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। চন্দেল্লরাজগণ গৌড় এবং রাঢ়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ধঙ্গ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যশোবর্ম্মার রাঢ় ও গৌড় অভিযানের কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণ মিশ্রের নাটকে এদেশের পুর, জনপদাদির কোন কাল্পনিক নাম ব্যবহারের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

'বীরভূম বিবরণ' ১ম খণ্ড সংকলনকালে (সন ১৩২৩ সাল) আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণস্থিত "আড়া" গ্রামই

প্রাচীন রাঢ়াপুরীর স্মৃতি বহন করিতেছে। (শ্যামারূপার গড়কাহিনী, ২৩৯ পৃ:) দীর্ঘ কাল অতীত হইল এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই। সত্য নির্ণয়ের জন্য বিষয়টী ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। দামোদর নদের উত্তরতীরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন দুর্গাপুর হইতে কিছু কম প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে 'আড়া' নামে গ্রাম আছে। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ একটী অনতিবিশাল ধ্বংসস্তূপ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্গাপুর হইতে যে রাজপথ এই ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়া অজয়ের দক্ষিণতীরস্থিত শিবপুর গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সেই পথের উপরেই 'আড়া' গ্রামের প্রসিদ্ধ 'রাঢ়েশ্বর' শিবের মন্দির। সাধারণ লোকে গ্রামকে যেমন 'আড়া' বলে, শিবকেও তেমনি 'আড়েশ্বর' শিব বলিয়া থাকে। আমাদের মনে হয় এই "আড়া"ই প্রবোধচন্দ্রোদয়ের "রাঢ়াপুরী।"

এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসস্তূপ হইতে বহু মন্দির ও আবাসবাটীর প্রস্তরময় ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতোমধ্যেই স্থানীয় লোকে একটী নদীর সেতু প্রস্তুতের কাজে এবং নিজেদের গৃহাদিতে ব্যবহার জন্য এইরূপ ভিত্তি খুঁড়িয়া প্রচুর প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছে। পাথরগুলি চৌকা করিয়া কাটা। এই জাতীয় পাথর বাকুড়ার শুশুনিয়া কিম্বা সাঁওতাল পরগণার তরণী পাহাড় প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটী স্থান গড়দুয়ার নামে পরিচিত। পূর্ব্ব প্রান্তে কতকটা স্থানকে লোকে বাজীগড় বলে। গড়দুয়ারে প্রাচীর বা দুয়ারের কোন ধ্বংসাবশেষ নাই। বাজীগড়ের নিকটে কিছু কিছু প্রস্তর ও প্রাচীরের অবশেষ পড়িয়া আছে। পরিখা ও প্রাচীরের ক্ষীণ চিহ্ন দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। গ্রামে ও তাহার চারি পাশে কতকগুলি বড় বড় দীঘি আছে। প্রবাদ শুনিতে পাই, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে সাহজাদ রায় নামক একজন জমিদার বাস করিতেন। তিনিই কয়েকটী দীঘির পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন, অপর কয়েকটী তাঁহারই ব্যয়ে খনিত।

সাহজাদ রায়ের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, "তিনি এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তন্ত্রমতে সাধনা করিয়া নায়িকা-সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম ভুবন রায়। ইনি অতি দীনাবস্থা হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নবাবের নিকট সাহজাদ উপাধি লাভ করেন। একদিন বীরভূমের সিঙ্গুর গ্রামনিবাসী সাধক বিরূপাক্ষ সাহজাদের সিদ্ধি-লাভের কথা শুনিয়া আড়ায় গিয়া উপস্থিত হন। সাহজাদ প্রত্যহ নিজ ইষ্টদেবীর দর্শন পাইতেন। বিরূপাক্ষ সাহজাদের ইষ্টদেবীর দর্শন প্রার্থনা করিলে ইষ্টদেবী বলেন যে, আমি বিরূপাক্ষের উপাস্যা অম্বিকা নহি, আমি অম্বিকার দাসী মাত্র। অতঃপর নায়িকা গিয়া অম্বিকাকে বিরূপাক্ষের কথা বলিলে দেবী বলেন যে, বিরূপাক্ষের গুরুদত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ। শুদ্ধ মন্ত্র আমি লিখিয়া দিতেছি ; এই মন্ত্রে উপাসনা করিলে আমি তাহাকে দর্শন দিব'। শুনিয়া বিরূপাক্ষ বলেন যে 'আমার গুরুদত্ত মন্ত্রই শুদ্ধ, আমি দেবীর দর্শন চাহি না'। তাঁহার গুরুভক্তি দেখিয়া দেবী তাঁহাকে দর্শন দেন, বিরূপাক্ষ তখন একটী শিলাসনে বসিয়া মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। গুরুদত্ত মন্ত্র অশুদ্ধ বলায় তিনি দেবীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেবী বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি প্রার্থনা করিলেন যে আমি যখন যেখানে জপে বসিব তুমি এই শিলাসনখানি বহিয়া দিবে। কিছু দিন এইরূপে আসনখানি বহিয়া দেবী সাহজাদকে উক্ত প্রস্তরখণ্ড চাহিয়া লইতে বলেন। সাহজাদ বিরূপাক্ষের নিকট হইতে পাথরখানি লইয়া তদ্দ্বারা একটী শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। লোকে বলে সেই শিবলিঙ্গই রাঢ়েশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পাথরখানি লওয়ার জন্য বিরূপাক্ষের পুত্র কবীন্দ্রের শাপে সাহজাদ শ্রীহীন হন।"

কবীন্দ্র কেন্দুলা জগন্নাথপুর গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। কেন্দুলার মহিষমর্দ্দিনী দেবী কবীন্দ্রের প্রতিষ্ঠিতা। আড়া ও কেন্দুলা গ্রাম অধুনা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি, ভুবন রায় বালে গরু চরাইতেন। তিনি জঙ্গলের মধ্যস্থিত কোন (পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসস্তূপে) স্থানে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই অর্থেই তাঁহার অবস্থার উন্নতি হয়। তিনি বিষয়-সম্পত্তি খরিদ করিয়া জমিদার হইয়া বসেন। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয়, তিনি প্রাচীন রাঢ়েশ্বর শিবের মন্দির ও দীর্ঘিকাদির সংস্কার সাধন করেন। সাধনার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু শিব-প্রতিষ্ঠার

কথায় সন্দেহ হইতেছে ; কারণ, লোকে নিজ নামেই শিব প্রতিষ্ঠিত করে। শিবের রাঢ়েশ্বর নাম দেখিয়া মনে হয়, তিনি পুরানো শিবলিঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং মন্দিরাদি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের নিকটস্থিত একটী দীঘি "মহাকাল-দীঘি" নামে পরিচিত। আর একটী দীঘির নাম 'রমণা'।

গ্রামের দক্ষিণে এক গ্রামদেবী আছেন, নাম 'অখিলেশ্বরী'! মূর্ত্তিটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে বা কাহারা মূর্ত্তির সম্মুখ-ভাগ চাঁছিয়া তুলিয়া দিয়াছে। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুইটী কদলীবৃক্ষ, মাথার উপরে সর্পের সাতটী ফণা ছত্রাকারে সজ্জিত। দেবী দ্বিভূজা, ভগ্ন পাদপীঠে একটী হস্তী ক্ষোদিত রহিয়াছে। বেদীর উপরে বৃক্ষমূলে আরো কয়েকটী ভগ্ন মূর্ত্তি, একটী বাসুদেব-মূর্ত্তি, একটী তারামূর্ত্তি এবং অপর দুই একটী অজ্ঞাত মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ। তারামূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুই ছত্র লিপি ছিল, এক ছত্র একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, অপর ছত্রের একটী কি দুইটী অক্ষর পড়া যায় মাত্র। তারার দুই পার্শ্বে পঞ্চ মহাভয়ের মূর্ত্তি প্রায় অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। মূর্ত্তির ভাস্কর্য্য-ধারায় পাল-রাজত্বের প্রথম ভাগের শিল্প-রীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মরাজতলায় পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিযুক্ত একটী ভগ্নমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ নামে পূজা পাইতেছেন। গঠন-প্রণালী দেখিয়া এ মূর্ত্তিগুলিও পালরাজাদের সময়ের পুরানো বলিয়া মনে হয়।

চন্দেল্লরাজ ধঙ্গ যখন রাঢ়দেশ জয় করেন, সেই সময় যাঁহারা এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কাহারো নিকট হইতে কৃষ্ণ মিশ্র বোধ হয় রাঢ়াপুরী ভূরিশ্রেষ্ঠী প্রভৃতি নগরীর বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে ধঙ্গ খ্রীষ্টীয় ১০০২ অব্দে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অঙ্গ রাঢ় জয় করেন।

মধ্যভারতে খাজুরাহোর বিশ্বনাথমন্দিরে ধঙ্গের যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়,—তিনি যুদ্ধে রাঢ়ের রাণীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

"কাত্বং কাংচী নৃপতি বনিতা কা ত্বমন্ধ্রাধিপস্ত্রী
কা ত্বং রাঢ়া-পরিবৃঢ় বধূঃ কা ত্বমঙ্গেন্দ্র পত্নী।
ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরি প্রিয়াণাং
কারাগারে সজল নয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ"॥

এই রাঢ়াধিপ কে? বঙ্গ কাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন "এদিকে রাঢ়দেশে সমরে পরাজিত হইয়া হয় ত বিগ্রহ পাল ধঙ্গের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন এবং হয় ত কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে স-স্ত্রীক চন্দেল্ল কারাগারে বাস করিতে হইয়াছিল।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্য কাণ্ড ১৭২ পৃঃ)। রাজন্য কাণ্ডের ১৭৪ পৃষ্ঠায় কিন্তু লেখা আছে—প্রায় ৯৮০ হইতে ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কম্বোজ দলন করিয়া তিনি (মহীপাল) সমস্ত উত্তর বঙ্গ উদ্ধারে সমর্থ হন"। ৯৯০ মধ্যে মহীপাল যদি উত্তরবঙ্গ উদ্ধারে সমর্থ হইলেন, তাহা হইলে ১০০২ খ্রীষ্টাব্দে ধঙ্গ আর বিগ্রহ পালকে বন্দী করিতে পাইলেন কোথায়? বিগ্রহ পালের মৃত্যুর পর না মহীপাল অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন?

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহীপালের মৃত্যু হইয়াছিল। কারণ মহীপালদেবের রাজ্যকালে (?) সারনাথে ১০৮৩ সংবতে (১০২৬ খ্রীঃ) যে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে 'প্রবর্দ্ধমান' বা 'কল্যাণ বিজয় রাজ্যে' ইত্যাদি কোন পদ ব্যবহৃত হয় নাই (বাঙ্গালার ইতিহাস ২৫৭—২৫৮ পৃঃ)। মজফরপুর জেলায় ইমাদপুরে মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রমাণের উপর নিভর করিয়া রাখালবাবু লামা তারানাথ কথিত মহীপালের বায়ান্ন বৎসর রাজ্য করিবার কথা ঐতিহাসিক সত্যরূপে মানিয়া লইয়াছেন। এই হিসাবে খ্রীষ্টীয় ৯৭৫ অব্দে মহীপালের রাজ্যারোহণ সাল নির্ণয় করিতে হয়। সুতরাং তিনি যে বলিয়াছেন দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বের শেষ ভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে রাঢ় ও অঙ্গ ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়" (বাঙ্গালার ইতিহাস ২৪২ পৃঃ), সে কথাও গ্রহণ করা চলে না। তাহা হইলে ধঙ্গ কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

ইতিহাসে—ক্ষোদিত লিপিমালায় এ পর্য্যন্ত আমরা দুইজনকে রাঢ়াধিপরূপে দেখিতে পাইয়াছি ; একজন ১ম মহীপাল দেব, রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ লিপিতে ইনি উত্তর রাঢ়ের অধিপতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে মহীপাল তখন গৌড়েশ্বররূপেই পরিচিত। কারণ যে "কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে পরাস্ত করিয়া মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিলেন, সিংহাসন গ্রহণের নবম রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বেই তিনি সেই গৌড়পতিকে পরাস্ত করিয়া পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতির বাণগড় স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়,—

দুর্ব্বারারি বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণ গ্রামগ্রহো গীয়তে।
কম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দু মৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

"যাঁহার দুর্ব্বার শত্রুসৈন্য বিনাশ, দান এবং ধনুর্গুণ গ্রহণের দক্ষতার কথা বিদ্যাধরগণ সানন্দে স্বর্গলোকে গান করে, সেই কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি 'কুঞ্জরঘটাবর্ষ' কর্ত্তৃক ভুবনের অলঙ্কার স্বরূপ এই ইন্দুমৌলির (শিব) মন্দির নির্ম্মিত হইল।" ইতঃপূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ কুঞ্জরঘটাবর্ষ শব্দের অন্ধ অর্থ ধরিয়াছেন। আমাদের মনে হয় রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধিপতিগণের যেমন ধারাবর্ষ, অকালবর্ষ, অমোঘবর্ষ, প্রভূতবর্ষ প্রভৃতি উপাধি ছিল, ইঁহারও সেইরূপ 'ঘটাবর্ষ' উপাধি ছিল। কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের মতের মোটামুটী মর্ম্ম এইরূপ, দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে অধুনা 'কাম্বে' নামে পরিচিত স্থানই গরুড় পুরাণোক্ত কম্বোজ, এবং ইহা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সামন্ত রাজ্য ছিল। কম্বোজান্বয়জ-গৌড়পতি (কুঞ্জর ঘটাবর্ষ ?) এই কম্বোজেরই অধিবাসী এবং ইনি রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় ইন্দ্রের সামন্তরূপে কিছুদিন গৌড় শাসন করিতে আসিয়া পরে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা ইহা সম্ভব বলিয়া মনে করি। মনে হয় স্বাধীনতা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ইনি 'ঘটাবর্ষ' উপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মা দেবের গৌড় আগমনের (৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের) পরে আমরা এই ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করি। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র যে সময় কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করেন এবং তাঁহার মহাসামন্ত নরসিংহ যে সময় পলায়নপর কান্যকুব্জ-রাজ মহীপালের [ইনি বঙ্গের পালসম্রাট ১ম মহীপাল নহেন।] অনুসরণে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়ে এই কুঞ্জর ঘটাবর্ষ কর্ত্তৃক গৌড় অধিকৃত হয়।

যে বাণগড়ে এই কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মহীপালদেব সমগ্র উত্তর বঙ্গ জয় করিয়া সেই বাণগড়ের সমীপবর্ত্তী (?) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তঃপাতী কোটীবর্ষ বিষয়ে 'গোকলিকা মণ্ডলে কুরট পল্লিকা গ্রাম কৃষ্ণাদিত্য নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই দানের তাম্রশাসন বাণগড় হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ইহাই প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপি নামে পরিচিত। এই লিপি হইতেই জানিতে পারি রাজ্যের নবমবর্ষের পূর্ব্বেই তিনি—

"হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহু দর্পাদনধিকৃত বিলুপ্তং
রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিত চরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপাল
শ্রীমহীপাল দেবঃ॥"

"যুদ্ধে বিপক্ষ সকলকে বাহুদর্পে হত ও অনধিকৃত বিলুপ্ত-পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক অপরাপর ভূমিপতি-গণের মস্তকে চরণপদ্ম স্থাপন করিয়া শ্রীমহীপালদেব অবনীপাল হইয়াছেন।" সুতরাং বলিতে হয় প্রথম মহীপাল তখন গৌড়েশ্বর রূপেই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ধঙ্গ যে ইঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিম্বা ইঁহাকে রাঢ়াধিপ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। চন্দেল্ল রাজবংশ পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোলের ইতিহাস অন্যরূপ। তিনি পাল সম্রাটের কয়েক-জন সামন্তকে জয় করিয়া গঙ্গা পার হইবার পথেই উত্তর রাঢ়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কি জন্য জানিনা তিনি মহীপালকে গৌড়েশ্বর বলিয়া উল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। তিনি যে মহীপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, 'চণ্ডকৌশিক' নাটক হইতেই তাহা অনুমিত হয়। এই নাটকে কর্ণাটকগণ নবনন্দ এবং মহীপাল চন্দ্রগুপ্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

"যং সংশ্রিত্য প্রকৃতি গহনামার্য্য চাণক্য নীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।

কর্ণাটত্বং ধ্রুব মুপগতানদ্য তানেব হন্তং
দোর্দ্দপাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপালদেবঃ"॥

এখানে কর্ণাটক বলিতে রাজেন্দ্র চোল ও তাঁহার সেনাগণকে বুঝাইতেছে মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। চাণক্যনীতি অবলম্বনেই গৌড়েশ্বর তাঁহাকে উত্তর রাঢ়ে গিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। (আর্য্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত) 'চণ্ডকৌশিক' নাটক মহীপাল দেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যেই রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় 'রাঢ়াধিপ',—"মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ"। ঈশ্বর ঘোষ ইহাঁকে রাঢ়াধিপ বলিয়াছেন, অথচ নাম করেন নাই। তিনি পিতা, পিতামহ প্রপিতামহের নাম করিয়াছেন, প্রত্যেকের কিছু কিছু বিশেষণও লিখিয়াছেন, কিন্তু যিনি ইহাঁদের সকলের অপেক্ষা সম্মানিত পদবীতে আরূঢ় ছিলেন, তাঁহার নাম না করিবার হেতু কি? আমাদের মনে হয় এই অজ্ঞাতনামা রাঢ়াধিপই ধঙ্গের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। তাই ঈশ্বর ঘোষ তাম্রশাসনে তাঁহাকে রাঢ়াধিপ মাত্রই বলিয়াছেন, নিজের গৌরবের দিনে স্বীয় বংশের বিস্মৃতপ্রায় পরাজয়-কাহিনীর স্মারক তাঁহার নাম গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পথে পাল সামন্তচক্রের প্রত্যেকেই—দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র যেমন সম্মুখ-সংগ্রামে বাধা দিয়াছিলেন, তেমনই ধঙ্গ যখন কাঞ্চী এবং অন্ধ্র দেশ জয় করিয়া রাঢ়ের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, সে সময় ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ হয় তো রণক্ষেত্রে তাঁহার গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অঙ্গদেশে কোন্ ব্যক্তি পালবংশের সামন্ত নরপতি ছিলেন জানা যায় না। মহীপালদেবের রাজ্যের ৪৮শ বৎসরে যে তীরভুক্তি তাঁহার অধিকারে ছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। তৎপূর্ব্বেই মগধ এমন কি কাশী পর্য্যন্ত তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশ যে মহীপালের রাজ্যকালে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোন দেশের কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি হইতে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মাত্র দেখিতে পাই যে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের সঙ্গে যুদ্ধে ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে মিথিলার কিয়দংশে মহীপালদেব অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয় রাঢ়াধিপের সঙ্গে যুদ্ধের পর স্বদেশে ফিরিবার পথে রাঢ়াধিপের মত অঙ্গরাজ্যের কোন সামন্তের সঙ্গেও তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রাঢ়াপুরীরই অধীশ্বর ছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি রাঢ়াধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অনধিকৃত বিলুপ্ত-পিতৃরাজ্য প্রথম মহীপাল যখন রাঢ়ের নিভৃত প্রদেশে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হয়তো ঈশ্বর ঘোষের ঐ বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহীপালকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাই তিনি সম্মানিত রাঢ়াধিপ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ বিশ্বস্ত, রাজভক্ত এবং বীরত্বাভিমানী ছিলেন বলিয়াই তিনি বোধ হয় গৌড়ীয় সেনা সাহায্যার্থে আসিবার পূর্ব্বেই ধঙ্গকে বাধা দিয়াছিলেন, কিম্বা বৃদ্ধ বয়সে অতর্কিত আক্রমণে পরাস্ত হইয়াছিলেন। হয় তো সে সময় গৌড়েশ্বর অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তথাপি যে ধঙ্গ গৌড় আক্রমণ করেন নাই, হয় তো তাহার অন্য কোন কারণ ছিল।

অথবা এমনও হইতে পারে যে, এই রাঢ়াধিপ কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি কুঞ্জর ঘটাবর্ষের অনুরক্ত ও গুপ্ত সহায়ক ছিলেন। কুঞ্জর ঘটাবর্ষের পরাজয়ের পর গৌড়েশ্বর আর রাঢ়াধিপকে আক্রমণ করা উচিত মনে করেন নাই। অথবা কোন রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। এমন সময় ধঙ্গ আসিয়া রাঢ়দেশ আক্রমণ করিলেন। গৌড়েশ্বর গৌড় সীমান্ত সুরক্ষিত করিয়া রাঢ় যুদ্ধের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে রাঢ়াধিপ বন্দী অথবা নিহত হইলেন। রাঢ়যুদ্ধে ক্লান্ত চন্দেল্লরাজ আর গৌড় আক্রমণে সাহস করিলেন না। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন-পথে পাল সামন্তচক্রের অঙ্গাধিপতিকে জয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। মনে হয়, এই যুদ্ধের পরই রাঢ়াধিপের পুত্র ধূর্ত্ত ঘোষ রাঢ় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর অনুকূল থাকিলে তিনি দেশত্যাগ করিতেন কি না সন্দেহ; এবং তিনি রাঢ় দেশে বর্ত্তমান থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে রাজেন্দ্র

চোলের সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইতাম। কারণ সেকালে রাঢ়দেশবাসী বা বঙ্গবাসী কেহ শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ বা বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেন না। আমাদের মনে হয়, রাঢ়াধিপের পতনের পর গৌড়েশ্বর উত্তর রাঢ়ের সীমা দামোদরের তীর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেন, এবং আরো দক্ষিণে দক্ষিণ রাঢ়ে (গড় মান্দারণে) রণশূরকে ও দণ্ডভূক্তিতে (মেদিনীপুরে) ধর্ম্মপালকে সীমান্তরক্ষক সামন্তরূপে নিযুক্ত করেন। রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের সময় তাই তাঁহার প্রতিরোধকরূপে আমরা রণশূর ও ধর্ম্মপালকেই দেখিতে পাই। এবং এই দুই সামন্তের বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক রাজেন্দ্র চোল অগ্রসর হইয়া আসিলে স্বয়ং গৌড়েশ্বরকে উত্তর রাঢ়ের রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে দেখি। অবশ্য এ সমস্তই আমাদের অনুমান মাত্র। আশা করি, পাঠকগণ সমস্ত দিক্ আলোচনাপূর্ব্বক বিষয়টীর যুক্তিযুক্ততা বিচার করিবেন। আমরা অতঃপর ঈশ্বর ঘোষের কুল-পরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি।

ঈশ্বর ঘোষের কুল পরিচয় এইরূপ—

"বভূব রাঢ়াধিপ লব্ধজন্মা তিগ্মাংশু চণ্ডো নৃপ বংশ কেতুঃ
শ্রীধূর্ত্ত ঘোষো নিশিতাসিধারা নির্ব্বাপয়িতারি-
ব্রজ-গর্ব্ব-লেশঃ॥
আসীত্ততোহপি সমর ব্যবসায়সার বিস্ফূর্জ্জিতাসি
কুলিশক্ষত বৈরিবর্গং
শ্রীবাল ঘোষ ইতি ঘোষ কুলাব্জজাত মার্ত্তণ্ড মণ্ডলমিব
প্রথিত পৃথিব্যাং॥
তস্মা ভবদ্ধবল ঘোষ ইতি প্রচদণ্ডঃ সুতো জগতি গীত
মহা প্রতাপঃ
যেনেহ যোধ তিমিরৈক দিবাকরেণ বজ্রায়িতং
প্রবল বৈরি কুলাচলেষু॥
ভবানী বা পরা মূর্ত্ত্যা সীতেব চ পতিব্রতা
সম্ভাবা নাম তস্যাভূদ্ ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ॥
তস্মা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা জয়ত্যেকো দুর্দ্ধব
সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্র দ্যুতিঃ
যস্ত প্রোজ্জ্বিত শৌর্য্য নির্জ্জিত রিপোঃ প্রৌঢ় প্রতাপশ্রুতে
রাস্তম্বাষ্প জল-প্রণাম মলিনং শত্রু স্ত্রিয়ো বিভ্রতি"॥

[স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বর ঘোষঃ কুশলী" ইত্যাদি] "রাঢ়াধিপ হইতে লব্ধজন্মা সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড শ্রীধূর্ত্তঘোষ শাণিত অসিধারায় শত্রুকুলের গর্ব্বলেশ নাশ করিয়া নৃপবংশের কেতুস্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহা হইতে সমর-ব্যবসায়-কুশল, বিস্ফূর্জ্জিত তরবারী-বজ্রে বৈরীবর্গ নিধনকারী ঘোষ-কুল-কমলের মার্ত্তণ্ডরূপে পৃথিবীপ্রথিত শ্রীবালঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধবল ঘোষ নামে এক পুত্র জন্মে।—যাঁহার প্রচণ্ড শাসনদণ্ডের মহাপ্রতাপ জগতে গীত হইত এবং যিনি প্রতিযোদ্ধারূপ অন্ধকারের দিবাকর ও বৈরী-কুলাচলের বজ্রস্বরূপ ছিলেন। তিনি নারায়ণের লক্ষ্মীর মত, সীতার ন্যায় পতিব্রতা, ভবানীর অপরা মূর্ত্তি স্বরূপিনী সম্ভাবা নাম্নী ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নির ন্যায় জয়শীল, দুর্দ্ধর-সাহস অপরের কথা কি কান্তিপ্রভায় ইন্দ্রদ্যুতিকেও পরাজয়কারী ঈশ্বর ঘোষ তাঁহার পুত্র। যিনি প্রদীপ্ত শৌর্য্যে রিপুগণকে পরাজিত করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রৌঢ় প্রতাপের পরিচয় শুনিয়া অশ্রু-বাষ্প-মলিন মুখমণ্ডল শত্রু রমণীগণ বিভ্রান্তা হয়।"

এই তাম্রশাসন দ্বারা ঢেক্করী হইতে মহামাণ্ডলিক শ্রীমদ্ ঈশ্বর ঘোষ মার্গ সংক্রান্তি দিনে জটোদায় স্নান করিয়া পিপোল্ল মণ্ডলান্তঃপাতী গাল্লিটিপ্যক বিষয় সম্ভোগ দিগ্ঘা সোদিকা গ্রাম নিব্বোক শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে দান করেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "জটোদয়া" পাঠ ধরিয়া 'গঙ্গা' অর্থ করিয়াছিলেন। পাঠ আছে "জটোদায়াং স্নাত্বা"; "জটোদয়াং স্নাত্বা" পাঠ প্রকৃত হইলে "গঙ্গায় স্নান করিয়া" অর্থই হইবে। তাহা হইলে "রাঢ়াপুরী" হইতে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই দানকৃত গ্রামের অনুসন্ধান করিতে হয়। রাঢ়াপুরী হইতে আন্দাজ আট-দশ ক্রোশ দূরে আধক্রোশেরও কম ব্যবধানে "দিঘা সোয়ারা" নামে পাশাপাশি দুইটী গ্রাম আছে। তাহারই কিছু দূরে "গোল্লিষ্ঠা" নামে গ্রাম। এই 'গোল্লিষ্ঠা' 'গাল্লিটিপ্যক' নামের অপভ্রংশ এবং 'দিঘা সোয়ারা' দিগ্ঘা সোদিকা নামের রূপান্তর কি না ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন। এগুলি মিলিয়া গেলে অজয় নদের তীরে ঢেক্করী বা ঢেক্কর গড়ও পাওয়া যাইবে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কিন্তু

এ বিষয়ের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি জটোদা পাঠ ধরিয়া কালিকা পুরাণ হইতে বচন উদ্ধারপূর্ব্বক কামরূপে জটোদার অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"গৌরী বিবাহ সময়ে সর্ব্বৈ মাতৃগণৈঃ কৃতঃ।
জলাভিষেক ভর্গস্য জটাজটৈষু যঃ পুরা॥
তৈ স্তোয়ৈ রভবদ্যস্মা জ্জটোদাখ্যা নদী ততঃ।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বলেন "প্রাচীন ডাকার্ণব তন্ত্রে কামরূপ ও ঢেক্করীর উল্লেখ আছে। সৌমার বা উপর আসামের লোকেরা কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী-(গণকে) এবং তাঁহাদের ভাষাকেও ঢেক্করী বা ঢেক্‌রী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। মোগল বাদশাহদিগের সময়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলেও তাহাদের অধিকারভুক্ত আসাম প্রদেশ 'সরকার বাঙ্গালভূম', 'সরকার ঢেক্‌রী', 'সরকার কামরূপ', ও 'সরকার দরঙ্গ' এই কয় বিভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমান আমলে বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার পশ্চিমপ্রান্ত লইয়া সরকার বাঙ্গালভূম এবং তাহার পার্শ্বেই বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা সরকার ঢেক্‌রী বলিয়া পরিচিত হইত।" (রাজন্য কাণ্ড ২৪৯—২৫০ পৃষ্ঠা)

ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনখানি দিনাজপুর জেলা বর্ত্তমান "মালদোয়ার-ষ্টেটে" রক্ষিত আছে। মালদোয়ারে জনশ্রুতি আছে নিব্বোক শর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের গুরুদেব ছিলেন। তিনি দান গ্রহণ করিয়া তাম্রশাসনসহ গ্রামখানি নিজের গুরুদেবের চরণে সমর্পণ করেন। নিব্বোক শর্ম্মার গুরুবংশই মালদোয়ার ষ্টেটের রাজবংশ। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের উপরিউক্ত জটোদা ও ঢেক্করী সম্বন্ধীয় অনুমান সত্য হইলে বলিতে হয় ঈশ্বর ঘোষ গোয়ালপাড়া অঞ্চলেরই রাজা ছিলেন এবং নিব্বোক শর্ম্মাও ঐ অঞ্চলেরই লোক। অবশ্য রাজার গুরু যে বিদেশী হইতে পারে, এমন কথা বলা চলে না। তবে রাজার পক্ষে গুরুদেবকে রাজধানী বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে আনিয়া বাস করানোই স্বাভাবিক। নিব্বোক শর্ম্মাও হয় তো মালদোয়ারের কাছাকাছি কোথাও বাস করিতেন। তাহা হইলে 'দিগ্‌ঘাসোদিকা' প্রভৃতির অনুসন্ধান ঐ অঞ্চলেই করিতে হইবে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের অনুমান সমর্থন করিতে হইলে আন্দাজ করিয়া লইতে হয়—অজ্ঞাতনামা রাঢ়াধিপ রাজা ধঙ্গের হস্তে বন্দী বা নিহত হইলে শ্রীধূর্ত্ত ঘোষ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে গিয়া নূতন রাজ্য সংস্থাপন করেন। নূতন রাজ্য এবং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই তিনি নৃপবংশকেতু নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ঈশ্বর ঘোষের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তাঁহার আজ্ঞা অশেষ রাজন্যকগণকে পালন করিতে হইত। তাঁহারও সামন্ত-সহচর ছিল, তাঁহার অধীনেও বিষয়পতি ভুক্তিপতি ছিল, তাঁহারও কোট্ট (দুর্গ) ছিল, সেনাপতি কোট্টপতি ছিল। একজন রাজাধিরাজের প্রবল প্রতাপ বিজ্ঞাপক যে সকল রাজপাদোপজীবী থাকিত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষেরও সেই সকল রাজপাদোপজীবী ছিল।" (সাহিত্য ১৩২০) এহেন ঈশ্বর ঘোষ যদি অজয়তীরবর্ত্তী ঢেক্করী বা নিজ রাজধানী রাঢ়াপুরীতে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে স্বীয় প্রপিতামহের পরিচয়ে নূতন করিয়া রাঢ়াধিপ হইতে জন্মলাভের কথা উল্লেখ করিতেন না। সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের অনুমানই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বর ঘোষ পিতামহ বালঘোষকে সমর ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় নিজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে আজীবন যুদ্ধবিগ্রহেই লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। পাল রাজত্বের শেষভাগে ঈশ্বর ঘোষের অভ্যুদয়কাল অনুমান করিতে পারি। তিনি হয় তো প্রতাপহীন পাল রাজবংশের নামে মাত্র অধীন ছিলেন। গৌড়েশ্বর রাম পালের পরে এবং বিজয় সেনের পূর্ব্বে ঈশ্বর ঘোষের সময় নির্দ্দেশ করিতে হয়। আমাদের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ বিদ্রোহী তিগ্মদেবকে শাসন করিয়া গৌড়েশ্বর কুমার পালের অমাত্য বৈদ্যদেব যে সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসন অধিকার করেন, ঈশ্বর ঘোষ সেই বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হয় তো বৈদ্যদেবকে সাহায্যদানের জন্যই তিনি মহামাণ্ডলিক পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা কুমার পালের স্বর্গারোহণের পর তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিগ্মদেবের পরিণাম স্মরণে মহামাণ্ডলিক উপাধি গ্রহণেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ, শ্যাম পণ্ডিত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের পুঁথিতে ঈশ্বর ঘোষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোমঘোষ। সোমঘোষ ধবল ঘোষের নামান্তর হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় ধূর্ত্ত ঘোষের বা বালঘোষের কামরূপ অঞ্চলে বিজয়লাভের স্মৃতি ধর্ম্মমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত হইয়া গিয়াছে। তাই নাম সাদৃশ্যে কেহ কেহ ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ কল্পনা করিয়া থাকেন। ১০০২ খৃষ্টাব্দে ধঙ্গ রাঢ়দেশ জয় করেন। সেই সময় ধূর্ত্ত ঘোষ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়ের পর ইছাই ঘোষের অভ্যুদয়। এই উভয় ঘটনাই পাল সম্রাট প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইছাই ঘোষের সঙ্গে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের একত্বের কোন প্রমাণ নাই। ইছাই ঘোষ অজয় নদের তীরবর্ত্তী ঢেক্কর বা শ্যামারূপার গড়ে রাজা হইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর ঘোষ গোয়ালপাড়া অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তিনি রাঢ়দেশ হইতে অন্যত্র গিয়াছিলেন বলিয়াই রাঢ়াধিপ রূপে পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিয়াছিলেন। হয় তো এই স্মৃতিই তাঁহাকে রাজ্যের বা রাজ্যাংশের ঢেক্কীর নামকরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

প্রাচ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্-এ

প্রাচ্য দর্শনের প্রথমতঃ দুইটি বিভাগ—আস্তিক দর্শন এবং নাস্তিক দর্শন। যাহারা আস্তিক তাহাদিগের যে দর্শন তাহা আস্তিক দর্শন, আর নাস্তিক-দর্শন নাস্তিকগণের—ইহা ত অতি সহজ কথা। কিন্তু কথা হইতেছে—কে-ই বা আস্তিক আর কে-ই বা নাস্তিক, তাহার সমাধান হইবে কিসে? সাধারণ ভাবে (Popular sense) আমরা বলিয়া থাকি, 'অমুক লোকটি ত ভারি নাস্তিক! ঠাকুর দেবতা মানে না!—বলে কি না পুতুল-পুজো? জাগ্রত শালগ্রামকে বলে কি না পাথর নুড়ি?' পদি পিসির দল এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক অগ্রণী। তাঁহাদিগের মতে ত 'হাঁচি টিকটিকি খনার বচন' না মানিলেই নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতে হয়। কিন্তু আসলে আস্তিকতা ও নাস্তিকতার মাপকাটি, ভেদ বা বৈশিষ্ট্য (Differentia) কোন্ খানে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা—আত্মার অনাদিত্ব ও অবিনাশিত্ব, এক কথায় আত্মার নিত্যত্ব অর্থাৎ দেহের জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব এবং অন্য দেহাশ্রয়ে তাহার পুনর্জ্জন্ম ও তদুপযুক্ত ভোগ-লোক স্বীকার করেন, যাঁহারা অদৃষ্ট, কর্ম্মফল ও বেদোক্ত বিধি-নিষেধে আস্থাবান্ তাঁহারাই আস্তিক। এবং যাঁহারা তদ্ব্যতিরিক্ত, তাঁহারা নাস্তিক। অতএব ফল কথা হইল এই যে, পরলোক, জন্মান্তরবাদ, আত্মার নিত্যত্ব এবং শ্রুতির প্রামাণ্য যাঁহারা স্বীকার করেন না, নাস্তিক কেবল তাঁহারাই। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অস্বীকরণই যে নাস্তিকতার নিয়ামক এরূপ কোনও নিয়ম নাই। কারণ এতাদৃশ নিয়ম স্বীকার করিলে সাংখ্যদর্শনকার কপিল মুনিকেও নাস্তিকগণের তালিকায় স্থান দিতে হয়, যেহেতু তাঁহার মতে ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ নাই (১)। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে কস্মিন্‌কালেও নাস্তিক ছিলেন না এ বিষয়ে আজিও কাহারও সংশয় বা মতদ্বৈধ বর্ত্তমান নাই।

এহেন নাস্তিকগণের চার্ব্বাক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, আর্হত দর্শন প্রভৃতি কতিপয় দর্শনশাস্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইরূপ আস্তিকগণেরও ছয়খানি বিরাট দর্শন আছে। তাহাদিগের নাম,—ন্যায়দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জলদর্শন, মীমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন। এই ছয়খানি জগৎ-জোড়া-নাম প্রাচ্য-দর্শন—ইহাদিগকে সংক্ষেপে 'ষড়্‌দর্শন' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। আস্তিক ও নাস্তিকগণের দর্শন সমূহের সংখ্যা সর্ব্বসাকল্যে ষোড়শ—ইহাই সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-কার মাধবাচার্য্যের অভিমত (২)।

পৃথিবীর যে কোনও বিভাজ্য 'দ্রব্য' (৩) বা জাতিকেই ভেদকের (Differentiating Attribute) বৈশিষ্ট্য ভেদে আমরা বিভিন্ন প্রকারে ভাগ (classify) করিতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মনুষ্যজাতিকে বিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় (৪)। পুনরায় সেই মনুষ্যজাতিকেই দেশভেদে বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী, ইংরাজ, আইরিশ, আমেরিকান

(১) ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—কপিল-সূত্র।

(২) চার্ব্বাক-বৌদ্ধার্হত-রামানুজ-পূর্ণপ্রজ্ঞ-নকুলীশ পাশুপত—শৈব-প্রত্যভিজ্ঞা - রসেশ্বর - পাণিনি - ন্যায় - বৈশেষিক-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসা-বেদান্তেতি ষোড়শ দর্শনানি ইতি সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে।

(৩) ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমকালা দিগ্‌দেহিনৌ মনঃ।
দ্রব্যাণি—ইতি বিশ্বনাথঃ।

(৪) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গীতা।

প্রভৃতি অসংখ্য ভাবে বিভাগ করিতে পারি। আবার ধর্ম্মভেদে এই মানব জাতিই হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান্ প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত।

বিভাগ করিবার (classification) এই নিয়ম—দার্শনিক বিভাগের কালেও এই নিয়ম খাটে। ষড়্দর্শনকে আমরা প্রধানতঃ ছয় ভাগে ভাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাকেই আবার অন্য ভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—ন্যায়, সাংখ্য এবং মীমাংসাদর্শন। তন্মধ্যে ন্যায়দর্শন পুনরায় প্রণেতৃ-ভেদে দুই প্রকার—গৌতম (কাহারও মতে গোতম)-মুনি-কৃত এবং কণাদ (কণভুজ্ বা কণভক্ষ)-মুনি-কৃত। গৌতম-কৃত-দর্শনই আসল ন্যায় দর্শন। ন্যায়-দর্শনের অনেকগুলি পর্য্যায়-শব্দ আছে, যেমন অক্ষপাদ-দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র প্রভৃতি। কণাদ-মুনিকৃত দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন, কণাদ-দর্শন বা ঔলূক্য-দর্শন।

সাংখ্য-দর্শন দুই প্রকার—কপিল-মুনি-কৃত এবং পতঞ্জলি-মুনি কৃত। কপিল-কৃত দর্শনই আসল সাংখ্যদর্শন। পতঞ্জলি-কৃত দর্শনের নাম যোগ-দর্শন, যোগ-শাস্ত্র বা সাংখ্য-প্রবচন। এই দর্শনকে সংক্ষেপে 'পাতঞ্জল' বলা হয়।

মীমাংসা-দর্শনের ভেদও দ্বিবিধ—পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্ম মীমাংসা জৈমিনি-মুনি-কৃত। উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা বেদব্যাস-মুনি-কৃত। এই ব্রহ্মমীমাংসাই জগৎ-প্রসিদ্ধ বেদান্ত-দর্শন।

ন্যায়, সাংখ্য ও মীমাংসা—এই তিনটি দর্শনের প্রত্যেকের যে দ্বিবিধ ভেদ উক্ত হইল, তাহারা পরস্পর নিকটতম সম্বন্ধে সমৃদ্ধ (Allied)। তাহাদিগকে সমান-তন্ত্র-শাস্ত্র কহে। দুইটি সমান-তন্ত্র-শাস্ত্র এইভাবে রচিত যে একটি অপরটির অনুক্ত বিষয় ও মতের পরিপূরক। যেমন ন্যায় ও বৈশেষিক—ইহারা সমান-তন্ত্র-শাস্ত্র। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

ষড়্-দর্শনকে আরও অন্য এক প্রকারে বিভাগ করিতে পারা যায়। এই মতে ষড়্দর্শনের মাত্র দুইটি ভাগ—শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত। শ্রৌত অর্থাৎ শ্রুতি বা বেদ-সম্বন্ধীয়—বেদবাক্যের মীমাংসার উপরই যাহার ভিত্তি। আর স্মার্ত্ত দর্শন হইতেছে স্মৃতি-বিষয়ক-দর্শন ; সাক্ষাৎভাবে শ্রুতির উপর যাহার প্রতিষ্ঠা নহে। শ্রৌত-দর্শন দুইটি—মীমাংসা ও বেদান্ত। অবশিষ্ট চতুষ্টয় অর্থাৎ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল—স্মার্ত্তদর্শন।

দার্শনিক বিভাগের নিম্নলিখিত নক্সাটি (chart) অবলোকন করিলেই ব্যাপারটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমাদের এই জীবনটা কি? আমরা এ জগতে কোথা হইতে আসিলাম, কেন আসিলাম, মৃত্যুর পর কোথায়ই বা যাইব ? এই সংসারের উদ্ভব কোথা হইতে, কোথায়ই বা ইহার লয়, এই বিশ্বজগৎ-সৃষ্টি কিরূপে হইল, কে করিল, কেমনই বা সেই বিশ্ব-স্রষ্টার স্বরূপ—এ সমস্ত চিন্তা আমাদের মনে কখনও উদয় হয় কি ? এই সকল গভীর-তম প্রশ্নের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সংসারের অতি সামান্য-তম বাস্তব ব্যাপার—যাহা নিত্যই আমাদের প্রত্যক্ষের গোচর হইতেছে—ঐ অন্তরীক্ষে যাযাবর গ্রহ-নক্ষত্রাদির অনন্ত-কাল ধরিয়া আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ, পৃথিবীর বক্ষে লক্ষ লক্ষ স্রোতস্বতী, জলধি, পর্ব্বতরাজি, প্রকৃতির নিত্য নূতন অভিনব সৃষ্টি-নৈপুণ্য—এ সমস্ত বিষয়ে কোন প্রশ্নই ত আমাদের অন্তরাকাশে কোন দিন উদিত হয় না। আমরা সাধারণ ব্যক্তি, বিশ্বের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সঙ্গে চির-অভ্যস্ত—তাই বুঝি আমাদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সমস্যাই স্থান পায় না। কিন্তু যে-কোন শিশুর দিকে চাহিয়া দেখুন—তাহার অন্তর প্রতি পদে জ্ঞান আহরণের জন্য, বিশ্বের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ-রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য চির-উৎসারিত। দার্শনিকের মন সেই শিশু-মানবের মন।

বহির্জগৎ হইতে অন্তর-মন রুদ্ধ করিয়া জড়ের ন্যায় কোন প্রকারে জীবন-যাপন করিয়া যাওয়া দার্শনিকের স্বভাব নহে। বৈজ্ঞানিকের মত দার্শনিকও জাগতিক তত্ত্ব-সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞানাণুবীক্ষণের সাহায্যে বিচার (analyse) করিয়া তাহার মধ্যে আসল যে স্বরূপ (essence) বা উদ্দেশ্য (Philosophy), তাহার গূঢ় পরম তত্ত্বের সন্ধান করেন। এই যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নিখিল জগৎ (Physical World), তাহার পশ্চাতে (Meta) যে অজানা, অব্যক্ত পরম রূপের ইঙ্গিত রহিয়াছে, যাহা বিশ্বের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত, অথচ ইহা হইতে কত উর্দ্ধে (Transcendental)—তাহারই সন্ধানে ফিরিবার অসীম আগ্রহ ও প্রবল বাসনা মানব-অন্তরে চির-নিহিত রহিয়াছে এবং ইহাই হইল দর্শন-শাস্ত্রের (Metaphysics) মূল উৎস।

কিন্তু ইহার মধ্যেও একটি কথা আছে। জাগতিক রহস্য সমাধানের

এই যে আকুল আকুতি, ইহা মানব-মনে আপনা হইতেই কেমন করিয়া জাগরিত হইল? বিনা প্রয়োজনে কেহই ত কোন কার্য্যে রত হয় না (৫)। অতএব সংশয় হইতে পারে—নিশ্চয় ইহারও মূলে কোন প্রয়োজন, কোন জিজ্ঞাসা অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান আছে—যাহার সমাধানের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মনুষ্য-সমাজ চিরদিন অস্থির-চঞ্চল আপনহারা হইয়া গিয়াছে। সেই মূল কারণটি হইতেছে—দুঃখবাদ ও তাহার প্রতিকার। এবং প্রাচ্য-দর্শনের বৈশিষ্ট্যই এই দুঃখবাদে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—দুঃখবাদ কি?

সুখ ও দুঃখ—ইহা লইয়াই মনুষ্য-জীবন। 'সুখ'—এই বস্তুটির সহিত সাক্ষাৎকার অনেকেরই না থাকিতে পারে, কিন্তু শেষ দ্রব্যটির সহিত পরিচয় নাই এরূপ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ জগতে দুর্লভ। মানব-জীবন ত বলিতে গেলে দুঃখেরই সমষ্টি। মানুষ সংসারে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কোন্ এক অশুভক্ষণে সেই যে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে, সে ক্রন্দন ত সারা জীবনেও শেষ হয় না। মৃত্যুতেই যে তাহার অবসান। যেদিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করি, দুঃখ ভিন্ন স্থান নাই। জীবনের পঞ্চদশ অংশই ত দুঃখে পরিপূর্ণ।

দার্শনিকগণের মতে এই দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। জ্বরবিকারাদি ব্যাধি অর্থাৎ কায়িক দুঃখ এবং বিয়োগাদি-জনিত আধি অর্থাৎ মানসিক দুঃখ (৬)—ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব কারণ জনিত দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখ। এবং তস্করাদি মনুষ্য ও ব্যাঘ্রাদি প্রাণী হইতে আগত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ।

এই যে অনন্ত দুঃখ-রাজি—ইহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনুষ্য-সমাজ প্রযত্ন করিয়া আসিতেছে চিরকাল। মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, পরম পুরুষার্থই হইতেছে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ সাধন। কোন উপায়ে হয় ত কাহারও জীবনে কিঞ্চিৎ দিবস যাবৎ দুঃখের অবসান হইল, কিয়ৎকাল অবধি সে 'সুখ ভোগ করিতেছি' বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল। কিন্তু এ অবস্থা ত বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। চক্র বিঘূর্ণিত হইয়া গেল (৭)। পুনরায় দুঃখের সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া জীবন তাহার বিষময় হইয়া উঠিল। অতএব এমন কিছু উপায় নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যাহার বলে বর্ত্তমান দুঃখ ধ্বংস হইবার পরে জীবনে আর না কোন দুঃখের আগমন হইতে পারে। এইরূপ ভাবে দুঃখ নাশের নাম চরম-দুঃখ-ধ্বংস বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মানব-জীবনের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য। এবং তাহারই উপায় নিরূপণ করিতে যাবতীয় প্রাচ্যদর্শন-শাস্ত্র-সাগরের সৃষ্টি।

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি অর্থে মোক্ষকেই বুঝায়। দার্শনিকগণ ইহাকেই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের মতে ইহারই নাম নির্ব্বাণ।

(৫) প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।
(৬) পুংস্যাধির্মানসী ব্যথা ইত্যমরঃ।
(৭) চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

'দর্শন' শব্দের যৌগিকার্থের অনুসন্ধান করিলেও আমাদের কথার তাৎপর্য্য বোধগম্য হইবে। 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া 'দর্শন' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দৃশ্' ধাতুর সাধারণ অর্থ বিষয় ও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ-জনিত জ্ঞান অর্থাৎ প্রেক্ষণ। কিন্তু শাব্দিকগণ 'দৃশ্' ধাতুর জ্ঞান-সামান্য অর্থেও প্রয়োগ করিয়া থাকেন (৮)। এই জ্ঞান কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়-জন্য না হইলেও সাধারণতঃ বঙ্গভাষায় আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করি, সেরূপ জ্ঞান নহে। অমরসিংহের মতে মোক্ষ-বিষয়িণী বুদ্ধির নামই জ্ঞান (৯)। অতএব যে শাস্ত্র মোক্ষ-বিষয়ক তত্ত্ব-জ্ঞানের সাধক, তাহাই দর্শন শাস্ত্র এই ফলিতার্থ।

দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের পরম-পুরুষার্থত্ব বিষয়ে দার্শনিক-সমাজে কিঞ্চিৎ বিপ্রতিপত্তি বিদ্যমান আছে। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি এবং তাহাই পরম পুরুষার্থ—ইহা নৈয়ায়িক ও সাংখ্যকারগণের অভিমত। তাঁহাদের মতে মুক্তি জন্য-পদার্থ। বৈদান্তিকগণ কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না। তন্মতে মুক্তি নিত্য-পদার্থ এবং তাহা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।

আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন, সুখ-প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি নহে। মানুষ আজীবন মরীচিকার ন্যায় সুখেরই সন্ধানে ফিরিতেছে। সুখ কাহার না ঈপ্সিত? 'জীবনে দুঃখ দূর হউক'—কেবলমাত্র ইহাই যে অভিপ্রেত তাহা নহে, অধিকন্তু 'আমার সুখ হউক' ইহাও কাম্য। মাত্র দুঃখের অভাব লইয়াই মানুষ থাকিতে পারে না। অতএব সুখ প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ একান্ত কামনীয় (১০)।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তি-সহ নহে। কেন যুক্তি-সহ নহে তাহার অনুধাবন করিতে হইলে কতিপয় দার্শনিক মতের সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন!

জ্ঞান মাত্রই আত্মার ধর্ম্ম, শরীর, মন বা ইন্দ্রিয়াদির নহে (১১); অর্থাৎ 'আমার অমুক বিষয়ে জ্ঞান হইল' এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান আমার আত্মাতেই উৎপন্ন হইল, শরীরাদিতে নহে। জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভূতি ও স্মৃতি। তন্মধ্যে অনুভূতি চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই (১২) ইন্দ্রিয়-জন্য, অবশিষ্ট সমুদয় অতীন্দ্রিয়। যদ্যপি সকল জ্ঞানই 'মনঃ'রূপ ইন্দ্রিয়জন্য হইয়া থাকে, তথাপি ইন্দ্রিয়স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণ যে জ্ঞানে করণ, তাহাই

(৮) দৃশেরপি জ্ঞানবচনত্বাদিতি শাব্দিকাঃ।
(৯) মোক্ষে ধীর্জ্ঞানম্, অন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প-শাস্ত্রয়োরিত্যমরঃ।
(১০) নিত্য-সুখ-সাক্ষাৎকার এব মোক্ষ ইতি কুমারিল-ভট্ট-পাদাঃ।
(১১) শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বঞ্চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ।
মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ॥
ভাষা পরিচ্ছেদ।
(১২) ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যম-ব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্—গৌতম-সূত্র।

'বরষা নামিছে নভে"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রত্যক্ষ—ইহাই মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের অভিপ্রায় (১৩)। অথবা যে জ্ঞানের পক্ষে অন্য কোনও জ্ঞান করণ নহে তাহাই প্রত্যক্ষ (১৪)। যাহা হউক এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রৌত্র ও মানস,—এই ষড়্‌-বিধ।

বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জনিত এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে অর্থাৎ ইহা জন্য বা অনিত্য। জ্ঞান নিত্যও হইতে পারে। ঈশ্বরের যে জ্ঞান তাহা নিত্য।

জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি-জন্য অনিত্য জ্ঞান আত্মাতে সর্ব্বাবস্থায়ই উৎপন্ন হয় না। শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জন্য-জ্ঞান হইয়া থাকে; অর্থাৎ আত্মা শরীর রূপ আধারে যখন অবস্থিতি করে, মাত্র তখনই সেই আত্মায় অনিত্য জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা (১৫)।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সুখ-প্রাপ্তি অর্থাৎ সুখ-বিষয়ক-জ্ঞানই যদি পরম-পুরুষার্থ হয়, সুখ-জ্ঞানই অপবর্গের নামান্তর হয়, ত সে জ্ঞান নিত্য না অনিত্য? কারণ জ্ঞান মাত্রই হয় নিত্য, না হয় অনিত্য। যদি সুখ-জ্ঞান নিত্যই হয় তাহা হইলে মুক্তির পূর্ব্বেও সে জ্ঞান আত্মাতে বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে। কারণ সর্ব্বকালে বর্ত্তমান না থাকিলে তাহাকে নিত্য বলিব কিরূপে? অতএব সুখ-জ্ঞানের নিত্যত্ব পক্ষে বদ্ধ ও মুক্তের কোনও প্রভেদ থাকে না; অপর পক্ষে যদি তাহাকে অনিত্য বলা যায়, তাহা হইলে মুক্তাবস্থায় সে জ্ঞান আত্মায় থাকা অসম্ভব; যেহেতু জন্য জ্ঞান মাত্রেরই পক্ষে শরীর কারণ এবং মুক্তাবস্থায় আত্মা শরীরাবচ্ছেদে থাকে না। অতএব 'সুখ-প্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ' এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে; আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।

কিন্তু মানব-জীবনে কেন এই দুঃখ? দুঃখবাদিগণ দুঃখের স্বপক্ষে হয় ত বলিবেন,—'দুঃখ' ত মানুষের অতি উপকারী বন্ধু। দুঃখই মানুষকে সৎ করিয়া তুলে। দুঃখানলে দগ্ধ হইয়াই মানুষ 'খাঁটি সোনা' হয়। দুঃখ না থাকিলে 'সুখ' বলিয়াই বা কোন কিছু থাকিত কি? 'সুখ' ও 'দুঃখ'—ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ (Relative) শব্দ। এক ব্যতীত অন্যের সত্বা নাই। দুঃখ আছে বলিয়াই আমরা সুখের স্বরূপ বুঝিতে পারি। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের উপলব্ধি হইতে পারিত না, পৃথিবীতে মিষ্টাস্বাদ-দ্রব্য-ব্যতীত অন্য দ্রব্যও আছে বলিয়াই আমরা শর্করা আস্বাদন করিয়া তন্মধ্যে মিষ্টত্বের বৈশিষ্ট্য অনুভব করি। এরূপ দুঃখই আমাদের সুখকে মধুময় করিয়া তুলে। জীবনে সুখ ব্যতীত অন্য কিছু না থাকিলে সুখের এতাদৃশ মাধুর্য্য থাকিত না। কথিত আছে, দীর্ঘকাল অমৃত ভক্ষণে দেবতাগণেরও অরুচি আসে। অতএব সুখ-দুঃখের সামঞ্জস্যেই জীবনে সত্যকার আনন্দ-বোধ।

এই যে যুক্তি, ইহা যে সদ্‌যুক্তি তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ স্বেচ্ছায় ত দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে পারে না। মানুষ চায়, সুখ যদিও অদৃষ্টে না ঘটে, অন্ততঃ দুঃখ হইতে যেন মুক্তি পাই।

দুঃখবাদকে অন্য উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করা যাইতে পারে। সুখ ও দুঃখ—আমাদেরই পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মের ফলবিশেষ। সৎকর্ম্মের ফল সুখ, অসৎকর্ম্মের ফল দুঃখ। এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে আবার মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারণ, দেখিতে পাই যে, এ নিয়ম জগতে অধিকাংশ স্থলেই খাটে না। নিয়ম অপেক্ষা ব্যতিক্রমের স্থলই বেশী। সাধু ব্যক্তিই সংসারে অধিক কষ্ট পায়। দুর্জ্জনগণ দিব্য সুখে বাস করে। অতএব বাধ্য হইয়া অদৃষ্ট ও জন্মান্তরবাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট এবং আত্মার অবিনাশিত্ব অর্থাৎ পরজন্ম স্বীকার করিলে এই ব্যতিক্রম আর বিসদৃশ ঠেকে না। কারণ কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট মৃত্যুর পরেও আত্মাতে বর্ত্তমান থাকে। এ জন্মে যে মানব সৎকর্ম্ম করিয়াও চির-জীবন দুঃখ পাইল, সে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে অশেষ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং তজ্জনিত দুরদৃষ্টের ফলই এ জন্মে ভোগ করিয়া গেল। এ জন্মে কৃত সৎকর্ম্ম-জনিত শুভাদৃষ্ট পুণ্যাদৃষ্টের ক্ষয় হইয়া গেলে পরজন্মে ফলোন্মুখ হইবে। এইরূপভাবে দেখিলে জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলার (Uniformity of Nature) কোনই বৈলক্ষণ্য-বোধ হইবে না।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন এবং অনেকে (১৬) বলিয়াও থাকেন, মৃত্যুর পরে কি হইবে, পুনর্জন্ম হইবে কি না, স্বর্গে বা নরকে কোথায় যাত্রা করিতে হইবে—এ সকল বস্তু ত আমাদের কাহারও প্রত্যক্ষগোচর নহে; অতএব এ বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে গেলে উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করা হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহা আমার বা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়—তদ্‌ব্যতিরিক্ত আর কিছুই স্বীকার বা বিশ্বাস করিব না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে, জগতের আরও অসংখ্য বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে হয়। অধিক কি, সংসারে প্রাণধারণ করিয়া থাকাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ আমাদের জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের 'বারো আনা' অংশই ত প্রত্যক্ষ-ব্যতিরিক্ত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে আমরা কেহই দেখি নাই; তাই বলিয়া তাঁহাদের অতীত কালীন অস্তিত্বকে কি অস্বীকার করিতে হইবে? এরূপ যুক্তি মানিলে ইতিহাসেরও ত কোন মূল্য থাকে না। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বলিতে হয়, যাহা 'আমার' প্রত্যক্ষীভূত নহে তাহাই অসত্য; কারণ মদ্‌ব্যতিরিক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুভূত জ্ঞান মৎকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞান হইতে ভিন্ন; অতএব তাহা অবিশ্বাস্য। জগতের যে কোনও বিজ্ঞান বা শাস্ত্র—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক—এই মতে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; কারণ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা Theoryর উপর, এবং সকল Theoryই হইতেছে

---

(১৩) ইন্দ্রিয়ত্বেন রূপেণ ইন্দ্রিয়াণাং যত্র জ্ঞানে করণত্বং, তৎ প্রত্যক্ষমিতি বিবক্ষিতমিতি মুক্তাবলীকারঃ।

(১৪) জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষমিতি বিশ্বনাথঃ।

(১৫) অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ।

(১৬) চার্ব্বাক মতাবলম্বিগণ (Materialistic Thinkers)।

সেই সকল মানবের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ফল যাঁহারা আমার হইতে ভিন্ন এবং যাঁহাদিগকে আমি স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। এই প্রকার বহু-যুক্তি-বলে বুঝা যায়, মাত্র প্রত্যক্ষই মানব-জীবনের সকল জ্ঞান ব্যাপিয়া নাই। তদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞানও প্রমাণ হইতে পারে—এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

এক্ষণে পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে আসা যাউক। দুঃখবাদের প্রতীকার করা যায় কি প্রকারে? দুঃখকে কেমন করিয়া মানব-জীবন হইতে তিরোভূত করা যায়? কবি ত ঘোষণা করিয়া গেলেন,

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।......

কিন্তু জিজ্ঞাস্য—সে পথে জগতের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে কি? কত দাতব্য প্রতিষ্ঠান, Relief funds গঠিত হইল, জগতের দুঃখভার তাহাতে বিন্দুমাত্রও কমিল কি? মনুষ্যের সামর্থ্য কতখানি? ভগবান্ মানবকে দুঃখ দিয়াছেন, কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, সদসদবিবেচনা বুদ্ধি দিয়াছেন, শুভাশুভ অদৃষ্ট দিয়াছেন, সুখ দুঃখ ভোগ করিবার শক্তি দিয়াছেন, আর মানুষ চায় অস্বাভাবিক উপায়ে দুঃখকে দগ্ধ কদলী প্রদর্শন পূর্ব্বক সুখটুকু সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়া লইতে? দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কি এতই সহজ-সাধ্য ব্যাপার?

আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দার্শনিকগণ এই প্রকারে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে জগতের যাবতীয় বস্তুই কতিপয় কারণ-জন্য হইয়া থাকে। এই কারণ তিন প্রকার—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি-কারণ ও নিমিত্ত কারণ। কার্য্য (effect) যাহাতে সমবেত তাহার নাম সমবায়ি কারণ; সমবায়ি কারণে প্রত্যাসন্ন যে কারণ তাহা অসমবায়ি-কারণ; এতদুভয়-ব্যতিরিক্ত কারণের নাম নিমিত্ত কারণ। ইহাদের মধ্যে সমবায়ি-কারণ ও অসমবায়ি-কারণের নাশে কার্য্যের নাশ অবশ্যম্ভাবী। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ধরুন, একখানি বস্ত্র উৎপাদন করিতে হইলে, প্রথমতঃ তন্তু-সমূহের আবশ্যকতা। এই তন্তু বস্ত্রের পক্ষে সমবায়ি-কারণ। কিন্তু স্তূপীকৃত তন্তু পড়িয়া থাকিলেই ত আর বস্ত্র উৎপন্ন হইবে না। বস্ত্র উৎপন্ন করিতে হইলে তন্তু-সমূহের পরস্পর সংযোগ প্রয়োজন। এই যে সংযোগ—ইহার নাম অসমবায়ি কারণ। আবার সংযোগ ও স্বতঃসিদ্ধ হইবে না, তজ্জন্য তন্তুবায় আবশ্যক। তন্তুবায় বস্ত্রের পক্ষে নিমিত্ত-কারণ। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সমবায়ি-কারণ ও অসমবায়ি-কারণের নাশের সঙ্গেই কার্য্যের নাশ হইয়া থাকে (১৭)। যদি অগ্নি-সংযোগ-বশতঃ বা অন্য কোনও কারণে তন্তু সমূহের নাশ হয়, অথবা কর্ত্তন-ছেদনাদি-বশতঃ তাহাদিগের সংযোগের নাশ হয়, তাহা হইলেই বস্ত্রের নাশ হইবে। কিন্তু নিমিত্ত কারণ যে তন্তুবায়, তাহার নাশে বস্ত্ররূপ কার্য্যের নাশ হয় এমন কোন কথা নাই।

যাহা হউক, দার্শনিকগণ দেখিলেন, দুঃখ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মারই ধর্ম্ম। যতক্ষণ শরীর আছে, দুঃখ অবশ্যই থাকিবে। শরীরই দুঃখের কারণ। অতএব দুঃখের অবসান সাধন করিতে গেলে তাহার কারণ শরীর-ধারণ বা পুনর্জন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-সাধন অগ্রে প্রয়োজন। এক্ষণে পুনর্জন্মের লোপ হইবে কিরূপে? ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তিই জন্মের প্রতি কারণ; অতএব প্রবৃত্তি-নাশে জন্ম-নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। এই প্রবৃত্তি পুনরায় রাগ ও দ্বেষ নামক দোষ জন্য। অতএব এই দোষের নিবৃত্তি হইলেই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। সেই দোষ আবার মিথ্যাজ্ঞানজন্য হইয়া থাকে। অতএব মিথ্যাজ্ঞান নাশে দোষের নাশ নিশ্চিত। শরীরে আত্মবুদ্ধির নাম মিথ্যাজ্ঞান। বেদান্তে ইহাকেই অবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ফল কথা, দুঃখের কারণ শরীর-ধারণ, শরীর ধারণের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ রাগদ্বেষাত্মক দোষ, দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞান। অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞানই সকলের মূল কারণ। সেই মিথ্যা-জ্ঞানের বিনাশ হইলেই যথাক্রমে দোষ, প্রবৃত্তি ও পুনর্জন্মের বিনাশ হইয়া দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইবে (১৮)। ইহারই নাম নিঃশ্রেয়স বা সাযুজ্য-লাভ।

ভগবান বুদ্ধদেব ইহাই প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন। সংসার পরিত্যাগ কর, বৈরাগ্যের সাধনা কর। দুঃখ স্বতঃ প্রস্থান করিবে। সংসার শূন্য ব্যক্তিরই আসল সুখ ও শান্তি; মহানির্ব্বাণের পথে বাধা-হীন অগ্রগতি।

(১৭) কারণ নাশাৎ কার্য্যনাশঃ—কণাদ-সূত্র।

(১৮) দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়েতদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ—গৌতম-সূত্র।
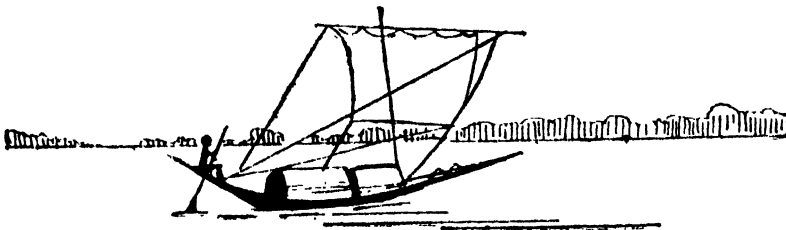
পতিব্রতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

অজ্ঞাত যারা, অখ্যাত যারা,
ভুলিছি যাদের কথা,
প্রাসাদ কুটীর ধন্য করেছে
যে সব পতিব্রতা,
রূপ যাহাদের ধূপের মতন
পুড়েছে দেবোদ্দেশে,
পতিই দেবতা, পতিই ধর্ম্ম
জানিয়াছে ভালবেসে।

লালসা যাদের নিবিড় নিষ্ঠা
করে নি ক চঞ্চল,
স্বর্গে মর্ত্তে বাঁধে গাঁটছড়া
যাদের চেলাঞ্চল,
দেয়নি ফিরায়ে স্বামী কৃতান্ত
যে সব সাবিত্রীর,
শুধু নিরাশায় জীবন কাটিছে
ফেলিছে নেত্রনীর,
অভাগিনী হায় যে সব বেহুলা
জিয়াতে পারেনি স্বামী,
স্মৃতি পঞ্জর বক্ষে ধরিয়া
যাপিছে দিবস যামি;

যে দময়ন্তী বনেই রহিল
ছিন্ন অর্দ্ধ বাসে,
"কোথা নলরাজ" "কাঁদে রাজবধূ
কই সে ফিরে না আসে,
তুচ্ছ করিয়া পিতার ভবন
ভবন অলকা জিনি,
স্বামীর সঙ্গে শ্মশানে রহিল
যে শিব-সিমন্তিনী,
গ্রামের যে সীতা অনলে পুড়িল
না কহি' একটী কথা,
অনামা কবির প্রণাম লহ গো
সে সব পতিব্রতা।

সৃষ্টিকে যারা করে পবিত্র
চির কল্যাণ আনে,
দীন অন্দর মন্দির হয়
যাদের অধিষ্ঠানে,
যাহাদের প্রেম মলিন ভারত
ধৌত করিছে সদা,
যারা সমাজের গঙ্গা যমুনা
সরযূ ও নর্ম্মদা,
যাদের স্বস্তি হিন্দু গৃহের
ওষ্ঠে ভিজায় আসি,
যাদের ভস্মে উদ্ভবে পীঠ
মণিকর্ণিকা, কাশী,
ভয়েতে পলায় দূরে অলক্ষ্মী
কলুষ-কালিমা সরে,
যাদের হাতের সাঁজের প্রদীপ
আলাই-বালাই হরে,
যাদের লাগিয়া লক্ষ্মী আসেন,
আসেন মা দশভুজা,
রবি শশী করে যাদের আরতি
দশ দিক দেয় পূজা,
চন্দন বহে দেহ সৌরভ
ফুল হৃদয়ের জ্যোতি,
রোষবহ্নিতে পুড়ে মরে কাম
ধন্য সে সব সতী,
সাধ্যে নাহিক এ ক্ষীণ কণ্ঠে
তাদের স্তোত্র গাহি,
পদবন্দনা করি কৃতার্থ
নিত্য আশীষ চাহি।

বারবেল লইয়া শরীরচর্চ্চা

শ্রীনীলমণি দাশ

আমাকে শারীরিক ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করিবার জন্ম বহুবার কলিকাতার বহু স্থানে যাইতে হইয়াছে। এমন কি কলিকাতা হইতে বহুদূর—জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা প্রভৃতি বহু স্থানে মধ্যে মধ্যে ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শনের জন্ম যাইতে হয়। আমি যখন যে স্থানে ক্রীড়া প্রদর্শন করি, তখন সেই স্থানের লোকেরা প্রায় আমাকে

১ (ক)

জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি কি ব্যায়াম করেন? কাহার method follow করেন?"

গত বৈশাখ মাসে "তরুণের দেহচর্চ্চা" নাম দিয়ে 'ভারতবর্ষে' আমার বিভিন্ন ব্যায়াম-ক্রীড়ার ছবি ও বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইহা প্রকাশিত হইবার দুই চারি দিন পরে আমি বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকখানি চিঠি পাই। প্রত্যেক পত্র-লেখকই জানিতে চান, আমার ব্যায়াম-পদ্ধতি কি? ইহার মধ্যে দুই একজন সহৃদয় পত্রলেখক আমাকে আমার পদ্ধতি প্রকাশ করিবার জন্ম অনুরোধ করিয়াছেন। ইহার ফলে আমি যে পদ্ধতিতে ব্যায়াম করি, সেই পদ্ধতির ছবি ও বিবরণ লিখিতে সুরু করি।

১ (খ)

আমার মতে বারবেল লইয়া ব্যায়াম সমস্ত ব্যায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে শরীরের আকার ও শক্তি যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি হয়, সেরূপ আর কোন ব্যায়ামে হয় না। ইহা আমার মনগড়া কথা নহে। আমি বাল্যকালে যে কিরূপ ক্ষীণকায় ছিলাম, তাহা আপনারা বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষ পাঠে অবগত হইতে পারিবেন। বারবেল

লইয়া ব্যায়াম করিবার পর আমি আমার শরীরের ওজন ও মাপ অনেক বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছি। পূর্ব্বে আমার ওজন ছিল ৮০ পাউণ্ড; এক্ষণে আমার ওজন ১৫০ পাউণ্ড; প্রায় পূর্ব্বের দ্বিগুণ। আমার শক্তি বৃদ্ধির কথা নিজমুখে বলা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বৈশাখের সংখ্যা দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া আমাদের সমিতিতে (শক্তি-সমিতি) এবং কলিকাতা একাডেমীতে ব্যায়াম-শিক্ষক হিসাবে যত ছাত্র আমার তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম অভ্যাস করে, প্রত্যেকে বারবেল লইয়া ব্যায়াম করিয়া প্রভূত ফল পাইয়াছে। এই সমস্ত কারণে আমি বারবেল লইয়া ব্যায়ামের অধিক পক্ষপাতী।

২ (ক)

এক্ষণে আমি যে পদ্ধতিতে ব্যায়াম করি ও ছাত্রদের যে পদ্ধতিতে ব্যায়াম করাই তাহার Figure ও বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমার মনে হয় যদি কোন যুবক প্রত্যহ অর্দ্ধ ঘণ্টা করিয়া উক্ত পদ্ধতিতে ব্যায়াম

২ (খ)

করে, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার অসামান্য শারীরিক উন্নতি ও শক্তি-বৃদ্ধি হইবে। ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেককে নিজের একখানি করিয়া খালি গায়ে ছবি তুলিতে এবং তাহার নিম্নে নিম্নলিখিত উপায়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাপ ও শরীরের ওজন লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ করি।

নাম······ · ···························

বয়স········· তারিখ·········

ওজন········· উচ্চতা ········

	না ফুলাইয়া (Normal)	ফুলাইয়া (Contracted)
বাহু (Arm)	"	"
পুরবাহু (Fore-arm)	"	"
কবজি (Wrist)	"	"

	না ফলাইয়া	ফুলাইয়া
ঘাড় (Neck)	"	"
ছাতি (Chest)	"	"
কোমর (Waist)	"	"
পায়ের গুলি (Calf)	"	"

৩ (ক)

৩ (খ)

প্রত্যেক ব্যায়ামকারীরই তিন চারি মাস অন্তর একবার করিয়া উক্ত উপায়ে নিজ শরীরের মাপ ও ওজন লওয়া উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন নিজ শরীরের উন্নতি হইতেছে কি না।

ব্যায়াম-পদ্ধতির ছবি দিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা উচিত, কোন Figure অধিকবার করিলেই ফল ভাল হয় না, বরং ঠিক ভাবে যদি কয়েকবার বেশ মন দিয়া আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুক্ত স্থানে ব্যায়াম অভ্যাস করা হয়, তাহা হইলেই দ্রুত উন্নতি হয়। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে ব্যায়াম বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তির পরামর্শ লওয়া উচিত। নিম্নলিখিত Figure সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, তাহা হইলে তিনি আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিলে অথবা সকালে ৬, পার্শীবাগান লেনে শক্তিসমিতিতে বা বৈকালে কলিকাতা একা ডেমীতে আসিলে আমি সাদরে আমার যতদূর সামর্থ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারি।

Figure 1.

নিজ শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে কুড়ি পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে, সেই ওজনের বারবেল লইয়া ১ (ক) ছবির মত পা জোড় করিয়া দাঁড়াও।

পরে হাতের উপর অংশ শরীরের সহিত চাপিয়া নীচের অংশ কনুই হইতে তুলিয়া ১ (খ) ছবির মত কর

৪ (ক)

৪ (খ)

৫ (ক)

৫ (খ)

এই সময় হাতের কনুই উপরে ঠেলিয়া দাও এবং এইরূপ অবস্থায় দুই সেকেণ্ড থাক। পরে নীচে নামাও ও হাত সোজা কর এবং যাহাতে Tricep Muscle Contract হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ।

এই রকম ১০.১২ বার করিলে Biceps ও triceps বৃদ্ধি পাইবে।

তুলিবার সময় প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে এবং নামাইবার সময় নিশ্বাস ফেলিবে।

৬ (ক)

Figure 2.

নিজ শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে চল্লিশ পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে, সেই ওজনের Bar-bell Disc rodএর এক দিকে পরাইয়া ২ (ক) ছবির মত দাঁড়াও।

পরে আগের মত হাতের উপর অংশ শরীরের সহিত চাপিয়া নীচের অংশ কনুই হইতে বাঁকাইয়া ২ (খ) ছবির মত কর। এই সময় হাতের কনুই ২ (খ) ছবির মত উপর দিকে তুলিয়া দাও। এইরূপ অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থাক। পরে নীচে নামাও ও পূর্ব্বের আকার ধারণ কর। এই সময় হাত সোজা কর যাহাতে triceps muscle contract হয়।

এইরূপ ১০।১২ বার করিলে Biceps ও Triceps প্রভৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তুলিবার সময় প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে এবং নামাইবার সময় নিশ্বাস ফেলিবে।

৬ (খ)

Figure 3.

নিজ শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে কুড়ি পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে সেই ওজনের Bar-bell লইয়া কোমর বাঁকাইয়া পা জোড় করিয়া ৩ (ক) ছবির মত দাঁড়াও।

পরে হাতের উপর অংশ না বাঁকাইয়া নীচের অংশ

কনুইয়ের নিকট হইতে বাঁকাও ও ৩ (খ) ছবির মত কর। এইরূপ অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থাক। পরে নীচে নামাও ও ৩ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

এইরূপ ১০ বার প্রত্যহ করিলে শীঘ্র হাতের গুলি (Biceps muscle) cricket ballএর মত গোলাকার হইবে।

তুলিবার সময় প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে এবং নামাইবার সময় নিশ্বাস ফেলিবে।

এইরূপ ১০।১২ বার করিলে Fore-arm, হাতের উপরের মাংসপেশী, triceps ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

তুলিবার সময় প্রশ্বাস গ্রহণ করিবে এবং নামাইবার সময় নিশ্বাস ফেলিবে।

৭ (ক)

Figure 4.

নিজের শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে ৩০ পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে, সেই ওজনের বারবেল লইয়া ৪ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। হাত শরীরে সংলগ্ন রাখ।

পরে কনুয়ের কাছ হইতে বাঁকাইয়া ৪ (খ) ছবির মত কর ও হাতের কনুই উপর দিকে একটু তুলিয়া দাও। এইরূপ ভাবে ২ সেকেণ্ড রাখিয়া ৪ (ক) ছবির আকার পুনঃ ধারণ কর।

Figure 5.

নিজ শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে ৩০ পাউণ্ড বাদ

৮ (ক)

দিয়া যে ওজন হইবে সেই ওজনের বারবেল লইয়া ৫ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। হাত শরীরে সংলগ্ন রাখ।

পরে হাতের কবজি (Wrist) বাঁকাইয়া বারবেল সমেত (কনুই না বক্র হয়) যতদূর সম্ভব হাত ভিতর দিকে লইয়া গিয়া ৫ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। সর্ব্বদা বুক ফুলাইয়া থাকা উচিত। পরে পুনরায় ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

যতক্ষণ হাত ব্যথা না হয় ততক্ষণ এইরূপ করিলে Flexors of the Fore-arms বৃদ্ধি পায়।

কনুই বাঁকাইবার সময় প্রশ্বাস গ্রহণ কর এবং কব্জি সোজা করিয়া ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করিবার সময় নিশ্বাস ফেলিয়া দাও।

Figure 6.

একটি ১½ diameter কাঠের রুলের সহিত শক্ত দড়ি বাঁধিয়া ঐ দড়ির অপর প্রান্তে একখানি ৫ পাউণ্ড চাকা সংলগ্ন কর। ফলে ৬ (ক ও খ) ছবির যন্ত্রের মত

৮ (খ)

একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইবে। ঐ যন্ত্র হাতে করিয়া ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। দৃষ্টি রাখ যাহাতে কনুই হইতে হাতের নীচের অংশ উপর অংশের right-angle positionএ থাকে।

পরে লাটায়ে সুতা গুটাইবার মত করিয়া গুটাইতে থাক। এই সময় হাতের কনুই যাহাতে শরীর সংলগ্ন থাকে সে বিষয়ে মনোযোগ দাও। গুটাইতে গুটাইতে ৬(খ) ছবির মত হইলে পুনরায় খুলিতে থাক এবং ৬(ক) ছবির আকার ধারণ কর।

এইরূপে ৫।৬ বার গুটাইলে ও খুলিলে Fore-arm, Flexors of the Fore-arm, ও wrist ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

গুটাইবার ও খুলিবার সময় সাধারণভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা উচিত।
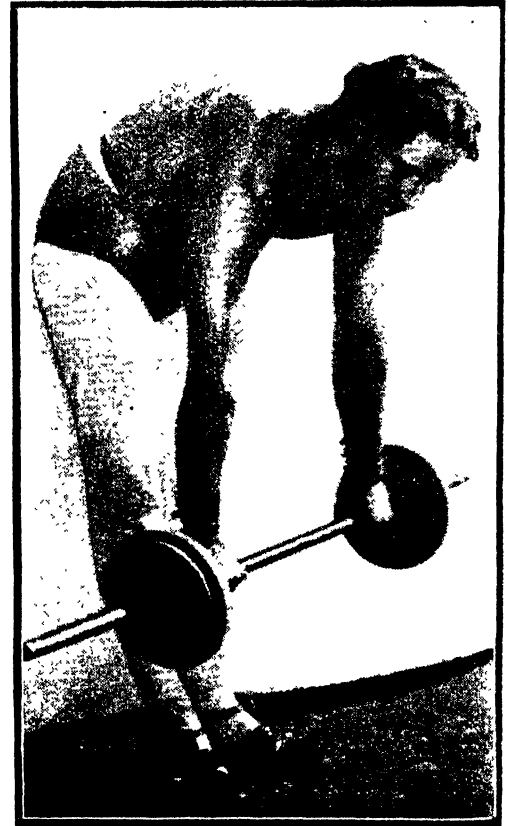
৯ (ক)

Figure 7.

নিজের শরীরের অর্দ্ধেক হইতে ২৫ পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে, সেই ওজনের বারবেল লইয়া ৪ (ক) ছবির মত দাঁড়াও।

পরে আস্তে আস্তে ৭ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। এই অবস্থা কাঁধের মাংসপেশী (Trapizius)

সঙ্কুচিত কর। এই Figure অভ্যাস করলে যাহাতে হাতের কনুই বা শরীর বক্র না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এইরূপ ১০।১২ বার করিলে কাঁধের মাংসপেশী (Trapizius) বৃদ্ধি পায়।

৭ (খ) ছবির আকার ধারণের সময় প্রশ্বাস গ্রহণ কর এবং ৭ক ছবির আকার ধারণ কালে নিশ্বাস ফেল।

Figure 8.

নিজের শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে ৫০ পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে, সেই ওজনের Bar-bell লইয়া ৮(ক) ছবির মত দাঁড়াও।

পরে কোমর ও শরীর সোজা রাখিয়া Barbell সমেত হাত পিছনের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ৮(খ) ছবির আকার ধারণ কর। এইরূপ অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থাক এবং পরে পুনরায় ৮(ক) ছবির আকার ধারণ কর।

এইরূপ ১০।১২ বার করিলে triceps বৃদ্ধি হইবে।

হাত পিছনের দিকে ঠেলিবার সময় প্রশ্বাস লও এবং কোমরে রাখিবার সময় নিশ্বাস ফেল।

Figure 9.

নিজের শরীরের ওজনের অর্দ্ধেক হইতে ৩০ পাউণ্ড বাদ দিয়া যে ওজন হইবে, সেই ওজনের Bar-bell লইয়া পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত সোজা রাখিয়া ৯(ক) ছবির মত সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়।

পরে প্রথম ছবির অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া ৯(খ) ছবির অনুরূপ হাত উপরে তোল, যাহাতে Barbell rod বুকের সহিত সংলগ্ন হয়। পরিশেষে ৯(ক, ছবির আকার ধারণ কর।

এইরূপ ১৫।১৬ বার করিলে Latissimus dorsi ও পিঠের মাংসপেশী বৃদ্ধি হয়।

৯ (খ)

তুলিবার সময় প্রশ্বাস গ্রহণ কর এবং নামাইবার সময় নিশ্বাস ফেল।

প্রাকৃতিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা

ডাঃ শ্রীঅতুল রক্ষিত বি-এসসি. এম-বি.

প্রাকৃতিক চিকিৎসা কি?—আমাদের ভগবান-প্রদত্ত জল, বায়ু, সূর্য্য, মাটী, খাদ্য ইত্যাদির সাহায্যে কেমন করিয়া রোগ আরাম করিতে পারি—ইহা খালি সেই চিকিৎসা।

রোগ কেন হয়?—শরীরের মধ্যে যদি অনেক আবর্জ্জনা এসে জমা হয় এবং সেগুলি রক্তের সঙ্গে যদি মিশিয়া যায় তবেই রোগ দেখা দেয়। রক্তের সাধারণ গুণ এই যে আমরা যে খাদ্য খাই তার সারাংশ গ্রহণ করে শরীরের মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতিকে বৃদ্ধি করা এবং অসার অংশ দাস্ত, প্রস্রাব, ঘর্ম্ম ও নিঃশ্বাস ইত্যাদি রূপে বাহির করিয়া দেওয়া। যদি রক্তের এই ময়লা নিঃসারণের উপায় কমিয়া যায় তখন শরীরের মধ্যে ময়লা জমিয়া রক্ত দূষিত হয় এবং রোগ দেখা দেয়।

আমাদের রক্ত কি থেকে হয়? আমরা যা খাই তাই থেকে রক্ত তৈয়ারী হয়। এই রক্তই শরীরের জীবনীশক্তি রক্ষা করে। সেই জন্য শরীরের মধ্যে ভাল রক্ত তৈয়ারী হবার জন্য আমাদের উপযুক্ত খাওয়ার প্রয়োজন।

এখন এই খাওয়া সম্বন্ধে আমি একটু বলতে চাই। আমরা কি খাই? মুখরোচক করবার জন্য ঝাল, মশলা, তৈল ইত্যাদি দিয়া ভাল করে রান্না করে খাই। কিন্তু এ রকম খাওয়ায় অপকারিতা বেশী,—উপকার মোটেই নাই। ঝাল যেমন হাতে বেশীক্ষণ থাকলে জ্বালা করে কিংবা বাইরে চামড়ার কোন অংশে খানিকক্ষণ লেগে থাকলে জ্বালা করে, লাল হয় ও ফোস্কা হয়, ঠিক সেইভাবে আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে যদি এই ঝাল চলিয়া যায়—ভিতরে পাকস্থলীতে ঘা হয় এবং তাহা পরিপাক-শক্তির বিশেষ ক্ষতি করে। ঝাল, মশলা দেওয়া তরকারী আমাদের একটা দুষ্ট ক্ষুধা এনে দেয়; অর্থাৎ সত্যকার যে ক্ষুধা তাহা থাকে না বলে কোনরকম করে ঝাল, মশলা, একটা চাটনী অল্প করে অন্যায় ক্ষুধার বৃদ্ধি করে—বেশী খাবার লোভ হয় এবং তার ফলে হয় কি—ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ। জিহ্বার স্বাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাওয়া যায় বটে, কিন্তু পেটের পক্ষে বিশেষ হানিকর মনে রাখবেন। এই জন্যই বাঙ্গালীর ছেলেরা অতি সহজেই হজমের রোগে ভুগিয়া থাকেন—যাহাকে আমরা চলতি কথায় Dyspepsia বলি। এই Dyspepsia অনেক রকম ভাবে দেখা দেয়। কারো হয়ত অম্বল হয়, ঢেঁকুর উঠে, পেট ফুলে থাকে, ক্ষুধা হয় না, গা বমি বমি করে, সকালবেলা মুখ দিয়ে জল ওঠে, মুখ দিয়া দুর্গন্ধ বয়, জিভ ময়লায় ভর্ত্তি থাকে, মনের কোন স্ফূর্ত্তি থাকে না, দাস্ত পরিষ্কার হয় না কিংবা পেট কামড়ায়, যন্ত্রণা হয় ও আম দাস্ত ইত্যাদি হয়। কিন্তু তাহার চিকিৎসায় খালি Soda খেলে ফল হবে না—ভাল হবে না যতক্ষণ না আপনি মূল চিকিৎসা করছেন অর্থাৎ আপনার পাকস্থলীর সংস্কার হচ্ছে; এবং তা করতে গেলে আপনার বাঁধা-ধরা খাদ্যের নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে—তবেই আপনি সারতে পারবেন। একটা ঘোড়া যদি ক্লান্ত হয়ে যায় তাকে চাবুক মেরে আপনি খানিকটা চালাতে পারবেন—তার শরীরে শক্তি না থাকলেও প্রকৃতি-প্রদত্ত একটা যা Reserve ক্ষমতা থাকে, তার বলে খানিকটা যেতে সমর্থ হয়। কিন্তু যখন সেই Reserve Power শেষ হয়ে যায় তখন একবারে শুয়ে পড়ে—হাজার চাবুক মারলেও সে নড়তে পারে না—অবশেষে মারা যায়। সেই রকম, যখন ক্ষুধা থাকবে না, ঝাল মশলা দিয়ে চাবুক মেরে পাকস্থলীর ক্ষুধা অল্প পরিমাণে বাড়াতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষুধা অস্বাভাবিক। কিছুদিন বাদে আপনিও দেখবেন পাকস্থলীর আর কোন ক্ষমতা নাই। তখন অল্প খেলেও হজম করবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তখন আর খেতে কিছু ইচ্ছা হবে না, শরীর দুর্ব্বল অনুভব করবেন, ওজনে অনেক কমে যাবেন এবং যে কোন মহাব্যাধি দুর্ব্বল শরীর আশ্রয় করে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। আর একটা দেখুন, পৃথিবীর মধ্যে যে সব মহাজাতি আজ এত উন্নত হয়েছেন, তাদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে চেয়ে দেখুন—ঝাল, মশলা, তেল তাঁরা মোটেই খান না। এমন কি রান্না জিনিষ খুব কম খান। বেশীর ভাগ কাঁচা, সিদ্ধ ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। তাঁদের ভিতর অজীর্ণতা দেখা যায় না। শরীর আমাদের চেয়ে খুব বেশী খাটতে পারেন। কাঁচা এবং সিদ্ধ খাদ্যে অনেক গুণ। কাঁচা বিলাতী বেগুন, কড়াইশুটি, বাঁধাকপি, বরবটী, সিম, পিঁয়াজ, শসা, শালগম, ওলকপি, পানিফল, পালংশাক, লেটুস, বিট ইত্যাদি মিশিয়ে ও একটু লেবুর রস ও লবণ সংযোগে খেলে শরীরের খুব উপকারী। উপকার দুই প্রকারে—এক কাঁচা খাওয়ার দরুণ—ভাইটামিন অর্থাৎ খাদ্য-প্রাণ শরীরে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে বলে শরীর সবল হয়—কারণ রান্না করলে ভাইটামিন নষ্ট হয়। দ্বিতীয় পেট খারাপ হয় না বা পেট ভারি হয় না; খাবার পর হাঁসফাস করতে হয় না; আর খুব পরিষ্কার দাস্ত হয়। কাঁচা জিনিষ সহজে জীর্ণ হয় ও তরকারীর উপরকার ছাল গুলো খাওয়া হয় বলে সেগুলি পেটে পড়লে পেট পরিষ্কারের সহায়তা করে। কিন্তু রান্না করলে বাইরেকার আবরণ চলে যায় ও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। সিদ্ধ খাওয়ারও অনেক উপকারিতা—যাঁরা একেবারে কাঁচা খেতে পারেন না তাঁদের সিদ্ধ খাওয়া চলতে পারে। সব চেয়ে ভাল যদি বাষ্পে সিদ্ধ হয়। Cookerএর মধ্যে বাষ্পে সিদ্ধ করিয়া খাইলে খাদ্যের জীবনীশক্তি খানিকটা থাকে, সবটা নষ্ট হয় না। অনেক সময় সিদ্ধ করিয়া জলটা আমরা ফেলে দিই। কিন্তু সেই জলের মধ্যে তরকারীর অনেক মূল্যবান জিনিষ থাকে। সেটাকে ফেলে না দিয়ে বরং চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা দরকার। অনেকে হয়ত বলবেন—আমাদের সিদ্ধ কি বা কাঁচা মুখে ভাল লাগে না। কিন্তু আমি বলি। আমরা ত খালি অভ্যাসের দাস—যা অভ্যাস করব তাই সহ্য হবে। প্রথম দুদিন একটু কষ্ট হবে কিন্তু তার পর সব সয়ে যাবে—তখন সেইটাই ভাল লাগবে। কথায় বলে শরীরের নাম মহাশয়—যা সওয়াবেন তাই সয়। দেখুন, মাড়োয়ারীর

ছেলেদের মাছ কিংবা মাংসের নামে গা শিউরে ওঠে ; আর আমাদের কিন্তু জিভে জল আসে ; কেন না, তাদের অভ্যাস নাই, আর আমাদের অভ্যাস আছে। খাওয়া-দাওয়া একটা অভ্যাসেরই বশ। কাজেই যে খাওয়ার অভ্যাসে শরীর ভাল থাকবে তেমন খাওয়াই আমাদের দরকার। রসনার তৃপ্তির জন্য না খেয়ে পেটের ও শরীরের তৃপ্তি যাতে হয় তাই দেখাই মঙ্গল।

তার পর দেখুন তেল—তেল আমরা ভাল খাঁটি পাই না। বেশীর ভাগই সরিষা, গুজা, বাদাম ইত্যাদি মিশ্রিত তৈল ব্যবহার করি। ব্যবসাদাররা দরের সুবিধার জন্য সরিষার তৈলের পরিবর্তে এই রকম বিষ মিশ্রিত তৈল তৈয়ারী করছেন এবং আমরা তা অম্লানবদনে হজম করছি। তার ফলে হয় কি—আমাদের আয়ু কমে যায়—শরীরের তেজ ক্ষীণ হয়ে যায়। তেলের মধ্যে সব চেয়ে ভাল তিলের তেল কিংবা Olive Oil যাতে আমাদের অম্বল কখন হয় না। ঘিয়ের মধ্যেও অনেক রকম ভেজাল চালান হয়—যেমন সাপের কিংবা শূকরের চর্বি। সেই সব বিষ খেয়ে আমাদের শরীর কত দিন ভাল থাকতে পারে ?

খাওয়া দাওয়ার বিষয় বলতে গেলে আমাদের ভাতরুটীর কথাও একটু বলা দরকার। আমরা যেমন ভাবে ভাত খাই, তাতে ভাতের সারাংশ থাকে না। প্রথমতঃ চাল আমরা কলে ছাঁটা ও সিদ্ধ খাই। এই রকম কলে ছাঁটা চালের উপরকার নালকোর চলে যায়—ভাইটামিন নষ্ট হয়। তার পর রান্না করে ভাতের যা ফেন তাও হাঁড়ি উপুড় করে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে ভাইটামিন যা কিছু সব নষ্ট হয়ে যায় ও কতকগুলো ছাই দিয়ে পেট বোঝাই করা হয়। সেই জন্যই এই রকম ভাবে ভাত খেয়ে আমাদের শরীরের শক্তি নষ্ট হয়েযায় ও আমরা Beri Beri রোগে আক্রান্ত হই। Beri Beri রোগীকে ডাক্তাররা ফেন খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। ফেনের মধ্যে অনেক মূল্যবান জিনিষ থাকে—দুর্বল, রোগগ্রস্ত শিশুদের ফেন খাওয়াইয়া সবল করা যায়। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণের রসদ ফুরিয়ে গেলে খালি ফেন খাওয়াইয়া তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। কথায় বলে আমরা ভেতো বাঙ্গালী—ঐ রকম আবর্জ্জনাপূর্ণ ভাত খেয়ে আমরা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ি। অল্প পরিমাণে ভাত খেলে আমাদের শরীরে অলসতা আসে না। কিন্তু আমরা ভাত খাই খুব প্রচুর পরিমাণে। বিড়াল ডিঙ্গোতে পারে না এমনি চূড়া করে নিয়ে ভাত খেলে সে ভাত হজম হয় না। খাবার পর ঘুম আসে, পেট ভারী হয় ; এবং কিছু দিন বাদে পেটে বেশ একটা জমাট ভূঁড়ি হতে থাকে। আমাদের অল্প পরিমাণে খেতে হবে। যাঁরা ফেন খেতে পারেন না তাঁরা রান্নার সময় একটু সাবধান হয়ে রাঁধলে ফেন খেতে হয় না। যেমন চাল ঠিক সেই পরিমাণ জল এমন দিতে হবে যে রান্নার কালে সেই জলটা ভাতের গায়ে লেগে যায়। বেশী পরিমাণ জল দিলেই বেশী ফেন বাহির হয়।

আমরা বড় তাড়াতাড়ি খাই। আমরা চিবিয়ে খাই না বলে দাঁত শক্ত হয় না ও খাবার লালার সঙ্গে মিশতে পারে না। লালার রস খাদ্য দ্রব্যের জীর্ণতার সহায়তা করে।

অনেকে বলেন আমাদের দুধ খেলে হজম হয় না—পেটে বায়ু জমে ইত্যাদি। তাহার মানে আমরা অন্যান্য জিনিষ খেয়ে পেটটা ভরিয়ে দিই—তাহার উপর একবাটী দুধ খাই। কিন্তু হয় কি—দুধটা একটা বেশ শক্ত জিনিষ; বাইরে তরল থাকলেও ভিতরে ছানা হয়। তাই অন্যান্য জিনিষ হজম করতে গিয়ে দুধ হজম করবার রস শরীরে থাকে না বলে দুধ হজম হয় না। দুধ খেতে হলে আমাদের যেমন চা sip করে খাওয়া হয়, তেমনি করে অল্পে অল্পে দুধ খেলে ভাল হয় ; কারণ অল্পে অল্পে চুমুক দিয়ে খেলে কিংবা চামচ দিয়ে খেলে দুধ লালার সঙ্গে মিশে পেটে বড় বড় ছানা হয় না—ছোট ছোট ছানা হয় এবং শীঘ্র হজম হয়। আর একটা জিনিস—দুধ কাচা খেলে উপকারিতা বেশী ; কারণ তাতে ভাইটামিন ও চূণ জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে, কিন্তু গরম করে ফুটালে এই দুইটা জিনিস নষ্ট হয়ে যায় ও উপকারিতা চলে যায়। অনেকে আপত্তি করবেন যে অনেক রকম বীজাণু দুধের মধ্যে থাকবে এবং সে দুধ কাচা খেতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আমি বলি যার রক্তের তেজ থাকে তাকে কোন রকমই জীবাণু আক্রমণ করতে পারে না। কিন্তু যখন রক্তের তেজ কমিয়া যায় তখন যতই কেন জীবাণু তাড়াতে চেষ্টা করুন না—আপনাকে সে সুবিধামত আক্রমণ করবেই।

দই খাওয়ার উপকারিতা যথেষ্ট আছে। ইহাতে পেট বেশ ঠাণ্ডা থাকে ও পেটের গোলমাল নিবারণ করে।

মাছ মাংস অল্প পরিমাণে খাওয়া ভাল। মাংসের ঝোল ফেলে দেওয়া উচিত নয় এবং মাংস রাঁধতে হলে ঝাল, মশলা মোটেই না দেওয়া উচিত এবং একদিন খাব বলে একেবারে জামবাটী ভর্ত্তি করে খাওয়া উচিত নয়। তার পরদিন তার অন্যায় ফল ভোগ করতে হয়। ডিম খেতে হলে কাঁচা ডিম খাওয়াই ভাল। নচেৎ সিদ্ধ ডিম সম্পূর্ণরূপে হজম হয় না।

সব চেয়ে যা ভাল এবং বেশী পরিমাণে খাওয়া উচিত সেটা ফল। ফলের মধ্যে কোন ভেজাল থাকে না, ফলেতে পেট বেশ ঠাণ্ডা থাকে, পেট বোঝাই করে না এবং ফলের রসে রক্তের পুষ্টি হয়। বিশেষ করে কমলালেবু, বাতাবী লেবু, বেদানা, আপেল, পেঁপে, কলা, আনারস, আম, নাশপাতি, আক, খরমুজা, কেশুর ও যাবতীয় ফলই শরীরের পক্ষে হিতকর। আমরা ফলের দেশে থাকিয়া ফলের ব্যবহার করি না। আর এই ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে কত কোটী টাকার ফল চালান হয়ে যায় তাঁদের স্বাস্থ্যের জন্য। তাঁরা ফলের উপকারিতা জানেন। তাই প্রত্যেক-বার খাওয়ার শেষে তাঁরা ফল না খেয়ে ছাড়েন না। আমরা কিছুও যদি না খাই, খালি ফল খেয়ে আমাদের অনেক ব্যারাম সারাতে পারি।

যখন শরীরে রোগ দেখা দেয় তখন অন্য সব কিছু খাওয়া বন্ধ করে ফল খেলে খারাপ হবে না। ফল শরীরের রক্তের ময়লা শুদ্ধ করে ও জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলে। কত বড় বড় সাধুরা খালি ফলাহার করেই তাদের জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শরীরের মধ্যে নিত্য দুইটা ক্রিয়া হচ্ছে—একটী খাদ্যের সারাংশ গ্রহণ করছে (Assimilation) এবং অপরটী অসার অংশ বর্জ্জন করছে (Elimination)—শরীরের একটী পূর্ণশক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ খাদ্য গ্রহণ করছে ও

অপর ভাগ অথাদ্য বর্জ্জন করছে। আমাদের অসুখের সময় অথাদ্য বর্জ্জন করবার শক্তি অনেক কমে যায়। তখন কিছু খেলে রক্তের মধ্যে আরও ময়লা জমতে থাকে এবং পরিপাক রস কমে যায় বলে কিছু হজম হয় না। অসুখের সময় আমাদের কিছু না খাওয়াই ভাল ; কারণ তখন শরীরমধ্যস্থ শক্তি কোন খাদ্য জীর্ণ করবার জন্য খরচ হবে না বরং সম্পূর্ণরূপে ময়লা বর্জ্জন করতেই প্রস্তুত থাকবে। যত সত্বর শরীরের এই ময়লা বাহির হবে ততই শীঘ্র রোগের মুক্তি হবে। অসুখের সময় কিছু না খাওয়াই ভাল—যদি একান্ত না খেয়ে থাকার কষ্ট অনুভব করেন তাহলে খালি ফল খেয়ে থাকলে চলতে পারে। কারণ ফল জলেরই মতন খুব সহজে জীর্ণ হয়। ফল খেলে যে ঠাণ্ডা লাগে বা সর্দ্দি হয় এটা একটা ভ্রমাত্মক ধারণা। আমি বলি আমাদের প্রাকৃতিক চিকিৎসায় সর্দ্দি কিছু খারাপ জিনিষ নয়। যেমন ঘরের মধ্যে ময়লা জমলে জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলে দিই, তেমনি রক্তের মধ্যে ময়লা এলে ফুসফুস জল দিয়ে ময়লা ধুয়ে দেয়—তাই সর্দ্দিরূপে বাইরে দেখা দেয়। আমাদের প্রাকৃতিক মতে রোগের চিকিৎসা করতে হলে তাকে খাদ্যের নিয়ম বলে দিই—তাকে বলি যদি আপনি শীঘ্র সারতে চান তাহলে দু'বেলা ফল খেয়ে থাকবেন—তাতে আপনার শরীর হাল্কা হবে—শরীরের ময়লা কেটে যাবে ও রক্তের খাদ্যও তৈয়ারী হবে। অসুখের সময় খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তখন খাদ্য জীর্ণ করবার পরিপাক রস শরীর মধ্যে থাকে না বলে যদি কিছু ভারী জিনিষ খাওয়া যায় তাহা বিষের কাজ করে। এই জন্য জন্তুদের শরীর খারাপ হলে তারা কোন খাবার জিনিষ মুখে করে না। সহিস এসে যখন বলে বাবু, ঘোড়া দানা ছোড় দিয়া, তখন জানতে হবে তার কোন রোগ হয়েছে। রোগের সময় উপবাস করা শরীরের পক্ষে মঙ্গলজনক।

চিরন্তনী

শ্রীমতী উমাশশী দেবী

শ্রাবণের মেঘভারাক্রান্ত সন্ধ্যা -সারাদিন অবিশ্রাম বর্ষণের ফলে, সঙ্কীর্ণ গলিপথে একহাঁটু জল জমিয়া গিয়াছিল। সেই কাদা-জলে শাড়ি সেমিজ ভিজাইয়া বাড়ী ঢুকিয়াই পায়ের ভিজা জুতা খুলিতে খুলিতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে অরুণা হাঁকিল—সতি !

অন্নপূর্ণা হ্যারিকেন্ হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন, অনু এলি ? ওমা, এই সন্ধ্যেবেলা ভিজে নে'য়ে এলি একেবারে,—ওই চুলের গাদা সারা রাতেও শুকোবে না কি ?

ভিজা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে অপ্রসন্ন মুখে অরুণা জবাব দিল, ভারি আমার সখ্ কি না ভিজ্‌বার,—পথে আর আমার জন্যে কে ছাতা ধরে আছে বল ! বৃষ্টির দিনে বাইরে ঘুর্‌তে গেলে, না ভিজে আর উপায় কি ?

মেয়ের বিরক্তি বুঝিয়া মা ক্ষুন্নকণ্ঠে বলিলেন,—নে বাছা ! ভিজে চুল্ মুছে ফেল্ শীগ্‌গির্ ! সবই আমার কপালের লেখা—না' হ'লে তোমার বয়সী মেয়েরা সবাই এক এক সংসারে গিন্নী হ'য়ে বসেছে,—আর তুমি শুধু শুধু আপনার সৃষ্টিছাড়া খেয়ালে পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে,—কে আর ভেবেছিল বল ?

বাধা দিয়া অরুণা বলিল, ক্ষিধে পেয়ে গেছে মা ! খাবার দাও। সতুকে দেখ্‌ছিনে যে !

মা কথা কহিবার আগেই সতীশ আসিয়া বলিল, বাবাঃ ! দিদির বাড়ীর কথা মনে হ'ল এতক্ষণে ? এই কাদায় কতবার যে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত ঘুরে এলুম। তা' কোন্ দিকে গিয়েছ ব'লেও যাও নি, যে এগিয়ে যা'ব আর একটু—

দিদি ধমক্ দিয়া কহিল, কি দরকার ছিল তোমার, এই জল ভেঙে আমাকে খুঁজ্‌তে যাবার ? সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—নিজে পড়্‌তে বস্‌লেই পার্‌তে ! তা' তো নয়,—ওই ব'লে মাকে ভুলিয়ে, ঘুরে আসা হচ্ছিল আর কি !

সতীশ মহা রাগিয়া বলিল, মেয়েদের কক্ষনো ভাল কর্‌তে নেই। তোমারি দরকারে খুঁজ্‌ছিলাম। নিমন্ত্রণটা তোমারি। তবে আমাকে ঘাড়ে ব'য়ে দিয়ে আস্‌তে হবে, সেই জন্যেই যা' আমার তাড়া ছিল একটু।

খাবার হাতে অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, চুপ্ কর্ তো বাপু ! সারাদিন পরে মেয়েটা এলো—এক মিনিট দেরি সয় না ! বুড়োধাড়ি ছেলে, এখনও কোথাও যা'বার নামে নেচে ওঠা'—

ছেলে বলিল—হ্যাঁ—সব জায়গায় যাচ্ছি কি না? একটা চাঁদাও দাও না যে বলখেলার ক্লাবে ভর্ত্তি হই। ছুটীর দিনেও দিদি সারাদিন ঘুরে এলো, আর আমার বেলায় কেবল পড়া আর পড়া। কোথা'ও যেতে চাইনে আমি যাও,—সে দুম্‌দাম্ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল,—বোধ হয় পড়িবারই জন্য।

খাইতে খাইতে হাসিয়া অরুণা বলিল, সতুকে আচ্ছা রাগিয়ে দিলে মা! ব্যাপার কি বল ত'?

মা বলিলেন—দুপুরে বীণা এসেছিল তো'কে ও'র নতুন বাড়ীতে নিয়ে যেতে,—কিসের খাওয়া আছে আজ। তো'দের স্কুলের সব বন্ধুরা আস্‌বে। বল্‌লে—একা সব পেরে উঠ্‌ব না ব'লে অনি'কে নিতে এলুম তাড়াতাড়ি। তা' মেয়ে তোমার কেরাণীর বেহদ্দ হ'য়েছে মাসিমা! আজ তো স্কুল কলেজ সব বন্ধ,—গেল কোথায়? এলেই কিন্তু সতুকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিও।

অপ্রসন্ন মুখে অরুণা বলিল, ও'র শ্বশুরবাড়ী! মা! তুমি তো জান, ও-সব গোলমালের মধ্যে যেতে ভাল-বাসি না। আমি যেতে পার্‌ব না ব'লে দিলেই ভাল কর্‌তে। মিথ্যে আশা ক'রে থাক্‌বে, মনে ক'রে খারাপ লাগ্‌ছে,—

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি বলেছিলুম, সে কখন ফির্‌বে ঠিক্ নেই, তা' ছাড়া ওখানে যেতে রাজি হবে না হয় ত'। তা'তে উল্টো চাপ মেয়ে আমাকেই দিলে—তুমি আর আমাকে ভালবাসো না—তাই ওদের আমার সংস্রবে যেতে দিতে চাও না। আমার নতুন বাড়ীতে অনির না যা'বার কি কারণ ঘট্‌ল, তাই বল? সকলেই দেখ্‌লে, কেবল তোমরা কেউ দেখ্‌লে না, এতে আমার যত কষ্ট হয়, ওঁদের কাছে লজ্জাও তত করে। আজও যদি সে না যায়, আমিও আর এ-বাড়ীতে আস্‌ছি না।—তা' তোমার ইচ্ছে না হয় যেয়ো, না খাবারটা খেয়ে নাও,—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

একই গাড়ীতে ছোট-বড় অনেকগুলি মেয়ে যখন স্কুলে যাইত, বীণার সহিত তখনই অরুণার পরিচয় হয়। বীণা বয়সে কয়েক বৎসরের বড় এবং উঁচু ক্লাশের ছাত্রী হইলেও, অরুণার সঙ্গে ভাব হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। অপরূপ রূপসী এই বালিকাকে প্রথম হইতেই বীণার চক্ষে বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেই ভাল লাগা কবে যে সুদৃঢ় বন্ধনে পরিণত হইয়াছিল, সে কথা, আজ বোধ হয় কাহারও ভাল করিয়া মনে পড়ে না। অরুণার পিতা রমানাথবাবু এক নামজাদা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বিদ্যার তুলনায় উপার্জ্জন সামান্য হইলেও অবস্থা তাঁহার সচ্ছল-ই ছিল। অরুণার পরে দুই তিনটী সন্তান অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলে, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটীর দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই, ভাবিয়াছিলেন,—সেটীও তাহার অগ্রজদেরই পথানুসরণ করিবে। তাই প্রথম সন্তান অরুণার উপরই তাহার সমস্ত মনটা পড়িয়া থাকিত। ফলে, অনিন্দ্যসুন্দরী জননীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতির মত বালিকা কন্যা, পিতার অতুলনীয় চরিত্রের অনুকরণে গড়িয়া উঠিতেছিল। বীণাদের বাড়ী ছিল দু'তিনখানা বাড়ীর পরে। ধনবানের একমাত্র দুলালী কবে কি করিয়া যে অরুণার পিতৃমাতৃ-স্নেহের অংশী হইতে আপনাদের বিদ্যুতালোকিত গৃহের অশেষবিধ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে তাহারই পার্শ্বে বসিয়া খানিকটা রাত্রি পর্য্যন্ত গভীর মনোযোগে স্কুলের পড়া তৈয়ারি করিত, তাহা যেন ভাল করিয়া বুঝা যায় না, শুধু এই দু'টী বালিকার সহিত তাহাদের পিতামাতাও বুঝিতেন, তাহারা শুধু দুইটী খেলার সাথী প্রতিবেশী নহে,—যেন দুইটী সহোদরা, একবৃন্তে দুইটী ফুলের মতই সুন্দর।

বীণার বিবাহের পর, তাহার পিত্রালয়ে কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে আসিয়া, অরুণাকে দেখিয়া, তাহার শাশুড়ী বলিলেন, বৌমা! এই বুঝি তোমার অনু? তা' বল না তোমার মেসোমশা'য়কে মেয়েটী আমাকে দিতে, আমি হিরণের বউ করি। ওঁরা যদি রাজি হ'ন, কিরণকে দিয়ে তখন ওঁদের কাছে কথা পাড়্‌ব। কি রূপ বাপু! এমন দেখিনি কখনও। লজ্জায় লাল হইয়া অরুণা তাঁহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পলাইয়া গেলেও, এই একান্ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বীণা ভুলিল না। তাহারই অবিরাম আলোচনার ফলে ও হিরণের জননীর আগ্রহে, কিছু দিনের মধ্যেই হিরণের সহিত অরুণার বিবাহ-সম্বন্ধ একরকম স্থির হইয়া গেল। হিরণের ডাক্তারি পড়া শেষ হইলেই

বিবাহ হইবে, কথা রহিল। জননীর অবশ্য এত বিলম্বে মত ছিল না, কারণ, পুত্র তখন মেডিক্যাল্ কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র; এবং হিরণের যুবক চিত্তও এই অনুপমা কিশোরীকে বধূ রূপে পাইতে লুব্ধ কম হয় নাই। কিন্তু পঠদ্দশায় বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া এতদিন সহপাঠী মহলে গলা ফাটাইয়া, এখন নিজেই তাহার ব্যতিক্রম করা সঙ্গত মনে করিল না। বীণা দুঃখিত হইয়া অনুযোগ করিলে, হিরণ বুঝাইল, বিবাহ হইলে মেয়েদের আর শিক্ষার সুযোগ হয় না। এই তিন বৎসর সময় পাওয়ায় অরুণা স্বচ্ছন্দে ম্যাট্রিক পাশ করিতে পারিবে। আর বিবাহ যখন স্থির হইয়া রহিল, তখন নিশ্চিন্ত মনেই পড়াশোনা চলিবে। এই বিদ্রূপে রাগিয়া বীণা কয়েকদিন হিরণের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিল।

কন্যার শিক্ষা এত শীঘ্র সমাপ্ত হয়,—পিতার ইহা অভিপ্রেত ছিল না। মাতৃহীনা বীণাকে তাঁহারা অরুণার মতই স্নেহ করিতেন বলিয়া, তাহার একান্ত আগ্রহে বাধা দিতে মনে সঙ্কোচ হইতেছিল। এক্ষণে হিরণের অসম্মতির কারণ বীণার নিকট শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। হিরণ তাঁহার অপরিচিত নহে। অধ্যাপনা কালে এই প্রিয়দর্শন মেধাবী ছাত্রটীর গভীর অনুসন্ধিৎসা দর্শনে, তাঁহার বিদ্যানুরাগী চিত্ত স্বতঃই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাই অবসর কালে কত দিন হিরণ তাঁহার গৃহে আসিয়া পঠিত বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছে। পরে পাঠান্তরে মন দিলেও সাহিত্যালোচনা সে ত্যাগ করে নাই বলিয়া অধ্যাপকের সহিত সংস্রবও ছিল, এবং বীণার সম্পর্কে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এক্ষণে নিজের বিবাহ-প্রসঙ্গ উঠায় হিরণ এ বাটীতে আসিতে সঙ্কুচিত হইত। শিক্ষিত যুবকের এই লজ্জানম্র ব্যবহার রমানাথ বাবুর ভাল লাগিত। রূপে-গুণে সর্ব্ব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষিত এই যুবককে নিজের জামাতৃরূপে কল্পনা করিয়া তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিতেন।

আশু কন্যা-বিবাহের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের কাজে মন দিলেন। কিন্তু এই অযথা বিলম্বে অরুণার জননীর অভিযোগের অন্ত রহিল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল—কন্যার বয়স বাড়িতেছে, —সন্তানের অশুভাশঙ্কায় সদা-শঙ্কিতা জননী বিচলিতা হইতেন। কোনও দিন স্বামীকে স্পষ্টই বলিতেন, অনুকে যখন-তখন ওঁদের বাড়ী যেতে দিও না। ওঁরা হলেন রাজা লোক। তা'র ওপর, ওই চাঁদের মত ছেলে। ডাক্তার হ'য়ে বেরুলে কত বড় বড় লোক দশ-বিশ হাজার ঢেলে মেয়ে দিতে চাইবে। বীণার শাশুড়ী হাজার ভাল হোন্, তবু মেয়েমানুষ তো! তখন সে সব ফেলে যদি শুধু রূপ দেখে তোমার মেয়ে না নিতে চান তা'হলে কি হ'বে?

স্বামী হাসিয়া বলিতেন, তোমার স্বজাতিপ্রীতি প্রশংসনীয় বটে! হিরণের মা স্ত্রীলোক ব'লেই নিজের কথা রাখ্‌তে পার্‌বেন না, এ ধারণা কিসে হ'ল? মেয়ে এখন পড়্‌ছে পড়ুক। পরে ওঁরা যদি ও'কে না চান্, আমি ও'কে অন্য সুপাত্রে দিতে পার্‌ব নিশ্চয়।

প্রতিবাদ করিয়া অন্নপূর্ণা বলিতেন, মেয়ে এখন বড় হয়েছে। হিরণের মত ছেলেকে দেখে, স্বামী হ'বে জেনে, শেষে যদি অন্যরকম হয়,—মেয়ে আমার চিরদিন দুঃখ পাবে। তা'র চেয়ে ও সংস্রব এখন ছাড়াই ভাল।

রমানাথ বলিতেন, হিরণকে তুমি চেন' না বলেই মিথ্যে ভয় পাচ্ছ। ও'রা দুজনে পরস্পরের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে —এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। না হলে, দেখ, আমাদের বিনা চেষ্টায় কেমন কোরে এই যোগাযোগ হয়ে গেল! ভগবানের বিধানে মনে অবিশ্বাস এনে, মিথ্যে কষ্ট পেয়ো না।

তখনকার মত নীরব হইয়া গেলেও, জননীর মন, এই যুক্তিতে নিরস্ত হইত না।

কোনও দিন অন্তরাল হইতে এ প্রসঙ্গ শুনিতে পাইলে জননীর অমূলক আশঙ্কায় অরুণা মনে মনে হাসিত। রমানাথ আধুনিক চালে চলিলেও, অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী ছিলেন না বুঝিয়াই, সে হিরণের সংস্রব এড়াইয়া চলিত। বীণার অশেষবিধ বিদ্রূপ, উপদ্রব সত্ত্বেও, সে হিরণের সম্মুখে পড়িলে লজ্জায় আরক্ত হইয়া নির্ব্বাক নতমুখে বসিয়া থাকিত। হিরণও কোনও দিন তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টামাত্র করে নাই। তবু বীণা কিম্বা সম্পর্কীয়া কোনও আত্মীয়ার পরিহাসে, তাহার সকৌতুক মুগ্ধ দৃষ্টির সহিত দৈবাৎ অরুণার দৃষ্টি মিলিত হইত। সে দৃষ্টিতে এমন কিছু থাকিত যাহাতে

তাহার কুমারী হৃদয় এ অনিন্দ্যকান্তি যুবককে আপনার ভাবী স্বামী জানিয়া, শ্রদ্ধায় প্রেমে বিগলিত চিত্ত ইহারই পদতলে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিত।

এমনি বিশ্বাস, আশঙ্কা ও আশায় মিশিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল! আসন্ন উৎসবের কল্পনায় আত্মীয়-বন্ধু উৎসুক হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কন্যা ও ভাবী জামাতার সাফল্য-গর্ব্বে উৎফুল্ল পিতা কিরণের নিকট বিবাহের দিন স্থির করিতে গিয়া, আগেই হিরণের সবিনয় অনুরোধ শুনিলেন, গবর্ণমেণ্ট্ হইতে একটা বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, পাইলে—সে বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার দান সসম্মানে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে,—তৎপূর্ব্বে কোনও আদেশ করিয়া তিনি যেন তাঁহাকে অপরাধী না করেন,—দুই বৎসরের মধ্যেই সে ফিরিবে।

ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের প্রতি ধনী-সন্তান ছাত্রের এই শ্রদ্ধা প্রশংসনীয় হইলেও, এই ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া রমানাথের মনে আঘাত লাগিল। কিন্তু মুখে তিনি হিরণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াই ফিরিয়া আসিলেন। অত্যন্ত কোমলচিত্ত হইলেও আত্মমর্য্যাদাবোধ তাঁহার অধিক মাত্রায় ছিল। তাই, হিরণের জননীর বারবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও, হিরণকে তিনি দ্বিতীয়বার বলিতে সম্মত হইলেন না। বলিলে হয় ত বিবাহ হইয়া যাইত; কারণ, মাতার অশ্রুজলে ও ভ্রাতৃজায়ার সস্নেহ তিরস্কার অভিমানে হিরণ তখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কন্যাপক্ষ হইতে আর কোনও সাড়া আসিল না।

বিদেশ যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িলে, বন্ধু-বান্ধব লইয়া একটা ভোজের আয়োজন করিয়া, কুণ্ঠিতা হিরণের জননী পুত্রকন্যাসহ অন্নপূর্ণাকে নিমন্ত্রণ করিতে বীণাকে পাঠাইয়া দিলে, তিনি অসম্মত হইয়া বলিলেন, তোমার শাশুড়ীকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লো, অনুর বিয়ের আগে আর আমি কোথাও যা'ব না।

মাসিমাকে বারবার অনুনয় করিয়া বিফল হইয়া, বীণা হিরণের জেদী স্বভাবের অশেষবিধ নিন্দা করিয়া সজল চক্ষে ফিরিয়া গেলে, এই কোমলহৃদয়া কিশোরীর ম্লান মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে অন্নপূর্ণার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পরদিন বিকালে অরুণা বই খাতা এবং সতুকে লইয়া পড়িবার ও পড়াইবার জন্যই বোধ হয় উপরে গিয়া বসিল। কিন্তু মন তাহার অত্যন্ত অবাধ্য ভাবে বীণার কোলাহল-মুখরিত গৃহে ঘুরিতেছিল। বহু-বহুবার দৃষ্ট হিরণের হাস্য-প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাহার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়া অকারণে বারবার চক্ষু সজল হইতেছিল। সহসা সেই পরিচিত কণ্ঠ শুনিতে পাইল—

সত্যিই আপনি যা'বেন না এ আমি বিশ্বাস করি নি। মা আমাদের ছেড়ে কখনও থাকেন নি। তাঁর খুব কষ্ট হবে। আমি আশা করেছিলুম—আপনি মধ্যে মধ্যে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবেন। শিক্ষার জন্যে আমি বিদেশ যাচ্ছি,—কত দিনে ফিরব ঠিক নেই। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে যাবেন না ভেবে আমার ভারি কষ্ট হল' মা! আমি নিতে এসেছি আপনাকে—চলুন আপনি। হিরণের কণ্ঠস্বর কাণে যাওয়া মাত্র সতুকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। সে ছুটিয়া নামিয়া গেল। মা কি উত্তর দিলেন তাহাও অরুণার কাণে পৌঁছিল না। সে শুধু শুনিতে লাগিল হিরণের কথা—কি মধুর কণ্ঠ! কি করুণ ভাষা! এ ভাবে 'মা' বলিয়া ডাকিতে, এবং মার সহিত এ ভাবে হিরণকে কথা কহিতে সে আজ প্রথম শুনিল। সুদীর্ঘ প্রবাস-যাত্রার পূর্ব্বে সে যেন তাহাদের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া মা'র কাছে স্নেহের দাবী জানাইল। হিরণের সব-ই ভাল, মন্দ বলিবার তাহার কিছুই নাই। তবে কেন যে সে এমন করিয়া সকলের কথা ঠেলিয়া দূরে যাইতেছে, ইহা যেন ঠিক বুঝা যায় না। সে যদি এ রকম না করিত, তাহা হইলে আজিকার এই বিদায়-উৎসব যে প্রীতি-উৎসবে পরিণত হইত, তাহার প্রধান নায়িকা হইত, অরুণা নিজে! এমনই অসম্ভব কল্পনায় সে যখন তন্ময় হইয়া আছে, তখন মা তাহার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে লইয়া হিরণের সঙ্গে তাহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই অযথা বিলম্বের জন্য সেখানে অনেক অনুযোগ তাঁহাকে শুনিতে হইল এবং অরুণার বিপদের পরিসীমা রহিল না। পরিচিতা সমবয়স্কারা সকলেই বলে, রাগেই অরুণা আসতে চায় নি। হিরণবাবুর ভারি অন্যায় যে, এ রকম করে চলে যাচ্ছেন। বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে

গেলে ওকে কোনও কিছুতেই বেমানান্ দেখাত না নিশ্চয়।

লজ্জায় সঙ্কোচে আরক্তমুখী অরুণা ইহাদের হাত এড়াইয়া বীণার গৃহে গিয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল। পাশের হল্-ঘর হইতে গানের স্বর ও হাসি কথার সুমিষ্ট আওয়াজ সুস্পষ্ট কাণে পৌছিলেও, অন্যমনস্কা ভাবে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল,—সহসা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই, হিরণের দীর্ঘ দেহ সম্মুখে দেখিয়া, লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে সে যেন অভিভূতের মত সেই দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল। হিরণও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াই রুদ্ধ দ্বারের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সহসা পাশের দরজা খুলিয়া বীণা অরুণার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, ও কি ঠাকুরপো! তোমাকে নিয়ে এলুম একটা জিনিস দেবার জন্যে, তুমি ও-দিকে ফিরছ কোথায়?

হিরণ হাসিয়া বলিল, নতুন জিনিস এ ঘরে কিছু দেখ্‌ছি নে তো? তা' তুমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে এ দিক দিয়ে এসে বস্‌লে যে! মতলবটা কি বল তো?

দরজাটা বন্ধ দেখে এ দিকে কেউ আমাদের সন্ধানে আস্‌বে না, বুঝলে বোকারাম! অনু! ঠাকুরপো আজ অনেক জিনিস পেলে, তুই আর কি দিবি? তোর ঐ লকেটশুদ্ধ হারটা ওকে পরিয়ে দে।—যাচ্ছে অপ্সরীদের রাজ্যে, তোর মুখ-আঁকা লকেটটা সঙ্গে থাক্‌লে চাই কি মাঝে মাঝে রূপসীদের রূপ-বর্ণনার অত্যুক্তিতে বাধা পড়্‌তে পারবে,—বলিয়া অরুণার গলা হইতে সরু চেনে গাঁথা লকেট খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া, জোর করিয়াই তাহাকে হিরণের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। সেই কম্পিত হাত দু'খানির দিকে চাহিয়া হিরণ বলিল, হার পরব কি বল? চাইবার অধিকার হয় নি এখনও,—তবে তোমরা দয়া করে লকেটটী দান কর তো খুসি হয়ে বিদায় হই।—

গম্ভীর মুখে বীণা বলিল, ও'র হাত থেকে ফুলের হার আজ তোমার পর্‌বার্ কথা! কেন—কি মত্‌লবে সকলের কথা ঠেলে সেটা স্থগিত রেখে চলে যাচ্ছ, তুমিই জান। এর মূলে আমি আছি ব'লে এটা লাগ্‌ছে আমাকে বেশী। তাই ও'র হাত দিয়ে তোমার গলায় মালা আমি দিইয়ে রাখ্‌ছি।

এইবার হিরণের মুখের হাস্যদীপ্তি নিভিয়া গেল; মৃদু কণ্ঠে বলিল, বৌদি, তোমরাও পরের মত এই সব কথা বল্‌বে? যে জন্যে যাচ্ছি, সফল হই, সে তৃপ্তি তো তোমাদেরই। আমাকে সুখী করতে যা তোমরা আমাকে দিতে চেয়েছ,—দু'দিন পরে নিলে নেওয়ার কি কিছু ত্রুটী হ'বে? বিয়ে ক'রে তোমাদের গণ্ডির মধ্যে ও'কে ফেলে রেখে, এতদিনের জন্যে চলে যেতে আমার রুচি হ'ল না। বাপমা'র কাছে স্বাধীন ভাবে থাক্‌বে, পড়্‌বে—ও তাই ভালবাসে; আমারও ইচ্ছে ভাল করে শেখে। এ ছাড়া, মত্‌লব কি হ'তে পারে তুমিই বল?

দুই পদ পিছাইয়া, বারেকের জন্য অরুণা মুখ তুলিয়া চাহিল। এত দিন ইহাকেই সে অবিচার করিয়া আসিয়াছে। অথচ শুদ্ধমাত্র তাহারই সুবিধার জন্য সকলের কথা ঠেলিয়া হিরণ সকলের নিন্দাভাজন হইতেছে। এমন কি, তাহার পিতামাতাও উদ্দেশ্য না বুঝিয়া ইহার ব্যবহারে মনে দুঃখই পাইয়াছেন। তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া বীণা তাহাকে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বেশ, তাই যদি হয়, তা' হ'লেও, এটা তুমি ও'র হাত থেকে মাথা পেতে নাও, আমি দেখি। ধর যদি হঠাৎ মরেই যাই, তোমাদের বিয়ে দেখা ভাগ্যে না থাকে—

বাধা দিয়া শুষ্কস্বরে হিরণ বলিল, সেই জন্যেই আমিও নিতে পার্‌ছি না বৌদি, মর্‌তে তো আমিও পারি,—ছেলেখেলা ক'রে তুমি ও'র জীবনে একটা দাগ দিয়ে দেবে কেন!

হিরণের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অরুণার অবশ দেহ বীণার দেহের উপর এলাইয়া পড়িল ও হার ছড়াটী তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল।

সবেগে পাখা চালাইয়া দিয়া, নত দেহে হার ছড়াটী কুড়াইয়া হিরণ তাহার লকেটটী খুলিয়া লইল। একবার মুহূর্ত্তের জন্য অরুণার পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, হারটী তাহার গলার উপর নিক্ষেপ করিয়া, গৃহের বাহির হইয়া গেল।

বীণার কোলে মুখ লুকাইয়া অরুণা ফুলিয়া ফুলিয়া

কাঁদিতে লাগিল, ও তাহার চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিঃশব্দে বীণার চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে আহারাদির পর নিমন্ত্রিতগণ অরুণাকে আদর করিয়া বৎসরান্তে ভোজের দাবি জানাইয়া একে একে বিদায় লইতে আরম্ভ করিলে, অন্নপূর্ণা বলিলেন, সতু ঘুমিয়ে পড়ছে. দিদি! এইবার আমরাও আসি তা' হ'লে—

হিরণ বলিল, আমি আপনাদের পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ব্যস্ত হইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, সারাদিন গোলমালেই কাট্‌ল,—রাত হ'য়েছে, তুমি আর ঘোরাঘুরি ক'রো না। ঘরের গাড়ী, এমনিই তো মেয়েরা আসা যাওয়া করে, ড্রাইভার পৌঁছে দেবে।

হিরণের জননী বলিলেন, তা' হোক্ বোন্! ঘুরতেই তো দেশ ছেড়ে চল্‌ল। আর সময় পাবে না হয় ত অরুণার বাবাকে প্রণাম ক'রে, আশীর্ব্বাদ নিয়ে আসুক,—বলিতে বলিতেই তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

নত হইয়া হিরণের জননীকে প্রণাম করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, মন খারাপ করবেন না দিদি, আপনার আশীর্ব্বাদে ওদের ভালই হ'বে।

অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া হিরণ তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। মা ডাকিয়া বলিলেন, তবে বিমলাকে তুমি এই সঙ্গে নিয়ে যাও,নামিয়ে দিও.—ও রোগাছেলে ফেলে এসেছে,—গাড়ী ফিরে আস্‌তে রাত বেশী হবে। বিমল হিরণের মা'র বাল্যসখী, এবং অরুণার দূর সম্পর্কীয় মাসী। অন্নপূর্ণা বলিলেন, ভালই হ'ল, আমিও একবার নেমে দেখে যা'ব।

সকলে গাড়ী চড়িয়া বসিলে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অরুণার মামার বাড়ী কাছেই,—বড় রাস্তায় গাড়ী হইতে নামিয়া সরু গলি-পথে একটু হাঁটিয়া যাইতে হয়। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী থামিলে, সম্মুখ হইতে নামিয়া হিরণ গাড়ীর দ্বার খুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নিদ্রিত সতুকে গাড়ীর আসনে শোওয়াইয়া বিমলার পিছনে নামিতে নামিতে অন্নপূর্ণা বলিলেন, তুমি আর ভিজো না বাছা! গাড়ীতে উঠে ব'সো। অনুরও নেমে কাজ নেই,—আমি এখনি ফির্‌ব। হিরণকে প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়াই তাঁহারা চলিতে আরম্ভ করিলে, হিরণের ইঙ্গিতে ড্রাইভার নামিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে চলিল। নিমেষমাত্র সেই দিকে চাহিয়া, খোলা দরজা দিয়া হিরণ গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া বসিতেই, সচকিতে অরুণা সরিয়া বসিল। সে চমক এতই সুস্পষ্ট যে সেই স্বল্পালোকেও তাহা হিরণের দৃষ্টি এড়াইল না।

অরুণা ভাবিল—হিরণের আজ কি হইয়াছে? এত বৎসরের মধ্যে, সহস্র সুযোগ সত্ত্বেও, যে কোনও দিন ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা মাত্রও করে নাই বলিয়াই তাহার কুমারী হৃদয়ের শ্রদ্ধা অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল: আজ নিরাশায়, আশঙ্কায় সবই যখন ম্লান দেখাইতেছে, তখন, হিরণ কি তাহার শ্রদ্ধাটুকুও এই ভাবে চূর্ণ করিয়া তাহাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়াই বিদায় লইবে! অসহায় দৃষ্টি তুলিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল।

তাহার এই ভাবান্তরে, মুহূর্ত্তের জন্য-হয় ত হিরণের মনে একটু দ্বিধা জাগিল। পরক্ষণেই আপনার বুক পকেট হইতে অরুণার ফটোশুদ্ধ ক্ষুদ্র লকেটটা বাহির করিয়া বলিল, এটা ফিরিয়ে নিতে চাও? কশাহতের মত বিবর্ণ মুখে অরুণা হিরণের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইল। লকেটটা পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া হিরণ বলিল, কেঁদেই তুমি ধরা পড়ে গেলে। কিন্তু অনু! তুমিও কি মনে করছ, আমি অন্যায় করে যাচ্ছি? তুমিও কি বিশ্বাস করতে পারছ না যে, তোমাকে পাবার যোগ্য হ'য়েই আমি ফিরে আস্‌ব?

নতমুখী অরুণার নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া একটু অধীর ভাবেই হিরণ বলিল, কথা কও অনু! কোনও দিন তোমাকে বিরক্ত বা বিব্রত করবার রুচি আমার হয় নি. কিন্তু আর সময় নেই,—এ সময়টুকু লজ্জা করে থেকে আমাকে কষ্ট দিও না। আত্মীয়হীন প্রবাসে, দিনের পর দিন কাটাবার জন্যে তোমার মুখের একটা কথাও আমাকে শুন্‌তে দাও,—বল, আমি কি তোমার ওপর কিছু অন্যায় করলুম?

গাড়ীর মধ্যেই বসিয়া পড়িয়া হিরণের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া অরুণা মুখ তুলিয়া চাহিল, জলে ভরা সেই দুটী আয়ত চক্ষুর দৃষ্টির সম্মুখে বিপুল বলে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া, দুই হাতে অরুণার কোমল হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে হিরণ বলিল, —তোমাকে আমি বড় ছেলেমানুষ ভেবে এসেছি।

এ রকম করে তুমি যে চোখের জল ফেল্‌বে, এ আমার মনেও হয় নি। তা'হ'লে—যাই হোক্, এইটুকু নিয়েই এখন আমি বিদায় হলুম,—ভগবান্ যেন তোমাকে শান্তিতে রাখেন।

এইবার অরুণার চোখের জল ঝর্‌ঝর্ করিয়া সেই সম্মিলিত চারিখানি হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতেই, ত্রস্তে আপনার হাত টানিয়া লইয়া সে আসনের উপর উঠিয়া বসিল। এক অভূতপূর্ব্ব বেদনায় তাহার দেহ-মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণিকের জন্য হিরণের উন্নত মুখ তাহার মস্তকের উপর নত হইল। পরক্ষণেই দরজা খুলিয়া হিরণ নামিয়া পড়িল। গলিপথে তখন অন্নপূর্ণাকে দেখা যাইতেছে!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে হিরণের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় সকলেই যখন দিন গণিতেছে, তখন তাহার নিকট হইতে জননীর নামে সুদীর্ঘ পত্র আসিল, সে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মা যদি সন্তুষ্ট মনে অনুমতি দেন, তবে এ দিকটা ভাল করিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া যাইবে ইহাই তাহার একান্ত সাধ। সে আশা করে, মা আপত্তি করিবেন না। অরুণার পিতারও সম্মতি সে চাহিয়াছে। তবে তাঁহাকে পৃথক পত্র লিখিল না। তাঁহাদের অনুমতি পাইলে, পরে বিস্তারিত সকল বিষয় জানাইবে। তাহার আরও এক বৎসর সময় লাগিতে পারে।

শিশুকাল হইতে একান্ত সুবোধ সন্তানের বারবার এই স্বেচ্ছাচারে জননী ক্ষোভে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। অরুণার পিতামাতাকে, এমন কি, অরুণাকেও মুখ দেখাইতে তাঁহার লজ্জা হইতে লাগিল। বীণাই ম্লানমুখে সংবাদটা তাঁহাদের জানাইতে রমানাথবাবু হাসিমুখে বলিলেন—বেরিয়ে যখন পড়েছে, অর্থেরও অপ্রতুল নেই, তখন ঘুরে আস্‌তে চাইবে বৈ কি!

অন্নপূর্ণা বিষণ্ণ মুখে নীরবেই রহিলেন। কন্যার মুখের ঈষৎ ম্লান ছায়া তাঁহার চক্ষু সজল করিয়া দিল। ইহার পর একদিন অন্নপূর্ণার সাধের সংসার ভাঙিয়া গেল,—মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে রমানাথ বাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। চিকিৎসকদিগের গোপনতার চেষ্টা সত্ত্বেও, আপনার আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, অধীরভাবে তিনি কিরণকে বলিলেন, হিরণকে আনা যায় না? আর সময় নেই বুঝি? এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে জানলে, তা'কে চলে আস্‌তে লিখে দিতুম। আর কিছু দিন তোমরা আমাকে রাখ্‌তে পার না? হিরণের হাতে অনুকে দিয়ে যেতে পারলে, এই শেষ সময়ে সতুর চিন্তাও আমাকে এমন করে পিছনে টান্‌ত না, আমি শান্তিতে যেতে পার্‌তুম।

কিরণ চিরদিনই কোমল-প্রকৃতি,—দৃঢ়চিত্ত অধ্যাপকের এই শিশুর মত ব্যাকুলতা দেখিয়া সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। কোনও মতে রুদ্ধস্বরে বলিল, হিরণকে খবর দিচ্ছি আমি। কিন্তু কেন এত ভয় পাচ্ছেন আপনি, ভাল হ'য়ে যাবেন। আর আমরা তো সকলেই আছি আপনার কাছে।

এই আশ্বাসে আসন্ন-মৃত্যু রোগী নিশ্চিন্ত হইলেন না,—প্রবল জ্বরের প্রকোপে অর্দ্ধচেতনার মধ্যেই হিরণের নাম বারবার তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন যখন একবার কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ চেতনা ফিরিল,—স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল।

আপনার দুর্নিবার রোদনাবেগ সম্বরণ করিয়া সযত্নে পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে অরুণা বলিল, বাবা, তুমি অমন ক'রে কেঁদো না। সতুর জন্যে কিছু ভাব্‌তে হ'বে না তোমাকে। তোমার মনের মত করে যত দিন না ও'কে মানুষ করে তুল্‌তে পারি, তত দিন আমিও লেখাপড়া নিয়েই থাকব, তুমি চুপ কর' বাবা। কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কন্যার মুখে আপনার দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াই যেন পিতা নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিলেন। তবুও তাঁহার মৃদু স্বর শোনা গেল, সে ফির্‌বে, কিন্তু যদি সময়ে ফির্‌ত,—যদি তা'র হাতে তোমাকে তুলে দিতে পারতুম, তা' হ'লে—

বিপুল বলে আপনাকে সংযত রাখিয়া, অশ্রুহীন চক্ষে পিতার মৃত্যুশীতল ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে অরুণা সেই একই কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে লাগিল, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আক্ষেপের সমাপ্তি ঘটিল।

কিরণের পত্রে এই দুঃসংবাদ পাইয়া আপনার দেশভ্রমণ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই হিরণ ফিরিয়া আসিল।

গভীর অনুতাপের সহিত পিতৃহীন বালককে বুকে

চাপিয়া ধরিয়া হিরণের সেই উচ্ছ্বসিত রোদনের সম্মুখে অরুণা অশ্রুহীন চক্ষে দাঁড়াইয়াছিল, কক্ষতলে লুটাইয়া অন্নপূর্ণা কাঁদিতেছিলেন—সেদিকেও তাহার দৃষ্টি ছিল না। শুধু কি একটা বলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। পরক্ষণেই সে পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। বহুক্ষণ পরে শান্ত ভাবে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন হিরণ চলিয়া গিয়াছেন, ঘরে আলো জ্বালিয়া সতু পড়িতে বসিয়াছে, মা নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর সে বীণাকে দিয়া মাকে জানাইল, সতু মানুষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে বিবাহ করিবে না। মা তো শুনিয়া কাঁদিয়াই অস্থির। মেয়েকে বুঝাইয়া বলিলেন, বিবাহ হইয়া গেলে সকলেই স্বস্তি পায়, ভাইকে মানুষ করিয়া তুলিবার সুবিধাও বেশী। কারণ, পুরাতন দাসী ভিন্ন এখন দেখিবার কে আছে? আর এ ভাবে থাকিলে লোকেই বা বলিবে কি!

বিরক্ত ভাবে অরুণা বলিল,—বাবাকে স্পর্শ করে যে কথা আমি বলেছি সে কথা আমি রাখবই। এতে এই ভাবে চিরদিন কাটাতে হয় তাই হ'বে। যা' আমাদের আছে তাই দিয়ে আমার বাপের বংশধরকে, তাঁর সন্তানের যোগ্য ক'রে গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করব,—বড় লোকের নিরাপদ আশ্রয়ে আমার দরকার নেই। তবে তোমার সমাজে,—আমাকে নিয়ে যদি গোল হয় কিছু, বল, আমি বোর্ডিংএ গিয়ে থাক্‌ব।

ইহার পর আরও একদিন হিরণ এ-বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। অরুণা বুঝিল ইহা বীণার ষড়যন্ত্র, এবং মা'রও ইহাতে যোগ আছে; তাই, সে কলেজ হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই, দাসী ও সতুকে লইয়া, বীণার সঙ্গে তিনি কোথায় গিয়াছেন, বালক-ভৃত্য ভিন্ন বাড়ীতে কেহ নাই। হিরণের আগমন সংবাদে প্রথমে ভাবিল, 'কেহ বাড়ী নাই' বলিয়া দ্বারের বাহির হইতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবে। পরে কি ভাবিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছিল; এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত—দুই চারি কথার পর, হিরণের কুণ্ঠিত মৃদু আবেদনের উত্তরে দৃঢ়স্বরে জানাইয়াছিল, বিবাহ সে করিবে না, যাহা না হওয়ায়—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, পিতা শান্তি পান্ নাই,—তাহার জীবনে আর তাহার প্রয়োজন নাই। সতুকে তাঁহার উপযুক্ত সন্তান গড়িয়া তোলাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য,—অন্য কোনও কামনা আর তাহার নাই।

বিবর্ণ মুখে উঠিয়া, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কম্পিত স্বরে হিরণ বলিয়াছিলেন,—সতুকে মানুষ করে তুল্‌তে তুমি যে কারো সাহায্য নেবে না, কারো মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না,—এ আমি আগেই শুনেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কামনা পূর্ণ হোক্। আমার কৃত কর্ম্মের ফল—যত কঠোরই হোক্,—আমি ভোগ করব। কিন্তু একটা কথার জবাব তুমি আমাকে দাও, তার পরে আর আমি কোনও দিন তোমার সাম্‌নে আস্‌ব না। মুখ তোল অনু! আমার দিকে চাও, বল, সতু তোমার বড় হোক্, তোমার ইচ্ছামত মানুষ হ'য়ে—সংসারী হোক্, তার পরে? তার পরে তোমাকে আমি পাব তো? বল?

হিরণের অসমাপ্ত কথার মধ্যেই কাঁদিয়া অরুণা কক্ষতলে বসিয়া পড়িয়াছিল। সেই অবসরে হিরণ বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—আর সে তাঁহাকে দেখে নাই।

প্রথম প্রথম ইহা লইয়া অরুণাকে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছিল। তাহার এই প্রত্যাখ্যানের কথা সহপাঠিনী-মহলে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য প্রশ্ন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাহার উপর কম বর্ষিত হয় নাই। বাটীতে সর্ব্বক্ষণ জননীর কঠিন মুখ, মধ্যে মধ্যে বীণার রাগ-অভিমান, এ সব কিছু দিন লাগিয়াই ছিল। শেষে তাহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া সকলেই হাল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ইহার ফলে পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া গেল অনেক। অরুণা বাহিরের সমস্ত সংস্রব ঘুচাইয়া নিজের ও ভাইএ'র বিদ্যাচর্চ্চাতেই মগ্ন রহিল, বীণাও আর তাহাকে দলে টানিতে পারিল না। হঠাৎ কিরণের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় সে কিছু কালের জন্যই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেল; এবং বিদায় কালে প্রচুর অশ্রুবর্ষণে এই দু'টী বাল্যসখীর মনোমালিন্য নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

হিরণের জননী, সুন্দরী বিদূষী পাত্রীর সন্ধান লইয়া দেখাইয়া, বুঝাইয়া, চোখের জল ফেলিয়া, কিছুতেই পুত্রকে বিবাহে সম্মত করিতে না পারিয়া অরুণার উপর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন। ইহার পরে বিলাত-ফেরত

ডাক্তার-পুত্র যেদিন দাদার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া চলিল, তখন আর তাঁহার ভাবিবারও কিছু রহিল না। অবশ্য অর্থের অপ্রতুল তাঁহার ছিল না এবং রোগা ছেলেটার সঙ্গে ডাক্তার ছেলেটী থাকিলে মন এ দিকে বেশী নিশ্চিন্ত হইবারই কথা, কিন্তু তাঁহার মাতৃহৃদয় এক দিক দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না, হাস্য-কৌতুকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বেদনা-মাখা, অনিন্দ্যসুন্দর পুত্রমুখ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়া অরুণার উপর বিতৃষ্ণা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল। ফলে—এত দিনের ঘনিষ্ঠতা ঘুচিয়া সুদৃঢ় ব্যবধান গড়িয়া উঠিল এবং তাহারই অন্তরালে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে অরুণা স্বর্গগত পিতৃস্মৃতি সদা জাগ্রত রাখিয়া, ভাইটীকে লইয়া গভীর মনোযোগে অধ্যয়নে রত রহিল।

ইহার পর কয় বৎসর নিরুপদ্রবেই কাটিয়াছে। বীণা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিলেও বেশী দিন থাকিত না। দূরে থাকিলে চিঠি-পত্র লিখিয়া অরুণার নিকট হইতে সংবাদ লইত। এত বড় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার আভাস পর্য্যন্তও কাহারও পত্রে থাকিত না। তাহার পর সুস্থ স্বামী পুত্র সঙ্গে দেশে ফিরিয়া, বীণাই আসিয়া দেখা করিয়া যাইত। আবার গোল বাধিল তাহার নূতন বাড়ী হইয়া। বালীগঞ্জে নূতন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে সকল আত্মীয়-বন্ধুর সহিত বীণার সহপাঠিনীদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেদিনও অরুণা যায় নাই। আবার আজ এই ব্যাপার। সতুর পাশে একটা চৌকি লইয়া বসিয়া অরুণা বিগত কত বৎসরের প্রতিটি ঘটনা ভাবিতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন—কি ঠিক্ হ'ল তোমাদের বল। তা' বুঝে রান্না করব।

অপ্রতিভ ভাবে মুখ তুলিয়া অরুণা বলিল,—তাই ভাব্ছি মা! অতটা দূরে—এখনি রাত হয়ে গেল,—সতুকে একা পাঠাতে মন সরূছে না,—ফিরূতে অনেক দেরি হবে।

সবেগে মাথা নাড়িয়া সতীশ বলিল, না ভাই দিদি, তোমার নিমন্ত্রণ রাখ্তে একা আমি যাচ্ছি না আর। তোমার সব ক্লাশফ্রেণ্ডের দল আমাকে ঘিরে দাঁড়া'বে, আর কেন তুমি গেলে না সেই কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমার জিভ্ জড়িয়ে যা'বে,—সেবার যা ভুগেছি আমি—আর বীণাদিকেই বা কি জবাব দেব?

অরুণা বলিল, সারাদিন ঘুরে ঘুরে আমি ভারি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি মা! কাছে-পিঠে হ'লেও কথা ছিল। অতটা দূর গাড়ী চড়ে যেতেও আর মন লাগ্ছে না।

মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন, সত্যই তাহাকে বড় পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে। এমনও তাঁহার মনে হইল—এই কিছুক্ষণ আগে—যখন সে বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তখনও বোধ হয় এমন ম্লান মুখ তাহার ছিল না। তিনি তাহার পিছনে আসিয়া কুণ্ডলীকৃত ভিজা চুলের রাশি খুলিয়া, হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, শরীর যখন ভাল নেই,—তোমাদের কারোই গিয়ে কাজ নেই অনু! বীণা মনে দুঃখ পাবে—তা' আমাদের নিয়ে দুঃখ পেয়েই আস্ছে তো! সমাজের সঙ্গে কি-ই বা যোগ আছে আমাদের—যে সামাজিক ব্যাপারে না গেলে কথা হবে!

মাথাটা বড় ধরে উঠেছে মা, শুয়ে পড়ি একটু—বলিয়া এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। অসময়ে ঘুম তাহার চক্ষে আসিল না। সে ভাবিতে লাগিল বীণার কথা। এতক্ষণ অধীর আগ্রহে বীণা তাহার প্রতীক্ষায়, বার বার পথের দিকে চাহিতেছে নিশ্চয়! বন্ধুরা সকৌতুকে কতই না আলোচনা করিতেছে! বীণার ম্লান মুখ কল্পনা করিয়া অরুণার চক্ষে জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল অতীতের এমনি এক কোলাহল-মুখরিত রজনীতে বীণার নির্জ্জন গৃহে হিরণের উক্তি, অরুণার সেই লজ্জাকর দুর্ব্বলতা! সজোরে মন হইতে এই সব চিন্তা দূর করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

রাগ করিয়া বীণা আর আসে নাই। অরুণা নিজেই লজ্জিত হইতেছিল, সে কেন আর পাঁচজনের মতই সহজভাবে বীণার বাড়ী গেল না! ইহাতে আরো লোককে নানা জল্পনা করিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। পাঁচ সাত দিন নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া একদিন সে সহজভাবেই বলিল, মা! সতুকে নিয়ে একবার বালীগঞ্জে যাব আজ।

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বীণা ভাল আছে তো? আসেওনি আর সেই থেকে। কুণ্ঠিতস্বরে অরুণা বলিল, খবর তো পাই নি কিছু, নিশ্চয় ভালই আছে সব।

রেগেছে খুব, যাই একবার, ও'র নতুন বাড়ীটা আমি দেখ্‌লেই যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, দেখেই আসি—বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

অতর্কিতে এমন ভাবে অরুণাকে আসিতে দেখিয়া প্রথমটা বীণার মুখে কথা ফুটিল না। তাহার পর অরুণার বিপন্ন ভাব দেখিয়া বলিল, কি ভাগ্যি যে এলি! সেদিন অত করে বলে এলুম—তা, তুই আর কাউকেই চাস্ না তো, কারো দুঃখকষ্টে তোর যায় আসেও না কিছু! ভেবেছিলুম, আমার বোন্ বলেই এ বাড়ীতে এসে সহজভাবেই আমাদের আনন্দে যোগ দিবি। তা' বড়াই তুই যতই করিস্, গলদ যা আছে তো'র মধ্যে সে যা'বে কোথায়?

আরক্ত মুখে অরুণা বলিল, বাবা, এসে দাঁড়ালুম—মেয়ে ব'কেই চলেছে,—বস্‌তেও বল্‌বি না না কি। চল্ ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসি আগে।

হাসিয়া বীণা বলিল, তোর ভয় নেই, ওঁরা বল্‌তে বাড়ীতে আজ আর কেউ নেই। মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঠাকুরপোর সঙ্গে ও-বাড়ীতে গেছেন।

নূতন বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া দ্বিতলের বসিবার ঘরে দুইজনে গিয়া মুখোমুখি বসিলে, অরুণা বলিল, এতবড় বাড়ীতে ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত ছেড়ে সারাদিন কাটাস্ কি করে,—তোর ফাঁকা লাগে না?

লাগ্‌লে আর উপায় কি বল! তোমার মত স্বাধীনা তো নই; যেমন এরা রাখ্‌বে, তেমনি থাক্‌তে হবে। কিন্তু তুই আর কত দিন কাটাবি এমন করে? বয়স তো কম হ'ল না, বিদ্যেও যথেষ্ট হয়েছে, সতুও ছোটটী নেই। এক্‌জামিন্ দিয়েই পরে কলেজে ভর্ত্তি হ'বে। বাড়ীতে মাষ্টার পড়াবে। মাসিমা আছেন, তুই-ও সর্ব্বদাই দেখ্‌তে শুন্‌তে পারবি, আর কেন এমন করে থেকে একজনকে কষ্ট দিস্, নিজেও কষ্ট পাস্?

অরুণা মৃদুকণ্ঠে বলিল, কেন তোমরা এ রকম মনে কর? আমি বেশ আছি। বীণাদি! সত্যি বল্‌ছি ভাই, আমার জন্যে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ, ভাব্‌তে আমার ভারি খারাপ লাগে। তোমরা ইচ্ছে কর্‌লেই তোমাদের সংসারের গোলযোগ মিটিয়ে নিতে পার,—আমিও সহজ ভাবেই তোমার বাড়ী আস্‌তে পারি। না হ'লে, আমাকে দেখ্‌লে যে তোমার শাশুড়ী প্রসন্ন হ'ন না, সেটা বোধ হয় তোমাকে বলে দিতে হ'বে না?

অপ্রতিভ হইয়াও কঠিন কণ্ঠেই বীণা বলিল, সেটা তাঁরই বড় অপরাধ কি না! অমন ছেলে, অর্থ, মান, সম্ভ্রম, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই,—অমন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কোন্ মা'র ভাল লাগে শুনি!

তা'র আমি কি কর্‌ব! আমি তো কোনও দিন বলি নি, যে—কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, ওই জন্যেই কোথাও যাওয়া আমি ছেড়েছি, কারো সঙ্গে সংস্রবও রাখি না। তবু-ও যদি তোমাদের ক্ষতি হয়, তা'হলে আমাকে দেশ ছেড়ে যেতে হয়।

তাহার উত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া বীণা বলিল, তা' উঠ্‌লি কেন! দোষ তোদের কারো নয়, সবই আমার,—মরুতে তোমার মত কাঠখোট্টাকে ভালবেসে, চিরদিন কাছে পেতে চেয়েছিলুম। দেশ ছেড়ে তো একজন গিয়েছিল, কি লাভ হ'ল তা'তে? তুই বলিস্ বাবার মৃত্যুশয্যায় শপথ করেছি, সে বলে, তাঁর কাছে বাগ্‌দত্ত আছি—তোরা নিজের নিজের মন বুঝ্‌ছিস না, ভাব্‌ছিস্—এতেই সত্যরক্ষা হচ্ছে। ভাগ্যে তোদের যা' আছে হবে। আর যদি তোকে কোনও কিছু বলি—তখন যা খুসি বলিস্—বলিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইল, কিন্তু গল্প আর জমিল' না। হঠাৎ এক সময় চকিত হইয়া অরুণা বলিল—সন্ধ্যে হয়ে এলো—আজ এইবার ফিরি ভাই, আবার একদিন আস্‌ব।

হাসিয়া বীণা বলিল, তোকে চিন্‌তে আমার বড় বাকি আছে কি না! উনি এখনি ফির্‌বেন—দেখা ক'রে যাস্। কত দিন একসঙ্গে হই নি সব,—আর ভাস্থর হওয়া যখন ভাগ্যে নেই, শ্যালীর অভাবটাই না হয় ঘুচুক—কি বলিস্?

ভীত ভাবে অরুণা বলিল, কিরণবাবুর কত দেরি হবে ঠিক্ নেই,—লাভে হ'তে তোমার শাশুড়ী এসে পড়্‌বেন! এসে পর্য্যন্ত তুমি যা' আরম্ভ করেছ,—তিনি আবার একচোট গায়ের ঝাল্ মেটা'বেন হয় ত। তা'ছাড়া—

বাধা দিয়া বীণা বলিল, 'তা ছাড়া'টা কি? একপাল মেয়ে চরিয়ে খাস্—একজন ভদ্রলোকের সাম্‌নে পড়্‌লে দুটো কথা কইবার মত শিক্ষাও তোর হয় নি না কি? ঠাকুরপো যদি এসেই পড়ে—লোভীর মত হাঁ ক'রে তোর দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে, সে ছেলে সে নয়! কত তপস্যা থাক্‌লে ও'র মত স্বামী হয়। কোন্ ভাগ্যবতী ও'কে পাবে ব'লে তপস্যা করছে, তাই বোধ হয় তোর এমন সৃষ্টিছাড়া মতি বুদ্ধি হয়েছে। যাক্‌গে বাপু! ঘুরে ফিরে সেই এক কথাই এসে পড়্‌ছে। তুই বোস্ একটু—আমি ঠাকুরকে রান্নার জোগাড়টা করে দিয়ে আসি।

সে নীচে নামিয়া গেলে অরুণা উঠিয়া বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। বীণা বলিয়া গেল, অনেক তপস্যা থাকিলে হিরণের মত স্বামী লাভ হয়,—এ কথা যে কত সত্য, তাহা তাহার মত কে জানে? এখন তাহার মনের ভাব যাহাই হোক, কিশোরী অরুণা কি হিরণকেই স্বামী ভাবিয়া বৎসরের পর বৎসর প্রতীক্ষা করে নাই? হিরণের প্রসঙ্গমাত্রেই পিতার আননে স্নেহস্নিগ্ধ ছায়াপাত দেখিয়া সে কি কত দিন অধীর আগ্রহে তাহার প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন কামনা করে নাই? পিতা যাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, সে আত্মদানের বিনিময়ে, সেই স্নেহাস্পদকে তাঁহার একান্ত আপনার করিয়া দিবে—পিতা তৃপ্ত হইবেন, সে নিজে সেই তৃপ্তির হেতু হইবে, --অতুল স্নেহময় পিতার একমাত্র কন্যার ইহা অপেক্ষা কামনার কি থাকিতে পারে? অরুণাও তাই কামনা করিত,—পিতামাতার সাধ পূর্ণ হোক্। তাহার কুমারী হৃদয় সেই সৌম্য প্রিয়দর্শন যুবকের উদ্দেশে সর্ব্বদাই সম্ভ্রমে প্রেমে অবনত হইয়া থাকিত, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? কাহার দোষে দুইটী সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিল? অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া অরুণা চঞ্চল হইয়া উঠিল; মনে জাগিল মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার সেই আক্ষেপোক্তি,—শেষ সময়েও এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তাঁহার এত সাধ,—মাত্র যাহার খেয়ালের জন্য পূর্ণ হয় নাই, তাহার জন্য অরুণার মনে এতটুকুও স্থান নাই, তাহার চিন্তা এখন মনে বিরক্তিই জাগাইয়া তুলে, ইহা সে বুঝিয়াছিল বলিয়াই অনায়াসে হিরণকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছিল। আজ কিন্তু সবিস্ময়ে অনুভব করিল, সেই দিনের মতই অকথিত বেদনায় আজও বুকের মধ্যে টন্ টন্ করিতেছে এবং কখন তাহার একান্ত অগোচরে চোখের জল ঝরিয়া বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিয়াছে। চমকিয়া অরুণা চারি দিকে চাহিল,—ভাগ্যে কেহ এ দিকে আসে নাই! একদিনকার দুর্ব্বলতার সাক্ষী বলিয়া, এমনিতেই বীণাকে তাহার এখনকার মনের ভাব কিছুতেই বিশ্বাস করান যায় না! তাহার উপর তাহারই বাড়ীতে এ-ভাবে চোখের জল ফেলিতে দেখিলে সে যে কি বলিয়া বসিবে তাহার ঠিক্ নাই। চোখ মুখ মুছিয়া, নীচের দিকে চাহিতেই দেখিল, বীণা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। অকস্মাৎ এত প্রসন্নতার হেতু খুঁজিয়া না পাইয়া সে একটু বিদ্রূপের স্বরেই বলিল এতক্ষণে তোমার মুখে হাসি ফুট্‌ল! এখন আস্‌বে? না আমি নেমে যা'ব? বাড়ী ফিরব কখন, রাত হ'য়ে যাবে যে?

বীণা জবাব দিল, তোর তাড়া দিয়ে কি হবে! সতু গেছে সাম্‌নের মাঠে খেলা দেখ্‌তে, সে ফিরে আসুক।

রাগিয়া অরুণা বলিল, এ-সব তোমার ফন্দি, রাত দুপুর পর্য্যন্ত তুমি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌বে না কি? আজ দেখ্‌ছি কপালে দুর্ভোগ আছে!

থাক্‌লে তো ভাল হয়, শিক্ষা হয় কিছু। আর রাগ করে না—যাচ্ছি আমি। প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়াই বীণা সরিয়া গেলে, অরুণা ঘুরিতে ঘুরিতে হিরণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইল।

বীণা বলিতেছিল—আমি তো জানি না উনি ও-বাড়ী যাবেন,---ও ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখ্‌তে চেয়েছিল তাই—

বিরক্তস্বরে হিরণ বলিলেন, তাই ওকে মা'র সাম্‌নে দাঁড় করাতে চাইছিলে? বুদ্ধি তোমার কবে হবে?

মৃদুস্বরে বীণা বলিল, মা ও'কে বরাবরই স্নেহ করেন ঠাকুরপো! আজও যদি ও'র মত বদলায়, তেমনি স্নেহেই তিনি ও'কে কোলে টেনে নেবেন।

তুমি ভুল করছ বৌদি! মা ও'কে দেখে কি ব'লে বসবেন ঠিক্ নেই। বাড়ীতে এসে অপমানিত হয়ে যদি ও'কে ফিরতে হয় সে বড় লজ্জার কথা হ'বে তা

ছাড়া—মত বদ্‌লাবার অধিকার কি আর কারো নেই? দুনিয়া কি ঐ একজনের মতেই চল্‌বে মনে কর?

অরুণার দুই কাণ দিয়া আগুন ছুটিয়া গেল,—সত্যই তো, নির্ব্বুদ্ধি বীণা নিজে দুঃখ পাইতেছে, অরুণাকেও হিরণের চক্ষে হেয় করিয়া তুলিতেছে! রাগে দুঃখে তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া আসিল। ওদিকে বীণার রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল—তুমিই তো মনে করাচ্ছ ঠাকুরপো! একটা বউ এনে দাও না আমাকে, ওর নামও তোমাদের বাড়ীতে কখনও করব না। অনুচ্চ সহাস্য কণ্ঠে হিরণ বলিলেন—চুপ্, চুপ, ক্ষেপে গেলে না কি? তোমরা খোঁয়াড়ে ঢুকেছ বলে—যে গরুটা চ'রে খাচ্ছে, সে ভারি দুর্ভাগা—এ নাই মনে করলে। যাও, তোমার অতিথি একা আছে, ও'ঠো! বীণার উঠিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া ত্বরিত পদে অরুণা ঘরে গিয়া বসিল, পরক্ষণেই বীণা আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া সহজ পরিহাসে বলিল, এই অনু! দ্যাখ্, তোর ভাগ্যে নিজের পতি তো নয়-ই, ভগ্নিপতির সঙ্গে আলাপও লেখা নেই। ওঁদের ফিরতে অনেক দেরি হ'বে ঠাকুরপো এসে বল্‌লে। সে ঐদিকে কোথা যা'বে—তোদের নামিয়ে দিয়ে যাবে—

অরুণা মুখ তুলিয়া চাহিল না। তখনও হিরণের কথা আগুনের মত তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল। আঘাত এতদিন সেই করিয়া আসিয়াছে,—প্রতিঘাত-ও যে আছে,—সামান্য এতটুকু কথায়ও যে মানুষের মনে এত বেদনা লাগিতে পারে, ইহা সে কোনও দিন ভাবিয়া দেখে নাই। আজ যখন বুঝিল—অপরে তাহার দত্ত চরম দণ্ড মাথায় লইয়া, আশা-তৃষাহীন জীবন না বহিয়া—অন্য উপায়ে সুখী হইতে পারে—অমনি দুঃসহ বেদনায় তাহার অন্তর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল। অথচ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে নিজেই বলিয়াছে 'তোমরা সুখী হ'লেই পার"! নতমুখেই সে বলিল, সতুকে নিয়েই আমি যা'ব—তুমি আর গোল বাধিয়ো না ভাই!

এইবার রাগিয়া বীণা বলিল—ও'র গাড়ীতে গেলেও তোর জাত যাবে না কি! তুই মনে করিস্ এমনি তেজ তোর চিরদিন থাক্‌বে? মেয়েজন্ম এমন নয়—ও'র পায়েই একদিন যেচে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে দেখিস"—

আরক্তমুখে অরুণা বলিল, কখনো না, প্রাণ গেলেও ও-রুচি আমার কখনও হবে না দেখো।

এই সময়ে গৃহদ্বারে দাড়াইয়া হিরণ বলিলেন, বৌদি, বোঝা যদি আমার ঘাড়েই চাপাতে চাও, তোমার অতিথিসৎকার চটপট্ সেরে নাও, আমাকে রোগী দেখ্‌তে যেতে হবে।

বৌদি উত্তর দিল—তোমার বোঝা তুমিই জুটিয়ে নিও ভাই! এ বোঝা-টোঝা কিছু নয়, কুটুম্ব লোক বেড়াতে এসেছে, ভদ্রতা করে পৌছে দেবে মাত্র!

বীণার অভিমানভরা কথা কাণে পৌছিলেও অন্য-মনস্কে অরুণা চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল।

তাহাদের খাইতে বসাইয়া পাশে বসিয়া বীণা নানা প্রশ্ন করিতেছিল। দুই একটা অসংলগ্ন উত্তর দিয়া এক সময়ে অরুণা খাওয়া শেষ করিয়া সজল চক্ষে বলিল, আজ কি মনে হচ্ছে জানো বীণাদি! বড় যদি না হতুম, বাপের আদুরে মেয়ে—পাঁচজনের স্নেহপাত্রী থাক্‌তে থাক্‌তেই যদি জীবনটা শেষ হয়ে যেত, তবেই সুখের হ'ত, নয় ভাই!

কি যে বকিস্? বালাই! যা'বার সময় আর মন খারাপ করিস্‌নে। সত্যি ভাই, দিনটা আজ বড় খারাপ গেল। বড় অশুভক্ষণে বাড়ী থেকে বের হয়েছিলি, না? এসে পর্য্যন্ত স্বস্তি পেলি না—আর আস্‌বিও না কোন দিন!

হাসিয়া অরুণা বলিল, কেন? তোমার বকুনি আজ কিছু নতুন নয় তো! ক' বছর ধরেই তো চল্‌ছে—যত দিন বাঁচবে—ব'কেই নেবে।

থাম্ ভাই, ও-সব কথা আর নয়,—মনটা বড় খারাপ লাগ্‌ছে। শীগ্‌গিরই একদিন যাচ্ছি আমি, ঠাকুরপো মাসিমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে বল্‌ছিল।

গাড়ীতে বসিয়া একবার অরুণা বিচলিত হইল। সতু তখন মহা উৎসাহে হিরণের পার্শ্বে বসিয়া গাড়ী চালানর কৌশল দেখিতেছিল! অরুণার মনে হইল, কয় বৎসরেই সতু কত বড় হইয়া উঠিয়াছে। জগতে কত শীঘ্র কত পরিবর্ত্তনই হয়। যে লোকটী অরুণার

সম্মুখে পিছন ফিরিয়া বসিয়া—নির্ব্বিকারভাবে গাড়ী ছুটাইয়া চলিয়াছে, উহার পরিবর্ত্তন কি সব চেয়ে বেশী হয় নাই? অবশ্য অরুণার তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই। একদিন ইহার প্রেমের অর্ঘ্য সে হেলায়ই ফিরাইয়া দিয়াছে। তবুও আজ ইহার নির্লিপ্ত ব্যবহার তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া সতু যখন হিরণের স্নেহের পরিচয় দিয়া মা'র কাছে গল্প জুড়িয়াছিল, অরুণা বিরক্ত ভাবে ধমক দিল—সারা বিকাল তো এমনি কাট্‌ল, আবার গল্প কেন? বই নিয়ে ব'সো না একটু।

সতু রাগিয়া বলিল, বাবাঃ! মেয়ে সব সময় রেগেই থাকেন! খেয়ে এলাম—একদিন না হয় না প'ড়ে শুয়ে পড়ি—তা' নয়, খালি পড়া আর পড়া।

তাই পড়্ না শুয়ে, বক্‌বক্ করছিস্ কেন! মাথা ধরিয়ে দিলি যে বলিয়া আলোটা আড়াল করিয়া সে নিজেই শুইয়া পড়িল।

কিছু দিন পরে ছেলেমেয়ে সঙ্গে, বীণা আসিয়া হাসি গল্পে বাড়ীটি মুখরিত করিয়া তুলিল। হিরণ সন্ধ্যার পর আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইবেন শুনিয়া, মা খাবার তৈয়ারি করিতে নীচে নামিয়া গেলেন। সেই অবকাশে বীণা বলিল, তোর শরীর ভাল নেই না কি? ক'দিনে শুকিয়ে উঠেছিস্ যেন।

অরুণা বলিল, গরমে ঘুম হয় নি—তাই। একটা ভাবনায়ও পড়েছি,—তোমার কাছে পরামর্শ চাইলে—এখনি সেই বকুনি সুরু হবে তো?

হাসিয়া বীণা বলিল, খুব সুনাম আমার হয়েছে বল্? আচ্ছা তিন সত্যি করছি—তুই যে রকম চাস্, ঠিক্ সেই রকম পরামর্শ দেব তোকে,—কথাটা কি শুনি?

ইতস্ততঃ করিয়া অরুণা বলিল, সেই যে, আমার ক্লাশের দুটী ছাত্রীর কথা বলেছিলুম—ও'দের বাপ পশ্চিমে বদলি হ'য়ে যাচ্ছেন,—মেয়েকে পড়াবার জন্যে আমাকে যেতে বল্‌ছেন। মাইনে স্কুলের চেয়ে বেশ মোটাই হবে। তবে ছুটী পা'ব না। এখন তাই ভাব্‌ছি,—অত দূরে ছেড়ে দিতে মা কি রাজি হবেন?

গম্ভীর মুখে বীণা বলিল—অত ভাব্‌না তোমার আছে না কি! কারো আপত্তিতে তোমার কিছু আসে যায়? তুমি হচ্ছ বিদুষী মেয়ে। কিন্তু রোজগার তো করছ, তবু অভাব এত কিসে হল শুনি? মোটা মাইনের চাকরি না হলে চল্‌ছ না কেন? কেউ তো তোমার ঘাড়ে পড়ে নি বাপু, যে দেশ ছেড়ে পালা'তে হ'বে!

অরুণা হাসিয়া বলিল, তিন সত্য ক'রেও কথা রাখ্‌তে পার্‌লে না বীণাদি! চটে যাচ্ছ, কথায় কথায় কি যে ছল্ খুঁজে বেড়াও ঐ তোমার দোষ! ভদ্র পরিবারে অসুবিধে বিশেষ নেই, আর এই সুযোগে একটু ঘুরে আসাও হবে, তাই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তবে মা রাজি না হ'লে হয় না তো?

বিদ্রূপের স্বরে বীণা বলিল, তিনি না হয় রাজি হ'লেন—কিন্তু এতে তোমার শপথ ভঙ্গ হবে না? সতুকে এখানে দেখ্‌বে কে? ও'র তো এক্‌জামিন এসে পড়্‌ল। তুমি পশ্চিমে চাকরি নিয়ে চল্‌লে—ও যদি গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়, ঠেকাবে কে? তবে যদি বল এ শ্বশুরবাড়ী যাওয়া নয়, চাকরি করা—এতে সব দিক না দেখ্‌লেও চলে, সে আলাদা কথা।—

তাহার মুখের ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠিয়া অরুণা বলিল—খুব হয়েছে ভাই বীণাদি! মাপ্ কর, আর পরামর্শ দিতে হ'বে না আমাকে, বাপ্‌রে! বড়োবয়সে তুমি যা' হয়ে উঠেছ, কিরণবাবু কি ক'রে তোমার কাছে রেহাই পান আমি তাই ভাবি। বাস্তবিক ভাই, বেচারীর দশা ভেবে, আমার মায়া হয়—

তোমার মত লোকের মায়া নিয়ে লাভ? সবাই তো শুধু আঁখি ভরে রূপ দেখে জীবন কাটাতে পার্‌বে না? সে যাক্—এখন তোর মত্‌টা কি বল্ আমাকে। যদি মাসিমাকে বল্‌তে বলিস্—না হয় বল্‌ব, আমার আর কি? মৃদুস্বরে অরুণা বলিল, ব'লে দেখো। সতুর পড়ার ভাল বন্দোবস্ত না ক'রে আমি যা'ব না এ মা নিশ্চয়ই জানেন।

বলি বলি করিয়াও বীণা কথাটা অন্নপূর্ণাকে বলিতে পারিল না। খাওয়ার পরে সকলে গল্প করিতেছিলেন। বীণার প্রিয়দর্শন পুত্রটীকে বুকে চাপিয়া অন্নপূর্ণা অন্যমনা ভাবে মধ্যে মধ্যে হিরণের দিকে চাহিতেছিলেন। বহুদিন তাঁহার গৃহে শিশুর কলকণ্ঠে বিচিত্র কলরব কেহ শুনে

নাই। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, মেয়ে যদি এমন অসম্ভব পণ করিয়া না বসিত, সম্মুখোপবিষ্ট এই স্কন্দপ্রতিম যুবকের শিশু প্রতিচ্ছবি এতদিনে তাঁহার গৃহেও এমনই আনন্দের উৎস বহাইত। কন্যা জন্মিলে লোকে যাহা কামনা করে, না চাহিয়াই তাহা তিনি পাইয়াছিলেন—যাহাকে কথায় বলে—চাঁদ হাতে পাওয়া। মেয়ে নিজেই নিজের সৌভাগ্যের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, তিনি আর কি করিবেন! তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখ এই সব চিন্তায় মধ্যে মধ্যে ম্লান হইয়া উঠিতেছিল। জননীর এই ভাবান্তর কন্যার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। বীণার পশ্চাতে বসিয়া তাহার শিশু কন্যাটীকে খেলা দিতে দিতে, সকলের অলক্ষিতে সে এক একবার হিরণের দিকে চাহিতেছিল। এই অপরূপ রূপের জন্যই হিরণ মার মনে এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। এত রূপ—এ যেন তাহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ! শুধু এ অপরাধ অরুণার নিজের কত বেশী, তাহাই মনে পড়িল না। হিরণের সেই প্রসন্নহাস্যময় মুখ দেখিয়া যে মনে কোনও নিরাশা বা গ্লানি আছে ইহা মনে হয় না। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া অরুণা মুখ ফিরাইল, চক্ষু তাহার অকারণে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কথাটা বীণা বলিতে না পারিলেও, সতুর কাণে যাইতেই সে মা'কে বলিয়া দিল। অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া শুনিয়া গেলেন। পরে একদিন মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, অভাব না থাকা সত্ত্বেও তুমি চাক্‌রি করছ, আমি বাধা দিই নি। তাই ব'লে এত সাহস হবে এ-ত ভাবি নি। যা ভাল বোঝো করো। তোমার কাজে বাধা দেবার রুচি আমার নেই। আমার যদি কিছু সুকৃতি থাক্‌ত,—এই আগুনে পুড়্‌তে আমাকে রেখে তিনি চলে যেতেন না।

স্তম্ভিতা অরুণা জননীর গমনপথের দিকে চাহিয়া বসিয়াই রহিল। এমন কঠিন তিরস্কার সে কাহারও মুখে শুনে নাই। তাহার একগুঁয়েমিতে মা সুখী নহেন, ইহা সে জানে। কিন্তু সে দুঃখ যে এত তীব্র হইতে পারে তাহা তাহার ধারণার অতীত। তাই কি মা'র শরীর দিন দিন এমন ভাঙিয়া পড়িতেছে? তবে কি তাহার জন্য অশান্তি লইয়া মাতা পিতার পথানুসরণ করিবেন? তাহাই যদি হয়—তবে কাহার জন্য তাহার এই দৃঢ়তা! সতু মানুষ হইবে, সংসারী হইবে, দেখিয়া মা সুখী হইবেন,—পিতা যাহা পাইলেন না, মাকে সেই তৃপ্তিটুকু দিতেই তো এই জীবনপণ চেষ্টা! এইবার অভিমানে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। মা'র যদি ইহাতে এত অসহ্য দুঃখ, সে কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও শুনিত না,—এমন অবাধ্যতা সে কবে করিয়াছে? কি তাহার অপরাধ? শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছে—পিতার সামান্য ইচ্ছাও মা'র কাছে দেবাদেশের চেয়েও বড় ছিল। সেও পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে শপথ করিয়াছিল, তাহাই পালন করিয়া চলিতেছে। চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার অন্তিম ইচ্ছার মূল্যও আজ জননীর নিকট কিছুই নহে—ইহা সে কিরূপে বুঝিবে? পিতার আদরিণী কন্যার চক্ষে অশ্রু আর বাধা মানিল না। কত দীর্ঘ বৎসর অতীত হইয়াছে, তবুও পিতার কোনও স্মৃতি তো তাহার কাছে এতটুকু ম্লান হয় নাই! এই যে সতু এখনও শিশুর মত চঞ্চল,—দুইবেলা বকাবকি করিয়া তাহাকে পড়াইতে হয়! বিবাহ করিয়া অরুণা যদি সংসার করিতে চলিয়া যায়, তাহাকে দেখিবে কে! সব বুঝিয়াও, হিরণকে দেখিয়াই মা'র এই অবুঝের মত দুঃখ—তাহাকে একান্ত আপনার করিয়া পাইবার আর সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াই মা'র মন এমন বিচলিত হইয়াছে।

দুঃখে অভিমানে অরুণাও কোনও কথা তুলিল না, মা'ও জিজ্ঞাসা করিলেন না। বীণার মুখেই শুনিলেন, ছাত্রী দুটী অরুণা-দিদির মত পরিবর্ত্তনের আশায় কলিকাতাতেই রহিয়া গেল। দিন পূর্ব্বের মতই কাটিলেও, অরুণার মধ্যে যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। সে অন্যমনস্কে কি ভাবে, সময় সময় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মা'র মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন বুঝিবার চেষ্টা করে, দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিলে অপ্রতিভ ভাবে ম্লান হাসিয়া মুখ নত করে। জননীর অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল,—তাঁহার সেই তিরস্কারে অভিমানেই কন্যা শুকাইয়া উঠিতেছে মনে করিয়া প্রায়ই তিনি ভাবিতেন, নিকটে বসাইয়া ভাল কথায়, তাহার মন হইতে সকল গ্লানি মুছিয়া লইবেন। কিন্তু সে সুযোগও যেন সে দেয় না। তাহাদের ভাই বোনের পরীক্ষা সন্নিকট। শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও সতুকে লইয়া দুইবেলা

তাহার বসা চাই। জননীর অবসর মিলিতেছিল না। সন্তান বড় হইলে যে এমন পর হইয়া যায় এ ধারণা যেন তাঁহার এই প্রথম মনে হইল।

সতুর পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে নিজে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময়ে এক রাত্রে অন্নপূর্ণা বিসূচিকায় আক্রান্ত হইলেন। বহু দিন পরে আবার সেই পূর্ব্ব দৃশ্যের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল,—সেই চিকিৎসকের আনাগোনা, আত্মীয়-স্বজনের অক্লান্ত পরিচর্য্যা, পরপারের যাত্রীকে ধরিয়া রাখিবার অদম্য প্রয়াস। রাগ দুঃখ ভুলিয়া হিরণের জননী আসিয়া রোগীর শিয়রে বসিলেন। মর্ম্মর-প্রতিমার মত ভাবলেশহীন অরুণার মুখ দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। সে সতু নহে যে, হিরণের আশ্বাসে ভুলিবে। আসন্ন ঝটিকার জন্য প্রস্তুত হইয়াই সে অক্লান্ত ভাবে জননীর পরিচর্য্যা করিতেছিল। পরদিন কাটিয়া শেষ রাত্রে যন্ত্রণা কমিয়া শান্তভাবে রোগী চক্ষু মেলিলে, পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া হিরণের জননী বলিলেন, কা'কে খুঁজ্‌ছ বোন্? এই যে ছেলেমেয়ে তোমার কাছেই রয়েছে ভাই!

সজল দৃষ্টি তাঁহার দিকে ফিরাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে অন্নপূর্ণা বলিলেন, আপনি এসেছেন দিদি! শেষ সময়ে আমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন! অন্যমনস্কা অরুণার কর্ণে প্রত্যুত্তর পৌঁছিল না, অপলকে জননীর মুখপানে চাহিয়া শব্দহীন হাহাকারে বুক তাহার ফাটিয়া পড়িতে চাহিল,—ইঁহাদের নিকট জননী নিজেকে অপরাধী মনে করিতেন কেন? এত ব্যথা তাঁহার কোথায় লুকান ছিল? সময় থাকিতে সে কিছুই বুঝিতে চাহে নাই, আজ আর কোনও উপায় নাই, আর কিছু করা যাইবে না! মা স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, অনু! মা আমার! সতুর দিকে চেয়ে বুক বাঁধো। সংসারে তোমাদের একা রেখে যেতে হচ্ছে ভেবেই স্বস্তি পাচ্ছি না।

মা'র মুখের পাশে মুখ লুকাইয়া আর্ত্ত কণ্ঠে অরুণা বলিল, আমার ভাব্‌না ভেবে শেষ সময় বাবা শান্তি পান্ নি, তোমাকেও শান্তি দিলুম না আমি,—তুমিও এই আগুন বুকে নিয়ে যেয়ো না মা! যদি কিছু উপায় থাকে—বলে দাও আমাকে—কিসে তুমি এ সময়ও এতটুক তৃপ্তি পাবে!

প্রাণপণ বলে আদরিণী কন্যার মাথাটী বুকের উপর টানিয়া লইয়া মা বলিলেন,—এ সব ভেবে দুঃখ বাড়িয়ো না অনু! তোমার মত তৃপ্তি আমাকে কেউ দেয় নি,—প্রথম তোমার মুখে 'মা' ডাক্ শুনে আমার জন্ম সার্থক হয়েছে। সতুর জন্যে যে জীবন তুমি বেছে নিলে—মেয়ে ব'লেই পেরেছ মা! ছেলে হ'লে—এত স্বার্থত্যাগ হ'ত না হয় ত। তোমার মত মেয়ে কোলে পেয়েছিলুম বলেই—হিরণের মত ছেলেকে আপনার কর্‌বার আশা করেছিলুম। আর আমার শক্তি নেই মা! অনেক কথা মনে হচ্ছে—বল্‌তে পার্‌ছি না। কত দিন তোমাকে মনঃকষ্ট দিয়েছি—তোমার পথ থেকে তোমাকে ফেরাতে চেয়েছি, সে যে কেন—যদি কখনও মেয়ের মা হও বুঝবে। আজ আমি এই শুধু বলে যাচ্ছি অনু! সতু আত্মসম্মান বজায় রেখে মানুষ হ'বে এ যেমন তাঁর সাধ ছিল—তোমাকে দিয়ে হিরণকে পা'বার সাধ তা'র চেয়ে বেশীই ছিল এটুকু বিশ্বাস ক'রো। ভগবান্ যেন তোমার আশা পূর্ণ ক'রে তোমাকে সুখী করেন মা! তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করেন।

পুত্রকন্যাকে সংসারে একা কল্পনা করিয়া মৃত্যুপথযাত্রিনীর দুই চক্ষে ধারা বহিল। সেই চক্ষু দু'টী মুছাইয়া দিতে দিতে কাঁদিয়া বীণা বলিল, মাসিমা! আমি কি কেউ নই তোমার? আট বছর বয়স থেকে তোমার কোলে আমার অর্দ্ধেক রাত কেটেছে, আজ আমাকে পর ক'রে দিয়ে যাচ্ছ?

মৃত্যুপাণ্ডুর ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, তুমি যে রাজরাণী মা! তোমার জন্যে কোনও ভাব্‌না তো নেই আমার, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি সুখে থেকো। তুমি আমার বড় মেয়ে—ভাই-বোন্‌কে দেখ্‌বে জানি, তবু—অনুর মুখের দিকে চেয়ে মন মান্‌ছে না! এক সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কহিয়া তিনি যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন, অরুণার লুণ্ঠিত মস্তক বুকের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া হিরণ বলিলেন, মা! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শীর্ণ হস্ত হিরণের মুখে বুলাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস সবলে টানিয়া মা মেয়ের হাতখানি হিরণের হাতের উপর রাখিয়া কষ্টে উচ্চারণ করিলেন, তাঁর বড় সাধ ছিল, সময় পান্ নি,

আমিও এত দিন পারি নি, আজ শেষ সময়ে—অনুকে সতুকে তোমার দু'হাতে তুলে দিয়ে গেলুম, দেখো,—আর ও'র ভাগ্যে সুখ যদি না থাকে তুমি সুখী হ'তে চেষ্টা ক'রো বাবা? এই আশীর্ব্বাদ, অনুচ্চারিত বাণী অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল। কিরণের বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া হাহাকার করিয়া সতু জননীর শীতল বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। গৃহের সকলেই উচ্ছ্বসিত রোদনে আকুল হইল। শুধু শুষ্ক চক্ষে চাহিয়া পাষাণ-প্রতিমার মত অরুণা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হিরণের জননী নিজে উপস্থিত থাকিয়া মাতৃহীনদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। মৃতার নানা সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া তিনি চক্ষের জল ফেলিলেন। বীণা ও সতু কাঁদিয়া লুটাইত, কিন্তু অশ্রুহীন চক্ষে দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া অরুণা শুনিয়া যাইত। হিরণ নিজে চিকিৎসক—এই ভাষাহীন দুঃসহ বেদনা ভোগ দেখিয়া অরুণার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে কি উপায় আছে! ভগবানের কি গূঢ় উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উভয়ের জীবন এমন জটিল সূত্রে একত্র গ্রথিত হইয়াছে কে বুঝিবে! তবুও একদিন বীণাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌদি, অমন ক'রে থেকে ও-কি শেষে পাগল হয়ে যাবে?

কাঁদিয়া বীণা বলিল, কি হ'বে ঠাকুরপো! কাঁদ্‌তেও পার্‌ছে না যেন,—তুমি এসো না ভাই আমার সঙ্গে, যদি দুটো কথা কওয়াতে পার—মাথা নাড়িয়া হিরণ বলিলেন, সে আমি পারব না বৌদি! ও' যে ওই পাগলের মত চোখ তুলে চেয়ে থাক্‌বে, আর দূরে দাঁড়িয়ে আমি তাই দেখ্‌ব—বড় বোনের মত মনে করি তোমাকে—কিছু মনে ক'রো না কিন্তু—আমার অবস্থা তুমি বুঝ্‌বে না।

হিরণের জননী এইবার বিব্রত হইলেন। অত্যন্ত কোমলহৃদয়া বলিয়া, কাহারও বিপদে দূরে থাকিতে পারিতেন না; তাই ধনী-গৃহিণী শত অসুবিধা সহ্য করিয়াও কয় দিন ইহাদের লইয়া কাটাইলেন। কিন্তু তাঁহারও সংসার আছে,—দাসী-চাকরে কত দিন চালাইবে? একমাত্র পুত্রবধূ, সেও স্বামীপুত্র ফেলিয়া এখানে আছে—বকিয়া, বুঝাইয়া তাহাকেও পাঠাইতে পারিতেছেন না। শাসন সম্বন্ধে শিথিল-প্রকৃতি বলিয়া, বধূ, পুত্র হইতে দাস-দাসী পর্য্যন্ত, কেহই তাঁহার শাসনে ভীত হইত না। একরকম রাগ করিয়াই তিনি ইহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বহু দিন পরে অরুণাকে দেখিয়া—এই দুঃসময়েও তাঁহার মুগ্ধ চক্ষু অনিমেষে চাহিয়া থাকিত। পুত্র সংসারী হইল না—কিন্তু তাহার অপরাধ কি? দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্য-সম্পন্না এই নারীকে যে একদিন স্ত্রী বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিয়াছে, অন্য দিকে মন দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। দোষ তাঁহারই—কুক্ষণে রূপ দেখিয়া ভুলিয়া এই অগ্নিশিখাকে তিনি গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। ফলে—পুত্র জীবনের সুখ-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই অগ্নিতে আহুতি দিয়াছে। বধূ রূপে আজ ইহাকে বরণ করিয়া গৃহে লইতে পারিলে আবার সংসারে শান্তি আসে। তাহা যখন হইবার নহে, তখন এই দুষ্প্রাপ্য রত্ন সম্মুখে রাখিয়া, নিরুপায় সন্তান, নিশিদিন নিরাশার বেদনা বহন করিবে,—মা হইয়া তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন! এই পাষাণ-প্রতিমাকে কিছু বলাও বৃথা। যে মনে আপনা হইতে অনুভূতি জাগে না,—যুক্তি, উপদেশে তাহাকে জাগানো অসম্ভব! কি করা যায়? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বীণার উপরই তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। পুত্রবধূ লইয়া সুখী হওয়া তাঁহার ভাগ্যে নাই। নহিলে, ধনীর দুলালী বধূ লইয়া গেলেন,—জ্ঞাতিগোত্র কেহ নহে,—সম্বন্ধ পাতাইয়া ইহাদের লইয়া সে চিরদিন সকলকে জ্বালাইয়া মারিল। তাহার আগ্রহেই তো অরুণাদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়। সে না দেখাইলে এই রূপের আগুনে এমন করিয়া নিজের বুদ্ধিও তিনি পুড়াইয়া খাইতেন না। তাহার পর যখন তাহাদের সঙ্গে নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অসম্ভব, তখনও সে পূর্ব্বের মতই তাহাদের ধরিয়া পড়িয়া আছে। স্বামীপুত্রের মুখ পর্য্যন্ত চাহে না এমনই নির্ব্বোধ। ইহাদের লইয়া সংসার করিতে, তিনিই ঝালাপালা হইয়া গেলেন। বিরক্ত চিত্তে অরুণাকে শুনাইয়াই তিনি বীণাকে বলিলেন, বৌমা! আর ত এমন করে থাকা চলে না। সতু, অরুণাকে নিয়ে আমরা বাড়ী যাই চল, বামাও চলুক। বাড়ীটা পরিষ্কার করে ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে বলি।

আগ্রহের সহিত বীণা বলিল, সেই তো সবচেয়ে ভাল হ'বে মা! আপনি যা ব্যবস্থা করবেন, তা'র

ওপরে আমাদের আবার কথা কি!—কথা কিন্তু বহু দিন পরে অরুণাই কহিল। ধীর স্বরে বলিল, সতু আর পিসিকে নিয়ে আমি বেশ থাক্‌ব। বীণাদি তো মাঝে মাঝে আসে, এখনও সেই রকম এক একদিন দেখে গেলেই যথেষ্ট হবে। আমাদের নিয়ে অনেক কষ্ট ভোগ হ'ল, আর বেশী করে বিব্রত হবেন না আপনি।

এ ভাবে ইহাদের নিজগৃহে লইয়া যাইতে হিরণের জননীর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অরুণা যখন নিজেই অসম্মতি জানাইল, তখন বিরক্ত হইয়াই তিনি বলিলেন, তোমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মা! সবই বোঝ। তোমার মত রূপের ডালি মেয়ে কি ওই একরত্তি ছেলে আর বুড়ো ঝির ভরসায় ফেলে রাখা যায়? দেখাশোনা করবে কে? তোমাদের মা, শেষ সময়ে তোমাদের আমাদের হাতে দিয়েই চোখ বুজেছেন। এখন আমি যদি না দেখি, সে আমার মহাপাপ হ'বে। কিরণ তো আদালত-ঘর করে, ঐ পর্য্যন্ত—সংসারের কিছুই দেখে না। এক হিরণ। তা' ওর যা পেশা,—বাঁধাধরা সময় ও'র নেই। তোমাদের রেখে গেলে স্বস্তি আমরা কেউ-ই পা'ব না। কিন্তু গ্রহের ফলে, বেশী অশান্তি ওরই হবে। যখন তখন এলে শেষে পাড়াপ্রতিবাসী পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্‌বে। এমনিতেই নিরপরাধে বাছার আমার জীবন নষ্ট হ'তে বসেছে। তা'র ওপরে মানুষে যে ওকে দুষ্‌বে সে আমি সইতে পারব না। তা'র চেয়ে তোমাদের নিয়েই যাই চল'।

কথাগুলিতে স্নেহের পরিচয় কিছু থাকিলেও, অভিযোগের ভাগই অধিক মাত্রায় ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য অরুণার বিশাল চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া নম্রভাবে বলিল, বাবা যখন গেলেন, ওই ঝি'র ভরসায়ই মা আমাদের নিয়ে ছিলেন। পিসি আমার জন্মের আগে থেকে আছে শুনেছি। এখন আমারও বয়স হয়েছে, সতুও ছোটটী নেই। আমাদের তো সারাদিন স্কুল-কলেজেই কাট্‌বে। কেউ বাড়ীতে এলেও দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নয়। সে সব গোলমাল আপনি হ'তে দেবেন না। যদি কিছু দরকার হয়, সতুকে দিয়ে আমিই জানা'ব। বাবা-মা'র শেষ নিঃশ্বাস যে যে ঘরে আছে, সে ঘর ছেড়ে, এই দেশেই আর কোথাও থাকতে আমি পারব না।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই আরক্ত মুখপানে চাহিয়া উপায়ান্তরবিহীনা হিরণের জননী অরুণার যুক্তিই মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বীণা কাঁদিয়া আকুল হইল; তাহাকে যাইতেই হইবে। সে এক গৃহের বধূ, স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের জননী। সংসার তাহার সঙ্কীর্ণ পরিসরে যে গণ্ডি আঁকিয়া দিয়াছে, তাহার বাহিরে বেশী দিন থাকা তাহার চলিবে না। যাহাকে সহোদরাধিক স্নেহ করে, তাহার দুর্দ্দিনে ইচ্ছামত তাহার কাছে থাকিবার বা তাহাকে কাছে রাখিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। দারুণ বেদনায় বুকের মধ্যে টন্ টন্ করিয়া সহসা তাহার মনে হইল, শিক্ষিতা অরুণা এই নাগপাশের মর্ম্ম বুঝিয়াই বোধ হয় এই জীবন বরণ করিয়া লইয়াছে। ভালই করিয়াছে, নহিলে—তাহাকেও যদি আজ সদ্য-মাতৃহারা ভাইটীকে ছাড়িয়া যাইতে হইত, উহারা কেহই বাঁচিত কি?

বিদায়-কালে দুই বাহু দিয়া অরুণাকে বেষ্টন করিয়া বীণা বলিল, তোকে ছেড়ে যেতে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে! এমন করে থাকার তো তোর কথা নয়? আর কত কষ্ট আমাদের দিবি? ম্লানমুখে অরুণা বলিল, সতুর কথা ভাব্‌ছ না কেন? আজ আমি ছাড়া ও'র কে আছে? কাঁদিয়া বীণা বলিল, চোখের জলও কি তুই শুকিয়ে ফেলেছিস্? মাসিমাকে আর দেখ্‌ব না, আর আমরা তাঁ'র আদর ভোগ করব না, এ কথা কি তোর মনে হচ্ছে না? রুদ্ধ স্বরে অরুণা বলিল—মনে সবই হচ্ছে ভাই! কিন্তু বীণাদি, মাকে কোন্ সুখ আমি দিয়েছি? আমাকে পেয়ে অনেক সাধই তাঁর মনে জেগেছিল, এ তিনি কত দিন আমাকে বলেছেন। এমন করে আমাদের ফেলে তিনি চলে যেতে পারেন এ তো কখনও ভাবি নি। তা'হলে হয় ত তাঁর সাধ মিটত! আমার জন্যে বড় অশান্তিতে তাঁ'র দিন কেটেছে। আজ বাবার কাছে গিয়ে তিনি শান্তি পেয়েছেন। তাঁ'র জন্যে কাঁদ্‌বার আমার কিছু নেই ভাই। বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল,—এত দিন পরে রুদ্ধস্রোত মুক্ত হইয়া এই দুইটী মাতৃহীনাকে সিক্ত করিয়া দিল। অরুণাকে কাঁদিতে দেখিয়া সকলেই স্বস্তিবোধ করিল। তাই কেহ তাহাদের সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা মাত্র

করিল না। শেষে আপনি চক্ষু মুছিয়া সতুকে সান্ত্বনা দিবার ব্যর্থ চেষ্টায়, আবার চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া বীণা বিদায় লইলে—সেই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে পিতৃমাতৃহারা দু'টী ভাই বোন্ আপনাদের শূন্যগৃহে লুটাইয়া পড়িল।

সংসারে যাহারা একা—শোক লইয়া পড়িয়া থাকা তাহাদের চলে না। অরুণাকেও উঠিতে হইল। সতুর কলেজের ব্যবস্থা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হিরণ করিয়া দিতে চাহিলে, অরুণার অনিচ্ছা বুঝিয়া, বীণা তাহাকে নিবৃত্ত করিল। হিরণও, প্রয়োজন নাই বুঝিয়া, আসা বন্ধ করিলেন। আবার তাহারা ভাইবোনে বাহিরের সংস্রব ঘুচাইয়া গৃহ ও কলেজ লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু সময় সময় অরুণার মনে হইত, সে যেন বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কাহারও সবল হস্তে এই ভারগুলি তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে বিশ্রাম লইতে পারিলে সে যেন বাঁচে। কত দিনে সতু মানুষ হইবে? এমনি ভাবে সাফল্যলাভ করিলেও এখনও সাত-আট বৎসর তাহার পড়াই চলিবে। তাহার পর পিতার মতই বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যাদানের কার্য্যেই সে নিযুক্ত থাকিবে--ইহাই অরুণার সাধ। ইহাতে অর্থাগম হয় ত প্রচুর নহে; কিন্তু যে জীবন পিতা বাছিয়া লইয়াছিলেন, পুত্রের পক্ষে তাহাই কল্যাণকর। সে কি অল্প দিনের কথা! কত দিনে এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন হইবে; তত দিন এ ভার সে বহিতে পারিবে কি না কে জানে! বিস্মিতা অরুণা আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিত—কেন সে এমন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে? কিশোর বয়সে অকুণ্ঠিত চিত্তে যে, অপরের সাহায্য ত্যাগ করিয়া, পিতৃহীন শিশুকে বড় করিয়া তুলিবার স্পর্দ্ধা রাখিয়াছিল, আজ পূর্ণ যৌবনে—বয়সে, বিদ্যায় স্বোপার্জ্জিত অর্থে, যখন সত্যই সে সর্ব্ববিষয়ে সক্ষমতা লাভ করিয়াছে, তখন এ দৌর্ব্বল্য তাহার কোথা হইতে আসিল? কেন এমন হয়? থাকিয়া থাকিয়া শ্রান্ত শির যেন আশ্রয়ের আশায় লুটাইয়া পড়িতে চায়। সর্ব্বংসহা জননীই ছিলেন সকল শক্তির উৎস। তাঁহার অভাবেই মন এমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, ইহাই সে আপনাকে বুঝাইল,—কিন্তু মন বুঝিল কি?

কালচক্রের আবর্ত্তনে মানব-জীবনে কত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। অরুণার সাধ পূর্ণ করিয়া যুবক সতীশ এখন এক কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ভাই বোনের সে সুখনীড় বহু দিন ভাঙিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা দাসীর মৃত্যু হইলে—সতুকে কলেজ-হোষ্টেলে রাখিয়া, সে নিজে বোর্ডিংএ উঠিয়া আসিল। পরিচিত এক ভদ্র-পরিবারকে, আপনাদের জিনিসপত্র বুঝাইয়া, একখানা ঘর বন্ধ রাখিয়া, বাড়ীটা ভাড়া দিল। সেই অর্থে সতুর খরচ অনায়াসে চলিয়া যাইবে,--বৃত্তির টাকাটা থাক্। ঈষৎ হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। যিনি একদিন তাহাদেরই শুভেচ্ছায় এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি এখন পরলোকে। কাহারও জীবদ্দশায় অরুণা তাঁহাদের অনুমোদিত কোনও কার্য্য করিয়া কাহাকেও তৃপ্তি দিল না,—নিজের মা'কেও নয়, হিরণের মা'কেও নয়। আজ একই সঙ্গে স্বর্গীয়া দুই জনের সহিত নিজেদের নাম এ ভাবে মনে হওয়ায় তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। সবই যেন স্বপ্নের মত জীবন হইতে মুছিয়া যাইতেছে। হিরণের জননীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি নিজে অতুল খ্যাতি, অর্থ, পদমর্য্যাদা, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, পশ্চিমের এক সহরে হাঁসপাতাল খুলিয়া, কতকগুলি বেকার চিকিৎসক ও নার্সের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া সে দেশের—দশের ধন্যবাদ কুড়াইয়া দিন কাটাইতেছেন,—বিবাহ করেন নাই। মাতৃসমা শশ্রূর মৃত্যুকালেও পুত্রের একক জীবনের জন্য আক্ষেপ,--অবশেষে সোদরাধিক স্নেহাস্পদ একমাত্র দেবরের দেশত্যাগ,—অরুণাকেই ইহার মূল জানিয়া, বীণাও আর বড় একটা তাহার সান্নিধ্য চাহিত না। বীণার এই রাগ তাহার প্রতি গভীর স্নেহের ফলে অভিমানেরই রূপান্তর—মনে মনে বুঝিয়াই অরুণাই মধ্যে মধ্যে সতুকে পাঠাইয়া সংবাদ লইত। দৈবাৎ কোনও প্রশ্নের উত্তরে, সতু অরুণার লাবণ্যহীন কৃশ দেহের উল্লেখ করিলে, জ্বলিয়া উঠিয়া বীণা মন্তব্য প্রকাশ করিত, মরুকগে, শ্রী নিয়ে কি ছাই হ'বে! কেবল পুড়িয়ে মারবে বই ত নয়! গেলে—ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি।

সতীশ এখন অনেক কিছুই বুঝিয়াছিল। তবুও বীণাদির রূঢ় উত্তরে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়া দিদির কাছে

অনুযোগ করিতে আসিলে দেখিত,—হাসিমুখে শুনিতে শুনিতে কখন্ দিদির বিশাল চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্ব-কথিত ছাত্রী দু'টীর মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠাটী অর্দ্ধপথে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট স্বামীর সহিত সাত ঘাটের জল খাইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কনিষ্ঠা কিশোরীটি তখনও অরুণার ছাত্রী। ইহাদের সুমিষ্ট ব্যবহারে অরুণার একটা আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। নিজের মনের গতির অনুসরণ করিতে গিয়া—বীণাকে তাহার সর্ব্বক্ষণ মনে পড়িত। কত দিন যে প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, 'কেমন করিয়া বীণা তাহাকে অতখানি ভাল বাসিয়াছে—যাহা সহোদরার নিকটেও দুর্ল্লভ'—এই কিশোরীটিকে স্নেহ করিয়া যেন তাহার সদুত্তর মিলিত এমনও মনে হইত। কন্যার পিতা যদি জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ জামাতার আশা ত্যাগ করিতে পারেন, ইহাকে সতুর জন্য চাহিয়া লইয়া—মাতার শূন্য সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার ব্রত উদ্‌যাপন করিবে। সতুর মত ছেলে ক'টা হয়? সস্নেহে ভাইটীর ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত সুগৌর দেহের পানে চাহিয়া অরুণা ভাবিত, রূপে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে—এমন বড় একটা চোখে পড়ে না। ভগবানের এমন সৃষ্টি বৃথা হইবে না—সতু সুখী হইবে,—কিন্তু বৃথা হয় না কি! রূপে গুণে অতুল্য—ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রিয়তম পুত্র বলিয়া যাহাকে সকলে মনে করিত, ভগবানের সেই অনুপম সৃষ্টি কি সার্থক হইয়াছে!

সভয়ে এ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অরুণা কল্পনা করিত, সতুকে সংসারী করিতে পারিলেই তাহার ছুটী—আর তাহার করিবার কিছু নাই। তাহার পরে—আর কিছু ভাবিতে গেলেই—এক আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে—নির্জ্জন গৃহে—এক অসমাপ্ত বাণী তাহার কাণে বাজিতে থাকে—মাথা ঘুরিয়া ক্লান্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসে। এমনি যখন শরীর-মনের অবস্থা,—ছাত্রীটী বলিয়া বসিল, দাদা পশ্চিমের একটা ভাল জেলায় বদ্‌লি হয়ে গেছেন। বাবা, মা, ছোট্‌দা, আমরা সবাই ছুটীতে যা'ব সেখানে। বৌদি অনেক করে লিখেছে,—এবার আপনাকে যেতে-ই হবে আমাদের সঙ্গে।

অরুণা জানাইল—সে বোর্ডিং-বাস ছাড়িয়া গৃহে ফিরিতেছে। তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ—কিছুদিন নিরুপদ্রব বিশ্রাম না লইলে চলিতেছে না।

সেই সুগঠিত দেহের পানে চাহিয়া ছাত্রীটি জেদের সহিত বলিল, তা' হলে, শীত সাম্‌নে—পশ্চিমের জল হাওয়াই তো বেশী উপকারী হবে! আপনারই সুবিধে—আমরা কেবল রোজ রোজ আপনার মুখখানি দেখে আর মিষ্টি কথা শুনে তৃপ্তি পা'ব। এই জন্যেই এত সাধ্য-সাধনা—বাক্য-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবেদনকারিণী সাভিমানে মুখ ফিরাইল।

হাসিয়া অরুণা বলিল, আচ্ছা গো আচ্ছা! আর রাগে কাজ নেই। তবে দেখি সতুকে ব'লে। সে এখন বড় হয়েছে, তোমাদের চেয়ে রাগও হয়ত' বেশী করবে। আমারই দুদিক্ থেকে মুস্কিল হচ্ছে।

অনেক বাদানুবাদের পর অপ্রসন্ন মুখে সতীশ বলিল, তোমার খুসি হয় যাও, আমি আর কি বাধা দেব। যা শরীরের দশা দেখ্‌ছি—বলেই বা ফল কি তোমায়! ছোট থেকে দেখে আস্‌ছি তোমার মতটাই বজায় থাকে—তাই থাক্। কিন্তু দিদি! মনে আছে তোমার? সেই যখন হিরণবাবু এখানে ছিলেন—একবার চাক্‌রি কর্‌তে যেতে চেয়েছিলে,—বেশী দিন গেল না মা গেলেন—এবার কার পালা কে জানে?

অরুণার মুখে কে যেন কালী মাড়িয়া দিল। সস্নেহে ভাইটীর মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া ভৎর্সনার স্বরে বলিল—ছিঃ সতু!

প্রশস্ত রাজপথ ছাড়িয়া কৃষক-পল্লীর পায়ে-চলা আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ দিয়া ডাক্তার মিত্র আবাসে ফিরিতে-ছিলেন। শিক্ষিত অশ্ব যেন প্রভুর মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই। আপনার স্বাভাবিক গতি রোধ করিয়া ধীর কদমে চলিতেছিল। এইমাত্র—দুইটী শিশু রাখিয়া এক তরুণী জননী অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। যুবক স্বামীর উন্মাদ ব্যাকুলতা ডাক্তারের কঠিন চিত্তকেও অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার নিকটবর্ত্তী নিজ গৃহের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন,—উপবেশন-কক্ষে ইহারই মধ্যে আলো জ্বালা হইয়াছে এবং বৈদ্যুতিক পাখা সবেগে চলিতেছে। কে আসিল? অশ্ব ছুটাইয়া মুহূর্ত্ত

খেলার সাথী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৈয়দ সাদিক আলি মির্জা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মধ্যেই কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিতেই ভৃত্য আসিয়া ঘোড়া ধরিয়া সবিনয়ে জানাইল, বিকাল হইতে এক বাবুলোক যাত্রীদিগকে লইয়া তাহার অশেষবিধ আপত্তি সত্ত্বেও জোর করিয়া ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করিয়াছে। হাঁস্‌পাতালের ডাক্তারবাবুও বহুক্ষণ এখানে ছিলেন—এইমাত্র চলিয়া গিয়াছেন।

বিরক্ত ভাবে তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই একটি যুবক অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে তাঁহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল,—আপনিই ডাক্তার মিত্র? নমস্কার! বড় বিপদে পড়েই আপনার অনুমতির অপেক্ষা না রেখে অত্যন্ত অন্যায় জেনেও আপনার অসুবিধা ঘটিয়েছি। কিন্তু আগে দয়া করে আমার সঙ্গে এসে দেখুন একবার,—

অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বারাণ্ডায় উঠিতে উঠিতে ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, আপনাকে এদিকে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। কি হ'য়েছে বলুন আগে—

অদূরে পথের ধারে একখানি সুদৃশ্য মোটর গাড়ীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যুবক বলিল, ঐ গাড়ীতে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। চালা'তে মন্দ জানি না। এই পাশের পথের বাঁকে হঠাৎ একজন চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলে সবেগে নীচে মাঠের ওপর পড়ে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তখনি গাড়ী থামিয়ে ফেলেছিলুম—রাহী লোকও দু'চার জন এসে পড়ে। তাদের সাহায্যে আর তা'দেরই পরামর্শে তাঁকে আপনার ঘরে এনে শুইয়েছি। কি করে এ ঘটনা ঘটল, বুঝতে পারছি না। গাড়ীর দরজা ভাল ক'রে বন্ধই ছিল। আমি মধ্যে মধ্যে দুই একটা পরিচিত জায়গার পরিচয় দিচ্ছিলুম। ওঁরা সব বল্‌ছেন আপনার এইখানে এসেই ইনি উঠে ঝুঁকে কি দেখ্‌তে গিয়ে—টাল্ সাম্‌লাতে না পেরে পড়ে যান্। ধাক্কা লেগে দরজাও খুলে যায় বোধ হয়। কাছেই হাঁস্‌পাতালে নিয়ে যেতে দু'একজন বলেছিল। যুক্তিযুক্ত বুঝ্‌লেও মেয়েরা কিছুতেই সম্মত হলেন না। একটু ম্লান হাসি হাসিয়া যুবক আবার বলিল, হাঁস্‌পাতাল থেকে ডাক্তার সেন তখনি এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে আমাকে অনেক আশ্বাস দিলেও, রোগীর সম্বন্ধে বড় ভয় দেখিয়ে গেছেন। তিনি বল্‌ছেন ফুস্‌ফুসে আঘাত লেগেছে। এঁর হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল। এ রকম সুস্থ দেহে এ রকম দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্র বড় দেখা যায় না।”

ভৃত্যের সাহায্যে ততক্ষণে ডাক্তারের বেশ পরিবর্ত্তন সমাধা হইয়াছিল। তাহাকে ডাক্তার সেনের উদ্দেশে পাঠাইয়া ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহারই স্প্রিংএর খাটে শুভ্র শয্যায় রোগীকে শোওয়াইয়া, সবুজ-আবরণ-মণ্ডিত আলোকাধার ঘুরাইয়া রাখা হইয়াছে। অত্যন্ত মৃদু আলোকে সুস্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। তাঁহাকে রোগীর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শয্যাপার্শ্ব হইতে দুইটী তরুণী সসঙ্কোচে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের রোদনস্ফীত মুখের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টি ফেলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে চিকিৎসক আঘাতের স্থান নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই আদেশে আবরণমুক্ত উজ্জ্বল আলোকে আহতার সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত হইল।

পর মুহূর্ত্তেই অস্ফুট ধ্বনি করিয়া ডাক্তার মিত্র চেয়ার ঠেলিয়া সবেগে দুই পদ পিছাইয়া আসিলেন। ভীত ভাবে সকলে তাঁহার দিকে চাহিতেই, তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া যথাকর্ত্তব্য নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া যুবককে বলিলেন—দেখুন, দুঃখের বিষয়, আপনাকে আমি বিশেষ ভরসা দিতে পারছি না। আমার দ্বারা যতটুকু হওয়া সম্ভব, ক্রুটী হবে না। তবে তখনি হাঁস্‌পাতালে নিয়ে গেলে, অনেক সুবিধা পাওয়া যেত। সজল চক্ষে যুবক বলিল, আপনি দয়া করে সঙ্গে চলুন—ওঁকে আমরা বাড়ী নিয়ে যাই। মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিলেন, এঁকে এখন এতটুকু নড়ান অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর এসে গেছে। এই জ্বর না নামা পর্য্যন্ত কিছু বলা যায় না। জীবনের আশা,—হ্যাঁ, আমি ভাল করেই দেখেছি—এখন আশা খুবই কম। তবে চেষ্টা করে দেখা যাক্।

তাঁহার বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তরুণী দুটী গৃহতলে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ডাক্তার মিত্রের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া যুবক বলিল, এঁকে বাঁচিয়ে দিন্ ডাক্তারবাবু, যত টাকা লাগে,—আমাদের সর্ব্বস্ব ব্যয় করব, উঃ কি ভয়ানক! অসাবধানে আমিই শেষে এঁকে খুন্ করলুম!

ডাক্তার বলিলেন, ও রকম করে কোনও ফল নেই।

আপনারা এখন ফিরে যান্—কত দূরে যেতে হবে? সকালে আবার এসে দেখে যা'বেন।

মুখ তুলিয়া একটী তরুণী বলিল, দাদা, ডাক্তারবাবুকে বল, দয়া করে আমাদের এখানে থাক্‌তে দিন্। এমন ক'রে অরুণাদিদিকে ফেলে আমরা বাড়ী ফির্‌তে পার্‌ব না—মাগো! তরুণী অপরার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল।

যুবক ডাক্তারের দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন, এঁদের সঙ্গে আপনিও অধীর হ'বেন না। এটা হাঁস্‌পাতাল না হলেও, রোগী যখন এসেছে, সেই রকম ব্যবস্থায়ই চল্‌তে হবে। ডাক্তার সেন গিয়ে দুজন নার্স পাঠিয়ে দেবেন। তারা সর্ব্বক্ষণ এঁকে দেখ্‌বে। আমিও আছি। এঁর জ্ঞান আজ হ'বে কি না ঠিক্ নেই। আপনাদেরও বিশ্রামের দরকার। দেরি না ক'রে ফিরে যান্। ঠিকানাটা রেখে যান্—যদি সে রকম কিছু হয়, খবর দেব। না - না, আমি এমনি বল্‌ছি,—অতটা ভয় অবশ্য এখনই নেই। কিন্তু ওঁর জ্ঞান হলেও—আপনারা অত ব্যাকুল হ'লে ওঁর পক্ষে খারাপই হ'বে। দেরি না ক'রে ফিরে যান্—উঠুন।—এই দৃঢ় আদেশের স্বরে চমকিয়া মুখ তুলিয়া তরুণী ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, আপনি ভাল ক'রে দেবেন তো? দয়া ক'রে এঁর প্রাণটুকু ফিরিয়ে দিন ডাক্তারবাবু! আমাদের বাঁচান আপনি।

ম্লান হাসিমুখে কোমলস্বরে ডাক্তার মিত্র বলিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টা আমি কর্‌ব। কিন্তু আপনারাও আমার কথা শুনুন্—বাড়ী ফিরে যান্! এই সময়ে ডাক্তার সেনের প্রেরিত নার্স আসিয়া পৌঁছিতেই, তরুণী দুটী উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবকের আকর্ষণে দ্বারের দিকে ফিরিয়া তাহারই বাহুতে মুখ লুকাইয়া উভয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুও এ দৃশ্যে পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। অত্যন্ত ধীরতার সহিত যুবককে বিদায় দিয়া গৃহে ফিরিতেই, নার্স উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে বলিল, আমাকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে,—আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে!

মাথা নাড়িয়া ডাক্তার মিত্র বলিলেন, আপনি বরং রাত্রের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আসুন। ঘণ্টাখানেক পরে একটা ইন্‌জেক্‌সান্ দেব, জ্বর একটু নামে কি না দেখ্‌তে; আমাকে কয়েক ঘণ্টা এই ঘরে থাকতে হবে। আপনি বরং এসে পাশের ছোট ঘরটায় একটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন, আমি ডেকে দিয়ে যা'ব।

রীতি-বিরুদ্ধ হইলেও, ডাক্তার মিত্রের সুব্যবহারে সকলেই সাহস পাইত বলিয়া, বিনীত প্রতিবাদের স্বরে নার্স বলিল, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন অসুস্থ আপনারই,—বিশ্রাম আপনার একান্ত প্রয়োজন বলেই মনে হচ্ছে না কি? প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাহীনা শয্যাশায়িনী অতুলনীয়া রূপসীর মুদ্রিতনেত্র রক্তবর্ণ মুখপানে দৃষ্টি ফিরাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া ডাক্তার কেদারার উপর বসিয়া পড়িলে, অগত্যা গৃহের আলো আবরণমণ্ডিত করিয়া নার্স বাহির হইয়া গেল।

দুই হাতে আপনার মাথা টিপিয়া ধরিয়া ডাক্তার মিত্র ভাবিতে লাগিলেন, অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! যাহাকে না পাইয়া জীবন শুষ্ক মরুময় হইয়া গেল, যৌবনের সেই কামনার ধন, আজ এতদিন পরে—তাঁহারই গৃহে মৃত্যু শয্যা পাতিয়াছে! সে কি জানিয়াছিল, কোথায় আসিয়াছে! জানিলে হয় ত এ পথে সে আসিত না। মনে পড়িল বহুদিনশ্রুত সেই সদর্প উক্তি—"প্রাণ থাকতে এ রুচি আমার হ'বে না"। প্রাণপণে সে আপনার শপথ রক্ষা করিয়াছে,—বাঁচিবার আশা থাকিতে, তাঁহার সংস্রবে সে আসে নাই। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে, কোন্ পাপে এত শাস্তি লেখা হইয়াছিল? একাগ্র প্রেমে, অবিচলিত ধৈর্য্যে যাহার প্রতীক্ষা করিয়াই তিনি যৌবনের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন, যাহার আশা ত্যাগ করিয়া মনকে শান্ত করিবার কঠোর সাধনায়, যখন তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন ভাবিতেছিলেন, তখন আবার কেন এই নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল? যে কুসুমকোমল তনুলতা একান্ত নির্ভরে তাঁহার বিশাল বক্ষে লুটাইয়া পড়িবে আশা ছিল, আজ অপরিচিতের মত অতি সন্তর্পণে তাহাকে দূর হইতে স্পর্শ করিতে হইল! তাও কত ভয়ে, কত সঙ্কোচে,—পুরুষের ভাগ্যে এমন বিড়ম্বনা পূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছে কি?

কোথা হইতে কি প্রকারে এই অভাবনীয় সংযোগ সংঘটিত হইল, ইহা যে ধারণার অতীত। যাহা অপ্রাপ্য সেই কাম্য বস্তু দূরে রাখিবার জন্যই, তাঁহার এই দূরদেশে আসা। দুর্ভাগ্য এখানেও তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না।

প্রথম যৌবনে ব্যগ্র বাহু প্রসারিত করিয়া যে প্রেম-প্রতিমাকে হৃদয়ে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন, আজ তাহার নিস্পন্দ দেহ তাঁহারই শয্যায় লুটাইতেছে! কোথা হইতে সে আসিল? কেন আসিল? অধীর উত্তেজনায় উঠিয়া ডাক্তার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন! সেই অনুপম রূপরাশি, যাহা বৎসরের পর বৎসর মনশ্চক্ষে কল্পনা করিয়াই তাঁহার দিন কাটিয়াছে। আজ তাঁহার নিভৃত কক্ষে তাঁহার চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে তাহা ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয় ত এইবার চিরদিনের মতই ইহা পৃথিবীর বক্ষঃ হইতে বিদায় লইবে। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি আপনার কার্য্য সাধন করিয়া যাইবে—মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি, প্রাণপণ চেষ্টা—কিছুই তাহার গতিরোধ করিতে পারিবে না। তাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহারই গৃহ হইতে চির-বিদায় লইবে—জানিবেও না শেষ সময় সে কোথায় কাহার কাছে ছিল। তিনিও জানিতে পারিবেন না কি তাহার মনে ছিল। মনে কাহাকেও ছিল কি না! দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগে ডাক্তার স্থান কাল ভুলিয়া রোগিনীর তপ্ত ওষ্ঠে আপনার বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর চাপিয়া দুই বাহু দিয়া সেই সংজ্ঞাহীন দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। পরক্ষণেই তাড়িতাহতের মত চমকিয়া বাহুবন্ধন খুলিয়া পার্শ্বে বসিয়া, তাহার জরতপ্ত কোমল হাতখানি আপনার ঘর্ম্মশীতল কঠিন মুষ্টিমধ্যে চাপিয়া অপলকনেত্রে সেই চিরপ্রিয় মুখখানির দিকে চাহিলেন। কঠিন সংযমের রুদ্ধস্রোত এত দিনে যেন মুক্তি পাইয়া ধারাকারে ঝরিয়া ঝরিয়া রোগের উত্তাপ জুড়াইয়া দিতে লাগিল।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুশ্রূষাকারিণী এই অ-দৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃশ্যে স্তম্ভিত হইল। ডাক্তার মিত্রকে কয় বৎসর হইতে তাহারা দেখিতেছে। তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপ, উন্নত হৃদয়, সংযত চরিত্রের জন্য সকলেই তাঁহাকে একটু অধিক মাত্রায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। আকস্মিক বিপদে পতিত রোগীর—তাঁহার গৃহে স্থান লাভ এই প্রথম নহে, সুন্দরী যুবতী রোগীও দুর্লভ নহে; কোনও দিন মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ এই দৃঢ়চিত্ত পুরুষকে বিচলিত হইতে দেখে নাই। আজ তাঁহার এ কি ব্যবহার? কিন্তু এ দৃশ্য যখন লোক-চক্ষুর অন্তরালেই অভিনীত হইল, তখন ইহা গোপন রাখাই যুক্তিযুক্ত, কারণ—কেহই ইহা বিশ্বাস করিবেন না। লাভের মধ্যে তাহারই হয় ত জীবিকার পথ রুদ্ধ হইবে। তবুও একটা দীর্ঘশ্বাস সে রোধ করিতে পারিল না। নারী যাহাকে শ্রদ্ধা করে—তাহার অশ্রদ্ধেয় ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক আঘাত পায়—তা সে অনাত্মীয় হইলেও। নিঃশব্দেই সে ফিরিয়া গেল। ইতিমধ্যে ঘড়িতে দুইটা বাজিতেই চমকিয়া ডাক্তার উঠিলেন। রোগীর ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত মমতার সহিত হাতখানি শয্যায় নামাইয়া রাখিলেন। তাঁহার আদেশমত ভৃত্য নার্সকে ডাকিয়া দিলে তাহাকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া অত্যন্ত অসংলগ্নপদে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

কয় দিন অত্যন্ত আশঙ্কার মধ্যেই কাটিল। আত্মীয়েরা ডাক্তারের আদেশে নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া সজল চক্ষে চাহিয়া কাটাইত, ও অত্যন্ত অনিচ্ছুক গতিতে নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইত। সপ্তাহান্তে জর কমিয়া রোগী অর্দ্ধসচেতন ভাবে মধ্যে-মধ্যে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেই, সকলে একটু আশান্বিত হইয়া উঠিলেন। ডাক্তার মিত্র যুবককে প্রশ্ন করিলেন—এঁর ভাই বোন্‌কে খবর দিয়েছেন?

বিস্মিত ভাবে যুবক তাঁহার দিকে চাহিতেই, আপনার অসাবধানতা গোপন করিতে ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন, এঁরা সেদিন এঁর ভাইবোনের কথা বল্‌ছিলেন কি না! ব্যাকুলচিত্ত যুবক ডাক্তারের এই অপ্রতিভ ভাব ধরিতে পারিল না—বলিল, আপনি একটু আশা দিয়ে আদেশ করলেই খবর দিই—না' হ'লে কি দেখ্‌তে তাঁদের আস্‌তে বল্‌ব আমরা?

কক্ষতলে বসিয়া যুবকের আনীত সুট্‌কেশ হইতে রোগীর পরিধেয় বাহির করিতে করিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নার্স ডাক্তারের মুখপানে চাহিল। তাহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইল—এই যুবতী ডাক্তারের অপরিচিতা নহেন। এই সময় একখানা ভাজ-করা শাড়ির মধ্য হইতে একখানা খাম মাটিতে পড়িয়া গেল ও পাখার বাতাসে উড়িয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া পড়িল। অন্য কেহ লক্ষ্য না করিলেও ইহা ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াইল না। দুই চারিটি কথার শেষে বাহিরে যাইবার সময় তিনি চিঠিখানি কুড়াইয়া পকেটে রাখিলেন।

রাত্রে ফিরিয়া, রোগীকে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে

নিদ্রিত দেখিয়া, ডাক্তার আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার নিশ্চিন্ত অবসর মিলিল। জামার পকেট হইতে খামখানি বাহির করিলেন। বহুপূর্ব্ব-দৃষ্ট পরিষ্কার ইংরাজিতে শিরোনামা 'বীণাপাণি মিত্র'। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া তিনি খাম খুলিয়া ফেলিলেন। হয় ত ইহাতে এমন কিছু আভাস থাকিতে পারে যাহাতে তাঁহার এই অশান্ত হৃদয়ের হাহাকার শান্ত হইবে।

অরুণা লিখিয়াছে—

ভাই বীণাদি,

আসবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করতে সাহস হয় নি,—তুমি নিশ্চয়ই বাধা দিতে! এখন এত দূরে এসে কেমন যেন খারাপ লাগছে। শরীর এক এক সময় এমন দুর্ব্বল মনে হয় যে, ভয়ও একটু হয়,—হয় ত কোন্ সময় মরেই যা'ব,—শেষ সময় তোমাদের মুখ দেখ্‌তে পা'ব না। তা' হলে কিন্তু মরণেও সুখ পা'ব না ভাই!

যদি তেমন কিছু হয়—মনের সাধ তোমার কাছে জানিয়ে রাখি। আমার সাধ পূর্ণ করতে তোমার মত প্রাণান্ত চেষ্টা কেউ করবে না জানি।

আমার ছাত্রী নীলিমা—যা'দের সঙ্গে এসেছি—এর বাপ্ যদি সম্মত হন্, ঐটীকে সতুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সংসার পেতে দিও। যে ব্রত নিয়ে আমি তোমাদের সংসারে আগুন জেলেছি, যাকে শান্তি দিই নি, সে ব্রত উদ্যাপনের আগেই হয় ত আমার ছুটী হবে। তা' হলে আমার অসম্পূর্ণ কায তুমি সম্পূর্ণ করবে—এ আমি জানি। এঁরা ধনী, কিন্তু বিদ্যার আদর করেন। সতুও নিঃস্ব নয়। সহায়হীন ছিল, মা ও'কে শেষ সময়ে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, আমি গেলে তিনি ও'র সহায় হবেন। জগতে তা'হলে ও'র জন্যে ভাববার কারো কিছু থাকবে না।

আমার প্রণাম নিও। আবার যদি আস্‌তে হয়—তোমার ছোট বোন্‌টি হ'য়ে তোমার কোলে যেন আমার শৈশব কাটে। যৌবনে তোমার সাধ পূর্ণ করতে যেন আমার সর্ব্বস্ব দান করতে পারি—আর তোমাকে কষ্ট না দিই।

আর একটা কথা লিখ্‌তে আমার বাধ্‌ছে, কিন্তু অস্বীকার করে যাওয়া চল্‌বে না, বীণাদি' ভাই! এ জীবনে যাঁকে দূরে রেখেই দিন শেষ করলুম, তাঁকে আমার শত শত প্রণাম জানিয়ে ব'লো, কৈশোর থেকে আজ পর্য্যন্ত নিজেকে আমি তাঁরই জেনে এসেছি—পরলোকে তাঁকে পা'ব, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাচ্ছি। যত দুঃখ তাঁকে দিয়েছি সে আমি জানি। শুনেছি তিনি এই দিকেই আছেন। মুক্তির দিন যদি আসে, যদি সুযোগ পাই, নিজেই তাঁ'র ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যা'ব। আমি বেঁচে থাকতে এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে না জেনে অসঙ্কোচে আমার মনের কথা তোমাকে জানালুম। এই সঙ্কোচটুকু কাটাতে পারি নি ব'লে ক্ষমা ক'রো। আমার সতুকে তোমরা শান্ত ক'রো—সুখী ক'রো।

তোমার—অনু।

পত্র পাঠান্তে সজল চক্ষু পরিষ্কার করিয়া ডাক্তার মুক্ত দ্বারপথে বাহিরের দিকে চাহিলেন,—তবে সে তাঁহার দর্শন-কামনা করিয়াছিল! চেতনাহীন সেই দেহ গভীর আবেগে বক্ষে ধরিয়া তবে তিনি তাহার আত্মাকে ক্লিষ্ট করেন নাই! আঃ! বুকের পাষাণভার যেন নামিয়া গেল। কিন্তু সে কি সত্যই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মত তাঁহার শূন্য হৃদয়পিঞ্জরের প্রবেশদ্বারে আসিয়াই ফিরিয়া উড়িয়া পলাইবে? কোনও মতেই তাহাকে ধরা যাইবে না? তাহা হইতে পারে না, এমন করিয়া পাইয়া আর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব! দীর্ঘ দিনের অর্জ্জিত বিদ্যাবুদ্ধি—বুকের রক্ত দিয়াও তাহাকে রাখিতে হইবে,—তাহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইতে হইবে। উত্তেজিত হৃদয় শান্ত অবসাদে ভরিয়া আসিল,—ডাক্তার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন রোগিনীর অবস্থা অনেক ভাল মনে হইল। শ্রান্তিভারানত চক্ষুর ক্ষণিক দৃষ্টি স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হইল। অনুনয়-বিনয়ে মৌন থাকিবার সর্ত্তে ডাক্তারের সম্মতি আদায় করিয়া যুবক ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া সারাদিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইল। তাহার পাপ তবে প্রায়শ্চিত্তবিহীন নহে! ইঁহাকে তবে আবার তাহারা ফিরাইয়া গৃহে লইয়া যাইবে,—ইঁহার ভ্রাতার আগমন-সম্ভাবনায় তবে তাহাকে মুখ লুকাইতে হইবে না,—বারবার সেই মর্ম্মর-প্রতিমার দিকে চাহিয়া যুবকের চক্ষু সজল হইতেছিল।

বিকালের দিকে গৃহে ফিরিয়া ডাক্তার তাহাদের

জোর করিয়াই বিদায় দিলেন। সারাদিন অনাহারে রোগীর নিকট থাকিয়া সকলেই রোগী হইলে, স্থানাভাবে ডাক্তারকেই শেষে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। ইঁহার ভ্রাতা যদি সন্ধ্যার মধ্যে আসিয়া পৌছেন তবেই—নচেৎ কাল সকালে আবার দেখা হইবে।

কয় দিনের পর ডাক্তারের এই আত্মীয়তাসূচক পরিহাসে ও বাক্যে মনের মধ্যে অনেকখানি আশা লইয়া তাহারা ফিরিয়া গেলে, আর একবার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিয়া গেলেন, হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া, আহারাদি সারিয়া রাত্রে তিনি এই গৃহেই থাকিবেন—শুশ্রূষাকারিণী রাত্রিটা বিশ্রাম লইবে! তাহার চক্ষে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া ডাক্তার মিত্রের অধর-কোণে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। হস্তস্থিত পুস্তক টেবিলে নিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাড়াইলেন। প্রভাত-চন্দ্রের মত বিগতপ্রভ সেই রূপের দিকে চাহিয়া আশঙ্কায় মন শিহরিয়া উঠে,—কত দিনে সে সুস্থ হইবে! অথবা সুস্থ হইবে কি না কে বলিতে পারে? সে তো নিজের মৃত্যু-কামনাই করিতেছিল। নিজের পরাজয়ের লজ্জাই সে বড় করিয়া দেখিয়াছে। আর কাহারও দুঃখ, ব্যর্থ জীবনের শূন্যতা তাহার মনে স্থান পায় নাই। এত দিন প্রতি কার্য্যে এই পাষাণ-প্রতিমার ইচ্ছাই জয়ী হইয়াছে,—আজও কি তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহারই শেষ সাধ মিটিবে?

ব্যর্থ যৌবনের বেদনার শত নিদর্শন ডাক্তারের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আশঙ্কার কারণ নাই বুঝিয়াও মন তাঁহার অকারণে ভীত হইতেছে। এই কয় দিনের যন্ত্রণায়, দীর্ঘ কালের রোগীর মত সে মুখের রক্তিমা মিলাইয়া পাণ্ডুরাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘপক্ষ্ম বিশাল নেত্রের চারিপাশে বৃত্তাকারে কালি পড়িয়াছে। যদি তাহাকে রাখা যায়—পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে কত দিন লাগিবে কে জানে? নানা অসংলগ্ন চিন্তায় অন্যমনস্ক ডাক্তারের চেয়ার টানিয়া বসার শব্দে নিদ্রাভঙ্গে রোগী চক্ষু মেলিয়া চাহিল,—ক্লান্ত ব্যাকুল দৃষ্টি। এই দৃষ্টিটুকুর আশাতেই যে বসিয়া ছিলেন এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়া বিপন্নভাবে ডাক্তার তাড়াতাড়ি মাথার দিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন,—রোগী অস্ফুট কণ্ঠে জল চাহিয়া চক্ষু মুদিল। আপনার স্পন্দিত হৃদয় সবলে দমন করিয়া মেজর গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া ডাক্তার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বিস্মিত ভাবে অরুণা ডাক্তারের দিকে চাহিল। তাহার রোগ-দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছুই যেন ধারণা করিতে পারিতেছিল না। সযত্নে ঔষধ খাওয়াইয়া, যথা স্থানে গ্লাস রাখিয়া, ফিরিতে গিয়া ডাক্তার দেখিলেন,—অরুণার দৃষ্টি যেন তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছে—তাহার কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইতেছে। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তিনি সেই সঙ্কীর্ণ শয্যার প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত মূর্খের মত কাজ হইয়াছে—সদ্যসংজ্ঞা-প্রাপ্ত দুর্ব্বল রোগী কোনও কারণে উত্তেজিত হইলে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি, ইহা চিকিৎসক হইয়া তিনি ভুলিলেন কিরূপে? তাহার এই চেতনা সঞ্চারের সময়ে সম্মুখে থাকা তাঁহার উচিত হয় নাই। হয় ত তাঁহার এই ভ্রমের ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া, এত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, নিয়তি আপনার কার্য্য সাধন করিবে। অনুতপ্ত ভাবে চাহিতেই অরুণার ব্যাকুল দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল,—সে তাঁহাকে চিনিয়াছে!

আত্মসম্বরণে অসমর্থ ডাক্তার অরুণার শীর্ণ হস্ত আপনার দুই হস্তে ধরিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে ডাকিলেন, অরুণা! আমার অনু! বারেকের জন্য সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া অরুণার চক্ষু মুদিয়া গেল।

বেগে পাখা চালাইয়া সযত্নে চোখে মুখে শীতল জলের হাত বুলাইয়া দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে অরুণা আবার চাহিয়া দেখিল। সে যেন নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহার সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার তাহার শিয়রে গিয়া বসিলেন। সাবধানে দুর্ব্বল মস্তকের উপাধান সরাইয়া সযত্নে আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন।

চেষ্টার সহিত আপনার শীর্ণ হস্ত তাঁহার কোলের উপর রাখিয়া অরুণা চক্ষু মুদিল। সেই মুদিত চক্ষু হইতে ধারার পর ধারা নামিয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত করিতে লাগিল। এই নিঃশব্দ রোদনে বাধা দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া তিনি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। মুক্ত বাতায়ন-পথে উষার আলোক গৃহে প্রবেশ করিতেই, সচকিতে ডাক্তার আপনার ক্রোড়-শায়িতা রোদন-শ্রান্তা যুবতীর মুখপানে চাহিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়া সে যে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গভীর অন্যমনস্কতায় তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। তখনও চোখের কোণে জল জমিয়া আছে, কিন্তু কয় দিনের যন্ত্রণা-কুঞ্চিত ললাট মসৃণ হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় সে মুখ প্রশান্ত দেখাইতেছিল। ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়া, পরিপূর্ণ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, তিনি তাহার মাথাটী সযত্নে উপাধানে রাখিতেই, জাগিয়া অরুণা ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিল। তাহার সেই ভীতা হরিণীর মত দৃষ্টি দেখিয়া হিরণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিমুখে নত হইয়া সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাণ্ডুর ললাটে আপনার তপ্ত ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন—চারিটি নেত্রের অশ্রুধারা এত দিনে একত্র মিলিত হইল। বাহিরে তখন কয়েকজনের মিলিত পদশব্দের সহিত বীণা ও সতীশের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল।

জ্যোতিষ-আলোচনা

কঙ্কণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ

শ্রীমথুরানাথ দাস

জ্যোতিষশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। গণিত জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ। গণিত জ্যোতিষই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আগামী •ই ভাদ্র তারিখে যে সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইবে, তাহা দেখিবার জন্য বোধ হয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকবর্গ এবং ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব আছেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের জ্যোতির্ব্বিদ্‌বর্গ ঐ গ্রহণ দর্শনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন।

বর্ত্তমানে সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। এবার এমন একটি সূর্য্যগ্রহণ ঘটিবে যাহা জীবনে একবার দর্শন করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাহাদের ভাগ্যে ঘটে তাহাদের পক্ষেও জীবনে দুইবার দর্শন করা সুকঠিন। কারণ, সাধারণতঃ মানুষ এত দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া আরও প্রতিবন্ধক আছে। পৃথিবীর বা যে কোন দেশের সকল স্থান হইতে একবারের অধিক এইরূপ গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

সূর্য্যগ্রহণ তিন প্রকার :—খণ্ডগ্রহণ বা আংশিক গ্রহণ, সর্ব্বগ্রাস বা পূর্ণগ্রহণ এবং বলয় বা কঙ্কণগ্রহণ।

সূর্য্যগ্রহণে—সূর্য্য চন্দ্রের অন্তরালে থাকে ; অর্থাৎ সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যস্থানে চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতেই আমরা সূর্য্যকে আংশিক বা সম্পূর্ণ অদৃশ্য দেখি। চন্দ্রগ্রহণে—চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা চন্দ্রকে অস্পষ্ট দেখি। আংশিক চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্রের কতক অংশ অস্পষ্ট এবং পূর্ণগ্রহণে সম্পূর্ণ চন্দ্র অস্পষ্ট অর্থাৎ অন্ধকারের বস্তু যেরূপ অস্পষ্ট দৃষ্ট হয় তদ্রূপ দেখায়। তখন পৃথিবী মধ্যস্থানে এবং চন্দ্র সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে।

সূর্য্যের আলোকে সৌরজগৎ নিয়তই উদ্ভাসিত হইতেছে। গ্রহউপগ্রহ-মণ্ডলী সর্ব্বদাই এই আলোককে বাধা প্রদান করিতেছে। সূর্য্যের বিপরীত দিকে সর্ব্বদাই তাহাদের ছায়া স্বীয় স্বীয় পশ্চাদ্ভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সূর্য্যালোক পৃথিবী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় সূর্য্যের বিপরীত দিকে পৃথিবীর পশ্চাদ্ভাগে সূর্য্যালোকের অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে ; তাহাই পৃথিবীর ছায়া।

সূর্য্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ এতদুভয়ে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন স্থানের দর্শন-কালের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য আছে। তাহা জানিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার বিষয়।

চন্দ্রগ্রহণ একই সময়ে পৃথিবীস্থ সকল স্থান হইতে দৃষ্ট হয়। এই জন্য ষ্টেণ্ডাড টাইম অনুসারে সকল স্থান হইতে একই কালে চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হয়। তখন পৃথিবীর গোলত্ব বশতঃ বিভিন্ন স্থানের পূর্ব্ব পশ্চিমে যে দূরত্ব তদনুসারে তত্তৎ স্থান হইতে সময়ের পার্থক্য বা ভিন্ন ভিন্ন সময় উপলব্ধি হয় ; এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ই তত্তৎ স্থানের লোকেল টাইম বা দৃশ্য-মান সময়।

জানিয়া রাখা উচিত যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়কে সকল স্থান হইতেই একরূপ জানিবার জন্য প্রায় সকল দেশে ষ্টেণ্ডার্ড টাইম প্রচলিত হইয়াছে। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়েই পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিমের দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর গোলত্ব বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময় দৃষ্ট হয়, ইহাই সেই সেই স্থানের লোকেল টাইম।

চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে পতিত হইলে দৃষ্টিপথের সকল স্থান হইতেই এক সময়েই এই অবস্থা দৃষ্ট হইবে। ছায়াস্থিত বস্তু দৃষ্টিপথের সকল স্থান হইতে যেরূপ দৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তদ্রূপই দৃষ্ট হইবে।

সূর্য্যগ্রহণের দর্শনকাল অন্যরূপ। সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্য্যকে অন্তরাল করিয়া অর্থাৎ ঢাকা দিয়া রাখে। সূর্য্য ও চন্দ্রের সমসূত্রে সূর্য্য

হইতে চন্দ্রের অন্তরালে আকাশ-মণ্ডলে যে শূন্য স্থান থাকে, তথায় যখন যে দর্শনকারী উপস্থিত হয়, সে তখন তথা হইতে সূর্য্যগ্রহণ দেখিতে পায়।

চন্দ্র (পৃথিবীর দৃশ্যতঃ) পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীকে বেষ্টন করে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি বশতঃ চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সকল বস্তুকেই আমরা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখি। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট দিন আমরা চন্দ্রকে আকাশের যে স্থানে অবস্থিত দেখি, তৎপরবর্ত্তী দিন তথা হইতে কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাই। এইরূপ প্রায় এক মাস কাল আকাশের দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা এইরূপ দেখি যে, চন্দ্র দিন দিন কিছু কিছু করিয়া পূর্ব্ব দিকে সরিয়া সরিয়া প্রায় এক মাসে আকাশ-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় পূর্ব্ব স্থানে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে যেদিন চন্দ্র সূর্য্যকে ঢাকা দিয়া অর্থাৎ পৃথিবীস্থ লোকের দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া চলিয়া যায় তখন পৃথিবীস্থ প্রত্যেক পশ্চিমস্থানবর্ত্তী দর্শক পূর্ব্বস্থানবর্ত্তী দর্শকের পূর্ব্বেই উহা দেখিতে পায়। ইহাকে আমরা সূর্য্যগ্রহণ বলি।

মনে করুন, ভূমি হইতে ৪০ হাত উর্দ্ধে বৃক্ষশাখায় একটি ফল আছে। আবার ঠিক তাহার ১০ হাত নীচে অর্থাৎ তাহারই নীচে অথচ ভূমি হইতে ৩০ হাত উপরে আর একটি ফল রহিয়াছে। উভয় ফলের ঠিক নীচে ভূমিতে একটি লোক দাঁড়াইয়া উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে, উভয় ফলই তাহার সহিত এক সমসূত্রে আছে। তাহার ৫ হাত পূর্ব্বে থাকিয়া আর একটি লোক উর্দ্ধ দিকে চাহিলে দেখিবে, নীচের ফলটি উপরের ফলটি হইতে কিছু পশ্চিমে রহিয়াছে। ঐ নীচের ফলটি আর একটু পূর্ব্বে সরিলে সমসূত্রে আসিতে পারিবে। উভয় ফলের ঠিক নীচ হইতে ৫ হাত পশ্চিমে থাকিয়া অন্য একটি লোক উর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিবে, তাহার এবং উপরের ফলের সমসূত্র হইতে নীচের ফলটি কিছু পূর্ব্বে আছে। এখন, যদি কল্পনা করা যায় যে নীচের ফলটি আমাদের চন্দ্রের মত পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে সরিতেছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, পশ্চিম প্রান্তস্থ লোকটি সর্ব্ব প্রথমেই উভয় ফলকে সমসূত্রবর্ত্তী হইতে অর্থাৎ উপরের ফলটি নীচের ফলের অন্তরালে যাইতে দেখিয়াছিল। তার পর মধ্যস্থানের লোকটি এই অবস্থা অবলোকন করিয়াছিল এবং পূর্ব্ব দিকস্থ লোকটি সর্ব্ব শেষেই এই অবস্থা দৃষ্টিগোচর করিল। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, সূর্য্যগ্রহণ পৃথিবীস্থ প্রত্যেক স্থান হইতে তাহার পূর্ব্ব দিকস্থ স্থানে পরবর্ত্তী সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব বোম্বাইতে যখন দেখা যাইবে যে, চন্দ্র সূর্য্যকে ঢাকিতেছে, অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, তৎপূর্ব্বস্থানবর্ত্তী কলিকাতা হইতে তাহার কিছু পরে গ্রহণ আরম্ভ হইবে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মদেশ হইতে আরও পরে এই অবস্থা দৃষ্ট হইবে।

বোম্বাইয়ে যখন সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইবে, তখন কলিকাতার স্থানীয় টাইম বোম্বাইর স্থানীয় টাইম অপেক্ষা এক ঘণ্টা দুই মিনিট এক সেকেণ্ড বেশী হইবে; কিন্তু তখন কলিকাতায় গ্রহণ দৃষ্ট হইবে না। ইহার ১৯ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড পরে কলিকাতায় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইবে। তখন কলিকাতার লোকেল টাইম বোম্বাইর লোকেল টাইম অপেক্ষা এক ঘণ্টা ২১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড বেশী হইবে।

আগামী ৫ই ভাদ্র বোম্বাইতে ষ্টেণ্ডার্ড ৮টা ৫০ মিনিটে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইবে। তখন তথাকার স্থানীয় টাইম ৮টা ১১ মিনিট ২০ সেকেণ্ড হইবে এবং কলিকাতার স্থানীয় টাইম ৯টা ১৩ মিনিট ২১ সেকেণ্ড হইবে। ইহার ১৯ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড পরে ষ্টেণ্ডার্ড ৯টা ৯ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড এবং স্থানীয় ৯টা ৩৩ মিনিট ২ সেকেণ্ডএ কলিকাতায় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইবে। তখন বোম্বাইর লোকেল টাইম হইবে ৮টা ৩১ মিনিট ১ সেকেণ্ড।

এবার ৫ই ভাদ্র তারিখে যে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহা কঙ্কণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্য্যগ্রহণ। ইহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। এরূপ গ্রহণ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে ইতঃপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। ভবিষ্যতে আর ঘটিবার সম্ভাবনাও খুব কম অথবা নাই।

বলয়গ্রাস বা সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ কালে যে সমস্ত স্থান হইতে বা যে দেশ হইতে গ্রহণ দৃষ্ট হয়, তথাকার সকল স্থান হইতে বলয়গ্রাস বা সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয় না। সেই দেশের নির্দ্দিষ্ট কতক স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে আংশিক গ্রহণই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যখন আমাদের দৃষ্টিতে চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যকে ঢাকে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে যখন আমরা সূর্য্যকে চন্দ্র দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইতে দেখি, তখন সর্ব্বগ্রাস অথবা পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ ঘটিয়াছে বলিয়া থাকি। আর যখন চন্দ্র স্বীয় গতিপথে চলিতে চলিতে এমন অবস্থায় আসে যে, গোলাকার চন্দ্র গোলাকার সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে না পারায় সূর্য্যের পরিধি বা গোলাকার প্রান্তভাগ বলয়ের মত দৃষ্ট হয়; তখন আমরা ইহাকে কঙ্কণ গ্রহণ অথবা বলয় গ্রহণ বলিয়া থাকি।

এখন প্রশ্ন এই যে, সূর্য্যগ্রহণ সম্পূর্ণ গ্রাস ও বলয় গ্রাস এই দুইয়ের মধ্যে এক অবস্থা আমরা দেখিব, উভয় অবস্থা দেখিব কিরূপে? চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর এক সমসূত্রে আসিলে, হয় চন্দ্র সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিতে পারিবে এবং তাহাতে পূর্ণ গ্রহণ হইবে; না হয় সূর্য্য চন্দ্র কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ আবৃত হইতে পারিবে না, বলয় গ্রহণ দৃষ্ট হইবে।

ইহার উত্তর এই যে পৃথিবী হইতে সূর্য্য সর্ব্বদা সমান দূরে থাকে না। আবার চন্দ্রও পৃথিবী হইতে সর্ব্বদা সমান দূরে থাকে না; অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষ সম্পূর্ণ গোল নহে, চন্দ্রের কক্ষও সম্পূর্ণ গোল নহে; উভয়ই ঈষদ্ ডিম্বাকৃতি। এই জন্য কখন কখন সূর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে দেখি এবং কখন কখন সূর্য্যের গর্ভে চন্দ্রকে অবস্থান করিতে দেখি। শেষোক্ত অবস্থানই বলয় গ্রহণ।

আমি যদি আমার চক্ষু হইতে এক হাত দূরে একটি ছোট থালা রাখি এবং দুই হাত দূরে একই সমসূত্রে অপেক্ষাকৃত বড় আর একখানা থালা রাখি তবে আমি প্রথমতঃ এই দুই অবস্থার এক অবস্থাই দেখিব। যদি দেখি প্রথম থালাখানা দ্বিতীয় থালাখানাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তবে একই সমসূত্রে রাখিয়া প্রথম থালা আরও দূরবর্ত্তী করিলে অথবা দ্বিতীয় থালাকে আরও নিকটবর্ত্তী করিলে, কিংবা প্রথম থালাকে দূরে সরাইয়া দ্বিতীয় থালাকে নিকটে আনিলে, অর্থাৎ এই উভয় কাজ একই সঙ্গে

করিলে, দ্বিতীয় থালার দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ বলয়ের মত অবস্থা দেখিতে পাইব।

বর্তমান বৎসরে যে বলয় গ্রাস সূর্য্য গ্রহণ দৃষ্ট হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক। ভারতের ভাগ্যে এই গ্রহণ দৃষ্ট হইবে। 'ভারতবর্ষে'র পাঠকবর্গ অথবা ভারতবর্ষের দর্শকবর্গ এই বলয় গ্রহণ দর্শনের জন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে আর এক বাধা বর্ত্তমান আছে যাহার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; যে বাধা প্রত্যেক বারের বলয় গ্রহণেই হইয়া থাকে। এই জন্তই পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখিতেছি যে ভারতের সকল স্থান হইতে এই গ্রহণ বলয়রূপে দৃষ্ট হইবে না। সুতরাং সকলের ভাগ্যে ইহার দর্শন ঘটিবে না।

এইরূপ একটি গ্রহণ কদাপি সকল স্থান হইতে একরূপ দৃষ্ট হয় না। নির্দ্দিষ্ট কতক স্থান ব্যতীত অন্তান্ত স্থানে আংশিক গ্রহণ দৃষ্ট হইবে। রেঙ্গুন, খুলনা, নদীয়া, পাটনা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এই গ্রহণ বলয়রূপে দৃষ্ট হইবে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে এই সকল স্থানের উপর দিয়া একটা (ঈষদ্ গোল) সরল রেখা টানিলে কঙ্কণ গ্রহণ দর্শনের স্থানগুলির কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। উহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে। তদ্ব্যতীত অন্তান্ত স্থানে কঙ্কণ গ্রহণ দৃষ্ট হইবে না। ইহাতে হয়ত পাঠকবর্গ নিরুৎসাহ হইলেন; কিন্তু ইহাতে আরও আনন্দ আছে। জানিবার, শিখিবার ও আনন্দ উপভোগ করিবার আরও বহু কথা আছে। জ্যোতিস শাস্ত্রের বা আকাশ তত্ত্বের প্রত্যেক কথা, গ্রহনক্ষত্রাদির সকল অবস্থা বা অবস্থানই প্রীতিপদ। তবে আমরা সর্ব্বদা যাহা দেখি না, তাহাই আমাদের কাছে অধিক আনন্দদায়ক। কঙ্কণ গ্রহণ দর্শন স্থান ব্যতীত অন্তান্ত স্থানের দর্শকবর্গেরও জ্ঞাতব্য ও আনন্দদায়ক দর্শনীয় বিষয় আছে। অবশ্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সে সমস্তই অবগত আছেন। কোন কোন স্থানে শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রের মত সূর্য্যের আকৃতি দৃষ্ট হইবে। তবে সূর্য্যের পরিধি বা চাপ শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রাপেক্ষা আরও অধিক বর্দ্ধিত দৃষ্ট হইবে।

কঙ্কণ গ্রহণ দর্শনের স্থানসমূহ দুইটী সমান্তরাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত করিলে ঐ রেখাদ্বয় অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার সঙ্গে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থান করে। ঐ সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের প্রশস্ততা প্রায় ৪৮ মাইল মাত্র। কিন্তু উত্তর দক্ষিণে যে কোন দ্রাঘিমার ৬০ মাইল স্থান ঐ সরল রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক দ্রাঘিমার প্রায় ৬০ মাইল স্থান হইতে বলয় গ্রাস দৃষ্ট হইবে। কিন্তু দ্রাঘিমার সঙ্গে তির্য্যগ-ভাবে সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের লম্বস্বরূপ মাত্র ৪৮ মাইল স্থানের মধ্যে কঙ্কণ গ্রহণ দৃষ্ট হইবে। ঐ সমান্তরাল রেখাদ্বয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রেঙ্গুনের দিকে প্রসারিত হইবে।

শ্রীহট্ট জেলায় কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে না। শ্রীহট্টের পশ্চিম দিকস্থ পাটনাতে কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে। পাটনার পশ্চিমস্থ পুণাতে কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে না। কলিকাতা হইতে কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে না। কিন্তু তাহার প্রায় ২৫ মাইল উত্তরস্থ স্থান হইতে এবং উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রায় ২০ মাইল দূরস্থিত স্থান হইতে কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে।

শ্রীহট্ট উক্ত সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত স্থান হইতে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রায় ২০০ মাইল দূরে থাকিবে। শ্রীহট্ট হইতে ঠিক দক্ষিণ দিকে ২৬০ মাইল দূর হইতে কঙ্কণ দৃষ্ট হইবে।

শ্রীহট্ট হইতে সূর্য্যকে প্রায় শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রের মত স্বল্প-পরিসর দৃষ্ট হইবে। শুক্লা তৃতীয়াতে চন্দ্রের পরিধির কিঞ্চিদূন অর্দ্ধেক দৃষ্ট হয়। কিন্তু সূর্য্যের পরিধির কিঞ্চিদূন প্রায় সমস্তই দৃষ্ট হইবে। শ্রীহট্ট হইতে আমরা সূর্য্যকে প্রায় হাসুলির মত দেখিতে পাইব। বলয় গ্রহণে সূর্য্যের যে কোন বিপরীত প্রান্তদ্বয়ের পরিসরের পার্থক্য দৃষ্ট হইলে, তাহাকে আমরা বলয়প্রায় বা সদৃশবলয় বলিব। এবং ঐ পার্থক্য যত কম হইবে ততই প্রকৃত বলয়ের স্বরূপ হইবে। সৌর বলয়ের সকল দিক সমান পরিসর বিশিষ্ট দৃষ্ট হইলে তাহাই পূর্ণ বলয়। আর ঐ বলয়ের এক দিক খোলা থাকিলে তাহাকে আমরা হাসুলি গ্রহণ বলিতে পারি। ইহা আংশিক গ্রহণেরই একটা অবস্থান্তর। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহার আরও ভাল একটা নাম রাখিতে পারেন।

সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের ঠিক মধ্য দিয়া আর একটি সমান্তরাল রেখা টানিলে ঐ রেখার সংলগ্ন স্থান সমূহেই পূর্ণ বলয় দৃষ্ট হইবে। এবং সেই দুই রেখার নিকটস্থ মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে বলয়প্রায় দৃষ্ট হইবে। ঐ রেখা দ্বয়ের বহির্ভাগে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে হাসুলির মত দৃষ্ট হইবে। আমরা গ্রহণ মধ্যকালে সূর্য্যের উত্তর ধারটা দেখিব, দক্ষিণ ধার অদৃশ্য বা খোলা দেখিব; যেহেতু আমরা কঙ্কণ গ্রহণ দর্শন স্থানের উত্তরে আছি। আর কঙ্কণ গ্রহণ দর্শন স্থানের দক্ষিণে থাকায় পুণাবাসীরা গ্রহণ মধ্যকালে সূর্য্যের দক্ষিণ প্রান্তটা গ্রহণাবশিষ্ট দেখিবে। শ্রীহট্ট অপেক্ষা শিলংবাসীরা সূর্য্যের উত্তরাংশ বেশী দেখিবে এবং গৌহাটীবাসীরা আরও বেশী দেখিবে।

কলিকাতা হইতে সম্পূর্ণ কঙ্কণ দৃষ্ট না হইলেও সূর্য্যের দক্ষিণাংশ পুণা অপেক্ষা অনেক কম গ্রাসাবশিষ্ট দৃষ্ট হইবে এবং উত্তর প্রান্ত কিছু বেশী গ্রস্ত দেখিবে, সামান্ত মাত্র অদৃশ্য দেখিবে।

শ্রীহট্টবাসীরা সূর্য্যের উত্তরাংশে যতটুকু গ্রাসাবশিষ্ট দেখিবে কলিকাতা-বাসী তদপেক্ষা অনেক কম দক্ষিণাংশেই গ্রাসাবশিষ্ট দেখিবে। সে দিন যদি আকাশ মেঘমুক্ত থাকে তবে সকলের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। আর যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে সে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিবে। কিন্তু মধ্যাহ্নে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল রজনীর অন্ধকারের মত অন্ধকার অনুভূত হইবে। এ সময় বর্ষা শেষ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়া ও ভূতলের বিভিন্ন স্থানে বারিপাত হওয়া অসম্ভব নয়। যদি তাহাই হয় তবে নির্ম্মল আকাশের সেই অপূর্ব্ব শোভা জ্যোতির্ব্বিদ্ মণ্ডলে আনন্দ দান করিতে পারিবে না। আমরা কামনা করি যেন সে দিন নভোমণ্ডল মেঘমুক্ত থাকিয়া জ্যোতির্ব্বিদমণ্ডলীর এবং প্রায় অর্দ্ধ ভূমণ্ডলের দর্শকমণ্ডলীর নয়ন এবং মনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে।

অন্ধকারে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

রাত্রি দুইটার ট্রেণে নেমে মেঠো এষ্টেশনে
তখনি ছাড়িয়া দিনু গাড়ী,
ঘণ্টায় একটি ক্রোশ চলে যদি দুটি মোষ,
সকালেই বাড়ী যেতে পারি।

ঠায় পায় চলে তারা পাচনির নেই তাড়া,
সারা পথ চালক ঘুমায়,
আমি শুধু রাত্রি সারা বসিয়া রহিনু খাড়া,
এ নিশীথ ভুলাল আমায়।

সারা পথ অন্ধকার, ক্ষীণ আলো তারকার
মাঝে মাঝে তাহাই সম্বল
চারিদিকে সবই চুপ, প্রকৃতির কালোরূপ
এ কান্তারে করিল বিহ্বল।

চারিদিকে থম থম, গাছে হয় প্রেতভ্রম,
তবু ভয়ে অঙ্গ না শিহরে।
পাইয়া মাঠের' পরে রজনীরে, এ অন্তরে
ক্ষণে ক্ষণে পুলক সঞ্চরে।

ঠেলি ঘন আঁধিয়ারে বাতাস ছুটিতে নারে,
ঝিরি ঝিরি বহে সে মন্থর,
আউচ ফুটেছে কোথা দিয়ে যায় সে বারতা,
ধীরে ধীরে সন্তরে প্রান্তর।

কভু ওঠে কভু নামে কভু বা ঘুমন্ত গ্রামে
নীরবে প্রবেশে মোর রথ,
"ধীরে, ক'রনাক শব্দ" ইঙ্গিত শাসিছে স্তব্ধ
ঘন ধূলিভরা গ্রাম পথ।

তেঁতুল গাছের কোলে বেদিয়া বাদুড় ঝোলে,
তারা যেন আঁধারেরি ছানা,
চাহিবারে উর্দ্ধপানে তারা মোর দৃষ্টিটানে
ভয় তারে করেনাক মানা।

পশ্চাতে প্রান্তর ফেলি নিবিড় তিমির ঠেলি
বনপথে গাড়ী যবে ঢোকে,
নিরুপায় মনে হয় অতল রহস্যময়
পাতালে চলেছি নাগলোকে।

বন ফুলবাস ধূপে সুরভি, নিশ্বাসরূপে
টেনে লই যেন অন্ধকারে,
শুনি, কবে চেঁচামেচি বটগাছে পেঁচা-পেঁচী
থামাইতে ঝিল্লীর ঝঙ্কার।

চন্দ্রালোকহীন নভঃ চন্দ্রাতপ তলে নব-
পরিচয় তমস্বিনী সনে,
যেথা দিগ্‌দিগন্তরে একেশ্বরী রাজ্য করে,
সে চিত্রটি রয়ে গেছে মনে।

এমন মাধুরীময় আঁধার যে কভু হয়,
স্বপনেও পাইনি সন্ধান,
হেন রূপ তমসার কখনো হেরিনি আর,
পূর্ণিমাও তার কাছে ম্লান।

মিথ্যা কথা বলিব না, ছিল মধু আশ্বাসনা
প্রান্তরের সে তিমির তলে,
সে যে সুপ্রভাতখানি গৃহাঙ্গনে দিবে আনি
একখানি বদন-কমলে।

ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

বৈশাখী পূর্ণিমা যেমন বৌদ্ধদিগের এক পরম পবিত্র তিথি, কারণ, এই তিথিতে ভগবান গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, সেই তিথিতে ষট্ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনার পর সিদ্ধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর মগধ, বৈশালি, কাশী, কোশল প্রভৃতি দেশে তাঁর ধর্ম্মপ্রচার করিবার পর সেই পূর্ণিমা তিথিতেই আশি বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, সেইরূপ আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতেও, তিনি তাঁহার ধর্ম্ম বারাণসীর উপকণ্ঠে অবস্থিত মৃগদাব বা সারনাথ নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। সেই কারণে বৈশাখের পূর্ণিমার ন্যায় আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিও, তাঁহাদের নিকট সমান পবিত্র। তজ্জন্য হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা আড়াই হাজার বৎসরের সেই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে এই তিথিতে তাঁহারা অর্পণ করিয়া থাকেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে সত্য তিনি উরুবিল্বে বোধিদ্রুমমূলে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা গম্ভীর এবং অপ্রমেয়। সেই কারণ, লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে কি না, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান হইয়া পড়েন। বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে বর্ণিত আছে, সেই সময়ে ভগবান ব্রহ্ম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, জগতের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য, তাঁহার ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। তদনন্তর ভগবান বুদ্ধ তাঁহার ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সমুৎসুক হন। তিনি ভাবিলেন যিনি শুদ্ধসত্ত্ব, পবিত্রস্বভাব, যাঁহার রাগ, দ্বেষ, মোহ মন্দীভূত হইয়াছে, সেইরূপ লোকের কাছেই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। সেই কারণে তিনি তাঁহার অন্যতর পূর্ব্ব-শিক্ষক রামপুত্র রুদ্রককে স্মরণ করিলেন। পরক্ষণেই তিনি বুঝিতে পারিলেন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রামপুত্র রুদ্রক দেহত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি আরাড়কালামের কথা মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে আরাড়কালাম তিন দিন হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন পাঁচজন সহধর্ম্মানুষ্ঠায়ীর কথা স্মরণ করিলেন,—তাঁহাদের নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্র, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ। ইঁহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ইঁহারা ভদ্রবর্গীয় পঞ্চক নামে অভিহিত হইতেন। যখন গৌতম শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের অসারতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, উহার দ্বারা যে কোনরূপ সত্য লাভ হয় না, উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন ও সেই সঙ্গে সুজাতা প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আহারবিহার করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট বিবেচনা করিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমন করেন। গৌতম ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বারাণসীর উপকণ্ঠে মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সর্ব্বপ্রথম ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত বুদ্ধত্ব লাভের সপ্তম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন।

অনতিবিলম্বে তথাগত বারাণসীর মৃগদাব নামক ঋষিপত্তনে উপস্থিত হন। পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, গৌতম নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তপস্যা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সবিশেষ অভ্যর্থনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা নিজ নিজ আসনে বসিয়া থাকিব। তিনি নিজেই একখানি আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিবেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিজ নিজ আসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিলেন। বিবিধ ধর্ম্মালাপাদির পর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে গৌতম, আপনার দেহকান্তি সুবিমল হইয়াছে, আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, আপনি কি কোন অলৌকিক ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন? তথাগত

উত্তর করিলেন—"আমি অমৃত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী পথ আমার নয়নগোচর হইয়াছে, আমি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছি, আমি সর্ব্বদর্শী ও নিষ্পাপ হইয়াছি, আমার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, আমি সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন—"ভগবন্, দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করুন।" সেই সময় স্বর্গ হইতে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হে ভগবন্, এই বারাণসীতে আসীন হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করুন।" তখন তিনি রাত্রির প্রথম যামে ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিলেন, মধ্যম যাম নানা প্রকার ধর্ম্মালাপে অতিবাহিত করিলেন এবং শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন— "প্রব্রজিতদিগের উভয় অন্ত পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহারা প্রায়ই, হয় কেহ কাম সুখভোগে আসক্ত থাকেন, তাঁহারা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় নিরোধের প্রয়াস পান না, বা কোন প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, আর এক শ্রেণীর লোক নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন ও নিজেকে নিগৃহীত করেন। এই উভয় পন্থাই হীন, গ্রাম্য, নিষ্ফল ও অনার্য্যজনোচিত। উভয় অন্ত পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথই অবলম্বন করা উচিত। এই মধ্যপথই তথাগত সাধন-বলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি প্রকৃত জ্ঞান, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। তাঁহার পর তিনি চারি আর্য্য সত্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। জগৎ দুঃখময়, দুঃখ কাহাকে বলে, সেই দুঃখ কিরূপে কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ও সেই সঙ্গে দুঃখ নিবৃত্তির সার্থকথা ও কি প্রকারে মানব দুঃখের কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বুঝাইলেন যে জগৎ দুঃখময়, জাতি (শরীর পরিগ্রহ) দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, যাহা ইচ্ছা করা যায়, প্রাপ্ত না হইলেই দুঃখ, সংক্ষেপতঃ পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ইহাই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহা অনিত্য ও দুঃখপদবাচ্য। এই দুঃখের উৎপত্তি, পুনর্জন্মের হেতু যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। এই তৃষ্ণা তিন প্রকার— কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা। ইন্দ্রিয় সুখস্পৃহাকে কামতৃষ্ণা বলে। জন্মের জন্য যে তৃষ্ণা তাহাকে ভবতৃষ্ণা ও ধনের নিমিত্ত তৃষ্ণাকে বিভবতৃষ্ণা বলে। বর্ষাকালে মেঘের বর্ষণে বীরল-তৃণ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তৃষ্ণা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ও জীবকে অভিভূত করিয়া থাকে। তিনি আরো দেখাইলেন যে দেহীর পক্ষে সুখ অতি স্নিগ্ধকর বলিয়া বোধ হয়, সে সর্ব্ববস্তুতেই সুখ

বুদ্ধদেব

অন্বেষণ করে। এই প্রকারের মনুষ্যেরা সুখস্রোতে নিমগ্ন হয় ও সুখান্বেষী হইয়া বারংবার জন্ম জরা ভোগ করিয়া থাকে। এই তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই লোকের রাগ, দ্বেষ, মোহ দূরে যায় ও জন্মজরা ব্যাধি মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিমুক্ত-চিত্ত হইয়া সংসারের পরপারে গমন করিতে পারে। গৌতম বুদ্ধ কর্ত্তৃক সারনাথে প্রদত্ত প্রথম উপদেশ বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহাকে দুঃখবাদও বলা যায়। দুঃখের অস্তিত্ব ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে এত উজ্জ্বল ও এতাদৃশ হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশ তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই প্রদান করেন নাই। ইহার পর তিনি অষ্টাঙ্গমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন।

সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গমার্গ বা মজ্ঝিমা পটিপদা বা কল্যাণ ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে; ইহাই নির্ব্বাণলাভের শ্রেষ্ঠ পথ। অনিত্য দুঃখ ও অনাত্মের জ্ঞানকেই সম্যক্ দৃষ্টি বলে. ইহাই নির্ব্বাণলাভের প্রথম সোপান। প্রত্যেক যৌগিক পদার্থ যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে বা উৎপন্ন হইবে, সকলেই ক্ষয়শীল। যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিলয় আছে, সেই কারণেই এই সংসারে প্রত্যেক বস্তুই অনিত্য দুঃখ উৎপাদক ও অনাত্ম। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি বা চিন্তা করিতেছি, সকলেই অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। এমন কোন পদার্থ নাই, কি কামলোক, কি রূপলোক, কি অরূপলোক—সকল স্থানেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা বাল্যে যাহা ছিলাম যৌবনে তাহা নাই এবং যৌবনে যাহা ছিলাম বার্দ্ধক্যে তাহা নাই. এমন কি, প্রাতে যাহা ছিলাম বৈকালে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দীপশিখার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—রাত্রির প্রথম যামে যে দীপশিখা জ্বলিতেছে, দ্বিতীয় যামে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং তৃতীয় যামে যাহা জ্বলিতেছে দ্বিতীয় হইতে তাহা স্বতন্ত্র। তবে যে আমরা এই দীপশিখা দেখিতেছি, তাহা একটী ধারামাত্র। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থ ই Molecule বলুন, Atom বলুন, এমন কি যাহা কল্পনারও অতীত, যাহাকে Electron বলে, তাহা অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, সেই কারণেই অনিত্য। যতদিন জীব বা পুদ্গল জন্ম-মৃত্যুর অধীন থাকিবে, ততদিন দুঃখ অপরিহার্য্য। এই দুঃখের মূল কারণ হইতেছে কাম বা তৃষ্ণা। গৌতম বুদ্ধ ইহাকেই দেহরূপ গৃহকারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাম বা আসক্তির নিবৃত্তি হইলে দুঃখের নিবৃত্তি, ইহারই নাম বিরাগ বা তৃষ্ণাক্ষয়, ইহারই নামান্তর নির্ব্বাণ বা মুক্তি।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ অনিত্য, দ্বিতীয় লক্ষণ দুঃখ, তৃতীয় লক্ষণ অনাত্ম। ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তাসমূহের মধ্যে পরস্পর অতি বিরুদ্ধ দুইটী মত দেখা যায়। এক মত বলে আত্মা আছে, অন্য মত বলে আত্মা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে প্রভেদ এই স্থানে। বেদপন্থী বা আত্মবাদীদিগের মূল কথা হইল আত্মার নিত্যতা. বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; ভগবান বুদ্ধ তন্ন তন্ন ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইয়াছেন জগতের কোন বস্তু আমার নহে; কোন বস্তুই আমি নহি, বা কোন বস্তু আমার আত্মা বা সত্ত্বা নহে। ন এতং অস্মিং; ন এসহি অহমং অস্মিতি, ন মে এষ অত্তাতি।

এই অনাত্মবাদকেই কোন কোন ইংরাজ দার্শনিক লেখক The flower of Indian thought বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌতম বৌদ্ধ আত্মার লেশমাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কোন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জীব বা পুদ্গল দুঃখ কষ্টের ভাগী হইবে। মোট কথা, আমরা আত্মা বলিয়া যাহা বুঝি, তাহা অনিত্য ও দুঃখপদবাচ্য।

এই দুঃখবাদ ঠিক কোন্ সময়ে ভারতভূমে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা হইতে পারে যে, গৌতম বুদ্ধ এই দুঃখবাদকে যেরূপ উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, এরূপ আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। অনেকে বলিবেন, কেন, সাংখ্যকার ত পূর্ব্বেই এই দুঃখতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় সাংখ্য-দর্শনেরও আরম্ভ দুঃখবাদে। সাংখ্যকারও বলিয়াছেন, জগতে জীবকে ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত সহিতে হয়। সেই দুঃখত্রয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ—রোগাদির জন্য শারীরিক দুঃখ, এবং কামক্রোধাদির জন্য মানসিক দুঃখ। মনুষ্য, পশু, বা স্থাবরজনিত দুঃখের নাম আধিভৌতিক দুঃখ। আর যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতির আক্রমণে যে দুঃখ হয় তাহার নাম আধিদৈবিক। যত দিন শরীর

তত দিন দুঃখের অভিঘাত। অথচ দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে,—হেয়। অর্থাৎ আমরা দুঃখ চাহি না; দুঃখের হানি চাহি। সাংখ্য মত বুদ্ধের পূর্ব্বে না পরে, সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কারণ, উহা ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয়। তবে গৌতম বুদ্ধই দুঃখপদার্থকে সাধনার দ্বারা নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং দুঃখ কাহাকে বলে তাহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় জগৎ সমক্ষে প্রচার করেন। তাহার মজ্ঝিমা পটিপদা বা মধ্যপথ জীবের সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায়। এমন সহজ ও সরল মুক্তির পথ অতি বিরল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গৌতম বুদ্ধ আত্মার নিত্যত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে পুদ্গল বা জীব কেবলমাত্র স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র, তাহা হইলে স্কন্ধের বিনাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে? কেই বা নির্ব্বাণ লাভ করে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে স্কন্ধরূপ অনিত্য বস্তু যখন দূরে যায়, তখন একমাত্র নিত্য বস্তু যে নির্ব্বাণ তাহাই বিদ্যমান থাকে। কারণ নির্ব্বাণ নিত্য, শাশ্বত অনিমিত্ত, বিমক্ষ। উহা Annihilation বা negation নহে। ইহাকে নির্ব্বাণই বলুন আর শূন্যই বলুন ইহা মানব-চিন্তার সর্ব্বোচ্চ সোপান। দার্শনিক চিন্তা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক প্রকার ধ্যান-ধারণার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে শূন্যতার ধ্যানই সাধনমার্গের উচ্চতম সোপান। এখানে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ নাই; সুখ নাই, দুঃখ নাই, অস্তি নাই, নাস্তি নাই ইহা অস্তিনাস্তির সমন্বয়, এখানে উৎপত্তি নাই বিনাশ নাই,—ইহা উৎপত্তি-বিনাশের মিলন স্থান। এখানে নিত্যত্ব বা ক্ষণিকত্ব এই সকল আপাত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, পরস্পরের বিরোধ ত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিত আছে। ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসতের মিলন নহে, বা সৎ ও অসতের অভাব নহে, ইহা বাক্য ও মনের অগোচর। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন - যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। এই কারণেই ঋষিগণ নেতি নেতি বলিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এই নেতি নেতি Negation Annihilation নহে। ইহা অস্তিনাস্তি, এবং ভাব ও অভাবের মিলন। এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—হে শুভতে এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা গম্ভীর অপ্রমেয় ও অক্ষয়।

ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো। মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ
সব্বত্থ বিমুত্ত মানসো ন পুনং জাতি জরা উপেহিসি।

"হে ভিক্ষু তোমার সম্মুখে, মধ্যে, যাহা কিছু আছে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর, এবং সর্ব্ব-প্রকারে বিমুক্ত-চিত্ত হইলে তোমাকে জন্মজরা ভোগ করিতে হইবে না।"

মতিলাল ঘোষ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালী জাতিকে যাঁহারা রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় যাঁহারা লোকমত গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মতিলাল ঘোষ মহাশয় অকুতোভয়ে সংবাদপত্রের সেবা করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বলে সর্ব্বপ্রকার অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় তাঁহার লেখনী সদাই উন্মুখ থাকিত। তাঁহার দেশাত্মবোধে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না।

যশোহর জেলায় যে গ্রামখানি এখন 'অমৃতবাজার' নামে পরিচিত, পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল 'পলুয়া মাগুরা'। মতিলালের জননীর নাম অমৃতময়ী। পরবর্ত্তীকালে 'পলুয়া মাগুরা' গ্রাম মতিলালের জননীর নামানুসারে 'অমৃতবাজার' নামে পরিচিত হয়। 'অমৃতবাজার

পত্রিকা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল ঘোষ মহাশয় বঙ্গীয় ১২৫৪ অব্দের ১২ই কার্ত্তিক তারিখে (ইংরেজী ১৮৪৭ সালের ২৬এ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন।

মতিলালের পিতামহ পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় তাঁহার সময়ে বিখ্যাত কুলীন ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। মতিলালের পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় যশোহর জেলা আদালতে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার আমলে বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসব, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ এবং অন্যান্য ক্রিয়া-কর্ম্ম হইত। হরিনারায়ণ আরবী ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

মতিলাল পিতার চতুর্থ পুত্র এবং ষষ্ঠ সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার তিনটি ভাই ও দুইটি ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মতিলালের একটি যমজ ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে এই ভগিনীর মৃত্যু হয়।

মতিলালের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার বিদ্যানুরাগী ছিলেন। চরিত্র-গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণের হৃদয়েও তিনিই বিদ্যানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।

বসন্তকুমারের কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার ও মতিলাল এই তিনজনে মিলিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তন করেন। হেমন্তকুমার শৈশবকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে অপর দুই ভ্রাতার সহিত সংবাদপত্র পরিচালন করিতেন।

শিশিরকুমার তাঁহার জীবনের প্রধান অংশ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে অতিবাহন করেন। মতিলাল এই বিষয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

মতিলালের পরেও চারিটি ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে হীরালাল, রামলাল, বিনোদীলাল ও গোলাপলাল। এই আট ভ্রাতাই পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সৌভ্রাত্রের এমন অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইঁহাদের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালন উপলক্ষে এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে সর্ব্বদা একত্র কার্য্য করিতে হওয়ায় শিশিরকুমার ও মতিলালের মধ্যে অপর সকল ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই কারণে এই দুই ভাইয়ের মধ্যে একের জীবনীর আলোচনা করিতে গেলেই অপরের প্রসঙ্গের আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ, এই দুই ভ্রাতা বহু কার্য্য একত্র সম্পাদন করেন এবং এই সকল কার্য্যে উভয়ের সমান অংশ ছিল। অপর ভ্রাতৃগণের মধ্যে গোলাপলাল প্রথম হইতেই অমৃতবাজারের কার্য্যাধ্যক্ষ এবং শেষ বয়সে পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শৈশবে মতিলাল অতি শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বালক ছিলেন। পাছে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহার কোন অন্যায় আচরণ দেখিয়া বিরক্ত হন, এই ভয়ে তিনি সদাই সশঙ্ক ও সঙ্কুচিত থাকিতেন। বড় ভাইদের তিনি সর্ব্বদাই আনুগত্য করিতেন—ইহাই তাঁহার শৈশব-চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। এই কারণেই তিনি চিরজীবন আপনাকে অন্তরালে রাখিয়া দেশের ও দশের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন - খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন, অথচ, খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ তাঁহার যথেষ্টই ছিল। তিনি ছিলেন কর্ম্মযোগী; দুঃস্থ দেশবাসীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, এবং এই ব্রত তিনি আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন।

যথারীতি গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মতিলাল কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে ইংরেজী শিখিবার জন্য গমন করেন। এই বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না, তথাপি, তিনি অত্যধিক পরিমাণে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। তৎকালে যান-বাহনের সুবিধা ছিল না। সেই হেতু বাড়ী হইতে কৃষ্ণনগরে যাইবার কালে তিনি বনগ্রাম হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ৫০ মাইল পথ অনায়াসে পদব্রজে অতিক্রম করিতেন। ছুটিতে এই ভাবে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। তিনি যখন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতেন, তখন—১৮৬০-৭০ সালে "বর্দ্ধমান জ্বরে" (অধুনা যাহা ম্যালেরিয়া নামে পরিচিত), হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলায় বহু লোক-ক্ষয় হয়—গৌড়, গদখালি, উলা,

কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, নৈহাটী প্রভৃতি সমৃদ্ধ জনবহুল গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে। মতিলাল স্বচক্ষে এই জ্বরে লোকক্ষয়ের দৃশ্য অবলোকন করিয়া তাঁহার "জীবন স্মৃতি"তে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর মতিলাল কলেজে প্রবেশ করেন। কিছুদিন জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে এবং কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে তিনি কলেজ বোর্ডিংএ থাকিতেন, এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে গান করিতেন। তাঁহার গলা বড় মিষ্ট ছিল, গানও তিনি সুন্দর রূপে করিতে পারিতেন। সেইজন্য তাঁহার গান স্থানীয় ভদ্রলোকদের বড় একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল।

মতিলাল এফ-এ পরীক্ষা দেন নাই। পরীক্ষা দেওয়া তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। এই পরীক্ষা-বিদ্বেষ তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল। তিনি বলিতেন, পরীক্ষা দিতে দিতে আমাদের দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের জীবন ক্ষয় হইয়া যায়। মতিলাল পরীক্ষার বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞানানুশীলনে বিরত ছিলেন না। তিনি কলেজে না পড়িয়াও, গৃহে বসিয়াই যে জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রগণের অপেক্ষা কম ছিল না।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মতিলালের পিতা হরিনারায়ণ বাবুর মৃত্যু হয়। তখন মতিলালের বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। এফ-এ পরীক্ষা না দিয়া মতিলাল এই বয়সে খুলনা জেলার পিলজঙ্গ গ্রামের একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মতিলাল মৃদু স্বভাবের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তাও তাঁহার বড় অল্প ছিল না। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাহস ছিলনা। তাঁহার মতের দৃঢ়তা ছিল। তিনি কখনও ক্রুদ্ধ হইতেন না; কিন্তু তাঁহার মতের বা আদেশের প্রতিবাদ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না।

পিলজঙ্গে মতিলাল বেশী দিন কাজ করিতে পারেন নাই। এখানে তাঁহার স্বভাবতঃ ক্ষীণ স্বাস্থ্য আরও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। এই সময় বরাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বসন্তকুমার "অমৃত প্রবাহিনী" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা-খানিকে "অমৃতবাজার পত্রিকা"র পূর্ব্বসূচনা বলা যাইতে পারে। "অমৃত প্রবাহিনী" বেশী দিন চলে নাই—বসন্তকুমারের অকাল-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার তাঁহাদের ইনকম ট্যাক্স ডেপুটী কলেক্টরের চাকুরী এবং মতিলাল তাঁহার হেড মাষ্টারী ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া ১৮৬৮ সাল হইতে "অমৃতবাজার পত্রিকা" নামে একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকা তখন তাঁহাদের গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইত। হেমন্তকুমার, মতিলাল, ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, যশোহর জেলা স্কুলের শিক্ষক জগদ্বন্ধু ভদ্র, মতিলালের ভগিনীপতি হাইকোর্টের উকীল কিশোরীলাল সরকার প্রভৃতি তখন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা ছাপিবার সাজ-সরঞ্জাম ছিল একটি কাঠের প্রেস এবং কিছু পুরাতন টাইপ। ঘোষ ভ্রাতারা মিলিয়া নিজেরাই 'কাপি' লিখিতেন, নিজেরাই কম্পোজ করিতেন, নিজেরাই কালি প্রস্তুত করিতেন, নিজেরাই কালি লাগাইতেন ও নিজেরাই ছাপিতেন। তাহার পর ছাপা কাগজ নিজেরাই প্যাক করিয়া ডাকে দিতেন। তখন উহার গ্রাহক সংখ্যা অনুমান পাঁচ শতের অধিক ছিল না।

অমৃতবাজার পত্রিকায় স্থানীয় রাজপুরুষগণের কার্য্যা-কার্য্যের সমালোচনা বাহির হইত। পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার অল্পকাল পরেই যশোহরের কোন ইয়োরোপীয়ান রাজকর্ম্মচারীর একটি অন্যায় অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা উহাতে প্রকাশিত হয়। সেই রাজ-পুরুষ ঘোষ-ভ্রাতৃগণের নামে মানহানির অভিযোগ করেন। বিচার ফলে রাজকর্ম্মচারীর দোষ সপ্রমাণ হয় এবং ঘোষ-ভ্রাতারা মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মোকদ্দমা চালাইতে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হন। তখন, গ্রামে থাকিয়া পত্রিকা পরিচালন করা নিরাপদ নহে দেখিয়া ঘোষ ভ্রাতারা সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঘোষ ভ্রাতারা কলিকাতায় আসেন।

কাগজখানি আবার বাহির করিবার ইচ্ছা, কিন্তু অর্থের একান্ত অসদ্ভাব। পিলজঙ্গের স্কুলে হেডমাষ্টারী করিয়া মতিলাল দুই শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দিলেন। আর এক শত টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইল। এই তিন শত টাকা সম্বল করিয়া কলিকাতা, বহুবাজার, হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি হইতে ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় দ্বৈভাষিক পত্র রূপে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হইল।

এখানেও কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর রাজপুরুষদের প্রীতিকর হইল না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভার্ণাকুলার প্রেশ এ্যাক্ট পাশ হইল। এই আইন পাশ হইবার পর আর এক দিনও বাঙ্গলা ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা বাহির করা চলে না। কিন্তু ঘোষ ভ্রাতৃগণ দমিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা এক রাত্রির মধ্যে কাগজখানিকে সম্পূর্ণ ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে অমৃতবাজার ইংরেজী সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। দুই বৎসর পরে হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৮৭ সালে বাগবাজার আনন্দ চাটুয্যের লেন হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আপিস ও ছাপাখানা এখনও ঐ স্থানেই অবস্থিত আছে।

শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় অমৃতবাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। অপর ভ্রাতারা, বিশেষ করিয়া মতিলাল পত্রিকা সম্পাদন-কার্য্যে শিশিরকুমারকে সাহায্য করিতেন। পঁচিশ বৎসর পত্রিকা সম্পাদন করিবার পর শিশিরকুমার অবসর গ্রহণ করিলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে মতিলাল পত্রিকার সম্পাদক হন।

মতিলাল এ যাবৎ অন্তরালে থাকিয়াই সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এবং সাধারণের কার্য্যে যোগদান করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ বৎসর তিনি পাবলিক সার্ব্বিস কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দান করেন। এই সাক্ষ্যের ফলে দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সরকারী বিধান ছিল এই যে, সরকারের কার্য্য-বিভাগগুলিতে উপযুক্ত দেশীয়গণকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে, কার্য্যতঃ কিন্তু এই নিয়ম প্রতিপালিত হইত না। সরকারী কার্য্যবিভাগগুলিতে ছোট বড় অধিকাংশ পদেই সাধারণতঃ ইয়োরোপীয়ানরা এবং তাঁহাদের পোষ্য ও আশ্রিতবর্গ চাকুরী পাইতেন। মতিলাল সরকারী ডাক-বিভাগের কাগজ-পত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ইয়োরোপীয়ান উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বজাতি-পোষণের কথা প্রকাশ করিয়া দেন। পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ব্রাডল এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ইহার ফল এই হয় যে, পোষ্ট আফিস বিভাগের তৎকালীন সর্ব্বময় কর্ত্তা স্যার এফ্, হগ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর হইতে এই বিভাগে বহু ভারতবাসী চাকুরী পাইয়া আসিতেছেন।

সহবাস-সম্মতি আইন উপলক্ষে দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। আইনের প্রতিবাদ কল্পে পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে একটি সভা হয়। আইনের প্রতিবাদের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। মতিলাল এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই আন্দোলন উপলক্ষেই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী হইতে অমৃতবাজার পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা রূপে বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

মতিলাল চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে অন্যতম নেতার কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পত্রিকার লেখক ও সম্পাদক রূপে অনেক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সভা-সমিতিতে বক্তৃতা বেশী করেন নাই। সাধারণ সভায় খুব কমই যাইতেন, যেখানে যেখানে যাইতেন, সেখানেও সকল সময় বক্তৃতা করিতেন না, প্রধানতঃ শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। তিনি বক্তৃতা খুব কম করিতেন, কথাও খুব কম কহিতেন, কিন্তু যখন এই স্বল্পভাষী লোকটি কোন সভায় বক্তৃতা করিতেন, তখন তিনি এমন যুক্তিপূর্ণ কথা বলিতেন যে, তাঁহার পর অপর কাহারও বলিবার আর বড় বেশী কিছু থাকিত না। তাঁহার সেই অল্প কথার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া যাইত। ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া লেখায় ও বক্তৃতায় এইরূপে তিনি বাঙ্গলায় লোকমত গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাধারণের প্রয়োজনীয় এবং রাজনীতিক বিষয়সমূহ

সম্বন্ধে তিনি এত সংবাদ রাখিতেন যে, কোন কথা পড়িলে সে সম্বন্ধে তিনি অতি সুযুক্তিপূর্ণ ও তথ্য-বহুল মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন। আর তাঁহার ব্যক্তিত্বও বিরাট ছিল। তাঁহার উপস্থিত-বুদ্ধিও অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার লেখনীও রস বর্ষণ করিত। অতি গুরুত্বপূর্ণ গম্ভীর বিষয়েও তিনি রসসঞ্চার করিতে পারিতেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও মন্তব্যের এই সরসতাই অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষত্ব; এবং গোড়া হইতে এ পর্য্যন্ত পত্রিকার এই বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ আছে।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ও মতিলাল সর্ব্বাগ্রগণ্য নেতৃমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। ১৯০৫-০৬ অব্দের এই আন্দোলনের সময় মতিলাল অভূতপূর্ব্ব অকুতোভয়তার পরিচয় দেন। তাঁহার সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকায় তখন অনল বর্ষিত হইতেছিল। আন্দোলনের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা প্রভৃতি ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্ব্বাসিত। নির্ব্বাসনের জন্য নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের তালিকায় মতিলালেরও নাম ছিল, মতিলাল তাহা জানিতেন। তথাপি তিনি আপনার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই—লেখনীও সংযত করেন নাই।

মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত ভক্তি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিলালকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। মতিলাল তাঁহার অবসর সময় বৈষ্ণব-ধর্ম্মালোচনা ও হরিনাম-কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের ন্যায় মতিলালও সুকণ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই যখন নাম-কীর্ত্তন করিতেন তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, তাঁহারা রস-সাগরে ডুবিয়া যাইতেন।

সন ১৩২৯ সালের ২৫এ ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বঙ্গের এই অদ্ভুত কর্ম্মী, স্বদেশসেবক সাংবাদিক ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব-প্রবর অমর-বাঞ্ছিত লোকে প্রস্থান করেন।

অতি-বোগাস্

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

(১)

প্রীতি আইন মানে না। অন্ধ-বিশ্বাস জোগায় তার পূজার সম্ভার। খেয়াল তার দেবতা। এ দেবতার রূপ উনপঞ্চাশ প্রকার। প্রীতি আমার জীবনাকাশে নবে থেকে পরেশকে ভাসিয়ে এনেছিল ধূমকেতুর মত, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অনুতাপ আমাকে কশাঘাত করেছে। লোকে প্রিয়জনের অঙ্গ-স্পর্শ ক'রে শপথ করে। আমি মাত্র দু'মাস পূর্ব্বে অতি-প্রিয় স্বদেশী চায়ের পেয়ালার উষ্ণ অঙ্গ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ-দেহে প্রাণ থাকৃতে তার মুখ-দর্শন কর্ব্বনা। কারণ, এই আসি ব'লে যে গিয়েছিল চলে, যাবার সময় আমার বিবাহে যৌতুক পাওয়া সোণার হাত-ঘড়িটা, সোণা-হেন-মুখে তার মণিবন্ধে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। এম-এ পাশ কর্ব্বার সুবিধার মধ্যে ছিল তো ঐটুকু—বিবাহে পাওয়া যৌতুক। তাও যদি খামখেয়ালী বন্ধুর দল একটা একটা ক'রে আত্মসাৎ করে তো জীবনের খতিয়ান খাতায় বাকী থাকবে তো বামে শূন্য। যাত্রার দলের নারদ মুনির মত বন্ধুর অকস্মাৎ তিরোধানের পর তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি সর্ব্বত্র। কিন্তু সে অনুসন্ধান চালের বস্তায় ছুঁচ-খোঁজা। দেশে পত্রাঘাত করে দেখেছি যেন হিমাচলের গায়ে কুঙ্কুম-বর্ষণ। নিস্পরোয়া, নির্ব্বিকার! সাড়া নাই, স্পন্দন নাই, চমক্ নাই!

ইডেন-উদ্যানের ফটকের বাহিরে আজ তার অপ্রত্যাশিত দর্শনে প্রথম ইচ্ছা হল ঘাড়টা মট্‌কাবার। কিন্তু তার মট্‌কানো ঘাড় জীবনে একটা অভাবের সৃষ্টি কর্ব্বে এই ভেবে টানাটানির সংসারে আর একটা অভাব বাড়ালাম না। একটু গোপনে গা-ঢেকে তার

অতি-মনোহর বাক্যালাপ উপভোগ কর্ত্তে লাগলাম। সে বাক্যালাপ করেছিল হনুমানওয়ালার সঙ্গে। অবশ্য সোলার হনুমান, গায়ে শোনের লোম।

পরেশ বল্লে—বাবা, এ তোমার অদ্ভুদ রামায়ণের হনুমান। বীরভদ্র যে কোনোদিন কুকুর-বাহন ছিল তা' তো বট্‌তলার রামায়ণে পড়িনি।

লোকটা বল্লে, বাবু, মুরুখ্যু লোক! পেটের দায়ে পুঁতুল গড়েছি। দোহাই ধর্ম্মাবতার ঘরে তিন তিনটে ছেলে মেয়ে। নারায়ণ জানেন আজ দুদিন ধরে তারা মুখে এক গরাস অর্ণ তোলেনি।

বল কি! সব শেয়ালের কি এক ডাক্। ছেলেদের ওটা মজ্জাগত সংস্কার! আমি ছেলেবেলায় ভাতের গন্ধ পেলে কাঁটাল গাছের উপরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম!

মর্কট-ব্যবসায়ী কোনো প্রকারে হাসি চেপে গলা কাঁপিয়ে বল্লে—বাবা! মুরুখ্যু মানুষ। আপনাদের সঙ্গে কি তরক্ক কর্ত্তে পারি? বল্‌তে লজ্জা করে বাবু, পরিবার গামছা পরে দিন কাটাচ্চে।

আহা হা! তোমার সোণার সংসার! সব রকমের আদর্শ-চরিত্রের! আমাদের গ্রামের নিধু ঠাকরুণ যাদুধর এক টুকরো ছেঁড়া সাট পরে দিনরাত পুকুরে ডুবে থাক্‌তো। ওকে বলে শুচি-বাই। ওর চিকিৎসা আছে।

এবার লোকটা হাসি চাপতে পারলে না। একটু সামলে নিয়ে বল্লে—বাবা, সব কথায় বিদ্রূপ কর্ল্লে কি কথা বলা যায়? সত্যি বাবু, সাহেবদের কাছে এক টাকা নিই। আপনি আট আনা দিন—একেবারে দেশী মাল—দেশী সোলা, দেশী শোন, হনুমানের মুখের রঙ্ দেশী—ভাতের হাঁড়ির তলা চেঁচে বার করা।

বহুৎ আচ্ছা! এবার ভাল প্যাচ্ মেরেছে। সাহেব-বাঙ্গালীর ভেদাভেদ-বটিকা, অনুপান স্বদেশী ক্বাথ। কিন্তু, দেখ মাষ্টার, কুকুর জানোয়ারটা অস্পৃশ্য। কে একজন রাজা কুকুর পুষে স্বর্গে যেতে পারেনি। আমার নিশ্চিত গন্তব্য পথের কাঁটার বেড়াটি তুমি রাখ। এই নগদ বাঁধা সিকিটি নাও। দেশী মদ, তাড়ি, স্বদেশী সবাক চিত্র যাতে খুসি এই নিকেল-খণ্ড ব্যয় ক'রে তুষ্টি লাভ ক'রো।

অম্লানবদনে লোকটা চার-আনা গ্রহণ কর্ল্লে। আমি আত্মপ্রকাশ করে বল্লাম—এমন সোণার সুযোগ হাতছাড়া কর্ল্লে কেন? তবু ঘরে একটা তোমার প্রতিমূর্ত্তি থাক্‌তো।

সে দুই বাহু প্রসারণ করে আমায় আলিঙ্গন কর্ল্লে। নিঃশব্দে হাতের সিগারেট্‌টা নিয়ে টান্‌তে লাগলো।

আমি বল্লাম—তোমার লজ্জা নাই? আমার বিবাহের ঘড়ি—

ওঃ! চলো, সেটা লোন অফিস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কুবের লোন-ভাণ্ডারে সেটা বাঁধা দিয়েছি।

লোন্ অফিসে! বাঁধা দিয়েছ? বল কি? এত খানি নীচ হয়েছ তুমি! পরেশ গাঙ্গুলী বি-এস্‌সি-জমিদারের ছেলে। বাঁধা দিয়েছ? লোন আফিসে?

তা, লোন আফিসে কি লোকে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী শিখতে যায়?

সত্য, তাকে উদার, নিষ্পাপ ব'লে জান্‌তাম। কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! হঠাৎ দু' মাসের মধ্যে পরেশ এমন চরিত্র-হীন হ'ল কিসের প্রলোভনে।

আমি বল্লাম—বন্ধুর বিবাহে পাওয়া ঘড়ি তুমি বন্ধক দিলে কি ব'লে? পুলিসে সংবাদ দিলে তোমার জেল হ'য়ে যায় জান?

আহা! এতখানি আইন শিখেও—সেই গাছতলা!

নির্লজ্জ! বেহায়া!

আর একটা সিগারেট আছে?

সিগারেট আছে? এই নাও—মুখাগ্নি কর। ধিক্!

হোঃ হোঃ! ধিক্। বারোয়ারী-তলায় যাত্রা শুনছ নাকি? সত্যি বহুদিন যাত্রা শুনিনি। যাত্রা হ'ল বাঙ্গালীর জাতীয় কাল্‌চার! যাত্রা, কীর্ত্তন, রসগোল্লা, মুড়ি! আর যাত্রা শুনবে কে? আজকাল সবাক্ চিত্র আমাদের অবাক্ করে রেখেছে।

বাঁধা দিয়েছ? অ্যাঁ বল কি? স্ত্রী কি বলবে? তার পিতার দেওয়া উপহার—

কি? স্ত্রী না ঘড়ি।

তোমার মাথা, মুণ্ডু, পিণ্ডি।

বোগাস্।

বোগাস্! কোণ-ঠেসা হলেই বলে বোগাস্।

যে বন্ধুর ঘড়ি কুবের ভাণ্ডারে বাঁধা দেয় সে বোগাস নয়?

মূর্খ! শোন! পরোপকার কলিকালে নিষিদ্ধ। তোমার বাড়ী থেকে বাসায় ফিরে বাবার তার পেলাম, বোনের অসুখ। তখনি বাড়ি যেতে হবে। তোমার ঘড়িটা বাধালে গণ্ডগোল। যদি নিজের কাছে রাখি ফস্ক চেয়ে বসবে। পীড়িত ভগ্নী—না বল্‌তে পার্ব্বো না। আর যদি টানার ভেতর রাখি, নফরা খানসামা নিশ্চয় চুরি করবে। বেটা বোগাস্! তৃতীয় বার বিবাহ করেছে। কল্‌কাতার বাসায় রাখ্‌লে শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানে --যাক্। কাজেই কি করি? পথে ছিল লোন অফিস্। দু টাকায় তিন মাসের সর্ত্তে বাঁধা দিয়েছি। ঘড়িও নিরাপদ রইল, আমিও নিশ্চিন্ত হ'লাম।

তার মুখের দিকে তাকালাম। সে রসিদ বার করলে। এর পর আর তর্ক চলে না। যুক্তির কোথাও ভুল নাই। তার পাগলামির মধ্যে ঐটাই ছিল সুলক্ষণ।

আউট্‌রাম ঘাটের জেটিতে বসে সে ব'ল্লে,—একটা উদ্দেশ্য না থাকলে জীবনটা হয়—কর্ণধারহীন নৌকার মত। একটা দায়িত্ব-জ্ঞান থাকা চাই।

তুমি অতি বোগাস্।

আজ্ঞে মাপ কর্ত্তে হ'য়েছে। আমি মোটেই বোগাস্ নই। জীবনকে অবশ্য এত দিন একটা খেলার পুতুল ভাবতাম, আজ কিন্তু জীবনের প্রতি আমার সে ভাব নাই। মানুষের দায়িত্ব-জ্ঞান থাকা উচিত।

তার দায়িত্ব-জ্ঞান দেখালে পরেশ—অম্লান বদনে আমার চাদরে হাত মুছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে বল্লে, —জুতাটা ময়লা হ'য়েছে। মানুষ সর্ব্বদা সৌন্দর্য্যের সেবা করবে।

আমি চাদরটা টেনে না নিলে সে পাদুকা-সৌন্দর্য্যের সেবা কর্ত্ত তার দ্বারা। দায়িত্ব সম্বন্ধে সে বোঝালে যে জ্যেষ্ঠ কর্ত্তব্য পিতার শ্রম-লাঘব করা। তার ভগ্নী স্বরূপার বিবাহের আয়োজন কর্ব্বার ভার সে নিয়েছে। রায় বাহাদুর মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায় পেন্সন-পাওয়া ব-জজ। তাঁর পুত্র গ্লাসগো থেকে কি একটা পাশ ক'রে এসেছে। মুরারি বাবু তালতলা না বেলতলা কোথায় একটা প্রাসাদ বানিয়েছেন। রোজ সন্ধ্যার সময় তিনি ইডেন বাগানে আসেন। কপালে কি হাতে অথবা হাঁটুর উপর একটা কাটা দাগ আছে। কোনো দিন পাঞ্জাবী পিরাণ পরেন, কোনো দিন কোট। তাঁকে চিনে বার করতে হ'বে এবং তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব কর্ত্তে হ'বে।

আমি বল্লাম,—তুমি ভদ্রলোকের যে রকম সনাক্ত করবার লক্ষণগুলা জোগাড় ক'রেছ তাতে তিনি মোটেই নিজেকে গোপন কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

তার জন্য আট্‌কাবে না। চল না বাগানে যাই। লোকটার একটা মজার 'হবি' আছে। মানুষ 'হবি' ভিন্ন থাক্‌তে পারে না।

মুরারিবাবুর ব্যসনটা কি? মৌমাছি পোষা? উহুঁ! গোলাপে জুঁইয়েতে মিলিয়ে দো-আঁসলা কলম করা? মোটেই না। কুকুরের লেজ কাটা? ও-সব বাতিক তাঁর নাই। ফুটবল ম্যাচের সময় খেলোয়ার-বিশেষের পদস্খলন হ'লে চেঁচিয়ে বলা—বার করে দাওতো ওটাকে মাঠ থেকে? অশিষ্ট তিনি নন। তবে কি?

নূতন রকমে তিনি পেন্সন ভোগ করেন। তাঁর হবি হ'চ্চে ছেলের জন্য পাত্রী দেখা।

বল কি? এতো মহা বোগাস্ খেয়াল।

না বল। তিনি মাত্র ২১৩টি মেয়ে দেখেছেন।

পরেশ চিরকাল পাগল। এই পাগলটা লোকের কাছে ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব পেশ কর্ব্বে?

সে বল্লে,--দেখ, দুরূহ যা সেই হ'ল আয়ত্ত কর্ব্বার বিষয়। সেওড়াফুলি আবিষ্কারে মজা নাই—মজা গৌরীশঙ্করের তুষার-ক্ষেত্রে খিচুড়ি রেঁধে খেতে পাল্লে।

ভাল। মাত্র তিনজন প্রৌঢ়কে বিরক্ত ক'রে শেষে মুরারিবাবুকে চিনে ফেল্লাম। প্রথমটি নগ্ন শির গুজরাটী, দ্বিতীয়টি গালকাটা মুসলমান—মাথায় ফেজ, পরণে পায়জামা কোর্ত্তা ফতুয়া। আমার নিষেধ না শুনে পরেশ তাঁকে ধরলে। সে বল্লে—খেয়াল উনপঞ্চাশের চেয়ে বেশী। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ সেকেলে শাস্ত্র। নবীন বায়ু-তন্ত্রে নিশ্চয়ই বায়ুর সংখ্যাধিক্য নির্ণয় হ'য়েছে। কে

জানে মুরারিবাবু এই সাম্যের যুগে মুসলমানি পোষাক পরেন কি না।

আমরা দুজনে মুরারিবাবুর উভয় পার্শ্বে বস্‌লাম। মোটেই তাঁর কোনো দ্রষ্টব্য স্থানে কাটা দাগ ছিল না। বেশ-ভূষাও সাধারণ। মাথার চুল কষকষে কালো—পেন্সন পাওয়ার ইসারা দেহের কোথাও নাই।

কাব্যে, সাহিত্যে, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে—যেখানে যত কুমারীর বর্ণনা পড়েছিলাম সবগুলার জগা-খিচুড়ী পাকিয়ে তো ফল্গুরাণীর পরিচয় দিলাম। লোকটা প্রকাণ্ড বোগাস্। অতি ধীরভাবে অমায়িক হাসির উৎসাহ দিয়ে আমাদের বর্ণনার ভাণ্ডার লুঠ করলেন। শেষে অতি মোলায়েম ভাবে মিষ্ট কণ্ঠে ডাহিনা বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বল্লেন,—তা হ'লে বোঝা গেল মেয়েটি যত বা লম্বা তত বা বেঁটে। রং তাঁর গোলাপের মত কি গন্ধরাজের মত তা' স্পষ্ট বোঝা গেল না। বোধ হয় শাদা গোলাপের মত। বিদ্যা সম্বন্ধে ঠিক্ বুঝলাম না কুমারীর প্রাচীন সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অধিক, না সবুজ সাহিত্যে। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যেন নিরাপদ সিদ্ধান্ত হতে পারে যে গীতা, বাইবেল ও ধম্মপদে তাঁর দখল সমান।

পরেশ আমার মুখের দিকে চাহিল। চাহনীর অর্থ বোগাস্। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু খাপছাড়া, অপ্রীতিকর সমস্যা-পূর্ণ, আমাদের বাক্য-শাস্ত্রে তা সূচিত হয় এক কথায়—বোগাস।

আমি বল্লাম,—কি জানেন অর্থাৎ মানে হচ্চে কি—

আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পরেশ বল্লে—সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে—এক কথায় কিনা—

মুরারিবাবু মোলায়েম হেসে বল্লেন—দৌত্য কাজটা শক্ত। মোটের উপর মানে হ'চ্চে, সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে—এ-কাজ আপনাদের উপযোগী নয়।

কথায় শ্লেষ ছিল না, তীব্রতা ছিল না, রাগ করবার কোনো উত্তেজনা ছিল না তার মাঝে। অবশ্য আমরা একটু অপ্রতিভ হ'লাম। আমার ধারণা ছিল গদীচ্যুত সবজজ হয়—মোটা, অরসিক, খিট্‌খিটে, আর পিছন-চাওয়া। এ ভদ্রলোকের দেখলাম স্বভাব একেবারে বিপরীত। এঁর রস-বোধ আমাকে বিস্মিত কল্লে। বল্লাম,—আপনি ঠিক বলেছেন রায় বাহাদুর। আমাদের ভগ্নী, আমরা তাকে যে চোখে দেখব—

থাক্ আর কৈফিয়তে কাজ নাই।

পরেশের বংশ-পরিচয়, গোত্র, মেল, থাক, কৌলিন্য, গোত্র-পতি প্রভৃতি অসম্ভব তত্ত্ব সম্বন্ধে জেরা আরম্ভ হ'ল। পরেশের পাগলামীটা দেখ্‌লাম ভণ্ডামীর মুখোস সে গোবিন্দ সামন্তর মত টকাটক্ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো। মেয়ের গণ, কোন্ লগ্নে তার জন্ম—এ প্রশ্ন-বৈতরণীও সে পার হ'ল, শেষে রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন—মেয়ের কি দশা?

এবার তার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। বল্লে,—ভারি ভাল দশা রায় বাহাদুর। দুর্দ্দশা তার কাছে ঘেঁষ্‌তে পারে না। আমার আর তার মাঝে একটি ভাই আছে। অবশ্য আমার সঙ্গে মনোরমার ঝগড়া হয়না। কিন্তু আমার ভাইয়ের সঙ্গে তার একটু খুঁটিনাটি হ'লেই দুর্দ্দশা হয় ভাইয়ের।

তিনি মেয়েটিকে দেখ্‌তে চাইলেন। পরেশ বল্লে, সে এখন তাদের দেশে বসন্ত-গৌরীতে আছে। শীঘ্রই তার পিতা সপরিবারে কলিকাতা আসবে। পরেশ বাসার সন্ধান কচ্চে। তারা এলে চাটুয্যে মশায়কে একবার পায়ের ধুলা দিতে হবে তাদের বাড়ি।

বাসায় যেতে হবে? কেন, এখানে দেখাতে পার্ব্বেন না মেয়েটিকে?

এখানে? আমরা সমস্বরে বল্লাম—এখানে?

মুরারিবাবু তাঁর সেই শান্তস্বরে বোঝালেন যে ইডেন উদ্যান, ঢাকুড়ে সরোবর, ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির সভা কলিকাতার বিবাহের হাট। কত মেয়ে-দেখাদেখি হয় এখানে, দেনা-পাওনার দর-কষাকষি, খাট-পালঙ্কের পরিমাপ। তাঁকে তেরটি মেয়ে দেখতে হয়েছে এখানে।

২১৩টির মধ্যে?—বলেই জিভ্ কামড়ে সামলাবার চেষ্টা করলাম। বৃদ্ধ সজাগ। বল্লেন—সে সংবাদ ও কানে পৌছেচে।

পরেশ এবার একটু গরম হয়ে বল্লে—বলেন কি? এই নারী-প্রগতির দিনে?

আমারও রক্ত-চলাচলের বেগটা দ্রুত হয়ে উঠেছিল। আমি বল্লাম,—কি জানি আপনাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের

গতি। আমাদের বৈদ্যের মেয়েরা এ অপমান কোনো দিন সহ্য কর্ব্বে না।

ভদ্রলোক হাসলেন। বল্লেন—আমার বন্ধু বৈদ্য না-না বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বেঞ্চিমোড়ার ডেপুটি এখন অস্থায়ী জেলার হাকিম নাম শ্রীযুক্ত অমুকনাথ সেন শর্ম্মা। সেবার তাঁর স্ত্রী এসে সাত দিনে ২১টি বৈদ্য-কুমারীকে এই বাগানে দেখে গেছেন। তার মধ্যে ৩টি বি-এ, ৭টি—

পরেশ বল্লে—থাক্। থাক্! ক্ষমা কর্ব্বেন। আমার বোনের কেরাণীর সঙ্গে বিয়ে দেব—গ্লাসগো গ্রাজুয়েট চাহিনা।

এতবড় মাথাটা হ'ল বোগাস্। আমি ইসারা কর্ল্লাম। পাগলের তখন মাথা গরম হ'য়েছে। সে সমাজের পিতৃ শ্রাদ্ধ আরম্ভ করলে। আরে রাম! রাম! এমন রগচটা লোকটাও ঘাড়ে দৌত্য-কাজের ভার নেয়? বিবাহ চুলোয় যাক্, একটা ফৌজদারী না হয়।

ভদ্রলোক ধীরভাবে সব কথা শুনলেন। শেষে হেসে বল্লেন,—দেখুন বামনবদ্দি কায়েত, সমাজের মাথা ব'লে যাঁদের অভিমান—তাঁরা এ কাজ করেন। আর আর অস্পৃশ্য হরিজন, এমন কি নবশাকেরাও এ সভ্য পদ্ধতি জানেনা। হবেই তো, তারা নীচ-জাত কিনা। আপনি ব্রাহ্মণ হ'য়ে এমন সেকেলে কথা বল্‌চেন?

এবার পরেশ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। বল্লে—আপনি বয়সে বড়, শিক্ষিত ব্যক্তি। পিতার আদেশে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু মাপ করবেন। সরকারী চাকুরীতে আপনার—

তিনি হেসে বল্লেন—বল্‌তেও ভুলে গিয়েছিলাম। বেশীর ভাগ সেই সব মেয়ের বাপেরা স্বাধীন-বৃত্তি-জীবী উকীল ডাক্তার; জমিদারও আছেন।

তাঁর ঠাণ্ডা নিরুদ্বেগ শ্লেষ-বাক্য আমাদের গায়ে তীরের মত বিঁধতে লাগলো।

আমি বল্লাম—তর্কে কি হবে? আমাদের মেয়ে আমরা চেতলার-গো-হাটে বা চিৎপুরের ঘোড়া-পটীতে দেখাতে পারব না। এ যদি আপনার সর্ত্ত হয়।

সেই অমায়িক হাসি—সেই শীতল স্বভাব।

—কি মুস্কিল। ছেলেমানুষ আপনারা, গায়ে পড়ে ঝগড়া করছেন কেন? মানীর মান ভগবান রাখেন। দুর্য্যোধন কি দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা কর্ত্তে পেরেছিল? যার সম্ভ্রম-বোধ আছে, কার সাধ্য তার সম্ভ্রান্ততা নষ্ট করে!

নিজের ঠিকানা দিলেন— বেলতলাও না, তালতলাও না—মনোহরপুকুর। আমরা চীনে হোটেলে বসে দু'জনে সিদ্ধান্ত কর্ল্লাম যে, মুরারিবাবু মোটেই বোগাস্ নন।

(২)

দায়িত্ব-জ্ঞান-দীপ্ত পরেশ গাঙ্গুলীর সাত দিন কোনো সংবাদ পাইনি। বুঝলাম সে আবার নির্ব্বিকার হ'য়েছে। তার অনাসক্তি-যোগের মূলে ছিল অসংযম। এক কাজে বহুক্ষণ লেগে থাকবার শক্তি তার মোটে ছিলনা, অথচ তার অতি-বড় শত্রু কোনোদিন বল্‌বে না যে পরেশ অলস বা অকর্ম্মণ্য। কিন্তু কিং কর্ম্ম কিং অকর্ম্ম, এ বিষয়ে তার ধারণার সঙ্গে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মতানৈক্য ছিল। সে আরবী ঘোড়ার মত সর্ব্বদাই সচকিত, সচঞ্চল; অথচ জীবনটা ছিল তার কাছে রসহীন আকর্ষণী-শক্তি-বর্জ্জিত।

সে এসেই টানা থেকে সিগারেট বার ক'রে চাকরকে লেমনেড্ আনতে হুকুম দিলে। টেবিলের উপর বস্‌ল—স-পাদুকা শ্রীচরণ রাখ্‌লে পালিস-করা চেয়ারের হাতলের উপর। কালীর দোয়াত উল্টে দিলে, ব্লটিং কাগজ ছিঁড়ে প্যাডটাকে নষ্ট কর্ল্লে, কালীর কলঙ্ক মোছবার প্রচেষ্টায়। তাড়াতাড়িতে তারিখ-দেখাটা রদ্দি কাগজের চুব্‌ড়িতে ফেল্লে। যাক্।

গৃহে কথঞ্চিত শান্তি স্থাপিত হবার পর তার ভগ্নীর বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম।

সে বল্লে—ধ্যৎ! ও-সব বোগাস্। দেখ, আমাদের দেশের সম্পাদকগুলা একেবারে অসম্ভব।

অসম্ভাবনার কারণ নির্ণয়ের গবেষণার ফলে বুঝলাম সে একটা গল্প লিখেছে। কোন সম্পাদক সেটা প্রকাশ কর্ব্বার মত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নি।

আরে! বোধ-শক্তিই নাই, তো বুঝবে কি? আমাদের জীবনে ব্যাপকতা নাই। বাঙ্গালার বাহিরে যে একটা প্রকাণ্ড পৃথিবী আছে তার চেতনা নেই বাঙালী জাতির।

নিরুপদ্রব অসহযোগ তার প্রগল্ভতাকে রোধ কর্ত্তে পার্ল্লে না। সাহিত্য আজ যা আঁকে, সমাজ কাল সেই ছাঁচে মানুষ ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি করে। বাঙালী-জীবনের বিস্তৃতির সাহায্য করা উচিত তাদের, যাদের হাতে আছে কালী-কলম। মানুষের মন যত শীঘ্র জ্ঞান লাভ করে, সংস্কারগত আলস্যের জন্য তত শীঘ্র তার উদ্ভব করে না। এই সব সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সে আমার এক থোকা চুরুট নিঃশেষ কর্ল্লে।

ভিন্ন-মত পোষণ কর্ব্বার মত শক্তি সে সময় আমার ছিল না। সারাদিন আদালতে মক্কেলের প্রতীক্ষা করে মস্তিষ্কের একটা গুরুতর অবসাদ এসেছিল। কূট-তর্কের সমরানলে ঝাঁপ দেবার প্রবৃত্তি তখন ছিল না। সুবোধ বালকের মত মেনে নিলাম তার কথা। সে বল্লে—বিস্তৃতি হয় নূতনকে বরণ কল্লে। খাঁচা ছেড়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে মুক্ত বাতাসের, মুক্ত আকাশের পরিচয় না পেলে মানুষ এমনিই কূর্ম্ম-অবতার হয়ে যায়।

সে পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে দিলে। তার গল্প, যার প্রতি সম্পাদককুল অশ্রদ্ধা প্রকাশের ধৃষ্টতায় অভিযুক্ত। এই শান্ত সন্ধ্যায় তার উগ্র উপন্যাস-মদিরা-রস পান কর্ত্তে হবে, এ চিন্তা উদ্বেগের সৃষ্টি কর্ল্লে—কারণ বন্ধু আমার নাছোড়বান্দা। বল্লাম—ওদের কথা ছেড়ে দাও। খালি লেখক' হ'লে হয় না। দস্তুর-মাফিক মো-সাহেবি বৃত্তি আয়ত্ত কর্ত্তে পারলে তবে ওরা প্রবন্ধ ছাপে। দলাদলি রেষারিষি—

ঠিক বলেছ। আচ্ছা, পড়তো গল্পটা। এর দোষটা তারা পেলে কোথা ?

সর্ব্বনাশ ! অগত্যা আরম্ভ কর্ল্লাম বৈকুণ্ঠের খাতা।

পঞ্চশর।

অনন্ত-সুন্দরের সৃষ্টি-কৌশলের মূলে বিদ্যমান সৌন্দর্য্যের আত্ম-বিকাশ। শিব-সুন্দরের রূপই বিশ্ব; তাই রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ দিকে দিকে ক্ষণে ক্ষণে সেই সুন্দরেরই বিজয়-সমাচার প্রচারে রত।

আচ্ছা থাক ! থাক ! এতে অনেক সময় লাগবে !

কেন, ভাষা তো তকৃতকে ঝক্‌ঝকে। আর শব্দের দ্যোতনা—

না না, সে সবে ওদের আপত্তি নয়। আপত্তি গল্পাংশে। বে-য়াদব অল্প বুদ্ধির দল। শোন দেখি গল্পটা।

মোলায়েম প্রস্তাব। আমি হৃষ্ট-মনে সেই অমৃত-সমান কথা শুনতে লাগলাম।

গল্পের ঘটনা-স্থল কাশ্মীর। নায়িকা ইয়ারকান্দের গুলনেবাজ খাঁর ষোড়শী কন্যা হাসিনা। তার বাপ লাদাকের পথে ইয়াকের পিঠে নামদা গালিচা, ভেড়ার লোম নিয়ে শ্রীনগরে বাণিজ্য কর্ত্তে আসে। সঙ্গে আসে হাসিনা, আর বিশ্বাসী কুকুর দিল্লু। দিল্লু তিব্বতীয় পুডুল জাতীয়—গায়ে বড় বড লোম—লোমে চোখ অবধি ঢেকে পড়ে।

বাঃ ! বেশ কুকুর তো।

হ্যাঁ ! শোন। হাসিনার বর্ণ দাড়িম্বের মত। শতধারে যেমন ঝরণার জল পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া ঝরিয়া পড়ে নীল পাথরের চাঙ্গড় ধৌত করিয়া—হাসিনার কেশ-ভার তেমনি শত বেণীরূপে তার কম্বু-গ্রীবা বাহিয়া নীল কোর্ত্তার উপর ছড়াইয়া পড়ে। নির্ঝরের জলস্রোতের উপর তারার প্রতিবিম্বের মত ছোট ছোট তারকা-আকারের রজতাভরণ তার বেণী-রাশির সুষমা বর্দ্ধন করে।

বাঃ বেশ বর্ণনা হয়েছে। ব্যাপকতা আছে। সেই এক-ঘেয়ে ফণীর সঙ্গে বেণীর তুলনা—রামচন্দ্র !

সে বল্লে—আরে ছিঃ ! বোগাস্ !

আর একটা বিষয়েও মিলে গেছে। জলে যেমন মাছ থাকে তেমনি শুনেছি ওদের সেই শত বেণীতে অনেক উকুন থাকে—ছারপোকাও নাকি সানন্দে সেখানে বাস করে।

সে রাগলে না। হেসে বল্লে—শোন। এদিকে সমরকন্দ থেকে সমরু আসে শ্রীনগরে লোম বেচ্‌তে, কার্পেট বেচ্‌তে, আর জাফরাণ কিন্‌তে। সে সোনমার্গে বসে দেখছিল ডুবন্ত সূর্য্যের লাল আলো-প্রতিফলিত উলার হ্রদ—তার পিছনে পাহাড়ের থাক্—তার পিছনে তুষার-সম্ভার শিরে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাঙ্গা পর্ব্বত—'নির্ব্বাক নগ্ন-সুন্দর যোগী—ধ্যান-মগ্ন।' এমন সময় তার দৃষ্টি পড়ল হাসিনার উপর। সে শৈলবালা হাসির কল্লোলে প্রকৃতির সান্ধ্য-সৌন্দর্য্যকে সজীব সজাগ করছিল।

কুকুরটা তার সঙ্গে ক্রীড়ারত। সে বিচিত্র প্রকৃতি-সৃষ্টির মূল-একতা ঘোষণা করিতেছিল—পাহাড়, জল, মানুষ, পশু, তরুশিরে বসিয়া যাহারা কাকলী করিতেছিল—বুল্‌বুল্, কস্তুরা।

বাঃ! অতি সুন্দর।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে সমরু মিঞার সাধ্য কি হাসিনার প্রেমে না পড়ে। কিন্তু ওদিকে কাসগরের চীনা হাকিমের পুত্র ফ্যাংচো পূর্ব্বাবধিই আত্ম-বিক্রয় করেছিল হাসিনার হাস্যে ও লাস্যে। দু'বছর সমরু ও ফ্যাংচোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কলহ চল্‌ল। সে সোজা ঝগড়া নয়। সে-প্রসঙ্গে মধ্য-এসিয়ার অনেক স্থলের বর্ণনা আছে। লেহ্ সহরের রাজপথে লাদাকীদের পোলো খেলার সমাচার আছে; আর আছে মাঝে মাঝে উভয় প্রেমিক কর্ত্তৃক পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলি ছোঁড়া।

সত্যই তার গল্প উপভোগ্য, সুখপাঠ্য। তার পর যে ঘটনা এলো, সম্পাদক-কুল তাতেই বোধ হয় ভীত হয়েছিল। এইখানেই তার ব্যাপকতার সৃষ্টি।

খুলনা জেলার কাদাখোঁচা গ্রামের ফণী সেন দিল্লীর এক কলেজের অধ্যাপক। ফণীর মধ্যে অধ্যবসায় আছে, জিদ্ আছে। তাই বন্ধুরা তাকে বলে বাঙ্গাল। সে বলে মধ্য-বাঙলার অধিবাসী বাঙাল নয়। বন্ধুরা বলে, শিয়ালদহে রেলে চড়ে যে দেশে যায় সেই বাঙ্গাল।

বাঃ বেশ রসিকতা হ'য়েছে তো।

হ্যাঁ। গ্রীষ্মাবকাশে ফণী কাশ্মীর গিয়েছিল। সে গন্ধর্ব্বপল্লীর পথে ক্ষীরভবানী দেবীর পীঠস্থান দেখতে যাচ্ছিল। সঙ্গে তার ছিল দুই বন্ধু। গন্ধর্ব্বপল্লী বা গাণ্ডারবলে সিন্ধু-নদীর উপর এক নূতন পোল আছে। ফণী সেতু পার হয়েই দেখ্‌লে নদী-সৈকতে এক কুকুর; তার গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছে শৈল-কুসুম—হাসিনা। সিন্ধু-নদের তীরে এক বজরায় দু'টি হাঁজি যুবতী উদুখলে ধান কুট্‌ছিল। হাসিনা তাদের পাশে ঘাসের ওপর ব'সে তর্জ্জনী ও বুড়া আঙ্গুলের চাপে কাগজী আখ্‌রোট ভাঙ্গছিল। বন্ধু দু'জন কাঠের মুগুর-বিক্ষোভ-প্রকোপ দেখে ধানভানা যুবতীদের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। কিন্তু বেচারা প্রফেসার ফণী সেন হাসিনার দেখ্-মার রূপের ঝলকে আত্ম-বিক্রয় কর্‌লে। একটা উইলো গাছের নীচে ব'সে দুটা চর্ব্বিত-চর্ব্বণরত ইয়াকের অন্তরালে ব'সে সমরু নিজে খাচ্ছিল কাশ্মীরি নাক্, আর আপেল-গণ্ড যুবতীর বাদাম-চর্ব্বণরত কুন্দ দন্তের আব্‌ছা সৌন্দর্য্য উপভোগ করছিল। আর দূরে একটা চেনার গাছের আড়াল থেকে ফ্যাঙ্‌চোর ইয়ারকান্দী দূত লক্ষ্য করছিল সমরুকে। কারণ তার ওপর ছিল কড়া হুকুম যেন এ-যাত্রা সমরু খান্ কাশ্মীরের উপত্যকা ছেড়ে হিন্দু-কুশ গিরিবর্ত্মে প্রবিষ্ট হ'তে না পারে।

প্রফেসার ফণী ইংরাজী, ফরাসী, স্কন্দনাভ, এমন কি জার্ম্মান সাদারম্যানের সমস্ত প্রেমের নভেল—অবশ্য ইংরাজী ভাষায়—পাঠ ক'বে প্রণয়-বৈচিত্র্যের সকল রহস্য আয়ত্ত ক'রেছিল। এমন কি কাশ্মীরি কোক-শাস্ত্রের হিন্দি অনুবাদও তার কাছে অনাদৃত ছিল না। মোটের উপর সে বুঝেছিল রমণীরত্ন পৃথিবীর মত বীরভোগ্যা। সে একেবারে হাসিনার পাশে গিয়ে একটা আখরোট গাছের রলার উপর উপবিষ্ট হ'ল। দিল্লীতে সে শিখেছিল উর্দ্দু। দুই এক কথার পর সে গালেবের চোখা চোখা কবিতা-বাণ বর্ষণ কর্‌লে সিনকিয়াঙি হাসিনার উপর। সে অবুঝের হাসি হেসে ব'ল্লে—তুম কিয়া বুলী বোলা—বাঙ্‌লা! হাঃ অদৃষ্ট! প্রফেসার নূতন ভাবে ব্যূহ রচনা কর্‌লে।

কলকাত্তা যায়েগা। আচ্ছা সহর! কাবিলে দীদ্। আলি-আলসান্ ইমারত।

স্লেহে।

অবশ্য স্লেহ যে কি তা' ফণী বোঝে না। কিন্তু ছাড়বার পাত্র সে নয়। বল্লে—মোটর গাড়ি। হাওয়া গাড়ি! ভস্ ভস্ ভঃ! নানা রকম হাত-পা খেলিয়ে সে বাক্যকে প্রাণ দিলে। যুবতী বল্লে—দেখা। ছিব্-নগার! কল্‌কাত্তা গাবু। রেল—কঃ?

আলবৎ। শ্রীনগরসে জাম্মু হাওয়া-গাড়ি। পীছে রেল কুঃ! ঘট্-ঘট্ ঘট্-ঘট্ শিয়াল-কোট লাহোর অমৃতসর দিল্লী—

হাসিনার রক্তাভ হেম অঙ্গে প্রীতির লক্ষণ স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

ভার ইয়া শমিন ?

ভার-ইয়া-শমিন।

এবার সে চম্পক অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

ও: পাহাড় ইয়ে জমিন? জ্যাদা জমিন—প্রেন—সিধা—লম্বা। হরিণ চিড়িয়া—কোকিল কুহু! কুহু! কুহু!

এই সংবাদ আর ফণীর মুখের কোকিল-কাকলী হ'ল ফ্যাঙচো-শমরু কোম্পানীর প্রেম-সমাধির কফিনের পেরেক। তার পর বজরার হাজি ও রৌপ্য-মুদ্রার সাহায্যে এক পক্ষের মধ্যে প্রফেসার হাসিনাকে নিয়ে জাম্মুতে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে অবশ্য এল দিল্লু। সে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ফণীর হাত থেকে আধ টিন বিস্কুট খেয়ে দৃঢ় সৌহার্দ্দ-বন্ধনে বাঁধা পড়েছিল বাঙ্গালী অধ্যাপকের কাছে। শ্রীনগর জাম্মুর পথ নির্জ্জন—কেহ সন্দেহ করলে না। সেখানে এক ডোগড়া ব্রাহ্মণের বিধবা-ভগ্নীর সাহায্যে হাসিনা বেনারসী-শাড়ি-শোভিতা অবগুণ্ঠনবতী হিন্দুস্থানী রমণীতে পরিণতা হ'ল।

বেচারা সম্পাদকের দল! এ গল্প প্রকাশিত হ'লে তাদের পত্রিকার কি দশা হ'ত একবার ভেবে নিলাম। তাকে বল্‌লাম—উপসংহার।

সে বল্‌লে—প্রথমে প্রফেসারের আত্মীয়-স্বজন হাসিনাকে ঘরে নিতে দ্বিধা কল্লে। ফণী বোঝালে—বিলাত থেকে মেম বিয়ে করে আনলে যখন তারা বাঙালীর কুলবধূ হতে পারে, ইয়ারকন্দের মহিলা আমাদের সংসারে তো আরও অবলীলাক্রমে প্রবেশ কর্ত্তে পারে। যেহেতু ইয়ারকন্দ এসিয়া ভূখণ্ডে।

অগত্যা সেন-বধূরা বরণডালা মাথায় নিয়ে বারাণসী কাপড়ে গাছ-কোমর বেঁধে হাসিনাকে ফণী-পত্নীরূপে গ্রহণ কল্লে। আর শৈল-সুতা হাসিনা—বাঙালীর মনোরম বিবাহ-রীতিতে মুগ্ধ হইয়া অমল হাসির বিপুল স্রোতে আপনি ভাসিল, আর পুষ্পশোভিত বিবাহ-বাসর হাসির রোলের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল।

তা তো হ'ল। কিন্তু সেই দু' বেটার কি হ'ল? শমরু আর মাঙ্গু না ফাঙ্কু।

শমরু আর ফাংচো! তারা পরস্পরের উপর সন্দেহ করে ভীষণ সমর-প্রবৃত্ত হ'ল। কিন্তু কেহ কাকেও ধরা দেয় না—উভয়ে উভয়ের রক্তের লালসায় মধ্য-এসিয়ার সহরে সহরে ঘুরতে লাগল। শেষে যখন প্রকাশ পেলে যে, হাসিনার নিরুদ্দেশের কারণ উভয়েরই অজ্ঞাত—তখন তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলে। শমরু হ'ল বোখারার মস্‌জিদের মোল্লা—ফাংচো হ'ল কাশগরের বৌদ্ধ-মন্দিরের লামা।

কিন্তু বেচারা দিল্লু খুলনার গুমোট গরমে দেহত্যাগ করিল। লোম-কোমল গলা ধরিয়া পবিত্র অশ্রুজলে সিক্ত করিল বহরমপুরী রেশমী দুকূলপ্রান্ত হাসিনা, এখন মলিনা দেবী।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটা কথা কিন্তু বুঝলাম যে, বন্ধু আমার স্ত্রী-জাতির মনো-বিজ্ঞানের সনাতন তত্ত্ব অতি রোমাণ্টিক গল্পের মারফত প্রচার কর্ত্তে চেয়েছে—বলবানে চাহিলে সে দুর্ব্বলকে বরণ করে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরলে সে সমতল ভূমি চায়।

পাশের ঘর থেকে নূতন দিয়াশলাই নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম—তার রেশমী চাদর আছে আমার চেয়ারের উপরে, কিন্তু পরেশ নাই। বোগাস্! (ক্রমশঃ)

ভারতের চিনি

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

ভারতের চিনির আধুনিক ইতিহাসে ১৯৩২ সাল একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর হইতে ভারতে এই শিল্পের ইতিহাসে হয়তো একটী নূতন যুগের প্রারম্ভ সূচিত হইবে। ইং ১৯৩২ সালের বাজেট-অধিবেশনে ভারতের ব্যবস্থাপক সভা চিনি-শিল্প সংরক্ষণের জন্য এক আইন পাশ করিয়াছেন। তাহার নাম Sugar Industry Protection Act—Act XIII of 1932 (চিনি-শিল্প-সংরক্ষণ আইন, ইং ১৯৩২ সালের ত্রয়োদশ আইন)। এই আইনে বিদেশী চিনির উপর মণ প্রতি ৫।৶১০ টাকা হারে (হন্দর প্রতি ৭।০ টাকা) শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—ইহা ইং ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ইং ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে। আবশ্যক বোধ করিলে, ইহার পরেও এই আইনের পরমায়ু আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, আইন সভায় এ কথাও হইয়া আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্বে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তথা ভারত সরকার ভারতের নেটিব কৃষকদের দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর আজ বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ভারতের চিনি-শিল্পের চিতাভস্ম সদয় সরকার বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি লাভের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ যে কোন কারণেই হোক্‌, অর্দ্ধ শতাব্দী পরেও দরদ যদি আজ সত্য সত্যই প্রতিকার একটা রূপ গ্রহণ করে, তথাপি তাহা ভারতবাসীর সৌভাগ্যেরই সূচনা বলিতে হইবে। যে সব ইংরেজ মহাপ্রভু মূক, দরিদ্র প্রজাবৃন্দের (dumb millions) ব্যথায় মুখর হইয়া ওঠেন, ইহাতে তাঁহারাও অকৃতজ্ঞ ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কৃতজ্ঞতা আদায়ের দাবীর লিষ্টিতে আর একটী নিশ্চিত দাবী যোগ করিতে পারিবেন।

ভারতের চিনি-শিল্পকে রক্ষা করার নিমিত্ত বিদেশী চিনির উপর কোন বিশেষ শুল্ক স্থাপন করা উচিত কি না, উচিত হইলে কি পরিমাণ শুল্ক স্থাপন অথবা কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহার অনুসন্ধান এবং নির্দ্ধারণ করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বাণিজ্য-বিভাগের (Commerce Department) ১২৭T নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইং ১৯৩০ সালের ২০এ মে তারিখে টেরিফ বোর্ডকে এক আদেশ করেন। তখন টেরিফ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মিঃ এ. ই. মেথিয়া, আই-সি-এস; এবং ডক্টর জন মাঠাই ও মিঃ ফজল ইব্রাহিম রহিমতুল্লা এই দুইজন মেম্বর ছিলেন। তাঁহারা ইং ১৯৩০ সালের জুন মাসেই তদন্ত আরম্ভ করেন এবং ইং ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসেই তাঁহাদের রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করেন। টেরিফ বোর্ড অসাধারণ তৎপরতা এবং যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাদের রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। এক বৎসর পরে ইং ১৯৩২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে গভর্ণমেণ্ট চিনি-শিল্প-সংরক্ষণ আইনের বিল (Sugar Industry Protection Bill) ভারতীয় আইন-সভায় (Legislative Assemblyতে) প্রথম উপস্থিত করেন; এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উহা সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়। আইন সভার উক্ত বাজেট-অধিবেশনেই ঐ বিল পাশ হইয়া আইন স্বরূপে গৃহীত হয়। টেরিফ বোর্ড ১৫ বৎসরের জন্য এই আইন অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু আইন-সভা প্রথমে সাত বৎসরের মেয়াদে পাশ করিয়াছেন; আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন কথা আছে। এই আইনের বিল যখন তাৎকালিক মন্ত্রী সার জর্জ্জ রেণী সাহেব আইন-সভাতে উপস্থিত করেন, তখন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "Now in this

particular case, I doubt whether it can be said, inspite of arguments that the Tariff Board have adduced, that, at any rate, one of the conditions laid down by the Fiscal Commission, is entirely satisfied. I do not myself feel that we should be justified in saying that it is reasonably certain that, in India generally sugar will some day be produced as cheaply as it is produced in Java and in Cuba. That, I think, is very doubtful.* ইহার ভাবার্থ এই যে, কোনও শিল্পকে সংরক্ষণ-শুল্ক দ্বারা রক্ষা করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে যে যে অবস্থা উপস্থিত থাকা আবশ্যক, ফিস্ক্যাল্ কমিশন (রাজস্ব-কমিশন) তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিনি-শিল্প সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, টেরিফ বোর্ডের উপস্থাপিত সমস্ত যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও, রাজস্ব-কমিশনের অন্ততঃ একটী সর্ত্তের অবস্থা ইহাতে বিদ্যমান নাই। ভবিষ্যতে যে কখনও জাভা এবং কিউবার মত সস্তায় চিনি উৎপন্ন হইবে, এ কথা বিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, অন্ততঃ তিনি ইহা অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে করেন। অর্থাৎ এই যে বিদেশী সস্তা চিনির উপর শুল্ক ধরা হইতেছে, এ কার্য্যটী ঠিক বিধি-সঙ্গত হইতেছে না। ঐ রকম সস্তা চিনি ভারতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং অনর্থক চিনির মূল্য বেশী করিয়া দিয়া ভারতের জন-সাধারণকে অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইতেছে।

রাজস্ব কমিশন (Fiscal Commission) তাঁহাদের রিপোর্টে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোনও শিল্পকে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, ঐ শিল্পের উপাদান অর্থাৎ কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে দেশে পাওয়া যায় কি না, শ্রমিকের মজুরী (Cheap power and labour) সস্তা কি না এবং দেশে উক্ত শিল্পের উৎপন্ন-দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা (home market) আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত উক্ত শিল্পের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব কি না; অথবা দেশের স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে, যত দ্রুতগতিতে উক্ত শিল্পের উন্নতি হওয়া উচিত, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত তাহা সম্ভবপর কি না; তৃতীয়তঃ, পৃথিবীতে অনেকাংশেই অবাধ-বাণিজ্যের নীতি প্রচলিত আছে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এই তিনটী সূত্রের মূল নীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, দেশের কোন শিল্পকে রক্ষা করার নিমিত্ত বিদেশী জিনিষের উপর শুল্ক (protective duty) স্থাপন করিতে হইবে।

এই তিন সর্ত্তের মূল নীতি স্বীকার করিয়া লইলেও, দেখা যাক্ যে, চিনি-শিল্প সম্বন্ধে ইহার নীতিগত বিরোধ কোথায়? প্রথমতঃ, (১) উপাদান, (২) শ্রমিকের মজুরী বা খরচা ও (৩) চাহিদা। আমরা বিপরীত দিক হইতে আরম্ভ করিব;—চাহিদার কথা ধরা যাক্ প্রথমে। বিদেশ হইতে কি পরিমাণ চিনি প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়া থাকে, তাহা দেখিলেই জানা যাইবে যে, চাহিদা (home market) আছে কি না। গত কয়েক বৎসর যে পরিমাণ বিদেশী চিনি ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। প্রতি তিন বৎসরের গড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে—

বৎসর	প্রতি বৎসরের গড় আমদানী
১৯১৭—১৮ ১৯১৮—১৯ ১৯১৯—২০	৪,১১,০০০ টন
১৯২০—২১ ১৯২১—২২ ১৯২২—২৩	৪,০৯,০০০ টন
১৯২৩—২৪ ১৯২৪—২৫ ১৯২৫—২৬	৫,৮২,০০০ টন
১৯২৬—২৭ ১৯২৭—২৮ ১৯২৮—২৯	৭,৯৩,০০০ টন
১৯২৯—৩০	১০,০০,০০০ টন

(See Indian Tariff Board's Report, 1931, p 22.)

দেখা যাইতেছে ইং ১৯২৯—৩০ সালে দশ লক্ষ টন অর্থাৎ দুই কোটী তেয়াত্তর লক্ষ সত্তর হাজার মণ চিনি বিদেশ হইতে এক বৎসরে ভারতে আমদানী হইয়াছে। ইহা

* Legislative Assembly's Debate-Official Report Vol, I. 1933.

ছাড়াও ভারতে যে কয়েকটী কারখানা আছে তাহাতে প্রায় এক লক্ষ টন এবং খন্দসারি দেশী প্রথায় প্রায় দুই লক্ষ হইতে আড়াই লক্ষ টন চিনি প্রস্তুত হয়। * সুতরাং এত চিনি যেখানে কাট্‌তি হয়, সেই ভারতে দেশী চিনির চাহিদা (home market) হইতে পারে কি না তাহা তর্ক করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা, শ্রমিকের মজুরী বা খরচা। হতভাগ্য ভারতের মত দরিদ্র দেশে যত সস্তায় মজুর পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। আমেরিকার সিকাগোনিবাসী এক ভদ্রলোক এই লেখকের সহিত টাটা কোম্পানীর লোহার কারখানা দেখিতে গিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। মজুরেরা দৈনিক ছয় আনা, সাত আনা পারিশ্রমিক পায়, এ কথা প্রথমে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে রাজী হন নি। পরে যখন মজুরেরা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, প্রকৃতই তাহারা ঐরূপ মজুরী পায়, তখন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী তো শিহরিয়া উঠিলেন যে, কি করিয়া এই উপার্জ্জনে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ভারতের সর্ব্বত্রই সাধারণ শ্রমিকের মজুরীর হার কিছু-কম-বেশী এই রকম; বরং কোন কোন স্থানে ইহারও কম মজুরী প্রচলিত আছে। চিনি-শিল্পে দক্ষ বা অভিজ্ঞ শ্রমিকের তেমন দরকার হয় না। ভারতীয় শ্রমিকেরা বেশ বুদ্ধিমান; অতি অল্প কাল মধ্যেই তাহারা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া লয়। সস্তায় ভাল মজুর পাইতে ভারতে কোন অসুবিধা হয় না। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মজুরীর হার উদ্ধৃত করা হইল—

দেশ	দৈনিক মজুরী শিলিং—পেন্স
জাভা	০ — ১০
ফিলিপাইন	১ — ৬
নেটাল	২ — ৮
মরিশস্	৩ — ৬
কিউবা	৫ — ০
হাওয়াই	৬ — ০
কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড	১১ — ০

* Tariff Report (1931) p. 29.

(Maxwell's Economic Aspects of Cane Sugar Production; and Tariff Report).

ভারতবর্ষে গড়ে যদি আট আনা দৈনিক মজুরী ধরা যায়, তাহা হইলে দৈনিক (১৲ এক টাকা = ১ শি. ৬ পে.) মজুরী নয় পেন্স হয়। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কোনও দেশে শ্রমিকের মজুরী ভারত অপেক্ষা কম নয়। জাভাতে প্রায় সমান সমান।

তৃতীয় কথা, উপাদান অর্থাৎ কাঁচা মাল। এ ক্ষেত্রে কাঁচামাল মানে আক (ইক্ষু)। উৎকৃষ্ট রকমের প্রচুর আক উৎপন্ন করা চাই। তাহা করিতে হইলে (১) উর্ব্বর জমি চাই, (২) জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা এবং অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উপযুক্ত সার নির্ব্বাচন ও ব্যবহার করা চাই, (৩) আবশ্যক হইলে জল সেচনের ব্যবস্থা করা চাই; (৪) উৎকৃষ্ট রকমের চারা গাছ (Seedlings এবং Cuttings) প্রস্তুত এবং বিতরণ করা চাই, (৫) আগ্রহান্বিত কৃষক চাই।

(১) উর্ব্বর জমি—ইক্ষুর আদি জন্মভূমি ভারতবর্ষে ইক্ষু চাষের উপযুক্ত জমি নাই, এ কথা বলার দুঃসাহস না থাকাই ভাল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, বেহার ও উড়িষ্যার কতক, বাংলা, আসাম, মাদ্রাজের কতকস্থানে ইক্ষু চাষের উপযুক্ত যথেষ্ট জমি আছে এবং চিনি-শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও আকের চাষ এখনও চলিতেছে। বাংলা দেশে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিলে, আকের জমি আরও অনেক বেশী পাওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশে অবিলম্বে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করা উচিত। (২) জমির সার—কোন্ জমিতে কি প্রকারের সার দিলে উৎকৃষ্ট আক জন্মিতে পারে, জমির রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা, গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ শুধু যে তাহাই নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন তাহা নয়, পরন্তু সেই সার কৃষকেরা যাহাতে সহজে পাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। (৩) জল সেচন—যেখানে জল সেচনের (irrigation) প্রয়োজন সেখানে সে ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করিবেন। (৪) উৎকৃষ্ট রকমের চারা গাছ—ইহার পরীক্ষা, উৎকর্ষ সাধন এবং কৃষকদিগের নিকট উপস্থিত করা গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের কর্ত্তব্য। উপরের চারটী বিষয়ের দায়িত্বই গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের। (৫)

আগ্রহান্বিত কৃষক। আমাদের দেশের কৃষকদের নূতন কিছু গ্রহণের শক্তি বা আগ্রহ নাই, তাহারা অত্যন্ত গোঁড়া, এই রকমের একটা নিন্দাবাদ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়। কিন্তু এই অপবাদ যত জোরে প্রচার করা হয়, ততখানি সত্য নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, কোন বিশিষ্ট প্রণালী, বীজ বা চারাগাছ তাহাদের কৃষির পক্ষে অধিকতর উপযোগী, তাহারা আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করে। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। আধুনিক দৃষ্টান্ত স্বরূপে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার কৃষিবিভাগ ট্যানা (গেণ্ডারীও বলে কৃষকেরা) নামের এক রকম আক প্রচলন করিয়াছিলেন। এই আক উপরে খুব শক্ত, শেয়ালে খুব কম খায়, এই জন্য কৃষকেরা খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিল। কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল যে, এই আকের গুড় খারাপ হয়, লবণাক্ত আস্বাদ, কিছু দিন রাখিলে গুড়ে পোকা হয়। সুতরাং গুড়ের দাম কৃষকেরা কম পাইতে লাগিল। তার পরে এখন আবার কৃষিবিভাগ হইতে কয়ম্বাটোর (Coimbatore) আকের প্রচলন করা হইতেছে। এই আকও কৃষকেরা আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছে। ট্যানা আক আবাদ করিয়া ঠকিয়াও পুনরায় তাহারা এই কয়ম্বাটোর আক আগ্রহের সহিত আবাদ করিতে প্রস্তুত হইতেছে, ইহাতে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় না যে, কৃষকেরা গোঁড়া রক্ষণশীল তো নয়ই, পরন্তু যুক্তি-সঙ্গত রূপে উপস্থিত করিতে পারিলে, তাহারা নূতন জিনিষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে! তাহাদের সম্মুখে নূতন জিনিষ যুক্তি এবং প্রমাণের সঙ্গে ধরিতে জানা চাই; ফাঁকি দিলে চলে না। কৃষকদের সহিত যাঁহাদের কোন ঘনিষ্ঠ সংশ্রব নাই, এ রকম শিক্ষিত লোক অথবা কৃষি বিভাগের তথা গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্পৃষ্ট বড় কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ, নিজেদের বিভাগীয় দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বা অবহেলা গোপন করিবার জন্য কৃষকদের ঘাড়েই সমস্ত দোষের বোঝা চাপাইতে চান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কৃষি-বিভাগ বা শিল্প-বিভাগ আজন্ম দারিদ্র্যে, কোনও রকমে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শুধু একটা কাঠামো টানিয়া লইয়া সনাতন গোযানের মত চলিতেছে,—একটা লেফাপা-দোরস্ত প্রাণহীন অস্তিত্ব। যাহা করা উচিত, যাহা তাঁহারা করিতে চান, তাহা তাঁহারা করিতে পারেন না; অর্থ নাই, অর্থ নাই—সেই এক সনাতন কৈফিয়ৎ। অর্থ নাই বা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আগ্রহ নাই বলিলেই, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ঘাড়ের উপর হইতে সমস্ত দোষ নামিয়া যায় না। দোষ কৃষকদের নয়, দোষ কৃষকদের অভিভাবক যাঁহারা তাঁহাদের। জাভা, কিউবা, ফরমোসা প্রভৃতি স্থানের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আকের চাষ সফল করিতে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম এবং সুদীর্ঘ সাধনা করিতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিয়া বা সে কথা মনে না করিয়া, ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী যদি ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় শুধু নিরাশার বাণীই প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে বাণীকে আমরা সরল সত্য বলিয়া অভিনন্দিত করিতে দ্বিধাবোধ করিব।

রাজস্ব কমিশনের দ্বিতীয় সর্ত্ত—গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব কি না। তাহা যে মোটেই সম্ভব নয়, এ উত্তর দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করার প্রয়োজন হয় না। বিদেশী চিনির ব্যবসা সুদীর্ঘ দিন নিজ নিজ রাজশক্তির নানা রকম সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারত গভর্ণমেণ্টের অমনোযোগে এবং অবহেলায় ভারতের চিনি-শিল্প লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থায়, এই প্রবল এবং অসম প্রতিযোগিতার মুখে, ভারতের বিধ্বস্ত চিনি-শিল্প ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং আশ্রয় ব্যতীত পুনরুজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিবে, এ আশা করা নিতান্তই দুরাশা, ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

রাজস্ব-কমিশনের তৃতীয় সর্ত্ত—পৃথিবীর অবাধ বাণিজ্যের কথা মনে রাখা। আজ ইং ১৯৩৩ সালে এ নীতির কথা আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। অবাধ-বাণিজ্য-নীতি সম্প্রতি ধামা-চাপা পড়িয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশই নানা রকম শুল্কের প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছে। ভারতের স্বার্থ-রক্ষার জন্য,

ভারতের ধ্বংস-প্রাপ্ত প্রধান প্রধান শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা-কল্পে যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট আজ শুল্কের প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে চান, তাহাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নাই; বরং তাহা তেজস্বিতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত না করিলে, ভারতের স্বার্থ ধ্বংস করার পথই প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

সুতরাং আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, রাজস্ব-কমিশনের রিপোর্টে বর্ণিত কয়টী অবস্থাই চিনি-শিল্প সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে এবং গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই তাহা সফল করিয়া তুলিতে পারেন। সার জর্জ্জ রেণী মহাশয় যে ব্যক্তিগত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোনই যুক্তি-সঙ্গত ভিত্তি নাই।

রাজস্ব-কমিশনের সূত্রগুলির মূল নীতি মনে হয় এই যে, স্বদেশী শিল্পের কোন জিনিষ যদি সেই রকমের বিদেশী জিনিষের মূল্য অপেক্ষা কম বা সমান মূল্যে, অদূর ভবিষ্যতেও দেশে বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সেই স্বদেশী শিল্পকে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের দ্বারা রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই রকম ক্ষেত্রে, গভর্ণমেণ্ট যদি বেশী শুল্ক (protective duty) ধরিয়া সেই জিনিষের দাম বেশী করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রকারান্তরে জন-সাধারণকে বেশী দাম দিয়া সেই জিনিষ কিনিতে দীর্ঘকাল, হয় ত চিরকালের জন্যই, বাধ্য করা হয়। তাহাতে জন-সাধারণ অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারাও কেহ কেহ এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। যেমন সম্প্রতি টাটা কোম্পানীর লোহার কারখানার প্রস্তুত জিনিষ সম্বন্ধে এই রকমের একটা কথা উঠিয়াছে যে, জন-সাধারণ আর কত দিন বিদেশী জিনিষ অপেক্ষা বেশী মূল্যের টাটার লোহার কড়ি, বরগা, টীন খরিদ করিবে? চিনি বা অন্য কোন শিল্প সম্বন্ধেও ত তো ঠিক এই রকমের কথাই উঠিতে পারে। সার জর্জ্জ রেণীও এই কথাই বলিয়াছিলেন। চিনি-শিল্প সম্বন্ধেই আমরা এই কথাটা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা ইহার বিপরীত চিত্রটী কল্পনা করিয়া দেখি। তর্কের খাতিরে ধরিয়া লইলাম যে, জাভা বা কিউবার মত কম খরচে, অদূর ভবিষ্যতে বা কখনও, ভারতে চিনি উৎপন্ন হইতে পারিবে না। সুতরাং জন-সাধারণকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় এই জন্য বিদেশী চিনির উপর সংরক্ষণ শুল্ক (protective duty) উঠাইয়া দেওয়া হইল। জাভা হইতে অবাধ-গতিতে চিনির স্রোত বহিতে থাকিল। ভারতের চিনির কারখানাগুলি যেমন উঠিয়া যাইতেছিল তেমনি একে একে উঠিয়া গেল; উত্তর ভারতের খন্দসারি ছোট ছোট কারখানাগুলিও বন্ধ হইল। ভারতের বাজার দখল করা যায় কি না তাহারই প্রাথমিক পরীক্ষা স্বরূপ কিছু দিন পূর্ব্বে জাভা হইতে গুড় আমদানী হইতেছিল। টেরিফ বোর্ড তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন, "Should Java sugar-manufacturers seriously take up the question of the manufacture of gur with a view to capturing the Indian market, the risk involved, if no duty were imposed, would be so serious as to menace the whole future of Indian sugar-cane and the industries dependent on it. It is in the national interest therefore that timely action should be taken to prevent the development of any organised attempt from outside to invade the Indian gur market. *। প্রসঙ্গতঃ, এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, কিছু দিন হইল জাপান ভারতে মিছরী চালান দেওয়া আরম্ভ করিয়াছে। কিউবা এবং ফরমোসা হইতে কাঁচা চিনি (raw sugar) জাপানে আমদানী করা হয়; সেটাকে মিছরী করিয়া ভারতে যখন রপ্তানী করা হয়, তখন আমদানী চিনির উপর যে শুল্ক দিতে হইয়াছিল তাহা ফেরত দেওয়া হয়; এবং তাহা ছাড়াও রপ্তানীকারকদিগকে জাপান গভর্ণমেণ্ট অর্থ-সাহায্য করেন। জাপানী জাহাজ কম ভাড়ায় ভারতে মাল পৌছাইয়া দেয়; সে জন্য জাপানী জাহাজ-কোম্পানীরা জাপান গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য (subsidy) পায়। তার পরে জাপানী মুদ্রার (ইয়েন) মূল্য বিনিময়ে (exchangeএ) কম করিয়া দেওয়ার জন্য খুব কম দামে জাপানী ব্যবসায়ীরা তাহাদের জিনিষ

* Indian Traiff Report (1931) p. 37.

ভারতে বিক্রয় করিতে পারে। এই সব নানা রকম সুবিধা পাইয়া জাপানীরা প্রতি হন্দর মিছরী ভারতের বাজারে ষোল টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। পক্ষান্তরে, ভারতের প্রস্তুত মিছরী সাড়ে আঠার টাকা হন্দরের কম বেচিতে পারা যায় না *। লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাই যে, প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট নিজের দেশের শিল্প-বাণিজ্যের রক্ষা, উন্নতি এবং বিস্তার-কল্পে যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া অষ্ট প্রহর সতর্ক দৃষ্টিতে জাগিয়া রহিয়াছে। যা হোক্, আমরা কল্পনা করিতেছি যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভারতের চিনি, মিছরী, গুড় প্রস্তুত করার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল, সস্তা বিদেশী চিনি, মিছরী ও গুড়ে আমরা রসনা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলাম এবং অনর্থক ক্ষতির হাত হইতে উদ্ধার পাইলাম। কিন্তু ভারতে এখন প্রায় ৮০,৯০ লক্ষ বিঘা জমিতে আকের আবাদ হয়, এই জমিতে তখন কিসের আবাদ হইবে? সহস্র সহস্র ভারতবাসী এখনও আকের আবাদ করিয়া, চিনি গুড় প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদের উপায় কি হইবে? এই সব অসংখ্য বেকারের অন্ন-সমস্যার সমাধান করিবে কে? সে দায়িত্ব কাহার হইবে? যদি দেশের রাজ-প্রতিষ্ঠানকে তাহারা বলে যে, আমরা দরিদ্র বেকার হইলেও দেশের প্রজা; প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত রাজ-শক্তি দায়ী; আমরা কাজ করিতে প্রস্তুত আছি; হয় কাজ দাও, নয় খাইতে দাও; তাহা হইলে পুলিসের লাঠির 'মৃদু আঘাত' অথবা পুলিস ফৌজের বন্দুক ছাড়া তাহার ন্যায়সঙ্গত, সহৃদয় এবং শোভন উত্তর কি হইবে? তাহারা যদি জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ কোন অন্যায় বা অশান্তিকর পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে কি না? এ চিত্র কি মঙ্গলের চিত্র? শান্তির চিত্র? বরং কিছু বেশী মূল্যে চিনি কিনিলে, যদি এই সব সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়, আকের চাষ আরও বহু-বিস্তৃত হয়, চিনির কারখানার সংখ্যা বাড়ে, বেকারের হাহাকার অনেকটা কমে,—দেশের টাকা দেশে থাকে, জনসাধারণের মঙ্গলের দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কি তাহাই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না? অন্যান্য দেশে সাধারণ তহবিল (রাজ-কোষ) হইতে বেকারদিগকে গভর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাও তো জন-সাধারণের অর্থ হইতেই দেওয়া হয়। অত্যাবশ্যক শিল্প বা পণ্য সম্বন্ধে দেশ আত্ম-প্রতিষ্ঠ না হইলে, বাহিরের বিপদের সময় দেশকে যে কি পরিমাণ ক্ষতি এবং অসুবিধা সহ্য করিতে হয়, তাহা গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় অনুভব করা গিয়াছে, এ কথাও মনে রাখিতে হইবে।

আরও দেখিতে হইবে যে, রাজনৈতিক এবং অর্থ-নৈতিক হিসাবে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত অন্যান্য স্বাধীন দেশে কি প্রথা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহারা কোন্ নীতি মানিয়া চলিতেছে। ইহা দেখিতে হইলে, সেই সব দেশের কোন্ দেশে চিনি প্রস্তুতের খরচ কত, প্রথমে আমরা তাহাই দেখিব। নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল—

দেশ			খরচা প্রতি হন্দর শিলিং—পেন্স
কিউবা	...	...	৮—৪½
জাভা	...	...	৯—৩
ফিজি	...	...	১২—৩
ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিস্	...	...	১২—৪½
হাওয়াই	...	...	১৩—৬½
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	...	১৫—৮½
জার্ম্মাণী	...	...	১৫—১১½
ফরমোসা	...	...	১৭—৭
আমেরিকা (বীট)	...	...	১৮—৮
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	২৩—০
আর্জ্জেণ্টাইন	...	...	২৪—৩
ভারতবর্ষ	...	...	১৫—৯ হইতে ১৭—০

(Indian Tariff Report—1931. p. 36.)

ভারতবর্ষে এক হন্দর চিনি প্রস্তুত করিতে ১০।/০ আনা হইতে ১১৶০ আনা অর্থাৎ ১৫ শিলিং ৯ পেন্স হইতে ১৭ শিলিং পর্য্যন্ত খরচ পড়ে। উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, এক হন্দর (১ মণ—১৫ সের) চিনি প্রস্তুত করিতে কিউবাতে ৮ শিলিং ৪ পেন্স (ভারতের

* Amrita Bazar Patrika, Feb 28 1933.

এক মণে ৪।০ টাকা) জাভাতে ৯ শিলিং ৩ পেন্স (এক মণে ৫৲ টাকা) খরচ পড়ে। কিউবা জাভা অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়াতে প্রায় আড়াই গুণ বেশী খরচ পড়ে, কিন্তু সেই অষ্ট্রেলিয়াতে বিদেশী চিনির প্রবেশই নিষেধ। জার্ম্মানীতে প্রায় দ্বিগুণ খরচ পড়ে, ভারতের হিসাবে প্রতিমণে ৮৷৵ টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু সেই জার্ম্মানীতে বিদেশী চিনির উপর শুল্ক (protective duty) আছে প্রতি মণ ৭৸৹ টাকা। জার্ম্মানী অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের কত ক্ষতি হইতেছে! এমন কুকার্য্য জার্ম্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ কেমন করিয়া করিতেছে? অদূর ভবিষ্যতে তো নয়ই, সুদূর ভবিষ্যতেও জার্ম্মানী বা অষ্ট্রেলিয়াতে কিউবা বা জাভার মত সস্তায় চিনি উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, কিম্বা সম্ভব হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা (reasonable certainty) নাই। অথচ ভারতবর্ষে যখন বিদেশী চিনির উপর ইং ১৯৩২ সালে ৫।৵১০ টাকা মণপ্রতি শুল্ক ধরা হয়, তখন টেরিফবোর্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভা পর্য্যন্ত সকলেরই এমন সঙ্কোচ এবং লজ্জিত ভাব, যেন এ কুকাজের আর কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পান্ না! সার জর্জ্জ রেণীর বক্তৃতার উত্তরে বড় গলায় জোর করিয়া এ কথা বলার লোক বেশী ছিল না যে, যে পর্য্যন্ত বিদেশী এক মণ চিনিও ভারতের বাজারে বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা ভারতের চিনিশিল্পকে যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষণ শুল্কের দ্বারা রক্ষা করার চেষ্টা করিব; আমাদের অর্থ-নীতি আমরা ভারতের বিশেষ অবস্থা এবং অভিজ্ঞতার উপরই প্রতিষ্ঠিত করিব, কোন ব্যক্তি বিশেষের সন্দেহ বা মতের উপর নয়। সমস্ত প্রধান শিল্প সম্বন্ধেই অল্প-বিস্তর এই কথা খাটে। অটোয়া চুক্তিতেও আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও নিজের দেশের শিল্প-বাণিজ্য রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন হইলেই অবাধ-বাণিজ্য-নীতি বিশেষ আগ্রহের সহিত ধামা-চাপা দিতে ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। যাহোক, ভারতের চিনি-শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে চিনি-শিল্প-সংরক্ষণ-আইন পাশ হইয়াছে এজন্য টেরিফ বোর্ড, ব্যবস্থাপক সভা, সিলেক্ট কমিটি এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট ভারতবাসী কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমরা আশা করি, যত দিন ভারতের বাজারে বিদেশী চিনি বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভারতের চিনি-শিল্প ব্যবস্থাপক সভা এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইবে না। আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিলে এখনও ভারতের মৃতপ্রায় চিনি-শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু ধ্বংস-প্রাপ্ত, লুপ্ত ব্যবসাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে, তেমনি আন্তরিকতার সহিত আয়োজন করিতে হইবে। লেফাপা-দোরস্ত চেষ্টায় বা আন্তরিকতাহীন বৃথা আড়ম্বরে মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার হয় না, ধাপ্পা দেওয়া চলিতে পারে।

বাজারে এখনও জাভা চিনি বিক্রয় হইতেছে, এখনও বিদেশী চিনি ভারতে আমদানী হইতেছে। জাভা চিনি ভারতের বাজারে বিক্রয় করার তাহারা না কি নূতন পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। জানি না কোন্ ভ্রাতাদের সহায়তায় বিদেশীরা কোন্ নূতন পথ অবলম্বন করিবে। ভারতের চিনি-শিল্পকে রক্ষার নিমিত্ত হয় তো শুল্কের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এদিকে আবার শুনিতেছি, ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ না কি চিনির কারখানা আর বেশী না হয়, তাহার চেষ্টাও করিতেছেন। ফল কথা, ভারতের বণিক-সমিতিগুলির এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড উইলিংডন গত ইং ১৯৩২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের ব্যবস্থাপক সভায় যে অভিভাষণ দেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—

"Honourable members will remember that as a result of the recommendations of the Sugar Committee of the Imperial Council of Agriculture Research and of the Tariff Board's enquiry that followed, the Sugar Industry Protection Act was passed in April last. The impetus which this protection has given to the industry may be gauged from the fact that about 24 sugar factories have been or are about to be set up in Northern India in the current year and more are expected to follow. There is considerable scope for the expansion and development of

the sugar industry in this country both in the agricultural and manufacturing side. My Government fully realise the value of research in this connection and it is their declared intention to assist this development by provisions of funds to the Imperial Council for sugar research."

আমরা আশা করি, ভারতের সর্ব্বপ্রধান ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সার্থক হইবে,—চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, আমাদের সেই সুপরিচিত পুরাতন বন্ধু 'অর্থাভাব'এর বিশাল গহ্বরে সকল সদিচ্ছা, সকল প্রেরণা এবং আন্তরিকতা সমাধি প্রাপ্ত হইবে না।

বর্ষা

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(১)

অয়ি বর্ষে! দেবতার সৌন্দর্য্য-দুহিতা,
এস, তব অভিনব রূপরস ল'য়ে,
নিদাঘ-তাপিত ধরা চাহিতেছে তোমা ;
এস, তব ঘনমেঘকুণ্ডল উড়ায়ে।

(২)

সারা বিশ্ব গ্রীষ্ম তাপে নিপীড়িত হেরি,
জলের আধার সব গিয়াছে শুকায়ে
নদনদী সরোবরে নাহি কোনো বারি
সকলে রয়েছে শুধু আকাশে তাকায়ে।

(৩)

জগৎ ব্যাপিয়া উঠে "জল জল" ধ্বনি,
"জল" নামে সকলের পরাণ আকুল।
অয়ি বর্ষে! এস, সাথে এই জল আনি
তৃপ্ত করে দাও তুমি সব জীবকুল।

(৪)

জীর্ণ ঘরে, শুষ্ক মাঠে কৃষক-দম্পতি,
হতাশে চাহিয়া আছে তব মুখ পানে,
দেবতা চরণে করে ব্যাকুল প্রণতি,
ধান্য হ'লে দেশবাসী বাঁচিবে পরাণে।

(৫)

শুষ্ক তটিনীর তীরে বাঁধি তরীখানি,
বিষাদে বসিয়া আছে বণিক সুজন,
কবে বর্ষা স্রোতধারা বহিবেক আনি
পণ্যজ সংগ্রহে তরী ভাসিবে তখন।

(৬)

আবেগে কবির হিয়া উথলি উঠিবে,
বর্ষে! তব অনুপম সৌন্দর্য্য নেহারি।
নবীন নূতন রূপ জগৎ ধরিবে
স্বরগের শোভা হয় তুলনা তাহারি।

(৭)

ছুটিবে আকুল বেগে গিরি দরি বহি
যৌবন-স্পন্দন-মদ-মত্ত স্রোতস্বিনী.
কুল কুল রবে সদা প্রেম-গান গাহি
ভুলাবে সকল মন নৃত্যে তরঙ্গিনী।

(৮)

বনরাজি নবপত্রে পূর্ণ শোভা ধরি,
ফোটাবে বিচিত্ররূপে কত ফুলদল।
অনিল বহিবে গন্ধ চারিদিক ভরি,
তরুলতা ধরিবেক মনোহর ফল।

(৯)

তুমি ত আসিবে বর্ষে! নব রূপে মাতি,
সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু দিবে রাঙ্গা মেঘ।
নিবিড়কুন্তলভার মেঘজাল পাতি,
হানিবে কটাক্ষ ঘন বিদ্যুতের বেগ।

(১০)

নব দূর্ব্বাদলশ্যাম ধরণী আদরে
পাতিবে অঞ্চলখানি কোমল পরশে।
তব বারিধারা বিন্দু ল'য়ে বুকে ক'রে,
সুন্দর জগৎ হবে মগন হরষে।

যতীন্দ্রমোহন

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ একটি স্মরণীয় দিন। এই ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে কলিকাতাবাসী, বঙ্গবাসী, তথা ভারতবাসী শুনিল বাঙ্গলার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন! বন্দী বীরের এই আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতবর্ষ শোক-বেশ পরিধান করিল—দোকান-পাট বন্ধ রহিল! দেশের এই প্রিয় সন্তানের জীবনাবসানে দেশবাসীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল।

যতীন্দ্রমোহন ভারতের অন্যতম অবিসম্বাদিত নেতা। তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র; তিনি দেশের সম্ভ্রান্ত, পদস্থ, মান্যগণ্য, জন-সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন নাগরিক। কিন্তু কেবল এই সকল কারণেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। দেশের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, যে দুঃখ হাসিমুখে বরণ করিয়াছেন—দেশ সেবার জন্য যে ভাবে দেহপাত করিয়াছেন, অবশেষে বন্দীদশায় যে ভাবে দেহ বিসর্জ্জন দিলেন, ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তাহার তুলনা বড় বেশী নাই।

৭ই শ্রাবণ রবিবারের প্রভাত—সুপ্রভাত, না কুপ্রভাত? আপাত-দৃষ্টিতে এই প্রভাত সুপ্রভাত বটে—এই প্রভাতে সুপ্তোত্থিত নগরবাসী শুনিল যতীন্দ্রমোহন আর নাই—জনসাধারণ আর তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না—আর তাঁহার মুখে আশার বাণী শুনিবে না—বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়া জয়যাত্রার পথে পরিচালিত হইবে না।

কুপ্রভাত বৈ কি! যতীন্দ্রমোহন অসুস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দিন যে এত নিকট হইয়া আসিয়াছে, তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই। রবিবার

যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত

প্রত্যুষের সংবাদপত্র বহন করিয়া ফেরীওয়ালারা যখন কলিকাতাবাসীর দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিয়া ফিরিতে লাগিল—"যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পরলোকে," তখন

নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন সদ্য সুপ্তোত্থিত নগরবাসীর কর্ণে তাহা অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই শুনাইল। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই দিবসের প্রথমেই, সংবাদপত্র খুলিয়াই, এই সংবাদ পাঠ করিয়া, রবিবারের প্রভাত যে কুপ্রভাত হইয়া আসিয়া দর্শন দিল, তদ্ব্যতীত, আর কি বলা যাইতে পারে?
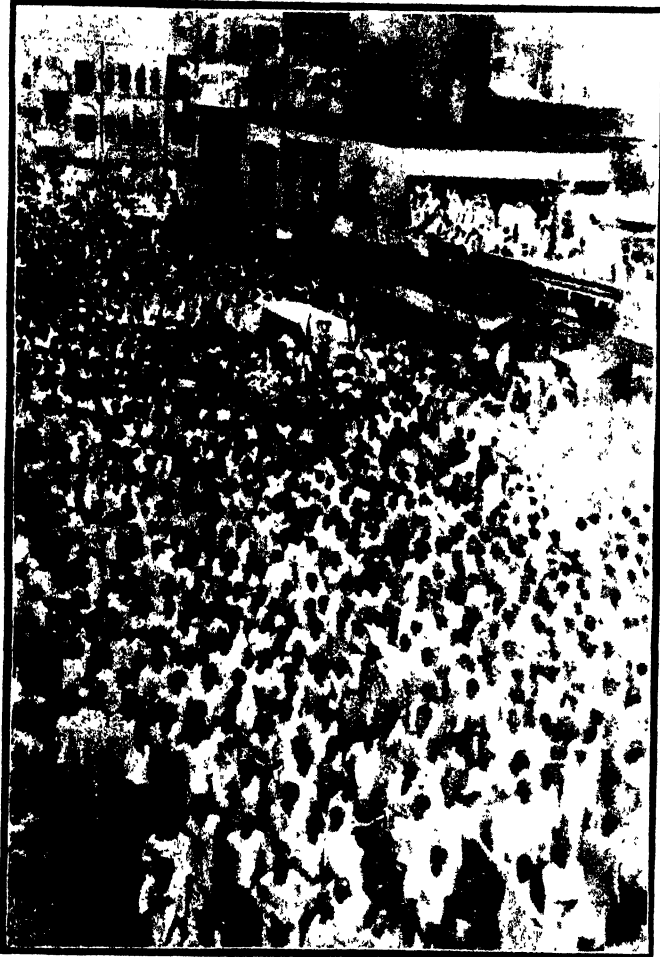
শব-যাত্রা—(কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সঙ্গমস্থলে)
(আলোকচিত্র গ্রহীতা—শ্রীমান্ সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কিন্তু না। এই ৭ই শ্রাবণ রবিবারের প্রভাত ঠিক কুপ্রভাত নহে—ইহাকে সুপ্রভাত বলিলেও অসঙ্গত হইবে না।

মৃত্যু চিরদিন বিভীষিকা লইয়াই দেখা দিয়া থাকে। প্রিয়জনের সহিত চিরবিদায়ের নিশ্চয়তা লইয়া আসে বলিয়া মৃত্যু কাহারও কাছে প্রীতিকর হয় না। চঞ্চল, গতিশীল জীবন মৃত্যুর কঠোর স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে গতিহীন, স্তম্ভিত হইয়া যায়। এ মৃত্যু কে কামনা করিতে, বাঞ্ছা করিতে পারে?

কিন্তু মানুষের জীবনে, জাতির জীবনে এমন সময় আসে যখন বিভীষিকাময় মৃত্যুও অবাঞ্ছনীয় হয় না। মৃত্যুর এই রূপ সুন্দর, কাম্য, বাঞ্ছনীয়, বরণীয়!

যতীন্দ্রমোহন! বাঙ্গলার যে যে স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বরেণ্য, চট্টল তন্মধ্যে অন্যতম। সেই সুন্দরী চট্টলের যতীন্দ্রমোহন! বাঙ্গলার অদ্বিতীয় নেতা যতীন্দ্রমোহন! বাঙ্গালা মায়ের সর্ব্বস্বত্যাগী দুঃখী যতীন্দ্রমোহন! বাঙ্গালার ভাগ্যদোষে তিনি বন্দী! জন্মভূমি হইতে সুদূরে নির্ব্বাসিত,—আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন! এমন অবস্থায়, যখন মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই তখন,তেজস্বী স্বদেশ-সেবকের মৃত্যু অবাঞ্ছনীয় নহে। দেশ-মাতৃকার নির্ভীক কর্ম্মবীর হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করিয়া চিরমুক্তি লাভ করিলেন। রবিবারের প্রভাত সুপ্রভাতও বটে—জনগণমনঅধিনায়কের মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাত তাঁহার চিরমুক্তির বার্ত্তা আনিয়া ভারতের ঘরে ঘরে বিলাইয়াছে। ৭ই শ্রাবণ রবিবারের প্রভাত সুপ্রভাত নয় ত কি?

কলিকাতায় আয়োজন

রবিবারের অবশ্য কৃত্য সম্পাদনের পর কলিকাতার জনসাধারণ পর দিন সোমবারের কৃত্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রাঁচি হইতে সংবাদ আসিল, যতীন্দ্রমোহনের দেহাবশেষ সোমবার প্রত্যুষে হাবড়ায় আসিয়া পৌছিবে। কলিকাতার নাগরিক মরণোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

ভারে ভারে পুষ্পসম্ভার সংগৃহীত হইল। যতীন্দ্রমোহনের শব-শোভাযাত্রা হাবড়া হইতে কোন্ কোন্ পথ দিয়া জয়-যাত্রা করিবে তাহা নির্দ্ধারিত হইল। সেই সকল পথের চতুষ্পথগুলিতে তোরণ নির্ম্মিত হইতে লাগিল; তোরণ-গুলি পুষ্পস্তবকে সজ্জিত হইতে লাগিল। সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি যতীন্দ্রমোহনের শবদেহের যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া উৎসাহে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সোমবারের অনুষ্ঠানের উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইল।

রাঁচি হইতে যাত্রা

রবিবার বেলা দুই ঘটিকার সময় যতীন্দ্র-মোহনের রাঁচিস্থিত অস্থায়ী বন্দীনিবাস হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইল। শবদেহ সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর স্থাপন করিয়া তদুপরি রাশি রাশি পুষ্পস্তবক আস্তৃত করা হইল। তৎপূর্ব্বেই দেহের পচন নিবারণের জন্য কলিকাতা হইতে তারযোগে প্রেরিত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে ঔষধাদি ইন্‌জেক্ট করা হইয়াছিল। স্থানীয় জনগণ শবদেহ শেষ দেখা দেখিয়া লইবার পর পালঙ্কে শায়িত করিয়া পুষ্পরাশিতে তাহা আবৃত করা হইল। শোকার্ত্ত নরনারীর বিপুল শোভাযাত্রা রাঁচির প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিল। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় শবদেহ কলিকাতাগামী ট্রেনের একখানি স্পেশাল সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল—সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। রাঁচির জনসাধারণ শ্রদ্ধানত মস্তকে শবদেহের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল।

ট্রেন রাঁচি হইতে ডাউন নাগপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন মরি এবং জামসেদপুরের পথে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল। এদিকে শবদেহকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য কলিকাতা হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কয়েকটি দল রেলপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন।

রামরাজাতলা ষ্টেসনে ট্রেন পৌছিলে শবদেহ ট্রেন হইতে নামাইয়া মোটরযোগে হাবড়ায় আনয়ন করা হইল।

কলিকাতায়

সোমবার প্রত্যূষ হইতেই বিশাল জনতা হাবড়ার ময়দানে সমবেত হইয়াছিল। সকাল সাড়ে আটটার

যাত্রা-পথে (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সঙ্গমস্থলে মহিলাবৃন্দের শবানুগমন) (আলোক-চিত্র গ্রহীতা—শ্রীমান্ সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

সময় হাবড়ার টাউনহল হইতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া শবদেহ কলিকাতায় আনয়ন করা হয়।

সেদিন সকালে রাজপথ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে কি দেখিলাম! হাবড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিবার পর

শোভাযাত্রা যতই অগ্রসর হইতে থাকে, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পথের উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাগুলির জানালা, দরজা, বারাণ্ডা, ছাদ নরনারীতে সমাচ্ছন্ন। আর পথে বিশাল জনসমুদ্র।

বেলা প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকার সময় শোভাযাত্রা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "ভারতবর্ষ" কার্য্যালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

জানালা, বারান্দা, ছাদ হইতে পুরমহিলারা শঙ্খধ্বনি করিয়া পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করিতে থাকেন। বর্ষাকাল, আকাশে কিন্তু মেঘাড়ম্বর তেমন ছিল না। সেই জন্য, বেলা যত অধিক হইতে থাকে, গ্রীষ্ম ততই প্রবল ভাবে অনুভূত হইতে থাকে। তদুপরি বিশাল জনতা। পথের মধ্যস্থলে নগ্নপদ নরনারী—অবিরাম জনস্রোত। পথের উভয় পার্শ্বে কাতারে কাতারে দর্শক। হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী—জাতিবর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অপূর্ব্ব সমন্বয়। গলদ-ঘর্ম্মাক্ত কলেবর জনস্রোতের ক্লেশ নিবারণের জন্য পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলি হইতে চলমান জনতার উপর বারিধারা বর্ষিত হইতেছিল।
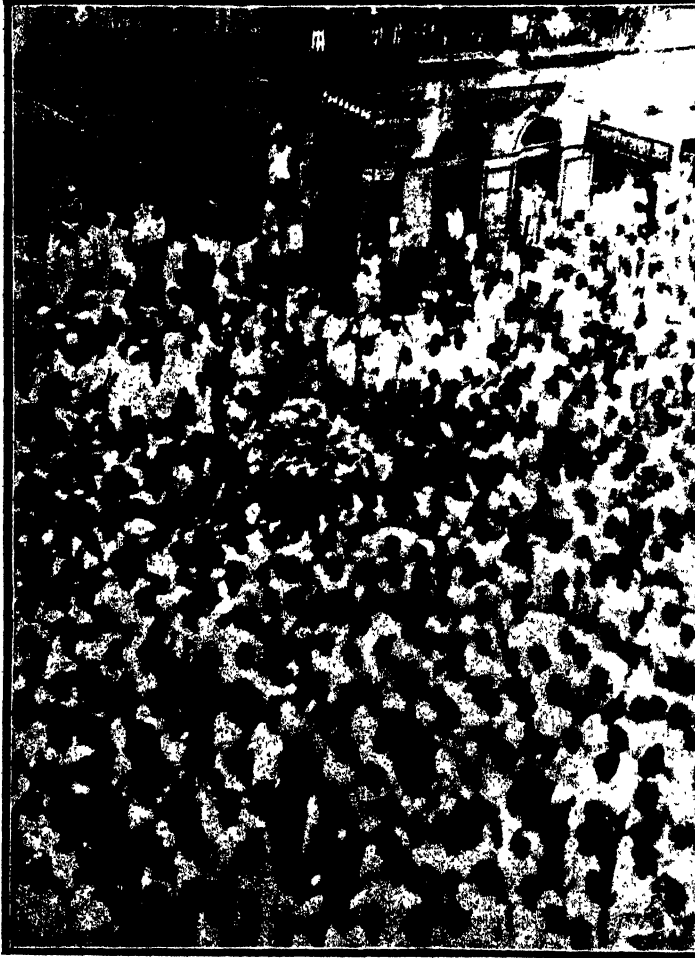
যাত্রা-পথে ('ভারতবর্ষ' আফিসের সম্মুখভাগে) (আলোকচিত্র গ্রহীতা—শ্রীমান্ সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কলিকাতাবাসী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতীর শব-দেহের জয়-যাত্রা দেখিয়াছেন, চিত্তরঞ্জনের জয়-যাত্রা দেখিয়াছেন, যতীনদাসের জয়-যাত্রা দেখিয়াছেন, সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে তাহাদের বর্ণনাও পাঠ করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহনের জয়-যাত্রাও তদনুরূপই হইয়াছিল। কলিকাতার cosmopolitan জনসাধারণ যতীন্দ্রমোহনকে দেশনেতার যোগ্য সম্মান দিতে কৃপণতা করে নাই। "বন্দে মাতরম্", "জয় সেনগুপ্ত কি জয়" ধ্বনি করিতে করিতে triumphal archএর ভিতর ও পার্শ্ব দিয়া এই শোভাযাত্রা triumphal march করিয়াছিল। যে যে স্থান বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সেনগুপ্তের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, পথিমধ্যে সেই সেই স্থলে

শোভাযাত্রা এক একটি চতুষ্পথে বিজয়-তোরণের নিকট উপস্থিত হয়, আর উপস্থিত প্রতীক্ষমান সম্ভ্রান্ত নগরবাসীরা অগ্রসর হইয়া শবাধার পুষ্পভারে আবৃত করেন। পথের উভয় পার্শ্বের গৃহগুলির দরজা,

শোভাযাত্রা কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল—লোকে এই সময়ে তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল—শেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রায় অপরাহ্নকালে বিরাট শোভাযাত্রা কেওড়াতলার শ্মশান
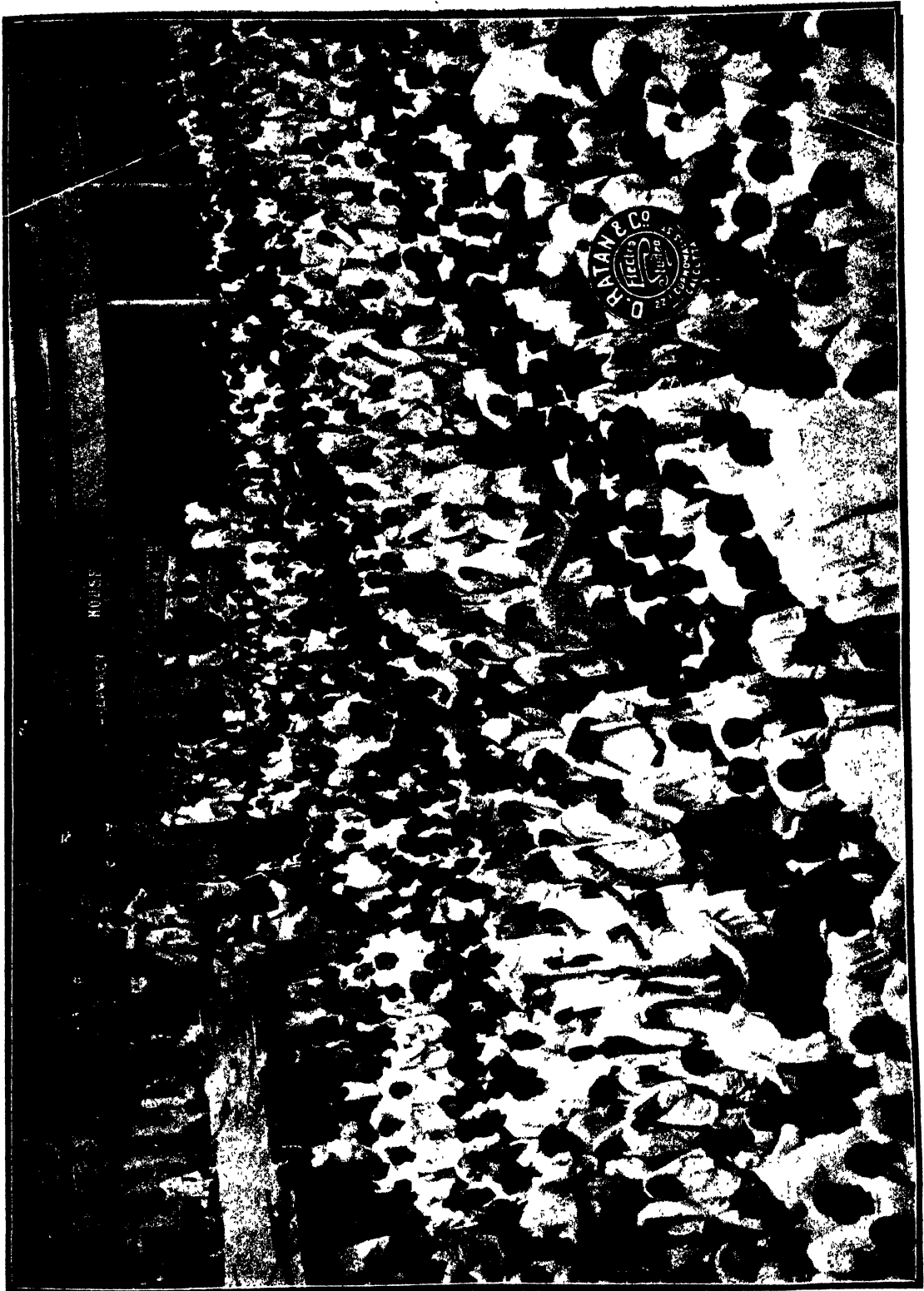
যাত্রা-পথে (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে) (আলোকচিত্র গৃহীতা—ডি, রতন—এণ্ড কোং)

ঘাটে পৌঁছিল। বঙ্গের অদ্বিতীয় জননেতা চিত্তরঞ্জনের চিতা যেখানে জলিয়াছিল, তাহার পার্শ্বে তাঁহার উত্তরাধিকারী, তাঁহার সোদরোপম নেতা যতীন্দ্রমোহনের দেহাবশেষও পঞ্চভূতে পরিণত হইল। সেনগুপ্তের জন্মভূমি চট্টলের অধিবাসীরা সেনগুপ্তের দেহ ভস্মীভূত করিবার দাবী করিয়াছিলেন,—শবদেহ চট্টগ্রামে পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়া তার করিয়াছিলেন। তাহা সম্ভব হয় নাই। তবে দেহের ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিয়া রৌপ্যাধারে স্থাপন করিয়া যথোচিত সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমারোহ সহকারে বিশেষ বন্দোবস্তে চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের যাত্রামোহন হলের পার্শ্বে একটি চিহ্নিত ভূমিখণ্ডে ভস্মাবশেষ সমুচিত অনুষ্ঠানের সহিত সমাহিত হইয়াছে। যেদিন যতীন্দ্রমোহনের শবদেহ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে, সেই সোমবার চট্টগ্রামে একটি জনসভায় দেহাবশেষের সমাধি অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। সমাধির উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের কল্পনা হইয়াছে। স্মৃতিস্তম্ভের জন্য স্বতন্ত্র চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে। স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণে যে টাকা ব্যয় হইবে, সংগৃহীত চাঁদার টাকায় তাহার সমগ্র ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে, অতিরিক্ত যাহা ব্যয় হইবে, তাহা চট্টগ্রামের অধিবাসী আসাম-প্রবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় রাজকুমার ঘোষ M. L. C. বাহাদুর দিবেন বলিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে ভেদ নাই, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীতে ভেদ নাই, শত্রু-মিত্রে ভেদ নাই —ভারতের যেখানে যে এই সংবাদ শুনিয়াছে, সেই অশ্রুপাত করিয়াছে, সেই সমবেদনা জানাইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী

এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া মহাত্মা গান্ধী "এ্যাডভান্স" পত্রের আপিসে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার নামে তারের বার্ত্তা প্রেরণ করেন—এইমাত্র সেনগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ শুনিলাম। আপনার এই ক্ষতি সমগ্র জাতিরই ক্ষতি। আপনার এই নিদারুণ শোকে অসংখ্য লোক সমবেদনা জ্ঞাপন করিবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে আমাকেও গ্রহণ করিবেন—গান্ধী।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার করেন—নির্ভীক যতীন্দ্রমোহনের নিকট দেশের উন্নতির জন্য কোন ত্যাগই অত্যুচ্চ ছিল না। তিনি তাঁহার অর্থকরী জীবিকা ছাড়িয়া দিয়া সপরিবারে কঠিন সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপাইয়া সুখলেশহীন কঠোর জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সহৃদয় এবং অমায়িক ব্যবহারে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের চিত্তজয়ী জননায়ক। জাতীয় জীবনের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার মত একজন নেতার তিরোধান ভারতবর্ষের পক্ষে অসহনীয়। রাজবন্দীরূপে বহুদিন কারাবাসের ফলেই যে তাঁহার অকালমৃত্যু এত শীঘ্র ঘটিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি উন্নতমনা শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। এবং তাঁহার দেশমাতৃকার স্বাধীনতার বেদীর উপর তিনি মহোল্লাসেই জীবনাঞ্জলি দিলেন। এইরূপ মহান জীবনের এই স্বচ্ছন্দ নির্ব্বাণের স্মৃতি ভারতবর্ষের পক্ষে যেমন গৌরবের কথা তেমনি লজ্জারও বিষয়।—রবীন্দ্রনাথ।

তা' ছাড়া ভারতের ছোটবড় সকল নেতা, সকল প্রধান ব্যক্তি তার যোগে সমবেদনা জানাইয়াছেন।

রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সকল প্রতিষ্ঠানের জাতীয় পতাকা সেনগুপ্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অর্দ্ধনমিত রাখা হইয়াছিল।

জীবন-কথা

যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহন চট্টগ্রামবাসী এবং চট্টগ্রামের উকীলদিগের নেতা ছিলেন। তিনি যখন প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তখন মফঃস্বলের উকীলরা রাজনীতিচর্চ্চায় জাতীয় দলের মত সমগ্র দেশে বিস্তার করিতেন। যাত্রামোহনেরও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আহ্বানে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনের জন্য চট্টগ্রামে সম্মিলন আহ্বান করিতে তিনি পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে ফরিদপুরে পাঠাইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। চট্টগ্রামে ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৯০৪

খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ব্যারিষ্টারীর জন্য অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পঠদ্দশায় তিনি খেলায় কৃতিত্ব দেখান এবং বিলাতে ভারতীয়দিগের সমিতিতে সভাপতি ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পর বৎসর হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ক্রমে ব্যবহারাজীব হিসাবে ফৌজদারী মামলা পরিচালনে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পায় এবং বোম্বাইতে ইন্দোরের মমতাজ-ঘটিত বাওলা-হত্যার মামলায় তিনি ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার নেতৃত্বগুণ বিকশিত হয়, তেমনই তিনি আপনার সর্ব্বস্ব দুঃস্থ ধর্ম্মঘটকারীদিগকে প্রদান করিয়া দারিদ্র্য বরণ করেন। এই দারিদ্র্য তিনি সঙ্গের সাথী করিয়াছিলেন।

তিনি চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলে যোগ দেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার বাগ্মিতা ও যুক্তিযুক্ত কথা বিশেষ ফলোপধায়ী হইত। অকালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু ঘটিলে মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে তাঁহাকে মৃত নেতার স্থলাভিষিক্ত করিয়া কলিকাতার মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগেস কমিটীর সভাপতি ও ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলের নেতা করা হয়।

তিনি পাঁচ বার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়া-

সব শেষ (আলোচিত্র-গ্রহীতা—সুধা ও রাউত)

যে সময় তিনি ব্যবহারাজীবরূপে সাফল্য লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ করেন, সেই সময়েই দেশে রাজনীতিক আন্দোলনও বিপুল বন্যার মত আসিয়া পড়ে। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন। চিত্তরঞ্জন দাসের মত যতীন্দ্রমোহন সেই আন্দোলনে যোগ দিয়া ব্যবসা ত্যাগ করেন।

এই সময় আসাম-বেঙ্গল রেলে ধর্ম্মঘট হয় এবং প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় প্রায় চৌদ্দ হাজার লোক আড়াই মাস কাল ধর্ম্মঘটে অবিচলিত থাকে। এই সময় যেমন

ছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার উপর কাউন্সিলারদিগের শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যবাহুল্য হেতু যাইতে পারেন নাই।

তিনি রেঙ্গুণে, কলিকাতায় ও দিল্লীতে রাজদ্রোহ ও আইন ভঙ্গের অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হইয়া আটক হয়েন; সেই অবস্থাতেই তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছে।

সাময়িকী

পুণা সম্মিলন ও কংগ্রেস—

মহাত্মা গান্ধী প্রায়োপবেশনের পর বল লাভ করিলে পুণায় কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের যে সম্মিলন হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—কর্ম্মীরাও সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তাহাতে আইনভঙ্গ আন্দোলন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা "ন যযৌ ন তস্থৌ" ধরণের। আইনভঙ্গ আন্দোলনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমরা গত মাসে দেখাইয়াছিলাম। এই আন্দোলন যে অসহযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, মহাত্মাজী "হরিজন" আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার মূলনীতি হইতে কতকটা বিচ্যুতির সমর্থন করিয়াছিলেন। বিশেষ, এইরূপ আন্দোলনের সাফল্যের জন্য যে সকল অবস্থার প্রয়োজন, সে সকল অনুকূল অবস্থাও আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কংগ্রেসকর্ম্মী মিষ্টার আসফ আলি একখানি অনতিদীর্ঘ পত্রে মহাত্মাজীকে তাহা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই পত্রে তিনি দেখাইয়াছিলেন—ভারতবর্ষের ৩৫ কোটি অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ সামন্তরাজ্যসমূহের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাদিগের রাজনীতিক সমস্যা স্বতন্ত্র। তাহার পর ৫০ লক্ষ লোক সরকারের চাকরীয়া—তাঁহাদিগের জন্য বৎসরে সরকার দুই শত কোটি টাকা ব্যয় করেন। আরও প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সরকারী চাকরী পাইবার চেষ্টা করেন। এই যে ১ কোটি লোক ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বজন যদি ৫ জন হিসাবে ধরা যায়, তবে আরও ৫ কোটি লোককে বাদ দিতে হয়। আবার বর্ত্তমানে যে মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগদান করিতে অসম্মত, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সেইজন্য আরও প্রায় ৬ কোটি লোক বাদ দিতে হয়। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে অবশিষ্ট ১০ কোটি লোক রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের জন্য আগ্রহশীল। এই ১০ কোটি লোকের মধ্যে কতজন আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন? কাজেই এমন কথা বলা যায় না যে, আইনভঙ্গ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণতি লাভ করিয়াছে বা তাহা দেশের অধিকাংশ লোককে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে। তদ্ভিন্ন, যে কারণে এবার আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে কারণও আর নাই। যে সকল অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, সে সব অর্ডিনান্সের অনুরূপ আইন ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে বিধিবদ্ধ হইলেও অর্ডিনান্স আর নাই।

সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন, কংগ্রেস আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন এবং তখন সকল দলের লোক একযোগে রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তি চাহিলে সরকার তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইবেন।

কিন্তু পুণার বৈঠকে মহাত্মাজী মত প্রকাশ করেন—বিনা সর্ত্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করা যাইতে পারে না। সেই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিতীয় প্রস্তাবে মহাত্মাজীকে মীমাংসার উপায় স্থির করিবার চেষ্টায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতে বলা হয়!

গত বৎসর বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বন্দী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মহাত্মাজী যখন বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, তখন বড়লাটের পক্ষ হইতে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে এবার যে অনুরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ অবশ্যই ছিল না। সেবার বড়লাটের পক্ষ হইতে লেখা হইয়াছিল—

"Government can hardly believe that you (Mr. Gandhi) or the Working Committee contemplate that His Excellency can invite you with the hope of any advantage to an interview held under the threat of resumption of Civil Disobedience."

এবার অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং বড়লাটের উত্তরও এইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু সে উত্তর

পাইয়া মহাত্মাজী পুনরায় তার করেন। তাহাতে তিনি বড়লাটের উত্তরে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে বৈঠকের কার্য্যের বিবরণ গোপন রাখা হইয়াছে, সংবাদপত্রাদিতে তাহার বিবরণ দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সরকারের পক্ষে সঙ্গত নহে। বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, বৈঠকের সদস্যরা শান্তিপ্রয়াসী। ইহাতে বড়লাটের পক্ষ হইতে যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

"বড়লাট আশা করিয়াছিলেন যে, সরকারের সঙ্কল্প সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। সরকারের কথা এই যে, আইনভঙ্গ আন্দোলন আইনবিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা সরকারকে ভীতিবিহ্বল করিবার জন্য পরিকল্পিত। যে প্রতিষ্ঠান সে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নাই, সরকার তাহার প্রতিনিধির সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।"

মহাত্মাজীর পক্ষের কথা—তিনি উভয় পক্ষের সম্মান-জনক মীমাংসার দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বড়লাটকে সে জন্য সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান চেষ্টায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে বড়লাট আরউইনের সহিত তাঁহার আলোচনায় সুফল ফলিয়াছিল।

আবার কেহ কেহ বলেন—প্রথমবার প্রত্যাখ্যানের পর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া মহাত্মাজী কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষায় অবহিত হয়েন নাই। বহু দিন পূর্ব্বের কথা—লর্ড ল্যান্সডাউন যখন বড়লাট, তখন সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া সরকার যে ইস্তাহার প্রচার করেন, কংগ্রেস তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সরকারকে আপনাদিগের কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। তাহার পর লর্ড কার্জ্জন যখন বড়লাট, তখন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সার হেনরী কটন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, তিনি সরকারের পুরাতন কর্ম্মচারী সার হেনরীকে সানন্দে সাক্ষাতের অনুমতি দিবেন, কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি সার হেনরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি অসম্মত। সার হেনরী লর্ড কার্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তখন কংগ্রেস সহযোগের পথ ত্যাগ করে নাই। আর আজ যখন কংগ্রেস অসহযোগনীতি অবলম্বন করিয়াছে এবং আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, তখন তাহার প্রতিনিধির পক্ষে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনরায় বড়লাটের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

কোন পক্ষের কথা অধিক যুক্তিসহ আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কারণ, "ভারতবর্ষ" রাজনীতিক পত্র নহে এবং মাসের সংবাদ কোনরূপে অনুরঞ্জিত না করিয়া প্রদান করাই "সাময়িকীর" উদ্দিষ্ট।

কিন্তু ইহার পর যাহা হইয়াছে, তাহা আরও বিস্ময়কর। বড়লাট মহাত্মাজীর মত একজন সর্ব্বজন-সম্মানিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে শিষ্টাচারে সুফল না ফলিলেও কুফল ফলিত না, যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারাও পরবর্ত্তী ঘটনায় ব্যথিত হইয়াছেন।

গত ২২শে জুলাই তারিখে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মিষ্টার এনী এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, পুণায় সম্মিলনের নির্দ্ধারণ এবং সম্মিলনে ও বাহিরে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের সহিত আলোচনার বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ স্মরণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত নিয়মে কাজ হইলে তাহা দেশের কল্যাণকর হইবে—

(১) বর্ত্তমান অবস্থায় আইনভঙ্গ আন্দোলন বিনা-সর্ত্তে প্রত্যাহার করা হইবে না।

(২) ব্যাপকভাবে জনগণের দ্বারা টেক্স ও খাজনা বন্ধ প্রভৃতি সম্বলিত আইনভঙ্গ আন্দোলন বর্ত্তমানে বন্ধ রাখা হইবে। কিন্তু যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে নিজ দায়িত্বে আইনভঙ্গ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগের আইনভঙ্গ করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) যাঁহারা কংগ্রেসের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য লাভের আশা না করিয়া আপনাদিগের দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিতে পারেন বা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আইন অমান্য করিবেন, এমন আশা করা যায়।

(৪) এ পর্য্যন্ত (আইনভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে) যে সব গোপন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সে সব বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৫) কংগ্রেসের সকল প্রতিষ্ঠান—এমন কি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে আর থাকিবে না: কিন্তু যে স্থানেই সম্ভব প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত নিয়ন্ত্রাতা ("ডিক্টেটার") থাকিবেন।

(৬) যে কোন কারণেই কেন হউক না যে সকল কংগ্রেসকর্ম্মী আইনভঙ্গ করিতে পারিবেন না, তাঁহারা যে ব্যক্তিগতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যথাসাধ্য কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, ইহা আশা করা যায়।

কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠাবধি গণতান্ত্রিকতার প্রবর্ত্তন জন্যই আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে। সেই কংগ্রেসের নামে—একক মিষ্টার এনী কিরূপে এই সব আদেশ প্রচার করিতে পারেন? বিশেষ, পুণা সম্মিলনের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে—ব্যক্তিগতভাবে আইনভঙ্গ করিবার প্রস্তাব সম্মিলনে ত্যক্ত হইয়াছিল। মিষ্টার এনীর বিবৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সামঞ্জস্য রক্ষা করা দুষ্কর বা অসম্ভব। তাহাতে বলা হইতেছে, ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলন বন্ধ রাখা হইবে এবং যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে আইনভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন, কংগ্রেস তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য দিবেন না। অথচ কংগ্রেস আশা করেন, লোক ব্যক্তিগতভাবে নিজ দায়িত্বে আইনভঙ্গ করিবেন! তাঁহারা কোন্ বা কোন্ কোন্ আইনভঙ্গ করিবেন, কে তাহা স্থির করিয়া দিবেন? যে কোন আইন ভঙ্গ করিলে তাহা কি আইন ভঙ্গ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে? ব্যাপকভাবে আইন ভঙ্গ আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া—তাহা বিনাসর্ত্তে প্রত্যাহার [illegible] যায় না বলিলে—উভয় উক্তিতে কিরূপ সামঞ্জস্য [illegible]তে পারে? তাহার পর লোককে ব্যক্তিগত ভাবে নিজ দায়িত্বে আইনভঙ্গ করিতে বলা ও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে অবহিত হইতে বলা, একইরূপ Pious [illegible]. কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ কি?

শেষ কথা—কংগ্রেস জাতির প্রতিষ্ঠান—জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বিবৃতির দ্বারা তাহার উচ্ছেদ সাধনের অধিকার কাহারও নাই। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকালব্যাপী চেষ্টায়—নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের ত্যাগে যে প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও পুষ্টি তাহার প্রয়োজন এখনই শেষ হয় নাই। যেদিন স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতের ব্যবস্থাপক সভা দেশের প্রকৃত প্রতিনিধিদলে গঠিত হইয়া দেশের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবে, শাসননীতির আবশ্যক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিবে, সেইদিনই কংগ্রেসের প্রয়োজনের অবসান হইবে—সেদিন কংগ্রেস ও ব্যবস্থাপক সভা অভিন্ন হইবে। "শ্বেতপত্রের" প্রস্তাবে যে সে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের কথা উঠিতে পারে না, ইহা সরকারই স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং কংগ্রেসের প্রয়োজন আছে, বরং তাহার প্রয়োজন দিন দিন অধিক হইয়া উঠিতেছে। কেন না, কংগ্রেসই জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে এবং জাতির অভাব অভিযোগের বিষয় ব্যক্ত করিতে পারে।

যেদিন কবি হেমচন্দ্র কংগ্রেসে ভারতমাতার "যোগ-নিদ্রা শেষ" দেখিয়া লিখিয়াছিলেন!—

"জীবন সার্থক আজি রে আমার,
এ রাখী-বন্ধন ভারত-মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পুরাবার তরে চলিল।—
যে নীরদ উঠি রিপন-মিলনে
শুষ্ক তরুডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল"

সেদিনের আশা আজ এমনভাবে নিরাশায় নিমগ্ন হইতে পারে না।

কংগ্রেসের উপর দিয়া বহুবার প্রবল বাত্যা বহিয়া গিয়াছে। লর্ড ডাফরিন ইহাকে "অজ্ঞাতরাজ্যে লম্ফ-প্রদান" ও কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে "আণুবীক্ষণিক সংখ্যাল্প সম্প্রদায়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর লর্ড আরুইন সেই কংগ্রেসকে জাতির সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান বলিয়া তাহার প্রতিনিধিদিগকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুরাটে

যজ্ঞভঙ্গ হইয়াছিল, কংগ্রেস মরে নাই; পরন্তু নবীন শক্তিতে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। একদিন আয়ার্লণ্ডের অন্যতম নেতা সেকস্টন প্রধান নেতা পার্ণেলের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "even *his* services to Ireland did not entitle him to effect Ireland's ruin." আজ এ দেশের লোকও তাহাই বলিবে।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট করিয়া দিবার কি কারণ থাকিতে পারে? সত্য বটে সরকার আইনভঙ্গ আন্দোলন দৃঢ়ভাবে দলিত করিতে বদ্ধপরিকর—কিন্তু সেই আন্দোলন ব্যতীত যে কংগ্রেসের আর কোন কাজ নাই, এমন হইতে পারে না; সেই আন্দোলন সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পরন্তু মিষ্টার আসফ আলি বলিয়াছেন—ইহা সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে অর্থাৎ ইহার ফলে সাম্প্রদায়িরও বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে; ইহাতে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান শিথিল হইয়াছে—ইত্যাদি। কংগ্রেসের করণীয় কার্য্যের অভাব নাই। তদ্ভিন্ন এজন্যও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, জাতির অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী প্রচেষ্টা জলবিম্বের মত বা পবনের হিল্লোলের মত নিঃশেষ হইতে পারে না।

কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের মধ্যেই অনেকে আইনভঙ্গ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে—এইরূপ মত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন চাহিয়াছেন। এখন তাঁহাদিগের পক্ষে—অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেস অসহযোগ ও পরে আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করায় যাঁহারা অনিবার্য্য মতভেদ হেতু কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন। যদি তাহা হয়, তবে কংগ্রেস আবার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ গৌরব লাভ করিতে পারিবে এবং ইহার মতামত অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা বরং যে কোন সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইবে। কারণ, তখন জাতির বাসনা কংগ্রেসের দ্বারাই অভিব্যক্তি লাভ করিবে।

জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তনের সময় উপনীত হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। এ সময় জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ধীরভাবে—বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া—আপনাদিগের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া অবিচলিত সঙ্কল্পে সেই কর্ত্তব্য পালন করার প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—

রথের পুনর্যাত্রার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কয় দিন ধরিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে মুসলমানগণ তাহাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে মর্ম্মাহত না হইয়া পারা যায় না। এই ঘটনা সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে প্রেস অফিসার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে কোনরূপ অনুরঞ্জনমুক্ত ও সরকারী তদন্তের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা সেই বিবৃতি অবলম্বন করিয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি—

৩রা জুলাই তারিখে উল্টা রথ ছিল। সেদিন মহকুমা হাকিম সার্কল ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয়, ইঁহাদিগের উপস্থিতির কারণ এই যে, কয় দিন পূর্ব্বে মুসলমানরা হিন্দুদিগের কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। বহু দিনের একটি হিন্দু-মন্দিরের কাছে কিছু কাল পূর্ব্বে একটি মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ের ব্যবস্থানুসারে মুসলমানরা মন্দিরে বাদ্যে আপত্তি করে।

বেলা ৫টার সময় রথের "টান" শেষ হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় মহকুমা হাকিম স্থানীয় ডাক বাঙ্গলোয় ফিরিয়া যাইবার পর, মুসলমানরা গৃহগামী হিন্দু যাত্রীদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে এবং বাঙ্গলো ঘিরিয়া ফেলে। তাহাদিগের ব্যবহার যে অন্যায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে তাহারা পুলিসের দারোগাকে আক্রমণ করিয়া আঘাত করে। বাধ্য হইয়া মহকুমা হাকিম গুলী চালাইবার জন্য পুলিসকে আদেশ করেন। পুলিস গুলী চালাইলে জনতা পশ্চাৎপদ হয়।

পরদিন মুসলমানদিগের দ্বারা মীরজাপুর, হরেকনগর ও মরাপুকুরিয়া গ্রামত্রয়ে হিন্দুগৃহ লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া

যায় ; বেলডাঙ্গায় ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেও হিন্দুদিগকে আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। তখন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কতকগুলি উপদ্রুত গ্রামে গমন করিয়া বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া স্থানে স্থানে পুলিস মোতায়েন করিয়া আইসেন।

পরদিন অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠে। প্রায় দুই হাজার মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া নয়াপুকুরিয়া গ্রাম আক্রমণ করে। তথায় যে স্বল্পসংখ্যক পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছিল, তাহারা প্রায় এক ঘণ্টা কাল জনতার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদিগের গুলী ফুরাইয়া যায়। জনতা হিন্দুদিগের গৃহ আক্রমণ করে এবং প্রায় এক শত গৃহে অগ্নিযোগ করে। তিন মাইল দূরবর্ত্তী বেলডাঙ্গা হইতে ধূম দেখিয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তথায় উপস্থিত হইলে আক্রমণকারীরা পলায়ন করে। মাত্র ছয় জন গ্রেপ্তার হয়।

ইহা ভিন্ন বিশাপুকুর, নূতন গ্রাম ও সারগাছি গ্রামত্রয়েও কতকগুলি হিন্দুগৃহ মুসলমানদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়।

কয়জন লোক হত ও বহু লোক আহত হইয়াছে। মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক পুলিসের দারোগাকে প্রহারের কথা ও মহকুমা হাকিমের বাঙ্গলো ফিরিবার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই সরকারী বিবরণ।

কীর্ত্তন ভঙ্গের পরও যে জিলার রাজপুরুষরা বিপদের গুরুত্ব কল্পনা করিতে পারেন নাই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্থানীয় হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে হিন্দুদিগের আশঙ্কার সংবাদ সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। বেলডাঙ্গা দেশপূজ্য পরলোকগত মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সম্পত্তি। ইহা খাসে আছে—অর্থাৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন নহে। ভূম্যধিকারী মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দীর স্থানীয় কর্ম্মচারীরাও এ বিষয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের গোচর করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ কেহই ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই।

বিস্ময়ের বিষয় ও পরিতাপের কথা এই যে, ঘটনার পর মুসলমান নেতারা—

(১) মুসলমানদিগের কৃত কর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার না করিয়া হিন্দুদিগকেই দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন।

(২) এই চেষ্টায় তাঁহারা নানা কল্পিত কথার প্রচার করিতেছেন।

প্রথমেই মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে প্রচার করা হয়, হিন্দুরা একখানি খড়ের ঘর মসজেদ অগ্নিযোগে দগ্ধ করিয়াছে। পুলিস তদন্তে কিন্তু প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা সত্য নহে।

খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন সরকারের বড় চাকরীয়া ছিলেন। তিনি ঘটনার কয় দিন পরে ঘটনা-স্থানে যাইয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি মুসলমানদিগকে আক্রমণকারী বলিয়াও তাহাদিগের অপরাধ লঘু প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে লিখিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমানে চুক্তি ছিল, হিন্দুরা মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবেন না ; হিন্দুরা চুক্তির সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চুক্তির ভাব রক্ষা করেন নাই! তাঁহার কথা, হিন্দুরা আপনাদিগের মন্দিরের সম্মুখে অত্যন্ত উচ্চরবে বাজনা বাজাইয়াছিলেন—"in an annoying and outrageous manner." অর্থাৎ হিন্দুরা তাহাদিগের মন্দিরের সম্মুখেও কিরূপ ভাবে বাজনা বাজাইতে পাইবেন, তাহা মুসলমানের অনুমতিসাপেক্ষ!

সার আবদল করিম গজনবীর আন্দোলনে মসজেদের সম্মুখে বাজনায় আপত্তি ছিল, খাঁ বাহাদুর বলিয়াছেন, মসজেদের সান্নিধ্যেও (সম্মুখে নহে) বাজনায় মুসলমানরা আপত্তি করেন। তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, কতকগুলি লোক রটাইয়াছিল, হিন্দুরা মুসলমানদিগের অপমানজনক নানা উক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই অজ্ঞ মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়াছিল। কাহারা এই রটনা করিয়াছিল? তাহারা হিন্দু, না, মুসলমান? হাজি মহম্মদ ইউসুফ প্রভৃতি স্থানীয় মুসলমান নেতারা এই মিথ্যার কোনরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি? তবে মোমিন সাহেবও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—মুসলমানরা যে দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, উত্তেজনার কারণ থাকিলেও তাহা সমর্থন করা যায় না!

তাহার পর মিষ্টার ফজলল হক প্রভৃতি কয়জন মুসলমান একযোগে আর এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, হিন্দু ব্যাঘ্রগণই নিরীহ মুসলমান মেষদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল—সব দোষ হিন্দু-দিগের। ইঁহাদিগের উক্তির আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগের নাই।

এখন আমরা সরকারকে বলিব, যাহাতে এইরূপ দুর্ঘটনার পুনরভিনয় না হয়,—না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ভাবে পুলিসের দারোগা প্রহৃত হইয়াছেন এবং মহকুমা হাকিম ও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার পর তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যাহারা দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে এবং যাহারা তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করিয়াছে, তাহারা সমাজের শৃঙ্খলার শত্রু এবং তাহারা যথোচিত দণ্ড না পাইলে সরকারের সম্ভ্রম ও বেলডাঙ্গা অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইবে না। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সঙ্গত অধিকার সম্ভোগ করেন—ইহাই আমাদিগের কামনা। কোন পক্ষ যেন অপর পক্ষের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে না পারেন।

বিদেশে ফল রপ্তানী—

গত বৎসর হইতে যে বিলাতে আম্র রপ্তানী হইতেছে, সে সংবাদ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। গত বৎসর নূতন ফল বলিয়া আম্র অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল—এক-একটি ফলের জন্য ক্রেতা আঠারো আনা পর্য্যন্ত দিয়াছিল। এবার রপ্তানী ফলের পরিমাণ অধিক ও মূল্য কম হইয়াছে। এবার এক একটি আম ছয় আনায় বিক্রীত হইয়াছে। বিলাতের ব্যবসায়ীদিগের মত, মূল্য আরও কমিলে বিলাতে যথেষ্ট আম বিক্রীত হইবে। বিশেষ বিশ্লেষণ-ফলে আম্র অসাধারণ পুষ্টিকর প্রতিপন্ন হওয়ায় ইহার আদর আরও বাড়িবে। আম্র ব্যতীত একার লিচু ও কলা রপ্তানী হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে গাবও গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, লিচু ও গাব বিলাতের লোকের রসনায় রসসঞ্চার অনিবার্য্য করিয়াছে; কলাও আদর পাইয়াছে। বিলাতে জ্যামেকা প্রভৃতি কয়টি স্থান হইতে যে পরিমাণে কলা যায়, তাহাতে মনে হয়, ভারতবর্ষ হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ কলা রপ্তানী করা সম্ভব। আবার করাচী হইতে কিছু কাঁঠাল ও ৫০ টন আনারস রপ্তানী হইয়াছে। কাঁঠাল এ দেশে কতক লোকের প্রিয় হইলেও তাহার গন্ধে অনভ্যস্ত ইংরাজরা তাহার আদর করিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু আনারসের আদর হইবেই। কারণ, বিলাতের লোক নানা স্থান হইতে টিনে ভরা আনারস আনাইয়া আদর সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমরা লক্ষ্য করিতেছি—

(১) বোম্বাই হইতে আম

(২) ব্রহ্ম হইতে গাব

(৩) পেশাওয়ার অঞ্চল হইতে কলা

(৪) করাচী হইতে কাঁঠাল ও আনারস রপ্তানী হইল। অথচ কলিকাতা বন্দর হইলেও বাঙ্গালা হইতে কোন ফল রপ্তানীর ব্যবস্থা হইল না। কিন্তু বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ ও মালদহে উৎকৃষ্ট আম, ঢাকার রামপাল প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কলা এবং নদীয়া যশোহর প্রভৃতি জিলায় প্রভূত পরিমাণ কাঁঠাল জন্মে ও আনারস উৎপন্ন করা যায়। বিশেষ বাঙ্গালায় ও আসামে যে আনারস উৎপন্ন হয়, তাহার সৌরভ হাইওয়াই প্রভৃতি স্থানের আনারসে নাই।

বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ কি কেবল পাট ও ধানের পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকিবেন? বাঙ্গালায় এখনও ক্ষেত্রে আনারসের চাষ হয় না। কবির কথায়—"ঝোপে ঝাপে" তাহার জন্ম—ছায়ায় বেড়ার মধ্যে আনারসের চারা রোপণ করা হয়। ইহাতে ফলের আস্বাদন আশানুরূপ হয় না। এই ফল যেমন ফল রূপে, তেমনই টিনে কাটা অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানী করা সম্ভব। ফলের অভাবে বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কারখানা যথেষ্ট পরিমাণ টিনে ভরা আনারস পাঠাইবার চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। মাদ্রাজে—বিশাখাপত্তনের উপকণ্ঠে সিমহাবলন পাহাড়ে যেমন ভাবে আনারসের চাষ করা হয়, বাঙ্গালায় সেইরূপে

ইহার চাষ অনায়াসে করা যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সরকারের কৃষিবিভাগ এদিকে মনোযোগ দেন নাই। এই বিভাগের সম্বন্ধে বলিতে হয়—

"জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর।"

আর সেই জন্যই আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হইতে বিদেশে ফল রপ্তানী করিয়া আয়ের উপায় করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। অথচ পাটের দাম কমিয়া গিয়াছে এবং ব্রহ্মের পর স্পেন হইতেও চাউল আমদানী হইতেছে।

আমরা এ বিষয়ে কৃষিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম, ফরোক্বী সাহেহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

সরকার ও কৃষি—

বাঙ্গালা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিপ্লবতন্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। সরকারের পক্ষ হইতে এই সকল সমস্যা সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, এই সকল পুস্তিকায় তাহাই বলা হইয়াছে। সকল সভ্য দেশেই সরকারের প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা আছে এবং সকল দেশেই সরকারের সেই প্রচার কার্য্য সংবাদপত্রের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য্য পরিচালিত হয় না বলিয়া সরকারের কোন সংবাদপত্র নাই এবং সেই জন্য সরকারকে এইরূপ পুস্তিকার সাহায্যে আপনাদিগের বক্তব্য লোকের গোচর করিতে হয়। সংপ্রতি এই বিভাগ হইতে বাঙ্গালায় কৃষির উন্নতি বিষয়ে বেতারে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে এবং সেগুলি পরে মুদ্রিত হইয়াছে। এইরূপে গঠনমূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় আমরা প্রচার বিভাগের সম্পাদককে অভিনন্দিত করিতেছি। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

(১) বাঙ্গালা দেশে চিনি
(২) বাঙ্গালায় তামাক
(৩) বাঙ্গালার গবাদি পশুর উন্নতি সাধন
(৪) গো-পালন ও পশুখাদ্য
(৫) গৃহপালিত পশুর খাদ্যের চাষ
(৬) ফসলের পোকা ও তাহার প্রতীকার
(৭) চীনা বাদামের চাষ
(৮) ভদ্র যুবকদিগকে জমী বিলি।

প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে পাঠকের উপকার হইবে। এ দেশে অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে এবং কৃষির সাফল্য বর্ত্তমান অবস্থায় ও ব্যবস্থায় অনিশ্চিত হইলেও এ দেশ কৃষিপ্রধান বা কৃষিপ্রাণ। কৃষির উন্নতি হইলে কৃষির লাভে লোক অন্য নানা শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। আমেরিকায় তাহাই হইয়াছে।

কিন্তু সে জন্য কৃষি বিভাগের কার্য্যের ও কর্ম্ম-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধনেরও প্রয়োজন হইবে। চিনি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে কেবল ইক্ষুর চাষের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও খর্জ্জুর বৃক্ষের রস হইতে প্রভূত পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত—এখনও গুড় প্রস্তুত হয়। বিশেষ খেজুর গাছ একবার বড় হইলে তাহার জন্য আর ১৫।২০ বৎসর কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না। সে হিসাবে ইহাতে ইক্ষু অপেক্ষা অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। আমরা শুনিয়াছি, ঢাকায় সরকারী কৃষি বিভাগ চিনির জন্য ইক্ষু লইয়াই পরীক্ষা করিতেছেন—গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে খেজুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষা বন্ধ করা হইয়াছে। কেন? ইহাতে মনে হয়—

"অগাধ জলের মকর যেমন
বুঝে না মিঠি কি তিত"

—কৃষি-বিভাগ তেমনই ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আগামী শীতকাল হইতেই খেজুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া লোক লাভবান হইতে পারে—ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। সেদিন সিমলা শৈলে চিনির ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে চিনির উৎপাদন-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কিছু টাকা কি খেজুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনে ব্যয়িত হইবে?

আমরা এই প্রসঙ্গে প্রচার বিভাগকে আরও কতক-

গুলি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রচার করিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালায় ধানের সঙ্গে কিরূপে গোচরের ব্যবস্থা করা যায়, কিরূপে আনারসের চাষে সাফল্য লাভ করা যায়, হাঁস ও মুর্গী পালন করিয়া কিরূপে লাভবান হওয়া যায় —সে সকল বিষয়ে উপদেশ পাইলে দেশের বেকার যুবকরা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

জয়েণ্ট কমিটী—

ভারতে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের বিচার করিবার জন্য যে জয়েণ্ট কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহার অধিবেশন কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিল। এখন কতকগুলি শাখা সমিতির কাজ চলিবে। বাঙ্গালা হইতে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কমিটীর কাজের জন্য সরকারের নিমন্ত্রণে বিলাতে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন। সরকার মহাশয় বৈঠকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়েন নাই—তৃতীয় অধিবেশনে গিয়াছিলেন। তদবধি তিনি বাঙ্গালার প্রকৃত প্রতিনিধির কাজ করিয়া আসিতেছেন। তৃতীয় অধিবেশনে তিনি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, পাট বাঙ্গালার প্রায় একচেটিয়া সম্পদ হইলেও পাটের উপর যে কোটি কোটি টাকার রপ্তানী শুল্ক আদায় হয়, তাহার এক পয়সাও বাঙ্গালা পায় না—ইহা অসঙ্গত ও অবিচার। পাট পচানয় ও কাচায় যে বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ঐ টাকা যদি বাঙ্গালা পায়, তবে আর বাঙ্গালায় সরকারের ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক হয় না। এ ক্ষেত্রে বাঙ্গালার অবস্থা "বাসা থাকিতে বাবুই পাখী ভিজে"—স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার এই চেষ্টা বাঙ্গালা সরকার কর্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে। "শ্বেতপত্রে" সদস্ত পদ্ধতির যে প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে —পাটের শুল্কের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ যে প্রদেশে পাট উৎপন্ন হইবে, সেই প্রদেশকে দিতে হইবে। কিন্তু জয়েণ্ট কমিটীতে যখন এই বিষয় আলোচিত হয়, তখন বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস "শ্বেতপত্রের" প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—ঐ শুল্ক কেন্দ্রী সরকারেরই প্রাপ্য, সুতরাং বাঙ্গালা উহা পাইতে পারে না! বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির অবস্থা "টলমল"—বাঙ্গালীরা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করায় বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা কাপড়ের দাম অসঙ্গতরূপে বর্দ্ধিত করেন। বাঙ্গালার পক্ষ হইতে পরলোকগত কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বোম্বাইয়ে যাইয়া কলওয়ালাদিগকে এইরূপ অসঙ্গত কার্য্যে বিরত হইতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—তাঁহারা ব্যবসায়ী; বাঙ্গালা যদি ভাবাবেগে নির্ব্বোধের মত কাজ করে, তাঁহারা অবশ্যই সেই সুযোগে লাভবান হইবেন। তদবধি বোম্বাই বাঙ্গালার দৌলতে লাভ করিতে এবং বাঙ্গালার উন্নতিতে—সম্ভব হইলে—বাধা দিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সে যাহাই হউক, বাঙ্গালা সরকার বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, পাটের শুল্ক না পাইলে বাঙ্গালার ক্ষতি অনিবার্য্য। এখন আশা করা যায়, জয়েণ্ট কমিটী বাঙ্গালার প্রতি সুবিচার করিবেন। যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় তখন যে জয়েণ্ট কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সে কমিটীও বাঙ্গালার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন।

বিলাতে একদল লোক এ দেশে—বিশেষ বাঙ্গলায় আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ মন্ত্রীর অধীন করিতে আপত্তি করিতেছেন। বাঙ্গালায় যে সন্ত্রাসবাদীরা অনাচার করিতেছে, সেই ছল ধরিয়া তাঁহারা এই কথা বলিতেছেন। সরকার মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন—

(১) আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ হস্তান্তরিত না করিলে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

(২) বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদীরা হিন্দুদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাই আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ হস্তান্তরিত করিতে বলিতেছেন।

(৩) আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ হস্তান্তরিত না করিলে যে সন্ত্রাসবাদের অবসান হইবে, এমন মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এই অবস্থায় যদি কেবল বাঙ্গালাতেই ঐ বিভাগ সংরক্ষিত রাখা হয়, তবে বাঙ্গালায় অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইবে।

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক সদস্যসংখ্যা নির্দ্ধারণে বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর রোয়েদাদে ও পুণার চুক্তিতে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের স্বার্থ অযথা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইহাতে ভারত-সচিব বলেন, বাঙ্গালা পুণা চুক্তিতে বহু দিন কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই এবং বাঙ্গালা হইতে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে চুক্তি সমর্থন করিয়া তার করিয়াছিলেন। ভারত-সচিবের এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন কালে তিনি তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা হেতু পুণা চুক্তি বিশেষভাবে বিচার না করিয়া ঐ তার করিয়াছিলেন। এখন তিনি বুঝিয়াছেন, ঐ চুক্তিতে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের স্বার্থ অযথা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, তিনি রাজনীতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং সেই অনভিজ্ঞতাই তাঁহার কৃত কর্ম্মের কারণ। অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যের ফল দেখিয়া এখন তিনি ব্যথিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে ঐরূপ তার করা সুবিবেচনার পরিচায়ক নহে, তাহা স্বীকার করিয়া তিনি সৎসাহসের পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এই সৎসাহস অবশ্যই প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির পর ভারত-সচিব কি বলিবেন? তিনি যদি মনে করিয়া থাকেন, সাম্প্রদায়িক সদস্য-সংখ্যা সম্বন্ধে বিলাতের সরকার যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অটল, তবে তিনি ভ্রান্ত। রাজনীতিক ব্যাপারে কোন নির্দ্ধারণ অটল হইতে পারে না। বাঙ্গালী—বাঙ্গালার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে বিলাতী সরকারের নির্দ্ধারণ ব্যাপারে তাহা বিশেষরূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা অন্যায় ও অসঙ্গত, বিলাতের সরকার তাহার পরিবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করিবার কি কারণ দেখাইতে পারেন?

—

সার চারুচন্দ্র ঘোষ—

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ সার চারুচন্দ্র ঘোষ অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহার বন্ধুরা ও তাঁহার পৈত্রিক বাসগ্রাম বিখ্যানন্দকাটীর অধিবাসীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থের অনুপস্থিতি কালের জন্য লর্ড রিপণ যখন রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে চীফ জাষ্টিস নিযুক্ত করেন, তখন সেই ঘটনা ভারতবর্ষে কিরূপ আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা কবি হেমচন্দ্রের রচিত কবিতায় বুঝিতে পারা যায়—

"বংশী বাজিছে রমেশের জয়—
আজ রে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—
কাছে এস, ভাই, করি আশীর্ব্বাদ,
চিরসুখে হর কাল;
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল।
উজল আজি হে বাঙ্গালীর নাম—
উজল ভারত ভূমি;
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি।"

আজ আর এরূপ নিয়োগে কেহ বিস্ময়ানুভব করেন না; পরন্তু সকলেই মনে করেন, স্থায়ীভাবে ঐ আসনে বসিবার অধিকার ভারতবাসীর আছে। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তন! যখন একজন ভারতীয়কে বড় লাটের শাসন পরিষদের সদস্য করিবার প্রস্তাব হয়, তখন ভারতবন্ধু লর্ড রিপণও তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। সে দিনও কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই, অল্প কাল মধ্যে ভারতবাসী প্রাদেশিক শাসকের পদ পাইবেন। ইহাতেই এ দেশে এ দেশের লোকের অধিকার বিস্তৃতির স্বরূপ উপলব্ধ হয়। আর লর্ড মেকলের সেই কথা মনে পড়ে—

"Ever since childhood I have been seeing nothing but progress, and hearing of nothing but re-action and decay."

মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছেন। সরকারের বিবৃতিতে প্রকাশ, তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে আইনভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার "আশ্রমের" ৩২ জন লোকের সহিত রাজগ্রামে অভি-যান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এরূপও প্রকাশ হইয়াছিল যে, সরকার তাঁহাকে কোনস্থানে নজরবন্দী অবস্থায় রাখিবেন। তিনি যদি নজরবন্দী অবস্থার কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহাকে সাধারণ আইনানুসারে মামলা-সোপর্দ্দ করা হইবে। মহাত্মাজী গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহার "আশ্রম" ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাহার পরেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিগত ৪ঠা আগষ্ট প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত দেশাইকে এই সর্ত্তে মুক্তি প্রদান করা হয় যে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে যারবেদা-কারাগারের সীমানা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং তাঁহারা পুনার সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবেন না। মহাত্মা কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া কারাগারের সীমানার মধ্যেই অবস্থিতি করেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করিবেন না বলেন। তখন আদেশ-অমান্য অপরাধে তাঁহাকে ও দেশাইকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় এবং মধ্যাহ্নের পর সেখানেই তাঁহাদের বিচার হয়। সরকারের আদেশ অমান্য করিয়াছেন, এ কথা মহাত্মা স্বীকার করেন। বিচারক মহাশয় মহাত্মা ও তাঁহার সহচরকে এক বৎসর বিনাশ্রমে কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন এবং মহাত্মাকে প্রথমশ্রেণী ও তাঁহার সঙ্গীকে দ্বিতীয়-শ্রেণীতে আবদ্ধ করিবার আদেশ দেন। এই আদেশ সম্বন্ধে মহাত্মা বলেন যে, কারাগারে শ্রেণী-বিভাগ তিনি ঠিক মনে করেন না, সকলকেই এক শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত। তাঁহার এ আপত্তি গৃহীত হয় নাই, তিনি কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা জানিতে লোকের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য স্বাভাবিক। শুনা যাইতেছে কলিকাতায় সরকারের সম্প্রীতিভাজন কোন ব্যক্তির গৃহে এক সভার স্থির হইয়াছে, বাঙ্গালা হইতে আইনভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধা-চরণ করা হইবে এবং চিত্তরঞ্জন দাস গঠিত—অধুনাবিলুপ্ত স্বরাজ্য দলের পুনর্গঠন করা হইবে। স্বরাজ্য দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সমর্থন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা বলিতেন, তাঁহারা অসহযোগী। এবার যদি সেই দল পুনর্গঠিত করা হয়, তবে দলের লোকেরা যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহিবেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে তাঁহারা সরকারের সহিত কতদূর সহযোগ করিবেন এবং প্রস্তাবিত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিবেন কি না, তাহাই দেখিবার বিষয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণে ইঁহারা আপত্তি করিবেন না, ইহাই অনেকের অনুমান। যদি ইঁহাদিগের আয়োজন কার্য্যে পরিণত হয়, তবে অবশ্যই ইঁহারা দলের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশ করিবেন। পুরাতন স্বরাজ্য দলের কার্য্য-পদ্ধতি বর্ত্তমানে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিদেশে বাঙ্গালী যুবকদ্বয়ের কৃতিত্ব

আমরা অতীব আনন্দের সহিত দুইজন বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছি। ইঁহারা দুই ভাই, বড় ভাইয়ের নাম শ্রীমান হীরেন দে এবং ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীমান্ নীরেন দে। ইঁহারা অবসর-প্রাপ্ত খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায় হেমচন্দ্র দে বাহাদুর এম এ মহাশয়ের পুত্র। শ্রীমান হীরেন্দ্র লণ্ডনের সেণ্টজর্জ মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতালে তিন বৎসরের উপর শিক্ষালাভ করিয়া উচ্চ উপাধি লাভ করেন। এখন তিনি লণ্ডনের ডিভনপোর্টের রয়েল আলবার্ট হাসপাতাল ও চক্ষুরোগ চিকিৎসালয়ের সহকারী সার্জ্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এ প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কাজে কেহ বাঙ্গালী নিযুক্ত হয়েন নাই। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তিনি সেখানকার সকলের বিশেষ প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমান্ হীরেন্দ্র টিউবারকুলোসিস্ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নীরেন দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট কিংস্ কলেজ হইতে সসম্মানে উপাধি পরীক্ষা

উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুধু তাহাই নহে, তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়া 'college colour' পাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

শ্রীমান্ হীরেন দে

তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিগত ২২শে জুলাই দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিবার

শ্রীমান্ নীরেন দে

জন্য সেইদিন তাঁহাদের বাসভবনে বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল; তাঁহার অনেক পিতৃবন্ধু সেই উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া শ্রীমান্ নীরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমরা এই কৃতী ভ্রাতৃদ্বয়ের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

অমরচন্দ্র বসু—

অমরচন্দ্র বসু ইংরাজী ৮ই অক্টোবর, শনিবার, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের পানিহাটীর বাটীতে জন্ম-গ্রহণ করেন। যথাসময়ে তিনি প্রবেশিকা এবং এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এল্ পরীক্ষা দেন। ঐ

অমরচন্দ্র বসু

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছু দিন কলিকাতার শিয়ালদহ কোর্টে বাহির হয়েন। পরে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। তিনি ছোট আদালতের একজন খ্যাতনামা উকীল বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন এবং

ঐ আদালতে একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর ওকালতী করিয়াছিলেন। তিনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ওকালতী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। গত বৎসর এমন দিনে তাঁহার নাত্-জামাতা স্বনামধন্য পুরুষ ৺চন্দ্রমাধব ঘোষের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এবং পরে তাঁহার জামাতার মৃত্যু হওয়ায় বুঝি তিনি দ্রুত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি ইংরাজী ২৬শে জুন, সোমবার, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু, জ্যেষ্ঠা পৌত্রী শ্রীলতিকা ঘোষ প্রভৃতি অন্যান্য পৌত্র পৌত্রী, পুত্রবধূ এবং আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

রায় প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর—

পাবনা জেলাস্থ ভারেঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার-বংশে সন ১২৬১ সালের ২২শে শ্রাবণ প্রসন্ননারায়ণের জন্ম হয়। ঐ জমিদারী হিন্দুরাজগণের সময়ে সৃষ্ট হয়, এবং উহা উত্তরবঙ্গের অতি প্রাচীন জমিদার-বংশসমূহের অন্যতম। এই বংশ পরলোকগত স্যর আশুতোষ চৌধুরীর মাতুল বংশ। প্রসন্ননারায়ণ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বাল্যকালে পিতৃহীন হন। যে জ্ঞাতির উপর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তিনি ঐ বিষয়ে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটান। ফলে সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধে প্রথম জীবনে প্রসন্ননারায়ণকে নানারূপ ক্লেশ পাইতে হয়। সুতরাং ধনী-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও পাঠ্যাবস্থায় তাঁহাকে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু অদম্য উৎসাহে সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্যর রাধাকান্ত দেব মেমোরিয়াল পদক প্রাপ্ত হন। পরলোকগত রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বি-এ পাশ করিবার পর কিছু দিন তিনি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী ছিলেন এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এল পাশ করিয়া পাবনাতে ওকালতী আরম্ভ করেন, এবং অতি অল্প কাল মধ্যেই স্বীয় প্রতিভায় তত্রত্য উকীলদের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া গণ্য হন। ১৮৯৫ সালে তিনি পাবনার সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হয়েন এবং অতিশয় যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য্য করিয়া ৩৩ বৎসর পরে ১৯২৮ সালে ওকালতী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রসন্ননারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। নিজ অধ্যয়ন কালে যে অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চিরদিন স্মরণ ছিল; সেই জন্য তিনি বহু সংখ্যক ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিতেন এবং অর্থ সাহায্য করিতেন।

তাঁহার চেষ্টায় নিজ গ্রামে "ভারেঙ্গা একাডেমী" নামক হাইস্কুল স্থাপিত হয় এবং মাতার নামে হরসুন্দরী চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং পাবনা টাউনের প্রসিদ্ধ দর্শন-টোলটী স্থাপিত হয়। ইহার প্রত্যেকটীর জন্যই তিনি বহু অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। নিঃস্ব ছাত্রগণকে ও সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতগণকে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। বাংলায় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে প্রসন্ননারায়ণ সর্ব্ব প্রথম দলের অন্যতম। মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে তাঁহার পাঠোদ্ধারই শুদ্ধ বলিয়া বিদ্বৎ সমাজে গৃহীত হয়। তিনি গায়ত্রীর শঙ্করভাষ্য এবং সায়ণ ভাষ্য সমেত চারি প্রকার ভাষ্য টীকাসহ প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকা পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে আদৃত হয়। আইনেও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। আইন সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি পুস্তক আছে। একখানি "Confessions and Evidence of Accomplices" উক্ত বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাঁহার অপর পুস্তক "Prosecution in False Cases" বিগত শারদীয় পূজার সময় প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ পুস্তকেরও বিশেষ আদর হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত "প্রমোদ" নামে হাস্যরস সম্বন্ধেও একখানি পুস্তক আছে। এতদ্ব্যতীত 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি অনেক বৎসর পাবনা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং পাবনা সহরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি

প্রত্যেক দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। প্রসন্ননারায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পরোপকারী, উন্নতচরিত্র, আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে উত্তরবঙ্গ একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছে। বিগত ৩০শে আষাঢ় (১৩৪০) ধার্ম্মিক প্রসন্ননারায়ণ স্বধামে গমন করিয়াছেন।

রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু—

সন ১২৫৫ সালের ২৯শে মাঘ, খুলনা জেলার অন্তর্গত খলিসাখালি গ্রামে কুঞ্জবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় পরের গৃহে থাকিয়া ও তাহাদের সাহায্যে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, তিনি যশোহর জেলাস্থিত খাজুরা গ্রামের স্কুলে ও পরে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর স্কুলে পাঠ করেন এবং শেষোক্ত স্কুল হইতে সম্মানের সহিত এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি মহর্ষি রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। ৺রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের অনুগ্রহে, তাঁহার বাটীতে থাকিয়া ও তাঁহার ভ্রাতা ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহচর্য্যে কুঞ্জবাবু জেনারেল এসেম্ব্রিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্—(অধুনা স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজ)—হইতে সসম্মানে এফ্-এ পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি সম্মানের সহিত বি-এ পাশ করেন। ঐ সময়ে তিনি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়দ্বয়ের ছাত্র ছিলেন এবং সার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী লইয়া বারাসত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক এবং পরে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েন। এই সময়ে তিনি এম্-এ, বি-এল পাশ করেন এবং বারাসতের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি 3rd assistant to D. P. I., Bengal ও ক্রমে Personal assistant পদে উন্নীত হন। ১৮৮৮ খৃঃ হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি Eden Hindu Hostelএর Superintendent ছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ ১৪ই মার্চ্চ তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে কয়েক বৎসর তিনি বারাসত মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ হইতে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি ৪০ বৎসরের উপর বারাসত মহকুমার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি Hindu Family Annuity Fund এর Secretary ও পরে Director ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd এর Director ছিলেন। ১৯২৩ খৃঃ জুন মাসে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় সাহেব খেতাব পান। জীবদ্দশায় তিনি কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক লিখেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি History of Barasat নামে একখানি পুস্তক লিখিতেছিলেন। উহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

রায় সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু

মৃত্যুকালে ইনি বর্ষিয়সী পত্নী, ৬টী পুত্র, ২টী কন্যা এবং পৌত্র-পৌত্রী ও প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী রাখিয়া যান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় সাহেব পুলিনবিহারী বসু ও তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণবিহারী বসু, এম-এ সম্প্রতি পেন্সন লইয়াছেন। তাঁহার অন্য দুই পুত্র ডাক্তার ও কনিষ্ঠ পুত্র উকিল।

ইঁহার উদার মতে, শিশু সুলভ সারল্যে এবং সৎচরিত্রে অনেকে ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। ইঁহার অনেক বন্ধু, সহপাঠী ও ছাত্র ইঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। বিগত ২৯শে আষাঢ় ১৩৪০ বারাসতের বাসভবনে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা—

বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া যে মামলা পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি সহজে মুছিবার নহে। সেই বিশ্ববিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অভিনয়ে এতদিনে এদেশে যবনিকাপাত হইল বলিয়া মনে হইতেছে। চারি বৎসর ধরিয়া পাঠকরা সংবাদপত্রে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচার-বিবরণ পাঠ করিয়াছেন;

সুতরাং এই মামলার বিবরণ বিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতী ও ভারতীয় এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ভারতে বোলশেভিকবাদ প্রচারের সম্বন্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের ফলে ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেন্ট ইটন নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীকে ভারতে বোলশেভিক-বাদের বিভীষিকা কতদূর প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেন। মিঃ ইটন তদন্ত শেষ করিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ রিপোর্ট দাখিল করেন। রিপোর্টে তিনি দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে ভারতের দুইশত স্থানে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ বহু কাগজপত্র ও দলিল হস্তগত করে এবং ভারতের নানাস্থান হইতে ৩১ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ৩১ জনের মধ্যে বঙ্গদেশে ৯ জন, বোম্বাই প্রদেশে ১৩ জন, যুক্ত প্রদেশে ৫ জন, ও পঞ্জাবে ৩ জন গ্রেপ্তার হন। ৩১ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজ্ করা হয়। মীরাট এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়ায় তথায় বিচার করা স্থির হয়, এবং মামলাটি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত হয়। ৩১ জন আসামীর মধ্যে মামলার শুনানির সময় একজনের মৃত্যু হয়। সেসন আদালতে বিচারের ফলে কিশোরী-লাল ঘোষ, ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরে কিশোরীলাল ঘোষ মহাশয় লোকান্তরে প্রস্থান করেন। অবশিষ্ট আসামীরা (২৭ জন) বিভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল রুজ্ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি ইয়ং আপীলের মামলার বিচার করিয়া গত ৩রা আগষ্ট রায় প্রদান করিয়াছেন। গত ১৬ জানুয়ারী মীরাটের সেসন জজ মিঃ ইয়ক যে ২৭ জনকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ জন হাইকোর্টের বিচারে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পাঁচজনের সম্বন্ধে বিচারপতিরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিচারকালে তাঁহারা যতদিন আটক ছিলেন, তাঁহাদের দণ্ডের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে ; অতএব তাঁহারাও এ যাত্রা মুক্তিলাভ করিলেন। ১২ বৎসর হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডিত আসামীদের দণ্ডভোগের সময় কমাইয়া ৩ হইতে ১ বৎসর করা হইয়াছে। একজন আসামী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহার দণ্ডকালও তিন বৎসর হইল। চার বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামীকে সাত মাস দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আদালতে রায়ের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। রায়টি টাইপকরা ফুলস্কেপ কাগজের ১৭৯ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। এই দীর্ঘ রায় এখনও আদালতে সম্পূর্ণভাবে পড়া শেষ হয় নাই।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনের জন্য সরকার পক্ষ হইতে বিরাট আয়োজন করা হয়, মামলার তদ্বিরের জন্য কয়েকজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস মোকদ্দমা পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হন। আসামীরা সঙ্গতিশালী নহেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সেণ্ট্রাল ডিফেন্স ফাণ্ড স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে তাহার একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। সরকার পক্ষে ডেপুটি পুলিস ইনস্পেক্টর মিঃ হর্টন ছিলেন অভিযোক্তা—তাঁহারই আবেদন অনুসারে ৩১জন আসামীকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল যে তাঁহারা বৃটিশ সম্রাটকে বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া ১২১ ক ধারার অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

সরকারী হিসাবে সেসন পর্য্যন্ত মামলা চালাইতে সরকারের ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। হাইকোর্টে আপীলের মামলা চালাইতে আরও কিছু ব্যয় হওয়া সম্ভব। আসামীরা দরিদ্র হইলেও, জনসাধারণের অর্থ-সাহায্যে তাঁহাদের মোকদ্দমা পরিচালিত হইলেও এ পক্ষেও যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছে। তদ্ব্যতীত, ত্রিশ বত্রিশ জন লোক সাড়ে চারি বৎসর আবদ্ধ থাকায় তাহাদের আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট হইয়াছে। এত অর্থ, এত সময় ব্যয় করিয়া, হাইকোর্টে মীরাট মামলার পরিণাম যাহা

দাঁড়াইল তাহাতে মনে হয়, এই অর্থ ও সময় ব্যয় কি সার্থক হইয়াছে ?

দুই একজন ছাড়া, নিম্ন আদালত সাধারণতঃ আসামীদিগকে জামিনে মুক্তি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন নাই; অথচ, হাইকোর্টে নয় জন সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেন, পাঁচজনের আটক কালই যথেষ্ট দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইল, অপর সকল আসামীর দণ্ড হ্রাস হইল—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডকাল তিন বৎসরে পরিণত হইল—ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে ১২১ ক ধারায় অভিযোগ হইয়াছিল। কিন্তু কমিউনিজম মতবাদ পোষণ করা ছাড়া, রাজা বা রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ৩১ জনকে একত্র করিয়া একটা বিরাট মামলা খাড়া করা হইলেও, প্রকৃত পক্ষে অভিযোগটা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেটা একটা মতবাদ মাত্র—ধরিবার ছুঁইবার যো নাই। এই সকল ব্যাপারে বিবেচনা করিয়াই বোধহয় অবশিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল রুজ্ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে যদি অবশিষ্ট আসামীরা, অন্ততঃ তাঁহাদের অধিকাংশ যদি মুক্তিলাভ করেন তাহা হইলে বিরাট মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারটা অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বাণী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট গৃহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে "শিক্ষা বিকীরণ" বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন— "ভোজ্য জিনিষে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েচে কতজনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্য্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুসি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখে ধু ধু করচে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লণ্ঠন ঝোলানো হয়েচে ইস্কুল কলেজে। কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেওয়ালে বন্দী আলোক হয় তাহলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশেও এককালে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল টোলে চতুষ্পাঠিতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা।

শিক্ষার দুর্গতি আজ অসীম। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে এসে এই চেষ্টা, এই প্রশ্ন। মাতৃভাষায় আজ তার উদ্বোধন কী হবে না ? এক দিন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যখন শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজী-সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজী জানতেন সবাই, তবু তাঁরা স্বীকার করেচেন ইংরেজী সাহিত্যের বাণী তাদের মনে সহজ সাড়া পেয়েছে। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষা ইংরেজী ভাষা বাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ পথে তার অনেক খানি মারা যায়। ইংরেজী খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয়, এমন বাঙ্গালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি-এণ্ড-ও কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্যতার পথ বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের সম্পূর্ণ দাবী মিটিতে চায়না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা, আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা' বলচি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়।

আমার বিষয়টা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষা জলের কলে চালানোর কথা নয়। পাইপ যেখানে পৌছায় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষার সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী ?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত

বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি, তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক। বঙ্গভূমির দিগ দিগন্তরে, সমস্ত দেশের চিত্তক্ষেত্র আজ পরিপূর্ণ হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে-পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙ্গালী চিত্তের মরা নদীর রিক্তপথে বান ডেকে বয়ে যাক্ দুইকূল-পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "প্রিয় বান্ধবী"—২৲

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র"—৫৲

কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত গানের বই "নূপুর"—৷৷৹

শ্রীপ্রীতিকণা দত্তজায়া প্রণীত স্ত্রীপাঠ্য "রাণী দুর্গাবতী"—৷৹

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "খোকাখুকুর A. B. C."—৷৹

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "সব ভূতুড়ে"—৷৴৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী সিরিজের "পেয়ালার প্রলয়" ও "ফুলের হীরার হল" প্রত্যেকখানি—৷৹

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত "মহাপ্রস্থানের পথে"—২৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত শিকারের গল্প "ঝিলে জঙ্গলে"—৷৷৴৹

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ প্রণীত—"দামোদরের বিপত্তি"—২৲

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "অনেক রকম"—১৲

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম-এ, বি-এল—সম্পাদিত শান্তিদেবকৃত "বোধিচর্য্যাবতার" প্রজ্ঞাপারমিতা নামক নবম পরিচ্ছেদ—৷৷৹

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পাষাণ-পুরী"—১৷৹

অধ্যাপক শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়চৌধুরী এম-এস্‌সি প্রণীত "বিজ্ঞানের নানা কথা"—৸৵৹

অধ্যাপক শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়চৌধুরী এম-এস্‌সি প্রণীত "বিজ্ঞানের খবর"—৸৹

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত ছোট গল্প "অদৃশ্য শত্রু"—২৲

শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জাপানী মুখোস"—৸৹

দ্রষ্টব্য।—আগামী আশ্বিন মাসের 'ভারতবর্ষ' ২৬শে ভাদ্র প্রকাশিত হইবে। কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ' যথাসময়ে বাহির হইবে। বিজ্ঞাপন দাতারা আশ্বিন মাসের বিজ্ঞাপন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ১০ই ভাদ্রের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

সত্যকাম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কিরণময় ধর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আশ্বিন—১৩৪০

প্রথম খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

তেনাহং কিম্

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

"Ultimately the mystery may be the only thing that matters......"

কাল রাত তখন প্রায় বারোটা হবে। Wellsএর নতুন বইখানা পড়তে পড়তে ওই কথাগুলোর কাছে এসে যেন চমকে ওঠা গেল! বিশ্বজগৎকে যিনি প্রায় সবটাই বুঝে ফেলবার মৎলব করেচেন, এবং আদি সৃষ্টির কাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা ক'রে যিনি বিধাতার অভিপ্রায় প্রায় ধ'রে ফেলেচেন বললেও চলে, তিনি হঠাৎ বলে উঠচেন 'শেষকালে হয়ত একমাত্র বস্তু যা না হ'লে চলে না সে হচ্চে গুহাহিতং···'। আমি কিন্তু ওই পর্য্যন্ত পড়েই যেন চমকে উঠলাম। ওয়েলস্ কিন্তু চমকেছেন ব'লে মনে হয় না; কারণ, তিনি সেখানে থামেন নি' Spencerএর মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে। তিনি তার পর বলে চলেচেন 'But within the rules and limits of the game of life, when you are catching trains or paying bills or earning a living, the mystery does not matter at all.' কথাগুলো, হয়ত কেন, সত্যি ঠিক। এই জীবনের খেলা-ঘরের মাঝখানে যেখানে আমাদের গাড়ী ধরবার জন্তে ঘড়ির পানে তাকিয়ে ষ্টেশনে ছুটতে হয়, দোকানদারের বিল শোধ করবার জন্য চিন্তাকুল হতে হয়, কিম্বা জীবিকার তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখতে হয়, সেখানে ওই গুহাহিত রহস্য না হ'লেও আমাদের চলে। শুধু তাই নয়, রহস্যের কোনো প্রয়োজনই হয় না। কথাগুলো অত্যন্ত সত্য, নয় সেজদা? আমি কিন্তু কাল ওই কটি কথা পড়ার পর আর একটি ছত্রও পড়তে পারলুম না, এমন কি ওই বাক্যটিও পূরো আমার মনকে অধিকার করতে পারলে না। আমার যে-মন এতক্ষণ ধ'রে ওই বইখানির নানা চিন্তাস্রোতে ভেসে চলেছিল অধীর ঔৎসুক্যে, অকস্মাৎ ওই বাক্যাংশের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে পাক খেতে লাগল, আর কিছুতেই মন আমার এগুলো না। কেবলি মনে হতে লাগল 'Ultimately the mystery

may be the only thing that matters......'। আলো নিবিয়ে দিয়ে উত্তরের পুষ্পিত মাধবীলতাঘেরা বাতায়নের মাঝ দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর ধ্রুবলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। চারিদিকের পৃথিবী তখন সুপ্তিমগ্ন, ধ্যানলীন: ঘনকুন্তলা ধরণীর অশ্রুসিক্ত মুখখানির পানে যেন আকাশ তার অনন্ত নীরব নেত্রে নির্ণিমেষ চেয়ে রয়েচে। ওই নিবিড় নিস্তব্ধতার মাঝে মিলিয়ে গেল আমার সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা অবধি পড়া কত কথা, কত চিন্তা; মানুষের কত রকমের আশ্চর্য্য বিকাশের ইতিবৃত্ত; আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে জেগে রইল শুধু একটা কথা :—the mystery...the only thing that matters...আর কিছুতেই কিছু যায়-আসে না! কি আসে যায়! শুধু জানা চাই সেই গুহাহিতকে। কি হবে সুখ দিয়ে, সম্পদ্ দিয়ে, কি হবে আরামের নানা উপকরণ দিয়ে, কি হবে Wealth দিয়ে, কি হবে ওই ভালো খাওয়া-পরা-থাকা-আমোদ-প্রমোদের Happiness দিয়েই বা, যদি সেই গুহাহিতকেই না দেখা গেল, যদি সেই যবনিকাই না সরানো গেল যার এপারে বসে ওমর খৈয়াম হতাশ হয়ে সুরাপান ক'রেই বেদনা ভোলার চেষ্টা করে গেলেন? না, না, ওই রহস্য-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না প'ড়ে উপায় নেই! ভালো খাওয়া-পরা···বিস্বাদ হয়ে ওঠে সব।··কাল রাত বারোটার পর অন্ধকারে বাতায়ন দিয়ে না জানি কোথায় দৃষ্টি আমার ডুবে গিয়েছিল! নাম-না-জানা না জানি কি-সব কীটের অদ্ভুত শব্দ-ঝঙ্কারে নিঃশব্দতা অতল গভীর হয়ে উঠেছিল; মনে হচ্চিল যেন মধ্য রাত্রির আকাশ তার নিবিড় ধ্যানের মাঝে সেই পরম রহস্যকে পেয়েচে।

তুমি হয় ত আমার কাল রাতের অবস্থার বর্ণনা শুনে মুখ টিপে হাসচ, আর ভাবচ মৈত্রেয়ীর কাল রাতে এ রকম মাথার বিকার হ'ল কেন? নিশ্চিন্ত হও সেজদা, ও আমার কালকের মধ্যরাতের কথা। আজ এই সূর্য্যালোকিত শরৎ-মধ্যাহ্নের সুনীল আকাশের পানে চেয়ে কালকের সেই অবস্থার কথা যেন স্বপ্নের মতই লাগচে। অনেক স্বপ্নই ভোরের আলোর স্পর্শে ঘাসের ওপরকার শিশিরের মত মিলিয়ে যায়, আর তাদের মনে আনা যায় না একেবারেই। এটি কিন্তু তা নয়, কালকের অনুভবের একটা অস্ফুট স্মৃতি আজ সারাদিন ধ'রেই মনকে যেন কেমন করচে। তাই তো তোমাকে না ব'লে থাকতে পারচি নে।

তোমার কখনো এ রকম হয়েচে সেজদা? কখনো কি ক'লকাতার অজস্র যান-বাহনের দ্রুত চলাচলের মাঝখানে, লক্ষ লক্ষ পথিকের ভিড়ের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে এই প্রতীয়মান উৎকট বাস্তবতা তোমার কাছে মিথ্যা অর্থহীন মনে হয়েচে; কখনো কি অকস্মাৎ নগরের ভীষণ কোলাহলে বধিরপ্রায় কাণে তোমার অসীম আকাশের ওপার থেকে গভীর নীরবতা নেমে এসেচে, যা তোমার চারদিকে বাস্তব জগৎ হয়ে তোমাকে ঘিরে ছিল সেই জগৎ কি একখানি মস্‌লিনের ওড়নার মত উড়ে গেছে; আর এক দৃশ্যাতীত রহস্যের অস্তিত্ব কি তোমায় কখনো আত্ম-বিস্মৃত, বিশ্ব-বিস্মৃত করেচে? বোধ হয়, না; যদি কখনো তোমার এমন অনুভূতি না হয়ে থাকে, তা হলে আমার এই কথাগুলোকেও তুমি প্রলাপ ব'লেই ভাববে। কিন্তু তোমায় না ব'লে যে আমার আজ উপায় নেই!

মনে পড়ে, একদিন তুমি আমায় একটা ছবি দেখিয়েছিলে আমেরিকার একটা Sky-scraperএর। নিউইয়র্ক সহরটা অনেক নীচে দেখা যাচ্চিল, তার ওপরে মাথা তুলে ওই Sky-scraper; তখনো সম্পূর্ণ হয় নি--তারই একটা সরু লোহার কড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন রাজমিস্ত্রী। তুমি কিম্বা আমি সেখানে দাঁড়াতে গেলে তৎক্ষণাৎ নিউ ইয়র্কের রাজপথে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা হয়ে যেত। কিন্তু সেই লোকটির মাথা ঘোরা তো দূরের কথা—সে যেন কোনো পার্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানচে এমনিতরো তার ভাবখানা দেখে আমার সেদিন অবাক্ লাগছিল। আমার কি মনে হয় জান সেজদা! যদি কোনো শিশুকে—যার উচ্চতার বোধ হয়নি'—ওই কড়ির ওপর দাঁড় করানো যেত তা হ'লে সেই শিশুও হয় ত অনায়াসে তার ওপর দাঁড়িয়ে ওই রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে গল্প সুরু করে দিত। শুধু তুমি-আমিই রাজপথে দুর্ঘটনার কারণ হ'তাম।

ওই ছবির কথাটা এখানে মনে এল কেন জান?

আমার মনে হয় গুহাহিতকে সইতে পারাও তোমার আমার মত মানুষের কাজ নয়। Sky-scraperএর ওপরে দাড়াতে যেমন তোমার-আমার ভয়ের অন্ত নেই, তেমনি রহস্যের সামনেও আমাদের ভয়ের সীমা-পরিসীমা নেই। তাই তাকে কেবলি এড়িয়ে চলি; আর যদি অকস্মাৎ সেই গভীর গহ্বরের কিনারায় কথনো চলে যাই, আর সে-সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন আত্মরক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে, রহস্যময় আমাদের চেতনাকে গ্রাস ক'রে ফেলে। আমার মনে হয় তুমি সেই রাজমিস্ত্রী নও; এই সৃষ্টির পরম-রহস্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দ হয়ে থাকার শক্তি তোমারও নেই!

দিন পনেরো হ'ল বিজ্ঞান মিত্র আর সমর হালদার এসেছিলেন আমাদের এখানে। তার পর কথায় কথায় Divine Mystery নিয়ে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বিজ্ঞান মিত্র আর সমর হালদারের রীতিমত বাক্‌যুদ্ধ হ'য়ে গেল। শেষটায় চা খাইয়ে তবে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি হ'ল। পরে নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতায় আমার লজ্জা হতে লাগল, Havelock Ellisএর কথা কয়েকটি চোখে পড়ল যখন সেদিনই বিকেলবেলা। তাঁর Impressions and Comments 3rd series বইখানা তুমি দেখেচ কি না জানি না। সব কথাগুলো যদি দেখতে তোমার কৌতূহল হয় তো ১১—১৩ পৃষ্ঠা দেখো। আমি শুধু তার দু ছত্র তোমায় না শুনিয়ে পারচি নে। তিনি বলচেন, I do not, indeed, myself think that the inaptitude for the function of religion—ancient as the religious emotions are—represents a higher stage of development.…It exalts us above the commonplace routine of our daily life, and it makes us supreme over the world. But, like love also, it is a little ridiculous to those who are unable to experience it. And since they can survive quite well without experiencing it, let them be thankful, as we also are thankful. সত্যি তো বিজ্ঞান মিত্র আর সমর হালদারের যদি পরম রহস্যকে বাদ দিয়েও দিন চলে যায় তো যাক্ না, তা নিয়ে তাদের বোঝাবার উদ্দেশ্যে বাক্‌যুদ্ধের ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়?

তারা কি যুক্তি দিচ্ছিল, সেজদা, জান? তারা আমায় বললে ও-প্রশ্নটা উঠেচে বুদ্ধির—অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির দরবারে। বিচার-বুদ্ধি—তারা ইংরাজীতে বলছিল Rational Intellect—যাকে প্রমাণ ক'রে দেখাতে পারে না, তা আছে কি নেই তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই! না যদি থাকে ভালো কথা! কিন্তু হায় রে, ওই বিচার-বুদ্ধির টেনিস ফিল্ডের বাইরেও যে 'বল' গিয়ে পড়ে যদি জাল ঘেরা না থাকে! কিন্তু এ নিয়ে তর্ক,—কি ছেলেমানুষীই না করেচি সেদিন! চোক বুজে যদি কেউ গভীর খাতের তট দিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে চলে যায় যাক্ না! যার অস্তিত্বই আমার চেতনার বাইরে, তার সম্বন্ধে আমাদের দায় আবার কি!

শুধু বিজ্ঞান মিত্র আর সমর হালদারই কি ওই রহস্যকে অস্বীকার করচে, সেজদা? আমার মনে হচ্চে ওই মিঃ ওয়েলস্‌ও এক দৌড়ে ওই রহস্যের বিভীষিকাকে এড়িয়ে গেছেন। তিনি নিতান্ত না মানলে নয় বলেই যেন রহস্যকে একটুখানি সেলাম জানিয়ে দৌড়ে জীবনের খেলাঘরে এসে ঢুকেচেন। আমার আরো মনে হয় ওই ছত্রগুলো তিনি কখনো আমার মত নিস্তব্ধ নিশীথের আকাশের পানে তাকিয়ে লেখেন নি। যেখানে চতুর্দ্দিকে কলকোলাহল ক'রে মানব-কর্ম্মধারা চলেচে তারই দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি ওই কটি কথা লিখে-ছিলেন। আমার মত যদি তিনি মধ্য রাতের নিষুপ্ত ধরণীর কোনো বাতায়ন দিয়ে অনন্তের পানে তাকিয়ে ও-কথা লিখতে আরম্ভ করতেন তা হ'লে ওই বাক্যটি the only thing that mattersএ এসেই থেমে যেত!

সত্যি, দিনের আলো একটা কত বড় আবরণ! একটি ছোট্ট জগতের বুদ্‌বুদ্ তার ক্ষণিকের অস্তিত্ব দিয়ে কেমন করে একটা অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত তারকা-লোককে একেবারে অস্তিত্বহীন ক'রে রেখে দেয়! দিনান্তে যখন এই জগতের আলো নিবে যায় তখন কী আশ্চর্য্য রকমেই না প্রকাশ পায় বিস্ময়ভরা তারকাময় ব্রহ্মাণ্ড! তেমনি এই আমাদের বাস্তব জীবন, কী অদ্ভুত আবরণ টেনে রেখেচে চোকের ওপর! আবরণ রয়েচে বলে বুঝতেই দেয় না, অথচ এই বাস্তব জীবন আমাদের বঞ্চিত করে রেখেচে পরম-রহস্যের সংস্পর্শ থেকে! যদি বা কখনো অকস্মাৎ আবরণ একটু অপসারিত হয়ে যায়, হঠাৎ

দেখায় ভয়ে মরি ! নিউইয়র্কের সেই Sky-scraperএর ওপরকার সেই রাজমিস্ত্রীর মত স্বচ্ছন্দ হয়ে দাঁড়াতেও পারি না, আর সেখান থেকে সত্যকে তার অপরিসীম বিস্তারের পরম প্রশান্তির মাঝে দেখবার সৌভাগ্যও ঘটে না !

কাল রাতের বেলা ওই রহস্যের আভাসে আমার মাথা ঘুরে পড়ার দশাই হয়েছিল বটে ; চেতনা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা হ'লে যে চলবে না, সেই কথাটি আজ এই মধ্যাহ্ন বেলাকার প্রশান্ত সুনীল আকাশের অনন্ত উদার বিস্তারের পানে চেয়ে চেয়ে মন বলচে ! সূর্য্যালোকে নিউইয়র্কের রাজমিস্ত্রী যেমন পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে, তেমনি গুহাহিতকেও পরিপূর্ণ চেতনা নিয়ে উপলব্ধি করা চাই···Ultimately ···the only thing that matters··· মন বলচে সেই পরম রহস্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ সাক্ষাৎকার চাই ; কারণ, সেই খানেই রয়েচে আমার গোপন ঘরের সোনার চাবিটি, সে চাবিটি নিয়ে না জানি কোন্ অনাদি যুগের প্রথম প্রভাতে গরুড় পাখী সপ্ত সাগরের পারে প্রয়াণ করেচে।······

সেদিন আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'ভালোবাসাতেই কি জীবনের চরম পরিপূর্ণতা নয় ?' আজ এই মুহূর্ত্তে আমি তার উত্তর পেলাম। ভালোবাসা, গভীর ভালোবাসার মত সুন্দর আর কি আছে তা জানি না ! তবু এই কথাই আজ মনে হচ্চে ভালোবাসায় আমাদের অন্তরাত্মার শেষ পরিচয় নেই ! আমার কাছে ভালোবাসা খুলে দিয়েচে একটি গভীর বেদনার আনন্দাশ্রুময় পথ ; এই কাঁদনের পথ ধ'রে হয়তো একদিন সেই পরম গোপনের সাক্ষাৎ পাব !

মধুকর

শ্রীজগৎমোহন সেন বি-এস্ সি

বরষার শেষ ভরসা মিলায়
দূরে নীলাকাশ-বুকে,
কুঁড়ির কপাট খুলিয়া দোপাটি
বাহিরায় হাসিমুখে।
খোলা পেয়ে দ্বার, প্রজাপতি তার
তরুণ হিয়ার মধু-সম্ভার
দস্যুর মত করিয়া উজাড়
লুণ্ঠন করে সুখে।
লুণ্ঠন কালে দস্যুর গালে
চুমিয়া কুসুম কহে,—
—দলে দলে তার উন্মাদনার
তড়িৎ-প্রবাহ বহে,—
"হৃদয় নিঙাড়ি লহ প্রিয়তম !
চির জনমের সঞ্চয় মম,
এ মধু রেখেছি তোমারি লাগিয়া
আর কারো তরে নহে।
হৃদয় নিঙাড়ি লহ মধু কাড়ি,
লহ, লহ, প্রিয়তম !
রিক্ত করিয়া সার্থক কর
জন্ম জীবন মম।
মুকুলের মাঝে এই ভরসায়—
যাপিয়াছি কাল ভরা বরষায়
তিল তিল করি ভাণ্ডার ভরি
রেখেছি কৃপণ সম।

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রজাপতি সম
প্রিয়, প্রিয়তম মোর।
ভকতির সুধা খুঁজিয়া ফিরিছ
অনন্তকাল ভোর।
আমার মনের অস্ফুট কলি
সঙ্গীতে, রূপে আজো ত' উছলি
ওঠেনি, ফোটেনি কুসুম এখনো
কাটেনি বরষা ঘোর।
আজো মোর ফুল লুকানো মুকুল
পত্র দুকূল-পুটে ;
নাহি উৎসব, নাহি কলরব,
গুঞ্জন নাহি উঠে।
হৃদয় পাত্রে দিনে দিনে হায়
মধু ভরি উঠে কানায় কানায়,
কোরকের কারা বিদরি কুসুম
বাহিরিতে চায় ফুটে।
কবে বাহিরিব ছিঁড়িয়া কুঁড়ির
বদ্ধ আঁধার ঘর ?
দ্বার খোলা পেয়ে আসিবে ছুটিয়া
তস্কর মধুকর ?
কবে এ পাত্র নিঃশেষ করি
সঞ্চিত সুধা লবে অপহরি
মুকুলের মাঝে বরষা নিশায়
খুঁজি তারই অবসর।
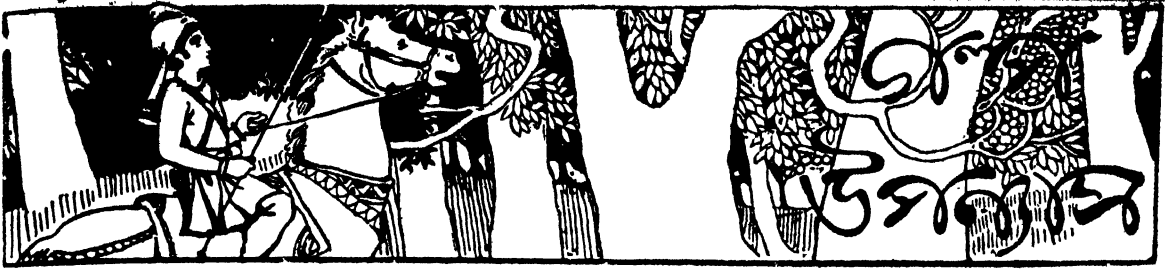
শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(৭)

বৈকালে মাধব হাটে গেল ; সন্ধ্যাবেলায় সে ফিরিয়া আসিল। হাট হইতে ফিরিয়া তার কাপড়ের বোঝা ফেলিয়া সে ঘরের দাওয়ায় হাত পা ছাড়িয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তার মুখে বিষাদ ও আশঙ্কার নিদারুণ ছায়া !

মাধবের মুখ দেখিয়া বিন্দুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। মাধবের পাশে বসিয়া তাকে পাখা দিয়া বাতাস করিতে করিতে মাধবের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মাধব যে কারণ বলিল তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ। মাধব সুধু একখানা উড়ানী ছাড়া কিছুই বেচিতে পারে নাই। সুতরাং হাট হইতে কিছু চাল ছাড়া কোনও কিছুই আনিতে পারে নাই।

ঠিক এমনটা কখনও হয় নাই। ইতিপূর্ব্বেই বিলাতী কাপড় আমদানী আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু এই দূর অগম্য দেশে তখনও তাহা খুব বেশী আসে নাই। যাহা আসিত তাহা মোটা কাপড়—তাহাতে জোলাদেরই ক্ষতি করিয়াছিল,—সূক্ষ্মকর্ম্মকুশল তাঁতিদের তাতে খুব বেশী ক্ষতি হয় নাই। তাই মাধব ও অন্যান্য তাঁতিরা প্রতি হাটেই কাপড় বেচিয়া যাহা পাইত তাতে তাদের দিন চলিয়া যাইতেছিল।

কিন্তু সম্প্রতি রাধাগোবিন্দ সাহা নামে এক মহাজন এক-চালান বিলাতী ধুতি ও শাড়ী আনিয়াছে, তাহা সূক্ষ্ম ও সুদৃশ্য। গত দুই হাটে সে কাপড় কিছু কিছু বিক্রয় হইয়াছিল,—কিন্তু এবারকার হাটে খরিদ্দারেরা একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল রাধাগোবিন্দের দোকানে এই "গুটিভাজে"র কাপড় কিনিবার জন্য। তাঁতির কাপড়ের দিকে কেউ ফিরিয়াও চাহে নাই। এবারকার হাটে তাঁতিরা বেচিয়াছে সুধু কয়েকখানা উড়ানী !

অবস্থা শুনিয়া বিন্দু একেবারে দমিয়া গেল। সে আশঙ্কা করিল যে এবারকার হাটে যে অবস্থা হইয়াছে, আগামী হাটেও হয় তো সেই অবস্থাই হইবে। তাহা হইলে তো মাধবের সংসার অচল হইবে !

সেও মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

শারদাও সব কথা শুনিল। সে অতশত বুঝিল না। সে সুধু বুঝিল যে এবার হাটে কাপড় বিক্রী হয় নাই—এখন কয়েক দিন ধারে চালাইতে হইবে। সে কথাটা বিশেষ গায় না মাখিয়া, তার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতার সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল।

মাধব ও বিন্দু ম্লানমুখে দাওয়ায় বসিয়া নিঃশব্দে ভাবিতে লাগিল। বিন্দু ভাবিল, তার টাকার যদি এখন কিছু অবশিষ্ট থাকিত, যদি মাধবের বিবাহ দিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া না বসিত, তবে এ বিপদের দিনে তার কত উপকার হইতে পারিত। মাধব ভাবিতে লাগিল তার পিতামহের আমলে তাদের চারখান তাঁত চলিত, আজ ঠেকিয়াছে তার একখানায়—তাও বুঝি সে রাখিতে পারে না।

মাধবের বোনা নূতন একখানা শাড়ী পরিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া শারদা কাজ করিতেছিল। দুজনেরই চক্ষু পড়িল তার উপর। দুইজনেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল।

বিন্দু বলিল, "পোলাপান! ও কি বুইঝবো ওয়ার কপালে কি দুঃখ আছে।"

মাধব বলিল, "ওয়ারে বিয়া কইর‍্যা আমিও মইলাম, ওয়ারেও মাইরলাম।"

একটু পরে বিন্দু বলিল, "নেও, ওঠ! এমুন থাইকবো না। বিলাতী কাপর তো আর টিকবো না বেশী—তখন দেইখ্যা শুইন্যা মাইন্‌সে আবার আমাগো কাপরই পইরবো। ওঠ মুখখান ধুইয়া আইসা চাইড্ডা জলপান খাও।" মাধব উঠিল।

বিলাতী কাপড় টেঁকসই নয়, তাই তাঁতির কাপড় লোকে শেষে কিনিবে এ ভরসা তাঁতিদের অনেক দিন ছিল।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিন্দু একটা উপায় ঠিক করিল। দক্ষিণ পাড়ায় কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-পরিবার বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিদেশে ওকালতী করিয়া বেশ কিছু সঙ্গতি করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি বাড়ীতে 'দালান' অর্থাৎ পাকাবাড়ী করিতেছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি গৃহ-প্রবেশের জন্য সপরিবারে দেশে আসিয়াছেন; কিছুদিন তাঁরা থাকিবেন। বিন্দু ভাবিল তাঁহাদের বাড়ীতে মেয়েদেরকে দেখাইলে কিছু কাপড়-চোপড় বিক্রয় হইতে পারে।

সেই আশায় সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কয়েক-খান কাপড় পুঁটুলী বাঁধিয়া পরদিন সকালে নীয়োগী-বাড়ী লইয়া গেল। নীয়োগী-বাড়ী তখন রমরম করিতেছে। সমস্ত নীয়োগী-পরিবার এবং তাঁদের চারিদিককার বহু আত্মীয়-কুটুম্ব আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। পুরুষেরা বৈঠকখানায় বা গাছতলায় বসিয়া মজ্‌লিস করিতেছে, নেউগী বাবুদের রায়ত-জন আসিয়া চাটাই পাড়িয়া গল্প-গুজব করিতেছে আর তামাক উড়াইতেছে। অন্দরের উঠানে মেয়ের দল ছুটাছুটি করিয়া কাজ ও তার চেয়ে বেশী চেঁচামেচি করিতেছে। টেঁকিঘরে একদল মেয়ে "বারা" ভানিতেছে—ছেলে-মেয়ের দল হৈ চৈ করিয়া সারা বাড়ী ছুটাছুটি করিতেছে।

ছোট্ট কাপড়ের পুঁটুলীটি হাতে করিয়া আসিয়া বিন্দু কিছুক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ তাহাকে বিশেষ লক্ষ্য করিল না। অনেকক্ষণ পর উকীল-গৃহিণী আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "আ লো—কে? বিন্দু না কি? আইচস্, আয় আয়—বইস্।" তার পর একটু মুচকী হাসির সহিত—"তুই তো মাধইব্যার কাছেই আছস, কেমুন?"

বিন্দু একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল "হ' বো'ঠাইক্যান, আর জামু কোহানে—ওয়ার কাছে বয়স কাটাইলাম, এহন বুড়াবয়সে আর কে পুইছবো?"

"বুড়া? কস্ কি? তুই তো আমারও কত ছোট—আমার বিয়ার সময় তরে দেখিছি একিবারে গ্যাদা। কেমুন?"

"হ' বো'ঠাইক্যান, আপনের থিক্যা তো ছোটই।"

কথায় কথায় বিন্দু কহিল যে মাধব এখন বিবাহ করিয়াছে। চক্ষু বড় বড় করিয়া নীয়োগী-গিন্নী হাসিয়া বলিলেন, "বিয়া ক'রছে, ক'স কি?"

তার পর প্রশ্ন হইল, বউ দেখিতে কেমন, কত বড়, স্বভাব কেমন ইত্যাদি। শেষে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, নববধূর সঙ্গে বিন্দুর ভাব কেমন?

বিন্দু বিশেষ বাগাড়ম্বরের সহিত প্রকাশ করিল যে বধূ তার নিরতিশয় স্নেহের পাত্রী এবং নিতান্ত অনুগত—সে নিজেই মাধবের জন্য বধূ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে ইত্যাদি। সে আজ বেশ স্পষ্ট করিয়াই অনুভব করিল যে শারদার সঙ্গে যে তার সদ্ভাব নাই এ কথাটা তার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা নয়, এবং কথাটা যত চাপা থাকে ততই মঙ্গল। তাই সে খুব বড় গলায় তার সঙ্গে শারদার স্নেহ-সম্বন্ধের ব্যাখ্যান করিয়া গেল।

গিন্নী বলিলেন বধূকে একবার তাঁকে দেখাইতে হইবে এবং বিন্দুকে বার বার করিয়া বলিয়া দিলেন যে পরের দিন প্রাতে যেন সে তাকে লইয়া আসে।

তার পর অনেক কথাবার্ত্তার পর অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বিন্দু তার পুঁটুলী খুলিতে খুলিতে বলিল, "বো'ঠাইক্যান, খানকত কাপড় দেখাইবার আইচিলাম।"

গৃহিণী কাপড় কয়খানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে গৃহিণী বউ-ঝি প্রভৃতি নানাশ্রেণীর মেয়ে বিন্দুর চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

অনেক দেখাশোনার পর গৃহিণী তিনখানা কাপড় রাখিলেন, দামের জন্য পরে আসিতে বলিলেন।

বিন্দু বলিল, "বো'ঠাইক্যান, কিছু যদি এখন দিতেন তবে বড় ভাল হইতো—আইজ ঘরে একটা পয়সা নাই।"

গৃহিণী অনেক আপত্তির পর দুইটা টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

উৎফুল্ল অন্তরে বাড়ী ফিরিয়া টাকা দুইটা মাধবের সামনে ফেলিয়া দিয়া বিন্দু তাকে এই সুসংবাদ জানাইল।

মাধব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সে একেবারে হাত পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছিল; তার ভাবনার অন্ত ছিল না। তার হাতে একটি পয়সা নাই; হাটে কাপড় বিক্রী হইল না, এখন যে খাওয়া-পরা কেমন করিয়া চলিবে তার ঠিকানা নাই। তার পর সে একখানা নূতন ঘর আরম্ভ করিয়াছে—তার জন্য কামলা-খরচ দিতে হইবে, ছাউনির খড় কিনিতে হইবে, বেড়ার জন্য চাটাই কিনিতে হইবে—তার পয়সা তার নাই। ঘরখানার খুঁটি পোতা হইয়া গিয়াছিল, সেই উলঙ্গ খুঁটিগুলি যেন তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল।

মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তার তাঁতে গিয়া বসিল। তাঁত বুনিতে তার আনন্দের অবধি ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তাঁতে বসিয়া কাপড় বুনিয়া যাইত—ক্ষিপ্র হস্তে মাকু চালাইত, ভাজি নাড়িয়া দিত—আর মনের আনন্দে গান করিত। কিন্তু আজ তার গান আসিল না, আনন্দ আসিল না, সে বিষণ্ণভাবে কলের মত কাজ করিতে লাগিল।

সে বুনিতেছিল ডুরে শাড়ী—বিচিত্র শোভাময়। আজকের দিন বুনিলেই শেষ হইয়া যায়, কাল আবার নূতন তানা তাঁতে চড়াইতে হইবে। সে খুব উৎসাহের সহিত শাড়ী দু'জোড়া বুনিতেছিল, আশা ছিল, ইহা হইতে বেশ কিছু পয়সা সে পাইবে। কিন্তু আজ তার মনে হইল, কি হইবে বুনিয়া?—কেহ কি কিনিবে? তাই সে নিতান্ত অলসভাবে উৎসাহহীন হইয়া মাকু চালাইতেছিল।

শারদা আসিয়া তার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঃ, কি বাহারের শাড়ী হইছে!"

মাধব তার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "তুই নিবি একখান?"

শারদার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এত ভাল এবং দামী শাড়ী সে কোনও দিন পরিবার ভরসা করে নাই। তাই স্বামীর এ প্রশ্নে তার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "দেও যদি তো নিমু না ক্যান?"

মাধব বলিল, "দিমু—এক জোরা দিমু—আইজ কাপরখান নামাইয়াই দিমু তরে, পরিস্।"

আনন্দে শারদা নৃত্য করিয়া উঠিল।

মাধব ভাবিল, দোষ কি? এ কাপড় বিক্রী তো হইবেই না, তা শারদাই পরুক! এখন হইতে সে আর কিছুই বুনিবে না, সুধু উড়ানী বুনিবে—বাজারে তারই কিছু চাহিদা আছে।

তার পর সে উদাস মনে শাড়ী বুনিয়া গেল, শারদা নাচিয়া নাচিয়া কাজ করিতে করিতে বার বার আসিয়া শাড়ীখানা দেখিতে লাগিল।

যখন বিন্দু আসিয়া তার সামনে দুইটা টাকা ফেলিয়া তার সৌভাগ্যের কথা বলিল, তখন মাধবের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। সে উৎসাহের সহিত কাপড় বুনিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলায় তাঁত হইতে শাড়ী নামিল। শারদা ছুটিয়া আসিল। দু জোড়া শাড়ী হইতে এক জোড়া কাটিয়া মাধব শারদাকে দিল। শারদা একখানা তুলিয়া রাখিয়া অপরখানা পরিয়া আসিয়া মাধবের পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। মাধব অতৃপ্ত নয়নে তাকে চাহিয়া দেখিল।

শাড়ীখানা পরিয়া শারদার রূপ বড় খুলিয়াছিল। সেই রূপরাশির উপর শাড়ীখানা চাঁদের উপর পাতলা মেঘের প্রলেপের মত শোভাময় হইয়া উঠিয়াছিল।

বিন্দু যখন শারদার অঙ্গে এই শাড়ী দেখিল, তখন তার দুই চক্ষু কপালে উঠিয়া গেল। মাধব কি পাগল! এত দামী শাড়ী—তাহা দিয়া বসিল শারদাকে?

(৮)

পরের দিন সকালে বিন্দু শারদাকে লইয়া নেউগী-বাড়ী গেল।

মাথায় অনেকটা তেল ঠাসিয়া পাট করিয়া চুল

টানিয়া বাঁধিয়া সে শারদার মুখখানা মুছাইয়া দিল। শারদার নিজের দু-গাছা রূপার বালা ছিল, তাহা সে পরিল, বিন্দুও তার নিজের তিন চারখানা রূপার গহনা বাহির করিয়া শারদাকে পরাইয়া দিল। শারদা পরিল তার নূতন শাড়ীখানা।

মাথায় ঘোমটা টানিল সে এক হাত; কিন্তু নূতন কোরা শাড়ীখানায় না ঢাকিল তার মুখ, না ঢাকিল তার দেহ।

অনেকগুলি বাড়ীর উঠান ডিঙ্গাইয়া বেঁকাচুরা ছায়ায় ঢাকা পথ দিয়া তারা গেল। পথে যে পড়িল সে শারদার এ রূপরাশির দিকে দু'দণ্ড না চাহিয়া পারিল না।

নেউগী-বাড়ী সেদিন একটা বড় রকম খাওয়া-দাওয়া ছিল। রান্নাবাড়ীর উঠানে একটা ছোট-খাট পর্ব্বতের মত মাছের কাঁড়ি জমিয়াছিল। তার চারধারে ঘিরিয়া লোকজন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছিল।

নেউগী-গৃহিণী কোমরে কাপড় গুঁজিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া দুই হাত নাড়িয়া অনর্গল হাঁকাহাঁকি করিতেছিলেন, এই মাছগুলি কুটাইবার ব্যবস্থা করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে। তাঁর কথা শুনিয়া কেহ বঁটি খুঁজিতে গেল, কেহ লোক ডাকিতে গেল, কেউ বা বলিল, "আসি।" কিন্তু চট পট কেউ মাছ কুটিতে বসিল না। গৃহিণীর চীৎকার চলিতে লাগিল।

এমন সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল শারদাকে লইয়া বিন্দু।

নেউগী-গৃহিণী বিন্দুকে দেখিয়াই তার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এই যে, বিন্দু আইচস্; আয় তো বিন্দু, বইস্ তো দাওখান লইয়া।" বলিয়া তিনি বিন্দুকে একটা বঁটির উপর টানিয়া বসাইলেন। বিন্দু মাছ কুটিতে লাগিয়া গেল।

শারদা আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার চঞ্চল চক্ষু দুটি কেবল এই উৎসবের বাড়ীতে তার অনভ্যস্ত ঐশ্বর্য্যের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একটা রুইমাছের মাথাটা কাটিয়া নামাইয়া বিন্দু বলিল, "বো'ঠাইক্যান, মাধইব্যার বউরে আইনবার কইছিলেন—ঐই যে।" বলিয়া সে শারদাকে দেখাইয়া দিল।

নেউগী-গৃহিণী শারদার দিকে একবার একটু চাহিয়া সুধু বলিলেন, "বেশ তো বউডি"—তার পরেই "দেখিস পিত্তি গালিস না। বেশ বড় বড় কইরা কয়েকখান চাকা ফালা"—তার পর অন্য একজনের দিকে ফিরিয়া "ও ফালানের মা, তুমি আমারে দুইডা বটি নি আইনা দিব্যার পার—যাওচে দেহ গা।" তার পর আর এক জনকে আর একটা ফরমায়েস করিলেন, তার পর আর একজনকে। তার পর এক ননদিনীকে ধরিয়া আনিয়া মাছের কাছে বসাইয়া তিনি ছুটিলেন অন্য ডিপার্টমেণ্টে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শারদার বিরক্তি ধরিয়া গেল। একগলা ঘোমটা টানিয়া ঠিঁ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা শারদার কোনও দিনই ধাতে সয় না। তার হাত পায়ের চঞ্চলতাকে এমন করিয়া দমন করিয়া সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। সে ছটফট্ করিতে লাগিল। বিন্দু খ্যাস্ খ্যাস্ করিয়া মাছ কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে ছোট বড় নানা রকমের বঁটি লইয়া লোক উপস্থিত হইল—খ্যাস্ খ্যাস ফ্যাস ফ্যাস করিয়া মাছ কাটা চলিতে লাগিল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সুধু ইহা দেখিতে দেখিতে শারদার চক্ষু টাটাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে নেউগী-গৃহিণী আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে তিনি গিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, মেয়ে ও বউদের যে পান সাজিবার ভার ছিল, তাহারা তখনও তাতে হাত দেয় নাই। সকলকে ডাকাডাকি বকাবকি করিয়া তিনি হাতের গোড়ায় ছোট বউকে পাইয়া তাকে পান সাজিতে বসাইলেন। তখন তাঁর মনে হইল মাধবের বউ আসিয়াছে, তাকে পান সাজিতে বসান যাইতে পারে। তাই তিনি রান্নাবাড়ীর উঠানে ফিরিয়া আসিয়া বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন মাধবের স্ত্রী কোথায়?

শারদা সেখানে দাঁড়াইয়াই ছিল, বিন্দু তাকে দেখাইয়া দিল। গৃহিণী অমনি খপ্ করিয়া শারদার বাহু ধরিয়া তাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, "আয় চে লো ছেরী—একখান কাম কর চে"—বলিয়া তাকে টানিতে টানিতে ছোট

বধূর নিকটে লইয়া পান সাজিতে বসাইলেন। ক্রমে অনেকগুলি মেয়ে ও বউ আসিয়া পান সাজিতে বসিয়া গেল। সকলের সঙ্গেই শারদার পরিচয় হইল—আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল।

শারদার পক্ষে এ যেন এক নূতন পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়। সে তাঁতির মেয়ে, তাঁতির বউ। ভদ্রলোকের বাড়ী তার গতিবিধি ছিল না এমন নয়, কিন্তু সে সব ভদ্রলোক গরীব এবং গ্রাম্য। নেউগী-পরিবার ধনী—তারা শহরে বাস করে। তাদের চলন-চালন, ধরণ-ধারণ, কথাবার্ত্তা সবই নূতন ধরণের—তাদের বেশভূষাও ভিন্ন! শারদার মনে হইল যেন সে স্বপ্নের ঘোরে হঠাৎ কোন এক ইন্দ্রপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু তার সবচেয়ে চমক লাগিল যখন তাদের সেই পানসাজার মজ্‌লিসে আসিয়া উপস্থিত হইল বড় বউ মনোরমা।

অপরূপ সুন্দরী মনোরমা। রঙ যেন তার ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখখানি যেন ছাঁচে কাটা; আর তার মাঝে যে এক জোড়া চোখ—না জানি ভগবান কোন্ মোহের ঘোরে ঐ স্বপ্নজড়িত দীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত ভাসাভাসা ঢলঢল চোখ দুটি গড়িয়াছিলেন। ছোট্ট কপালের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে মেঘের স্তূপের মত কেশরাশি। মাথায় কাপড় আছে, কিন্তু মুখ ঢাকা ঘোমটা নাই।

বড় বউ আসিল ছোট একটি ছেলে কোলে করিয়া। ছেলে তো নয় যেন মোমের পুতুল। মোটাসোটা গোলগাল—চকচকে চঞ্চল তার চোখ, আর কপালের উপর থোপা থোপা কোঁকড়া চুল।

শারদা তার বড় বড় ডবডবে চোখ বিস্ফারিত করিয়া মনোরমার দিকে চাহিল—এত রূপ যে মানুষের সম্ভব এ কথা শারদা কোনও দিন কল্পনাই করিতে পারে নাই। এ যেন সাক্ষাৎ ভগবতী শিশু কার্ত্তিককে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বড় বউও শারদাকে দেখিয়া চাহিয়া রহিল। চাহিয়া দেখিবার মত রূপ শারদারও আছে, তাই মনোরমা চাহিয়া রহিল।

মনোরমা ছোট বউকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে লো?"

ছোট বউ বলিল, "মাধব তাঁতির বউ।" বলিয়া সে একটু হাসিল।

মনোরমাও মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাই না কি? মাধবের তো কপাল ভাল!—দেখি তো তাঁতি-বউ, তোর হাতের সাজা একটা পান দে খাই।"

শারদা একটা পান লইয়া তার হাতে দিয়া টিপ করিয়া মনোরমার পায় একটা প্রণাম করিল। রীতি অনুসারে এ বাড়ীতে আসিয়া সবাইকে প্রণাম করা তার উচিত ছিল—কিন্তু তার খেয়াল হয় নাই, আর অবসরও সে পায় নাই। কিন্তু মনোরমাকে দেখিয়া তার মাথা যেন আপনি নুইয়া পড়িল। সে পায় হাত দিয়া তাকে প্রণাম করিল।

মনোরমা শারদাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া পান মুখে দিল। একটু পরে সে বলিল, "বাঃ বেশ তো পান সাজিস্ তুই। তোর হাতের রান্না ভাল হবে—জানিস্?"

মনোরমার রূপে সে মুগ্ধ হইয়াছিল। তার অপূর্ব্ব মনোহর কণ্ঠস্বরে সে পুলকিত হইয়াছিল। তার পর মনোরমা তার রূপের প্রশংসা করিয়াছে—এখন আবার তার পান সাজার সুখ্যাতি! শারদা একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। মনোরমা তাকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিল।

মনোরমার কোলে শিশু ছট্‌ফট করিতেছিল। মনোরমা বিরক্ত হইয়া তাকে ধমক দিয়া উঠিল। শারদা সলজ্জ হাস্যের সহিত হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেন না ওয়ারে আমার কোলে?"

মনোরমা শিশুকে শারদার কোলে দিয়া বলিল, "নে, দেখ্ তো রাখতে পারিস কি না। সকাল থেকে ব'য়ে বেড়াচ্ছি—আর পারি নে।"

শিশুকে দেখিয়াই শারদার লোভ হইয়াছিল তাকে কোলে করিতে। এখন তাকে সত্য সত্য কোলে পাইয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে তাকে লইয়া এমন নাচানাচি লাফালাফি সুরু করিয়া দিল যে দেখিতে দেখিতে শিশু তার বশ হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তার সঙ্গে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। শারদাকে কিল চড় মারিয়া অস্থির করিল; আর খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

শিশুকে এমনি করিয়া বশ করিয়া শারদা মনোরমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তার পর সে যতক্ষণ রহিল ততক্ষণ শারদা মনোরমার সঙ্গেই গল্প করিল, তারই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিল। দুজনে বেশ নিবিড় স্নেহ-সম্বন্ধ নিমেষ মধ্যে গড়িয়া উঠিল।

মনোরমার বয়স বছর আঠার। সে সুধু সুন্দরী নয়—বড় কৌতুকময়ী। হাসিবার ও হাসাইবার শক্তি তার অসামান্য। গুণের তার অবধি নাই। মিষ্টিমুখ ছাড়া সে কথা কহিতে জানে না, কারও উপর দ্বেষ সে কোনও দিনই করে নাই, ঝগড়া করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। স্নেহময়ী, করুণাময়ী সে, সকলকে ভালবাসিতে চায়,—সকলের প্রতি তার অশেষ মমতা।

তবু বড় বউয়ের অখ্যাতির অবধি ছিল না। অখ্যাতির প্রথম দফা এই যে তার লাজলজ্জা নাই। বিবাহের পর হইতেই সে ঘোমটা যা দেয় সে তার নাকের নীচে কখনও নামে না, এখন তো সে আরও উপরে উঠিয়াছে। তা ছাড়া এত বড় বেহায়া সে যে, দিন-দুপুরে শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া সে স্বামীর ঘরে যায় এবং স্বামীর সঙ্গে কথা বলে এবং হাসাহাসি করে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন অনেক বয়স পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর দিনের বেলায় দেখা-শোনা হওয়া একেবারে সর্ব্বশাস্ত্র-বিগর্হিত ছিল। সেকালে পিতা বর্ত্তমানে বিবাহিত, যোগ্য পুত্ত্রেরা—তাদের বয়স বিশই হউক বা চল্লিশই হউক—দিনের বেলায় অন্তঃপুরে আসিত না। গভীর রাত্রে যখন খবর পাইত যে পিতা ঘরে দুয়ার দিয়া শুইয়াছেন তখন পুত্র সন্তর্পণে খড়ম হাতে করিয়া পা টিপিয়া চোরের মত আপন শয়ন-গৃহে যাইত। সেই দিনে মনোরমা অম্লানবদনে দ্বিপ্রহরে স্বামী-সম্ভাষণে যাইত, ইহা কম লজ্জা বা নিন্দার কথা নয়।

আরও ভয়ানক কথা এই যে আঠার বছরের বউ, তার গলা শোনা যায়! সেকালের রীতি ছিল যে বউরা শ্বশুরবাড়ীতে ফিস ফিস করিয়া কথা কহিবে, গলা খুলিয়া প্রাণ গেলেও কথা কহিবে না। যে বধূর কণ্ঠ লোকে শুনিতে পাইত তাকে বেহায়া সবাই বলিত। মনোরমার কণ্ঠ সুধু শোনা যাইত না, অনেক সময়ই তার বংশী-বিনিন্দিত কণ্ঠের উচ্চ হাস্তধ্বনি বাড়ীখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিত,—শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে শিহরিত করিয়া ফেলিত। এমন মেয়েকে বেহায়া না বলিবে কে?

সব চেয়ে বেশী লজ্জার কথা এই যে মনোরমা সর্ব্বদা সেমিজ পরিয়া সাজিয়া থাকে! সেমিজ তখনও এ অঞ্চলে দেখা দেয় নাই। মনোরমাই প্রথম সেমিজ—যাকে সেকালে বলিত কামিজ—পরিয়া দেখা দেয়। সেমিজ পরাটা যে সেকালে কত বড় লজ্জা ও নিন্দার কথা ছিল, সে কথা এ কালের পাঠক বুঝিতেও পারিবেন না। ধনীর ঘরের অনেক যুবতী রূপবতী বধূ স্বচ্ছ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁদের সমগ্র রূপলাবণ্য লোকের চক্ষের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া দেখাইতেন—মাথার উপর সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া রাখিলে তাতে তাঁহাদিগকে কেহ নির্লজ্জ বলিতে পারিত না। কিন্তু সেমিজ পরিয়া দেহটাকে সম্যকরূপে আবৃত করিলে সেটা সুধু বিবিয়ানা বলিয়া নিন্দিত হইত না, নির্লজ্জতার পরিচয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। মনোরমা সেকালের মেয়ে হইলেও, তার বাপ কলিকাতার একজন বড় উকীল এবং সেও কলিকাতায় মানুষ হইয়াছে, বেথুন স্কুলে সে কিছুদিন লেখাপড়াও করিয়াছে। কাজেই সেমিজ পরিতে সে শৈশব হইতে অভ্যস্ত, এবং সেমিজ পরিয়াই সে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছিল। দেখিয়া গ্রামবাসিনীদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মনোরমার আর একটা দোষের কথা এই যে, সে অলস এবং অকর্ম্মণ্য;—কাজের মধ্যে সে জানে শুধু সাজিয়া গুজিয়া পটের পরী হইয়া বসিয়া থাকিতে। এ কথাটাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। রান্নাবাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম গৃহকর্ম্মই সে বেশ করিতে জানে এবং সাধ্যমত করেও। কিন্তু সে খুব কঠোর কর্ম্মে অভ্যস্ত নয়। পাড়াগাঁয়ের ঝি বউরা যেমন দিনরাত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে পারে ততটা মনোরমা পারে না—কেন না অত পরিশ্রম করা তার অভ্যাস নাই। তাই পল্লী-গ্রামে আসিয়া তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কর্ম্মপটুতার খ্যাতি সে অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ইহাই তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের ভিত্তি।

এত অখ্যাতি লইয়া মনোরমার জীবন প্রথম প্রথম

বড়ই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল—সে তার ভিতর বাঁচিয়া ছিল সুধু তার স্বামী ও শাশুড়ীর আদরে। অন্য লোকে যাই বলুক, মনোরমার স্বামী বা শাশুড়ী কোনও দিনই তার সুখ্যাতি বই নিন্দা করেন নাই। আর এত স্নেহ, এত প্রীতি সে তাঁদের কাছে পাইয়াছিল যে সমস্ত পৃথিবীর নিন্দাবাদ সে অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শেষে এমন দিন আসিল যখন, যারা তার খুব বেশী নিন্দা করিত, তারাই তার প্রশংসায় শত-মুখ হইয়া উঠিল। সে তার কোনও নবাবিষ্কৃত গুণের জন্য নয়, তার নিন্দাকারীদের কোনও অনৈসর্গিক চরিত্র-বিপর্য্যয়ের ফলে নয়,—তার কারণ সুধু এই যে দুই বৎসর হইল তার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। সেকালের ডেপুটীর কার্য্যের মর্য্যাদার পরিমাণ আজকের মানদণ্ডে করা চলে না। সেকালে ডেপুটীর কাজই ছিল বাঙ্গালীর পক্ষে সবচেয়ে বড় কাজ—বেতনের দিক দিয়াও বড়, আর ক্ষমতা ও গৌরবের দিক দিয়া তো বটেই। দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—যারা ইচ্ছা করিলেই লোককে ফাটকে দিতে পারে, তারা যে অনন্যসাধারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে সে আর বিচিত্র কি? সুতরাং অন্য নারীর পক্ষে যেটা অমার্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, ডেপুটী-গৃহিণী মনোরমার পক্ষে সেটা প্রশংসার বিষয়ই হইয়া উঠিয়াছিল।

তবু আড়ালে গিয়া কাণাঘুষা করিয়া লোকে নিন্দা করিতে ছাড়িত না। ডেপুটি হইয়া ফণীভূষণ পুর্ণিয়ায় নিযুক্ত হইয়াছিল। সে মনোরমাকে সেখানে লইয়া গেল। অবশ্য মনোরমা একা যায় নাই—এক বিধবা পিসিমা তার অভিভাবিকা হইয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইহাতে ফণীভূষণ এবং মনোরমা দুজনেরই বিশেষ নিন্দার কারণ হইয়াছিল। চাকরী করিয়া বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ তখন ছিল না। যাঁহারা বিদেশে চাকরী করিতেন তাঁরা একাই যাইতেন—স্ত্রীপুত্রাদি থাকিত দেশে পরিবারের অভিভাবকদের কাছে। ইহাই লোকে জানিত স্বাভাবিক। শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর-ননদ হইতে ছাড়াইয়া বধূকে নিজের কাছে লইয়া যাওয়া একটা নিদারুণ স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জতার পরিচয় বলিয়া পরিগণিত হইত;—এবং যাহারা এমন অপকর্ম্ম করিত তাদের নিন্দার সীমা থাকিত না। মনোরমা যে বুড়া শ্বশুর শাশুড়ীকে ফেলিয়া স্বামীটিকে লইয়া সুদূর বিদেশে আমোদ করিতে গেল, ইহাতে লোকে কাজেই কাণাঘুষা করিত।

শারদা মনোরমার এত নিন্দার কথা জানিত না। সে চোখে দেখিল মনোরমার অপূর্ব্ব রূপরাশি, কাণে শুনিল তার মধুর কথা, আর দেখিল তার অমায়িক ব্যবহার। সে মুগ্ধ হইয়া গেল। তার সারা চিত্ত লুটাইয়া পড়িল ঐ সুন্দরীর পদপ্রান্তে। সে আরও বাঁধা পড়িল মনোরমার শিশুর রূপলাবণ্যে। যখন সে বিদায় হইল তখন সে তার মনটি রাখিয়া গেল মনোরমার কাছে। মনোরমারও শারদাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। বিদায়ের সময় সে শারদাকে বার বার বলিয়া দিল যেন সে রোজ একবার কোনও না কোনও সময় আসে। ঘাড় নাড়িয়া শারদা বলিল, সে নিশ্চয় আসিবে।

ইহার পর শারদাকে ঘরে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইল।

অবসর পাইলেই সে ছুটিয়া যায় নেউগী-বাড়ী! আর অবসর সে ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে; কেন না তিনজন লোকের সংসার, কাজকর্ম্ম এমন বেশী কিছু নয়, একজনেই অনায়াসে করিতে পারে। শারদা কোনও কাজ না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে বিন্দুই তাহা করিবে। কাজেই তার অবসরের অভাব হয় না। সকাল হউক, দুপুর হউক, সন্ধ্যা হউক, তার মন ছুটিলেই সে চলিয়া যায়।

বিন্দুর এ সব ভাল লাগে না। নেউগী-বাড়ী একটা পাড়া অন্তর—সে প্রায় পোয়া ক্রোশের ধাক্কা। সোমত্ত বয়সের সুন্দরী বউ যে একা-একা যখন-তখন এতটা রাস্তা ছুটিয়া যাইবে, এ ভাল কথা নয়। তা ছাড়া, কাজের বোঝাটা শারদা বিন্দুর ঘাড়ে ঝাড়িয়া ফেলিয়া যায়, এটাও বিন্দুর কাছে ভাল লাগিবার কথা নয়। তার উপর আসল কথা, নেউগী-বাড়ীতে শারদার এতটা প্রতিপত্তিতে তার চোখ টাটায়। নেউগী-গিন্নী বিন্দুর পুরাতন মুরুব্বি। তাঁর অনুগ্রহের জোরে পাড়ার দশ-জনের কাছে সে বেশ একটু প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে। সে ঘরে যে শারদা এমনি করিয়া প্রবেশ করিয়া

তার চেয়ে বেশী আদর কাড়িয়া লইতেছে, ইহাতে রাগ হয় না?

কয়েক দিন বিন্দু সুধু গর্‌গর্‌ করিল। তার পর একদিন শারদাকে মৃদুভাবে শাসন করিবার চেষ্টা করিল—শারদা গ্রাহ্য করিল না। ক্রমে বিন্দুর মেজাজ চড়িয়া গেল। যদিও সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে শারদার সঙ্গে সে আর ঝগড়া করিবে না, তবু—এতটা কি মানুষের শরীরে সয়?

একদিন সে খুব মুখ করিয়া শারদাকে গালিগালাজ করিয়া বলিল, যে ঘর-সংসার উচ্ছন্ন করিয়া দিয়া এই যে দিনরাত নেউগী-বাড়ী ছুটাছুটি—এ সব সে হইতে দিবে না।

শারদা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন করিয়া সে বারণ করিবে,—সে কি শারদাকে বাঁধিয়া রাখিবে?

বিন্দুর রাগ চড়িয়া গেল, সে বলিল, "রাখুম না? নিচ্চয় রাখুম!" তার পর সে প্রসঙ্গক্রমে শারদাকে বুঝাইয়া দিল যে নেউগী-বাড়ী দৌড়াদৌড়ির ভিতর আসল কথাটা কি তাহা তার বুঝিতে বাকী নাই। সুধু সে বাড়ীর বউ-ঝির টানে এমন ক্ষেপা লোকে ক্ষেপে না।

শারদা বলিল, এ বিষয়ে বিন্দুর জানিবার কথা, কেন না নেউগী-বাড়ী তার খুব বেশী গতিবিধি আছে, সে-বাড়ীতে সে কিসের টানে যায় তাহা বিন্দু অবশ্যই জানে—তার নিজের অভিজ্ঞতা আছে।

এইবারে বিন্দু যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়া শারদার পিতামাতার প্রতি তীব্র দোষারোপ করিয়া বলিল যে সবাই শারদার মত চরিত্রের লোক নয়। এমন করিয়া ঢলাঢলি করিলে অন্ধ যে সেও বুঝিতে পারে। শারদা ভাবে সে ডুব দিয়া জল খায়, সে কথা ঠিক নয়। জানে সবাই! এইবারে বিন্দু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শারদার দুশ্চরিত্রের একটা অপবাদ দিয়া অম্লান বদনে বলিয়া গেল যে, যে নেউগী-মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে শারদার অবৈধ সম্পর্ক বিন্দু নিজ চক্ষে দেখিয়াছে।

শারদা রাগে একেবারে ফুটন্ত জলের মত টগ্‌বগ্‌ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ সে সুধু অগ্নিময় দৃষ্টিতে বিন্দুর দিকে চাহিয়া শেষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "করি যদি তা, ত' তুই কওনের কে? তুই আমার শাশুড়ী না ননদ যে তুই কস্‌? ক' শাশুড়ী? কেমুন?—আর তুই কস্‌ কোন্‌ মুখে? কইতে জিব্বাডা খইসা পরে না! তুই কস কেমতে? এহানে করিত্যাছস কি? তুই যে আমার সোয়ামীর লগে থাকস, সে তো তোর পোলাও না, ভাইও না। কি কস? আমি যদি তাই করি—বেশ করি। তর বাপের তাতে কি? তুই কইরবার পারস আমি পারমু না। বেশ করুম—ঠাইসা করুম। তুই চুপ থাক্‌।" বলিয়া সে প্রবল বেগে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল।

বিন্দু শূন্য ঘরে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিল, আর অক্ষম রোষে চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

কুরুক্ষেত্র আবার বাধিয়া উঠিল। মাধব দেখিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বিন্দু তার কাছে শারদার নামে যতই লাগাক, মাধব তার এক কথাও বিশ্বাস করিত না। শারদার রূপ-রাশি, তার মনকাড়া সহস্র ছলা-কলায় সে একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। তার নামে কোনও মন্দ কথাই সে বিশ্বাস করিতে পারিত না। অথচ বিন্দুকে কোনও কথা বলিতে তার সাহস ছিল না। কাজেই বেচারা মাধবের মাথা চুলকান ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না।

কিছুদিন তার মহা অশান্তিতে কাটিল। শেষে হঠাৎ দৈবানুগ্রহে একটা উপায় হইল।

বর্ষার শেষে শারদার মা একদিন একখানা ডিঙ্গি করিয়া কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং শারদাকে কয়েক দিনের জন্য নিজের কাছে লইতে চাহিল। এ প্রস্তাবে মাধব আপত্তি করিল না, কেন না বাড়ীতে নিত্য ঝগড়ার তাড়নায় সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু-দিনের জন্য সে মুক্তি পাইয়া বাঁচিল। বিন্দুর আপত্তি করিবার কোনও কথা নয়।

শারদা আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু একবার নদীর ঘাটে গিয়া সে দেখিল যে ডিঙ্গিখানা চালাইয়া আনিয়াছে গোপাল। গোপালকে বলিবার জন্য তার একপেট কথা জমা হইয়াছিল। ঘাটের ধারে গোপালের সঙ্গে তার কতক কথা বলা হইয়া গিয়াছে। আরও অনেক

বলিবার আছে। তাই ঘাট হইতে ফিরিয়া সে মায়ের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

দুর্গার পক্ষে দূর গ্রাম হইতে মেয়ে আনা-নেওয়ার কল্পনা বৃথা, কেন না সে সঙ্গতি তার নাই। তাই এ দুই বৎসরের মধ্যে সে মেয়েকে দেখিবার বা তাকে আনিবার কোনও চেষ্টাই করে নাই। কিন্তু গ্রামের জমীদারের কন্যার বিবাহ। তাতে কাজ করিবার জন্য অনেক লোকজনের প্রয়োজন। দুর্গা তার মেয়ের নাম করিয়াছিল। জমীদার-গৃহিণী সম্মত হইয়া শারদাকে আনাইতে বলিয়াছিলেন। সেই সুযোগ পাইয়া সে গোপালের হাতে-পায় ধরিয়া তার ডিঙ্গী করিয়া শারদাকে লইতে আসিয়াছিল।

শারদা চলিয়া যাইবার পর নেউগী-পরিবার চলিয়া গেলেন।

নেউগী-গৃহিণী বিন্দুকে দাসী করিয়া সঙ্গে লইতে চাহিলেন। বিন্দু সাহ্লাদে সম্মত হইল। মাধবের গৃহে বাস তার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শারদার সঙ্গে কোন্দল করিয়াও বেশীদিন সে এখানে টিকিতে পারিবে বলিয়া ভরসা হইল না। তাই নেউগী-পরিবারে আশ্রয় পাইয়া সে বাঁচিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

মৃত্যু

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সকালবেলা নিচে বৈঠকখানায় বসে' লোকেশ একটা রেগুলার-আপিলের গ্রাউণ্ড্স্ ড্রাফ্ট্ করছে, একজন ভদ্রলোক খোলা দরজা দিয়ে সরাসরি তার কাছে এসে একটু কুণ্ঠিত গলায় বললে,—আপনার একটা চিঠি।

লোকেশ তার দিকে এমন তাচ্ছিল্যে তাকালো যে মাত্র ঐ একটা চাউনিতেই যেন তার সমস্ত অন্তরাত্মা হ'লো উদ্ঘাটিত। ভদ্রলোক কী বুঝলো ভদ্রলোকই জানে, কিন্তু আমরা দেখলাম তার ডাঁটালো নাকে, চওড়া কপালে, চাপা চিবুকে নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ ঔদাসীন্য। সামান্য একটা চিঠির মোড়ক খুলতে অলক্ষিতে আঙুলে যে ঈষৎ অসহিষ্ণুতা জাগে তার যেন ততোটুকু উৎসাহও সহ্য হ'বে না। চিঠির মধ্যে অপ্রত্যাশিতের যে বিস্ময় আছে তার স্নায়ুমণ্ডলী তা মানতে রাজি নয়। কী জানি কা'র চিঠি!

খামটা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিটা সে নিশ্বাসের অর্দ্ধপথেই পড়ে' ফেললে। নথি-পত্রের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বললে,—আপনার ভুল হয়েছে, এ বাড়ি নয়।

ভদ্রলোক চঞ্চল হ'য়ে বললে,—ভুল, ভুল কেন হ'তে যাবে? আপনিই কি লোকেশলোচন—

—চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ, খামের ওপরে আমারই নাম দেখছি বটে। লোকেশ তবুও এতোটুকু চিন্তিত হ'বার চেষ্টা করলে না, বল্লে—তা আমার name-sake ডাক্তার অনেক থাকতে পারে, মশাই। আমি ডাক্তার নই, উকিল। আপনার ঠিকানা ভুল হয়েছে।

ভদ্রলোক জোর-গলায় বললে,—না, আমার ভুল হয় নি। আমি উকিল লোকেশবাবুর কাছেই এসেছি।

—তা আসুন, আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের কাছে আসবেন ব্রিফ্ নিয়ে, মামলা জিতিয়ে দেবো। রুগীর প্রেস্‌ক্রুপ্‌শানের আমরা কী জানি!

প্রেস্‌ক্রুপ্‌শান নয়, ভদ্রলোক নিরীহ, নিস্তেজ গলায় বল্লে, —সীতেশবাবু আপনাকে একবার যেতে বলে' দিয়েছেন।

—তা তো চিঠিতেই দেখতে পাচ্ছি। লোকেশ চিঠিটায় দ্বিতীয়বার চোখ বুলোলো, ঠাট্টায় ঠোঁটের বাঁ কোণ্‌টা একটু বেঁকিয়ে বল্লে,—তা আপনার বাবু দেখছি বেজায় রসিক। তাঁর স্ত্রী মরতে চলেছেন, সেখানে আমি গিয়ে কী করবো? স্ত্রীর কোনো উইল-টুইল করতে হ'বে নাকি? কই, তা-ও তো কিছু

চিঠিতে লেখা নেই। যান্, আপনার বাবুকে গিয়ে একবার জিগ্‌গেস করে' আসুন।

ভদ্রলোক কাতর মুখভাব করে' বিবর্ণ গলায় বল্‌লে,—মা-ঠাকরুণ সত্যিই বেশিক্ষণ আর নেই। আপনি দয়া করে' একবারটি চলুন।

—কিন্তু আমি গিয়ে করবো কী তাই বলুন শুনি। কে না কে সীতেশবাবু, তাঁর স্ত্রী বসেছে মরতে, সেখানে আমার কী করবার আছে। ব্যাপারটা যে আপনারা মশাই, যাচ্ছেতাই ঘোরালো করে' তুললেন। দেখুন আরেকবার ভেবে। লোকেশ অমনোযোগী হ'বার চেষ্টা করলে: আপনার বাবু নিশ্চয়ই শোকের মাথায় কা'র ঠিকানা লিখতে আর-কা'র ঠিকানা লিখে দিয়েছেন। অবস্থা খারাপ বুঝলে, আমি ড্রাইভার সমেত আপনাকে গাড়ি দিচ্ছি, চট্ করে' জেনে আসুন গে। আমি নই, মশাই। এ কখনো হ'তে পারে?

—আপনিই। ভদ্রলোকের কথাটা এবার একটা কঠিন তিরস্কারের মতো শোনালো: মা-ঠাকরুণ আপনাকে একবারটি দেখতে চেয়েছেন।

গলা ছেড়ে লোকেশ হঠাৎ হেসে উঠলো; টেব্‌লে একটা চড় মেরে বল্‌লে,—এ বলে কী! আপনি কি দিনে-দুপুরে পাগল হ'লেন নাকি মশাই? মাননীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী, মরতে বসেছেন বলে' কি মাথা তাঁর এমনি খারাপ হয়েছে যে চেনেন না-শোনেন না কোথাকার এক উকিলকে দেখবার জন্যে আবদার করবেন? এ যে মশাই, উপন্যাসেও পড়া যায় না।

হাসি থেমে গেলে সহসা ঘরের শূন্যতা যেন ভীষণ নিঃশব্দে হাহাকার করে' উঠলো। গলা নামিয়ে লোকেশ জিগ্‌গেস করলে: আপনার মা-ঠাকরুণের নাম বলতে পারেন?

—পারি।

—কী?

—শ্রীযুক্তা—

—নাম, নাম।

—লীলাবতী—

—লীলা? তাই বলুন। মোকদ্দমা-সম্পর্কে নতুন একটা কেস্-ল'র নজির পাওয়ার মতো প্রায় সে যেন একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল্ আরাম অনুভব করলে: That Lily? হুঁ! বিয়ে করেছিলো শুনেছিলাম। ও! আপনার ঐ সীতেশবাবুকে বুঝি? কী করেন ভদ্রলোক?

ভদ্রলোক বল্‌লে,—সাতক্ষীরার ওদিকে তাঁর জমিদারি আছে। আমি তাঁর সরকার—এই পঁচিশ বছর, তাঁর বাবার আমল থেকে কাজ করে' আসছি।

—লীলা, লীলা, নামটা টেনে-টেনে বার দুই উচ্চারণ করে' লোকেশ কাগজপত্রে ফের মন দিলে; বল্‌লে,—গোড়ায় সেই কথাটা বললেই হ'তো। আপনাকে তা হ'লে মিছিমিছি আর পাগল ঠাওরাতুম না।

প্রায় আপ্যায়িত হ'বার ভঙ্গি করে' সরকার বললে,—না, না, তাতে কিছু আমি মনে করিনি।

—কিন্তু মেয়েদের সব-সময়েই স্বামীর নামে পরিচয় দিতে হ'বে এ অত্যন্ত কু-প্রথা, মশাই। কে-না-কে এক সীতেশবাবুকে বিয়ে করেছে ব'লেই লীলা চির জীবনের জন্যে সীতেশবাবুরই স্ত্রী থাক্‌বে, এ-ও এক চমৎকার আবদার দেখছি। লোকেশ রেখাহীন, নিশ্চিন্ত মুখে জাজ্‌মেন্টের সার্টিফাইড্ কপি-র উপর নীল পেন্সিলে মোটা-মোটা দাগ টানতে লাগ্‌লো।

সরকার নরম, ভিজা গলায় বল্‌লে,—কিন্তু সেই জীবন আর বেশিক্ষণ নেই। আপনি একবারটি চলুন, বোধ হয় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সব শেষ হ'য়ে যাবে।

—সব শেষ হ'য়ে যাবে। শব্দ কয়টা আবৃত্তি করার মতো ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে' লোকেশ বললে,—সব তো কবেই শেষ হ'য়ে গেছে। এখন আমি গিয়ে করবো কী? আমার আর কী কাজ?

—মা-ঠাকরুন যে আপনাকে ভারি দেখতে চাইছিলেন।

—তাই বলুন। লোকেশ মুখ তুলে সোজা হ'য়ে বসলো, মুচ্‌কে একটু হেসে বল্‌লে,—কিন্তু আপনার বাবু চিঠিতে সে কথাটা বেমালুম চেপে গেছেন দেখছি। লিখেছেন, দেখুন না এই চিঠিটা: আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যাশায়ী, আপনি আসিয়া দয়া করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব একবার তাহাকে দেখিয়া যাইবেন।

—ও তাই হ'লো, সরকার অস্থির হ'য়ে ঝাঁজালো

গলায় বললে,—এতো বড়ো বিপদের সময় বাবুর ভাষার ভুল ধরবেন না। আপনি চলুন।

চিঠিটা একপাশে সরিয়ে রেখে লোকেশ আবার পেন্সিল নিলে; বললে,—সীতেশবাবুর স্ত্রীর কী হয়েছে?

—সে অনেক-কিছু, ভুগছেন আজ প্রায় তিনমাসের ওপর—ডাক্তাররা অনেক সব উদ্ভট নাম বাৎলালে, কিন্তু কিছুতেই কিছুর কিনারা হ'লো না। কাল রাত বারোটা থেকে অবস্থা একেবারে খারাপের দিকে চলে' গেছে, আজ সকালবেলা শ্বাস সুরু হয়েছে দস্তুরমতো।

লোকেশ ঠোঁটের কোণটা আবার কুঁচ্কোলো: শ্বাস উঠেছে অথচ স্পষ্ট নাম-ঠিকানা মনে করে' কাউকে দেখতে চাইছে, এ যে দেখছি মশাই অদ্ভুত রুগী। আপনাদের কিচ্ছু ভয় নেই, এ-রুগী ঠিক সেরে উঠবে।

নিদারুণ বিরক্ত হ'য়ে সরকার বললে,—কথা না-হয় কাল রাত থেকে বন্ধ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে' কাউকে দেখবার ইচ্ছাটা আর আগে জানানো যায় না?

—তাই বলুন। লোকেশ পিঠ সোজা করে' চেয়ারে হেলান দিলে: তা হ'লে অনেক আগে থেকেই আমাকে দেখতে চেয়েছে। আপনার বাবু শেষকালে কিনা আমাকেই দয়া করতে বলছেন। কিন্তু এখন, এই শেষ সময়ে গিয়ে আমি কী করবো? আমায় কে চিনবে?

—কেন চিন্‌বেন না? বাবু-ই তো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমি সঙ্গে করে' নিয়ে গেলে কেন তিনি আপনাকে চিনতে পারবেন না?

কথাটা যেন ভীষণ উপভোগ করবার মতো—লোকেশ এমনি গভীর সরলতায় গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। বল্লে,—তা, সঙ্গে না-হয় আমি আমার একখানা ভিজিটিং-কার্ডও নিয়ে যাবো। কিন্তু আমি গেলে কারু কোনো কিছু লাভ হ'বে বলতে পারেন? আমি প্রোফেশ্যানাল্ মোর্ণার নই, মড়ার খাটে আমি কাঁধও দিতে পারবো না। আর কারু শোকে ধর্‌তাই বুলি পেড়ে সান্ত্বনা দেয়া—Oh horrible, আমি সমস্ত শরীর দিয়ে তা ঘৃণা করি। আপনাদের বিপদের মাঝে আমি গিয়ে করবো কী? ও-সব হৈ-চৈ আমার পোষায় না, মশাই।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আপদ-নখ দেহ রাগে ও ঘৃণায় থরথর করে' কেঁপে উঠলো। ব্যাপারটা সে কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারলো না। জমিদারি কাজে এতো দীর্ঘ সময় ব্যাপৃত থেকেও এতো বড়ো একটা অমানুষিকতা সে মরে' গেলেও কল্পনা করতে পারতো না। বর্ব্বরতম অপরাধ করে' যে ফাঁসি যায় সেও বোধ করি মানুষত্বের নামে এর চেয়ে বেশি করুণা দাবি করতে পারে।

ভদ্রলোক কঠিন করে' বললে,—আপনার সঙ্গে বাজে কথা বলার আমার সময় নেই। আপনি যাবেন কিনা বলুন।

—বাজে কথা বলার আমারই কি সময় আছে নাকি? ন'টা প্রায় বাজে, খেয়ে-দেয়ে আমাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কোর্টে যেতে হ'বে। লোকেশ ড্রয়ার টেনে সিগারেটের একটা টিন বা'র করলো: কেউ মরছে শুনে সমস্ত পৃথিবী তো মশাই, হাত-পা গুটিয়ে বসে' থাকতে পারে না! একমাত্র মরা-ই তো আর মানুষের কাজ নয়।

ঝুঁকে পড়ে' লোকেশ আবার কাগজপত্র ঘাঁটতে সুরু করলে।

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালো না। দরজার কাছে এসে তেতো, রুক্ষ গলায় বললে,—তা হ'লে বাবুকে গিয়ে বলবো আপনি ফি পাবেন না বলে' এলেন না।

—আপনার যা খুসি বলতে পারেন। আমার কাজ আগে, না বিলাসিতা আগে?

—ছি-ছি, ভদ্রলোক ততোক্ষণে বাইরে চলে' এসেছে: একজন মরতে বসেছে, সে শত শত্রু হ'লেও তো, মানুষে শেষ সময়ে তা'র সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, আর এ কি না একজন শিক্ষিত উকিল—এতো যা'র নাম-ডাক—ছি-ছি-ছি—

ভদ্রলোক সঙ্গে একেবারে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছিলো। ভদ্রলোক উঠতেই গাড়ি ষ্টার্ট দিলে।

এতোদিন ধরে' যাকে সে মনে-মনে ঘৃণা করে' এসেছে তাকেই যে সে কোনো এক দিন সর্ব্বাঙ্গ ভরে' ভালোবেসেছিলো সে-কথা লোকেশের নতুন করে' আজ মনে পড়লো। বহু বৎসর পরে জন্মভূমিতে ফিরে আসার

মতো যেন মনোরম লাগছে। গুণে' হিসেব করে' দেখলো লীলার বিয়ে হয়েছে আজ ছ' বচ্ছর—বিয়ে হয়েছে মানে শরীর নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, লোকেশের প্রেমকে করেছে অপমানিত, প্রত্যাশাকে করেছে রূঢ় অপঘাত। সেদিনের সেই অকালস্বপ্নভঙ্গের পর লোকেশ তার চারপাশে ধীরে-ধীরে পৃথিবীর নতুন পরিবেশ রচনা করলে: তার প্রেমের তিরোধানের শূন্যতা বিস্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। প্রথম-প্রথম সে-প্রেম রূপান্তরিত হ'য়ে উঠলো প্রবলতম ঘৃণায়, পাশবিক প্রতিহিংস্রতায়: সেখানেও সেই সমান উন্মাদনা, সমান দাহ। যা ছিলো মধুর, তা-ই হ'য়ে উঠলো বিষ: যা ছিলো নেশা, তাই হ'য়ে উঠলো মত্ততা। লীলাকে তার জীবন থেকে বাদ দেবার জন্যে সুরু হ'লো তার নতুন সমারোহ—ত্যাগের তীব্রতা। যে বিদায় নিয়ে গেছে, তার ছায়ার প্রহরায় সে জীবন কাটাতে পারবে না—যেখানে যতোটুকু স্মৃতির ধূলিকণা সঞ্চিত হ'য়ে ছিলো সব সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে—তার এই বাঁচবার বেগের হাওয়ায়। ছিঁড়লো সব তার চিঠি-পত্র, ভুললো সব তার স্পর্শ ও সামীপ্যের ইতিহাস। মনে-মনে তার নামোচ্চারণ করা পর্য্যন্ত পাপ, রাত্রে তাকে স্বপ্নে দেখলে মনে করতে হ'বে স্বাস্থ্যবিকৃতি। তার জীবন্ত থাকার পরোক্ষ অভিজ্ঞতাটা পর্য্যন্ত অপবিত্র। তার পাতিব্রত্যের চেয়ে সামান্য একটা রূপোপজীবিনীর ধর্ম্মভীরুতায় বেশি সত্য, বেশি নিষ্ঠা। সমগ্র শরীরকে রক্ষা করতে হ'লে এই গলিত প্রত্যঙ্গটা সে অনায়াসে কেটে বাদ দিতে পারবে।

শেষে এই ঘৃণা পর্য্যবসিত হ'য়ে এলো নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে। লীলাকে ঘৃণা করাও যেন তাকে অন্যায় মর্য্যাদা দেয়া, তার বিচ্ছেদকে স্বীকার করে' নেয়া মানে তার অস্তিত্বকে দেয়া মূল্য। ঘৃণা যেন প্রেমেরই উল্টো পৃষ্ঠা, তাই প্রেমের এই প্রতিবেশিতা লোকেশের সহ্য হ'লো না। লীলা হ'য়ে উঠলো মাত্র একটা নাম, তা'র সঙ্গে তা'র সম্পর্কটা মাত্র একটা খবরের কাগজের সংবাদ। লীলার সঙ্গে তার কী ঘটেছিলো না-ঘটেছিলো সব যেন একটা মাসিক-পত্রের গল্প। সে বেঁচে আছে কি নেই, তার চেয়ে মোকদ্দমার ফলাফলে লোকেশের বেশি কৌতূহল। সে তার কাজ নিয়ে এতো মশ্‌গুল্ যে সামান্য একটা বিয়ে করতে পর্য্যন্ত তার সময় হয় নি।

সেই লীলা আজ এতোদিনের অজ্ঞাতবাস কাটিয়ে হঠাৎ লোকেশের সামনে আবির্ভূত হ'লো। তাকে সে দেখতে চায়, চিরকালের জন্যে চলে' যাবার আগে তাকে একটিবার সে কাছে পেতে চায়, তার স্বামীকে দিয়ে সে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে।

এই বুঝি—এতোদিনে বুঝি তার প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে।

লোকেশের মনে পড়লো বিয়ের অনেক আগে লীলার একবার অনেক দিন ধরে' প্রায় একটা মরণান্তক অসুখ হয়েছিলো। লোকেশ ছিলো তখন তার একান্ত কাছে—রাত্রে-দিনে, তার ঘরে, তার বিছানায়। করতো তাকে অজস্র সেবা, একটা দৈত্যের মতো অক্লান্ত, অমানুষিক পরিচর্য্যা। তারপর গভীর রাতে, কিছুতেই যখন তার আর ঘুম আসতো না, লোকেশ ছাদে চলে' আসতো অন্ধকারে আলুলিত আকাশের নিচে। মনে-মনে তার প্রার্থনা উঠতো পুঞ্জীভূত হ'য়ে: যে-ঈশ্বর লীলার দেহের অণুতম ব্যাক্‌টিরিয়াম্ থেকে সুরু করে' বিরাট মহীরুহে পর্য্যন্ত প্রাণক্রিয়া সঞ্চারিত করে' দিয়েছেন, যে-প্রাণ সামান্য পিঁপড়ে থেকে অতিকায় গণ্ডারে, স্পঞ্জে, শামুকে, সাপে, অক্টোপাস্‌এ, লিচেন্ থেকে তিমিতে, মাকড়সা থেকে প্রজাপতিতে, ঘাসে, আগাছায়, চাঁপার কোরকে—লোকেশ সমস্ত দেহ-মন দিয়ে লীলার দেহে কামনা করতো সেই প্রাণ, সেই দ্রুত তীক্ষ্ণ স্পন্দমানতা। ঈশ্বরের কাছে সে আর কিছু ভিক্ষা করতো না, শুধু লীলা বেঁচে উঠুক, মাত্র শরীরে বেঁচে উঠুক, এই ছিলো তার আপ্রাণ প্রার্থনা। লীলার কাছে কিছুই যেন তার আর চাইবার নেই—শুধু তার দেহে থাক্ প্রাণবহনের দীপ্তি, মাত্র একটা যান্ত্রিক ছন্দোবদ্ধতা। আর সে কিছু চায় না, লীলা শুধু বেঁচে উঠবে, আবার খিল্‌খিল্ করে' হাসবে, ঘরে-বারান্দায় ছুটোছুটি করে' বেড়াবে, সেতার বাজাবার সময় আধখানা শরীর এলিয়ে তেমনি পা বেঁকিয়ে বসবে। আবার তেমনি পিঠে ভেঙে পড়বে খোঁপার স্তূপ, শরীরের রেখায়-রেখায় পিছলে পড়বে লাবণ্য। আর সে কিছু চায় না, শুধু

লীলা বেঁচে উঠুক। তার চেয়ে বড়ো কীর্ত্তি যেন লীলার আর কিছু থাকতে পারে না। আকাশের সীমান্তে প্রতি রাত্রে যেমন একটি তারা জেগে থাকে, তেমনি পৃথিবীর একপ্রান্তে সে বেঁচে থাকলেই যেন যথেষ্ট।

সত্যি-সত্যি, তার সেবায় হোক্, প্রার্থনায় হোক্, লীলা বেঁচে উঠলো। বেঁচে উঠলো, কিন্তু তার প্রেম গেলো মরে'। চোখের জল ও মুখের হাসিতে জীবনের একটা প্রান্তে বিচিত্রিত রামধনুর মতো ক্ষণকাল জেগে থেকে মিলিয়ে গেলো সে বিস্মরণের অন্ধকারে।

সেই থেকে সজ্ঞান সচেষ্টতায় লীলাকে সে এড়িয়ে চলেছে; স্বচক্ষে কোনোদিন দেখে নি তার মুখ, যার ললাটে কলঙ্কবিন্দুর মতো সিন্দুর হয়েছে অলঙ্কার, স্মৃতিতে করেনি তার ধ্যান যার নামের আবহাওয়ায় পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ পঙ্কিলতা। কিন্তু, আশ্চর্য্য, তবু সে লোকেশকে ভোলে নি, তার অস্তিত্বের অন্তরালে কঠিন কঙ্কালের মতো সে সেই অতীতকে আজো পর্য্যন্ত লালন করে' এসেছে: আজ কিনা সমস্ত অন্তরাত্মা অনাবৃত করে' তাকে সে একবার দেখতে চাচ্ছে! মরতে বসেছে বলে' ভেবেছে এই এক কণা করুণা থেকে হয়তো সে বঞ্চিত হ'বে না।

লোকেশ হাঁক দিলো: বিনোদ!

সোফার হাজির।

—গাড়ি বা'র করো শীগ্‌গির, আমায় এক্ষুনি একটু বেরোতে হ'বে। হ্যাঁ, ঠিকানা? লোকেশের মুখ-চোখ ত্রস্ত, বিমর্ষ হ'য়ে উঠলো: ঠিকানা জেনে রাখিনি তো? কী হ'বে? লোকটা একটা bluff দিয়ে গেলো নাকি?

বিনোদ বল্‌লে,—যে-লোকটা গাড়ি করে' একটা চিঠি নিয়ে এসেছিলো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিঠি। চিঠিতে নিশ্চয়ই ঠিকানা আছে। এই যে—সেই টালিগঞ্জ। মুদিয়ালি রোড। চেনো? তবে তৈরি হ'য়ে নাও চট্‌পট্, আমি আসছি ওপর থেকে।

উপর থেকে লোকেশ দস্তুরমতো সাজগোজ করে' এলো—বিয়ে-বাড়িতে সে যেন নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছে। পাঞ্জাবির ঢিলে হাতা আর লুটোনো লম্বা কোঁচায় তার পরিপাটি শৈথিল্য, যত্ন করে' চুল ফেরানো, পায়ের জুতো আয়নার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। কতো দিন পরে লীলার সঙ্গে আবার তার দেখা হ'বে।

নিচে, ড্রয়ার খুলে সিগারেট-কেসে সে সিগারেট ভরে' নিচ্ছে, বিনোদ দেখা দিলো।

—চলো। ঠিকানাটা মনে আছে তো?

গাড়ি ট্রাম-ডিপো পার হ'য়ে চললো আরো দক্ষিণে। লোকেশ বল্‌লে,—টার্ন নিয়ে সোজা রাস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ো না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে। কাছাকাছি এলে বলো।

বিনোদ ক্লাচ্ টিপে বল্‌লে,—এইবার আরেকটু সামনে মুদিয়ালি রোড।

—আচ্ছা, দাঁড়াও।

গাড়ি দাঁড়ালো।

লোকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে,—শোনো! তুমি একবার যাও ও-বাড়ি। চুপি-চুপি কাউকে জিগ্‌গেস করে' খবর নিয়ে এসো ও-বাড়ির গিন্নি-মা'র এখন কেমন অবস্থা। যদি শোনো এখনো প্রাণ আছে, সটান্ আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আমার কোর্টের বেলা হ'য়ে গেলো আমি ওখানে গিয়ে করবো কী?

বিনোদের গলা কেঁপে উঠলো: আর যদি শুনি—

ধোঁয়ায় পর-পর কয়েকটা ring তৈরি করে' লোকেশ বললে,—আর যদি শোনো, হ'য়ে গেছে, তা হ'লেও আমাকে এসে তাড়াতাড়ি খবর দেবে। আমি একবার তাকে দেখবো।

বিনোদ সাত-পাঁচ কিছু অনুধাবন করতে না পেরে আস্তে-আস্তে বা।ড়র সন্ধানে বেরিয়ে গেলো।

একটা সিগারেট পুড়তে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে—বিনোদ তার মধ্যে ফিরে এলো না। নিশ্চয়ই এখনো প্রাণ যায় নি, তাকে তা হ'লে সোজা বাড়িই ফিরে যেতে হ'বে আর-কি। শেষকালে সমস্ত আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়ে একটা মরণোন্মুখ নারীর কাতরোক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে সে লীলার চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আর তার এই পৌরুষের পরাজয় দেখে লীলার নিষ্প্রভ চক্ষু হঠাৎ তৃপ্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—এ অসম্ভব। ফিরেই সে যাবে ঠিক, তার

একটা পার্ট-হার্ড কেস্ আছে, পরের একটা তুচ্ছ খেয়ালের জন্যে সে তার কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে পারে না। কিন্তু, লোকেশ আরেকটা সিগারেট ধরালো, এতো দূর এসেও যদি লীলাকে তার দেখবার সুযোগ না হয়,—না, ঐ বিনোদ এসে পড়েছে।

—কী, বাড়ি পেলে খুঁজে? কি খবর? আছে কেমন?

খবরটা এমন নয় দশ-বিশ গজ দূর থেকে তা চেঁচিয়ে বলা যায়। বিনোদ লোকেশের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়ালো; ভারি, ম্লান গলায় বল্‌লে,—এই খানিক আগে মারা গেছেন।

—যাক্। যেন বুক থেকে কঠিন একটা পাথর নেমে গেছে এমনি স্বচ্ছন্দ চাঞ্চল্যে লোকেশ মোটরের দরজাটা খুলে ফেল্‌লো। ফুটপাথে নেমে এসে বললে,—কী করে' টের পেলে?

স্তম্ভিতের মতো লোকেশের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিনোদ বল্‌লে,—তুমুল কান্নাকাটি পড়ে' গেছে।

লোকেশ চাপা গলায় প্রায় একটা গর্জ্জন করে' উঠলো: বোকা! সে তো মরবে ভেবেও বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি করতে পারে। পৃথিবীতে কান্নার কিছু দুর্ভিক্ষ আছে নাকি?

—না, আমি একজনকে জিগ্‌গেসও করেছিলাম—এতো কান্নাকাটি কিসের? সে বল্‌লে, আধঘণ্টাটাক্ আগে এ-বাড়ির বড়ো গিন্নি আজ মারা গেলেন।

—যাক্। লোকেশ যেন আরো হাল্‌কা হ'লো। কোঁচাটা বার দুই ঝেড়ে সে বললে,—তুমি তা হ'লে গাড়িতে বোস, আমি গিয়ে একটিবার তাকে দেখে আসছি। কদ্দূর যেতে হ'বে বলো দিকি?

—বেশি নয়, বাঁ হাতি দু' তিনটে বাড়ির পরেই। গাড়িতেই চলুন না।

—না, গাড়ি লাগ্‌বে না। তেল লাগলে মোড়ের দোকান থেকে গ্যালন দুই নিয়ে নাও চট্ করে'। আমি আসছি।

দরজার সামনে যারা ভিড় করে' দাঁড়িয়ে ছিলো, সম্রান্ত আগন্তুক দেখে তারা একসঙ্গে পথ ছেড়ে দিলো। তাদের মুখের চেহারা দেখে লোকেশের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে পরমতম ঘটনাটা নির্ব্বিঘ্নে ঘটে' গেছে। কে কী ভাবলো কে জানে, সিঁড়ি গুনে'-গুনে' লোকেশ উপরে উঠে এলো, অল্পদগ্ধ সিগারেটটা সামনে যে জানলা পেলো, দিলো তার বাইরে ছুঁড়ে। বারান্দা পেরিয়ে, কান্নার উত্তালতা পরিমাপ করে'-করে' সে একেবারে লীলার শোয়ার ঘরে ঢুকে পড়লো।

বহু লোকের জটলা চলেছে, ঘরের মধ্যে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে শোকের তরঙ্গ। তার মধ্যে খাটের উপর স্তূপীকৃত বিছানা-বালিশের মাঝখানে অপরিমাণ নিঃশব্দতার সমুদ্র নিয়ে লীলা শুয়ে আছে। সেই লীলা! লোকেশ এক পা দু' পা করে' খাটের কাছে এগিয়ে এলো। নিজের-নিজের শোক নিয়ে সবাই এতো বিভোর, কেউ তাকে বিশেষ লক্ষ্য করলো না। মৃত্যু আজ যেন সকল দুয়ার অবারিত করে' দিয়েছে।

সেই লীলা। লীলার মৃত্যুর উদ্দেশে তাকে যদি একটা ফরমায়েসি কবিতা লিখতে হ'তো তো তাকে সে অনায়াসে তুলনা দিতো নিরুত্তর এক নদীতটের সঙ্গে। তার আজকের এই পৃথিবীময় অকূল চিহ্নহীনতার যেন তুলনা নেই। একদিন তার মন থেকে সে মুছে গিয়েছিলো, আজ গেলো দেহ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। পৃথিবীতে কোথাও আর সে নেই, পৃথিবীর বাইরে সৌরজগম্মণ্ডলে কোনো দূরতম গ্রহ-তারায়ো নেই এই পার্থিব প্রাণের পরিচয়; নিঃশেষে সে থেমে গেছে, ফুরিয়ে গেছে, শূন্য হ'য়ে গে'ছ। লীলার কাছে তার যেন এইটুকুই পাওনা ছিলো,—বাকি ছিলো লীলার শুধু এই শেষ উদ্ঘাটন। গভীরতম তৃপ্তিতে লোকেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো: নিরর্থকতার এতো বড়ো একটা সুন্দর পরিণতি সে যেন এর আগে কোনো দিন কল্পনা করতে পারতো না।

নীরক্ত বিবর্ণতা—লীলা মাত্র তার কঙ্কাল নিয়ে শুয়ে আছে, আর তার প্রাণহীন তাপহীন রুক্ষ চুলের মধ্যে মুখ গুঁজে কে-একজন—এই হয়তো সীতেশ—অসহায় শিশুর মতো কান্নায় উঠছে ফুঁপিয়ে। মৃত্যুর কাছে তার এই শোক যেন কতো বড়ো লজ্জার, মৃত্যুর কাছে তার প্রেমের এই পরাজয় যেন কতো হীন, কতো অপৌরুষের। অন্তরতম আনন্দে লোকেশের সমস্ত

রক্তস্রোত যেন তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, মুখে ফুটে উঠলো সেই আনন্দের উদ্দীপ্ত নৃশংসতা। লীলার স্বামী দেখছে মৃত্যু, সে দেখছে অবিনশ্বরতা। লীলা নেই, তার অর্থ লোকেশের জীবনের অনপনেয় কলঙ্ক হয়েছে অপসারিত: তার পরাভবের, তার ব্যর্থতার। লীলা নেই, তার অর্থ সে আজ মুক্ত, অ-সীমাবদ্ধ, ফিরে পেয়েছে সে যেন তার হৃত ঐশ্বর্য্য, লুপ্ত প্রতিষ্ঠা। লীলার কাছে তার পরিচয়ের মাত্র এইটুকুই ছিলো বাকি, একজনের অভাবে এতোদিনে চারদিকে তার উপচে পড়চে চিত্তের পূর্ণতা। লীলা যে এতো সুন্দর, এতো রমণীয় যে তার মৃত্যুর মালিন্য, তার চিরস্থায়ী নিস্তব্ধতা, তার নিঃশেষ অপসরণ, এ-কথা লোকেশ নিজেই এতোদিন উপলব্ধি করে নি। আজ তাই আর তার অহঙ্কারের অন্ত পাওয়া ভার—লীলা আর নেই তার পরিচয়কে খণ্ডিত করতে; সে এতোদিনে দিয়ে গেছে তার পরম প্রতিদান।

কে আরেকজন সীতেশের গায়ের উপর হাত রেখে সজল কণ্ঠে বল্লে,—শত মাথা খুঁড়লেও তো আর তাকে ফিরে পাবে না। ছি সীতেশ, তুমি ছেলেমানুষ নাকি? ছেড়ে দাও এবার লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটি করো নি, হাজারে-হাজারে টাকা খরচ করেছ, সহরের নাম করা যেতে পারে এমন কোনো ডাক্তার, কোনো চিকিৎসা বাকি রাখো নি। সাধু-সন্নেসি, যাগ-যজ্ঞ, মানত-হত্যে সব করে' দেখেছ—ভগবান যাকে নেবেন তা আর কী করে' ফিরে পাবে বলো? মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ ভগবতী, এমন সতী-সাধ্বী মা আমার সেই দিব্যধামে চলে' গেছেন। তার জন্যে শোক করছ কী, সীতেশ?

সান্ত্বনার হাওয়া লেগে সীতেশের শোক-শিখা যেন আরো লেলিহান হ'য়ে উঠলো। খেলনা নিয়ে ছোট ছেলে যেমন আকুলি-বিকুলি করে, তেমনি সে আদর করতে লাগলো সেই নিষ্প্রাণ মৃন্ময় পুতুলটাকে। এই ভেবেই তার দুঃখ আজ অসীম যে, যে-দেহ ছিলো একদিন যৌবনে বিহ্বল, লাস্যে তরঙ্গায়িত, তাপে ঘ্রাণে রোমাঞ্চে অরণ্যের মতো শিহরায়মান, তা আজ এতো কুৎসিত, এতো বীভৎস হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু লোকেশের তাতে একবিন্দু সমবেদনা নেই। সে দেখছে যে-দেহ ছিলো এতোদিন বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত, যান্ত্রিক একটা অভ্যাস-পালনে জড়ত্বপ্রাপ্ত, ক্ষুধায় কামনায় আরামে আমোদে কলুষ-ক্লিষ্ট, তা আজ মৃত্যুতে কতো সুন্দর, কতো অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে উঠেছে। লীলা মরলো বটে, কিন্তু ফিরে পেলো সে যেন তার প্রথম যৌবনের সেই ক্ষণিক মৃত্যুহীনতা। তার মৃত্যুতে আজ লোকেশের মতো কেউ পরিপূর্ণ সুখী নয়।

কে-একটি মহিলা শোকার্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে' উঠলেন: তোমরা সব কৌটো ভরে' সিঁদুর নিয়ে এসো, নিয়ে এসো আলতার পাতা। বৌমাকে সেই তার বিয়ের বারাণসী-খানা পরিয়ে দাও, হাতে দাও সেই কাজললতা। রাজলক্ষ্মী মা-কে আমার আমি নিজ হাতে সাজিয়ে দেবো। ফুল কই, বাগান উজোর করে' ফুল নিয়ে আসতে বল্, সীতেশ।

লোকেশ আর সেখানে দাঁড়ালো না। যেমনি এসেছিলো তেমনি অলক্ষিতে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে-আস্তে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

কায়রো

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এডেন থেকে রাত্রে জাহাজ ছাড়ল। এই ক'দিন জাহাজে বাস করার ফলে প্রথমদিকের অস্বাচ্ছন্দ্যকর giddy অবস্থা কেটে গিয়েছিল। রাত্রে আহারাদির পর যথা-রীতি বল-নাচ চল্‌ল।

আমি বরাবরই কাপড় পরে চলেছিলাম। মধ্যে একদিন নোটীশ-বোর্ডে নোটীশ দেখা গেল—"Gentlemen are requested to wear coats in dining saloon." বুঝলুম, বিজ্ঞপ্তিটী বোধ হয় আমাকেই উপলক্ষ্য কোরে; কারণ, আমি সার্ট ও স্যাণ্ডেল পরেই বরাবর থাকতুম। যাই হোক, হুকুম যখন জারী হোল, আমিও ধুতি স্যাণ্ডেল বজায় রেখে, গায়ে একটা কোট চাপিয়ে তা তামিল কোরলুম। এই নোটীশের ফলে মিঃ খাঁ উত্তেজিত হোয়ে একটা কাগজে 'রেজোলিউশন' লিখে ফেল্লেন যে, সকলে নিজের জাতীয় পোষাক জাহাজে পরবে; এবং ভারতীয় সকলকে তিনি সেটা সই করালেন। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, সকলেই, এমন কি উদ্যোক্তাও, যথারীতি কোট-প্যাণ্ট পোরেই ডেকে ও খাবার ঘরে হাজির দিলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "যে সমাজে যাচ্ছি, তাদের মত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।" অতএব নির্ব্বোধ আমি একঘরেই হোয়ে রইলুম।

মাঝে মাঝে সঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়, এবং অপর একজন অত্যন্ত অল্পবয়সী সঙ্গী মিঃ সাহা তাঁদের মাতৃদত্ত মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহারের জন্যে আমন্ত্রণ কোরতেন। আমন্ত্রণটা এত বেশী ঘন ঘন হোত যে, সব সময় আর তার জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হোত না। একদিন হঠাৎ মিঃ সাহার কেবিনে গিয়ে দেখি, তিনি একটা শুকনো মালা কোলে নিয়ে বোসে আছেন, আর চোখ দিয়ে টপ্‌-টপ কোরে জলের ধারা গড়িয়ে পোড়ছে। আমাকে দেখে তিনি ত্রস্তভাবে মালাটা ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। আমি এই পবিত্র মুহূর্ত্তটীকে অনধিকার-প্রবেশ কোরে আঘাত করার জন্যে গ্লানি অনুভব কোরলাম। মিঃ সাহা শুক্‌নো হাসি হেসে বল্লেন, "এস ব্যানার্জ্জী"। আমি সেই মুহূর্ত্তটুকুর গাম্ভীর্য্য নষ্ট না কোরে বল্লাম "ও মালা কে তোমায় দিয়েছিল মিঃ সাহা?" সে উত্তর দিলে "আসবার সময় মা পরিয়ে দিয়েছিল।" মালাটা মেজে থেকে তুলে ধরলাম,—মনে হোল, বিশ্বের মাতৃ-আশীর্ব্বাদ বুঝি ওতে মাখান। ধীরে ধীরে মালাটা তার হাতে দিয়ে "বোসো, আসচি" বোলে দ্রুত বেরিয়ে এলাম।

মিশরের সাকী—কায়রো। জলচক্র টানবার জন্যে উট ব্যবহৃত হয়—এদের নাম সাকী

ম্যাপে দেখেছিলাম লোহিত সাগর আরব সাগর অপেক্ষা প্রস্থে অনেক সরু ; কাজেই আশা কোরেছিলাম, হয় ত বা দুদিকের তীর দেখতে পাব ; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখি অন্ধের দিবা-রাত্র সমান—ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র দৃষ্টি সাগরের বিস্তৃতি ভেদ কোরতে অক্ষম। জলের রং আরব সাগরের মত অত গভীর নীল নয়। মাঝে মাঝে জলের ওপর এক একটা লাল শেওলার আবরণ দেখা যাচ্ছিল। অনেকে কল্পনা কোরছিলেন, এই থেকেই এর নাম লোহিত সাগর হোয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। এখানে এসে বেশ গরম অনুভব কোরলাম। আরব

প্যালেস হোটেল—হেলিওপোলিস
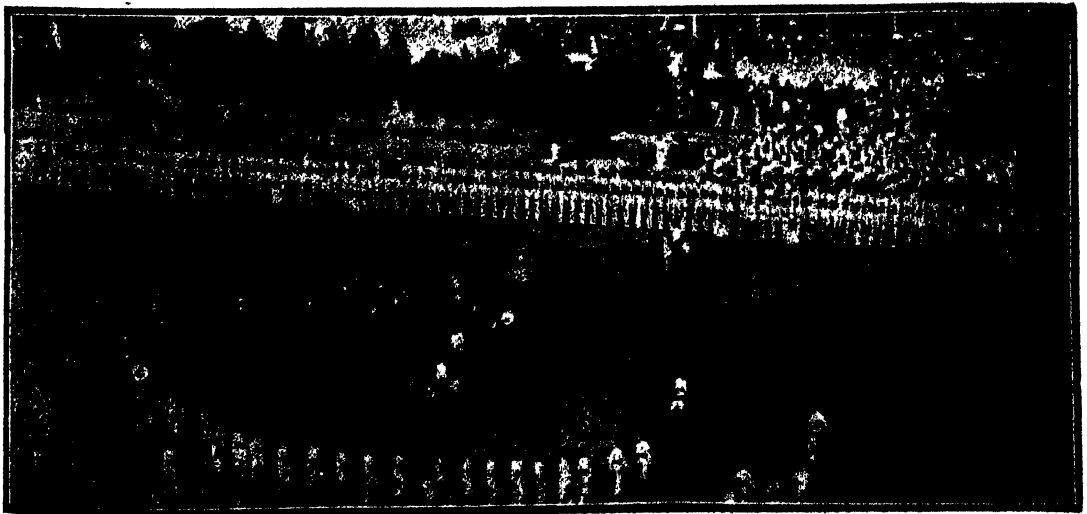
কার্পেট শোভাযাত্রা—কায়রো। পূর্ব্বে কায়রো থেকে একটা কার্পেটকে শোভাযাত্রা কোরে ধুমধামের সঙ্গে মক্কা নিয়ে যাওয়া হোত—এটা একটা প্রধান উৎসব ছিল ; খুব সম্প্রতি এ উৎসব রাজাদেশে বন্ধ হোয়ে গেছে।

ভোরবেলা জাহাজ সুয়েজ বন্দরে খাল পেরোবার আগে নোঙর কোরল। কুক কোম্পানী এখান থেকে কায়রো যাবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা কোরে রেখেছে। ভোরবেলা জাহাজ থেকে যাত্রীদিগকে নিয়ে গিয়ে সারা দিনে কায়রো দেখিয়ে আবার রাত্রে পোর্ট সৈয়দে জাহাজ ধরিয়ে দেয়। জাহাজ ইতিমধ্যে সারা দিনে সুয়েজ খালটুকু অতিক্রম করে। অন্য দিন চা দেয় সকাল ৮টায়—সেদিন কায়রো যাত্রীদিগকে চা দিলে ভোর ৬টায়। যাত্রী ভারতীয়ের মধ্যে আমি ও ভাইসচ্যানসেলার মিঃ সারওয়ার্দ্দির ভ্রাতুষ্পুত্র; বাকী ন'জন শ্বেতাঙ্গ। এখানে নামতে হোলে পুলিশের অনুমতি নিতে হয়। আমরা পূর্ব্ব থেকেই যাবার খবর দেওয়ায়, কুক কোম্পানীই আমাদের হোয়ে অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। কাজেই কেবল পাসপোর্ট দেখিয়েই

স্ফিংক্স—কায়রো। কাছের লোকটী থেকে সমস্ত মূর্ত্তিটীর উচ্চতা কল্পনা করা যেতে পারে

ছাড়পত্র পেলাম। তাদের মোটর তৈরী ছিল—তিনখানি মোটরে এগারজন যাত্রী উঠে বসলাম। এখানে মোটরের ষ্টীয়ারিং বাঁ দিকে অর্থাৎ Keep to the Right। মোটর কিছু দূর অগ্রসর হোতেই আবার পুলিশ গাড়ী থামিয়ে কাষ্টমস্‌এ ডিউটী দেবার মত কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা কোরলে ও মোটামুটি গাড়ীতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। পুলিশদের পোষাকগুলি বেশ। আগাগোড়া সাদা পোষাক। মাথায় ঘাড় পর্য্যন্ত ঢাকা টুপী।
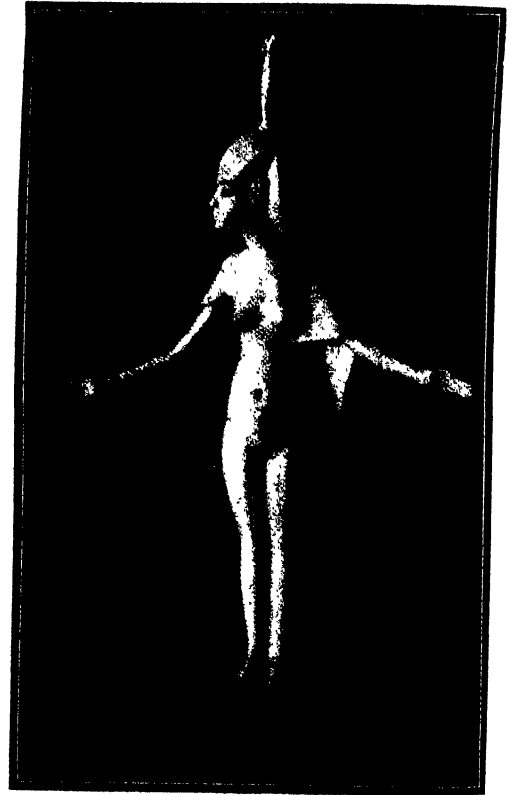
সুয়েজের বুক চিরে গাড়ী চল্ল একটা রেল লাইনের পাশে পাশে। ছোট্ট সহর—বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট বা লোকজনের মধ্যে বিশেষ চাকচিক্য চোখে পোড়ল না। কিছু দূর চলার পর আবার গাড়ী থামিয়ে পুলিশ নম্বর নিলে। তার পরই তেপান্তরের মাঠ দিয়ে তিনটী মোটর-পক্ষী রাজপুত্র ও পুত্রীদের বুকে নিয়ে ছুটল। এতদিন আকাশের কোল ছুঁয়ে ছিল খালি নীল জল; আজ ধূসর উপলবিস্তীর্ণ মরুভূমি। কোমল নীলের বদলে কঠিন

টুট্-আনখ্-আমুনের ইষ্ট দেবী নিথ—কায়রো

জোলো হাওয়ার বদলে মরুর তৃষিত বায়ু; অতল-পরিবর্তে কঠিন ঘনিষ্ঠ স্পর্শ বহু দিন পরে বেশ

বন্যায় নীলের জল পিরামিডের পায়ের কাছে—কায়রো

ভাল লাগল। ঘর-বাড়ী নাই, লোকজন নাই, বন-জঙ্গল নাই, পশু-পাখীর কলরব নাই,—নিঝুম, নিস্তব্ধ মরুর বুকের

মহম্মদ আলী মসজিদের অন্তর্দেশ—কায়রো
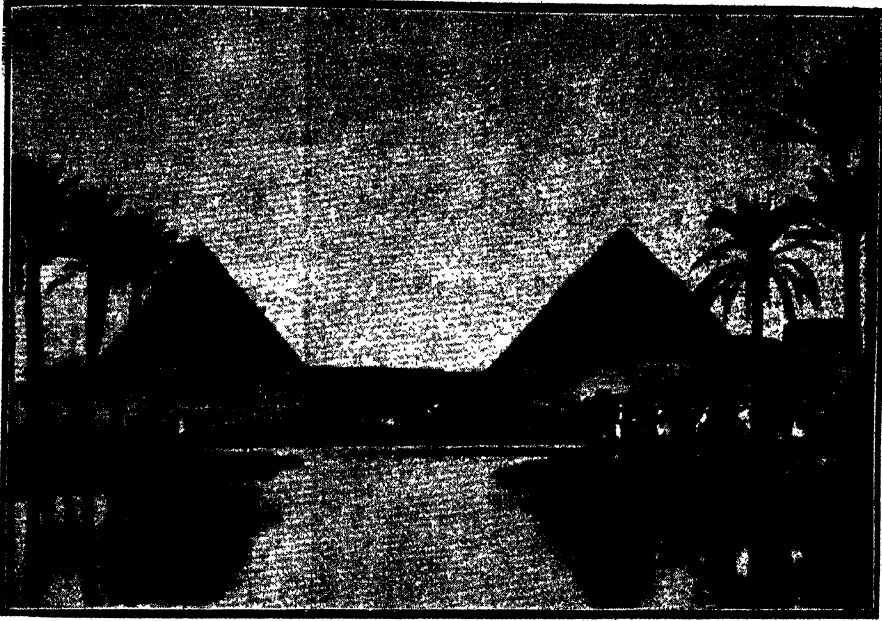
যাত্রী। চার দিকের কঠিন আবহাওয়া মনের কোণের সুপ্ত দস্যুবৃত্তিকে যেন নাড়া দিতে লাগল। বেদুইনের অশ্ব-খুরের আওয়াজ যেন কাণে বাজতে লাগল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বালির পাহাড় মাথা খাড়া কোরে রয়েছে —যেন যৌবনশ্রী-লুপ্ত অতীতের বৃদ্ধ সাক্ষী যুগ যুগ ধা মরুর বুকে তার অতীত ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি-ধ্যানে মগ্ন।
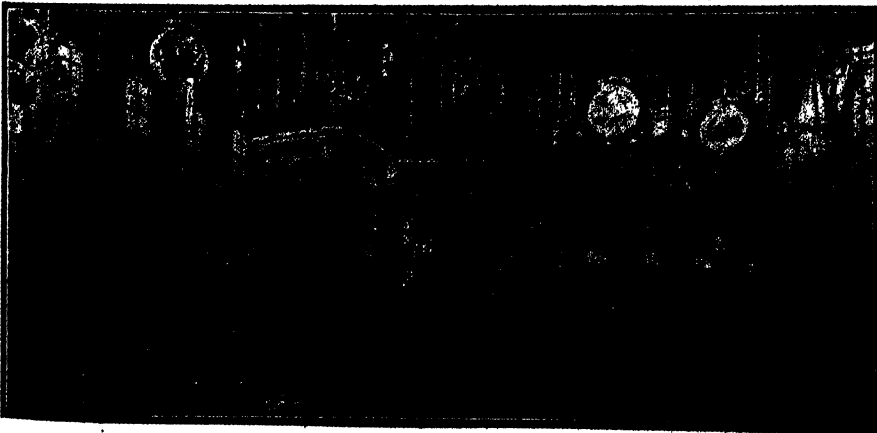
রাস্তায় মাঝে মাঝে পুলিশের ফাঁড়ি আছে। কোথাও-কোথাও রাস্তায় কুলিরা কাজ কোরছে,—মোটর আর

সাহেব দেখলেই বাঁ হাত তুলে সেলাম কোরছে—বুঝলাম, গোলামীটা এদেরও মজ্জাগত হোয়েছে।

রাজন্ত উপত্যকা—মিশর। এই উপত্যকায় বহু রাজার সমাধি; সামনের খনিত কবরটী টুট্‌-আন্‌খ্‌-আমুন

টুট্‌-আন্‌খ্‌-আমুনের ছড়ি—কায়রো

বাজারে কফির দোকান—কায়রো

চোলতে চোলতে সহসা ড্রাইভার বোলে উঠল—"মিরাজ"। অবাক বিস্ময়ে দেখি, দূরে একটা জায়গায় যেন জল চক্‌চক্ কোরছে। ক্ষণপরেই মোটরের গতির সঙ্গে তা মিলিয়ে গেল।

বহু দূর এসে গাড়ী থামল। আমরা নেমে একটু হাত-পা ছাড়ালাম। ড্রাইভার আঙুল বাড়িয়ে দেখালে দূরে ইস্‌মাইল পাশার প্রাসাদের

টুট্‌-আন্‌খ্‌-আমুনের বক্ষসজ্জা—হারজাতীয়
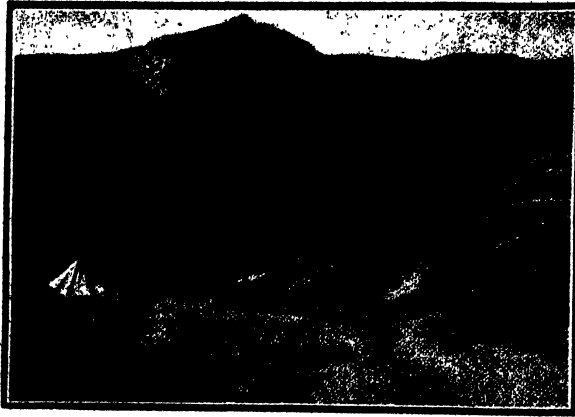
ধ্বংসাবশেষ—ঐশ্বর্য্যের চরম পরিণতি।

সকালের দিকে বেশ শীত কোরছিল। সেদিন মিঃ সারওয়ার্দ্দি আমায় সুট পোরতে অনুরোধ করেন; কারণ,

রাজন্য সমাধির অপরাংশ

টুট্-আন্‌খ্-আমুনের স্বর্ণ-কফিন—কায়রো। নিপুণ শিল্প-কলা দেখবার জিনিষ
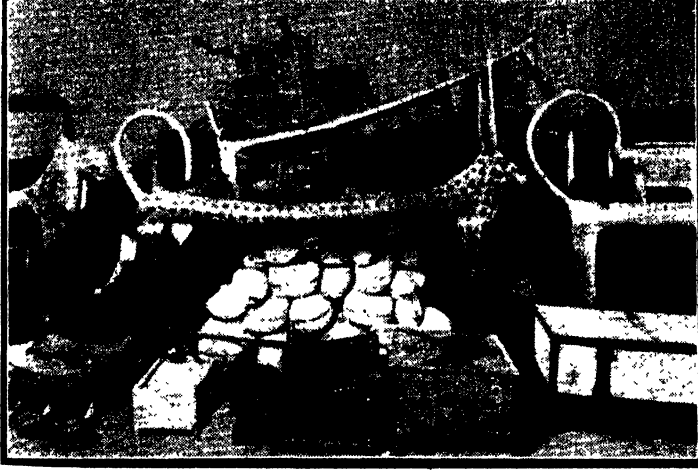
টুট্-আন্‌খ্-আমুনের খাট ও আসবাবপত্র যা সমাধির পাশের ঘরে ছিল—কায়রো

নরুসন্ধ্যা—কায়রো

মিশরীয়রা, বিশেষ কোরে সেখানকার ইংরেজী হোটেলের পরিচারকেরা, সে বেশটাকে শ্রদ্ধা করে বেশী। কাজেই শ্রদ্ধা পাবার জন্তে না হোক, অশ্রদ্ধা এড়াবার জন্তে তাই কোরতে হোয়েছিল; কিন্তু সুট পরা সত্বেও শীত কোরছিল; আবার দুপুরবেলা অসহ্য গরম লাগছিল।

নিজস্ব পাড়া—কায়রো

স্বর্ণ-মৃগ, টুট্-আন্‌খ্-আমুনের কবরে প্রাপ্ত—কায়রো

নীলনদে মহিষ-স্নান—কায়রো

প্রায় তিন ঘণ্টায় ৮৫ মাইল রাস্তা অতিক্রম কোরে গাড়ী হেলিওপেলিস নামে একটা বেশ সাজান সহরে এসে ঢুকল। সহরটী নূতন তৈরী হোচ্ছে,—দেখেই আমাদের বালীগঞ্জকে মনে পড়ে। অমনি সহরের প্রান্ত-দেশে অথচ আভিজাত্য-শালী বাড়ীর সমষ্টি; কিন্তু এখনও ঘেঁষাঘেঁষি হবার অবকাশ পায় নাই। একটা বাড়ীর গড়ন শিবমন্দিরের মত

দেখে একটু কৌতূহল হোল; ভাবলাম, বুঝি কোনো ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এখানেও নিজের ধর্ম্মধ্বজা স্থাপন কোরেছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, ঐটা কোনো এখানে। আর একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাসাদ বোলেই ভুল হয়; কিন্তু শুনলাম, সে প্রাসাদে মুদ্রাবিনিময়ে আমার মত সম্রাটও
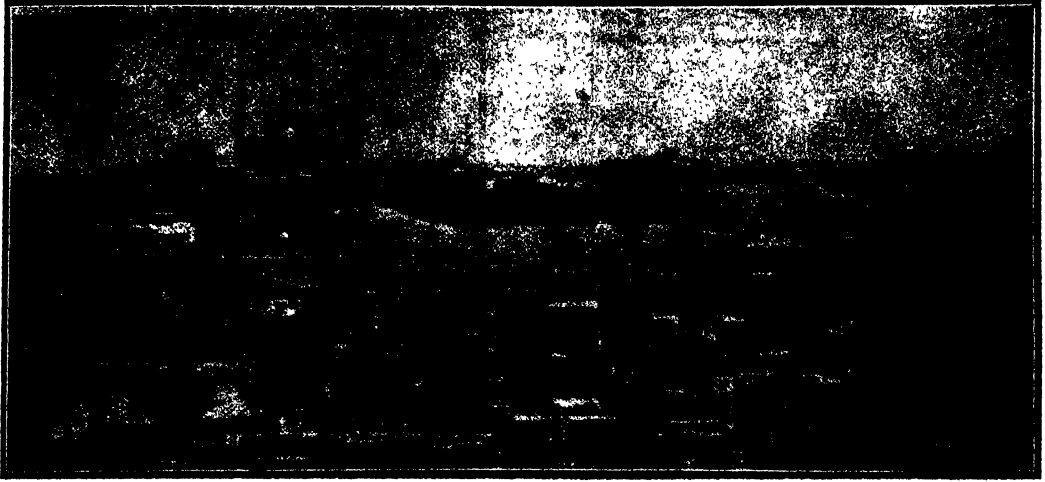
মহম্মদ আলীর মস্‌জিদ ও কায়রোর সাধারণ দৃশ্য

বেলজিয়ান ব্যারণের বাড়ী। সহরটা বেশ পরিষ্কার। পীচ দেওয়া রাস্তা। ট্রাম মোটর ঘোড়া সবই চলছে বাস কোরতে পারে; অর্থাৎ সেটা "প্যালেস হোটেল"। এই সহরটা পেরিয়ে গাড়ী আরো অনেক দূর গিয়ে

টুট্-আন্‌খ্-আমুনের হাতীর দাঁতের আসবাব—কায়রো

আলবাস্তারের ফুলদানী। টুট্-আন্‌খ্-আমুনের কবরে প্রাপ্ত—কায়রো
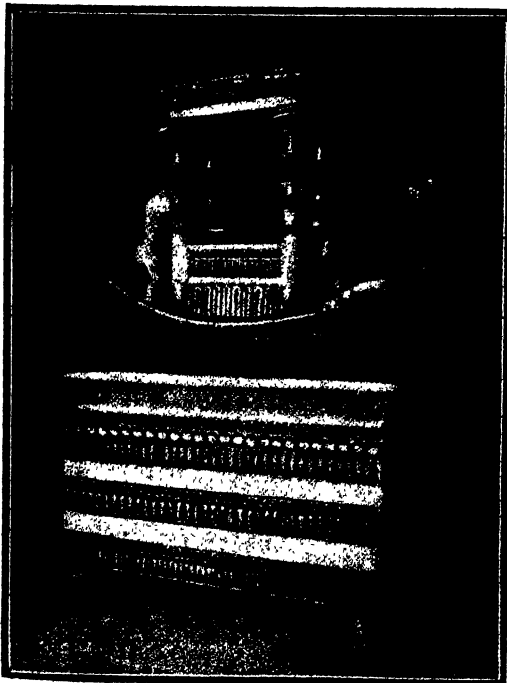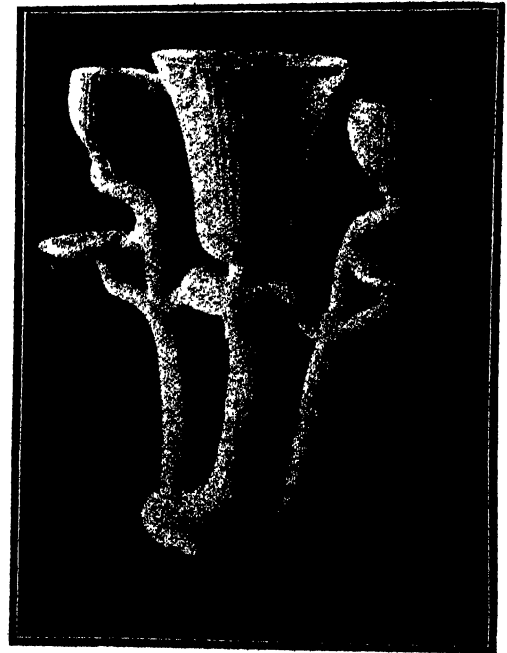
কায়রো সহরে পৌঁছল। আমাদের বিশ্রামের জন্যে কায়রোর সবচেয়ে বড় হোটেল Continental Savoy নির্দ্দিষ্ট হোয়েছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আবার সহরের ভেতর দিয়ে গাড়ী ছুটল। সহরটা বেশ সাজান ও পরিষ্কার বোলেই মনে হোল। মিউজিয়ামটা প্রকাণ্ড—আমরা বেশ তাড়াতাড়িই দেখেছিলাম; তবু

কায়রো রূপসী

সই—কায়রো

মোটরে মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এখান থেকে একজন ইংরাজি-বলা গাইড সঙ্গে চোলল।
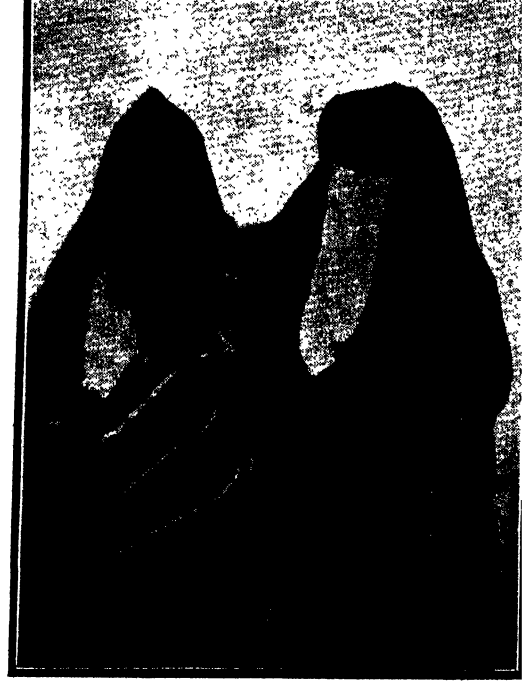
দু'ঘণ্টার কমে শেষ কোরতে পারি নি। কায়রোর চতুষ্পার্শ্বে এবং আস্যুয়ান, লাক্সর, আবু সিমবেল, কার্নাক, সাক্কার প্রভৃতি জায়গায় যে সব প্রাচীন জিনিষ পাওয়া গেছে, সবই এখানে সঞ্চিত আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব তিন চার হাজার বৎসর আগেকার যে সব কারুকার্য্য, ভাস্কর্য্য, শিল্প এখানে আজও সাজান আছে, তা দেখে এইটাই কেবল বারে বারে মনে হয় —মানুষ কি ক্রমশঃ বুদ্ধিমান, কৃষ্টিমান ও শিল্পী হোচ্ছে; কিম্বা ছ' হাজার বছর আগেও তার বুদ্ধিমত্তা যতটুকু ছিল আজও তাই আছে? সে আমলের যে সব হাল প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রের চিত্র দেখলাম, আজ
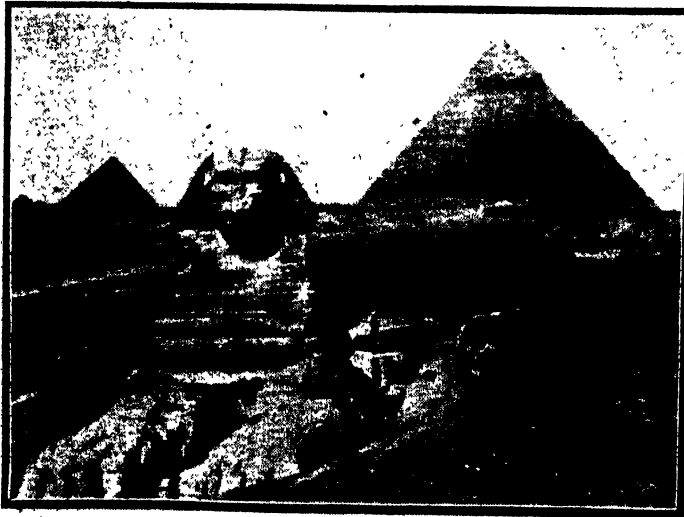
পিরামিড ও স্ফিন্‌ক্স—কায়রো

বহু সহস্র বৎসর পরেও এখনও তেমনি যন্ত্রই মিশরে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন মিশরীয়দের জীবন-যাত্রার যে সব আসবাব-

তখনকার নারী আজকের নারীর মতই বেশ-বিন্যাসে পটু ছিল। তখনকার কয়েকটী মূর্ত্তির চোখ আজও সত্যকার চোখ বোলে ভ্রম হয়, এত চমৎকার তার

টুট্-আন্‌খ্-আমুনের সিংহাসন—কায়রো

শার্দ্দুল-প্রভু, টুট্-আন্‌খ্-আমুন—কায়রো

নীলনদের সেতু—কায়রো

পত্র ও চিত্র যাদুঘরে রয়েছে, তা থেকে মনে হয়, তারা এখনকার চেয়ে কোনো অংশে কম বিলাসী ছিল না। তাদের প্রতাপ আজকের প্রতাপশালীর মতই উগ্র ছিল।

চিত্রন। তখনকার ফ্যাসন অবশ্য অন্য রকমের ছিল; কিন্তু সে ত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল।

একটা জিনিষ এখানে মনকে বড় পীড়া দেয়।

এখানকার অধিকাংশ জিনিষই প্রাচীন কবর থেকে আনীত। পূর্ব্বে মিশরীয়রা মৃতের সঙ্গে তার ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীও কবরস্থ কোরত। এখন তাদেরই স্বজাতি ঔৎসুক্যের বশে, লোভের তাড়নায়, যশের মোহে সেই সব মৃতদের জিনিষ লুণ্ঠন কোরছে—কবরের অন্ধকার আলো থেকে আবার তাদিগকে আলোর মাঝে টেনে এনে হাজির কোরেছে। কী ক্ষতি ছিল যদি সেগুলো না

মা—কায়রো

প্রকাশিত হোত? বর্ত্তমান যুগের সেগুলি দেখে কী বিশেষ লাভ হবে? মানব কত দিন থেকে সভ্য সে কথা মানবকেই শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা নাই বা দিলে! আর যদি যশের মোহ, ঔৎসুক্যের তাড়না এড়ান একান্তই অসম্ভব হয়, সেগুলি যথাস্থানে রাখলেই কি বিশেষ ক্ষতি হোত? আমার মত যাত্রীরা হয় ত সেগুলো একত্র এক ঘণ্টায় দেখতে পেত না—হয় ত এমনি সব ভ্রমণ-কাহিনী লেখা হোত না; কিন্তু তাই বোলে কি মৃতের জিনিষ লুঠ কোরতে হবে!

নীচের তলা দেখার পর দোতলায় গেলাম।
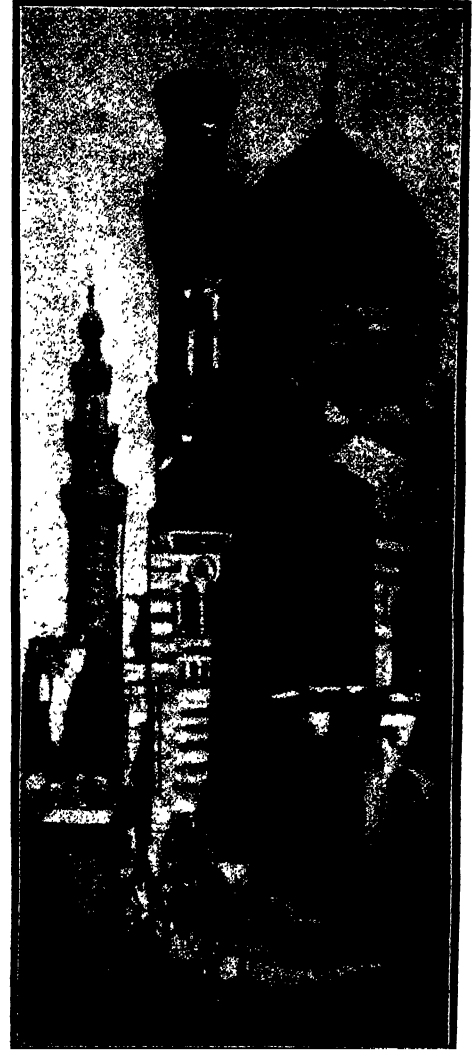
নীল-মস্‌জিদ—কায়রো। মস্‌জিদের মাথাটী নীল রংএর

সেকালের নানা অস্ত্র, নানা সজ্জা, বিভিন্ন গৃহস্থালীর দ্রব্য প্রভৃতি সাজান। এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য টুট্‌-আন্‌খ্‌-আমুনের হল।

টুট-আন্‌খ্‌-আমুনের কবর আবিষ্কারের বিষয় অনেকেই জানেন। এই হলে সেই সব জিনিষ সাজান আছে। একটী

সোনার কাফিনে টুট্-আন্‌খ্-আমুনের মৃতদেহ আছে। সেটী পর-পর তিনটী কাফিন দ্বারা আবৃত ছিল। সবগুলিই

দিশী বাজারের একাংশ—কায়রো

আছে। টুট্-আন্‌খ্-আমুনের ব্যবহৃত চেয়ার, খাট, ছড়ি, বাক্স, ফুলদানী, মুকুট প্রভৃতি যা কিছু তাঁর কবরে পাওয়া

নীল নদ—কায়রো

গিয়েছিল, এখানে রক্ষিত আছে। কবরের মধ্যে তাঁর শোবার ঘরের পাশের ঘরে (Ante-chamber) যে সব জিনিষ ছিল, সেগুলি আলাদা একটী ঘরে যেমন ছিল তেমনি কোরে সাজান আছে। তখনকার কাঠের কাজ, আলাবাস্তার পাথরের চমৎকার কারুকার্য্য, হাতির দাতের শিল্প দেখে মুগ্ধ না হোয়ে থাকা যায় না। সবগুলির প্রতিলিপি দেওয়া অসম্ভব, কতকগুলি দিলাম।

মিউজিয়াম থেকে কায়রোর দিশী বাজারে গেলাম। রাস্তাগুলো অপরিসর; কিন্তু পিচ দেওয়া রাস্তায় বেশ ভীড় ও গোলমাল। পুরুষরা পা পর্য্যন্ত আলখাল্লা আর মাথায় ফেজ পোরে চোলেছে। কেউ কেউ কোট-প্যাণ্টের ওপর ফেজ চড়িয়ে জাতীয়তা বজায় রেখেছে। মেয়েদের পোষাক একটু

টুট্-আনুখ্-আমুনের ভ্রমণের বাক্স

টুট্-আনুখ্-আমুনের গয়নার বাক্স, কাঠ ও হাতীর দাঁতের কাজ, কায়রো

অদ্ভুত রকমের—গলা থেকে পা পর্য্যন্ত কালো আলখাল্লা; কপাল থেকে মাথা ঢেকে একটা কালো কাপড় পিঠ পর্য্যন্ত ঝোলে; আর চুল থেকে কপালের ওপর দিয়ে একটা পেতলের চোঙা নেমে এসে নাকটা ঢেকে রাখে। নাকের ডগা থেকে একটা কালো মিহি জাল সারা মুখটা ঢেকে রাখে; অর্থাৎ নাক ও মুখের হাঁ বাদ দিয়ে চোখ ও গালের উপরাংশ এবং কাণ পর্য্যন্ত দেখা যায়। তবে ক্রমশঃ এই জালের সূক্ষ্মতা বেড়েই চলেছে এবং আধুনিকাদের মহলে নাকের ঢাকাটী অস্তিত্ব হারিয়েছে—অতি আধুনিকারা কেবল মাথা থেকে গোটা মুখের ওপর একটা অতি সূক্ষ্ম জাল ফেলে

টুট্-আনুখ্-আমুনের সিংহাকৃতি ফুলদানী—কায়রো
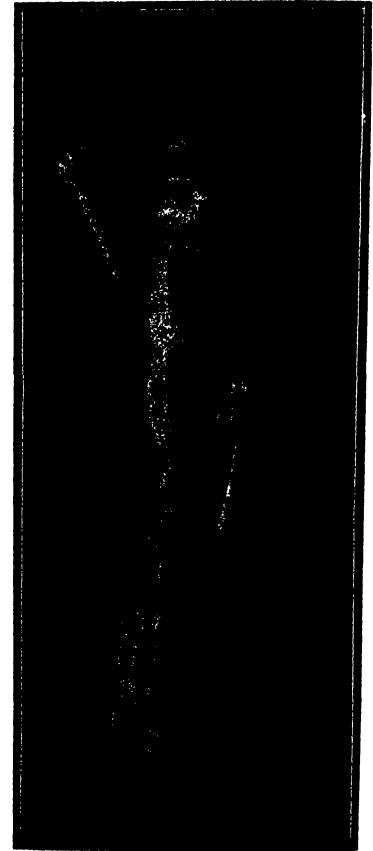
রাখেন—বেটা আছে কি না বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়।

গাধা এবং খচ্চর দুই-ই নির্ব্বিকার চিত্তে গাড়ী বইছে। রাস্তায় উটও প্রায় চোখে পড়ে। ট্রামগুলো একলাই চলেছে; অর্থাৎ পেছনে জোড়া নেই, আকৃতিও ছোট। হালে মোটর-বাসও মাথা গলিয়েছে।

পুরানো ধরণের বাড়ীগুলো দেখলেই চেনা যায়—সেকেলে কাঠের জাফ্‌রী, ছোট ছোট খোলা বারান্দা, পাশাপাশি বাড়ীগুলি—পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। দোকানগুলি আমাদের দেশের মত কোরে সাজান, পশ্চিমের শো-কেশ, বা পরিচ্ছন্নতা প্রবেশপত্র পায় নাই। বাজারে এদের জীবনযাত্রা দেখে জাতটাকে খুব কর্ম্মী ও ব্যস্ত বোলে মনে হোল না। দোকানদার খদ্দেরের সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েচে,—আলবোলাতে তামাক পুড়ছে।

টুট্-আন্‌খ্-আমুনের কফিনের ওপরের সমাধি-মন্দির, চারপাশে চারটী দেবী-মূর্ত্তি টুটানের নিরাপত্তার জন্যে পাহারা দিচ্ছেন—এটি চমৎকার প্রস্তর-নির্ম্মিত

গাইড একটা সুগন্ধির দোকানে নিয়ে গিয়ে পূরলে। দু'একজন কিছু-কিছু কিনলেন। এখানকার সকলেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজি বোলতে পারে। রাস্তার দুধারে দোকানীরা চীৎকার কোরে ডাকে "Take Sir, fine thing, Souvenir ইত্যাদি।" কতকটা আমাদের "Take Take, no take" জাতীয়। পাশাপাশি তিন-চারিটী দোকান থেকেই অবিশ্রান্ত আহ্বান—দৃকপাত কোরলেই বিপদ একবারে ছেঁকে ধোরচে। এখানকার দোকানীরা এক নম্বর ঠগ এবং অসভ্য। দাম-দর করাই বিপদ। আমি মোটরে চাপার পর একজন কতকগুলি ফটো নিয়ে এলো বেচবার জন্যে। দামে পোষাল না বোলে নিলাম না। সে বারবার নেবার জন্যে অনুরোধ কোরতে লাগল। শেষে আমি বল্লাম "খারাপ ফটোগুলোর যা দাম

টুট্-আন্‌খ্-আমুন কবরে প্রাপ্ত একটী মূর্ত্তি—কায়রো

চেয়েছ সেই দামে ভাল ফটোগুলো দিলে নিতে পারি।" সে তাইতেই রাজী হোল। ইতিমধ্যে গাড়ী ষ্টার্ট দিলে। সে রাজী হওয়ায় আমি তাকে দাম দিলাম। সেও ফটোর গোছা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে ভিড়ে সরে পোড়ল। গাড়ী ইতিমধ্যে চোলতে সুরু কোরেছিল। আমি ফটোর খাম খুলে দেখি হতভাগা খারাপগুলোই দিয়ে পালিয়েছে। কেবল আমিই নয়—দলের প্রায় অনেকেই নানা ভাবে প্রতা-

ন্বিত হোয়েছিল। শুধু ঠগই নয়—এরা অত্যন্ত পাজী ও অসভ্য। অতীতের এত বড় একটা সুসভ্য স্বাধীন জাত কালের কোপে কেমন কোরে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা হারিয়ে, কৃষ্টি হারিয়ে আজ এত নিম্ন স্তরে নেমে এসেছে তাই ভাবি। মরুভূমির বুকে হোলেও কায়রোতে অনেক গাছপালা দেখা যায়। রাস্তার ধারে কয়েকটী পার্ক বেশ সুবিন্যস্ত। এখানকার মুদ্রার নাম পিয়াস্তা। প্রায় ৪½ পিয়াস্তায় এক শিলিং; অর্থাৎ প্রায় দশ আনা। এখানকার শাসন-প্রথা Constitutional monarchy। বাজার থেকে ফিরে হোটেলে লাঞ্চ খেলাম। খাবার সময় আমি বিফ ও হাম খাইনা বোলে খাওয়ায় আমার জন্যে মাছ ও তরি-তরকারীর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। খাওয়ার পর আবার বেলা আড়াইটায় মোটরে ছুটলাম দশ মাইল দূরে পিরামিড দেখতে। কিছুদূর এসেই বহুশ্রুত নীল নদ পার হোলাম। তখন জল ঘোলা;—বিস্তৃত নদ, বুকের ওপর দিয়ে লম্বা সাদা পাল তুলে মাল-বোঝাই নৌকো চোলেছে। কায়রোর ঘরবাড়ীর আড়াল থেকে মুক্তি পেলেই পিরামিড চোখে পড়ে—তিনটী পাশাপাশি অতীতের সাক্ষী আজও মরুর বুকে দাঁড়িয়ে। নীল নদের তীর বহু দূর পর্য্যন্ত শস্য-শ্যামল—প্লাবনের সময় এর জল পিরামিডের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করে শুনলাম। আমাদের মোটর যেখানে থামল, সেখান থেকে পিরামিড আরো প্রায় বিশ মিনিটের পথ। এখান থেকে মোটরের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব, তাই অন্য যানের ব্যবস্থা আছে। মাত্র দুটী টোঙ্গা ছিল, তাতে দুটী মহিলা ও অন্য দুজন গেলেন। বাকী আমরা উটের পিঠে চোড়লাম। হাতীর মত উটের পিঠেও বসবার বেশ গদি আছে এবং গমনভঙ্গীও প্রায় অনুরূপ। প্রত্যেক উটকেই তার পরিচালক সামনে দড়ি ধোরে নিয়ে চোল্লো। সে আবার মাঝে মাঝে তার উটের বাহাদুরী প্রতিপন্ন কোরবার চেষ্টায় তাকে দৌড় করাচ্ছিল, আর ভর্ত্তিপেট আরোহীর দল সেই মরুভূমির বুকে দ্বিপ্রহরে আরামপ্রদ আরোহনে যে আরাম উপভোগ কোরছিল তা অনির্ব্বচনীয়! যেতে যেতে আমার উটের সহিস একটা সবুজ দাগ-ধরা চারকোণা ছোট তামার ঢিবি আমার দিয়ে বল্লে "Take, So 11c-

নীলনদের তীরে পিরামিডের উদ্দেশে উপাসনা—কায়রো
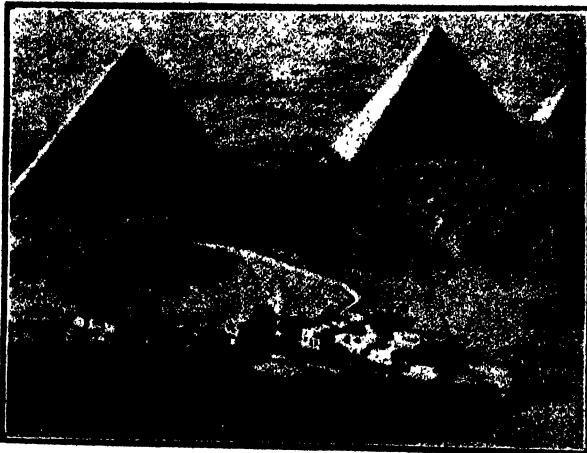
পিরামিডের একটী দৃশ্য, কায়রো

nir"। অকস্মাৎ তার এই করুণার কারণ বুঝতে পারলুম না। আমি সেটা নিয়ে ভাল কোরে দেখতে লাগলুম। সে বোলে যেতে লাগল "Good luck, old King's, keep it, Souvenir" ইত্যাদি। অবশেষে সে আসল কথা পাড়লে "Fifty piastas, very cheap, don't tell any body"। এতক্ষণে তার আত্মীয়তার কারণ বুঝলাম। বল্লাম "dont want"। সে নাছোড়বন্দা—নিতেই হবে। এমন জিনিষ আর পাবেন না, পাঁচশো পিয়াস্তার বিনিময়েও নয় ইত্যাদি। পরে সে ৫ পিয়াস্তার কেবল আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার খাতিরেই ঐটা দিতে চাইলে। পরে জেনেছিলাম অমনি কোরে ওরা যাত্রীদিকে ঠকায়। সেটা আসলে তার নিজেরই তৈরী এবং মাটীতে পুঁতে রেখে রং ধরান।

মরুপোত পিরামিডের পাশে এসে নোঙর কোরলে। সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতমের কাছে দাঁড়িয়ে কেবলি মনে পোড়তে লাগল তাজমহলকে।

কে জানে কোন্ মূর্খ এদের দুজনকে একাসন দিয়েছে। শিল্পীর অপূর্ব্ব কল্পনা তাজ; তার নিপুণ শিল্প যে কি হিসেবে পিরামিডের সঙ্গে তুলিত হোতে পারে জানি না। স্থায়িত্বের কাল হিসেবে পিরামিড বার্দ্ধক্যের দাবী কোরতে পারে, সমাধির ওপর স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে তাজের পাশে স্থান পাবার আবেদন কোরতে পারে; কিন্তু শিল্পকলার দিক দিয়ে সে বহু নীচে। দীর্ঘ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অতগুলি পাথর সু-দূরের পাহাড় থেকে কেটে আনা নিশ্চয়ই ব্যয়সাপেক্ষ, কলকজার সাহায্য ব্যতিরেকে

একটী বাক্সে যুদ্ধের চিত্র

টুট্-আন্খ্-আমুনের দ্বিতীয় কফিন—কায়রো

৪৮১ ফিট উঁচু একটা বিরাট স্তূপ গড়ার বাহাদুরী আছে; কিন্তু শিল্প নাই। এই বিরাট স্তূপগুলির ভেতর রাজা ও রাণীর সমাধির জন্তে দুটো পাশাপাশি ঘর আছে। সেখানে যাবার অনুচ্চ, সঙ্কীর্ণ রাস্তাও আছে। পাশাপাশি তিনটী পিরামিড—প্রথমটাই সর্ব্বোচ্চ। বর্ত্তমানে এটার উচ্চতা ৪৫১ ফিট; মাথার ৩০ ফুট বুঝি কোন মুসলমান-আক্রমণকারী মক্কায় নিয়ে গেছেন। কায়রোতে মোট নটী পিরামিড আছে শুনলাম। দূরে অন্যত্র আরো পাঁচটী পিরামিড দেখা যায়। কালের কোপে পিরামিড

ফলবিক্রেতা বাড়ীর দরজায় ফল বেচতে এসেছে—কাছে পাড়াপড়শীর ভিড়—কায়রো

গুলির ওপরের চুনবালি খোসে পোড়ে পাথর বেরিয়ে পোড়েছে—কেবল মাথায় সামান্ত একটু এখনও আছে।

পিরামিডের অনতিদূরে এখনও খননকার্য্য চোলছে—অনেকগুলি বাড়ীঘর ও মন্দির আবিষ্কৃত হোয়েছে। এমনি একটী মন্দিরের সামনেই বহুজনবাদিত স্ফিন্‌ক্স (Sphinx)—প্রকাণ্ড উঁচু একটা সিংহের আকৃতি-বিশিষ্ট অথচ মানুষের মুণ্ড-ওয়ালা পাথরের মূর্ত্তি। পূর্ব্বে এটার বুক পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হোয়েছিল, এখন পায়ের থাবা পর্য্যন্ত খনিত হোয়েছে। দুটী থাবার মাঝে মন্দির-প্রবেশের পথ। কাজেই, এটাকে অনেকে মন্দিরের প্রহরী বলে, কেউ বলে দেবতা। কারনাকের মন্দিরের দরজায় এমনি আকৃতিবিশিষ্ট ছোট ছোট স্ফিন্‌ক্সের সার দেখে মনে হয় এগুলি প্রহরীই; কিন্তু গাইড বোলছিল দেবতা। এই স্ফিন্‌ক্সের থাবাগুলোর উচ্চতা মানুষের চেয়ে বেশী।

লেখক

কোনো মুসলমান রাজার মূর্খতায় স্ফিনিক্স আজ কর্ত্তিত-নাসা। এখানে ফটোগ্রাফারের দল দাঁড়িয়ে আছে—যাত্রীদের ফটো তুলে পয়সা অর্জ্জনের চেষ্টায়। অতীতের এই মূক সাক্ষীর কাছে দাঁড়িয়ে মনে হোল ঐ পাষাণকে চীৎকার কোরে বলি "ওগো পাষাণ তুমি একবার মুখ খোল, প্রত্নতাত্ত্বিকের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন

কোরে তোমার ঐশ্বর্য্যের দিনের কথা আমাদিগকে শোনাও।" কিন্তু পাষাণ পাষাণই। হয় ত ঐ দেবতা একদিন জাগ্রত ছিল। আজ তার চারি দিকের এই দীন গ্লানিময় আবহাওয়ায় তার কণ্ঠরোধ কোরেছে।

পিরামিডের কাছে বিদায় নিয়ে এখানকার বিখ্যাত "মহম্মদ আলীর মসজিদ" দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড মসজিদ—সহর থেকে উঁচু জায়গায় অবস্থিত। মসজিদের চার পাশে এখন ইংরাজ সৈন্যের থাকবার আস্থানা। মসজিদ থেকে গোটা সহরের একটা সাধারণ দৃশ্য পাওয়া যায়। মসজিদে এখন মেরামত চোলছে, ভিতরে বহু কাঠ বাঁশ বাঁধা। ভিতরে এবং বাইরে ভিৎ খুঁড়ে দেখা হোচ্ছে বোনেদ শক্ত আছে কি না। ভিতরে বিস্তর ঝাড় লণ্ঠন। আগ্রা দিল্লী দেখার পর এ মসজিদ বিস্ময় উদ্রেক করে না। এখানেও অনেকে স্ফিন্‌ক্স, পিরামিড, প্রভৃতির ক্ষুদ্র সংস্করণ কিনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে।

এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় "নীল-মসজিদ" (Blue Mosque)। "সুলতান হাসান মসজিদ" প্রভৃতি দেখে হোটেলে ফিরলাম। হোটেলের দরজাতেও পাথরের মালা, ফটো, জুতা-মেরামতওয়ালা প্রভৃতি বিবিধ জিনিষ বিক্রেতার অনর্গল অনুরোধ।

বিকেলে হোটেলে চা খেয়ে সন্ধ্যা "ছ"টায় পোর্ট-সৈয়দের ট্রেণ ধরলাম। গাইড বরাবরই ভদ্র ব্যবহার কোরেছিল ও যথেষ্ট পরিশ্রম কোরেছিল বোলে তাকে কিছু বখসিস্ দিলাম। অনেক শ্বেতাঙ্গ কিন্তু এ সময় গা-ঢাকা দিয়েছিল। ষ্টেশনে বহু ইংরাজী মাসিক ও দৈনিক পত্র, ইংরাজী নভেল প্রভৃতি এবং প্রত্যেকেরই ইংরেজী ভাষা জ্ঞান এখানে ইংরাজেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে।

ট্রেণ মরুভূমির 'ওপর দিয়ে চল্ল। দূরে মরুভূমির মাঝে সূর্য্যাস্ত সুন্দর, বিস্ময়কর। কিছুক্ষণ পর জানালা খুলে রাখা অসম্ভব হোয়ে পোড়ল; কারণ, ট্রেণের হাওয়ায় অবিশ্রাম বেগে ধূলো বালি কামরা ভরিয়ে দিতে লাগল। রাত্রি ১০॥টায় ট্রেণ জাহাজ ধরিয়ে দিলে। অন্যান্য যাত্রীরা আমাদের জন্যে উৎকণ্ঠিত হোয়ে অপেক্ষা কোরছিলেন। আমরা আসবামাত্রই আনন্দধ্বনি কোরে উঠলেন। সঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় খবর দিলেন আমার একটা টেলিগ্রাম তাঁর কাছে ভুলে গিয়েছিল; সেটা তিনি আবার পার্শারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই বন্ধুদের মিলনানন্দ উপভোগ করা ভাগ্যে ঘোট্‌ল না—টেলিগ্রামের খোঁজে ছুটলাম।
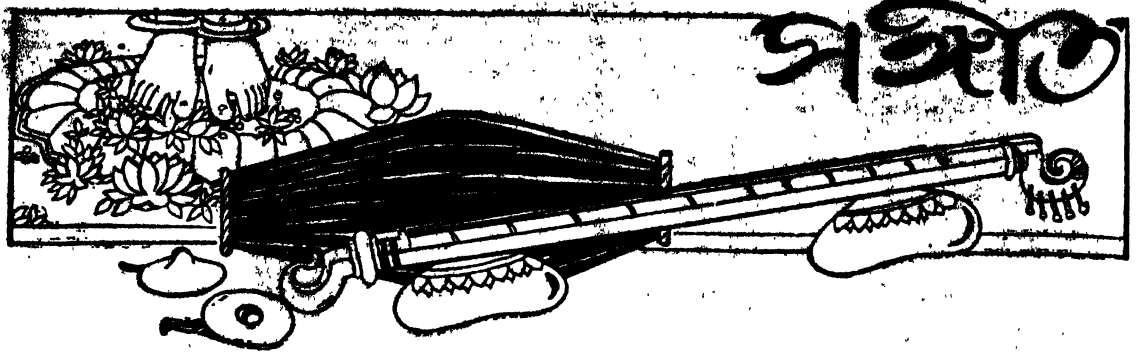
কথা—কাজী নজরুল ইস্‌লাম।   সুর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস।

স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাগেশ্রী—দাদ্‌রা।

আর লুকাবি কোথায় মা কালী।
আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার ক'রে,
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥
সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে, বেড়াস্ মা তুই আগুন জ্বালি,
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবনভরা রূপ দেখালি॥
আমি পূজা ক'রে পাইনি তোরে, এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস মা সেথা দুঃখ-দুলালী॥

  +   •   +   •
II { র্সা | ণা ধা মা | মপধা মা জ্ঞা | ঋা সা । | সা । II
 • লু   কা বি কো   থা•• য় মা   কা লী •   আ র

 •   +   •   +   •
II (সা । ।) | সা ঋা সা | ণ্ধা ণা ণা | সা মা মা | মা । । | I
 আমার   বি • শ্ব   ভু• ব ন   আঁ ধা র   ক রে •

I ধা । । | ধা মপধা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা | II
 তো র রূ   পে মা•• স   • ব ডু   বা লি

অনন্ত প্রেম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন

II { মা মা মা | ধা । | ণা ণা র্সা | র্সা র্সা । | I
সু খে র গৃ ০ হ শ্ম শা ন ক রে ০

I র্সর্রা র্সা ণা | ধা ণা । | র্সরা ণর্সর্রা র্মর্জ্ঞা | র্রা র্সা । | } I
বেড়া স্ মা তু ই ০ আ০ গু০০ ০ন জ্বা লি ০

I (র্সা) | র্সা র্সা র্সা | র্সা ণা ধা | ধা ধণধা পমা | পা মপধা ধা I
আমায় দু ০ খ্ দেও য়া র ছ লে০০ ০০ মা তো০০ র

I মা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা । | বা মা জ্ঞা | রা সা II II
ভু ভ বা ০ রূ প দে খা লি

II { সা মা । | মা মা ধা | ধা ধা ণা | ণা র্সা র্সা | I
পূ জা ০ ক রে ০ পা ই নি তো ০ রে

I র্সর্রা র্সর্রা সা | সধা ণা পা | র্সর্রা র্সর্রর্জ্ঞা । | র্রা র্সা । | } I
এ০ বা০ র চো খে র জ০ লে০০ ০ এ লি ০

I র্সা র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা | র্সা র্রা র্সা | I
বু কে র ব্য থা য় আ স ন পা ০ তা,

I র্সা । র্সা | ণা ধা । | ধা মা মা | পা । । | I
ব স মা সে থা ০ দু খ্ দু লা লি ০

I পা । মপধা | মা জ্ঞা । | রা জ্ঞা | রা সা II II
ব স মা০০ সে থা ০ দু খ্ দু লা লি

আই হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪

ষ্টেসনে চলেছি। গাড়ীখানা এগুচ্ছে কি পেছুচ্ছে গাড়ীতে বসে ঠিক্ করা কঠিন। তার ওপর গাড়ীতে উঠেই গাড়োয়ানকে বলে দিয়েছি—ঘোড়াকে ঠেঙিয়োনা বাপু। কিন্তু ভারতের জীব, মার না খেলে আর কবে এগিয়েছে! আমি পৌঁছবার ৩।৪ মিনিট পূর্ব্বেই ট্রেণ চলে গেছে।

গাড়ী থেমে গেল, আমার ক্ষণিক শান্তির আশাটুকুও থেমে গেল। হতভম্বের মত এদিক ওদিক চাচ্ছি। দেখি রণগোপাল যেন কাজ সেরে, উৎসাহের সহিত চেনা গাড়োয়ান খুঁজচে, পেলেই এক লাফে উঠে পড়ে। হেন কালে চারি চক্ষুর মিলন।

আমাকে দেখে তার উৎসাহ যেন নিবে গেল—হঠাৎ মুখ থেকে "কই আপনি যান…" বলেই—"কোথা যাবেন?"

"কিষণগঞ্জ যাবো বলে বেরিয়েছিলুম, ট্রেণ তো ছেড়ে গেছে দেখচি।"

"তবে? লরি দেখবো? সেই সুবিধে।"

"না—কাল একটু সকাল সকাল তৈরি হতে চেষ্টা পাব। তুমি কোথা থেকে? গেঞ্জী গায়, গান্ধী ক্যাপ্।"

"আমার কথা কইবেন না, যাদের নিজের বলে কিছু নেই—তাদের আবার ড্রেস্। ফকির সাহেবকে ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিলুম। যদি কিছু হয়তো ওঁদের দ্বারাই। আরব ঘুরে এসেছেন। এ রকম প্রভাব দেখিনি মশাই, মুখের কথা খসালে—লাকো মাথা খসে যায়। বলেন, যে মাটির অন্ন খেয়েছি সেই আমার দেশ—হিন্দুস্থান আমার দেশ।—কি মহাপ্রাণ…"

"এমন লোক? আহা দর্শন মিললো না? কোথা গেলেন?"

"ওঁদের কি কিছু ঠিক্ আছে—যেখানে প্রাণ চায়। কারুর অধীন নন।"

"তা আমি জানি ভাই। ফকিরদের মধ্যে ভালো সব যোগীপুরুষ আছেন। গোঁসাই মশাই তাঁদের কথা প্রায়ই বলতেন।—তুমি বাড়ী যাবে তো উঠে পড়ো, এখানে দাঁড়িয়ে আর ফল কি—ট্রেণ তো আর নেই। বাবা ফিরেচেন?"

উঠতে উঠতে বললে—"সে তো বলেই ছিলুম, আমার কাছে স্পষ্ট কথা মশাই slave mentalityই ওঁকে খেয়েছে। পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায়…"

"থাক্—ও-কথা ভাই। সংসারী লোক, কতগুলির ভাবনা ভাবতে হয়। ও বয়সে আমাদের কি আর তোমাদের মত মনের জোর থাকে?"

হাসি টেনে বললে—"আপনার মত হতে পারলে তো মশাই ভাগ্য বলে মনে করি। আগে কি আমি জানি,—একটি ষড়াননের (revolver) জন্যে ফকির সায়েবকে ধরবার আমার কি দরকার ছিল। প্রমিস্ করে গেলেন কিন্তু ও জিনিষের এখন—অধিকন্তু ন দোষায়। আপনি আমকে 'না' বলবেন না তা জানি। এ backward জায়গাকে একটু forward করে দিয়ে যান। আপনাদের এখন তো টুরিং আর ইনস্পেকসন্,—এ ছাড়া আর কাজ কি? আমার কাছে পষ্ট কথা মশাই। চলুন, বেশ হ'য়েছে—আপনার এখুনি বাড়ী ফেরবার তো কথা নয়। চলুন, মুকুন্দ বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবেন—দেখবেন—আপনার কাছে তাঁর প্রাণের কথা নাড়ী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। বেশ আনন্দে কাটবে। আমরা ছেলে-ছোকরা, তাই আসল কথা বার করেন না, —চাষ বাস করতে বলেন। কিসের চাষ, কি চষতে বলেন, তা কি আর বুঝি না, কিন্তু ভাঙেন না। আমি বুঝিয়ে থাকবোখন। কি বলেন—"

"না ভাই—এখন নয়—আমার মাথাটা ধরেছে—বাসাতেই যাই।"

"এখন বেশ নিরিবিলি ছিল কিন্তু। তা যখন বলেন —আসি। আমি তবে এইখানেই নাবি। তাঁর কথা

শুনতে হবে, বাই।" আমি মাত্র 'বেশ' বলেই সারলুম। রণগোপাল নেবে গেল। একটা দোকানে ঢুকলো—তার পরই এদিক উদিক চেয়ে—চট্ করে দু-পা এগিয়ে একখানা বড় লম্বা আটচালায় ঢুকে পড়লো।

আমি ভাবতে লাগলুম,—ছেলে-ছোকরাও যে ছাড়েনা। বুড়োকে নিয়ে এ অভিনয় মন্দ নয়। কিন্তু ধকোল সামলাবার বা এই ছেলেদের বুদ্ধির কসরত উপভোগ করবার বয়স যে নেই! তাই তো—রাতদিন এই মিথ্যার দাঁও প্যাঁচ, ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের অজ্ঞাতসারেই যে লোক মিথ্যার মূর্ত্ত বিগ্রহ দাঁড়িয়ে যায়, সেটা জাতির পক্ষেও যেমন লজ্জাকর, দেশের পক্ষেও যে তেমনি অনিষ্টকর। এতে গর্ব্বের বা বাহাদুরির কি আছে। এই ১৮।১৯ বচরের ছেলের এই কি পরিণতির পথ।

যাক্, অন্যের পথ নিয়ে আমার দুর্ভাবনা কেনো—এখন নিজের পথ খুঁজে পেলে যে বাঁচি।

আমি ফিরে আসতে স্বাতি খুব খুসী। আমিও একটু নিশ্চিন্তে শুতে পেয়ে ততোধিক। তার পর—এক যে ছিল রাজা বলতে বলতে কখন যে নাক বাজা সুরু হ'য়েছে এবং স্বাতি চটে উঠে গেছে তার কিছুই টের পাইনি। সন্ধ্যের আগে মুখ ভার করে চা দিতে এসে কেবল বললে—"ভারি গপ্পো বলেছ, আমি যদি আর কখনো শুনতে চাই। নাক্ দিয়ে মানুষ গপ্পো বলে বুঝি?"

২৫

কিষণগঞ্জে নাই বা গেলুম, কিই বা এমন দরকার। দায়ে পড়েই বলেছিলুম,—গাড়োয়ানকে এক টাকা দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত তো করেছি। মন বুঝলোনা—কথাটা যে মিথ্যে দাঁড়ায়। নাতীর ভরসায় গেলে পথে পথে ঘোরা আর "দি গ্রেট্ মৈথিলী-হোটেলে" চিঁড়ে দই খেয়ে বাঁশের মাচায় শুয়ে রাত কাটানো ছাড়া উপায় নেই; কারণ সেও ওই করে কাটায়। আবার ভাগ্যে যদি হোটেলে কোনো গাইয়ের আবির্ভাব হয়, তা হ'লে এক বাগেই অপঘাত! কি বুকের জোর! গান গায় যেন লাঠালাঠি করছে। বাঘ ভাল্লুকে তাড়া করলে প্রাণের ভয়েও অত চেঁচিয়ে কাকেও ডাকতে পারিনা।

—ওঃ তাও তো বটে,—হয়েছে। দু'কাজ হবে—আনন্দেই থাকবো। দাদার বৈবাহিক শান্তনু চক্রবর্ত্তী যে ওখানে নামী উকীল, বাড়ীঘর করেছেন। সে বচর পূর্ণিমা এসেছিলেন—পরিচয় হতে—কি লজ্জাই দিলেন, দু'কথা শোনালেন, অভিমানও করলেন। বললেন—"এই জন্যে সমান ঘরে কুটুম্বিতা করাই নিয়ম ছিল—বড় ঘর খোঁজা বিড়ম্বনা, সুখ হয়না। কে কার খোঁজ রাখে। লেখক হয়েছ—একখানা বয়েরও কি পিত্তেস রাখিনা! হলুমই বা গরীব—তাদেরও সাদ আহ্লাদ আছে ভাই। এতো নিকটে রয়েছি"—ইত্যাদি। বড় লজ্জা দিয়েছিলেন। তবে আর কি? কত খুশী হবেন।—

—"সিঁড়ির দোরে" বলে আমার নব-প্রকাশিত বইখানা সুটকেসে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চললুম। ঠাকুর বলতেন—আগে আস্তানা পাকড়ে নিশ্চিন্ত হ'তে হয়, তার পর দেব দর্শন, চাঞ্চল্য থাকবেনা। মহাপুরুষের কথা, খুবই ঠিক্। থাকবার জায়গা ঠিক্ থাকলে আবার ভাবনা কিসের। প্রথম সাক্ষাতেই আনন্দোচ্ছ্বাস, তার পরই জলখাবার চা, গল্প গুজুক লুচ্যাহার আর আরামে নিদ্রা। আর কি চাই। বেই বাড়ী যাচ্ছি—মশারি আবার কেনো, বেডিং খুলতেই দেবেন না,—উকীলের মুখ—সঙ্গে মিলে দশকথা শোনাবেন। ঝাড়া হাত-পা'ই ভালো। কিন্তু মুস্কিল—এক হপ্তার কম কোন মতেই ফিরতে দেবেননা...

—পথে সুবিধে ছিল, কিন্তু কোথাও চা খেলুমনা। সন্ধ্যের পরই পৌঁছুচ্ছি—মুখ হাত ধুয়ে বেই বাড়ীর তয়েরি সিঙাড়া, আলুর দমের সঙ্গে দু'কাপ্ টানা যাবে।

—শান্তনু বাবু নামী উকিল—সবাই চেনে। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করতেই সেলাম করে বললে "আপ সয়তানী বাবুকো ডেরাপর যায়েঙ্গে—আইয়ে বাবু।" উঠে প্যাঁট্ হয়ে বসে রুমালখানা বার করে জুতোটা ঝেড়ে মুখটাও মুছে ফেললুম। আর কি—এসে গেছি। ভারি মজা হবে a surprise—মুখে প্রফুল্ল হাসি লেগেই রইলো।

গাড়ি থামলো—'আ গিয়া বাবু'। রাস্তার উপরই ধপধপে একখানি বাড়ী, সামনেই বাগান। একটি ছোট ঘরে আলো জলছে—বেশ উজ্জ্বল। চেয়ার টেবিল,

বেঞ্চ। চেয়ারে শান্তহু বাবু স্বয়ং, বেঞ্চে তিন চারটি মক্কেল বলেই মনে হয়।

—বাঁ দিকের ঘরটি বড়—কিন্তু আলোয় ছোট। মধ্যে একটু দালান বা অন্দরে যাবার পথ।

গাড়ি থামতে কেউ চেয়েও দেখলেনা, চাকরও ছুটে এলোনা। তারা আমার কল্পনাতেই অসম্ভব ছুটোছুটি করেছিল—বোধ হয় হাঁপিয়ে পড়েছে। ভাগ্যে স্যুটকেসটি ছোট ছিল! গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে, নিজেই সেটা হাতে করে নেবে পড়লুম।

এইবার চম্‌কে দেব,—সোজা সেই ছোট ঘরটির দোরে উপস্থিত।

শান্তহু একটু মুখ তুলে দেখে—"কে? কি কাজ? —আচ্ছা ও-ঘরে বসগে—না হয় সকালে এসো, এখন আমি বড় ব্যস্ত, কিছু শুনতে পারবনা"...

এ হ'ল মক্কেল-মুণ্ডন তীর্থ, বেই বেতালা বলেন নি, রহস্যটা ঠিকই হ'য়েছে।

বড় ঘরের ছোট আলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে ঝাপসা দেখলুম। কেবল কাণে গেল—"তিব্বতের অগ্নিকোণটা Sea levelএর চেয়ে কত ফিট্ কত ইঞ্চি বেশী উঁচু।"

যার জঠরের অগ্নিকোণটা তখন জলছে—তার তিব্বতের অগ্নিকোণের খবরের জন্যে আদৌ আগ্রহ ছিলনা। তবু লক্ষ্য করে দেখলুম—একটি বচর চল্লিশের রোগা ফ্যাকাশে লোক, নিজের টাকে হাত বুলুচ্ছেন আর তার তলা থেকে এই-সব অনাবশ্যক আবর্জ্জনা বার করে একটি ১৩।১৪ বচরের ছেলের মাথায় চাপাচ্ছেন। বললেন "—under-line করো—পেন্সিলের দাগ দাও।" দরকারটা বুঝলুমনা, ও ছেলে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও তিব্বতের উচ্চতা কোনোদিন ওর দরকার হবেনা,—ধার্ম্মিক বা চোর হলেও—না। ছেলেদের মগজে এসব জঞ্জাল কেনো! ভারতের পাওনাই এই সব মহামূল্য রাবিশ্।

দূর করো আমি ভেবে মরি কেনো—ও উঁচুই থাক্। এখন এক কাপ চায়ের যে দরকার।

ঝাপসা কেটেছে,—স্যুটকেসটা রেখে ঘরটির চারদিক একবার চোখে দেখলুম'। পশ্চিমের তাল ঘেঁশে এক-খানি খাটিয়ার ওপর কম্বলে মোটা বিছানা, পাশেই দেয়ালের গায়ে মশারিটে ডানা মেলে ঝুলছে। সকল দেয়ালেই দেনো এলম্যানাক্, মৃত্যুর, দুঃখের, মাখনের;— ৩৭ বচর পূর্ব্বের হলেও—ভিটামিনের চৌহদ্দি। কোনটায় জুলাই, কোনটায় অক্টোবর! বুঝলুম ঘরটি আগন্তুক আমলা মুক্কেল, আর অনাহুতদের জন্যে, আর রাত্রে চাকরদের 'ডাক্ঘর' বা নাক ডাকাবার ঘর।

কেমন একটা অস্বস্তি এসে গেলো। একটি ভদ্রবেশী যৌবন-উত্তীর্ণ ক্লান্ত লোক, পূর্ব্বোক্ত খাটিয়াখানির বাঁশের ফ্রেমে মাথা রেখে বসে বসেই, ঘুমিয়ে পড়েছেন।

একটি চাকর, ঘরে ঢুক্তেই বললুম—"ওহে চায়ের সুবিধে আছে কি?" সে উত্তর না দিয়ে সামনের দেলে আঙুল বাড়ালে মাত্র, এবং সেই তিব্বতের অগ্নিকোণের উচ্চতা-অভিজ্ঞ মাষ্টারটিকে লক্ষ্য করে বললে—বাবু অন্দর গেয়ে, আপ খানে যাইয়ে।

পূর্ব্বে নজর পড়েনি; সত্যিই তো—এখনো কার্ড ঝুলছে। এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে পেছিয়েই দিলে। ইংরিজি হরপে লেখা,—Tea Over অর্থাৎ চায়ের দফা খতম! প্রাণে বরফের আঁখর টানে যে,—ভদ্রলোকের মুখ বন্ধ! উদিকে আবার—বাবু অন্দর গিয়া! ডোবালে যে! চিনতে পারলেন না নাকি? উপায়? বুদ্ধি-শুদ্ধি ঘুলিয়ে গেলো!

যিনি খাটিয়ায় ঠেশ দিয়েছিলেন—তিনি থর্ থর্ থর্ করে হাস্য-মুখর কণ্ঠে বললেন—বসে পড়ুন—না হয় ডাল ধরুন—

আমি চম্‌কে বসেই পড়লুম। লোকটি যে চিৎপাৎ হয়ে চেয়েছিলেন, ঘুমোন নি, কাগজের পটিমারা চিমনির আলোয় তা বুঝতে পারিনি।

বললেন—"আমাকে শুইয়ে ফেলেছে মশাই। ওই বোর্ডখানি আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, ইউনিয়ান-বোর্ডের রাজ-সংস্করণ। তাঁরা রাস্তা-ঘাটে মারেন, ইনি বাড়ীতে; তা আপনি কি করে এখানে! পূর্ণিমায় না?"

গলাটা খুব পরিচিতই পাচ্ছিলুম, আর সন্দেহ রইল না—বাসব নাকি?

The same [সেই বটে]। মুখেই নমস্কার জানাচ্ছি —বলে দুহাতে ঘাড়টা চুলকুতে চুলকুতে উঠে এলেন। আধপোটাক্ শুষেছে মশাই। খাটিয়ায় ব্লড্-হাউণ্ডের বাচ্চা পুষেছেন দেখচি। এ খাটে কোন্ জাট্ শোন্?

চাকরটা বললে—এই পণ্ডিতজি মহারাজ—

ওঃ তাই অমন—বলেই থেমে গেলেন।

বললুম, "চুলগুলো আছে তো? ওঁর তো দেখছি···

বাসব সত্যিই সৌখিন বাবু, চুলের মোহ যথেষ্টই আছে।—বলচি, আগে,—উঃ—বলেই, ক্রকোডাইল-লেদার ব্যাগটা খুলে, আয়োডিন-পেষ্ট্ বার করে ঘাড়ে ঘষতে লাগলেন।

তাঁকে পেয়ে আমার অকূলে পড়ার ভাবটা সমূলে সরে গেল। বিপদে প্রিয়জনের সাক্ষাৎ মশানে মা কালীর অভয় হস্তের মত দুর্লভ প্রাপ্তি। দুজনে থাকলে যমের বাড়ীর পথেও জয়জয়ন্তী বেরয়। তাই না দ্বৈতবাদকে এত ভালবাসি। যাক্—একটা উপায় হবেই।

বাসবের তখনো মালিস চলছে, উনি অসম্ভব সাবধানীদের একজন। বললেন—সকালে কালজ্বরের ইন্‌জেক্‌সন্ নিতেই হবে।—এখন কটা? রিষ্টওয়াচ দেখলেন—সাড়ে নয়—২৪ ঘণ্টার মধ্যে নেওয়াই চাই। ভয়ঙ্কর ফ্যাসাটিডিয়স্—খুঁৎখুঁতে।

"—এমন কি হয়েছে,—দেখি।" হাত বুলিয়ে বললুম—"ছারপোকার কামড় কে বললে,—এ যে আমবাত।"

"বলবে আবার কে মশাই! আমার অন্তরাত্মা বলছে! উঠে পড়ুন—"বলেই ব্যাগ্ হাতে করে উঠে পড়লেন। যে ছেলেটি পড়ছিল তাকে বললেন,—"ওহে ভাই—দ্রাবিড়বাবুকে বোলো—সকালে ডাক-বাংলায় দেখা করতে—আমার অবস্থা ভাল নয়—আমি উঠলুম।"

"দ্রাবিড় আবার কে?"

"শান্তনুবাবুর বড় ছেলে—কনষ্ট্রাক্‌সনের কনট্রাক্টার। তিনি Life Insure করবেন বলেই এসেছিলুম। আগে নিজের লাইফ্ বাঁচাই গে চলুন···"

নামটি যে—

"হ্যাঁ—ওর হিস্ট্রি আছে। বাট্ বচরে শান্তনুই বা কটা শুনেছেন, ও সব মহাভারতের মাল,"—এই বলে কটকের horn-stick নিচ্ছেন দেখে বললুম,—"আমি যে মুস্কিলে পড়লুম। দেখা না হলেও বা—"

"আপনি সেই আশা করচেন নাকি? আসুন,—আসুন, খেতেও হবে—শুতেও হবে, তা জানেন। আহার Overএর বোর্ড এইবার ভালে চড়বে,—আর শুতে হলে—ঐ মৃত্যুশয্যায়। চলে আসুন—কাজ থাকে কাল দেখা করবেন।"

"তাই তো—বড় অভদ্রতা হবে যে। ভাইঝিটি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে এসেছি,—সে আশা করচে, অপেক্ষাও করচে নিশ্চয়ই। কি মনে করবে···"

বাসব বললেন—"আপনার মিছে ভাবনা সৃষ্টি করা রোগ আছে—সেটা জানি। এ উকীল-বাড়ী—এখানে সে ভাবনার কারণ নেই। কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না,—করে তো বলবেন,—আমি টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমি আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি না—ভারী কষ্টে পড়বেন।"

অগত্যা লজ্জা আর অস্বস্তি নিয়ে বেরলুম। বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আমার সুটকেস্‌টা বাসবই নিয়ে চল্লেন। বাসবের বয়স প্রায় চল্লিশ হবে। এই সব সহৃদয় প্রীতি-ভাজনদের দয়াতেই বেঁচে আছি। কিন্তু শান্তনুবাবু কি মনে করবেন? অপরাধীর মতই চল্লুম;—আমাদের কথাও চললো।

বাসব বললেন—"হঠাৎ এখানে যে বড়? ক্রমে দেখচি কাশী ছাড়লেন, সেই সঙ্গে আমাদেরও। দু'দণ্ড আনন্দে কাটতো, তা হতেও বঞ্চিত করলেন। কেনো বলুন দিকি?"

কাশীতে মহাপুরুষ মেলা থেকে চক্রধর-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সংক্ষেপে সমাপ্ত করলুম। শুনেছি ভূতে পেলে সেকালে গঙ্গাময়রা ঝাড়্‌তো, কিন্তু ভুঁইফোঁড় ভক্ত আর শুভানুধ্যায়ীতে পেলে—লোক কার শরণ নেয় জানো? শেষ জীবনটা লোক শান্তি খোঁজে, এখন যাই কোথা? 'নন্দকুমার'খানাও গেলো···সে সব নোটিস্···

বাসব—হো হো করে হেসে উঠলেন—"আপনার মত লোককেও—অ্যাঁ, আপনার ওপর···তা আর আশ্চর্য্য কি। শনি নারায়ণকেও পাথর কাটিয়েছিলেন। জগতে সকলকে তুষ্ট করতে যাওয়ার চেয়ে ভুল নেই,—কেবল অশান্তি বাড়ানো, আপনার হয়েচেও তাই।"

"হ্যাঁ—গো, এই দেখনা, সেবার পরিচয় হবার পর শান্তনু বাবু কি লজ্জাই দিলেন, অভিমানও করলেন, বললেন—"এই কাছে রয়েছেন, আমরা না হয় কেউ নই,

একবার ভাইঝিকেও তো দেখতে আসতে হয় ইত্যাদি।' ওঁর বড় ছেলের সঙ্গে আমার ভাইঝির বিবাহ হ'য়েছে কিনা—"

"দ্রাবিড়ের সঙ্গে ?"

"দ্রাবিড় কি কর্ণাট তাও জানিনা, আমি তখন চীনে। তাই না ওঁর ওখানেই এসে পড়লুম। এখন কাজটা কিন্তু …মনটাও ·"

"ভাববেন না—কাজটা খুব ভাল হয়েছে। অজানা জায়গায় রাস্তায় কাটাতে হো'ত—অনাহারে, তার ওপর সরকারী আশ্রয় তো ছিলই। Out-post নিকটেই। এখানে আমার দুতিনবার আসা হয়েছে। একবার ভুগেই ডাক-বাংলা পাকড়েছি। এখন বলেন—সে কি, আমি রয়েছি—আমি থাকতে উকি কথা। এটা কি ভালো দেখায়, আমাকে বড়ো লজ্জা দেওয়া হয়—না, তা হবেনা। চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি—এখুনি সব নিয়ে আসুক, ইত্যাদি। ভগবানের কৃপায়, চাকর কোনোদিন আসেনি। কলকেত্তাকে হারিয়ে দিয়েছেন—'না' বলতে জানেন-না। যাক্ সে কথা,—রসুন্—" বলেই রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লেন। যেন হঠাৎ কি মনে প'ড় গেছে।

"কি হ'ল ? দাঁড়ালেন যে ? অনেকক্ষণ বওয়া হয়েছে, এই বার দিন আমি একটু বই—এই বলে সুটকেস্‌টা নিতে হাত বাড়ালুম।" দুপা পেছিয়ে বললেন—"না না, ওর জন্যে নয়, ও আর কতই বা, বড় জোর সের পাঁচ ছয় হবে।—হ্যাঁ ষ্টেশনে আপনার দেরী হ'য়েছিল কি ?"

"কেনো ? হ্যাঁ—মিনিট পনেরো তো বটেই"

"ও তাই। আসছেন বলে খবর দিয়েছিলেন বুঝি ?"

"না,—সেইটিই ভুল ক'রেছি,—না ?"

চিন্তিত ভাবে বললেন—"তবে কি করে…"

"হ্যাঁ তাই তো, এক বচর পরে আমাকে চিনবেন কি করে, চেনাও কঠিন"।

চলতে চলতে বললেন—"না না—তা নয় ! আপনার আসবার মিনিট কয়েক আগে একটি মুসলমান যুবক আপনার নাম করেই শাস্তজু বাবুর কাছে খোঁজ নিচ্ছেলেন—এসেছেন কি ? আপনার কে হন ? শাস্তজু বাবু বললেন—আমার আবার কে হবে, মক্কেল যদি হয়। তিনি হেসে বললেন—মক্কেল তো আমার গো। তাঁর কোনো কষ্ট না হয় তাই—বলতে বলতে দু'জনে বাগানটার দিকে গেলেন। দেখলুম তাঁর খাতির খুব।

পণ্ডিতজিও 'সেলাম উজির সায়েব' বললেন।—আপনার চেনা বুঝি ? তাঁর সঙ্গে একটি বৃদ্ধলোকও ছিলেন—সাধুফকির বলেই মনে হয়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে—চক্রধর বলেছিল বটে—উজির সায়েবের সঙ্গে দেখা হলে কোনো অসুবিধে হবেনা। সেই খবর দিয়ে থাকবে। যাক্—মানুষের মন কি পাজি জিনিষ, চক্রধরকে সন্দেহ করে কত বড় অপরাধ করেছি—ছিঃ—"

ডাক্‌বাংলায় পৌছে গেলুম। বাসবের ঘব সামনেই ছিল, ঢুকতে ঢুকতেই দুকাপ চায় অর্ডার দিলেন। বিস্কুটের বাক্স তাঁর সঙ্গেই ছিল।

বেওয়ারিস ঘুরে ঘুরে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলুম। ইজি চেয়ারে গা ঢেলে বাঁচলুম। চায়েব Orderএই অর্দ্ধেক প্রাণ পেয়েছিলুম। বাসব ধড়াচুড়ো ছাড়তে ছাড়তেই—চা হাজির।

One Minute [এক মিনিট] বলেই, ব্যাগ খুলে শিশি বার করে একটা বটিকা আমার হাতে দিলেন, আর দুটো নিজের মুখে।—"চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিন, ভয় নেই 'মহালক্ষ্মীবিলাস বটিকা'—পাঁচ মিনিটে চাঙ্গা করে দেবে।"

তথাস্তু। তার পর চা,—কেটলিতে যতক্ষণ এক ফোঁটাও রইলো।

"বেডিং সঙ্গে নেই বুঝি ?"

"কুটুম বাড়ী—সেটা যে কেমন দেখায়।"

"তা বটে—এই খুঁজতে আসে আপনাকে"—বলে হাসলেন।

আমি বিচলিত হয়ে বললুম,—"খুব সম্ভব,—তা হলে কি করবো··"

"কিছু ক'রতে হবেনা, আজ এক বিছানায় দু'জনের শয়ন—লেখা আছে।"

বসে নানা কথা। জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন কি লিখচেন ?"

"চাই-বাসা।"

"সে আবার কি, আপনার নাম-করণগুলো অদ্ভুত। চাইবাসা তো একটা জায়গার নাম…"

"কেনো,—এটা তো খুব সোজা,—চায়েদের বাসা।"

হো হো করে হাসলে।

কালীর কথা চলবো।

বাইরে খুট্ খট্ শব্দে আমাকে সচকিত করে দেয়।—

শান্তহু বাবুর লোক, নিতে এলো বুঝি! ছিঃ চলে' এসে কাজটা…

টেবিলের ওপর খাবার এসে গেল।—লুচি, পাঁপর ভাজা, পটল ভাজা, মাংস, দধি, চিনি।

বাসবের পাঁপর আর দধি নিত্য চাই, বাড়ীতেও দেখেছি। বলেন দধির চেয়ে উপকারী আহার্য্য আজো আবিষ্কৃত হয়নি,—বস্, আর, মেথার বীজ ওর মধ্যে বিজ্ বিজ্ করচে। বুলগেরিয়ানরা ওই খেয়ে সবাই শতায়ু, তেমনি বলিষ্ঠ। তবে তারা ঘোড়ার দুধের দই খায়,—এ হতভাগ্য দেশে সেইটার অভাব। শুধু তার ডিম খেয়ে আর কত হবে,—তা না হলে আজ ইত্যাদি—

ঠাকুরকে দেখিয়ে বললুম—এ লোকটি?

পূর্ব্বনিবাস বোধ হয়—বেলুচিস্থান, অধুনা ব্রাহ্মণ, টোলেপড়া—জ্যোতিবার্ণব, তাই সঙ্গে নিয়ে বেরুই। খুব কাজের লোক এবং expert. (ক্রমশঃ)

অস্পৃশ্যের আবেদন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ধন্য হয়েছি মোরা তোমাদের
চরণের রেণু চুমি,
উচ্চেই থাক, আমারে উঠাতে
নামিয়া এসো না তুমি।

তুমি থাক নিতি সুদূর উচ্চে
মহামহিমায় ঘেরা,
মোরা উঠি সেথা ভক্তির পথে
ভাঙিয়া জাতির বেড়া।

আমাদেরও আছে আপনার জন
দেবতার কাছাকাছি,
এ কথা স্মরিয়া বুকে বল পাই
এ আশা নিয়েই বাঁচি।

মোরা রহি পড়ে কালিমার ঢাকা
তাও সহা যায় প্রাণে,
তোমরা মলিন মাটিতে এসো না,
তাহে বুকে শেল হানে।

তোমরা শিখর, আমরা সোপান,
এক হৃদি, এক জাতি;
একই সনাতন ধর্ম্মের মোরা
বিরাট সৌধ গাঁথি।

তোমাদের মত সব সদাচারে
হ'ক আমাদের দাবী,
পংক্তি-ভোজনে কি মান বাড়িবে,
মোরা সেই কথা ভাবি?

পরশের মোরা নহি ত কাঙাল
শ্রীরাম দে'ছেন কোল,
শ্রীগৌরাঙ্গ বুকে জড়াইয়া
বলেছেন 'হরিবোল'।

মোরা নিতি করি জ্ঞানে অজ্ঞানে
কত শত হীন কাজ,
নিজে পবিত্র থাকিতে পারি নে
আপনিই পাই লাজ;

সম্ভ্রমে মোরা নিজে সরে যাই
তাহে কে বা দোষ পেলে,
স্নাত জনকেরে পরশ করে না
ধূলাকাদা-মাখা ছেলে।

ভক্তি যখনই অভিষেক করে
আমাদের দেহ মন,
তখনি তোমরা ছাড়িয়া দিয়াছ
বুকের সিংহাসন।

কত 'সূত' পেলে গুরুর আসন
জাতিভেদ করি নাশ,
অর্ঘ্য লভিল গোটা সমাজের
কত শত 'রুহিদাস'।

সমাজ আমার নামিয়া আসিবে
নিম্ন আমার স্তরে,
ভাবিতেও আমি লজ্জায় মরি,
পরাণ কেমন করে।

আমারে উঠাতে যে শক্তি চাই
চাই যেই মহাপণ.
আমাদের মাঝে হ'ক উদ্ভব
সেই নর-নারায়ণ।

তুমি সোণা থাকো, আমি যে লৌহ
ছুঁয়ে কোনো ফল নাই,
পরশ-মাণিক চিন্তামণির
মোরা পরশন চাই।

গগনের বুকে তারকা থাকুক,
পৃথিবীতে থাক্ ফুল,
উল্কার মত ছুটিয়া এসো না,
করিয়ো না মহাভুল।

অতি-বোগাস্

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

(৩)

তিন দিন পরে পরেশের আবার সাক্ষাৎ পেলাম —ঢাকুড়ের লেকের ধারে। সে কপালে হাত দিয়ে সরোবরে জলের লহর দেখ্‌ছিল। বুঝলাম, আপাততঃ সে প্রকৃতি-চাওয়া ভাবুক। বোধ হয় কাব্য লিখবে।

আমি বল্লাম—"কি হে? একটা সিগারেট খাও।"

"না।"

"গল্প রচনা কি হ'ল?"

"বোগাস্।"

এই হ'ল সে আসল মানুষ। একেবারে নিস্পৃহ অনাসক্ত। সোমবারে যদি সে হয় কবি, মঙ্গলবারে সে জিউ-জিৎসুর শিক্ষানবীশ। ১০টার সময় সে যদি হয় ভীষণ সিগারেট-সেবী, এগারটার সময় সে ধুমপান-নিবারিণী সভার সভ্য।

এবার সে নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্‌লে; বল্লে—"মুরারী-বাবুর কাছে বড় বোগাস্ প্রতিপন্ন হওয়া গেছে।"

"কেন?"

"সেদিন তিনি কল্পকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন আমাদের বাসায়। এখন দেখছি আমাদের সংবাদগুলা সব ভুল হ'য়ে গেছে। টকাটক্ বলেছি, ভেবেছিলাম অত কথা কি আর তিনি মনে করে রাখতে পার্বেন। কিন্তু—এখন দেখ্‌ছি গোত্রটা কি রকম করে মিলে গেছে, বাকী সব

ভুল। এ-দেশে মৌলিকতার আদর নাই। প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব অভিসম্পাত।"

"সর্ব্বনাশ!"

সে বল্লে—"আর তুমিও মহা বোগাস্। কি ব'লে বল্লে যে ফুল্ল লম্বা?"

"আরে আমি কি ছাই তোমার বোনকে আজ অবধি দেখেছি। কি সব গ্লাস্‌গো ফ্লাস্‌গো বল্লে, আমি ভাবলাম একটু উঁচু মেয়ে হ'লে তবে তাদের পছন্দ হবে। আর উঁচু নীচু কি জান—রেলেটিভ্ কথা।"

"বাবা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। বলেন বি-এস্‌সি পাশ ক'রে আমি নাকি একটা হনুমান হয়েছি।"

"গুরুজন! নমস্কার! কিন্তু এ সত্য আবিষ্কার কর্ত্তে তাঁর এত কেন বিলম্ব হ'ল তা বুঝ্‌তে পারলাম না। স্নেহ অন্ধ!"

আমি বল্লাম—"ভাগ্যিস্ বল্‌লে। আমি আজই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে যাব ভাবছিলাম।"

"না, তোমার কোন ভয় নাই।"

"ভরসাই বা হয় কেমন ক'রে? আর কিছু না। আমাদের নির্ব্বোধ ওপর-চালাকীতে তোমার ভগিনীর বিবাহ-সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল, এটা বড় মনে লাগে।"

এবার তার চক্ষের সেই অলস ভাবটা কেটে গেল; অবসাদ তিরোহিত হ'ল।

সে বল্লে—"ব্রাদার, ঐটে ভুল। বিয়েটা এক রকম পাকাপাকি হয়ে গেছে ঐ ভুলের জন্যে।"

"বল কি?"—আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম। একটি ভদ্রলোকের মেয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—থতমত খেয়ে একটু সরে গেলেন। অপাঙ্গে আমাদের যুগলমূর্ত্তি দেখলেন; কি ভাবলেন সবিশেষ অন্তর্যামী জানেন বটে—তবে আমরাও তাঁর মনোভাব অনুমান কর্ত্তে অক্ষম হ'লাম না।

পরেশ বল্লে—"ঐতো মজা! পৃথিবীটা খাপছাড়া লোকে পূর্ণ। আমাদের বোকামী মুরারীবাবুর বড় ভাল লেগেছে। বোধ হয় বিশ্বাস—ফুল্লও ঐ রকম হবে—তাহলে ছেলেকে কু-বুদ্ধি দিয়ে পৃথক কর্ত্তে পার্ব্বে না। বিবাহ একরকম ঠিক্! গ্লাসগো একবার ভগিনীকে দেখবে মাত্র।"

ব্যাঙের ছাতা থেকে হেলির ধূমকেতুর ভ্রমণ-মার্গ অবধি অনেক বোগাস্ ব্যাপার জানবার চেষ্টা করেছে মানুষ; এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে অনেক রহস্যও ভেদ করেছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আজ অবধি কেহ কার্য্য-কারণের সম্বন্ধের আইন বার কর্ত্তে পারেনি আমাদের মন-যন্ত্রের। পরেশের সঙ্গে যার শোণিত-সম্পর্ক আছে এমন নর-নারীর বাসস্থান তো বয়কট করা উচিত, প্রজাপতির যদি তার চক্‌চকে রঙীন ডানার অন্তরালে বিবেক-বুদ্ধি থাকে। কিন্তু ঠিক ঐ সম্পর্ক হয়েছিল বালিকা ফুল্লরাণীর পক্ষে, দুশো চোদ্দটি বালিকার মধ্যে, বিবাহোপযোগী বিশেষ গুণ।

আমি বল্লাম—"তবে এত বিমর্ষ কেন? পিতা তো তোমাকে অধিক স্নেহ করবেন এখন, যেহেতু তোমার পাগলামি—অর্থাৎ—"

সে আমাকে অপাঙ্গে দেখে চলে গেল। ডাকলাম ফিরলো না। সবুজ তৃণের মাঝে সগৌরবে পড়েছিল একখানি লাল পুস্তক—"শত-কর্ম্ম।"

শত-কর্ম্মের রহস্য বুঝলাম, যখন চারদিন পরে সে এসে আমার ক্ষমা-ভিক্ষা করলে। পিতার ভৎ'সনায় সে নিজেকে অপদার্থ ভেবে এখন স্বাধীন হবার জন্য বিশেষ চিন্তাকুল হ'য়েছিল।

"আর কথাটাও সত্য। কি জান ভাই, ভবে এসে—"

"অ্যাঁ—" ভবে এসে শুনে বিস্ময়ে, আনন্দে, ভয়ে নির্ভয়ে এমন একটা চিৎকার করে উঠ্‌লাম যে, আমার চাকর বুধুয়া শশব্যস্ত হয়ে ঘরে হাজির হ'ল। তাকে সিগারেট আন্‌তে বলে—দুই বন্ধুতে খুব হাসলাম। শেষে ভবে আসার ফিলজফি সে ব্যাখ্যা করলে। ভগবান সকল পাপ ক্ষমা করেন কিন্তু "ভবে এসে" লোকে যদি অলস হয়—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি কর্ম্ম তার দ্বারা সম্ভব, তা নির্ণয় কর্ব্বার জন্য পরেশ টেলিফোনের ডিরেক্‌টারির প্রথম অধ্যায়ে ক্লাশিফায়েড্ লিষ্ট দেখে একটা ব্যবসা অনুসন্ধান কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের কোনোটাই তার মনে লাগেনি। শেষে "শত-কর্ম্ম" কিনে সে "বাঁশ বনে ডোম কানা" হ'য়ে ঢাকুড়ে সরসীর লীলায়িত তরঙ্গ-হিল্লোলে পড়ন্ত রৌদ্র-কিরণের সন্তরণ-রেখা পর্য্যবেক্ষণ কচ্ছিল।

আমি বল্লাম—"ব্যবসার অভাব কি? বাঙ্গালী চিরদিন চণ্ডীদাসের ভক্ত। তাই এখন ভদ্র-সন্তানেরা সেই প্রাচীন কবির শ্বশুর-কুলের ব্যবসাটা আরম্ভ করেছে। তুমিও একটা ডাইং ক্লিনিঙের ভাটী খুলে দাও।"

"বোগাস্।"

মাথার তেল—না। গোঁপ পাকাবার মলম—হবে না। চুম্বন-স্থির ঠোঁটের আলতা, জুতার ফিতা, জওহারলাল আমসত্ব, সুবাস আমলকীর চাটনী প্রভৃতি নানাপ্রকার বাণিজ্য-কথা আলোচনা করা গেল, কিন্তু কোনোটিই তার মনঃপূত হ'ল না। গান্ধী-জপ-মালা লিমিটেড্ মারফত হরিনামের মালা সরবরাহ করবার প্রস্তাব প্রায় তার চিত্তহরণ করেছিল, কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল যে তাতে লাভ হবে না। ইত্যবসরে আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হল। পূর্ব্বদিনের গোটা দুই আপেল ছিল। তাদের গায়ে ইঁদুরের দাঁতের দাগ।

পরেশ আমার কাঁধে খুব জোরে এক থাবড়া মেরে বল্লে—"হয়েছে। প্রেরণা এসেছে। বার কর্ত্তে হ'বে ইঁদুর মারা ঔষধ।"

শেষে ঠিক্ হ'ল মুষিক-মুষল লিমিটেড্ খুলে সে ইঁদুর-মারা বিষে দেশ ছাইয়ে ফেলবে। ইঁদুর সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অভিমুখে গমন কর্ল্লে। সে যেন শরতের মেঘ—ক্ষণিক বর্ষণের পর গলে গেল।

(৪)

এবার যেদিন সে এলো, সেদিন আর পরেশের মুখে মুষিক-মুষল লিমিটেডের কথা নাই। মিলন-নিশিতেই তার মানস-পুত্রদের বিচ্ছেদ-নিশি আস্ত। তার প্রথম প্রশ্নে মনে হ'ল আপাততঃ মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় সে ব্যাপৃত। হতেও পারে, সে মনে মনে মতলব আঁটছিল আমার একখানা জীবন-চরিত লিখ্‌বে।

"তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ?"—গুরুগম্ভীর আকস্মিক প্রশ্ন—নূতন টায়ার ফাটার যেমন শব্দ।

"ও পদার্থে আর কেমন ক'রে পড়ব? ছেলে বেলায় বাবা টিকে দিয়েছেন। প্রেম-বসন্ত কায়দা কর্ত্তে পারেনি।"

"অর্থাৎ।"—সেই গুরুগম্ভীর স্বর! এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি—মাথার চুল এলোমেলো।

"অর্থাৎ ছেলেবেলায় বিবাহ হয়েছে, তারপর বরষার ধারার মত ঝরছে ভাগ্যাকাশ থেকে নিরাশা—টুপ্, টুপ্ টুপ্।"

"হুঁ!"

তার পরেই নীরবতা। নিস্তব্ধতা পীড়াদায়ক হ'ল। বল্লাম—"পরেশ, তোমার বন্ধুপ্রীতি নাই? প্রাণে করুণা নাই? মনে রস নাই? রসনায় বাক্য নাই? বাক্য যে ব্রহ্ম।"

সুবিধা হ'ল না। তুষ্ণীম্ভূত। জমাটী নিস্তব্ধতা!

"ছিঃ পরেশ। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। তুমি যদি হও কৃষ্ণ, আমি তোমার শ্রীদাম। তুমি যদি হও জগাই, আমি তোমার মাধাই"—

"উঃ!" একটা দীর্ঘশ্বাস! তবু ভাল। বরফ গল্‌ছে। এইবার বান ডাকবে। মনে মনে ভেঁজে নিলাম—"নারদ-কীর্ত্তন-পুলকিত মাধব।"

আমি বল্লাম—"তুমি পরেশ গাঙ্গুলী, আর আমি প্রকাশ গুপ্ত—তুমিও সংক্ষেপে পি, জি, আমিও তাই।"

"তা' বটে।"

"তবে? আমার হৃদয়ের কবাট মুক্ত। তুমি ঢুকে পড়। এ লাল ইণ্ডিয়ানের উইগ্‌ওয়াম, বেদুইনের তাঁবু, ঋত্বিকের আশ্রম—শান্তির বয়া, বীরযোদ্ধার ট্রেঞ্চ—বন্ধুর হৃদয়।"

"কি আর বল্‌ব। আমি মরেছি।"

ইঃ আল্লা! বম্ ভোলানাথ!

"আমার প্রাণের ভাই পরেশ। তবে কি শমরু-ফাংচো কোম্পানীর দশা তোমার হয়েছে? ফণী সেনের মত অধ্যবসায় দেখাও। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! লাগে!"

"দেখ ভাই প্রকাশ! তুমি আর আমি অভিন্ন-হৃদয়।"

"আহা! নিতাই-গৌর। হরি-হর। জন ও যীশু!"

"তোমার কিছু অজানা নাই। জগতকে ভাবতাম বোগাস্। তখন কি জানতাম সৃষ্টি এত মধুর। গয়ে ছেঁদো কথা লিখেছিলাম—সুন্দরের উপর। কিন্তু এখন দেখছি—জ্যোৎস্না আহাঃ।"

আহাঃ! আমি পাখাটা তুপ্যাঁচ বাড়িয়ে দিলাম। আবেগ-নির্ঝরিণী তেমনি কুলু কুলু স্বরে বইতে লাগলো!

উৎসাহ দিয়ে বল্লাম—"সত্য কথা! উষার লাল আলো যেমন নিজেকে ছড়িয়ে দেয়—জলে, স্থলে, ফলে ফুলে—সে নিজের মৃদু আলিঙ্গনে যেমন সবাইকে রাঙিয়ে তোলে—প্রেমও তেমনি। সে স্ব-প্রকাশ—সে—সে—"

"তা তো হ'ল, কিন্তু সে নিষ্ঠুর। সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু যার জন্যে তার সৃষ্টি তাকে তো এনে দেয় না হাতের মাঝে। সে অনুভূতি। কিন্তু যার জন্য প্রাণ-জ্বালানো অনুভূতি, সে তো কই মুঠোর ভেতর আসে না।"

যখনই কোনো হেঁয়ালী বোঝবার আবশ্যক হয় আমি বস্তুতন্ত্রের সাহায্যে তাকে বুঝে ফেলি। মাঝে মাঝে বীজ-গণিতের সংখ্যা দিয়েও তাকে কায়দা করি। এ-ক্ষেত্রে মনে মনে ঠিক করলাম—প্রেম যদি হয় ক—যার জন্য সে জন্মায় অর্থাৎ তার পোষ্য বাবা—খ। ক যদি হয় অনুভূতি, তা হ'লে খ কি? উহুঁ! 'আচ্ছা 'ক' যদি হয় প্রাণ-জ্বালানো অনুভূতি—ধর কপাল-পোড়ানো ইচ্ছা—ধর তীব্র বাসনা—তাহ'লে কার পোষ্য-পুত্র সে? জলের মত বুঝলাম—টাকা।

"টাকা।"

সে অর্থহীন নেত্রে আমার দিকে চাহিল। বুঝলাম অঙ্কের উত্তরটা হয়েছে ভুল। আমার পক্ষে যদি হয়—টাকা, তার পক্ষে কি হবে? হ্যাঁ ঠিক্ কথা! ভালবাসার পাত্রী।

আমি বল্লাম—"কে সে ভালবাসার পাত্রী?"

"সে অনেক কথা।"

"ব'লে ফেল সংক্ষেপে। অল্পোক্তিই রসের জননী।"

জলদ-গম্ভীর স্বরে সে বল্লে—"মুরারিবাবুর কন্যা চাঁপার কলি।"

আমি হতভম্ব হলাম। এ আবার কি নূতন ব্যাধি। ঘণ্টাখানেক মেহনত করে, অনেক বড় বড় কথার টোপ ফেলে তবে তার নিকট হতে সত্য সংগ্রহ কর্ল্লাম। গ্লাস্‌গো বি-এসসি গিরিজা সম্মত হ'য়েছে পরেশের ভগিনী মনোরমাকে বিবাহ কর্ত্তে। পরেশ তাদের বাড়ি তু'দিন গিয়েছিল। শুনেছিল গিরিজার একটি ভগিনী আছে, কিন্তু সে বোগাস্ সংবাদে তার কোনো লাভালাভ ছিল না। কাল সন্ধ্যার সময় সে যখন গিরিজার সঙ্গে চা-পান কচ্ছিল হঠাৎ ঘরে এলো এক কিশোরী—কালো মেঘে যেমন বিজলী জ্বলে—নিরাশার মাঝে যেমন মক্কেল আসে। গিরিজা পরিচয় করে দিলে। চাঁপার কলি—কোনো কথা বল্লে না, নধর অধরে চাঁদের মত হেসে অপাঙ্গে তাকিয়ে দশটি চাঁপার কলির মত অঙ্গুলি একত্র ক'রে তাকে নমস্কার ক'রে চলে গেল। তার আঙ্গুল দেখেই বাপ-মা নাম দিয়েছিল চাঁপার কলি, কি তার বর্ণ দেখে, সে সমস্যা সারা রাত পরেশচন্দ্রকে নিদ্রাহীন রেখেছে।

বাল্যাবধি তাকে আমি জানি। তার মনের মান-চিত্র আমার নখদর্পণে ছিল। তার চিন্তার পথঘাটগুলা আমার সবিশেষ জানা ছিল। তার মনোরথ কোথায় গিয়ে মোড় ফিরবে আমি দিব্যচক্ষে তা দেখতে পাচ্ছিলাম। তার প্রেমের ঝোঁকটা মেরেকেটে আট-চল্লিশ ঘণ্টাকাল বিদ্যমান থাকবে,—ধাঁ ক'রে আমি সেই মান-চিত্রে দেখে নিলাম। এই সুবর্ণ ৪৮ ঘণ্টা অনেক আমোদ দেবে আমাদের তা বুঝলাম। সুতরাং যথাসম্ভব তার প্রণয়-বহ্নিতে ইন্ধন দিলাম। কি জানি প্রেম-স্ফুলিঙ্গ কখন নিভে ছাই হয়।

(৫)

না! লক্ষণটা যেন সপ্তাহ-জ্বরের। ডেঙ্গুর কাল উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল—উপশমের চিহ্ন নাই, বিরাম তো পরের কথা। এখন আর পরেশের কাছে কোনো পদার্থ বোগাস্ নয়। জীবনের যেন একটা অর্থ আছে—সৃষ্টির মূলে যেন স্পষ্ট দেদীপ্যমান একটা প্রকাণ্ড অনিন্দ্য-সুন্দর উদ্দেশ্য। সে খোলাখুলি আমাকে বল্লে—প্রাণটা নগদা মুটের মোট নয় যে ঠিকানায় ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। পথ-চলার প্রত্যেক ধাপ মনোহর, প্রত্যেক ধাপের জ্যোতিঃ আছে।

তার পিতার নিকট প্রসঙ্গ তুলে দেখেছি—সুবিধা নয়।

"আজ্ঞে, মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে, এবার পরেশের বিয়ে দিলে একটি মেয়ে যাবে একটি মেয়ে ঘরে আসবে।"

"পরেশের আবার বিয়ে।"

কেন তা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার ভরসা হল না। কারণ প্রত্যুত্তরের অপ্রিয় কথাগুলা মুখর হয়ে আমার কাণের কাছে ভোঁ ভোঁ করছিল।

"মুরারীবাবু বেশ লোক—খাসা লোক।"

"হ্যাঁ। ভারি রসিক লোক।"

"আর ছেলেপুলে নেই। একটি বুঝি মেয়ে আছে।"

"শুনেছি।"

"কুটুম কর্ত্তে হয় তো ঐ-রকম। আমার জ্যেঠামশাই বল্তেন—আদান-প্রদানে কুটুম্বিতা বাড়ে।"

"তাই নাকি? আমার ঠাকুর কিন্তু বলতেন এক ঘরে দুই কুটুম করলে অমঙ্গল হয়।"

ব্যস্! আর পাথরের প্রাচীরে মাথা ঠুকে কোনো ফল নাই।

আউট্রাম ঘাটে চা-পান কর্ত্তে নিমন্ত্রণ কল্লাম গিরিজাকে। তাকে নানা কথার পর বল্লাম—"আপনার ভগিনীর বিবাহের কিছু ঠিক্ হ'ল নাকি?"

ভারি আনন্দ বোধ হ'তে লাগলো পরেশের লজ্জা-বনত মুখ দেখে। দুর্ব্বৃত্ত দুর্দ্দান্ত দুর্দ্দমনীয় পরেশ—চিরদিন যার কাছে জলস্থল মরুব্যোম সব বোগাস্—নিরর্থক—আজ প্রেমের দেবতা এ কি কর্লেন?

গিরিজা হেসে বল্লে—"বোনের বিয়ে হওয়া শক্ত। বাবার আদুরে মেয়ে চাঁপার কলি। বাবা জানেন ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার বিবাহের ব্যাপারে। তিনি নিজে পছন্দ ক'রে শেষে পাত্র-পাত্রীকে আমাদের সাম্নে ধরবেন। আমাদের মত না হ'লে বিবাহ হ'বে না।"

"আপনি কটি পাত্রী দেখেছেন?"

সে হেসে বল্লে—"মাত্র একটি। মিস্ মনোরমা গাঙ্গুলী। বাবা আমাদের মতামত ঠিক জানেন, তাই—"

"হুঁ! বাকী ২১৩টি আপনার সাম্নে ধরেন নি।"

আমিও অপ্রস্তত হ'লাম, গিরিজাও হ'ল। বল্লে—"সেটা কি জানেন—"

পরেশ বল্লে—"থাক্। গুরুজনদের কার্য্যের সমালোচনা ক'রে এমন সন্ধ্যাটা মাটি কর্ব্বার আবশ্যক নাই। আহা, কি গৌরবে সূর্য্য ডুবছে।"

সত্যিই গৌরবের কথা। কেবল সূর্য্যের পক্ষে নয়, দর্শকেরও পক্ষে।

অনেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চাঁপার কলির কথায় এলাম।

সে বল্লে—"চাঁপার কলি বড় রোমাণ্টিক। সে গৌরী-শঙ্কর পাহাড়ে চড়ে, কিম্বা জলন্ত আগুন খায়, কিম্বা চলন্ত রেল গাড়ীর নীচে থেকে পঙ্গুকে উদ্ধার করে, এমন লোক না পেলে বিয়ে কর্বে না।"

সে খুব খানিকটা হেসে বল্লে—"অথচ সার্কাসের খেলোয়াড় বিয়ে কর্ব্বেনা। কুলশীল বিদ্যা চাই, তার ওপর পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া চাই।"

আমরা সবাই হাসলাম। এবার পরেশও হাসলে।

আমি বল্লাম—"কোনো বি, এস-সি যদি ঐ আরাণ-কোলা জাহাজের উপর থেকে জলে লাফ্ মেরে তার ভাইয়ের সিগারেটের পাইপ উদ্ধার করে?"

"ওঃ, নিশ্চয়।"

ভদ্রতার হিসাবে কথা পাল্টে নিলাম। ফস্তরাণী যে একেবারে অন্য ধরণের, পরেশ তা বোঝালে।

সে বল্লে—"শেয়াল দেখলে ফস্ত ভয় পায় অথচ খাঁচার বাঘ সিংহ তার প্রিয়।"

আমি বল্লাম—"মিঃ চাটার্জ্জি, অর্থটা বুঝলেন? বুনো শেয়াল হ'লে আপনার চলবে না। খাঁচার বাঘ হবার চেষ্টা করুন। দিনের বেলা থাপটি মেরে চোক্ পিট্ পিট্ কর্ত্তে হ'বে, আর যত তর্জ্জন-গর্জ্জন রাত্রে।"

সে বল্লে—"তা মিঃ গুপ্ত, যদি খাঁচাতেই ঢুকতে হয় তো খ্যাঁকশেয়ালী হওয়ার চেয়ে বাঘ হওয়াই ভাল।"

তিন প্যাকেট সিগারেট আর তার আনুসঙ্গিক চা, আইসক্রীম, বিস্কুট প্রভৃতি ধ্বংস করে প্রসন্নচিত্তে আমরা নিজ নিজ গন্তব্য-পথে চলে গেলাম। মনে মনে বুঝলাম যে, পরেশ ও চাঁপার কলির মিলন হবে রাজযোটক। শেষে উভয়কেই বাস কর্ত্তে হবে রাঁচি! তা হ'ক, স্থানটা স্বাস্থ্যকর অথচ সুদৃশ্য।

পরদিন প্রভাতে বন্ধু এসে দেখা দিল।

প্রথম প্রশ্ন—"গৌরীশঙ্কর অভিযান আবার একটা না কি হবে?"

উত্তর—"সুবিধা নয়। বড় ঠাণ্ডা। আবার বরফের চাঙড়া খসে পড়ে।"

"দেখ, আমি পাহেলগামের ভিতর দিয়ে কোলাহাই তুষার-ক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। সেটা গিরিজাকে না শোনান কি তোমার পক্ষে বন্ধুর কাজ হয়েছে?"

অপরাধ স্বীকার কর্‌লাম; ভবিষ্যতে তাকে যথা-বিধি এ সমাচার জানাতে প্রতিশ্রুত হ'লাম।

"আমি সাঁতার জানি। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে আজ ভর্ত্তি হব।"

"গিরিজাকে জানাব।"

"আমি ঘোড়ায় চড়ি। কাদাখোঁচা চকাচকি মারি। একবার একটা ভোঁদড় মেরেছিলাম। বাঘ পেলেও মারতে পারি।"

"ভাল। এবার চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের সন্ন্যাসী হও। কাঁটা-ঝাঁপ, বঁটি-ঝাঁপ, বাণ-ফোঁড়া এই সব কর—ছবি নেওয়া যাক। সে ছবি দেখ্‌লে চাঁপার কলি কেন গোলাপের কাঁটাও ভড়্‌কে যাবে।"

"বোগাস্‌।"

এবার পরামর্শ হতে লাগলো। একটা মরা বাঘের বুকের উপর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে টেনে তার মুখ ফাঁক ক'রে ধরলে কি হয়? দুটো বাধা। এক তো মরা বাঘ পাওয়া যাবে না, আর দ্বিতীয়তঃ সালসার বিজ্ঞাপনে দেখা দিয়ে ও-রকম চিত্র তার রোমান্স হারিয়েছে।

(৬)

বীরেন্দ্র ভাব্‌ত সে একজন সহীদ—অপরে সহীদ হয় মরণের প্রসাদে, বীরেন্দ্র সহীদ হয়েছিল জীবনের কদাকার দৈর্ঘ্যে—নিজের জীবনের দৈর্ঘ্যে নয়, তার দীর্ঘজীবী মাতুলানীর জীবনের। সে মাত্র লক্ষকতক টাকা পেয়েছিল নিজে পিতার মৃত্যুর পর। সে আজ তিন বছরের কথা। কিন্তু বীরেন্দ্র আর অপর লাখ-কতক টাকার মধ্যে ব্যবধান ছিল চীনের প্রাচীরের মত—তার বৃদ্ধা মাতুলানী। বছর দুই মাতুলানী ছিলেন একরকম সংজ্ঞাহীনা স্থবির। তার পূর্ব্বে অবশ্য যথা-নিয়মে তাঁর মস্তিষ্কে আশ্রয় নিয়েছিল ভীমরথী। কিন্তু, মান্ধাতার আমলের হিন্দু আইনের এমনই মোচ্‌কোফের যে, তাঁর প্রাণ থাক্‌তে বীরেন্দ্র তার মাতুলের অতুল ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করবার অধিকারী ছিল না। এক আত্মীয় ছিলেন সেই সম্পত্তির পরিদর্শক। কু-লোকে বলে প্রতি মাস তার ধন-ভাণ্ডারকে মোটামুটি কিছু দান করিত—বীরেন্দ্রের মাতুলের বিষয়-সম্পত্তি। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল তাঁতে আর বীরেন্দ্রে দড়ি টানাটানি—দড়ি অবশ্য বৃদ্ধার জীবন।

কিন্তু শ্মশান-চাওয়া হলেও বীরেন্দ্র সরল আর বন্ধুবৎসল। একশ্রেণীর লোক আছে তারা ধাপে ধাপে যেমন উপরে ওঠে, তেমনি নীচের সোপানগুলা ভেঙ্গে ফেলে; উর্দ্ধনেত্র—পরিত্যক্ত নিম্ন-ভূমি তাদের অপ্রিয়। বীরেন্দ্র মোটেই ধাপ-ভাঙ্গা বা ছাদ-মুখো ছিল না। স্কুলে প্রতি ধাপ্‌ সে উঠ্‌তো পরীক্ষার সময় আমাদের ব'লে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। দু'বার অঙ্কের খাতা আমি আর পরেশ লিখে দিয়েছিলাম। ধর্ম্মে মতি না থাকা লোক হ'লে সে আমাদের ঘৃণা করত—জীবনের অট্টালিকা থেকে উপরে ওঠা ধাপের মত আমাদের ভেঙ্গে ফেল্‌ত। কিন্তু লাখের পর লাখ টাকা আসার সঙ্গে তার প্রাণে বন্ধু-প্রীতির জোয়ার আস্‌ছিল। মামীমাতার ৺গঙ্গালাভের পর আমরা যে বন্ধু-প্রীতির বন্যায় ভেসে যাব—সে দুর্ভাবনায় মাঝে মাঝে প্রাণে আতঙ্ক হ'ত।

বীরেন্দ্রের স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুরের মর্ত্তে অধিষ্ঠানকালে সাধ ছিল পুত্রকে পাশ-করা দেখ্‌বেন। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-দালানের কড়া পাহারার দুর্ব্বিপাকে আমরা তার সাগর-লঙ্ঘনের বিশেষ কিছু ব্যবস্থা কর্ত্তে পারিনি। তবু পিতার বিনোদনার্থ বীরেন্দ্র ইংরাজী-বুক্‌নী-সিঞ্চিত বাঙ্‌লা বলা অভ্যাস করেছিল। তার পিতার তেলের কলে সবাই অবাক্‌ হ'য়ে কর্ত্তাবাবুর পুত্রের মেধার প্রশংসা কর্ত্ত।

প্রথম উচ্ছ্বাসের পর বীরেন্দ্র বল্লে—"একটা ডেন্‌জার হয়েছে। একটা চাকর সিলিঙ্‌ থেকে ডাউন-ফল্‌ হ'য়েছিল, পা ভেঙ্গে গেছে। অ্যামবুলেশন ডেকে হাঁসপাতাল পাঠাতে হ'ল।"

আমরা সহানুভূতি প্রকাশ কর্‌লাম। সে বল্‌লে—"গুড্‌ ফরহেড্‌ যে মরেনি; তা'হলে আবার করনেশন কোর্টে হাঙ্গামা হ'ত।"

মামীমাতার কুশল সম্বন্ধে ব'ল্লে—"মামীমার সেই 'কমা'র অবস্থা।"

পরেশ বল্লে—"হ্যাঁ এখন ফ্লপ্টপ হ'লেই মঙ্গল।"

পরেশের প্রেমে পাওয়ার সংবাদে সে উল্লসিত হ'ল। না হ'বে কেন? সে পরেশকে বলত ডোণ্ট-কেয়ার পরেশ। টাকা আনা পাইয়ের নিরাময়তার উপর যার স্নেহ-দৃষ্টি নিরন্তর, সে পরেশের মত নির্লিপ্ত ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি যোগীর প্রতি অনুরক্ত না হ'য়ে থাকৃতে পারে না। হ্যানিমানের নীতি রোগে অভ্রান্ত, কিন্তু প্রেমে তার সার্থকতা নাই।

বীরেন্দ্র বল্লে—"ভারি গুড্ খবর। সাস্পিসাস্ কাজটা মর্ণিং মর্ণিং হওয়াই ভাল।"

কিন্তু অস্‌পিসাস্—বীরেন্দ্রের ভাষায় সাস্‌পিসাস্ ব্যাপার সংঘটিত হয় কিরূপে। একদিকে পরেশের পিতার ইচ্ছা কাজকর্ম না করলে তার বিবাহ দেবেন না, ওদিকে চাঁপার কলি তাকে বিবাহ কর্ব্বে না যতদিন না সে তপ্তশলাকা দিয়ে দাঁত খোঁটে, কেউটে সাপ দিয়ে কান চুলকায়। তিন বন্ধুতে অনেক জল্পনা-কল্পনা ক'রে ঠিক হ'ল কাজের কথা। বীরেন্দ্রের ফানুস্-মার্কা সর্ষপ তৈলের বিক্রী মালয়দেশে অত্যধিক। তার বহুদিনের সাধ সে সিঙ্গাপুরে একটা শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সে সাধ পরেশ পূরণ কর্ত্তে সম্মত হ'ল। শিঙ্গাপুরের দি বেঙ্গল সর্ষপসার কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হ'বে মিঃ পি, গাঙ্গুলী বি, এস্ সি। রাত্রি এগারটা অবধি ব'সে তিনজনে প্রস্‌পেক্টস্ বিজ্ঞাপন অবধি মুসাবিদা করলাম। অবশ্য মাঝে ঘণ্টাখানেক চীনা হোটেলে কচ্ছপের সুরুয়া, কাউ খাউ, চাউ চাউ প্রভৃতি ভোজন হ'য়েছিল।

বীরেন্দ্র বল্লে—"যদিও তুমি ম্যানেজমেণ্ট ডিরেক্‌সান হবে, কাজ চালিয়ে নেবে আমার সেখানকার এজেণ্ট হাজি সুলতান্ আমেদ। সে আমার বাবার টাইমের লোক, ভারি ডাউন-রাইট।"

জীবনের এটা সনাতন পদ্ধতি। কেউ ভূত ধরে, কেউ হানাবাড়ি ছেড়ে পলায়। কিন্তু এই দো-টানায় জগত বড় বেশী এগোতে পারেনি। আমরা স্থির কল্লাম, এই দুমুখো স্রোতকে এক খাদে বহাতে পারে বিজয়লক্ষ্মী মালা-চন্দন নিয়ে মিঃ পি, গাঙ্গুলীর একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে থাকতে পারবেন না। বিরহ হ'ল প্রেমের ছাগলাদ্য ঘৃত, মকরধ্বজ। সিঙ্গাপুর গেলে পরেশের প্রেম সবল ও পুষ্ট হ'বে, আর আমরা এখানে প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকব। সে বঙ্গোপসাগর থেকে একটা মাল্লাকে বাঁচাবে—ভারত মহাসাগরে তিনটে চীনে বোম্বেটের খাঁদা নাক কেটে বোম্বেটে জাহাজ ডুবিয়ে দেবে। এতে চাঁপার কলি কেন সমগ্র ফুলবাগান তার প্রতি আকৃষ্ট হ'বে।

দি বেঙ্গল সর্ষপসার কোং লিমিটেড্ জন্মলাভ করায় চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল। মুরারী বাবু পরেশকে অভিনন্দন কর্ল্লেন। গিরিজা গুন গুন সুরে গাহিল—"দেশ-বিদেশে যাওরে আন্‌তে নব নব জ্ঞান।" পরেশের জননী দিন দুই অনশনে কাটিয়ে কেবল সমুদ্র, জাহাজ, মালয় জাতি, কলুর ঘানি, বাছা সরিষার খাঁটি তৈল ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ কর্ত্তে লাগলেন এবং নবার্জ্জিত প্রত্যেক জ্ঞান-কণাকে পরেশের সমুদ্র-যাত্রা এবং বিদেশ-বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনা-রূপে রণ-সজ্জায় সাজিয়ে তুললেন। অবশ্য সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্ব হ'ল তাদের সেনাপতি।

"ছিঃ বাবা! সমুদ্র-যাত্রা করলে জাত যায়—ব্রাহ্মণের ছেলে।" অবশ্য জাহাজ-ডোবা যুক্তির পর।

পরেশ বল্লে—"সে কি মা। ঐ সমুদ্র পার হ'য়ে যে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং লঙ্কা গিয়েছিলেন। তখন যদি সমুদ্র পার হ'বার নিষেধ মানতেন তিনি, তাহ'লে মা জানকীর কি হ'ত ভাব তো।"

"তোর একে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। মালাই দেশে গিয়ে কতকগুলা মালাই বরফ খেয়ে গলা ভাঙ্গবে, বুকে সর্দ্দি বসবে—যাসনি বাপু সে দেশে।"

"না মা। দেশটা মোটেই ঠাণ্ডা নয়। মালাই বরফ খাওয়া সে দেশে আইন ক'রে মানা ক'রে দিয়েছে কোম্পানী।"

"তুই যে গোঁয়ার-গোবিন্দ। বলছিস্ কাকাতুয়া পাখি কাক্ চড়াইয়ের মত উড়ে বেড়ায়। তুই পাখি ধর্ত্তে ঠিক্ গাছে উঠ্‌বি, আর পড়ে গিয়ে পা খোঁড়া করবি। না বাপু, যেতে হ'বে না।"

"মা, তোমার এক কথা। আমি কি আর খোকা আছি মা। আমি তিনটে পাশ করেছি। সেখানে বড় সাহেব হব, ব্যবসা কর্ব্ব—"

"আমার শ্রাদ্ধ করবি। কুলীন বামুনের ছেলে—কলুর দোকান খুল্‌বি—লজ্জার কথা।"

পিতা ডেকে পাঠালেন তাকে। গুড়গুড়ির নল হাতে নিয়ে, গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত নয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক ভেবে চিন্তে—"

"চিন্তার শক্তি তোমার কোনদিন ছিল এমন তো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।"

উত্তর নাই। "বিদেশে চিরদিন থাক্‌তে হবে আর লোকেই বা কি বলবে—বামুনের ছেলে কলুর ব্যবসা।"

"আজ্ঞে আজকালকার দিনে? মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—"

"কি বলেছেন।"

"মানে হচ্ছে, কাকেও ঘৃণা কর্ত্তে নাই।"

"আমিও তো বলছি না নর-দেবতাকে ঘৃণা কর্ত্তে। তিনি কি বলেছেন মুচির উপর ভালবাসাটা দেখাবে, বামুন বদ্দি কায়েতের ছেলে তাদের পৈতৃক ব্যবসা আত্মসাৎ ক'রে, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে? কলুর ওপর ভালবাসা দেখাতে গিয়ে কত গরীব ঘানিওয়ালার ব্যবসা বন্ধ কর্ত্তে হ'বে। ঘুরে-ফিরে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম্—যেটা মহাত্মা মানা করেন।"

"আজ্ঞে তা না। শ্রমের সম্ভ্রম বাড়াতে হবে তথাকথিত ভদ্রলোকের মধ্যে।"

"গ্রাজুয়েট খবরের কাগজ ফেরি করবে—যখন সে অক্লেশে শিল্প ব্যবসা কর্ত্তে পারে। যে বেচারা মূর্খ, খবরের কাগজ বেচতো, সে রিক্সা টান্‌বে। অর্থাৎ শ্রমের সম্ভ্রান্ততা বাড়াবার জন্য, তোমার সবুজ না কাঁচা কি বল—তার ফিলজফি—মানুষকে ঘোড়া গাধায় পরিণত ক'রে দেশের কল্যাণ কর্ব্বে।"

জবাব তো ছিলও না, আর আসল কথাটাও বল্‌তে পারে না। ইতিমধ্যে রাস্তায় একটা হট্টগোল হ'ল—বুঝি কে মোটর-চাপা পড়েছিল—সেই হিড়িকে পরেশ উঠে গেল।

মুরারিবাবুর সঙ্গে দুজনের দেখা। তিনি বল্লেন—"বেশ! বেশ! ঘরে-থাকা যুবকের ঘোরো-বুদ্ধি হয়, জানেন তো। সেক্সপিয়ার বলেছে।"

কিন্তু আসল স্থানে খবরটার কি ফল হ'ল তা তো বোঝবার কোনো উপায় ছিল না। গিরিজার উপর যথাসাধ্য প্যাঁচ কষা গেল—কিন্তু কোনো স্পষ্ট সুফল পাওয়া গেল না। সে নিজে তুষ্ট হ'য়েছিল। চাঁপার কলির নাম উচ্চারণ কর্ত্তে পারলাম না, ভদ্রতার খাতিরে। সুতরাং সিদ্ধান্ত কর্ত্তেই হ'ল পরেশকে যে গিরিজাটা বোগাস্।

(আগামী বারে সমাপ্য)

পল্লী-শ্রী

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

নৌকাখানি ভিড়িয়াছে একটি গ্রামের কাছে,
মাঝি গেছে আহার সন্ধানে,
আমি উঠি নদীতীরে হেরি ওই গ্রামটিরে
মায়ামুগ্ধ সজল নয়ানে।
পথখানি জল থেকে চলিয়াছে এঁকে বেঁকে,
আম্রবন হইয়াছে পার,
ঘট কাঁখে আসে বধূ, নব মুকুলের মধু
বিন্দু বিন্দু ঠোঁটে পড়ে তার।
পাকুড়ে বাদুড় ঝোলে, তালগাছ হতে দোলে
সারি সারি বাবুয়ের বাসা,
কোথায় বাতাবি ফুল গন্ধে বন মশ্‌গুল,
হেথা হতে তৃপ্ত হয় নাসা।
যতদূর দৃষ্টি ধায় নয়ন জুড়ায়ে যায়,
তরঙ্গিত শ্যামল উচ্ছ্বাস,
মাঝে মাঝে রক্তকেতু তুলেছে বৈচিত্র্য হেতু
মধুদূত শিমুল পলাশ।
শুধু ছায়া, শুধু ছায়া, আধা আলোকের মায়া—
উঠে ধূম গৃহচাল ভেদি' ;
দেখা যায় দুটি গোলা কুয়া হ'তে জল তোলা,
বেড়াখানি রচেছে মেহেদি।
কামার পেটায় লোহা, দেখি দূরে দুধ দোহা,
ডোমের মেয়েরা বুনে ঝাড়,
বটচ্ছায়ে ধেনুগণ করে সুখে রোমন্থন,
গোবর কুড়ায়ে যায় বুড়ী।
মন্দিরের ধাপে ধাপে আল্‌তার দ্যুতি কাঁপে,
পূজা দিতে জননীরা আসে ;
দোলা বাঁধি আমগাছে ছেলেরা দুলিয়া বাঁচে,
দাদা কাঁপে, ভাই দেখে হাসে।

রসতৃপ্ত পাখী সব অবিশ্রান্ত কলরব
করিতেছে কুলায়ে কুলায়ে।
বায়ু বয় ঝিরি ঝিরি শ্রান্তি হরি ধীরি ধীরি
রাখালের নয়ন ঢুলায়ে।
মনে হয় এত দিনে বসতি ফেলেছি চিনে।
ধন্য হই, এই নদী তীরে
জীবন কাটায়ে দিতে পারি যদি এ নিভৃতে
ছায়াচ্ছন্ন একটি কুটীরে ;
তরীযাত্রা হয় শেষ, শান্ত হয় সব ক্লেশ
বন্ধ হয় সকল সন্ধান,
কোলাহল হট্টগোলে ক্লান্ত হ'য়ে মার কোলে
ফিরে আসে মায়ের সন্তান।
দেখে বটে মনে হয় গ্রামখানি শান্তিময়,
জানি আমি সত্য ইহা নহে,
পাপ তাপ আধিব্যাধি দৈন্য শোক দুঃখ আদি
অন্তরে গোপনে এরও রহে।
কোথা নেই রোগ শোক ? এ সংসার মর্ত্তলোক,
তাহা ছাড়া কভু কি সম্ভবে ?
নগরে কি এই সব করেনাক' উপদ্রব ?
একই কথা,—তাই যদি তবে
যেথা শুধু কাড়াকাড়ি তুচ্ছ নিয়ে মারামারি
হানাহানি চলে অবিরাম,
নাহি শান্তি, নাহি স্বস্তি দ্বেষানল দহে অস্থি,
ভায়ে ভায়ে শুধুই সংগ্রাম ;
তার চেয়ে ভাল ঢের নহে কি এ গ্রামান্তের
ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত জীবন ?
ব্যাধি আছে দৈন্য আছে, এ কথা কে ভুলিয়াছে ?
আছে তবু শিয়রে ব্যজন।

আছে বটে হাহাকার, আছে তবু সান্ত্বনার
স্নেহভরা মায়ের ভাষণ,
আছে দুঃখ ডামাডোল, আছে তবু মার কোল
মধুময় স্নেহের শাসন।

রূপকথা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সেদিন বৎসরের প্রথম বর্ষণ। বৈশাখের রোদে পৃথিবী ফেটে চৌচীর হ'য়ে গেছে। মোটা মোটা জলের ধারাগুলো তারই বুকের উপরে আনন্দের প্রলেপের মতো ঝ'রে পড়্‌ল। প্রকৃতির মনের ভিতরে যে মা আছেন, সূর্য্যের দহন যখন নিদারুণ হ'য়ে ওঠে, তখনই চোখে জাগে তাঁর ভ্রূকুটি। ক্রোধে তাঁর মুখ কালো হ'য়ে উঠে' সৃষ্টি করে ঘন মেঘের অজস্র পর্দ্দার। সে মেঘ কখনো বা জাগায় ঝড়, কখনো বা ঝরায় জল।

বাইরের কাজ গেল সব বন্ধ হ'য়ে, ভিতরের কাজের উপরেও কারো মন রইল না। এমনি ক'রে ভিতরের সঙ্গে বাইরের যোগ যখন স্থাপিত হয়, তখনই মানুষের মনে জাগে আড্ডার ইচ্ছা, জটলার জল্পনা। আমাদের সকলের মনও আড্ডা জমাবার দিকে ঝুঁকে' পড়্‌ল। আকাশের দিকে তাকিয়ে সমীর বল্‌লে—শূন্য-পথে আজ সাগরের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই সময়েই তার উপর দিয়ে গ'ড়ে তোলা যায় তাসের সেতু। অতএব এইবার এসো, সকলে মিলে' 'ব্রিজ' সুরু করা যাক্।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জোড়া তাস এনেও সে হাজির কর্‌লে। কিন্তু তাড়াতাড়ি তাতে বাধা দিয়ে মায়া বল্‌লে—না—না—বড়-দা', আজ তাস নয়, আজ আমরা গল্প শোন্‌ব। নীহার দা, তুমি আমাদের সকলকে তোমার একটা গল্প শোনাও।

নীহার আমার বন্ধু। ও যখন গল্প বলে, ওর চোখের ভিতরে জাগে কেমন একটা স্বপ্নের আবেশ, সারা মুখে ছাপিয়ে ওঠে একটা বিস্ময়ের বিহ্বলতা। কতবার ওর গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হ'য়েছে, ও তো গল্প ব'লে না, মনের পর্দ্দার উপরে ছবির পর ছবি এঁকে রচনা করে গল্পের স্বপ্নলোক। সুতরাং ওর গল্প শোনার প্রলোভন আমাদের কারো কাছেই কম ছিল না। তাই আপত্তি না ক'রে বল্‌লুম—তাস এই রইল নীহার, তুমি তাহ'লে সুরু করো তোমার গল্প।

নীহার কোনো কথা না ব'লে তার বড় বড় চোখ্ দু'টো তুলে' কেবল একবার মীরার দিকে তাকালে।

মায়া বল্‌লে—অনুমতি দে মীরা-দি'। তোর অনুমতি ছাড়া নীহার-দার আবার 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

মীরার কাছে ওর মনটা যে বাঁধা প'ড়ে গেছে সে খবর কেবল ওরা দু'জনে নয়, এ বাড়ীর ছোট-বড় সকলেই জেনে ফেলেছে। সুতরাং মায়ার কথাটা বল্‌বার ভঙ্গিতে আমরা সকলেই হেসে উঠ্‌লুম।

নীহারও হাস্‌লে, কিন্তু সে হাসি রহস্যময়। তার ভিতরে লজ্জা বেশী কি আনন্দ বেশী, স্নিগ্ধতা বেশী কি বিহ্বলতা বেশী—কিছুই ধরা যায় না। হাস্‌বার ও কথা বল্‌বার আর্টে ও সমান ওস্তাদ। হাসির সেই টুকরো-গুলো ঠোঁটের প্রান্তে চেপে রেখেই নীহার বল্‌লে—তা নয় মায়া, ভাব্‌ছি কি গল্প বল্‌ব? আজকের এই মেঘ-মেদুর অপরাহ্নের সঙ্গে গল্প তো খাপ খায় না, খাপ খায় কেবল রূপকথার। সেই তেপান্তরের মাঠ, ধূ ধূ কর্‌ছে জনহীন প্রান্তর। তারি ভিতর দিয়ে সাঁ সাঁ ক'রে ছুটে' চ'লেছে রাজপুত্রের ঘোড়া—রাত্রির অন্ধকারের মতো তার গায়ের রং। মাঠের শেষে অপরূপ রাজপুরী, আর সেই রাজপুরীর ভিতরে সোনার পালঙ্কে শুয়ে' আছেন তার চেয়েও অপরূপ রাজকন্যা কুঁচ-বরণ যাঁর দেহ, মেঘ-বরণ যাঁর চুল। কিন্তু এ যুগে তো তোমরা রূপকথাকে অচল ক'রে রেখেছ। তাকে বাদ দিয়েছ তোমরা সাহিত্য থেকেও, মানুষের মনের কল্পনা থেকেও।

আমি বল্‌লুম—রূপকথার ভিতরে যদি রূপ থাকে তবে তা সাহিত্যেও চলে এবং গল্পের আসরেও অচল হয় না। গল্প তোমার ঢের শুনেছি, আজ না হয় রূপকথার রূপের ভিতরেই অবগাহন করা যাক্।

গলাটা সানিয়ে নিয়ে, চোখের দৃষ্টিতে আচম্‌কা ভেসে আসা একটা মোহের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলে' নীহার বল্‌তে সুরু কর্‌লে—

* * * *

তুষার-পুরীর তরুণ রাজা শপথ করলেন—লূতার সূতা দিয়ে যে রূপসী রাজকুমারীর দেহের আচ্ছাদন তৈরী তাকেই তাঁর চাই, এবং তাকে না পেলে জীবনেও তাঁর প্রয়োজন নেই, রাজ্যেও তাঁর প্রয়োজন নেই।

রাজার শপথ শুনে' রাজ্যের মাথায় টনক ন'ড়ে উঠ্‌ল। মন্ত্রী তাঁর কাঁচা-পাকা চুলের রাশির ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—হায় রাজা, এ আবার তোমার কি শপথ! লূতার জাল—যাতে বাতাসেরও ভর সয় না, তাই দিয়ে নাকি আবার মানুষের দেহের আচ্ছাদন তৈরী হয়!

সেনাপতির তলোয়ার তার খাপের ভিতরে শুধু বার কয়েক ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ল। সে রাজাকে বল্‌লে—প্রভু, তলোয়ারের জোরে যাকে জয় করা যায় তাকে যদি তুমি এনে দিতে বল্‌তে, আমি প্রাণপাত ক'রেও এনে দিতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু তোমার মন যে আকাশের ফুল দিয়ে অসম্ভবের মালা গেঁথে চ'লেছে। তার উপরে তো আমার হাত নেই।

বন্ধুরা বল্‌লেন—মিশরের রাজকুমারীর সৌন্দর্য্য চাঁদের জ্যোৎস্নাকেও ম্লান ক'রেছে; চীনের রাজকন্যার রূপ সমুদ্রের জোয়ারের মতো, তা দেহের তীর ছাপিয়ে দিখিদিকে উপ্‌চে পড়ে; গ্রীসের রাজকুমারীর দিকে যদি একবার তাকানো যায় তবে সে চাহনি সেইখানেই স্থাণুর মতো স্থির হ'য়ে থাকে—পলক ফেল্‌বার কথা মনেও হয় না; আর রুমের বাদশাজাদী?—বিদ্যুতের বুকের ভিতর থেকে তার দীপ্তিটুকু চুইয়ে নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে তার দেহ—তার লাবণ্য। তোমার যাকে চাই বলো—আমরা বিবাহের উদ্যোগ করি। কেবল খেয়ালের পিছনে ছুটে' তোমার সুখ, আমাদের সুখ, রাজ্যের সুখ নষ্ট ক'রো না।

রাজা অসহিষ্ণু হ'য়ে বল্‌লেন—যে দেশের বসন লূতার সূতায় তৈরী সেই দেশের রাজকন্যাকেই আমার চাই।

দিনের পর দিন মিলিয়ে যায়, তবু লূতার সূতার তৈরী কাপড়-পরা রাজকন্যার সন্ধান মেলে না। রাজ্যের কাজ রাজার দুয়ারে প'ড়ে পাহাড়ের মতো বেড়ে ওঠে। রাজকার্য্যে রাজা মন দিতে পারেন না। দরবারে এসে বিচার-প্রার্থীরা ফিরে' যায়, সংস্কারের কাজে—শাসনের কাজে পলে পলে শৃঙ্খলার অভাব ঘটে। ক্রমে রাজ্য চালানো অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজার কাছে যেয়ে মন্ত্রী জানালেন—মহারাজ, আপনি না দেখায় রাজকার্য্য অচল হ'য়ে উঠেছে, আপনি রাজসভায় ফিরে' আসুন।

রাজা বল্‌লেন—সে তো হ'তে পারে না মন্ত্রী, কারণ এখনো লূতার সূতার কাপড়-পরা রাজকন্যার সন্ধান মেলে নি।

সেনাপতি এসে জানালেন—মহারাজ, প্রত্যন্ত সীমায় বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, আপনি যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ দিন।

রাজা উত্তর দিলেন—আমি যে রাজকন্যাকে চাই সেনাপতি, তাকে যদি তোমরা এনে দিতে পারো, তবেই আমাকে আবার তোমাদের ভিতরে ফিরে' পাবে। নতুবা রাজ্য রসাতলে যাক্, একটা আঙুল তুলে'ও আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব না।

রাজার কথা শুনে' রাজ-দরবারের সকলের মুখের হাসি আবার নতুন ক'রে মিলিয়ে যায়। মন্ত্রণাগারের দরজা বন্ধ ক'রে আবার পাত্র-মিত্র-অমাত্যেরা ভাব্‌তে সুরু করেন।

সেদিনও দরজা বন্ধ ক'রে ভাব্‌ছিলেন তাঁরা প্রতিকারের উপায়, এম্‌নি সময় দরজার উপরে অকস্মাৎ করাঘাতের পর করাঘাতের ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নকিব হেঁকে বল্‌লে—মহারাজের রথের ধ্বজা দেখা দিয়েছে। তিনি দরবারে আস্‌ছেন। আপনারা দরজা খুলে' তাঁর অভ্যর্থনা করুন।

আনন্দের আলোকে ললাটের জমাট অন্ধকার রাশিকে উড়িয়ে দিয়ে সভাসদেরা সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—মহারাজের জয় হোক্।

রাজার যে দরবার এতদিন ধ'রে অরণ্যের মতো নিস্তব্ধ হ'য়ে প'ড়েছিল, সেই রাজ-সভা আবার মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল। বৈতালিকের কণ্ঠে জাগ্‌ল স্তুতির গান, সভা-

-সদদের কণ্ঠে ফুটুল আনন্দের অভিবাদন, বিদূষকদের কণ্ঠে ফুটুল সরস রহস্যের ছন্দ-বিলাস। কিন্তু রাজা স্তুতি-পরিহাস-অভিবাদন কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে বল্‌লেন—প্রাচীন পুঁথির পাতায় খুঁজে' পেয়েছি, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা যে দেশ, সেই দেশে লূতার তন্তুর মতো বসনে দেহ ঢেকে বাস করেন রাজকন্যা। হাজারো গোলাপের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ির ডানা মেলে দিয়েছে তাঁর গালে, কাল-বৈশেখীর মেঘের আঁচল দোলে তাঁর চুলে, নিশীথ রাত্রির তারার দীপ্তি জ্বলে তাঁর চোখে। কিন্তু রাজপুরীর প্রাচীর ঘিরে' খোলা তলোয়ার হাতে লাখো প্রহরী তাঁকে পাহারা দেয়। সমস্ত দিন-রাতের ভিতরে সে পাহারার বিরাম নেই। সুতরাং বলে সে রাজকন্যাকে কেউ হরণ করতে পার্‌বে না। সে দেশের গাছে ফলে হীরার ফল, মাটিতে ফলে সোণার শস্য। সমস্ত রাজ্য ঘিরে' কুবেরের ভাণ্ডার ছড়ানো। সুতরাং ধনের লোভ দেখিয়ে যে তাকে জয় করা যাবে তারও সম্ভাবনা নেই। অতএব সে দেশে যেতে হ'লে লাগ্‌বে দুর্জ্জয় সাহস, এবং তার রাজকন্যাকে হরণ ক'রে আন্‌তে হ'লে লাগ্‌বে অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আমার রাজ্যের ভিতরে এমন সাহস কার আছে যে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙিয়ে সে রাজ্যে প্রবেশ করার স্পর্দ্ধা রাখে এবং এমন বুদ্ধি কার আছে যে তারি জোরে লাখো প্রহরীর পাহারায় ঘেরা রাজকন্যাকে হরণ ক'রে আন্‌তে সক্ষম? প্রশ্ন শেষ ক'রেই রাজা সভার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌লেন।

নিস্তব্ধ সভার কোনো প্রান্ত হ'তে আশ্বাসের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। রাজা মন্ত্রীর দিকে চোখ্‌ ফিরালেন। মন্ত্রী বল্‌লেন—কেবল বুদ্ধির জোরে কাজ হাসিল করা যদি সম্ভব হ'তো মহারাজ, এই বুড়ো মাথাটাকে না হয় একবার নাড়াচাড়া ক'রে দেখ্‌তুম। কিন্তু সমুদ্র পেরুবার, পাহাড় ডিঙাবার সাহসও আমার নেই, বয়সও আমার নেই।

মন্ত্রীর উপর থেকে ফিরে' এসে রাজার চোখ্‌ পড়্‌ল সেনাপতির উপরে। খাপ হ'তে তলোয়ারখানা খুলে' মাটিতে মাথা নোয়ায়ে সেনাপতি বল্‌লেন—মহারাজ, কেবল সাহস দিয়ে যদি কাজ হ'তো, এই মুহূর্ত্তে আপনার তৃপ্তির জন্য আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতেও প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ী আমি, যে বুদ্ধির কথা আপনি বল্‌ছেন, তার সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই।

রাজার ললাটে হতাশার মেঘ ঘন হ'য়ে ঘনিয়ে এলো। সভা ছেড়ে তিনি আবার উঠে' দাঁড়ালেন। কিন্তু দরবার ত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বেই এবার দূরে একপ্রান্তে উঠে' দাঁড়ালো এক নাগরিক; দীর্ঘ বলিষ্ঠ তার দেহ, চোখে তার বুদ্ধির দীপ্তি, মুখে তার দৃঢ়তার ছাপ। সে বল্‌লে—রাজকন্যার সন্ধান পাবো কিনা জানি না, তবে বিপদকে যে বিপদ ব'লে মনে করে না এবং ছল ও বল যখনই যেটার দরকার, সমান ভাবে তার প্রয়োগে যার সঙ্কোচ নেই আমি সেই লোক। সে রকমের লোকের যদি মহারাজের প্রয়োজন হয়, আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।

রাজা আবার মন্ত্রীর দিকে চোখ্‌ ফিরালেন। ধীরে ধীরে উঠে' দাঁড়িয়ে মন্ত্রী বল্‌লেন—মহারাজ, রাজ্যের সকলেই ওকে চেনে। ওর নাম তুহিন। কিন্তু ওর নিজের নামের চাইতে 'বেপরোয়া' নামেই ও বেশী পরিচিত। সে-লোকের কাছে আপনি কোন্ বড় কাজের প্রত্যাশা করেন, কারাগার আর ঘরের ভিতরে যার কোনো প্রভেদ নেই, যে পরের বুকেও ছুরি হানে এবং নিজের বুকে ছুরি হান্‌তেও দ্বিধা করে না?

রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে বল্‌লেন—বন্ধু, আমি তোমার নাম শুনেছি, তোমার প্রস্তাবে সভার মুখে যে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে' উঠেছে তাও দেখ্‌লুম। কিন্তু যে নিজের জীবনের মায়া রাখে না এ তো তারি কাজ। সুতরাং রাজকন্যার অন্বেষণের ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ কর্‌লুম।

স্থির হ'লো—পরের দিন রাজার জাহাজে চ'ড়ে তুহিন সমুদ্র-যাত্রা কর্‌বে, যে দেশে লূতার সুতার বসন তৈরী হয় সেই দেশের রাজকন্যাকে আন্‌বার জন্য।

* * * *

ভোরের দিকে আকাশ ছিল সেদিন ভারি স্বচ্ছ, নীলের ছোপে ছোপানো। রোদের অজস্র উচ্ছল হাসি তার শূন্য ছাপিয়ে ঝর্ণার মতো ঝ'রে পড়্‌ছিল পৃথিবীর বুকের উপরে। এমন চমৎকার দিন, আর তারি ভিতর দিয়ে অসম্ভবের অনুসন্ধানে খেয়ালী রাজার জন্য খেয়ালী 'বেপরোয়ার' যাত্রা। সুতরাং তাকে বিদায় দেবার উদ্দেশ্যে রাজ্য ভেঙে সকলে এসে জড় হ'লো সমুদ্রের তীরে।

কিন্তু রোদের মিষ্টি আলো কড়া হ'য়ে উঠ্‌বার আগেই আকাশের এক টেরে দেখা দিল ছোট্ট এক টুক্‌রা মেঘ। তারপর সেই মেঘ বাড়্‌তে বাড়্‌তে ছেয়ে ফেল্‌ল সমস্ত আকাশ; নীলের রং হ'য়ে উঠ্‌ল ঘন কালির মতো কালো। আর সেই কালোকে ভেদ ক'রে ছুটে' চল্‌ল সোনার সাপের মতো এঁকে বেঁকে বিদ্যুতের চোখ্‌-ঝল্‌সানো তলোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের অজগরেরা গুমরে উঠে' আকাশময় গড়িয়ে ফির্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

উপরের আকাশও অসীম, নীচের সমুদ্রও অসীম। এক অসীমের রোষের ছোঁয়াচ এসে লাগ্‌ল আর এক অসীমের বুকে। যে সমুদ্র ছিল শান্ত, তারি বুকে জাগ্‌ল প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য। পাহাড়ের মতো উঁচু হ'য়ে উঠে' ঢেউগুলো এসে লাফিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল দুর্ব্বল বালু-বেলার বুকের উপরে। কোনোটা বা আবার মাঝপথেই ভেঙে ক্রুদ্ধ ক্লান্ত জানোয়ারের হাঁর মতো মেলে ধর্‌লে বীভৎস মুখ—শ্রান্তির ফেনাতে ভরা, রোষের গর্জ্জনে মুখর।

আকাশ বাতাস সমুদ্র যখন এমনি ক'রে মেতে উঠেছে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে, তখনই তুহিনকে সঙ্গে নিয়ে রাজা এসে দাঁড়ালেন সাগরের বেলাভূমির উপরে। সমুদ্রের দিকে একবার চোখ্‌ বুলিয়ে নিয়ে রাজা বল্‌লেন—বেপরোয়া, আজ তো তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। ব'লে দাও তোমার সঙ্গীদের জাহাজ নিরাপদ স্থানে নোঙর ক'রে আজ্‌কের মতো যে যার বাড়ীতে ফিরে' যাক্‌।

তুহিন জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন মহারাজ, কিসের জন্যে আপনি এ আদেশ কর্‌ছেন?

রাজা বল্‌লেন—দেখ্‌ছ না, আকাশে জেগেছে আজ মৃত্যুর হাতছানি, বাতাস ভ'রে উঠেছে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যে, সাগরে বাজ্‌ছে ধ্বংসের বিষাণ। সদ্য মৃত্যুর মুখে হাতে ধ'রে তো তোমাকে আমি তুলে' দিতে পারি নে।

তুহিন বল্‌লে—কিন্তু মহারাজ, আমার পক্ষে আজ্‌কের দিনই তো যাত্রার সব চেয়ে শুভ দিন। ঝড়ের ভয়ে যারা সমুদ্রে ভাস্‌তে ভড়্‌কে যাবে, আপনি কি ক'রে আশা করেন যে, তারাই এনে দেবে আপনাকে সাত সমুদ্র তের নদীর পরপারে পাহাড় ঘেরা যে দেশ, সেই দেশের রাজকন্যাকে? দুঃসাহস আর দুঃখ—এরাই তো আমাদের সঙ্গী। আমার সঙ্গে যারা যাবে তাদের যাচাই ক'রে নেবার এমন সুযোগ কাল হয়তো আর না-ও মিল্‌তে পারে। সুতরাং মহারাজের জয় হোক্‌। আজ্‌কের এই দুর্য্যোগই হ'বে আমাদের যাত্রা-পথের প্রথম পাথেয়।

জাহাজে চ'ড়ে মাঝি-মাল্লাদের সকলকে ডেকে তুহিন বল্‌লে—বন্ধুগণ, ঝড় আমাদের মিতা, দুর্য্যোগ আমাদের বন্ধু, দুঃসাহস আমাদের হাতিয়ার। আমাদের পথ আরাম ও বিলাসের ভিতর দিয়ে নয়, হাসি ও ফুলের আস্তরণের উপর দিয়ে নয়। সুতরাং আজকের এই ঝোড়ো হাওয়াকে সাম্‌নে রেখেই সমুদ্রে আমাদের জাহাজ ভাসাতে হ'বে। তোমরা পাল তোলো, নোঙর খোলো, আর যে ভয় পাও—এখনো সময় আছে—এই-খানেই সে নেমে পড়ো।

বেপরোয়ার সঙ্গীদের মুখের উপরে উপেক্ষার একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা শুধু ফুটে' উঠ্‌ল। তারপরেই ঝড়ের হাওয়া লেগে পালগুলো উঠ্‌ল ফুলে', জাহাজখানা উঠ্‌ল দুলে' এবং পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মাথার উপর দিয়ে সে জাহাজ ছুটে'ও চল্‌ল সীমাহীন সাগরের বুক ভেদ ক'রে সেই অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে যে দেশের রাজকন্যার দেহ ঘিরে' জড়িয়ে থাকে লূতার তন্তুর মতো সূক্ষ্ম বস্ত্রের আচ্ছাদন।

* * * * *

মস্ত বড় দেশ। সাগর প'ড়েছে তার শাড়ীর আঁচল, তুষার-কিরীট পাহাড় প'ড়েছে তার মাথার মুকুট। রাতে নীলার মতো নীল তার আকাশে জ্যোৎস্নার আলো হীরে ঝরায়, দিনে অমৃতের মতো রোদের ধারায় স্নান ক'রে মাটি হ'য়ে ওঠে তার সবুজ। আর এই সবুজ মাটির প্রান্তর ভ'রে ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে তার অফুরন্ত শস্যের ভাণ্ডার। এম্নি দেশের বুকে একদিন এসে ভিড়্‌ল তুহিনের জাহাজ।

মাটির উপরে পা দিতেই চা'র ধারে তার অসংখ্য নর-নারীর ভিড় জ'মে উঠ্‌ল। দৃষ্টিতে তাদের বিস্ময় আছে কিন্তু অসৌজন্য নেই—কৌতূহল আছে কিন্তু সে কৌতূহল অবিশ্বাসের উগ্রতায় কালো হ'য়ে ওঠে না। তুহিন আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এ কেমন দেশ, বিদেশীর উপরেও এদের অবিশ্বাস নেই! তার অভিজ্ঞতার চেহারা এক মুহূর্ত্তে বদ্‌লে গেল। সে তার সঙ্গীদের ডেকে বল্‌লে—ডবল নোঙরের শিকল পরাও জাহাজের পায়ে। হয়তো কিছুদিন আমাদের এই দেশেই ডেরা বেঁধে বাস কর্‌তে হ'বে।

নতুন দেশের রাজপথ দিয়ে চ'লেছে তুহিন। চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এসে পা দু'খানা তার হঠাৎ থম্‌কে থেমে গেল। বিকিকিনি চ'লেছে নানা জিনিষের। কিন্তু তারি মধ্যে ও কি বস্তু? একখানা কাপড়ের একটা প্রান্ত ধ'রে দোকানী তার আর একটা প্রান্ত হাওয়ায় ছুঁড়ে' দিয়ে হাঁক্‌লে—'আব্‌রোঁয়া', সঙ্গে সঙ্গে সে প্রান্তটা হাওয়ায় মিশে' শূন্যের মাঝখানে মিলিয়ে গেল। ঐ তো লূতাতন্তুর বস্ত্র! এই তবে সেই দেশ যেখানে লূতার সূতা দিয়ে মানুষের দেহের আচ্ছাদন তৈরী হয়! তুহিনের ছোট ছোট চোখ্ দু'টো আনন্দের আলোকে ইস্পাতের ছুরির মতো চক্ চক্ ক'রে উঠ্‌ল।

নিজেদের দেশ থেকে যে সব জিনিষ তারা নিয়ে এসেছিল তারি বিনিময়ে একদিন তুহিন কিনে' আন্‌লে এই লূতাতন্তুর একটা টুকরো। জিনিষটা পর পর সাতটা ভাঁজ ক'রে দেহের উপরে ফেলে সে দেখ্‌লে তাতেও দেহের লজ্জা ঢাকে না, জলের ভিতরে ফেলে দেখ্‌লে কাপড়খানা বিলকুল মিলিয়ে গেছে জলের ঢেউ-এর সঙ্গে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে দিলে ছড়িয়ে ময়দানের ঘাসের উপরে। সাদা জিনিষটা সবুজ ঘাসের সঙ্গে মিশে' এক হ'য়ে মিলিয়ে গেল।

একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে নিজের মনে মনেই তুহিন বল্‌লে—দেশ পাওয়া গেল, বস্ত্রও পাওয়া গেল। কিন্তু রাজকন্যা? এইবার এই লূতাতন্তুর বসন পরেন যে রাজকন্যা তুহিনের সন্ধানী মন তাঁকেই খুঁজে' বা'র কর্‌বার জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

পাষাণের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রাজপুরী। তারি ভিতরে কালো কষ্টিপাথরের সৌধ। তারি একটি কক্ষে শ্বেতপাথরের দেয়ালের আড়ালে রাজকন্যা বাস করেন। দক্ষিণের দিকে জাফ্‌রি-কাটা জানালার ধারে থাকেন তিনি শুয়ে'। তাঁকে হাওয়া করে গোলাপের বনে গড়াগড়ি দিয়ে মিঠে হ'য়ে উঠেছে যে বাতাস সেই বাতাসের চামর। তিনি হাসেন—সে হাসির ভিতর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মুক্তার দীপ্তি, কথা বলেন—সে কথার ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে যায় বহুদূর থেকে ভেসে-আসা বাঁশীর সুর। লূতার-সূতার বসনে ঢাকা প'ড়েও ঢাকা পড়ে না তাঁর অঙ্গের সৌষ্ঠব। নদীর বান যেমন উছ্‌লে উঠে' উপ্‌চে পড়ে, চলার সময় তেমনি তাঁর দেহের তট ছাপিয়ে উছ্‌লে উঠে' উপ্‌চে পড়ে রূপের আলো। দুনিয়ার সব শিল্পীর সেরা শিল্পী যে, যৌবন নিপুণ হাতের তুলি দিয়ে তাঁর দেহের নতোন্নত ভাঁজগুলো সেই দিয়েছে টেনে। মেঘের মতো কালো অলকে দোলে তাঁর নীলপদ্মের মালা, পরিপুষ্ট স্তনের উপরে জলে তাঁর হীরের চুম্‌কি। স্থূল জঘনের উপরে অলসভাবে এলিয়ে প'ড়ে থাকে তাঁর মরকতের মেখলা।

তুহিন দেখ্‌লে সে বড় কঠিন ঠাঁই। সাত তোরণে সাত শত প্রহরী ভিড় ক'রে আছে রাজকন্যাকে পাহারা দেওয়ার জন্য। হাতে তাদের ধারালো হাতিয়ার, চোখে তাদের শ্যেনের দৃষ্টি, মনে তাদের বাঘের সাহস। সেখান থেকে তাঁকে চুরি ক'রে আনা অসম্ভব।

অবস্থা দেখে তুহিনের মনেও আশার ভিৎটা যেন একটু ন'ড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু তার দেহের ভিতরে ছিল সেই মন যা কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করতে জানে না, কোনো বাধার সাম্‌নে স'রে দাঁড়ানোর কল্পনাও যার অপরিচিত। তাই রাজকন্যাকে হরণ করবার জন্ত নানা ফিকিরও সে খুঁজে ফিরতে লাগ্‌ল। যার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে পথের নিশানা খুঁজে' পেতেও তার দেরী হয় না।

রাজা দরবারে ব'সেছেন। মাথার উপরে জরীর তারে কাজ-করা চন্দ্রাতপ, চা'র ধারে তার মুক্তোর ঝালর। পা'র তলে পুরু নরম গালিচা। বসন্তের হাওয়া লেগে গাছের মাথায় যখন নতুন পাতার মঞ্জরীগুলো বেরিয়ে আসে, তখন তার যে রং হয় গালিচার গায়ে সেই রং-এর আমেজ। এই গালিচার উপরে হাতীর দাঁতের সিংহাসন মণি-মুক্তা হীরে-পান্নার দীপ্তিতে অপরূপ। সেই সিংহাসনের উপরে ব'সে চা'র পাশে পাত্র-মিত্র সভাসদ নিয়ে রাজা তাঁর নিত্যকার কাজ ক'রে চ'লেছেন, হঠাৎ মাটির সাথে মাথা নোয়ায়ে রাজাকে অভিবাদন ক'রে সেখানে এসে দাঁড়ালো তুহিন—বরফের মতো সাদা যার রং, শিলার মতো সুগঠিত যার দেহ।

রাজা বল্‌লেন—তুমি কে? কি চাই তোমার আমার দরবারে?

তুহিন বল্‌লেন—আমরা কয়েকজন বিদেশী, ভাগ্যান্বেষণে এসেছি আপনার রাজ্যে। আমরা আপনার আশ্রয়-প্রার্থী।

রাজা বল্‌লেন—কোন্ বিদ্যা তোমাদের অধিগত? কোন্ সেবার বিনিময়ে তোমরা পেতে চাও রাজার অনুগ্রহ?

তুহিন বল্‌লে—সেবার ভিতরে আমরা কোনো বাছ-বিচার রাখিনে মহারাজ। যে সেবা যেমন ভাবে আপনি চান, আমি এবং আমার অনুচরেরা নিঃসঙ্কোচে তাই আপনাকে দান করব।

রাজা খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—আমি তোমাকে আমার সভাসদদের ভিতরে স্থান দান করলুম।

কাজেও দেখা গেল সেবার ভিতরে সত্য সত্যই তাদের কোনো রকমের বাছ-বিচার নেই। রাজার অনুগ্রহ লাভের জন্ত কোনো দুঃসাধ্য কাজকেই তুহিন এবং তার অনুচরেরা অসাধ্য ব'লে মনে ক'রে না। প্রাণকে পণ রেখেই তারা চেষ্টা করে রাজাকে খুশী করতে। তাঁর খেয়ালের তারা রসদ যোগায়—সে খেয়াল ভালো কি মন্দ তার দিকে তারা ফিরে'ও তাকায় না। এম্‌নি ক'রে ধীরে ধীরে তারা রাজার প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌ল। এইবার তাদের কাজ হ'লো কেবল খেয়াল মিটানো নয়, রাজার মনে নানা রকমের বদখেয়ালেরও সৃষ্টি করা। দুর্ব্বল রাজা নিজের শক্তির দম্ভে মত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। মানীর সম্ভ্রম হ'য়ে উঠ্‌ল তাঁর কাছে খেলার বস্তু, যুবতীর যৌবনের উপরে জাগ্‌ল তাঁর লোভ। দরবার ছেড়ে ডেরা বাঁধলেন তিনি বিলাস-মঞ্জীলে। রাজা রাজকার্য্য দেখেন না, প্রজা পায় না তার অন্যায়ের প্রতিকার। দুঃখীর কান্না রাজ-প্রাসাদের দোর থেকে প্রতিহত হ'য়ে আকাশের দিকে গুমরে উঠে' ভগবানের কাছে তাদের নালিশ জানায়।

দিন আসে দিন যায়। যে রাজার নামে ছিল প্রজার আনন্দ, তিনিই হ'য়ে উঠ্‌লেন সকলের কাছে বিভীষিকার বস্তু। যে শ্রদ্ধা রেখেছিল তাঁকে সকলের কাছে মনের মাণিক ক'রে সেই শ্রদ্ধাই লুটিয়ে পড়্‌ল পথের ধূলোর উপরে। এই ভাবে যা রাজ্যের সবচেয়ে বড় বনিয়াদ তাতেই ধর্‌ল ভাঙন। আর বনিয়াদে যখন ভাঙন ধরে তখন রাজ্য ধ্বংস হ'তেও খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। তুহিনের তৎপরতায় রাজ্যের ভিতরে অন্তর্বিপ্লবের মেঘ ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠে' কাল-বৈশাখীর মেঘের মতো দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। মন্ত্রীর সঙ্গে সে গোপনে পরামর্শ করলে, সেনাপতিকে দেখালে সিংহাসনের লোভ, অমাত্য-পারিষদদের ভিতরে জাগিয়ে তুললে মসনদ লাভের দুরাশা। যাকে এ-সব দিয়ে ভুলাতে পারলে না তাকে সে মুগ্ধ করলে রাজ্যের কল্যাণের লোভ দেখিয়ে

চা'রদিকে থেকে জাল বুনে' বুনে' এমনি ক'রে সে রচনা করলে পরস্পরের প্রতি একটা অবিশ্বাসের আবহাওয়া। তার পরেই একদিন অন্তর্বিপ্লবের আগুন তার জিভ্ মেলে রাজ্যের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়্‌ল।

মানুষের পরাজয়ের মূলে থাকে তার দেহ-মনের অধঃপতন। তাই এ কথাটা বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিতেও নাগরিকদের দেরী হ'লোনা।

যুদ্ধ হ'লো, কিন্তু সে খুব বড় যুদ্ধ নয়। লোক ম'রে রক্ত ঝর্‌ল, কিন্তু সে রক্তের পরিমাণ সামান্যই। আগেকার দিন হ'লে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে দেশ রক্তের সমুদ্র রচনা কর্‌ত, সেই দেশে যে রক্ত ঝর্‌ল তাতে রণক্ষেত্রের মাটিতে কাদারও সৃষ্টি হ'লো না। যুদ্ধ শেষে নিজের সৈন্যদের হাতে রাজা নিজেই বন্দী হ'লেন।

পরের দিন ভোরের আলোকে রাজ্যের লোকেরা চোখ মেলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখ্‌তে পেলে—দুর্গ-তোরণ থেকে তাদের রাজার নামাঙ্কিত পতাকা নেমে গেছে, আর তার জায়গায় উড়্‌ছে অচেনা নামের ছাপ-আঁকা এক নিশান। তারা বিস্মিত হ'য়ে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ালো রাজ-দরবারে। সেখানেও তারা দেখ্‌তে পেলে—তাদের রাজার সিংহাসনের উপরে বিদেশী তুহিনের মাথায় রাজ-মুকুটের মরকত মণিটা ধক্ ধক্ ক'রে জ্বল্‌ছে। আর দোরে দাঁড়িয়ে নকিব হাঁক্‌ছে—

"রাজ্যের ভিতরে সৃষ্টি হ'য়েছিল অরাজকতার। সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না, প্রজার ধন-রত্ন-জীবন নিরাপদ ছিল না। তাই সেনাপতি তুহিন তাঁর স্বদেশের রাজার নামে গ্রহণ কর্‌লেন আজ হ'তে এ দেশের শাসন-ভার। যে উৎপীড়িত তাকে দেবেন তিনি আশ্রয়, যে অত্যাচারী তার উপরে আস্‌বে নেমে তাঁর নিগ্রহের বজ্র। যেখানে জেগে উঠেছে অশান্তির হাহাকার, সেইখানে আন্‌বেন তিনি সোয়াস্তির আনন্দ। যে তাঁর কাছে মাথা নোয়াবে তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য তিনি প্রাণকেও পণ রাখ্‌বেন। কিন্তু যে তাঁর বিরুদ্ধে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়াবে, তার মাথার উপরে খাঁড়ার আঘাত হান্‌তেও তিনি দ্বিধা কর্‌বেন না। নাগরিকেরা যেন এ-কথা কখনো বিস্মৃত না হ'ন যে, তুহিনের প্রতিহিংসার হাত হ'তে এ পর্য্যন্ত কেউ কোথাও অব্যাহতি পায় নি।"

অপ্সরীদের কেলিকুঞ্জের মতো রাজ-অন্তঃপুরের উদ্যান। রাতের নিভৃতে জ্যোৎস্না যে আলো ঝরায় তারি ধারায় স্নান ক'রে সেখানে ফোটে গোলাপের হাসি, কমলের দীপ্তি ও চাঁপার লাবণ্য। গন্ধে তাদের বাতাস হ'য়ে ওঠে ভারি ও মন হ'য়ে ওঠে মাতাল।

এই বাগানের ভিতরে নরম গালিচার মতো সবুজ ঘাসের অস্তরণের উপর স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিলেন রাজকন্যা। তাঁর হাসির যে দীপ্তি ভোরের আলোকেও ম্লান ক'রে দিত ঠোঁটের উপর থেকে হারিয়ে গেছে তার সমস্ত চিহ্ন। তার জায়গায় কালো দু'টো চোখ্ ছাপিয়ে জেগে উঠেছে একটা করুণ দৃষ্টি, আকাশের মতো উদাস, সাগরের মতো গভীর। রেশমের মতো সুন্দর অজস্র চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে তাঁর চোখের কোঠায়, মুখের পাশে, জরীর সূতা দিয়ে পাড় পরানো, চুনি-পান্নার বুটি দেওয়া লূতাতন্তুর তৈরী শাড়ীর উপরে। জ্যোৎস্নালোকে এখন তাকে দেখে মনে হয় যেন একটা সাদা পাথরের মূর্ত্তি—প্রাণহীন অথচ অপরূপ।

রাজকন্যার ধ্যান ভাঙ্‌ল মহল-প্রতিহারিণীর পদশব্দে। সে এসে রাজকন্যাকে অভিবাদন ক'রে বল্‌লে—বর্ত্তমান মহারাজা রাজকুমারীর সাক্ষাৎ চান।

স্বপ্নের আবেশ-ভরা চোখ্ দু'টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রাজকন্যা বল্‌লেন—তাঁকে নিয়ে এসো।

ধীরে ধীরে সেখানে এসে দাঁড়ালো তুহিন। মুখ তুলে' রাজকন্যা বল্‌লেন—তুমিই নতুন রাজা?

তুহিন বল্‌লে—না রাজকন্যা, আমি রাজা নই—রাজার প্রতিনিধি।

—তোমার রাজা কোথায়?

—সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তিনি রাজকন্যার প্রতীক্ষা ক'রে দিন গুণ্‌ছেন।

—তোমার কথার ভিতরে হেঁয়ালীর গন্ধ আছে, অর্থ ধর্‌তে পার্‌ছি নে। ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো।

তুহিন বল্‌লে—তুষার-পুরীর রাজার খেয়াল হ'লো, লূতার তন্তু দিয়ে গড়া যে কাপড় তাই দিয়ে দেহের লজ্জা নিবারণ করেন যে রাজকন্যা তাকেই তাঁর চাই। দেশ দেশান্তরে লোক ছুট্‌ল; সহরে, নগরে, পল্লীতে খোঁজা হ'লো তন্ন তন্ন ক'রে, কিন্তু লূতা-তন্তুর কাপড়-পরা রাজকন্যার সন্ধান মিল্‌ল না। তারপর তাঁরি অনুসন্ধানে সমুদ্রের বুকে ভাস্‌ল আমার ভেলা। সাগর পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে কি ক'রে যে এ-দেশে এসে পৌঁছেচি, তারি দীর্ঘ তার কাহিনী। সে কাহিনী···

রাজকন্যা তাকে বাধা দিয়ে বল্‌লেন—সে কাহিনী থাক্। কারণ তার উপসংহার আমি জানি। কিন্তু এরি জন্য তুমি ধ্বংস কর্‌লে এমন একটা রাজ্য—শ্রীতে, সম্পদে, শান্তিতে সারা দুনিয়ায় যার জোড়া ছিল না! রাজকন্যার গলার স্বর অশ্রুর বাষ্পে ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু একটু পরেই আত্ম-সম্বরণ ক'রে তিনি আবার বল্‌লেন—তোমার রাজাকে ব'লো, তাঁর এবং আমার ভিতরে প্রাচীর তুলে' ব্যবধান রচনা ক'রেছে আমার পিতৃ-পিতামহদের রক্ত, আমার দেশের সর্ব্বনাশ—যে দেশ আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বড়। সুতরাং আমাদের মিলন অসম্ভব।

তুহিন বল্‌লে—রাজকন্যা, আমি নফর মাত্র। রাজার কাছে দাঁড়িয়ে সব কথা গুছিয়ে বল্‌বার সাহস আমার নেই। সুতরাং তাঁকে যা বল্‌বার আপনাকেই তা বল্‌তে হ'বে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। আপনার হুকুম হ'লে পুর-পরিখার প্রান্তে এনে জাহাজ ভিড়াতেও আমার দেরী হ'বে না।

রাজকন্যার নীল পদ্মের মতো স্নিগ্ধ চোখ্ আগুনের শিখার মতো জ্ব'লে উঠ্‌ল। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পরেই শান্ত কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—অর্থাৎ আমি তোমার বন্দী। বিদেশী সেনাপতি, এদেশের রাজকন্যা কখনো কারো অনুগ্রহ বাচ্‌ঞা করে নি, আজও কর্‌বে না। তাকে ভয় দেখানো নিষ্প্রয়োজন। তোমার জাহাজ তৈরী হ'লেই দেখ্‌তে পাবে আমার যাত্রার আয়োজনও শেষ হ'য়ে গেছে।—ব'লেই তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ কর্‌লেন।

রাতে ঝড় হ'য়ে গেছে। তুষার-পুরীর রাস্তার বুকের উপরে জ'মে উঠেছে তুষারের স্তূপ। তার গাছের মাথা হ'য়েছে সাদা, পাহাড়ের চূড়া হ'য়েছে সফেদ, ছাদের আলিসায়, জানালার গরাদেতে ঝুলে' আছে থোকা থোকা সাদা বরফের চাপ। তারি উপরে এসে পড়্‌ল ভোরের সূর্য্যের আলো। সে আলো গাছের মাথায় ফুটালো হীরকের ফুল, পাহাড়ের মাথায় দুলালো মণি-মরকতের চন্দ্রহার, সৌধের চূড়ায় ও রাস্তায় ছড়ালো ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিলাস।

রাজপ্রাসাদের জানালায় ব'সে রাজকন্যা উন্মনার মতো চেয়েছিলেন প্রকৃতির সেই অস্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের দিকে। এম্‌নি সময় সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন তুষার-পুরীর রাজা—তরুণ দেহে যার বাইরের বরফের মতোই শুভ্রতার দীপ্তি। রাজকন্যার কাছে এগিয়ে এসে তিনি বল্‌লেন—রাজকুমারী, সাম্‌নের ঐ তুষার-স্তূপের মতোই তুমি কঠিন। কিন্তু তুষারও তো গ'লে যায়। তোমার মন কি কখনো গল্‌বে না?

ক্লান্ত ম্লান চোখ্ দু'টি আস্তে আস্তে টেনে তুলে' রাজকন্যা বল্‌লেন—তুষার গলে সূর্য্যের আলোকে। কিন্তু আমার মনে সে সূর্য্যের আলো কোথায় যার ছোঁয়ায় গ'লে যাবে তার এই দুঃখের তুষার-স্তূপ? মহারাজ, তুমি আমাকে মার্জ্জনা করো।

—সেই এক কথা, মার্জ্জনা করো। কত যুগ গেছে আমার অশ্রুজলের ভিতর দিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাসের আগুনে আমার জীবনে কত আনন্দের ফুল শুকিয়ে ম্লান হ'য়ে ঝ'রে প'ড়েছে। আমার কত বিশ্বস্ত অনুচরের বুকের রক্ত ঝর্‌ণার জলের মতো ঝ'রেছে তোমাকে জয় ক'রে আনার পথে। এত দুঃখ আমি সহ্য ক'রেছি সে কি তোমাকে শুধু পেয়ে হারাবার জন্য? তা হয় না রাজকন্যা। তোমাকে আমার চাই-ই।

—চাই-ই?—আমাকে যদি তুমি সহজ পথে চাইতে মহারাজ, তবে হয়তো তোমার গলায় বরমাল্য ছুলিয়ে দিতে আমি দ্বিধা করতুম না। কিন্তু তোমার পথে পথে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা। আমি যে দেশের রাজকন্যা সে দেশের লোক ও-গুলোকে কুষ্ঠের মতো কুৎসিত ব'লে মনে করে।

অসহিষ্ণু হ'য়ে রাজা বল্লেন—কিন্তু আমার সাধনা? তারও কি কোনো দাম নেই?

রাজকন্যা বল্লেন—বীভৎসতা দিয়ে সুন্দরের সাধনা হয় না মহারাজ। তুমি যে সাধনা ক'রেছ তা দিয়ে একটা সুখী, শান্তি-প্রিয় জাতির পায়ে লোহার শৃঙ্খল জড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তা দিয়ে প্রেমের দেবতাকে—সুন্দরকে জাগানো যায় না।

ক্রোধে অপমানে রাজার কণ্ঠস্বর তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন—মনে রেখো রাজকন্যা, প্রেমের সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আমি তোমাকে নির্য্যাতন করতে চাই নে, কিন্তু তুমিও আমাকে নির্য্যাতন করতে বাধ্য ক'রো না।

রাজকন্যার ঠোঁটের উপরে উপেক্ষার ছোট এক টুক্‌রো হাসি ইস্পাতের ছুরির মতো চক্ চক্ ক'রে উঠ্‌ল। তিনি বল্লেন—আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মহারাজ? কিন্তু তুমি কি আজও বুঝতে পারো নি, ভয়ে যে বশ্যতা স্বীকার করে আমি তাদের দলের নই। তোমার এবং আমার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আমার দেশ। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব।

—তাই যদি হয়, আমার দয়াও আর তোমার জন্য অনর্থক খরচ হ'বে না রাজকন্যা। রাজ-সিংহাসন যদি তোমার কাম্য না হয়, তবে রাজ-প্রাসাদেও তোমার স্থান নেই। তোমাকে গ্রহণ করতে হ'বে বন্দীশালার বন্ধন।

—তোমার রাজপুরীর চাইতে বন্দীশালার বন্ধন আমার কাছে ঢের বেশী কামনার বস্তু মহারাজ।

—যেখানে নিজের মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে তোমাকে উপার্জ্জন করতে হ'বে তোমার বেঁচে থাকার পাথেয়।

—আমার দেশ, আমার সভ্যতা আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, পরিশ্রমের দ্বারা যে অন্ন সংগ্রহ না ক'রে সে নিজের অন্ন ভাগ চুরি করে পরের অন্নের ভাগ হ'তে।

—তাই যদি হয়, আমি এই আদেশ দিলুম রাজকন্যা, বন্দীশালার ভিতর ব'সে আজ থেকে তোমাকে বুনতে হ'বে লুতার তন্তু দিয়ে সূক্ষ্ম সুন্দর বসন। তোমার ঘরের প্রহরী আমি মানুষ রাখ্‌ব না। কারণ তোমার যে রূপ তাতে মানুষকে ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ। তাই তোমার চা'র পাশে থাক্‌বে যত সব কলের প্রহরী। লোহা-লক্করের ঝঞ্ঝনা বাজিয়ে তারা অনবরত তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, তুমি বন্দী। কালো ধোঁয়ার ঘেরা থাক্‌বে তোমার আকাশ বাতাস। সে ধোঁয়ার আঁচ্ লেগে তোমার চোখ্ জ্বলতে থাক্‌বে, নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আস্‌বে। কালির ঝুল মেখে সোনার চাঁপার মতো রং হ'য়ে উঠ্‌বে তোমার কুৎসিত বিশ্রী ভয়াবহ। রাজার প্রেমকে উপেক্ষা করবার দুঃখ যে কতখানি এমনি ক'রে উৎপীড়নের জাঁতায় পিষে' তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো।

তোমার জয় হোক্ মহারাজ। তোমার আদেশ আমি মেনে নিলুম। তোমার বন্দীশালাই আজ থেকে হ'বে আমার ঘর। গতর খাটিয়ে যে মজুরী পাবো তাই হ'বে আমার অন্ন-বস্ত্রের অবলম্বন। তোমার কাজে আমি ফাঁকি দিতে চাইনে, কিন্তু সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি স্বপ্ন দেখ্‌ব আমার মুক্তির। আজ হোক্, কাল হোক্, দশ যুগ পরে হোক্, আমি জানি আমার কান্না আমার দেশের—আমার ভাইদের বুকে একদিন সাড়া জাগাবেই। আর যেদিন সে সাড়া জাগ্‌বে সেদিন সাগরের ব্যবধান হ'বে তাদের কাছে গোষ্পদের মতো, ক্ষ্যাপা ঘোড়ার বল্গা ধ'রে তারা মুখোমুখি হ'বে দাঁড়াবে সেদিন বিপদের ঝড়ের সাম্‌নে। তোমার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার তলে বুক পেতে দিতেও সেদিন তারা আর দ্বিধা করবে না। তাদের বন্দিনী রাজকন্যার মুক্তি হ'বে সেদিন তাদের ধ্যান, তাদের জ্ঞান, তাদের তপস্যা। সেইদিনের প্রতীক্ষায় তোমার উৎপীড়নের সমস্ত দুঃখই আমার বুকে সইবে, তোমার গ্লানি বা লাঞ্ছনার কোনো ব্যথাই আমার কাছে অসহ ব'লে মনে হ'বে না।

* * * *

সেতারের উপরে ছড়্ টেনে্তে টান্তে সহসা তার ছিঁড়ে' গেলে একটা করুণ কান্নায় ফেটে প'ড়ে তার সুর যেমন থম্কে থেমে যায়, নীহারের কণ্ঠস্বর হঠাৎ তেমনি ক'রে থেমে গেল। থামার শব্দে সচকিত হ'য়ে চেয়ে দেখ্লুম—তার মুখের চেহারা একেবারে বদ্লে গেছে, সমস্ত রক্তের ছাপ হারিয়ে সে মুখ ছাই-এর মতো সাদা হ'য়ে উঠেছে।

তার সে মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বল্তে আমাদের কারো সাহস হ'লো না। কিন্তু মীরা তাড়াতাড়ি ছুটে' এসে তার হাত ছু'খানা হাতের ভিতরে তুলে' নিয়ে একেবারে ভেঙে পড়া মেঘের মতো আর্দ্র সুরে ডাক্লে—নীহার !

অকস্মাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে মানুষ যেমন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, নীহারও তেমনি ক'রে তার স্বপ্নের ভিতর হ'তে যেন জেগে উঠ্ল। তারপর তার বড় বড় চোখ্ ছু'টোতে আত্মগ্লানির একটা তীব্র বেদনা ফুটিয়ে তুলে' সে বল্লে—জানো মীরা, এই রাজকন্যাকে তুষারের দেশে আমি এবার দেখে এলুম। দেহ তার সত্য সত্যই কালিয় ঝুলে কালো হ'য়ে গেছে। লোহার শিকলের বন্ধনা বাজে তার সারা দেহ ঘিরে'। তবু সে অপরূপ। সে আমাকে বল্লে—আমি তোমাদের দেশের রাজকন্যা। আমি পথ চেয়ে ব'সে আছি, কবে সেই পথিক আস্বে যে আমাকে দেবে মুক্তির ভরসা, পরিত্রাণের আশ্বাস। এম্নি হতভাগ্য আমি মীরা, যে, সে আশ্বাস আমি তাকে দিয়ে আস্তে পারিনি।

নীহারের বুকের ব্যথা এতক্ষণে অশ্রুর ধারা হ'য়ে গ'লে গ'লে ঝ'রে পড়্তে লাগ্ল। মীরার দৃষ্টির ভিতরে জেগে উঠ্ল স্নিগ্ধ সান্ত্বনার আলো। সেই দৃষ্টির আলো নীহারের অন্ধকার মুখের উপরে ফেলে সে বল্লে—তুমি যে একা, তাই তো পারোনি তাঁকে আশ্বাস দিতে। এবার আমরা ছু'জনে যাবো তাঁর মুক্তির পরোয়ানা নিয়ে। মুক্তি যে তিনি পাবেনই, তোমার মুখের উপরে পাচ্ছি আমি তার আভাস, বাইরের ঐ বাতাসের ভিতরে পাচ্ছি আমি তার ইঙ্গিত।

এতক্ষণ পরে বাহিরের দিকে তাকাবার আমরা ফুর্সুৎ পেলুম। তাকিয়ে দেখি প্রকৃতির চোখে তখনো কান্নার বিরাম নেই। আকাশ ছাপিয়ে ঝর্ছে জল, কিন্তু পৃথিবীর বুক তার ব্যথায় থম্-থম্ কর্ছে।

খড়্গ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কামারশালায় বসিয়া আপন মনে কাজ করিতেছিলাম। চৈত্রের নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে অগ্ন্যুত্তপ্ত লোহার উপর হাতুড়ীর আঘাত পড়িতেছিল—ঠং—ঠং—ঠং। এই শব্দটী আমার বেশ লাগে। নিজের জাতীয় ব্যবসা বলিয়া বলিতেছি না—আমার সত্যই মনে হয় পৃথিবীর আর কোন কঠিন ধাতুর মধ্য হইতে এমন সুর বাহির হয় না।

হাপরের দড়ি টানিতে টানিতে ছোঁড়াটা দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। যে লোহাটাকে পিটিতেছিলাম সেটাকে আবার আগুনে গুঁজিয়া দিলাম। ছোঁড়াটার ঢুলিয়া পড়ার ভঙ্গী দেখিয়া এবার হাসিয়া ফেলিলাম। ঘুমাইতে ঘুমাইতে দিব্য হাপর টানা অভ্যাস করিয়াছে ছেলেটা। আমি ভাবিতেছিলাম নিজের কথা। একটা কথা আমাদের দেশে আছে—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে। আমারও হইল তাই। এই কথাটা রোজই আমি ভাবি, ভাবিয়া সুখ পাই। কামারের ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াও অবশেষে লোহাই পিটিতেছি। বুদ্ধিমান ছেলে দেখিয়া বাবা লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল—আমি চাকরী করিব। আমার আশা ছিল বড় মানুষ হইব। কবি—কিম্বা নেতা এমনি একটা কিছু।

স্কুলের সানুডে সভার কবিতা লিখিতাম—হাততালি পড়িত। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিলাম কোন রূপে থার্ড ডিভিসনে, বৃত্তি পাইলাম না। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইল। চাকরীও মিলিল না। অবশেষে সেই ঢেঁকির মত ধান ভানিতেছি—কামারের ছেলে লোহাই পিটিতেছি। চিন্তাধারায় ছেদ পড়িল। ছোঁড়াটার ঘুম গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। হাত একেবারে থামিয়া গেছে। ধ্যানী বুদ্ধের মত ভঙ্গীতে ছোঁড়াটা নিস্তব্ধ হইয়া ঘুমাইতেছে।

মানুষ না কি চিরদিনই ছেলেমানুষ। খেলার সখ, কৌতুকের প্রলোভন কোন দিনই তাহার যায় না। অকস্মাৎ আমি হাপরের দড়িটার এক প্রান্ত ধরিয়া সজোরে টান মারিলাম। ছোঁড়াটা সে প্রবল ঝাঁকিতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। অমনি হাপরটা চলিতে লাগিল অজগরের মত। আগুনের মধ্যে লোহাটা হইয়া উঠিতে-ছিল জলজলে রাঙা। স্তিমিত আগুন হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু ক্রমশঃ আগুন আবার ম্লান হইয়া আসিল। ছোঁড়াটা আবার ঘুমাইতে সুরু করিয়াছে। লোহাটাকে তুলিয়া কয়টা ঘা মারিয়া জলের মধ্যে সশব্দে ডুবাইয়া দিলাম। আরও কয়টা কাজ ছিল, কিন্তু ভাল লাগিল না। ছোঁড়াটার দেখিয়া আমারও একটু আরাম করিতে ইচ্ছা হইল। ছোঁড়াটাকে শুইতে বলিয়া নিজেও সেইখানে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

সম্মুখে লাল-কাঁকর-বিছানো গ্রাম্য রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রান্তর চিরিয়া চলিয়া গেছে। মাঠের উপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র যেন কাঁপিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতিটা কেমন যেন উদাসীন, স্তব্ধ। এমনি প্রখর দ্বিপ্রহরের একটা মোহ আছে; সে আলস্য আনে—নেশার মত পাইয়া বসে। উন্মুক্ত দক্ষিণ হইতে মিঠা হাওয়ার প্রবাহে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। দূরে প্রান্তর-মধ্যে কোথায় বৃক্ষতলে বসিয়া কোন রাখাল গান গাহিতেছিল তাইরে—নাইরে—নাইরে—না।

এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—যন্ত্র-বিদ, রয়েছ না কি হে! ভাষার ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম বক্তা আমাদের গ্রামের রাজাবাবু রায় মহাশয়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম। এই মানুষটাকে সত্য সত্যই আমি ভক্তি করি। রায় মহাশয় আমার পড়ার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু আমার জন্য কেন—এ অঞ্চলে যে কেহ হোক তাঁহার উপকার হইতে কেহ বঞ্চিত হয় না। আর তাঁহাদের বংশের দান—নাথরাজ চাকরাণ ভূমি ভোগ করে এখানকার শতকরা আশীটা গৃহস্থ। এই রায়েরা বাংলার একটী প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। সম্রাট ঔরংজীবের সময়ে ঢেকার রাজা রামজীবন রায়ের প্রবল প্রতাপ বাংলার ইতিহাসের উপাদান হইয়া আছে। উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে রায়বংশ তখন সমাসীন ছিলেন। ভাগ্য না কি চক্রবৎ। সর্ব্বোচ্চ স্থানে উত্থানের পর গতি হয় তাহার নিম্ন দিকে। রাজা রামজীবনের শেষ জীবনেই নবাব মুর্শীদকুলিখাঁর সহিত সংঘর্ষে রায়-বংশের পতন হইয়াছিল। সেই সময়েই রায়বংশ তাঁহাদের বাসভূমি ঢেকা পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রায়বংশের আরও দুইটী শাখা অন্য দুই স্থানে বাস করিতেছেন। রাজ্য নাই, সম্পদ নাই, কিন্তু এখনও এ অঞ্চলে রায়বংশের জ্যেষ্ঠের উপাধি রাজা-বাবু। সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, কিন্তু এখনও এ অঞ্চলের লোক রায়বংশের অপার স্নেহের ভারে তাঁহাদের পায়ে মাথা নীচু করিয়া চলে। বর্ত্তমান রাজাবাবু শিক্ষিত ব্যক্তি, জেলার সদরে ওকালতী করেন। সরল উদার মানুষ। কিন্তু ওকালতীতে প্রসার তাঁহার হইল না। এ জন্য আমি একদিন দুঃখ করিয়াছিলাম। তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—

যন্ত্রবিদ্, লাঙলের ফাল তুমি তৈরী কর, কিন্তু লাঙলে মাটী চষতে হলে তোমার দ্বারা হয় না। সে কি তোমার অপরাধ? রায়বংশের কাজ ছিল বিচার করা, বিচার প্রার্থনা করা ধাতে সইবে কেন?

লোকে হয় ত শুনিলে বলিবে দাম্ভিক। কিন্তু আমি জানি তা নয়। এ উত্তর তাঁহারই মুখে শোভা পায়। বজ্রাহত দেবতাহীন দেউল বিপুল প্রতিধ্বনিতে কথার যে উত্তর দেয়—সে তাহার দাম্ভিকতা নয়,—সে তাহার স্বভাব।

যাক্। প্রণাম করিয়া লোহার মোড়াখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম। তিনি বসিয়া কহিলেন—

—আঃ—কি রোদই উঠেছে এর মধ্যে। অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি—তোমার কাছে আসি; কিন্তু রোদের ভয়ে বেরুতে পারি নাই। তবু ত মক্কেলের পিছু পিছু ঘুরে আমাদের পোড়-খাওয়া মাথা হে!

বলিয়া আপনার রসিকতায় তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম—আমাকে ডেকে পাঠালেই ত' হ'ত!

—সে কি আর জানি না হে! কিন্তু গ্রাম-প্রান্তের তোমার এই কুটীরখানি আমার বড় ভাল লাগে। আর ধর তোমরা হলে শিল্পী লোক, কোন কাজে হয় ত ভোর হয়ে থাকবে। কিন্তু যে ডাকতে আসবে সে ত' তা' বুঝবে না, ব্যাঘাত ক'রে বসবে। তার পর শোন, একটা জিনিষ তোমাকে দেখাতে এনেছি। যন্ত্রবিদ্ নাম দিয়েছি তোমার—তোমাকে এটা মেরামত ক'রে দিতে হবে। কই রে মতিলাল, এলি?

মতিলাল রাজাবাবুর পাইক। সে আসিয়া নামাইয়া দিল প্রকাণ্ড একখানা খড়্গ। খড়্গখানা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। এত প্রকাণ্ড আর এত ওজনের খড়্গ বলিয়া নয়, খড়্গখানির গঠন-পারিপাট্য সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। অন্যের না হোক, কিন্তু যে লোহা লইয়া নাড়া-চাড়া করে তাহার চোখে এ বস্তু পড়িলে আর চোখ ফিরিবে না। খড়্গখানি হাতে তুলিয়া ওজন অনুমান করিবার চেষ্টা করিলাম।

রাজাবাবু বলিলেন—সেকালে এর ওজন ছিল দশ সের। এখনও আছে সাড়ে সাত সের, কাল ওজন ক'রে দেখেছি আমি। রাজা রামজীবনের সিংহ-বাহিনীর মন্দিরের বলির খড়্গ—কালদণ্ড হল এইটী। তোমাকে ত বলেছি সমস্ত ইতিহাস। রাজার এমনি খড়্গ ছিল দুখানি। কালদণ্ডে নিত্য বলি হ'ত দেবমন্দিরে, আর যমদণ্ডখানি ছিল রাজার নিজের ব্যবহারের জন্যে। সেখানা এখনও অটুট অবস্থায় আছে আমাদের নওয়া-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ীতে।

আমি বলিলাম—এইখানাতেই তবে মহাষ্টমীর বলি বিচ্ছেদ হয়েছিল?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাজাবাবু কহিলেন—হ্যাঁ—সেই রায় বংশের কপাল ভাঙল'। কর্ম্মকার ছেত্তা (ছত্তারক) ব্রহ্মচর্য্য পালন করত, অসুরের মত শক্তিশালী যুবা ছিল সে। অবলীলাক্রমে সে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহিষ বলি করে গিয়েছে। কিন্তু মহাষ্টমীর বলি ছোট একটী পাঠা, সেই পুরুষের হাতে আর এই খাঁড়ায় বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তার কিছু দিন পরেই নবাবের আক্রমণে ঢেকাও ধ্বংস হ'ল। তাঁহার ঠোঁট দুইটী কাঁপিতেছিল। আমি নতমস্তকে খড়্গখানার দিকে চাহিয়া রহিলাম। খড়্গখানার মধ্যস্থলে—ঠিক আঘাতের স্থানটাই ভাঙিয়া গিয়াছে।

রাজাবাবু কহিলেন—ভাগ্য, সবই ভাগ্য হে যন্ত্রবিদ্। রাজার সেবার ত্রিপাপীর বৎসর। সকলে তাঁকে নিষেধ করেছিল নবাবের সঙ্গে বিরোধ করতে। রাজস্ব নিয়ে তখন নবাবের সঙ্গে রাজার বিরোধ চলছিল কি না! কিন্তু তখন কলেশনাথের মন্দির অর্দ্ধসমাপ্ত। রাজস্ব দিতে গেলে মন্দির আর সমাপ্ত হয় না। রাজা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—তোমরা কি ত্রিপাপীর বিঘ্ন এড়াতে কলেশনাথের পূজো রেখে নবাবের পূজো করতে বল? তার পরও লোকে তাঁকে নিষেধ করেছিল। তখন মধ্যে মধ্যে রাজপুরীতে না কি গভীর রাত্রে কার কান্নার সাড়া পাওয়া যেত। রাজা কিন্তু কারও নিষেধ শুনলেন না। কলেশনাথের মন্দির সম্পূর্ণ হল ভাদ্র মাসে, আশ্বিন মাসেই ঢেকার কাহিনী শেষ হ'ল। বলি বিচ্ছেদের পর কর্ম্মকার রামসাগরের বাঁধা ঘাটের রাণার ওপর কোপ মেরে কোপ মেরে খড়্গখানাকে বসিয়ে দিয়ে রামসাগরের জলে আত্মহত্যা করেছিল। সে ত তুমি সব জান বোধ হয়?

কহিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার কাছেই শুনেছি।

—তখনই বোধ হয় এখানার মাঝখানটা ভেঙেছিল। কত দিন যে এখানার অনুসন্ধান করেছি! এত দিনে পাওয়া গেল রামসাগরের ভেতর থেকে। এবার সায়রের জল অনেকটা শুকিয়েছিল—তখন ধারের পাঁক তুলতে তুলতে পেয়েছিল এক চাষী।

রাজাবাবু নীরব হইলেন। আমিও ইতিহাসের কথা ভাবিতেছিলাম। একটী সমৃদ্ধ রাজবংশের পতনের কত কথা কত কল্পনা মনের মধ্যে ফিরিতেছিল। এত বড় নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কোন্ অপরাধে দেবী

বিমুখ হইয়াছিলেন? মনে হইল—হয় তো রাজার অপরাধ ছিল না, অপরাধ করিয়াছিল পূজক কিম্বা আর কেহ; হয় তো বা আমার স্বজাতীয় সেই ছেত্তারই কোন অপরাধ ঘটিয়াছিল! মনের মধ্যে তিনিই জাগিয়া উঠিলেন। মনে মনে কল্পনা করিলাম—এক বিশালদেহ শক্তিশালী ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ পুরুষ। অপার সাহস—বিপুল শক্তি! সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিষ্ঠুরতার কথা মনে জাগিয়া উঠিল। অবলীলাক্রমে দিনের পর দিন শত শত নিরপরাধ পশুর জীবন অটুট ধৈর্য্যের সহিত সে হনন করিয়াছে। কত দিন—হয় তো বা প্রতি দিনই ছিন্ন-কণ্ঠ পশুর রক্তধারায় রক্তাক্ত অঙ্গে সে নৃত্য করিত। কখনও এতটুকু মমতা হয় নাই—চাঞ্চল্য আসে নাই মনে। হয় ত কোনও দিন সে চঞ্চল হইয়াছিল—তাহার সেই নিষ্ঠাভঙ্গের অপরাধেই দেবী তাহার হাতে বলি গ্রহণ করেন নাই। আবার মনে হইল ব্রহ্মচারী যুবা—অন্য অপরাধ কিছু করে নাই ত?—শিহরিয়া উঠিলাম। জীবনও গেছে তাহার অপঘাতে। এখনও বোধ হয় ঢেকার ভগ্নস্তূপে তাহার অশান্ত প্রেতাত্মা নিশীথ রাত্রে মাথা কুটিয়া মরে!

রাজাবাবু কহিলেন—এখানা তোমায় মেরামত করে দিতে হবে যন্ত্রবিদ্! দেবমন্দিরে ত অঙ্গহীন জিনিষ রাখতে নেই। কি বলছ? না—হত্যার খড়্গ বলে হাত দেবে না এতে?

একটু লজ্জিত হইলাম। কথাটার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল।

আমার পিতৃবৃত্তির মধ্যে এই ছেত্তার কর্ম্মও একটা বৃত্তি ছিল। কিন্তু সেইটা আমি গ্রহণ করি নাই। জন্মাবধি আমি কখনও এই বলি দেখিতে পারি না। জাজ্জ্বল্যরূপে মনে পড়ে শৈশবে একবার উৎসাহ করিয়া বলি দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সে দৃশ্য দেখিয়া সেইখানেই কাঁদিয়া উঠি। কোনক্রমে আমাকে থামান যায় নাই। তার পর আমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মরণাক্রান্ত পশুর আর্ত্তনাদ—তার ছিন্ন কণ্ঠের রক্তধারা—পশুর সেই শেষ নিমেষপাত মনে পড়িলে আজও আমি শিহরিয়া উঠি।

এ ইঙ্গিতটা সেইজন্য।

রাজাবাবু আবার বলিলেন—কি—আপত্তি আছে না কি?

করযোড়ে কহিলাম—আজ্ঞে না।

—কিন্তু দেখ, এখানিকে কিন্তু ঠিক সেই পুরানো আমলের মত করে দিতে হবে। যেমন তার বাঁট ছিল আকার ছিল তেমনিটা করে দিতে হবে।

আমি কহিলাম—চেষ্টা করব আমি। কিন্তু পুরানো বাঁট বা এ খাঁড়ার আকার নিখুঁত কেমন ছিল, কেমন করে জানব আমি?

তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন—দেখ, এক কাজ করা যাক। এখন আমার আদালত বন্ধ আছে, চল কালই আমরা নওয়াপাড়া যাই। ঢেকাও কাছে পড়বে। ঢেকা হ'য়েও ঘুরে আসব। নওয়াপাড়ায় বাড়ীতে খড়্গখানার আকার-প্রকারও দেখা হবে—ঢেকাও দেখে আসা হবে। কি বল?

ঢেকা দেখিবার ইচ্ছা ছিল বহু দিন হইতে। তৎক্ষণাৎ রাজী হইলাম, বলিলাম—যে আজ্ঞে।

সোৎসাহে রাজাবাবু বলিলেন—তা' হলে চল কালই রওনা হওয়া যাক।

* * * *

নওয়াপাড়া হইয়া ঢেকায় পৌঁছিলাম অপরাহ্ণ বেলায়।

গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রায়-বংশের কীর্ত্তি-কলাপের ধ্বংসাবশেষ। মেটে গ্রাম্য রাস্তাটা ধরিয়া গ্রামের প্রান্তে পা দিতেই নজরে পড়িল রাস্তাটার দু-পাশে সু-প্রাচীন দেবদারু তরুশ্রেণী পথটাকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। বুঝিলাম এইটাই ছিল রাজপথ। দেবদারু গাছের একটা মহিমান্বিত সৌন্দর্য্য আছে। মুগ্ধ হইয়া গাছগুলির পানে চাহিলাম। দেখিলাম দুইটা গাছের মাথা বাজ পড়িয়া পুড়িয়া গেছে। সুবিশাল কাণ্ডের অঙ্গে বিপুল গহ্বর অন্ধকারে ভরিয়া আছে। মনে হইল—কত বিগত ইতিহাস ওই গহ্বরের মধ্য দিয়া ধরণীগর্ভে মুখ লুকাইয়াছে।

তিনি কহিলেন—ওই দেখ!

শব্দানুসরণে পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইলাম। গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফিরিল না।

সম্মুখেই ধ্বংসোন্মুখ এক বিশাল অট্টালিকা!

অর্দ্ধভগ্ন সু-উচ্চ অলিন্দের উপর তিনটী সুবৃহৎ খিলান এখনও অটুট অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। অলিন্দের এক পাশের আলিসা দেওয়া চত্বর এখনও ঠিক আছে। অপর পার্শ্বেরটী ভাঙিয়া গেছে। অভগ্ন চত্বরটীর গা বহিয়া সিঁড়ি উঠিয়া গেছে। তাঁহার পিছনে পিছনে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া চত্বরের উপরে উঠিলাম। দেখিলাম দালানটীর দু-পাশে দুটী নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠের মধ্যে সেই খিলানওয়ালা হল। হলের নীচে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠের চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়।

এইটীই ছিল রাজার বিচারভবন ও সভাভবন। এই অবারিতদ্বার সভাগৃহে বসিয়া রাজা প্রজাদের দর্শন দিতেন, অভিযোগ, নিবেদন গ্রহণ করিতেন। দক্ষিণ দিকে যে চত্বরটী অটুট ছিল, সেই দিকের দ্বিতল প্রকোষ্ঠখানি এখনও দাঁড়াইয়া আছে, এই দিকের সিঁড়ি দিয়া উপরেও উঠা যায়। রাজাবাবু উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে উপরে উঠিলাম। ফালি বারান্দা-ঘেরা ঘরখানির চারিদিকেই খিলান। সেই খিলানের ফাঁক দিয়া পশ্চিম দিকে যাহা দেখিলাম—তেমনটী বোধ হয় জীবনে আর দেখিব না।

বিশাল এক সরোবর কমলবনে কমলালয়ার কমলাসন হইয়া আছে। চারি পাড়ে তাহার রায়বংশের কীর্ত্তি-কলাপের ধ্বংসাবশেষ।

রাজাবাবু কহিলেন—এই রামসাগর। লম্বায় এক মাইল হবে।

রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ের উপর বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছিল। ছাদহীন অট্টালিকার দেওয়ালগুলি বড় বড় ফাটলে পরিপূর্ণ। ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে জঙ্গল মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। খেজুর, শিমুল, অশ্বত্থ, বাবলা—আরও কত বড় বড় গাছ দেখা যাইতেছিল। তলে তলে ছোট জঙ্গলগুলি ছাইয়া জাতি-টগরের গাছগুলি সাদা ফুলে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। প্রাসাদের ঠিক মধ্যস্থলে অন্দরের ঘাটটী প্রকাণ্ড একটী ছাতিম গাছের নিবিড় ছায়াতলে কত যুগ আগে যেন ঘুমাইয়া গেছে। ঘাটটীর মধ্যস্থলে একটী চত্বর—চত্বরটীর দু'পাশে দুটী পলকাটা মিনার। মিনার দুটীর কোল হইতে চত্বরের পার্শ্বদেশ বাহিয়া দুইটী সিঁড়ি সায়রের জলতলে চলিয়া গেছে। একটা মিনারের পাশে একটা গুলঞ্চ ফুলের গাছ উঠিয়াছে। গাছটার চাঁপার বর্ণ ফুলের ফুলঝুরি দেখা দিয়াছে। পশ্চিম পাড়ে ছিল রাজার ঠাকুরবাড়ী। ভগ্নশীর্ষ সারি সারি দেউলমালার কোলে সুবৃহৎ নাটমন্দিরের চিহ্ন আজও দাঁড়াইয়া ছিল। ঠাকুরবাড়ীর সুবিস্তৃত ঘাটটীই বোধ হয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে।

পশ্চিম আকাশে মেঘের রেশ জমিয়াছিল। তাহারই অন্তরালবর্ত্তী সূর্য্যের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত রশ্মিমালায় নীল আকাশ তখনও উজ্জ্বল মণির মত ঝলমল করিতেছিল। মেঘমালার ছিন্নাংশগুলি অপরূপ লাল রংএ ভরিয়া গেছে। সায়রের জলতলে তার প্রতিবিম্ব। একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিলাম। সম্মুখের পাড়ের কোন একটা গাছ হইতে একটা কোকিল ডাকিতেছিল। একটা হলুদমনি পাখী শিষ দিয়া ডাকিতেছিল 'কৃষ্ণের পোকা হোক'। পদ্মবনের মধ্য হইতে তীক্ষ্ণরবে চীৎকার করিয়া ফিরিতেছিল কতকগুলা জলচর পাখী। অন্দরের জঙ্গলে ডাকিয়া উঠিল একটা ডাহুক।

মেঘান্তরালে সূর্য্যের আলো অস্তাচলে ডুবিতেছিল। ওদিকে আলোকদীপ্তি ম্লান হইয়া আসে, আর এদিকে আকাশের মেঘের কালো মুখ আঁধার হইয়া আসে। তাহারই ছায়ায় সায়রের জলে যেন যুগ-যুগান্তের বিষণ্ণতা ঘনাইয়া উঠিল। মনে হইল রামসাগরের জলতল হইতে আড়াইশো বৎসর অতীতের মর্ম্মঘাতী বিয়োগান্ত ইতিহাস ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। সুদূর উত্তর দিগন্তে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়মালা দিক্‌হস্তীর মত দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারও চারি পাশ ঘিরিয়া নিবিড় বিষণ্ণতা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। বনানী আলোড়িত করিয়া প্রকৃতিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

রাজাবাবু বলিলেন—চল হে যন্ত্রবিদ্—অন্ধকার হয়ে এল। চল ফিরি বাসায়।

বাসায় কিন্তু থাকিতে পারিলাম না। ধ্বংসস্তূপের বিষণ্ণ রহস্য যেন আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। রাজাবাবু গেছেন পাশের গ্রামে এক জমিদারের বাড়ী।

সন্ধ্যার পরই আমি আবার আসিয়া এবার মন্দির-চত্বরের বাঁধা ঘাটে বসিলাম। এই ঘাটটাই বেশ ভাল আছে।

কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। তাহার উপর পশ্চিমের আকাশে মেঘ ঘন হইয়া উঠিতেছিল। বৃক্ষনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ভগ্ন প্রাসাদমালা কোথায় যেন লুকাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে বড় বড় মাছ সায়রের জলে আলোড়ন তুলিয়া ফিরিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জলচর পাখীর দল পদ্মবনে নীড় মধ্যে সুপ্তিভঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। খড়্গখানা সঙ্গে আনিয়াছিলাম—আত্মরক্ষার্থে লাগিতে পারে বলিয়া। সেখানা পাশে রাখিয়া ঘাটের শীতল পাষাণে শুইয়া পড়িলাম। রৌদ্রদগ্ধ দেহ যেন জুড়াইয়া গেল!

ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে ধরণীর রূপ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। মুখ ফিরাইয়া ছিলাম সায়রের দিকে। প্রথমেই পশ্চিমাকাশের উদ্ধত মেঘমালার সীমারেখার কোল হইতে আকাশভরা তারামালার প্রতিবিম্ব লইয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল সায়রের জল। তার পর জলের মধ্যে চোখে পড়িল তীরভূমির বৃক্ষচ্ছায়া। সেই বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্যে জাগিয়া উঠিল বিশাল ধ্বংসস্তূপ। আমার পিছনের নাটমন্দিরের ভাঙা দেউল হিল্লোলিত জল মধ্যে কাঁপিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দেউলের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম—সে কাঁপে না। স্থির নিস্পন্দ হইয়া অন্ধকারের মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হয় তো বা সে দেবতাকে ডাকিতেছে—এস',—হে দেবতা ফিরে এস' বস'। কিম্বা হয় ত বলিতেছে—অবসান কর,—আমার এ জীর্ণ জীবনের অবসান কর। কত জীবনের জীবনান্তের অভিশাপ রক্তলেখায় আমার বুকে আজও মিশিয়া আছে। সে দাহ আমার সহ্য হয় না। অবসান কর।

—বন্ধু!'

চমকিয়া উঠিলাম।—'কে?'

—আমি। তোমার পাশেই আমি রয়েছি। আমি সেই খড়্গখানা। বিস্মিত হইয়া গেলাম। লোহার খড়্গ কথা কয়?

সে বোধ হয় আমার বিস্ময় অনুমান করিয়াছিল। কহিল—হ্যাঁ—বন্ধু, কয়। আড়াইশো বছর আগে মহাতান্ত্রিক এক ব্রাহ্মণ আমার জড়চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন। রাজা রামজীবনের পুরোহিত আমার মন্ত্র-বলে প্রাণবন্ত করেছিলেন। আজ আড়াই শো বছর ধরে আমি দুর্ব্বহ জীবন বহন করছি।

চমৎকৃত হইয়া গেলাম। মনে মনে সে তন্ত্র-সাধককে প্রণাম করিলাম।

তার পর সসম্ভ্রমে কহিলাম—আমায় কি বলছ?

সে কহিল—আমি বলছি, তুমি কি আবার আমাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে?

—তুলব বলেই ত সংকল্প করেছি।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে কহিল—সেই অনুরোধই তোমায় করছিলাম আমি। আমায় পূর্ণাঙ্গ করে তুল না বন্ধু! বরং আমার এ জীবনের তুমি অবসান করে দাও। আমার বেদনা ত তুমি জান। আমার বেদনার সঙ্গে জন্মান্তর হতে তোমার পরিচয় রয়েছে। তোমার কি মনে পড়ে না?

—কি?

—মনে কর বন্ধু, তুমিই সেই কর্ম্মকার ছেত্তা—যে আমায় দিয়ে কত শত জীবের হত্যা সাধন করেছে। মনে কর—মনে কর—পিছনের পানে একবার তাকাও।

শিহরিয়া উঠিলাম।

জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া যেন পিছনের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছিলাম। চকিত হইয়া চোখ মেলিয়া বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। দীপ্ত দিবালোকে নহবৎ-মুখরিত নাটমন্দিরের বিচিত্র শোভায় চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল। সেই নাটমন্দিরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলাম কোন্ জন্মান্তরের আমি। নিকষ পাথরে খোদাই-করা মূর্ত্তির মত দৃঢ় সবল বিশাল দেহ আমার।

আমার পাশেই আমার সে জন্মের বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর আমার সম্মুখে বীরবপু দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দেহের দিকে চাহিয়া ছিলেন. পরণে তাঁহার পট্টবাস—অনাবৃত বিশাল বক্ষে শুভ্র উপবীত ঝলমল করিতেছিল।

বাবা আমায় আদেশ করিল—সামনে রাজা রয়েছেন, প্রণাম কর।

আমি প্রণাম করিলাম।

রাজার কণ্ঠস্বর শুনিলাম—কল্যাণ হোক।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর নাটমন্দিরের সর্ব্ব স্থানে গমগম করিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আবার ক্ষণপরে তাঁহার স্বর শুনিলাম—

—হাঁ, তোমার ছেলে পুরুষ বটে, বলীয়ান বটে কর্ম্মকার। আশীর্ব্বাদ করি দেবসেবা অব্যাহত ভাবে তোমার দ্বারা প্রতিপালিত হোক।

আবার আমি প্রণাম করিলাম। তিনি কহিলেন—

জান বোধ হয়, কেন তোমায় ডেকেছি?

আমি কিছুই জানিতাম না। নিরুত্তর ভাবে তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে আমার সাহস ছিল না। একখানা খড়্গ তুলিয়া আমায় দেখাইয়া তিনি কহিলেন—এই খড়্গ আমি দেব-মন্দিরের বলির জন্য তৈরী করিয়েছি। কিন্তু এমন পুরুষ এখানে কেউ নাই যে এই খড়্গ স্বচ্ছন্দে চালনা করতে পারে। এক পারত তোমার বাপ। কিন্তু বৃদ্ধ হয়েছে সে। তাই তার স্থলে তোমাকে এ কাজের ভার নিতে হবে। এই খড়্গে তোমাকে দেবীর মন্দিরে নিত্য বলি করতে হবে।

সমস্ত শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল। দিবালোক উৎসব সব যেন চোখের সম্মুখে কাল হইয়া গেল। বুকের মধ্যে অন্তরাত্মা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সেই মুহূর্ত্তে রাজার আদেশ হইল—যাও, স্নান করে এস। পুরোহিত তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন। খড়্গ শুদ্ধ নিয়ে যাও—ধুয়ে আনবে।

সে কণ্ঠস্বরের একটা সুগম্ভীর মহিমা ছিল। সে কণ্ঠোচ্চারিত আদেশ অমান্য করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। নতশিরে খড়্গ গ্রহণ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাইলাম পরিধানের জন্য রক্তবর্ণ পট্টাম্বর। সূর্য্যকিরণে বস্ত্রখানা ঝকমক করিতেছিল। তাহার রক্তবর্ণ যেন শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আবার আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

স্নানান্তে রক্তাম্বর পরিধান করিয়া দেবীর সম্মুখে খড়্গ হাতে দাঁড়াতেই পুরোহিত আগাইয়া আসিলেন। দীর্ঘ শীর্ণ গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ, চক্ষে যেন অগ্নির দীপ্তি প্রতিভাত হইতেছিল। আমার গলায় দেবীর প্রসাদী সিন্দূর-রঞ্জিত বিল্বপত্রের ও রক্তজবার মাল্য পরাইয়া দিয়া কহিলেন—এ খড়্গ ধারণ করতে হলে আ-জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে। প্রতিশ্রুত হও—দেবীর সম্মুখে শপথ কর রমণীর চরণ ভিন্ন মুখের দিকে কখনও তাকাবে না?

সর্ব্বশরীর আমার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সমস্ত শক্তি, সকল চৈতন্য যেন সু-নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া আসিল। অপরূপা রসময়ী পৃথিবীর রূপ রস আমার চক্ষের সম্মুখে মুছিয়া যাইতেছিল। তবু মন্ত্র-মুগ্ধের মত শপথবাক্য উচ্চারণের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুটিল না!

তীব্র কণ্ঠে আবার আদেশ হইল—শপথ কর!

অকস্মাৎ একটী বাঁশী যেন সুমধুর সুরে বাজিয়া উঠিল—ও-কে বাবা? মুখ তুলিয়া চাহিলাম।

দেখিলাম—রজনীগন্ধার মত তন্বী অপরূপ একটী কিশোরী পুষ্পপরাতে কুসুমার্ঘ্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুখখানি তাহার বিবর্ণ হইয়া গেছে। পদ্মদলের মত শুভ্র আয়ত চোখ দুটির দৃষ্টি তাহার শঙ্কাতুর!

বুঝিলাম—আমার এই রক্তাম্বরপরিহিত খড়্গহস্ত অসুরের মত মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিয়াছে!

রাজার উত্তর শুনিলাম—নতুন ছেত্তা মা। এই এখন সিংহবাহিনীর মন্দিরে বলি করবে।

একটী মাত্র কথা সে কহিল—বাপ্‌রেঃ!

কিন্তু ওই একটী কথাই শত সহস্র হইয়া আমার কাণে বাজিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে আবার আদেশ হইল—শপথ কর!

এ পাশ হইতে আমার পিতার কণ্ঠস্বর শুনিলাম—বাপ-পিতামহের বৃত্তি এ—এ যে করতেই হবে বাবা!

কম্পিত কণ্ঠেই বোধ হয় শপথ করিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ হইতে কয় ফোঁটা জল নাটমন্দিরের পাষাণ চত্বরের বিন্দু পরিমিত স্থান সিক্ত করিয়া তুলিল। পুরোহিতের আদেশে সুমধুর নহবৎ থামিয়া গেল। বাজিয়া উঠিল ঢোলে ঢাকে শিঙায় বলিদানের বাদ্য। যন্ত্রের শব্দের মধ্যে সে কি উন্মত্ত ছন্দ! সে ছন্দে শিরায় শিরায় রক্ত যেন নাচিয়া নাচিয়া ফেরে!

উৎসর্গ করা—সিন্দূর-চিহ্নিত মহিষ-শিশুকে যূপকাষ্ঠে

বন্ধন করা হইল। মানুষের সমবেত শক্তির প্রয়োগে পশু-শিশুটীর যন্ত্রণার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। নড়িতেছিল শুধু কাণ দুটি! আদেশ হইল—বলি দাও!

চক্ষু মুদিয়া দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে খড়্গ হানিলাম। পরমুহূর্ত্তে জয়ধ্বনিতে নাটমন্দিরটা যেন ফাটিয়া পড়িল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম রক্তে সমস্ত ভাসিয়া গেছে। পাষাণ-চত্বরের বুকে আমার সে নয়নাশ্রুর লজ্জা সে রক্তে আবরিত হইয়া গেছে—তার সন্ধান আর পাওয়া যাইবে না।

*　*　*　*　*

আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল মন্দির-চত্বরে একখানি ঘরে। আহার নির্দ্দিষ্ট হইল দেবী-প্রসাদ, শয়ন নির্দ্দিষ্ট হইল কঠিন পাষাণে। দেবীর পুরোহিত আমার কর্ণে মন্ত্র দিয়া দীক্ষিত করিলেন। মহাশক্তির উপাসক হইলাম আমি। সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া জীবন চলিতে লাগিল। নিত্য নিয়মিত বলি হইয়া যায়। অবলীলাক্রমে বিশাল খড়্গখানা উঠে—নামে। ছিন্নকণ্ঠ জীবের রক্তধারা দেবীর খর্পর ভরিয়া দেয়, আমার অঙ্গও ভাসাইয়া দেয়। আর কিন্তু বুক কাঁপে না, দৃষ্টি শিহরিয়া উঠে না। আমার গুরু দেবীর পুরোহিত আমার ললাটে সেই রক্তটীকা নিত্য পরাইয়া দেন।

সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরের বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসি। নহবৎখানায় নহবৎ বাজে। দক্ষিণ পাহাড়ে সু-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টনীর অন্তরালে অন্দরের ঘাটে বীণার সুরের সঙ্গে নারী-কণ্ঠের গান কোকিলকে লজ্জা দেয়। নূপুরের ধ্বনির সঙ্গে নৃত্যছন্দ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে সায়রের জলচারী বিহঙ্গদলের কলকণ্ঠকে লজ্জা দিয়া নারীকণ্ঠের কলহাস্য মুখরিত হইয়া উঠিত।

এ আমার ভাল লাগে না। সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ করিয়া আমি যেন চাহিতাম অবিশ্রান্ত ছেদহীন রুদ্র সঙ্গীত! মনে হইত ওই বলিদানের বাদ্যছন্দ যদি দিবা-রাত্রি বাজিত! মহাকালের নৃত্যছন্দে আমার শোণিত-প্রবাহ যদি অহর্নিশি নাচিয়া নাচিয়া ফিরিত!

বিরামে অবসরে আমার চিত্ত কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে! মৃদুতা আমার সহ্য হয় না! যখনই এমন একটা বিচলিত অবসর আসিত তখনই আমি আমার ইষ্টদেবীর জপে বসিতাম। সম্মুখে থাকিত সুরাপূর্ণ পাত্র। দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া নিঃশেষে সেটুকু পান করিতাম। মহাশক্তির প্রসাদে অদৃশ্যলোকের দুয়ার যেন উন্মুক্ত হইয়া যাইত। শুনিতাম—উন্মত্ত ছন্দে বাজিয়া চলিয়াছে মহাকালের নূপুর!

এমনি করিয়া অভ্যাসের বশে দিন দিন বোধ করি পাষাণ হইয়া উঠিতেছিলাম। অথচ মনে পড়ে—দেবী-মন্দিরে হত্যা-ব্রতে ব্রতী আমার বাবাকে দেখিয়া আমার ভয় করিত। কতদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—

মা, বাবা কেন এমন করে পাঁঠা কাটে?

মা সশঙ্কে বলিতেন—চুপ্—চুপ্—ও বলতে নাই। মা সিংহবাহিনীর মন্দিরে বলিদান করেন। তোকেও যে বড় হয়ে বলিদান করতে হবে। এ যে আমাদের বৃত্তি।

আমি বলিতাম—কক্ষনও না—কক্ষনও আমি বলিদান করব না।

শৈশবের সে দুর্ব্বলতার কথা মনে পড়িলে আজ হাসি। বিগত অপরাধের জন্য মনে মনে আমার ইষ্টদেবীকে স্মরণ করি। পাষাণ সোপানের ফাটল বাহিয়া পিপীলিকার শ্রেণী যাওয়া-আসা করিত কত সময় তাই দেখিতাম। এত বড় সঞ্চয়ী জাত বোধ হয় দুনিয়ায় আর নাই। ক্ষুদ কুঁড়া যা পায় তাই মুখে লইয়া ছুটিয়াছে! এতটুকু ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেও সংসার পাতিবার কি বিপুল আগ্রহ! কৌতুকভরে কখনও আঙুল দিয়া তাহাদের পথরোধ করিতাম। ক্রুদ্ধ কীট প্রাণপণে আমাকে দংশন করিত। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া আমার দেহ পরিত্যাগ করিত। ক্ষুদ্র কীটকে আমি হত্যা করিতাম না। উপেক্ষায় হাসিতাম।

নির্দ্দিষ্ট পথে এমনিভাবে দিন কাটিতেছিল।

অকস্মাৎ সমস্ত রাজপুরী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলের মুখেই আশঙ্কার ছায়া। নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীরা চুপি চুপি কি বলাবলি করে। কথাটা ক্রমে কাণে আসিয়াও পৌঁছিল। নিশীথ রাত্রে মধ্যে মধ্যে নাট-মন্দিরের সান্নিধ্যে কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে!

সে কান্নার মধ্যে কোন ভাষা নাই—আছে শুধু মর্ম্মভেদী সকরুণ সুর-বিলাপ। কত যে বেদনা তাহার মনে, তাহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু সে কান্নার করুণায় রামসাগরের বুক হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে শোনে, তাহাকেও না কি কাঁদিতে হয়। রাজকন্যা সেদিন শুনিয়া পরদিন পর্য্যন্ত না কি কাঁদিয়াছিলেন। রাণীও শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই নাট-মন্দিরে থাকিতেও আমার কাণে একদিনও সে কান্না আসিল না! শুনিতাম সে কেমন কান্না!

সেদিন রাত্রে জাগিয়া বসিয়া থাকিলাম।

পাষাণ-সোপান স্পর্শ করিয়া রামসাগরের জল নিথর স্তব্ধ রহস্যের মত বোধ হইতেছিল। আকাশের তারার প্রতিবিম্ব কাল জলের মধ্যে একখানি স্থির আলেখ্য। কখনও কখনও জলতলবাসী জীবের গতির আলোড়নে জল কাঁপিয়া উঠে—আর সঙ্গে সঙ্গে জলের নীচে আকাশের তারা-ঝরা জোনাকীর মত চারিদিকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে প্রহরীর হাঁক শোনা যায়। অন্দরের ঘাটের পাশে ছোট ছাতিম গাছটার নিবিড় অঙ্ক মধ্যে বসিয়া কোন একটা নিশাচর পাখী তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছিল। সে সুতীক্ষ্ণ কর্কশ স্বর সুদীর্ঘ ভল্লের মত অন্ধকারের বুক চিরিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া চলিতেছিল। নিস্তব্ধ রাজপুরীটীকে অন্ধকারের মধ্যে বোধ হইতেছিল যেন একটী রহস্যলোক!

দণ্ডের পর দণ্ড কাটিয়া রাত্রি প্রভাতের দিকে ঢলিয়া পড়িল। আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পাক খাইয়া ঘুরিয়া আসিল। অগ্নি-কোণে শুকতারা নভোমণ্ডলের শিরোরত্নের মত দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

কিন্তু কোথায় কি?

বুঝিলাম—দুর্ব্বল চিত্তের ভ্রম ছাড়া এ কিছুই নয়। ওই নিশাচর পাখীটার ডাক হয় তো পুরবাসিনীদের কাণে কান্নার মতই ঠেকিয়াছে। কিম্বা হয় ত আমার দুর্ব্বার সাহসের সম্মুখে সে নিশাচরী আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসিনী হয় নাই।

* * * *

আমার সম্মুখে সে দেখা দিল না, কিন্তু এখনও না কি সে কাঁদে। এবং সে পাখীর ডাক নয়—মানুষের বা মানুষের আত্মার কান্না ছাড়া অপর কিছু নয়। আমার দুর্ভাগ্য আমি সেদিন জাগিয়া থাকি না।

এই কান্নার ফলেই না কি দেবীর শিরোলগ্ন রক্তজবা নিত্য রাত্রে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে। পুরোহিত পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কঠোর তন্ত্র-সাধনায় দেবীর প্রসন্নতা ভিক্ষায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। এ দিকে রাক্ষসী নিশাচরীর কান্নার ফল বোধ হয় ফলিয়া গেল—আনন্দ-মুখর রাজপুরীর উপর যেন বজ্রাঘাত হইয়া গেল। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারী সংবাদ লইয়া আসিলেন—নবাব ঢেকা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন।

কিছু দিন হইতেই রাজার সহিত নবাবের রাজস্ব লইয়া মনোমালিন্য চলিতেছিল। উভয় পক্ষের বাদানুবাদ এত দিন ধূমায়মান বহ্নির মত ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। এত দিনে পূর্ণ তেজে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে—নবাব ফৌজ পাঠাইয়াছেন। ফৌজ আসিতেছে কাটোয়া হইয়া বাদশাহী সড়ক ধরিয়া।

আশ্বিন মাস—সম্মুখে অকাল-বোধনোৎসব।

চারি দিকে রণসজ্জার সজ্জিত হইতে লাগিল। স্থির হইল—মহাষ্টমীর পূজা শেষে মহা নবমীর দিন যুদ্ধযাত্রা হইবে। ভরা ময়ূরাক্ষীকে সম্মুখে রাখিয়া এ পারে ঢেকার ছাওনী পড়িবে।

মহা সপ্তমীর দিন বিরাট উদ্যমে উৎসবে ক্ষুদ্র নগরী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নাটমন্দিরে পূজা-বাদ্যের সমারোহ। ওদিকে গড়ের মধ্যে রণবাদ্যের উদ্দাম ছন্দ আকাশ বাতাস পাগল করিয়া ফিরিতেছিল। এক-দিকে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি নাট-মন্দিরে খিলানে খিলানে জলতরঙ্গের মত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ও-দিকে গড়ে বাজিতেছিল রণশিঙা—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যদলের জয়ধ্বনি।

মহাসমারোহে সপ্তমী পূজা শেষ হইয়া গেল। আরতির পর নির্জ্জন নাটমন্দিরে বসিয়া খড়্গখানায় উখা বুলাইয়া তীক্ষ্ণ ধারকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিতেছিলাম। আজ নাটমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। পুরবাসিনীর

দেবী-মন্দিরে কামনার ঘৃত-দীপ জ্বালিয়া দিতে আসা-যাওয়া করিতেছেন। এই দীপ জ্বলিল আজ এই সপ্তমী সন্ধ্যায়—অহর্নিশি জ্বলিয়া এ দীপ নিভিবে নবমী-রজনী প্রভাতের সঙ্গে।

মাথার উপর দিয়া প্রহর ঘোষণা করিয়া একটা নিশাচর পাখী কর্কশ রবে ডাকিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল। আমিও উঠিলাম। বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। ইষ্ট-দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া মনে মনে আমার রাজার কল্যাণ কামনা করিলাম। কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না—অকস্মাৎ কাহার স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। অস্তোন্মুখ অষ্টমীর চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় দেখিলাম অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! পাষাণ-বিগ্রহ ভেদ করিয়া দেবী কি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন! মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি কহিলেন—তুমি কাঁদছিলে? তবে তুমিই এমন করে কাঁদ?

চোখ দিয়া আমার জল গড়াইতেছিল সত্য—কিন্তু তবু এ প্রশ্নের মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি আবার কহিলেন—কেন তুমি এমন করে কাঁদ? কি তোমার আক্ষেপ? এত বেদনা তোমার কিসের?

অস্তমান চাঁদের পাণ্ডুর আলোকে দেখিলাম পুষ্প-কলির মত ঠোঁট দুটী তাঁহার কাঁপিতেছে।

আমাকে তবু নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার কহিলেন—এসেছিলাম দেবীর মন্দিরে প্রদীপে ঘি দিতে। এসে শুনলাম সেই কান্নার শব্দ। স্থির থাকতে পারলাম না, সাহস করে এসে দেখি এই ঘাটের ওপর পড়ে পড়ে তুমি কাঁদছ। সেই কান্নার সুর আমি তোমার কণ্ঠ হতে বের হতে শুনেছি। কেন—কেন তুমি কাঁদ?

আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম—আমি?—কিন্তু তুমি কে?

—আমায় কি তুমি দেখ নি? আমি রাজকন্যা। কিন্তু কেন তুমি এমন কোরে কাঁদ? বল তুমি।

আমি কাঁদি—এ যে আমারই কাছে পরম বিস্ময়! মনের মধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু এ ত মিথ্যা—ভিত্তিহীন নয়। আমি কখন আসিয়া ঘাটে বসিয়াছি—আমার চোখের কোলে কোলে যে এখনও জল গড়াইতেছে!

রাজকুমারী বলিলেন—বলবে না তুমি? তুমি না বল আমি বুঝেছি।

মুহুর্মুহুঃ আমি বাস্তবকে হারাইয়া ফেলিতেছিলাম,—সকল কথা আমার কাণে আসিতেছিল না। কিন্তু এই কথাটা আমাকে সচেতন করিয়া তুলিল। প্রবল আগ্রহ-ভরে আমি কহিলাম—কেন কাঁদি আমি?—আমি ত জানি না। আমায় বলুন—দয়া ক'রে—

তিনি প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা তুমি কি অনিচ্ছা সত্ত্বে এ ছেত্তার কাজ নিয়েছিলে?

সকল কথা মনে পড়িয়া গেল। বুক চিরিয়া পড়িল শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস—কিন্তু মুখে কোন উত্তর আসিল না।

রাজকুমারী বলিলেন—তাই—তাই তোমার অন্তরাত্মা এমন করে কাঁদে। অভ্যাসে আয়ত্ত নিষ্ঠুরতা যখন ঘুমোয় তখন সে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু আমি ত বড় অনিষ্ট করলাম তোমার। স্ত্রীলোকের মুখ দেখা—তার স্পর্শ তোমার নিষিদ্ধ নয়? আমি যে স্পর্শ করে তোমায় ডেকেছি।

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু নাটমন্দিরের মধ্যে মানুষের সাড়া পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। রাজ-কুমারীও শুনিয়াছিলেন—তিনি ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা পিছন ফিরিয়া কহিলেন—এ হত্যার কাজ তুমি ছেড়ে দিয়ো। এ কাজ তুমি কর না। আর—আর—আমায় মাপ কর তুমি। আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম।

ঘাটের পাশ দিয়া সরু এক ফালি একটা রাস্তা বাহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চাঁদের অস্তগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানেই সে তন্বী মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না। অশ্রুও দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিতেছিল—চোখে যে তখনও জলের বিরাম ছিল না। অন্ধকার চারি পাশে আজ মনে হইল—এত দিনের হত্যা করা জীবগুলির মৃত্যুযন্ত্রণা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—আমার অন্তরাত্মার পায়ে মাথা কুটিতেছে!

* * * *

মহাষ্টমীর বলি সন্ধ্যার পরই হইবার কথা।

সন্ধ্যায় স্নানান্তে খড়্গ হাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উৎকণ্ঠিত জনতা চারিপাশে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল। নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি উঠিতেছিল। তাহার মধ্য হইতে একটী কণ্ঠ আমি চিনিতে পারিলাম। সর্ব্বাঙ্গ আমার কাঁপিতেছিল। যে খড়্গখানা এতদিন আমার কাছে পালকের মত হালকা ছিল—সে আজ যেন হইয়া উঠিয়াছে পাষাণের মত গুরুভার। আলোকোজ্জ্বল মুক্ত দ্বারপথে দেবীমূর্ত্তি ধূপ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে—আমার চোখের দৃষ্টিপথও আজ রুদ্ধ। দেবীমূর্ত্তি আজ আমার সম্মুখে নাই।

জলে তামি ডুবাইয়া লগ্ন ক্ষণ গণনা চলিতেছিল। পুরোহিত তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। শেষ তামিটী জলে ডুবিতেছে—তখন গুরু আদেশ করিলেন—'বলি দাও।' খড়্গ তুলিলাম—প্রাণপণ শক্তিতে খড়্গ হানিলাম। কিন্তু কম্পিত হাত হইতে খড়্গ যেন খসিয়া গেল। অর্দ্ধছিন্ন ছাগমুণ্ড তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

জনতা কলরোলে হায় হায় করিয়া উঠিল—তাহার মধ্য হইতে একটী কাতর কণ্ঠ করুণ স্বরে আমায় তিরস্কার করিল—কি করলে তুমি—কি করলে!

আমিও বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম—অদ্ভুত সে কান্না—অবর্ণনীয় যাতনার সুর তাহার মধ্যে। আমার কান্না আজ স্বকর্ণে শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এত কান্না আমার কোথায় ছিল!

অকস্মাৎ একটা প্রদীপ্ত কণ্ঠস্বরে সমস্ত নাটমন্দির সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিপুল রোষ সে কণ্ঠস্বরে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল।

রাজা আদেশ করিলেন—হত্যা কর—ওই হতভাগ্য ছেলাকে ওইখানে বলি দাও!

পুরোহিত কহিলেন—শান্ত হও রামজীবন—

বাধা দিয়া রাজা কহিলেন—না—না—ঠাকুর, আপনি জানেন না—মায়ের আমার নরবলি গ্রহণের সাধ হয়েছে।

ধীর স্থির রাজা উন্মাদ হইয়া গেছেন।

একটী করুণায় ভরা পরিচিত সুমধুর কণ্ঠ মিনতির সুরে ধ্বনিয়া উঠিল—বাবা!

ক্রুদ্ধ রাজা বিপুল রোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—না—না—না।

সেই মুহূর্ত্তেই আমি উঠিয়া রাজার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলাম—আপনার আদেশ আমি পালন করব। স্নান করে আসি আমি।

খড়্গখানাকে হাতে লইয়া ঘাটে আসিলাম। আশে পাশে এই উন্মুক্ত দিবালোকেও আজ এতদিনের হত্যা-করা জীবগুলি তৃপ্ত প্রতিহিংসায় যেন অট্টহাসি হাসিতেছিল। রামসাগরের জলচারী বিহঙ্গদলের কল কণ্ঠের মধ্যে ওই অট্টহাসির সুর। মৃদু-উচ্ছ্বসিত সায়রের জলতরঙ্গের ধ্বনি মধ্যে সেই অট্টহাসির সুর—যেন তাহারা জলতলেও বসিয়া হাসিতেছে। গড়ের রণবাদ্যের উদ্দাম ছন্দে সেই অট্টহাসির বিপুল প্রতিধ্বনি। আমার বুকের মধ্যে হাসিতেছিল আর একজন—যে এতদিন কাঁদিয়াছে সে আজ হাসিতেছিল।

এতদিন পরে জাগ্রত আমি কাঁদিলাম ভয়ে—বিভীষিকায়—অব্যক্ত যাতনায়। কঠোর সংযমে আমি ভিতরের মানুষটীর গলা টিপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম। সে বিপুল রবে হাসিয়া উঠিল। বুঝিলাম—শক্তি হারাইয়াছি—সেই আজ জেতা!

সে কহিল—দেখছ আমার অঙ্গপানে চেয়ে—যতগুলি অস্ত্রাঘাত তুমি পশু-অঙ্গে করেছ—সবগুলি আমার অঙ্গে এসে পড়েছে—তবু আমি মরি নি। আমি মরি না।

করুণাময়ীর স্পর্শে আজ আমি অনন্ত শক্তি পেয়েছি!

মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দিলাম। আর দিলাম সর্ব্বনাশী নারীকে। হায় করুণাময়ি, তোমার অযাচিত করুণার কি প্রয়োজন ছিল আমার!

খাঁড়াখানাকে পাশে ফেলিয়া দিয়া পাষাণ-সোপানে বসিয়া পড়িলাম। কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কাঁদিতেছিলাম,—অকস্মাৎ মনের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল। সত্যই কি আমি শক্তিহীন! ভগবানের দেওয়া শক্তি—সে কি আমার বিনা অপরাধে চলিয়া গেল! দেহখানাকে ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া অনুভব করিলাম—সে আমার মধ্যে বিপুল বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে। তবে? উন্মাদের মত খড়্গখানাকে হাতে লইয়া ভীষণ আবেগে

প্রয়োগ করিলাম পাষাণ রাণার উপর! পাষাণ ভিন্ন হইয়া সেইখানেই খড়্গখানা প্রোথিত হইয়া গেল।

এতক্ষণে একটা সান্ত্বনা পাইলাম। কিন্তু খড়্গখানাকে তুলিলাম না। থাক—আমার শক্তির ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া ওইখানেই ও থাক। কিন্তু কাঁদিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছিল না। জীবনান্তের পূর্ব্বে আজ জীবনের জন্য সকল কান্না কাঁদিয়া শোধ করিয়া লইতে ইচ্ছা হইল।

ঘাটের পাশে একটা বৃক্ষনিবিড় স্থানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম।

ঘাটের উপর কাহার পদধ্বনি শোনা গেল। সে পদধ্বনি আবার মিলাইয়া গেল। আবার অল্পক্ষণ পরেই পদধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আমার কাছ পর্য্যন্তও আসিয়া পৌছিল—সঙ্গে সঙ্গে রাজার ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনিলাম—

—থাক—তাকে খুঁজতে হবে না। তার ওপর আমি অবিচার করেছি। যার শক্তিতে—আর যে খড়্গে পাষাণ ভিন্ন হয়—একটা ক্ষুদ্র ছাগশিশু তার অবহেলায় দ্বিচ্ছেদ হয়। আমার অদৃষ্ট এ। তাকে পেলে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করতাম।

তারস্বরে চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইল—না—না—না আমায় মার্জ্জনা করবেন না, অপরাধী আমি অপরাধী!

কিন্তু স্বর ফুটিল না। আমার কণ্ঠ রোধ করিল সেই—জীবনের যত দুর্ব্বলতার আকর আমার সেই!

অস্থির ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মাথার উপরে নবমীর চাঁদ স্বল্প মেঘের অন্তরালে আজ যেন আমার বেদনায় ম্লান হইয়া গেছে। গড়ের রণবাদ্য আর বাজে না—বোধ হয় এই দুঃসংবাদে স্তব্ধ হইয়া গেছে। বাতাসে ঘৃতসিক্ত অগ্নি ধূমের গন্ধ আসিতেছিল। অর্দ্ধছিন্ন ছাগদেহটাকে ভস্মীভূত করা হইতেছে বোধ হয়। একটী মৃদু-বিলাপের সুর শুনিলাম। অন্দরের ঘাট হইতে শব্দটা আসিতেছিল। কণ্ঠস্বরটা চিনিলাম। আমি যেন উন্মাদ হইয়া গেলাম।

দুর্ব্বিষহ যাতনায় একটা প্রকাণ্ড পাথর কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলাম। তার পর—সম্মুখে রামসাগরের অগাধ অতল জলে নামিয়া আগাইয়া চলিলাম। কি শীতল স্পর্শ!

* * * *

ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম বৃষ্টিধারায় সর্ব্বাঙ্গ আমার ভিজিয়া গেছে। আকাশের মেঘের কোল চিরিয়া বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছিল—সেই আলোকে দেখিলাম আমি সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে। সর্ব্বাঙ্গ আমার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অধীর পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

খড়্গখানাকে রামসাগরের জলে নিক্ষেপ করিলাম। একটা শব্দ উঠিল ঝুপ ;—আর জল খানিকটা আন্দোলিত হইয়া উঠিল!

ত্যাগের পূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি বি-এ

বাহুর মাঝে চাহি না আজি ধরা,
পরণে তব পট্টবাস পরা—
পূজায় ভরা মন ;
আননপরে দীপ্তি যাহা ফুটি,
দেহের দীপ ছাড়ায়ে যেন উঠে—
শিখার আবেদন !

অগুরুবাসে অঙ্গখানি ভরি'
সাজ তুমি করেছ সুন্দরি,
দেবীর পূজারতি,
আবির্ভাব তাই ও আগমন,
দৃষ্টি নহে—তোমার দরশন
মাগিছে মম নতি !

দেহের মাঝে রমণী ছিল যে-বা
দেবতা সাজি' আজি সে চাহে সেবা
হইয়া দেবাতীত,
তাই ত মনে জাগিছে নব ভয়
নূতন রূপে যোগীরই যেন জয়,
ভোগী—সে ধিক্‌ত

আলিঙ্গন-আকুল বাহু দুটি
চরণে তাই পড়িতে চায় লুটি'
শ্রদ্ধা-নিবেদনে,
বাসনা যত বিস্ময়েতে হারা
মনের মাঝে টুটিয়া মোহকারা
লুটিছে ক্রন্দনে !

পুণ্য তব প্রসাদে অবগাহি'
প্রেয়সি, আজি আশীর্ব্বাদ চাহি,
নিও-না অপরাধ ;
ভোগের পূজা অন্তরালে আজি
ত্যাগের পূজা উঠিল ঐ বাজি'
ঘুচায়ে পরমাদ।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৯)

ট্রেণ পুরী ষ্টেশানে গিয়া পৌছিল। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে কল্যাণীকে উঠাইয়া নিমাই নিজেও উঠিয়া বসিল।

সুটকেশটা ঠিক করিয়া রাখিতে রাখিতে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "এলে ভালোই হল বউদি, নিজের চোখে দেখে যা বিশ্বাস করতে পারবে, অন্য কেউ হাজার শপথ করে বললেও তা বিশ্বাস করবে না। আমি তোমার একটী কথায় কখনও এখানে আসতুম না, তবে কিনা এরপর বিশুদার কাছে গল্প করবে—আমি তো যেতে চেয়েছিলুম, ঠাকুরপোই আমায় নিয়ে গেল না। ভাবলুম কেন নিমিত্তের ভাগি হয়ে থাকি, তোমায় একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই বিশুদা কতখানি অযত্নে অনাদরে রয়েছে।"

স্বর্গদ্বারে নন্দা বাসা লইয়াছিল, এ ঠিকানা নিমাই পূর্ব্বেই যোগাড় করিয়াছিল।

দ্বারদেশে গাড়ী থামিবামাত্র দাসী-চাকরেরা সব ছুটিয়া আসিল।

দেশের কৈবর্তদের ছেলে শ্রীরূপ দাস নন্দার সহিত আসিয়াছিল। ইহাকে কল্যাণী ছোটবেলা হইতে বেশ ভালোরূপেই চিনিত। প্রথমটায় সে আসিতে চাহে নাই, তাহার পর নেহাৎ কেবল জগন্নাথ দর্শনের প্রলোভনে সে চাকরী ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

শ্রীরূপ হঠাৎ কল্যাণীকে নামিতে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রথমটায় সে দুইটী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিল; তাহার পর এক মুখ হাসিয়া মাথা নিচু করিয়া তাহার পায়ের ধুলো লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "মাসীমা এসেছেন যে, মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়েছেন বুঝি ?"

কল্যাণী আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গেল, ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, কেমন আছেন তিনি ?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "এখন একটু ভালো আছেন, জর এখনও হয় সামান্য করে, ছেড়েও যায়। অন্য সব রোগ কমে গেছে, জীবনের ভয় আর নেই। ডাক্তারেরা আগে সাহস দেননি, এখন সাহস দিয়েছেন, বলেছেন আর দু চার দিন পরেই উঠে বেড়াবেন।"

আশ্বস্ত হইয়া কল্যাণী একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচালি খবরটা দিয়ে। অসুখের খবর পেয়ে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা বলা যায় না। জগন্নাথ তোর মামাবাবুকে ভালো করে দিল, ওঁকে গিয়ে যাওয়ার দিন আমি ঠাকুর দেখে পূজো দিয়ে যাব।"

পরম ভক্তি-ভরে সে হাত দুখানে কপালে ছোঁয়াইল।

শ্রীরূপ উভয়কে ঘরে লইয়া গেল। নিমাইয়ের ভার আর একটী লোকের উপর দিয়া তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল বাবুর যেন এতটুকু অযত্ন না হয়, তাহা হইলে মা আর আস্ত রাখিবেন না।

কল্যাণীকে লইয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল।

উপরের বড় দালানটার পাশে একটী ঘর; সামনা-সামনি তিনটী দরজায় নীল রংয়ের পর্দা দুলিতেছিল। শ্রীরূপ চুপি চুপি বলিল, "এই ঘরে মামাবাবু আছেন, আমি গিয়ে আগে খবর দিই, আপনি একটু দাঁড়ান।"

ভিতরে নন্দা তখন ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কখনও অনুনয় বিনয়, কখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বিশ্বপতি অটুট অচল। সে এক গোঁ ধরিয়া আছে এখন কিছুতেই ঔষধ খাইব না, একটু পরে খাইবে।

শ্রীরূপ পরদা সরাইতেই কল্যাণীর দৃষ্টিতে পড়িল মূল্যবান খাটিয়াতে মূল্যবান শয্যার উপর শায়িত বিশ্বপতি, পার্শ্বে মেজার গ্লাসে ঔষধ লইয়া দাঁড়াইয়া নন্দা।

বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, এ দৃশ্য যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

শ্রীরূপকে দাঁড়াইতে দেখিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কি চাস্ ?"

শ্রীরূপ বলিল, "দেশ হতে মাসীমা এসেছেন। তিনি কার মুখে মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়ে—"

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি এদিকে ফিরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "রাঙাবউ এসেছে ?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "আজ্ঞে ?"

ঔষধের গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া নন্দা বলিল, "বউদি এসেছে,—কোথায় রে ?"

শ্রীরূপ বলিল, "এই যে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

নন্দা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেল।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। তাহার মুখখানা তখন মরার মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিতা নন্দা আসিয়া তাহার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল, "বেশ করেছ, তুমি এসেছ ভাই। বিশু দার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় তোমায় খবর দেওয়ার কথা বলেছিলুম, কিন্তু বিশুদা কিছুতেই খবর দিতে দিলেন না; বললেন—খবর দিয়ে অনর্থক মানুষটাকে ভাবিয়ে তোলা হবে; সে তো আসতে পারবে না, কেবল কেঁদে-কেটে অস্থির হবে। তার চেয়ে ভালো হয়ে উঠে একেবারে বাড়ী চলে যাব, তখন জানতে পারলেও কোন ক্ষতি হবে না। সত্যি ভাই, উনি খবর দিতে দিলেন না বলেই খবর পাঠাই নি, নইলে তোমার স্বামী, তুমি তাঁর স্ত্রী, তোমায় তাঁর এত ব্যারামের খবর না দিয়ে থাকতে পারি ?"

নিছক ন্যাকামোপূর্ণ কথাগুলি কল্যাণীর অন্তরটাকে

আরও বেশী জ্বলাইয়া দিল, মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল, সে একবার একটু হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না।

নন্দা বলিল, "বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো ভাই, দেখবে চল।"

সে কল্যাণীকে এক রকম প্রায় টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

"চেয়ে দেখ বিশুদা, কে এসেছে? বেশ মানুষ তো তুমি,—তুমিই না কত কথা বলেছিলে—বউদি নাকি তোমায় দেখতে পারে না, ভালো বাসে না। তাই তো বলি, এও কি একটা কথার মত কথা যে স্ত্রী নাকি তার স্বামীকে দেখতে পারবে না, ভালো বাসবে না। যাই বল, তুমি যে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী এ কথা হাজার বার বলব।"

বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়া ছিল, এ এ কথা শুনিয়া তাহার মুখের ভাব যে কিরূপ হইয়া গেল তাহা কল্যাণী দেখিতে পাইল না। কল্যাণী একবার মাত্র চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে তাকাইয়াই চোখ ফিরাইল।

নন্দা কলহাস্যের সঙ্গে বলিল, "বলি উত্তর দিচ্ছ না যে, একটা কথা বলবারও কি ইচ্ছে হচ্ছে না? সেদিন তর্ক করছিলে না, ভারতে সতীর আদর্শ নেই, সীতা সাবিত্রীর কথা সব মিছে, কেবল কল্পনা মাত্র। দেখ দেখি, সত্যিই ভারতে সতী মেয়ে আছে কিনা, আজ সেটা মানতে পারবে কি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, এ দিকে ফিরিল না।

হার মানিয়া নন্দা বলিল; "থাক বাপু, তোমার সঙ্গে এখন আর কথা বলছিনে। এসো বউদি, বিশুদা খানিক শুয়ে থাক, তারপরে আসব এখন। এসো বউদি, আগে স্নান করে একটু জল খেয়ে এসে বসো, কাল সারারাত ট্রেনে কেটেছে, শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে রয়েছে।"

কল্যাণীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "ওষুধটা খেয়ো বিশুদা, যেন ফেলে দিয়ে বলো না—খেয়েছি।"

ঔষধ মাথার কাছে টিপয়ের উপর যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, বিশ্বপতি যেমন শুইয়া ছিল তেমনই শুইয়া রহিল, সে নড়িল না, এ দিকে ফিরিলও না।

ঘণ্টাখানেক পরে নন্দা কল্যাণীকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

"আঃ পোড়াকপাল, কি রকম আক্কেল তোমার বিশুদা, এখনও ওষুধটা খাও নি। ও আজ বউদি এসেছে কিনা, আমার হাতে খাবে কেন, এখন বউদির হাতেই খাবে তো। নাও ভাই বউদি, ও ওষুধটা ফেলে দাও, আর এক দাগ ওষুধ ঢেলে খাইয়ে দিয়ো, দেরী করো না।"

সে মৃদু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কতবার নড়িল, কতবার তাহার চাবির শব্দ হইল, বিশ্বপতি সাড়া পাইয়াও ফিরিল না, জাগিয়া থাকিবার কোন চিহ্নও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল; নিচু হইয়া হাতখানা স্বামীর কপালে রাখিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এসেছি বলে কি রাগ করেছ?"

বিশ্বপতি এ-পাশে ফিরিল, দুইটী চোখের দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের উপর রাখিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমায় এখানে আসতে কে বলেছে রাঙা বউ?"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া গেল।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কেউ আসতে বলে নি, আমি নিজেই এসেছি। এখানে আসায় তোমার কোনও ক্ষতি হয়েছে কি?"

বিশ্বপতি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "হয়েছে বই কি। তোমার এখানে আসায় নন্দাকে কতটা অপদস্থ করা হয়েছে সে কথাটা ভেবে দেখেছ কি? নন্দা তোমায় দেখে নিশ্চয়ই মনে করেছে—তুমি কোন ক্রমে আমার অসুখের কথা শুনে মনে ভেবে নিয়েছ আমার সেবাশুশ্রূষা হচ্ছে না, সেই জন্যই ছুটে এসেছ। অথচ তুমি জানো না, স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবে না, সে আমায় কি রকম ভাবে সেবা করছে।

বন্ধন করা হইল। মানুষের সমবেত শক্তির প্রয়োগে পশু-শিশুটীর যন্ত্রণার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। নড়িতেছিল শুধু কাণ ছুটি! আদেশ হইল—বলি দাও!

চক্ষু মুদিয়া দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে খড়্গ হানিলাম। পরমুহূর্ত্তে জয়ধ্বনিতে নাটমন্দিরটা যেন ফাটিয়া পড়িল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম রক্তে সমস্ত ভাসিয়া গেছে। পাষাণ-চত্বরের বুকে আমার সে নয়নাশ্রুর লজ্জা সে রক্তে আবরিত হইয়া গেছে—তার সন্ধান আর পাওয়া যাইবে না।

* * * * *

আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল মন্দির-চত্বরে একখানি ঘরে। আহার নির্দ্দিষ্ট হইল দেবী-প্রসাদ, শয়ন নির্দ্দিষ্ট হইল কঠিন পাষাণে। দেবীর পুরোহিত আমার কর্ণে মন্ত্র দিয়া দীক্ষিত করিলেন। মহাশক্তির উপাসক হইলাম আমি। সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া জীবন চলিতে লাগিল। নিত্য নিয়মিত বলি হইয়া যায়। অবলীলাক্রমে বিশাল খড়্গখানা উঠে—নামে। ছিন্নকণ্ঠ জীবের রক্তধারা দেবীর খর্পর ভরিয়া দেয়, আমার অঙ্গও ভাসাইয়া দেয়। আর কিন্তু বুক কাঁপে না, দৃষ্টি শিহরিয়া উঠে না। আমার গুরু দেবীর পুরোহিত আমার ললাটে সেই রক্তটীকা নিত্য পরাইয়া দেন।

সন্ধ্যার পর নাটমন্দিরের বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসি। নহবৎখানায় নহবৎ বাজে। দক্ষিণ পাহাড়ে সু-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টনীর অন্তরালে অন্দরের ঘাটে বীণার সুরের সঙ্গে নারী-কণ্ঠের গান কোকিলকে লজ্জা দেয়। নূপুরের ধ্বনির সঙ্গে নৃত্যছন্দ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে সায়রের জলচারী বিহঙ্গদলের কলকণ্ঠকে লজ্জা দিয়া নারীকণ্ঠের কলহাস্য মুখরিত হইয়া উঠিত।

এ আমার ভাল লাগে না। সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ করিয়া আমি যেন চাহিতাম অবিশ্রান্ত ছেদহীন রুদ্র গীত! মনে হইত ওই বলিদানের বাদ্যছন্দ যদি দিবা-রাত্রি বাজিত! মহাকালের নৃত্যছন্দে আমার শোণিত-প্রবাহ যদি অহর্নিশি নাচিয়া নাচিয়া ফিরিত!

বিরামে অবসরে আমার চিত্ত কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে! মূকতা আমার সহ্য হয় না! যখনই এমন একটী বিচলিত অবসর আসিত তখনই আমি আমার ইষ্টদেবীর জপে বসিতাম। সম্মুখে থাকিত সুরাপূর্ণ পাত্র। দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া নিঃশেষে সেটুকু পান করিতাম। মহাশক্তির প্রসাদে অদৃশ্যলোকের দুয়ার যেন উন্মুক্ত হইয়া যাইত। শুনিতাম—উন্মত্ত ছন্দে বাজিয়া চলিয়াছে মহাকালের নূপুর!

এমনি করিয়া অভ্যাসের বশে দিন দিন বোধ করি পাষাণ হইয়া উঠিতেছিলাম। অথচ মনে পড়ে—দেবী-মন্দিরে হত্যা-ব্রতে ব্রতী আমার বাবাকে দেখিয়া আমার ভয় করিত। কতদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—

মা, বাবা কেন এমন করে পাঁঠা কাটে?

মা সশঙ্কে বলিতেন—চুপ্—চুপ্—ও বলতে নাই। মা সিংহবাহিনীর মন্দিরে বলিদান করেন। তোকেও যে বড় হয়ে বলিদান করতে হবে। এ যে আমাদের বৃত্তি।

আমি বলিতাম—কক্ষনও না—কক্ষনও আমি বলিদান করব না।

শৈশবের সে দুর্ব্বলতার কথা মনে পড়িলে আজ হাসি। বিগত অপরাধের জন্য মনে মনে আমার ইষ্ট-দেবীকে স্মরণ করি। পাষাণ সোপানের ফাটল বাহিয়া পিপীলিকার শ্রেণী যাওয়া-আসা করিত কত সময় তাই দেখিতাম। এত বড় সঞ্চয়ী জাত বোধ হয় দুনিয়ায় আর নাই। ক্ষুদ কুঁড়া যা পায় তাই মুখে লইয়া ছুটিয়াছে! এতটুকু ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেও সংসার পাতিবার কি বিপুল আগ্রহ! কৌতুকভরে কখনও আঙুল দিয়া তাহাদের পথরোধ করিতাম। ক্রুদ্ধ কীট প্রাণপণে আমাকে দংশন করিত। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া আমার দেহ পরিত্যাগ করিত। ক্ষুদ্র কীটকে আমি হত্যা করিতাম না। উপেক্ষায় হাসিতাম।

নির্দ্দিষ্ট পথে এমনিভাবে দিন কাটিতেছিল।

অকস্মাৎ সমস্ত রাজপুরী যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলের মুখেই আশঙ্কার ছায়া। নিয়ন্তরের কর্ম্মচারীরা চুপি চুপি কি বলাবলি করে। কথাটা ক্রমে কাণে আসিয়াও পৌঁছিল। নিশীথ রাত্রে মধ্যে মধ্যে নাট-মন্দিরের সান্নিধ্যে কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে!

সে কান্নার মধ্যে কোন ভাষা নাই—আছে শুধু মর্ম্মভেদী সকরুণ সুর-বিলাপ। কত যে বেদনা তাহার মনে, তাহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু সে কান্নার করুণায় রামসাগরের বুক হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে শোনে, তাহাকেও না কি কাঁদিতে হয়। রাজকন্যা সেদিন শুনিয়া পরদিন পর্য্যন্ত না কি কাঁদিয়া-ছিলেন। রাণীও শুনিয়াছেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এই নাট-মন্দিরে থাকিতেও আমার কাণে একদিনও সে কান্না আসিল না! শুনিতাম সে কেমন কান্না!

সেদিন রাত্রে জাগিয়া বসিয়া থাকিলাম।

পাষাণ-সোপান স্পর্শ করিয়া রামসাগরের জল নিথর স্তব্ধ রহস্যের মত বোধ হইতেছিল। আকাশের তারার প্রতিবিম্ব কাল জলের মধ্যে একখানি স্থির আলেখ্য। কখনও কখনও জলতলবাসী জীবের গতির আলোড়নে জল কাঁপিয়া উঠে—আর সঙ্গে সঙ্গে জলের নীচে আকাশের তারা-ঝরা জোনাকীর মত চারিদিকে ছড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে প্রহরীর হাঁক শোনা যায়। অন্দরের ঘাটের পাশে ছোট ছাতিম গাছটার নিবিড় অন্ধ মধ্যে বসিয়া কোন একটা নিশাচর পাখী তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছিল। সে সুতীক্ষ্ণ কর্কশ স্বর সুদীর্ঘ ভল্লের মত অন্ধকারের বুক চিরিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া চলিতেছিল। নিস্তব্ধ রাজপুরীটাকে অন্ধকারের মধ্যে বোধ হইতেছিল যেন একটা রহস্যলোক!

দণ্ডের পর দণ্ড কাটিয়া রাত্রি প্রভাতের দিকে ঢলিয়া পড়িল। আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পাক খাইয়া ঘুরিয়া আসিল। অগ্নি-কোণে শুকতারা নভোমণ্ডলের শিরো-রত্নের মত দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল।

কিন্তু কোথায় কি?

বুঝিলাম—দুর্ব্বল চিত্তের ভ্রম ছাড়া এ কিছুই নয়। ওই নিশাচর পাখীটার ডাক হয় তো পুরবাসিনীদের কাণে কান্নার মতই ঠেকিয়াছে। কিম্বা হয় ত আমার দুর্ব্বার সাহসের সম্মুখে সে নিশাচরী আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসিনী হয় নাই।

* * * *

আমার সম্মুখে সে দেখা দিল না, কিন্তু এখনও না কি সে কাঁদে। এবং সে পাখীর ডাক নয়—মানুষের বা মানুষের আত্মার কান্না ছাড়া অপর কিছু নয়। আমার দুর্ভাগ্য আমি সেদিন জাগিয়া থাকি না।

এই কান্নার ফলেই না কি দেবীর শিরোলগ্ন রক্তজবা নিত্য রাত্রে খসিয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে। পুরোহিত পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কঠোর তন্ত্র-সাধনায় দেবীর প্রসন্নতা ভিক্ষায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। এ দিকে রাক্ষসী নিশাচরীর কান্নার ফল বোধ হয় ফলিয়া গেল—আনন্দ-মুখর রাজপুরীর উপর যেন বজ্রাঘাত হইয়া গেল। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারী সংবাদ লইয়া আসিলেন—নবাব ঢেকা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন।

কিছু দিন হইতেই রাজার সহিত নবাবের রাজস্ব লইয়া মনোমালিন্য চলিতেছিল। উভয় পক্ষের বাদানুবাদ এত দিন ধূমায়মান বহ্নির মত ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে-ছিল। এত দিনে পূর্ণ তেজে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে—নবাব ফৌজ পাঠাইয়াছেন। ফৌজ আসিতেছে কাটোয়া হইয়া বাদশাহী সড়ক ধরিয়া।

আশ্বিন মাস—সম্মুখে অকাল-বোধনোৎসব।

চারি দিকে রণসজ্জার সজ্জিত হইতে লাগিল। স্থির হইল—মহাষ্টমীর পূজা শেষে মহা নবমীর দিন যুদ্ধযাত্রা হইবে। ভরা ময়ূরাক্ষীকে সম্মুখে রাখিয়া এ পারে ঢেকার ছাওনী পড়িবে।

মহা সপ্তমীর দিন বিরাট উদ্যমে উৎসবে ক্ষুদ্র নগরী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নাটমন্দিরে পূজা-বাদ্যের সমারোহ। ওদিকে গড়ের মধ্যে রণবাদ্যের উদ্দাম ছন্দ আকাশ বাতাস পাগল করিয়া ফিরিতেছিল। এক-দিকে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি নাট-মন্দিরে খিলানে খিলানে জলতরঙ্গের মত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ও-দিকে গড়ে বাজিতেছিল রণশিঙা—তাহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যদলের জয়ধ্বনি।

মহাসমারোহে সপ্তমী পূজা শেষ হইয়া গেল। আরতির পর নির্জ্জন নাটমন্দিরে বসিয়া খড়্গাখানায় উখা বুলাইয়া তীক্ষ্ণ ধারকে তীক্ষ্ণতর করিয়া তুলিতে-ছিলাম। আজ নাটমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। পুরবাসিনীর

দেবী-মন্দিরে কামনার ঘৃত-দীপ জ্বালিয়া দিতে আসা-যাওয়া করিতেছেন। এই দীপ জ্বলিল আজ এই সপ্তমী সন্ধ্যায়—অহর্নিশি জ্বলিয়া এ দীপ নিভিবে নবমী-রজনী প্রভাতের সঙ্গে।

মাথার উপর দিয়া প্রহর ঘোষণা করিয়া একটা নিশাচর পাখী কর্কশ রবে ডাকিয়া ডাকিয়া চলিয়া গেল। আমিও উঠিলাম। বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। ইষ্ট-দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া মনে মনে আমার রাজার কল্যাণ কামনা করিলাম। কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না—অকস্মাৎ কাহার স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। অস্তোন্মুখ অষ্টমীর চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় দেখিলাম অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! পাষাণ-বিগ্রহ ভেদ করিয়া দেবী কি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন! মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

তিনি কহিলেন—তুমি কাঁদছিলে? তবে তুমিই এমন করে কাঁদ?

চোখ দিয়া আমার জল গড়াইতেছিল সত্য—কিন্তু তবু এ প্রশ্নের মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি আবার কহিলেন—কেন তুমি এমন করে কাঁদ? কি তোমার আক্ষেপ? এত বেদনা তোমার কিসের?

অস্তমান চাঁদের পাণ্ডুর আলোকে দেখিলাম পুষ্প-কলির মত ঠোঁঠ দুটী তাঁহার কাঁপিতেছে।

আমাকে তবু নিরুত্তর দেখিয়া তিনি আবার কহিলেন—এসেছিলাম দেবীর মন্দিরে প্রদীপে ঘি দিতে। এসে শুনলাম সেই কান্নার শব্দ। স্থির থাকতে পারলাম না, সাহস করে এসে দেখি এই ঘাটের ওপর পড়ে পড়ে তুমি কাঁদছ। সেই কান্নার সুর আমি তোমার কণ্ঠ হতে বের হতে শুনেছি। কেন—কেন তুমি কাঁদ?

আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম—আমি?—কিন্তু তুমি কে?

—আমায় কি তুমি দেখ নি? আমি রাজকন্যা। কিন্তু কেন তুমি এমন কোরে কাঁদ? বল তুমি।

আমি কাঁদি—এ যে আমারই কাছে পরম বিস্ময়! মনের মধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু এ ত মিথ্যা—ভিত্তিহীন নয়। আমি কখন আসিয়া ঘাটে বসিয়াছি—আমার চোখের কোলে কোলে যে এখনও জল গড়াইতেছে!

রাজকুমারী বলিলেন—বলবে না তুমি? তুমি না বল আমি বুঝেছি।

মুহুর্মুহুঃ আমি বাস্তবকে হারাইয়া ফেলিতেছিলাম,—সকল কথা আমার কাণে আসিতেছিল না। কিন্তু এই কথাটী আমাকে সচেতন করিয়া তুলিল। প্রবল আগ্রহ-ভরে আমি কহিলাম—কেন কাঁদি আমি?—আমি ত জানি না। আমায় বলুন—দয়া ক'রে—

তিনি প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা তুমি কি অনিচ্ছা সত্ত্বে এ ছেত্তার কাজ নিয়েছিলে?

সকল কথা মনে পড়িয়া গেল। বুক চিরিয়া পড়িল শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস—কিন্তু মুখে কোন উত্তর আসিল না।

রাজকুমারী বলিলেন—তাই—তাই তোমার অন্তরাত্মা এমন করে কাঁদে। অভ্যাসে আয়ত্ত নিষ্ঠুরতা যখন ঘুমোয় তখন সে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু আমি ত বড় অনিষ্ট করলাম তোমার। স্ত্রীলোকের মুখ দেখা—তার স্পর্শ তোমার নিষিদ্ধ নয়? আমি যে স্পর্শ করে তোমায় ডেকেছি।

আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু নাটমন্দিরের মধ্যে মানুষের সাড়া পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। রাজ-কুমারীও শুনিয়াছিলেন—তিনি ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা পিছন ফিরিয়া কহিলেন—এ হত্যার কাজ তুমি ছেড়ে দিয়ো। এ কাজ তুমি কর না। আর—আর—আমায় মাপ কর তুমি। আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলাম।

ঘাটের পাশ দিয়া সরু এক ফালি একটী রাস্তা বাহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চাঁদের অস্তগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানেই সে তন্বী মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইলাম না। অশ্রুও দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিতেছিল—চোখে যে তখনও জলের বিরাম ছিল না। অন্ধকার চারি পাশে আজ মনে হইল—এত দিনের হত্যা করা জীবগুলির মৃত্যুযন্ত্রণা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—আমার অন্তরাত্মার পায়ে মাথা কুটিতেছে!

* * * *

মহাষ্টমীর বলি সন্ধ্যার পরই হইবার কথা।

সন্ধ্যায় স্নানান্তে খড়্গ হাতে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উৎকণ্ঠিত জনতা চারিপাশে করযোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল। নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি উঠিতেছিল। তাহার মধ্য হইতে একটী কণ্ঠ আমি চিনিতে পারিলাম। সর্ব্বাঙ্গ আমার কাঁপিতেছিল। যে খড়্গখানা এতদিন আমার কাছে পালকের মত হালকা ছিল—সে আজ যেন হইয়া উঠিয়াছে পাষাণের মত গুরুভার। আলোকোজ্জ্বল মুক্ত দ্বারপথে দেবীমূর্ত্তি ধূপ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে—আমার চোখের দৃষ্টিপথও আজ রুদ্ধ। দেবীমূর্ত্তি আজ আমার সম্মুখে নাই।

জলে তামি ডুবাইয়া লগ্ন ক্ষণ গণনা চলিতেছিল। পুরোহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। শেষ তামিটী জলে ডুবিতেছে—তখন গুরু আদেশ করিলেন—'বলি দাও।' খড়্গ তুলিলাম—প্রাণপণ শক্তিতে খড়্গ হানিলাম। কিন্তু কম্পিত হাত হইতে খড়্গ যেন খসিয়া গেল। অর্দ্ধছিন্ন ছাগমুণ্ড তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

জনতা কলরোলে হায় হায় করিয়া উঠিল—তাহার মধ্য হইতে একটী কাতর কণ্ঠ করুণ স্বরে আমায় তিরস্কার করিল—কি করলে তুমি—কি করলে!

আমিও বুক ফাটাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম—অদ্ভুত সে কান্না—অবর্ণনীয় যাতনার সুর তাহার মধ্যে। আমার কান্না আজ স্বকর্ণে শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এত কান্না আমার কোথায় ছিল!

অকস্মাৎ একটা প্রদীপ্ত কণ্ঠস্বরে সমস্ত নাটমন্দির সভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

বিপুল রোষ সে কণ্ঠস্বরে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল।

রাজা আদেশ করিলেন—হত্যা কর—ওই হতভাগ্য ছেত্তাকে ওইখানে বলি দাও!

পুরোহিত কহিলেন—শান্ত হও রামজীবন—

বাধা দিয়া রাজা কহিলেন—না—না—ঠাকুর, আপনি জানেন না—মায়ের আমার নরবলি গ্রহণের সাধ হয়েছে।

ধীর স্থির রাজা উন্মাদ হইয়া গেছেন।

একটী করুণায় ভরা পরিচিত সুমধুর কণ্ঠ মিনতির সুরে ধ্বনিয়া উঠিল—বাবা!

ক্রুদ্ধ রাজা বিপুল রোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—না—না—না।

সেই মুহূর্ত্তেই আমি উঠিয়া রাজার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলাম—আপনার আদেশ আমি পালন করব। স্নান করে আসি আমি।

খড়্গখানাকে হাতে লইয়া ঘাটে আসিলাম। আশে পাশে এই উন্মুক্ত দিবালোকেও আজ এতদিনের হত্যা-করা জীবগুলি তৃপ্ত প্রতিহিংসায় যেন অট্টহাসি হাসিতেছিল। রামসাগরের জলচারী বিহঙ্গদলের কল কণ্ঠের মধ্যে ওই অট্টহাসির সুর। মৃদু-উচ্ছ্বসিত সায়রের জলতরঙ্গের ধ্বনি মধ্যে সেই অট্টহাসির সুর—যেন তাহারা জলতলেও বসিয়া হাসিতেছে। গড়ের রণবাদ্যের উদ্দাম ছন্দে সেই অট্টহাসির বিপুল প্রতিধ্বনি। আমার বুকের মধ্যে হাসিতেছিল আর একজন—যে এতদিন কাঁদিয়াছে সে আজ হাসিতেছিল।

এতদিন পরে জাগ্রত আমি কাঁদিলাম ভয়ে—বিভীষিকায়—অব্যক্ত যাতনায়। কঠোর সংযমে আমি ভিতরের মানুষটীর গলা টিপিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম। সে বিপুল রবে হাসিয়া উঠিল। বুঝিলাম—শক্তি হারাইয়াছি—সেই আজ জেতা!

সে কহিল—দেখছ আমার অঙ্গপানে চেয়ে—যতগুলি অস্ত্রাঘাত তুমি পশু-অঙ্গে করেছ—সবগুলি আমার অঙ্গে এসে পড়েছে—তবু আমি মরি নি। আমি মরি না।

করুণাময়ীর স্পর্শে আজ আমি অনন্ত শক্তি পেয়েছি!

মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত দিলাম। আর দিলাম সর্ব্বনাশী নারীকে। হায় করুণাময়ি, তোমার অযাচিত করুণার কি প্রয়োজন ছিল আমার!

খাঁড়াখানাকে পাশে ফেলিয়া দিয়া পাষাণ-সোপানে বসিয়া পড়িলাম। কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কাঁদিতে-ছিলাম,—অকস্মাৎ মনের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল। সত্যই কি আমি শক্তিহীন! ভগবানের দেওয়া শক্তি—সে কি আমার বিনা অপরাধে চলিয়া গেল! দেহ-খানাকে ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া অনুভব করিলাম—সে আমার মধ্যে বিপুল বেগে আবর্ত্তিত হইতেছে। তবে? উন্মাদের মত খড়্গখানাকে হাতে লইয়া ভীষণ আবেগে

প্রয়োগ করিলাম পাষাণ রাণার উপর! পাষাণ ভিন্ন হইয়া সেইখানেই খড়্গখানা প্রোথিত হইয়া গেল।

এতক্ষণে একটা সান্ত্বনা পাইলাম। কিন্তু খড়্গখানাকে তুলিলাম না। থাক—আমার শক্তির ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া ওইখানেই ও থাক। কিন্তু কাঁদিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছিল না। জীবনান্তের পূর্ব্বে আজ জীবনের জন্য সকল কান্না কাঁদিয়া শোধ করিয়া লইতে ইচ্ছা হইল।

ঘাটের পাশে একটা বৃক্ষনিবিড় স্থানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম।

ঘাটের উপর কাহার পদধ্বনি শোনা গেল। সে পদধ্বনি আবার মিলাইয়া গেল। আবার অল্পক্ষণ পরেই পদধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আমার কাছ পর্য্যন্তও আসিয়া পৌঁছিল—সঙ্গে সঙ্গে রাজার ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনিলাম—

—থাক—তাকে খুঁজতে হবে না। তার ওপর আমি অবিচার করেছি। যার শক্তিতে—আর যে খড়্গে পাষাণ ভিন্ন হয়—একটা ক্ষুদ্র ছাগশিশু তার অবহেলায় দ্বিচ্ছেদ হয়। আমার অদৃষ্ট এ। তাকে পেলে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করতাম।

তারস্বরে চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইল—না—না—না আমায় মার্জ্জনা করবেন না, অপরাধী আমি অপরাধী!

কিন্তু স্বর ফুটিল না। আমার কণ্ঠ রোধ করিল সেই—জীবনের যত দুর্ব্বলতার আকর আমার সেই!

অস্থির ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মাথার উপরে নবমীর চাঁদ স্বল্প মেঘের অন্তরালে আজ যেন আমার বেদনায় ম্লান হইয়া গেছে। গড়ের রণবাদ্য আর বাজে না—বোধ হয় এই দুঃসংবাদে স্তব্ধ হইয়া গেছে। বাতাসে ঘৃতসিক্ত অগ্নি ধূমের গন্ধ আসিতেছিল। অর্দ্ধছিন্ন ছাগদেহটাকে ভস্মীভূত করা হইতেছে বোধ হয়। একটা মৃদু-বিলাপের সুর শুনিলাম। অন্দরের ঘাট হইতে শব্দটা আসিতেছিল। কণ্ঠস্বরটা চিনিলাম। আমি যেন উন্মাদ হইয়া গেলাম।

দুর্ব্বিষহ যাতনায় একটা প্রকাণ্ড পাথর কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলাম। তার পর—সম্মুখে রামসাগরের অগাধ অতল জলে নামিয়া আগাইয়া চলিলাম। কি শীতল স্পর্শ!

* * * *

ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম বৃষ্টিধারায় সর্ব্বাঙ্গ আমার ভিজিয়া গেছে। আকাশের মেঘের কোল চিরিয়া বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছিল—সেই আলোকে দেখিলাম আমি সেই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে। সর্ব্বাঙ্গ আমার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

অধীর পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

খড়্গখানাকে রামসাগরের জলে নিক্ষেপ করিলাম। একটা শব্দ উঠিল ঝুপ;—আর জল খানিকটা আন্দোলিত হইয়া উঠিল!

ত্যাগের পূজা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি বি-এ

বাহুর মাঝে চাহি না আজি ধরা,
পরণে তব পট্টবাস পরা—
পূজায় ভরা মন ;
আননপরে দীপ্তি যাহা ফুটি,
দেহের দীপ ছাড়ায়ে যেন উঠে—
শিখার আবেদন !

অগুরুবাসে অঙ্গখানি ভরি'
সাজ তুমি করেছ সুন্দরি,
দেবীর পূজারতি,
আবির্ভাব তাই ও আগমন,
দৃষ্টি নহে—তোমার দরশন
মাগিছে মম নতি !

দেহের মাঝে রমণী ছিল যে-বা
দেবতা সাজি' আজি সে চাহে সেবা
হইয়া দেবাতীত,
তাই ত মনে জাগিছে নব ভয়
নূতন রূপে যোগীরই যেন জয়,
ভোগী—সে ধিক্‌ত

আলিঙ্গন-আকুল বাহু ছুটি
চরণে তাই পড়িতে চায় লুটি'
শ্রদ্ধা-নিবেদনে,
বাসনা যত বিস্ময়েতে হারা
মনের মাঝে টুটিয়া মোহকারা
লুটিছে ক্রন্দনে !

পুণ্য তব প্রসাদে অবগাহি'
প্রেয়সি, আজি আশীর্ব্বাদ চাহি,
নিও-না অপরাধ ;
ভোগের পূজা অন্তরালে আজি
ত্যাগের পূজা উঠিল ঐ বাজি'
ঘুচায়ে পরমাদ ।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৯)

ট্রেণ পুরী ষ্টেশানে গিয়া পৌছিল। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে কল্যাণীকে উঠাইয়া নিমাই নিজেও উঠিয়া বসিল।

সুটকেশটী ঠিক করিয়া রাখিতে রাখিতে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "এলে ভালোই হল বউদি, নিজের চোখে দেখে যা বিশ্বাস করতে পারবে, অন্য কেউ হাজার শপথ করে বললেও তা বিশ্বাস করবে না। আমি তোমার একটী কথায় কখনও এখানে আসতুম না, তবে কিনা এরপর বিশুদার কাছে গল্প করবে—আমি তো যেতে চেয়েছিলুম, ঠাকুরপোই আমায় নিয়ে গেল না। ভাবলুম কেন নিমিত্তের ভাগি হয়ে থাকি, তোমায় একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই বিশুদা কতখানি অযত্নে অনাদরে রয়েছে।"

স্বর্গদ্বারে নন্দা বাসা লইয়াছিল, এ ঠিকানা নিমাই পূর্ব্বেই যোগাড় করিয়াছিল।

দ্বারদেশে গাড়ী থামিবামাত্র দাসী-চাকরেরা সব ছুটিয়া আসিল।

দেশের কৈবর্ত্তদের ছেলে শ্রীরূপ দাস নন্দার সহিত আসিয়াছিল। ইহাকে কল্যাণী ছোটবেলা হইতে বেশ ভালোরূপেই চিনিত। প্রথমটায় সে আসিতে চাহে নাই, তাহার পর নেহাৎ কেবল জগন্নাথ দর্শনের প্রলোভনে সে চাকরী ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

শ্রীরূপ হঠাৎ কল্যাণীকে নামিতে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রথমটায় সে দুইটী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিল; তাহার পর এক মুখ হাসিয়া মাথা নিচু করিয়া তাহার পায়ের ধূলো লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "মাসীমা এসেছেন যে, মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়েছেন বুঝি ?"

কল্যাণী আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গেল, ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, কেমন আছেন তিনি ?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "এখন একটু ভালো আছেন, জ্বর এখনও হয় সামান্য করে, ছেড়েও যায়। অন্য সব রোগ কমে গেছে, জীবনের ভয় আর নেই। ডাক্তারেরা আগে সাহস দেননি, এখন সাহস দিয়েছেন, বলেছেন আর দু চার দিন পরেই উঠে বেড়াবেন।"

আশ্বস্ত হইয়া কল্যাণী একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচালি খবরটা দিয়ে। অসুখের খবর পেয়ে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা বলা যায় না। জগন্নাথ তোর মামাবাবুকে ভালো করে দিল, ওঁকে নিয়ে যাওয়ার দিন আমি ঠাকুর দেখে পূজো দিয়ে যাব।"

পরম ভক্তি-ভরে সে হাত দুখানে কপালে ছোঁয়াইল।

শ্রীরূপ উভয়কে ঘরে লইয়া গেল। নিমাইয়ের ভার আর একটী লোকের উপর দিয়া তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল বাবুর যেন এতটুকু অযত্ন না হয়, তাহা হইলে মা আর আস্ত রাখিবেন না।

কল্যাণীকে লইয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল।

উপরের বড় দালানটার পাশে একটী ঘর; সামনা-সামনি তিনটী দরজায় নীল রংয়ের পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। শ্রীরূপ চুপি চুপি বলিল, "এই ঘরে মামাবাবু আছেন, আমি গিয়ে আগে খবর দিই, আপনি একটু দাঁড়ান।"

ভিতরে নন্দা তখন ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কখনও অনুনয় বিনয়, কখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বিশ্বপতি অটুট অচল। সে এক গোঁ ধরিয়া আছে এখন কিছুতেই ঔষধ খাইব না, একটু পরে খাইবে।

শ্রীরূপ পরদা সরাইতেই কল্যাণীর দৃষ্টিতে পড়িল মূল্যবান খাটিয়াতে মূল্যবান শয্যার উপর শায়িত বিশ্বপতি, পার্শ্বে মেজার গ্লাসে ঔষধ লইয়া দাঁড়াইয়া নন্দা।

বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, এ দৃশ্য যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

শ্রীরূপকে দাঁড়াইতে দেখিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কি চাস্ ?"

শ্রীরূপ বলিল, "দেশ হতে মামীমা এসেছেন। তিনি কার মুখে মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়ে—"

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি এদিকে ফিরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "রাঙাবউ এসেছে ?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "আজ্ঞে ?"

ঔষধের গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া নন্দা বলিল, "বউদি এসেছে,—কোথায় রে ?"

শ্রীরূপ বলিল, "এই যে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

নন্দা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেল।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। তাহার মুখখানা তখন মরার মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিতা নন্দা আসিয়া তাহার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল, "বেশ করেছ, তুমি এসেছ ভাই। বিশুদার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় তোমায় খবর দেওয়ার কথা বলেছিলুম, কিন্তু বিশুদা কিছুতেই খবর দিতে দিলেন না; বললেন—খবর দিয়ে অনর্থক মানুষটাকে ভাবিয়ে তোলা হবে; সে তো আসতে পারবে না, কেবল কেঁদে-কেটে অস্থির হবে। তার চেয়ে ভালো হয়ে উঠে একেবারে বাড়ী চলে যাব, তখন জানতে পারলেও কোন ক্ষতি হবে না। সত্যি ভাই, উনি খবর দিতে দিলেন না বলেই খবর পাঠাই নি, নইলে তোমার স্বামী, তুমি তাঁর স্ত্রী, তোমায় তাঁর এত ব্যারামের খবর না দিয়ে থাকতে পারি ?"

নিছক ন্যাকামোপূর্ণ কথাগুলি কল্যাণীর অন্তরটাকে

আরও বেশী জ্বলাইয়া দিল, মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল, সে একবার একটু হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না।

নন্দা বলিল, "বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো ভাই, দেখবে চল।"

সে কল্যাণীকে এক রকম প্রায় টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

"চেয়ে দেখ বিশুদা, কে এসেছে? বেশ মানুষ তো তুমি,—তুমিই না কত কথা বলেছিলে—বউদি নাকি তোমায় দেখতে পারে না, ভালো বাসে না। তাই তো বলি, এও কি একটা কথার মত কথা যে স্ত্রী নাকি তার স্বামীকে দেখতে পারবে না, ভালো বাসবে না। যাই বল, তুমি যে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী এ কথা হাজার বার বলব।"

বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়া ছিল, এ এ কথা শুনিয়া তাহার মুখের ভাব যে কিরূপ হইয়া গেল তাহা কল্যাণী দেখিতে পাইল না। কল্যাণী একবার মাত্র চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে তাকাইয়াই চোখ ফিরাইল।

নন্দা কলহাস্যের সঙ্গে বলিল, "বলি উত্তর দিচ্ছ না যে, একটা কথা বলবারও কি ইচ্ছে হচ্ছে না? সেদিন তর্ক করছিলে না, ভারতে সতীর আদর্শ নেই, সীতা সাবিত্রীর কথা সব মিছে, কেবল কল্পনা মাত্র। দেখ দেখি, সত্যিই ভারতে সতী মেয়ে আছে কিনা, আজ সেটা মানতে পারবে কি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, এ দিকে ফিরিল না।

হার মানিয়া নন্দা বলিল; "থাক বাপু, তোমার সঙ্গে এখন আর কথা বলছিনে। এসো বউদি, বিশুদা খানিক শুয়ে থাক, তারপরে আসব এখন। এসো বউদি, আগে স্নান করে একটু জল খেয়ে এসে বসো, কাল সারারাত ট্রেনে কেটেছে, শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে রয়েছে।"

কল্যাণীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "ওষুধটা খেয়ো বিশুদা, যেন ফেলে দিয়ে বলো না—খেয়েছি।"

ঔষধ মাথার কাছে টিপয়ের উপর যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, বিশ্বপতি যেমন শুইয়া ছিল তেমনই শুইয়া রহিল, সে নড়িল না, এ দিকে ফিরিলও না।

ঘণ্টাখানেক পরে নন্দা কল্যাণীকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

"আঃ পোড়াকপাল, কি রকম আক্কেল তোমার বিশুদা, এখনও ওষুধটা খাও নি। ও আজ বউদি এসেছে কিনা, আমার হাতে খাবে কেন, এখন বউদির হাতেই খাবে তো। নাও ভাই বউদি, ও ওষুধটা ফেলে দাও, আর এক দাগ ওষুধ ঢেলে খাইয়ে দিয়ো, দেরী করো না।"

সে মৃদু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কতবার নড়িল, কতবার তাহার চাবির শব্দ হইল, বিশ্বপতি সাড়া পাইয়াও ফিরিল না, জাগিয়া থাকিবার কোন চিহ্নও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল; নিচু হইয়া হাতখানা স্বামীর কপালে রাখিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এসেছি বলে কি রাগ করেছ?"

বিশ্বপতি এ-পাশে ফিরিল, দুইটী চোখের দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের উপর রাখিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমায় এখানে আসতে কে বলেছে রাঙা বউ?"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া গেল।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কেউ আসতে বলে নি, আমি নিজেই এসেছি। এখানে আসায় তোমার কোনও ক্ষতি হয়েছে কি?"

বিশ্বপতি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "হয়েছে বই কি। তোমার এখানে আসায় নন্দাকে কতটা অপদস্থ করা হয়েছে সে কথাটা ভেবে দেখেছ কি? নন্দা তোমায় দেখে নিশ্চয়ই মনে করেছে—তুমি কোন ক্রমে আমার অসুখের কথা শুনে মনে ভেবে নিয়েছ আমার সেবাশুশ্রূষা হচ্ছে না, সেই জন্যই ছুটে এসেছ। অথচ তুমি জানো না, স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবে না, সে আমায় কি রকম ভাবে সেবা করছে। এ

দিনের শেষে

শিল্পী— শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

রকম সেবা হয় তো তোমার কাছেও পেতুম না রাঙাবউ, কারণ সংসারের কাজ তোমায় করতেই হবে, কিন্তু তার কোন কাজ নেই।"

একটু থামিয়া দম লইয়া সে বলিল, "বুঝতে পারছি আমার কথা শুনে তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করব,—অপ্রিয় সত্য আমায় প্রকাশ করতেই হবে, তোমার মনে কষ্ট হবে জেনেও। নন্দা তোমায় দেখে প্রচুর হাসছে, আমার ভার তোমার পরে ছেড়ে দিয়ে গেছে; ওর ওই হাসির তলায় যে কতখানি বেদনা জমে উঠেছে, সেটা অনুভব করবার শক্তি তোমার আছে কি?"

কল্যাণীর মুখখানা একেবারে পাংশুস হইয়া গেল, সে আর চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাইতে পারিল না; নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশ্বপতি বলিল, "আমার জন্যে তোমার এই ব্যগ্রতা এই অসামান্য স্বামী-ভক্তি না দেখালেই ভাল হতো রাঙাবউ; নিজের নামটার আগে পতিব্রতা শব্দটা না জুড়ে দিলেও বিশেষ ক্ষতি হতো না। এর চেয়ে তুমি যদি ঘরের বউটি হয়ে সেইখানে সেই ঘরে বসে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেলতে, আমার মতে সেইটাই হতো স্বামী-ভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের মত ঘরের বউয়েদের স্বামীর বিদেশে ব্যারাম জেনে কয়জন ঘর ছেড়ে স্বামীকে দেখতে ছোটে বল দেখি? তারপর এসেছ কার সঙ্গে। ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? একজন নিঃসম্পর্কীয় লোকের সঙ্গে আসা কি তোমার উচিত হয়েছে রাঙাবউ? সত্যিই সে কথা, এতে কেউ তোমার অসাধারণ স্বামীভক্তির কথা সগৌরবে বলে গেলেও আমি কোনদিনই প্রশংসা করব না।"

কল্যাণী মুখ তুলিল, তাহার পাংশুস মুখ তখন আবার স্বাভাবিক বর্ণ ধরিয়াছে।

যথাসাধ্য কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া সে বলিল, "কিন্তু ওইখানেই বুঝতে ভুল করেছ। আমি সতী, স্বামীর 'পরে আমার নিষ্ঠা আর ভক্তি আছে, এই কথাটাই লোক-সমাজে রাষ্ট্র করবার জন্যে আমি নিমাই ঠাকুরপোর সঙ্গে এখানে এতদূরে চলে আসতুম না। সত্যিই আগে বুঝতে পারি নি, এখানে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি কতটা বোকামীর কাজ করেছি! কিন্তু না, ভয় নেই, আমি এখানে থাকব না, তোমাদের সঙ্কুচিত বিব্রত করব না, আমি আজই যেমন এসেছি, তেমনই চলে যাব।"

সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইল।

অদূরে ধূ ধূ করিতেছে বেলাভূমি। তাহার ও-পাশে অনন্ত জলরাশি গর্জ্জন করিয়া উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া আসিতেছে, বেলাভূমির বুকে আছাড় খাইয়া ফেনরাশি বুকে লইয়া সরিয়া যাইতেছে।

সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কল্যাণীর চোখ দুইটী জ্বালা করিতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ কখন দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কখন তাহা চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

(১০)

আজই কল্যাণী ফিরিয়া যাইতে চায় শুনিয়া নন্দা একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল—

"সে কি বউদি, এ কখনও হতে পারে। আজ এসে আজই তুমি চলে যেতে চাও, এ কি একটা কথার মত কথা?"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া জানাইল সে স্বামীকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিতে আসিয়াছিল। সে সাধ তাহার মিটিয়া গেছে, স্বামী অনেক ভালো আছেন দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে! আর এখানে থাকার কোন আবশ্যক তাহার নাই; ওদিকে বাড়ী ঘর সব পড়িয়া আছে, দেখিবার লোক কেহ নাই—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

নন্দা রাগ করিল, মুখ ভার করিয়া বলিল, "বাড়ী ঘর করে করেই যে গেলে, বাড়ী ঘর তোমায় স্বর্গে দেবে, না? যেমন কর্ত্তা তেমনি গিন্নি; কর্ত্তা কি সহজে আসে,—ভাবলুম বুঝি কেঁদেই ফেলে। কথার মধ্যে কথাই ওই বাড়ী ঘর দেখবে কে, সব যাবে। বাবাঃ,—কিই বা ঘর; সব তো ভাঙ্গছে, চুরছে, ইঁট খসছে,—যেন সমস্ত বাড়ীই দাঁত বার করে হাসছে। সেই বাড়ীতে এমন সব দামী জিনিসপত্রও আছে যা পথের ভিখারী পর্য্যন্ত পথ দিয়ে ঠেলে চলে যায়।"

কল্যাণীর বড় বড় চোখ দুইটী একবার মাত্র দপ

করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্যই বিকৃত হইয়া উঠিল। তখনই সে মুখে হাসি ফুটাইয়া মিষ্ট সুরেই বলিল, "কিন্তু তাই আমার লাখটাকার জিনিস ভাই দিদি। গরীবের ঘরে জন্মেছি, সামান্য নুন ভাত খেয়েই মানুষ হয়েছি। তার বেশী পাওয়ার কামনা যদি কোনদিন মাথা তুলে উঠতে চেয়েছে, আমি তাকে চেপে ধরেছি। নিজের খড়ের ঘরে নুন-ভাত শাক-ভাত যা জোটে, তাই যে কোন লোকের মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে যথেষ্ট বলেই মনে করি। বড়লোকের বাড়ী রোজ ষোড়শোপচারে খাওয়া আর দামী পালঙ্কে শুয়ে ঘুমানতে মানুষের হীনত্বের পরিচয়ই দিয়ে থাকে; সে রকম আরামপ্রিয় সুখী লোককে কেউ মানুষ বলে গণনা করে না।"

কল্যাণীর এই সুন্দর সত্য কথাগুলি নন্দার বুকের মধ্যে আঘাত দিল বেশ, মুখরা চপলা নন্দা একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। কল্যাণীকে সে কৃপার চোখেই দেখিয়া আসিতেছে। সে বেশই জানে এ মেয়েটী কোনদিনই মাথা উঁচু করিতে পারিবে না। ইহাকে যতই কেন না আঘাত করিয়া যাও, এ মাথা নিচু করিয়াই থাকিবে, ফিরাইয়া আঘাত সে কোনদিনই দিতে পারিবে না। চিরদিন সে দূর্ব্বার মত মাটীর বুকেই থাকিবে, মানুষের পায়ের তলে দলিত পিষ্ট হইবে; সে যে আছে তাহা কাহাকেও কোনদিন জানিতে দিবে না।

আজ নন্দা নিঃশব্দে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বাড়বানল জ্বলেই দেখা যায়,—সে অনলে যে অনেক কিছুই ধ্বংস করিতে পারে, তাহা সে আগে জানে নাই, আজই জানিল।

নিমাই আহারান্তে নিচে একটী ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল; ভিতরে যে এত কাণ্ড হইয়া গেছে তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। কল্যাণী খোঁজ লইয়া যে ঘরে সে ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

"শুয়ে পড়লে যে ঠাকুরপো? ওঠো, বিশ্রামের সময় তোমার নেই, এখনই রওনা হতে হবে, এখানে থাকার অধিকার নেই, যাওয়ার হুকুম হয়েছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া নিমাই উঠিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাঃ, আজ এসে পৌঁছেই চলে যেতে হবে এ আশ্চর্য্য হুকুমটা কে দিলে শুনি। নন্দা বুঝি? রোসো, তার সঙ্গে দেখা করে আমি এ সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে নিচ্ছি, এ সব তোমার কর্ম্ম নয় বউদি।"

অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া বিকৃত হাসির টুকরা একটু মুখের উপর টানিয়া আনিয়া কল্যাণী চাপা সুরে বলিল, "না, তার হুকুম শুনবার সৌভাগ্য এখনও আমার হয় নি, তবে এখানে একদিনের বেশী থাকতে গেলেই যে শুনতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। হুকুম সে দেয় নি। যাঁর হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে, আমার সেই মনিব আমায় চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।"

নিমাই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল,—তাহার পর বলিল, "কে, বিশুদা বলেছে তোমায় আজই চলে যেতে হবে?"

কল্যাণী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই বই আর কি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে। ভেবে দেখলুম তিনি যা বলেছেন তা অন্যায় নয়, সবই সত্যি। বুঝলে ঠাকুরপো, আমি এখনই চলে যেতে চাই, আর একটী ঘণ্টাও এখানে থাকতে পারব না। তুমি ওঠ, একখানা গাড়ী নিয়ে এসো, একটুও দেরী করো না।"

নিমাই উঠিতে চাহে না; বলিল, "তুমি বড় অধৈর্য্য বউদি, আসতে যেমন—যেতেও ঠিক তেমনি। আমি আগেই বলেছিলুম না—, থাক সে কথা; কিন্তু কি যে তোমাদের কথাবার্ত্তা হল যার জন্যে আর একটী ঘণ্টাও তুমি এ বাড়ীতে থাকবে না, সেটা জানতে পারলেও যে হতো।"

কল্যাণী কঠিন মুখে বলিল, "আসল কথা, তুমি এখন এমন আরাম ছেড়ে নড়তে চাও না—কেমন? কিন্তু শোন ঠাকুরপো, যদি তুমি না যাও, গাড়ী না ডাক, আমি একাই পায়ে হেঁটে চলে যাব, পথে কাউকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশানে যাব, তোমার সাহায্যের কোনও দরকার হবে না: তুমি আমার যাওয়ার গাড়ী-ভাড়াটা দিয়ে দাও দেখি, তা হলেই যথেষ্ট দয়া মনে করব।"

ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুতর রকমই ঘটিয়াছে,

তাহা বুঝিতে নিমাইয়ের বিলম্ব হইল না। সে ভাবনা পড়িল, "গাড়ীর জন্যে ভাবনা নেই বউদি, আমি এখনই টাঙ্গা নিয়ে আসছি, কিন্তু ষ্টেশানে গিয়ে এখন বসেই থাকতে হবে; ট্রেণ তো এখন নেই, সেই সন্ধ্যায় ট্রেণ।"

কল্যাণী বলিল, "তা হোক, আমি সেখানে বসে থাকব সেও আমার ভালো, আমি এখানে আর এক মিনিটও থাকব না।"

ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছে তাহা নিমাই স্পষ্ট জানিতে না পারিলেও আন্দাজে কতকটা বুঝিল; সে উঠিয়া গায়ে জামা দিয়া গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল।

উপর হইতে নন্দার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, "এ রকম করলে আমি কি করে পারব বল দেখি বিশুদা? সেই কখন হতে দুধটুকু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করছি, কথা যেন কানে যাচ্ছে না, ঘুমোনোর ভাণে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে পড়ে আছ। না বাপু, আমারই ঝকমারী হয়েছে তোমার এখানে আনা, তার জন্যে এই নাক কান মলা খাচ্ছি। তুমি একটু ভালো হয়ে দুদিন দুটো ভাত খেয়ে বউদির সঙ্গে বাড়ী চলে যেয়ো, আমি আর যদি একদিন তোমায় এখানে থাকবার জন্যে অনুরোধ করি তবে আমার নামই নন্দা নয়।"

কল্যাণী কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

অসীম অনন্ত ব্যবধান,—সে যাহাকে কাছে পাইতে চায়। দূর দূরই থাকিয়া যাইবে, কেহ কাহারও নাগাল জীবনে পাইবে না।

বিবাহ-বন্ধন—

আজ সে কথা মনে করিতেও হাসি পায়। লোকে বলে "সাত পাকের বিবাহ—চৌদ্দ পাকে খুলে না,—" এ কথা কি সত্য?

সাত পাক—সে একটা মিথ্যা আচার মাত্র; নারায়ণ—সাক্ষী গোপাল। সেই বিবাহের দিনে যাহারা উপস্থিত ছিল আজ তাহারা কে কোথায়?

শুধু বুকটাই জ্বলিতে লাগিল, চোখে এক বিন্দু জল আসিল না। দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া কল্যাণী শূন্য নয়নে কোন্ দিক পানে তাকাইয়া রহিল কে জানে।

(১১)

গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

নন্দা উপরের বারাণ্ডা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া নিচে নামিয়া আসিল।

"কাজটা ভালো হচ্ছে কি ভাই বউদি? এই আজই মাত্র এসে এতটুকু বিশ্রাম না করে অমনি চললে, এটা কি ভালো কাজ করছ? তোমার নিজের তরফ থেকে কোন কথা না থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের কল্যাণ-অকল্যাণটাও দেখা চাই তো?"

কল্যাণী বলিল, "আমার হঠাৎ আসা আর হঠাৎ চলে যাওয়ায় গৃহস্থের অকল্যাণ হবে না ভাই দিদিমণি, ভগবান তোমাদের মঙ্গলই করবেন। আমি একটা অশুভ গ্রহের মত হঠাৎ আকাশে উঠে পড়েছি; থাকলে বরং অনিষ্টই হবে, মিলিয়ে গেলে ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হবে না।"

নন্দা বিমর্ষ মুখে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তোমায় আমি আর রাখতে চাইনে; বউদি, তোমার এ রকম মন নিয়ে এখানে থাকার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু বিশুদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?"

কল্যাণীর মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল, সে মাথা নাড়িল, বলিল, "দরকার দেখছি নে।"

এতটুকু আঘাত দেওয়ায় প্রলোভন নন্দা এড়াইতে পারিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেটা তো উচিত হবে না বউদি, সতী মেয়ের কাজ এ নয়। যে সতীর আদর্শ তোমায় বাংলার নাম-না-জানা একটী ছোট পল্লী হতে অপরিচিত একটী পুরুষকে সাথী করে এতদূরে এখানে টেনে এনেছে, তোমার এই কাজে সেই মহান আদর্শ খাটো হয়ে যাবে না কি?"

কল্যাণী দৃপ্ত দুইটী চোখের দৃষ্টি নন্দার মুখের উপর স্থাপন করিল, বলিল "না, আমার সে আদর্শকে আমি নিজের হাতে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলেছি। তার সেই গুঁড়োগুলো রেণু রেণু করে ধূলোর সাথে মিশিয়ে বাতাসের কোলে ছেড়ে দিয়েছি। আজ বুঝেছি, স্বপ্নেরও ভিত্তি চাই, নইলে তা গড়ে উঠতে পারে না,

তার ছায়া মনে থাকে না। ভুল ততক্ষণই সত্যি বলে বোধ হয়, যতক্ষণ তার স্বরূপটা চোখে না পড়ে। সেই স্বরূপ যখন চোখে পড়ে, তখন তার দাম এক কানা-কড়িও হয় না, এ-কথা বোধ হয় মেনে নেবে। মেয়েরা যে আদর্শ নিয়ে চলবে, সে আদর্শ টিঁকে থাকতে পারে কতক্ষণ? মেয়েরা যার পরে নির্ভর করে তার আদর্শ অটুট রাখবার চেষ্টা করবে, সে যদি ভার নেওয়ার অনুপযুক্ত হয়, সে যদি ভেঙ্গে পড়ে, যে ভর দিয়ে দাঁড়ায় তাকেও পড়তে হবে। পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় না দিলে একটা আদর্শকে ঠিক রাখা চলে না, সে আদর্শ এমনই করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়, তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। আমার কথা বলবে দিদিমণি? আজ দেখছি ছায়াকে কায়া বলে ধরতে ছুটেছিলুম,—আজ দেখছি, সব মিথ্যে, আমার কিছু সার্থকতায় ভরে উঠতে পারলে না।"

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতেছিল; পাছে সে দুর্ব্বলতা নন্দা বুঝিতে পারে এই জন্যই সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দা বলিল, "ওটা ভাই তোমার মিথ্যে কল্পনা। পুরুষেরা শতকরা নব্বইজন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে, কদাচিত যদি তোমার আদর্শ অনুযায়ী স্বামী দেখতে পাওয়া যায়, যারা রামের মতই স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করে যায়। যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয় তাদের স্ত্রীরা যে তোমার মত অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে না, এ কথা ঠিক। এই সব স্ত্রীরা তো তাদের স্বামী বেচারাদের তোমার মত সন্দেহের চোখে দেখে পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না; তারা সেদিকে চেয়েও দেখে না। পুরাণের কথা যদি তোলো, যাদের আদর্শ নিয়ে তোমরা চলছ, তাদের মধ্যেও ঠিক এই রকম ভাব ছিল বলেই না তারা আদর্শ সতী হতে পেরেছিল। বেদবতী কি করেছিলেন শুনি? তিনি স্বামীর বাসনা পূর্ণ করতে কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে কোলে নিয়ে লক্ষহীরার বাড়ী যান নি? তিনি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে পতিতা নারীর বাড়ীতে দাসীর কাজ করেন নি? রাবণ যে বহু নারীর স্বামী ছিলেন, তাই বলে মন্দোদরী তাঁকে ঘৃণা করেছিলেন? তাঁর পর হতে শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তর্হিত হয়েছিল? হিন্দুর পরমদেবতা কৃষ্ণ কি করতেন শুনি, তাই বলে রাধিকা তাঁকে ঘৃণা করে ত্যাগ করেছিলেন?"

নন্দা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কল্যাণী গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওইখানেই যে প্রকাণ্ড বড় ভুল হয়ে গেছে দিদি। আমরা—মেয়েরা যুগে যুগে পতিব্রতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে এমনি করে নিজেদের সব রকমে হেয় করে রাখছি, নিজেদের সর্ব্বনাশ করছি। ওদের হীন বাসনা তৃপ্তির জন্যে আমরাই নিজেদের সত্তা ভুলে পতিতার দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি, স্বামীকে কোলে করে তার বাড়ীতে নিয়ে গেছি। নারীর অধঃপতন আর কাকে বলে? স্বামী অন্য কারও সঙ্গে বাস করছেন, আমি দাসীর মত তাঁর সেবা করব, সেই স্বামীকেই একমাত্র দেবতা জেনে পূজো করে যাব, তাঁর আদেশে আমি বেঁচে থাকব, মরব, কারণ আমি সতী, আমি পতিব্রতা; আমায় এ আদর্শ অটুট রাখতেই হবে। এমনি করে আমরাই না ওদের ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে দিয়েছি, সহধর্ম্মিণী না হয়ে সহচারিণী হয়েছি, ওদের বাসনা কামনা বাড়িয়ে তুলেছি, নিজেদের সব দিক হতে গুটিয়ে এনে সতী নামটা নিয়ে জগতে নিজেদের প্রচার করে যাচ্ছি। শাস্ত্রের কথা তুলে রেখে দাও দিদি, ওই শাস্ত্রের অনুশাসনগুলো কেবল আমাদের জন্যেই নয় কি? পুরুষেরা এর একটাও কি মেনে চলে? ওই অনুশাসন—ওই চোখ-রাঙানীই না আমাদের এত তুচ্ছ, এত হেয় করে রেখেছে। স্বামী চোখের সামনে ব্যভিচার করবেন, আমাদের তা দেখে যেতে হবে, সয়ে যেতে হবে, তবু সেই স্বামীকেই দেবতা বলে পূজো করতে হবে, এরই নাম সতীত্ব, এরই নাম পাতিব্রত্য। তোমার ওই পচা শাস্ত্রের কথা তুলে রেখে দাও দিদি; চোখের সামনে যা অহরহ দেখতে পাচ্ছি, তার সত্যতা না মেনে নিয়ে যা দেখিনি তার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার মত শক্তি তোমার থাকতে পারে—আমার নেই।"

নন্দা কি বলিবে বলিয়া মুখ তুলিল, তাহার পরই হঠাৎ মুখ নামাইয়া চুপ করিয়াই রহিল।

কল্যাণী দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল; বলিল, "কিন্তু তুমি আমার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখে যেয়ো ভাই দিদিমণি, মনে কোরো—মানুষ

কোনক্রমে চোখ বুজে একটাই আঘাত সইতে পারে, কেননা তার আগে সে কোনও আঘাত পায় নি বলেই আঘাতের বেদনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকে। বুকের একদিক ভাঙলে পরে সেই দিকটাতেই মানুষের চোখ পড়ে থাকে, কিন্তু যদি সব হাড়গুলোই তার ভেঙে যায় সে কোন্‌দিকে তাকাবে, তাই ভেবেই ঠিক করতে পারে না। একটা বিষ-ফোড়া উঠলে মানুষ তার দিকে নজর দেয়, তার ব্যথায় অধীর হয়ে ওঠে; কিন্তু যদি দেহে হাজারটা বিষফোড়া ওঠে, কোন্‌টা যে বেশী ব্যথা করছে, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা যে সে দেখবে, তাই ভেবে ঠিক করতে পারে না। একটা ফোড়ায় সে হাজার রকম ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু হাজার ফোড়ায় একটা ওষুধ লাগিয়েই সে তখন খুসি হয়ে থাকে, কারণ তখন তার খুসি না হওয়া ছাড়া আর উপায়ই থাকে না যে। তখন তার ইচ্ছা আসে না, প্রবৃত্তি জাগে না, দেহ মন একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষ মাত্রেই যে এই একই ধারায় চলছে দিদি, কেবল একটার কথাই তো হচ্ছে না যে তুমি কোনও প্রতিবাদ করবে।"

নন্দা ফস্‌ করিয়া বলিয়া বসিল, "একটু একটু করে ওষুধ লাগানোর চেয়ে সবগুলো যদি কেটে দেওয়া যায়—"

শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণী বলিল, "ওই তো ভুল, বলা সহজ, করাই না কঠিন। বলি—সেই যে গভীর বেদনা—সেটাই বা সইবে কে দিদি? দেখ, মানুষ দেবতা নয়,—মানুষ মানুষই। তার দেহটা কি কি উপাদানে তৈরী তা জান তো? ছুরি চালানো দূরের কথা, তোমার গায়ে আমি একটা ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলে তুমি চমকে ওঠো কি না বল দেখি? ওই তো দিদি, দুর্ব্বলতা মানুষের যে ওইখানেই। সবাই তো পরমহংস হতে পারে না ভাই, সবাই কিছু বলতে পারে না এ-গালে চড় মারলে ও-গাল ফিরিয়ে দেব। অতটা সহ্যশীলতা যে দিন পাব, সেদিন আর কাউকে শিষ্য করার আগে তোমায় দীক্ষা দেব তা মনে করে রেখো।"

নন্দার গৌর মুখখানা কালো হইয়া গিয়াছিল; সে নীরবে কেবল অধর দংশন করিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে কল্যাণী গিয়া গাড়ীতে উঠিল, নিমাই তাহার সম্মুখেরআসন দখল করিয়া বসিল। তাহার পর গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার শব্দটাও ক্রমে মিলাইয়া গেল। নন্দা তখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর কথাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলিতেই দৃষ্টি পড়িল উপরের খোলা জানালাটার দিকে;—বিশ্বপতি সেই জানালার গরাদে ধরিয়া যে-পথে একটু আগে গাড়ীখানা চলিয়া গেছে, সেই পথের পানে আত্মহারার মতই তাকাইয়া আছে।

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "বিশুদা, দাঁড়িয়েছ একেবারে,—পড়ে যাবে যে এখনি।"

তাহার ব্যগ্রকণ্ঠের সুরেই বিশ্বপতির চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে নিচে নন্দার পানে তাকাইল, একটু হাসির রেখা মাত্র তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল এবং সে জানালা ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

(১২)

কল্যাণী গুম হইয়া ষ্টেশনে একখানা বেঞ্চে বসিয়া ছিল। পথে সে একেবারেই মুখ বন্ধ করিয়াছিল। নিমাই তাহার প্রকৃতি বেশ জানিত, সেই জন্যই সে তাহার সহিত একটাও কথা বলে নাই।

কিন্তু ট্রেণ আসিতে তখনও বহু বিলম্ব ছিল।

নিমাই খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "জগন্নাথের দরজায় এসে চোখ বুজেই ফিরলে বউদি, তাঁকে দেখে জন্ম সার্থক করে গেলে না? তোমাদের মেয়েদের মধ্যে এ-রকম ভাব হওয়াই যে আশ্চর্য্য,—শুনেছি জগন্নাথ দেখবার জন্যে তোমাদের মেয়েরাই স্বামী পুত্রের মায়া কাটিয়ে ছুটে আসত—এখনও আসে।"

শুষ্ক হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ এখনও আসে, এ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল নয়। এখন ঠাকুর কোথায় দেখব ঠাকুর-পো, পাথরের দেবতার দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে।"

নিমাই বলিল, "চেষ্টা করলে খোলা পাওয়া যেত।"

কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দরকার নেই।"

নিমাই বলিল, "কেন? ডাকলে দরজা খুলবে না—তোমার প্রবৃত্তি নেই?"

কল্যাণী বলিল, "অনেক টাকা দিলে হয়তো দরজা খুলে দেখতে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তি আমার নেই। দরজায় যত ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার উপযুক্ত শক্তি আমার নেই ঠাকুর-পো, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন বিশ্রাম চাই।"

একটু সময় নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "দেবতা সে দেবতাই। পাষাণের আবরণের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে, ওই আবরণের বাইরের ডাক কি তা ভেদ করতে পারবে, সে প্রাণ কি বিগলিত করতে পারবে? জগন্নাথের পাথরের মূর্ত্তি দেখে পুজো দিয়ে আমি কতটুকু লাভ করব ঠাকুর-পো? নিজের ভালো—কিন্তু কোন সময়ের জন্মে চাইব? ইহকালের জন্যে না পরকালের জন্যে ভাবব? ইহকালে যা পেলুম এই আমার পর্য্যাপ্ত পাওয়া। মুক্তকণ্ঠে বলছি ঢের পেয়েছি, এর বেশী আরও যদি দিতে চাও—দাও, আমি সব বোঝা বইব, ভেঙ্গে পড়ব না। আর পরকাল? সত্যি বল দেখি ঠাকুর-পো, পরকাল আছে কি? চিরদিন বলে এসেছি পরকাল আছে, এ জন্মেই আমার সব কিছু ফুরিয়ে যাবে না, এর পরের জন্মে আমার এ জন্মের ব্যর্থতা সফলতায় ভরে যাবে। আজ এই মুহূর্ত্ত হতে জেনে নিলুম—মানুষের ইহজন্মই আছে, পরজন্ম নেই;—যে সেই পর-জন্মের আশায় দিন কাটিয়ে যেতে চায়, এ জন্মটাকে দুঃখের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে পরজন্মের কল্পিত চিন্তায় প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—সে মূর্খ, মহামূর্খ। স্বর্গ নরক মিছে কথা ঠাকুর-পো, স্বর্গ নরক্ নেই, দেবতা নেই, ও-সব নিছক কল্পনামাত্র।"

যে চিরকাল একনিষ্ঠ ভাবে দেবসেবা করিয়া আসিয়াছে, স্বর্গ নরকের পাপপুণ্যের হিসাব যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে রাখিয়া আসিয়াছে, সে আজ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। কালাপাহাড় একদিন একনিষ্ঠতার সঙ্গেই নিজের ধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছিল। সেদিন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান একদিনে হঠাৎ কালাপাহাড় হইয়া যাইবে।

কল্যাণীও বড় আঘাতের বেদনা পাইয়াই জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে চায়—বিশ্বাস করাইতে চায়, দেবতা নাই, মানুষের ইহকাল আছে পরকাল নাই, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব সে আজ অস্বীকার করে।

নিমাই সত্যই একটু আঘাত পাইল; বলিল, "কিন্তু হঠাৎই এতটা নাস্তিক হয়ে উঠলে বউদি? তোমাদের শাস্ত্রে বলে—"

দৃপ্তকণ্ঠে কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্র অনেক কথাই বলেছে, বল্‌ছেও, কিন্তু সে সবই কি মানুষে মেনে চলতে পারে ঠাকুর-পো? শাস্ত্র উপদেশ দেয়, অনেক নজিরই সে দেখিয়েছে। শুনেছি একজন লোকের কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, তার পতিব্রতা স্ত্রী সেই স্বামীর পাপকামনা চরিতার্থ করবার জন্যে তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে গণিকার বাড়ীও গিয়েছিল। আমাদের শাস্ত্র এইরকম লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছে, কিন্তু সত্যি করে বল দেখি ঠাকুর-পো, বাস্তবে কয়টা মেয়ে এ-রকম করে পাতিব্রত্যের দৃষ্টান্ত মেনে চলতে পারে?"

নিমাই একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো বউদি, হয় তো সত্যই এ-রকম কিছু ঘটেছিল; নইলে শাস্ত্রকারেরা পুঁথির পাতে লিখে রেখে যেতে পারত না। মেয়েরা যে ভালোবেসে সব কিছুই করতে পারে তা মানো তো? যে মেয়েটী তার কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে বুকে ধরে গণিকার বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, তার সেই প্রবৃত্তির মূলে গভীর ভালোবাসাই যে ছিল, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না।"

কল্যাণী উত্তর না দিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল। আন্তরিক ভালোবাসা কথাটা হয় তো খুবই সত্য, কিন্তু এই প্রকৃত ভালোবাসাই যে নাই।

কল্যাণীও তো একদিন ভাবিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে আন্তরিক ভালোবাসে; তাহার এ ভালোবাসা কোনোদিন শিথিল হইবে না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। আজ নিমাইয়ের কথায় অত্যন্ত সচকিত হইয়াই সে নিজের অন্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু সেখানে প্রতিহিংসার দুর্দ্দমনীয় কামনা ছাড়া আর কিছুই নাই। আঘাত দিয়া সে আঘাত পাওয়ার বেদনা ভুলিতে চায়, ঘরের কোণে পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে সে চায় না।

নিমাই টিকেট কাটিতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকেট করলে ঠাকুর-পো ?"

নিমাই বলিল, "উপস্থিত কলকাতার টিকেট করে আনলুম, তারপর ওখান হতে দেশের টিকেট করা যাবে।"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, বলিল, "কিন্তু আমি তো আর দেশে ফিরব না, বাড়ীতে যাব না।"

নিমাই যেন আকাশ হইতে পড়িল, "বাড়ী যাবে না কি রকম ?

কল্যাণী অধর দংশন করিয়া বলিল, "বাড়ী যাব—কার বাড়ীতে আমি যাব—বাস করব বল দেখি ? যে কেবলমাত্র আমায় বিয়ে করে আমার জীবনটা ব্যর্থতায় ভরে দিয়ে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করতে রেখে নিজে সরে গেছে, তারই বাড়ীতে যাব ? দিনের পর দিন তার ঘর বাড়ী পাহারা দেব, পরিষ্কার করব—একা দুঃখময় জীবনটা কাটিয়ে দেব—সে আমি পারব না, কিছুতেই না।"

নিমাই তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় থাকবে ?"

কল্যাণী সোজা উত্তর দিল, "তোমার বাড়ীতে—"

"আমার বাড়ীতে—?"

নিমাইয়ের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে নিস্তব্ধে কেবল কল্যাণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

কল্যাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এ কথা শুনে তোমারই বা এত ভয় হল কেন ঠাকুরপো ? তোমার বাড়ী আমি থাকতে চাচ্ছি শুনেই তোমার মুখখানা সাদা হয়ে গেল, এতে তোমার কিসে বাধছে বলতে পারো ? কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা চলবে না ঠাকুরপো, তুমি দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় আমার কাছে থাকতে চাও, অনেক লোকে এ জন্যে তোমায় অনেক কথাই বলেছে ; কিন্তু একটা কথাও তুমি কানে নাওনি। এই যে বাড়ী ঘর মা ছেড়ে কেবল আমার সঙ্গলাভের জন্যই আমার সঙ্গে এসেছ, এ সত্য আজ তুমি অস্বীকার করতে চাইলেও আমি তো তা মানব না ঠাকুরপো। আমি যা লক্ষ্য করছি সেগুলো কি কেবল বাইরের, ওর মধ্যে তোমার অন্তরের আকর্ষণ এতটুকু নেই ? আজ তোমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে চাই শুনে তুমি শিউরে উঠলে, কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, তোমার অন্তরের অন্তরালে আমায় তোমার কাছে পাওয়ার কামনাটাই জাগছে নাকি ?"

নিমাই স্তম্ভিতভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল ; ধীরকণ্ঠে বলিল, "হয়তো হয়েছিল বউদি কিন্তু—"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ মনের ভাবটা বদলে গেছে—কেমন ? নাঃ, দেখছি সত্যিই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে, যাতে অতি বড় মহাপাপীর মনের গতিও বদলে যায়। একদিন যাকে নিজের কাছে পেতে চেয়েছিলে, আজ তাকে হাতের কাছে পেয়েও ঠেলে দিতে চাচ্ছো, এ কি কেবল তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যেই নয় কি ?"

নিমাই বলিল, "তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে কি না তা জানি নে, তবে মানুষের মনে যে বিরাট দৌর্ব্বল্য আছে এ কথা স্বীকার করব। তোমায় একদিন খুব কাছেই পেতে চেয়েছিলুম—সেদিন তোমায় পাওয়া দুরূহ বলেই জানতুম। তবু বলি বউদি, কি রকম ভাবে যে পেতে চেয়েছিলুম তা আমি আজও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তোমার কাছে যাওয়ার, তোমার কাছে থাকার, কথা বলার একটা অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে আছে,—হয়তো তোমায় পরস্ত্রী বলেও ভাবিনি, কেন না জয়ের নেশা মানুষকে পাগল করে। কিন্তু জয় যখন স্বতঃই হয়ে যায়, যুদ্ধের আয়োজনই হয় মাত্র, তখন মানুষ শক্তি-হীন হয়ে পড়ে, আগেকার উদ্যম আর থাকে না, এ কথা তুমিও মানবে তো বউদি।"

কল্যাণী বলিল, "বুঝেছি, উদ্যোগপর্ব্বেই জয়লাভ করেছ, তুমি তাই আজ উদ্যমহীন ; তোমার মধ্যে আর স্পৃহা নেই, সেইজন্যেই তোমার বাড়ীতে তোমার কাছে আমায় রাখতে তুমি ভয় পাচ্ছ।"

নিমাই হাসিতে গেল, "ভয় ? ভয় নয় তবে—"

কল্যাণী বলিল, "সংস্কারে বাধছে বল ?"

নিমাই তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছো বউদি ?"

বিস্মিত হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "কিসের পরীক্ষা তোমায় করব ঠাকুরপো ?"

নিমাই বলিল, "তুমি প্রথম হতেই আমার আচরণ-

গুলো লক্ষ্য করেছ, আমার দৌর্ব্বল্য কোন্‌খানে তা তুমি সহজেই ধরতে পেরেছ, আর সেই ছিদ্রগুলো পেয়েই তুমি আজ একটা মতলব গড়ে তাতে সাহায্য করতে আমায় ধরেছ। কিন্তু বউদি, তোমার কথা তুমি বলেছ, আমার কথা এবার শোন। মানুষ ভালোবাসে হয় তো অনেককেই, অথচ অনেকেই প্রথমে বুঝতে পারে না সে কি রকম ভালোবাসে, তাদের ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীদের কি রকম ভাবে পেতে চায়। এর মীমাংসা হয় দিন কত পরে যখন ভালোবাসার তরলতা ঘুচে যায়, সেটা জমাট হয়ে আসে ;—তখনই একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়ার জন্যে মানুষ অধীর হয়ে ওঠে। দেহের দাবীর কথা বলবে—কিন্তু ও তো পুরানো হয়ে গেছে বউদি। মানুষ সৃষ্টির আদিম যুগ হতে দেহের উপর রাজত্ব করে আসছে, দেহের তৃপ্তিই একমাত্র কাম্য জিনিস বলে জানছে। আজও যদি আমরা তাদেরই মত কেবলমাত্র দেহ উপভোগ করাটাকেই একমাত্র কাম্য বলে সকলের উপরে স্থান দেই, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে—আজ সেই সব অসভ্যদের তুলনায় অনেক উপরে স্থান পেয়েও আমরা সভ্য শিক্ষিত নই, আমরা এক পা এগিয়ে যেতে পারি নি, ঠিক সেই জায়গাতেই রয়ে গেছি। চোখের সামনে যে সব নিকৃষ্ট প্রাণীদের দেখতে পাই—যারা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণে পরস্পরের কাছে আসে, আমরা নিজেদের ওদের চেয়ে মহৎ বলে ধারণা করলেও দেখতে পাই—ঠিক ওদেরই পর্য্যায়ে পড়ে আছি। ওদেরই মত আমাদের কাজ দৈহিক তৃপ্তিসাধন, বংশ-বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টির আদিম যুগে যখন কেবল সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল, তখন এ আচরণ মন্দ চলে নি ; কিন্তু আজ যখন আমরা দেখতে পাই বংশ-বৃদ্ধি করে কেবল পৃথিবীতে কতকগুলো দরিদ্র রুগ্ন পরিবারই রেখে যাচ্ছি, তখন সাবধান হওয়াই ভালো বই কি। তখন আমরা বেশী ভাবতে শিখি নি, ভবিষ্যতে আমাদের চোখ যায় নি, আমরা বর্ত্তমান জগৎটাকে মেনে চলতুম। দেহের সম্পর্ক ছাড়া আবার যে প্রীতিকর সম্পর্ক থাক্‌তে পারে, সে কথা আজ যেমন জেনেছি সেদিন জানি নি, সেদিন বুঝিনি উপভোগে আসক্তি, তৃষ্ণা কমে না, আরও বাড়ে। আজ আমায় সত্যিকার জয়লাভ করতে দাও বউদি, দৈহিক ঘৃণিত সম্পর্কের কথা ভুলে যেতে দাও ; এসো—আমরা একটা নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করি। তুমি আমার মা হও, আমি মনে প্রাণে তোমার সন্তান হই। এতে তুমিও রক্ষা পাবে, আমিও পাব, আমরা পবিত্র নির্ম্মল যোজক। তুমি আমার বোন হও, আমি তোমার ভাই হই, নিঃসঙ্কোচে আমি তোমার পরিচয় সকলের কাছে দিয়ে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। আমায় পরীক্ষা করছ কর, আশীর্ব্বাদ কর—যেন উত্তীর্ণ হতে পারি।"

কল্যাণী নির্ব্বাকে শুধু নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। নিমাই কথা শেষ করিয়া একটা কোন কথা শুনিবার প্রত্যাশায় তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু কল্যাণী উত্তর দিল না। নিমাইয়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নিচু করিল।

সংশয়ে নিমাইয়ের বুক দুলিতেছিল—এ নারী কি চায় ?

খানিক পরে কল্যাণী মুখ তুলিল ধীরকণ্ঠে বলিল, "কলকাতায় চল ঠাকুরপো। তুমি আমার সঙ্গে যে সম্পর্কই পাতাও—জেনো—আমি ওখানেই থাকব—দেশে আর ফিরব না। উপস্থিত তোমার বাড়ীতে আমায় দুদিনের জন্যে স্থান দাও, তারপরে নিজের জায়গা নিজে দেখে নেব।"

ট্রেণ আসিবার সময় হইয়াছিল, উভয়েই প্রস্তুত হইল। (ক্রমশঃ)

রূপমতী

শ্রীরাধারাণী দেবী

(কাহিনী)

ফেরে সারাদিন বাজবাহাদুর শিকার অন্বেষণে,
ব্যর্থ বুঝি বা হ'ল সন্ধান, ভাবে বীর মনে মনে।
অমোঘ তাহার লক্ষ্য, করেছে যে-মৃগের সন্ধান,
গহন কাননে লুকায়ে সে আজি পাবে কি পরিত্রাণ ?

সারা অরণ্য ঢুঁড়ি ফেরে বাজ একাকী সঙ্গীহীন,
পূবের সূর্য্য নেমে এসে ক্রমে পশ্চিমে হ'ল লীন।
অস্তরবির সোণালী আভায় উজল শ্যামল বন ;
শিকার না পেলে ফিরিবেনা বাজ আজ তার দৃঢ়পণ।
হেনকালে যেন দূর হতে এলো বীণাঝঙ্কার কাণে,
বিস্মিত বাজ দাঁড়ালো থমকি'—কে বাজায় কোন্‌খানে ?
কার সুনিপুন করপরশনে খেলিছে বীণায় সুর
নববসন্তে রাগ বসন্ত,—মুখরে বনানী পুর !
ভুলিয়া শিকার সুর অনুসরি চলে কুতূহলে বাজ !—
গোধূলি লগনে ঝলকে গগনে মেঘের কনক তাজ।

আম্রমুকুল ঘনসুগন্ধে উতলা দখিণবায় !
বনের আড়ালে নীড়হারা কোন্ বিরহী বিহগ গায়
ব্যথাপরিপূর একটানা সুর উদাস করুণ গান।
তরুশাখা ভরি ফুলমঞ্জরী আবেশে কম্পমান।
মলয়পরশে উতল হরষে কুহরে কাননে পিক,
নববসন্ত-উৎসবরাগে রঞ্জিত চারিদিক।
বনসীমান্তে উত্তরি বাজ হেরিল উপল ঘিরে
রজত উৎস সঙ্গীতস্রোতে নেচে চলে ধীরে ধীরে !
তারি তীরে তরু-কুঞ্জ মুখরি' গুঞ্জরি' ওঠে বীণা !—
চিত্রের প্রায় দাঁড়াইল বাজ।

সম্মুখে সমাসীনা
সে নিভৃতবনে শ্বেতশিলাসনে কে তরুণী সুন্দরী ?
সোণার বীণায় তোলে ঝঙ্কার গহনপ্রান্ত ভরি' !

ধীরে ধীরে ক্রমে শান্ত হইল চঞ্চল অঙ্গুলি ;
থামিল বীণার সুরমূর্চ্ছনা।—কুমারী নয়ন তুলি
হেরিল সমুখে দাঁড়ায়েছে তার,—তরুণ সূর্য্য হেন
সুন্দর বীর !—কান্ত-মূরতি প্রশান্ত-ছবি যেন !
চকিতপুলকে পুলকিত দিঠি হ'ল দোঁহে বিনিময় !
তরুশাখা হতে দুজনার শিরে ঝরিল কুসুমচয়।
সেই ক্ষণিকের ক্ষণবীক্ষণে কি জানি কি ছিল মায়া,—
দোঁহার নয়নে উঠিল ফুটিয়া মুগ্ধপ্রেমের ছায়া !
ফাগুন জ্বেলেছে আগুন তখন অশোকের শির'পর,
সারা অরণ্য দুলে দুলে করে আনন্দ-মর্ম্মর।

দু'টি উজ্জ্বল অনিমেষ-আঁখি মেলিয়া কিশোরী পানে
মধুরকণ্ঠে বাজবাহাদুর কহিল সসম্মানে—
"—কে তুমি রূপসি ঘনবনতলে বীণায় বুনিছো ফাঁদ,—
নীলাকাশ হতে নেমে কি এসেছো ঈদের কনকচাঁদ !
কোন্ বনদেবী লীলারহস্তে ধরেছো মানবী কায়া ?—
গহন কাননে করেছো সৃজন স্বরগের রূপমায়া !"

আয়ত বিশাল নয়ন যুগল মেলি তার ক্ষণকাল
নিশ্চল হয়ে রহিল কুমারী, আরক্ত হল গাল।
নীল নয়নের স্বচ্ছ তারায় কাঁপিল আলোকরেখা ;
ফুটিল ললাটে মুকুতাবিন্দু, স্বভাব সরম লেখা।
লাজ-কম্পিত কোমলকণ্ঠে কহিল কুমারী ধীরে—
"আজি বসন্ত-উৎসব, তাই নির্ঝরিণীর তীরে
আসিয়াছি মোরা খেলায় যাপিতে। রূপমতী মোর নাম।
রাঠোর তনয়া, জাতি রাজপুত, ধরমপুরেতে ধাম।"

"—তুমি রূপমতী ?" কহিল যুবক,—উল্লাসে কাঁপে বুক !
"অশেষ ভাগ্যে হেরিলাম আজ দুর্লভ ওই মুখ !
সারা মালবের শ্রেষ্ঠা বিদুষী, পরমা রূপসী যিনি—
রাঠোর ঠাকুর থানসিংহের নন্দিনী আদরিণী !

তুমিই কি সেই তন্বী-তরুণী সুন্দরী 'রূপমতী' ?—
অনুপমা বীণাবাদিনী ও যিনি শুনেছি সুকবি অতি !!"

অরুণ-কান্তি তরুণ বীরের আবেগব্যাকুল-স্বরে—
বিস্মিতা বালা তাকায়ে ক্ষণেক রহিল সে মুখ' পরে।
সরমজড়িত দু'টি কালো আঁখি নিমেষে করিয়া নত
কহিলা রূপসী সলজ্জ-হাসি নবোঢ়া বধূর মত,—
"—থানসিংহের অযোগ্যা মেয়ে আমি সেই রূপমতী'।
শুধাতে পারি কি তব পরিচয়—নাহি যদি হয় ক্ষতি ?"

সখীরা সকলে সভয়ে ভাবিছে নীরবে দাঁড়ায়ে দূরে,—
কা'র সাথে সখী করে আলাপন বিজন এ' বনপুরে ?—

কহিল যুবক—"লাবণ্যময়ি ! 'বাজিদ্' আমার নাম।
'বাজ বাহাদুর' নামে পরিচিত মাণ্ডুর সুলতান।
তব রূপ গুণ খ্যাতি অতুলন শুনিয়াছিলাম আগে,
কল্পনা মোর ঘিরেছিল তোমা, ঘনপ্রেম অনুরাগে।
ধন্য হইল নয়ন হেরি' ও অপরূপ রূপ আজ,—
ধন্য হইল শ্রবণ আমার শুনি বীণা বনমাঝ।
মধুর আলাপে জীবন আমার সার্থক মনে করি !
অন্তরপটে আঁকা রবে তুমি বাজের জীবন ভরি !"

* * *

নব বসন্তে মলয় তখন কাননে ফিরিছে শ্বসি' ;
ব্যাকুল পুলকে বিবশ বকুল তরুমূলে পড়ে খসি' !
নীড় অভিমুখী পাখীর কাকলী সুরভি ফুলের বাস
স্বপ্ন-আবেশে ভরিয়া তুলিছে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাশ।
রূপবিমুগ্ধ বাজ বাহাদুর কহিল আবেগ ভরে,—
"অনুমতি যদি করো তুমি দেবি ! লয়ে যাই মোর ঘরে,
এ দেশের যিনি শ্রেষ্ঠা সুকবি সুন্দরী গুণবতী
মাণ্ডুগড়ের সুলতানাপদে।

হে রূপসি রূপমতি !

তুমি যদি হও মহিষী আমার স্বর্গ মানিব ধরা !
সার্থক হবে জন্ম জীবন—সার্থক বাঁচা মরা।"

সহচরীকুল সভয়ে আকুল, শিহরি উঠিল সবে—
সঙ্কেতে কহে এ উহারে—"মাগো ! এ হলে

বলো কী হবে !'

কাঁপিয়া উঠিল তনুবল্লরী—কাঁপিল আঁখির পাতা,
ভালে দেখা দিল ভাবনার রেখা, চিন্তানমিত মাথা।
গেল কতখন নীরবে এমনি।—

আবেগে কহিল বাজ,—

"তোমার মৌন সম্মতি লভি' ধন্য মাণ্ডুরাজ !"
চমকি' রূপসী কহে—"সুলতান !" মৃদু কম্পিত সুরে—
"পুণ্যসলিলা রেবারে ত্যজিয়া যেতে তো পারিনা দূরে !
তীর্থ রেবার পূতধারে আমি নিত্য সিনান করি !
নর্ম্মদাদেবী ইষ্ট আমার, আরাধ্যা ঈশ্বরী !
মাণ্ডু প্রাসাদে সম্ভব হলে রেবার অধিষ্ঠান—
জেনো রূপমতী তোমার কণ্ঠে করিবে মাল্যদান।"
ব্যাকুল কণ্ঠে বাজ কহে—"দেবি ! এ আদেশ ফিরে লহ !
রেবা বেগবতী তার খরগতি কেমনে ফিরাবো কহ।
সম্ভব হলে রাখিত এ' পণ জেনো বাজ প্রাণপণে !
বলো আর কিছু, পারে যা' মানুষ বাহুবলে এ' জীবনে !"

* * *

'বাজ বাহাদুর—বাজ বাহাদুর—সুলতান—সুলতান !'
বহু দূর হতে উচ্চকণ্ঠে এলো যেন আহ্বান !
অশ্বক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে শব্দিত হ'ল বন,
নিমেষে ঘেরিল অরণ্য আসি মাণ্ডু সৈন্যগণ।

কুমারী নীরব।—বাজ কহে—"তবে বিদায় রাঠোরবালা !
বুঝিয়াছি তুমি পাঠানের গলে নাহি দিবে বরমালা।"
শুনি দর্পিত সেনাপতি কহে "দেহ অনুমতি প্রভু !
বলে লয়ে যাই। নতুবা যাবে কি রাঠোর-দুহিতা কভু ?"
সহচরীকুল শুনিয়া আকুল কাঁদিয়া উঠিল ভয়ে !
—চলে গেল বাজ, "আসি তবে আজ—"

বলে গেল সবিনয়ে।

* * *

ধরমপুরের রাঠোর ঠাকুর থানসিংহের ঘরে—
নব-বসন্ত-উৎসব-দিনে শোকের অশ্রু ঝরে।
তরুণী দুহিতা কহিয়াছে কথা ম্লেচ্ছ যবন সহ—
রটিয়াছে গ্রামে থানসিংহের কলঙ্ক দুর্ব্বহ !

রাঠোর দিয়াছে কঠোর আদেশ গরল করিয়া পান
রূপমতী যেন আজই রজনীতে ত্যজে তার পাপ প্রাণ !—
দণ্ড শুনিয়া মূর্চ্ছিতা মাতা শয্যা নিয়েছে ভূমে,
গ্রামের ফাগুন-উৎসব আজ আঁধার বিষাদ-ধূমে !

ধরমপুরের ধর্ম্মযাজক সবাকার গুরু যিনি,
শুনি সংবাদ থানসিংহেরে আদেশ দিলেন তিনি,
"নব ফাল্গুন শুভদিনে আজ বসন্ত-উৎসবে
কুমারী বালার মৃত্যুদণ্ড সঙ্গত নাহি হবে।
আগামী প্রভাতে আদেশ তোমার পালিবে সে নিশ্চয়।
সারা মালবের রূপসীশ্রেষ্ঠা আজি যেন বেঁচে রয়।"

পিতার কঠিন আজ্ঞা পালনে রূপমতী দৃঢ় মন,
সারানিশি তার মহাযাত্রার করে শেষ আয়োজন।
আজি নিশান্তে উদিলে সূর্য্য এ' জীবন-রবি তার
জনমের মত নামিবে অস্তে।

—"জানে কি এ' সমাচার
সেদিনের সেই তরুণদেবতা কাননে দেখেছি যারে ?"
ভাবে রূপমতী—এ' বারতা তারে হয় তো
ব্যথিতে পারে।
মরণের ক্ষণে তার মুখ আজ বারে বারে পড়ে মনে,
ইষ্টদেবীরে আড়াল করিয়া ভেসে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

ফুরায় রজনী, পাণ্ডুর হয়ে আসে ক্রমে নভতল,
বিদায় বেলায় ভোরের তারার আঁখি করে ছলছল !
জাগরক্লান্ত বন্দিনী চখে লাগিল তন্দ্রাবেশ,—
হেরিল স্বপন,—কে যেন অমরী এলায়ে নিবিড় কেশ
দাঁড়ায়েছে এসে,—কহে মৃদু হেসে—"নর্ম্মদাদেবী আমি !
মাণ্ডুগড়ের বাজবাহাদুর তোমারি যোগ্য স্বামী।
সার্থক তব সুকঠিন পণ,—মাণ্ডুপ্রাসাদ-দ্বারে
রেবার উৎস উত্থিত আজ। এবার নির্ব্বিচারে
বাজের কণ্ঠে দিয়া বরমালা রাখ তার সম্মান !"—
তন্দ্রা টুটিয়া চকিতে উঠিয়া দেখে নিশি অবসান !
বিস্ময়ে ভয়ে পুলকে বিহ্বলা রূপমতী ভাবে মনে,—
"দয়াময়ি মাগো ! একি রহস্য করিলি সেবিকা সনে !

এখনি আসিবে বিষের পাত্র, যাত্রী যে পরপারে,—
কেমনে করিবে শপথরক্ষা ?—বরিবে কেমনে তাঁরে ?"

মাণ্ডুগড়ের প্রাসাদের দ্বারে সেদিন রজনীশেষে
করে কোলাহল ভীত বিস্মিত নগরবাসীরা এসে !
জনতার সেই কল কোলাহলে সহসা নিদ্রা টুটি'
বাজবাহাদুর ঝরোকায় তাঁর বাহির হলেন উঠি !
প্রাসাদের পাশে ধরাতল ভেদি' দেখেন প্রবলধারা
উত্থিত আজ উৎসের মত।

হেরিয়া,—প্রবীণ যারা
বলে বিস্ময়ে—"কেমনে এখানে রেবার দরিয়া এলো ?—
শুনি উল্লাসে উন্মাদ বাজ হাতে যেন চাঁদ পেলো।
নিমেষে তাহার আদেশে সাজিল মাণ্ডুসৈন্যদল ;
উড়ে চলে বাজ ধরমপুরেতে আনন্দে চঞ্চল।

তখনো উষার অলক্তরাগ লেগে আছে পূবাকাশে,
অরুণরথের আলোকের ধ্বজা দিগন্তে সবে ভাসে !
সারানিশি জাগি ফাগুন মেলায় ক্লান্ত নিদ্রাতুর
শান্ত প্রভাতে সুশীতল বাতে ঘুমায় ধরমপুর।
হেনকালে সেথা প্রচণ্ডবেগে দীপ্ত উল্কা মত
পড়িল আসিয়া বাজ বাহাদুর, সঙ্গে সেনানী শত !
ক্ষুদ্র সে গ্রাম উঠিল কাঁপিয়া পাঠানের পদ ভরে ;
জাগিয়া উঠিল সুপ্ত রাঠোর সচকিতে ঘরে ঘরে !
রূপমতী প্রতি প্রাণদণ্ডের বারতা শুনি কি আজ—
ধরমপুরের বুকে বাজ হেন পড়েছে আসিয়া বাজ ?—

থানসিংহের গৃহদ্বারে বাজ যেমনি দাঁড়ালো আসি,
নববধূবেশে রূপমতী এসে দিল গলে মালা হাসি !
কহিল.—"এসেছো ? এবার সহজে এ'প্রাণ
ত্যজিব আমি !
করিনু আমার সত্যরক্ষা, বরিনু তোমারে স্বামী।
দাও অনুমতি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে এখন যাই,—
মিলনেই চিরবিদায় হে প্রিয় লইনু তোমার ঠাঁই।"

মুহূর্ত্তে বাজ অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিল বালিকারে !
ইঙ্গিতে তার পাঠান সৈন্য ফিরিল স্কন্ধাবারে।

মাণ্ডুগড়ের প্রাসাদ পার্শ্বে ঝাউ-বীথিকার কোলে
পুণ্য রেবার ক্ষীর নীর যেথা উৎসারে কলরোলে,
উঠিয়াছে সেথা নূতন প্রাসাদ গগনচুম্বী শির !
বাজবাহাদুর নাম দেছে তার 'রূপমতী-মন্দির'।
এই মন্দিরে মিলনানন্দে দু'জনের কাটে দিন,
পূবের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে উষায় নিশীথ লীন।
নিত্য তাদের নয়নে প্রভাত বুলায় রঙীন তুলি !
দিবস রজনী বিভোর দু'জনে নিখিল-বিশ্ব ভুলি।
কভু রূপমতী গাহে সঙ্গীত, সঙ্গত্ করে বাজ !
কখনো বীণায় তোলে ঝঙ্কার, সুরের সূক্ষ্ম কাজ
চম্পককলি অঙ্গুলি তার নিপুণ রঙ্গে সাধে।
বাজ-বাহাদুর মুগ্ধ বিধুর রাগ রাগিনীর ফাঁদে !
নিতি নব নব রচি প্রেমশ্লোক শুনায় প্রিয়ার কাণে ;
রূপমতী তার গাহে উত্তর মধুর ছন্দগানে।
মাণ্ডু প্রাসাদ কল-মুখরিত সুন্দর সুরে সুরে ;
দু'টি নরনারী নূতন স্বর্গ রচিল মালবপুরে।

* * *

বরষের পর বরষ দু'জনে সুখের স্বপনে ভোর !
একদা কেমনে রাঠোরবালার ভাঙিল ঘুমের ঘোর।
রংমহলের বাতায়ন হতে পড়িল নয়নে তার
মাণ্ডুরাজ্য অরাজকপ্রায়, শৃঙ্খলা নাহি আর !
রূপমতী সাথে দিবসে ও রাতে মাতোয়ারা সুলতান !
ভুলিয়া আপন রাজ্যের শুভ, ভুলি রাজ-সম্মান।
রূপমতী তাঁরে ফিরিতে রাজ্যে মিনতি করিল কত !
"—তোমার রূপের অতলে যে জন ডুবেছে মীনের মত
আনন্দনীরে সঞ্চরি' ফেরা এই শুধু তার কাজ।"—
ছন্দোবন্ধে উত্তর দেয় প্রিয়ারে, প্রেমিক বাজ।
নিরুপায় হয়ে রূপমতী নিল আপনি শাসনভার !
রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ দেখা দিল গুণে তার।
রূপমতী জয় ঘোষিতে লাগিল সকল মালবভূমি।
—বাজ বলে "প্রিয়ে ! আমারে ফেলিয়ে
রা'জ্য কি নিলে তুমি ?"

* * *

মাণ্ডুগড়ের পূর্ব্বপ্রাসাদে ফুলজানী সুলতানা !
নবমহিষীর গর্ব্ব ভাঙিতে মন্ত্রণা করে নানা !
বাজের গভীর প্রেম অনুরাগ নিবিড় সোহাগ যত
শোনে লোকমুখে—ঈর্ষায় দুখে ফুলজানী জ্বলে তত।
রূপমতী বাজে বিচ্ছেদ কিসে ঘটে' যায় সত্বর,—
তারি খোঁজে ফেরে পাঠানী বেগম, লেগেছে গুপ্তচর।
বিশৃঙ্খল রাজ্যের ভার নিজকরে তুলে ল'য়ে
মাণ্ডুশাসনে যবে রূপমতী রয়েছে ব্যস্ত হয়ে ;—
রাজকার্য্যের জটিল জালেতে বদ্ধ হেরিয়া তারে,
ফুলজানী ভাবে স্বর্ণসুযোগ মিলিয়াছে এইবারে।
দিলো বুঝাইয়া বাজ বাহাদুরে—
"তোমারো অধিক প্রিয়
রাজ্যই ওর। নতুবা তোমারে ছাড়িয়া রহিত কি ও
মন্ত্রণাগারে দরবারঘরে অহরহ রাজকাজে ?—
তারি পায়ে পায়ে ফিরিতেছ তুমি ? ছি ছি দেখে
মরি লাজে।
যার প্রেমে তুমি সব কিছু ভুলে বৈরাগী হলে বাজ।
সে তোমারি এই মস্নদ্ পেয়ে ভুলেছে তোমারে আজ।"

যে-বিষ ছড়াল ফুলজানী, তার ফলিল অমোঘ ফল
প্রমোদবিলাসী বাজবাহাদুর সহজেই চঞ্চল !
ত্যজি' 'রূপমতী-মন্দির' এলো পূর্ব্ব প্রাসাদে ফিরে !
শতেক তরুণী আনি ফুলজানী বাজেরে রাখিল ঘিরে।

অভিমানাকুল অন্তর লয়ে শূন্য প্রাসাদ মাঝে—
ভূমিতে লুটায়ে কাঁদে রূপমতী গভীর ব্যথায় লাজে।
"আমি প্রেমহীনা ?—এ কথা কেমনে ভাবিতে
পারিলে বাজ ?
তোমার রাজ্য রাখিতে কি গেল আমার রাজ্য আজ !"
রূপমতী প্রেমে বাজবাহাদুর করে যদি সন্দেহ,
রবি শশী তারা হবে জ্যোতিঃহারা রবেনা জগতে কেহ !
সিন্ধু সলিলে তরঙ্গদল নিশ্চল হবে আজ !
রূপমতী প্রেমে বিশ্বাস যদি হারায় প্রেমিক বাজ !

উল্লাসে নদী সাগর অবধি বহে যায় কেন তবে ?—
রূপমতী আর বাজবাহাদুরে বিচ্ছেদ যদি হবে !"
বাজের বিরহে বাজিয়াছে তার মর্ম্মে কাতর শোক,
উদ্বেলি ওঠে করুণছন্দে বেদনাব্যাকুল শ্লোক।
রাঠোরদুহিতা প্রেমগর্ব্বিতা তেজোময়ী রূপমতী
কহে অভিমানে "কায়মনোপ্রাণে হই যদি আমি সতী—
ফিরিতেই হবে সাধ্বীর পাশে স্বামীরে তাহার ঠিক !
রূপমতী চায় মস্‌নদ্ ?—ছি ছি ! হেন কলঙ্কে ধিক্ !!"

হোথা ফুলজানি-বেগম-মহলে প্রমোদের স্রোত বহে—
তবু,—থেকে থেকে বাজের হৃদয় প্রিয়ার বিরহে দহে।
ভুলিতে সে জ্বালা ডাকি বলে—"সাকি ! সুরার পেয়ালা ভরো !
কোথা নর্ত্তকি ! নাচো হরদম ! সারেঙ্গি ! গজল্ ধরো !"

* * * *

দিন চলে যায় !…কারো সুখে দুখে স্থির নাহি রহে কাল !
গুরু অভিমানে জমে ওঠে প্রাণে জটিলতা-জঞ্জাল !
আজো রূপমতী-মহল শূন্য,—আসেনি ফিরিয়া বাজ !
ব্যথা-বিমথিতা প্রিয়বঞ্চিতা ত্যজিয়াছে রাজকাজ।
বাজের বিরহ বেদনায় তার অহরহ ঝুরে প্রাণ,—
নবজীবনের নবীন প্রভাতে উৎসব-অবসান।
ক্ষুব্ধ-কাতর অন্তরে তার অশ্রুকরুণ-সুর
জমে ওঠে ক্রমে রক্তরঙীণ বিচ্ছেদ-ব্যথাতুর !
কৃষ্ণানিশার নিকষ আঁধারে নিবিড় নিশুতি রাতে
কেঁপে ওঠে তার বীণাঝঙ্কার অকথিত বেদনাতে।
রাণী রূপমতী রচি' দুখগীতি মর্ম্মের বাণী যত—
শূন্য প্রাসাদে গাহে একাকিনী,—চক্রবাকীর মত !
আসিত সে গান বাতাসে ভাসিয়া পূর্ব্ব প্রাসাদ মাঝে
সচকিত করি সুরাপ্রমত্ত অচেতনপ্রায় বাজে !
স্খলিত চরণে উঠি সুলতান প্রাসাদ মীনারে এসে—
দিত উত্তর ছন্দে ছন্দে হৃদয়-আবেগে ভেসে।
মান অভিমান ছিল অফুরাণ দু'জনার প্রাণ জুড়ে,
আঁখিজলে ধুয়ে সুরে সুরে মু'য়ে ক্রমে তাহা গেল উড়ে।

নিতি নিতি করি গীতি-বিনিময় সারাটি রজনী জাগি'
বাজবাহাদুর ব্যাকুল-বিধুর প্রিয়ার মিলন লাগি !
বুঝি নিজ ভুল ফিরিল একদা অনুতাপ-নত শিরে,—
সন্তাপহরা প্রেমের স্বর্গ 'রূপমতী-মন্দিরে।'
এল রূপমতী প্রিয়তম পাশে বিরহ-মলিন তনু,
অধরে নয়নে হাসি ও অশ্রু ফুটালো ইন্দ্রধনু।
কহিল—"এসেছো ? এতদিন পরে মনে কি পড়িল ফিরে—
সহকারচ্যুতা ধূলিলুণ্ঠিতা বিস্মৃতা লতাটিরে ?—
ছিনু এতদিন পথ চাহি প্রিয় ! অহরহ তব লাগি !
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী আঁখিজলে গেছে জাগি' !"

জুড়ি দুই পানি অশ্রুব্যাকুল বাজ বলে—"প্রিয়তমা !
জানি ক্ষমাতীত অপরাধ মোর ; তবু মোরে কর ক্ষমা !
তোমারে ত্যজিয়া করিয়াছি প্রিয়া নিজেরি সর্ব্বনাশ !—"
মুছায়ে অশ্রু রূপমতী দিল প্রেমভরে আশ্বাস,—
"নিঠুর নিয়তি ঘটায়েছে ইহা, কেহ দোষী নহে জানি !
—রাজ্য দিয়াছে আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ-রেখা টানি' !
চলো তারে ছেড়ে চলে যাই দূরে দু'জনে ভাবনাহীন !
তরুতলে মোরা বাঁধিয়া কুটীর কাননে কাটাব দিন।
দূরে—বহুদূরে—সাগরের তীরে শ্যামল শৈল কোলে,—
প্রকৃতির রূপ-সম্পদে যেথা আনন্দে মন ভোলে,—
সেথা গিয়া মোরা রচিব ধরায় নবীন স্বর্গলোক।—"

শুনি আগ্রহে বাজ কহে—"প্রিয়ে ! এখনি পূর্ণ হোক
কল্পনা তব ; এহেন জীবন যাপিবারে যদি পাই
ধন সম্পদ, রাজ্য, বিলাস কিছু আমি নাহি চাই।
আজ শুধু তুমি শুনাও আমারে সেদিনের সেই গান
প্রথম মিলন-লগ্নে যে সুরে মুগ্ধ করেছো প্রাণ !
বাজাও তোমার সুমধুর বীণা, তোলো তোলো ঝঙ্কার !
আজি মালবের অধিপতিরূপে শুনে লই শেষবার !"
হেসে রূপমতী নিল তুলি বীণা, ধ্বনিল মোহন সুর !
—বাজ বলে—"আজ কণ্ঠ তোমার সুধা হতে সুমধুর !"

সহসা সেথায় ছুটে এসে দিল দৌবারী সমাচার !
"দিল্লীপতির মোগলবাহিনী ঘিরেছে দুর্গদ্বার !

আকবর শা'র বীর সেনাপতি আদম খাঁয়ের সেনা
মাণ্ডুগড়ের কেল্লা না নিয়ে দিল্লীতে ফিরিবেনা।"

হুঙ্কারি' বাজ গর্জ্জি' উঠিল—"বাজিদ্ মরেনি আজো!
যেখানে যে আছো পাঠানসৈন্য, হাতিয়ার নিয়ে সাজো;
জানাও এখনি আদেশ আমার,—নিজে যাবে সুলতান!
মোগলের করে মাণ্ডু দেবেনা এ'দেহে থাকিতে প্রাণ!"

বিদ্যুৎবেগে চলে গেল বাজ,—বলে গেল
"—আসি প্রিয়ে!
যদি বেঁচে ফিরি, যাবো সেই বনে তোমারে সঙ্গে নিয়ে!—
যেথা একদিন গোধূলিলগনে স্নিগ্ধ রেবার তীরে—
পেয়েছিনু খুঁজে মালবের মনি! সেইখানে যাবো ফিরে!"

মোগলবাহিনী মাণ্ডুদুর্গ করিয়াছে অধিকার!
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেছে বাজ, ফেরেনি প্রাসাদে আর!
আদম খাঁয়ের অধীনে এসেছে মালব সিংহাসন;
ধৃত পরাজিত ছত্রভঙ্গ পাঠান সৈন্যগণ।
বাজের হারেমে ছিল সুন্দরী তরুণী রমণী যত
একে একে হ'ল নব সুলতান আদমের অনুগত।
শুধু রূপমতী রাঠোর যুবতী মোগলে নিলনা মানি;
বন্দী করিল আদম তাহারে 'জাহাজ-মহলে' আনি।
সবার মাঝারে সেরা যেই নারী রূপগুণ-গরিমায়,
বিজয়ী মোগল পাগল, তাহারে মহিষী করিতে চায়।

রূপমতী তারে পাঠাল বারতা,—"কালি পূর্ণিমা-রাতে
আমার মিলনলগ্ন।"—
শুনিয়া স্বর্গ লভিল হাতে;
রূপমতীরূপে মত্ত আদম।—মহার্ঘ্য রাজবেশে—
জ্যোৎস্নানিশীথে প্রবেশিল একা জাহাজ-মহলে এসে।
প্রথমপ্রণয়ভীরু প্রেমিকের কম্পিত হিয়া ল'য়ে—
আসিল তাহার প্রার্থিতা পাশে অধীর ব্যাকুল হ'য়ে।

দেখে সব দ্বার আজি খোলা তার; উৎসব আয়োজন,
দুয়ারে দুয়ারে মঙ্গলঘট রঙীণ-আলিম্পন।
ফুলপল্লবে সজ্জিত গৃহ, জ্বলিছে লক্ষ বাতি!
চামেলীগন্ধে অন্ধবাতাস মহলে ফিরিছে মাতি'।
হেমপালঙ্কে কুসুম-অঙ্কে নববধূবেশে সাজি'
রূপসী-শ্রেষ্ঠা রূপমতী শুয়ে অঘোরে ঘুমায় আজি।

পুলকবিহ্বল চঞ্চলপদে আদম আসিল কাছে,
ধীরে ধীরে তার ধরিল বাহুটি ভাঙে বা সুপ্তি পাছে!
শিহরি উঠিল সভয়ে সহসা,—একি এ সর্ব্বনাশ!
মালব রূপসী এড়ায়েছে আজ মোগলের বাহুপাশ।
রাঠোরবালিকা কোমলে কঠোর,—জহর করিয়া পান
বক্ষে বাজের অঙ্গুরী লয়ে ত্যজিয়াছে সুখে প্রাণ॥
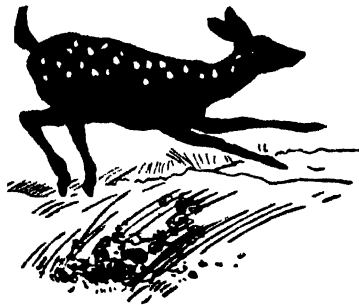
— শেষ —

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

[কাম্বোজের ওঙ্কারধাম ও মন্দির]

প্রাচীন কাম্বোজ প্রদেশ এখন ফরাসী অধিকৃত ক্যাম্বোডিয়া। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে সেখানে যে বিরাট 'ওঙ্কার' মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল, সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল তা' পরিত্যক্ত ও ক্রমশ নিবিড় ঘন-অরণ্য-জালে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল। বেশী দিনের কথা নয়, এই মন্দিরটি যখন আর একবার ফরাসীদের আমলে প্রথম লোক-লোচনের গোচর হ'ল,—তখন দেখা গেলো যে এই সুদীর্ঘকালের অযত্নে পরিত্যক্ত জঙ্গল-সমাহিত বিরাট মন্দিরটি এক অতীত সভ্যতার উচ্চ আদর্শ বহন ক'রে আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্পকলা, এর স্থাপত্যের অনুপম সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রত্যেক দর্শকের মনে একটা বিস্ময়াকুল প্রশংসার ভাব জাগিয়ে তোলে! একটা অত্যাশ্চর্য্য ও অপরূপ সুন্দর কিছু দেখলে মানুষের মন যেমন অপরিসীম বিস্ময় পুলকে অভিভূত হ'য়ে পড়ে, 'ওঙ্কার' তেমনি করেই দর্শকদের মনকে অভিভূত করে।

ওঙ্কার-মন্দিরের মূলভিত্তি। (ভগ্নাবস্থা)

'ওঙ্কার'-মন্দিরের অস্তিত্ব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে বটে কিন্তু যাদের এই বিপুল কীর্ত্তি তারা আজ বেঁচে নেই। আশে-পাশের সমস্ত শহর ও অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দির একেবারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হ'য়েছে। ভীষণ জঙ্গল তার সহস্র বলিষ্ঠ বাহু বিস্তার করে এই প্রাচীন মানব-কীর্ত্তি ধ্বংস করবার জন্য যেন তার কণ্ঠরোধ ক'রে ধরেছে। বর্ত্তমান কাম্বোজ বা ক্যাম্বোডিয়া প্রদেশ

নর্ত্তকী (ওঙ্কার-মন্দির-গাত্রে এইরূপ অসংখ্য নর্ত্তকীর নানা নৃত্যভঙ্গী উৎকীর্ণ করা আছে)

দক্ষিণে নদী ও সরোবরগুলির তীর ঘেঁসে সংস্থাপিত, কিন্তু ওঙ্কারধাম উত্তরে জনপদ-বহুল ক্যাম্বোডিয়ার সীমান্ত থেকে অন্ততঃ ক্রোশ দুই তিন দূরে। মাত্র জনকয়েক পীত পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এই ধ্বংসাবশেষ অংশে এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন মন্দির-পার্শ্বে পড়ে আছেন। সহরবাসীরা কেবলমাত্র বৎসরে একবার তাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একটি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়। তারা এই মন্দিরটিকে দেবতার সৃষ্টি বলে মনে করে। এ যে মানুষের পরিকল্পিত, মানুষেরই হাতে গড়া পূজা-পীঠ, এ তারা জানে না। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এ মন্দির কারা নির্ম্মাণ করেছে জানো?—তারা ও পরস্পর-বিরোধী যে তার ভিতর থেকে সত্য নির্ণয় করে ওঠা একরকম দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাঁরা বলেন কাম্বোজের প্রাচীনতম অধিবাসীদের নাম ছিল শায়াম্পা। তারা নাগ-সাধক ছিল। তাদের দেবতা সর্প। পরে মালয়দের সঙ্গে এদের বহুল সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পরবর্ত্তীকালে এরা ক্মোমেন নামে পরিচিত হয়েছিল। ফোর্ণেরোর মতে খৃষ্ট পাঁচ শতাব্দীতে এদেশে আর্য্যেরা অভিযান ক'রেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের যুবরাজ প্রথম এখানে এসে ক্মের সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছিলেন। পিতার সঙ্গে বিরোধ ক'রে তিনি যখন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে নির্ব্বাসিত হন, তাঁর সঙ্গী দলবল নিয়ে তিনি পূর্ব্ব প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হ'য়েছিলেন। পথে সমস্ত দেশ
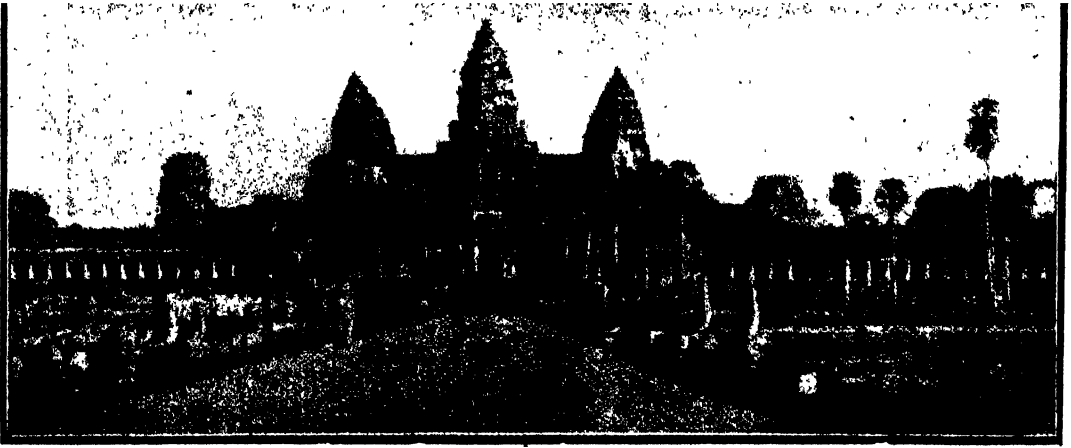
ওঙ্কার-মন্দির দৃশ্য

অসংশয়ে উত্তর দেয়—দেবতা! ওঙ্কারের শিল্পীরা আজ এমন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে যে তাদের অস্তিত্ব এককালে ছিল কিনা তার কোনো সূত্রই আজ এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মন্দিরে যে সব প্রাচীন হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে বর্ত্তমান কাম্বোজবাসীদের কাছে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। 'ওঙ্কার মন্দির' সম্বন্ধে কোনো কাহিনী, কিম্বদন্তী বা এর মহান শিল্পীদের সম্পর্কে কোন ঐতিহ্যও আধুনিক ক্যাম্বোডিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ওঙ্কারের স্থাপত্য সম্বন্ধে বহু গবেষণা ক'রে এ বিষয়ে যে সকল মতামত প্রকাশ ক'রেছেন সেগুলি এত বিভিন্ন রকমের জয় করে লুঠ করে ধ্বংস ক'রে শেষে এই কাম্বোজে এসে তিনি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর সংস্থাপিত এই ক্মের সাম্রাজ্য প্রায় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বলবীর্য্যে, শিল্প-বাণিজ্যে এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবে এখানকার আদিম সর্প-পূজা প্রায় লোপ পেয়েছিল এবং হিন্দু দেব-দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। ওঙ্কারধাম হিন্দুরাই এখানে নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু, সপ্তম শতাব্দীতে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, আর মাত্র একটি স্তম্ভ খোদাই ও পালিশ করা শুধু বাকী, সেই সময় সিংহল থেকে বৌদ্ধধর্ম্মের বন্যা এসে

কাম্বোজকে প্লাবিত ক'রে দিয়েছিল। ওঙ্কারও এই সময় হিন্দু মন্দিরের পরিবর্তে বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হয়। ওঙ্কার-মন্দির-গাত্রে এখনও পাশাপাশি হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্ত্তির সঙ্গে যদিও বৌদ্ধ মূর্ত্তিরও সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওঙ্কার-মন্দিরের স্থাপত্য সম্পূর্ণ বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত। এই মন্দির প্রাচীন হিন্দু ও খ্মের স্থাপত্যের এক বিরাট নিদর্শন।

খ্মের-সম্রাট স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাতে অবিলম্বে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ভগবান স্বয়ং এ কথা বলেছেন। এইরূপ মনোভাব ও ধর্ম্মাদর্শের ফলেই বিনা রক্তপাতে 'ওঙ্কার-মন্দির' বৌদ্ধ মঠে পরিণত হ'তে পেরেছিল।

কিছুই কিছু নয়, সংসার অনিত্য—সবই মায়া—হিন্দুশাস্ত্রের এই ধর্ম্মোপদেশ—বৌদ্ধ অভিযানের ফলে তাঁদের সামনে এমন প্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে ওঠাতে সেখানকার হিন্দু শিল্পীরা সকলেই প্রায় দুঃখবাদী ও উদাসী হ'য়ে পড়লো। ফলে, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে

ওঙ্কার-মন্দিরের প্রবেশ-পথ (সংস্কৃত অবস্থা) উভয় পার্শ্বে সপ্তশীর্ষ নাগ ফণা বিস্তার ক'রে রয়েছে। নিম্নে দ্বারপাল সিংহদ্বয়

বৌদ্ধধর্ম্মই হ'য়ে উঠ্‌লো সমস্ত খ্মের সাম্রাজ্যের রাজধর্ম্ম। নবধর্ম্মের নবীন দীপ্তির কাছে পুরাতন হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতিঃ যখন ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে গেল, প্রাচীন-পন্থীরা তখন তাঁদের পিতৃ-পিতামহের আদর্শ ধর্ম্মে অধিকতর দৃঢ় বিশ্বাসী হ'য়ে বলতে লাগলেন—এমনটা যে হবে এ তাঁরা জানতেন। কারণ, এ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল,—সংসারে সেখানে আর এমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য-কীর্ত্তি স্থাপিত হ'ল না যা কলা ও কল্পনায় ওঙ্কারে'র সঙ্গে সমান গর্ব্ব ক'রতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এই সময় থেকেই 'খ্মের'-স্থাপত্য-কলার অধঃপতন সুরু হ'য়েছিল। 'ওঙ্কার-ধাম' যদি আজ কাম্বোজের পরিবর্তে ভারতবর্ষ কিম্বা ব্রহ্মদেশেও স্থাপিত হ'ত—তাহ'লে হয়ত' পৃথিবীর সকল

দেশের তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগে যেতো এই মন্দির-প্রাঙ্গণে। কিন্তু ক্যাম্বোডিয়ার অবস্থা আজ এমন যে সে দেশের শিল্পীরা গৃহ নির্ম্মাণ ত' দূরের কথা, সামান্য একখানা চালা ঘরও ভাল ক'রে তৈরী ক'রতে জানে না! কাজেই এ লক্ষীছাড়া দেশে সহজে কেউ যেতে চায় না! 'ওঙ্কার-ধাম' সেখানে আজ যেন দরিদ্রের ঘরে দুর্লভ মণি হেন শোভা পাচ্ছে।
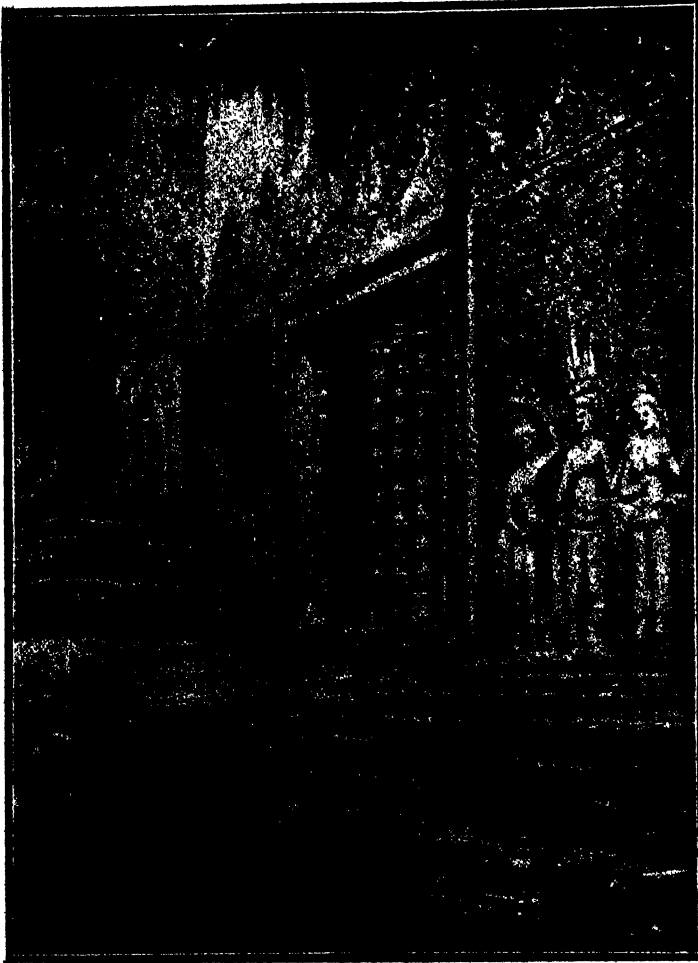
ওঙ্কার-মন্দির-গাত্রের উপর শিলা-চিত্র (ফুল ও লতাপাতার পরিকল্পনা ছাড়া স্বর্গের অপ্সরাদের নৃত্যপরা মূর্ত্তিও উৎকীর্ণ রয়েছে। বাতায়নের সুগঠিত প্রস্তর গরাদগুলি ওঙ্কার-মন্দিরের স্থাপত্য-কলার একটি প্রধান বিশেষত্ব)

ওঙ্কারের সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। এমনিই এক সুষমা-মণ্ডিত সুসজ্জ অথচ রহস্য বিজড়িত এর রূপ, যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শিল্পীর রঙীণ তুলিও এর মহিমা এঁকে প্রকাশ ক'রতে পারবে না। এই মন্দির যে কত বিরাট, তার একটা মোটামুটি ধারণা হ'তে পারে যদি এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা প্রভৃতির সঠিক পরিমাপ অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করা যায়। পূর্ব্বেই ব'লেছি—ওঙ্কারে খ্মের স্থাপত্য-কলার প্রাধান্যই ওতোপ্রোতভাবে বিদ্যমান। খ্মের-মন্দিরের বিশেষত্বই হ'চ্ছে প্রত্যেক মন্দিরটির চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং প্রশস্ত পরিখা বা গড়খাই দিয়ে ঘেরা থাকে। ওঙ্কারেও সুদৃঢ় দুর্গপ্রাকারের মত উচ্চ প্রাচীরে চারিদিক ঘেরা। প্রাচীরের কোলে চওড়া খাল কাটা। মন্দিরে প্রবেশ ক'রতে হ'লে যে কোনো দিকের একটি সেতুর উপর দিয়ে গড়খাই পার হ'য়ে প্রাচীর-সংলগ্ন মন্দিরের তোরণ-দ্বারে যেতে হবে। মন্দিরের ভিত্তি-মূলই আগাগোড়া দশ ফুট উঁচু এক জমাট পাথরের বিরাট বেদী! তারই উপর এই বিপুলায়তন মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছে পাথর কেটে কেটে কুঁদে কুঁদে বসিয়ে! সমস্ত মন্দিরটাই পাথরে গড়া, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কোথাও এর কারিগরেরা জোড়া লাগাবার জন্য সিমেণ্টের মতো কোনো মশলা ব্যবহার করেনি, অথচ এমন নিপুণভাবে পাথরের উপরে পাথর চাপিয়ে এ মন্দির তৈরি যে কোথাও এর একটু ফাঁক চোখে পড়ে না।

ওঙ্কার-মন্দির আকারে দীর্ঘ-চতুষ্কোণ। লম্বা দিকে ৭৯৬ ফিট ও চওড়া দিকে ৫৮৮ ফিট। প্রধান মন্দিরের চূড়া বেদী-মূল থেকে ২৫০ ফিট উঁচু। চারকোণের চারটি শোভামন্দিরের চূড়া ১৫০ ফিট উঁচু। এই সব চূড়ার সমাবেশ কিন্তু ঠিক ভারতীয় মন্দির-চূড়ার সমাবেশের অনুরূপ নয়। ভারতীয় মন্দির-চূড়া যদিই

ধ্বজা-কেন্দ্রের সন্নিহিত হয়, ততই তার উচ্চতা হ্রাস হ'য়ে আসে; কিন্তু ক্মের মন্দিরের চূড়া যতই ধ্বজা-কেন্দ্রের সন্নিহিত হয়, ততই ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠ্‌তে থাকে! কাজেই চারিদিকের উচ্চ প্রাচীর সত্বেও দূর হ'তেই এ মন্দিরের অনেকখানি দর্শকদের দৃষ্টিগোচর হয়। ওঙ্কার-মন্দির-চূড়ার এই যে ক্রমশ উঁচু হ'য়ে ওঠা টোপরের মত আকৃতি, এবং অলিন্দের সেই পানের খিলির মত খিলানের ছাদ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে আজও এক বিস্ময়কর রহস্য

খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি 'ওঙ্কার'-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হ'য়েছিল। ক্যাম্বোডিয়ার বা শ্যামের কিম্বা আনামের কোনো শাসক বা কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান বা ধর্ম্মসম্প্রদায় যে ওঙ্কার-মন্দিরের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার কখন গ্রহণ করেছিলেন এরূপ কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ওঙ্কার-মন্দিরের জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থা দেখে এই কথাই এর আবিষ্কর্ত্তাদের মনে হয়েছিল যে এ মন্দিরটির যারা মালিক

প্রধান মন্দিরে প্রবেশের সোপানশ্রেণী (এ থেকে মন্দিরের বেদীমূলের উচ্চতার কতকটা ধারণা হতে পারে)

হ'য়ে রয়েছে। ওঙ্কারের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, এর উপরে ওঠবার যে সোপান-শ্রেণী তা ভারতীয় মন্দিরের সোপান-শ্রেণীর অনুরূপ নয়। মন্দিরের প্রশস্ত দেওয়ালের অভ্যন্তরেই উপরে উঠবার সোপানের ব্যবস্থা ক'রে ওঙ্কারের স্থপতিরা অধিকতর কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন।

ছিল, তারা বহুকাল পূর্ব্বে এটিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে কোন নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা করতে বাধ্য হ'য়েছিল। তারপর ফরাসীরাই সেদিন একে নিশ্চিত ধ্বংসের গ্রাস থেকে উদ্ধার ক'রে জগতের নিকট পরিচিত ক'রে দিয়েছে। প্রায় ১২০৯ বিঘা জমীর উপর এই ওঙ্কারধাম নির্ম্মিত হ'য়েছে। সুতরাং এ মন্দির পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

রাখতে হ'লে অন্ততঃ দু'শো লোককে প্রত্যহ পরিশ্রম ক'রতে হবে। সে যাই হোক্, যে অবস্থায় এ মন্দির উদ্ধার হ'য়েছে তা' একেবারে অপ্রত্যাশিত! সুদীর্ঘ অরণ্য-সমাধি এর বেশী কিছু ক্ষতি ক'রতে পারেনি। ১৩০০ শত বৎসরের অবহেলার পরেও আজ দেখা যাচ্ছে এ মন্দিরের রূপ ঐশ্বর্য্যের যেন তুলনা নেই!

অন্যান্য হিন্দু-মন্দিরের চেয়ে ওঙ্কার-মন্দিরের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারা যায়—এর অনাড়ম্বর গঠন-পারিপাট্য এবং সংযত সৌন্দর্য্যের মধ্যে। যে ভারতবর্ষ থেকে একদল লোক বেরিয়ে গিয়ে এখানে রাজ্যবিস্তার ক'রে এই বিরাট কীর্ত্তি স্থাপন করেছিল, সেই ভারতবর্ষেও ঠিক এর জুড়ি মেলে এমন একটি মন্দির দেখতে পাওয়া যায় না। মন্দির এখানে অসংখ্য আছে বটে, মাদুরা, ত্রিবেন্দ্রম্, শ্রীরঙ্গম্, রামেশ্বরম, এ সমস্তই অসামান্য মন্দির; কিন্তু এগুলি দেখলে মনে হয় যেন কুবেরের ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-কলার আতিশয্যের উৎপাতে প্রত্যেকটি ভারাক্রান্ত! কিন্তু ওঙ্কার সম্বন্ধে এ অভিযোগ করবার উপায় নেই! স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কলা এ মন্দিরেও প্রচুর আছে, কিন্তু, তার মধ্যে কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। আগাগোড়া একটা সুসামঞ্জস্যে ভরা। ওঙ্কারধামের মন্দিরগাত্রে (প্রায় একহাজার পঁচিশ) বিস্তৃত যেসব ভাস্কর্য্যশিল্প ও উদ্গত শিলা-চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে তার মধ্যে এত শত-সহস্র রকমের মূর্ত্তি চোখে পড়ে যে তার সংখ্যা হয়না; কিন্তু এমনিই আশ্চর্য্য শক্তিধর ও প্রতিভাশালী ছিল সে যুগের শিল্পীরা যে, সেই অসংখ্য চিত্রের মধ্যে কোনটিকেই পুনরাবৃত্তি বা একরকম বলে মনে হয়না। সমস্ত রামায়ণ-বর্ণিত

সহাস্যবদন বুদ্ধমূর্ত্তি (ওঙ্কারে প্রাপ্ত)

খোদিত পাষাণ-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ

কাহিনী এই মন্দিরের পাষাণগাত্রে পর্য্যায়ক্রমে উৎকীর্ণ করা আছে! রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ, বানর কটকসহ বীর হনুমানের তাঁকে সাহায্য করা—সবই আছে। রাম-লক্ষ্মণের সেই ধনু আকর্ষণ করে শরক্ষেপের মধ্যে যে গম্ভীর শৌর্য্য ও বীর্য্য বিকশিত হ'য়ে উঠেছে, রাক্ষসের অসি ভল্ল তরবারি আস্ফালনের মধ্যেও তেমনিই একটা নিষ্ঠুর নৃশংস ক্রূরতা ফুটে উঠেছে! বীর হনুমান বীরোচিত মূর্ত্তিতেই এখানে
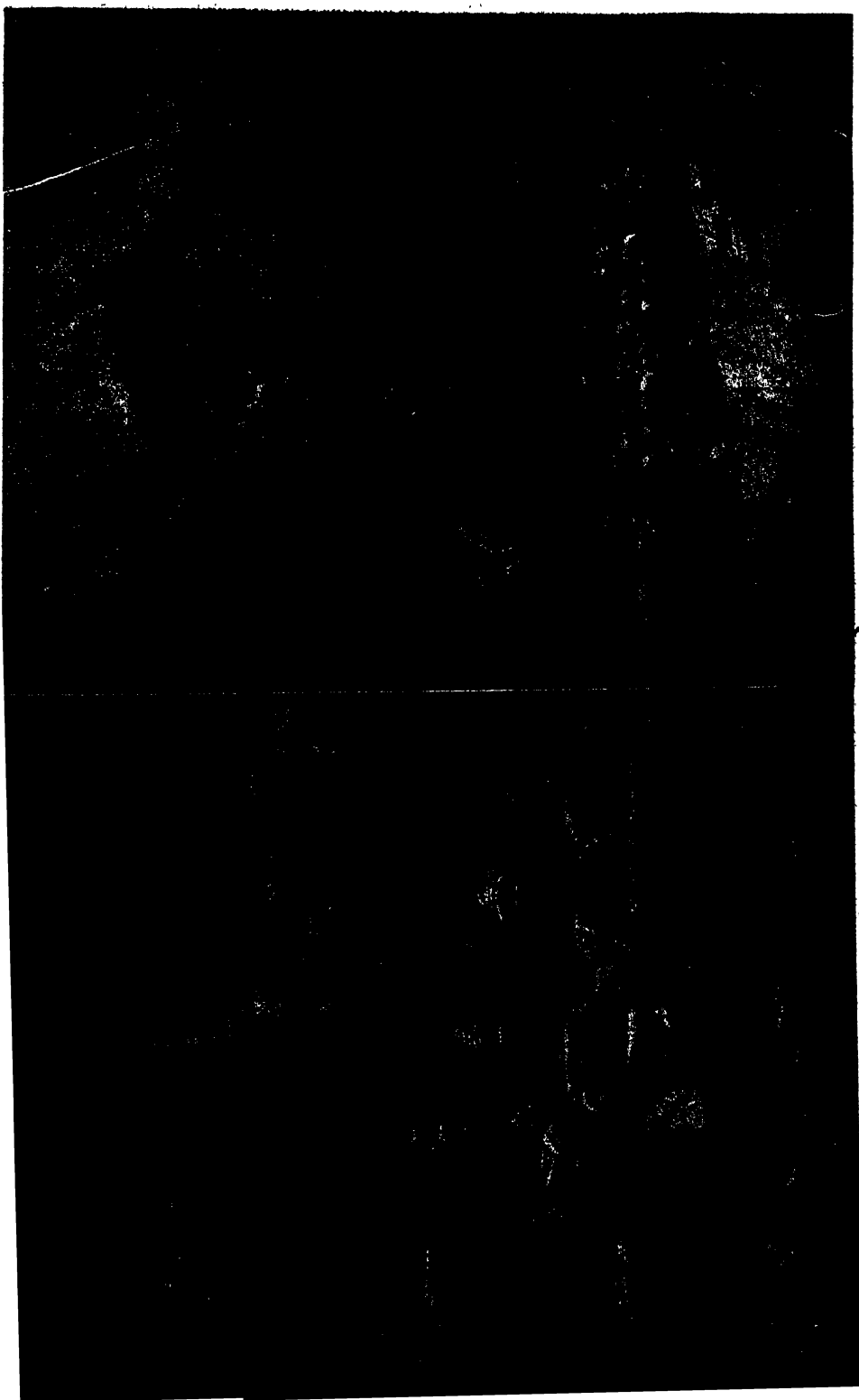
ওঙ্কার-ধাম নগরীর পূর্ব্ব তোরণ-দ্বার।   তোরণদ্বারের উভয় পার্শ্ব পাষাণে গঠিত অসংখ্য দ্বাররক্ষী সুসজ্জিত

পরিকল্পিত হ'য়েছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তিটির মুখভঙ্গী থেকে সুরু করে তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাবভাব, গঠন ও সংস্থান এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক ক'রে কঠিন পাথরের উপর তাঁরা খোদাই ক'রে গেছেন যে আজ এতকাল পরে তাঁদের হাতের এই অনুপম কাজ দেখে সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে তাঁদের শিল্প-প্রতিভার কাছে আপনিই মাথা নত হ'য়ে পড়ে।

ক্মের রাজ্যের রাজধানী ছিল 'ওঙ্কারধাম'। মন্দির থেকে তিনমাইল দূরে এই শহর অবস্থিত ছিল। যে

'ওঙ্কার-শিল্পীদের শিলাশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন

আর্য্যবাহিনী ভারতবর্ষ থেকে এখানে অভিযান ক'রেছিলেন, রাজধানী 'ওঙ্কারধাম' তাঁদেরই স্থাপিত। এই নগর ওঙ্কার-মন্দিরের চেয়ে আরও অনেক প্রাচীন; কারণ, সহর হবার দীর্ঘকাল পরে মন্দির-গঠন-কার্য্য সুরু হয়েছিল। কাজেই পরিত্যক্ত ওঙ্কার-মন্দির ধ্বংস হবার অনেক আগেই পরিত্যক্ত নগর 'ওঙ্কার ধাম' কালের অপ্রতিহত প্রভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়েছিল। ওঙ্কারধামের বিচিত্র ধ্বংসাবশেষ দেখে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে একদিন এ শহর ছিল নয়নাভিরাম। যদিও মন্দিরের অনুরূপ মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য এ নগরীর ছিল এমন কথা বলা চলে না, তবে এ কথা নিশ্চয় যে কলাকল্পনায় ও ভাবৈশ্বর্য্যের দিক দিয়ে এ শহরও ছিল মন্দিরের তুল্যই রহস্য-মধুর ও বিস্ময়-বিমুগ্ধকর।

সুন্দরী নগরী ওঙ্কারধাম বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি—অসংখ্য কারুকার্য্য-খচিত স্তম্ভ চূড়া ও গম্বুজ পরিশোভিত, এবং নানা মূর্ত্তি ও ভাস্কর্য্য শিল্প সমন্বিত ছিল। পাষাণে খোদিত সুবৃহৎ
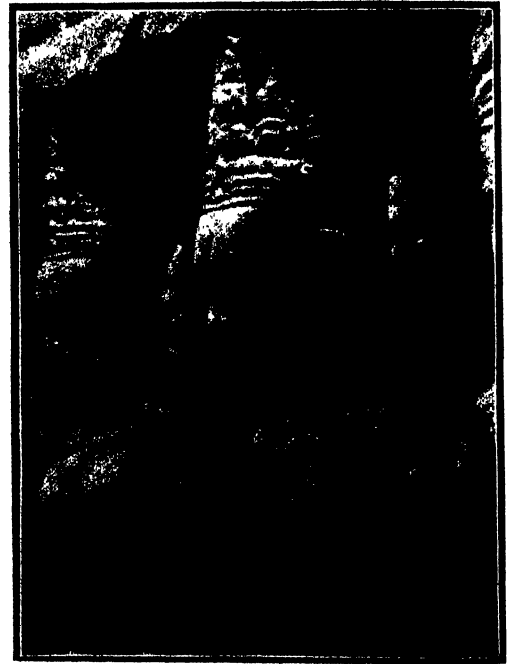
ওঙ্কারের অপরূপ মূর্ত্তিশিল্প। (ভাস্কর্য্য-কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন)

সিংহ হস্তী প্রভৃতি দ্বারপাল প্রাসাদ তোরণদ্বারের শোভাবর্দ্ধন ক'রতো। ছোট বড় কত না দেব-দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি এখনো শহরের নানাস্থানে ভেঙে পড়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। নগর-প্রবেশের এক সুপ্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড তোরণদ্বার ছিল। তোরণশীর্ষে ধনুর্দ্ধারী বীরদের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা ছিল। তোরণের দুইপাশে প্রহরীদের ও দ্বারপালদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর পাষাণ

কক্ষ নির্ম্মিত ছিল। এ সহরে বাস ক'রতো কারা ?—এ প্রশ্নের উত্তর ওঙ্কার-মন্দির-গাত্রের উদ্গত শিলাচিত্রগুলি থেকেই পাওয়া যায়। পাত্রমিত্র সভাসদ্ মন্ত্রী সন্ন্যাসী, সংসারী, ব্যবসায়ী, পুরোহিত, নর্ত্তকী, রাজার পার্শ্বচর ও স্তাবকের দল, সৈনিক-সেনাপতি সবই ছিল এ শহরে। রাজা যখন তাঁর সৈন্য সামন্ত ও হাতীঘোড়া নিয়ে যুদ্ধযাত্রা

ওঙ্কারধামের আর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ
(এইরূপ ৩৭টি চূড়া পাওয়া গেছে)

করতেন, ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সকলে তাঁকে প্রণাম করতো। এ ছবিও সেখানে আছে। আর আছে যমদূতেরা পাপীদের শাস্তি দিচ্ছে, কোথাও বা সবুজ চাঁদোয়ার তলায় গণেশ নৃত্য করছেন, কোথাও বা আছে বোধিসত্ত্বমূলে ধ্যানসমাহিত ভগবান বুদ্ধ। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, কিন্তু সকল স্থানেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে—সপ্তশীর্ষ সর্প। এই নাগরাজ ঊর্দ্ধে ফণা তুলে সর্ব্বত্রই যেন দংশনোদ্যত হ'য়ে রয়েছেন। ওঙ্কার-মন্দিরের প্রত্যেক প্রবেশপথে ও সেতুমুখে এই নাগরাজ তাঁর সপ্তফণা মেলে পাহারা দিচ্ছেন।

প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা বহু গবেষণা ক'রে স্থির করেছেন

ওঙ্কার মন্দিরের বুদ্ধমূর্ত্তি

যে কাম্বোজের অধিবাসীদের নাগপূজাকে আর্য্যেরা এসে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাদের ধর্ম্মে তাঁরা আঘাত করেন নি বলেই সহজে এদেশে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ওঙ্কারধাম নগর ও ওঙ্কার-মন্দির নির্ম্মাণে এই নাগ-সাধক সিয়াম্পা

শিল্পীদের সাহায্য না পেলে তাঁদের পক্ষে এ জিনিস গড়ে তোলা সম্ভবপর হ'ত না।

এই ধ্বংসাবশেষ শহরের বুকের উপরও একটি ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ওঙ্কার-মন্দিরের মত অত বিরাট না হ'লেও নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। এই

কাম্বোজের মানচিত্র

মন্দিরের ছোট বড় সাঁইত্রিশটি চূড়া পাশাপাশি ঘেঁসে উঠেছে প্রধান মন্দির-চূড়াকেই অবলম্বন করে। এর চারকোণে চারটি মূর্ত্তি আছে—চারটিই ব্রহ্মণ্য দেবতার। তাদের মুখে যেন এক রহস্তময় হাসির আভাস ফুটে রয়েছে। ক্যাম্বোডিয়ার এই দিকটায় বহুদূর পর্য্যন্ত মেকঙ্ উপত্যকার নিম্নদেশ এবং বৃহৎ সরোবরের বিশাল-তীর-ভূমি বেষ্টন ক'রে পড়ে আছে এক গতায়ু জাতির মৃত-সভ্যতার কঙ্কালের মত অসংখ্য শিলাস্তূপ! কত বিস্মৃত স্মৃতিস্তম্ভ, মহিমান্বিত মন্দির, সুদৃঢ় দুর্গ, অনিন্দিত নগর, সুন্দর সেতু, শোভন সরণী আজ কালের নির্ম্মম আঘাতে চূর্ণ হ'য়ে ফরাসী অধিকৃত ইন্দো-চীনের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে।

প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা এ পর্য্যন্ত এ স্থানে প্রায় শতাধিক মন্দির আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে একাধিক মন্দির এমন বেরিয়েছে যেগুলি কোনো অংশেই ওঙ্কারের চেয়ে হীন নয়। সেগুলি যদি আজ অক্ষত থাক্‌তো তাহ'লে হয়ত' ওঙ্কারের গর্ব্ব তারা ম্লান ক'রে দিতে পার্‌তো! এ-সব মন্দির, দুর্গ ও নগর প্রাসাদ যে কেবল কালের প্রভাবেই ধ্বংস হ'য়েছে তা' নয়, খ্মেররাজ্য যারা পরে এসে জয় করেছিল, তাদের নিষ্ঠুর নৃসংশতার চিহ্ন বহু মন্দিরের বিগ্রহ মূর্ত্তি ও পাষাণ-প্রাকার আজও ধারণ ক'রে রয়েছে দেখা যায়! ওঙ্কারের এও একটা গভীর রহস্ত, কারণ এখনো পর্য্যন্ত স্থির ক'রতে পারা যায়নি—কারা সেই হৃদয়হীন বর্ব্বর যারা এমন ক'রে এই কীর্ত্তিমান মানুষের অনুপম সৃষ্টি শতদল পদদলিত ক'রতে পেরেছিল!

খ্মের সাম্রাজ্য কেমন ক'রে ধ্বংস হ'ল এবং সে জাতটা কোথায় লুপ্ত হ'ল এরও কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি এখনো। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকুমার বিতাড়িত হ'য়ে তার দলবল নিয়ে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছিল—'ফোর্ণেরোর' এই বিবরণ ঐতিহাসিকেরা গ্রাহ্য ক'রতে পারেন নি। ফুক্তে বলেন গঙ্গার উপকূল থেকে দলে দলে শৈব ব্রাহ্মণরা এখানে এসে এ দেশকে

ওঙ্কার-মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ শিলাশিল্প (দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন)

হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রেছিলেন এবং পরে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁরা মিলে মিশে এক হ'য়ে গেছলেন। জেনারেল বেলীর মতে খ্মের সভ্যতা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ভারতের এক দল দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী, যারা সমুদ্রপথে এসে মেনাম ও মেকঙ্‌ নদীর ভিতর দিয়ে এখানে উপস্থিত হ'য়েছিল। মোটের উপর ভারত-বাসীরাই যে কাম্বোজের স্রষ্টা এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন, কেবল স্থলপথের পরিবর্ত্তে তাঁরা যে জলপথেই অভিযান করেছিলেন এই নিয়েই তাঁদের তর্ক। তাঁরা ওঙ্কার-মন্দিরের স্থাপত্যকে হিন্দু স্থাপত্যকলা ব'ললে ভুল করা হবে। হিন্দুরা এ মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন বটে কিন্তু স্থানীয় আদর্শের অনুসরণে এবং স্থানীয় শিল্পী-দেরই সাহায্যে তাঁরা এ কার্য্য সম্পাদন ক'রেছিলেন। এই খ্মের স্থাপত্য-কলা—হিন্দুরা যখন এদেশে আসেন তখন সমধিক উৎকর্ষলাভ করেছিল, তবে সেটা কাঠের তৈরি ঘর বাড়ীতেই নিবদ্ধ ছিল, হিন্দুরাই এসে প্রথম এদের সেই দারুশিল্প পাষাণে রূপান্তরিত করেন। হিন্দু-প্রভাবেই কাঠের বাড়ী পাথরের মন্দির হ'য়ে উঠেছিল।

ওঙ্কার-মন্দির-প্রাঙ্গণ

বলেন স্থলপথে এলে তাঁদের পদচিহ্ন সে পথে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো। আর একটা বিষয়েও তাঁরা একমত হ'তে পারেন নি। সেটা হ'চ্ছে ওঙ্কার-মন্দিরের স্থাপত্যকলা নিয়ে। তাঁরা বলেন হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাচ্ছি বটে, হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু, এ মন্দিরের স্থাপত্য-বিজ্ঞান তো হিন্দুর মন্দির-স্থাপত্যের অনুরূপ নয়। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ গ্রসলীয়ার এর উত্তরে ব'লেছেন, গ্রসলীয়ারের এই মতই এখন অনেকে মেনে নিয়েছেন। তবে, এ-কথাও ঠিক যে যারা সেদিন এ জিনিস গড়েছিল তাদের বংশ আজ লোপ পেয়ে গেছে, কারণ আজকের ক্যাম্বোডিয়ার যারা অধিবাসী স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য বা অন্য কোনো শিল্প-কলা সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এমন কি তাদের পোষাকে পরিচ্ছদে অলঙ্কারে তৈজসপত্রে আচার ব্যবহারে ধর্ম্মভাবে সামাজিকতায় বা চিন্তাধারায় কোথাও তিলমাত্র হিন্দু-প্রভাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।

কাঁচের আওয়াজ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

'কুমীরের মতন দাঁত বা'র করবেন না মশাই : আপনার হাঁ দেখ্‌লে ভয় করে। কলের পাইপটা সারিয়ে না দিলে বাড়ী-ভাড়া পাবেন না।' গিরীন বল্‌তে লাগলো,—'মাসকাবারি রক্ত চুষে খাওয়া এবার আপনার চলবেনা—'

এই কথা বল্‌তে-বলতেই বাধলো বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া। এবং প্রতিমাসের পয়লা তারিখে এমনি ঝগড়াই বেধে আসছে বহুকাল থেকে। হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই আর-সবাই এসে দু'জনকে জাপ্‌টে ধ'রে থামালো। তারপর পরস্পরের বিদীর্ণ কণ্ঠের আস্ফালন, এবং গালাগালি।

ভূদেববাবু ব'লে চললো, 'ঢের ভাড়া জুটে যাবে আমার, গোয়াল খোলা থাক্‌লে বৃষ্টির দিনে অনেক গরু এসে ঢুক্‌বে। আবার লম্বা-লম্বা কথা। জানিনে আপনার কেচ্ছা? মদ খেয়ে ঢলাঢলি,—মেয়েছেলে নিয়ে—ব'লে দেবো এদের, বড়বাজারের সেদিনের কাণ্ডটা? বস্তিবাটি থেকে সেবার পুলিশে ধ'রে এনেছিল কেন, বলে দেবো সকলের সাম্‌নে?'

গিরীনের চোখ দুটো রাগে তখন ধক্‌ধক্ ক'রে জল্‌ছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলো, 'যদি না বলো তবে তোমায় এখুনি কুচিয়ে কেটে ফেল্‌বো...অনেক খুন করেছি আমি···ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও বল্‌ছি। কি বল্‌বি বল্···আমি চোর, আমি চরিত্রহীন—এই ত? আর তুই? তুই যে নীচ, হীন, রক্তপিশাচ—'

কিন্তু কেউ তা'কে ছেড়ে দিল না। কেন ছেড়ে দিল না, এবং দিলেই বা কী ঘটনা ঘট্‌তো সে-আলোচনা নিষ্ফল।

লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে : মাসে একবার ক'রে দাঁড়িয়ে যায়। যারা পথের ওপারের ফুটপাথ দিয়ে দেখে-দেখে চ'লে যায়, তারাও জানে এ-বাড়ীতে মাঝে-মাঝে কেন লোকজন দাঁড়ায়। গিরীনের গলার আওয়াজ পথের পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত জানে।

শেষকালে এক বৃদ্ধা এসে সেদিন থামালো দু'জনকে। একজন নাছোড়বান্দা জমিদার, আর-একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রজা। বৃদ্ধা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মিটিয়ে দিয়ে বললে, 'গালাগালি ত করলে বাবা এতক্ষণ, এবার একটু গলাগলি করো দিকি? বুকের ছাতি বাবা তোমাদের দু'জনেরই বড় নয়।'

তা বটে। গিরীন এতক্ষণ এটা বুঝতে পারেনি; কেমন করেই বা পারবে, বুঝতে সে জীবনে কিছুই পারলো না। ফস করে অত লোকের মাঝখানে গলা নামিয়ে বললে, 'এ-বাড়ীতে আপনারা কি নতুন এসেছেন বুড়ি-মা? বেশ, বেশ···ওহে ভূদেববাবু, কাল এসো, দেবো তোমার ভাড়াটা চুকিয়ে,—আরে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছো কেন বলো ত? সঙ্‌ দেখ্‌ছ?'

একজন কে-যেন বল্‌লে, 'সঙ্‌ নয়, মাতাল।'

'তবে রে—' বলে দু'পা গিরীন এগোতেই সবাই যে-যার পালাতে লাগলো। দেখা গেল, তার মুখ-চোখের চেহারা দেখে বাড়ীওয়ালারো রাগ কতকটা প্রশমিত হয়েছে। হ্যাঁ, ভাড়াটা আগামী কাল অবশ্য সে পাবেই : গিরীনের চরিত্র-দোষ থাকুক, কিন্তু তার কথার ঠিক আছে! বাড়ীওয়ালা বিদায় নিল।

সবাই চলে যাবার পর বুড়ী বললে, 'দেখছিলুম তোমাদের কাণ্ডটা। রক্ত ত' সবারই গরম বাবা, ঠাণ্ডা রাখতে পারে ক'জন? তোমার বাছা অল্পবয়েস, ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে চললেই পারো।'

বুড়ীর কথাগুলি ভারি মিষ্টি : গিরীনের আর রাগ নেই। সে বললে, 'কোন্‌ ঘরে থাকা হয় বুড়ী-মা?'

'নীচের তলায় ওই পেছন দিকে দু'টো ঘর··ভাল বাড়ী ত আর খুঁজে বা'র করবার সময় ছিল না, এসে পড়তে পারলে হয়। হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ,—আর অল্পদিনের জন্যে—'

কথায়-কথায় জানা গেল, কি যেন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বুড়ীর জামাই এসে উঠেছে

হিন্দুধর্মে দীক্ষিত ক'রেছিলেন এবং পরে এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁরা মিলে মিশে এক হ'য়ে গেছলেন। জেনারেল বেলীর মতে খ্মের সভ্যতা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ভারতের এক দল দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী, যারা সমুদ্রপথে এসে মেনাম ও মেকঙ্‌ নদীর ভিতর দিয়ে এখানে উপস্থিত হ'য়েছিল। মোটের উপর ভারতবাসীরাই যে কাম্বোজের স্রষ্টা এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন, কেবল স্থলপথের পরিবর্তে তাঁরা যে জলপথেই অভিযান করেছিলেন এই নিয়েই তাঁদের তর্ক। তাঁরা ওঙ্কার-মন্দিরের স্থাপত্যকে হিন্দু স্থাপত্যকলা ব'ললে ভুল করা হবে। হিন্দুরা এ মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন বটে কিন্তু স্থানীয় আদর্শের অনুসরণে এবং স্থানীয় শিল্পীদেরই সাহায্যে তাঁরা এ কার্য্য সম্পাদন ক'রেছিলেন। এই খ্মের স্থাপত্য-কলা—হিন্দুরা যখন এদেশে আসেন তখন সমধিক উৎকর্ষলাভ করেছিল, তবে সেটা কাঠের তৈরি ঘর বাড়ীতেই নিবদ্ধ ছিল, হিন্দুরাই এসে প্রথম এদের সেই দারুশিল্প পাষাণে রূপান্তরিত করেন। হিন্দু-প্রভাবেই কাঠের বাড়ী পাথরের মন্দির হ'য়ে উঠেছিল।

ওঙ্কার-মন্দির-প্রাঙ্গণ

বলেন স্থলপথে এলে তাঁদের পদচিহ্ন সে পথে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পাওয়া যেতো। আর একটা বিষয়েও তাঁরা একমত হ'তে পারেন নি। সেটা হ'চ্ছে ওঙ্কার-মন্দিরের স্থাপত্যকলা নিয়ে। তাঁরা বলেন হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাচ্ছি বটে, হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এ মন্দিরের স্থাপত্য-বিজ্ঞান তো হিন্দুর মন্দির-স্থাপত্যের অনুরূপ নয়। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গ্রসলীয়ার এর উত্তরে ব'লেছেন, গ্রসলীয়ারের এই মতই এখন অনেকে মেনে নিয়েছেন। তবে, এ-কথাও ঠিক যে যারা সেদিন এ জিনিস গড়েছিল তাদের বংশ আজ লোপ পেয়ে গেছে, কারণ আজকের ক্যাম্বোডিয়ার যারা অধিবাসী স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য বা অন্য কোনো শিল্প-কলা সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এমন কি তাদের পোষাকে পরিচ্ছদে অলঙ্কারে তৈজসপত্রে আচার ব্যবহারে ধর্ম্মভাবে সামাজিকতায় বা চিন্তাধারায় কোথাও তিলমাত্র হিন্দু-প্রভাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।

কাঁচের আওয়াজ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

'কুমীরের মতন দাঁত বা'র করবেন না মশাই : আপনার হাঁ দেখ্‌লে ভয় করে। কলের পাইপটা সারিয়ে না দিলে বাড়ী-ভাড়া পাবেন না।' গিরীন বল্‌তে লাগলো,—'মাসকাবারি রক্ত চুষে খাওয়া এবার আপনার চলবেনা—'

এই কথা বল্‌তে-বলতেই বাধলো বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া। এবং প্রতিমাসের পয়লা তারিখে এমনি ঝগড়াই বেধে আসছে বহুকাল থেকে। হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই আর-সবাই এসে দু'জনকে জাপ্‌টে ধ'রে থামালো। তারপর পরস্পরের বিদীর্ণ কণ্ঠের আস্ফালন, এবং গালাগালি।

ভূদেববাবু ব'লে চললো, 'ঢের ভাড়া জুটে যাবে আমার, গোয়াল খোলা থাক্‌লে বৃষ্টির দিনে অনেক গরু এসে ঢুক্‌বে। আবার লম্বা-লম্বা কথা। জানিনে আপনার কেচ্ছা? মদ খেয়ে ঢলাঢলি,—মেয়েছেলে নিয়ে—ব'লে দেবো এদের, বড়বাজারের সেদিনের কাণ্ডটা? বস্তিবাটি থেকে সেবার পুলিশে ধ'রে এনেছিল কেন, বলে দেবো সকলের সাম্‌নে?'

গিরীনের চোখ দুটো রাগে তখন ধক্‌ধক্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলো, 'যদি না বলো তবে তোমায় এখুনি কুচিয়ে কেটে ফেল্‌বো...অনেক খুন করেছি আমি···ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও বল্‌ছি। কি বল্‌বি বল্‌···আমি চোর, আমি চরিত্রহীন—এই ত? আর তুই? তুই যে নীচ, হীন, রক্তপিশাচ—'

কিন্তু কেউ তা'কে ছেড়ে দিল না। কেন ছেড়ে দিল না, এবং দিলেই বা কী ঘটনা ঘট্‌তো সে-আলোচনা নিষ্ফল।

লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে : মাসে একবার ক'রে দাঁড়িয়ে যায়। যারা পথের ওপারের ফুটপাথ দিয়ে দেখে-দেখে চ'লে যায়, তারাও জানে এ-বাড়ীতে মাঝে-মাঝে কেন লোকজন দাঁড়ায়। গিরীনের গলার আওয়াজ পথের পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত জানে।।

শেষকালে এক বৃদ্ধা এসে সেদিন থামালো দু'জনকে। একজন নাছোড়বান্দা জমিদার, আর-একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রজা। বৃদ্ধা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মিটিয়ে দিয়ে বললে, 'গালাগালি ত করলে বাবা এতক্ষণ, এবার একটু গলাগলি করো দিকি? বুকের ছাতি বাবা তোমাদের দু'জনেরই বড় নয়।'

তা বটে। গিরীন এতক্ষণ এটা বুঝতে পারেনি; কেমন করেই বা পারবে, বুঝতে সে জীবনে কিছুই পারলো না। ফস করে অত লোকের মাঝখানে গলা নামিয়ে বললে, 'এ-বাড়ীতে আপনারা কি নতুন এসেছেন বুড়ি-মা? বেশ, বেশ···ওহে ভূদেববাবু, কাল এসো, দেবো তোমার ভাড়াটা চুকিয়ে,—আরে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছো কেন বলো ত? সঙ্‌ দেখ্‌ছ?'

একজন কে-যেন বল্‌লে, 'সঙ্‌ নয়, মাতাল।'

'তবে রে—' বলে দু'পা গিরীন এগোতেই সবাই যে-যার পালাতে লাগলো। দেখা গেল, তার মুখ-চোখের চেহারা দেখে বাড়ীওয়ালারো রাগ কতকটা প্রশমিত হয়েছে। হ্যাঁ, ভাড়াটা আগামী কাল অবশ্য সে পাবেই : গিরীনের চরিত্র-দোষ থাকুক, কিন্তু তার কথার ঠিক আছে! বাড়ীওয়ালা বিদায় নিল।

সবাই চলে যাবার পর বুড়ী বললে, 'দেখছিলুম তোমাদের কাণ্ডটা। রক্ত ত' সবারই গরম বাবা, ঠাণ্ডা রাখতে পারে ক'জন? তোমার বাছা অল্পবয়েস, ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে চললেই পারো।'

বুড়ীর কথাগুলি ভারি মিষ্টি : গিরীনের আর রাগ নেই। সে বললে, 'কোন্‌ ঘরে থাকা হয় বুড়ী-মা?'

'নীচের তলায় ওই পেছন দিকে দু'টো ঘর···ভাল বাড়ী ত আর খুঁজে বা'র করবার সময় ছিল না, এসে পড়তে পারলে হয়। হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ,—আর অল্পদিনের জন্যে—'

কথায়-কথায় জানা গেল, কি যেন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বুড়ীর জামাই এসে উঠেছে

হাসপাতালে: মেয়ে সেই হাসপাতালে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গেছেন, একটা কেবিন্ ভাড়া করা হয়েছে। ছেলে-মেয়ে দু'টি আছে বুড়ির হেপাজতে। অবস্থা, যতদূর জানা গেল, নিতান্ত মন্দ নয়। অসুখ সারলেই আবার তা'রা দেশে চলে যাবে। অল্পদিনের জন্যই আসা। আলাপ-আলোচনাদির পর গিরীন বলে' বললো, 'তোমার যদি দোকান-বাজার করবার দরকার থাকে, আমাকে ব'লো,—ভয় নেই বুড়ী-মা, হিসেব-টিসেব সব এসে আমি বুঝিয়ে দেবো।'

'না বাবা, আমাদের সঙ্গে একটা ঝি আছে।' এই ব'লে বুড়ী তখনকার মতো বিদায় নিল।

শেষ কথার আত্মীয়তাটুকু বুড়ী হয়ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারলো না। বুড়ীর দোষ নেই, যে-আত্ম-পরিচয় গিরীন একটু আগে প্রকাশ করেছে, সেটা অত্যন্ত শ্রীহীন বর্ব্বরতা; মানুষ যদি তা'কে বিশ্বাস না করে তবে সে তাদের অপরাধ নয়। এ বাড়ীটা প্রকাণ্ড, অনেকগুলো মহল, চার-পাঁচটা প্রবেশ-পথ, কে-কোথায় খণ্ড-খণ্ড পরিবার নিয়ে ছড়িয়ে থাকে গিরীন কোনোদিন হিসাব করেও দেখেনি, সে গ্রাহ্যই করে না। সে করে না, কিন্তু আর-সবাই যে তা'র সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত এও ত আর গোপন করা চলে না। তার যাতায়াতের পথে মুখোমুখি হলে সবাই সভয়ে সরে দাঁড়ায়, কলতলায় সে এসে দাঁড়ালে কি-মেয়ে কি-পুরুষ সন্ত্রাসে সেখান থেকে চলে যায়; তা'র যেদিকে ঘর সেদিকে মশা-মাছি পর্য্যন্ত এগোয় না। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই মানুষ বাঁচে: গিরীনকে চিরদিন সবাই এড়িয়ে এসেছে। সে জানে না বটে কিন্তু তার সম্বন্ধে সকল সংবাদ এ-বাড়ীর সবাই রাখে।

নিজের ঘরে এসে গিরীন ঢুকলো। এখনি তা'কে বেরোতে হবে। কোথায়, তা সে নিজেও জানে না। তার না-আছে কার-কারবার, না-আছে চাকরি। তবু সে বেরোয়, প্রতিদিনই বেরোয়; এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে না-বেরোলেই তার চলে না। রাত্রে সে যখন ফেরে এ-বাড়ীর সবাই তখন নিদ্রা যায়। পরিবার-পরিজন তার কেউ নেই, ছিল কিম্বা আছে এ-প্রশ্ন কেউ তাকে কোনোদিন করেওনি। সম্ভবত নেই। অবস্থা তার মন্দ নয়, বরং এ-বাড়ীর অনেকের চেয়েই ভাল, কিন্তু সে-অবস্থার নদীতে নিত্য জোয়ার-ভাঁটা—তা'তে ঐক্য নেই, সঙ্গতি নেই।

বাইরে পায়ের শব্দে পায়চারি থামিয়ে গিরীন দাঁড়ালো,—'কে?—আরে, বুড়ি-মা, এসো এসো—'

বুড়ী একখানি রেকাবে করে কতকগুলি আনারস কেটে এনেছে, তার পাশে দু'টি সন্দেশ: হাতে এক গেলাস জল। বললে, 'খেয়ে নাও ত দাদা···আজ দ্বাদশী কিনা···তুমি বাঁউনের ছেলে—'

গিরীন হেসে বুড়ী-মার হাত থেকে সেগুলি নিল। বললে, 'আজ কী সুপ্রভাত, তোমার সঙ্গে দেখা,—এসব ত আর আমাকে কেউ দেয় না···বসো তুমি বুড়ি-মা, তোমার সামনেই ব'সে-ব'সে খাবো—' একখানি-একখানি আনারস মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে সে পুনরায় হেসে বললে, 'আমার মা'র কথা মনে পড়ছে, বুঝলে বুড়ি-মা, দ্বাদশীতে আমি মুখের কাছে না দাঁড়ালে তিনিও জল খেতেন না—মা বড় মিষ্টি, না বুড়ি-মা?'

বুড়ী বললে, 'আহা, তা আর নয় ভাই, সর্ব্বংসহা,—তবে আর মা বলেছে কেন? বলে—কুপুত্তুর যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়।'

তারপর একটু-একটু ক'রে বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ চলে। গিরীন-যে ভদ্রঘরের সন্তান, অবস্থা-যে একসময় তাদের বেশ ভালই ছিল, এ-কথা বৃদ্ধা স্পষ্ট করে জান্তে পারে। বছর দশ-বারোর ইতিহাস সে আর বুড়ী-মার কাছে প্রকাশ করলো না। বললে, 'লোককে বললে কি-আর এখন বিশ্বাস করবে, আমি লেখাপড়া জানি,—একটা পাশও করেছিলুম বুড়ি-মা,—কিন্তু সে-সব কথা আর মনে নেই···কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল এই ক'টা বছর।'

এমন সময় একটি মেয়ে এসে বুড়ীর পাশে দাঁড়ালো। হাতে তার একটি ছোট পাথরের বাটি,—'এই নাও দিদমা, মুখশুদ্ধি আর পয়সা—'

'এইটি বুঝি তোমার নাৎনী বুড়ী-মা? ভারি ফুটফুটে মেয়েটি ত?'—হাসতে-হাসতে গিরীন একটু এগিয়ে এলো, তারপর চোখ পাকিয়ে হাতের থাবা তুলে ভয় দেখিয়ে বললে, 'হালুম্!'

মেয়েটি ভয়ে আঁৎকে উঠে দিদিমাকে আঁক্‌ড়ে ধরলো, হাত থেকে তার একটা দু'আনি মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়লো।

নিজের বন্য রসিকতায় গিরীন নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার সঙ্গে একটু হেসে দু'আনিটি কুড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধা বললে, 'এই নাও ভাই, এই তোমার দক্ষিণে…অমনি ত খাওয়াতে নেই বাঁউনের ছেলেকে—'

গিরীন একটু প্রতিবাদ ক'রে বললে, 'সে কি বুড়ি-মা, পৈতে আছে বলেই বুঝি আমি বামুন·· না, না—'

'সে কি হয় ভাই, এ-যে নিয়ম…আমরা অপরাধী হবো?'

অগত্যা দু'আনা পয়সা ব্রাহ্মণের প্রণামী-বাবদ গিরীনকে গ্রহণ করতে হ'লো। বৃদ্ধার আর বসবার সময় ছিল না, রান্নাবান্না বাকি, উঠে যাবার সময় বললে, 'আচ্ছা দাদা, আলাপ-সালাপ হ'লো—আর এই ত নীচেই রইলুম…ও-ভাই কমু, পেন্নাম কর্ বাছা, বাঁউনের ছেলে, গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম কর্—'

মেয়েটি এতক্ষণে একটু সাহস পেয়েছিল: অর্থাৎ, এই জংলী লোকটা যে সত্যই ব্যাঘ্র নয় এ-কথাটি সে অনুভব করেছে। দিদিমার কথায় গলায় আঁচল দিয়ে মেঝেয় নুইয়ে প'ড়ে সে গিরীনকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। গিরীন বারণ করলো না, অস্বীকার করলো না, এমন কি দু'পা পিছিয়ে যাবার চেষ্টাও তার দেখা গেল না।

দরজার বাইরে যেতেই গিরীনের মাথায় আবার পাগ্‌লামি চেপে বসলো। হঠাৎ গিয়ে হেসে পুনরায় সে কমুর দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে' উঠলো,—'হালুম্!'

কমু ফিরে দাঁড়ালো, একটুখানি পরিচ্ছন্ন ও স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, 'ইঃ, এবারে আর ভয় খাবো না, তুমি বাঘ না আরো কিছু।'

দিদিমার গলা ধরাধরি ক'রে কমু নীচে নেমে গেল।

বেশ লাগছে দিনটি: গিরীন বেশ খুসি আছে। খুসি সে রোজই থাকে, কিন্তু আজকের সঙ্গে মিল নেই প্রতিদিনের। তার জাতি ছিল না, ভুলেই গিয়েছিল সে কোন্ জাতি: আজ একজন এসে স্বীকার করেছে সে ব্রাহ্মণ, তাকে দক্ষিণা দিয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে হয়। আজ বারো বছরের মধ্যে কোথাও মনে পড়ে না যে, কোনো একদিন কোনো রকমে তার ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পৈতাটা ভাগ্যি সে রেখেছিল।

কিন্তু প্রণামটা?—জীবনে কেউ তা'কে কোনোদিন প্রণাম করেনি। শরীরের নানা জায়গায় তা'র আছে ক্ষতের দাগ, একটা আঙুল তা'র কাটা, একটা পায়ে একটু খুঁড়িয়ে চলে,—দেহের এই সমস্ত ক্ষত ও ক্ষতির ছোট-ছোট ইতিহাস তার অন্তরে জমা আছে, সে-ইতিহাস কেবল কলঙ্ক ও লজ্জার,—তাদের ছাপিয়ে এলো আজ এই প্রণাম: একটি নিষ্পাপ, কলুষলেশহীন কুমারীর প্রণাম। তবে সে নিতান্ত অযোগ্য নয়!

সারা দুপুরটা গায়ে পথের হাওয়া লাগিয়ে বিকালে সে বাড়ী ঢুক্‌লো। ঢুকেই সিঁড়িতে উঠ্‌তে আবার কমুর সঙ্গে দেখা। ওদিকে ঝি কাজ করছে। বুড়ী-মা খাইয়ে দিচ্ছেন কমুর ছোট ভাইটিকে। কমু তাকে দেখে বললে, 'একবার হালুম্ ব'লো?'

'হালুম্।' ব'লে গিরীন তেড়ে গেল। কিন্তু কমু আর ভয় পায় না: হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো। বললে, 'তুমি ফুঁ দিয়ে তুলোর পাখী ওড়াতে পারো?'

গিরীন বললে, 'হ্যাঁ, পারি।'

'কই ওড়াও দিকি?'—ব'লে ঘরে গিয়ে কোথা থেকে কমু একটু তুলো নিয়ে এলো। বললে, 'একটা আমি, একটা তুমি…মাটিতে যার আগে পড়বে সেই হারবে কিন্তু।'

'বেশ, তাই সই।' ব'লে গিরীন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

দুই চিম্‌টি হাল্‌কা শিমুল তুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে দু'জনে তলার দিক থেকে প্রাণপণে ফুৎকার দিতে লাগলো: সে কী উৎসাহ। নাৎনীর এই বাচালতায় দিদিমা তিরস্কার করতে লাগলেন, কিন্তু তখন কে-কা'র কথা শোনে। ছেলেটা খাওয়া ফেলে ছুটে এলো। কমুর তুলো শূন্যেই ভাসছে, গিরীনের তুলোটুকু বোধহয় একটু ভারি, কেবলই নেমে পড়ছে। অবশেষে মেঝের কাছাকাছি আসতেই গিরীন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁ দেবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু কিছুতেই না: তুলো পড়লো মাটিতে, তারই হ'লো হার। সর্ব্বাঙ্গ তখন তার ঘর্ম্মাক্ত, মুখ-চোখ রাঙা। কমু বিজয়োল্লাসে হৈ চৈ ক'রে হেসে বললে, 'কেমন হয়েচে, বললুম পারবে না আমার সঙ্গে? হেরেছ ত? কানমলা খাও এবার?'

গিরীন নিজের হাতেই নিজের দু' কান মলে' বললে, 'আর কি?'

'নাকখৎ দাও মেঝের ওপর?'

কথাটা শুনেই দিদিমার চোখ পড়লো এদিকে: হাঁক পেড়ে বললেন, 'বলি হ্যালা কমু, তোর কাণ্ডটা কি? বাছাকে এমন ক'রে হয়রাণি করা···ও কি তোর একবয়েসী—?'

'বাজী রেখে আমার সঙ্গে খেলতে আসে কেন দিদ্মা, আমি নাকি ডাকতে গেছলুম?'

রোয়াকের ধারে গিরীন বসে পড়লো: তখনো সে হাঁপাচ্ছে। কমু এসে বসলো তার কাছে: যেন কতদিনের বন্ধুত্ব, কতকালের পরিচয়। কমুর কানে দু'টি দুল, হাতে কয়েকগাছি নূতন ফ্যাসনের সোনার চুড়ি। কমু দেখতে সুন্দর, আর-একটু বড় হলে আরো সুন্দর হবে: জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সন্ধিস্থানে সে পা দিয়েছে। জীবনে যার বারে বারে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, কমুর কাছে বসতে তার বড় সঙ্কোচ হয়।

কত গল্পই চলতে লাগলো। কবে কোন্ গ্রামের ধারে একটি জন্তী গাছের তলায় একটা ছাতার্ পাখী মরে পড়েছিল তারই রোমাঞ্চকর ইতিহাস: পাঠশালার পণ্ডিত কোন্ এক বর্ষাকালে কেমন পা পিছলে পড়ে' গিয়েছিলেন: আর সেই-যে ডালিম-বৌ একদিন ভূতের ভয় পেয়ে কাঠের সিন্দুকের মধ্যে ঢুকেছিল, সে-কথা কি কেউ ভুলে গেছে?

গিরীন বললে, 'দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের বাগানে একবার তাকে একটা মাকড়সা তাড়া করেছিল: সে তখন খুব ছোট। সেই সময়টায় সে একদা ধরেছিল একটা কোকিলের ছানা, কমুর মতো তার ঠোঁটের ভিতরটি ছিল লাল: মরে গেল সেই পাখীটা একদিন: রাঙা পিঁপড়ে তার চোখ খুবলে খেতে লাগলো।

যাতায়াতের পথের পাশে তাদের গল্প চলছিল, দু' জনেই চলেছে ভেসে ভেসে। লোকনাথ তাদের দিকে একবার কটাক্ষে তাকিয়ে পার হয়ে গেল, পার হয়ে গেল ও-ঘরের ন'-বৌ। তাদের চোখে-মুখে আশঙ্কার ছায়া,—এই কুপরিচিত দুঃশীল ও বিপজ্জনক লোকটা মেয়েটিকে না বিপদে ফেললে হয়। কমুর গায়ে অতগুলি সোনা-দানা: তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারী মেয়ে···ও-লোকটার ত আর ধর্ম্মজ্ঞান নেই,—ভগবান জানেন, কী মৎলব আছে ওর মনে-মনে।

'তুমি সাবানের ফেনা দিয়ে রঙীন ফানুস ওড়াতে পারো?'

'পারি না? তাসের ঘরও তৈরি করতে পারি। কতবার করেছি।' গিরীন বললে।

'আর কাপড়ের ইঁদুর?—দেখবে একটা মজা···চোর আসবে কেমন?'—ব'লে কমু নিজের দুই হাতের আঙুল ক'টি পাকিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে বলতে লাগলো, 'এই ছাখো, বর আর বউ ঘুমিয়ে রয়েচে ঘরে: দরজায় খিল বন্ধ; তিনটে চোর নীচের তলায় ফন্দি আঁটচে, চুরি করবে: কুকুরটা ডাকচে ঘেউ-ঘেউ ক'রে—দেখলে ত?'

গিরীন বললে, 'আমিও পারি, দেখবে? এই ছাখো: খরগোস ছুটচে জঙ্গলে: ব্যাধ তাড়া করেছে; তীর এসে বিঁধলো খরগোসের বুকে; মরে গেল সে।'

কমু আর-একটু কাছে এগিয়ে এলো। বললে, 'আমাকে শিখিয়ে দেবে? তুমি ত অনেক জানো।'

হ্যাঁ, অনেক জানে সে; অনেক দেখেছে সে জীবনে। কিন্তু কিছু যে জানেনা তাকে কিছু শেখানো কঠিন। দু'জনের মধ্যে যে তফাৎ অনেকখানি। একজন কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুটছে, আর-একজন ফল হয়ে ঝরে পড়েছে: পোকায় খেয়েছে তার শাঁস, তার প্রাণের ঐশ্বর্য্য: জীবনটা তার খরচ হয়ে গেছে। গিরীন চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। সুন্দর দুটি চোখ; সে-চোখে এখনো ছায়া পড়েনি পৃথিবীর মালিন্যের: এখনো তা'তে রয়েছে আকাশের মায়া।

ধীরে-ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'শেখাবো আর-এক সময়, বুঝলে কমু? এখন যাই।'

ভারাক্রান্ত মন, অবসাদগ্রস্ত দেহ—গিরীন চলে গেল আপন ঘরের দিকে।

সন্ধ্যার পরে কমুর মা ফিরে এলেন: তাঁর চোখে-মুখে একটু আশ্বাসের চিহ্ন। কমুর বাবা হাসপাতালে একটু ভাল আছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে এখনো ক'দিন সময় লাগবে। মা এসে সারাদিনের কথালাপ সুরু করলেন দিদিমার সঙ্গে। ছোট ভাইটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কমু এক ফাঁকে বেরিয়ে এলো। ভাল লাগচে না তার ঘরের মধ্যে। কেমন ক'রে লাগবে? একদিকে তার জয়ের আনন্দ, আত্মপ্রসাদ: অন্যদিকে কৃতিত্ব আহরণের প্রবল তৃষ্ণা! গিরীনের কাছে তার না গেলেই চল্‌ছে না! সমস্ত ম্যাজিকগুলো তার শিখে নেওয়া চাই-ই: দেশে গিয়ে মিণ্টু আর শৈলকে সে চম্‌কে দেবে: বল্‌বে না সে কেমন ক'রে শিখেছে: জানাবেনা সে কাউকে তার এই যাদুবিদ্যা শেখার গোপন ইতিহাস।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। চাটুয্যে মশাইয়ের ঘরের কাছ ঘেঁষে যাবার সময় বড়দিদি বললেন, 'অ কমু, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ মা? এত রাতে—'

'ম্যাজিক্‌ শিখ্‌তে যাচ্ছি পিসিমা।'

'ছি মা, যেতে নেই ওদিকে, ফিরে এসো; ওদিকে বাঘ আছে, জানো ত?'

স্নেহের সম্পর্ক সকলের সঙ্গে হয়ে গেছে। অনুকূল প্রকৃতি হলে সম্পর্ক তৈরি হতে একদিন সময়ও লাগে না। কিন্তু বারণ শুন্‌লো না কমু কারো: গেল সে গিরীনের ঘরের দিকে। সমস্ত বাড়ীটার সঙ্গে এদিকটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন: অটল নীরবতা বুক চেপে বসেছে। বারান্দায় আলো নেই, আলোর চিহ্নও নেই এদিকে। কমু গিয়ে ঘরের কাছে দাঁড়ালো। দরজার একটা কপাট বন্ধ; কৌতুক ক'রে কমু দিল দরজায় একটা টোকা: ভিতর থেকে রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে জবাব এলো, 'কে অ?'

আবার পড়লো এক টোকা: হাসি চাপতে গিয়ে কমুর পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বুঝি পাকিয়ে যায়। ভিতর থেকে গিরীন ধমক দিল, 'ইয়ার্কি করিসনে আবদুল্‌, ভেতরে আয়—' গলার আওয়াজটা তা'র একটু জড়ানো।

তবু এলো না দেখে গিরীনের একটু সন্দেহ হলো: ঘরে আলো জল্‌ছে: উঠে সে দরজার কাছে আসতেই কমু আর সাম্‌লাতে পারলো না: বাঁশীর মতো ধারালো তার তীব্র দীর্ঘ কণ্ঠে হেসে উঠলো। হেসে উঠেই ধরলো গিরীনের একটা হাত চেপে। বললে, 'কেমন জব্দ? টের পেয়েছিলে একটুও? কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছি। আচ্ছা, আবদুল্‌ কে বলো না?'

'আবদুল্‌? সে একটা লোক, দোকানে বসে বিড়ি পাকায়। তুমি এলে এত রাতে ম্যাজিক্‌ শিখতে?'

'বেশ করেছি, খুব করেছি। ওমা, কতগুলো লাঠি তোমার ঘরে; লোকের মাথায় মারো বুঝি?—গেলাসে ক'রে কী খাচ্ছিলে তুমি? এ রাম্‌!'

গেলাসটা রাখলো গিরীন তক্তার উপর। বললে, 'আচ্ছা, আর খাবো না, তুমি এসেছ যখন—'

কমু বল্‌লে, 'কী ওতে?'

'ওতে?'—হেসে গিরীন একটা ঢোক গিল্‌লো, বললে, 'ওতে জল।'

'জল বুঝি রাঙা হয়? কী মিথ্যুক।'

হাতটা তা'র ছেড়ে দিয়ে কমু ঘরের চারিদিকে তাকালো: জান্‌লাগুলো সব বন্ধ: অত্যন্ত অস্বাভাবিক কতকগুলো গৃহ-সজ্জা, একটার পাশে আর একটা থাকার কোনো যুক্তি নেই: সামঞ্জস্য নেই। ভিতরটায় খানিকক্ষণ থাক্‌লে আতঙ্ক হয়। ঘরে আলো সামান্য, কিন্তু সেই আলোতেই কমুর গায়ের গহনাগুলি ঝলমল করছে। গিরীন তা'র প্রতি একবার একান্ত দৃষ্টিতে তাকালো। গহনাগুলি বাজারে বিক্রি করলে তার অন্তত ছ'মাস বেশ চলে যেতে পারে: বাজারে তার অনেক দেনা: হ্যাঁ, একটি সামান্য কাজ, তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ একটি কাজ এখুনি ক'রে ফেল্‌তে পারলে বহু মহাজনের লাঞ্ছনার হাত থেকে সে মুক্তি পায়।

'আচ্ছা, কমু?'

কমু তার দিকে তাকিয়েই ছিল এতক্ষণ, সে বুঝতে পারেনি। বন্য জানোয়ারের হিংস্র দৃষ্টিকেই সে চেনে, সে বুঝতে পারে না ভয়চকিতা হরিণীর চোখের মায়া। কমু বললে, 'ও মা, তোমার চোখ পিট্‌ পিট্‌ করছে কেন?'

একটু থতিয়ে সে বললে, 'আচ্ছা কমু, তোমার পুরো নাম কি?'

'পুরো নাম?—কমলিকা মিত্র। গাঁয়ে আমাকে সবাই খুকি বলে ডাকে। ইস্, কি বিচ্ছিরি গন্ধ তোমার ঘরে, ভারি নোংরা কিন্তু তুমি।'

'আমি নোংরা: বাঃ, বেশ ত: আর তুমি বুঝি খুব পরিষ্কার?'

'ওমা, পরিষ্কার না? দেখ দিকি?'—নিজের প্রতি গিরীনের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কমু বললে, 'একটুও ধুলো-কাদা নেই। তুমি ত একটা ভূত!'—ধমক দিয়েই সে হাসতে লাগলো। খুশী হলো সে গিরীনের উপর: গিরীন প্রতিবাদ করছে না। গিরীন তা'র করতলগত।

'আচ্ছা, কা'র গায়ের জোর বেশি, বল ত কমু?'

তা'র আজগুবি প্রশ্নে কমলিকা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। হাসতে-হাসতে সে লুটিয়ে পড়লো তক্তার একটা ধারে। তার হাসির শব্দে আছে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি: পাথরে চিড় খায়: মাটি ওঠে কেঁপে: রাত্রি হয় চঞ্চল: ঘর ওঠে দুলে। তার হাসির শব্দই আলাদা।

'আমাকে আজ ম্যাজিক্ না শেখালে ছাড়বো না কিন্তু।'

গিরীন তখন একটু-একটু টলছে। বললে, 'মুখের ম্যাজিক্ দেখবে কমু?'

'সে আবার কি?'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' গিরীন বললে, 'শোনো: এই দাঁত দেখ্‌ছ ত? কথা বেরোবে এর পাশ দিয়ে।'

কমু হেসে বললে, 'সে ত সবারই বেরোয়।'

'আমার বেরোবে নতুন কথা। ওয়ান্, টু, থ্রি: আমি কি বিশ্রী।'

'তারপর?'

'চোর্: আমি একটা চোর!'

কমু হাততালি দিয়ে আবার হেসে উঠলো। বললে, 'আচ্ছা, তুমি লাঠি খেলতে জানো? ওরে বাপরে, আমাদের গাঁয়ের ঝণ্টু-পালোয়ান কী লাঠি খেলে। একবার একটা বাঘ মেরেছিল সে।'

'আমিও জানি লাঠি খেলতে। বাঘ মারতে আমিও—'

'ইস্, তার মতন আর খেলতে হয় না।'

কথাটা গিরীনের পৌরুষে ভয়ানক আঘাত করলো। বললে, 'দেখবে?' বলেই সে একখানা লাঠি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো: বললে, 'ওই কোণে দাঁড়িয়ে ছাখো। তোমার ঝণ্টু-পালোয়ানকে হারিয়ে দেবো, তবে আমার নাম গিরীন গোঁসাই।'—ঈর্ষায় ধক্‌ধক্ ক'রে জলছে তা'র চোখ। এই বালিকার কাছে তার আত্ম-সম্মান আজ বিপন্ন।

কোণে গিয়েই দাঁড়ালো কমলিকা। গিরীন লাঠিটা বাগিয়ে ঘোরাতে লাগলো। দু'বার না ঘোরাতেই হলো এক কাণ্ড: তক্তার উপরে ছিল গেলাসটা, লাঠির ঘা লেগে মেঝের উপর সেটা ছিটকে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। চমক ভাঙলো তার এতক্ষণে: লাঠি নামালো। কিন্তু গেলাস ভাঙার সেই শব্দটা ঠিক কমলিকার হাসির মতো: হাসির মতো সেটা চুরমার হলো। ভাঙা কাঁচের গেলাসের টুক্‌রোগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সে কমলিকার হাসির অনুরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ আওয়াজ। প্রাণ দিয়ে শুন্‌লো সেই শব্দটি: হৃদয়ের পদ্মপুটে ঢেকে রাখলো শব্দের সেই অনির্ব্বচনীয় ব্যঞ্জনাটি।

গেলাসের ভিতরকার দুর্গন্ধময় তরল পদার্থটুকু মেঝের উপর গড়াতে লাগলো। কমলিকা হাসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুক্‌লো আর একজন। গিরীন উঠ্‌লো শিউরে। নেশা গেল তার ছুটে: বললে, 'বেরিয়ে যা আবদুল্, এখন যা ভাই;—যা এ-ঘর থেকে।'

আবদুল্ গেল না: কুৎসিত দৃষ্টিতে কমুর দিকে একবার তাকিয়ে হেসে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোত্থেকে আন্‌লি রে একে? বাঃ!'

গিরীন চীৎকার ক'রে উঠলো, 'অপমান করিসনে ভদ্দলোকের মেয়েকে: বেরিয়ে যা বল্‌ছি। যাবিনে—?' বলেই সে কুলুঙ্গী থেকে বা'র করলো একখানা ছোরা: স্তিমিত আলোয় তার ফলাটা ঝল্‌সে উঠ্‌লো। খুন করতে যাওয়াটা তার অভ্যাস।

'শালা, মনে রাখিস্, আমি ইব্রাহিমের ছেলে।'—বলেই আবদুল্ গেল পালিয়ে। প্রতিজ্ঞা ক'রে গেল, ওই ছোরা একদিন সে পিছন থেকে বসাবে গিরীনের পিঠে।

গোলমাল একটা হোলো: বাড়ীর অনেকেই এলো ছুটে। দিদিমা এলেন, এলো লোকনাথ, চাটুয্যে মশাই এসে কমুর হাতখানা ধরে টেনে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেলেন। হৈ-চৈ হ'তে লাগলো। একজন ছুটলো থানায় খবর দিতে। হতভাগা এবারে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে: এবারে সবাই পেয়েছে সুবিধা: দাগী আসামী: তিলে-তিলে করে পাপ, সময় হ'লে ফলে।

অন্যায় আজ সে কিছুই করেনি; জানে, শাস্তি তার হবেনা। পুলিশের কাণ্ড-কারখানায় সে আর ভয় পায়না। গিরীন বসে রইলো চুপ করে: এত লোকের অভিযোগের বিরুদ্ধে একটিও সে প্রতিবাদ করলো না। সবাই একে-একে চলে যাবার পর হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে সে কাঁচের টুক্‌রোগুলি একত্র করতে লাগলো। এক জায়গায় সেগুলি একত্র ক'রে একটি-একটি হাতে নিয়ে সে আবার মেঝের উপর বাজাবার চেষ্টা করলো: শব্দ হ'তে লাগলো ঠুন্‌-ঠুন্‌ ক'রে: কান পেতে রইলো সে কাঁচগুলির আওয়াজের প্রতি। কাঁচ ভাঙার মতো হাসি।

অনেক রাতে পুলিশ এলো তাকে গ্রেপ্তার করতে।

*

* *

দু' বছর বাদে সে জেল্‌ থেকে ছাড়া পেলো।

মতি-গতি তার বদ্‌লায়নি। একজন মার্কামারা ভবঘুরে: বেকার: দাগী আসামী: নগরীর পথে-পথে তা'কে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক বন্ধু তার চারিদিকে: অনেক সঙ্গী। তবু মাঝে-মাঝে ফাঁক পেলেই সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায়-রাস্তায় ট্রাম চলে: বাস্‌ চলে: তাদের ঘণ্টার আওয়াজ তার কানে আসে। দম্‌কল ছোটে, তার ঘণ্টার সঙ্গে গিরীনের মন উধাও হয়ে যায়। দোকানের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়: টাকা-পয়সার শব্দ হয়। চাবি-সারানোওয়ালা বড় একটা তারের আংটায় এক-গোছা চাবি বেঁধে ঝণাৎ-ঝণাৎ শব্দ ক'রে চলে যায়: গিরীন কিছুদূর যায় তা'র সঙ্গে-সঙ্গে। খঞ্জনী বাজিয়ে ভিখারী গান গাইলেই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে শোনে। শোনে সে কান পেতে: আর ভাবতে চেষ্টা করে এই শব্দের মধ্যে তার অতীত জীবনের কোনো স্মৃতি জড়িত কিনা।

নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়: ষ্টীমারের বাঁশী বাজে। কুলুকুলু গঙ্গা বয়ে যায়, গিরীন চেয়ে থাকে সেইদিকে। চেয়ে থাকে উদাস হয়ে।

অবশেষে একদিন খুনের দায়ে সে আবার ধরা পড়লো। বিচারে হলো তা'র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হাতে-পায়ে লোহার শিকল দিয়ে যখন তাকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে, লোহার শিকলের ঝুম্‌ঝুম্‌ আওয়াজটি শুন্‌ছে সে কান পেতে, এও প্রায় সেই ভাঙা কাঁচের টুক্‌রোর মতো আওয়াজ। জীবনে একটি দিন মাত্র তার বসন্ত এসেছিল, একটি দিনমাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল কাঁচের গেলাস: আলো এসে পড়েছিল তার অন্ধকূপে: দেখা পেয়েছিল সুন্দরের!

জেল্‌এর পাখী এসে পৌঁছলো জেল্‌এ: তখন খাবার ঘণ্টা বাজ্‌ছে।

"—কে তুমি ক্ষণিকা ?"

চন্দ্রচূড়

মহানগরীর নাট্যশালায় বিপুল জনতা আজ—
প্রবাস হইতে বহুকাল পরে
জয়মালা পরি ফিরিয়াছে ঘরে
যশের মুকুট মণ্ডিত শিরে লোকপ্রিয় নটরাজ !

তারি আবাহন বন্দনাগীতি চলেছে নগরময়,
খ্যাতির তিলক লাঞ্ছিত ভাল,
নিপুণ নৃত্যে রচি মায়াজাল
আজি রজনীতে রঙ্গমঞ্চে দিবে নব পরিচয় !

ছুটিয়া এসেছে অগণিত লোক উৎসুক উৎসাহে
এসেছে তরুণ কিশোর চপল,
এসেছে কিশোরী তরুণীর দল,
রহস্য-ঘেরা যবনিকা পানে আগ্রহে ফিরে চাহে

বহু আশা নিয়ে এসেছিনু আমি হেরিতে সে নটগুরু
পাইনি আসন পুরোভাগে ভাই,
একটু পিছনে বসেছিনু তাই,
নৃত্য-আসরে চিত্ত আমার আনন্দে ভরপুর !

চক্ষে স্বপন উতল বক্ষে অসীম কৌতূহল
সজ্জিত সেই নাট্যশালায়
বিদ্যুৎ-দীপ-দীপ্ত মালায়
মনে হয় যেন স্বর্গের এ কি—সুর-রাজ সভাতল

কত বিচিত্র বরণের বাস সুন্দর চারু বেশ—
নগরবাসিনী তরুণীর দল
কিশোরী কুমারী লীলা-চঞ্চল,
চপল নয়নে চকিত চাহনি—উজল কাজল কেশ !

আশে পাশে মোর সমুখে পিছনে যেদিকেই ফিরে চাই
রূপপু'রের অঙ্গন ভরি'
বিকচ রঙীন ফুল অপ্সরী
কোমল কমল কোটী মুখমাঝে দিশেহারা হ'য়ে যাই !

নাট্যশালার দ্বিতল-আসনে বামে এক ঝরোকায়
সহসা হেরিনু জ্বলে রূপ-শিখা
নীলাকাশে যেন বিজলীর লিখা
মুখে মৃদু হাসি নয়ন উদাসী মোর পানে ফিরে চায় !

কালোশাড়ী তার আলো করা রূপে দিয়েছে স্বপ্নাবেশ—
নয়নে পলক নাহি পড়ে আর—
মনে হয় বুঝি ফিরে চাওয়া ভার,
দোঁহে দোঁহাকার আঁখির বাঁধনে রহিনু নির্ণিমেষ !

নাচে নর্ত্তক, দর্শকে দেয় জয়রোল বারে বারে—
ঐক্যতানের কাণে আসে সুর
নিক্কনে নট চরণে নূপুর—
আমি ছিনু তবু যেন বহুদূর অজ্ঞাত কোন্ পারে !

হেরিনু বারেক সুন্দরী যেন সঙ্কেত দিল কিছু,
উথলে পুলকে বুকে পারাবার
ফিরে দিনু আমি ইঙ্গিত তার,
সহসা কি যেন সরমে এবার নয়ন হইল নীচু !

জানিনা কখন নৃত্য-আসর হ'য়ে গেল অবসান,
আমি চেয়েছিনু শুধু তারি দিকে
ডাগর দু'আঁখি তারো অনিমিখে
মোর মুখ পানে ছিল নিশ্চল উচ্ছল দু'টি প্রাণ !

* * *

মঞ্চ আবরি' ঘন যবনিকা গুণ্ঠন দেছে টানি,
শূন্য করিয়া প্রেক্ষা-ভবন
দর্শক চ'লে গেলো অগণন,
আমি ভাবিতেছি পরিচয় তার কেমনে লইব জানি !

নাট্যশালার নির্গম-পথে ছিনু তারি পথ চেয়ে,
বিপুল জনতা ঠেলি নর-নারী
মন্থর গতি চলে সারি সারি,
দেখিনু দাঁড়ায়ে একে একে ক্রমে চলে গেল' যত মেয়ে

সেত আসিল না ! জানিনা কখন কোন্ পথে গেল' চলে,
হয়ত' হারাহু জনতায় তারে,
আগ্রহে আমি খুঁজি চারিধারে,
কোথা সে রূপসী, কি নাম তাহার, কে আমারে দেবে বলে।

সেই হ'তে মিতি বুকে ল'য়ে স্মৃতি সন্ধানে ফিরি তার ;
তন্বী-তরুণী—কে তুমি ক্ষণিকা ?
জ্বেলে দিয়ে গেলে প্রাণে প্রেমশিখা,
হবে নাকি—ওগো, হু'জনে আবার এ জীবনে দেখা আর ?

ঢেউ

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সত্যভামা যে কোন দিন সহরে আসিয়া আর গ্রামে ফিরিবে না সে-কথাটা হয়ত বিধাতারও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বিধাতার অজ্ঞাত থাকিলে কি হইবে, বিবাহের পর সত্যভামা আর গ্রামে যায় নাই। পঁচিশটা বছর আর তা'র শ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না ; স্বামী উকীল হইতে সব্‌জজ হইয়া গেলেন, ছেলেপুলেতে ছোট মেয়ে টুনীরও ঘর ভরিয়া উঠিল,—ঘর ভাঙিয়া দালান হইল —উৎসব-নিমন্ত্রণ হাঁক-ডাক হৈ-চৈ বাড়ীতে লাগিয়াই আছে—তার কি শ্বাস ফেলিলে চলে ? তার বাবা মাধব শিরোমণি মরিলেন পঞ্চাশ গাঁয়ে সাড়া তুলিয়া—এত বড় নৈয়ায়িক এ অঞ্চলে ক'টাই বা আর ছিল ;—কিন্তু তখনো সত্যভামার উপায় ছিল না সংসার ফেলিয়া নড়িবার। বড় মেয়ে আসন্ন-প্রসবা, তার ছেলের কালা-জ্বর—এখন-তখন অবস্থা। শিরোমণি মশাই দূর হইতেই মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। ছেলে-মেয়ে স্বামী-সংসার লইয়া এমন ব্যস্ত ক'জন সৌভাগ্যবতী থাকিতে পারে ? গাঁয়ের লোকেরা মানিল না। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী ত' সশব্দেই বলিয়া ফেলিলেন, "সহরে ভূতে ধরেছে আর কি ! যাঁর নাভি-গঙ্গা দেখতে দশ গাঁয়ের লোক পড়্‌ল ভেঙে, তাঁরই মেয়ে না কি আসে না তাঁর শেষ-সময় !" কিন্তু বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী যত বড় সত্যবাদীই হোন, সত্যভামাকে সহরের ভূতে পায় নাই। সত্যভামা মাধব শিরোমণিরই মেয়ে, কোন দিন তা'কে দেখিবার সুযোগ হইলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বুঝিয়া আসিবেন।

পঁচিশ বছর অনবচ্ছিন্ন গিন্নিপণা করিয়া যখন সত্যভামা অবসর গ্রহণ করিয়াছে, তখন বাপের বাড়ী তা'র পরিষ্কার। মা-বাবার ভিটায় বাতি দিবার জন্য যা-ও একটা ভাই ছিল, গ্রামে সে-বছর কলেরার মড়ক আসিল তা'কেই উপলক্ষ্য করিয়া। সত্যভামা অনেক-বারের মত এই শেষবার, বুঝিল ছেলেবেলাকার সেই গ্রাম আর তা'র জন্য ভাত মাপে নাই।

অবসর গ্রহণের নির্জ্জনতা সত্যভামাকে বড় বেশি করিয়া বাজিল। মনটা যেন তা'র বাপের পোড়ো ভিটার মতই শূন্য, ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। সেখানকার রূঢ়, স্তিমিত বিষণ্ণতাই তা'র মনে ছোঁয়াচ ধরাইল না কি ? সত্যভামা বসিয়া ভাবিত। এত দিন ধরিয়া কর্ম্মের যে বিরাট স্তূপ সে জড় করিয়াছে—তা'তে যেন তা'র আত্মাকে মিশাইয়া দিতে পারে নাই ; কোন্ উগ্র অনিবার্য্য অস্বস্তিকর উন্মাদনা তা'কে চালিত করিয়া লইয়াছে। প্রবাল-কীটের মত জীবন-শেষে আপন কার্য্যের বিরাটত্বে অবাক হইয়া সত্যভামাও ভাবিল, এত বড় সংসার কোন্ অসম্ভব উপায়ে সে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে

গড়িয়া তুলিয়াছে! দিনের পর দিন আপন সত্বাকে লঙ্ঘন করিয়া, উৎপীড়িত করিয়া আজ সে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে আর নিজেকে চেনা যায় না। কোথায় গিয়াছে তার সেই বাল্য-পরিচিতেরা, যাদের সান্নিধ্য ছাড়া আপন অস্তিত্ব সে কোন দিন কল্পনা করিতে পারিত না—তাদের সেই তকতকে উঠান, রান্না-ঘরের পেছনে বড় বড় নারকেল গাছ দুইটা, উঠানের সঙ্গেই একফালি আবাদের জমি, তার পাশেই খাল—যাদের স্পর্শ পাইয়া জীবনের চৌদ্দটা বছর তাহার কাটিয়াছে,—কোথায় গেল সেই সব! এই কোলাহলহীন স্বচ্ছমুহূর্তে ভীড় করিয়া তারা আসিয়া দাঁড়ায়;—সত্যভামা চিনিতে চায় সমস্ত চেতনা দিয়া—হয়ত চিনিতে পারেও, কিন্তু অস্পষ্ট,—কালের অপরিচ্ছন্ন যবনিকায় দৃষ্টি তার বাধিয়া যায়।

ভোর-বেলা ঘুম হইতে জাগিয়াই সে-দিন সত্যভামা শুনিল নীচে তার ঝি-চাকর নাতি-নাত্‌নিরা মহা সোর-গোল তুলিয়াছে। কান ঝালাপালা হইবার যোগাড়। ব্যাপারটা দেখিতে হয়। সত্যভামা নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়িতেই নীচেকার কথার কয়েকটা টুকরা তার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। "চোর না হলে অমন করে চায় কেউ?" "ওকে পুলিশে দেবার আগে কয়েক ঘা লাগিয়ে দে না অতুল!" "কি ছাই চ্যাঁচাচ্ছিস্, দে না শুনতে, শুনেই দেখি মহাপ্রভুর আগমন কেন!" সত্যভামা নামিয়া দেখিল, মহাপ্রভুটি হয়ত একটি ভিখারীরই ছেলে—বয়স চৌদ্দর বেশি হইবে না। শতছিন্ন ময়লা কাপড়ের আবরণে সে অতি কষ্টে আপনার সম্ভ্রম রক্ষা করিতেছে। বড় বড় নির্ব্বোধ চোখ দুইটা মেলিয়া এই একদল অপরি-চিতের রূঢ় কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছে।

মাকে আসিতে দেখিয়া টুনী যেন জটলা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সরিয়া আসিতে আসিতে বলিল, "চোর।"

একসঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠ প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, "দিদিমা, চুরি করতে এসেছিল ও।"

মণ্টু বলিল, "আমি দেখেছি প্রথম…"

মাণিক তার প্রথম জন্মগ্রহণ করিবার দাবী অবমানিত হইতে দিতে পারে না; সে দিদিমার কাছে আগাইয়া আসিয়া হাত পা নাড়িয়া বলিল, "সুট্‌ করে কলতলায় ঢুকে পড়েই চারদিকে চাইছিল—ভাগ্যিস রবার কিনতে আমি বাইরে যাচ্ছিলাম তখন; আমাকে দেখেই পালাই-পালাই করছে, অতুল এসে ধরে ফেল্ল।"

মণ্টু বাধা দিতে চাহিল, "না দিদিমা—" মাণিকের রোষ-কষায়িত চোখের দিকে চোখ পড়িতেই বাকি কথাটা তার গলায় আট্‌কাইয়া গেল।

মৃণাল—সত্যভামার বড় মেয়ের ছেলে; ফার্ষ্টক্লাশে পড়িবার দাবীতে সে এই দুই অপোগণ্ডকে ধমক দিয়া উপরে পাঠাইয়া বলিল, "একে যা করতে হয় কর দিদিমা; অতুল ত তক্ষুণি থানায় নিয়ে যায়; আমি বলি, দিদিমা এসে নিক।"

সত্যভামা অনেকক্ষণ 'চোর' ছেলেটির চোখের দিকে চাহিয়া ছিল। মনে পড়িল, মাধব শিরোমণি স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন দুই ঘর প্রজা। সদানন্দ—সদানন্দই হয়ত তাদের ছেলেটির নাম ছিল। তা'র যম-পুকুরের ব্রতের ত্রিশটা দিন পরম উৎসাহে সদানন্দ রায়দের দীঘি হইতে পানা আনিয়া দিত, 'চোখ-পানি' মাছ ধরিয়া দিত। বিবাহের সময় সত্যভামা দেখিয়া আসিয়াছিল—সদানন্দ প্লীহাজ্বরে ভুগিতেছে; দিনকতক পরেই হয়ত সে মরিয়াছে;—বাঁচিয়া থাকিলেও, সে আজ কোথায়, সত্যভামা সে খবর পায় নাই। নিজের কণ্ঠে নিজেই চম্‌কাইয়া সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর নাম কি রে?"

ছেলেটির সমস্ত চেতনা যেন এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আজ্ঞে উমেশ। আমি চোর নই মা-ঠাকরুণ। বাবুদের বল আমি চোর নই।" ঝি-চাকরের ব্যবধান ঠেলিয়া সে সত্যভামার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"এখানে কেন এসেছিলি?" কণ্ঠে সত্যভামার অভয় গলিয়া পড়িতেছিল। উমেশ শীর্ণ হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, "মা-বাবা, জায়গা-জমি কিছু নেই, মা, আমার। হেঁটে রতনপুর থেকে এসেছি—পথে কিছুই খাইনি—খেয়ার মাঝিও পয়সা নেয়নি। শুনেছি সহরে খাওয়া মেলে!"

আস্ফালনে আর কাজ হইবে না বুঝিয়া মৃণাল সরিয়া পড়িল। টুনীর কাছে ব্যাপারটা কেমন নূতন ঠেকিতেছে।

অনুরূপ ঘটনা ছেলেবেলায় সে অনেক দেখিয়াছে। মা আসিয়া কোন দিন আগন্তুকদের থানার পথে বাধা হন নাই। আজ অকস্মাৎ মায়ের মধ্যস্থতা টুনীর ভাল লাগিল না।

"ওকে তুমি ভালমানুষ ভেবেছ না কি মা? থানায় নিয়ে গেলেই জেনে আস্‌বে অতুল, ও দাগি-চোর না হয়েই যায় না।"

কলতলায় কুঁজোতে জল ধরিতে ধরিতে অতুল উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিল। কথাটাতে তার সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।

সত্যভামা উপরে উঠিয়া গেল; বলিয়া গেল, "ও এখানেই খাবে আজ।"

মৃণাল সত্যভামাকে পাইয়া বসিয়াছে। "দিদিমা, উমেশ তাহলে আমাদের কী হ'ল,—তোমার ছেলে—আমাদের মামা নয়?" টুনী এসব পরিহাসকেও আমল দিতে চায় না: "কি সব নোংরামি করিস্‌ মৃণাল, যা পড়্‌তে যা। মা, আজ ডলির জন্মদিন, তোমাকে বলে পাঠিয়েছে—দুপুর বেলায়ই যেতে হবে কিন্তু।"

সত্যভামা ছোট্ট করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা যাস্‌ তোরা।"

"বাঃ! তুমি যাবে না? বাবাও যাবেন বল্লেন। আমি মোটর সাফ করতে বলে দিয়েছি রামসদয়কে।"

সত্যভামা বলিল, "যা, যাব'খন।"

মাসীর ধমকে মৃণাল একটুও স্থানচ্যুত হয় নাই। দিদিমার কাছে সরিয়া আসিয়া সে চুপি চুপি বলিতে চাহিল, "উমেশও যাবে ত?"

সত্যভামা এইবার রাগিয়া উঠিয়াছে। "তোরা আমায় পেয়েছিস কি—বল্‌ তো? দেবো আমি এক্ষুণি দূর করে ওকে। সব সময় ঠাট্টা-ইয়ারকি আমার ভাল লাগে না বাপু।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সত্যভামা নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উমেশ পরিতৃপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া, অতুলের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, একথালা ভাত লইয়া বসিয়াছে। সত্যভামাকে দেখিয়া উমেশ এতটুকু হইয়া বলিল, "চার দিন পরে ভাত পেলাম, মা, যা খেয়ে পেট ভর্‌বে।" সত্যভামা একটু হাসিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "ওকে মুড়িঘণ্টটা দেওয়াস্‌ কিন্তু অতুল; থা'ক্‌, খুব ভাল হয়েছে।"

"না, মুড়িঘণ্ট আমার লাগ্‌বে না, এম্নিতেই পেট ভরে যাবে।" ভাতের প্রথম গ্রাসটাতেই উমেশের কেমন যেন আমেজ আসিয়াছে।

"লাগ্‌বে না কেন? ভালবাসিস্‌ নে? নিত্য-নিমন্ত্রণে খাস্‌নি কোন দিন? তোদের গাঁ ত নদীর কাছেই, খুব মাছ পাওয়া যাবার কথা।"

নদী ত আছেই, তা ছাড়া হালদারদের দীঘিতে রুই কাত্‌লা কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। দশ-পাঁচটা গাঁয়ের নিমন্ত্রণের মাছ ওখান হইতেই হইতে পারে। সে কথাটা উমেশ অনেক কষ্টে, অনেক বকিয়া, অস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিল।

"তোদের গাঁয়ে বাঁশ-ঝাড় নেইরে, উমেশ, নিচ দিয়ে সরু পথ। ভাঁটফুল ফুটে থাকে না পথের পাশে? ষষ্ঠী-পূজোয় ছেলেমেয়েরা আসে না দল বেঁধে বাঁশের ডগার পাতা ছিঁড়ে নিতে?"

"হ্যাঁ আসে। গেলো বছর বোসদের বুড়িকে ত ওখা-নেই সাপে কাটুল। সনাতন ওঝা এসে কত ঝাড়্‌-ফুঁক্‌! কিছুতেই বুড়ি আর চোখ মেলে চাইল না। সনাতন বলে গেল, কাল-সাপ; ও-বিষ কিছুতেই নাম্‌বে না।"

"তোদের ওখানে মনসাপূজো হয় না বুঝি? সাপে কাটে যে লোকদের? সারা শ্রাবণ মাসটা আমার বাবা পদ্মপুরাণ পড়্‌তেন। গাঁয়ের সব লোক এসে জড় হ'ত ধুয়া গাইবার জন্ত।" সত্যভামা দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অতীতের দিনগুলিকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিল। তার পর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল: "পদ্মপুরাণ পড়্‌লে বংশ থাকে না। বাবার বংশও থাক্‌বে না জান্‌তাম।" উমেশের দিকে ফিরিয়া তার চোখে পড়িল ছেলেটা ভাত অর্দ্ধেকটাকও খাইতে পারে নাই। একটু ব্যস্ত হইয়াই সত্যভামা বলিল, "এ কি, ও ভাতকয়টাও খেতে পার্‌লিনে। শুধু জলই খাচ্ছিস্‌! আর যা গরম পড়েছে এ ক'দিন! পুড়ে গেলুম। মেঘের

ফোঁটাও দেখা যায় না আকাশে। নে, দই দিয়ে খেয়ে ফেল ও-কটা ভাত। হাঁ চল্‌বে, মাত্র ত দুটো ভাত।"

উমেশ উঁকি দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "বিষ্টি হ'বে। দেখে এসেছি কেদারঠাকুর নারায়ণ-শিলা জলে ডুবিয়ে রেখেছেন। সাত দিনের দিন এক ফোঁটা হলেও পড়্‌বে।"

সত্যভামার মনে পড়িয়া গেল এমনি অনাবৃষ্টিতে 'মেঘ-মাগন' এর কথা। "আচ্ছা উমেশ, তোদের গাঁয়ে মেঘ মাগ্‌তে যায় না বামুনের ছোট ছোট মেয়েরা—স্নান করে, এলোচুলে? এখনো আমার মনে আছে ছড়াগানের দু'একটা পদ: 'মেঘ রাজারে মেঘ রাজা, তুই না সোদর ভাই—' কেমন, বেরুবে না এখন মেয়েরা মেঘ-মাগ্‌তে?"

এমন কোন ঘটনা উমেশের মনে পড়িল না। ভাতের থালায় সে নিবিষ্ট হইয়া রহিল।

"ও, আজকাল কেউ করে না বুঝি? ছোট ছোট মেয়েরা জাল দিয়ে চুলও বাঁধে না, কেমন? ছোট বেলায় আমরা বেঁধেছি। সার করে চুলের কাঁটা গুঁজে দিতাম, মাথায় চিনেমাটির পক্ষী দেওয়া চুলের কাঁটা,—দূর থেকে বেলফুলের কুঁড়ির মালার মত দেখ্‌তে হ'ত। আজকাল ও-সব আর নেই, না রে?"

উমেশের ত স্পষ্টই মনে আছে তার ছোট বোনটা যেবার মরিয়া গেল সে বছর তার বাবা ওর জন্য চুলের জাল, চুলের কাঁটা কিনিয়া আনিয়াছিল। কাজেই এইবার উৎসাহিত হইয়াই সে বলিল, "হাঁ, আজকালও পরে।"

সত্যভামা দেখিতেছে নন্দীবাড়ীর ছোট মেয়ে ষোড়শীর সঙ্গে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে খালের বাঁধে মাছধরা দেখিবার জন্য। বাগ্দীদের জোয়ান-জোয়ান ছেলেগুলির পোলো লইয়া সে কি হুল্লোড়! ওদিকে কার পুকুরের বুঝি পাড় ভাঙিয়াছে—উঠিতেছে শোল আর মৃগেল মাছই বেশি। সত্যভামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া মাছ ধরা দেখিত, যতক্ষণ না শিরোমণি আসিয়া আড়-কোল করিয়া তাকে বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। হয়ত এখনো খালে তেমনি মাছ ধরা হয়, তেমনি বামুন-কায়েতের ছোট ছোট মেয়েরা খুশীর দৃষ্টিতে চাহিয়া তা' দেখে! হয়ত সেই মেয়েদেরই অনেকের বিবাহ হইয়া যাইবে এত দূরে, যেখানে গাঁয়ের কাক-চিলও যাইতে পারে না; সত্যভামার মত হয়ত তারাও ভাবিবে গ্রাম্য-পরিবেশে স্নিগ্ধ শৈশবের কথা।

পেছনে টুনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে: "এ কি—তুমি যাবে না না কি মা?"

উমেশ লজ্জায় ছোট হইয়া গিয়া খালি থালের উপর আঙুল ঘষিতে লাগিল। তার জন্যই না ঠাকরুণ এত কাজ ফেলিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সত্যভামা সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ডলির জন্মদিন, তাকে যাইতে হইবে বই কি। গিয়া অনর্থক কথায় হাসিতে হইবে, আগন্তুকদের শাড়ীর ঝলমলানি, মার্জ্জিত অনুচ্চ কণ্ঠস্বর, ডলির দু'একটা সেতারের গদ, একটা গানও হয়ত, উপভোগ না করিলে চলিবে কেন?

উমেশ কিন্তু এ বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। অতুলের শুইবার ঘরের পাশেই কোঠার মত একটু জায়গা ছিল, এত দিন সেখানে কয়লা রাখা হইত, উমেশই বন্দোবস্ত করিয়া ওটাকে চমৎকার শুইবার ঘর করিয়া লইয়াছে। একটা ভাঙা তক্তপোষে গোটা দুই পেরেক ঠুকিয়া সত্যভামাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "দিব্যি হয়ে গেছে, মা, শোবার বন্দোবস্ত!"

সত্যভামা বলিল, "খালি কাঠে কি করে শুবি বল্, গায়ে লাগ্‌বে না? একটা কাঁথাও আনিস্ নি বাড়ী থেকে!"

"খুকুমণিদের ছেঁড়া কাঁথা নাই দু'একটা? আমি শেলাই করে নিতুম।"

"নাঃ ওদের কাঁথা নেই। আমারি আছে একটা। বিয়ের আগে আমায় শেলাই করে দিয়েছিলেন মা;—পাড়ের কাঁথা, কাপড়ের পাড় জোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী! মায়ের চিহ্ন, ওটা দিতে পারি নে। তুই বরং এক কাজ কর। টুনীর কাছ থেকে কয়েকখান ছেঁড়া কাপড় চেয়ে নিয়ে শেলাই করে নিস কাঁথা।"

"হাঁ, দুটো কাপড় জোড়া দিয়ে নিলেই আমার ঢের হবে।"

সত্যভামা চলিয়া গেল। মেলা কাজ পড়িয়া আছে। টেলি আসিয়াছে সবজজ নিকুঞ্জ চ্যাটার্জ্জি

এবার রায় সাহেব উপাধি পাইলেন। উৎসবের ভূমিকা স্বরূপ তাই একটা টি-পার্টি হইবে। সত্যভামা পুরাতন উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া রান্না-বান্নার যোগাড়-যন্ত্র করিতে চাহিতেছে। অথচ কাজ যে বেশি আগাইয়াছে তা নয়। ঘুরিতেছে বাড়ীময়; অলস মন্থর পদক্ষেপে কোথাও একটু কর্ম্ম-ব্যস্ততা জাগে নাই। নিকুঞ্জ চ্যাটার্জ্জিই যখন উকিল হইতে মুন্সেফ হইয়া গেলেন, তখন ত আর এমন ছোটখাট টি-পার্টি নয়, দেড়শ' দুইশ' লোকের পাত পড়িয়াছিল—খাইয়া তারা তৃপ্তি পাইয়াছিল তারই কর্ম্মকুশলতায়। বয়স? এখনও ত এমন অথর্ব্ব হইয়া সে পড়ে নাই যে এই হ্রস্ব উৎসবের আয়োজন একা করিতে পারে না। আর একাও ত সে নয়, টুনী আছে —তাছাড়া হাতের পাঁচ আছে একটা ঠাকুর। তবু, তবু যেন সত্যভামার সম্মুখে কি একটা ফাঁক পড়িয়া গিয়াছে, তা উত্তীর্ণ হইবার সামর্থ্য তার নাই। হলঘরে ঢুকিয়া চেয়ার-গুলিতে দুই একটা টানও সে দিল; আলমারীর কাচগুলি ধূলায় ময়লা হইয়া আছে, কাপড়ের আঁচলটা সেগুলির উপর একবার বুলাইয়া আনিল, কিন্তু তার বেশি দূর নয়; যেমন ঘরে ঢুকিয়াছিল, সন্তর্পণে তেমনি বাহির হইয়া আসিল। ওধারেই উমেশের ঘুমাইবার খুপরীটা। নিজের অজ্ঞাতেই সত্যভামা সেখানে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

উপরের তলা হইতে একটা সোরগোল উঠিল। সত্যভামার বুকে সে কি ধড়্‌ফড়ানি। মাণিক মণ্টু যা হইয়াছে, কি জানি, ষ্টোভেই পুড়িয়া গেল না কি! একটা চীৎকার উন্মুখ করিয়া সত্যভামা উপরে আসিয়া উপস্থিত। ছোটখাট একটা জটলা। জটলার ভিতর হইতে ভীত উৎসুক একজোড়া চোখ কা'কে যেন খুঁজিতেছে। উমেশ! উমেশ সত্যভামাকে দেখিতে পাইয়া একরকম আছাড় খাইয়াই তার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কান্নাই যেন ছিট্‌কাইয়া আসিল: "তুমি বল, মা, ওদের, আমি চোর নই। আমি না কি চুরি কর্‌তে উপরে এসেছি মা।"

মৃণাল ভ্যাঙ্‌চাইয়া উঠিল: "না চুরি কর্‌তে আস্‌বেন কেন, হাওয়া খেতে উপরে এসেছেন! বুঝেছ দিদিমা, আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকে, দেখি, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—ভাগ্যিস আমি এসে পড়েছিলাম—"

টুনী শুষ্ক গলায় বলিল: "চুরি কর্‌বার মতলব ছিল আর কি! ওদিন মাকে বল্লাম—"

সত্যভামার পায়ের তলা হইতে একটা ভিজা শব্দ আসিল, "মাকে জিজ্ঞাসা কর দিদিমণি, তোমাকে খুঁজ্‌তে এসেছিলাম আমি, একটা ছেঁড়া কাপড়ের জন্যে—"

মাণিক নাক-মুখ সিঁটকাইয়া উঠিল: "হিঁঃ, তবে তুই আমাকে দেখে পালাচ্ছিলি কেন?"

টুনী সিঁড়ির মুখে অতুলকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। নিতান্ত উদাস এবং নিস্পৃহ কণ্ঠ হইতে কথাটা আসিল: "ওকে কি কর্‌তে হবে করে আয় অতুল।"

সত্যভামা তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্তশীল কথাবার্ত্তায় তপ্ত হইবার কথাই ত। উমেশ চোর, কেন না একদিন সে কদর্য্য পোষাকে তাদের বাড়ীতে ঢুকিয়াছে; কেন না আজ তার উপরে উঠিবার সাহস পর্য্যন্ত হইয়াছে। যে-হেতু সে চোর হইতে পারিত, সে-হেতু সে চোর। সত্যভামা উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িল: "দিচ্ছি আমি আজই ওকে তাড়িয়ে। তোমাদের কাউকে আর চোর পাহারা দিতে হবে না। এই উমেশ, আজই তুই চলে যা —জেলখানায় পচ্‌তে ত আর সহরে আসিস্‌নি। না—না, আমার পা জড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে—ওঠ্‌ শীগ্‌গির।"

উমেশ পা ছাড়িয়া উঠিল। ধারে কাছে কেউ নাই। যারা ছিল চলিয়া গিয়াছে যার যার কাজে।

সত্যভামা মুখ ফিরাইয়া বলিল: হাঁ চলে যা—"

উমেশ আসিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়াছে, সত্যভামা ডাকিল, "দাঁড়া—" হাতে লাল-নীল রঙের একটা পুঁটুলির মত: "শীত আস্‌ছে সাম্‌নে; নিয়ে যা কাঁথাটা। কীই বা কর্‌ব ওটা দিয়ে আর। গাঁয়ে ফিরে গেলে গায়ে দিস।"

সিঁড়িতে উমেশের পায়ের শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। সত্যভামা তার সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রুতিমান করিয়া সেই শব্দ শুনিতে লাগিল—সেই শব্দ বাজিয়া চলিয়াছে আঁকা-বাঁকা খালের ধারে ধারে সাদামাটির সরু একটি পথ দিয়া —দেখিতে সব গাঁয়েরই মত একটি অখ্যাত গাঁয়ের ভিতর।

তপ্ত ঘিয়ের একটা উগ্র গন্ধের সহিত টুনীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল: "সব চপ পুড়ে গেল ছাই— মা তুমি আস্‌বে, না কি?"

সত্যভামা চপ না ভাজিলে পার্টিতে আজ একটা কেলেঙ্কারীই হইবে।

বাচখেলা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ডাক্তার

অধ্যাপক শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
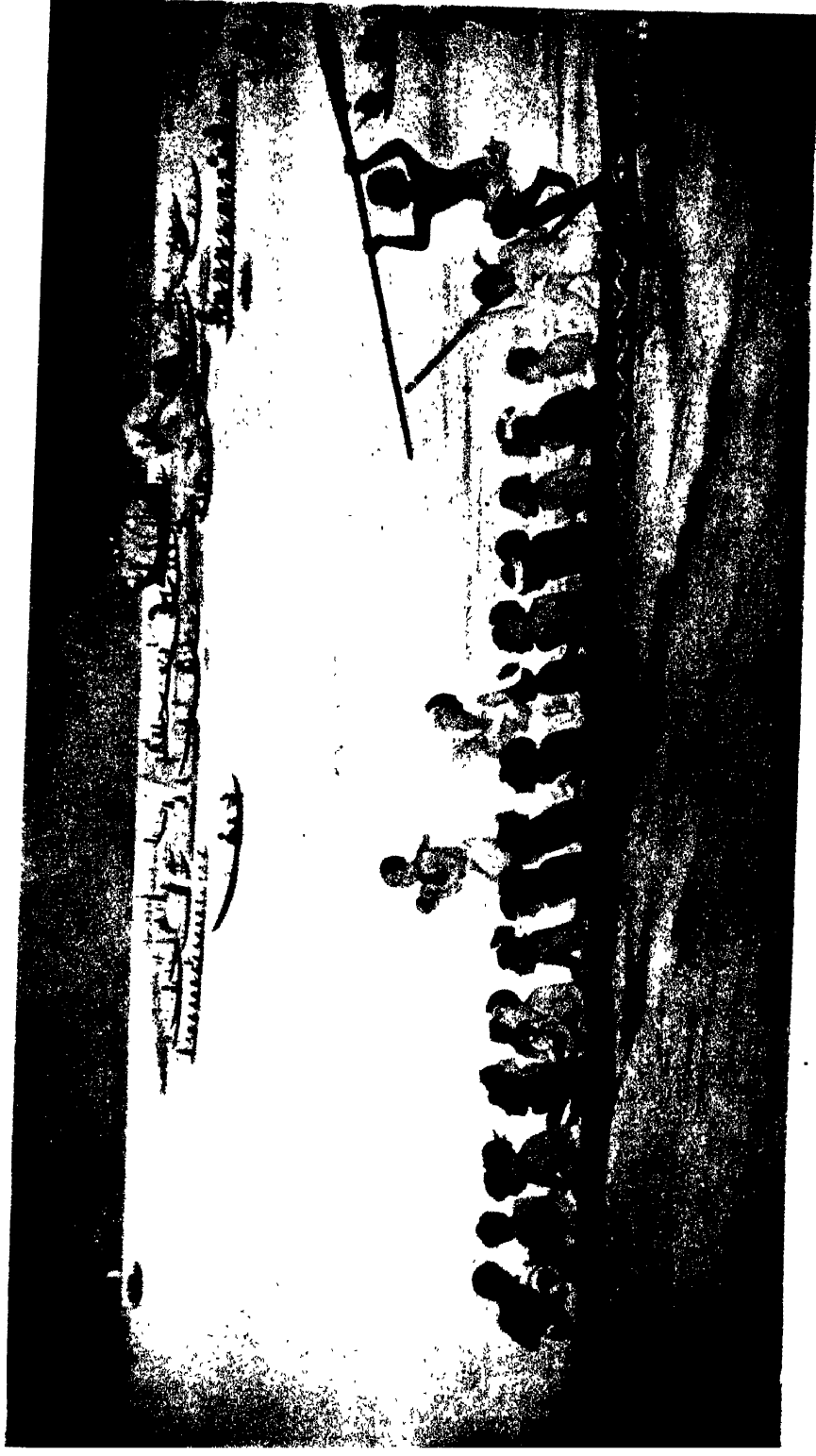
হ্যারিসন রোড্ আর কলেজ ষ্ট্রীট্ জংশনের কাছাকাছি, ছোট একটা গলির মুখে প্রথম বাড়ীখানি। নম্বর তার এম্নি বিদ্‌ঘুটে যে লোকে, রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়েছে যে উঁচু নারকেল গাছটি, তারই উল্লেখ করে বাড়ীটা নির্দ্দেশ করতো! ডাক্তারের চেয়ে লোকে বেশী চিন্‌তো ডাক্তারের নানা দেশের ছাপমারা লম্বা লেজটিকে; কারণ যে পাড়ায় দু দুটো এফ্-আর-সি-এস, আর গোটা পঞ্চাশ এম্-বি, এল্-এম্-এস, আর এম্-ডি (এইচ্), এবং রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশী, সেখানে নতুন ডাক্তারকে কজনই বা চেনে, অথবা চিনতে চায়! তবু পাড়ার লোকেরা দেখে অবাক্ হয়ে যেতো, ডাক্তারের নীচের ঘরটা, যতক্ষণ ডাক্তার বাড়ীতে থাকে, লোকের পর লোক এসে সরগরম করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, তাদের বেশীর ভাগই, হয় লক্ষীছাড়া বন্ধুর দল, নয় মাসিকের সম্পাদক, নয় লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট, নয় ছাত্র, অথবা বিনা পয়সার রোগীর দল! ডাক্তার সবারই সঙ্গে হেসে কথা বলে, সকলকেই খাতির করে, সময় সময় বন্ধুদের জলযোগ ও চাযোগ করতে অনুরোধ করে। আর বন্ধুরাও তা' প্রত্যাখ্যান করার মত অনুদারতা দেখান না। এম্নি করে দিন কাটে!

উপার্জ্জন যা' হয়, তার তুলনায় খাটুনী অনেক বেশী! ভোর ছ'টা হতে আরম্ভ করে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ডাক্তার আর নিঃশ্বাস ফেল্‌বার অবসর পায় না, কারণ তার রোগ, রোগী ও ঔষধের খেয়াল ছাড়া আরো অনেক খেয়াল আছে। তাই পরিশ্রম যা' করতে হয়, তার কতকটা কর্ত্তব্যানুরোধে আর কতকটা খেয়ালের বশে! দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার একটি দিনের কাজের তালিকা উল্লেখ করলেই সেটা বেশ বুঝতে পারা যাবে!

আগের রাত্রিতে একটা পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার আড্ডায়, অর্থাৎ ক্লাবে অনেক দেরী হয়ে থাক্‌বে—তাই, ডাক্তারের যখন ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে! সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা রোগী দেখবার সময়। তার পরই সহরের অপর প্রান্তস্থিত হাসপাতালে অনাহারী ভিজিটিং ফিজিসিয়ানের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে বেরোতে হয়। তাই, হাত মুখ ধুয়ে কোন রকমে এক পেয়ালা গরম চা পান করে, ডাক্তার পোষাক পরে নীচে নেমে এলেন। ঘরে তখন শুধু চারটি লোক বসে আছে। একজন বহুদিনের হাঁপানি কাশির রোগী, রোজ ভোরে ডাক্তারকে দর্শন করে যাওয়া নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির অঙ্গবিশেষ। সুতরাং নিত্য গঙ্গা যেমন জল হয়ে থাকেন, তেমনি নিত্য ডাক্তার দর্শনের সঙ্গেও পয়সার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। তবু ডাক্তারকে যে কষ্ট করে দেখা দিয়ে যান সে নেহাৎ দয়াপরবশ হয়েই। কাজেই ভালমন্দ দু চার কথা বলার পরই তিনি আগের ওষুধ চলবে জেনে বিদেয় হলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিজের রোগের ইতিহাস প্রায় আধ ঘণ্টায় শেষ করে, ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে তাকে আরাম করে দেবার জন্য কাঁদতে লাগলো। ডাক্তার তাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করে, স্নায়বিক রোগের ওষুধ লিখে দিয়ে আট টাকা ফিস্ দাবী কর্লেন! শুনেই রোগীর চক্ষু স্থির! আট টাকা! নতুন ডাক্তার বলেই না সে এসেছে, কম পয়সাতে হবে বলে! কিন্তু আট টাকা, সে যে অনেক টাকা, আজকালকার দিনে! ইত্যাদি, ইত্যাদি! ডাক্তার মৃদু হেসে বল্লেন, "নতুন ডাক্তারের বুঝি আর খাবার থাকবার দরকার নেই, কেমন?" শেষে অনেক হাতে পায়ে ধরে, দর কষাকষি করে, রোগী আট টাকার বদলে পাঁচ টাকায় রফা করে, প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পরেই এলেন তৃতীয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি, বল্লেন, আট টাকার বদলে ষোল টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, শুধু একখানা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট চাই, কেন না ছুটীর তাঁহার একান্ত আবশ্যক! ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসুখ কি?"

"অসুখ হতে যাবে কেন?" বলিয়া ভদ্রলোকটি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

এম্নি সময় উপরের ঘরে টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ডাক্তারের রোগী দেখবার কামরা যদিও নীচে, তবু টেলিফোন থাকে উপরে শয়ন-কক্ষে, দুই কারণে, এক, রাত্রিতে নীচে কষ্ট করে ছুটে আসতে হয় না, দুই, আবশ্যক ও অনাবশ্যক মত বাইরের লোকের হাত হতে টেলিফোঁর ব্যবহার বাঁচাবার জন্য। ডাক্তার বল্লেন, "আপনি বসুন, আমি টেলিফোন্‌টা শুনে আসি।"

"হ্যালো!"

"হ্যালো! কে আপনি?"

"ডাক্তার আছেন? আমি রামমোহন।"

"এই যে আমি কথা বলছি। কি, খবর কি? আছেন কেমন?"

"ভালই আছি, তার পর সেই লেখাটা, কত দূর?"

"ওহো, একেবারেই ভুলে গেছি, দেখি আজকালের মধ্যেই শেষ কোর্ব্ব!"

"পরশুর মধ্যে চাই-ই চাই কিন্তু!"

"চেষ্টা কোর্ব্ব!"

"না না, সে হবে না, চাই-ই চাই, কেমন, মনে থাকবে ত?"

"আচ্ছা, নমস্কার!"

ডাক্তার আবার নীচে এসে বল্লেন "তার পর আপনার অসুখের কথা বলুন!" ভদ্রলোকটি বল্লেন "অসুখ নয়, সার্টিফিকেট!"

ডাক্তারের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল, বল্লেন "দেখুন, রোগের চিকিৎসা করা আমাদের কায, সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবসা আমরা করি নে!" ভদ্রলোকটি অবাক্ হয়ে বল্লেন "সে কি কথা! সব ডাক্তারই ত সার্টিফিকেট দেয়!"

ডাক্তার মুখে একটু হাসি ফুটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস করে বল্লেন "সকলের কথা হচ্চে না, আমার কথাই হচ্চে!"

"তবে আপনার কাছে এলুম কেন?" প্রশ্ন হলো!

ডাক্তার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লেন "সেটা বোধ হয় আমার বিলাতের টাইটেলগুলোর জন্য, নয় কি?"

ভদ্রলোক আরো দু চারিবার ডাক্তারকে রাজী করাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে শেষে ক্ষুণ্ন মনে শ্লেষের ভাষায় বল্‌লে "এই করেই আপনি প্র্যাকটিস্ করবেন কোলকাতায়?"

ডাক্তারের রাগ হলো, কিন্তু ডাক্তারের রাগ করলে চলবে কেন, তাই বল্লেন "আপনি এখন আসুন তবে, নমস্কার।"

রাগে গজগজ করতে করতে ভদ্রলোক দরজার উপরই রাগটা প্রকাশ করে চলে গেলেন!

তার পরই এলেন চতুর্থ ব্যক্তিটি, একজন জীবন-বীমার দালাল। আগন্তুকটি বল্লেন "আপনার পলিসিটা—"

ডাক্তার হেসে বল্লেন "দেখুন, ভদ্রলোকের এক কথা! আমার সর্ত্ত আমি আপনাকে দিয়েছি, আপনাদের কোম্পানী হতে যে টাকাটা ডাক্তারের ফিস্ বলে পাব, সেটিই আমি আপনাদের কোম্পানীতে ফিরিয়ে পাঠাতে পারি প্রিমিয়ম হিসেবে, তার একটি পয়সা বেশী নয়। সুতরাং আমি কত টাকার পলিসি নেবো সে ভার আপনার উপর, আমার কাছে নয়!"

দালালটি বল্লেন "আচ্ছা, আমি প্রমিস্ কচ্ছি···"

ডাক্তার বল্লেন "প্রমিসের কথা হচ্চে না, প্র্যাকটিক্যাল্ কথা হচ্চে! আচ্ছা, নমস্কার!"

ডাক্তার উঠ্‌লেন। উপরে যেতে না যেতে আবার টেলিফোন বেজে উঠলো! ডাক্তার আশান্বিত হয়ে টেলিফোন ধরে বল্লেন "হ্যালো, কে?"

"আমি সুধীর, ক্লাস এসিষ্টাণ্ট!"

"কি খবর?"

"কাল ক্লাস আছে, লেকচার-নোটের পয়েণ্টগুলি।"

"আচ্ছা!"

ডাক্তার রামমোহন বাবুর লেখার তাগাদার নোটের পাশে লিখে রাখলেন (2) Lecture-note to-morrow 12 Noon.

চাকর এসে বল্লে "বাবু, বাজারের হিসেবটা।" ব্যাটার চিরকালই ওই বদ্‌খেয়াল, ডাক্তার যখন তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখুনি তার বাজারের হিসেব না দিলে নয়। ডাক্তারের মেজাজ কিন্তু খুব ভাল, তাই হিসেব লিখতে বসে বল্লেন "কি কি, তাড়াতাড়ি বল্!"

চাকর বল্লে, "বাবু লিখে নেন কাঁচকলা—আধসের!" ডাক্তার টেবিলে বসে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ফর্ম্মে লিখলেন

তাই ; বল্লেন, "আর কি ?" "আদা…" এম্নি সময় বাইরের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো, ডাক্তার মুখ তুলে দেখেন উপেন আর সামনে নেই।

তখনো সু জুতা পরা হয়নি। একটা জুতো পায়ে দেওয়া হয়েছে এম্নি সময় আবার টেলিফোন্ ডাকলে! এবার একটা কল, একজন হার্টের রোগীর বুকে ব্যথা হয়েছে ও শ্বাসের কষ্ট হচ্চে। ডাক্তার বল্লেন "হাসপাতাল থেকে ফিরতে দেড়টা" নোটে লেখা হলো (৩) মিসেস বানার্জ্জি, ১৯ নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীট, দেড়টা।

চাকর নীচে থেকে একটা হলদে রঙের খাম এনে হাতে দিল। সাড়ে ছটায় একজন কবি-বন্ধুর প্রশস্তিতে যোগদানের জন্য আহ্বান-পত্র। নোটে নম্বর পড়লো (৪) বেঙ্গল ক্লাব ৬॥০টা। তখুনি হঠাৎ নজর পড়লো, ওপাশের পুরানো নোটের উপর, Lecture বরানগর হাইস্কুল, সাড়ে তিনটা!

"ওহো হো, একেবারে ভুলে গিছলুম, আজই যে লেকচার, আচ্ছা জ্বালাতন করে খেলে দেখছি!" বলেই ডাক্তার ড্রয়ার খুলে দেখলেন, লেকচারের পয়েন্টগুলি ঠিক আছে কি না! তার পরেই ফোন্ তুলে ধরে বল্লেন "রিজেন্ট, টু, থ্রি, টু"

"হ্যালো!"

"হ্যালো, কে? বিপিনবাবু!"

"তাহলে আপনি আড়াইটায় আসবেন, কেমন?"

"আমি তৈরী থাকবো, কিন্তু দেখবেন ঠিক ঠিক সাড়ে তিনটায় যেন সভা আরম্ভ হয়। আমি দেরী করতে পারবো না, অনেক এনগেজমেণ্ট আছে। হেডমাষ্টারকে এখুনি খবর পাঠিয়ে দিন।"

"আচ্ছা—নমস্কার! হাসপাতালের বেলা হলো!"

আর একটা জুতো পায়ে দেওয়া হয়ে গেছে, ডাক্তার ডাকলেন "ওরে উপ্‌নে, ও উপনে।" উপনে অর্থাৎ উপেন বোধ করি কয়লা ভাঙ্‌ছিলো, সেই কয়লারঞ্জিত হস্তে ঘরে ঢুকে বললে, বাবু ডেকেছেন?"

ডাক্তার বল্লেন "হ্যাঁরে বেটা, এরি মধ্যে ভূত সেজে বসেছিস্। হাত ধুয়ে ষ্টেথিস্‌কোপ্‌টা নিয়ে আয় দিকি, নীচে থেকে!"

উপেন চলে গেল। আবার ক্রিং ক্রিং বেজে উঠ্‌লো! অপ্রসন্ন চিত্তে ডাক্তার ফোন্ ধল্লেন "হ্যালো!"

"হ্যালো! ডাক্তার আছেন?"

"এই যে কথা বলছি, তাড়াতাড়ি বলুন।"

"আমি মিসেস্ বাসু কথা বলছি, বেবির আজ বড় অসুখ বেড়েছে।"

"কোন্ বেবি, আপনার ছোট নাতিটি কি?"

"না, না, সে তো ডল, আমার মেজছেলে বেবির কথা বলছি।"

এতক্ষণে ডাক্তারের খেয়াল হলো, যে মিসেস্ বাসুর চল্লিশ বৎসরের একটি বেবি আছে বটে!

"আচ্ছা, বলুন।"

"আপনি একবার দয়া করে আসবেন কি?"

"কখন?"

"এখুনি এলে ভাল হয়।"

"অসম্ভব, হাসপাতালের বেলা হয়েছে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটার আগে হবে না!"

"তার আগে?"

"উপায় নেই, অনেক কাজ!"

"তাহলে এবেলা ডাঃ আচারিকেই ডাকি!"

"আচ্ছা" বলে ডাক্তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফোন ছেড়ে দিলেন! মিসেস্ বাসু হাই সোসাইটির লেডী, যখন তখনই ছুটতে হয় তাঁর ডাকে, পয়সার জন্য না হলেও পৃষ্ঠপোষণের জন্য ত বটে! তাই অন্ততঃ একটি দিনের জন্যও ডাক্তার, কল ছেড়ে দিয়ে যে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়লেন, তা বোধ হয় হতাশার নয়—স্বস্তিরই!

আবার ফোন্ শব্দ করে উঠ্‌লো! একটু কড়া স্বরেই ডাক্তার বল্লেন "হ্যালো, কে আপনি?"

"আজ্ঞে, আমি তিনকড়ি ভট্টাচার্য্যি, এণ্টনি বাগাম লেনে থাকি, একটা দোকান থেকে কথা বল্‌ছি!"

"তা' কি চাই?"

"আমার কাশিটা আর পেটের অসুখটা বেড়েছে, একটু ওষুধ বদলে দেবেন কি?"

আবার সেই বিনে পয়সার রোগী!

ডাক্তার বল্লেন "এখন হবে না, কাল এসো!"

"আজ্ঞে ততক্ষণে যে মরে যাবো!"

"আজ সময় নেই !"

"তবু একটা প্রেস্‌ক্রিপসন যদি রেখে যান্ দয়া করে!"

"আচ্ছা', আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, সাড়ে নটার সময় এসে বেয়ারার কাছ থেকে নিয়ে যেও।"

এই বলে ডাক্তার প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে বসলেন, আর একখানা প্যাড্ নিয়ে—

Re.

Tinct, Camphor. Co ... m xv.

Tinct Hyoscyamus ... m x.

উপেন ষ্টেথিস্‌কোপ নিয়ে এসেছে! আবার টেলিফোনের শব্দ হলো। ডাক্তার বিরক্তিভরে বল্লেন "আঃ, জ্বালিয়ে খেলে দেখছি, ভাগ্যিস্ বাইরের কল্‌গুলির জন্য পয়সা দিতে হয় না!" ওদিকে ফোন বেজেই চলেছে ক্রিং রিং, ক্রিং রিং। ডাক্তার হেঁকে বল্লেন "যা বেটা, দেখছিস্ কি? ধর ফোনটা!"

উপেন ফোন ধরে বল্লে "হালু।"

ডাক্তার চেঁচিয়ে বল্লে "কে আবার?"

উপেন বল্লে "এজ্ঞে, তেনা বলছেন, ডাক্তারবাবুর লগে কথা কইবান্!"

"সরে যা' গাধা" বলে অর্দ্ধ-সমাপ্ত প্রেস্‌ক্রিপ্‌সান ফেলে রেখেই ডাক্তার উঠে আবার ফোন ধরে বল্লেন "হ্যালো, কে, কে আপ্‌নি!"

"আমি নরেন!"

"ওঃ নরেনদা', তার পর, খবর কি?"

"কেমন আছ? দেখাই নেই যে!"

"কাজের যা' ভীড়!"

"সেই ভূতের বেগার ত!"

"না করে আর উপায় কি?"

"আজ সন্ধ্যায় আমাদের এখানে আসবে কি?"

"কেন?"

তোমার বৌদির হুকুম, সাড়ে ছটায় আসতেই হবে!"

"অধীন জনের প্রতি এত অত্যাচার কেন?"

"বাড়ীতে অনেক মেয়ে-ছেলেরা আসছেন, তোমাকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেবেন বলে!"

"ওঃ, তাই বলুন, আপনারা এখনো হাল ছাড়েন নি দেখছি!"

"আমি ছাড়ার কে? তোমার বৌদিই ত কর্ণধার! কর্ণ ছাড়া না ছাড়ার মালিক তিনিই, আমি শুধু আজ্ঞাবহ বার্ত্তাবহ মাত্র!"

"তাঁকে বলবেন, আমি রণে ভঙ্গ দিচ্ছি।"

"কিন্তু ওরা যে রণসাজ করে বেরিয়েছেন, তার কি হবে!"

"বলুন, ফুর্‌সৎ নেই!"

"শোনে কে?"

ডাক্তার বেশ টের পেলেন ফোনটা হস্তান্তরিত হয়ে গেল! মেয়েলি কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল "ঠাকুরপো, পালাবার পথ নেই, আসতেই হবে।"

"কি কোর্ব্ব বৌদি, অনেক এন্‌গেজমেণ্ট!"

"এখানের এন্‌গেজমেণ্টটি যে সব চেয়ে বড়!"

"দুঃখিত, অত্যন্ত অক্ষম জেনে ক্ষমা করবেন!"

"তার পর বেচারা যে তোমারই জন্য আসছে, তার কি হবে?"

"ভাল করে খাইয়ে দেবেন, তবেই খুসী হয়ে ফিরে যাবে!"

"না গো না, সে দিল্লীর লাড্ডুর চেয়ে আর কিছুই বেশী পছন্দ করে না।"

"দুর্ভাগ্য বলতে হবে!"

"তাহলে তুমি আসছ না!"

"আজ অসম্ভব, অহোরাত্র কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়ে আছে!"

"তবে কি হবে?"

"সবুরে মেওয়া ফল্‌বে!"

"ছাই ফল্‌বে! তুমি যে লক্ষ্মীছাড়া আছ, সেই থাকবে দেখছি—"

"কি কোর্ব্ব, দুর্ভাগ্য! আচ্ছা, আসি তবে বৌদি, হাসপাতালে যাবার সময় হয়েছে অনেকক্ষণ, আজ লেট লতিফ্ হয়ে গেছি!" বলে ডাক্তার ফোন ছেড়ে দিলেন।

খেয়াল ছিল প্রেসক্রিপ্‌সনটা লেখা হয়ে গেছে, তাই হাতের কাছে প্যাড্‌খানা টেনে নিয়ে, To be taken thrice daily বলে সই করে, ষ্টেথিস্‌কোপটা পকেটে পুরে বল্লেন, "দেখ্, উপ্‌নে, তিনকড়ি ভট্টচায

আসবে সাড়ে নটায়, এই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনখানা রইলো। হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কি ? ঐ যে প্যাডে, তাকে দিবি, বুঝ্‌লি !” বলেই ডাক্তার আর কালবিলম্ব না করে, ধপ্‌ধপ্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। তখন নটা বেজে গেছে।

তার পর হাস্‌পাতালের দৈনন্দিন গৎবাঁধা কাজ, নোট-বুকে লেখা এন্‌গেজমেণ্টগুলির মান রাখতে ডাক্তারের উর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি, তার মাঝে ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ, সাহিত্যচর্চ্চা, শরীরতত্ত্ব প্রচার, সামাজিকতা কিছুই বাদ পড়লো না। শুধু সাড়ে চারটা হতে সাড়ে ছটা, ভিজিটিং সময়ে দু'চারিজন বন্ধু ও দু-একটি রোগী এসে দেখতে পেলো, ডাক্তারের নামের পাশে out বলে কথাটা জল্‌জল্‌ কর্চ্ছে ! ডাক্তারের তাতে যে খুব বেশী ক্ষতি হলো এমন নয়, বড় বেশী হয়ত আট টাকার মতন। তবে উপেন রাগে গজগজ্‌ কচ্ছিল, কারণ ডাক্তার সদ্যঃ-প্রাপ্ত পাঁচটি টাকা হতে তাকে বাজার-খরচের জন্য যে টাকাটা দিয়েছিলেন, তা' বাজারে কেউ নিতে সাহস করেনি !

রাত সাড়ে এগারোটায় ডাক্তার ফিরে এসে, খেতে বসে দেখেন, ডাল ভাত ছাড়া আর কিছুই রান্না হয়নি। দুপুর বেলাও যা খাওয়া হয়েছিল তাকে গলাধঃকরণ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, সুতরাং অপ্রসন্ন চিত্তে যখন ঠাকুরকে কারণ জিজ্ঞেস কল্লেন, সে জবাব দিলে উপেন জানে ! উপেনকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই, সে এসে টাকাটা দেখিয়ে ব্যাপার বুঝিয়ে দিলে। বহু দিনের পুরানো চাকর কি না, বাবুর ধাত জানে ! ডাক্তার কাউকে কিছু না বলে, সুশীল সুবোধ বালকটির মত খেয়ে উঠে গেলেন ! সারাদিন এম্নি পরিশ্রমের পর ডাক্তারের সুনিদ্রার অভাব হয়নি, এটা আমরা বেশ জানি !

* * * * *

পরদিন। ডাক্তার সবেমাত্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, হাসপাতাল হতে ফিরে এসেছেন। উপেন এসে খবর দিলে, তিনকড়ি ভট্‌চায্‌ দেখা করতে চায়, কারণ তার প্রেসক্রিপ সনখানা কোন ডিস্পেনসারিই রাখে নি !

ডাক্তার চটে উঠে বল্লেন "যেখানে পাক্‌, কিনে খেতে বল্‌ গে দিনে তিনবার—!"

* * * *

দিন দশ পরের কথা। ডাক্তার এসে নীচে বসেছেন বিকেল-বেলা ! ফোনের ডবল্‌ কনেক্‌শন্‌ করা হয়েছে আগের দিন, কারণ উপর নীচে ছুটোছুটী করা বড় কষ্ট-দায়ক। প্রথমেই ক্লাস-এসিষ্টাণ্ট সুধীর কার্ড পাঠালে ! ডাক্তার তাকে ডেকে বসিয়ে বল্লেন "কি খবর কি ?"

"নোটগুলি !"

"কেন, কাল যে বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম !"

"হাঁ পেয়েছি, কিন্তু ওটা আপনার একটা লেখা !"

"সে কি ?"

সুধীর পকেট হতে বের করলে, সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরিত, মগের 'মুলুক' ভ্রমণের ত্রয়োদশ পর্ব্বটি ! ডাক্তারের ত চক্ষুস্থির !

ফোন্‌ ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠ্‌লো !

"হালো ! কে আপনি ?"

"রামমোহন ! তুমি কে, ডাক্তার কি ? এ আবার কী রসিকতা করেছ ভাই ! কাল লেখা প্রেসে পাঠাতে গিয়ে দেখি, শুধু কতকগুলি অবোধ্য ও দুর্ব্বোধ্য ল্যাটিন কথা ছাড়া আর কিছু নেই।"

"ওঃ তাই, ওটা বড্ড ভুল হয়ে গেছে দাদা ! ক্লাসের নোটগুলি গেছে আপনার কাছে, আর আপনার ওটা গ্যাছে ক্লাস্‌-এসিষ্টাণ্টের কাছে, সে এখুনি এটা ফিরিয়ে এনেছে !"

"যাক্‌ ভালো, ভায়া বিয়ে করনি, তা না হলে যদি প্রেম-পত্রখানা আমার কাছে পাঠাতে, তাহলেই হাটে হাঁড়ি ভাঙতো !"

"ওই জন্যেই ত লক্ষীছাড়া হয়ে আছি দাদা !"

"যাক্‌, লোক পাঠাবো কি ?"

"হাঁ !"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি করে সুধীরকে পরদিন লেক্‌চারের জন্য কতকগুলি নোট লিখে দিয়ে বিদেয় কল্লেন !

আবার ক্রিং রিং ক্রিং রিং। এবার জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন !

তার পর একমুখ হাসি নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলে তিনকড়ি ভট্‌চায, এই বলতে বলতে, "এবার যা' অমোঘ ওষুধ দিয়েছেন ডাক্তারবাবু, তাতে আমাদের গাঁয়ের

হারাধন কোবরেজও হার মানে। এই দেখুন না কেমন সেরে উঠেছি! এত ভাল ওষুধ বলেই বেটারা ডিস্‌পিন-সারিতে রাখে না কি না, তাই হাঁকিয়ে দিলে। হঠাৎ যখন নজর পড়লো তখন দেখি, এ যে আদা কাঁচকলা! তখুনি বাজারে গিয়ে কিনে নিলুম। ডাক্তার বাবু, আজকাল বুঝি বিলেতে এ-সব ওষুধই চলছে!"

ডাক্তার তিনকড়ির একটি কথাও বুঝতে না পেরে বল্লেন "কী বোলছেন ভট্‌চায্‌ মশাই।"

ভটচায্‌ মশাই বল্লেন "আগের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটাই চলবে কি?"

ডাক্তার দেখতে চাইলে, তিনকড়ি সযত্নে তৈলাক্ত নামাবলীর কোণ হইতে এক-টুকরো ময়লা কাগজ খুলে ডাক্তারের সম্মুখে ধরল। তাতে লেখা আছে,

কাঁচকলা—আধসের

আদা—

To be taken thrice daily.

ডাক্তারের ত চক্ষুস্থির!

রিং রিং ক'রে সম্মুখের কলিংবেল্‌ বেজে উঠল! ডাক্তার অধীর হয়ে ডাকলেন "উপ্‌নে, ওরে উপ্‌নে, পাজি, শূয়ার, গাধা!"

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের দেওয়ান-চক্রবর্ত্তী বংশসম্ভূত। এই বংশ পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের দেওয়ানী করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার আত্ম-জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও তৎপুত্র রামরাম চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি অনুমান করেন; কারণ, তাঁহাদের কুলশাস্ত্রে সর্ব্বত্র ইঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইঁহাদের পরেও এই বংশের আরও অনেকে রাজবংশের দেওয়ানী করিয়া গিয়াছেন। স্বয়ং কার্ত্তিকেয়চন্দ্রও সেইরূপ কৃষ্ণনগর রাজ-বাটীর দেওয়ান ছিলেন, এবং এই কারণে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

দেওয়ান-চক্রবর্ত্তী-বংশ চিরকাল ধর্ম্মভীরু বংশ। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন —"ইঁহারা যদি ধর্ম্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের ন্যায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজেরাই কার্য্যতঃ রাজ্য-সম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া বরং আপনাদিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখনও রাজবাটীর অনেক বিষয় ইঁহাদের নামে বেনামী রহিয়াছে। সে সকল বিষয় ইঁহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন। প্রভুদিগকে মারিয়া আত্ম-পোষণ করা দূরে থাকুক, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের বিলক্ষণ সাংসারিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে। এই বংশের পূর্ব্ব কথা যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে বংশ-পরম্পরা ক্রমে ইঁহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় খাত-পূর্ত্তাদি খনন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দান প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মেই নিয়োগ করিয়াছেন।" দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় এই বংশের সুযোগ্য সন্তান ও অলঙ্কার ছিলেন। তিনিও সাধুতায় অগ্রগণ্য, ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্য-নিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন-পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় এই বংশের উমাকান্ত রায় মহাশয়ের পুত্র। সন ১২২৭ সালের কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির রাত্রিকালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যথারীতি পঞ্চম

বর্ষ বয়সে তাঁহার হাতেখড়ি হয় এবং তিনি পিতার নিকট বাঙ্গলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে তাঁহার পারশী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হয়। পারশী ভাষায় তিনি বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার দুই এক বৎসর পরে তিনি বিষয়-কর্ম্ম শিক্ষা লাভার্থ কৃষ্ণনগর জজ আদালতে রিটার্ণ নবীশের সেরেস্তায় শিক্ষানবীশ রূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের আদেশে আদালত-সমূহে পারশী দপ্তর রহিত হইয়া তৎস্থলে ইংরেজী ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র তখন ইংরেজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছু দিন পরে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ডাক্তারী পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কিন্তু ডাক্তারী পড়া তাঁহার অদৃষ্টে সহিল না।

আজকাল স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক-পত্রাদিতে প্রায়ই দেখা যায়, বাঙ্গালী জাতির হজমশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে—তাই দেশশুদ্ধ লোক অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে। শত বর্ষ পূর্ব্বে কিন্তু দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। তখনকার লোকরা আর যে রোগই ভোগ করুক অজীর্ণ রোগে যে ভুগিত না, তাহা ঠিক। তবে কলিকাতার অবস্থা সেই শত বর্ষ পূর্ব্বেও স্বতন্ত্র ছিল। এ সম্বন্ধে স্বয়ং দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"তৎকালে মফস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোণা লাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নির্ম্মিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মীর ঝোল পান করিতেন, এবং রাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, এ কারণ আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল; এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ সেবনে কোন উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পর দিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল।" কলিকাতার জলবায়ু তাঁহার ধাতে সহ্য না হওয়াতে তাঁহার ডাক্তারী পড়া হইল না।

কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া তিনি রাজবাটীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন, এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রাজবাটীতেই কাজ করিয়া গিয়াছেন—অন্য কোথাও যান নাই। রাজা শ্রীশচন্দ্র প্রথমে তাঁহাকে খাস সেক্রেটারীর (Private Secretary ?) পদে নিযুক্ত করেন। তৎসহ, অল্প দিন পরে, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কুমার সতীশচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে কুমার সতীশচন্দ্র এই কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কৃষ্ণনগর রাজ-ষ্টেটের মামলা-মোকদ্দমার তদ্বিরের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর রাজা শ্রীশচন্দ্র মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্রকে মাসিক অর্দ্ধশত টাকা বেতনে তাঁহার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে তাঁহার বংশানুক্রমিক দেওয়ানী পদ লাভ হইল। দেওয়ানী পাইয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ষ্টেটের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে ষ্টেটের যেমন যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, তাঁহার বেতনও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১২৮১ সালে দেখা যায়, তিনি মাসিক ২৫০ টাকা বেতন পাইতেছিলেন। এই বেতন পরে আরও বর্দ্ধিত হইয়া ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বংশ বরাবরই কৃষ্ণনগরের রাজ-বংশের এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানভাজন ছিলেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র হইতে এই বংশের সম্মান আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী বংশ বৈবাহিক সূত্রে রাজশাহী হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনগণকে আনিয়া কৃষ্ণনগরে এবং তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে স্থাপন পূর্ব্বক ঐ অঞ্চলে বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনদিগের একটি নূতন দল প্রতিষ্ঠিত করিয়া "মত কর্ত্তা"র বংশ নামে অতিরিক্ত সম্মান লাভ করিয়া-ছিলেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রে এই সম্মান চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী,—প্রিয়ভাষী, সদালাপী, সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী এবং রাজবংশের প্রকৃত হিতকামী ছিলেন। তিনি তেজস্বী ও নির্ভীক পুরুষ। তিনি স্বয়ং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন—কাহারও অন্যায়াচরণ আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না; এমন কি, রাজাও অন্যায় করিলে তিনি দৃঢ়তা সহকারে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন-কথায় আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণনগরের নৈতিক আবহাওয়া তৎকালে অত্যন্ত দূষিত ছিল। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের চরিত্রবল অসাধারণ ছিল—এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াও তিনি আপনাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিয়া-ছিলেন—কোন প্রলোভনই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজবংশের তিনি এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে, অন্যত্র উচ্চতর সম্মান ও অধিকতর বেতনের প্রলোভনও তিনি অম্লানবদনে সংবরণ করিয়াছিলেন। রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর যেমন মহারাণী স্বর্ণময়ীর বিষয় সম্পত্তি যক্ষের ধনের ন্যায় আগলাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, কৃষ্ণনগরের রাজবংশের বিষয়-সম্পত্তি সেইরূপ দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বংশ এবং বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্র

রায় মহাশয় রক্ষা করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র জনসাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে কম শ্রদ্ধা করিতেন না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিভার্স টমসন যখন কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করিতে আসেন, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র তখন রোগশয্যাশায়ী। ছোটলাট রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার ভবনে গমন করেন এবং রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "দেখুন, আপনার জমিদারী এই দেওয়ানের হস্তে আছে, ইহা আপনার পরম সৌভাগ্য জানিবেন। আমি আশা করি, ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, আপনার পিতা এবং পিতামহের ন্যায় আপনিও ইঁহাকে সম্মান করিবেন।" লাটসাহেব কার্ত্তিকেয়চন্দ্রকে কিরূপ অসাধারণ শ্রদ্ধা করিতেন, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কিন্তু হায়, রাজকুমার কার্ত্তিকেয়চন্দ্রকে সম্মান করিয়া চলিবার অবসর বেশী দিন পান নাই; কারণ, ঐ বৎসর ২রা অক্টোবর শুক্রবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন।

বস্তুতঃ কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে অনেক সময়ে তাঁহাকে কঠোরভাবে কার্য্য করিতে হইত। ইহাতে তিনি অনেকের বিরাগ উৎপাদন করিতে বাধ্য হইতেন—কেহ কেহ গোপনে তাঁহার শত্রুতা সাধনেও প্রয়াস পাইত। কিন্তু শত্রুমিত্রের বিরাগ বা অনুরাগে অবিচলিত থাকিয়া তিনি কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতেন—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা গুণে তিনি শত্রুমিত্র সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

একদা গবর্ণমেণ্ট নদীয়া জেলার প্রায় সমস্ত লাখেরাজ ভূমির লাখেরাজ স্বত্ব রহিত করিয়া অত্যধিক হারে কর নির্দ্ধারণ করেন। লাখেরাজভূমির অধিকারীরা তখন সরকারের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন। স্থির হয় যে, তাঁহারা লাখেরাজ ভূমির নির্দ্ধারিত বাৎসরিক খাজনার অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্টকে দিবেন এবং অর্দ্ধাংশ নিজেরা লইবেন। কিন্তু নির্দ্ধারিত করের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় কার্য্যতঃ সরকারের প্রাপ্য সরকারকে দিয়া তাঁহাদের হাতে বড় কিছু থাকিত না। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট কিছু খাজনা রেহাই দেন। ইহাতে লাখেরাজদারগণ পূর্ব্বপ্রদত্ত কর হইতে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা ফেরত পান।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র "ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত" নামে যে উপাদেয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নামে নদীয়ার রাজবংশের ইতিহাস হইলেও তাহাকে বঙ্গদেশের আংশিক প্রামাণ্য ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সেইরূপ তাঁহার "আত্মজীবন-চরিত" খানি তৎকালীন বঙ্গের সামাজিক দর্পণ-স্বরূপ। এই বইখানিতে রায় মহাশয় সেকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তৎকালীন তরুণ বঙ্গ কিরূপে অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এ দেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে, আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন। হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখন কখনও তাঁহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম।"

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র দেখিতে অতি সুপুরুষ এবং মধুরকণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন। তিনি "গীতমঞ্জরী" নামে একখানি গ্রন্থ এবং কতকগুলি সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন।

'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা সুকবি ও সাহিত্যরথী পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের সাত পুত্রের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন; তিনি 'পতাকার' সম্পাদক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও সাহিত্য-রসিক। তিনি ভাগলপুরের উকিল। দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবেত্তা শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের পরিচয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণকে দিতে হইবে না।

অগ্নিগর্ভ মাঞ্চুরিয়া

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাঞ্চুরিয়ার বৈদেশিক সম্পর্কের কথার কিছু কিছু আলোচনা না করলে, মাঞ্চুরিয়ার নূতন রাজ্য-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পুরোপুরি বোঝা যাবে না। ১৯০৪ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়ায় প্রধানতঃ জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ চলে আসছিলো। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতির নাম মধ্যে মধ্যে সেখানে শোনা গেলেও তারা তখনও সেখানে বিশেষ ভাবে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। কাজেই বলা যেতে পারে ১৯০৪ সালের পর থেকে, অর্থাৎ রুশ-জাপানের লড়াইয়ের পরই আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে মাঞ্চুরিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এই প্রবন্ধে তাই ১৯০৪ সালের পর থেকে মাঞ্চুরিয়া যে বৈদেশিক সম্পর্কে জড়িত, তাই সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করবো।

রুশ-জাপানের লড়াইয়ের ফলে রাশিয়ার মূর্ত্তি ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এলো। নিজেদের সমস্যা নিয়েই রাশিয়াকে এমনি বিব্রত হয়ে পড়তে হল যে মাঞ্চুরিয়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সজাগ রাখবার সময় তার রইলো না। যে দেশ-গুলির সঙ্গে শত্রুতা চলে আসছিলো, সেইগুলির সঙ্গে

শেজী হ্রদের তীরে অবস্থিত হোটেল থেকে ফুজী'র দৃশ্য

টোকিয়োর আধুনিক অট্টালিকাশ্রেণী

তাকে আপোষের ব্যবস্থা করতে হল। ১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে রাশিয়া গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পারস্য, আফগানিস্থান এবং তিব্বত সম্বন্ধে আপোষ করে। ১৯০৭ সালে এবং ১৯১০ সালে রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে পর পর দুটী চুক্তি হয়।

রেলপথের কার্য্য পরিচালনার ভার জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণির হস্তে প্রদান করা হোক।

কিন্তু রাশিয়া এবং জাপান এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নি। এই ব্যাপারে তাদের মৈত্রী-বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। এর

জাপানের বৃহত্তম জাহাজ

১৯০৯ সালে আমেরিকান ধনী হারিম্যান পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক বিরাট রেলপথ নির্ম্মাণের কল্পনা করেন।

নিচিরেণ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধ নিচিরণের জন্ম-তিথিতে ইকেগামীর মন্দির—বাহিরে সমবেত নরনারী

সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট মিষ্টার নক্স এই পরিকল্পনা সমর্থন করে বলেন যে সমান স্বার্থ সৃষ্টির জন্ম মাঞ্চুরিয়ার
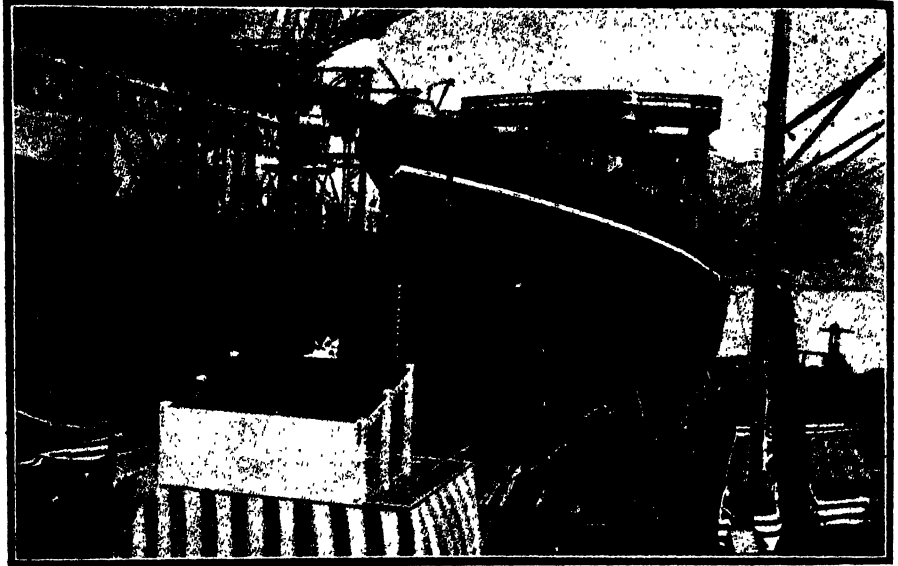
কিছুকাল পরে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হোল। জাপান এই সময় রাশিয়াকে অস্ত্রাদি সাহায্য করলে। ফলে ১৯১৯ সালে রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে আর একটী চুক্তি হোল। এই চুক্তিতে রাশিয়া স্বীকার করলে জাপানের বিরুদ্ধে যদি কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা হয় রাশিয়া তা সমর্থন করবে না এবং রাশিয়া সম্বন্ধেও জাপান এই নীতি অবলম্বন করবে।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বিদ্রোহ বাধল। সেই বৎসরই নভেম্বর মাসে সেখানে জনগণের শাসনতন্ত্র—বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ফলে ১৯১৮ সালে অন্যান্য জাতির পরামর্শ অনুসারে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলে। ১৯২৫ সালের পর

থেকে এই দুই দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ না বাধবার কারণ, মাঞ্চুরিয়া থেকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাঁচা মাল জাপানে চালান হয়, কিন্তু রাশিয়া নিজেই যথেষ্ট কাঁচা মাল উৎপাদন করে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ না বাধাই স্বাভাবিক।

প্রথম প্রথম জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। পরে আমেরিকা মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বিশেষ প্রতিপত্তি স্বীকার করে নেয়। এই কারণেই ৯১৫ সালের চীন-জাপানের সন্ধিতে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ পরিচালনার ভার আরও ৯৯ বৎসরের জন্য জাপানের হস্তে প্রদান করা হলেও আমেরিকা তাতে আপত্তি করে নি। একেবারে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে করে নি বলতে পারি না,—এমনি করে মাঞ্চুরিয়ায় ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়।

১৯২৪ সালে জাতীয় শাসনতন্ত্রই সমগ্র চীনের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করছিলো। এই সময় আমেরিকা চীনের প্রতি বিশেষ ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বৎসরে চীনের রাজনৈতিক অবস্থা যে আকার ধারণ করলো, তা'তে আমেরিকার সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ রইলো না, চীনাদের শাসন-দক্ষতায় আমেরিকা সন্দেহ করতে লাগলো। আমেরিকা উপলব্ধি

টোকিয়ো উপসাগরে বাণিজ্য তরী
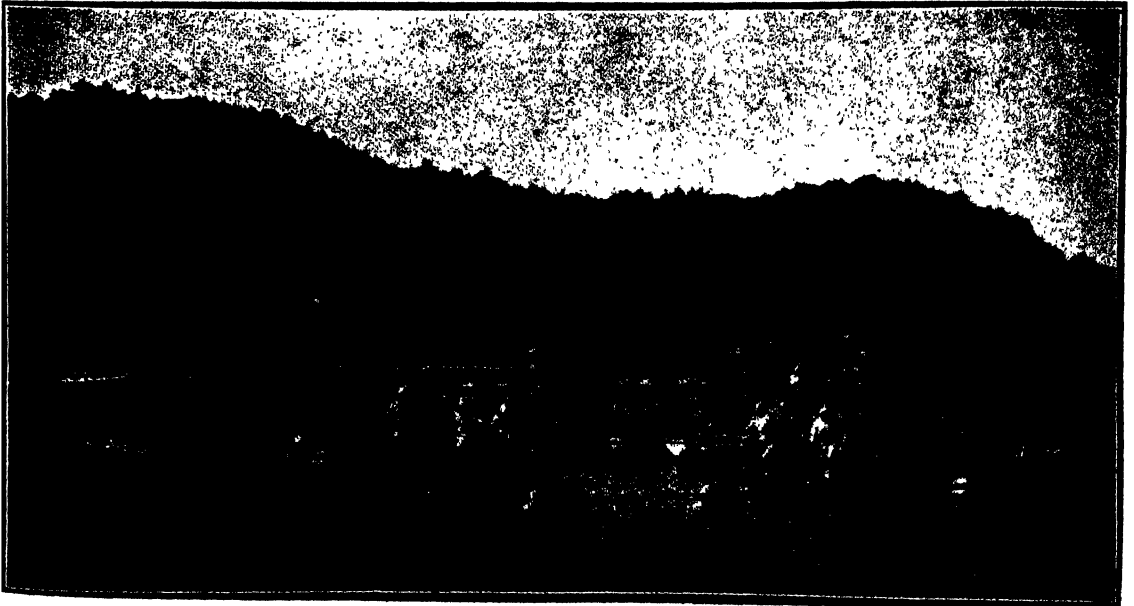
কোকিচো মিকিমিতোর ডুবুরী-দল মুক্তার সন্ধান করচে

করলো যে জাপানের সহযোগিতা ভিন্ন চীনে মহাজনী করা কঠিন। ফলে মাঞ্চুরিয়ায় আমেরিকা এক কোটী ডলারের অধিক নিয়োগ করতে সাহস করে নি।

গ্রেট বৃটেনের সঙ্গেও জাপানের সম্পর্ক দশ বৎসর

কাওয়া গুচি হ্রদ

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠই ছিল। তার পর ধীরে ধীরে গ্রেট বৃটেনের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েচে এবং হচ্চে।

নিক্কোর নিসর্গ-শোভা

গ্রেট বৃটেন মাঞ্চুরিয়ায় প্রায় ছয় কোটী টাকা ঢেলেচে এবং এর প্রায় সমস্তটাই পিকিং-মুকদেন রেলপথের জন্যে। বৃটেন এখানে যে অর্থ নিয়োগ করেচে সেগুলি যতদিন নিরাপদ থাকবে, যতদিন মাঞ্চুরিয়ার আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হবে না, ততদিন উভয় দেশের সম্পর্ক তিক্ত হবে না বলেই মনে হয়।

ফ্রান্সও চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথের জন্য বহু টাকা নিয়োগ করেচে। কিন্তু এই টাকা সে নিয়োগ করেচে রাশিয়ার হাত দিয়ে, সুতরাং ফ্রান্সের দাবী খুব প্রবল নয়। তবুও মাঞ্চুরিয়ার ঘটনা-ধারার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে সে বিস্মৃত হয় নি।

এই কথাগুলির উল্লেখ করলাম, কারণ, এ থেকে বোঝা যাবে মাঞ্চুরিয়ার প্রতি একাধিক জাতির লুব্ধ দৃষ্টিপাতের কারণ কোথায়। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে মাঞ্চুরিয়ার সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভের কারণও বোধ করি এইগুলি।

এদের মধ্যে জাপানের দাবী এবং অধিকার যে আর সকলের চেয়ে বেশী, এ কথা বোধ হয় না বললেও চলবে।

অনেকে মনে করেন যে রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার পর থেকেই জাপান মাঞ্চুরিয়ায় তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করেচে। কিন্তু এ রকম ধারণা পোষণ করা বোধ হয় ঠিক হবে না। বস্তুতঃ মাঞ্চুরিয়ায়

জাপানের অধিকার একদিনে বিস্তার লাভ করে নি, ক্রমে ক্রমে করেচে। মহাযুদ্ধের সময় তার অধিকার আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রমাণ ১৯১৫ সালের সিনো-জাপানী সন্ধি, মাঞ্চুরিয়ার পাঁচটী রেলপথ নির্ম্মাণ-সম্পর্কে ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে চীন এবং জাপানের মধ্যে পত্র-বিনিময়, এবং ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার চারিটী রেলপথ নির্ম্মাণ সম্পর্কে জাপানের সঙ্গে চীনের চুক্তি। ১৯১৫ সালের সিনো-জাপানী সন্ধির ফলে জাপান বহু নতুন অধিকার পায় এবং বহু অধিকারের আয়ুকাল নেয় বাড়িয়ে। উদাহরণ

কারাফুটোর নদীতীরে অগণ্য সীল রৌদ্র-সেবা করচে

কারাফুতোর কাগজের কল

স্বরূপ বলা যায় যে এই চুক্তির ফলেই পোর্ট আর্থার ও ডেরেণের লীজ্ এবং দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও আণ্টং-মুকদেন রেলপথের অধিকার-কাল জাপান বাড়িয়ে নেয়।

অনেক বিদেশী সমালোচক বলে থাকেন যে জাপান প্রায় কুড়ি বৎসর আগে মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করে নি। এ থেকে
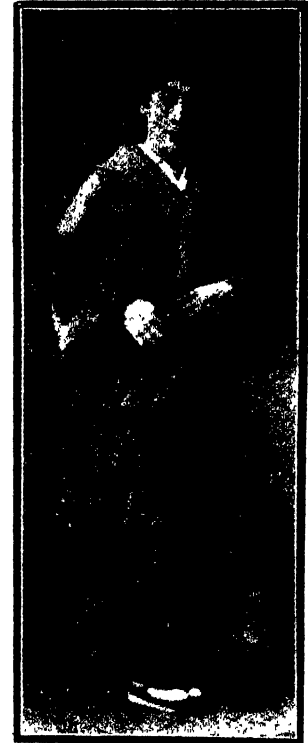
টোকিয়োর ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী রিৎযু-কো-মোরি

বোঝা যায় যে মাঞ্চুরিয়ায় জাপান যে কার্য্যনীতি অনুসরণ করচে তা ব্যর্থ হয়েচে। ভবিষ্যতে জাপান মাঞ্চুরিয়ার কাছ থেকে মোটা লাভ প্রত্যাশা করতে পারে না।

কিন্তু এ রকম ভবিষ্যদ্বাণী করবার সময় বোধ হয় এখনও আসে নি। একটা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনের পক্ষে কুড়ি বৎসর এমন কি পর্য্যাপ্ত সময়?

এবার চীনের সঙ্গে জাপানের মাঞ্চুরিয়া নিয়ে কেন এত গোলযোগ বেধেচে তা দু চার কথায় বলবার চেষ্টা করবো।

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের একটা বড় অভিযোগ এই

রূপ-সজ্জাকালে মিস্ মোরি

যে বিভিন্ন রেলপথ নির্ম্মাণ-সম্পর্কে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল চীন তা যথাযথ ভাবে পালন করে নি।

সাইবিরিয়ান হরিণ—এরাই কারাফুতোর ভারবাহী পশুর কাজ করে

১৯০৭ সালে কাউলুন ক্যান্টন রেলপথ নির্ম্মাণ সম্পর্কে যে এংলো-চাইনিজ চুক্তি হয় তাতে বলা হয়েচে :

চীন-সরকার এমন কোন রেলপথ নির্ম্মাণ করিবেন না যাহা প্রতিযোগিতায় ইহার ক্ষতি করিতে পারে।

সাংহাই-নানকিন্ রেলপথ-ঋণসম্পর্কে গ্রেট বৃটেন এবং চীনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে প্রকাশ :

ডায়রেক্টার জেনারেল এবং বৃটিশ ও চাইনিজ কর্পোরেশনের লিখিত সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত সাংহাই-নানকিন রেলপথের প্রতিযোগী কোন রেলপথ নির্ম্মাণ করা চলবে না।

এই রেলপথগুলির জন্য যে অর্থ নিয়োগ করা হয়েচে সে-গুলি সম্বন্ধে যাতে আশঙ্কার কোন কারণ না ঘটে সেইজন্যই সাবধানতামূলক এই সব ব্যবস্থা। কিন্তু জাপানের মতে চীন এই সকল সর্ত্ত যথাযথ ভাবে পালন করে নি। ১৯২৭ সালে চীন তাহুশান থেকে পাইন্তালাই পর্য্যন্ত ১৫৬ মাইল দীর্ঘ এক রেলপথ এবং মুকদেন থেকে হেইলং পর্য্যন্ত ১৪৭ মাইল দীর্ঘ আর একটী রেলপথ নির্ম্মাণ করে। ১৯২৯ সালে হেলং থেকে কিরিণ পর্য্যন্ত ১২৭ মাইলব্যাপী আর একটী রেলপথ নির্ম্মাণ করে চীন দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথকে উভয় পার্শ্ব থেকে আক্রমণ করল। জাপান এই রেলপথগুলি সম্বন্ধে চীনের সঙ্গে একটা রফা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু মার্শাল চ্যাং সুয়েনিয়াং এই প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নি। এতে জাপান যদি চীনের প্রতি প্রসন্ন হতে না পেরে থাকে তা হলে জাপানকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না।

এ সব ছাড়া চীন না কি আরও এমন অপরাধ করেচে যা' জাপানের মত সাম্রাজ্যবাদী জাতির পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ জাপান বলে টাওনান্—সিসুপিংকাই রেলপথ থেকে যথেষ্ট আয় হওয়া সত্বেও চীন না কি জাপানের ঋণের টাকার সুদ বা আসল কিছুই

ভাল করে মেটায় নি। কোন কোন রেলপথ নির্ম্মাণের সময় চীন ও জাপানের মধ্যে এইরূপ চুক্তি হয়েছিল যে সেগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার জন্য জাপানের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, কিন্তু সে চুক্তিও না কি চীন সকল ক্ষেত্রে প্রতিপালন করে নি।

১৯১৫ সালে চীন ও জাপানের মধ্যে যে সন্ধি হয় তার তৃতীয় ধারাটী এইরূপ :

জাপানের প্রজাগণ দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় স্বাধীনভাবে বাস করিতে ও ভ্রমণ করিতে পারিবে, তাহদের যে-কোন প্রকার ব্যবসায় করিবার এবং পণ্য উৎপাদনের অধিকার থাকিবে।

কিন্তু এ সর্ত্তও চীন বহুবার উপেক্ষা করেচে। বহু জাপানী ও কোরিয়ানকে চীনের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিশেষ স্থান থেকে সরিয়ে দিয়েচেন। এই জন্যে চীনের কর্ত্তৃপক্ষ না কি গোপনে বহু-সংখ্যক আদেশ প্রচার করেছিলেন ; এবং যারা এ আদেশ পালন করে নি তাদের কাউকে মৃত্যু-ভয় দেখিয়ে আদেশ পালন করতে সম্মত করা হয়েছিল।

চিনি দিয়ে তৈরী উদ্যান-বাটিকা। জাপানের প্রসিদ্ধ কন্‌ফেকশনার নাওকিচি হামিকুরা লণ্ডন প্রদর্শনীতে এইটী দেখিয়ে স্বর্ণপদক ও রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রফি পেয়েচে। ছবির কোণে—উপর দিকে তাঁর ছবি

১৯৩১ সালে ফেংটিন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা চীনাদের প্রতি এক আদেশ প্রচার করে জানিয়েছিলেন যে তারা যেন জাপানীদের ঘর-বাড়ী ভাড়া না দেয় এবং যে সব জমি তারা লীজ নিয়েচে সেগুলির জন্যে তাদের যেন নতুন করে লীজ না দেওয়া হয়।

কিরিন্ প্রদেশের তান্‌হুয়া প্রদেশে "নিশি গাওয়া রিয়োকান্' নামে একটী সরাইখানা ছিল। ১৯২৯ সালে চীন-কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে এই সরাইখানাটী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই প্রদেশেরই নাঙ্গান সহরে জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল সাত শ' পঞ্চাশ। চীন-কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের ফলে ক্রমে জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা হ্রাস হয়ে ছাপ্পান্নয় দাঁড়ায়।

এ ছাড়া কোরিয়ানদের উপরেও চীন যথেষ্ট অত্যাচার করেচে বলে শোনা যায়। মার্শাল চ্যাং সুয়েলিয়াংএর আধিপত্যকালে এই অত্যাচার চরম সীমায় উঠেছিল।

কোরিয়ানদের প্রতি মার্শাল চ্যাং-এর অত্যাচারের করুণ কাহিনী বারান্তরে বলবো।
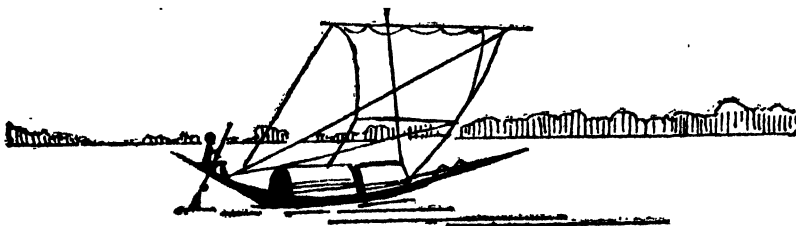
পুরুষের ব্যথা

শ্রীপুষ্পদেবী

দেশ জুড়ে আজ মহা কলরব নারীর দুঃখ শুনি ;
আমি গৃহ-কোণে বসে একমনে পুরুষের দুখ গুণি।

গৃহে গৃহে যত নারী-লাঞ্ছনা সকলি নারীর দোষে
বধূ লাঞ্ছনা শ্বশুরে করে না—ঘটে শাশুড়ীর রোষে।

ননদেই দেয় বহু যন্ত্রণা—দেবরে দেয় না কভু ;
যতই বল না পুরুষে কর্ত্তা—নারীই গৃহের প্রভু।

শ্বশুরের স্নেহে স্বামীর যতনে বধূর হৃদয় ভরা ;
দেবরের মধু নিরমল স্নেহে বুকখানি আলোকরা।

যতটুকু গৃহে রহে গো শান্তি সে শুধু এদেরি তরে ;
তবু মিছে দাও ইহাদের দোষ, আর এরা কিবা করে।

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি অর্থের তরে খাটে ;
সারা দিন ভোর কেটে যায় তার রাস্তায় পথে ঘাটে।

ক্লান্ত অবশ তনুখানি তার, শ্রান্ত যখন মন,
চাহিছে পরাণ রমণী হিয়ার স্নেহ-সুধা পরশন।

বাহিরের শত জ্বালায় জ্বলিয়া গৃহপানে মন ধায় ;
প্রিয়ার মুখের মধুর হাসিতে সকলি ভুলিতে চায়।

গৃহেতে আসিলে জননী কহেন বধূর জ্বালায় যাই ;
বধূ কয়, চলি পিতার আলয়ে, এ সুখেতে কাজ নাই।

সারাদিন ধরে যখন যা করি, কিছুতেই নাই খুসী ;
জীবন তো যায়, জানি না কি করে মায়েরে তোমার তুষি।

জননী কহেন, ধন্য বউমা, ছেলেরে করেছ পর ;
তার চেয়ে বল পারিব না আমি করিতে শ্বশুর-ঘর।

আবার ছেলের বিয়ে দিব আমি, তুই কি করিবি মোর !
দিনে দিনে বড় বেড়েছে সাহস, ভাঙ্গিব গুমর তোর।

বধূ কয় কেঁদে, এত দুখ দেছ, এতেও মেটে নি সাধ ;
এনেছিলে তুমি নিজেই এ গৃহে সে কি মোর অপরাধ ?

স্বামীর নিকট গিয়া বলে, আজ তুমিই বিচার কর ;
আরো সহিবার চেয়ে বল 'আজ বিষ খেয়ে তুমি মর'।

পুরুষ তখন শিরে কর হানি আপন মরণ চায় ;
কাহারে তুষিতে কে পুনঃ রুষিবে তাহাও ভেবে না পায়।

এত গেল শুধু মান-অভিমান, অর্থেরও বেলা তাই ;
যত এনে দেয়, কেহ খুসী নয়,—চারিধারে নাই নাই।

পিতামাতা ভাবে—আনে যত টাকা উড়ায় সবই বধূ ;
বধূ ভাবে, সবি বাপ মায়ে দেয়—দাসী বাঁদি সেই শুধু।

যে ধারেতে যায় সে ধারেই জ্বালা কণাটুকু সুখ নাই
রমণীর দুখ পুরুষের দোষে—কি করে' বুঝে না পাই।
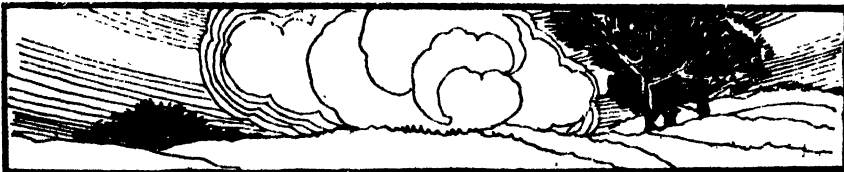
শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯

এত বড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকি রহিলনা, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্ত্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্য্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিলনা। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। সহরে এত অল্প মূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবেনা ভয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের কত ভাড়া বাকি পড়িয়া আছে এবং, কত ভাবেই না এই গৃহ-স্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলা-বলি করচে মা?

—কি কথা সারদা?

—ওরা বলচে আজই এ-বাড়ী থেকে আপনি চলে যাবেন।

—ওরা সত্যি কথাই বলেচে সারদা।

—সত্যি কথা? সত্যিই চলে যাবেন আপনি?

—সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে যে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচেনা মা, ভাব্‌চে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে। আমিও ভাবতে পারিনে মা বিনা-মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে-কোথায় ভেসে যাবো। তবু, ওরা যা জানেনা আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ-বাড়ী আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে সে আর সইছেনা, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারেনা।

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারেনা সারদা? এ-বাড়ী আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বৎসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বৎসর ভুল করতে হবে এ আমি আর মানবোনা—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার তো কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে তো তোমাকে সহজে খুঁজে পাবেনা মা।

সারদা নত-মুখে কহিল, না মা তিনি আর আসবেননা।

—এমন কথনো হয়না সারদা,—সে আসবেই।

—না মা আসবেননা। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেননা, কিন্তু অতি-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়-ঘরের মেয়ে, বড়-ঘরের বৌ,—কোথাও একলা যাওয়া চলেনা, সঙ্গে দাসী একজন চাই,—আমি আপন সেই দাসী মা।

—কি ক'রে জানলে সারদা আমি বড়-ঘরের মেয়ে, বড়-ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ কথা

আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, লেখা আছে আপনার সর্ব্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন,—এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলোনা সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্চেন। বড়-ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারও থাকে মা?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারেনা সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়। সে হলে এ ছলনা কোনদিন-না-কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারেনা সে শুধু এই জন্যেই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালোবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই, জল্পনা করা দূরে থাক, ও-কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জ্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

—কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

—উপায় যদি না থাকে আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড় ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা, তুমিও তেমন-ঘর থেকে আসোনি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিইবা দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তাহলে দাসীর কাজ করবোনা, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবেনা মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেনা কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পাননা। তাহার পরে সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক-কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে ঘুচিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিঘ্ন আশ্রয় ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়ত আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামী-গৃহ-বাসের বহু স্মৃতি মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবন-যাত্রার ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবেনা। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ-আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হোক সে-আশ্রয় বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য-হাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অহরহঃ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্ব্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পাণ ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে,—তাহার লালসা-লিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যা-পার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

—মা?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা? সত্যি সত্যিই আজ চলে যাবেননা ত?

—আজ নাহলেও একদিন ত যেতে হবে।

—কেন যেতে হবে ? এ বাড়ীত আপনার।

—না আমার নয় রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেননা যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল কারণ হিন্দু নারীর কানে ইহা বাজিবেই। এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা ত সবাই জানি এ বাড়ী তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বত্ব আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল শুধু মৌখিক ? লেখা-পড়া হয়নি ? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা ?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন যাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন এখন রাগের ওপর যদি তিনি অস্বীকার করেন ?

সবিতা অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবোনা। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়ীটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয়না ? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিলনা বলেই ত বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে, এত বড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতোনা। কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেননা—এমন কি জোরে সম্ভব হয় মা ? বোধহয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড়ো নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তাতে ত কোন গোলযোগ ঘটবেনা মা ?

সবিতা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগ ঘটায় সাধ্য কার !

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিলনা। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে সে সম্বরণ করিল ; তখন কি তিনি বলিলেন কি তিনি করিলেন এই সকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। সারদায় বিস্ময়ের সীমা নাই,—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজি !

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন—কে মহাদেব ?

দরওয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ী আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখালরাজ বাবু আছেন তিনি কখনো রাগ করবেননা।

কেহ সঙ্গে যায় এ ইচ্ছা সবিতার ছিলনা, বলিলেন রাগ হয়ত কেউ করবেনা, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা ? সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশি সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার,—প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নেবো। এই

বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি রকম মনে হয় সারদা? জম্‌কালো ধরণের মস্ত মানুষ,—না?

সারদা বলিল, না মা তা মনে হয়না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্চেনা।

—কেন হচ্চেনা সারদা?

—হচ্চেনা বোধহয় এই জন্যে মা, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে মনে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচিনে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয় একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব,—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়,—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গৌর বর্ণ দীর্ঘ দেহ পূজায়, উপবাসে, আচারে নিয়মে শীর্ণ,—এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

—না মা হয়না। আপনার হয়?

—না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ অপছন্দর জিনিস নয়, তাঁকে নির্ব্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হলো শাস্ত্রের বিধি মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই করে যারা সত্যি করে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জ্বেলে জীবনের পথ হাৎড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার যাত্রায় স্বামীর রূপ যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দুদিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলনা, বুঝিল এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ায় আতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জ্জনা ভিক্ষা। ইচ্ছা হইলনা প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বেদনা বাড়ায় কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলনা, বলিল, একটা কথা ভারি জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাওনা,—এই ত? আর লজ্জা বাড়বেনা সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেসা করো।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচেনা। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়ত জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেক দিন অনেক রকমে ভেবে দেখেচি কিন্তু আমার গত-জীবনের কর্ম্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্ম্ম-ফল মানে তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিলনা, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক জন্মের অজানা কর্ম্ম-ফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ জন্মের ভাঙা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলক-ধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেছে বলো ত? যে-লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড়ো মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি তবু, তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি কোরে?

এবার সারদা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালো-বাসেননি মা?

—না মা, সেদিনেও না,—কোন দিনই না।

—তবু পদস্খলন হলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই ত দেখলুম, আজ হয়ত সর্ব্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে চেয়ে দুচোখ জলে ভেসে গেছে,—ভেবেই পায়নি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে! দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্য-ময় সংসারে বিনা দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের পরে! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এম্‌নিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিলনা, মাথা নাড়িয়া বাঁধা-

রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তর অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিলনা এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা ?

সবিতা উত্তর দিলেননা, আর তাহাকে বুঝাইবারও চেষ্টা করিলেননা, শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাহিরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ী আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ী কালকের মতো অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ীর সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়া য়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিলেননা, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারম্বার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণে দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়ত এ-অশ্রুর কোন মর্য্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইলনা, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

সোমরস

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

অম্বুজাক্ষ সরকার কল্‌কাতার কোনো প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কে কাজ করেন। ব্যাঙ্ক প্রসিদ্ধ হ'লেও বেতনের তেমন প্রসিদ্ধি নেই। শ্যামবাজার অঞ্চলে ছোট একটি গলির মধ্যে খান দুই ছোট ছোট ঘর ভাড়া ক'রে সস্ত্রীক অম্বুজাক্ষ বাস করেন। অতি কষ্টে তাঁ'র সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

এই গল্পের যেখানে প্রারম্ভ, সেখানে একদিন অম্বুজাক্ষকে দেখা গেল রাস্তায়—বেলা সাড়ে ন'টার সময় বাজারে চলেছেন। হাতে একটি ছোট থ'লে, পায়ে শতছিন্ন মলিন একযোড়া স্যাণ্ডাল, গায়ে কোঁচার টেপ্ এবং দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সহরে বেশ বর্ষা নেমেছে। কিছুক্ষণ আগে খুব জোর এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, রাস্তা পিছল এবং স্থানে স্থানে চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডগুলি অতি মারাত্মকভাবে আত্মগোপন ক'রে আছে। অম্বুজাক্ষ কোনো দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে হন্‌-হন্ ক'রে বাজারের দিকে চলেছেন—পাথরখানার উপর যেমন অন্য-মনস্ক ভাবে পা ফেলেছেন, অমনি খানিকটা কাদা আর জল ছিটুকে এসে তাঁর কাপড়ে লাগ্‌ল। কিন্তু এতে অম্বুজাক্ষের গতিরোধ হল না। আপন মনেই বল্‌তে বল্‌তে চল্‌লেন, 'যত হতভাগা এক জায়গায় জুটেছে রে—ভাগ্যিস্ জামাটা প'রে আসি নি !'

হঠাৎ সম্মুখে তাকিয়ে একটু চম্‌কে উঠে অম্বুজাক্ষ যেন কিছুই দেখেন নি এমনিভাবে আগিয়ে চলেছেন, এমন সময় পিছন থেকে ডাক শুন্‌লেন, 'ও অম্বুজ, আরে দাঁড়াও ভাই, আমিও যাচ্ছি বাজারে।'

'আরে কে—নিতাই যে! বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে ভাই, একটু পা চালিয়ে এস !'

নিতাই তাড়াতাড়ি অম্বুজাক্ষের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং তার পর দু'জনে বাজারের দিকে চল্‌তে লাগ্‌লেন।

'তার পর, কি খবর ? সন্ধ্যের দিকে দেখাসাক্ষাৎ নেই কেন ?'

'আর বলো কেন ভাই, দুর্গতির চরম আরম্ভ হ'য়েছে। গিন্নী বিছানা নিয়েছেন আজ প্রায় দেড় মাস হ'ল। দু'টো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে, এই বাজার, এই আপিস্, এই রান্না, এই ডাক্তারখানা—প্রাণান্ত হ'ল।'

'বলো কি হে ? কি অসুখ হ'য়েছে ?'

'অসুখ আর কি ? জ্বর—জ্বর নিয়েই ত গেলাম কি

না! রেমিটেণ্ট টাইপ্—ডাক্তার এখনো কিছু বলে নি—দেখা যাক্ কি হয়!'

'তাহ'লে ত বড় মুস্কিলে পড়েছ অম্বুজাক্ষ, এ রকম ক'রে ত পেরে উঠ্‌বে না। কিছু দিনের জন্যে না হয় একটা ঠাকুর-টাকুর রাখো।'

'রাখ্‌তে আর কা'র অসাধ রে ভাই, ক্ষমতায় কুলোয় না যে। নাও, নাও বাজার ক'রে নাও—মোটেই দেরী নেই আর—সময় হ'য়ে গেছে।'

বাজারের লোকারণ্যের মধ্যে নিতাই আর অম্বুজাক্ষ মিশিয়ে গেলেন।

অম্বুজাক্ষ যে বাড়ীতে থাকেন, সে বাড়ীটি বড় হ'লেও, তাঁর নির্দ্দিষ্ট ঘর দু'টি খুবই ছোট। একটিকে শয়ন এবং বিশ্রাম-ঘর ক'রে অন্যটিকে রান্না এবং ভাঁড়ার ঘর করতে হ'য়েছে। বাড়ীটির বাকী ঘরগুলিতে অন্য ভাড়াটেরা থাকেন। কাপড়-মেলার জায়গা, পায়খানা এবং কল পৃথক্ নয়। কাজেই বাড়ীখানিতে একটা নিত্য হৈ-চৈ, আত্মসংরক্ষণের অতি-সতর্ক নিত্যকার চেষ্টা—এ সব আছেই। এরই মধ্যে অম্বুজাক্ষ সস্ত্রীক বিরল-অবকাশ ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে দিনের পর দিন যাপন করেন।

বাড়ীটিতে বাহিরে যাতায়াতের রাস্তা একটি মাত্র। অনেকগুলি লোক একই সঙ্গে বাজার ক'রে একই রাস্তা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করছেন। সব শেষে অম্বুজাক্ষকে দেখা গেল। রান্নাঘরের সম্মুখের চটের পর্দ্দাটি হাত দিয়ে সরিয়ে 'এই নাও বাজার—তুমি আবার ভাত নামাতে গেলে কেন?'—ব'লে অম্বুজাক্ষ কলের ঘর অধিকার করবার চেষ্টায় ধাবিত হ'লেন।

'আ মরণ! বলে, ভাত নামালে কেন? ভাত যেন উনিই নামাচ্ছেন চিরটা কাল! বলি, পিণ্ডি দেয় কে রেঁধে? একচোখো কোথাকার—!'—ব'লে গৃহিণী শ্রীমতী উমাশশী রান্নাঘরের দেওয়ালের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

বাজারের থলেটিকে মেঝেয় ঢেলে তরকারি কোটা আরম্ভ হয়েছে—এমন সময় অম্বুজাক্ষ স্নান শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দাঁড়ালেন, বললেন,—'হ'য়েছে, হ'য়েছে, যা' হয়েছে দিয়ে দাও'—ব'লে কড়াইটা উনুনে চাপিয়ে তেল ঢেলে দিলেন।

'তোমার বিছানা ছেড়ে ওঠা একেবারে নিষেধ, বুঝলে? ডাক্তার বারণ করেছে—অথচ তুমি রোজ রোজ এখানে উঠে আসবে, কি অন্যায় ব'লো দেখি!'—তরকারি নাড়তে নাড়তে অম্বুজাক্ষ বললেন।

'না এলে চলবে কি ক'রে শুনি, ক'টা ঝি-চাকর আছে তোমার যে আমাকে ছুটি দেবে? জন্মের মত ছুটি হয় ত, বাঁচি!'—উমাশশীর চক্ষু সজল এবং গলার স্বর একটু ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল।

অম্বুজাক্ষ নিঃশব্দে খুন্তী নাড়তে লাগলেন। সত্যই ত, ক'টা ঝি-চাকর আছে যে উমাশশীকে ছুটি দেওয়া হ'বে। তা'র আর ভাববারও অবকাশ নেই। কোনো রকমে তরকারির আলুটা সিদ্ধ হ'লেই হয়।

পরক্ষণেই উমাশশী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, 'তোমার কি একটু আক্কেল নেই? কতবার ব'লে দিলাম দুটো কসি পেয়ারা আনতে—সে কথা কি তোমার কাণেই গেল না? বলিহারি যা হোক্,—এখন ওষুধ খাই কি দিয়ে শুনি! নিজে ত সেরেসুরে আপিসমুখো হ'বেন—এখন মর্ তুই ছেলে-মেয়ে দু'টো নিয়ে সমস্ত দিন!'

অম্বুজাক্ষের আপিসের তখন আর বোধ হয় আধ ঘণ্টা দেরী। তাঁ'র কাণে তখন কোনো শব্দ প্রবেশ করে না—দৃষ্টি ভাতের থালার দিকে নিবদ্ধ; আগুনের মত গরম ভাত ডাল এবং তরকারির সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে গ্রাসের পর গ্রাসে উদরস্থ হচ্ছে। বাহিরের জগতে জুতো, জামা, ছাতি এবং জলন্ত রৌদ্রে চলন্ত ট্রাম ছাড়া আর কিছুই তাঁর লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নয়।

নিতাই আর অম্বুজাক্ষ আপিসে পাশাপাশি বসেন; কাজে কাজেই বন্ধুত্ব হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। খাতা লিখ্‌তে লিখ্‌তে নিতাই কলমটা একবার তুলে নিয়ে অম্বুজাক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। আধময়লা একটা পাঞ্জাবী—গলার কাছটায় ঘামে মলিন হ'য়ে উঠেছে। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো বহু দিনের সংস্কার অভাবে জীর্ণ। বন্ধুর কিন্তু কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই—এই নিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। নিতাই কত দিন কত অনুযোগ-অভিযোগ ক'রেছেন, ব'লেছেন, 'এর

চেয়ে ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়া হ'য়ে জন্মা'লে পারতে অম্বুজ! আমারও সংসার আছে—কৈ, দেখেছ কোনো দিন আমাকে অপরিষ্কার থাকতে? মাইনের কথা যদি ধরো, তাহ'লে তোমার আমার মাইনে ত একই ভাই—তবে শুধু শুধু নিজের এমন হাল ক'রে রেখেছ কেন বলো দেখি?'

আজ অম্বুজের দিকে চেয়ে নিতাইএর কি জানি কেন হঠাৎ কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না। তাঁ'র মনে হ'ল, এই সমস্ত ব্যাঙ্কটায় এর চেয়ে দুঃখী মুখ যেন তিনি আর কোনো দিন দেখেন নি। কি ভেবে কলমটি হাতে তুলে নিয়ে অম্বুজের দিকে তিনি চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ নিতাইএর দিকে অম্বুজাক্ষের দৃষ্টি ফিরল। একটু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'কি দেখ্‌ছ ভাই,—রূপ?'

'হ্যাঁ, রূপই বটে! কি রূপই হচ্ছে দিন-দিন। বলি, অভাবটা তোমার একার না কি হে অম্বুজাক্ষ?'

'তুমি ঠিক বুঝ্‌বে না নিতাই, আমি যতই বোঝাই, তুমি ঠিক বুঝ্‌বে না।'

'বুঝি আর না বুঝি, অনেকখানি যে তোমার নিজের ইচ্ছাকৃত, এ কথা কি স্বীকার করবে না?'

খাতা লিখ্‌তে লিখ্‌তে অম্বুজাক্ষ হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, 'নিজের ইচ্ছা? কোথায় নিজের ইচ্ছা? ও বস্তুটাকে বিসর্জন দিয়েছি বহু কাল। যা দেখ্‌ছ, সবই ভাগ্যকৃত। ভাগ্য মানো নিতাই?'

নিতাই আপন মনে আবার খাতা লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। খানিকটা লিখে আবার প্রশ্ন করলেন, 'বৌ কেমন আছে আজ? ডাক্তার কি বল্‌ছে?'

'বৌ? সেই একই অবস্থা। বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন নেই। ডাক্তার আর কি বল্‌বে? কিছু দিন পরেই হয় ত বল্‌বে, টাইফয়েড্ না হয় টি, বি। রোগ আর কিছুই নয় নিতাই, রোগ হচ্ছে দারিদ্র্য।'

'তা' অনেকটা সত্যি বটে। তবে, ব্লাড্‌টা একবার এগ্‌জামিন ক'রে দেখো দেখি। কিছু পাওয়া যায় যদি, তাহ'লে সেই সূত্র ধ'রে চিকিৎসা চল্‌তে পারে!'

'তা কি আর বাকী রেখেছি নিতাই, সমস্তই হ'য়েছে। ডাক্তাররই এখনো কোনো হদিশ পায় নি, তা আমরা ত 'লে-ম্যান'।'

'কোনো হদিশ্ পাওয়া যায় নি, বলো কি হে? আজকের দিনে বিজ্ঞান কি মিথ্যে হ'বে?'

'ভাই নিতাই, বিজ্ঞানের পরীক্ষার ফলও টাকা দিয়ে কিন্‌তে হয়। কোথায় পা'ব ভাই অত টাকা? আজ দেড় মাস হ'ল ভুগ্‌ছে, যা সামান্য পুঁজি ছিল, চিকিৎসাতেই ব্যয় হ'য়ে গেল। কাজেই ভাগ্য মানা ছাড়া আর উপায় কি?'

খাতা লিখ্‌তে লিখ্‌তে নিতাই ক্রমশঃ নিঃস্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। তাঁ'র অভিজ্ঞতায় এত দুঃখের বিচিত্রতা নেই। স্ত্রী স্বাস্থ্যবতী—অসুরের মত খাটুনী খাটে। নিজের স্বাস্থ্যও ভালো। ছেলেমেয়ে কিছুই হয় নি—এই একটি মাত্র সনাতন দুঃখ বন্ধু-মহলে প্রচার করবার মত আছে। এ দুঃখকে বন্ধুরা আমলই দেয় না। কাজেই নিতাই অম্বুজাক্ষের বিচিত্র দুঃখের কাহিনীর মধ্যে আর তল পেলেন না।

রবিবার। সমস্ত সপ্তাহের সীমাহীন ব্যস্ততা এক-দিনের অবকাশের মধ্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে। অম্বুজাক্ষের বাসার সম্মুখের গলিটি আজ অকারণ হাসি-কোলাহলে মুখরিত। কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখের রোয়াকে ব'সে চা খাচ্ছেন, কেউ বা তাস খেলছেন এবং কেউ বা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পরিবৃত হ'য়ে সেতারে মনোনিবেশ ক'রেছেন। অম্বুজাক্ষ সকালে উঠে বিছানা ইত্যাদি যথারীতি তুলে রেখে ষ্টোভ্ জেলে একটু হালুয়া তৈরী ক'রে ছেলে-মেয়ে দু'টিকে খাইয়েছেন এবং নিজের জন্য কেট্‌লি ক'রে জল চাপিয়ে দিয়েছেন ষ্টোভের উপর। উমাশশী চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে আছেন। ষ্টোভ জল্‌ছে এবং নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে রবিবারের সকালে তা'র একটানা সাঁই-সাঁই শব্দটির মধ্যে অম্বুজাক্ষ যেন বহু দিনের হারানো একটি সুরের সন্ধান পেয়েছেন —এমনিভাবে চৌকীতে ব'সে ব'সে তিনি ভাব্‌ছেন। প্রথম চাকরি হ'য়েছে। একটি বাসা ঠিক ক'রে উমাশশীকে আন্‌তে গেছেন অম্বুজাক্ষ—উমাশশীর তখন সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রসন্ন মন! রাত্রে উমাশশী বাসাটির কত খবর খুঁটিয়ে

প্রথম যৌবনের দিনগুলি। তার পর থেকে জীবন সেই একই প্রবাহে যদি ব'য়ে চল্‌ত! অম্বুজাক্ষ একটি ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ষ্টোভের কাছে এগিয়ে গেলেন। কেট্‌লির মুখ দিয়ে অজস্র বাষ্প ঢাক্‌নিটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে—অম্বুজাক্ষ তাঁ'র মেয়ের নাম ধ'রে ডাক্‌লেন, 'কমলা, ও কমলা, একটু দুধ নিয়ে এসো ত মা ও ঘর থেকে!'

পাঁচ বছরের মেয়ে কমলা বাইরে খেলা কর্‌ছিল। তার দু'বছরের ছোট ভাইটি উমাশশীর কাছে তখনো শুয়ে আছে। বাবার ডাকে সাড়া দিয়ে কমলা ছুটে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়া'ল।

'যাও ত মা, ও ঘর থেকে একটু দুধ নিয়ে এসো—চা হ'বে।'—অম্বুজাক্ষ বল্‌লেন।

'চা হ'বে বাবা? যাই—' ব'লে কমলা ও-ঘরে চ'লে গেল। চা হ'য়ে গেলে বাবা তা'কে একটি ছোট কাপে ক'রে চা খেতে দেন, সেই কথাটিই তা'র সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ল।

উমাশশী চাদরখানি সরিয়ে ফেলে উঠে বস্‌লেন—কঙ্কালসার রুগ্ন দেহ। মাথার সম্মুখ দিকে চুল উঠে গিয়ে সীঁথির কাছে একটু ছোট টাকের মত হ'য়েছে। রক্ত-লেশহীন সাদা মুখ—সকালের আলোয় আরও পাণ্ডুর ব'লে মনে হচ্ছে। হাঁটুর উপর হাত রেখে কপালটি টিপে ধ'রে উমাশশী আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'হতচ্ছাড়া জ্বর—নিরেনব্বই আর কিছুতেই কমে না!'

কমলা দুধ এনে দিয়ে জানালার ধারে ব'সে তা'র ছোট্ট পুতুলের বাক্সটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অম্বুজাক্ষ উমাশশীর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'দেখো ত একবার থার্ম্মোমিটার দিয়ে—কত জ্বর আছে।'

উমাশশী বিরক্তির সুরে বল্‌লেন, 'দেখো গে যাও তুমি, আমি আর পারি নে বাবু নিত্যি নিত্যি ঐ জ্বর দেখ্‌তে! দেখ্‌লে সারবে কি বল্‌তে পারো?'

"হ্যা সারবে, রোজ দু'বার ক'রে দেখ্‌তে ব'লেছে ডাক্তার—দু'বারও ত হয় না।'

উমাশশী আর কোনো কথা না ব'লে ছেলেটিকে তাঁর শীর্ণ বুকের উপর তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অম্বুজাক্ষ চা তৈরী ক'রে উমাশশীর জন্ত কাপটি ঢেকে রেখে দিয়ে নিজের কাপটি নিয়ে বাইরের রোয়াকে বেরিয়ে গেলেন। এখনই ডাক্তার-খানা যেতে হ'বে। তার পরে বাজার আনা, ওষুধ আনা এবং রান্নার জোগাড় দেখা—রবিবারও তাঁর কাছে নিত্য অভিশাপের মত। কমলা পুতুল রেখে দিয়ে আবার বাইরে খেল্‌তে চ'লে গেল।

অম্বুজাক্ষ মনে মনে হিসাব ক'রে দেখ্‌লেন, উমাশশীর এই অসুখের ব্যাপারে তাঁর যে সামান্ত সঞ্চয় ছিল, তা'র সমস্তই নিঃশেষিত হ'য়েছে। কিন্তু এই একমাত্র সম্বল শেষ করেও উমাশশীকে যদি রোগমুক্ত করতে পারা যেত, তা হ'লেও একটা সান্ত্বনার কথা ছিল। রোগমুক্ত হওয়া ত দূরের কথা, উমাশশীর শারীরিক ব্যাধি যেন তা'র মনেও সংক্রামিত হচ্ছে—কি অসম্ভব রাগ আর বিরক্তি এসেছে উমাশশীর! সে কথা ভাব্‌লেও বিস্মিত হ'তে হয়। সেদিন মেয়েটাকে খাওয়াতে ব'সে অকারণে তা'র গালে দু'তিনটে ঠোনা মেরে তা'র কাণ ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টান্‌তে টান্‌তে একেবারে কলতলায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখ্‌ল। উমাশশীর হাতের নখ লেগে মেয়েটার কাণ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগ্‌ল—সে ফুলে ফুলে কাঁদতে আরম্ভ কর্‌ল। বাইরে যেমন শীর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে উমাশশী, তার মনও তেমনি সংকীর্ণ হ'য়ে আস্‌ছে। অম্বুজাক্ষ রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে ভাবতে লাগলেন—এ ব্যাধির ওষুধ কোথায়? সে ওষুধ যে ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারিতে নেই, এ কথা ধ্রুব সত্য। সাধ্যমত চিকিৎসা করা'তে তিনি ত বাকী রাখেন নি—ফলে, টেম্পারেচারের খাতা নিরেনব্বই-এর অঙ্কে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল, ডাক্তারখানার খাতায় ঋণের পরিমাণ বাড়তে লাগ্‌ল এবং মনের মধ্যেও যে শান্তি অশান্তি তৃপ্তি অতৃপ্তির একটা জমাখরচের খাতা আছে, তাতে অশান্তি আর অতৃপ্তিই বেড়ে চলেছে। পকেটে হাত দিয়ে অম্বুজাক্ষ টেম্পারেচারের খাতাখানা বা'র কর্‌লেন—প্রত্যেক তারিখের নীচে উমাশশীর জ্বরের গতি-প্রকৃতি নির্দ্দেশের অঙ্কপাত—মানুষের অসীম ধৈর্য্য অনিশ্চিত রোগমুক্তি-কামনায় যেন এর প্রত্যেক পাতাটিতে নিঃশেষ হ'য়েছে।

রৌদ্রের উত্তাপ বেড়ে উঠ্ছে। অম্বুজাক্ষ একটি ডাষ্ট্-বিনের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই যেন বল্লেন, 'না, না—কখনই নয়। এমন ক'রে সর্ব্বনাশের পথে আর যেতে পারি নে।' পাশ দিয়ে কয়েকটি লোক অম্বুজাক্ষের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেল্তে ফেল্তে চ'লে গেল। ততক্ষণে অম্বুজাক্ষ দু'হাত দিয়ে টেম্পারেচারের খাতাখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে ডাষ্ট-বিনে ফেলে দিয়েছেন। 'চুলোয় যাক্—চুলোয় যাক্! আমি আর পারি নে হে ভগবান্'—আপন মনেই কথা কয়টি বল্তে বল্তে অম্বুজাক্ষ আস্তে আস্তে আগিয়ে চল্লেন। 'ওষুধ ডাক্তার-খানায় নেই, ওষুধ আছে অন্যত্র। নৈলে, রোগ সারে না কেন? থাকুক নিরেনব্বই—দেখি ক'দিন থাকে! ওষুধের টাকায় ভাল দেখে কিছু ফল-টল কিনে নিয়ে যাই ওর জন্যে'—এই ভেবে অম্বুজাক্ষ বাজারের দিকে চল্তে লাগলেন। বাজারের সম্মুখের কাপড়ের দোকানখানায় অসম্ভব ভিড়। সম্মুখে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে। দু'তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে সম্ভবত বাড়ীর গৃহিণী জামাকাপড় পছন্দমত কিন্তে এসেছেন। ছেলেমেয়েগুলির কি সুন্দর স্বাস্থ্য,—দোকানদার সম্মুখে ভালো ভালো কাপড়ের থান ধ'রে আছে, আর গৃহিণী তাঁ'র অপরূপ হাসিভরা প্রসন্ন মুখে এক একখান ক'রে হাত দিয়ে দেখে নিচ্ছেন। ছেলেমেয়েগুলি কলরব করছে, 'এটা নয় মা, ঐ টে—ঐ টে!' অম্বুজাক্ষ সমস্ত দৃশ্যটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মনে মনে বল্লেন, 'ব্যাধির ওষুধ ডাক্তারখানায় নেই, সে আছে অন্যত্র!' কিন্তু কোথায় সে ওষুধ, মানুষের কত দুঃসাধ্য চেষ্টায় কত আত্মঘাতী পরিশ্রমে সে মৃত-সঞ্জীবনী তা'র করতলগত হ'বে—এ সমস্যার সমাধান অম্বুজাক্ষ করতে পারেন নি, শুধু তিনি এইটুকু বুঝ্লেন যে ডাক্তারখানার দামী ওষুধের শিশির মধ্যে সব সময়ে তা'কে পাওয়া যায় না।

এক সের বেদানা এবং আরও কিছু ভাল ফল-টল নিয়ে অম্বুজাক্ষ বাসায় ফিরলেন। চটের পর্দ্দাটি সরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দেখেন উমাশশী উনুন ধরিয়ে সাগু জ্বাল দিচ্ছেন। তাঁ'র দিকে চেয়ে অম্বুজাক্ষ বল্লেন, 'এই নাও, আজ আর ওষুধ খেতে হ'বে না।'

'কি এনেছ ওতে?'

'এই বেদানা, আঙুর, ন্যাসপাতি—এই সব আছে। ছেলেদের দাও, তুমিও খাও। আর, গরম জল ক'রে বেশ ক'রে গা মুছে ফেলো।'

'আজ আবার ফল আনবার সখ হ'ল কেন? ডাক্তার ব'লেছে বুঝি?'

'না, ডাক্তার বলে নি, ডাক্তার আর বল্বেও না—ডাক্তার আর আস্বে না বাড়ীতে।'

'তবেই সব হ'য়েছে। যা-ও বা ওষুধ খেয়ে কোনো রকমে টিকে ছিলাম, তা-ও তুমি আর চাও না। বলি, এম্নি ক'রেই কি মানুষকে মেরে ফেল্তে হয়?—এর চেয়ে গলা টিপে মেরে ফেলো না কেন!'

'দেখ, মিছিমিছি ব'কো না এমন ক'রে। আমি আর পারছি নে, আমার ক্ষমতায় আর কুলোচ্ছে না। আমি যা বলি তাই ক'রো দেখি, তোমার অসুখ-বিসুখ সব সেরে যা'বে।'

'ক্ষমতায় যখন কুলোচ্ছে না, তখন আবার নবাবী ক'রে ফল আন্তে গেলে কি জন্যে? এ দিকে পরনের কাপড় জোটে না, আবার বেদানা খাওয়াবেন রোজ রোজ।'—উমাশশীর রোগপাণ্ডুর মুখে একটা তিক্ত বিরস বীভৎস হাসি ফুটে উঠ্লো।

অম্বুজাক্ষ সেদিকে আর চাইতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি চটের পর্দ্দাটি সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়া'লেন।

দোতলার দত্ত-গৃহিণীর ভারি একটা কু-অভ্যাস ছিল। আল্সের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে তিনি অম্বুজাক্ষের শ্রীহীন সংসারের দিকে উঁকি দিতেন। টুক্রো টুক্রো যে-সব দৃশ্য তাঁ'র চোখে পড়্ত, ভালো লাগুক, মন্দ লাগুক, সেগুলোকে তিনি মনে মনে উপভোগ করতেন নিশ্চয়ই। সেদিনও এমনি অভ্যাসের বশে উঁকি দিয়ে দেখ্লেন, উমাশশী মাথার কাপড় খুলে দিয়ে কলতলায় ব'সে আছেন। কলের ক্ষীণতম ধারাটি উমাশশীর কেশবিরল মস্তকে এসে পড়্ছে এবং উমাশশী সেই অপ্রচুর প্রবাহটিকে সর্ব্ব শরীরে গ্রহণ করবার জন্য অস্থিবহুল পাঁজরে ক্রমাগত হাত ঘষছেন। উপর থেকেই দত্তগৃহিণী চীৎকার ক'রে বল্লেন, 'ও বামুন-বৌ, বলি ও হচ্ছে কি? অসুক্-শরীরে দেখ্ছি দিব্যি চান্ করছ।'

উপরের দিকে তাকিয়ে মাথার কাপড়টি একটু টেনে দিয়ে উমাশশী বল্লেন, 'না মা, ডাক্তারের এখন আর বারণ নেই কি না—তাই চান্ করছি। এখন ওষুধ খাওয়ার পাট উঠে গেছে—এখন শুধু বেদানার রস, দুধ, রোজ চান্ করা—এই সব হচ্ছে। তা এতে শরীর ভালো বোধ করছি মা, যাই বলুন।'

'ভালো হ'লেই ভালো বাছা। আমরা ত ভেবে ভেবে সারা হলুম। সোণার ঘর-সংসার তোমার বাছা—সেরে-সুরে দেখে শুনে নাও। তাহ'লে ডাক্তারের বারণ নেই, কি ব'লো বামুন-বৌ!'

'না মা, বারণ নেই। আপনার ছেলে গিয়ে জেনে এসেছে। আর, তা ছাড়া ক দিনই বা বিছানায় থাকব—যা পারি, একটু-আধটু না দেখ্লে কি ক'রে চলে

বলুন ? আপনার ছেলে ত খেটে খেটে সারা হ'ল—আপিস্ করবে, ডাক্তারখানা হাঁটবে, না রাঁধবে ?'

'তা বেশ হ'ল মা, ভালোই হ'ল। কেমন শরীর—কি হ'য়ে গেছে মা ? মুখখানিও দেখ্‌বার যো ছিল না, তবু আজ দেখে মনটা খুশী হ'ল।'—অতি কোমল আত্মীয়তার সুরে দত্ত-গৃহিণী কথা কয়টি ব'লে ছাদের ওপাশে অন্তর্হিত হ'লেন।

কাপড় কাচ্‌তে কাচ্‌তে উমাশশী বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'আ মর মাগী, দরদ জানা'তে আর জায়গা পা'ন না যেন! অসুখে ভুগ্‌লাম আজ দু'মাস—উনি আজ্‌কে খোঁজ নিতে এসেছেন!' কাপড় কেচে নিয়ে ছাদে মেল্‌তে যাচ্ছেন উমাশশী, এমন সময় পিছন থেকে কমলার ডাক শুন্‌তে পেলেন, 'মা, ওমা—বাবা এসেছে, তোমাকে ডাক্‌ছে।'

'কাপড় মেলে দিয়ে যাচ্ছি, বলগে যা।'—ব'লে উমাশশী ছাদে উঠে গেলেন।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। অম্বুজাক্ষ চৌকীতে ব'সে জুতোর ফিতে খুল্‌ছেন। আফিস থেকে ফির্‌তে আজ তাঁ'র একটু দেরী হ'য়ে গেছে। ছোট খোকা হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত খাদ্য-বস্তুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে জামাটি খুলে অম্বুজাক্ষ আল্‌নায় রাখ্‌লেন। এমন সময় সিক্ত বস্ত্রে উমাশশী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়া'লেন।

'ভর সন্ধ্যে বেলায় আবার ডাক্‌লে কি জন্যে, আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই। কি দরকার বলো, বলো শীগ্‌গির!'

ধীর ক্লান্ত কণ্ঠে অম্বুজাক্ষ বল্‌লেন, 'কাপড়টা ছেড়ে ফেলো। ভিজে কাপড়ে থেকো না। কাপড় ছেড়ে এঘরে একবার আস্‌বে। খুব বেশী তাড়াতাড়ি নেই।'

পরিষ্কার শাড়ীখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে উমাশশী ব'লে গেলেন, 'ন্যাকামি দেখ্‌লে গা জ্বালা করে—যেন একটা সঙ্! যা দরকার, তা কি আর এক কথায় বলা হ'ত না না কি ?'

অম্বুজাক্ষ জানালার ধারে টিনের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বস্‌লেন। চুরোট বড় একটা তাঁ'কে টান্‌তে দেখা যায় না। গলির ভিতর দিয়ে যে দক্ষিণের হাওয়াটি পথ ভুল ক'রে এই ঘরে এসে পড়েছে, সেই হাওয়াটি উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে অম্বুজাক্ষ আজ একটি চুরোট ধরিয়ে অন্যমনে টান্‌তে লাগ্‌লেন। কখন যে উমাশশী এসে দাঁড়িয়েছেন, তা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

'ওমা তামাক-পোড়া তামাক-পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে কোথা থেকে ঘরের মধ্যে ? তবেই হ'য়েছে—ও নেশা আবার কবে থেকে ধর্‌লে গো ? সর্ব্বনাশ হোলো, যে-টুকু বাকী ছিল, এইবার তা-ও শেষ হ'বে!'—উমাশশীর গলার স্বর অধীর, রূঢ় এবং তিক্ত!

'চ'টে যেও না উমাশশী, মানুষের এ-সব দরকার হয়—বুঝ্‌লে ? এদিকে এসো, শুনে যাও।'—ব'লে অম্বুজাক্ষ চেয়ার থেকে উঠে আল্‌নার কাছে গেলেন এবং জামার পকেটে হাত দিয়ে কি একটা জিনিষ বা'র করলেন, অন্ধকারে তা ভালো ক'রে বোঝা গেল না। তার পর উমাশশীর দিকে আগিয়ে এসে বল্‌লেন, 'এই নাও উমাশশী, গোয়ালার দুধের দেনা দিয়েও যা' থাকবে, তা'তে তোমার দু'জোড়া ভালো শাড়ী হবে—নাও, ধরো!'

'কি গো কি ? এ তুমি কোথায় পেলে ? আজ ত মাসের সবে পনেরো তারিখ, মাইনে ত পেয়েছ, তবে এ আন্‌লে কি ক'রে ?'—ব'লে উমাশশী দুই বিস্ফারিত নয়নে হাতের উপরে খোলা দু'খানি নোটের দিকে চেয়ে রইলেন।

'যেখান থেকে হোক্, যেমন ক'রে হোক্ আমি পেয়েছি—তুমি রেখে দাও, যা কর্‌তে বল্‌লাম, তাই ক'রো।'

'দাঁড়াও, একটা আলো জেলে নিয়ে আসি!'—ব'লে উমাশশী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অম্বুজাক্ষ চুরোটটি হাতে ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে থাক্‌লে তিনি দেখ্‌তে পেতেন, উমাশশী ঘরের কোণে গলায় আঁচল দিয়ে তাঁ'র আরাধ্য কোনো দেবতার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাচ্ছেন, বহু দিনের ব্যাধি-রুদ্ধ চোখের জল আজ বাঁধ ভেঙে ফেলে তাঁ'র দুই শীর্ণ শুষ্ক পাণ্ডুর গালের উপর দিয়ে ঝ'রে পড়ছে।

পুরুষের ভাগ্য এবং আরও একটা কি রহস্যময় বস্তুর জ্ঞান দেবতাদেরও নেই—মানুষের কি ক'রে থাকবে ?—এই ধরণের একটা প্রবচন আছে। অম্বুজাক্ষ তাঁর ভাগ্য-রহস্যের সন্ধান কি ক'রে পেলেন, তা' ঠিক জানা গেল না। কিন্তু প্রত্যহ আপিস্ থেকে ফির্‌তে তাঁর রাত হ'ত এবং সাত দিন, আট দিন, দশ দিন পর পর পরিশ্রম-ক্লান্ত অম্বুজাক্ষ 'এই নাও উমাশশী' ব'লে স্ত্রীর হাতে কোনো দিন দু'খানা, কোনো দিন তিনখানা এবং কোনো দিন চারখানা ক'রে নোট দিয়ে দিতেন। একটা অধীর আনন্দে উমাশশীর সর্ব্ব দেহমন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত—তাই প্রতি দিন সন্ধ্যায় ঘরের কোণে ব'সে তাঁ'র প্রণামের মাত্রা বেড়ে গেল। প্রার্থনা কর্‌তেন, 'মনে বল দাও আমার হে ঠাকুর, সব দিক সাম্‌লা'বার শক্তি দাও।'

পরের মাস থেকে যেদিন দেখা গেল একজন ঠিকে

ঝি উমাশশীর এঁটো বাসনের কাঁড়ি নিয়ে কলতলায় ব'সে ব'সে মাজ্‌ছে, সেদিন দত্ত-গৃহিণী উপর থেকে এক-গাল হেসে উমাশশীকে অভ্যর্থনা করলেন, 'বলি, এ না হ'লে কি আর চলে বামুন-বৌ! কথায় বলে পাঁচটার সংসার, আজ না থাকে কাল হ'বে। একটা ঝি-টি না হ'লে পেরে উঠ্‌বে কেন?'

উমাশশী এ-সব কথার বড় একটা জবাব-টবাব দেন না; সংসারে সৌভাগ্য আস্‌ছে তাঁ'র বন্যার মত। তা'রই অধীর আনন্দে তাঁ'র মন সর্ব্বদাই উন্মনা—এ আনন্দ যেন নেশার মত, দেহ-মনকে কি নিবিড় ভাবে যেন আচ্ছন্ন ক'রে আছে! কে কোথায় সামান্য কিছুতে কি মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ফেল্‌ল, সে দিকে লক্ষ্য দেবার সময় উমাশশীর নেই।

সেদিন সকালে স্নান করতে করতে তাঁ'র মনে হ'ল পাঁজরের হাড় ক'খানা আর দেখা যায় না। একটা স্নিগ্ধ লঘু মেদ-স্তর সর্ব্বশরীরে বড় লোভনীয় লাবণ্য বিস্তার করতে আরম্ভ ক'রেছে। নিজের শরীরের দিকে উমাশশী বহু কাল চেয়ে দেখেন নি। আজ যেন তাঁ'র বহু দিনের জড়তার ঘুম ভেঙে গেল। স্নান ক'রে উঠে তাই প্রথম সূর্য্যের দিকে তাকা'বার চেষ্টা ক'রে অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে একটি নমস্কার নিবেদন করলেন।

অম্বুজাক্ষ যখন আপিস্ থেকে ফিরলেন, তখন রাত প্রায় ন'টা। উমাশশী আজ স্বল্প প্রসাধিত বেশে খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাইয়ে দিচ্ছিলেন। বিছানায় সুন্দর শুভ্র চাদর পাতা, নিরাভরণ গৃহসজ্জা সুনিপুণ হস্তে পরিচ্ছন্ন-বেশ—ধূপের একটা মৃদু সৌরভ ঘরের মধ্যে এলেই অনুভব করা যায়। অম্বুজাক্ষ ঘরের মধ্যে এসে জামা খুলতে খুলতে বললেন, 'বাঃ, আজ যে ধূপ জেলেছ দেখ্‌ছি। এই নাও, টাকাটা রাখো—বাসাটা বোধ হয় বদ্‌লা'তে হ'বে, কি বলো?'

উমাশশী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন। খোকাকে নামিয়ে রেখে তিনি যে আজ স্বামীর হাত থেকে টাকা নিয়ে বাক্সে রাখ্‌বেন—এমন শক্তিও আজ যেন তাঁ'র নেই। অম্বুজাক্ষের হাতে আজ একখানা দু'খানা নোট নয়—অনেকগুলি নোট এবং টাকা ঘরের আলোতে ঝক্‌মক্ ক'রে উঠ্‌ল।

রাত্রে খেতে ব'সে অম্বুজাক্ষ বললেন, 'শরীর কেমন বুঝ্‌ছ আজকাল?'

'কৈ, জর-টর ত কিছুই বুঝি নে। ভালোই আছে বোধ হয় শরীর!'—উমাশশীর কণ্ঠস্বরে আর সে রুক্ষতা নেই, কণ্ঠস্বর স্নেহার্দ্র, প্রতি মুহূর্ত্তের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ধীর এবং করুণ।

'তাহ'লে ভালোই আছ—বাসাটা বদ্‌লে ফেল্‌লে শরীর আরও ভালো হ'বে বোধ হয়।'—অম্বুজাক্ষ খাওয়া শেষ ক'রে স্ত্রীর দিকে একবার চাইলেন। উমাশশীর চোখের দৃষ্টি তাঁ'কে তাঁ'র প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেল। একটা মৃদু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অম্বুজাক্ষ আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

দত্ত-গৃহিণী আজ আর উপর থেকে কথা বল্‌ছেন না। তিনি নীচে নেমে এসেছেন। বাসায় আরও অনেকে এসেছেন। সত্য-নারায়ণের পুজো দিয়ে—পরনে একখানি দামী গরদের শাড়ী—উমাশশী সকলকে প্রসাদ বিতরণ করছেন। একখানি পাথরের ডিশে বিবিধ ফল-মূল-মিষ্টান্ন সাজিয়ে দত্ত-গৃহিণীর সম্মুখে ধ'রে দিয়ে উমাশশী বল্‌লেন, 'আশীর্ব্বাদ করবেন মা, আপনাদের আশীর্ব্বাদ পেলেই আমার কাজ!'

'আহা, করব বৈ কি বাছা, করব বৈ কি! চিরকাল তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌ছি মনে মনে, তা'র ফল কি ফল্‌বে না? বেঁচে থাক বাছা তোমরা দু'জন—স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে ঘর-করনা করো—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি নে বামুন-বৌ!'

'আর দু'টো আম দেব মা? বেশ মিষ্টি আম, নিজে কিনে এনেছে বাজার থেকে!'

'আহা দেবে বৈ কি বাছা, দেবে বৈ কি! আবার কবে দেখা হ'বে বামুন-বৌ! বাসা ত ছেড়ে দিয়ে চল্‌লে; তা কেমন বাসা হ'ল একবার দেখিয়ে এনো বাপু!'

'বাসা মা ছাড়তাম না—ধরুন এইখানে থেকেই ত সব! কিন্তু আপনার ছেলের জিদ্, কি করি? হ্যাঁ, বাসা দেখ্‌বেন বৈ কি, আপনার ছেলেই একদিন দেখিয়ে আন্‌বে। ছ'সাতখানা ঘর আছে শুন্‌ছি,—অত ঘর নিয়ে কি যে হ'বে তা' জানি নে বাপু!'

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বিপুল দেহভার নিয়ে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে দত্ত-গৃহিণী বল্‌তে বল্‌তে চল্‌লেন, 'টাকার দেমাক্ ত খুবই হ'য়েছে দেখ্‌ছি—টাকা এখন থাকলে হয়!'

আপিসে নিতাই আজ কিছু দিন ধ'রে অম্বুজাক্ষের বেশভূষা লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌ছেন। মুখে কিছুই বলেন নি কারণ পরিবর্ত্তন যৎসামান্য। জামার কলারে ঘামের চিহ্ন আজকাল দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, ক্যাম্বিসের জুতোর পরিবর্ত্তে ভালো একযোড়া জুতো পা'য়ে উঠেছে। কিন্তু নিতাই সেদিন আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারলেন না যেদিন তিনি দেখ্‌লেন, অম্বুজাক্ষ আপিসের ছুটির পর পকেট থেকে একটা দামী সিগারেট কেস্ বা'র ক'রে নিতাই-এর সম্মুখে ধরলেন। স্মিতমুখে নিতাই বল্‌লেন,—

'কি হে অম্বুজ, আজকাল ব্যাপার কি তোমার? আপিসের পর ত দেখাশোনা হয়ই না আর, জামা-

কাপড়-জুতো বদ্‌লেছ, সিগারেট খাচ্ছ—কি ব্যাপার বলো দেখি !'

'কেন, তুমিই ত বল্‌তেজামা-কাপড়-জুতো বদ্‌লা'তে। বেশী শুধু একটা সিগারেট-কেস্‌! এ আর এমন কি মারাত্মক ব্যাপার যা'র জন্যে অত অবাক্ হচ্ছ !'

'না, অবাক্ হই নি, তবে তোমার কিছু একটা ঘটেছে ব'লে মনে হচ্ছে। মুখ যে এত প্রসন্ন দেখি নি হে—এখন যে প্রায় সদাই হাসি-হাসি ভাব! তুমি কিছু না বল্‌লেও আমি বুঝ্‌তে পারি না ভাবো? বৌ কি সেরে উঠেছে না কি ?'

'হ্যাঁ ভাই, বৌ সেরে উঠেছে। দিব্যি এখন সংসারের কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌ছে শুন্‌ছে। কিন্তু ভাই, এর মধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। ডাক্তারী ওষুধ একদম বন্ধ ক'রে দিয়ে শুধু ফলমূল আর দুধ—এই খাইয়ে নেচারের উপর ছেড়ে দিয়ে এখন বেশ সেরে উঠেছে—এ রকম হেল্‌থ ওর আগে দেখি নি বল্‌লেই চলে।'

'যাক্, যেমন ক'রেই হোক্, সেরে গেছে শুনে খুশী হ'লাম। সেই বাসাতেই আছ ত ?'

'এখনো সেখানেই আছি, তবে শীগ্‌গির বাসা বদ্‌লা'ব —এই মাসের শেষে।'

'বেশ বেশ, তা সন্ধ্যের দিকে কি করো? এক একবার ক্লাবের দিকে এলেই ত পারো!'

অল্প একটু হেসে অম্বুজাক্ষ বল্‌লেন, 'সন্ধ্যের দিকেই ত কাজ ভাই—আজকাল বড্ড বিজি থাকি সন্ধ্যের দিকে!'

'এই ধরা প'ড়ে গেছ যাদু! তাই বলি, অম্বুজ আমাদের ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে নিশ্চয়ই—কি করো কি বলো ত মাণিক!'

'সে নানা-ধরণের কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত; ধ'রে নাও ব্রোকারি।'

'বেশ বেশ—অনেক রকম না করলে আজকাল সংসার চালানোই দায়!'—ব'লে নিতাই একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়্‌লেন। বাস থেকে নেমে বাড়ী যাওয়ার সময় নিতাই ভাব্‌লেন, 'ঠিক হ'য়েছে, বেচারা অম্বুজ, এইবার যদি একটু গুছিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ওকে দিয়ে ওর লাইফ্-টা ইন্‌সিওর করিয়ে নিতে হ'বে।' নিতাই গোপনে গোপনে লাইফ্-ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট্।

নিতাই চ'লে গেলে অম্বুজাক্ষ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের জন-স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বাসার উদ্দেশে চল্‌তে লাগ্‌লেন। কন্‌ট্রাক্টারের বাসায় একবার যাওয়া উচিত ছিল। তা' আজ আর না গেলেও চলে। বিরাট নগরী—অজস্র ধারায় কর্ম্মস্রোত উৎসারিত হচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্ক, মানুষের দেহ, মানুষের মন একটি যন্ত্রে মথিত হ'য়ে যে অপূর্ব্ব রসায়নে রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে—তার নাম সোমরস, মানুষের দেহ-মনের চিরন্তন ক্ষুধা মেটা'বার একটি মাত্র উপায়—এই কথা অম্বুজাক্ষের হঠাৎ মনে হ'ল। এই সোমরসের সন্ধান অম্বুজাক্ষ পেয়েছেন—ইহজীবনের ক্ষুধা বোধ হয় আর তাঁকে পীড়া দেবে না।

গল্পের শেষ প্রান্তে এসে দেখা গেল সেদিনও বর্ষা। অম্বুজাক্ষকেও দেখ্‌তে পাওয়া গেল। তাঁ'র প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ীর বারান্দার সম্মুখের জাফ্‌রিগুলির উপরে বৃষ্টির প্রচণ্ড ছাট্ এসে চূর্ণীকৃত হ'য়ে যাচ্ছে। একখানা ইজিচেয়ারে দেহভার সমর্পণ ক'রে অম্বুজাক্ষ একখানি দৈনিক পত্রিকার ব্যবসা-সংক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলি উল্‌টে যাচ্ছেন। রাত্রি। সমস্ত ঘরখানিতে একটা স্নিগ্ধ নীল আলো—মাথার উপরে একখানি পাখা বন্-বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে: নীচের কোনো একখানি ঘরে হিন্দুস্থানী ওস্তাদ কমলাকে গান শেখাচ্ছেন। তাঁ'র গুরুগম্ভীর গলার সঙ্গে সঙ্গে কমলার লঘু চপল কণ্ঠস্বরের আওয়াজ বৃষ্টির ঝর্-ঝর্ ধারার মধ্যে ভারি মধুর মনে হচ্ছে। উপরের একখানি ঘরে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী খোকা টিউটারের কাছে ইংরাজী পড়্‌ছে। উমাশশী সুদূর অন্দরের মধ্যে কোনো গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন বোধ হয়।

অম্বুজাক্ষ কাগজখানা এক পাশে রেখে দিয়ে চশমা খুলে খাপের মধ্যে রেখে দিলেন। কপালে একবার হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মাথার চুলগুলি প্রায় সাদা হ'য়ে এসেছে। কিন্তু জগৎ-সংসারের বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন নেই। সেই বৃষ্টি একই ভাবে ঝ'রে পড়্‌ছে—আজ হঠাৎ বাজারের কাছাকাছি সেই আত্মগোপন-প্রয়াসী পাথরখানার কথা তাঁ'র মনে প'ড়ে গেল। কাপড়ে কাদা ছিট্‌কে এসে লেগেছিল। এখনো কাদা ছিট্‌কে এসে যে লাগে না তা' নয়—তবে মোটরের টায়ারে এসে লাগে, কাপড় পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। অল্প একটু হাস্‌লেন অম্বুজাক্ষ—হঠাৎ তাঁ'র মনে হ'ল আজ যদি মৃত্যু আসে, তবে অভাব থাক্‌বে না কোথাও। তাঁ'র জীবনের পরীক্ষা শেষ হ'য়েছে—সোমরসের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ। সংসার তাঁ'র কাছ থেকে আর কিছুই চাইতে পারে না—কিন্তু কোথায় সেই স্বাদ, জীবনের সেই বিচিত্র যৌবন, সেই আশা, সেই তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা! আরও নূতন কোনো রসের পাত্র তাঁ'র চেষ্টার অপেক্ষায় এই বৃষ্টি-ধারা-ধৌত অসীম অন্ধকারময়ী রজনীর ছায়া-গুণ্ঠনের তলে হয় ত অনাবিষ্কৃত হ'য়ে পড়ে আছে। হয় ত তা'রি সন্ধানে অম্বুজাক্ষকে আবার পথচারী হ'তে হ'বে।

সাময়িকী

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে"—

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মাড়বারী, গুজরাতী, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, শিখ প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া 'ক্যাপিটাল' পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, কিছু দিনের মধ্যেই বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা বাঙ্গালার বাহিরের সহর বলিয়া বোধ হইবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বলেন নাই—অন্য সকল প্রদেশ সরকারী চাকরীতে বাঙ্গালী নিয়োগের বিরোধী, এমন কি, বিদ্যালয়ে ও হাসপাতালেও বাঙ্গালীকে স্থান দিতে কুণ্ঠিত। অথচ সে সকল প্রদেশ শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের উদ্বোধনের জন্য বাঙ্গালীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী! যে বিহার বাঙ্গালীর চেষ্টায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, সেই বিহারে হাসপাতালে বাঙ্গালার বাঙ্গালী স্থান পায় না। আবার কলিকাতার কোন শিক্ষা বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে যে কোন প্রদেশের লোক অবাধে স্থান পায়। বাঙ্গালার সরকারী চাকরীতেও তাহাই। এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব হইয়াছিল, বাঙ্গালা সরকারের অধীনে যে সব চাকরীতে কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাই অথবা যোগ্য বাঙ্গালী বা বাঙ্গালায় অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া বাসকারী প্রার্থী পাওয়া যায়, সে সব চাকরীতে বাঙ্গালী ব্যতীত আর কোন প্রদেশের বা দেশের লোক নিযুক্ত করা হইবে না।

বিস্ময়ের বিষয় কোন কোন বাঙ্গালীই জাতীয়তার কথা তুলিয়া এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রেম ও ভারতবাসীর প্রতি প্রেম যত বাঞ্ছনীয়ই কেন হউক না, বাঙ্গালীর পক্ষে প্রাদেশিক "সঙ্কীর্ণতা" অবলম্বন করিবার যে বিশেষ কারণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালা সরকার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালার সরকারী চাকরীতে যে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীরই অধিকার তাহা বাঙ্গালা সরকার স্বীকার করেন ও সেই নীতি অনুসারে কায করিয়া থাকেন।

আমরা জানি, সরকারী চাকরীর সংখ্যা অতি অল্প এবং সেই চাকরীতে জাতির অভাব মোচন হইতে পারে না। সুতরাং আর সব দিকে—ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভাগে অবাঙ্গালীরা যে বাঙ্গালীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, তাহার প্রতীকার করিতে হইবে। সে কায সরকার করিতে পারেন না, কাযেই তাহা বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন সামন্ত রাজ্যের কথায় বলিয়াছিলেন:—

"There is no spectacle which finds less favour in my eyes...than that of a cluster of Europeans settling down upon a Native State and sucking from it the moisture which ought to give sustenance to its own people."

তেমনই বঙ্গজননীর যে স্তন্য তাঁহার সন্তানের জন্য প্রয়োজন, তাহা তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে প্রদান করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বলিয়াছিলেন—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালীকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখে না। ইহা দুঃখের বিষয় হইতে পারে; কিন্তু ইহা সত্য। ভারতের আর সকল প্রদেশই সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদিগের জন্য, কেবল বাঙ্গালায় যে-কেহ আসিয়া শোষণ-নীতি অবলম্বন করিতে পারে—বাঙ্গালার সরকারী চাকরীও লাভ করিতে পারে।

ইংরাজ শাসনে সকল ক্ষেত্রে মেধাবী বাঙ্গালীর প্রাধান্য যে অন্যান্য প্রদেশের লোকের ঈর্ষার কারণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সভাপতির সন্ধানে ভারতের সকল প্রদেশকে বাঙ্গালায় আসিতে হইয়াছিল। করাচীতে, লাহোরে ও যুক্তপ্রদেশে সংবাদপত্রের সম্পাদকের পদে বাঙ্গালীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে। জয়পুর ও

বরোদায় দেওয়ানের পদ বাঙ্গালী অলঙ্কৃত করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও বাঙ্গালীকে ভাইস-চ্যান্সেলার করিতে হইয়াছে। কাশ্মীর দরবারেও বাঙ্গালী অসাধারণ আদর লাভ করিয়াছেন। বিহারে প্রথম ইংরাজী সংবাদ-পত্র পরিচালন বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, বাগ্মী—বাঙ্গালীর মত কেহই হইতে পারেন নাই। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানেও বাঙ্গালীর কীর্ত্তি কালজয়ী। সেই জন্যই অন্যান্য প্রদেশ বাঙ্গালার প্রতি ঈর্ষাপরবশ। বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা কথায় কথায় বলেন—বাঙ্গালীর ব্যবসা-বুদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহারা যে উপায়েই কেন হউক না, কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহাদিগের ব্যবসাবুদ্ধির কাছে বাঙ্গালীকে মস্তক নত করিতে হইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই যে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল-ওয়ালারা বার বার বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের নিকট প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া জাতীয়তার আবরণে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন, তাহাতে কি মনে হয় না, তাঁহাদিগের প্রকৃত ব্যবসাবুদ্ধি বিশেষ প্রবল নহে? তাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালীর প্রতি কিরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী এখনও ভুলে নাই। আজও তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য বলিয়া বাঙ্গালার কয়লা বর্জ্জন করিয়া কলে দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা ব্যবহার করেন; অথচ বাঙ্গালীকে বোম্বাইয়ের কলের কাপড় "মায়ের দেওয়া" বলিয়া অধিক মূল্যে কিনিতে বলেন।

সংপ্রতি শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে জয়েণ্ট কমিটীতে আলোচনার সময় বাঙ্গালার প্রতি অন্যান্য প্রদেশের মনোভাবের বিষয় সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিশেষরূপ জানিয়া আসিয়াছেন। তাহার তিনটি দৃষ্টান্ত আমরা নিয়ে দিতেছি:—

(১) বাঙ্গালার অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়া পুণায় হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়, সার নৃপেন্দ্রনাথ যখন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন তখন ভারত-সচিব যেমন ছল ধরেন, সে সময় বাঙ্গালা মহাত্মাজীর জীবন রক্ষার আগ্রহে যখন চুক্তির প্রতিবাদ করে নাই, তখন তাহার এখন আর প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই। যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধি সার তেজ বাহাদুর সপরু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলেন, তিনি বাঙ্গালার তিন-চার জন উচ্চবর্ণের লোকের নিকট হইতে ঐ চুক্তির সমর্থক পত্র পাইয়াছিলেন। পত্রলেখকদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, নাম তাঁহার স্মরণ নাই; তবে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কার্শিয়ংএর রাজা! কার্শিয়ংএর রাজা বলিয়া কোন জীবের অস্তিত্ব কিন্তু বাঙ্গালার লোক জানে না। সার তেজ বাহাদুর কোন্ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ কথা বলিয়াছিলেন?

(২) বাঙ্গালায় বিপ্লববাদীদিগের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। কোন্ প্রদেশে পড়ে নাই? অথচ সেই ছল ধরিয়া যখন কতকগুলি ইংরাজ বাঙ্গালার আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ (পুলিস) ব্যবস্থাপক সভার নিকট কৈফিয়তের জন্য দায়ী মন্ত্রীর অধীন করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, তখন বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত মুকুন্দ রামরাও জয়াকর বলিয়া উঠেন, বাঙ্গালার অপরাধে যেন অন্যান্য প্রদেশকে ঐ ব্যবস্থায় বঞ্চিত করা না হয়। তিনি অবশ্যই জানেন, ঐ বিভাগ "হস্তান্তরিত" না হইলে প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা জানিয়াও তিনি বাঙ্গালায় ঐ বিভাগ মন্ত্রীর অধীন করিবার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার এই ভাব কি জাতীয়তার নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

(৩) বৎসরের পর বৎসর ভারত-সরকার বাঙ্গালায় উৎপন্ন পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের কোটি কোটি টাকায় বাঙ্গালাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ফলে অর্থাভাবে বাঙ্গালায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচ, শিল্প—এ সকলের উন্নতি সাধন সম্ভব হয় নাই; আর বাঙ্গালার তুলনায় অন্য অনেক প্রদেশই এই সকল কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া উন্নতির পথারূঢ় হইয়াছে। এবার বিলাতের সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, এই শুল্কের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালাকে প্রদান করা হইবে। বাঙ্গালী ইহার সব টাকাই দাবী করে। সার নৃপেন্দ্রনাথ যখন বাঙ্গালীর দাবী উপস্থাপিত করেন, তখন পঞ্জাবের; যুক্তপ্রদেশের ও মাদ্রাজের প্রতিনিধিরা একযোগে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বাঙ্গালা

যদি চিরস্থায়ী ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত বাতিল করে, তবে তাহার প্রভূত ধনাগম হইবে, সুতরাং তাহাকে পাটের রপ্তানী শুল্কের টাকা দিবার প্রয়োজন নাই! বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, না হইবে, তাহার সহিত বাঙ্গালার পাটের শুল্ক প্রাপ্তির কোন সম্বন্ধ নাই। পাটের রপ্তানী শুল্ক বাঙ্গালার প্রাপ্য কি না, তাহাই বিবেচ্য। কিন্তু তাহা না করিয়া পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধিরা যে বাঙ্গালাকে ঐ রপ্তানী শুল্কে বঞ্চিত করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন, বাঙ্গালার অনিষ্ট সাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি কথা বলিব। প্রথমে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, বোম্বাইয়ের নামজাদা ব্যবসায়ী সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস পাটের রপ্তানী শুল্ক বাঙ্গালাকে দিবার প্রস্তাবে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদিগের সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা সংবাদপত্রে এক পত্র লিখেন,—সার পুরুষোত্তমদাস জানাইয়াছেন, তিনি তেমন কর্ম্ম করেন নাই। এখন জানা গিয়াছে, প্রথম সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতা হইতে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা তাঁহাকে তার করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য ফলে বাঙ্গালায় তাঁহাদিগের ব্যবসার ক্ষতি হইয়াছে, তিনি যেন তাহা বিবেচনা করেন। তাহাতেই সার পুরুষোত্তমদাস তার করেন, তিনি প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বাট্টার হার নির্দ্ধারণের সময় তিনি বাঙ্গালার স্বার্থহানির যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি; এবং জানি বলিয়াই মনে করি, তাঁহার পক্ষে এবারও বাঙ্গালার বিরুদ্ধাচরণ করায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সে যাহাই হউক, বাঙ্গালীকে এখন আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে। বিদেশী ব্যবসায়ীরাই যে কেবল "শতমুখে বাণিজ্যের স্রোতে" বাঙ্গালা হইতে অর্থ লইয়া যাইতেছে, তাহাই নহে; পরন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরাও তাহাই করিতেছে। আবার তাহারা বাঙ্গালায় বসিয়া বাঙ্গালার অর্থ শোষণ করিতেছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, জাপানীরা যেমন এ দেশে আসিয়া কল প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল, ইহারা তাহাই করিয়াছে ও করিতেছে। বাঙ্গালায় ভারতীয়দিগের পাটকলের একটিমাত্র বাঙ্গালীর—প্রেমচাঁদ জুট মিল। আর সব? আদমজী, গগনভাই, হুকুমচাঁদ, বিরলা—এ সব পাটকলের নামেই ইহাদিগের অধিকারীরা যে অ-বাঙ্গালী তাহা সপ্রকাশ। ইঁহারা বাঙ্গালায় উৎপন্ন পাট পণ্যোপকরণরূপে ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালায় অর্থার্জ্জন করেন। ইঁহারা আপনাদিগের স্বার্থও বাঙ্গালীর স্বার্থ হইতে এত ভিন্ন মনে করেন যে, আপনারা একটি স্বতন্ত্র বণিক সভা করিয়াছেন।

তাহার পর কাপড়ের কলের কথা। বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী ও ঢাকেশ্বরী বাঙ্গালীর। বাঙ্গালায় আজকাল আরও কয়টি কাপড়ের কল হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বঙ্গ-অভ্যুদয় মিল কাহাদিগের? আর তাহাতে যদি বা বাঙ্গালীর কিছু মূলধন থাকে, কেশোরাম প্রভৃতিতে বাঙ্গালীর স্বার্থ কতটুকু? অথচ বাঙ্গালী "স্বদেশীর" নামে এই সকল কলের কাপড় বাঙ্গালীর কলের কাপড়েরই মত আদর করে।

বাঙ্গালার টাকা যাহাতে যথাসম্ভব বাঙ্গালায় থাকে ও বাঙ্গালীর উন্নতিকর কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষার জন্য তাহা করিতে হইবে।

বাঙ্গালাকে তাহার আপনার চেষ্টায় আপনার বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইবে। বাঙ্গালার অর্থনীতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, সেচের, শিক্ষার ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা অন্যান্য প্রদেশের সমস্যা হইতে স্বতন্ত্র। এখন বাঙ্গালীকে সে সকলের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে আর কেহই করিবে না। বাঙ্গালীকে আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে, অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সব ভারতবাসী বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালা কি কোনরূপে উপকৃত হইয়াছে, না তাহারা বাঙ্গালার "সার শস্য গ্রাসে"?

শিক্ষা-সমস্যা—

প্রায় দেড় শত বৎসর এ দেশে ইংরাজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে এ দেশে

পূর্ব্বে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। গ্রামে গ্রামে যে সব বিদ্যালয়ে লোক বর্ণ পরিচয়, শুভঙ্করী শিক্ষা করিত ও তালপত্রে আরম্ভ করিয়া লিখিতে শিখিত, সে সব বিদ্যালয়ের স্থান নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে। নিম্নপ্রাথমিকের পর উচ্চ প্রাথমিক, তাহার পর মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—তাহার পর কলেজ। এই সব বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ হয়—টেক্‌ষ্টবুক সোসাইটি পাঠ্য পুস্তক পরীক্ষা করিয়া বর্জ্জন বা অনুমোদন করেন। কাগজে কলমে কোন ত্রুটি নাই। ১৯৩০—৩১ খৃষ্টাব্দে সরকারের স্বীকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা এইরূপ ছিল :—

কলেজ	...	৬৮
উচ্চ বিদ্যালয়	...	১,১৩৪
মধ্য বিদ্যালয়	...	১,৯৩৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	...	৫৯,৭০৭
মাদ্রাসা, কারীগরী প্রভৃতি বিদ্যালয়	...	৩,১৬৫

এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—২৬, ৫০, ৪৫৭ এবং বিদ্যাবিস্তার জন্য বৎসরে প্রায় ৪ কোটী টাকা ব্যয় হয়।

কিন্তু যত দিন যাইতেছে, ততই এই শিক্ষার নানা ত্রুটি প্রকাশ পাইতেছে এবং লোক বলিতেছে, এই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়া যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা সার্থক হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার বলিয়াছিলেন, ইংরাজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় কেরাণী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিলে অন্ধকার দেখিতে হয়। কারণ, ধর্ম্মসম্পর্ক-শূন্য, শৃঙ্খলাবর্জ্জিত এই যে শিক্ষা ইহা লাভ করিয়া যাহারা চাকরীর সন্ধান করিবে, ভবিষ্যতে তাহাদিগের সকলের চাকরী যোগান সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

বাস্তবিক এই শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নহে। জাতীয় শিক্ষা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহার অবলম্বনীয় ব্যবসায়ের বা বৃত্তির উপযুক্ত করে। সে শিক্ষার সহিত সমাজের যোগ থাকা প্রয়োজন। এ দেশে দেশীয় লোকের দ্বারা যে সব "জাতীয় বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলও বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকরণে; সে সকলও সমাজের ব্যবস্থা হইতে রস গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিবার মত করিয়া সৃষ্ট হয় নাই।

এখন দেখা যাইতেছে, এই যে শিক্ষা, ইহা এ দেশের অধিকাংশ লোককে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করে না। কেবল তাহাই নহে, ইহার ফলে লোক যে যাহার বৃত্তি বা ব্যবসা ত্যাগ করায় সমাজে বিশৃঙ্খল ঘটিতেছে এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে ব্যবধান বৃদ্ধি হেতু সমাজের আরও অনিষ্ট হইতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে পঞ্জাবের মন্ত্রী বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ব্যর্থ হইয়াছে; যাহাতে শিক্ষার্থী "করিয়া খাইবার" উপযোগী হয়, সে ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষা বিস্তারে যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহা অপব্যয় হইবে। কিন্তু শিক্ষা-সমস্যার কিরূপ সমাধান হইলে, তাহা হইতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই; হয় ত তাহা ভাবিয়াও দেখেন নাই।

তাহার পর দেখা যাইতেছে, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সমবায় সমিতিগুলির রেজিষ্ট্রার বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির দ্বারা এ দেশের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বর্ত্তমান শিক্ষায় এই কৃষিপ্রাণ দেশে লোক কৃষিকার্য্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহা ত্যাগ করিতেছে এবং পল্লীগ্রামেও আর বাস করিতে চাহিতেছে না। এই জন্য পরীক্ষা হিসাবে পুরী জিলায় "সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সব বিদ্যালয়ে কিতাবতী শিক্ষায় অধিক মনোযোগ না দিয়া বৃদ্ধ ও বালক সকলকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতে হইবে; এবং লোক কিরূপে তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারে, সেই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। সে সব বিষয়—

(১) কিরূপে কৃষির উন্নতিসাধন করা যায়;

(২) কিরূপে লোক স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতে পারে?

(৩) কিরূপে সামাজিক জীবনের ও জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতিসাধন হয়।

দিল্লী এখন স্বতন্ত্র "প্রদেশ"। তথায় যিনি শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা তিনি ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ এই পাঁচ বৎসরের তথাকার শিক্ষার যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

"শিক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও জনগণের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধনশীল ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ফলে কেবল যে ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি পরিচালন দুষ্কর হইয়া উঠিবে, তাহাই নহে; পরন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যেও একযোগে কাব করিবার পথ বিস্তৃত করিয়া পরিবারে অশান্তির উদ্ভব করিবে।"

তিনি বলেন, এই ব্যবধান যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় সে জন্য স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিতে হইবে।

কিন্তু যে শিক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে, সে শিক্ষার বিস্তারে কি ঈপ্সিত ফললাভ হইবে? এ দেশে জনগণকে কিরূপ শিক্ষা দিলে তাহারা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আর স্ত্রীশিক্ষা কি রূপ ধারণ করিলে তাহা সমাজের ও পরিবারের কল্যাণকর হয়, তাহাও বিবেচ্য। ইতোমধ্যেই দেখিতেছি, যে কিভাবতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহার ফলে একদল মহিলা পুরুষের সহিত একযোগে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা যে ভারতীয় সমাজের ব্যবস্থাবিরোধী এবং ইহার ফল যে সমাজের পূর্ব্ব রূপের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন —তাহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র— মাতৃত্বেই নারীর গৌরব। যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান অতিক্রম করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় উৎসাহিত করে, সে শিক্ষায় কি সুফল ফলে? তাহার পর এই যে সহশিক্ষা, ইহা যে সব দেশে চলিত আছে, সে সব দেশে বর্ণ বিভাগ নাই এবং সে সকল দেশেও ইহা যে সমাজের পক্ষে কল্যাণজনক হইয়াছে, এমন বলা যায় না। বিশেষ সে সকল দেশে সতীত্বের আদর্শ ও মর্য্যাদা এ দেশে তাহার আদর্শ ও মর্য্যাদা হইতে ভিন্নরূপ।

এই সকল বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, অশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দাও, বলা যত সহজ তাহা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে এবং কার্য্যে পরিণত করিতে হইলেও বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

এক দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি আর এক দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির অনুকরণ মাত্র হইলে, তাহা সার্থক হয় না। কেন না, সমাজের যে রূপ ও জাতির যে সব সংস্কার যুগ-যুগব্যাপী অবস্থা হইতে উদ্ভূত সে সব সহসা পবনের হিল্লোলের মত মিলাইয়া যাইতে পারে না। যে সভ্যতা ভারতে সৃষ্ট, তাহার বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে শিক্ষা-পদ্ধতি কখনই দেশোপযোগী হইবে না।

এ দেশের শিক্ষা-সমস্যা যে জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশকে তাহার অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ, সকল প্রদেশের অবস্থা একরূপ নহে। মুসলমানরা যে এই জটিল সমস্যার জটিলতা বর্দ্ধিত করিতেছেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা "মুসলিম কালচারের" নামে যে ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কোন উপকার না হইলেও দেশে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্য অবশ্যই বাধা পাইবে। আর মুসলমান-দিগের কোন দানে কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-বিস্তার বা জ্ঞানানুশীলন কার্য্য বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। তাঁহারা হিন্দুদিগের দানেই উপকৃত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের জন্য যে স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ব্যয় সংস্কৃত কলেজের ব্যয়ের তুলনায় অধিক হইলেও তাহার ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ে শিক্ষাবিস্তারে কি বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর পাওয়া যাইবে?

এখন বাঙ্গালার মনীষীদিগের পক্ষে বাঙ্গালায় শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া প্রয়োজন সে বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

কংগ্রেস—

কংগ্রেসের কি হইবে? মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ অনুসারে কংগ্রেসের সব প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এখন কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিবার পথও বিঘ্নবহুল। কিন্তু বিঘ্নবহুল হইলেই যে তাহা করিতে হইবে না, এমন নহে। দেখা যাইতেছে, প্রায় সকল প্রদেশেই কংগ্রেসকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ কার্য্যোপযোগী করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গত অর্দ্ধ

শতাব্দী কাল কংগ্রেস জাতির একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের কায করিয়া আসিয়াছে; তাহাতেই জাতির রাজনীতিক কর্ম্মোত্তম কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং তাহাতেই জাতির রাজনীতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মঞ্চ হইতেই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই দেশের বহু মত কংগ্রেসকে সমর্থন করিয়াছে এবং কংগ্রেসের নির্দ্দেশে নানারূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে বিচলিত হয় নাই।

কংগ্রেসকে নূতন করিয়া গঠিত করিতে হইলে তাহার কার্য্য-পদ্ধতি কি হইবে, তাহার আলোচনাও হইতেছে। রাজনীতিক কারণে কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংপ্রতি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী যে মুক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বহু ত্যাগ, বহু কষ্ট স্বীকার ও বহু ভুলভ্রান্তি প্রকাশের পর তাহা স্থগিত করা হইয়াছে। এখন ধীর ও স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। তাঁহার নিজ মত এই যে, নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে—বিশেষ বাঙ্গালায় সকল সম্প্রদায় সম্মিলিত চেষ্টায় তাহা সফল করিতে পারিবেন—

কংগ্রেসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দল গঠিত করিতে হইবে। যাহারা দুর্নীতিপরায়ণ, আন্তরিকতা-বর্জ্জিত, কংগ্রেসের নামে স্বার্থসিদ্ধি করিতে পটু, এই দলে তাহারা স্থান পাইতে পারিবে না। এই দল কার্য্যপদ্ধতির পুরোভাগে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য স্থাপিত করিবেন—

(১) পল্লীসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার

(২) ক্রমে ক্রমে কৃষকদিগের ঋণমুক্তি সাধন

(৩) ম্যালেরিয়া দূরীকরণ ও সেচের ব্যবস্থা করা

(৪) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যার সমাধান

(৫) বিনাবিচারে আটক ব্যক্তিদিগের মুক্তি

(৬) অর্ডিনান্সের প্রত্যাহার করান

(৭) সরকার স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে অগ্রসর হইলে তাহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজনীতিক কার্য্য অপেক্ষা গঠনমূলক কাযকে প্রাধান্য দিতে চাহিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, সর্ববিধ গঠনমূলক কায রাজনীতিক অধিকারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। গত দ্বাদশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালায় দ্বৈত শাসন যে সফল হয় নাই, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ—গঠনমূলক কাযের জন্য আবশ্যক অর্থের অভাব। সুতরাং রাজনীতিক আন্দোলনকে গৌণ উদ্দেশ্যে পরিণত করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়?

তবে আমরা দলের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে কংগ্রেসের নামে স্বার্থসিদ্ধি করিতে পটু বহু লোক—সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সর্ব্বনাশ সাধক—বহু লোক কংগ্রেসের সংস্রবে থাকিয়া কেবল আপনাদিগের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে সরকারের গুপ্তচর প্রভৃতিরও অভাব নাই।

মহাত্মা গান্ধীও বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে আইন-ভঙ্গ আন্দোলন ত্যাগ করাই প্রয়োজন। কংগ্রেস কখনও ইহা তাহার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করে নাই এবং যখন ইহা কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তখন কংগ্রেস একটি বিশেষ দলের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে। মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন আইনভঙ্গ আন্দোলনে সম্মতি প্রদান করে, তখনও তাহা অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থা যে সে ব্যবস্থার অনুকূল নহে, তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং তাহা বুঝিয়াই মহাত্মাজী তাহা ত্যাগে সম্মতি দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, অসহযোগও যে সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, তাহা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি গত ত্রয়োদশ বর্ষ কাল দেশের লোককে যে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতেই উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন, স্বয়ং "হরিজন" আন্দোলনের সাফল্যলাভের জন্য সেই ব্যবস্থাপক সভার সাহায্য গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি কারাগারে প্রেরিত হইয়া যে সুবিধা চাহিয়াছেন, তাহাও অসহযোগীর নীতি-বিরুদ্ধ; সে বিষয়ে তিনি যে সহযোগ করিয়াছেন, তাহা তিনি, সরকারকে লিখিত তাঁহার পত্রেই, স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায় দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে কংগ্রেস পুনর্গঠিত করিয়া

তাহাকে নিয়মানুগ পথে পরিচালিত করিবার সময় সমুপস্থিত বলিয়াই বিবেচনা করা যায়। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, সার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্ত চিরভূরি যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি যে প্রতিষ্ঠানে স্থান লাভ করিতে পারেন না, সে প্রতিষ্ঠান কখনই জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

নূতন শাসন-পদ্ধতি, যেমনই কেন হউক না, প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহাতে যে ভারতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে না, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে যে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার কিছু বিস্তৃত হইবে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। যদি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সে পদ্ধতির আলোচনায় যোগ দিতেন, তবে হয় ত তাহাতে ভারতবাসীর অধিকার আরও কিছু বিস্তৃত হইত।

নূতন শাসন-পদ্ধতি পরিচালনে কংগ্রেস কি ভাবে কায করিবে তাহাও বিবেচ্য। কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে সম্মতি দিবে কি না? সম্মতি দিলে কংগ্রেসের মতাবলম্বী ব্যক্তিরা কেবল মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গিবার জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন, কি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিবেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। বাধা দিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে?

এই সব বিবেচনা করিয়া কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিবার অধিকার কংগ্রেসের। সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বানে কোন বাধা হইতে পারে না। গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্ট শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ সিংহের মামলায় যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কখনই সরকার কর্ত্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় নাই।"

সুতরাং এই সমিতির পক্ষে কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করিবার পথে কোন বাধা নাই। কিন্তু সে কমিটী যদি সেরূপ আহ্বান করা প্রয়োজন মনে না করেন, তবে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক পরামর্শ সভায় সমবেত হইয়া কংগ্রেসের পরিচালন ভার গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জাতির কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আজ বিশৃঙ্খলতা, সংশয় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তায় দেশবাসী কর্ণধারহীন তরীর স্থায় বিপন্ন। মহাত্মা গান্ধীও কারাগারে যাইয়া "হরিজন" আন্দোলনেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কংগ্রেসকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জাতীয় জীবনে নেতৃত্বের ভার প্রদান করিয়া তাহার নির্দ্দেশ পালন জাতির পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? আমরা বাঙ্গালার অবস্থা স্বতন্ত্রভাবে আজ আলোচনা করিব না। তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে, সমগ্র ভারতের যে সাধারণ অবস্থা তদ্ব্যতীত বাঙ্গালার অবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাঙ্গালার সমস্যা বাঙ্গালীকেই সমাধান করিতে হইবে।

—

ক্ষুধিত ও ব্যাধিগ্রস্ত—

সার জন মেগ ভারতের লোকের—বিশেষ পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তিনি এক বিবরণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষিপ্রাণ স্থানসমূহের চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে প্রশ্নের উত্তর আনাইয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা মনে করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! তাঁহার পূর্ণ বিবৃতি এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহার সারাংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন:—

(১) ভারতবর্ষের লোক সুস্থ ও সবল হইবার মত আবশ্যক আহার্য্য পায় না।

(২) লোকের আয়ুষ্কাল সাধারণতঃ যাহা হইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেক হইতেছে।

(৩) গত দশ বৎসরে যে সব স্থানে অনাবৃষ্টির উপদ্রব হয় নাই, সে সব স্থানেও প্রত্যেক পাঁচ খানি গ্রামের এক খানিতে অন্নকষ্ট হইয়াছে।

(৪) দেশে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক হইলেও জন্মের হার যে হিসাবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে খাদ্যশস্যাদির অভাব অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে।

(৫) বালিকারা পূর্ণ পরিণতি লাভের পূর্ব্বেই সন্তানের জননী হয়।

(৬) বিসূচিকা, প্লেগ ও বসন্ত প্রায়ই মহামারী রূপে দেখা দেয়।

(৭) দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, এমন মনে হয় না; কারণ তাঁহারা এ পর্য্যন্ত এই শোচনীয় অবস্থার কারণ বা প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণের কোন চেষ্টাই করেন নাই।

দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে দেশের ক্রমবর্দ্ধনশীল দুর্দ্দশার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইহার নিদান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। তাহার কারণ এই যে, এ বিষয়ে সরকারের কোন উদ্যোগ দেখা যায় নাই এবং এই কার্য্যে যে আয়োজন প্রয়োজন, তাহা সরকারের পক্ষেই সহজসাধ্য।

সার জন ভারতবর্ষের ব্যাধিগ্রস্তদিগের যে আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

লোক সংখ্যা	...	৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ
ইহার মধ্যে—		
রিকেটস্ রোগগ্রস্ত শিশু	...	২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮ শত
রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তিহীন	...	৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার ২ শত
সিফিলিশগ্রস্ত	...	৫৫ লক্ষ ৬ হাজার ৮ শত
গণোরিয়াগ্রস্ত	...	৭৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫ শত
কুষ্ঠরোগগ্রস্ত	...	১ লক্ষ ৪১ হাজার ৩ শত
ফুসফুসে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত	...	১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪ শত
অন্যান্য যক্ষ্মারোগগ্রস্ত	...	৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪ শত
উন্মত্ত	...	২ লক্ষ ৮২ হাজার ৪ শত
জন্মগত মানসিক বিকারগ্রস্ত		৩ লক্ষ ১৭ হাজার ৭ শত
অন্ধ	...	১৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৫ শত

যে সকল রোগ প্রতীকারসাপেক্ষ এবং অন্যান্য দেশে যে সকল রোগ নির্ম্মূল করিবার জন্য সরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং আংশিক সাফল্যলাভও করিয়াছেন, এ দেশে সে সকল রোগ কিরূপে লোককে জীর্ণ করিতেছে, উদ্ধৃত তালিকা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সার জন যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় :—

ভারতবর্ষে শতকরা ৩৯ জন লোক আবশ্যক আহার্য্য পায়, ৪১ জন আবশ্যক আহার্য্য পায় না, আর অবশিষ্ট ২০ জনের আহার্য্যের পরিমাণ শোচনীয়।

তাহার পর সার জন বলিয়াছেন, দেশে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যে আর লোকের কুলাইতেছে না—জনসংখ্যা সে সকলের তুলনায় বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যদি অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংসাধিত না হয়, তবে বর্ত্তমানে লোকের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা আরও বর্দ্ধিত হইবে। তাহা হইলে কেবল যে দেশের জনগণ জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে বিশেষরূপ বিপন্ন হইবে, তাহাই নহে; পরন্তু খাদ্যশস্যাদি—দেশের লোকের জন্য প্রয়োজনের অধিক উৎপন্ন না হইলে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাহার উপর নির্ভর করেন, তাঁহারাও বিশেষরূপ বিপন্ন হইবেন। জমীতে যে ফশল উৎপন্ন হয়, তাহা যদি কৃষকদিগের ব্যবহার জন্যই প্রয়োজন হয়, তবে জমীর খাজনা ও টেক্স প্রভৃতি দিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য প্রাপ্তি অসম্ভব হইবে। ফলে সমাজসৌধ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে।

সার জন যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার পূর্ব্বে শিক্ষিত ভারতীয়রা বলেন নাই, তাহা নহে। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বহু ভারতীয় ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের ভাবনায় আকুল হইয়াছিলেন। তাহার পর সকল প্রদেশের লোকই এই সম্ভাবনা অনুভব করিয়াছেন। বিশেষ বর্ত্তমান ব্যবসা মন্দায় দেশে যে দুর্দ্দশার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—সকলেই তাহাতে পীড়িত।

আজ যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং রোগে ও অর্থ-কষ্টে ভারতবাসী যেরূপ বিপন্ন তাহাতে সরকারের পক্ষে অগ্রণী হইয়া দেশবাসীর সহিত একযোগে নিদান নির্ণয় ও বিধান করা প্রয়োজন। কেবল বর্ত্তমান বেকার-সমস্যাই এ দেশের প্রধান সমস্যা নহে। ভবিষ্যতে যে এই সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আকাশে বজ্রগর্ভ প্রলয়-ঝটিকার পূর্ব্বগামী মেঘ সঞ্চিত হইতেছে—বিলয়-ভূয়িষ্ঠ বিদ্যুতের বিকাশে তাহার বিপদের বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে।

এই সময় সাবধান না হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ইহা বিবেচনা করিয়া দেশের সরকারের ও দেশের লোকের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তাহা পালন করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালায় নারী-হরণ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালায় নারীহরণের অভিযোগ বর্দ্ধিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, সকল ঘটনা পুলিসে পৌছে না; লোক সময় সময় "সম্ভ্রম হানির" শঙ্কায় ঘটনা গোপন করিয়া থাকে। তথাপি গত বৎসরের যে ঘটনা-তালিকা সরকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

জিলা ও ঘটনা—

২৪ পরগণা ২০, নদীয়া ১৮, মুর্শিদাবাদ ৩, যশোহর ৫, খুলনা ৮, বর্দ্ধমান ৭, বীরভূম ২, বাঁকুড়া ২, মেদিনীপুর ২, হুগলী ০, হাওড়া ১, রাজসাহী ১৫, দিনাজপুর ৩, জলপাইগুড়ী ৩, রংপুর ৫১, বগুড়া ১২, পাবনা ১৭, মালদহ ৪, দার্জ্জিলিং ৩, ঢাকা ১০, মৈমনসিংহ ৩১, ত্রিপুরা ৩, বাখরগঞ্জ ৩০, ফরিদপুর ০, নোয়াখালি ১, চট্টগ্রাম ৯, মোট—২৬০।

কয় বৎসর হইতেই যে এই পাপ বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রমাণ—১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও ২ শত ৮০টি ও পর বৎসর ২ শত ৭৯টি ঘটনা ঘটিয়াছিল, জানা গিয়াছে।

বিস্ময়ের বিষয় এই ৫৫ মামলায় মাত্র ৬৮ জন অপরাধী দণ্ড পাইয়াছে! অথচ অনেক স্থলে প্রত্যেক ঘটনায় অপরাধীর সংখ্যা একাধিক।

সেদিন কলিকাতা উল্টাডিঙ্গীতে এইরূপ একটি ঘটনায় আসামীদিগকে দণ্ড দিবার সময় বিচারক বলিয়াছিলেন, এরূপ অপরাধে কঠোর দণ্ড প্রদানই তিনি কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন। সেদিন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু এই সব অপরাধে আসামীদিগকে—অপরাধী প্রমাণিত হইলে—বেত্রাঘাত দণ্ড দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মার্কিণের সংবাদে প্রকাশ, জুরীরা এইরূপ অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিতে বলিয়াছেন।

মার্কিন প্রভৃতি দেশে সামাজিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে নারী বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের তুলনায় অনেকটা আত্মরক্ষাক্ষম এবং সে সব দেশের সমাজ ধর্ষিতা নারীকে ত্যাগও করে না। সেই অবস্থায় মার্কিণের জুরীও যদি এই অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ডাদেশ দিতে বলেন, তবে এ দেশে কিরূপ কঠোর দণ্ড সঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এ বিষয়ে সরকারের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেদিন সরকার পক্ষে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলিয়াছেন, সরকার একাধিকবার কর্ম্মচারীদিগকে এই সব ব্যাপারে বিশেষ উত্তম সহকারে কায করিতে অর্থাৎ অপরাধী যাহাতে গ্রেপ্তার ও দণ্ডলাভ করে সে বিষয়ে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং পুনরায় সেইরূপ উপদেশ দিতেছেন।

আমরা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ না করিয়াও এ কথা বলিতে পারি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, অপরাধীরা অপহৃতা নারীকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যাইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা আশ্রয় পাইয়াছে, অর্থাৎ আশ্রয়দাতারা তাহাদিগের কুকার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার যে এক সম্প্রদায়ে অধিক দেখা গিয়াছে, তাহা সেই সম্প্রদায়ের কলঙ্কের কথা।

মানুষ কত দুর্নীতিপরায়ণ হইলে এই সব ব্যাপার সম্ভব হয় ও অপরাধীদিগকে কোন রূপে দণ্ড দান করে না, তাহা মনে করিলে ব্যথিত হইতে হয়। শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজের শাসন মানুষের প্রকৃতিগত পশুত্ব সংযত করিয়া রাখে। কিসের দোষে—কোন্ ত্রুটিতে এ দেশে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা সমাজের হিতকামী ও সরকার সকলেরই কর্ত্তব্য। দিনের পর দিন সংবাদপত্র খুলিলেই যে নারীহরণের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা সমাজের পক্ষেও লজ্জার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভদ্রপরিবারে সংঘটিত ও আদালতে মামলার বিবরণে প্রকাশিত কতকগুলি ঘটনার প্রতি সামাজিকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। যে সমাজে স্ত্রী ও শ্রী অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহাদিগের শাস্ত্রকারের উক্তি—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা"—সেই সমাজে ও সেই জাতির মধ্যে

যদি গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, যদি পরিবারেই নারীর লাঞ্ছনা হয়, তবে যে সমাজের দুর্দ্দশা সত্যসত্যই বেদনার কারণ হয়, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

আমরা কোন্ পথে চলিয়াছি এবং সে পথ আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিব না? আমরা যে প্রতীচির অনুকরণ করিতে পটু সেই প্রতীচির সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ হইলেও তথায় যে এরূপ পাপ সমাজ সহ্য করে না এবং সরকার তাহা দমিত করিতে সর্ব্বদাই আগ্রহশীল—তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতের বস্ত্রশিল্প—

যখনই এ দেশে কাপড়ের কলের উন্নতির জন্য বিদেশী বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক বসাইবার বা দেশীয় সূতার উপর শুল্ক লোপ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তখনই বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীরা তাহাতে আপত্তি করিয়া আসিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, ভারতের সরকার যতই দেশের জনমতের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবেন, ততই সরকারকে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবার জাপানী কাপড়ের উপরও কড়া শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই জন্য জাপান এ দেশের তুলা ব্যবহার করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে এবং তাহাতে যে এ দেশের তুলা উৎপাদনকারী কৃষকদিগের ক্ষতি হইতেছে, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন জাপান ও ইংলণ্ড উভয় দেশের ব্যবসায়ীরাই বুঝিতে পারিয়াছেন—ভারতবাসীর সহিত সহযোগের ব্যবস্থা করিয়া পরস্পরের স্বার্থরক্ষার উপায় করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের অনিষ্ট অনিবার্য্য।

সেই জন্য জাপান হইতে যেমন, বিলাত হইতেও তেমনই বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিরা ভারতে আসিতেছেন। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া সরকারের ও দেশের ব্যবসায়ীদিগের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

জাপানের কথা, জাপান এ দেশ হইতে তুলা কিনিয়া লইয়া যায় এবং সেই তুলায় বস্ত্র বয়ন করিয়া এ দেশে বিক্রয় করে। সুতরাং জাপানী কাপড়ের উপকরণ ভারতীয় এবং সেই উপকরণ বিক্রয় করিয়া এই কৃষিপ্রাণ দেশের কৃষকরা লাভবান হয়। এই অবস্থায় এ দেশের পক্ষে জাপানী পণ্য—অধিক শুল্ক স্থাপিত করিয়া—বর্জ্জন করা সঙ্গত নহে।

বিলাতেও এখন সেই কথা। ইতোমধ্যেই বিলাতের কাপড়ের কলওয়ালারা ভারতবর্ষ হইতে তুলা লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই তুলায় যে সূতা হইবে, তাহাতে বস্ত্র বয়ন করিয়া তাঁহারা এ দেশে বিক্রয় করিবেন।

যত দিন ভারতবর্ষে উৎপন্ন তুলায় ভারতীয় বস্ত্রে ভারতবাসীর বস্ত্র-সমস্যার সমাধান না হয়, তত দিন এই ব্যবস্থা যে মন্দের ভাল, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষ যদি বিদেশী কলকারখানার জন্য পণ্যের উপকরণ প্রস্তুত করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে, তবে তাহা বিশেষ দুঃখের কারণ হইবে।

জাপানের ও বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিরা এ দেশে আসিয়া কি কি প্রস্তাব করেন, তাহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বে আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিব না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাহি, ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের পক্ষেই বস্ত্র-বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করা সঙ্গত। কারণ, গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, কোন প্রদেশ যদি এ বিষয়ে অগ্রগামী হয়, তবে সে অন্য প্রদেশের অর্থ শোষণ করিয়া পণ্য মূল্য অযথা বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতে দ্বিধা বোধ করে না। হিসাব করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালায় কাপড় উৎপন্ন করিবার কতকগুলি সুবিধা বোম্বাইয়ের ও আমেদাবাদের নাই। অথচ এখনও বাঙ্গালী স্বদেশী বস্ত্রের জন্য বহু পরিমাণে বোম্বাই ও আমেদাবাদের উপর নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালার কলে উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য ঐ সকল স্থানের কলে উৎপন্ন বস্ত্র অপেক্ষা অল্প হইবে এবং সে কাপড় রেল বা ষ্টীমারের ভাড়া দিয়া বাঙ্গালায় আনিতে হইবে না। ইহাতে কাপড়ের পড়তায় যে সুবিধা অনিবার্য্য তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

বাঙ্গালায় তুলার চাষ সম্বন্ধেও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এখনই ত্রিপুরা প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন

হয়, সে সকল স্থানে মার্কিণের ও মিশরের লম্বা আঁকড়া তুলার চাষ করিলে ফসল কিরূপ হয় তাহা দেখিতে হইবে এবং যদি ফসল ভাল হয়, তবে সে চাষের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে। বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগ এ বিষয়ে কি করিতেছেন?

আমরা বাঙ্গালীকে এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে বলিতেছি।

মহাত্মা গান্ধী—

পুণার বৈঠকে জনগত আইন-ভঙ্গ আন্দোলন স্থগিত করা স্থির হইলে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত ভাবে আইন-ভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার অভিপ্রায়ে অভিযান করিবার প্রাক্কালে ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন। সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিলে তিনি মুক্তির সর্ত্ত পালন না করায় পুনরায় তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ হয়। তিনি কারাগারের মধ্য হইতে অবাধে "হরিজন" আন্দোলন পরিচালিত করিবার সুযোগ সরকারের নিকট প্রার্থনা করেন। সরকার তাঁহাকে কতকগুলি সুযোগ প্রদান করেন। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সব সুযোগ না পাইলে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া অনশন আরম্ভ করেন। সরকার তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া "হরিজন" আন্দোলনেই আত্মনিয়োগ করিবেন, কি আবার রাজনীতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবেন, তাহা জানা যায় নাই।

তিনি, বোধ হয়, যেমন আইন-ভঙ্গ আন্দোলনের তেমনই অসহযোগের জন্য দেশ প্রস্তুত নহে বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৎ সাহস হেতু তাঁহার আদর্শে ও উপদেশে ত্যাগ-ক্লেশ-সহকারী তাঁহার স্বদেশবাসীকে সে কথা বলিয়া দিবেন, এমন আশা অবশ্যই করা যায়। ইতঃপূর্ব্বে একবার তিনি যখন খদ্দরের প্রচারেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পর পুনরায় রাজনীতিক কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। এবার কি হইবে, জানিবার জন্য মহাত্মাজীর দেশবাসীরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন।

পরলোকে স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু—

বৃহত্তর বঙ্গে প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহাদের অগ্রগণ্য। গত ১০ই ভাদ্র শনিবার (১৩৪০) কলিকাতায় অবস্থান কালে ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। স্যার বিপিনকৃষ্ণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি শিক্ষা-লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় পরিচালনের পর তিনি জব্বলপুরে ঐ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অতঃপর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগপুরে গমন করেন। নাগপুরই তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে তিনি স্মল কজ কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি তত্রত্য উকীল সরকারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় উকীল সরকারের পদ ত্যাগ করেন। নাগপুরের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নাগপুরের উকীল সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ কমিশনে তিনিই একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নাগপুর হাইকোর্টের অস্থায়ী জুডিশিয়াল কমিশনার নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সি-আই-ই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নাইট এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন।

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ—

গত ২রা আগষ্ট (১৯৩৩) বুধবার ১-৪৫ মিনিটের সময় "কার-তারকের" অন্যতম অংশীদার সত্যেন্দ্রনাথ সরকার
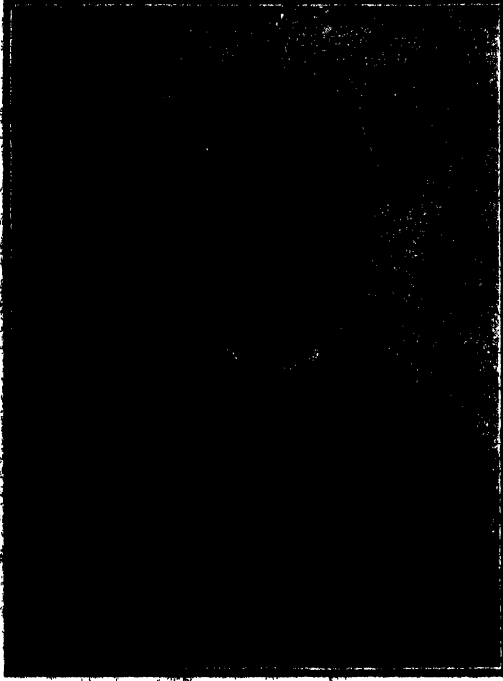
৺সত্যেন্দ্রনাথ সরকার

পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্বর্গীয় নলিনবিহারী সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার সদ্‌গুণাবলী সবই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শীলতায়, সৌজন্যে ও শালীনতায় আত্মীয়, স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি তাঁহাদের স্বীয় "কার-তারক" আফিসে যোগদান করেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত আফিসেই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি সরকার মনোনীত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর ছিলেন। কার-মাইকেল হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও সরস্বতী বিদ্যালয়ের তিনি সদস্য ছিলেন। মোহিনী মিল লিঃ কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ্ কমার্সের সহকারী সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে বৃদ্ধা মাতা, পত্নী, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ও তাঁহার গুণমুগ্ধগণ অত্যন্ত শোকাভিভূত। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনগণের এই গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ইন্দ্রাণী"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "জাগৃহি"—২৲
ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত উপন্যাস "পরিণাম"—২৲
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল প্রণীত উপন্যাস "বিয়ের নেশা"—১৲
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত "নীতি গল্পগুচ্ছ"—।৵০
শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত উপন্যাস "অনুচ্চারিত"—১৲
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর"—১৲
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "তুমিনী"—১।০
শ্রীবিমলা গুহ প্রণীত উপন্যাস "পুনর্মিলন"—১৲
শ্রীকনকলতা ঘোষ প্রণীত "পত্র-লেখা"—।৵০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী প্রণীত উপন্যাস "সোনার চাষ"—১৲
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত গীতি কবিতা "মুকমুরি"—১৲
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত নাটক "রাজা গণেশ"—১৲
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত "শ্রীগৌরাঙ্গ"—১।০
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত গল্পের বই "গল্পমাল্য"—১।০
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "যেদিন ফুটলো কমল"—২৲
অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ প্রণীত "গলায় কাঁটা"—১।৵০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "দৌলতখানা"—৸০
শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছোটদের গল্পের বই "ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা"—।০
শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত "শিকারী ছেলে"—।৵০
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত "মিছিল"—১৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত হৃষীকেশ সিরিজের ১৭নং গ্রন্থ "দেশ-বিদেশের শাস্তির কাঠামো"—৩।০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

কুমার সম্ভব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

কার্ত্তিক—১৩৪০

প্রথম খণ্ড	একবিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

বাঁশরী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শ্রীমতী বাঁশরী সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হোলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান্‌-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য। ক্ষিতীশ সাহিত্যিক। চেহারায় খুঁত আছে, কিন্তু গল্প লেখায় খ্যাতনামা। পার্টি জমেছে সুষমা সেনদের বাগানে।)

বাঁশরী

ক্ষিতীশ, সাহিত্যে তুমি নূতন ফ্যাশনের ধূমকেতু বললেই হয়। জলন্ত ল্যাজের ঝাপটায় পুরোনো কায়দাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছ আকাশ থেকে। যেখানে তোমাকে এনেছি এটা বিলিতী বাঙালী মহল, ফ্যাশনেব্‌ল্‌ পাড়া। পথঘাট তোমার জানা নেই। দেউড়ীতে কার্ড তলব করলেই ঘেমে উঠতে। তাই সকাল সকাল আনলুম। আপাতত একটু আড়ালে বোসো। সকলে এলে প্রকাশ কোরো আপন মহিমা। এখন চললুম, হয়তো না আসতেও পারি।

ক্ষিতীশ

রোসো—একটু সমঝিয়ে দাও। অজায়গায় আমাকে আনা কেন ?

বাঁশরী

কথাটা খোলসা করে বলি তবে। বাজারে নাম করেছ বই লিখে। আরো উন্নতি আশা করেছিলুম। ভেবেছিলুম নামটাকে বাজার থেকে উদ্ধার করে এত ঊর্দ্ধে তুলবে যে, ইতর সাধারণ গাল পাড়তে থাকবে।

ক্ষিতীশ

আমার নামটা বাজারে-চলতি ঘষা পয়সা নয়, সে কথা কি স্বীকার কর না।

বাঁশরী

সাহিত্যের সদর বাজারের কথা হচ্চে না, তোমরা যে নতুন বাজারের চলতি দরে ব্যবসা চালাচ্চ সেও একটা বাজার। তার বাইরে যেতে তোমার সাহস নেই পাছে মালের গুমর কমে। এবারে তারই প্রমাণ পেলুম তোমার এই হালের বইটাতে যার নাম দিয়েছ

"বেমানান।" শস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ তোমার পুরো পরিমাণেই আছে। মাঝারি লেখকেরা মরে ঐ লোভে। তোমার এই বইটাকে বলি আধুনিকতার বটতলায় ছাপা, খেলো আধুনিকতা।

ক্ষিতীশ

কিঞ্চিৎ রাগ হয়েছে দেখছি; ছুরিটা বিঁধেছে তোমাদের ফ্যাশনেব্‌ল্ শার্ট্‌ফ্রন্ট্‌ ফুঁড়ে।

বাঁশরী

রামো! ছুরি বল ওকে! যাত্রার দলের কাঠের ছুরি, রাংতা মাখানো! ওতে যারা ভোলে তারা অজ্‌বুগ।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা মেনে নিলেম। কিন্তু আমাকে এখানে কেন?

বাঁশরী

তুমি টেবিল বাজিয়ে বাজনা অভ্যেস কর, যেখানে সত্যিকার বাজনা মেলে সেইখানে শিক্ষা দিতে নিয়ে এলুম। এদের কাছ থেকে দূরে থাক, ঈর্ষ্যা কর, বানিয়ে দাও গাল। তোমার বইয়ে নলিনাক্ষের নামে যে দলকে সৃষ্টি করে লোক হাসিয়েছ সে দলের মানুষকে কি সত্যি করে জান?

ক্ষিতীশ

আদালতের সাক্ষীর মতো জানিনে, বানিয়ে বলবার মতো জানি।

বাঁশরী

বানিয়ে বলতে গেলে আদালতের সাক্ষীর চেয়ে অনেক বেশি জানা দরকার হয়, মশায়। যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হোলেই তাকে বলে সাহিত্য।

ক্ষিতীশ

ছেলেমানুষী রুচিকে রস জোগাবার ব্যবসা আমার নয়। আমি এসেছি জীর্ণকে চূর্ণ করে সাফ করতে।

বাঁশরী

বাস্‌রে! আচ্ছা বেশ, কলমটাকে যদি ঝাঁটাই বানাতে চাও তাহোলে আস্তাকুঁড়টা সত্যি হওয়া চাই, ঝাঁটাগাছটাও, আর সেই সঙ্গে ঝাড়ু-ব্যবসায়ীর হাতটাও। এই আমরাই তোমাদের নলিনাক্ষের দল, আমাদের অপরাধ আছে ঢের, তোমাদেরও আছে বিস্তর। কসুর মাপ করতে বলিনে, ভালো করে জানতে বলি, সত্যি করে জানাতে বলি, এতে ভালোই লাগুক মন্দই লাগুক কিছুই যায় আসে না।

ক্ষিতীশ

অন্তত তোমাকে তো জেনেছি বাঁশি! কেমন লাগছে তারও আভাস আড়চোখে কিছু কিছু পাও বোধ করি।

বাঁশরী

দেখো সাহিত্যিক, আমাদের দলেও মানান বেমানানের একটা নিক্তি আছে। চিটেগুড় মাখিয়ে কথাগুলোকে চট্‌চটে করে তোলা এখানে চলতি নেই। ওটাতে ঘেন্না করে। শোনো ক্ষিতীশ, আর একবার তোমাকে স্পষ্ট করে বলি।

ক্ষিতীশ

এত অধিক স্পষ্ট তোমার কথা যে, যত বুঝি তার চেয়ে বাজে বেশি।

বাঁশরী

তা হোক, শোনো। অশ্বত্থামার ছেলেবেলাকার গল্প পড়েছ। ধনীর ছেলেকে দুধ খেতে দেখে যখন সে কান্না ধরল, তাকে পিটুলি গুলে খেতে দেওয়া হোলো, দু'হাত তুলে নাচতে লাগল দুধ খেয়েছি বলে।

ক্ষিতীশ

বুঝেছি, আর বলতে হবে না। অর্থাৎ আমার লেখায় পিটুলি-গোলা জল খাইয়ে পাঠক শিশুদের নাচাচ্ছি।

বাঁশরী

বানিয়ে-তোলা লেখা তোমার, বই-পড়ে লেখা। জীবনে যার সত্যের পরিচয় আছে তার অমন লেখা বিস্বাদ লাগে।

ক্ষিতীশ

সত্যের পরিচয় আছে তোমার?

বাঁশরী

হাঁ আছে, দুঃখ এই, লেখবার শক্তি নেই। তার চেয়ে দুঃখের কথা—লেখবার শক্তি আছে তোমার, কিন্তু নেই সত্যের পরিচয়। আমি চাই, তুমি স্পষ্ট জানতে

শেখো যেমন প্রত্যক্ষ করে আমি জেনেছি, সাচ্চা করে লিখতে শেখো। যাতে মনে হবে আমারি মন প্রাণ যেন তোমার কলমের মুখে ফুটে পড়ছে।

ক্ষিতীশ

জানার কথা তো বললে, জানবার পদ্ধতিটা কী?

বাঁশরী

পদ্ধতিটা সুরু হোক আজকের এই পার্টিতে। এখানকার এই জগৎটার কাছ থেকে সেই পরিমাণে তুমি দূরে আছ যাতে এর সমস্তটাকে নির্লিপ্ত হয়ে দেখা সম্ভব।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা তাহোলে এই পার্টিটার একটা সরল ব্যাখ্যা দাও, একটা সিনপ্‌সিস্।

বাঁশরী

তবে শোনো—একপক্ষে এই বাড়ির মেয়ে, নাম সুষমা সেন। পুরুষমাত্রেরই মত এই যে, ওর যোগ্যপাত্র জগতে নেই নিজে ছাড়া। উদ্ধত যুবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনতরো আস্তিন-গোটানো ভঙ্গী দেখি যাতে বোঝা যায় আইন-আদালত না থাকলে ওকে নিয়ে লোকক্ষয়কর কাণ্ড ঘটত। অপর পক্ষে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশঙ্কর। মেয়েরা তার সম্বন্ধে কী কানাকানি করে বলব না, কারণ আমিও স্ত্রী জাতিরই অন্তর্গত। আজকের পার্টি এঁদের দোঁহাকার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট নিয়ে।

ক্ষিতীশ

দু-জন মানুষের ঠিকানা পাওয়া গেল। দুই সংখ্যাটা গড়ায় এসে সুশীতল গার্হস্থ্যে। তিন সংখ্যাটা নারদ, পাকিয়ে তোলে জটা, ঘটিয়ে তোলে তাপজনক নাট্য। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কোথাও আছে নিশ্চয়, নইলে সাহিত্যিকের প্রলোভন কোথায়?

বাঁশরী

আছে তৃতীয় ব্যক্তি, সেই হয়তো প্রধান ব্যক্তি। লোকে তাকে ডাকে পুরন্দর সন্ন্যাসী। পিতৃদত্ত নামটার সন্ধান মেলে না। কেউ দেখেছে তাকে কুম্ভমেলায়, কেউ দেখেছে গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে। কেউ বলে ও য়ুরোপে অনেক কাল ছিল। সুষমাকে কলেজের পড়া পড়িয়েছে আপন ইচ্ছায়। অবশেষে ঘটিয়েছে এই সম্বন্ধ। সুষমার মা বল্লেন—অনুষ্ঠানটা হোক ব্রাহ্ম-সমাজের কাউকে দিয়ে, সুষমা জেদ ধরলে একমাত্র পুরন্দর ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চলবে না। চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াটার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, বলব, কোনো একটা জায়গায় ডিপ্রেশন ঘটেছে। গতিকটা ঝোড়ো রকমের; বাদলা কোনো না কোনো পাড়ায় নেমেছে, বৃষ্টিপাত হয়তো স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। বাস্ আর নয়।

ক্ষিতীশ

ওই যাঃ, এই দেখো আমার এণ্ডির চাদরটাতে মস্ত একটা কালীর দাগ।

বাঁশরী

ব্যস্ত হও কেন। ঐ কালীর দাগেই তোমার অসাধারণতা। তুমি রিয়ালিষ্ট্, নির্ম্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ। ঐ আসছে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা।

ক্ষিতীশ

তার মানে?

বাঁশরী

দুই সখী। ছাড়াছাড়ি হবার জো নেই। বন্ধুত্বের উপাধি পরীক্ষায় ঐ নাম পেয়েছে, আসল নামটা ভুলেছে সবাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(দুই সখীর প্রবেশ)

১

আজ সুষমার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট, মনে করতে কেমন লাগে।

২

সব মেয়েরই এন্‌গেজ্‌মেণ্টে মন খারাপ হয়ে যায়।

১

কেন?

২

মনে হয় দড়ির উপরে চলছে, থর্ থর্ করে কাঁপছে সুখ দুঃখের মাঝখানে। মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ভয় করে।

১

তা সত্যি। আজ মনে হচ্চে যেন নাটকের প্রথম অঙ্কের ড্রপ্‌সীন্ উঠল। নায়ক নায়িকাও তেমনি, নাট্যকার নিজের হাতে সাজিয়ে চালান করেছেন রঙ্গভূমিতে। রাজা সোমশঙ্করকে দেখলে মনে হয় টডের রাজস্থান থেকে বেরিয়ে এল দুশো তিনশো বছর পেরিয়ে।

২

দেখিস্‌নি, প্রথম যখন এলেন রাজাবাহাদুর। খাঁটি মধ্যযুগের; ঝাঁক্‌ড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলা কথা খুব বাঁকা। পড়লেন বাঁশরীর হাতে, হোলো ওঁর নতুন সংস্করণ। দেখতে দেখতে যে রকম রূপান্তর ঘটল, কারো সন্দেহ ছিল না ওঁর গোত্রান্তর ঘটবে বাঁশরীর গুষ্টিতেই। বাপ প্রভুশঙ্কর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকের কবল থেকে নিয়ে গেলেন সরিয়ে।

বাঁশরীর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ঐ পুরন্দর সন্ন্যাসী, সব ক-টা বেড়া ডিঙিয়ে রাজার ছেলেকে টেনে নিয়ে এলেন এই ব্রাহ্মসমাজের আঙটি বদলের সভায়। সব চেয়ে কঠিন বেড়া স্বয়ং বাঁশরীর।

(সুষমার বিধবা মা বিভাসিনীর প্রবেশ। স্বল্পজলা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর পড়ে যে রকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা। শিথিল-বিস্তারিত দেহ, কিছু মাংসবহুল, তবু চাপা পড়েনি যৌবনের ধারাবশেষ।)

বিভাসিনী

বসে বসে কী ফিস্‌ ফিস্‌ করছিস্‌ তোরা?

১

মাসি, লোকজন আসবার সময় হোলো, সুষমার দেখা নেই কেন?

বিভাসিনী

কী জানি, হয়তো সাজগোজ চলছে। তোরা চল্‌ বাছা চায়ের টেবিলের কাছে, অতিথিদের খাওয়াতে হবে।

১

যাচ্ছি মাসি, ওখানে এখনো রোদ্দুর।

বিভাসিনী

যাই দেখি গে সুষমা কী কর্‌ছে! তাকে এখানে তোরা কেউ দেখিস নি?

২

না মাসি।

বিভাসিনী

কে যে বললে, ঐ পুকুরটার ধারে এসেছিল।

১

না, এতক্ষণ আমরাই ওখানে বেড়াচ্ছিলুম।

(বিভাসিনীর প্রস্থান।)

২

চেয়ে দেখ্‌ ভাই, তোদের সুধাংশু কী খাটুনিই খাটছে। নিজের খরচে ফুল কিনে এনে টেবিল সাজিয়েছে নিজের হাতে। কাল এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। নেপু বিশ্বাস মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল সুষমা টাকার লোভে এক বুনো রাজাকে বিয়ে করছে।

১

নেপু বিশ্বেস! ওর মুখ বাঁকবে না? বুকের মধ্যে যে ধনুষ্টঙ্কার! আজকাল সুষমাকে নিয়ে ছেলেদের দলে বুক জ্বলুনির লঙ্কাকাণ্ড। ঐ সুধাংশুর বুকখানা যেন মানোয়ারি জাহাজের বয়লার ঘরের মতো হয়ে উঠেছে।

২

সুধাংশুর তেজ আছে, যেমন শোনা নেপুর কথা অমনি তাকে পেড়ে ফেল্‌লে মাটিতে, বুকের উপর চেপে বসে বললে, মাপ চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

১

দারুণ গোঁয়ার, ওর ভয়ে পেট ভরে কেউ নিন্দে করতেও পারে না। বাঙালির ছেলেদের বিষম কষ্ট।

২

জানিসনে আমাদের পাড়ায় বসেছে হতাশের সমিতি। লোকে যাদের বলে সুষমাভক্ত সম্প্রদায়, সৌষমিক যাদের উপাধি, তারা নাম নিয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার দল। নিশেন বানিয়েছে, তাতে ভাঙাকুলোর চিহ্ন। সন্ধ্যাবেলায় কী চেঁচামেচি। পাড়ার গেরস্তরা বল্‌ছে কাউন্সিলে প্রস্তাব তুলবে আইন করে ধরে ধরে অবিলম্বে সব ক-টার জীবন্ত সমাধি অর্থাৎ বিয়ে দেওয়া চাই। নইলে রাত্তিরে ভদ্রলোকদের ঘুম বন্ধ। পাব্লিক-ন্যুসেন্স যাকে বলে।

১

এই লোকহিতকর কার্য্যে তুই সাহায্য করতে পারবি প্রিয়।

২

দয়াময়ী, লোকহিতৈষিতা তোমারও কোনো মেয়ের

চেয়ে কম নয় ভাই। লক্ষ্মীছাড়ার ঘার লক্ষ্মী স্থাপন করবার সখ আছে তোমার। আন্দাজে তা বুঝতে পারি। অছু, ঐ লোকটাকে চিনিস ?

১

কখনো তো দেখিনি।

২

ক্ষিতীশবাবু। গল্প লেখে, খুব নাম। বাঁশরী দামী জিনিষের বাজার দর বোঝে। ঠাট্টা করলে বলে—ঘোলের সাধ দুধে মেটাচ্ছি, মুক্তার বদলে শুক্তি।

১

চল ভাই, সবাই এসে পড়ল। আমাদের একত্র দেখলে ঠাট্টা করবে। (উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাগানের কোণে তিনটে ঝাউগাছ চক্র করে দাঁড়িয়ে। তলায় কাঠের আসন। সেই নিভৃতে ক্ষিতীশ। অন্যত্র নিমন্ত্রিতের দল কেউবা আলাপ করছে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে, কেউবা খেলছে টেনিস্‌. কেউবা টেবিলে সাজানো আহার্য্য ভোগ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।)

শচীন

আই সে, তারক, লোকটা আমাদের এলাকায় পিল্‌পেগাড়ি করেছে, এর পরে পার্মমেণ্ট টেন্যুরের দাবী করবে। উচ্ছেদ করতে ফৌজদারী।

তারক

কার কথা বলছ ?

শচীন

ঐ যে নববার্ত্তা কাগজের গল্প-লিখিয়ে ক্ষিতীশ।

তারক

ওর লেখা একটাও পড়িনি, সেইজন্যে অসীম শ্রদ্ধা করি।

শচীন

পড়নি ওর নূতন বই 'বেমানান' ? বিলিতি-মার্কা সভ্য বাঙালিকে মুচড়ে মুচড়ে নিংড়েছে।

অরুণ

দূরে বসে কলম চালিয়েছে, ভয় ছিল না মনে। কাছে এসেছে এইবারে বুঝবে, নিংড়ে ধবধবে সাদা করতে পারি আমরাও। তারপরে চড়াতে পারি গাধার পিঠে।

অর্চ্চনা

ওর ছোঁওয়া বাঁচাতে চাও তোমরা, ওরই ভয় তোমাদের ছোঁওয়াকে। দেখছ না দূরে বসে আইডিয়ার ডিমগুলোতে তা দিচ্চে।

সতীশ

ও হোলো সাহিত্যরথী, আমরা পায়ে হাঁটা পেয়াদা, মিলন ঘটবে কী উপায়ে ?

শচীন

ঘটকী আছেন স্বয়ং তোমার বোন বাঁশরী। হাই-ব্রো দার্জ্জিলিং আর ফিলিষ্টাইন্‌ সিলিগুড়ি এর মধ্যে উনি রেললাইন পাতছেন। এখানে ক্ষিতীশের নেমতন্ন তাঁরি চক্রান্তে।

সতীশ

তাই নাকি ! তাহোলে ভগবানের কাছে হতভাগার আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি। আমার বোনকে এখনো চেনেন না।

শৈলবালা

তোমরা যা-ই বল, আমার কিন্তু ওর উপরে মায়া হয়।

সতীশ

কোন গুণে ?

শৈল

চেহারাতে। শুনেছি ছেলেবেলায় মায়ের বঁটির উপর পড়ে গিয়ে কপালে চোট লেগেছিল, তাই ঐ মস্ত কাটা দাগ। শরীরের খুঁৎ নিয়ে ওকে যখন ঠাট্টা কর, আমার ভালো লাগে না।

শচীন

মিস্‌ শৈল, বিধাতা তোমাকে নিখুঁৎ করেছেন তাই এত করুণা। কলির কোপ আছে যার চেহারায়, সে বিধাতার অকৃপার শোধ তুলতে চায় বিশ্বের উপর। তার হাতে কলম যদি সরু করে কাটা থাকে তাহোলে শত হস্ত দূরে থাকা শ্রেয়। ইংরেজ কবি পোপের কথা মনে রেখো।

শৈল

আহা, তোমরা বাড়াবাড়ি করছ।

সতীশ

শৈল, তোমার দরদ দেখে নিজেরই কপালে বঁটি

মারতে ইচ্ছে করছে। শাস্ত্রে আছে মেয়েদের দয়া আর ভালোবাসা থাকে একমহলে, ঠাঁই বদল করতে দেরি হয় না।

শচীন

তোমার ভয় নেই সতীশ, মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।

শৈল

আমাকে তাড়াতে চাও এখান থেকে।

শচীন

সতীশ সেই অপেক্ষাই করছে। ও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

শৈল

রাগিয়ো না বলছি, তাহোলে তোমার কথাও ফাঁস করে দেব।

শচীন

জেনে নাও বন্ধুগণ, আমারও ফাঁস করবার যোগ্য খবর আছে।

সতীশ

মিস্ বাণী, দেখছ লোকটার স্পর্দ্ধা। গুজবটাকে ঠেলে আনছে তোমার দিকে। পাশ কাটাতে না পারলে এক্সিডেণ্ট্ অনিবার্য্য।

লীলা

মিস্ বাণীকে সাবধান করতে হবে না। ও জানে তাড়া লাগালেই বিপদকে খেদিয়ে আনা হয়। তাই চুপচাপ আছে, কপালে যা থাকে। ঐ যে কী গানটা, "বলেছিল ধরা দেব না।"

গান

বলেছিল ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয়নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তারপরে শেষে কী যে হোলো কার,
কোন দশা হোলো জয় পতাকার,
কেউ বলে জিৎ, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।

অর্চ্চনা

আঃ কেন তোরা বাণীকে নিয়ে পড়েছিস। ও এখনি কেঁদে ফেলবে। সুষীমা, যা তো ক্ষিতীশবাবুকে ডেকে আন চা খেতে।

লীলা

হায়রে কপাল! মিথ্যে ডাকবে, চোখ নেই দেখতে পাও না!

সতীশ

কেন দেখবার কী আছে?

লীলা

ঐ যে, এণ্ডি চাদরের কোণে মস্ত একটা কালীর দাগ। ভেবেছেন চাপা দিয়েছেন কিন্তু ঝুলে পড়েছে।

সতীশ

আচ্ছা চোখ যা হোক তোমার।

লীলা

বোমা তদন্তে পুলিশ না এলে ওঁকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সতীশ

আমার কিন্তু ভয় হয়, কোনদিন বাঁশরী ঐ জখমি মানুষকে বিয়ে করে পরিবারের মধ্যে আতুরাশ্রম খুলে বসে।

লীলা

কী বল তার ঠিক নেই। বাঁশরীর জন্যে ভয়! ওর একটা গল্প বলি, ভয় ভাঙবে শুনে। আমি উপস্থিত ছিলুম।

শচীন

কী মিছে তাস খেলছ তোমরা! এসো এখানে, গল্প-লিখিয়ের উপর গল্প! সুরু করো।

লীলা

সোমশঙ্কর হাত-ছাড়া হবার পরে বাঁশরীর সখ গেল নখী দন্তী গোছের একটা লেখক পোষবার। হঠাৎ দেখি জোটাল কোথা থেকে আস্ত একজন কাঁচা সাহিত্যিক। সেদিন উৎসাহ পেয়ে লোকটা শোনাতে এসেছে একটা নূতন লেখা। জয়দেব পদ্মাবতীকে নিয়ে তাজা গল্প। জয়দেব দূর থেকে ভালোবাসে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে। রাজবধূর যেমন রূপ তেমনি সাজসজ্জা, তেমনি বিদ্যেসাধ্যি। অর্থাৎ একালে জন্মালে সে হোতো ঠিক তোমারি মতো শৈল। এদিকে জয়দেবের স্ত্রী বোলো আনা গ্রাম্য, ভাষায় পানা পুকুরের গন্ধ, ব্যবহারটা প্রকাশ্যে বর্ণনা করবার মতো নয়, যে সব তার

বীভৎস প্রবৃত্তি, ড্যাশ্ দিয়ে ফুট্‌কি দিয়েও তার উল্লেখ চলে না। লেখক শেষকালটায় খুব কালো কালীতে দেগে প্রমাণ করেছে যে, জয়দেব স্রব্, পদ্মাবতী মেকি, একমাত্র খাঁটি সোনা মন্দাকিনী। বাঁশরী চৌকি ছেড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে বলে উঠল, "মাস্‌টর্‌পীস্!" ধন্যিমেয়ে! একেবারে সার্‌লাইম্ ন্যাকামি!

শচীন

মানুষটা চুপ্‌সে চ্যাপ্টা হয়ে গেল বোধ হয়।

লীলা

উল্টো। বুক উঠল ফুলে। বললে, "শ্রীমতি বাঁশরী, মাটি খোঁড়বার কোদালকে আমি খনিত্র নাম দিয়ে শুদ্ধ করে নিইনে, তাকে কোদালই বলি।" বাঁশরী বলে উঠল, "তোমার খেতাব হওয়া উচিত—নব্যসাহিত্যের পূর্ণচন্দ্র, কলঙ্কগর্ব্বিত।" ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় যেন আতস বাজির মতো।

শচীন

এটাও লোকটার গলা দিয়ে গলল? বাধল না?

লীলা

একটুও না। চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভাবল, আশ্চর্য্য করেছি, এবার মুগ্ধ করে দেব। বললে, "শ্রীমতী বাঁশরী, আমার একটা থিয়োরী আছে। দেখে নেবেন একদিন ল্যাবরেটারীতে তার প্রমাণ হবে। মেয়েদের জৈবকণায় যে এনার্জ্জি থাকে সেটা ব্যাপ্ত সমস্ত পৃথিবীর মাটিতে। নইলে পৃথিবী হোতো বন্ধ্যা।" আমাদের সর্দ্দার নেকি শুনেই এতখানি চোখ করে বললে, "মাটিতে! বলেন কী ক্ষিতীশবাবু! মেয়েদের মাটি করবেন না। মাটি তো পুরুষ। পঞ্চভূতের কোঠায় মেয়ে যদি কোথাও থাকে সে জলে। নারীর সঙ্গে মেলে বারি। স্থূল মাটিতে সূক্ষ্ম হয়ে সে প্রবেশ করে, কখনো আকাশ থেকে নামে বৃষ্টিতে, কখনো মাটির তলা থেকে ওঠে ফোয়ারায়, কখনো কঠিন হয় বরফে, কখনো ঝরে পড়ে ঝরণায়।" যা বলিস ভাই শৈল, বাঁশি কোথা থেকে কথা আনে জুটিয়ে, ভগীরথের গঙ্গার মতো, হাঁপ ধরিয়ে দিতে পারে ঐরাবত হাতিটাকে পর্য্যন্ত।

শচীন

ক্ষিতীশ সেদিন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছিল বলো!

লীলা

সম্পূর্ণ! বাঁশি আমার দিকে ফিরে বললে, "তুই তো এম্-এস্-সিতে বায়ো-কেমেষ্ট্রী নিয়েছিস্, শুনলি তো? বিশ্বে রমণীর রমণীয়তা যে অংশে, সেইটাকে কেটে ছিঁড়ে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে হাইড্রলিক্ প্রেস্ দিয়ে দলিয়ে সল্‌ফ্যুরিক্ এসিড্ দিয়ে গলিয়ে তোকে রিসর্চ্চে লাগতে হবে।" দেখো একবার দুষ্টুমি, আমি কোনো কালে বায়োকেমেষ্ট্রি নিইনি। ওর পোষা জীবকে নাচাবার জন্তে চাতুরী। তাই বলছি ভয় নেই, মেয়েরা যাকে গাল দেয় তাকেও বিয়ে করতে পারে কিন্তু যাকে বিদ্রূপ করে তাকে নৈব নৈবচ। সব শেষে বোকাটা বললে, "আজ স্পষ্ট বুঝলুম পুরুষ তেমনি করেই নারীকে চায় যেমন করে মরুভূমি চায় জলকে, মাটির তলার বোবা ভাবাকে উদ্ভিদ করে তোলবার জন্যে"। এত হেসেছি!

তারক

তুমি তো ঐ বললে। আমি একদিন ক্ষিতীশের তালি-দেওয়া মুখ নিয়ে একটু ঠাট্টার আভাস দিয়েছিলেম। বাঁশরী বলে উঠলেন, "দেখো লাহিড়ি, ওর মুখ দেখতে আমার পজিটিভ্‌লি ভালো লাগে।" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললেম, "তাহোলে মুখখানা বিশুদ্ধ মডার্ন্ আর্ট্। বুঝতে ধাঁধাঁ লাগে।" ওর সঙ্গে কথায় কে পারবে—ও বললে, "বিধাতার তুলীতে অসীম সাহস। যাকে ভালো দেখতে করতে চান তাকে সুন্দর দেখতে করা দরকার বোধ করেন না। তাঁর মিষ্টান্ন ছড়ান ইতর লোকদেরই পাতে।" বাই জোভ্, সূক্ষ্ম বটে।

শৈলজা

আর কি কোনো কথা নেই তোমাদের? ক্ষিতীশবাবু শুনতে পাবেন যে।

সতীশ

ভয় নেই, ওখানে ফোয়ারা ছুটছে, বাতাস উল্টোদিকে, শোনা যাবে না।

অর্চ্চনা

আচ্ছা তোমরা সব তাস খেলো, টেনিস্ খেলতে যাও, ওই মানুষটার সঙ্গে হিসেব চুকিয়ে আসি গে।

(অর্চ্চনা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে গেল ক্ষিতীশের কাছে। দোহারা

গড়নের দেহ, সাজে সজ্জায় কিছু অযত্ন আছে, হাসিখুসি ঢলঢলে মুখ, আয়ু পশ্চিমের দিকে এক ডিগ্রি হেলেছে।)

অর্চ্চনা

ক্ষিতীশবাবু, পালিয়ে বসে আছেন আমাদের কাছ থেকে তার মানে বুঝতে পারি কিন্তু খাবার টেবিলটাকে অস্পৃশ্য করলেন কোন দোষে? নিরাকার আইডিয়ায় আপনারা অভ্যস্ত, নিরাহার ভোজেও কি তাই? আমরা বঙ্গনারী বঙ্গসাহিত্যের সেবার ভার পেয়েছি যে দিকটাতে, সে দিকে আপনাদের পাকযন্ত্র।

ক্ষিতীশ

দেবী, আমরা জোগাই রসাত্মক বাক্য, তা নিয়ে তর্ক ওঠে, আপনারা দেন রসাত্মক বস্তু; ওটা অন্তরে গ্রহণ করতে মতান্তর ঘটে না।

অর্চ্চনা

কী চমৎকার! আমি যখন থালায় কেক সন্দেশ গোছাচ্ছিলুম আপনি ততক্ষণ কথাটা বানিয়ে নিচ্ছিলেন। সাতজন্ম উপোষ করে থাকলেও আমার মুখ দিয়ে এমন ঝকঝকে কথাটা বেরোত না। তা যাকগে, পরিচয় নেই, তবু এলুম কাছে, কিছু মনে করবেন না। পরিচয় দেবার মতো নেই বিশেষ কিছু। বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জে যাবার ভ্রমণবৃত্তান্তও কোনো মাসিকপত্রে আজ পর্য্যন্ত ছাপাইনি। আমার নাম অর্চ্চনা সেন। ঐ যে অপরিচিত ছোটো মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বেড়াচ্চে আমি তারি অখ্যাত কাকী।

ক্ষিতীশ

এবার তাহোলে আমার পরিচয়টা—

অর্চ্চনা

বলেন কী। পাড়াগেঁয়ে ঠাওরালেন আমাকে? শেয়ালদ ষ্টেশনে কি গাইড্ রাখতে হয় চেঁচিয়ে জানাতে যে কলকাতা সহরটা রাজধানী! এই পরশুদিন পড়েছি আপনার "বেমানান" গল্পটা। পড়ে হেসে মরি আর কি। ওকী! প্রশংসা শুনতে আজও আপনার লজ্জা বোধ হয়? খাওয়া বন্ধ করলেন যে? আচ্ছা সত্যি বলুন, নিশ্চয় ঘরের লোক কাউকে লক্ষ্য করে লিখেছেন। রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বানানো যায় না। ঐ যে, কে-জায়গাটাতে মিস্টার্ কিরেণ গাপ্টা বি-এ ক্যান্টাব্, মিস্ লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাঁক দিয়ে আঙুটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাসীর দাবী করে হোহা বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, ম্যাচ্‌লেস্,—বঙ্গ-সাহিত্যে এ জায়গাটার দেশলাই মেলে না, একটু পোড়া কাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়লিস্‌টিক্ ক্ষিতীশবাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

ক্ষিতীশ

আমাদের দু-জনের মধ্যে কে বেশি ভয়ঙ্কর, বিচার করবেন বিধাতাপুরুষ।

অর্চ্চনা

না, ঠাট্টা করবেন না। সিঙাড়াটা শেষ করে ফেলুন। আপনি ওস্তাদ, ঠাট্টায় আপনার সঙ্গে পারব না। মোষ্ট্ ইণ্টারেস্‌টিং আপনার বইখানা। এমন সব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ যে মেয়েটা কী তার নাম—কথায় কথায় হাঁপিয়ে উঠে বলে, মাই আইজ্, ও গড্—লাজুক ছেলে ন্যাণ্ডেলের সঙ্কোচ ভাঙবার জন্যে নিজে মোটর হাঁকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেললে খাদে, মৎলব ছিল ন্যাণ্ডেলকে দুই হাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হ'বি তো হ' ন্যাণ্ডেলের হাতে হোলো কম্পউণ্ড ফ্র্যাক্‌চার। কী ড্রামাটিক্, রিয়ালিজমের চূড়ান্ত! ভালোবাসার এত বড়ো আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিল না। ভেবে দেখুন, সুভদ্রার কত বড়ো চান্স্ মারা গেল, আর অর্জ্জুনেরও কব্জি গেল বেঁচে।

ক্ষিতীশ

কম মডার্ন্ নন আপনি। আমার মতো নির্লজ্জকেও লজ্জা দিতে পারেন।

অর্চ্চনা

দোহাই ক্ষিতীশবাবু, বিনয় করবেন না। আপনি নির্লজ্জ! লজ্জায় গলা দিয়ে সন্দেশ গলছে না। কলমটার কথা স্বতন্ত্র।

লীলা

(কিছু দূর থেকে) অর্চ্চনা মাসি, সময় হয়ে এল ডাক পড়েছে।

অর্চনা

(জনান্তিকে) লীলা, আধমরা করেছি, বাকিটুকু তোর হাতে।

(অর্চনার প্রস্থান।)

(লীলা সাহিত্যে ফার্স্ট্‌ক্লাশ্‌ এম্‌-এ ডিগ্রি নিয়ে আবার সায়েন্স্‌ ধরেছে। রোগা শরীর, ঠাট্টা তামাসায় তীক্ষ্ণ—সাজগোজে নিপুণ, কটাক্ষে দেখবার অভ্যাস।)

লীলা

ক্ষিতীশবাবু নমস্কার! আপনি 'সর্ব্বত্র পূজ্যতে'র দলে। লুকোবেন কোথায়, পূজারী আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের গরজে। এনেছি অটোগ্রাফের খাতা। সুযোগ কি কম! কী লিখলেন দেখি?

"অন্ত সকলের মতো নয় যে-মানুষ তার মার অন্ত-সকলের হাতে।" চমৎকার, কিন্তু প্যাথেটিক্‌। মারে ঈর্ষা করে। মনে রাখবেন, ছোটো যারা তাদের ভক্তিরই একটা ইডিয়ম্‌ ঈর্ষা, মারটা তাদের পূজা।

ক্ষিতীশ

বাগ্বাদিনীর জাতই বটে, কথায় আশ্চর্য্য করে দিলেন।

লীলা

বাচস্পতির জাত যে আপনারা। যেটা বললেম ওটা কোটেশন্‌। পুরুষের লেখা থেকেই। আপনাদের প্রতিভা বাক্য-রচনায়, আমাদের নৈপুণ্য বাক্য প্রয়োগে। ওরিজিন্যালিটি আপনার বইএর পাতায় পাতায়। সেদিন আপনারই লেখা গল্পের বই পড়লেম। ব্রীলিয়েন্ট্‌। ঐ যে যাতে একজন মেয়ের কথা আছে, সে যখন দেখলে স্বামীর মন আরেক জনের উপরে, বানিয়ে চিঠি লিখলে, স্বামীর কাছে প্রমাণ করে দিলে যে সে ভালোবাসে তাদের প্রতিবেশী বামনদাসীকে। আশ্চর্য্য সাইকলজির ধাঁধা। বোঝা শক্ত স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার এই ফন্দী, না, তাকে নিষ্কৃতি দেবার ঔদার্য্য।

ক্ষিতীশ

না না আপনি ওটা—

লীলা

বিনয় করবেন না। এমন ওরিজিন্যাল্‌ আইডিয়া, এমন ঝকঝকে ভাষা, এমন চরিত্রচিত্র আপনার আর কোনো লেখায় দেখিনি। আপনার নিজের রচনাকেও বহদূরে ছাড়িয়ে গেছেন। ওতে আপনার মুদ্রাদোষ-গুলো নেই, অথচ—

ক্ষিতীশ

ভুল করছেন আপনি। 'রক্তজবা'—ও বইটা যতীন ঘটকের।

লীলা

বলেন কী! ছি, ছি, এমন ভুলও হয়! যতীন ঘটককে যে আপনি রোজ দু-বেলা গাল দিয়ে থাকেন। আমার একী বুদ্ধি! মাপ করবেন আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ। আপনার জন্তে আর এক পেয়ালা চা পাঠিয়ে দিচ্চি—রাগ করে ফিরিয়ে দেবেন না।

(লীলার প্রস্থান।)

(রাজা বাহাদুর সোমশঙ্করের প্রবেশ। রাজবংশিক চেহারা "শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ" রৌদ্রে পুড়ে ঈষৎ ম্লান গৌরবর্ণ, ভারী মুখ, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচ্‌কান, সাদা মস্‌লিনের পাগ্‌রাবী কায়দার পাগড়ি, শুঁড়তোলা সাদা নাগরা জুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।)

সোমশঙ্কর

ক্ষিতীশবাবু, বসতে পারি কি?

ক্ষিতীশ

নিশ্চয়।

সোমশঙ্কর

আমার নাম সোমশঙ্কর সিং। আপনার নাম শুনেছি মিস্‌ বাঁশরীর কাছ থেকে। তিনি আপনার ভক্ত।

ক্ষিতীশ

বোঝা কঠিন। অন্তত ভক্তিটা অবিমিশ্র নয়। তার থেকে ফুলের অংশ ঝরে পড়ে, কাঁটাগুলো দিনরাত থাকে বিঁধে।

সোমশঙ্কর

আমার দুর্ভাগ্য আপনার বই পড়বার অবকাশ পাইনি। তবু আমাদের এই বিশেষ দিনে আপনি এখানে এসেছেন, বড়ো কৃতজ্ঞ হলুম। কোনো এক সময়ে আমাদের শম্ভুগড়ে আসবেন এই আশা রইল। জায়গাটা আপনার মতো সাহিত্যিকের দেখবার যোগ্য।

বাঁশরী

(পিছন থেকে এসে) ভুল বলছ, শঙ্কর, যা চোখে

দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওঁর চোখ উল্টো দিকে। সে কথা যাক। শঙ্কর ব্যস্ত হোয়ো না। এখানে আজ আমার নেমন্তন্ন ছিল না। ধরে নিচ্ছি সেটা আমার গ্রহের ভুল নয় গৃহকর্ত্তাদেরই ভুল। সংশোধন করতে এলুম। আজ সুষমার সঙ্গে তোমার এন্‌গেজ্‌মেণ্টের দিন অথচ এ সভায় আমি থাকব না এ হোতেই পারে না। খুসী হওনি অনাহূত এসেছি বলে?

সোমশঙ্কর

খুব খুসী হয়েছি, সে কি বলতে হবে?

বাঁশরী

সেই কথাটা ভালো করে বলবার জন্তে একটু বোসো এখানে। ক্ষিতীশ, ঐ চাঁপা গাছটার তলায় কিছুক্ষণ অদ্বিতীয় হয়ে থাকোগে। আড়ালে তোমার নিন্দে করব না।

(ক্ষিতীশের প্রস্থান।)

শঙ্কর, সময় বেশি নেই, কাজের কথাটা সেরে এখনি ছুটি দেব। তোমার নূতন এন্‌গেজ্‌মেণ্টের রাস্তায় পুরোনো জঞ্জাল কিছু জমে আছে। সাফ করে ফেললে সুগম হবে পথ। এই নাও।

(বাঁশরী রেশমের থলি থেকে একটা পান্নার কণ্ঠী, হীরের ব্রেস্‌লেট্‌, মুক্তোবসানো ব্রোচ বের করে দেখিয়ে আবার থলিতে পুরে সোমশঙ্করের কোলে ফেলে দিলে।)

সোমশঙ্কর

বাঁশি, তুমি জান আমার মুখে কথা জোগায় না। যা বলতে পারলেম না তার মানে নিজে বুঝে নিয়ো।

বাঁশরী

সব কথাই আমার জানা, মানে আমি বুঝি। এখন যাও, তোমাদের সময় হোলো।

সোমশঙ্কর

যেয়ো না বাঁশি। ভুল বুঝো না আমাকে। আমার শেষ কথাটা শুনে যাও। আমি জঙ্গলের মানুষ। সহরে এসে কলেজে পড়ার আরম্ভের মুখে প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা। সে দৈবের খেলা। তুমিই আমাকে মানুষ করে দিয়েছিলে, তার দাম কিছুতেই শোধ হবে না। তুচ্ছ এই গয়নাগুলো।

বাঁশরী

আমার শেষ কথাটা শোনো শঙ্কর। আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন জাগা অরুণ রঙের দিগন্তে। ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে, তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম। আত্ম-পরিচয় ঘটল। বাস্‌, তুইপক্ষে হয়ে গেল শোধবোধ। এখন তু-জনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম। আর কী চাই।

সোমশঙ্কর

বাঁশি, যদি কিছু বলতে যাই নির্ব্বোধের মতো বলব। বুঝলুম আমার আসল কথাটা বলা হবে না কোনো-দিনই। আচ্ছা তবে থাক্‌। অমন চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন? মনে হচ্চে তুই চোখ দিয়ে আমাকে লুপ্ত করে দেবে।

বাঁশরী

আমি তাকিয়ে দেখছি একশো বছর পরেকার যুগান্তে। সে দিকে আমি নেই, তুমি নেই, আজকের দিনের অন্ত কেউ নেই। ভুল বোঝার কথা বলছ! সেই ভুল বোঝার উপর দিয়ে চলে যাবে কালের রথ। ধুলো হয়ে যাবে, সেই ধুলোর উপরে বসে খেলা করবে তোমার নাতি নাৎনীরা। সেই নির্ব্বিকার ধুলোর হোক জয়।

সোমশঙ্কর

এ গয়নাগুলোর কোথাও স্থান রইল না; যাক তবে। (ফেলে দিলে ফোয়ারার জলাশয়ে।)

(সুষমার বোন সুষীমার প্রবেশ। ফ্রকপরা, চষমা চোখে, বেণী দোলানো, দ্রুতপদে-চলা এগারো বছরের মেয়ে।)

সুষীমা

সন্ন্যাসী-বাবা আসছেন শঙ্করদা। তোমাকে ডেকে পাঠালেন সবাই। তুমি আসবে না বাঁশিদিদি?

বাঁশরী

আসব বৈ কি, আসার সময় হোক আগে। (সোমশঙ্কর ও সুষীমার প্রস্থান) ক্ষিতীশ, শুনে যাও। চোখ আছে? দেখতে পাচ্চ কিছু কিছু?

ক্ষিতীশ

রঙ্গভূমির বাইরে আমি। আওয়াজ পাচ্চি, রা[illegible] পাচ্চিনে।

বাঁশরী

বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলে[illegible]

নিজের জোরে, আলকাৎরা ঢেলে। এখানে পুতুল-নাচের রাস্তাটা বের করতে তোমারো অফীশিয়াল্ গাইড্ চাই! লোকে হাসবে যে!

ক্ষিতীশ

হাসুক না। রাস্তা না পাই, অমন গাইড্‌কে তো পাওয়া গেল।

বাঁশরী

রসিকতা! সস্তা মিষ্টান্নের ব্যবসা! এজন্যে ডাকিনি তোমাকে! সত্যি করে দেখতে শেখো, সত্যি করে লিখতে শিখবে। চারিদিকে অনেক মানুষ আছে, অনেক অমানুষও আছে, ঠাহর করলেই চোখে পড়বে। দেখো দেখো ভালো করে দেখো।

ক্ষিতীশ

নাই বা দেখলেম, তোমার তাতে কী?

বাঁশরী

নিজে লিখতে পারি নে যে ক্ষিতীশ। চোখে দেখি, মনে বুঝি, স্বর বন্ধ, ব্যর্থ হয় যে সব। ইতিহাসে বলে, একদিন বাঙালি কারিগরদের বুড়ো আঙুল দিয়েছিল কেটে। আমিও কারিগর, বিধাতা বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছেন। আমদানি করা মালে কাজ চালাই, পরখ করে দেখতে হয় সেটা সাঁচ্চা কি না। তোমরা লেখক, আমাদের মতো কলম-হারাদের জন্যেই কলমের কাজ তোমাদের।

(সুষমার প্রবেশ। দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রং যাকে বলে কনকগৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।)

সুষমা

(ক্ষিতীশকে নমস্কার করে) বাঁশি, কোণে লুকিয়ে কেন?

বাঁশরী

কুণো সাহিত্যিককে বাইরে আনবার জন্য। খনির সোনাকে শাণে চড়িয়ে তার চেক্‌নাই বের করতে পারি, আগে থাকতেই হাতযশ আছে। জহরৎকে দামী করে তোলে জহরী, পরের ভোগেরই জন্য, কী বলো? সুষী, ইনিই ক্ষিতীশবাবু, জান বোধ হয়।

সুষমা

জানি বৈ কি। এই সেদিন পড়ছিলুম ওঁর 'বোকার বুদ্ধি' গল্পটা। কাগজে কেন এত গাল দিয়েছে বুঝতে পারলুম না।

ক্ষিতীশ

অর্থাৎ বইখানা গাল দেবার যোগ্য এতই কি ভালো!

সুষমা

ও রকম ধারালো কথা বলবার ভার বাঁশরী আর ঐ আমার পিস্‌তুতো বোন লীলার উপরে। আপনাদের মতো লেখকের বই সমালোচনা করতে ভয় করি, কেননা তাতে সমালোচনা করা হয় নিজেরই বিদ্যে বুদ্ধির। অনেক কথা বুঝতেই পারিনে। বাঁশরীর কল্যাণে আপনাকে কাছে পেয়েছি, দরকার হোলে বুঝিয়ে নেব।

বাঁশরী

ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল্ হিস্ট্রী লেখেন গল্পের ছাঁচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রং লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানী সমুদ্রের ওপার থেকে। দেখে দয়া হোলো। বললুম জীব জন্তুর সাইকলজির খোঁজে গুহা গহ্বরে যেতে যদি খরচে না কুলোয় অন্তত জুয়োলজিকালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে দোষ কী?

সুষমা

তাই বুঝি এনেছ এখানে?

বাঁশরী

পাপমুখে বলব কী করে? তাই তো বটে! ক্ষিতীশবাবুর হাত পাকা, মাল মশলাও পাকা হওয়া চাই। যথাসাধ্য জোগাড় দেবার মজুরগিরি করছি।

সুষমা

ক্ষিতীশবাবু, একটু অবকাশ করে নিয়ে আমাদের ওদিকে যাবেন। মেয়েরা সদ্য আপনার বই কিনে আনিয়েছে সই নেবে বলে। সাহস করছে না কাছে আসতে। বাঁশি, ওঁকে একলা ঘিরে রেখে কেন অভিশাপ কুড়োচ্চ?

বাঁশরী

(উচ্চহাস্যে) সেই অভিশাপই তো মেয়েদের বর।

সে তুমি জান। জয়-যাত্রায় মেয়েদের লুটের মাল প্রতিবেশিনীর ঈর্ষা।

সুষমা

ক্ষিতীশবাবু, শেষ দরবার জানিয়ে গেলুম। গণ্ডি পেরোবার স্বাধীনতা যদি থাকে একবার যাবেন ওদিকে। (সুষমার প্রস্থান)

ক্ষিতীশ

কী আশ্চর্য্য ওঁকে দেখতে! বাঙালি ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। যেন এথীনা, যেন মিনর্ভা, যেন ব্রুন্‌হিল্‌ড্।

বাঁশরী

(তীব্রহাস্তে) হায়রে হায় যত বড়ো দিগ্‌গজ পুরুষই হোক না কেন সবার মধ্যেই আছে আদিম যুগের বর্ব্বর। হাড়-পাকা রিয়লিস্ট্ বলে দেমাক কর, ভাণ কর মন্তর মান না। লাগল মন্তর চোখের কটাক্ষে, একদম উড়িয়ে নিয়ে গেল মাইথলজির যুগে। আজও কচি মনটা রূপকথা আঁকড়িয়ে আছে। তাকে হিঁচড়িয়ে উজোন পথে টানাটানি করে মনের উপরের চামড়াটাকে করে তুলেছ কড়া। দুর্ব্বল বলেই বলের এত বড়াই।

ক্ষিতীশ

সে কথা মাথা হেঁট করেই মানব। পুরুষ জাত দুর্ব্বল জাত।

বাঁশরী

তোমরা আবার রিয়লিস্ট্! রিয়লিস্ট্ মেয়েরা। যত বড়ো স্থূল পদার্থ হও না, যা তোমরা তাই বলেই জানি তোমাদের। পাঁকে ডোবা জলহস্তীকে নিয়ে ঘর যদি করতেই হয় তাকে ঐরাবত বলে রোমান্স্ বানাইনে। রং মাখাইনে তোমাদের মুখে। মাখি নিজে। রূপকথার খোকা সব। ভালো কাজ হয়েছে মেয়েদের! তোমাদের ভোলানো! পোড়া কপাল আমাদের! এথীনা! মিনর্ভা! মরে যাই! ওগো রিয়লিস্ট্, রাস্তায় চলতে যাদের দেখেছ পানওয়ালীর দোকানে, গড়েছ কালো মাটির তাল দিয়ে যাদের মূর্ত্তি, তারাই সেজে বেড়াচ্চে, এথীনা মিনর্ভা।

ক্ষিতীশ

বাঁশি, বৈদিক কালে ঋষিদের কাজ ছিল মন্তর পড়ে দেবতা ভোলানো—যাঁদের ভোলাতেন তাঁদের ভক্তিও করতেন। তোমাদের যে সেই দশা। বোকা পুরুষদের ভোলাও তোমরা আবার পাদোদক নিতেও ছাড় না। এমনি করেই মাটি করলে এই জাতটাকে।

বাঁশরী

সত্যি, সত্যি, খুব সত্যি। ঐ বোকাদের আমরাই বসাই টঙের উপরে, চোখের জলে কাদামাখা পা ধুইয়ে দিই, নিজেদের অপমানের শেষ করি, যত ভোলাই তার চেয়ে ভুলি হাজার গুণে।

ক্ষিতীশ

এর উপায় ?

বাঁশরী

লেখো, লেখো সত্যি করে, লেখো শক্ত করে। মন্তর নয়, মাইথলজি নয়, মিনর্ভার মুখোসটা ফেলে দাও টান মেরে। ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চয্য মেয়েও ভাবা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্চে। সামনে পড়ল পথ-চল্‌তি এক রাজা, সুরু করলে জাদু। কিসের জন্যে? টাকার জন্যে। শুনে রাখো, টাকা জিনিষটা মাইথলজির নয়, ওটা ব্যাঙ্কের, ওটা তোমাদের রিয়লিজ্‌মের কোঠায়।

ক্ষিতীশ

টাকার প্রতি দৃষ্টি আছে সেটা তো বুদ্ধির লক্ষণ, সেই সঙ্গে হৃদয়টাও থাকতে পারে।

বাঁশরী

আছে গো হৃদয় আছে। ঠিক জায়গায় খুঁজলে দেখতে পাবে পানওয়ালীরও হৃদয় আছে। কিন্তু মুনফা একদিকে, হৃদয়টা আর একদিকে। এইটে যখন আবিষ্কার করবে তখনি জমবে গল্পটা। পাঠিকারা ঘোর আপত্তি করবে, বলবে মেয়েদের খেলো করা হোলো. অর্থাৎ তাদের মন্ত্র-শক্তিতে বোকাদের মনে খট্‌কা লাগানো হচ্চে। উঁচু দরের পুরুষ পাঠকও গাল পাড়বে। বল কী, তাদের মাইথলজির রং চটিয়ে দেওয়া! সর্ব্বনাশ! কিন্তু ভয় কোরো না ক্ষিতীশ, র যখন যাবে জলে, মন্ত্র পড়বে চাপা, তখনো সত্য থাকবে টিঁকে, শেলের মতো, শূলের মতো।

ক্ষিতীশ

শ্রীমতী সুষমার হৃদয়ের বর্ত্তমান ঠিকানাটা জানতে পারি কি?

বাঁশরী

ঠিকানা বলতে হবে না, নিজের চোখেই দেখতে পাবে যদি চোখ থাকে। এখন চলো ঐ দিকে। ওরা টেনিস্ খেলা সেরে এসেছে! এখন আইস্‌ক্রীম্ পরিবেষণের পালা। বঞ্চিত হবে কেন? (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(বাগানের একদিক। খাবার-টেবিল ঘিরে বসে আছে তারক, শচীন, সুধাংশু, সতীশ ইত্যাদি)

তারক

বাড়াবাড়ি হচ্চে সন্ন্যাসীকে নিয়ে। নাম পুরন্দর নয় সবাই জানে। আসল নাম ধরা পড়লেই বোকার ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দেশী কি বিদেশী তা নিয়েও মতভেদ। ধর্ম্ম কী জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলে, ধর্ম্মটা এখনো মরেনি তাই তাকে নামের কোঠায় ঠেসে দেওয়া চলে না। সেদিন দেখি আমাদের হিমুকে গল্‌ফ্ শেখাচ্চে। হিমুর জীবাত্মাটা কোনোমতে গল্‌ফের গুলির পিছনেই ছুটতে পারে, তার বেশি ওর দৌড় নেই, তাই সে ভক্তিতে গদ্‌গদ। মিস্‌টীরিয়স্ সাজের নানা মাল-মশলা জুটিয়েছে। আজ ওকে আমি এক্‌স্‌পোজ্ করব সবার সামনে, দেখে নিও।

সুধাংশু

প্রমাণ করবে তোমার চেয়ে যে বড়ো সে তোমার চেয়ে ছোটো!

সতীশ

আঃ সুধাংশু, মজাটা মাটি করিস কেন? পকেট বাজিয়ে ও বলছে ডক্যুমেণ্ট্ আছে। বের করুক না, দেখি কী রকম চীজ সেটা। ঐ যে সন্ন্যাসী, সঙ্গে আসছেন এঁরা সবাই।

(পুরন্দরের প্রবেশ। ললাট উন্নত, জ্বলছে দুই চোখ, ঠোঁটে রয়েছে অনুচ্চারিত অনুশাসন, মুখের স্বচ্ছ রং পাণ্ডুর শ্যাম, অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত দীপ্তিতে ধৌত। দাড়ি গোঁফ কামানো, সুডৌল মাথায় ছোটো করে ছাঁটা চুল, পায়ে নেই জুতো, তসরের ধুতি পরা, গায়ে খয়েরি রঙের ঢিলে জামা। সঙ্গে সুষমা, সোমশঙ্কর, বিভাসিনী।)

শচীন

সন্ন্যাসী ঠাকুর, বলতে ভয় করি, কিন্তু চা খেতে দোষ কী?

পুরন্দর

কিছুমাত্র না। যদি ভালো চা হয়। আজ থাক্, এইমাত্র নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

শচীন

নেমন্তন্ন আপনাকেও? লাঞ্চে না কি? গ্রেট্‌-ইষ্টার্নে বোষ্টমের মোচ্ছব?

পুরন্দর

গ্রেট্‌ইষ্টার্নেই যেতে হয়েছিল। ডাক্তার উইল্‌কক্সের ওখানে।

শচীন

ডাক্তার উইল্‌কক্স্! কী উপলক্ষ্যে?

পুরন্দর

যোগ-বাশিষ্ঠ পড়ছেন।

শচীন

বাস্‌রে! ওহে তারক, এগিয়ে এসো না।—কী যে বলছিলে?

তারক

এই ফটোগ্রাফ্‌টা তো আপনার?

পুরন্দর

সন্দেহ মাত্র নেই।

তারক

মোগলাই সাজ, সামনে গুড়গুড়ি, পাশে দাড়ি-ওয়ালাটা কে? সুস্পষ্ট যাবনিক।

পুরন্দর

রোশেনাবাদের নবাব। ইরাণী বংশীয়। তোমার চেয়ে এঁর আর্য্য রক্ত বিশুদ্ধ।

তারক

আপনাকে কেমন দেখাচ্চে যে!

পুরন্দর

দেখাচ্চে তুর্কির বাদশার মতো। নবাব সাহেব ভালোবাসেন আমাকে, আদর করে ডাকেন মুক্তিয়ার মিঞা, খাওয়ান এক থালায়। মেয়ের বিয়ে ছিল, আমাকে সাজিয়েছিলেন আপন বেশে।

তারক

মেয়ের বিয়েতে ভাগবত পাঠ ছিল বুঝি ?

পুরন্দর

ছিল পোলো খেলার টুর্ণামেন্ট। আমি ছিলুম নবাব সাহেবের আপন দলে।

তারক

কেমন সন্ন্যাসী আপনি ?

পুরন্দর

ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। কোনো উপাধিই নেই, তাই সব উপাধিই সমান খাটে। জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে। তোমার বাবা ছিলেন কাশীতে হরিহর তত্ত্বরত্ন, তিনি আমাকে যে নামে জানতেন সে নাম গেছে ঘুচে। তোমার দাদা রামসেবক বেদান্ত-ভূষণ কিছুদিন পড়েছেন আমার কাছে বৈশেষিক। তুমি তারক লাহিড়ি, তোমার নাম ছিল বুকু, আজ শ্বশুরের সুপারিসে ককস্‌হিল্‌ সাহেবের এটর্ণি অফিসে শিক্ষানবিশ। সাজ বদলেছে তোমার, তারক নামের আদ্যক্ষরটা তবর্গ থেকে টবর্গে চড়েছে। শুনেছি যাবে বিলেতে। বিশ্বনাথের বাহনের প্রতি দয়া রেখো।

তারক

ডাক্তার উইল্‌কক্সের কাছ থেকে কি ইন্ট্রোডাক্‌শন্‌ চিঠি পাওয়া যেতে পারবে ?

পুরন্দর

পাওয়া অসম্ভব নয়।

তারক

মাপ করবেন। (পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম)

বাঁশরী

সুষমার মাষ্টারিতে আজ ইস্তফা দিতে এসেছেন ?

পুরন্দর

কেন দেব ? আরো একটা ছাত্র বাড়ল।

বাঁশরী

সুরু করাবেন মুগ্ধবোধের পাঠ ? মুগ্ধতার তলায় ডুবেছে যে-মানুষটা হঠাৎ তার বোধোদয় হোলে নাড়ী ছাড়বে।

পুরন্দর

(কিছুক্ষণ বাঁশরীর মুখের দিকে তাকিয়ে) বৎসে, একেই বলে ধৃষ্টতা। (বাঁশরী মুখ ফিরিয়ে সরে গেল)

বিভাসিনী

সময় হয়েছে। ঘরের মধ্যে সভা প্রস্তুত, চলুন সকলে।

(সকলের ঘরে প্রবেশ। দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে বাঁশরী থমকে দাঁড়াল।)

ক্ষিতীশ

তুমি যাবে না ঘরে ?

বাঁশরী

সস্তা দরের সদুপদেশ শোনবার সখ আমার নেই।

ক্ষিতীশ

সদুপদেশ !

বাঁশরী

এই তো সুযোগ। পালাবার রাস্তা বন্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের মার।

ক্ষিতীশ

আমি একবার দেখে আসি গে।

বাঁশরী

না। শোনো, প্রশ্ন আছে। সাহিত্য-সম্রাট, গল্পটার মর্ম্ম যেখানে, সেখানে পৌঁছেছে তোমার দৃষ্টি ?

ক্ষিতীশ

আমার হয়েছে অন্ধ-গো-লাঙ্গুল ন্যায়। ল্যাজটা ধরেছি চেপে, বাকিটা টান মেরেছে আমাকে কিন্তু চেহারা রয়েছে অস্পষ্ট। মোট কথাটা এই বুঝেছি যে, সুষমা বিয়ে করবে রাজাবাহাদুরকে, পাবে রাজৈশ্বর্য্য, তার বদলে হাতটা দিতে প্রস্তুত, হৃদয়টা নয়।

বাঁশরী

তবে শোনো বলি। সোমশঙ্কর নয় প্রধান নায়ক, এ কথা মনে রেখো।

ক্ষিতীশ

তাই না কি ? তাহোলে অন্তত গল্পটার ঘাট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তারপরে সাঁৎরিয়ে হোক, খেয়া ধরে হোক পারে পৌঁছব।

বাঁশরী

হয়তো জানো পুরন্দর তরুণ সমাজে বিনা মাইনের মাষ্টারি করেন। পরীক্ষায় উৎরিয়ে দিতে অদ্বিতীয়। কড়া বাছাই করে নেন ছাত্র। ছাত্রী পেতে পারতেন অসংখ্য, কিন্তু বাছাইরীতি এত অসম্ভব কঠিন যে এতদিনে একটি মাত্র পেয়েছেন তাঁর নাম শ্রীমতী সুষমা সেন।

ক্ষিতীশ

ছাত্রী যাদের ত্যাগ করেছেন তাদের কী দশা ?

বাঁশরী

আত্মহত্যার সংখ্যা কত, খবর পাইনি। এটা জানি, তাদের অনেকেই চঞ্চু মেলে চেয়ে আছে উর্দ্ধে।

ক্ষিতীশ

সেই চকোরীর দলে নাম লেখাও নি ?

বাঁশরী

তোমার কী মনে হয় ?

ক্ষিতীশ

আমার মনে হয় চকোরীর জাত তোমার নয়, তুমি মিসেস্ রাহুর পদের উমেদার। যাকে নেবে তাকে দেবে লোপ করে, শুধু চঞ্চু মেলে তাকিয়ে থাকা নয়।

বাঁশরী

ধন্য ! নরনারীর ধাত বুঝতে পয়লা নম্বর, গোল্ড্ মেডালিষ্ট্। লোকে বলে নারী-স্বভাবের রহস্য ভেদ করতে হার মানেন স্বয়ং নারীর সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্ত, কিন্তু তুমি নারীচরিত্রচারণচক্রবর্ত্তী, নমস্কার তোমাকে !

ক্ষিতীশ

(করজোড়ে) বন্দনা সারা হোলো এবার বর্ণনার পালা সুরু হোক।

বাঁশরী

এটা আন্দাজ করতে পারনি যে, সুষমা ঐ সন্ন্যাসীর ভালোবাসায় একেবারে শেষ পর্য্যন্ত তলিয়ে গেছে ?

ক্ষিতীশ

ভালোবাসা, না ভক্তি ?

বাঁশরী

চরিত্রবিশারদ, লিখে রাখো মেয়েদের যে-ভালোবাসা পৌঁছয় ভক্তিতে সেটা তাদের মহা-প্রয়াণ,—সেখান থেকে ফেরবার রাস্তা নেই। অভিভূত যে পুরুষ ওদের সমান প্ল্যাট্‌ফর্‌মে নামে সেই গরীবের জন্য থার্ড্‌ক্লাস্, বড়ো জোর ইণ্টারমীডিয়েট্। সেলুন গাড়ী তো নয়ই। যে উদাসীন মেয়েদের মোহে হার মানল না, ওদের ভুজপাশের দিগ্‌বলয় এড়িয়ে যে উঠল মধ্য গগনে দুই হাত উর্দ্ধে তুলে মেয়েরা তারই উদ্দেশে দিল শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। দেখোনি তুমি, সন্ন্যাসী যেখানে মেয়েদের সেখানে কী ঠেলাঠেলি ভীড় !

ক্ষিতীশ

তা হবে। কিন্তু তার উল্টোটাও দেখেছি। মেয়েদের বিষম টান একেবারে তাজা বর্ব্বরের প্রতি। পুলকিত হয়ে ওঠে তাদের অপমানের কঠোরতায়, পিছন পিছন রসাতল পর্য্যন্ত যেতে রাজি।

বাঁশরী

তার কারণ মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিম্বা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা বোঝা গেল সন্ন্যাসীকে ভালোবাসে ঐ সুষমা। তার পরে ?

বাঁশরী

সে কী ভালোবাসা ! মরণের বাড়া ! সঙ্কোচ ছিল না কেননা একে সে ভক্তি বলেই জানত। পুরন্দর দূরে যেত আপন কাজে, সুষমা তখন যেত শুকিয়ে, মুখ হয়ে যেত ফ্যাকাসে। চোখে প্রকাশ পেত জ্বালা, মন শূন্যে শূন্যে খুঁজে বেড়াত কার দর্শন। বিষম ভাবনা হোলো মায়ের মনে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বাঁশি, কী করি ?” আমার বুদ্ধির উপর তখন তাঁর ভরসা ছিল। আমি বললেম, “দাও না পুরন্দরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে।” তিনি তো আঁৎকে উঠলেন, বললেন, “এমন কথা ভাবতেও পার ?” তখন নিজেই গেলুম পুরন্দরের কাছে। সোজা বললুম, “নিশ্চয়ই জানেন, সুষমা আপনাকে ভালোবাসে। ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করুন বিপদ থেকে।” এমন করে মানুষটা তাকাল আমার মুখের দিকে, রক্ত জল হয়ে গেল। গম্ভীর স্বরে বললে, “সুষমা আমার ছাত্রী তার ভার আমার পরে, আর আমার ভার তোমার পরে নয়।” পুরুষের কাছ থেকে এত বড়ো ধাক্কা জীবনে এই প্রথম। ধারণা ছিল সব পুরুষের পরেই সব মেয়ের আব্দার চলে, যদি নিঃসঙ্কোচ সাহস থাকে। দেখলুম দুর্ভেদ্য দুর্গও আছে। মেয়েদের সাংঘাতিক বিপদ সেই বন্ধ কপাটের সামনে, ডাকও আসে সেইখান থেকে কপালও ভাঙে সেইখানটায়।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা বাঁশি, সত্যি করে বলো সন্ন্যাসী তোমারও মনকে টেনেছিল কিনা।

বাঁশরী

দেখো, সাইকলজির অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের মহলে কুলুপ দেওয়া ঘর। নিষিদ্ধ দরজা না খোলাই ভালো, সদর মহলেই যথেষ্ট গোলমাল, সামলাতে পারলে বাঁচি। আজ যে পর্য্যন্ত শুনলে তার পরের অধ্যায়ের বিবরণ পাওয়া যাবে একখানা চিঠি থেকে। পরে দেখাব।

ক্ষিতীশ

ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখো বাঁশি। পুরন্দর আঙটি বদল করাচ্চে। জানলার থেকে সুষমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা। স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে। বরফের পাহাড়ে যেন সূর্য্যাস্ত, গলে পড়ছে ঝরণা।

বাঁশরী

সোমশঙ্করের মুখের দিকে দেখো, সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিঁড়ছে? আর পুরন্দর, সে যেন ঐ সূর্য্যেরই আলো। তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকাণ্ড চলছে তার সঙ্গে কোনো যোগই নেই। অথচ তাকে ঘিরে একটা জলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে।

ক্ষিতীশ

সুষমার পরে সন্ন্যাসীর মন এতই যদি নির্লিপ্ত তবে ওকেই বেছে নিলে কেন?

বাঁশরী

ও যে আইডিয়ালিস্‌ট্‌! বাস্‌রে! এত বড়ো ভয়ঙ্কর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না ক্ষিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, জেঙ্গিস্‌ খাঁর চেয়ে সর্ব্বনেশে।

ক্ষিতীশ

সন্ন্যাসীর পরে তোমার মনে মনে ভক্তি আছে বলেই তোমার ভাষা এত তীব্র।

বাঁশরী

যাকে তাকে ভক্তি করতে না পেলে বাঁচে না যে সব হ্যাংলা মেয়ে আমি তাদের দলে নই গো। রাজরাণী যদি হতুম মেয়েদের চুলে দড়ি পাকিয়ে ওকে দিতুম ফাঁসি। কামিনী কাঞ্চন ছোঁয় না যে তা নয়, কিন্তু তাকে দেয় ফেলে ওর কোন এক জগন্নাথের রথের তলায়, বুকের পাঁজর যায় গুঁড়িয়ে।

ক্ষিতীশ

ওর আইডিয়াটা কী জানা চাই তো?

বাঁশরী

সে আছে বাওয়ান্ন বাঁও জলের নীচে। তোমার এলাকার বাইরে, সেখানে তোমার মন্দাকিনী পদ্মাবতীর ডুব সাঁতার চলে না। আভাস পেয়েছি কোন ডাকঘর-বিবর্জ্জিত দেশে ও এক সঙ্ঘ বানিয়েছে, তরুণ তাপস সঙ্ঘ, সেখানে নানা পরীক্ষায় মানুষ তৈরি হচ্চে।

ক্ষিতীশ

কিন্তু তরুণী?

বাঁশরী

ওর মতে গৃহেই নারী, কিন্তু পথে নয়।

ক্ষিতীশ

তা হোলে সুষমাকে কিসের প্রয়োজন?

বাঁশরী

অন্ন চাই যে। মেয়েরা প্রহরণধারিণী না হোক বেড়ীহাতাধারিণী তো বটে। রাজভাণ্ডারের চাবিটা থাকবে ওরই হাতে। ঐযে ওরা বেরিয়ে আসছে, অনুষ্ঠান শেষ হোলো বুঝি।

(পুরন্দর ও অন্য সকলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।)

পুরন্দর

(সোমশঙ্কর ও সুষমাকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে) তোমাদের মিলনের শেষ কথাটা ঘরের দেয়ালের মধ্যে নয় বাইরে, বড়ো রাস্তার সামনে। সুষমা, বৎসে যে সম্বন্ধ মুক্তির দিকে নিয়ে চলে তাকেই শ্রদ্ধা করি। যা বেঁধে রাখে পশুর মতো প্রকৃতির গড়া প্রবৃত্তির বন্ধনে বা মানুষের গড়া দাসত্বের শৃঙ্খলে ধিক্‌ তাকে। পুরুষ কর্ম্ম করে স্ত্রী শক্তি দেয়। মুক্তির রথ কর্ম্ম, মুক্তির বাহন শক্তি। সুষমা, ধনে তোমার লোভ নেই তাই ধনে তোমার অধিকার। তুমি সন্ন্যাসীর শিষ্যা তাই রাজার গৃহিণীপদে তোমার পূর্ণতা।

(ডান হাতে সোমশঙ্করের ডান হাত ধরে)

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলাভস্ব,
জিত্বা শত্রূণ ভুংক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধং।"

ওঠো তুমি যশোলাভ করো। শত্রুদের জয় করো—

যে রাজ্য অসীম সমৃদ্ধিবান তাকে ভোগ করো। বৎস, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো প্রণামের মন্ত্র।

"নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্ তে
নমোস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব,
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।"

তোমাকে নমস্কার সম্মুখ থেকে, তোমাকে নমস্কার পশ্চাৎ থেকে, হে সর্ব্ব, তোমাকে নমস্কার সর্ব্বদিক থেকে। অনন্ত-বীর্য্য তুমি, অমিতবিক্রম তুমি, তোমাতেই সর্ব্ব তুমিই সর্ব্ব!

[ক্ষণকালের জন্য যবনিকা পড়ে তখনি উঠে গেল। তখন রাত্রি, আকাশে তারা দেখা যায়। সুষমা ও তার বন্ধু নন্দা।]

সুষমা

এইবার সেই গানটা গা দেখি ভাই।

নন্দা

(গান)

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,
তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি
পেয়েছি আঁধার রাতে॥
না দেখিবে তারে পরশিবে না গো
তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো,
তারায় তারায় র'বে তারি বাণী,
কুসুমে ফুটিবে প্রাতে॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল,
বীণাবাদিনীর শতদলদলে
করিছে সে টলমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে
ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোক
ভাতিছে নয়নপাতে॥

(পুরন্দরের প্রবেশ)

সুষমা

(ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে) প্রভু, দুর্ব্বল আমি। মনের গোপনে যদি পাপ থাকে ধুয়ে দাও মুছে দাও। আসক্তি দূর হোক, জয়যুক্ত হোক তোমার বাণী।

পুরন্দর

বৎসে, নিজেকে নিন্দা কোরো না, অবিশ্বাস কোরো না, নাত্মানমবসাদয়েৎ। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আজ তোমার মধ্যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে মাধুর্য্যে, কাল সেই সত্য অনাবৃত করবে আপন জগজ্জয়িনী বীরশক্তি।

সুষমা

আজ সন্ধ্যায় এইখানে তোমার প্রসন্নদৃষ্টির সামনে আমার নূতন জীবন আরম্ভ হোলো। তোমারি পথ হোক আমার পথ।

পুরন্দর

তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাবার সময় আসন্ন হয়েছে।

সুষমা

দয়া করো প্রভু, ত্যাগ কোরো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারি সঙ্গে

পুরন্দর

আমি দূরে গেলেই তোমার শক্তি তোমার মধ্যে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার হৃদয়দ্বার খুলে দিয়েছি নিজে স্থান নেব বলে নয়। যিনি আমার ব্রতপতি তিনি সেখানে স্থান গ্রহণ করুন। আমার দেবতা হোন তোমারি দেবতা, দুঃখকে ভয় নেই, আনন্দিত হও আত্মজয়ী আপনারই মধ্যে।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সোমশঙ্করের মহত্ত্ব তুমি আপন অন্তরের থেকে চিনতে পেরেছ?

সুষমা

পেরেছি।

পুরন্দর

সেই দুর্লভ মহত্ত্বকে তোমার দুর্লভ সেবার দ্বারা মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করবে, তার বীর্য্যকে সর্ব্বোচ্চ সার্থকতার দিকে আনন্দে উন্মুখ রাখবে এই নারীর কাজ, মনে রেখো তোমার দিকে তাকিয়ে সে যেন নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে এই কথাটি ভুলো না।

সুষমা

কখনো ভুলব না।

পুরন্দর

প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয় এই জন্যেই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করিতে পারে, তোমার কাছে এই আমার শেষ কথা। (ক্রমশঃ)

সামলবর্ম্মের নবাবিষ্কৃত বজ্রযোগিনী তাম্রশাসন

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ আছেন যাঁহারা তাম্রশাসন ব্যাপারটা ব্রিটিশ শাসন বা মুসলমান শাসন জাতীয় কোন পদার্থ কল্পনা করিয়া লইবেন। কাজেই আদিতেই ব্যাখ্যা করা আবশ্যক যে হিন্দু আমলে রাজার আজ্ঞাকে শাসন বলিত। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া রাজা যে আদেশ প্রচার করিতেন সেই আদেশ-বাণী তামার পাতে খোদিত হইত এবং ভূমিদানের দলিল স্বরূপ উহা দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইত। এই দলিলে রাজা বলিতেন—অমুক রাজা কুশলে থাকিয়া তাঁহার রাজ্ঞী রাজপুত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে যথোপযুক্ত—মানয়তি, বোধয়তি, সমাদিশতি চ—যে অমুক গ্রাম অমুক ব্রাহ্মণকে দেওয়া গেল—ইহাতে আপনাদের সকলের মত হউক। রাজার এই আদেশবাণী বা শাসন-যুক্ত তাম্রলেখগুলিই তাম্রশাসন নামে পরিচিত। ইহা বিভীষণ কোন ব্যাপার নহে। প্রাচীন আমলের কাহিনীতে অনুরাগ থাকিলে ইহাদের বিবরণে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিবারই কথা।

তাম্রশাসনগুলিতে রাজা প্রথম নিজের বংশাবলীর পরিচয় দিতেন। তাঁহার কোন্ পূর্ব্বপুরুষ কি কি গৌরবের কাজ করিয়াছেন, কোন্ দেশ জয় করিয়াছেন, কোন্ রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাও বলিতেন। তিনি নিজে কি কি করিয়াছেন তাহারও যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে থাকিত। তাহার পর কোন্ জমী দান করা হইল,—তাহা কোন্ মণ্ডল (পরগণা), বিষয় (জেলা) এবং ভুক্তির (বিভাগের) অন্তর্গত এবং প্রদত্ত জমীর পরিমাণ কি ইহাও লিখিত হইত। পরে দানপ্রাপক ব্রাহ্মণের বেদ ও গোত্রের পরিচয় এবং তাঁহার তিন-পুরুষের নাম উল্লেখ করা হইত। সর্ব্বশেষে শাসনখানি কোন্ সনে অথবা প্রদাতা রাজার রাজত্বের কোন্ সম্বৎসরে প্রদত্ত হইল তাহাও থাকিত। কাজেই বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা-মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন,—আমাদের মত ইতিহাসশূন্য দেশের লুপ্ত অতীত ইতিহাস উদ্ধারের পক্ষে এই প্রাচীন তামার পাতে লেখা সমসাময়িক দলিলগুলি কি পরিমাণ মূল্যবান্। ইহাতে প্রদাতা রাজবংশের এবং রাজার ইতিহাস জানা যায়; প্রাচীন আমলের ভৌগোলিক বিভাগের খবর পাওয়া যায়, দানপ্রাপক ব্রাহ্মণের পরিচয়ে ঐ আমলের ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায় এবং রাজার রাজত্ব কত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল তাহারও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রাচীন আমলের কথা লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন তাঁহারা এক-একখানা নূতন তাম্রশাসনের আবিষ্কারে এত আনন্দিত কেন হ'ন উপরের বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। পাণিনি ইত্যাদি প্রাচীন সূত্রকার সম্বন্ধে কথিত হয় যে সূত্রে একটি অক্ষরও কমাইতে পারিলে তাঁহারা না কি আঁটকুড় ঘরে বংশধর জন্মের আনন্দ পাইতেন! প্রত্নতত্ত্ববিৎ-মহলে নূতন তাম্রশাসনের আবিষ্কার তাহার অপেক্ষা কম আনন্দজনক ব্যাপার নহে।

কিন্তু তাম্রশাসন বড়ই দুর্লভ, উহা চাহিলেই মিলে না আবার না চাহিতে অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে অপ্রত্যাশিত রূপে আসিয়াও উহা উপস্থিত হয়! বাঙ্গালায় সেনদের আগে বর্ম্ম-উপাধিধারী এক বংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছে—প্রায় শ'খানেক বছর রাজত্ব করিয়াছে—ইহা বহু দিন হইতেই বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ববিৎ-মহলে জানা ছিল। বাঙ্গালায় প্রত্নতত্ত্ব-চর্চ্চার আদি যুগে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডে ভারতীয় প্রত্নবিদ্যার জনক প্রিন্সেপ সাহেব উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দির সংলগ্ন একখানি শিলালিপির পাঠ প্রকাশিত করেন। এই লিপি হইতে জানা যায় যে এই মন্দির উত্তর রাঢ় দেশের সিদ্ধল গ্রামীয় ভবদেব ভট্ট নামক এক অসাধারণ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের আমলেও কিছু কাল মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পরে ১৯০০

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক কিলহর্ণ সাহেব ভারত গভর্ণমেণ্ট-প্রচারিত এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রিকায় এই লিপির এক সংশোধিত পাঠ প্রকাশিত করেন। ইহার পরে প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গীয় জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে হরিবর্ম্মদেবের এক অগ্নি-দগ্ধ তাম্রশাসনের এক অস্পষ্ট প্রতিলিপি ১৩১১ সনে প্রকাশিত করেন। কিন্তু এততেও বর্ম্মবংশের ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। অবশেষে ১৩১৮ সনে ঢাকা জেলায় নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বেলাব গ্রাম হইতে ভোজবর্ম্মদেবের একখানি পূর্ণাঙ্গ তাম্রশাসন পাওয়া যায়। বলিতে গেলে, এই বেলাব লিপি পড়িয়াই বর্ত্তমান লেখকের প্রাত্নতাত্ত্বিক জীবনের আরম্ভ। এই লিপিখানি লইয়া ঐ আমলে বহু লেখালেখি হইয়াছিল। গালাগালিও কম হয় নাই। যাক্,—বেলাব লিপিতে বর্ম্মবংশের ইতিহাস অনেকখানি জানা গেল বটে, কিন্তু ফাঁকও রহিল বিস্তর। বেলাব লিপির শাসন-প্রদাতা রাজার নাম ভোজবর্ম্মা। তাঁহার পিতার নাম সামল। সামলের পিতার নাম জাতবর্ম্ম। জাতবর্ম্মের পিতা বজ্র। বজ্র বর্ম্মই এই বর্ম্ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশধারায় বর্ম্ম বংশের বিখ্যাত রাজা হরিবর্ম্মদেবের স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ হরিবর্ম্মদেব যে অনেক বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহার নানা প্রমাণ বিদ্যমান। হরিবর্ম্মের অগ্নিদগ্ধ তাম্রশাসনে হরিবর্ম্মের পিতার নাম বসু মহাশয় পড়িয়াছিলেন জ্যোতির্ব্বর্ম্ম। বেলাব লিপি আবিষ্কারের পরে সামলের পিতার নাম জাতবর্ম্ম দেখিয়া আমরা অনেকেই অনুমান করিয়াছিলাম যে নামটি জ্যোতির্ব্বর্ম্ম নহে, জাতবর্ম্ম হইবে। কিন্তু তবু সন্দেহের অবসর রহিয়া গেল এবং বেলাব লিপির বর্ম্মবংশে হরি বর্ম্মের স্থান কোথায় তাহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল না। আমরা উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, বর্ম্মবংশের নূতন একখানি শাসন কবে আবার আবিষ্কৃত হয়!

বঙ্গীয় বর্ম্মবংশের ইতিহাস উদ্ধার প্রয়াসের এমনি অবস্থায় একদিন একজন ভদ্রলোক আমার আফিসে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া পকেট হইতে একখানি তাম্রশাসনের ভাঙ্গা টুকরা বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। মূল তাম্রশাসনখানি ভাঙ্গিয়া চারি টুকরা হইয়া গিয়াছিল—ইহা তাহাদেরই নিম্ন দক্ষিণ কোণের টুকরাখানি। হাতে লইয়াই দেখি,—বিপরীত পৃষ্ঠে একেবারে নীচের লাইনে লিখিত আছে—"শ্রীমত্ সামল বর্ম্মদেব পাদীয় সম্বত্"—ইহার পরেই ভাঙ্গা। ব্যোম্ ভোলানাথ! সামল বর্ম্মের নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে!

যে ভদ্রলোকটি তাম্রশাসনের টুকরাটি লইয়া আসিয়া-ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিখ্যাত গ্রাম বজ্রযোগিনীতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বজ্র-যোগিনী গ্রামটি আয়তনে প্রকাণ্ড! উহার ২৮টি পাড়া; প্রত্যেক পাড়ার স্বতন্ত্র নাম আছে এবং প্রত্যেক পাড়াই এক একটি ছোটখাট গ্রাম। সোমপাড়া এইরূপ একটি পাড়া। সোম উপাধিধারী কায়স্থ বংশ হইতেই ঐ পাড়াটি সোমপাড়া নাম পাইয়াছে। বজ্রযোগিনী গ্রামে অনেক-গুলি 'দেউল' আছে। হিন্দু আমলের দেবালয়ের ইষ্টকাকীর্ণ ভগ্নাবশেষগুলিকে বিক্রমপুরে দেউল বলে। সোম পরিবারের বসতবাড়ী এরূপ একটি দেউলের সংলগ্ন। দেউলে স্থানে স্থানে জীর্ণ পাকা গাঁথুনী এখনও বর্ত্তমান। দেউল-ভিটার উত্তর পূর্ব্ব-পশ্চিম দীর্ঘ একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। দক্ষিণে একটি উত্তর-দক্ষিণ দীর্ঘ ক্ষুদ্রতর পুকুর আছে। এই পুকুরটির পাড় দিয়া জেলা-বোর্ডের রাস্তা বজ্রযোগিনীর বাজারে চলিয়া গিয়াছে। এই পুকুরটির উত্তর পাড়ে, (পাড় হইতে মাত্র ১০।১২ হাত উত্তরে) বহুদিন পূর্ব্বে কয়েকটি বালক ফুলের চারা পুঁতিতে মাত্র বিঘত খানিক মাটির নীচে এই তাম্রশাসনের টুকরাটির আবিষ্কার করে। কয়েক বছর আগে এই পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছিল এবং উদ্ধৃত পঙ্ক পুকুরের পাড়েই ফেলা হইয়াছিল। তাম্রশাসনের টুকরাটি আয়তনে ৫$\frac{1}{8}$" × ৪$\frac{1}{8}$" ইঞ্চি মাত্র। স্বভাবতঃ এই অনুমান হয় যে পুকুরের ভিতর হইতে পঙ্কের সহিত উত্থিত হইয়া টুকরাটি পুকুরের পাড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। আবিষ্কারের পরে বহু দিবস পর্য্যন্ত টুকরাটি বালকগণের খেলিবার সামগ্রী হইয়া ছিল। প্রিয়নাথবাবু ঐ বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটারী করিতেন। দৈবাৎ তিনি উহা

একদিন দেখিতে পাইয়া হস্তগত করিলেন এবং ঢাকায় আনিয়া মিউজিয়মে উপহার দিলেন।

তাম্রশাসনের টুকরাটির পাঠোদ্ধার করিয়া দেখিলাম, গদ্যাংশে ভোজবর্ম্মের বেলাব লিপির যে মুসাবিদা, সামলবর্ম্মের এই বজ্রযোগিনী লিপিরও সেই একই মুসাবিদা। রাজার বংশ-পরিচয়াত্মক পদ্যাংশের শ্লোকগুলি নূতন। গদ্যাংশের নষ্ট অংশ পুনরুদ্ধার করিতে বেগ পাইতে হয় নাই। নিম্নে সামলবর্ম্মের এই নূতন বজ্রযোগিনী লিপির পাঠ দেওয়া গেল। গদ্যাংশ হইতে লক্ষ্য করা যাইবে, প্রত্যেক ছত্রে যে পরিমাণ অক্ষর আছে,—প্রায় তাহার সমান সংখ্যক অক্ষর সংলগ্ন অপ্রাপ্ত টুকরাটিতে ছিল।

প্রথম পৃষ্ঠ

সামলবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রথম পৃষ্ঠ

১। [প্রায় ১৫টি অক্ষর লুপ্ত] ব ক ব ম ন পাযঃ স্মাম্ভ
২। [প্রায় ১২টি অক্ষর লুপ্ত] রি জাতঃ স্বস্থোর্থিনাং দোহদ দোহ
৩। [প্রায় ১২টি অক্ষর লুপ্ত] র্ম্মা বর্ম্মাগ্রণীঃ প্রা গ্রহরো যদূনা [ং]
৪। [প্রায় ১৬টি অক্ষর লুপ্ত] [দো]র্বজ্র জর্জ্জরিত কৃত্স্ন বিপক্ষ শৈলং ভূ।
৫। [„ „ „] বিভবো হরিবর্ম্মদেবঃ ॥ কলচুরি—কু
৬। [„ „] শ্রীরিতি খ্যাতিভাজন্। স খলু পরিণিনা
৭। [„ „] বা মাতৃবংশ্যাঃ বিদ্যায়াম্বিনয়ঃ শ্রুতাদিব জ
৮। [„ „] নৃপতিস্তস্যাং স তস্মাদভূত্। যৎপাদাগ্রপরিগ্র

৯। [" " "] ত্রিকাভি রভবন্ ভূয়োভিষিক্তাইব॥ সন্ধ্যা

১০। [" " "] জ বিকটেত্কট কোটিদংষ্ট্রঃ। যদ্বান্ধ

১১। [" " "] ল (?) কবলৈক মহাপ্রহোভূত্॥ পা নৌ পা

১২। [" " "] জ (?) বল্লীবলনে প্রসাদ বচসি স্মেরে চ ব

১৩। [" " "] া যশোবাস য়ন্ন স্যা শ্চক্ষতি মা বিরোধি

১৪। [(১১টি অক্ষর লুপ্ত) স খলু শ্রীবি] ক্রমপুর সমা বাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবা

১৫। [রাত্ মহারাজাধিরাজ শ্রীজাতবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাত] পরম বৈষ্ণব পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

সামলবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত
তাম্রশাসন
দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

১। বিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তা [ন্ ইহা কীর্ত্তিতান্ চট্টভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্র]

২। করাংশ্চ ব্রাহ্মণাম্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ য [থার্হম্মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ]

৩। মতমস্ত ভবতাম্ যথোপরিলিখি [তা ভূমিরিয়ং স্বসীমাবচ্ছিন্নাতৃণপূতি]

৪। গোচরপর্য্যন্তা সতলা সোদ্দেশা স [াত্র পনসা স গুবাক নালিকেরা স ল]

৫। বণা সজলস্থলা সগর্ত্তোষরাসহ্য [দশাপরাধা পরিহৃতসর্ব্বপীড়া আচাড়]

৬। ভড়প্রবেশা অকিঞ্চিতপ্রগ্রায্যা (হ্যা) সমস্ত [রাজভোগকর হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা * *]

৭। কারক শ্রীভীমদেবকারিত স্থরসি [(প্রায় ১৭টি অক্ষর লুপ্ত)]

৮। ক শ্রীপ্রজ্ঞাপারমিতা ভট্টারিকা শ্রী [(প্রায় ১৫টি অক্ষর লুপ্ত) শ্রীসা]

৯। মলবর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনিবিধিব [হুদকপূর্ব্বকংকৃত্বা ভগবন্তং বাস্থদেব ভট্টা]

১০। রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চপুণ্য [যশোভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং]

১১। যাবত্ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন শ্রীমত্ বিফুংচ [ক্রমুদ্রয়াতাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ]

১২। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি উ [ভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ]

১৩। আস্ফোটয়স্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ [ভূমিদাতা কুলেজাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।]

১৪। স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং স [বিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।]

১৫। শ্রীমত্ সামল বর্ম্মদেব পাদীয় সম্বত্ [প্রায় ১৬টি অক্ষর লুপ্ত]

পদ্যাংশ শ্লোকাকারে সজ্জিত করিলে নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করে। *

(ইন্দ্রবজ্রা—১১ মাত্রা)

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি জাতঃ
স্বস্থোর্থিণাং দোহদদোহ ০ ০।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ম্মা
বর্ম্মাগ্রণীঃ প্রাগ্রহরো যদূণাং ॥

(বসন্ত তিলক—১৪ মাত্রা)

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
দোর্ব্রজর্জ্জরিত কৃত্স বিপক্ষশৈলং।
ভূ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ বিভ বো হ রি বর্ম্ম দেবঃ ॥

(মালিনী—১৫ মাত্রা)

কল চুরি কু ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্রী রি তি খ্যাতিভাজম্।
স খ লু প রি ণি না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বা মাতৃ বংশ্যাঃ ॥

(শার্দ্দূল বিক্রীড়িত—১৯ মাত্রা)

বিদ্যায়াম্বিনয়ঃ শ্রুতাদিব জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নৃপতি স্তস্যাং স তস্মাদভূৎ।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্লোকগুলির ছন্দ নির্ণয় করিয়া সাজাইতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ; তজ্জন্ত তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাম্রশাসনের মৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ বিখ্যাত প্রত্নলিপিবিশারদ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার দেখার ফলে পাঠের দুই একটি স্থানে উন্নতিও সাধিত হইতে পারিয়াছে। আমি এই সঙ্গে রাধাগোবিন্দ বাবুকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যত্‌পাদাগ্রপরিগ্র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ০ ০ শ্রিকাভিরভবন্ ভূয়োভিষিক্তা ইব ॥

(বসন্ততিলক—১৪ মাত্রা)

সংক্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ জবিক টৌত্‌কটকেটি দংষ্ট্রঃ।
যদ্বাঙ্গ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ০ ল(?)কবলৈক মহা গ্রহোভূৎ ॥

(শার্দ্দুল বিক্রীড়িত—১৯ মাত্রা)

পানৌ পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
০ ব ল্লী বলনে প্রসাদ বচসি স্মেরে চ ব ০ ০ ০।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ যশোবাসয়-
ন্ন স্যাশ্চঞ্চতি মা বিরোধি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০॥

প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার ব্যাপারে বিধাতা বহু দিন হইতেই প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সহিত পরিহাসের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়া আছেন! এই বর্ম্ম বংশের ইতিহাস সম্পর্কে এই কথা বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভুবনেশ্বর প্রশস্তি হইতে জানা গেল ভবদেব ভট্ট হরিবর্ম্মের মন্ত্রী ছিলেন। এই সময় উত্তর বঙ্গে পালবংশ প্রবল। কাজেই হরিবর্ম্মদেব কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। অথচ ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে কোথাও এমন কিছু নাই যাহা হইতে জোর করিয়া বলা চলে যে হরিবর্ম্মদেব—পূর্ব্ব কি পশ্চিম কি দক্ষিণ বঙ্গে অথবা বঙ্গ-বহির্ভূত কোন স্থানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরে হরিবর্ম্মদেবের একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গেল—তাহা আবার অগ্নিদাহে বিকৃত! নগেনবাবু অনেক কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিলেন—বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে শাসনখানি প্রদত্ত ইহাও পড়িলেন;—কিন্তু যে প্রথম পৃষ্ঠায় এই কথা কয়টি আছে তাহার ছবি দিলেন না। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার একখানা ছবি ছাপিলেন বটে কিন্তু উহা এমনি অস্পষ্ট যে উহা হইতে একটি অক্ষরও নিশ্চিতরূপে পড়িবার যো নাই! উহার সহিত নগেন্দ্রবাবুর পাঠ মিলাইবার চেষ্টা করিলে অল্পক্ষণেই হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। ভোজবর্ম্মের বেলাব লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় উহার সাহায্যে ধরা যায় যে নগেন্দ্রবাবুর পাঠ স্থানে স্থানে মনগড়া। এই শাসনখানা ফিরিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। সেই জন্য এই শাসনখানার অনুসন্ধান করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু শাসনখানি কোথায় গেল, তাহার কোনই খোঁজ পাইতেছি না। নগেনবাবু লিখিয়াছেন, বালীনিবাসী পণ্ডিত গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এই শাসনখানা পাঠোদ্ধারের জন্য দিয়াছিলেন। নগেনবাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটই এই শাসনখানি পাঠোদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত হ'ন। কলিকাতা হইতে বালী সম্ভবতঃ ট্রেইনে আধঘণ্টার কম রাস্তা। নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বালীতে এই গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের খোঁজ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। অথচ কলিকাতানিবাসী প্রত্নপ্রেমিকগণ কেহই এই অনুসন্ধানটি করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেলাব লিপি হইতে বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্মের স্থান কোথায় তাহা জানা যায় না। বেলাব লিপিতে হরিবর্ম্মের নামও স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। কেবল এক স্থানে ইঙ্গিত আছে যে এই যাদববংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আলোচ্য নবাবিষ্কৃত সামল বর্ম্মের শাসনপাদাংশখানিতে হরিবর্ম্মের নাম পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। শাসন-

খানি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেলে এইবার এই রহস্তের মীমাংসা হইত। কিন্তু এবারেও বিধাতা পরিহাসপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। হরিবর্ম্ম সামলবর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা, এই পর্য্যন্তই এই শাসন হইতে স্থিরীকৃত হইল—হরির সহিত সামলের সম্পর্ক কি তাহা এই শাসন হইতেও জানা গেল না। এই ত্রিচতুর্থাংশ-লুপ্ত শাসনের যেটুকু আছে তাহার শ্লোকগুলির অর্থবোধ করিতে চেষ্টা করিলে বিধাতার লুকোচুরিরই শুধু তারিফ্ করিতে হয়! তথাপি অর্থ বোধের চেষ্টা না করিয়া উপায় নাই। তাহার পূর্ব্বে এই মনে রাখা আবশ্যক যে বেলাব লিপি হইতে জানা গিয়াছে, বর্ম্মবংশের আদি পুরুষের নাম বজ্রবর্ম্মা। তিনি যাদব সেনার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম জাতবর্ম্মা। তিনি রাজা হইয়া কলচুরি বংশীয় প্রবলপ্রতাপ রাজা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কর্ণের অপর কন্যা যৌবনশ্রীকে পালবংশীয় তৃতীয় বিগ্রহপাল দেব বিবাহ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র,—দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল ও শূরপাল। দ্বিতীয় মহীপালের সময় দিব্য নামক কৈবর্ত্ত নায়কের নায়কতায় কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়া উত্তর-বঙ্গ পালবংশের হস্তচ্যুত করে। বর্ম্মবংশের জাতবর্ম্মা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তিনি রাজা হইয়া কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া অঙ্গ দেশে শ্রীবিস্তার করিয়া, কামরূপের শ্রীকে পরাজিত করিয়া—'নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং',—উত্তরবঙ্গাধিপতি কৈবর্ত্তরাজ দিব্যের শ্রীকে নিন্দা অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া সার্ব্বভৌম হইয়াছিলেন। জাতবর্ম্মার ছেলে সামলবর্ম্মা। সামলের ছেলে ভোজবর্ম্মা।

আলোচ্য শাসনের পদ্যাংশ ৬টি শ্লোকে সজ্জিত করা হইয়াছে।

প্রথম শ্লোকে—এক বর্ম্মরাজের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে—তিনি যাদব বর্ম্মরাজগণের অগ্রণী ছিলেন। প্রথম ছত্রে জাত শব্দটির ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ জাতবর্ম্মার কথাই বলা হইতেছে।

দ্বিতীয় শ্লোকে—হরিবর্ম্ম দেবেরই গুণকীর্ত্তন হইতেছে। ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে শৈলসকলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনি বাহুবজ্রের আঘাতে বিপক্ষগণকে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব শ্লোকে যদি জাতবর্ম্মাই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, তবে এই শ্লোকে কীর্ত্তিত হরিবর্ম্মাকে তাঁহার পুত্র বলিয়াই ধরিতে হইবে।

তৃতীয় শ্লোকটিতেও হরিবর্ম্মদেবেই কীর্ত্তিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। হরিবর্ম্মা যদি জাতবর্ম্মার পুত্র হইয়া থাকেন তবে হরিবর্ম্মদেবের মাতা বীরশ্রী ছিলেন নিশ্চয়। কারণ বেলাব লিপি হইতে আমরা জানি যে জাতবর্ম্মা কলচুরিবংশীয় মহারাজা কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই শ্লোকে কলচুরি কুলের উল্লেখ আছে। "শ্রীরিতিখ্যাতি ভাজন্' কাহাকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত, বুঝা গেল না। 'মাতৃবংশ্যাঃ' সম্ভবতঃ হরিবর্ম্মের কলচুরি কুলের মাতৃবংশীয়দিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। হরিবর্ম্মদেব কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহার উল্লেখ ছিল—'সখলু পরিণিনা' শব্দ কয়টি তাহাই সূচিত করিতেছে।

চতুর্থ শ্লোকে—হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রের উল্লেখ ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের আমলেও বর্ম্মবংশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অক্ষুন্ন ছিল। ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এই পুত্রের নাম নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শ্লোক হইতেও নামটি লুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান যেরূপ বিদ্যাতে প্রযুক্ত হইলে বিনয়ের উৎপত্তি হয়, রাজমহিষীতে হরিবর্ম্মদেব তেমনি এই পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন। শ্লোকের যেটুকু আর আছে তাহার ভাব যেন এই ছিল যে পরাজিত নৃপতিগণ এই রাজার পাদাগ্র গ্রহণ কালে চরণনখনিঃসৃত কিরণ দ্বারা যেন পুনরায় হৃতরাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন। অর্থাৎ রাজা পরাজিত শরণাগত রাজার রাজ্য ফিরাইয়া দিতেন।

পঞ্চম শ্লোকে—একটা যুদ্ধের উল্লেখ আছে। 'যদ্বাজ' শব্দে অনুমান হয় যুদ্ধটা যেন বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে হইয়াছিল। ইহার বেশী কিছুই বুঝা গেল না। সামলবর্ম্মার প্রসঙ্গ এই শ্লোকেই ছিল—কারণ পরের শ্লোকে কোন রাজার নামোল্লেখের অবসর দেখা যায় না—উহা রাজার মহিমা বর্ণনাত্মক মাত্র। শ্লোকের

শেষাংশের শব্দ কয়টি হইতে বুঝা যায়, রাজা যেন কোন রাজ্য বা দেশ কবলীকৃত করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ শ্লোকে—সম্ভবত' সামলবর্ম্মের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তে অভয় বা অন্ত কিছু সূচিত হইত; ভুজ (?) লতার আন্দোলনে প্রসাদ ঝরিয়া পড়িত ইত্যাদি।

এই ব্যাখ্যার চেষ্টা হইতে পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, হরিবর্ম্মা জাতবর্ম্মার পুত্র কি না, এই নূতন শাসন হইতে তাহা কিছুই স্পষ্ট বুঝা গেল না।

গদ্যাংশের প্রধান কথা এই যে [সন্ধিবিগ্রহ] কারক বা অন্য কিছু কারক শ্রীভীমদেব কৃত বৌদ্ধদেবী প্রজ্ঞা-পারমিতার মন্দিরে অথবা বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ বাসুদেব বিষ্ণুকে প্রীত করিবার জন্য বিষ্ণুচক্র মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করাইয়া তাম্রশাসনে লিখিয়া কিছু জমী বৈষ্ণব রাজা সামলবর্ম্মা উৎসর্গ করিয়া দিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামের সোমপাড়াস্থ যে দেউলে এই শাসনের টুকরাখানি পাওয়া গিয়াছে—সম্ভবত: উহাই ভীমদেব কারিত প্রজ্ঞাপারমিতার দেউল। উহার উত্তরস্থ পূর্ব্বপশ্চিম-দীর্ঘ বৃহৎ দীর্ঘিকা হইতে কয়েকখানি বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই দীঘি হইতে পাওয়া প্রায় মানুষ সমান উচ্চ একখানি খদিরবনী তারার মূর্ত্তি বর্ত্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই মূর্ত্তির নীচে প্রায় ১২শ—১৩শ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত আছে—"কায়স্থ শ্রীসন্তোষ গু"। 'গু' অক্ষরটির পরে 'প' অক্ষরটির কিয়দংশও দেখা যায়। এই স্থানে এই তারা-মূর্ত্তির ছবি দেওয়া গেল।

তাম্রশাসনখানি কি করিয়া ভাঙ্গিয়া চারি টুকরা হইল, সেই বিষয়ে অনুমান মাত্র করা যায়। সম্ভবত: পরবর্ত্তী কালে এই দেউলের জমী ও দেউল বিপক্ষগণ জবর দখল করিয়াছিল। বৌদ্ধ দেউলের অধিকারের প্রধান দলিল এই রাজশাসনখানা তাহারাই ভাঙ্গিয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে। বৈষ্ণব রাজা সামলবর্ম্মের রাজোচিত পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা দেখিয়া মনে যেমন আনন্দ হয়, পরসম্পত্তি লোলুপ এই দুর্ব্বৃত্তগণ-কৃত ধর্ম্মস্থানের এই অবমাননা অনুমান করিয়া মনে আবার তেমনি বিষাদের সঞ্চার হয়।

সামল নামটির অর্থ কোন অভিধানে খুঁজিয়া পাইলাম না। সম্ভবতঃ উহা সামর (সমর সম্বন্ধীয়, সমরে প্রবৃত্ত) শব্দেরই কোমলীকৃত রূপ, কারণ সংস্কৃতে র এবং ল তে ভেদ করা হয় না।

সোমপাড়া দেউল সংলগ্ন দীঘিতে প্রাপ্ত খদিরবনী তারা

শেষ পথ

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম্‌-এ, ডি-এল

(৯

গোপালের সঙ্গে শারদার সখ্যসূত্র দুই বৎসর আগে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। দুই বৎসর পর যখন তারা আবার মিলিত হইল তখন তারা দেখিতে পাইল যে তাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই দুই বছরের মধ্যে—শারদার মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে হঠাৎ কোথা হইতে দমকা হাওয়ার মত উদাস যৌবন আসিয়া তার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিয়াছে। সে বালিকা যেন দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রজাল-বলে একটি পুষ্ট পরিণত নারী হইয়া উঠিয়াছে।

শারদার দেহে যৌবনের এই দ্রুত প্রসক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সংসারের ভালমন্দ অনেক কথা সে জানিয়াছে, বুঝিয়াছে। জীবনের গতি তার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—অকাল-যৌবনের সঙ্গে অকালগৃহিণীত্বের সংযোগে তাকে কথা-বার্ত্তা কাজকর্ম্ম চালচলন সব বিষয়েই পূর্ণ যুবতীর অভিনয় করিতে হয়। কিন্তু তবু তার অন্তরটা এখনও আছে কাঁচা। তার শৈশবের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল চিত্ত এখনও তার বাহ্যিক ব্যবহারের গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ততার তলায় ফল্গুর মত বহিয়া যায়—এবং মাঝে মাঝে তার যত্নে গড়া যৌবনের খোলস ফুটিয়া বাহির হয়।

গোপালের বয়স হইয়াছে পোনেরো-ষোল। তারও অনেক বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে বয়সের অতিরিক্ত। দেহে তার যৌবনের সঞ্চারের বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই, কিন্তু অন্তরে যৌবনের মদিরা তার শিশু-জীবনের সরল উচ্ছ্বাসের ভিতর বেশ একটু রঙ ফলাইয়া দিয়াছে। তার ফলে সে হইয়া পড়িয়াছে লাজুক। উদ্ভিন্ন-যৌবনা শারদার অপূর্ব্ব রূপরাশির দিকে সে তাই সোজাসুজি চাহিতে পারে না। একবার চায় তো আবার সে চক্ষু নত করে। কথা কহিতে তার বাধ বাধ ঠেকে। আগে সে যে অবাধ প্রভুত্বের সহিত শারদাকে সম্ভাষণ করিত, তাহা সে আর এখন করিতে পারে না। তার দেহের কোনও বিশেষ বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু মনটা তার আগেই যৌবনের কোঠায় পা' দিয়া বসিয়া আছে।

দুই বছর আগে শারদা ও গোপাল প্রায়ই একসঙ্গে থাকিত—সেটা ছিল তাদের চরিত্রগত ঐক্যের ফল। দুজনেই ছিল সমান উচ্ছৃঙ্খল, দুজনেরই প্রাণশক্তি ছিল প্রবল। তাই সহজ আকর্ষণে তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এখনও গোপাল সুযোগ পাইলেই শারদার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে—কিন্তু সে শারদার রূপ-যৌবনের আকর্ষণে। মুখ ফুটিয়া সে কথা সে বলে না, নিজের মনের কাছেও সে কথা সে স্বীকার করে না; কিন্তু অনল যেমন পতঙ্গকে টানে, শারদা তেমনি টানে গোপালকে। কথা গোপাল বেশী বলে না,—যা বলে তাহা অনেক হিসাব করিয়া, অনেক ওজন করিয়া বলে। কিন্তু যাহা বলে তাহাই সে অনাবশ্যক লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে বলে। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে সে শারদাকে যেন গিলিয়া খাইতে চায়। লজ্জায় সে বেশী চাহিতে পারে না, কিন্তু যখনই চায় তখনই তার ভিতর ফুটিয়া উঠে একটা ক্ষুধিত তৃষিত দৃষ্টি।

শারদা তার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা কয় তার ভিতর

বিশেষ সঙ্কোচ সে করে না। কেন না গোপালের ভিতর এমন কিছুই সে দেখে নাই যাতে তার উদ্গত যৌবনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে। সে দেখে গোপাল তার পূর্ব্ব-পরিচিত বালক। শারদার শিশু-চিত্ত যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন সে গোপালকে তার চিরপ্রিয় শৈশব-সহচরের মত সহজ সম্ভাষণ করে। আর যখন সে তার যৌবনের খোলসের ভিতর ঢুকিয়া থাকে, তখন সে গোপালকে নিতান্ত শিশুর মত জানিয়া মুরুব্বীর মত আদেশ করে। অনেক দিন তার এই ব্যবহার লইয়া বেশ একটা কৌতুকের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

জমীদার-বাড়ীর বিবাহ—দীর্ঘকালব্যাপী উৎসব সেখানে। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, গ্রামের আবালবৃদ্ধ যার যেমন শক্তি সে বাড়ীতে কাজ করিতেছে। গোপাল সেখানে কাজ করে—তার প্রধান কাজ তামাক সাজা। শারদাও সেখানে কাজ করে, কিন্তু সে করে বয়স্ক নারীর কাজ—বাঁটনা বাঁটে, কুটনা কোটে, ভাঁড়ারের কাজে সহায়তা করে, এমনি সব করে। ছেলে-বুড়ো চাকর-বাকর বা চাকর-চাকরাণীর ছেলে-পিলের এক পাল সকালবেলায় আসে 'মাইধানী' খাইতে—শারদা একদিন তাদের চিড়া-গুড় বিতরণ করিতেছিল। সে বয়স্ক চাকরদের মধ্যে বিতরণ করিতে-ছিল, গোপাল তার মাঝখানে আসিয়া কোঁচড় পাতিয়া দাঁড়াইল। শারদা তার ধামা সরাইয়া ধমক দিয়া বলিল—"যা, পোলাপানেরা এখন সর্।" গোপাল সলজ্জ হাস্তের সহিত শারদাকে বলিল, "তুই আমারে কস পোলাপান—ক্যা?" সকলে হাসিয়া উঠিল। আর একদিন গোপাল ও তার বয়সের আর কয়েকজন এক জায়গায় বসিয়া ছিল, শারদা সেখানে কাজ করিতে আসিল। সে অত্যন্ত বুড়ীর মত বলিল, "তোমরা পোলাপানেরা কাজের জায়গায় আইস ক্যান? যাও বাইরবাড়ী যাও।"

শারদা সুধু কথায় এমনি বলিত না, যখন সে পরিণত-বয়স্কা নারীর মত সংসারের কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত, তখন সে সত্যসত্যই গোপালকে শিশুর মত জ্ঞান করিত। কিন্তু যখন সে তার এই আবেষ্টন হইতে তফাতে চলিয়া যাইত, তার শৈশবের আবহাওয়ার ভিতর, তখন গোপাল ও সে দুটি বালক বালিকা হইয়া যাইত। যখন পুকুর-ঘাটে তারা সাঁতার কাটিতে সুরু করিত তখন তাদের পাল্লাপাল্লি, জল ছিটাছিটির ভিতর কোনও মর্য্যাদার প্রভেদ থাকিত না। কামরাঙা গাছতলায় গিয়া কামরাঙা পাড়িয়া খাইবার সময় গোপালের সঙ্গে সে সমান পদবীতে দাঁড়াইয়া শিশু-সুহৃদরূপে তাকে দেখিত। তখন তারা কথাবার্ত্তা যাহা কহিত সে ঠিক আগেরই মত; শারদা শৈশবের অকুণ্ঠিত সরলতার সহিত তার কথা বলিত, গোপাল শুনিত, উত্তর দিত, ঠিক তেমনি, কিন্তু তার মনের ভিতর, চোখের উপর তবু একটা কিসের গোলাপী রঙ খেলিয়া যাইত।

জমীদার-বাড়ীর বিবাহ মিটিয়া গেল। তার এক মাস পর পদ্মাপূজা, তার পর দুর্গাপূজা। নিমন্ত্রিত যারা আসিয়াছিল তাদের অনেকেই পূজা পর্য্যন্ত রহিয়া গেল—শারদারও কাজ বহাল রহিল।

কামরাঙা গাছতলায় দাঁড়াইয়া একদিন দ্বিপ্রহরে শারদা গোপালকে বিস্তারিতভাবে বলিল বিন্দুকে সে কত রকম করিয়া জ্বালাতন করিয়াছে। বিন্দুকে সাপে কাটা ভূতে ধরা প্রভৃতি ব্যাপারের ভিতরের খবর সে মহা আনন্দে ও উৎসাহে বলিয়া গেল। গোপাল শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিল এবং মাঝে মাঝে তার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিল যে আরও কত বিচিত্র উপায়ে বিন্দুকে নির্য্যাতন করা যাইতে পারিত। শারদা শুনিয়া বলিল, সে কথা তার মনে হয় নাই, এইবার ফিরিয়া সে গোপালের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবে। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া কামরাঙা কামড়াইতে কামড়াইতে এই আলাপ করিতেছিল, পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আমোদের সহিত। গোপাল শুধু মাঝে মাঝে অপাঙ্গে শারদার দেহের দিকে চাহিতেছিল, তার রূপমাধুরী উপভোগের লালসায়।

কামরাঙা-তলা হইতে তারা চলিল বেত ছোপের সেখানে, গভীর জঙ্গলে। তখনও কতকগুলি বেতফল-গাছে ঝুলিতেছিল। তারা দুজনে অনেকগুলি থোপা পাড়িয়া লইল—গায় পায় কাঁটা ফুটিল—তাহা তারা গ্রাহ্য করিল না। তার পর এক জায়গায় বসিয়া বেতফলগুলি খাইয়া নিঃশেষ করিল আর আলাপ করিতে লাগিল।

তার পর তারা আসিয়া পড়িল নদীর ধারে। গোপাল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শারদাকে দেখাইয়া দিল ওপারে বিলে অনেকগুলি পদ্ম ফুটিয়াছে। সেদিকে চাহিয়া শারদার চক্ষু জলজল করিয়া উঠিল।

গোপাল কথা তুলিল যে দুই বৎসর আগে একদিন পদ্মফুল তুলিতে গিয়া তারা কি নাকাল হইয়াছিল। দুইজনে সেই কথার পুনরাবৃত্তিতে ভয়ানক আমোদ উপভোগ করিল। গোপাল প্রস্তাব করিল নদী পার হইয়া কিছু ফুল সংগ্রহ করা যাক। এ প্রস্তাবে শারদার চিত্ত নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তার গত দুই বৎসরের জীবনে তার যে সঙ্কোচ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা তাকে বাধা দিল। সে অস্বীকার করিয়া বলিল যে লোকে দেখিলে নিন্দা করিবে—এখন তো আর সে "পোলাপান" নাই!

গোপালের কিন্তু আগ্রহের অন্ত ছিল না। সে খুব পীড়াপীড়ি করিল। শারদার মন টলমল করিয়া উঠিল। কিন্তু তার যে বয়স হইয়াছে এবং সে বিবাহিতা এবং অনেকের মনের দিকে চাহিবার তার প্রয়োজন আছে এই সব অনুভূতিতে তার চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। শেষে তার একটা বুদ্ধি মনে আসিল। চোখ দুটি বড় বড় করিয়া মহা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত সে এই প্রস্তাব গোপালের কাছে করিল যে এখন গেলে লোকে দেখিতে পারে, নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু আজ জ্যোছনা রাত্রি—রাতের বেলায় তারা দুজনে যদি যায় কেহ জানিতে পারিবে না। বিশেষতঃ আজ রাত্রে জমীদার বাড়ীতে ভাসান যাত্রা হইবে, সকলে সেখানে থাকিবে। সেই ফাঁকে তারা আসিয়া যদি ফুল তুলিয়া আনে তবে কেহই জানিতে পারিবে না।

গোপাল এ প্রস্তাব অনুমোদন করিল। তার পর তারা যে যার ঘরে ফিরিল।

এক প্রহর রাত্রে সমস্ত গ্রামের লোক জমীদার-বাড়ীতে জমায়েত হইল ভাসান যাত্রা দেখিতে। গান আরম্ভ হইয়া গেল। তখন শারদা এবং গোপাল সকলের অলক্ষিতে সে স্থান হইতে সরিয়া গেল।

জ্যোৎস্নালোকে তারা দুজনে ফিস ফিস করিয়া কথা কহিতে কহিতে চলিল নদীর ধার দিয়া। বিলের কাছাকাছি আসিয়া তারা দাঁড়াইল। গোপাল ফস্ করিয়া কাপড় ছাড়িয়া নেঙটী পরিল। শারদা তার কাপড়খানা আঁটিয়া কোমর বাঁধিয়া পরিতে লাগিল।

গোপাল সসঙ্কোচে বলিল, "কাপড় ভিজাবি তুই?"

হাসিয়া শারদা বলিল, "তা নয় কি! নেংটা হমু? আমি কি পোলাপান?"

গোপাল আবার বলিল, "কিন্তু ভিজা কাপড়ে যদি কেউ তরে দেখে? তখন কি কবি?"

শারদা চট করিয়া একটা উপযুক্ত জবাব প্রস্তুত করিয়া বলিল।

গোপাল তবু বলিল, না হয় একটা গামছা সংগ্রহ করিয়া আনা যা'ক।

শারদা বলিল, "দুর—কিছু হ'বো না—চল।"

অগত্যা গোপাল সম্মত হইল। দুইজনে সাঁতার কাটিয়া পরপারে গেল।

বিলের ভিতর পা দিতেই শারদার পা হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁকে বসিয়া গেল। শারদা চীৎকার করিয়া বলিল, "গেলাম—ধর্—ধর্।"

গোপাল অগ্রসর হইয়া হাত বাড়াইয়া তাকে টানিয়া তুলিল। একেবারে দুই বাহু দিয়া শারদাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সে তাকে টানিয়া তুলিল। শারদার দেহের সঙ্গে এই নিবিড় আলিঙ্গনে তার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যখন শারদা উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সেও একটু লজ্জিত ভাবে হাসিল। তাতে গোপালের বুকের ভিতর দপ্ দপ্ করিতে লাগিল।

তখন তারা বিলের ধারে পা বাড়াইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল এবার বিলে ভীষণ পাঁক—কোনও খানেই পা ফেলিবার স্থান পাইল না।

এমন সময় তাদের চোখে পড়িল একখানা ছোট ডিঙ্গি অদূরে বাঁধা রহিয়াছে। উৎসাহিত হইয়া তারা সেই দিকে ছুটিয়া চলিল, সেই ডিঙ্গীতে চড়িয়া ফুল সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হইবে।

ডিঙ্গিখানা ছোট্ট, তার একটা ছোট্ট 'ছই'ও আছে। তার কাছে আসিয়া গোপাল ও শারদা তড়াক করিয়া তাতে উঠিয়া বসিল। শারদা গেল নৌকার আগায়,

গোপাল পশ্চাতে। লগা গাড়িয়া নৌকা বাঁধা ছিল, গোপাল দেখিতে দেখিতে বাঁধন খুলিয়া লগা উপড়াইয়া তুলিল। তার পর এক ধাক্কায় ডিঙ্গি অনেক দূরে চলিয়া গেল। আগা নায়ে শারদা একখানা লগা তুলিয়া ধাক্কা দিতে প্রস্তুত হইল। এমন সময়—

"ক্যায়া রে—নায় ক্যায়া?" বলিয়া কে একজন হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের ভিতর কে যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

ব্যাপারটা এই। দুর্গা পূজার সময় এই বিল হইতে পদ্মফুল সংগ্রহ করা হয়। এ বিলের মালিক তিনজন, তাঁরাই এ ফুল লইতে অধিকারী। কিন্তু যার যখন খুসী সে আসিয়া বরাবরই ফুল তুলিয়া লইয়া যায়। তার ফলে এই হইয়াছিল যে গত বৎসর জমীদার-বাড়ীর পূজার সময় এখানে মোটেই পদ্মফুল অবশিষ্ট ছিল না। সেই জন্য জমীদার মহাশয় এখানে রাত্রে পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, যাতে কেহ ফুল চুরি করিতে না পারে। এই ডিঙ্গির ভিতর রাত্রে পাহারাদার শুইয়া থাকে। শারদা বা গোপাল এ সংবাদ জানিত না।

পাহারাদার ছিদাম মাঝির হুঙ্কার শুনিয়াই গোপাল এবং পরে শারদা ঝুপ করিয়া জলের ভিতর লাফাইয়া পড়িল। তার পর পাঁকের ভিতর দিয়া তারা যথাসম্ভব বেগে পলায়ন করিতে লাগিল।

ছিদাম উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বাহির হইয়া আসিল। গোপাল নামিয়াই নৌকাটা খুব জোরে বিলের ভিতর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল। সেই ধাক্কার বেগে ডিঙ্গি তখন খানিকটা তফাতে চলিয়া গিয়াছিল। ছিদাম প্রথমে নৌকাটা সামলাইয়া পারের দিকে লইয়া চলিল। পাঁকের ভিতর দিয়া গোপাল ও শারদা খুব বেগে অগ্রসর হইতে পারিল না। কাজেই ছিদাম আসিয়া শারদাকে ধরিয়া ফেলিল—গোপাল তখন উঠিয়া ছুট দিয়াছে।

পাহারাদার ছিদাম মাঝি শারদাকে সাপটিয়া ধরিয়া তার মুখ তুলিয়া দেখিল। শারদা খুব হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করিতে লাগিল।

ছিদাম বলিল, "আরে শারদী! তুই যে!"

সে শারদাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল এবং শারদার হাত-পা ছোঁড়ার চোটে তাকে ভালরকম কায়দা করিতে না পারিয়া তাকে একেবারে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে নৌকার দিকে চলিল।

শারদা চীৎকার করিয়া ছিদামকে গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং গোপালকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ওই নির্ব্বংশ্যা·· পলাস যে বড়—পলাস তো তর গুষ্টীর মাথা খাস—তর একখান হাড় আস্তা রাখুম না আমি—আয় শীগ্‌গির।"

গোপাল তার চীৎকার শুনিয়া ফিরিল।

সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল। তার পর সে পা টিপিয়া অগ্রসর হইয়া ছিদামের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকার কাছে আসিয়া ছিদাম শারদাকে নৌকার উপর ফেলিয়া তাকে দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া নৌকায় উঠিবার জন্য এক পা তুলিয়া দিল। ঠিক সেই সময় গোপাল তার অপর পা ধরিয়া এমন জোর টান দিল যে ছিদাম হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। তার মাথাটা প্রথমে নৌকায় ঠোকা খাইয়া তার পর কাদার উপর খুসিয়া পড়িল। সেই অবস্থায় গোপাল তাকে কাদার উপর দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে লাগিল। আর শারদা নৌকা হইতে নামিয়া একখানা বৈঠা দিয়া ছিদামকে দুমদাম করিয়া পিটিতে লাগিল।

তার পর ছিদামকে অচেতন অবস্থায় সেখানে ফেলিয়া তারা ছুটিয়া পলাইল।

ওপারে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়া শারদা বলিল, "কাইল কি উপায় হোবো?—ও গোড়াকপাইলা তো আমারে চিনচে! ও তো কইয়া দিবো।"

তখনই দুজনে পরামর্শ স্থির করিল। শারদা তার বাড়ীতে গিয়া কাপড়খানা বদলাইয়া লইল। তার পর সে এবং গোপাল দুজনেই জমীদার-বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। গোপাল ডাকিয়া ডাকিয়া বাবুদের তামাক সাজিয়া দিতে লাগিল। শারদা ঘরের ভিতর গিয়া জমীদারের একটি ঘুমন্ত ছেলেকে জাগাইয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছেলেটি কাঁদিতে লাগিল। তাকে শান্ত করিতে করিতে সে জমীদার-গৃহিণীর কাছে লইয়া গেল। জমীদার-গৃহিণী তখন গান শুনিতেছিলেন। শারদা

তাঁকে গিয়া বলিল, কোকন কিছুতেই থাকে না, শারদা এক প্রহর হইল উহাকে কোলে করিয়া ঘুরিতেছে—কিছুতেই সে মানে না, বলে মার কাছে যাইবে।

গৃহিণী উঠিয়া ভিতরে গেলেন। শারদা তার পর হইতে বরাবর গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া গায় পড়িয়া তাঁর সেবা করিতে লাগিল।

পরের দিন আহত স্থানগুলি বাঁধিয়া ছিদাম মাঝি যখন নালিশ করিতে আসিল যে কাল রাত্রে শারদা এবং গোপাল পদ্ম চুরী করিতে গিয়া ধরা পড়ায় তাকে মারপিট করিয়া অজ্ঞান করিয়া দিয়াছিল, তখন জমীদারবাবু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিলেন। গোপাল যে কাল সারারাত্রি তাঁর পাশে পাশে ছিল। গৃহিণী বলিলেন শারদা সারা রাত্রির মধ্যে এক দণ্ডও তাঁর কাছ ছাড়া হয় নাই।

ছিদাম এই দুইটি শয়তানের বাচ্ছাকে মনে মনে শাপিতে শাপিতে বাড়ী ফিরিল।

(১০)

ছিদাম মাঝি প্রতিজ্ঞা করিল শারদার উপর প্রতিশোধ লইবে। সে শক্তিমান যুবক, লাঠি ধরিতে জানে—সাহসও আছে। তার সাহস ও শক্তির উপর আস্থা বশতঃই সে পদ্মবনে একলা পাহারা দিবার ভার লইতে পারিয়াছে। কিন্তু শারদার কাছে এই লাঞ্ছনার পর অভিযোগ করিয়া সে তো প্রতিকার পাইলই না, উপরন্তু লোকের কাছে তার গঞ্জনার সীমা রহিল না। একটা মেয়ে ও একটা ছোট ছেলে তাকে মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল তার এই অভিযোগ শুনিয়া সকলেই প্রকাশ্য ভাবে তাকে টিটকারী দিতে লাগিল। কেহ কেহ ইঙ্গিত করিল শারদা নয়, কোনও প্রেতিনী তাকে এইরূপ ভাবে বঞ্চিত করিয়া নাকাল করিয়াছে। কেহ কেহ উপযাচক হইয়া তাহাকে কবচ ধারণের উপদেশও দিল। এই সব কথায় ছিদাম মোরিয়া হইয়া উঠিল, সে প্রতিজ্ঞা করিল শারদার উপর প্রতিশোধ সে লইবেই।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শারদা নদীর ঘাটে গা ধুইয়া জল আনিতে গিয়াছিল। আর যাহারা গিয়াছিল সবাই উঠিয়া আসিল, শারদা খেয়াল করিল না। অনেকক্ষণ জলে গা ডুবাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

যখন সে উঠিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সে ঘাটে তখন জনপ্রাণী নাই। শারদা ইহাতে ভয় পাইল না, ভয় তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সে জল তুলিয়া পারে উঠিতেই পাট ক্ষেতের ভিতর হইতে কে একজন বাহির হইয়া পিছন হইতে হঠাৎ কাপড় দিয়া তার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তার পর তাকে কোলে তুলিয়া পাট ক্ষেতের ভিতর প্রবেশ করিল।

শারদার কলসী কাঁকাল হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—সে প্রবল বেগে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু চীৎকার করিতেও পারিল না, চোখেও দেখিতে পাইল না। ছিদাম তাকে পাট ক্ষেতের ভিতরে লইয়া একটু ফাঁকা জায়গায় তাকে ভূমিতে শোয়াইয়া দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িল।

তার পর অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিল। ছিদাম শারদার দুই হাত বিস্তৃত করিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একটা দড়ি আসিয়া ছিদামের মাথা গলিয়া গলা বেষ্টন করিয়া ধরিল, আর কোথা হইতে কে সেই দড়ি ধরিয়া এমন এক হেঁচকা টান দিল তাতে দড়ির ফাঁসটা তার গলায় চাপিয়া বসিল। ছিদাম দুই হাত দিয়া দড়িটা চাপিয়া ধরিল—কে যেন তাকে উপর দিকে টানিয়া তুলিতে লাগিল।

গোপাল কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শারদার সন্ধান করিতে ঘাটের ধারে আসিতেছিল। পাট ক্ষেতের কাছে আসিয়া সে দেখিতে পাইল, কে একজন তার ভিতর নড়াচড়া করিতেছে। সে আত্মগোপন করিয়া লক্ষ্য করিল। তার পর দেখিল ছিদাম শারদাকে লইয়া পাট ক্ষেতের ভিতর গেল।

একটু চিন্তা করিয়া সে অমনি নিকটবর্ত্তী কুমার বাড়ীতে গেল। সেখানে কুমার পাড়ে দড়ি পড়িয়া ছিল, তাহা খুলিয়া লইল। সেই পাট ক্ষেতের পাশেই একটা বড় গাছ ছিল, তাহার একটা ডাল পাট ক্ষেতের উপর দিয়া গিয়াছিল। সেই গাছের উপর চড়িয়া দড়ির মাথায় একটা ফাঁস করিয়া গোপাল সন্তর্পণে তাহা ছিদামের মাথার ভিতর দিয়া গলাইয়া দিল আর প্রাণপণে টানিতে লাগিল। আচমকা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া ছিদাম ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া প্রাণপণে গলার ফাঁসটা

টানিয়া ধরিল। গোপাল তাকে যতদূর সম্ভব টানিয়া তুলিয়া দড়িটা গাছের ডালের সঙ্গে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিল। ছিদামের পায়ের ডগাটা মাটি ছুঁইয়া রহিল, হাত দিয়া সে গলার ফাঁসটা একটু আলগা করিয়া রাখিল—আর কোনও রকমে নড়াচড়া তার সম্ভব হইল না।

শারদা সেই ফাঁকে ছুটিয়া পলাইল এবং গোপাল অল্পক্ষণ বাদেই তার সঙ্গে মিলিল।

এমনি করিয়া ক্রমে শারদার সঙ্গে গোপালের পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং প্রথম পরিচয়ে যে সঙ্কোচ ও লজ্জা আসিয়াছিল তাহা ক্রমে কাটিয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে যখন কারও কোনও কাজ থাকে না এবং বেশীর ভাগ লোক পড়িয়া ঘুমায়, তখন তারা দুজনে বনে বাদাড়ে গাছের ডালে নদীর জলে কোথায় কোথায় যে ঘুরিয়া বেড়ায় তার ঠিকানা নাই। শারদার মনে ইহাতে কোনও সঙ্কোচ ছিল না, লজ্জাও ছিল না, কেন না সে গোপালকে ছেলেমানুষ বলিয়া জানিত, তার প্রতি যৌবনসুলভ আকর্ষণের ছায়া মাত্রও তার মনে উঠিত না। কিন্তু গোপালের মন সাদা ছিল না, আর তার সঙ্কোচেরও অভাব ছিল না। তার মনের তলায় যে উদ্ভিন্নমান যৌবন তাহা শারদার দিকে চাহিয়া আলোড়িত হইত, অনেক কথাই তার মনে হইত—কিন্তু বলিতে সাহস হইত না।

একদিন সে সাহস করিয়া তার মনের কথা প্রকাশ করিয়া শারদার প্রেম ভিক্ষা করিল।

একটা পুকুরের ধারে বসিয়া তারা বাতাবী নেবু খাইতেছিল—কথায় কথায় গোপাল সসঙ্কোচে কথাটা বলিল।

"ধেৎ! চুপ দে!" বলিয়া শারদা ধমক দিয়া উঠিল। গোপাল তার হাত ধরিয়া অনুনয় করিল।

শারদা বেগে উঠিয়া তার হাতখানা প্রবল বেগে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "দেখ গোপাইলা, ভাল হ'বো না কইল। পোলাপান, নাকে টিপি দিলে দুধ পরে তার আবার কথা শুন! যা' আমি তর সাথে কথাই কমু না।"

বলিয়া শারদা চলিল।

তিরস্কৃত হইয়া গোপালের ভারী লজ্জা হইল। আর শারদা যে তাকে 'পোলাপান' বলিয়া তিরস্কার করিল তাতে তার রাগও হইল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া শারদার হাত চাপিয়া ধরিল, শারদা তার হাত কামড়াইয়া দিল।

গোপাল তখন তার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "দেখ শারদী, বড় বাইর বারছে তর। তর তেল পারুম'নে র'। তুই যদি ই কথা কারুইরে কস তবে কইল আমি তরে আস্তা রাখুম না।"

"কমু না, খুব কমু। এহনি আমি গিয়া কমু! তুই আমারে এমুন কথা ক'স? তর মুরাদটা কি? আমার ভাতার নাই?"

"এঃ! ভারী তো এক বুরা ভাতার তার আবার গপ্প!"

"আছে আছে বুড়া, আমারই আছে, তর তাতে কি? ছাই কপাইলা, পোরাকপাইলা" ইত্যাদি!

শারদা বকিতে বকিতে চলিল। গোপাল একটু ভাবিল। তার বড় ভয় হইল।

একটু দাঁড়াইয়া সে ছুটিয়া গিয়া শারদার পায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তর পায় ধরি শারদী, কইস না কারেও, আর আমি ত'রে কিচ্ছুই কমু না।"

শারদার রাগ পড়িল, সে বলিল "ডর নাই, ছাড়, কমু না কারেও—আর এমুন করিস না।"

গোল মিটিয়া গেল। শারদা গৃহে চলিল, গোপাল বিষণ্ণ মনে মাঠের দিকে চলিল।

কিন্তু আর একদিকে ইহাতে গোল পাকাইয়া উঠিল।

গোপাল যখন শারদার পদপ্রান্তে পড়িয়া অনুনয় করিতেছে তখন দুর্গা অপর দুইটি নারীর সহিত পুকুরঘাটের দিকে আসিতেছিল। তারা সবাই ইহাদের দুইজনকে দূর হইতে দেখিতে পাইল।

দুর্গা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া শারদার দিকে অগ্রসর হইল এবং শারদার চুল ধরিয়া টানিয়া তাকে মাটিতে ফেলিয়া কিল চড় লাথি যথেচ্ছ মারিতে লাগিল এবং অবিমিশ্র অনভিধানিক কথায় তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিল।

শারদার ভয়ানক রাগ হইল।

সে উঠিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া রণরঙ্গিণী বেশে দাঁড়াইয়া তার মাকে বলিল—"কী-ঈ—তুই আমারে মারস?"

দুর্গা বলিল, "মারুম না, এহনি হইছে কি? তর হাড্ডি ভাইঙ্গা টুকরা টুকরা করুম—হইছে কি?" বলিয়া

সে পথের পাশ হইতে একটা গাছের ডাল কুড়াইয়া তাড়া করিল।

শারদা তার হাত হইতে সে কাঠ কাড়িয়া লইল। তার পর দুর্গা আবার তার চুল চাপিয়া ধরিল, শারদাও তার মার মুখে প্রাণপণে দুই হাত দিয়া আঁচড়াইতে লাগিল।

এমন সময় অপর দুইটি নারী মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া মা ও মেয়েকে ছাড়াইয়া দিল।

দুর্গা গর গর করিয়া 'নির্ব্বংশ্যা গোপাইল্যা'কে অকথ্য গালিগালাজ করিতে করিতে ঘাটের দিকে চলিল। শারদা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ঘরে গেল।

শারদার সব চেয়ে বেশী রাগ ও দুঃখ হইল এই কথা ভাবিয়া যে যে মুহূর্ত্তে সে গোপালকে তার দুঃসাহসের জন্ম তিরস্কার করিয়া ফিরিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তার মাতা তার নামে এই মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া তাকে গঞ্জনা দিল। এই লজ্জায় ও গ্লানিতে তার বুকটা কেবলি ফুলিয়া উঠিতে লাগিল নিদারুণ ক্ষোভে!

পরের দিন এই মুখরোচক কথাটা গ্রামের সর্ব্বত্র রটিয়া গেল। এমন ভাবে রটিল যে দুর্গা ও শারদা এ কথা অনেকের কাছে অনেক ভাবেই শুনিল। ডাল-পালা জুড়িয়া শারদার সঙ্গে গোপালের অবৈধ প্রেমের কাহিনী বেশ ফয়লাও হইয়া প্রকাশ হইল। শারদা এ-সব কথা শুনিয়া রাগে গর গর করিতে লাগিল। দুর্গাও খুব রাগিল এবং সে তার রাগ ঝাড়িল আসিয়া তার মেয়ের উপর। সে বলিল, "ছাইকপালী পোরা-কপালী, আমার মুখ দেখানের পথ রাখলি না!"

শারদা কোনও কথা কহিল না, গুম হইয়া সারাদিন তার ঘরের ভিতর পড়িয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় সে তার ঘর হইতে চুপ চাপ বাহির হইয়া গেল। গোপালকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল।

গোপাল অত্যন্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে তার সামনে দাঁড়াইল। তার ভারী দুঃখ হইয়াছিল শারদার মিথ্যা কলঙ্কের কথা শুনিয়া—কিন্তু সে দুঃখ প্রকাশ করিবার ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না।

সে সুধু বলিল, "শারদী, আমার উপর রাগ করিস না।"

শারদা বিরক্তির সহিত বলিল, "না রাগ করি নাই। কিন্তু শোন্। তুই যাবি আমার সাথে?"

"কোন্‌খানে?"

"যেখানেই হউক।—আমি ই গাঁয় আর থাকুম না।"

এ কথায় গোপাল ভয় পাইল— শারদার জন্ত। শারদা যদি এখন রাগের মাথায় গৃহত্যাগ করে তবে তার দুঃখের সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া সে ভয় পাইল।

সে বলিল, পাগল! কোথায় যাইবে সে, গেলে তো আর ঘরে ফিরিতে পারিবে না।

শারদা বলিল তাহার জন্ম তার চিন্তা নাই, ফিরিবার জন্ম সে যাইতেছে না। গোপালের যদি সাহস না হয় সে একাই যাইবে।

গোপালের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—তার দ্বিধা ভাসিয়া গেল।

দুইজনে তাহারা পথে চলিল। কিছু দূর পর্য্যন্ত তারা পাটক্ষেতের সূক্ষ্ম আইল দিয়া গা ঢাকিয়া অগ্রসর হইল। গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া তারা সড়কের উপর উঠিল।

এইখানে আসিয়া গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, এখন কোন্ দিকে তারা যাইবে?

শারদাও ভাবিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, "না, আর কোথাও যামু না, শ্বশুরবাড়ীই যাই।"

গোপাল যদিও ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার সময় ভয়ানক সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল, তবু পথে বাহির হইয়া নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃসঙ্গতার ভিতর সুন্দরী কিশোরীর মদিরময় সঙ্গে আসিয়া তার প্রাণ তাতিয়া উঠিয়াছিল নানা বিচিত্র মনোমদ কল্পনায়। এই প্রস্তাবে সে যেন হঠাৎ তার কল্পনার স্বর্গ হইতে ধপ করিয়া কঠিন ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সে একটু হতাশার সুরে বলিল, "শ্বশুরবাড়ী—ভাতারের কাছে যাবি?"

একটু হাসিয়া শারদা বলিল, "হ' তাই যাই। বড় রাগ হইছিল, ভাবছিলাম ঘরে আর থাকুম না। কিন্তু ভাইব্যা দেইখল্যাম, আমার সোয়ামী তো কোনও দোষ করে নাই। সে তো আমারে ভালই বাসে—মাইনসের উপর রাগ কইরা তারে ক্যান দুঃখু দেই।"

গোপাল হতাশভাবে বলিল, "বেশ, তাই চল।"

নীরবে তারা পথ চলিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রে শারদা তার স্বামীর গৃহের অঙ্গনে পা দিল। গোপাল সেখান হইতেই বিদায় লইল; সে আর শারদার বাড়ীতে পা দিল না।

শারদা মাধবকে ডাকিয়া তুলিল। মাধব যেন তাকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইল।

বিন্দু চলিয়া যাইবার পর হইতেই মাধব শারদার জন্য ছটফট্ করিতেছিল। অনেকবার সে মনে করিয়াছিল শারদাকে আনিতে যাইবে। কিন্তু নিজের অন্নকষ্টের কথা স্মরণ করিয়া সে থামিয়া গিয়াছিল, শারদার অভাবে তার নিঃসঙ্গ দুঃখের দিনগুলি বড় কষ্টে কাটিতেছিল।

হঠাৎ শারদাকে সম্মুখে দেখিয়া সে বিস্ময় ও পুলকে অধীর হইয়া বলিল, "তুই যে!"

শারদা মধুর হাসি হাসিয়া স্বামীর কণ্ঠ দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হ, আমি আইলাম। তর লিগ্যা বড় পরাণডা পুইরলো তাই আইলাম। তুই তো আমারে আনলি না।"

মাধব তাকে বুকের ভিতর চাপিয়া বলিল, "কার সাথে আলি তুই?"

শারদা বলিল সে একাই আসিয়াছে—মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে।

বিস্মিত হইয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল মাতার সহিত তার ঝগড়ার হেতু কি? শারদা বলিল যে তার মা তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়াছে—একটা দুধের ছেলে—তার সঙ্গে শারদার দোষ ঘটিয়াছে এমনি কথা বলিয়া তাকে অযথা প্রহার করিয়াছে। সেই রাগে সে মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। শেষে সে বলিল, "মা আমার কে? যার হাতে পরছি সেই এখন আমার সব—মারে কাটে সেই মাইরবো। সে ছাইকপালী আমারে কওনের কে? কওচে! এহন তর কাছে আইছি, তুই আমারে মাইরা কাইট্যা ফালাইলেও আমার কওনের কিছু নাই।"

মাধব একেবারে গলিয়া গেল। শাশুড়ীর উপর তার নিদারুণ ক্রোধ হইল। শারদাকে সাপটিয়া ধরিয়া সে আদর করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

কতদূর

মৃণাল দেবী

কতদূর, কতদূর?
কোথা শেষ বলে দাও
কাঁদে প্রাণ ব্যাথাতুর।
কতদূর?
চলিতে চলিতে আমি
হারায়ে ফেলেছি দিশা,
দিবসে ঘনায়ে এল
আঁধার সে অমানিশা,
বড় শ্রান্ত হয়েছি গো
কোথায় আমার 'পুর'
বলে দাও কোথা শেষ
সেই দেশ কতদূর?
কোথায় ঝরে না ফুল
নিদারুণ আঘাতে,
সন্ধান আসেনা ছেয়ে
জীবনের প্রভাতে,
স্নিগ্ধ ভালবাসা-ভরা
বহে বায়ু সুমধুর
বলে দাও সে বন
কতদূর, কতদূর?
যেথায় ঝরে না আঁখি
অবিরল ধারাতে
সেথায় আমার পথ্
চলা শেষ হবে যে;
হাসিরে ফুটায়ে তুলে
যেথা পাপিয়ার সুর
বেদনার নাই লেশ
সেই দেশ কতদূর?

বাঙ্গালা পাটীগণিতের পরিভাষা

অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

আধুনিক পাটীগণিত স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের সঙ্কেতের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরলোকগত ডাক্তার কেজরি (Dr. Cajori) বলেন, "যে সকল উদ্ভাবনের ফলে সভ্যতার এত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে তন্মধ্যে সংখ্যা-লিখনের এই সঙ্কেতটি সর্ব্বপ্রধান।" * ভারতবর্ষ এমন একটি সঙ্কেত উদ্ভাবনের গৌরব প্রাপ্ত হন—ইহা কোনও কোনও বিদেশী লেখকের সহ্য হয় না। তাই তাঁহারা জগৎকে বুঝাইতে চাহেন যে, এই সঙ্কেতটি ভারতে উদ্ভাবিত হয় নাই, ভারত ইহা অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মত স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনেক অসার ও ভিত্তিহীন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাদিগকে একটি নমুনা দিতেছি। ভিত্তিহীন যুক্তির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে সকল যুক্তি একেবারে অমূলক নহে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানটি এই— §

ভারতবাসীরা বাঁ দিক হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া ডাইন দিকে যান। অতএব, যদি ভারতবাসী দ্বারা স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যা-লিখনের সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইত, তবে সংখ্যা লিখনে এককের ডাইনে দশকের, দশকের ডাইনে শতকের, শতকের ডাইনে সহস্রের স্থান হইত, অর্থাৎ দুই হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ ৫৪৩২ এইরূপে লিখিত হইত। কিন্তু প্রচলিত সঙ্কেত অনুসারে উক্ত সংখ্যাটি ২৩৪৫ এইরূপে লিখিত হয়। অতএব এই সঙ্কেতটি ভারতবাসী দ্বারা উদ্ভাবিত হয় নাই। যাঁহারা লিখিতে লিখিতে ডাইন হইতে বাঁয়ে যান তাঁহাদের দ্বারাই এই সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছে। *

প্রচলিত সঙ্কেতে বড় এককের স্থান ছোট এককের বাঁয়ে। ইহাই বিরুদ্ধবাদিগণের আপত্তির কারণ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ইত্যাদি দেশের লোকেরা ভারতবাসীদের মত লিখিতে লিখিতে বাঁ হইতে ডাইনে যান। তথাপি তাঁহারা মিশ্র সংখ্যা লিখিবার সময় বড় একক ছোট এককের বাঁয়ে লিখিয়া থাকেন; যথা, চারি পাউণ্ড পাঁচ শিলিং ছয় পেন্স £4. 5s. 6d. এইরূপে লিখিত হয়, 6d. 5s. £4 এইরূপে নহে। ভারতবাসীরাও মিশ্র সংখ্যা এইরূপে লিখিয়া থাকেন। সংখ্যা উচ্চারণ করিবার সময় বড় একক পূর্ব্বে বলিয়া পরে ছোট একক বলিবার রীতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। সংখ্যা-লিখনে এই রীতির ব্যত্যয় হইবে কেন? ইহা হইতেই উপরিলিখিত যুক্তির অসারতা প্রতীয়মান হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে এই সকল বিরুদ্ধবাদী লেখক বাঙ্গালা পাটীগণিত পড়েন নাই। যদি তাঁহারা উহা পড়িতেন, তবে তাঁহারা উপরিলিখিত যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর সারগর্ভ যুক্তি দিতে পারিতেন। তাঁহারা বলিতে পারিতেন, "স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যা-লিখনের সঙ্কেতটি যে ভারতে উদ্ভাবিত হয় নাই তাহার প্রমাণ বাঙ্গালা পাটীগণিতের পরিভাষা। এই পরিভাষা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে ইংরাজদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে আধুনিক পাটীগণিতের অস্তিত্বই ছিল না। নিম্নলিখিত ইংরাজি ও বাঙ্গালা পদগুলি তুলনা করিয়া দেখুন :—

Power	শক্তি
Reduction	লঘূকরণ
Prime to one another	পরস্পর মৌলিক.
Common factor ...	সাধারণ গুণনীয়ক
Greatest common factor	গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক
Least common multiple	লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক
Reciprocal fractions	অন্যোন্যক ভগ্নাংশ
Perfect square ...	পূর্ণ বর্গ"

* A History of Mathematics (1922)এর ৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal এর ইং ১৯০৭ সনের জুলাই মাসের সংখ্যার ৪৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* যাঁহারা লিখিতে লিখিতে ডাইন হইতে বাঁয়ে যান, যদি তাঁহারা স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যা-লিখনের সঙ্কেত বাহির করিতেন তবেই এককের ডাইনে দশকের, দশকের ডাইনে শতকের, এইরূপ অন্য এককের ডাইনে তাহা অপেক্ষা বড় এককের স্থান হইত। অন্য এক সময় এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

"দেখুন, বাঙ্গালা পদগুলি ইংরাজি পদগুলির অবিকল অনুবাদ। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, বঙ্গদেশ ইংরাজদের নিকট হইতেই আধুনিক পাটীগণিত প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতে আধুনিক পাটীগণিতের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই বঙ্গদেশ বিদেশীর নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছে। বঙ্গদেশে father-in-law এর অনুবাদ 'আইনে পিতা' বা 'আইনতঃ পিতা' এবং great-grandson এর অনুবাদ 'বড় জাঁকাল পুত্র' ব্যবহৃত হয় না; পাটীগণিতের প্রথম হইতেই ইংরাজি পদগুলির অনুবাদ ব্যবহৃত হয় কেন? যদি ভারতে আধুনিক পাটীগণিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকিত, তবে বঙ্গদেশ ।ক কখনও ভারতীয় পদগুলি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজি পদগুলির অবিকল অনুবাদ সাদরে গ্রহণ করিত?"

এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, যে ভাবে পারভাষা সৃষ্ট হওয়া উচিত বাঙ্গালা পাটীগণিতের পরিভাষা সে ভাবে রচিত হয় নাই। যে সকল বিষয়ে আমরা অন্যের নিকট ঋণী নহি বরং অন্যে আমাদের নিকট ঋণী, রচনার দোষে সে সকল বিষয়েও আমরা অন্যের নিকট ঋণী প্রতীয়মান হই।

কোনও পদ নূতন করিয়া রচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত যে, ঐরূপ পদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে কি না অথবা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে আছে কি না। যদি না থাকে, তবেই নূতন পদের সৃষ্টির আবশ্যকতা হইতে পারে। এস্থলেও চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য; যথা,—

(১) যাহা বুঝাইতে ইচ্ছা, পদটি দ্বারা যেন ঠিক তাহাই বুঝায়।

(২) পদটি যেন যথাসম্ভব ছোট হয়।

(৩) পদটি যেন অকারণ শ্রুতিকটু না হয়।

(৪) পদটি যেন বিদেশী ভাষার প্রচলিত অনুরূপ পদটি অপেক্ষা কম অসুবিধাজনক হয়; নতুবা বিদেশী ভাষার পদই গ্রহণীয়। বিদেশী ভাষার পদ গ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বিরুদ্ধবাদী বিদেশী লেখকগণ ইতিপূর্ব্বে যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখনের সঙ্কেত যে ভারতবর্ষেই উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা এখন অস্বীকার করিবার যো নাই।* ৬৬২ খৃষ্টাব্দে সেবেরাস্ সেবক্ট্ (Severus Sebokt) নামে সিরিয়া দেশের বিখ্যাত লেখক হিন্দুদের এই সঙ্কেতটির প্রশংসা করিয়াছেন। এই সঙ্কেত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তথা হইতে ইয়ুরোপে প্রচারিত হয়। ৬৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যভট তাঁহার আর্য্যভটীয়-নামক গ্রন্থে (খ্রীঃ অব্দ ৪৯৯) এবং § ব্রহ্মগুপ্ত ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে (খ্রীঃ অব্দ ৬২৮) আধুনিক পাটীগণিতের কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তার পর ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মহাবীর নবম শতাব্দীতে, নবীন আর্য্যভট ও শ্রীধর দশম শতাব্দীতে, শ্রীপতি একাদশ শতাব্দীতে এবং ভাস্কর দ্বাদশ শতাব্দীতে পাটীগণিত রচনা করিয়াছিলেন।* বাঙ্গালা পাটীগণিতের পরিভাষার জন্য এই সকল গ্রন্থ অনুসন্ধান করাই স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় এই যে, যখন বাঙ্গালা পাটীগণিতের প্রচলিত পরিভাষা সৃষ্ট হইয়া-

---

* American Mathematical Monthly পত্রিকায় ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সনের চারিটি সংখ্যায় এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের চারিটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। Edinburgh বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক Dr. A. B. Keith প্রথম প্রবন্ধটি পড়িয়া লিখিয়াছেন, "আপনার মত সাধারণের গ্রহণীয় হইবে, সন্দেহ নাই (No doubt your view will receive general acceptance)", দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পড়িয়া লিখিয়াছেন, "আপনার অখণ্ডনীয় (?) যুক্তিগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম (I am glad to see your convincing arguments)," এবং তৃতীয় প্রবন্ধটি পড়িয়া লিখিয়াছেন, "এই প্রবন্ধের প্রমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক (The proof in this paper is very satisfactory)"।

§ স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যালিখনের সঙ্কেতটি আর্য্যভটীয়েই প্রথম দৃষ্ট হয়। তথায় লিখিত আছে:—

একঞ্চ দশ চ শতঞ্চ সহস্রং অযুতনিযুতে তথা প্রযুতম্।
কোট্যর্ব্বুদঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ॥

নিযুত = আধুনিক লক্ষ। প্রযুত = আধুনিক নিযুত।

* নবীন আর্য্যভটের পাটীগণিত তাঁহার মহাসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থের অন্তর্গত। শ্রীপতির পাটিগণিতও তাঁহার সিদ্ধান্তশেখর নামক গ্রন্থের অন্তর্গত। অপর তিন জনে পাটীগণিতের পৃথক পৃথক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। মহাবীরের গ্রন্থের নাম গণিতসারসংগ্রহ, শ্রীধরের দুইখানি গ্রন্থের নাম পাটীগণিত ও ত্রিশতিকা এবং ভাস্করের গ্রন্থের নাম লীলাবতী। শ্রীধরের পাটীগণিত এখন পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ছিল, তখন ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামক সুপ্রসিদ্ধ ও সুলভ গ্রন্থখানিও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজি পরিভাষাগুলির অনুবাদ করা হইয়াছিল। আধুনিক পাটীগণিতের সৃষ্টি ও উন্নতি-সাধনের জন্য সমস্ত পৃথিবী যে কয়েকজন ভারতীয় আচার্য্যের নিকট ঋণী, ভারতবাসী হইয়াও আমরা তাঁহাদের সৃষ্ট পরিভাষা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যে অবিচার করিয়াছি তাহা নিরাকরণের উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাদান ও পরীক্ষাগ্রহণ বঙ্গভাষায় পরিচালিত হইবে—এইরূপ প্রস্তাব চলিতেছে এবং তজ্জন্য পরিভাষা-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র সমিতিও মনোনীত হইয়াছে। বাঙ্গালা পাটীগণিতের প্রচলিত পরিভাষার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না তাহা বিচার করিবার এবং আবশ্যক হইলে ঐ পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিবার উপযুক্ত সময় এখন।

আমাদের বাঙ্গালা পাটীগণিতের পুস্তকগুলি ইংরাজি পাটীগণিত অবলম্বনে লিখিত। এই কারণে যে সকল ইংরাজি পদের বাঙ্গলা অনুবাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচিত হইল সেইগুলি ও অপর কয়েকটি পদ নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	ইংরাজি পরিভাষা	প্রাচীন গ্রন্থের পরিভাষা	প্রচলিত বাঙ্গালা পাটীগণিতের পরিভাষা	প্রস্তাবিত পরিভাষা
১	Rule	(১) পরিকর্ম্ম (২) বিধি	নিয়ম নিয়ম	(১) পরিকর্ম্ম (২) নিয়ম
২	Power	সমবধ	শক্তি	সমবধ বা সমঘাত
৩	Term	পদ	রাশি	পদ
৪	Reduction		লঘূকরণ	সবর্ণন
৫	Prime to one another	দৃঢ়	পরস্পর মৌলিক	দৃঢ়
৬	Common factor	অপবর্ত্ত	সাধারণ গুণনীয়ক	অপবর্ত্ত
৭	G. C. M., G. C. D., H. C. F., H. C. D.	করণী	গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক	করণী
৮	L. C. M.	নিরুদ্ধ	লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক	নিরুদ্ধ
৯	Mixed number		মিশ্রিত সংখ্যা মিশ্র সংখ্যা	মিশ্র সংখ্যা
১০	Cancelling of common factors	অপবর্ত্তন		অপবর্ত্তন (অপবর্ত্তিত করা)
১১	Cancelling of common factors from the numerator of one fraction and the denominator of another	বজ্রাপবর্ত্তন		বজ্রাপবর্ত্তন
১২	Cross multiplication			বজ্র গুণন
১৩	Reduction to lowest terms		লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিত করা	লঘূকরণ (লঘু করা)

১৪	Having a common denominator	তুল্যচ্ছেদ, সমচ্ছেদ তুল্যহর, সদৃশচ্ছেদ	সাধারণহরবিশিষ্ট	সমহর
১৫	Having a common numerator		সাধারণলববিশিষ্ট	সমলব
১৬	Compound fraction	প্রভাগ	গর্ভিত ভগ্নাংশ	প্রভাগ
১৭	Reciprocal fractions		অন্যোন্যক ভগ্নাংশ	ব্যস্ত বা বিপরীত ভগ্নাংশ
১৮	Recurring decimal		পৌনঃপুনিক দশমিক	পৌনঃপুনিক দশমিক
১৯	Non-recurring part		তদবস্থ অংশ	স্থির অংশ
২০	Recurring part		পৌনঃপুনিক অংশ	চর অংশ
২১	Compound practice		মিশ্র সাঙ্কেতিক	জটিল সাঙ্কেতিক
২২	Proportional division	প্রক্ষেপককরণ	সমানুপাতিক ভাগহার	প্রক্ষেপককরণ
২৩	Unitary method		ঐকিক নিয়ম ঐকক নিয়ম	ঐকিক নিয়ম
২৪	Perfect square		পূর্ণবর্গ	বর্গ
২৫	To find two quantities whose sum and difference are given	সংক্রমণ	দুইটি রাশির সমষ্টি ও অন্তর হইতে রাশি দুইটি নির্ণয়করণ	সংক্রমণ
২৬	Discount			বাট্টা
২৭	True discount			ন্যায্য বাট্টা
২৮	Commercial discount			ছুট বা ছাড়

(১) ইংরাজি পাটীগণিতে rule শব্দটি দ্বারা যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি কর্ম্মও বুঝায় (যথা, first four rules) এবং যে নিয়মে কোনও কর্ম্ম করিতে হয় সেই নিয়মটিও বুঝায়। ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ এই দুই স্থলে 'পরিকর্ম্ম' ও 'বিধি' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের গণিতাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে লিখিত আছে, "সঙ্কলিত ইত্যাদি বিংশতি পরিকর্ম্ম"। যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি আট প্রকার কর্ম্মের শেষে লীলাবতীতে লিখিত আছে "আট প্রকার পরিকর্ম্ম সমাপ্ত হইল"।

(২) বর্গকে প্রাচীন আর্য্যভট "সদৃশদ্বয়স্য সংবর্গঃ", মহাবীর "দ্বিসমবধ", শ্রীধর "সদৃশদ্বিরাশিঘাত" এবং ভাস্কর "সমদ্বিঘাত" বলিয়াছেন। ঘনকে তাঁহারা যথাক্রমে "সদৃশত্রয়সংবর্গ", "ত্রিসমাহতি", "সমত্রিরাশিহতি" এবং "সমত্রিঘাত" বলিয়াছেন। সংবর্গ, আহতি, হতি, বধ এবং ঘাত এই শব্দগুলি দ্বারা গুণন ও গুণফল বুঝায়। Power বুঝাইতে মহাবীরের "সমবধ" অথবা ভাস্করের "সমঘাত" শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৩) বাঙ্গালা পাটীগণিতে ২৲+৩।৴০—১।৵০ ইহাকে রাশি বলা হয়, এবং ইহার ২৲, ৩।৴০, ১।৵০ এই তিনটি অংশকেও রাশি বলা হয়। অর্থাৎ ইংরাজিতে quantity (বা expression) এবং term বলিলে যাহা যাহা বুঝায় সেই সকল বুঝাইতে বাঙ্গালায় 'রাশি' শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। Term বলিলে যাহা বুঝায় তাহা বুঝাইতে ভারতীয় আচার্য্যগণ 'পদ' শব্দটি ব্যবহার করিতেন।

(৪) ইংরাজি পাটীগণিতের reduction শব্দটির

বাঙ্গালা অনুবাদ 'লঘুকরণ' করা হইয়াছে। মিশ্ররাশির 'লঘুকরণ' দুই প্রকারে সঙ্ঘটিত হয়; যথা, (১) উচ্চ-শ্রেণীর এককে নিম্নশ্রেণীর এককে পরিবর্ত্তিত করিয়া, (২) এককের সংখ্যা ছোট করিয়া। প্রথম প্রকারের 'লঘুকরণ'কে 'নিম্নগ' ও দ্বিতীয় প্রকারের 'লঘুকরণ'কে 'ঊর্দ্ধগ' বলা হয়। 'নিম্নগ লঘুকরণে' এককের সংখ্যা বড় বা গুরু হয় এবং 'ঊর্দ্ধগ লঘুকরণে' এককের শ্রেণী উচ্চ বা গুরু হয়। অতএব এই দুই স্থলে 'লঘুকরণ' বলা হইবে কেন? গুরুকরণ বলিলে দোষ কি? এই কারণে, লঘুকরণ শব্দটি ঠিক হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ইংরাজি পাটীগণিতের reduction শব্দটির অর্থ কিন্তু ইংরাজি অভিধানে অন্যরূপ দেওয়া হইয়াছে। *The Oxford English Dictionary* নামে বিখ্যাত ইংরাজি অভিধানে reduction শব্দটির অর্থ এইরূপ দেওয়া আছে :—

"6. **a**. *Arith.* (*a*) The process of changing an amount from one denomination to another. (*b*) The process of bringing down a fraction to its lowest terms."

বাঙ্গালায় এই দুইটি অর্থ নিম্নলিখিত ভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) কোনও রাশিকে এক বর্ণ (denomination) হইতে অন্য বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার ক্রিয়া বা বিধি।

(খ) কোনও ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিত করিবার বিধি।

'লঘুকরণ' শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটিই বুঝায়, প্রথম অর্থটি বুঝায় না। প্রথম অর্থটি বুঝাইতে ভারতীয় গণিতাচার্য্যগণের 'সবর্ণন' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। তাঁহারা পণকে কড়ায় (বরাটকে) অথবা কড়াকে পণে পরিবর্ত্তিত করাকে সবর্ণন আখ্যা দেন নাই বটে। কিন্তু উহার অনুরূপ ক্রিয়াকে সবর্ণন আখ্যা দিয়াছেন। মিশ্র সংখ্যা অপ্রকৃত ভগ্নাংশে ব্যক্ত হইলে সবর্ণিত হয়—ইহা ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন। ৩$\frac{৫}{১৬}$ সবর্ণিত হইলে $\frac{৫৩}{১৬}$ হয়। অতএব ৩$\frac{৫}{১৬}$ কাহনও সবর্ণিত হইলে $\frac{৫৩}{১৬}$ কাহন হয়। সামান্য ভগ্নাংশের আকারে ভগ্নাংশ লিখিবার প্রথা উদ্ভাবিত হওয়ার পূর্ব্বে পণ বা আনা, গণ্ডা, কড়া, ইত্যাদি দ্বারা ভগ্নাংশ ব্যক্ত হইত। তখন ৩$\frac{৫}{১৬}$ কাহনকে ৩ কাহন ৫ পণ এবং $\frac{৫৩}{১৬}$ কাহনকে ৫৩ পণ বলা হইত। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, ৩ কাহন ৫ পণ সবর্ণিত হইলে ৫৩ পণ হয়।

শ্রীধর তাঁহার ত্রিশতিকায় সবর্ণনের নিম্নলিখিত উদাহরণটি দিয়াছেন :—

"পঞ্চ পুরাণাস্ত্রিপণাঃ কাকিণ্যেকা বরাটকেনোনা।
তৎপঞ্চমভাগোনা সমাসতঃ কিং ফলং ভবতি॥"

এই শ্লোকে 'বরাটকেনোনা' ও 'তৎপঞ্চমভাগোনা' এই দুইটি স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ "কাকিণী" এই একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য পদটির বিশেষণ। পুরাণ = কাহন; কাকিণী = বুড়ি ($\frac{১}{৫}$); বরাটক = কড়া ($\frac{১}{১}$); সমাসতঃ = মিলন বা যোগ হেতু।

অতএব উক্ত শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ এইরূপ হইবে :—

পাঁচ কাহন, তিন পণ, ১$\frac{১}{৫}$ কড়া কম এক বুড়ি যোগ করিলে কি ফল হয়?

উদাহরণটির সমাধানে শ্রীধর লিখিয়াছেন, "সবর্ণিতে জাতম্ $\frac{১৬৬৪৭}{৩২০০}$"। অর্থাৎ ৫ কাহন, ৩ পণ, ১$\frac{১}{৫}$ কড়া কম এক বুড়ি সবর্ণিত হইলে $\frac{১৬৬৪৭}{৩২০০}$ কাহন হয়।

অতএব দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কোনও মিশ্র রাশিকে নিম্নশ্রেণীর এককে অথবা উচ্চশ্রেণীর এককে ব্যক্ত করাকে ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণের অনুকরণে 'সবর্ণন' বলা যাইতে পারে।*

(৫) যে দুইটি সংখ্যার কোন সাধারণ গুণনীয়ক

---

* বাচস্পত্য অভিধানে সবর্ণন শব্দের অর্থ 'তুল্যরূপতাসম্পাদনে অংশসবর্ণনং স্যাৎ' লীলা" এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লীলাবতী রচয়িতা ভাস্কর বা অন্য কোনও ভারতীয় গণিতাচার্য্য সবর্ণন শব্দটি ঐ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, 'তুল্যরূপতা সম্পাদন পূর্ব্বক সমাস' এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। দুইটি ভগ্নাংশকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করা হইলে তাহাদের তুল্যরূপতা সম্পাদন হয়। কিন্তু এই ক্রিয়াকে 'সমচ্ছেদবিধান' বলা হইয়াছে, 'সবর্ণন' বলা হয় নাই। 'হর' শব্দটির পরিবর্ত্তে 'ছেদ' শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হইত। ভগ্নাংশের সবর্ণনের নিমিত্ত সমচ্ছেদ-বিধান আবশ্যক। এই কারণে ভাস্কর অংশসবর্ণনের প্রকরণে প্রথমেই সমচ্ছেদবিধানের সূত্র দিয়াছেন। শ্রীধর একটি উদাহরণের সমাধানে লিখিয়াছেন, "এবং সবর্ণনং ছেদসাদৃশ্যঞ্চ কৃত্বা" (৮ সুধাকর দ্বিবেদি সঙ্কলিত ত্রিশতিকার ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] অর্থাৎ এইপ্রকারে সবর্ণন ছেদসাদৃশ্য বা সমচ্ছেদবিধান করিয়া। অতএব সবর্ণন ও সমচ্ছেদ-বিধান এক নহে।

নাই তাহাদিগকে ইংরাজিতে prime to one another এবং বাঙ্গালায় 'পরস্পর মৌলিক' বলা হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গালা পদটি ইংরাজি পদটির অবিকল অনুবাদ। ১০ ও ২১কে পরস্পর মৌলিক বলা হয়। অর্থাৎ বঙ্গদেশে ২১কে অনিচ্ছাসত্বেও সত্য গোপন করিয়া বলিতে হইবে, "ভাই ১০, সকলেই বলে তুমি ২ ও ৫ এর গুণনে উৎপন্ন বলিয়া কৃত্রিম সংখ্যা। কিন্তু আমি ত স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, তোমার মধ্যে কৃত্রিমতা আদৌ নাই, তুমি ২ ও ৫ এর গুণনে উৎপন্ন হও নাই, তুমি একটি মৌলিক সংখ্যা।"

মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে; কিন্তু সংখ্যার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কখনও হয় না। কৃত্রিম সংখ্যা সকলেরই নিকট কৃত্রিম; উহা কাহারও নিকট কৃত্রিম এবং কাহারও নিকট অকৃত্রিম বা মৌলিক হইতে পারে না। নবীন আর্য্যভট ও ভাস্কর 'পরস্পর মৌলিক' পদটি ব্যবহার করেন নাই, 'দৃঢ়' পদটি ব্যবহার করিয়াছেন।* শুনা যায়, দুই রাজা পরস্পরের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিয়া কখনও কখনও এক রাজার কন্যা অপর রাজার পরিবারে বিবাহ দিয়া মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। যতদিন ঐ কন্যার সহিত উভয় পরিবারের সম্পর্ক থাকে, ততদিন কোন পক্ষই অপর পক্ষের সঙ্গে সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করিতে পারেন না। নিঃসন্তান অবস্থায় ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে অর্থাৎ উভয় পরিবারের কোনও সাধারণ আত্মীয় না থাকিলে উভয় পরিবারই আবার পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে দৃঢ়ভাব ধারণ করিতে পারেন। অতএব দুইটি সংখ্যার কোনও সাধারণ গুণনীয়ক না থাকিলে তাহাদিগকে 'দৃঢ়' বলা যাইতে পারে।

(৬) সাধারণ গুণনীয়ক বুঝাইতে ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, নবীন আর্য্যভট ও ভাস্কর 'অপবর্ত্ত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অপবর্ত্ত শব্দের ধাতুগত অর্থ 'যাহা দূরে থাকে' বা যাহা দূরে সরাইয়া লওয়া যায়। দুই বা ততোধিক সংখ্যা হইতে যে গুণনীয়ক বাহির করিয়া লওয়া যায় তাহাকে অপবর্ত্ত বলা যাইতে পারে।

* নবীন আর্য্যভটের মহাসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থের কুট্টকাধ্যায়ের ১ম এবং ভাস্করের লীলাবতীর কুট্টকাধ্যায়ের ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৭) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নবীন আর্য্যভট গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বুঝাইতে 'করণী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

অন্যোন্যং ভাজ্যহরৌ বিভজেৎ তাবন্নিরগ্রতাং গচ্ছেৎ।
কশ্চিচ্ছোধশ্ছেদঃ করণীসংজ্ঞোঽত্র বিজ্ঞেয়ঃ ॥

(মহাসিদ্ধান্ত, কুট্টকাধ্যায়, ৬৫ শ্লোক)

অগ্র = ভাগশেষ; নিরগ্রতা = ভাগশেষহীনতা, ভাগশেষ না থাকিবার অবস্থা।

শোধ = নিঃশেষকর্ত্তা, অর্থাৎ যাহা দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না।

ছেদ = হর, ভাজক।

শ্লোকটির অর্থ এই :—

ভাজ্য ও হর (ভাজক) উভয়কে পরস্পর ভাগ করিবে যে পর্য্যন্ত না ভাগশেষের লোপ হয়। যে ভাজক দ্বারা তাহার ভাজ্যকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না তাহার সংজ্ঞা করণী বলিয়া জানিবে।

ভারতীয় আচার্য্যগণ অবর্গ সংখ্যার বর্গমূলকেও করণী আখ্যা দিয়াছেন। করণী শব্দ দ্ব্যর্থক হইলেও অর্থভ্রমের আশঙ্কা নাই। '২০ ও ২৫এর করণী নির্ণয় কর'; '$\sqrt{৭}$ এই করণীটির আসন্নমান নির্ণয় কর'। এই দুইটি উদাহরণে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে করণী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে এবং কোন্ স্থলে কোন্ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে স্থির করিতে কোনও অসুবিধা হয় না। প্রত্যেক ভাষায় অনেক শব্দের বহুপ্রকার অর্থ থাকে। স্থল অনুসারে অর্থ নির্ণীত হয়। ইংরাজি জ্যামিতিতে circle শব্দটি দ্বারা কখনও পরিধি এবং কখনও পরিধির অন্তর্গত স্থান বুঝায়।

(৮) লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বলিলে যাহা বুঝায় তাহা বুঝাইতে মহাবীর 'নিরুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

ছেদাপবর্ত্তকানাং লব্ধানাং চাহতৌ নিরুদ্ধঃ স্যাৎ।
হরহৃতনিরুদ্ধগুণিতে হারাংশগুণে সমো হারঃ ॥*

(গণিতসারসংগ্রহ, কলাসবর্ণব্যবহার, ৫৬ শ্লোক)

* এই শ্লোকটি হইতে দেখা যায় যে, নিরুদ্ধ বা ল-সা-গু-নির্ণয় করিবার নিয়ম এবং কতকগুলি ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠসাধারণহরবিশিষ্ট করিবার নিয়ম মহাবীরাচার্য্যই প্রথম দিয়াছেন।

অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের হরগুলির সাধারণ গুণনীয়কগুলি বাহির করিয়া লইলে যে সকল (দৃঢ়) সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাদের ও ঐ সাধারণ গুণনীয়কগুলির গুণনে হরগুলির নিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। ঐ নিরুদ্ধকে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হয় তাহা দ্বারা ঐ ভগ্নাংশের হর ও লব গুণ করিলে ভগ্নাংশগুলির হর সমান হয়। ছেদ=হর। অপবর্ত্তক=অপবর্ত্ত+স্বার্থে ক। অংশ=লব। হার=হর।

নিরুদ্ধ শব্দের ধাতুগত অর্থ 'অবরুদ্ধ' বা 'আবদ্ধ'। যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার মধ্যে দুই বা ততোধিক সংখ্যা গুণনীয়করূপে নিরুদ্ধ বা আবদ্ধ থাকে তাহাকে ঐ শেষোক্ত সংখ্যাগুলির নিরুদ্ধ বলা হইয়াছে।

(৯) Mixed numberএর অবিকল অনুবাদ 'মিশ্রিত সংখ্যা' কোনও কোনও পুস্তকে দৃষ্ট হয়। যেরূপ আমরা 'মিশ্রিত রাশি' না বলিয়া 'মিশ্র রাশি' বলিয়া থাকি, সেইরূপ মিশ্রিত সংখ্যা না বলিয়া মিশ্র সংখ্যা বলা উচিত। প্রাচীন গ্রন্থে মিশ্র সংখ্যা ভাগানুবন্ধের অন্তর্গত ছিল।

(১০) দুইটি সংখ্যা হইতে অপবর্ত্ত কাটিয়া ফেলা বা সরাইয়া লওয়াকে অপবর্ত্তিত করা বা অপবর্ত্তন বলে। ২ দ্বারা অপবর্ত্তন করিলে ২৪ ও ৩৬ স্থলে ১২ ও ১৮ হয়। ২৪ ও ৩৬ ৩ দ্বারা অপবর্ত্তিত হইলে ৮ ও ১২ হয়। এইরূপ $\frac{২৪}{৩৬}$ ৩ দ্বারা অপবর্ত্তিত হইলে $\frac{৮}{১২}$ হয়।

(১৩) মিশ্র রাশিকে এক একক হইতে অন্য এককে ব্যক্ত করাকে সবর্ণন বলিলে, ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিত করণের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত ছোট 'লঘুকরণ' পদটি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(১৪) 'সাধারণহরবিশিষ্ট' এই শব্দটির পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত ছোট শব্দ 'সমহর' ব্যবহার করা ভাল বলিয়া মনে হয়। সমহর=সম বা সমান হইয়াছে হর যাহাদের। সংস্কৃতে সূত্রগুলি পদ্যে রচিত হইত বলিয়া ছন্দের অনুরোধে সমানার্থক অনেক শব্দ বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হইত। এই কারণে ভাস্করাচার্য্য 'হর' শব্দের পরিবর্ত্তে কখনও 'হার', কখনও 'ছেদ', ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালায় হর শব্দটিই ব্যবহার করিয়া থাকি। অতএব ভাস্করাচার্য্যের 'সমচ্ছেদ' ও 'তুল্যহর' এই দুইটি সমানার্থক শব্দের পরিবর্ত্তে 'সমহর' শব্দটির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় মনে হয়। তুল্যহর শব্দটিতে একটি যুক্ত বর্ণ থাকায় উহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি।

(১৫) উপরিলিখিত কারণে সাধারণলববিশিষ্ট শব্দটির পরিবর্ত্তে 'সমলব' শব্দটির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

(১৬) ভাগের ভাগকে পুরাতন আচার্য্যগণ 'প্রভাগ' আখ্যা দিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রভাগের নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়াছেন :—

দ্রম্মার্দ্ধত্রিলবদ্বয়স্য সুমতে পাদত্রয়ং যদ্ভবেৎ
তৎপঞ্চাংশকষোড়শাংশচরণঃ সম্প্রার্থিতেনার্থিনে।
দত্তো যেন বরাটকাঃ কতি কদর্য্যোণার্পিতাস্তেন মে
ব্রূহি ত্বং যদি বেৎসি বৎস গণিতে জাতিং প্রভাগাভিধাম্॥

অর্থাৎ, হে সুমতে, এক কাহনের (দ্রম্মের) $\frac{১}{২}$ এর $\frac{২}{৩}$ এর $\frac{৩}{৪}$ যাহা হয় তাহার $\frac{১}{৫}$ এর $\frac{১}{১৬}$ এর $\frac{১}{৪}$ যিনি প্রার্থীকে দিয়াছেন সেই কৃপণ কত কড়া (বরাটক) দিয়াছেন তাহা আমাকে বল, যদি, বৎস, তুমি প্রভাগ নামক ভাগের জাতি জান।

পুরাতন নাম 'প্রভাগ' বিদ্যমান থাকিতে আধুনিক 'গর্ভিত ভগ্নাংশ' নামটির আবশ্যকতা কি?

(১৭) Reciprocal fractions এর বঙ্গানুবাদ 'অন্যোন্যক ভগ্নাংশ' করা হইয়াছে। 'অন্যোন্যক' শব্দটির পরিবর্ত্তে পুরাতন 'ব্যস্ত' বা 'বিপরীত' শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে অর্থও সুগম হইত, উচ্চারণও সুখকর হইত। জ্যামিতিতে দুইটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটির কল্পনা ও সিদ্ধান্ত যথাক্রমে অপরটির সিদ্ধান্ত ও কল্পনা হইলে তাহাদিগকে বিপরীত প্রতিজ্ঞা বলা হয়। দুইটি ভগ্নাংশের মধ্যে একটির লব ও হর যথাক্রমে অপরটির হর ও লব লইলে তাহাদিগকে বিপরীত ভগ্নাংশ বলিলে দোষ কি? এইরূপ দুইটি ভগ্নাংশের একটিকে ব্যস্ত করিলে অপরটি পাওয়া যায়। ব্যস্ত ও বিপরীত সমানার্থবোধক শব্দ।

(১৯), (২০)। মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিকের যে অংশ পুনঃ পুনঃ উদিত হয় না অর্থাৎ যে অংশ স্থির থাকে তাহাকে তদবস্থ অংশ বলা হয়। তদবস্থ ও স্থির —উভয় শব্দের একই অর্থ। তথাপি প্রথম শব্দটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি সহজ, ক্ষুদ্র ও শ্রুতিমধুর। স্বরবর্ণ-

ছত্রপতি শিবাজী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবন বি-এ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

গুলির মধ্যে ই এবং উ শ্রুতিমধুর, অ, আ, ঐ, ঔ কর্কশ। এই কারণে বঙ্গদেশে অনেক শব্দের অন্ত্য অকার উচ্চারিত হয় না। এবং এই কারণেই উৎকলেও উচ্চারণ-কালে পদের অন্ত্য অকার লোপ করিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা 'তদবস্থ' শব্দটির চারিটি অকারই উচ্চারণ করি, কিন্তু 'স্থির' শব্দের অকার অন্তে আছে বলিয়া উচ্চারণ করি না, মধুর ইকার উচ্চারণ করি। এই কারণে 'স্থির' শব্দটি 'তদবস্থ' শব্দটি অপেক্ষা শ্রুতিমধুর। অতএব 'তদবস্থ' শব্দটির পরিবর্ত্তে 'স্থির' শব্দটির ব্যবহার ভাল বলিয়া মনে হয়।

প্রাচীন গণিতাচার্য্যগণ লোষ্ট্রকের সাহায্যে প্রস্তার-ভেদ (different combinations) নির্ণয় করিবার সময় 'স্থির' ও 'চর' এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। যে সকল লোষ্ট্রক, তাহাদের স্থানে স্থির থাকে তাহাদিগকে স্থির লোষ্ট্রক এবং যে লোষ্ট্রক স্থির থাকে না, স্থানান্তরে গিয়া উপস্থিত হয় তাহাকে চর লোষ্ট্রক বলা হয়। লোষ্ট্রকের এইরূপ সংজ্ঞার অনুকরণে মিশ্র পৌনঃপুনিকের স্থির ও পৌনঃপুনিক অংশকে যথাক্রমে 'স্থির' ও 'চর' অংশ বলা যাইতে পারে।

(২১) ইংরাজি পাটীগণিতে সাঙ্কেতিক দুই প্রকার, simple এবং compound। Simpleএর অনুবাদ 'সরল' এবং compoundএর অনুবাদ 'মিশ্র' করিয়া বাঙ্গালা পাটীগণিতে সাঙ্কেতিককে 'সরল' ও 'মিশ্র' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যদি একজাতীয় দ্রব্যসমূহ বা বিষয়সমূহ প্রকৃতি অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, তবে এক শ্রেণী সরল হইলে অপর শ্রেণী জটিল হইবে, মিশ্র হইতে পারে না, অথবা এক শ্রেণী 'মিশ্র' হইলে অপর শ্রেণী 'অমিশ্র' হইবে, সরল হইতে পারে না। সাঙ্কেতিককে সরল ও মিশ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করায় শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইয়াছে। সরল ও জটিল এই দুই শ্রেণীতেই সাঙ্কেতিককে বিভক্ত করা বাঞ্ছনীয়।

(২২) আচার্য্য মহাবীর প্রক্ষেপককরণের নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়াছেন :—

চত্বারি শতানি সখে যুতাশ্বশীত্যা নরৈর্বিভক্তানি।
পঞ্চভিরাচক্ষ্ব ত্বং দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চষড্গুণিতৈঃ॥

অর্থাৎ, হে সখে, ৫ জনের মধ্যে ৪৮০ (মুদ্রা) ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬এর অনুপাতে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের অংশ নির্ণয় কর।

এইরূপ প্রশ্নের সমাধানকে মহাবীর ও শ্রীধর 'প্রক্ষেপককরণ' আখ্যা দিয়াছেন।

(২৩) শ্রদ্ধেয় আচার্য্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদা-প্রসন্ন দাস মহাশয় ঐকিক নিয়মের পরিবর্ত্তে ঐকক নিয়ম ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কারণ, ইংরাজি unitary methodএর unitary শব্দের অনুবাদ ঐকিক নহে, ঐকক হওয়া উচিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর নিমিত্ত লিখিত তাঁহা নব্য পাটীগণিতের ১১১ পৃষ্ঠায় (৩য় সংস্করণ, ১৯৩১) তিনি পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "ইং ১৯০২ সালে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত 'পাটীগণিতসার' নামক পুস্তকে ঐকক কথাটী ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ও পরে প্রকাশিত অনেক পাটীগণিতে ঐকিক কথাটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।" Unitary method অনুসারে অঙ্ক কষিবার সময় আমরা সাধারণতঃ প্রথমে একটি দ্রব্যের মূল্য, ওজন, ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া থাকি। সুবিধা বুঝিয়া কোনও কোনও স্থলে পরিশ্রম-লাঘবের নিমিত্ত একটির পরিবর্ত্তে অন্য কোনও সংখ্যার মূল্য, ওজন, ইত্যাদি বাহির করিয়া লই বটে। কিন্তু এই সকল স্থল-গুলিতেও একটির মূল্য, ওজন, ইত্যাদি স্থির করিয়া লইলে গুরুতর দোষ হয় না। যখন প্রত্যেক স্থলেই নির্ণেয় উত্তর একটির সম্বন্ধে স্থির করিয়া প্রদত্ত সংখ্যার সম্বন্ধে স্থির করা যাইতে পারে, তখন এই নিয়মের সম্বন্ধে ঐকিক (এক+ ষ্ণিক) শব্দটিই ঐকক (একক + ষ্ণ) অপেক্ষা অধিকতর প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয়। স্থল বিশেষে সুবিধা অনুসারে নিয়মটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও ইহার নামের পরিবর্ত্তন সঙ্গত নহে। গুণক পূর্ণ সংখ্যা হইলে গুণন যেরূপে করা হয়, গুণক ভগ্নাংশ হইলে গুণন সেইরূপে করা হয় না। তথাপি গুণন শব্দটির পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। তাহা হইলে ঐকিক শব্দটির পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি?

ঐকক শব্দে দুইটি কর্কশ স্বর (যথা, ঐ, অ) উচ্চারিত হয়। ঐকিক শব্দে প্রথমে কর্কশ স্বর 'ঐ' এবং তার পর মধুর স্বর 'ই' উচ্চারিত হয়। অতএব ঐকিক শব্দটি ঐকক শব্দটি অপেক্ষা শ্রুতিমধুর।

উপরিউক্ত দুই কারণে ঐককের পরিবর্ত্তে ঐকিক শব্দের প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

(২৪) ইংরাজি perfect square এর ব্যবহারের অনুকরণে বাঙ্গালা পাটীগণিতে উহার অনুবাদ 'পূর্ণবর্গ' পদটির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদটির আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমরা জানি, ১, ৪, ৯, ১৬, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি বর্গ সংখ্যা এবং ২, ৩, ৫, ৬, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি অবর্গ সংখ্যা। অতএব সংখ্যাসমূহ বর্গ ও অবর্গ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। বর্গ সংখ্যাগুলিকে 'পূর্ণবর্গ' ও 'অপূর্ণবর্গ' এইরূপ দুই শ্রেণীতে কেহ বিভক্ত করেন নাই। যদি 'পূর্ণ সংখ্যা' ও 'পূর্ণ বর্গ' এই দুই স্থলে 'পূর্ণ' শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত, তবে 'পূর্ণ বর্গ' দ্বারা অখণ্ড বর্গ সংখ্যা এবং 'অপূর্ণ বর্গ' দ্বারা $\frac{1}{4}$ ইত্যাদি বর্গ ভগ্নাংশ বুঝাইতে পারিত। তাহা হইলে বর্গসংখ্যাসমূহ 'পূর্ণ' ও 'অপূর্ণ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারিত। কিন্তু 'পূর্ণ বর্গ' শব্দটি দ্বারা অখণ্ড বর্গ সংখ্যা ও বর্গ ভগ্নাংশ উভয়ই বুঝান হইতেছে। 'বর্গ' শব্দটি দ্বারা যখন এই কার্য্য সাধিত হয়, তখন অতিরিক্ত 'পূর্ণ' শব্দটির ব্যবহার নিরর্থক।

(২৬) টাকা কিংবা হুণ্ডি ভাঙ্গাইলে বাটা দিতে হয়। হুণ্ডির বাটাকে discount বলে। অতএব discount এর বাঙ্গালা 'বাটা' হইতে পারে।

(২৮) নগদ টাকায় দ্রব্য বিক্রয় করিবার সময় চিহ্নিত দাম হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয় তাহাকে কোথায়ও (যথা, বরিশাল জেলায়) 'ছুট' এবং কোথায়ও [যথা, কলিকাতায়] 'ছাড়' বলা হয়।

অনুবাদের আবশ্যকতা আছে—ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বিচার না করিয়া কেবল অনুবাদের নিমিত্তই অনুবাদ করিয়া নূতন পদের প্রচলন করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। পাটীগণিতের প্রচলিত পরিভাষার পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না পাঠক-পাঠিকাগণ বিচার করুন —ইহাই তাঁহাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা।

আই হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬

ভৃগুপদ একখানি করে গরম লুচি এনে দিচ্ছে আমরা তা বে-সরম জঠরে চালান দিচ্ছি। কিমার পুর-ঠাশা নিটোল পটোল এসে পড়ছে আর অদৃশ্য হচ্ছে। আধ-ডজন্ যখন সাযুজ্য লাভ করলে তখন কাজটা মন্থর গতি নিলে—কথা পথ পেলে। ভৃগুপদর রন্ধন-নিপুণতার সুখ্যাতি করতে কেউই কৃপণতা করলুমনা। তবে তার নিজের জন্যে কিছু রইলো কিনা সেটা জানবার সৎ-সাহসও এলোনা।

শান্তনুবাবুর ভিটামিনের চৌহদ্দি ত্যাগ করে আসার জন্যে মনের অস্বস্তি আর রইলোনা। শরীর মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল,—এতক্ষণে কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরে পেলুম। কাশী ছেড়ে বাসবের এখানে আসার কারণটা কি তা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি!

—হ্যাঁ—এইবার বল'তো তোমার এখানে আসার কারণটা কি,—বেড়াতে?

আশীর্ব্বাদ করুন—এমন দুর্ব্বুদ্ধি আমার না ঘটে। বেড়াতে হলে—কাশ্মীর যেতুম! এটা কি বেড়াতে আসবার জায়গা। পয়সার পিত্তেসে লোক সবই করে—প্লেগের মধ্যে রুগী দেখে বেড়ায়। প্রফেসারি করে' পেটের ভাতটা হয়, আর পত্নীর জন্যে ৪।৫ ট্রাঙ্ক কাপড়, সেমিজ ব্লাউস্ রেখে পর-পারে যাত্রাটাও চলে। মেয়ের বে'তে মহামহিম ছাড়া উপায় নেই,—তাও একটি হলে। তদতিরিক্তে—ভিটে মর্টগেজ। সে আর কবার চলে? ৩৫ পেরিয়ে এই সব দুর্ভাবনা আসে—সে আপনি জানেন।

বলেছিলে বটে।

তার পর শুধু হাতে যা চলে তাই ধরলুম। চুরিতে সিঁদকাটিটেও চাই, Life Insurance-এ কেবল মাথা আর মুখ। ছুটি-ছাটার ফাঁকে তাই করে বেড়াই,—এখন Chief agent হ'য়েছি, রাজস্থান আর বেহারেই ভরন্তর।

এক রকম 'আকাশবৃত্তি' বলো ?

সেটাও তো ভগবানের এলাকা ছাড়া নয়—বর্ষণ আকাশ থেকেই হয়। চ'লেছিলুম মজফ্‌ফরপুর,—বারুণী জংসনে দেখি একটি যুবা একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে লাইফ-ইনসিওর সম্বন্ধে কথা কইতে কইতে প্ল্যাটফর্ম্মে বেড়াচ্ছেন। ভাবলুম ইনিও স্বগোত্রই হবেন। যাক্—অমন কতো আছে। ভৃগু যে গোড়া থেকে তাদের সঙ্গ নিয়েছে তা দেখিনি। গাড়ী অনেকক্ষণ থামে,—রামদানা কিনতে গিয়ে থাকবে।—সে তাড়াতাড়ি এসেই বললে,—'ওদিকে দিক্‌শূল—কিষণগঞ্জে চলুন—অমৃতযোগ।' জিজ্ঞাসা করলুম—'ব্যাপার কি ?' বললে, 'চলুন না—ওঁর কামরায়,—১০ হাজারের মক্কেল। আপনার টিকিট তো স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল বাচেনা।'

তাই করা হ'ল। ভৃগুবাক্য আমার পরীক্ষিত—সে বাজে কথা কয়না। ট্রেণ ছাড়লো, ভৃগু সুবিধা মত বাবুটির হাতের চেটোয় উঁকি মারতে লাগলো। মানুষ চঞ্চল, স্বভাবতই হাত নাড়ে-চাড়ে, কখনো সোজা পিট্‌ কখনো উল্টো পিট, কখনো মোড়ে,—ভৃগুর চক্ষুও তৃষিত ভাবে নানা angleএ ঘোরে,—অথচ সন্তর্পণে। আমার হাতে এ বৎসরের কোম্পানীর ক্যালেণ্ডার—ছবিখানা খুব চিত্তাকর্ষক,—এণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা। ভৃগু তাঁর হাতে নজর রেখেছে আর তিনি আমার হাতের ক্যালেণ্ডারে।

তাঁর দেখবার আগ্রহ দেখে বললুম,—'দেখুন না, expressionটা (ভাবটা) কি সুন্দর করেছে,—উভয়ের মনের কথাটি যেন print-এ লেখা। একে ব'লে artist। ক্লিওপেট্রার অধরের হাসিমাখা ঈষৎ বক্রভাবে হৃদয়ের টকি-কোটো ফুটে উঠেছে,—না ?' তিনি ঝুঁকে নিবিষ্ট হতেই হাতটা আলগা দিয়ে বললুম,—'নিন, ভালো করে দেখুন, আমার অনেক আছে।' 'Thanks' বলে হাতে নিয়েই বললেন—'আপনি এদের এজেণ্ট বুঝি ?' বললুম 'হ্যাঁ—চিফ্‌।' আমার দিকে ভালো করে চাইলেন, বললেন—'এই Southern Gate (দক্ষিণ দোর) কোম্পানীর বেশ নাম আছে—সাউণ্ড'। বললুম—'One of the best threes of the world...'

বটে ?

এই দেখুনন।' 'বলে Gold bound প্যামফ্লেট্‌খানা বার করে তিনের পৃষ্ঠার ভায়োলেট্‌ লাইনটেয়—এই নীলার আংটিপরা আঙুলটা টেনে তাঁর চখের সামনে ধরলুম।

ও—আমি পূর্ব্বেই শুনেছি...

ঠিক্‌ সেই সময় ক্যালেণ্ডারের ওপর তাঁর ডান হাতটা চিতিয়েছিল—আর তার ওপর ভৃগু যেন নাক ঠেকাবে বলে ঝুঁকে পড়েছিল। তিনি ভৃগুকে বলে উঠলেন—'অত করে কি দেখচেন বলুন তো—আমি সেই পর্য্যন্ত লক্ষ্য করছি। কিছু আসে নাকি ?' বলে হাসলেন।

ভৃগু অপ্রতিভের মত—না—এমন কিছু না, একটা রেখা কিছু অসাধারণ। সংস্কারি-রেখা বলে পড়াই ছিল, দেখিনি,—তাই...

আমি বললুম, ওঁর ওই রোগ,—ওই সূত্রে আমার সঙ্গেও আলাপ। বড় জ্যোতিষী, এখনো research নিয়ে পাগল। বনেলির রাজদর্শনে একবার যাবেন, বাক্যদত্ত আছেন।

তিনি ক্যালেণ্ডার পাশে রেখে ভৃগুকে নিয়ে পড়লেন। এটা মানুষের স্বভাব।

সংস্কারি-রেখাটা কি ?

যে প্রবল ইচ্ছাটি নিয়ে মানুষ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করেছে সেই সংস্কার যে রেখায় ফুটে ওঠে—তাকেই বলে।

সেটা কি,—তা ধরা যায় ?

তা যায় বইকি,—খাটতে হয়। লোক যে-বয়সে পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করেছে, এ জন্মে ঠিক্‌ সেই বয়সে সেই আকাঙ্ক্ষাটি নিয়ে—সেই রেখাটি ফুটে সুস্পষ্ট হয়।

বাবুটি সাগ্রহে বললেন,—আপনি একটু দয়া করে দেখুন না,—ও রেখাটি কি নির্দ্দেশ করে। আমি আপনাকে বৃথা খাটাবোনা। আপনি যাবেন কতদূর ?

ভৃগু আমার সঙ্গে দুএক কথা করে বললে—বাসব বাবু বলচেন,—বেশ, আমার তো কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে

যাওয়া নয়, পুর্ণিয়াতেও এজেন্ট আছে, তার Progress দেখে, ও-অঞ্চলের হাওয়া জেনে,—আমিও বনেলি ঘুরে যাইনা—

বাবুটি বললেন,—বেশ তো দু'দিন কিষণগঞ্জে থেকে যেতে হানি কি,—আপত্যি আছে কি?

আমিই কথা কইলুম—আমি দু'একবার গিয়েছি। রেজা মিঞা ২৫ হাজারের পলিসি নিয়েছেন, যেতেও বলেছিলেন, আরও কয়েকজন নিতে চায়। শান্তনু বাবুর সঙ্গে দেখাও হবে—বড় ভদ্রলোক।

বাবুটি বিনীত ভাবে ব'ললেন—তিনিই আমার পিতা,—তবে আর ছাড়চিনা মশাই।

তারপর অনেক কথা। ভৃগু কাগজ পেন্সিল নিয়ে নিবিষ্ট। মধ্যে মধ্যে বাবুটির মুখের দিকে দেখে নিচ্ছে; কখনো হাতটাও। পাঁচটা ষ্টেসন্ পেছিয়ে গেল। শেষ বিহিপুরে পৌছে ভৃগুর পেন্সিল থামলো। সে চোখ বুজে চুপ করে বসলো। ট্রেণ ছাড়তে চোখ চাইলে।

দ্রাবিড় ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—কিছু ঠিক্ হল মশাই?

ভৃগু এক টুকরো ফিকে হাসির সঙ্গে বললে—কি করে বলবো,—অদ্ভুত ঠেকচে,—রহস্যের মত। এসব বলতে নেই—যারা এর কিছু বোঝেনা তারা ঠগ বলবে। আপনাকে এর জন্যে কিছু দিতে হবেনা। সে চুপ করলে।

দ্রাবিড় চঞ্চল হয়ে বললে,—সে কি মশাই, আর কেউ না বুঝুক, আমি তো বুঝবো। আমার প্রাণে কোন্ ইচ্ছা প্রবল এবং আমাকে অধীর করে রেখেছে, সেটা আমি বুঝবোনা তো বুঝবে কে?

ভৃগু বললে—সত্য, কিন্তু ঘটনাচক্রে উনি যে (আমাকে দেখিয়ে) এই গাড়ীতেই উপস্থিত। তাতে…

বললুম—তার মানে? আমি না হয় নেবে যাচ্ছি। কারুকে নাবতে হবেনা—আপনি দয়া করে বলুন।

তখন ভৃগু দ্রাবিড়কে বললে—আগে বলুন আপনার বয়স এখন ২৪ বচর '৭ মাস কি, নইলে সবই ভুল হয়েছে।

দ্রাবিড় অবাক্। Exactly, ঠিক্ তাই। এ আপনি…

সে আমার শাস্ত্র জানে। তা যদি হয়—তা হলে আমি নাম কারুর করব না,—শাস্ত্র নিষিদ্ধ।—আপনি পূর্ব্ববঙ্গের কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। ২১ বচর বয়সে আপনার যক্ষ্মার সূত্রপাত হয়। কবিরাজ সেটা আপনার কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তখন আপনার বিবাহও হয়েছে, একটি পুত্রও হয়েছে। আপনি I. A. পাস করেছেন। কবিরাজ পুরীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের বিধান দিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই আপনার সন্দেহ হল—আপনার মোটা টাকা প্রাপ্তির উপায় চিন্তা বরাবরই ছিল, বোধ হয় লটারির টিকিট কেনা বাইও ছিল—কিন্তু সেটা বড় অনিশ্চিত, তখন আর সময়ও নেই। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটা নিশ্চিত কিছু মাথায় আসায়—দ্রুত সেই চেষ্টা আরম্ভ করেন, কিন্তু রোগ প্রতিবন্ধক হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সেটা হতে দিলেনা। সেই উগ্র চিন্তা নিয়ে দেহান্ত হয়। সেটা Life Insure ছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাইনা। এখন সেইরূপ প্রবল ভাবে সেই ইচ্ছাটি দেখা দেবার কথা—তা সেটা যাই হোক্। আমার গণনা যদি ঠিক্ হয় তা হলে, আমার চেয়ে আপনিই সেটা ঠিক্ অনুভব ক'রচেন…

দ্রাবিড় সবিস্ময়ে ভৃগুর দিকে চেয়ে বললে—এই কিছু পূর্ব্বে বারুণী ষ্টেসনে আমার পরিচিত এক বন্ধুকে জীবন বীমার জন্যে আমার মনের অসম্ভব চাঞ্চল্যের কথা বলছিলুম। তিনি বলছিলেন—পারো তো ১০ হাজারের কম কোরোনা। আমার মনও তাই বলছিল। সেই ইচ্ছা মাথায় নিয়েই ট্রেণে এসে বসেছি।

ভৃগু তখন তাঁর হাতটা সহজেই টেনে দেখিয়ে দিলে—এই রেখাটি থাকতে আপনার সাধ্য কি যে অন্যথা করেন। এটা আপনার সাধনের ধন, অবহেলা করবেন না। এ টাকা লক্ষ্মী হয়ে ঘরে ঢুকবে, ঠিক সময় হয়েছে—যেখানে ইচ্ছে করে ফেলুন।

দ্রাবিড় বললে—বাসব বাবু উপস্থিত—এ যোগাযোগ ভগবানের। উনি দয়া করে করিয়ে দিয়ে যান।

আমি শান্তনু বাবুকে চিনি, দ্রাবিড়ের অনুরোধ সত্ত্বে, মিছে ওজর দেখিয়ে ডাক-বাংলায় উঠেছি—তার কারণও আপনাকে বলেছি। কাজটা দ্রাবিড় গোপনে করতে চায়; সকালে দেখতেই পাবেন।

বললুম—দ্রাবিড় যে আমার ভাইঝি-জামাই—

—আপনার ভাইঝির অনিষ্ট করচি, না ভালো করছি? এডুকেশন Departmentএ কাজ করি,—এ কাজ স্বীকার করবার আগে সব দিক থেকে ভেবে দেখেছি। ওতে দেশের উপকার করাই হয়। সকলে এখনো বোঝেনি তাই স্থল বিশেষে ফন্দি খুঁজতেও হয়, সেটা কারো মন্দের জন্যে নয়। নিজের চেয়ে, যার করা হয় তারই উপকার বেশী।

বললুম—তা বটে, বাঃ, বেশ উপভোগ্য তোমার ওই ভূগুটি।

—এ বিশ্বাসীর দেশে, জ্যোতিষের মত ব্রহ্মাস্ত্র আর নেই। এ শিক্ষা বেহারেই লাভ করেছি। এ প্রদেশে বুদ্ধিমান উকীলে জ্যোতিষী পোষেণ। মামলার আগেই মক্কেলদের বিজয়পত্র তাঁরাই দেন,—তার পর উকীল। আদায় আগাম। জ্যোতিষী যা পান, তারও দশ আনা উকীলের। আমার কাজে ভরা-ডুবির ভয় নেই,—জ্যোতিষীর পাওনা জ্যোতিষীর। বড় বড় একগুঁয়ে গণ্ডার পাড়তে ওঁদের সাহায্য নিতে হয়,—ওঁরা গণ্ডার গ্রেপ্তারের গাণ্ডিবী।

একি' বলে চমকে উঠলুম। এখানে রাতেও চড়ুই পাখীর উপদ্রব দেখচি! চীনে এই রকম মাছির উপদ্রব,—রাতেও নিস্তার ছিলনা, তবে ২।৩ মাস মাত্র।

বাসব হো হো করে হেসে বললেন—চড়ুই পাখি নয়—মোশা।

বলো কি,—মশা? ও ছুঁলে তো আর রক্ষে নেই,—এক কামড়েই ম্যালেরিয়ার মড়ক। যে রকম developed (গতর) তাতে স্থানটা খুব healthy বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু ও-বাড়ীর পণ্ডিতজিকে দেখে···

ওঁকে যে মশা নয়, 'ম'শায়ে কামড়েছে। বললুমনা—দশ আনা ছ' আনা। তাতে লোক মরেনা—মড়াঞ্চে মেরে থাকে।

আহার শেষ হয়েছিল, হাস্য রসে 'মধুরেণ' করে ওঠা গেল।

ভগবানের অসীম কৃপা, তাই বাসবের সঙ্গে অভাবনীয় দেখা। বেডিং পর্য্যন্ত আনিনি,—অপঘাৎ এড়িয়ে দিলেন।

পরে এক-শয্যায় শয়ন।—ভাবতে লাগলুম কত রকমের অভিনেতা মিলে দুনিয়াটাকে চালিয়ে চলেছে, কোনো রসেরই অভাব নেই। এই বৈচিত্র্যময় সমষ্টি-জীবনের পশ্চাতে সেই জীবনাধার রসরাজ।—চিন্তাও থামেনা—নিদ্রাও আসেনা। বাসবের নাসিকাধ্বনি যে কখন চেতনা হরণ করলে জানতে পারিনি।

ভোর রাত্রে—৪টা হবে, বাসব বাইরে যাবে বলে উঠলো, আমারও ঘুম ভেঙে গেলো। সে টর্চ্ নিয়ে বাইরে গেলো। ভাবলুম ফিরলে আমিও উঠবো। মনেই পড়লনা যে ডাক-বাংলায় ঘরে-বাইরে বলে কিছু নেই। এ এক একটি আলাদিনের ল্যাম্প।

বাসব দেখি পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে আমাকে ঠেলছে।—ব্যাপার কি?

—আস্তে, উঠে আসুন ধীরে।

বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠলো। ভূত দেখলে নাকি? এই সব একান্তেই তো তাঁদের আড্ডা। মনে মনে রাম রাম করতে করতে উঠলুম। বাহুটা বাঁকিয়ে কপালের কাছে এনে মাদুলিটেয় মাথা ঠেকালুম।

বাসব বেরুতে দিলেনা, দোরের কাছে যেতেই, হাতটা টেনে ধরে টর্চটা সামান্য টিপে চুপি চুপি বললে—জানলার নীচে দেখুন দিকি,—চেনেন কি?

দেখি একটি লোক স্থাল ঠেশ দে—হাঁটু বুকে, ঘুমিয়ে পড়েছে। হাঁটুর ওপর পাকা চুল দাড়ি রাখা। শিউরে উঠলুম, বাসবকে ঘরের মধ্যে টানলুম। ঢুকেই, খিল দিয়ে টর্চ নিবিয়ে মশারির মধ্যে উভয়ের প্রবেশ। কানে কানে কথা—

উনিই সেই উজীর সায়েবের সঙ্গী—ফকির সায়েব।

বললুম—এবং আমার শুভাকাঙ্ক্ষী চক্রধর।

দুজনেই একদম চুপ—মিনিট পাঁচেক! আমার মনের অবস্থা অনুমান করে বাসব বললে—বড়ই ব্যতি-ব্যস্ত করেছে দেখচি—অযথা অশান্তির কারণ,—কিন্তু সত্যের মার নেই নবীন বাবু—চিয়ার্ আপ্ সার্।

আমি এখনো সামলাতে পারিনি। একি কাণ্ড! নিবিড় রণগোপাল সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করেছিল; আমি তাকে বিশ্বাসই করতে পারিনি। ভেবেছিলুম ছেলেদের মধ্যে বোধ হয় মনের অকৌশল আছে, নচেৎ রণগোপাল যে প্রকৃতির ছেলে তার বিরুদ্ধে এরূপ অসম্ভব

অনুযোগ! দেখছি সেই রণগোপালই তো ফকির সায়েবকে ট্রেণে তুলে দিতে গিয়েছিল, এতো তার মুখেই শোনা! তবে আর—

বাসব আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে—কিছু ভাববেননা, বুঝছেননা ওদের কোথায় একটা ভুল হয়েছে—

বললুম—আমার বুঝে ফল? তাতে আমার ভোগাভোগ কমবে কি? বাঘে যদি ভুলক্রমে গরু মনে করে মানুষকে ধরে, তার পর সেটা জানতে পেরে থাবা-জোড় করে পায়ের ধুলো নেয় নাকি। প্রাণে বাঁচলেও আঠারো ঘা ঘোচেনা। যাক্—সে চিন্তা আমার নয়—মালিকের—

তিনি আবার কে?

যাঁর দুনিয়া এবং যিনি আমার মধ্যেও।

খুব সান্ত্বনা তো?

—ওর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আছে নাকি? আমি তো জানিনা। যাক্, ভুল চুক সবারই হয়, তা বলে ওদের ব্যবস্থা তো মন্দ নয়। সেটা আমাকে আনন্দই দেয়। আমাদের দেশের লোকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বড়ই আলগা;—হচ্চে হবে, হবেই খন—এই ধরণের। কিন্তু এই সব ইয়ং উদীয়মানের যেন একটা নেশায় পেয়ে থাকে,—কাজে আনন্দ না থাকলে তা হয়না। এইটি সুলক্ষণ। ওরাও তো আমাদেরি দেশভাই। এটা যে দেশের কত বড় লাভ একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। ভবিষ্যৎ বলতে তো দু এক বচর, দু এক মাস নয়—নিরবধি কাল। সুতরাং এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেশকে একদিন মানুষ ক'রে তুলবেই। তখন রায় মশায়ের "আবার তোরা মানুষ হ" বলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

উঃ! আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষার ল্যাটিচিউড্ তো খুব লম্বা—পথও তেমনি অদ্ভুত একদম 'টিপারারি!'

বললুম—কখনো ছোটো কিছু নিয়ে ঘর কোরোনা ভায়া। আমার পথটা—কাশী থেকে মজফ্‌ফরপুর যেতে কিষণগঞ্জের চেয়ে অদ্ভুত কি? যার কাজ সেই করায়—ডাক-বাংলায় ডাকলে কে?

বাসব চুপি চুপি কথা ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। আমি তার গা টিপলুম।—বাসব কি জানি কি ভেবে আমার পায়ের ধুলো নিলে।

বললে—ওঃ সকাল হ'য়েছে যে—উঠে পড়া যাক্। আপনার প্রোগ্রাম কি?

আমি চুপি চুপিই বললুম—এই সকালের ট্রেণেই পুনর্যাত্রা।

আমিও আর কোথাও যাবনা, এই কাজটা সেরেই কাশী। এদের এ ভুল আমাকে ভাংতে হয়েছে।

খবরদার এমন কাজ করতে যেওনা,—আসামী বাড়িও না। মাঝে মাঝে বিরক্তিকর হলেও—আমার উপভোগ্যই লাগছে। একদিন আপনিই খুলে যাবে,—মিথ্যার আয়ু নেই......

উঠে পড়া গেল। কেউ কোথাও নেই। ভৃগু ৭টার মধ্যে লুচি পটোল ভাজা আর হালুয়ার সঙ্গে দু কাপ চা খাইয়ে দিলে। বাসবকে অনেক করে বুঝিয়ে—ফিরলুম। চিন্তার খোরাক যথেষ্টই সংগ্রহ করা হ'য়েছিল, পথটা সহজেই কেটে গেল।

২৭

পূর্ণিয়া ষ্টেসনে নেবে চারদিক চেয়ে দেখলুম। রণগোপাল নেই। একখানা সাম্পানি গাড়ী করে বাসায় রওনা হলুম। ঘোড়ার পিটে সপাৎ করে চাবুক পড়তেই, ইস্ করে চমকে উঠলুম। গাড়োয়ানকে বললুম—ঘোড়াকে ঠেঙিওনা বাবা,—আমার তাড়া নেই। প্রাণ কিন্তু চাইছিলো—পৌচুতে পারলে এক ছিলিম গুড়ুক খেয়ে বাঁচি।

বাজারের কাছে পৌছে দেখি—একখানা খাটিয়ার ওপর—অত্যন্ত ময়লা—ছাল-ছাড়ানো লেপ, ছেঁড়া কম্বল, গলাভাঙা একটা কুঁজো আর যেন ল্যাম্প-মোছা একখানা জীর্ণ টোয়ালে নিয়ে দুজন লোক চলেছে। প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠলো,—কে আবার মরলো? এ আসবাব তো সেই শেষের দিনেই বেরোয়,—আমাদের বরাদ্দ কর অন্তিম ঐশ্বর্য্য! ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে আঁতুড়ের উন্নতি আপনিই হয়ে আসছে,—এ দিকটার জন্যে বোং হয় কোনো জবরদস্ত অবতারকে জন্ম নিতে হবে।

এই বীভৎস চিন্তার সময় পেলুমনা; গতিরামবা লাঠির ভরে দ্রুতগতি আসছিলেন,—আমাকে দেখে গাড়োয়ানকে হুকুম করলেন—রোকো—রোকো।

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখে এলেন বুঝি—কেমন আছেন?

কে কেমন আছেন? আমি তো কিষণগঞ্জ থেকে ফিরচি।

জানেন না?—চলুন চলুন। কুবেরবাবুর কাল রাত থেকে ভারী অসুখ যে, আহা—promising young man—ডাক্তার ডিপুটি উকীল মোক্তার—জেলার মাথারা সব সেইখানেই, চলুন,—ফিরুন,—এই গাড়িওয়ান—ঘুমাও···

মাপ করুন গতিরামবাবু, আমার এখন যাবার মত অবস্থা নয়। আপনার গাড়ী দরকার থাকে আমি ছেড়ে দিয়ে এটুকু হেঁটে যাচ্ছি—

আপনি যাবেননা, অত বড় positionএর লোক ···সকলে হাজির হয়েছে···

যাবনা তো বলিনি,—এখন পারবনা। সকলে যখন হাজির—আবার ভিড় বাড়ানো কেনো। আমার সঙ্গে জানা-শুনোও নেই—ব্যায়রামটা কি?

যাবেননা আর শুনে কি হবে। অত বড় লোকটা,—যে শুনছে সেই···

শরীর মন দুই অস্বচ্ছন্দ ছিল, বড় বিরক্ত বোধ হল; বললুম—যে শুনছে সেই মানে—বড়-বড়রা তো? আমি তো তা নই মশাই। আর—অত বড় লোকের মানেও বুঝি না,—বড় টাকা বাড়ী নে'যান বা ব্যাঙ্কে রাখেন। তাতে অন্যের কি মশাই। রোগের সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝলুমনা। লোকাভাব থাকে তো—সেবার জন্যে যেতে পারি, যা আমাদের কাজ। বড়রা ত আহারের সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই সরে পড়বেন, তাঁদের regularity রক্ষা তো করতেই হবে। সেই সময় না হয়···

গাড়ীখানার সুবিধা হ'লনা দেখে তিনি আর দাঁড়ালেননা। আমার মাথাটা খারাপ করে দিয়ে চলে গেলেন। এরা একটি show-case—

কোথাও কিছু নেই, বাড়ী ফিরে চা আর গুড়ুক খেতে পারলে বাঁচি,—না—গ্রহ রাস্তায় ঘুরছে!

যাক্—পৌছে গেলুম।

স্বাতি ছুটে এসে বললে—আমি মাকে আগেই বলছি—দাদামশাই আজ আসবেনই আসবেন।

হাসতে হাসতে বললুম—সেই সঙ্গে চায়ের জল চড়িয়ে দিতেও বলেছ বোধ হয়।

ও মা এখনো চা খাওয়া হয়নি। বলে সে বাড়ী ঢুক্‌লো। চাকরটাকে বললুম—সূর্য্যি শিগ্‌গীর একছিলিম তামাক সাজ বাবা।

আবি লিজিয়ে বাবু, বলে সে যেন ডুব সাঁতারের চালে ছুটলো। আমি সোজা শয্যায় পা চালালুম। —আঃ বাঁচলুম। কি পাপ—চোক বুজলেও গতিরাম বাবুর সেই দুশ্চিন্তা-রঙানো মুখশ্রী, চোখের পাতা ফুঁড়ে হাজির! হাসিও পায়—দুঃখও হয়। হক্ না হক্ মনটা খারাপ করে দিয়ে গেলেন।

গুড়ুকও এলো সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত গলার আওয়াজ —স্বাতি এই আঁব কটা নিয়ে যাতো মা—নতুন গাছটায় হয়েছিল, তোর দাদামশাইও এসেছেন, তাই এলুম নিয়ে।

চেয়ে দেখি—পলাশ কুসুম। বয়েস তেমন না হলেও আপিসের বড় বাবুটির ঝাঁঝে আর তাতে মাঝে মাঝে পাকাচুল দেখা দিচ্ছে। একাই তিন কাজ করে,—চাকরি করে, চুল ফেরায়, 'ব্রিজ' খেলে। বিলিতি বলে অবহেলা নেই—খুব সভক্তিই খেলে। বাপ বেটায় কমপিটিসন চলে। পূর্ণিয়ায় প্লেগ নেই—ওইটে আছে। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নেই।—ম্যাডোনা না হলেও বাকি সময় পলাশের কোলেপিঠে ছেলেমেয়ে থাকে। অশান্তির অন্ত নেই। ভেতরটা তিক্ত হয়ে থাকাই সম্ভব, ওপরে অনাবশ্যক প্রকাশ নেই। তাই বেচারাকে ভালোবাসি, সান্ত্বনার কথাও শোনাই।

ঘরে ঢুকে—একি মশাই,—সন্ধ্যে বেলা শুয়ে পড়েছেন যে, শরীর ভাল আছে তো? তামাকের গন্ধ বেরিয়েছে যে—

একটু হাসি টেনে বললুম,—গন্ধ পাচ্ছি, উঠতে পাচ্ছি না।

তা হলে যে বড় চিন্তার কথা হয় মশাই—

কথাটা বেশ উপভোগ্যই লাগলো, হাসতে হাসতে —'ঠিক বলেছ ভাই' বলে উঠে পড়লুম।

পলাশ নলটা হাতে তুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করলুম—কুবেরবাবুর কি কঠিন কিছু—?

কে বললে আপনাকে? পূর্ণিমায় ম্যালেরিয়া আবার একটা ব্যায়রাম নাকি?

ম্যালেরিয়া জ্বর?

তা বলবার জো আছে কি? জ্বর তো মুটে, মজুর, কেরাণীর হয়—বড়দেরও তাই নাকি! হলেও ল্যাটিন করে ল্যাটিভিয়া-ভিনিকিম্-ফেব্রোম্যালো, এই রকম একটা বিদকুটে কিছু বলাই চাই। আমার গেরো, আমিও মশাই গিয়ে পড়েছিলুম। ঘটার দৌড় কি,—দেউড়িতে ৭খানা মোটর। সত্যি তো আর দেখতে যাওয়া নয়,—দেখা দিতে যাওয়া,—অর্থাৎ আমিও এসেছি মশাই। Mutual affair (মাসতুতো ব্যাপার) কিনা। নব-রত্নের সভা। কেউ বলছেন—আধ মোণ, কেউ বল্লেন—উঁহু তিরিশ সের, কেউ বল্লেন—সে কি,—নষ্ট হয় ক্ষতি নেই কিন্তু কম পড়লে—Think of the terrible moment —Lifeটে কি! এক মোণ বরফ আনতে মোটর বেরিয়ে গেল। তার পর blood নিতে,—বাঘের চেয়ে ব্যগ্র তিনজন ডাক্তার চড়োয়া!—

ডাবের জল খেতে হবে,—দুখানা telegram চলে গেল। গতিরামবাবু "আমি যাচ্ছি" বলে ছুটলেন। ফিরে এসে বললেন,—"নেবুর জন্যে নেপালের মিনিষ্টারকেও একখানা করে দিলুম—money is no question"—সকলে ধন্য ধন্য করলেন। বারাণ্ডায় গিয়ে Standing Council of Lordsএ শোনা গেল—রাত্রে attend করছে কে? Intelligent and smart লোক চাই। একজন বললেন,—সে ভাবতে হবে না, আপিসের কেরাণীরা রয়েছে, অনাথ most intelligent, obedient and servicable.

—শুনে চমকে গেলুম মশাই, এই সেদিন inspectionএ বড়বাবু তাকে Lazy and Worthless লিখিয়ে দিয়েছেন। যাক্, সেই রইলো,—থাকবে আর কে? সকলের চেয়ে বিরক্তিকর—প্রতি ৫।৭ মিনিট অন্তর কোনো না কোনো highপদীর প্রশ্ন—'এখন কেমন বোধ করছেন?'—এই পেশাদারী অভিনয় দেখে সেখান থেকে পাশ কাটাতে পারলে বাঁচি। একটা ভুল করে একটি হাফ্-হাজারি হুজুরকে. সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলুম —'জ্বর তো?' তিনি আমার দিকে এমন দৃষ্টি হানলেন, আমি তো এতটুকু,—কি অপরাধই করেছি! 'বোঝনা সোঝনা কথা কও কেনো? What do you mean by জ্বর, এখানে ভিড় কোরো না।' তা সত্যি,—আমাদের দরকার তো এখন নয়।

বরফ আসতেই সকলে বরফ জল চেখে দেখলেন অর্থাৎ এক পেট করে খেলেন—যেহেতু সকলেই বিষম উদ্বেগ-কাতর ছিলেন। তার পর দু টিন Cream Craker আর চা শেষ করে, যে যার মোটরে উঠলেন। অবশ্য অনাথকে সাবধান, সতর্ক watchful, very careful, alert ও নিদ্রাহীন থাকতে বারবার উপদেশ দিতে ভুললেননা।

রোগী আজ আপিসে গিয়েছিলেন। জ্বর ছেড়ে গেছে, বড় কাহিল—grape juice খাচ্ছেন।

আমি অবাক হয়ে যেন ভাগবত শুনছিলুম আর ভাবছিলুম—পলাশকে এত উত্তেজিত হতে কোনো দিন দেখিনি; চাকরি আছে তো? থাকলেও আর বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয়না। বললুম—

জ্বর ছেড়েছে, আপিসে গেছেন—তবে গতিরামবাবু আমার মনটা গিছে ··

আপনি ওঁকে চেনেন না? একটু বিস্মিত মুখে,—বড়র গন্ধ থাকলে গতিরামবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ—এটা সবাই জানেন, নূতন কিছু নয়। ছোটোকে নিয়ে টানাটানি কেনো? God forbid—তাদের কাজ তো নির্দ্দিষ্ট রয়েছেই—তখন তো সুখের পায়রা কেউ থাকেন-না।—চটপট্ dove-cot খোঁজেন। ভগবান তাঁদের ভাল রাখুন—গরীবদের দুর্ভোগ কমুক। ঝড় বৃষ্টি রোদে শ্মশানে যে একটা দাঁড়াবার আচ্ছাদন পর্য্যন্ত নেই, সেটা তো বড়দের খেয়ালে আসে না,—যেহেতু সজ্ঞানে তাঁদের তো সে পথের যাত্রী হতে হবেনা।

—না—পলাশকে থামানো দরকার। বললুম—থাক ভাই, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন' বড়দের কথা···

সে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো। কিসের বড় মশাই? নিজেরা ভাল খান, ভাল পরেন, মোটর চড়েন, বড় T. A. টানেন, বড় Bank account রাখেন, বড় টাকার Life Insure করেন, ভারত মাতার বুকে ইটের বড় বড় পাঁজা পোড়ান—ইমারৎ চাপান—finish—কাদের

মধ্যে তো এই। বলে কিনা "বোঝনা সোঝনা কথা কও কেনো।" ওঁদের বোঝাটা ওই টাকার ওজনে কিনা,—তাই বড় বোঝেন। ছোট কিছু মনে ধরেনা—জরকে ধনুষ্টঙ্কার কি T. B. বললে যদি খুশি হোস্ তাই বলনা বাবা—বলছি ··

সুবিধে নয়—পলাশের আজ একি হল। কথাটা বড্ড লেগেছে দেখছি, লাগবারই কথা। গরিব মধ্যবিত্তদের যে মর্ম্ম বলে একটা স্থান আছে,—তাদেরও যে লাগে, সেটা কর্ত্তারা ভুলে যান। ভাবচি অন্য কথা ফেলে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দি—

স্বাতি প্লে'ট করে গজা দিয়ে চা আনতে গেল। বললুম, যাক ও পাপ কথা পলাশ—এখন চা খাওয়া যাক্।

ঠিক্ বলেচেন,—ও পাপও থাকবে, আমাদের তাপও থাকবে, মিছে মাথা খারাপ করা। বড্ড লেগেছিল তাই আপনাকে বলে খোলসা হলুম।

বেশ করেছ—আর না। ওতে নতুন কিছু নেই—ওরে type বলে। টাইপ কত রকমের থাকে ··

হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার সঙ্গে ২৩ দিন রণ গোপালকে দেখলুম। পরিচিত বুঝি?

আবার ও-নাম কেনো? বললুম,—না এইখানেই পেয়েছি, খুব স্বদেশী, না?

হ্যাঁ, মাড়োয়ারিদের ছাপমারা খাঁটি স্বদেশী।

তার মানে?

হাসতে হাতে—রবারের ছাপ্।

—না, আমার আর দুনিয়ায় থাকা চলেনা। এদের কথার অর্থবোধ আসেনা, কারুর কথাই আর ঠিক্ বুঝতে পারিনা।

আমার অবস্থা দেখে পলাশ বললে—দেখুন—কোনো কিছুর 'অতি'টা স্বাভাবিক নয়, তা দেখলেই সাবধান হতে হয়। তাতে ভুল করাও ভাল। আচ্ছা, এখন চললুম।—আবটা খেয়ে দেখবেন, নতুন গাছের—

পলাশ কুসুম চলে গেল। আমি অন্য-মনে পোড়া তামাকটাই টেনে চললুম। দুর্গতির মধ্যে ভাবনা চিন্তাগুলোও দ্রুতগতি চলে,—একটাও সদ্গতি লাভ করেনা,—এলোমেলো অমৃতাক্ষর। কবিগুরুও তাই ওই মুস্কিল-আসানের দিকে ঝুঁকেছেন।

একান্তে এই বিরাটের গোগৃহটি মন্দ লাগেনি,—কিন্তু এখানেও আর স্বস্তি নেই। তবে কথা আছে—'হলেই বা কাটের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারলেই হল'—তা ধরে। মাটির মানুষ রোজগারটি করে, সিগারেটটি টানে, ব্রিজ খেলে,—কোনো গোলমালে নেই,—সব বেশ আছেন। জনিতা কোথায় সেটা জানবার বৃথা উৎসাহ নাইবা রইল। এমন নির্ব্বিরোধ স্থানও আমার সয়না দেখচি।

আহারান্তে শয্যা নিতেই সব দুর্ভাবনা সরে গেল। এক ঘুমে রাত কাবার। খাঁটি বুদ্ধিমান মাত্র দুটি জন্মে ছিলেন,—কুম্ভকর্ণ আর জড়ভরত। তাঁদের স্মরণ করে চেয়ে দেখি,—নিবিড় চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছে।

(ক্রমশঃ)
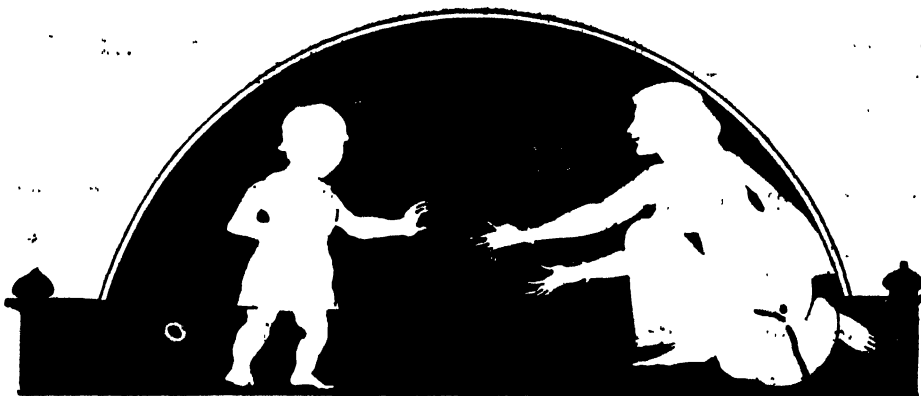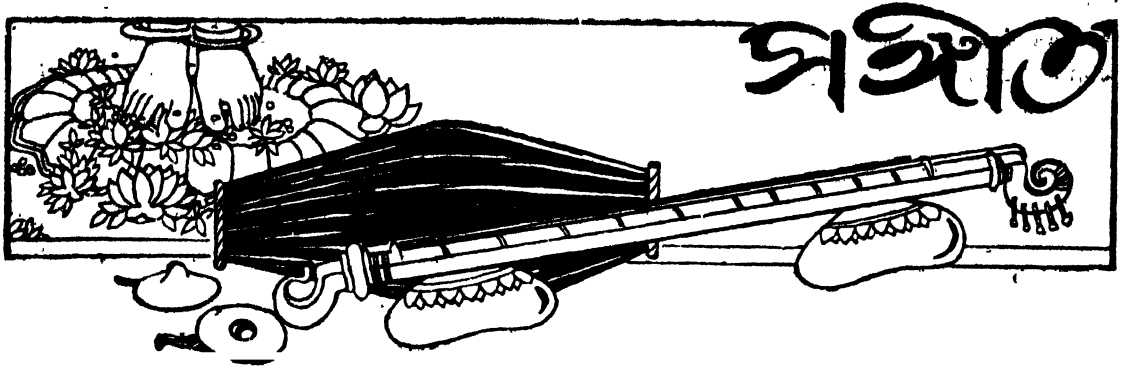
কথা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার　　　　　　　　　　সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

ভীমপলাশী মিশ্র—দাদ্‌রা

মোর আঙিনায় আবার যখন
আসবে ওরা খবর নিতে ;
বনের পাখী করবে যখন
　　　　কল গীতে ;
রইবে খালি কুটীরখানি,
জ্বালবে না কেউ প্রদীপ আনি
　　　　ভাঙা ভিতে।
শুনবে না কেউ তাদের গানে ;
উঠবে না ঢেউ কারো প্রাণে ;
মুখর খালি হবে এ ঘর
　　　　সেই ধ্বনিতে।

\+ ২ + ২
II { সা সা সরা | -জ্ঞজ্ঞরা সা -ণ্‌া I সা গা -মা | মপা জ্ঞমা -পা I
মোর্ আ ঙি- --- না য়্ আ বা র্ য- খ- ন্

(পা -মা পা | -র্সণা ধা পা I পমপা মজ্ঞা -মজ্ঞা | জ্ঞরা -জ্ঞরা ণ্‌সা) } I
আ স্ বে - ও রা খ- ব- -র্ নি -- তে

{ পণা ণা ণা | ণধা -পধা পমা I পা -দা র্সণধণা | ণদা পা -া I
ব- নে র পা- -- খী ক র্ বে-- য খ ন্

(পণা ণা ণা | ণধা -পধা পমা I পা -দা র্সর্সা | -া -া -া I
ব- নে র পা- -- খী ক র্ বে - - -

-নর্সা -না দ্ধা | পা -া -া) } I পসা -রমা মা | মরা -মপদা -মপা I
-- - য থ - ন্ ক -- ল গী --- --

মজ্ঞা -া -া | -সরা -া -জ্ঞসা II
তে - - - - -

\+ ২ + ২
II { সা সা সা | সন্া সসা সন্া I সদন্া সা -জ্ঞা | -সরা -া মজ্ঞা I
র ই বে খা - লি কু- টি - - র্ খা

মসা -া -া | -া -া -া I সা -গা গা | গা মা গমা I
নি - - - - - আ স্ বে না কে উ

মা মগমা -জ্ঞরা | -মসরা -মপা -া I -পমা -গমা মপা | মজ্ঞা -া -মসা } I
প্র দী- -- -- -- - - -প্ আ নি - -

সা -রমা মা | মরা -মপদা -মপা I মজ্ঞা -া -া | -সরা -া -জ্ঞসা II
তা -- ভা ত্তি- --- -- তে - - - - -

\+ ২ + ২
II { পা -া পা | মধপা মজ্ঞা মা I পণা ণা -র্সা | র্সা -া র্সা I
শু ন্ বে না-- কে উ তা- দে র্ গা - নে

র্সণা -র্সা র্সর্জ্ঞা | র্রা র্সা র্সা I র্সণা -র্রর্সা র্সা | র্সণা -র্সণা ধপা } I
উ ঠ্ বে না চে উ কা -- রো প্রা -- ণে-

II { পণা ণা ণধা | -পধা পমা মা I পা পদা -র্সণধণা | পদ্মা পা -া } I
মু- খ র- -- খা লি হ বে- --- এ ঘ র্

পসা রমা মা | মরা -মপদা -মপা I মজ্ঞা -া -া | -সরা -া -জ্ঞসা II II
সে ই- ধ্ব নি- --- -- তে - - -

যুযুৎসু-কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮ নং

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে তখন যদি কেহ ডান কনুইয়ের কাছে তাহার বাঁ হাত দিয়া জোর করিয়া ধরে, তবে নিজের সেই হাতটী কনুইয়ের কাছে মুড়িয়া, তাহার ধরা হাতের ডান দিক দিয়া উপরে তুলিয়া, তাহার হাতের বাঁ দিকে জোরে ঝাঁকুনি দিয়া নামাইয়া লইলে হাতটী ছাড়াইতে পারা

৮নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

যায়। যে হাতের কাজ হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে সেই পা-টী পিছাইয়া লইলে অপরে আর ধরিতে পারিবে না।

যদি কেহ বাঁ কনুইয়ের কাছে তাহার ডান হাত দিয়া ধরে তবে উপরিউক্ত ভাবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিলেই হাতটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

৯ নং

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে তখন যদি কেহ ডান কনুইয়ের কাছে তাহার ডান হাত দিয়া জোর করিয়া ধরে তবে নিজের সেই হাতটী তাহার ধরা হাতের ডান দিক দিয়া উপরে তুলিয়া সমান্তরাল ভাবে নিজের ডান দিকে জোরে ঝাঁকুনি দিয়া লইয়া যাইলে হাতটী ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়। যে

৮নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

হাতের কাজ হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে সেই পা-টী পিছাইয়া লইলে অপরে আর ধরিতে পারিবে না।

যদি কেহ বাঁ কনুইয়ের কাছে তাহার বাঁ হাত দিয়া ধরে তবে উপরিউক্ত ভাবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিলেই হাতটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

১০ নং

হাত দুইটা যখন নীচে সাধারণ খোলা অবস্থায় থাকে তখন যদি কেহ ডান কনুইয়ের কাছে তাহার দুই হাত দিয়া জোর করিয়া ধরে তবে নিজের সেই হাতটী তাহার দুই হাতের ডান দিক দিয়া উপরে তুলিয়া সমান্তরাল
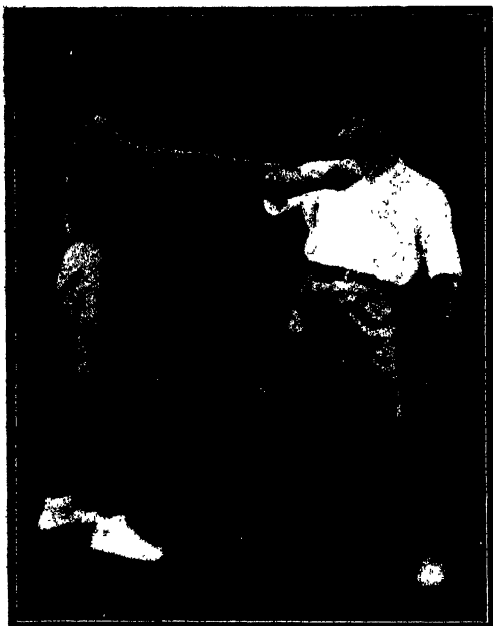
৯নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

১০নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

৯নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১০নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

ভাবে নিজের ডান দিকে জোরে ঝাঁকুনি দিয়া লইয়া যাইলে হাতটী ছাড়াইয়া লইতে পারা যায়। যে হাতের কাজ হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে সেই পা-টী পিছাইয়া লইলে অপরে আর ধরিতে পারিবে না।

যদি কেহ বাঁ কনুইয়ের কাছে তাহার দুই হাত দিয়া ধরে তবে উপরিউক্ত ভাবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিলেই হাতটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

১১ নং

হাত দুইটী যখন নীচে সাধারণ ঝোলা অবস্থায় থাকে তখন যদি কেহ ডান কনুইয়ের কাছে তাহার দুই হাত

১১নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

দিয়া জোর করিয়া ধরে তবে নিজের সেই হাতটী কনুইয়ের কাছে মুড়িয়া তাহার দুই হাতের মধ্য দিয়া উপরে তুলিয়া তাহার ডান-হাতের কব্জীর উপর জোরে আঘাত করিয়া ঝাঁকুনি দিয়া নামাইয়া, হাতটী ডান ধারে একেবারে পিছাইয়া লইলে হাতটী ছাড়াইতে পারা যায়। যে হাতের কাজ হইতেছে সেই পা-টী সঙ্গে সঙ্গে পিছাইয়া লইলে অপরে আর ধরিতে পারিবে না।
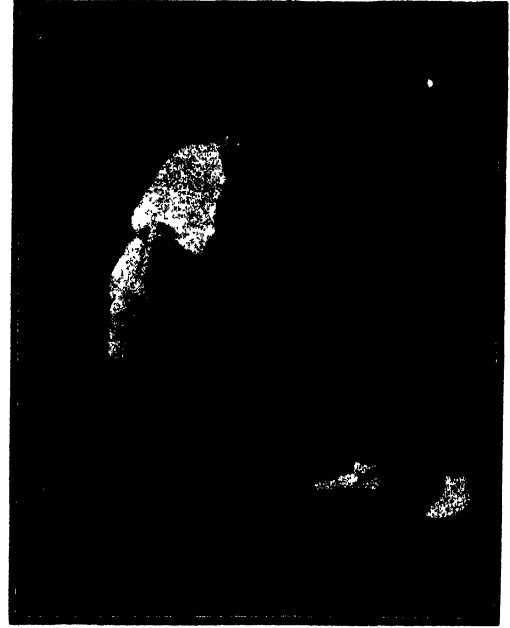
১১নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১২নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

যদি কেহ বাঁ কনুইয়ের কাছে তাহার দুই হাত দিয়া ধরে তবে উপরিউক্ত ভাবে হাতের ও পায়ের

১২নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১৩নং প্যাঁচের ২য় চিত্র
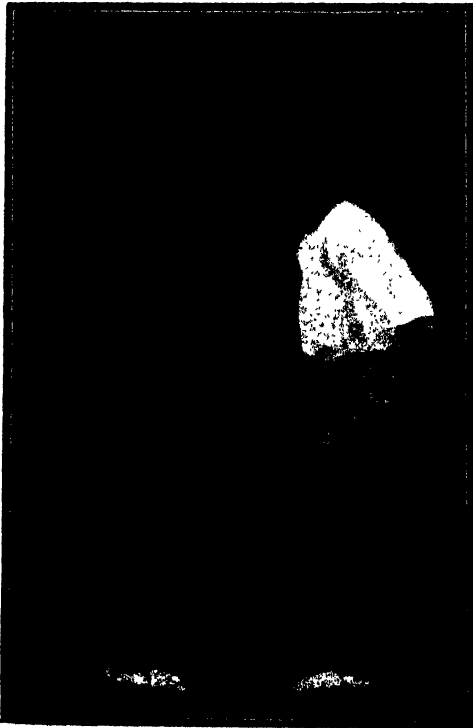
১৩নং প্যাঁচের ১ম চিত্র
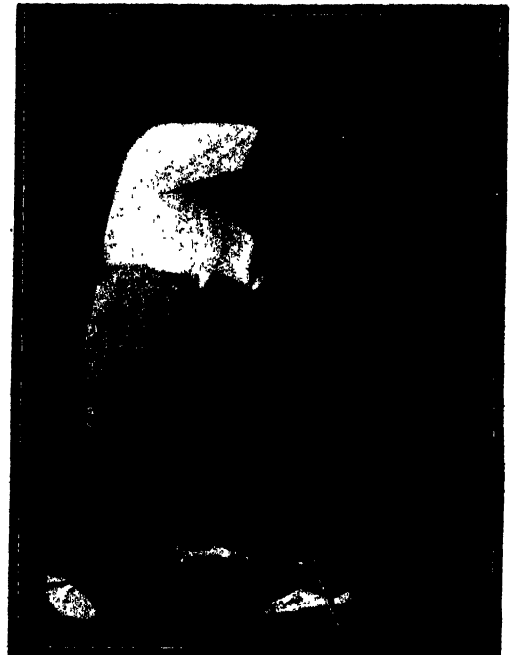
১৪নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

কাজ বদলাইয়া করিলেই হাতটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

১৪নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১৫নং প্যাঁচের চিত্র

১২ নং

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার ডান হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে নিজের ডান হাতের চেটো দিয়া তাহার ডান কব্জীতে জোরে মারিবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাকে একটু বাঁ দিকে ঘুরাইয়া লইলে তাঁহার হাতটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার বাঁ হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে উপরিউক্ত ভাবে হাতের ও শরীরের কাজটী বদলাইয়া করিলেই তাহার হাতটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

১৬নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

১৩ নং

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে এবং যদি তাহার দুই হাতের মধ্যে ফাঁক থাকে তবে একটু নিচু হইবার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটী দুলাইয়া পিছনে লইয়া গিয়া তার পর তাহার দুই হাতের মধ্য দিয়া জোরের সহিত উপরে তুলিয়া দিয়া হাত দুইটী দুই ধারে নামাইয়া দিলে তাহার হাত দুইটী ছাড়িয়া যাইবে।

১৪ নং

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে এবং যদি তাহার দুই হাতের মধ্যে ফাঁক থাকে তবে বাঁ হাত নিচু হইতে এবং ডান হাতটী উপর হইতে তাহার দুই হাতের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া নিজের অপর হাতের কনুইয়ের কাছে ধরিয়া একটু বাঁ দিকে কাৎ হইয়া বাঁ কনুই দিয়া নিচু হইতে তাহার ডান কনুইয়ে এবং ডান কনুই দিয়া উপর হইতে তাহার বাঁ

১৬নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

কনুইয়ে জোরে মারিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু ডান দিকে কাৎ হইলেই তাহার হাত দুইটী ছাড়িয়া যাইবে।

হাত দুইটী এবং শরীরের কাজ বদলাইয়া করিলেও তাহার হাত দুইটী ছাড়িয়া যাইবে।

১৫ নং

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে একটি হাত তাহার চিবুকে অপর হাতটী

কোমরে ও যে কোন পা, যে দিক দিয়া হউক তাহার আগান পা-টীতে যে কোন প্রকারে আট্‌কাইয়া জোরে

১৭নং প্যাঁচের ১ম চিত্র
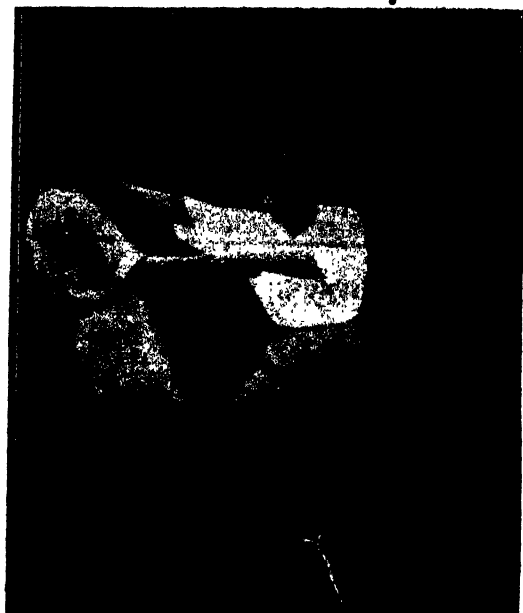
১৭নং প্যাঁচের ২য় চিত্র।

চিবুকে ধাক্কা দিলে তাহার হাত দুইটী ছাড়িয়া যাইবে এবং সে পড়িয়া যাইবে।

১৬ নং

যদি কেহ সম্মুখ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে হাত দুইটী বাহির হইতে তাহার ধরা হাতের নিকট লইয়া যাইয়া প্রত্যেক হাতের চারিটী আঙ্গুল দিয়া তাহার বুড়া আঙ্গুলটী ধরিয়া ও নিজের বুড়া আঙ্গুলটী তাহার বুড়া আঙ্গুল ও অন্য আঙ্গুলের মধ্যস্থলে
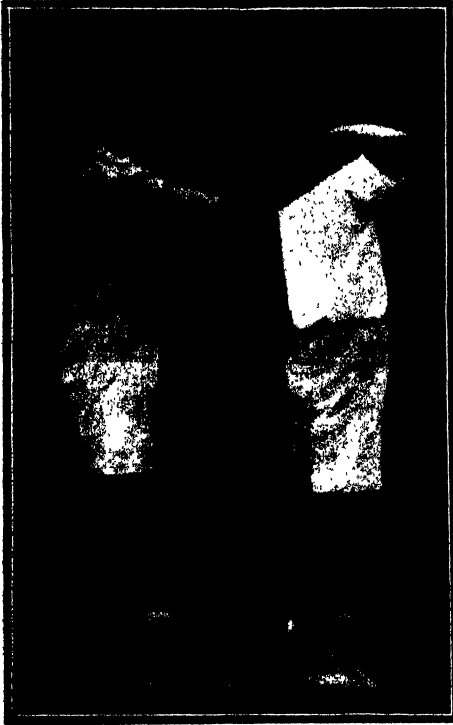
১৮নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

রাখিয়া টিপ্পিন দিতে দিতে তাহার বুড়া আঙ্গুলটী টানিলে তাহার হাত দুইটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

১৭ নং

যদি কেহ ডান ধার হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে বাঁ হাতটী, তাহার হাতের সহিত সমরেখায় রাখিয়া তাহার ডান কব্জীটী ধরিয়া ও ডান হাতটী নিচু হইতে তাহার দুই হাতের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিয়া তাহার চিবুকে ধাক্কা মারিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-টী তাহার দুই পায়ের মধ্যে আগাইয়া দিয়া ও বাঁ হাতে ধরা তাহার কব্জীটী জোরে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিলে তাহার হাত দুইটী ছাড়িয়া যাইবে ও সে পড়িয়া যাইবে।

যদি কেহ বাঁ ধারে ধরে তবে উপরিউক্ত ভাবে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিলেই তাহার হাত দুইটী ছাড়িয়া যাইবে।

১৮নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১৮ নং

যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া গলাটী টিপিয়া ধরে তবে হাত দুইটী তাহার ধরা হাতের নিকট লইয়া যাইয়া প্রত্যেক হাতের চারিটী আঙ্গুল দিয়া তাহার বুড়া আঙ্গুলটী ধরিয়া ও নিজের বুড়া আঙ্গুলটী তাহার বুড়া আঙ্গুল ও অন্য আঙ্গুলের মধ্যস্থলে রাখিয়া টিপ্পিন দিতে দিতে তাহার বুড়া আঙ্গুলটী টানিয়া হাত দুইটী ফাঁক করিলে তাহার হাত দুইটী ছাড়াইতে পারা যাইবে।

ঘূর্ণি-হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৩)

দিনের পর চলিয়া যাইতেছে, কল্যাণী বা বিশ্বপতির কোনও উদ্দেশ নাই,—সনাতন ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে কেমন করিয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল—কল্যাণী নিমাইয়ের সহিত পুরীতে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে এক-রাত্রিও থাকে নাই; সে যেমন গিয়াছিল তেমনই ফিরিয়াছে; কোথায় গিয়াছে সে সংবাদ কেহই জানে না।

কথাটা সনাতন বিশ্বাস করিতে পারে না।

এ কথা কখনও বিশ্বাস করিতে পারা যায়? গ্রামের লোকে কল্যাণীর পরিচয় পাইয়াছে কতটুকু? তাহারা কল্যাণীকে দেখিয়াছে মাত্র, আসল মানুষটাকে চিনিতে পারে নাই! তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিবে; কেন না, প্রকৃতিই তাহাদের ঐরূপ। শূন্যে ছায়া গড়িয়া তাহাই লইয়া একটা বিরাট মূর্ত্তি কল্পনায় গড়িয়া তোলা লোকের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস, মিথ্যা কথা সাজাইয়া মালা গাঁথিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত।

সনাতন কল্যাণীকে চেনে। কেবল বাহিরের মানুষটার নয়, তাহার অন্তরে যে রহিয়াছে তাহার পরিচয় সনাতন পাইয়াছে। সনাতন জানে কল্যাণী তেমন মেয়ে নয় যে এত সহজে পথ হারাইয়া ফেলিবে।

শ্রীরূপ পুরী হইতে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে। সে-ই এই ব্যাপারটা গ্রামে রাষ্ট্র করিয়াছিল। একদিন পথ চলিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া সনাতন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কথাটা কি বাস্তবিক? মা লক্ষ্মী কি ফিরিয়া আসিয়াছে, না বিশ্বপতির কাছেই আছে?

শ্রীরূপ জানাইল—সত্যই কল্যাণী যেদিন পুরীতে গিয়াছিল সেইদিনই বৈকালের দিকে চলিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীতে বড় জোর দুই তিন ঘণ্টা মাত্র ছিল। বাড়ীর ভিতর কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা সে জানে না; তবে কল্যাণী হঠাৎ চলিয়া আসায় বাড়ীর সকলেই যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেও তাহার চেয়ে বড় কম হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিয়া গোপনে সে জানিতে পারিয়াছে নিমাইবাবুর সঙ্গে বিশ্বপতিকে দেখিতে যাওয়ায় বিশ্বপতি মোটেই খুসি হইতে পারে নাই এবং সেইজন্যই সে কল্যাণীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছে; নিমাইবাবুকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। বিশ্বপতি কল্যাণীকে তৎক্ষণাৎ পুরী ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছিল,—গ্রামের বাড়ীতে যেন না ফিরিয়া আসে সেজন্য আদেশ দিয়াছিল। সেইজন্যই কল্যাণী গ্রামে ফিরে নাই, আর আসিবেও না।

সনাতন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া রহিল, তাহার পর কম্পিত শ্লথপদে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

অভাগিনী নারী এমনই করিয়া না অত্যাচার লাঞ্ছনা সয়?

হতভাগ্য বিশ্বপতি,—

এমন রত্ন সে চিনিল না! কাচ লইয়া সে ভুলিয়া রহিল, মহামূল্য হীরক পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিল!

নিমাইয়ের সঙ্গে সে পুরী গিয়াছে, এইমাত্র তাহার অপরাধ, এ ছাড়া আর কোন অপরাধ তো সে করে নাই! প্রিয়জন যদি দূরদেশে থাকিয়া সঙ্কটাপন্ন ব্যারামে পড়ে, কেহই স্থির থাকিতে পারে না।

বিশ্বপতি ধরিয়া লইয়াছে অন্য রকম। সে নিমাইকে অন্য রূপ ভাবিয়াছে, কল্যাণীকে ভুল বুঝিয়াছে। কল্যাণীর নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে সে কলঙ্কের রেখা আঁকিয়া দিয়াছে, স্পষ্টই অপমান করিয়াছে।

সে ধারণাও করিতে পারে নাই—স্বামীর সঙ্কটাপন্ন ব্যারামের খবর পাইয়া স্ত্রী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে যে এ জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এমনই মিথ্যা সন্দেহ করিয়াই না পুরুষরা মেয়েদের ধ্বংসের পথে নামাইয়া দেয়, তাহাদের আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়? এই যে দারুণ অপমানে

মর্ম্মাহতা কল্যাণী চলিয়া গেছে,—কে জানে সে কোথায়, কে জানে সে বাঁচিয়া আছে কি না? যদি আত্মহত্যা করিবার সাহস তাহার না হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিতেও বৃদ্ধ সনাতন শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু তাহাও কি সম্ভব হইতে পারে? দুনিয়ায় প্রলোভন অনেক আছে; কিন্তু সেই প্রলোভনে পড়িয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবে, কল্যাণী তেমন মেয়ে নয়। অধঃপাতে যাওয়া লোকে যত সোজা বলিয়া মনে করে, সত্যই তত সোজা নয়।

তথাপি সনাতন অস্থির হইয়া উঠিল। কল্যাণীর নামে লোকে যে এত কথা বলিতেছে, তাহা সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, কল্যাণীর এ গৃহত্যাগ করিয়া আর কোথাও স্বচ্ছন্দে বাস করার সংবাদ পাইবার পরিবর্ত্তে মৃত্যু সংবাদ পাইলেই ভালো হয়। সে কাঁদিবে, কষ্ট পাইবে, তবু সগর্ব্বে সকলকে জানাইবে—তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা, তাহার মা-লক্ষ্মী নিজের পবিত্রতা বাঁচাইতে আত্মবলি দিয়া বিজিতার গৌরব লাভ করিয়াছে।

সনাতন ভাবিতে লাগিল, সে এখন কি করিবে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বিশ্বপতিকে একখানা পত্র দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিল।

বহুকাল পরে সে সেদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোয়াত, কলম ও কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

এক লাইন লিখিতে দশটা ভুল হয়, "ক" লিখিতে "ল" লিখিয়া বসে; কোন্ লাইনটা কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে অক্ষর যোজনা করা চলে না। তবু যেমন তেমন করিয়া পত্রখানা শেষ করিয়া সে সেই দিনই নিজের হাতে পোষ্ট অফিসে দিয়া আসিল।

পত্রে সে কল্যাণীর সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিল না, কেবল লিখিল বিশ্বপতির শীঘ্র ফিরিয়া আসা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর অসুস্থ, সেই জন্য কিছু দিন সে মেয়ের নিকট যাইবে। এখানকার জমিজমা বাগান ও বাড়ী কাহার ভরসায় রাখিয়া যায় তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

পত্র পাঠাইয়া সে উত্তরের আশায় পথপানে তাকাইয়া রহিল। তাহার দৌরাত্ম্যে পোষ্টম্যানের পথ-চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। প্রত্যহই সে পথের ধারে পোষ্টম্যানের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া থাকে, আকাঙ্ক্ষিত লোকটীকে দেখিয়াই নিকটে ছুটিয়া যায়, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—"বাবুর পত্র আছে—আমার নামের পত্র?"

গ্রামের ছেলেই পোষ্টম্যানের কাজ করে, সে উত্তর দেয় "পত্র নাই।"

অনুনয়ের সুরে সনাতন বলে, "তবু দেখ না ভাই একবার, ওর মধ্যে যদি থাকে—"

পোষ্টম্যান তাহার অন্তরের আকুলতা বুঝে না; তবুও সময় নষ্ট করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া হাতের সমস্ত পত্রগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, তাহার পর উত্তর দেয়—"না দাদা, পত্র আসে নি।"

হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিয়া সনাতন বারাণ্ডায় বসিয়া পড়ে। দিন গণিয়া হিসাব করে কত দিন পত্র দেওয়া হইয়াছে। এই তো কাছেই পুরী,—পত্র যাইতে বড় জোর না হয় চার দিনই লাগে, আসিতেও চার দিন লাগে। কিন্তু কত আট দিন অতীত হইয়া গেল, আজও তো পত্রের জবাব আসিল না।

অবশেষে সত্যই একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; পোষ্টম্যান হাসিমুখে একখানি কার্ড দিল। তাহাতে সামান্য দুচার লাইন লেখা,—এই ভাদ্র মাসের কয়টা দিন পরেই বিশ্বপতি আসিতেছে, সনাতন যেন আর কয়টা দিন অপেক্ষা করে।

সনাতন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহা হইলে বিশু আসিতেছে,—আর বেশী দিন সে পুরীতে থাকিবে না।

পত্রখানা সে সযত্নে রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

(১৪)

বাড়ী ফিরিবার জন্য বিশ্বপতি ছট্‌ফট করিতেছিল, পুরী তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

সেদিনে শ্রাবণের মেঘভরা একটী দিনে যে আসিয়াছিল, ক্ষণেকের দেখা দিয়া শান্তির পরিবর্ত্তে

অশান্তি লইয়াই সে চলিয়া গেছে,—অহোরাত্র কেবল তাহার কথাটাই মনে জাগিতেছিল।

কতখানি আশা লইয়াই সে আসিয়াছিল; আর কি নিদারুণ অভিমান ও বেদনা লইয়া সে চলিয়া গেছে। সে বিশ্বপতির কাছে একটী কথাও বলে নাই, একটীবার মাত্র যে চোখ দুটি তুলিয়াছিল তাহাতেই তাহার মনের ভাষা ব্যক্ত হইয়া গেছে।

সে আর একটীবার বিশ্বপতির পানে ফিরিয়া চায় নাই, সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল।

নিজের মনের ব্যথা প্রকাশ করিবার জন্য সে অধীর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া সে একটী কথাও বলিতে পারে নাই। সমস্ত দিনটা নন্দার মুখে একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথচ নীরবে সে নিজের সব কাজই করিয়া গেছে। কতবার বিশ্বপতির সম্মুখে আসিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইয়াছে, ঔষধ নিয়মিত ভাবেই নিজের হাতে ঢালিয়া দিয়াছে, অথচ কোন কথাই হয় নাই। সন্ধ্যার পর সে বিশ্বপতির নিকটে আসিয়া বসিল, আবার প্রতিদিনকার মত গল্প জুড়িয়া দিল। এই গল্পের ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বউদির জন্যে আজ তোমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে—না বিশুদা?"

অকস্মাৎ চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দূর, তাই কি;—সত্যি নন্দা, তার জন্যে আমার—"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "বিলক্ষণ, তোমার কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ চাচ্ছি বিশুদা,—ওর জন্যে তোমায় আর দিব্যি করতে হবে না। স্ত্রীর এ রকমভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় স্বামীর মনে নিদারুণ কষ্ট হয় না, এ কথা বললে আমি শুনব না।"

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না না, সত্যি তুমি বিশ্বাস কর নন্দা, রাঙা-বউকে সত্যিই আমি ঠিক অন্তরের সঙ্গে নিতে পারি নি। অথচ তুমি তো দেখেছ নন্দা—রূপ তার যথেষ্ট আছে, লেখাপড়া বেশী না জানুক—তবু গুণ তার যথেষ্ট আছে। ও যদি না আসত আমি কোথায় ভেসে চলে যেতুম তার ঠিক নেই। ও ছিল বলেই আমি আজও গৃহী,—আজও ছন্নছাড়া হইনি। যেখানে যখন গেছি—একেবারে ভেসে যেতে পারি নি, নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিলীন করতে পারিনি, ওর কথা মনে করে আবার ফিরে এসেছি। কিন্তু তবু—তবু নন্দা, সত্যি কথাই বলছি আমি ওকে সত্যি নিজের বলে নিতে পারি নি, ওকে ভালোবাসতে পারি নি। যেটুকু করেছি সে যেন কেবল কর্ত্তব্যের দায়ে। ও যে তা বোঝে নি তা নয়,—দেখলে না—আমার একটী মাত্র কথায় কি রকম করে চলে গেল, আর একটীবার পেছন ফিরে চাইলে না, আমি যা বললাম সে কথাটা বুঝবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না! এতে তুমি মনে করবে রাঙা-বউ বোকা,—তা নয়,—সে অনেক বুদ্ধি ধরে তা জেনে রেখো।"

কল্যাণী যে বোকা নয় তাহা নন্দা অন্তরে অন্তরে বেশ বুঝিয়াছিল। যদি বিশ্বপতি বোকা বলিত তাহা হইলে সে প্রতিবাদ করিত, কিন্তু বিশ্বপতিও তাহার পরিচয় জানে জানিয়াই সে চুপ করিয়া গেল।

বিশ্বপতি ক্লান্তভাবে বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া বলিল, "হঠাৎ বিকেল হতে মাথাটা কি রকম ধরেছে, কিছুতেই নরম পড়ল না। ভেবেছিলুম গরমে মাথা ধরেছে, কিন্তু এখন তো বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে তবু—"

নন্দা বলিল, "হাত বুলিয়ে দেব?"

বিশ্বপতি বলিল, "দাও।"

নিস্তব্ধে সে পড়িয়া রহিল, নিস্তব্ধে নন্দা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নন্দা ইহার পর কল্যাণীর সম্বন্ধে আর একটী কথাও তুলিল না, বিশ্বপতিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে কেবল ভয় হইতেছিল নন্দা কখন কি খোঁচা দেয়, কখন কি কথা বলিয়া বসে।

বাড়ী ফিরিবার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন বাড়ী ফেরার কথা মুখে আনিবামাত্র নন্দা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া বলিল, "তাই বল যে বউদির জন্যে মন কেমন করছে। তবে কোন্‌মুখে সেদিনে বললে বউদিকে ভালোবাস না,—আমি তাই ভাবছি। মাগো, তোমরা পুরুষ জাতটা এত মিথ্যে কথাও বলতে পারো।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "আঃ, কি যে

বল নন্দা, দেশে কেবল যেন আমার বউই আছে, বাড়ী ঘর জমিজমাগুলো সব ভেসে গেল আর কি। এই দেখ সনাতন পত্র দিয়েছে তার অসুখ,—সে মেয়ের বাড়ী চলে যাবে, আমায় শীগ্‌গির যেতে বলেছে।"

পত্রখানার উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া নন্দা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িল, "উঁহু, তা বলে তোমার এখন যাওয়া হতে পারে না বিশুদা। এই সে দিন অত বড় ব্যায়রামটা হতে উঠলে, এখনও চেহারা ফেরে নি, গায়ে জোর পাও নি, এখনই তোমায় পাঠাই আর কি? ও সব কথা রাখ, আসল কথা বল যে দেশে না গেলে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। এখানে যে তোমার নেশা চলছে না,—দেশে না গেলে ও সব ছাই ভস্ম খাওয়ার সুবিধা হবে কেন?"

বিবর্ণ হইয়া গিয়া বিশ্বপতি বলিল, "ছিঃ, ছিঃ, তুমি ও-সব কথা কি বলছ নন্দা? তোমার হয়েছে কি বল দেখি? যা মনে আসছে তাই মুখ ফুটে বলে যাচ্ছো? একটু ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে কথা বললেই ভালো হয় না কি?"

চাপা হাসি হাসিয়া নন্দা বলিল, "অত ভেবে কথা বলার মত ধৈর্য্য আমার নেই বিশুদা। কিন্তু আমার মনে ছিল না সত্যিই তুমি পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়েছ। তা যদি হয়ে থাকো তা হলে সত্যিই কপালের জোর বলতে হবে, কি বল। যাক, তুমি সনাতনকে একখানা পত্র লিখে দাও—এ মাসের এ কয়টা দিন যাক। আশ্বিনের দশই আমাদের যাওয়ার দিন ঠিক করে উনি পত্র দিয়েছেন। তার আগেই উনি আসবেন, আমরা একসঙ্গেই যাব। কলকাতা হতে তুমি সহজেই বাড়ী চলে যেতে পারবে। আর এই কয়টা দিন মাঝখানে বই তো নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

বাড়ীর দিকে মনটা অহোরাত্র টানিলেও বিশ্বপতি মুখ ফুটিয়া আর একটী কথাও বলিতে পারিল না। সেই দিনই একখানা কার্ডে সনাতনকে পত্র লিখিয়া সেখানা নন্দার হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

নন্দা হাতের মধ্যে পত্রখানা লইয়া উদাসীন ভাবে বলিল, "না, সত্যি, তোমার মন যদি একান্তভাবে টেনেই থাকে, তুমি অনায়াসে চলে যেতে পারো বিশুদা,—এর পরে যে আমার নামে দোষ দেবে আমিই তোমায় যেতে দেইনি—"

অত্যন্ত কাতর হইয়া হাত দুখানা যোড় করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "মাফ কর নন্দা, কেটে কেটে আর নুন দিয়ো না। যদি জানতে এর জ্বালা কি রকম তা হলে এ রকম করে কাটা ঘায়ে নুন দিতে পারতে না।"

নন্দা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কথাটা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "দেশে তো যাবে,—সেখানে গিয়ে যদি শরীরের দিকে নজর না দাও, জানছো তার পরিণাম কি হবে?"

বিশ্বপতি বলিল, "তুমি দেখে নিয়ো আমি শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখি কি না। কার্ত্তিক মাসে একবার তোমার ওখানে যাব, গেলেই দেখতে পাবে।"

নন্দা গম্ভীর মুখে বলিল, "দেখা যাবে। বেশী দূরের পথ তো নয়, যদি নাই এসো—আমি নিজেই যাব দেখতে।"

পত্রখানা দাসীর হাতে দিয়া সে পোষ্ট করিতে পাঠাইয়া দিল।

(১৫)

দিনগুলা যেন কাটিতে চায় না। পুরীর দৃশ্য একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র দেখিতে আর ভালো লাগে না। কিছুর মধ্যেই আর বৈচিত্র্য নাই।

অথচ একদিন এই সব দেখিতেই বড় ভালো লাগিত। বিশ্বপতি সমুদ্রের ঢেউ দেখিতে ছুটিয়া যাইত। সাগরে সূর্য্যোদয় দেখা তাহার কাছে বড় লোভনীয় ছিল। আকাশে যখন মেঘ সাজিয়া আসিত, কালো জলের উপরে কালো মেঘের ঢেউ খেলিত, আশ্চর্য্য হইয়া সে তখন তাকাইয়া থাকিত।

জগন্নাথের মন্দিরে নিত্য কত লোক আসা যাওয়া করিত, বিশ্বপতি প্রত্যহ তাহা দেখিতে যাইত।

এখন সে আর দেখিতে যায় না, দেখিতে ভালোও লাগে না। বিশ্বপতি এখন দেশের কথাই ভাবে।

ক্ষুদ্র গ্রাম, জনাকীর্ণ সহরের তুলনায় সে কত পিছনে—কি নিবিড় অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। তবু সেখানে যা আছে আর কোথাও তাহা নাই। অসুখ হইতে

উঠিয়াই সে কল্যাণীকে একখানা পত্র দিয়াছিল, এত কালের মধ্যে তাহার জবাব আসিল না। কল্যাণী রাগ করিয়া গিয়াছে, সে হয় তো উত্তরও দিবে না। বিশ্বপতি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র দিয়াছে, রোগের সময় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্যই সে কল্যাণীকে অমন কটু কথা বলিয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্বপতি বেশ বুঝিতেছিল অভিমানিনী কল্যাণী সে অপমান ভুলিতে পারে নাই, ভুলিতেও পারিবে না। তাহার নিকট হইতে এত দূরে থাকিয়া বিশ্বপতি যে কোনো দিনই ক্ষমা পাইবে না, ইহা জানিত সত্য কথা। নিকটে গিয়া পড়িলে হয় তো ক্ষমা মিলিলেও মিলিতে পারে, দূর কেবল দুইয়ের মাঝখানে অধিকতর দূরত্বের ব্যবধানই জাগাইয়া রাখিবে।

সর্ব্বদাই তাহাকে চিন্তাকুল ও অন্যমনস্ক দেখিয়া নন্দা সেদিন আর স্থির থাকিতে পারিল না, স্পষ্ট বলিল, "তুমি বাড়ী চলে যাও বিশুদা, আমাদের এখনও যেতে দু পাঁচ দিন হয় তো দেরী হবে, তোমায় কেন আর বন্ধ করে রাখি। এ সময়টা গেলে তোমার ভাঙ্গা শরীর আরও বেশী ভেঙ্গে পড়বে বলেই যা আমার বাধা দেওয়া, নইলে আর কি? সত্যিই তো তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য এখানে থাকো নি, তোমার ভরসাতেই যে আমরা এই বিদেশে প'ড়ে আছি তাও নয়। আমার ঝি চাকর, পুরানো সরকার আছে, ওরাই আমাদের দেখাশুনা করতে পারবে। তুমি থাকলেও যা না থাকলেও তাই, তবে অনর্থক—"

সে কথাটা আর শেষ করিল না; বিশ্বপতি মুখখানা নত করিয়া রহিল, নন্দার কথার একটা উত্তর দিল না।

নন্দা তাহার নত মুখখানার পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "আমি তা হলে আজই ওঁকে পত্র দেই তুমি যাচ্ছো। কলকাতায় নেমে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো অবশ্য করে। কবে যেতে চাও বিশুদা? শুক্রবারে দিন না কি ভালো আছে, সেই দিনই তা হলে যাও—কি বল?"

বিশ্বপতি মুখ তুলিল, তাহার মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা—"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি নন্দা, আমায় এ-রকম ভাবে বিঁধে তোমার কি সুখলাভ হয় বল তো? একটা জীবন্ত লোককে ধরে আগুনে পুড়িয়ে তোমার মনে কতখানি শান্তি হয়?"

উত্তরটা নন্দার মুখে আসিয়াছিল—তোমার মত লোককে বিঁধে শান্তি তৃপ্তি লাভ হয় বই কি! কিন্তু সে কথা সে চাপিয়া গেল। বলিল, "তোমায় বিঁধে আমার কোন লাভ নেই, শান্তিও নেই বিশুদা, আর এই কি বিঁধবার মত কথা? তুমি নিজেই বারুদের স্তূপ, একটুখানি আগুনের আঁচ সইবার ক্ষমতা তোমার নেই, লোকে কি করবে বল?"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বিশুদা, আমার দিব্যি,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—সত্যি উত্তর দেবে?"

বিশ্বপতি বলিল, "তোমার দিব্যি দেওয়ার কোন দরকার দেখছি নে, কেন না, দিব্যি না করেও এ পর্য্যন্ত যে মিছে কথা বলেছি তা আমার মনে হয় না। যা জিজ্ঞাসা করবে কর, উত্তর যা দেব তা সত্যিই দেব—যদিও জানি নে বিশ্বাস করবে কি না।"

নন্দা বলিল, "তুমি আগেও বলেছ, এখনও বল, বউদিকে কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরেই দেখ—এই কি সত্যি কথা?"

বিশ্বপতি মুখ টিপিয়া একটু হাসিল মাত্র।

চিন্তিত মুখে নন্দা বলিল, "তবেই তো দেখছি ভাবিয়ে তুললে। আমি জানতুম মানুষের মন বড় উর্ব্বর, এখানে এতটুকু বীজ পড়বার অপেক্ষা মাত্র, বীজটি পড়বামাত্র গাছ জন্মায়। জানো—আমি ভালোবাসার কথা বলছি? আমি জানি ভালোবাসা অনেক রকমেই জন্মায়, যেমন উপকারীকে ভালোবাসা, বন্ধুকে ভালোবাসা, শুশ্রূষা-কারিণীকে ভালোবাসা—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিল, "আর দাসীকে ভালো-বাসা, রাঁধুনীকে ভালোবাসা? বল বল, ও বেচারাদের কেন ছেড়ে দেবে,—ওদেরও নাও।"

হাসিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "তাই বা মন্দ কি? যে ঝি কি রাঁধুনী ঠিক মনের মত কাজ করে যায়, তাকে বুঝি মনিব ভালোবাসে না? তুমি কি বলতে চাও ভালোবাসা কেবল কর্ত্তব্যের জন্যেই, ওর বৈশিষ্ট্য কিছু নেই? আজকাল এ জিনিসটা কত সস্তা তা জানো?

নিরেট মূর্খ, পড়ে থাক পাড়াগাঁয়, তবুও তো ভালোবেসে গাঁখানাকে বৃন্দাবন করে তুলেছ।"

বিশ্বপতি বদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দার পানে তাকাইয়া রহিল,—বলিল, "ঠাউরেছ ঠিক, যমুনা যদিও সেখানে নেই, তবু আমাদের সেই কানা নদীটাও উজান বয়েছিল। বড় দুঃখ ছিল নন্দা—সেখানে তুমি ছিলে না, থাকলে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করতে।"

নন্দা রাগ করিয়া বলিল, "আমার ভারী দায় কি না। ঘরের পানে না তাকিয়ে কোথায় কোন্ দুটো চোখের সন্ধানে, কোথায় কার শাড়ীর আঁচল দেখে ছুটতে, আমি যেতুম তাই দেখতে? সাতপাকের বাঁধন দিয়ে যাকে আনা যায়, সে বেচারী বাধ্য হয়েই সব সয়ে যায়,—চোখের সামনে স্বামীর ব্যভিচারিতা দেখলেও একটা কথা বলবার যো তার থাকে না। আমি তো সাতপাকের বাঁধনে আসি নি বিশুদা। চোখের সামনে সে রকম দেখলে আমাদের অসহায়ের প্রধান অস্ত্র ঝাঁটা নিয়েই দৌড়াতুম।"

বিশ্বপতি নিঃশব্দে কেবল হাসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

নন্দা বলিল, "যেতে দাও ও-সব কথা। এক কথা বলতে গিয়ে হাজার কথা এসে পড়ল। বউদিকে তুমি ভালোবাস না আসল কথা সেইটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাও। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয় এ কথা জোর করে বলতে পারি। ঠাট্টা ছেড়ে দাও, সত্যি করে বল দেখি—তুমি—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিল, "হয় তো হতে পারে—কোন দিন তা ভাবি নি,—ভেবে দেখবার দরকারও হয় নি নন্দা।"

নন্দা পাইয়া বসিল, বলিল, "তবে পথে এসো দাদা। অনেক দিন ধরে অনেক খেলাই খেলছ,—আজ সত্যিই ধরা দিতে হল কিনা বল দেখি? হ্যাঁ, সত্যি কথা বল—সাতখুন তোমার মাপ, বল—বউদির জন্যেই ব্যগ্রতা! আমি তোমায় যেমন করেই পারি আশ্বিন মাসের প্রথমেই বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তা নয় কত ভণিতা,—ওঁর বাড়ী যায়, জমী যায়, সব যায়,—কাজেই ওঁকে বাড়ী যেতেই হবে, আর কোথাও থাকা চলে না। আচ্ছা, সত্যি বল বিশুদা, এই এতগুলো মিথ্যে কথা এতদিন ধরে বলার কি দরকার ছিল,—সত্যি বললে আমি কি তোমায় ধরে মারতুম—না তোমায় তাড়িয়ে দিতুম? বাপ রে, তোমরাই আবার বল মেয়েরা ভারি চাপা প্রকৃতি, সে কথা একেবারে মিথ্যে কি না বল। আমি দেখছি তোমাদের নাগাল পাওয়াই দুষ্কর,—আমাদের ক্ষমতা নেই যে তোমাদের জাতের নাগাল পাই।"

হঠাৎ কান উঁচু করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বপতি কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, নন্দা ত্রস্তভাবে বলিল, "রোস রোস, শুনে আসি—কারা যেন বেড়াতে এসেছেন, মা আমায় ডাকছেন। আচ্ছা, তোমার কথা পরে শুনব এখন, আগে ওদিকটা দেখে আসি।" ত্বরিতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

মায়ের আহ্বান সে শুনিতে পাইল অথচ বিশ্বপতি শুনিতে পায় নাই,—আশ্চর্য্য হইয়া সে কেবল তাকাইয়া রহিল।

(১৬)

বেলা বারটার ট্রেনে বিশ্বপতি গ্রামের বুকে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন থামিতেই সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সঙ্গে একটা ট্রাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নাই। ট্রাঙ্কে কল্যাণীর জন্য নন্দা কতকগুলি জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে।

তাহার নিজের জন্য প্রস্তুত স্বামীর দেওয়া উপহার নূতন মিনা-করা দুল জোড়া বিশুদার স্ত্রীকে উপহার দিয়াছে, শাঁখার উপর সোণা বাঁধান দুইটী বালা এবং একটি সোণা বাঁধান লোহা দিয়াছে। এ ছাড়া কাপড় জামা, হাতীর দাঁতে তৈয়ারী সিন্দুরের কৌটা, কোন কিছুই দিতে সে কার্পণ্য করে নাই।

তাহাকে লুকাইয়া বিশ্বপতি একখানি ধূপছায়া রঙের শাড়ী, আলতার শিশি, চিরুণী প্রভৃতি কিনিয়াছে। আসার সময় নন্দাকে লুকাইয়া কোন এক সময় বাক্সে ভরিয়া লইয়াছে।

নন্দারাও আসিয়াছে, তাহারা কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় বিশ্বপতিকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার পায়ের উপর মুখখানা রাখিয়া

চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নন্দা বলিয়াছিল, "বাড়ী গিয়েই একখানা পত্র দিয়ো বিশুদা, আর মাঝে মাঝে এক-একবার মনে করে আমার বাড়ী যেয়ো—ভুলো না। আর যদি আমায় কোন দিন এতটুকু স্নেহ করে থাক—এতটুকু ভালোবেসে থাক,তবে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলে যাও—এবার হতে সৎ হয়েই থাকবে, আর কোন দিন নেশার জিনিস স্পর্শও করবে না।"

বিশ্বপতি হাসিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হাসি তাহার মুখে ফুটে নাই, সে চেষ্টার ফলে তাহার মুখখানাই কেবলমাত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সে নন্দার মাথায় হাত রাখিয়াছিল, কি বলিয়াছিল তাহা সেই জানে।

আজ ষ্টেসন ছাড়াইয়া গ্রামের পথে পা দিয়াই মনে পড়িয়া গেল পূজার আর দেরী নাই। আজ সে যেন নূতন করিয়াই আকাশের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল আকাশ নীল হইল কবে, এ বর্ণ এতদিন লুকাইয়া ছিল কোথায় ?

মাঠের মাঝখানের পথ দিয়া চলিতে শুভ্র বন কাশ ফুলগুলি তাহার গায়ে তাহাদের কোমল স্পর্শ দিয়া জানাইল, তাহারা আজও ঠিক তেমনই আছে ;—মানুষ নিত্য বদলায়, তাহারা বদলায় না।

পাখীরা গাছের শাখায় বসিয়া,—উড়িয়া যাইতে গান গাহিয়া তাহাকেই যেন অভ্যর্থনা করিয়া গেল।

পাশেই একটা আমগাছের ঘন পাতার আড়ালে বসিয়া একটা পাখী শীষ দিতেছিল। একটু দাঁড়াইয়া বিশ্বপতি পক্ষীটাকে একবার দেখিবার চেষ্টা করিল। মনে পড়িল—এ দোয়েলেই শীষ দিতেছে ; কয়েক মাস পূর্ব্বে গ্রামে যখন সে ছিল তখন এই দোয়েলের শীষেই প্রত্যহ প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ঘরের জানালার ধারে একটী গাছে বসিয়া পাখীটি প্রত্যহ ভোরের সময় গান গাহিতে সুরু করিত।

মাত্র কয়েক মাস দেশ ছাড়া ; ইহারই মধ্যে যেন কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। যেদিন সে যায় সেদিন ওই শিউলি ফুলের গাছটা লক্ষ কুঁড়ি বুকে জাগাইয়া তুলে নাই,—আজ সবুজ পাতার মাঝে লক্ষ সাদা কুঁড়ি জাগিয়াছে, গাছের তলায় কত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে।

ক্রতপদে বিশ্বপতি পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। গ্রাম্য পথ এ সময় পথিক-পরিত্যক্ত, গ্রামবাসী এ সময় নিজের নিজের গৃহে কার্য্যে ব্যাপৃত। পথে কচিৎ কাহারও সহিত দেখা হইল ; তাহারা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, একটা কথাও বলিল না।

বিশ্বপতি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, ছোট হালকা ট্রাঙ্কটাকে হাতে লইয়া হন হন করিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিল।

সনাতন বাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, হঠাৎ সামনে বিশ্বপতিকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি হুঁকা ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল—"এই যে দাঠাকুর,—আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম।"

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে তাহার হাত হইতে ট্রাঙ্ক নামাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল, একটা মাদুর আনিয়া বারাণ্ডায় পাতিয়া দিল।

শ্রান্তভাবে বিশ্বপতি মাদুরে বসিয়া পড়িল ; সনাতন বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ওপরের জামাটা খুলে ফেল দাঠাকুর, একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে।"

একটু হাসিয়া গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে বিশ্বপতি বলিল, "পাখা আমায় দাও সনাতন ; তোমায় আর বাতাস করতে হবে না। তুমি একটু বস—পাঁচটা কথাবার্ত্তা হোক।"

সনাতন সে কথায় কান দিল না, আগের মতই বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ইস, কি চেহারাই হয়ে গেছে দাঠাকুর, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছ, দেখে আর চিনবার যো নেই। গায়ের অমন সোণার মত রং একেবারে কালি হয়ে গেছে, সমস্ত মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—"

বিশ্বপতি নিজের আকৃতির পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "এখন তো বেশ ভালো হয়েছি ; যে চেহারা হয়েছিল. তা যদি আগে দেখতে তা হলে জ্ঞান থাকত না।" বলিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

সনাতন দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "জগবন্ধু রক্ষা করেছেন। শ্রীরূপের মুখে সবই শুনেছি দাঠাকুর, যা অসুখ হয়েছিল ওতে যে প্রাণে বেঁচেছ এই ঢের। তুমি একটু বসো দাঠাকুর, আমি চট করে মুখুয্যে বাড়ী হতে আসি।"

সে বিশ্বপতির আহার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। মুখুয্যে বাড়ীর মেয়েদের ধরিয়া যদি দুইটী ভাতের যোগাড় করিয়া আনিতে পারে, তাহাই সে ভাবিতেছিল। এই মানুষটা দুপুরে বাড়ী আসিয়াছে, এখন নিজেই রাঁধিয়া খাইবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

সে পাখা রাখিয়া উঠিয়া অগ্রসর হইতেই বিশ্বপতি ডাকিল, "আবার মুখুয্যেদের বাড়ী কেন, হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল ?"

মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, "তোমার খাওয়ার যোগাড় করতে।"

বিশ্বপতি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কেন, তারা কেউ নেই,—কোথায় গেল সব ?"

কি উত্তর দিবে সনাতন তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না; সে কেবল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বিশ্বপতি প্রশ্ন করিয়া নিজেই তাহার উত্তর দিল, "বোধ হয় তার মাসীমার বাড়ী গেছে। তা যাক—একা এই বাড়ীতে থাকাও তো বড় কম কথা নয়,—ওতে আমি এতটুকু রাগ বা দুঃখ করি নি, করবও না। অনেক কাল সেখানে যায় নি, কত দিন আমি নিজে পাঠাতে চেয়েছিলুম, কিছুতেই নড়ে নি, কেবল বলেছে আমার কষ্ট হবে। যাক—দেহটাও ভালো হবে। কিন্তু আমার খাওয়ার যোগাড় করতে ওদের বাড়ী আর বলতে যাওয়া কেন ? ঘরে চাল ডাল আছে তো, ওই দুটো খিচুড়ী করে নেব এখন।"

সনাতন একটা পথ পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল, বলিল, "তাই কি হয় দাঠাকুর, এই সবে গাড়ী হতে নামলে—এখনই চান করে এসে নিজের খাবার নিজেই তৈরী করে নেবে—এ কখনও হতে পারে ? মুখুযোদের বড় মাকে আমি আগেই বলে রেখেছি—তুমি এলে তোমার খাবার তাঁকে দিতে হবে। তিনি বলে দিয়েছেন বলেই না যাচ্ছি। তুমি একটু বস,—আমি এখনই ফিরে আসছি।"

সে চলিয়া গেল ও মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

খানিক বিশ্রাম করিয়া বিশ্বপতি একবার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, ঘরের ভিতরটা দেখিয়া ট্রাঙ্কটাকে তক্তাপোষের উপর রাখিয়া খানিকটা তৈল মাথায় দিয়া ঘষিতে ঘষিতে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সনাতন মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিল, "একে তো ওই শরীর, এখনও ভালো করে সেরে উঠতে পারনি দাঠাকুর, তাতে এতক্ষণ ধরে যে জল বসিয়ে এলে এটা কি উচিত হল ? বড় মা কখন ভাত দিয়ে গেছেন, তোমার জন্যে বসে থেকে এইমাত্র উঠে গেলেন। নাও, এখন তাড়াতাড়ি করে কাপড় ছেড়ে খেতে বস দেখি।"

বিশ্বপতি কাপড় ছাড়িয়া আহারে বসিল। পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভাত খাইয়া আচমন সমাপ্তে সে ঘরে আসিয়া সনাতনের প্রস্তুত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

"আচ্ছা সনাতন, তোমার মা-লক্ষ্মী কবে মাসিমার বাড়ী গেল ? ওখান হতে কেউ নিতে এসেছিল—না সে নিজেই চলে গেল ?"

উত্তরের আশায় সে সনাতনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

কেমন করিয়া সে সংবাদ দেওয়া যায়,—সনাতন একেবারে থামিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি একটা হাই তুলিয় জিজ্ঞাসা করিল, "পুরী হ'তে ফিরে এখানে এসে সে কি বললে ? আমার কথা কিছু বলেছিল ?"

এ সত্য আর গোপন করিয়া রাখা চলে না, এখন প্রকাশ না করিলেও ঘণ্টাখানেক পরেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাতে এতটুকু সন্দেহ নাই।

কম্পিত কণ্ঠে সনাতন বলিল, "মা-লক্ষ্মী তো পুরী হতে ফেরেনি দা-ঠাকুর !"

"ফেরেনি—সে কি সনাতন—অ্যাঁ।"—বিশ্বপতি ধড়্‌ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সনাতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল।

বিশ্বপতি ডাকিল—"সনাতন—"

সনাতন মুখ তুলিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "মা-লক্ষ্মী সে গিয়েছেন, আর তাঁর ঘরে তিনি ফেরেন নি। সে

পর্য্যন্ত বর্ষের মত এ বাড়ী আগলে বসে আছি দা-ঠাকুর, এত অসুখ হয়েছে তবু এক পাও নড়তে পারি নি।"

বিশ্বপতি দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "মরে গেছে, কোথায় তার সব শেষ হল?"

সনাতনের মুখে শীর্ণ হাসির রেখা নিমেষের তরে জাগিয়া উঠিল,—"মরলে ত ভালো হতো—সকল বিষয়ের শাস্তি হতো। সে মরেনি দা-ঠাকুর, সে তোমার মুখে, তোমার নির্ম্মল বংশে কালি দিয়ে কোথায় চলে গেছে।"

"আর নিমাই—"

সনাতন উত্তর দিল, "সেও আর আসে নি।"

পৃথিবী কি ঘুরিতেছে, পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে? সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল কেন? এখানকার আলো, শব্দ, লোকজন সব কোথায় গেল?

বিশ্বপতি হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

সনাতন যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনই আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত করুণ নেত্রে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

রাঢ়াপুরী

(প্রতিবাদ)

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্রসংখ্যার ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় 'রাঢ়াপুরী' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি রাঢ় সম্পর্কে চন্দেল্ল-রাজ ধঙ্গ, বঙ্গের পাল রাজবংশীয় প্রথম মহীপালদেব, কাম্বোজালয় গৌড়পতি, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের কবি কৃষ্ণমিশ্র, চণ্ডকৌশিক নাটকের কবি আর্য্যক্ষেমীশ্বর ও ধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ ইত্যাদি বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তির অবতারণা করিয়া বহু গবেষণা করিয়াছেন।

তিনি ঈশ্বর ঘোষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর রাজন্য-কাণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রকাশিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার সম্পাদিত, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত Bengal Inscription III দেখিতেন, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনেক কথাই লিখিতেন না। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার প্রথম করেন দ্বারভাঙ্গার পণ্ডিত ৺বচ্ছা ঝা। ঐ পাঠ অপ্রকাশিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কতকটা বচ্ছা ঝার পাঠ অনুসরণ করিয়া ১৩২০ সনের 'সাহিত্য' পত্রিকায় একটি পাঠ প্রকাশ করেন। এই শাসনের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবং স্থানে স্থানে অক্ষর অস্পষ্ট হওয়ায় ঐ সব স্থানে কাল্পনিক পাঠ যোজিত হইয়াছে। অক্ষয়বাবু ঐ শাসনের প্রথম শ্লোকের নিম্নলিখিত পাঠ দিয়াছেন:—

"বভ্রুব রাঢ়াধিপ লব্ধজন্মা তিগ্মাংশুচণ্ডো নৃপবংশ কেতুঃ।
শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারো নির্ব্বাপিতারি ব্রজগর্ব্ববলেশঃ॥

এই দুইটি লাইনের শেষাংশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ননীবাবু লিখিয়াছেন যে বচ্ছা ঝা ও অক্ষয়বাবু 'বভ্রুব' এবং 'লব্ধজন্মা'র মধ্যে যে 'রাঢ়াধিপ' পাঠ ধৃত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই কাল্পনিক। ননীবাবু এই শাসনখানির যে প্রতিলিপি দিয়াছেন তাহা হইতে আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে ঐরূপ পাঠের কোনই সম্ভাবনা নাই। ননীবাবুর প্রদত্ত পাঠ নিম্নে উদ্ধার করা গেল।

বভূব—গদ্ধির (?) লব্ধজন্মা—৺—৺ কেতুঃ।
শ্রীধূর্ত্ত.ঘাষো নিশিতাসিধারা—নি [র্ব্বা] (পিতা)—৺—৺—

উপরিউক্ত '—গদ্ধির' পাঠ অর্থশূন্য। ননীবাবুও ঐ পাঠ সম্বন্ধে সন্দিহান। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে উহার প্রকৃত পাঠ 'নাগাদ্ধর' (কায়স্থসমাজ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩৩৮, ১৮৫পৃঃ)। 'গদ্ধির'এর পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষরটি ননীবাবু একেবারেই পড়িতে পারেন নাই। এই অক্ষরটি আমরা 'না' বলিয়াই মনে করি। দ্বিতীয়টি ননীবাবু 'গ' পড়িয়াছেন। কিন্তু ইহার সহিত আকারের চিহ্ন (।) স্পষ্টই বিদ্যমান। এই শাসনে 'ম' এবং 'দ্ধ' দেখিতে প্রায় এক প্রকার। সুতরাং ননীবাবুর পাঠ 'দ্ধ'কে 'ম'ও পাঠ করা যাইতে পারে। চতুর্বিংশতিতম ছত্রের 'বিটপাম্বিত' শব্দের 'ম' দ্রষ্টব্য। ননীবাবু 'দ্ধি' পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহার সহিত ইকারের চিহ্ন (ি) দেখিতে পাইতেছি না। এই সব কারণে আমরা '—গদ্ধির'কে 'নাগাম্বর' পাঠ করিয়াছি। অধ্যাপক ভাণ্ডারকরও আমাদের এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন (Inscriptions of Northern India, No. 2100)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর ঘোষের সহিত রাঢ়ের কোনই সম্পর্ক নাই। যাঁহারা এই কারণে ঈশ্বরঘোষকে ধর্ম্ম পুরাণের ইছাই ঘোষের সহিত এক এবং গোপ জাতীয়

প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রয়াস নিতান্তই ব্যর্থ হইতেছে।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিদ্যানিধিও এই 'রাঢ়াধিপ'এর ধাঁধাঁ হইতে নিস্কৃতি পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

"যদি হরিশ্চন্দ্রকে একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের শেষপাদে ধরি, তাহা হইলে লাউসেনকে অন্ততঃ একশত বৎসর পরে আনিতে হইবে। তাহাতে ঢেকরীর গড়ের তাম্রশাসনদাতা ঈশ্বর ঘোষকে ধর্ম্মপুরাণের ইছাই ঘোষ পাই। ঈশ্বর ঘোষের কাল অজ্ঞাত। তাঁহার দত্ত তাম্রশাসনের লিপি-দৃষ্টে তাঁহাকে দ্বাদশ শতাব্দের অনুমান করা হইয়াছে। ধর্ম্মপুরাণে ইছাই ঘোষের পিতার নাম সোমঘোষ, তাম্রশাসনে ধবল ঘোষ। একজনের দুই নাম থাকা অসাধারণ নয়। কিম্বা ময়ূরভট্ট প্রকৃত নাম বিস্মৃত হইয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া 'সোম' নাম রাখিয়াছেন।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮, ৭৯ পৃষ্ঠা)।

যোগেশবাবু ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের সময় দ্বাদশ শতাব্দী অনুমান করিয়াছেন। ননীবাবু বলেন যে এই তাম্রশাসন সেনদিগের তাম্রশাসন সমূহ হইতে প্রাচীন। ইহার লিপির সহিত প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপির সাদৃশ্য আছে (Bengal Inscriptions III. P. 149)। সুতরাং ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন দশম একাদশ শতাব্দীর, দ্বাদশ শতাব্দীর নহে। আমরা লাউসেনকে প্রথম মহীপালের সমসাময়িক অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষ পাদ এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক মনে করি (পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ, ১৩৪০, ৬৩. পৃঃ)।

হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন—"ইতিহাসে ক্ষোদিত লিপিমালায় এ পর্য্যন্ত আমরা দুইজনকে রাঢ়াধিপরূপে দেখিতে পাইয়াছি ; একজন ১ম মহীপাল দেব, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে ইনি উত্তর রাঢ়ের অধিপতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।" তাঁহার মতে দ্বিতীয় রাঢ়াধিপ মহা-মাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের প্রপিতামহ। আমরা উপরে দেখিয়াছি যে ঈশ্বর ঘোষ কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কেহ রাঢ়াধিপ ছিলেন না। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলৈ লিপিতে মহীপালকে উত্তর-রাঢ়ের অধিপতিও বলা হয় নাই। তাহাতে মহীপালের পরাজয়ের কথায় পর উত্তর রাঢ় এবং গঙ্গার উল্লেখ করিয়াই ঐ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণভাবে শেষ করা হইয়াছে। তাহা দ্বারা মহীপালের সহিত উত্তর রাঢ়ের কি সম্পর্ক তাহা বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ মহীপাল রাজেন্দ্র চোলের বিজয়বাহিনীকে বাধা দিতে উত্তর রাঢ়ে গিয়াছিলেন।

তিনি বলেন যে কাম্বোজান্বয় গৌড়পতি কুঞ্জর ঘটাবর্ষ, চন্দেল্লরাজ যশোবর্ম্মদেবের গৌড়ে আগমনের (৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের) পরে গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার গৌড়ে আগমন ৯৫৪ খৃষ্টাব্দ নহে। কিলহর্ণ সাহেব ভুল করিয়া ঐ তারিখের খাজুরাহো লিপি যশোবর্ম্মার বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা তাঁহার পুত্র ধঙ্গের সময়ের, কেননা উহাতে ধঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। আমরা কুঞ্জর ঘটাবর্ষকে অত পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ইহাঁকে আমরা তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়া মনে করি। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তির ষষ্ঠ শ্লোকে ইহাঁকে সামন্তসেনের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখিতে পাই, যথা—

> "যস্মিন্ সঙ্গর চত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূত দ্বিষদ্বর্গে যেন কৃপাণ-
> কালভুজগঃ খেলায়িতঃপাণিনা।
> দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটাবিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলীমুক্তাস্থূলবরাটিকা-
> পরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ ॥ ৬ ॥

(Bengal Inscriptions. Vol. III. p. 47

আমরা শীঘ্রই এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করিতেছি।

চন্দেল্লরাজ ধঙ্গের তিনখানি লিপি প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথমখানি ১০১১ বিক্রম সংবতের এবং শেষ দুইখানি ১০৫৫ ও ১০৫[illegible] সংবতের। শেষখানিতে লিখিত আছে যে ধঙ্গদেব কাঞ্চী, অন্ধ্র, রাঢ় ও অঙ্গদেশের রাজ্ঞীগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন (E. I. Vol. 1., P 140)। ১০৫৫ সংবতের লিপিতেও শত্রুবনিতাদিগকে কারাবরোধ করার উল্লেখ আছে। সুতরাং এই ঘটনা ১০১১—১০৫৫ সংবতের মধ্যে ঘটিয়াছিল। এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধঙ্গদেব কাঞ্চী হইতে অন্ধ্রদেশ হইয়া রাঢ়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাঢ় হইতে অঙ্গে যাইতে হইলে গৌড় বা মগধ অতিক্রম না করিয়া যাওয়া যায় না অথচ ইহাতে গৌড় কিম্বা মগধের কোন উল্লেখ নাই কেন? আমাদের মনে হয় ঐ সময়ে রাঢ়াধিপ সম্ভবতঃ মগধ সিংহাসনও অধিকার করিয়াছিলেন তাই মগধের পৃথক উল্লেখ করা হয় নাই। ১০১১—১০৫৫ সংবৎ ৯৫৪—৯৮ খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ও প্রথম মহীপালের রাজ্যকালের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এই প্রথম মহীপালের রাজ্যকালে ঘটাই খুব বেশী সম্ভব। কারণ মহীপালদেবের নবম রাজ্যাব্দের লিপিতে দেখা যায় তিনি অনধিকারীর হস্ত হইতে পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মতে মহীপালদেবের মৃত্যু ও তৎপুত্র নয়পালদেবের রাজ্যলাভ ১০৩০—৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (I. A. S. B. Pt 1. pp. 192-3)। মহীপালদেব অন্ততঃ ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যকাল ৯৮২-১০৩৩ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। অতএব তাঁহার রাজ্যচ্যুতি ৯৮২-৯৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটিয়াছিল ইহা ধঙ্গদেবের রাজ্যকাল মধ্যে পড়ে সুতরাং আমাদের অনুমানে কোন অসঙ্গতি নাই। এখন দেখা যাউক এই রাঢ়াধিপ কে ছিলেন। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে রাঢ়ের পঞ্জিকায় যে রাজচক্রবর্ত্তী লাউসেনের উল্লেখ পাই সেই লাউসেনই চণ্ডকৌশিকোল্লিখিত কর্ণাটক। এবং সেই রাঢ়াধিপ লাউসেনই কিছুকালের জন্য মহীপালদেবকে মগধসিংহাসন হইতে তাড়াইয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন (পঞ্চপুষ্প, বৈশাখ, ১৩৪০ সম্ভবতঃ এই লাউসেনই চন্দেল্লরাজ ধঙ্গদেব কর্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন

চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেব যে ১০১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন যে এই গাঙ্গেয়দেব সম্ভবতঃ মিথিলারাজ্য বাঙ্গদে[illegible]

পুত্র গঙ্গদেব। তিনি শক বৎসর ১০৭৬—১১৫০ খৃষ্টাব্দে মিথিলার রাজত্ব করিতেছিলেন (Indian Historical Quarterly, Vol. VII. p. 681.)।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কবি কৃষ্ণমিশ্র যেরূপ ভাবে রাঢ়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বেশ একটু গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে মনে হয় কৃষ্ণমিশ্র রাঢ়ের সহিত সম্পর্কান্বিত ছিলেন। চন্দেল্ল যশোবর্ম্মণ কর্ত্তৃক গৌড়জয়ের পর হইতেই গৌড় ব্রাহ্মণ ও গৌড় কায়স্থদিগকে উত্তর-ভারতের নানা রাজ-দরবারে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ধঙ্গদেবের ৯৫৪ খৃষ্টাব্দের খাজুরাহো প্রশস্তির লেখক জয়গুণের পুত্র গৌড়কায়ণিক জড়চ। এই 'গুণ' বঙ্গীয় কায়স্থগণের পদবী। আবার ধঙ্গদেবের ১০০২ খৃষ্টাব্দের প্রশস্তির কবি রাম পূর্ব্বে তর্কারিকাবাসী ছিলেন। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে এই তর্কারিকা উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় অবস্থিত ছিল (Indian Antiquary, Vol LX., pp 14—18.) কৃষ্ণমিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ সম্ভবত: ধঙ্গদেবের রাঢ় বিজয়কালে রাঢ় হইতে কান্যকুব্জ গমন করিয়াছিলেন।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ে উল্লিখিত চক্রতীর্থকে বর্ত্তমান গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী চাকদহ বলিয়াই মনে হয়। পবনদূতের 'দশিতাবর্ত্ত চক্রাং' কথার দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায়। আবর্ত্তকে এখনও অনেকস্থলে দহ বলা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে চাকদহ গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল।

ফরাসী দেশের দু'টি প্রসিদ্ধ বন্দর

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

(টুলোঁ ও মার্সেল)

(১)

২০শে সেপ্টেম্বর ভোরবেলা আমাদের জাহাজখানা ভূমধ্য-সাগরতীরস্থ ফরাসী দেশের টুলোঁ বন্দরে লাগলো। টুঁলো ও মার্সেলের কথা আগে অনেক শুনেছি, সুতরাং ইতিহাস সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। ফিনিসিয়ান ও রোমানদের নিকট টু:লঁা পরিচিত ছিল ; কারণ এখান হতেই তারা প্রসিদ্ধ টিরিয়ান বেগুনে রংএর জন্য
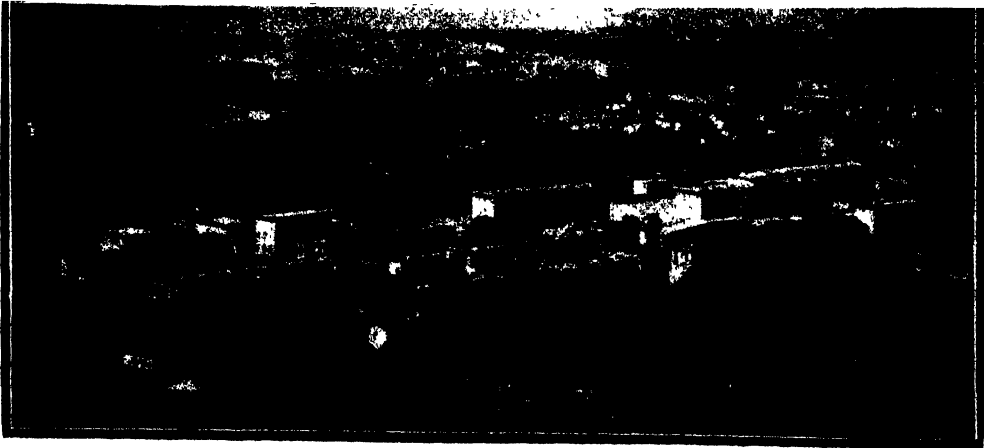
সাধারণ দৃশ্য—টুলোঁ

প্রথমোক্ত বন্দরটিতে পদার্পণ করতে গিয়ে যে মন অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠেছিল, তা' বলাই বাহুল্য। প্রাচীনকালে এ বন্দরটি তেমন প্রসিদ্ধ ছিল না এবং এর পুরাতন শেল্ ফিস্ ধরে নিয়ে যেতো, কোথাও কোথাও তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে সেরাসেন্‌রা টু:লঁা আক্রমণ করে এবং তৎপরে প্রায় তিন শতাব্দী

এ স্থানটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। মধ্যযুগে প্রভেন্সের ফিউডেল্ লর্ডদের মধ্যে টুলোঁ নিয়ে বিবাদ বাধে, এবং এ স্থানটি মার্সেলের লর্ড.দের অধীনে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে টুলোঁ বেশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে এবং ঐ সময়েই এ-স্থানে একটি প্রাচীর ও টাওয়ার নির্ম্মিত হয়। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ লুইর প্রধান মন্ত্রী কার্ডিনাল্ রিচ.লু. টুলোঁকে তাঁর নূতন নৌ-বহরের স্থান রূপে গঠন করেন এবং তখন হতেই বন্দর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স ইর্ডজেন সহরটি দখল করতে অকৃতকার্য্য হন। ১৭৯৩ ইংরেজীতে, তদানীন্তন অখ্যাতনামা গোলন্দাজ সেনাদলের একজন সামান্ত মেজর নেপোলিয়ান ইংরেজদের হাত হতে বন্দরটি কেড়ে নেন,

টুলোঁ—বন্দর

এবং তাদের যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে তাড়িয়ে দেন। পরবর্ত্তী-কালে, মিশর অভিযানের পর, নেপোলিয়ন টুলোঁর পথে অগ্রসর হলে, বৃটিশ নৌবহর কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হয়ে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে ফ্রেজাস্এ তাড়িত হন। ট্রাফেলগারে যে অভিযানের শেষ হয়, ভিলেন্যুভ নৌবহরের টুলোঁ হতে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সূচনা। এ-সব নানা কারণে ফরাসী দেশে, মার্সেল বন্দরের পরই, টুলোঁর স্থান। তাই সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক আলেকজেণ্ডার ডুমা, যেমন তার "কাউণ্ট ডি মণ্টিক্রিস্টো" মার্সেলে আরম্ভ করেছেন, তেমি জোসেফ কনরাড্ও, তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'দি রোভার' পুস্তকে টুলো ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিকেই পুস্তক-বর্ণিত ঘটনাস্থল বলে নির্দ্দেশ করেছেন।

বিশ হাজার টনের এত বড়ো জাহাজ বলে, তা' একেবারে বন্দরে এসে লাগে নাই, সুতরাং আমাদের নৌকা ক'রে এসে জেটীতে উঠতে হল। তারপরই আরোহীরা সহর দেখবার জন্য অনেকগুলি দলে বিভক্ত হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমরাও ক'জনে ছোটখাটো একটি দল তৈরী করে, বন্দরের সমুদ্রতীরস্থ অপরিসর পথ দিয়ে সহরে প্রবেশ কল্লুম। প্রথম দৃষ্টিতেই নেপল্স্এর সঙ্গে তুলনায় বন্দরটিকে অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন মনে হলো। বন্দরে ঢুকবার পথেই নৌকার দাঁড় হাতে একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত আছে; সম্মুখে সমুদ্রের দিকে বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে, সে যেন দূরাগত নাবিকদিগকে সাদরে আহ্বান কচ্ছে। সহরে ঢুকতে গিয়েই গলির দুপাশে অনেকগুলি দোকান দেখতে পাওয়া গেল। আমরা সেখানে বেশী দেরী না করে, সোজাসুজি সহরের ভিতরে ঢুকলুম। কিছুদূর যেতে না যেতেই চোখে পড়লো টুলোঁর প্রসিদ্ধ গীর্জ্জা ঘরটি। আমরা ক'জন ভিতরে গিয়ে নানা মূর্ত্তি ও ধূপ ও আলোর সমাবেশে ইউরোপীয় পৌত্তলিকতার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেলুম। অনতিদূরে কাছেই টুলোঁর টাউন হল। একবার তার ভিতরও উঁকি দিতে ত্রুটি হয়নি আমাদের। তারপরই পর-পর অনেকগুলি রাস্তা পার হয়ে আমরা একটি সুপ্রশস্ত পার্কে এসে পৌছলুম; তার নাম লিবার্টি স্কোয়ার। পার্কের মধ্যস্থলে, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মূর্ত্তি স্থাপিত, এবং তাদের চারিদিকে জলের ফোয়ারা ঝরে পড়ছে। ভিতরে পাথরের ও বাইরে লোহার রেলিংএ ঘেরা, তরুছায়া সমাচ্ছন্ন এ স্থানটি অতি সুদৃশ্য ও মনোরম বলে মনে হলো। পার্কের এদিকে সেদিকে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে বসে সে দৃশ্য উপভোগ করেছিলুম, এম্নি সময় সামরিক বাদ্যের শব্দ শুনে অনেক বালক বালিকা ও নরনারীকে পার্কের

এক কোণে ছুটতে দেখে, সেদিকে ব্যাপার কি দেখতে এগিয়ে গেলুম। গিয়ে দেখি, একটি লম্বা প্রসেশন্ চলেছে, একেবারে সামরিক কায়দায়! প্রথমেই কালো পতাকাবাহী পদাতিক সেনার দল মার্চ্চ করে চলেছে, তার পশ্চাতে অশ্বারোহী, তার পশ্চাতে শ্বেতাঙ্গ পদাতিক, তৎপরে নিগ্রো অশ্বারোহী ও পদাতিক, তৎপশ্চাতে ব্যাণ্ড্। ব্যাণ্ডএর পেছনে, ফরাসী দেশের জাতীয় পতাকা, এবং তৎপশ্চাতে গম্ভীর পাদবিক্ষেপে চলেছেন ধর্ম্মযাজকের দল কালো পোষাক পরে। সব শেষে, এলো, ষোলটি ঘোড়ায় টানা একখানা শকট ও তার উপরে জাতীয় পতাকায় ঢাকা প্রকাণ্ড শবাধার! তৎপশ্চাতে আবার একদল শ্বেতাঙ্গ ও একদল নিগ্রো পদাতিক! পার্কের ও-পাশের রাস্তা দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে প্রসেশন্টি চললো, আর রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে অসংখ্য জনতা টুপী তুলে মৃতের প্রতি সম্মান দেখালে! শুনতে পেলুম বিগত মহা-সমরের সুবিখ্যাত কে একজন জেনারেল মারা গেছেন; তাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, একেবারে সম্পূর্ণ সামরিক ভাবে, তাঁর শব নিয়ে যাওয়া হচ্চে সমাধি-স্থানে। বীর ও বীরত্বের পূজা, পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম দিন হতেই চলে আসছে, সকল দেশে, সকল স্থানে, এবং সকল কালে। একই মুহূর্ত্তে আমার মনে পড়ে গেল, দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের অভূতপূর্ব্ব গরিমাময় দৃশ্য! তার তুলনায় মনে হল, এ অতি অকিঞ্চিৎকর, অতি নগণ্য!

শববাহী প্রসেশনটি যখন ওদিকে চলে গেল, তখন আমরা কজন লিবার্টি স্কোয়ার হতে বের হয়ে আবার পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলুম। দু' তিনটি রাস্তা পার হয়ে গিয়েই টুলোঁর সুপ্রসিদ্ধ রাজপথ বুলেভার্দ দা ট্রাসবুর্গে পৌছলুম। পথটির দুপাশেই সারি সারি গাছ, ও বড় বড় দোকান-পাট পথের সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। একটু এগিয়ে যেতেই হাতের ডান দিকে ইকোল ডি টুঁলো পড়লো। সেদিন রবিবার ছিল, তাই কলেজের শুধু ঘরগুলি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

তারপরই আমরা প্যালে ডি জাষ্টিস্ দেখতে গেলুম। দূর হতেই দেখতে পেলুম, সম্মুখস্থ তিনখানি দরজার উপর ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের বীজমন্ত্র লিবার্টি, ইকুয়ালিটি ও ফ্রেটার্নিটি (স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী) জল্ জল্ কচ্ছে। এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটির গঠন একটু নূতন ধরণের; একতলা হলেও ধর্ম্মাধিকরণের উপযোগী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গাম্ভীর্য্য তাতে বেশ আছে। ভিতরে প্রবেশের সোপান-শ্রেণীর দুপাশে দুটি মূর্ত্তি স্থাপিত, এবং তিনটি প্রবেশ-দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেদিন কোর্ট বন্ধ থাকায়, কেবল বিচারকের আসন ও উকীল ও অর্থী-প্রত্যর্থীদের উপবেশন-কক্ষ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়ে ওঠে নি। অতঃপর বুলের্ভাদ দা ট্রাসবুর্গে ফিরে এসে

লিটোরেল প্রমিনেড্—টুলোঁ

আমরা ট্রামে চড়ে একটি পাহাড়ের উপর পুরাতন দুর্গ "গরগে ডুলিউন" দেখতে গেলুম। দুর্গটি অনেকদিনের পুরাতন, এবং তৎকালীন স্থাপত্যবিদ্যার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আমরা ট্রামে করে সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রমিনেড দিয়ে, কে' ক্রনষ্টাড্ট্-এ পৌছলুম ও খেয়া নৌকায় লা মার্ট্তে পৌছে, অল্পদূর পথে হেঁটে পিরি লুই রেস্তোরাঁর কাছে পৌছলুম। এই রেস্তরাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তী উঁচু স্থানটিতে নেপোলিয়ন ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হন, সেজন্যই ফোর্ট নেপোলিয়ন প্রসিদ্ধ এবং টুলোঁর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অন্যতম। টুলোঁ বন্দরের অপর পারে স্থিত টেমারিস্ ও লে সাব্লেট, তাদের হোটেলগুলি ও স্নান-ভূমির জন্য

প্রসিদ্ধ, সুতরাং বন্ধুদের কেউ কেউ সেগুলি দেখতে যেতে প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু জাহাজ ছাড়বার আর বেশী দেরী ছিল না, কাজেই অধিকাংশের ভোটে জেটিতে ফিরে যাওয়াই স্থির হলো। সুতরাং আর ঐ স্থানগুলির দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে উঠে নি।

জেটিতে ফিরবার পথে, বন্ধু-বান্ধবেরা নানা জিনিষ-পত্তর কিনতে মনোনিবেশ কল্লেন। আমি তাদের সঙ্গে অযথা দেরী না করে, কতকগুলি সুপক্ক বড় আঙুর কিনে, তাই খেতে খেতে, জেটিতে ফিরে এলুম। আমাদের

সত্যই ভুলে গিছ্‌লুম বটে! তাই ইতস্ততঃ করে বললুম "কেন এত শিগ্‌গিরই ?" বান্ধবী বল্লেন "হাঁ আর এক ঘণ্টা পরেই গাড়ী ছাড়বে।"

মিস্ কলম্বো তার ভগ্নীপতির বাহু আকর্ষণ করে বল্লে "জন, এস না, ওদিকে আমরা লেসিটার জন্য ক'টি খেলনা কিনে আনি, ততক্ষণে লেসিটা ডক্‌টর পলের সঙ্গে কথা বলুক।"

শ্যালিকার বাহুবেষ্টনে বেচারা জন সেদিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হল। লেসিটা সেদিকে চেয়ে বল্‌লে "আমার
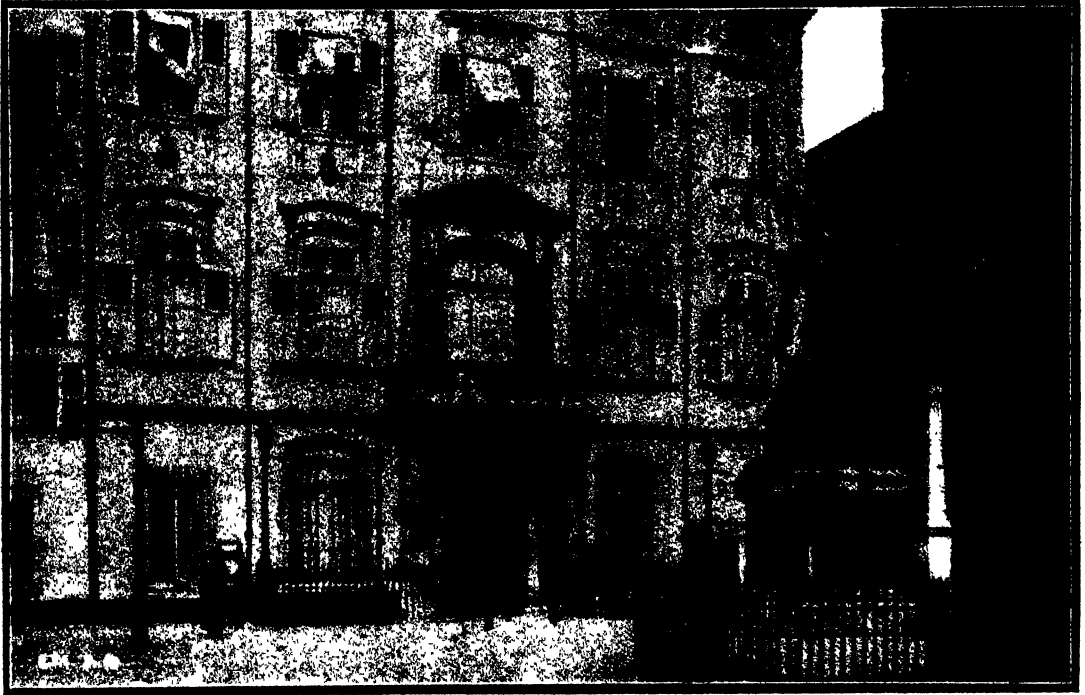
টাউন হল—টুলোঁ

জাহাজের ফরাসী, স্পেনিশ, ও সুইস্ যাত্রীরা এবং যারা ট্রেণে ইংলণ্ডে যাবেন তাঁরা ততক্ষণে লটবহর নিয়ে টুলোঁয় নেমেছেন। আমি প্রায় ভুলেই গিছ্‌লুম যে আমার বন্ধু জন ও বান্ধবী লেসিটা এবং মিস্ কলম্বো টুলোঁতেই জেনীভা-গামী ট্রেণে চাপবেন! ভাগ্যিস্ জেটিতে একটু শিগ্‌গির ফিরে এসেছিলুম, তাই তাঁদের সঙ্গে বিদায়ের ক্ষণে দেখা হলো! বান্ধবী লেসিটা এগিয়ে এসে বল্লেন "ডক্‌তর পল, আপনি বোধ হয় ভুলেই গিয়েছেন যে আমরা এখনি গিয়ে ট্রেণে চাপবো।"

বোন, আমার মেয়ে লেসিটাকে অত্যন্ত ভালবাসে, তাই খেলনা কিনতে যাচ্ছে! আহা, আজই সন্ধ্যেবেলা, আমার প্রিয়তমা কন্যাটিকে আমি দেখতে পাব! ডক্‌তর পল, আপনি ধারণাও কর্ত্তে পারবেন না আমার মেয়েটি কত সুন্দরী।"

বলা বাহুল্য এ' কথাটি বান্ধবীর মুখে আমি ন্যূনকল্পে পাঁচশো বার শুনেছি। দূরাগত জননীর বুকের ধন কন্যাটিকে আবার ফিরে পাবার ব্যাকুল ইচ্ছায় সেই স্নেহপূর্ণ অভিব্যক্তির পুনরুক্তি শুনে শুনে আমার অতৃপ্তি

হয়নি একদিনের জন্যও। ঠিক আগের রাত্রিতে, আমাদের জাহাজ যখন ফরাসী দেশের সীমানা ঘেঁসে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল, আর অদূরবর্ত্তী তীরে দীপমালা, নৈশ-কালে পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্রের মত জ্বলছিল, তখন লেসিটা, ওই নীস্, ওই মন্টিকার্লো বলে আমাকে ফরাসী সীমানার নানা স্থান নির্দ্দেশ করতে করতে, ডি রিভেরিয়াতে তার শিশুকাল কেমন কেটেছিল, তারপর নীসের এক নির্জ্জন আবাসে কি করে তার ও জনের বিবাহিত-জীবনের প্রথম দুটি বছর কেটেছে, তারই গল্প কচ্ছিল, অবিরত ভাবে; আর তার পরেই এসেছিল তার একমাত্র শিশু-কন্যার কথা। তার কথাগুলি আমাকে এতই আকৃষ্ট করেছিল যেন আমার মনে হচ্ছিল, আমি নিজের চোখে, ছোট্ট একটি মেয়েকে ডি রিভোরিয়াতে বাড়তে দেখছি, সেই আবার বড় হয়ে স্বামীর সঙ্গে সুখের নীড় রচনা করে কপোত-কপোতীর মত মন্টি-কার্লোয় জীবনের দুটি সুখময় বছর যাপন কচ্ছে, আবার তার পরই স্বর্গের পবিত্রতা মাখা একটি শিশু-কন্যা তাকে আদর কচ্ছে সুতরাং আবার সেই মেয়েটির উল্লেখে আমি বল্লুম "আপনার মেয়েটিকে দেখতে আমারও সাধ হয়!"

বান্ধবী আমার প্রতি ব্যগ্র দৃষ্টি স্থাপন করে বল্লেন "একবার আসবেন কি দয়া করে জেনীভায়—!"

আমি বল্লুম "ইচ্ছে আছে, যদি সময় হয় নিশ্চয়ই আসবো!"

"তবে আমাদের জেনীভার ঠিকানাটা লিখে নিন্।"

আমি পকেট হতে ডায়েরীখানা খুলে দিলে সেই তাতে জেনীভার ঠিকানা লিখে দিতে দিতে বল্লে "এক-খানা চিঠি দেবেন, আসবার আগে, বোধ হয় তখন জোড়েই আসবেন।"

আমি ডায়েরীখানা পকেটে পুরতে গিয়ে, একেবারে সশব্দে হেসে উঠ্লুম—।

বান্ধবী লেসিটা-সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কলম্বোর কাছা-কাছি ভারত মহাসাগরে বান্ধবীর সমুদ্রপীড়ার সময় সামান্য ওষুধ দেওয়া থেকে আমাদের বন্ধুত্বের আরম্ভ হয়; তার পর প্রায় আঠারো দিন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আঠারো ঘণ্টাই, একত্র গল্প-গুজব ও খেলার মাঝে, বান্ধবী ও জনের সঙ্গে আমার অত্যন্ত হৃদ্যতা হয়েছিল। তাই যেদিন ফ্যান্সি-ড্রেস্-বলএ, প্রথম পুরস্কার পেয়েই বান্ধবী এসে, তার পুরস্কারের ভাণ্ডার হতে, প্রথম চকোলেটটি আমাকে তুলে দিলেন খেতে, তখন একটুও বিস্মিত হই নি! মনে আছে, আর একদিন নাচ ও

প্যালে ডি জাষ্টিস্—টুলোঁ
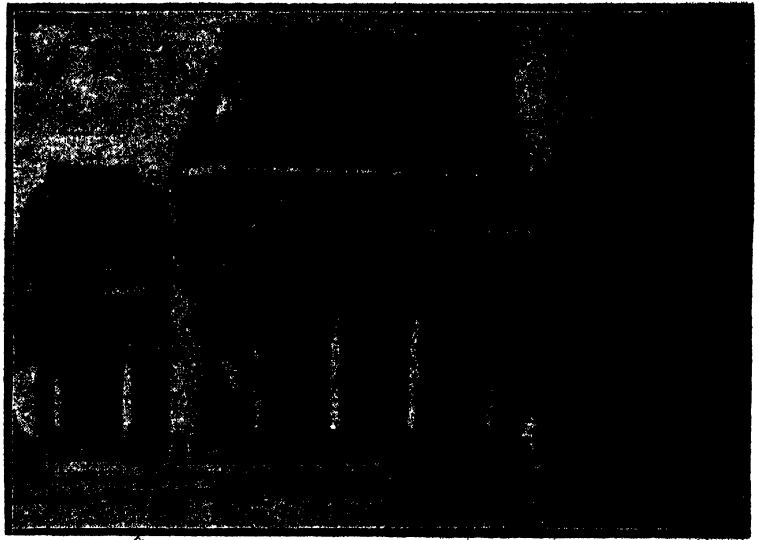
গানের আসরে দেরী হওয়াতে স্থানাভাবে আমরা তিন জন গিয়ে অর্গ্যানের বাক্সটিকে রিজার্ভ বক্স তৈরী করে, তারই ভিতর বসেছিলুম। আমার একই জাহাজের সঙ্গী-সাথীরা, বিশেষতঃ ইন্দোরের যুগল বন্ধু—সরকার ও মুখুয্যে, প্রথমতঃ আকারে-ইঙ্গিতে এবং পরে প্রকাশ্য-ভাবেই আমাকে বান্ধবীর কথা বলে ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না; বিশেষতঃ সেদিন গানের মজ্‌লিসে এরকম অদ্ভুত রিজার্ভ বক্সে বসার পর থেকে। কিন্তু এ-সব বিষয়ে আমি চিরকালই বেপরোয়া; সুতরাং আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলার সকল প্রচেষ্টাই বিফল হতো! বন্ধু ও বান্ধবীর নিকট আমি অল্প ফরাসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলুম,

এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু শিখতে পেরেছিলুম। তারা দুজনেই, আমার মুখে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা শুনতে চাইতো; তাতে ভারতীয় লোকজন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ই আলোচিত হতো। বান্ধবীর বোনটি আমাদের এ সকল কথাবার্ত্তায় বড়-একটা যোগ দিত না, কারণ তার সময় কাটাবার মত বন্ধু, বান্ধব ও আমোদ-প্রমোদ, অনেক কিছুই অন্যত্র জুটেছিল।

আমরা কথা বলতে বলতে একটু এগিয়ে গিছলুম। সম্মুখেই একটা কাফে ছিল; বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা কল্লুম এক কাপ্ চা কি কফি ইচ্ছে করেন কি না। বান্ধবী হেসে বল্লেন, "এক কাপ্ কফি হলে মন্দ হয় না।" তাকে বসতে অনুরোধ করে, দু কাপ্ কফির অর্ডার কল্লুম। বান্ধবী ও আমি দুখানি পাশাপাশি চেয়ারে বসে কফি পান করতে করতে প্রায় আধ ঘণ্টা গল্প কল্লুম। এম্নি সময়, জন্ ও ম্যালিকার সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হলো। তাদের হাতে কতকগুলি কাঠের খেলনা, বোনঝির জন্য বাঁশীর কেনা! এমন সময় হঠাৎ ঢং ঢং করে জাহাজের ঘণ্টা পড়লো। আমার খেয়ালই ছিল না যে আমাদের সময় এসেছে জাহাজে যাবার। তাই তাড়াতাড়ি বন্ধু ও বান্ধবীদ্বয়ের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজের পানে ছুটলুম। তারা তিনজনও খানিক এগিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালে!

ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজে উঠে, ডেকে গিয়ে বসবার স্থানে দেখি মস্ত বড় সভা, কারণ বন্ধুরা সকলেই আগে এসেছেন, এবং আমার সম্বন্ধেই মুখরোচক আলোচনা চলছিল বোধ করি। কারণ আমার আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নাটকীয় ধরণে উঠে, টুপী তুলে আমাকে অভিবাদন জানালে! তাতে আমার মুখখানা ভীষণ বিরক্তিতে ভরে উঠ্‌লো; তাই অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরে সেদিকে দৃকপাতমাত্র না করে, যেখান হতে বন্ধু ও বান্ধবীদ্বয়কে দেখা যায়, সেখানে রেলিংএ ভর করে ঝুঁকে দাঁড়ালুম! আমার হাত হতে রুমালখানি হাওয়ার সঙ্গে উড়ছিল; বন্ধুজন ও বান্ধবীদ্বয়ের বিদায় সূচক হাতনাড়া দেখতে দেখতে হঠাৎ জাহাজখানির মুখ ফিরে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু, বান্ধবীদ্বয় ও ফরাসীদেশের টুলোঁ বন্দরের নিকট বিদায় নিলুম।

প্লেস্ ডি লা লিবার্টি—টুলোঁ

(২)

মার্সেল

প্রায় দেড় বছর পরে ১৯৩১ ইংরেজীর, ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মার্সেলে এসে পৌছলুম। সঙ্গে শিখবন্ধু ডক্টর সোডি। উদ্দেশ্য তৃতীয় দিনে স্বদেশ-যাত্রা! মার্সেলে এই আমার প্রথম আগমন, সুতরাং শিখ বন্ধুটিকেই গাইড্ করে, তাঁর পূর্ব্ব-পরিচিত একটি হোটেলে আস্তানা নিলুম! এ হোটেলটিতে শুধু থাকবার স্থানই পাওয়া গেল, তেতলার দুইটি অনতি-প্রশস্ত কক্ষে; কিন্তু হোটেলের কর্ত্রীটি কিছুতেই আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন না। সারাদিন ট্রেণে কর্লেই চলবে। কিন্তু আপনি কি যাবার মুখে মার্সেলে কোথাও খাননি?"

বন্ধু একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত উত্তর কল্লেন "হাঁ খেয়েছিলুম বৈ কি? কিন্তু সে শুধু এক রাত্রির জন্য, আর তাও এক বন্ধুর সঙ্গে অনেক দূরে একটা ভারতীয় হোটেল আছে, সেখানে গিয়ে—! সেখানে মন্দ খাওয়ায় না, কিন্তু, দু'বছর পরে আমার পক্ষে চিনে যাওয়া অসম্ভব! এই হোটেলটির ঠিকানা নোটবুকে লেখা ছিল, তাই কোন রকমে চিনে বের করতে পেরেছি।"

"আচ্ছা তার জন্য ভাবনা কি, এখন চলুন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, ভগবানের ইচ্ছা হলে, কিছু না কিছু ভাগ্যে জুটবেই জুটবে।" বলে বন্ধুকে তাড়া দিলুম।

বুলেভার্দ ডি ষ্ট্রাসবুর্গ—টুলোঁ

ভ্রমণের পর পেটে খিদের যে প্রাবল্য ছিল, তা' বোধ হয় বলাই বাহুল্য; তার উপর বন্ধুটি আবার একটু হিষ্টেরিকেল্, (ঐতিহাসিক নন্; দার্শনিক!), কাজে কাজেই হোটেলে পৌছবার আগে হতেই খাবার জন্য ছট্ফট্ কচ্ছিলেন। হোটেলে খাবারের ব্যবস্থা না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে বললেন "ডক্টর, এখন উপায়, আমি ত না খেলে আর নড়তেই পারবো না!"

আমি হেসে বল্লুম "বন্ধু, এত হতাশ হবার কারণ নেই; ট্যাক্সিতে আসবার সময় অনেকগুলি রেস্তরাঁ ত পথের দুদিকে দেখে এসেছি, তাদের একটিকে পেট্রোনাইজ

বলা বাহুল্য, বাহিরের তাড়ার চেয়ে বন্ধুর ভিতরের তাড়াও বড় কম ছিল না। তাই আমাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষ দুটির দোরে তালা বন্ধ করে আমরা মার্সেলের পথে, খাবার আশায় বেরিয়ে পড়লুম। তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। দু-তিনটা রাস্তা পার হয়েই একটা ছোট রেস্তরাঁর দর্শন পাওয়া গেল এবং তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায়, তাকেই পেট্রোনাইজ করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। লোকের ভীড়ের মধ্যে, কোন রকমে দুটি স্থান করে, বসে পড়ে, অত্যন্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মত, যা পায় তাই খায়, কখনো এটা খাব, ওটা খা'ব বলিয়া আব্দার করে না, এই ভাবে সে রাত্রিতে

আহার-পর্ব্ব শেষ করা গেল। আমার বন্ধুটি নিরামিষাশী, তাই তার কষ্টই হল বেশী! আর আমি ত এক-প্রকার সর্ব্বভুক্‌ই, আর পাকস্থলীতেও বোধ করি বা সর্ব্বভুক্ হুতাশনই বিরাজ কচ্ছিলেন; তাই, যা পাওয়া গেল, তা দিয়েই উদর পূর্ণ করে আহার করা গেল!

রেস্তরাঁ হতে পথে বেরিয়ে এসেই, তদানীন্তন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই বন্ধুতে একটু মতদ্বৈধ হয়ে গেল। বন্ধু বল্লেন "হোটেলে ফিরে যাওয়া যাক্!" উদর পূরণের সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যে "ভবঘুরে" মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছিল; তাই বল্লুম, "না বন্ধু, এমন রাতে হোটেলে ফিরে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়।"

রাত সাড়ে ন'টার সময়ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সঙ্গীর অভাব হতো না।

একাকী আপন মনে মার্সেলের রাজপথ দিয়ে মন্থর গমনে চলেছি; উদ্দেশ্য নেই, গন্তব্য-স্থল নেই, শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়াবার আশায়! খানিকদূর এগিয়ে যেতে না যেতেই একটি লোক এসে কাণের কাছে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, "ওয়াণ্ট এন্‌জয়মেণ্ট স্যার? ভেরী নাইস্।"...ওঃ হরি! আমি যে ফরাসী দেশের একটি নগরের পথে চলেছি, তা একেবারেই ভুলে গিছ্‌লুম; লোকটির কথা আমাকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দিলে! বিনা উত্তরে এগিয়ে যাওয়ার

সেণ্ট চার্লস্ ষ্টেশন—মার্সেল

সোডি বল্লেন, "শরীর ও মনের এ রকম ক্লান্ত অবস্থাতে, ঘুম ছাড়া আর কিছু কর্ত্তব্য হতে পারে না!"

আমার মুখ দিয়ে ভবঘুরে বল্লে "ঘুম যথেষ্ট হবে, কিন্তু মার্সেলের পথে বেড়াবার সুযোগ জীবনে আর নাও আসতে পারে।"

কয় মিনিট বাদানুবাদের পর যখন বন্ধুকে কিছুতেই বাইরে যেতে রাজী করতে পাল্লুম না, তখন অগত্যা, সে রাত্রির মত পথেই বন্ধুকে "শুভরাত্রি" ইচ্ছা করে, আমি বেরিয়ে পড়লুম মার্সেলের পথে, আর বন্ধু ফিরে গেলেন হোটেলে! বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একবার মনে হলো, হায়! এমি সময় যদি মুখুয্যেভায়া সঙ্গে থাকতো, তাহলে

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক রকম নাছোড় ভাবেই, প্রায় এক ফার্লং বিড়বিড় করে বকতে বকতে চললে, ও অবশেষে বোধ করি আমাকে "অরসিক, বেরসিক" প্রভৃতি নানাভাবে কল্পনা করে, হাল ছেড়ে দিয়ে পশ্চাৎপদ হয়ে গেল। প্রায় মিনিট পাঁচ পরেই, আর একটি লোক এসে কতকগুলি ছবি সম্মুখে ধরলে! এক কথায়, আমার কোন ছবির আবশ্যক নেই বলে আবার সামনে এগোতে যাচ্ছি দেখে সে বল্লে "মুসেঁ, এগুলি মার্সাইর বিখ্যাত সুন্দরীদের ছবি।" তবু আমি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কল্লুম না দেখে, সে আমার কাণের কাছে মুখ এনে যা' বল্লে, তাতে আমার এত রাগ হলো,

যে মনে হলো, তাঁর গালে কসে একটা চড় বসিয়ে দিই! প্যারিসের পথে, বন্ধু মুখুয্যের তেলে বেগুনে জলে উঠার কথা মনে পড়লো! বাস্তবিকই লোকটির বেহায়াপনা দেখে আমার অবস্থাও অনেকটা তেমনিই হয়েছিল। কিন্তু, একাকী বিদেশে রাগ প্রকাশ যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনা করে, অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে এগিয়ে চল্লুম! একটা প্রকাণ্ড মোড় পার হয়ে যেটা অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তা, সে-দিকেই চলতে আরম্ভ কল্লুম। এবার আর একটি লোক এসে বল্লে "স্তর, ব্লু সিনেমায় যাবেন?" ব্রুসেলস্‌এ ফরাসী ভাষায় টকি দেখতে ও শুনতে গিয়ে, অত্যন্ত বোকা হয়েছিলুম, দু চারিটি শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছুই

দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস কল্লুম "ব্লু, সিনেমা, কি এবং কোথায়?" লোকটা খুবই উৎসাহভরে বলে যেতে লাগলে "এ সিনেমায় মুভিং পিক্‌চার দেখানো হয়। এমনটা আর কোথাও হয়না, এমন কি প্যারিসেও নয়। সেজন্য হাজার হাজার বিদেশী লোক মার্সেলে আসে শুধু ব্লু সিনেমা দেখতে! এমন কোন বিদেশী নেই যে একবার মার্সেলে পদার্পণ করে, ব্লু সিনেমা না দেখে গ্যাছে! ইত্যাদি ইত্যাদি!" সৌভাগ্যক্রমে তখন মুভিং পিক্‌চারের অর্থ জানতুম, আর না জানলেও বিশেষ ক্ষতি ছিলনা, কারণ লোকটি ভাঙা ইংরেজীতে যেভাবে ব্লু সিনেমার দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি অনর্গল বলে যাচ্ছিল, তাতে কখনই
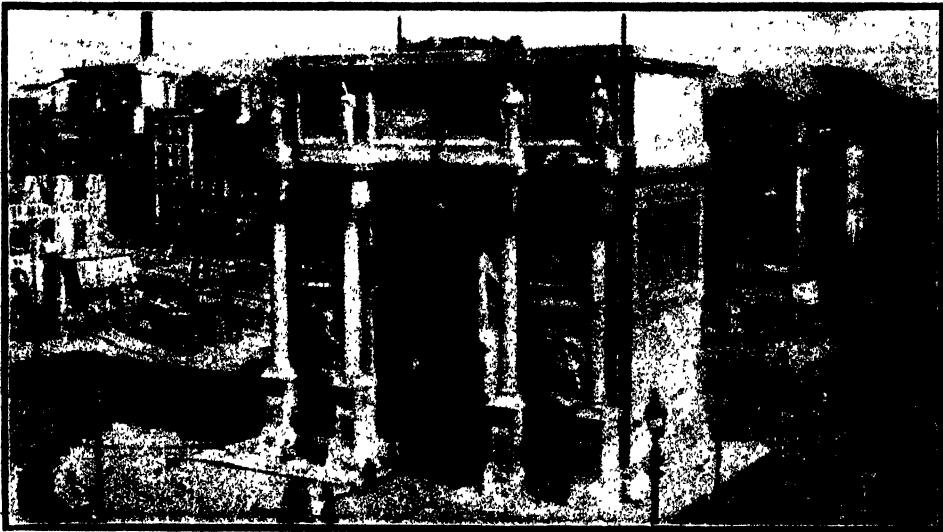
আর্ক ডি ট্রায়াম্ফ—মার্সেল

বুঝতে পারিনি, তাই ফরাসীদেশে সিনেমার উল্লেখে বিশেষ উৎসাহ হলো না মনে। তাই অসম্মতি জানিয়ে, মিনিট দুই এগিয়ে যেতে আর একটি লোক বল্লে "মুসে ব্লু সিনেমা?" ভাবলুম, ব্লু সিনেমা হয় ত খুব প্রসিদ্ধ সিনেমা, না হয় নূতন খুলেছে, তাই দালাল রেখে বিদেশীদের কাছে ক্যানভাস্ কচ্ছে! তা হোক, ফরাসী দেশে টকিতে আর যাচ্ছিনে! তারপরই যখন আর একটি লোকের মুখে ব্লু সিনেমার নাম উল্লেখ শুনতে পেলুম, তখন মনে অত্যন্ত কৌতূহল হলো, যে ব্লু সিনেমার নিশ্চয়ই একটা বিশেষত্ব কিছু আছে। সৌভাগ্যক্রমে লোকটি ইংরেজীতে কথা বলছিল, তাই একটু

সুরুচিসঙ্গত অথবা শ্লীল বলা চলেনা! বলতে বলতে সে যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে তার বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কচ্ছিল, এবং তাতে তার উৎসাহের অন্ত ছিলনা। লোকটি নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে মস্ত একটি শীকার হাতে পেয়েছে এবং বিদেশী লোকটিকে জালে ফেলে বেশ কিছু রোজগার করবে সে রাত্রিতে! কিন্তু যখন তার সব কথা শুনে আমি বল্লুম "আচ্ছা তা' বেশ! কিন্তু আজ রাত্রিতে ত যেতে পারবো না, কারণ আমার সঙ্গে টাকা নেই, কাল যাব'খন;" তখনো সে হাল না ছেড়ে বললে "কত আছে সঙ্গে?"

লোকটির এই প্রশ্নে, একাকী বিদেশের পথে অত্যন্ত

শঙ্কিত হয়ে পড়লুম, তাই বল্লুম "কিছুই নেই!" এই বলে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে যে পথে এসেছিলুম সে পথেই ফিরে চলতে আরম্ভ কল্লুম। আশাহত লোকটি তখনও সঙ্গ ছাড়ে নাই। তাকে পশ্চাতে আসতে দেখে আমি আরো জোরে পা ফেলতে লাগলুম। আমার মনে হলো, অত রাত্রিতে অপরিচিত বিদেশে, মার্সেলের মত স্থানে আর থাকা উচিত নয়। প্রায় আধঘণ্টা পরে, দ্রুতপদে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে যখন এসে হোটেলের দ্বারে পৌছলুম, তখন যেন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো!

পরদিন ঘুম ভাঙ্তে জানি না কেন একটু বেলা হয়েছিল। দরজায় টোকার শব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে, ড্রেসিং গাউনটা ত্বরিতহস্তে গায়ে চাপিয়ে বল্লুম "ভিতরে

ট্রান্সপোর্ট ব্রিজ—মার্সেল

এস।" সশব্দে দরজা খুলে যিনি ঘরে প্রবেশ কল্লেন, তিনি বন্ধু ডাক্তার সোডি ছাড়া আর কেউ নন্। দেখে স্পষ্টই বুঝতে পাল্লুম তাঁর প্রাতঃকৃত্য ও বেশ-ভূষা তখন সবই হয়ে গেছে! সোডি আমাকে তদবস্থ দেখে বল্লেন "একি ডাক্তার, এইমাত্র শয্যা ছেড়ে উঠ্লে বুঝি? কাল রাত ক'টায় ফিরেছিলে?"

"না, বেশী রাত ত হয়নি, বোধ হয় বারোটা বেজে ক'মিনিট হয়ে থাকবে। সত্যিই বড্ড দেরী হয়ে গেছে উঠ্তে! বন্ধু কিছু মনে না কল্লে আমি দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরী হতে পারি।" এই বলে আমি বন্ধুর প্রতি চাইলুম তাঁর অনুমোদনের অপেক্ষায়!

"আচ্ছা, আমি তাহলে নিজের কক্ষে বসে অপেক্ষা করি" বলে সোডি চলে গেলেন। কথামত বেশভূষা করে বের হতে, দশ মিনিটের বেশী আমার লাগে নি, এটা সত্যি কথা!

বন্ধু ও আমি দুজনে গিয়ে প্রথমেই আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত রেস্তর াঁয় প্রাতরাশ শেষ কল্লুম; পরিজ, টোষ্ট্ ও চা দিয়ে! নিরামিষাশী বন্ধুর খাতিরে, সসেজ্ কি বেকন্ ইচ্ছা সত্ত্বেও নিই নি। তার পরই দুজনে বের হলুম মার্সেলের এদিকে ওদিকে ঘুরে দেখতে। প্রথমেই কুক্ কোম্পানীতে কিছু কায ছিল। তাই শেষ করে, খানিকটা এদিক সেদিক ঘুরে আমরা সোজা উত্তর-মুখো চলে জুলস্ গেস্ড্ প্ল্যাসে পৌছলুম। এখানে একটি আর্ক ডি ট্রায়াম্ফ অথবা বিজয়-তোরণ স্থাপিত আছে, তাহা সাধারণতঃ পোর্ট ডি এইক্স্ নামে প্রসিদ্ধ। এই তোরণটির উচ্চতা প্রায় কুড়ি মিটার; এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। প্রসিদ্ধ ভাস্কর ডেভিড্ ডান্জার ও রেমি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এর সম্মুখস্থ স্তম্ভ সারি এবং প্রতিমূর্ত্তিগুলি দর্শনযোগ্য! সাধারণ-তন্ত্র ও নেপোলিয়নের সময়ের নানা ঘটনার বিবৃতি এর গায়ে প্রস্তরের দ্বারা খোদিত আছে। সেখান হতে খানিকটা পশ্চিম-দিকে গিয়ে আমরা সমুদ্রতীরে পৌছলুম। কাছেই মার্সেল বন্দরের জেটি! আমার ধারণা ছিল, নেপলেস্, অথবা কলম্বোর মত, চমৎকার সমুদ্রতীর দেখতে পাব, অন্ততঃ টুলোর

মত ত বটেই; কিন্তু, মার্সেলের সমুদ্রতীর দেখে, সে ধারণা দূর হয়ে গেল! কত নোংরা অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন যে তা', না দেখলে ধারণাই কর্ত্তে পার্ত্তাম না। এ-রকম নোংরা সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথ ধরে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল, যেন একটা জেলেপাড়া দিয়ে চলেছি, কে বলবে যে এটা ফরাসীদেশ। এত সুবিখ্যাত বন্দর মার্সেল! এ-রকম চলতে চলতে আমরা সেণ্ট্রাল কমিসারিয়েট পর্য্যন্ত গিয়ে যখন এপ্রিল মাসের প্রখর সূর্য্যতেজ অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন হোটেলে ফিরে এলুম। প্রখর রবিকরে ঘর্ম্মাক্ত শরীরের ক্লান্তি দূর হতে এক ঘণ্টারও উপর লাগলো। ডাক্তার সোডি স্নান না করে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন, আমি কিন্তু, সেদিন স্নান না করে থাকতে পারিনি। দুপুর বেলা "লাঞ্চ"এর জন্য আবার বেরোতে হয়েছিল, কিন্তু খাওয়ার পর আবার হোটেলে ফিরে এসে একেবারে শুয়ে পড়লুম।

অপরাহ্ন প্রায় সাড়ে তিনটার সময়, আবার যখন বেরোতে চাইলুম, তখন, সহজে আয়াসপ্রিয় বন্ধু কিছুতেই বের হতে চাইলেন না, তখন অগত্যা একাই বের হতে হলো। আমি হোটেল হতে বের হয়ে, সোজাসুজি পশ্চিমমুখো গিয়ে মার্সেলের সুপ্রসিদ্ধ ট্রান্সপোর্ট সেতুর নিকটে উপস্থিত হলুম। পুরাতন মার্সেল বন্দরের এই সেতুটি একটি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। একটা গোল সিঁড়ী দিয়ে উপরের প্ল্যাটফর্ম্মে উঠ্‌তে হয়, অথবা লিফ্‌টেও উঠা যায়। এর স্তম্ভগুলি প্রত্যেকটি প্রায় ৮৬ মিটার উঁচু এবং সেতুটি প্রায় ২৬৫ মিটার লম্বা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, আর্ণোডিন এই সেতু নির্ম্মাণ করে যশস্বী হন। পুরাতন বন্দরের একদিক হতে অন্যদিকে লোক বহনের জন্য ইলেকট্রিক-ট্রাম সেতু দিয়ে চলাচল করে।

সেতুর কাছে দাঁড়িয়েই অদূরে ডুমার কাউণ্ট ডি মণ্টিক্রিষ্টো'তে বর্ণিত, 'সেটু ডি'ফ' দেখতে পেলুম। এই স্থানটি দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন হতে মনে মনে পোষণ করে এসেছি। তাই ২৫ ফ্রাঙ্ক দিয়ে, আর একদল লোকের সঙ্গে, সেটুতে যাওয়ার খেয়া নৌকায় চড়লুম। সেটু একটা ছোট-খাটো দুর্গবিশেষ! ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে ইহা স্পেনিয়ার্ডদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ফ্রান্সিস্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পরে এখানে রাজনৈতিক বন্দীদের আবদ্ধ করে রাখা হতো! সুবিশাল প্রাচীর-ঘেরা, ভূমিগর্ভস্থ, অসংখ্য কক্ষ, ডুমা বর্ণিত রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের প্রত্যেকটি ঘটনা, সজীব ভাবে মনে করিয়ে দেয়। ঐ স্থানের রক্ষকটি, আমাদের অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন কক্ষ হতে কক্ষান্তরে, স্তিমিত আলোকের সাহায্যে নিয়ে গিয়ে, তার নানা চমকপ্রদ কাহিনী বলে যাচ্ছিল!

সেটু ডি'ফ—মার্সেল

সেটু ডি'ফ হতে ফিরে ওপারে আসাতেই ছ'টা বেজে গেল। ফিরে এসে দেখি কথামত, বন্ধু তার বড় পাগড়ীটা মাথায়, অত্যন্ত জমকালো ভাবে ট্রান্সপোর্ট ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, আর একদল লোক, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা ও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাঁর প্রতি সবিস্ময়ে চেয়ে আছে, আর শিখ বন্ধু অল্প অল্প হাসছেন। আমাকে ফিরতে দেখে, তিনি যেন অত্যন্ত সাহস পেলেন এবং সম্মিলিত জনতার প্রতি একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সদর্পে আমার সঙ্গে চলতে আরম্ভ কল্লেন। আমরা

ধীর পাদবিক্ষেপে ফেরো পার্কের দিকে রওয়ানা হলুম। ওখানে পৌছুতে পৌছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল! পুরাতন বন্দরের প্রবেশ-পথে একটি সঙ্কীর্ণ অন্তরীপের উপর মার্সেলের এই সুপ্রসিদ্ধ উদ্যানটি স্থাপিত এবং তাতে নানা প্রকারের তরু লতাপাতা দেখতে পাওয়া যায়! প্রত্যহই মার্সেলের অনেক অধিবাসী সেখানে প্রাতে ও অপরাহ্নে ভ্রমণের জন্য আসেন। এখানে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা আছে। ১৮৫৮ ইংরেজীতে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহা নির্ম্মাণ করান ও সাম্রাজ্ঞীকে উপহার দেন। এখন তাতে ফার্ম্মেসী ও মেডিসিনের ইস্কুল বসে। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ভার্দিলান এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, "হারাণো রতন" খুঁজতে আমাকেও যেতে হলো। অনেক অলিগলি ঘুরে, অনেক আকাশ পাতাল ভেবে, অনেক লোককে জিজ্ঞেস করে, অনেকটা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে আমরা যখন এসে গন্তব্য স্থানে পৌছলুম, তখন রাত দশটার কম নয়। সুতরাং এই এ্যাড্‌ভেঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী ফল, কায়িক পরিশ্রম, মানসিক ক্লান্তি ও ঔদরিক ক্ষুধা সকলেরই একসঙ্গে সমাবেশ হয়েছিল। কাজেই যে পর্য্যন্ত না, ডাল ভাত সহকারে উদরপূর্ণ করে আহার ও জলপান করা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত শান্ত হতে পারিনি। অনেকদিন পরে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য ডাল ও ভাত পাওয়াতে, বন্ধুকে
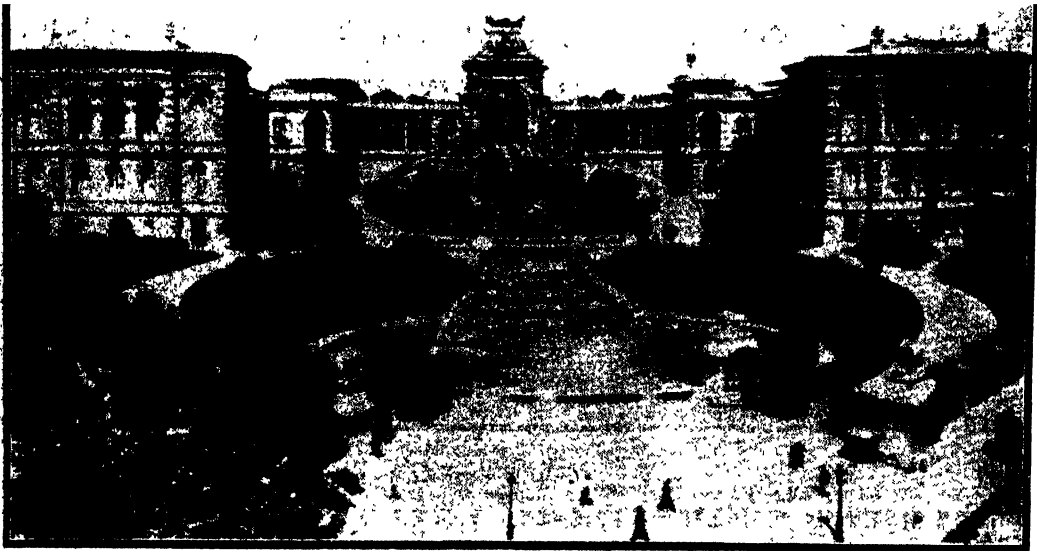
প্যালে ডি লংচ্যাম্প—মার্সেল

বাস্তবিকই এই প্রতিমূর্ত্তির মুখাবয়বের মত এত বিমর্ষ ও বিষাদাচ্ছন্ন ভাব, কোন পাথরের মূর্ত্তির মুখে আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। মনুমেণ্টটির কাছে দাঁড়িয়ে, সেই নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, উপরে অসংখ্য তারকাখচিত নীলাকাশ ও নিম্নে পুঞ্জে পুঞ্জে দীপমালা শোভিত সমুদ্র-তীরের নৈসর্গিক দৃশ্য যা' দেখেছি, তা' চিরজীবন মনে থাকবে।

প্রায় আটটা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলুম। তারপরই সোডি বল্লেন যে, তিনি রাত্রিতে নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ব্ব-পরিচিত সিংহল দেশীয় হোটেলটি বের করবেন। প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিলুম। সে রাত্রিতে হোটেলে ফিরতে (অবশ্য হোটেল-ওয়ালা ভদ্রলোকটির নির্দ্দেশ মত) রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা হয়েছিল!

পরদিন ভোরবেলা, প্রাতরাশ শেষ করে, প্রথমেই গেলুম আবার কুক্ কোম্পানীর বাড়ীতে, কখন জাহাজ এসে বন্দরে পৌছবে, এই খবর জানতে। বেলা দুটায় জাহাজ এসে মার্সেলে পৌছবে শুনে মনটা অত্যন্ত আশ্বস্ত হ'ল! আর কয় ঘণ্টা পরেই স্বদেশগামী জাহাজে চড়বো এই আশায় মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে উঠলো! তবু সময় নষ্ট করার ইচ্ছা ছিল না মোটেই। তাই ট্রামে

করে, তাড়াতাড়ি মার্সেলের দ্রষ্টব্য অন্তান্ত যতদূর সম্ভব দেখা যায়, তারই জন্ত রওয়ানা হলুম বন্ধু দুজনের সঙ্গে।

প্রথমেই গেলুম টাউনহলে। পুরাতন বন্দরটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, টাউনহলের সম্মুখ ভাগটি খুবই চমৎকার দেখায়, এবং এককালে সমসাময়িক স্থাপত্য-কলায় তা' একটি নিদর্শন ছিল। এই হলটি ১৬৮৯ ইংরেজীতে নির্ম্মিত হয় এবং পুরাতন মার্সেলের কেন্দ্রস্থলে একটি অত্যন্ত সুদৃশ্য প্রাসাদোপম ভবন। এর আশে-পাশে আরো অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে পেলুম, তার মধ্যে মেইজোঁ ডায়ামাঁটি, হোটেলে ডিউ ও ভিলেহুভ প্লেশ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত স্থানটিতে কাউণ্ট ভিলেহুভের স্মৃতিসৌধ আছে।

এর পরই আমরা মার্সেলের অতি প্রসিদ্ধ কেথিড্রেলটি দেখতে গেলুম। ষোড়শ শতাব্দী হতে মার্সেলে যতগুলি অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়েছে, এইটিই সবচেয়ে সুন্দর। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স লুই নেপোলিয়ন এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। কেথিড্রেলটি রোমান বিজেনটাইন ষ্টাইলে নির্ম্মিত, এবং প্রায় বারো হাজার লোকের জন্তে ভিতরে স্থান আছে। সম্মুখস্থ সপ্রশস্ত বারান্দা হতে অদূরবর্ত্তী সমুদ্র-তীরের ডক্ ও জাহাজগুলির স্থানকে অতি চমৎকার দেখায়।

অতঃপর আমরা পুরাতন বন্দরের প্রবেশ-দ্বারে-স্থিত সেণ্টজিন ফোর্ট দেখতে গেলুম। দ্বাদশ শতাব্দীতে, খৃষ্টের জন্মস্থানের তীর্থযাত্রীদের একটি বিশ্রামগৃহ ছিল; ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ লুই তা' ভেঙে তার উপর এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করেন। যদিও আধুনিক দুর্গ হিসাবে ইহার মূল্য বেশী নয়, তবুও মার্সেল হয়ে যে সমস্ত সিপাহীরা অন্তত্র যায়, তাদের বাসের জন্ত এই দুর্গটি ব্যবহৃত হয় বলে শুনলুম।

এর পরই আমাদের গন্তব্যস্থল হ'ল মার্সেলের সুবিখ্যাত স্মৃতিসৌধ, লংচ্যাম্প প্রাসাদ। এটি, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এর অভ্যন্তরে কটি মিউজিয়ম আছে; তার মধ্যে, চিত্র, শিল্প, প্রাণী ও ধাতুবিভাগ প্রসিদ্ধ! প্রাসাদটির পশ্চাতে চিড়িয়াখানা, কিন্তু তা' খুব বড় নয়। সম্মুখ হতে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাটির দৃশ্য বড়ই চমৎকার! মনে হয় যেন, কোন দক্ষ চিত্রকর, ফুলে ফলে, পাথরে ও জলে, নানা রং ফলিয়ে একখানা মনোমুগ্ধকর চিত্র এঁকে রেখেছে। আমাদের সময় বড় কম ছিল, তাই দুঃখ হয়, সেদিন বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে, এর শোভা উপভোগ করতে পারি নি। শুনলুম মার্সেলে, পুরাতন মিউজিয়ম, বোরলি মিউজিয়ম প্রভৃতি অনেক-গুলি মিউজিয়ম আছে; কিন্তু সময়াভাবে আমাদের সেগুলি দেখা ঘটে উঠে নি!

প্যালে ডি জাষ্টিস্—মার্সেল

তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে, তাই আমাদের ফিরতে হলো তাড়াতাড়ি করে। ফিরবার পথেই, হোটেলের কাছে, প্রকাণ্ড প্যালে ডি জ্যাষ্টিস্ দেখতে পেলুম। তা' অনেকটা আমাদের কলিকাতার সিনেট হাউসের অনুরূপ। বাহির হতে দেখে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না; শুধু সম্মুখে একটি বাগান ও তার মধ্যে বেরিয়ারের মূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য।

হোটেলে ফিরে, আমরা যতদূর সম্ভব শীগ্‌গির স্নানাহারের পালা শেষ করে, লগেজগুলি বেঁধে তৈরী হলুম। দুখানা ডেক্-চেয়ার সস্তা দরে কিনে নিলুম; কারণ, বিলাত-যাত্রার সময় তারজন্ত বেশ কিছু বেশ

পেতে হয়েছিল। আমাদের জাহাজ "ব্রিটোনিয়া" সময়ের একঘণ্টা আগেই এসে মার্সেলে পৌঁছেছিল; তাই বেলা দেড়টাতেই, জাহাজে এসে উঠ্‌লুম! প্রায় দুঘণ্টা পরেই যখন আস্তে আস্তে জাহাজ নোঙর তুললে, তখন অদূরবর্ত্তী মার্সেল বন্দরের পানে চেয়ে, জাহাজের মৃদু গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউএর তালে তালে, হৃদয় নেচে উঠ্‌লো! এতদিন যে শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলুম, আজ সেইদিন এসেছে! আমার মন আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে গিয়ে পৌঁছেছিল আমার স্বদেশে প্রিয়জনদের নিকট, শুধু শরীর জাহাজ দেশে গিয়ে পোঁছবার আশায় অপেক্ষা কচ্ছিল! কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও আমার চোখছটি নিজের অলক্ষ্যে সজল হয়ে উঠেছিল!—দেশে ফিরে গিয়ে আমার প্রিয়তম পূজ্যপাদ পিতামহকে আর দেখতে পাব না, বোধ করি এই কথাটিই, কাঁটার মত আমার বুকে বিঁধছিলো!

চন্দ্রগোমী

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

প্রাচীন বাঙ্গালায় যে সমস্ত মনীষী কীর্ত্তিমান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহাদের লইয়া আমরা গর্ব্ব করি,—যাঁহাদের গৌরব-গাথায় কৃতার্থম্মন্ত হই—চন্দ্রগোমী তাঁহাদের অন্যতম। কেবল বাঙ্গালায় নয়, একদা তাঁহার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক যশের সৌরভ সমগ্র জম্বুদ্বীপ-ময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিত[১]। তিনি ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ, কবি, নাট্যকার, নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধতন্ত্রের একজন উপদেষ্টা ও লেখক। তা ছাড়া, তিনি জ্যোতিষ, সঙ্গীত, সুকুমার-কলা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন[২]। এক জীবনে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা বড় সহজ কথা নয়।

তিব্বতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার ত্তেঙ্গুরে চন্দ্রগোমীর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ রহিয়াছে। 'আর্য্যতারাদেবী স্তোত্র-মুক্তিকামালা' নামে যে বইখানি তিনি লিখিয়াছিলেন, সেখানির অনুবাদও ত্তেঙ্গুরে আছে। ইহাতে দেখা গেল, তাঁহার এক নামান্তর ছিল 'অমরচন্দ্র'[৩]। মনে হইতেছে, ইহাই ছিল তাঁহার আদি ও প্রকৃত নাম। বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়াও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার উপাধি ছিল 'গোমিন্'[৪]। গোমিন্ উপাধিধারী আর একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ নবম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রদেশে গিয়াছিলেন, এ কথা কান্‌হেরিতে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে[৫]।

চন্দ্রগোমীর বাড়ী উত্তর-বঙ্গে, বরেন্দ্রে, রাজসাহী অঞ্চলে। ইহা কেবল তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে'[৬]। এবং 'প্যাগ্-সাম্-জন্-জ্যাঙ্গে'[৭] লিখিত আছে তাহা নয়, 'মনোহর-কল্প' নামে তিনি নিজে যে লোকনাথ-স্তোত্র[৮] লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও স্পষ্ট লেখা আছে। তিনি জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় বংশে, কিন্তু পরে বৌদ্ধাচার্য্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্ম্ম পিটক অধ্যয়ন করিয়া নৈয়ায়িক বিদ্যাধরাচার্য্য অশোক কর্ত্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণের মতে, চতুর্থ ধ্যানী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু চতুর্থ বলিয়া অবলোকিতেশ্বরের সম্মান অন্য কোন দেবতা হইতে ন্যূন নয়। পরন্তু মহাযানপন্থিগণের ইনিই সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতা। ইনি অনন্ত করুণাময় এবং শক্তি বা তেজের প্রতিমূর্ত্তি। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাঁহাকে বৌদ্ধেরা 'চতুর্থ জগৎ' বলিয়া অভিহিত করেন, ইনি তাহারই সৃষ্টিকর্ত্তা; এ যে বর্ত্তমান কল্প, ভদ্রকল্প, ইনি তাহারই অধীশ্বর; আর এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম, যতদিন পর্য্যন্ত না মৈত্রেয়-বুদ্ধ তুষিত-স্বর্গ হইতে মানুষী-বুদ্ধ রূপে জগতে অবতীর্ণ হন, ততদিন ধরিয়া তিনি এই ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তারূপে অধিষ্ঠান করিতে থাকিবেন। যখন নির্ব্বাণলাভের সময় আসিয়াছিল, তখন এই পরম কারুণিক দেবতাই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, যতদিন না সর্ব্বভূতের বোধিজ্ঞান লাভ হয়, ততদিন আমি নির্ব্বাণ চাইনা। সেই অবধি সকল প্রাণীর মধ্যে তিনি দিব্যজ্ঞান বিতরণ করিতে প্রয়াসী। এই সকল

(১) J. A. S. B., 1908, Vol. IV. N. S.. pp. 594-95.

(২) Indian Logic, Mediæval School, S. C. Vidyabhusana, Calcutta, 1909, p. 121.

(৩) Catalogue dù Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, par P. Cordier, Troisieme partie, p. 185.

(৪) Ind. Ant., 1884, Vol. XIII, p, 135, note 16.

(৫) Ibid, p. 135.

(৬) Geschiste des Buddhismus, Von Schiefner, pp, 145-46.

(৭) Pag-Sam-Jon-Zang ed S. C, Das. Index, p. xci.

(৮) Cordier op. cit, Deuxieme partie, p. 302.

কারণে বৌদ্ধজগতে ইঁহার প্রতিপত্তির সীমা নাই। এই অবলোকিতেশ্বরের শক্তি হইতেছেন আর্য্যতারা। তারা তারিণী, ত্রাণকর্ত্রী, তিনি ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করেন। চন্দ্রগোমী এই তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পরম ভক্ত ছিলেন ও ইঁহাদের উদ্দেশ্যে কতগুলি স্তব স্তোত্র তিনি লেখেন।

গল্প আছে,—নালন্দার রাজার কন্যার সহিত চন্দ্রগোমীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। এই বিবাহে চন্দ্রগোমীর তেমন আপত্তির কারণ ছিলনা, কিন্তু যখন শুনিলেন রাজকুমারীর নামও তারা, তখন তিনি ত্রাসে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার উপাস্য দেবীর নাম যে মানবীর, তাহাকে বিবাহ করিতে চন্দ্রগোমীকে কিছুতেই রাজী করান গেলনা। এই প্রত্যাখ্যানে নালন্দাপতির সম্মানে আঘাত পড়ায়, বরেন্দ্রের রাজা চন্দ্রগোমীর উপর বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে একটা সিন্দুকের ভিতর ভরিয়া গঙ্গার ভাসাইয়া দিলেন। ভাসিতে ভাসিতে সেই সিন্দুক ঠেকিল গিয়া বরিশালে সমুদ্রের কাছে এক দ্বীপে। বেচারী চন্দ্রগোমী ততক্ষণ সিন্দুকের ভিতর বসিয়া বসিয়া তারাদেবীর নিকট একান্ত চিত্তে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। দেবীর কৃপায়, যাহা হউক, তিনি সিন্দুক হইতে মুক্ত হইলেন এবং ঐ দ্বীপে উঠিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার প্রস্তর-মূর্ত্তিও স্থাপন করিলেন। দ্বীপটায় প্রথমত: থাকিত কতকগুলি জেলে, কিন্তু পরে আরও অনেক জাতীয় লোক সে দ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল, এবং উহা ক্রমশঃ একটা বিরাট নগরীতে পরিণত হইয়া উঠিল। কিন্তু চন্দ্রগোমীর বাস হেতু দ্বীপটার নাম হইয়া গেল 'চন্দ্রদ্বীপ'[৯]।

চন্দ্রগোমীর গঙ্গায় ভাসিবার কথায় দীর্ঘতমা ঋষির উপাখ্যান মনে পড়ে। বৈশালী দেশে জ্যেষ্ঠ শরদ্বন্তের গৃহে অবস্থান কালে, অনুজ উতথ্যের পত্নীর প্রতি আসক্ত হওয়ায় দীর্ঘতমাকে একটা ভেলায় চড়াইয়া এমনি ভাবে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হয়। ভেলা যখন ভাসিতে ভাসিতে অঙ্গরাজ্যে (ভাগলপুরে) উপস্থিত হইল, তখন অঙ্গ-রাজ বলি তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন, এবং পরে বলির অনুরোধে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে ব্রাহ্মণ দীর্ঘতমা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পঞ্চ পুত্র উৎপাদন করেন।

পরলোকগত পার্জ্জিটার সাহেব[১০] প্রমুখ কাহারও কাহারও মতে, এই দীর্ঘতমার ভাসিবার কাহিনী নিছক কল্পনা নয়, কারণ বৈশালী হইতে অঙ্গদেশের দূরত্ব ন্যূনাধিক সত্তর মাইল,—তা এতটা পথ একটা ভেলায় চড়িয়া কেহ ভাসিয়া আসিতে পারে। দীর্ঘতমার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হইলে, চন্দ্রগোমীর কাহিনীও অবিশ্বাস্য মনে করিবার হেতু থাকেনা।

একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের নাম পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি ছিলেন। এক একবার মনে হয়, চন্দ্ররাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ঐ স্থানের নাম হইয়াছে চন্দ্রদ্বীপ। কিন্তু আশ্চর্য্য, তেঞ্জুরে 'শান্তিহোম' বলিয়া চন্দ্রগোমীর স্বীয় একখানি পুস্তকের অনুবাদ আছে, তাহাতে তাঁহাকে 'দ্বৈপ' বলিয়া অভিহিত দেখিতে পাই[১১]। কোনও একটা দ্বীপের সহিত তাঁহার পূর্ব্বেতিহাস জড়িত না থাকিলে তাঁহার নিজ গ্রন্থে এই বিশেষণের ব্যবহার থাকিতে পারেনা, ইহা বলা বাহুল্য। কে জানে, হয়ত উক্ত গল্পের মূলে কিছুটা সত্য ছিল, পরে লোকের মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া উহা উপরিউক্ত রূপ ধারণ করিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে হিন্দুরা অনুরূপ একটা গল্প রচনা করিয়াছিলেন—সেটা দেখা প্রয়োজন। চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে বিক্রমপুরের জনৈক ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবী ছিলেন ভগবতী। যথাকালে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক বালিকার পাণিপীড়ন করিবার পর শুনিলেন, পত্নীর নামও ভগবতী। তিনি ভাবিয়া পাইলেননা, কি করিয়া দেবীকেই বা স্ত্রীর নামে পূজা করা যায়, অথবা কি করিয়া স্ত্রীকেই বা দেবীর নামে আলিঙ্গন করা যায়। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, এ প্রাণ আর রাখিবনা। কিন্তু প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার যতগুলি সহজ পদ্ধতি নরলোকে জানা ছিল, তাহার কোনটাই বোধ করি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনঃপূত হয় নাই ; তাই তিনি ঠিক করিলেন, একখানি নৌকা করিয়া সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেওয়া যাক্, তাহা হইলে সাগর-গর্ভেই লীন। বিক্রমপুরের দক্ষিণে বাকি তখন অকুরন্ত বারিধি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক রাত্রি নৌকা বাহিয়া চলার পর দ্বিতীয় দিনের প্রভাতে দেখিতে পাইলেন, দূরে আর এক নৌকায় একটি জেলের মেয়ে, একলা। পরে বালিকার কথাবার্ত্তায় তিনি স্থির বুঝিয়া ফেলিলেন, এ যেমন তেমন বালিকা নয়, নিশ্চয়ই দেবী স্বয়ং, ছদ্মবেশে। ছদ্মবেশী দেবী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, প্রত্যেক নারীর মধ্যেই ভগবতীর অধিষ্ঠান আছে, প্রত্যেক নারীই তাঁহার শক্তি,— অতএব, দেবীর নামে কাহারও স্ত্রীর নাম হইলে কোনও হানি হয়না। ইহার পর বর প্রার্থনা ও প্রদানের পালা। দেবী বর দিলেন, যে স্থানে নৌকার উপর কথাবার্ত্তা হইলে, একদিন সে স্থানের জল শুকাইয়া গিয়া ডাঙ্গায় পরিণত হইবে, ব্রাহ্মণ হইবেন ইহার অধীশ্বর, আর ব্রাহ্মণের নামানুসারে সে জায়গার নাম হইবে 'চন্দ্রদ্বীপ'[১২]।

বলা বাহুল্য, বৌদ্ধদের দেখাদেখি, বা আরও স্পষ্ট ভাষায়—বিদ্বেষবশতঃ, বহু পরবর্ত্তী কালে হিন্দুরা এই গল্প তৈয়ারী করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে হিন্দু-প্রাধান্যের এক গৌরবময় যুগ। কোনও কোনও বিদেশী পর্য্যটকও এই সময়ের তত্রত্য সমৃদ্ধি সম্বন্ধে জলন্ত ভাষায় সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। এহেন চন্দ্রদ্বীপের নামোৎপত্তির সঙ্গে যে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম জড়িত, ইহা হিন্দুদের সহ্য হয় নাই। কাজেই 'চন্দ্রগোমী'র পরিবর্ত্তে 'চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী' এবং 'তারা'র স্থলে 'ভগবতী'র সৃষ্টি হইল।

(৯) Vidyabhusana op. cit., pp. 121-22.

(১০) Ancient Indian Historical Tradition, London, 1922, pp. 158-59.

(১১) Cordier op. cit. II. p. 362.

(১২) J. A. S. B., 1874, p. 205

চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীকে নায়ক করিয়া এই হিন্দু-সংস্করণ গল্পের আর একটা দিক আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে—দেবী ভগবতী এক দিন স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, সোন্দা নদীতে—যেখানে তাঁহার নৌকা বাঁধা থাকে—কতগুলি দেবমূর্ত্তি আছে,—সেগুলি উত্তোলন করিতে। প্রভাত হইলে, তিনি তাঁহার ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দে'কে আদেশ করিলেন, দে ডুব্, তোল্ মূর্ত্তি। দনুজমর্দ্দন দুইবার ডুবিয়া দুই প্রস্তর-মূর্ত্তি তুলিল। আর একবার ডুব দিলেই নাকি লক্ষ্মী-মূর্ত্তি পাওয়া যাইত, কিন্তু সেটা আর হইয়া উঠে নাই। যাহা হউক, চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন তাঁহার ভৃত্যকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিলেন, ঐ স্থানের জল শুকাইয়া গিয়া স্থল দেখা দিবে, তখন সে হইবে তাহার রাজা। কিন্তু ঐ স্থানের নামকরণটা যে তাঁহার নিজের নামানুসারে হইবে, এ প্রলোভনটা ব্রাহ্মণ ত্যাগ করিতে পারিলেননা। রাজা হইয়া দনুজমর্দ্দন তাঁহার প্রভুর ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া ঐ স্থানের নাম রাখিলেন 'চন্দ্রদ্বীপ'১৩।

চন্দ্রগোমীর গল্পে বলে, চন্দ্রদ্বীপে কিছুকাল বাস করার পরে, তিনি সেখান হইতে গেলেন সিংহলে। ফিরিবার পথে তিনি দক্ষিণ-ভারতে বররুচির বাড়ীতে পাণিনি ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্য দেখিতে পাইলেন। পড়িয়া দেখিলেন, উহাতে নাকি শুধুই শব্দাড়ম্বর, প্রকৃত পদার্থ কিছুই নাই। সুতরাং তিনি নিজে পাণিনির একখানা ভাষ্য লিখিলেন, তাহার নাম হইল 'চান্দ্র ব্যাকরণ'।

বাস্তবিক পক্ষে চন্দ্রগোমী তাঁহার ব্যাকরণখানা দাক্ষিণাত্যে বসিয়া লিখিয়াছিলেন কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণ যে পাণিনির ভাষ্য নয়, এ কথা না বলিলেও চলে। তবে তাঁহার ও পাণিনির ব্যাকরণে অনেক স্থলে সাদৃশ্য আছে,—তিনি পাণিনীর রীতি ও পদ্ধতির অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছেন। আবার উভয়ের মধ্যে অনৈক্যও আছে। জার্ম্মাণীর লিপ্‌জিগ্ (Leipzig) হইতে Dr. Bruno Liebich চান্দ্রব্যাকরণ ছাপিয়াছেন, উনাদি ও ধাতুপাঠ সহ। পাণিনির ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত, চন্দ্রের ব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে। কিন্তু যেমন পাণিনির, তেমন চন্দ্রের ব্যাকরণে, প্রত্যেক অধ্যায় চারিটি পাদে বিভক্ত। পাণিনির সূত্রসংখ্যা ৪,০০০, চন্দ্রের ৩, ১০০। গণনায় স্থির হইয়াছে, চন্দ্রের নিজস্ব মৌলিক সূত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৩৫। সূত্রপাঠে বৌদ্ধ চন্দ্রগোমী বৈদিক সূত্রগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাণিনীর প্রত্যাহার সূত্রের মধ্যে তিনি অনেকগুলি লইয়াছেন, এবং নিজেও কতকগুলি রচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ব্যাকরণে সংজ্ঞাগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করেন নাই, এজন্য তাঁহার ব্যাকরণের এক নাম হইয়া গেল 'অসংজ্ঞক ব্যাকরণ'। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ব্যাকরণে সংক্ষিপ্ততা সাধন করা, এবং তাহাতে তিনি প্রচুর সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ স্থলে একটা প্রবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে, "অর্দ্ধমাত্রা লাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ", অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রার লাঘব করিতে পারিলেও বৈয়াকরণরা পুত্রোৎসবের ন্যায় আনন্দলাভ করেন।

(১৩) Ibid, p. 206.

(১৪) Ind. Ant. Vol. XV., 1886, p. 184.

চান্দ্রব্যাকরণের জন্য উণাদিসূত্র ও ধাতুপাঠ চন্দ্রগোমী নিজে লিখিয়াছিলেন। উণাদি সূত্র তিনটি পাদে বিভক্ত, আর ধাতুপাঠ দশ অধ্যায়ে। চন্দ্রের ধাতুপাঠে কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ধাতু সন্নিবিষ্ট আছে। উণাদি প্রত্যয়গুলি তিনি অন্ত্যবর্ণানুসারে সাজাইয়াছেন, এবং তাঁহার উণাদিসূত্রের উপর তিনি নিজেই এক বৃত্তি লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া, তিনি একখানা 'লিঙ্গানুশাসন' ও আরও কতগুলি ছোট ছোট নিবন্ধ, যথা—'বর্ণসূত্র' ১৬ 'পরিভাষা-সূত্র' 'বিংশতি উপসর্গ বৃত্তি' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। তেঙ্গুরে 'চান্দ্রাধিকার সংগ্রহ' ও 'চন্দ্রগোমি-প্রণিধান' বলিয়া দুইখানা পুস্তকের অনুবাদ আছে।

চান্দ্র সূত্রপাঠের উপর বৃত্তি লিখিয়াছিলেন ধর্ম্মদাস,—বোধ হয় চন্দ্রেরই শিষ্য। ইহাতে 'গণপাঠ' সন্নিবিষ্ট আছে, আর এখানি অতি মূল্যবান পুস্তক। আচার্য্য ধর্ম্মপাল চন্দ্রের বর্ণসূত্রের উপর বৃত্তি লিখিয়াছিলেন। 'চান্দ্র বিভক্তি-কারিকা' লিখিয়াছিলেন ভিক্ষু হরিভদ্র। এই হরিভদ্র ত্রৈকূটক বিহারের হরিভদ্র হইতে পারেন, যিনি সম্রাট ধর্ম্মপালের কথায় 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক' লিখিয়া নাগার্জ্জুন ও মৈত্রেয়নাথের মতবাদের সমন্বয়সাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কায়স্থ চাকাদাস নামে জনৈক ব্যক্তি 'সম্বন্ধোদ্দেশ' বলিয়া ছয় অধ্যায়ে বা উদ্দেশে তিঙ্ন্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে এই বইয়ের একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিতে গ্রন্থকারের নাম আছে চর্চ্চাদাস, এবং ক্যাটালগে ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে, এখানি পাণিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় ১৮। স্বর্গীয় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে, চাকাদাস সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১২ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন১৯।

এতদ্ব্যতীত চান্দ্রব্যাকরণের উপরে আরও অনেকানেক টীকা-টিপ্পনী লেখা হইয়াছিল২০।

প্রায় ৬৬০ খৃষ্টাব্দে বামন ও জয়াদিত্য একত্রে 'কাশিকা-বৃত্তি' লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা চন্দ্রের ব্যাকরণ হইতে অনেক কিছু লইয়াছেন, এমন কি চন্দ্র যে সব নূতন সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি পর্য্যন্ত২১। * * অথচ কাশিকাবৃত্তিতে গ্রন্থকারদ্বয় চন্দ্রের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বামন যে পাণিনীর 'লিঙ্গানুশাসন' লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি চান্দ্র লিঙ্গানুশাসনের ঋণ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বৈয়াকরণ শাকটায়ন ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের

(১৫) J. B. B. R. A. S., Vol. XXIII 1909 p. 10?.

(১৬) Systems of Sanskrit Grammar, S. K. Belvalkar Poona 1915, p. 117.

(১৭) Ind. Ant. Vol, V., p. 30.

(১৮) Triennial Catalogue of MSS. Govt. Oriental Library. Madras, 1919-20 to 1921-22, Vol. IV., Part I., Sanskrit A p. 4555

(১৯) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩,১৩, পৃঃ ২৫৪।

(২০) Ind, Ant. Vol. XXV.. pp. 103-5.

(২১) Ibid, Vol. XV., p. 183.

(২২) Peterson's Third Report on the search of Sanskrit MSS., 1884-86, pp. 43 and 113.

(৮১৪-৮৭৮ খৃঃ) সমসাময়িক, তিনিও বহুলাংশে চন্দ্রের নিকট ঋণী। তিনিও বৈদিক সূত্রগুলি এবং পাণিনির অনেক সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র সূরি তাঁহার 'শব্দানুশাসনে' বহুবার চন্দ্রের ব্যাকরণ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সব উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, অন্যান্য বৈয়াকরণদিগের উপর চন্দ্রের ব্যাকরণ কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

জিনসেন নামক জৈন সূরি ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে 'হরিবংশ পুরাণ' রচনা করেন। এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তিনি যে সকল প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণদের নামোল্লেখ করিয়া নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চন্দ্রের নাম আছে। ১১৪০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান সূরি 'গণরত্নমহোদধি' লেখেন। ইহারও প্রারম্ভে চন্দ্রের প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করা হইয়াছে (শালাতুরীয়—শকটাঙ্গজ—চন্দ্রগোমি—দিগ্বস্ত্র—ভর্ত্তৃহরি—বামন—ভোজমুখ্যা.......দ্বিতীয় শ্লোক) ২৪। মুগ্ধবোধকার বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাঁহার 'কবিকল্পদ্রুমের' প্রারম্ভে যে অষ্ট-মহাশাব্দিকের নাম করিয়াছেন, চন্দ্র তন্মধ্যে অন্যতম।

ব্যাকরণ ব্যতীত চন্দ্রগোমী একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'লোকানন্দ'। এখানি পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ, এবং Memoirs of the Oriental Section of the Imperial Russian Archæological Society-র চতুর্থ ভাগে ছাপা হইয়াছে। চন্দ্রগোমী যে একখানি ধর্ম্মকাব্য লিখিয়াছিলেন, সেখানি 'শিষ্যলেখ'২৫। ইহাতে ১১৪টি শ্লোক আছে, কিন্তু এখানি চিঠির আকারে লেখা,—তাঁহার শিষ্য রত্নকীর্ত্তিকে সংসার বাসনা ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া। এই রত্নকীর্ত্তি একজন রাজপুত্র ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি নামে এক ভিক্ষু শিষ্যলেখের বৃত্তি লিখিয়াছিলেন; ইনি ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে নেপালের রাজা শঙ্করদেবের রাজত্বকালে শান্তিদেব প্রণীত বোধিচর্য্যাবতারের পঞ্জিকা বা টীকা লেখেন২৬। চন্দ্রগোমীর ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থখানির নাম 'ন্যায়সিদ্ধালোক'২৭। এসব ব্যতীত, তেঙ্গুরের যতখানি ক্যাটালগ্ কর্দিয়ে (Cordier) সাহেব ছাপিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে চন্দ্রগোমীর লেখা নিম্নলিখিত পুস্তক বা স্তবস্তোত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়,—

দেশনাস্তব। তারাভট্টারিকাস্তব বলি বিধি। আর্য্যমঞ্জুশ্রীনাম সংগীতি টীকা, নামান্তর প্রকাশদীপ। আর্য্যামোঘপাশ পঞ্চদেব স্তোত্র। মনোহরকল্পনাম লোকনাথ স্তোত্র। মহাকারুণিক স্তোত্র। আর্য্য-মহাকারুণিক পরিদেবন স্তোত্র। আর্য্যাবলোকিতেশ্বর স্তোত্র। সিংহনাদ-সাধন। আর্য্যবজ্রবিদারণী-পিণ্ডীকৃত সাধন। হয়গ্রীব সাধন। আর্য্য সিতাতপত্রাপরাজিতানামোপায়িকা। আর্য্য-সিতাতপত্রাপরাজিতা বলি বিধি। আর্য্যতথাগতোষ্ণীষসিতাতপত্রাপরাজিতাপ্রত্যঙ্গিরানামধারণী সাধন। রক্ষাচক্র। আর্য্যতথাগতোষ্ণীষসিতাতপত্রানামধারণী বিধি। পশুমারীরক্ষাবিধি। শান্তিহোম। অভিচারকর্ম্মন। পুষ্টিবশিহোম। সিদ্ধি-সাধনানুসারেণ মৃতবৎসা চিকিৎসা। নিবরণলবাকবিধি। চৈত্য-সাধনবিধিক্রমনাম। ভগবত্যুষ্ণীষবিজয়াস্তোত্র। সিংহনাদসাধন। শ্রীজম্ভলসম্পসংক্ষিপ্তসাধন। হয়গ্রীবসাধন। অষ্টশতসাধন। আর্য্যুর্দ্ধ্বনী-তারাকল্প। শ্রীমহাতারাস্তোত্র। আর্য্যতারাস্তোত্রদ্বাদশগাথা। আর্য্য-তারাস্তোত্রবিশ্বকর্ম্মসাধন। আর্য্যতারাদেবীতোত্র, নামান্তর পুষ্পমালা। আর্য্যতারাদেবীস্তব। অষ্টভয়ত্রাতস্তোত্র। আর্য্যজম্ভলস্তোত্র। আর্য্য-তারাদেবীস্তোত্র নামান্তর মুক্তিকামালা। বোধিসত্ত্বসম্বরবিংশক।

গল্পে বলে, বররুচির বাড়ী বসিয়া ব্যাকরণখানা লেখার পর চন্দ্রগোমী গেলেন নালন্দায়। এখানে তাঁহার সহিত মধ্যমক-বৃত্তির প্রসিদ্ধ লেখক চন্দ্রকীর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ হইল। চন্দ্রগোমী ছিলেন আর্য্য অসঙ্গের যোগাচার মতানুবর্ত্তী, আর চন্দ্রকীর্ত্তি ছিলেন নাগার্জ্জুনের শূন্যবাদের অনুগামী। তাঁহাদের দুইজনের মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইল। চন্দ্রকীর্ত্তিও একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। চন্দ্রগোমীর ধারণা হইল চন্দ্রকীর্ত্তির ব্যাকরণখানি তাঁহার নিজের খানার অপেক্ষা সারবান হইয়াছে। এই কারণে তিনি অভিমান করিয়া এক কূপের মধ্যে তাঁহার ব্যাকরণখানি ফেলিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অবলোকিতেশ্বর ও তারা সশরীরে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া কহিলেন, চন্দ্রকীর্ত্তি অত্যন্ত অহঙ্কারী, আর তা ছাড়া তাঁহারই বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং উহা মানবের পক্ষে অধিকতর কল্যাণজনক হইবে। ইহা বলিয়া তাঁহারা বইখানি কূপ হইতে উঠাইয়া দিলেন। তখনই হইতে ঐ কূপের নাম হইয়া গেল 'চন্দ্রকূপ', আর তাহার জলপানের নিমিত্ত সে স্থানে লোকের হুড়াহুড়ি লাগিয়া গেল—ঐ জল পান করিলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য বৃদ্ধি পাইবে, এই বিশ্বাসে।

এই গল্পানুসারে চন্দ্রগোমী চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতিদ্বন্দী। কিন্তু তাঁহার শিষ্যলেখ অনুসারে তিনি চন্দ্রকীর্ত্তির ছাত্র ২৮। ইহা হইতে তাঁহার তারিখটা নির্ণয় করা যাইতে পারে। Prof Minayeff,—যিনি শিষ্যলেখ সম্পাদন করিয়াছেন,—তাঁহার মতে চন্দ্রগোমী চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ছিলেন। ডাঃ এস্. কে, বেল্ভাল্কর মহাশয় বলেন, তিনি ৪৭০ খৃঃাব্দে জীবিত ছিলেন, এবং এই অভিমতের সমর্থনে বল্লভাতের গুরু চন্দ্রাচার্য্যকে চন্দ্রগোমী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ২৯। কিন্তু চন্দ্রাচার্য্যের সহিত চন্দ্রগোমীর অনন্যতা প্রতিপাদনের নামসাদৃশ্য ভিন্ন অপর কোনও হেতু নাই; আর চীনা-পরিব্রাজক ইৎসিং-এর কথা সত্য হইলে, ভর্তৃহরি ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ভর্তৃহরির পরম-গুরু কখনও ৪৭০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকিতে পারেননা। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুমান

(২৩) Catalogue of Sanskrit and Prakrta MSS. in C. P. and Berar, Nagpur, 1926, Introduction p. XXII.

(২৪) Ed. Julius Eggeling, London, 1879.

(২৫) J. R. A. S. 1889, pp. 1133-35

(২৬) Bib. Ind. ed.

(২৭) Cordier op. cit. III, p. 450; Vidyabhusana, op. cit. p. 123.

(২৮) Cordier, op. cit., pp. 343 and 428.

(২৯) Systems of Sanskrit Grammar, pp. 58-59.

করিয়াছিলেন, চন্দ্রগোমী প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, কারণ তিব্বতীয় আখ্যায়িকায় তিনি রাজা হর্ষের পুত্র শীলের সমসাময়িক। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে, এই হর্ষ কান্যকুব্জের প্রসিদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন, যিনি ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কাজেই তাঁহার পুত্র শীলের সময় আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দ ৩০। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই মত গ্রাহ্য হইতে পারেনা, কারণ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর অর্জ্জুনাশ্বের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাঁহার বংশীয় কেহ রাজত্ব করেন নাই। তা ছাড়া, জয়াদিত্য ও বামন যখন চন্দ্রগোমীর নিকট ঋণী, তখন তাঁহাকে ৭০০ খৃষ্টাব্দে ঠেলিয়া লওয়া চলেনা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই শীল-রাজাকে, রঘোলি হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উল্লিখিত সৌবর্দ্ধন-পুত্র পৌণ্ড্রজিৎ শৈলোদ্ভব রাজকুমার বলিয়া অনুমান করেন ৩১। পৌণ্ড্র-বিজয়ী শৈলবংশীয় এই রাজকুমারের নাম অজ্ঞাত, এবং বসুজ মহাশয় নিজেই বলেন, "সৌবর্দ্ধন-পুত্র গৌড় অধিকার করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়না,......তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহাকে তাঁহাদের অধীশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন, সেই শশাঙ্কদেবের বংশধর বা আত্মীয় কাহাকেও তাঁহারা গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন ৩২।" কিন্তু যে ব্যক্তি রাজাই হন নাই, তিনি কেন শীল নামক রাজার সহিত অভিন্ন হইবেন, তাহা বুঝা গেলনা; এবং শৈল নামক বংশে উৎপন্ন সৌবর্দ্ধনের অজ্ঞাত-নামা পুত্র কেন উপাখ্যান-বর্ণিত হর্ষের পুত্র শীল হইতে যাইবেন, তাহার কারণও বোধ করি 'শৈল' ও 'শীল' এই দুই নামের সাদৃশ্য !!

চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার মধ্যমিকা-বৃত্তিতে ভাববিবেকের নামোল্লেখ করিয়াছেন ৩৩। ভাব-বিবেক নালন্দার আচার্য্য ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ৩৪, আর ধর্ম্মপালের সময় মোটামুটি হিসাবে ৬০০—৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। চন্দ্রগোমী চন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য হইলে, চন্দ্রগোমী খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন, মনে করিতে হয়। তাঁহাকে চন্দ্রকীর্ত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ধরিয়া লইয়া কার্ণ সাহেব তাঁহার সময় ৬৩০ হইতে ৬৪০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ৩৫।

তিব্বতের একজন মস্ত রাজা ছিলেন স্রং-সাং-গাং-পো, তাঁহাকে তিব্বতের সার্লামেন্ (Charlemagne) বলা হয় ৩৬। বস্তুতঃ তিব্বতের যত কিছু উন্নতি, তাহা একরকম তাঁহার সময় হইতেই প্রারব্ধ হইয়াছিল।

তিনি অমুর পুত্র সাম্-ভোটকে ষোলজন সঙ্গীসহ ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,—উদ্দেশ্য তাঁহারা ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান অপহরণ করিয়া স্বদেশে শিক্ষা বিস্তার করিবেন। তিব্বতীয় এক ঐতিহ্য অনুসারে সাম্-ভোট ও তাঁহার সঙ্গিগণ পণ্ডিত দেববিদ্ সিংহের নিকট কলাপ, চান্দ্র ও সারস্বত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ৩৭। স্রং-সাং-গাং-পো'র রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চীনা ইতিবৃত্ত অনুসারে, তিনি আনুমানিক ৬০০ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাই এখন ঐতিহাসিক সমাজে গৃহীত হইতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে সাম্ ভোটের চান্দ্র ব্যাকরণ পাঠের কথা অস্বীকার করিতে হয়।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের ব্যাকরণের পঠন-পাঠনও অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশে কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বৃহস্পতি রায়মুকুট তাঁহার অমর-কোষের টীকা 'পদচন্দ্রিকা'য় বহু স্থানে চন্দ্রগোমীর মতামত উল্লেখ করিয়াছেন ৩৮। ষোড়শ শতাব্দীতেও জয়ানন্দ বন্দ্যঘটীয় তাঁহার 'চৈতন্য-মঙ্গলে' বলেন, চৈতন্যদেব চান্দ্র-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলের ("চান্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে") ৩৯। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীতেও, দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টিকায় চান্দ্র-মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ৪০। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চন্দ্রের স্মৃতি তাঁহার স্বদেশে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বতের তারনাথ তাঁহার 'বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে' বলিয়াছেন, "চন্দ্রগোমীর সময় হইতে অদ্যাবধি তাঁহার ব্যাকরণ তিব্বতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইতেছে, এবং কি সদ্ধর্ম্মী কি অপধর্ম্মিগণ সকলেই উহা পাঠ করে! কিন্তু সমন্তভদ্র (চন্দ্রকীর্ত্তি) যে ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাহা অত্যল্প দিনের মধ্যেই অপ্রচলিত হইয়া পড়ে, এবং অধুনা উহার একখণ্ডও বিদ্যমান আছে কিনা, তাহা অজ্ঞাত ৪১।"

দক্ষিণে, চন্দ্রের ব্যাকরণ সিংহলেও সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সে আদর তথায় অব্যাহত ছিল। সিংহলরাজ প্রথম পরাক্রমবাহুর সময়ে (১১৫৩ খৃঃ) 'দাঠা বংসো'—প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দাঠা বংসোর অন্তে বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগোমী-শব্দ-শাস্ত্রের বিবৃতি পঞ্জিকায় তিনি 'রত্নমতী' নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন। প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দে কশ্যপ-নামক জনৈক সিংহলী পণ্ডিত চান্দ্রমতের উপর ভিত্তি করিয়া 'বালাববোধন' নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ লেখেন ৪২। ঐ সময় হইতেই আদি চান্দ্রব্যাকরণের ব্যবহার সিংহলে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল, আর কশ্যপের বই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতে লাগিল। কিন্তু তিব্বত আজিও চন্দ্রগোমীকে ভুলিতে পারে নাই। আজিও তিব্বতীয়গণ চান্দ্রব্যাকরণ পাঠ করিয়া বঙ্গমাতার এই সুসন্তানকে দিনে দিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছে, বাঙ্গালীকে দিনে দিনে গৌরব-প্রকাশের অধিকার প্রদান করিতেছে।

(৩০) Vidyabhusana. op. cit,, p. 123.

(৩১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২৬৩।

(৩২) ঐ, পৃঃ ৭৯।

(৩৩) Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS. in the University Library Cambridge, Cecil Bendall, 1883. p. 115.

(৩৪) Watters, Yuang Chwang, II p. 122.

(৩৫) Kern, Manual of Buddhism, 1896, p. 130.

(৩৬) Sylvain Levi, Le Nepal, II, Paris 1905, p. 148.

(৩৭) J. A. S. B., 1881, p. 219.

(৩৮) Cf. Report on the Search for Sanskrit MSS. in the Bombay Presidency, for 1883-84, R. G. Bhandarkar pp. 62, 468 and 474.

(৩৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, নদীয়া খণ্ড, পৃঃ ১৮।

(৪০) রজনীকান্ত গুপ্ত সং, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৯০ ইত্যাদি।

(৪১) Schiefner p. 155.

(৪২) Published, Colombo, 1895.

অতি-বোগাস

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্

(৭)

আমাদের যুগাবতার বলেছিলেন যে মানুষ মানের জন্য, অর্থের জন্য, পৃথিবীর ইষ্টের জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, তেমন ব্যাকুল ভগবানের জন্য হলে তিনি দেখা দেন। আপাততঃ আমার উচ্চাভিলাষ ছিল না যে তিনি সশরীরে আমাকে দেখা দেন, তবে প্রাণে সাধ ছিল যে ধনী মক্কেলের রূপ ধারণ ক'রে তিনি ভ্রাতৃ-বিরোধজনিত একটি বাটোয়ারার মামলা আমার হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু তার ছিল মাত্র সাধ, আসল ব্যাকুলতা ছিল পরেশের আইবুড়া নাম খণ্ডাবার। কদিন আর অন্য চিন্তা ছিল না। কর্তৃপক্ষের উপর আমাদের প্যাঁচগুলা তেমন কার্য্যকরী হ'চ্ছিল না। চেষ্টা তো করে যেতে হবে—তারপর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে কর্ম্মফল নিবেদন।

সকালে যখন পরেশের পিতা রামলালবাবু ডেকে পাঠালেন তখন আশা জেগে উঠেছিল ক্লান্ত মনে। কিন্তু আলাপের পর—যাক্ সে কথা বলছি।

দুই ভবিষ্যত বৈবাহিক প্রশান্ত-মনে তাম্রকূট সেবন কর্‌ছিলেন। হাসি-মুখে তাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা কর্ল্লেন। ওকালতি প্রতিযোগিতার কঠোরতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

রামলালবাবু বল্লেন—তুমিও কি ঐ ঘানি কোম্পানীর মধ্যে আছ নাকি?

ঘানি কোম্পানী? ওঃ! দি বেঙ্গল সর্ষপসার কোং লিমিটেড! না আমি নাই।

পরেশ কি সত্যই শিঙ্গাপুর যাচ্চে নাকি?

আজ্ঞে তার যাওয়া না-যাওয়া আপনার অনুমতির উপর নির্ভর করে। ওর প্রকাণ্ড রকম কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, আর বাড়ীর ওপর টান।

হ্যাঁ তা নিশ্চয়।

আমি টোপ গিল্‌লাম। কে জানে কেঁচোয় ঢাকা বড়শী আছে? বল্লাম—ওঃ ভীষণ। বোনটিকে এত ভালবাসে যে তার বিবাহের পর ঘরের নির্জ্জনতা তাকে গ্রাস করবে এই আতঙ্কে সে অস্থির।

স্নেহের ভগ্নি!—মুরারিবাবু বল্লেন।

সে আপনার সেবা কর্ত্তে চলে যাবে। কিন্তু মনোরমার পেট্-টিপলে চোখ-ওল্টানো পুতুল, তার পুতুলের বেনারসী খাট। তার মোজা-বোনবার কাটা তার ছবি আঁকবার তুলি—

তার কবিতার খাতা?—রায় বাহাদুরের উক্তি।

জানি না সে কবিতা লেখে কিনা। ছোট বোন্ সে তো আর আমাদের দেখাবে না। উভয়ের অধরোষ্ঠের সন্ধিস্থল, চক্ষের কোন্ প্রভৃতি লক্ষ্য কর্ল্লাম। সন্দেহ ভিত্তিহীন ব'লে মনে হ'ল। সেকালের লোক, আমাদের উপর-চাল যে এঁরা দেবেন এমন মনে হল না।

রামলালবাবু বল্লেন—হ্যাঁ বাবা বুঝেছি তুমি যা বল্‌ছ। কিন্তু এর উপায় কি? আমিও তো স্বর্গরাণীকে ছেড়ে থাকবো।

আমি কপাল কুঁচকে, মাথায় চুলের ভিতর হাত চালিয়ে দিয়ে যেন তখনি প্রেরণা এলো, এমনি ভান ক'রে, বল্লাম—আমার মনে হচ্চে উপায় যেন আছে। পায়রা যখন ওড়ে তার ডানা কেটে দিতে হয়। কুকুর বেশী পোষা হয় তার ল্যাজ কেটে দিলে। ওর যদি—যদি—

ডানা কিম্বা ল্যাজ। কিন্তু দুটোর কোনোটাই যে আছে তা মনে হয় না। বাপের কথা স্বতন্ত্র। কি বলেন বেহাই মশায়?—বলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লেন রায় বাহাদুর। সেকেলে তৃতীয় শ্রেণীর রসিকতায় গাঙ্গুলী মহাশয়ও বালকের মত হাসলেন। দিব্য গৌরকান্তি, নগ্নদেহে একগোছা ধপ্‌ধপে যজ্ঞোপবীত—হাস্য-মুখ রামলালবাবু পরেশ অপেক্ষা অনেক সুপুরুষ। আমি সংযমের ভান দেখিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম। বল্লাম

—মানে হচ্চে পা'য় শিকল বাঁধা অর্থাৎ কিনা মোটের উপর—

মুরারীবাবু বল্লেন—বিবাহ।

তখন তার বিবাহের কথার আলোচনা হ'তে লাগ্‌লো। দেখলাম কর্ত্তা ঘরে একটি তরুণী পুত্র-বধূর শোভা সন্দর্শনে একেবারে বীতরাগ নন। কিন্তু কি রকম স্ত্রী-রত্ন পরেশের পক্ষে সুশোভন হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন হল।

আমি বল্লাম—অর্থাৎ এমন স্ত্রী হয় যে তার ভগ্নির সংবাদ সে তার মারফত পায়। তার ভগ্নির ওপর পরেশের স্নেহ অটুট রাখে, এই রকম হ'লে সুবিধা হয়। অবশ্য আমি নিজের মন থেকে বল্‌ছি, পরেশের মনোভাব বুঝিনি।

তাঁরা পরস্পরের দিকে চাহিলেন। হেঁয়ালী-পূর্ণ চাহনী—প্রেরণার আবাহন গোছ। আমি উৎসাহিত হ'য়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বল্লাম—রায় বাহাদুর আপনার তো একটি মেয়ে আছে।

সে স্থলে বোমা পড়লে কি ফল হ'ত—প্রত্যক্ষ করলাম। দু'জনের চোখোচোখির সরলার্থ হৃদয়ঙ্গম কর্ল্লাম।

একজন বল্লেন—ওঃ!

অপরজন বল্লেন—হুঁ!

অর্থাৎ—তবে রে ইষ্টুপিডের দল—ভিতরে ভিতরে এই সব ষড়যন্ত্র। আ গ্যালো—বেয়াদব।

আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। সন্ধ্যার পর গিরিজা বল্লে—বাবা আজ চাঁপার কলিকে হেসে বল্‌ছিলেন তার সঙ্গে পরেশের বিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ তা আপনার ভগ্নি কি বল্লেন। বুক করছিল ধড়াস ধড়াস। মুখ যাচ্ছিল শুকিয়ে।

সে 'না রাম না গঙ্গা ব'লে ঠোঁট ফুলিয়ে চলে গেল। আমরা খুব হাসলাম। বাবা বল্লেন, পরেশ যদি একটা জ্যান্ত সিংহের ল্যাজ ধরে পাক্ দুই ঘুরিয়ে দিতে পারে তাহ'লে তার সঙ্গে বোনের বিয়ে হয়।

(৮)

আমার মনে যে পরিমাণে নিরাশা ঘনিয়ে আস্‌ছিল ঠিক সেই প[illegible]উৎসাহ দেখা দিয়েছিল পরেশের প্রাণে। একটা [illegible]গাস্ লোক এক কর্ম্মে মাসাবধি কাল মন-নিয়োগ কর্ত্তে পারে যখন, তখন বুঝ্‌তে হবে সত্যই প্রেম তাকে তপ্ত-কড়ায় গালিয়ে নূতন করে গড়্‌ছিল। কিন্তু লাঙ্গুল ধরে ঘোরালে না কামড়ে ঘুরতে সম্মত হবে এমন সিংহেরও তো সন্ধান পাওয়া গেল না। একখানা ভোজবাজীর পুস্তকে পড়েছিলাম হাতে ঘৃত-কুমারীর আঠা মেখে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে না। কিন্তু দাহিকা শক্তির সঙ্গে চালাকী ক'রে মুখে আগুনের ভাঁটা প্রবেশ করবার না ছিল তার ইচ্ছা, না ছিল আমাদের দুঃসাহস।

বীরেন্দ্র সাধুখাঁর সাধু বুদ্ধি নেহাৎ মন্দ নয়। সে বল্লে—একটা রাস্তার ইন্‌সিডেণ্ট থেকে কারও প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে পারলে বোধ হয় গুড্ ফ্রুট্ হ'তে পারে।

ক'দিন ধরে সবাই মিলে ভাব্‌তে লাগলাম এক্‌সিডেণ্ট থেকে বাঁচ্‌তে রাজি হবে কে? আমি বল্লাম—যদি তিন জন্ম কৌমার্য্য তোমার ভাগ্যে থাকে, আমি আমার দুর্ল্লভ জীবনকে অমন ভাবে শঙ্কটাপন্ন কর্ত্তে পার্ব্ব না।

শেষে সিদ্ধান্ত হল, বাসুদেব মুখুজ্যের শরণাপন্ন হওয়া। বাসুদেব জিম্‌নাষ্টিক কর্ত্ত, লোক ভাল, কেবল একটা মুদ্রা-দোষ ছিল তার—ঘড়ি মেলানো। পথে ঘাটে কোথাও একটা ঘড়ি দেখ্‌তে পেলেই হ'ল। অমনি বাসুদেব পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে নিজের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে পরের ঘড়ির সঙ্গে তাকে সম-সাময়িক করে দিত।

আমার ঘড়ির উপর বাসুদেবের দৃষ্টি পড়া মাত্র সে পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে মিলিয়ে করলে তিনটে দশ মিনিট—ছিল তিনটে—ঠিক সময়। যাক্।

পরেশ বল্লে—কসরত করা খুব ভাল। গায়ে জোর হয়—মনেরও জোর বাড়ে।

আরে বাঃ! গুণ্ডারা পাঁচ পয়সার জন্যে লোকের দেহটাকে করবে পিন-কুশান। বড় বড় ছুরি পুতে দেবে গায়ে।

হ্যাঁ। তা বটে! মানে হচ্চে জোয়ালো লোক মরতে ভয় পায় না।

বল কি? যার পেট-জোড়া পিলে সে মরতে ভয় পায় না, কারণ মৃত্যু তার দরজাগোড়ার অতিথি। যার দেহে বল আছে সে মরতে যাবে কেন? বালাই বাট্!

ভাব ও ভাষা

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আমি বল্লাম—মবুবে বলে কি লোকে ডন্ বট্‌কী করে, না ডাম্বেল ভাঁজে।

সে শিশুর মত হাস্‌লে। পরেশ হ'ল বিরক্ত, আর নিরাশ। আমি তাকে থামিয়ে বল্লাম—তবে বলতে হবে যে জীবন নশ্বর।

তা যখন মান্ধাতার আমল থেকে সবাই মরচে তখন জীবনকে আর চিরস্থায়ী কেমন ক'রে বল্‌ব।

তবে মানুষ কর্ত্তব্যের অনুরোধে জীবনকে তুচ্ছ করে।

করে এইজন্যে যে তখন জীবনের কথা সে ভাবে না ব'লে। কর্ত্তব্যই তখন তার ধ্যেয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পালনের মাঝে যদি একবার মনে হয় যে বুঝি বা প্রাণ গেল তখন কর্ত্তব্যকে শিকেয় তুলে রেখে সে প্রাণের পিছনে দৌড়ায়।

মহা মুস্কিল। তার্কিক বাসুদেব তো বাগ্ মানে না। বার দুই চুপি চুপি ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে দিলাম। সেও ঘড়ির কাঁটা সরিয়ে দিলে। আমরা এসেছিলাম বেলা তিনটায়, এখন বেলা আড়াইটা, ঘড়ির মতে।

পরেশ বল্‌লে—ভাই ও-সব বোগাস কথা ছেড়ে দাও। সাদা কথা এই যে বিপন্ন বন্ধুর মহা-উপকার কর্ত্তে হবে তোমাকে।

বাসুদেব বল্লে—কথাটাকে আরও একটু চুনকাম করে সাদা কর। এখনও তার গায়ে প্রহেলিকার কুহেলিকা লেগে রয়েছে।

বাসুদেব "দিগ্বিজয়" পত্রিকায় "দেহ ও দেহী" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখ্‌ত।

আমি বল্লাম—শোন। পরেশ প্রেম-পাগল—

"অ্যাঁ!"—সেই বলিষ্ঠ দেহের ভীম রবে পরেশ চমকে উঠ্‌লো। তাকে সংক্ষেপে সব কথা বল্লাম। সে বল্লে—আমায় কি করতে হবে!

মোটর-চাপা পড়তে হবে।

সে বিস্ময়-নেত্রে দেখ্‌লে আমায়। মাথায় টোকা মেরে বল্লে—মাথা খারাপ হ'য়েছে। মাথা খারাপ হ'য়েছে। বালাই, ষাট্। কেতাব-ভরা রোগের ফিরিস্তি রয়েছে—রোজ নূতন নূতন রোগের আবিষ্কার হ'চ্চে—আর এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমি গাড়ি-চাপা পড়ে মরব?

পরেশ বল্লে—প্রকাশটা বোগাস্। কথা কইতে পারে না ব'লে ওকালতিতে ওর কিছু হয় না।

তার অকৃতজ্ঞতায় আমি ক্ষুণ্ণ হ'লাম। সে বল্লে—সত্যি গাড়ি-চাপা পড়তে হবে না। পড়-পড় হ'তে হ'বে। অভিনয়। বুঝ্‌লে?

তাই বল বন্ধু। একেবারে পেটের পিলে চল্‌কে উঠেছিল। অভিনয় করতে হবে। তাই বল। মন্দ কি। কলেজ ছেড়ে অবধি আর ও-কাজটা হয় নি।

সে একেবারে হাত নেড়ে আবৃত্তি আরম্ভ ক'ল্লে—"সত্য যদি তুমি রামানুজ"—

আঃ থাক্! থাক্!

পরেশ ব'ল্ল—অভিনয় হ'লেও থিয়েটার নয়—

ওঃ! যাত্রা! অনেক লোক চাই। জুরি, দোহার। জুরি গালে হাত দিয়ে গাইবে—প্রাণপ্রতি মা জানকী।

পরেশ বল্লে—শেষ অবধি ধীর হ'য়ে শোন না ভাই। যাত্রা ঠিক্ নয়, সিনেমা—

ওঃ! সিনেমা। সবাক্ না অবাক্?

হ্যাঁ, অবশ্য সবাক্।

সে লুল্ল! গ্র্যাণ্ড হ'বে। নাম বার করে ফেলব। হোলিউড্ থেকে পত্র আস্‌বে। চারিদিকে নাম জাহির হ'বে। শেষে একটা ডাচেস্ বিয়ে ক'রে ফেল্‌ব।

পরেশ বোঝালে। অভিনয় হবে রাস্তায়। মুরারি বাবুর বাড়ির ঠিকানা দিলে। বাসুদেব হবে অন্যমনস্ক যুবক। রাস্তায় "দিগ্বিজয়" পড়তে পড়তে যাবে। সার্টের বোতাম খোলা—পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডাল। এমন সময় তার পিছন থেকে বিজলী শিঙা ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে বড় বিউইক্ গাড়ি আসবে। গাড়িতে থাকবে—বীরেন সাধু খাঁ। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌বো। পরেশ ছুটে গিয়ে গাড়িটাকে ঠেলে ধরবে। তাতে গাড়ি পেছিয়ে পড়বে, তখন সে বাসুকে জড়িয়ে ধ'রে সামনের বাড়িতে নিয়ে যাবে। দু'জনেই হাঁফাবে। তার পর ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, পরেশের লজ্জাবনত বিনীত চক্ষুর অপূর্ব্ব চাহনী ইত্যাদি।

সে বল্লে—গাড়িখানা কিসের কর্ব্বে'—পিজবোর্ডের, না বাঁশের ওপর কাগজ জড়িয়ে?

পরেশ বল্লে—না না, গাড়িখানা হ'বে আসল। বীরেনের গাড়ি।

ওঃ বাবা।

কোনো ভয় নাই। ঠিক তোমার ছয় ইঞ্চি দূরে এসেই হ্যাণ্ড-ব্রেক্ ফুট-ব্রেক—দুই-ই টিপে দেবে। তোমার গায়ে কিছু আঁচ লাগবে না। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আমি গাড়ি ধরব। দেখাবে যেন আমিই গাড়ি থামালাম। তার পর আমি যখন গাড়িকে ঠেলা মারবো সে ব্যাক গিয়ার দেবে—গাড়ি পেছিয়ে যাবে।

বাসুদেব নীরব হ'য়ে মনের পটে চিত্রটা এঁকে দেখ্‌তে লাগলো। শেষে বল্লে—হ'বে না।

হবে না ?

উঁহু! হবে না।

পরেশ বল্লে—বাসু, তোমার হৃদয় তো আগে এমন কঠিন ছিল না। তুমি গ্রীকদের মত দেহ ও মনের পুষ্টি-সাধন কর্ত্তে এক সঙ্গে। এখন দেখ্‌ছি তোমার দেহের স্থূলতা তোমার বুদ্ধিকে মেঘাবৃত করেছে।

সে বল্লে—দেখ ব্রাদার, ও-সব বোগাস ব্যাপারে সুবিধে হবে না। প্রেম-পাগল হ'য়েছ, হ'য়েছ। কিন্তু সিনেমার সঙ্গে তোমার প্রেমের কি সম্পর্ক তা বোঝাও নি। দু' নম্বর—যদি ছবিই তুলবে তো কাগজের মোটারে তোমার আপত্তি কি—কাঠের বেড়ালে তো রোজই ইঁদুর ধরে চলচ্চিত্রে। আর তার পর ইংরাজি বুক্‌নী মারা সূর্য্য-বংশীয় বীরেন সাধুখাঁর মোটার বিদ্যার ওপর তোমার অমন অচল দৃঢ়বিশ্বাস গজালো কবে থেকে তাও বোঝাও। যেহেতু এই সেদিন রথের মেলায়—একজনের ধুচুনীকে মোটর-দলিত ক'রে সে সাত পয়সা হরমত দিয়েছে।

এবার আমি অপমানের প্রতিশোধ নিলাম। বল্লাম —বল, বাগ্মীবর বল। কি বোঝানই বোঝালে। আমি নিস্তব্ধ হ'য়ে শুন্‌ছি। বোগাস্।

সে বল্লে—ভাই আমার কি মতি-স্থির আছে। তুমি বোঝাও।

আমি বোঝালাম। বাসুদেব বুঝ্‌লে। বল্লে—হ্যাঁ। মতলবটা মন্দ না। কিন্তু আমি বীরেনের পরীক্ষা না নিয়ে কাজে সম্মত হ'ব না।

(৯)

খুব জোর মহল্লা চল্‌তে লাগলো সাতগেছের সাধুখাঁ কাননে। প্রথম দিন মালির কলসীকে বাসুদেব সাজিয়ে মহল্লা দিতে গিয়ে কলসী গেল ফেটে। শেষে তার কানা বাম্পারে লেগে অনেক হাস্য-রসের সৃষ্টি করলে। বীরেন্দ্র বল্লে—ওটা সাইট সিইঙের ডাউনে ছিল, কি করব।

বাসুদেব বল্লে—বাবা, আর একটু হ'লে আমাকেও তো ডাইনে যেতে হ'ত।

সেদিন মহল্লা বন্ধ হ'ল। তার পর দিন অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে আবার বাসুদেবকে নিয়ে আসা গেল সাধুখাঁ কাননে। সেদিন একটা সাড়ে পাঁচ ফুট বাঁশে কাপড় জড়িয়ে বাসুদেবের কুশ-পুত্তলির উদ্দেশে গাড়ি চালানো হ'ল। বার সাতেক পরীক্ষায় সাধুখাঁ উত্তীর্ণ হ'ল।

তার পর পিছে হটার মহল্লা। প্রথম বার ঠিক্ হ'ল। কিন্তু দ্বিতীয় বার পরেশ যেমনি কুশ পুত্তলিকাকে বাঁচিয়ে গাড়িকে মারলে ধাক্কা—গাড়ি পিছু হেটে এক খেঁকি কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। বিশেষ কিছু হয়নি। মাত্র পিছনের ডাহিনা চাকায় তার ন্যাজটা চেপটে গিয়েছিল। আরে বাপ্‌রে বাপ! কি ভীষণ চীৎকার। একেবারে চেঁচিয়ে সে গ্রাম ফাটিয়ে ফেল্‌লে। আর তার লাঙ্গুল পীড়ার গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে সহানুভূতি জানিয়ে রাজ্যের কেলো ভুলো নলে গ্যাঁদা গগন পবন শারমেয় সঙ্গীতে মুখরিত করে তুল্লে। কার সাধ্য সেখানে এক মিনিট টেঁকে!

যেদিন ড্রেস-রিহারসাল হ'ল—সবাই খুসি। মন্ত্রগুপ্ত ছিল আমাদের সাফল্যের প্রাণ। সুতরাং দর্শক সংগ্রহ করায় বিচক্ষণতা ও ধীরতাকে অবলম্বন কর্ত্তে হ'লো। দর্শক হ'ল বাগানের তিন জন উড়ে মালি, আর হরিজন-পত্নী লক্ষ্মী। বহুদিনের অত্যাচারে হরিজনদের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে বেয়াড়াপনা। সে বেয়াড়াপনা প্রকট হ'ল লক্ষ্মীর হাসিতে। তার মতামত সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হ'ল। যত জিজ্ঞাসা করা হয় কি বুঝ্‌লি, সে তত হাসে মুখে কাপড় দিয়ে।

দীনুর ধর্ম্মে মতি ছিল। বাগানের ডাব চুরি ক'রে

দীনু একখানা উড়িয়া ভাষার "নাট-চুরি" কিনেছিল। সে সুর করে পড়ত। তার মত জিজ্ঞাসা করা গেল।

"বাবা দীনু, বলতো কি বুঝ্‌লে।"

সে গরীব মনুষ্য বুঝিবাকু কি পাড়িবি বাবুমান।

বাবা বিনয় ছাড়। এই যে চোখের সামনে এতবড় কাণ্ডটা হয়ে গেল এর কি অর্থ বোধ কল্লে দয়া করে না হয় বলেই ফেল্লে বাবা!

মু কহিবী না। চাকর মানুষ—

এবার বাসুদেব অধ্যক্ষতা নিলে।—তা বেটা চাকর মানুষ! কে বল্‌ছে তুই ইউনিভার্সিটির ভাইস-চান্সেলার। এই যে দেখলি আমি পড়তে পড়তে যাচ্ছি, তোর বাবু গাড়ী চালিয়ে এসে আমায় প্রায় চাপা দিয়েছিল, এমন সময় পরেশবাবু এসে আমায় বাঁচালে, গাড়িকে চেপে ধরে থামালে, ধাক্কা মেরে পেছিয়ে দিলে—কি বুঝলি?

পরেশবাবু ধক্কা দিল।

ধক্কা দিল! তোর আদ্যশ্রাদ্ধ করিল।

এবার মাগুনীর পালা। মাগুনী প্রভু-ভক্ত। এ বাগানে ফুল বা ফল কম পড়লে সে আস্‌-পাশের বাগান থেকে চুরি করে এনে দেয়। তাকে আদর করে বীরেন বল্লে—মাগুনী, মাগু, উছু বল্‌তো কি বুঝ্‌লি।

সে মাথা নেড়ে বল্লে—বুঝিছি।

উৎসাহিত হয়ে আমরা বল্লাম—কি বুঝেছিস্‌?

সে আপনাদের চরণ সেবা করছি বাবু বুঝিব না।

বহু সাধ্য-সাধনার ফলে, সে বল্লে—বাবুরা সব ডকাতি করবে।

পড়লো গাড়ি নদ্দামায়। এবার লক্ষ্মীর হাসির বেগটা থামলো। সে বল্লে—উড়ে মেড়া কিনা ডাকাতি করবে!

এবার পরেশ তাকে হাতে নিলে বল্লে—লক্ষ্মী, তুমি বাঙ্গালী, তুমি হাড়ীর—অর্থাৎ হরিজনের মেয়ে, তুমি আর বুঝবে না।

সে বল্লে—বোয়ের কাছে বড়াই দেখাবেতো বাবু! ও বৌ ধরে ফেলবে।

ধরে ফেলবে? কেন?

আমাদের বাবুকে চিনে ফেলবে।

নগদ একটাকা তাকে বথ্‌সিস্‌ দিয়ে আমরা পরামর্শ কর্ত্তে বস্‌লাম। বীরেনকে চেনেন রামলালবাবু, কথাটা এক দিন না এক দিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। ছদ্ম-বেশ চাই।

বাসুদেব বল্লে—চীনে সাজাও।

কিন্তু বীরেন্দ্রের নাক ছিল লম্বা। চীনের পোষাকে সে ধরা পড়ে যাবে। কাবুলীর পোষাক তাকে মানায় কিন্তু কাবুলী মেরে-কেটে বাইসিকেল চড়ে। কলিকাতার সহরে মোটর চালানো কাবুলী তো পাওয়া যায়না। ইংরাজ সাজানো হবে না, কারণ স্বদেশীর যুগে বিলাতী ছদ্মবেশ গ্রহণ কর্ল্লে সাহেবরা বলবে, তাদের ভিন্ন আমাদের কোনো কাজ চলেনা। শেষে ঠিক হ'ল বীরেন্দ্র শিখ সাজবে। দাড়ি গোঁপ কেশের বোঝা সবাই মিলে তাকে একেবারে নূতন মানুষ সৃষ্টি করবে।

বাসুদেব কানিংহামের শিখ ইতিহাসখানা ইত্যবসরে পড়ে ফেললে। আমি একজন শিখ ড্রাইভারকে কিছু বথ্‌সিস্‌ দিয়ে শিখ দরজীর সন্ধান কর্ল্লাম ভবানীপুরে। লালবাজারের পুলিস আফিসের পিছন থেকে হাটু আলি বাল্‌বরের দোকান থেকে দাঁড়ি গোপ পরচুল কিনে আনলাম। পরেশ তার মায়ের এয়ো-সংক্রান্তি ব্রতের জন্যে কেনা হাতের লোহা এক গাছা চুরি করে আনলে।

শিখ্‌ সেজে বীরেন্দ্রকে মানালো বেশ। কিন্তু শিখ্‌ ড্রাইভারের গায়ের গন্ধের হ'ল অভাব। শেষ ঠিক হ'ল, যে দিন কাণ্ডটা হবে তার আগের দিন বীরেন স্নান কর্ব্বেনা। আর রসুন-বাঁটার মৃদু প্রলেপ তার অঙ্গে লাগাতে হ'বে।

পূর্ণ মহল্লা হ'য়ে যেমনি পরেশ বাসুদেবকে উদ্ধার করলে অমনি সংবাদ এলো বীরেন্দ্রের মাতুলানী দেহত্যাগ করেছেন। বীরেন্দ্র শশব্যস্ত হ'য়ে যাবার সময় ব'লে গেল—একটা কন্‌ডোলেশন মিটিং কর্ত্তে হ'বে।

(১০)

বল ত একি মরা। এর চেয়ে বেঁচে থাকাতো ছিল ভাল।

আর তিনদিন বাদে কাণ্ডটা হবে আর এতদিন বেঁচে থেকে—

আরে কও কেন কথা? শাস্ত্র মিথ্যা হবার নয়। বলে "জপ তপ কর কি মরতে জানলে হয়।" মরতে জানে ক'জন?

আউটরাম ঘাটের ঘড়ি দেখে বাসু ঘড়ি মিলিয়ে নিলে। উপরে উঠে দেখলাম পরেশ আর যামিনী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

পরেশ বল্লে—বোগাস্।

পরে শুনলাম তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল উড়ো জাহাজের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলের জাহাজ কমবে কিনা।

যামিনী অর্থনীতির পণ্ডিত। তার কোঁকড়া চুলের নীচে এক-মাথা বুদ্ধি ছিল ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে। অকস্মাৎ অদূরে দেখা দিল গিরিজা। আমি টিপে দিলাম বাসুদেবকে। সে দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পলায়ন কল্লে। পাছে গিরিজা তাকে চিনে রাখে।

গল্প হ'ল। যামিনী আঁক কষে দেখিয়ে দিলে যে জিনিষের দাম অনেক কমে যায় যদি মানুষের বদলে ঘোড়া কিম্বা গাধার সাহায্যে নৌকার গুণ টানা হয়।

সে যাবার পর গিরিজা বল্লে—আজকাল আপনারা দুর্ল্লভ-দর্শন হ'য়েছেন যে দেখছি।

এই পরেশের শিঙ্গাপুর যাবার সব বন্দোবস্ত হচ্চে কিনা। রথ-তলার পাঁপড়ের মত বিক্রী হচ্চে কোম্পানীর সেয়ার।

কই বীরেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন না।

তার মাতুলানী বিয়োগ হয়েছে কিনা এখন একমাস তো তার অশৌচ, তার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি আছে।

পরেশ বল্লে—ইষ্টুপিড। অমৃত বোস্ বলেছেন কলুরা সূর্য্য বংশীয়। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের নিয়মে বারো দিনে শ্রাদ্ধ কর্ল্লেই পারতো।

গিরিজা বল্লে—মামী মারা গেছেন?

হ্যাঁ।

মামী মারা গেছেন তো বারো দিনই বা লাগবে কেন, একমাসই বা লাগবে কেন। মাতুলানী বিয়োগে তিন দিনে অশৌচান্ত!

"অ্যাঁ!" বলে পরেশ এক তুড়ি-লাফ্ মারলে। খানসামা ছুটে এলো। বল্লে—"হুজুর!"

আইস-ক্রীম। চা', কফি। যা' আছে সব। অ্যাঁ তিন দিনে অশৌচ!

অন্য টেবিলে যারা চা-পান কর্চ্ছিল তারা তাকিয়ে দেখ্লে। গিরিজা বিস্মিত হ'য়ে ভবিষ্যত শ্যালককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ-কর্ত্তে লাগলো।

আমি বল্লাম—পরেশ শিঙ্গাপুর যাবার জন্য বড় ক্ষেপেছে কিনা। ভেবেছিল মাসখানেক কোম্পানীর কাজ বন্ধ থাকবে। তাই।

(১১)

ঠিক্ যেমন যেমন মহল্লা দিয়েছিলাম কাণ্ডটা ঠিক তেমনি হ'ল। অপ্রত্যাশিত ফল-লাভ করা গেল। ঠিক্ সেই সময় বারান্দার উপর থেকে চাঁপার কলি সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। সব ভাল, সব মঙ্গল।

কিন্তু একটা ব্যাপার ঘট্‌লো তার কি ফল হবে তা ভেবে ঠিক্ কর্ত্তে পারলাম না। পরেশের ভাই ছিল বলেছি। তার নাম নরেশ। সে এতদিন আমার এ-ইতিহাসে কাব্যে উপেক্ষিতার মত ছিল। কিন্তু আজ সে হঠাৎ যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ "কাণ্ড"র পর ফুট্‌বোর্ডে উঠে শিখ্ ড্রাইভারের দাড়ি চেপে ধরলে। আর সেই ধরার ফলে বীরেন্দ্রের কৃত্রিম শ্মশ্রু তার হাতে রহে গেল। বীরেন তো দে দৌড়। কিন্তু সে তার গাড়ির নিয়েছিল নম্বর।

আমরা এ সব কথা কিছু জানতাম না। পরে নরেশ আমাকে বল্লে—প্রকাশদা, একটা কথা যেন বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

আমি বল্লাম—কেন ভাই?

সে বল্লে—আমি শিখ্‌টাকে মারতে গিয়েছিলাম; তার কোনো পুরুষে শিখ্ না—ঠিক বীরেনবাবুর মত চেহারা, তবে গোঁপ-কামানো।

বল কি?

তার দাড়িটা যেমনি আমার হাতে উঠে এলো গিরিজাবাবু সেটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বল্লেন—কাউকে বোলো না।

বল কি?.

তিনি আমাকে ফুটবোর্ড থেকে মিঠেমে টেনে নিয়ে

বল্লেন—সরে পড়ুন। আর অমনি বীরেনবাবু বেগে পালিয়ে গেলেন।

বল কি? আর কেউ ব্যাপারটা জানে?

না। চক্ষের নিমেষে হল কিনা। কেউ জানে না—অন্ততঃ কেউ এ-কথা তোলে নি। আরও একটা কথা আমি জানি। আমি গাড়ির নম্বর দেখে নিয়েছিলাম। পরে পুলিসের বই থেকে দেখেছি গাড়িখানা বীরেনবাবুর।

বল কি?

ভাবলাম জীবনের এইটাই রহস্য। এক অজ্ঞাত রাজপুত্রকে কে একজন গুলি মেরেছিল ব'লে ইউরোপ এসিয়ায় চার বৎসর রক্তের গঙ্গা বহে গিয়েছিল। নরেশকে অনেক মিষ্ট কথা বল্লাম। তাকে বোঝালাম যে, গিরিজা আর বীরেন নিশ্চয় ষড়যন্ত্র ক'রে বাসুদেবকে ভয় দেখাচ্ছিল। তার দাদা গোঁয়ারতুমি ক'রে গাড়ির সামনে গিয়েছিল। যাক্ এ-সব গুরুজনদের কথায় সে ছেলেমানুষের পক্ষে না থাকাই ভাল। সে প্রতিশ্রুত হ'ল কাকেও কিছু বলবে না—কিন্তু বড় খুশী হ'ল না আমার কৈফিয়তে।

পরেশের সঙ্গে পরদিন দেখা হ'ল। সে বল্লে—মা খুব গুরুতর রূপে কথাটা নিয়েছেন। বাবাকে তিরস্কার করেছেন—আমার মত গোঁয়ার ছেলেকে শিঙ্গাপুর যেতে দিচ্চেন বলে। বাবা আমাকে বলেছেন—বিদেশ যাওয়া হবে না। দেশে বসে চাষাদের উন্নতির বিধান কর্ত্তে হবে। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। তাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি শিল্প শেখাতে হবে। আর সব বোগাস্ কাজ কর্ত্তে হবে কিন্তু—

আসল কথার কোনো উল্লেখ নাই। নরেশের কথা পরেশকে বল্লাম না।

গিরিজার সঙ্গে যখন দেখা হল তাকে পরেশ বল্লে—তোমাদের বাড়ির সামনে—

গিরিজা বল্লে—আমার বোন্ চাঁপার কলি বারান্দা থেকে দেখেছে।

পরেশ বল্লে—তাই নাকি?

গিরিজা বল্লে—আমার বোনের রোমাণ্টিক প্রকৃতি কিনা, তার মনের মধ্যে ভারি একটা ছাপ মেরেছে কালকের ঘটনা।

পরেশ গুণ গুণ স্বরে গান গাচ্ছিল—"তোমার আমার গোপন কথা কেউ তো জানে না।" অথচ বালতির শব্দ শুনে ঘোড়া যেমন কান খাড়া করে, তেমনি কান খাড়া করে সে শুনছিল।

চাঁপার কলি প্রশংসা করছিল—ধীরতার—ধীরতা বীরতা আর বীরব আত্মবলির।

"গোপন কথা, গোপন কথা।"—গুন গুন স্বরে।

বলছিল কি মাংসপেশী!

"আমায় ডাক দিয়েছ কোন সকালে—কেউ তা জানে না—আমায়—" এবার গানের সুর একটু চড়া।

ভদ্রলোকের নামটা ভাগ্যে জেনেছিলাম। মুখুজ্যে যখন আমাদের—

পরেশ তার দিকে চাহিল। কি সে চাহনী! কত ব্যথা, কত কুতূহল, কত মর্ম্মবেদনা পরস্পরের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি কাচ্ছিল প্রথমে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে সেই চাহনীর ভিতর দিয়ে—তারা যেন সিনেমার চার আনার টিকিটের খরিদদার।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। বেশ লোক। এম, এ। বাবার ইচ্ছা ওঁর সঙ্গেই বোনের বিয়ে হয়।

পরেশ টেবিলের পায় একটি লাথি মারলে। চা চলকে পড়ল গিরিজার গায়ে।

গা মুছতে মুছতে গিরিজা বল্লে—বাসুদেববাবুও নিমরাজী—

পরেশ বল্লে—বে-ইমান! মিরজাফর! বিশ্বাসঘাতক!

সে বেগে চলে গেল। গিরিজা খুব হাস্‌লে। আমি বল্লাম—গিরিজাবাবু; আপনি নূতন কুটুম্ব হচ্চেন। আপনার ব্যবহারটা—

কেন আমার কি ব্যবহার! আপনারা কি আমাকে ষড়যন্ত্রের ভিতর নিয়েছিলেন। কি করে জানব কার জন্যে আপনারা সিনেমাটা করলেন, বাসুদেববাবুর জন্যে না পরেশের জন্যে।"

ছিঃ! ছিঃ!

এখন একটা খুনোখুনি বাঁচাতে চান তো চলুন।

(১২)

আমরা দাঁড়ালাম জানলার বাহিরে। ধীরতার প্রতি-মূর্ত্তি বাসুদেব চারপায়ের ওপর শুয়েছিল। অনর্গল

বকে যাচ্ছিল পরেশ। অশ্রাব্য কথাও যে তার মধ্যে ছিলনা তা বলতে পারিনা।

খানিক পরে বাসুদেব বল্লে—রাঁচির ভাড়া কত?

এটা উপহাসের বিষয় মোটেই নয়। গ্রীক শিক্ষার মধ্যে কোথা ছিল কৃতঘ্নতার সম্মান?

ফ্যাচ ফ্যাচ করবার কোনো কারণ দেখিনি। কি অস্ত্র নেবে নাও। মল্লযুদ্ধ হ'ক—যে জিতবে চাঁপার কলি হ'বে তার।

গিরিজা বল্লে—না মশায়, আমার বোনকে নিয়ে এ-রকম কথা-বার্ত্তা কইতে দেব না।

আমি বল্লাম—তখন বস্ত্রহরণ করেছিলেন, এবার গোবর্দ্ধন ধারণ করুন।

এমন সময় খুব একটা গোলমাল হ'লো, ছুটে এলো বীরেন। আমাদের দেখে বল্লে—এ কি তোমরা আউট ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে কেন?

সে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লো। পরেশকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—গুড্ ক্রু্ট—ফরহেড্ ষ্ট্রং—তোর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে—রামলাল বাবুর কাছ থেকে আস্‌ছি।

পরেশ হতভম্ব। গিরিজার অবাধ হাসি। তার সঙ্গে সুর তাল মিলিয়ে বাসুদেব হাসিল। আমি ঠিক করতে পারলাম না—হাসব না কাঁদব।

সত্যই বাসুদেব মির্জ্জাফর। সে গিরিজার পিস্‌তুতো ভাইয়ের শালা। আমাদের সকল কথা সে দিনের-পর-দিন জানাতো গিরিজাকে।

গিরিজা বল্লে—তবে বলি শোন। বোন্ আমার মোটে রোমান্টিক নয়। তবে খুব আমুদে। সে সব কথা জানতো—বীরেনের দাড়িটা তার বাক্সে আছে।

পরেশ বোকার মত তাকালে। গিরিজা বল্লে—এই কথা শোনবার পর—পরেশ বল আমার ভগ্নির পাণিগ্রহণ করবে কিনা।

সে বল্লে—সে যদি ডুগডুগি কিনে বাজায় তো আমি সেই তালেই নাচবো। কি জান জীবনে একজনের কাছে বোকা হওয়াই ভাল—পাড়ায় পাড়ায় বোকামী করে বেড়িয়ে আর লাভ কি?

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠ্‌লাম—পরেশটা অতি-বোগাস। (শেষ)

প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার উদ্ভব ও বিকাশ

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক

আমাদের অনেকের বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার তাদৃশ বিকাশ হইয়াছিল না। তাঁহাদের মতে প্রাচীন ভারতের কুশীলবগণ অভিনয়-কলার প্রথম সোপানে মাত্র পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। রোমে এবং তৎপরে ইয়োরোপে যখন নটদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, নাট্যরঙ্গকে শয়তানের লীলা বলিয়া ধর্ম্মযাজকগণ ও জনসাধারণ ঘোষণা করিতেন, তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে নাট্যকলার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তখন হইতেই ঋষিরা নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদস্বরূপ গণ্য করিতেন "নাট্যবেদস্ত পঞ্চমম্"। প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীন ভারতের বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ—ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভরত প্রায় রামায়ণের সমকালীন, সেই সময়ে এই গ্রন্থের প্রচার। এই বিশাল গ্রন্থে নাট্যমন্দির নির্ম্মাণের প্রণালী হইতে আরম্ভ করিয়া, নৃত্যকলার নানা প্রকার ভঙ্গিমা, এবং অভিনয়-কলার বিভিন্ন প্রকার রস বিচার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। যে সময়ে এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে নাট্যাভিনয় বহুলরূপে প্রচলিত ছিল, এবং নাট্যকলা বিশেষরূপে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞার শৈশবাবস্থা, তৎসম্বন্ধে সেই সময়ে এত গূঢ় তথ্যপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হইতে পারে না,—নিশ্চয়ই বহু দিনের ও বহু পূর্ব্ববর্ত্তীগণের এবং নিজের অভিজ্ঞতার সমষ্টি লইয়া ভরত এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থের বোম্বাই হইতে প্রচারিত ভুলভ্রান্তিসঙ্কুল দেবনাগরী সংস্করণ ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক সংস্করণ নাই। এই গ্রন্থের কতক অংশ নাকি ফরাসী-দেশ হইতে প্রচারিত হইয়াছে। Dr. Sylvain Levi প্রণীত "La Theatre Indien" Horace Heamn Wilson প্রণীত "Hindu Theatre" প্রভৃতি গ্রন্থগুলির উপাদান এই ভরতের নাট্য-শাস্ত্র হইতে গৃহীত। যদি কোন সুধী ব্যক্তি এই গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করেন, তাহা হইলে তিনি একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন বলিয়া মনে করি। শুনিয়াছি বরোদার মহারাজার পাঠাগারের লাইব্রেরীয়ান এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্কৃত সংস্করণ প্রণয়ন

করিতেছেন। আচার্য্য হোরেস হিমান উইলসন লিখিয়া গিয়াছেন—"The nations of Europe possessed no dramatic literature before the 14th or the 15th century, at which period the Hindu drama had passed into decline."

আমরা এখন নাটকের আদর্শের জন্ম বিলাতের দিকে চাই, অথচ আমাদের দেশে যে কি ছিল তাহার অনুসন্ধান দ্বারা পুনরুদ্ধার করিয়া, সেই আদর্শে নাট্যকলার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা আমরা করি না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে নাট্য-কলার তাদৃশ বিকাশ ঘটিয়াছিল না, এবং প্রাচীন ভারতের কুশীলবগণ অভিনয়-কলার প্রথম সোপানে মাত্র পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে প্রথমতঃ আমরা প্রাচীন ভারতে নাট্য ও অভিনয়-কলার বিকাশ, এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ দিবার চেষ্টা করিব এবং দেখাইতে চেষ্টা করিব যে প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার কতখানি উৎকর্ষ হইয়াছিল।

ভরত-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্র

মহামুনি ভরতই নাট্যশাস্ত্রের স্রষ্টা ইহা সকলেই বিশ্বাস করেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকে ভরতকে অমরাবতীর নাট্যকার ও নাট্য-পীঠ-শিল্পী বলিয়াছেন। ভবভূতি উত্তররামচরিতে ভরতকে যন্ত্রসঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থকার বলিয়াছেন। নাটক সম্বন্ধে ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রই আদি প্রামাণিক গ্রন্থ। ভরতের গন্ধর্ব্ববেদ অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইলেও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম পাদপীঠ রূপে পরিচিত। এই গ্রন্থে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে পঞ্চম বেদ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

নাট্যের পুরাতত্ত্ব

নাট্যশাস্ত্র কত পুরাতন তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পাণিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। সামশ্রমী মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতবর্গ খৃঃ পূঃ ২৩০০ বৎসরে পাণিনির কাল নির্ণয় করেন। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বুলার (Buhler), কবি সোমদেব প্রণীত কথাসরিৎসাগরের কোন আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসরে পাণিনির কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মনু নটদিগের ব্যবসায়ের উপর খড়্গহস্ত এবং তিনি ব্রাহ্মণদিগকে নট হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র যাহা খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসরে লিখিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থে রঙ্গমঞ্চ ও নাটক সম্বন্ধে যে ভাবে উল্লেখ আছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে নাট্যাভিনয় বেশ প্রচলিত ছিল। তার পর আমরা দেখিতে পাই মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন "রত্নাবলী" ও "নাগানন্দ" দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া, নাগানন্দে জীমূতবাহনের ভূমিকা অভিনয় করিতেছেন। তার পরে দেখিতে পাই যে আর্য্য ক্ষেমীশ্বর বিরচিত "চণ্ডকৌশিক" নাটক মহারাজ মহীপালদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত হইতেছে। নাট্যশাস্ত্রে অন্যান্য মুনিরা প্রশ্ন করিতেছেন এবং ভরত তাহার উত্তর দান ব্যপদেশে নাটকীয় সূত্রের ও নিজ কার্য্যাবলীর ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রাচীন নাট্যকলার উৎপত্তির ইতিহাস

কোন এক সময়ে মনুষ্যগণ নিরক্ষর বিধায় অজ্ঞানতার গভীর কূপে পতিত থাকিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতেছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, যাহাতে জনগণমধ্যে আমোদ এবং লোক-শিক্ষা উভয়ই একসঙ্গে প্রচার হয়, এবং যাহাতে শূদ্রাদি নিরক্ষর শ্রেণীয়াও উপকৃত হইতে পারে, এমন একটী উপায় উদ্ভাবন-কল্পে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা তখন চারি বেদকে আহ্বান করিয়া দেবতাদিগের প্রস্তাব তাঁহাদিগের গোচরে আনয়ন করেন এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য চাহেন। তখন ঋগ্‌বেদ কথোপকথন (Dialogue or recitation), সামবেদ গান, যজুর্ব্বেদ রঙ্গাভিনয় (Acting) এবং অথর্ব্বেদ ভাবাভিনয় (Emotions)—এইরূপে প্রত্যেকে এক একটী বস্তু দান করেন। ইহা হইতে পঞ্চমবেদরূপ নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি হয় এবং পিতামহ ব্রহ্মা মহামুনি ভরতকে এই শাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—"ইন্দ্রকেতন দণ্ডের স্থাপন উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসব আগতপ্রায়, এই সময়ে তোমার নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রমাণ দিবার সুন্দর সুযোগ উপস্থিত।" পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে ভরত এই উপলক্ষে "অমৃত মন্থন" নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া দেবতা ও অসুরদের সম্মুখে অভিনয় করেন। এই নাটকে দেবতা কর্ত্তৃক অসুরগণের পরাজয় দেখান হইয়াছে। এই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া অসুরগণ অভিনয়-কালে উৎপাত আরম্ভ করিয়া অভিনয়ে ব্যাঘাত জন্মায়। তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্থাপিত কেতন-দণ্ড উৎপাটিত করিয়া তদাঘাতে অসুরগণকে জর্জ্জরিত করেন এবং অসুরেরা শান্ত হয়। দণ্ডাঘাতে অসুরেরা যে প্রকার জর্জ্জরিত হয়, দণ্ডখানিও বিশেষ রূপে পিষ্ট হয়। এই ঘটনা হইতে ইন্দ্র কেতন দণ্ডের নাম "জর্জ্জর" হয় এবং এই জর্জ্জরই রঙ্গমঞ্চের প্রতীক স্বরূপ (Emblem) পরিগণিত। প্রাচীন কালে সমস্ত অভিনয়ের পূর্ব্বে এই জর্জ্জরকে পূজা করিবার বিধি ছিল। এই জর্জ্জর ১০৮ অঙ্গুলী অথবা ৭২ ইঞ্চি লম্বা, ইহার ছয়টি গিঁট এবং তন্মধ্যস্থিত পাঁচটি স্থান। প্রত্যেক গিঁট মধ্যস্থিত স্থানে এক একটী দেবতার বাস এবং তাহার নির্দ্দেশ স্বরূপ বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রে মণ্ডিত। প্রথম স্থান শ্বেত—দেবতা ব্রহ্মা; দ্বিতীয় স্থান নীল—দেবতা বিষ্ণু; তৃতীয় স্থান পীতবর্ণ,—দেবতা শিব; চতুর্থ স্থান লোহিতবর্ণ,—দেবতা কার্ত্তিকেয়; পঞ্চম স্থান নানা বর্ণের বস্ত্রে মণ্ডিত—ইহাতে বাসুকী বিরাজ করেন। জর্জ্জর দণ্ড কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে।

কিন্তু এই প্রকারে অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটায়, মহামুনি ভরত, যাহাতে ভবিষ্যতে এই প্রকার উৎপাত কোন কারণে না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মাও ভবিষ্যতে সুব্যবস্থামত ও বিনা ব্যাঘাতে যাহাতে অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে একটী অভিনয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং অসুরদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে এটা নাটকাভিনয়, উদ্দেশ্য আমোদ ও লোকশিক্ষা, ইহাতে ক্রুদ্ধ হওয়া অনুচিত। দেবাসুরযুদ্ধে অসুরের পরাজয় বিষয়ক নাটকের অভিনয়ে

অসুরেরা ক্রমাগত উপদ্রব করিতে থাকায়, শেষে ইহা সাব্যস্ত হইল যে নাটকে আর অসুরদিগের পরাজয়সূচক অপমান, আর দেবতাদের জয়-সূচক গৌরব দেখান হইবে না।

নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় গৃহের যে প্রকার বর্ণনা আছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল—

অভিনয় গৃহ। (প্রেক্ষাগার ও রঙ্গমঞ্চ)

গৃহের অর্দ্ধভাগ দর্শকদিগের জন্য, অপরার্দ্ধ রঙ্গমঞ্চের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। দর্শকদিগের বসিবার স্থান গ্যালারির হিসাবে সাজান,—প্রত্যেক আসনের সারি, পূর্ব্ববর্ত্তী আসনের সারি অপেক্ষা একহস্ত পরিমিত উচ্চ। সম্মুখভাগের আসন ব্রাহ্মণের জন্য—দুই পার্শ্বে দুইটী শ্বেত বর্ণের স্তম্ভের দ্বারা চিহ্নিত। তৎ পশ্চাতে ক্ষত্রিয়ের আসন, সম্মুখে লোহিত বর্ণের স্তম্ভের দ্বারা চিহ্নিত। ইহার পশ্চাতে বৈশ্য এবং শূদ্রের স্থান;—বৈশ্যেরা উত্তর-পশ্চিম ভাগে, শূদ্রেরা উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে; বৈশ্যদের আসন পীতবর্ণের শূদ্রদের আসন নীল বর্ণের স্তম্ভের দ্বারা চিহ্নিত। ইহার পশ্চাতে অন্যান্য জাতির বসিবার স্থান। এই অডেটোরিয়ামের দেয়ালের গায়ে আধুনিক বক্সের (Box seat) ন্যায় একপ্রকার বারান্দা থাকিত, তাহাতেও বসিবার বন্দোবস্ত থাকিত।

অভিনয়-গৃহের অপরার্দ্ধ অভিনেতাদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট—ইহাই রঙ্গমঞ্চ। এই স্থানের পশ্চাৎ দিকের এক অষ্টম ভাগের সম্মুখে ছয়টী স্তম্ভ সমসূত্রে স্থাপিত। এই স্থানের নাম রঙ্গশীর্ষ, ইহা নাট্যবেদের কর্ত্তা ব্রহ্মার নামে উৎসর্গীকৃত। এই অংশ নেপথ্য গৃহের সহিত এক বা দুইটী দরজার দ্বারা সংলগ্ন। অবশিষ্ট স্থান রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চ কখন কখন দ্বিতল—এমত অবস্থায় উপরের তালায় স্বর্গের দৃশ্যাদি দেখান হইত। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ নানা প্রকার দৃশ্যপটে পরিশোভিত, যথা বন, উদ্যান, প্রাসাদ, কক্ষ, পর্ব্বত, নদী ইত্যাদি। এই সমস্ত দৃশ্যপট কাপড়ের উপরে এবং রঙ্গমঞ্চের দেওয়ালের গায়ে আঁকা।

অভিনয় গৃহের নির্ম্মাণ-কার্য্য-কালে, বিভিন্ন অংশের নির্ম্মাণে, বিভিন্ন পূজা অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণ ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হইবার সময়, কুৎসিত, কদাকার অঙ্গহীন ব্যক্তি এবং ভিক্ষুক সন্ন্যাসী প্রভৃতির গৃহ সান্নিধ্যে আগমন বা প্রবেশ নিষিদ্ধ; ইহারা অযাত্রা।

নাট্যে নৃত্যের সংযোজনা।

প্রথম অভিনয় "অমৃত মন্থনের" পর মহাদেবকে অভিনয় দেখানর জন্য "ত্রিপুর দহ" নামক নাটক হিমালয়-শিখরে অভিনীত হয়। মহাদেব অভিনয় দর্শনে অতিশয় প্রীত হন এবং নাট্যকলার উন্নতি কল্পে, অভিনয়ে নৃত্যযোজনার বিষয়ে ভরতকে পরামর্শ দেন। হস্তপদ, কটীদেশ, পার্শ্বদেশ, উদর, পৃষ্ঠদেশ, বক্ষদেশের নানা প্রকার ভঙ্গীতে কখন ধীরে, কখনও দ্রুতে সে সমস্ত গতি হয় তাহাদের নাম 'মাতৃকা'। নৃত্যে তিন বা চারি প্রকার মাতৃকার সমাবেশের নাম 'করণ'। এই প্রকার একশত আট রকম করণের বিষয় নাট্য-শাস্ত্রে বিবৃত আছে। বিভিন্ন প্রকার করণের সমাবেশের নাম 'অঙ্গহার'। এই প্রকার বত্রিশ রকম অঙ্গহারের বর্ণনা আছে। নৃত্য শেষ করিবার চারি প্রকার ভঙ্গিমার উল্লেখ আছে। মহাদেব এই সমস্ত নৃত্যকলা তণ্ডু মুনিকে শিক্ষা দিয়া ভরতকে এই সমস্ত শিক্ষা দিবার জন্য তণ্ডুকে আজ্ঞা দেন। তণ্ডু কর্ত্তৃক শিক্ষিত বলিয়া এই নৃত্যকলার নাম "তাণ্ডব নৃত্য"। এই স্থলে মুনিগণ ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"নাটকাভিনয়ে নৃত্য সংযোজনার প্রয়োজন কি? ইহাতে নাটকের আখ্যান বস্তুর বিশ্লেষণে বা পরিণতি বিষয়ে কোনই সাহায্য হয় না, অভিনয়-কলাই তৎপক্ষে যথেষ্ট; সুতরাং অভিনয়ে নৃত্যের সার্থকতা কি?" ভরত তদুত্তরে বলিতেছেন, "নৃত্যে অভিনয়ের সাহায্য করে না, কিন্তু সময়োচিত ভাবভঙ্গীতে অভিনয়-রসের অভিব্যক্তির সাহায্য করিয়া, অভিনয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।"

তৎপরে নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা এই প্রকার আছে—

পূর্ব্ব রঙ্গ

যবনিকা উত্তোলনের পূর্ব্বে যথাস্থানে বাদ্য-যন্ত্রাদি রক্ষা করিতে হইবে, এবং যন্ত্রীগণ নিজ নিজ যন্ত্রের নিকট আসন গ্রহণ করিবেন। তৎপরে নিজ নিজ যন্ত্র উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া যন্ত্রের সুর বাঁধিতে হইবে। সুর বাঁধা হইলে যন্ত্রীগণ নিজেদের হাত ঠিক করিবার জন্য কিছুক্ষণ যন্ত্র অভ্যাস করিবেন। তার পরে ঐক্যতান বাদন হইলে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সূচক প্রার্থনা-সঙ্গীত হইবে। এই সমস্ত কার্য্য প্রকৃত রঙ্গমঞ্চের বাহিরে এক পার্শ্বে পরদার অন্তরালে নির্ব্বাহ হয়। তৎপরে যবনিকা উত্তোলন। অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্প হস্তে সূত্রধর ও তাহার সহিত দুইজন সঙ্গী—একজনের হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, অপরের হস্তে "জর্জ্জর" বাহিত হইবে এবং তৎপশ্চাতে অধ্যক্ষ মহাশয় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন। প্রবেশ করিয়াই সূত্রধর অঞ্জলিবদ্ধ পুষ্প সেই স্থানে ছড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে প্রণাম করিবে। তার পর অধ্যক্ষ মহাশয় মাটীতে হাত রাখিয়া তিনবার প্রণাম করিবেন এবং উঠিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে রঙ্গমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া সঙ্গীর নিকট হইতে জর্জ্জর গ্রহণ করিবেন এবং যন্ত্রাদির দিকে পাঁচপদ অগ্রসর হইবেন। তার পর ঘুরিয়া দশ দিকপালকে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিবেন। এই সময় আর এক ব্যক্তি পুষ্প হস্তে প্রবেশ করিবেন এবং জর্জ্জর, বাদ্যযন্ত্র এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে পূজা করিবেন। তার পর অধ্যক্ষ মহাশয় নান্দীপাঠ করিবেন। তার পর জর্জ্জরের সম্মানার্থ রচিত একটী শ্লোক যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত আবৃত্তি করা হইবে। সাধারণতঃ এই শ্লোক ঈশ্বর, রাজা বা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি-সূচক। তার পর জর্জ্জরকে ভূমিতে বা যথাস্থানে রক্ষা করিবার সময় আর একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইবে। তার পর অধ্যক্ষ মহাশয় একটী প্রেম সম্বন্ধীয় ও একটী বীরত্বব্যঞ্জক শ্লোক উপযুক্ত যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত আবৃত্তি করিবেন। তার পর তিনি তাঁহার সঙ্গীদের সহিত আলাপচ্ছলে সংক্ষেপে নাটকের আখ্যান-বস্তুর আভাস দিবেন, এবং দর্শকগণকে নাটকাভিনয় দর্শনের জন্য অনুরোধ করিবেন। ইহাকে "প্ররোচনা" কহে। ইহার পর অধ্যক্ষ মহাশয় প্রস্থান করিবেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার সঙ্গীগণের সহিত প্রস্থান করিলে, আর এক ব্যক্তি প্রবেশ

করিবেন। ইনি "স্থাপক"। ইনি সুমধুর অঙ্গবিক্ষেপে রঙ্গমঞ্চের উপর যন্ত্র-সঙ্গীতের তালে তালে পাদক্ষেপ করিতে করিতে, দেবতা ব্রাহ্মণকে স্তুতি করিবেন, দর্শকগণকে স্তুতি করিবেন, কবি এবং নাট্যকার ও নাটকের প্রশংসা করিবেন, এবং এখন নাটকাভিনয় আরম্ভ হইবে ইহাই জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিবেন। ইহা অনেকটা এখনকার নাটকের প্রস্তাবনার ন্যায়।

প্রাচীন অভিনেতৃগণ

মহামুনি ভরতের কর্তৃত্বাধীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সকলেই স্বর্গের গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা। এই সমস্ত অভিনেতৃগণ কালক্রমে অভিনয়-কলায় এমন সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন যে নিজেরাই নাটক প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের নাটকে মুনি ঋষিদের বিদ্রূপ বাহির হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ঋষি মহাশয়েরা কুপিত হইয়া এই অভিশাপ দিলেন যে নটেরা শূদ্রাচারী হইবে এবং তাহাদের নাট্যবিদ্যা লোপ পাইবে। ইহাতে মহামুনি ভরত মধ্যস্থ হইয়া অনেক অনুরোধে দ্বিতীয় অভিশাপ কাটাইয়া লইলেন, প্রথমটা বলবৎ থাকিয়া গেল।

তদনন্তর চন্দ্রবংশীয় মহারাজ নহুষ স্বর্গজয় করিবার পর মর্ত্ত্যে তাঁহার রাজধানীতে নাটকাভিনয় করাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ভরত মুনিকে অনুরোধ করেন। ভরত তাঁহার অভিনেতৃগণকে তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহারাজা নহুষের ইচ্ছামত কার্য্য করাইতে সম্মত করেন। এই উপলক্ষে স্বর্গীয় অভিনেতারা মর্ত্ত্যে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন ও তৎপরে স্বর্গে ফিরিয়া যান। কিন্তু মর্ত্ত্যে তাঁহারা তাঁহাদের একটী বংশ রাখিয়া যান। তাঁহাদের এই বংশধরগণ তাঁহাদের পৈতৃক ব্যবসা—অভিনয়—অবলম্বন করেন। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে ইহাদিগকে শূদ্রাচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নহুষের রাজধানীতে অভিনয় উপলক্ষে ভরত তাঁহার অভিনেতৃবর্গের নেতাস্বরূপ নিজে আসিয়াছিলেন না। কোলাহল অথবা কোহিল নামক তাঁহার একজন সুদক্ষ অভিনেতাকে নাট্যশিক্ষকরূপে দলের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রকারে স্বর্গ হইতে অভিনয়কলা মর্ত্ত্যে প্রবর্ত্তিত হইল।

ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন দেশবাসী ও জাতি-ভেদে দেহে বিভিন্ন বর্ণে বর্ণযোজনা (paint) করিবার উপদেশ আছে।

বিভিন্ন দেশবাসীদের রুচিভেদে নাটকের চারি প্রকার ধারার বর্ণনা আছে—

নাট্যের ধারা

১। দাক্ষিণাত্য—দক্ষিণাপথ, কোশল, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র দেশবাসীরা এই ধারার পক্ষপাতী।

২। আবন্ত্য—অবন্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র, মালব, সিন্ধুদেশবাসীগণ এই ধারার পক্ষপাতী।

৩। ওড্রমাগধী—অঙ্গ, বঙ্গ, বৎস্য, মগধ, পৌণ্ড্র, নেপাল, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, মালাকা, মলবর্দ, ব্রহ্মোত্র, ভার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশবাসীগণের নাটকীয় ধারা ওড্রমাগধী।

৪। পাঞ্চাল্যমধ্যম—পাঞ্চাল, শূরসেন, কাশ্মীর, হস্তিনাপুর, বাহ্লীক, মদ্র প্রভৃতি দেশবাসী এই ধারার অনুসরণকারী।

নাট্যের ভাষা

নিম্নলিখিত সাতটী প্রাকৃত ভাষার বিষয় উল্লেখ আছে যাহা নাটক রচনায় ব্যবহৃত হইত যথা :—(১) মাগধী, (২) অবন্তীজ (৩) প্রাচ্য (৪) শূরসেনী (৫) অর্দ্ধমাগধী (৬) বাহ্লীক (৭) দাক্ষিণাত্য। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাষা যথা,—(১) সাভরী (২) আভিরী (৩) চণ্ডালী (৪) শকরী (৫) দ্রাবিড়ী।

ইন্দ্রকেতন উৎসবের অর্থ

ইন্দ্রকেতন দণ্ডের স্থাপন উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় নাট্যের উদ্ভব। জর্জ্জর দণ্ড যাহা ভারতীয় নাট্যের প্রতীক চিহ্ন (Emblem) স্বরূপ, ইন্দ্রকেতন দণ্ড হইতে সম্ভূত। এই ইন্দ্রকেতন দণ্ডের স্থাপন উৎসবের ন্যায় উৎসব পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে, যথা ইংলণ্ডে মে-পোল (May-pole) উৎসব। ইংলণ্ডে শীতকাল সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের সময়। শীতের শেষে যখন প্রকৃতি হাস্যময়ী রূপ ধারণ করে, তখন গ্রাম্য লোকেরা নিকটস্থ বনে গিয়া একটা তরুণ ওক্ বৃক্ষ তুলিয়া মহাসমারোহে তাহাদের গ্রামে বহন করিয়া আনে এবং নূতন জীবনের চিহ্নস্বরূপ প্রকাশ্য কোন স্থানে সেই বৃক্ষটী প্রোথিত করে ও নিজেদের ইচ্ছামত সেই গাছটী নানা প্রকারে সজ্জিত করে। সমস্ত গ্রামের লোক সেই মে পোল দণ্ডের চারিদিকে নৃত্যগীত ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে। ভারতে ইন্দ্রকেতন দণ্ডের স্থাপনাও এই প্রকার। ইয়োরোপে যেমন শীতকাল নিরানন্দময়, ভারতবর্ষে—বর্ষাকালও তদ্রূপ। বর্ষাপগমে প্রকৃতি হাস্যময়ীরূপ ধারণ করে। প্রাচীন ভারতবাসীরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এই প্রকার দণ্ডস্থাপনা করিত এবং ইহাকে ইন্দ্রকেতন দণ্ড বলিত। নবজীবনের আবির্ভাবের চিহ্নস্বরূপ এই কেতনদণ্ড স্থাপন উপলক্ষে নানা প্রকার উৎসবাদি হইত। বোধ হয় এই ব্যাপারের প্রকৃত অর্থ এই প্রকার। এই সম্পর্কে আমোদ প্রমোদ হইতে ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি। এই ইন্দ্রযাত্রার উৎসব এখনও নেপালের একটি প্রধান উৎসব। নেপালে কোন দণ্ড স্থাপিত হয় না, তবে প্রসারিত হস্ত সহ ইন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রসারিত হস্ত হইতে দণ্ডধারণের ভাব সূচিত হয়। ভারতীয় নাট্যকলার ভারতের অতি পুরাতন এক উৎসব উপলক্ষে উৎপত্তি। ইহা খাঁটী ভারতীয় জিনিষ। পরবর্ত্তী গ্রীক সাহিত্যের নিকট কোন অংশেও ঋণী নহে।

ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র অতি পুরাতন এবং বৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ। উপরে যেটুকু আভাষ দেওয়া গেল—তাহা হইতে সকলে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে stage (রঙ্গমঞ্চ) Audatorium (প্রেক্ষাগার) Concert (একতান বাদন) কি প্রকার ছিল তাহার কিছু আভাষ পাইবেন। আমাদের এখনকার যে বন্দোবস্ত আছে প্রায় তাহারই অনুরূপ ; অন্ততঃ কোন অংশে হীন নহে। *

* বহু কাল পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে।

ক্ষত-চিহ্ন

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু এম-এ

শ্রদ্ধা-ভক্তি ব্যাপারগুলো আমার ধাতে সয় না। রক্তে বেয়াড়াপনার স্রোতটাই ছেলেবেলা থেকে প্রবল বইতে সুরু করেছে। জীবিতদের মধ্যে কাউকেই শ্রদ্ধা করি না। তবে ভালোবাসি বটে, ভীষণ-ভালোবাসি একজনকে। তিনি আমার উৎকট ভালোবাসার ঝাঁঝ সহ্য ক'রতে না পেরে মাঝে-মাঝে অতিমাত্রায় বিব্রত হ'য়ে পড়েন; বলেন: আমি পাগল হ'য়ে যাব; অথচ আমি কিন্তু মনে-মনে জানি তাঁর এই বিরক্তি-প্রকোপটা কিছু নয়, ওর দৌড় ঐ ভুরু-কোঁচকানো পর্য্যন্তই,—তাঁর চোখের প্রশান্ত কালোতে আমার জন্যে যে-স্নেহ সঞ্চিত হ'য়ে আছে, সেখানে এর আঁচ পৌছোয় না—সেখানে নিশিদিন অতল অচঞ্চলতা বিরাজমান।

মা আমার কোনো কাজ-অকাজেই বাধা দেন না—একেবারে হাত-পা-মন-খোলা চূড়ান্ত স্বরাজ। এমন মাকে ভালো না বেসে উপায় আছে?

হাঁ, শ্রদ্ধাও করি বটে একজনকে। তিনি আমার পিতা। কিন্তু সে শ্রদ্ধার প্রধান কারণ তিনি আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ঠিক আজকের মতোই তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারতুম, এ-কথা বিশ্বাস করি না। তিনি মরে' গেছেন, তাই আমি বেঁচে গেছি; তাঁর মৃত্যুর দ্বারাই আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠেছে; তিনি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মহাকালের অতলস্পর্শ গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছেন ব'লেই আমি জীবনের আলোছায়াচিত্রিত বিচিত্র পথে আমার চিহ্ন এঁকে যেতে পাচ্ছি। এ কি কম কথা? এমন পিতাকে যে-সন্তান শ্রদ্ধা না করে, তাকে কোনো মানুষ শ্রদ্ধা করে না।

বিনা পরিশ্রমে পিতার অর্জ্জিত সঞ্চয় আপনার প্রয়োজনে ক্ষয় ক'রতে পারছি একে আমার পরম সৌভাগ্য বলে' মেনে নিইনি। বরাবর এই আমি জেনে এসেছি যে আমার নিতান্ত স্বাভাবিক ন্যায়সঙ্গত 'মর্য্যাদ' অধিকারের সীমা আমি কখনো লঙ্ঘন করি নি। ঠিক এই রকমটি না হ'লেই যাবার পক্ষে হ'ত অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। আমাদের বাবারা যতই রাগ করুন, এ-কথা একশ'বার সত্যি যে কোনো ছেলে এবং কোনো মেয়েই নিজের ইচ্ছায় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। সুতরাং যিনি আমাকে অজানা শূন্য থেকে এই জানাশোনা মাটির উপর এনে দাঁড় করালেন, তিনি আমার বাঁচবার অত্যন্ত এলিমেণ্টারী প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে' গেছেন এতে তাঁরও কোনো বাহাদুরী নেই, আমারো চির-কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাকবার কোনো কারণ নেই। বাবা করেছেন তাঁর সামান্য কর্ত্তব্য—আমি পেয়েছি আমার ন্যায্য পাওনা।

আমার নিজের এমন কোনো শক্তি বা উৎসাহ নেই, যে আমার পুত্র বা কন্যার জন্যে আমার পিতার মতো পুঁজি-পাটা কিছু রেখে যেতে পারব। সুতরাং আমি বিবাহ করি নি। আমি চিন্তায় ও কাজে পুরোপুরি র‍্যাশ্‌ন্যালিষ্ট।

এই সব জিনিষ মোটা সহজবুদ্ধি ও স্বচ্ছ বাস্তবতার মানদণ্ডেই আমি পরিমাপ করে' থাকি। একটু জোর করে' ফু দিলেই জোলো ভাবালুতার দানাবিহীন আল্‌গা বাষ্পগুলি অতি সহজে জল হ'য়ে গলে' যায়। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী অসহ্য ছেঁদো কথা! বড়-বড় জোয়ান-জোয়ান সবল হাত-পা-ওয়ালা মানুষগুলি এই-রকম দু'-একটা সামান্য সামান্য হাস্যকর বচনের চাপে ফুটো বেলুনের মতো কেমন অনায়াসে চুপ্‌সে যায়—পঙ্গুর মতো হাত-পা'র ব্যবহার কেমন সুন্দর চোখ বুজে ভুলে যায়!

২

পাড়ার লোকেরা ভাবে আমার মতো সৌভাগ্যবান পুরুষ সংসারে খুব কমই আছে। তারা আমাকে ঈর্ষা করে। সে তো করবেই—সেটা তাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। আমি তাদের ঈর্ষাকে বেশ রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করি। ঘুম থেকে উঠেই ওদের মনে পড়ে আপিস; ময়লা দুর্গন্ধময় ন্যাকড়াটা হাতে নিয়ে সাতটার

মধ্যে বাজার না এনে দিতে পারলে আপিসের ভাত জুটবে না। কোনো রকমে একগাল মুড়ি কিংবা পয়সায়-পাঁচখানা-বিস্কুটের একটা টুক্‌রো কিংবা বড় জোর মাখম-ছাড়া একখণ্ড পাঁউরুটির সঙ্গে ছ'-আনা পাউণ্ডের জোলো একবাটি চা গিলে ছাতা বগলে ওরা যখন বেরিয়ে পড়ে, আমি তখন ল্যাজারাসের দামী খাটে নরম ধব্‌ধবে বিছানায় ফরাসী নেটের নিচে সিল্কের ওয়াড়-দেয়া বালিশে মাথা গুঁজে উপুড় হ'য়ে নাক ডাকাই; চাকরটা তিন চারবার করে' চা বদ্‌লে দিয়ে যায়, কেননা সাতটা থেকে দশটার মধ্যে যে-কোনো সময় ঘুম ভাঙ্‌তে পারে এবং ঘুম ভেঙেই হাতের কাছে গরম চা না পেলে ব্যাটাদের চাকরী থাকবে না জানে। কাপড় ছেড়ে নিচে নেমে দেখি বন্ধুরা একে-একে সব জুটেছে, আর গান্ধী, চণ্ডীদাস, রেসিং টিপ্‌স্ এবং নবাব অফ্ পাতাউদি নিয়ে বেশ ঘোরালো রকমের জটলা পাকিয়ে তুলেছে। বন্ধুরা জানে, ওদের কাউকেই সম্মান করি না এবং সবাইকেই অনুকম্পা করি; কিন্তু তবু ওরা আসে। আসবেই, কেননা আমিও জানি এবং ওরাও জানে যে, যতদিন ভাত ছড়াতে পারব ততদিন কিছুতেই কাকের অভাব হবে না। খুসি-মতো স্নান করি, খাই—ঘড়ি আমার উপর প্রভুত্ব করতে পায় না। আপিসে যাবার কুৎসিত প্রয়োজন নেই—দরকার হ'লে দিনে ঘুমাই, নতুবা পড়ি বা লিখি। সন্ধ্যাবেলা মাঝে-মাঝে সাহিত্যিক মজ্‌লিস্ বসে,—অর্থাৎ সাহিত্যিকরা আসেন আড্ডা দিতে এবং আড্ডা জমে নানারকমের অসাহিত্যিক বিষয় নিয়ে। কিন্তু সেও আমার খুসির উপর নির্ভর করে, কারণ প্রত্যেকটি সন্ধ্যা এমন করে' নষ্ট করে' দিলে চলে না—জীবনের মৌতাত সংগ্রহ করতে মধ্যে-মধ্যে বাইরে যেতে হয় এবং ফিরতে হয় অনেক রাত। সুতরাং পাড়ার লোক তো আমাকে ঈর্ষা করবেই।

আমার জীবনে একটা প্রবল নেশা আছে—লেখা এবং পড়া। প্রত্যেক মাসে বিস্তর বই কিনি—হুয়্যানের আমি বাঁধা খদ্দের—এবং সে সমস্ত বই মনোযোগ দিয়ে পড়ি। ভালো লিখ্‌তে পারি ব'লে সাহিত্যিক-মহলে নাম আছে, আর সম্পাদক ম'শায়রাও খুব খাতির করেন। এই অতিরিক্ত খাতিরের অন্যতম কারণ অবশ্য লেখার জন্য আমার কোনো মূল্য না-নেওয়া। সবাই জানে আমার টাকার দরকার নেই, আর যে-মূল্য আমাদের দেশের কাগজওয়ালারা দিয়ে থাকেন তা' দিতে তাঁদের লজ্জা না হ'লেও নিতে আমার লজ্জা করে।

আরো একটা নেশা আমার আছে। আমরা বারট্রাণ্ড রাসেলের মানস-পুত্র—সেক্‌স্ আমাদের কাছে Procreation-এর প্রতীক নয়, recreation-এর।

৩

রাস্তার ও-পারে পুরানো একতলা বড় বাড়ীটা অনেক দিন খালি পড়ে' আছে। ভাড়াটে আসে, ছ'-একমাস থেকে চলে' যায়, আবার খালি পড়ে। কেন জানিনে, বরাবর বা অনেকদিন কোনো ভাড়াটে এসে ও-বাড়ীতে থাক্‌তে পারে না। কিছুদিন থেকে দেখ্‌ছিলাম বাড়ীটার উপর সংস্কার-কার্য্য চল্‌ছে। সহজেই বোঝা গেল এ হচ্ছে কোনো নূতন প্রতিবেশী-আগমনের ভূমিকা।

ফাইভ্‌-ইয়ার প্ল্যান সোভিয়েট রাশিয়ার চেহারা কতখানি বদ্‌লে দিয়েছে, সে-সম্বন্ধে একটা বই খুব মনোযোগের সঙ্গে উপরে আমার পড়ার-ঘরে বসে' পড়ছিলাম এমন সময় মট্‌রু এসে বল্লে—"ও-বাড়ীতে কা'রা এল জানেন অশোক-দা?"

"কে রে?"—আমার মন ও চোখ রয়েছে বইয়ের উপর।

মট্‌রু বল্লে—"শ্যামপুকুর নারী-সংঘের নাম জানেন?"

"কৈ, নাম শুনেছি বলে' তো মনে করতে পাচ্ছিনে।"

"আপনি দেশের কোনো খবরই রাখবেন না তার কি হবে। ওরাই শ্যামপুকুর থেকে উঠে আমাদের পাড়ায় এল। ঐ দেখুন না বাড়ীর সামনে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে—শ্যামবাজার নারী-সঙ্ঘ।"

দেশের কোনো খবরই আমি রাখি না। আমার অজ্ঞতার জন্যে মট্‌রুর কাছে লজ্জা প্রকাশ করলুম। প্রসন্নচিত্তে সমস্ত ঘরময় অপার্থিব হাসির আলোক ছড়াতে ছড়াতে মট্‌রু নিচে নেমে গেল। ঠিক জানি না, হয়তো মার কাছে গেল। মাকে ও কিনেছে। খাবার নিয়ে, এটা ওটা দিয়ে ও মার সঙ্গে এমন সব আব্‌দার সুরু করে' দেয়, যা কেবলমাত্র মট্‌রুর পক্ষেই সম্ভব। অদ্ভুত

আমার এই প্রতিবেশী মটরু ছেলেটি। বারো-তেরো বছর বয়স, পড়াতে মন নেই, দেশের এমন কোনো খবর নেই যা ও জানে না, কাউন্টি ও টেষ্ট্ ক্রিকেট যারা খেলে তারা কে কয়টা সেন্চুরী করেছে, সে-সব একেবারে মুখস্থ, পিকেটিং করতে ওস্তাদ, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টদের নাম এক নিঃশ্বাসে বলে' যেতে পারে। মুখখানি সদা-প্রফুল্ল; আর এমন অকৃত্রিম সরলতা আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। আমরা যে ধনী আর ওরা যে গরীব সে জন্যে তার এতটুকুও সঙ্কোচ নেই। ওর চলাচল আমাদের বাড়ীতে অবাধ, এমন কি আমার পড়ার ঘরে পর্য্যন্ত। আমাদের বাড়ীর এবং মার হৃদয়ের অন্তঃপুরে ও কবে যে কি রকম করে' প্রবেশ করল তা টেরই পাওয়া গেল না।

রাস্তার উপরকার বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। মটরু সত্যিই ব'লছে—বেশ বড়গোছের একটা লম্বা কালো সাইনবোর্ড, তার উপরে সাদা রং-এ লেখা আছেঃ শ্যামবাজার নারী-সঙ্ঘ। বাড়ীর ভেতর একটা বড় উঠোন্ আছে, তার কিছুটা আমার বারান্দা থেকে দেখা যায়। দেখলুম অনেক মেয়ের ভিড়। সবাই কাজে ব্যস্ত—এ-ঘর ও-ঘর করা, জিনিষপত্র গোছানো, উঠোন পরিষ্কার করা। দেখলুম লাঠি-খেলা, ছুরি-খেলা এ সবেরও আয়োজন আছে। মনে হ'ল কুমারী, বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা সব রকমের মেয়েই আছে। তাদের কেউ বা হৃতগৌরবা, কেউ বা স্ফুটনোন্মুখ কলিকা, কেউ বা যৌবনমধ্য-গগন-চারিণী।

অস্বস্তি লাগে। এতগুলো মেয়ের একত্র সমাবেশের মধ্যে চোখ তার আরাম হারিয়ে ফেলে। আমার খাবার টেবিলে ফলদানিতে যখন দুটো আম বা তিনটে আপেল বা চারটে ম্যাঙ্গোষ্টিন্ দেখি তখন বেশ লাগে; দোকানে ফলের স্তূপ দেখ্‌লে খাবার ইচ্ছে যা খেয়ে ফেরে। বিশেষ করে' এই সঙ্ঘ-সমিতি প্রভৃতির নাম শুন্‌লে আমার গা' জ্বালা ক'রতে থাকে। আর তার সঙ্গে যদি নারীর সংস্রব থাকে তবে তো কথাই নাই। আমাদের দেশের মেয়েরা একসঙ্গে মিলে কোনো কাজ করতে পারে এ-কথা বিশ্বাস করবার বয়স আমার অনেক দিন চলে' গেছে।

৪

মটরু এরি মধ্যে নারী-সঙ্ঘে যাতায়াত সুরু করে' দিয়েছে। বাতাসের মতো ওর গতি কি সব জায়গায়ই অপ্রতিহত?

বেলা চারটে আন্দাজ হবে। ঘুম ভেঙেছে অথচ ভাঙেনি; নিদ্রা-জাগরণের এই প্রদোষকালে আপনাকে এবং বাইরের জগৎকে আব্‌ছায়ার মতো আমার অবচেতনায় অনুভব করতে পাচ্ছি এমন সময় মটরু এসে খবর দিলে—"অশোক-দা, কাল সকালে তরুদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আপনি বাড়ী থাকবেন তো?"

চোখ না মেলে এবং ভাঙ্গা গলায় বল্লুম—"তরুদি আবার কে রে? কল্‌কাতার সব লোকই কি তোর চেনা?"

মটরু হাস্‌তে লাগ্‌ল: "বাঃ, তরুদিকে জানেন না! তরুদিকে আমাদের পাড়ার কে না চেনে! উনিই তো শ্যামবাজার নারীসঙ্ঘের সেক্রেটারি। চমৎকার মানুষ, অশোক-দা। আমাকে খুব ভালোবাসেন। বলেছেন ওঁকে নিয়ে আমায় বাড়ী বাড়ী যেতে হবে চাঁদা আদায় ক'রতে। চাঁদার উপরেই ওঁদের সব চলে কিনা। তরুদির ছ'-মাসের জেল হয়েছিল জানেন? সঙ্ঘের মেয়েরা কি চমৎকার লাঠি এবং ড্যাগার খেলে, কি বল্‌ব আপনাকে অশোক-দা। আপনি দেখ্‌বেন? আচ্ছা আপনাকে একদিন নিয়ে যাব…"

"পালা' পালা'। এত বক্‌র্—বক্‌র্ ক'রতে পারিস্! পালা', ডেঁপো ছোঁড়া।"

মটরু পালাল। সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্লে: "কাল সকালে কিন্তু তরুদিকে নিয়ে আসব অশোক-দা।"

ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বল্লুম: "ঐটি কিন্তু করোনা মটরু, ভীষণ মা'র খাবে বলে' দিচ্ছি।"

কার কথা কে শোনে। তরুদিকে নিয়ে মটরু ঠিক এসে হাজির। ভীষণ মা'র দেওয়া হ'ল না।

কাগজ পড়্‌তে পড়্‌তে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বিধবাবেশিনী তরুদিকে পাশের ঘরে নিয়ে

গেলাম। নমস্কার ও ভদ্র-সম্ভাষণ বিনিময়ের পর নারী-সঙ্ঘের সেক্রেটারি আমার হাতে একটি ছাপানো কাগজ দিলেন। লেডী বোস্, লেডী মুখার্জ্জী, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির নামে পাব্লিকের কাছে আবেদন: দেশহিতে আত্মনিবেদিতপ্রাণ তরুলতাদেবী ও তাঁর সহকর্ম্মিনীদের মহতী প্রচেষ্টাকে সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা যেন সফল ও সার্থক করে' তোলা হয়।

তরুলতাকে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে বল্লুম: "আপনাদের কাজে আমার সহানুভূতি নেই, আর কোনো আর্থিক সাহায্য আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

তরুলতার মুখ দেখে মনে হ'ল এমনতরো কথা জীবনে এই তিনি প্রথম শুন্লেন। অথই জলে ডুবে যাচ্ছেন, বাঁচার জন্যে মটুরু-তৃণের দিকে হাত বাড়ালেন। মটুরু ততক্ষণ রাস্তায়।

সাধারণ মেয়ে হ'লে এর পর নমস্কার করে' উঠে যেতেন। বুঝ্লুম তরুলতা সাধারণের একটু উপরে, যখন তিনি বল্লেন: "আপনার যদি সময় থাকে এ-সম্বন্ধে আমি একটু আলোচনা ক'রতে চাই।"

বল্লুম, "সময় আমার প্রচুর, কেননা টাকা আমার অপ্রচুর নয়। কিন্তু এ-আলোচনাতে তর্ক ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না।"

তরুলতা বল্লেন, "তর্কটাই কোনো-কোনো সময় একটা মহালাভ।" তরুলতার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ল। নীর ছেড়ে এবার তীরে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন।

বল্লুম, "আপনি যদি লাভ মনে করেন তা'তে আমার কোনো ক্ষতি নেই।" দু'জনেই হেসে উঠ্লাম।

তরুলতা বল্লেন, "আমাদের কাজে আপনার সহানুভূতি নেই কেন তা' না জান্লে আমার পক্ষে কোনো আলোচনা করা মুস্কিল।"

আমি বল্লুম "প্রথমত, আপনাদের কি কাজ তা' আমি জানি নে। দ্বিতীয়ত, মেয়েরা একসঙ্গে মিলে সত্যিকার কোনো কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি নে। তৃতীয়ত, আমাদের মেয়েদের আসল গলদ কোথায় তা' বোঝবার মতো শক্তি মেয়েদের নেই। আশা করি আপনি রাগ কচ্ছেন না,—আমার কথা বলবার ভঙ্গীটা বড় বিশ্রী—বড় ধারালো, ঝাঁঝালো, অপরিচিত কানে অনেক সময় অভদ্রতা-ঘেঁসা শোনায়।"

তরুলতা সবল প্রতিবাদ করে' জানালেন তিনি কিছু মনে কচ্ছেন না; বল্লেন, "দশজনের অনুগ্রহের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, অনেক সময় অনেক রূঢ় কথা শুন্তে হয়, তা' নিয়ে রাগ করলে কবে কাজ বন্ধ ক'রতে হ'ত। কিন্তু মেয়েরা সত্যিকার কোনো কাজ করতে পারে না এ-ধারণা কি করে' আপনার হ'ল?"

বাঃ বেশ তো কথা ব'লতে পারে শ্যামবাজার নারীসঙ্ঘের সেক্রেটারি। ভালোই তো লাগ্ছে মেয়েটিকে—শাদা খদ্দরের নিরাভরণ বিধবা বেশ, মাথা-ভরা কালো চুলগুলির মধ্যে একটা অনাঘ্রাত সুরভি, বুদ্ধি-প্রদীপ্ত সুন্দর মুখখানির মধ্যে কিসের যেন সুকোমল বিনম্র আহ্বান, সমস্ত দেহখানি ঘিরে আছে সুদৃঢ় সুগঠিত যৌবনের ললিত সঞ্চয়।

আমি বল্লুম, "কাজের মতো কাজ ক'রতে হ'লে যে বুদ্ধির দরকার তা' মেয়েদের নেই। আপনার সংঘের মেয়েরা কি করে জান্তে পারি?"

তরুলতা এক নিঃশ্বাসে বলে' গেলেন, "চরকা কাটা, তাঁত বোনা, রং করা, শেলাই শেখা, আরো নানা রকমের শিল্প কাজ, স্বদেশী ব্যবহার করা এবং করানো—"

"বুঝ্তে পেরেছি", আমি বল্লুম, "জেলে যাওয়া, হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক্ করা, জেল থেকে মুক্তি পাওয়া, বিয়ের চেষ্টা করা, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া—"

"আপনি মেয়েদের বড্ড বেশি ছোটো করে' দেখেন।"

"অনর্থক বড় করে' দেখলে আপনারা খুসি হ'ন জানি, কিন্তু তা'তে খুসি-করা ছাড়া আপনাদের আর কোনো উপকারই করা যায় না। এই ধরুন, যে কাজের লিষ্টি দিলেন, এতে আপনারা ত্রিভুবনে কার কি উপকারে আসবেন? এই যে মেয়েগুলোকে নাচাচ্ছেন, এ একেবারে ব্যর্থ—ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।"

তরুলতা একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "আপনার কথা শুধু অসঙ্গত নয়, অশোভন। নাচাচ্ছি মানে? ভেতরকার কোনো কথা না জেনে আপনি যা' বলচেন তাই আমি মেনে নেব!"

অথচ এই তরুলতা দেবী খানিক আগেই বল্লেন রূঢ় কথায় রাগ করলে ওঁদের চলে না। বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছেন আমার কথা শুনে। তা' জ্বলুন, আমিও আজ সহজে ছাড়ছিনে, দেখি কত তর্ক করতে পারেন। যে খেল্‌তে চায় তাকে খেলাব না কেন?

বল্লুম, "আচ্ছা ধরুন, আপনারা যে পিকেটিং করতে বাজারে যান, কেন, কী উদ্দেশ্যে?"

উনি শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বল্লেন, "অনেক অন্ধ পুরুষ আছে যারা চোখ থাকতেও চাইবে না, তাদের চোখ খুল্‌তে।"

বল্লুম, "ওতো গেল রাগের কথা। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কখনো কেন মানুষ বিলিতি কিন্‌তে চায়?"

"মোহ, তা' ছাড়া আবার কি!"

"তা ছাড়াও অন্য কারণ আছে। কিন্তু তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম মোহ। যে-মনে মোহ জন্মে সে-মন বদ্‌লাবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন?"

তরুলতা চুপ করে' রইলেন। বল্লুম, "পিকেটিং করা না শিখিয়ে আপনার মেয়েদের অন্য শিক্ষা দিন যা'তে ওরা মা হ'তে পারবে এমন সব ছেলে-মেয়ের, যারা জন্মাবে সংস্কার ও মোহমুক্ত মন নিয়ে।"

তরুলতা বল্লেন, "ঘরে বসে' প্ল্যান করা অনেক সোজা অশোকবাবু, কিন্তু কাজে নাব্‌লে দেখা যায় অনেক বাধা।"

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "সে বাধা যদি অতিক্রম করতে না পারেন তবে আপনার আবেদন-পত্র নিয়ে খবরের কাগজের আপিসে যান, সম্পাদক মশায়রা সসম্ভ্রমে মুখে বিনীত হাসি টেনে চেয়ার থেকে উঠে অভ্যর্থনা করবেন, এক ইঞ্চি মোটা টাইপে ডবল কলমে 'তরুলতা দেবীর মর্ম্মস্পর্শী আবেদন' বলে' আপনার বক্তব্য ছাপাও হবে, এমন কি যদি ইচ্ছে করেন তবে ওর সঙ্গে আপনার ছবিও বেরুতে পারবে এবং এক কলম লম্বা গুরু-গম্ভীর সম্পাদকীয় মন্তব্য। পরদিন সকাল বেলা কাগজ খুলে আপনার খুসি আর ধরবেনা, এবং সমস্ত কল্‌কাতা সহরে সাড়া পড়ে' যাবে যে এই তরুলতা দেবী।"

তরুলতা দাঁড়িয়ে পড়েছেন, "সাহায্য আপনি না করতে পারেন, কিন্তু অপমান করবার আপনার কোনো অধিকার নেই।"

"অপমান আপনাকে করতে চাই নি। চাঁদা দেওয়া আমার স্বভাব ও রীতির বিরুদ্ধে, তাই আপনাকে বোঝাতে চাইছিলুম। কংগ্রেসের অনেক বড় বড় পাণ্ডাকেও আমি ফাঁকি দিয়েছি।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

(৫)

দুঃখ হ'তে লাগল। দুটো টাকা ফেলে দিলেই হ'ত। সেই লোভে হয়তো আবার একদিন আস্‌ত। ধনুক থেকে তীর ছেড়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনবার মন্ত্র তো জানিনে।

পরদিন মট্রু এসে বল্লে, "তরুদি আপনার উপর ভয়ানক চটে গেছেন। আপনি নাকি তাঁকে অপমান করেছেন।"

আমার কৌতূহল চাড়িয়ে উঠ্‌ল, "কী বলেছে রে মট্রু।"

"বল্লেন, লোকটার সুধু টাকাই আছে, আর কিছু নেই। সত্যি আপনার ভারি অন্যায় অশোক-দা। দু'-একটা টাকা চাঁদা দিলে কি-ই বা আপনার লোকসান হ'ত!"

"মট্রু, একটা কাজ করতে পারবি?"

হ্যাঁ, কী না পারে মট্রু। কি কাজ না জেনেই লাফাতে সুরু করে' দিলে।

পকেট থেকে পঁচিশটে টাকা বার করে' মট্রুর হাতে দিয়ে বল্লুম, "তোর তরুদিকে দিয়ে আয়। কি বলে আমাকে এসে জানিয়ে যাবি।"

একটু পরেই মট্রু ফিরে এল। টাকাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে, "নিলেন না!"

"কি বল্লেন?"

"বল্লেন, তোমার অশোক-দাকে ব'লো, ছোটলোকের টাকা আমরা নিই না।"

বটে!

যে মানসিক শক্তি থাক্‌লে শারীরিক বাজে-খরচ গণনার মধ্যে আসে না, তার অভাব বোধ করছি। তাই মাঝ-রাস্তা থেকে বাড়ী ফিরতে হ'ল। একবার বেরিয়ে আটটার মধ্যে বাড়ী ফেরা আমার জীবন-চরিতে বড় স্থান পাবার মতো ঘটনা।

হঠাৎ কি মনে হ'ল, বরাবর মার শোবার ঘরে উপস্থিত হ'লাম। মা তো একেবারে অবাক্। এত সকালে ফিরে এলাম, আমার কি অসুখ করেছে?

আমি হ'য়ে গেলাম আরো অবাক্, প্রায় হতবুদ্ধি। মা এবং তরুলতা পাশাপাশি মার খাটে বসে আছেন। বিনা কাজে ঘরে অপেক্ষা করতে লজ্জা কচ্ছিল, বিনা বাক্যে চলে' যেতে আরো লজ্জা হ'ল। ও এরই মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ করেছে, আমি হতভাগ্য তার কোনো খবরই রাখি না।

তরুলতার মুখের উপর এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখটাকে বুলিয়ে নিয়ে মাকে বল্লুম, "না মা, অসুখ করেনি, তবে আজকালকার পৃথিবীতে সুখই বা কোথায় পাওয়া যাবে বল। ভাব্‌ছি একটা আশ্রম টাশ্রম করলে মন্দ হয়না।"

তরুলতার চোখ বল্লে আমার কথার ধ্বনি তার মনের অনেক নিচে গিয়ে পৌঁছেচে। বল্লুম, "আপনার বাহনটিকে দেখ্‌ছি না যে!"

তরু বল্লেন, "মার কাছে আস্‌তে বাহন লাগে না, নিজেই আসা যায় এবং পথ অত্যন্ত সোজা।"

বল্লুম, "এই আবিষ্কার যদি সময় মতো হ'ত তবে মিছেমিছি বিপথে যেতে হ'ত না।"

জবাব দিলেন মা। "হাঁরে অশু, চাঁদা চাইতে এসেছিল বলে' তুই নাকি সেদিন তরুকে অপমান করেছিস?"

অতি সহজেই বল্‌তে পারলুম, "হাঁ।"

তরুলতা উস্‌খুস্ কচ্ছে। যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই মা ওর হাত ধরে' বসিয়ে দিলেন। আমাকে বল্লেন, "ও তোর বড্ড অন্যায়। কি চমৎকার মেয়ে, দিনরাত দেশের কাজে ব্যস্ত। তোরা যদি সাহায্য না করবি তো ওরা কাজ করবে কি হাওয়া খেয়ে। আমি ওদের কাজ দেখে এসেছি।"

মার তোরঙ্গের উপর বসে পড়ে' বল্লুম, "অপমান করে' থাক্‌তে পারি, অন্যায় করিনি। (বেশ টের পাচ্ছি তরু আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে) আর অপমান অনেক সময় টনিকের কাজ করে—আত্মমর্য্যাদাবোধকে চেতিয়ে তোলে।"

তরু মুখ খুল্‌লে, "আত্মমর্য্যাদার অভাব কোথায় দেখ্‌লেন?"

এ-প্রশ্ন করবার অধিকার তরু দাবী করতে পারে বটে। আমার টাকায় ও সেদিন লাথি মেরেছে। তবু বল্লুম, "ভিক্ষাবৃত্তিতে মর্য্যাদা বাড়ে এই প্রথম শুন্‌লুম আজ। এতে কোনো বড় কাজই হ'তে পারে না।"

তরু বল্লে, "আমরা সবা'র ভিক্ষে তো নিই না।" আমার মুখের চেহারা কেমন হয় দেখ্‌তে তরু আমার দিকে তাকাল।

মা বল্লেন, "প্রত্যেক বড় কাজই গোড়ায় ছোটো থাকে।"

"মুস্কিল এই—ওঁদের কাজ চিরকালই ছোট থাকবে, কোনো দিন বাড়বে না।"

তর্কের কোনো মীমাংসা হ'ল না—কোনো তর্কেরি হয় না। কিন্তু একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা গেল। মা এবং মটুরু এবং আমাদের নারী-সঙ্ঘের সেক্রেটারি তিন-জনে মিলে যাতায়াত, আদান-প্রদান এবং স্নেহবিনিময়ের সমুদ্র মন্থন করে' সুধাপাত্র ক্রমশই পূর্ণ করে' তুলছেন; কিন্তু বিষভাণ্ড নিঃশেষে পান করবার সময় দেখা যাবে আমি নীলকণ্ঠ ছাড়া আর কেউ তা'তে চুমুক দেবে না।

আরো কয়েক দিন যেতেই নিঃসংশয়ে বুঝে নিলাম নারী-সংঘের সীমানা রাস্তা অতিক্রম করে' আমার অন্তঃপুরের দিকে গুটি-গুটি পা বাড়াচ্ছে, এবং এই নিঃশব্দ অভিযান এবং নিস্তব্ধ ক্রমশঃ-অধিকার-বিস্তারের মধ্যে হৃদ্‌স্পন্দনহীন রক্তমাংসশূন্য কেবল নিরাকৃতি একটি সংঘেরই আভাস পাওয়া গেল, আর কারো নয়, এবং আর কিছুরি নয়। তরুলতার বুদ্ধির 'পরে শ্রদ্ধা হ'ল,—ও জানে স্ফীতকায় গাছের গুঁড়িটা যদি কেবলি ভ্রূকুটি করতে থাকে, তবে তা'তে সাহস হারাবার কিছু নেই, সন্তান-স্নেহভারনত মায়ের আঁখিপল্লবের মতো গাছের যে-শাখাটি মাটির দিকে ঝুঁকে আছে গাছে চড়ার কাজে তা'কে অনায়াসে ব্যবহার করা চলে।

কখনো রাস্তায়, কখনো আমার বাড়ীর আঙিনায়, কখনো বা মার শোবার ঘরে তরুলতাকে দেখতে লাগলুম। যে সামান্য চোখ চাওয়া-চাওয়ি হয় তা'তে তার দৃষ্টিতে যুদ্ধবিজয়ের গর্ব্বদৃপ্ত অহঙ্কার চৌঘুড়ি চালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এতো আমার মতো মানুষের পক্ষে চোখ বুজে এবং মনকে শাসিয়ে সহ্য করা অত্যন্ত সুকঠিন ব্যাপার। আমারি আঙিনায় এবং আমারি চোখের সুমুখে নিটোল যৌবনের পরিপূর্ণ বর্ণাঢ্য পেয়ালাটি সৌরভ বিকীর্ণ এবং মায়াজাল বিস্তারিত করে' ঘোরাঘুরি করবে, আর আমি উদগ্র অসহনীয় পিপাসা নিয়ে শৃঙ্খলিত অসহায়ের মতো নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কৃত করব, তা কোনো-মতেই হ'তে পারে না,—না, কোনোমতেই নয়।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে পড়বার ঘরে একটা শোফায় শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের সব চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা কি সেইটেই জানবার আকাঙ্ক্ষা কচ্ছিলাম। মনের এই বিগলিত কল্পনা-বাষ্পার্দ্র অবস্থা অনেক সময়ই একটা মানসিক বিলাস, এ কিছু নয় জানি, তবু কোনো বিশেষ সময়ে কোনো বিশেষ ঘটনা-সংস্থানে এই কিছু নয়ই হঠাৎ একটা মস্ত-কিছু হ'য়ে দাঁড়ায়।

"মা! মা আছেন? উপরে মা আছেন?"—কণ্ঠস্বর সিঁড়ি বেয়ে আস্তে-আস্তে উপরে উঠে আসছে। তরুলতার উচ্চ কণ্ঠস্বর কখনো শুনিনি, কিন্তু তবু বুঝতে পারলুম—না,—না, বোঝা ঠিক নয়, রক্তালোড়িত চিত্তে আশা করতে লাগলুম—এই ক্রমশ-পুরঃস্ত্রিয়মান কণ্ঠ যেন তরুলতা ছাড়া আর কারো না হয়।

পর্দ্দা ঠেলে বেরিয়ে আলো জ্বেলে বল্লুম, "এই যে আসুন।"

তরুর চেহারা দেখে মনে হ'ল আমার অনুপস্থিতিতে এ-বাড়ীর সব ঘরেই তার যাতায়াত চলে এবং ও ভাবতেই পারেনি যে উপরে অন্ধকারে আমি চুপ করে' বসে আছি এবং এমন সময়ে।

অপ্রতিভ তরু বল্লে, "মা আছেন? মা—মাকে—"

অপ্রতিভ হ'লে অধিকাংশ মেয়ের মুখেই একটা নিরেট নির্ব্বুদ্ধিতা ঘনিয়ে ওঠে,—তরুর অপ্রতিভতা-র মুখের আকাশে রচনা করলে সম্মোহনের একটি রঙিন সূর্য্যোদয়।

বল্লুম, "মা মাসির বাড়ী গেছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি আছেন। অতএব বসুন।"

নিরাপত্তি নিরাগ্রহে খাটের পাশের চৌকিটাতে তরু এমন ভাবে ব'সল যে মার অনুপস্থিতিটা যে ওর পক্ষে একটা নিদারুণ আশা-ভঙ্গের কারণ হ'ল এমন কথা মনে করতে পারলুম না।

"প্রতিনিধি না হাতী! আপনি মার পা-ছোঁবারো যোগ্য ন'ন।"—তরুর চিত্তলোভন সকৌতুক অচ্ছ হাসিতে সমস্ত ঘরটা যেন গান গেয়ে উঠল।

হাসিতে যোগ দিয়ে বল্লুম, "পায়ের প্রতি আমার লোভ নেই, আমি মানুষের মন ছুঁতে চাই।"

"সে আপনার কর্ম্ম নয়। মার কাছে এলে মনে হয় যেন অনন্ত আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"আর আমার কাছে এলে?"

একটু থেমে তরু বল্লে, "সত্যি কথা যদি শুনতে চান তো বলব—প্রকাণ্ড ধূমকেতুর একটা পুচ্ছাংশ আপনি।"

"আপনার কি গায়ে তাত লাগছে এবং মনে হচ্ছে অমঙ্গলে-ভরা একটা খণ্ড-প্রলয়ের আর বেশি দেরি নেই?"

কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে তরু বল্লে, "আপনার কোনো ওজর আমি শুনব না,—আমাদের কাজে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে।"

বল্লুম, "মাকেই তো পেয়েছেন, আমাকে আর কেন।"

"আপনাকেও চাই। ডবল এঞ্জিন না হ'লে আমাদের কাজের রথটিকে সার্থকতার শিখরে টেনে তোলা যাবে না।"

হেঁয়ালিপনায় পরাজয় স্বীকার করবার মানুষ আমি নই; বল্লুম,—"একটা এঞ্জিন থেকেই যে-পরিমাণে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তাতেই লোকনিন্দার মৌচাকে বিষম সোরগোল পড়ে গেছে। মৌমাছিগুলো এরি মধ্যে হুল ফোটাতে সুরু করেছে।"

তরু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। আমার বাড়ীতে তরুর যাওয়া-আসা নিয়ে বন্ধুমহলে আমাদের দুজনকে নিয়ে যে সমস্ত কথা রটেছে সেগুলিই একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বল্লুম।

"কাছে এলেই যে সব কথা মনে আনতে হবে তার কোনো মানে নেই। চলুন আপনার লাইব্রেরিটা দেখে আসি—" বলে' তরু উঠে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

ওর মুখটা সেই মুহূর্ত্তে দেখ্‌তে পেলুম না, কিন্তু ওর মনটার উপর সেই মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত সূর্য্যালোক সংহত হয়ে এসে পড়ল এবং আমি অত্যন্ত স্পষ্ট করেই দেখ্‌তে পেলুম মায়ের বুকের ভয়ের মতো ওর মনটা কাঁপছে।

আলমারিগুলো খুলে দিলাম। তরু একমনে বইগুলো ঘাঁটছে, মাঝে-মাঝে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস কচ্ছে, দু'-একখানা বই আলাদা করে টেবিলের উপর রাখছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছি ওগুলি ও পড়তে নেবে। কি করে' বোঝাই ওকে যে সবগুলি বই ওকে দিয়ে দিতে পারি, অনেক কাজ করতে পারি ওর আশ্রমের জন্যে, অনেক টাকা ব্যয় করতে পারি ওর পরোপকারের খামখেয়ালি তৃপ্ত করতে।

বই-দেখার ফাঁকে ফাঁকে তরু তার আশ্রমের দুর্দ্দশার কথা ব'লতে লাগল। ভাড়া দেওয়া হয়নি, বাড়ীওয়ালার দারোয়ান এসে কাল কত কথা বলে গেছে সে কথাও আমাকে জানালে।

হঠাৎ বলে' উঠলুম,—"আচ্ছা তরু দেবী, আপনি ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বিশ্বাস করেন?"—প্রশ্নটা তরুর কানে খাপছাড়া শোনাল হয় ত। ও মানে জানতে চাইলো।

বল্লুম,—"এই ধরুন আপনার নারী-সঙ্ঘ। আপনার সঙ্ঘ আমার কাছে অর্থহীন—ওটা আমার কাছে একটা আইডিয়া মাত্র, কিন্তু আপনি আমার কাছে বাস্তব।"

মনে হ'ল তরু যেন একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল, বল্লে, —"হ্যাঁ, তাই কি?"

উত্তর দিলুম, "ঐ ঝাপ্‌সা আইডিয়ার জন্যে আমার মতো মানুষ কিছুই করতে পারে না। আপনার মধ্যে ঐ সঙ্ঘ-আইডিয়ার প্রতীককে দেখ্‌তে চাই। আপনার সঙ্গে যদি সত্যিকার কোনো মানব-সম্বন্ধ কখনো প্রতিষ্ঠিত হয় একমাত্র তখনই হয় তো আমার দ্বারা কোনো কাজ সম্ভব হবে।"

ব'লতে ব'লতে একটা আল্‌মারি বন্ধ কচ্ছিলাম। আল্‌মারির একটা দরজা একেবারে সুইচে গিয়ে ঠেকেছে; দরজাটা টানতেই হাত লেগে আলোটা নিভে গেল।

ষোলো বছরের মেয়ের মতো ভয় পেয়ে তরু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—"এ কি কাণ্ড! আলো নেবালেন কেন? জ্বালুন, জ্বালুন শীগ্‌গির।"

সেই মুহূর্ত্তে, সত্যি বল্‌তে কি, আমার লোভ ছিল প্রচুর, কিন্তু দুরভিসন্ধি একটুও ছিল না। ওর ঐ কুৎসিত চীৎকারে আমার রাগ হ'ল, এবং লোলুপতার সরীসৃপটা তার লালাসিক্ত সর্পিল জিহ্বাটা লক্‌-লক্‌ করতে করতে এক মুহূর্ত্তে উপরে উঠে কখন যে আমার মনকে রাগলেশহীন করে' দিল, তা টেরই পাওয়া গেল না।

যেখানে ছিলাম নির্ব্বাক হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভয়-ক্ষিপ্র অধীর পদক্ষেপে তরু নিজেই আলো জ্বালাতে এল এবং একেবারে আমার গায়ের উপর এসে পড়ল। আমার হাতের আঘাতে আলমারির কাচ ভেঙে গেল এবং খান্‌-খান্‌ শব্দে মেঝেয় পড়ে ঘরের অন্ধকারকে মন্দ্রিত করে' তুলল।

কাচ ফুটে আমার হাত কেটে গেছে, আঙুল বেয়ে রক্ত টপ্‌-টপ্‌ করে নিচে পড়ছে, অন্ধকারেও তা' বুঝতে পাচ্ছি। আমার রক্তাক্ত হস্তের অমিতবল মুঠির মধ্যে তরুলতার কম্পিত হাত। অন্য হাতে পকেট থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট বার করে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লুম,—"তরু, এই নাও টাকা, বাড়ী-ভাড়া দিয়ো; আরো পাঁচশো চাও তো কাল দেব, কেবলমাত্র—"

গোখ্‌রো সাপের মাথা মাড়িয়ে দিয়েছি,—তরু রাগে কাঁপতে লাগল। "অশোকবাবু, আপনার টাকা আছে, তবু আপনার মুখের উপর বল্‌ছি আপনি ছোটলোক, আপনি জানোয়ার, ব্রুট্‌—" বলে একটানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমাকে লাথি মারলে এবং অন্ধকারকে মথিত এবং পাঁচশো টাকার নোট, ভাঙ্গা কাচ ও আমার উন্মত্ত লালসাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওর পেছনে পেছনে আমিও বাইরে এলাম। সিঁড়ির মাথায় মাকে দেখে তরু থম্‌কে দাঁড়িয়েছে।

মা বল্লেন,—"এ কি তরু! তোমার কাপড়ে যে রক্ত!"

ওকে আর কথা বল্‌বার সুযোগ দিলাম না। "নাঃ

জেনেশুনে সব ছোটলোকদের এ-বাড়ীতে তুমি কেন ঢুকতে দিয়েছ মা। কী সাংঘাতিক মেয়ে! এমন কাজ নেই যা এরা না করতে পারে।"

মা অস্থির হয়ে পড়েছেন, "কি হয়েছে রে অশু?"

কষ্টে শ্বাস নিতে নিতে বল্লুম, "হবে আর কি! ব'লতে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তুমি বাড়ী নেই, আর এই সুযোগে উপরে উঠে এসেছে। নির্লজ্জের মতো টাকার লোভে আমার কাছে কি জঘন্য প্রস্তাব করলে। শেষকালে গ্লাস ছুঁড়ে আমার হাত কেটে দিয়ে পালাচ্ছে!"

মা সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বল্লেন, "ও মা কী কেলেঙ্কারি! আমি পাড়ায় মুখ দেখাব কি করে'! বেরিয়ে যাও, ডাইনী মেয়ে। ফের এ-বাড়ীতে ঢুকবে তো দেখবে মজা!"

তরু একটা প্রতিবাদ করতেও লজ্জায় মরে গেল। দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না।

আগাছার শিকড়-সুদ্ধ তুলে ফেলাই ভালো। পরদিন পুলিসকে গোপনে খবর দিলাম! রাত তিনটে থেকে ভোর অবধি নারী-সঙ্ঘে জোর খানাতল্লাস চল্ল। হয়তো সন্দেহজনক কিছু পেয়ে থাকবে। তরুলতা ও আরো দু'জন মেয়েকে গ্রেপ্তার করে' নিয়ে গেছে। বে-আইনী ঘোষণা করে' সঙ্ঘও ভেঙ্গে দিলে।

তরুলতা এখন কোথায়, কে জানে। হয় তো জেলে বসে' প্রতিদিন আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। হয় তো বা এতদিন খালাস পেয়ে আবার একটা সঙ্ঘ গড়ে' তুলেছে—বাড়ী-বাড়ী চাঁদা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

৬

এক হাতে চা অন্য হাতে খাবার নিয়ে মা এসে ডাকছেন—"ওঠ্ বাবা, পাঁচটা যে বাজে, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

শীতান্ত-কালের অপরাহ্নে আপনার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছি, মা আমার পাশে খাটে এসে বসেছেন, মার নিজের হাতের তৈরি চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে মনে একটা উপচীয়মান মন্থর আরাম ঘনিয়ে এসেছে।

মা হঠাৎ এক সময়ে বলে' উঠ্লেন, "ভয়ে-ভয়ে তোকে একটা কথা বলি। কল্‌কাতায় আর ভালো লাগ্‌ছেনা, আমাকে একটু তীর্থ করিয়ে আনবি।"

আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠ্লাম: "মা, তুমি একেবারে আমার মনের কথা টেনে ধার করেছ। অনেকদিন বেরুনো হয়নি। চল, কালই চল।"

মা অবাক্ হ'য়ে গেলেন। এত সহজে রাজি হব, তা' সত্যি তাঁর ধারণাতীত ছিল।

গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল; প্রয়াগ, অযোধ্যা শেষ করে' হরিদ্বারে এসে আস্তানা গাড়া গেছে। আমার এবং মার দু'জনেরই ইচ্ছে কিছুদিন এখানে থাকি। গঙ্গার উপর একটা বাড়ী পাওয়া গেছে। নিরতিশয় আরামে গা-হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছি। গঙ্গার খরস্রোত, তিন দিকের পাহাড়, হিমালয়ের হাতছানি, স্থানটির স্মরণাতীত কালের প্রাচীনতা, সব মিলে ঘুমপাড়ানি গানের মতো আমার মনের উপর কাজ করছে।

কিন্তু আমার মতো বেয়াড়া মন কতদিন ঘুমিয়ে থাক্‌তে পারে? এতদিন ছিল পথ-চলার নেশা—অন্য কিছু ভাব্‌বার অবসর ছিল না। হরিদ্বারের নেশাও এবার ছুট্‌তে সুরু করেছে। মা তো সন্ধ্যাহ্নিক, গঙ্গাস্নান, বিল্বকেশ্বর, আর ব্রহ্মকুণ্ড আর হরি-কি-পাড়ি নিয়ে বেশ আছেন, কিন্তু আমার চিত্তে যে কল্‌কাতার ফেনিলোচ্ছল বাসনা-চঞ্চল সন্ধ্যাগুলি মাঝে মাঝে অতর্কিতে আঘাত করতে আরম্ভ করেছে, তার প্রতীকার হিমালয়ের এই শুষ্ক কঠিন প্রান্তদেশে কী করে' মিলবে?

কন্থলে বেড়াতে গেছি। সতীঘাটের একেবারে নিচের সিঁড়ীতে বসে' আছি—চোখ দুটো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অগভীর জলের প্রবল স্রোত, নানা রং-এর নুড়ি, ওপারের পাহাড় ঘেঁসে কাংড়ী—গুরুকুলের পথ, তীর্থযাত্রীরা সিঁড়ি বেয়ে নাব্‌ছে ও হাত-পা ধুয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে, একটা কুকুর জলের তোড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এপারে এসে পৌঁছুলো, কতগুলো চিল মাছের আশায় মধ্য-চড়ার পাণ্ডার মতো ওৎ পেতে আছে—এম্‌নি সব টুক্‌রো-টুক্‌রো দৃশ্য উদাসীন চোখের উপর ছাপ মেরে মেরে চলে যাচ্ছে।

"বাঃরে, অশোক বাবু যে! কবে এলেন এ দেশে?"

"কী আশ্চর্য্য, এই মুহূর্ত্তে আপনার কথাই ভাব্‌ছিলাম। জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না।"

জানি এ-কথা আমার কেউ বিশ্বাস করবেনা; তরুলতাও করলনা।

আশ্চর্য্য! একেই বলে 'লাক্‌'। তরুলতাকে আবার কোনোদিন দেখ্‌তে পাব এবং এইখানে এমনি ভাবে!

আমার এবং মার কথা সমস্ত বল্লাম, কিন্তু তরু তার কোনো কথা বল্লেনা। হরিদ্বারের বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে বল্লে, "বিশেষ কারণে আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। কাল সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকবেন—আপনাকে দিয়ে আমার ভীষণ দরকার। সত্যিই ভগবান আছেন, নইলে আপনাকে এখানে পাব দুরন্ত কল্পনায়ও ভাব্‌তে পারিনি।"

কয়েক ধাপ উঠে মুখ ফিরিয়ে বল্লে, "ভালো কথা, সন্ধ্যাবেলা কি মা বাড়ী থাক্‌বেন।"

"বিকেলবেলা তিনি বেরিয়ে যান—রাত দশটার আগে ফেরেন না। শুনুন, আমার টাঙ্গা আছে সঙ্গে, কোথায় যাবেন বলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।"

"না, দরকার নেই।"—তরুলতা কোথায় মিলিয়ে গেল!

কী অসম্ভব পরিবর্ত্তন হয়েছে তরুলতার। কোথায় সেই শ্যামবাজার নারী-সঙ্ঘের পরোপকারী সেক্রেটারি, আর কোথায় এই কন্খলের গঙ্গাতীরবর্ত্তিনী উদ্দাম তরুলতা। ও এবার নিজের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। কেন কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হ'লাম, কেন ওকে জোর করে আজই আমার সঙ্গে নিয়ে গেলাম না?

আজ কি আর সন্ধ্যা হবে না? ঘড়িগুলো কি সব বন্ধ হয়ে গেল? ইচ্ছে করে সূর্য্যটাকে ধাক্কা দিয়ে পশ্চিম গগনের সীমান্তে সরিয়ে দেই।

গঙ্গার উপরকার বারান্দায় একটা মাদুর পেতে শুয়ে আছি। পরপারে পাহাড়ের উপর নিরন্ধ্র অন্ধকার নেমে এসেছে কালো মৃত্যুর মতো।

তরু এল। রেলিংএ হেলান দিয়ে মাদুরের উপর বসল—কোনো দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই। আমার বাড়ী আজো তেমনি জনশূন্য, আমাদের চারিদিকে আজো তেমনি অন্ধকার। আমি বদ্‌লাই নাই, আমার বুক আজো দুরু-দুরু করে, কিন্তু এ অভয় মন্ত্র তরু কোথায় পেল? কে ওর গুরুদেব?

আমার মুখে এল, "তরু, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, নইলে এত সহজে আমার কাছে এসে বস্‌তে পারতে না।"

তরু বল্লে, "সেই পুরানো কথা আজ তুলো না অশোকবাবু। সত্যি বিশ্বাস কর, আমার মনে এতটুকুও দাগ আর নেই। তুমি আমার মহৎ উপকার করেছ। সেদিনকার আঘাত আমার পক্ষে দরকার ছিল।"

হাতড়ে বেড়াচ্ছি, ঠিক মতো কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

তরু বল্লে, "একটু সরে' বসবে অশোকবাবু, আমি একটু শোব। সমস্ত দিন আজ ঘুরেছি, কিছু খাইনি এখনো, শরীর বড্ড ক্লান্ত লাগ্‌ছে।"

খাবার আন্‌তে চাইলাম, তরু বল্লে, "আরেক দিন খাব, আজ নয়। আজ খাবার সময় নেই।"

কী ওর কাজ? কী চায় ও? কী সংকল্প নিয়ে ও আজ আমার কাছে এসেছে?

প্রায় মিনিট দশেক কারো মুখে কথা নেই। হঠাৎ তরু বল্লে, "সেদিন পাঁচশো টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলে মনে আছে অশোকবাবু?"

"আছে।"

"আমি সে-টাকা পা-দিয়ে মাড়িয়ে ফেলে এসেছিলুম মনে আছে?"

"আছে।"

"আজ আবার সেই টাকা কুড়িয়ে নিতে এসেছি। পাঁচশো নয়, একশো পেলেই তোমার কেনা হয়ে থাকব। দেবে অশোকবাবু?"

বল্লুম, "আজ তোমার ভয় কোথায় গেল তরু? সেদিনকার মতো আজো কিন্তু ঘরে কেউ নেই, আজো কিন্তু তেমনি অন্ধকার।"

তরু বল্লে, "হাঁ তা' জানি। ভেবেছ অশোকবাবু, তার জন্যে কি আমি প্রস্তুত হয়ে' আসিনি? সম্মুখে

আমার যে অন্ধকার রয়েছে তার কাছে আজকের অন্ধকার তো দিবালোক, অশোকবাবু।"

উপরে সপ্তর্ষি-মণ্ডল একটা বিরাট প্রশ্নের দরখাস্ত মহাকালের কাছে প্রসারিত করে' দিয়েছে, আর নিচে আমার পাশে শুয়ে আছে একটি জীবন্ত প্রহেলিকা। একটা অন্ধ আশঙ্কা ও লাগাম-ছাড়া বিক্ষিপ্ত ভাবনা আমার স্নায়ুগুলোকে অসাড় করে দেবে এইবার।

তরুর একটা হাত আমার দুহাতের মধ্যে তুলে নিলাম। ও হাত সরিয়ে নিল না, লেশতম আপত্তিও জানাল না; এই স্পর্শ ওর অন্তরে একটুও আলোড়ন হয়তো তোলে নি। ওর স্নায়ুগুলি বোধ করি সব মরে গেছে। যে নারীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং বীরোচিত আত্মরক্ষার সমস্ত প্রভেদ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার প্রেমস্বেষহীন মরা হাত দিয়ে আমি কী করব?

তরু বল্লে, "হাত ছেড়ে দিলে যে অশোকবাবু! ভয় কচ্ছে?"

বল্লুম, "হাঁ। একদিন ভয়ে তুমি হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলে, আজকে আমার পালা।" আবার নিস্তব্ধতা।

বল্লুম, "টাকা দিয়ে কি করবে তরু জানতে পারি? আবার কি একটা আশ্রম গড়ে তুলছ?"

তরু বল্লে, "এই টাকার উপর আমার স্বামীর জীবন নির্ভর কচ্ছে। ন'টার গাড়ীতেই আজ তাকে হরিদ্বার ছাড়তে হবে। তার পেছনে শত্রু কিল্‌বিল্ কচ্ছে।"

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, "তোমার স্বামী আছেন, তবু তোমার বিধবার বেশ কেন?"

অবিচলিত কণ্ঠে তরু জবাব দিলে, "জীবন তো তাকে একদিন দিতেই হবে। আগে থেকেই বৈধব্যকে সইয়ে নিচ্ছি, মন্দ কি? কিন্তু তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি, স্বামী কাকে বলে জানিনে, তবু মনে হয় স্বামীর চেয়ে তিনি অনেক বড়। কিন্তু তুমি ও-সব বুঝবে না, অশোকবাবু। দেরি করো না, আমার আর সময় নেই।"

পাঁচখানা একশো টাকার নোট তরুর হাতে এনে দিলাম। আজো আমরা তেমনি একা, চারিদিকে তেমনি অন্ধকার। আজ আর তরুলতা পা দিয়ে টাকা মাড়ায় না, আমার দিকে লাথি উঁচিয়ে তোলে না।

কৃতজ্ঞতায় তরুর গলার স্বর ভারি হয়ে এসেছে। "এতগুলি টাকা দিলে, এর পরিবর্ত্তে কি কিছুই নেবে না অশোকবাবু!"

"পরিবর্ত্তে আমি অনেক পেয়েছি তরু," বলে' তরুর হাতটা টেনে আমার কনুইয়ের নিচে গভীর ক্ষতচিহ্নের উপর রাখলুম।

তরু জিজ্ঞেস করলে, "কিসের দাগ?"

বল্লুম, "আলমারির কাচে কেটে গিয়েছিল।"

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্প্রতি রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় একখানি গ্রন্থের ভূমিকায় সর্ব্বাধিকারী-বংশের গুণগান করিয়াছেন এই ভাবে "বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয়, মহানুভব, জ্ঞানে ধর্ম্মে শীর্ষস্থানীয় * * *।" ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১২২২ সালের অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় প্রসন্নকুমার হুগলী (তখন বর্দ্ধমান) জেলার অন্তর্গত আরামবাগ (তখন জাহানাবাদ) মহকুমাভুক্ত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট দারকেশ্বর (কানা) নদীর তীরবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "তীর্থভ্রমণ" ও "সঙ্গীতলহরী" প্রণেতা যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ডাঃ রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, সব্‌জজ্‌ আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং 'ঠাকুর-গ' প্রণেতা ও হিন্দু-পেট্রিয়ট্ সম্পাদক রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রসন্নকুমারের সহোদর ভ্রাতা। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা, সংস্কৃত, কিছু পার্শী, পড়িয়া উচ্চ-ইংরাজি শিক্ষার জন্য প্রসন্নকুমার যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহাদের প্রপিতামহ ৺মুন্সী রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারীর বাটী ও বাগান খিদিরপুরে ছিল। রামনারায়ণ ঐ সম্পত্তির অধিকাংশ স্থানীয় রাজপথ নির্ম্মাণ জন্য সরকারকে বিনা-মূল্যে দান করেন; মুন্সীগঞ্জ এবং মুন্সীবাগান রোড নামে তাহা এখনও বর্ত্তমান।

কলিকাতায় নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে প্রসন্নকুমারের পড়িবার ব্যবস্থা হয়। কলেজের ছাত্রশ্রেণীভুক্ত হইবার কিছুদিন পরে তিনি মাতৃহীন হ'ন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মধ্যম সহোদর সূর্য্যকুমার খিদিরপুরের বাটীতে আসেন। মাতৃবিয়োগ-হেতু সূর্য্যকুমারের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। প্রসন্নকুমার অসীম স্নেহাদরে সহোদরকে 'ভুলাইবার' চেষ্টা করেন। তখন পাঠাদিতে মন বসাইয়া সহোদরের শোক মন্দীভূত করিবার আয়োজন হয়। প্রসন্নকুমার ভ্রাতাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। তিনি স্বহস্তে সূর্য্যকুমারের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। পাঠের তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতেন।

দুই সহোদরই হিন্দু কলেজে উচ্চ সম্মানের সহিত জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। সমধিক কৃতিত্বের সহিত তদানীন্তন শ্রেষ্ঠতম ও কঠিনতম পরীক্ষা—লাইব্রেরী একজামিনেসন্—উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তুল্য কৃতিত্বের সহিত সূর্য্যকুমার নবস্থাপিত মেডিকেল কলেজের উচ্চতম পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া দ্বিতীয় বর্ম্মাযুদ্ধের সময়ে 'নেভাল সার্জ্জন' এবং সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে 'ব্রিগেড সার্জ্জন'এর পদ লাভ করেন। "লাইব্রেরী মেডাল" ও সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি প্রাপ্ত প্রসন্নকুমার শিক্ষকতা বরণ করিয়া লইয়া ঢাকা কলেজ, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পরে সংস্কৃত ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর্ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। উভয় সহোদরই ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করেন। তাঁহারা ডি, এল্‌, রিচার্ডসন ও ডিরোজিওর ন্যায় অধ্যাপকবৃন্দের বিশেষ প্রিয় হন। প্রসন্নকুমার অঙ্কশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 'নটিক্যাল্ এ্যাল্‌মানাক্' ও সংস্কৃত জ্যোতিষ মতে স্থিরীকৃত সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে উপনীত সিদ্ধান্তের ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া নবীন গণিতশাস্ত্রবিৎ প্রসন্নকুমার প্রবীণ গণিতাধ্যক্ষদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। উত্তরকালে বাঙ্গালা ভাষায় অঙ্কশাস্ত্রের জন্য অভিনব পরিভাষা সৃষ্টি করিয়া তিনি তাঁহার বীজগণিত ও পাটিগণিত রচনা করেন। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় সুধীসমাজে আদর্শ গ্রন্থ বলিয়া চিরদিন সমাদৃত হইয়াছে ও হইবে, শত অনুকরণেও ইহার মৌলিকত্ব নষ্ট হইবার নহে।

হিন্দু কলেজে প্রসন্নকুমারের সহপাঠী ও বন্ধুবর্গের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক,

রাধানাথ সিকদার, রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজে প্রসন্নকুমার সর্ব্বজনপ্রিয় সহপাঠী ছিলেন। প্রাচীন বয়সেও রামতনু লাহিড়ী 'প্রসন্ন' বলিতে কাঁদিয়া ভাসাইতেন।

প্রসন্নকুমারের বন্ধুপ্রীতিও ছিল অসীম। তিনি বন্ধুবর্গকে সহোদরতুল্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের আপদ-বিপদ নিজের আপদ-বিপদ মনে করিতেন। ইহার দুই একটী উদাহরণ এই স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে পরশ্রীকাতর ব্যক্তিবর্গ হাইকোর্টে তাঁহার প্রবেশ করা সম্বন্ধে বিশেষ বিরোধ উপস্থিত করেন। প্রসন্নকুমার ও তদনুজ সূর্য্যকুমারের অক্লান্ত পরিশ্রমে চক্রীদের চক্র বিফল হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার 'মধুস্মৃতি'তে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদন ও প্রসন্নকুমারের অন্য বন্ধু কবিবর হেমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থ সর্ব্বাধিকারীদের বহুবাজারের বাসায় 'পড়া' না হইয়া ছাপাখানায় যাইত না। নিজের সহস্র কাজের অসুবিধা করিয়াও দিনের পর দিন প্রসন্নকুমার এ সকল শ্রবণ করিতেন। বিধবা বিবাহের আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণজালে আবদ্ধ হ'ন। তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিতে প্রসন্নকুমার ও তাঁহার সহোদরবর্গ বিশেষ সহায় হ'ন।

প্রসন্নকুমার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হ'ন। তাঁহাকে তাঁহাদের সকল সামাজিক ও সাহিত্যিক কার্য্যে সহায়তা করিতে হইত। বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুবাদ ও প্রকাশে প্রসন্নকুমার বিশেষ পরিশ্রম করেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি সাধনে তাঁহার অসীম উৎসাহ ছিল; তাঁহার পাঠ্যাবস্থার কাল হইতেই ইহার আভাস পাওয়া যায়। উত্তরকালে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও অনুবাদ সম্বন্ধে তারানাথ তর্কবাচস্পতি, সত্যব্রত সামাধ্যায়ী, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রভৃতিকে প্রসন্নকুমার সবিশেষ আনুকূল্য করেন। ইঁহাদের সকল গ্রন্থেই পৃষ্ঠপোষক রূপে প্রসন্নকুমারের নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহারই উৎসাহে প্রাণাধিক প্রিয় তাঁহার ছাত্রদল বাঙ্গালা ভাষার সেবায় ব্রতী হ'ন এবং তদানীন্তন বাঙ্গালা লেখকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রামকমল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী, কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর কবিরত্ন, তারাকুমার কবিরত্ন, রজনীকান্ত গুপ্ত ও ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত। ইহা ব্যতীত সহযোগীদিগের মধ্যে রামময় তর্করত্ন, হরিনাথ ন্যায়রত্ন ও তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার প্ররোচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অনুরোধে এবং প্রসন্নকুমারের উপদেশে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাংলা ভাষায় "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী" প্রণয়ন করেন। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের শ্যাম-শ্যামা বিষয়ক উপাদেয় গ্রন্থ "সঙ্গীত লহরী" প্রসন্নকুমার স্বয়ং প্রকাশ করেন। "সঙ্গীত-লহরী"র দ্বিতীয় সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। সুধী ও ভক্ত সমাজে তাহা বিশেষ আদৃত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। প্রসন্নকুমার খানাকুল-কৃষ্ণনগর পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রণী কালিদাস তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত "শ্রীরাম স্তোত্র শতকম" প্রকাশ করেন।

সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই প্রসন্নকুমার বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনে তৎপর হ'ন। তাঁহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে দীন মাতৃভাষার সেবা করিতে বদ্ধপরিকর হ'ন। ইহা ৬০ বৎসরের অনেক পূর্ব্বের কথা। বাঙ্গালা ভাষার সমাদরে সংস্কৃত কলেজের অংশ গ্রহণ সুতরাং অল্প নহে। যাঁহারা বিপরীত মত পোষণ করেন সম্ভবতঃ তাঁহাদের এ সকল সংবাদ জানা নাই।

প্রসন্নকুমারের ছাত্রবৎসলতাও চির-প্রসিদ্ধ। তখনকার দিনে এবং তাহার বহু পরেও বাঙ্গালী ছাত্রগণ তাঁহার "পাটীগণিত" ও "বীজগণিত" পড়িয়া 'মানুষ' হইয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় ও প্রসন্নকুমারের ছাত্রগণ তাঁহাকে দেবতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য-রচনার জন্য ঘোষিত একটী বিশেষ

পারিতোষিক প্রতিযোগিতায় তাঁহার প্রিয় ছাত্র তারাকুমার উপস্থিত হইতে পারিবেন না সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলিত প্রসন্নকুমার অনুজ ডাক্তার সূর্য্যকুমার ও নিজের পাল্কী পাঠাইয়া তাহাকে পরীক্ষা-স্থলে আনাইয়া ল'ন। তারাকুমার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পান। রামকমল ও কৃষ্ণকমলের প্রতি স্নেহের অন্ত তাঁহার ছিল না। নিজের বাসায় তো তাঁহাদিগকে পড়াইতেনই, তাঁহাদের রামকৃষ্ণপুরের বাটীতে যাইয়াও পড়াইতেন। পড়াইতে পড়াইতে এক একদিন রাত্রি অধিক হইয়া যাইত—'বাসায় ফেরা' আর হইত না। রক্ষণশীল হইয়াও প্রসন্নকুমার,—পিতৃগৃহ-বহিষ্কৃত এবং আশ্রয়দাতার গৃহ হইতে বিতাড়িত উপবীতত্যাগী শিবনাথ শাস্ত্রীকে সাদরে গৃহে স্থান দেন; তাঁহার এম-এ পড়ার এবং পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থাও তিনি করেন। ভৃত্যেরা উপবীত-ত্যাগীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে অসম্মত হওয়ায় শিবনাথের সেবার ভার তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র দেবপ্রসাদের (স্যার্) উপর অর্পিত হয়। ছাত্রবর্গের মধ্যে কেহ অসুস্থ—সংবাদ পাইলেই শত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রসন্নকুমারের সোদর ও দোসর ডাক্তার সূর্য্যকুমার ঔষধ-পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া পীড়িতের নিকট উপস্থিত হইতেন।

প্রসন্নকুমারের পোষ্য-বাৎসল্যও ছিল অসামান্য। নিজ আয়ের চারি-ভাগের তিনভাগ ব্যয় হইত স্বগ্রাম রাধানগরে নিজ প্রতিষ্ঠিত "খানাকুল-কৃষ্ণনগর—এ্যাঙ্গলো স্যান্স্ক্রিট্ স্কুল'এর জন্য। সে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন হইত সংস্কৃত কলেজেরই মত। স্কুলের কৃতী ছাত্রদিগকে কলিকাতায় আনিয়া তিনি স্বব্যয়ে সংস্কৃত কলেজে 'লেখাপড়া' করাইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম পরলোকগত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল্ মহাশয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পরিত্যাগের পরে সেই পদে আহূত হ'ন প্রসন্নকুমার। তিনি আসিবার সঙ্গেসঙ্গেই কলেজের সাময়িক গোলযোগ সব মিটিয়া যায়; অব্রাহ্মণ বলিয়া কোনো 'সোরগোল' উঠে নাই। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া ল'ন। অধ্যক্ষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মহামান্য বেথুনের কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগে শিক্ষানীতিবিদ্‌দিগের অগ্রণী প্রসন্নকুমার একজন প্রধান সহায় ও পরামর্শদাতা ছিলেন। রাধানগরে বিদ্যালয় স্থাপনের পরে নিকট ও দূরবর্ত্তী নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয়। উৎসাহীদিগকে উৎসাহ দিতেন—প্রসন্নকুমার। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইবার পরে এ সকল কার্য্য তাঁহার বাড়িয়াই যায়। কলেজের করণীয় কার্য্যাদি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যত্র নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও নব নব বিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে তাঁহার 'দশ হাত' হইত।

প্রিয়দর্শন, বিনয়ী, মিষ্টভাষী প্রসন্নকুমার যেমন মৃদুস্বভাব ছিলেন, তেমনই তিনি ছিলেন নির্ভীক, তেজস্বী, স্পষ্টবাদী এবং দৃঢ়কর্ত্তব্য-পরায়ণ। তাঁহার আবাল্য সুহৃদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন কার্য্যে প্রসন্নকুমারকে নহিলে চলিত না। প্রসন্নকুমারেরও তাই। গ্রামের পাশাপাশি আবাস সূত্রে এবং কলিকাতায় 'পাক-পৈতা' প্রভেদ নির্ব্বিশেষে এক বাসায় অবস্থান-সূত্রে তাঁহাদের শৈশব কৈশোরের বন্ধুত্ব দৃঢ় হইয়াছিল। একই সময়ে একই বাসায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রচিত হইয়াছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ও 'শকুন্তলা', যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণ' প্রসন্নকুমারের 'বীজগণিত' ও 'পাটীগণিত' এবং রাজকুমারের 'ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী।' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসন্নকুমারকে সংস্কৃত পড়াইতেন এবং প্রসন্নকুমার বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী পড়াইতেন।

বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতা-কালে সংস্কৃত কলেজে অনেক সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার তাহা আরও বাড়াইয়া ফেলেন। এখন যেখানে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগ, সেই দ্বিতলের ঘরে থাকিত 'খেরো বাঁধা' রাশি রাশি পুঁথি। প্রসন্নকুমারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল সেই পুঁথিগুলি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ্ লাটসাহেবের কাছে আবদার করিয়া সেই গৃহ চাহিলেন—প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যবহারের জন্য। উগ্র পত্রাদি ব্যবহারের পরে প্রসন্নকুমারের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া লাটের হুকুম হইল "ঘর ছাড়িয়া দাও, পুঁথি নীচে লইয়া যাও"। নির্ভীক প্রসন্নকুমার উত্তর করিলেন, "নিজহস্তে নিজ শিশু হত্যা করিতে পারিব না,

অন্ত জল্লাদ অনুসন্ধান করুন।" সুদরিদ্র প্রসন্নকুমার অম্লানবদনে বহুজন-বাঞ্ছিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্রবর্গ এমন কি ভৃত্যবর্গও কলেজ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সরকার বাহাদুর একের পর এক দুইজন প্রিন্সিপাল পাঠাইলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। প্রসন্নকুমারও অটল অচল। ব্যাপার আর 'গড়াইতে' দেওয়া উচিত নয় বুঝিয়া সরকার বাহাদুর প্রসন্নকুমারের 'জেদ্ বজায়' রাখিয়া সসম্মানে তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলেন। প্রসন্নকুমারের মন কিন্তু 'ভাঙ্গিয়া' গিয়াছিল। ডিরেক্টর বাহাদুর পদোন্নতির অছিলায় প্রসন্নকুমারকে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত করিলেন। পরে তিনি বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষতা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপকতা করেন।

প্রসন্নকুমারের সমসাময়িক সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বা শিক্ষক বা ছাত্রদের মধ্যে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন; আর আছেন পণ্ডিত, জ্ঞানী, কর্ম্মী ও উপদেশক 'গীতা সভার' আচার্য্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এবং কালীঘাটের সাধক শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য; ৭৬ বৎসর বয়সেও সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ ক্যাপ্‌টেন্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায়, উকিল শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্যামলাল দে।

প্রসন্নকুমারের শিশু পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়—দশঘরার শ্রীযুক্ত লালবিহারী বিশ্বাসের সহিত। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত হয়। তৃতীয়ার বিবাহ হয়—পাইঘাটীর জমিদার-বংশের শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর চৌধুরীর সহিত। কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় কলিকাতা চোরবাগান দত্ত বাড়ীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত। কেবল তৃতীয়া কন্যাই জীবিতা আছেন। তিনি বিধবা।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার রজনীতে ৬২ বৎসর বয়সে প্রসন্নকুমার মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার অদ্ভুত নৈতিক চরিত্র, নির্ভীক কর্ত্তব্য-প্রিয়তা এবং অক্লান্ত দেশ-সেবার আদর্শ লোক-হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তাঁহার তিরোধানে তৎকালীন শ্বেতাঙ্গ সুধীবর্গও শোকান্বিত হ'ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্‌সেলার অনারেবল্ মিষ্টার হাণ্টারের কন্‌ভোকেসন্ অভিভাষণ হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। সেই বৎসরে লোকান্তরিত ডাঃ চন্দ্রকুমার দে, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ ও দুইজন সাহেব সদস্যের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, "But chiefly we mourn the loss of Babu Prasanna kumar Sorvadhi kari the erudite Principal of the Presidency College and the conscientious custodian and spirited defender of its precious manuscripts and the ingenious Mathematician who transplanted the Arithmetic and Algebra of Europe into the Vernacular of Bengal." ইহার বহুদিন পরে গভর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারী অনারেবল্ মিষ্টার বোল্টন্ সংস্কৃত কলেজ-গৃহে প্রসন্নকুমারের তৈলচিত্র উন্মোচনকালে প্রাণস্পর্শী ভাষায়, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে স্বর্গগত কর্ম্মবীরের গুণগান করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়েন।

সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের স্মৃতি পূজা করিয়া তাঁহার আত্মার উদ্দেশে আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধার এই অঞ্জলি অর্পিত হইল।

আরতি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবন বি-এ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বধূ-নির্বাচন

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

অনুপমকে লইয়া অনুপমের মায়ের দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার শেষ নাই।

সাত নয়, পাঁচ নয়, ওই একটিমাত্র ছেলে; তাও যেমন-তেমন ছেলে নয়,—রূপে গুণে সমান। ফুটফুটে রং, লম্বা ছিপ্‌ছিপে দেহ; বছর দুই হইল এম, এ, পাশ করিয়া বসিয়া আছে। বসিয়া আছে, কারণ কিছু না করিলেও চলে। বাপ যে টাকাটা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাহার জীবনে অর্থকষ্ট হইবার কথা নয়।

এমন ছেলের বিবাহ করিতে গা নাই।

মস্ত বড় বাড়ী। নীচের তালার সমস্তটা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও দোতালায় যে ঘরগুলা আছে তাহারও অর্দ্ধেক তালাবন্ধই থাকে। বাস করিবার মানুষ কই? বাহিরের দিকে একটা ঘর অনুপমের পড়িবার ঘর। ঘর নয়, হল! বইতে ঠাসা। সেখানাকেই বসিবার ঘর করিলেও চলে। কিন্তু ঘরের অভাব নাই বলিয়া পাশের ঘরখানিকে বসিবার ঘর করা হইয়াছে। তাহার পর হইতে যতগুলি ঘর সবগুলিই দিবারাত্রি বন্ধ থাকে। ও-দিকের সুদূর প্রান্তে পাশাপাশি দুখানি ঘরে থাকে মা ও ছেলে। তেতালার দুখানি ঘর লইয়া পিসিমার সংসার,—অর্থাৎ একখানি তাঁহার শয়ন-কক্ষ, আর একখানি একাধারে ভাঁড়ার ও রান্নাঘর।

অতি শৈশবে পিসিমার বিবাহ হইয়াছিল। অতি শৈশবেই তিনি বিধবা হন। অনুপমের পিতামহ বিধবা কন্যার জন্য তেতালার ঘর দুখানি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। পাকাপাকি উইল করিয়া অবশ্য নয়, কিন্তু তিনি জানিতেন তাঁহার মৌখিক আদেশই অনুপমের পিতার পক্ষে যথেষ্ট। এরূপ ব্যবস্থা করিবারও কোন প্রয়োজন ছিল না; কারণ একে তো অনুপমের পিতা স্বভাবতঃই স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তা ছাড়া বাঙ্গালী পরিবারে কেহ কোন কালেই বিধবা ভগিনীকে ফেলিতে পারেনা; ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ ভগিনীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মোটা ভাত মোটা কাপড়টা দেয়। অনুপমের পিতামহ বিধবা কন্যার জন্য একখানি বাড়ীও দিয়া গিয়াছেন। তাহার উপস্বত্ব হইতে পিসিমার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। কতকটা এই সকল কারণে এবং কতকটা তাঁহার কলহ-পরায়ণতার জন্য বাড়ীতে পিসিমার প্রভাব অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল। অনুপমের মাতা তাঁহাকে বিলক্ষণ ভয় করিয়া চলিতেন।

কিন্তু এ হেন পিসিমাও অনুপমকে বাগ মানাইতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন।

অনুপমের মা এমনিতেই ভালমানুষ লোক; তাহার উপর বিধবা ননদের অসংখ্য পীড়ন সহিয়া সহিয়া তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, কাহাকেও কোন কথা জোর করিয়া বলিবার শক্তি নাই। প্রতিবেশিনীরা মাঝে মাঝে এ বাড়ী আসেন। এ বাড়ীর মেয়েরাও প্রতিবেশীদের বাড়ী যাতায়াত করেন। অনুপমের কথা প্রায়ই ওঠে। তা আবার না ওঠে? বাঙ্গালী ঘরের ছেলে—রূপ আছে, অর্থ আছে, বিদ্যা আছে। এমন ছেলে বিবাহ করিবে না, এও আবার একটা কথা?

ঘোষ-গিন্নী অবসর-প্রাপ্ত সাব-জজের স্ত্রী। বুদ্ধিমতী বলিয়া পাড়ায় তাঁহার নাম আছে। তিনি চোখ মট্‌কাইয়া হাসেন; বলেন,—এর মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। দাঁড়াও না···

অনুপমের মা এ-কথা শুনিয়া আড়ালে চোখ মোছেন। ছেলেকেও কিছু বলিতে পারেন না, প্রতিবেশিনীদেরও কিছু বলিতে পারেন না।

কিন্তু পিসীমা ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন; বলেন,—তা হতেই বা কতক্ষণ? চোখখাগীদের ধেড়ে ধেড়ে মেয়েরা যে দিনরাত্রি ছাতের ওপর হাঁ ক'রে রয়েছে! চোখ-খাগীরা আমার ছেলের নিন্দে না ক'রে ঘরের মেয়ে সামলাক্।

খবরটা দিতে আসিয়াছিলেন মজুমদার-গিন্নি। তাঁহার বাড়ীটা দূরে নয়। সকল বাড়ীর মতো তাঁহার বাড়ীতেও বিবাহযোগ্যা বড় মেয়ে আছে। এবং

কলিকাতা সহরে ছাতই মেয়েদের পার্ক বলুন, আর গড়ের মাঠ বলুন, সব। পিসিমার কথা শুনিয়া তিনি মুখ আম্‌তা আম্‌তা করিলেন।

অনুপমের মা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—ও আবার কি কথা ঠাকুরঝি ?

পিসিমা সেকেলে লোক। পুরুষমানুষের চরিত্র-হীনতাকে তিনি দোষের বলিয়াই মনে করেন না। তাই অনুপমের চরিত্রদোষের ইঙ্গিত নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়া পাল্টা জবাব দিলেন।

পিসিমা বৌকে মুখ ঝাম্‌টা দিয়া বলিলেন,—তুমি থামো তো বৌ। বলবে না, ছেড়ে দেবে!

সেই রাত্রে আহারের সময় দুই ননদ-ভাজে অনুপমের কাছে গিয়া বসিলেন। তাঁহাদের ভিজা বিড়ালের মতো শান্ত ভাব দেখিয়া অনুপম সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

—বড় যে ভব্যিযুক্ত হয়ে বসেছ। কি ব্যাপার বল তো ?

পিসিমা কথা কহিলেন। বলিলেন,—ব্যাপার আর কি। আমরা তীর্থে যাব ; কিছু টাকা দে দিকি ?

তীর্থে যাবে ? কেন এখানে অসুবিধাটা কি হচ্ছে ?

—অসুবিধা আবার কি ? বুড়ো হয়েছি, তীর্থ-ধর্ম্ম করব না ? আজীবন তোর এই নেড়া সংসার আগ্‌লে থাকবো ?

অনুপম একটু চিন্তার ভাণ করিয়া বলিল,—তা ঠিক। ফিরতে কত দেরী হবে তোমাদের ?

মা বলিলেন,—আর কি সুখেই বা ফিরবো ? ফিরবো না। নাতী-নাতনী নিয়ে আনন্দ করার সাধ-আহ্লাদ তো নেই।

অনুপম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—এই কথা! তা আমি কি বিয়ে করব না বলেছি ? মেয়ে কই ?

মা অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন,—বিয়ে করব না আবার কাকে বলে! যে মেয়ে আনছি তাই তোর পছন্দ হচ্ছে না।

অনুপম মাথা তুলিয়া বলিল,—ক'টা মেয়ে এনেছ শুনি ? হালদারদের সেই সিরিঙ্গে কালো মেয়েটা। আর···

পিসিমা বলিলেন,—সে না হয় সিরিঙ্গে কালো মেয়ে, কিন্তু রসুলপুরের চৌধুরীদের বাড়ীর অমন মেয়ে···

অনুপম হাসিয়া বলিল,—রক্ষে কর পিসিমা। রসুল-পুরের চৌধুরীদের বাড়ীর মেয়ে···

পিসিমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,—কেন, মন্দই বা কি ? তিনটে পাশ করেছে, গান-বাজনা জানে, দেখতে শুনতেও ভালো। সুপাত্রী আর কাকে বলে ?

অনুপম গলা খাটো করিয়া বলিল,—ও সব মেয়ের গোঁফ বেরুবে আর দুদিন পরে। তোমার সামনে পায়ের ওপর পা দিয়ে চেয়ারে বসে সেই গোঁফে তা দেবে। জানো ?

ছেলের কথা শুনিয়া দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

এক টুকরা লুচি মুখে পুরিয়া অনুপম বলিল,—গড়ের মাঠে যাবে হকি খেলতে। তাতে তোমরা কোনো কথা বলতে গেলেই দেবে হকি-ষ্টিক দিয়ে মাথা ফাটিয়ে। জানো না তো ?

পিসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—না, তুই-ই সব জানিস। পাশ-করা মেয়ে তো আর আমরা দেখি নি! সবাই তারা চেয়ারে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে, আর গড়ের মাঠে হকি খেল্‌ছে। বিয়ে করবি না, তাই বল্‌।

মা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—আচ্ছা, পাশ-করা মেয়ে বিয়ে না কর্‌তে চাস্‌ নেই নেই। ঠাকুরঝির দেওরের মেয়েটি তো সুন্দরী। তাকেই বরং দেখে আয়।

—ঠাকুরঝির দেওর! তিনি আবার কে পিসিমা ? তাঁর কথা তো কখনও শুনিনি। তোমার আবার দেওর আছেন না কি ?

পিসিমা একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—নিজের দেওর নয়, দূর-সম্পর্কের। আমার শ্বশুরের···

সম্পর্কের কথা উঠিলেই অনুপম বিব্রত হইয়া ওঠে। তাড়াতাড়ি বলিল,—বুঝতে পেরেছি। তাঁরই মেয়ে।

পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হ্যাঁ। তারপরে বলিলেন,—অমন সুন্দরী মেয়ে আমি তো চোখে দেখি নি। যেমন রূপ, তেমনি গড়ন।

মুগ্ধ হইবার ভাণ করিয়া অনুপম বলিল,—হুঁ ?

মা কৈফিয়তের সুরে বলিলেন,—তবে তেমন লেখা-পড়া জানে না বাপু। পাশ-টাস নয়।

এই সামান্য ত্রুটি ডান হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া অনুপম বলিল,—তা হোক্। কিন্তু নাকে নোলোক পরে? পায়ে মল?

আবার দুজনে হাসিয়া উঠিলেন।

পিসিমা আব্দারের সুরে বলিলেন,—শোন কথা ছেলের? আজকাল মেয়েরা আবার নোলোক পরে, না মল পরে?

মা বলিলেন,—তাইতেই তো অমন ধিঙ্গির মতো লাগে। আমার তো বাপু নোলোক-পরা মেয়ের মুখ ভারি মিঠে লাগে। কালে-কালে কীই যে হচ্ছে!

গম্ভীর ভাবে অনুপম বলিল,—সেই দুঃখেই তো বিয়ে করতে মন হয় না মা।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোর আর দুঃখ ক'রে কাজ নেই বাছা। যে কালের যা। তুই একটা বিয়ে করলেই আমরা কৃতার্থ হই। আমাদের দিন তো শেষ হ'য়ে এল। এখন যে ক'টা দিন আছি···

মা আঁচলে চোখ মুছিলেন।

দিন পনেরো পরে পিসিমার দেওর রামসদয়বাবু কন্যাসহ এ বাটিতে পদার্পণ করিলেন। মা মেয়েটিকে বুকে করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন। আর পিসিমা বসিলেন দেবরের সঙ্গে গল্প করিতে। কতকাল দেখা নাই, গল্প যেন আর ফুরাইতে চায় না।

রামসদয়বাবু শিমলায় বড়লাটের দপ্তরে বড় চাকুরী করেন। মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করিবার জন্য লম্বা ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যেখানে যত আত্মীয়স্বজন আছেন, মনে করিয়া করিয়া সকলকেই মেয়ের জন্য একটি সুপাত্র দেখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। মেয়েটিকে পিসিমা ছোটবেলায় একবার দেখিয়াছিলেন। তখন মেয়েটির বয়স আট কি নয়। এতদিন পরে মেয়েটিকে স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনে পড়িবার কথা নয়। কিন্তু এ কথা বেশ মনে ছিল যে, মেয়েটি সুন্দরী। বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হইল, সে যদি তাহার মায়ের রূপের কিছু অংশেরও অধিকারী হয়, তাহা হইলেও অনুপমের তাহাকে অপছন্দ হইবে না। সেই ধারণার বশেই তিনি রামসদয় বাবুকে পত্রপাঠ একদিন মেয়ে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং সেই পত্র পাইয়াই রামসদয়ের আবির্ভাব।

দীর্ঘ দিন কেরাণীগিরি করিলে যাহা হয়, রামসদয়-বাবুরও তাহাই হইয়াছে,—অর্থাৎ কিছু অপ্রয়োজনীয় মেদ ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। কিন্তু মনটি তাঁহার বড় সাদা। মাসের পর মাস নিয়মিত মাহিনা পাইয়াছেন। সরকারী চাকুরী, কাজেরও তেমন ভিড় নাই। যে টাকা মাহিনা পাইয়াছেন, তাহাতে সংসার-খরচ চালাইয়াও কিছু বাঁচিত। সেই টাকাটা মাসে মাসে যায় ব্যাঙ্কে। সেই টাকাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া বেশ মোটা অঙ্কে দাঁড়াইয়াছে। মনটিও তাই সাদাই আছে। কেবল ইদানী গৃহিণীর তাড়ায় একটা দুর্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু সেও টাকার নয়, পাত্রের।

রামসদয় ঢিপ্ করিয়া পিসিমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিয়া বলিলেন,—এই নিন আপনার মেয়ে বৌদি। ওকে আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে গেলাম। যা হয় ক'রবেন। আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।

বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইয়া দিলেন।

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—বাবাজি কোথায়?

পিসিমা কপালের কাছ অবধি ঘোম্‌টাটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া বলিলেন,—কোথায় গেছে। আসবে এখুনি। কিন্তু লাফিও না, স্থির হয়ে ব'স।

বসিতে বসিতে অপ্রস্তুতভাবে রামসদয় বলিলেন,—ওই একটা ভারী বদ অভ্যেস হ'য়ে গেছে বৌদি। ওই হাসিটা···ভাগ্যিস বাবাজি নেই···তাহ'লেই···

দরজার গোড়ায় কপাটে ঠেসান দিয়া বসিয়া পিসিমা বলিলেন,—বাড়ীর খবর বল। বৌ কেমন আছে? ছেলেরা?

রামসদয় তখনও বোধ হয় হাসির অপরাধটার কথাই ভাবিতেছিলেন; অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—ভালোই।

—বৌএর সেই বুকের ব্যথাটা সেরেছে?

—না, সারে নি।

পিসিমা ঠোঁট টিপিয়া হাসিলেন। বলিলেন,—তাহলে আর ভালো কি ক'রে বল্‌ছ।

রামসদয় তেমনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—না, ভালো বলা যায় না।

পিসিমা হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—তুমি ঠিক তেমনি আছ, ঠাকুরপো। তেমনি বোকা-বোকা, মন-ভোলা। তবে যে শুনি, তুমি নাকি মস্ত বড় চাকরী কর, অনেক টাকা মাইনে।

রামসদয় একবার একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন; বলিলেন,—কি জানি, কি বলতে কি বলেছি। কিন্তু আমার মনটা বড় ভালো নেই। মেয়ের বিয়ের চিন্তায়···

ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। মেয়ের বয়স আঠারো-উনিশের কম নয়।

পিসিমা বলিলেন,—এত দিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে?

—ঘুমোই নি বৌদি। কিন্তু দেশে এসে দুদিন জিরিয়ে যে মেয়ের একটা সম্বন্ধ করব তার ছুটি পাচ্ছিলাম না। অবশেষে···

পিসিমা নতমুখে ইঙ্গিতপূর্ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—যাক্ গে, সে ভালোই হয়েছে।

সে হাসির অর্থ রামসদয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না; বিস্মিতভাবে বলিলেন,—কেন বল তো?

পিসিমা একবার তাঁহার দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া বলিলেন,—অমনি একটি ফুট্‌ফুটে বৌএর আমাদের দরকার ছিল।

এমন সুন্দর মেয়েকে যে অনুপম পছন্দ না করিয়া পারিবে না, এ বিষয়ে পিসিমা নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বলিলেন,—একটু বোসো। আমি আসছি।

পাশের ঘরে গিয়া দেখেন মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া অনুপমের মা খাটের উপর বসিয়া আছেন; আর তাঁহার দু চোখে জলের ধারা নামিয়াছে।

পিসিমা হাসিয়া বলিলেন,—ও কি বৌ, এখন থেকেই অতটা ভালো নয়।

অনুপমের মা হাসিয়া চোখ মুছিলেন। বলিলেন,—বেয়াইএর জলখাবার, ঠাকুরঝি?

পিসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যা করছ, তাই কর।

বলিয়া মেয়েটির কাণদুটি ঢাকিয়া যে দুই গুচ্ছ চুল পড়িয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে তুলিয়া দিলেন। মেয়েটি কেশগুচ্ছ যথাস্থানে রাখিবার জন্য একবার আত্মবিস্মৃত-ভাবে হাত তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল।

অনুপমের মা বলিবেন,—ও কি ঠাকুরঝি! কাণের ওখানকার চুলগুলো তুলে দিলেন কেন? বেশ তো ছিল। ওই যে এখনকার ফ্যাশান। এ কি আপনাদের সময় পেয়েছেন?

পিসিমা অপ্রস্তুত ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—তাই নাকি? তবে বাছা, যেমন ছিল তেমনি ক'রে দাও। আমার অনুপম আবার···

পিসিমা আর দাঁড়াইলেন না। হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

মেয়েটিকে অনুপমের মায়ের খুবই পছন্দ হইয়াছে। যেমন পরীর মতো রূপ, তেমনি নরম-সরম স্বভাব। এ কালের মেয়েরা যে এমন শান্ত এবং লাজুক হয়, তাহা তাঁহার ধারণাতেই ছিল না। মেয়েটির উপর এক মুহূর্তে তাঁহার যেন কেমন মায়া পড়িয়া গিয়াছে। মনে হইল, এখন হইতেই সে যদি তাঁহার কাছে থাকিয়া যায় তো বেশ হয়। তাঁহার কেমন মনে হইল, গৌরীর মতো এই মেয়েটি যেন তাঁহার পাগ্‌লা ছেলের জন্যই এতকাল তপস্যা করিতেছিল।

পিসিমা নিজের হাতে জলখাবার লইয়া আসিলেন। ঝি আসিয়া মেঝেয় আসন পাতিয়া দিয়া গেল। অনুপমের মা বুকে করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আসনে নিয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়ে বড় লাজুক, কিছুতে হাত বাহির করে না। মা নিজের হাতে একটি একটি করিয়া ফল, মিষ্টান্ন তাহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন।

—লজ্জা কি মা? আমাকে কি লজ্জা করতে

আছে? তোমার বাড়ীতে যেমন একটি মা আছেন, আমিও তেমনি মা। আমাকে লজ্জা করতে নেই। বুঝলে?

কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল, পাগ্‌লা ছেলের ফেরার নাম নাই। সবাই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পছন্দ হইয়াছে বটে। কিন্তু ছেলেকে না দেখাইয়া তো কথা দেওয়া যায় না।

পিসিমা বলিলেন,—তোমাদের তাহ'লে আজ রাত্রে থেকে যেতে হচ্ছে ঠাকুরপো। অনু তো এখনও ফিরলো না।

রামসদয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—তাহ'লে খুকু বরং থাক্। কিন্তু আমি কি ক'রে থাকি? জানোই তো তোমার বোনকে!

বলিয়া আর এক দফা উচ্চহাস্য করিয়াই মধ্যপথে থামিয়া গেলেন। সভয়ে বলিলেন,—দেখছো?

দ্বারের অন্তরাল হইতে অনুপমের মা অনুচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—বেয়ান বুঝি···

তাড়াতাড়ি রামসদয় বলিলেন,—সে বৌদিকে জিগেস করবেন। উনি সব জানেন।

রামসদয় বাবু নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কি কথা মনে পড়ায় তখনই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—বেয়ানের কথা বলছেন? তাহ'লে এক-দিনের ঘটনা শুনুন।

কিন্তু তখনই স্মরণ হইল, ঘরের মধ্যে কন্যা আছে। আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, সে থাক। পরে বল্‌ব। তাহ'লে খুকু রইল বৌদি।

রামসদয় বাবু চলিয়া গেলেন।

রামসদয় বাবু চলিয়া যাওয়ার আধঘণ্টা পরেই অনুপম আসিল। বৃষ্টিতে তাহার জামা-কাপড় ভিজিয়া সপ্‌সপ্ করিতেছে।

মা তাহার রকম দেখিয়া গালে হাত দিলেন। বলিলেন,—ভিজ্‌লি কোথায় রে? কাপড় ছাড়্ শীগগির। ওরে ও রামধন, বাবুর জন্যে কাপড় নিয়ে আয় তো একখানা।

জামা কাপড় বদলাইয়া সুস্থ হইয়া বসিয়া অনুপম বলিল,—আজ যা বৃষ্টিটা মাথার ওপর দিয়ে গেছে মা। উঃ! মুষলধারে বৃষ্টি!

—তখন কি তুই রাস্তায়?

বীরত্বের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে অনুপম বলিল,—আবার কোথায়?

তারপরে সকাতরে বলিল,—একটু চা দিতে পারো মা? ঠাণ্ডায় শরীরটা জমে গেছে।

বলিয়া হাতে হাত ঘসিতে লাগিল।

মা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, দিচ্ছি এনে।

অনুপম একটা বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। বই পড়াটা তাহার বাতিক। পরীক্ষা পাশ করার পরেও এই অভ্যাসটা সে ছাড়ে নাই। তা ছাড়া করিবেই বা কি? কাজ তো কিছুই নাই! মাসের পর মাস ইংরাজি পুস্তকের দোকান হইতে তাহার নামে গাদা-গাদা বই আসে। সকাল-সন্ধ্যা সেইগুলি লইয়াই তাহার দিন কাটে,—এবং ভালোই কাটে।

হাতের কাছের বইখানি টানিয়া লইয়া সে একমনে পড়িতেছিল। অবশ্যই এক মনে পড়িতেছিল। নহিলে বাহিরে অতগুলি লোকের পদশব্দ এবং দ্বারপ্রান্তের নারীমূর্ত্তি নিশ্চয়ই তাহার চোখে পড়িত। কিন্তু কিছুই চোখে পড়িল না। সে যেমন বই পড়িতেছিল তেমনি পড়িতে লাগিল।

এদিকে খুকুর ডান হাতে চায়ের বাটি, বাঁ হাতে খাবারের রেকাবী। দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে ঘামিয়া উঠিল। অথচ যাহার জন্য এই সমস্ত আনা সে চাহিয়াও দেখে না, কথাও বলে না। কিন্তু মা ও পিসিমার নিঃশব্দ তর্জ্জনে সে দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারে না। তাঁহারা ক্রমাগত ভিতরে যাওয়ার জন্য তাড়া দেন। এমনি অবস্থায় কোনো রকমে কম্পিত পা দুটিকে টানিয়া সে টেবিলের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

এতক্ষণে তাহার উপর অনুপমের দৃষ্টি পড়িল। অনুপম বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এবং তাহার চোখে চোখ না ফেলিয়াও খুকু তাহার বিস্মিত দৃষ্টি যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

অনুপমের মা তাহাকে একখানি লাল বেনারসী পরাইয়া দিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন নানা আভরণ। সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা খুকুকে রাজকন্যার মতো চমৎকার দেখাইতেছিল।

খুকুর সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে ও লজ্জায় থরথর করিয়া কাঁপিতে-ছিল। চায়ের বাটি টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া খানিকটা চা চল্‌কিয়া টেবিলের উপর, খোলা বইখানির উপর এবং সেখান হইতে অনুপমের জামা-কাপড়ে পড়িয়া গেল। অনুপম হাঁ হাঁ করিয়া উঠিতেই খুকুর বাঁ হাতের খাবারের থালাটিও ঝন্ ঝন্ করিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া গেল। খাবারগুলা ছড়াইয়া পড়িল না বটে, কিন্তু সমস্ত মিলিয়া সে একটা কাণ্ড!

জামা-কাপড় হইতে চায়ের জল ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য অনুপম তখন চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিয়াছে। অপরিচিতার সম্মুখে যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে?

এ প্রশ্নের কি উত্তর সে দিবে? খুকু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যত কাঁপে, তত ঘামে। ব্যাপার দেখিয়া অনুপমের মা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া খুকুকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

—এ মেয়েটি কে, মা?

মা হাসি চাপিয়া বলিলেন,—কে আবার! ঠাকুরঝির দেওরের যে মেয়েটির কথা সেদিন বলছিলাম না? সেই। বেশ মেয়েটি না?

অনুপম হাসিয়া বলিল,—দিব্যি মেয়ে।

তারপরে টেবিলের ঢাকার পানে চাহিয়া বলিল,—ঢাকাটা না হয় ধোপার বাড়ী দিলেই হবে। চায়ের জল ফেলে পুড়িয়ে যে দেয়নি এই যথেষ্ট। কি বলো?

মা রাগিয়া বলিলেন,—তা অজানা বেটাছেলের সামনে ভয় হবে না? ও আমার একালের মেয়ের মতো তো নয়।

পুস্তকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যথাসাধ্য বিরক্তি গোপন করিয়া অনুপম সংক্ষেপে কহিল,—তা ঠিক।

মা সোল্লাসে বলিলেন,—তাহ'লে এই সম্বন্ধই ঠিক করি।

অনুপম চেয়ারটা ঘুরাইয়া মায়ের দিকে সুমুখ ফিরিয়া বসিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—না।

ছেলের সে কণ্ঠস্বরে মা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেলেন। তারপরে কি একটা বলিতে যাইতেই অনুপম রুক্ষ-কণ্ঠে বলিল,—তুমি কিছু বোঝ না কেন, মা? এক কাপ চা দিতে গিয়ে যে একটা টেবিলের ঢাকা, একখানা জামা, একটা কাপড় নষ্ট করে,—মানুষ পুড়ে মরতে মরতে বেঁচে যায়, সে মেয়ে নিয়ে আমি কী করব?

—তা নতুন জায়গায় এসে…

ছেলে আবার কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—নতুন পুরোনো জানি নে মা, এই ধরণের হ্যাকা মেয়ে আমার দুচক্ষের বিষ। রূপ…রূপ…রূপ—শুধু রূপ নিয়ে আমি ধুয়ে খাবো!

মা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। অনুপম বইখানির যে জায়গায় চা পড়িয়াছিল সেই জায়গায় ব্লটিং দিয়া শুকাইতে চেষ্টা করিল। এ বিবাহ ভাঙিয়া গেল। একদিকে মা ও পিসিমা, অপরদিকে ছেলে একা। কয়দিন উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিল। কিন্তু মায়ে-ছেলের কত দিন কথা বন্ধ থাকিতে পারে? তিন দিন, কি চার দিন। তারপরে সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

ইহার দিন কয়েক পরে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল।

ক্যালকাটার সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা। দর্শক ও উপদর্শকের ভিড়ে তিল ধরিবার ঠাঁই নাই। গাছের শাখায় মানুষ বাদুড়ের মতো ঝুলিতেছে। 'র‍্যাম্পার্টে' কতকগুলো লোক ঠেলাঠেলি করিতেছে। কয়েকটা লোক কাঠের ডগায় আয়না বাঁধিয়া নূতন কৌশলে খেলা দেখিতেছে। ভিতরের অবস্থাও বর্ণনার অতীত এবং এই ভিড়ে শুধু পুরুষ নয়, বহু মহিলারও সমাগম হইয়াছে।

হঠাৎ এদিক হইতে চীৎকার উঠিল, 'গোল' 'গোল', এবং ওদিক হইতে তাহার পাল্টা চীৎকার উঠিল, 'নট্ গোল' 'নট্ গোল'। ছাতায়, টুপিতে, জুতায়, রুমালে মাথার উপরকার আকাশ অন্ধকার হইয়া উঠিল। গোলমাল শান্ত হইলে দেখা গেল, গোল নয়, রেফারী গোল দেয় নাই। এত বড় অন্যায় জাতীয় পক্ষ নীরবে সহ্য করিতে পারে না। আবার চীৎকার উঠিল, অশ্রাব্য কটু কথা, হিন্দী-বাংলা-ইংরাজির অবিশ্রান্ত বাক্য-নির্ঝর। কিন্তু তাহাতেই শেষ হইল না। একদল চেঁচাইয়া উঠিল, মার রেফারীকে। দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল আসন ছাড়িয়া পিল্ পিল্ করিয়া খেলার মাঠ আচ্ছন্ন

করিয়া ফেলিল। খেলা বন্ধ হইয়া গেল। সেই জনস্রোতে কে রেফারী আর কে রেফারী নয়, ঠিক করা কঠিন। অধিকতম উৎসাহী দল ইতিমধ্যে গ্যালারীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। কাহার মোটর ঠিক নাই, যে পারে নিকটবর্ত্তী মোটরের ট্যাঙ্ক হইতে পেট্রল আনিয়া গ্যালারীর বেঞ্চে ঢালে, আর দেশলাই জ্বালাইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একদল সোয়ারী পুলিস ও সৈন্য আসিয়া খেলার মাঠে ছুটিয়া ছুটিয়া এলোপাথারী ব্যাটন চালাইতে লাগিল। সেই ব্যাটনের মুখে বাঙালী বীর তিষ্ঠিতে পারিল না। যে যে-দিকে পারিল পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিল। তাহাতেও নিস্তার নাই। সোয়ারী পুলিস পিছু ছাড়ে না।

অনুপম প্রথমে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল পশ্চিম দিকে। কিন্তু সোয়ারী পুলিসের তাড়ায় সেদিক হইতে দক্ষিণে, তারপরে পূর্ব্বে এবং অবশেষে উত্তর দিক ঘুরিয়া যখন আবার পশ্চিমে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল একটি মেয়ে সাঁকোর কাঠের রেলিঙে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। শুধু ঘাড়ের উপর ফাঁপানো কবরীটি থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তখন গোলযোগ অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সোয়ারী পুলিস লোক তাড়া করা ছাড়িয়া খেলার মাঠের আগুন নিবাইতে মনোনিবেশ করিয়াছে।

একলা মাঠে একটি মেয়েকে এমন করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া অনুপমের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় তাহাকে ডাকা সঙ্গত হইবে কি না স্থির করিতে পারিল না। মনে হইল সঙ্গত হইবে না। যে কারণেই মেয়েটি কাঁদুক তাহার সহিত তাহার কি সংস্রব!

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো বাধাই টিকিল না। অনুপম তাহার পাশে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,—শুনুন, শুনছেন?

মেয়েটি চমকিয়া জল-ছলছল চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করিল।

কালো মেয়ে। তন্বী। বড় বড় ক্লান্ত চোখ। মুখখানি কতকটা অশ্রু-স্নানে, কতকটা অস্ত-রবির আভাসে বড় করুণ, বড় কোমল, বড় মিষ্টি লাগিতেছিল।

অনুপম অজ্ঞাতসারেই আরও একটু সরিয়া আসিল। কোমল কণ্ঠে কহিল,—আপনার কি হয়েছে আমাকে বলবেন? আপনি কি খেলার মাঠে গিয়েছিলেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

—আপনি কি হারিয়ে গেছেন? কি হ'য়েছে আপনার? সঙ্গের লোকদের খুঁজে পাচ্ছেন না?

মেয়েটি কোনো রকমে আর একবার সায় দিয়াই অশ্রুরোধ করিবার জন্য মুখে আঁচল-চাপা দিল।

মেয়েটির দুঃখে অনুপমের মন গলিয়া গেল।

কহিল,—তা, এখানে দাঁড়িয়ে তো লাভ নেই। সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। যদি বিশ্বাস করেন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। তাই করবেন?

মেয়েটি আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—আমার গলার হার?

—হার? কি হ'ল? হারিয়ে গেছে? খেলার মাঠেই বোধ হয়···

অনুপম হতাশভাবে একবার খেলার মাঠের দিকে চাহিল। বাহিরের লোক আর সেখানে কেহ নাই। কয়েকজন লোক, বোধ হয় মাঠের কর্ত্তৃপক্ষই হইবে, আর বহু গোরা ও পুলিশ বীরদর্পে মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মেয়েটির জন্যও সেখানে যাইতে অনুপমের সাহস হইল না।

কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে শুধু একবার বলিল,—তাই তো!

তারপরে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিল,—দেখুন, ওখানে যাওয়া এখন মানুষের অসাধ্য। সুতরাং হারের জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। ও আর পাওয়াও যাবে না। তার চেয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখন বাড়ী ফিরে যাওয়া দরকার। বুঝলেন? আপনার জন্যে বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই ভাবছেন।

মেয়েটিও সে কথা বুঝিল। বলিল,—চলুন।

ট্রামের রাস্তা একটু দূরে। চলিতে চলিতে অনুপম জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি প্রায়ই খেলা দেখতে আসেন?

—মাঝে মাঝে।

অনুপমের মুখে আসিতেছিল,—অন্যায় করেন।

কিন্তু মেয়েটির উপর কেমন যেন মমতা হইতেছিল। মনে মনে বলিল,—তা, এমন অন্যায়ই বা কি? মেয়ে মানুষ হওয়াটা কি এমনই অপরাধ যে, এমন চমৎকার খেলাও দেখিতে পাইবে না?

খানিক পরে অনুপম আবার জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি পড়েন বোধ করি?

মেয়েটি সায় দিল,—হ্যাঁ।

—কলেজে?

—হ্যাঁ, থার্ড ইয়ারে।

—আপনি কার সঙ্গে এসেছিলেন? আপনার বাড়ীর কারও সঙ্গে?

—আমার দাদার সঙ্গে।

আহা, বেচারা দাদা! বোনের জন্য সে যে এখন কোথায় খোঁজাখুজি করিতেছে, কে জানে! মেয়েটি কিন্তু মোটেই কলেজে-পড়া মেয়ের মতো নয়। হার হারাইয়া বেচারী কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছে! কলেজে-পড়া মেয়ে যে এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নিজের চোখে না দেখিলে সে বিশ্বাসই করিত না। কলেজে-পড়া মেয়ে। একলা পথ-চলায় নিশ্চয়ই অনভ্যস্ত নয়। খেলা দেখিতেও মাঝে-মাঝে আসে। সুতরাং খেলার মাঠও অপরিচিত নয়। কিন্তু আকস্মিক হৈ চৈ, গ্যালারীতে অগ্নিকাণ্ড, পুলিসের লম্ফঝম্ফ, সর্ব্বোপরি হার হারাণো, সবগুলি মিলিয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে অবশ করিয়া দিয়াছে। ছেলেমানুষ! তাহার আর দোষ কি?

—আপনি কি ট্রামে যেতে পারবেন? না, ট্যাক্সি ডাকবো?

—না, ট্রামেই চলুন।

ট্রামরাস্তার কাছে আসিয়া অনুপম একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল।—মেয়েটির চোখে তখন আর জল নাই বটে, কিন্তু মেঘও কাটে নাই।

অনুপম বলিল,—আপনার মুখখানি তো শুকিয়ে গেছে। একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, কিম্বা সরবৎ। কি বলেন?

মেয়েটি কথা বলিল না, অন্যদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনুপম চলিবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলিল,—না, আমি তাড়াতাড়ি ফিরতে চাই।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

এখন তাহার চা খাওয়ার সময় নাই। বাড়ীর সকলে তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দাদার জন্য তাহার নিজেরও উদ্বেগের সীমা নাই। এখন কি সময় নষ্ট করা চলে?

মেয়েটি যে শিক্ষিত ভদ্রবংশের সে বিষয়ে অনুপমের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে যে এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশ তাহা সে ভাবে নাই।

বালিগঞ্জের দিকে একটা মস্ত বড় হাতা-ওয়ালা বাড়ী। ভিতরে প্রশস্ত লন, টেনিস খেলার জায়গাও আছে। সম্পূর্ণ বিলিতি প্রথায় সাজানো একখানি চমৎকার বাড়ী।

মেয়েটির নাম শ্যামলী। শ্যামলীই বটে। কালো? না কালো নয়,—কচি ঘাসের রং, পাউডার ও স্নোতে নীলাভ দেখায়।

আপনাকে কিন্তু চা খেয়ে যেতে হবে। আপনি রাস্তায় তখন চা খেতে চেয়েছিলেন।

—আমি? আচ্ছা।

শ্যামলীর মা আসিয়া কাছে বসিলেন। নানা প্রকারে অনুপমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আত্মপরিচয় দিতে বসিলেন। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের বেশী হইবে তবু কম হইবে না। নিতান্ত সাদাসিধে, ভালোমানুষ লোক। ব্যারিষ্টারের গৃহিণী হইয়াও এই সেকেলে ভট্‌চায্‌ বাড়ীর মেয়ের অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

শ্যামলী ইতিমধ্যে কাপড় বদলাইয়া আসিয়াছে। পরণে তাহার কমলা রঙের অতি সাধারণ একখানি শাড়ী, মাথার এলো চুল পিঠের উপর ছড়ানো, পায়ে একজোড়া জরিদার স্যাণ্ডাল। মুখের সে মেঘ কাটিয়াছে। বরং অনুপমের মনে হইল, শ্যামলীর ঠোঁটের কোণে তাহার মনের উচ্ছ্বসিত হাসির আভাস জাগিয়াছে।

চাকর ট্রেতে করিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। শ্যামলীর মা চা খান না। দুটি মাত্র বাটি,—একটি অনুপমের, একটি শ্যামলীর। শ্যামলী চা ঢালিতে লাগিল।

—আপনি কি চিনি বেশী খান ?

—একটু।

—তিন চামচ ?

—তাই দিন।

চায়ের চিনি সম্বন্ধে শ্যামলীর মায়ের একটা কথা বলিবার ছিল,—যারা পরিশ্রম করে যথেষ্ট তাদের পক্ষে···

অকস্মাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ও কি ! ও কি !

এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনুপম লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—না, না, ও কিছু নয়···কিছু হয় নি···

খানিকটা চা বাটি উছলাইয়া টেবিলে এবং অনুপমের গায়ে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। তাড়াতাড়ির মুখে হয়তো শ্যামলীর হাত লাগিয়া কিম্বা হয়তো টি-পটে ঠেকিয়া বাটিটাও উলটাইয়া গিয়াছে।

শ্যামলীর মা গম্ভীরভাবে বলিলেন,—আরও সাবধান হ'য়ে চা ঢালতে হয়।

অনুপম আবার ব্যস্ত হইয়া বলিল,—না, না, ওঁর দোষ নেই। আমিই বোধ হয়···

শ্যামলীর মা সে কথা শুনিলেন না। বলিলেন,—গায়ে-টায়ে কোথাও পড়ে নি তো ?

—কোথাও না।

ফিরিবার পথে অনুপমের মন সুমধুর রসে সিঞ্চিত হইয়া উঠিল। কি চমৎকার মেয়ে! কী লজ্জা! কী নম্রতা! চা পড়িয়া যাওয়ার কথা মনে হইতেই অনুপম হাসিয়া ফেলিল। বেচারী কি অপ্রস্তুতই না হইয়াছে! অথচ অপরিচিত পুরুষের সামনে কোন্ মেয়ের না হাত কাঁপে। বরং না কাঁপিলেই মানায় না। তার উপর বিকালের কাণ্ডটাও তো কম নয়!

অনুপম নিজের মনেই আর একবার বলিল,—চমৎকার মেয়ে!

এই ঘটনার পরে কয়দিনই অনুপম শ্যামলীদের বাড়ীর কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। একটা উপলক্ষ তো চাই। দিনরাত্রি অনুপম অনেক ভাবিয়াও বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার উপলক্ষ সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

অবশেষে মায়ের কাছে কথাটা পাড়িল।

শেষ পর্য্যন্ত যে ছেলের বিবাহে মতি হইয়াছে ইহাতেই মা ও পিসিমা কৃতার্থ হইলেন। ছেলে যখন নিজে সম্বন্ধ করিয়াছে, তখন মেয়ে নিশ্চয় দেখিয়াছে এবং হয়ত···এবং নিজে যখন সে দেখিয়াছে তখন মেয়ে অপরূপ সুন্দরী না হইয়া যায় না। অনুপমের খুঁৎখুঁতে স্বভাব! কোথাও এতটুকু খুঁৎ থাকিলে সে আর সেদিকে চাহিত না।

দিন কয়েক পরে একদিন টেলিফোনে খবর দিয়া মা ও পিসিমা চলিলেন তাহাদের বাড়ী। অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি হইল না। কিন্তু মেয়ে দেখিয়া তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। একে কালো, তাহার উপর রোগা টিংটিঙে। না মুখের শ্রী, না দেহের গড়ন, না চলার ভঙ্গি, যেন ফড়িঙের মতো লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। পিসিমার তো দেখিয়া পিত্ত জ্বলিয়া গেল! ছোঁড়াগুলার কি চোখ বলিয়া কিছু নাই ?

কিন্তু ছেলের যখন পছন্দ হইয়াছে তখন তার উপর আর কথা কি? এখন কথাটা পাড়া যায় কি করিয়া? শ্যামলীর মা তো বকিয়া চলিতেছেন। বাড়ীটা করিতে কত খরচ পড়িয়াছে, ছেলেটা কয়েক দিন পরেই বিলাত যাইবে, আরও অনেক কথা।

অনুপমের মা কথাটা পাড়িবার জন্য ঠাকুরঝিকে চোখ টিপিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াই ফেলিলেন,—

—আমরা ভাই, আরও একটা কাজের কথা বলিতে এসেছিলাম।

শ্যামলীর মা তখন সবে নূতন টেবিলটার কথা বলতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বিস্মিতভাবে পিসিমার মুখের দিকে চাহিলেন।

—বলছিলাম কি, আমাদের অনুপমের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হ'লে বেশ হয় না ?

প্রথমে কথাটা বুঝিতে শ্যামলীর মায়ের যেন দেরী হইতেছিল। তার পর দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—অনুপম যে-দিন শ্যামলীকে বাড়ী নিয়ে এল সেইদিনই আমার এ কথা মনে হয়েছিল। ওর মতো জামাই পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু তা আর হবার উপায় নেই।

—উপায় নেই! কেন?

—ওর অন্য জায়গায় বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। তিনি শীঘ্রি বিলেত থেকে ফির'বন। ফিরলেই···তারপর হাসিয়া বলিলেন,—ওদের অনেক দিনের জানা-শোনা! আজকালকার মেয়ে। বুঝতেই তো পারেন। এখানে আর আমাদের কথা চলবে না।

মা ও পিসিমার মনে প্রথমে একটু দুঃখই হইয়াছিল। কিন্তু তারপরে তাঁহারা খুশীই হইলেন। মাগো: ওই ছেলের পাশে ওই বৌ!

কিন্তু মায়ের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া অনুপম বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইল। শ্যামলীর অন্যত্র বিবাহ স্থির হইয়াছে? আর সে বিবাহ ভালোবাসিয়া? অথচ সে যে স্পষ্ট শ্যামলীর চোখে···

শ্যামলীর চোখে কি দেখিয়াছে? স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতিঃ? কিন্তু স্বর্গীয় প্রেমের জ্যোতিঃ সম্বন্ধে তাহার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। তথাপি অনুপমের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা থাকিয়া থাকিয়া খচ্‌খচ্ করিতে লাগিল। কিন্তু সে কি এমনই ভুল দেখিল? হবে!

পিসিমা একটু বাঁকা হাসিয়া বলিলেন,—তা যাই বলিস বাপু, তোর পছন্দর প্রশংসা করতে প্যারি না। ওই কালো মেয়ে!

—কালো! ওকে কি তুমি কালো বলো?

—ওকেই আমরা কালো বলি বাছা, তোরা যা বলিস তাই বল্। আমার রাম ঠাকুরপোর মেয়ের কাছে ও কি আবার একটা মেয়ে? কি বল বৌ! বরং বলিস যদি, এখনও তাদের লিখে দিলে তারা লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হবে। কি বলিস?

বিরক্তভাবে অনুপম বলিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।

আরও কি গজ্‌গজ্ করিয়া বলিল বোঝা গেল না।

শেষ

লহ পূজা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ধর কবিরত্ন, বি, এল্

বালিকা প্রভাতে উঠি
তুলি ফুল গাঁথি মালা
দেবতা-মন্দিরে ওই
চলিছে সাজায়ে ডালা।
পূজা তার হ'লো নাকো;
পূজারি রুধিল পথ।
কাঁদে বালা, 'হে ঠাকুর,
মিছে তবে মনোরথ?'

হেনকালে কুহুরবে
কোকিল ডাকিল বনে,
তাথৈ পাপিয়া নাচে
মধুকর গুঞ্জরণে,
'বনফুল রাশি রাশি
ভরা-হাসি মুখে চায়
কহে বালা, 'হে ঠাকুর,
আছ কি হে দুনিয়ায়?'

আবার গাহিল পাখী
তরুশাখে ঝাঁকে ঝাঁকে,
পূরবে ভাতিল রবি
রাঙ্গাছবি ফাঁকে ফাঁকে,
কে তুই দাঁড়ায়ে বালা
মরমে পশিলি স্বর?—
'হে ঠাকুর, লহ পূজা,
ব্যাপ্ত তুমি চরাচর।'

এ রহস্য বুঝিনারে
রে পূজারি, আয়, আয়—
মন্দিরে দাঁড়ায়ে বালা
দুয়ার রুধিবি আয়।
বালিকা প্রণমি কহে,
'লহ পূজা, হে ঠাকুর,
তোমার মন্দির, যেথা
তুমি-আমি ভরপুর।'

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রকলা)

অতীতের যা কিছু সম্পদ দেখে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই, তার মধ্যে প্রাচীন চিত্রকলার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যই আমাদের সবচেয়ে বেশী অভিভূত করে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর সমুন্নত যুগে জগতের প্রসিদ্ধ কলাবিদেরা যে সকল চিত্র এঁকে অমরত্ব অর্জ্জন ক'রেছেন, অতীতের অজ্ঞাত শিল্পাচার্য্যগণের তুলির আঁচড়ের কাছে তা' বালকের চিত্রাঙ্কণ-প্রচেষ্টা বলে মনে হয়!

স্পেনদেশে বিস্কে উপসাগর কূলে শান্তান্দার পর্ব্বতের পশ্চাতে যে চূণে পাথরের গিরিশ্রেণী আছে, তদভ্যন্তরস্থ চিত্রগুলির অধিকাংশই জীবজন্তুর ছবি। আল্‌তামীরা গুহার ছত্রতলে প্রথমেই চোখে পড়ে বায়শন্ মহিষের পাল, বরাহযুথ ও কুরঙ্গদল। অন্যান্য জীবজন্তুর ছবিও আছে, কিন্তু সেগুলি ভিন্ন গুহায়। আল্‌তামীরা ও তার আশে পাশে এ রকম পঞ্চাশটি সচিত্র গুহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। বায়শন মহিষগুলির এক একটির চিত্র দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট। বায়শনের চিত্রগুলিই সবচেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে। এ গুলিকে প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত বলা চলে। লাল ও কালো মিশ্রিত গাঢ় তাদের

পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে অঙ্কিত গুহা-চিত্র (স্পেনের 'আল্‌তামীরা' গুহার ছত্রতলে আঁকা)

গুহাগুলির মধ্যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব রঙীন পঙ্কচিত্র (Fresco) আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তার অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে সমস্ত শিল্প জগৎ বিস্মিত। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞগণ বলেন এ চিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীদের আঁকা। বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এগুলি আঁকা হ'য়েছিল। পর্ব্বত গুহার অভ্যন্তরে রৌদ্র বৃষ্টি ও আলোবাতাসের সংস্পর্শ থেকে আড়ালে থাকার ফলে এ ছবিগুলি এত দীর্ঘকাল ধ'রে টিকে আছে।

চামড়ার রং, আলোছায়ার অনুপাতে কোথাও হাল্‌কা কোথাও বা ঘোর ক'রে দেওয়া আছে। চোখ, শিং, খুর লেজ, নাকমুখ সমস্ত নিখুঁত ক'রে আঁকা।

হরিণগুলি এক একটি প্রায় সাড়ে সাত ফুট লম্বা! এই বৃহৎ আকার পঙ্কচিত্রেও প্রত্যেক হরিণটির গড়ন একেবারে যেন ওস্তাদের তুলির আঁচড়ে টানা! প্রথমতঃ হরিণের সমস্ত আদ্‌রাটা কড়া কালো রেখায় এঁকে নিয়ে পরে তাতে রঙ চড়ানো হ'য়েছে। প্রথমে আগা গোড়া ঘন লাল রংয়ের প্রলেপ দিয়ে পরে হরিণের ছালের

অনুকরণে সেই রং স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত চেঁচে তুলে ফেলে বা পাতলা ক'রে এবং কোথাও বা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে অন্য রং ভরে চমৎকার হরিণ এঁকেছেন তাঁরা।

বটে, কিন্তু এখনো যা অবশিষ্ট আছে তার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য শিল্পকলার নৈপুণ্যের দিক দিয়ে মনে হয় যেন আজও অননুকরণীয়! প্রত্যেকটি জীবজন্তু দেখলেই মনে হয় যেন এরা সজীব! পটে আঁকা নয়! এদের ভঙ্গী

দু'টি হরিণ (ফরাসী দেশের দোর্দ্দোঁ গুহায় আঁকা)

ও অবস্থানের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক প্রাণীটিকে শুধু জীবন্ত ক'রে তোলেনি তাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেন একটা চটুল গতিবেগ সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছে!
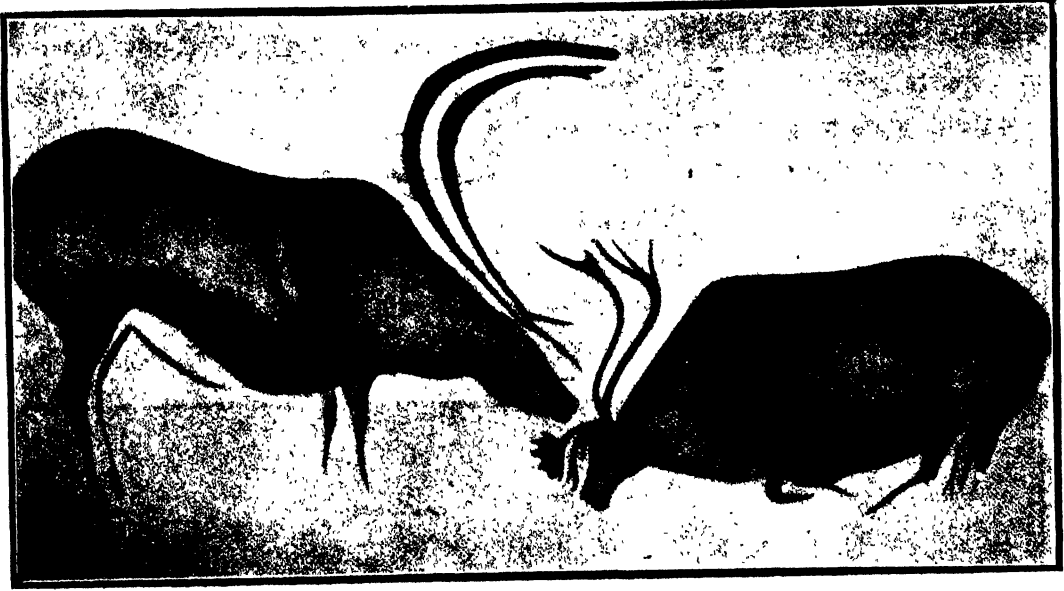
বরাহযূথের মধ্যে এক একটি শূকর দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ফুট! কিন্তু এমনি সম-আয়তনে সেগুলি আঁকা যে এত-বড় শূকর কোথাও এতটুকু চোখে অস্বাভাবিক ঠেকে না! গুহাদ্বারের সন্নিকটেই যে ছুটন্ত শূকরটি আঁকা ছিল বর্ষার অত্যাচারে তার কিছু কিছু অনিষ্ট হয়েছে

লোমশ গণ্ডার (বিশ হাজার বৎসর আগে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে)

পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্ব্বের অজ্ঞাত শিল্পীদের এই অদ্ভুত কলাজ্ঞান ও শিল্প-দক্ষতার পরিচয় আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদেরও চমৎকৃত ক'রে দিয়েছে!

বিশ বৎসর আগে ফরাসী দেশের দোর্দ্দোঁ উপত্যকায় ঠিক এই ধরণেরই কতকগুলি সচিত্র পর্ব্বতগুহা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এই গুহাগুলির মধ্যেও অসংখ্য জীবজন্তুর পঙ্কচিত্র আছে। এ ছবি-গুলির সঙ্গে স্পেনের গুহায় আঁকা ছবি-গুলির এমন অবিকল সৌসাদৃশ্য রয়েছে যে দেখে মনে হয় যেন সেই একই শিল্পীর দল এখানে চলে এসে এ ছবিগুলিও এঁকেছিলেন! সেই বায়শন্—সেই

বরাহ—সেই হরিণ—একেবারে হুবহু এক! কেবল এই ফরাসী গুহার মধ্যে আরও এমন সব জীবজন্তুর চিত্র পারে, যা ফরাসী গুহায় আছে কিন্তু স্পেনের গুহায় নেই। এই জাতীয় গণ্ডারের অস্তিত্বও আজ জীবজগত থেকে

ছাগ ও বাইশন্ (আল্‌তামীরার গুহাচিত্র)

আছে যা স্পেনের শিল্পীরা কখনো চোখে দেখেননি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একরকম লোমশ গণ্ডারের উল্লেখ করা যেতে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এই লোমশ গণ্ডার আঁকার মধ্যে প্রাচীন ফরাসী শিল্পীরা যে অনায়াস-দক্ষতা ও আশ্চর্য্য

কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তা' প্রকৃতই বিস্ময়কর! তাঁদের হাতের ওস্তাদি টানের গুণে কেবলমাত্র রেখার

বরাহ দম্পতি (মৃত্তিকায় গড়া)

সাহায্যেই তাঁরা বিরাটকায় গণ্ডারের সুগোল বপুর জীবন্ত আকৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সেই রেখারই আঁচড়ে

বৃষ ও বাইশন (আল্‌তামীরা গুহা-চিত্র)

গণ্ডারের লোম্শ আকারও ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে। গণ্ডারের নাসাখড়্গ, হ্রস্ব লাঙ্গুল প্রভৃতি নানা খুঁটিনাটির কোনোটিই তাঁরা আঁকতে ভোলেননি! এই বেয়াড়া জানোয়ারটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁরা তুলির মুখে তুলে ধরেছেন এই গুহার পাষাণ-গাত্রে!

লাল জমীর উপর কালোরঙে আঁকা একটি নেকড়ে বাঘের প্রাচীর চিত্র (Mural Painting) এই ফরাসী-গুহায় আছে। এ ছবিখানি ভারি সুন্দর। একজোড়া শৈলমৃগ পরস্পরের দিকে ফিরে হেঁটমুখে তৃণাস্বাদনে নিযুক্ত—এই চিত্রখানির মধ্যে এমন একটি কলা-সঙ্গত বিন্যাস-সুষমা বিদ্যমান যে অতীতের এই সব শক্তিধর শিল্পীর অসামান্য প্রতিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নেই!

আদিম যুগের এই সব অজ্ঞাত রূপদক্ষ রংয়ে ও রেখায় যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন তা দেখে মনে হয় তাঁরা ছিলেন সেদিনের যাদুকর শিল্পী! যেমনটি তাঁরা চোখে দেখতেন ঠিক তেমনটিই আবার

অবলীলাক্রমে তাঁদের তুলির আঁচড়ে সৃষ্টি করতেন। অতিকায় হস্তী (mammoth) আজ ধরাপৃষ্ঠ হ'তে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে, কিন্তু পাষাণ-গুহার প্রাচীর গাত্রে অতিকায় হস্তীর সমকালীন সে-যুগের অতিমানব শিল্পীগণ সেই বিলুপ্ত প্রাণীর যে নিখুঁত ছবি অক্ষয়পটে এঁকে রেখে গেছেন, তার ভিতর দিয়ে শিল্প-জগতে অতিকায় মাতঙ্গদল অমর হ'য়ে রয়েছে।

শূকরী ও হরিণী (আল্‌তামীরা)

গুহাবাসী শিল্পীরা ভালুকের চিত্রও এঁকে গেছেন। এই ফরাসী গুহার মধ্যেই একটি ভাল্লুক আঁকা আছে—দু'পায়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে! আর একটি আছে একটি ভাল্লুকের চলন্ত অবস্থার চিত্র। গুহায় মৎস-চিত্র প্রায় বিরল বলা চলে। মাত্র দু'একটি ভিন্ন আর চোখে পড়ে না। পাখীর ছবিও খুব কম।

চিত্রশিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে মানুষ যখন মাটি পুড়িয়ে ব্যবহার ক'রতে শেখেনি, ধাতুদ্রব্যের কোনো সন্ধানই যখন জানতোনা তারা, যখন বস্ত্রবয়ণ ক'রে প'রতে শেখেনি, জমীতে লাঙল

রূপী বানর (ফরাসী গুহাচিত্র)

দিয়ে চাষ ক'রতে জানতোনা, এমন কি পশু পক্ষী ধোরে পোষমানাতে বা কাজে লাগাতেও শেখেনি যখন, তখনও কিন্তু তারা ছবি আঁকতে পারতো। আঁকা ছবির পরিচয় প্রাচীন প্রস্তর-যুগ থেকে—এমন কি তারও আগে থেকে—পৃথিবীতে পাওয়া গেছে। মানুষ তখন গুহায় বাস ক'রতো, শিকারই ছিল তখন তার জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। শিকার জুটলে তার হাতে আর কোনো কাজ থাকতোনা। তখন সে ব'সে বসে তার গুহার সৌন্দর্য্য ও শ্রী সম্পাদন ক'রতো দেওয়ালে ও ছত্রতলে ছবি এঁকে!

এই সব আদিম শিল্পীদের রংয়ের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত! তারা লৌহ সংমিশ্রিত মৃত্তিকা থেকে চমৎকার লাল হলুদে ও পাটকিলে রং সংগ্রহ ক'রতো। কালো রং তারা ভুসো থেকে এবং manganese oxide থেকে

প্রাচীনতম ভাস্কর্য্য (পাথর কুঁদে এই নারী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'য়েছিল বহু সহস্র বৎসর আগে। তখন ফরাসী সুন্দরীদের এমনিই সুকুমার কান্তি ছিল)

নিতো। সাদা রং পেতো তারা খড়িমাটি ও china clay থেকে। এই সব উপাদানের সাহায্যে আদিম যুগের শিল্পীরা তাঁদের চিত্রে যে রংয়ের বৈচিত্র্য প্রকাশ ক'রে গেছেন তা' যথার্থই বিস্ময়কর। রংয়ের ঐশ্বর্য্যে ফরাসী গুহাচিত্রগুলি স্পেনের গুহাচিত্র অপেক্ষা অনেক

শ্রেষ্ঠ। কারণ ফরাসীরা তাদের মাটিতে রংয়ের সন্ধান পেয়েছিল স্পেনের শিল্পীদের চেয়ে অনেক বেশী ; তাই এদের গুহাচিত্রে দেখা যায় বাসন্তী রং, যোগীয়া, কমলালেবু রং, গোলাপী, সিঁদুরে লাল, রক্তরাঙা, ফিরোজা, নীল, বেগুণে, পাটকিলে, খয়েরি, মিশ্‌মিশে কালো, ও পিটুলির মত শাদা স্পেনের গুহাচিত্রে এত রকমের রং নেই।

বরাহ ও বাইশন (আল্‌তামীরা)

ফাঁপা হাড়ের চোঙার মধ্যে কিম্বা শিঙের ভিতর এঁরা রং সংগ্রহ ক'রে রাখতেন। পাথরের শিলের উপর রং বাটা হ'ত। বড় বড় ঝিনুক বা শামুকের পাত্রে রং গুলে নেওয়া হ'ত চর্ব্বি মিশিয়ে ব্যবহার করবার জন্য।

সচকিত বৃষ! (হঠাৎ ছুটতে ছুটতে যেন কি শব্দ শুনে সচকিত বৃষটি থেমে উৎকর্ণ হ'য়ে রয়েছে)

রঙীন খড়িমাটি ব্যবহার ক'রতেন তাঁরা পেন্সিলের মত; ছবির আদরা টানবার জন্য খড়িমাটি হাত থেকে পড়ে
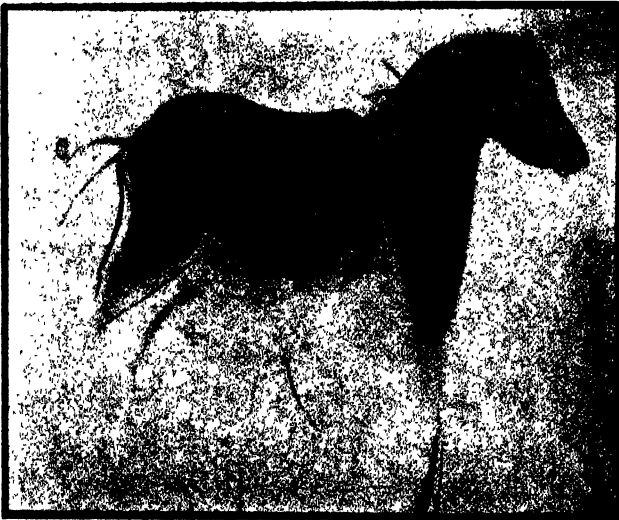
ঘোড়া (একটি চিত্রের উপর আর একটি চিত্র আঁকা হ'য়েছে)

ভেঙে যেতো ব'লে খড়িমাটির টুক্‌রোর মধ্যে ফুটো ক'রে তাঁরা দড়ি বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। আদিম শিল্পীদের চিত্রাঙ্কণের এ সমস্ত সরঞ্জামই কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে তাঁদের গুহার ভিতর থেকে। কেবল পাওয়া যায়নি তাঁদের হাতের সেই অদ্ভুত তুলি যার এক একটি টানে এমন সজীব মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে পর্ব্বত গুহার অভ্যন্তরে। তাই অনুমান হ'য়, তাঁরা তুলির পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ব্যবহার করতেন।

এই যে পাষাণের বুকে বিস্ময়কর শিল্প-নৈপুণ্য—এ কেউ হঠাৎ একদিনে অর্জ্জন ক'রতে পারে না। এই অতুলনীয় রূপ-দক্ষতার পশ্চাতে আছে সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ সাধনা। মনীষী হেন্‌রী ব্রল্‌ প্রমুখ একাধিক পণ্ডিতের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার গুণে এই আদিম চিত্র-শিল্পের সুরু থেকে এর ক্রমবিকাশ ও পরিণতির চারটি ধারাবাহিক সোপান আবিষ্কৃত হয়েছে। আদিম শিল্পকলার এই স্তরভেদ থেকে এই কথাটা আজ নিঃসন্দেহ রূপে সপ্রমাণিত হ'য়েছে যে আদিম যুগের মানুষেরা সকলেই বর্ব্বর ছিলনা। বিশেষ ক'রে এই শক্তিশালী ও প্রতিভাবান শিল্পীদের সম্বন্ধে এ কথাই বলা চলে যে তাঁরা ছিলেন সে যুগের পুরুষোত্তম। ভাবীকালের উন্নতি ও উৎকর্ষ তাঁদেরই গুণে সম্ভব হয়েছিল। তাঁরাই ছিলেন সুকুমার-কলার আদি জনক বা স্রষ্টা! প্রাক্‌-ধাতবাব্দের এই মানুষেরাই—এই শিলাযুগের শিকার-জীবিরাই জগতকে প্রথম নব নব মানস-বিলাসের বিচিত্র সন্ধান দিয়ে গেছেন।

চিত্রকলার অনুশীলন তাঁরা প্রথম সুরু করেছিলেন নরম মাটি বা কাদার উপর আঙুলের সাহায্যে রেখা টেনে। সেদিন এমনি করেই তাঁদের ধ্যানের রূপ ফুটিয়ে তুলে তাঁরা খুশী হ'তেন। কিন্তু, আকাঙ্ক্ষা মানুষের বেড়েই চলে। সাধ কখনো অল্পে মেটে না। যা' হচ্ছিল কাদার উপর দাগ টেনে, তাকে কঠিন পাথর কেটে কুঁদে রাখবার সাধ হ'ল মানুষের। কাদার ওপর আঁচড় স্থায়ী নয়। মানুষ তার সৃষ্টিকে অক্ষয় ক'রতে চাইলে। তাই পাথরের ছেনি তৈরি ক'রে সে পাষাণের বুকে শিলা-চিত্র খোদিত ক'রে রাখতে লাগলো। পরে সে ছেনি তার কেমন ক'রে লোহা হ'য়ে গেল, লোহা

কেমন ক'রে শেষে তুলি হ'য়ে দাঁড়ালো—পাথর থেকে কাঠ, কাঠ থেকে চামড়া, গাছের ছাল, পাতা,—পাতা থেকে কবে আবার কাগজের উপর তাদের চিত্র প্রতিফলিত হ'তে সুরু হ'লো—এ ইতিহাস আজ আর কারুর অবিদিত নেই।

শিশুরা প্রথম লিখতে শিখলে যেমন ঘরে দোরে দেওয়ালে মেঝেয় সর্ব্বত্র তাদের হাতে-খড়ির অ-আ, ক-খ, লিখে ছড়িয়ে রাখে, গুহাচিত্রগুলিকে যেন কেউ সেরূপ না মনে করেন। এগুলি চিত্রকলায় মানুষের প্রথম হাতে-খড়ির পরিচয় নয়, এ তার চিত্র-শিল্পে পরিণত বিদ্যারই নিদর্শন! হাতে-খড়ি তার হ'য়েছিল পাথরের টুকরো, পশুর শৃঙ্গ ও হাড়ের

নেকড়ে বাঘ (ফরাসী গুহা চিত্র)

র খোদাই করে। তাদের প্রথম চেষ্টার এ সব চিহ্ন এখনো লুপ্ত নি একেবারে। এই যে তাদের া-বিদ্যার প্রথম পরিচয়, এ দেখে ই এ প্রশ্ন মনে আসে যে হঠাৎ এ াক কি ক'রে তাদের মাথায় া! একি অন্যান্য কুটীর-শিল্পের কোনো প্রয়োজনের তাগিদে া শিখেছিল? এর পিছনে সে অনুপ্রেরণা ছিল, যা সেই আদিম র মানুষকে তদানীন্তন এই অতি অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে

বোধ থেকে উদ্ভুত না কল্পনা-সুলভ ইচ্ছা-প্রণোদিত? অথবা অবসর-যাপনের—সৌখীন বিলাস? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রভাব মানুষের চিত্তে যে সুকুমার বৃত্তিকে
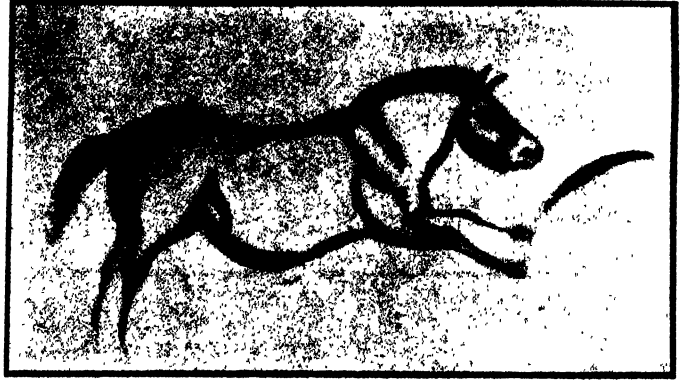
অস্থির অশ্ব (স্পেনের 'আলতামীরা' গুহা)

উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে, তারই ফলে সে সৃষ্টি ক'রে শিল্প, কাব্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কলা-কারু! পৃথিবীর আদিম মানুষও যে এ প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি এই গুহাচিত্রগুলি কি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে?

এর উত্তরে বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, ঠিক কলাবিদ্যার পরিচয় হিসাবে তাঁরা গুহার মধ্যে এই জীবজন্তুর চিত্রগুলি এঁকে রাখতেন না। এর পশ্চাতে একটা আদিম যুগের কোনো অলৌকিক অনুষ্ঠান আছে বলে তাঁরা অনুমান করেন। কারণ প্রত্যেক

পাথরের ঘোড়া (প্রাচীনতম ফরাসী ভাস্কর্য্য)

অনুষ্ঠানের যোগাযোগ গুহার একেবারে শেষপ্রান্তে যেখানে

করাও প্রায় দুরূহ, বিনা আলোকে কোনো কিছুই যেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না—সেইখানেই তাঁদের যত চিত্র আঁকা আছে দেখা যায়। এই চিত্রগুলি যে শিল্পীদের অন্ধকারের মধ্যে বাতী জেলে আঁকতে হ'য়েছিল এতে আর কোনো ভুল নেই! পশুচর্ব্বীর সাহায্যে তাঁরা যে পাথরের প্রদীপ জালাতেন এ প্রমাণও পাওয়া গেছে।

সে যুগের শিকারজীবী মানুষ যে অপরিসর গুহার মধ্যে নিজেরা বাস ক'রতো, আশ্চর্য্য এই যে-সে সকল গুহার কোনোটিতেই একটিমাত্র ছবিও তাঁরা আঁকেন নি, সুতরাং গুহার শোভা, সৌষ্ঠব বা অলঙ্কার হিসাবে যে এই চিত্রগুলি অঙ্কিত হ'য়েছিল এমন কথাও জোর ক'রে বলা চলেনা। এগুলি যেখানে আঁকা আছে—তার প্রত্যেকটি গুহারই বিশেষত্ব হ'চ্ছে সেগুলি সবচেয়ে বড় ও লম্বা। এমন কি তার এক একটি দৈর্ঘ্যে দেড় হাজার গজেরও বেশী! মনে হয় এইখানে এক একদলের সমস্ত গুহাবাসীরা মাঝে মাঝে তাদের সেই অলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একত্রে সমবেত হ'ত। সে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্ভবতঃ তাঁদের শিকার সংক্রান্ত ব্যাপারেরই যে যোগ ছিল এ অনুমান তাঁদের গুহা-চিত্রগুলি ভাল করে অনুধাবন ক'রে দেখলে স্বতঃই মনে উদয় হয়। প্রথমতঃ সমস্ত ছবিই প্রায় কোনো না কোনো জীবজন্তুর! দ্বিতীয় সে জন্তুগুলি সবই প্রায় তাঁদের সময়ের অতি প্রয়োজনীয় ও লোভনীয় শিকার! মহিষ ঘোড়া হরিণ শূকর বৃষ ছাগল প্রভৃতি জীবের প্রাধান্যই চিত্রগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। বাঘ ভাল্লুক সিংহ গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র বন্য জন্তুরা প্রায় চোখে পড়েনা। এই যে কেবল প্রয়োজনীয় শিকারের জীবগুলিকেই তাঁরা এঁকে রেখে গেছেন এর কারণ নিশ্চয়ই এ নয় যে—শিল্পকলার দিক দিয়ে এই সব প্রাণীর ছবিই সবচেয়ে সুন্দর ও নয়নাভিরাম। বরং এই কারণটাই অধিকতর সঙ্গত ব'লে মনে হয় যে এই প্রাণীগুলিই ছিল তখন তাঁদের জীবন-ধারণের প্রধান অবলম্বন, কাজেই তাদের এঁকে রাখায় কলা-চর্চ্চার অপেক্ষা প্রয়োজনের ও স্বার্থের তাগিদই সূচিত হয় বেশী।

বৃদ্ধ বাইশন্ (আল্তামীরা)

গুহার শোভা-সৌন্দর্য্য বা নিজেদের শিল্প-পরিচয়

হিসাবে একটা কীর্ত্তি রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য যে এর মধ্যে ছিলনা, তার প্রমাণ হ'চ্ছে—একই স্থানে একই পটভূমিকার উপর আগে যে ছবি আঁকা হয়েছিল তারই ঘাড়ের উপর একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আঁকা হ'য়েছে! অথচ, পরে আঁকবার সময় আগের আঁকা ছবিখানি সেখান থেকে তুলে ফেলবার বা মুছে ফেলবার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি! কাজেই মনে হয়, এ ছবি শিল্প সৃষ্টির খাতিরে আঁকা নয়, কোনো কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের সঙ্গেই এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল।

আর এক রকমের চিত্র এই সব গুহার অভ্যন্তরে দেখতে পাওয়া গেছে; সেগুলি সব 'করপদ্মের' চিত্র! আমাদের দেশে যেমন 'হরির চরণ' বা গদাধরের 'পাদপদ্ম' রাখার রীতি আছে, হয়ত পঞ্চাশ হাজার বছর আগে গুহাবাসী মানবেরা তাদের প্রিয়জনের 'করপদ্মের' চিত্র নিয়ে রাখতেন। এ ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায়, কোথাও হাতখানি দেওয়ালের গায়ে রেখে তার চারিদিকে খড়ি বুলিয়ে 'করপদ্ম' দেগে নেওয়া হয়েছে, কোথাও বা হাতে রং মাখিয়ে পাথরের উপর সেই হাতের রঙিন ছাপ্ নেওয়া হ'য়েছে! জুতোর মাপ দেবার সময় এখনও যেমন কাগজের উপর আমাদের পা' রেখে তার চারিদিকে পেন্সিলের দাগা বুলিয়ে নেওয়া হয়, পঞ্চাশ হাজার বছর কি আরও বেশী দিন আগে মানুষ প্রথম ছবি আঁকতে শিখেছিল তেমনি ক'রেই; ওই পাথরের উপর হাত রেখে পাঁচ আঙুলের চারপাশে দাগা বুলিয়ে।

এই গুহাচিত্রের পরিচয় অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও পাওয়া গেছে। মানুষের প্রথম শিল্প প্রচেষ্টার এই প্রাচীনতম নিদর্শন সর্ব্বত্রই প্রায় এক রকম। সেই করপল্লব ও জীবজন্তুর ছবিই প্রধান। ক্রমে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন প্রস্তর যুগ থেকে ধাতব আমলে এসে পৌছালো সে উল্কী পরতে শিখলে, ফুলফল লতাপাতা আঁকতে সুরু ক'রলে। নিজেদের প্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্যাদি ও মানুষের মূর্ত্তি আঁকতেও সে সুপটু হ'য়ে উঠ্‌লো। এই গুহাচিত্রের চরম পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের 'অজন্তা' ও 'বাঘগুহা' প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহার ও ইলোরার কৈলাস মন্দিরে; এখানে চিত্র ও স্থাপত্য পাশাপাশি প্রতিযোগিতা ক'রে পরস্পরকে যেন অতিক্রম ক'রে যাবার চেষ্টা ক'রেছে। তবে, এ গুলির বয়স দু'হাজার বছরেরও কম, তবু পঞ্চাশ হাজার বছর আগের প্রাচীন শিল্পীরা যে এঁদের চেয়ে কেউ অল্প শক্তিশালী ছিলেন এমন কথা বলা চলেনা। চিত্রকলার ইতিহাস অতি চিত্তাকর্ষক। পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

অভিনন্দন

অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার

(শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের 'অনামী' পাঠে—)

"অনামী" আসিল নামি'
　　কোন্ সে-ধারায়?
আপনি পথের মাঝে
　　পথ যে হারায়!
আঁচল লুটায়ে পড়ে
শিশির কণায় ঝরে
তারি কথা দেয় ধ'রে
　　তারায় তারায়!

আফোটা অনামী ফুল
　　অলকে জড়ায়
নিবিড় চঞ্চল আঁখি
কি যেন আবেশ মাখি'
তাহারি অস্ফুট ভাষে
　　হৃদয় ভরায়।

(বিজয়াদশমী, ১৩৪০

বাঙ্গালার জমিদারবর্গ

আচার্য্য স্যার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

(২)

গত ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' বর্ত্তমান জমিদারদিগের বিষয় কিছু বলিয়াছি। অনেকে হয় ত ভাবিতে পারেন যে আমি তাঁহাদিগের উপর অযথা দোষারোপ করিয়াছি; কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে জমিদারদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য তাঁহারা নিজেরাই ষোল-আনা দায়ী। আমি জমিদারদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী, আজ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার জমিদারদিগের বিলোপ সাধন হয় তাহা হইলে দেশে এক ভীষণ অর্থ-নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে, কারণ জমিদারবর্গের সঙ্গে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, গাঁতিদার, দরগাঁতিদার, মৌরুষীদার সকলেই এক সূত্রে গাঁথা। তাঁহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নিরন্ন হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

বোম্বাই অঞ্চলের ঐশ্বর্য্যশালিগণ বাঙ্গলার জমিদার-বর্গের সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করিয়া থাকেন। খুলনার ভীষণ দুর্ভিক্ষে ও উত্তর-বঙ্গ প্লাবনের সময় ঐ সমস্ত প্রদেশ হইতে অনেক রাজোচিত দান পাইয়াছিলাম। যদিও তাঁহারা অকাতরে মুক্তহস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকে ইহাও বলিতে ত্রুটি করেন নাই যে, যে দেশের ধনবহুল জমিদারবর্গ পরম সৌভাগ্যক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করেন, সে দেশের অধিবাসীবৃন্দের দুর্দ্দশায় অন্য প্রদেশবাসিগণের নিকট হাত পাতিবার প্রয়োজন কি? কারণ, তাঁহারা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না যে, বর্ত্তমান জমিদার-গণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই, এমন কি ৯৯জন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ঋণজালে জড়িত।

Royal Agricultural Commissionএর সম্মুখে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র একটী সুচিন্তিত মন্তব্য দাখিল করেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, জমিদারবর্গ প্রজাগণের নিকট হইতে মোট চৌদ্দ কোটী টাকা কর পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে রাজস্ব, রোডসেস্ এবং আমলা গোমস্তাদিগের বেতন বাদ দিলে ইহা মাত্র ৯ কোটীতে দাঁড়ায়। প্রথম শুনিলেই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যাঁহারা জমির উপস্বত্ব ভোগ করেন তাঁহাদের সংখ্যা মোট ৪১ লক্ষ। তাহা হইলে প্রত্যেকের আয় ২২্ টাকার অধিক হয় না। অধিকন্তু ইঁহারা আবার বহু সরিকে বিভক্ত। যাঁহাদের ন্যূনকল্পে ১২০০০্ আয়, তাঁহারাই Legislative Assemblyতে ভোট দিতে পারেন। এইরূপ ভোটদাতাগণের সংখ্যা বাঙ্গলাদেশে মাত্র ৭০০। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙ্গলার জমিদারগণ হিংসা-নয়নে দেখিবার পাত্র নন। অবশ্য ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা ধনী ছিলেন।

কিন্তু, অদ্যাপি বর্দ্ধমান, কাশীমবাজার, ময়মনসিংহ (মুক্তাগাছা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, গৌরীপুর), রাজসাহী (নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁটিয়া), পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকো * প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত বনিয়াদী ঘর আছে এবং যাঁহাদের আয় ২।৩ লক্ষ হইতে ১০।১২ লক্ষ বা ততোধিক হইবে আমি তাঁহাদেরই কথা বলিতেছি। চুনাপুঁটির কথা ধরিলাম না। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষগণ দেশের নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন; অদ্যাপি তাঁহাদের দানে পুষ্ট এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আমরা দেখিতে পাই।

উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ সালে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গভরমেণ্টের নিকট ঐ বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন, এবং পরে নিজ ব্যয়েই উহা স্থাপন করেন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তদীয় সুযোগ্য পুত্র রাজা প্যারীমোহনও বিদ্যা বুদ্ধিতে জমিদারদিগের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। Sir William Hunter একবার London Times পত্রে বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশে প্যারীমোহনের ন্যায় রাজস্ব ও প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সেই সময় আর কেহই ছিলেন না। রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত

---

* রাণাঘাট, নড়াইল ও সাতক্ষীরার জমিদারদিগের কথা উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাঁহারা এখন প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।

একমত ছিলেন। উত্তরপাড়ার Public Library ইঁহাদের একটী উজ্জল কীর্ত্তি। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ জমিতে প্রথম আলুর চাষ প্রবর্ত্তিত করান এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন; এখনও কাল্না অঞ্চলের প্রজাবর্গ তাঁহাকে এই জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে।

শতাধিক বর্ষের অধিক হইল ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল যখন কাশীবাসী হন, তখন সর্ব্বপ্রথমে তিনিই অন্যূন ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কাশীতে একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন; এবং তৎপরে দানপত্রের দ্বারায় চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটীর হস্তে উক্ত বিদ্যালয় দান করেন। জয়নারায়ণ ঘোষালের একমাত্র পুত্র রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল কাশীতে অন্ধ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু অর্থব্যয়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিয়া সাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের চতুর্থ প্রপৌত্র রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর বর্ত্তমান 'জয়নারায়ণ' ভবনটী বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া এবং স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ ও পরিচালনার জন্য আরও বহু সহস্র মুদ্রা উক্ত কলেজের ট্রাষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

১৮১৭ সালে যখন হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ও গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর ইহার উন্নতি-কল্পে প্রভূত অর্থ দান করেন। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ স্বর্গীয় মহারাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর মহাভারত, রামায়ণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিরতণ করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি স্কুল কলেজে এবং নানাবিধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে দান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সর্ব্বস্ব দান করিয়া একরকম রিক্ত হন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সমসাময়িক পুঁটিয়ার রাণী শরৎকুমারীও বহুবিধ সদনুষ্ঠানে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহী কলেজ প্রধানতঃ পুঁটিয়ার ও দিঘাপতিয়ার দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। টাঙ্গাইলের জাহ্নবী চৌধুরাণী যে স্কুল স্থাপন করেন, তাঁহার পুত্রবধূ দীনমণি চৌধুরাণীও তাহাতে উপযুক্ত রূপ দান করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী রাসমণির কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যদিও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তথাপি তিনি স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার এতদ্ বিষয়ে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া বেথুন সাহেব তাঁহাকে দেশীয় স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান উদ্যোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

"I am anxious to give you the credit which justly belongs to you of having been the first native in India, who in modern times has pointed out the folly and wickedness of allowing women to grow up in utter ignorance, and that it is neither enjoined nor countenanced by anything in the Hindu Sastras."

জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম স্যার রাধাকান্তই সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং উক্ত মহাগ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ যাবতীয় সুধীগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রকাশিত হইলে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার অভিনবত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহার অনুজ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত-চর্চ্চার পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। এস্থলে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি অজ্ঞাতসারে দেশহিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করিতেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় মহারাজা মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী, টাকীর মুন্সী-বংশের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন প্রথিতনামা জমিদার সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউন হলে যখন বঙ্গ-ভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ সভা আহূত হয়, তখন অমিততেজা সূর্য্যকান্ত সিংহবিক্রমে যে প্রকার সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন, তাহা অতীব বিরল ও প্রশংসনীয়। তিনি বলিয়াছিলেন "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরিব সেও ভাল, বিদেশী কাপড় স্পর্শ করিব না।" তাঁহার সম্বন্ধে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, যাহা এখনকার

পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। যে কল্পনাপ্রসূত কথোপকথন উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে সত্য ঘটনার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে।

লর্ড কার্জ্জন—মহারাজ! আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

সূর্য্যকান্ত—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কত রাজন্যবর্গ উপাসনা করিয়া ভারতেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধির পদধূলি লাভ করিতে সক্ষম হন না; আর আমি ত একজন নগণ্য জমিদার মাত্র। ইহা আপনার ঔদার্য্য ও মহানুভবতার নিদর্শন।

লর্ড কার্জ্জন—মহারাজ, আমার আগমনের উদ্দেশ্য হয় ত এখনও আপনি বুঝিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার আয়তন অতি বৃহৎ। একজন গভর্ণরের অধীনে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা একরকম অসম্ভব। কাজেই প্রাকৃতিক সীমা অনুযায়ী এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। আমার মনোগত ইচ্ছা যে আপনাকেই পূর্ব্ব-বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত করাই। (I propose to make you the first nobleman in East Bengal.)

সূর্য্যকান্ত—আমাকে মাপ করিতে হইবে। সমস্ত বাঙ্গালীজাতি, অন্ততঃ যাহাদের দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে, তাঁহারা কখনই এ ব্যাপার অনুমোদন করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের এই ধ্রুব বিশ্বাস যে, আজ যদি বাঙ্গলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতির যে একতা ও সংঘবদ্ধতা আছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। আমিও প্রকাশ্যভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছি। আজ যদি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহা হইলে দেশে বিদেশে আমার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে এবং আমি বাঙ্গালীজাতির ধিক্কারের পাত্র হইব।

পূর্ব্বকালের জমিদারদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। এই রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়, যাহাতে তাঁহাদের গুণাবলির ও সৎকার্য্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! আজ তাঁহাদের বংশধরদিগের প্রতি তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হয়। বঙ্গমাতার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যিনিই কামনা করুন না কেন, তাঁহাকে সমভাবে জমিদার, প্রজা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই উন্নতির প্রয়াসী হইতে হইবে। বর্ত্তমান জমিদারগণ জাতীয় নব-জাগরণের পশ্চাতে পড়িয়াছেন; এমন কি পাছে স্বার্থের ব্যাঘাত হয় এইজন্য তাঁহারা অনেক সময় দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন না। পরবর্ত্তী সংখ্যায় বর্ত্তমান জমিদার দিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।*

* শ্রীমান অরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

অনুরোধ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌সি

মন-দখিণারে নব-বসন্তে খুলে দাও সখি! দ্বার,—
আসুক লুঠিয়া বিশ্বের যত সঞ্চিত মধুভার;
কুঞ্জ বিতান ঘিরি অনিবার
এ কি নিশিদিন গুঞ্জন তার!—
দিকে-দিকে জাগে চির-চঞ্চল
বাসন্তী-অভিসার!

উতলা দখিণা; কেমনে সে রোধে আপন মর্ম্ম-কথা?—
নৃত্য-চপলা তটিনীর বুকে জাগে কি গো নীরবতা?
ভোরের আলোকে যে পাখীটি গায়,—
বলো দেখি তারে কে তাহা শিখায়?
রাখিলে খাঁচায় ভোলে কি গো কভু
আলোক-লেখার কথা?

খুলে দাও দ্বার! দিকে-দিকে তারে দাও আজ বিলাইয়া—
শত রজনীর উৎসব-রসে জীয়ানো তাহার হিয়া!
কুসুমের বুকে জাগে যবে মধু;—
জানে নাকো কেহ, জানে তার বঁধু!
প্রাণে প্রাণে যত চলে জানাজানি
—জানে শুধু দরদিয়া!

—বৃথা ঢাকো আজ অবগুণ্ঠনে কমল আননখানি—
সাধ জাগে, তবু শুনেও শোনে না প্রথম প্রণয়-বাণী!
মাগি' চুম্বন অধীর অধর;
দিতে প্রতিদান কাঁপে থরথর।
বাড়ে যত সাধ, লাজ শতগুণে
আনে শুধু সাথে টানি!

পুষ্প-বিতানে লাগে যদি দোল, ভোলে কি মধুপ তায়?
যত বাড়ে দূর—বেদনা-বিধুর ধরিবারে শুধু চায়!
প্রাণ ছুঁয়ে যত চলে যায় গান,
মন তার লাগি' করে আনচান!
ছোটে নিতি মিছে করি সন্ধান—
অনন্ত সুষমায়!

—খুলে দাও দ্বার! খুলে দাও দ্বার! জীবনের শুভক্ষণ
এসেছে গো সখি! কর তারে আজ মহা অভিনন্দন'
সাধনা তোমার হ'য়ে শতদল—
আজি এ প্রভাতে বিথারিল দল!
আগমনী যদি গেয়েছে পরাণ
—বৃথা তবে 'গুণ্ঠন!

সাময়িকী

বিজয়ার সম্ভাষণ—

বিজয়ান্তে—বর্ষাতে মা'র পূজা শেষ করিয়া—মা'কে প্রণাম করিয়া—কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সকলকে প্রীতিসম্ভাষণ—নমস্কার, আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করা আমাদিগের বাঙ্গালার চিরাচরিত প্রথা। সেই প্রথানুসারে আমরা আজ সর্ব্বপ্রথমে সকলকে আমাদিগের প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। যিনি আমাদিগের জননী—বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যাঁহার অঙ্কে পালিত হইতেছেন, যাঁহার বন্দনাকালে আমরা বলি—

"শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম"

যিনি আমাদিগের বাহুতে শক্তি ও অন্তরে ভক্তি, সেই শক্তিরূপিনী জননীর চরণে আমরা আজ সশ্রদ্ধ প্রণাম করিতেছি। তিনি প্রসন্ন মনে তাঁহার সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন—বহুবলধারিণী, তারিণী, রিপুদলবারিণী জননীর সন্তানগণ তাঁহার সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবার যোগ্যতা লাভ করুক। আজ জগতে দুর্দ্দিনের অন্ধকার—তাঁহার কৃপা ব্যতীত এ অন্ধকার দূর হয় না। কিন্তু তাঁহার কৃপায় ইহা ক্ষণকালমধ্যে দূর হইয়া আবার তরুণ অরুণ-কিরণ-বিকাশ সূচিত হইতে পারে। তিনি সেই কৃপা দান করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। যে ক্ষুদ্র হিংসা, দ্বেষ, হীনতা, দৈন্য মানুষকে ও সমাজকে পীড়িত করে, আজ সে সকলের বিজয়া হউক—সে সব বিস্মৃতির অতলে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা শান্তিজলে অভিষিক্ত হইয়া মনুষ্যত্বের বিরাট আদর্শের অনুসরণ করি। তাহা শক্তিসাপেক্ষ,—শক্তিরূপিনী আমাদিগকে তাহার জন্য আবশ্যক শক্তি প্রদান করুন। তাঁহার বর ও অভয় লাভ করিয়া আমরা ধন্য ও সর্ব্ববিধ অকল্যাণমুক্ত হই।

—

"রাজনীতিক" হত্যা—

গত ২রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বার্জ্জ আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে মেদিনীপুরে দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট—মিষ্টার পেডী ও মিষ্টার ডগ্‌লাস এইরূপে নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মিষ্টার বার্জ্জের শোচনীয় হত্যায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্থানীয় খেলোয়াড়দিগের দলে ফুটবল খেলিবার জন্য আসিয়াছিলেন; এবং যখন মোটর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া খেলা করিবার স্থানে যাইতেছিলেন, তখন একাধিক যুবক অতর্কিতভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করে। তিনি তখনই গতপ্রাণ হইয়া পতিত হয়েন। তাঁহার সঙ্গে যে প্রহরীরা ছিল তাহাদিগের গুলীতে একজন যুবক নিহত ও একজন আহত হয়। আহত যুবক "আমাকে মেরে ফেল" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে এবং পরে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে তিনজনের জীবন এই ঘটনায় নষ্ট হইয়াছে—একজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী, দুইজন বাঙ্গালী যুবক—তিনটি পরিবারে শোকের ঘনান্ধকারপাত হইয়াছে।

মিষ্টার বার্জ্জের শিষ্টাচার, সাহস প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যাইতেছে। তিনি যে সাহসী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তাঁহার পূর্ব্বে দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট মেদিনীপুরে নিহত হইয়াছিলেন জানিয়াও তিনি তথায় অবাধে লোকের সহিত মিশিতেন—আপনার কর্ত্তব্য পালনে দ্বিধানুভব করেন নাই। তিনি শিষ্টাচারীও ছিলেন। কারণ, তিনি স্থানীয় যুবকদিগের সহিত ফুটবল খেলিতেন এবং ফুটবল খেলিতে যাইয়া আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং মনে করা স্বাভাবিক যে, মিষ্টার বার্জ্জকে ব্যক্তিগত কারণে হত্যা করিবার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। যে কারণে, তাঁহার পূর্ব্বে মিষ্টার পেডী ও মিষ্টার ডগ্‌লাস নিহত হইয়াছেন, সেই কারণেই এক বা একাধিক

লোক নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া—মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

সন্ত্রাসবাদে ইহার উদ্ভব। ইহা রাজনীতির অনুরঞ্জনে রঞ্জিত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, রাজনীতির দিক হইতে লক্ষ্য করিলে ইহা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় না হইয়া পরিপন্থী হয়। বাঙ্গালায় যখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া দেশে বিষম বিক্ষোভ, সেই সময়—সেই সুযোগে এই সন্ত্রাসবাদের প্রচারকগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আয়ার্লণ্ড তাহাদিগের আদর্শ ছিল। আজ আমরা আয়ার্লণ্ডে সন্ত্রাসবাদের ফল কি হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব, ইহার ব্যর্থতার বীজ ইহার অন্তরেই বিদ্যমান।

আইরিশরা বাঙ্গালী সন্ত্রাসবাদীদিগের তুলনায় অধিক সঙ্ঘবদ্ধ ছিল এবং অধিক ব্যাপকভাবে আপনাদিগের ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী যে "বয়কট" অস্ত্র দ্বারা জয়লাভের আশা করিয়াছিল, তাহারও উদ্ভব আয়ার্লণ্ডে। আইরিশরা যে ভাবে ইহা পরিচালিত করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়কর। যদি জমীদারকে খাজনা দিতে অস্বীকার করায় কাহারও জমী বিক্রয় হয়, তবে কি হইবে? আইরিশ নেতা পার্ণেল এক সভায় জিজ্ঞাসা করেন, খাজনার জন্য কোন প্রজার জমী বিক্রয় করা হইলে যদি আর একজন তাহা ক্রয় করে, তবে লোক ক্রেতার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে? সভায় একজন শ্রোতা বলে, "তাহাকে গুলী করিয়া মারিব।" শুনিয়া পার্ণেল বলেন, না—পথে, গির্জ্জায়, বাজারে যে স্থানে সে যাইবে সেই স্থানেই লোক তাহাকে বর্জ্জন করিবে—যেন সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। এক মাস যাইতে না যাইতেই আইরিশরা এই উপদেশানুসারে কায করে। লর্ড আর্ণের আমমোক্তার কাপ্তেন বয়কট প্রজারা স্বেচ্ছায় যে খাজনা দিতে চাহিয়াছিল, তাহা না লইয়া পূর্ণদাবি শোধ টাকা চাহিলে প্রজারা তাঁহাকে বর্জ্জন করিল। তাঁহার ভৃত্যগণ ও শ্রমিকরা ভয়ে বা স্বেচ্ছায় কার্য্য ত্যাগ করিল। তিনি ক্ষেত্রের কাযের জন্য কৃষক পাইলেন না, কেহ তাঁহার শকট-চালক হইতে স্বীকার করিল না; —নালবাঁধ তাঁহার ঘোড়ার নাল বাঁধিতে ও রজক তাঁহার কাপড় কাচিতে অস্বীকার করিল; মুদী তাঁহাকে জিনিষ বেচিতে ও হরকরা তাঁহার পত্র বিলি করিতে অসম্মত হইল। পুলিশ ও সৈনিকদিগের সাহায্যে তাঁহাকে ফশল সংগ্রহ করিতে হইল। যে ফশলের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা, তাহা রক্ষা করিতে বাহান্ন হাজার টাকা ব্যয় হইল। শ্রমিকদলকে রক্ষা করিবার জন্য সাত হাজার সৈনিক ও পুলিশ প্রয়োজন হইল। পার্ণেল বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক সালগমের জন্য প্রায় বারো আনা খরচ পড়িয়াছিল!

ইহা হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ বর্জ্জন "বয়কট" নামে অভিহিত হয়। এই ক্ষেত্রে আইরিশরা যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে—যেরূপে একযোগে কায করিয়াছিল, তাহা কি বাঙ্গালায় সম্ভব হইয়াছে? হয় নাই। কিন্তু আইরিশরাও সন্ত্রাসবাদের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সন্ত্রাসবাদীদিগের অনাচার—লোকের ধনসম্পত্তি ও প্রাণনাশে যত প্রবল হইয়াছে, তাহা দমন করিবার জন্য সরকারকেও তত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এক-পক্ষের উগ্রতায় অপর পক্ষের ব্যবস্থার উগ্রতা তত বর্দ্ধিত হইয়াছে। সেই জন্য প্রায় ৪০ বৎসর কালের আয়ার্লণ্ডের ইতিহাস রক্তে রঞ্জিত, অশ্রুসিক্ত। বাস্তবিক সন্ত্রাসবাদীরা যদি তাহাদিগের কার্য্যে বিরত হইত, তবে হয়ত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দেই আয়ার্লণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। কারণ, এই বৎসরেই আইরিশ জননায়ক পার্ণেল প্রভৃতির সহিত বিলাতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক গ্ল্যাডষ্টোনের মীমাংসার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পার্ণেল প্রস্তাব করেন, প্রজাদিগের বাকি খাজনার একটা সুব্যবস্থা হইলেই নেতারা খাজনা বন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবেন। গ্ল্যাডষ্টোন ইহাতে সম্মত হইলে পার্ণেল, ডিলন, ডেভিড প্রভৃতি কারারুদ্ধ জননায়কগণ মুক্তিলাভ করেন। তখন যাঁহারা আয়ার্লণ্ডে দমননীতি পরিচালিত করিতেছিলেন সেই ইংরাজরাজ-কর্ম্মচারী ফরষ্টার ও কাউপার পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদিগের স্থানে লর্ড স্পেন্সার ও লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেনডিশ নিযুক্ত হয়েন। আইরিশ প্রজারা বকেয়া খাজনার ভার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরম আনন্দানুভব করে। কিন্তু আততায়ীদিগের কার্য্যফলে মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ ও আশার অবসান হয়।

আজ বঙ্গদেশে যেমন, তখন আয়ার্লণ্ডেও তেমনই এক দল লোক মনে করিত, যে-কোন অস্ত্র লইয়াই কেন হউক না সরকারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, গোপনে নরহত্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বাঁরা সাফল্য লাভ করা যায়। কিন্তু তাহাদিগের লক্ষ্য স্থির ছিল না। ইহাদিগের একটি দলের নাম ছিল—"অপরাজেয়।" ইহারা চীফ সেক্রেটারী ফরষ্টার ও তাঁহার সহচারী বার্ককে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ৬ই মে তারিখে নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড স্পেন্সার ও নূতন চীফ সেক্রেটারী লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেন্‌ডিশ শোভাযাত্রা করিয়া ডাবলিন সহরে প্রবেশ করেন। সেদিনের অনুষ্ঠান শেষ হইলে লর্ড ফ্রেডরিক মিষ্টার বার্কের সহিত ফিনিক্স পার্কে বেড়াইতে গমন করেন। মেদিনীপুরে আততায়ীরা যেরূপে মিষ্টার বার্জ্জকে হত্যা করিয়াছে, সেই ভাবেই আততায়ীরা উভয়কে হত্যা করে। তাহাদিগের ছুরিকাঘাতে উভয়ের জীবনপাত হয়।

এই ঘটনায় বিলাতের লোকের সহানুভূতির অবসান হয়; গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি আর আইরিশদিগকে সাহায্য করিতে পারেন নাই। এমন কি আইরিশ জননায়ক—যে সময় আয়ার্লণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল সেই সময় এই ব্যাপারে—ব্যথিত হইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গ্লাডষ্টোন তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার অভাবে অনাচার দমন করা দুঃসাধ্য হইবে। আয়ার্লণ্ডের ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—একজন সদাশয় ইংরাজ শান্তির দূত হইয়া আসিয়া এইরূপে নিহত হওয়ায় সকলেই বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলেন।

"অপরাজেয়" দলের লোকরা কিরূপ চতুর ও সাহসী ছিল, তাহার পরিচয় পূর্ব্বোক্ত হত্যা সম্পর্কে পাওয়া গিয়াছিল। ঐ দলের কেরী নামক একজন লোক সরকারের গোয়েন্দা হইয়া হত্যার রহস্য ভেদ করিয়া দেয়। ফলে ছয় জনের মৃত্যুদণ্ড, দুই জনের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড এবং কয় জনের কারাদণ্ড হয়। কেরীকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু তাহার আশঙ্কা ছিল, দলের লোকরা তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিবে না। পুলিশের পাহারায় কয় মাস লুকাইয়া থাকিবার পর সে দেশত্যাগ করিয়া ভীতিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিলে সরকার তাহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেন। জাহাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার পরে ছদ্মবেশধারী কেরীকে কেপটাউন-যাত্রী জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হয়। সে তখন পাওয়ার নাম গ্রহণ করিয়াছিল। প্যাট্রিক ওডনেল নামক এক ব্যক্তি কিন্তু তাহার অনুসরণ করিতেছিল। যখন কেরী কেপটাউনে পৌছিয়া সপরিবারে নাটাল-যাত্রী মেলরোজ জাহাজে আরোহণ করে, তখনও ওডনেল তাহার সহযাত্রী হয়। জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিলে সুযোগ বুঝিয়া সে কেরীকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

যে দেশে সন্ত্রাসবাদীরা এইরূপে ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করিতে পারে, সে দেশেও তাহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

আইরিশরা নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা ইংরাজদিগকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যে সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করে, সে সকলের মধ্যে ফিনিয়ান সোসাইটী ও সিন ফিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিন ফিনের উদ্দেশ্য ছিল—"আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা।"

এমন কি জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংরাজ যখন বিব্রত, সেই সময় আইরিশরা বিদ্রোহী হইয়া প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিল। ইহার জন্য আইরিশরা কিরূপ আয়োজন করিয়াছিল, তাহা "স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে"র মুখবন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত ছিল—

"গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, আইরিশ রেপাব্‌লিকান ব্রাদারহুড, প্রকাশ্য সামরিক প্রতিষ্ঠান, আইরিশ স্বেচ্ছাসৈনিক দল ও আইরিশ নাগরিক দল—এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আয়ার্লণ্ডের পুরুষদিগকে কার্য্যের জন্য ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া—সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া—আয়ার্লণ্ড এতদিন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, আজ সে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। আমেরিকায় নির্ব্বাসিত আইরিশদিগের ও য়ুরোপে বীর মিত্র-শক্তি সমূহের সাহায্যে নির্ভর করিয়া জয়লাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া আয়ার্লণ্ড আজ (ইংরাজকে) আক্রমণ করিতেছে। কিন্তু তাহার আপনার শক্তিই তাহার সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন।"

মার্কিণ-প্রবাসী আইরিশদিগের অর্থসাহায্যে আইরিশরা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল—তাহারা কলের কামানও পাইয়াছিল। যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়, তখন নাগরিকদলে অন্ততঃ তিন হাজার ও স্বেচ্ছাসৈনিক দলে অন্ততঃ তেরো হাজার সশস্ত্র লোক ছিল। তাহাদিগকে লইয়া আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহীরা ডাবলিন সহর অধিকার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা পক্ষকালও সুশিক্ষিত সরকারী সেনাদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে নাই। এই পক্ষকাল ডাবলিন সহরে দিবসের আলোক অগ্নিযোগে প্রজ্জলিত গৃহ হইতে নির্গত ধূমে মলিন এবং রাত্রির অন্ধকার অগ্নিশিখার আলোতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। যে সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহার মূল্য অন্যূন ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা; হতাহত সৈনিক ও পুলিশের সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত; বোধ হয়, নাগরিক দলে সহস্রাধিক লোক হতাহত হইয়াছিল। কোন লেখক বিদ্রোহাবসানে ডাবলিন সহরের দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"আমি বহু ধ্বংসাবশিষ্ট নগর প্রত্যক্ষ করিয়াছি—জর্মাণ যুদ্ধে বিধ্বস্ত উত্তর ফ্রান্সে ও বেলজিয়মে বহু নগর দেখিয়াছি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র ব্যাপার। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদিগের লোকরাই আমাদিগের বিরাট নগরের বক্ষ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে।"

ইহার পূর্ব্বে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যে বিদ্রোহের আয়োজন হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আইরিশরা দেশ-বিদেশ হইতে বহু অর্থ পাইয়া এবং বহু লোক সংগ্রহ করিয়াও সন্ত্রাসবাদের দ্বারা আয়ার্লণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। পরন্তু এমন কথা বলা যায় যে, সন্ত্রাসবাদীদিগের অনাচার অনুষ্ঠিত না হইলে—দীর্ঘকাল আয়ার্লণ্ড—রক্তসিক্ত পথে পরিভ্রমণ না করিলে হয় ত বহুদিন পূর্ব্বে তথায় স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইত।

কেবল তাহাই নহে, অনাচারের পরিবেষ্টন যদি একবার সৃষ্ট হয়, তবে তাহা দূর করা সহজসাধ্য হয় না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ—

"গঠন ভাঙ্গিতে পারে, আছে নানা খল;
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে, সে বড় বিরল।"

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (৬ই) আয়ার্লণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির ফলে আয়ার্লণ্ডকে কানাডার মত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদত্ত হয়। কিন্তু তাহাতে কি আয়ার্লণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার স্বীকৃত হইতে না হইতে—যাঁহারা দুর্দ্দিনে একযোগে কায করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই মতভেদ ও পদ্ধতিভেদ উদ্ভূত হয়। যাঁহারা আয়ার্লণ্ডের সেবায় বহুবার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই একজন—সেনাদলের নায়ক জেনারল কলিন্স আততায়ীর গুলীতে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার হত্যা সম্পর্কে আয়ার্লণ্ডের ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—

"যে ইংরাজের সহিত তিনি দৃঢ়সঙ্কল্পে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের আঘাতে যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটিত, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু তাঁহার যে স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্য তিনি বার বার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই এক জনের গুলীতে প্রাণ হারান সত্য সত্যই অদ্ভুত পুরস্কার লাভ। পূর্ব্বে বহুবার যেমন, এই ঘটনাতেও তেমনই প্রতিপন্ন হইয়াছে, আয়ার্লণ্ডে দেশসেবকের পথ বিপদের কঙ্করে কণ্টকিত।"

আজও আমরা দেখিতেছি, আয়ার্লণ্ড যেন সশস্ত্র সৈনিকদলে পূর্ণ স্কন্ধাবার হইয়া আছে। এই অবস্থা পূর্ব্বসৃষ্ট অশান্তির ও অনাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল।

দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা—দেশের লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করা—দেশকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করা রাজনীতি। সুতরাং ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যা এ সকল প্রকৃত রাজনীতি নহে। কোন হত্যাই "রাজনীতিক" হত্যা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

আমরা আজ কিছু বিস্তৃতভাবে আয়ার্লণ্ডের ইতিহাসের শিক্ষার আলোচনা করিলাম। তাহার কারণ, এদেশের—বিশেষ বাঙ্গালার সন্ত্রাসবাদীরা যে আয়ার্লণ্ডের সন্ত্রাসবাদীদিগের আদর্শের ও পদ্ধতির অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা উভয় দেশের সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আয়ার্লণ্ডে যাহা সম্ভব হয় নাই, এ দেশে তাহা সম্ভব না হইবার বিশেষ কারণ আছে। সে দেশের লোকের প্রকৃতির সহিত এ দেশের লোকের শিক্ষার ও দীক্ষার এবং শিক্ষাদীক্ষাপ্রভাবিত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন পরিস্ফুট। হিংসা এ দেশের—বিশেষ হিন্দুর ধাতুসহ নহে। সেই জন্যই বাঙ্গালায় প্রথম সন্ত্রাসবাদীরা মাণিকতলার বাগানে ধৃত হইয়া যে বিবৃতি আদালতে প্রদান করে, তাহাতে বলিয়াছিল, যখন মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমায় ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড আহত না হইয়া দুইজন মহিলার মৃত্যু ঘটে; তখনই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাদিগের অনুষ্ঠানে ভগবানের অভিসম্পাত আছে। আজ তাহাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাদিগের ভ্রম স্বীকার করিয়াছে ও তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রচারও করিতেছে। কিন্তু প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিল, আজ তাহা নির্ম্মূল করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যায়ও তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

আয়ার্লণ্ডে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যে সব বিশৃঙ্খলা ব্যাপ্তিলাভ করে সে সকল দলিত করিবার জন্য আইরিশ সরকার যে ইস্তাহার প্রচার করেন, তাহার একাংশ এইরূপ—

"দেশের লোক যে সরকারকে দেশ ও দেশবাসীর রক্ষার ও শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার ভার দিয়াছে আইনমান্যকারী প্রজামাত্রকেই (অত্যাচার ও অনাচার-জনিত বিপদ হইতে) রক্ষা করা সেই সরকারের কর্ত্তব্য। সরকার দৃঢ়তা সহকারে সেই কর্ত্তব্য পালন করিবেন।"

সেই কর্ত্তব্যপালনে দেশের সরকারকে সাহায্য করাই দেশের লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। সরকারকে যেমন কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়, দেশের লোককেও তেমনই সেই কার্য্যে সরকারকে সাহায্য করিতে হয়।

যাঁহারা মনুষ্যত্বের, ধর্ম্মের, নীতির, সমাজের দিক হইতে দেখেন, তাঁহারা অবশ্যই সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিবেন। কারণ, ইহা মনুষ্যত্বের মূলসূত্রের বিরোধী, ইহা ধর্ম্মের পরিপন্থী, ইহা নীতির ধ্বংসকর এবং সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

যাঁহারা রাজনীতির দিক হইতে দেখেন, তাঁহারাও ইহার সমর্থন করিতে পারেন না। রাজনীতিক মুক্তি যে এই পথে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা অন্যান্য দেশের ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতায় মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বুঝিয়াছেন; এবং বুঝিয়াই দেশবাসীকে অহিংস থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, সন্ত্রাসবাদীদিগের কার্য্য-ফলে আয়ার্লণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসনলাভে বিলম্ব ঘটিয়াছে। এ দেশের সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিলাতে যাঁহারা বিলাতী সরকারের প্রস্তাবিত ভারতের শাসন-সংস্কারের বিরোধী অর্থাৎ যাঁহারা বর্ত্তমানে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার-বিস্তার অসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাঁহারা এই সন্ত্রাসবাদের ছল ধরিয়া বাঙ্গালায় আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ ব্যবস্থাপক সভার নিকট কৈফিয়তের দায়ী মন্ত্রীর অধীন করিতে আপত্তি করিতেছেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, ঐ বিভাগ মন্ত্রীর হস্তগত না করিলে প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করা হয় না। জানিয়াও তাঁহারা যে এই বিভাগ হস্তান্তরিত করিবার বিরোধিতা করিতেছেন, সে কেবল সন্ত্রাসবাদীদিগের অনাচারের জন্য। আর যে সকল প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী-দিগের অনাচার অল্প বলিয়া উপেক্ষা করা যায়, সে সকল প্রদেশের প্রতিনিধিরাও কেহ কেহ পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীতে বাঙ্গালাকে এই অধিকারে বঞ্চিত রাখিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন নাই। মেদিনীপুরে মিষ্টার বার্জ্জের হত্যা যে বিরোধীদিগের দ্বারা যুক্তিরূপে প্রচার হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এ অবস্থায় বাঙ্গালার লোকের কর্ত্তব্য কি? বাঙ্গালার লোককে—বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানকে একযোগে লোক-মতের দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যে, সে অবস্থায় সন্ত্রাসবাদের বীজ আর সমাজে অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না। বাঙ্গালার লোককে আপনাদিগের কার্য্যের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইবে, বাঙ্গালার লোক সমাজ হইতে এই পাপ উন্মূলিত করিতে উদ্‌গ্রীব।

বাস্তবিক এই সন্ত্রাসবাদ সমাজের নানারূপ ক্ষতি করিতেছে। সন্ত্রাসবাদ লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব ও সংস্কার সব দূর করিয়া মানুষের পশুত্বের পুষ্টি সাধন করে। সন্ত্রাসবাদীদিগের কার্য্যফলে যে বাঙ্গালার লোক আজ

বিপন্ন, দেশে ডাকাইতী বাড়িয়া চলিয়াছে, লোকের ধনপ্রাণ আর নিরাপদ নহে, দেশের অস্থির অবস্থায় দেশে শিল্পবাণিজ্য প্রসার না পাইয়া সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সন্ত্রাসবাদীরা যে স্বার্থান্বেষীদিগকেও দলপুষ্টির সহায় বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ডাকাইতীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। তিন বৎসরে ডাকাইতীর সংখ্যা কিরূপ বাড়িয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল—

খৃষ্টাব্দ	ডাকাইতীর সংখ্যা
১৯২৯	৬৯৩
১৯৩০	১১০৩
১৯৩১	১৯২৯

যে মেদিনীপুরে পর পর তিন জন ম্যাজিষ্ট্রেট আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন আলোচ্য তিন বৎসরে তথায় ডাকাইতীর সংখ্যা কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। এই তিন বৎসরে মেদিনীপুরে সংঘটিত ডাকাইতীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫, ১৪৩ ও ২৬১ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে জিলায় সন্ত্রাসবাদীদিগের কার্য্য-পরিচয় অধিক পাওয়া গিয়াছে, সেই জিলাতেই ডাকাইতীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এই সব ডাকাইতীতে কাহারা বিপন্ন হইয়াছে? সন্ত্রাসবাদীদিগের দেশের লোকই এই সব ডাকাইতীতে বিপন্ন হইয়াছে।

এক দিকে যেমন সরকারী কর্ম্মচারীদিগের জীবন-নাশ হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই দেশের লোকের মন কুণ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাকে বাধা দিতে যাইয়া কেহ কেহ জীবন হারাইয়াছে।

সন্ত্রাসবাদ সমাজের সংস্কার শিথিল করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া সমাজের কত অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা ভদ্র ঘরের শিক্ষিত যুবতীদিগকেও হীন হত্যা কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কুমিল্লায় দুই জন যুবতী একখানি দরখাস্ত লইয়া যাইবার ছলে ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে যাইয়া নিরস্ত্র ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করিয়া মারিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে এক যুবতী চান্সেলার সার ষ্ট্যানলী জ্যাকশনকে হত্যা করিবার চেষ্টায় গুলী ছুড়িয়াছিল। চট্টগ্রামে দুই জন যুবতী সন্ত্রাসবাদীদিগের দলে থাকিবার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—একজনকে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পর মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, একজন সেদিন ধরা পড়িয়াছে। যাহারা সংসারে কল্যাণরূপিনী হইবে, মাতৃত্বে যাহাদিগের গৌরব—তাহারা যখন বিনা উত্তেজনায় স্বহস্তে নরহত্যা করে, তখন সমাজের বিপদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে আর বিলম্ব হয় না। তাহাদিগের কার্য্যের ফল কি হয়?

দেশের লোক আজ স্বাবলম্বননীতির অনুরক্ত। সে অবস্থায় দেশের লোককে এই সন্ত্রাসবাদ হইতে সমাজরক্ষা আত্মরক্ষা করিবার জন্য স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করা কি সঙ্গত নহে? তাহাও কি দেশবাসীর কর্ত্তব্য নহে? যাহাদিগের কার্য্যফলে বাঙ্গালীর রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক উন্নতির পথ বিঘ্নাস্তৃত হইতেছে, তাহাদিগের প্রচারিত মত যাহাতে সমাজে গৃহীত না হয়—উত্তেজনাপ্রবণ যুবকযুবতীকে উদ্ভ্রান্ত না করে, সেজন্য দেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যখন এইরূপ এক একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন একবার তাহার নিন্দা করিতে এবং নিন্দা করিবার আবরণে কেবল শাসক-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ও পরিচালিত নীতিতে দোষারোপ করিলে সুফল ফলিবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। শাসক-সম্প্রদায়ের অবলম্বিত নীতি ও পদ্ধতি যে নির্ভুল বা ত্রুটিশূন্য এমন না-ও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যদি ত্রুটি বা ভ্রম লক্ষিত হয়, তবে তাহা দেখাইয়া দেওয়াই সন্ত্রাসবাদের প্রকৃত বিরোধীদিগের কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা করেন না, পরন্তু এক দিকে স্বাবলম্বন নীতি প্রচার করেন এবং অপর দিকে বলেন, সরকার অবিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া—অগ্রনী হইয়া লোকের সহযোগ পাইবার ব্যবস্থা না করিলে সে সহযোগ পাইবেন না, তাঁহারা হয় আপনারা ভ্রান্ত, নহে ত তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তাঁহারা বর্ত্তমান সরকারের সাহায্য বর্জ্জন করিয়া দেশে সর্ব্ববিধ গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া কি দেশ হইতে সন্ত্রাসবাদ উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করিতে

পারেন না? সেদিকে তাঁহারা কি করিয়াছেন ও করিতেছেন?

বাঙ্গালা আজ সন্ত্রাসবাদে বিপন্ন। এই বিপদের স্বরূপ নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গালা হইতে ইহা দূর করিতে না পারিলে, বাঙ্গালীর আরও অনিষ্ট অনিবার্য্য। ইহা বাঙ্গালার স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করেন। এই বিপদ দূর করিবার জন্য কি করা প্রয়োজন, লোক ও লোকমত কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন বা ইহা সম্পাদনে সাহায্য করিতে পারে, তাহাই আজ বিশেষভাবে বাঙ্গালীর বিবেচ্য।

কেন না, এই মত যদি একবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা দূর করা কত দুঃসাধ্য আয়ার্লণ্ডে তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। তথায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইহার উৎপাতে বিব্রত হইয়া কসগ্রেভের সরকারকে অতি উৎকট ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল—সহস্র সহস্র লোককে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেও হইয়াছিল।

সুতরাং ইহা সমাজদেহে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারিবার পূর্ব্বেই ইহার উচ্ছেদ সাধনের উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

—

দামোদরের খাল—

গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গালার গভর্ণর বর্দ্ধমান জিলায় পানাগড় রেল ষ্টেশন হইতে কয় মাইল দূরবর্ত্তী রণ্ডিয়া নামক স্থানে দামোদরের খালের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই খালের জন্য বাঙ্গালার প্রজার প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইংরাজ শাসনে ইহাই বাঙ্গালায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সেচের খাল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এতদিন মাদ্রাজে, পাঞ্জাবে, বোম্বাইয়ে, যুক্তপ্রদেশে বহু সেচের খাল খনিত হওয়ায় বহু জমী উর্ব্বর হইলেও বাঙ্গালায় সে ব্যবস্থা হয় নাই। যতদিন বাঙ্গালা বলিলে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত—ততদিন যে সব খাল এই প্রদেশে খনিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই বিহারে ও উড়িষ্যায়। বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য খাল ছিল কেবল —ইডেন খাল। হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলাদ্বয়ে বহু নদী হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় জলবদ্ধতা হেতু লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সেই সব নদীগর্ভ যাহাতে বর্ষার জলে ধৌত হইয়া যায় সেইজন্য ইডেন খাল খনিত হয়। সে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের কথা। তদবধি এই খালে বাঙ্গালার কেবল আর্থিক ক্ষতিই হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, শীতকালে অনেক সময় খালে জল না থাকায় ইহার জলে নির্ভর করিয়া সেচনসাধ্য কৃষিকার্য্য করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং খাল খননের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই—এমন কথাও বলা যাইতে পারে।

আলোচ্য খাল খননের অন্যতম উদ্দেশ্য—ইডেন খালে জলসরবরাহ যাহাতে অনিশ্চিত না হয়, তাহাই করা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য উদ্দেশ্য—৩শত ৬৬ মাইল বা ২ লক্ষ ৩৪ হাজার একর জমীতে সেচের জল দেওয়া ও কতকটা স্থানের পানীয় জলের অভাব মোচন করা।

এই জন্য রণ্ডিয়ায় দামোদরের বাঁধ দিয়া বর্ষার সময় ও অন্য সময়ে নদীর কতকটা জল খালে প্রবাহিত করা। দামোদরের জলে প্রচুর পলীমাটী থাকায় জমীতে সে জল পড়িলে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়—ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, যে বৎসর দামোদরের বন্যা হইয়াছে, সেই বৎসর বন্যা-প্লাবিত স্থানসমূহে ফসল ভাল হইয়াছে। কিন্তু যে বৎসর বর্ত্তমান বৎসরের মত পর্জ্জন্যের কৃপা অতিমাত্রায় বর্ষিত হইবে, সে বৎসর কৃষকের পক্ষে টাকা বা মূল্য দিয়া সেচের জন্য জল লইবার প্রয়োজন হইবে না। বিশেষ সেচের জলের যে মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে মূল্য ধরিয়া হিসাব না করিলে খালের জন্য ব্যয়িত ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার সুদ ও আসলের জন্য সঞ্চয় পোষায় না—সে মূল্য অল্প নহে। কাযেই আর্থিক হিসাবে এই খাল সফল হইবে, কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বাঙ্গালার গভর্ণর স্বীকার করিয়াছেন, কোন একটি স্থানের লোকের উপকারার্থে যদি সমগ্র প্রদেশের প্রজাকে অর্থব্যয় করিতে হয়, তবে প্রজারা অবশ্যই সেই টাকা হইতে আয়ের আশা করিতে পারে। পাঞ্জাব প্রভৃতি যে সব প্রদেশে সেচের খাল খনন করা হইয়াছে, সে সকল স্থানে জলাভাবে যে সব জমীতে ফসল উৎপাদন করা যাইত না, খালের জলে সে সব জমীতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা যাইতেছে। পাঞ্জাবে প্রায় ৯০ লক্ষ উষর জমীতে এখন ফসল হওয়ায় মরুভূমি স্বর্ণক্ষেত্রে

পরিণত হইয়াছে। মাদ্রাজে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর জল খালে প্রবাহিত করায় ৯০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সংপ্রতি ২০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সকর বাঁধ ও খাল শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ৭৫ হাজার মাইল সেচের খালে প্রায় ৫ কোটি একর জমীতে সেচের সুব্যবস্থা হইয়াছে। এই ৫ কোটি একর জমীতে যে ফসল উৎপন্ন হইতেছে তাহার মূল্য বৎসরে প্রায় দুই শত কোটি টাকা। জাপানে ৭০ লক্ষ ও আমেরিকায় ২ কোটি একরের অধিক জমীতে সেচের ব্যবস্থা নাই। এই যে সব খাল, ইহাতে সেচের জন্য যে জল প্রবাহিত হয়, তাহা সত্য সত্যই তরল স্বর্ণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দামোদরের খালে কি কৃষিকার্য্যের সেরূপ কোন উন্নতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে? যদি না থাকে, তবে যে টাকায় এই খাল খনিত হইল তাহা বাঙ্গালার পক্ষে ভারমাত্র হইয়া থাকিবে।

এই খাল সম্বন্ধে আমাদিগের আরও কিছু বলিবার আছে। বর্ত্তমান যুগে সেচের খাল সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ সার উইলিয়ম উইলকক্স ইহার সমর্থন করেন নাই। সার উইলিয়মের চেষ্টা ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে মিশরকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নীল নদের জলে তিনি মিশরকে কৃষিকার্য্যে সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন। গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে—তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি এই দামোদর খাল খনন সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম—

বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলাদ্বয়ে, বর্দ্ধমান হইতে দক্ষিণে দামোদরের তীরবাসী যে সব লোক বাঁধের ফলে বন্যার সময় ও শীতকালে দামোদরের জলে বঞ্চিত হইয়া দারিদ্র্যপীড়িত ও ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত হইয়াছে বন্যার সময় ও শীতকালে দামোদরের জল প্রথমে পাইবার তাহারাই অধিকারী। বর্ষার সময় দামোদরের রক্তবর্ণ জল এবং শীতকালে অল্প জল তাহারা প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবিত দামোদরের খাল তাহাদিগের সে অধিকার অবজ্ঞা করিতেছে। এই খালের জন্য ব্যয়সাধ্য বাঁধ দিয়া যে জল খালে আনা হইবে তাহা যাহারা পাইবে, তাহাদিগের সে জলে কোন অধিকার নাই। বাঁধ দিয়া জল খালে না লইলে দামোদরের তীরবাসীরাই সে জল লাভ করিতে পারে। পরে এই খাল আরও দীর্ঘ করিলে এ সব জমীতেও শীতকালে সেচের জল পাওয়া যাইবে, এ কথা বিচারসহ নহে। তখন এ সব জমীতে জল পাওয়া যাইবে না এবং খালে সে সব স্থানের জলনিকাশ ব্যবস্থায় বাধা ঘটিবে। কাষেই এই খালের প্রস্তাব কোনরূপে সমর্থিত হইতে পারে না। যদি দামোদরের তীরবাসীদিগের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া অতিরিক্ত জল পাওয়া যায়, তবে তাহা খালে লওয়া যাইতে পারে—নহিলে নহে।

এই যুক্তি দেখাইয়া সার উইলিয়ম খাল খননের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া দামোদরের তীরবাসী প্রায় দশ লক্ষ লোকের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মত বিশেষজ্ঞের কথা বাঙ্গলা সরকারের এঞ্জিনিয়ার অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাই পরে এক প্রবন্ধে সার উইলিয়ম বলেন—

বাঙ্গালায় যাইয়া আমি আমার সব যুক্তি প্রকাশ করিয়া আমার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলাম। আমি বাঙ্গালা সরকারের এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রস্তাবিত দামোদর খালের বিষয় আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাঁহার কথাতেই প্রমাণ হয়—দামোদরের খাল সমর্থন করা যায় না।

তিনি বলিয়াছিলেন লর্ড ক্রোমার মিশরে নদীতে বাঁধ দিতে সম্মতি প্রদানের পূর্ব্বে কৃষি বিভাগের ও স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালকদিগের মত লইয়া তবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। দামোদরের খাল কিন্তু বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টারের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ইহাতে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইডেন খালে সেচের জন্য জল সময় সময় থাকিত না। বহু অর্থব্যয়ে যে খাল কাটা হইয়াছিল, তাহার এইরূপ অবস্থা যে এঞ্জিনিয়ার-

দিগের দক্ষতার পরিচায়ক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা আশা করি, এই খালেও সেরূপ দুর্গতি হইবে না। বাঙ্গালার গভর্ণর স্বীকার করিয়াছেন, ইডেন খালের এই ত্রুটি দূর করা নূতন খালের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারে, এই খালে যে টাকা ব্যয় হইল, তাহার কতকাংশ ইডেন খালের ব্যয়ে যুক্ত হওয়া সঙ্গত।

এখন জিজ্ঞাস্য—

(১) খাল খনিত হওয়ায় রণ্ডিয়ার নিম্নে দামোদরের অবস্থা কি দাঁড়াইবে ?

(২) খালটিকে আর্থিক হিসাবে লাভবান বলা যাইতে পারে কি না ?

বলা হইয়াছে দামোদরের খালে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল লওয়া যাইবে। শীতকালে কি দামোদরে তদপেক্ষা অধিক জল পাওয়া যায় ? দামোদরে বন্যার সময় ব্যতীত অন্য সময় অধিক জল থাকে না। কাযেই শীতকালে খালে জল যাইবার পরে নদীগর্ভে যে জল থাকিবে, তাহা যদি রণ্ডিয়ার নিম্নে অতি অল্প পরিমাণে যায়, তবে সত্যসত্যই সে সব স্থানের লোকের সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে।

এই খালে লাভ হইবে কি না সে সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইডেন খাল খননাবধি তাহাতে লোকসান হইতেছে। সে খাল স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খনিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালার প্রজাসাধারণের অর্থে সামান্য কয় মাইলের লোকের উপকার করিবার চেষ্টা সমীচীন কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্ষার সময় সেচের জন্য খালের জল প্রয়োজন হইবে না ; অথচ সেই সময়েই নদীর জলে পলী থাকায় তাহাতে জমী উর্ব্বরতা লাভ করে। শীতকালে সেচের জলে তাহা হয় না। সুতরাং অজন্মা ব্যতীত অন্য সময় যে লোক শীতকালে অধিক মূল্য দিয়া জল লইবে, এমন আশা করা যায় না।

এ বিষয়ে সরকারের আশা কিরূপ তাহা জানিতে বাঙ্গালার লোকের কৌতূহল অবশ্যই স্বাভাবিক।

সার উইলিয়ম উইলকক্স যথার্থই বলিয়াছেন—বাঙ্গালার জমীতে প্রচুর পরিমাণে পলীমাটীবাহী লাল জল প্রদান করাই প্রথম প্রয়োজন। তাহাতে জমী উর্ব্বর হয় এবং ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়। শীতকালের জলে এতদুভয়ের কিছুই হয় না। কাযেই তাহার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত অল্প। ডাক্তার বেণ্টলী বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার কারণ সন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার যে সব স্থানে এখনও বর্ষার পলীভরা লাল জল জমীতে যায়, সে সব স্থানে ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই চলে ; আর যে সব স্থানে তাহা হয় না সেই সব স্থানই ম্যালেরিয়ার আকর ও অস্বাস্থ্যকর।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ইকনমিক বোটানিষ্ট মিষ্টার এলবার্ট হাউয়ার্ড একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, ধান্যের ক্ষেত্রে ধান্যবৃক্ষের মূলে অম্লজানপূর্ণ জল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, তবে ফসল বিশেষ উন্নতিলাভ করে। তিনি বলেন, বর্দ্ধমান জিলার মত যে সব স্থানে বাঁধ দিয়া বন্যার জলের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে, সে সব স্থানে ধান্যক্ষেত্রে জল পরিবর্ত্তন করা যায় না—বদ্ধ জলে ফসলের ফলন কমিয়া যায় এবং অপকৃষ্ট চাউল খাওয়ায় লোকের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাঁহার মতে বাঁধ দিয়া বন্যার জল রুদ্ধ করায় লোকের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে—তাহাদের স্বাস্থ্য ও শস্য উভয়ই নষ্ট হওয়ায় সে সকল স্থান জনশূন্য হইতেছে। এই সব স্থানে বন্যার জল প্রবেশের উপায় করিলে লোকের স্বাস্থ্যের ও ধান্যের উন্নতি অনিবার্য্য। ধান্যের ফসলের বিষয় বিবেচনা না করিয়া দেশের স্বাভাবিক জলনিকাশ পথে বাধা দেওয়া বিশেষ অনিষ্টকর।

রণ্ডিয়ার খালে জল লইলে তাহার নিম্নে দামোদরের তীরবাসী লোকরা ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রবাহিত অম্লজান-পূর্ণ জল পাইবে কি না, তাহা বিবেচ্য। যদি তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হয়, তবে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একর জমীতে কৃষকরা ইচ্ছা করিলে মূল্য দিয়া বর্ষার জল লইতে পারিবে বলিয়া বহুবিস্তৃত স্থানে লোকের স্বাস্থ্য ও শস্যহানি করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

তবে এক হিসাবে এই খাল খননে আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এই নদীমাতৃক দেশে এতদিন জলপথই

উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সেচের ও জল নিকাশের জন্য খাল খনিত হইত; গত শতাধিক বর্ষ মধ্যে সে সব দিকে সরকারের বা দেশের লোকের তত দৃষ্টি পড়ে নাই। ফলে, বাঙ্গালার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—উর্ব্বরতা হ্রাস পাইয়াছে। আবার জল নিকাশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাধারণ ও রেলপথ রক্ষিত হইয়াছে এবং বন্যা নিবারণের জন্য বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। নানা কারণে বাঙ্গালার নদী নালা মজিয়া উঠিয়াছে। আবার কচুরী পানার এক নূতন আপদের আবির্ভাব হইয়াছে। যে কেহ পশ্চিম বঙ্গের যে কোন স্থানে যাইলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এতদিনে যে এ দিকে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা আশার ও আনন্দের বিষয়।

সার উইলিয়ম উইলকক্স বলিয়াছেন, এখনও উপযুক্ত স্থানে গঙ্গার বাঁধ দিয়া বাঙ্গালার পুরাতন সেচের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা যায়। গঙ্গার জল যদি আবার বর্ষাকালে বাঙ্গালার নানা নদীতে ও খালে প্রবাহিত করা যায়, তবে যে বাঙ্গালীর দুর্দ্দশাদুঃখ প্রশমিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা জানেন, ব্যবসার সুবিধার জন্য মার্কিণে মিসিসিপীর মোহানা বিস্তৃত ও গভীর করা সম্ভব হইয়াছে, যাঁহারা ম্যাঞ্চেষ্টারে "সিপ কেনাল"—খাল দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে করিতে পারেন না—এ কায অসম্ভব। সুন্দরবনে খাল কাটা হইবে কি না স্থির হইবার পূর্ব্বে অত্যধিক অর্থব্যয়ে যে সব মাটীকাটা কল ক্রয় করিয়া অর্থের অপব্যয় করা হইয়াছে, সে সব কল না কিনিয়া সেই অর্থে যদি কার্য্যোপযোগী মাটীচালা কল ক্রয় করা হইত, তবে সে সকলের সাহায্যে যে অনেক হাজা-মজা জলপথের সংস্কার সাধন সম্ভব হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালার ব্যয়সঙ্কোচ কমিটী এখন সেগুলিকে ভাঙ্গা লোহার দরে বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানে যখন বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার সেচের সুব্যবস্থার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন, তখন তাঁহারা সার উইলিয়ম উইলকক্সের প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন—এ আশা বাঙ্গালার লোক অবশ্যই করিতে পারে। দামোদরের খাল সরকারের নূতন নীতি প্রবর্ত্তনের পরিচায়ক—প্রথম প্রয়াস বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মিসেস বেসাণ্ট—

মাদ্রাজের উপকণ্ঠে তিনি যে বিরাট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তথায় গত ২০শে সেপ্টেম্বর পরিণত বয়সে মিসেস এনী বেসাণ্টের মৃত্যু হইয়াছে। সমস্ত জীবন অস্থির উৎসাহের চাঞ্চল্যে কায করিয়া মৃত্যুকালে তিনি নিদ্রিতাবস্থায় শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। নব ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপারে তাঁহার কৃত কার্য্য অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসেও তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লণ্ডনে ডাক্তার ছিলেন এবং গণিত, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করিতেন। ধর্ম্মমতে তিনি সংশয়বাদী ছিলেন এবং কন্যা সেই সংশয়বাদ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া মত হইতে মতান্তরে যাইয়া শেষে হিন্দু ভারতে সন্দেহসংশয়াতীত ধর্ম্মমতের সন্ধান লাভ করিয়া শান্তি পাইয়াছিলেন।

যখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর তখন খৃষ্টধর্ম্মযাজক মিষ্টার বেসাণ্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর ও স্ত্রীর মনের গতি ভিন্নরূপ ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার এক পুত্র ও পর বৎসর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার সন্তানদ্বয় ঘুংরীকাশীতে আক্রান্ত হয়, তখন নিষ্পাপ শিশুর যন্ত্রণায় তাঁহার মনে ভগবানের বিধান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া উঠেন। তখন স্বামীর সহিত তাঁহার বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়।

ইহার পর তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েন এবং মিষ্টার ব্রাডলর সহিত একযোগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতের পক্ষে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি ও মিষ্টার ব্রাডল প্রজনন সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধীয় পুস্তিকা প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ইহার ফলে তিনি তাঁহার

পুত্রের অভিভাবক থাকিবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে, পুত্রকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

তখন লর্ড লিটন ভারতের বড়লাট। তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে মিসেস বেসাণ্ট প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তখনই প্রথম ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাজনীতির মধ্যে দিয়া যাহার আরম্ভ, ধর্ম্মের উপদেশে তাহার পরিণতি।

ইহার পর ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কী ও কর্ণেল অলকটের প্রতিষ্ঠিত "থিয়সফীর" সহিত তাঁহার পরিচয়। তিনি সেই ধর্ম্ম-মতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার জন্য দীর্ঘকাল যে কায করিয়াছেন, তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত।

এ দেশে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তিনি হিন্দু ভারতের কেন্দ্র বারাণসীতে হিন্দু-কলেজ স্থাপিত করেন। তাহাই এখন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

তাঁহার রচনার ক্ষমতা যেমন অসাধারণ ছিল, বক্তৃতা-শক্তি বুঝি তদপেক্ষাও অসাধারণ ছিল। তিনি তাঁহার সমসাময়িক বক্তৃগণের মধ্যে প্রধান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি কত বক্তৃতা করিয়াছেন এবং কত প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা স্থির করিয়া বলা দুষ্কর।

এ দেশে তিনি রাজনীতিক কার্য্যে অগ্রগামী দলভুক্ত ছিলেন। এক এক দিন তিনি চারটি বক্তৃতাও করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি এ দেশের লোককে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনীতিক প্রচার কার্য্যের জন্য তিনি প্রথমে 'কমন ওয়েল্‌থ' ও পরে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্র প্রচার করেন। কিরূপ যোগ্যতা সহকারে এই পত্রদ্বয় পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

তিনি মনে করিতেন, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া সঙ্গত এবং ভারতবাসীকে সাধনার দ্বারা সেই অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। সে জন্য লোককে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তিনি আয়ার্লণ্ডের মত ভারতেও "হোম রুল" প্রবর্ত্তনের আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তি হেতু এই আন্দোলন এ দেশে যেমন ব্যাপ্তি লাভ করে, তেমনই অন্যান্য দেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে ও বক্তৃতায় ভারতে "হোম রুল" প্রতিষ্ঠার সমর্থন করিতে থাকেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংরাজ পক্ষে ভারতবাসীর সাহায্যের উল্লেখ করিয়া তিনি স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি প্রবল করেন। প্রথমে বোম্বাই সরকার ও পরে মধ্যপ্রদেশের সরকার তাঁহাকে তাঁহাদিগের শাসিত প্রদেশে আসিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। তাঁহার কার্য্য-ফলে সমগ্র দেশে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য প্রবল আন্দোলন

মিসেস্ বেসাণ্ট

চলিতে থাকে। মাদ্রাজের গবর্ণর ইহাতে বিচলিত হইয়া উঠেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে তাঁহাকে আটক করা হয়। তিনি সরকারের ভাব দেখিয়া পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, সরকার তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিবেন; সেই জন্য 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে বিদায়-জ্ঞাপক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়। তাঁহার আটকতে এ দেশে ও বিলাতে প্রবল আন্দোলন হয় এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্টে বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয়—ভারতে দায়িত্ব-শীল শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য।

মুক্তিলাভ করিয়া তিনি কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হয়েন।

যখন মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি মত প্রকাশ করেন—তাহাতে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। কিন্তু তিনি প্রাপ্ত অধিকার ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন ও কংগ্রেসের সহিত মতভেদহেতু স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন পরিচালিত করিতে থাকেন।

যখন রৌলট আইন আলোচিত হয়, তখন তিনি সরকারকে সে আইন বিধিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে গান্ধীজীর প্রস্তাবিত আইন ভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তনেরও প্রতিবাদ করেন। এ দেশের জনগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি বলেন, সাধারণ ভাবে আইন ভঙ্গ আন্দোলনে পরে অসংযম ও অনাচার অনিবার্য্য হইবে। তিনি এ কথাও বলেন যে, লোক যদি আপনার বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া আইন ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা; নহিলে লোকের বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া লোককে অপরের আদেশে আইন ভঙ্গে প্রযুক্ত করা গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী। তিনি শাসন-সংস্কারে লব্ধ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়া অধিকার লাভ চেষ্টার সমর্থন করেন।

গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত আইন ভঙ্গ আন্দোলনের ব্যাপ্তি ফলে এ দেশের লোকের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। তিনি নিয়মানুগ পথে আন্দোলন পরিচালিত করিয়া ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন অর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জীবনব্যাপী দেশ-সেবার "পুরস্কারে" যে লাঞ্ছনা পাইয়াছিলেন—মিসেস বেসাণ্টের পক্ষেও তাহার অন্যথা হয় নাই। সেই জন্যই কোন ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন—

"Gratitude may occasionally be met with in private life, but it is a negligible quantity in politics."

ইহার পর তিনি আর সক্রিয়ভাবে কোন রাজনীতিক আন্দোলনে অগ্রণী হয়েন নাই। কিন্তু তিনি পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবার জন্য যে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য কিরূপ আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিপ্লবের ও অনাচারের বিরোধী ছিলেন—কিন্তু ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্ব্বদাই সমর্থন করিতেন।

যখন নবভারতের রাজনীতিক ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন এই যে বিদেশী মহিলা ভারতবর্ষে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া ভারতবাসীর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম তাহাতে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখিত হইবে।

রামমোহন মৃত্যু-শতবার্ষিকী—

গত মহাষ্টমীর দিন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে রামমোহন অসাধারণ শক্তির অনুশীলনকল্পে এ দেশে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া দিকে দিকে উন্নতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—ভগীরথ যেমন সাধনা করিয়া মন্দাকিনীধারা আনিয়া সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনি তেমনই সাধনা করিয়া উন্নতি প্রবাহ আনিয়া জাতিকে জড়ত্ব-শাপমুক্ত করিয়াছেন—শক্তিপূজার মহাষ্টমীর দিন তাঁহার মৃত্যু যে সঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য। আজ জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে—যখন বিভিন্ন আদর্শের সৃষ্টি হইতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষে যে আবর্ত্তের উদ্ভব হইতেছে তাহাতে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা সপ্রকাশ হইয়াছে—তখন রামমোহনের আদর্শ স্মরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু সংস্কার মাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, পরন্তু জাতীয় সংস্কার কখন উপেক্ষা করিতেন না। তিনি ভাঙ্গিবার কার্য্য অপেক্ষা গঠনের কার্য্যেই অধিক উৎসাহ প্রযুক্ত করিতেন, আনন্দানুভব করিতেন। সেই জন্য নবভারতে আজ তাঁহার সেই উৎসাহের ফল আমরা ভোগ করিতে পারিতেছি এবং সেই জন্যই তিনি সমগ্র ভারতে অক্ষয় যশঃ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সকল মতের সহিত সকলের মতের ঐক্য থাকিতে পারে না; কিন্তু তাঁহার

কৃত কর্ম্মের জন্য আজ সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার মৃত্যুর পর যে শতবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে নবভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নবভারতে তাঁহার স্থান কত উচ্চে তাহা আমরা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি। তাই আজ ভারতের সকল প্রদেশে সকলে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

—

'আলো ও ছায়ার' কবি—

সে আজ ৪৪ বৎসরের কথা। তখন "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত ভূমিকা সহিত" একখানি কবিতা-সংগ্রহ 'আলো ও ছায়া' নামে প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখিকার নাম ছিল না এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক পুস্তকও "আলো ও ছায়া প্রণেতৃ প্রণীত" বলিয়াই প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাঠকসমাজ লেখিকার নাম সংগ্রহ করিয়াছিল। তিনি কুমারী কামিনী সেন। তিনি ঐ প্রথম পুস্তক প্রকাশ করিয়াই বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন; তাহার কারণ পুস্তকখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রোগভোগ না করিয়া তিনি কয় দিন অসুস্থ থাকিয়াই তাঁহার ঈপ্সিত শান্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জিলায় বাসণ্ডা গ্রামে বৈদ্য পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মকালে তাঁহার পিতা চণ্ডীচরণ সেন কলেজের ছাত্র—তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। তাঁহার জননী অল্প লেখাপড়া জানিতেন এবং কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কন্যার জন্মের ছয় বৎসর পরে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আইসেন।

চণ্ডীচরণ স্বয়ং অধ্যয়নপ্রিয় ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা মেটকাফের জীবন চরিত ও 'টমকাকার কুটীর' ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করেন এবং এ দেশে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠাকালের কতকগুলি ঘটনা লইয়া কয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। রাজনীতিক কারণে সেগুলির প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

অতি অল্পবয়সে কন্যার কবিতা রচনায় প্রীত হইয়া চণ্ডীচরণ তাঁহাকে রামায়ণ ও মহাভারত উপহার দেন। তিনি কিরূপ যত্নসহকারে ঐ মহাকাব্যদ্বয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং মহাকাব্যদ্বয়ের চরিত্রগুলির স্বরূপ কিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামিনী পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং 'টমকাকার কুটীর' অনুবাদ করিতে পিতাকে সাহায্য করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সের পর তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ গমন করেন এবং ১৮৮৬

কামিনী রায়

খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পরীক্ষায় তিনি যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সংস্কৃত সে সকলের অন্যতম।

ইহার পর তিনি কিছুদিন বেথুন কলেজে শিক্ষকের কাজ করেন।

তিনি ভাবের আবেগে কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু সেগুলির উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা ছিল না এবং তিনি সেগুলি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী ছিলেন না। এই সময় তাঁহার কোন পিতৃবন্ধু তাঁহার

১৪ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে রচিত কয়টি কবিতা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে দেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, এই পিতৃবন্ধু—দুর্গামোহন দাশ। দুর্গামোহন ও হেমচন্দ্র উভয়েই তখন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল। 'বৃত্রসংহারের' কবি হেমচন্দ্র তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অন্যতম দিক্‌পাল বলিয়া পরিচিত ও স্বীকৃত।

কবিতাগুলি পাঠ করিয়া হেমচন্দ্র সেগুলির "ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে" মুগ্ধ হইয়া ভূমিকা লিখিয়া দেন। তাঁহার এই ভূমিকায় গুণগ্রাহিতার পরিচয় যেমন পরিস্ফুট—সূক্ষ্ম সমালোচনাশক্তিও তেমনই সপ্রকাশ। তিনি কবিতাগুলির বৈশিষ্টের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই সেগুলিকে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে প্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। সে বৈশিষ্ট্য—ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা ও সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতা। সেই জন্যই 'আলো ও ছায়ার' অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক প্রকাশের কুড়ি বৎসর পরে—যখন তিনি সংসারে নানা শোক ভোগ করিয়াছেন, তখন তিনি "পিতৃপ্রতিম" হেমচন্দ্রকে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া যে কবিতা লিখেন, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—

"তোমার আশ্বাস, দেব, আশীর্ব্বাদ তব
সমুজ্জ্বল প্রভা দিয়া রাখিয়াছে নব
বিংশতি বরষ ধরি' যেই গীতহার,
আজ লোকান্তর হ'তে তাই উপহার
লহ এ ভক্তের হাতে; আজ মনে হয়
তবে বুঝি নিতান্তই অযোগ্য তা' নয়।"

ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায় তাঁহার কবিতার অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। বিপত্নীক কেদারনাথের সহিত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কবির বিবাহ হয়। কেদারনাথের পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত পুত্রত্রয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শেষ জীবনে কবিকে নানা শোকভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি শিশু-সন্তানের ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর নগেন্দ্রনাথের ও যতীন্দ্রনাথের শোক তাঁহাকে পীড়িত করে। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

স্বভাবতঃ লোকলোচনের দৃষ্টিকুণ্ঠিতা ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও তিনি নারীজাতির উন্নতিকর ও অধিকার বৃদ্ধির আন্দোলন সম্পর্কিত আন্দোলনে যোগ দিতেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী এক সভায় যোগ দিয়া যাইয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জীবনে তিনি তাঁহার কবিকল্পনা সার্থক করিয়া গিয়াছেন—

"তৃষিত আঁখির আগে যে দিব্য আলোক জাগে,
তাহারেই লক্ষ্য করি চলি অনিবার।"

তাঁহার কবিতায় কবি-হৃদয়ের যে ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

হাসি

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

পরিণীত জীবনের সুদীর্ঘ সপ্ত বৎসর বিবিধ অরিষ্টি, অবলেহ এবং মাদুলি-কবচ-মানস-জলপড়ায় কাটিয়া যাইবার পর বধূ সেই প্রথম সন্তানের জননী হইলেন। কন্যাসন্তান হইলেও কবিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া মঙ্গলশঙ্খই সেদিন বাজিয়া উঠিয়াছিল—'ভবন আঁধার' হয় নাই।

সদ্যোজাতাকে স্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছাপন্না নবপ্রসূতির মুখে অভিনব মাতৃমমতার হাসি ফুটিয়া উঠিল,—বিধবা শ্বশ্রূ জন্মগৃহের দ্বারান্তে দাঁড়াইয়া নবপৌত্রীকে দেখিয়া হাসিয়া পিতামহী-প্রাণের কল্যাণ-আশীস্ বর্ষণ করিলেন। —দেবর দেবনাথ হাসিতে হাসিতে দাদাকে 'তার' করিতে 'তারঘরে' ছুটিল।

দীননাথ কলিকাতায় কোন শস্তার মেসে থাকিয়া কেরাণী-জীবন যাপন করে—শনিবারে শনিবারে 'উইক্-এণ্ড'এ স্বগ্রামে আসিয়া রবিবারের রাত্রিশেষ পর্য্যন্ত গৃহজীবনের আংশিক আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যায়। অফিসে যাইবার মুখে সেদিন দীননাথ দেবনাথের 'তার' পাইল।

'চাইল্ড্'—অর্থাৎ শিশু কথাটা পুত্র-কন্যা উভয় রূপ অর্থই প্রকাশ করে। 'শিশু জাত হইয়াছে'—অপূর্ব্ব পিতৃত্ব-বোধে সে যেন দ্বিজত্ব লাভ করিল,—মুখে গৌরবের গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত হাসি।

ট্রেণে বসিয়া দীননাথ আবার টেলিগ্রামটা খুলিয়া ভালো করিয়া পড়িয়া দেখিল—অনেকক্ষণ চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া রাখিল। সুসংক্ষিপ্ত ভাষা—'শিশু জাত হইয়াছে'। শিশু—কিন্তু পুত্র না কন্যা,—পুত্রই নিশ্চয়,—হাঁ, নাদুস-নুদুস সুন্দর একটি ক্ষুদ্র মানবক। —চমৎকার! আচ্ছা, কি নাম রাখা যাইবে তাহার—শিবনাথ না শশিনাথ?—না, বড্ড সেকেলে নাম ঐ দুইটা;—হাঁ, হাঁ, ঠিক হইয়াছে—'সুরনাথ'—বেশ নাম হইবে এই 'সুরনাথ'!

ষ্টেশনের মাইলটাক দূরে বাসগ্রাম। ষ্টেশনে নামিয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরিয়া দীননাথ হন্‌হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। খানিকটা চলিয়া, সংক্ষিপ্ত পায়ে-চলা পথে গ্রামে প্রবেশ করিবার বাঁকে গ্রামবাসী দুইজন সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। চলিবার ঝোঁকে সে তাহাদিগকে এড়াইয়া যাইতেছিল; একজন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে দীনু, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতই ছুটে' চলেছ যে—"

অন্যজন বলিল,—"তাও ত' মেয়ে বিইয়েছে বউ বুড়ো বয়সে!"

দীননাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল—এক মুহূর্ত্ত মনে মনে কি ভাবিল। তৎক্ষণাৎ মৃদুহাস্যে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল,—"মেয়ে?—হোক্ না মেয়ে ভাই, —আমাদের হা-ছেলে আঁটকুড়ে ঘরে মেয়ে কি আর ফেল্‌না?"

বিদ্রূপকারীরা লজ্জিত হইল। প্রথম বন্ধু বলিল,—"সত্যি দীনু, এ মেয়ে তোমার ফেল্‌না হবে না মোটেই। খুড়ীমা দেখে এসে বল্লেন, দু'দিনও ওর বয়স পূরো হয়নি কিন্তু মুখে সে কি হাসি! যেমন ফুট্‌ফুটে রং তেম্‌নি—"

"চল্লুম ভাই, এখন—" বলিয়া দীননাথ মুখ ফিরাইয়া বাঁক ঘুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। অমন সুন্দর 'সুরনাথ' নামটা কোনই কাজে লাগিল না ভাবিয়া হয় ত' মনে তাহার একটু ক্ষোভ হইয়াছিল।

পুত্র আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া ডাকিল,—"মা!"—মা'র মুখে হাসি, চোখে আনন্দাশ্রু।

সূতিকা-কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত হইল। দীননাথ দেখিল—একমুঠি যুঁই ফুলের উপর একটি গোলাপ ফুলের তাজা পাপ্‌ড়ি! মা বলিলেন,—"দেখেছিস্ দুষ্টু মেয়ের মুখে কি হাসি!"

—"হাস্‌ছেই ত'—বাঃ!"

দেবনাথ পিছন হইতে বলিল,—"সত্যি মা, অতটুকু মেয়ের মুখে অমন হাসি আর আমি দেখিই নি—।"

অবিলম্বে নবকুমারীর নামকরণ হইয়া গেল—'হাসি'।

প্রথম-শৈশবে যে হাসি ওষ্ঠ-রক্তিমায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কৈশোরের ক্রমবিকাশে সেই হাসি কণ্ঠরাগিণীতে উন্মুখর হইয়া বাজিয়া উঠিল—উপলাহত নির্ঝরিণীর স্বচ্ছন্দ খল খল হাসি,—উচ্ছ্বসিত কল্লোল!

কুলের আচার চুরি করিয়া খাইতে গিয়া ভাঁড়শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে,—মা দিলেন মেয়ের পিঠে দুম্ করিয়া বসাইয়া এক কীল,—মেয়ে উঠিল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া। কাকার গানের খাতার পাতার উপর ভাইঝি এক কিম্ভুতকিমাকার রাক্ষুসে ছবি আঁকিয়া বসিয়াছে,—কাকা আসিয়াছেন তাড়া করিয়া,—"রোস্ ত' দুষ্ট মেয়ে, কাণ মলে' ছিঁড়ে' দিচ্ছি—!"—দুষ্টু মেয়ে হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে খাতা হাতে করিয়াই মারিল এক দৌড়।—এমনই।

এমনই,—এবং আরও অনেক রকম। হাসির হাসিতে বৈচিত্র্য ছিল—চিত্তলোকের অপূর্ব্ব আলোকসম্পাত উৎসারে ইন্দ্রধনু রচনা করিত। নিকট-প্রতিবেশী নিতাই পালের বাড়ীর মেয়ে নীলিমা তাহার ক্রীড়াসঙ্গিনী। নীলিমাদের বাড়ীতে একদিন হাসি গিয়াছে 'আগ্‌ডুম-বাগ্‌ডুম' খেলিতে। কেমন করিয়া নীলিমার পা লাগিয়া একটা শ্বেতপাথরের নক্সীদার বাটি হঠাৎ শাণ-বাঁধানো মেঝেতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। শব্দ শুনিয়া নীলিমার মা আসিয়া দুয়ারে উঁকি মারিলেন—এক-মুহূর্ত্তেই চোখ-মুখ তাঁহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

"লক্ষীছাড়ী বজ্জাত্ মেয়ে—!"—মা আসিলেন ঝাঁপাইয়া মেয়েকে মারিতে। মা ও মেয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাসি—মুখে সলজ্জ স্মিত হাসি,—মাথা নীচু করিয়া বলিল,—"কাকী মা, বাটি ভাঙ্গল আমারই পা লেগে,—নীলি'র দোষ নেই ত'।"

হাসির মা প্রতিবেশিনীকে আর-একটি পাথর-বাটি কিনিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দাম তুলিয়াছিলেন হাসির পিঠে বেশ ঘা-কয়েক কঠিন কীল বসাইয়া। ফলে—সেই খিল্ খিল্ হাসি!

আর একদিন হাসি তাহার নিজের শান্তিপুরে ডুরেখানি একটি ভিখারিণী মেয়েকে দান করিয়া ফেলিয়া মা'র নিকট যথেষ্ট তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইয়াও অমনই করিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুমা'র কোলে গিয়া মুখ লুকাইয়াছিল।

কৈশোর তারুণ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু হাসির হাসি থামিল না বা কমিল না। স্বভাব-সুলভ শালীনতার অভাব না ঘটিলেও সংস্কারমূলক সঙ্কোচ তাহাকে তেমন করিয়া বাঁধিতে পারিতেছিল না। জ্যৈষ্ঠের উদ্দাম ঝড়ে গৃহসংলগ্ন আমবাগানে চুল এলাইয়া কোঁচড় ভরিয়া আম কুড়াইয়া ফেরে এখনও এই অদ্ভুত মেয়েটা—নির্ভয়-আনন্দে হাসিয়া, লাফাইয়া। বহিরঙ্গনের বকুলতলায় ক্রীড়াসঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলিয়া সে ফুল কুড়ায়, ফুল ছড়ায়, মালা গাঁথিয়া গলায় বা চুলে পরে, হাসে;—পথচারী পথিকরা ধাড়ী মেয়েটির দিকে চাহিয়া অলক্ষ্যে হাসিয়া চলিয়া যায়। সে যেন স্বচ্ছন্দচারিণী নভোবিহঙ্গী প্রাঙ্গণধূলায় নামিয়া আসিয়াছে, স্বর্গের সঙ্গীত ভুলিয়া যায় নাই।

কিন্তু মর্ত্ত্যের মাটী স্বর্গের স্বচ্ছ ধারাকে ধূলিমলিন করিতে চাহে,—প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রথার ছাঁচে ফেলিয়া কৃত্রিম রূপ দান করিতে উদ্যত হয়,—সহজকে আঘাত করিয়া জটিল করে।—ইহাই নিয়ম।

সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া পাড়া-পড়শীরা নানা জন নানান অভিমত প্রকাশ ও প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই বা দোষ কি?—কুমারী-জীবন ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশের পথে অগ্রণী হইয়াছে, কিন্তু—

বর্ষীয়ানরা কহিতেন,—"দীনুর মেয়েটা বাপু যেন কেমন ধারা! বয়সে নেহাৎ কচি নয় ত', কিন্তু কি বেহায়ার মত হি হি করে' হাসে যখন-তখন! সাত-রাজার ধন এক মেয়ে—কিছু বল্‌বেও না ওরা।"

বর্ষীয়সীরা নাক সিঁট্‌কাইতেন,—"শুধু হাসে?—ধিঙ্গীর মত লাফিয়ে বেড়ায় রাত-দিন—সরম-ভরম কিচ্ছু নেই। সময় থাক্‌তে যোগেযাগে পার কর্‌তে না পার্‌লে শেষে মেয়েকে নিয়ে মুস্কিল হবে বাপ-মা'র।"

বধূরা একবাক্যে বলিতেন,—"বড় হ'লে ও-মেয়ে কখ্‌খনো ভালো হবে না; বিয়ে কর্‌বে ওকে কে?"

কিশোর-কিশোরীর দল তাহাদের হাসি-দি'কে

প্রাণের অধিক ভালোবাসিত—শ্রদ্ধা করিত। বাড়ীর বড়রা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সহিত না মিশিতে, না খেলিতে—যদিও তাহারা সে নিষেধবাক্য গ্রাহ্য করে নাই।

এদিকে হাসির মা হাসিকে প্রত্যহই তিরস্কার করিতেন,—"ছুষ্টু মেয়ে, হাসিটাকে তোর একটু খাটো কর্।"

পিতামহী পৌত্রীর পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিতেন,—"বউয়ের যেমন কথা! এক মেয়ে—হাস্‌বে না ত' কি কাঁদ্‌বে?"

দেবনাথ অমনই হাসিয়া ছড়া কাটিতে সুরু করিত,—"রাম-গরুড়ের ছানা, হাস্‌তে তোদের মানা—"

দীননাথ সপ্তাহান্তে গৃহে ফিরিয়া সানন্দে বলিত,—"মা আমার হাসে—যেন সাক্ষাত্ জগদ্ধাত্রী!"

কিন্তু সাক্ষাত-জগদ্ধাত্রীর হাসি গ্রামের ব্যবহারিক জগতে একদিন বিপর্য্যয়ের সূচনা করিল। প্রতিবেশী-দের প্রতিকূল অভিমত অতর্কিতে বিরুদ্ধ অভিযোগে পরিবর্ত্তিত হইল।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। হাসিদের বাড়ীর সাম্‌নের পুকুর-পাড়ের পথটা বৃষ্টি হইলেই পিছল হইয়া পড়ে—বিশেষতঃ বর্ষাকালে। হাসি জল ভরিয়া কলসী-কাঁখে পুকুরের ঘাট হইতে তাল গাছের গুঁড়ির ধাপ বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে। ঐ সময় দুইটি পথিক ষ্টেশনের দিক হইতে ঐ পথে সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া দক্ষিণ-পাড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হাসি চাহিয়া দেখিল—একজন গ্রামের মাতব্বর বৃদ্ধ রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, অন্যজন তাঁহারই যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। রসিক চক্রবর্ত্তীর হাতে ছাতা ও লাঠি ছাড়া আর কিছু নাই;—রামলালের হাতে ও কাঁধে ছোট-বড় গোটাকয়েক বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, বগলে ছাতা এবং কাগজে জড়ানো খুড়া-ভাইপো উভয়ের দুই জোড়া জুতার 'চতুষ্পাটি'।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী এক টিপ্ নস্য লইয়া নাকে গুঁজিয়া দিলেন।—কিন্তু তিনি কি জানিতেন যে দ্রব্যগুণ অত দূর গড়াইবে? "হেঁচ্চো"—হাঁচির ঝাঁকি লাগিয়া দেহটা কাঁপিয়া উঠিতেই পা গেল তাঁহার ভেজা আঠালো মাটীতে হঠাৎ পিছলাইয়া। তিনি নিজেই শুধু পতিত হইলেন না,—সঙ্গে সঙ্গে পাতিত করিলেন ভারবাহী ভ্রাতুষ্পুত্রকেও। খুড়ার পতন তত গুরুতর হইল না—আচম্‌কা বসিয়া পড়িবার মত থপ্ করিয়া কাদার উপর সাদাসিধা আছাড় খাইলেন মাত্র। কিন্তু রামলাল তাহার লটবহর সমেত হুমড়ি খাইয়া হুড়মুড় করিয়া সাংঘাতিকভাবেই পড়িয়া গেল—ভারবস্তুগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ভারবাহী ব্যক্তিটি ঘাটের দিকে গড়াইয়া চলিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মাত্র। হাসি তাহার কলসীটি তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া রামলালের পতন রোধ করিল এবং জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া দিল। তাহার পর চোখ ফিরাইয়া খুড়ার দিকে চাহি-তেই,—"হি-হি-হি!" সে কি হাসি—অনর্গল, অফুরন্ত!

খুড়া বাম হস্তে কোমর চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের করতলভার কাদার উপর রাখিয়া ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না—চোখে জল! তিনি হাসির দিকে ঝাপ্‌সা চোখে চাহিয়া জড়িতস্বরে বার-দুই উচ্চারণ করিলেন,—"আমি—আমি—আমাকে—" হাসি হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্তচ্যুত লাঠিটি দূর হইতে তাঁহার দিকে আগাইয়া দিল, কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতে গেল না।

তার পর সে তাহার কলসীটি লইয়া জল ফেলিয়া দিয়া আবার জল আনিতে ঘাটে নামিয়া গেল। এবং,—"হি-হি-হি-হি!"—হাসি চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহার দুরন্ত হাসির বেগ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

—"হি-হি—হা-হা!"

ঘটনা ইহাই; কিন্তু রটনা হইল অনেক বেশী এবং অন্য প্রকার।—নির্লজ্জা মেয়ে হাসি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্মুখে তাঁহার ভূপৃষ্ঠ-পতিত যুবক-ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে উঠাইয়া দিবার ছলে তাহাকে অভদ্রভাবে স্পর্শ করিয়া এবং আপত্তিকর উচ্চহাসি হাসিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে!

পরদিন রবিবারে প্রত্যুষেই দীননাথের ডাক পড়িল গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে।

সমাজ দীননাথকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল ; কিন্তু বাদী-পক্ষীয় বেফাঁস রামলাল সহসা স্বীকার করিয়া বসিল যে হাসি তাহাকে ঐরূপে ধরিয়া না ঠেকাইলে পুকুরের উঁচু পাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া হয়ত' তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তিই ঘটিত,—এবং, হাসির স্পর্শে কোন অভদ্রতা এবং হাসিতে কোন দুঃশীলতা ছিল না। প্রতিবাদে রসিকলাল বলিলেন, হাসির ঔপহাসিক উচ্চহাসি স্বয়ং তাঁহাকেই অপমানিত করিয়াছে,—আরও, তিনিও ত' আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, হাসি কেন তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল না ?

চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের মধ্যে একটা চাপা-হাসির ঢেউ উঠিল। প্রাজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধম্‌কাইয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন এবং মধ্যস্থরূপে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সান্ত্বনা দান করিয়া বিবাদীর প্রতি অপেক্ষাকৃত লঘু-দণ্ড বিধান করিলেন—'হাসির হাসি ছঁটিয়া তাহাকে আয়ত্তে আনিতে হইবে, পাড়া-ময় টি-টি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো বন্ধ করিতে হইবে এবং যেমন করিয়াই হউক্ চল্‌তি বৎসর না ঘুরিতেই মেয়ের শুভ-সপ্তপদী সমাধা করিয়া ফেলিতে হইবে ; নতুবা—'

অনুশাসন শিরোধার্য্য করিয়া দীননাথ গৃহে ফিরিয়া আসিল।—এবার হাসির বিবাহের জন্য সত্যই সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবে।

—"হাসি।"

"কি বাবা, যাই"—হাসি উত্তর দিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুকুর-পাড়ের ব্যাপারটা সেদিন হাসির মা আগা-গোড়াই জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিয়াছিল।—হাসির কোনই দোষ ছিল না ত'! তথাপি আংশিক ভাবে তিরস্কৃত করা হইল শুধু তাহার দুর্নিবার অশিষ্ট হাসির জন্য। বহির্ভ্রমণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল ; কিন্তু অন্তঃপ্রাঙ্গণ তাহার নির্ম্মম হাস্যোচ্ছ্বাসে সমভাবেই মুখরিত হইতে থাকিল।

"আহা! যে ক'দিন আছে মেয়েটা বাপ-মা'র ঘরে, হাসুক্—হাসুক্ সে এম্‌নিতর হাসি!"—হাসির মা'র চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বৎসর না ঘুরিতেই হাসির বিবাহ হইয়া গেল—কিন্তু সহজে নয়।

পর-পর অনেক কয়টি 'সম্বন্ধ' প্রায় ঠিকঠাক হইয়াও আবার ভাঙিয়া গেল।—দুর্নিরোধ সেই সমাজ-হিতৈষীদের কাণভাঙানি! ব্যাপার দেখিয়া দীননাথ হাল ছাড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। দেবনাথ দাদাকে আশ্বস্ত করিল এই বলিয়া যে ঈশ্বর যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই,—যাহার তাহার হাতে ত' আর মেয়েকে ফেলিয়া দেওয়া যায় না,—দেখিয়া শুনিয়া হাসির যোগ্য বর শীঘ্রই সে স্থির করিয়া দিবে। কিন্তু দেবনাথও হালে পানি পাইল না—একাধিক বার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই সে করিয়া উঠিতে পারিল না। এবং,—উপন্যাস বা নাটকে প্রায়শঃ যেরূপ পাঠ করা যায় সেরূপ কোন স্মরণীয় ব্যাপারও ঘটিতে দেখা গেল না ;—রামলাল যদি অবিবাহিত হইত, এবং একদা-সংঘটিত সেই পুকুর-পাড়ের বিষম পথ-বিপর্য্যয়ে ত্রাণকারিণী হাস্যময়ী হাসির প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে হয় ত' সেইরূপ কোন চিত্তাকর্ষক পরিণতি সম্ভব হইলেও হইতে পারিত। তথাপি, প্রকারান্তরে কৃতজ্ঞ রামলাল তাহাদের পরম উপকার করিল, বলিতেই হইবে।—সে একদিন সঙ্গোপনে দীননাথকে বিশেষ এক সৎপরামর্শ প্রদান করিল।

পরামর্শ-ফলে দীননাথ-দেবনাথ দুই ভাই গিয়া চণ্ডীমণ্ডপাধিপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণে শরণপ্রার্থী হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গম্ভীর ঔদাস্যে বলিলেন,—"ভাব্‌বার কথা বটে!—দেখি, কি কর্‌তে পারি।"

উভয় প্রার্থী করজোড়ে নিবেদন করিল, তিনিই তাহাদের একমাত্র ভরসা।—ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রচ্ছন্ন-আত্মপ্রসাদের ঈষদ্ হাস্য হাসিয়া পূর্ব্ব বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন।

অবশেষে সত্যই তিনি দয়া করিয়া একটি উত্তম সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিলেন। বর তাঁহারই এক দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয়—দোজবরে হইলেও একচত্বারিংশাধিক বয়ঃসীমা অতিক্রম করেন নাই। সদ্‌গুণশীল সুকুলবান্ ব্রাহ্মণতনয়—পণমর্য্যাদা অপরিহার্য্য কিন্তু অপরিমেয় নহে। উপায়হীন দরিদ্র দীননাথ গোপনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

নিকট ভদ্রাসন বন্ধক রাখিয়া সংগৃহীত পণমর্য্যাদায় একমাত্র কন্যা হাসির শুভ-পরিণয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিল।

স্বামিগৃহ-যাত্রাকালের বিদায়-মুহূর্ত্তে পিতৃগৃহের দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িয়া হাসির গণ্ডতট প্লাবিত করিয়াছিল;—এক দিকে পিতৃগৃহের চিরস্নেহময় বেদনা-করুণ প্রাণগুলি, অন্য দিকে ম্লানমুখ নির্ব্বাক শৈশব-সাথীর দল;—দৃষ্টিপথে অশ্রু-বাদল নামিয়া আসিলেও ওষ্ঠপুটে তাহার অস্ফুট হাসির অস্পষ্ট রৌদ্রাভাস লক্ষিত হইয়াছিল।

—আহা! সোণার মেয়ে হাসি!

"মধু দিলি নি কাণে,—অ পুঁটু?"—তন্বী কিশোরীটির দিকে চাহিয়া স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়সী হাঁকিলেন।

পুঁটু হাসিয়া বলিল,—"ভুল হয়েছে, খুড়ী মা। ঠোঁটে চিনি দিয়েছি বৌয়ের, মধুর কথা মনে নেই—দাও, দিচ্ছি দিয়ে বৌকে।"

"কি ন্যাকা,"—বর্ষীয়সী চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—"বউই দেবে তোর কাণে মধু দিয়ে—তুই দিবি কেন? দাও ত' বউমা, পুঁটুর কাণে একটু বেশী করে' মধু দিয়ে।—ও সম্পর্কে তোমার ননদ।"

বর-গৃহে আলোকোজ্জ্বল 'ছায়ামণ্ডপে' পাটি পাতিয়া বর ও বধূকে পাশাপাশি বসাইয়া 'বৌ-পরিচয়' রূপ স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। আত্মীয়-স্বজনগণ সঙ্গতি-অনুসারে কেহ নগদ টাকা বা কেহ অন্যরূপ উপহারযোগ্য বস্তু প্রদান করিয়া নববধূর 'মুখদর্শন' করিতেছেন। প্রথানুযায়ী গুরুস্থানীয়গণ ধান-দূর্ব্বাসহ আশীস্ বর্ষণ করিয়া যাইতেছেন, এবং অন্যসম্পর্কীয়রা—বিশেষতঃ নারী ও বালকবালিকাগণ বধূর ঠোঁঠে চিনি গুঁজিয়া দিয়া এবং আপনাদের কাণে মধুর দ্বারা মধুসিক্ত করাঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া লইয়া তাহার সহিত মধুর আত্মীয়তা-সূত্রে সংবদ্ধ হইতেছে—"বৌয়ের মুখের কথা চিনির মত মিষ্টি হউক্,—তাঁহাদের কর্ণে তাহার বাক্য মধুবর্ষণ করুক'।

চিনির পর চিনি গুঁজিয়া দিয়া বধূর ঠোঁট দুইখানি এমন পুরু করিয়া তোলা হইয়াছিল যে সেখানে যেন একটি চিনির দোকান খোলা হইয়াছে—চমৎকার! বধূ চোখ বুজিয়া স্থিরভাবে বসিয়া ছিল—তাহাকে সেইরূপ ভাবে থাকিতেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল,—তাহার অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, আবার হাসিও পাইতেছিল। সে আস্তে আস্তে ঠোঁট দুইটি নাড়িয়া ঠোঁটের চিনিগুলি কিছু কিছু ঝরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

দেবর-স্থানীয় এক বালক সহসা বলিয়া উঠিল,—"বাঃ! বাঃ! বৌদি দিব্যি চিনি খাচ্ছেন যে!—ও পিসীমা, দেখ—দেখ—"

হাসি আর তাহার হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না—খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—কাঁপিয়া দুলিয়া ফাঁপিয়া ফুপিয়া হাসিয়া চলিল,—ভুলিয়া গেল যে চারিদিকে অজস্র আলোক ও লোক-সমারোহ, এবং সেখানে সে হইতেছে নব-বধূ।

অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলে সমস্বরে ধিক্কার দিয়া উঠিলেন,—"ছি! ছি! ছি! বেহায়া নতুন বৌটার লজ্জা নেই!—পাগল না কি?"

'বধূর লজ্জা নাই' কথাটার দ্বারা স্বতঃ-প্রমাণিত হইয়া যায় যে 'পূর্ব্বে'ও তাহার লজ্জা ছিল না। 'পূর্ব্বে'—অর্থাৎ পিতৃগৃহে। বাইরে কানাঘুসা চলিতে লাগিল। এবং ঘরে—

ভট্টাচার্য্য-ভাগিনেয়ের পিতা-মাতা নাই; খুড়ীমা সংসারের কর্ত্রী। প্রথম-পক্ষের কয়েকটি ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে, একটি সংসারাশ্রিতা বিধবা ভগ্নী ও খুড়ী মা'র একটি অর্দ্ধোন্মাদ অনতিবয়স্ক পুত্র—ইহাদের উপর খুড়ীমা একচ্ছত্রী কর্ত্রীত্ব করিয়া থাকেন। মুখ বাঁকাইয়া মোটা-গলায় খুড়ীমা বলিলেন,—"তোমার মামার যেমন পছন্দ! অতবড় কলাগাছের মত—"

ভ্রাতুষ্পুত্র মৃদুস্বরে কহিলেন,—"এমন আর বেশী বয়স কি,—ছেলেমানুষ।"

"হ্যাঁ, ছেলেমানুষই!"—খুড়ী-মা ভেংচাইয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয়-পাক্ষিকের মন সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল। যেরূপ বয়সে তিনি পক্ষান্তর গ্রহণ করিলেন,—সেরূপ বয়স এবং অবস্থায় ঐ প্রকার সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক।—তাঁহার দোষ নাই। তিনি দ্বিতীয়াকে মিষ্ট-কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে লজ্জাই স্ত্রীলোকের সর্ব্বোত্তম ভূষণ এবং উচ্চ হাসি লজ্জাহীনতার অন্যতম নিকৃষ্ট লক্ষণ।

বধূর পিত্রালয়-গমন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইল। প্রথমে পিতৃব্য, পরে পিতা হাসিকে লইতে আসিয়া কাঁদিয়া ফিরিলেন,—চোখের জল মুছিয়া হাসি হাসিল।

হাসির স্বামীর কৌলিক ধর্ম্ম বা ব্যবসায় হইতেছে গুরুগিরি। এই ধর্ম্ম-ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে বৎসরে ত্রিমাসাধিক কাল বিভিন্ন শিষ্যগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে হয় এবং সেই ত্রৈমাসিক অর্জ্জন সংসারের যাণ্মাসিক ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া থাকে।

এবারও তাঁহাকে কুলধর্ম্ম-প্রচারে বাহির হইতে হইবে—দুই-এক দিনের মধ্যেই তিনি শুভযাত্রা করিবেন। কিন্তু এবার যেন গুরুদেব উৎসাহহীন এবং ঈষৎ দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত। আধিদৈহিক উপভোগের মোহ যেমন এক দিকে সন্দিগ্ধ স্বামীকে তরুণী স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন বাহ্যিক রূঢ়তা প্রকাশ করিতে দেয় নাই, অন্য দিকে তেমনই তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে দিন-দিনই সন্দিগ্ধতর করিয়া তুলিতেছিল—যদিও কয়েক মাসের ক্রমিক অতি-সতর্ক পর্য্যবেক্ষণ সত্বেও সন্দেহের সৌচিক ছিদ্রটিও প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই।

অপ্রত্যক্ষ অনুমানের অবশ্য অন্ত ছিল না। পূর্ব্ব-পক্ষীয় বালক পুত্র দুইটি—বড়টি ত' চিররুগ্ন,—কিন্তু অনুমান অনেক সময় অসঙ্গতিকে অবহেলা করিয়াই চলে। অনুমান অগ্রসর হইয়া চলিল এবং আসিয়া দাঁড়াইল খুড়ী মা'র সেই আধপাগ্‌লা ছেলেটার কাছে। পাগল—পাগল কিসের?—বদ্‌মাইস!—পাগলামি ওর ভাণ।

বৌদি বলিতে অজ্ঞান—বৌদি'র কাছে আসিলে পাগ্‌লামি ওর সারিয়া যায় এক মুহূর্ত্তে,—বৌদি'র কোন কাজ করিয়া দিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে সে,—বৌদি'র খুসীতে হাতে হাতে স্বর্গ পায়!—বৌদি,—তবু যদি নিজের বৌদি হইত?—হতভাগা।

খুড়ী-মা'র ভয়ে তিনি মুখে স্পষ্ট কিছু উচ্চবাচ্য করিতে পারিলেন না, কিন্তু গাম্ভীর্য্যে গাল ফুলাইয়া হাসিকে গোপনে বলিলেন,—"পাগ্‌লাটাকে বেশী আস্কারা দিয়ো না হাসি,—পাগল—কখন কি করে' বসে ঠিক নেই।"

—"পাগল না ত'—বুদ্ধি একটু কম।"

"বুদ্ধি একটু কম! হুঁ—"—একটু থামিয়া, চাপা-তিরস্কারের স্বরে তিনি বলিলেন,—"আমি বল্‌ছি বদ্ধ-পাগল,—আমল দিয়ো না।"

"আচ্ছা, আমল দেব না।"—হাসি মৃদু হাসিয়া বলিল।

ঐ মুমূর্ষু মৃদুহাসিই এখনও বাঁচিয়া আছে,—মুখরতা মরিয়া উচ্চহাসি ঝরিয়া গিয়াছিল।—স্বামীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সামান্য মৃদুতম হাসিটুকুও এড়ায় না।

কি একটা অছিলায় খুড়্‌তুত ভাইটিকে ধরিয়া জ্যেঠ্‌তুত দাদাটি একদিন শক্ত করিয়া কাণ মোচ্‌ড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তার বেশী নয়; এবং তাহাতেই খুড়ী মা'র সে কি চণ্ডীমূর্ত্তি!—কি বিপদ!

এইরূপ সমস্যাজটিল অবস্থার আবেষ্টনে নবীনা বধূকে রাখিয়া প্রৌঢ় স্বামী বেচারী দীর্ঘ দিনের জন্য গৃহত্যাগ করিতেছেন—কতকটা বাধ্য হইয়াই,—মস্তিষ্ক চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে না? কিন্তু—

অকস্মাৎ তিনি সাময়িক সমাধানের একটি সরল সূত্রে হস্তার্পণ করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। খুড়ী মা'কে ডাকিয়া বলিলেন,—"খুড়ী-মা, চলুক্ না শ্রীশ আমার সঙ্গে এবার?"

—"কোথায় রে?"

—"শিষ্যবাড়ী। গেলে কিন্তু খুব ভালো হয়,—কিছু কিছু প্রণামীও জুটবে ঐ সঙ্গে।"

সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। খুড়ী-মা চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন,—"শ্রীশকে সঙ্গে নিয়ে যাবি তুই শিষ্যি-বাড়ী?—ঐ দুধের ছেলে—রোগা!—আর সাত-ঘাটের জল পিয়ে পিয়ে বেড়াবি তুই এ-গাঁ সে-গাঁ করে'!"—খুড়ী-মা ঠোঁট উল্টাইয়া হাসিলেন।

দাদা 'দুধের ছেলে' রোগা ভাইটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে খুড়ী মা'র ঘরের বারান্দায় চৌকাঠের উপর বসিয়া তৈল ও কাঁচালঙ্কা সহযোগে এক বাটি মুড়ির সদ্ব্যবহার করিতেছে। পেশীপুষ্ট দোহারা চেহারা,—সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা গাঢ় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রোগাও বটে,—দুধের ছেলেও বটে! মাথার দোষ আছে, মনে হয়;—কিন্তু সে তাহার মাথার দোষ কি দুষ্টামি, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

শ্রীশের দিকে চাহিয়া শ্রীশের দাদা রামকমল একটি

দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।—দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজের দেহের দিকে একবার চাহিলেন—মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। এখনও ত' পূর্ণ-বর্ত্তমান অটুট যৌবনশ্রী তাঁহার—সুস্থ-সবল দেহ, তদুপরি নাতিদীর্ঘ সুন্দর একটি মানানসই ভুঁড়ি!—সন্দেহ নাই, সুপুরুষ তিনি। তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

পরদিন দুর্গানাম স্মরণ করিয়া তিনি শিষ্য-শিকারে বাহির হইলেন। যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পূর্ব্বপক্ষীয়া কিশোরী কন্যা ক্ষেমঙ্করীকে আড়ালে ডাকিয়া কি নিগূঢ় সদুপদেশ দান করিয়া গেলেন।

ক্ষেমঙ্করী বাহিরে দেখিতে আর-দশটি পল্লীবালিকার মতই সাধারণ একটি বালিকা—বয়সে একাদশী মাত্র,—কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই বয়সেই সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী। সে এমন পাকা পাকা কথা ঝাড়িতে পারে যে প্রবীণ ব্যক্তিরাও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যান—যেন একটি জ্যেঠাই-মা! ম্যালেরিয়া-শীর্ণ বিবর্ণ দেহের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে উহার সুপরিস্ফীত পেটটি; উহা প্লীহা-যকৃতের দ্বারা কি দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ তাহা বিশেষ গবেষণার বিষয়।

'সৎমা' কথাটার বিরূপাত্মক কূটার্থবোধ শুধু তাহার অধিগত নহে, সহজাত সংস্কারের মত অস্থিমজ্জাগত ছিল। পিতৃভক্তির প্রাবল্য কোন কালেই ছিল না—পিতার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে বরং মনে মনে নূতন মা ও পুরাতন পিতা উভয়ের প্রতি সে সমবিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু সহসা পিতৃদেব কর্ত্তৃক বিমাতার উপর চৌকিদারি করিবার চমৎকার ইঙ্গিত পাইয়া প্রাণে তাহার পিতৃপ্রাণতার বান ডাকিল। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কন্যা স্বীয় সন্ধানী চক্ষু উদ্যত করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না।

—"নতুন-মা,—ও নতুন-মা!"

গ্রীষ্মের প্রতপ্ত দ্বিপ্রহর। খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘরের ঝঞ্চাট মিটাইয়া কিছুক্ষণ হইল হাসি আসিয়া তাহার শয়ন-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর বসিয়াছে।—সম্মুখে কয়েক লাইন লেখা একখানি খোলা চিঠির কাগজ। কাল রাতে এই কয় পংক্তি সে লিখিয়া রাখিয়াছিল, আজ পত্রখানি সম্পূর্ণ করিতেই হইবে। পত্রখানি লিখিত হইতেছে তাহার দুঃখিনী মা'র উদ্দেশে। কলমটি হাতে তুলিয়া লইয়াছে মাত্র, এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল। জানালা খুলিয়া হাসি দেখিল—ক্ষেমঙ্করী।

কোঁচড়ের ভিতর হইতে একটি কাঁচা আম বাহির করিয়া উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষেমঙ্করী হাসিয়া বলিল,—"খোল না নতুন-মা, দোরটা তোমার একবার।"

ক্ষেমঙ্করী তাহার নতুন-মা'কে এতদিন এমন সুস্পষ্টভাবে এড়াইয়া চলিত এবং অপরিহার্য্য হইলে এমন গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রয়োজনীয় কথাটি বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িত যে তাহার বিবাদী মনের পরিচয় নতুন-মা'র নিকট আদৌ নূতন ছিল না। সেই ক্ষেমঙ্করী আজ তাহার সহিত সাধিয়া ভাব করিতে আসিয়াছে! হাসি বিস্মিত হইল—কিন্তু খুসীও হইল। আহা! উহার যে মা নাই!—রোগা মেয়েটি! সে হাসিয়া বলিল,—"ওঃ তুমি!—দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, দোর খুলে' দিচ্ছি।"

ক্ষেমঙ্করীর কোঁচড়-ভরা কাঁচা আম দেখিয়া হাসির মনে পড়িয়া গেল—সেই জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম। পিতৃগৃহের একটা মুছিয়া-যাওয়া সুন্দর ছবি স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিয়া তাহার নিশ্বাস ভারী ও দীর্ঘ হইয়া আসিল। পরক্ষণেই সে হাসিল। বলিল,—কাঁচা আম খেয়ে কি জর করবি, ক্ষেমী?"

ক্ষেমঙ্করী মাথা নাড়িয়া বলিল,—"ওঃ, এ আমি কত' খাই!—তুমি বুঝি ভালোবাস না, না?"

"আমি?—ভালোবাসি বৈ কি!"—হাসি হাসিয়া বলিল।

—"কেটে, নুন-লঙ্কা দিয়ে মাখিয়ে আন্‌ব, নতুন-মা?"

—"আনো।"

ক্ষেমঙ্করী 'আমঝাল' তৈয়ার করিয়া আনিতে রান্নাঘরে ঢুকিতেছে, আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—শ্রীশ একখানি সাদা খাম হাতে করিয়া লইয়া নতুন-মা'র ঘরের বারান্দায় উঠিল। এই কাঠ-ফাটা টা-টা রোদে পোষ্টাফিসে গিয়াছিল পাগ্‌লাটা খাম কিনিয়া আনিতে?

নতুন-মা'র বিছানার উপর একখানি লিখিতে-আরম্ভ-করা চিঠির কাগজ এইমাত্র দেখিয়া আসিল সে,—কে জানে কাহার নামের চিঠি? কৌতূহলের সীমা ছিল না—কিন্তু ক-অক্ষরও পেটে নাই যে পড়িয়া দেখিবে। তবে নাই বা পড়িতে পারিল, যেমন করিয়াই হউক্ খোঁজ লইয়া জানিবেই সে উহা কাহার চিঠি। সরস্বতীর অকৃপায় কি আসিয়া যায় তাহার দুষ্টা-সরস্বতী প্রসন্না থাকিলে?—ক্ষেমঙ্করীর মুখে ক্রূর হাসি ফুটিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। হাসির পিতৃগৃহ হইতে প্রকাণ্ড একটি পাকা আমের ঝাঁকা উপঢৌকন লইয়া দুইজন লোক আসিয়াছে। একজন—এক জনমজুর; অন্যজন—ওঃ! রামলাল দাদা যে! একবার মাথার কাপড়টা টানিয়া নামাইয়া দিয়া আবার সে উঠাইয়া লইল—বাপের-বাড়ীর গাঁয়ের লোককে লজ্জা কি! কিন্তু লজ্জা হইল এক অতীত দিনের হাস্যকর সংঘটন স্মরণ করিয়া। তাহাদের বাড়ীর সাম্‌নের পুকুর-পাড়ের পিচ্ছিল পথে এক বর্ষাকালের শেষবেলায় হঠাৎ পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া—

হাসির মুখে সলজ্জ হাসির রক্তাভা ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু মাথায় সে কাপড় টানিয়া দিলই না। বারান্দা হইতে উঠানে নামিয়া আসিয়া রামলাল দা'র পদপ্রান্তে করস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

রামলাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ভালো আছিস, হাসি?"

হাসি মৃদুস্বরে কহিল,—"আছি, দাদা। আপনারা—"

রামলাল সান্ত্বনার সুরে বলিল,—"ভালোই আছি। কাকা, জ্যেঠামশাই, জ্যেঠাই-মা—তোদের বাড়ীর ওঁরাও সবাই ভালো আছেন।"

হাসি মাথা নত করিয়া, লুকাইয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। পিতা না আসিতে পারেন, কাকাও কি তাহার এই উপলক্ষে একবার আসিতে পারিতেন না? তাঁহাদিগকে যে হাসি কত—কত দিন হইতে দেখিতে পায় নাই! কেন তিনি আসিলেন না? হাসি ক্ষুণ্ণ হইল—মনে মনে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিল। কিন্তু তাঁহাদের না আসিবার প্রকৃত কারণও ত' হাসির অবিদিত ছিল না! তাহার চক্ষু দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল—চেষ্টা করিয়া সে অশ্রু সম্বরণ ও আত্ম সম্বরণ করিল। এবং হাসিল—বেদনা-ম্লান মেঘ্‌লা দিনের হাসি!

রামলাল সেইদিনই চলিয়া যাইবে—হাসি কিছুতেই যাইতে দিবে না। উপহৃত পক্কাম্রের সুমিষ্ট সৌরভে খুড়ীমা সত্যই সেদিন অত্যধিক হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; তিনিও বলিলেন,—"না বাবা রামলাল, কিছুতেই তোমার যাওয়া হ'চ্ছে না আজ। রাতটা খেয়ে দেয়ে এখানে কাটিয়ে কাল যেয়ো, বাপু!—বৌমা, দাদা তোমার আজ থাক্‌বেনই; ভেবো না।"

আষাঢ় মাসও কাটিয়া গেল। অতঃপর এক ধারা-শ্রাবণের দিনে ধর্ম্মবণিক্ রামকমল ঠাকুর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। শিষ্যযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন পদব্রজে,—ফিরিয়া আসিলেন অর্থসম্ভারে ডিঙ্গা সাজাইয়া। জালিক শিষ্য মহিম মাঝি নিজের পান্‌সীতে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল।

ভ্রাতুষ্পুত্রের শারীর সমাচার গ্রহণ করিবার পর খুড়ী মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চিঠিতে পৌঁছবার কথা ছিল বুধবারে, পৌঁছলি আজ শনিবারে;—দেরী হ'ল যে? আমরা ত' ভেবে মরি।"

বক্র কটাক্ষে অদূরবর্ত্তিনী গৃহকর্ম্মরতা হাসির দিকে চাহিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র খুড়ী মা'র প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—"শ্বশুর-বাড়ীর গাঁ'টা দিয়ে একটু ঘুরে' এলুম কি না—।"

হাসি উৎকর্ণ হইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। চোখোচোখি হইতেই তিনি গম্ভীর-উপেক্ষায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

খুড়ী মা বলিলেন,—"ভালোই। ক'দিন ছিলি শ্বশুরবাড়ী?"

—"শ্বশুর-বাড়ীর নাগাল পাইনি। দক্ষিণ পাড়ায় মামা-বাড়ী নেমেছিলুম নৌকো থেকে একবার।"

—"ওঃ!—আচ্ছা, সে সব শোনা যাবে পরে। এই এলি,—এখন একটু জিরো।"

"মামারা ভালো আছেন" বলিয়া রামকমল অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল।

শ্লেষাত্মক হেঁয়ালি !—দুর্ব্বোধ্য। হাসি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কর্ম্মান্তরে অন্তরালবর্ত্তিনী হইল।

রন্ধনগৃহে উনুনের পাশে বসিয়া হাসি আজ বারম্বার অঞ্চলে চক্ষুমার্জ্জনা করিতেছিল।—ইন্ধন বুঝি শুষ্ক ছিল না? কিন্তু এত কি ধূঁয়া হইয়াছিল,—এখন ত' নাই? চোখে কুটা বা কীট পড়িল কি? নতুবা,—না, হাসি ত' কই এমন করিয়া কাঁদে না! চোখে জল আসিলেও মুখে জাগে তাহার হৈম হাসির বিভাস।—আজ তাহার কি হইল?

প্রবাস-প্রত্যাগত স্বামিদেবতার জন্য ভোগের আয়োজন প্রারব্ধ হইয়াছে—প্রাত্যহিক সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত একাধিক রসনারোচক আহার্য্য প্রস্তুত হইতেছে। রন্ধনকারিণীর মন হঠাৎ কেন এমন উন্মন হইয়া পড়িল! ধীর-সতর্কতার সহিত নুন, ঝাল প্রভৃতির মিশ্রণ-পরিমাণ স্থির করিয়া মসলাদি ব্যঞ্জনপাত্রে নিক্ষেপ করিলেও তাঁহার সন্দেহ যাইতেছিল না—পাছে কিছু কম বা বেশী হইয়া পড়ে। সে ভাবিল, ক্ষেমঙ্করীকে দিয়া চাখাইয়া লইলেই ত্রুটি নির্ণীত ও সংশোধিত হইতে পারিবে। ক্ষেমঙ্করীকে ডাকিবার জন্য সে উঠিয়া জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল—ডাকা হইল না।

দক্ষিণদ্বারী ঘরের বারান্দায় একখানি বড় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া রামকমল তাঁহার সন্তশিবাগৃহপুষ্ট মসৃণ ভুঁড়িটিতে ধীরে ধীরে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিতেছেন এবং ক্ষেমঙ্করী তাঁহার সম্মুখে দাওয়ায় বসিয়া তাঁহাকে নিম্নস্বরে কি সব কহিতেছে,—তিনি তাহার দিকে মাঝে মাঝে চোখ তুলিয়া চাহিতেছেন এবং দুই-একটি বিশেষ প্রশ্ন করিতেছেন। হাসি প্রথমে ক্ষেমঙ্করীকে চোখের ইসারায় ডাকিতে চেষ্টা করিল, পরে "ক্ষেমী, ক্ষেমী" করিয়া বার-দুই অনুচ্চকণ্ঠে ডাক দিল,—ক্ষেমঙ্করী সাড়া দিল না। পিতা-পুত্রীতে এত কি কথা হইতেছে?—হাসি বুঝিতে পারিল না।

রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া বাহির হইতে খুড়ী মা হাঁকিলেন,—"রান্না শেষ হ'ল, বৌমা?"

—"না খুড়ী মা, এখনো সব হয় নি—দেরী আছে।"

দেরী আছে? খুড়ীমা বিরক্তির সুরে বলিলেন,—"তোমার দেখি সব-তাতেই দেরী,—স্বর্ নেই কোন কাজেই। এত দিনের পর সোয়ামী এল ঘরে—"

খুড়ী মা কথাটা শেষ না করিয়াই চলিয়া গেলেন। উহ্য শেষাংশটুকু বুঝিয়া লইতে হাসির বিলম্ব হইল না—তাহা হইতেছে 'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তিহীনতার অভাব'। সে মনে মনে তাহারই মনকে তিরস্কৃত করিল।—সত্যই ত', তাহার মনে ভক্তির সে তন্ময়তা কই,—অনুরাগের সেই আকুল আকর্ষণ? স্বামী—নারীর দেবতা। সেবিকা নারী কোন্ সাহসে দেবতার ভালোমন্দের বিচার করিতে বসিয়া তাঁহাকে অপমান করে,—তাঁহার সেবায় ত্রুটি করে?

স্বামী ও বালকদিগের প্রাথমিক-পরিবেষণ কোন-প্রকারে শেষ করিয়া ফেলিয়াই হাসি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। খুড়ী মা আহার-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রামকমল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সাত-তাড়াতাড়ি অমন করে' কোথায় গেল ও?"

খুড়ী মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শোনা গেল—খিড়্‌কীর দিক হইতে "ওয়াক্, ওয়াক্" শব্দ আসিতেছে; যেন কেহ বমন-বেগ নিবারণ করিতে চাহিতেছে, নিবারিত হইতেছে না।

—"বমি কর্‌ছে না কি,—কি হ'ল হঠাৎ?"

খুড়ী মা বলিলেন,—"ক'দিন থেকেই বৌমা অম্নি 'ওয়াক্' পাড়ে—তোকে বল্‌তে ভুলে' গেছি। ছেলে-পিলে হবে হয় ত'।"

সম্ভাবিত-সন্তানের পিতা ইহা শুনিয়া যে বিশেষ খুসী হইলেন এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না এবং ইহার পর তিনি কথাটি মাত্র কহিলেন না। কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্বশুর-বাড়ীর গ্রাম হইতে যে সব কথা রামকমল শুনিয়া আসিয়াছেন এবং আজ কন্যা ক্ষেমঙ্করীর নিকট কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে যে সব কথা শুনিলেন,—মিলাইয়া দেখিয়া তাঁহার মুখ কালো ও মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল।

—"ও কি রে, অমন করে' খাচ্ছিস্ যে?"

—"ভালো লাগ্‌ছে না শরীরটা।"

হাসি কেবল বাহির হইতে আসিয়া দুয়ারে পা বাড়াইয়াছে, রামকমল অর্দ্ধভুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাত্রে রাখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন।

"আহা! সবি যে তোর পাতে পড়ে' রইল রে—?" —খুড়ীমা প্রশ্ন করিলেন।

রামকমল কোন উত্তর দিলেন না। দ্বারমধ্যবর্ত্তিনী পত্নীর দিকে একবার অলক্ষ্য ক্রূর-কটাক্ষে চাহিলেন,—ইচ্ছা হইল, ধাক্কা দিয়া কি লাথি মারিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেন; কিন্তু কষ্টে দুষ্ট-মনোভাব দমন করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

ভ্রম সংশোধন—প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জন্ম-তারিখে একটু ভ্রম ঘটিয়া গিয়াছে। জন্ম ১৩২২ স্থলে ১২৩২ সাল হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত "অনামী"—৩৲
শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী প্রণীত কাব্য "আঙিনার ফুল"—১৷৽
শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত গল্পের বই "ছিন্ন পাপ্‌ড়ী"—১৷৽
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "শরীর গঠন"—১৲
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পাদিত "ছোটদের বার্ষিকী"—১৷৽
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সংগৃহীত "ব্রহ্ম লাভের পন্থা"—প্রথম খণ্ড—১৲
কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত "গুলবাগিচা"—১৷৽
স্যার শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত "জেনেভা ভ্রমণ" ও "দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য কাহিনী"—প্রত্যেকখানি—৷৷৽
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "যথাক্রমে"—২৲
শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পুরোহিত"—২৲
"Elementary Anatomy and Physiology"র বঙ্গানুবাদ — অনুবাদক ডাক্তার প্রভাতকুমার কবিরাজ—১৷৽
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "ডাউন দিল্লী এক্‌সপ্রেস্‌"—।৽
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত "মুক্তির রূপ"—।৽
শ্রীপীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "মাধুকরী"—।৽
শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ এম-এ প্রণীত খণ্ড কাব্য "ওপারের ঢেউ"—২৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "অসম্ভব"—৷৷৵৽
শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক "দাতাকর্ণ"—।৽
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বর্ম্মা প্রণীত ডিটেকটিভের গল্প "কালসর্প"—।৽
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নীলকণ্ঠ"—১৷৽
শ্রীইলা দেবী ও শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার প্রণীত গল্পের বই "সপ্তক"—১৷৽
শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী সিরিজের "বিচারক দস্যু" ও "বোম্বে বন্দরে রেক"—প্রত্যেকখানি ৷৽
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত উপন্যাস "পরাহত"—১৷৽
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এ প্রণীত উপন্যাস "শনির দশা"—১৲
স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সরকার প্রণীত শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী এম-এ সম্পাদিত "ছোট গল্প"—৷৵৽
শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "ভুলের বোঝা"—১৲
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "আমার বন্ধু"—১৷৽
শ্রীসুধীরেন্দু রায় প্রণীত গল্পের বই "একখানি মুখ"—১৲
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অপরাধী"—১৷৽
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "চলার পথে"—২৲
শ্রীযতীন সাহা প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "আঁধার রাতের মুসাফির"—।৽
শ্রীপম্মেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "গল্পপ্রিয়া এবং শ্রীমঙ্গল"—৷৵৽
শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "গল্পের মায়াপুরী"—১৲
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বিংশ শতাব্দীর সেরা সাহিত্যিক"—১৷৽
শ্রীললিতকুমার ঘোষ প্রণীত ছেলেমেয়েদের "ছুটির গল্প"—।৽
শ্রীরমেন্দু দত্ত প্রণীত কাব্য "মঞ্জুলা"—১৷৽
শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "জানোয়ার"—।৽

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
Of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

রাগিণী সুরট

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর দে

অগ্রহায়ণ—১৩৪০

প্রথম খণ্ড | একবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঁশরী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাঁশরীদের বাড়ী। ক্ষিতীশ ও বাঁশরী)

ক্ষিতীশ

তোমার হিন্দুস্থানী শোফারটা ভোরবেলা মুহুর্মুহু বাজাতে লাগল গাড়ীর ভেঁপু। চেনা আওয়াজ, ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম।

বাঁশরী

ভোরবেলায় ? অর্থাৎ

ক্ষিতীশ

অর্থাৎ আটটার কম হবে না।

বাঁশরী

অকালবোধন !

ক্ষিতীশ

দুঃখ নেই, তবু জানতে চাই কারণটা। কোনো কারণ না থাকলেও নালিশ করব না।

বাঁশরী

বুঝিয়ে বলছি। লেখবার বেলায় নলিনাক্ষের দল বলে যাদের দাগা দিয়েছ তাদের সামনে এলেই দেখি তোমার মন যায় এতটুকু হয়ে। মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে বোঝাতে থাক—ওরা তো ডেকোরেটেড্ ফ্ল্স্। কিন্তু সেই স্বগতোক্তিতে সঙ্কোচ চাপা পড়ে না। সাহিত্যিক আভিজাত্যবোধকে অন্তরের মধ্যে ফাঁপিয়ে তোল তবু নিজেকে ওদের সমান বহরে দাঁড় করাতে পার না! সেই চিত্তবিক্ষেপ থেকে বাঁচাবার জন্য নলিনাক্ষদলের দিন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই তোমাকে ডাকিয়েছি। সকাল বেলায় অন্তত ন-টা পর্য্যন্ত আমাদের এখানে রাতের উত্তরাকাণ্ড। আপাতত এ বাড়ীটা সাহারা মরুভূমির মতো নির্জ্জন।

ক্ষিতীশ

ওয়েসিস্ দেখতে পাচ্ছি এই ঘরটার সীমানায়।

বাঁশরী

ওগো পথিক, ওয়েসিস্ নয়, ভালো করে যখন চিনবে তখন বুঝবে মরীচিকা।

ক্ষিতীশ

আমার মাথায় আরো উপমা আসছে বাঁশি, আজ তোমার সকালবেলাকার অসজ্জিত রূপ দেখাচ্চে যেন সকাল বেলাকার অলস চাঁদের মতো।

বাঁশরী

দোহাই তোমার, গদগদ ভাবটা রেখে দিয়ো একলা ঘরের বিজন বিরহের জন্য। মুগ্ধ দৃষ্টি তোমাকে মানায় না। কাজের জন্য ডেকেছি, বাজে কথা ষ্ট্রিক্‌ট্‌লি প্রোহিবিটেড্।

ক্ষিতীশ

এর থেকে ভাষার রেলেটিভিটি প্রমাণ হয়। আমার পক্ষে যা মর্ম্মান্তিক জরুরী তোমার পক্ষে তা ঝেঁটিয়ে ফেলা বাজে।

বাঁশরী

আজ সকালে এই আমার শেষ অনুরোধ, গাঁজিয়ে ওঠা রসের ফেনা দিয়ে তাড়িখানা বানিয়ো না নিজের ব্যবহারটাকে। আর্টিষ্টের দায়িত্ব তোমার।

ক্ষিতীশ

আচ্ছা তবে মেনে নিলুম দায়িত্ব।

বাঁশরী

সাহিত্যিক, হতাশ হয়ে পড়েছি তোমার অসাড়তা দেখে। নিজের চক্ষে দেখলে একটা আসন্ন ট্র্যাজেডির সঙ্কেত—আগুনের সাপ ফণা ধরেছে, এখনো চেতিয়ে উঠল না তোমার কলম, আমার তো কাল সারারাত্রি ঘুম হোলো না। এমন লেখা লেখবার শক্তি কেন আমাকে দিলেন না বিধাতা যার অক্ষরে অক্ষরে ফেটে পড়ত রক্তবর্ণ আগুনের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্চি আর্টিষ্টের চোখে, বলতে পারছিনে আর্টিষ্টের কণ্ঠে। ব্রহ্মা যদি বোবা হতেন তাহোলে অস্ফুট বিশ্বের ব্যথায় মহাকাশের বুক যেত ফেটে।

ক্ষিতীশ

কে বলে তুমি প্রকাশ করতে পার না বাঁশি, তুমি নও আর্টিষ্ট! তুমি যেন হীরেমুক্তোর হরির লুঠ দিচ্ছ। কথায় কথায় তোমার শক্তির প্রমাণ ছড়াছড়ি যায় দেখে ঈর্ষা হয় মনে।

বাঁশরী

আমি যে মেয়ে, আমার প্রকাশ ব্যক্তিগত। বলবার লোককে প্রত্যক্ষ পেলে তবেই বলতে পারি। কেউ নেই তবু বলা—সেই বলা তো চিরকালের। আমাদের বলা নগদ বিদায় হাতে হাতে দিনে দিনে। ঘরে ঘরে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেগুলো ওঠে আর মেলায়।

ক্ষিতীশ

পুরুষ আর্টিষ্টকে এবার মেরেছ ঠেলা, আচ্ছা বেশ, কাজ আরম্ভ হোক। সেদিন বলেছিলে একটা চিঠির কথা।

বাঁশরী

এই সেই চিঠি। সন্ন্যাসী বলছেন,—প্রেমে মানুষের মুক্তি সর্ব্বত্র। কবিরা যাকে বলে ভালোবাসা সেইটাই বন্ধন। তাতে একজন মানুষকেই আসক্তির দ্বারা ঘিরে নিবিড় স্বাতন্ত্র্যে অতিকৃত করে। প্রকৃতি রঙীন মদ ঢেলে দেয় দেহের পাত্রে, তাতে যে মাৎলামি তীব্র হয়ে ওঠে তাকে অপ্রমত্ত সত্যবোধের চেয়ে বেশি সত্য বলে ভুল হয়। খাঁচাকেও পাখী ভালোবাসে যদি তাকে আফিমের নেশার বশ করা যায়। সংসারে যত দুঃখ, যত বিরোধ, যত বিকৃতি সেই মায়া নিয়ে যাতে শিকলকে করে লোভনীয়। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যে চিন্‌তে যদি চাও তবে বিচার করে দেখো কোন্‌টাতে ছাড়া দেয় আর কোন্‌টা রাখে বেঁধে। প্রেমে মুক্তি, ভালোবাসায় বন্ধন।

শুনলেম চিঠি, তারপরে?

বাঁশরী

তারপরে তোমার মাথা! অর্থাৎ তোমার কল্পনা! মনে মনে শুনতে পাচ্চ না শিষ্যকে বলছেন, ভালোবাসা আমাকে নয়, অন্য কাউকেও নয়। নির্ব্বিশেষ প্রেম, নির্ব্বিকার আনন্দ, নিরাসক্ত আত্মনিবেদন, এই হোলো দীক্ষা মন্ত্র।

ক্ষিতীশ

তাহোলে এর মধ্যে সোমশঙ্কর আসে কোথা থেকে?

বাঁশরী

প্রেমের সরকারী রাস্তায় যে প্রেমে সকলেরই সমান

অধিকার খোলা হাওয়ার মতো। তুমি লেখকপ্রবর, তোমার সামনে সমস্তাটা এই যে, খোলাহাওয়ায় সোম-শঙ্করের পেট ভরবে কি ?

ক্ষিতীশ

কী জানি! সূচনায় তো দেখতে পাচ্ছি শূন্য পুরাণের পালা।

বাঁশরী

কিন্তু শূন্যে এসে কি ঠেকতে পারে কিছু? শেষ মোকামে তো পৌঁছল গাড়ি, এ পর্য্যন্ত রথ চালিয়ে এলেন সন্ন্যাসী সারথি! আড্ডা বদলের সময় যখন একদিন আসবে তখন লাগাম পড়বে কার হাতে? সেই কথাটা বলো না রিয়লিস্ট্!

ক্ষিতীশ

যাকে ওরা নাক সিট্‌কে প্রকৃতি বলেন, সেই মায়াবিনীর হাতে। পাখা নেই অথচ আকাশে উড়তে চায় যে স্থূল জীবটা তাকে যিনি ধপ করে মাটিতে ফেলে চট্‌কা দেন ভাঙিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়ে দেন ধূলো।

বাঁশরী

প্রকৃতির সেই বিদ্রূপটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবণের হাত থেকে, শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাঁকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম্, নোঙরামিকে নয়। লেখো লেখো দেরি কোরো না, লেখো এমন ভাষায় যা হৃৎপিণ্ডের শিরাছেঁড়া ভাষা। পাঠকেরা চম্‌কে উঠে দেখুন এতদিন পরে বাংলার দুর্ব্বল সাহিত্যে এমন একটা লেখা ফেটে বেরোল যা ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্য্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

ক্ষিতীশ

ইস্, তোমার মনটা নেমেছে ভল্‌ক্যানোর জঠরাগ্নির মধ্যে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওদের অবস্থায় পড়তে কী করতে তুমি?

বাঁশরী

সন্ন্যাসীর উপদেশ সোনার জলে বাঁধানো খাতায় লিখে রাখতুম। তার পরে প্রবৃত্তির জোর কলমে তার প্রত্যেক অক্ষরের উপর দিতুম কালীর আঁচড় কেটে। প্রকৃতি জাদু লাগায় আপন মন্ত্রে, সন্ন্যাসীও জাদু করতেই চায় উল্টো মন্ত্রে, ওর মধ্যে একটা মন্ত্র নিতুম মাথায় আর একটা মন্ত্রে প্রতিদিন প্রতিবাদ করতুম হৃদয়ে।

ক্ষিতীশ

এখন কাজের কথা পাড়া যাক। ইতিহাসের গোড়ার দিকটায় ফাঁক রয়েছে। ওদের বিবাহ সম্বন্ধ সন্ন্যাসী ঘটাল কী উপায়ে?

বাঁশরী

প্রথমত সেনবংশ যে ক্ষত্রিয়, সেনানী শব্দ থেকে তার পদবীর উদ্ভব, ওরা যে কোনো এক খৃষ্ট-শতাব্দীতে এসেছিল কোনো এক দক্ষিণ প্রদেশ থেকে দিগ্‌বিজয়ী-বাহিনীর পতাকা নিয়ে বাংলার কোনো এক বিশেষ বিভাগে, সেইটে প্রমাণ করে লিখল এক সংস্কৃত পুঁথি। কাশীর দ্রাবিড়ী পণ্ডিত করলে তার সমর্থন। সন্ন্যাসী স্বয়ং গেল সোমশঙ্করদের রাজ্যে, প্রজারা হাঁ করে রইল ওর চেহারা দেখে, কানাকানি করতে লাগল কোনো একটা দেব অংশের ঢালাই দিয়ে এর দেহখানা তৈরি। সভাপণ্ডিত মুগ্ধ হোলো শৈবদর্শন ব্যাখ্যায়, রাজাবাহাদুরের মনটা সাদা, দেহটা জোরালো, তাতে লাগল কিছু সন্ন্যাসীর মন্ত্র, কিছু লাগল প্রকৃতির মোহ, তারপরে এই যা দেখছ।

ক্ষিতীশ

হায়রে, সন্ন্যাসী কি আমাদের মতো অভাজনদের হয়ে স্থূল প্রকৃতির তরফে ঘটকালি করেন না!

বাঁশরী

রাখো তোমার ছিবলেমি। ভুল করেছি তোমাকে নিয়ে, যে মানুষ খাঁটি লিখিয়ে তার সামনে যখন দেখা দিয়েছে সৃষ্টি কল্পনার এমন একটা জীবন্ত আদর্শ দব্ দব্ করছে যার নাড়ি, তার মুখ দিয়ে কি বেরোয় খেলো কথা? কেমন করে জাগাব তোমাকে? আমি যে প্রত্যক্ষ দেখছি একটা মহারচনার পূর্ব্বরাগ, শুনছি তার অন্তহীন নীরস কান্না। দেখতে পাচ্ছ না অদৃষ্টের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ; থাক্‌গে, শেষ হোলো আমার কথা। তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে চললুম।

(প্রস্থানোদ্যম)

ক্ষিতীশ

(ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে)

চাইনে খাবার। যেয়ো না তুমি।

বাঁশরী

(হাত ছিনিয়ে নিয়ে উচ্চহাস্তে)

তোমার বেমানান গল্পের নায়িকা পেয়েছ আমাকে! আমি ভয়ঙ্কর সত্যি।

(ড্রেসিং গাউনপরা সতীশের প্রবেশ)

সতীশ

উচ্চহাসির আওয়াজ শুনলুম যে।

বাঁশরী

উনি এতক্ষণ ষ্টেজের মুনুবাবুর নকল করছিলেন।

সতীশ

ক্ষিতীশবাবুর নকল আসে না কি?

বাঁশরী

আসে বৈ কী, ওঁর লেখা পড়লেই টের পাওয়া যায়। তুমি এঁর কাছে একটু বোসো, আমি ওঁর জন্ত খাবার পাঠিয়ে দিইগে।

ক্ষিতীশ

দরকার নেই, কাজ আছে দেরি করতে পারব না।

[প্রস্থান।

বাঁশরী

মনে থাকে যেন আজ বিকেলে সিনেমা—তোমারি পদ্মাবতী।

(নেপথ্য হতে—"সময় হবে না"।)

বাঁশরী

হবেই সময়, অন্ত দিনের চেয়ে দু-ঘণ্টা আগে।

সতীশ

আচ্ছা বাঁশি, ঐ ক্ষিতীশের মধ্যে কী দেখতে পাও বলো তো।

বাঁশরী

বিধাতা ওকে যে পরীক্ষার কাগজটা দিয়েছিলেন, দেখতে পাই তার উত্তরটা। আর দেখি তারি মাঝখানে পরীক্ষকের একটা মস্ত কাটা দাগ।

সতীশ

এমন ফেল-করা জিনিষ নিয়ে করবে কী।

বাঁশরী

ডান হাত ধরে ওকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেব।

সতীশ

তার পরে বাঁ হাত দিয়ে প্রাইজ্‌ দেবার প্ল্যান্‌ আছে না কি?

বাঁশরী

দিলে পরের ছেলের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে।

সতীশ

ঘরের ছেলের প্রতিও। এদিকে ও-মহলের হাল খবরটা শুনেছ?

বাঁশরী

ও মহলের খবর এ মহলে এসে পৌছয় না। হাওয়া বইছে উল্টো দিকে।

সতীশ

কথা ছিল সুষমার বিয়ে হবে মাসখানেক বাদে, সম্প্রতি স্থির হয়েছে আসছে হপ্তায়।

বাঁশরী

হঠাৎ দম এত দ্রুতবেগে চড়িয়ে দিলে যে?

সতীশ

ওদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠেছে দ্রুতবেগে, হঠাৎ দেখেছে তোমাকে রণরঙ্গিণী বেশে। তোমার তীর ছোটার আগেই ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়—এইরকম আন্দাজ।

বাঁশরী

আমার তীর! আধমরা প্রাণীকে আমি ছুঁইনে। বনমালী, মোটর ডাকো।

[বাঁশরীর প্রস্থান।

(শৈলর প্রবেশ, বয়স বাইশ কিন্তু দেখে মনে হয় ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। তনু দেহ শ্যামবর্ণ, চোখের ভাব স্নিগ্ধ, মুখের ভাব মমতায় ভরা।)

সতীশ

কী আশ্চর্য্য! ভোরের স্বপ্নে আজ তোমাকেই দেখেছি শৈল। তুমিও আমাকে দেখেছ নিশ্চয়।

শৈল

না, দেখিনি তো।

সতীশ

আঃ, বানিয়ে বলো না কেন? বড়ো নিষ্ঠুর তুমি। আমার দিনটা মধুর হয়ে উঠত তাহোলে।

শৈল

তোমাদের ফরমাসে নিজেকে স্বপ্ন করে বানাতে হবে। আমরা যা, শুধু তাই নিয়ে তোমাদের মন খুসি হয় না কেন?

সতীশ

খুব হয়, এই যে সাক্ষাৎ এসেছ এর চেয়ে আর কিসের দরকার?

শৈল

আমি এসেছি বাঁশরীর কাছে।

সতীশ

ঐ দেখো, আবার একটা সত্য কথা। সদ্য বিছানা থেকে উঠেই দু-দুটো খাঁটি সত্য কথা সহ্য করি এত মনের জোর নেই। ধর্ম্মরাজ মাপ করতেন তোমাকে যদি বলতে আমারি জন্য এসেছ।

শৈল

ব্যারিষ্টার্ মানুষ, তুমি বড্‌ড লিটরল্। বাঁশরীর কাছে আসতে চেয়েছি বলে তোমার কাছে আসবার কথা মনে ছিল না এটা ধরে নিলে কেন?

সতীশ

খোঁটা দেবার জন্যে। বাঁশির সঙ্গে কথা আছে কিছু? আমাদের লগ্ন স্থির করবার পরামর্শ?

শৈল

না, কোনো কথা নেই। ওর জন্য বড়ো মন খারাপ হয়ে থাকে। মনের মধ্যে মরণ বাণ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অথচ কবুল করবার মেয়ে নয়। ওর ব্যথায় হাত বুলোতে গেলে ফোঁস্ করে ওঠে, সেটা যেন সাপের মাথার মণি। তাই সময় পেলে কাছে এসে বসি, যা তা বকে' যাই। পর্শুদিন সকালে এসেছিলুম ওর ঘরে। পায়ের শব্দ পায়নি। ওর সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি। ডেস্কে ঝুঁকে পড়ছিল বসে, বেশ বুঝতে পারলুম চোখ দিয়ে জল পড়ছে। যদি জানত আমি দেখতে পেয়েছি তাহোলে একটা কাণ্ড বাধত। বোধ হয় আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত। আস্তে আস্তে চলে গেলুম। কিন্তু সেই ছবি আমি ভুলতে পারিনে। বাঁশি গেল কোথায়?

(খানসামা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল)

সতীশ

বাঁশি এইমাত্র বেরিয়ে গেছে, ভাগ্যিস্ গেছে।

শৈল

ভারি স্বার্থপর তুমি।

সতীশ

অত্যন্ত। ও কী, উঠছ কেন? চা তৈরি সুরু করো।

শৈল

খেয়ে এসেছি।

সতীশ

তা হোক না, আমি তো খাইনি। বসে খাওয়াও আমাকে। কবিরাজী মতে একলা চা খাওয়া নিষেধ, ওতে বায়ু প্রকুপিত হয়ে ওঠে।

শৈল

মিথ্যে আব্দার করো কেন?

সতীশ

সুযোগ পেলেই করি, তোমার মতো খাঁটি সত্য আমার ধাতে নেই। ঢালো চা, ও কী করলে, চায়ে আমি চিনি দিইনে তুমি জানো।

শৈল

ভুলে গিয়েছিলুম।

সতীশ

আমি হোলে কখনো ভুলতুম না।

শৈল

আমাকে স্বপ্ন দেখে অবধি তোমার মেজাজের তো কোনো উন্নতি হয়নি। ঝগড়া করছ কেন?

সতীশ

কারণ মিষ্টি কথা পাড়লে তুমিই ঝগড়া বাধাতে। সীরিয়স্ হয়ে উঠতে।

শৈল

আচ্ছা থামো, তোমার চা খাওয়া হোলো?

সতীশ

হোলেই যদি ওঠ তাহোলে হয়নি।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য

হরিশবাবু দলিলপত্র নিয়ে এসেছেন।

সতীশ

বলো ফুরসৎ নেই। [ভৃত্যের প্রস্থান।

শৈল

ও কী ও, কাজ কামাই করবে!

সতীশ

করব, আমার খুসি।

শৈল

আমি যে দায়ী হব।

সতীশ

তাতে সন্দেহ নেই, বিনা কারণে কেউ কাজ কামাই করে না।

(নেপথ্য থেকে—"সতীশদা!")

সতীশ

ঐরে! এল ওরা! বাড়িতে নেই বলবার সময় দিলে না।

(সুধাংশুর সঙ্গে একদল লোকের প্রবেশ)

অলক্ষুণের দল, সকালবেলায় মুখ দেখলুম, উনুনের উপর হাঁড়ির তলা যাবে ফেটে।

সুধাংশু

মিস্ শৈল, ভীরু তোমার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আজ ছাড়ছিনে!

সতীশ

ভয় দেখাও কেন? চাও কী।

শচীন

চাই লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবের চাঁদা। প্রথম দিন থেকেই বাকি।

সতীশ

কী! আমি তোমাদের দলে! ভিগরস্ প্রোটেষ্ট্ জানাচ্ছি, বলবান অস্বীকৃতি।

নরেন

দলিল দেখাও।

সতীশ

আমার দলিল, এই সামনে সশরীরে।

সুধাংশু

শৈলদেবী, এই বুঝি! বেআইনি প্রশ্রয় দেন পলাতকাকে।

শৈল

কিছু প্রশ্রয় দিইনে, নিন্ না আপনাদের দাবী আদায় করে।

সতীশ

শৈল, যত তোমার সত্য আমার বেলায়। আর এদের সামনে সত্যের অপলাপ, প্রশ্রয় দেও না বলতে চাও!

শৈল

কী প্রশ্রয় দিয়েছি?

সতীশ

এইমাত্র মাথার দিব্যি দিয়ে আমাকে চা খাওয়াতে বসোনি? শ্রীহস্তে অজীর্ণ রোগের পত্তন আরম্ভ, তবু আমাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া!

শচীন

লোকটা লোভ দেখিয়ে কথা বলছে। শৈলদেবী, যদি শক্ত হয়ে থাকতে পার তাহোলে ওকে আমাদের লাইফ্ মেম্বর্ করে নিই।

সতীশ

আচ্ছা তবে বলি শোনো। চাঁদা পাবা মাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার, তাহোলে এখনি বাকি বকেয়া সব শোধ করে দিই।

শচীন

শুধু চাঁদা নয়। আমাদের ঘরে নেই চা ঢেলে দেবার লোক, যাদের ঘরে আছে সেখানে পালা করে চা খেতে বেরুই—তারপরে কিছু ভিক্ষে নিয়ে যাই—আজ এসেছি বাঁশরী দেবীর করকমল লক্ষ্য করে।

সতীশ

সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবী তার করকমলসুদ্ধ অনুপস্থিত। অতএব ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ মিনিটের নোটিস্ দিচ্ছি, বেরোও তোমরা—ভাগো।

শৈল

আহা ও কী কথা! না খেয়ে যাবেন কেন? আমি বুঝি পারিনে খাওয়াতে। একটু বসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

সতীশ

কিন্তু ঐ যে ভিক্ষার কথাটা বললে, ভালো ঠেকল না। উদ্দেশ্যও বুঝতে পারছিনে।

সুধাংশু

কিংখাবের দোকানে আমাদের সমবেত দেনা আছে, আজ সমবেত চেষ্টায় শোধ করতে হবে।

সতীশ

কিংখাব! ভাবী লক্ষ্মীর আসন রচনা?

শচীন

ঠিক তাই।

সতীশ

আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা—

শচীন

না হে, অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে দেব অবিলম্বে।

(শৈলের প্রবেশ)

শৈল

সব প্রস্তুত, আসুন আপনারা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বারান্দায় সোমশঙ্কর। গহনার বাক্স খুলে জহরী গহনা দেখাচ্চে। কাপড়ের গাঁঠরি নিয়ে অপেক্ষা করছে কাশ্মীরী দোকানদার।)

বাঁশরী

কিছু বলবার আছে।

(সোমশঙ্কর জহরী ও কাশ্মীরীকে ইঙ্গিতে বিদায় করলে।)

সোমশঙ্কর

ভেবেছিলুম আজই যাব তোমার কাছে।

বাঁশরী

ও সব কথা থাক্। ভয় নেই, কান্নাকাটি করতে আসিনি। তবু আর কিছু না হোক তোমার ভাবনা ভাববার অধিকার একদিন দিয়েছ আমাকে। তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জান সুষমা তোমাকে ভালোবাসে না?

সোমশঙ্কর

জানি।

বাঁশরী

তাতে তোমার কিছুই যায় আসে না?

সোমশঙ্কর

কিছুই না।

বাঁশরী

তাহোলে সংসার-যাত্রাটা কী রকম হবে?

সোমশঙ্কর

সংসার-যাত্রার কথা ভাবছিইনে।

বাঁশরী

তবে কিসের কথা ভাবছ?

সোমশঙ্কর

একমাত্র সুষমার কথা।

বাঁশরী

অর্থাৎ ভাবছ, তোমাকে ভালো না বেসেও কী করে সুখী হবে ঐ মেয়ে।

সোমশঙ্কর

না তা নয়। সুখী হবার কথা সুষমা ভাবে না— ভালোবাসারও দরকার নেই তার।

বাঁশরী

কিসের দরকার আছে তার, টাকার?

সোমশঙ্কর

তোমার যোগ্য কথা হোলো না বাঁশি!

বাঁশরী

আচ্ছা ভুল করেছি। কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর বাকি। কিসের দরকার আছে সুষমার?

সোমশঙ্কর

ওর একটি ব্রত আছে। ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে, তাকে সাধ্যমতো সার্থক করা আমারও ব্রত।

বাঁশরী

ওর ব্রত আগে, তারি পশ্চাতে তোমার, পুরুষের মতো শোনাচ্চে না, একথা ক্ষত্রিয়ের মতো নয়ই। এত বড়ো পুরুষকে মন্ত্র পড়িয়েছে ঐ সন্ন্যাসী। বুদ্ধিকে দিয়েছে ঘোলা করে, দৃষ্টিকে দিয়েছে চাপা। শুনলুম সব, ভালো হোলো। গেল আমার শ্রদ্ধা ভেঙে, গেল আমার বন্ধন ছিঁড়ে। বয়স্ক শিশুকে মানুষ করবার কাজ আমার নয়, সে কাজের ভার সম্পূর্ণ দিলেম ছেড়ে ঐ মেয়ের হাতে।

(পুরন্দরের প্রবেশ। সোমশঙ্কর প্রণাম করলে, অগ্নিশিখার মতো বাঁশরী উঠে দাঁড়াল তার সামনে।)

বাঁশরী

আজ রাগ করবেন না ; ধৈর্য্য ধরবেন, কিছু প্রশ্ন করব।

[পুরন্দরের ইঙ্গিতে সোমশঙ্করের প্রস্থান।

পুরন্দর

আচ্ছা বলো তুমি।

বাঁশরী

জিজ্ঞাসা করি, সোমশঙ্করকে শ্রদ্ধা করেন আপনি ? ওকে খেলার পুতুল বলে মনে করেন না ?

পুরন্দর

বিশেষ শ্রদ্ধা করি।

বাঁশরী

তবে কেন এমন মেয়ের ভার দিচ্ছেন ওর হাতে যে ওকে ভালোবাসে না ?

পুরন্দর

জান না এ অতি মহৎ ভার, একই কালে ক্ষত্রিয়ের পুরস্কার এবং পরীক্ষা। সোমশঙ্করই এই ভার গ্রহণ করবার যোগ্য।

বাঁশরী

যোগ্য বলেই ওর চিরজীবনের সুখ নষ্ট করতে চান আপনি ?

পুরন্দর

সুখকে উপেক্ষা করতে পারে ঐ বীর মনের আনন্দে।

বাঁশরী

আপনি মানব-প্রকৃতিকে মানেন না ?

পুরন্দর

মানব-প্রকৃতিকেই মানি, তার চেয়ে নীচের প্রকৃতিকে নয়।

বাঁশরী

এতই যদি হোলো, ওরা বিয়ে নাই করত ?

পুরন্দর

ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে মেয়ে, ব্রতকে নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ এই কথা মনে করে দুটি মেয়ে পুরুষ অনেকদিন খুঁজেছি। দৈবাৎ পেয়েছি।

বাঁশরী

পুরুষ বলেই বুঝতে পারছ না যে, ভালোবাসা নইলে দুজন মানুষকে মেলানো যায় না।

পুরন্দর

মেয়ে বলেই বুঝতে ইচ্ছা করছ না, ভালোবাসার মিলনে মোহ আছে,— প্রেমের মিলনে মোহ নেই।

বাঁশরী

মোহ চাই, চাই সন্ন্যাসী, মোহ নইলে সৃষ্টি কিসের ! তোমার মোহ তোমার ব্রত নিয়ে—সেই ব্রতের টানে তুমি মানুষের মনগুলো নিয়ে কেটে ছিঁড়ে জোড়া তাড়া দিতে বসেছ—বুঝতেই পারছ না তারা সজীব পদার্থ, তোমার প্ল্যানের মধ্যে খাপ খাওয়াবার জন্য তৈরি হয়নি। আমাদের মোহ সুন্দর, আর ভয়ঙ্কর তোমাদের মোহ !

পুরন্দর

মোহ নইলে সৃষ্টি হয় না, মোহ ভাঙলে প্রলয় একথা মানতে রাজি আছি। কিন্তু তুমিও একথা মনে রেখো, আমার সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির চেয়ে অনেক উপরে। তাই আমি নির্মম হয়ে তোমার সুখ দেব ছারখার করে। আমিও চাইব না সুখ; যারা আসবে আমার কাছে সুখের দিক থেকে, মুখ দেব ফিরিয়ে। আমার ব্রতই আমার সৃষ্টি, তার যা প্রাপ্য তা তাকে দিতেই হবে। যতই কঠিন হোক।

বাঁশরী

সেইজন্যেই সজীব নয় তোমার আইডিয়া সন্ন্যাসী। তুমি জান মন্ত্র, জান না মানুষকে। মানুষের মর্ম্মগ্রন্থি টেনে ছিঁড়ে সেইখানে তোমার কেঠো আইডিয়ার ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে অসহ্য ব্যথার 'পরে মস্ত মস্ত বিশেষণ চাপা দিতে চাও। তাকে বল শান্তি ? টিঁকবে না ব্যাণ্ডেজ্, ব্যথা যাবে থেকে। তোমরা সব অমানুষ, মানুষের বসতিতে এলে কী করতে ! যাও না তোমাদের গুহা গহ্বরে বদরিকাশ্রমে। সেখানে মনের সাধে নিজেদের শুকিয়ে পাথর করে ফেলো। আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের তৃষ্ণার জল মুখের থেকে কেড়ে নিয়ে

মরুভূমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে সাধনা বলে প্রচার করতে চাও কোন্ করুণায়! ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ লাগবে না তোমাকে? যা নিজে ভোগ করতে জান না তা ভোগ করতে দেবে না ক্ষুধিতকে?

(সুষমার প্রবেশ)

এই যে সুষমা, শোন্, বলি। মরীয়া হয়ে মেয়েরা চিতার আগুনে মরেছে অনেক, ভেবেছে তাতেই পরমার্থ। তেমনি করেই নিজের হাতে নিজের ভাগ্যে আগুন লাগিয়ে দিনে দিনে মরতে চাস্, জ্বলে জ্বলে। চাসনে তুই ভালোবাসা, কিন্তু যে মেয়ে চায়, পাষাণ সে করেনি আপনার নারীর প্রাণ, কেন কেড়ে নিতে এলি তার চির-জীবনের আনন্দ। এই আমি আজ বলে দিলুম তোকে, ঘোড়ায় চড়িস শিকার করিস সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিস তবু তুই পুরুষ নোস—আইডিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তোর দিন কাটবে না গো, তোর রাত বিছিয়ে দেবে কাঁটার শয়ন।

(সোমশঙ্করের প্রবেশ)

সোমশঙ্কর

বাঁশি, শান্ত হও, চলো এখান থেকে।

বাঁশরী

যাব না তো কী! মনে কোরো না মরব বুক ফেটে! জীবন হবে চির চিতানলের শ্মশান। কখনো এমন বিচলিত দশা হয়নি আমার! আজ কেন এল বন্যার মতো এই পাগ্‌লামি। লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! তোমাদের তিনজনের সামনে এই অপমান। থামো সোমশঙ্কর, আমাকে দয়া করতে এসো না। মুছে ফেলব এই অপমান, কোনো চিহ্ন থাকবে না এর কাল। এই আমি বলে গেলুম।

[বাঁশরী ও সুষমার প্রস্থান।

পুরন্দর

সোমশঙ্কর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

সোমশঙ্কর

বলুন।

পুরন্দর

যে ব্রত তুমি স্বীকার করেছ তা সম্পূর্ণই তোমার আপন হয়েছে কি? তার ক্রিয়া চলেছে তোমার প্রাণ ক্রিয়ার সঙ্গে?

সোমশঙ্কর

কেন সন্দেহ বোধ করছেন!

পুরন্দর

আমার প্রতি ভক্তিতেই যদি এই সংকল্প গ্রহণ করে থাকো তবে এখনি ফেলে দাও এই বোঝা।

সোমশঙ্কর

এমন কথা কেন বলছেন আজ? আমার মধ্যে দুর্ব্বলতার লক্ষণ কিছু দেখছেন কি?

পুরন্দর

মোহিনী শক্তি আছে আমার এমন কথা কেউ কেউ বলে, শুনে লজ্জা পাই, যাদুকর নই আমি।

সোমশঙ্কর

আত্মার ক্রিয়াকে যারা বিশ্বাস করে না তারা তাকে বলে যাদুর ক্রিয়া।

পুরন্দর

ব্রতের মাহাত্ম্য তার স্বাধীনতায়। যদি ভুলিয়ে থাকি তোমাকে, সে ভুল ভাঙতে হবে। গুরুবাক্য বিষ, সে বাক্য যদি তোমার নিজের বাক্য না হয়।

সোমশঙ্কর

সন্ন্যাসী, যে ব্রত নিয়েছি সে আজ আমার রক্তে বইছে তেজরূপে, জ্বলছে বুকের মধ্যে হোমাগ্নির মতো। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, আজ আমার দ্বিধা কোথায়?

পুরন্দর

এই কথাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখ থেকে। আর একটি কথা বাকি আছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কেন সুষমার বিবাহ দিলুম তোমার সঙ্গে। তোমারি কাছ থেকে আমি তার উত্তর চাই।

সোমশঙ্কর

এতদিনের তপস্যার এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্দ্ধে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারি 'পরে তার দিলে এই অনির্ব্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।

পুরন্দর

বৎস, যতদিন রক্ষা করবে, তার দ্বারা তুমি আপনা-

কেউ রক্ষা করতে পারবে। ঐ তোমার মূর্ত্তিমান ধর্ম রইল তোমার সঙ্গে,—ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতম্‌। আমার বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত, সেই সঙ্গে শিষ্যের বন্ধন থেকে আমিও মুক্তি পেলুম। তোমাদের বিবাহের পর আমাকে যেতে হবে দূরে—হয়তো কোনোদিন আমার আর দেখা পাবে না। আমার এই আশীর্ব্বাদ রইল, জানথ আত্মানম্‌ আপনাকে পূর্ণ করে জানো।

[পুরন্দরের প্রস্থান।

(সোমশঙ্কর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।)

ওরে ভোলা, সেই নতুন গানটা।—

গান

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।
দুন্দুভিতে হোলো রে কার আঘাত সুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি,
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া,
বজ্রশিখায় এক্‌ পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥

[নেপথ্য থেকে]

যেতে পারি কি?

সোমশঙ্কর

এসো এসো।

(তারকের প্রবেশ)

তারক

রাজাবাহাদুর, আজকাল তোমার কাছে আসতে কী রকম ভয় ভয় করে।

সোমশঙ্কর

কোনো কারণ তো দেখিনে।

তারক

কারণ নেই বলেই তো ভয় বেশি। আজ বাদে কাল বিয়ে কিন্তু মনে হচ্চে যেন দ্বীপান্তরে চলেছ। ভয়ানক গাম্ভীর্য্য।

সোমশঙ্কর

বিয়েটা তো এক লোক থেকে অন্য লোকে যাত্রাই বটে।

তারক

সব বিয়ে তা নয় রাজন্‌। নিজের কথা বলতে পারি। আমার বরযাত্রা হয়েছিল পটলডাঙা থেকে চোরবাগানে। মনের ভিতরটাও তার বেশি এগোয়নি। আমার স্ত্রীর নাম পুষ্প। রসিকবন্ধু তার কবিতায় আমাকে খেতাব দিলে পুষ্পচোর। কবিতাটার হেডিং ছিল চৌর-পঞ্চাশিকা। কবিকে প্রশ্ন করলেম, চৌর-পঞ্চাশিকার একটা কবিতাই তো দেখছি, বাকী উনপঞ্চাশটা গেল কোথায়? উত্তর পেলেম, তারা উনপঞ্চাশ পবনরূপে বরের হৃদয়-গহ্বরে বেড়াচ্চে ঘুরপাক দিয়ে।

সোমশঙ্কর

এর থেকে প্রমাণ হয় আমার রসিক বন্ধু নেই, তাই গাম্ভীর্য্য রয়েছে ঘনিয়ে।

তারক

আমাদের পাড়ার লক্ষ্মীছাড়ার দল অশোক গুপ্তদের বাগানে দর্ম্মা-ঘেরা একটা পোড়ো কর্ণরিতে ক্লাব্‌ করেছে। আপিস থেকে ফিরে এসে সেইখানে সন্ধ্যে-বেলায় বিষম হল্লা করতে থাকে। সান্ত্বনা দেবা'র জন্যে আমরা লক্ষ্মীমন্তরা ওদের নিমন্ত্রণ করছি। তোমাকে প্রিজাইড্‌ করতে হবে।

সোমশঙ্কর

শুনেছি বৈকুণ্ঠলুণ্ঠন পাঁচালি লিখে ওরা আমাকে লক্ষ্মীহারী দৈত্য বানিয়েছে।

তারক

সে কথা সত্যি। ওদের টেম্পেরেচর্‌ কমানো দরকার হয়েছে।

সোমশঙ্কর

বৈধ উপায়ে ওদের ঠাণ্ডা করতে রাজি আছি।

তারক

আমাদের কমলবিলাস সেনগুপ্তকে দিয়ে একটা নিমন্ত্রণ পত্র রচিয়ে নিয়ে এলুম।

সোমশঙ্কর

পড়ে শোনাও।

তারক

প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য,
আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য,
উদর সেবার উদার ক্ষেত্রে মিলুন উভয় পক্ষ,
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানারসের ভক্ষ্য।
সত্যযুগে দেবদেবীদের ডেকেছিলেন দক্ষ,
অনাহূত পড়ল এসে মেলাই যক্ষ রক্ষ,
আমরা সে ভুল করব না তো, মোদের অন্নকক্ষ
দুই পক্ষেই অপক্ষপাত দেবে ক্ষুধার মোক্ষ।
আজো যাঁরা বাঁধন-ছাড়া ফুলিয়ে বেড়ান বক্ষ
বিদায়কালে দেব তাঁদের আশীষ লক্ষ লক্ষ,
তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে জুটুন কারাধ্যক্ষ,
এর পরে আর মিল মেলে না যরলবহক্ষ।

ঐ আসছে ওদের দল।

(সুধাংশু শচীন প্রভৃতির প্রবেশ)

সোমশঙ্কর

কী উদ্দেশ্যে আগমন ?

সুধাংশু

গান শোনাব।

সোমশঙ্কর

তার পরে ?

সুধাংশু

তার পরে নোব্‌ল্ রিভেঞ্জ, সুমহতী প্রতিহিংসা।

সোমশঙ্কর

ঐ মানুষটার কাঁধে ওটা কী ? বোমা নয় ?

সুধাংশু

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এখন গান।

সোমশঙ্কর

কার রচনা ?

শচীন

কপিরাইটের তর্ক আছে। বিষয় অনুসারে কপি-রাইট্‌-স্বত্ব আমাদেরই, বাক্যগুলি যার তাকে আমরা গণ্য করিনে।

গান

আমরা লক্ষীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদাই করছি টলোমল,
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল ॥
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল ॥
লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি',
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল ॥
তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল ॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব-সাগরে,—
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল ॥
আমরা জুটে সারাবেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান করব খেলা গো,
কণ্ঠে যদি সুর না আসে করব কোলাহল ॥

সোমশঙ্কর

এবার কিঞ্চিৎ ফলাহারের আয়োজন করি।

সুধাংশু

আগে দেবী আসুন ঘরে, তার পরে ফল কামনা করব।

সোমশঙ্কর

তৎপূর্ব্বে—

সুধাংশু

তৎপূর্ব্বে সুমহতী প্রতিহিংসা।

(গাঁঠরি থেকে কিংখাবের আসন বেরোল।)

লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর ভক্তদের যোগ থাকবে এই আসনটিতে। তোমাদের ঘরের মাটি রইল তোমাদের, তার উপরে আসনটা রইল আমাদেরি। আর তাঁর কমলাসন, সে আছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে।

সোমশঙ্কর

কী তোমাদের বলব। বলবার কথা আমি জানিনে।

(ক্রমশঃ)

শেষ পথ

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(১১)

শারদার যে কলঙ্কের কথাটা রটিয়াছিল তাহা সহজেই চাপা পড়িয়া গেল। শারদা পলায়ন করিয়া উধাও হইয়া যায় নাই, স্বামীর কাছে চলিয়া গিয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়াই সকলে স্থির করিল যে তার নামে যে অপবাদ উঠিয়াছিল তাহা মিথ্যা। কাজেই তাহা লইয়া বিশেষ উচ্চ-বাচ্য হইল না।

গোপাল সেই যে শারদাকে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তার পর আর সে বাড়ী ফিরিল না। সে কয়েক দিন এদিক ওদিক ফিরিয়া শেষে এক ভদ্রলোকের সঙ্গ ধরিয়া রঙ্গপুর চলিয়া গেল। এবং সেখানে সেই ভদ্রলোকের অনুগ্রহে তাঁর বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল এবং তাঁর তামাকের কারবারে এক-আধটুকু সাহায্য করিতে লাগিল।

শারদার এখন সুখে সংসার করিবার কথা, কেন না এখন বিন্দু নাই—সে একাই মাধবের ও তার সংসারের সর্ব্বময়ী। কিন্তু সুখের অন্তরায় হইল তার অর্থাভাব। ভগীরথপুরের তাঁতিদের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতে লাগিল। সকলেরই কারবার প্রায় নষ্ট হইবার দশা। তার মধ্যে কেহ কেহ ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া কাপড় লইয়া দূরে হাটে গঞ্জে বা সহরে বিক্রয় করিতে লাগিল। তারা ছয় মাস বাড়ী বসিয়া কাপড় বোনে; আর ছয় মাস এমনি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বিক্রয় করে। তাদের একরকম দিন চলিতে লাগিল। কিন্তু শারদাকে ফেলিয়া মাধবের ঘর ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। তার বেচা-কেনা নিকটবর্ত্তী হাটেই করিতে হয়। কাজেই তার অবস্থা সচ্ছল আর রহিল না; বড় কষ্টে দিন চলিতে লাগিল। বিন্দু বিদেশ হইতে মাঝে মাঝে দুই চার টাকা পাঠায়, তাতে তাদের একরকম চলে।

কিন্তু শারদার মনে তাতে দুঃখ নাই। সে প্রাণপণ পরিশ্রম করে। শাক-পাতা কুড়াইয়া মাছ ধরিয়া আনিয়া স্বামীকে যথাসাধ্য খাওয়ায়-দাওয়ায় এবং আপনি যা পারে খায়। দুঃখকে সে বড় আমল দেয় না। মাধবকেও মুখ ভার করিয়া থাকিতে দেয় না।

গ্রামে একদিন ভাসান যাত্রা হইয়াছিল। শারদা তাহা দেখিতে গিয়াছিল। ভাসান-যাত্রা সে অনেক দিন দেখিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন শোনে নাই। গানে তার মন মোটেই বসিত না। সে যাত্রার আসরে গিয়া বরাবরই নানারকম নষ্টামী করিয়াছে, বিশেষ গোপাল যদি সেখানে থাকিত। শেষ যেদিন ভাসান যাত্রা হইয়াছিল সেদিন সে গোপালের সঙ্গে পদ্মবনের সেই ভয়ানক অভিযানে গিয়াছিল! সে কথা স্মরণ হইতে তার গা কাঁপিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশের কথা! ভাগ্যে গোপাল বুদ্ধি করিয়া তাকে বাঁচাইয়াছিল, না হইলে ছিদাম মাঝি সেদিন আর তার ধর্ম্ম বা ইজ্জতের কিছু অবশিষ্ট রাখিত না! তার পরও যখন ছিদাম মাঝি তার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিয়াছিল তখনও গোপাল তাকে কি আশ্চর্য্য উপায়ে উদ্ধার করিয়াছিল! লোকে গোপালকে দেখিতে পারে না, তাকে কেবল গালাগালি করে; কিন্তু শারদার মনে হইল গোপালের মত মানুষ হয় না। তার কথা ভাবিতে তার চিত্ত আনন্দে স্নেহে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত

হইয়া যায়। তার কাছ ছাড়িয়া তার ভাল লাগে না। অনেক সময়ই মনে হয় সে যদি কাছে থাকিত তবে বড় ভাল হইত। তাকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

ভাসান যাত্রার আসরে বসিয়া গানের মাঝে মাঝে শারদার মনের ভিতর এই সব কথা খেলিয়া যাইতে লাগিল। গোপালের শত সহস্র স্মৃতি নানারূপে তার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিয়া তাকে আনন্দে ও বিষাদে ভরিয়া দিল।

তবু গানও সে শুনিতে লাগিল। এবার সে গান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া রহিল না। মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া এক একটা গান তার মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

যখন লক্ষীন্দর বেহুলার সঙ্গে ঘরে শুইয়া আছে সেই সময় কাল-নাগ আসিয়া তাকে দংশন করিল—লক্ষীন্দর 'সায় বেণের ঝি'কে ডাকিয়া বলিল—বেহুলা উঠিয়া বসিল। এইখানে শারদা কাণ খাড়া করিয়া শুনিল। তার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! তার মনে হইল তার যদি এই অবস্থা হইত তবে কি সর্ব্বনাশই হইত। তার ঐ ঘরের মধ্যে যদি সাপ আসিয়া—ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল বিন্দুকে সেদিন সাপে কাটার মিথ্যা সন্দেহে কি নাকাল হইতে হইয়াছিল। সে কথা স্মরণ হইতে সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

তার পর বেহুলার বিলাপ! শুনিয়া সকলে কাঁদিয়া ভাসাইল, শারদা চক্ষু মুছিয়া শেষ করিতে পারিল না।

বেহুলা ভেলায় করিয়া স্বামীর দেহ লইয়া চলিল—ক্রমে ক্রমে সে দেহ গলিয়া পচিয়া গেল, তবু বেহুলা নড়িল না। সে বিবরণ শুনিয়া শুনিয়া তার কান্না বাড়িয়া গেল।

পরিশেষে যখন বেহুলা লক্ষীন্দরকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বাড়ী ফিরিল, সতীর গৌরবে দেশময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—তখন শারদার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গেল। সে অত্যন্ত তৃপ্তি ও আগ্রহের সহিত চাঁদবেণের বাড়ীতে উৎসব ও মনসার পূজার বিবরণ শুনিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ কি না

"বেউলা বলে লক্ষীন্দর
পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর।"

বলিয়া সে স্মরণ করাইয়া দিল যে তারা শাপভ্রষ্ট দেব দেবী, তাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব যাইতে হইবে।

গান সমাপ্ত হইয়া গেল। শেষটা তার ভাল লাগিল না। বেশ সব মিলিয়া গিয়া শেষে যে এমনি করিয়া বেহুলা লক্ষীন্দর স্বর্গেই যা'ক যেখানেই যাক পৃথিবী ছাড়িয়া গেল, ইহা তাহার ভাল লাগিল না। শারদার কান্না পাইতে লাগিল।

স্বামীর সহিত বাড়ী ফিরিয়া সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেহুলা লক্ষীন্দরের কথা আলোচনা করিতে লাগিল। অনেক কথাই তার মনে হইতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল সে যদি বেহুলার মত কায়মনোবাক্যে সতী হয় তবে সে স্বামীকে চিরজীবী করিতে পারিবে—মরিলেও তাকে বাঁচাইতে পারিবে। মনে হইল দেব দেবী বড় ভয়ানক বস্তু, তাদেরকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। সে স্থির কহিল মনসাকে সে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল তার শৈশবের দেবতা নাটাই চণ্ডীর কথা। নাটাই চণ্ডীও জাগ্রত দেবতা—তাঁর পূজায় অবিবাহিতের বিবাহ হয়, অপুত্রকের পুত্র হয়—কত কি হয়। তাহা তো সে আপনি দেখিয়াছে। সেই যে দিন সে ধান-ক্ষেতে গিয়া নাটাই বর্ত্তের উদ্যোগ করিয়াছিল তার পরই তো তার বিবাহের কথাবার্ত্তা হইল;—বৎসর ফিরিল না, তার বিবাহ হইল। এমনি সব বহু জাগ্রত দেবতার পূজার ফল তার মনে হইল।

ইহার পর হইতে সে বর্ত করার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ করিল। নাটাই বর্ত্ত, পাঠাই বর্ত্ত, মনসা পূজা, সত্য নারায়ণ প্রভৃতি নানাবিধ পূজাপাট ও ব্রত নিয়ম নিতান্ত নিষ্ঠার সহিত করিতে লাগিল। তার উঠানে যে তুলসী গাছ ছিল তার কাছে রোজ দ্বিগুণ নিষ্ঠার সহিত প্রণাম করিতে লাগিল, সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিতে লাগিল।

কিন্তু এত করিয়াও সে মাধবের অবস্থার কোনও উন্নতি করিতে পারিল না। রোজ দু-বেলা ভাত খাওয়াও তাদের ঘটিয়া উঠে না। প্রায়ই চিনা বা কাওন সিদ্ধ করিয়া ভাতের পরিবর্ত্তে খাইতে হয়।

একদিন রাত্রে সে চিনার ভাত নূন দিয়া খাইতেছিল। মাধব আঁচাইয়া আসিয়া তার কাছে বসিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে

তার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তার খাওয়া শেষ হইলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাধব বলিল, "তোকে বিবাহ করিয়া আনিয়া দুই বেলা দুই মুষ্টি ভাত দিতে পারিব না ইহা ভাবি নাই। কি দুঃখই দিলাম তোকে।"

শারদা মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিল, "ইয়ারে দুঃখু কই না—বুইঝচ? যতক্ষণ আমার লোহা আছে সিন্দূর আছে ততক্ষণ কোনও দুঃখুরেই দুঃখু কই না। বেউলা, অত বড় সতী, তার কি দুঃখুডাই হইল। আমি দুইডা চিনা খাইয়াই কান্দুম?"

এমনি করিয়া সে সকল দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়—আর দিন-রাত ঠাকুর দেবতার নিকট মাথা খোঁড়ে স্বামীর মঙ্গল হউক, তার দৈন্য দূর হউক!

এক বৎসর পর বিন্দু দেশে ফিরিল।

তার চেহারা ফিরিয়াছে। খাইয়া দাইয়া তার চেহারা দিব্য চক্‌চকে এবং একটু মোটা-সোটা হইয়াছে। তার ফলে তার যৌবন যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আর তার চলন-চালন ধরণ-ধারণ অনেকটা মার্জ্জিত হইয়াছে—তার কথাবার্ত্তার সুরও ফিরিয়াছে।

একগাল হাসি লইয়া বিন্দু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধব ও শারদা দুই জনেই তাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। হাসিমুখেই তারা তাকে সম্ভাষণ করিল, কিন্তু তাদের হাসিটা শীর্ণ। অর্দ্ধাহারে ক্লিষ্ট, চিন্তায় জীর্ণ মাধবের বয়স যেন এক পায় দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। শারদা শুকাইয়া যেন ছোট্টটি হইয়া গিয়াছে—

তাদের দিকে চাহিয়া বিন্দুর হাসি মিলাইয়া গেল। সে বলিল, "এ কি হাল হইয়াছে ত'গো? ক্যান? ব্যামো হইছে নাকি?"

মাধব হাসিয়া বলিল, ব্যারাম হইবার প্রয়োজন হয় নাই। খাইতে না পাইলেই দেহের চাকচিক্য ঝরিয়া পড়ে।

বিন্দু বলিল, "আ আমার পোরা কপাল! এতই কি খাওনের কষ্ট হইছে ত'গো। তা' আমারে কস নাই।"

বিন্দু তাড়াতাড়ি তার কোমর হইতে এক গাঁজিয়া বাহির করিয়া মাধবের হাতে দিল। গাঁজিয়ার ভিতর কুড়ি টাকা ছিল। সেকালে কুড়ি টাকা ছিল একটা সম্পদ।

তার পর সে তার পোঁটলা খুলিয়া শারদার জন্য আরসী চিরুণী, শাঁখা, চুড়ি ও কাপড় যাহা আনিয়াছিল, তাহার হাতে দিল। শারদা নত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিল।

সেদিন বাড়ীতে উৎসব লাগিয়া গেল। শারদা ঘুর ঘুর করিয়া বিন্দুর চারিদিকে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল এবং মিষ্টি কথায় বিন্দুর কাণ ভরিয়া দিল। মাছ ও দুধ কিনিয়া বিরাট আয়োজনের সহিত খাওয়া-দাওয়া হইল। পাড়াময় লোকজন আসিয়া বিন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। বিন্দু বড় গলায় সহরের নানারকম গল্প করিতে লাগিল, সকলে অবাক্ হইয়া শুনিল।

একটা মস্ত বড় নূতন খবর শোনা গেল বিন্দুর কাছে। সে আসিয়াছে রেল এবং 'জাহাজে' চড়িয়া। রেল যে কি বস্তু তাহা গ্রামবাসীরা কখনও শোনে নাই, জাহাজ বা ষ্টীমার সম্বন্ধেও কোনও ধারণাই তাদের নাই। তারা বিন্দুর কাছে হাঁ করিয়া তার বর্ণনা শুনিতে লাগিল। রেল এ অঞ্চলে তখনও হয় নাই, এখনও নাই। ষ্টীমারও তখন এদিকে আসিত না, সেই বৎসর প্রথম ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। পোড়াবাড়ীতে ষ্টীমার হইতে নামিয়া বিন্দুরা নৌকায় বাড়ী আসিয়াছে। নৌকায় যাহা সাত দিনের পথ, রেল ও ষ্টীমারে তাহা যে একদিন একরাত্রে আসা গিয়াছে, ইহা শুনিয়া সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল।

শারদার মনে হইল—একবার যদি রেল ষ্টীমারে চড়া যাইত, জীবন ধন্য হইত!

সারাদিন হৈ হৈ করিয়া কাটিল।

রাত্রে শুইবার সময় শারদার বুকের কাছটা চড়াৎ করিয়া উঠিল।

এতদিন পর বিন্দু আসিয়াছে—তাকে আলাদা ঘরে শুইতে বলা যায় না।

কিন্তু তার স্বামীর পাশে বিন্দু শুইবে ইহাও তো সওয়া যায় না।

শারদা অত্যন্ত ম্লানমুখে তার এবং মাধবের বিছানার সঙ্গেই আর একখানা কাঁথা পাতিয়া দিল।

আহারের পর তাড়াতাড়ি শারদা গিয়া সেই বিছানার একপাশে মুড়ি-শুড়ি দিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল।

মাধব ও বিন্দু দাওয়ায় বসিয়া কথা কহিতে লাগিল। মাধবেরও মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। বিন্দু এতদিন পর আসিয়াছে, তাকে অন্যত্র শুইতে বলা যায় না। আবার বিন্দুকে শুইতে দিলে শারদা রাগ করিবে। সে মহা উদ্বিগ্নভাবে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, আর বিন্দুর বক্তৃতা শুনিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর সে একবার ঘরে গিয়া দেখিল শারদা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর বিন্দুর জন্য বিছানা শারদাই পাতিয়া রাখিয়াছে।

মাধব নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। সে বিন্দুকে শুইতে ডাকিল।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, "তবু ভাল, আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি এই দাওয়ায়ই আমার শয্যা হইবে।"

সে উঠিয়া আসিল।

পরের দিন শারদা বিন্দুর সঙ্গে নেউগী বাড়ী গেল। গিয়া দেখিল এবার বড়বধূ আসে নাই, নেউগী মহাশয়, গৃহিণী, তার ছেলে মেয়ে আসিয়াছে। বড় ছেলে ও বড় বউ কর্ম্মস্থানে আছে, ছোট বউ বাপের বাড়ী গিয়াছে।

বড় বউ না আসায় শারদা মনঃক্ষুণ্ন হইল। আর সবার সঙ্গে তার বেশী বনিল না। সে চুপচাপ গৃহিণী ও কন্যাদের ফরমায়েস মত কাজ-কর্ম্ম করিল, খাওয়া দাওয়া করিল—তার পর চলিয়া আসিল। বিন্দু তার সঙ্গে আসিল না। সেদিন রাত্রেও বিন্দু নেউগী বাড়ীতেই রহিল।

দুই তিন দিন নেউগী বাড়ী যাতায়াত করিয়াই শারদা জানিতে পারিল যে বিন্দু এখন মাধবের প্রেমের কাঙ্গালিনী নয়।

নেউগী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর রাঁধুনী বামন আসিয়াছে। শারদা শুনিল যে বিদেশে মাধবের বিরহ ভুলিবার জন্য বিন্দু এই রাঁধুনী বামনকে আশ্রয় করিয়াছে। সে তাদের দুজনের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার যাহা দেখিল তাহাতে শারদার সন্দেহ রহিল না যে যাহা সে শুনিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

শারদার ভয়ানক ক্রোধ ও ঘৃণা হইল। ঘৃণা তার হইবারই কথা। সীতা সাবিত্রী বেহুলা প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়া সে সতীত্বের আদর্শে তার জীবন গঠিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—ঘৃণা তো তার হবেই। কিন্তু রাগ করিবার তার কথা নয়—বরং বিন্দু যে তার স্বামীর স্কন্ধ ছাড়িয়াছে তাহাতে তার সুখী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হইল দারুণ ক্রোধ! বিধবা হইয়া বিন্দু যে পুরুষান্তর আশ্রয় করিয়াছে ইহাতে শারদার খুব বেশী ঘৃণা হয় নাই, হইয়াছে হিংসা। কিন্তু বিন্দু যে মাধবকে বঞ্চিত করিয়া আবার অন্য পুরুষ আশ্রয় করিয়াছে—ইহাতে তার হইল দুর্জ্জয় রাগ।

দুই এক দিন সে বিন্দুর সঙ্গে কোনও কথাই কহিল না। রাগ হইলেও, রাগ দেখাইবার মুখ তার নাই; কেন না এখন তারা বিন্দুর অনুগ্রহেই বাঁচিয়া আছে—এখন বিন্দুর প্রতি রাগ দেখাইবার সাহস শারদার হইল না।

তিন চার দিন পর একদিন শারদা বিন্দুকে বলিল, "তোমার ভয় করে না?"

সেদিন বিন্দু শারদার কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়াছিল।

হাসিয়া বিন্দু বলিল, ভয় করিবে সে কাহাকে। তাহার তো আর স্বামী নাই যে তাহাকে খাইতে আসিবে।

গম্ভীরভাবে শারদা বলিল, "ধর্ম্মের ভয় নাই? দেবতাদিগকে ভয় কর না?"

হো হো করিয়া বিন্দু হাসিয়া উঠিল—তার একটু লজ্জাও হইল। শেষে সে বলিল, "তুই পোলাপান, তুই ই-সব বুঝবি না।"

শারদা আরও গম্ভীর ভাবে বলিল, "দেখ, অসতী হওন বড় পাপ। জান না, অহল্যা পাষাণ হইছিলো; অসতীরে নরকে কি শাস্তি দেয় শুইনচ তো? পাপ করণ লাগে না।"

"থাম্, থাম্—আর বুইড়্যামি করণ লাইগবো না।" বলিয়া বিন্দু কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

শারদা কিন্তু ছাড়িল না। সে যত ধর্ম্ম-কথা শুনিয়াছিল সব উপদেশ বিন্দুকে দিতে লাগিল।

বিন্দু শেষে বলিল, দেখ্, সে সব তো যা' হইবে মরিলে। এখন তুই মাধবকে কিছু বলিস না তোকে অনুনয় করি। ব্যাগাত্তা করি।"

শারদা স্বীকার করিল যে মাধবকে বলিবে না, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিন্দুরও প্রতিজ্ঞা করিতে হইল যে সে মাধবের শয্যার প্রতি আর লোভ করিবে না।

(১২)

ইহার তিন বৎসর পর মাধবের আঙিনায় শারদা ধান শুকাইতেছিল, এমন সময় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল একটি যুবক।

যুবকের দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, রং কালো, কিন্তু মুখখানি উজ্জ্বল ও সুন্দর, দাড়ি কামান, সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা আছে। চকচকে টেড়ী, গায় সার্ট, কোঁচাইয়া কাপড় পরা, পায় জুতা এবং কাঁধে কোঁচান উড়ানি। দিব্য ফিটফাট বাবুটি।

তাহাকে দেখিয়া শারদা ঘোমটা টানিয়া ঘরের দিকে ছুটিল।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া যুবক বলিল, "আমাকে চিনলি না শারদী—আমি গোপাল।"

মাথার কাপড় একটু সরাইয়া আড়চোখে শারদা তার মুখের দিকে চাহিল। গোপালই বটে। তখন সে মাথার কাপড়টা একটু খাটো করিয়া দিয়া গোপালের দিকে অগ্রসর হইয়া সলজ্জভাবে বলিল, "ও মা, তুমি তো দিব্য বড় সড় হইছ।"

গোপাল হাসিয়া বলিল, "এখন আর পোলাপান কবি না তো? এখন তো নাকে টিপি দিলে দুধ পড়ে না?"

এ কথায় শারদার মুখ লজ্জায় রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল। যে সংস্রবে সে শেষ কথাটা বলিয়াছিল, তাহা তার মনে হইল, তাই সে লজ্জিত হইয়া উঠিল।

শারদা দাওয়ার উপর একখানা মাদুর পাতিয়া গোপালকে বসিতে দিল।

মাধব বাড়ী ছিল না। শারদা গিয়া গাছ হইতে দুইটা আম পাড়িয়া আনিল। দুইটা আম ও গোটাকয়েক বাতাসা দিয়া গোপালকে জল খাওয়াইল। গোপাল খাইয়া বলিল, "তামুক নাই?"

শারদা হাসিয়া বলিল, "তামুক খাওন শিখছ বুঝি?" বলিয়া সে কল্কি লইয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

গোপাল বলিল, "তামুক কেন? তার বড় বড়তাও বাদ দেই নাই। রংপুরে থাকি তামুকের বেবসা করি, সকলই করণ লাগে।" বলিয়া এমনভাবে সে হাসিল যে শারদার বুক টিপ্ টিপ করিয়া উঠিল।

তামাক সাজিয়া কল্কীটা সে গোপালের হাতে দিল। গোপাল কায়স্থ, কাজেই তাঁতির হুকা তাকে দিতে পারিল না।

তামাক খাইতে খাইতে গোপাল তার কীর্তিকলাপের লম্বা লম্বা গল্প করিয়া গেল।

শারদা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, গোপাল রংপুর গিয়াছে কত দিন?

গোপাল তাহাকে বলিল, যেদিন সে শারদার সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেদিন শারদাকে এখানে পৌছাইয়া আর সে বাড়ী ফেরে নাই। তার মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সে দেশত্যাগী হইয়া রংপুর গেল। সেখানেই এত দিন ছিল, আজই ফিরিয়াছে। এখনও বাড়ী যায় নাই। শারদাকে একবার না দেখিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিল না, তাই সে এখানে আসিয়াছে।

শারদা আবার লজ্জায় লাল হইয়া গেল। এ সব কথায় ইঙ্গিত যে কি তাহা লক্ষ্য করিয়া সে মনে মনে বড় ভয় পাইল।

গোপাল গল্প করিল সে মাইনর পাশ হইয়াছে, এখন পড়াশুনা ছাড়িয়া তামাকের কারবারে গোমস্তা-গিরী করে। অনেক টাকা সে রোজগার করিয়াছে। ইহারই মধ্যে সে পাঁচশত টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে—ইচ্ছা করিলে আরও বেশী পারিত। বলিতে বলিতে সে কোমর হইতে একটা পুঁটলী খুলিয়া শারদাকে দেখাইল একতাড়া নোট। নোট তখনও এ অঞ্চলে চলতি হয় নাই। শারদা জিজ্ঞাসা করিল, ওগুলি কি? গোপাল তাকে বুঝাইয়া বলিল এগুলি টাকা। অবাক্ হইয়া শারদা চাহিয়া দেখিল।

গোপাল বলিল, "নিবি তুই?"

শারদা লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া বলিল, "নাঃ।" আর সে বলিল, এ টাকা দেশে চলিবে না। বাস্তবিকই তখন পাড়াগাঁয় নোট চলিত না।

গোপাল নোটগুলি গুটাইয়া রাখিয়া একটা গাঁজিয়া বাহির করিল—তাতে প্রায় পঞ্চাশটা রূপার টাকা আছে। সে সবগুলি টাকা ঢালিয়া তার সামনে দিল।

শারদা ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল। অভাবের সংসার তার, একটা টাকা হইলে দশ দিন চলে। এতগুলি টাকা সামনে দেখিয়া তার চোখ চকচকে হইয়া উঠিল, কিন্তু ভয়ে মুখ শুকাইয়া উঠিল।

গোপালের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তার বড় ভয় হইয়াছিল। তার মনে হইয়াছিল যে গোপালের অভিসন্ধি ভাল নয়। তাই গোপাল যখন তাকে টাকা দেখাইয়া তার সামনে টাকা ঢালিয়া দিল, তখন তার মনে হইল যে এ টাকা যদি সে নেয় তবে গোপাল তার কাছে তার মূল্য আদায় করিতে চাহিবে। তাই তার মুখ শুকাইয়া গেল।

সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "না থাক। আমরা গরীব মানুষ, অত টাকা দিয়া কি করুম?"

গোপাল হাসিয়া বলিল, "টাকার কাম তো গরীবেরই! তুই নে—নিবি না ক্যান? লজ্জা কিসের? আমি তো তর পর না! কি ক'স্?"

শারদা ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "না থাইক। তুমি টাকা তুইল্যা রাখ। আমার টাকায় কাম নাই।"

গোপাল এক থাবায় গোটাকুড়িক টাকা তুলিয়া লইয়া শারদার হাত ধরিয়া জিদ করিয়া তার ভিতর টাকাগুলি গুঁজিয়া বলিল, শারদার লইতেই হইবে, সে না নেয় এ টাকা গোপাল জলে ফেলিয়া দিবে।

ভয়ে শারদার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে না লইয়া পারিল না। নিদারুণ অভাবে নিপীড়িত সে—এতটা সম্পদ হাতের ভিতর পাইয়া ছাড়িবার মত জোর তার হইল না। টাকা কয়টা লইয়া সে ঘরের ভিতর রাখিয়া আসিল। অবশিষ্ট টাকা গোপাল গুটাইয়া তুলিয়া লইল।

তার পর কিছুক্ষণ রংপুরের গল্প করিয়া গোপাল উঠিয়া বলিল, "তুই একবার যাবি না—মায়ের কাছে?"

শারদা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "না কেমতে যামু?"

গোপাল অনুনয় করিয়া বলিল, একবার শারদা কোনও রকমে অন্ততঃ দুদিনের জন্যও যেন যায়। তার পর মৃদুস্বরে সে বলিল, "আমি যে ছাশে আইচি সে খালি তরে দেখনের লিগ্যা—নাইলে আমার আর কোনও কাম নাই। তুই যাইস।" তার চোখের ভিতর একটা কোমল প্রেমের ভিক্ষার দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। সেদিকে চাহিয়া শারদা চক্ষু নত করিল। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, "দেখুম্, যদি পারি।"

"দেখুম্ না। যাবি।"

শারদা স্বীকার হইল।

(১৩)

গোপাল খুব অনেকক্ষণ ছিল না, বড় জোর ঘণ্টা খানেক। তার পর সে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহারই ভিতরে সে শারদার মনের ভিতর এমন একটা ছাপ রাখিয়া গেল যে শারদা ঘুরিয়া-ফিরিয়া সুধু তারই কথা ভাবিতে লাগিল।

গোপালের সুন্দর সুসজ্জিত দেহ দেখিয়া শারদা পুলকিত হইয়াছিল। সেই ছোকরা গোপাল, গাঁয়ের দুর্দ্দান্ত ছেলে গোপাল যে এত বড় সভ্যভব্য একটি বাবু হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে শারদার কৌতুহলও হইল, আনন্দও হইল। একটা বিচিত্র পুলকভরা ভাবের সৃষ্টি করিল তার এই অভিনব সুদর্শন যুবামুর্ত্তি!

গোপাল লেখাপড়া শিখিয়াছে, সেও একটা অপূর্ব্ব কথা! লেখাপড়ার পরিমাণ-ভেদ শারদার জানা ছিল না। তার কাছে এম-এ পাশ এবং ছাত্রবৃত্তি পাশ একই কথা। লেখাপড়া জানা লোক মানেই একটা মস্ত উঁচু শ্রেণীর লোক। সেই খানসামার ছেলে গোপাল আজ লেখাপড়া শিখিয়া বাবু হইয়াছে। এও যেমন আশ্চর্য্য তেমনি আনন্দের কথা।

আর সুধু লেখাপড়া শেখে নাই, এই বয়সেই সে টাকা রোজগার করিয়াছে অনেকগুলি। পাঁচশো টাকা যে কতগুলি তাহা শারদা ঠিক জানে না, কিন্তু যত টাকা তার জ্ঞানের সীমার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী! এত টাকা তার হইয়াছে; এ কথা ভাবিয়াও তার ভারি আনন্দ বোধ হইল, গর্ব্ব হইল।

আনন্দ ও গর্ব্ব হইল কেন না গোপালের উপর তার

একটা অধিকার-বোধ ছিল। সে যে তারই খেলার সাথী, স্নেহের ভাগী গোপাল। একসঙ্গে তারা কত না খেলা খেলিয়াছে, কত না দুষ্টামি করিয়াছে। তারা দু'জনে যে ছিল জোড়া মাণিক! সে যে তারই গোপাল। তাই গোপালের এ সৌভাগ্য ও অভ্যুদয়ে শারদার আনন্দ না হইবে কেন?

আরও আনন্দ এই যে এত বড় হইয়াছে গোপাল, তবু তার বাল্যসখীকে ভুলিয়া যায় নাই। ভোলা দূরে থাকুক, দেশে আসিয়া আগে ছুটিয়া আসিয়াছে তারই কাছে। এতখানি অনুরাগ তার। ইহাতে আনন্দ কি চাপিয়া রাখা যায়? সবার উপর শারদা স্মরণ করিল যে গোপাল উপযাচক হইয়া তাকে "এক মুঠা টাকা" দিয়া গিয়াছে। শুধু তার উচ্ছ্বসিত স্নেহবশে সে দিয়াছে টাকা, শারদাকে দিয়া তার আনন্দ তাই দিয়াছে। তার অকৃত্রিম অনুরাগের এই নিঃসন্দেহ পরিচয়ে শারদার বুক ভরিয়া গেল আনন্দ ও কৃতার্থতায়, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। দুঃখী শারদা, পয়সার অভাবে পেট ভরিয়া খাইতে সে পায় না, তার কাছে এ টাকার আদর যে সব চেয়ে বড় হইবে তাহা বিচিত্র নয়।

যতক্ষণ গোপাল কাছে ছিল, ততক্ষণ তার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও সমগ্র আচরণ দেখিয়া শারদার মনে একটা আতঙ্ক হইয়াছিল—ভয় হইয়াছিল বুঝি সে শারদার কাছে কোনও পাপের প্রস্তাব করিবে। একদিন গোপাল যখন ছোট ছিল, তখন সে এমনি একটা প্রস্তাব করিয়াছিল। তখন তার পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক ডেঁপোমীর পরিচয় বলিয়া শারদা তাকে অনায়াসে তিরস্কার করিয়া বিদায় করিয়াছিল। শারদার ভয় হইয়াছিল বুঝি গোপাল আজ সে কথার পুনরাবৃত্তি করিবে। আজ যদি সে তেমন কোনও কথা বলিত, তবে শারদা তাকে তেমনি তুচ্ছ করিয়া তিরস্কার করিয়া দূর করিতে পারিত না। গোপাল এখন বড় হইয়াছে, বড়লোক হইয়াছে; শারদা গরীব তাঁতির বউ, তার পক্ষে তাকে তিরস্কার করা সম্ভব হইত না। বুঝি তেমন তিরস্কার করিতে সে পারিতও না। তার নিজের চিত্তে যে উদ্বেল তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাতে তার মনে ভয় হইতেছিল বুঝি-বা তেমন কথা উঠিলে সে না বলিতে পারিবে না। তাই সে বড় ভয়ে-ভয়ে ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে সে কামনা করিতেছিল মাধবের প্রত্যাবর্ত্তন—মাধব আসিলে যেন সে বাঁচে।

কিন্তু গোপাল যখন কোনও অসঙ্গত কথা না বলিয়া কেবল তার পুরাতন সরল স্নেহের ভূয়িষ্ঠ পরিচয় দিয়া চলিয়া গেল, তখন শারদা পরম স্নিগ্ধ কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া মনে করিল মিছাই সে ভয় পাইয়াছিল, গোপাল তো ভয়ের বস্তু নয়! তখন তার হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া দৃষ্টিপথে গোপালের অনুসরণ করিয়া গেল। যতক্ষণ গোপালকে দেখা গেল, বেড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সে অপলক দৃষ্টিতে তাকে চাহিয়া দেখিল। যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন মনটা দারুণ অতৃপ্তিতে ভরিয়া রহিল যে এত অল্পক্ষণ গোপাল ছিল। আরও অনেকক্ষণ কেন সে রহিল না? সে কেন ভয়ে মরিয়া গেল, গোপালকে আর একটু বসিতে অনুরোধ করিল না?

সেই দিন হইতে গোপালের স্মৃতি তার অন্তরে মধুময় হইয়া রহিল। গোপালের কথা ভাবিয়া তার চিত্ত পুলকিত হয়;—তার সৌভাগ্য, তার গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে ভরিয়া উঠে চিত্ত, আর গোপালের সঙ্গে তার শৈশবের শত শত স্নেহ সম্বন্ধের কথা বার বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তার চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিয়া পুলক ও স্নেহের রসে সারা চিত্ত সরস করিয়া দেয়।

গোপাল তাকে বলিয়াছে একবার সে থাকিতে থাকিতে যেন শারদা মায়ের কাছে যায়। সেই অনুরোধের কথা তার বার-বার মনে পড়ে, মন তার ছুট্-ফুট্ করে একবার গিয়া গোপালের সঙ্গে আবার দেখা করিবার জন্য। কিন্তু কেমন করিয়া সে যাইবে? সে গেলে মাধবের উপায় কি হইবে? যদি কোনও উপায়ে সে গিয়া কয়েকটা দিন থাকিতে পারিত! গোপালের অভীপ্সিত সঙ্গ যদি আর কয়েকটা দিন সে পাইত!

রোজ রোজ সে তার বেড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকে গোপাল যে পথে গিয়াছে সেই পথের দিকে। মনটা তার ছুটিয়া যায় গোপালের সেই পদ-চিহ্নের উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে তার কাছে। কিন্তু উপায় সে খুঁজিয়া পায় না।

গোপাল চলিয়া যাইবার দিন দশ বারো পরে মোক্ষদা নামে একটি স্ত্রীলোক শারদার কাছে আসিয়া বলিল, তার মায়ের বড় ব্যারাম—একবার শারদাকে যাইয়া দেখিতে বলিয়াছে।

মায়ের ব্যারামের কথা শুনিয়া শারদার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তার এ কথাও মনে হইল যে ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই বুঝি তার মাতৃগৃহে যাইবার এ সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন!

মাধবের কাছে বেশী অনুরোধ করিতে হইল না। সে মহাব্যস্ত হইয়া শারদাকে যাইতে বলিল, সে নিজেও শীঘ্র গিয়া শাশুড়ীকে দেখিয়া আসিবে আশ্বাস দিল। সে একখানা ফরমায়েসী কাপড় বুনিতেছিল, শীঘ্র সে কাপড়খানা দিতে হইবে, তাই সে যাইতে পারিল না।

মোক্ষদার সঙ্গে শারদা হাঁটিয়া চলিল।

পথে চলিতে চলিতে শারদা মায়ের ব্যারামের বিস্তৃত বিবরণ মোক্ষদার কাছে জিজ্ঞাসা করিল। মোক্ষদা তাকে বলিল তিন দিন হইল অবিচ্ছেদ জ্বর, জ্বরে গা ভাজিতেছে, তার সঙ্গে পেটের অসুখ—বিকারের লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

শারদা মহাব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সে গিয়া দেখিতে পাইবে তো?

মোক্ষদা তাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, তেমন কোনও ভয়ের কারণ নাই। গোপাল নিজে টাকা দিয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে বিচক্ষণ কবিরাজ আনাইয়াছে। তিনি চিকিৎসা করিতেছেন, বলিয়াছেন ভয়ের কোনও কারণ নাই, তিনি নিশ্চয় আরোগ্য করিবেন।

শারদার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, "গোপাল আমার আর-জন্মের বন্ধু আছিল—সে না থাইকলে আমার মায়ের কোনও চ্যাষ্টাই হইত না।"

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল "সুধু কি আর-জন্মের—এ জন্মেরই কম কিসে?"

শারদা সরল উচ্ছ্বাসের সহিত বলিল, "কম? ইয়ার থিক্যা আর কি হইবার পারে। মায়ের প্যাটের ভাইও কখনও এত ভালবাসে না।"

"তা বই কি?" বলিয়া মোক্ষদা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িল; কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল।

গ্রামের নিকটে আসিয়া মোক্ষদা শারদাকে বলিল, গ্রামে গিয়া যেন সে কাহারও কাছে তার মায়ের অসুখের কথা না বলে।

শারদা চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "ক্যান?"

মোক্ষদা একগাল হাসিয়া বলিল, তার মার কোনও অসুখই করে নাই—কথাটা আগাগোড়া একটা রচনা। "এমুন মিছা কথা তুই ক'লি ক্যান?"

"মিছা কথা?" বলিয়া শারদা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল, ইহা শারদাকে আনিবার জন্য একটা কৌশল মাত্র এবং ইহা গোপালের উদ্ভাবিত।

শারদা রাগে গর গর করিতে করিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্রোধে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কোনও কথাই সে বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নীরবে দ্রুতপদে চলিয়া সে থামিয়া দাঁড়াইল। মোক্ষদার দিকে রক্তনেত্রে চাহিয়া সে বলিল, "তুই ছাইকপালী কোন্ আক্কলে গেলি? সে কইছিল কইছিল, তুই গেলি ক্যা লো নির্ব্বংশ্যার বেটী? এখন আমি ঘরের মানুষটিরে কমু কি ক' যে?"

মোক্ষদা ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "আর অত রাগ দেখান লাইগবো না সতীর বিটি! আলো! বয়সকাল খালি তরই হয় নাই, আমাগরেই বয়সকাল আছিল। সগগলই বুঝি—বুইচ্ছস্ নি?"

এ কথায় শারদার ক্রোধ আর বাধা মানিল না। সে যা নয় তা বলিয়া মোক্ষদাকে গালিগালাজ করিতে করিতে ক্রমে তার চুল ধরিয়া টানিয়া তাকে কিল চড় মারিয়া অস্থির করিল। মোক্ষদা চীৎকার করিয়া উঠিল।

শারদা তখন ছুটিয়া তার মায়ের ঘরের দিকে চলিল। মোক্ষদা তার উদ্দেশে যা-নয় তাই বলিয়া গালিগালাজ করিতে করিতে গোপালের কাছে গেল, তাকে তার দৌত্যের সাফল্যের সংবাদ দিয়া বকশীস্ লইবার জন্য।

শারদাকে দেখিয়া দুর্গা অবাক হইয়া গেল। তার মুখ চোখ দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে। শারদা কোনও মতে কথাটা চাপা দিয়া বলিল সে সুধু তার মাকে দেখিতে আসিয়াছে, পরের দিনই চলিয়া যাইবে। তার পর সে তার মাকে গাঁয়ের

করিয়া গেল যে দুর্গার আর কথাটা তলাইয়া দেখিবার কোনও অবসর হইল না।

গোপালের উপর শারদার দুর্জ্জয় ক্রোধ হইল। তার অভিসন্ধি সম্বন্ধে তার এখন দারুণ সন্দেহ হইল। সন্দেহটা আরও নিবিড় হইয়া উঠিল এই জন্য যে গোপাল মোক্ষদাকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছে। গ্রামের ভিতর মোক্ষদার নামে ভয়ানক অখ্যাতি ছিল। অবৈধ প্রেমের দৌত্যে এবং তাহার আনুষঙ্গিক সর্ব্ববিধ অপকার্য্যের সম্পাদনে তাহার কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। শারদার আরও রাগ দুঃখ হইল এই কথা ভাবিয়া যে মোক্ষদা যখন ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে এই ব্যাপারের একখানাকে সাতখানা করিয়া অবিলম্বে গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়া রটনা করিবে। কেন না মোক্ষদার অভ্যাসই এই। যত লোকের যত অপকর্ম্মে সে সহায়তা করে, তাদের সেই সব অপকার্য্য লইয়া সে সবার কাছে গল্প করিয়া বেড়ায়। বলে সে গোপনে, এবং নিভৃতে, অতি মৃদুস্বরে—কিন্তু বলে গ্রামের প্রায় বার আনা স্ত্রীলোকের কাছে। ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় শারদা গা কামড়াইতে লাগিল যে হয় তো আজ দিনের মধ্যেই মোক্ষদা তার অবৈধ প্রেমের মিথ্যা কাহিনী গ্রামের জন পঞ্চাশেক মেয়ের কাছে এমনি করিয়া বলিয়া বেড়াইবে, এবং হয় তো দুই দিনের মধ্যেই সবাই জানিবে যে গোপালের সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় আছে।

তাই গোপালের উপর তার ভয়ানক রাগ হইল। গোপাল যখন তাকে এতটা কারসাজী করিয়া আনাইয়াছে, তখন সে শীঘ্রই হয় তো তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। আসিলে শারদা যে তাকে কি রকম করিয়া সম্ভাষণ করিবে তার সম্বন্ধে সে নানাবিধ ভয়াবহ কল্পনা করিতে লাগিল। ঝাঁটা দিয়া তার গায়ের বিষ ঝাড়িবে, কিম্বা নোড়া দিয়া তার দাঁত ভাঙ্গিবে, না চেলা-কাঠ দিয়া তার মাথায় বাড়ী দিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। মাছ কুটিতে বসিয়া সে ভাবিতেছিল যে এখন যদি গোপাল আসে তো এই আঁস বঁটি দিয়া তার নাকটি কাটিয়া নামাইবে। রাঁধিবার সময় মনে হইল সে আসিলে জলন্ত কাঠ উনান হইতে বাহির করিয়া তার মুখ পুড়াইয়া 'অজার' করিয়া দিবে।

কিন্তু সারা দিন-রাত্রের ভিতর গোপাল আসিল না।

পরের দিন সকালে উঠিয়া শারদা স্থির করিল, আজই আহারের পর সে চলিয়া যাইবে। বাড়ী ফিরিয়া স্বামীকে কি বলিবে, তার কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে, তাহা ভাবিয়া তার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল। কিন্তু যাহাই হউক যাইতে তার হইবেই।

সকাল বেলায় নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল গোপাল তার প্রতীক্ষায় পথে দাঁড়াইয়া আছে। তখন সেখানে কেউ নাই দেখিয়া সে নত মস্তকে শারদার কাছে অগ্রসর হইল।

শারদার ক্রোধের তীব্রতা এক রাত্রে অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু গোপালকে দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইল। সে গোপালকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইল।

গোপাল তার পাশে পাশে চলিতে চলিতে বলিল, তার ভয়ানক অপরাধ হইয়া গিয়াছে; সে বুঝিতে পারে নাই যে মোক্ষদা এমনটা করিবে। সে মোক্ষদাকে পাঠাইয়াছিল বলিয়া কহিয়া শুধু শারদাকে বাড়ী আনিতে। মোক্ষদা নিজ হইতে একটা উপন্যাস রচনা করিয়া এই কুৎসিত কাণ্ডটা দাঁড় করাইয়াছে।

এই সব কথা শুনিয়া শারদা থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "তবে মোক্ষদা পিসিরে পাঠাইছিলা ক্যান? জান না সে কি চরিত্রের লোক? তোমার ও ভাল-ভালাই আমি মোটেই বিশ্বাস করি না!"

গোপাল শারদাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিল, তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। সে না বুঝিয়া দোষ করিয়াছে।

শারদার মনটা একটু ভিজিল। সে বলিল, "তোমার তো মাপ কইরলেই মিটলো, আর আমি! আমি এখন কি উপায় করমু—ঘরের মানুষরে কেমনে বুঝামু—তা কও যে। গাঁয়ের মাইনসে যে থুক দিবো তা গো কেমনে থামামু?" খুব রাগের সঙ্গে সে কথা কয়টা বলিল।

গোপাল বলিল, 'ঘরের মানুষ' অর্থাৎ মাধব সম্বন্ধে গোপাল ব্যবস্থা করিয়াছে। সে আজ সকালেই লোক পাঠাইয়া মাধবকে শারদার হইয়া সংবাদ দিয়াছে, দুর্গার অসুখ সারিয়াছে, কোনও চিন্তার কারণ নাই—শারদা দুই চার দিন মায়ের কাছে থাকিয়া ফিরিবে!

শারদা চটিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, এ মিথ্যা কথা বলিয়া আবার তাকে জালে জড়াইবার কি প্রয়োজন ছিল? কে গোপালকে ইহা করিতে বলিয়াছিল? এবং স্পষ্ট করিয়া গোপালকে জানাইয়া দিল যে সে আজই চলিয়া যাইবে, তার অদৃষ্টে যাহা থাকুক সে স্বামীর কাছে গিয়া সত্য কথাই বলিবে। বলিয়া সে বেগে ঘাটের দিকে চলিল।

ঘাট হইতে ফিরিবার সময় সে দেখিল গোপাল তখনও সেইখানেই গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। গোপালের মুখের ভাব দেখিয়া তার একটু করুণা হইল।

সে কাছে আসিলে গোপাল বলিল, "শারদী, বড় চুক করছি—তুই আমার কাণডা মইলা দিয়া যা।"

তার অনুতপ্ত ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া শারদার হাসি পাইল। সে হাসিয়া বলিল, "দেই র'" বলিয়া কৌতুক করিয়া হাত বাড়াইল।

তার হাসিতে সাহস 'পাইয়া গোপাল বলিল, যাহা হইবার তাহা তো হইয়া গিয়াছে, এখন যখন মাধবের কাছে খবরটা পাঠানু হইয়া গিয়াছে তখন শারদা দুই চার দিন অন্ততঃ এ গ্রামে থাকিয়া গেলেই ভাল হয়। না হইলে কথাটা আরও গোলমেলে হইয়া উঠিতে পারে।

এ যুক্তি এখন শারদার মনে ধরিল। সে একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বীকার করিল।

ইহার পর ক্রমে গোপাল এ-কথা ও-কথা কহিতে কহিতে অনেক কথাই বলিল, শারদাও তার সঙ্গে সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

গোপাল শারদার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে গিয়া উঠিল। দুর্গার বাড়ী সুধু একখানা ছোট খড়ের ঘর, তার দাওয়ায় রান্নার জন্য একটু জায়গা আছে, সম্মুখে একটা আঙ্গিনার মত, তার এক পাশে ছোট-খাট একটা 'পালান' বা তরকারীর ক্ষেত।

গোপাল আসিয়া দাওয়ার উপর একখানা তক্তা পাতিয়া বসিল। শারদা ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া উনান ধরাইতে বসিল। দুর্গা কাজে গিয়াছিল, কাজেই বাড়ীতে তারা দুজনেই সুধু ছিল।

উনান ধরাইতে গিয়া ধোঁয়ায় শারদার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, ভিজা কাঠ ভাল করিয়া ধরিতে চায় না। গোপাল উঠিয়া শারদাকে বলিল, "সর, আমি চোকা ধরাইয়া দেই।"

শারদার আপত্তি খাটিল না। গোপাল তার পাশে উবু হইয়া নল দিয়া কিছুক্ষণ ফুঁ দিল। তার পর সে উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। খড় কুটা জ্বালাইয়া শারদা কাঠে আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গোপাল বুঝিল খড় কুটার কর্ম্ম নয়, সে পাঁকাটীর সন্ধান করিতে লাগিল। দুর্গার ঘরে পাঁকাটি ছিল না, ছিল একদিকে একটা জীর্ণ পাঁকাটির বেড়া। গোপাল উঠিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে সেই বেড়া হইতে অর্দ্ধেক পাঁকাটি ভাঙ্গিয়া আনিল।

শারদা বলিল, "করলি কি? খাইবস আমারে। মায় দেইখ্যা আর আমারে আস্তা রাইখবো না।"

গোপাল হাসিয়া বলিল, "ডর নাই তর, আমি তরে দুই বোঝা পাটখরি পাঠাইয়া দিমুনে, তাতে বেড়াও হোবো, জ্বালানও চইলবো।"

প্যাকাটির সহায়তায় গোপালের উনান ধরাইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

উনান ধরিলে শারদা বলিল, "এখন সর, আমি হারি চরাই।"

গোপাল সামান্য একটু সরিয়া বসিল। শারদা হাসিয়া একটা জলন্ত পাঁকাটি বাহির করিয়া গোপালকে বলিল, "সইরা যা', নাইলে দিমু তোর মুখ পুরাইয়া।"

গোপাল হাসিতে হাসিতে সরিয়া গেল।

গোপাল একটু উঠিয়া গেল। তার নিজের বাড়ী হইতে দুই বোঝা পাঁকাটি আনাইয়া শারদার আঙ্গিনায় মজুত করিয়া দিয়া সে আবার আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল।

অনেকক্ষণ বসিয়া সে গল্প করিল। বিদেশের অনেক আশ্চর্য্য খবর সে বলিল। রেলের কথা, ষ্টীমারের কথা, রংপুর সহরের কথা, সেখানকার রাজবাড়ীর কথা, মাহিগঞ্জের কালীবাড়ীর কথা—সেকালের ডাকাতদের কথা, অনেক কথা বলিল। শারদা অশেষ কৌতূহলের সহিত সব কথা শুনিতে লাগিল।

গোপাল তার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল তার মনিব কত বড় মহাজন, কত বিশ্বাস তিনি করেন

গোপালকে। দশ বারো হাজার টাকা গোপাল নিজের হাতে নাড়াচাড়া করে। মনিব বলেন গোপালের মত ব্যবসায়-বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না, গোপাল একদিন মস্ত বড় ব্যবসায়ী হইবে। তার স্বপ্নের কথা, কল্পনার কথা সে শারদাকে বলিল। দুই হাজার টাকা তার হাতে জমিলে সে নিজে কারবার করিবে, আর ভগবানের যদি অনুগ্রহ থাকে ঐ তামাকের কারবারে সে দশ বিশ বছরে লক্ষপতি হইতে পারিবে। বাড়ীতে দালান অর্থাৎ পাকাবাড়ী করিবে, ঘোড়া গাড়ী রাখিবে—কত কি করিবে।

একাগ্র চিত্তে শারদা শুনিতে লাগিল। গোপালের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কল্পনায় তার আনন্দ হইল গোপালেরই মত। সে বর্ত্তমান ভুলিয়া গেল, ভবিষ্য গোপালকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া তার মন প্রশংসায়, পুলকে ভরিয়া গেল।

গোপাল বলিল, একবার যদি শারদাকে রংপুর নিতে পারিত সে, তবে আশ মিটাইয়া সে তাকে সব দেখাইত।

একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শারদা বলিল, "আমি কেমনে যামু?" কিন্তু যাইতে পারিলে সে যাইত—এবং খুসী হইত, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া গোপাল বলিল, গেলেই যাওয়া যায়। শারদা একবার বলিলেই গোপাল তাকে লইয়া যাইতে পারে।

হাসিয়া শারদা বলিল, "কস কি দুরমুখা, আমার ভাতার নাই? সংসার নাই?"

গোপাল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তাকে এক মাস না দেখিতে পাইলে কি তার বৃদ্ধ স্বামী মরিয়া যাইবে?

শারদা বলিল "থাম, পোড়াকপাইলা—আকথা কুকথা মুখে আনিস্ না।"

গোপাল হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা যাইট, বাইচ্যা থাইক তর সোয়ামী। তা' এক মাস কি সে তারে ছাইর‍্যা থাইকবার পারে না।"

শারদা হাসিয়া বলিল "না।"

সেদিনকার মত কথাবার্ত্তা ঐখানেই শেষ হইল।

শারদা রোজ যাই যাই করে, গোপাল এটা ওটা ওজুহাত তুলিয়া তাকে বারণ করে। এমনি করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল।

গোপাল ধীরে ধীরে অলক্ষিতে শারদার উপর তার প্রভাব বিস্তার করিল। নিতান্ত সরল সহৃদয়তার সহিত সে কথাবার্ত্তা কয়, শারদার হইয়া অনেক খাটাখুটি করে, তাকে এটা-ওটা দেয়। এমনি করিয়া সে তার আন্তরিক প্রীতির পরিচয় দেয়। শারদা সে পরিচয়ে ক্ষুব্ধ হয় না, কোনও রকম গ্লানি বোধ করে না, আনন্দের সঙ্গে তার বাল্য সুহৃদের এই অকৃত্রিম প্রীতি উপভোগ করে, নিজেও তাকে স্নেহের সহিত সম্ভাষণ করে, পরম প্রীতির চক্ষে দেখে।

বড় আনন্দে কাটিল সাতটা দিন।

সাত দিনের দিন শারদা বলিল, কাল সকালে সে তার মায়ের সঙ্গে স্বামীগৃহে যাইবে।

গোপাল মুখ ভার করিয়া বলিল "ক্যান যাবি?"

শারদা হাসিয়া বলিল, "দেখ চে?—পাগলের কথা। আমি কি স্বাধীন যে থাকমু। আমার ঘর দুয়ার আছে, সোয়ামী আছে, তারে কে দেখে?"

দুর্গার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। দুর্গা বাড়ী ছিল না।

গোপাল অনেকক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "আমি যাইবার দিমু না তরে—তুই আমার সাথে চল।"

শারদা হাসিয়া বলিল, "তর সাথে যামু কি? পোলাপানের মত কথা কস তুই এখনো।"

গোপাল বলিল, ছেলেমানুষের মত কথা সে মোটেই বলিতেছে না। আকুল কণ্ঠে সে বলিল শারদাকে সে চায়। তার ঘরবাড়ী ধন দৌলত সব তার পায় সমর্পণ করিবে গোপাল—ভৃত্য হইয়া থাকিবে। শারদা কি সম্মত হইবে না? কেন? কিসের জন্য। তার স্বামী তো তাকে দুটো খাইতেও দিতে পারে না।

এ কথা শুনিয়া শারদা স্তম্ভিত হইল। ভয়ে তার বুক ঢিপ্ ঢিপ করিতে লাগিল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, "ই-কি কথা! কি ক'স তুই?—কুলমান খাইয়া জাইত দিয়া আমি তর সাথে বাইর হইয়া যামু!"

সে দাঁড়াইয়া উঠিল। ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

গোপাল বলিল, কেন? কি দোষ? সকলেই তো এমনি করিতেছে। রংপুরে এদেশের মহাজন যতজন গিয়াছে তাদের অনেকেই তো এমনি পরস্ত্রী লইয়া দিব্য ঘরসংসার করিতেছে। তাহাদের তাতে কিছু সর্ব্বনাশ হইয়া যায় নাই। বিদেশে কে বা দেখিতে যাইবে, আর কে বা অত খবর লইবে? ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তি সে প্রয়োগ করিল।

শারদা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ওঠ—পালা তুই—দূর হ' পোড়াকপাইলা। পলা শীগ্‌গির।"

গোপাল উঠিল না, বরং লোলুপ দৃষ্টিতে শারদার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে হঠাৎ তার হাত চাপিয়া ধরিল।

এক ঝট্‌কায় তার হাত ছাড়াইয়া লইয়া শারদা দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া শাসাইল যে সেই মুহূর্ত্তে যদি গোপাল সে স্থান ত্যাগ না করে তবে শারদা মারিয়া তার হাড় গুঁড়া করিয়া দিবে, তাকে কাটিয়া কুচা কুচা করিবে। একখানা দা' হাতে করিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া শারদা তাকে এই কথা বলিল।

গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শারদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে সে চলিয়া গেল।

শারদার সর্ব্বাঙ্গ তখন উত্তেজনার আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

ভারত যুদ্ধাব্দ-সমালোচন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

প্রথমে নিজের প্রবন্ধের ভুল সংশোধন করি। "ভারতযুদ্ধ কোন্ বৎসরে?"—এই প্রবন্ধে তিনটি ভুল হইয়াছে।*

(১) ৩৫৭ পৃষ্ঠে ২য় পাটিতে কলি ও দ্বাপরের সন্ধ্যার সংখ্যায় ভুল হইয়াছে। সহস্র বর্ষে কলিযুগ। ইহার দশমাংশ, একশত বৎসর, সন্ধ্যা। দিব্য সংখ্যায় ১০০ × ৩৬০ বৎসর। দ্বাপরের সন্ধ্যা ইহার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৭২০০০ বৎসর। দুই সন্ধ্যাসহ কলি ১২০০ বর্ষ। দিব্য সংখ্যায় ১২০০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০ বৎসর।

(২) ৩৬৪, ৩৬৫ পৃঃ কলিযুগ সহস্র বৎসর। ইহার আরম্ভ খ্রি-পূ ১৩৫৩ অব্দে। এটি হইবে ১৩৭২। এই পরিবর্তনের হেতু লিখিতেছি। পাঁচ বর্ষের যুগের আদিযুগ যে অব্দে আরম্ভ, সে অব্দে সহস্র-বর্ষাত্মক কলিযুগেরও আরম্ভ হইয়াছিল। কোন্ অব্দে আরম্ভ তাহা গণিবার উপজীব্য আছে।

(১) সে অব্দে মাঘ শুক্ল প্রতিপদে রবির উত্তরায়ণ, (২) শিশির ঋতুর আরম্ভ, (৩) পূর্বরাত্রে পৌষ অমাবস্যায় রবি-শশীর সহিত শ্রবিষ্ঠা (ধনিষ্ঠা) তারার ("বিটা ডেল্‌ফিনাই") যুতি হইয়াছিল। অর্থাৎ এই তারার সায়ন ভোগ ২৭০° হইয়াছিল। গণিত দ্বারা পাই খ্রি-পূ ১৩৫৭ অব্দে হইয়াছিল। ইহার নিকটবর্তী ১৩৫৩ ও ১৩৭২ অব্দে পৌষ অমাবস্যায় উত্তরায়ণ হইয়াছিল। এই দুই অব্দে (২রা জানুয়ারি) এই এই লক্ষণ হইয়াছিল। পুরাণেও এই এই লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (বায়ু ৫৩। ১১২—১১৪)। আমি ১৩৫৩ অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

সম্প্রতি অন্য এক বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া দেখিতেছি, আর এক লক্ষণ ধরা হয় নাই। প্রতি যুগের প্রথম বর্ষের নাম সংবৎসর। প্রথম, ষষ্ঠ, একাদশ, ষোড়শ ইত্যাদি বর্ষ সংবৎসর হইত। বরাহ-মিহির "পৈতামহ সিদ্ধান্তে" লিখিয়াছেন, ২ শকে (খ্রি-পর ৮০ অব্দে)

* "ভারত-যুদ্ধ কোন্ মাসে?" এই প্রবন্ধে কয়েকটি ছাপার ভুল হইয়াছে।

৩০১ পৃঃ	২ পাঃ	১৬ পং	সাক্ষাৎরূপে হইবে	বৃষ্টিরূপে
৩০২	১	৮	সে	যে
"	২	৭	বিষুবান্	বিষুবান্
"	"	১১	পুত্ত	দুই
৩০৪	"	টিপ	দুই তিন বৎসরের	দুই তিন শত বৎসরের

সংবৎসর হইয়াছিল। খ্রি-পূ ১৩৫৩ অব্দ ধরিলে এই লক্ষণ মেলে না। এই কারণে ইহার ১৯ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৩৭২ অব্দে যাইতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা খ্রি-পূ ৫৮ অব্দে বিক্রম-সংবৎ সংবৎসর পাওয়া যাইতেছে। খ্রি-পূ ১৩৭২ অব্দে ধনিষ্ঠাদ্যে উত্তরায়ণ হইয়াছিল। রামায়ণে ও মহাভারতে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র শ্রবণাদি-গণনা-রূপ নক্ষত্র-সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উপাখ্যানটি এই অব্দের পরে রচিত, কবিদ্বয় কালের সঙ্গতি ভাবেন নাই। সে যাহা হউক, ১৩৭২ অব্দে মুখ্য কলির আরম্ভ, ৩৭২ অব্দে অন্ত। তদনন্তর ২৭২ অব্দে কলির সন্ধ্যারও অন্ত হইয়াছে। ৩৭২ অব্দের নিকটবর্তী কালে কলি প্রবল। সে সময়ে মহানন্দ উত্তর-ভারতে একরাট্।

(৩) ৩৬০ পৃঃ। ভারতযুদ্ধ খ্রি-পূ ১৪৫৫, এবং পরীক্ষিতের জন্ম ১৪৫৪ অব্দে না হইয়া দুই বৎসর পরে হইবে, অর্থাৎ পরীক্ষিৎ ১৪৫২ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উপরের ভুলের সহিত এই ভুলের সম্বন্ধ নাই। কল্পমুখ ধরিতে ভুল হইয়াছিল। প্রবন্ধে যুদ্ধাব্দ লিখিবার সময় সন্দেহ হইয়াছিল, ১৪৫৪ অব্দে পরীক্ষিৎ, আর ঠিক একশত বৎসর পরে ১৩৫৪ অব্দে কলি, এ যেন গড়া-পেটা ঐক্য। "ভারত-যুদ্ধ কোন মাসে?" প্রবন্ধে বর্ষারম্ভ ঋতু আলোচনা করা গিয়াছে। যজুর্বেদের কালে বসন্ত, বর্ষমুখ, কিন্তু ঋগ্বেদে বসন্ত নামও নাই। সেখানে বর্ষ অর্থে শরৎ ও হেমন্ত শব্দ আছে। শিশির হেমন্তের মধ্যে গণ্য হইত। শরৎ হইতে ও তিনমাস পরে শিশির হইতে, এই দুই ঋতু হইতে বর্ষ আরম্ভ হইত। অর্থাৎ শারদ বিষুব ও উত্তরায়ণ, বৎসরের দুই মুখ গণ্য হইত। দ্বিবিধ বৎসরের দুই নাম শরৎ ও হেমন্ত। আমি প্রবন্ধে ভ্রমক্রমে বসন্ত বিষুবে কল্পারম্ভ ধরিয়াছি, এটি হইবে শারদ বিষুবে। অবশ্য পূর্ণিমা, মাসের ও বর্ষের অন্ত। খ্রি-পূ ৩২৬৭ অব্দে শারদ বিষুব দিনে পূর্ণিমা হইয়াছিল। সেদিন চন্দ্র রোহিণী তারার নিকটে, রোহিণী নক্ষত্রের আদ্যে ছিল। মাস অগ্রহায়ণ।

অগ্রহায়ণ, বৎসরের প্রথম মাস। এই হেতু এই মাসের নাম ও প্রসিদ্ধি। খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দে মৃগশিরায় পূর্ণিমা হইতে অগ্রহায়ণ মার্গশীর্ষ আরম্ভ হইয়া ২৫০০ অব্দে অন্ত হইয়াছিল। তৎকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ হইত। ইহার পর কার্তিক মাস পড়িয়াছিল। লোকমান্য টিলক তাঁহার Orion গ্রন্থে অগ্রহায়ণ মাস লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছেন। আমাদের উদ্দিষ্ট কল্পারম্ভ কালে রোহিণীতে পূর্ণিমা হইত। চাক্ষুষ মন্বন্তরের কার্তিক পূর্ণিমা ঐ সীমা বাঁধিয়া দিয়াছে।

রোহিণীতে পূর্ণিমা ও মাসান্ত। ইহার প্রায় ২৪৫ বৎসর পূর্বে রোহিণীর প্রথম পাদান্তে বর্ষান্ত হইত। তখন ভরণী, কৃত্তিকা, ও রোহিণীর প্রথম পাদ, এই ২।০ নক্ষত্রে মাস পূর্ণ হইত। অর্থাৎ খ্রি-পূ ৩৫০০ অব্দের সন্ধান পাইতেছি। ৩৫০৩ অব্দে রোহিণীর প্রথম পাদান্তে পূর্ণিমা হইয়াছিল। এটিও এক বিশেষ কাল, এবং বোধহয় আর এক কল্পমুখ হইয়াছিল। এ বিষয় পরে লিখিতেছি।

কি দাঁড়াইল, দেখা যাউক। খ্রি-পূ ১৪৫৩ অব্দে (১৬৪৯ কল্যব্দে) ভারতযুদ্ধ, ১৪৫২ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম।* এই অব্দ কলিবর্ষ। ১৩৭২ অব্দও কলিবর্ষ ও মুখ্য কলিযুগের আরম্ভ। অন্তর ৮০ বৎসর। ইহা হইতে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যা শত বৎসর ধরা হইয়াছে। ১৪৫১ অব্দে কলি, ১৪৪০ অব্দেও কলি। পূর্ব প্রবন্ধে ১৪৪০ অব্দে কলি কিছুতে পাই নাই। আর এক কথা। আমি মনে করিয়াছিলাম, চতুর্মুখ মহেশ্বর একটা রূপক মাত্র। গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী"র পঞ্চশস্যে দেখিতেছি চতুর্মুখ মহেশ্বরের প্রতিমূর্তি নির্মিত হইত। তাঁহার চতুর্থ বদন, কলি বদন, বাস্তবিক ভীষণ, মনে হয় যেন রোদন করিতেছেন। যে প্রতিমূর্তির চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সেটি নাকি ৪র্থ খ্রিষ্টাব্দ-শতকের।

---

* এই অব্দেও "ভারত সাবিত্রী"র তিথি পাওয়া যাইতেছে।

১	ডিসেম্বর	পৌষ	শুক্লত্রয়োদশী	মৃগশিরা
১০	"	মাঘ	কৃষ্ণাষ্টমী	স্বাতী
১৮	"	মাঘ	অমাবস্যা	শ্রবণা

স্পষ্ট তিথি না গণিলে যুদ্ধের দশম দিবসে কৃষ্ণাষ্টমী ও অষ্টাদশ দিবসে অমাবস্যা পাওয়া যায় না। তিথি হেতু যুদ্ধ ডিসেম্বর মাসে আসিয়া পড়িয়াছে। দিন গণিলে নভেম্বর মাসে পড়িত। অমাবস্যায় শ্রবণা দেখিয়া বলরামের বাক্য স্মরণ হইবে। কিন্তু এই ঐক্য আকস্মিক। তাঁহার বাক্য শ্রবণাদি গণনায় (খ্রি-পূ ৪০১ অব্দের) পরের মনে হয়।

খ্রি-পূ ১৪৫২ অব্দে পরীক্ষিতের জন্ম। ১৪৫২—১০৫০ =৪০২ অব্দে মহানন্দের অভিষেক। নবনন্দের ৮৮ বর্ষ রাজ্যভোগ। অতএব খ্রি-পূ ৪০২—৮৮=৩১৪ অব্দে কিম্বা ৩১৩ অব্দে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হইয়াছিল। জৈন পুরাণ মতে ৩১৩ অব্দে।

ভারতের পুরাবৃত্ত-জিজ্ঞাসুমাত্রেই ভারত-যুদ্ধাব্দ-নির্ণয়ের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আসিতেছেন। এই অব্দ না জানিলে পুরাবৃত্ত-প্রবেশে পথ পাওয়া যায় না। দুই একটা উদাহরণ দিই। ইক্ষ্বাকু বংশের বৃহদ্‌বল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকু হইতে ৯৪ পুরুষ (বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ)। পুরুষ প্রতি ২০ বৎসর গণিলে ৯৪×২০=১৮৮০ বৎসর। ১৪৫৩ অব্দে যুদ্ধ। অতএব ইক্ষ্বাকু খ্রি-পূ ৩৩৩৩ অব্দে সূর্যবংশের বীজ হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শাম শাস্ত্রী স্বায়ম্ভুব মনুকে বৃহৎ কলিমুখে, খ্রি-পূ ৩১০২ অব্দে বসাইয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি কল্পাদি এই একটী মনে করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এক এক প্রকার গণনার এক এক কল্পমুখ ছিল। তিনি কৃষ্ণযজুর্বেদ ও আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্র দৃষ্টে লিখিয়াছেন, পরশুরামের পিতা জমদগ্নি, এবং বিশ্বামিত্র চতুর্থ 'অতি-রাত্র' যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ১৪৫৬ বৎসর হ্রাসে। কিন্তু কোথা হইতে? যদি 'অতিরাত্র' গণনার কল্পমুখ খ্রি-পূ ৩৫০৩ ধরি, তাহা হইলে উক্ত যজ্ঞ ৩৫০৩—১৪৫৬=খ্রি-পূ ২০৪৭ অব্দে হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র হইতে বৃহদ্‌বল ৩০ পুরুষ। প্রতি পুরুষে ২০ বৎসর গণিলে ৬০০ বৎসর। বৃহদ্‌বল ১৪৫৩ অব্দে ছিলেন। অতএব রামচন্দ্র ১৪৫৩+৬০০=২০৫৩ অব্দে ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কল্যব্দ ধরিলে রামচন্দ্র খ্রি-পূ ১৬৪৫ অব্দে আসিয়া পড়েন, এবং পুরুষ প্রতি ১৩ বৎসর পড়ে।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন. রাজা জনক সপ্তম অতি-রাত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কল্পমুখ হইতে ১৪৬৮ বর্ষ পরে। ৩৫০৩—১৪৬৮=২০০৫ অব্দে। এই জনক সীতার পিতা হইতেছেন। দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত দ্বাদশ অতি-রাত্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ১৪৮৮ বৎসর হ্রাসে। ৩৫০৩—১৪৮৮=২০১৫ অব্দে ভরত ছিলেন। ভরত হইতে পরীক্ষিৎ ২৭ পুরুষ। পুরুষ প্রতি ২০ বৎসর গণিলে ৫৪০ বৎসর। পরীক্ষিৎ খ্রি-পূ ১৪৫২ অব্দে। অতএব ভরত ১৪৫২+৫৪০=১৯৯২ অব্দে ছিলেন। দ্বিবিধ গণনার ঐক্য হইতেছে।

এই সকল বিষয়ের গবেষণা কিছুই হয় নাই। ভারত-যুদ্ধাব্দ জানিতে পারিলে অন্ততঃ পুরুষ গণিতে পারা যাইবে। তখন "মান্ধাতার আমল" বলিয়া এক অনির্দিষ্ট অতীত কাল বুঝিতে হইবে না। ইক্ষ্বাকু হইতে মান্ধাতা ১৮ পুরুষ, প্রায় খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে ছিলেন।

ভারত-যুদ্ধ প্রবন্ধের কয়েকজন পাঠক আমায় পত্র দ্বারা তাঁহাদের সংশয় জানাইয়াছেন। সত্যনির্ণয় সকলের উদ্দেশ্য, এবং পরস্পর তর্কদ্বারা সত্যনির্ণয়ে সাহায্য হয়। কিন্তু সকলের যাবতীয় তর্কের নিরসন আমার সাধ্য নয়। যে উপজীব্য ও যুক্তি দ্বারা ভারতাব্দ নির্ণয় করা গিয়াছে, তাহাতে সংশয় থাকিলে অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে। তাঁহাদের পত্র দীর্ঘ, এখানে উদ্ধৃত করিবার স্থান হইবে না।

১। শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন "ভারত সাবিত্রী"র ২য় [?] সংস্করণে ভীষ্মের নিধনতিথি এই রূপ আছে,

মার্গেমাসি হতো ভীষ্মো কৃষ্ণপক্ষে যথাষ্টমী।

এই পরিবর্তিত পাঠ কোন আধুনিক পণ্ডিতের কল্পিত মনে হয়। ভীষ্ম মার্গ, অগ্রহায়ণ মাসে হত হন নাই। চারিশত বৎসর পূর্বে নীলকণ্ঠ মাঘমাস লিখিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত দেখিলেন মাঘ মাস শীত মাস, হেমন্ত নয়। তিনি ভাবেন নাই, অয়ন-চলন হেতু পূর্বকালের মাঘ মাস এখন ঋতুতে দেড়মাস পিছাইয়া আসিয়াছে।

২। শ্রীযুত নন্দ-কিশোর মণ্ডল মহাশয় দ্বিতীয় তৃতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে লিখিয়াছিলেন। তিনি যুগসন্ধি কাল বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর মেরু ও চুম্বকের মেরু একস্থানে আসিলে যুগসন্ধি হয়। তাঁহার মতে যুগসন্ধি কালে যুদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার মতে খ্রি-পূ ১৬০৯ অব্দে যুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাঁহার মতের কোন প্রমাণ তুলেন নাই। তাঁহার বিশেষ তর্ক, "মঘায় সপ্তর্ষিকালে কলির ১২০০ বৎসর গত কিরূপে সম্ভবে?" এখানে তিনি "দ্বাদশাব্দশতাত্মক" বিশেষণটির

প্রকৃত অর্থ ধরেন নাই। যেমন পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ বলিলে পাঁচ বর্ষের যুগ বুঝায়, তেমন দ্বাদশশতবর্ষাত্মক যুগ বলিলে বারশত বৎসরের যুগ বুঝায়। বহুব্রীহি সমাস-সিদ্ধ পদটি কলির বিশেষণ। এবম্বিধ কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

৩। আর এক পাঠকও পূর্বে লিখিয়াছিলেন। ইনি যুদ্ধ কালের নানাবিধ গ্রহস্থিতি এবং যুদ্ধারম্ভতিথির বিসম্বাদ দেখাইয়া মনে করেন, যুদ্ধাব্দ নির্ণয় চেষ্টা বৃথা। ইঁহার মতে "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও তাহার উপাখ্যান ভাগ এক চমৎকার রূপক।" "মহাভারত গ্রন্থ এক কাব্য, অতিশয়োক্তি কাব্যের প্রাণ", ইত্যাদি। কিন্তু মহাভারত ই-তি-হা-সও বটে। ইতিহাস, অর্থ-(lessons) যুক্ত পুরাবৃত্ত। History ইতিহাস নয়, পুরাবৃত্ত। পূর্বে পুরাবৃত্ত নাম চলিতেছিল। পুরাণ পুরাবৃত্ত, history.

৪। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয় যত্নপূর্বক শেষ প্রবন্ধ পড়িয়া পুরাণ হইতে শ্লোক তুলিয়া অর্থ করিয়া কয়েকটি সংশয় জানাইয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান, পরে দেখিতেছি। তিনি এক সংবাদও দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের প্রচলিত সংস্করণে পরীক্ষিৎ-মহানন্দের বর্ষান্তর ১০১৫। তিনি লিখিয়াছেন, বোম্বাই বেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানার বিষ্ণুচিত্তী ও শ্রীধরী টীকা-সংবলিত বিষ্ণুপুরাণে ১০৫০ আছে, ১০১৫ নাই। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে ১০৫০। এখন বিষ্ণুপুরাণেও ১০৫০ পাইতেছি। যে বিষ্ণুপুরাণ উইলসন সাহেব ইংরেজীতে অন্তরিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও ১০৫০ ছিল।

কিন্তু ভারতীভূষণ মহাশয় তিন পুরাণের স্পষ্ট বচনে সন্দিহান হইয়া ১৫০০ বর্ষ মনে করেন। কারণ টীকাকার বিষ্ণুচিত্ত ও শ্রীধর স্বামী পুরাণ হইতে বৃহদ্রথ বংশের ১০০০, প্রদ্যোত বংশের ১৩৮ এবং শিশুনাগ বংশের ৩৬২ বর্ষ রাজ্যকাল যোগ করিয়া ১৫০০ বর্ষ দেখাইয়াছেন। বিষ্ণুচিত্ত এইরূপে সার্ধসহস্র গণিয়া লিখিয়াছেন "বায়ুক্তেঽপি পরীক্ষিন্নন্দান্তরং সার্ধসহস্রমেবেত্যুক্তম্", বায়ু পুরাণেও সার্ধসহস্র বর্ষ। এ কথা ঠিক। বায়ু ও অন্য তিন পুরাণ প্রদত্ত তিন বংশের রাজ্যকাল যোগ করিলে ১৫০০ বর্ষ হয়। তথাপি চারি পুরাণের এক-খানিতেও এই যোগফল স্বীকৃত হয় নাই। প্রথম তিন পুরাণে ১০৫০, চতুর্থ পুরাণে ১১৫০ বর্ষ লিখিত আছে। মূল পুরাণে কি পাঠ ছিল, কিম্বা বর্তমান পুরাণে কি পাঠ উচিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। কি আছে তাহাই বিবেচ্য। দুই দশ বৎসর নয়, চারিশত পঞ্চাশ বৎসরের অন্তর। নিশ্চয় কোথাও ভুল হইয়াছে।

প্রথমে দেখাই পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর ১৫০০ বর্ষ হইতে পারে না। এই অন্তর পরে নন্দবংশ ১০০ বর্ষ গতে প্রায় খ্রি-পূ ৩১৩ অব্দে মৌর্যচন্দ্রগুপ্তের অভিষেক। তদনুসারে পরীক্ষিৎ খ্রি-পূ ১৫০০+১০০+৩১৩=১৯১৩ অব্দে গিয়া উপস্থিত হন। এই অব্দ কিম্বা ইহার নিকটবর্তী অব্দ

১। বৃহৎ কলি-মুখ নয়।

২। যুধিষ্ঠিরাব্দ-মুখ নয়।

৩। বৈবস্বত মন্বন্তরে নয়।

৪। ১২০০ বর্ষের কলিযুগের সন্ধ্যায় নয়।

৫। মঘা-সপ্তর্ষি নয়। পুরাণে সপ্তর্ষি অর্থে প্রথম দুই তারা। সপ্তর্ষির অন্য কোন তারা ধরিবার জো নাই।

৬। মঘা অব্দ-শতক নয়। কারণ পুরাণ মতেই মহানন্দ বিংশ এবং পরীক্ষিৎ দশম শতকে ছিলেন।

৭। পরীক্ষিৎ নন্দান্তর ১০৫০ বর্ষ, ১৫০০ বর্ষ নয়।

সার্ধ সহস্র বর্ষের একটীও সমর্থক নাই। অতএব মনে হয়, উক্ত তিন বংশের রাজ্যকাল বুঝিতে ভুল হইতেছে।

প্রথমে বার্হদ্রথ বংশ দেখি। চেদিদেশে উপরিচর-বসু নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ। ইঁহা হইতে বংশের নাম বার্হদ্রথ হইয়াছিল। ইঁহার অন্বয়ে আর এক বৃহদ্রথ জন্মিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বৃহদ্রথ হইতে নবম পুরুষ। তৎপুত্র জরাসন্ধ দশম, তৎপুত্র সহদেব একাদশ (মৎস্য ৫০।২৬—৩৩)। ইনি ভারতযুদ্ধে নিহত হন বায়ুপুরাণে (৯৯।২১৩—২২৭) দশজনের নাম আছে। একটি লুপ্ত। বিষ্ণুপুরাণে (৪ ১৯) কয়েকজনের নাম লুপ্ত। প্রথম বৃহদ্রথ হইতে ৩২ রাজা ১০০০ বর্ষ রাজ্য-ভোগ করেন। অন্তিম রাজা রিপুঞ্জয়।

ইক্ষ্বাকুবংশের বৃহদ্বল এবং পুরুবংশের অভিমন্যু ভারতযুদ্ধে নিহত হন। ইক্ষ্বাকুবংশের অন্তিম রাজা ক্ষেমক, এবং পুরুবংশের অন্তিমরাজা সুমিত্র। যথা,

	ইক্ষ্বাকু	পুরু	বৃহদ্রথ
পুরুষ	বৃহদ্বল	অভিমন্যু	সহদেব
১	বৃহৎক্ষণ	পরীক্ষিৎ	সোমাপি
২১	+ +	+ +	রিপুঞ্জয়
২৯	• সুমিত্র	ক্ষেমক	—

দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের পরে ইক্ষ্বাকু ও পুরুবংশের ২৯ পুরুষ চলিয়াছিল। কিন্তু বৃহদ্রথ বংশ ২১ পুরুষ। পুরাণ বলিতেছেন, বার্হদ্রথ বংশের ৩২ রাজা ১০০০ রাজ্য করিয়াছিলেন। মৎস্য পুরাণ ৩২ রাজার নামও দিয়াছেন। প্রথম বৃহদ্রথ হইতে সহদেব ১১, সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় ২১, একত্রে ৩২। অতএব হারাহারি প্রতি পুরুষে ৩১·২ বর্ষ। সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় ২১ পুরুষে ২১×৩১·২=৬৫৫ বর্ষ। কদাপি ১০০০ বর্ষ হইতে পারে না।

কিন্তু বায়ু ও মৎস্য পুরাণ আশ্চর্যকাণ্ড করিয়াছেন। সোমাপি হইতে রিপুঞ্জয় পর্যন্ত নাম করিয়া প্রত্যেকের রাজ্যকাল দিয়া ২১ জন দ্বারা ১০০০ বর্ষ পূর্ণ করিয়াছেন! সোমাপি ৫৮, তৎপুত্র ৬৪, তৎপুত্র ২৬, তৎপুত্র ১০০, তৎপুত্র ৫৬ বর্ষ ইত্যাদি রাজ্যকাল বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেহ ৫০,৬০ বর্ষ রাজ্য করিলে তৎপুত্র ৫০,৬০ বর্ষ রাজ্য করিতে পারেন না। কারণ আয়ুর সীমা আছে। পুরুষকাল ৩০ বর্ষের অধিক ধরিতে পারা যায়না। ২১ রাজার ৬৫০ বর্ষ রাজ্যভোগও সাধারণ নয়। কবি লিখিয়াছেন, তিনি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যরাজগণের নাম "প্রাধান্যতঃ" বলিতেছেন। ইহার অর্থ, তিনি প্রধান প্রধান রাজগণের নাম করিয়াছেন, সকলের করেন নাই। আমরা যাবতীয় রাজার নাম চাইনা, চাই বংশাবলী। কবি তস্যপুত্র তস্যপুত্র এবং প্রত্যেকের রাজ্যকাল লিখিয়া বংশাবলীতে অবকাশ রাখেন নাই। বিষ্ণুপুরাণ প্রত্যেকের রাজ্যকাল লেখেন নাই।

কি কারণে বার্হদ্রথ বংশ রিপুঞ্জয়ে সমাপ্ত হয়, তাহা বায়ু ও মৎস্য লেখেন নাই। কবি লিখিয়াছেন,

বৃহদ্রথেষ্বতীতেষু বীতিহোত্রেষ্বন্তিষু।
পুলকঃ স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রমভিষেক্ষ্যতি॥

বৃহদ্রথবংশ অতীত হইলে, অবন্তিতে বীতিহোত্র (অগ্নি) বংশের রাজ্যকালে পুলক (প্রকৃত নাম প্রদ্যোত) স্বীয় রাজাকে হত্যা করিয়া স্বপুত্র (পালককে) অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কোন্ রাজ্যে? তখন মগধে বৃহদ্রথ বংশ অতীত। অতএব মনে হয় অবন্তী রাজ্যে হত্যা হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে লিখিয়াছেন, মুনিক নামে অমাত্য রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া স্বপুত্র প্রদ্যোতকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখানে অবশ্য মগধরাজ্য বুঝিতে হইবে। দুই উক্তি এক নয়, সন্দেহ হইতেছে। এই সন্দেহের অপর কারণ আছে। মৎস্য পুরাণ (২৭২) লিখিয়াছেন, বীতিহোত্র বংশ ২০ পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশ্য মগধে নয়। সে বংশের অবসান কেন হইয়াছিল পুরাণ লেখেন নাই। হত্যা দ্বারা অবসান? কে জানে।

মনে করি রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া অমাত্য স্বপুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। তস্যপুত্র তস্যপুত্র করিয়া পাঁচপুরুষ ১৩৮ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। অন্তিম রাজা নন্দিবর্ধন।

তারপর দেখিতেছি, এক শিশুনাগ বংশ ১০ পুরুষ রাজ্য করিয়াছিলেন। এই শিশুনাগ কোথা হইতে আসিলেন? বায়ু ও মৎস্য বলিতেছেন, শিশুনাগ প্রদ্যোত বংশের পঞ্চম রাজা নন্দিবর্ধনের যশঃ হরণ করিয়া (পরাজয় করিয়া?) নিজে মগধে বসিলেন ও স্বীয় পুত্রকে বারাণসীতে বসাইলেন। তাহা হইলে শিশুনাগ এক আগন্তুক। তিনি প্রদ্যোতবংশের অন্বয় নহেন। প্রদ্যোতবংশের হইলে, শিশুনাগ বংশ এই নূতন নাম হইত না, প্রদ্যোতবংশের ১৫ রাজা গণিত হইত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, শিশুনাগ নন্দিবর্ধনের পুত্র। কোনটা সত্য, কে জানে। তদুপরি ১০ পুরুষে ৩৬২ বর্ষ রাজ্যভোগ অধিক বোধ হইতেছে।

অনিশ্চিত রাজবংশের অনিশ্চিত রাজ্যকালে নির্ভর করিতে পারা যায়না। এই কারণে আমি ত্যাগ করিয়াছি। বিতর্কদ্বারা ফল হইবে না, স্বমতি আসিয়া পড়িবে! মগধে বৃহদ্রথ বংশ ২১ পুরুষ, প্রদ্যোত ৫ পুরুষ, ও শিশুনাগ ১০ পুরুষ, এই ৩৬ পুরুষ পরীক্ষিৎ ও নন্দের অন্তরে রাজ্য করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রতি ৩০ বর্ষ ধরিলে ১০৮০ বর্ষ। পুরাণ লিখিয়াছেন ১০৫০ বর্ষ। অবিশ্বাসের হেতু দেখিতেছিনা।

শ্রীযুক্ত ত্রিভুবন মহাশয়ের দ্বিতীয় তর্ক, বায়ু ও মৎস্য লিখিত সপ্তর্ষি গণনায় ১৫০০ বর্ষ আছে। আমি এই দুই পুরাণের শ্লোকগুলি অনেকবার পড়িয়াছি, এবং প্রয়োজনীয় অংশ বিষ্ণুপুরাণের তুল্য দেখিয়া প্রবন্ধে পৃথক উল্লেখ করি নাই। বিষ্ণুপুরাণের অতিরিক্ত শ্লোকে পরীক্ষিৎ-নন্দান্তর প্রসঙ্গ নাই। বায়ু ও মৎস্যের শ্লোকে এত সাদৃশ্য যে উভয়ের মূল একই ছিল, কালান্তরে লিপিকর-প্রমাদে স্থানে স্থানে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে মৎস্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক বায়ু পুরাণের (৯৯।৪১৫—৪২১) সহিত মিলাইয়া লইবেন।

"বঙ্গবাসী"র মৎস্য অঃ ২৭৩।

১। মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
এবং বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাড়হুত্তরম্ ॥ ৩৫

২। পৌলোমাস্ত তথাক্ধ্রান্ত মহাপদ্মান্তরে পুনঃ।
অনন্তরং শতান্যষ্টৌ ষট্‌ত্রিংশৎতু সমাস্তথা ॥ ৩৬

৩। তাবৎ কালান্তরং ভাব্যমান্ধ্রান্তাদাপরীক্ষিতঃ।
ভবিষ্যেতে প্রসংখ্যাতাঃ পুরাণজ্ঞৈঃ শ্রুতর্ষিভিঃ ॥ ৩৭

৪। সপ্তর্ষয়স্তদা প্রাংশু প্রদীপ্তেনাগ্নিনাসমাঃ।
সপ্তবিংশতি ভাব্যানামান্ধ্রানাস্ত যদা পুনঃ ॥ ৩৮

৫। সপ্তর্ষয়স্ত বর্ত্তন্তে যত্র নক্ষত্রমণ্ডলে।
সপ্তর্ষয়স্ত তিষ্ঠন্তি পর্য্যায়েণ শতংশতম্ ॥ ৩৯

৬। সপ্তর্ষিণামুপর্য্যেতৎ স্মৃতং বৈ দিব্যসংজ্ঞয়া।
সংখ্যাদিব্যাঃ স্মৃতাঃ ষষ্টির্দিব্যাব্দানি তু সপ্তভিঃ।
এভি প্রবর্ত্ততে কালো দিব্যঃ সপ্তর্ষিভিস্তবৈ ॥ ৪০

৭। সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে হ্যুদিতৌ নিশি।
তয়োর্মধ্যে তু নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং দিবি ॥ ৪১
তেন সপ্তর্ষয়ো জ্ঞেয়া যুক্তা ব্যোম্নি শতং সমাঃ।
নক্ষত্রাণামৃষীণাঞ্চ যোগস্ত্বেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৪২

৮। সপ্তর্ষয়ো মঘাযুক্তাঃ কালে পারিক্ষিতে শতম্।
ব্রহ্মণস্ত চতুর্বিংশা ভবিষ্যন্তি শতম্ সমাঃ ॥ ৪৩

মুদ্রিত পাঠ উদ্ধৃত হইল। এত অশুদ্ধ যে মিলাইতে পারা যায় না। বায়ু পুরাণের পাঠও তথৈব। দুই পাঠ মিলাইয়া ভাবার্থ দিতেছি।

১। "পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহাপদ্মের অভিষেক ১০৫০ বর্ষ।"

২।৩। এখানে বায়ুর বাক্য অপূর্ণ, 'যৎ' পরে 'তৎ' নাই। "মহাপদ্ম ও অন্ধ্ররাজ পৌলোমার অন্তর ৮৩৬ বর্ষ। অন্ধ্রান্ত ও পরীক্ষিৎ হইতেও ততকাল পুরাণজ্ঞ ও শ্রুতজ্ঞেরা ভবিষ্য পুরাণে সংখ্যা করিয়াছেন।"

ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে, পরীক্ষিৎ-মহাপদ্ম ৮৩৬, এবং মহাপদ্ম-অন্ধ্রান্ত ৮৩৬ বর্ষ *। পৌলোমা অন্ধ্র বংশের অন্তিম রাজা। অতএব পরীক্ষিৎ হইতে অন্ধ্রান্ত ৮৩৬+৮৩৬=১৬৭২ বর্ষ। পরীক্ষিৎ সপ্তর্ষির দশম শতকে ছিলেন, অন্ধ্রান্ত ১০০০+১৬৭২=সপ্তবিংশ শতকে হইয়াছিল। ৪র্থ শ্লোকে এই কথা আছে।

কিন্তু পরীক্ষিৎ হইতে মহাপদ্ম ১০৫০ বর্ষ, ১ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অন্ধ্রান্ত দুইবারই বা কেন? দ্বিতীয় অন্ধ্রান্ত স্থানে সুমিত্র করিলে সঙ্গত অর্থ আসে। মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রান্ত ৮৩৬, আর পরীক্ষিৎ হইতে সুমিত্র ৮৩৬ বর্ষ। সুমিত্র পরীক্ষিতের অন্তিম বংশধর, ২৯ পুরুষ, পরীক্ষিতের ৮৩৬ বর্ষ পরে আসিয়া থাকিবেন। অন্ধ্রান্ত সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

---

* ত্র্যম্বক কালে মৎস্য পুরাণের এই পরীক্ষিৎ—নন্দান্তর ৮৩৬ বর্ষ ধরিয়া ভারতযুদ্ধ খ্রি-পূ ১২৬৩ অব্দে আনিয়াছেন। বিলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের ইংরেজী অনুবাদে 'সহস্রবর্ষং পঞ্চাশদুত্তরম্' It was 1000 years less by Fifty করিয়াছেন। অর্থাৎ সহস্র বর্ষে পঞ্চাশ অধিক। অতএব ১০০০—৫০=৯৫০। পণ্ডিত শাম শাস্ত্রীও এই অর্থ মনে করিয়াছেন। কালে লিখিয়াছেন, আনন্দাশ্রম মুদ্রণাশয়ের এবং কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির বায়ু পুরাণে আছে,

মহাদেবাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
একবর্ষ সহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্ ॥

তিনি মনে করেন, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের নাম মহাদেব, এবং 'একবর্ষ সহস্রং পঞ্চাশদুত্তরম্' ১০০১—৫০=৯৫১ যুদ্ধের পরে বর্ষ।

পরীক্ষিতের অভিষেক ১৫ বর্ষ বয়সে
পরীক্ষিৎ হইতে মহানন্দ অভিষেক ৮৩৬
নবনন্দ ১০০
চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ৯৫১ বর্ষ
অভিষেকাব্দ ৩১২
খ্রি-পূ ১২৬৩ যুদ্ধাব্দ

ব্যাখ্যাটি নূতন, এইহেতু এখানে উদ্ধৃত করিলাম। সকল পুরাণেই মহাপদ্ম বা মহানন্দ আছে। চন্দ্রগুপ্তকে যে মহাদেব বলা যইত, তাহারও প্রমাণ নাই। টীকাকারেরা ৯৫০ বুঝেন নাই, ১০৫০ বুঝিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মঘা এই ব্যাখ্যার প্রবল বিরোধী।

৪। এই শ্লোক হইতে সপ্তর্ষি-প্রসঙ্গ আরম্ভ। সপ্তর্ষি নামের চারি অর্থ হইয়াছিল। (১) শকটাকারে অবস্থিত সপ্ততারা সম্বলিত নক্ষত্র বিশেষ, (২) সপ্তর্ষি নক্ষত্রের প্রথম দুই তারা, (৩) সপ্তর্ষি অব্দ-শতক, (৪) দক্ষিণায়ন। এই শ্লোকের বায়ুর পাঠে প্রেতীপে রাজ্ঞি বৈ শতম্' আছে। তাহার অর্থ হয় না। প্রেতীপে রাজ্ঞি' অর্থে কেহ কেহ প্রতীপ রাজার কালে মনে করিয়াছেন। পরীক্ষিতের উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম প্রতীপ ছিল। কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করিবার কোন হেতু পাওয়া যায়না। তার পরই বা কি? কিন্তু কবির অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইতেছে। "উর্দ্ধ আকাশে প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য সপ্তর্ষি অন্ধ্রান্ত কালে সপ্তবিংশ শতকে থাকিবেন।" পরীক্ষিৎ দশম শতকে ছিলেন। তাহার ১১০০ বর্ষ পরে অন্ধ্রান্ত হইয়াছিল।

৫। বায়ুর পাঠ শুদ্ধ। "নক্ষত্র-চক্রে ২৭ নক্ষত্র। সপ্তর্ষি শতবর্ষক্রমে সপ্তবিংশ নক্ষত্র ভোগ করেন।"

৬। বায়ু ও মৎস্য মিলাইয়া অর্থ। এখানে সপ্তর্ষি দক্ষিণায়ন। "৬০ দিব্য বর্ষে সপ্তর্ষির ১ বৎসর বা ১ যুগ।" অর্থাৎ ৬০×৩৬০ বর্ষে অয়ন নক্ষত্রচক্র ভ্রমণ করে। অর্থাৎ ৬০ বৎসরে অয়ন ১ দিন সরে। (কবি সপ্তর্ষি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য একত্র করিতে গিয়া এখানে অয়ন-চলন আনিয়াছেন। কিন্তু এখানে অকারণ। আর এক সপ্তর্ষি বৎসর ছিল। তাহার পরিমাণ ৩০৩০ মানুষ বৎসর (বায়ু ৫৭, মৎস্য ১৪২)। সেটি প্রাচীন।

৭। এখানে সপ্তর্ষি, পুলহক্রতু। পূর্ব প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে। বায়ুর শ্লোক অশুদ্ধ।

৮। বায়ুর শ্লোক শুদ্ধ। "পরীক্ষিতের' কালে সপ্তর্ষি মঘাতে ছিলেন, অন্ধ্রান্ত কালে চতুর্বিংশে থাকিবেন।"

চারি পুরাণেই এই বাক্য আছে। তথাপি মৎস্য ও বায়ু ৪র্থ শ্লোকে সপ্তবিংশ শতকে অন্ধ্রান্ত বলিয়াছেন। বিষ্ণু ও ভাগবতে আছে, সপ্তর্ষি মহানন্দের কালে পূর্বাষাঢ়ায় বা বিংশ নক্ষত্রে ছিলেন। এই সকল উক্তি একত্র করিলে

১। সপ্তর্ষির দশম শতকে পরীক্ষিৎ (আমার অনুমানে খ্রি-পূ ১৪৪০—১৩৪০)

২। " বিংশ " মহানন্দ (৪৪০—৩৪০)

৩। " চতুর্বিংশ " (প্রথম) অন্ধ্রান্ত (খ্রিপূ ৪০—খ্রিপ ৬০)

৪। " সপ্তবিংশ " (দ্বিতীয়) অন্ধ্রান্ত (খ্রিপ ২৬০—৩৬০)

অন্ধ্রান্ত দুইকালে লিখিত হইয়াছে। একই দেশের পক্ষে দুই উক্তি সত্য হইতে পারে না। যেমন বৃহদ্রথ বংশের ৩২ রাজা কতক মগধে কতক অন্য দেশে রাজ্য করিলেও বংশের পূর্ণরাজ্যকাল ১০০০ বর্ষ এখানেও তেমন অন্ধ্র বংশের রাজার কতক মগধে কতক অন্যদেশে রাজ্য করিতেন। এক দেশের রাজত্ব চতুর্বিংশে, এবং অন্য দেশের রাজত্ব সপ্তবিংশে অন্ত হইয়াছিল। বায়ু (৯৯।৩৫৮) লিখিয়াছেন, "অন্ধ্রানাং সংস্থিতাঃ পঞ্চ", অন্ধ্রেরা পাঁচ দেশে রাজ্য করিতেন।

পুরাণে মহাপদ্ম-সহ নন্দ বংশ (৯) ১০০, মৌর্য বংশ (১০) ১৩৭, শুঙ্গ বংশ (১০) ১১২, কণ্ব (৪) ৪৫ বর্ষ—৩৯৪ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর অন্ধ্র বংশ। এই বংশের আরম্ভ দেখি। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত খ্রি-পূ ৩১৩ এবং মহাপদ্ম ৪১৩ অব্দে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অতএব প্রায় খ্রি-পূ ৪১৩—৩৮৪ খ্রি-পূ ২৯ অব্দে অন্ধ্র বংশের আরম্ভ। দেখা যাইতেছে, অন্ধ্র বংশের এক শাখা অনধিক এক শত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। অন্য এক শাখা আরও তিন শত বৎসর করিয়াছিলেন। বর্তমান ইতিহাসের সহিত ইহার ঐক্য আছে কিনা, তাহা এখানে বিবেচ্য নহে।

কিন্তু মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রান্ত ৮৩৬ বর্ষ, এই উক্তিতে সংশয় হইতেছে। কারণ মহাপদ্ম বিংশ নক্ষত্রে থাকিলে অন্ধ্রান্ত অষ্টাবিংশে আসিয়া পড়ে। অপরঞ্চ, মহাপদ্ম হইতে কণ্ব বংশের ভোগ ৩৯৪ বর্ষ। তদনন্তর পুরাণ মতে ৩০ অন্ধ্রারাজার ভোগ কাল ৪৫৬ বর্ষ। মোট ৮৪০ বর্ষ। ইহাই ৮৩৬ বর্ষ। কিন্তু মহাপদ্ম খ্রি-পূ ৪১৩ অব্দে অভিষিক্ত হইলে ৮৩৬—৪১৩=খ্রি-প ৪২৩ অব্দে অন্ধ্রান্ত ঘটে। অতএব মহাপদ্মকে শত বৎসর পূর্বে লইতে হয়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, নড়াইবার জো নাই! ইহা হইতেও বুঝিতেছি ২য় ৩য় শ্লোকের অর্থ ঠিক হয় নাই, পাঠে ভুল আছে। ভারতযুদ্ধাব্দ নির্ণয়ের নিমিত্ত অন্ধ্রান্তকাল জানিবার প্রয়োজনও নাই।

সে যাহা হউক বায়ু ও মৎস্ত পুরাণে পরীক্ষিৎনন্দান্তর ১৫০০ বর্ষ এবং পরীক্ষিৎকে খ্রি-পূ বিংশ অব্দ-শতকে পাইলাম না। ইহাতে ভারতীভূষণ-মহাশয়ের স্থায় আরও কেহ কেহ দুঃখিত হইবেন। কিন্তু আমার দুঃখ আরও অধিক। আমি বহুকাল যাবৎ যুধিষ্ঠিরকে শকপূর্ব ২৫২৬ (খ্রি-পূ ২৪৪৯) অব্দে কৌরব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছি। ইহার তিন চারি হেতু ছিল।

১। পরাশর-নন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরের কালে ছিলেন। তিনি বেদ-ব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। যজুর্বেদ খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দের। অতএব এই অব্দে যুধিষ্ঠির ছিলেন। ২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের নাম আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় অশ্বমেধ করিয়াছেন! এই ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ-পুত্র ভীমসেন উগ্রসেন শ্রুতসেন এই তিন রাজার নামও আছে। শতপথে ধৃতরাষ্ট্রের নামও আছে। শতপথ অপেক্ষা ঐতরেয় পুরাতন। শতপথ যজুর্বেদের ছয়শত বৎসরের অধিক পরে মনে করিতে পারা যায় না। অতএব পরিক্ষিৎ এই দুই ব্রাহ্মণের পূর্বে ছিলেন। ৩। বৃদ্ধগর্গ জ্যোতিষী ছিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরাব্দমুখ খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে বলিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে যুধিষ্ঠিরাব্দ এই নাম কেন হইবে? ৪। ভারতবর্ষের প্রাচীনতার গৌরব ভারতীমাত্রেরই স্বাভাবিক।

গত বৎসর যাবতীয় প্রমাণ একত্র করিয়া ভারত যুদ্ধাব্দ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই। দেখিলাম আর্য্যভটের স্থায় অসামান্ত জ্যোতিবিদ্ পাঁজির কলিমুখে যুদ্ধ ঘটাইয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী বৃদ্ধ গর্গের মত্ মানেন নাই। জ্যোতির্বিৎ হইলেই পুরাবৃত্তবিৎ হইতে হইবে, এমন কথাও নাই। কোন বিষয়ের সাক্ষী অনেক থাকিলে, এবং কেহ আপ্ত না হইলে অধিকাংশের উক্তির ঐক্যাংশ সত্য মানিতে হয়। এখানে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন গ্রন্থে একই বাক্যের আবৃত্তি নয়। এক এক সাক্ষী এক এক প্রকার উক্তি করিয়াছেন, আপাততঃ ঐক্যাংশ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐক্য পাইলে সংশয় থাকে না। অধিকন্তু অনেকের উক্তি স্বীকার করিলে অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এইটি চরম পরীক্ষা। অগত্যা যুধিষ্ঠিরাব্দ-মুখের সহস্র বর্ষ পরে আসিতে হইয়াছে। সহৃদয় পাঠক আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবেন।

অন্য হেতুদ্বয়ের দশা কি হইল? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কনিষ্ঠ ব্যাস। তাঁহার পূর্বে বেদের অংশ বিভাগ বহুবার হইয়া থাকিবে, বিষ্ণুপুরাণে একথার আভাস আছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের পূর্বেও স্মৃতি ছিল, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠ স্মৃতিকার, তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারত ও পুরাণে আর এক পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের নাম আছে। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণের নামের সহিত দ্বিতীয় জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণের নামের ঐক্য দেখিয়া প্রথমটিতে সন্দেহ হয়। ধৃতরাষ্ট্রের নামও সে সন্দেহ দৃঢ় করিতেছে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণের সমগ্র এককালে প্রণীত হয় নাই। বেদ-সংহিতা হয় নাই, মহাভারত, পুরাণ, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি হয় নাই। ভাষা দেখিয়া নূতন যোজনা ধরিবার জো নাই। যেখানে চন্দ্রসূর্য-নক্ষত্র কালের সাক্ষী, সেখানে অন্য সাক্ষীর অ-কাল উক্তি বলবতী হয় না। তথাপি যদি কেহ পরীক্ষিৎকে খ্রি-পূ ১৪৫০ অব্দের পূর্বে দেখাইতে পারেন, আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না।

হাসি

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আশ্চর্য্য!—রুষ্ট রামকমল ইহার পর অসাধারণ ধীরতার সহিত আত্মস্থ হইয়া সাধারণ স্বাভাবিকতায় চলিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারে কোন প্রকার বাহ্যিক বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইল না। সন্দেহ নাই, এইরূপ বিস্ময়কর অটুট সংযমের অধিকারী হওয়া যে-সে কথা নহে এবং যে-সে লোকের পক্ষে সম্ভবপরও নহে। আর,—সহস্রধর শিষ্যের মন্ত্রদীক্ষক-গুরু শ্রীমৎ রামকমল ঠাকুর সত্যই ত' যে-সে লোকও নহেন!

তাঁহার এই অবিচলিত ধৈর্য্য ও সংযমের সহজ অধিকারের মূলে বিশেষ দুইটি কারণ ছিল—একটি, নিয়মিত অহিফেন-সেবন; অপরটি, নিয়মিত ভাবে নগেন ডাক্তারের নিভৃত বৈঠকখানায় দ্বৈরথ দাবা-যুদ্ধে মধ্যাহ্ন-যাপন। অহিফেনের আচ্ছন্ন ভাব ও দাবার নিমগ্নতা যৌগিক মিশ্রণের রাসায়নিক রচনাকুশলতায় তাঁহার মস্তিষ্কের চিন্তাচক্রে একটি কুটিল প্রচ্ছন্নতার সরীসৃপমণ্ডল রচনা করিয়াছিল। বাহির হইতে তাঁহার আভ্যন্তরিক বিচলন ক্বচিৎ পরিলক্ষিত হইত,—আত্মসম্মান আহত হইলেও তিনি আত্মগোপন করিতে জানিতেন এবং দংশন করিতে অভিলাষী হইলে অন্ধকারে-বিচরণকারী সর্পের মত অলক্ষিতে দংশন করিতেন, কিন্তু দংশনের পূর্ব্বে ফোঁস্ করিতেন না।

দীর্ঘ মধ্যাহ্ন নগেন ডাক্তারের বৈঠকখানায় দাবা-দ্বৈরথে কাটাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামকমল সেদিন বিশ্বস্ত ক্রীড়াবন্ধুপ্রদত্ত একটি লেবেল-হীন ছিপি-আঁটা ছোট শিশি উত্তরীয়তলে সঙ্গোপনে লুকাইয়া লইয়া চলিলেন।—এই নগেন ডাক্তারের অদ্ভুত একটি গ্রাম্য-বৈঠকীয় উপাধি ছিল—'ত্র্যহস্পর্শ'। ইনি স্বীয় বিশেষত্বে তদঞ্চলে একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক ও ঔষধ-প্রস্তুতকারক বলিয়া বিদিত। এলোপ্যাথি, হোমিও-প্যাথি ও কবিরাজি—এই তিনপ্রকার চিকিৎসাপ্রণালী এক সঙ্গে মিলাইয়া এই চিকিৎসকপ্রবর এক অভিনব চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বহস্তপ্রস্তুত ঔষধগুলিও ঐরূপ অপূর্ব্ব ত্রিসংমিশ্রণসৃষ্ট। উক্ত 'ত্র্যহস্পর্শ' উপাধিটিতে উহারই রহস্যার্থ নিহিত আছে।

—"এক বড়ি করে' বল্‌লে না?"

—"হ্যাঁ, দিনে রাতে যখনি হোক্ এক-এক বড়ি রোজ—জল হোক্ দুধ হোক্ বা পাণের সঙ্গে। মাস-খানেক চলুক্ ত'।"

—"খেতে কিছু—?"

"স্বাদ গন্ধ কিচ্ছু নেই,—চমৎকার ওষুধ!"—হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন।

মস্তিষ্কে চক্রান্ত করিতে করিতে রামকমল ধীরে ধীরে অন্যমনস্কের মত গৃহে ফিরিলেন।

মাসখানেক হইবে। ইহারই মধ্যে হাসির অমন সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল কি করিয়া! পেটে ও পিঠে-পাঁজরে ব্যথা, বিবমিষা, চক্ষু ও ত্বকের বর্ণ রক্তহীন পাণ্ডুর,—বুক ধড়্‌ফড়্ করে হাঁটিলে বা অধিক কথা কহিলে,—সন্ধ্যার দিকে গাত্রতাপ বৃদ্ধি পায়। এত দিন এই ক্রম-সহিষ্ণু দুর্ব্বল দেহ লইয়াই হাসি কোন প্রকারে সংসারের কাজ চালাইয়া আসিতে-ছিল, কিন্তু কয়েক দিন হইতে সে যেন সম্পূর্ণই অপটু হইয়া পড়িয়াছে—কোন স্থানে চুপচাপ বসিয়া থাকা ছাড়া সামান্য শ্রমসাধ্য কর্ম্মও সে এখন করিয়া উঠিতে পারে না।—চির-অনলসা কর্ম্মঠা মেয়ে হাসির এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

এই এক মাসে রামকমলেরও কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই?—হইয়াছে। যে গাম্ভীর্য্যের আবরণে তিনি আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিলেন, অলক্ষিতে তাহারই উপর কখন যে তাঁহার অপরাধী মনের অসতর্ক ছায়াপাত হইয়াছিল, তিনি নিজে তাহা বুঝিতে না পারিলেও, বাহির হইতে লক্ষ্য করিলে উহা একান্ত দুর্ব্বোধ্য ছিল না। সর্ব্বদাই সচকিত অন্যমনস্কতা,—সাংসারিক ব্যাপারে

শিথিল ঔদাসীন্য,—অহেতুক বিরক্তিপ্রকাশ! অনুতাপ? —হইতে পারে। মানুষের মন ত'! 'ত্র্যহস্পর্শ' বড়িগুলি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত না হইতেই সহসাই সেদিন তিনি শিশিশুদ্ধ কোথায় ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। কয়েক দিন হইতে পীড়িতার শুশ্রূষার দিকেও যেন তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনুতাপ-পরিশুদ্ধ প্রাণে অনুরাগ অঙ্কুরিত হইল কি? অথবা, একটা মনোহর ভোগপাত্র হাত হইতে পড়িয়া হেলায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে,—একটি স্ফুটনোন্মুখ সুন্দর কুঁড়ি চোখের উপরে শুকাইয়া উঠিতেছে, বিলাসীর পান-লালসা ও ঘ্রাণ-বিলাস পরিতৃপ্ত হইল না!—

বধূর স্বাস্থ্যের আকস্মিক দ্রুত অবনতিতে শঙ্কিত হইয়া খুড়ীমা একদিন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—"বৌয়ের অবস্থা যেন কেমন-কেমন,—বাপ-মা'কে খবর দে না তুই?"

রামকমল যেন অকূলে কূল পাইলেন—'যাক্, বাঁচা গেল!'

—অপরাধী যেন অপরাধ গোপন করিবার নিশ্চিত উপায় খুঁজিয়া পাইল। একটা আশ্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বস্তির স্বরে তিনি কহিলেন,—"আজই দিচ্ছি খুড়ীমা, তাঁদের তার করে'। মন আমার বড্ড খারাপ —ও কেন হঠাৎ অমন হ'য়ে পড়্‌ল!"

রামকমল ঠাকুর তদীয় স্কন্ধলম্বিত গাত্রমার্জ্জনীপ্রান্তে উভয় চক্ষুপ্রান্ত স্পর্শ করিলেন।—খুড়ীমা করিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি বক্র-কটাক্ষপাত।

দীননাথের গৃহপ্রাঙ্গণে বেশ একটি ছোটখাট ভীড় জমিয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের বালক-বালিকা-নারীর দল যেন গ্রাম ভাঙ্গিয়া সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে।—গ্রামের ঝিয়ারী হাসি তাহাদের কতদিনের পর আজ যে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল!

বেলা তখনও প্রহর পূরে নাই। পূব্‌ঘরের খোলা-বারান্দায় যেখানটায় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝুঁকিয়া-পড়া পুষ্পিত শাখার ছায়া আসিয়া আঁচল বিছাইয়া বসিয়াছে, সেখানে একটি পুরু বিছানা পাতিয়া দিয়া চারিদিকে উঁচু করিয়া বালিস সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই বিছানার উপর বালিস ঠেসান দিয়া আছে—হাসি নয়, হাসির কঙ্কাল! বৃদ্ধা ঠাকুমা একখানি পাখা হাতে করিয়া আসিয়া পাশে বসিয়াছেন, যদিও বাতাস করিবার প্রয়োজন নাই—বাহিরে বেশ ঝিরঝিরে বাতাস।

বালক-বালিকারা একটি-দুইটি করিয়া উঠান হইতে বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া একে-একে বিছানা ঘেঁসিয়া প্রথমে দাঁড়াইয়া ছিল, এখন বসিয়া পড়িয়াছে;—কি বলিয়া তাহারা তাহাদের হাসিদি'র সহিত কথা আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না!—এ কি সত্যই তাহাদের সেই হাসি দি'—?

আর একটু দূরে পাড়ার বয়স্কা মেয়েরা নীরবে কেহ দণ্ডায়মানা, কেহ উপবিষ্টা। সকলেরই মুখভার গম্ভীর—মলিন। হাসির দিকে চাহিলে যে চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠে!—আহা রে বাছা!

একজন বর্ষীয়সী কহিলেন,—"ভীড় কমিয়ে সরে' দাঁড়াও গা তোমরা একটু!—অ বৌমা, হাসিকে একটু দুধ গরম করে' এনে খাওয়াও না?"

হাসির মা দুধ আনিতে গেলেন—তাঁহার পা কাঁপিতেছিল, তিনি চোখে ঝাপ্‌সা দেখিতেছিলেন।—এই কি তাঁহার সোণার মেয়ে হাসি!

দেবনাথ কবিরাজ ডাকিতে গিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে দুই-চারিজন প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়াছিলেন; দীননাথকে ডাকিয়া হাসির সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন।

উঃ!—মুখ বিকৃত করিয়া হঠাৎ হাসি কোঁকড়াইয়া কুঁচ্‌কাইয়া শুইয়া পড়িবার মত হইল—ইঃ! কি যে অসহ্য সেই পেটের ব্যথা! মুহূর্ত্ত মাত্র। তখনই আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া সে সহজ ও সোজা হইয়া বসিল।—এই ত' তাহার আজন্মের পরিচিত পিতৃগৃহ,—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর আত্মীয়-পরিজন,—সরলপ্রাণ শিশুসাথীর দল! —ঐ ত' সুন্দর আলো আকাশে,—বাতাসে মধুর বন-গন্ধ!—সারিয়া যাইবে,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এ ব্যাধি তাহার সারিয়া যাইবে—যাইবেই!—হাসি হাসিল—কঙ্কালের মুখে ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র প্রাণের হাসি!

* * * *

সেই দিন এবং সেই সময়। শ্রীমৎ রামকমল ঠাকুর তাঁহার শয়ন-কক্ষের একান্তে একাকী গালে হাত দিয়া বিষণ্ণ ম্লান মুখে বসিয়া ছিলেন—তাঁহার চোখে মুখে কে যেন কালী মাড়িয়া দিয়াছে!

খুড়ীমা কষ্টে তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া, তাঁহাকে ঐরূপ বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও কি রে রাম, অমন করে' বসে' আছিস্ যে ওখানে—?"

"ও—এম্‌নি"—রামকমল উত্তর দিলেন, কিন্তু তেমনই বসিয়া রহিলেন।

"ভাবিস্ নি;—ভগবান করুন, আবার বৌ তোর ভালো হ'য়ে এসে ঘর কর্‌বে।"—এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া খুড়ীমা প্রস্থান করিলেন।

রামকমল কি বিরক্ত হইলেন?—কি জ্বালা! বৌ ভালো হইয়া আসিয়া ঘর করিবে, সে জন্য সত্যই কি তাঁহার ঘুম হইতেছে না?—তিনি জোর করিয়া বিদ্রোহী মনকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন।

কিন্তু, যে কারণেই হউক, ঘুম যে তাঁহার হইতেছে না, ইহাও সুনিশ্চিত। গতরাত্রি সম্পূর্ণ জাগিয়া কাটিয়াছে—এলো-মেলো কত-কি ভাবিয়াছেন মাথামুণ্ডহীন ভাবনা! আজও সকাল হইতে গালে হাত দিয়া ঘরের কোণটিতেই তিনি ঠায় বসিয়া আছেন।—কেন?

দেয়ালের গা'য় কতকগুলি নূতন ও পুরাতন ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছিল। একখানি বিচিত্র ক্যালেণ্ডারের প্রতি অন্যমনে চাহিতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। একটি সুগৌর শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া এক শ্যামশ্রী তরুণী জননী সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছেন—'রাঙা শিশু জড়ায় বাহু কালো মায়ের গলে';—মা'র মুখে উজ্জ্বল-সুন্দর হাসি।

হাসি—স্বর্গীয় হাসি,—সুপবিত্র হাসি! আপন মনের অলীক আবিলতা দিয়া এই হাসিকে তিনি মলিন করিতে চাহেন?—এই হাসি,—ঐ শিশু—

রামকমল দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার গালে হাত দিয়া বসিলেন। অজ্ঞাতেই একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

"ও কি! নাওয়া-খাওয়া নেই, এখনো তুই গালে হাত দিয়ে তেম্‌নি করেই বসে' আছিস্ ওখানে?"—খুড়ীমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন।

রামকমলের যেন সম্বিত হইল—আবার তিনি বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিলেন। খুড়ীমা'র মুখের দিকে চাহিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"আমি শীগ্‌গির নেয়ে আস্‌ছি খুড়ীমা, তুমি খাবারের ঠাঁই করে' রাখো গে'। এখনি খেয়ে-দেয়ে আমি গোঁসাইগঞ্জ রওনা হ'চ্ছি ওদের ওখানে—"

খুড়ীমা চাহিয়া দেখিলেন—ভ্রাতুষ্পুত্রের চক্ষু দুইটি সত্যই আজ আকুল অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছে,—ছলছল করিতেছে! (শেষ)
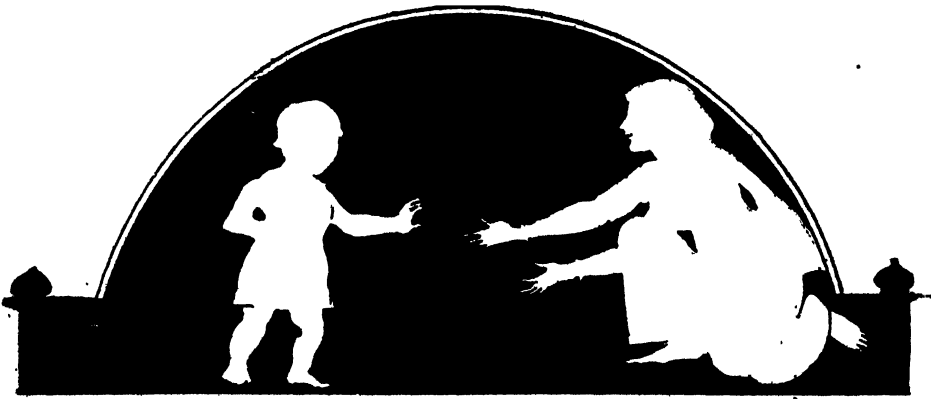
আদর্শ সাহিত্য

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

প্রয়োজনের নানা পণ্যের হাট-বাজার বসে, বড় বড় মেলা বসে। মেলার কাছে ছাউনিতে ছাউনিতে থাকে কত খেয়াল মিটাইবার আয়োজন; এখানে নাগরদোলা, সেখানে ভোজের বাজি, সেখানে গানের পালা। কড়া-ক্রান্তির হিসাবি বুদ্ধিমানেরা পেটের খাদ্য ও পিঠের কাপড় প্রভৃতি ছাড়া বড় জোর দু-একটা পুতুল কেনে, কিন্তু খেয়ালে কিছু খরচ করে না। সাধারণ লোকে কিন্তু একটুখানি অভাবের কথা ভুলিয়া দু-একটা ঘূর্ণিপাক খায়, কৌশলের খেলা দেখে ও দু-একটা গান শোনে। লাভ-লোকসানের হিসাব ছাড়িয়া যখন কবির গানে শোনে—'মনে রইল সই মনের বেদনা,' তখন ঘর-সংসারের অভাবের দুঃখ ভুলিয়া, মনে একটা বেদনা কুড়াইয়া বিনা লাভে উদাস বুদ্ধির চালনা করে। ব্যথা-বেদনার কিছু ছিল না, কিছু হারাইয়া সে শোক পায় নাই; তবু গান শুনিয়া লোকের মনে হয়—কি-যেন সে হারাইয়াছে, কে-যেন মনের মানুষ আছে যাহাকে সে খুঁজিয়া পাইতেছে না, কাহাকে যেন কিছু বলিবার ছিল, বলিবার আছে, কিন্তু 'বলি বলি, কথা বলা হোল না'। খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকা ছাড়াও মানুষে একটা অজানা ভাবের সেবা করিয়া সুখী হইতে চায়; ইহাকে কি কবিত্ব-বুদ্ধি নামে ব্যাখ্যা করিব!

এই যে মানুষের মনের প্রকৃতি যে সে মনোহর দৃশ্যে বা মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইলে একটা অজানা নূতন ভাবের ঢেউ তাহার মনকে আঘাত করে, আর সে ঠিক বুঝিতে পারে না যে তাহার মনে বিস্মৃত অতীত যুগের কথা মনে পড়িতেছে, না, একটা নূতন রাজ্যের দিকের অনুভূতির জন্য তাহার ভাবের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—ইহা কবি কালিদাসের একটি অসাধারণ কবিতায় অতি মনোহরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবির কবিতায় প্রাণে নূতন কুঁড়ি ফুটিবার ইঙ্গিত নাই, আছে বিস্মৃত অতীত দিকের ভাবনার কথা। অতুল্য কবিতাটি এই—

রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকে ভবতি যৎ সুখিনোঽপি জন্তুঃ,
তৎ চেতসা ভবতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি।

মনের চারিপাশ হইতে অনাদি, অতীত ও অশেষ ভবিষ্যতের ভাব মুছিয়া ফেলিয়া কড়া-গণ্ডার হিসাব করিয়া কাজের লোক হইবার জন্য রুসের নূতন যুগের প্রবর্ত্তক লেনিন হইয়াছিলেন দৃঢ় ও কঠোরকর্ম্মা। তাঁহার সহকারী ও মিত্র গর্কি, লেনিনকে বিঠোবেনের সঙ্গীত শুনাইতে নিয়াছিলেন; সঙ্গীত শুনিয়া লেনিন উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া গর্কিকে বলিয়াছিলেন যে ঐরূপ সঙ্গীত কর্ম্মের বাধা, কেন না, উহাতে মন এমন কোমল ও ভাবে অবশ হয় যাহাতে কঠোরকর্ম্মা হইয়া সমাজের হিতের জন্য প্রয়োজনের নর-বধ অসম্ভব হয়। এইখানে প্রশ্ন ওঠে যে আমাদের জীবন-বাণী ফুটিয়া ওঠে নিরবধি কঠোর কর্ম্মে, না, অবসরের একটুখানি খেয়ালের উদ্রেকে?

যতই আমাদের দৃষ্টি সংযত করিয়া কর্ত্তব্যের হিসাবের খাতায় লাগাই না কেন, আপনার অচ্ছেদ্য স্বাভাবিক প্রকৃতিতে মানুষ চাহিবেই চাহিবে অসীম চারিদিকের মধ্যে, যে অসীমের অতি নগণ্য কোণায় সে ক্ষুদ্র ও পরিমিত। আমাদের মন হইতে, চেতনা হইতে এই স্বয়ম্ভু ভাবকে কিছুতেই তাড়াইতে পারিব না যে আমরা অজানা, অনাদি ও অশেষের মধ্যে বিচরণ করি। আমাদের চেতনার প্রতি বিন্দুতে, আমাদের সমগ্র মনে অনন্তের অলোপ্য ছাপ রহিয়াছে, ও সেই দিকে আমাদের মন ফিরাইলে আমরা মনোহরের স্বপ্নে বিভোর হইবই হইব, আর সেই ভাবের মধুরতাকে শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিদায়ক সামগ্রী জানিয়া তাহার দিকে নিরন্তর হাত বাড়াইবই বাড়াইব। কবি গয়টের ফাউষ্টের মত জীবনের বহু বিভ্রাট ও যুদ্ধের পর শয়তান মেফিষ্টোফিলিসের প্রভাব এড়াইয়া মনকে প্রসারিত করিয়া বলিতে বাধ্য হইব—Eternal Nature, where shall I grasp thee, O. where!

চেতনায় অসীমের ছাপ দাগা মানুষ, যে প্রকৃতির প্রভাবে অনন্তমুখী হয় ও অফুরন্তকে ভাবিয়া পরম তৃপ্তি পায়, সে প্রকৃতির নাম দিয়াছি কবিত্ব-বুদ্ধি; বিশেষ শ্রেণীর আস্তিকদের ব্যবহৃত 'ভক্তি' শব্দে উহার ব্যাখ্যা হয় না, কেন-না, 'ভজ্' ধাতুমূলক ঐ শব্দে ভজনা করিবার ও তোয়াজ করিবার ভাব আছে, আর উহাতে আনন্দ-মগ্নতার ভাব প্রস্ফুট নয়। প্রেম বলিলে উহার অভিব্যক্তি হয় চমৎকার, কিন্তু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়বিশেষের হাতে প্রেমের গায়ে লাগিয়াছে একটা হাল্কা (vulgar) ভাব যাহা দূর না করিলে প্রেম শব্দের মর্য্যাদা থাকে না। উদ্ভবের অনন্ত উৎসের দিকে তাকাইয়া সেই উৎসের সঙ্গে উদ্ভূতের বাঁধন আঁটিতে না পারিয়া যাঁহারা সন্দেহবাদী বা নাস্তিক নাম পাইয়াছেন, তাঁহারাও অনন্তমুখী হইয়া বিস্মিত ও তৃপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ কবিত্বরসে উদ্ভাসিত তিনি প্রাণস্পর্শী মধুর ধ্বনিতে বা দৃশ্যে আত্মহারা হইয়া অফুরন্তকে ভোগ করেন। নিশাকালে ধ্বনিত পাখীর সুস্বরে কবি Keats আত্মহারা হইয়া ভাবিয়াছিলেন—তিনি অনন্ত প্রসারের মধ্যে উপিয়া গিয়া ও গলিয়া ভুলিতেছিলেন সেই ব্যথার যাতনা, যাহার সঙ্গে বনের পাখীর আনন্দ-গীতি যেন অপরিচিত। Fade far away, dissolve and quit, forget, what thou amongst the trees, Hast never Known—ইহাই কবির উচ্ছ্বাসের বাণী। কবির যে ভাব হইয়াছে সুস্বরে উদ্দীপ্ত, সেই ভাব যে, বিশ্বের উদ্ভবের দিকে তাকাইলে আর সেই উদ্ভবের মনোহারিত্বের সঙ্গে প্রাণের অনুভূত হর্ষ-বিষাদকে জুড়িলে, অতি অধিক মাত্রায় জীবনকে উচ্ছ্বসিত ও তৃপ্ত করে, তাহা কোন কবিতার দৃষ্টান্ত না তুলিয়াই বুঝিতে পারি। কবি Browning এই ভাবের মোহে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—যাহা প্রেমিকের শরীরের clay clod তাহাকেই মথিয়া প্রেমিকেরা পায় অনন্তকে—ঈশ্বরকে।

যাহা ক্ষুদ্রতায় আয়ত্তের অধীন ও সুন্দর তাহার ভোগের পারে আছে যে অনায়ত্ত ও মনোহর, তাহাই যে অশরীরী ছায়ার মত চেতনায় প্রকাশিত হইয়া প্রেমকে গভীর ও অফুরন্ত করে, তাহাই আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন "মদন-ভস্ম" নামে কবিতা জোড়ায়। শারীর সম্ভোগের তৃষায় চিত্ত অরুণ বর্ণে রঞ্জিত হয় ও সুরভিমুগ্ধ হয়, কিন্তু প্রেম যেখানে সুন্দরের পারে মনোহরের উপাসনা পায়, সেখানে বিশ্বের অসীমে, আকাশে, বাতাসে, প্রেমের রস ঝরিয়া পড়ে। প্রেমিক তাহার আয়ত্তের কুসুম-রথের কাছেই প্রণত হইয়া কেবল আঁচলের ও প্রাণের সুরভি ফুল উপহার দিয়াই সুখী হয় না; অসীমের দিকে তাকাইয়া তাহার বাণী উচ্চারিত হইতেছে :—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে, করেছ এ কি সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

সুন্দর বলি তাহাকে যাহার অবয়ব যেন সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া আমাদের অনুভূতিতে স্নিগ্ধতা দেয়, আর কোমল মধুর ভাবের সঙ্গে জড়িত হইয়া যেন পূর্ণরূপে উপভোগ্য হইয়া উঠে। কিন্তু শুধু মনোহরের নামেই অল্প-বিস্তর ব্যাখ্যা করা যায় তাহাকে যাহা সুন্দর হইয়া, বা না হইয়াও, তাহার প্রাণের প্রভাবে আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করে। তোমার সন্তানের রূপের অবয়ব অপরের অনেক সন্তানের রূপের অবয়বের তুলনায় অসুন্দর হইলেও তোমার কাছে তোমার আদরের সন্তানেরা পৃথিবীর সকল শিশুদের মধ্যে সর্ব্বাধিক মনোহর; তোমার প্রাণের ভালবাসা সেখানে অঙ্গের মধ্যে না ঘুরিয়া কূলহারা হইয়া প্রসারিত হয়। যে নারীর অবয়বের রূপের বা বর্ণের উজ্জ্বলতার গৌরব নাই, যে রূপোত্তমা—তিলোত্তমা নয়, বরং যে রূপের হিসাবে দশের চোখে অসুন্দর বলিয়া প্রতীত, সে যখন আপনার ক্ষুধার জ্বালা অগ্রাহ্য করিয়া গভীর স্নেহে সন্তানের মুখের পানে তাকাইয়া আহারের সারা গ্রাসটি সন্তানের মুখে দিয়া তৃপ্ত হয়, তখনকার মনোহর দৃশ্যে আমাদের প্রাণ অভিভূত হয় অপরিমিত ভালবাসার অসীম উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া। আবার যে দৃশ্য সৌন্দর্য্যে কেবল অল্পে অনুভূত আর অতি অধিক পরিমাণে আমাদের অনুভবের অনায়ত্ত হইয়া আমাদিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া মনোহর হয়, ইংরেজিতে এক শব্দে তাহার নাম Sublime। প্রাচীনের যে উপনিষদাদি গ্রন্থে অসীমের উপাসনা আছে, সেখানে উপাস্যকে কোথাও 'সুন্দর' বলা হয় নাই। যিনি উপাস্য তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি আরও কিছু; কিন্তু

কোথাও তিনি ক্ষুদ্র 'সুন্দর' শব্দে অভিহিত বা অনুভূত হ'ন্ নাই। ঐ সকল গ্রন্থে আদিম যুগের অনেক অমার্জ্জিত সংস্কারের কিছু-কিছু প্রভাব আছে; কিন্তু কোথাও মনোহর অনাদিকে 'সুন্দর' বলিয়া ছোট করা হয় নাই।

বলিতেছি না যে যাহা ক্ষুদ্র সুন্দর তাহা গ্রাহ্য নয়, বা মনোরম নয়; যাহা গ্রাহ্য, যাহা আয়ত্তাধীন, যাহা মনোরম ও সুন্দর, সেই উপভোগ্য যেখানে অফুরন্ত অসীমের ইঙ্গিত দেয় না অথবা তাহার আভাসকে পরিস্ফুট করে না, সেখানে আমরা স্থায়ী রসের নির্ঝর পাই না। যে সাহিত্যে এই স্থায়ী রস নাই তাহা কালজয়ী হইতে পারে না; বুদ্বুদ-সাহিত্য বুদ্বুদে মিলাইয়া যায়। আমাদের লীলায় যে বুদ্বুদ ফুটিতেছে ও নিবিতেছে, তাহা আমাদের কাছে প্রিয়; সানন্দে ও সশোকে আমরা সেই বুদ্বুদের লীলা বর্ণনা করি। বুদ্বুদগুলি সার বাঁধিয়া আলোকে ভাস্বর হইয়া ফোটে; কিন্তু যখন তাহাদিগকে তরঙ্গের ফেনিল শিরে দেখিতে পাই, তখন যদি অফুরন্ত রঙ্গলীলা ও তরঙ্গলীলার তলায় অসীম স্রোতের খেলা ভুলিয়া যাই, অথবা ঐ স্রোত ও তরঙ্গের সঙ্গে বুদ্বুদের লীলাকে জুড়িয়া না দেখিতে পাই, তবে বুদ্বুদের সাহিত্য বুদ্বুদে মিলাইয়া বিস্মৃত হয়। প্রেমের বুদ্বুদ যেখানে প্রাণের অফুরন্ত টানের গায়ে গায়ে না ফোটে, সেখানে অল্প ভোগেই প্রেম উপিয়া যায়; কবি Browningএর প্রাণস্পর্শী ভাষায় আছে—We cannot touch these bubbles then, But they break.

প্রেম যখন প্রাণের অসীম ভাবের উচ্ছ্বাসে তরঙ্গিত, তখন প্রিয় বা সুন্দরের ভোগকে চলিত কথার 'সুখ' নাম দিয়া বুঝান' যায় না, আর উচ্ছ্বাসকেও যেন ব্যথার মত বেদনারূপে প্রতীত করিতে হয়। কবি ভবভূতি এই মনোহর অবস্থাকে সুখ-দুঃখের অতীত মনোহর আকর্ষণ বলিয়া বুঝাইয়াছেন; রাম সীতাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—ন জানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। এই সঙ্গে বলি—আমাদের চিত্তপটে কালিদাসের আঁকা সেই চির-মনোহর ছবির কথা। শকুন্তলা যেখানে যৌবনের বিকাশে ও লাবণ্যের প্রভায় উজ্জ্বল ন'ন্, বরং যেখানে তাঁহার মুখে বিষাদের কালি ও পরণে ধূলিধূসর বসন, আর যেখানে তিনি অপরিমিত প্রেমের অফুরন্ত বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায় অযত্ন-গ্রথিত কেশে দাঁড়াইয়া আছেন, সেই-স্থানে (যাহাকে যথার্থই জীবন-লীলার স্বর্গ বলা চলে) দুষ্মন্ত দেখিলেন দেবীর মনোহর প্রতিমা,—বসনে পরি-ধূসরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণীঃ। এখানে যে অফুরন্ত বিশ্বাস প্রাণকে উজ্জ্বল করিতেছে, তাহার স্থায়িত্ব কালের আঘাতে লোপ হইবার নয়।

তুমি যদি চাও তোমার একটি নির্দ্দিষ্ট আকর্ষণের পদার্থকে বা ভোগের সামগ্রীকে তোমার একটি নির্দ্দিষ্ট কামনার আয়ত্তাধীন করিতে, আর তোমার সেই আকাঙ্ক্ষায় ভুলিয়া যাও যে তোমার ভোগ্য বুদ্বুদটি অপর বুদ্বুদের সঙ্গে গাঁথা আছে, তবে তুমি কেবল তাহাকে নিত্য নূতন কামনার বর্ণে উজ্জ্বল করিয়াই সুন্দর করিয়া নিতে পার; কিন্তু সে পথে তোমার বাধা এই যে তোমার কামনা ও কাম্য যখন হয় অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন, তখন তৃপ্তির নামে একটি বিষ উৎপাদিত হয়, ইংরেজিতে যাহার নাম Sad Satiety, তাহাতে ভোগ্য হয় তোমার বিরাগের সামগ্রী। কবি Browning —In a year কবিতায় এই অবস্থাকেই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেমিক তাহার প্রেমের পাত্রীর যে লীলায়, যে অভিমানে আপনার প্রেম বাড়াইয়াছিল, সেইগুলি ধীরে ধীরে বা এক বৎসরের মধ্যে প্রেমের ক্ষয়ের কারণ হইয়া ওঠে,—অর্থাৎ আর সেগুলি ভাল লাগে না। মিলন যেখানে ক্ষণিক ভোগের উত্তেজনায়, তখন যাহা উত্তেজনার সামগ্রী তাহা মলিন হইলেই প্রাণের আকর্ষণ উপিয়া যায়। অসীমের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য প্রাণ মিলন ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করে, কিন্তু মিলন আসে না। Browningএর ভাষায় Bitterly we re-embrace,—single still.

পৃথিবীর ছোট-বড় সকল আকর্ষণের বস্তু, অথবা আমার রূপকের ভাষায় সকল বুদ্বুদ বহু সম্পর্কে পরস্পরে বাঁধা আর তাহাদের সকল বাঁধন একটি অসীম বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে বা চিরপ্রবাহিত স্রোতের সঙ্গে বাঁধা আছে। এইটুকু ভুলিলেই তৃপ্তিতে জন্মে বিষ, আর প্রাণে প্রাণে ঘটে ছাড়াছাড়ি, অর্থাৎ ইংরেজিতে বলিতে পারি, আসে sad satiety ও divorce. ঐ যে বলিয়াছি বুদ্বুদে বুদ্বুদে বাঁধনের যোগ, আর বিশ্ব-নিয়মের সঙ্গে তাহাদের বাঁধনের কথা, উহাই হইল প্রাণের স্থিতির

নীতি বা moral relation. আমাদের জীবন-লীলায় এমন কিছু নাই যাহা এই স্থিতির নীতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইলে স্থায়ী রসে পুষ্ট হইতে পারে; আমরা অনন্তকে ভুলিলে শুকাইয়া মরি। আমরা বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা; আমরা যদি স্থিতির নীতির সঙ্গে বাঁধন হারাই তবে জীবন-লীলায় অফুরন্ত তৃপ্তি না পাইয়া জ্বালায় অধীর হই ও ক্ষুদ্র ভোগ্যকে সরস করিবার জন্য রঙ্-এর উপর রঙ্ ঢালিয়াও কিছু করিতে পারি না। যে আনন্দ আসে অলক্ষ্যে আমাদের প্রাকৃতিক ধর্ম্মে অফুরন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া, তাহা কোন কৃত্রিম উপায়ে পাওয়া যায় না।

যাহাতে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা বাড়ে সেই ধরণের রূপ যদি কেহ আঁকে তবে অতি বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকেও সেই চিত্রে অধিক সময় তাহার উত্তেজনার উপকরণ পায় না। ভোগের ইঙ্গিতের চিত্রটি ছাড়িয়া যদি ভোগলিপ্সুকে চিত্রের মূলের আস্ত জীবন্ত ভোগ্যকে দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে দেখিতে পায়, যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে পায় তৃপ্তির বিরামের হলাহল,—চিত্রের বা ভোগ্যের দৃশ্যে সে জ্বালাহীন স্থায়ী আনন্দের নির্ঝর পায় না, কেবল জ্বালার উপর তাহার মনে সেই জ্বালা বাড়ে, যাহাতে আনে তাহার শরীরের ক্ষয়, মনের জড়ত্ব ও কর্ম্মে অপটুতা। যাহাতে জাগে এই জ্বালা বা feverish heat, তাহা কখনও জীবন ও সাহিত্যে আদৃত হইতে পারে না। উহাকে যদি বিষ বোধে ত্যাগ করিতে না পারি, জঞ্জাল জানিয়া পোড়াইতে না পারি তবে জীবন হইবে দুঃস্থ ও সাহিত্য হইবে ঘৃণ্য।

যাহারা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রকে উপাস্য করিয়া সাহিত্য গড়ে, তাহারা যে কত চপল ও রস-বোধহীন হয় তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। বলিয়াছি যে টানাটানি করিয়া বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রকে সুন্দর করিতে হইলে তাহার গায়ে রঙ্-এর উপর রঙ্ ঢালিতে হয়, তবুও আশ মেটে না। অতি উচ্চ কণ্ঠে আমাদের দেশের থিএটারি ধরণে না চেঁচাইলে বীর-রস জমাইতে পারা যায় না ও মড়াকান্না না জুড়িলে করুণ রসের উদ্রেক হয় না। তাঁহার ভাষায় চেঁচানি ও মড়াকান্না নাই বলিয়া কবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় অনেকে করুণ রস পান্ না, এ কথা আমি নিজে অনেকের কাছে শুনিয়াছি। আশ্চর্য্য ঘটনাকে অতি দক্ষতায় সঙ্গে ফুটাইলেও অনেকে চায় যে ঐ বর্ণনার গায়ে গায়ে অনেক-বার 'হায় কি হইল!' জোড়া চাই। কাঁচা বুদ্ধির উকিলেরা ধীরভাবে কোন নিষ্ঠুর ঘটনা বিবৃত করিতে পারে না,—তাহারা অনেক হাস্যকর উচ্ছ্বাসের ভাষায় বিচারককে বিরক্ত করিয়া নিজের মামলার জোরটুকু নষ্ট করে।

ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের আসরেও এই অসার চপলতার দৃষ্টান্ত অনেক মেলে, যেখানে লোকে মানুষের সঙ্গে স্থায়ী সম্বন্ধ বাঁধিবার আগ্রহে ধর্ম্মকে পায় নাই। যেখানে সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতায় দুঃখ-অভাবের অমূল্য উপকারিতা বুঝিয়া ঈশ্বরের দিকে তাকায় নাই, অর্থাৎ যেখানে প্রাণের প্রাকৃত নির্দ্দেশে অনন্তের দিকে মুখ ফিরায় নাই, আর উল্টাদিকে যেখানে এই অসম্ভব কামনা করিয়াছে যে সে দুঃখ তাড়াইয়া ও চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া মুক্তি নামে "নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ" পাইবে, সেখানে কৃত্রিম উত্তেজনায়, কোলাহলে ও চীৎকারে মনে একটা উত্তাপ জন্মাইয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিতে ভাবে যে তাহার মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়াছে। মত্ততা আনিবার জন্য একটা গানের বিচ্ছিন্ন অর্থশূন্য ছোট পদ ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে থাকে, আর চেঁচাইয়া ও লাফাইয়া মূর্চ্ছা আনিয়া ধূলায় গড়ায়। অসীমের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাহার মধ্যে এই উত্তেজনার স্থান কোথায়? আর চীৎকার করিবার অবসর কোথায়? অসীম মনোহরের দিকে দৃষ্টি পড়ে খাঁটি জীবন-লীলার অভিজ্ঞতায়,—উহার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাইয়া নয়। আর মনোহরের দিকে কবির দৃষ্টিতে আস্তিক, নাস্তিক, যে-কেহ দৃষ্টি ফেলুক্ না কেন, সে অতি বিন্দুমাত্রে অসীমের স্পর্শের অনুভব পাইয়া এমন মধুরতা আস্বাদন করে, যাহাতে লাফালাফির স্থান থাকে না; কিন্তু যাহারা কল্পনায় ভাবে যে কি-যেন একটা অজানা আছে যাহা দেখা দিবে একটা জানা-বস্তুর মত রূপ ধরিয়া, তাহার লক্ষ্য না জানিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিতে কেবল মাথা কুটিয়া ধূলায় গড়াইয়া ও চীৎকার করিয়া কেবল কোলাহলেরই সৃষ্টি করিতে বাধ্য। অসীমের সঙ্গে মানুষে যে পরিমাণে সম্পর্ক-শূন্য, সে সেই পরিমাণে চপল ও ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন; ইহাদের গড়া সাহিত্য স্থায়ী হইতে পারে না ও প্রাকৃত ভাবে মানুষকে স্থায়ী আনন্দ দিতে পারে না।

যাহারা চায় জ্ঞানের গৌরব কমাইয়া, তর্ক বা সন্দেহ তাড়াইয়া ভক্তি নামক বৃত্তির জোরে সত্যকে ধরিতে, তাহাদের গোড়ার ভুল দেখাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আমরা যাহা-কিছু ঠিক দেখি, সে-ত আমাদের জাগরণে চেতনা দিয়া,—ঘুমাইয়া, স্বপ্ন দেখিয়া নয়। মানুষের স্থিতির অর্থই তাহার চৈতন্যটুকু—দীপ্ত সংজ্ঞাটুকু। এই চেতনা বা জ্ঞানকে ঠেলিয়া সন্দেহের সম্ভাবনা ও তর্ক উড়াইবার জন্য ইহারা মাথা গুঁজিতে চায় সেই প্রবৃত্তির আড়ালে, যাহাতে শুধু দেয় মনে খানিক অনুরাগ বা আঠা; এ অবস্থায় মাথা গুঁজিতে হয় যে অন্ধকারে, তাহা ত অতি স্পষ্ট। অন্ধকারে গুনের আঠা বাড়াইয়াও যখন কুলায় না, তখন প্রতপ্ত মাথায় চাৎকার করিয়া জ্ঞানলভ্য সত্যকে পাইতে চায়, —মস্তিষ্কের স্থিরতা উড়াইয়া, জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া, অর্থাৎ দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া যাহারা চায় উষ্ণ মস্তিষ্কে আবৃত দৃষ্টিতে সত্য ধারণা করিতে, তাহাদের কি বিড়ম্বনা! এই সঙ্গে এই কথাটুকুরও উল্লেখ করি যে যাহারা অতি ক্ষুদ্রকে অসীমের প্রতিকৃতি করিয়া খাড়া করে তাহারা নিজের চোখের কাছে ক্ষুদ্রতার আবরণ দিয়া অসীমকে উড়াইয়া দেয় বা বধ করে।

অতি ক্ষুদ্রকে যাহারা জীবনের আকাঙ্ক্ষার উপাস্য করে তাহারা সেই ক্ষুদ্রকে টানিয়া বুনিয়া মধুর করিবার জন্য যে আয়োজন করে তাহা সযত্নে লক্ষ্য করিতেছি। তাহারা উপাস্যের মন্দির গড়ে এমন ললিত-লবঙ্গলতার বেড়া দিয়া যাহা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কঠোর ঝঞ্ঝা-বাতের আঘাত পায় না, কেবল মৃদু মলয় সমীরণে দোলে; আর যেখানকার কুঞ্জে কেবল আছে কুহুধ্বনি—যে ধ্বনি বর্ষার দিনের বজ্র-নির্ঘোষে মূক হইয়া লুকায়। উপাসকের মন ভুলাইবার জন্য উপাস্যের কাছে সাহিত্যের যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তাহা পুষ্টিবিধানের ক্ষমতাবর্জ্জিত মধুর কোমল কান্ত ভোগ। কোমলতার অনুরাগে মত্ততা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে এমন ভাষার সৃষ্টি হয় যাহার গায়ে পুরুষত্বের জোর নাই—মনুষ্যত্বের তেজ নাই। ভাষা এমন কাঁটা-বাছা ও হাড়-বাছা ও এমন মাংস-পেশী-শূন্য যে সেই থল্ থলে জেলি-ফিশের মত ভাষা কেহ চিবাইতে পারে না,—কেবল উহা দাঁত এড়াইয়া গলায় ঢুকিতে যায়। এই কোমলতার উপাসনার পারলৌকিক ফল যাহাই থাকুক, আমাদের ইহজগতের সাহিত্যিক ফল অতি মন্দ। এই নিস্তেজ সাহিত্য আফিং-এর নেশায় ঘুম পাড়াইবার মত মানুষকে বিশ্ব ভুলাইয়া অনাদি শক্তির দিকে অসীম দৃষ্টি রোধ করিয়া মানুষকে কল্পিত স্বপ্নের ঝোঁকে ডুবাইয়া রাখে। প্রবৃত্তি বাড়ে শুইতে—মঞ্জুতর কুঞ্জতল কেলি সদনে।

অল্প পূর্ব্বেই moral relation বা স্থায়ী নীতির ইঙ্গিত করিয়াছি। যেখানে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে ভোগের ক্ষুদ্র তৃষায় ভুলিয়া যাই যে আমরা সকলে একটি বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে নানা সম্বন্ধ বাঁধিয়া চলিয়াছি, আর যেখানে ভুলিয়া যাই যে অক্ষমতা, ত্রুটি ও অপরাধ প্রত্যেক মানুষের জীবনে ঘটিবে আর নিশ্চিতই বদলাইবে, সেই-খানে আমরা অন্যের ত্রুটি ও অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি না; ঐরূপ মার্জ্জনা না করায় যে আমরা প্রকৃতিদত্ত বা ঈশ্বরদত্ত সঙ্গী হারাইতেছি ও কর্ত্তব্যসাধনের পথে নিজেকেই ক্ষুণ্ণ করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারি না। মানুষ যে মনুষ্যত্ব না পাইলে, মহৎ হইবার পথে না চলিলে অপরের অপরাধ ও ত্রুটি ধরিয়া বিচ্ছেদ ও বিড়ম্বনা ঘটায়, তাহা কবি Browningএর মত হৃদ্য করিয়া কেহ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যে প্রেমিক তাকাইয়া আছে প্রেমপাত্রীর ত্রুটি ও অপরাধের দিকে, তাহাকে জীবন-রসে অভিজ্ঞ প্রেমপাত্রী বলিতেছেন :—

> What so false as truth is,
> False to thee;
> Where the serpent's tooth is,
> Shun the tree.
> Where the apples redden,
> Do not pry;
> Lest we lose our Eden
> Eve and I.

ইহার পর ঐ পাত্রীর বাণী এই—হে প্রিয়, তুমি যদি বিশ্ব-নিয়মের ধাতার দিকে চাহিয়া মহত্ত্ব ও দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া তোমাতে আমাকে মুগ্ধ করিতে পার, তবেই মানুষ হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলে সুখী হইব—

> Be a god and hold me with a charm,
> Be a man and fold me with thy arm.

এই যে প্রেমের পুণ্যময় ধর্ম্ম সূচিত হইল, যাহাতে

শুচিবাই নাই, আছে উচ্চ পবিত্রতার বোধে ক্ষমা ও প্রাণের অন্তরে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত মাহাত্ম্যের সঙ্গে মিলন, উহা ক্ষুদ্রতার মধ্যে জন্মে না। পুণ্যের ও ধর্ম্মের নামে যাহারা কৃত্রিম ও অস্বাস্থ্যকর সমাজনীতি গড়ে, তাহারা বিশেষভাবে স্ত্রীলোককে দুর্ব্বল জানিয়া কথায় কথায় তাহাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষায় পোড়াইয়া অক্ষমার পাশবিক অভিনয় করে। অনন্তের দৃষ্টিতে প্রাণকে প্রসারিত করিতে পারিলে কখনও ঐরূপ অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা ও পাপ জন্মিয়া সমাজকে ও সাহিত্যকে কলুষিত করিতে পারে না।

অনন্তের দিকে চাহিতে না পারিলে কোন কল্পিত শিক্ষায় বা ব্রত উদ্‌যাপনায় যে মানুষকে পরের প্রতি অনুরাগী করা যায় না, আর মানুষ যে বিশ্ব-ব্যাপী নীতি-বন্ধনের মধুর বেদনা অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের গৌরব পাইতে পারে না ও সাহিত্যকে চিরস্থায়ী ও সরস করিতে পারে না, তাহাই বলিলাম। বলিলাম যে তাহাই হইবে স্থায়ী সাহিত্য ও মধুর সাহিত্য, যাহাতে অনন্তের ইঙ্গিত আছে ও যাঁহা অনন্তের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইতিহাস সাক্ষী, মানুষের সমাজ যেখানে যত অধিক প্রসারতা লাভ করিয়াছে ও ধর্ম ও সমাজ প্রভৃতি বাঁধা নিয়মে কঠোরভাবে বাঁধা না পড়িয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অনেক সুবিধা পাইয়াছে ও বহু স্থানের জ্ঞান বাড়াইতে পারিয়াছে, সেই স্থানে সাহিত্য হইয়াছে স্থায়ী রসে তত কালজয়ী। আমাদের সেই ইতিহাস নাই যাহাতে জানিতে পারি যে প্রাচীন কালে ভারতের আর্য্য-সমাজ কিরূপে বহু লোকের সঙ্ঘের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। রাজাদের নামের ছড়া ছাড়া লোক-সাধারণের স্থিতির বিবরণ অতি অল্পই পাই, আর যাহাও পাই তাহা নানা কথা জুড়িয়া, অনুমানে আমাদের অতি চমৎকার সাহিত্য মহাভারত, যুগে যুগে নীতি-কথা ও ধর্ম্মকথার অনেক উপদেশে এমন পরিপূর্ণ হইয়াছে যে উহার মধ্যে কেন্দ্ররূপে যে ভারতী-কথা আছে, তাহাকে অনেক জোড়া দিয়া খাড়া করিতে হয়; এইরূপে অল্পাধিক পরিমাণে খাড়া করিয়াও ভারতী-কথা, যে সমাজের ফলকে রচিত হইয়াছিল, তাহার স্বাধীনতা ও প্রসার দেখিয়া বিস্ময় জন্মে। পালি সাহিত্যে যখন পড়ি যে, শাক্যমুনি ধর্ম ও জীবন-সমস্যার ৬৩টি বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিতেছেন, তখন Rhys Davidsএর মত সকলকে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে হয় যে কি করিয়া আমাদের এখনকার প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্য শাসনের স্থিতির যুগে এত চিন্তার স্বাধীনতা ও মত-বৈচিত্র্য ছিল; বুঝিতে পারি, যে ইতিহাস বা ইতিহাসের আভাস এখনও পাই, প্রাচীন ঠিক সেরূপ ছিল না। থেরীগাথা প্রভৃতিতে নারীদের যে স্বাধীনতা লক্ষ্য করি, গৃহ্যসূত্রে ও ধর্ম্মসূত্রে তাহার আভাস নাই। কাজেই মনে করিতে পারি, ভারতী-কথার সমাজ ব্রাহ্মণ্য শাসনের ইতিহাস দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা যাহাকে বলি বিবাহ-বন্ধনের শিথিলতা ও জাতিভেদের শিথিলতা, তাহা সমাজের পক্ষে ভাল ছিল কি-না, তাহার বিচার না করিয়া বলিতে পারি যে, সমাজ ছিল ধর্ম্মে-কর্ম্মে বড় স্বাধীন। আবার অন্য দিকে কেবল মানসিক বিকাশের ও অভিজ্ঞতা-লাভের প্রাকৃতিক নিয়ম লক্ষ্য করিয়াই বলিতে পারি যে সেকালের সমাজ ছিল এমন প্রসারিত ও বহু লোক-চরিত্র জানিবার অনুকূল, যাহা কড়া-শাসনের সমাজে জন্মিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য ভারতী-কথা সাহিত্যে দেখিতে পাই যে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দুর্য্যোধন, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, বিদুর প্রভৃতির বহু পুরুষের চরিত্র এমন দক্ষতায় ও ব্যক্তিত্বের জ্ঞানে অঙ্কিত যে উহাদের একজনের গায়ে অপর জন মেলে না ও সকলেই নির্দ্দিষ্টরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক ব্যক্তি। পুরুষদের সম্বন্ধে যাহা বলা গেল—গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতির সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। আমরা একালে বহু দেশ-বিদেশের জ্ঞানের গৌরব করি, কিন্তু বেশির ভাগ সাহিত্যে একজন পুরুষ বা একজন নারী কেবল 'ভোল্' ফিরাইয়া নানা গ্রন্থে দেখা দিতেছেন, দেখিতে পাই।

ভারতী-কথার বিস্তৃত আলোচনা করিতে বসি নাই, কিন্তু নিশ্চিতরূপে সামাজিক প্রসার না হইলে যে এমন সাহিত্য রচিত হইতে পারিত না, তাহা সুনিশ্চিত। আমরা যদি এখন এই বিশ্বের উন্নতির দিনে সমাজের প্রসারকে খর্ব্ব করিতে যাই আর Nationalismএর নামে চিহ্নিত জাতীয়ত্ব গড়িবার দিকে মন দিই, অর্থাৎ যদি বহু জনসঙ্ঘের প্রতিভূস্বরূপ ভারতী-কথার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ছাড়িয়া প্রাদেশিকতার একতারা বাজাইতে বসি,

তবে আমাদের সাহিত্য কিছুতেই প্রসার লাভ করিতে পারিবে না।

সামাজিক প্রসার না পাইয়া ও বহু জাতির সঙ্গে রক্ত মিশ্রণ করিতে না পারিয়া অনার্য্যদের বহু ক্ষুদ্র দল কিরূপে ক্ষয় পাইতেছে তাহার খাঁটি দৃষ্টান্ত পাই আফ্রিকার বা‌ণ্টু-বুশ্‌মান্‌দের বিবরণে। যে যৌবনে বুদ্ধিশক্তির উন্মেষ হয় কার্য,করীরূপে, সেই যৌবনেই ঐ জাতির লোকেদের মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি বন্ধ হইয়া আসে আর উহারা ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়। আশা করি আর্য্যের সমাজ-প্রসারের ঐতিহ্যের দেশে আমরা বাণ্টু-বুশ্‌মান্ সাহিত্য রচিব না।

ভারতী-কথার যুগের পর, অথবা বহু পরেও এক-সময়কার বহু জাগ্রত জাতির বংশধরদের মধ্যে কালিদাস পাই, ভবভূতি পাই, কিন্তু তাহার অল্প সময়ের পরেই দেখিতে পাই—সাহিত্য প্রাদেশিকতার চাপে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে, প্রাণশূন্য হইয়াছে ও তাহাতে কেবল বর্ণনার জন্যই কৃত্রিমভাবেই অনেক কথা রচিত হইয়াছে।

এখানে বলা চলে না, ভারত-রাষ্ট্রের কি অবস্থায় প্রদেশে-প্রদেশে অগণ্য রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন ভারতে জাতীয় উন্নতি-বিধানের কর্ম্ম ছিল না ও একসঙ্গে দশের প্রাণ জাগাইয়া মনুষ্যত্ব বাড়াইবার ব্যবস্থা বিহিত হয় নাই। বিস্তৃত কর্ম্মভূমিতে যখন আনন্দের উৎস খোলে নাই, তখন নিষ্কর্ম্মা ও কুকর্ম্মা রাজাদের তুষ্টির জন্য যে সাহিত্য রচিত হইতেছিল, তাহাতে শারীর ভোগের লিপ্সাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছিল। চাটুকার সাহিত্যিকেরা চেষ্টা করিয়াছিল·এক দিকে গায়ে শুড়্‌শুড়ি দিয়া আনন্দ বাড়াইতে, আর অন্য দিকে কথার ভোজবাজিতে একটা চমক্ দেখাইতে। বর্ণনীয় কোন বিষয় ছিল না, তাই কতকগুলি সানুনাসিক শব্দ-যোজনা করিয়া অনুপ্রাসের ঘটা বাড়াইয়া এক শব্দের নানা অর্থ ফলাইয়া সাহিত্যিকেরা তাহাদের কৌশলের কেরামতি দেখাইত। সঙ্কীর্ণ বিধ্বস্ত সমাজে প্রেমে-পড়া উঠিয়া গিয়াছিল; কবিরা প্রাচীন কালে প্রেমে-পড়ার গল্প প্রাণহীন শব্দের যোজনায় লিখিতে লাগিল, আর প্রেমবিষয়ে অনভিজ্ঞতায় নায়ক-নায়িকারা এ-উহাকে স্বপ্নে দেখিয়া প্রেমে পড়িয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইত। দময়ন্তীর বিরহ-ব্যথার বর্ণনায় বাঁধা নিয়মের কোকিল, মলয়-সমীরণ প্রভৃতি আমদানি করিয়া শ্রীহর্ষ গোটা চল্লিশেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন; তাহা পড়িতে গেলে দময়ন্তীর বিরহ-ব্যথার কোন অনুভূতি জন্মে না, আর দময়ন্তীর চেয়ে অক্তি অধিক পরিমাণে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত হই আমরা অসার শব্দ-যোজনা ঠেলিয়া, ও যথার্থ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের বিরহ ঘটিয়াছে মনে করিয়া।

এই নির্জীব কর্ম্মহীন ভারতে পরে পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কৃত্রিম রচনার প্রাণহীন সাহিত্য অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল। নানা রাজসভার কবিরা মনের বিনোদের যথার্থ উপকরণ না পাইয়া শরীর খুঁড়িয়া ইন্দ্রিয়লিপ্সার উৎস খুলিয়া দিতেছিল, আর মানুষের মনে জাগাইতেছিল পশুত্ব; তবে সুখের বিষয় এই যে, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে পড়িয়া যখন রাজসভায় চলিতেছিল এই ঘৃণ্য অধম ভাবের লীলা, তখনও অতি প্রাচীন কালের পুণ্যের ধারা সমাজে অন্তঃসলিলা বহিতেছিল। তাই দেখিতে পাই যে, প্রাচীন বিধ্বস্ত বনিয়াদি বড় মানুষের পরিত্যক্ত ভিটায় যেমন এখানে-সেখানে কাঁটা-বনের জঙ্গলে প্রাচীনকালের বীজে ভাল ফুলের চারা দেখা দেয়, সেইরূপ লোকসমাজের মধ্যে কোথাও কোথাও ভাল সাহিত্য দেখা দিয়াছিল। ময়মনসিজ্‌ জেলার দূর পল্লীতে মুসলমানদের আমলে যেসকল প্রাণস্পর্শী গাথা রচিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন অন্তঃসলিলা ধারার পরিচয়। প্রাচীনযুগের পবিত্র ঐতিহ্য যে, অপবিত্র কৃত্রিম সাহিত্যের চাপে ধ্বংস হইতে পারে নাই, এখন আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। বিদেশীয়দের প্রভাবে যখন দেশের প্রাদেশিকতার গণ্ডি অতি অল্প পরিমাণেও ভাঙ্গিতে লাগিল, তখনই বৈদ্যুতিক স্পর্শে জাগিয়া উঠিবার মত দেশের মূর্চ্ছিত প্রাণ অনেক স্থানে জাগিয়া উঠিল। রাজনৈতিক অধোগতির প্রসঙ্গে অনেক তর্ক-বিবাদ উঠিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে এই প্রত্যক্ষ-লব্ধ ঋদ্ধি অস্বীকৃত হইতে পারে না যে আমরা এই নূতন যুগে পাইয়াছি রবীন্দ্রনাথকে, যাঁহার বহু রচনা অনন্তের ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত হইয়া সতেজ প্রাণময় স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে।

বিদেশের সংস্পর্শে প্রাদেশিকতার গণ্ডি ভাঙিয়া প্রাণের প্রসারের কথা বলিলাম, কিন্তু এই সঙ্গে উল্লেখ করিতে ভুলিব না যে আমাদের সমাজে এক সময়কার দুঃস্থ জীবনের অভিব্যক্তিতে যে কুৎসিত রুচির সাহিত্য জন্মিয়াছিল, তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাবের ফলে বিদেশের ইন্দ্রিয়জ মোহের সাহিত্য কোথাও কোথাও অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে। মানুষের প্রবৃত্তির যে বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের গ্রন্থে থাকিতে পারে, কিন্তু দশের চিত্ত-বিনোদনের সাহিত্যে অপ্রযুক্ত, সেই বিশ্লেষণের ফাঁকির অজুহাতে কোথাও কোথাও অতি ঘৃণ্য রচনা প্রচারিত হইতেছে। পদ্মের পঙ্কজ নাম-ধরিয়া যাহারা উহার বিকশিত রূপে মুগ্ধ না হইয়া উহার রূপ বুঝাইতে চায় পাঁক খুঁড়িয়া দেখিয়া, সেই কাদা-খোঁচা সাহিত্যিকদের মনের অবস্থা বুঝিতে বাকি থাকে না; অনেক বেদে সাপের হাঁচি চেনে। মনে হয়, পচা-মাংসলোলুপ হাড়গিলা-শকুনি শ্রেণীর সাহিত্যিক অধিক নাই। প্রাণবিনোদের যথার্থ উৎস না পাইয়া যাহারা শুষ্‌শুড়ি দিয়া শরীরের বিনোদ ঘটাইতে চায়, তাহারা শুষ্‌শুড়ির ফলের ক্ষয়ের দিকে নিশ্চয়ই তাকাইবে। বিদেশের কোন-কোন ঘৃণ্য সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা রাক্ষস-রাক্ষসী সাজিয়া স্নেহ-প্রেম পায়ে দলিয়া ঐ যে নির্লজ্জ দম্ভে বলিতেছে—

স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ "জীবিতমপি বা যদি"
আরাধনায় 'শুষ্‌শুড়ে' মূর্ঞ্চতু নাস্তিমে ব্যথা।

কখনও উহা প্রাণ-প্রসারের নবযুগের শিক্ষায় আদৃত না হইয়া পদদলিত হইবে, আশা করি। যে সাহিত্যে, যে জীবনে অনন্তের দৃষ্টি ফোটে না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, ধন্য জীবন নয়।

ইয়োরোপের দুইজন শ্রেষ্ঠতম মনীষী

শ্রীকনক রায়

চিত্রশিল্পী গেটে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে একজন মস্ত বড় চিত্রশিল্পী সে খবর সম্প্রতি বাঙালীরা জানিতে পারিয়াছে। ঠিক এমনি ধরণের একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে ইয়োরোপের একজন প্রকাণ্ড সাহিত্যিকের সম্পর্কেও। ইনি হইতেছেন জার্ম্মান কবি গেটে। কবি, দার্শনিক, নাট্যকার হিসাবে গেটের নাম পৃথিবীর সুধীজন প্রায় সকলেই জানেন। কারণ দুনিয়ায় যে কয়জন সাহিত্যিক যশের শাশ্বত গৌরব লাভ করিয়াছেন গেটে তাঁহাদেরই অন্যতম। এই সাহিত্যিক-খ্যাতি ছাড়াও একজন বড় বৈজ্ঞানিক হিসাবেও গেটের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। প্রকৃতিবিজ্ঞানে যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল আমাদের অনেকের কাছে সে খবরটাও ছাপা নাই। মানুষের চোয়ালের হাড় এবং বানরের হনুস্থি (Inter maxillary bone) যে অনেকটা একই রকমের গেটের কাছেই তাহা প্রথম ধরা পড়ে। সে হিসাবে তিনি ডারউইনেরও অগ্রদূত—এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক হিসাবে গেটেকে জানিলেও চিত্রশিল্পী গেটেকে আমরা জানিতাম না। অথচ এই চিত্র-শিল্পে গেটের যথেষ্টই প্রতিভা ছিল। তাঁহার অনেকগুলি ছবি সম্প্রতি লোক-নয়নের সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। এই ছবিগুলির ভিতর দিয়াই তাঁহার চিত্রাঙ্কন-প্রতিভার পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

বস্তুতঃ ছবি আঁকা তাঁহার জীবনের একটা বড় রকমের সখ ছিল। অত্যন্ত তরুণ বয়সেই তিনি ছবি আঁকিতে সুরু করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি লিপজিকে লেখাপড়া করিতে যান, তখনই ছবি আঁকার কাজে তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। তখন তাঁহার বয়স

মোটে ১৪ বৎসর। তার পর যখন তিনি ড্রেসডেনে যান, সেখানকার আর্ট গ্যালারিতে এই শিক্ষা তাঁহার পাকা ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাঁধনের ভিতর ধরা দিবার বিরোধী। তাই বিবাহকে তিনি এড়াইয়া গিয়াছিলেন। আর তার ফলে একটা কালো দাগ তাঁহার জীবনে চিরদিনের জন্যই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রেমাস্পদাকে জীবনের সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ না করিলেও তাঁহার এই প্রেমের ইতিহাসটি তিনি রেখার অক্ষরে অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গেটে—ক্যাম্পানায়

গেটে যখন রোমে যান, তখন তিনি 'সেণ্ট পিটারে'র একখানা ছবি আঁকেন। এই ছবিখানি ১৭৮৭ সালে তিনি উপহার দিয়াছিলেন ফ্রাউ ভন ষ্টেইনকে। কে এই ফ্রাউ ভন ষ্টেইন্ সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা অসম্ভব নয়। ইনি উইমারের একজন রাজ-

গেটের আঁকা ছবিগুলি তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনীকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। ২০ বৎসর বয়সে সেসেনহেইম-এর জনৈক ধর্ম্মযাজকের বাড়ীর একখানা ছবি তিনি আঁকিয়াছিলেন। এই ছবিখানির পিছনে একটি ইতিহাস আছে। এই ধর্ম্মযাজকের একটি মেয়ে ছিল—নাম তার ফ্রাইডেরিকা ব্রাইয়ন। গেটে পড়েন এই মহিলাটির প্রেমে। বিবাহ হয় তো স্বচ্ছন্দেই হইতে পারিত। কিন্তু গেটের মন ছিল তখন কোনোরূপ

সেসেন্‌হিমে ধর্ম্মযাজকের গৃহ—গেটের অঙ্কিত

কর্ম্মচারীর পত্নী। বয়সে গেটের ঢের বড়। অনেকগুলি ছেলেমেয়ের জননী। প্রায় ১০ বৎসর কাল ইঁহার ইঙ্গিত একান্তভাবে কবির জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গেটের তখনকার জীবনে এই মহিলাটিই তাঁহার কলালক্ষ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কবি শিলারের সহিত গেটের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় একখানি সাময়িক পত্রে লেখার নিমন্ত্রণের ভিতর দিয়া। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শিলার এই পত্রিকাতে লেখার জন্য গেটেকে নিমন্ত্রণ করেন। এইভাবে যে সৌহার্দ্দ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা উভয়ের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।
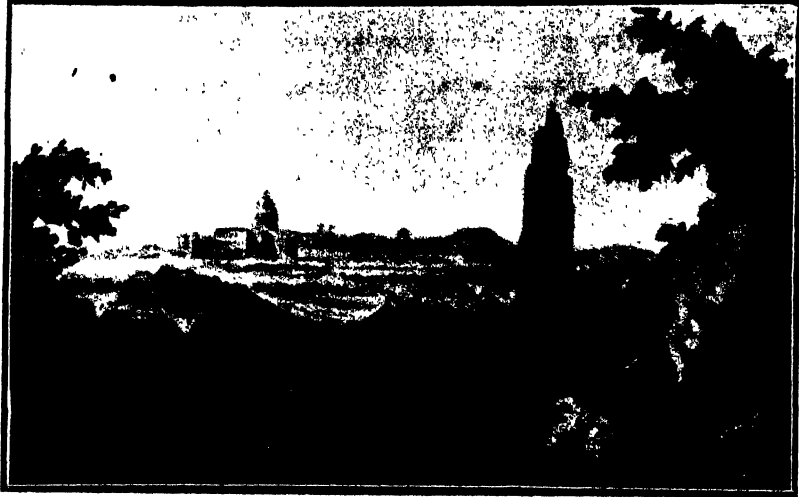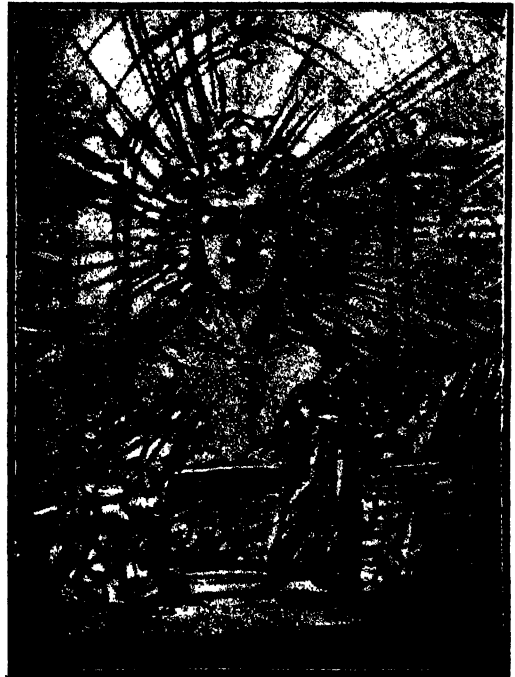
গেটের অঙ্কিত পেন্সিল চিত্র

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে শিলার পরলোকের পথে যাত্রা করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্বের স্মৃতি চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখার নিমিত্ত শিলারের বাগানের একখানা ছবি গেটে তুলির লেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

গেটের পত্নীর নাম ছিল ক্রিশ্চিয়ানা ভালপিয়াস।

সেণ্টপিটার্সের দৃশ্য

গেটের অঙ্কিত চিত্র

ইটালী হইতে উইমারে ফিরিয়া আসার পর এই ক্রিশ্চিয়ানা ভালপিয়াসের সঙ্গে হয় তাঁহার পরিচয়।

পরিচয়টির ভিতরে দেহের আকর্ষণই ছিল বেশী। কারণ যে প্রতিভা থাকিলে গেটের মতো মনীষীর আত্মার সঙ্গিনী হইতে পারা যায় সে প্রতিভা ক্রিশ্চিয়ানার ভিতরে ছিল না। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গেটে তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের এক পুত্রও ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্র জন্মগ্রহণ করিল বটে, কিন্তু আইন অনুসারে পরিণয়সূত্রে তখনও তাঁহারা আবদ্ধ হন নাই। তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, পুত্র হওয়ার ঢের তাঁহাদের অনেকের পরিচয় আছে। এই যন্ত্রাসের কাছে পৃথিবীর আত্মাকে যেখানে তিনি কথার পর কথা সাজাইয়া রূপ দিয়াছেন সেইখানকার একটি চিত্রও তিনি রেখার অক্ষরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ছবিখানির অভি-ব্যঞ্জনা চমৎকার। ব্যাপারটি সাধারণ নয়, তাই চিত্র রেখাও সাধারণ চিত্র-পদ্ধতির অনুসরণ করে নাই। একটি অদ্ভুত আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়া ছবিখানিকে তিনি একটি অপরূপ রূপ দিয়াছিলেন।

গেটের অঙ্কিত ডাইনীর চিত্র

পরে—১৮০৬ খৃষ্টাব্দে। ক্রিশ্চিয়ানার একখানা চমৎকার ছবি গেটে আঁকিয়া গিয়াছেন। নিদ্রালসা ক্রিশ্চিয়ানার এই আলেখ্যটির ভিতর দিয়া কবির সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন-বিহ্বল তন্দ্রাতুর মনের একটা আভাসও ধরা পড়ে।

কিন্তু এসব চিত্র অপেক্ষা যে সব চিত্রে কল্পনার ভিতর দিয়া তুলিকে মুক্তি দিবার সুযোগ পাওয়া যায় সেই গুলিতেই কবির দক্ষতা সমধিক পরিস্ফুট। গেটের নামের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত ডাঃ ফষ্টাসের নামের সঙ্গেও

তাঁহার কতকটা এই ধরণেরই আর একখানা চিত্র হইতেছে 'ডাইনীর' ছবি। অস্বাভাবিক বস্তুকে অস্বাভাবিক আবেষ্টনের ভিতরে ফেলিয়া এই যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা—ইহাতে তুলির উপর যতখানি হাত থাকা আবশ্যক তাহার চেয়ে বেশী আবশ্যক কল্পনার। কল্পনার খেয়াল যাহার ভিতরে সমস্ত বাধা-বাঁধনের গণ্ডি ছাড়াইয়া একেবারে বল্গা ছেঁড়া ঘোড়ার মতো বেপরোয়া হইয়া উঠিতে না পারে এ ধরণের ছবি তাঁহারা আঁকিতে

পারেন না। গেটে সেক্সপীয়ারে খুব একজন বড় ভক্ত ছিলেন; অনেকে মনে করেন, এই ছবির পরিকল্পনা কবি গেটে গ্রহণ করিয়াছিলেন সেক্সপীয়ারের নাটকের ডাইনীর চিত্র হইতে।

জেনায় সিলারের উদ্যান

চিত্র-শিল্প যাহাদের নামকে দুনিয়ার দরবারে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, গেটের রেখাঙ্কনগুলি তাঁহাদের ছবির ভিতরে স্থান পাওয়ার হয় তো যোগ্য নহে। কিন্তু তাহা হইলেও শব্দের অভিনব চয়ন-পদ্ধতির ভিতর দিয়া যাঁহার বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তুলির সরস্বতীও যে তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন না এই ছবিগুলিই তাহার প্রমাণ। তাহা ছাড়া এ-গুলির ভিতর দিয়া কবি গেটের হৃদয়ের এমন কতকগুলি রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায় যাহার সন্ধান এ ছবিগুলি না থাকিলে হয় তো কোনো কালেই পাওয়া যাইত না। সেদিক দিয়াও ছবিগুলি অমূল্য।

নেপোলিয়ানের প্রেম পত্র

যাঁহারা খুব বড় বীর, তলোয়ারের ঝনৎকার এবং কামানের গর্জ্জনে যাঁহারা পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত করিয়া তোলেন, তাঁহাদের হৃদয়েও যে প্রেমের আলো-ছায়ার খেলা চলে, ভালোবাসার আশা-নিরাশার দ্বন্দ

নেপোলিয়ন

থাকে, এ কথা সাধারণতঃ আমাদের কল্পনায় আসে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই তাহাদের পথ। তাই আমরা মনে করি—তাঁহাদের মনও মৃত্যুর মতোই কঠিন, পাষাণের মতোই শুষ্ক ও নীরস।

ঠিক এই কথাই মনে হয় আমাদের নেপোলিয়ানের সম্পর্কেও। পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে বিরাট বাহিনী, তাহাদের কামানের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হইয়া গিয়াছে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় বাতাস মুখরিত,

রাণী জোসেফাইন

চার পাশের নর-নারী ভয়ে আড়ষ্ট ও বিহ্বল। সৈন্যদলের হয় পিছনে না হয় সাম্‌নে ঘোড়ার উপরে নেপোলিয়ান --মৃত্যুর মতো নির্ভীক, মরুভূমির মতো রসশূন্য—বুকের কোথাও তাঁর মায়া-মমতার লেশমাত্রও নাই।

কিন্তু এ চিত্র যে নেপোলিয়ানের সত্যিকারের চিত্র হইতে কত বিভিন্ন তাহার পরিচয় আজ স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে জোসেফাইনের কাছে লেখা তাঁহার পত্রগুলির ভিতর দিয়া। এই পত্রগুলির ভিতর আটখানি পত্র সম্প্রতি নীলামে চড়ানো হইয়াছিল। এই নীলামের ব্যাপারটা সারা পাশ্চাত্য জগতে বেশ একটা বড় রকমের সাড়ারও সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে এই পত্রগুলি সম্বন্ধেই কয়েকটি কথা বলা দরকার।

নূতন প্রেমের মোহে যখন নেপোলিয়ানের চোখে স্বপ্নের ঘোর, মন মাতালের মতো অশান্ত—এ চিঠিগুলি সমস্তই সেই সময়কার লেখা। ফরাসী গণতন্ত্রের মোহর আঁকা ঈষৎ নীলাভ কাগজে যাঁহাকে আমরা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর অথচ বিরাট সামরিক প্রতিভা বলিয়া জানি তিনিই এগুলি লিখিয়াছিলেন তাঁহার প্রথম প্রেমাস্পদার উদ্দেশে।

বিবাহের দুই সপ্তাহ আগে সকাল সাতটার সময় প্রথম চিঠিখানি লিখিত। নেপোলিয়ান লিখিয়াছেন—

"আমার জাগ্রত অবস্থার সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুমি জাগিয়া রহিয়াছ। তোমার ছবি এবং গত রাত্রির বিহ্বলতার স্মৃতি আমার বিশ্রামের অনুভূতিকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

"জোসেফাইন তুমি মধুর, তুমি অতুলনীয়। কি অসম্ভব প্রভাব তুমি বিস্তার করিয়াছ আমার মনের উপরে! জোসেফাইন তুমি কি আমার উপরে বিরক্ত হইয়াছ? তোমার মুখ কি ম্লান হইয়া গিয়াছে? তোমার মনের শান্তি কি আমি নষ্ট করিয়াছি? আমার মন বেদনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তোমার এই প্রেমাস্পদ মানুষটি কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না।"...

বিবাহের অল্প কিছু দিন পরেই ইতালীর বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে। প্রিয়াকে ছাড়িয়া অকস্মাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল তাঁহাকে একেবারে পথের প্রান্তে। অশ্রান্ত কুচ-কাওয়াজ—কিন্তু তাহার ভিতরেও তাঁহার বুকে শান্ত হইয়া জাগিয়া ছিল তাঁহার প্রিয়তমারই অনিন্দিত মুখখানা। তাই তাঁহার এই

সময়কার পত্রগুলির ভিতর যেমন ধরা পড়িয়াছে বেদনার নিবিড় ছায়া, তেমনি ধরা পড়িয়াছে অভিমানের বাষ্পোচ্ছ্বাস। একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"তোমার আগের পত্রখানি পড়িয়া আমি খুশী হইতে পারি নাই। বন্ধুত্বের মতো এ পত্রখানি যেন শীতল—আবেগশূন্য। তোমার দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে আগুন ঝরিয়া পড়ে পত্রে তাহার নিশানা খুঁজিয়া পাইলাম না।..."

দুই সপ্তাহ পরে আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"কয়েক দিন হইল তুমি আমাকে কোনো চিঠিপত্র লিখিতেছ না। তুমি তবে কি করিয়া সময় কাটাইতেছ? প্রিয়তমে তোমার বিশ্রামের আমি ঈর্ষা করিতেছি না। কেবল সময়ে সময়ে আমার নিজেকে আমি অত্যন্ত অশান্ত বলিয়া মনে করিতেছি। শীঘ্র—যত শীঘ্র পারো তুমি আমার কাছে চলিয়া এসো।...

"তোমার পাখা মেলিয়া দাও। কিন্তু ভ্রমণ ধীরে সুস্থেই করিও। পথ দীর্ঘ—বিশ্রী—বিরক্তিকর। গাড়ী যাহাতে উল্‌টাইয়া না পড়ে, অসুস্থ বা ক্লান্ত হইয়া যাহাতে না পড়ো, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শান্ত ভাবে তুমি আসিও প্রিয়তমে, ধীরে আসিও।"

আর একখানি পত্রে বিরহের বেদনার সহিত আসিয়া মিশিয়াছে নেপোলিয়ানের আত্মগ্লানির অনুশোচনা। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে ঝড়ের সৃষ্টি করিতেন এ পত্রেও তাঁহার মনের ভিতরকার সেই ঝড়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"তুমি পীড়িত, তুমি আমাকে ভালোবাসো। তবু আমি তোমাকে অসুখী করিয়াছি। এ ব্যথা আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

তোমার প্রতি আমার অন্যায়ের সীমা নাই। কি করিলে যে আমার অপরাধের সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত হইবে তাহা আমি জানি না। তুমি রোগ-শয্যায় শায়িত, অথচ প্যারিসে থাকার জন্যই আমি তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি। তোমার যে প্রেম আমার হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে তাহাই মুছিয়া ফেলিয়াছে আমার বিচার-বুদ্ধিকে।

"......আর কোনো রমণীর চিন্তাও আমি করিতে পারি না। আমার চোখে তাহাদের মুখে লাবণ্য নাই, দেহে সৌন্দর্য্য নাই, মনে বুদ্ধির দীপ্তিও নাই। তুমি একাই আমার আনন্দের উৎস। যে মূর্ত্তিতে তুমি আমার কাছে ধরা দিয়াছ সেই মূর্ত্তিই তোমার আমার মনের সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।"

মেরিয়া লুইস

আটখানি চিঠিই ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ভিতরে লেখা। এগুলি পরলোকগত লর্ড রোজবেরির দলিল দস্তাবেজের ভিতর পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি তাঁহার কন্যা লেডি সিবিল গ্রাণ্টের আদেশে এগুলি নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা হইয়াছে। আটখানি চিঠির দাম পাওয়া গিয়াছে ৪,৪০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬০ হাজার

টাকা। চিঠিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন মিঃ বেন ম্যাগ্‌স্‌। দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি কেনা-বেচার ব্যবসায় ইয়োরোপে ইনি অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সঙ্গে মেরিয়া লুইসের নিকট লিখিত নেপোলিয়ানের একখানা পত্রও নিলামে চড়িয়াছিল। ১০০০ পাউণ্ড দক্ষিণা দিয়া মিঃ ম্যাগসই সেখানাও কিনিয়া লইয়াছেন। ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন—জোসেফাইনকে ত্যাগ করিয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান প্রুসিয়ার এই রাজকুমারীটির পাণিগ্রহণ করেন। এল্‌বায় নির্ব্বাসিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজ্যভ্রষ্ট সম্রাট এ পত্রখানি তাঁহারই কাছে লিখিয়াছিলেন। পত্রখানির সুর ছিল ভারি করুণ। কিন্তু তাহা হইতেও করুণ ব্যাপার এই যে নেপোলিয়ানের এ পত্র তাঁহার পত্নীর কাছে পৌঁছিবারও সুযোগ পায় নাই।

জোসেফাইনের কাছে লেখা নেপোলিয়ানের ১৭ খানা চিঠি বোনাপার্ট পরিবারের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই চিঠিগুলি তাঁহারা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অনেকের ধারণা—তাঁহাদেরই একজনের জন্ত মিঃ ম্যাগ্‌স্‌ চিঠিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন। মিঃ ম্যাগ্‌স্‌কে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। খরিদ্দার পাইয়াই যে তিনি এগুলি কিনিয়া লইলেন তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এই খরিদ্দার যে কে তাহা তিনি কাহাকেও যথেষ্ট করিয়া জানান নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন—চিঠিগুলি ইংলণ্ডের বাহিরে যাইবে না।

নেপোলিয়ানের এই চিঠিগুলির জন্য যেমন লোভ ছিল আমেরিকার তেমনি লোভ ছিল ফরাসীদের। ডাক ক্রমেই চড়িতে থাকে। আমেরিকার ডাক উঠিয়াছিল ২৯০০ পাউণ্ড। ফরাসীরা ৩০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যিনি ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠতম গর্ব্ব ও গৌরব তাঁহার চিঠিগুলি নিজেদের দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত ফরাসীদের আকাঙ্ক্ষা যে একান্ত তীব্র হইবে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা নেপোলিয়ানের সময়েও ফরাসীদের দুর্ব্বার গতির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহারাই ফরাসীদের এ আকাঙ্ক্ষাও প্রহত করিয়াছে। সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিয়া ইংরেজেরাই নেপোলিয়ানের এই অমূল্য চিঠিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন।

আই-হ্যাজ (I has)

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮

কি হে নিবিড় কতক্ষণ? বেলা হয়ে গেছে নাকি?

আজ্ঞে না, এই সাড়ে ছটা। পড়তে বসেছিলুম—চীৎকার আর কান্নাকাটিতে বসতে দিলেনা, তাই চলে এলুম। আপনি কখন এলেন?

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কান্নাকাটি কেনো? কেউ...? পথে কাল খাট-বিছানা দেখে ..

একটু হাসি টেনে বললে,—কোনো ভালো জিনিষই আপনার দৃষ্টি এড়ায়না দেখছি। সেই খাটই এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে। সেই germinant জিনিষ—প্লেগ-রক্তবীজ—এখন থাকে কোথায়? শেষ চাকরের ঘরে ঢোকে। চাকর সারারাত বাইরে কাটিয়ে, সকালে সরে পড়লো। এখন সব আক্রোশটা গিয়ে পড়েছে কৃশানু বাবুর ওপর—

কেনো—তিনি কি করলেন? তিনি তো মাসাবধি অসুস্থ, কোর্টে যেতে পারেননা।—দেখতে গেলুম—কত কথাই কইলেন—সবই দুঃখের আর হতাশার! বললেন—আর পারচিনা,...তিন বচর থেকেই অপটু। শোনে কে...(দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন)—

বললুম—আর, পেরে দরকারই বা কি, সবি তো করেছেন, চিরদিনই কি পারতে হবে? হলো কতো?

এখন আপনাকে বলতে আর কি—৭৪—আর কি পারি? কিন্তু না পারলেও শান্তি নেই। আমাদের দাঁড়িয়ে কাজ, মাথা ঘোরে, অনেক দিন থেকেই চোখে ভালো দেখতে পাচ্চিনা,—বাতে নড়তে পারিনা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছলেন।—৫২ বচর practice হল, এখনো বলে,—বাড়ী বসে কি করবে—বাজার খরচটাও তো আসবে ··

শুনে তো আমি স্তম্ভিত। বললুম, ইংরিজি হিসেবে to die in harness হলে—জোয়াল কাঁধে করে' মলে—যদি স্বর্গ পান তো মানা করায় পাপ আছে। কিন্তু আমাদের মতে এ তো আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।—যাক্ শুনে সেদিন বড় মনোকষ্ট নিয়ে ফিরেছিলুম নিবিড়। জানো এখন তিনি কেমন আছেন? একবার দেখতে যাওয়া যে উচিত—

এ টরনেডোর মুখে নয়, দুদিন পরে যাবেন দাদাবাবু।

হ্যাঁ—সে খাট্ বিছানার সঙ্গে ওঁদের কি,—ওতো নিশ্চয়ই কোনো ভদ্রলোকের নয়···

নিবিড় হাসিমুখে বললে, ওতে উনবিংশ শতাব্দির পূর্ণিয়ার ঐতিহাসিক Material রয়েছে। পূর্ব্বে এ স্থানটা ম্যালেরিয়ার মালভূমি ছিল, তাতো জানেন। কাছারীতে উকীলদের লেপ কম্বল রাখতে হ'ত, কেস্ আরম্ভ করে, কম্প দিয়ে জ্বর এলেই—কম্বল মুড়ি দেবার privilege ছিল। কাঁপুনিটে কম্বলের মধ্যে সেরে, আবার গিয়ে সুরু করতেন। কাল যা দেখেছেন সেটা কৃশানু বাবুর ৫২ বছরের সম্পত্তি, কত হাকিম বদল হয়েছে কিন্তু ও আর বদলায় নি। অনেকবার বদলাবার কথা হয়েছিল নাকি, কিন্তু বাড়ীর ধারণা—ও জিনিষগুলি বড় লক্ষ্মীমন্ত, ওর দৌলতেই···

আমাকে নির্ব্বাক দেখে নিবিড় বললে—কর্ত্তা এবার একদম গা ঢেলেছেন, বেচারির কাছারি যাবার শক্তি আর নেই। উৎসাহ, উপদেশ, উদ্দীপনা, শেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনায় কাজ দিলেনা দেখে হতাশ হয়ে,—কাল ওই লেপ-লক্ষ্মীকে বাড়ী আনিয়ে ফেলেছেন। সেই দেখে ৫২ বচ্ছরের কথা, যখন তখন উথ্‌লে উঠছে, তাই কখনো কান্না কখনো গঞ্জনা চলেছে। চাকর পালালো,—গোয়ালে ঢোকানো হবেনা—কারণ মঙ্গলা দুধ দেয়, তার ভালোমন্দ হতে পারে, ইত্যাদি। জীবনব্যাপী কৃতকর্ম্মের পুরস্কার পেয়ে—কৃশানু বাবু চুপ্।

আমার ব্যথিত চিত্ত সরাসরি বলে বসলো—ও পাপ দূর করে ফেলে দিলেই তো হয়, আর রাখা কেনো?

নিবিড় বললে—মাপ করেন তো একটা কথা বলি,—আপনি কি নিজেকে উকীলদের চেয়ে বুদ্ধিমান ভাবেন? তাঁরা কি বোঝেন না—ওগুলো কেনো বাড়ী আনানো হয়েছে?—ওর সদ্ব্যবহারের শুভক্ষণ যে আসন্ন, তখন কি···

শুনে শিউরে গেলুম। সত্যিই তো—সনাতন নিয়মই তো তাই। শঙ্করাচার্য্য বৈরাগ্য-শতক যে কেনো মিছে লিখেছিলেন, বুঝতে পারিনা। নিবিড় এতবড় কথাটা এই বয়সেই এমন সহজ ভাবে বুঝে ফেলেছে দেখে আশ্চর্য্যও হলুম। আজকালের ছেলেদের মাথা কি সাফ্। একেবারে স্বচ্ছ স্ফটিকস্তম্ভ।

আপনি হাত মুখ ধুন, আমি এখন যাই।

নিবিড় চলে গেল।

সূর্য্য, তামাক দিয়ে যা বাবা

* * * *

নিবিড় চলে যাবার মিনিট তিনেক পরেই নমস্কার করে' রণগোপাল হাজির হল।

সকালে এ আপদ আবার কেনো? কতকগুলো মিছে কথা কইবে এবং তা শুনতেও হবে। সভ্যতার সাজা! যারা জেনে বুঝে অবাধে মিথ্যাগুলো হজম করতে পারে তারাই শিক্ষিত ও সিভিলাইজ্‌ড্।

আপনি বাড়িতে রয়েছেন জেনেও আসতে পারিনি,—মাপ করবেন। আপনাকে জানাবার মত অনেক কথা ছিল, ছট্‌ফট্ করছিলুম। কি করি, চক্রধরবাবু বিদেশে এসে বেয়ারামে পড়ে গেছেন, দেখবার শোনবার কেউ নেই,—ক'দিন একা পড়ে আছেন শুনে সেইখানেই থাকতে হ'য়েছিল। আজ একটু ভালো আছেন,—তাই। দেশের কি কপাল মশাই যাদের প্রাণ আছে তাদেরি যতো···

কি অসুখ?

এদিক ওদিক চেয়ে, দোরের বাইরে দেখে—বিশেষ সতর্কতার সহিত—আপনাকে গুরু বলে জেনেছি

—আপনাকে বলতে আর কি (চুপি চুপি) প্রপোর্‌সন্ তো জানা নেই, অথচ না করতে পারলেও স্বস্তি নেই, —লেগেই আছেন। তাই আপনার কাছে একটু hint এর জন্তে হান্‌টান্ করছিলেন। শেষ মন-মরা হয়ে নিজেই এটা ওটা মিশিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ জলে উঠে—খুব বেঁচে গেছেন,—আরো বাঁচোয়া—শব্দ হয়নি;—ভারতমাতা আছেন। নইলে আজ—উঃ! রণগোপালের মুখ একদম বীরবাহু পতনের সংবাদ-দাতার মত দাঁড়িয়ে গেল। যেন—"কি আর কহিব।" ঠাশ্ করে একটি চপেটাঘাতই এর অলিখিত প্রেসক্রিপ্‌সন্।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—কবে এমনটা?

এই পরশু রাতে মশাই। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের জ্বালা কি থামে? সারারাত spirit ঢেলেছি। ও-রকম একটি খাঁটি লোককে একদিন খোয়াতেই হবে দেখছি! উনি কি নিরস্ত হবেন? মানা শুনবেন না, দেশ ওঁর রক্তমাংস। কত বলেছি, বলেন—এ শরীর মায়ের কাজেই যদি এলোনা,—এ ব্যর্থ জীবন থাকলেই কি আর গেলেই কি!—আপনি একটু দয়া করলে যে কত কাজ হয়, ওরূপ মূল্যবান জীবনটাও বাঁচে—দেশেরও……

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে—আহা, আপনার সঙ্গে আলাপ করাতে পারলুম না! মুকুন্দ বাবুর কি অদ্ভুত প্রভাব—আশ্চর্য্য শক্তি, সিগারেট আর কেউ ছোঁয়না, একদম বৈতরণী পার! দোকানদারেরাও তাতে খুসি। —মশাই যার ৩০৲ টাকা পুঁজি সেও বলে—১৭ টাকার Gold flake মজুদ, চুলোয় যাক্ ও-পাপ আর রাখবোনা। ভাববো ১৭ টাকা মায়ের পুজোয় দিয়েছি। অধিক কি ডাক্তার সনাতন পাকড়াশী, উকীল সৌভরী সামন্ত— —যাঁদের এক টিনের কম দিন যেতনা,—যাঁরা চামড়ার চিমনি বললে হয়,—তাঁরা পর্য্যন্ত go to hell করে দেছেন। তরুণদের তো কথাই নেই—তারা হল দেশের আশা ভরসা,—যে কথা সেই কাজ। এমন না হলে হয়! আর কি চান? দেশ জেগেছে মশাই…

কতক্ষণ আর চুপ করে থাকবো? বললুম—এটা সত্যই সুসম্বাদ. বড় বড় ইংরেজ ডাক্তারেও সিগারেটের অপকারিতা প্রতিপন্ন করে, ওর ব্যবহার নিষেধ করেছেন, তা ছাড়া এ গরীব দেশের পক্ষে ওটা অশোভন লজ্জারিও।

রণগোপাল ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে বললে —ওসব কথা প্রবন্ধে পড়তেই ভালো, আমাদের ও ভাববার আর সময় নেই—আমাদের চিত্তপট—বরকটে ভর। সেটা হলেই হল। তাকৃসিন্ ১৩ বচরের তরুণ, হপ্তায় তিন টিন্ ফুঁকতো,—সে আর ছোঁয়না! বাপ-মার সবে ধন, তাঁরা তাই বিষম চিন্তাকুল হয়ে পড়েছেন। কত করে বোঝাচ্ছেন—"লক্ষ্মী বাপ্, অসুখ করবে— আচ্ছা দুটিন্ টান্।" সে একদম এডাম্যাণ্ট্। যুবকরা দেশের সর্ব্বস্ব—মুখাগ্রে জীবন পণ,—তারাই ভারত মাতার Vitality, তাদের কথা ছেড়ে দিন। তাতে তিন দিনে ছ'খানা বিড়ির দোকান বসে গেছে, বেচারারা যুগিয়ে উঠতে পারছেনা। আবার কি চান? Even দুর্দ্ধোরা কূর্ম্মবৃত্তি ধরেছেন, নিরাপদ স্থলে পকেট থেকে হাত বার করেন,—ধোঁ ছাড়েন না—গিলে ফেলেন। Something is better,·· না।

বক্তৃতা বন্ধ করতে পারলে বাঁচি। বললুম—বলো কি রণগোপাল—এ বড় কম কসরৎ নয়…

Moral effect মশাই—moral effect—নৈতিক…

বললুম—তা বটে। একে ভদ্র-সন্তান, তায় সব শিক্ষিত—একবার ওর অপকারিতা বুঝলে…

রণগোপাল উত্তেজিত ভাবে বললে—অপকারিতা ফপকারিতা কি বলছেন মশাই, প্রাণের কথাটা তো বলচেননা। মনে মনে কতটা খুসি হচ্চেন তাই বলুন। দেশের কতটা টাকা বিদেশে যাচ্ছিলো…

হয়েছি হে—খুব খুসি হয়েছি—খুসি হবার কথাই যে। আচ্ছা আজ আর নয়, আজ আমাবস্তে,—এখন আমার চণ্ডী পাঠের সময়…

রণগোপাল সবিস্ময়ে কপালে চক্ষু তুলে—"চণ্ডীপাঠ"! বলেই নীরব—। পরে—"এ যজ্ঞের আসল বীজ" তো ওইতেই। "মারয় মারয়, ঘাতয় ঘাতয়—ওই-তেই তো সব।" নিশ্বাস ফেলে হতাশ ভাবে—"লিডার না থাকলে…" কাতর মুখে—তা আমাদের এ সব উপদেশ দেননা কেনো আমরাও তো"—

বললুম পড়লেই হয়,—পাঠে তো কারুর মানা নেই ভাই।

ওসব ঢালা ব্যবস্থা তো পুরুত বামুনের জন্তে মশাই।

রইখানা আনবো'খোন—আমাদের যেটুকু দরকার—দয়া করে দাগ দিয়ে দেবেন; গুরু ভিন্ন কি হয় মশাই? অন্ধের মত সারা জঙ্গল ঘুরে মরতে হয়—না চিনি বিশল্যকরণী না চিনি ইসের-মূল। অমূল্য সময় হু হু করে চলে যাচ্ছে।

বললুম—বেশ তো—সব না পারো—অম্বিকা স্তবটি নিত্য পাঠ কোরো—কল্যাণ হবে···

মাপ করুন, নিজের কল্যাণের কথা তো আর মনেই আসেনা, এখন দেশের কল্যাণের···

সে তো উত্তম কথা রণগোপাল, খুব উচ্চ সঙ্কল্প···

শুধু সঙ্কল্প নিয়ে কি করবো মশাই যদি পথ দেখাবার গুরু না মেলে। ও সমুদ্র ছেঁচে পথ পেতে হলে দিন ফুরিয়ে যায়।—উঃ নিত্য চণ্ডীপাঠ করেন! কি হলে আপনার কৃপা হবে—দয়া করে বলুন, আর যে পারছিনা···

তাড়াতে পারলে বাঁচি, শেষে বলতেই হল—হবে হবে, সুময় হলেই হবে—অত উতলা হচ্ছ কেনো। এখন যাও—কমরেডকে দেখগে; ওরকম কর্ম্মী 'লাখে না মিলে এক'—যাও আর নয়। সে যতদিন পড়ে থাকবে দেশ তত বছর পিছিয়ে পড়বে,—যাও···

রণগোপাল উৎফুল্ল আনন্দে তুড়িলাফ খেয়ে আমার পায়ে এসে ঢু মারলে।—বস্—আপনার আশীর্ব্বাদ পেয়েছি আর ভয় করিনা। আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক বজ্র,—আসুক গরজি সিন্ধু,—এই পদধূলি নিয়ে চললুম—এ একদিনেই তাঁকে চাঙ্গা করে দেবে।—হুঁঃ—চণ্ডী থাকতে চারুপাঠ পড়িয়ে পণ্ড করে রেখেছে মশাই। পড়ো—পুরুভুজ সমুদ্রের মধ্যে থাকে, কাটলেই বাড়ে,—এ সব জানবার বড়ো দরকার।—ঘর চলেনা!—আর সমুদ্রের ওপরে যারা থাকে, তাদের ব্যবস্থা কি? পুরুভুজ পড়িয়ে দেশকে চতুর্ভুজ বানাবেন···কিছু কি পড়তে দিয়েছে!—পড়ো টমের-সন্, জনের-সন, নেলের-সন্, আর আমাদের son চুলোয় gone!

বললুম আগের কাজ আগে,—চক্রধরকে দেখগে—

হ্যাঁ এই চললুম মশাই; কি করি, প্রাণের জ্বালায় বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইলুম। মনে কত কথাই আপনা আপনি ছায়াচিত্রের মত ফুটলো মিলোলো! সেই সঙ্গে বিস্ময়, বেদনা আনন্দও ছুঁয়ে গেল। এ-সব কি ছেলে?—রত্ন। আমরা ও-বয়সে চলন্ত মাংস-পিণ্ড মাত্র ছিলুম, কিছুই বুঝতুমনা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে মুখ তুলে কথাই কইতে পারতুমনা। সায়েব দেখলে বাঁশ বনে গায়েব হ'য়ে যেতুম! কেউ কোন্ মুখো বাড়ী জিজ্ঞাসা করলে তখন হুঁ করে ভাবতে হোত, কোন্ দিকে সূর্য্য ওঠে! এরা অন্যের বাড়ীর কটা জানলা তা বলে দিতে পারে। সিঁড়ির কটা ধাপ, ঘরে কখানা বরগা—এদের কণ্ঠস্থ। কি প্রখর দৃষ্টি, কি অযাচিত অনুসন্ধিৎসা! এরা বাঁচলে দেশের ভাবনা শেষ হয়ে যাবে—দরকারই হবেনা। দেবতারা মঙ্গল করুন—বাঁচিয়ে রাখুন। এতদিন কেবল বেঁচেই রইলুম—ভেতরে ভেতরে দেশটা কি এগিয়েই গেছে! ব্রাহ্মণের ছেলে চণ্ডীপাঠ করি,—তাতেও উদ্দেশ্য বার করে,—বাঃ। কী তীক্ষ্ণ ধী!

পড়েছিলুম—"এইকালে এই"—আহা ভুলে যাচ্ছি—"পূর্ণ কলেবর হবে যবে",—নাঃ মনে পড়ছেনা···

যাক্‌গে, কিন্তু জ্বালালে যে···

নাঃ আর থাকা নয়—মিছে অশান্তি ভোগ কেনো? অবশ্য করণীয় যা ছিল সবই তো মোটামুটি সারা হয়েছে। চতুরাশ্রম শেষ করেছি,—ইস্কুল যাওয়া, চাকরী করা, বিবাহ এবং সন্তানের মুখ দর্শন সমাপ্ত। ওঃ, তাই বোধ হয় তাদের মুখদর্শন করতে আর ইচ্ছা হয় না। তীর্থও সেরে রেখেছি, তবে কেন আর অশান্তি ভোগ?—ফুলেলা-বাবা বলেছিলেন এতগুলি দুরূহ ত্যাগ-স্বীকার যে করতে পেরেছে সে তো পায়ে হেঁটে স্বর্গে যেতে পারে। সেই চেষ্টাই পাবো। মহাপুরুষ—হপ্তায় দুসের খাঁটি গাজিপুরি মাখতেন, বলতেন—"ব্রহ্মতালুমে ব্রহ্মাজি আসন লিয়া,—হর বখৎ হমন্ চল্ রাহা হায়।" তাঁর কথা ওতে কি আর···

তবে কলকেতায় একবার যেতেই হবে—লোকে ওকেই বলে তীর্থরাজ। সেটা মাড়োয়ারী, গুজরাটী পাঞ্জাবী, উৎকলী মহা মহা সাধকে ছেয়ে ফেলেছে,—ঝুন্ ঝন্ ঝন্ ঋন্, টন্ টন্, ধর্ম্মপ্রাণ মাত্রেই জুটেছে সব মহা মহা তাপস।

তাঁদের দেখে দেহশুদ্ধী করে—মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা। কিন্তু ভীষণ পাহাড়ী চড়াই ঠেলতে হবে—লোহার পা হলেই ঠিক্ হয়, অভাবে বাটা কোম্পানীর অন্ততঃ ১২ জোড়া পাম্প পিঠে ফেলে রওনা হয়ে পড়বো—আবশুক মতো এক এক জোড়া ছাড়বো—বেশী বইতে পারবোনা। শুনেছি মাঝে মাঝে 'চটি' পাওয়া যায়। যায় বইকি—তানা ত সব মহাপ্রস্থান করে কি করে, দরকার মত নিলেই হবে। নিশ্চয় সব মাপেরই আছে, যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভায়ের পা তো এক মাপের ছিলনা। আমার তাদের মত ল্যাটাও নেই, দ্রৌপদীর জন্যে জরির নাগরা খুঁজতে হবেনা।—শান্তির নিশ্বাস পড়লো। অশান্তির মধ্যে পথ পেলুম,—এখন জুতো মিললেই হয়।

নাঃ, যখন সব মায়াই কাটাচ্ছি, কলকেতায় একবার যেতেই হবে। শেষ কর্ত্তব্য সেরে যাওয়াই ভাল—মনটা খোলসা থাকবে। আজো যে দু'একজন পূর্ব্ব-পরিচিত, আমার মত পত্তনে-অমর হয়ে, রাজধানীর গৌরব রক্ষা করচেন ও প্রদর্শনীর বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এবং ডালহাউসী কি রকম বেশে চৌরঙ্গীতে চানাচুর বেচে বেড়াতেন, সেটা শোনাচ্ছেন,—তাঁদের নমস্কার করে আশীর্ব্বাদ নিয়ে দুর্গম পথে দুর্গা বলে—রওনা হওয়াই উচিত। (ক্রমশঃ)

গর্ব্বী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

হল্‌দিঘাটায় বাড়ী বলে তার
জল্‌দিই হলো বীর সে,
যদিও কখনো যুদ্ধ করেনি
ধরেনি ধনুক তীর সে।
হল্‌দিঘাটার হাউরে হরিশ
ফেরে সে কিসের ধান্দায়,
সন্ধ্যার কাজ সকালে সে করে,
সকালের কাজ সন্ধ্যায়।
অশোভন তাহা যখনি যা করে
প্রতিভার সেটা চিহ্ন,
তাহার নিকট তখনি তা পাবে
যেটা চাও সেটা ভিন্ন।
ভুলটাও তার উল্টা রকম,
মৌলিক তার আগ্রাম,
সকল 'ডোবা'ই সাগর তাহার,
সকল 'ডুলি'ই তাঞ্জাম।
সকল হুকুম ফরমান তার
তায়দাদ সব পাট্টা,
চন্দন বলে চালাইতে হবে
তাহার শুষ্ক কাঠ্‌টা।
রঙমহালে সে রন্ধন করে
রন্ধন ঘরে বৈঠক,
জীর্ণ শীর্ণ দেহ টাটু তার
তারেও ভাবে সে 'চৈতক'।
নিজেই নিজের সমালোচনায়
উঠে সবাকার শীর্ষে,
হল্‌দিঘাটায় বাড়ী বলে তার
জল্‌দিই হলো বীর সে।
মীনের শ্রেষ্ঠ 'মেঘনা'র সিঙ্গি
হ'ক না ওজনে পাতলা,
সে পারে বিঁধিতে, মোটে তা পারেনা
রুই কি মিরিগ কাৎলা।
'দণ্ডক বন' বিছুটির কাছে
রসালেরে হবে হারতে,
বিছুটি যে ফল হাতে হাতে দেয়;
আম সে ত হয় পাড়তে।
যে যত করুক হরিনাম গান
দিক্ না যতই মচ্ছব,
কীর্ত্তন গান বোঝার মালিক
বৃন্দাবনের কচ্ছপ।
হল্‌দিঘাটায় বাড়ী বলে তার
জলদিই হলো বীর সে,
যদিও কখনো যুদ্ধ করেনি
ধরেনি ধনুক তীর সে।
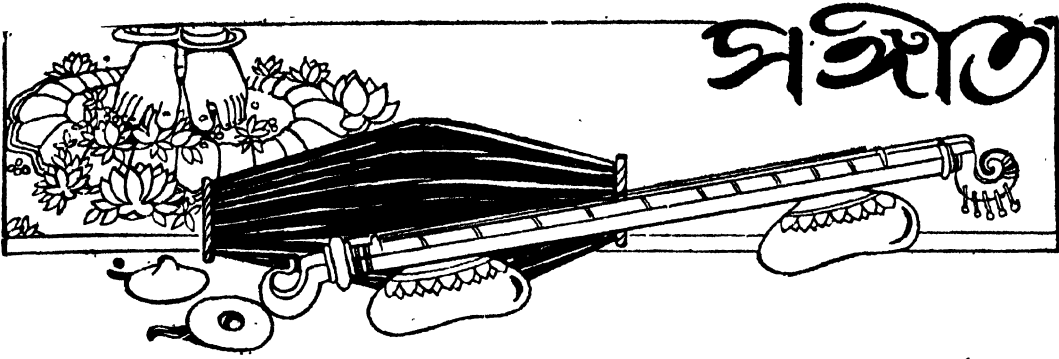
কথা ও সুর—কাজী নজ্‌রুল্‌ ইস্‌লাম। স্বরলিপি—শ্রীজগৎ ঘটক।

আশাবরী মিশ্র—দাদ্‌রা

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে;
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক্‌
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন॥

পাগ্‌লী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাইকো শেষ।

সিন্ধুতে ঐ বিন্দু খানিক
তার ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মাণিক
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ্‌বসন॥

মা II II { মা পদা -ণর্সা | র্সা র্সর্রা -র্সর্র্সা I ণধা ধণা -ধণা | ণদা -পা -দা I
আমার্‌ কা লো॰ ॰॰ মে য়ে॰ ॰॰র্‌ পা॰য়ে॰ ॰র্‌ ত লা য়্‌

I মপা জ্ঞমা ণা | দা -পদপা মপা I মজ্ঞা -রজ্ঞা সরা | রা মা.(-া) } I
দে॰ খে॰ ॰ যা ॰॰॰ আ॰ লো না॰ চ ন

[পদা ণর্সা]

I মা I { পা জ্ঞা জ্ঞা | র্রা র্সরা -নর্সা I পা র্সণসা র্সণা | ণদা পা -া I

মায়ের্ রূ প্ দে খে দে॰ ॰র্ বু ॰॰ক্ পে তে শি ব্

[পদা মা -া]

I পদা মা মা | পদা -ণর্সা র্সর্সা I ণধা -ণা দা | পা -া -া } I II

যা॰ বৃ হা তে॰ ॰॰ ম॰॰ র॰ ণ্ বা চ ন্ ॰

[ণর্সা দর্সা -া]

মা II { মা পা -া | ণদা দা -ণা I ণা ণর্সা -া | র্সা র্সা -া I

আমার্ কা লো ॰ মে॰ য়ে র্ আঁ ধা॰ র্ কো লে ॰

I দা দা -া | ণা র্সা -া I র্সর্রা ণর্সর্রা -র্মজ্ঞা | র্সর্রা র্সা (-া) } I

শি শু ॰ র বি ॰ শ॰ শী॰॰ ॰॰ দো॰ লে ॰

[পজ্ঞা]

I র্সা I { র্সা -জ্ঞা জ্ঞা | র্জরা জ্ঞা -া I জ্ঞর্মা জ্ঞর্রা -জ্ঞা | জ্ঞাঋা র্সা র্সা I

মায়ের্ এ ক্ টু খা নি ॰ রূ॰ পে॰ র্ ঝ লক ঐ

[পা পদা -ণর্সা ণধা -ণা দা পদা মা -া]

I পা -া মা | পণা ণধা ণা I পণা -ণা দা | পা -া -া } II II

স্নি গ্ ধ বি॰ রা॰ ট্ নী॰ ল্ গ গ ন্ ॰

া II { সা -জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা জ্ঞা -া | জ্ঞরা জ্ঞা -া I

॰ পা গ্ লী মে॰ য়ে ॰ এ॰ লো ॰ কে॰ শী ॰

I জ্ঞমা জ্ঞরা -জ্ঞা | জ্ঞঋা সা -ঋা I সণ্া সা -জ্ঞা | জ্ঞা সা -া I

নি॰ শী॰ ॰ থি নী র্ ছু লি য়ে কে ॰ শ্

I সা রা -মা | মপা পা -া I পা পা -দা | পদা পমা -া I

নে চে ॰ বে॰ ড়া য়্ দি নে র্ চি॰ তা য়্

I মা পা -া | পদা পদা ণর্সা I ণধা -সণা দা | পা -া -া } II

লী লা র্ রে॰ তা॰ র্॰ মা॰ ই॰ কো শে ॰ ষ্

II { মা -া পা | ণদা দা -ণা I ণা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
সি ন্ ধু তে • ও ই বি ন্ দু খা নি ক্

I দা -া দা | ণা র্সা -া I র্সর্রা র্সর্রা -র্মর্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্রর্সা -া } I
ঠি ক্ রে প ড়ে • রূ • পে • র্ • মা ণি ক্

[পা]
I { র্সা -া র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I -দা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | -র্ঋা -র্সা -া I
বি • শ্বে মা য়ে র্ রূ প্ ধ রে না •

[পদা মা -া]
I পা -দা -মা | পদা -ণর্সা র্সর্রর্সা I ণধা -ণা ণদা | পা -া -া } II II
মা • আ মা • • র্ তাই • দি • গ্ ব স ন্ •

গালুডি

শ্রীমুণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী

কলিকাতার একান্ত একঘেয়ে জীবনযাত্রা এবং নিরবচ্ছিন্ন কাজের কোলাহলে ক্লান্ত হইয়া অনেকেই কিছুদিনের জন্ত পশ্চিমে গিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়,—শিমুলতলা, মধুপুর বা গিরীডি অঞ্চলেই লোক-সমাগম বেশী হয়। মনে হয়, ইহার কারণ কলিকাতার নিকটেই এই সকল রমণীয় স্বাস্থ্যকর স্থান অবস্থিত, সকল দিক দিয়াই সুবিধা এবং খরচাদির পরিমাণও কম হয়।

কলিকাতার খুবই নিকটে সিংভুম জেলার অন্তর্গত ধলভূম রাজার জমিদারীর মধ্যে "ঘাটশীলা" এবং "গালুডি" নামক দুইটি অতি মনোরম স্থান আছে। এই দুইটি স্থান বি, এন, আর মেন লাইনের উপর। কলিকাতা হইতে ঘাটশীলা ১৩৩ মাইল মাত্র এবং ঘাটশীলার পরের ষ্টেসন গালুডি ছয় মাইল দূরে। আজকাল ডাক্তার-বৈদ্যগণের মতে এই সকল অঞ্চলও স্বাস্থ্যকর। এই কারণে এখন এ-সব জায়গারও লোক-সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। আট বৎসর পূর্ব্বে এ সকল স্থান জঙ্গলময় ছিল। ঘাটশীলায় এখন অনেক ঘর-বাড়ী হইয়াছে, এমন কি দোকানপাটের দিক দিয়াও উন্নত হইয়াছে।

ঘাটশীলা হইতে দুই মাইল দূরে মৌভাণ্ডার নামক
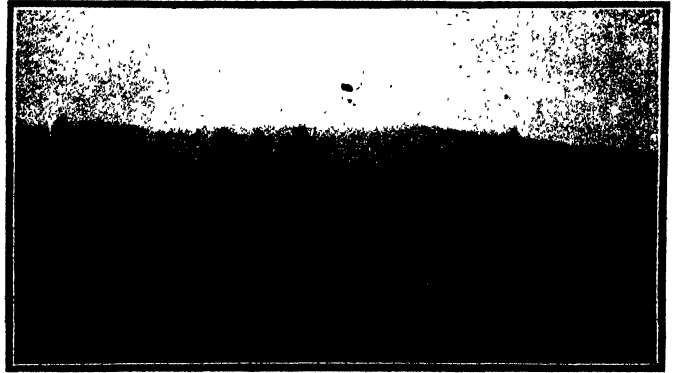
পূর্ব্বদিকে বরাভূম গিরিশ্রেণী, মধ্যে রুক্মিনী পাহাড় স্থানে 'ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের' তামার কারখানা এবং সাত মাইল দূরে মুখাবানিতে ইঁহাদের তামার বৃহৎ খনি আছে। এই তামার কারখানা এবং খনির জন্য

ঘাটশীলার প্রাধান্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সিংভূম জেলার পাহাড়গুলির মধ্যে অনেক স্থানে লোহা এবং তামা পাওয়া যায়। তামার পাথরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সোনাও থাকে।

সুবর্ণরেখা নদী রাঁচীর পাহাড়গুলির মধ্য হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া চাণ্ডিল, টাটানগর, গালুডি, ঘাটশীলা, দাঁতন, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থানসমূহের মধ্য দিয়া
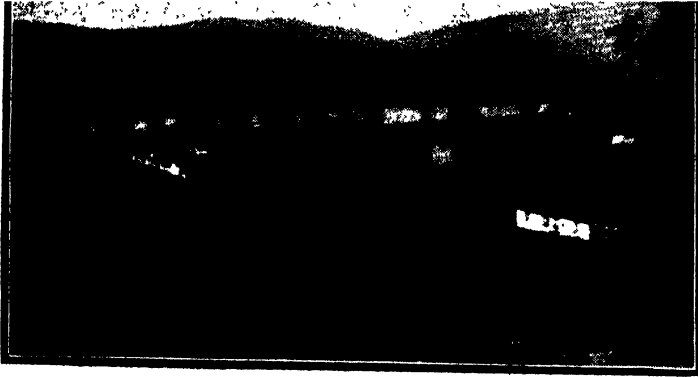
উত্তর এবং পশ্চিমদিকের পাহাড়

প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীর কোলে গালুডি এবং ঘাটশীলা অবস্থিত। গালুডিতে বসতি অধিক নহে। রেল ষ্টেসনের এক পারের এই গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। কলিকাতা বাসিন্দাদের মাত্র

পশ্চিম এবং দক্ষিণাংশে সিদ্ধেশ্বরগিরি

চার পাঁচখানি 'বাংলা' আছে। ষ্টেসনের অপরপারে মাহুলিয়া গ্রামে অনেক লোকের বাস। এ সকল অঞ্চলে সাঁওতাল, ভূমিজ, কেওট প্রভৃতি জাতির বাস। তবে সাঁওতালই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কয়েকঘর মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গালীও কার্য্য-উপলক্ষে এ সকল স্থানে বসবাস করিতেছেন।

মাহুলিয়া গ্রামের মধ্যে পোষ্ট-অফিস; মুদিখানার কয়েকটি দোকানও আছে। তরিতরকারীর বাজার বলিয়া কিছুই নাই। মুদির দোকানে আলু ও পেঁয়াজ সব সময়েই মিলে। প্রতি সোমবার হাট হয়। হাটে প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। কলিকাতা অপেক্ষা মাছ মাংসের দর সুলভ। বর্ষাকালে এখানে নদীর ইলিশ মাছ এত সুস্বাদু যে, গঙ্গার ইলিশকে হার মানিতে হয়। ইহা ব্যতীত কালবোস, রুই, কাৎলা, চিংড়ী এ সকল মাছ তাজা অবস্থায় প্রায় সব সময়েই পাওয়া যায়; তবে প্রত্যহ মিলে না। ছোট বড় সকল মাছেরই দর ছয় আনা সের।. খাঁটি দুধ টাকায় পাঁচ সের মাত্র। ঘি বা সরিসার তেল ভাল পাওয়া যায় না। হাটের দিন তরি-তরকারী বেশী পরিমাণে কিনিয়া রাখিতে হয়। এ সকল অঞ্চলে গালার চাষ খুবই দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে গালার কারখানাও আছে।

গ্রামে একটি Middle English স্কুল আছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ পাণ্ডা মহাশয় এ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। স্থানীয় সকল জাতির অধিবাসীগণের সন্তানেরাই এই স্কুলে পড়ে। পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন পাণ্ডা মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় এখানে বালিকা বিদ্যালয়েরও একটি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। প্রায় বৎসর দশেক পূর্ব্বে রেল ষ্টেসনের নাম মাহুলিয়াই ছিল। গালুডি গ্রামের এলাকার মধ্যে ষ্টেসনটি অবস্থিত বলিয়া এখন মাহুলিয়া নাম পরিবর্ত্তন হইয়া 'গালুডিহা' হইয়াছে। মাহুলিয়ার ভিতর কলিকাতাওয়ালাদের প্রায় বারো খানি ছোট বড় 'বাংলা' আছে। এ স্থানে যে বাংলাগুলি ভাড়া দেওয়া হয়, তাহার কোনটিই বিশেষ সুবিধাজনক

নহে; তবে লোকে প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া বাড়ীর সুবিধা অসুবিধার কথা বিস্মৃত হন। বাড়ীগুলির অবস্থানুযায়ী মাসিক ভাড়াও অন্য স্থান হইতে অধিক। গ্রীষ্মকালে জলের বিশেষ কষ্ট। সকল বাড়ীতে কূয়া নাই এবং যেখানে কূয়া আছে গ্রামের অধিবাসিগণ জল লইতে লইতে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রারম্ভেই জল ফুরাইয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ ফিট্ নিম্ন পর্য্যন্ত কূয়া খনন না করিলে ভাল জল মিলে না।

গালুডিতে ডাক্তারের বড়ই অভাব। ডাক্তারের দরকার হইলে এক ঘাটশীলা, না হয় ১৭ মাইল দূরে টাটানগরে যাইতে হয়। এই কারণে এ স্থানে রোগগ্রস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে আসা উচিত নহে। গৃহকার্য্যের জন্ত এখানে ঝি বা চাকরের অভাব নাই। তাহারা 'কলকাতাই-ঝির' মত কাজকর্ম্মের বহর দেখিয়া ভয় পায় না। এ দেশ খুব গরীব বটে; কিন্তু এখানে চোরের উপদ্রবের কথা আজ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। এখন এখানে বাড়ী করিবার মত জমির দর বিঘা পিছু ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। জমি কিনিতে হইলে গ্রামের প্রধানের সহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। এ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে একজন করিয়া প্রধান আছেন। অধিকাংশ প্রধানই বাঙ্গালী এবং শিক্ষিত। গ্রামের যাহা কিছু খাজানা আদায়ের ভার প্রধানের উপর। তিনি উক্ত খাজানার টাকাকড়ি ধলভূমের রাজাকে বুঝাইয়া দেন। প্রতি বিঘা এক টাকা হারে খাজানা এবং রাস্তার কর বাবদ খাজানার টাকা পিছু দুই পয়সা দিতে হয়।

গিরীডি, মধুপুর, দেওঘর প্রভৃতি সহরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। ঘাটশীলাও যে খুব শীঘ্রই ঐ সকল স্থানের স্থায় গণ্য হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; তবু গালুডির অবস্থা ঐরূপ হইতে এখনও একটু বিলম্ব আছে। ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে গালুডির কথা অনেকেরই জানা ছিল না। এখন লোক-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই মহানগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ গৃহ নির্ম্মাণে ব্রতী হইয়াছেন। আশা করা যায়, পাঁচ বৎসরের মধ্যেই গালুডির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এখন এখানে যে

সিদ্ধেশ্বরের কোলে সুবর্ণরেখা

গরীব গ্রামবাসীগণের স্কন্ধে ভূত, ব্রহ্মদৈত্য ডাইন প্রভৃতি চাপিয়া নানারূপ রোগের সৃষ্টি করে এবং রোজার ঝাড়ফুকের গুণে অভাগা ব্যক্তিগণ অকালে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তখন আর সম্ভবতঃ ডাক্তার

সুবর্ণরেখায় স্নানে.আনন্দ

বৈদ্যগণের চিকিৎসায় ঐ সকল অলৌকিক দৈত্যগুলি স্কন্ধে চাপিতে সাহস করিবে না।

মানভূম জেলায় উল্লিখিত স্থানগুলির সহিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের তুলনা করিলে দেখা যায়, গালুডিই প্রকৃতি-সুন্দরীর বেশী কৃপালাভ করিয়াছে। গালুডির চতুর্দ্দিক বেষ্টিত বলা চলে। প্রায় সাত মাইল দূরে উন্নত

পূর্ব্বদিক ঘিরিয়া বরাভূম মহকুমা অঞ্চলের গিরিশ্রেণী উত্তরের বিশাল দলমা গিরির সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। গালুডি হইতে দলমা প্রায় ১৭ মাইল। সিদ্ধেশ্বরগিরির শাখা-প্রশাখা আবার সমস্ত পশ্চিম দিক এবং দক্ষিণের প্রায় অর্দ্ধেক দখল করিয়া গালুডিকে অতি

মহুলিয়ার হাট

মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। এই সিদ্ধেশ্বরের অপর দিকে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের সীমানা। এই পাহাড় প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। এই সকল গিরিশ্রেণী জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

গ্রামের বালক শিকারীগণ

এখানে নানা হিংস্র পশুর বাস। পূর্ব্বে বাঘ, ভল্লুক, হাতী পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এই গ্রামের ভিতর বিচরণ করিতে আসিয়া বিপদ ঘটাইত ; কিন্তু এখন তাহারা আপনাদের বিপদ সম্যক বুঝিয়া এরূপ বিচরণে ক্ষান্ত দিয়াছে।

এ-স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড় বা টিলা চতুর্দ্দিকে অনেক রহিয়াছে। রেল-ষ্টেসন হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে সুবর্ণরেখা নদীর দৃশ্য অতি সুন্দর। সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড রুদ্র মূর্ত্তিতেও এ স্থানের শোভা বিলুপ্ত হয় না। অন্ধকার রাত্রে ১৭ মাইল দূরে বিখ্যাত টাটার লোহার কারখানার উজ্জ্বল আলো মেঘের গায় প্রতিফলিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। কোকিল, দোয়েল, বুলবুলি, বাবুই, টিয়া প্রভৃতি পক্ষীগণ ভোর হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যা অবধি গীত-লহরীতে গালুডিকে সজীব করিয়া রাখে। এই সকল জায়গায় শীতকালে যেমন ঠাণ্ডা, আবার গ্রীষ্মকালে তেমনি গরম পড়ে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে এ-স্থান অতীব সুন্দর।

শীতের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত এদেশে সাঁওতাল, ভূমিজ, কেওট প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যে শিকারের ডঙ্কা বাজিয়া উঠে। ইহাদের শিকার একটি আমোদের ব্যাপার। সিংভূম এবং মানভূম জেলায় যে পাহাড়ে যেদিন শিকার হয়, পূর্ব্বেই ঐ সকল জেলার মধ্যে যতগুলি হাট বসে, সেই হাটের দিনে প্রায় সকল জায়গায় শিকারের কথা ঘোষণা করা হয়। শিকারের দিনে নির্দ্দিষ্ট পাহাড়ে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে শিকারীগণ আসিতে থাকে। তাহারা জঙ্গলাকীর্ণ পথ বাহিয়া অতি প্রত্যূষে পাহাড়ে

উঠিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ বহুদূর গ্রাম হইতে পদব্রজে আসিয়া শিকারে যোগদান করে। কেহ বা তাহাদের দশ বারো বৎসরের পুত্রকেও সঙ্গে লইয়া আসে। অধিকাংশ দলই দশবারোজন শিকারী লইয়া

গঠিত; এমনও দেখা যায় মাত্র একটি দলে একশো জন ব্যক্তি যোগ দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় পাহাড়ের খানিকাংশ ঘিরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। তাহারা নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া নির্দিষ্ট পাহাড়টিকে বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃই শীর্ষদেশে উঠিতে থাকে। তাহাদের কাছে অস্ত্রের মধ্যে থাকে—কাঁড়বাঁশ অর্থাৎ তীরধনুক, টাঙ্গি, তাব্‌লা অর্থাৎ টাঙ্গির ন্যায় ক্ষুদ্র অস্ত্র, বর্শা, কুড়ুল প্রভৃতি। অর্দ্ধ-মাইল দূর পর্য্যন্তও ইহারা কাঁড় চালাইয়া থাকে এবং চতুর্থাংশ মাইলের ভিতর অনায়াসে জানোয়ারকে কাঁড় বিদ্ধ করে। শিকারের সময়ে ইহারা যে বিপদগ্রস্থ হয় না, এ কথা বলা যায় না। শিকার করিতে করিতে বাঘ কিংবা ভল্লুকের কবলে পড়িয়া শিকারী প্রাণ দিয়াছে, এমনও শুনা গিয়াছে।

কেওটজাতীয় শিকারীদ্বয়

এই সকল শিকারীদের পাহাড়ে আসিবার বহু পূর্ব্বে অপর কয়েকটি দল পাহাড়ের শিখরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দলের ব্যক্তিগণ হাঁড়িয়া বা মহুয়ার মদ, চাল, ডাল প্রভৃতি আহারের সামগ্রী লইয়া তথায় বিক্রয় করে এবং ঢাক, ঢোল, মাদল, শিঙা এইরূপ ভাবে বাজাইতে থাকে যে, উপর হইতে পশুপক্ষী ভয় পাইয়া নিম্নদিকে ছুটিয়া পালায়। এদিকে যে সকল শিকারী পাহাড় বেষ্টন করিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাদের সম্মুখে পলাতক পশুপক্ষী পতিত হইয়া কেহ না কেহ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। সম্মুখে হাতী দেখিলে ইহারা ছাড়িয়া দেয়, কারণ ভারত-সরকারের আদেশ ব্যতীত হাতী শিকার নিষিদ্ধ। সমস্ত দিন ধরিয়া শিকারীগণ শিকারে প্রবৃত্ত থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিরি-শিখরের নিকট উপস্থিত হয়। এরূপ আয়োজন সত্ত্বেও ইহারা অধিক শিকার করিতে সক্ষম হয় না। যখন গিরি-শিখরের নিকট সকলে একত্রে মিলিত হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায়—মাত্র তিন চারিটি হরিণ ও ময়ূর কিংবা বনকুকুট, কয়েকটি খরগোস এবং একটি বা বাঘ বা ভল্লুক শিকার করিয়াছে। শিকারের এই সকল দ্রব্য কাহারও লইয়া যাইবার আদেশ নাই; ঐ স্থানেই সকলে মিলিয়া রাঁধিয়া আহার করিতে হয়। ইহাদের মতে

বাঁধনের পথে

ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণে দ্বাদশ বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়; এমন কি ইহারা হরিণের ছাল পর্য্যন্ত পোড়াইয়া গলাধঃকরণ করিতে ছাড়ে না। আহারাদির পর

মহুয়ার মদে মাতোয়ারা হইয়া সমস্ত রাত্রি নৃত্যগীত করিতে থাকে। এইরূপ শিকারের আমোদকে সাঁওতালি ভাষায় 'সুন্তান' বলে। গালুডির নিকটে মানভূম জেলার অন্তর্গত 'রাইকা' পাহাড়ে প্রতি বৎসর ৭ই বৈশাখ শিকারের বিরাট আয়োজন হয়। সেই

আসনপানির শীর্ষদেশে জঙ্গলময় পথ

সময় বহুদূর হইতে শিকারীরা আসিয়া থাকে; এমন কি ভালাইডিয়া, ঝালদা, ধলভূমগড়, বরাভূম প্রভৃতি করদরাজ্যের রাজগণ আসিয়াও এই শিকারে যোগদান করেন।

একদল সাঁওতাল শিকারী

এই প্রকার শিকার ব্যতীত কয়েকজন মিলিয়া দল গঠন করিয়াও ইহারা মধ্যে মধ্যে শিকার করে। অনেক বাঙালী ভদ্রলোক সাঁওতালদের সঙ্গী করিয়া বনমধ্যে হরিণ বা ময়ূর শিকার করিতে গিয়া হঠাৎ হিংস্রজন্তুর কবলে পড়ায়, সাঁওতালগণ তাঁহাদের ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে, এমনও অনেক সময় ঘটিয়াছে। ভূমিজ বা কেওট জাতি শিকারীদের সাথী করিলে ঐরূপ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। মানভূম জেলার অন্তর্গত 'কুঁচিয়া' গ্রামের পাঁচজন বাঙালী ভদ্রলোক কুড়ি-জন সাঁওতাল সঙ্গে লইয়া একটি বাঘ মারিতে গিয়া কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়া-ছিলেন, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিগত ২৬শে মার্চ তারিখে আমরা কলিকাতা হইতে গালুডিতে দেড়মাসের জন্য বেড়াইতে যাই। আমরা দলে ভারী ছিলাম; সঙ্গে আমার মাতৃদেবী ও অন্যান্য মহিলা ও বালক বালিকা ছিলেন। আমরা সকলে এবং স্থানীয় বন্ধু-বর শ্রীযুক্ত বাদলচন্দ্র ও তাঁহার মাতৃদেবী, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মল্লিক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ২১শে এপ্রিল তারিখে গালুডি হইতে মোটরবাস্‌যোগে বাঁধন গ্রামে যাত্রা করিলাম। বাঁধন-যাত্রার উদ্দেশ্য বেড়াইতে যাওয়া। এখান হইতে বাঁধন ১৯ মাইল এবং এই পথে কুঁচিয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামটি ১১ মাইলে পড়ে। বিভূতিবাবুর মাতুলালয় কুঁচিয়া গ্রামে; সেই-জন্য তাঁহাকে আমরা সঙ্গে লইলাম। ব্যবসার জন্য বাঙলা ছাড়িয়া বিভূতিবাবুরা এ স্থানে বসবাস করিতেছেন; বন হইতে কাঠ চালানই ইঁহাদের ব্যবসা। কুঁচিয়া গ্রামে এই বিভূতিবাবুর মামারাই বিশজন সাঁওতাল সহ বাঘ মারিতে গিয়াছিলেন। ঘাটশীলা হইতে মোটরবাস ভাড়া করা হয়। আহারাদির সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া-ছিলাম। অতি প্রত্যুষে বাঁধনের পথে বাস্ চলিতে লাগিল। এই পথে মোটরবাস্ বা গাড়ী পূর্ব্বে কখনও যায় নাই।

গালুডির পূর্ব্বদিকে 'রুক্মিণী' পাহাড়ের পাশ দিয়া পথটি সাতমাইল দূরে নরসিংহপুরের নিকট আসনপানি পাহাড়ের উপর উঠিয়াছে। সাঁওতালগণ রুক্মিণীকে রুক্ষিণী বলিয়া থাকে। উক্ত পাহাড়ে রুক্মিণীদেবীর বিগ্রহ ছিল, সেই কারণে রুক্মিণী পাহাড় নাম হইয়াছে। এখন দেবী ঘাটশীলায় আনীত হইয়া সাধারণ পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট আছেন কি না বলিতে পারি না; কারণ শুনা যায়, সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। আসনপানি পাহাড়ে সিংভূম ও মানভূম জেলার সীমানায় 'ফুরকী' ঝরণায় "দোয়ার-সিনী দেবী" বা দ্বারবাসিনীদেবী একটি রমণীয় স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষুদ্র একটি গুহার মধ্যে কাল পাথরের অঙ্গে সিন্দূরে ভূষিতা দেবী অবস্থিত। দেবীর সম্মুখে যে বলি হয়, তাহা বুঝা যায় প্রাঙ্গণে বৃহৎ হাঁড়িকাঠটি দেখিয়া। ফুরকী ঝরণা অতিক্রম করিয়া জঙ্গলময় পথটি ক্রমান্বয়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের শীর্ষদেশ অতিক্রম করিয়াছে। পুনরায় নামিয়া গিয়া মানভূম জেলায় বরাভূম মহকুমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আসনপানি পাহাড় লঙ্ঘনের পর এক মাইলের ভিতর কুঁচিয়া গ্রাম। এখান হইতে বাঁধন মহকুমা সাত মাইল। এই সাত মাইল পথেও কাটা- পাহাড় নামক একটি পাহাড় পার হইয়া বাঁধনে আসিতে হয়। বাঁধন পর্য্যন্ত ১৯ মাইল পাহাড়—পথের দৃশ্য অতি মনোরম; কিন্তু রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয়। পথের দুই পাশে ঘন জঙ্গল এবং পথের মধ্যে একটি নদী সাতবার অতিক্রম করিতে হয়। এই-জন্য নদীর নামও হইয়াছে 'সাত-গুড়ুম'—আমাদেরও অবস্থা একেবারেই গুড়ুম। কোনখানেই সেতু নাই। অতিকষ্টে বন্যজন্তুভরা বিপদ-সঙ্কুল কদর্য্য পথ অতি-বাহিত করিয়া বেলা আটাটায় আমরা খুচিয়াগ্রামে পৌঁছিলাম।

কুঁচিয়াগ্রামে মাত্র দুইঘর বাঙালীর বাস। ইহা ব্যতীত সকলেরই সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি। বিভূতি-বাবুর মাতুলালয়ের সকলের সহিত খুবই আলাপ হইল।

দণ্ডায়মান—বামে বিভূতিবাবু ও দক্ষিণে হরেন্দ্রবাবু; উপবিষ্ট—বামে হরবাবু ও দক্ষিণে বলাইবাবু (কুঁচিয়াগ্রামে)

তাঁহাদের আদর-অভ্যর্থনা এবং অতিথিসেবা দেখিয়া সত্যই আমরা অতিশয় মুগ্ধ হইয়া গেলাম। বিভূতিবাবুর মাতুলদের কাছে বাঘ শিকারের কাহিনী শুনিয়া, যে

লড়াইয়ের স্থান

স্থানে ইঁহাদের বাঘের সহিত লড়াই হইয়াছিল, সেখানে যাইতে বড়ই ইচ্ছা হইল। মেয়েদের বিভূতিবাবুর বাড়ীতে রাখিয়া নান অস্ত্রশস্ত্রসহ আমরা তাঁহাদের সহিত লড়াইয়ের স্থানে গেলাম। এই স্থানটি আঁত

ভয়ঙ্কর ; চতুর্দ্দিকে জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে বড় বড় গর্ত্ত এবং চলার পথে কাঁকড়ে ভরা—জুতা পায়ে চলিতে পারা যায় না। এই সকল জঙ্গলে শালগাছের সংখ্যাই অধিক। লড়াইয়ের স্থানের একটি ফটো তুলিয়া রাস্তায় ফিরিয়া আসিলাম এবং মোটরবাসে বাঁধন পর্য্যন্ত গিয়া সন্ধ্যার পর গালুডিতে ফিরিয়া আসিলাম।

কুখনি জঙ্গল হইতে একটি বাঘ নিকটস্থ কোন এক গ্রামের এলাকায় আসিয়া পড়ে। তথায় একটি মহিষের জীবন নাশ করিয়া বাঘটি বনখুঁচা গ্রামের নিকট আসে। উক্ত গ্রামের কয়েকটি সাঁওতাল বাঘ মারিতে উদ্যত হয় ; ফলে ছয়জন মারা পড়ে। গত ৩১শে মার্চ

শ্রীজহরলাল দত্ত ও দক্ষিণে লেখক

শুক্রবার প্রত্যূষে ডাঙ্গরজুড়ি গ্রামের নিকট জঙ্গলে বাঘটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের নিকটস্থ গ্রামগুলিতে পবনবেগে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, কুঁচিয়া গ্রামবাসীগণও বিচলিত হইয়া উঠিল। বাঘটিকে মারিবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদিগের সাহসে কুলাইল না। কুঁচিয়াগ্রামের এক মাইলের মধ্যে যখন বাঘ আসিয়া উপস্থিত, তখন এখানেও যে আসিতে পারে, এই কথা ভাবিয়া বিশজন সাঁওতাল অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাবুদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহারা জানিত বাবুরা মধ্যে মধ্যে বন্দুক লইয়া শিকারে যান। বাবুরা যে কখনও বাঘ মারেন নাই এমন নহে, তাঁহারা একদিন একটি নেকড়েবাঘকে লাঠির দ্বারাই যমালয়ে পাঠান। বাবুরা সাঁওতালদের কথায় স্বীকৃত হইয়া বাঘ মারিতে প্রস্তুত হইলেন। বাবুদের মধ্যে ছিলেন—দাশরথি দত্ত, হরগৌরী দত্ত, চিত্তরঞ্জন মল্লিক, বলাইচন্দ্র বসু এবং হরেন্দ্রলাল পাঁড়ে মহাশয়গণ। বিশজন সাঁওতালও বাবুদের রক্ষার্থে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শিকারীগণ বেলা আটটায় বাটীর বাহির হইয়া ডাঙ্গরজুড়ী জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বাবুদের হাতে অস্ত্র বলিতে ছিল,—দাশরথিবাবুর হাতে লাঠি, হরবাবুর হাতে একনলা বন্দুক, চিত্তবাবুর হাতে টাঙ্গি, বলাইবাবুর হাতে বর্শা এবং হরেন্দ্রবাবুর হাতে তাবলা।

শিকারীগণ বনমধ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে ; তখনও পর্য্যন্ত বাঘের সন্ধান না পাইয়া সকলে বাড়ী ফিরিবার জন্য মনস্থ করিলেন। জঙ্গলে হাঁটাপথের চিহ্ন নাই বলিলেই হয়। বন্ধুর বনভূমির স্থানে স্থানে পাঁচ ছয় কাঠা লইয়া এক একটি বিরাট গর্ত্ত। গর্ত্তের ভিতরেও নানারূপ গাছপালা। হাঁটা পথের সন্ধানে এইরূপ গর্ত্ত কেবলি অতিক্রম করিতে করিতে শিকারীগণ চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি বৃহৎ গর্ত্তের ভিতর নামিতেই, তাঁহারা বাঘের গন্ধ পাইলেন। দেখিতে পাইলেন ঐ গর্ত্তের ভিতর একটি গুহায় ব্যাঘ্রমহাশয় বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরা গর্ত্তের মধ্যেই গুহা হইতে প্রায় বিশ হাত দূরে থাকিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন ; অকস্মাৎ হরবাবুর বন্দুকের গুড়ুম করিয়া শব্দ হইল। গুলি গিয়া বাঘের পশ্চাদ্ভাগে বিদ্ধ হইতেই, প্রচণ্ড গর্জ্জনে বাঘটি গুহা হইতে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু সম্মুখে এক শালের গুঁড়িতে বাধিয়া গেল। বাধা পাইয়া বাঘটি ক্রোধে ভীমপরাক্রমে নিমিষে গুঁড়ি কামড়াইয়া গাছটিকে ভূতলশায়ী করিল। মড় মড় শব্দে হাত পনের দূরে শালগাছটি পড়িয়া যাইতেই দেখা গেল—বাঘটি গর্ত্তের উপরে! এদিকে হরবাবু আর একটি গুলি বন্দুকে ভরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে পলকের মধ্যে বাঘটি লম্ফপ্রদান করিয়া দাশুবাবুকে আক্রমণ করিল। যখন বাঘের কামড়ে দাশুবাবুর বামদিকের চোখ, কান এবং পশ্চাদ্ভাগের

খানিকাংশ উড়িয়া গেল, তখন আর চারজন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া বীরের ন্যায় বাঘের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। চিত্তবাবুর সঙ্গে বাঘের কিছুক্ষণ ধরিয়া রীতিমত লড়াই চলিল। ইত্যবসরে বলাইবাবু বাঘের মুখের ভিতর বর্শা চালাইয়া দিলেন। বর্শার লৌহ-ফলক বাঘের কামড়ে ভাঙিয়া গেল। বাঘ সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনের চেষ্টা করিতেই, হরবাবুর বন্দুকের গুলি পুনর্ব্বার ছুটিয়া তাহার বক্ষ ভেদ করিল। বাঘের শেষ গর্জ্জন বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভবলীলাও সাঙ্গ হইল। প্রায় সাত আট মিনিট ধরিয়া লড়াই চলিয়াছিল।

বাঘের মৃত্যুর পর হরবাবু সেই বিশজন সাঁওতালের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহারা কখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইঁহাদের সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অতিকষ্টে ইঁহারা আহত দাশুবাবু এবং চিত্তবাবুকে স্কন্ধে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। বাঘটিকে আনিতে অনেক ব্যক্তি গ্রাম হইতে জঙ্গলে গেল; কিন্তু বাঘটি এত বৃহৎ যে জঙ্গলের বাহির করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সত্যই আমরা যখন বাঘছালটির ফটো তুলি, তখন মাপিয়া দেখিয়াছিলাম লেজ সমেত নয় হাত। বাঘছালের মাঝে মৃত দাশরথিবাবুর ছবি রাখা হইয়াছে এবং ছবির ডান পাশে ক্ষুদ্র একটি দ্রব্য পড়িয়া আছে, তাহা তিন ইঞ্চি লম্বা বাঘের একটি দাঁত। অতঃপর সাঁওতালেরা বাঘের মাংস লইয়া গেল। গ্রামের ব্যক্তিগণ বাঘছাল সঙ্গে করিয়া বন হইতে ফিরিয়া আসিল। এদিকে সেই রাত্রেই বাবুদের বাড়ীতে হাহাকার উঠিল। তিনটি কন্যা, তিনটি পুত্র ও স্ত্রীকে রাখিয়া দাশুবাবু গতায়ু হইলেন। চিত্তবাবুর বয়স মাত্র বাইশ বৎসর। মাত্র একবৎসর হইল তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার অল্পবয়স্ক সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিয়া উক্ত ঘটনার ছয়দিন পরে বাঁধনের দাতব্যচিকিৎসালয়ে দেহ ত্যাগ করিলেন।

এই বাঘ শিকারের প্রায় একমাস পরে অর্থাৎ ২৯শে এপ্রিল কুঁচিয়া গ্রামের নিকট পাহাড়ে সাঁওতালদের শিকার হয়। প্রায় ১২০০ সাঁওতাল শিকারের দিনে বাবুদের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে; কারণ তাহারা বলে, "আমরা যে বাঘকে কাঁড় বিঁধিয়াছিলাম তোমরা কেন তাহাকে মারিলে, অতএব ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩০০৲ টাকা ও মহুয়ার মদ দিতে হইবে। না দাও যদি ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিব।" বাবুদের অবস্থা শোচনীয় হইল। সবেমাত্র বাড়ীর অশৌচ গিয়াছে, তাহার উপর এ কি বিপদ! কিন্তু তাঁহারা ইহাতে বিচলিত না হইয়া একটি কৌশল করিলেন। প্রায় তিন মণ মুড়ি ও মদ আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তোমাদের খাওয়া শেষ হইলে টাকা দিব। ইতিমধ্যে গোপনে একজন ব্যক্তিকে সাইকেলযোগে বাঁধনের থানায় সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইলেন। দেড় ঘণ্টার ভিতর মোটরবাসে বন্দুকধারী চল্লিশজন পুলিশ আসিয়া পড়িল। পুলিশের বন্দুকের শব্দে অনেক সাঁওতাল পলাইয়া গেল এবং কয়েকজন সর্দ্দার সমেত গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট দোষ স্বীকার করিল। তাহাদের এরূপ করিবার কারণ জানা যায় যে, বাবুদের সঙ্গে যে বিশজন সাঁওতাল বাঘ মারিতে গিয়া পলাইয়া আসে, পরে তাহাদের তিরস্কার করার জন্য ঐ সাঁওতালগণ শিকারের দিন সুযোগ পাইয়া সকল জাতভাইদের ক্ষেপাইয়া তুলে। ধৃত সাঁওতালেরা পুলিশের নিকট বলে, আর কখনও এরূপ করিবে না এবং অপরাপর সাঁওতালেরাও যাহাতে এরূপ না করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর পুলিশ তাহাদের সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

কুঁচিয়া গ্রামে বাবুদের সংসারের মধ্যে দুইজন শিকারী সকলকে কাঁদাইয়া গেলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা একজনকে যে বিপদের মাঝে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের বাঙালীর গৌরবেরই কথা। আমরা ভগবানের নিকট এই প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মঙ্গল কামনা করি।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৭)

বিশ্বপতি এ ধাক্কা সামলাইয়া উঠিল।

সনাতন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বিশ্বপতির হাসি, আনন্দ যেন বাড়িয়া উঠিল। ছেলেটা কি পাগল হইয়া গেল না কি?

সে বিস্ময়ে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া থাকে। বিশ্বপতি তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি ভাবছ বলব সনাতন? ভাবছ—এ রকম একটা ধাক্কা পেয়েও আমি সইলুম কি করে? মানুষে যা সইতে পারে না—"

সনাতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি আগেই তাই খবর দেই নি দা-ঠাকুর।"

বিশ্বপতি বলিল, "ভেবেছিলে আমি অস্থির হয়ে উঠব, কিন্তু তা কেন হবে সনাতন? সত্যি বল—ভেবে দেখ—সে বড় কম কষ্টে যায় নি, তার সে কষ্টের কথা আমি জানি,—আর কেউ জানে না। বলছো—গ্রামের লোকে যা-না-তাই বলছে,—ওরা বলুক, ওদের বলার দিন এসেছে, বলতে দাও। ওরা কি জানে সনাতন, কেবল বাইরেটা দেখে বিচার করছে বই তো নয়—ওদের কথা ছেড়ে দাও—"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন রাগ করিয়া বলিল, "তুমি ও-রকম করে হেসো না দা-ঠাকুর। আমি আগে এ কথা বিশ্বাস করতে চাই নি, কিন্তু এখন বিশ্বাস করছি—এখন ঠিক জানছি এ রকম ব্যাপারও ঘটতে পারে। বলছ কষ্ট পেয়ে গেছে, কিন্তু কি কষ্ট ছিল তার বল দেখি? খাওয়া-পরার কষ্ট সে তো একটা দিনও পায় নি—"

বিশ্বপতি তাহাকে থামাইয়া দিল,—"থাম সনাতন, ওই খাওয়া-পরাটাকেই খুব বড় করে দেখো না, জগতে খাওয়া-পরাটাই শ্রেষ্ঠ সুখ নয়, তা জানো? খেতে বিড়াল কুকুরেও পায়, তারাও বেঁচে থাকে; সেও তেমনি খেতে পরতে পেরেছিল, কিন্তু এতটুকু আদর, এতটুকু যত্ন সে আমার কাছ হতে কোন দিন পায় নি। সকল মানুষের মনেই সাধ-আহ্লাদ বলে একটা জিনিস থাকে। অনেক জিনিসই মানুষ পাওয়ার কামনা করে এও তুমি জানো তো? তুমি কি বলতে চাও তোমার মা-লক্ষ্মীর মনে সাধ-আহ্লাদ কিছু ছিল না, তার অন্তরের অন্তরালে কোন দিন এতটুকু কামনা-বাসনা জাগে নি? সব ছিল সনাতন, ওর ওই বুকের আড়ালে অনেক কিছুই পাওয়ার আশা জেগে ছিল, কিন্তু আমি তার একটী সাধও পূর্ণ করতে পারি নি—তার অন্তরের বিরাট দৈন্তের পানে চাই নি, ঠিক তোমারই মত তার কেবল খাওয়া-পরার আবশ্যকতাটাই বুঝেছিলুম, তাই খেতে-পরতে দিয়েই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল বলে ভেবেছিলুম। তার কোথায় বেদনা তা বুঝি নি—তার বেদনা দূর করবার চেষ্টা করি নি;—নিজের দিকে চেয়ে নিজের পাওনা-গণ্ডাই বুঝে নিয়েছিলুম। তুমি বলছ কষ্ট সে পায় নি, কিন্তু আমি জানি সে তার সর্ব্বস্ব দিয়েও তার প্রতিদানে এতটুকু কিছু না পেয়েই চলে গেছে।"

উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নীরব ঘরে বিশ্বপতি ভাবিতেছিল—যে চলিয়া গেছে তাহার কথা, আর সনাতন ভাবিতেছিল বিশ্বপতির কথা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, "কিন্তু লোকের কথা আমি যে সইতে পারিনে দা-ঠাকুর।"

বিশ্বপতি শান্ত কণ্ঠে বলিল "মারামারি করবে? কিন্তু কি নিয়ে মারামারি করবে, কি কথা বলে গ্রামের লোকদের থামাতে চাও বল দেখি? তোমার মা-লক্ষ্মী যেমন সত্যিই ঘর ছেড়ে গেছে, তেমনি সত্যিই এরা অনেক কথা বলছে। এ দুই-ই সত্যি ব্যাপার, এর মধ্যে মিথ্যের নাম-গন্ধ নেই বলেই এর প্রতিবাদ করা চলে না সনাতন। দেশের লোক বলবে আমারই তো—? তা বলুক, আমি সত্যি বলেই চুপ করে থাকব।"

সনাতন বলিল, "কেউ কেউ বলছে বউবাজারে নিমাইয়ের বাড়ীতে গেলেই ওদের দেখতে পাওয়া যাবে, ওরা ওখানে ছাড়া আর কোথাও নেই।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, শান্ত কণ্ঠেই বলিল, "না, কি দরকার তার, কেন আমি সেখানে তার খোঁজ করতে যাব? সে যা চেয়েছিল আমি তার কিছুই দিতে পারি নি; সে যদি এখন তা পেয়ে থাকে, আমার কি উচিত তাকে বঞ্চিত করা? কেবলমাত্র ছুইটী মন্ত্র পাঠ, একটা অনুষ্ঠানের শক্তি কি এতই বেশী হবে সনাতন, যাতে একটী বিমুখ চিত্তকে ফিরান যেতে পারে? যেখানে সত্যিকার কোন আকর্ষণ নেই সেখানে সে মন্ত্রপাঠ মিথ্যে হয়ে যায়, নারায়ণ-শিলা পাথরই হয়ে থাকে, দশজন সাক্ষীর মুখর মুখও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আজ আমারও সব মিথ্যে হয়ে গেছে সনাতন, অন্তরের বন্ধন—অন্তরের আকর্ষণই আজ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মূর্খ সনাতন এ-সব কথার অর্থ বুঝিল না, কেবলমাত্র বুঝিল বিশ্বপতি স্ত্রীর উপর সকল দাবী ছাড়িয়া দিয়াছে, কুলত্যাগিনী স্ত্রীর সহিত সে আর কোনও সম্পর্ক রাখিবে না।

যে কথাটা দিনকতক সমস্ত গ্রামখানাকে বেশ সরগরম রাখিয়া আবার নূতন প্রসঙ্গের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, বিশ্বপতি ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা আবার নূতন করিয়াই জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, বাজারে, হাটে, সর্ব্বত্র আবার সেই চাপা কথাটা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশ্বপতির কানে সকল কথাই আসিতে লাগিল, সেও মনের খুসিতে অপর্য্যাপ্ত হাসিতে সুরু করিয়া দিল।

সেদিন মুখুর্য্যে মহাশয় তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন, "তাই তো বাবাজি, বউ-মা যে এমন করে তোমাদের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়ে যাবে তা আমরা কেউই স্বপ্নেও ভাবি নি। এ দিকে তো বউটি লক্ষ্মী ছিল, মুখে একটী কথা ছিল না, কেউ কখনও ওর মুখ দেখতে পায় নি; লোকে পাঁচমুখে বউয়ের সুখ্যাতি করত, সকলেই বলত —এমন বউ আর হবে না। ওর মধ্যে যে এত শয়তানী ছিল, তা আর কে জানবে বল? যাই হোক, ও-সব কথা ভেবে আর মন খারাপ করো না বাবাজি, আবার বিয়ে-থাওয়া কর, সংসার পাতাও। কিসের বয়স তোমার, তোমার বয়সে আমার ছুই পক্ষ গতায়ু হয়েছিল, আমি আবার কানাইয়ের মাকে বিয়ে করবার যোগাড় করেছিলুম। কিছু ভেব না, মন খারাপ কর না; পুরুষ তুমি, সোজা চল। বাংলাদেশে মেয়ের অভাব নেই; এক স্ত্রী আছে জেনেও লোকে সেই ছেলের হাতেই নিজের মেয়ে দান করে,—আগের পক্ষের পাঁচ সাত ছেলে মেয়ে থাকতে লোকে আবার বিয়ে করে স্ত্রী আনে,—বোঝ, এ দেশের মেয়ের বাজার কি রকম, কত সস্তায় বাংলার মেয়ে বিকায়? তোমার ভাবনা কিসের বাবাজি, আজ কথা দাও, কাল দেখতে পাবে একশ মেয়ে বরণডালা সাজিয়ে তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।"

নিজের রসিকতায় নিজেই প্রীত হইয়া তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখি, ছুদিন যাক, ছুদিন পরে বিয়ে একটা করলেই হবে।"

পাড়ার কয়েকটী তরুণ একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; তাহারা আসিয়া বিশ্বপতিকে ধরিয়া বসিল, "সে হচ্ছে না দাদা, বউদি হয় তো মুহূর্ত্তের ভুলে একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছেন, তাই বলে তাঁকে এতবড় শাস্তি দেওয়া যায় না। বউদি নিমাইয়ের মত লোকের প্রলোভনে পড়ে গেছেন; আপনিও যথার্থ স্বামীর আদর্শ দেখান। আপনাকে গিয়ে তাঁকে আনতে হবে না, আমাদের হুকুম করুন, আমরা তাঁকে নিয়ে আসি।"

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল—"না, দরকার নেই।"

সুরেশ নামে ছেলেটী বলিল, "আপনি এ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না?"

বিশ্বপতি বলিল, "না, ভুল বুঝো না, সে জন্যে আমি তাকে যে আনতে চাই নে—তা নয়। সে যেখানে সুখে আছে তাই থাক, এখানে এই কষ্টের মধ্যে আমি তাকে আনতে চাই নে।"

ছেলেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল বিশ্বপতি যদিও কল্যাণীকে ভালোবাসিত, তবু সেই ভালোবাসার জন্যও তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

ইহারই কয়েক দিন পরে বিশ্বপতি সেদিন সনাতনকে ডাকিয়া বলিল, "এখানে আমায় ওরা আর থাকতে দিলে না সনাতন, আমি কলকাতায় ফিরে যাই।"

উত্তেজিত হইয়া সনাতন বলিল, "লোকের কথার ভয়ে তুমি কলকাতায় পালাবে দা-ঠাকুর? কেন, তুমি কি দোষ করেছ যার জন্তে তোমায় এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে?"

মলিন হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দোষ কারও নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। ওদের কথার ভয়েই যে আমি চলে যেতে চাচ্ছি তা নয়, আমার মন আর এ দেশে থাকতে চাচ্ছে না। মাসখানেকের জন্ম একবার কলকাতায় ঘুরে এলে হয় তো আবার ভালো হয়ে উঠবে।"

অপ্রসন্ন মুখে সনাতন বলিল, "সেই নন্দার বাড়ীতেই তো যাবে দা-ঠাকুর? ওকে নিয়ে দেশে বড় কম কথাটা তো হয় না; লোকে যা বলছে তা শুনলে কানে হাত চাপা দিতে হয়। আবার ওই বাড়ীতেই থাকবে তো?"

বিশ্বপতি বলিল, "লোকে যা বলে সবই কি ঠিক হয় সনাতন? লোকের মুখ আছে, ওরা অনেক কথাই বলবে, তার মধ্যে একটা হয় তো সত্যি, দশটা মিথ্যে। আমি নন্দার বাড়ীতে ছিলাম, নন্দা প্রাণপণ যত্নে সেবা করে আমায় বাঁচিয়েছে, যারা এমন সুন্দর একটা কথা গড়বার উপাদান পেয়েছে, তারা তা ছাড়বে কেন? এতটুকু উপাদান না পেয়েও যখন মস্ত বড় প্রাসাদ শূন্তে তৈরী হতে পারে, এতে তো এতটুকু উপাদান আছে। কিন্তু ও সব কথা ছেড়ে দাও সনাতন, ও-সব ব্যাপার নিয়ে যত ভাববে ততই আরও জটিল হয়ে উঠবে।"

মূর্খ সনাতন বলিল, "কিন্তু নন্দা—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বিশ্বপতি বলিয়া উঠিল, "আবার নন্দা? নন্দা যে কি তা আমি আজও বুঝতে পারি নি সনাতন, ওকে আমি আজও চিনতে পারি নি। ওর নাগাল পেতে হলে অনেকটা উঠতে হয়, ততখানি উঠবার মত শক্তি আমার নেই,—তাই আমায় নীচের পড়েই থাকতে হয়েছে। সে আমায় নিজের কাছে রেখে আমার উপকারই করেছিল; যা কেউ পারে নি সে তা পেরেছিল। এ জন্তে আমায় বলতে পার, আমি লুব্ধ পতঙ্গের মত তার দিকে ছুটেছিলুম, কোন দিকে চাই নি। অথচ স্পষ্ট যে তাকেই আশা করেছিলুম তা নয়। আমি কোন দিন বুঝতে চেষ্টা করি নি, আমারই মনের অন্তরালে তাকে পাওয়ার আশা প্রচ্ছন্ন ছিল। তবু—তবু যদি জানতে সনাতন, সে কতখানি এগিয়ে গেছে, তা হলে আমায় ওর কাছে থাকার জন্তে একটী কথা বলতে পারতে না।"

সে দুই হাতের মধ্যে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিল।

সনাতন আর একটী কথা বলিল না, কিন্তু তাহার সহজ বুদ্ধিতে সে এত উঁচু ধরণের কথা যে লইতে পারিল না, তাহা তাহার অপ্রসন্ন মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল।

বিশ্বপতি নিজের সামান্ত কাপড় জামা কয়খানা গুছাইয়া নন্দার দেওয়া ট্রাঙ্কটাতেই ভরিয়া লইল। কল্যাণীর জন্ত জিনিসগুলা বাক্সের তলায় চাপা দিয়া রাখিল, সে-গুলা কি করিবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় সে এখনও পায় নাই।

একদিন ক্লান্ত মন লইয়া শ্রান্ত চরণে গ্রাম্যপথ অতিবাহিত করিয়া বিশ্বপতি কলিকাতা যাত্রা করিল।

আজ গ্রামের বুকে সে সৌন্দর্য্য ছিলনা, গ্রাম আজ নেহাতই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে—সেই জন্তই তাহার কোন আকর্ষণও নাই। বিশ্বপতির নয়নে যে মোহের অঞ্জন ছিল, চোখের জলে তাহা আজ ধুইয়া গেছে।

চলিতে চলিতে হঠাৎ একবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল।

উজ্জ্বল সুনীল আলোক; বাতাসে ভাসিয়া সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল দুই এক টুকরা সাদা মেঘ আসিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। আকাশে বাতাসে আজ আগমনীর সুর বাজিয়া উঠিতেছে, গাছের ডালে বসিয়া পাখীরা আগমনী গাহিতেছে। পথের ধারে স্থলপদ্ম ফুলের গাছটা অসংখ্য লাল ফুলে নিজের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দিতেছে। পথিক পথ চলিতে তাহার পানে তাকাইয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথ। পথের দুধারে ধানের গাছগুলি বাতাসে দোলা খাইতেছে। অদূরে কাশফুলগুলির সাদা মাথা নোয়াইয়া দিয়া বাতাস দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৃষ্টি-পথ ঝাপসা হইয়া আসিল, সকল দৃশ্যের সামনে পাতলা কুয়াশার একখানি পর্দা যেন নামিয়া আসিল।

বিশ্বপতি আর চোখ তুলিল না, পথের পানে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইল।

(১৮)

সন্ধ্যার একটু পরে বিশ্বপতি শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিল। ট্রাঙ্কটাকে হাতে লইয়া সে পথে নামিল। নন্দার বাড়ী সে চিনিত, সোজা হ্যারিসন রোড ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। একবার একখানা রিক্সা ভাড়া লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পকেটে হাত দিয়া সে ইচ্ছা দূর করিতে হইল, মাত্র কয়েকটী পয়সা ছাড়া পকেটে আর কিছু নাই।

হন হন করিয়া সে পথ চলিতেছিল; বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটা গলিপথে খানিকদূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রূপোপজীবিনীর দল সে পথে দাঁড়াইয়া আছে, অনেক ঘরে ইহারই মধ্যে গান বাজনা সুরু হইয়া গেছে।

পাশ দিয়া চলিতে একটী মেয়ে ডাকিল,—"আসুন"।

দারুণ ঘৃণায় বিশ্বপতির মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিতভাবে কি যেন বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল—আজ যে পথে পদার্পণ করিতে—যাহাদের পানে চাহিতে তাহার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, কল্যাণীও তো এই পথে আসিয়া—উহাদেরই একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথবা একদিন দাঁড়াইবে। আজ হয় তো নিমাই তাহাকে খুবই যত্নে রাখিয়াছে, আজ হয় তো সে স্বপ্নেও জানে না তাহার স্থান এই পথের ধারে কোন একটা খোলার ঘরে। তাহাকেও হয় তো একদিন ইহাদেরই মত কদর্য্য সাজে নিজেকে সজ্জিত করিয়া, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে কদর্য্য হাসির রেখা ফুটাইয়া এই পথের ধারে প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

কেই বা তাহা ভাবে? এই যে সব হতভাগিনীরা এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কতজন যখন বাহিরের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পথে পা দিয়াছিল তখন কল্পনাতেও আনে নাই একদিন তাহাদের সবই যাইবে—থাকিবে কেবল কাঠামোখানা। আজ তাহাদের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেছে, তাহাদের চোখের সামনে যে ভবিষ্যৎ, তাহা নিবিড়তম অন্ধকারে ঢাকা। উঠিতে ইচ্ছা হয় না তবু তাহাদের উঠিতে হয়। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া তবু তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে হয়। নারীজীবনে এ কি নরক বিড়ম্বনা। একদিন ইহারাই ছিল গৃহের দেবী; স্বর্গের সুষমা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী; ক্ষণিকের মোহে পড়িয়া আজ তাহারা নামিয়াছে কোথায়? আজ তাহাদের অতীত জ্বালাপ্রদ, বর্ত্তমান ভীষণ ভীতিপূর্ণ, ভবিষ্যৎ নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। ইহাদের উদ্ধার করিবে কে,—সে পথই বা কই?

বিশ্বপতি ঘৃণা করিবে কাহাকে? কাহাকে সে দুই পায়ে দলিয়া পিছনে ফেলিয়া যাইতে চায়? কল্যাণীও যে উহাদের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে,—একদিন পথ চলিতে বিশ্বপতি তাহার গৃহের সুষমাকেও এই পথের ধারে বিকৃত অবস্থায় লুটাইতে দেখিবে।

বিশ্বপতিকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই মেয়েটী সাহস করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথের আলো উজ্জ্বলভাবে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। বিশ্বপতি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

হায় অভাগিনী নারী, তবু ওই মুখে হাসি ফুটাও, তবু ওই মুখে কথা বল? চোখের কোণ জলে ভরিয়া উঠিতেছে,—কি কষ্টেই না সে জল সামলাইয়া লইতেছ নারী,—যেন উছলাইয়া পড়িয়া তোমার গণ্ডের কৃত্রিম বর্ণ না ধুইয়া যায়। কল্যাণী,—হায় কল্যাণী, কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ? শেষে উদরান্নের জন্য এমনই করিয়া তোমাকেও লোকের কাছে হাত পাতিতে হইবে? হায় দুর্ভাগিনী—

খুব শান্ত সুরেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

মেয়েটী নত মুখে বলিল, "আপনি যদি—"

সে যে কথাটা বলিতে চায় তাহা বলিবার আগেই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপতি করুণা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "আসল কথা বল যে তোমার কিছু চাই—কেমন? কিন্তু আমার কাছে মাত্র পাঁচ আনা পয়সা ছাড়া

আর কিছুই নেই। তাই নাও, এতেই আজ দিনটা কাটিয়ে দিয়ো।"

পকেট হাতড়াইয়া শেষ সম্বল পাঁচ আনা বাহির করিয়া মেয়েটীর কম্পিত হাতের উপর রাখিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল। একবার ফিরিয়াও দেখিল না, যাহাকে সে পয়সাগুলি দিয়া গেল সে তখনও সজল চোখে এই যথার্থ মানুষটার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার জীবনে এরূপ ধরণের মানুষ বুঝি এই প্রথম পড়িল,—যে যথাসর্ব্বস্ব,—যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, দিয়া নিঃস্বের মত চলিয়া যায়, বিনিময়ে কিছুই চায় না।

বিশ্বপতি ভাবিতেছিল পকেটে আর কিছু থাকিলে ভালো হইত। মাত্র পাঁচ আনা পয়সা; উহাতে কতক্ষণের জন্য ওই মেয়েটীর ক্ষুধা নিবৃত্ত থাকিবে? বড় জোর আজকার রাতটা,—কাল সকালেই অভাব রাক্ষসী আবার তো লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে। যদি বেশী কিছু থাকিত, অন্ততঃ পক্ষে দুইটা দিনও হয় তো সে স্বভাবসিদ্ধ শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ পাইত,—দুইটা দিন সে কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিত,—নিজের ভাবনা নিজেই করিতে পাইত।

ঝোঁকের বশে পকেটে যাহা ছিল তাহাই লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিয়া চলিয়া আসিলে আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত।

সম্মুখে একটী নারী।

বিশ্বপতি চলার পথে বাধা পাইয়া দাঁড়াইল।

প্রথম দৃষ্টিপাতেই সে অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

এ কে,—এ মুখ তাহার পরিচিত নয় কি? হাঁ—ওই মুখ চোখ, ওই সুন্দর সুঠাম ভঙ্গী, সুদীর্ঘ দেহ—এ সবই তো তাহার বড় পরিচিত।

"চন্দ্রা—"

কেমন করিয়া এই নামটা তাহার মুখ ফুটিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল, তাহা নিজেই সে জানে না। নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকাইয়া অবাধ্য জিহ্বাটা চাপিয়া ধরিল।

চন্দ্রা কোথায় যাইবে বলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সামনে পথের উপর একখানা মোটর দাঁড়াইয়া বিশ্রী রকম শব্দ করিতেছিল।

নিজের নামটা শুনিবামাত্র চন্দ্রা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল; বিশ্বপতির পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিল, বলিল, "দাদাবাবু যে—এ পথে হঠাৎ? হাতে একটা বাক্স দেখছি, বাড়ী হতে আসছ, না বাড়ী চলেছ?"

বিশ্বপতি ভাবিতেছিল ইহার কথার উত্তর দিবে কি না। অবশেষে উত্তর দিতে হইল।

বলিল, "না—বাড়ী যাচ্ছি নে, বাড়ী হতে আসছি। তারপর—এখানেই আছ বুঝি? বেশ—বেশ, অনেক দিন পরে তোমায় দেখে ভারি খুসি হয়েছি। কোন্ ঘরে আস্তানা তুলেছ,—এই খোলার চালাখানা বোধ হয়? এ-রকম ঘর ছাড়া তোমাদের কপালে আর ঘর জুটবে কোথা হতে—আমিও তো তাই ভাবি।"

চন্দ্রা হাসিতে লাগিল, বলিল, "রোস, গাড়ীখানাকে আগে বিদায় করে দেওয়া যাক, একটু দেরী কর।"

সে অগ্রসর হইয়া গেল, বিশ্বপতি সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিককার বীভৎস দৃশ্যগুলা দেখিয়া লইল।

চন্দ্রা ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, "এসো—"

বিশ্বপতি অগ্রসর হইল না, বলিল, "না, গিয়ে আর কাজ নেই, এখান হতেই বিদায় নেওয়া যাক।"

"বাঃ, বেশ লোক তুমি; তোমার জন্যে আমি গাড়ী বিদায় করে দিলাম, অত ক্ষতি সইলুম; আর তুমি কি না চলে যেতে চাচ্ছো। সে হবে না দাদাবাবু, আজ আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ, যেতেই হবে।"

সে বিশ্বপতির হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই বিশ্বপতি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ছাড়, ছাড়, রাস্তায় আর কেলেঙ্কারী করতে হবে না, চল, যাচ্ছি।"

চন্দ্রা একটু হাসিয়া অগ্রসর হইল।

পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বিশ্বপতি ভাবিতেছিল যদি কোন দিন এমনই অতর্কিতে তাহার পলায়িতা স্ত্রীর সহিত দেখা হইয়া যায়!

উঃ সে কথা মনে করিতেও বুকের মধ্যে কি রকম করিয়া উঠে।—

বিশ্বপতি একবার উপরপানে চাহিয়া মাথা একটু নত করিল—সে দিন যেন না আসে, সে দিন বিশ্বপতি সহ্য করিতে পারিবে না। যত দুঃখ কষ্ট বেদনা আসে আসুক, সে দিন যেন না আসে।

(১১)

দ্বিতল অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বিশ্বপতি বলিল, "কারও অদৃষ্ট পাতা-চাপা, কারও পাথর-চাপা। তোমার অদৃষ্ট পাতা-চাপা ছিল কি না, তাই পাতাটা বাতাসে উড়তেই ভেতরের সুখসমৃদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে। যাক, সত্যি ভারি খুসি হয়েছি চন্দ্রা, অদৃষ্টটা ফিরিয়েছ দেখছি। আমি তো ভেবেছিলুম কোনও একটা খোলার ঘরে জায়গা করে নিয়েছ।"

চন্দ্রা সিঁড়ির পথ দেখাইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মাই নি, ছোটলোকের মেয়ে—তোমাদের আশীর্ব্বাদের জোরেই পাতা উড়ে যাবে দাদাবাবু। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদের জোরেই আজ অবস্থা আমার ফিরেছে।"

তীব্রকণ্ঠেই বিশ্বপতি বলিয়া উঠিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলো না চন্দ্রা, এ নারী-জীবনের চরম অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বলিতে বলিতে সে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহা চন্দ্রার চক্ষু এড়াইল না।

দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত ঘরে ইজিচেয়ারে বিশ্বপতিকে বসাইয়া চন্দ্রা বলিল, "আগে একটু জল খেয়ে নাও দাদাবাবু, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন। ভয় নেই, আমি হাতে করে দেব না, আমার রাঁধুনী বামনি আছে, তাকে দিয়ে যেতে বলি।"

বিশ্বপতি নিষেধ করিবার আগেই সে চলিয়া গেল। খানিক পরে একটী মেয়ের হাতে জলখাবার দিয়া সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মেয়েটী জলখাবার বিশ্বপতির সামনে তেপায়া টেবলটার উপরে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। অদূরে মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, জলটুকু খাও আগে, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন। বুঝতে পারছি, আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি।—মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। জলতেষ্টা তো আছেই; তা ছাড়া ক্ষিধেও তো বড় কম হয় নি।"

বিশ্বপতি সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "না, সত্যি ক্ষিধে হয় নি; তবে তেষ্টা যে পেয়েছে এ কথা স্বীকার না করলে মহাপাপ হবে।"

চন্দ্রা বলিল, "আচ্ছা—আগে জল খাও, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

বিশ্বপতি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রেকাবীখানি অবিলম্বে খালি করিয়া ফেলিল। তাহার পর একনিঃশ্বাসে একগ্লাস জল খাইয়া সে মুখ মুছিবার জন্য কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া লইতেই চন্দ্রা ব্যস্ত হইয়া তোয়ালেখানা আগাইয়া দিয়া বলিল, "এইটাতে হাত মুখ মোছ।"

বিশ্বপতি একটু হাসিয়া হাত হইতে তোয়ালেখানা লইল।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর, যাওয়া হচ্ছে কোথায়? বাড়ী ছেড়ে চলে এলে কেন?"

বিশ্বপতি বলিল, "যাচ্ছি নন্দার কাছে, সেখানে থাকব বলে এসেছি। হঠাৎ বিশেষ নয়, অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে এই ব্যবস্থাই ঠিক করলুম।"

চন্দ্রা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "বেশ লোক, নন্দার মোহ তোমার এখনও যায় নি দেখছি! নইলে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারলে?"

বিশ্বপতি হাসিল, "নিজের সংসারই নেই; কার জন্যে ভাবব চন্দ্রা?"

চন্দ্রা রাগ করিয়া বলিল, "শুনেছি মোহের আঁজন চোখে পরলে লোকে সব কিছুই দেখতে পায় না,—তাদের মনটাও সে সময় অন্ধ হয়ে যায়,—তোমারও তাই হয়েছে দাদাবাবু। নন্দা তোমায় এমনভাবে মুগ্ধ করেছে, যাতে তুমি তোমার সংসারের কথা, স্ত্রীর কথা সব ভুলে গেছ। সত্যি বল তো দাদাবাবু, বৌদিকে কোথায় রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নন্দার কাছে বাস করতে এলে?"

বিশ্বপতি মুখ নীচু করিল। তাহার পর [illegible]

মুখ তুলিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "তার ব্যবস্থা আমায় করতে হয় নি চন্দ্রা, নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিয়েছে; তার জন্তে আমায় আর কোনো দিনই মাথা ঘামাতে হবে না। সে দয়া করে তার ভাবনা হতে আমায় চিরমুক্তি দিয়ে গেছে।"

চন্দ্রা বিস্ফারিত নেত্রে বিশ্বপতির পানে খানিক তাকাইয়া রহিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে কি কথা বলছ? বউদি মারা গেছে, কই—সে কথা শুনি নি তো?"

বালয়াই মনে পড়িয়া গেল সে সংবাদ পাইবে কেমন করিয়া,—কে সে সংবাদ এখানে আনিয়া দিবে? সে যেখানে বাস করে এ যে আলাদা জগৎ,—এখানে ও জগতের কোন বার্ত্তাই আসিয়া পৌছায় না।

বিকৃত হাসি হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না, সে দুর্ভাগ্য তার অদৃষ্টে আসে নি চন্দ্রা,—তা হলে অনেকখানি কামনা বাসনা নিয়ে তাকে যেতে হতো। তুমি যে পথে এসে যেখানে থেমে গেছ, সেও এই পথে গেছে, কোথায় থেমে গেছে সে সন্ধান এখনও পাই নি। তার জীবনে অনেক আশাই ছিল কি না, দরিদ্র স্বামী তার কোন বাসনাই পূর্ণ করতে পারে নি, সেই জন্তে সে চলে গেছে।"

কতক্ষণ উভয়েই নীরব।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রা বালল, "তোমার মত দরিদ্র স্বামীর ঘরে স্ত্রীরূপে বাস করবার অধিকার পেলে অনেক রাজকন্যাও ধন্য হয়ে যেত। তার অদৃষ্ট বড় খারাপ, না হলে স্বামীর স্ত্রীরূপে পবিত্র জীবন যাপন করতে সে পারলে না কেন? এই কুৎসিত চির-অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে সে চলে গেল কেন?"

বিশ্বপতি চুপ করিয়া কোন দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকাইয়া রহিল।

চন্দ্রা বলিল, "সে বুঝতে পারেনি দাদাবাবু, আপন চলার গতিতেই সে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একদিন বুঝবার দিন তার আসবে; সে দিন সে জানতে পারবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কতখানি ভয়ানক। নিজেকে সে দিন তাকে ধিক্কার দিতেই হবে, সে দিন তাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। এই চিরন্তন সত্যের ব্যতিক্রম তার কোনমতে ঘটে যাবে।"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না ঘটতেও পারে। তুমিও তো বেশ আরামে রয়েছ চন্দ্রা। এ পথে এসে সুখীই হয়েছ দেখতে পাচ্ছি; খোলার ঘর ছেড়ে দোতালা বাড়ী, লাইট, ফ্যান, দাসদাসী, কোন কিছুরই তো অপ্রতুল নেই দেখছি।"

চন্দ্রার মুখখানা মুহূর্তের জন্ত একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখনই জোর করিয়া এক টুকরা হাসি মুখে ফুটাইয়া সে বলিল, "কিন্তু দাদাবাবু, এই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরটুকুই তুমি দেখছ,—কিসের বিনিময়ে লাভ করেছি তা তো দেখছ না। মুখের হাসিটুকু দেখে যা ভাবছ, সত্যি তা নয়। ওই হাসির আড়ালে কান্নার সাগর গর্জ্জে ফুলে উঠছে তা দেখছ না,—দেখছ উপরেরটাই—না? আমি যদি বউদির অধিকার পেতুম, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য পেলেও আমি সে কুঁড়েঘর ছাড়তুম না দাদাবাবু, কিছুতেই না—কেউ আমায় একচুল সরাতে পারত না।"

হঠাৎ সে দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ফেলিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বিশ্বপতি দেখিতে লাগিল সে কি রকমভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কল্যাণীও একদিন এইরূপেই কাঁদিবে। পিছনে ফেলিয়া আসা সেই কুঁড়েঘরটার স্মৃতি হয় তো তাহার মনে ভাসিয়া উঠিবে। সে আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া বলিবে—আমায় এ নরক হইতে উদ্ধার কর মুক্তিদাতা, আমায় তোমার চরণে স্থান দাও।

কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল কল্যাণী। বিশ্বপতি বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল—রূপহীনা কল্যাণী,—তাহার পানে আর কেহ ফিরিয়াও চায় না। তাহার পাপার্জ্জিত অর্থ আর তাহাকে শান্তি দিতে পারে না,—সে সত্রাসে সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল হাত দুখানা বাড়াইয়া দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিতেছে—এসো, ওগো এসো, আমায় মুক্ত কর, আমায় এ অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া গেল,—চন্দ্রা কি বলিতেছে। কাল্পনিক কল্যাণী কোথায় পলাইল,—সামনে জাগিয়া উঠিল বাস্তব চন্দ্রা।

চন্দ্রা সোজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার চোখে জল নাই; কিন্তু চোখের পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে।

"নন্দার কাছে যাবে—তাই যাও। ওখানে থাকলে তুমি বেশ ভালো থাকবে তা জানি। তার আগে এখানে আমার কাছে দুদিন থেকে যাও না দাদাবাবু, এতে তোমার কোন আপত্তি হবে কি ?"

"এখানে, তোমার কাছে ?" বিশ্বপতি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মনে বোধ হয় দ্বিধা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"কিন্তু এখানে থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না চন্দ্রা ? অবশ্য—আমার থাকতে কোন আপত্তি নেই। এখন যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে জীবনের বাকি দিন কয়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ কোনদিনই আমার ছিল না, তা তো জানো ? তোমার বাড়ী যাওয়া নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছিল। সে সব কথা আমার কানে যে আসে নি তা নয়, কিন্তু সে আসাই মাত্র। থাকতে আমি পারি, ঠুনকো জাতের ওপর মায়া আমার এতটুকু নেই। সচ্চরিত্র নামে খ্যাতিলাভ করবার জন্যে আমি এতটুকু উৎসুক নই। তবে তোমার পাছে কোন ক্ষতি হয় তাই ভাবছি। কারও ক্ষতি করে আমি নিজে পরম সুখে থাকব এমন স্বার্থপর আমি নই চন্দ্রা।"

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া গোপনে চোখের জল মুছিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিয়া বলিল, "না গো, এতটুকু ক্ষতির ভয় যদি থাকত, আমি তোমায় এখানে রাখতে চাইতুম না। এমন বোকা তো কেউ নেই যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবে। আজ তুমি জাতের মায়া করছ না, কিন্তু আমি করি, নিজের নয়—তোমার। আজই না হয় জাতের ছাপ আমার গায়ে নেই, একদিন তো ছিল, যেদিন আমার ছায়া মাড়ালে তোমাদের জাতকে স্নান করতে হতো। তার ছায়াটা তো আজও এ মন হতে মোছে নি। মনে অহোরাত্র জেগে আছে বলেই কায়স্থের ছেলেকে নিজের হাতে জলটুকু পর্য্যন্ত খেতে দিতে পারলুম না। বলবে সংস্কার, আমিও তা মেনে নেব। এই সংস্কারের বাঁধন হতে মুক্ত হতে পারে কয়জন ? এর প্রভাব যে-কোন রকমে মানুষের জীবনে ফুটে উঠবেই। ওই একটা দিকেই যা দুর্ব্বলতা আছে। আর ওরই জন্যে যেটুকু ক্ষতি সহ্য করেছি, তা ছাড়া আর নয়। ভয় নেই, আমার এতটুকু ক্ষতি করবার ক্ষমতা এখনও তোমার নেই। দেখছো তো কত বড় বাড়ীখানা দখল করেছি, এর মধ্যে বহু অর্থও করেছি। এত টাকা রাখব কার জন্যে, এত বড় বাড়ীখানার মালিক হবে এর পরে কে ?"

বিশ্বপতি চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া বলিল, "বুঝেছি, শেষ কাজটা তুমি আমায় দিয়েই করিয়ে নিতে চাও ? বহুত আচ্ছা, তা হলে একটু চটপট মরে যাও চন্দ্রা, তোমার মুখে আগুন দিয়ে নেওয়া যাক। কেবলমাত্র মুখে আগুন দেওয়ার ফলে যদি এত বড় বাড়ী আর এতগুলো টাকাকড়ি পাই—সে যে অনেক সৌভাগ্যের কথা। জান ত, অনেক তপস্যা করবার ফলে তোমার মুখে আগুণ দেওয়ার অধিকারী হয়েছি। অবস্থা তো বেজায় রকম কাহিল, দিন আনা দিন খাওয়া গোছের; দেশের বাড়ীখানা আছে এইমাত্র,—দেয়াল ভাঙছে, চালের খড় উড়ছে, জমীজমাগুলোও বেহাত হয়ে গেছে। জীবিকার জন্যে চাকরী করা যখন পোষাবে না—যে ভাবেই হোক পরের কাছে থেকেই যখন ভাত জোটাতে হবে, তখন এখানে রাজার হালে থেকে হুকুম চালিয়ে সুখভোগ করা যাক। তবে তাই হল চন্দ্রা, দিনকতক—অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে এখানেই ডেরা ফেললুম। দিনান্তে তোমার সেবাটুকু নিঃশেষ করে নেওয়া যাক। শেষে কিন্তু একদিন এই আলসে প্রকৃতিটাই তোমার চোখে সূঁচ বিঁধিয়া দেবে। সে দিন বিদায় করবার পথ খুঁজে পেলে হয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে চোখ তুলিল না, মেঝের উপর দুইটী চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া নিস্তব্ধে সে বসিয়া রহিল।

(২০)

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছিল, বিশ্বপতি কোন সংবাদ দিল না। নন্দা প্রতিদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিত,—হয় তো আজ তাহার সংবাদ আসিবে, একখানি পোষ্টকার্ডে অন্ততঃ পক্ষে দুটি মাত্র লাইনে সে লিখিয়া জানাইবে, ভালো আছে।

দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া সপ্তাহ, তাহার পর ক্রমে

মাসের পর মাসও চলিয়া গেল, বিশ্বপতি কোনও সংবাদ দিল না।

নন্দা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল বড় কম নয়। অন্য সময় হইলে হয় তো এত ব্যস্ত হইয়া পড়িত না, কারণ, এ লোকটীর স্বভাবই যে এই রকম তাহা সে বেশ জানিত। সে যখন যেখানে যায়, সকলকে আপনার করিয়া লইয়া এমন ভাবে জাঁকাইয়া বসে যে, কেহ দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না—একদিন হঠাৎ এই লোকটিই এই সব পিছনে ফেলিয়া অচেনা অজানা পথে এমন যাত্রা করিবে, যখন তাহাকে ডাকিয়া আর তাহার সাড়া মিলিবে না। এই সব আপনার জন তখন তাহার একেবারেই পর হইয়া যায়,—ইহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার নূতন কোনও স্থানে দিব্য জাঁকাইয়া বসে। এ-সব প্রকৃতির লোকেরাই এমনই। ইহাদের যতই কেন না স্নেহ ভালোবাসা ঢালিয়া দেওয়া যাক, যতই শক্ত শৃঙ্খল দিয়া বাঁধা যাক, দেখা যায় সে সবই মিথ্যা হইয়া গেছে। ইহারা চিরপথিক, চিরদিন চলার পথে চলিয়াছে, বিশ্রাম ইহাদের অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই।

কোন দিন হয় তো ইহারা শান্তিও পায় না। দূরের পানে লক্ষ্য রাখিয়া চলার কালে হাতের কাছে যাহা পড়ে তাহা হেলা করিয়াই যায়, দূর ততই দূরে সরিয়া যায়, মরীচিকা দূরে নাচিতে থাকে।

নন্দা বিশ্বপতির প্রকৃতি জানিয়াও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল কেবল তাহার অসুস্থ শরীরের কথা ভাবিয়া। অতবড় ব্যারাম হইতে যে মানুষ কেবলমাত্র সুস্থ হইয়াই একা বাড়ী চলিয়া গেল, তাহার একখানা পত্র দেওয়া উচিত ছিল বই কি।

সব বুঝিয়াও নন্দা রাগ করে। কি রকম মানুষ বিশ্বদা, পিছন ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলিয়া গেল একদিন কেহ প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে,—রোগীর পানে তাকাইয়া তাহার আহার নিদ্রা ছিল না।

মাঝে মাঝে নন্দা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। কোন মতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সে রুদ্ধ করিতে পারিত না।

সে দিন কি একটা কথায় সে স্পষ্টই স্বামীকে বলিয়া বসিল, "তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ জাত বাপু! কেউ তোমাদের জন্যে প্রাণপাত যত্ন যখন করে, তখন সে যত্ন বেশ নাও, কিন্তু পেছন ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যাও।"

অসমঞ্জ একটু হাসিল, বলিল, "তাই বটে। কিন্তু বিচারটা বড় একচোখো হচ্ছে নন্দা। খালি নিজেদের দিকটাই দেখছ, পুরুষদের 'পরে বড় অন্যায় দোষ চাপাচ্ছ। যদি উপযুক্ত বিচার করতে তা হলে বলতে দোষ দুই জাতেরই আছে, কেউ একা দোষী নয়।"

নন্দা খুসি হইল না, বলিল, "কেন, মেয়েরা কি দোষ করেছে?"

অসমঞ্জ মাথা দুলাইয়া বলিল, "এক হাতে কখনও তালি দিয়েছ নন্দা,—দেওয়া যায় দেখেছ? অবশ্য তুমি যেমন একমাত্র পুরুষ বেচারাদের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছ, আমি তা চাপাব না, আমি বলব না সব দোষ মেয়েদের, তারা অকৃতজ্ঞ। এ রকম একতরফা বিচার করতে তোমরা পার, আমরা পারি নে।"

নন্দা মুখ ভার করিয়া বলিল, "একতরফাই বটে। নিজেদের দোষ কেই বা কোন্ দিন দেখতে পায়? যদি দেখতে তা হলে অনেকটাই জ্ঞান হতো, মানুষ হতে পারতে।"

অসমঞ্জ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বটে বটে, ভুলে গিয়েছিলুম তোমরা কি, আর আমরা কি? আমরা শাসক আর তোমরা যে শাসিত। নিজেদের দোষ আমরা দেখব কি করে? তোমরা চিরদিনই প্রভুর আজ্ঞাবহা দাসী, কাজেই—"

নন্দা মহা কোলাহল বাধাইয়া দিল, "ও কথা বলো না বলছি। কিসের জোরে তোমরা প্রভু আর আমরা দাসী তা প্রমাণ কর।"

অসমঞ্জ বলিল, "এ প্রমাণ করা শক্ত কি? আজই তোমায় হিন্দুদের শাস্ত্রগুলো ভালো করে দেখাব এখন, তাতেই দেখতে পাবে।"

নন্দা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "শাস্ত্র তো তোমাদেরই পুরুষ জাতেরা তৈরী করেছে। তারা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে ঠিক সেই মতই আইন তৈরী করেছে। আজ আমরা তোমাদের কারচুপি বেশ ধরতে পেরেছি বলেই না শাস্ত্রগুলো অতল জলে ডুবিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে চাই।

অসমঞ্জ বলিল, "ফেললেই তার স্মৃতি যাবে ?"

নন্দা জোরের সঙ্গে বলিল, "মানুষের স্মৃতি এমন কিছু সবল নয় যে যুগ-যুগান্তর ধরে একটা ছায়া ধরে রাখবে। কাজেই সে ছায়াকে মিলাতেই হবে।"

অসমঞ্জ বলিল, "অনেক সময় ছায়াই কায়ায় পরিণত হয় নন্দা। যেদিন উপকারিতা বুঝবে সেদিন মরা ছায়াকে জীবন্ত কায়ায় পরিবর্ত্তিত করে নিতে একটুও দেরী হবে না।"

নন্দা বলিল, "উপকারিতা বুঝলে তবে তো ? আমরা আজ বিচার করে দেখছি ওতে উপকার নেই, আছে অপকার। অমনি করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই না এ দেশের মেয়েগুলো মরেছে। আজ যে মেয়েদের তোমরা দেখছ, সেটা ওদের কায়াই মাত্র। পদে পদে নিষেধের গণ্ডি দিয়ে রেখে তোমরাই ওদের নির্জ্জীব করে দিয়েছ। ওদের উৎসাহ—হাসি আনন্দ নিঃশেষে শাস্ত্রের তুলি দিয়ে মুছে দিয়েছ।"

বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল। একদিন যে মেয়েটী প্রবল ঘৃণার সঙ্গে তাহার বাণী উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা মনে করিয়া সে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িল।

অসমঞ্জ চুপ করিয়া ছিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আমি ভাবছি কি নন্দা, তুমি যদি হাজার হাজার লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই রকম লেকচার দাও, তারা কি রকম তোমায়—"

রাগ করিয়া নন্দা বলিল, "যাও, সব তাইতে ঠাট্টা ভালো লাগে না।"

অসমঞ্জ বলিল, "সত্যি—ঠাট্টা নয়, সত্যিকার যা তাই বলছি। বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি এ-সব কথা। আমার কথা আমি বলতে পারি, তাতে কোনও দোষ নেই নিশ্চয়ই। আমি একালের এই নারী-প্রগতি মোটেই যে পছন্দ করিনে তা নয়, তবে বড় বাড়াবাড়ি দেখলে অগত্যা কথা বলতে হয় বটে। হও না তোমরা খনা, লীলাবতী, গার্গী, বিশ্ববারা,—তোমরা আমাদের সত্যিকার সহধর্ম্মিণী ভগ্নি কন্যা হও, তোমাদের কাছ হতে আমরা সহায়তা পাবই। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তোমরা শক্তি ক্ষয় কোরো না, আমার শক্তিও ক্ষয় কোরো না, এইমাত্র মিনতি। মনে করো দুইটী প্রধান শক্তি মিলে এক হয়ে কাজ করলে অনেক কিছুই করা যেতে পারে; কিন্তু এরা নিজেদের মধ্যে যদি মারামারি কাটাকাটি করে মরে তাতে নিজেদেরই ক্ষতি নয় কি ? জগতের কোন উপকার তো হবেই না—তা ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরাই লোপ করে দেবে।"

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

নন্দা বলিল, "মস্ত বড় বড় কথা বলে ফেলেছ। গার্গী, বিশ্ববারার কথাটা বলা সহজ, মেনে নেওয়াই কঠিন। আজ যদি সত্যিকার বিশ্ববারা তোমাদের সামনে আসে, তোমরা তাকে যে আমল দেবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। ক্ষমতার গর্ব্ব বড় বেশী। সেই গর্ব্বই তোমাদের কোন কিছু মানতে দেবে না। কে বলতে পারে, অতীতে যারা জন্মে উপযুক্ত স্থান পেয়ে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করতে পেরেছিল, এর মধ্যে আরও কোনও মেয়ে সেই রকম বা তার চেয়েও বেশী শক্তি নিয়ে জন্মেছিল কি না; কিন্তু তার দুর্ভাগ্য বশতঃ উপযুক্ত স্থান না পেয়ে অকালেই ঝরে পড়তে হয়েছে। এ কথা স্বীকার নিশ্চয়ই করবে এ দেশে প্রতিভার ধ্বংস হয় এই রকমে—ফুটতে গিয়ে ফুটতে না পেরে ফুল ঝরে পড়ে। তার পর শুকিয়ে রেণু রেণু হয়ে একদিন উড়ে যায়। তখন তার ফোটার দাগটুকুও থাকে না। তোমরা স্থান দাও নি, মেয়েরা তাই নিজেরাই নিজেদের স্থান গড়ে নিচ্ছে। সেখানে তারা দাঁড়াবে। অদূর ভবিষ্যতে অমন হাজার বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী, গার্গী এই দেশের বুকেই আবার জেগে উঠবে। আজ যাকে তোমরা বলছ উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা,—কালে এই প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে দেখতে পাবে নির্ম্মল পরিষ্কার স্নুপেয় জল—যাতে তৃষ্ণা দূর করবে—তৃপ্তি আনবে। এ কথা মানি—আজ প্রথম যে আলোড়ন এসেছে এতে তলা হতে অনেক জমা কাদা ওপরে ভেসে উঠবে। সেগুলো পরিষ্কার করবার জন্তেই না এই প্রচেষ্টা চলছে।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "অথচ এ ময়লা জলের তলায় আছেই,—মাঝে মাঝে এক একটা চাপ যখন ভেসে ওঠে তখন সমস্ত জলটাই নোংরা হয়ে ওঠে। এ রকম ভাবে নিত্য জল নোংরা হয়ে অখাদ্য হওয়ার চেয়ে

একেবারে তলার সব ময়লা ছেঁচে তুলে ফেলা ভালো। এতে জল একবারই নোংরা হবে। তার পরে যে জল পাওয়া যাবে তাতে অনেক দিন চলবে।"

অসমঞ্জ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে মনে হইল সে নন্দার কথাগুলা ভাবিতেছে।

নন্দা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ উঠিয়া গেল। খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে তখন একখানা পত্র রহিয়াছে।

"দেখ, এই পত্রখানা কাল পোষ্ট করব বলে রেখেছিলুম, কিন্তু কারও হাতে দিতে আর মনে ছিল না। তুমি বার হওয়ার সময় এখানা নিয়ে যেয়ো দেখি।"

অসমঞ্জ পত্রখানা উল্টাইয়া ঠিকানাটা দেখিয়া লইয়া পকেটে রাখিল।

নন্দা বলিল, "আশ্চর্য্য দেখ—আমরা তোমাদের খাওয়া পরা, ঘুমের সময় পর্য্যন্ত দেখব শুনব, আর তোমরা পেছন ফিরলে আর ফিরে চাইবে না, একেবারে সব ভুলে যাবে—নয় কি ?"

অসমঞ্জ এবার সত্যই গম্ভীর হইয়া গেল। হাতের সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এ কথা কিছুতেই ঠিক নয় নন্দা,—সব পুরুষই তোমার বিশুদা নয় একথা মনে কোরো।"

নন্দা বিবর্ণ হইয়া গিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

অসমঞ্জ বলিল, "তোমার বিশুদা তোমার একটা ডাক শুনে সব ফেলে এতদূরে ছুটে এসেছিল, তখন তার বাড়ীর কথা মোটেই মনে ছিল না। তার পর একদিন যেমন বাড়ীর কথা মনে হল, সে বাড়ীর দিকে ছুটল,—তুমি যে প্রাণপাত করে তাকে বাঁচিয়েছ সে কথাটা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেল। জেনে রাখ নন্দা, একটা মাত্র মানুষকে ধরে সমস্ত মানুষকে বিচার করা চলে না। সকল পুরুষই তোমার বিশুদা নয়, সকলেই তার মত অকৃতজ্ঞ নয়।"

নন্দার সুন্দর ঠোঁট দুখানা কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতেই কখন জলে ভরিয়া উঠিল।

হয় তো আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না; যদি না অসমঞ্জ উঠিয়া যাইত।

দূর নীলাকাশের একটী কোণ ঘেঁসিয়া তখন কালো একখানি মেঘ ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নন্দার চোখের জল হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

ক্ষয়রোগের পরিচর্য্যা *

ডাক্তার শ্রীসুশীলকুমার সেন, এম-বি

ক্ষয়রোগের বীজাণু ধনী-দরিদ্র বিচার করে না। একই প্রকারে এই বীজাণু সকল শ্রেণীর লোককে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং সময়মত যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে সকলের একই অবস্থা ঘটে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসা-প্রণালী অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে Sanatorium বা স্বাস্থ্যনিবাস-অনুমোদিত চিকিৎসাই ক্ষয়রোগের জন্য মূলতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তবে অবস্থা ভেদে কেহ কেহ চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাসের শরণাপন্ন হন, কেহ নিজ গৃহে কেহ বা স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়া থাকেন।

ক্ষয় রোগ সংক্রামক ব্যাধি। রোগের বীজাণু বাতাসের সহিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অথচ কেন সকল দেহ রোগাক্রান্ত হয় না এটা আলোচ্য বিষয়। অনেকের দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল। এইরূপ শরীরের মধ্যে বীজাণু প্রবেশ করিলেও রোগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যাহাদের দেহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অথবা অপর কোনও ব্যাধি দ্বারা নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে তাহারাই অধিকাংশ স্থলে রোগাক্রান্ত হয়; যেহেতু রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার যে প্রতিষেধক শক্তি দেহে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান থাকে এই সকল ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে।

ক্ষয়রোগীর চিকিৎসার মূলের কথা হইতেছে রোগীর জন্য প্রচুর পুষ্টির ব্যবস্থা করা। এই পরিকল্পে শুধু পর্য্যাপ্ত আহার গ্রহণ করাই যথেষ্ট নহে। খাদ্যের সার্থকতা নির্ভর করে পূর্ণমাত্রায় তাহা জীর্ণ এবং পরিপাক করিবার শক্তির উপর। সুতরাং রোগী যে সকল আহার্য্য সম্পূর্ণভাবে জীর্ণ করিয়া পুষ্ট দেহ ধারণ ও বল সঞ্চয় করিতে পারে সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

চিকিৎসা বিষয়ে তিনটি নিয়ম পালন করা আবশ্যক—

১। পূর্ণ মাত্রায় পুষ্টিলাভের অনুকূল স্থানে রোগীর বাসস্থান নির্দ্দেশ;

* এই প্রবন্ধে মূলতঃ ফুসফুস সংক্রান্ত ক্ষয় রোগের আলোচনা করা হইয়াছে।

২। যাহাতে রোগের বৃদ্ধি না হইয়া দমন হয় তদনুরূপ ব্যবস্থা এবং

৩। রোগ সংক্রান্ত যন্ত্রণা বা কষ্টের লাঘব সাধন।

এই রোগের চিকিৎসায় বিশ্রামে সবিশেষ উপকার দর্শে। পরন্তু রোগীর দৈহিক অবস্থানুসারে ব্যায়াম অথবা শ্রমের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে রোগী সমুচিত ফল লাভ করে, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায়।

উন্মুক্ত বায়ু এবং সূর্য্যালোকে অবস্থান বিশেষ হিতকর। রৌদ্রকর প্রখরতা ধারণ করিবার পূর্ব্বে এবং পরে তাহাতে অবস্থান করিলে রশ্মি হইতে দেহের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। রোগের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে রোগের দ্রুত উপশম লক্ষ্য করা গিয়াছে। উচিত চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময় অথবা উপশম অন্তে রোগীকে যেরূপ স্থানে বাস করিতে হইবে অর্থাৎ পরবর্ত্তী জীবন যে স্থানে অতিবাহিত করিতে হইবে তদনুরূপ স্থানেই চিকিৎসাধীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেন না অনেক স্থলে দেখা যায় পাহাড় পর্ব্বত-বহুল স্থানে চিকিৎসা দ্বারা উপসর্গ দূর হইবার পর সমতল ভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অনেকে পুনর্ব্বার রুগ্ন হইয়া পড়েন। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসক এরূপ মত প্রকাশ করেন যে চিকিৎসার জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার কোন যৌক্তিকতা নাই। তবে যে সকল স্থানের তাপ দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল নহে এবং পর্য্যাপ্ত নির্ম্মল বায়ু এবং সূর্য্যালোকেরও অভাব নাই, সে সকল স্থান রোগীর চিকিৎসা ও সত্বর স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলা যায়।

অধিকাংশ রোগী গৃহে থাকিয়া চিকিৎসাধীন হইতে ইচ্ছুক হন। আত্মীয় স্বজনের সেবা-যত্ন দূরের কথা তাহাদের অদর্শনও অনেকের পক্ষে ক্লেশদায়ক হইয়া পড়ে।

এই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি যেমন আত্মীয় বন্ধুবর্গের কর্ত্তব্য আছে তেমনি রোগীরও অপর সকলের প্রতি বিশেষ একটি কর্ত্তব্য আছে। সেটি হইতেছে নিজের দ্বারা ব্যাধির যাহাতে প্রসার লাভ না হয় তাহার জন্য যত্নবান হওয়া। যক্ষ্মারোগী মুখের উপর রুমাল চাপা না দিয়া কাশিবে না, বিশেষ পাত্র ভিন্ন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না এবং বিনা কারণে অপরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে স্পর্শ করিবে না। রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষ হইতে এইটুকু সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে পরিচর্য্যার অবশিষ্ট অংশ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য হইলেও অপরের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বলিলেই চলে।

বড় সহরের অধিবাসী রোগীকে যখন সেই পারিপার্শ্বিকেই চিকিৎসাধীন হইতে হয়, তখন আদর্শ ব্যবস্থার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিলেও সুচিকিৎসার প্রণালীগুলি যথাসম্ভব পালনীয়। গৃহের অন্যান্য লোকের সুস্থতাকল্পে রোগীকে স্বতন্ত্র ঘরে থাকিতে দিতে পারিলেই ভাল হয়। যে ঘরের দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম মুক্ত এবং অভাবে গৃহের যে ঘরে আলো-বাতাস বেশী সেই ঘরই রোগীর পক্ষে অধিক উপযোগী। অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য চিকিৎসক রোগীকে সম্পূর্ণ মুক্ত স্থানে রাখিতে বলেন। তাঁহাদের মতে রোগী মাত্রেরই গ্রীষ্মকালে ১১-১২ ঘণ্টা এবং শীতকালে ৬-৮ ঘণ্টা কাল খোলা বাতাসে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। এই ব্যবস্থার এতদূর অনুমোদন তাঁহারা করেন যে জ্বর, কাশি, রাত্রিতে ঘাম হওয়া, এমন কি কাশির সঙ্গে রক্ত উঠাও এই ব্যবস্থার প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করেন না। অবশ্য শীতের সময় গায়ে উপযুক্ত বস্ত্রাদি রাখিবার আবশ্যকতা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পাকা বাড়ী হইলে রোগীকে একতলাতে রাখাই ভাল; কেননা রোগীর সেবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে তাহাদের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা সুবিধাজনক হয়। পরন্তু আবশ্যক মত রোগীও বিনা আয়াসে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে এবং অবস্থানুসারে ঠেলা গাড়ী (invalid chair) প্রভৃতির ব্যবস্থাও সহজে চলিতে পারে। বাড়ীর বিশেষ কোন ঘরের প্রতি রোগীর আকর্ষণ থাকিলে সেই ঘরে রোগীকে রাখা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত।

রোগীর ঘরে যথোচিত আলো এবং বাতাস চলাচলের জন্য যথেষ্ট দরজা জানালা থাকা দরকার। ঝড় বৃষ্টির সময় ব্যতীত অপর সকল সময়েই দরজা জানালা খোলা থাকিবে। অনেক পরিবার রাত্রিতে জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া ব্যাপারে অনভ্যস্ত। তাহাদিগের জন্যও ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করিলে চলিবে না; তবে রোগী যেন কোন কারণে শীত বোধ না করে। ভারতের কোন কোন স্থলে চিমনীর দ্বারা অথবা ঘরের মধ্যে আগুন রাখিয়া ঘর গরম করা আবশ্যক হয়। শীতের প্রকোপ কম হইলে গরম জল পূর্ণ রবারের থলি (Hot water bag) কিম্বা গরম জল ভরা বোতল কাপড়ে জড়াইয়া বিছানায় রাখিলেও কাজ চলিতে পারে।

সম্ভবমত ঘরে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। রবিকর রোগীর প্রভূত উপকার সাধন করে। উপরন্তু শুশ্রূষাকারীরও পর্য্যাপ্ত আলোকিত কক্ষে কাজকর্ম্মের সুবিধা হয়।

রাত্রিতে আলোকের জন্য স্থানীয় ও পারিবারিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। বৈদ্যুতিক আলোকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, ইহা হইতে কোনরূপ হানিকর ধূম নির্গত হয় না। যে আলোই ব্যবহৃত হউক, প্রত্যহ একই সময়ে ঘরের আলো নির্ব্বাপিত করা উচিত। সুস্থ ব্যক্তির মত রোগী অধিক রাত্রি জাগরণ না করিলেও প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিলে উপকার পাইবে।

রোগীর ঘরের মেজে ও দেওয়াল যথাসম্ভব ধূলিমুক্ত রাখিতে হইবে। এজন্য প্রত্যহ ভিজা ন্যাকড়া দিয়া এগুলি মুছিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা পরিচর্য্যার একটি প্রধান অঙ্গ। মেজেতে কার্পেট বিছান মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

রোগীর পায়খানার ব্যবস্থা ঘরের সন্নিকটে করিতে হইবে। কিছু দিন পর পর আইজাল (Izal) বা ফিনাইল (Phenyle) ইত্যাদি শোধক দ্বারা কলঘর, পায়খানা ধৌত করা উচিত।

বিছানা অধিক প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যকতা নাই। অধিক কাল রোগ-ভোগের ফলে দেহ শীর্ণ হইয়া পড়িলে কোমল বিছানার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগী সচ্ছল অবস্থাপন্ন হইলে জলপূর্ণ রবারের গদি (water bed)র বন্দোবস্ত করা যায়। চাদর কম্বল ইত্যাদি ব্যবহার্য্য জিনিষ স্তূপাকৃতি বিছানায় না রাখিয়া এগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিলে রোগীর পক্ষে আরামদায়ক হয় সন্দেহ নাই।

ইতিপূর্ব্বে দেহপুষ্টির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেহকে পরিমেয় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করিলে এক দিকে রোগজনিত ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে সেই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। এ জন্য আহার এবং আহার্য্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবেন। আহার্য্য বিচার চিকিৎসকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, কেন না, আত্মীয়দের উপর এই ভার ন্যস্ত হইলে মতভেদের আশঙ্কা থাকে। পরিবার বিশেষের রুচি এবং শিক্ষার উপর বিষয়টি সম্যক নির্ভর করে; এ জন্য স্থান ও পাত্র ভেদে অনুরূপ ব্যবস্থা হইলে দোষ নাই।

প্রত্যহ নির্দ্ধারিত সময়ে রোগীকে পথ্য দিতে হইবে। তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক হইলে সামান্য লঘু পথ্য দিতে আপত্তি নাই। পরিষ্কার পাত্রে সুচারু খাদ্য পরিবেশন করিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় এমন কি, ক্ষুধার অভাবে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। খাদ্যে ঝাল ও গরম মশলার পরিমাণ যত কম হইবে ততই ভাল এবং পরিপাক শক্তি বুঝিয়া লঘু বা গুরু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণতঃ ঘি, মাখন দুধ, সর, ছানা, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি এবং রকমারি ফল খাদ্য হিসাবে উত্তম। তবে শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিবে। অধিক দুগ্ধ সংযোগে প্রস্তুত সুজি, পালো ইত্যাদি পরম হিতকর। জলীয় খাদ্যের মাত্রাও ঠিক রাখা দরকার। পানীয় জল ব্যতীত লিমনেড, সরবৎ, ডাব খাইতে দিতে পারা যায়। শয্যাশ্রয়ী রোগীর জন্য দুধ এবং অন্যান্য তরল খাদ্যের উপরই বেশী নির্ভর করিতে হয়। দেহের অবস্থানুসারে উপযুক্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের আহার্য্য জোগান উচিত।

রোগীর দেহের তাপ (temperature) ৯৮°·৪ অর্থাৎ normal না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বিছানায় রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ ব্যবস্থারও মাত্রার ব্যতিক্রম ঘটে, কখন কখন রোগীকে সকল সময়ে শয্যায় শায়িত রাখিতে হয়, আবার অবস্থা বিশেষে কথা বলা, বই পড়া, ধূমপান করায় বাধা থাকিলেও মল মূত্র ত্যাগের জন্য উঠিতে দেওয়া হয়। কখনও বা বই পড়া কথা বলায় আপত্তি থাকে না; কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগের সময় ভিন্ন শয্যাত্যাগ করিতে দেওয়া সমীচীন বিবেচিত হয় না।

ব্যায়ামের মাত্রা নির্দ্ধারণ চিকিৎসক করিয়া দিবেন। দেহের তাপ (temperature) স্বাভাবিক (normal) হইবার পর সাধারণতঃ ১০ মিনিট হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত রোগীকে বসিয়া থাকিতে দেওয়া হয়। তাহার পর দেহের সুস্থতা অনুসারে কয়েক পা চলা এবং সহিয়া গেলে একটু একটু হাঁটা অনুমোদন করা যায়। বেড়াইবার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইতে হয় এবং অল্পে অল্পে বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা ব্যতীত দিবসের সকল সময়েই রোগী ওঠা-বসা ও চলাফেরা করিতে পারে। চলিবার গতি কিন্তু কোন ক্রমেই ঘণ্টায় দুই মাইলের ঊর্দ্ধে হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

চলা-ফেরা সম্পূর্ণরূপে সহ্য হইলে রোগীকে প্রতিদিন কিঞ্চিৎ দৈহিক পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হয় এবং শ্রমের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইলে তাহারা কতক স্থলে কঠিন পরিশ্রম সহ্য করিতে সক্ষম হয় দেখা গিয়াছে। যদি শ্রম সহ্য হইতেছে না মনে হয়, তবে একেবারে কমাইয়া দিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা আরও আস্তে আস্তে মাত্রা বাড়ান দিবেন। চিকিৎসক-নির্দ্ধারিত ব্যায়াম বা শ্রমের মাত্রার ব্যতিক্রমে অশুভ ফল ফলিতে পারে।

শ্রমের জন্য এরূপ কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বাচন করা উচিত যাহাতে রোগীর স্বভাবজাত উৎসাহ আছে। অনেক স্বাস্থ্যনিবাস বা Sanatoriumএ সুস্থ রোগীরা তৎসম্পর্কীয় কর্ত্তৃপক্ষকে পরিচালনা কার্য্যে বহুবিধ সহায়তা করেন। কেহ temperature লিপিবদ্ধ করেন, কেহ বা খাদ্য বিভাগের তত্ত্বাবধান, উদ্যান রচনায় সাহায্য ও পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপও দেখা যায় যে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের রোগী তথাকথিত আরোগ্য লাভ করিবার পর ক্ষয়রোগীদের জন্য হাঁসপাতাল কিম্বা স্যানাটরিয়ামের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিয়মিতভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন।

চলাফেরা করিতে পারা রোগীদের স্নানাদি ও প্রসাধনের জন্য অপরের সাহায্য লইবার আবশ্যকতা নাই। শয্যাশ্রয়ী রোগীর সেবায় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। স্নানান্তে সম্পূর্ণ শুষ্ক গামছা কিম্বা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত। যাহাদিগকে বিছানায় রাখিয়া স্নান করাইয়া দিতে হয় তাহাদিগের দেহের এক এক অঙ্গ ক্রমে ক্রমে ধুইয়া মুছিয়া দিতে হয়। সমস্ত দেহ এক যোগে স্নানের জন্য উন্মোচন করিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া যাওয়া এরূপ রোগীর পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় রোগীর স্নানের জল দেহের অনুরূপ গরম হইলে স্নানে কোন ক্লেশ হয় না। স্নানের পর চুল ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা ও পরে চিরুণী ব্যবহার করা আরামদায়ক হয়।

ক্ষয়রোগীর শরীরের তাপ ৩ ঘণ্টা অথবা ৪ ঘণ্টা পর পর নেওয়া উচিত এবং ইহা পরিচর্য্যার একটি আবশ্যক অঙ্গ। অনেকে নিজেই এ কাজ করিতে সমর্থ। মুখ-গহ্বরে মলদ্বারে এবং বগলে অথবা কুচকীতে থার্ম্মোমিটার দ্বারা তাপ লওয়া যায়। তাপ মুখে লওয়াই প্রশস্ত; কারণ ইহাতে সঠিক তাপ নির্ণীত হয় অথচ প্রক্রিয়াটিও অত্যন্ত সহজ। শারীরিক পরিশ্রম, স্নান অথবা আহারের অব্যবহিত পরে তাপ (temperature) না লইয়া আধ ঘণ্টা দেরী করিয়া লইলে সঠিক তাপ (temperature) উঠে।

যে সকল রোগীর কাসি বা নিষ্ঠীবনের সহিত বীজাণু নির্গত হয় তাহারা যে সংখ্যায় কত তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বীজাণু দ্বারাই রোগের বিস্তার লাভ ঘটে। থুথু এবং কাসি ফেলিবার জন্য রোগীর সঙ্গে বা কাছে একটি পাত্র রাখা অত্যাবশ্যক। এ জন্য বাজারে প্রচলিত এক প্রকার ঢাকাওয়ালা পাত্র Spittoon পাওয়া যায়। যে সকল রোগী চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় তাহারা pocket spittoon সঙ্গে রাখিলে আবশ্যক মত তাহা ব্যবহার করিতে পারে। ঘরে থাকিবার সময়ে থুথু কাসি একটি পাত্রে ত্যাগ করিলে পরে ঐ পাত্র বিশোধক ঔষধ দ্বারা নির্দ্দোষ করিয়া ফেলিতে হইবে। থুথু ফেলিবার জন্য এক প্রকার রুমালের চলন আছে। এই রুমাল ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক; কারণ পরে উহা পুড়াইয়া ফেলা চলে। কাপড়ের রুমাল ব্যবহারের পর কার্ব্বলিক এসিড লোশন কিম্বা অন্য কোন

শোধক দ্বারা ইহাকে দোষশূন্য করিতে হয়। থুথু ও কাসি ফেলা বিষয়ে রোগীর বিশেষ যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং শুশ্রূষা বা পরিচর্য্যাকারীর পক্ষে এই দিকে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোনও গতিকে মেজেতে থুথু অথবা কাসি পড়ে তাহা হইলে উহার তরল অংশ সত্বরই শুকাইয়া যায় এবং এমত অবস্থায় মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে অসংখ্য বীজাণু বর্ত্তমান থাকিতে পারে। তরল অংশ শুকাইয়া গেলে বীজাণুগুলি ধূলিকণার সঙ্গে মিশিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় এবং এইরূপে প্রধানতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত সুস্থ-দেহে প্রবেশ লাভ করে। এই কারণে থুথু ও কাসি ফেলা এবং তজ্জন্য ব্যবহৃত পাত্র শোধন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

দেহের অবস্থার মোটামুটি ধারণা করিবার জন্য রোগিদিগকে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া ওজন করিলে ভাল হয়। প্রতিবারে ভোজনের আধ ঘণ্টা কিম্বা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে একই ধরণের কাপড় জামা পরিধান করিয়া ওজন হইলে প্রকৃতপক্ষে শরীর বৃদ্ধি হইল না ক্ষয়গ্রস্ত হইল তাহা জানা যায়।

রোগীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত কথা বলিবার পরিমাণ ঠিক করিয়া দিতে হইবে। বেশীক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলে রুগ্ন শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য বিরক্তিভাজন হইতে হইলেও রোগীকে সম্পূর্ণ নিয়মাধীন রাখিতে হইবে।

রোগীর ব্যবহার্য্য তৈজস-পত্র, কাপড় জামা ইত্যাদি কিরূপে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং মল-মূত্র থুথু কাসি কিরূপ প্রণালীতে শোধন করিতে হইবে, এমন কি কোন্ কোন্ উপায়ে রোগীর ব্যবহৃত ঘর পুনরায় সুস্থ লোকের বাসোপযোগী করা যায় তাহা সাধারণের প্রণিধানযোগ্য।

স্থূলতঃ বাসনপত্র জলে এক ঘণ্টা কাল ফুটাইয়া লইলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়। পরে কিছুক্ষণ ফিনাইলের লোশনে ডুবাইয়া রাখিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। নোংরা কাপড় চোপড় কার্ব্বলিক লোশন (১/২০ অংশ অর্থাৎ ১৯ ভাগ জলে ১ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড) এ অনূ্যন ১২ ঘণ্টা ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ধুইয়া ফেলিলে ভাল হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মল ও মূত্রের সহিত ক্ষয় বীজাণু নিষ্ক্রান্ত হয়না। কিন্তু সময়ে সময়ে এগুলিও সম্পূর্ণরূপে শোধন করা আবশ্যক বিবেচনা করা হয়। এই প্রকার স্থলে রোগী পূর্ব্ব-কথিত কার্ব্বলিক লোশনযুক্ত পাত্রে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। মলত্যাগের পর পাত্রে আরও কার্ব্বলিক এসিড যোগ করিয়া একটা ছোট লাঠি দিয়া ভাল করিয়া নাড়িতে হইবে। মল লোশনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিলে দুই ঘণ্টা কাল এইভাবে রাখিয়া পরে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং লাঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

যে সকল পাত্রে থুথু, কাসি প্রভৃতি ফেলা হয় সেগুলি শোধন করিবার উপায় হইতেছে সর্ব্বসমেত পাত্রগুলিকে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল জলে ফুটাইয়া লওয়া। যে ঘরে রোগী থাকে সে ঘর গন্ধক অথবা ফর্ম্মালিন (formalin) গ্যাস দ্বারা শোধন করা যাইতে পারে। এ জন্য বিছানা ও অন্য জিনিষপত্র ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া এবং ঝুলাইয়া দিলে কার্য্যকরী গ্যাস সকল জিনিষের সংস্পর্শে আসিতে পারে। গ্যাস দিবার পূর্ব্বে ও পরে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা আবশ্যক। রোগীর ব্যবহৃত সামান্য মূল্যের দ্রব্যাদি পুড়াইয়া ফেলিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় এবং যেগুলি জলে ফুটাইয়া ফেলা যায় সেগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থায় প্রশস্তই।

শুশ্রূষাকারীর কতকগুলি নিয়ম পালন করা উচিত। সময়ে স্নানাহার, ছুটির সময় খোলা জায়গায় বেড়াইলে কিম্বা সুবিধামত খেলা-ধূলায় অতিবাহিত করিলে শরীর পটু হয় এবং কাজের সময় কাজে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। কোনপ্রকার সেবার কার্য্য করিবার পরেই হাত ধোওয়ার এবং সর্ব্বদা নাক-মুখ হইতে হাত তফাতে রাখিবার অভ্যাস করিতে হইবে। হাতের নখ ছোট করিয়া কাটা, দাঁত পরিষ্কার রাখা, সর্ব্বদা নাক দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া প্রভৃতি অভ্যাস ও আয়ত্ত করিতে হইবে। নিজের দেহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলেই শুশ্রূষাকারী বা কারিণীর প্রথম কর্ত্তব্য চিকিৎসকের নিকট হইতে ব্যবস্থা লওয়া।

মাণ্টা

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পোর্টসৈয়দে মাটী ছেড়ে জাহাজ আবার জলে ভাসল। এই ক'দিন একসঙ্গে অহোরাত্র থাকায় যাত্রীদের মধ্যে একটা পরিচয়ের শৃঙ্খল গোড়ে উঠেছিল। পরস্পর গল্প-

মাস্তা গির্জ্জা—মাণ্টা

গুজব হয় ত অনেকেই কোরতেন না; কিন্তু তবু একটা চেনার চাউনি সকলের চোখেই খেলত। পরস্পরের সুখ-

গেটা-রিয়েল—প্রধান প্রবেশ-সেতু—মাণ্টা।

দুঃখের প্রতি সকলেই যেন সাধ্যমত দৃষ্টি রাখতেন। লোকগুলি তাদের কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে আহারে বিহারে পরস্পর পরিচিত হোয়ে পোড়েছিল।

এক বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গী নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে চোলে-

ষ্ট্রার্ডা-সাণ্ডা লুসিয়া—সিঁড়ি বহুল রাস্তা—মাণ্টা।

ছিলেন। জাহাজে উঠে থেকে তিনি যেদিকের ডেকের যে চেয়ারটী দখল কোরে বসেছিলেন, সারা যাত্রার মধ্যে তাঁকে সেটী পরিত্যাগ কোরতে দেখি নি। জাহাজে তাঁর কোনো বন্ধু বা শত্রু ছিল বলে মনে হোত না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী বই হাতে কোরে তিনি এসে বোসতেন। বড় জোর কখনও সমুদ্রের অসীম নীল জলের ওপর তাঁর সৌম্য দৃষ্টি মেলে ধরতেন। আবার খাবারের বিউগ্-লের সঙ্গে সঙ্গে যথানিয়মে খাবার ঘরে গিয়ে হাজরে দিতেন। আমি এবং সঙ্গী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কত দিন
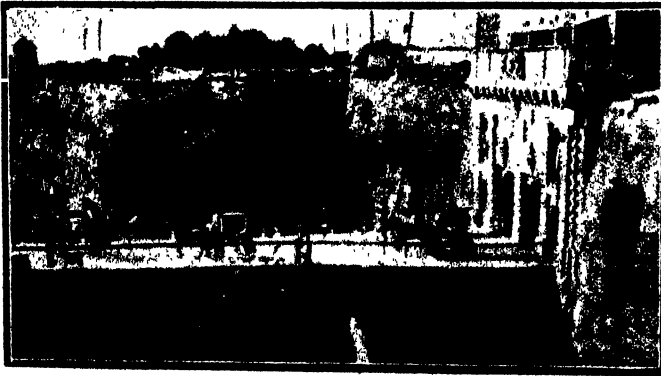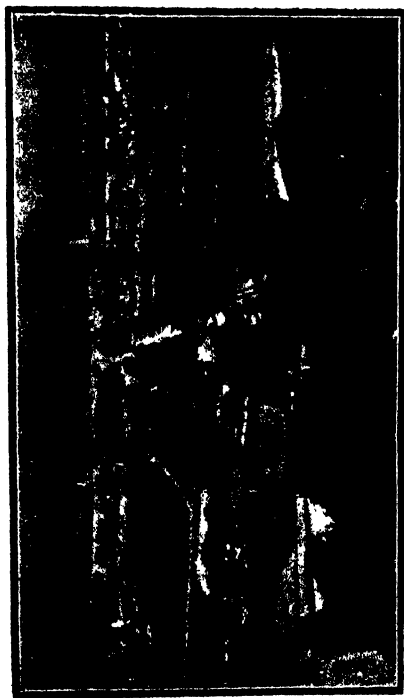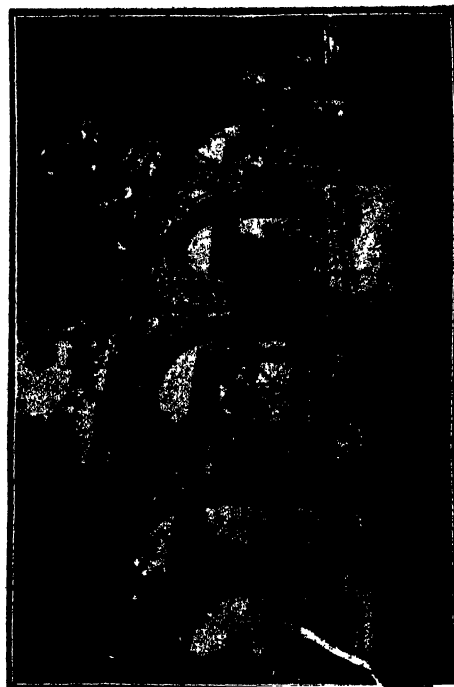
সমুদ্রের হাঁসং এব মাল্টা

গ্র্যাণ্ড হারবার হই ত ট মাল্টা

বারাক্কা-উদ্যান—মাল্টা

মাগলিস গার্ডেন—মাল্টা

এই গম্ভীর নির্ব্বাক বৃদ্ধার কথা ভেবেছি ; এই কোলাহল-মুখর জাহাজ-জীবনের মাঝে মৌন নির্লিপ্ত বৃদ্ধাটীকে দেখে

মাণ্ট—সুন্দরী
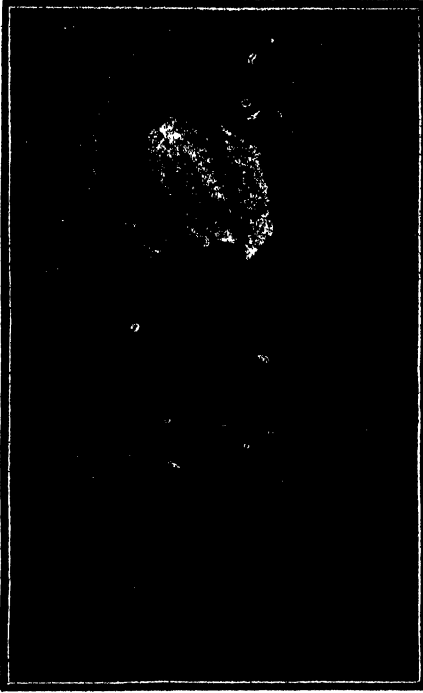
বিস্ময়ে অভিভূত হোয়েছি। বন্ধু বোলতেন "চলুন, বুড়ীর সঙ্গে আলাপ করি" ; কিন্তু তাঁর নির্লিপ্ততা যেন কেমন

কো-ক্র্যাথি চ্যুর্চের অভ্যন্তর-ভাগ—মাণ্টা
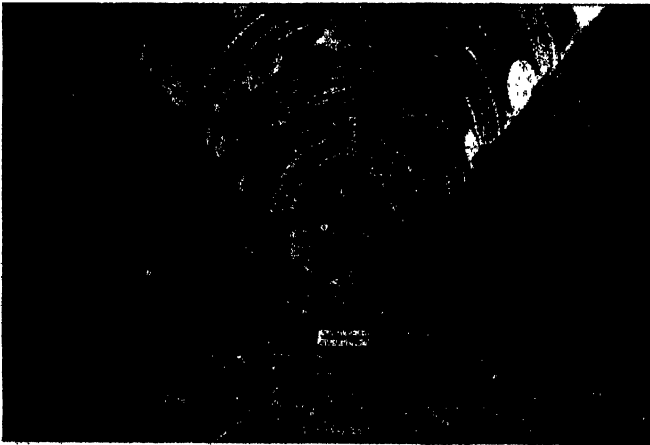
বাধা দিত। কে জানে কি ব্যথা তাঁর অন্তরে পুঞ্জীভূত হোয়ে আছে, অথবা হয় ত স্বভাবই অমনি !

আবার ঠিক এর উল্টো ছিল দুটী কিশোরী—পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে অবশ্য। সে দুটী কখনও হাফ প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট পোরে, কখনও ঢিলে পায়জামা পোরে, নেচে কুঁদে, লাফিয়ে দৌড়ে জাহাজ মাত কোরে রাখত। এদের একটা বছর ত্রিশের প্রেমপাত্রও জুটেছিল—ফরমাশ খাটতে খাটতে বেচারীর প্রাণান্ত হোত—ডেক কয়েলে, টেনিশে, সাঁতারের চৌবাচ্চায় সর্ব্বত্রই এদের প্রবল প্রতাপ ছিল। আর একটী মেয়ে আমাদের সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছিল তার সৌম্য স্থির দৃষ্টিতে, বিলাসহীন বেশভূষায় এবং সংযত আচরণে। বয়স তার হয় ত বছর বিশেক—কুমারী নিশ্চয়ই ; কিন্তু তবু কী সংযত সৌম্য শ্রী—বিলাসিতার ব্যঞ্জনা কোন দিন তার দেহে দেখি নাই। তাই বোলে সে দরিদ্র ছিল না। যৌবনের জোয়ার সর্ব্বাঙ্গে বোয়ে গেলেও কোনো দিন তার অসংযত উচ্ছ্বাস দেখি নাই। তার বেণীবদ্ধ সোনালী চুলগুলি পিঠের ওপর চিকচিক কোরত ; কিন্তু তাতে কৃত্রিম তরঙ্গ তুলবার চেষ্টা ছিল না। কোনো খেলাধূলায় সে অসংযত হুড়োহুড়ি কোরত না ; অথচ খেলতে ডাকলে প্রত্যাখ্যান কোরত না। সে প্রাণহীন ছিল না ; কিন্তু প্রাণের আবেগকে বাঁধ দিতে জানত। কোনো দিন তাকে স্নানের চৌবাচ্চায় অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় পুরুষদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি কোরতে বা সূর্য্যস্নান কোরতে দেখি নি। পুরুষদের মধ্যেও এমনি ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন প্রত্যেকে।

একজনকে প্রায়ই সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-প্লাবিত খোলা ছাদে বসে প্রেম কোরতে দেখতাম। প্রেমিকার পেছনের চুলগুলি পুরুষদের মত খুব ছোট কোরে ছাঁটা—শীর্ণ নিষ্প্রভ দেহ—চোখে একটা লোলুপ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি—চোখের কোলে এক পোঁচ কালি লেপা। চেহারা দেখেই মনে হোত পেশাদার প্রেমিকা। জাহাজখানি যেন জগতের পকেট এডিশন—নানা প্রকৃতির নানা প্রবৃত্তির লোকের একত্র সমাবেশ।

যাত্রা আমাদের ক্রমশঃ শেষ হোয়ে আসছিল।

জাহাজে এত দিন যে সব খেলাধূলোর প্রতিযোগিতা চলছিল, সেগুলোর ফাইনাল আরম্ভ হোল। মাল্টা পৌঁছোবার পূর্ব্ব রাত্রে 'কুকুরদৌড়' হোল। কী সে উৎসাহ, কতই না ঘটা, কী চাঁদা সংগ্রহের উদ্যম। গোটা ছয়েক খেলার কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে হাতকয়েক দূরে সেই দড়ি ধোরে জকিরা বোসলেন—ওয়ান, টু, থ্রি'র সঙ্গে সঙ্গে দড়ি গোটান আরম্ভ হোল, কুকুরও দৌড়াতে লাগল। দর্শকদের কী সে উত্তেজিত আগ্রহ, উৎসাহবাণী, উৎকণ্ঠা! অধিকাংশ যাত্রীই এক একটা কুকুরের উপর বাজী ধোরেছিলেন; কাজেই এ উৎসাহের পেছনে উৎস ছিল অর্থ। ওরা জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ করে। ভোগ মানে শুধু বিলাসই নয়, ব্যসনও। আমাদের মত পরকালের দিকে স্তিমিত নেত্রে তাকিয়ে থেকে জগৎ অনিত্য বোলে নিজের অপারগতা ও অভাব গোপন করে না; আবার পরক্ষণেই প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশের নেশায় জগৎটাকে সত্য বোলে ভ্রম করে বসে না।

সকাল থেকেই দূরে মাল্টার পাহাড় চোখে পড়ছিল, যখন বেশ কাছে এসেছি, তখনও মনে হচ্ছিল, এটা একটা পাহাড়—জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এর বুকে যে ঘরবাড়ী, লোকজন, গাড়ীঘোড়া আছে, তার কোনো পরিচয়ই পাওয়া যায় না—মনে হয়, প্রাণহীন শুকনো পর্ব্বত-স্তূপ। কিন্তু জাহাজ যখন অনেক ঘুরে বন্দরের মধ্যে ঢুকল,
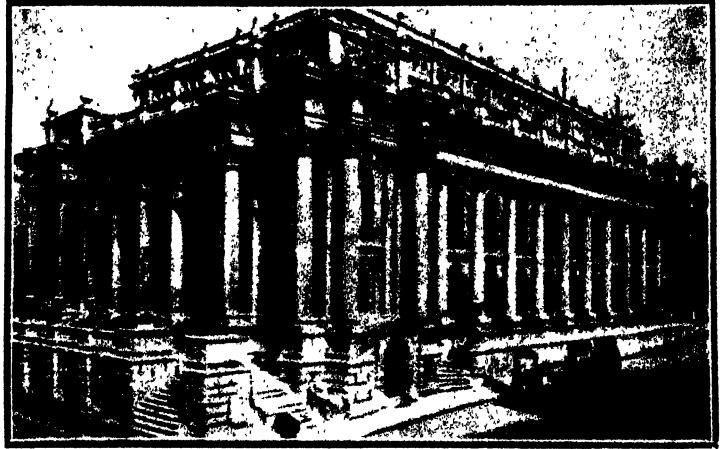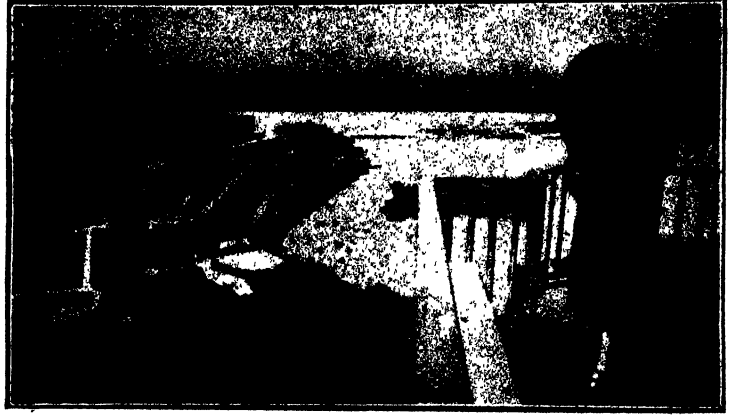
রয়্যাল অপেরা—মাল্টা

ষ্ট্রাডা রিয়েল—প্রধান রাস্তা—মাল্টা

তখন বিশ্বাস কোরতেই হোল যে, পাষাণের মাঝেও প্রাণ আছে।

স্লিয়েমা—মাণ্টা

মার্সামুক্সেটো হইতে ভ্যালেটা—মাণ্টা
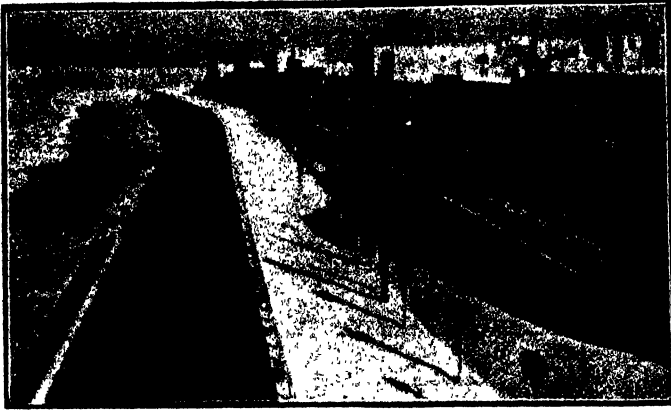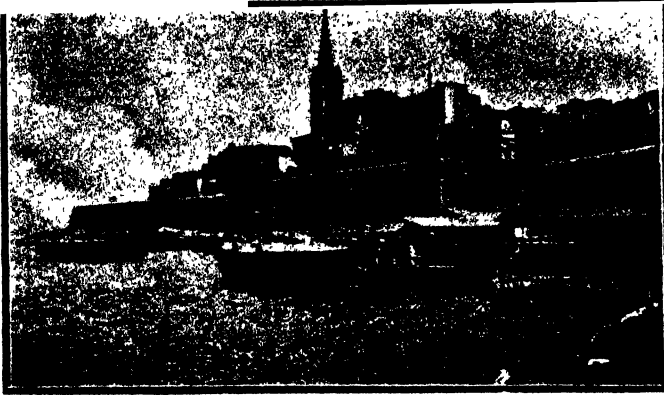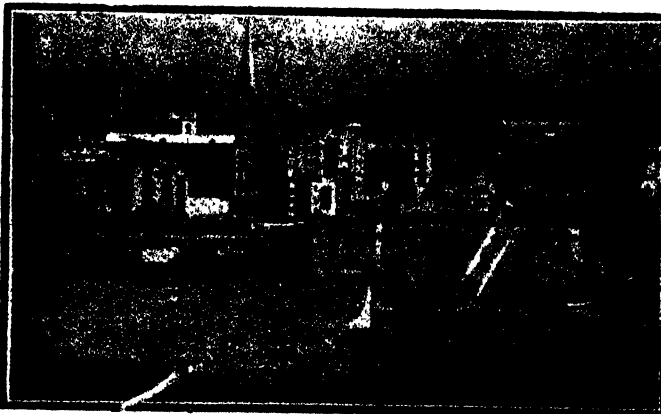
ভ্যালেটা—মাণ্টা

জাহাজ দাঁড়াবামাত্র অনেকগুলি ছোট ছোট নৌকো জাহাজকে ঘিরে ফেল্লে—যেন কোনো মৃত কীটকে পিপড়ের দল আহরণ চেষ্টায় ব্যস্ত। অনর্গল উচ্চ চীৎকারে কি যে বলে, বুঝবার উপায় নাই, মাঝে মাঝে দুএকটা ইংরাজী কথা কাণে আসে "Want boat Sir, nice boat". সহসা চার পাঁচটা ছেলে নৌকো থেকে লাফ দিয়ে পোড়ে জলের নীচে ডুব দেয়—স্বচ্ছ জলে অনেকদূর তাদের লীলায়িত দেহ দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর তারা উঠে আসে। একজন মুঠো খুলে দেখায় একটী মুদ্রা। অল্পক্ষণেই ব্যাপারটা বোঝা গেল—যাত্রীর দল এক একটা তাম্রমুদ্রা জলে ছুঁড়ে দিচ্ছে; আর পাঁচ-সাতজন ডুবুরী বালক অমনি লাফ দিয়ে তা কুড়িয়ে আনতে ডুবছে। যে সেটা আনতে পারছে সেই সেটা লাভ কোরছে—পুরীর সমুদ্র তীরে নুনিয়া বালকদের মত।

কোম্পানীর ষ্টীম লঞ্চ এসে আমাদিগকে তীরে নিয়ে গেল—পাশপোর্ট দেখাবার হাঙ্গামা নাই। তীরে নেমে গোটাদুই খাড়া চড়াই রাস্তা চোখে পড়ল—ঘরবাড়ী কিছুই দেখলাম না। অনেকগুলি টোঙ্গা ও ট্যাক্সী অপেক্ষা কোরছিল। এক কথায় কাজ হয় না; বহু দরদস্তর কোরতে হয়। এটা প্রায় প্রত্যেক পরাধীন জাতিরই মজ্জাগত পরাধীনতা যে নৈতিক অবনতি ঘটায়, এই সব ছোটখাট ঘটনায় তা বেশ পরিস্ফুট হয়। আমরা আট শিলিংএ ঘণ্টা হিসাবে চুক্তি কোরে একটা ট্যাক্সী ভাড়া কোরলাম। কেউ কেউ পদব্রজে কেউ বা টোঙ্গায় সহর দেখতে বেরুলেন। সহরটা পাহাড়ের ওপরে অধিত্যকাভূমিতে; কাজেই গ্র্যাণ্ড হারবার বা

প্রধান বন্দর থেকে সহরে উঠতে হোলে চড়াই ভাঙতে হয়। ওপরে উঠবার জন্মে বন্দর থেকে লিফটের বন্দোবস্তও আছে।

সারা দ্বীপটী পাহাড় ও কেল্লা ঘেরা। পাহাড়গুলি শ্যামল বৃক্ষাবৃত নয়—রুক্ষ ধূসর। সমুদ্র মাঝে মাঝে পাহাড়ের ভেতরে অনেকদূর ঢুকে যাওয়ায় অনেকগুলি ভাল ভাল প্রাকৃতিক বন্দরের সৃষ্টি হোয়েছে। গো সহরটী ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভ্যালেটা, ইমটার্কই, স্লিয়েমা মাস্তা, সিটী ভেচিয়া, ফ্লোরিয়ানা, মার্সা-মুস্কেটা ইত্যাদি নামে পরিচিত। একটা বেশ বড় সেতুর ওপর দিয়ে মোটর চল্ল। এইটাই সহরে ঢুকবার প্রধান রাস্তা। মোটরের চেয়ে ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাই বেশী। প্রথমে এসে মোটর থামল একটী বাগানের ফটকে। বেশ ঝকঝকে একটী ছোট্ট বাগান একেবারে সমুদ্রের ওপরে। সমুদ্রের ধারে বড় বড় খিলানওয়ালা পাশাপাশি দুটী দেওয়াল। অনেকেই সেখানে বেড়াতে এসেছে। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য ও গ্র্যাণ্ড হারবারটী দেখতে বড় চমৎকার। আরো ক'টী ছোট ছোট জনবহুল দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। নীলজলের মাঝে পীত ঘরবাড়ীগুলি বেশ চমৎকার লাগছিল। এই বাগান থেকে নীচে নামবার একটা সিঁড়ি আছে। বেড়াবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। এর নাম বারাক্কা। এর পর মোটর মালটার প্রধান রাস্তা ষ্ট্রাডা রিয়েলএর বুকের ওপর দিয়ে চোল্ল। দু'পাশে তিনচার তলা পাথরের আধুনিক বাড়ীঘর। রাস্তার ধারে ফুটপাথ; কাঁচের জানালাওয়ালা আধুনিক দোকান। কোথাও ওপর থেকে একটা সিঁড়ি নেমে এসে, কোথাও বা নীচে থেকে সিঁড়ি উঠে এসে রাস্তায় মিশেছে। সহরটী পার্ব্বত্য বোলে পারে

সিটা ভেচিয়া—মাল্টা

বারাক্কা উদ্যান হইতে সমুদ্রদৃশ্য—মাল্টা

ফ্লোরিয়ানা—মাল্টা

চলা পথের জন্তে এমনি সব সিঁড়ির বন্দোবস্ত কোরতে হোয়েছে। কোথাও বা বড় রাস্তার মাঝেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে—গাড়ী চলবার উপায় নাই। ঘর-বাড়ীগুলিও এক সমতলে নয়—একটার ছাদ অপরটার মেঝের মাথা ঠেকিয়েছে। এখানকার পোষ্ট আফিস থেকে আমাদের জনৈক সহযাত্রীকে খুঁজে নেবার কথা ছিল, তাই সেখানে গেলাম; কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাঁকে পাওয়া গেল না। পোষ্টাপিসটী অন্ধকার ও জনবহুল নয় বোলে বোধ হোল। একটার পর একটা রাস্তা পেরিয়ে গাড়ী এসে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর পাশে দাঁড়াল। প্রাসাদোপম অট্টালিকাটী স্বতঃই বিস্ময় উদ্রেক করে—ড্রাইভার বল্লে এটী "রয়াল অপেরা" অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ। এর কিছু দূর পরেই এখানকার মিউজিয়ামের দ্বারে এসে গাড়ী থামল। এখানে মাল্টার অতীত ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতির পরিচয় আছে। এখানকার সংগ্রহ থেকে জানা যায় খৃঃপূর্ব্ব ৩০০০ বৎসরেও মালটা সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত ছিল। বহু জাতি পরপর মালটাকে গ্রাস কোরেছে। এখন তারা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ কোরছে; কিন্তু সে বৃটিশের করুণাশ্রয়ে থেকে। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই খ্রীষ্টান; কাজেই অনেকগুলি চার্চ্চ আছে। তার মধ্যে একটী চার্চ্চ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এটীর নাম Coeathedral। এর ভেতরটা চমৎকার এবং বিরাট। এখানে কতকগুলি দেওয়াল-চিত্র আছে যা সত্যই সুন্দর। মিঃ খাঁ ভুলক্রমে সিগারেট মুখে দিয়ে এখানে ঢুকে পড়েন। এতে সেখানকার লোকেরা বিশেষ উত্তেজিত হোয়ে ওঠে। বিদেশী বোলে বিশেষ কিছু না বল্লেও তাদের ভ্রূভঙ্গী, মুখমণ্ডলে কুঞ্চিত রেখা, তীব্র দৃষ্টি সমন্বয়ে বলছিল "কে হে তুমি বেল্লিক।"
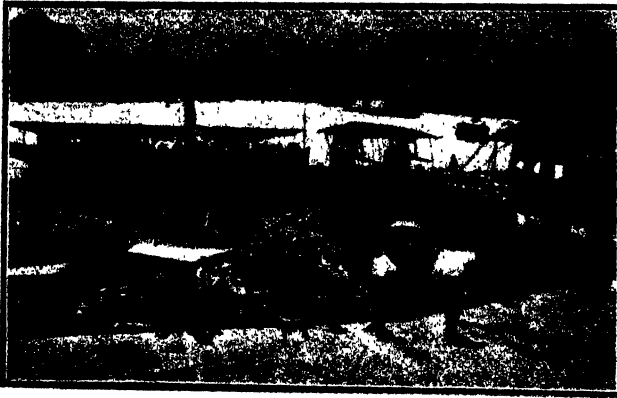
নৌ-সৈন্যের আড্ডা ডক—মাল্টা

প্রবেশ-দ্বার—মাল্টা

লাইব্রেরী—মাল্টা

আমরা যখন যাই তখন উপাসনা

চলছিল—বড় বড় মোমবাতি, ধূপধূনার গন্ধ এবং নীরব ভক্তমণ্ডলীর মৌনতার মাঝে যাজকের গম্ভীর উদাত্ত স্বর সব মিলে একটা চমৎকার আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই উপাসনা শেষ হওয়ায় চার্চ্চের জনৈক অধ্যক্ষ আমাদিগকে সমস্ত চার্চ্চটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালে। অন্যান্য বাড়ীর মধ্যে এখানকার লাইব্রেরীটা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা—বেশ সাজানো দোতলা বাড়ী। এখানে জনসাধারণ এসে পড়াশোনা করে। মটর ঘুরতে ঘুরতে আর একটা বাগানে এসে দাঁড়াল। এটার নাম 'Maglis garden ploriocna' পাহাড়ের বুকে এর কঠিন স্নিগ্ধ ছায়াও বেশ মিষ্টি লাগে। ভ্যালেটাই মালটার প্রধান অংশ—দোকানপাট, ভালভাল ঘরবাড়ী সব কিছুই এখানে। ভ্যালেটা ছাড়িয়ে মোটর খাঁ খাঁ কোরে পাহাড়ের বুক চিরে পিচ দেওয়া রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে চল্ল। রাস্তায় ইমটার্কা পড়ল। মনে হোল এখানে নতুন সহর বসছে। ঘরবাড়ীর সংখ্যা অল্প, চেহারা নতুন—গাছপালাও অল্প, তবে উন্নানর চেষ্টা চোলছে বোঝা যায়। ইতস্ততঃ বড় বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। এইখানে সৈন্যদের আড্ডা এবং হাঁসপাতাল। চোলতে চোলতে পাশের কয়েকটা সুউচ্চ বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত কোরে ড্রাইভার বোল্লে "citta vecchiat"। নানা রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটতে ছুটতে এসে পৌছল সমুদ্রের ধারে। এখানে রাস্তাটা একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁসে চলেছে। সমুদ্রের জল ঠিক রাস্তার পায়ে এসেই আছড়ে পড়ে। অনেকে এখানে স্নান কোরছে। এখানকার বাড়ীগুলির গড়ন যেন একটু অন্য রকমের। এই অংশের নাম স্লিয়েমা। এর পরে যেখানে আমাদের গাড়ী এল তা দেখে মন পুলকে ভরে উঠল। এই পাহাড়-ঘেরা পাষাণবুকেও মানুষ চেষ্টা কোরলে যে কেমন মনোরম সহর তৈরী কোরতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফ্লোরিয়ানা। চমৎকার সরল প্রশস্ত পিচ দেওয়া রাস্তা। রাস্তার দুধারে খেজুর ও অন্যান্য গাছের শ্রেণী। বাড়ীগুলিও ঘেঁষাঘেঁষি কোরে সৌন্দর্য্য নষ্ট করে নাই।

ছাগপালক—মাল্টা

দশ বছর আগে এখানে ট্রাম ছিল। পরে বাসের প্রতিযোগিতায় এখন তা লোপ পেয়েছে। এখানকার লোকদের পোষাক প্রায় ইয়োরোপীয়; কিন্তু মেয়েদের মাথায় ভ্যালডেটা এখানকার বিশেষত্ব। মাথার ওপর মোটরের হুডের মত একটা কাপড় মাথা ঢেকে পিঠ পর্য্যন্ত ঝোলে। এটা এখানকার প্রায় প্রত্যেক নারীই ব্যবহার করে। অন্যান্য পোষাকে বিশেষ তফাৎ নাই। মেয়েরা এখানকার বেশ সুন্দরী ও সুগঠিত। দেস

গ্র্যাণ্ড হারবার প্রধান বন্দর—মাল্টা

বোনা মালটার একটী প্রধান গৃহশিল্প। বহু নারী এই ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করে। বিদেশী পেলে এখানকার দোকানদার, গাড়ীওয়ালা, ফেরিওয়ালা সবাই রীতিমত ঠকাবার চেষ্টা করে। সাধারণ লোক দরিদ্র

লেস জন্মদাত্রী—মাণ্টা

বোলেই বোধ হোল—ভিখারী অনেক চোখে পোড়ল।

মোটর আবার বন্দরে হাজির কোরলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ষ্টীমলঞ্চ এসে আমাদিগকে জাহাজের কোলে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এখানে জাহাজ মাত্র কয়েক ঘণ্টা দাঁড়ায়; কাজেই বেশী দেরী করা সম্ভব ছিল না। জাহাজে গিয়ে দেখি দুই ধারের নৌকো থেকে জাহাজে অবিশ্রাম বেগে বালতি নামাওঠা কোরছে। নৌকায় লেস, চাদর ইত্যাদি নানা গৃহশিল্পের সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে—জাহাজ থেকে যাত্রীদল যেটা পছন্দ করবার জন্য দেখতে চাইছে, আর তারা অমনি বালতি করে তা ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছে; কারণ তাদের নিজেদের আসবার অনুমতি নাই—দাম দেওয়াও বালতির মারফৎ চোলছে। বহু নূতন যাত্রী এখান থেকে জাহাজে উঠল। কাজেই হৈ হৈ আর হুড়োহুড়ির অন্ত ছিল না। আকণ্ঠ যাত্রী বোঝাই কোরে জাহাজ আবার ধক্ ধক্ কোরে নোড়ে উঠল; মাটীর সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে আবার অনন্তের বুকে ভাসল। স্বতঃই একটা সুর কাণে বেজে উঠল—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি—"

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(১)

মহকুমার "সদর"—সহর নহে, পল্লীগ্রামও বলা যায় না। পল্লীগ্রামে যে নির্জ্জীব নিশ্চল ভাব—বদ্ধ জলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা নাই বটে; কিন্তু সহরের যে চাঞ্চল্য ও সজীবতা বেগবতী স্রোতস্বতীর কথা মনে করায় তাহারও একান্ত অভাব। আদালতগুলির অবস্থান জন্য "নগরের" যে দিকে নদী সেই দিক ব্যতীত আর তিন দিক হইতে সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হইতে লোক আসিতে থাকে—কেহ মামলা করিতে, কেহ দেখিতে, কেহ সাক্ষী শিখাইতে, কেহ সাক্ষ্য দিতে আইসে; আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা যে যাহার গ্রামে চলিয়া যায়। "নগরটি" নিস্তব্ধ হয়। যে অংশে আদালতের বড় বড় বাড়ীগুলা আছে সেই অংশেই নিস্তব্ধতা ঘনীভূত হয়। সেই অংশেই সরকারের নক্সায় গঠিত কয়খানি গৃহে ডেপুটী, সাব-ডেপুটী, মুন্সেফরা ও ডাক্তার বাস করেন। তাঁহারা যেন উকীল মোক্তার দোকানদার—এ সকল হইতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের পরিবারস্থা মহিলাদিগের যাতায়াত আপনাদিগের মধ্যে।' আর তাঁহাদিগের কথাই আর সকলের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য।

কয় মাস ধরিয়া উকীলদিগের লাইব্রেরীতে—বৈঠক-

থানায় সর্ব্বপ্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—মহকুমা হাকিম ডেপুটী জ্ঞানাঞ্জন বাবুর পুত্র প্রফুল্লকমলের সহিত, দ্বিতীয় মুন্সেফ রমাপতি বাবুর একমাত্র সন্তান কন্যা প্রতিমার বিবাহের সম্বন্ধ। আলোচনাকারীদিগের মধ্যে দুই চারিজন বলিলেন বটে, "অমন মেয়ে জ্ঞানবাবু পাইবেন কোথায় ?"—কিন্তু অধিকাংশের মুখে শুনা গেল, "রমাপতিবাবু খুব জিতেছেন।" এই মত ব্যাপ্তির কারণ—ডেপুটী জ্ঞানাঞ্জন বাবুর পিতা কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহার এক তৃতীয়াংশ ত পাইয়াছেনই, তাহার উপর অপুত্রক ধনী শ্বশুরের অন্যতরা কন্যাকে বিবাহ করায় সেদিক হইতেও অনেক টাকার সম্পত্তি তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছে। আবার তাঁহার এই মধ্যম পুত্রটি যাহাকে "হীরার টুকরা" বলে, তাহাই। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পর তিনটি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া "আই-সি-এস" ভুক্ত করা জ্ঞানাঞ্জন বাবুর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিধবা শাশুড়ীর আপত্তিতে তাহা হয় নাই। সে জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত। কিন্তু শ্বশুরের উইলে তাঁহার বিধবার সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ স্বত্ব ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার থাকায় সে দুঃখ জ্ঞানবাবুকে মনেই রাখিতে হইয়াছে। কারণ, জ্ঞানাঞ্জন বাবুর দুইটি বৈশিষ্ট্য সকলেই সহজে লক্ষ্য করিতে পারিত—তাঁহার অর্থ-প্রিয়তা, আর তিনি যে ধনে, পদে, মানে বড় এই ধারণা। প্রথম বৈশিষ্ট্যহেতু—যাহারা বলিতেছিলেন, "অমন মেয়ে জ্ঞানবাবু পাবেন কোথায় ?"—তাঁহারা আরও বলিতেছিলেন, "তা' ছাড়া বাপের এক সন্তান, অর্থাৎ আঁটকুড়ের ঘরের মেয়ে।"

এই "নিন্দকদিগের" অনুমান সত্য কি না, কে বলিতে পারে ? তবে জ্ঞানবাবু "কিছুই চাই না" বলিয়া "এগুলি না দিলে লোক কি বল্‌বে" বলিয়া যে ফর্দ্দ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের পিছাইয়া যাইবার কথা। রমাপতি কিন্তু তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়া সেইরূপ আয়োজনই করিতেছিলেন। ব্যয় অবস্থার অতিরিক্ত হইবে বুঝিয়া স্ত্রী বলিয়াছিলেন, "এত খরচ করবে কোথা থেকে ?" রমাপতি তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন, "একটা সন্তান। না হয় সারা জীবন চাকরী করে দেনা শুধব।" ব্যবস্থাটা স্ত্রীর নিকট প্রলোভনীয় মনে হয় নাই। এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সতর্কতা পুরুষের "যস্তবিষ্য" ভাব অপেক্ষা অধিক আদরণীয়। বিশেষ ঋণ শোধ করা কি তাহা রমাপতির পত্নী জানিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনিও স্বামীকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না। তাহার কারণ—পাত্র প্রফুল্লকমল সর্ব্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়, আর বিবাহের প্রস্তাব অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রফুল্ল ও প্রতিমা পরস্পরকে দেখিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের বিষয় জানিয়াছে। জ্ঞানবাবুর ব্যবস্থা ছিল, যখনই কলেজে চার দিনের অধিক ছুটী থাকিত, তখনই পুত্রদিগকে পিতামাতার কাছে আসিতে হইত। প্রফুল্লকমল ইতিমধ্যে বহুবার পিতা-মাতার কাছে আসিয়াছে এবং সেই সময়ের মধ্যে তাহার মাতা অনেকবার প্রতিমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লকমলের বয়স ২১ বৎসর, প্রতিমার ১৬ বৎসর।

(২)

অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে, স্থির হইয়াছিল। আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীতে সপরিবারে রমাপতি হুগলীতে নিজগৃহে পিতামাতার নিকট গিয়াছিলেন। কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়া—অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি কতক কিনিয়া কতক করিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি কর্ম্মস্থলে ফিরিলেন এবং ফিরিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে জ্বরে পড়িলেন। জ্বর টাইফয়েড দাঁড়াইল এবং তৃতীয় সপ্তাহে তাহাতেই রমাপতির মৃত্যু হইল। পুত্রের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পিতা-মাতা পুত্রের কর্ম্মস্থলে আসিয়াছিলেন—তথায় শ্মশানে সন্তানকে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে লইয়া হুগলীতে ফিরিয়া যাইলেন। যাইবার সময়ও রমাপতির পিতা জ্ঞানবাবুকে বলিয়া যাইলেন, "অরক্ষণীয়া কন্যা—আমি যত শীঘ্র পারি বিবাহ দিব।"

কিন্তু তিনি এক মাসের পর যখন জ্ঞানবাবুকে সে বিষয়ে পত্র লিখিলেন, তখন প্রথমে জ্ঞানবাবু লিখিলেন, "কালাশৌচের মধ্যে ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি ?"

প্রকৃত কথা এই যে, প্রলেপ যেমন পাত্রের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখে, মানুষ তেমনই যত দিন বাঁচিয়া থাকে আপনার অবস্থার ত্রুটি ঢাকিয়া রাখে—তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব ত্রুটি বাহির হইয়া পড়ে। রমাপতির মৃত্যুর পর জ্ঞানবাবু জানিতে পারিলেন, তাঁহার পিতার অনেক টাকা ঋণ ছিল; দুই পিতৃব্য ভাল চাকরীয়া হইলেও ঋণের অংশ ও সম্পত্তির অংশ উভয়ই ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। সম্পত্তির বিক্রয় লব্ধ অর্থে ও রমাপতির উপার্জ্জনে কেবল বৃহৎ বাসগৃহ রক্ষিত হইয়াছিল, ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ হইয়াছিল। এখন সম্বল ত গৃহ—তাহাতে কোন আয় নাই; আর জীবন বীমার কয় হাজার টাকা। সেই জন্য এ বিবাহে জ্ঞানবাবুর আর উৎসাহ ছিলনা। সেই জন্য রমাপতির পিতা যখন তাঁহাকে পুনরায় পত্র লিখিলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন, বন্ধু রমাপতিবাবুর আগ্রহাতিশয্যে তিনি এ সম্বন্ধে সম্মত হইয়াছিলেন—তিনি আর নাই, কাযেই এ সম্বন্ধ মৃতের স্মৃতিহেতু জ্ঞানবাবুর পক্ষে কষ্টকর হইবে। সেই জন্য তিনি অনুরোধ করিতেছেন, অন্য কোথাও প্রতিমার সম্বন্ধ করা হউক।

পত্র পাইয়া বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইলেন। শিক্ষিত, পদস্থ, সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিরা যে এমন ব্যবহার করিতে পারেন, সে ধারণা তাঁহার ছিল না। আর এই সংবাদ পতিশোককাতরা বিধবা পুত্রবধূর পক্ষে সত্য সত্যই অসহনীয় হইল। বৃদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, একবার স্বয়ং যাইয়া জ্ঞানবাবুর মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু পুত্রবধূর কথায় তিনি নিরস্ত হইলেন। সে প্রস্তাবের বিষয় অবগত হইয়া প্রতিমার মাতা শাশুড়ীকে বলিলেন, "মা, বাবাকে বলবেন, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ বটে, কিন্তু তবুও আমরা ছোটলোকের ঘরে প্রতিমাকে দেব না। টাকা যাদের কাছে কথার চেয়ে বড় তারা ভদ্রলোক নয়।" বৃদ্ধও তাহাই মনে করিলেন। তিনি মনে করিলেন, পুত্রবধূর একমাত্র সন্তান কন্যাকে নিকটে কোথাও বিবাহ দিলে ভাল হয়। তিনি হুগলীতেই পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতিমার ছিল—রূপ, আর তাঁহার, অবস্থা হীন হইলেও, সামাজিক সম্মানের অভাব ছিল না। উভয়ের সম্মিলনে যে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাইবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। তিনি কয়টি ভাল পাত্রের সন্ধানও অল্পদিনের মধ্যে পাইলেন।

(৩)

পিতা তাহার বিবাহ সম্বন্ধ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন জানিয়া প্রফুল্লকমল মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, রমাপতি বাবুদের কি অপরাধ?"

"অপরাধ" কি তাহা, এত দিন "ঘর করিয়া," জ্ঞান বাবুর স্ত্রীর অজ্ঞাত না থাকিলেও তিনি ইচ্ছা করিয়া স্বামীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানবাবু উত্তর দিলেন, "প্রফুল্লকে বলো, আমার মত বয়স আর অভিজ্ঞতা হ'লে তখন বুঝবে, হাভাতের ঘরে বিয়ে করলে সেটা খুব সুখের হয় না। বাপ-মা যা' করেন, ছেলের ভালর জন্যই করেন।"

মা উত্তর পুত্রকে জানাইলেন।

পিতার কথা শুনিয়া প্রফুল্লকমলের মন বিদ্রোহী হইল; তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা পুষ্টিকর শিক্ষা তাহাকে বলিতে উৎসাহী করিল, "বাপমারও ভুল হয়।" কিন্তু সে মনের বিদ্রোহ দলিত ও পিতার কথার প্রতিবাদের উৎসাহ দমিত করিল। সে মাতামহীপ্রদত্ত শিক্ষার ফলে। যে বয়সে শিশুর মন শিক্ষায় গঠিত হয়, সেই বয়সে প্রফুল্লকমল এই বুদ্ধিমতী, নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলার কাছে যে সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে বিনয়, শ্রদ্ধা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল;—যে দেশে ব্যক্তিই সমাজের কেন্দ্র—পরিবার নহে, সে দেশের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আবহাওয়াও সে ভাবে উন্মূলিত করিতে পারে নাই। সেই শিক্ষা তাহার বিদ্রোহী মনকে সংযত করিল। কিন্তু সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না যে, পিতা অবিচার করিলেন না। সেই চিন্তা তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, দারিদ্র্য কি কখন অপরাধ বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? আর সে কি এমনই নির্গুণ যে আপনি অর্থার্জ্জন করিতে পারিবে না—স্ত্রীর টাকার জন্য লোভ করিবে? এইরূপ চিন্তা আগ্নেয়গিরির মত অন্তরস্থিত বহ্নির মত তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

বিজয় মাঙ্গলিক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চিন্তামনি কর
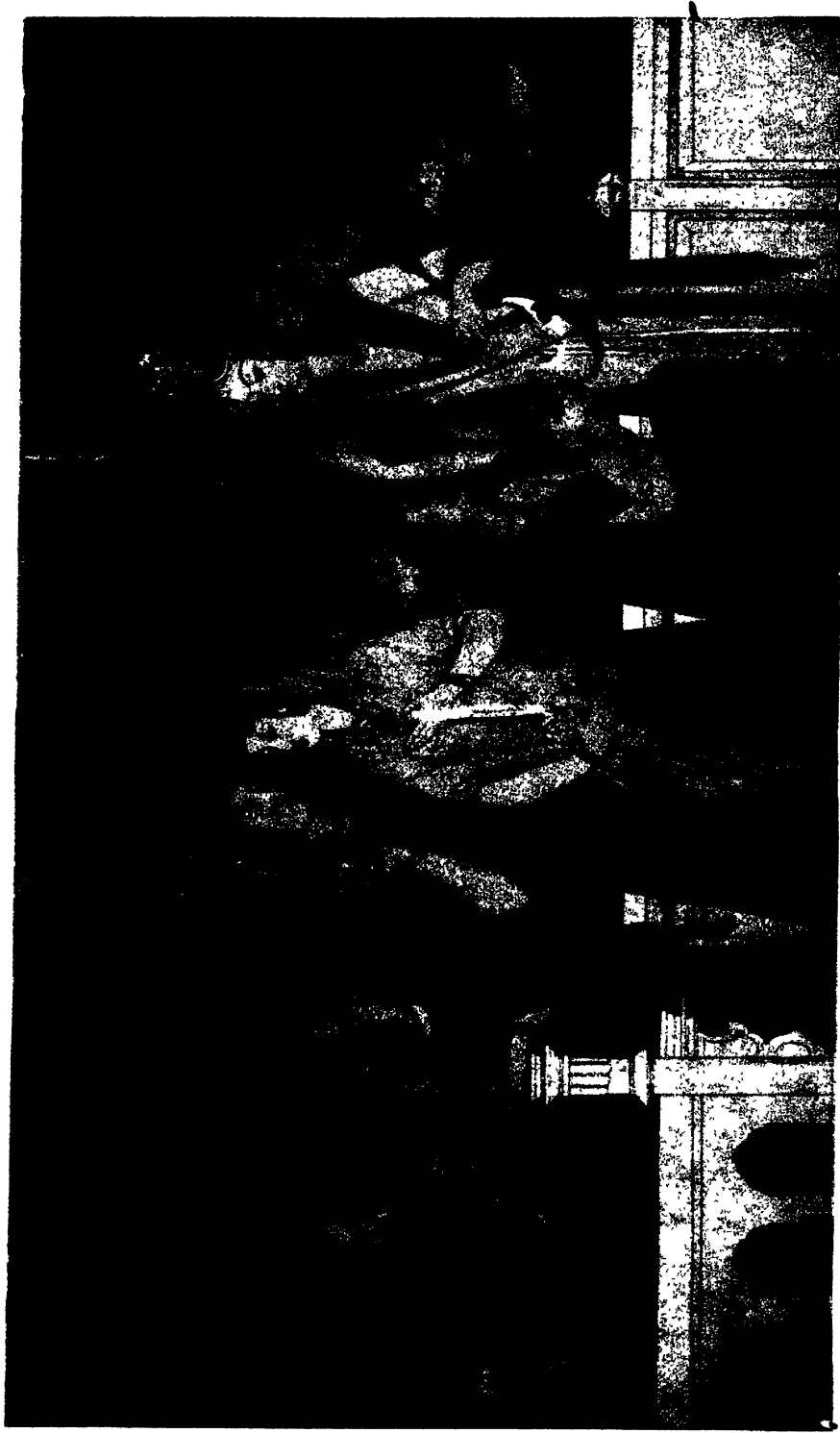
চতুর জ্ঞানাঞ্জন রমাপতির মৃত্যুর পরই পুত্রের জন্ত পাত্রীর সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রফুল্লকমলের মত বাঞ্ছনীয় পাত্র দুর্লভ। কাযেই অনেক স্থান হইতে প্রস্তাব আসিতে লাগিল। জ্ঞানাঞ্জন সম্বন্ধগুলি বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, প্রতিমার সহিত পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় যাঁহারা সব জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি কেবল চেষ্টা করিয়া বদলী হইলেন। নূতন স্থানে কেহই পুরাতন কথা জানিতে পারিল না।

তাহার পর মাঘ মাসে তিনি অনেক টাকাসহ পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন। পুত্রবধূ সুরমা প্রতিমার মত রূপবতী নহে বটে; কিন্তু সে সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিল, তাহার রূপ যেমন অসামান্ত, মর্য্যাদা তেমনই অধিক। অন্ততঃ জ্ঞানবাবু তাহাই মনে করিয়াছিলেন। সুরমা বড় জমীদারের পাঁচ পুত্রের এক ভগিনী; পিতা তাহার বিবাহের জন্য যে ১০ হাজার টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তেজারতীতে বাড়িয়া বিবাহকালে দ্বিগুণেরও উপর হইয়াছিল। সেই টাকার গর্ব্ব লইয়া সুরমা শ্বশুরবাড়ী আসিল—বুঝিল, তাহার আদর টাকায়।

বিবাহের অল্প দিন পরেই প্রফুল্লকমলের মাতামহী দৌহিত্র-পত্নীকে ও দৌহিত্রকে নিকটে লইয়া যাইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, অর্থলোভে জ্ঞানাঞ্জন ভুল করিয়াছেন—অথচ এ ভুল সংশোধন করিবার নহে। গর্ব্বই সুরমার একমাত্র ত্রুটি বলিয়া বৃদ্ধার নিকট প্রতিভাত হইল না। তিনি লক্ষ্য করিলেন, সুরমা কেবল যে পিতামাতার অতিরিক্ত আদরের দুষ্ট প্রভাবে প্রভাবিতা হইয়াছে, তাহাই নহে; তাহার শিক্ষা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে সে যে কখন প্রাচীন হিন্দু আচার ব্যবহারে শ্রদ্ধাশীল হইয়া তাঁহার বিপুল দেবসেবা ভক্তি সহকারে করিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল; তাঁহার অপরা কন্যার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতামাতাকে না বলিয়াই বিলাত গেল। তাহার পিতা পুত্রের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু "যখন সে গিয়াছে, তখন আর উপায় কি?" মনে করিয়া তথায় তাহার অধ্যয়নের ব্যয় নির্ব্বাহে সম্মত হইলেন।

(৪)

বৃদ্ধার মনে নূতন শঙ্কার উদয় হইল। তিনি চিন্তিতা হইলেন।

তাঁহাকে চিন্তিতা দেখিয়া প্রফুল্লকমল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমা, তোমাকে আজকাল যেন দেখি, কি ভাবছ।"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "এখনকার ভাবনা—ঠাকুরের চরণ।"

"সে ভাবনা ত অনেক দিনই ভেবে আসছ; তা'তে ত কখন তোমাকে বিষণ্ণ দেখা যায় নি!"

"তুই সত্যি বলেছিস। তোরা একজন বিলাতে গেলি; বৌদিদির যে ভাব দেখ্‌ছি, তা'তে যে দরকার হ'লে একদিন ও ঠাকুরদের সেবা দেখবে, তা' মনে হয় না—মাথা নোয়াতে অভ্যাস করে নি। তাই ভাবি, এতবড় দেবসেবার ব্যাপার—এর কি হবে?"

পিতার ব্যবহারে স্বয়ং যে টাকা উপার্জ্জন করা না হয় তাহার প্রতি প্রফুল্লকমলের ঘৃণা আসিয়াছিল। সে বলিল, "দিদিমা, তুমি ঠিকই বলেছ। এ সম্পত্তি তাঁর দুই মেয়েকেই দেবেন—এই যদি দাদামশাইয়ের অভিপ্রায় হ'ত, তবে তিনি উইল করে—সব সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে—ইচ্ছা করলে তুমি দত্তকও নিতে পারবে, এমন ব্যবস্থা করে যেতেন না। তাঁ'র উইল থেকে বুঝা যায়, তুমি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে, এই তাঁর অভিপ্রায় ছিল; আর তিনি তোমার বুদ্ধিতে বিশ্বাস করতেন—জানতেন, তুমি যা করবে, তা ভালর জন্যই। তুমি তাঁ'র সে বিশ্বাস আর সে অভিপ্রায় উপেক্ষা করো না।"

"কি করলে ভাল হয়, বল ত।"

"এই যে সব ঠাকুর এর কতক তাঁ'র পূর্ব্বপুরুষের, কতক তাঁ'র স্থাপিত। দেবসেবার ত্রুটি হ'বে, এ তিনি কখন কল্পনা করেন নি। যা'তে তাঁ'র অভিপ্রেত দেবসেবা অক্ষুণ্ণ থাকে তুমি তা'ই কর।"

প্রফুল্লকমলের কথায় বৃদ্ধা বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন। তিনি কয়দিন এ বিষয় বিচার করিলেন। তাহার পর উকীল ডাকিয়া উইলের খসড়া করা হইল—সমস্ত সম্পত্তি দেবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; বৃদ্ধার

কন্যাদ্বয় প্রথম সেবাইত হইবেন; তাঁহাদিগের অন্তে কোন দৌহিত্র হিন্দু আচার পালন করিয়া তাঁহার গৃহে সপরিবারে বাস করিয়া দেবসেবা পরিচালিত করিলে তিনি বা তাঁহারা সেবাইত হইবেন; অন্যথায় এবং তাঁহার বা তাঁহাদিগের পর সম্পত্তি কমিটীর দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং উদ্বৃত্ত আয়ে একটি টোল ও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে।

তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহেন জানাইয়া উইলের খসড়ার নকল উভয় জামাতার নিকট পাঠাইলেন। খসড়া ও পত্র পাইয়া উভয়েই বৃদ্ধার নিকট আসিলেন এবং বৃদ্ধাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টার মূলে যে অর্থলোভ ছিল, তাহা বৃদ্ধা বুঝিলেন এবং তাহা বুঝিয়াই তাঁহার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল। সেই উইল যথারীতি রেজেষ্টারী করা হইল।

জামাতৃদ্বয় যে যাহার কর্ম্মস্থলে ফিরিলেন। একজন দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। জ্ঞানাঞ্জন কিন্তু তাহা করিলেন না; কি উপায়ে আপনার ধনবৃদ্ধি করিতে পারেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট যে জার্ম্মাণ যুদ্ধের আরম্ভকালে "সেয়ার বাজারে" বেচা-কেনায় লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিলেন, সে কথা অনেকেই জানিতেন;—অনেক ডেপুটীও মনে করিতেছিলেন, তিনিও ঐরূপে অর্থার্জ্জন করিতে পারেন। জ্ঞানাঞ্জন তাহাই করিলেন। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে তিনি পিতৃধন ও আপনার উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানাঞ্জন অর্থপ্রিয় ছিলেন এবং টাকার শোক তাঁহাকে পীড়িত করিল—তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। চাকরীতে তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি চেষ্টা করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পুলিস বিভাগে ও প্রফুল্লকমলকে সাব ডেপুটীর চাকরী করিয়া দিলেন। সেই চাকরীর গোষ্পদে প্রফুল্লকমলের ভবিষ্যৎ উন্নতির বহু আশার বিসর্জ্জন হইয়া গেল।

সুরমার পিত্রালয়ে তাহার শ্বশুরের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা আলোচিত হইত। সে আলোচনা সুরমাকে পীড়িত করিত। একদিন সে শুনিল, মা বলিলেন, "সবই অদৃষ্ট! নইলে কি দেখে মেয়ে দিলে—আর কি হ'ল!" পিতা বলিলেন, "অদৃষ্ট আমাদের আর মেয়ের। বেহাই ত আর অদৃষ্টের দোষ দিতে পারেন না। বুড়ীকে তুষ্ট রাখলে কি অত বড় সম্পত্তি বেহাত হয়? তা'র পর, বাপের পয়সা পেয়েছ, নিজেও রোজগার করছ; একেবারে রাতারাতি বড়লোক হ'বার চেষ্টায় ফাটকা খেলা! তাইত বলে

'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে,
যন্ত্রণা হ'ল এঁড়ে গরু কিনে!'

একি অদৃষ্টের দোষ; না—বিপদ ডেকে আনা?"

মা বলিলেন, "এও অদৃষ্টে করায়।"

শ্বশুরের উপর অসন্তোষ সুরমার মনে ঘনীভূত হইতে লাগিল।

প্রফুল্লকমল যখন চাকরী পাইল, তখন সুরমা পিত্রালয়ে ছিল। চাকরীর স্থানে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে বলিয়া প্রফুল্লকমল তাহাকে লইতে আসিল। তদুপলক্ষে পিতামাতার কথোপকথনও সুরমা শুনিল—

পিতা বলিলেন, "চাকরী ত ঐ সামান্য। বেতন যা' তা'তে নিজে খেতে কুলায় না। সাত তাড়াতাড়ি পরিবার নিয়ে যাওয়া কেন? কোলে কচি ছেলে—তার একটা লোকও চাই। না হয় থাকত এখন ছ'মাস এখানে।"

"তুমি তা' বল্‌লে না কেন?"

"একটু বল্‌তেই বল্‌লে, 'বাবা বলেছেন।'—যেন তার উপর আর কথা নেই!"

"তুমি আর একবার বল; না হয় বেহাইকে লিখে দাও।"

"বল্‌তে ইচ্ছাও হয় না, সাহসও হয় না। দেখতে পাও না, মন খুলে কোন কথা কয় না?"

"কিন্তু আমি বুড়ী ঝীকে সঙ্গে দেব।"

"সে তুমি বলে দেখতে চাও ব'লো।"

তাহার পর পিতা বলিলেন, "মেয়েটার হাতে একশ টাকা দিয়ে দিও; আর বলে দিও, দরকার হ'লেই লিখে পাঠায়।"

(৫)

স্বামীর সঙ্গে তাহার কর্ম্মস্থলে যাইবার পথে সুরমা যখন শ্বশুরবাড়ীতে আসিল, তখন ভগিনীর দুই পুত্র চাকরী লইয়া যে যাহার পরিবারসহ কর্ম্মস্থলে যাইবে বলিয়া তাহার শ্বাশুড়ীর ভগিনী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

তিনি যেদিন ফিরিয়া যাইবেন, সেই দিন সুরমা শুনিতে পাইল, তিনি ভগিনীকে বলিতেছেন, "কপাল মন্দ—নইলে জামাইবাবুর অমন মন হ'বে কেন? মেয়েটাকে আমি দেখি নি; কিন্তু তুমি যা' বলেছিলে তা'তে মনে হয়, এ সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হয়েছে। টাকা! এই ত এত টাকা কোন্ দিক দিয়ে গেল, বুঝাই গেল না! বিধবার চোখের জল—তা'তে কি ভাল হ'ল? বৌ এসে দুধে আলতায় দাঁড়াবার পর তাকে নিয়ে গিয়েই মা'র মত বদলে গেল। তার পর এই টাকা নষ্ট। কত আশা ছিল, প্রফুল্ল মুখ উজ্জল করবে; তা' নয়, ঐ চাকরী নিয়ে খেতে হচ্ছে।"

সুরমার শ্বাশুড়ী বলিলেন, "যা' হ'বার হয়ে গেছে; সে কথা নিয়ে আর আলোচনা কেন?"

"মা যদি বেঁচে থাকতেন, তা' হলে আমি যেমন করে হ'ক তাঁ'র উইল বদল করাতে পারতাম। কিন্তু—" তিনি মাতার মৃত্যু স্মরণ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সুরমার মনে হইল অনলশিখা তাহার পদের নখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতেছে। যাহার যত দোষ—সবই তাহার? কি অবিচার—কি অত্যাচার!

এই দারুণ অসন্তোষ মনে সঞ্চিত করিয়া সে স্বামীর সঙ্গে গেল। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে পুরাতন দাসীর কাছে "বিধবার চোখের জলের" বিবরণ জানিয়া গেল।

নদীর জলধারা যেমন যে স্থানেই কেন উৎপন্ন হউক না, সাগরে যাইয়া পড়ে, স্ত্রীলোকের মনে অভিমান, রাগ তেমনই যে কারণে যে স্থানেই কেন উৎপন্ন হউক না, আসিয়া স্বামীর উপর পড়ে। সুরমারও তাহাই হইল। বয়সের ধর্ম্ম ভালবাসা যদি কখন তাহাকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করিত, তবে তিনটি কারণে তাহার বিমুখ চিত্ত সে আকর্ষণ নষ্ট করিত। প্রথম, তাহার জননীর পত্র। তিনি প্রতি পত্রেই তাহার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, আপনার অদৃষ্টকে দোষী করিতেন এবং লিখিতেন, তাহার নিশ্চয়ই অর্থাভাব হইতেছে—সে কেন তাহা লিখিতেছে না? দ্বিতীয় স্বামীর তাহার রুক্ষ ব্যবহারের প্রতিবাদে বিরতি। সে অন্যায় ব্যবহার করিলেও প্রফুল্লকমল কখন তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করিত না। তৃতীয়, স্বামীর ব্যবহারে কোনরূপ ক্রটির অভাব। সে যত চেষ্টাই কেন করুক না, তাহার প্রতি স্বামীর ব্যবহারে সে কোনরূপ ক্রটি লক্ষ্য করিতে পারিত না। প্রফুল্লকমল যে প্রথমতঃ পিতার ব্যবহারে, দ্বিতীয়তঃ পিতার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এবং তৃতীয়তঃ অবস্থাবিপর্য্যয়হেতু আপনার সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে হওয়ায় সর্ব্বদা মনে কি বেদনানুভব করিত, তাহা সুরমা জানিত না। সে এখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সে অবস্থা ঘটিবে জানিলে যে সুরমার পিতা কখনই তাহাকে কন্যাদান করিতেন না, তাহাও সে জানিত। সেই জন্য সে মনে করিত, তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবার কারণ সুরমার আছে। সময় সময় তাহার মনে হইত বটে, সুরমাই তাহাকে বেদনায় ভেষজ ও কার্য্যে উৎসাহ দিতে পারিত; কিন্তু সুরমার নিকট হইতে সেরূপ ব্যবহার সে আপনার প্রাপ্য বলিয়া মনে করিত না।

আর সুরমার মনে হইত, পরিশোধিত সলিলে যেমন রোগ-বীজ থাকেনা বটে, কিন্তু তাহাতে স্বাদ থাকেনা, কখনই স্বামীর ব্যবহারে কোন ক্রটি না থাকিলেও তাহাতে এমন কোন উপাদানের অভাব ছিল যে, তাহাই সে ব্যবহারের জন্য তাহার আগ্রহ নষ্ট করিয়া দিত। স্বামী ও স্ত্রী কাহারও মনে সুখ হইল না। স্বামীর মনে হইত, সে বিনাপরাধে শাস্তিভোগ করিতেছে; স্ত্রীর মনে হইত, সে তাহার প্রাপ্যে বঞ্চিত।

কার্য্যদক্ষতাহেতু তৃতীয় বৎসরেই প্রফুল্লকমল উচ্চতর পদ পাইল বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই জ্ঞানবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল—তাঁহাকে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তখন তাঁহার সম্বল কেবল পেন্সনের টাকা। কিন্তু তিনি যেভাবে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে অভ্যস্ত, তাহা ব্যয়সাধ্য। "শাল জোড়া ছিঁড়ে গেলে চাদরে আদর"—তাই তিনি তখন স্ত্রীর অধিকারে শ্বশুরের শূন্য গৃহে যাইয়া

মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন ; আর তাঁহার পত্নী সেই আসন্ন সর্ব্বনাশের সম্মুখে পীড়িত স্বামীর সেবা করিতেছেন।

তাহার পর জ্ঞানাঞ্জনের জীবন-দীপ নিবিল। প্রফুল্ল-কমল কর্ত্তব্যবোধে বিধবা জননীকে ও শিক্ষার্থী ভ্রাতাকে নিকটে আনিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। মা সম্মত হইলেন না। তিনি বধূর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিলেন—পুত্রের সংসারে অশান্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন না। পুত্র তাহা বুঝিল—বুঝিয়া ব্যথিত হইল। কিন্তু জীবনব্যাপী দুঃখ সে তাহার নিয়তি বলিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছিল—তাহা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। কিন্তু তাহাতে কি মানুষ সান্ত্বনালাভ করিতে পারে? জীবনব্যাপী দুঃখের অনিবার্য্যতানুভূতির উৎস হইতে কি কখন শান্তির স্নিগ্ধধারা উদ্গত হয়?

সে কোথাও—স্ত্রীর নিকটেও—মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারিলনা বটে, কিন্তু সে দুঃখ অকাল-জরায় তাহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিল।

এমনইভাবে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল—ত্রয়োবিংশ বর্ষে পিতার শ্রাদ্ধে পিত্রালয়ে যাইয়া সুরমা ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তা হইল ; সে আক্রমণ হইতে সে অব্যাবতি লাভ করিল না।

বিপত্নীক প্রফুল্লকমল ছুটী লইয়া একবিংশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র কনককমল ও সপ্তদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা প্রিয়ংবদাকে লইয়া মা'র কাছে মাতুলালয়ে আসিল।

(৬)

ছুটী যখন ফুরাইল, তখন দেখা গেল, প্রফুল্লকমল হুগলীতে বদলী হইয়াছে। সে মা'কে সে সংবাদ জানাইয়া বলিল, "প্রিয় বড় হয়েছে ; তুমি আমার সঙ্গে চল।"

মা বলিলেন, "বাবা, তুমি বল্‌লে আমাকে যেতেই হয় ; কিন্তু এই বিশ বৎসর দেবতার চরণ সেবা করে, শেষ ক'দিন তাঁহার চরণাশ্রয় ছাড়িতে মন সয়ছে না।"

প্রফুল্লকমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন উকীল হইয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী জিলার সদরে ওকালতী করে। সে-ই সপরিবারে মা'র কাছে থাকে। সে প্রস্তাব করিল, "প্রিয় আমাদের কাছে থাকুক।"

মা বলিলেন, "সে কি হয়? কখন একা থাকে নি—এ সময় ছেলেমেয়ে ছেড়ে থাকবে কেমন করে?"

প্রফুল্লকমলের এক পিসীমা সংসারে শেষাবলম্বন দেবরপুত্রের মৃত্যুতে সঞ্চিত দুই হাজার টাকা লইয়া কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, নবদ্বীপ—ইহার মধ্যে কোথায় যাইয়া বাস করিবেন, সেই বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্ম প্রফুল্লকমলের মাতার নিকট আসিয়াছিলেন। ভ্রাতৃজায়ার অনুরোধে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলেন। পুত্র কনককমলেরও তখন কলেজে ছুটী। সেও পিতার সঙ্গে হুগলীতে গেল।

হুগলীতে যে বাড়ীতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ভাড়াটিয়া ছিলেন, প্রফুল্লকমলের জন্য সেই বাড়ীই ভাড়া করা হইয়াছিল। বৃহৎ বাড়ী—প্রাসাদ বলিলেও বলা যায় ; দুই ভাগে বিভক্ত ; বাহিরের অংশ ভাড়া দিয়া বিধবা গৃহস্বামিনী দুই পুত্র ও এক কন্যা লইয়া ভিতরের অংশে বাস করেন। বাড়ীটি তিনি পিতামহের উত্তরাধিকারী হিসাবে পাইয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরালয়ও হুগলীতে। জ্যেষ্ঠপুত্র শিশির ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি শ্বশুরালয় হইতে এই গৃহে আসিয়া বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় সন্তান ললিতার এখনও বিবাহ হয় নাই—বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করা হইতেছে, কনিষ্ঠ মিহির কলেজে পড়ে। স্বামী ডাক্তার ছিলেন এবং যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পরিবারের মোটাভাত মোটা কাপড়ের অভাব হইবে না।

আগন্তুকদিগকে লইয়া যান দুইখানি গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেই শিশির—তাঁহাদিগের কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে—তথায় আসিল। তখন প্রথম গাড়ীখানি হইতে প্রফুল্লকমল ও কনককমল নামিয়াছেন ; দ্বিতীয়খানি হইতে প্রিয়ংবদা নামিয়া পিসীমা'কে নামাইতেছে। শিশির অগ্রসর হইয়া প্রিয়ংবদাকে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় কনক বলিল, "আপনি?"

তাহাকে দেখিয়া শিশির বলিল, "এই বাড়ী আমাদের। আপনাদের যদি কিছু দরকার হয়, তাই জান্‌তে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"বোধ হয়, ঠাকুর আর চাকর সব ঠিক করে

রেখেছে। যদি দরকার হয়, জানাব। আপনারা কি কাছেই থাকেন ?”

“এই বাড়ীরই পিছনের অংশে।”

“পড়ল!—পড়ল!”—ভৃত্য মাল নামাইবার সময় একটি স্যুটকেশ পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া প্রফুল্লকমল ঐরূপ বলিয়া উঠিল। শিশির ক্ষিপ্রহস্তে সেটি ধরিয়া ফেলিয়া নামাইয়া দিল। তাহার পর সে প্রফুল্লকমলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, “ছেলেটি কে ?

কনক বলিল, “ওদেরই বাড়ী।”

“আহা কি ছেলে! যেমন গড়ন, তেমনই রং—যেন গৌরাঙ্গ!”

প্রিয়ংবদা বলিল,“উনি না ধরলে স্যুটকেসটা পড়ে গেছল আর কি। আর ঐটেতেই যত ভাঙবার মত জিনিষ।”

প্রফুল্লকমল পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই ছেলেটিকে জান্‌লি কেমন করে ?”

কনককমল বলিল, “ল কলেজের মেসে। ওঁকে সবাই ভালবাসত। চমৎকার লোক।”

বাড়ী দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। সেকালের বাড়ী—বড় বড় উঁচু উঁচু ঘর—চওড়া বারান্দা—ব্যবস্থা ভাল।

জিনিষগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হইলে কনক বলিল, “যাই, শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি—সহর দেখবার ব্যবস্থা কর্‌তে হ’বে। এখানে দেখবার জিনিষ অনেক আছে।”

প্রিয়ংবদা বলিল, “বেশ! আমরা দেখব না ?”

“আগে আমি পথ চিনে আসি, তা’র পর তো’কে নিয়ে যা’ব। দিদিও যা’বেন না কি ?”

পিসীমা বলিলেন, “ঠাকুরদেবতা কিছু আছেন ?”

“সে খোঁজ নিয়ে আসব।”

প্রিয়ংবদা দাদাকে বলিল, “আমি যাই, ছাতে উঠে যতটা দেখা যায়, দেখে আসি। আমাদের অধিকার ত ঐ পর্য্যন্ত!”

“সে কথা বলতে পার না। এই নারীপ্রগতির যুগে তোমরা কোন্‌ অধিকারটা না চাইছ আর কোন্‌টাই বা না দখল করছ। সে বরং দিদিদের সময় ছিল।”

পিসীমা কিন্তু কথাটা মানিয়া লইলেন না। তিনি বলিলেন, “বলিস কি ? আমাদের সময় তীর্থে, গঙ্গা-স্নানে, দুইবেলা ঘাটে যাওয়া, আত্মীয়কুটুম্ব প্রতিবেশীর বাড়ীতে বিপদে সম্পদে গিয়ে কাজ করা, এসব যেমন ছিল, এখন তা নেই। তখন পথে আমাদের দেখলে পুরুষরা সম্ভ্রম দেখিয়ে সরে মাথা নিচু করে দাঁড়াত। তখনই ছিল মেয়েদের মনে মর্য্যাদার জ্ঞান। আর এখন যে মেয়েরা ফেক্তা দিয়ে বার হাত কাপড় পরে, চটি জুতো পরে ফটর ফটর করে ঘুরে বেড়ায়—ছেলেরা ত তাদের এতটুকু সম্ভ্রম করতেও জানে না। কি শিক্ষা!”

“দিদির সঙ্গে তর্কে পারা যাবে না”—কনককমল চলিয়া গেল।

প্রিয়ংবদাও ছাতে উঠিল। বাড়ীর মত ছাতও দুই ভাগে বিভক্ত। অপর দিকে ছাতে যে সদ্য কিশোরী কয়খানি কাপড় শুকাইতে দিতেছিল, তাহার দিকে প্রিয়ংবদার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সে যে শিশিরকুমারের ভগিনী তাহা তাহার গঠন ও অসাধারণ গৌরবর্ণ দেখিয়াই প্রিয়ংবদা বুঝিতে পারিল। ছাতের দুই অংশের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান-প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে-ই ললিতাকে ডাকিল। ললিতা নিকটে আসিলে সে পরিচয় করিয়া বলিল “আমরা আজ এসেছি; এখানে আমরা একা। আমি তোমাদের বাড়ী যা’ব, তোমাকেও আমাদের এদিকে আসতে হ’বে।”

ললিতা বলিল, “মা’কে বলব।”

সমবয়সীদিগের মধ্যে সহজেই সখ্য সংস্থাপিত হয়। তাই একদিকে যেমন কনক ও শিশির পরস্পরের গৃহাংশে যাতায়াত করিতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই প্রতিদিনই ছাতে প্রিয়ংবদার ও ললিতার কথা হইতে লাগিল।

কয়দিন প্রিয়ংবদার মুখে ললিতার অশেষ প্রশংসা শুনিয়া পিসীমা বলিলেন, “যাই একদিন, গিন্নীর সঙ্গে আলাপ করে আসি।” অধিক কথা বলা পিসীমা’র স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—বার্দ্ধক্যে সে বৈশিষ্ট্য আরও বাড়িয়াছিল। নাতিনীর সঙ্গে কথা কহিয়া অর্থাৎ কথা কহিতে না পাইয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাই পার্শ্বের বাড়ীর গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কনককমল সে কথা শিশিরকে জানাইলে সে মা'কে সে কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "বেশ ত। যখন আস্‌তে চা'ন একটা দোর খুলে দিও। তুমি যখন বাড়ীতে থাক, তখন এলেই ভাল হয়। আসতে চেয়েছেন, 'না' বলা যায় না।"

বিধবা হইয়া তিনি আর সামাজিক ব্যাপারে আগ্রহ দেখাইতেন না—কেবল পুত্রকন্যাগুলিকে "মানুষ" করিতে ও পূজার্চ্চনায় মন দিয়াছিলেন। পুত্রদিগের বন্ধুদিগের প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখিতেন।

পরদিন শিশির "সকাল সকাল" গৃহে ফিরিল এবং বাড়ীর দুই অংশের মধ্যে যে সকল দ্বার ছিল এবং রুদ্ধ থাকিত দ্বিতলে তাহারই একটি খুলিয়া দিয়া কনককমলকে সংবাদ দিল।

প্রায় এক ঘণ্টাটাক শিশিরের মাতার সহিত আবশ্যক অনাবশ্যক নানা কথা বলিয়া পিসীমা প্রিয়ংবদাকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ফিরিয়া আসিয়াই তিনি প্রফুল্লকমলকে বলিলেন, "পেফু, আজ ও-বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আহা যেন সুন্দরের ঝাড়—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন ছেলেমেয়েরা তেমনই কি মা! কপাল পুড়েছে, কিন্তু এখনও কি রূপ! যেন জগদ্ধাত্রী পিতিমে!"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "বৌ ত বলছিল, ছেলে বড় হয়েছে—ডাগর মেয়ে দেখে বিয়ে দাও—এসে সংসারের ভার নেবে। তা ও-বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে কনকের বিয়ে দাও। অমন মেয়ে—আহা, যেমন রূপ, তেমনই গুণ—কি শান্ত! যেন উমা।"

প্রফুল্লকমল কোন কথা বলিলেন না।

পিসীমা বলিয়া চলিলেন, "ওরাও কায়স্থ—আমি পরিচয় নিয়েছি। কোন বাধা হ বে না।"

পরিচয় প্রফুল্লকমলও লইয়াছিলেন এবং লইয়া তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। অদৃষ্টের এ কি উপহাস! যৌবন-প্রভাতের ব্যর্থ স্বপ্ন আজ জীবনের সায়াহ্নে আবার কেন মনে পড়িল? জানিলে তিনি কখন এই গৃহে আসিতেন না। যে ব্যথা পায় কালের ব্যবধানে সে কি ব্যথার কারণকে ক্ষমা করিতে পারে? স্মৃতি যে জীবনের সাথী—তাহার মৃত্যু নাই।

(৭)

পিসীমা চলিয়া যাইবার পর ললিতা লক্ষ্য করিল মা'র মুখ অন্ধকার—যেন আষাঢ়ের আকাশ মেঘে ভরিয়া গিয়াছে—কেবল বর্ষণের অপেক্ষা। সে কোন কারণ অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু মা'র মুখে এমন ভাব সে বড় দেখেও নাই।

সেইদিন রাত্রিকালে পুত্রদ্বয় ও কন্যা যখন আহার করিতে বসিল, তখন মা বলিলেন, "শিশির, বাইরের বাড়ীটায় আর ভাড়াটে রেখে কায নাই।"

শিশির বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মা?"

"তোর কাছে লোক আসবে, বৈঠকখানা থাকাই ভাল।"

"এদিকে কি ঘরের অভাব আছে? এত বড় বাড়ী পরিষ্কার রাখ্‌তে হ'লে দুটো চাকর লাগবে, মা? তা' ছাড়া, এখন ব্যবসার যা' অবস্থা! আদালত যাওয়া আসাই সার। এখন মাসে টাকা কটা ছাড়া' কি ভাল হ'বে?"

"কি জানিস্, ভাড়া দিলে ভাড়াটেরা কেমন লোক হ'বে, তা'ত বলা যায় না।"

"কিন্তু যাঁ'রা এসেছেন, তাঁ'রা ত ভাল লোক বলেই মনে হয়। আজ ত প্রফুল্লবাবুর পিসীমা এসেছিলেন। কেমন লোক?"

"ভালই।"

ললিতা বলিল, "বড্ড বেশী সাদাসিদে। হল হল করে ঘরের কত কথাই বল্‌লেন।"

কথাটা আর অগ্রসর হইল না।

পরদিন আহার শেষ করিয়াই পিসীমা প্রিয়ংবদাকে বলিলেন, "প্রিয়, চল ও-বাড়ী বেড়িয়ে আসি। দেখে আয় না, ছাতে যদি মেয়েটিকে পাস।"

প্রিয়ংবদা বলিল, "এখন ত সে ছাতে ওঠে না। আজ সকালেও বেশীক্ষণ ছিল না; বল্‌লে 'মা, শীঘ্র যেতে বলেছেন,' বোধ হয়, কোন কায আছে।"

পিসীমা ঝীকে ডাকিয়া ও-বাড়ীতে সংবাদ দিতে বলিলেন। ঝী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ও-বাড়ীর গিন্নী-মা'র শরীর ভাল নেই।"

এই উত্তর যে পিসীমাকে এড়াইবার উপায় হইতে পারে, পিসীমার তাহা ধারণাতেই আসিল না। তিনি ঘোরপেঁচ বুঝিতেন না। বরং গৃহিণীর অসুখের সংবাদে তাঁহার যাইবার উৎসাহ বাড়িল। তিনি বলিলেন, "এই ত গলির মধ্যে পাশের দোর। যাই, আমি দেখে আসি। আহা, অসুখ করেছে!"

শিশিরের মাতার কথায় শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি না থাকিলেও আগ্রহের যে অভাব ছিল, তাহা "আপন কথা সাত কাহন" করা পিসীমা লক্ষ্যও করিলেন না।

সেই দিন হইতে গৃহের দুই অংশের মধ্যবর্ত্তী অর্গলবদ্ধ দ্বার আর মুক্ত হইল না বটে, কিন্তু তাহাতে পিসীমা'র সেই গৃহে গমনে কোন বাধা হইল না। প্রিয়ংবদার সহিত ললিতার পরিচয়ও ঘনীভূত হইতে লাগিল।

কনককমলের কলেজের ছুটী ফুরাইয়া আসিল। সে চলিয়া যাইবে—প্রতি শনিবারে ও ছুটীতে আসিবে। সে যাইবার পূর্ব্বে পিসীমা প্রফুল্লকমলকে বলিলেন, "ছেলে যাবার আগেই কেন সম্বন্ধটা পাকা করে ফেল না? কালাশৌচ, তা' এখন ছেলে মেয়ে বড় হয় বলে ও আর কেউ মানে না। না হয় আর পাঁচ মাস পরেই বিয়ে হ'বে। ওরা ত আর কথা না হ'লে মেয়ে নিয়ে বসে থাক্‌বে না! অমন মেয়ে—ওর কি আবার সম্বন্ধের ভাবনা?"

কথাটা প্রফুল্লকমল যে ভাবেন নাই, তাহা নহে—তিনি আরও অনেক কথা ভাবিয়াছেন। কিন্তু যে কারণ তাঁহাকে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সাহস দিতেছিল না, তাহা ত আর কেহ জানে না!

শেষে পিসীমা'র নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি সাহস পাইলেন; বলিলেন, "তুমি ওঁদের মন বুঝে দেখ, ওঁরা কি এ কায করবেন?"

পিসীমা বলিলেন, "কেন করবেন না? বলে—সে যে একটা ছেলে।"

কতক্ষণে আহারের পাট শেষ হইবে, পিসীমা তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর শিশিরদিগের গৃহে গমন করিলেন।

প্রতিমা পিসীমা'র প্রস্তাব শুনিলেন। কনককমলের মত পাত্রে কন্যাসম্প্রদান করিতে পারিলে তাহা যে ভাগ্যের কথা তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু—। তিনি প্রস্তাব শুনিয়া কিছুক্ষণ পাষাণ-প্রতিমার মত রহিলেন; যেন তাঁহার শ্বাসও বহিতেছিল না। তাহার পর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আপনাকে সংযত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় চঞ্চলভাবে বলিলেন, "আপনি, মাফ করবেন। এ হ'তে পারে না।"

পিসীমা অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মা?"

প্রতিমার শুষ্ক চক্ষু যেন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আপনার ভাইপো জানেন—গরিবের ঘরের মেয়েকে বৌ করা আপনাদের কুলাচারবিরুদ্ধ! আমি গরিব—গরিবের মেয়ে, গরিবের বিধবা।"

পিসীমা কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না; কেবল "সে কি কথা, মা?" বলিয়া বিদায় লইলেন।

ততক্ষণে—মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য অকাল জলদে আচ্ছন্ন হইলে যেমন দেখায়, অশ্রুতে আচ্ছন্ন প্রতিমার চক্ষু তেমনই দেখাইতেছিল। তাহার পর দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বৃদ্ধ পিতামহ, বৃদ্ধা পিতামহী, বিধবা মাতা—সকলের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সকলের বুকের ব্যথা নিবিড় হইয়া আজ তাঁহার বুকে বাজিয়া উঠিল।

ললিতা আসিয়া মা'র অবস্থা দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া কোন দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া প্রতিমা প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিলেন।

সে রাত্রিতে তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কেন তিনি সংযম হারাইলেন? বিধাতার বজ্র যাহার সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, সে কিসের গর্ব্ব করিতে পারে? যে গিরিশৃঙ্গ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়, সে কি আর কখন সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিতে পারে?

(৯)

সে রাত্রিতে আরও একজন ঘুমাইতে পারিলেন না। পিসীমা আসিয়া সব কথা প্রফুল্লকমলকে জানাইয়া

বলিয়াছিলেন, "কি, বাপু, যেন হেঁয়ালী! দস্ত কি দুঃখ—কিছুই বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি চমৎকার, তাই আমার অত আগ্রহ ছিল। না হ'ক; সুন্দরী মেয়ে কি আর ভূভারতে নেই!"

পিসীমা'র কাছে যাহা হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইয়াছিল, প্রফুল্লকমলের কাছে, তাহা সরল বলিয়াই অনুভূত হইল। দীর্ঘ তেইশ বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য যেন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—বিধবা পুত্রবধূকে ও অবিবাহিতা পৌত্রীকে লইয়া পুত্রশোকাতুর পিতা পুত্রের শেষ কর্ম্মস্থল ত্যাগ করিতেছেন। সে দিন সে তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি নৌকায় তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িল, পিতার সঙ্কল্প শুনিয়া সে মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "এঁদের অপরাধ কি?" তাহার পর? দীর্ঘ তেইশ বৎসর সে অদৃষ্টের আঘাত বুক পাতিয়া লইয়াছে; পিতা যদি ভুল করিয়া থাকেন, তবে পুত্রের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কাহাকেও দোষ দেয় নাই; কখন ধৈর্য্য হারায় নাই; কখন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই।

যাহারা একদিন পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল—আজ ঘটনার স্রোতে তাহাদিগের মধ্যে কি ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে!

দীর্ঘকালের সাধনা প্রফুল্লকমলকে সংযমে অবিচলিত ও বিনয়ে নত করিয়াছিল। তাই আজ পূর্ব্বস্মৃতি ও পিসীমার কথা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

প্রভাতে পিসীমা পূজা শেষ করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "পিসীমা, তুমি একবার ও-বাড়ীতে যাও।"

পিসীমার আজ আর যাইতে ইচ্ছা ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কেন, পিফু?"

"একটু কায আছে; আমিও যাচ্ছি।"

পিসীমা অপ্রসন্ন চিত্তে শিশিরের মাতার নিকট গমন করিলেন।

তাহার পর প্রফুল্লকমল পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "একবার শিশিরকে ডাক ত।"

শিশির আসিলে প্রফুল্লকমল বলিলেন, "চল, বাবা, পিসীমাকে তোমার মা'র কাছে পাঠিয়েছি। আমার ক'টা কথা বলবার আছে।"

শিশির ও কনক নির্ব্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিল।

শিশিরের সঙ্গে তাহাদিগের অধিকৃত গৃহাংশে প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লকমলকে বলিলেন, "বাবা, তোমার মা'কে দয়া করে পাশের ঘরে আর পিসীমাকে দ্বারের কাছে আসতে বল।"

তাহার পর প্রফুল্লকমল বলিলেন, "পিসীমা, তুমি শিশিরের মা'কে বল, তিনি যা' বলেছেন, সে সবই আমি মাথা পেতে নিয়েছি। আমি আজ আমার মৃত পিতার হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি। তিনি যদি অপ—ভুল করে থাকেন, তবে আমি তাঁ'র ছেলে তা'র জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করা আমার কর্ত্তব্য তা' আমি যথাসাধ্য করেছি। উনি যদি পারেন, আমাকে ক্ষমা করুন। বাবা ধনী ছিলেন; আমি তা নই। ধনের যদি কোন মোহ থেকে থাকে, তা' আর নাই। ওঁকে তুমি বল, আমি যে এসেছি সে কেবল কনকের জন্য ওঁর মেয়েটিকে পাবার প্রার্থনা করেই নয়—শিশিরের জন্য উনি প্রিয়কে গ্রহণ করবেন এ প্রার্থনাও আমি জানাতে এসেছি। যদি প্রসন্ন মনে সম্মতি দেন, আমি মনে করব, আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হ'ল। যদি তা' না পারেন, তবুও যেন আমাকে ক্ষমা করবার চেষ্টা করেন।"

মস্তক নত করিয়া বিষণ্ণভাবে প্রফুল্লকমল গৃহত্যাগ করিলেন।

পিসীমা দেখিলেন, প্রতিমা অন্তরের চাঞ্চল্যে কম্পিতা হইতেছেন।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি পিফুকে কি বলব, মেয়ে?"

প্রতিমা নির্ব্বাক ইঙ্গিতে প্রফুল্লকমলের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন।

সেইদিন প্রফুল্লকমল মাতাকে লিখিলেন—

"মা,

রমাপতিবাবুকে, বোধ হয়, তোমার মনে আছে। —স্থানে যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি তথায় মুন্সেফ ছিলেন; বাবাও তখন সেখানে। তাঁর কন্যা প্রতিমার পুত্রের সঙ্গে প্রিয়ংবদার ও কন্যার সঙ্গে কনকের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলাম। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এরা যেন সুখী হয়।"

পিসীমা চলিয়া যাইলে প্রতিমা যাইয়া ঠাকুরঘরের দ্বারে বসিয়া পড়িলেন। অশ্রুর উৎসমুখ রুদ্ধ ছিল—এখন তাহা মুক্ত হইল।

শিশির, ললিতা ও মিহির—কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না। ললিতা ছোট মেয়েটির মত মাকে জড়াইয়া ধরিল; বলিল, "মা, যে সম্বন্ধে তোমার এত আপত্তি, তাতে তুমি সম্মতি দিলে কেন?"

প্রতিমার মনে হইল, তাঁহার মাতা একদিন যাহাতে পরাভব মানিয়া বেদনার কণ্টকাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্যে আজ তাহাই জয়ের ফুল্লোৎপল রূপে বিকশিত হইয়াছে।

তিনি কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "না, মা। আমি এতকাল যে ব্যথার মেঘ বুকের মধ্যে রেখেছিলাম, আজ তা বর্ষণে শেষ হয়ে গেল। আমি আশীর্ব্বাদ করি, আজ আমার এই চোখের জল তীর্থবারির মত—শান্তিজলের মত তোমাদের সব অকল্যাণ দূর করবে।"

তিনি আবার কন্যার মুখচুম্বন করিলেন; তাহার পর ঠাকুরঘরের চৌকাঠের উপর মাথা রাখিয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

ললিতাও মাতার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাকে প্রণাম করিল।

প্রতিমা উঠিয়া শিশিরের ও মিহিরের মস্তকে করতল স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর তোদের মঙ্গল করুন।" তাঁহার মুখে যেন দেবীভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল।

শিশির ও মিহির দেবতাকে প্রণাম করিয়া মা'র পদধূলি গ্রহণ করিল।

প্রেমের রহস্য

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আমার তরে তোমার মনে কোনো বেদন নাইক জানি;
তবুও কেন ব্যাকুল আমি সঁপ্‌তে তোমায় হৃদয়খানি?
কি জানি কি আভাস পেনু তোমার চোখে, তোমার মুখে;
তোমার হাসির পিছন হ'তে কি কথা মোর বাজ্‌ল বুকে!
প্রীতি-অনুরাগের কথা একটিও তো কওনি তুমি;
তবুও বারেক সরস হ'ল কঠোর মম চিত্তভূমি!
ছিল কি ঐ চ'ক্ষে মায়া? হাস্তে মায়া জড়িয়ে ছিল?
সেই মায়া কি সোনার যাদু ছুঁইয়ে দিয়ে জুড়িয়ে দিল?
তোমার কঠোর মৌনতাতে ছিল ক্ষণেক চপলতা?
চপলারি সমান তাহা জানাল কি গোপন কথা?
জানি নাকো কখন্ তুমি উদ্‌ঘাটিলে আপন হিয়া।
উঠ্‌ল নেচে আমার হিয়া সেই হিয়ারি পীযূষ পিয়া।
এখন মনে পড়্‌ছে কেবল—তুমি অটল বাক্যহীনা;
আমার প্রণয় ঘুরুল যেন ভিখারিণী সমান দীনা
তোমার কাছে হাতটি পেতে। দাওনি তারে তুমি কিছু।
দেবারি সাধ জাগল যেন,—কর্‌লে যখন নয়ন নীচু,
তখন আমার ভিখারী প্রেম আভাসে কি বুঝ্‌লে যেন,
আজকে সে তাই আশায় আশায় বা দুরাশায় দুল্‌ছে হেন।
মৌনা ওগো, পাষাণ-হিয়া, সত্যি ক'রে বল্‌বে নাকি—
আমার ভালবাসার ঝ'ড়ে দুলল কিনা হৃদয়-পাখী?
আমার ভালোবাসার আবেগ ছোঁয়নি কি গো
তোমায় মোটে?
পাওনি সুবাস—আমার বুকে যে-প্রেমকুসুম
আজকে ফোটে?
ভাব্‌ছি তোমার মুখটি দেখে, যদিও তাহা উদাস পারা,
শীতল যেন কর্‌ছে তোমায় আমার প্রেমের গোপন ধারা।
আমার প্রেমের এই আরতি ব্যর্থ সে কি ব্যর্থ, দেবী?
নিও নিও আমার পূজা, দাও অধিকার—চরণ সেবি।

পোর্ট-ব্লেয়ারের প্যারেড-স্থান

(এই স্থানে কৃষি-প্রদর্শনী বসিয়াছে)

-ব্লেয়ারের বন্দর
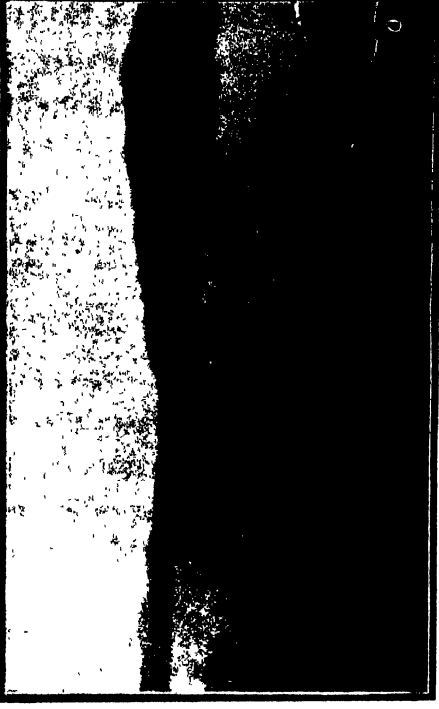
রে হেরি ট-পাহাড় ও চ্যাথাম

পোর্ট-ব্লেয়ার—সেলুলার কারাগার

(অপর একটী দৃশ্য)

পোর্ট-ব্লেয়ার—সেলুলার কারাগার

(বামে কারাকক্ষ, মধ্যে হাসপাতাল, প্রান্তে কার্য্যালয়)

কণা ও ঢেউ

শ্রীসুনীলবিহারী সেনগুপ্ত, এম্-এসসি

একটুকরা পাথর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যখন আর ভাঙ্গা চলে না তখন উহা আর পাথর থাকবে না ; তিনটি বিভিন্ন রকমের পরমাণুতে পরিণত হইবে। অবশ্য এইরূপ ভাঙ্গাচোরা হাতুড়ি পিটাইলেই হয় না ; রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এইরূপ ভাঙ্গা সম্ভব হয়। বর্ত্তমানে রাসায়নিকরা নব্বই রকম পরমাণুর খবর রাখেন। ইহাদের পরস্পরের মিলনে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের জানা ছিল পরমাণুই হইতেছে জড়ের অবিভাজ্য কণা ; কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ ভাগে কতকগুলি আবিষ্কারের ফলে আমাদের সে ধারণা উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন আমরা জানি এক একটি পরমাণু কতগুলি ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বিদ্যুৎকণার সমষ্টি। পরমাণুর এই নুতন রূপ বুঝিতে হইলে, আলোক জিনিষটা কি তাহা ভাল রকম জানা দরকার—কারণ জড় পদার্থ হইতে আমরা আলো পাই। সূর্য্য একটি জ্বলন্ত দ্রব্য বলিয়া উহা হইতে আলো পাইতেছি। গ্যাসের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালনা করিলে নানারকম আলো দেখা যায়। পরমাণুর ভিতর আলোড়ন চলে বলিয়া এই রকম আলোক দেখিতে পাই ; সুতরাং পরমাণুর ভিতরকার ব্যাপার বুঝিতে হইলে আলোক জিনিষটা কি তাহা ভালভাবে জানিতে হইবে।

আলোক এক রকম তেজ বা শক্তি। শক্তির ক্ষয় নাই। এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা চলে ; তাহাতে মোট শক্তির ক্ষয় হয় না। বিজলী-বাতির বিদ্যুৎ চালনা করাতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির ক্ষয় হইতেছে তাহা আমরা তাপ ও আলোক রূপে পাইতেছি। সূর্য্যের আলো মাটিতে পড়িলে গরম হইয়া উঠে ; এখানেও আমরা দেখি আলোক-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

আলোক সোজা পথে চলে। একটা বস্তু খুব জোরে যখন ছুটে তখন সোজা পথেই চলে তাহা আমরা জানি। এই জন্য আগেকার বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে বন্দুকের গুলির ন্যায় আলোক জলন্ত বস্তু হইতে নির্গত সারি সারি কণা। নিউটন ছিলেন এই মতের জন্মদাতা এবং এই মতবাদকে কণাবাদ (Corpuscular theory of light) নাম দেওয়া হয়।

কিন্তু আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই, আলোক সব সময়ে সোজা পথে চলে না। আয়নার উপর আলোকরশ্মি পড়িলে প্রতিফলিত হয় ; আবার জলের উপর পড়িলে আলোকের পথ বাঁকিয়া যায়। আলোকের পথ এই ভাবে বাঁকিয়া যায় বলিয়া জলের মধ্যে আঙ্গুল ডুবাইলে যেখানটা আঙ্গুল জল ছুঁইয়াছে সেইখানটা ভাঙ্গা বলিয়া মনে হয়—এই কারণে জলের গভীরতাও কম মনে হয়। নিউটন বলিতেন যে আয়না কিম্বা জলের উপরিভাগে কোন রকম টান বা অপসারণের ফলে আলোক-কণিকার পথ বাঁকিয়া যায়। জলের উপর যখন চাঁদের আলো পড়ে, আলোর বেশী ভাগই হয় প্রতিফলিত—সামান্য অংশের বক্রন (refraction) হয়। নিউটনের মতবাদানুসারে জলের উপরিভাগে সমস্ত আলোক-কণাতেই টান পড়া উচিত। তাহা হইলে ব্যাপারটা হয় এই যে সব আলোক কণারই বক্রন হওয়া উচিত। ইহাতে চাঁদ বা সূর্য্যের আলো জলে পড়িলে যে প্রতিফলন হয় তার কোন সদুত্তর পাই না। নিউটন বলেন যে আলোক-কণার কতকাংশ জলে ঢুকিয়া বাঁকিয়া যায় এবং কতকাংশ ঢুকিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে এবং তাহাতে প্রতিফলন হয়। নিউটনের এই ধারণার সহিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মতবাদের অতি চমৎকার সামঞ্জস্য আছে ; অর্থাৎ জাগতিক নিয়মে কোন শৃঙ্খলা নাই এবং এই নিয়মকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে আন্দাজ করিয়া (probabilities) লইতে হয়।

আলোকে আলোকে মিশিয়া যে কাটাকাটি হয়, যাহাকে আমরা interference বা ব্যতিকরণ বলি তাহা নিউটনের মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। খুব ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া আলোক চলিবার সময় আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে (diffraction)। এই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে হইলে নিউটনের কণাবাদ অচল হইয়া উঠে। এই সময় বৈজ্ঞানিকেরা আলোককে তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করেন। পুকুরে একটা ঢিল ফেলিলে জলে যে রকম ঢেউ উঠে, আলোক অনেকটা ঐ ধরণের ঢেউ, তফাৎ হইতেছে এইটুকু যে পুকুরের ঢেউগুলি বড় কিন্তু আলোকের ঢেউ খুব ছোট : এক ইঞ্চি পরিমিত জায়গায় হাজার হাজার আলোক ঢেউ উঠে। জলের ঢেউ কোন রকম বাধার উপর পড়িলে যেমন চারিদিকে বাঁকিয়া পড়ে, আলোকের বেলায়ও তেমনি হয় ; তবে এ ক্ষেত্রে বাধাটা খুব ছোট হওয়া দরকার।

আলোকে আলোকে মিশিয়া কাটাকাটি হইয়া অন্ধকার হয়—ইহা আলোক তরঙ্গ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট না হইলে সম্ভবপর হইত না। পুকুরে যে ঢেউ উঠে তাহার এক ভাগ থাকে উঁচু ও অপর ভাগ নীচু। যদি আর একটি ঢেউ আসিয়া ঐ ঢেউএর উপর এমন ভাবে পড়ে যাহাতে আগেকার উঁচু ভাগের উপর এখনকার ঢেউএর নীচুভাগ এবং নীচু ভাগের উপর উঁচু ভাগ পড়ে, তবে ঢেউ থামিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আলোকে আলোকে মিশিয়া অন্ধকার অনেকটা এই অবস্থাতেই ঘটে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে আলোক-তরঙ্গ কিসের উপর আশ্রয় করিয়া চলিতেছে। ইহার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করিলেন যে আমাদের চারিদিক ইথর নামে এক ঘন কঠিন পদার্থে পূর্ণ হইয়া আছে। এই ইথর পথে আনীত সূর্য্যালোকের ঢেউ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে আঘাত দিতেছে, তাহাতে আমরা আলোক দেখিতেছি। সব রকমের আলোক আমরা দেখিতে পাই না। লাল, হলুদ, কমলা, নীল, বেগুনী, সবুজ,

ইণ্ডিগো, এই সাত রকম রঙ দেখিতে পাই। আলোর রঙের ভিন্নতার কারণ আলোক ঢেউএর দৈর্ঘ্যের ভিন্নতা। দৃশ্যমান আলোকের মধ্যে লাল আলোকের ঢেউ সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং বেগুনী আলোর ঢেউ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। লাল আলো হইতে বড় ঢেউ আছে যাহা আমরা চোখে দেখি না। বেতার বার্ত্তার যে তরঙ্গ উঠে তাহা খুব বড়; তিন গজ হইতে ২০ মাইল লম্বা হয়। আবার বেগুনী আলোর চাইতে ছোট ঢেউ আছে, যেমন রঞ্জন-রশ্মির ঢেউ (লম্বায় এক ইঞ্চির ৬০ হাজার ভাগের এক ভাগ হইতে ১৪ লক্ষ ভাগের ৪৮ ভাগ পর্য্যন্ত)।

আলোককে তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলেও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। কোনও জিনিষ গরম করিলে দেখা যায় প্রথমে উহা লাল হয়। বেশী গরম করিলে হরিদ্রাভ এবং আরও বেশী গরম করিলে সাদা আলো বাহির হইতে থাকে। কত উত্তাপে কি রকম আলো বাহির হইবে, তার তেজ কি রকম, তাহা মাক্সওয়েল ও বোণ্টজম্যান প্রবর্ত্তিত নিয়ম হইতে বাহির করা সম্ভব। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল সব সময় এই নিয়ম খাটে না। এই সময় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্স প্লাঙ্ক বলিলেন যে জড় বস্তু যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ও পরমাণুতে বিভক্ত, শক্তি তেমনি কতগুলা অবিভাজ্য কণায় বিভক্ত। এক টুকরা জড় পদার্থ যেমন কতকগুলি অণু, পরমাণু লইয়া গঠিত, এক টুকরা শক্তিও তেমনি কতকগুলি শক্তিকণা (action quantum) লইয়া গঠিত। স্পন্দমান শক্তিকণাকে তেজাণু (Quantum) বলে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক ভিন্ন ভিন্ন আলোক-কণার সমষ্টি—এই হইতেছে শক্তিকণাবাদের মূল কথা। প্রত্যেক বর্ণের আলোক-কণার শক্তি এক নয়; আলোক-কণার অন্তর্নিহিত শক্তি আলোকের স্পন্দনের উপর নির্ভর করে। দৃশ্যমান আলোকের মধ্যে বেগুনী আলোর স্পন্দনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া উহার অন্তর্নিহিত শক্তিও বেশী। প্লাঙ্ক মনে করেন যে কোন জিনিষ গরম করিলে উহার অণু, পরমাণুর সহিত তাপ বিচ্ছুরিত তেজাণুগুলির শক্তির আদান প্রদান হইতে থাকে। এই ভাবে কল্পনা করিলে উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মির রং ও তাপের যে সম্বন্ধ পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা-লব্ধ ফলের সহিত একেবারে মিলে। যেখানে পরমাণুর সহিত আলোক-রশ্মির শক্তির আদান-প্রদান ঘটে—যাহার ফলে পরমাণু আলোক তরঙ্গ হইতে শক্তি গ্রহণ করিতে পারে কিম্বা আলোক-সৃষ্টি-কালে পরমাণুর শক্তি যখন ইথরে অর্পিত হয়, সেখানে আলোককে কণা বলিয়া ধরিতে হয়। বিংশ শতাব্দীর গবেষণার ফলে জানা গেল যে নিউটনের "কণাবাদ" একেবারে ভুয়া নয়।

এক্ষণে আমরা পরমাণুর গঠন লইয়া আলোচনা করিব। হাইড্রোজেন পরমাণু সব চাইতে হাল্কা ও ছোট পরমাণু; সুতরাং ইহার গঠন ধরা যাউক। হাইড্রোজেন পরমাণু একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক তড়িৎ-কণার সমবায়ে প্রস্তুত। ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণাকে আমরা বিদ্যুতিন বলিব। ইহা অত্যন্ত হাল্কা—হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮০০ ভাগের এক ভাগ। এই বিদ্যুতিন ধনাত্মক বিদ্যুৎকণাকে (proton) কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে;—যেমন সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগুলি পরিভ্রমণ করিতেছে। বিদ্যুতিন যে কেবল এক পথেই ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা নয়—একটির পর একটি দূরে দূরে বিদ্যুতিনের ঘুরিয়া বেড়াইবার পথ আছে। যখন এক কক্ষ হইতে বিদ্যুতিন লাফাইয়া অন্য কক্ষ পড়ে, তখন তখন আলোক বিকীর্ণ হয়। এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে বিদ্যুতিনকে সরাইতে হইলে পরমাণুকে উত্তেজিত করা দরকার। উত্তেজিত করিবার পন্থাও নানা রকম—খুব দ্রুতগামী আলফাকণা (alpha particle) আসিয়া বিদ্যুতিনে ধাক্কা লাগিলে বিদ্যুতিন সরিয়া যাইতে পারে; কিম্বা বিদ্যুৎ চালনা করিলে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে বিদ্যুতিন এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে চলিয়া যাইতে পারে—গরম করিয়াও উত্তেজিত করা সম্ভব। একটা কাঁচ-নলে হাইড্রোজেন-গ্যাস ভরিয়া তাহাতে যদি বিদ্যুৎ চালনা করা যায় তবে নানা রকম রঙের আলো বাহির হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করিলে বিদ্যুতিন বাহির হইতে শক্তি আহরণ করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লাফাইয়া দূরে চলিয়া যায়। এই অবস্থায় বিদ্যুতিন বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না—আপনা আপনি কাছের কক্ষায় ফিরিয়া আসে এবং পরে সহজাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফিরিয়া আসিবার সময় সঞ্চিত শক্তি আলোকরূপে বিকীর্ণ করে। এই আলোকের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষা করিয়া বলা যায় যে বিকীরিত আলোকের ঢেউএর দৈর্ঘ্য কতখানি এবং ঢেউএর দৈর্ঘ্য জানা থাকিলে উক্ত আলোক বিকীর্ণ করিতে কতখানি শক্তি ব্যয় হইয়াছে তাহাও বলা যায়। কোন কক্ষ হইতে কোন কক্ষে লাফাইয়া পড়িতে উক্ত শক্তি ব্যয় হয় তাহাও গণনা করিয়া বলা যায়। এই সমস্ত গণনাতে আলোককে এক একটি শক্তিকণা বলিয়া ধরা হইয়াছে।

গত কয়েক বৎসরের গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, যে বিদ্যুতিন ও প্রোটনকে আমরা শুধু কণিকা (particles) বলিয়া জানিতাম তাহাও কতগুলি তরঙ্গের সমষ্টি। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খুব ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলোক তরঙ্গ গেলে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—অবশ্য ছিদ্রের আয়তন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হওয়া দরকার। বিদ্যুতিনের তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের চাইতে অনেক ছোট; সেই আকারের ছোট ছিদ্রও পাওয়া যায়। কোন জিনিষের অণু পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রপথে যদি বিদ্যুতিন চালান যায় তবে দেখা যায় বিদ্যুতিনও আলোক তরঙ্গের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সম্প্রতি আমেরিকার ডেভিসন ও গারমার, এবারডিনের অধ্যাপক টমসন, জার্ম্মেণীর রাপ্ (Rupp) ফ্রান্সের ডভিলার (Dauviller), জাপানের কিকুচি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে আলোকের ন্যায় বিদ্যুতিনের প্রতিফলন ও বক্রন হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটন বলিয়াছিলেন আলোক কতগুলি কণিকা—অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে ধারণা বদলাইয়া গেল; হাইজেন্স, ইয়ং, ফ্রেজনেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন আলোক কতকগুলি ঢেউ। যখনই কোন সমস্যার সমাধান "কণাবাদে" হয় না তখন "তরঙ্গবাদে"

উহার মীমাংসা সহজ হইয়া উঠে। সোজা কথায়, স্থূল ভাবে (আলোর সাধারণ ব্যাপারে) দেখিতে গেলে আলোক কণামাত্র কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে উহাকে ঢেউএর সমষ্টি বলিয়া ধরিতে হয়।

আলোকের ন্যায় জড়েরও দুইটি রূপ দেখিতে পাই। আলোর বেলায় যেমন জড়ের বেলায় তেমনি নিউটনীয় নিয়ম খাটে বড় বড় জড়ের টুকরার উপর; আসলে জড়ও তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। ক্ষুদ্র জড়কণা—প্রোটন, বিদ্যুতিনের বেলায় জড়ের তরঙ্গরূপ ধরা পড়ে। দি ব্রগেলীই হইতেছেন এই প্রতীতির জন্মদাতা—স্রোয়েডিংগার এই নূতন মতবাদের যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধন করিয়াছেন।

আমাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ঢেউ উঠিতেছে, ছুটিতেছে। এই বিশ্ব তরঙ্গময়। এই তরঙ্গের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। এককালে লোকের ধারণা ছিল এই বিশ্ব কণিকাপূর্ণ—মাঝে মাঝে এক আধটা ঢেউ উঠিত আলো বহিয়া আনিবার জন্য। বর্ত্তমানে সে ধারণা বদলাইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে মহাজনপদ

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি এইচ-ডি

বুদ্ধদেবের সময়ে মধ্যদেশে চৌদ্দটী মহাজনপদ ছিল, যথা, কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদি, বংশ, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন, অস্সক ও অবন্তি। কম্বোজ এবং গান্ধার উত্তর ভারতবর্ষে অবস্থিত; এবং এই দুইটী দেশকেও মহাজনপদ বলা হইত।

কাশী—ইহার রাজধানী ছিল বারাণসী এবং ইহার অনেকগুলি নাম ছিল, যথা, সুরুন্ধন, সুদস্সন, ব্রহ্মবর্দ্ধন, পুষ্পবতী, রম্ম ১ এবং মোলিনী ২। ইহা বার যোজন বিস্তৃত ৩। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে রাজনৈতিক ইতিহাসে কাশীর যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। কাশীর রাজারা সময়ে সময়ে কোশলের রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। কাশী কোশল সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ইতিহাসে কোশলকে কাশীরাজ্য জয় করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়ে কাশীর ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছিল। ইহা কোশল এবং মগধ সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। কাশীরাজ্যের দখল লইয়া কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহিত মগধরাজ অজাতশত্রুর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং পরে মগধরাজ অজাতশত্রু কোশলবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজ্য আপন দখলে আনিয়াছিলেন ৪। এই পুণ্যধাম

মথুরানগর

1. Jataka IV, 119—120.
2. Ibid. IV, 15.
3. Ibid. VI, 160.
4. Samyutta Nikaya, I, 82-85.

বারাণসীতে বুদ্ধদেব ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ৫। বুদ্ধদেব বেরঞ্জা হইতে প্রয়াগে গঙ্গা পার হইয়া বারাণসীতে পৌঁছিয়াছিলেন ৬ এবং তাঁহার জীবনের অধিক সময় এইস্থানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৭। বৌদ্ধযুগে বারাণসী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্রাবস্তী এবং তক্ষশীলা-বাসীর সহিত বারাণসীবাসীর ব্যবসাবাণিজ্য চলিত ৮ বারাণসীর জনৈক যুবক হস্তীসূত্র অধ্যয়ন করিতে ২,০০০ যোজন দূরে অবস্থিত তক্ষশীলায় গমন করিয়াছিল ৯। করিতেন ১০। অনেক কোশলবাসী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব কোশলরাজ্যের শালা নামে একটি ব্রাহ্মণগ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। কোশলরাজ্যের নগরবিন্দ ১১ এবং বেনাগপুর ১২ নামে দুইটি ব্রাহ্মণগ্রামে বুদ্ধদেব গমন করিয়াছিলেন এবং বহু ব্রাহ্মণপরিবারকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কোশলরাজ্যের যুবরাজ দীর্ঘায়ুর সহিত বারাণসী রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছিল। রাজা প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কাশীরাজ্য দান করিয়াছিলেন। মহাকোশলের

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ

পুত্রেরা বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ এবং অজাতশত্রুর সহিত বহুবার ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল এবং পরে তাহারা তাঁহাদের পরম মিত্র হইয়াছিল। অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কাশীরাজ্য নিজ বশে আনেন। শাক্যগণ রাজা প্রসেনজিতের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

কোশল—পোক্কর সাদি নামে একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ শিক্ষক কোশলরাজ্যের অন্তর্গত উক্কট্ঠনগরে বাস

5. Majjhima Nikaya, I, 170 foll.; Samyutta Nikaya V 420 foll; Kathavatthu pp. 97, 559.
6. Samautapasadika I. 201.
7. Anguttara Nikaya, I. 110 foll.; III, 320 322 Samyutta Nikaya I. 105-106; Vinaya Texts. I 102-108.
8. Dhammapada Commentary, I, 123, III, 429.
9. Jataka, II, 47.
10. Sumangalavilasini I, 244-245.
11. Majjhima Nikaya, III, 290 foll.
12. Anguttara Nikaya, I, 180 foll.

কোশলরাজ্যের দুইটী রাজধানী ছিল—শ্রাবস্তী এবং সাকেত। রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ পুস্তকে অযোধ্যা ইহার সর্ব্বপ্রথম রাজধানী এবং তাহার পর সাকেত।

পুণ্যধাম বারাণসী

বুদ্ধের সময়ে অযোধ্যার প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছিল এবং শ্রাবস্তী ও সাকেত ভারতবর্ষের ছয়টী প্রধান নগরের

গৃদ্ধকূট পর্ব্বত

মধ্যে দুইটি নগর বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন অযোধ্যা এবং সাকেত অভিন্ন। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ছোট ছোট নগর ছিল, যথা, সেতব্য, উক্কট্ট, দণ্ডকপ্পক, নড়কপান এবং পঙ্কধা। কেহ কেহ বলেন যে শ্রাবস্তীতে শ্রাবস্তী নামে একজন ঋষি বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল শ্রাবস্তী; কিন্তু বৌদ্ধভাষ্যে[13] স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে, এখানে সকল রকমের দ্রব্য পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল শ্রাবস্তী—"সব্বম্ অত্থি"। বৌদ্ধ ইতিহাসে শ্রাবস্তীর প্রাধান্য খুব বেশী ছিল। ইহার কারণ এই যে এই স্থানে বুদ্ধদেব

13. Papancasudani 1, 59

অনেক যশস্বী বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং যশস্বিনী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী শ্রাবস্তী নগরীতে বাস করিতেন, যথা পটাচারা, কিশা-গোতমী, নন্দ এবং কঙ্কারেবত। প্রাচীন কোশলরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল :—উত্তর কোশল এবং দক্ষিণ কোশল এবং ইহাদের মধ্য দিয়া সরযূ নদী প্রবাহিত হইত।

অঙ্গ—ইহার রাজধানী ছিল চম্পা। ইহা মিথিলা হইতে ৬০ যোজন দূরে গঙ্গা এবং চম্পা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। রামায়ণ এবং মহাভারতের মতে ভাগলপুর এবং মুঙ্গের জিলাকে চম্পা বলা হইত. মগধ এক সময়ে অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চম্পার পুরাতন নাম ছিল মালিনী অথবা মালিন (চম্পস্তু পুরী. চম্পা যা মালিন্ত ভবৎ পুরা ১৫)। বৌদ্ধ পুস্তকে চম্পা নগরের এবং চম্পা তাহাদের মধ্যে একটি ১৮। মহাগোবিন্দ চম্পা নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন ১৯। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ সাতটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—

১।	কলিঙ্গ	রাজধানী	দন্তপুর
২।	অস্‌স	„	পোতন
৩।	অবন্তি	„	মাহিস্‌সতী
৪।	সোবীর	„	রোরুক
৫।	বিদেহ	„	মিথিলা
৬।	অঙ্গ	„	চম্পা
৭।	কাশী	„	বারাণসী

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে অঙ্গ একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল ; কিন্তু

জয়পুর নগর

14 Majjhima Nikaya, III, 270 foll.

15. Mahabharata, XII, 5. 6-7 ; Matsya, 48, 97 ; Vayu, 99, 105-106 ; Harivamsa, 32, 49.

16. Mahajanaka Jataka (No 539).

17. Jataka, VI. 539.

18. Vinaya Pitaka, I, 179.

19. Digha Nikaya, II, 235.

বুদ্ধের সময়ে তাহার রাজনৈতিক প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছিল। অঙ্গের সহিত মগধের প্রায়ই যুদ্ধ হইত ২০। অঙ্গদেশ, মগধরাজ বিম্বিসারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। সোনদণ্ড নামে একজন ব্রাহ্মণ চম্পা নগরে বাস করিত। এই নগরটি মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন এবং এই নগরের আয়ের উপর তিনি জীবনধারণ করিতেন ২১। চম্পার রাণী গগ্‌গরা পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন ২২। অঙ্গরাজ্যে গৌতমবুদ্ধ অনেকগুলি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ২৩। অঙ্গ এবং মগধের অনেক গৃহী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।
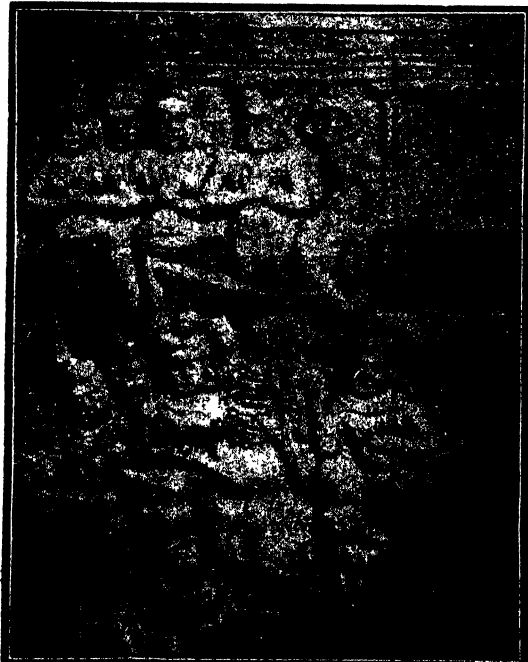
মগধরাজ অজাতশত্রু

অগ্‌গিদত্ত নামে রাজা মহাকোশলের পুরোহিত গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিয়া অঙ্গ-মগধ এবং কুরুরাজ্যের মধ্যস্থিত স্থানে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অঙ্গরাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব চলিত এবং অঙ্গবাসীগণ সিন্ধু-সৌবীর দেশে ব্যবসার জন্য যাইত। বুদ্ধদেবের সময়ে চম্পা একটি বড় নগর ছিল এবং আনন্দ ভগবান বুদ্ধদেবকে চম্পা কিংবা রাজগৃহ নগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ২৪। এক সময়ে মহিন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ চম্পা নগরে রাজত্ব

গৌতম বুদ্ধ

করিয়াছিলেন ২৫। এই চম্পা নগরে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে পাদুকা ব্যবহার করিতে আদেশ দেন ২৬।

---

20. Jataka, 1, 454-455.
21. Digha Nikaya, 1, III.
22. Sumangalavilasini, 1, 279.
23. Majjhima Nikaya, 1, 281 foll.
24. Digha Nikaya, II 146,
25. Dipavamsa, p. 28.
26. Vinaya Pitaka, 1, 179 foll.

মগধ—মগধের প্রাচীন রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। মগধদেশ বলিতে বর্ত্তমান পাটনা এবং গয়া জিলাকে বুঝায়। রামায়ণের ২৭ মতে গিরিব্রজের নাম ছিল বসুমতী এবং মহাভারতের মতে ইহার অপর একটি নাম ছিল বার্হদ্রথপুর ২৮ বা মাগধপুর ২৯। মাগধপুর পাঁচটী পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ৩০। এই পাঁচটী পর্ব্বতের নাম ছিল ইসিগিলি, বেপুল্ল, বেভার, পণ্ডব এবং গিজ্ঝকূট। মগধ-

সারনাথ
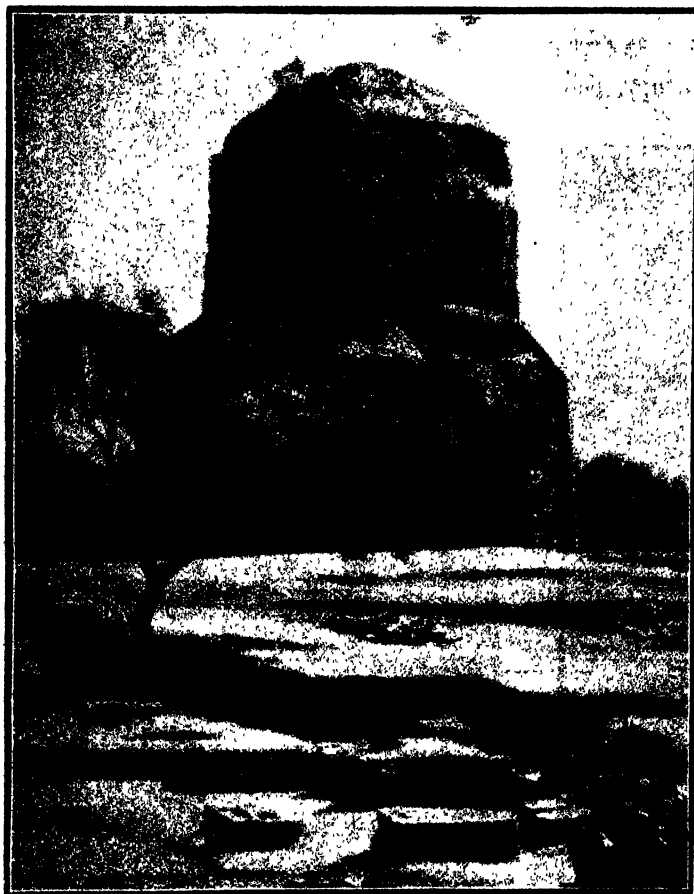
রাজ্যে ৮ ,০০০ গ্রাম ছিল এবং এই সকল গ্রাম রাজা বিম্বিসারের আয়ত্তাধীন ছিল ৩১। সেনানী গ্রাম নামে মগধের একটি গ্রাম ছিল। এখানে একটি সুন্দর বন এবং একটি স্বচ্ছসলিলা নদী প্রবাহিত হইত ৩২। একনালা নামে অপর একটি গ্রামে ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ বাস করিতেন ৩৩। মগধরাজ্যের নালক নামে অপর একটি গ্রামে সারিপুত্র জম্বুখাদক পরিব্রাজককে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন ৩৪। মগধরাজ বিম্বিসার যখন শুনিলেন যে বুদ্ধদেব বৈশালী নগর পরিদর্শন করিবেন, তখন তিনি তাঁহার জন্য একটি সুন্দর পথ নির্ম্মাণ করেন। রাজগৃহ হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত পথটী অত্যন্ত মনোরম ছিল ৩৫। এই পথটী বহুসংখ্যক মালা এবং নিশান দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল ৩৬। মগধ-রাজ্য এবং লিচ্ছবীদিগের দেশের মধ্যে সীমা ছিল গঙ্গা এবং গঙ্গার উপর মগধ ও লিচ্ছবীবাসীদিগের সমান স্বত্ব ছিল। দিব্যাবদানে লিখিত আছে যে বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন যে শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহ নগর যাইতে হইলে গঙ্গা নদী পার হইতে হইবে ২৭। অঙ্গ এবং মগধরাজ্যের মধ্য দিয়া চম্পা নদী প্রবাহিত হইত ৩৮। এক সময়ে বারাণসীর রাজা অঙ্গ এবং মগধ জয় করিয়াছিলেন ৩৯। অঙ্গরাজ্য রাজা বিম্বিসারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল ৪০। অজাতশত্রু লিচ্ছবীদিগের সাহায্যে কোশল রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অজাতশত্রুর রাজ্যকালে বৈশালীর বৃজিদিগের সহিত মগধের একটী সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল। বিম্বিসার এবং অজাতশত্রুর সময়ে

27. I, 32. 7.
28. II, 24—44.
29. II, 20, 30.
30. Vimanavatthu Commentary, p. 82.
31. Vinaya pitaka, I. 29.
32. Majjhima Nikaya, I, 166-167.
33. Samyutta Nikaya. I, 172-173.
34. Ibid. IV, 251-260
35. Dhammapada Atthakatha, III, 439-440.
36. Mahavastu I, 253 foll.
37. Page 55.
38. Jataka, IV, 454.
39. Jataka, V 315 foll.
40. Mahavagga, S. B. E. XVII p. 1.

মগধের আধিপত্য এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে মগধের ইতিহাস বলিতে উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝাইত। মগধ বৌদ্ধধর্ম্মের একটি সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ৪১। সম্রাট অশোক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে সমস্ত দূত পাঠাইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই মগধবাসী ছিলেন ৪২। অশোকের সময় মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। পাটলিপুত্র নগরের চারিটী তোরণদ্বার

জৈনধর্ম্মগুরু মহাবীর

হইতে প্রত্যহ চারিশত সহস্র কর্ষাপণ সংগৃহীত হইত ৪৩। যে সকল পর্ব্বত রাজগৃহকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বঙ্কক একটি। ইহার শীর্ষস্থানে যাইতে হইলে তিন দিন লাগিত। ইহার অপর একটি নাম ছিল সুপন ৪৪। রাজগৃহ হইতে অন্ধকবিন্দ পর্য্যন্ত একটি পথ ছিল ৪৫। রাজগৃহের একটি তোরণদ্বার ছিল। এই দ্বারটী সন্ধ্যার সময় বন্ধ করা হইত এবং সন্ধ্যার পর নগরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ৪৬।

জীবক বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন ৪৭। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন ৪৮। মগধ তাঁহার জন্মস্থান ৪৯। রাজগৃহ একটি দুর্গ ছিল। অজাতশত্রুর রাজ্যকালে ইহার সংস্কার হয়। রাজগৃহে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধসঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল ৫০। বৌদ্ধযুগে রাজনৈতিক ইতিহাসে মগধ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিক

ব্যবসা-বাণিজ্যেও মগধ খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিবাহ এবং অন্যান্য সূত্রে উত্তর রাজ্য সকল এবং গান্ধারের

41. Kathavatthu 1 89
42. Samantapasadika, 1, 63.
43. Samantapasadika, 1, 52.
44. Samyutta Nikaya II, 191-192,
45. Vinaya Pitaka, II, 93,
46. Vinaya Pitaka, IV, 116-117.
47. Vinaya Pitaka, II, 184-185.
48. Vinaya Texts (S, B, E), II, 74,
49. Vinaya Texts II, 207-208.
50. Vinaya Texts, III, Culla-vagga, 11th khandha.

সহিত মগধের বন্ধুত্ব ছিল। যখন অবন্তির রাজা প্রদ্যোৎ একটি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন মগধের রাজা

বেভার গুহা

বিম্বিসার আপন চিকিৎসক জীবককে তাঁহার শুশ্রূষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।
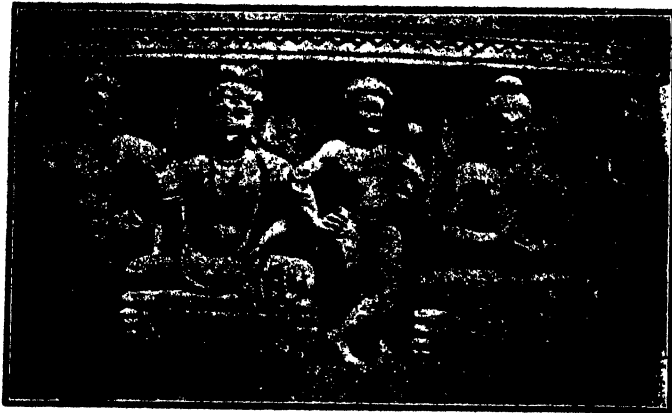
বোধিসত্ব

বৃজি—আটটী জাতির মধ্যে বৃজি, লিচ্ছবি এবং বিদেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিদেহদিগের রাজধানী ছিল মিথিলা। মিথিলার রাজা ছিল। বৈশালী কেবল যে লিচ্ছবিদিগের রাজা ছিল তাহা নহে—সমগ্র বৃজিগণের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বেসার নগরকেই বৈশালী বলা হইত। বুদ্ধদেবের সময়ে বৈশালী নগর তিনটী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বহুসংখ্যক হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, পুষ্করিণী ও আরাম ইহাতে বিদ্যমান ছিল ৫১। বৈশালীতে গৌতম নামে সুবিখ্যাত চৈত্য ছিল। বৈশালী হইতে রাজগৃহ এবং কপিলবাস্তু পর্য্যন্ত দুইটী পথ ছিল ৫২। বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতি আহূত হয় ৫৩। বৈশালীতে বুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং অম্বপালীর আম্রবনে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। বুদ্ধদেবের মতে লিচ্ছবিগণ পরিশ্রমী ছিল ৫৪। এই স্থানে জৈন ধর্ম্মগুরু মহাবীর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

বৃজিগণ সঙ্ঘ এবং গণরাজ্যের পক্ষপাতী ছিল ৫৫। বৈশালী নগরে বহুসংখ্যক লিচ্ছবি রাজা ছিলেন।

রাজনৈতিক ইতিহাসে মগধ এবং বৈশালী বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিল। বিম্বিসার একটি লিচ্ছবি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ লিচ্ছবিদিগের বন্ধু ছিলেন ৫৬। মগধ সম্রাট অজাতশত্রু বৃজিদিগকে ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ৫৭। গঙ্গার নিকটে একটি বন্দর ছিল। ইহার অর্দ্ধাংশ অজাতশত্রুর এবং অর্দ্ধাংশ লিচ্ছবিদিগের ছিল। এই বন্দরের অদূরস্থিত একটি পর্ব্বতের পাদদেশে বহুমূল্য ধাতুর খনি ছিল। এই সময়ে লিচ্ছবিদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল। অজাতশত্রু সুনিধ এবং বস্‌সকার নামক দুইটী মন্ত্রীকে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই কার্য্য করিতে বসস্‌কার সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে অজাতশত্রু লিচ্ছবিদিগকে ধ্বংস করেন।

মল্ল—মল্লরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এবং দুই ভাগের দুইটী রাজধানী ছিল—কুশীনারা এবং পাবা। মল্লদিগের শালবনে ভগবান বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ

51. Vinaya Texts II 171 ; cf. Lalitavistara, ch III, 21.
52. Vinaya Texts II, 210-211 ; III, 321 foll.
53. Ibid, III, 386 foll.
54. Samyutta Nikaya, II, 267-268.
55. Majjhima N, I 231.
56. Majjhima N. II 100-101.
57. Digha Nikaya, II 72 foll.

লাভ করিয়াছিলেন। এই শালবনটী হিরণ্যবতী নদীর নিকটে অবস্থিত ছিল। সর্ব্বপ্রথমে মল্লদিগের রাজা ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে তাহাদিগের মধ্যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। মল্লদিগের আরও অনেকগুলি বিখ্যাত নগর ছিল, যথা, ভোগনগর, অনুপিয়া এবং উরুবেল-কপ্প ৫৮। মল্লদিগের সংঘরাজ্য ছিল ৫৯। তাহাদিগের কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিল যাহাদের কার্য্যসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মল্লদিগের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ৬০। মল্ল এবং লিচ্ছবিদিগের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। রাজগৃহ হইতে ২৫ যোজন দূরে কুশীনারা অবস্থিত ৬১।

চেদি—যমুনার সন্নিকটে চেদি দেশ অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম বুন্দেলখাণ্ড্। দেশের রাজধানী ছিল সোত্থিবতী নগর ৬২। মহাভারতের শুক্তিমতী এবং সোত্থিবতী নগর অভিন্ন। চেদিরাজ্যের আরও কয়েকটা প্রসিদ্ধ নগর ছিল, যথা, সহজাতি ৬৩ এবং ত্রিপুরী। কাশী হইতে চেদিদেশ পর্য্যন্ত আমরা একটি পথের উল্লেখ পাই ৬৪। জেতুওর নগর হইতে ৩০ যোজন দূরে চেতরাষ্ট্র অবস্থিত ছিল ৬৫। অনুরুদ্ধ যখন চেদিগণের সহিত বাস করিতেছিলেন তখন তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চারিটী আর্য্যসত্য বিষয়ে বক্তৃতা চেদিদেশের ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রদান করা হইয়াছিল ৬৬।

বৎস ও বংশ—বৎসের রাজধানী ছিল কৌশাম্বী। এলাহাবাদের নিকটে কোশম দেশ পুরাকালে কৌশাম্বী নামে পরিচিত ছিল। সুংসুমার গিরির ভগ্গেরা বৎসদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল ৬৭। জটিলদিগের নেতা বাবরীর শিষ্যগণ কৌশাম্বীনগরে গিয়াছিলেন ৬৮। পিণ্ডোলভরদ্বাজ কৌশাম্বীর ঘোষিতা-রামে বাস করিত। তিনি কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের পুরোহিতপুত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত উদয়নের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছিল ৬৯।

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ

কুরু—ঋগ্বেদে কুরুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরুদেশ

58. Vide Some ksatriya Tribes of Ancient India, p. 149.
59. Majjhima Nikaya, I 231.
60. Vinaya Texts III pp. 4 foll; Ibid., II, 139; Psalms of the Brethren, 80.
61. Sumangalavilasini, II, 609.
62. Jataka, No. 422
63. Anguttara Nikaya III, 355.
64. Jataka No. 48.
65. Jataka, VI, 514-515.
66. Samyutta Nikaya, V, 436-437.
67. Jataka No. 353.
68. Sutta Nipata Commentary, II, 584.
69. Samyutta Nikaya, IV 110-112.

৮,০০০ যোজন বিস্তৃত ৭০। কম্মাস্সধম্ম নামে কুরুদিগের একটি নগরে বুদ্ধদেব অনেকগুলি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ৭১। রট্ঠপাল নামে জনৈক স্থবির রাজা কোরব্যের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। ৭২ কুরুদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় যে জম্বুদ্বীপের চক্রবর্ত্তী রাজা মন্ধাতা পূর্ব্ববিদেহ, অপরগোয়ান এবং উত্তরকুরু জয় করিয়াছিলেন। যখন তিনি উত্তরকুরু হইতে ফিরিতেছিলেন। ঐ দেশের অনেকগুলি অধিবাসী তাঁহার সহিত জম্বুদ্বীপে আসেন এবং জম্বুদ্বীপের যে স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন সেই স্থান কুরুরাষ্ট্র নামে পরিচিত ছিল ৭৩। কুরুদেশে বুদ্ধদেব বহু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং ঐ দেশের বহুলোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল ৭৪।

গৃদ্ধ্রকূটের অপরাংশ

কুরুক্ষেত্র (থানেশ্বর) কুরুদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাতন কুরুদেশ উত্তরে সরস্বতী নদী এবং দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত স্থানে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধপুস্তকে কুরুদেশের রাজধানী ছিল ইন্দপত্ত ইন্দপত্ত (ইন্দ্রপত্র) ৭ যোজন বিস্তৃত ছিল ৭৫। বৌদ্ধশাস্ত্রে অনেকগুলি কুরুরাজা এবং যুবরাজের উল্লেখ আছে, যথা, ধনঞ্জয় কোরব্য ৭৬, কোরব্য, ৭৭ এবং সুতসোম।

পঞ্চাল—পঞ্চাল দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর পঞ্চাল এবং দক্ষিণ পঞ্চাল এবং ইহার মধ্য দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত হইত। মহাভারতেও এই দুই ভাগের উল্লেখ আছে ৭৮। দিব্যাবদানে ৭৯ মতে উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর এবং জাতকের ৮০ মতে কম্পিল্লনগর ইহার রাজধানী ছিল। মহাভারতে ৮১ উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্র কিংবা ছত্রবতী নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্ল। বর্ত্তমানে ফারাখ্খাবাদ জেলার অন্তর্গত কম্পিলনগরকে পুরাকালে কাম্পিল্য বলিত। অহিচ্ছত্র (ছত্রবতী) এবং বেরিলি

70. Sumangalavilasini, II, 623
71. Digha Nikaya, II—Mahanidana & Mahasatipattham Suttas
72. Majjhima Nikaya, II, 65 foll.
73. Papaucasudani, I, 225-226.
74. Anguttara Nikaya, V. 29-32 ; Samyutta Nikaya II, 92-93 ; Majjhima Nikaya I, 55 foll ; Majjhima Nikaya, II, 261 foll ; Digha Nikaya, II, 55 foll.
75. Jataka No 537.
76. Jataka No, 276, 413, 515, 545.
77. Jataka No. 495, 537.
78. Cf. Vedic Index, I, 469.
79. Page 435.
80, Cowell, III, 230,
81. 138, 73-74.

জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান রামনগর অভিন্ন। উত্তর পঞ্চালের দখল লইয়া কুরুপঞ্চালের মধ্যে একটি সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল। উত্তর পঞ্চাল কুরুরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৮২ এবং কখন কখন ইহা কম্পিল্য রাষ্ট্রের একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হইত ৮৩। কম্পিল্লরাষ্ট্রের রাজারা উত্তর পঞ্চালনগরে দরবার করিতেন ৮৪ এবং কখন কখন তাঁহারা কম্পিল্ল নগরেও দরবার করিতেন। বিশাখ নামে পঞ্চালরাজার একটি দৌহিত্র ছিল; তাহার পিতার মৃত্যুর পর সে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। সে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ছয়টি অভিজ্ঞার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে ৮৫। জৈন পুস্তকে ৮৬ পঞ্চালরাজ চূড়নিব্রহ্মদত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে পঞ্চাল বলিতে আমরা যুক্তপ্রদেশের বুদাওন্, ফারাক্‌খাবাদ এবং তৎসংলগ্ন জেলাগুলিকে বুঝি।

মৎস্য—বর্ত্তমান জয়পুর দেশকে মৎস্য দেশ বলিত। সমগ্র আলওয়ার এবং ভরতপুরের কিছু অংশ মৎস্যদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃক্ষপুরের কুরুবংশীয় রাজার সহিত পাশাখেলায় মৎস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ৮৭। ঋগ্বেদ ৮৮ ও ব্রাহ্মণশাস্ত্রের ৮৯ মতে ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণে কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং সুরসেনের দক্ষিণে মৎস্যদেশ অবস্থিত ছিল। বিরাট নামে মৎস্যদিগের এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নাম হইতেই মৎস্যদেশের রাজধানীর নামকরণ হয়।

সুরসেন—সুরসেনদিগের রাজধানী ছিল মথুরা কিংবা মধুরা। কৌশাম্বীর ন্যায় মথুরা যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। গ্রীক লেখকের মতে ইহার রাজধানী মেথোরা নামে পরিচিত ছিল। মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য খুবই ছিল। এক সময়ে বুদ্ধদেব যখন মথুরা হইতে বেরঞ্জাতীরে আসিতেছিলেন পথিমধ্যে বৃক্ষতলে তিনি বিশ্রাম লইয়াছিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে অনেক গৃহী তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল ৯০। মথুরা নগরে কংস যাদবদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার প্রাণ বিনাশ হয়।

যখন মেগাস্থিনিস্ সৌরসেন (সুরসেন) সম্বন্ধে

পাটলিপুত্র

82. Mahabbharata, I, 138 ; Jataka No. 505.
83. Jataka No. 323. 513, 520.
84. Jataka No. 408.
85. Psalms of the Brethren, 152-153.
86. Uttaradhyayane Sutra, XLV, 57-61 ; cf. Svapnavasavadatta, Act. V ; Ramayana, I, 32.
87. Jataka, VI, 137.
88. VII, 18, 6.
89. Gopatha Brahmana, I, 2, 9.
90. Anguttara Nikaya, II, 57.

লিখিয়াছিলেন তখন মথুরা মৌর্য্যদের আয়ত্তাধীনে ছিল। কুশানদিগের প্রাধান্য সময়ে মথুরা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। বহু বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এই স্থানে পাওয়া গিয়াছে। মথুরা এবং বর্ত্তমান মহোলি অভিন্ন। বর্ত্তমান মথুরা নগরের দক্ষিণ পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে মহোলি অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে আর একটি মথুরার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পাণ্ড্যরাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল; ইহাকে দক্ষিণ মথুরা বলা হইত।

অস্‌সক—অস্‌সকদিগের রাজধানী ছিল পোতন। ৯১ দক্ষিণাপথে আর একটি অস্‌সকদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় ৯২। অস্‌সকদেশে গোদাবরী নদীর তীরে বাবরী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। দন্তপুরের রাজা কলিঙ্গের অস্‌সকের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎসংহিতা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে অস্‌সকেরা উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষে বাস করিত। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে অস্‌সক এবং মূলক ভিন্ন বলিয়া লিখিত আছে। বুদ্ধদেবের সময়ে অস্‌সকদিগের গোদাবরী তীরে অপর একটি উপনিবেশ ছিল ৯৪। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের ভাষ্যকার ভট্টস্বামীর মতে অস্‌সক অবন্তি এবং মহারাষ্ট্রদেশ অভিন্ন।

অবন্তি—অবন্তির রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। অচ্যুতকামী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মালওয়া, নিমার, মধ্যভারতবর্ষের সংলগ্ন দেশ সকল এবং অবন্তি অভিন্ন। প্রাচীন অবন্তি দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর এবং দক্ষিণ। উত্তর ভাগের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল মাহিসসতি

বেভার পর্ব্বত
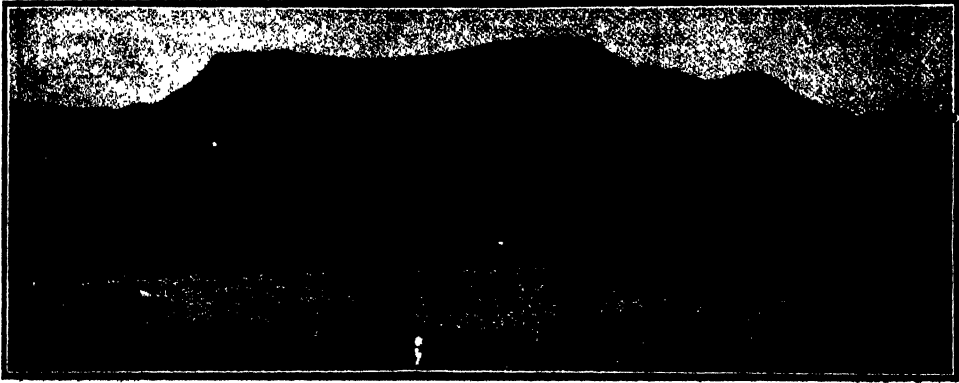
সহিত পোতনের রাজা অস্‌সকের প্রায়ই কলহ হইত। বৌদ্ধভাষ্যে অস্‌সকের রাজধানী পোত নগর নামে প্রসিদ্ধ। রাজা খারবেলের হাতীগুম্ফা শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রাজা খারবেল রাজা সাতকর্ণীকে অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম দিকে বহু সংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। অস্‌সক এবং অসক অভিন্ন। অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার পুস্তকে সিন্ধুনদীর উপকূলে অস্‌সকদেশ অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে। অস্‌সক এবং গ্রীকদিগের 'অস্‌সকেনাস্' রাজ্য অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি ৯৩ বা মাহিস্মতী। এই দক্ষিণ ভাগের অপর একটি নাম ছিল অবন্তি দক্ষিণাপথ ৯৫। বৌদ্ধদিগের মতে মাহিস্‌সতি অবন্তিদিগের রাজধানী ছিল কিন্তু মহাভারতের ৯৬ মতে অবন্তি এবং মাহিষ্মতি অভিন্ন। কুররঘর এবং সুদর্শনপুর নামে আরও দুইটী নগরের উল্লেখ পাওয়া যায় ৯৭। অবন্তি বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল। অনেক থের এবং থেরী এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিংবা বাস করিতেন, যথা, অভয়কুমার, ইসিদাসী, ইসিদত্ত, সোনকুটিকন্ন,

91. Digha Nikaya, II, 235; মহাভারতে পৌতন নামে পরিচিত. (I. 77. 47).

92. Sutta Nipata, verse, 977.

93. IV, 1, 173.

94. Sutta Nipata verse 977.

95 Carmichael Lectures, 1918, p. 54.

96. II, 31. 10.

97. Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, vol. I, 148.

উদান এবং মহাকচ্চান। উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের পুরোহিত বংশে মহাকচ্চায়নের জন্ম হইয়াছিল। মহাকচ্চায়ন চণ্ডপ্রদ্যোতকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন ৯৮। কৌশাম্বী এবং অবন্তির রাজপরিবারের মধ্যে কি ভাবে একটি বিবাহ ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতবর্ষে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ, কোশল, অবন্তি এবং কৌশাম্বী রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই কলহ হইত এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে বড়ই ব্যগ্র ছিল। প্রদ্যোত উদয়নকে বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রদ্যোত তাঁহার বাসবদত্তা নাম্নী কন্যার সহিত উদয়নের বিবাহ দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই বিবাহের ফলে কৌশাম্বী প্রদ্যোতের হস্তগত হয় নাই। উদয়ন মগধরাজার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কৌশাম্বীর রাজনৈতিক প্রাধান্য রক্ষার জন্য এই দুইটী বিবাহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

98. Psalms of the Brethren, 238 239.

পট্ পরিবর্ত্তন

শ্রীবিমল মিত্র

সিদ্ধেশ্বরীর মনে হইল : বাহির হইতে আশা যেন 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কতকটা আর্ত্তনাদের মতন। হঠাৎ কী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন।

রান্নাঘরের পিছন দিকটায় ঝোপ জঙ্গল ; সিদ্ধেশ্বরী আসিয়া দেখেন : আশা সেইখানেই পড়িয়া আছে ; পড়িয়া গোঙাইতেছে। বুকটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

লেম্পটা মুখের কাছে লইয়া যাইতেই সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া উঠিলেন :

—ও আশা, ও মা আশা, কি হয়েছে মা ?

আশা শুধু ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল—উঁ—

আশা যেমন শুইয়া ছিল তেমনি শুইয়া রহিল। উঠিবার শক্তি তাহার নাই। সিদ্ধেশ্বরী আশাকে কোলে তুলিয়া ঘরে আনিলেন। চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে—পাখার বাতাস করিতে তবে একটু জ্ঞান সঞ্চার হইল বোধ হয়।

মুখের উপর নীচু হইয়া সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—কি হয়েছে মা, ও আশা, আশা চোখ্ খোল, চেয়ে দেখ্—এই আমি তোর মা—

আশা চোখ খুলিল। সামনে মাকে দেখিয়াই দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ওমা, দিদি এসেছিল—দিদি—

—দিদি কে রে ?—শৈল ?—

চারিদিকে চাহিয়া সিদ্ধেশ্বরী তখন সমস্ত অবস্থাটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। আশা তুলসীতলায় প্রদীপ দেখাইতে আসিয়াছিল, প্রদীপটা মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। টগর গাছটার তলায় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আশাকে কোলের ভিতর আরো দৃঢ় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ভয় কি মা—ও কিছু নয়—মনের ভুল, সে কেন আসতে যাবে—সে রাক্কুসী কী আর—বলিতে বলিতে সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সে কেন আসিতে যাইবে! সেই এক বর্ষা রাত্রের দুর্য্যোগে শৈল কোথায় চলিয়া গিয়াছে।—চুলকাটিতলার শ্মশানে তাহার মৃতদেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—তিনি হাজার কাঁদিয়া কাটিয়াও তাহাকে রাখিতে পারেন নাই!—সত্যই তো, সে কেন আসিতে যাইবে!

ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হইল। কৃষ্ণা-একাদশীর চাঁদ ঘোষালদের চিলেকোটার আড়ালে ডুবিয়া গেল। একটা অদ্ভুত শব্দে আশার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ঘুমাইতেছেন। আশা কান পাতিয়া আবার শুনিল।

ঠিক্! দিদি আসিয়াছে ঠিক! নিশ্চয় কোনও সন্দেহ নাই!

ও ঘরে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া শব্দ হইতেছে।—তাহার পুতুলের বাক্স নড়িবার শব্দ! আশা বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আস্তে আস্তে টিপি টিপি পায় বড় ঘরের দরজা খুলিল। সব অন্ধকার! কিন্তু তবু আশার মনে হইল: ঘরের ওই কোণে যেখানে তাহার পুতুলের বাক্স থাকে, শব্দটা যেন ঠিক সেইখান হইতেই আসিতেছে।

আশা অন্ধকারের ভিতর চুপি চুপি সেই শব্দটা লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। দিদি তো জানিতে পারিলেই পলাইয়া যাইবে। এতটুকু শব্দও নয়—একেবারে কাছে গিয়া আচম্‌কা দিদিকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিবে। তারপর আর ছাড়িবে না। বলিবে—কেমন হয়েছে—আর পালাবি?—পুতুল নিয়েছি বলে' আমার ওপর রাগ করে' চলে গেছিস্. না দিদি?—

দিদি হয়ত বলিবে—ওরে আশা, ছাড় ছাড়,—এই দেখ্ আর আমি পালাব না,—মা'কে বলিস্‌নে—

কিন্তু কোথায় শব্দ—কোথায় কী!—কাছে যাইতেই শব্দটা চুপ হইয়া গেল। হঠাৎ আশার মনে হইল: তাহার পিছন দিকের খোলা দরজা দিয়া কে যেন গুটি গুটি সরিয়া গেল। সেই দিদির মতন চেহারা—সাদা শাড়ী পরা—খোঁপায় টগর ফুল। আশাও তাহার পিছন পিছন চলিল। বাহিরের দরজা খুলিয়া দেখে: দিদি কিছু দূরেই তাহার আগে আগে চলিয়া যাইতেছে। চারিদিকে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার! টগর গাছটার উত্তর দিকে ভাঙা সজিনা গাছটার তলা দিয়া দিদি চলিতেছে। তার পরেই বাঁশঝাড়—বাঁশঝাড়ের মধ্যে গিয়া পড়িলে দিদিকে আর পাওয়া যাইবে না।

আশা ডাকিল—ও দিদি—পালাস্‌নে—কথা শোন্—

দিদি ফিরিয়া চাহিল—কিন্তু দাঁড়াইল না। বড় সড়কের পাশে গাব গাছটার কাছে একবার থামিয়া আবার সোজা চলিতে লাগিল। গ্রাম তখন নিশুতি। আশার চীৎকার করিবার ক্ষমতাও নাই। দিদি চলিতেছে, আশাও চলিল। পথের দু'ধারে ঘন আস্‌শ্যাওড়ার জঙ্গল।—বুক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এক একবার দিদিকে দেখা যায়—আবার দেখা যায় না। আশা ছুটিয়া চলিল—কিন্তু দিদিও ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নলগাড়ীর মাঠের কাছে আসিয়া আশা দেখিল—কই দিদি নাই তো! কোন্ দিক দিয়া দিদি পলাইল কে জানে। চারিদিকে বিপুল অন্ধকার—কোথাও এতটুকু সাদার চিহ্ন নাই!

গাঢ় অন্ধকারের ভিতর আশা পথ হারাইয়া ফেলিল। পিছন পানে ফিরিয়া আশা দেখে: সেদিকেও পথ নাই। আশা মাঠের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। মাঠে লাঙল দেওয়া হইয়াছে—শুক্‌নো মাটির ঢেলায় আঘাত লাগিয়া আশার পা কাটিয়া গেল। বড় বাব্‌লা-গাছটির আশে পাশে যেন কতকগুলি অদ্ভুত মূর্ত্তি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আশা সারা মাঠময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছুটিতে লাগিল।

আশা ছুটিতেছে—মাঠের পর বিল।—বিলের উপর কচুরীপানার দামে ছপ্ ছপ্ শব্দ—বিলের পাশে মস্ত একটা তাল গাছ—তারপর বন—বৈচী কাঁটার বন—বনের পথ পার হইয়া উঁচু জমি—একটা বাজপড়া খেজুর গাছ—কচার বেড়া—আমবাগান—তারপর কেবল অন্ধকার—নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার—আকাশ—পৃথিবী কিছু নাই।

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। বলিলেন—ও আশা, আশা—কাঁদছিস্ কেন মা, আশা—এই যে আমি তোর পাশে শুয়ে আছি—ভয় কি মা—ভয় কি—

গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন: আশার জ্বর হইয়াছে।

টগর গাছটা উঠানের ঠিক উপরেই। গাছটা ফুলে ফুলে আজ ভরিয়া গিয়াছে। সকাল-বেলা পূজার ফুল তুলিতে তুলিতে সিদ্ধেশ্বরীর অনেক দিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল।

শৈল তখন ছোট, এ-পাড়া ও-পাড়ায় খেলিয়া বেড়ায়। একদিন কোথা হইতে এই গাছটা এইখানে আনিয়া পুঁতিয়া দিল।

পুঁতিয়া তো দিল—কিন্তু পরক্ষণেই ঘোষালবাড়ীর ছেলেরা আসিল ছুটিতে ছুটিতে।

তাহারা আসিয়া জানাইয়াছিল : শৈল না কি টগর গাছটি ঘোষালদের বাগান হইতে চুরী করিয়া আনিয়াছে। হয় ত চুরী সত্য সত্যই করিয়াছিল—কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার মত মেয়ে শৈল নয়।

ঘোষালবাড়ীর মেজ-গিন্নীও খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

গালে হাত দিয়া বলিলেন—ওমা, এই বয়েসেই এই—শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কী দশা হবে মা,—একরত্তি মেয়ের কীর্ত্তি দেখে আমার তো—নিজের মেয়ে হ'লে কেটে ফেল্‌তুম না—

মেজ-গিন্নী কলিকাতার মেয়ে। শেষে সেই গাছ তুলিয়া লইয়া গিয়া, বাগানে পুঁতিয়া দিয়া তবে ছাড়িলেন। বলিলেন—অমন মেয়েতে কাজ নেই মা—সাতজন্ম বাঁজা থাকবো—

ঘোষালবাড়ীর ছেলের দল লইয়া মেজ-গিন্নী বিজয়িনীর মত বাড়ী ঢুকিলেন।

তারপর, সকলে চলিয়া গেলে শৈলর উপর সে কী শাস্তি। অন্য মেয়ে হইলে পিঠ বোধ হয় ভাঙিয়া যাইত। কিন্তু শৈল এতটুকু কাঁদিল না—এতটুকু নড়িল না। মস্ত একটা চ্যালাকাটের সাহায্যে সিদ্ধেশ্বরী সেদিন তাহাকে এমন শাস্তি দিলেন—শেষ পর্য্যন্ত তাহার পিঠের সে দাগ মিলায় নাই। সে শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া কত দিন সিদ্ধেশ্বরী আড়ালে কাঁদিয়াছেন। সামান্য একটা ফুলগাছ—তাহার জন্য এত ?

পরে কালীনাথই কৃষ্ণনগরের কাছারী-বাড়ী হইতে একটা টগর গাছ আনিয়া দিয়াছিলেন। সেই গাছই এখন এত বড় হইয়াছে—সেই গাছেই এখন এত ফুল ফুটিতেছে—কিন্তু যাহার জন্য এত, সে-ই আজ নাই। এক বর্ষারাত্রের দুর্য্যোগে কালীনাথ তাহাকে চুলকাটি-তলার শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছেন।—সে আর আসিবে না।

পিছন ফিরিয়া চাহিতেই সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—ওমা, তুমি কখন এলে ? বলিয়াই মাথার ঘোমটা টানিয়া দিলেন।

কালীনাথ বলিলেন—আশা কোথায়—বাগানে গেছে বুঝি ?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—ওসব আবার আন্‌লে কেন—যা'র জন্যে আনা—সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কথা বাধিয়া গেল।

কালীনাথের হাতে মাটির পুতুল। বলিলেন—আশার জন্যে আন্‌লাম—তা' কই সে ? বড় মেয়ে চলিয়া যাইবার পর আশার উপর তাঁহার যেন মায়া বাড়িয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী আসিলেই গোয়াড়ীর মাটির পুতুল তাঁহার আনা চাই। বড় মেয়ে যতদিন বাঁচিয়া ছিল তাহার জন্যও আনিতেন। বলিলেন—এই রদ্দুরে তা'কে আবার বাগানে পাঠানো কেন ?

সিদ্ধেশ্বরী আর পারিলেন না। বলিলেন—ওগো তা'র যে জ্বর—

—জ্বর ? তাই না কি ? কই—কালীনাথ ঘরে ঢুকিলেন। কিন্তু কেহ ত নাই। সিদ্ধেশ্বরীও ঘরে ঢুকিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। আশা কই ! এই তো একটু আগে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল। আর এখনি কোথায় গেল ? কালীনাথ ততক্ষণে ও-ঘর এ-ঘর সব দেখিয়া আবার বাহিরে দেখিতে আসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ডাকিলেন—ও আশা—আশা—

কোনও সাড়া নাই। কালীনাথ পাগলের মত হইয়া গেলেন। গেল কোথায় ! সারা বাড়ী কোথাও যে নাই। ঘোষালদের বাড়ী যায় নাই তো !—কালীনাথের একবার মনে হইয়াছিল। কিন্তু না, শৈল চলিয়া যাইবার পর হইতে আশা বড়-একটা কাহারো বাড়ীতে যায় না তো ! কোথাও ঘুমাইয়া পড়ে নাই তো !

কালীনাথের আনা পুতুলগুলা তখন উঠানের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। সেগুলি পা দিয়া লাথি মারিয়া কালীনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ওই পুতুলগুলিই যত অনিষ্টের মূল !

অনেক দিন আগের এমনি একটা ঘটনা তাঁহার মনে পড়িল। বর্ষাকাল—দু' দু'টা মকর্দ্দমা শেষ করিয়া কালীনাথ তখন একটু স্থির হইয়াছেন। গোয়াড়ী হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটা পুতুল কিনিয়া বাড়ী আসিলেন। পথে বৃষ্টির জলে তাঁহার পা কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

বাড়ীর বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন—শৈলী, ও শৈলী ? ওরে আশা—

শব্দ শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী বাহির হইয়াছিলেন—ওগো তুমি এসেছ—আমাদের শৈলবুঝি আর—

শেষ পর্য্যন্ত বলিতে হয় নাই। কালীনাথ ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তখন আর দাঁড়াইয়া ভাবিবার সময় ছিল না।

যাহা হউক, পায়ের কাদা আর সে রাত্রে ধোয়া হইল না। ধুইলেন পরদিন একেবারে শ্মশান হইতে ফিরিয়া। সেদিন পুতুল হাতে করিয়া আসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, আজো যে তাহাই দেখিবেন, ইহা তিনি আশা করেন নাই।

কালীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল: দীঘির ঘাটে যায় নাই তো!

কথাটা মনে পড়িতেই কালীনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। —তাই তো। এতক্ষণ সেখানে তো একবার দেখা হয় নাই। চারিদিকে বড় বড় গাছের ছায়ায় অত বড় দীঘি দিনের বেলায়ও অন্ধকার। কালীনাথ পৈঁঠার উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। গভীর কালো জলের উপর ততোধিক কালো কালো ছায়া ফেলিয়া গাছগুলি নিঃশব্দ শান্ত্রীর দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও কাহারো সাড়া শব্দ নাই। নিথর নীরব জলরাশি যেন থম্ থম্ করিতেছে। উত্তর দিকের কোণে ঢোল-কলমির বনের ভিতর কি যেন একটা ভাসিতেছে না? চলিতে গিয়া কালীনাথের পা কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। যাহাকে তিনি সন্দেহ করিয়াছিলেন—সেটি আর কিছু নয়—কচুরীপানা শুকাইয়া গাদা হইয়া ভাসিতেছে। বাড়ী আসিতেই কিন্তু সব গোলমাল চুকিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—কী মেয়ে জানো রান্না ঘরের ভেতর শৈলর পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে—এদিকে আমরা এত ডাকাডাকি এত চেঁচামেচি—

সে রাত্রেও আশার জ্বর ছাড়িল না।

. . .

দিনের বেলা আশা বেশ থাকে—যত গোল বাধে রাত্রে। আশার মনে হয়: দিদি যেন ওই টগর গাছটায় হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দাঁড়াইয়া তাহাকে হাত-ছানি দিয়া ডাকে। দূরে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়া একটা তারা রোজ মিটি-মিটি করিয়া জলে—ভোর হইলে আর থাকে না; কোথায় ঘোষালদের চিলে-কোটার আড়ালে সব লুকাইয়া পড়ে।—আবার রাত্রি হইলেই জানালাটার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে উঁকি মারিয়া দেখে।

আশার মনে হয়—যত রোগের মূল যেন ওই পুতুলের বাক্সটা!

শৈল যখন বাঁচিয়া ছিল তখন দু' মেয়ের ছিল পৃথক ব্যবস্থা। কালীনাথ যখন কৃষ্ণনগর হইতে পুতুল আনিতেন, তখন দু'জনের জন্য একই পুতুল দুইটা আনিতে হইত। একটা এতটুকু ফারাক হইলেই ঝগড়া।

কিন্তু শৈল চলিয়া যাইবার পর হইতে সমস্তই আশার অধিকারে আসিয়াছে। আশা ভাবে—ওইগুলা সে নিয়াছে বলিয়াই দিদি অমন করিয়া রোজ রোজ আসে। তাই সে অমন স্বপ্ন দেখে। ঘুমাইলেই মনে হয়: দিদি যেন টিপি টিপি পায় আসিয়া তাহার পুতুলের বাক্স নাড়িতেছে। ঘুমাইতে ঘুমাইতে আশা কত দিন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে—তারপর আস্তে আস্তে ও-ঘরে যেখানে পুতুলের বাক্স থাকে—সেখানে হাত বুলাইয়া দেখে: সব যেমনকার তেমনই আছে। শুধু দুঃস্বপ্ন!

দুই মেয়েরই আজন্ম পুতুল খেলার সখ!

অনেক দিন আগের একটা ছোট ঘটনা আজও আশার মনে আছে।

নোনাগঞ্জে রথের মেলা বসে। রথ তো মাত্র দু'দিন, কিন্তু মেলা চলে পনেরো দিন ধরিয়া। নোনাগঞ্জের পথে নৌকা করিয়া একবার ইচ্ছামতী পার হইতে হয়।

তখন রাত হইয়াছে। কালীনাথের সঙ্গে দুই মেয়ে রথের মেলা দেখিয়া ফিরিতেছিল। দুই জনেরই হাত বোঝাই খেলনা আর পুতুল; ভীড়ও কম নয়। সেই নৌকার উপরেই দুই মেয়েতে ঝগড়া বাধিয়া গেল।

ঝগড়ার কারণ সামান্য; কিন্তু তাহা যে পুতুল লইয়া তাহা আজো আশার মনে আছে।

আরম্ভ করিয়াছিল আশা। বলিয়াছিল—এই দেখ্ দিদি, আমার বেনে বউ বড়—তোরটা ছোট—এই দেখ্—দেখ ইদিকে—

একটু উনিশ-বিশ ছিল হয় ত।—হয় ত ছিল না!

পটুয়ার হাতের কাজ—দুইটা ঠিক এক মাপের হয় নাই হয় ত। কিন্তু তা' কে শোনে! ঝগড়া বাধিতে দেরি লাগিল না।

কালীনাথ প্রথমে কাণ দেন নাই। গ্রামের আরো অনেক লোক নৌকায় পারাপারের জন্য উঠিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গেই কথায় মাতিয়া ছিলেন। যখন ওদিকে নজর গেল—তখন কথা ছাড়িয়া তাহা হাতাহাতিতে নাবিয়াছে।

বলিলেন—করিস্ কি—ও আশা—ও যে তোর দিদি—বলিয়া আগাইয়া গেলেন।

কিন্তু বিপদ তখন উপায়ের বাহিরে—

আশা তাহার দিদিকে এক ঠেলা দিয়াছে! ঠেলা দেওয়াতে নৌকাও কাঁপিয়া উঠিয়াছে। শৈল ছিল নৌকার ধারে! নৌকা কাঁপিতে সে-ও কাঁপিয়া উঠিল।

হাত কাঁপিল, পা কাঁপিল, দেহ কাঁপিল; তারপরেই ঝপাং করিয়া এক শব্দ।—

যে-হোক একজন পড়িয়াছে সন্দেহ নাই।

নৌকা শুদ্ধ লোক তো ভয়ে বিস্ময়ে কাট হইয়া গেল। অন্ধকারে ভাল দেখিতেও পাওয়া যায়না! কিন্তু শৈল পড়ে নাই—পড়িয়াছে তাহার পুতুল; একটিও নাই,—সব।

মেয়েদের বকিবেন তিনি পরে, আপাততঃ ব্যাপার দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন!

কপালের গ্রহ ছিল;—সেই রাত্রেই কালীনাথ আবার নোনাগঞ্জের মেলায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এবং সেই রকম দেখিয়া আবার প্রত্যেকটি পুতুল মিলাইয়া মিলাইয়া কিনিয়া তবে শান্তি!

মেয়েদের জন্য কালীনাথকে কি কম ভুগিতে হইয়াছে! তবু ইহাতেই কালীনাথের আনন্দ; ভাবিতেন: ছেলে তাঁহার নাই—মেয়েদের যখন বিবাহ হইয়া যাইবে—তখন কী লইয়া তিনি বাঁচিবেন? কিন্তু বিবাহ হইবার আগেই কালীনাথের চোখের সমুখ দিয়া একটি তো চলিয়া গেল।

চোখের সমুখ দিয়াই বটে।

সে বর্ষা রাত্রের দুর্য্যোগের কথা আজো কালীনাথের চোখের সম্মুখে জাগিয়া আছে।

বাহিরে বিপুল অন্ধকার—বৃষ্টি যেন থামিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। পাশাপাশি বাড়ীর কয়েকটা লোক জড়ো হইয়াছিল; তাহারাই শ্মশানে যাইবে। কিন্তু মুস্কিল বাধিল সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া। পাগলের মত সেই মৃত্যুশয্যায় মৃত কন্যাকে তিনি জড়াইয়া রহিলেন। বাহকদের মধ্যে একজন আগাইয়া গেল। বলিল—ও কাকিমা উঠুন—অমন অবুঝ হ'লে—

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী কোনও কথা শুনিতে চান্ না। কেহ কাছে যাইলেই চীৎকার করিয়া বলেন—ওগো না না—আমি ছাড়বো না—

তখন কে-ই বা বোঝে আর কে-ই বা বোঝায়। কালীনাথ তখন এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু সত্যই কয়েকজনের সাহস ছিল বলিতে হইবে! তাহারা অমন বিশ-পঞ্চাশ বার শ্মশানে গিয়াছে।—শব বহিয়া তাহাদের কাঁধে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।—শেষে তাহারাই আগাইয়া গেল। বলিল—নাঃ—এ তোমাদের কম্ম নয়—এইটুকুতেই—দেখি—

আশা ও সিদ্ধেশ্বরীর নিকট হইতে তাহারা একরকম জোর করিয়াই শবদেহ ছিনাইয়া লইয়া গেল। কালীনাথের আজো মনে আছে আশা বড় সড়কের গাব গাছ পর্য্যন্ত কেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল।—সে কী কান্না!

—ও দিদি, তোর পুতুল নিবিনে?—আমি আর নেব না—কখ্খনো নেব না—ও দিদি—শুন্‌লি—

মুস্কিল বাধিয়াছিল চিতা জ্বালাইবার সময়। ভিজা কাট জ্বালিতে গিয়া দশ আঁটি পাট্‌কাটি খরচ হইয়া গেল। যাহা হউক—সে-রাত্রে জ্বলে নাই—জ্বলিয়াছিল পরদিন। মৃতদেহ ততক্ষণে সারা রাত্রি জলে ভিজিয়া ঢোল হইয়া গেছে। সেই মৃতদেহ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—কালীনাথ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

পরের বার কৃষ্ণনগর হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় আবার পুতুল কিনিবার দরকার হইল।

কালীনাথ পুরানো খরিদ্দার। দোকানী বলে—এবার আজ্ঞে এই মাটির খরগোস দুটো নিয়ে যান দিকি কর্ত্তা—

—দেখো শ্রীবিলাস দু'টো যেন এক রকম হয়—নইলে জানতো মেয়েদের—

দোকানী সে কথা জানিত। নিঃসন্দেহে পুতুলটা কালীনাথের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তখনও কালীনাথের কিছুই মনে হয় নাই। ভুল ভাঙিয়াছে রাস্তায় আসিয়া। এমনি কতবার।

বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরীরও অমন হইত।

সিদ্ধেশ্বরীর দুই পাশে দুইজন শুইত। আশা শুইত বাঁদিকে—শৈল ডানদিকে। দুই দিকে দুইজনের সমান ভাগ। কিন্তু তবু দুই মেয়েতে ঝগড়া। সিদ্ধেশ্বরী কাহার দিকে পাশ ফিরিবেন তাহাই লইয়া ঝগড়া। শেষে অনন্যোপায় হইয়া সিদ্ধেশ্বরী সোজা উপর দিকে মুখ করিয়া শুইতেন। কিন্তু ঘুম আসিলেই আবার কখন পাশ ফিরিয়া শুইতেন। আবার ঝগড়া সুরু হইত।

সিদ্ধেশ্বরী ঘুমের ঘোরে রাগিয়া উঠিতেন: না মা, তোদের জ্বালায় আর—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবি শুনি—তখন তো আমি যাচ্ছিনে সঙ্গে—

একদিন ঘুমের ঘোরে সিদ্ধেশ্বরী একেবারে দেয়ালের দিকে ঘেঁসিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ আচম্‌কা ঘুম ভাঙিতেই ভয়ে এদিকে সরিয়া আসিয়াছেন।—তাই তো! অজান্তে একেবারে শৈলর ঘাড়ের ওপর গিয়া শুইয়াছিলেন নাকি? ছি-ছি—

—শৈলী ও শৈলী—দেখেছ, মেয়ের সাড় নেই একেবারে—

কিন্তু বলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন। শৈল তো নাই! যাহাকে ঠেলা, সে শৈল নয়—আশা।

শৈলর জায়গায় আশা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে।

শৈল যাইবার পর হইতেই আশা যেন কেমন-কেমন হইয়া গিয়াছে। সব বিষয়েই নির্লিপ্ত। ওই মেয়েই যে আগে অমন করিয়া ঝগড়া কোন্দল করিত, এখন আর তাহা বিশ্বাস করিবার গোটি নাই। কোনও জিনিষে স্পৃহা নাই। দাও ভাল—না-দাও চাহিবে না। পিঠোপিঠি মেয়ে—দু'টিতে একসঙ্গে বড় হইয়াছে—একসঙ্গে খেলিয়াছে—এক বাড়ীতে মানুষ—ছোটবেলা হইতে দুটিতে ছাড়াছাড়ি হয় নাই।—

সিদ্ধেশ্বরী ভাবিলেন: শৈল তো গিয়াছে উপায় নাই—কিন্তু আশাও যাইবে না কি? না, না। সিদ্ধেশ্বরী কাছে গিয়া বসিলেন।—ও আশা—ওমা—এখন কেমন আছিস্ মা—?

বিছানার উপর পুতুলগুলা ছিল। সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন—ওমা—অত পুতুল—সব কি হোল?

আশা বলে—দিদির পুতুলগুলো আর নেব না মা—ও থাক্।

এই পুতুলগুলা লইয়াই আশা কত দিন দিদির সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে! সে অনেক দিনের কথা: আগের দিন শৈলর জ্বর আসিয়াছে।—অনাদি কবিরাজ আসিয়া সেদিন বড়ি দিয়া গিয়াছেন। জ্বর-দেহে শৈল বিছানার উপর শুইয়া আছে—কিন্তু তবু প্রশ্নের বিরাম নাই।—এলোপাতাড়ি অসম্বদ্ধ প্রশ্ন।

—হ্যাঁ মা, আশা কই, বাগানে গেছে বুঝি?

—ও মা, ওই দেখ, ঘোষালদের বুধি আসছে—ওই আমার টগরগাছটা সব খেলে—খেলে—ওই খেলে—

—হ্যাঁমা—তোমার খাওয়া হয়েছে? আশার? কি দিয়ে খেলে—আমি সেরে উঠলে কিন্তু পুঁইশাকের ডাঁটা দিয়ে ভাত খাবো—আর অম্বল—

—মা, একটা কথা শোন কাণে কাণে—নীচু হও—আরো—কাউকে বোল না—এই—কাউকে বল্‌বে না বল—ঠিক?—ঘোষালদের কেষ্ট না—তামাক খায়—হ্যাঁ খায়—আমি দেখেছি—

তার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলে—হ্যাঁ মা, আমাদের পাথকো'তে না কি সাপ পড়েছে—আশা বলছিল—সব মিছে কথা—

হঠাৎ শৈলর মুখটা দৃঢ় হইয়া উঠিল। চোখে উদ্বেগ—দেহ কাঁপিতেছে। দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হঠাৎ শৈল যেন উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। সিদ্ধেশ্বরী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—ও কি—উঠিস্‌নে—উঠিস্‌নে—করিস কি—?—

কিন্তু কে কা'র কথা শোনে? শৈল উঠিবেই! সিদ্ধেশ্বরী শৈলর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখেন: বাহিরে আশা যাইতেছে। আশার হাতে শৈলর পুতুলের বাক্স।

শৈল চীৎকার করিয়া উঠিল—ওমা, ওই আমার সব পুতুল নিলে—নিলে—নিলে-এ—

সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া বাহিরে গেলেন।—ওরে ও আশা—দে—দিয়ে যা—শুন্‌লি—?—

আশা পলাইয়া গেল—কিন্তু সেই রাত্রেই শৈলর জ্বর বাড়িয়া গেল। সেই যে বাড়িয়াছিল, আর থামে নাই। বেঘোর বেহুঁস অবস্থায় পাঁচ দিন কাটিল।

আশা কাছে গেল।—ও দিদি—চোখ্‌ তোল—চেয়ে দেখ্‌—এই তোর পুতুল নে—এই-নে দিদি—

দিদি শুনিতে পাইল কি না কে জানে—কিন্তু কথা বলিল না। তাহার নিস্পলক দৃষ্টি ঘোলা হইয়া আসিল—কণ্ঠনালী একটু নড়িল,—ঠোঁট দু'টি কাঁপিয়া স্থির হইল। তেমনি করিয়াই কাটিল রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত। সিদ্ধেশ্বরী গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—জ্বর ছাড়িয়াছে—কিন্তু বুকের স্পন্দনও যেন আর নাই।

কালীনাথ তখন আসিয়া পড়িয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের শব্দে সেই বর্ষার দুর্য্যোগ রাত্রি কেমন করিয়া থমকিয়া উঠিয়াছিল—সে কথা আজ ভুলিয়া যাইবার নয়।

বিকালবেলা বিছানায় শুইয়া আশা জানালাটা খুলিয়া দিল। টগর গাছটা এখান হইতে স্পষ্ট দেখা যায়।

ওইখানে এই খানিক পরেই রাত্রি যখন গভীর হইবে—দিদি আসিবে। দিদি ওইখানে রোজ আসিয়া দাঁড়ায়। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কতদিন আচম্‌কা আশার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিতেই আশা দেখিয়াছে: ওই টগরগাছটিতে হেলান্‌ দিয়া দিদি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাদা কাপড় পরা—ছোট একটি কাঁচপোকার টিপ্‌ কপালের মাঝখানে চক্‌ চক্‌ করে—খোঁপার উপর একটি টগর ফুল গাঁথিয়া দেওয়া।

আশা শুইয়া শুইয়া একটা ফন্দী ঠিক করিল।—

একদিন রাত্রে যখন কেউ কোথাও থাকিবে না—চারিদিকে নিবিড় নিশুতি—চাঁদটা যখন ঘোষালদের চিলে-কোটার আড়ালে ডুবিয়া যাইবে—সেই সময় দিদির পুতুলের বাক্সটা ওইখানে ওই গাছতলায় রাখিয়া চলিয়া যাইবে।

সেই ভাল ; যাহার পুতুল সেই আসিয়া লইয়া যাক্‌। সেই ভাল—সেই ভাল!

পরদিন সকালবেলা কালীনাথের চলিয়া যাইবার কথা। এবার কৃষ্ণনগর হইতে ডাক্তার লইয়া আসিবেন। ভোর থাকিতে থাকিতে রওনা হইতে হইবে। পাঁচ মাইল দূরে ষ্টেশন—হাঁটিয়া যাইলেও কম সময় লাগে না।

খুব রাত থাকিতে থাকিতে কালীনাথ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। উঠিয়া একবার বাগানের দিকে গেলেন। প্রকাণ্ড আম বাগান। দু' একটা পাকিতে সুরু হইয়াছে—এখন হইতেই আম চুরী সুরু হয়। রাত থাকিতে থাকিতে সাত পাড়ার লোক অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া গাছে উঠিয়া আম পাড়িয়া লইয়া যায়। কালীনাথ বাগানে গিয়া কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; রাত্রি বোধ হয় এখনও অনেক—কালীনাথ আন্দাজ বুঝিতে পারেন নাই।

মস্ত বড় জামগাছটা পথের উপরেই পড়ে। জাম এখন পাকিবার সময় নয়—পাকিবে সেই জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি ; এখন কচি কচি জামে গাছটা ভরিয়া গিয়াছে। ছোটবেলায় কালীনাথ এই গাছটা হইতে একবার পড়িয়া গিয়াছিলেন। পড়িয়া ডান পা'টা কাটিয়া গিয়াছিল। আজও বোধ হয় কাটার দাগ আছে।

সে এক বড় মজার ব্যাপার।

হঠাৎ গুজব উঠিয়াছে: গ্রামে বাঘ আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইতেই যে যাহার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে ; রাত্রে গ্রাম যখন নিশুতি—অন্ধকারের তন্দ্রা ভেদ করিয়া কত বিকট শব্দ সকলের কাণে আসে। সকলেই শুনিতে পায় যেন কাছাকাছি পোয়াটেক্‌ পথ দূরেই সারা পল্লী চকিত সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া শব্দ হইতেছে—ফেউ ফেউ—

ওই শব্দের ইঙ্গিত যে কিসের—তাহা আর কাহারো জানিতে বাকি নাই।

কালীনাথ তখন ছোট। ভাজনঘাটার ইস্কুল হইতে ফুটবল খেলিয়া ফিরিতেছেন। পথেই কিন্তু রাত্রি হইয়া গেল। কালীনাথ সোজা আসিতেছিলেন। জোলের মাঠ পার হইয়া—নলগাড়ীর খাল—তারপর আমবাগান ; আমবাগানের ভিতর দিয়াই পথ। আসিতে আসিতে হঠাৎ কাছাকাছি যেন কোথায় ছুপ্‌ ছুপ্‌ শব্দ হইল। তারপরেই কোথায় যেন হঠাৎ শুক্‌নো পাতার উপর চলিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি শব্দ হইল। হাঁকের কাছে

এই আম গাছটা ছিল ; কালীনাথ ইহারই উপর উঠিলেন। উপরে উঠিয়া দেখেন : নীচে মস্ত বড় এক—

ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়িল। রাত এখন অনেক নিশ্চয়ই। পথ দিয়া গরুর গাড়ী আসিতেছিল। রাত্রি দশটার ট্রেণ ধরাইয়া গাড়ী এখন ফিরিতেছে। গাড়ী কাছে আসিতেই নন্দ বলিল—কে? খুড়োমশাই নাকি? এত রাত্রে এখেনে?

কালীনাথ বলিলেন—কত আর রাত, ভোর তো হোল বলে—

নন্দ বলিল—ভোর কোথায়? গরমের দিনে কি রাত ফোরবার যো আছে আজ্ঞে—রাত এখন তিন পো—

কালীনাথ ফিরিতেছিলেন। নন্দ বলিতেছিল—গাঁয়ে লোকজন যাচ্ছে মরে' ঝরে'—বন জঙ্গলও বাড়ছে তেমনি—আপনি তো আর দেশে থাকেন না, আমাদের চলাফেরা বন্ধ করতে হবে, খুড়োমশাই—

—কেন, কি হোল তোমাদের?

নন্দ যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। চুপি চুপি বলিল—কেন, আপনি শোনেন নি কিছু? কিছু শোনেন নি—

কালীনাথ বলিলেন—শুনেছি বৈ কি,—জমিদারের খাজনার কথা বোলছ তো?

নন্দ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—ও, আপনি শোনেন নি তা' হ'লে,—শুনুন তবে—আমি নিজের চোখে দেখিছি, খুড়োমশাই—দিদি আমার এইখেনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—একটা সাদা শাড়ী পরা—কপালে কাঁচপোকার টিপ, খোঁপায় ফুল গোঁজা—আমায় দেখে দিদি আবার সরে' গেলেন আড়ালে—বোধ করি চিন্‌তে পারলেন—আহা, চিনবেন না, কোলে পিঠে করে' এই সেদিনও বেড়িয়েছি—

কালীনাথ তবু কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—কা'র কথা বলছ, নন্দ?

নন্দ তেমনি ভাবেই বলিতে লাগিল—তা' যেমন ভাল মানুষটি ছিলেন দিদিটি আমার—বুঝলেন খুড়োমশাই—এখনও তেমনি—সেদিন, ওই সিঁদুরে আমগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন—ঝম্ ঝম্ করে' বিষ্টি হচ্ছে—আমি গাড়ী নিয়ে আসছিলাম, থমকে গেলাম—তা' একটু ভয় হয় বৈকি—কি বলেন—হয় না? ভাবলাম একবার ডাকি—ও দিদি—শৈল দিদি—

—আমাদের শৈলর কথা বলছ?—বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে কালীনাথ প্রশ্ন করিলেন।

—তারই কথা তো বল্‌ছি—তা' বলা তো যায় না, ওঁদের একটু ভয়-ভক্তি করে' চলতে হয়, নইলে—বদনগঞ্জের একাদশী বিশ্বেসের কি হয়েছিল জানেন তো—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে—

কোন এক একাদশী বিশ্বাসের কি হইয়াছিল কালীনাথ সে কথা শুনিলেন না ; তিনি ফিরিলেন। সিঁদুরে আমগাছতলায় আজ এখনি একবার দেখিতে হইবে!—আজো যদি শৈল সেখানে আসিয়া থাকে? এখনও রাত্রি আছে—কালীনাথ চলিলেন।

নন্দ গাড়ী থামাইয়া বলিল—যাবেন না খুড়োমশাই, কাজ নেই—না দেখেছেন—সেই ভালো—নইলে বদনগাছের একাদশী বিশ্বে—

কিন্তু কালীনাথ শুনিলেন না। পায়ের তলায় শুক্‌নো পাতা জমিয়াছে ; চলিতে গেলেই খস্ খস্ শব্দ হয়—

প্রকাণ্ড বাগান। নিস্তব্ধ বনস্থলী যেন কাহার আশায় প্রতীক্ষমান। বনপুরীর অভ্যন্তরে অন্ধকারের রাজত্ব। ও অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়। বন-রাজ্যের ভিতর নিঃশব্দ সান্ত্রীর দল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কালীনাথ যে আগন্তুক—কালীনাথ যে উঁহাদের রাজত্বে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছেন—ইহাতে যেন এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। কালীনাথ যেন উঁহাদেরই আত্মীয়—ওই অন্ধকারেই কালীনাথ মানুষ হইয়াছেন।

তাঁহার মনে হয় : এ পৃথিবী হইতে যত কিছু হারাইয়া গিয়াছে—ওই আকাশ হইতে যত তারকা খসিয়া গিয়াছে—যত কিছু অনাগত—যত কিছু বিগত, সব যেন ওই অন্ধকারকে কেন্দ্র করিয়া আছে। আমরা সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া দীপমালা জ্বালিয়াছি—কোথাও অন্ধকার রাখিব না পণ করিয়াছি, তাই আমাদের চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে—সারা জগৎ অন্ধকার না করিলে বুঝি আর আমাদের চোখ ফুটিবে না ;···ফুলের মতন অন্ধকারের রাজত্বে বসিয়াই আলোর সাধনা করিতে হইবে—

কিন্তু কালীনাথের মনে হইল : দূরে ওই যে সাদা

কাপড় পরা মূর্ত্তিটি—ওই শৈল নয় তো? বাবাকে দেখিয়া হয় ত সরিয়া যাইতেছে—ভয় কি মা—আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না!

পায়ের তলায় মর্ম্মর শব্দ হইতেছে—তবু কালীনাথ তাহারই উপর দিয়া চলিলেন। আকাশে চাঁদ নাই—অন্ধকারের ভীড়ে কালীনাথ যেন দিক-ভুল করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই নিশীথ রাত্রে হয় ত এমন করিয়া এখানে আসা উচিত হয় নাই। সারাদিন সূর্য্যের আলোয় যাহারা দিকচক্রবালের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে—এই তমাচ্ছন্ন রাত্রেই আবার তাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়া বিচরণ করে; বোধ করি এই অন্ধকারেই তাহাদের সুযোগ। পৃথিবীর যত আত্মা চলিয়া গিয়াছে, যত হাসি কান্না—যত আলো ছায়া একদিন বিদায় লইয়াছে, তাহারা যেন সবাই এই অন্ধকারে বাসা বাঁধিয়া আছে। যেদিন একাগ্রমনে আমরা এই অন্ধকারের রাজ্যে তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইব—মনে-প্রাণে তাহাদের কামনা করিব, সেদিন আবার তাহারা আসিবে। এ পৃথিবী হইতে কেহ হারায় নাই—কিছু চলিয়া যায় নাই। সবাই কোন-না-কোন স্থানে আত্মগোপন করিয়া আছে,—আমরা আলো জ্বালাইয়াছি বলিয়াই তাহারা লুকাইয়া থাকে।

ভাবিতে ভাবিতে কালীনাথ কোন্ অতীতের রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন।

—ও বাবা, বাবা, দেখেছ—দেখ, সিঁদুরে গাছতলায় তিনটে আম পড়ে ছিল—বাগানে গেলাম তাই তো!

—ওমা আমার কি হবে—দেখ দেখ—খাজা গাছের কাঁটালগুলো সব চুরি করে' নিয়েছে—এ ওই উজীর মণ্ডলের কাণ্ড।

—তুমি কিছু জান না বাবা, ওটা যে কাঁচামিঠে,—টিপ্‌ চাল্‌তে তো ও বাগানে—

—ও বাবা, ওই একটা আম পড়লো—ওই—শুন্‌লে?

ছোট ছোট কথা—দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি—তবু প্রত্যেকটি আজো কালীনাথের মনে রেখাপাত করিয়া আছে। যেদিন রাত্রে ঝড় হইত সেদিন শৈলর সে কি মাতামাতি! উপর্য্যুপরি বৃষ্টি পড়িতেছে—কাপড় ভিজিয়াছে—মাথা ভিজিয়াছে—কিন্তু তবু কাহারো কথা শুনিবে না। বাগান হইতে আম কুড়াইয়া আনিয়া ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিবে। আম খাইত তো ভারী—কুড়াইতেই তাহার যত আনন্দ!

কিন্তু একবার কালীনাথের মনে হইল: কেনই বা সে আসিবে! চুলকাটিতলার শ্মশানে কালীনাথ তাহাকে নিজে গিয়া পুড়াইয়া আসিয়াছেন।—কালীনাথ নিজের চোখে দেখিয়াছেন: তাহার দেহ তিল তিল করিয়া ভস্ম হইয়া গেল।—খুঁজিলে আজ সেখানে এতটুকু কণাও আর যে তাহার পাওয়া যাইবে না। যে চলিয়া যায়—সে আবার আসে না কি! যত সব মিথ্যা কথা—কুসংস্কার। সে মরিয়া গিয়াছে—সে কেমন করিয়া আসিবে? ভুল, ভুল, নিশ্চয়ই ভুল! উহাদের চোখের ভুল—মতিভ্রম! কালীনাথ নিজের মনেই হাসিয়া উঠিলেন—নিশ্চয় ভুল! এমন কথা না কি বিশ্বাস করিতে হইবে! ভূত বিশ্বাস করিবে ছোট ছেলেরা! কালীনাথ নিজের মনেই আর একবার হাসিয়া উঠিলেন—ভুল বৈ কি! নিশ্চয় ভুল!

কালীনাথ ফিরিলেন।

দীঘির পাশ দিয়া রাস্তা। এখানটায় অন্ধকার যেন আরো গাঢ়; কালো জলের উপর ততোধিক কালো গাছের ছায়া পড়িয়া দীঘির গাম্ভীর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার বাড়ীর দিকে নজর পড়িল:

উঠানের উপর যেখানটায় টগর গাছ ঠিক সেইখানে—গাছের তলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে না? কালীনাথ ভাল করিয়া দেখিলেন: তবে তো মিথ্যা নয়—যাহা শুনিয়াছেন, সব সত্য! ধ্রুব সত্য! শৈলই তো বটে! আগে ঠিক যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনি আছে।—কই, চেহারায় তো তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই!

কালীনাথ পা টিপিয়া টিপিয়া আগাইয়া গেলেন। শৈল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। একবার কালীনাথের মনে হইল: স্বপ্ন নয় তো! যদি স্বপ্নই হয়! নিজের দেহ স্পর্শ করিলেন—চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন: না স্বপ্ন নয়—এতটুকু মিথ্যা নয়। তিনি ঠিক দেখিতেছেন। শৈল আসিয়াছে। শৈল—তাঁহার মেয়ে—যে মেয়েকে তিনি চুলকাটিতলার শ্মশানে নিজে পোড়াইয়া

আসিয়াছেন! শৈল আসিয়াছে তবে! বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে সন্দেহে কালীনাথের মুখে কথা বন্ধ হইয়া গেছে—দেহে স্পন্দন থামিয়া গেল যেন।

শৈল আসিয়াছে—আসিয়াছে ঠিক! মিথ্যা সন্দেহ! যে চোখ দিয়া এতকাল কৃষ্ণনগরের কাছারীর কাজ করিয়াছেন সেই চোখ দিয়া কালীনাথ দেখিতেছেন। কতক্ষণ কাটিয়া গেল—এবার কালীনাথের সাহস আসিয়াছে!

আস্তে আস্তে কালীনাথ পিছনে গিয়া ডাকিলেন—শৈল—ওমা—

শৈল পিছন ফিরিল। কিন্তু মুখখানা দেখিয়াই অধিকতর বিস্ময়ে কলীনাথের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের রক্ত-চলাচল যেন ক্ষণিকের জন্ত বন্ধ হইয়া গেল।

—আশা? তুই?—এখানে?—এত রাতে?—

আশার মুখে কথা নাই। কালীনাথ বুঝিলেন জরের ঘোরে এমনি করিয়া এখানে আসিয়াছে। বলিলেন—চল্—ঘরে চল্—উঃ—গা যে পুড়ে যাচ্ছে একেবারে—

আশাকে ধরিয়া লইয়া কালীনাথ ঘরে যাইতেছিলেন; কিন্তু গাছতলায় পুতুলের বাক্স দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

—এগুলো এখেনে কেন রে—এ বুঝি তোর দিদির—?

শেষে আশা সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া কালীনাথ হাসিয়া উঠিলেন।—দূর পাগলী—তাই কখনো হয়—সে কেন নিতে যাবে—? চল্—ঘরে শুবি চল্—ও থাক্—ওখেনেই পড়ে' থাক্—

ভোর হইতে তখনও বহু দেরী! আশার মনে হইল, এখনও সময় আছে! দিদি আসিবার এখনো ঢের সময় আছে!

দিদি সত্যসত্যই আসিয়াছিল বলিতে হইবে। আশা ভোরবেলা জানালা খুলিয়া দেখিল: গাছতলায় পুতুলের বাক্স নাই। আনন্দে আশার চোখ দু'টি উজ্জল হইয়াছে! দিদি তবে রাগ করে নাই!—অভিমান করে নাই!

আশা যেন নূতন মানুষ! একদিনেই তাহার যেন নূতন শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। দিদির কাছে সে ঋণ-মুক্ত!—দিদি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে! সন্ধ্যার দিকে আশার জর একেবারে ছাড়িয়া গেল।

আশা বলে—হ্যাঁ বাবা, রাতের বেলা আমরা যখন চলে এলাম না, দিদি তখনই এসেছিল—

কালীনাথ বলিলেন—তা' হ'বে—ভালই হয়েছে—যা'র জিনিষ সেই নিয়েছে—

সকাল বেলাই কালীনাথের যাবার কথা ছিল—কিন্তু গাড়ী পাওয়া গেল না। ভাবিয়াছিলেন রাত্রের গাড়ীতে যাইলেই হইবে!...সন্ধ্যাবেলা আশার জর ছাড়িয়া যাওয়াতে ডাক্তার ডাকিবার দরকার হইল না। কালীনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাজে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দশটায় গাড়ী—সেইটাতেই যাওয়া। আশা তখন ঘুমাইতেছে।

সিদ্ধেশ্বরী গোছগাছ করিতেছিলেন—

—এই কাপড়টাতে আমসত্ব বেঁধে দিলাম—বুঝেছ—ভাতের সঙ্গে রোজ খেও—আর এইটেতে সরের ঘি, আর দেখ, দুধ এ মাস থেকে এক সের করে' নিও—না খেলে—যে খাটুনি—

—আর গোপালের মা'কে এই থান্‌টা আর সিঁদুরে গাছের আমক'টা দেবে—তোমাকে কত যত্ন-আত্তি করে—আর এবার আসার সময় একখানা আট হাতি ধুতি এনো তো—ঠাকুর মশাইকে দেব—

—ওই দেখ—আসল জিনিষই ভুলে গেছি—তোমার মাথা ধরে বলো—এই মাদুলিটা আনিয়ে রেখেছি, আমাবস্তের দিন বাসিমুখে জল দেবার আগে এটা ধারণ কোর দিকি—মনে থাকবে তো—যে ভুলো মন তোমার—

সিদ্ধেশ্বরী প্রত্যেকটি পুঁটুলি বাঁধিতেছেন, আর প্রত্যেকবার তাহার বিশদ বিবরণ দিতেছেন—

—এই দেখ, যেটি না দেখব সেটিই—পাঁচকড়ির দরুণ যে মুগ্ এক কাঠা দেবার কথা ছিল না,—তা' কি দিয়েছে দেখ—বেগার-ঠেলার কাজ—

তার পর খানিক থামিয়া বলিলেন—ওটা কি—ওই যে পুঁটুলিটা—ওটাতে আবার কি?

কালীনাথ তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা নিজের কাছে

সরাইয়া লইলেন।—না—না ওতে কিছু নেই, ও আমার দলিল-পত্তর,—ও কিছু না—

—দেখি—দেখি না—ওটা যদি খালি থাকে—গোটাকতক কাগ্‌জি-লেবু পুরে দি—দাও—

—না গো না—ওতে আমার দরকারী কাগজপত্তর আছে—কালীনাথ পুঁটুলিটা নিজের হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া রাখিলেন।

চারিদিকে বেশ অন্ধকার করিয়া আসিয়াছে; বাহিরে নন্দ গাড়ী লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কালীনাথ গিয়া উঠিলেন—

—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা—আশা কেমন থাকে লিখো, বুঝলে। গণেশ মাষ্টারকে না পাও তো—ঘোষালদের কেষ্টকে একটা পয়সা দিলেই লিখে দেবেখন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

নন্দ বলিল—হুঁকো নিয়েছেন তো খুড়োমশাই, পথে যদি খান্—আমি তামাক্ এনেছি—জয়চণ্ডীপুরের গুড়-তামাক খেয়ে দেখবেনখন্—অম্বুরিকে হার মানিয়ে দেয়—

গাড়ী টগর গাছ ছাড়িয়া—গাবগাছ-তলা দিয়া বড় সড়কে পড়িল। বাঁশঝাড় বাঁয়ে রাখিয়া দীঘির পাশ দিয়া রাস্তা। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

ছইএর ভিতর বসিয়া কালীনাথ সেই কাগজ-পত্রের পুঁটুলিটা খুলিলেন। কাগজপত্রের কথাটা মিথ্যা; কালীনাথ প্রত্যেকটি পুতুল হাত দিয়া স্পর্শ করিলেন। পুতুলগুলি শৈলর। এই পুতুলগুলিই একদিন তিনি কত যত্নে মেয়ের জন্ত কিনিয়া আনিয়াছেন—আজ এই গুলিই আবার নিজের হাতে ফেলিয়া দিতে হইবে। এই পুতুলগুলির জন্তই তো আশার যত অসুখ। আশার কথাগুলি কালীনাথের মনে পড়িল—হ্যাঁ বাবা, কাল রাতের বেলা আমরা যখন চলে' এলাম না, দিদি তখনই এসেছিল—

কালীনাথের হাসি আসিল। কালীনাথ যে উহাকে কতখানি ঠকাইলেন তা' তো সে জানিল না। ছোট মেয়ে, এখনও বয়স কম—সব বুঝিতে শেখে নাই। ভূত তো উহারাই বিশ্বাস করিবে। যে মরিয়া যায় সে আবার আসে না কি। উহাদের মনের ভুল। কালীনাথ তাহাকে নিজে চুলকাটিতলায় গিয়া পোড়াইয়া আসিয়াছেন। তাহার দেহ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেছে—এ কালীনাথের স্বচক্ষে দেখা! ভুল বৈ কি!—নিশ্চয় ভুল!

—নন্দ, দীঘির পাড়ে গাড়ীটা একবার লাগিও দিকি—একটু নাব্‌বো—

নন্দ গাড়ী থামাইল। বলিল—হুঁকোর জল ফিরিয়ে নেবেন বুঝি—নিন্—ও-কথা আমার মনেই ছিল না আজ্ঞে—

কালীনাথ পুঁটুলিটা লুকাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। দীঘির পৈঁঠা দিয়া নীচে নামিতে নামিতে কালীনাথের মনে হইল কেহ কোথাও নাই তো চারিদিকে। নন্দরও দেখিতে পাইবার কথা নয়।

কিন্তু ফেলিতে গিয়া কালীনাথের হাত যেন কাঁপিয়া উঠিল। আহা, একজনের কত আদরের, কত সাধের জিনিষগুলি।—ফেলিতে তাঁহার যেন কেমন মায়া হইল। আবার মনে হইল: না, যে বাঁচিয়া নাই, তা'র জিনিষ রাখিলেই বা কী—আর না-রাখিলেই বা কি! ওই পুতুলগুলার জন্তই যে আশার যা অসুখ। কালীনাথ হাত উঁচু করিলেন—কেবল ছাড়িয়া দিলেই হয়; ছাড়িয়া দিলেই ছলাৎ করিয়া একবার শব্দ হইবে—তার পর জলের উপর কয়েকটা ঢেউ উঠিবে, তার পর? তার পর কোন্ অতল তলায় তলাইয়া যাইবে, তা'র কি ঠিক আছে? কিন্তু কালীনাথের উঁচু করা হাত উঁচুই রহিল; পুঁটুলিটা যেন তাঁহার হাতের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। না, এ তিনি ফেলিতে পারিবেন না কখনও। কোন্ প্রাণে ফেলিবেন? এইগুলির সাথে একজনের কত স্মৃতিই জড়িত রহিয়াছে যে। কিন্তু এইগুলি দেখিলেই আবার আশার জ্বর হইবে—শৈলর মতন সে-ও তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবে।

আকাশ বাতাস পৃথিবী সব কিসের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। এই বুঝি গেল। কিন্তু কালীনাথ বজ্রমুষ্টিতে পুঁটুলিটা ধরিয়া রহিলেন। কে তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইবে—কাহারো সাধ্য নাই।

—কাহারো সাধ্য নাই। আকাশ বাতাসে যেন তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিল—না—নাই! কাছেই কোথ

একটা ঝিঁ ঝিঁ অনবরত ডাকিয়া চলিয়াছে; বাঁশঝাড়ের ভিতর ছোট একটু ফাঁক দিয়া কত্দূরে আকাশের একটি তারা যেন অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে! উহার মুখে উৎকণ্ঠা—চোখে আশঙ্কা—থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, না—না—ফেলিও না। কালীনাথের মুখ চোখ দৃঢ় গম্ভীর হইয়া উঠিল।—এ তিনি ফেলিবেন কেমন করিয়া? একজনের কত আদরের, কত সাধের জিনিষগুলি!

নন্দ উপর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—খুড়োমশাই, একটু বেশী করে' জল নেবেন হুঁকোয়—তামাকের হাতটা অম্নি ধুয়ে নেব—

হঠাৎ কি হইয়া গেল! কালীনাথ দেখিলেন—তাঁহার হাত হইতে পুঁটুলিটা পড়িয়া গিয়াছে। পড়িবা মাত্র ছলাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল।

কালীনাথের মনে হইল: মর্ম্মস্থলে বড় আঘাত পাইয়া কে যেন সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কালীনাথের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। যে ঝিঁ ঝিঁ পোকাটা এতক্ষণ ডাকিতেছিল সে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁশঝাড়ের ভিতর ছোট তারাটি যেন তাহার দিকে চাহিয়া বড় করুণ স্বরে বলিল—'করিলে কি?' আবার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সেই কথারই প্রতিধ্বনি উঠিল—'করিলে কি?' দীঘির পাড়ে নলখাগড়ার বনে চঞ্চল মর্ম্মরধ্বনি উঠিল; কালীনাথের মনে হইল: তাহার পায়ের কাছে দীঘির জল যেন পৈঁঠার উপর মাথা কুটিয়া তাঁহাকে কত কি নিবেদন করিতেছে!

উপায় নাই—এতক্ষণ সেগুলি কোন্ অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে তা'র কি ঠিক আছে?

কালীনাথ যে কখন গাড়ীতে উঠিয়াছেন, এবং কখন যে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে জ্ঞান তাঁহার তখন ছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল: এত বড় অপরাধের ক্ষমা নাই—ক্ষমা নাই তাঁহার! তাঁহার চোখের সমুখ হইতে যেন চির-পরিচিত পর্দ্দা সরিয়া গেছে।

নন্দর কথায় তাঁহার যেন চৈতন্য হইল।

নন্দ বলিতেছে—বুঝলেন খুড়োমশাই—এই সিঁদুরের আমগাছটা পেরোলেই—ছিলিম ধরাবো—এখানে নয়—বলা তো যায় না—ওঁদের একটু ভয়-ভক্তি করে চলতে হয়—নইলে, বদনগঞ্জের একাদশী বিশ্বেসের কি হয়েছিল, জানেন তো?—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে—

বদনগঞ্জের একাদশী বিশ্বাসের যাহাই হউক, কালীনাথের আজ সত্যই পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল!

চন্দ্রশেখর বসু

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গলা দেশের বাহিরে বৃহত্তর বঙ্গে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাঁহারা বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, বাঙ্গালী তাঁহাদের সংবাদ খুব কমই রাখিয়া থাকেন। চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এইরূপ একজন বাঙ্গালী। তিনি দ্বারভাঙ্গা রাজ্যে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, কয়জন বাঙ্গালী তাহার সংবাদ রাখেন? চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের পরলোক-গমনের মাসে আমরা তাই তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে শুনাইয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছি।

নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার রামসন্তোষ বসুর বংশ দক্ষিণ রাঢ়ীয় অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থ বংশ। ইঁহারা হুগলী জেলার মাইনগর সমাজভুক্ত বড়া বা খলিসানি গ্রাম নিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। ইঁহাদের এক শাখা পরে বারাসত মহকুমার অন্তর্গত আনরপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন। চন্দ্রশেখর বাবুর বৃদ্ধপ্রপিতামহ আনরপুরের বসু-বংশীয় রামসন্তোষ বসু মহাশয় পলাশী যুদ্ধের প্রায়—অনুমান সন ১১২১ অব্দে—পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে উলার অতি প্রসিদ্ধ এবং

মহা প্রতাপশালী মুস্তৌফী বংশীয় শিবরাম মুস্তৌফীর কন্যা তারিণীর পাণিগ্রহণ করিয়া, মুস্তৌফীদিগের জমিদারী হইতে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া উলার অধিবাসী হন। উলার মুস্তৌফীরা জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে মুস্তৌফী উপাধি ও জমিদারী পাইয়া মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। অনুমান ১১৬৬ সনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ৭০ বৎসর বয়সে রামসন্তোষ স্বর্গত হন। সেই হইতে তাঁহার বংশধরেরা উলায় বাস করিতেছেন।

রামসন্তোষের পুত্র রত্নেশ্বর জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। রত্নেশ্বরের পুত্র গুরুদাসও পিতার ন্যায় জপ-তপ ও শাস্ত্রালোচনা লইয়া কালাতিপাত করিতেন। অনুমান সন ১২৩৭ সালে ৬২ বৎসর বয়সে গুরুদাসের মৃত্যু হয়। গুরুদাসের পুত্র কালিদাস ও দেবীদাস। চন্দ্রশেখর বাবু কালিদাসের একমাত্র পুত্র। উলায় মহামারী আরম্ভ হইলে চন্দ্রশেখর সপরিবারে উলা ত্যাগ করেন; কিন্তু কালিদাস আর্ত্ত-সেবার্থ উলায় থাকিয়া যান এবং মহামারীতেই তাঁহারও মৃত্যু হয়। কালিদাস সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, এবং পরহিতার্থই আত্মপ্রাণ আহুতি দেন। অতিথি তাঁহার গৃহে আসিয়া কখনও বিমুখ হইত না।

সন ১২৪০ সালের ৮ই শ্রাবণ উলাগ্রামে চন্দ্রশেখরের জন্ম হয়। তাঁহার মাতামহ বংশ নদীয়া জেলার (অধুনা যশোহর জেলার) গুয়াতলি গ্রামের মিত্র বংশ। তাঁহারা কোন্নগরের মুখ্য কুলীন মিত্র বংশের শাখা।

চন্দ্রশেখর বাল্যকালে বাঙ্গলা, পার্শি, উর্দ্দু এবং পরে ইংরেজী শিক্ষা করেন। কিছু দিন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িবার পর বরিশালে মাতুলালয়ে গমন করিয়া তিনি সেখানকার একটি সামান্য স্কুলে কিছু দিন অধ্যয়ন করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জজ কলভিন সাহেব বরিশাল পরিদর্শনে গমন করিলে চন্দ্রশেখর স্কুলের ছাত্রদলের অগ্রণী হইয়া স্কুলটিকে গবর্ণমেণ্টের অধীন করিবার জন্য আবেদন করেন। সেই আবেদন অনুযায়ী, কলভিন সাহেবের চেষ্টায়, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্কুলটি গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর ঐ বিদ্যালয় হইতে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। ইহার পর তিনি কিছু দিন হুগলী কলেজে পড়িয়া-ছিলেন। অনন্তর তিনি কর্ম্ম-কাজের চেষ্টায় যশোহরের নিকটবর্ত্তী চূড়ামনকাটি গ্রামে গমন করেন, এবং তত্রত্য পাদরী জেমস সেল ও তদীয় পত্নীর সুপারিশে যশোহরের ডাকঘরে একটি সামান্য কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। চাকুরী প্রাপ্তির পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর ঐ গ্রামবাসী কেম্ব্রিজের এম-এ উপাধি-ধারী এণ্ডারসন নামক এক পাদরী সাহেবকে হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্র পড়াইতেন, এবং সাহেব তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন।

এই সময় নীলকরদিগের অত্যাচারে নদীয়া, যশোহর ও রাজসাহী জেলা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। পাদরী সাহেবরা এই অত্যাচার দমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড জেমস সেল সাহেবের উপদেশে চন্দ্রশেখর নানা স্থান হইতে নীলকরদিগের—বিশেষতঃ শ্যামচাঁদ-ভক্ত নীলকর সাহেবদিগের—অত্যাচারের ঘটনাগুলির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিতেন, এবং পাদরী সাহেবরা তদবলম্বনে রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেন। ইহার ফলে তিন বৎসর পরে কলিকাতায় নীলকর অত্যাচারের তদন্তকল্পে যে ইণ্ডিগো-কমিশন বসে, পাদরী জেমস সেল তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইণ্ডিগোক-মিশনে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মোল্লাহাটী কনসারণের কর্ত্তা ফারলং সাহেব নীল-করদিগের অত্যাচারের কথা স্বীকার করিলেন। তাঁহার সত্যবাদিতায় প্রসন্ন হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের ম্যানেজার করিয়া পাঠান। পাদরী সেল এবং অন্যান্য পাদরীরা এবং তাঁহাদের পত্নীরা চন্দ্রশেখরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহাকে খৃষ্টান হইবার জন্য প্রায়ই পীড়াপীড়ি করিতেন; এমন কি, তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য একটি সদ্গোপজাতীয়া খৃষ্টান যুবতীকে আনিয়া হাজির করেন এবং অনেক রকম প্রলোভন দেখান। কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবু কিছুতেই টলিলেন না দেখিয়া তাঁহারা বলেন, "চন্দ্র, তোমার মন প্রস্তরবৎ কঠিন।" তাহা শুনিয়া চন্দ্রশেখর অবশ্যই হাসিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর খৃষ্টান হইতে সম্মত না হইলেও তাঁহার প্রতি পাদরী সাহেবদের স্নেহমমতার একটুও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

১২৬৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৫৬) উলা গ্রামে মহামারী আরম্ভ হইলে চন্দ্রশেখর সপরিবারে বাঁশবেড়িয়া গ্রামে তাঁহার পিসির বাড়ী গিয়া আশ্রয় লয়েন। ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দ্রশেখর বর্দ্ধমানের কলেক্টারীতে ৩০ টাকা বেতনের একটি কেরাণীগিরি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় তিন মাসের মধ্যেই তাঁহার পদোন্নতি ঘটে এবং তিনি পরিবারবর্গকে কর্ম্মস্থলে লইয়া যান। বর্দ্ধমানের কলেক্টার হবহাউস (ইনি পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) সাহেব চন্দ্রশেখরের কর্ম্মকুশলতায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যখন (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) নদীয়া, যশোহর ও রাজসাহী জেলার নীলের আপীলের মোকদ্দমার বিচারার্থ অতিরিক্ত সিবিল ও সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন, তখন তিনি আগ্রহ সহকারে চন্দ্রশেখরকে নিজ আদালতের প্রথমে হেডক্লার্ক পরে সেরিস্তাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। হবহাউস সাহেব বিলাত চলিয়া গেলে চন্দ্রশেখর কিছু দিন লিট্লডেল সাহেবের অধীনে ঐ কর্ম্ম করেন। পরে বর্দ্ধমানের কলেক্টার ই, জি, বার্চ সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া স্বীয় সেরেস্তার হেডক্লার্ক পদে নিযুক্ত করেন। বর্দ্ধমানে থাকিতে চন্দ্রশেখরবাবু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ, পর বৎসর ফাল্গুন মাসে ব্রহ্মবিদ্যালয়, তিন বৎসর পরে দর্শন ও পুরাণ ইত্যাদির অনুশীলনার্থ ধর্ম্মসংসদ নামক একটি মাসিক সভা এবং ইহার কিছু কাল পরে ব্রহ্ম ইউনিয়ন নামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুল পরে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পরিণত হয়। বার্চ সাহেবের পর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব বর্দ্ধমানের কলেক্টার হইয়া আসিয়া চন্দ্রশেখরকে সেরিস্তাদারের পদ প্রদান করেন। ইনি চন্দ্রশেখরকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কলিকাতা পুলিশের কমিশনার হইয়া চলিয়া যাওয়ায় চন্দ্রশেখরের আর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। হগসাহেব চন্দ্রবাবুকে তাঁহার পিতা স্যার জেমস উইয়ার হগ বার্টের জমিদারী ও নীলকুঠির ম্যানেজার করিয়া পাঠাইলেন। চন্দ্রবাবু গণকে কখনো ছাড়িয়া দিলেন। তৎপূর্ব্বে জেমস ক্যাম্বেল ও এডওয়ার্ড টেলর এই দুইজন সাহেব নীলকুঠি ও জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন। ১৮৬৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর চন্দ্রশেখর সাহেবদের নিকট হইতে কার্য্যভার বুঝিয়া লইলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় বিদ্রোহী প্রজারা শান্ত হইল, মামলা মোকদ্দমার অধিকাংশ আপোস মীমাংসা হইল, বাকী করও প্রভূত পরিমাণে আদায় হইল। চন্দ্রবাবু মাতব্বর প্রজাগণকে ডাকাইয়া বিনা দাদনে স্বেচ্ছায় নীল বুনাইতে তাহাদিগকে রাজী করিলেন। তবে তাহারা এক সর্ত্ত করিতে চাহিল যে অতঃপর বাঙ্গালী ভদ্র ও ধার্ম্মিক লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও এই কনসারণের ম্যানেজার করা হইবে না। এরূপ সর্ত্ত মঞ্জুর করিতে কর্ত্তৃপক্ষ ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় চন্দ্রশেখর নীলকুঠি ও জমিদারী বিক্রয় করিবার পরামর্শ দিলেন। হগ সাহেব তাহাতে সম্মত সওয়ায় খণ্ডখণ্ড করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করা হইল, সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া চন্দ্রবাবুকে পুরস্কৃত করিলেন, চন্দ্রবাবুও কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব চন্দ্রবাবুকে ট্রাণ্ড ব্যাঙ্কের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। ছয় মাস পরে চন্দ্রশেখর কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন নাবালক দ্বারভাঙ্গার মহারাজার জমিদারীর ম্যানেজারের পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়া দ্বারভাঙ্গায় গমন করেন। তিনি দ্বারভাঙ্গায় পৌছিলে জেনারেল ম্যানেজার মেজর বরণ সাহেব আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দ্বারভাঙ্গাই চন্দ্রশেখরের জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র।

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি কতকগুলি কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তন করিলেন। নজর, উপঢৌকন, ডালি প্রভৃতি আদান-প্রদানের প্রথা রহিত করিলেন। কাছারীর সময় কাছারীতে ভিন্ন অন্য সময়ে অন্যত্র তিনি অর্থী-প্রত্যর্থীদিগের সহিত সাক্ষাতালাপ বন্ধ করিলেন। তিনি ৯ টার সময় কাছারী যাইতেন, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন। কাজকর্ম্ম উপলক্ষে লোককে তাঁহার বাসায় যাইবার তিনি সুযোগই দিতেন না। নিজের হাতে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন ক্ষমতা না রাখিয়া প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সহ ম্যানেজারকে জানাইতেন, ম্যানেজার তদনুযায়ী হুকুম দিতেন।

ইহাতে অতি সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিতে থাকে। এই সময়ে জেনারেল ম্যানেজারের বেতন ছিল ২৭৫০ টাকা, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের ছিল ১২০০ টাকা ও পার্সনাল এসিষ্ট্যাণ্ট চন্দ্রবাবুর ছিল ৩০০ টাকা। এ সময়ে রাজ্যের আয় সর্ব্ব-প্রকারে সালিয়ানা ২৮-৩০ লক্ষ টাকা ছিল।

চারি-পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শীতের গোড়ায় বিহার প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এক বৎসর কাল স্থায়ী হয়। এই এক বৎসর চন্দ্রশেখরকে বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অতি-পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চন্দ্রশেখর তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। দ্বারভাঙ্গায় আর ফিরিবার ইচ্ছা না থাকাতে তিনি তাঁহার মুরুব্বী হগ সাহেবকে অন্য কোন কর্ম্মের জন্য অনুরোধ করিলেন। হগ সাহেব প্রথমে তাঁহাকে মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে জুট ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে ৩০০ টাকা বেতনে কলিকাতার উত্তর বিভাগের কলেক্টারের পদ প্রদান করিলেন। এই সময়ে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা-বাসী করদাতৃগণকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। তদনুযায়ী ঐ বৎসর প্রথম কমিশনার নির্ব্বাচন হয়। নির্ব্বাচন ব্যাপারের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার হগ সাহেব চন্দ্রশেখরের উপর অর্পণ করেন, এবং তিনিও তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। হগ সাহেবের পর মেটকাফ সাহেব চেয়ারম্যান হইয়া চন্দ্রবাবুকে এসিষ্ট্যাণ্ট এসেসর করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। চন্দ্রবাবু ছয় মাসের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির আয় অনেক বাড়াইয়া দিলেন। পরবর্ত্তী চেয়ারম্যান সুটার সাহেবের আমলে চন্দ্রবাবু দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে দ্বারভাঙ্গার নূতন মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চন্দ্রবাবুকে আহ্বান পূর্ব্বক মাসিক চারি শত টাকা বেতনে তৎকালীন ম্যানেজার কর্ণেল রবার্ট মনি সাহেবের পার্সনাল এসিষ্ট্যাণ্ট পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ বৎসরই ২১এ অক্টোবর তারিখে চন্দ্রবাবু পাঁচ শত টাকা বেতনে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার মহারাজার খড়্গপুর পরগণা-স্থিত জমিদারীর এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। চারি বৎসর এই পদে কার্য্য করিয়া চন্দ্রবাবু পঁচাশী হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের স্থলে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দাঁড় করান। ইহার পর মহারাজা চন্দ্রবাবুকে পুনরায় দ্বারভাঙ্গায় আনিয়া মাসিক ১২০০ টাকা বেতনে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। কিছু কাল এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কার্য্য করিবার পর জেনারেল ম্যানেজারের কার্য্যভারও চন্দ্রবাবুর উপর আসিয়া পড়ে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্য্যন্ত চন্দ্রবাবু একাকী এই বিশাল রাজ্যের ম্যানেজারের সকল কার্য্য সুন্দরভাবে সম্পাদন করিয়া বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা পেনশন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সময় হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য যে সকল নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছিল, তৎসমুদয় একত্র করিয়া এক বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমে একটি 'কোড' প্রস্তুত করিয়া দিয়া আসেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে সকাল ৮টার সময় চন্দ্রবাবু সপরিবারে ট্রেনের একখানি প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ সেলুনে দ্বারভাঙ্গা ত্যাগ করেন। দ্বারভাঙ্গায় তিনি এরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায় ও সুমধুর ব্যবহারে আপামর সাধারণ তাঁহার প্রতি এরূপ প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন যে, ঐ দিন সকালে ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের এবং গবর্ণমেণ্টের বহু ইয়োরোপীয়ান ও দেশীয় রাজকর্ম্মচারী, মেমসাহেব এবং বেসরকারী ভদ্রলোকরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শেষ বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। পরবর্ত্তী কয়েকটি ষ্টেশনেও বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে বিদায় দান করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। চন্দ্রবাবু দ্বারভাঙ্গা রাজ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন।

চন্দ্রবাবু যখন বর্দ্ধমানে কার্য্য করিতেছেন তখন বর্দ্ধমানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রকোণা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত

হওয়ায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বহু সহস্র ব্যক্তি বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রবাবু কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া তথায় একটি অন্নসত্র খুলিয়া দেন। চারিদিক হইতে অর্থ-সাহায্য আসিতে থাকে। এই সত্রে প্রত্যহ ছয় সহস্র লোককে অন্নদান করা হইত। বহু দিন ধরিয়া সত্রের কার্য্য চলিয়াছিল। দ্বারভাঙ্গায় অবস্থিতিকালে চন্দ্রবাবু তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য-সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। সে সময়ে যে কয়েকজন সাহিত্যিক দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, চন্দ্রশেখর বাবু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় যখন তিনি অবস্থিতি করেন, তখন অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ তাঁহার গৃহে সমাগত হইয়া দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তিনি ১২৭৯ বঙ্গাব্দ হইতে ক্রমান্বয়ে "অধিকার তত্ত্ব", "বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি", "বেদান্ত প্রবেশ", "সৃষ্টি", "বেদান্ত দর্শন", প্রলয় তত্ত্ব" "পরলোক তত্ত্ব" ও "হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ" এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই সকল গ্রন্থে চন্দ্রবাবুর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি কলিকাতা পার্শী-বাগানে একটি বৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁহার জন্মভূমি বীরনগরেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি-বাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে বীরনগরে নূতন একটী সুরম্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বীরনগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিতে হয় এবং কলিকাতার বাড়ীতেই সন ১৩২০ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।

চন্দ্রবাবুর চারিটি সুযোগ্য পুত্র বর্ত্তমান—শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর। ইঁহারা চারি ভ্রাতাই কৃতী, সুবিদ্বান ও বিখ্যাত ব্যক্তি। শশিশেখর বাবু ইংরেজী সংবাদপত্রে সরস প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রাজশেখর বাবু সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটি-ক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজারের পদে বহুদিন অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহাকে সুপরিচালিত করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। "পরশুরাম" ছদ্মনামে তিনি বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্যে হাস্য ও ব্যঙ্গ-রস যোগাইয়া থাকেন। "চলন্তিকা" নামে তাঁহার একখানি সুন্দর বাঙ্গলা অভিধান আছে। তৃতীয় কৃষ্ণশেখর বাবু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। চতুর্থ পুত্র গিরীন্দ্রশেখর বাবু বি-এসসি পরীক্ষায় প্রথম হন। ইনি মেডিক্যাল কলেজের এম-বি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ডি-এসসি, সুপ্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

চন্দ্রালোকে তাজ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
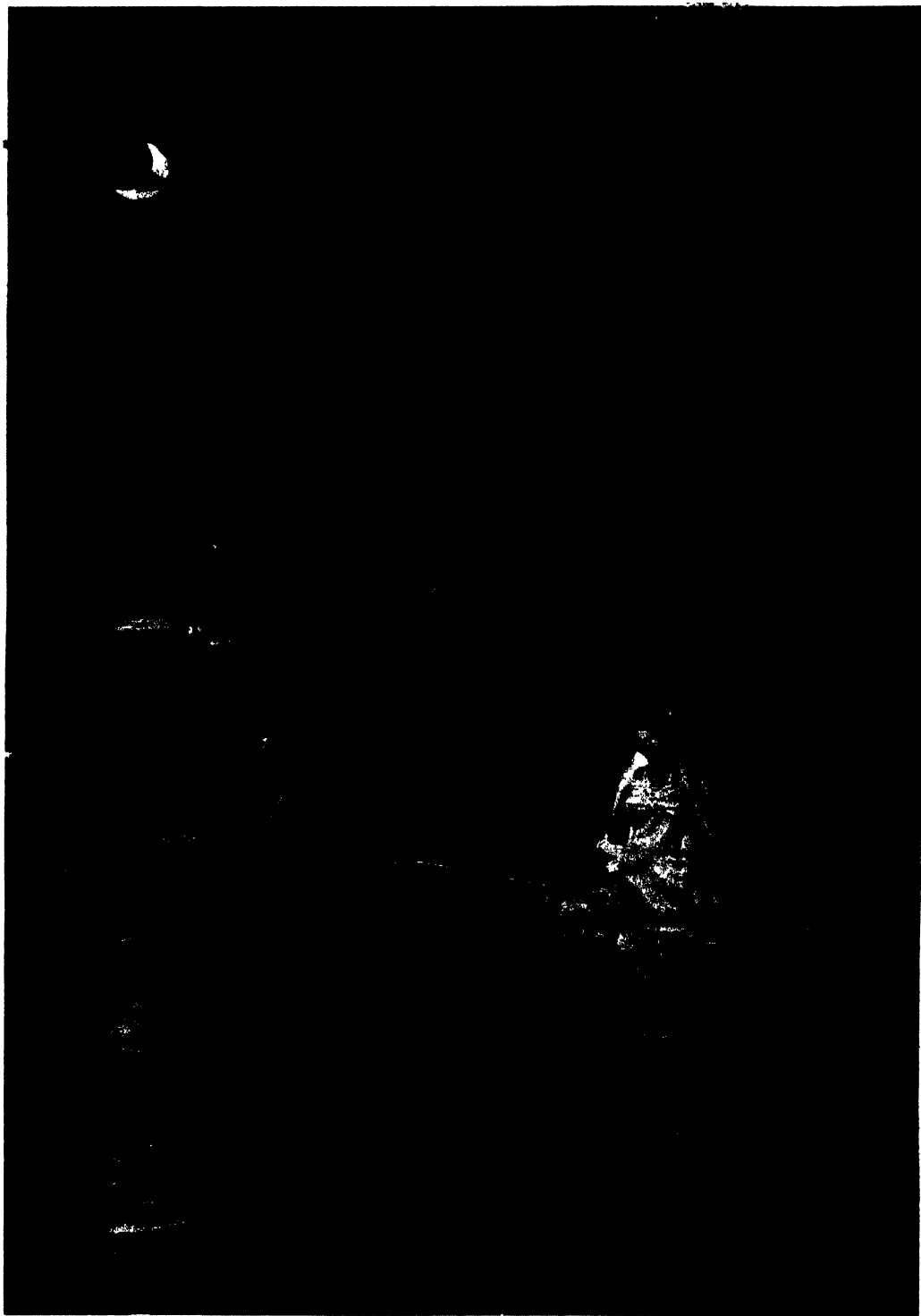
নষ্টচন্দ্র

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

বর্ষা-খোওয়া রোদ এসে ঠাকুরঘরের সামনে গোল-বারান্দায় পড়েছে। বর্ষণসিক্ত ধরণীর স্বেদবিন্দু অপহরণ করে নিয়ে পূবের হাওয়া তখনো বইছে। গোল-বারান্দার ধারে নারিকেলকুঞ্জের সুদীর্ঘ পত্রপল্লব সে হাওয়ায় উড়ছে তরুণীর সুদীর্ঘ কোমল কেশের মত।

কার্পেটের আসনে বসে এক প্রৌঢ়া কিসের চিন্তায় নিমগ্না। কালের প্রহরী তাঁর মুখের বলিরেখায় তাঁর অতীত জীবনের সকরুণ শোকের কাহিনীগুলি সুনিপুণ সূচীশিল্পীর মত বুনে দিয়ে গেছে। তাঁর শুভ্র কেশের পরে বাতাসের দোলা লাগছে, দৃষ্টি তাঁর সম্মুখে নিবদ্ধ। হরসুন্দরীর সঙ্গীহীন সুদীর্ঘ বৈধব্য-জীবনের যাত্রা-পথে একমাত্র সম্বল তাঁর ছেলে হীরেন,—কোন্ সুদূর কলকাতায় ঠাকুর-চাকরের জিম্মায় থাকে সে। সংসারে তাঁর প্রয়োজন অনেক দিনই ফুরিয়ে গেছে, তাই প্রতি-দিনকার নিয়মে-চলা জগতে পুঞ্জীভূত কাজের রাশি তাঁর কাছে খেলার মতই মনে হত। স্বামীর সামান্য জমিদারিটুকু যা এত দিন তিনি পক্ষীমাতার মত সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন, তা যেদিন হীরেনের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারবেন, সেদিনই তাঁর এই কাজ-কাজ খেলার অবসান ঘটবে। কিন্তু যাকে বলে বৈষয়িক বুদ্ধি, হীরেনের তা ত নেই। তার চিঠিতে যে সব কথা থাকে তা তিনি ভাল করে বুঝতে পারেন না। তাঁর দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। বেশ চলছিল আমাদের এই অতি-পরিচিত জগৎ, রাত্রের পর দিন, দিনের পর রাত্রি। তাসখেলার মত সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে পাঠসাঙ্গের পর বিবাহ, পিতৃপিতামহের চলা সেই পুরাতন পথে আবার নূতন করে চলা। জীবনযাত্রার ছন্দটি ছিল সুসঙ্গত, গতানু-গতিক। এই পল্লীভবনে সুদূর অতীত হতে কর্ত্তারা বসবাস করে গেছেন, জমিদারি দেখাশোনা করেছেন আপনার ন্যায্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় ক'রে, মাঝে মাঝে চাপকান এঁটে পাগড়ী পরে জেলায় গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করে এসেছেন, প্রজাদের শাসনে রেখে, সমাজকে বাঁচিয়ে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বজায় রেখে চলে গেছেন; কোনো গোল হয়নি, কোন দিন। বাগ্দী-কলু-নমঃশূদ্রের দল তাদের সুনির্দ্দিষ্ট সুসংক্ষিপ্ত গণ্ডীর ভেতর পরমানন্দে বাস করে এসেছে নিরন্তর;—গরীব যে, অস্পৃশ্য যে, অত্যাচারিত যে, সে সকল দৈন্য স্বীকার ক'রে এসেছে ভগবানের অমোঘ বিধান ব'লে। কিন্তু কোথায় গেল সে শান্তি! মহাযুদ্ধের পর এই যে নবযুগ এল তার সহস্র-ফণা বিস্তার ক'রে দেশে দেশে সমাজে সমাজে তার বিষাক্ত হাওয়া ছড়িয়ে, এর পরিণাম কি যে হবে কে জানে! এ কী চায়, কোথায় এর লক্ষ্য? এ যুগ নিজের মন নিজেই জানে না, কিছুতেই এর পরিতৃপ্তি নেই!—উন্মাদের মত এ এক ঘরছাড়া যুগ; বহুকালের সুখ-সঞ্চিত পুরানো আবাস ধূলায় চুরমার করে দিয়ে এ শুধু উদ্দাম বেগে পথচলার উন্মত্ত আবেগেই অস্থির; যুগ-সঞ্চিত আদর্শকে না মানাই হল এর আদর্শ!...প্রজারা বলে খাজনা দেব না, অনুন্নতরা বলে বিদ্রোহ করব, ছেলেমেয়েরা বলে গুরুজনকে মানব না!...লেখাপড়া হীরেনের প্রায় শেষ হয়ে এল, তার পৈতৃক ভদ্রাসনে এসে বাস করবার সময় হয়ে এল এবার। সংসারে তার মন নেই, হো হো ক'রে ঘুরে বেড়ানই তার আনন্দ। বিলেত পালাতে তার ভারি আগ্রহ, এবং ঐখানেই ত হরসুন্দরীর যত ভয়। আগেকার দিনে বিলেত-ফেরৎরা হত প্রচণ্ড সাহেব, সে তবু কতকটা গা-সওয়া হয়ে গেছল। এখন বিলেত থেকে ফিরে এসে লোকে আরও বেশী করে খদ্দর পরে, মুচিমালার সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাদের দাবীকে গগনস্পর্শী ক'রে তোলে। ছোটজাতের স্পর্দ্ধাকে তারাই ত বাড়িয়ে দিচ্ছে এম্নি ক'রে! এর চেয়ে ওরা যদি অখাদ্য খেয়ে মদে ডুবে থাকত ত সেও ছিল ভালো।...যদি এমন একটি মেয়ে ঘরে আনতে পারা যায় যে হীরেনকে বেশ শাসনে রাখতে পারে তাহলেই নিশ্চিন্ত হয়ে মরা যায়। নবযুগের হাওয়া ছেলেদের মত মেয়েদের গায়ে [illegible]

বেশী করেই লেগেছে,—নইলে তারা শান্তিময় অন্তঃপুর ছেড়ে হাটবাজারে পিকেট ক'রে বেড়ায়? কেউ এ কল্পনা কোনো জন্মে স্বপ্নেও ভাবতে পারত কি যে বাঙালীর মেয়ে রিভলভার হাতে নিয়ে নরহত্যা করতে বেরবে? —এই ত নবযুগের হাওয়া!—এ সব সর্বনাশীর দল যে সংসারে ঢুকবে তাকে ছারেখারে দেবে। তাই এমন জায়গা থেকে সন্ধান করে মেয়ে আনতে হবে যেখানে এ হাওয়া এখনও ঢোকেনি,—উচ্ছৃংখল হীরেনের গতিরোধ করার জন্যে হরসুন্দরী মনে মনে এই লৌহ-নিগড়ের ব্যবস্থা করলেন।

পাশের গ্রামের জমিদার পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখুয্যে ছিলেন ও-অঞ্চলের এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সমাজকে নিউমোনিয়া-গ্রস্ত রোগীর মত সর্বাঙ্গে কটন্-উল্ জড়িয়ে সর্ববিধ ঝড়ঝাপট হতে সাবধান করে কোনো মতে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই যে সর্বনেশে সাম্যবাদের ভাঙন এসে সমাজের গায়ে ঘা দিয়েছে, এর ধাক্কা সহ্য ক'রে কোনো প্রকারে টিঁকে যেতে পারলেই হল। ছুদিন বাদে কোথায় থাকবে এই সাম্যবাদ আর কোথায় থাকবে এই গণ্ডগোল। এই ছিল তাঁর দৃঢ় ধারণা। এর আগে এ দেশে এমন কত ঝড়ই ত ব'য়ে গেছে,—কত বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীচৈতন্য, রামমোহনের দল এসে এ সমাজকে দোল দিয়ে গেছেন, তবুও এ সমাজ ভাঙে নি। হাজার গান্ধী উপবাস করুন, তবুও 'যত দিন ভারত ভারত তত দিন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ!'—এর সঙ্গে চালাকি করবার জোটি আছে! তুমিও যেমন,—কেবল চুপচাপ টিঁকে যেতে পারলেই হল।...যে সকল দুর্লক্ষণ আজ দেখা দিয়েছে তা অধিকাংশই বহন করে এনেছে তরুণ বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা। তারা মনে করে একমাত্র তারাই হল মস্ত সমঝদার। একেবারে স্বয়ংসিদ্ধের দল আর কি! বর্ণাশ্রমধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলাকে দুপায়ে দলে যাওয়াতেই তাদের আনন্দ। আগে আগে ছেলেরা কলেজে পড়বার সময় সম্মুখে দাড়ী ও পশ্চাতে শিখা রাখত, এখন দুটোকেই সমানভাবে কর্তন করছে। আগে ওদের কলেজের মেসে জাতিভেদ বজায় রাখবার আয়োজনটা ছিল একটা দেখবার বস্তু, এখন সেটা পাপের মধ্যেই গণ্য হয়েছে। লজ্জাই হল স্ত্রীলোকের ভূষণ, এ ত আর অস্বীকার করবার জো নেই,—তা দেখ একবার কাণ্ডটা, মেয়েরা পরদা ত মানছেই না; পুরুষদের দেখে ওদের আঁচলে পা জড়িয়ে আছাড় খাওয়াই ছিল খুব উচিত, সে ত দূরের কথা, ওরা হাই হিল্ জুতা পরে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ঠুকে ঠুকে চলছে! এমন কথা অবিশ্যি কেউ বলবে না যে মেয়েদের একেবারে মুখ্যু করে রাখ,—মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও ক্ষতি নেই,—শাস্ত্রেই ত ওর বিধান রয়েছে,—শাস্ত্র মানতে হবে বৈ কি,—তবে এমনভাবে শেখাও যাতে তাদের শিক্ষা তাদের ঘর-সংসারের সহায়ক হয়। সংসার দেখা, স্বামীর সেবা করা, ছেলেপুলে মানুষ করা, আর শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলা পালন করা—এই নিয়েই ত মেয়েদের জগৎ। এ ছাড়া মেয়েমানুষের আবার দরকারটাই বা কিসের? পূর্ণেন্দুনারায়ণ তাই তাঁর মেয়েকে,—তার নামটি বেশ পৌরাণিক ধরণের—ক্ষেমঙ্করী,—তাকে এই শিক্ষাই বরাবর দিয়ে এসেছেন। গ্রাম্য পণ্ডিতের পাঠশালে সে দু'চার বছর পড়েছে, আর বাড়ীতে বসে সেই যে ফার্ষ্টবুকে এক গলির মধ্যে এক খোঁড়া লোকের সন্ধান পাওয়ার কথা আছে ততদূর পর্য্যন্ত শিখে ফেলেছে। আগেকার দিনের অপ্রবাসী পল্লী-সংসারে মেয়েদের মনের গলির মধ্যে ইংরেজী বইয়ের খোঁড়া লোক কেন, কোনো লোকেরই সন্ধান পাবার প্রয়োজন ছিল না, এখন অবিশ্যি ইংরেজীতে ঠিকানা লিখতে জানাটা মেয়েদের দরকার হয়ে পড়েছে। কোমল-কলাও মেয়েটির বেশ জানা আছে,—যাত্রার দলের দু-একটি গান সে সুর করে গাইতে পারে, আর দুর্য্যোধনের উরু ভাঙার পূর্বক্ষণেই ভীমসেনের সেই যে সাড়ে তিনঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতাটা রয়েছে, সেটিও মেয়েটির একেবারে কণ্ঠস্থ। এর চেয়ে বেশী শিক্ষা মেয়েকে আর কি দেওয়া যেতে পারত?

হরসুন্দরী মেয়েটিকে দেখে মনে মনে খুসীই হলেন, —এম্নি মেয়েই ত তাঁর দরকার। গ্রামের পরিচিত নীড় হতে এ কখনো বহির্জগতে পদার্পণ করে নি, বহির্জগতের কোনো খবরই এর কাছে এসে পৌছায় নি; কোনো দিন। এ দেখে এসেছে এর পিতাকে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে, প্রজাকে শাসনে রাখতে,—

সেই আদর্শই এ তার ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্তে মনে মনে সঞ্চিত করে রেখেছে, কারণ সকল মেয়েরই অন্তরের কামনা তাদের স্বামীরা তাদের পিতাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক্।…কেবল এক জায়গায় ভয়, হীরেন একে পছন্দ করবে ত? কিন্তু মায়ের কথার অবাধ্য হীরেন কখনো হয় নি ত এর আগে। ছেলে যে, সে চিরদিনই ছেলে, মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করা থেকে আরম্ভ ক'রে সে চিরদিনই সমান নাবালক। এ দেশের ছেলেদের এই একটা মস্ত গুণ যে তারা এই চিরন্তন-নাবালকত্ব কাটিয়ে উঠতে পারে না।—এই ত জননীদের সকলের সেরা গর্ব। হীরেনও তাঁর কথার অবাধ্য হবে না কখনো।

কথাবার্ত্তা পাকা করবার আগে মুখুয্যে মশায় ধরে বসলেন হীরেনকে তাঁর একবার দেখা দরকার। ছেলে-বেলায় যে-হীরেনকে তিনি দেখেছেন সে বর্ত্তমানকালে কেমন দাঁড়িয়েছে, তা না দেখে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে সমর্পণ করতে রাজী নন। তাঁর বৈঠকখানায় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়ে গেল, তামাকও পুড়ল বিস্তর। লাখ্ কথা নইলে বিয়ে হয় না, জানবেন এটা আংশিক ভাবেই সত্য। তামাকটি থাকা চাই, নইলে নিস্তামাক লাখ্ কেন কোটি কথাতেও প্রজাপতির নির্বন্ধে প্রতিবন্ধক বিস্তর। এ ক্ষেত্রে অবিশ্যি অন্য রকম দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু সেটি এখন খুলে বলা চলবে না, কেননা তাই নিয়েই ত গল্প। ধূমজ্যোতিঃ-সলিল মরুতের সন্নিপাত হল মেঘ নয়, মুখুয্যে মশায়ের গুড়গুড়ি,—সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত সে নিরন্তর শীর্ষদেশে অগ্নিসংস্থাপনা ক'রে বসে আছে। তার আকৃতি অনেকটা কমণ্ডলুর মত, রূপার তৈরি আর ওপরে সোনার অক্ষরে মালিকের নাম লেখা, বেশ সগৌরবেই লেখা,—"মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার এণ্ড্ অনারারি ম্যাজিষ্টার।"

স্থির হ'ল স-গুড়গুড়ি মুখুয্যে মশায় তস্য নায়েব সতীশ ভটচায্‌কে নিয়ে হীরেনকে দেখে আসবেন। হরসুন্দরীকে সেই কথাই জানিয়ে দেওয়া হল।

তুমুল তর্ক চলছিল হীরেনের বাসায়। হীরেন সকাল-বেলা বেড়াতে বেরিয়ে গেছে, তার বসবার ঘরে শ্রীবিলাস, সত্যেন, ধীরেন, বিনোদ এম্‌নি ও-পাড়ার ছ' সাতটি ছেলে নিত্যকার মত তর্ক জমিয়েছে। তক্ত-পোষের ওপর সেদিনকার দৈনিক পত্রিকা গুটিয়ে তাল-পাকিয়ে আছে। তাতে পঠিতব্য বিষয় যা ছিল তা ওদের পড়া হয়ে গিয়েছে, তর্কের উগ্রতার সময় মারা-মারির অস্ত্ররূপে কাগজখানির সদ্ব্যবহার চলছে এখন। এক ধারে খালি চায়ের পেয়ালা-কটি পড়ে আছে। ছেলেদের বয়স সব উনিশ কুড়ির মধ্যেই, সবাই কলেজে পড়ে এবং ঘোরতর তার্কিক। হীরেন হল ওদের পাণ্ডা, এবং তার ঘরেই ওদের বৈঠক বসে। রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও সাহিত্যে ওদের মস্ত মস্ত মত্ আছে, এবং কেন যে পৃথিবীটা সেই সকল মতানুসারে চলছে না এই নিয়ে ওদের ক্ষোভের আর সীমা নেই। সাহিত্যের কথাই ধরুন। ওদের মত্ হচ্ছে বাংলাদেশে জনকয়েক অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ ডিস্‌পেপ্‌টিক্ সাহিত্যিক নাকে চশমা এঁটে মৌরসী স্বত্ব নিয়ে কায়েমী ভাবে বসবাস করছেন, নড়বার নামটি নেই। প্রজা-জমিদারের সুবিধের জন্তে লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন কতবার ওলোট-পালোট করল, অথচ সাহিত্য-সেবীর সুবিধের জন্তে যে তেমনি ধরণের একটা আইনের আশু প্রয়ো-জনীয়তা রয়েছে, সে বিষয়ে কাউন্সিলের কোনো লক্ষ্যই নেই। ওরা তাই হতাশার ক্ষোভে এম্‌নি এক সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে সরাসরি একদিন এক চিঠি লিখে বসেছিল, —"মশাই, আপনি আজকাল যা লিখছেন তার সম্বন্ধে গোড়ার কথা হচ্ছে যে ওগুলো না লিখলেই ভাল করতেন। আপনার বিরুদ্ধে তরুণদের প্রধান অভিযোগ আপনার সুদীর্ঘ সাহিত্যিক পরমায়ু। আপনার দৈহিক অপমৃত্যুকামী আমরা নই, কিন্তু সাহিত্য-জগতে আপনার নির্বাণলাভের অতিকাঙ্ক্ষিত সুদিনের আশায় আমরা প্রাণ-ধারণ ক'রে আছি,—দয়া করুন,—সে আশায় আর জলাঞ্জলি দেবেন না। আপনার আগেকার দিনের লেখাগুলোই কি আপনাকে স্থায়ী আসন-দানের পক্ষে

নয় ?"—ওরা ভেবেছিল খুব মস্ত একটা চাল চেলে দিয়েছে, তাই ভয়ানক চমকে গেল যখন তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই প্রত্যুত্তর এলো,—"বন্ধুগণ, আমার আগেকার লেখাগুলোতেই তোমরা সন্তুষ্ট থেকো, আমার আধুনিক লেখাগুলো বোঝবার বৃথা চেষ্টা ক'রো না। নিজেদের কায়িক তারুণ্যের গর্বে এ কথা ভুলো না যে অনাগত যুগের তরুণ মনের যে কাহিনী আমি বহন ক'রে আনছি, তা তোমাদের মানসিক বার্দ্ধক্যের দ্বারে সাড়া দেবে না। আমার অতীতের লেখা অতীত যুগে সমাদর পায় নি, তোমাদের কাছে পাচ্ছে। আমার বর্ত্তমানের লেখা তোমাদের কাছে সমাদরের দাবী করে না, তোমাদের পরে যারা আসবে এ লেখা তাদেরই জন্য। তোমাদের এই অসৌজন্য আমাকে ব্যথিত ক'রেছে ভেবে মনে মনে মিছে উৎফুল্ল হ'য়ো না, কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ,—বিপুলা চ পৃথ্বী।"—সেই থেকে ওরা খুব দ'মে গেছে, সাহিত্যচর্চ্চা বড় একটা আর করে না।

সেদিনকার তর্কের বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। আমাদের দেশের এই এক সুগভীর কলঙ্কের কাহিনী বিশ্ব-সভার দ্বারে দ্বারে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে,—কী অপরিসীম লজ্জাই না এ বহন ক'রে এনেছে আমাদের জন্যে! যুগের পর যুগ ধরে একই দেশে বাস, একই অন্নে পরিপুষ্ট হওয়া, একই ভাষায় কথা বলা, একই শোণিত উভয় সম্প্রদায়ের ধমনীতে,—একই উদার ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ উভয় ধর্মই দিয়েছে আমাদের, তবু সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে কী অধর্মই না ক'রে আসছি এত দিন! মানুষ মানুষকে যদি ঘৃণা করে শুধু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রণোদিত হ'য়ে,—তার অপরাধের সীমা থাকে। কিন্তু যে মানুষ ধর্মের ছল ক'রে যার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিদ্বেষই নেই তার শিরে খড়্গ তোলে,—সে শুধু অধার্মিক ভণ্ড নয়, তার অপরাধের বোধ হয় সীমা নেই, কেন না সে হল মানবদ্রোহী!

এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে দুটি চিন্তার ধারা বর্ত্তমান। এক দলের মত হল এই যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ—এর মূলে রয়েছে সম্প্রদায় বিশেষের অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক অনুন্নত অবস্থা। এ সমস্যার সমাধান কি সেই পথেই আসবে না? যারা এতদিন পিছনে পড়ে ছিল, তারা যদি আজ দাবী করে—'আমাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দাও'—অগ্রসর সম্প্রদায়ের উচিত সে দাবী মেনে নেওয়া। দুর্য্যোধনের মত তারা যদি দম্ভ ক'রে বলে—'বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও ছাড়ব না'—তাহলে এটা নিশ্চিত যে দুর্য্যোধনের মতই সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও তারা রাখতে পারবে না, প্রাণও হারাবে, কেন না যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের সহায় হলেন ভগবান,—'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে'ই তাঁর চরণ নামে।

আমাদের দেশের আর এক সঙ্কীর্ণ দলের মত হচ্ছে মুখে যাই বল, দুই সম্প্রদায়ের অন্তরের মিল হওয়া সহজ নয়। অধিকার ত সমানই আছে, কে ওদের দাবিয়ে রেখেছে বলতে পার? এটা ত হিন্দুর শাসন নয়, মুসলমানেরও শাসন নয়,—ভগীরথের মত সাধনা ক'রে যারা এনেছে বর্ত্তমান জগতে ডেমক্র্যাসির পুণ্যধারা,—দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যারা মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ অধিকার দিতে কার্পণ্য করে নি,—এটা হ'ল সেই ইংরাজের শাসন। সে ত মুসলমানদের দাবিয়ে রাখে নি, তবে তারা পিছনে পড়ে রইল কেন? তাদের অর্থ-নৈতিক অবনতির জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী, জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হবার তাদের ক্ষমতা নেই। আগে তারা সে-ক্ষমতা অর্জন করুক, তার পর তাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার তারা নিজেরাই পাবে। বাছাই ক'রে অযোগ্য-দের নিয়ে দেশের রাষ্ট্রসংসদ গঠন করলে একটা সমগ্র রাষ্ট্রের অবনতি হতে বাধ্য, সেটাই কি হবে খুব বেশী কাম্য?

শ্রীবিলাস বলল, "ক্ষণিক অবনতি ঘটে ঘটুক, তা বলে ওরা কি চিরদিনই পিছনে পড়ে থাকবে? ভুল করতে করতেই ত মানুষ শেখে। বিচক্ষণতা হ'ল ভুল করার ও ভুল ভাঙার ইতিহাস। এমনি করেই আজ যারা পিছনে আছে কাল তারা অগ্রসর হবে। তখন সমগ্র রাষ্ট্র কী দুর্জ্জয় শক্তি অর্জন করবে তাব দেখি!"

বিনোদ বলল, "তত দিন ধরে উন্নত সম্প্রদায় পাণ্ডবদের মত অজ্ঞাতবাসে থাকবে বুঝি?"

শ্রীবিলাস বলল, "সে ত্যাগ স্বীকার ওদের করতেই হবে। তারা উন্নত বলে তাদের কাছে রাষ্ট্রের হ'ল ঐ

দাবী। ধনী যারা তাদের যেমন আয়ের ওপর ট্যাক্স দিতে হয়।"

বিনোদ বলল, "ক্ষমতা পেলে ওরা যদি বলে সবাইকে জোর করে মুসলমান করব! তখন? এ নজীর ত ভারতের ইতিহাসে বড় কম নেই!"

শ্রীবিলাস বলল, "তা নেই, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ এটা অতীত নয় বর্ত্তমান, আর শাসন-পদ্ধতি হবে রাজতন্ত্র নয় ডেমক্র্যাসি।"

বিনোদ বলল, "মস্ত বড় সান্ত্বনা! ওরা কি ভেবেছ হিন্দুবিদ্বেষ কোনো কালে ছাড়িয়ে উঠতে পারবে? সুবিধে পেলেই আমাদের টিপে মারবে। ওদের ওপর বিশ্বাস নেই।"

শ্রীবিলাস বলল, "ঠিক এই কথাই ত ওরাও বলতে পারে! তার কি উত্তর দেবে? এ অমূলক অবিশ্বাস মন হতে দূর কর বিনোদ।"

বিনোদ বলল, "আমরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেই বুঝি সবাইএর মন থেকে এ অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে?"

শ্রীবিলাস বলল, "বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে হবে না, তার চেয়ে কঠিনতর কাজ আমাদের রয়েছে।"

বিনোদ রাগত স্বরে বলল, "কি কাজ শুনি? মুসলমানের তাঁবেদারি করা ত?"

শ্রীবিলাস বলল, "দেখ বিনোদ, তুমি তরুণ নামের অযোগ্য।"

বিনোদ বলল, "তরুণ তুমি কাকে বল শ্রীবিলাস?"

শ্রীবিলাস বলল, "সম্প্রদায়-নির্বিশেষে মানব-চরিত্রের ভাল দিকটাই যে বড় করে দেখতে জানে, কোনো বাধাকেই যে দুরতিক্রম্য বলে মানে না, অনগ্রসরের বেদনায় যে দরদী, অন্যায়ের প্রতীকারে যে অগ্রণী, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে যে বিশ্বাসী, সেই হল তরুণ।"

বিনোদ বলল, "আমিও সেই তরুণ।"

শ্রীবিলাস বলল, "না, তুমি তা নও। তুমি প্রতি পদে কেবল বাধার কথা ভেবে থমকে দাঁড়াও।"

বিনোদ বলল, "বাঃ, ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে না? অন্ধের মত চোখ বুজে দৌড় দেবে না কি?"

শ্রীবিলাস বলল, "প্রচলিত গণ্ডীর বাইরে যেতে যার অতিসাবধানী মন নিরন্তর বিভীষিকা দেখে, তেমন লোকের দ্বারা পৃথিবীতে কোনো দিন কোনো সদনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। তারা হল জরাজীর্ণ পঙ্গু। তুমিও বিনোদ সেই দলে গেলে, এ কথা ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

অন্যান্য সকলে বলল, "ছিঃ বিনোদ, ছিঃ।"

বিনোদ দেখল সমরাঙ্গনে সে পরিত্যক্ত এবং একাকী। কুণ্ডলীকৃত দৈনিক পত্রিকা সজোরে আঁকড়ে বলল, "দেখাচ্ছি আমি জরাজীর্ণ পঙ্গু কি না!"

একটা মারামারি হয় আর কি! ভৃত্য নফ্‌রা দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে বাবুদের কাণ্ড দেখছিল। নিত্য তার এ তাণ্ডব আর সহ্য হয় না। ঘরের ভেতর এসে গম্ভীর সুরে বলল, "এজ্ঞে বাবুরা যদি মারামারি কর, ত এখুনি পুলুষ ডেকে আনব!"

চটিজুতা যোড়া তক্তপোষের নীচে হতে টেনে বার করে নিয়ে বিনোদ তার ভেতর পা ঢুকিয়ে বলল, "আমি চল্লাম। তোমাদের মত একগুঁয়ে লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা!"

ওরা সবাই হাহা ক'রে হেসে বলল, "পুলিষের নাম শুনে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে চললে বিনোদ?"

বিনোদ চলে গেল।

নফ্‌রা তার জলন্ত চাহনি দিয়ে ছোকরাদের শাসিয়ে চায়ের পেয়ালা কটা উঠিয়ে নিয়ে গেল।

এমন সময় প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা ক'রে হীরেন ফিরে এল। মহাচিন্তান্বিত তার মুখ, কপালের শিরাগুলো স্ফীত হয়ে নীলবর্ণ ধরেছে, ভ্রূ কুঞ্চিত, ওষ্ঠ মলিন। কোনো কথা না বলে সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তার হাতে রয়েছে সেদিনকার সকালে বেড়িয়ে ফেরার পথে পাওয়া এক চিঠি, তারই দিকে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে।

তার ভঙ্গী দেখে বন্ধুর দল একান্ত উদ্বিগ্ন হল।

শ্রীবিলাস ডাকল, "হীরেন দা, তোমার কি?"

কথা না বলে হীরেন শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যেন বলল, "বাড়ী থেকে চিঠি পেলে বুঝি? বাড়ীর খবর সব ভাল ত?"

হীরেন মাথা নেড়ে জানাল, না, বাড়ীর খবর সব ভাল নয়।

ধীরেন জিগেস করল, "বাড়ী থেকে কি খুব খারাপ খবর পেয়েছ?"

হীরেন ঘরের কড়ি বরগাগুলো গুণ্‌তে গুণ্‌তে অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল—"হুঁ"।

তখন ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। হীরেনের বাড়ীর খবর খুব খারাপ, মানে তার মায়েরই কিছু হয়েছে, কারণ বাড়ীতে তার আর ত কেউ নেই। তার মা হলেন বিধবা মানুষ, তা বিধবা মানুষের আর কি হতে পারে বল, এক তাঁর মৃত্যু ছাড়া। চট্‌ ক'রে ওদের মনে সেই কথাই লাগল, হীরেনদার মা মারা গেছেন।...জীবনে যার আর কোনো আত্মীয়-আত্মীয়াদের দল ভিড় ক'রে আসে নি, একমাত্র ছিলেন শুধু মা,—সেই মা! সব বন্ধনের মাঝে একমাত্র স্নেহের বন্ধন আজ ছিঁড়ল! মৌচাকের মত যাঁর বুকে তার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের কত মধু সঞ্চিত ছিল, তিনি আজ নেই! জীবনের পাত্র তার ফুটা হল, পড়ে রইল শুধু ফেনা।...ওদের সবাইএর চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠল।

নফ্‌রা হীরেনের জন্যে চায়ের সরঞ্জাম আনছিল। ওদের মৌন ও অশ্রুমলিন দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। বুদ্ধি তার বরাবরই প্রখর। ভাবল, এতক্ষণ বাবুরা ঝগড়া করছিল, এইবার একটা মারামারি করে বসেছে! এ রকম হাঙ্গামা 'নিত্যি' আর কত 'সহ্যি' হয় বল ত! মনিবের না হয় ও-সবে কোনো হুঁস্‌ নেই, কিন্তু গিন্নীমা শুনলে কি বলবেন! ছোকরা বাবুদের জ্বালায় নফ্‌রা কি শেষে পাগল হবে! ওদের নামে কিছু বললে দাদাবাবুর সে কি রাগ!—নফ্‌রা তুই যদি অমন করিস তোকে মার কাছে পাঠিয়ে দেব! পাঠিয়ে দিলেই নফ্‌রা যাচ্ছে কি না! ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করা গেল, সে কি তাকে দূরে পাঠিয়ে দেবার জন্যে! গিন্নীমার কাছে অবিশ্যি খাটুনি নেই, তামাকটা আমলা বাবুদের দয়ায় মেলেও অজস্র, আর খাওয়া সে ত রাজভোগ বললেই চলে। কিন্তু ঐ গাঁজাখোর উড়ে বামুনটা দাদাবাবুকে কি ছাইভস্ম খাওয়াচ্ছে সে কথা ভেবে দেশে বসে রাজভোগও কি নফ্‌রার গলা দিয়ে গলবে? ছোকরা বাবুদের দুষ্টামি নফ্‌রার আর বরদাস্ত হয় না। দাদাবাবুকে বললে ত হিতে বিপরীত! অমন একরোখা ছেলে নফ্‌রা আর ত্রিজগতে দেখে নি। তার চেয়ে ওঁকেই এর একটা উপায় করতে হবে। 'পুলুষের' ভয় দেখালেও ওদের দুষ্টামি কমে না, দাঁড়াও ত, এবার সত্যি সত্যি 'পুলুষ' ডেকে আনা যাক, বাবুদের হুঁস্‌ হয় কি না দেখা যাবে! দাদাবাবুর বকুনি অবিশ্যি খেতে হবে শেষে, তা নফ্‌রা ত পাজী আছেই, বকুনি ত নিত্য বরাদ্দ! মোড়ের মাথায় যে 'পুলুষ'টি পাহারায় থাকে সেটি বড় ভাল লোক, নফ্‌রার সঙ্গে তার ভাবও খুব। তাকে একবার ডেকে আনতে পারলেই হল!

খপ্‌ করে টেবিলে চায়ের সরঞ্জামগুলো বসিয়ে রেখে নফ্‌রা গুম্‌ গুম্‌ ক'রে চলে গেল।

চা দেখে হীরেনের সম্বিৎ ফিরে এল। তাড়াতাড়ি তৃষ্ণাশুষ্ক মুখে খানিকটা চা ঢেলে দিয়ে ওদের পানে চেয়ে বলল, "এই! তোদের সবাইএর চোখে জল কেন রে! কি হয়েছে?"

শ্রীবিলাস বলল, "সত্যিই কি হীরেন দা তোমার মা"—বলেই হঠাৎ থেমে গেল, তারা সবাই ভুল ক'রে বসে নি ত?

হীরেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, "না না, মা ভালই আছেন। এই দেখ, তিনি এক কাণ্ড ক'রে বসেছেন।" এই বলে তাঁর চিঠিখানি ওদের পড়তে দিল।

চিঠি নায়েব মশায়ের হাতের লেখা, অতএব বিষয়টা একটু জটিল বুঝতে হবে, কারণ সাধারণ চিঠিপত্র মা নিজেই লিখে থাকেন, জরুরি চিঠি বেশ গুছিয়ে লিখবার দরকার হলে নায়েব মশায়ের ডাক পড়ে। তার মায়ের জবানী করে নায়েব মশায় লিখছেন—"...বাবা হীরেন্দর, তুমি ছয় সাতটি পাশ করিয়া ফেলিয়াছ, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধিও হইয়াছে। এক্ষণে সুভালাভালি তোমার একটি বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি। দেশে আসিয়া সংসারী হও, পৈতৃক জমিদারি দেখাশোনা কর, এই আমার একান্ত কামনা জানিবে। সেই কারণে তোমাকে লিখি তোমার উপযুক্ত এক সুলক্ষণা পাত্রী ঠিক করিয়াছি। মেয়েটি বেশ ডাগর, আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার পূর্ণেন্দু বাবুর কন্যা, নাম ক্ষেমঙ্করী। অনুসন্ধানে জানিয়াছি কাষ্টেবুক অবধি ইংরেজী লেখাপড়া পড়িয়াছে, বাজনাও উত্তম জানে, এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গীতবাদ্যও শিখিয়াছে।

আজকাল শুনিতে পাই ঐরূপই চলন হইয়াছে, নতুবা মেয়েদের গীতবাদ্য প্রাচীন কর্তারা পছন্দ করিতেন না। হিন্দুর ঘরে ইহাই যথেষ্ট। জুতামোজা পরা মেম্ আসিয়া আমাদিগের তুলসীতলায় ইট্ বিট্ সিট্ করিয়া বেড়াইবে ইহা আমি চোখে দেখিব কেমন করিয়া!...কল্য পূর্ণেন্দু বাবু ও তাঁহার নায়েব তোমায় দেখিতে যাইবেন। তোমায় পছন্দ করিলে বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা করিবেন। গঙ্গাস্নান সারিয়া তোমার ওখানে বোধ করি বেলা এগারটার সময় পৌঁছিবেন। তাঁহাদের খুব আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইবে। পূর্ণেন্দুবাবু বড়ই নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। দেখিও বাবা, যেন কোনরূপ ম্লেচ্ছাচার না হয়। তোমার মায়ের অনুরোধ, তাঁহাদের সম্মুখে কোনোরূপ বাঁদরামি করিও না। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে, কথা বলিবার সময় মাটির দিকে চাহিয়া রহিবে। আজকালকার ছেলেদের গুরুলঘু জ্ঞান নাই, তাই এ সকল কথা সবিস্তারে লিখি। গঙ্গাজল ও গঙ্গা-মৃত্তিকা আছে ত? তাঁহাদের সম্মুখে এঁটো-কাঁটার বিচার করিবে, গণ্ডুষ করিয়া তবে ভাত খাইবে। আর একটি কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। তোমাদিগের কলিকাতায় শুনিয়াছি গোময় বড়ই দুর্লভ। যেরূপেই পার কিঞ্চিৎ গোময় সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। গোময় না হইলে মুখুয্যে মহাশয়ের আহারই হয় না"—ইত্যাদি ইত্যাদি, প্রকাণ্ড চিঠি, খুব পাকা হাতের লেখা, বানান সম্বন্ধে একেবারে যথেচ্ছাচার, বর্ণমালা ও অভিধানের তোয়াক্কা রাখে না।

শ্রীবিলাস বলল, "ইঃ, একেবারে অজ্ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—দেখছি যে! হায় হীরেনদা, তোমার কপালে শেষে এই ছিল!"

সত্যেন বলল, "মেয়েটি আবার বেশ ডাগর!"

ধীরেন বলল, "শুধু তাই নয় ফাষ্টোবুক অবধি লেখা-পড়া পড়িয়াছে!"

সত্যেন বলল, "আর অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গীতবাদ্যও জানে!"

শ্রীবিলাস বলল, "যাই বল, হীরেনদা, তোমার শ্বশুর ভাগ্য ভাল, গোময় নইলে, তাঁর আহারই হয় না!"

হীরেন ধমক দিয়ে বলল, "মার চিঠি নিয়ে তোরা অমন হাসি-ঠাট্টা করিস নি বলছি!"

মায়ের অনুরোধ হীরেনের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় আদেশ সেটা ওরা জানত।• ওর ম্লান-কাতর মূর্ত্তি দেখে ওর মনের মধ্যে যে কী গভীর সংগ্রাম চলছে তা ওরা বুঝতে পেরে মৌন হ'য়ে রইল।

হীরেন তার তরঙ্গায়িত কেশে মুষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। তার কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে যে-মানসী বধূর প্রতিমা সে কল্পনার উজ্জ্বল রঙে এঁকেছিল এত দিনে তা আজ এই কঠোর আঘাতে চূর্ণ হল। যে-তন্বী তার সুদীর্ঘ এলোচুলে তার তরুণ আলোর মত শুভ্র কলহাস্যে, তার কনকচাঁপার কলির মত দীর্ঘ কোমল অঙ্গুলীতে ওকে কল্পনার স্বর্গে আহ্বান ক'রে এসেছে, এত দিনে সে আজ ম্লান হ'য়ে বিলীন হ'য়ে গেল। যার তনু-দেহটি ঘিরে ও মনে মনে শুনেছে কত যুগের প্রণয়োচ্ছল ছন্দ, কল্পনায় যার কাণের কাছে ও গুঞ্জন করেছে, কত কাব্যের পঠিত কত কণ্ঠের ধ্বনিত সেই চিরন্তন স্তবগান,—ফুলের আগুন লাগা বনবীথিতে যার আগমন কল্পনা ক'রে ওর বক্ষ উঠেছে দুলে, যার স্বপ্নের পরশ-লাগা জ্যোৎস্না রাতে বিপুল সুখের আভাস জেগেছে ওর মনে,—ছন্দে যাকে বাঁধা যায় না, বাণীর যে অতীত তীরে,—সেই মানসী বধূর আজ কি নির্ব্বাসন হ'ল অতল বিস্মৃতির পারাবারে?

বেশ চলছিল স্বপ্নের জালবোনা, সহসা তা ছিঁড়ে গেল নীরস গদ্যের অবতারণায়। খুব মোটা কালো বেঁটে এক কন্‌ষ্টেবল্ সঙ্গে নিয়ে নফ্‌রা এসে ঘরে ঢুকল। মুখে তার যেন সমর-বিজয়ী ভাব।

কন্‌ষ্টেবল্ দেখে সকলের চক্ষু স্থির! 'অকুস্থল' ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে সে বলল, "কোন্ কোন্ আদ্‌মি দাঙ্গা করিয়েসে বাত্‌লাও!"—স্বর তার গম্ভীর, আদেশমূলক।

হীরেন শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে নফ্‌রাকে বলল, "হতভাগা, নিজের যন্ত্রণাতেই বাঁচি না, এর মধ্যে তুই আবার পুলিস ডেকে আনলি!"

কন্‌ষ্টেবল্ বুঝল হীরেনের অধম খুব গুরুতর, তারই যন্ত্রণাতে ও বাঁচছে না। জিগেস করল, "বাবু, আপনের নাম?"

উপায়ান্তর না দেখে হীরেন তার নাম-ধাম সব

লিখিয়ে দিল। কনষ্টেবল্ বলল, "কোন্ আদমি আপনেকে জখম করিয়েসে বাত্‌লান। হামি উস্কো গিরেফ্‌তার করব।" এই বলে তার সুপুষ্ট গুম্ফে একবার চাড়া দিয়ে দিল।

এ প্রশ্নে ছেলের দল পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। ভয়-চকিত তাদের দৃষ্টি। দেখে নফ্‌রা প্রশান্ত বদনে হাস্য করল।

ধীরেন শেষে অনেক বুদ্ধি ক'রে বলল, "আসামী ভাগ গিয়া।"

কনষ্টেবল্ গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, "হাঁ, হাঁ, ই হোনে সাক্‌তা।"—'হোনে সাক্‌তা' কেন, হয়েই থাকে। তার বিগত দ্বাদশবর্ষব্যাপী পুলিসি-জীবনে সে এমন একটি আসামীকেও দেখে নি যে তার সঙ্গে মুলাকাত্ করবার দেহলী দত্তপুষ্প হ'য়ে ব'সে আছে।

নফ্‌রা কনষ্টেবল্‌কে কিসের ইসারা করল। তখন চোখ্ পাকিয়ে রুল ঘুরিয়ে কনষ্টেবল্ বলল, "দেখিয়ে বাবুলোগ্, আউর দাঙ্গা ফ্যাসাদ মাৎ করো! ফিন্ দাঙ্গা কিয়া শুনেগা ত হামি আপনেদের সকুলকে পাকড়ে লিব। গিরেফ্‌তার ক'রে চালান দিব। আইন সভি হামার কুছু কুছু মালুম আসে। ভোকিল-বেলিষ্টার সে পুছিয়ে লিন্, আপনেদের ছেছে মাহিনা কয়েদ হোবে কম্ সে কম্,—সে হামি বোলে দিল। খবরদার আউর এয়া কাম্ মাৎ করনা!"

কনষ্টেবল্‌কে নিয়ে নফ্‌রা চলে গেল। বাইরে এসে একগাল হেসে নফ্‌রা বলল, "বেশ করেছ জমাদার সাহেব, বাবুদের যা ভয়টি দেখিয়েছ, তেনারা ঠিক জব্দ হয়েছে। তুমি শিগ্‌গির থানার দারোগা হবে তা আমি ব'লে দিনু।"

পুলিসের হাঙ্গামা চুকলে হীরেন বলল, "নফরাটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। তাকে আজই বাড়ী পাঠিয়ে দেব।" তখন তার খেয়াল হল ভদ্রলোক দুজন আজই এসে পৌছুবেন, তাঁদের খাওয়ার আয়োজন কিছুই করা হয় নি। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

শ্রীবিলাস হঠাৎ জিগেস করল, "আচ্ছা হীরেনদা, পূর্ণেন্দু মুখুয্যের চেহারা কেমন? তুমি তাঁকে দেখেছ ত?"

তার এ প্রশ্নে আশ্চর্য্য হয়ে হীরেন বলল, "হাঁ দেখেছি, তা তাঁর চেহারায় তোর কি দরকার শুনি?"

শ্রীবিলাস বলল, "এমনি জানতে চাইছি। তুমি তাঁর চেহারা বর্ণনা কর।"

হীরেন যতদূর সম্ভব বর্ণনা করল। গুড়গুড়িকে বাদ দিয়ে মুখুয্যে মশায়কে ধারণা করা শক্ত, তাই সে হাসতে হাসতে তাঁর নিত্যসঙ্গী গুড়গুড়ির বর্ণনা করতেও ভুলল না।

ড্রয়ার থেকে টাকা বার করে নিয়ে হীরেন নফ্‌রাকে ডাকল। খুব ধমক দিয়ে জিগেস করল, "হাঁরে হতভাগা, তোকে পুলিস ডাকবার বুদ্ধি কে দিল?"

নফ্‌রা বলল, "এজ্ঞে কেউ দেয় নি। আমি আপনি বুদ্ধি ক'রে ডেকে এনেছি দাদাবাবু।"

হীরেন বলল, "আমার মাথা কিনেছিস, হতভাগা পাজী নচ্ছার! ফের যদি তুই নিজের বুদ্ধি ফলাতে যাস্ ত তোকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব, বুঝলি?"

নফ্‌রা বলল, "এজ্ঞে"। এই বলে চলে যাচ্ছিল, হীরেন তাকে ডেকে বলল, "আর শোন, দুজন ভদ্রলোক আজ খাবেন বুঝলি? এখুনি গিয়ে ঠাকুরকে বলে দে। আমি বাজারে যাচ্ছি। শুনতে পেলি?"

নফ্‌রা বলল, "এজ্ঞে"--কিন্তু এবার আর যাবার কোনো লক্ষণই তার দেখা গেল না।

"সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি কেন, যা বলে দিগে যা"—এই বলে হীরেন তাকে আর একবার সচেতন করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নফ্‌রা ছেলেদের জিগেস করল, "কারা আজ এখানে খাবেন গা বাবু?"—ওরা তখন নফ্‌রার ওপর এত চটেছে যে তার কথার জবাবই দিল না।

শ্রীবিলাস বলল, "জান সত্যেন, বুড়োকে নিশ্চয়ই এতক্ষণে গঙ্গার ঘাটে পাওয়া যাবে। আমরা এতজন রয়েছি, সবকটা স্নানের ঘাটে খোঁজ নিতে হবে। বুড়োকে খুঁজে বার করা চাই-ই।"

সত্যেন বলল, "কেন, বুড়োকে নিয়ে কি হবে?"

শ্রীবিলাস বলল, "এর একটা বিহিত আমাদের করতেই হবে। যেমন করে পারি এ বিয়ে বন্ধ করবই।"

হীরেন বলল, "বল কি! তুমি তা কেমন করে পারবে?"

শ্রীবিলাস বলল, "মৎলব একটা মাথায় এসেছে। দেখ্‌লে না হীরেনদার মুখ। ও যেন ঠিক চাবুক খেয়েছে। এক দিকে ওর মায়ের অনুরোধ, আর এক দিকে ওর অনিচ্ছা। এমন মৎলব বার করেছি যাতে সাপও মরবে, লাঠীও ভাঙবে না। বিয়ে বন্ধ করতেই হবে।"

অনুসন্ধিৎসু নফ্‌রা আর থাকতে পারল না, জিগেস করল, "কার বিয়ে গা, বাবু?"

সত্যেন তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তোর সে খোঁজে দরকার কি! অব্যাপারেষু ব্যাপারং! যাও না, আর একবার পুলিস ডেকে আনবে না?"

শ্রীবিলাস বলল, "না, না, নফ্‌রারও শোনা চাই। আমি যে মৎলব করেছি, তাতে নফ্‌রার সাহায্য নইলে চলবে না।" এই বলে নফ্‌রাকে সমস্ত খুলে বলল। নফ্‌রা বুঝল তার মনিবের মস্ত বিপদ উপস্থিত। সে-বিপদ থেকে উদ্ধার করবার ষড়যন্ত্রে নফ্‌রা সানন্দে সম্মতি দিল।

তখন ওদের কিসের একটা গভীর পরামর্শ হ'য়ে গেল। নফ্‌রাকে কি কি করতে হবে শ্রীবিলাস তা বারবার বুঝিয়ে দিলে। তার পর ওরা বেরিয়ে গেল।

(৩)

ঘড়িতে তখন এগারটা বাজে, মুখুয্যে মশায়ের দেখা নাই।

আসন্ন বর্ষার পাণ্ডুর ছায়া এসে বিস্তীর্ণা নগরীর প্রাসাদশীর্ষে লেগেছে। আকাশে ঘনায়মান মেঘের পুঞ্জ, বাতাস কোন্ অভিনবের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে। হীরেন দেখছিল তার সঙ্কীর্ণ জানালার ফাঁক দিয়ে ঐ একটুখানি আকাশের টুকরো সিনেমার পরদার মত, তার ওপর দিয়ে মেঘের নাচন-লীলা চলেছে। মন তার উদাস হয়ে ভেসে গেল কোন্ সুদূরের পানে।... কত অতীত যুগের ওপার হ'তে ভেসে আসা কবির গান,—কত মানুষের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি-মুখর সে বাণী, সে আজ নূতন ক'রে দেখা দিল আবার! পুরাতন এই ধরণীতে কত প্রাবৃটের মহোৎসবে চিরনবীন সে লিপিকা কত সুধা সঞ্চিত ক'রে রেখে গেছে, আজ আর একটি বর্ষায় আবার একবার অভিনব আর একটু মধু, আর একটু সুধা ভ'রে দিতে এল সে বাণী। হাওয়ার পুষ্পকরথে কত নদী জনপদের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে এ মেঘ যুগের পর যুগ ধরে,—কত দশার্ণা-দশপুর-অবন্তী-উজ্জয়িনীর দেখা পেয়েছে এ,—কত পাণ্ডুচ্ছায়াঘন উপবনবৃতিকার কেতকী মুকুলিত হয়েছে এর পরশনে, এর স্তনিতগর্জ্জনে ভয়চকিত কত কান্তা আলিঙ্গনে বেঁধেছে তাদের প্রিয়কে,—এর অভ্যুদয় সূচনা ক'রেছে কত বিরহিনীর অশ্রুজল, কত পথিকের দীর্ঘশ্বাস!... বিস্তীর্ণা নগরীর সৌধশীর্ষের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সহর্ষ উল্লাস কালিদাসের হয় ত কল্পনাতেই ছিল, কিন্তু হীরেন তা জানে। এরোপ্লেনের ককপিটের চর্ম্মাসনে চর্ম্মবেষ্টনীর মধ্যে বসে তার বক্ষ ক'রেছিল দুরু দুরু! স্বপ্নে দেখা কল্পনা করা ওড়ার সঙ্গে বাস্তবের কী প্রভেদ! গানের মত, হাওয়ার মত, সৌরভের মত ভেসে যাওয়া এ নয়,—প্রথমে মনে হয় এ যেন মোটর চড়া, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিপুল গর্জ্জনে ভূমিকে পদাঘাত ক'রে উদ্দাম নর্ত্তকীর মত আকাশকে আঁকড়ে ওঠা সুরু হল সে মুহূর্ত্তের কোনো বার্ত্তাই ত সুদূর স্বপ্নেও সে পায় নি! এ ত নিঃশব্দে ভেসে চলা নয়, এ যেন আঁকড়ে আঁকড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশে চড়া,—একবার লম্ফ দেয় একবার নামে,—এমনি ক'রে চলা। মাথার মধ্যে রক্ত করে ঝিম্ ঝিম্, চোখ আপনি আসে বুজে। ব্যাকুল হয়ে মেঝের দিকে চায়,—সেটা রয়েছে স্থির, তবু যা একটু সান্ত্বনা! সাম্‌নে কাঁচের ডিম্বাকার জানালার মধ্য দিয়ে দেখা যায় পাইলটের মুখের খানিকটা অংশ। পাশের পুরু কাঁচের জানালায় যেয়ে দেখলে চোখে পড়ে সীমাহীন আকাশ, শুভ্র মেঘের পুঞ্জ। নীচের দিকে দৃষ্টি মেলবার সাহস যখন হয়, মাথার মধ্যে দোলা দিতে থাকে তখন। ছোট ছোট বাড়ীর সারি, ছোট ছোট সবুজ মাঠ, একটা সরু নালা তারি মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। তখনি মনে পড়ে ওগুলো ঐ রাজধানীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার শ্রেণী, বিস্তীর্ণ পার্ক, ঐ সরু নালাটা হ'ল গঙ্গা! ওপর থেকে দেখলে মনে হয়

রাজধানীটা যেন মস্ত বড় একটা উইটিপি, পৃথিবীর বুক থেকে কুরে কুরে মাটী তুলে অসংখ্য কোকর বানিয়ে তারি মধ্যে মানুষ উইএর মত পরম উল্লাসে বাস করছে! সেই মাটীর টুকরো নিয়ে তার কত দ্বন্দ্ব, কত যুদ্ধ! সেই ধূলার অংশ নিয়ে মারামারির নামই হ'ল জীবন। সে কি একবারও ভাবে তার মাথার ওপর কী বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, লোক হতে লোকান্তরে ছড়িয়ে আছে! মৌনী আকাশের বাধাহীন প্রসারের মধ্য দিয়ে বিপুল গর্জ্জন তুলে এই যে নক্ষত্রের গতিতে ছুটে চলা,—এ কোন্ মানুষের মনকে না উন্মন করে! এমনি করে কি কোনো দিন আমাদের এই প্রাচীনা পৃথিবীর পরিচিত নীড় হ'তে বিদায় নিয়ে মঙ্গলগ্রহের কোনো এক সহস্রক্রোশী খালের ধারে নজর করা সম্ভব হবে না? মাথার মুকুটে থাকবে মকরচূড়া নয়, নীলকণ্ঠ-পাখীর পালক, দখিন করে ধনুকবাণ থাকবে না, থাকবে একরাশি ফুলের মত বার্ত্তাবহনের বেতার যন্ত্র,—মঙ্গল-বাসিনীর যে মাঙ্গলিক উঠবে তার বার্ত্তা ধ্বনিত হবে পিছনে ফেলে আসা সুদূর পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে!...

তার অবিশ্যি এখনো দেরী আছে অনেক, কিন্তু আপাততঃ যে বার্ত্তা ধ্বনিত হ'ল সেটা মঙ্গলবাসিনীর মাঙ্গলিক নয়, ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘর রব। হীরেন তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দাঁড়াল, দেখল গাড়ীর ভেতর মুখুয্যে মশায় ও তস্য নায়েব সতীশ বিষণ্ণ বদনে বসে আছেন, গাড়ী থেমেছে কিন্তু তাঁদের কোনো লক্ষণই নেই। ওপর থেকে গাড়োয়ান হাঁকছে, "আরে উৎরোনা বাবু, য্যায়সা ঘোড়া গাড়ীমে কভ্‌ভি চঢ়া নে, উঁতায়্‌নে নেহি মাংতা!"

তখন বিষণ্ণ বদনে মুখুয্যে মশায় সতীশকে বললেন, "নামো সতীশ।"

সতীশ বলল, "আজ্ঞে তবে নামুন।"

দুজনে গাড়ী থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, গাড়ী চলে গেল। হীরেন এগিয়ে এসে মুখুয্যে মশায়কে প্রণাম ক'রে বলল, "আসুন, আসুন, আপনারা ভেতরে আসুন।"

ওঁরা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলেন।

হীরেন আবার বলল, "সে কি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন ভেতরে আসুন!"

তখন মুখুয্যে মশায় বিষণ্ণমুখে সতীশকে বললেন, "চল সতীশ।"

সতীশ বলল, "আজ্ঞে তবে চলুন।"

ভেতরে গিয়ে দুজনে বসতেই চান না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর দুজনে বসলেন। হীরেন ভাবল ব্যাপার কি! ওঁদের দুজনের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন সহসা গভীর বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে ওঁদের মনে, মৃতদেহ দেখে সিদ্ধার্থের যেমন হয়েছিল। ওঁরা এখন সংসার ত্যাগ ক'রে ধাঁ ক'রে বনে পালিয়ে যাবেন না কি?

হীরেন জিগেস করল, "পথে আপনাদের কোনো রকম বিপদাপদ ঘটেনিত?"

মুখুয্যে মশায় উদাস নেত্রে চেয়ে বললেন, "বিপদ! তবে সকল কথা খুলে বল সতীশ।"

সতীশ বলল, "আজ্ঞে বলি'তবে সকল কথা খুলে। কর্ত্তামশায়ের গড়গড়াটি চুরি হয়ে গেছে!"—শোকে তার প্রায় বাক্‌রুদ্ধ হল।

তাই ত! হীরেনের ত এতক্ষণ সেটা লক্ষ্য করা উচিত ছিল যে মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে তাঁর নিত্যসহচর গড়গড়াটি নেই! জিগেস করল, "বলেন কি! এত জিনিষ থাকতে গড়গড়া চুরি হল? কি ক'রে চুরি হল?"

সতীশ যা বলল তার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে ওঁরা দুজনে যখন গড়গড়াটি গঙ্গার ঘাটে রেখে স্নান করছিলেন তখন মুখুয্যে মশায় হঠাৎ লক্ষ্য করলেন একজন ভদ্রবেশী ছোকরা গড়গড়াটি নিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ছে। মুখুয্যে মশায় তৎক্ষণাৎ 'চোর চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠে ভিজে কাপড়েই ওদের পিছু পিছু ছুটেছিলেন, কিন্তু গঙ্গার মাটি পিছল থাকায় ভিজে কাপড়ে পা জড়িয়ে ধড়াস্ ক'রে আছাড় খেলেন, তাঁকে ধরাধরি ক'রে তুলতে, কাপড় ছাড়াতে একটু সময় গেল, ততক্ষণে গড়গড়াটি নিয়ে চোর যে কোথায় পালাল তার কোনো পাত্তাই হল না।...

মুখুয্যে মশায় সনিঃশ্বাসে বললেন, "আমার অত সাধের গড়গড়াটি গেল হে! আর লাভের মধ্যে বুড়ো

মিন্‌বে চিৎপাত হয়ে আছাড় খেয়ে লোক হাসালুম! যে বেদনা হয়েছে দেহে, সাত দিন এখন চূণে হলুদে মালিষ করতে হবে!"

হীরেন বলল, "পুলিষে খবর দেননি?"

মুখুয্যে মশায় বললেন, "কে আর খবর দেবে!"

সতীশ বলল, "আমি বলেছিলুম কর্ত্তাকে তেওয়ারি-টাকে সঙ্গে আনতে, কর্ত্তা শুনলেন না।"

মুখুয্যে মশায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "পস্তাচ্ছি হে তার জন্যে সতীশ, পস্তাচ্ছি।"

সতীশ বলল, "ভদ্রলোকের ছেলের কী জঘন্য প্রবৃত্তি দেখুন, শেষে চুরি ধরেছে!"

মুখুয্যে মশায় বললেন, "ম্লেচ্ছাচার সতীশ, ম্লেচ্ছাচার। তোমায় বলি নি, ঐ ত সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল।"

সতীশ বলল, "আজ্ঞে যথার্থ বলেছেন কর্ত্তা। ব্রাহ্মণের ছেলেরা আজকাল পৈতে পর্য্যন্ত পরে না!"

মুখুয্যে মশায় বললেন, "সর্ব্বনাশের তবে আর বাকী কি! পৈতেই যদি ফেললি তবে আর বাকী থাকল কি!" হীরেনের দিকে চেয়ে বললেন, "হীরেন বাবাজি, আশা করি তুমি অমন দুষ্কর্ম্ম কর না!"

হীরেন চট্‌ ক'রে উঠে পড়ে বলল, "ওহো, ভারি একটা ভুল হয়ে গেছে, আমাকে এক মিনিটের জন্যে মাফ্‌ করবেন, এখুনি আসছি।"—এই বলে তার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

সতীশ চোখ টিপে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, "পৈতে পরতে গেল।" খানিক পরে হীরেন ফিরে এসে বলল, "আপনারা আসুন, খাবার তৈরি।"

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে পান চিবুতে চিবুতে মুখুয্যে মশায় ও সতীশ বাইরের ঘরে এসে বসলেন। মুখুয্যে মশায় সতীশকে চুপি চুপি বললেন, "ওহে ভারি তামাক ইচ্ছে হচ্ছে সতীশ, দেখ না যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পার।"

সতীশ তখন হীরেনকে কর্ত্তার তামাক ইচ্ছার কথা জানাল। হীরেন মাথা চুলকে বলল, "চুরুট চলতে পারে কি? চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি। ওরে নফ্‌রা—"

নফ্‌রা দ্বারের আড়ালেই ছিল। সে বলল, "এজ্ঞে সে কি দাদাবাবু! চুরুট কেন, আমি কর্ত্তার জন্তে তামাক ঠিক ক'রে রেখেছি, এই নিয়ে এনু বলে!"

হীরেন ভাবল নফ্‌রার যা বুদ্ধি, এখনি হয় ত চাকরদের খেলো হুঁকায় কড়া তামাক এনে হাজির করবে। সে ধমক দিয়ে বলল, "যা, যা, তোকে আর সর্দ্দারি করতে হবে না, যা ঐ দোকান থেকে ঝাঁ করে চুরুট কিনে নিয়ে আয়।"

নফ্‌রা কিন্তু সে কথা শুনল না। সে বাড়ীর ভিতর হ'তে সুদৃশ্য গড়গড়ায় সুগন্ধি তামাক নিয়ে এল।

মুখুয্যে মশায় ও সতীশ গড়গড়া দেখে লম্ফ দিয়ে উঠলেন। হীরেনেরও প্রায় সেই অবস্থা! গড়গড়াটি কমণ্ডলুর আকৃতি, রূপার তৈরী, এবং, না—কোনো ভুল নেই,—ওপরে সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে,—বেশ সগৌরবেই লেখা,—"মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, জমিদার এণ্ড অনারারি ম্যাজিষ্টার!"

সকলেই নির্ব্বাক, শুধু নফ্‌রার মুখে একমুখ হাসি। মুখুয্যে মশায় বলে উঠলেন, "এঁ্যা! তোমার মনে এই ছিল! ও সো—সো—সতীশ"—ক্রোধে তিনি রুদ্ধবাক্‌ হলেন।

সতীশ ঘুসি পাকিয়ে আস্ফালন ক'রে হীরেনকে বলল—"তবে রে—" ইত্যাদি।

হীরেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সতীশ গড়গড়াটিকে উঠিয়ে নিয়ে সেটাকে আন্দোলন ক'রে বলল, "কোনো ভয় নেই কর্ত্তা!" হীরেনকে চোখ রাঙিয়ে বলল, "বেটা ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি! এখনি থানায় যাব, এখনি পুলিষ ডাকব! দেখছ আমার হাতের হাতিয়ার! চোপরও, খবরদার!"

এই বলতে বলতে ওদের ব্যাগটি নিয়ে, মুখুয্যে মশায়কে নিয়ে এবং মুখুয্যে মশায়ের গড়গড়াটি নিয়ে সতীশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুখে যতই আস্ফালন করুক না, তার ভেতরে ভেতরে ভয় হয়েছিল খুব। মুখুয্যে মশায়কে নিয়ে সেই যে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়ে বসল, আর একবারও পিছনে তাকাল না।

হীরেন আকাশ-পাতাল ভাবছিল ওটা তার বাড়ীতে এল কি করে! নফ্‌রা নিশ্চয়ই জানে। নফ্‌রাকে জিগেস করল, "তুই নিশ্চয় জানিস।"

"নফ্‌রা তৎক্ষণাৎ জবাব্‌ দিল, "এজ্ঞে আমি কিছুই জানি না দাদাবাবু!"

হীরেন বলল, "জানিস না! ন্যাকা! আমাকে পাগল পেয়েছিস না কি?"

নফ্‌রা জিভ্‌ কেটে বলল, "বালাই ষাট্‌, আপনি পাগল হবেন কেন দাদাবাবু, পাগল ছিলেন বটে আমার নিশ্চিন্দিপুরের মাসী,—চাষের কাজ সুরু হলেই বলতেন, 'ওরে নফ্‌রা, তুই ভাবিস নে, আমি ইন্দিরকে হুকুম দিয়েছি খুব বিষ্টি নামিয়ে দেবে'।"

হীরেন বলল, "চুলোয় যাক্‌ তোর নিশ্চিন্দি-পুরের মাসী। গড়গড়া এখানে কি করে এল তাই বল।"

এমনি ক'রে নফ্‌রার পীড়ন চলছে এমন সময় শ্রীবিলাস এসে পড়ল। সে বলল, "হীরেনদা, নফ্‌রাকে বোকো না, ওর দোষ নেই, দোষ আমার। আমিই তোমার মুখুয্যে মশায়ের গড়গড়া চুরি ক'রে নফ্‌রাকে দিয়েছি। যা শাস্তি দিতে হয় আমায় দাও।"

হীরেন আশ্চর্য্য হয়ে বলল, "তুমি কেন এ কাজ করতে গেলে?"

শ্রীবিলাস বলল, "প্রজাপতির প্রতিবন্ধ।"

হীরেন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে হেসে বলল, "আমাকে বাঁচালি ভাই, কিন্তু চোর ব'লে যে কলঙ্ক রয়ে গেল আমার!"

শ্রীবিলাস বলল, "মিথ্যা কলঙ্ক, তুমি যে নষ্টচন্দ্র দেখেছিলে, মনে নেই?"

মুখুয্যে মশায় হরসুন্দরীকে জানিয়ে দিলেন হীরেনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি রয়েছে; আপত্তির কারণ কিছু জানালেন না পাছে বৃদ্ধা মনে কষ্ট পান।

যথাসময়ে প্রচুর বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে সিমুলহাণ্ডানিবাসী জমিদার উদ্ধবনারায়ণ বাবাজীবনের সঙ্গে ক্ষেমঙ্করীর শুভ পরিণয়-কার্য্য সমাধা হয়ে গেল।

"রাঢ়াপুরী"

(প্রতিবাদের আলোচনা)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "রাঢ়াপুরীর প্রতিবাদ" পড়িলাম। আমি স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। ননীবাবুর প্রবন্ধ দেখি নাই। যোগেশবাবুর প্রতিবাদ পড়িয়া মনে হইতেছে ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠ আজিও সঠিক্‌ভাবে নির্ণীত হয় নাই। "রাঢ়াধিপ" কাল্পনিক হইতে পারে। "গঙ্গিয়" হইতে "নাগাঘর" ও খুব সুবিধাজনক মনে হয় না। লিপিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞগণ মূল শাসনখানা লইয়া এই ব্যাপারের নিরসন করিলে ভাল হয়। অন্যথায় গরজমত আমরা যাহা হয় একটা মানে করিতে থাকিব।

রাজেন্দ্রচোলের লিপিতে ধর্ম্মপাল, গোবিন্দচন্দ্র রণশূর প্রভৃতি কাহাকেও কোনদেশের অধিপতি বলা হয় নাই। কিন্তু দণ্ডভুক্তি, বাঙ্গালদেশ, তক্কণ লাঢ়ম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ঐ ঐ ব্যক্তির নাম দেখিয়া উঁহাদিগকে এতৎ দেশের অধিপতি বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। দণ্ডভুক্তি প্রভৃতির সঙ্গে ধর্ম্মপাল প্রভৃতির যে সম্পর্ক, মহীপালের সঙ্গেও উত্তর রাঢ়ের ঠিক সেই সম্পর্ক।

যোগেশবাবু লিখিয়াছেন "যশোবর্ম্মার গৌড়ে আগমন ৯৫৪ খ্রীঃ নহে"। সে খ্রীঃ তাহা হইলে কত? খাজুরাহোতে লক্ষ্মণজীর মন্দিরে যে লিপিতে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—

গৌড় ক্রীড়ালতাসিস্তুলিত খসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎ কাশ্মীরবীরঃ শিথিলিত মিথিলঃ কালবন মালবানাং।
সীদৎ সাবন্ত চেদিঃ কুরু তরষু মরুৎ সংজ্বরো গুর্জ্জরাণাং
তস্মাত্তস্যাং স যজ্ঞে নৃপ কুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মরাজঃ॥

লিপি-লিখিত জাত রাজ্যকাল গুর্জ্জর চেদী প্রভৃতি রাজগণের বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্য-ভাগেই যশোবর্ম্মদেব গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই লিপি ধঙ্গের সময় পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই উহাতে ধঙ্গের নাম পাওয়া যায়।

বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তির "বৈধীকৃত বিপক্ষ কুঞ্জরঘটা বিশ্লিষ্ট কুম্ভস্থলী মুক্তাস্থূল বরাটিকা" শ্লোকে বিপক্ষ পক্ষীয় গজ যুগেরই উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কম্বোজাধরজ গৌড়পতির সন্ধান কতখানি নিরাপদ বুঝিতে পারিলাম না। উক্ত গৌড়পতির কুম্ভস্থলী পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারি, কিন্তু মোটা মোটা মুক্তাবলী লইয়া বিভ্রাট ঘটিবে!! এই 'কুঞ্জরঘটা' গৌড়পতি অর্থে লিখিত হইলে "বৈধীকৃত

বিপক্ষ" কথা থাকিত না। তাছাড়া কম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির "বাণগড়" লিপির অক্ষর সেনবংশীয় রাজগণের লিপির অক্ষর হইতে অনেক পুরাণো। সুতরাং কুঞ্জরঘটাবর্ষকে বিজয়সেনের সময়ে টানিয়া আনার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার! বিজয়সেনের লিপিতে পরাজিত রাজগণের ঠিকানা খুঁজিতে হয় না। এখানে কোন শ্লিষ্ট শব্দও নাই। এরূপভাবে অর্থ করিলে তো অনেক লিপির মধ্যেই অনেককে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

যোগেশবাবু লাউসেনকে "কর্ণাটক" বলিতে চাহেন কোন্ সুবাদে? লাউসেন যদি রাঢ়মণ্ডলই দখল করিয়াছিলেন, তাহা হইলে মহীপালের পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া ছিলেন তিনি কে? মহীপালের বাণগড় লিপিতে যে "বাহুদর্পাহৃতমধিকৃত বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্যপিত্র্যং" কথা রহিয়াছে উহার অর্থ কি? পাল রাজাদের জনকভূ তো বরেন্দ্র. কে সেখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল? মহীপাল নিজরাজ্যের তৃতীয় বৎসরেই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করিলেন আর রাঢ়দেশ অনধিকৃত থাকিয়া গেল?

তারপর লাউসেন? আজ পর্য্যন্ত কোন খোদিত লিপিতে বা মুদ্রায় লাউসেনের নাম পাওয়া যায় না। লাউসেনের একমাত্র ভরসা ধর্ম্মমঙ্গল। অনেকগুলি ধর্ম্মমঙ্গলেই দেখিয়াছি—"ধর্ম্মপাল রাজা মলো অরাজক দেশ" এবং তাহার পর লাউসেনের অভ্যুদয়। এই ধর্ম্মপাল যে দণ্ডভুক্তিপতি ধর্ম্মপাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লাউসেন যেখানে রাজ্য করিয়াছিলেন সেই ময়নাগড় বা ঢেকুর গড় দাঁতনের সামন্তরাজ্য ছিল। তাহার বহু নিদর্শন ও জনশ্রুতি আজও রহিয়াছে। বীরভূম বিবরণ ১ম ও ৩য় খণ্ডে আমি তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়ের পরে লাউসেনের সময় ঠিক্ করিতে হইবে। ধর্ম্মমঙ্গল মানিতে হইলে এক অংশ বাদ দিয়া সুবিধামত অন্য অংশ মানিলে চলিবে কেন? লাউসেনকে বিচার করিতে হইলে ধর্ম্মমঙ্গল লইয়া তাহার সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য সম্ভব অসম্ভব দেখিয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমি ঐতিহাসিক নহি। রাঢ়াপুরীর স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রয়োজন মত কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। অনেক ঐতিহাসিককে কায়স্থ বাতিকগ্রস্থ দেখিতে পাই। আশা করি যোগেশবাবু তাঁহাদের দল পুষ্ট করিবেন না। কালিদাস বাঙ্গালী প্রতিপন্ন হইয়াছেন; রঘু, কুমার শকুন্তলায় অনেক জমিন্ বাঙ্গালায় পাওয়া গিয়াছে। সেইরূপ গুপ উপাধিধারীদের বাঙ্গালী কায়স্থ জানিতে পারিলে এবং তর্কারিকা প্রভৃতি স্থানগুলি মধ্যভারত হইতে বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত হইলে আমাদের আনন্দেরই কারণ ঘটিবে। তবে কথা এই যে 'গুপ' বাঙ্গালায় অন্য জাতিদেরও উপাধি রহিয়াছে। এবং তর্কারিকা নামক স্থান মধ্যভারতেও পাওয়া যাইতেছে।

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন মৃৎ-শিল্পের চমৎকারিত্ব)

প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য—এমন কি প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন অপেক্ষাও পুরাতন মৃৎ-শিল্প মানুষের মনকে অধিক মুগ্ধ করে। তার কারণ প্রাচীন মৃৎ-শিল্পের মধ্যে আমরা সেকালের মানুষদের একটা খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই। মৃৎ-শিল্পের ভিতর হ'তে তাদের যে ঘরের খবরটুকু আমরা জানতে পারি, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্য আমাদের সে সংবাদ দিতে পারে না। কাজেই মৃৎ-শিল্প আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে সকলের চেয়ে বেশী। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য দেয় শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়, স্থাপত্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে সে যুগের সমৃদ্ধির নিঃসন্দেহ প্রমাণ; আর মৃৎ-শিল্প বলে দেয় তখনকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার চিত্তাকর্ষক কাহিনী, যা অন্য কোনো উপায়ে জানবার সম্ভাবনা খুবই কম।

মানুষ তার সাংসারিক প্রয়োজনে সর্ব্বপ্রথম যে সকল পাত্র ব্যবহার করতো তা যে মৃৎ-পাত্র নয় এ-কথা বলাই বাহুল্য। কারণ মাটির জিনিস তৈরী করার চেয়ে ঢের বেশী সহজ ছিল পাথর বা কাঠ কুঁদে কিম্বা চামড়া সেলাই করে কোনো আধার প্রস্তুত করা। আবার তার চেয়েও সহজে আধার তৈরী হ'ত পাকা লাউ বা নারিকেল প্রভৃতি ফলের শক্ত খোলা কিম্বা শঙ্খ শামুক ঝিনুক ইত্যাদির খোল বা জীবজন্তুর মাথার খুলিতে। এ-গুলো আর তৈরী করে নেবার দরকার হ'ত না, একেবারে ব্যবহারের জন্য প্রকৃতি যেন তৈরী জিনিস মজুদ করে রাখতেন।
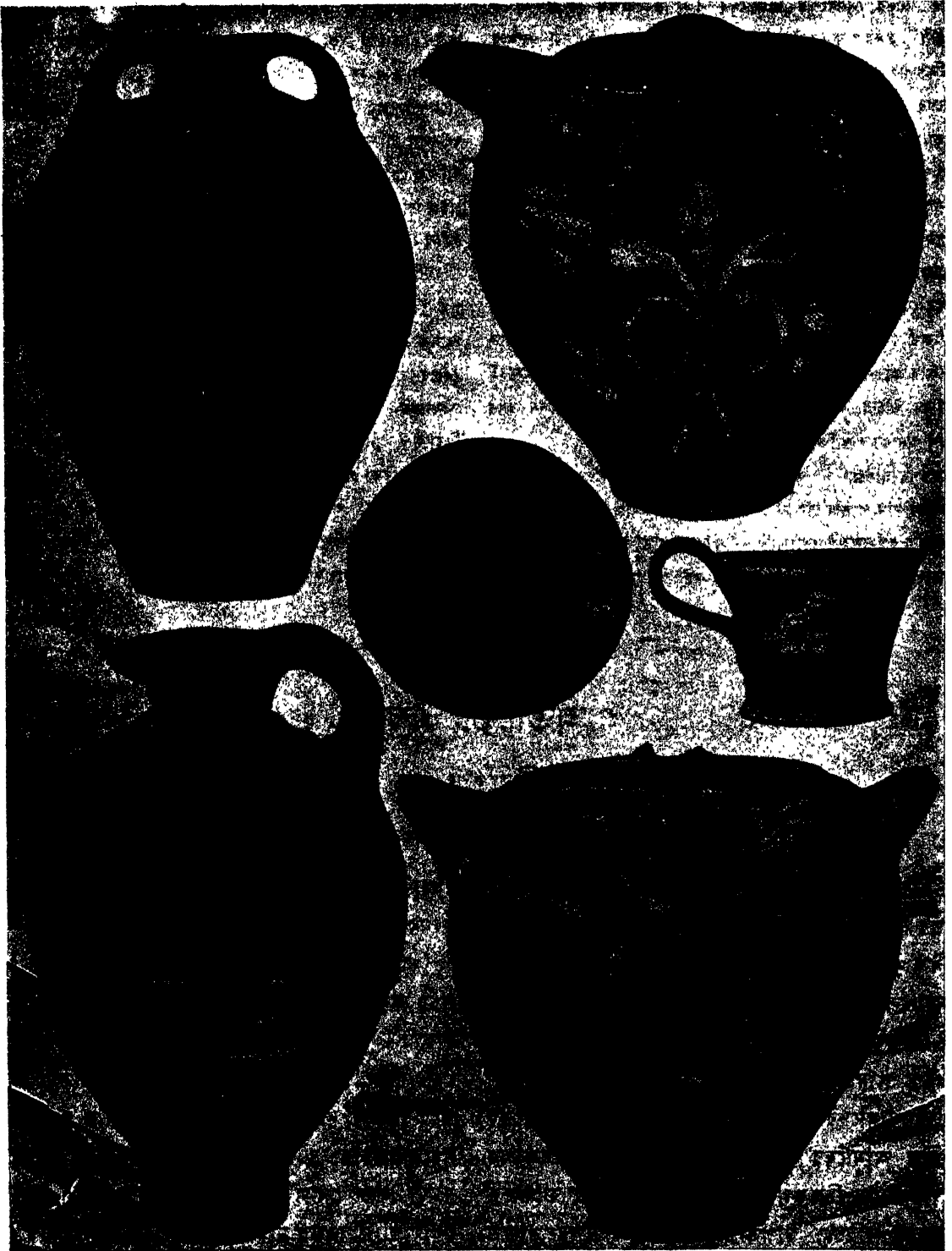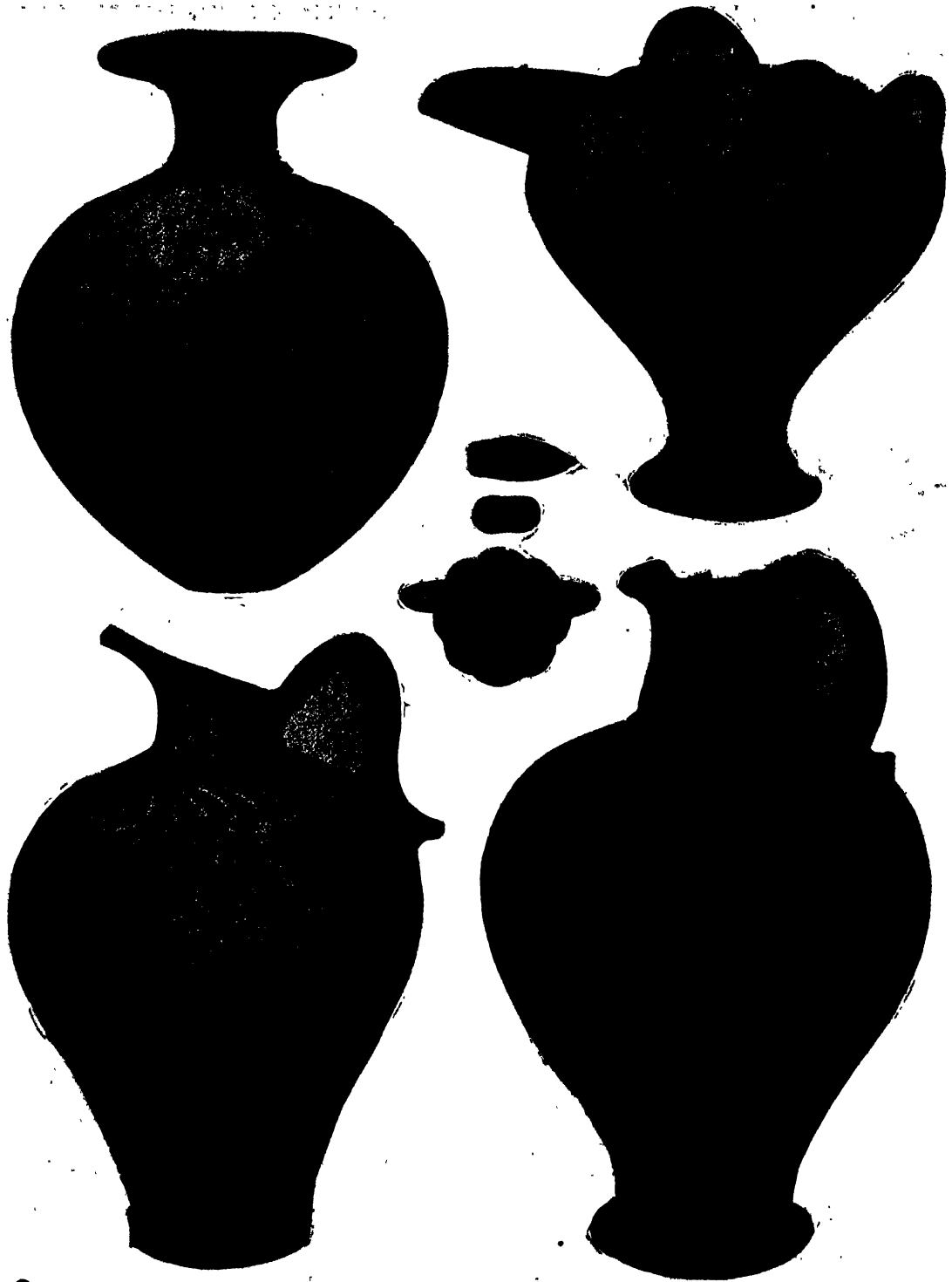
মাইনোয়ান মৃৎপাত্র

মাইশেনিয়ান মৃৎপাত্র—কলস (উটপাখীর ডিমের আকারে তৈরি। উটপাখীর ডিমের সোনা বাঁধানো তলা ও রূপালী গলার অনুকরণে গড়া ও রং করা)। ভৃঙ্গার (ভাবরের আকার ক্রমে বদলাচ্ছে)। গাগরী (মুখ ও হাতল রকমারী হয়ে উঠেছে রংয়েও বৈচিত্র্য ফুটেছে)। গাগরী (মুখ ও হাতল রকমারী হয়ে উঠেছে রংয়েও বৈচিত্র্য ফুটেছে)

কিন্তু, মানুষ যখন শিল্পী হ'য়ে উঠলো সে মৃৎ-পাত্র নির্মাণ ক'রতে সুরু করলেন মাটি মেখে হাতে গড়ে (পরে চাক ঘুরিয়ে গড়তে শিখেছিল) রৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে যে যেসব পাত্র তৈরী ক'রতে আরম্ভ করলে, প্রথমটা সেগুলির আকৃতি বা গড়ন হ'ত অনেকটা

গ্রীসের আদিম যুগের মৃৎপাত্র (খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর আগের তৈরি চামড়ার কাঠের পাথরের ও বেতের জিনিসের অনুকরণে নির্ম্মিত দুটি সুরাধার, একটি বাটি, একটি কৌটা, একটি গেলাস)

সেই প্রকৃতি-দত্ত ফলের খোল শামুকের খোলা ও জীব-জন্তুর খুলির আকারে। স্বভাবকে অনুকরণ করাই ছিল তখন তাদের শিল্পের আদর্শ। কাজেই, সেই পাত্রগুলির

৪ ভৃঙ্গার—(মাইনোয়ান মৃৎপাত্র, মুখনলের অত্যধিক দৈর্ঘ্য এ যুগের বিশেষত্ব, খৃঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বৎসর আগের)

উপর তারা যে সব কারুকার্য্য বা চিত্র বিচিত্র ক'রতো সেও ওই প্রকৃতির অনুসরণে। তার মধ্যে মৌলিকতার নিদর্শন ছিল বিরল।

প্রাচীন গ্রীসের যে মৃৎ-শিল্প, অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসে যে সকল মাটির জিনিস তৈরী হ'ত তার আকার ছিল অনেকটা চ্যাপ্টা বেতের চুপ্‌ড়ির মত। তাতে আবার লাল ও সাদা রং মাখানো হ'ত চুপ্‌ড়ির গায়ের রঙীণ চিরাড়ির অনুকরণে। লম্বা চোঙের মত আকারের মাটির পাত্রও তৈরী হ'ত এবং তাতে এত রকম কারুকার্য্য করা থাকতো যা

পানপাত্র (মাইনোয়ান মৃৎপাত্র, মুখনলের অত্যধিক দৈর্ঘ্য এ যুগের বিশেষত্ব খৃঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বৎসর আগের)

পাথর বা কাঠ কুঁদে করা অসম্ভব। চামড়ার বোতল যে ভাবে তৈরী হ'ত পরে মাটির ভাঁড়ও সেই আকারে তৈরী

৬ পানপাত্র (মাইনোয়ান মৃৎপাত্র, মুখনলের অত্যধিক দৈর্ঘ্য এ যুগের বিশেষত্ব খৃঃ পূঃ ২৫০০-২০০০ বৎসর আগের)

হ'য়েছিল। পেট মোটা, সরু গলা, ঢালু মুখ, পাশে বা কাঁধে হাতল আঁটা। চামড়ার বোতলে যেখানে যেখানে সেলাইয়ের দাগ দেখা যেত' মাটির আধারেও

ঠিক সেই সেই জায়গায় শেলাইয়ের অনুকরণে কারুকার্য্য করা হ'ত।

ধাতু-পাত্রের যুগেই সর্ব্বপ্রথম গ্রীসে গাড়ু বা বদনার মত নল আঁটা, হাতল বসানো, ঢালু মুখ পাত্র নির্ম্মিত হ'ত। ধাতু দ্রব্যের পক্ষে এরূপ আকারের পাত্র নির্ম্মাণ করা সহজ ও স্বাভাবিক হ'লেও এ ধরণের মৃৎ-পাত্র গড়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কঠিনকে আয়ত্ত করবার প্রয়াস মানুষের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব; তাই ধাতু-জয়ের দু'-হাজার বছর পরে আমরা দেখতে পাই মানুষ মৃৎ-পাত্র গড়তে শিখে সোনা রূপো বা ব্রোঞ্জে যেমনটি গড়া হ'ত, মাটি দিয়েও ঠিক হুবহু তেমনটি নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছে! সেই সুগঠিত আকার সুদৃশ্য আধার, সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত রূপ। ওই ধাতু-গঠিত আদর্শ সামনে থাকার ফলে গ্রীসের মৃৎ-শিল্পের এত দ্রুত উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল। তখন চক্র ও লেদ্ (lathe) প্রভৃতি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়নি। যা কিছু সব মানুষকে হাতেই গ'ড়তে হ'ত। খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর আগে অর্থাৎ ধাতব যুগের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে কুম্ভকারের চক্র প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই চক্রের সাহায্যে মৃৎ-শিল্প একেবারে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। গোল গোল বাটি ঘটি, কাণা-উঁচু বড় ধারিযুক্ত পাত্র, যা হাতে গড়ার যুগে ছিল অত্যন্ত কঠিন, তা' শুধু যে সহজ-সাধ্যই হ'য়ে উঠলো তাই নয়, সেই গোল ঘটি বাটির চারপাশ সুডৌল গোল হ'য়ে উঠলো, জিনিসগুলি পাতলা ও হালকা ক'রে গড়া সম্ভব হ'ল এবং ওপরে একেবারে নিখুঁত চক্‌চকে পালিশ দেওয়ারও আর কোনো বাধা রইল না।

গ্রীক্ শিল্পের সূতিকাগার ছিল ক্রীট দ্বীপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সেখানে শিল্প ও সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়—ঐতিহাসিকেরা য়ুরোপের এই অংশের প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতাকে বলেন—মাইনোয়ান শিল্প ও মাইনোয়ান সভ্যতা। কারণ, এই সময় 'মাইনো' নামে একজন রাজার অধীনে ক্রীট একটা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠেছিল। তাই, য়ুরোপের এই সময়ের এই স্থানের যা কিছু ব্যাপার সবই 'মাইনো'র নামে পরিচিত। মাইনোয়ান মৃৎ-শিল্প তখন চাকার সাহায্য পেয়েছিল; তাই কলারম্ভ হিসাবে ঐ সময়ের মৃৎ-শিল্পকে একালের নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য-প্রাপ্ত মৃৎ-শিল্পও

দেবঝারি (সামুদ্রিক জীবজন্তুর অনুকরণে চিত্রিত, এটিতে ক'রে দেবতার মস্তকে সুগন্ধ তৈল পানীয় সুরা মধু প্রভৃতি ঢালা হয়। চোঙের তলদেশে সরু ছিদ্র আছে, খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর আগের)

ভৃঙ্গার (সামুদ্রিক জীবজন্তুর অনুকরণে চিত্রিত, এটিতে ক'রে দেবতার মস্তকে সুগন্ধ তৈল পানীয় সুরা, মধু প্রভৃতি ঢালা হয়। চোঙের তলদেশে সরু ছিদ্র আছে, খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর আগের)

কোনো দিক দিয়ে পরাস্ত ক'রতে পারে নি। কেবল মাটী-মাখা আর পোড়ানো ব্যাপারটায় একালের বৈজ্ঞানিক যুগের মৃৎ-শিল্প সেকালের মৃৎ-শিল্পের চেয়ে

গাগরী (সামুদ্রিক জীবজন্তুর অনুকরণে চিত্রিত, এটিতে ক'রে দেবতার মস্তকে সুগন্ধ তৈল পানীয় সুরা মধু প্রভৃতি ঢালা হয়। চোঙের তলদেশে সরু ছিদ্র আছে, খৃঃ পূঃ ১৫০০ বৎসর আগের)

কলস (জীবজন্তুর চিত্রাঙ্কিত, খৃঃ পূঃ ৬৫০ বৎসর আগের)

অধিকতর নিখুঁৎ হ'য়ে উঠতে পেরেছে মাত্র! মাইনোর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ডিমের খোলার মত যে হালকা পাতলা সৌখীন মৃৎ-পাত্র পাওয়া গেছে, সার আর্থার ইভান্স্ সেগুলি দেখে বলেন মাটির জিনিস যে এমন ফেনার ফানুষের মত সূক্ষ্ম হ'তে পারে এ আমাদের কল্পনার অতীত! এ-রকম জিনিস গড়া ত' দূরের কথা, এর ভাঙা
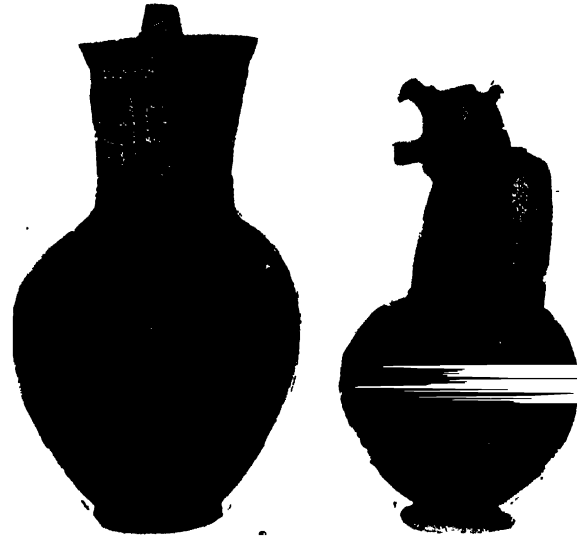
তৈলঘট ও ভৃঙ্গার (জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কিত এ্যাটিক মৃৎশিল্প খৃঃ পূঃ ৯০০-৭০০ বৎসর আগের)

টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে খাড়া করতে পারে এমন কারিগরও এ যুগে কেউ নেই।

মাটির জিনিসগুলিকে তারা এমন রং দিয়ে চমৎকার ক'রে তুলতো যে দেখে যথার্থই বিস্মিত হ'তে হয়। চক্‌চকে কালো জমীর উপর হলদে, লাল ও সাদা রংয়ের সাহায্য তারা এমন একটা রংয়ের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতো যে দেখলে মনে হ'ত জিনিসগুলি যেন রঙীন পাথরের তৈরী! ক্রীটে একরকম অদ্ভুত কালো পাথর পাওয়া যায় যার গায়ে লাল এবং সাদা রংয়ের ডোরা কাটা আছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে এদেশের শিল্পীরা এই পাথরের অনুকরণেই মাটির উপর রং দেওয়ার পরিকল্পনা ক'রেছিল ; কারণ, এই পাথরের তৈরি একাধিক ফুলদানী ভৃঙ্গার প্রভৃতি পাওয়া গেছে—আবার ঠিক অবিকল সেই রক-

মের রং-করা মাটির জিনিসও বেরিয়েছে। পাথরের গায়ের রং ভোরা আঁশ ও চক্রের অনুকরণে সেখানে অনেক রকম মাটির জিনিসই যে রং হ'ত তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মৃৎপাত্রের গায়ে যে সব কারুকার্য্য দেখতে পাওয়া যায় তার অধিকাংশই জ্যামিতির ক্ষেত্রাঙ্কণের মত। তার মধ্যে আবার পশুপক্ষী ও ফুল লতাপাতার সমাবেশ থাকায় দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু, এই যে সব ফুল লতাপাতা বা পশুপক্ষীর চিত্র, এর কোনোটিই স্বাভাবিক নয়। এগুলি সবই শিল্পীর কল্পনা-জগতের তরুলতা পুষ্পপত্র ও পশুপক্ষী। প্রাকৃত জগতে এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বভাবের হুবহু অনুকরণ ক'রতে তারা অনেক পরে শিখেছে। ধাতবযুগের শেষে যে সময়টাকে 'মাইশেনীয়ান যুগ' বলা হয়, ক্রীটের মাইনোয়ান শিল্পের প্রভাব যখন মূল গ্রীসের অন্তরপ্রদেশে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, সেই সময় ক্রীটে এক নব সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে এবং তার রাজধানী হয় 'মাইশিনে'। স্বর্ণলঙ্কার মত মাইশিনেকে সে যুগের লোকেরা বলতো:—"সোনার মাইশিনে!" এই সময়ই বিশ্ববিশ্রুত কবি হোমারের বর্ণিত নায়ক নায়িকারা বেঁচেছিলেন। 'ট্রয়' তখনও ধ্বংস হয়নি। প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যের অবিকল নকল করা এই সময়ের শিল্পীদের মধ্যেই সংক্রামক হ'য়ে উঠেছিল।

এই মাইশেনীয়ান যুগের মৃৎশিল্পে স্বাভাবিক ফুল লতাপাতা ছাড়া সামুদ্রিক জীবজন্তু ও মৎসাদির চিত্রও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বনচর কোনো জীবজন্তু বা মানুষের ছবি চোখে পড়ে না। খুব সম্ভবতঃ ক্রীটের শিল্পীরা এই সময় বুঝেছিল যে নরনারীর মূর্ত্তি বা জীবজন্তুর চিত্র এত বেশী সাধারণ এবং ধাতু নির্ম্মিত পাত্রাদি ও ভিত্তিগাত্রস্থ পঙ্ক-চিত্রে এত অধিক ব্যবহার হয়েছে যে মৃৎশিল্পের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে তার' আর কোনোই নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নেই। তাই, তারা ওগুলো একেবারে বর্জ্জন করেছিল। এ সময় যে সব মৃৎপাত্র তৈরি ক'রেছিল তার অধিকাংশগুলিরই পেটে
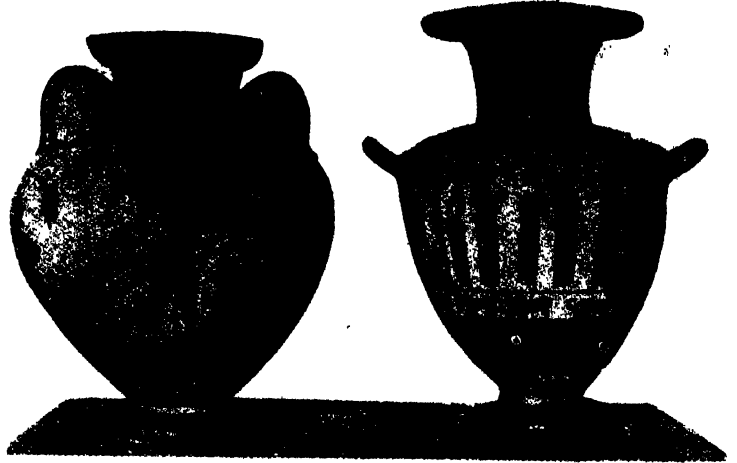
কলস বা ঘট (নর-নারীর চিত্রাঙ্কিত—এ্যাটিক্ ব্ল্যাক ফিগার্ পটারি, খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসর আগের)
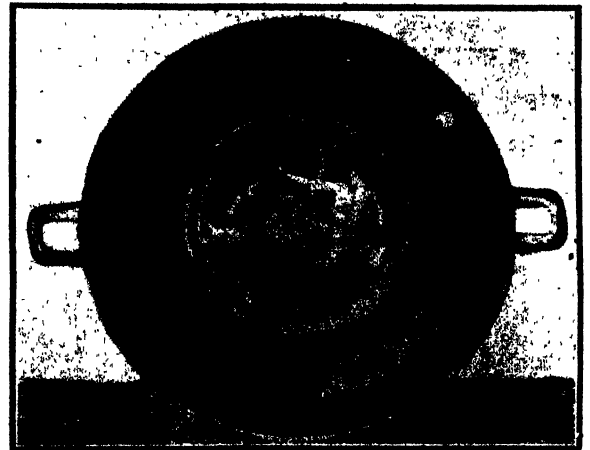
পানপাত্র (এ্যাটিক রেড্ ফিগার পটারি—একটি যুবক নৈশ ভোজনে বসেছেন, সম্মুখে নর্ত্তকী নাচছে, তিনি তাল দিচ্ছেন—চিত্রবলা হিসাবে অপূর্ব্ব—খৃঃ পূঃ ৪৫০ বৎসর আগের)

গলায় বা তলায় একটা ক'রে চওড়া রঙীন পটি ঘেরা বা ঝালর-আঁকা কিম্বা ফুলের কেয়ারী করা থাক'ত। ফুলের পটির উভয়প্রান্তে আবার সরু সরু ঢেউখেলানো বা ঘোরানো ঘোরানো রেখায় পাড় আঁকা। এই

পাড়টা আঁকতো তারা ধাতুপাত্রের গায়ে যে তারের ঘুরিয়ে আঁটা বা খাদ্‌রি কেটে বসানো ফুলদার কাজ থাকতো তারই অনুকরণে। মৃৎপাত্রের আকারও তারা যে ধাতুপাত্রেরই অনুরূপ ক'রতো এ-কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

সুরাগন্ধ (কাল্পনিক জীব ও মানুষের মুখের আকৃতি, খৃঃ পূঃ ৪৫০ বৎসর আগের)

এ সময় মৃৎপাত্রের রংও একেবারে বদলে গেছলো। কালো জমীর পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল পীতবর্ণের জমীর উপর অর্থাৎ মাটির আসল রূপটাই রেখে তার উপর লাল
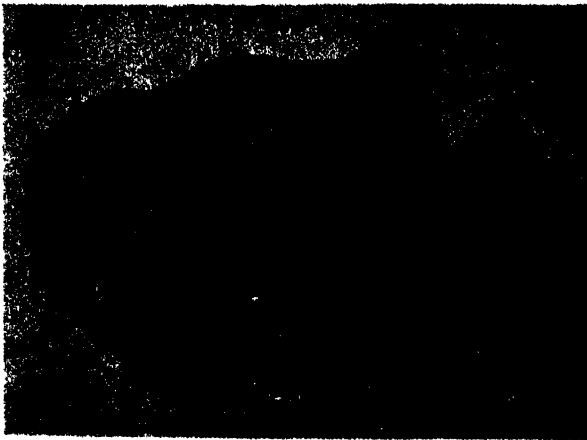
পুষ্পপাত্র (জানুসন্ধির অস্থির আকৃতি,—খৃঃ-পূঃ ৪৫০ বৎসর আগের)

কালো ও পাটকিলে রংয়ের ছোপ ধরানো হ'ত। গালা মিশিয়ে রং পালিশ করার পদ্ধতি এ সময় প্রচলিত হয়েছিল। রং লাগাবার নৈপুণ্য ও চাতুরীই হ'য়ে উঠেছিল এ সময় মৃৎশিল্পের একমাত্র অঙ্গসজ্জা। সমুদ্র এই সময়ের শিল্পীদের পরিকল্পনার প্রধান অবলম্বন হ'য়ে উঠেছিল। পুষ্পপাত্র পানপাত্র ভৃঙ্গার প্রভৃতি যে কোনো মৃৎপাত্রের গায়ে এ সময় দেখা যায়, সমুদ্রের ঢেউ, ফেনা, শেওলা, ঝিনুক, শামুক পাথর নুড়ি—ও অদ্ভুত অদ্ভুত সামুদ্রিক জীব আঁকা রয়েছে! ক্রীট দ্বীপের সমুদ্রকূলে কোনো তরঙ্গহীন শান্ত মুহূর্ত্তে সাগরের স্বচ্ছ বক্ষে ঠিক যেমন সব সিন্ধুসম্পদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পাওয়া যায়—শিল্পীরা তাদের মৃৎপাত্রের চিক্কণ মসৃন অঙ্গে অবিকল ঠিক তারই ছবি ফুটিয়ে তুলতো বিচিত্র রং ও তুলির সাহায্যে।

খৃঃ পূর্ব্ব প্রায় সহস্র বৎসর আগে এজীয়েন ভূমির এই প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতা বিদেশীদের আক্রমণজনিত সংঘাতের ফলে চূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যারা এলো তারা অধিকতর শক্তিশালী বটে, কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতায় এদের চেয়ে নিকৃষ্ট। তারা নিয়ে এলো সঙ্গে করে গ্রীক ভাষার সম্পদ ও নবধাতু লোহার সন্ধান। আর নিয়ে এলো সুকেশিনী সুন্দরীদের রূপের ঐশ্বর্য্য। ঐতিহাসিকদের মতে তারা সম্ভবতঃ কোনো উত্তরাঞ্চলের লোক। এদের শুভাগমনের আগেই মাইশেনিয়ান মৃৎশিল্পের অবনতি সুরু হ'য়েছিল। কাজেই এ ধাক্কা আর তারা সামলাতে পারলে না, আপনিই লোপ পেয়ে গেলো, কিন্তু এ সময় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আর একরকম মৃৎশিল্প বাজারে দেখা দিলে। এ সব মাটির জিনিসের গঠন বা আকৃতি নূতন রকম বটে, কিন্তু নির্ম্মাণ হ'ল সেই পুরাতন রীতির অনুসরণেই। এবারও ধাতু-পাত্রের অনুকরণেই মৃৎপাত্র গড়া হ'ল বটে, কিন্তু উপরের রঙীন কারুকার্য্যটুকু নেওয়া হ'ল তাঁতে বোনা ছিট বা ছুঁচে তোলা কাপড়ের ফুলকারী থেকে। সারি সারি তেকোনা বরফির মত ত্রিভুজ সমষ্টির সমাবেশ দেখা যেতে লাগলো সবেতেই,

কেবল সেগুলির আয়তনের পার্থক্য ও সাজানোর ঘোরফেরে একটি থেকে অপরটির বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করা যেতো। এই ধরণের গ্রীক মৃৎশিল্পের সংজ্ঞাই হয়ে গেছে "জ্যামিতিক"। এমন কি শেষটা নর-নারীর মূর্ত্তিও আঁকা সুরু হ'য়ে গেছলো ঐ জ্যামিতিক আকারে। তবে বেশীদিন এ পাগলামী স্থায়ী হয়নি। অল্পকালের মধ্যে গ্রীসের 'ক্ল্যাসিক্যাল্-আর্ট, মৃৎশিল্পেও তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। গ্রীসের এই ক্ল্যাসিক্যাল আর্টে নরনারীর মূর্ত্তি একটা প্রধান অঙ্গ হ'য়ে উঠেছিল যা মাইনোয়ান্ বা মাইশেনিয়ান শিল্পে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

অনেক কমে গেলো। মানুষের প্রতিকৃতিই ক্রমে অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বসলো।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে গ্রীসে মৃৎশিল্পের অপেক্ষা চিত্রকলার অনুশীলন ও উৎকর্ষ অধিকতর অগ্রসর হ'তে দেখা যায়। এ-সময় সব রকম শিল্পকলাতেই এথেন্স্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ ক'রেছিল। এথেন্সের তৈরি মৃৎপাত্রগুলির গঠন-পারিপাট্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে উঠেছিল। এ সময় শিল্পীরা তাদের প্রত্যেক কাজে নিজেদের নাম লিখে রাখা সুরু করেছিল। এটা প্রথম আরম্ভ করে চিত্রশিল্পীরা। তাদের দেখাদেখি কুমোর পোটোরাও তাদের কাজে নিজেদের নাম দিতে লাগলো।

গাগরী (এ্যাটিক্ রেড্ ফিগার্—খৃঃ পূঃ ৪৫০ বৎসর আগের)

তৈলঘট (মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়, চিত্রে শোকাচ্ছন্ন নারীর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন)

এমন অনেক মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যাতে জোড়া নামও রয়েছে, যেমন "শম্ভু গড়েছে—গোবিন্দ রং দিয়েছে।"

এথেন্স্ বা এ্যাটিকায় প্রস্তুত যে সব গ্রীক্ শিল্প সেগুলিকে 'এ্যাটিক্, শিল্প (Attic Industry) ব'লে অভিহিত করা হয়। এথেন্সের মৃৎশিল্পও Attic Potery নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই এ্যাটিক্ মৃৎশিল্পের প্রথম অভ্যুদয় খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে। এথেন্সের মৃৎপাত্রের বিশেষত্বই ছিল মিহি চিক্কণ লাল মাটির তৈরি জিনিস, তার উপর উজ্জ্বল্ কালো রংয়ের চিত্রবিচিত্র করা। ক্রমে এই কালো রংয়ের ছবির নানারকম সাজ পোষাক ও আকারের খুটিনাটির পার্থক্য বোঝাবার জন্য প্রথমটা সাদা রেখার সাহায্য নেওয়া

খৃঃ পূর্ব্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীর যে সব অতি প্রাচীন মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তার ধরণই আলাদা। এগুলিতে প্রায়ই জীবজন্তুর প্রাদুর্ভাব বেশী। তবে সবগুলিই যে প্রকৃত বনচর পশু তা নয়, রূপকথার কাল্পনিক জীবজন্তুও সারবন্দি হ'য়ে চলেছে এর মধ্যে। এ-সব পরিকল্পনাও যে সেকালের চিত্রিত বসন ও রঙীন পর্দ্দা থেকেই গৃহীত হ'য়েছে এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। ক্রমে মৃৎপাত্রের গায়ে নরনারীর মূর্ত্তি দেখা দিলে। জীবজন্তুরা তখন শুধু যে একপেশে হ'য়ে পড়লো তাই নয়, সংখ্যায়

হয়েছিল, পরে অন্যান্য রংয়ের ব্যবহারও প্রচলিত হ'য়েছিল। এক সময়ে এই কালো রং-করা লাল মাটির পাত্রগুলি শিল্পকলা হিসাবে এমন নিখুঁৎ ও অপূর্ব্ব সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল যে শিল্প-সামগ্রী হিসাবে সেগুলি আজও জগতের সর্ব্বোত্তম কারু-সৃষ্টি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মৃৎশিল্পের কারু-কার্য্যেরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছিল। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যে সব মৃৎপাত্র নির্ম্মিত হ'য়েছিল তার উপর কালো রংয়ের চিত্রের পরিবর্ত্তে লাল রংয়ের ছবিই দেখা

মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করবার জন্ত এযুগে একপ্রকার 'তৈলঘট' নির্ম্মিত হ'ত; এর গঠন প্রণালী একটু অন্ত ধরণের। এগুলিতে যে চিত্র অঙ্কিত হ'ত তা' ঠিক সেই অন্ত্যেষ্টির অবস্থা ও সময়োচিত। এই তৈল-ঘটগুলির গলা থেকে তলা পর্য্যন্ত প্রথমে সাদা রং করা হ'ত, তারপর সেই সাদা জমিতে রং দিয়ে সময়োচিত চিত্র আঁকা হ'ত। বহু মৃৎপাত্রের গড়ন বা আকৃতি—মানুষের মুখ, জীবজন্তুর মুখ, কাল্পনিক প্রাণী বা কিম্ভূত-কিমাকার ও হাস্তকর কিছু চেহারা ক'রে তোলা হয়েছে দেখা যায়। সম্ভবতঃ

ভৃঙ্গার ও পুষ্পপাত্র (খৃঃ পূঃ ৪৫০-৩০০ বৎসর আগের। চিত্রিত মৃৎপাত্রের পরের যুগের তৈরী)

যায়; তার কারণ, মাটির মসৃণ 'চিকণ' লাল জমীতে আঁকা ছবির স্থানটুকু শূন্ত রেখে, বাকী অংশটা কালো রংয়ে ভরে' দেওয়া হ'ত। কাজেই এখন পাত্র হ'য়ে উঠলো কৃষ্ণবর্ণ এবং চিত্র হ'য়ে উঠলো লাল! একশো বছর আগে ছিল পাত্র লাল কিন্তু তার উপরের চিত্রগুলি কালো রংয়ের ছায়াছবি (silhouettes) শিল্পবিশা-রদেরা এই দুরকমের নামকরণ ক'রেছেন—এ্যাটিক্ "ব্ল্যাক্ ফিগার" এবং—এ্যাটিক্ "রেড্ ফিগার্" পটারী।

এগুলি মৃৎপাত্রের আকারে বৈচিত্র্য সম্পাদন প্রচেষ্টার ফল। একটি পুষ্পপাত্র পাওয়া গেছে এমন অনন্তসাধারণ গঠনের যে সেটি মৃৎশিল্পের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটির আকৃতি অবিকল একজোড়া জানু-সন্ধির অস্থির মত। এর গায়ে আবার আঁকা আছে পাঁচ ছ'টি তরুণী সুন্দরী—পাখী যেমন ক'রে আকাশে উড়ে যায় তেমনি ভঙ্গীতে নৃত্য ক'রছে।

রংকরা মৃৎপাত্রের রেওয়াজ ক্রমেই কমে এসেছিল।

কারণ যেসব শক্তিশালী শিল্পী মৃৎপাত্র চিত্রিত ক'রতো, তাদের প্রতিভা উন্মেষের ক্ষেত্র আর কেবলমাত্র মৃৎপাত্রের গায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের নিপুণ তুলি চিত্রপটের বিশাল ক্ষেত্র খুঁজে নিয়েছিল। কাজেই মৃৎশিল্পীরা আবার সেই ধাতুপাত্রের কারিকুরির অনুকরণেই তাদের মৃৎপাত্রগুলিকে গঠিত ও অলঙ্কৃত ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল। সোনারূপা বা ব্রোঞ্জের পাত্রগুলির গায়ে যেমন পলতোলা, খাদ্‌রিকাটা, ছিলকাটা, মালা জড়ানো, ঝালর ঝোলানো, ফুলতোলা, লতাপাতার পেটি আঁটা বা ধানের শিসের কেয়ারী করা থাকতো, মাটির জিনিসেও মৃৎশিল্পীরা অতঃপর হুবহু তাই নকল ক'রতে সুরু করেছিল।

গ্রীকরা কলানুরাগী জাত ছিল, বিশেষ ক'রে নর-নারীর প্রতিকৃতির তারা খুব বেশী রকম ভক্ত ছিল ব'লে মৃৎশিল্পে তার প্রচলন স্বল্প হ'লেও সম্ভব হ'য়েছিল এবং এই মৃৎশিল্প পৌরাণিক যুগে একেবারে সুকুমার-কলায় পরিণত হ'তে পেরেছিল। সে যুগের শিল্পীদের প্রতিভা ও নৈপুণ্যের পরিচয় আজ আমাদের কাছে বহন ক'রে এনে দিয়েছে এই মৃৎশিল্প। এ জিনিসের অস্তিত্ব না থাকলে অতীতের শিল্পীদের কোনো সন্ধানই আমরা পেতুম না। পলিগ্নোটাশ্‌ প্রভৃতি গ্রীসের একাধিক বিশ্ববিশ্রুত শিল্পাচার্য্যের সৃষ্টি আজ কোথায় লোপ পেয়ে গেছে! তাদের অতুলনীয় তুলির আঁচড়ের কোনো চিহ্নই আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু, মৃৎপাত্রের পৃষ্ঠে তাদেরও অগ্রবর্ত্তী ছিল যে সকল শিল্পী তারা রেখে গেছে তাদের যে কৃতিত্বের অক্ষয় নিদর্শন তা চিরদিনের জন্য অবিনশ্বর হ'য়ে রইল। মৃৎশিল্পের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই শিল্পীদের সৃষ্টি কেউ ধ্বংস ক'রতে পারবে না।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন, সাহিত্য-বিশারদ

(স্বর্গীয়া ডক্টর আনিবেশান্টের প্রতি)

দেবি! তুমি "ব্রাহ্মণ্যে"র বিজয়-কেতন!
তুমি সমন্বয়-ক্ষেত্র প্রাচী-প্রতীচির!

ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিমণ্ডিত বিচিত্র জীবন
অভিনব অভিব্যক্তি গার্গী-মৈত্রেয়ীর!

তুমি মাতৃ-মহিমার মূর্ত্তি মহীয়সী!
ভক্তি, প্রীতি, করুণার বরেণ্য বিগ্রহ!

শুনাইলে আর্ত্তজনে মন্ত্র "তত্ত্বমসি"!
নিত্য সত্য জগতের তুমি বার্ত্তাবহ!

ঋষি তুমি নারীরূপে, ব্রহ্মজ্ঞা ব্রাহ্মণী!
জন্মিলে যবন-গৃহে কবিরের প্রায়!

বাগ্মিতায় বিশ্ববন্দ্যা, নারী-শিরোমণি!
সমর্পিলে সর্ব্বস্ব "শিবে"র সেবায়!

ভারতের মুক্তি-মন্ত্র তুমি মূর্ত্তিমতী!
তুমি নারী-প্রতিভার পূর্ণ-পরিণতি!

সাময়িকী

সন্ত্রাসবাদে বাঙ্গালা—

আমরা গতবার মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট-হত্যা উপলক্ষ করিয়া সন্ত্রাসবাদের আলোচনা করিয়াছি। তাহার পর তাহা লইয়া কতকগুলি ইয়োরোপীয় নানারূপ অসঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন। একজন এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ভারতের কোথাও কোন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী নিহত হইলে মেদিনীপুর জেলে বদ্ধ দুই বা ততোধিক সন্ত্রাসবাদীকে আনিয়া সরাসরি গুলী করিয়া মারা হউক। যে এরূপ প্রস্তাব করে, সে নিজেই সন্ত্রাসবাদী। সন্ত্রাসবাদের জন্য যে বাঙ্গালীই অধিক বিপন্ন, তাহা আমরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করি। গত তিন বৎসরে বাঙ্গালার নানা স্থানে নানা অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা নিম্নে গত চার বৎসরে সন্ত্রাসবাদীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনাচারের মোট সংখ্যা প্রদান করিলাম—

ঘটনা	বৎসর			
	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
হত্যা	৭	৫	৫	২
হত্যার চেষ্টা	৪	৬	৬	১
ডাকাইতী	১০	২৩	৩১	৩
ডাকাইতীর চেষ্টা	০	২	২	০
লুণ্ঠন	৬	১৮	১৯	৩
লুণ্ঠনের চেষ্টা	১	৫	৬	৩
বোমা নিক্ষেপ	৬	৭	৩	০
বোমা বিস্ফোরণ	২	০	২	০
সশস্ত্র আক্রমণ	১	০	১	০
মোট	৩৬	৬৬	৭৫	১২

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সরকারের কর্ম্মচারী ১১ জন, অন্য লোক ১০ জন ও সন্ত্রাসবাদী ২৬ জন নিহত এবং রাজকর্ম্মচারী ১২ জন, অন্য লোক ১৪ জন ও সন্ত্রাসবাদী ৪ জন আহত হইয়াছিলেন। পরবৎসরের হিসাব—রাজকর্ম্মচারী ৫ জন ও অন্য লোক ৪ জন নিহত এবং রাজকর্ম্মচারী ১৩ জন, অন্য লোক ৩ জন ও সন্ত্রাসবাদী ১ জন আহত। গত বৎসর—নিহত রাজকর্ম্মচারী ৬ জন, অন্য লোক ৬ জন, সন্ত্রাসবাদী ৫ জন এবং আহত—রাজকর্ম্মচারী ১০ জন, অন্য লোক ২৭ জন, সন্ত্রাসবাদী ৩ জন। বর্ত্তমান বৎসরে এ পর্য্যন্ত একজন রাজকর্ম্মচারী নিহত ও একজন আহত হইয়াছে এবং দুই জন (মেদিনীপুরেই) সন্ত্রাসবাদীর প্রাণ গিয়াছে।

এই কয় বৎসরের হিসাব লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়, সন্ত্রাসবাদীরা রাজকর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য লোককেও হতাহত করিতেছে এবং বোধ হয়, অধিক সতর্ক হওয়ায়, তাহাদিগের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

দেশের এইরূপ অবস্থা যে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার সুযোগ লইয়া এ দেশে ও বিদেশে বাঙ্গালীকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিলাতে এক দল ইংরাজ বলিতেছেন, বাঙ্গালায় যখন সন্ত্রাসবাদীরা অত্যাচার করিতেছে, তখন বাঙ্গালায় কখনই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলন করা যায় না; কারণ, গভর্ণমেণ্ট প্রজার ধন ও প্রাণ রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ আপনাদের হাতে রাখিতে বাধ্য। আর এ দেশে অন্যান্য প্রদেশের নেতারা বলেন, সে সব প্রদেশে যখন সন্ত্রাসবাদীদিগের অত্যাচার নাই বলিলেও বলা যায়, তখন বাঙ্গালার অপরাধে সে সব প্রদেশকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত রাখা হইতেই পারে না—বাঙ্গালা তাহার অপরাধের দণ্ড ভোগ করুন—আর সব প্রদেশকে বাঙ্গালার সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত হইবে না। নেতারা যখন এইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারেন, তখন অন্য লোক যে আরও অগ্রসর হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সেদিন "বিহারবাসী"

স্বাক্ষর করিয়া কোন লোক কলিকাতার এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন—

""ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার কথা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিবার কথা শুনিতে পাই না কেন? আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের মত নহে। সন্ত্রাসবাদ বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য—অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গালী প্রবাসীরা এই বিষ ছড়াইতেছে। অন্যান্য প্রদেশে লোক যখন নূতন শাসন-পদ্ধতিতে কিরূপে দেশের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি হইবে তাহার উপায় স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, বাঙ্গালীরা তখন বোমা ও বন্দুক ব্যবহার করিতে ব্যস্ত। অতএব সিদ্ধান্ত হইল—বাঙ্গালাকে ভারতবর্ষের বাহিরে রাখিলে আর সব প্রদেশের মঙ্গল অনিবার্য্য। বাঙ্গালাকে বহিষ্কৃত করিয়া ইংলণ্ডের উপনিবেশ হিসাবে শাসন কর ("Separate Bengal: govern it as a Crown Colony")—তাহা হইলে আর সব প্রদেশ গঠনকার্য্যে অবাধে অগ্রসর হইতে পারিবে।"

এই লেখকের বিদ্বেষবিজৃম্ভিত যুক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমাদের ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই যুক্তিই বিলাতে যে দল বাঙ্গালায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের বিরোধী, তাঁহাদিগের নিকট আদৃত হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও বাঙ্গালা পশ্চাতে থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য। অথচ বাঙ্গালার লোক মুষ্টিমেয় উদ্ভ্রান্ত যুবক যুবতীর কাজের জন্য দায়ী নহে—তাহাদিগের কাজের সমর্থনও করে না; পরন্তু সেই কাজের ফলে নানা রূপে বিপন্ন। ইহাদিগের কাজের জন্য বাঙ্গালীকে পাইকারী জরিমানার ও অতিরিক্ত পুলিসের ব্যয়ভার এই দুঃসময়ে বহন করিতে হইতেছে—অর্থের অভাবে, অর্থাৎ পুলিস বিভাগে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য, বাঙ্গালার সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির জন্য অধিক ব্যয় করিতে পারিতেছেন না; এবং দেশের লোকও অস্থিরতার মধ্যে ব্যবসা প্রভৃতিতে অর্থ-নিয়োগ ও আত্মনিয়োগ করিতে দ্বিধানুভব করিতেছে।

কয় মাস পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় দুইটি বিষয় ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথম—বাঙ্গালার গভর্ণর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন,* বোম্বাই প্রভৃতির তুলনায়, বাঙ্গালার সরকার লোকপ্রতি যে ব্যয় করিতে পারেন, তাহা অনেক অল্প। সুতরাং সরকারের আয় না বাড়িলে বাঙ্গালার লোকের অত্যাবশ্যক উন্নতির জন্যও অন্যান্য প্রদেশের মত অর্থ ব্যয় করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়—বাঙ্গালার অর্থসচিব যে হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াও, আইনভঙ্গ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের জন্য কয় বৎসরে পুলিসের জন্য যে ব্যয় বাড়িয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা যায় না; এবং তাহা যদি এই জন্য ব্যয় করিতে না হইত, তবে তাহাতে বাঙ্গালার অনেক কল্যাণকর কাজ করা যাইত। কয় বৎসরে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে	২১,৫০,০০০ টাকা
১৯৩২-৩৩ „	৪৭,০০,০০০ „
বর্ত্তমান বৎসরে	৫৩,৭৫,০০০ „
মোট	১,২২,২৫,০০০ টাকা

যে অর্থব্যয়ে দামোদরের খাল খনিত হওয়ায় ২ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমীতে সেচের সুব্যবস্থা হইল সেই খালেও ইহা অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় হয় নাই। যে সময় অর্থাভাবে বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে নূতন করভারে পীড়িত করিতে হইবে, যে সময়ে অর্থাভাবে বাঙ্গালার মৃতপ্রায় নদীগুলির সংস্কার সাধন করা যাইতেছে না, যে সময় বাঙ্গালার শিল্প বিভাগ দেশের লোককে শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্যও ব্যক্তিগত অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই সময় তিন বৎসরে এই যে পুলিস প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত ১ কোটি ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়, ইহা কি দুঃসহ ভার বলিয়াই বিবেচনা করা হইবে না?

এই আর্থিক ক্ষতি ব্যয়ের আধিক্যে হইতেছে। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি দুই প্রকারে হয়—ব্যয়ের বাহুল্যে এবং আয়ের হ্রাসে। সন্ত্রাসবাদের জন্য বাঙ্গালার আয় হ্রাসও হইয়াছে। বিদেশের সহিত আমাদের যে বাণিজ্য তাহা প্রায়ই বিদেশীর বা অন্য প্রদেশের লোকের

হস্তগত। দেশের মধ্যে ব্যবসাই আমাদের আছে—লোক তাহাতেও ভয়ে যথেষ্ট অর্থ নিয়োগ করিতে পারিতেছে না। যখন তখন ডাকাইতী ও লুণ্ঠন লোককে ভীত করিয়াছে। ব্যবসায়ীরা যখন টাকা লইয়া গতায়াত করেন, তখন যে সন্ত্রাসবাদীরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করে এবং অর্থ লুণ্ঠন করে, এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

কিন্তু আর্থিক ক্ষতি অপেক্ষাও বড় ক্ষতি যে আমাদের হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্থিক ক্ষতি পূর্ণ করা যায়, সমাজের ক্ষতি পূর্ণ করা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সন্ত্রাসবাদ আমাদের সমাজে ধর্ম্মের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিতেছে, মানুষকে তাহার পশুত্ব সংযত না করিয়া প্রবল করিয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে। সমাজের উন্নতির জন্য মানুষ কতকগুলি নিয়ম করে এবং ব্যবস্থা হয়, যে বা যাহারা সে সব নিয়ম ভঙ্গ করে সে বা তাহারা দণ্ডিত হয়। সে সব নিয়ম লঙ্ঘন করা অপরাধ ও পাপ—সমাজের দৃষ্টিতে অপরাধ, ধর্ম্মের কাছে পাপ। সন্ত্রাসবাদীরা সমাজের এই সব নিয়ম অনায়াসে লঙ্ঘন করিতেছে। এ দেশে পুরাণ হইতে কাব্য নাটক প্রভৃতির শিক্ষা—ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়। কিন্তু যাহারা পরের দ্রব্য লুণ্ঠন করে, লোকের জীবন নাশ করে, তাহারা অধর্ম্মকেই ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথমে এ দেশে কেবল যুবকরাই এই সব ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইত, এখন দেখা যাইতেছে যুবতীরাও তাহা করিতেছে। যেদিন কুমিল্লায় ভদ্রঘরের দুইটি বালিকা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল, সেদিন বাঙ্গালার সমাজ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর সেরূপ ব্যাপার একাধিক ঘটিয়াছে—আরও ঘটিবে কি না, কে বলিতে পারে?

সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে, যে-কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়। কিন্তু তাহাদিগের উদ্দেশ্য কি? তাহারা বলে, দেশকে মুক্ত করাই তাহাদিগের কার্য্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষ চিরদিনই আত্মিক বলকে বাহুবল বা পশুবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া আসিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, রক্তসিক্ত পথে মুক্তিলাভ করা যায় না; যাইলেও তাহা রক্ষা করা দুষ্কর হয়। সেই জন্যই মহাত্মা গান্ধী হিংসাশ্রয়ীদিগকে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন ও দিতেছেন। আর সেই জন্যই বাঙ্গালার চিত্তরঞ্জন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শেষ উক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হিংসাবাদের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য তিনি সন্ত্রাসবাদীদিগের অপ্রীতিভাজনও হইয়াছিলেন।

আজ যেমন—তিনি যখন নেতৃত্ব করিতেছিলেন তখনও তেমনই একদল লোক মনে করিতেছিলেন, কংগ্রেসের ও নেতৃগণের মনে সন্ত্রাসবাদের সহিত সহানুভূতি বিদ্যমান। সেই বিশ্বাস দূর করিবার জন্য তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—তিনি ও অন্য ভারতীয় নেতারা যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন এবং যে ভাবে হিংসার নিন্দা—প্রকাশ্য ও পরোক্ষ ভাবে—করিয়াছেন, তাহাতেও যে ইয়োরোপীয়দিগের মন হইতে ভুল বিশ্বাস দূর হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি বলেন—

"আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—আমি নীতি হিসাবেই রাজনীতিক কারণে হত্যার ও অন্য সর্ব্ববিধ হিংসাদ্যোতক কাজের বিরোধী। আমার ও আমার মতানুবর্ত্তীদিগের মতে এইরূপ কাজ ঘৃণার্হ। আমি ইহা আমাদের রাজনীতিক উন্নতির পথে বাধা বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা আমাদের ধর্ম্মের শিক্ষারও বিরোধী।

"কার্য্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে বিচার করিলেও আমি মনে করি, হিংসা যদি আমাদের রাজনীতিক জীবনে মূল বিস্তার করে, তবে তাহাতেই আমাদের স্বরাজ লাভের স্বপ্ন চিরকালের মত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই জন্য এ পাপ যাহাতে আর বিস্তার লাভ না করে, আমি তাহাই করিতে ব্যগ্র। আমাদের দেশে রাজনীতিক অস্ত্র হিসাবে ইহা যাহাতে কখন ব্যবহৃত না হয়, আমি তাহাই দেখিতে চাহি।"

ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেডের কথা-প্রসঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, তিনি যে হিংসা-নীতির নিন্দা করেন, লর্ড বার্কেনহেড তাঁহাকে সেই হিংসা-নীতি উন্মূলিত করিবার জন্য সরকারের সহিত সহযোগ করিতে

আহ্বান করিয়াছেন—হিংসার পথে যে দেশ কখন মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, এ বিষয়ে তিনি ভারত-সচিবের সহিত একমত। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি স্বাধীনতাই বহুমূল্য বলিয়া মনে করি—তাহাই লাভ করিতে প্রয়াসী। সেই জন্ত যে হিংসা-নীতি আমাদের স্বরাজলাভের পথে দারুণ বাধারূপে বিদ্যমান তাহার বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্যে আমার জীবনের অবশিষ্টকাল প্রযুক্ত করিতে আমি ইচ্ছুক ও আগ্রহশীল।"

বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য—চিত্তরঞ্জন তাঁহার ইচ্ছা ও আগ্রহ কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর লাভ করেন নাই। তিনি ফরিদপুরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার মতই ব্যক্ত হইয়াছিল।

আট বৎসর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, সমাজে যাহাতে এই পাপ আর বিস্তার লাভ না করে তিনি তাহাই করিতে ব্যগ্র। তাঁহার তিরোধানের পর কিন্তু এই পাপ কিরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে প্রদত্ত গত কয় বৎসরে সন্ত্রাসবাদী-দিগের কার্য্যতালিকা হইতেই বুঝিতে পারি। ইহা দিন দিন বিস্তার লাভই করিতেছে, মনে করা যাইতে পারে।

কিন্তু ইহার দ্বারা কি ফললাভ হইয়াছে? মুক্তি সাধনাসাপেক্ষ। দুই চারিজন রাজকর্ম্মচারীকে হত্যা করিলে—স্থানে স্থানে বোমা নিক্ষেপ করিলে—দেশের লোকের অর্থ লুণ্ঠন করিলে—মুক্তিলাভ করা যায় না। মুক্তিলাভ করিতে হইলে—সাফল্যলাভ করিতে হইলে যে একাগ্র সাধনা প্রয়োজন—চালাকীর দ্বারা যে কোন বড় কাজ সম্পন্ন করা যায় না, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালীকে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি জাতীয় ভাবে ওতপ্রোত ছিলেন এবং জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্ত দীক্ষা দিয়াছিলেন। আজ যে তাঁহার জন্মভূমি বাঙ্গালার যুবক যুবতীরা তাঁহার শিক্ষা ভুলিয়া—তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া—উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, ইহা কি একান্ত পরিতাপের বিষয় নহে?

হিংসা ও হত্যা এ দেশের লোকের শিক্ষার বিরোধী—প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ক্রোধবশে সন্ত্রাসবাদীরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছে; ক্রোধের অনিবার্য্য ফলও মনে করিতেছে না। গীতার শিক্ষা—

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বাস্তবিক ক্রোধ তাহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া তাহা-দিগের স্মৃতিবিভ্রম ঘটাইয়াছে। নহিলে তাহারা ইতিহাসের শিক্ষা এবং ভারতীয় সভ্যতার দীক্ষা ভুলিয়া যাইত না: ধ্বংসের পথে আপনারা প্রধাবিত হইত না—দেশকেও লইয়া যাইত না।

সন্ত্রাসবাদ একবার সমাজে স্থান লাভ করিলে তাহা দূর করা কিরূপ দুঃসাধ্য হয়, তাহা আজ আত্ম-কলহে জর্জ্জরিত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারপ্রাপ্ত আয়ার্লাণ্ডে দেখা যাইতেছে। তথায় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের অবসান হয় নাই।

সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য—লোককে ভীতিবিহ্বল করিয়া কোন কাজ করান বা কোন কাজে বিরত করা। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য—ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়কে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি বর্জ্জনে বাধ্য করা। কিন্তু পঁচিশ বৎসর কাল সন্ত্রাসবাদের যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে কি এ বিষয়ে তাহার সাফল্যের কোন সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হইয়াছে? হয় নাই বলিয়াই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—হিংসার পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

সন্ত্রাসবাদের দ্বারা রাজকর্ম্মচারীদিগকে ভীতিবিহ্বল করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা পূর্ব্বে রুসিয়ায় ও তাহার পরে আয়ার্লণ্ডেও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ইংরাজ ও বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীরা আতঙ্কের পরিচয় প্রদান করেন নাই। লর্ড হার্ডিংএর দৃষ্টান্ত সর্ব্বজন-বিদিত। যেদিন তিনি শোভাযাত্রা করিয়া নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই দিন হস্তি-পৃষ্ঠে তিনি বোমায় আহত হইয়াছিলেন। সোনারী মসজেদে বসিয়া নাদের শাহ দিল্লীর অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সেই আদেশ পালিত হওয়ায় "খুনী দরওয়াজা" দিয়া নিহত ব্যক্তি-দিগের রক্তস্রোত বহিয়া গিয়াছিল। তাহারই নিকটে আহত হইয়া—তিনি তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্য সার গাই ফ্লিটউড উইলসনকে বলেন—"যেন নীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না।" অর্থাৎ তাঁহার প্রতি আক্রমণে যেন অবলম্বিত নীতি ক্ষুণ্ন না হয়। লর্ড হার্ডিং বড়লাট;

তিনি যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু সেরূপভাবে বর্ণিত ও প্রশংসিত না হইলেও যে সব বাঙ্গালী রাজকর্মচারী বিপদসঙ্কুল অবস্থায় সন্ত্রাসবাদীদিগকে গ্রেপ্তার করেন ও যাঁহারা তাহাদিগের আক্রমণে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহস ও দৃঢ়তাও তুল্যরূপে প্রশংসিত হইবার যোগ্য। এখনও এ দেশে বিপদজনক চাকরীতে চাকরীয়ার অভাব হইতেছে না। সুতরাং, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, সে হিসাবে সন্ত্রাসবাদ সাফল্য লাভ করে নাই।

অথচ তাহার ফলে সমাজে যে ভাবের ব্যাপ্তি হইয়াছে, তাহা বিষের মত সমাজ-শরীরে ক্রিয়া করিতেছে। প্রবন্ধের প্রথম ভাগে আমরা যে তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, বহু সন্ত্রাসবাদীও অপরের প্রাণনাশের চেষ্টায় প্রাণ হারাইয়াছে। এই সম্পর্কে কত লোক যে কারাগারে ও আটক অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার ফলে বাঙ্গালার শত শত পরিবারে শোকের অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়াছে—বহু পরিবারে অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আর ইহাদিগের দৃষ্টান্তে ও প্রচার-ফলে উত্তেজনাপ্রবণ যুবকযুবতীর মনে যে ভাবের উদ্ভব হয়, তাহাতে ধর্ম্মের, সমাজের ও জননায়কদিগের সব শিক্ষা ব্যর্থ হইয়া যায়—সভ্যতার স্থান নৃশংসতা অধিকার করে। ইহা যে আমাদের অসাধারণ ক্ষতি, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

বাঙ্গালায় আজ কাজের অভাব নাই; অভাব কেবল কর্ম্মীর। দেশে যে শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত জনগণের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না, সে শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে হইবে; দেশের লোকের স্বাস্থ্য শোচনীয়—তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইবে; দেশের শিল্প লোপ পাইতেছে—পুরাতন শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এসব গঠনমূলক কাজ। এই সকলে আত্মনিয়োগ করিয়া যাঁহারা উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয় করিবেন, তাঁহারা দেশে প্রকৃত স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত করিবেন। কারণ, জাতি যখন শিক্ষিত হইয়া তাহার জন্মগত অধিকার লাভের চেষ্টা করে, তখন কোন শক্তি সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারে না। বন্দুক, বেয়নেট, বোমা—শিক্ষিত জাতির সঙ্কল্পবিরোধী হইলে ব্যর্থ হইয়া যায়। অজ্ঞতাই দৌর্ব্বল্যের কারণ। অজ্ঞ লোক উত্তেজনাপ্রবণ হয়, কিন্তু যে দৃঢ়তা বিচারবুদ্ধি-সঞ্জাত তাহা তাহারা লাভ করিতে পারে না।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির, দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ যতদিনে সরকার করিবেন, তত দিনে হইবে, মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা দেশপ্রেমের পরিচায়ক নহে। এ দেশে মুসলমান শাসন-কালেও এসব কাজের জন্য স্বাবলম্বী বাঙ্গালী দিল্লীর বা মুর্শিদাবাদের সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকিত না। আর আজ—আজ যখন সভা-সমিতি সম্মিলনে স্বাবলম্বনের কথা শুনা যায়, তখনই যে এসব কাজের জন্য আমরা সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব—দেশে যে একটি জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—আয়র্লণ্ডের সমবায় কৃষি সমিতির মত কোন সমিতি বাঙ্গালার নিরন্ন কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই—ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় এ সকল কার্য্য যত সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে, সরকারের চেষ্টায় তত সহজে ও সেরূপভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন ইংরাজ লেখক, এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, এ দেশের ধনীরা দেশের লোকের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দায়িত্ব উপলব্ধি করেন না—তাঁহাদিগের সুখনিদ্রা সে দায়িত্বের স্বপ্নে ভঙ্গ হয় না। তিনি ধনীদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। শত বর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যে সব পাঠশালা ছিল ও নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল টোল দেশে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ করিত—সে সব সরকারের সাহায্যে পরিচালিত হইত না। তখনও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার জন্য লোক জিলা বোর্ডের কাছে আবেদন করিত না। তখন গ্রাম্যমণ্ডলীতে গ্রামের লোকের কাজের ব্যবস্থা হইত।

আজ সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়াছি। আর সঙ্গে সঙ্গে যে হিংসা আমাদের প্রকৃতি ও শিক্ষার বিরোধী—যাহা

আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে, সে হিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছি। দেশের জনগণের মনে, শিক্ষার অভাবে, অধিকার সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। যতদিন জনগণের মনে সে ধারণা না জন্মিবে, ততদিন অধিকারলাভ সম্ভব নহে এবং সম্ভব হইলে তাহা মুষ্টিমেয় লোকেরই করতলগত হইবে; জনসাধারণের তাহাতে কোন লাভ হইবে না। তাহাদের মনে সে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। সে শিক্ষা দেশের লোকের দ্বারাই প্রদত্ত হইতে পারে। সন্ত্রাসবাদ সমাজে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তাহাতে সে সব কাজ সম্পন্ন হয় না। সেজন্য শান্তির ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন।

আজ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে—বিশেষ শিক্ষিত যুবকযুবতীদিগকে এই কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যায় আমরা যদি এই শিক্ষালাভ করি—যদি আমরা বুঝিতে পারি, সন্ত্রাসবাদী অত্যাচারীর আক্রমণে দুই চারিজন রাজকর্ম্মচারী নিহত হইলে আমাদের বাঞ্ছিত স্বরাজ লাভ হইবে না, পরন্তু স্বরাজলাভে বিলম্ব ঘটিবে; যদি মনে করি, দেশকে শান্তির পথে স্বরাজ লাভ করিবার উপযোগী করাই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমের পরিচায়ক—তাহাই সে সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য, তবে অমঙ্গলের মধ্য হইতে মহা মঙ্গলের উদ্ভব হইবে।

আজ যদি আমরা স্বাবলম্বী হইয়া প্রকৃত স্বরাজলাভ করিতে আগ্রহশীল হই, তবে যে পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, সে পথের পাথেয় আমরা আমাদের ইতিহাসে, আমাদের পুরাণে, আমাদের সমাজে পাইব; সে জন্য নিহিলিষ্ট রুসিয়ার বা সিন ফিন আয়ার্লণ্ডের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে আমরা বিষম ভুল করিব। ধর্ম্মের পথই আমাদের অবলম্বনীয়। যে শিক্ষা আমাদিগকে সে পথ হইতে দূরে লইয়া যায়, সেই শিক্ষা কল্যাণকর হইতে পারে না। আজ যখন দেশ সন্ত্রাসবাদে রাজনীতিক, আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থায় বিপন্ন হইতেছে, তখন ইহা স্মরণ করা—এই বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আমাদের প্রয়োজন।

জাতি যদি তাহার বৈশিষ্ট্যভ্রষ্ট হয়, তবে তাহার বিপদ অনিবার্য্য। শান্তির পথে যে স্বরাজলাভ করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই পথে যে অধিকার লাভ করা যায় তাহাই স্থায়ী ও জাতির কল্যাণকর হইয়া থাকে।

আজ আমাদিগের কর্ত্তব্য—প্রতিহিংসাপরায়ণ সঙ্কীর্ণচেতা ইংরাজ ও ভারতবাসীর প্রলাপোক্তি অবজ্ঞা করিয়া কিরূপে বাঙ্গালার উন্নতির অন্তরায় এই সন্ত্রাসবাদ দূর হয়—আমাদিগের জাতীয় সম্পদ অহিংসভাব নষ্ট করিতে না পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা।

মহেন্দ্রলাল সরকার—

শত বৎসর পূর্ব্বে (১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর তারিখে) ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন। কোন ইংরাজ মনীষী বলিয়াছেন—"Humanizing
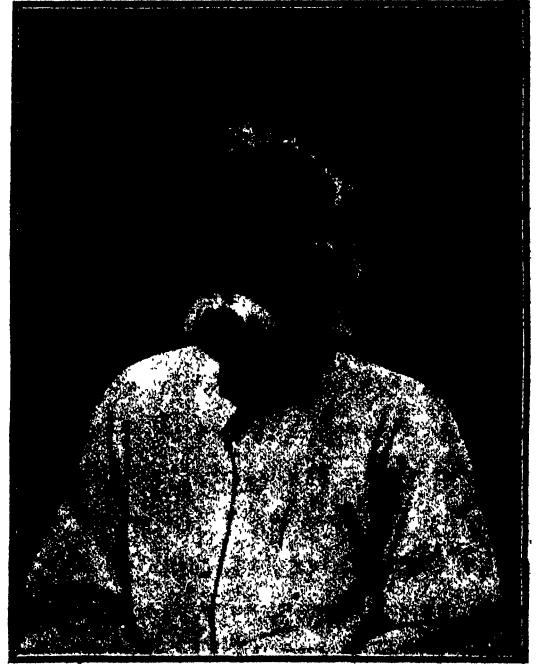
মহেন্দ্রলাল সরকার

movements of the world have sprung from the people" মহেন্দ্রলালের জীবনে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যে সব বর্ণ সমুচ্চ বলিয়া বিবেচিত নহে, সেই সকলের অন্যতম বর্ণের পরিবারে এই মেধাবী বালক জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া-

ছিলেন। হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিয়া পরে সেই চিকিৎসা-পদ্ধতিতেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মত প্রকাশের জন্য 'জার্ণাল অব মেডিসিন' নামক পত্র প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি মত পরিবর্ত্তনের জন্য নানারূপ নির্য্যাতন ভোগ করেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় দেশবাসীকে সুযোগ প্রদানকল্পে যখন বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ প্রতিষ্ঠান-স্থাপন-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি এ জন্য যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন, আমরা নিম্নে তাহার প্রতিলিপি প্রদান করিতেছি—

"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।"

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়; এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জন্মে। যদ্দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে।

২। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চ্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে অনেকগুলির বীজরোপণ প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাই করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে; নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যকমতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুসঙ্গিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটী গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটী আবশ্যকানুরূপ গৃহনির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক; অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সমাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠাতা

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার

এই সভা প্রতিষ্ঠার জন্য মহেন্দ্রলালকে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কৌতূহলী পাঠক 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র এই অনুষ্ঠানপত্রের সাতটি ধারার আলোচনা করিয়া বলেন, "এই অনুষ্ঠানপত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে

বঙ্গসমাজ চল্লিশসহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে এই তালিকাখানি একটি আশ্চর্য্য দলিল।" উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ধনীগণকে বলেন—

"আর কলঙ্কভার শিরে কেন বহন করেন? সকলেই অগ্রসর হউন। যিনি এক দিনে লক্ষ মুদ্রা দান করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন? পুত্রকন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন তাঁরা কেন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন? * * * * একবার মুক্তহস্তে দান করিয়া সমাজ স্থাপন করিয়া স্বীয় ভ্রম দূর করুন; বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন।"

প্রায় ছয় বৎসরের চেষ্টায় মহেন্দ্রলাল ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণক্ষম হইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল তাঁহার সময়ে সর্ব্বপ্রধান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও কলিকাতার অন্যতম অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তিনি কলিকাতার সেরিফ হইয়াছিলেন; তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডাক্তার অব ল" উপাধি প্রদান করেন; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার মনোনীত না হওয়ায় অনেকে সরকারকে দোষ দিয়াছিলেন; তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেও যশস্বী হইয়াছিলেন এবং একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন; তিনি বৈদ্যনাথে রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। কিন্তু তাঁহার এই সকল কার্য্যের ও গুণের গৌরব—তাঁহার বিজ্ঞানসভা স্থাপনের কল্পনার ও কার্য্যের গৌরবের তুলনায় দীপ্ত দিবাকরদ্যুতির নিকট খদ্যোতের ক্ষণস্থায়ী ক্ষীণ আলোকের মত প্রতীয়মান হইবে। তাঁহার এই কার্য্যের গুরুত্ব যেমন অসাধারণ, গৌরব তেমনই অতুলনীয়। একান্ত পরিতাপের বিষয়, এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালী যত উপকৃত হইতে পারিত, তত উপকৃত হয় নাই। সে জন্য আমরাই দায়ী। আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু স্বতন্ত্র গবেষণা-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন—তাঁহার যশঃ আজ সমগ্র সভ্য জগতে ব্যাপ্ত। আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিষ্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং বিরলপ্রাপ্ত অবসরকাল খদ্দর প্রচারে প্রযুক্ত করিতেছেন।

বহু বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক দেশে বিদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছেন। আর বাঙ্গালীর কল্পনা যে প্রতিষ্ঠানে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান—বাঙ্গালী মহেন্দ্রলাল সরকারের সেই প্রতিষ্ঠান আজ ভারতের অন্য প্রদেশের বৈজ্ঞানিকের গবেষণাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে! অন্য প্রদেশের বৈজ্ঞানিকের যোগ্যতা যত অধিকই কেন হউক না—তিনি যে বাঙ্গালী নহেন, সে কথা আমরা ভুলিব কেন?

সে দিনও একজন বাঙ্গালী ধনী এই প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়া বাঙ্গালার মান বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

আজ যখন বাঙ্গালী মহেন্দ্রলালের জন্মের শত বার্ষিক উৎসবে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে, তখন আমরা বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালার মনীষীরা আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণ করুন—ইহাকে নব জীবনে সঞ্জীবিত করুন। মহেন্দ্রলালের সাধনার ফল বিজ্ঞান-সভা বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের গবেষণাকেন্দ্র হউক—বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের আশা পূর্ণ করুন—"বঙ্গীয় যুবকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করুন; বঙ্গের শিল্প-বিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন।"

বিঠলভাই পেটেল—

ভিয়েনা সহরে বিঠলভাই পেটেলের মৃত্যু হইয়াছে। যে দেশের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন—সেই দেশ হইতে দূরে—যে চিন্ময়ী মা'কে তিনি মৃন্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহার অঙ্কে আসিবার জন্য ব্যাকুল সন্তানের মৃত্যু সত্য সত্যই শোচনীয়।

গুর্জ্জরের কৃষক পরিবারে বিঠলভাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা বাসগ্রাম হইতে আমেদাবাদে গমন করিয়াছিলেন। বিঠলভাই পেটেলের ব্যক্তিগত—পারিবারিক জীবনের কোন বিবরণ তিনি রাখিয়া যান

নাই। তাঁহার সমস্ত কার্য্য তাঁহার রাজনীতিক জীবনে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তাই তাঁহার বিষয় আলোচনা করিলে 'আনন্দ মঠের' দেশসেবক "সন্তানের" কথা মনে পড়ে—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা মা।"

বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া তিনি ব্যবহারাজীবের ব্যবসা আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে সাফল্যলাভ করিলেও অনন্যকর্ম্মা হইয়া সে কায করেন নাই। তিনি গুর্জ্জরের প্রজাদিগের কল্যাণকর কার্য্যে—তাহাদিগকে অত্যাচার অনাচার হইতে রক্ষা করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তাহার পর মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময় তিনি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মতানুবর্ত্তী হয়েন এবং "হোমরুল" আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েন। ইহার পর বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রৌলট আইনের বিরুদ্ধে তাঁহার সংগ্রাম স্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার উক্তিই সরকার সে আইন সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদে বে-সরকারী সদস্যদিগের মতের অভিব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রস্তাবিত হয়, তখন তিনি সেই সম্পর্কে পার্লামেণ্টের কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার জন্য দুইবার বিলাতে গমন করেন এবং তথায় অবস্থান-কালে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় ব্যক্ত করিয়া নানা প্রকারে প্রচার-কার্য্য পরিচালিত করেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব বিচার করিবার জন্য বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে অতিরিক্ত অধিবেশন হয়, তিনি তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

নূতন ব্যবস্থায় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশের পক্ষপাতী হইলেও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের বহুমত ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষে আত্মপ্রকাশ করিলে তিনি বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সভায় প্রবেশে বিরত থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের উৎসাহ মন্দীভূত হইলে—আইন ভঙ্গ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করা সঙ্গত কি না বিবেচনা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার অন্যতম সদস্য হয়েন।

চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠিত করিলে তিনি তাহাতে যোগ দেন এবং ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করেন। তথায় তিনি সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করেন এবং যখন পরিষদের প্রথম মনোনীত সভাপতির কার্য্য-কালের পর

বিঠলভাই পেটেল

সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় আইসে, তখন অধিকাংশ সদস্যের মতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়েন। সভাপতি হইয়া তিনি যে নিরপেক্ষতার ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। তিনি বিদেশে যাইয়া সে সব দেশের প্রতিনিধি-সভার কার্য্য-পরিচালন-পদ্ধতি অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং যে ভাবে সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তাহাতে কোন পক্ষই তাঁহার নিন্দা করিতে পারেন নাই।

সভাপতিরূপে যে সব কাজ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, সে সকলের কয়টির উল্লেখ করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব—

(১) ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের সদস্যগণ পরিষদ গৃহ ত্যাগ করিলে তিনি সভার কার্য্য স্থগিদ রাখিয়া সরকারকে পরামর্শ দেন, যখন সর্ব্বপ্রধান দল পরিষদ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন পরিষদ আর লোকের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিতে পারে না, সুতরাং যে সব বিষয়ে মতভেদ অনিবার্য্য, সরকার যেন সে সব বিষয় পরিষদে উপস্থাপিত না করেন।

(২) অর্থ-সচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল বিশেষরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় পরিষদে পেশ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পার্লামেণ্টের নিয়মের নজীরে তাহা অসিদ্ধ বলিয়া তাহা পেশ করিতে দিতে অস্বীকার করেন।

(৩) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সরকার যখন পাবলিক সেফটী বিলের নূতন পাণ্ডুলিপি পেশ করিতে চাহেন, তখন সভাপতি পেটেল তাহাতে বাধা দেন। তিনি বলেন, বিচারাধীন মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রস্তাবিত আইনের আলোচ্য বিষয় তখন বিচারাধীন ছিল—সুতরাং সে সময় পরিষদে উহার আলোচনা হইতে পারে না।

(৪) একবার পরিষদের অধিবেশনশেষে বড়লাটের বক্তৃতায় সভায় সভাপতির কার্য্য সম্বন্ধে যাহা উক্ত হয়, তিনি তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলে বড়লাট জানান, সভাপতির কার্য্যের কোনরূপ সমালোচনা করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

(৫) পরিষদ গৃহে পুলিসের অধিকার অস্বীকার করিয়া তিনি তথায় স্বতন্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করেন।

তিনি পর পর তিনবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কংগ্রেসের নেতৃগণ গ্রেপ্তার হইলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে এপ্রিল তারিখে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

পদত্যাগের পর তিনি আবার কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের সহিত একযোগে কায করিতে আরম্ভ করেন। পঞ্জাবে হাঙ্গামার পর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন ভাবে বড়লাটকে লিখিয়াছিলেন—"আমি সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া দেশের লোকের পার্শ্বেই আসিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি"—তেমনই পদত্যাগ-পত্রে বিঠলভাই বড়লাটকে লিখিয়াছিলেন, "দেশের মুক্তির সংগ্রামে আমি আমার দেশবাসীর পার্শ্বেই আমার উপযুক্ত স্থান লইব।" পেশওয়ারে যে হাঙ্গামা হয়, তিনি তাহার তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সরকার তাঁহার তদন্ত-রিপোর্ট প্রকাশ করিতে দেন নাই।

দিল্লীতে ডাক্তার আনসারীর গৃহে কংগ্রেসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভায় তিনি গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। তিনি বলেন, ইহাই তাঁহার সভাপতিরূপে কাজের পুরস্কার। কারাগারে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় দণ্ডকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মুক্তি দান করা হয়। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি চিকিৎসার্থ ভিয়েনায় গমন করেন। তথায় অস্ত্রোপচারে তাঁহার স্বাস্থ্য কিছু উন্নতি লাভ করিতে না করিতে তিনি গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে সাহায্য করিতে বিলাতে আইসেন। সেই শ্রমে আবার তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করেন। একটু সুস্থ হইতে না হইতে তিনি আমেরিকায় যাইয়া ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া অনেক স্থানে বক্তৃতা করেন। সেই শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করিয়া যায় এবং তিনি গত ২২শে অক্টোবর প্রাণত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি দেশে আসিয়া দেহরক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—তাঁহার "জীবতারা" দৈববশে বিদেশেই খসিয়া পড়িয়াছে—"চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?" কিন্তু তাঁহার যে প্রার্থনা তিনি "শ্যামা জন্মদে"—বলিয়া সম্বোধন করিয়া জননীর কাছে চাহিয়াছিলেন—"অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে"—জননী জন্মভূমি তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার দেশসেবার —তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পুরস্কার—

"ফুটিত যেন স্মৃতি জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে।"

—

জয়-স্তম্ভ—

বাঙ্গালার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টারের কার্য্যব্যপদেশে ফরিদপুরে রাজবাড়ী মহকুমায় মথুরাপুর গ্রামে যাইয়া শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত একটি পুরাতন স্তম্ভের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা "মথুরাপুরের দেউল" নামে পরিচিত এবং জয়-স্তম্ভ বলিয়াই মনে হয়। স্তম্ভটি প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত। কেহ বলেন, ইহা সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত, কেহ বা সংগ্রাম সাহকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই স্তম্ভের বিষয় স্থানীয় লোকের অজ্ঞাত ছিল না বটে, কিন্তু কেহই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ইহা দেখেন নাই এবং অযত্নে ও লোকের ব্যবহারদোষে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। ইহা ঘনজঙ্গলে বেষ্টিত হইয়াছিল। ইহার ইষ্টকে যে সব নক্সা আছে এবং ইহাতে "টেরাকট্টা" নামে পরিচিত যে দগ্ধ মৃত্তিকার কাম আছে, তাহা বাঙ্গালার সমৃদ্ধ শিল্পের পরিচায়ক। এইগুলিতে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ঘটনার ও সমসাময়িক বাঙ্গালার নানা চিত্র আছে। এতদিনও যে পুরাবস্তু বিভাগের দৃষ্টি এই স্তম্ভের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এই স্তম্ভটিকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে হয় ত বাঙ্গালার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে। যে সময় ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ঐ অঞ্চলে কে রাজা ছিলেন বা স্বাধীন রাজা হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—উহা কাহার জয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এ সকলের অনুসন্ধান প্রয়োজন। বাঙ্গালার কত স্থানে যে এইরূপ কত স্তম্ভ বা মঠ বা দেউল—ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি বক্ষে লইয়া অবহেলায় বিলোপের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কে বলিবে? একে এ দেশের জলবায়ু ও দ্রুতবর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ এইরূপ পুরাকীর্ত্তির পরম শত্রু—তাহার উপর আবার মানুষের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অনাদর ও অত্যাচার—এই সকলের বিলোপে সাহায্য করে। আমরা এই নবাবিষ্কৃত স্তম্ভের বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কোন পথে?—

পণ্ডিত শ্রীজওহরলাল নেহেরু সংপ্রতি তিনটি প্রবন্ধে স্বাধীনতা সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন। এখন তিনি বলিতেছেন, স্বরাজ বা স্বাধীনতা বলিলে ইংরাজের পরিবর্ত্তে ভারতবাসীর দ্বারা ভারতবাসীর শাসন বুঝায় না। তিনি বলিয়াছেন—

"আমরা কি চাহিতেছি? মুক্তি? স্বরাজ? স্বাধীনতা? বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের মত স্বায়ত্ত-শাসন? এ-সব কথায় যেমন অনেক জিনিষ বুঝাইতে পারে, তেমনই যৎসামান্যও বুঝাইতে পারে,—কিছু না বুঝাইতেও পারে? মিশর 'স্বাধীন'; কিন্তু সকলেই জানেন, বর্ত্তমানে ইহা ভারতের যে কোন সামন্ত রাজ্যের মত অর্থাৎ জনগণের অনভিপ্রায়ে তাহাদিগের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরশাসন; আর সে শাসন বৃটিশের দ্বারা রক্ষিত। আর্থিক হিসাবে মিশর কতকগুলি য়ুরোপীয় জাতির—বিশেষতঃ ইংরাজের উপনিবেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময় হইতে শাসকদিগের সহিত মিশরের জাতীয়তার সংগ্রাম চলিতেছে—তাহার অবসান হয় নাই। সুতরাং তথা-কথিত 'স্বাধীনতা' লাভ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মিশর জাতীয় স্বাধীনতায় বঞ্চিত।"

পণ্ডিত জওহরলাল স্বাধীনতাকে আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মৌলিক মত প্রকট করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—নানারূপ স্বাধীনতার কল্পনা করিয়াছেন। তেমনই আবার তিনি ভারতবর্ষকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জাতীয়তার আবরণে নানা পরস্পর-বিবদমান স্বার্থ দেখা যায়। যথা—

"সামন্তনৃপতিদিগের ভারত; বড় জমীদারদিগের ভারত; ভিন্নভিন্ন ব্যবসায়ীর ভারত; কৃষকের ভারত; শিল্পপ্রভুদিগের ভারত; মহাজনের ভারত; মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভারত ও শ্রমিকদিগের ভারত।"

সকল দেশেই নানা সম্প্রদায় থাকে এবং তাহাদিগের উদ্ভব ও অবস্থান অনিবার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। গণতন্ত্রশাসিত ফ্রান্সে ও আমেরিকাতেও ভূস্বামী, কৃষক,

ব্যবসায়ী, শ্রমিক, মহাজন—সব আছে এবং এই যে সব সম্প্রদায় এ সবই সমাজের পক্ষে প্রয়োজন ও সমাজের উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু হিন্দুভারতে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে এই সব সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সামঞ্জস্য যেরূপ রক্ষিত হইয়াছিল, তেমন আর কোন কালে কোন দেশে হয় নাই। কোন কোন য়ুরোপীয়ও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক সার জর্জ্জ বার্ডউডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে সামাজিক ব্যবস্থাই ভারতের শিল্পের উন্নতির কারণ। ভারতীয় সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থান এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট ছিল যে, পরস্পরের স্বার্থের সজ্ঘর্ষ হইতে পারিত না এবং সেইজন্য সমাজে শান্তি বিরাজ করিত; য়ুরোপে ধনিকে ও শ্রমিকে, মহাজনে ও অধমর্ণে, কৃষকে ও পণ্যোৎপাদকে যে বিরোধ মধ্যে মধ্যে বিবাদে আত্মপ্রকাশ করে, ভারতে তাহার উদ্ভব হইতে পারিত না।

পণ্ডিত জওহরলাল কিছুদিন হইতে বলশেভিক রুশিয়ার আদর্শের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক ও অনুরূপ সব ব্যবধান নষ্ট করিয়া দিতে চাহিতেছেন। তিনি বলিতেছেন।—

"ভারতে জাতীয়তার আন্দোলন প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আন্দোলন বলিয়া সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই অধিক করে। অথচ সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থগত বৈষম্যে বিরোধ উদ্ভূত হয় এবং যে বিধি ও নীতি এক সম্প্রদায়ের কল্যাণজনক তাহা অন্য সম্প্রদায়ের অনিষ্টকর হইতে পারে। সামন্তনৃপতির পক্ষে যাহা কল্যাণজনক তাহা তাঁহার প্রজাদিগের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে; যাহা জমীদারের কল্যাণজনক তাহাতে তাঁহার প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন হইতে পারে। যাহা বিদেশী মূলধনের স্বার্থসাধক, তাহা দেশের নবজাত শিল্পের অনিষ্ট করিতে পারে।"

তবে কিরূপে সব স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে? সব স্বার্থসামঞ্জস্য সাধিত হয় না। কিন্তু অসামঞ্জস্যের বিরোধের অবসান করাইয়া কিরূপে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়—তাহা পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার দেশের প্রাচীন সমাজপ্রথা অধ্যয়ন করিলেই জানিতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি প্রতীচীর দিকে—বিশেষ বলশেভিক রুশিয়ার দিকে বদ্ধ। তিনি যে জাতীয়তার সেবক বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছেন, তাহাকে আমরা প্রকৃত জাতীয়তা বলিতে পারি না। কারণ, প্রকৃত জাতীয়তা দেশের সব সংস্কার কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করে না, দেশের রীতিপদ্ধতি, প্রতীচীর রীতিপদ্ধতির মত নহে বলিয়া, সে সব বর্জ্জন করিতে চাহে না। যাঁহারা ইংরাজের অনুকরণ "দাস" মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারাও বিদেশের আদর্শাকৃষ্ট হইয়া "দাস"-মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারেন। সমাজ কি? মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম রচনা করে ও আপনারাই তাহা গ্রহণ করিয়া সমাজ গঠিত করে। সে সব নিয়ম ভাঙ্গিলে সমাজের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়;—শৃঙ্খলার ভিত্তি নষ্ট হইলে তাহার উপর রচিত সৌধ ভূলুণ্ঠিত হয়।

ফ্রান্স বারবার রক্তপাতের বেদনা সহ্য করিয়া ইহা উপলব্ধি করিয়াছে। যে ফ্রান্স একদিন মানবসমাজে মঙ্গলের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল—নূতন আলোক দেখাইয়াছিল, সেই ফ্রান্সই রক্তধারায় সে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। "সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী"—সমাজে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব করিয়াছে এবং বিশৃঙ্খলার অবসান করিবার জন্য আবার পুরাতন পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিপ্লবের উদ্ভব না করিলে সমাজ তাহার অন্তর্ণিহিত শক্তিতে কালোপযোগী সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। বিপ্লবে তাহা হয় না।

পণ্ডিত জওহরলাল বলেন; ভারতে স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম সে পীড়িতের উদ্ধারসাধনের জন্য। ইহা প্রধানতঃ অর্থনীতিক সংগ্রাম—অভাবে ও ক্ষুধায় ইহার উৎপত্তি—জাতীয়তা ইহার আবরণ মাত্র। জাতীয়তার এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। জাতীয়তা যে জাতির ছদ্মবেশ হইতে পারে, ইহা ম্যাটসিনী, গ্যারিবল্ডী, কাভুর, ওয়াশিংটন, জগলুল পাশা কেহই মনে করিতে পারেন নাই; পারিলে তাঁহার

প্রাণপণে জাতীয়তার জন্ম সংগ্রাম করিতেন না। পণ্ডিত জওহরলালের মৌলিক মত তাঁহাদিগের সকলের কাযকেই লজ্জা দিবে। যে কামালপাশা তুর্কীর মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, তিনিও জাতীয়তাকে ছদ্মবেশ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। যে সব জননায়কের কার্য্যফলে ভারতে জাতীয়তার পুষ্টি ও দেশাত্মবোধের বিকাশ হইয়াছে, তাঁহারা কখন ইহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বরং এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, পণ্ডিত জওহরলাল যে নূতন নীতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন—রুশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া যে পদ্ধতি প্রচলিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাই জাতীয়তার ছদ্মবেশধারী বিপ্লববাদ।

তিনি বলিয়াছেন :—

"ভারতে জনগণ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে ভারে পীড়িত তাহা বহন করা যায় না, সুতরাং সে ভারের হ্রাস করা প্রয়োজন এবং সেই জন্যই ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন। এই ভারহ্রাসের পরিমাপই স্বাধীনতার পরিমাপ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বিদেশী সরকারের এবং এদেশে ও বিদেশে কতকগুলি দলের ও সঙ্ঘের স্বার্থই এই ভারের কারণ। সুতরাং গান্ধীজী সংপ্রতি যে বলিয়াছেন, দৃঢ়মূল স্বার্থের উচ্ছেদ সাধন করাই স্বাধীনতা—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি কোন ভারতীয় সরকার বিদেশী সরকারের স্থান গ্রহণ করিয়া এই সব দৃঢ়মূল স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে, তবে তাহার দ্বারা স্বাধীনতার কায়া ত পরের কথা, ছায়াও লাভ করা যাইবে না।"

ইহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই—লেখক দলের ও সঙ্ঘের স্বার্থ নির্ম্মূল করিবার জন্ম উদ্গ্রীব ;—তাঁহার বিশ্বাস, তাহাই স্বাধীনতা। অর্থাৎ সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিনাশই স্বাধীনতা ; বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করাই স্বাধীনতা !

তবে কি লেখক মনে করেন—ইংলণ্ড স্বাধীন নহে? সত্যই কি তিনি বিশ্বাস করেন—ফ্রান্স ও আমেরিকা স্বাধীন নহে? এসব দেশ রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—ইংলণ্ডে এককালে নৃপতিকে প্রাণদণ্ড দিয়া, ফ্রান্স বিপ্লবের পৈশাচিক পদ্ধতির ফলে এবং আমেরিকা ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া স্বাধীনতা পাইয়াছে। সে স্বাধীনতা কি স্বাধীনতার কায়া—এমন কি ছায়াও নহে? যদি তাহাই হয়, তবে লেখকের স্বাধীনতার ধারণা মৌলিক এবং সাধারণ ধারণারও অতীত। সে ধারণা লইয়া ভারতবর্ষের লোক কি করিবে? তিনি যে নব মত প্রচার করিতেছেন, তাহাতে কি ভারতের জনগণের কোনরূপ উপকার—বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে, হইতে পারে। সকল দেশেই অধিকাংশ লোক দরিদ্র ; কেবল দারিদ্র্যের পরিমাণে প্রভেদ আছে। এই সব দরিদ্র লোক প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ। তাহারা যদি শুনিতে পায়, নূতন মতের ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের স্পর্শে ধনীর ধনভাণ্ডারের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা তথায় প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে—তবে তাহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেও পারে। এ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্পের মণিময় গহ্বরের দ্বারমুক্তি। আর ইহাতে—এই ভ্রান্ত আশার উত্তেজনায় সমাজে যদি বিপ্লব দেখা দেয়, তবে তাহাতেও বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার কথা বলিয়াছি। এই সব দেশেই কতকগুলি সম্প্রদায় ত্যাগ-স্বীকার করিয়া দেশের জনগণের অধিকার বিস্তার করিয়াছে—সমগ্র জাতি কখনই তাহা করে নাই। যে অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন পণ্ডিত জওহরলালের কার্য্য-পদ্ধতির অংশ—সেই সম্প্রদায়ই ইংলণ্ডে রানীমিডের প্রান্তরে রাজাকে বিপন্ন করিয়া প্রজার অধিকারের ছাড় আদায় করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু সে অধিকার আপনারাই সম্ভোগ করে নাই—জনগণকেও তাহা দিয়াছিল। ইংরাজ রাজনীতিকরা যখন দেশে শিক্ষা-বিস্তারের নূতন ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন, প্রজাসাধারণই তাঁহাদিগের প্রভু। ফ্রান্সে বিপ্লবের সময় একএকটি সম্প্রদায়ই ব্যাষ্টিলে ধ্বংস করিবার কল্পনা করিয়া কে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। আমেরিকার যাঁহারা স্বাধীনতার জন্ম সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সম্প্রদায়ভুক্ত—দেশের লোক তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, আজকাল এ দেশের রাজনীতিচর্চ্চাকারীরা প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে অসম্মত। বোধ হয়, তাঁহারা মনে করেন, সেকালের লোক যে ভাবের ভাবুক ছিল একালের লোক তাহা নহে; সুতরাং সেকালের কথা একালে প্রয়োগ করা যায় না। আজকাল এ দেশের রাজনীতি চর্চ্চাকারীরা আয়ার্লণ্ডের ও রুশিয়ার দৃষ্টান্তই বিশেষভাবে দেখাইয়া থাকেন।

আয়ার্লণ্ড নানারূপ অনাচারের পথে যে স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহাও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নষ্ট করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে নাই। সে দেশে এখনও জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী—সবই বর্ত্তমান। কিন্তু আয়ার্লণ্ডের দৃষ্টান্তেও, বোধ হয়, পণ্ডিত জওহরলাল বলিবেন—"ইহ বাহ্য।" কারণ, তিনি তাঁহার প্রবন্ধত্রয়ের একটিতে এক স্থানে বলিয়াছেন—

"অতীতের উপর প্রত্যয়ের আতিশয্য আইনজের বুদ্ধি বিবেচনা পশ্চাদ্‌গামী করিয়াছে এবং তিনি আর পুরোভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে পারেন না।"

ইংরাজ কবি পোপ বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন— "আমরা আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে নির্ব্বোধ বলি এবং আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদিগের পরবর্ত্তীরাও কিন্তু আমাদিগের সম্বন্ধে ঐ ধারণাই পোষণ করিবে।"

সুতরাং আয়ার্লণ্ডের অভিজ্ঞতাও বাতিল ও নামঞ্জুর। তবেই অবশিষ্ট থাকে রুশিয়া। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়া থাকেন, তিনি অহিংসার ভক্ত: কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হিংসার লীলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পাছে রাজবংশ কোন কালে আবার প্রাধান্য লাভ করে, এই জন্য "কেহ না রহিবে তা'র বংশে দিতে বাতি" হিসাবে যে পরিবারের নরনারী বালকবালিকা সকলকেই নির্ম্মমভাবে সংহার করা হইয়াছিল। যাহারা সে কায করিয়াছিল, তাহারা অকারণ হিংসার বিকাশ দ্বারা লোককে সন্ত্রাসিত করিবার জন্যই তাহা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কারণ, অন্য কোন পরিবারের কোন লোক যে কোনকালে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, ইহা তাহাদিগের উত্তেজিত মস্তিষ্কের ধারণাতীত ছিল।

তাহার পর রুশিয়া যে সব পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়াছিল, সে সকলের আমূল পরিবর্ত্তনও যে করিতে হয় নাই, এমন নহে। "পাঁচ বৎসরের" ও "দশ বৎসরের" পদ্ধতি সাফল্য লাভ করে নাই। সব সম্পত্তি জাতির এবং সব মানুষ সরকারের—এই ব্যবস্থা কখনও সম্ভব হইবে কি? রুশিয়ার পরিবর্ত্তন এখনও পরীক্ষাধীন। এই বিপ্লবের পূর্ব্বেও একবার রুশিয়ার সম্রাটের অধীনে লোককে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে পরীক্ষা সফল হয় নাই। এবার যে পরীক্ষা হইতেছে, তাহা ব্যাপক। কিন্তু তাহা যে সফল হইবেই, এমনও বলা যায় না। তাহার পর কথা—এক দেশের অবস্থা কখনই অপর দেশের অবস্থার সমান হয় না এবং সেই জন্য এক দেশের অবস্থা অন্য দেশে প্রয়োজ্য হইতে পারে না। কাযেই ভারতের সমস্যা রুশিয়ার সমস্যার মত নহে;—উভয় দেশের সমাজে যে প্রভেদ তাহাতেই সমস্যার প্রভেদ অনিবার্য্য করে।

যদি ভারতীয় সমাজে কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহা করিতে হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল যে সে বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধত্রয়ে আমরা তাহার পরিচয় পাই না। তিনি বলিয়াছেন!—

"ভারতবর্ষের আশু আকাঙ্ক্ষা কেবল দেশের লোকের শোষণ সম্পর্কেই বিবেচিত হইতে পারে। সেই শোষণের অবসান করিতে হইবে। তাহার স্বরূপ—(১) রাজনীতিক হিসাবে স্বাধীনতা বা বৃটিশের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। বৃটিশ শাসন সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। (২) অর্থনীতিক ও সামাজিক হিসাবে ইহা সাম্প্রদায়িক ও দলগত স্বার্থের উচ্ছেদ সাধন।"

প্রথমটির অবতারণায় আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ, যে সকল প্রবীণ রাজনীতির দীর্ঘকালের চেষ্টায় জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের যে রাজনীতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান রাজনীতিচর্চ্চাকারীদিগের এক দল তাহা চূর্ণ করিতেই চেষ্টা করিতেছেন। পুরাতন আদর্শ—

কংগ্রেসে বিজ্ঞবর দাদাভাই নৌরোজী ব্যক্ত করিয়াছেন,—"স্বরাজ" অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত-শাসন। বর্ত্তমান আদর্শ—"পূর্ণ স্বরাজ"। পণ্ডিত জওহরলাল তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন—বৃটিশের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা। ইহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—বৃটিশের সহিত সম্বন্ধ সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য। বর্ত্তমান সময়ে কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া জাতীয় আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা যে সুবিধা তাহা উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না।

ঐতিহাসিক ডরম্যান এ বিষয়ে বলিয়াছেন—"কেন কোন দরিদ্র ও দুর্ব্বল জাতি বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়া আপনি কুশাসনও লাভ করিতে চাহে, তাহা ভাবপ্রবণতাশূন্য ইংরাজ বুঝিতে পারে না। ইংরাজ উপনিবেশসমূহে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রন-স্বাধীনতা চাহিয়াছে ও লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্য ত্যাগ করে নাই। স্কচ্‌রাও আপনাদিগের জাতীয় স্বার্থে অবহিত বলিয়া সাম্রাজ্য ত্যাগ করিতে অসম্মত।"

তিনি আইরিশদিগের কথায় এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল বৃটিশ শাসনকে সাম্রাজ্যবাদ-প্রভাব দুষ্ট বলিয়া বৃটিশের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছেন। কেবল এবার রাজনীতিক কারণের উল্লেখ না করিয়া অর্থনীতিক কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষ ইহার মধ্যেই অর্থনীতিক বিষয়ে আপনার ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে বিদেশী পণ্যের উপর ভারতবর্ষ যে আমদানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে বিপন্ন হইয়াই এক দিকে বিলাতের, অপর দিকে জাপানের বস্ত্রোৎপাদক ব্যবসায়ীরা ভারতবাসীর সহিত (ভারত সরকারের সহিত নহে) আপোষ নিষ্পত্তি করিতে ব্যস্ত হইয়া এদেশে প্রতিনিধি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই জন্যই দেশের লোক বিদেশীর তুলনায় অধিক মূল্য দিয়া টাটার কারখানার লৌহ ও করগেটেড "টিন" কিনিতে বাধ্য হইতেছে। সেই জন্যই শর্করা-শিল্পে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিলাভের আশা করিতেছে। ইহার পর প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে প্রদেশগুলিও যে যাহার অর্থনীতিক ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। এ বিষয়ে লেখকের মত পুরাতন পরিবেষ্টন ত্যাগ করিতে পারিতেছে না; তিনি ভবিষ্যৎ ত পরের কথা, বর্ত্তমানও লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তিনি অর্থনীতিক যুক্তির অবতারণা না করিলেই ভাল হইত—যে যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। তিনি রাজনীতিক কারণ কেন যবনিকার অন্তরালে রাখিয়াছেন?

দ্বিতীয় কারণটিতে দেশের লোকের স্তম্ভিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। সকল সম্প্রদায়ের পার্থক্য ও স্বার্থ নষ্ট করিতে হইলে সমাজকে চূর্ণ করিয়া পুনর্গঠিত করিতে হয়। সহস্র সহস্র বৎসরের চেষ্টায় যাহা গঠিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুনর্গঠিত করা সহজসাধ্য নহে। মহাত্মারাও সেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে শক্তিশালী নহেন! বিশেষ এই চেষ্টার প্রথম ফল—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ ও বিবাদ। ভারতবর্ষে ধর্ম্মগত সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে অনল জাতীয়তাকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিষ্য পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতিকে লইয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাহার পর কি আবার আমরা নূতন সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি করিয়া বিপদের উপর বিপদের সৃষ্টি করিব? পণ্ডিত জওহরলাল কি বিষে বিষক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

পণ্ডিত জওহরলাল সোভিয়েট রুশিয়ার বিবরণ পাঠ করিয়াছেন,—অবস্থা অধ্যয়ন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এ দেশের সংহিতাসমূহ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। তাহা করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন, কত যুগের কত পরিবর্ত্তের মধ্য দিয়া সমাজের ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমাজ যে নানা জাতির বিজয়বাত্যা ও বিপ্লবের বন্যা সহ্য করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণ আছে। আজ যাঁহারা সহসা যে কারণ নষ্ট করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা কি তাঁহাদিগের দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন?

সমাজের যে গঠন জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর

করে, যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় রূপ পরিবর্ত্তন করে, তাহাকে সহসা বিনষ্ট করিলে অপকার অনিবার্য্য হয়।

মূল কথা—পণ্ডিত জওহরলাল যাহা চাহিতেছেন, তাহার মূলে রাজনীতিক ব্যাপার বর্ত্তমান। তিনি জাতীয়তাকে ছদ্মবেশ বলিয়াছেন। কিন্তু দেশ-প্রেম সকল সময় ছদ্মবেশ নহে—তাহা প্রকৃত উত্তেজক কারণ। তাহার যেমন সদ্ব্যবহার তেমনই অপব্যবহার আছে। বাস্তবিক—

"Patriotism, like other high and noble emotinal forces, may cause the most extreme and futile actions when misdircated in its aims."

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে আমরা এই কথা স্মরণ করিতে বলি।

আমাদিগের মনে হয়, ইহার পর পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার এই মত কংগ্রেসেও উপস্থাপিত করিবেন এবং কংগ্রেসকে তাহা গ্রহণ করাইবার চেষ্টাও করিবেন। যদি আমাদিগের এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইহাতে শঙ্কার বিশেষ কারণ আছে। কারণ, আজ রাজনীতিক বিষয়ে দেশের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। দেশের কাযও অল্প নহে। দেশের লোক যদি এই সময় গঠন-কার্য্য অবহেলা করিয়া ভাঙ্গিবার কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করেন, তবে তাহাতে দেশের অশেষ অকল্যাণই অনিবার্য্য হইবে।

যদি সাম্যবাদ প্রচারই পণ্ডিত জওহরলালের অভিপ্রেত হয়, তবে আমরা বলি, বাঙ্গালায় যিনি একদিন য়ুরোপীয় সাম্যবাদের আদর্শ তাঁহার বৈশিষ্ট্য সহকারে বিবৃত করিয়াছিলেন সেই বঙ্কিমচন্দ্রই বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সাম্যবাদ এখন প্রচারে সমাজের কল্যাণ ত হইবেই না—পরন্তু লোক ভুল বুঝিলে তাহাতে যথেষ্ট অমঙ্গল ঘটিবে। তাই তিনি তাঁহার সাম্যবাদ সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি আর প্রচারিত করেন নাই—সে সম্বন্ধীয় পুস্তিকাও প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলালের মত যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকারদিগের নিকট আপাতঃরম্য তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই জন্যই তাহাতে বিপদের সম্ভাব না অধিক। আমরা অনুরোধ করি, তিনি দেশে অর্থনীতিক নূতন নীতি প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে যেন দেশের সামাজিক ব্যবস্থা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন।

—

আশানন্দ স্মৃতি-স্তম্ভ :—

এক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-চরণ-রেণু-পূত পুণ্যভূমি শান্তিপুরে বীর আশানন্দ মুখোপাধ্যায় (ঢেঁকি) মহাশয় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক বীরত্বের ও পরোপকারের কথা এখনও আমাদিগের কাছে গল্প হইয়া আছে। এখনও কোথাও তাঁহার নাম হইলেই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই তাহা বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য-বিমণ্ডিত আনন্দের সহিত শুনিয়া থাকেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের এমন জিলা নাই যথায় আশানন্দ ঢেঁকির অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী কেহ জানেন না। তাঁহার স্মৃতি ও আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে সর্ব্বদাই জাগরূক রাখিবার জন্য শান্তিপুরে তাঁহার বাস্তভিটার উপর একটি "স্মৃতি স্তম্ভ" নির্ম্মিত হইতেছে। এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। আশানন্দ নদীয়া জিলার গৌরব; তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য সকলেই যে তৎপর হইবেন, সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ, "আশানন্দ-স্মৃতি-স্তম্ভ-সমিতি" আশানন্দপল্লী, শান্তিপুর পোঃ, জিলা—নদীয়া।

পরিকল্পিত স্মৃতি-স্তম্ভ

—

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী বড়দিনের অবকাশ-সময়ে গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বিগত কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গের বাহিরে এই সম্মেলন করিয়া আসিতেছেন; বাঙ্গালা দেশ হইতেও অনেক সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান

করিয়া থাকেন। এবার এই সম্মেলনের মূল সভাপতি হইবেন লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও সুকবি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়। আমরা এই উপযুক্ত সাহিত্যিককে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে অভিনন্দিত করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল; শেষ অধিবেশন তিন বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে হইয়াছিল। তাহার পর আর কোন সাড়াশব্দ নাই; পূর্ব্বের সেই আগ্রহ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনেরও সেই অবস্থা। এখন ঐ এক প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলনই চলিতেছে। আমাদিগের আশা আছে, এই সম্মেলনের অস্তিত্ব শীঘ্র লুপ্ত হইবে না, প্রবাসী সাহিত্যিকগণ সমান আগ্রহভরে বর্ষে বর্ষে এই সম্মেলনের আয়োজন করিয়া সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইবেন।

সন্ন্যাসীর তিরোভাব—

সংসারাশ্রমে শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত সন্ন্যাসী পরমানন্দতীর্থের তিরোভাব হইয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবাপ্রসন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। এক শিয়ারসোলের রাজপরিবারের উপদেষ্টারূপেই তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু অর্থে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। যে সময় তিনি ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন সেই সময়ে বৃন্দাবনে মোহান্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়েরই মত তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এই দুইজন ব্যবহারাজীবের ধর্ম্মপ্রাণতা ও ত্যাগ নব্য বাঙ্গালার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শিবাপ্রসন্ন যখন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠের মোহান্ত তাঁহার গুরু শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যু ঘটিলে তিনিই শিষ্যরূপে মধুসূদন তীর্থের শেষ কাজ সম্পন্ন করেন এবং জনগণ তাঁহাকেই মৃত শঙ্করাচার্য্য মহারাজের উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু কতকগুলি লোক এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত হয়। বিরক্ত পুরুষ ইহাতে প্রসন্নমনে গদী ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন এবং মনে করেন, দেবতা তাঁহাকে মঠের কার্য্যভার হইতে মুক্তি দান করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করিলেন। তদবধি তিনি বারাণসীতেই সাধনভজনে রত ছিলেন। তিনি আজ মহামুক্তি লাভ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার ত্যাগের ও ধর্ম্মপ্রাণতার দৃষ্টান্ত এই জড়বাদ জর্জ্জরিত যুগেও এই প্রদেশের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

নাজি অর্থনীতি

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ এম-এ

বহু দিন হইতেই একটা কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্" অর্থাৎ টাকা পয়সাই যত গণ্ডগোলের মূল। কথাটা যে এতই সত্য তাহা বুঝিলাম এই দুই চার বছর ধরিয়া। যাঁরা ভাল অর্থনীতিবিৎ তাঁরা ইহা ১০ বছর আগেই বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন। বিগত মহাসমর ও তৎপরবর্ত্তী ভার্সাই সন্ধি যে জগতের কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ অনর্থ আনিয়া ফেলিবে তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মোটের উপর, যেদিক দিয়াই হউক এই অনর্থ থামাইবার জন্য একদল লোক খুব উৎসাহের সহিতই সর্ব্বজাতি-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন। অনেক মারা-মারি কাটা-কাটির পর লোক বুঝিল যে মারা-মারি কাটা-কাটি করিয়া যতখানি শান্তির আশা করা যায় তা' সব মিলে না। কাজেই আপোষের মধ্য দিয়াই সম্ভোগ করিতে হইবে। অনর্থক লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় করার আর প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই পৃথিবীর অর্থনীতিতে যে এক প্রবল ধাক্কা লাগিয়াছে সে বিষয়ে আর কাহারও কোন সন্দেহই

নাই। এখনও পৃথিবীতে যে টাকা নাই তাহা নহে, কিন্তু সমর-ঋণের অছিলায় চঞ্চলা লক্ষ্মী গিয়া একেবারে ভাগ্যবান্ আমেরিকার হাতে পড়িয়াছেন। লক্ষ্মী একেবারেই চুপ্ করিয়া নাই। কিস্তীতে কিস্তীতে সুদ আদায়ের জন্ত মা লক্ষ্মী তাড়া করিতেছেন। কোন জাতি সুদ দিতেছে, কোন জাতি আংশিক দিয়া সাময়িক দুর্য্যোগ হইতে রক্ষা পাইতেছে। কোন জাতির দিবার একেবারেই ক্ষমতা নাই। কাজেই দুর্ব্বলের শেষ উপায় স্বরূপ সে তোড়জোড় করিয়া মালকোঁছা মারিতেছে।

যে সমস্ত জাতি সমর-ঋণের অছিলায় একেবারেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুর্ভাগা জার্ম্মানী একটি। যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মানী যেন একটি মুহূর্ত্তও সুস্থ নাই,—সর্ব্বদাই অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুতে পরিবেষ্টিত। ভিতরে কাহারা প্রধান হইবে সেই কলরোল ; আর বাহির হইতে "টাকা দাও, টাকা দাও" রব। জার্ম্মানীর দুরবস্থা অনেকটা ভারতের মত কি না জানি না। কিন্তু জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ এখনও অনেকটা অনিশ্চিত, কারণ, হার হিট্‌লার এখনও সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই।

যে সব রাষ্ট্রনীতিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া হার হিট্‌লার আজ জার্ম্মানীর ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছেন, সে সব ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। হার্ হিট্‌লার জার্ম্মানীর এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে। তিনি চান মধ্যবিত্ত লোকের জন্ত রাষ্ট্রনীতিক প্রাধান্ত। তিনি চান এক-দল লোক যাদের আদর্শ হইবে রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার প্রাধান্ত বিস্তারে সহায় হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এক কথায় হিট্‌লার চান গণতন্ত্রের নামে নিজের ও নিজের দলের লোকের প্রাধান্ত বিস্তার।

হিট্‌লার মুসোলিনীর শিষ্য, কাজেই ফ্যাসিষ্ট। ফ্যাসিষ্টবাদের ভূমিকা দিয়া মুসোলিনী বলিয়াছেন, "বহু শতাব্দীর পরাধীনতা শৃঙ্খল ফেলিয়া দিয়া ইতালী আজ ধীরে ধীরে জাগিতেছে। এ হেন জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেরূপ হইতে পারে, ফ্যাসিষ্টবাদ ঠিক্ তাহাই।" হিট্‌লারও ঠিক্ একটা প্রপীড়িত মধ্যবিত্ত জার্ম্মানীর মনোবৃত্তি লইয়া জাগিলেন। অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া হিট্‌লার চাহিলেন আপনার হস্তে রাষ্ট্রনীতিক অধিকার। তিনি অপরকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন না বটে, কিন্তু কাহাকেও প্রাধান্ত দিতে চাহিলেন না। তিনি চাহিলেন আর সকলকে তাঁহার প্রাধান্ত মানিয়া রাষ্ট্রাধিকার ভোগ করিতে। সরকারই জীবনে সব চেয়ে বড় জিনিষ। সকল কাজেই সরকারের অধীন থাকিতে হইবে এবং সরকারের সন্তোষের জন্তই যাহা কিছু করিতে হইবে। ইহাই হিট্‌লারের মনস্তত্ত্ব।

যাহারা অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে চায় তাহারা অপরকে একেবারে বাদ দিতে পারে না। অপরকে কিছু সুবিধা না দিলে তাহাকে কি করিয়া অধীন রাখা যাইবে ? কাজেই হিট্‌লার শ্রমিক ও ধনিক উভয়কেই একই রাষ্ট্রনীতিক অধিকার সমূহ দিলেন যাহাতে উভয় দলই তাঁহার হস্তগত থাকিতে পারে। ব্যবসা, বাণিজ্য হইতে একচেটিয়া ভাব তুলিয়া দিয়া সর্ব্বত্র আপাতঃ সমতা রক্ষা করিলেন। ইহার ফলে হিট্‌লারী দলের লোক সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মানীর সব কল-কারখানা ও কর্ম্মক্ষেত্র অধিকার করিতে লাগিলেন। সরকার তাহাদের পেছনে আছে। কাজেই তাহারা ধীরে ধীরে সর্ব্বক্ষেত্রে প্রাধান্ত বিস্তার করিতে লাগিল। অথচ কাহারও কিছু বলিবার নাই। সবই সমতার নামে করা হইয়াছে।

দেশে শত শত লোক বেকার। তাহাদেরও উপায় করিতে হইবে। তা' না হইলেও আবার একাধিপত্য থাকে না, কারণ, সেই অভুক্ত বেকারেরাই ত আবার প্রাধান্ত কাড়িয়া লইবে। কাজেই হিট্‌লার ভরসা দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, আগামী চারি বছরের মধ্যেই আমি সমস্ত বেকারকে খালাস করিব। সকলেই যাহাতে কাজ পায় আমি তাহা দেখিব। আমি সমস্ত জার্ম্মণদিগকে কাজ বাড়াইতে বলিতেছি।"

কৃষক কুলকেও হাতে রাখা চাই। নচেৎ সব চেয়ে বেশী মুস্কিল। তাহাদিগকেও আশ্বাস দিয়া হিট্‌লার বলিলেন, "আমি প্রথমেই কৃষক ও তাহার কাজকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইব। কারণ, আমি জানি যে আর্থিক সংস্কারের প্রথম সোপানই এই।"

হিট্‌লারের আবার লোক-নিন্দার ভয়ও আছে। তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি যে জগতের বিশেষ প্রীতিকর হইবে না সে আশঙ্কাও তিনি করেন। তাই তিনি সে কথাও বলিয়াছেন, "আজ যদি সমস্ত বিশ্বেই জার্ম্মানী ও জার্ম্মানীর কাজের নিন্দা উত্থিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জার্ম্মানবাসীর কর্ত্তব্য হইতেছে কেবলমাত্র জার্ম্মান শ্রমকেই সমর্থন করা। যদি তাহারা এ কথা অনুযায়ী কাজ করে, তবে অবশ্যই তাহারা লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ত কাজ যোগাড় করিতে পারিবে।"

হিট্‌লারের মনস্তত্ত্ব কি, কে বলিবে ? নেপোলিয়নের মত তিনি সমগ্র ইয়োরোপেই আপনার প্রাধান্ত বিস্তার করিতে চান কি না তা-ই বা কে জানে ? কিন্তু তিনি যে স্থানে স্থানে জার্ম্মান উপনিবেশের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন তাহা ত সুস্পষ্ট। তাঁহার হাতে জার্ম্মানীর কতদূর গতি ও কি পরিণতি হইবে তাহাও জানি না। তাঁহার এই ক্ষমতা-প্রিয়তা পৃথিবীবাসী ও জার্ম্মানবাসী সহিবে কি না কে জানে ? আমাদের জ্ঞানে জার্ম্মানীর ভবিষ্যত ঘোর কুয়াসাচ্ছন্ন। মোট কথা, নাজি অর্থনীতি ক্ষমতাপ্রিয়তারই একটা প্রয়োজনীয় উচ্ছ্বাসমাত্র বলিয়া বোধ হয়।

মাল্যাহতা

৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

মণির তরণী চন্দ্র স্তব্ধ নীলিমায়,
বিকীর্ণ শুক্তির মত তরুরাজি দূরে
মতিমালা ছায়াপথ সুদীর্ঘ রেখায়—
কে গেঁথেছে প্রাণ ভরি কোন্ মণিপুরে !

কৌতুকী কৌমুদী হাসে ঝরে বসুধারা—
চন্দ্রিকা চন্দন রসে দিগন্ত চিত্রিত,
চকোর-চকোরী দোঁহে মোহে আত্মহারা
কুরঙ্গ-মিথুন বনচ্ছায়াতে নিদ্রিত।

জোৎস্নার সমারোহ নীল বুকে ধরি,
বহিতেছে যমুনার অগাধ প্রবাহ
মধুর পঞ্চমে পিক উঠিছে কুহরি
দিকে দিকে পাখীদের কি গীতি-উৎসাহ।

মঞ্জু মল্লিকার গন্ধে মদকল শিখী,—
মাঝে মাঝে করিতেছে কেকা কলধ্বনি,
শিহরে অটবী রবে, ইন্দুচ্ছবি লিখি
শ্বেত কলাপীরা কোথা কাঁপায় অবনী।

ঊর্দ্ধলোকে শুভ্রদেহ দেবর্ষি নারদ
কচ্ছপী বীণায় গাঁথা মন্দারের মালা—
সুমধুর হরিনাম্ গানে গদ গদ
চন্দনচর্চ্চিত দেহ যেন সুধা ঢালা।

দূরে শোভে শিবালয় কুমুদ ধবল
জোৎস্না অমৃত স্নানে মুকুতা মসৃণ,
ভিতরে শঙ্কর মূর্ত্তি সু-স্নাত সজল,
শুধিছেন বর দানে ভক্ত প্রেমঋণ।

শুভ্র পুষ্পগুচ্ছ হাসে রত্ন দীপালোকে,
মসৃণ প্রাচীর লগ্ন ময়ুর ব্যজন,
ধূপের পবিত্র গন্ধ, চম্পকে অশোকে
বিল্বপত্র দ্রোণপুষ্পে পূজা আয়োজন।

বিচিত্র কাঞ্চন শ্রাবী, শ্বেতচ্ছত্র তলে
আধ আলো আধ ছায়া—প্রশান্ত মূরতি
নিমীলিত নত নেত্র, বদন কমলে
মুখশ্রিত সুধাময়, নিস্পন্দ যুবতী।

ধ্যানের বিভব মাঝে জ্ঞানের গরিমা,
প্রাণের আবেগ মাঝে পেয়েছে প্রকাশ
নারীত্বের দেবীত্বের নব মধুরিমা
লীলায়িত অঙ্গে অঙ্গে প্রসন্ন, সহাস।

হোথা ছায়ালোক ব্যাপ্তি রাজ-উপবনে
চারিদিকে বসন্তের পুষ্প-সমারোহ
তরুবীথি হিল্লোলিত কোমল পবনে
নবীন মুকুল ফুলে রতনের মোহ ?

মর মর তরুশাখা সর সর লতা
রজনী রহস্যধ্বনি মন্ত্রিত আঁধারে
শুনা যায় যমুনার কত কল কথা
কত মায়া ছায়াচ্ছবি দূরে পরপারে ?

পুণ্য পুঞ্জ শুভ্র দিব্য পাষাণ চত্বর,
কেতকী কুঞ্জের চারু ছায়াতে চিত্রিত,
সান্ধ্য মন্দ সমীরণে স্নিগ্ধ কলেবর,
দীর্ঘদেহী অজরাজ গভীর নিদ্রিত।

এখনো রয়েছে বুকে প্রিয়াদত্ত নিধি—
সান্ধ্য শুভ্র যূথিগুচ্ছ প্রণয়পরশ
যৌবন উৎসবপূর্ণ অনুকূল বিধি—
বিশ্ব যেন প্রেমকাব্য অমৃত সরস।

* * *

কেতকীচ্ছত্রের ছায়া, অকাল কুসুমে,
পরিব্যাপ্ত রেণুজালে মদগন্ধময়
সুন্দরীরে ধরি বুকে স্তব্ধ বনভূমে
চাহিল চপল নেত্রে স্পন্দিত হৃদয়।

রাণীরে রাখিয়া পাশে শিলাসনে বসি
আত্রানিল মুখপদ্ম মুগ্ধ নেত্রে চাহি,
মোহিনীরে মোহে ভরা রোহিণীর শশী
চিত্ত যেন বিত্তময় প্রেমে অবগাহি।

এই নিত্য প্রেমোৎসব যৌবন স্বপন,
দুর্ব্বার পৌরুষ মাঝে সুখ অনুপম
প্রেমে নিবায়েছি জ্ঞান, ও দেহ রতন
মঞ্জু মুদিতার মাঝে উষা মনোরম।

"প্রিয়তম" কণ্ঠবীণা উঠিল বাজিয়া
আনন্দের মাঝে মৃদু করুণা বেদনা
"এই দিব্য প্রেমালোকে রমণীর হিয়া
কত যে গর্ব্বিত সুখী কি করে অজনা।

"তব প্রেম মুকুটিত এ সৌভাগ্য মম ;
জীবন আমার প্রিয় মধুর উজ্জ্বল ;

দুর্লভ গৌরব মোর সার্থক জনম ;
প্রেমতীর্থ তব রাজচরণ কমল।

তবু যেন মনে হয় আমার জীবন
যেন কবে কার ক্ষুদ্র বিস্মিত স্বপন
তারা মাঝে পথহারা ছায়ার মতন
একাকিনী করি যেন রতনে চয়ন।"

মন্দার মালিকাঘাতে চকিতা সুন্দরী
"আকাশ কুসুমমাল্য! এরা কোন্ ফুল?"
শিহরিল কলেবর মণির মঞ্জীর
সহসা ঝরিল এ কি স্বপনের ভুল?

এ কি মূর্চ্ছা, এ কি মৃত্যু, এ কি দৈবীমায়া!
প্রিয়া মোর গেল চ'লি পুষ্পমাল্যাহতা!
বসন্তে ব্যপিল দিন মহা মেঘচ্ছায়া!
ওগো প্রিয়া কথা কও, কহ কহ কথা।

চন্দ্রিকা মিলাল চারু চন্দ্রের হৃদয়,
তন্ত্রী বেপনার মাঝে মধুরা রাগিণী ;
ফলিল ঋষির শাপ মাল্যাহতা হয়ে
মরিল পতির কোলে পতি সোহাগিনী।

চূর্ণ স্বর্ণপাত্র, আহা, লুপ্ত সুধারাশি ;
রাজ-কামনার মাঝে যমদণ্ড জলে,
দগ্ধ বক্ষ শোকদীর্ণ, ফুরাইল হাসি।
কমল নয়ন পূর্ণ তপ্ত অশ্রু জলে।

রত্নাঙ্কিতা তনুলতা, নিটোল যৌবন,
মৃত্যু-মৌনা মাল্যাহতা, আনন্দ-প্রতিমা ;
দুর্ব্বার এ মহাশোক শোকার্ত্ত বচন
নদের গদ্গদনাদ ঢালে মাধুরিমা।

কভু বা বিভ্রমবশে, অভিমান করি,
কহে কত প্রেমকথা, হৃদিরসায়ন
বিদীর্ণ মন্দরগিরি, উন্মদা নির্ঝরী,
উপল ব্যথিত গতি করে কলস্বন।

কুঞ্জ পুঞ্জ ঝঙ্কারিত অজের বিলাপে
মৌনশুক মৌন পিক প্রচ্ছন্ন কলাপী
খসিছে মঞ্জরী-মালা শুষ্ক মনস্তাপে
উন্মাদিনী প্রতিধ্বনি শোকে উঠে কাঁপি।

তব প্রেম পুণ্যপুঞ্জ ও পুণ্যবতীরে
মরণ বরণ করি নেছে পরলোকে
শুনি ঋষিসুত-মুখে মন্দাকিনীতীরে
ছিলেন অপ্সরী দেবী, শাপগ্রস্তা শোকে?

শাপমুক্ত দেবী নিজে তাপযুক্ত মোরা
কাঁপে না যমের দণ্ড ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে
শরীরিণী প্রেমমূর্ত্তি কুলিশ-কঠোরা
নহে সে মহিষী কিবা কব পৃথ্বীনাথে।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আপ্রান্ত আলোড়িত সাগর জল কিছুতেই যেন শেষ মানিতে চাহেনা। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলনা, দুর্ব্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতে ঘুচাইতে পারেননা, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে। তাই বোধহয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল,—বোধহয় যা' মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

—ভালো আছি।

—জ্বর আর হয়নি?

—না, আমি ত টের পাইনি।

—ডাক্তার এখনো আসেননি?

—না, তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কই, রাখালবাবুকে ত দেখচিনে? তিনি কি বাড়ী নেই?

—না, তিনি পড়াতে গেছেন।

—তোমার বাবা?

—তিনি সকালে বেরিয়েছেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইলনা। শেষে অনেক সঙ্কোচের

পরে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু?

—চিনবো কি করে আমার ত মুখ মনে নেই।

—বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা' পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচিনে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নাম আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনো বলেননি?

—না। এসব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইলনা। মিনিট খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোবার জল এনেচি উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তাহার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট কয়েক প'রে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং সুমুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের যায়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোন দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন, আপনি চার-পাচ দিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোর-জলে লুটোপুটি করে একাকার হয়েছে—সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদা দিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু, আমার এ রকম শক্ত হলো কেন মা? ছেলেবেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড্ডো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের জ্বরে তাহার এলো-মেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তেমনি অবিশ্রান্ত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হোক কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিলনা; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাঁহার অজানা নয়।

এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন, মেয়ে তাঁহাকে নীচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধিগে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

—যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা'হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো। না খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

—নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্ব্বল, এখনো যে পথ্যিও করোনি।

রেণু বলিল, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি, আজ আর কিছু খাবোনা। একটু দুর্ব্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এত-গুলি লোকে খেতে পাবেনা যে। তাছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্চো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা, ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ-কথার উত্তর আসিল না, সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে তো রেণু।

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না বোধ হয় হবে না,—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো

সারদা দিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উত্তরেই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সাবাক্‌ই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত আট দিনের উপবাসে একান্ত দুর্ব্বল। মেয়েটা মরিয়া মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ জীবনের পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধকরি সবিতার আর কিছুতে মিলিতনা যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পূজো আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদা দিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন উপোস করে থাকলেই আর দোষ হয়না। সত্যি নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্ম অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাহিতেননা, অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেননা।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মা'র বেলা সইতনা, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে দেশের বাড়ীতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতোনা, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নেই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেননি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

—হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

—তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন' বছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে,—পারবে ত মা? বললুম পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পূজো না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই বাড়ীতে না-খেয়ে থাকি। কিন্তু আজ থাকতুমনা মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিলনা ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্ম্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটা কথারও উত্তর দিলেননা। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়মপালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকুই বা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্যক্ত-চিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়ত বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনায় বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটি হয়ত তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্ত্তের জন্মও বুঝে নাই, তাঁহার কতদিনের কত সুখ-ভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তিহীন দিন, কত বেদনা-বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোপন-স্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দুটি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্যার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দ্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জন্ম? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে

বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে সে দোষ কি তাহাকে দিবার? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার। অধর্ম্মের মার যে এমন নির্দ্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্ত্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া আর সে উপলব্ধি করে নাই। গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে তাহার নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতীকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর? কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না!

—মা, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্ত্তের জন্ত সে সমস্ত বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত দেরি করলে যে? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভ ভাবে বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন, সবিতা বলিলেন, কিন্তু আর বেলা করতে পাবেনা। ঠাকুর পূজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি!

—তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দেতো মা আমার গামছাটা, জামাটা ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

—না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আমি তামাক সেজে দিই।

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের ওপর এত দরদ আর কারও হয়না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠক্‌লে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিলেন, ঠক্‌তে আপত্তি নেই মেজকর্ত্তা, কিন্তু এ-ই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগেনা মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে?

—হাঁ।

—মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনিত?

—না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরিবের ঘর, কিছুই নেই। হয়ত তোমার কষ্ট হলে নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, সে হবে না মেজকর্ত্তা, তুমি আমাকে কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবুর মুখ দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বল্‌ছিলুম আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে!

সবিতা কহিল, দেখা দরকার মেজকর্ত্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকত। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধহয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেননি। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জ্জনা করেন না মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

—কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

—তা' জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধকরি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

—দিলেন?

—কি জানো—

—সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্ম্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েছে যে মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠেনা। তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েছে ভাইপো'দের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

—সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবোনা। নন্দ সা'কে আমি ভুলিনি।

—কি করবে,—নালিশ?

—হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখ্‌ছি এক তিলও বদলায়নি।

—কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে না কি? দুঃসময় কার বেশি তোমার চেয়ে? কিন্তু কা'কে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দ্দক দিয়ে শেষ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত আদায় দিয়ে তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

—তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

—রাগ ত নয় আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-স্বজন—কর্ম্মচারী,—স্ত্রী পর্য্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লেনা। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনেনা, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবু বহুদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙায় তুলিয়াছিল। বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেছে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাব্‌বে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়ত গয়ায় পিণ্ড দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিল, তারা যা' ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু, তুমি পিণ্ডি দিতে না ছুটলেই হলো—ঐখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবেনা ত সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

—উত্তর দিলেনা যে?

ব্রজবাবু আরও কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। অপরাহ্ণ সূর্য্যের কতকটা আলো জানালা দিয়া মেঝের উপর রাঙা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি সবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এর মতোই আমার বেলা পড়ে এলো নতুন-বৌ, পাওনা বুঝে নেবার আর সময় নেই। কিন্তু তুমি ছাড়া এ সংসারে বোধহয় আর কেউ নেই যে বোঝে আমি কত ক্লান্ত। ছুটির দরখাস্ত পেশ করে বসে আছি, মঞ্জুরি এলো বলে। যা নিয়েছি যা দিয়েছি তার হিসেব নিকেশ হয়ে গেছে। হিসেব ভালো হয়নি জানি, গোঁজামিল অনেক রয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার জের টানতে আর আমি পারবনা। তোমার এ অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।

সবিতা একদৃষ্টে চাহিয়া শুনিতেছিল স্বামীর কথাগুলি, শেষ হইলে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আর পারবেনা মেজকর্ত্তা? সত্যিই কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচো?

—সত্যই বড় ক্লান্ত নতুন-বৌ, সত্যিই আর পারবোনা। কতো যে ক্লান্ত সে তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবেনা; তারা বলবে আলস্য, বলবে জড়তা, ভাববে আমার নিরাশার হা-হুতাশ। তারা তর্ক করবে, যুক্তি দেবে, মেরে মেরে এখনো ছোটাতে চাইবে—তারা এই কথাটাই কেবল জে'নে রেখেচে যে কলে দম দিলেই চলে। কিন্তু তারও যে শেষ আছে এ তারা বিশ্বাস করতে পারেনা।

—আমি বিশ্বাস করলে তুমি খুসি হবে?

—খুসি হবো কি না জানিনে কিন্তু শান্তি পাবো।

—কি এখন করবে?

—রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাবো। সেখানে সব গিয়েও যা বাকি থাকবে তাতে কোনমতে আমাদের দিন-পাত হবে। আর যারা আমাদের ত্যাগ করে, কলকাতায় রইলো তাদের ভাবনা নেই, সে তো তুমি আগেই শুনেচো।

—রেণুর ভার কাকে দিয়ে যাবে মেজকর্ত্তা?

—দিয়ে যাবো ভগবানকে। তাঁর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই, সে আমি জেনেচি।

সবিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ভগবানে তাহার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অতবড় নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হইতেও পারেনা। শঙ্কায় বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিয়া উঠিল কিন্তু, ইহার উত্তর যে কি তাহাও ভাবিয়া পাইলনা। শুধু যে-কথাটা তাহার মনের মধ্যে অহরহ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল তাহাই মুখে আসিয়া পড়িল, বলিল, মেজকর্ত্তা, আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে কি আমার অপরাধের দণ্ড দিতে? প্রতিশোধের আর কি কোন পথ তুমি খুঁজে পেলেনা?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও? আমাদের রতন খুড়ো আর রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছো?

এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে কহিল, ছি ছি কি কথা তুমি বলো!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো ? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো ?

কথাটা এত হাস্যকর যে বলা মাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিল, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল এইটুকুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমোট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি ? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে সেইদিনই আমি স্থির করেছিলাম আবার যদি কখনো দেখা হয় তোমার যা কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই, নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেনরা উভয়ের দেখা হয়,—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিল, আমি বুঝেচি মেজকর্ত্তা। ইহ-পরকালে আর যেননা তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়,—এই ত ?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে-আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর সে চাহিয়া দেখিতেও পারিলনা, নতনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমরা কবে বাড়ী যাবে মেজকর্ত্তা ?

—যত শীঘ্র পারি।

—এখন যাই তবে ?

—এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ-স্তূপ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল আজও সে তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্দ্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে আজিকার পূর্ব্বে এ কথা সে কবে ভাবিয়াছিল !

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াও সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মুক্তি পাবেনা মেজকর্ত্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আমাকে পারলেনা। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়ত তা জানতে পাবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময়ে রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল কিন্তু কিছু বলিলনা। এই নীরবতার মন্ত্র সে-ও হয়ত তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমরা বাড়ী চলো। (ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পথের পথিক"—১।•
শ্রীঅনুরূপা দেবী প্রণীত নাটক "নাট্যচতুষ্টয়"—১৲
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ"—।৵•
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত "বাংলা সাময়িক পত্রের তালিকা"—৷৶•
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রণীত ইংরেজী ভাষায় "দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের জীবনী"—১।•
শ্রীঅনীবাধব চৌধুরী প্রণীত "যোগাযোগ গল্প"—১।•
শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "অপেরার গল্প"—১৲
শ্রীব্রজমোহন ভৌমিক প্রণীত "শঙ্করাচার্য্য"—২।•
শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত "সরল পোল্ট্রী পালন"—১৲
আবুল কালাম মোহাম্মদ সামছুদ্দীন প্রণীত "কলিকাতা"—।•
মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রণীত "দুনিয়ার মুসলিম নারী"—৷৷•
শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "একাকিনী"—১৲
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "ঝড়ের যাত্রী-মেঘ"—।৵৹
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্য "লক্ষ্মীছেলে"—।৵•
শ্রীতারক গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "রূপকুমারী"—।/•
বন্দে আলী প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "মৃগপক্ষী"—।•
শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্য "নারী"—৷৷•
আবদুর রউফ প্রণীত উপন্যাস "পথের ডাকে"—৷৷•
শ্রীমৎ স্বামী সত্যধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "জাতি কথা"—/•
জনৈক লেখিকার লিখিত উপন্যাস "মহিলা মজলিস"—১।•
শ্রীবিমলচন্দ্র সী প্রণীত উপন্যাস "আলো-ছায়া"—১৲
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "যাযাবর"—১৲
শ্রীপূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "দিশেহারা"—১৲
শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম-এ, বি-এল প্রণীত "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"—১৲
শ্রীনির্ম্মল বসু প্রণীত ছেলেদের একত্রে "বীর শিকারী" ও "কুলের ঠাকুর্দা" প্রত্যেকখানি—।

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
The Bharatvarsha Printing Works.
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.